প্রভাত সঙ্গীত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রবিচ্ছায়া।

(সঙ্গীত)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

শ্রীযোগেন্দ্র নারায়ণ মিত্র কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

নং বেনেটোলা লেন আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত

বৈশাখ ১২৯২।

রাজর্ষি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রুদ্রচণ্ড

(নাটিকা)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

কলিকাতা।

ভগ্নহৃদয়।

(গীতিকাব্য)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

কলিকাতা

ছবি ও গান।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন্ধ্যা সঙ্গীত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা।

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রবীন্দ্র-সাহিত্য

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্য এবং গদ্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের পরিচয়-পত্র। গ্রন্থ কয়খানি শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং শ্রীঅমল মিত্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত

রাজা ও রাণী।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাযাবর

আখ্যান

প্রসাধন শেষে ধীরে ধীরে অভিনয়ের জন্য বেশ পরিবর্তন করলেন মলী সেন। কানের ইয়ারিং খুলে ফেলে পরলেন কুণ্ডল। কণ্ঠে সরু চেনের বদলে চওড়া হীরার কণ্ঠি। চরণে বাজল নুপুর, বাহুতে উঠল মনিবলয়, নিতম্বে দুলিয়ে দিলেন মুক্তার ঝালর-যুক্ত চুনীপান্নার মনোরম অলঙ্কার। আধুনিক কালের মিসেস্ সেন বসনে-ভূষণে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হলেন অতীত কালের রাজকন্যা মঞ্জুশ্রীতে। অঙ্গে তাঁর নীলাম্বর, বক্ষে তাঁর রক্তাংশুক, ঘনকৃষ্ণ কবরীবন্ধনে প্রস্ফুটিত শ্বেত করবীগুচ্ছ।

ঘড়ির পানে তাকিয়ে দেখলেন সাতটা বেজে দশ মিনিট। এখনও মিনিট কুড়ি সময় আছে। ইজি-চেয়ারটাতে দেহ এলিয়ে দিলেন। অভিনয়ে নিজ ভূমিকাটি উপলব্ধির চেষ্টা করলেন মনে মনে।

কিন্তু মন নিবিষ্ট করা কঠিন হলো। হঠাৎ শোনা গানের ভালো-লাগা সুর যেমন পুরোপুরি আয়ত্তে আসে না অথচ কেবলই ঘুরে-ফিরে কানে বাজতে থাকে, শচীনের মার প্রসঙ্গও তেমনি মলী সেনের মনে পড়তে লাগল ক্ষণে ক্ষণে। দুঃখের অনল এই বঞ্চিতা রমণীকে অঙ্গারের মতো মলিন করেনি, স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল করেছে। তিনি নিঃস্ব হয়েছেন, কিন্তু নিঃশেষ হননি। মন তাঁর বিক্ষোভে তিক্ত নয়, ঔদার্য্যে প্রশান্ত। বিধবার এই সৌম্য স্নিগ্ধ রূপটি মলী সেনকে একাধারে বিস্মিত ও আকৃষ্ট করল।

হঠাৎ চেয়ে দেখলেন [illegible] দাঁড়িয়ে মান্নামাসি।
তিনি [illegible] ঘুমিয়ে পড়েছিলে
না [illegible] কী? যা খাটুনিটা
[illegible] পারছ, অন্য আর
[illegible] বললেন, "না,
[illegible] অন্যমনস্ক হয়েছিলেম।

"খবর বিশেষ কিছু নয়। আসছে বুধবার গৌরীর জন্মদিন। গুটি দুই-তিন বন্ধুবান্ধবকে চা'য়ে ডাকব ভাবছি। নিখিলকে আসতে বলব, তোমার সুবিধে হবে কী?"

মান্নামাসির জিজ্ঞাসায় মলী সেনের প্রতি কোন গূঢ় ইঙ্গিত ছিল কি না তা তিনিই জানেন। অন্য সময়ে মলী সেনও এতে রাগ করতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে মলী সেনের মনের তন্ত্রীগুলি একটি বিশেষ স্বরগ্রামে বাঁধা ছিল। প্রশ্নটা সেখানে যেন অকস্মাৎ মুষ্টিঘাতের মতো বাজল। বললেন, "মিষ্টার রয়কে তুমি নিমন্ত্রণ করবে, তার সঙ্গে আমার সুবিধা অসুবিধার সংশ্রব কী?"

নীরবে পরাজয় স্বীকার করবেন এমন পাত্রী মান্না-মাসিও নন। তিনি শ্লেষের সঙ্গে জবাব দিলেন, "কী জানি ভাই, সে তো আমিও ভাবি। কিন্তু লোকে বলে, আজকাল মিষ্টার রয়ের নাকি নিজের মত বলে কিছুই নেই। তাই ভাবলেম—"

মলী সেন বাধা দিয়ে কঠিন স্বরে বললেন, "লোকে কী বলে না বলে, তা আমাকে শোনাবার দরকার নেই। তুমি কাকে নিমন্ত্রণ করবে না করবে, সেও তোমার ভাবনা। এ নিয়ে আমি আর কোন বাদানুবাদ করতে চাইনে, মান্নামাসি।"

"তুমি অন্যায় রাগ করছ, মলী। আমি না হয় চুপ করেই রইলেম। কিন্তু তাই বলে মেজাজ দেখিয়ে তো আর পাঁচজনের মুখে চাপা দিতে পারবে না ভাই। তাদের তো চোখ-কান দুইই আছে। তা যাকগে, জেনে সুখী হলেম যে, মিষ্টার রয়কে অন্য কারো অনুমতি নিয়ে চলতে হয় না।"

একটু অর্থমূলক হাস্য করে মান্নামাসি ড্রেসিং রুম থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

বিরক্তিতে ছেয়ে গেল মলী সেনের মন।

প্রবেশ করল সমীর। মলী সেন তাকে দেখে একটু বিস্মিতই হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কী সমীর, কী চাই?"

"আপনি আমার এ্যালবামটা দেখতে চেয়েছিলেন, তাই সেটা নিয়ে এসেছি।"

"এরই মধ্যে? কোথায় ছিল এটা?"

"হেদোয় আমার মাসির বাড়িতে, যেখানে আমি উঠেছি।"

"সেখান থেকে আনলে কখন?"

"এক্ষুনি। একটা ট্যাক্‌সি নিয়ে গেছিলেম।"

নিমেষে সমস্ত ব্যাপারটা মলী সেনের কাছে বালোকের মতো স্বচ্ছ হয়ে দেখা দিল। পরিচিত হলে নিজ ভক্তজনের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অতীতে বহু ন তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। এই প্রথম যেন াপন অনিন্দ্য দেহশ্রীর জন্য লজ্জা বোধ করলেন। পুরুষের কাছে তার অপ্রতিরোধনীয় আকর্ষণের কদর্য্যতা এমন পরিপূর্ণ নগ্নতায় এর আগে আর কোন দিন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়নি। তিনি নত-মস্তকে কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করলেন। তারপর স্নেহ-কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "ধীরা কোথায়? জান না? আচ্ছা চল, আমি দেখছি।"

ষ্টেজের গলি-পথটায় প্রেক্ষাগৃহ থেকে ধীরাকে ডাকিয়ে এনে বললেন, "কোথায় ছিলি এতক্ষণ? সামনের ঐ সারি ছুটো গেষ্টদের জন্যে। সমীরকে নিয়ে ওখানে বোস গে যা। সমীর, তুমি থিয়েটার শেষ হলে, আমার গাড়ীটা নিয়ে ধীরাকে বাড়ী পৌঁছে দিও। ভালো কথা, এ হপ্তার কী সিনেমা দেখেছ? কিছু দেখনি? আচ্ছা, তা হলে পরশু ম্যাটিনীতে ছুজনে টারজান দেখতে যেও। আমি টিকিট আনিয়ে রাখব।"

পাশাপাশি ছুখানি আসনে ছুজনে বসল। কিন্তু এই ছুটি কিশোর প্রণয়ীর যে সান্নিধ্য ইতিপূর্ব্বে পরস্পারের হৃদয়কে উদ্বেল ও রসনাকে মুখর করেছে আজ তার মধ্যে মাধুর্য্যের লেশমাত্র সন্ধান পাওয়া গেল না। ধীরা ষ্টেজের উপরে নীল ভেলভেটের যবনিকার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে রইল। আড়ষ্ট নিঃশব্দ। অবশেষে অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে সমীর প্রশ্ন করল, "সুরু হবে কখন?"

ধীরা জবাব দিল, "সাতটায়।"

"থিয়েটার ভাঙ্গবে কখন?"

"জানিনে।"

এ রকম প্রশ্নোত্তরের দ্বারা আদালতে জেরা করা হয়তো যায়। কথাবার্ত্তা চালানো যায় না। তবুও আবহাওয়াটাকে সহজ করার চেষ্টায় সমীর ঠাট্টা করে বলল, "এ্যামেচার থিয়েটার দলের শুনেছি সময়ের জ্ঞান থাকে না। তোমাদের নাটকের আরম্ভ সেভেন পি-এম না সেভেন এ-এম?"

অপর পক্ষ থেকে এই পরিহাসের যথোচিত সাড়া পাওয়া গেল না। সে হাতের ঘড়ি দেখে বলল, "আর মিনিট পনর পরে।"

সমীর জিজ্ঞাসা করল, "তোমার হলো কী? হঠাৎ এমন গম্ভীর কেন?"

ধীরা তার পানে না তাকিয়ে পূর্ব্ববৎ নির্লিপ্ত কণ্ঠেই জবাব দিল, "না, গম্ভীর কিসের?"

সমীর বিরক্ত হয়ে মনে মনে বলল, "খামোকা মুখ গোমড়া করে বসে থাকতে ভালো লাগে তো, থাক না। ভারি আমার বয়েই গেল।" সে আর কোন কথা না বলে হাতের প্রোগ্রামটির পাতা বার বার উল্টে পাল্টে পড়তে লাগল সিগারেটের বিজ্ঞাপন, অভিনেতা অভিনেত্রীদের নাম, কর্ম্মকর্ত্তাদের তালিকা।

নিজের সজ্জাকক্ষে ফিরে এসে মলী সেন যাঁকে দেখতে পেলেন তাঁকে কিছুমাত্র প্রত্যাশা করেননি। তিনি আর কেউ নন; তাঁরই স্বামী শিবনাথ।

শিবনাথ বললেন, "সিন্দুকের চাবিটা একবার দরকার।"

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একমাত্র প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ ব্যতীত বাক্যালাপ খুব সামান্যই ঘটে। দীর্ঘকাল থেকে এই নিয়মেই তাঁরা অভ্যস্ত। তবুও এই মুহূর্ত্তে ঠিক এই কথাটার জন্যে যেন মলী সেন প্রস্তুত ছিলেন না। গিরিবালার মতো তারও মনে হলো, হায়, এই উৎসবের সন্ধ্যা, এই উজ্জ্বল দীপালোকিত অপরিসর সজ্জাকক্ষ, এই অপূর্ব্ব রাজনন্দিনীর বেশ, এই স্বপ্নময় পরিবেশে যে কথা প্রথম মনে আসে সে কি সিন্দুকের চাবি! মোহ নয়, সুধা নয়, ক্ষণিক মাধুর্য্যের সামান্য ইঙ্গিতটুকুও নয়? আপন বক্ষে উদ্‌গত দীর্ঘনিঃশ্বাস সবলে দমন করে নিঃশব্দে ব্যাগ থেকে চাবির গোছাটা শিবনাথের হাতে দিলেন মলী সেন।

শিবনাথ মিনিট খানেক কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, "তোমার খান কয়েক গহনা দিতে পার দিন ছুই-তিনের জন্য? বিশেষ জরুরী।"

মলী সেন বললেন, "গহনা সমস্তই সেফ্‌-ডিপজিটের লকারে। তার চাবি সিন্দুকের ভিতর আছে। খুলে যা দরকার নিতে পার।"

শিবনাথ ব্যাখ্যা করে বললেন,—"আমার

নগদ টাকা সব কুড়িয়ে গুছিয়েও বোধ হয় হাজার খানেকের বেশী হবে না। এই রাত্তিরে আরও সাত হাজার টাকা খালি হাতে যোগাড় শক্ত। তাই কয়েকটা গহনা বাঁধা রেখে এখন টাকাটা নিচ্ছি। সোমবারে ব্যাঙ্ক খুললেই তোমার গহনা ফিরে পাবে।"

মলী সেন জিজ্ঞাসু নেত্রে শিবনাথের পানে তাকালেন। শিবনাথ বললেন, "টাকাটা নিয়ে আমাকে এখনই রওনা হতে হবে। ছবি তোমার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে।"

শিবনাথ প্রস্থানোদ্যোগ করতেই মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি যাচ্ছ কোথায় ?"

"আসানসোলে। ছবির কাছ থেকে এইমাত্র খবর নিয়ে লোক এসেছে। দেবেন তাদের আপিসের ক্যাশ ভেঙ্গেছিল, ধরা পড়েছে।"

ক্ষণেক নীরব থেকে মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "কাল সকালে সেখানে গেলে ক্ষতি কী ?"

"ক্ষতি অনেক। আপিসের বড় সাহেবকে অনেক বলে-কয়ে রাজী করানো গেছে, আজ রাত্তিরেই টাকাটা দিয়ে দিলে আর পুলিশে জানাবে না।"

"পুলিশে জানায় তো জানাবে। টাকা চুরি যে করেছে, তার শাস্তি সে পাবে। সেই শাস্তি থেকে তাকে বাঁচানোটাই অন্যায়।"

"তোমার বোন নেই। থাকলে জানতে পারতে যে ভগনীপতিকে জেলে পাঠানোটাই সংসারে সব চেয়ে বড় ন্যায় নয়।"

বোন না থাকলেও সে কথা মলী সেন বোঝেন। ছবিকে তিনি নিজেও স্নেহ করেন। তাই মনে মনে লজ্জিত হলেন। তাঁর আপত্তি তো সাহায্য দানে নয়। তিনি বললেন, "আর মিনিট কয়েক পরেই অভিনয় সুরু হবে, এখন তুমি চলে যাবে, সে কি করে হয় ?"

শিবনাথ জবাব দিলেন, "না হওয়ার তো কোন কারণ দেখছিনে। অভিনয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ যে কোনখানে সে তো আমি ভেবে পাইনে।"

"যোগাযোগ নেই, সে কথা সত্য। কিন্তু সেটা ঘটা করে প্রচার করারই বা সার্থকতা কী ?"

"প্রচার করা যেমন অনাবশ্যক, ভান করাও অনুচিত।"

অত্যন্ত মহৎ মনোভাব, সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও এমনই অদৃষ্টের খেলা যে, গত পনরটা বছর ধরে অহোরাত্র শুধু ভান করেই কাটাতে হচ্ছে !"

নির্ম্মম, নির্ভেজাল সত্য ! শিবনাথ হৃদয়ঙ্গম করলেন। তাইতো, ভান তো তাঁকেও কম করতে হয় না। জগতে বহু মনোবেদনারই লাঘব আছে সমবেদনায়। কিন্তু স্বামী বিমুখ বা স্ত্রী অননুরাগিনী প্রাণান্তেও এ দুঃখের প্রকাশ চলে না কারো কাছে। আত্মীয় পরিজনের কাছে, বন্ধুবান্ধবের কাছে, সমাজের কাছে অসুখী দম্পতীরা তাই নিরন্তর গোপনের প্রয়াস করে তাদের বিড়ম্বিত জীবনের দুঃসহ দুঃখভার। ভান করে,—সুখী, স্বাভাবিক, সম্মিলিত জীবন-যাত্রার। শিবনাথও তার ব্যতিক্রম নন।

শিবনাথকে নিরুত্তর দেখে মলী সেন মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "বন্ধুবান্ধব, নিমন্ত্রিত, অভ্যাগত সব এসেছেন। তোমাকে না দেখতে পেলে তাঁরা কী ভাববেন ? তাঁদের প্রশ্নের আমি কী উত্তর দেবো ? দোহাই তোমার, সবার কাছে এমন ভাবে আমার মাথা হেট করে দিও না।"

শিবনাথ স্থির কণ্ঠে বললেন,—"ছবির এই বিপদের সময়ে এ সব তুচ্ছ কথা ভাববার নয়।"

মলী সেন দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করে বললেন, "আমার সমস্ত কথাই তোমার কাছে তুচ্ছ। আচ্ছা, সামান্য একটা পাখি পুষলে তার প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ থাকে আমার সম্পর্কে তোমার তাও নেই ?"

শিবনাথ বললেন, "এতকাল পরে নতুন করে এ সব কথা আলোচনায় আজ আর কোন ফল আছে কি ?"

"না, নেই। তবুও একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, —তুমি বিয়ে করেছিলে কেন ? আমি তোমার কি ক্ষতি করেছিলেম ? আমার এত বড় সর্ব্বনাশ তুমি কেন করলে ?" ক্ষোভে ও বেদনায় মলী সেনের কণ্ঠ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

অত্যন্ত সঙ্গত প্রশ্ন। দুরূহও বটে। শিবনাথের দিক থেকে কোন জবাব ছিল না।

কাতর কণ্ঠে শিবনাথ বললেন, "তোমার ক্ষতি করেছি, সে কথা ঠিক। কিন্তু বিশ্বাস কর মলী, অন্যায় যা করেছি, সে ভুল করে করেছি। না বুঝে করেছি। ইচ্ছে করে নয়।"

"ভুল করেছ জেনে আমার লাভ কী ? আমার

জীবনটাকে যে এমন করে ব্যর্থ করে দিলে তা কি শুধু 'সরি' বললেই চুকে যায় ভেবেছ ?"

"কোন দিন তা ভাবিনি। মলী, তোমার দুঃখ অনেক। কিন্তু আমার মনস্তাপ যে তার চাইতে ঢের বেশী। তুমি তবুও নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য আমাকে দোষী করে মনে কিছু সান্ত্বনা পাও। আমি দোষ দেবো কাকে ? নিজের জীবনকে বিড়ম্বিত করেছি তার বেদনা মর্ম্মান্তিক। তোমার জীবনকে নষ্ট করেছি তার অনুশোচনা দুঃসহ। তুমি বিশ্বাস করবে না মলী, অনুতাপের পীড়নে দিনে মুখে আমার অন্ন রোচে না, রাত্রিতে চোখে আমার ঘুম আসে না।"

শিবনাথের কণ্ঠের আন্তরিকতা মলী সেনের হৃদয় স্পর্শ করল। তিনি কি বলবেন ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইলেন।

শিবনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "মলী, আমি মূর্খ, হঠকারিতা করেছি। কিন্তু তুমিই বা ভুল করতে গেলে কেন ? তোমাদের সমাজে তো মা-বাবার নির্দ্দেশে গৌরীদান হয় না। মেয়ের মত নিয়েই সেখানে পাত্র স্থির হয়। তুমি কেন আপত্তি করলে না ? আমাদের রীতিনীতি, আবহাওয়া, পরিবেষ্টন কোন কিছুই তো তোমার অনুকূল ছিল না।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মলী সেন বললেন, "আমার মত না নিয়ে বিয়ে হয়নি, সে কথা সত্য। বাবার তখন অত্যন্ত সঙ্কট যাচ্ছিল। শেয়ারের বাজারে হঠাৎ অনেক টাকা লোকসানে ঋণে তিনি আকণ্ঠ ডুবে ছিলেন। সে কথা ঘুনাক্ষরে কাউকে জানতে দেননি। ঠিক সেই সময়ে তোমার বাবা এই বিয়ের প্রস্তাব করেন। প্রথমে আমার বাবার মত ছিল না। কিন্তু বিয়ে হলে আমার বাবার কারখানা ও ব্যবসাগুলি সমস্ত তোমাদের ব্যবসার সঙ্গে এমাল-গ্যামেটেড হয়ে রক্ষে পাবে, শেয়ার হোল্ডারদের টাকাটা বাঁচবে, নিজেরও প্রতারক অখ্যাতি রটবে না ভেবে বাবা শেষটায় রাজী হন। কিন্তু আমি সম্মতি না দিলে তিনি কখনও বিয়ে দিতেন না।"

"তুমি সম্মতি দিলে কেন ?"

"বাবা বার বার বলেছিলেন 'মলী তুই খুশি হয়ে রাজী না হলে এ বিয়ে আমি দেবো না। আমার দেনার কথা, কারখানার কথা তুই ভাবিসনে। তার ব্যবস্থা যা করার আমি করবো।' কিন্তু আমার বাবাকে আমি ভালো করেই জানতেম। অত্যন্ত সেনসিটিভ মানুষ। সে দিনই রাত্তিরে চুপি চুপি তাঁর টেবিলের দেরাজ থেকে রিভলভারটা আমি সরিয়ে এনে নিজের কাছে লুকিয়ে রাখলেম। মনকে বোঝালেম, ছেলে থাকলে আজ সে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে বাবার পিছনে দাঁড়াতো। মেয়ে হয়ে আমি যদি তাঁকে তাঁর বিপদের দিনে উদ্ধার করতে না পারি, তবে ধিক আমাকে।"

শিবনাথ বিস্মিত হলেন। যাকে তিনি চিরকাল আরামপ্রিয়, গভীরতাহীন, লঘুচিত্ত, ফ্যাশানসর্ব্বস্ব তরুণী বলে মনে মনে করুণা করেছেন, সেও যে তার প্রিয়জনের কল্যাণে আপন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে আত্মত্যাগে সক্ষম, সে কথা কোন দিন তিনি কল্পনা করেননি।

মলী সেন বললেন, "তা ছাড়া,—মিথ্যে বলব না, ভেবেছিলেম, তোমার আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে যদি বা নিজেকে খাপ খাইয়ে না নিতে পারি, তোমার কাছ থেকে কোন আক্ষেপের কারণ ঘটবে না। লতার মূল যদি মাটি থেকে রস টানতে পারে, তবে রোদের তাপে সে শুকিয়ে মরে না।"

শিবনাথ অর্দ্ধস্বগতের মতো বললেন, "সত্যি, দুজনেই জীবনকে আমরা কী অসহ্য বিড়ম্বনা করে রেখেছি। হোয়াট এ টেরিবল্ মেস্!"

"টেরিবল্ মেস্ই বটে! কিন্তু এমন করে আর কতকাল জীবন কাটাতে হবে, বল।"

"যতকাল জীবনের শেষ না হচ্ছে। কিন্তু মৃত্যু তো আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। সময় হলে তাকে এড়ানো যেমন চলে না, সময় না হলে তাকে পাওয়াও তেমনি অসম্ভব। একটা সীন্ না করে তো এ যুগে প্রাণ দেওয়ার উপায় নেই!"

হঠাৎ দুই হাত দিয়ে শিবনাথের হাত চেপে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে মলী সেন বললেন, "এস, আবার নতুন করে আমরা জীবন আরম্ভ করি। যা গেছে, তা গেছে। যা আছে, তাই নিয়ে সুরু করি।"

ধীরে ধীরে নিজের হাত মুক্ত করে নিয়ে শিবনাথ একটু ম্লান হেসে বললেন, "এ তো পরীক্ষার পড়া নয় যে, সমস্ত বছর ক্লাশ পালিয়ে এগজামীনের আগে সারা রাত জেগে বই মুখস্ত করে পাশ করবে। এরিয়ার মেকআপের অবকাশ নেই জীবনে। না মলী, স্বভাবে, চিন্তায়, দৃষ্টিভঙ্গিতে কোথাও তোমার সঙ্গে আমার এতটুকু মিল নেই। তোমার পথ আর আমার

রাস্তা পৃথক্, চলার ছন্দ আলাদা। এক ঘরে আমরা বাস করব। এক ঘরে আমরা ঘর করব না। সৃষ্টিকর্ত্তার এই বিধান।"

দুই হাত দিয়ে চক্ষের অশ্রুবিন্দু মার্জ্জনা করে মলী সেন বললেন, "ভগবান লোকটার মতো এমন ধৈর্য্যশীল আসামী আর দ্বিতীয় নেই। সংসারের সমস্ত দুষ্কৃতির অভিযোগ অনায়াসে তারই মাথায় চাপিয়ে দেওয়া যায়। সে তো প্রতিবাদ করতে পারে না। হায়, পথের কথা তুলে আজ তুমি খোঁটা দিচ্ছ। একবারও তোমার মনে পড়ছে না যে, পথ আমার একদিনে পৃথক হয়ে যায়নি। ভুলে গেছ যে, আমি তো প্রথমে তোমার হাত ধরেই চলতে চেয়েছিলেম। তুমিই হাত সরিয়ে নিয়েছ।"

শিবনাথ বললেন, "আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না মলী, দোষ আমার। কিন্তু আমার কথা কাউকে বলার নয়। সে শুধু অন্তর্য্যামী জানেন। আমি আমার নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেই ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছি অহর্নিশি। তোমাকে ঠকাবার কোন অভিপ্রায় ছিল না। আমাকে তুমি ক্ষমা কর।"

উত্তরে মলী সেন কিছু বলার পূর্ব্বেই ব্যস্তপদে সিদ্ধনাথ প্রবেশ করে বললেন, "মিসেস্ সেন, ডাক্তার সত্যসিদ্ধুকে দেখেছেন? এখানে আসেননি তিনি?"

মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "ডাক্তারকে কেন? কী হয়েছে?"

"আর বলেন কেন! মেয়েদের ড্রেসিংরুমে অপর্ণা ফেইন্ট করেছে। আমাদের কালে তো পতন ও মূর্চ্ছাটা থাকতো পার্টের শেষে। এ যে দেখছি অভিনয়ের আগেই অজ্ঞান। প্রোগ্রেসিভ যুগ কিনা, সব কিছুই এখন আগে আগে হয়। হাঃ হাঃ হাঃ। যাই দেখিগে ডাক্তার আছে কোথায়। ডোবালে দেখছি। না, না আপনাকে আসতে হবে না। আপনি উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন? আমি ওদিক সামলাচ্ছি।"

সিদ্ধনাথ ডাক্তারের সন্ধানে গেলেন।

শিবনাথ বললেন, "আমি ছোট গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছি। বড় গাড়িটা আর ড্রাইভার রইল। দরকার হলে দোকানের অষ্টিনটাও টেলীফোন করলেই তোমাকে পাঠিয়ে দেবে।"

"তুমি আজ রাতটুকুও অপেক্ষা করতে পার না?"

"না, কোন মতেই না।" বলে শিবনাথ কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

মলী সেন ইজিচেয়ারটায় বসে ক্ষোভে ও অপমানে দগ্ধ হতে লাগলেন। যে লোক একটা সামান্য অনুরোধের মর্য্যাদা রাখে না, তার কাছে ভিক্ষুকের মতো নতুন করে জীবন আরম্ভের কথা তুলেছিলেন তিনি কোন্ লজ্জায়? ছিঃ ছিঃ, এমন দুর্ব্বলতা তাঁর কেমন করে ঘটল? ধিক তাঁকে! শত ধিক তাঁর অতিপ্রমত্ত প্রগল্ভতায়!!

হঠাৎ শচীনের মার উপরে মলী সেনের রাগ হতে লাগল। গিরিধর গোপাল, দীন দয়াল মধুসূদন! রাবিশ। উঠে দাঁড়িয়ে বেয়ারাকে হাঁক দিয়ে বললেন, পুরুষদের ড্রেসিংরুম থেকে অবিলম্বে নিখিলকে ডেকে আনতে।

অস্থির পদক্ষেপে পদচারণ করতে করতে ভাবলেন, ক্ষমা? কিসের ক্ষমা? ঝরণার উৎস শুকিয়ে দিয়ে তার কাছে চায় স্নিগ্ধ জলধারা? বাঁশীর রন্ধ্র বন্ধ করে দিয়ে প্রত্যাশা করে মধুর সুর?

ক্রোধে মলী সেনের কর্ণদ্বয় তপ্ত, নিঃশ্বাস দ্রুত এবং দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠল। দুই হাতের মুষ্টি বদ্ধ করে দাঁত দিয়ে ওষ্ঠাধর চেপে মনে মনে বললেন, না, কোট চাইলে ক্লোক দান করা বা ডান গালে চড় খেয়ে বাঁ গাল এগিয়ে দেওয়ার নীতিতে তিনি বিশ্বাস করেন না। ভাগ্যের কাছেও পরাভব মানবেন না কিছুতেই। দীপের আলো যদি না পান, জ্বালবেন অগ্নির শিখা। হয়তো তাতে পুড়ে মরবেন শুধু নিজেই। ক্ষতি নেই। তিনি হত হবেন, তবু নত হবেন না।

[ক্রমশঃ।

ভ্রম সংশোধন

এই সংখ্যায় শ্রীঅরবিন্দ এ্যাক্রয়েড ঘোষ রচনাটিতে ভুলক্রমে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের ছবির পরিবর্ত্তে লয়েড জর্জ্জের ছবি মুদ্রিত হয়েছে। র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের আলোকচিত্র আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

হাসি-মুখ

—সুকোমলরঞ্জন গুহ

ভয়াবহ মুখ

—উভারাণী পাল

তৃতীয় পুরস্কার)

মুখচন্দ্রিমা

—শান্তিনাথ মুখোপাধ্যায়

মুখশ্রী

—অমলকুমার বসু

প্রতিযোগিতা

বিষয়

খোঁপা

প্রথম পুরস্কার ১৫৲ দ্বিতীয় পুরস্কার ১০৲

তৃতীয় পুরস্কার ৫৲

ছবি পাঠানোর শেষ দিন ২২শে জ্যৈষ্ঠ

ডালহৌসী স্কোয়ার

—অবনী মতিলাল

প্রস্তুতির কাল নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ হইতে পারে না, কারণ সজীব মানুষ প্রতিদিবসের ভাণ্ডার হইতেই তাহার আহার্য সংগ্রহ করিয়া চলিয়াছে, চাল-ডাল-নুন-তেলের ভাণ্ডার রুদ্ধ হইলেও আলো-বাতাস-জলের ভাণ্ডার খোলাই থাকে; বাস্তব জীবন যখন রসদ সরবরাহ বন্ধ করে, শিল্পী তখন কল্পনা-জীবনের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই কল্পনা-জীবনের প্রধান উপকরণ আদিমতম কাল হইতে এখন পর্যন্ত রচিত বইগুলি। এই বই সেই অস্ফুট শৈশব হইতে আজও আমার মনের রসের জোগান দিয়া চলিয়াছে। সুতরাং বইয়ের সাহায্যে প্রস্তুতি আর কোনও সীমাবদ্ধ কালের মধ্যে ফেলিতে পারিব না, আমার জীবনের অন্যান্য কর্মসাধনার সঙ্গে সমান্তরালভাবে ইহা চলিয়া আসিয়াছে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

পঞ্চম তরঙ্গ

উপোদ্ঘাত—কাকলি

'যমুনা'য় মাসে মাসে প্রকাশিত 'চরিত্রহীনে'র অধ্যায়গুলি পড়িতে পড়িতে সর্বপ্রথম এক দেহাশ্রিত অনুভূতি আমার মনকে নাড়া দিল। এই অনুভূতি অতিশয় তীব্র, কিশোর মনের পক্ষে ক্ষতিকর। রামায়ণ-মহাভারতে বহু কাহিনী পূর্বেই পড়িয়াছিলাম, যেগুলি আজকাল অশ্লীল বলিয়া বর্জিত হয়; রাবণ-রম্ভা সংবাদ অথবা অষ্টাবক্রের জন্ম প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। যোগীন্দ্রনাথ বসু-প্রকাশিত রামায়ণ-মহাভারতে এইগুলি না থাকিলেও রামায়ণ-মহাভারত পাইলেই পড়িতাম এবং অধিকাংশ বাড়িতে বটতলার সংস্করণই পাইতাম। এই গল্পগুলি নিছক গল্প হিসাবেই পড়িয়াছিলাম, ইহারা মনে অন্য কোনও আলোড়নের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। আরও বিস্ময়ের কথা, এ যুগের পাঠক হয়তো বিশ্বাসই করিবেন না, ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' বাল্যকালেই মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল অথচ "নৃপনন্দন কামরসে রসিয়া" "খেলে রে সুন্দর সুন্দরী রঙ্গে" "একদিন দিবাভাগে কবি বিদ্যা-অনুরাগে" প্রভৃতি অংশ একসঙ্গে মন ও দেহের উপর রেখাপাত করিতে পারে নাই। 'চরিত্রহীন' পড়িতে পড়িতে দেহে নূতনের জাগরণ অনুভব করিলাম। এই উন্মেষ আনন্দদায়ক নয়, পীড়াদায়ক। সেই বাল্যকালে যে জায়গাটি আমাকে সর্বাপেক্ষা বিচলিত করিয়াছিল তাহা এখনও মুখস্থ আছে। মোক্ষদা বাড়ীউলির বাসায় সতীশ উপস্থিত হইয়াছে, ঘটনাচক্রে সাবিত্রীর ঘরে তাহারই ধবধবে পরিষ্কার বিছানায় সে বসিয়াছে এবং রাত্রির আহারও তাহাকে সেখানে সমাধা করিতে হইয়াছে। "আহারান্তে সতীশ আর একবার শয্যায় আসিয়া বসিল। সাবিত্রী ডিপা ভরিয়া পান আনিয়া দিল, এবং বাঁধা হুঁকায় তামাক সাজিয়া আনিয়া সতীশের হাতে দিয়া, পায়ের নীচে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া একটুখানি হাসিয়াই নিঃশব্দে মুখ নীচু করিল। সতীশের বুকের মধ্যে ঝড় বহিতে লাগিল। নাভিস্থ সমস্ত নাড়িগুলা ক্ষণে ক্ষণে কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইয়া সর্ব্ব-দেহে কাঁটা দিয়া যেন শীত করিয়া উঠিল। ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহার হুঁকা টানিবার সামর্থ টুকুও রহিল না।" পুরুষ মাত্রেরই যৌবনে ও পরে এই অস্বস্তিকর দেহ-সংস্কারের সহিত অল্পবিস্তর পরিচয় হয়, সেদিক দিয়া ইহা বাস্তব সুতরাং দোষাবহ নহে। কিন্তু এই অনুভূতির প্রতি এইভাবে অঙ্গুলিনির্দেশ করিতে পূর্বে আর কাহাকেও দেখি নাই। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তারকনাথ এবং আমার অধীত আরও বহু গ্রন্থাবলী ও বই, (ইহার মধ্যে 'বঙ্গবাসী' কার্যালয় হইতে প্রকাশিত নিন্দিত উপন্যাসগুলিও ছিল)—কুত্রাপি এই জাতীয় বর্ণনায় এইরূপ বিচিত্র লিপিকুশলতা প্রযুক্ত হয় নাই। ভাল সর্বদাই মন্দকে চাবুক মারিয়াছে। 'যমুনা'য় এই "চরিত্রহীন" খণ্ডশ পড়িতে পড়িতে সাবিত্রীর ঘরে সতীশের সেই দৈহিক নিগ্রহ বালক হইয়াও আমি উত্তরোত্তর প্রবলভাবে ভোগ করিতে লাগিলাম। আমার এত দিনের আদর্শ বিপর্যস্ত হওয়া

স্বভাবতই লেখকের প্রতি মন এক দিকে যেমন বিরূপ হইল অন্য দিকে অজগর-কবলিত হরিণের মত একটা মূঢ় আকর্ষণ আমাকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিল। এই মানসিক দ্বন্দ্ব আমাকে পরবর্তী জীবনে দীর্ঘকাল শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধ-সমালোচক করিয়াছিল, নীতি-বাগীশতা আমার শিল্পবোধকে খণ্ডিত করিয়াছিল। বাল্যকালের এই ঘটনাটির উল্লেখ না করিলে শরৎ-চন্দ্রের প্রতি আমার সাময়িক বিরূপতার আসল কারণ অজ্ঞাত থাকিত। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে আমি আশ্বস্থ হইয়াছি এবং তাঁহার বিপুল প্রতিভার প্রতি অনাবিল শ্রদ্ধা আমার চিত্তকে অধিকার করিয়াছে।

কার্তিক ১৩২০ হইতে ১৩২১ বঙ্গাব্দের প্রথম কয়েক মাস "চরিত্রহীন" 'যমুনা'য় বাহির হইতে হইতে বন্ধ হইয়া আমার আকর্ষণ-বিকর্ষণ-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়। পাবনা হইতে ১৯১৪ জুলাই মাসের গোড়ায় বাবার নূতন চাকুরি-স্থান দিনাজপুরে যাইতে হয়। তৎপূর্বেই 'চরিত্রহীন' বন্ধ হইয়াছিল কিনা স্মরণ নাই ; তবে পাবনাতে "চরিত্রহীনে"র সঙ্গে যে বিচ্ছেদ ঘটে, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর বাঁকুড়ায় মামার বাড়ির চারতলার ছাদে তাহার সহিত পুনর্মিলন হয় ইহা মনে আছে। "চরিত্রহীন" তখন সম্পূর্ণ পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে 'যমুনা' হাতে পড়িবার পূর্বে শরৎচন্দ্রের কোনও রচনা পড়ি নাই, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে পুস্তকাকারে "চরিত্রহীন" পড়িবার পর তাঁহার কোনও রচনাই অপঠিত রাখি নাই,—মাঝখানে পূরা চার বছরের অসহযোগ ঘটিয়াছিল।

"কথা কও, কথা কও" আহ্বান সেই যে শুনিয়াছিলাম, এতকাল তাহাতে সাড়া দিবার প্রবল চেষ্টা চলিতেছিল ; কিন্তু শ্রবণযোগ্য স্বর কণ্ঠে ফুটে নাই। মালদহ পরিত্যাগ করিয়া পাবনা যাইবার পথে বাঁকুড়ায় মামার বাড়িতে স্বরচিত একটি কবিতা মাতুল-বন্ধুদের ও মামাত-মাসতুত দাদাদের (ন'মামার উদার আশ্রয়ে তখন সংখ্যায় অনেকগুলি ছিলেন) প্রায়ই শুনাইতে হইত ; সেটি কোকিল-বিষয়ক এইটুকু মাত্র মনে আছে। সে কবিতা কণ্ঠেই ছিল, কণ্ঠেই হারাইয়া গিয়াছে। পাবনায় আসিয়া ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার লোভে সাবধান হইলাম। একটি কালো মলাট দেওয়া একসারসাইজ বুককে ভেলা করিয়া কালসমুদ্রে পাড়ি দিবার সুচিন্তিত চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহার প্রমাণ সযত্নে বহন করিতেছি। হিজিবিজি লেখায় পূর্ণ সেই খাতাটি হারাইয়া গেলে ভাল হইত, কিন্তু সব-কিছু সঞ্চয়ের বাতিকগ্রস্ত বালক এক নশ্বর সম্পত্তি হিসাবে সেটিকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। এই "মূল্যবান" খাতার মলাটে কাগজ আঁটিয়া লেখা আছে "আমার শৈশব কবিতাবলী", দেশপ্রেম-পরিচায়ক ঠিকানা আছে, রাইপুর, বীরভূম। প্রথম কবিতাটি "ব্যাস-বন্দনা"—

প্রণমে তোমার পদে কবিচূড়ামণি,
করপুটে ভক্তিভরে এ অভাগা দেব !
চাহ কৃপা ক'রে তুমি সত্যবতীসুত ;
অমিয় পীযূষধারা দেহ এ সন্তানে।
রচিয়া ভারতাখ্যান শিক্ষা দিলে সবে
যে মধুর ভ্রাতৃ-মাতৃ-পিতৃ স্নেহজ্ঞান—
দেখাও আমারে সেই কল্পনা-লেখনী
শিখাও আমারে তব ভগবদ্‌জ্ঞান।

দেখিতেছি খাতার উপরে অনেক সংশোধনের চিহ্ন রহিয়াছে ; কিন্তু এখানে প্রাথমিক রূপটিই হুবহু প্রকাশ করিলাম। ইহাই আমার সর্বপ্রথম সংরক্ষিত রচনা, তারিখ দেওয়া আছে ৬ই বৈশাখ ১৩২১।

বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছি, ঈশ্বরভক্তিতে এবং বন্ধুপ্রীতিতে সমাচ্ছন্ন এই খাতাখানি ; অদেখা যমুনা হইতে আরম্ভ করিয়া সাক্ষাৎদৃষ্ট অজয়-পদ্মার প্রশস্তি-কবিতাও অনেক আছে ; "ক্ষমার জয়" নামে একটি গাথা-কাব্যও ইহাতে আছে। কোনটিই উল্লেখযোগ্য নয়, শুধু একটি অপটু কবিতা এখানে উদ্ধৃত করিয়া স্বগ্রামের প্রতি আমার তদানীন্তন আকর্ষণের বহর দেখাইব। আজ সে আকর্ষণ নাই, ইহা শুধুই বিস্মৃত কাহিনী মাত্র। এমন ভাবে ভালবাসিবার মত করিয়া কবে যে সেখানে ছিলাম, তাহাও মনে পড়ে না। কবিতাটি এই—"মনে পড়ে"—

মনে পড়ে আধ আধ শৈশবকালের খেলা,
মনে পড়ে জন্মভূমে উত্তপ্ত দুপুর বেলা
বাগানের ছায়ামাখা গাছতলে ঝাপাঝাপি
মনে পড়ে আমাদের ছেলেখেলা দাপাদাপি।
মনে পড়ে অজয়ের শীতল ধবল জল
মনে পড়ে স্নানকালে তীরে তার কোলাহল,
সৈকতভূমিতে তার মনে পড়ে সাঁঝবেলা
সবে মিলি খেলিয়াছি কত রকমের খেলা।
ভীষণ গর্জন করি আসিত অজয়ে বান
মনে পড়ে সেকালীন দুখীদের দুখতান।
মনে পড়ে যবে আসি বৈশাখী নবীন মেঘে
গগন আঁধার করি ছুটিত গো মহাবেগে,

সে সময় আমগাছে উঠিয়া সকলে কত
নিত্যই নূতন খেলা খেলিয়াছি শত শত।
মনে পড়ে শীতকালে কাঁথা গায়ে দিয়ে সবে
ঠাকুমার কাছে মোরা গল্প শুনিতাম যবে—
কোন্ সে অজানা দেশে চলিয়া যেতেম আমি
সে গল্পের সাথে সাথে ভুলিয়া জনমভূমি।
সেই সে মধুর দেশে আবার যাইতে চাই,
সহরের কোলাহল ভাল তো লাগে না ছাই।
স্নেহের জনমভূমি মোর সেই রাইপুর,
এ মরতে স্বর্গতুল্য আজ হায় কত দূর!

দিনাজপুরে ১৯১৪ হইতে ১৯১৮—এই চারি বৎসরে মনে স্বদেশ-প্রেমের বান ডাকিয়াছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তখন ধীরে ধীরে রক্তাক্ত ও বিপ্লবাত্মক স্বাধীনতা-আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে। প্রকাশ্য সভাসমিতি গোপনীয় নিষিদ্ধ ষড়যন্ত্রে পর্যবসিত। অন্তর্বৃত্ত বহির্বৃত্ত প্রভৃতি দলভাগে ব্যাপারটি রোমাঞ্চকর ও ঘোরালো হইয়াছে, বিশেষত আমাদের কিশোর-মনে এই গোপনীয়তাই অশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে। আমি বহির্বৃত্তে স্থান পাইয়াছিলাম। হুকুম পালন করিতাম, ভোর রাত্রে বাড়ি হইতে পলাইয়া নিকটস্থ জঙ্গলের এক পোড়ো বাড়িতে ছোরালাঠি অভ্যাস করিতাম, কিন্তু কি কেন কোথায় কবে এ সকল প্রশ্নের জবাব পাইতাম না। স্বামী বিবেকানন্দ, অশ্বিনীকুমার দত্ত আমাদের নিত্য সঙ্গী। লক্ষ্য যাহাই হউক, উপলক্ষ্য চরিত্রগঠন, ব্রহ্মচর্য। মাঝে মাঝে দুই-একজন অপরিচিত যুবক আসিয়া আমাদিগকে কাঞ্চন নদীর নির্জন তীরে লইয়া গিয়া দেশপ্রেম সম্বন্ধে খুব ভাল ভাল পাঠ দিতেন, তাঁহাদের নাম পর্যন্ত জানিতাম না। মানুষের সংখ্যাবাচক পরিচয় সমস্ত ব্যাপারটিকে আরও গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। আমি কবিতা লিখি জানিয়া নম্বরী "দাদা"রা আমাকে স্বদেশ-প্রেমের কবিতা লিখিতে উৎসাহিত করিতেন। আমি খাতার পর খাতা ভরাইতাম, পড়িয়া শুনাইতাম এবং সকলের প্রশংসায় পরিতৃপ্ত হইতাম। এই কাব্যচর্চা-সংবাদ যে গোপন থাকে নাই তাহার প্রমাণ পাইতে দেরি হইল না। একদিন আমাদেরই প্রতিবেশী এবং পিতৃব্যস্থানীয় একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির গৃহে আমার ডাক পড়িল এবং বাধ্য হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে তাঁহারই চোখের সামনে তাঁহাদের বাগানের নিভৃত অংশে আমার বিবেকানন্দ-গ্রন্থগুলির সঙ্গে আমার দেশপ্রেমের কবিতার খাতাগুলি নিঃশেষে পুড়াইয়া দিলাম। কবিতাগুলির একটি পংক্তিও কাগজে অথবা মনে অবশিষ্ট রহিল না। এই ঘটনার পশ্চাতে সরকারী চাকুরিজীবী পিতার প্ররোচনা ছিল, তিনি সরাসরি আমাকে কিছু বলেন নাই। আমি আমার সেই বিপুল কাব্যসম্ভার বিসর্জন দিয়া সংসারের সকলের উপর বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িলাম, এমন কি পড়াশুনাও একরূপ ছাড়িয়া দিলাম।

এই চরম নৈরাশ্যের মধ্যে ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট-পিতার বদলি-উপলক্ষে দিনাজপুরে নবাগত শ্রীসত্যেন্দ্র-নাথ রায় সেকেণ্ড ক্লাসে আমার সহপাঠী হইলেন। হেয়ার স্কুলের নামকরা ভাল ছেলে, সুতরাং ক্লাসের ফার্ষ্ট বয় আমি চকিত হইয়া উঠিলাম। পরিচয় হইল এবং পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল। তিনি সেই সময়েই অনর্গল ইংরেজীতে বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। বিস্মিত ও আকৃষ্ট হইলাম, তাঁহাদের বাড়িতে ক্যারম ও ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি অন্য আকর্ষণও ছিল। নিয়মিত আড্ডা জমিতে লাগিল। মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত 'প্রগ্রেস' নামে একটি ইংরেজী মাসিক পত্রিকা সে বাড়িতে নিয়মিত আসিত। ছাত্রদের বহু শিক্ষণীয় বিষয় ইহাতে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবিষ্ট থাকিত। সত্যেন ইংরেজীতে অনুরূপ রচনা করিতে পারিতেন। আমাদের দিনাজপুর জিলাস্কুল হইতে একটি হাতের লেখা পত্রিকা প্রকাশের মতলব এই 'প্রগ্রেস' লইয়া আলোচনার ফলে আমাদের উভয়ের মনে জাগে। আমি সহপাঠীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলাম। তাহারা আমাকে জোর করিয়া স্পোর্টস্, ম্যাগাজিন সকল বিভাগেরই সম্পাদক নির্বাচিত করিয়াছিল। সুতরাং আমারই সম্পাদকতায় পত্রিকা প্রকাশিত হইল, সত্যেন হইলেন প্রধান পরামর্শদাতা ও লেখক। আমি অনেকগুলি প্রবন্ধ কবিতা ও "স্বপ্নভঙ্গ" নামে একটি গল্প লিখিলাম। ইহাই আমার হাতের লেখায় প্রথম বাহিরে আত্মপ্রকাশ। পত্রিকাখানির আর সন্ধান করিতে পারি নাই, কিন্তু সেই শুভারম্ভ হইতে আমি হইয়াছি সাহিত্যসেবী। সত্যেন চাকুরির দিকে ঝোঁক দিয়া উত্তরোত্তর উন্নতি করিতে করিতে আজ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারি হইয়াছেন, সরকারী নথিপত্রেই তাঁহার বাগ্‌দেবী আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

খাতা পুড়াইয়া সেই যে আশাভঙ্গ হই [illegible]

পড়াশুনার দিক দিয়া আর আত্মস্থ হইতে পারি নাই। সেই খাতায় নিবদ্ধ মতবাদের ফলে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইয়াও বাঁকুড়ায় চালান হইলাম। শীতল নিরাপদ জায়গা, কিন্তু আমি পড়াশুনা করিবার মত শৈত্য আয়ত্ত করিতে পারিলাম না। দল বাঁধিয়া কলেজ হষ্টেলেই নানা কসরৎ দেখাইতে লাগিলাম। মিশনারী কলেজ ও হষ্টেলের শান্ত আবহাওয়া গরম হইয়া উঠিল এবং কর্তৃপক্ষের ধমক খাইতে খাইতে দলগতভাবে আমার সম্মান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

দিনাজপুর জিলাস্কুল ম্যাগাজিনের প্রথম সংখ্যা বাহির করিয়াই আমার লেখার দিকটা শুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। পিতার বদলি হওয়ার ফলে সত্যেনের দিনাজপুর ত্যাগও আমার সাহিত্য-চর্চা বন্ধ হওয়ার অন্যতম কারণ। বাঁকুড়ায় খাই দাই আড্ডা দিই, মোড়লি করি এবং সুর করিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ি। দিনাজপুরে থাকিতেই 'প্রবাসী'র গ্রাহক হইয়াছিলাম জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া। সাহিত্য-চর্চায় বাবার সমর্থন ছিল না, সুতরাং বই কেনার সঙ্গতিও ছিল না। চাহিয়া চিন্তিয়া কিছু কিছু বই সংগ্রহ হইত, অন্য ভাবেও যে না হইত তাহা জ হলফ করিয়া বলিতে পারিব না; আমার লাইব্রেরির বহু বইই সেই সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু নানা ভাবে সংগৃহীত বইয়ের মধ্যে নিজের মনোমত বই কদাচিৎ স্থান পাইত। সরকারী কাগজের খাতা বাঁধাইয়া গোটা গোটা বই নকল করিতাম। শুধু রবীন্দ্রনাথের বই। 'গীতাঞ্জলি' ইংরাজী ও বাংলা, 'গোরা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায় অভিশাপ', 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন' সম্পূর্ণ নকল করিয়া লইয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরে যখন পরিচয় হয় তখন তাঁহাকে খাতাগুলি দেখাইয়াছিলাম, তিনি সস্নেহ বিস্ময়ে সেগুলি আমার নিকট হইতে সম্ভবত একলব্য ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বঙ্গবাণীসাধক, যাঁহার রচনা আমাকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল এবং তিনিই সর্বপ্রথম কবি যাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। সে কাহিনী যথাসময়ে বলিব।

বাঁকুড়াতে এই খাতাগুলিই আমার সম্বল ছিল। স্কলারশিপের টাকা হইতে দুই-একখানি করিয়া বইও কিনিতে লাগিলাম, প্রথম কিস্তিতে 'বলাকা' ও 'পলাতকা', পরে পরে খণ্ড খণ্ড অন্যান্য কবিতার বই। খাতা এবং বই লইয়া আসর সরগরম রাখিতাম, তর্ক করিতাম, মারামারি করিতাম। নিজে লিখিতাম না।

হঠাৎ একদিন আমাদের হষ্টেলের পাচকের এক আত্মীয়কে সাপে কামড়াইল। ওঝা বা ডাক্তার কাহার সাহায্য লওয়া হইবে ইহা লইয়া দুই দল হইল। ডাক্তার আসিল। হতভাগ্যের জীবন রক্ষা হইল না। ওঝার দল রটাইতে লাগিল, ডাক্তার-সমর্থকেরাই লোকটিকে হত্যা করিল। সাংঘাতিক দলাদলি। আমি শেষোক্ত দলে। এই দ্বন্দ্বে আমার মা সরস্বতী আবার কৃপা করিলেন। আমি ভাবাবেগে একটি আধ্যাত্মিক কবিতা লিখিয়া নোটিশ বোর্ডে টাঙাইয়া দিলাম। ঝড়ো হাওয়ায় তাহা উড়িয়া যাইবার কথা, গিয়াছিলও নিশ্চয়; কিন্তু আমার এক সহপাঠী বন্ধু, অধুনা বাঁকুড়ার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ও লেখক শ্রীরাধারমণ বিশ্বাস, বি. এ. বি. এল. সেদিন প্রীতিবশেই কবিতাটিকে মুখস্থ করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন; সম্প্রতি-প্রকাশিত (১৩৫৮) তাঁহার 'মৃত্যুর পর কি হয় ও কোথায় যায়' পুস্তকে তিনি কবিতাটিকে স্থান দিয়াছেন এবং আমাকে এক খণ্ড উপহার দিয়াছেন, হারানো কবিতাটিকে আমার সাহিত্যিক নবজীবনের প্রথম অভিব্যক্তি বলিতে পারি। কবিতাটি এই—

মিথ্যা কথা, কে বলে যে হারিয়ে গেছে
কিছু কি আর হারায়?
না-হারানোর বাণী যে ভাই আছে সবার মাঝে
রবি শশী তারায়।
বিধাতার এই মধুর বাণী রটাও ভুবন ভরে—
মিথ্যা কান্না-হাসি
জগৎজুড়ে জীবন-মরণ, আছে যাওয়া-আসা।
শুকায় ফুলের রাশি—
আবার মধুর প্রভাত-বায়ে ফুল যে উঠে ফুটে
দোলে সমীর ভরে;
যুগান্তরের এমনি ধারা, ধরার জিনিস কভু
হারায় কি আর ওরে?
ধরা যেদিন সৃষ্টি হ'ল সেদিন হতে আজও
যা ছিল তাই আছে।
বিধির মধুর দৃষ্টি যে ভাই সেদিন হতে আজও
আছে তাহার পাছে।

বন্ধুর প্রীতি সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর কাল যাহাকে রক্ষা করিয়াছে, আমিও তাহাকে অক্ষম জানিয়াও রক্ষা করিলাম। আমার মনের আগল এই কবিতার সঙ্গে সঙ্গে আবার খুলিয়া গেল এবং রুদ্ধ বন্যাস্রোত দুই কূল ছাপাইয়া ছুটিতে লাগিল। বন্যার জলের মতই তাহা আবর্জনা-পঙ্কিল হইলেও প্রবাহটা আমাকে সাগর-লক্ষ্যের দিকে ঠেলিয়া দিল। মৃত্যুর মুখামুখি হইয়াও আমি বাঁচিয়া গেলাম।

খোলস-পাল্টান

অ, আ, ই

আশ্বিনের প্রথম।

বর্ষাঋতু অতীত হলেও আকাশ হঠাৎ হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। বাঙলা থেকে হয়তো বর্ষা বিদায়-গ্রহণে রাজী নয়। হুগলী নদীর তীরে তীরে শ্বাপদ-সঙ্কুল গহন অরণ্য; গগনচুম্বী তাল তার তমালের যেন ঘন বসতি; শাল আর দেবদারু, আম জাম কাঁটাল। ওষধি আর আগাছায় বনভূমি পরিপূর্ণ। সবুজ নয়, ঘন নীল রঙ। বঙ্গোপসাগরের মোহানা থেকে মাতাল হাওয়া ছুটে আসে যখন-তখন। হুগলী নদীর তীর-দেশে দুলে ওঠে অরণ্য। গাছে গাছে ছোঁওয়া-ছুঁয়ি হয়। ঝড়ের বেগে তখন ফুঁসতে থাকে নদীকুল, শোঁ-শোঁ শব্দ হয়। কত গাছের কোটরে কোটরে বাঁশী বেজে ওঠে। কিছুক্ষণের ভয়ে দ্বেষাদ্বেষি ভুলে চিতা আর গোক্ষুরায় একত্র হয়। সর্প আর নকুলে। ঝড়ো হাওয়া যেন তখন ডেকে আনে কালো কালো মেঘ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে আর বারিবর্ষণ হ'তে থাকে আকাশ থেকে। হুগলী নদীও তখন কূল ছাপিয়ে ওঠে।

আশ্বিনের প্রথম, তবুও ভোরের আকাশ মেঘাবৃত হয়ে দেখা দিয়েছে আজ। দিনের শুভ্রতাকে যেন পরিহাস করতেই জড়ো হয়েছে ঐ কালো মেঘের রাশি। থেকে থেকে মেঘ ডাকছে গুরু-গুরু। যেন কোথায় কারা হঠাৎ মেশিন-গান দেগে চলেছে। পাখীর দল বাসা থেকে উড়তে বুঝি ভয় পেয়েছে। ভয়ে আর শঙ্কায় চঞ্চু ব্যাদান ক'রে চোখ মেলে আছে কুজ্ঝটিকাময় আকাশে। শিউলীর গন্ধভরা বাতাসে বৃষ্টিজলের রেণু। দু'-চার ফোঁটা বৃষ্টিও হয়তো বা পড়লো। এ কি দুর্দ্দৈব!

মানুষের সাড়া নেই কোথাও, তবুও গরাণহাটার গঙ্গামুখো পথে যেন মিছিল বেরিয়েছে। দলে দলে চলেছে শত শত। নানা অঙ্গভঙ্গী ও হাস্যালাপ করতে করতে ও সমুদ্রের কল্লোলের মত হেলতে-দুলতে চলেছে। হরেক রকম শাড়ীর বাহারে অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে। কারও কারও মুক্ত কেশজাল মনে হয় ঐ কৃষ্ণকায় মেঘেরই প্রতিচ্ছবি। চিৎপুরের যত বারাঙ্গনা চলেছে মুক্তিস্নান করতে। পাপমোচনের গণ্ডূষ পান করতে চলেছে। আলস্য-মন্থর গতিতে।

—বিষ্টি আসবে লো! পা চালিয়ে চল্।

কে যেন কথা বললে। শুনলো সকলে। তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলে কেউ কেউ। বেশ লাগছে যেন এই ভিজে-ভিজে সকাল। অদৃশ্য সূর্য্যের মিষ্টি আলো। ঠাণ্ডা হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দিতে সাধ হয়। বাদলা-দিনের ঔদাসীন্য।

—ভিজতেই তো যাচ্ছি! তবে আর বিষ্টিকে ভয় কেন?

কে যেন কথা বললে। কথা শুনে কেউ কেউ হাসলে খিল-খিল ক'রে।

—দেখিস্, ভেসে যাসনি যেন! বললে যেন কে।

হাওয়ায় হাওয়ায় কথা গেলো এক দল থেকে অন্য দলে। সৌদামিনীও ছিল পিছনে। বললে,—শুকনো কাপড়গুলো যে ভিজবে লা পোড়ারমুখী!

হয়তো বা দু'-চার ফোঁটা জলও পড়ছিল। শোঁ-শোঁ শব্দে হাওয়া বইছিল।

গহরজান শুধু যায়নি। ঘরেই ছিল। শুয়েছিল জেগে জেগে। চোখে তখনও ছিল ঘুমের জড়তা। আলস্য ত্যাগ ক'রে উঠতে চায় না গহরজান। ভাল লাগে যেন শুয়ে থাকতে একটা চাদরে বুক পর্য্যন্ত ঢেকে। জেগেছিল না ঘুমোচ্ছিল কে জানে! হঠাৎ সিঁড়িতে পদশব্দ শুনে চোখ মেলে তাকালো একবার। ঘুম-ভাঙ্গা ঢুলুঢুলু চোখ! পাশেই বসেছিল ডালিম চুপটি ক'রে। ডালিমকে সরিয়ে উঠে পড়লো গহরজান। ঘরের মানুষ চলে গেছে সূর্য্য ওঠার আগে। তবে আবার কে আসে এমন অসময়ে! পরনের কাপড় বেঠিক হয়েছিল। শাড়ীর আঁচল বুকে জড়াতে জড়াতে শুনলো দরজার কড়া নড়ছে। ক্ষণেকের জন্যে মুখে যেন বিরক্তি ফুটে ওঠে গহরজানের। ঘুমের আমেজটা নষ্ট হয়ে গেল। বললে, বেশ জোর গলাতেই বললে,—কে, কে?

কোন সাড়া নেই বাইরে। শুধু দরজার কড়া নড়ছে ঘন ঘন! ডিমওলা ডিম দিতে এসেছে না ডালওলা ডাল এনেছে! না অন্য কেউ? কেন কে জানে কিছুটা ভয়ে ভয়েই দরজার অর্গলটা খুললে গহরজান। যে দাঁড়িয়েছিল তাকে দেখে ঘোর বিস্ময়ে চেয়ে রইলো। মুখে কোন কথা ফুটলো না।

—ভীষণ ভিজে গেছি! অবাক হয়ে দেখছো কি? ভেতরে যেতে দাও। সহজ সরল কণ্ঠে বললে আগন্তুক; কথায় ক্ষীণ হাসি মিশিয়ে বললে।

গহরজান কোন কথা বললে না। শুধু সরে গেল দরজা থেকে। ভেতরে যাওয়ার পথ ছেড়ে দিলে।

আগন্তুকের আকৃতি আর পোষাক দেখে সত্যিই বিস্মিত হয়েছিল গহরজান। লোকটিকে আগে তো দেখেনি কখনও। লোকটির গায়ে গেরুয়া রঙের রেশমী আলখাল্লা। তসরের কাপড়। হাতে একটা ঝুলি, কি আছে কে জানে! লোকটির গোলাপী ফর্সা মুখে ঘন কালো শ্মশ্রু।

চুলে কত দিন চিরুণী পড়েনি, অযত্নে এলোমেলো হয়ে আছে। বড় বড় আরক্ত আঁখিযুগলে গভীর দৃষ্টি। চোখের কোলে কালি পড়েছে। গহরজানকে সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঝুলিতে হাত ঢুকিয়ে সামান্য হাসির সঙ্গে বললে লোকটি,—একটা দিন থাকতে দিতে হবে আমাকে। সাঁঝের অন্ধকার নামলেই চলে যাবো আমি। এই নাও তোমার পাওনা।

কথা বলতে বলতে কাগজের একটা নোট এগিয়ে ধরলে। গহরজান দেখলে একটা একশো টাকার নোট। ভাবলে জাল নয়তো! এমন না চাইতে টাকা দিয়ে যায় কেউ কেউ, বেশী টাকাই দিয়ে যায়। শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় অনেক সময়, নোটটা আসল নয় নকল। জাল-করা টাকা। তবুও লোকটির আকৃতি আর পোষাক দেখে লোকটিকে অসৎ মনে করতে পারে না যেন গহরজান। হাত বাড়িয়ে নোটটা নিয়ে নেয়। বিশ-পঁচিশ নয়, এক কথায় একেবারে একশো টাকা! কেই বা দেয়? নোটটা কাঁচুলীর ভেতর রেখে দরজার অর্গল তুলে দিয়ে লোকটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায় গহরজান। মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে সহজ হ'তে চেষ্টা করে।

হাতের ঝুলিটা কাঁধে ঝুলিয়ে লোকটি বললে,—আমাকে একটা ঘর দেখিয়ে দাও! আমি শুতে চাই কিছুক্ষণের জন্যে। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে।

লোকটা মাতাল নয়তো! কথা শুনে ভাবলে গহরজান। টাকা দিয়ে ঘুমোতে এসেছে! তাও বিশ-পঁচিশ নয়, একশো টাকা! কথা শুনে হাসতে চেষ্টা করে, কিন্তু মুখে যেন হাসি আসে না। শুষ্ক কণ্ঠে বলে,—চলুন, ঐ ঘরে চলুন।

ঘরে ঢুকে বললে লোকটি,—আমার জন্যে ব্যস্ত হ'তে হবে না। শুধু কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘুম থেকে উঠে আমি খাবো।

লোকটা চোর নয়তো! গহরজান জিজ্ঞেস করে,—কি খাওয়াতে হবে?

কয়েক মুহূর্ত্ত কি যেন ভাবলে লোকটি। বললে,—এই মাংস আর খান কতক রুটি। সুবিধে হবে না?

সন্ন্যাসী, গেরুয়াধারী হয়ে মাংস খাবে কি! গহরজান বললে,—হাঁ। কাবাব আর রোটি মিলবে।

কাগজের নোটটা বুকে বিঁধতে থাকে। গহরজানের বুকের ভেতরে কেমন একটা আলোড়ন হয়। বিশ-পঁচিশ নয়, একেবারে একশো টাকা! গহরজান ভাবছিল কতক্ষণে ফিরবে সৌদামিনী। একশো টাকার নোটটা হাতে পেয়ে না জানি কত খুশীই না হবে।

ঘরে ছিল একটা কাঠের চৌকি। মাদুর বিছানো। একটা তেলচিটে বালিস। হয়তো সৌদামিনী ঘুমিয়েছিল ঐ চৌকিতে। লোকটি হাতের ঝুলিটা নামিয়ে সত্যিই শুয়ে পড়লো। বালিসে মাথা না রেখে মাথা রাখলো ঐ ঝুলিতে। বললে,—কেউ যদি তল্লাস করতে আসে তো ব'লে দিও না এ ঘরে লোক আছে। নাম কি তোমার?

—গহর, গহরজান বাই।

কেমন যেন ভীত-কণ্ঠে কথা বলে গহরজান। তাকিয়ে থাকে অবাক চোখে।

—তুমি কি মুসলমান? লোকটির কথায় যেন কৌতূহল ফুটে ওঠে। বলে,—বলতে বাধা থাকলে ব'ল না।

দুঃখের হাসি দেখা যায় গহরজানের ওষ্ঠাধরে। বলে,—বেশ্যার কি জাত থাকে বাবু!

লোকটি প্রৌঢ়। বলিষ্ঠ আকৃতি। মুখে কঠোর কাঠিন্য। গহরজান ভাবছিল, লোকটা চোর নয়তো! খুনী ডাকাত কিংবা গুণ্ডা বা বদ্‌মাস! এখনও চোখে-মুখে জল দেওয়া হয়নি। লোকটাকে ছেড়ে এখনই যেতে হবে গোসলখানায়। একশো টাকা দিয়ে যদি হাজার টাকার জিনিষ নিয়ে ভেগে পড়ে! যদি একটা তোরঙ্গ তুলে নিয়েই চলে যায়?

—আমার জন্য ভাবতে হবে না। আমি এই ঘুমোচ্ছি। ঘুম থেকে উঠেই ডাকবো তোমাকে। লোকটি কথাগুলো বলে যেন নিকটতম আত্মীয়ের মত। বললে,—তুমি কাছাকাছি থাকবে তো?

—হাঁ বাবু, ডাকলেই সাড়া পাওয়া যাবে। কেমন যেন হতচকিতের মত কথা বলে গহরজান। বলে,—তুমি কি বাবু নিদ্ যেতেই এসেছ?

লোকটি হেসে ফেললে। হাসতে হাসতেই বলে,—হ্যাঁ। শুধু ঘুমতে এসেছি। ক'রাত্রি ঘুম নেই যে চোখে।

অনেক অভিজ্ঞতা আছে গহরজানের। দেখেছে কত মানুষ, কত রকমের। বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে লোকটির দিকে। অন্য মানুষ একশো টাকা দিয়ে ঘরে এলে এতক্ষণ কত আদব কায়দাই না দেখাতো গহরজান; লজ্জার মাথা খেয়ে কত হাসি-পরিহাস আর কত অঙ্গভঙ্গীই না করতো। কিন্তু লোকটির আকৃতি আর প্রকৃতি দেখে কেমন যেন সাহস হয় না গহরজানের। হাসতে চেষ্টা ক'রেও হাসতে পারে না। কথা বলতে গিয়ে মুখে যেন কথা আটকে যায়।

কথার শেষে লোকটি পাশ ফিরে শোয়। বলে,—অসময়ে এসেছি, আমার জন্যে ভাবতে হবে না। কাজ থাকে তো তুমি যেতে পারো।

কেমন যেন ভয়-ভয় করে গহরজানের। ঘরের বাইরে গিয়ে বলে,—যো হুকুম বাবু!

লোকটি বললে,—দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাও গহরজান বাই।

গহরজান ঘরের দরজাটা শুধু বন্ধ করে দেয় না, বাইরে থেকে দরজার শিকলী তুলে দেয়। কাঁচুলীর ভেতর থেকে নোটটা বের ক'রে আলোয় ধ'রে দেখে। দেখে নোটে রাজার ছাপ সত্যিকার আছে না নেই। জল রঙের রাজার ছবি দেখতে পেয়ে একটা তৃপ্তির শ্বাস ফেলে। গহরজান ভাবে মাসী এসে দেখলে কত খুশীই না হবে। কোথায় যেন মনের গহনে একটা কাঁটা খচ-খচ করে। গহরজান

স্থির করেছিল, লাখো টাকা দিলেও বসতে দেবে না অন্য কাকেও। থাকবে, বাঁধা হয়েই থাকবে। কিন্তু লোকটা তো চাইছে না কিছু, শুধু ঘুমোতে চাইছে। গহরজান গোসলখানার দিকে এগোয়। বালতি বালতি জল মাথায় না ঢাললে শরীরটা ঠিক হবে না। উগ্র মদের নেশায় কেটে গেছে রাত্রি, কপালটা দপ-দপ করছে। দেহে যেন কত উত্তাপ।

হঠাৎ টায়রাটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। গত রাত্রে লাভ করেছে গহরজান। জড়োয়া টায়রা। এখন মাসী বিক্রী ক'রে না দিলেই হয়। টায়রার সঙ্গে টায়রাটা যে দিয়েছে তাকেও বুঝি মনে পড়ে।

গুরু-গুরু মেঘগর্জ্জন হয় হঠাৎ। আকাশ নিনাদ করে। কাচকাটির মত জলের ফোঁটা পড়ে আকাশ থেকে মাটিতে। গহরজান বেশ অনুভব করে বাড়ীটা পুরানো। ঝড়ঝড়ে বাড়ীটা কেঁপে উঠলো মেঘ-নাদে।

কিন্তু বৃষ্টিকে উপেক্ষা ক'রে বেলা বর্দ্ধিত হওয়ার সঙ্গে পথে মানুষের আনাগোনা। টোকা আর ছাতা মাথায় পথে মানুষের যাওয়া-আসা চলে। আশ্বিনের প্রথম তবুও বর্ষা যে কলকাতা থেকে কেন বিদায় গ্রহণ করছে না, সে জন্য শহুরে কাপ্তেনদের মেজাজ চটে গেছে। যে যাঁর ল্যাণ্ডো আর পাল্কীগাড়ীতে বেরিয়ে পড়েছেন। কেউ বাজারে যাচ্ছেন, আবার কেউ বা রাত্রিটুকু গৃহে কাটিয়ে দিনের আলোয় যে যাঁর মেয়েমানুষের কাছে চ'লেছেন। কারও কারও হাতে ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা একেকটি ধরা রয়েছে। দু'পাশে তাকাচ্ছেন আর শুঁকছেন।

আশ্বিনের প্রথম। দুর্গোচ্ছব আসছে। রূপ বদলে গেছে যে কলকাতার বাঙালী পাড়ায়। বৃষ্টিকে উপেক্ষা ক'রেই বেরিয়ে পড়েছে মানুষ।

গোসলখানার জানলায় পথে চোখ রেখে আলস্যে দাঁড়িয়ে থাকে গহরজান। কলকাতার বারোইয়ারী দুর্গাপূজার কত দেরী কে জানে! পূজার মরশুমে পাড়ার ভোল বদলে যায়, জানে গহরজান। চোখের নিমেষে যেন হেসে ওঠে কলকাতা। গহরজানদের দরজায় যাওয়া-আসা করে যারা কখনও আসে না। পাকা-পোক্ত খদ্দের নয়, যত বোকা বেল্লিক উটকো।

দুর্গোৎসব বাঙালীদের পর্ব্ব। বোধ হয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল থেকেই বাঙলায় দুর্গোৎসবের প্রাদুর্ভাব। পূর্ব্বে নাকি রাজা-রাজড়াদের বাড়ীতেই কেবল দুর্গোৎসব হ'তো, কিন্তু অধুনা মহেশ তেলীকেও প্রতিমা আনতে দেখা যাচ্ছে।

দুর্গোৎসব। মেতে উঠবে কলকাতা। তবুও কেমন যেন ভয়-ভয় করে। দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়, দেহটা কেমন শক্ত হয়ে যায় গহরজানের। শুষ্ককণ্ঠ, জিবের তালু শুকিয়ে যায়।

কৃষ্ণনগরের কারিগরেরা কুমারটুলী ও সিদ্ধেশ্বরীতলা জুড়ে বসে গেছে। ঠেল মেরেছে কলুটোলা পর্য্যন্ত। জায়গায়-জায়গায় রং-করা পাটের চুল, তবলকীর মালা, টীন ও পেতলের অসুরের ঢাল-তরোয়াল, প্রতিমার নানা রঙের ছাপা শাড়ী ঝুলে পড়েছে। দর্জ্জিরা ছেলেদের টুপি, চাপকান ও পেটী নিয়ে দরজায়-দরজায় বেড়াচ্ছে। ঢাকাই ও শান্তিপুরে কাপুড়ে মহাজন, আতরওয়ালা ও যাত্রার দালালের দল আহার-নিদ্রে পরিত্যাগ করেছে। কোনখানে কাঁসারীর দোকানে রাশীকৃত মধুপর্কের বাটী, চুমকী ঘটি ও পেতলের থালা ওজন হচ্ছে। ধূপ-ধুনো, বেনে-মসলা ও মাথাঘষার একষ্ট্রা দোকান ব'সে গেছে।

হঠাৎ-বৃষ্টিতে বিলকুল লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। তবুও লোক দেখা যায় পথে। একটা চটা-ওঠা এনামেলের জগভর্ত্তি জল মাথায় ঢালতে থাকে গহরজান। শীত-শীত করে। আশ্বিনের প্রথমার্দ্ধ। বর্ষার দিন।

ঘরের লোকটি তখন চোখ মেলে তাকিয়েছে। ঝুলি খুলে বসেছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রেও যখন দেখেছে দরজা আর খুললো না, তখন উঠে ব'সলো লোকটি। খোলা জানলার বাইরে বর্ষণমুখর ম্লান সকাল দেখে বললে,—গ্র্যাণ্ড! লে গ্র্যাণ্ডিশ!

ধীরানন্দ,

তুমি এই পত্র পাওয়া মাত্র মারাঠা দেশ ত্যাগ করিও। আমি পদব্রজে মণিপুর যাইতেছি; মণিপুরের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ পাইলে অর্থ ভিক্ষা করিব। তুমি বর্দ্ধমানের সুজিৎনাথের নিকট তোমার কর্ত্তব্য জানিয়া লইও। তুমি জানিও, লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়াছে। ফক্‌ল্যাণ্ডের পরিবর্ত্তে মরিয়াছে ভারত-বন্ধু মাদাম ক্লারা—

চিঠিটা পড়া শেষ হয় না। দরজায় শব্দ শুনে লোকটি চিঠি থেকে চোখ তোলে। চমকে ওঠে যেন। কিন্তু কেউ কোথাও নেই, হাওয়ার বেগে ন'ড়ে উঠেছে নড়বড়ে দরজাটা। অর্দ্ধ-পঠিত চিঠিটা ঝুলিতে রেখে পুনরায় শুয়ে পড়লো লোকটি। হতাশাপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেললে একটা। কড়িকাঠে চোখ রেখে শুয়ে রইলো নিস্পন্দের মত। ক' রাত্রি ঘুম নেই, তবুও ঘুম আসে না চোখে। ঘরের ছবিগুলো নজরে পড়ে। আদম আর ইভের নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের ছবি। নিদ্রামগ্ন শচী দেবী ও বৈষ্ণবগুরু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের গৃহত্যাগের রঙীন বর্ণনার ছবি। ফোয়ারার ধারে জলকেলিরত নগ্নিকা।

মেঘবরণ কেশ। ভিজে চুলের বোঝা সামলাতে পারে না যেন।

গামছায় চুল জড়াতে জড়াতে গোসলখানার জানলা থেকে বর্ষার কলকাতা দেখে গহরজান। আসন্ন দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি চলেছে এখন। বৃষ্টির বেগ হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পথ যেন লোকে গিসগিস করছে। এত দিন দোকান-ঘর অন্ধকারপ্রায় ছিল, এখন দোকানের কপাটে কাই দিয়ে নানা রকম রঙীন কাগজ সাঁটা হচ্ছে। শীতকালের কাকের মতই দোকান-গুলোর চেহারা ফিরেছে। গোলা ও অজ্ঞ লোকেরা আরসি, ঘুনসি, গিল্টির গয়না ও বিলেতী মুক্তো একচেটেয় কিনচে। রবারের জুতো, কম্ফর্টার, ষ্টিক ও ল্যাজওয়ালা

অগুন্তি উঠছে। বেলোয়ারী চুড়ি, আঙ্গিয়া ও চুলের গার্ডচেনেরও অসংখ্য খরিদ্দার! পল্লীগ্রামের টুলো অধ্যাপকেরা বৃত্তি ও বার্ষিক সাধতে বেরিয়েছেন। যাত্রার অধিকারী ও বাইয়ের দালালদের ব্যস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে।

দুর্গোৎসব ঘনিয়ে আসছে। ভাবতেও যেন গা শিউরে ওঠে। হোক্ না উপরি রোজগারের সুদিন, তবুও যেন বুকের রক্ত জল হয়ে ওঠে গহরজানের। পূজার ক'টা দিন কি এক-দণ্ড স্থির হওয়া যায়। যত উটকো লোকের ভিড় হয়। পূজার মরশুমে কত টাকা উপার্জ্জন করে সৌদামিনী। টাকা নেয় আর লোক বসায়। গহরজানের কোন আপত্তিই তখন টেঁকে না। অসহিষ্ণু হ'লে মদের সঙ্গে একটু-আধটু কোকেন্ গিলিয়ে দেয়। গহরজানের দেহে তখন যেন কোন সাড় থাকে না।

অর্থের বিনিময়ে খদ্দেরের দল যথেচ্ছা মাল যাচাই ক'রে নেয়। কেমন যেন মুমূর্ষের মত হয়ে থাকে গহরজান। শুধু কি গহরজান? আরও কত কে।

ঘরের মানুষ এতক্ষণে ঘরে ফিরেছে কি না কে জানে! ক্ষণেকের জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়ে গহরজান। দিনের আলোয় টায়রাটা দেখবার লোভ জাগে। কিন্তু মাসী যে কোথায় রেখে গেছে কে জানবে! হয়তো নগদ দামে বিক্রী করতে গেছে। শরীরটা যেন স্নিগ্ধ হয়ে যায় সদ্যস্নানে।

দিনের আলো ফুটতে পুকুরে গিয়ে অবগাহন স্নান করেছিল রাজেশ্বরী। কতবার জলে ডুব দিয়ে ভেবেছিল আর উঠবে না। ডুবে যাবে, অতল জলে ডুবে যাবে। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাবে আর···। কিন্তু একটা হাত যে মোক্ষম ধরেছিল কে এক দাসী।

আলুলায়িত ভিজে চুলের রাশি পিঠের 'পরে। সুগন্ধি তেলের গন্ধ ভুরভুর করছে। সিঁথিতে টাটকা সিঁদুরের রেখা। কপালে টিপ। তুঁতে রঙের একটা আটপৌরে সাড়ী পরে ঘরের মেঝেয় বসেছিল রাজেশ্বরী। চোখে শূন্য দৃষ্টি, চেয়েছিল কোন্ দিকে কে জানে। সূর্য্যমুখীর মত হয়তো ঐ অস্পষ্ট সূর্য্যের দিকে চেয়েছিল। কি ভাবছিল কে জানে! হয়তো মনে মনে হরিনাম জপছিল।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে কাপড়-চোপড় ফিরিয়ে সহস্র হরিনাম জপতে শিখিয়েছিলেন রাজেশ্বরীর বৃদ্ধা পিতামহী। রাজেশ্বরীর কত আদরের ঠাগ্‌মা।

ঘরের কোলের দালানে ছিল এলোকেশী।

ঠোঁটের ফাঁকে গুল না দোকতা টিপছিল। রাজেশ্বরী হঠাৎ ডাক দেয়। বলে,—এলো, ও এলো। এলোকেশী আছিস?

মুখে একমুখ গুলের পিক। ডাক শুনেই সাড়া দিতে পারে না। ধড়মড়িয়ে উঠে গিয়ে পিক ফেলে আসে।

—কি বল'।

—কোথায় কে গুলী ছুঁড়ছে বল্' তো? রাজেশ্বরী শুধোয় আয়ত আঁখিযুগলে বিস্ময় জাগিয়ে।

—গুলী কোথায় ছুঁড়তে শুনলি? বললে এলোকেশী। কথায় দৃঢ়তা ফুটিয়ে।

—ঐ তো শব্দ হচ্ছে। শুনতে পাচ্ছো না? তুমি যে কালা হয়ে গেছো। রাজেশ্বরী সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলে।

—খানিক আগে তো মেগ ডাকছিল দুমদুমিয়ে। কৈ, এ্যাখন তো কোন' শব্দই শুনছি না বাছা। কে জানে বাবা, হয়তো কালাই হয়েছি! শেষের কথাগুলো আপন মনেই বলে যায় এলোকেশী।

রাজেশ্বরীর চোখে শূন্য দৃষ্টি। মুখে হতাশ-চিহ্ন। তুঁতে রঙের একটা আটপৌরে সাড়ী প'রে ঘরের মেঝেয় ব'সে থাকে। হয়তো পুনরায় হরিনাম জপতে থাকে।

সেই ফটকের কাছে ঘড়ি-ঘর। ঘণ্টা পড়ে ঢঙ ঢঙ। বেলা এখন কত কে জানে! হয়তো সাতটা-আটটা। আকাশে অস্পষ্ট সূর্য্য। ঘষা-কাচের থালা যেন একটা।

মন্দ মন্দ হাওয়া চলেছে। ফুরফুরে বাতাস শরৎ-দিনের। শিউলীর গন্ধবাহী। প্রজাপতি উড়ছে ডানা মেলে। নক্সা-কাটা ডানা। পুজো-পুজো হাওয়া বইছে যেন।

পুজোর মরশুমে ময়রার দোকানে দুগ্‌গোমণ্ডা বা আগাতোলা মিষ্টান্নের বায়না নেওয়া হচ্ছে। পাঁটার রেজিমেণ্ট-কে-রেজিমেণ্ট বাজারে প্যারেড করতে লেগে গেছে। ঢুলী, ঢাকী ও বাজন্দারদের ভিড়ে পথ চলা দায় হচ্ছে।

ক্যালকেশিয়ান বাবুদের কোন কোন বৈঠকখানায় আগমনী গাওয়া হচ্ছে; কোথাও তাস, দাবা আর পাশা পড়েছে। আতরের উমেদারদের শিশি হাতে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে। মা না কি পিত্রালয়ে আসছেন ক'দিনের জন্য। গজে না নৌকায় আসছেন কে জানে!

হন্তদন্ত হয়ে কোথা থেকে এসে হাজির হ'ল বিনোদা। হাঁফাতে-হাঁফাতে। ঘরে ঢুকে ইদিক-সিদিক দেখলো বার কয়েক। রাজেশ্বরীর কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে ফিসফিস শব্দে বললে,—বৌঠান, ফিরেছেন হুজুর।

কথা ক'টা শুনে রাজেশ্বরীর মলিন ও আয়ত আঁখিদ্বয় সামান্য বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। শুনলো, তবুও মুখ থেকে বিষাদের ছায়া মুছলো না। চোখ দু'টো জলসিক্ত মনে হয়। বিনোদা হয়তো ভেবেছিল রাজেশ্বরী খুশী হবে, হাসবে। কিন্তু ক্ষণেক আগেও আকাশের মত রাজেশ্বরীও কেঁদেছে। ঝর-ঝর জলের ধারা নেমেছিল চোখ থেকে।

কিন্তু কে বন্দুক ছুঁড়ছে! এত ঘন ঘন আওয়াজ?

চমকে চমকে ওঠে রাজেশ্বরী। তাকায় জানলার বাইরে। ইতি-উতি তাকিয়ে অনুমান করতে চেষ্টা করে, শব্দটা কোথা থেকে আসছে। বিনোদার কথাগুলো শুনে মনে মনে প্রস্তুত হয় রাজেশ্বরী। কখন হঠাৎ দেখা পাওয়া যাবে কে জানে?

যে কখনও মদের বুদ্‌বুদ্ দেখলো না তাকে খাওয়ানো হয়েছে চোলাই-করা দেশী মদ, যার গন্ধে নেশা হয়ে যায়। জল নয়, সোডা নয়, লেবু নয়, শুধু খাঁটি দেশী মদ কয়েক পাত্র। দেশী কোহলের প্রতিক্রিয়া হয়তো দেরীতে ফ'লেছে।

গাড়ী থেকে নেমে ট'লতে ট'লতে কোনক্রমে বৈঠকখানায় গিয়ে ফরাসে গড়িয়ে প'ড়েছে কৃষ্ণকিশোর। ঘুমে অচেতন হয়ে প'ড়েছে। পোষাক গেছে লাট হয়ে, মাথার চুল আলুথালু। অনন্তরাম কখন গিয়ে হলের জানলা ক'টা বন্ধ ক'রে দিয়ে গেছে। সূর্য্যালোকে যদি ঘুম ভেঙ্গে যায়। অনন্তরাম জেনেছিল হয়তো। ভেবেছিল, ঘুমোক্। ঘুমে যদি নেশাটা কেটে যায়।

ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে তখন, বেলোয়ারি কাচের ঝাড়টা দুলছিল মন্থর গতিতে। ঠুং-ঠাং শব্দ উঠছিল।

জানলা বন্ধ করতে করতে কাকে দেখলো অনন্তরাম। অস্ফুটে ব'লে ফেললে,—কর্ত্তাদাদু, তুমি?

কৃষ্ণকান্তর পিতামহ, যিনি ছিলেন ঘোর শাক্ত। শোনা যায়, কালীর সঙ্গে কথা বলতেন। অমাবস্যার রাত্রে মোষ কাটতেন, বলি দিতেন কালীর পায়ে। রক্ত-চেলী পরিধান করতেন, গায়ে রক্ত-চন্দন মাখতেন। শিখায় রক্ত-জবা। শোনা যায়, কলিকাতার সিদ্ধেশ্বরী না ঠনঠনেতে গভীর রাত্রে কি জন্য দু'-চার মানুষও বলি দিয়েছেন কর্ত্তাদাদু।

একটা দমকা হাওয়ার বেগে সম্বিৎ ফিরে পায় অনন্তরাম। কর্ত্তাদাদুর তৈলচিত্র টাঙানো ছিল ঘরের এক দেওয়ালে। অনন্তরাম দেখে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে, দেখে আর জানলা বন্ধ করে।

মুখে বিষাদের ছায়া। চুপচাপ ব'সে থাকে রাজেশ্বরী হতাশ দৃষ্টিতে দরজায় চোখ রেখে। কখন হঠাৎ দেখা পাওয়া যাবে কে জানে। প্রতি মুহূর্ত্তে অপেক্ষা করে রাজেশ্বরী। অপেক্ষা করে কাহিল ক্লান্ত হয়ে। আর হরিনাম জপ করে। কিছু যেন জানতে ইচ্ছা হয় না রাজেশ্বরীর। সদ্যবিবাহিত হয়ে শ্বশুরালয়ে একা-একা শয্যায় রাত্রি অতিবাহিত করেছে; গত বৈকাল থেকে দেখতে পায়নি স্বামীর মুখ—তবুও ব্যস্ত হয় না বিন্দুমাত্র। জানতে চায় না কোথায় কাটলো রাত; কেন বাড়ী ফিরলো না। যেন হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছে রাজেশ্বরী। বাড়ী ফিরেছে শুনেছে, বিষণ্ণ প্রতীক্ষায় ব'সে আছে। কখন হঠাৎ দেখা পাওয়া যাবে কে জানে! উপবাসক্লান্ত শরীর রাজেশ্বরীর, ক্ষুধার তীব্রতা যেন লোপ পেয়ে গেছে।

অনন্তরাম কিন্তু শুধু দেখে নিশ্চিন্ত হতে চায় না।

ব্যগ্র কৌতূহলে আস্তাবলে গিয়ে উপস্থিত হয়। কোচম্যান আবদুল তখন সবে নমাজ শেষ ক'রে উঠে পেঁয়াজ সহযোগে মুড়ী খেতে বসেছিল। অনন্তরাম বললে,—বুঢ্যা, তুম্ কুছ্ কাম্‌কা নেহি।

আবদুল অপ্রস্তুত হয়ে বললে,—কাহে? হাম কেয়া করবে?

অনন্তরাম বসলো উবু হয়ে। বললে,—মিঞা, বিলকুল যে ব'য়ে যাবে! ছোঁড়া কাল গয়নাটা বেমালুম গ্যাঁড়া ক'রে বাইজীকে দিয়ে দিয়েছে। নির্ঘাত, তুমি খোঁজ কর কেনে, ঠিক জানতে পারবে।

আবদুল কোন কথার জওয়াব দেয় না। পেঁয়াজ সহযোগে মুড়ী চিবিয়ে যায়। একটা ঘোড়া শুধু নাকে না মুখে শব্দ ক'রে আস্তাবলের স্তব্ধতা ভঙ্গ করতে চায়। অনন্তরাম বললে,—মিঞা যে কথা কও না দেখি! আমি কি মন্দ কথা বলেছি?

আবদুল এক মুঠো মুড়ী মুরগীর ছানাদের দিকে ছুঁড়ে বললে,—জরুর ঠিক বাত্ আছে। তবে ঘোড়া বদমাসী করলে, বজ্জাতী করলে, দু'ঘা জোর চাবুক কষে দিতে পারি আমি। ঘোড়ার মুনীব যদি বেআক্কেলী করে আমি তো ভাই নাচার। খামকা বরখাস্ত ক'রে দিলে বুড়াকে তুমি খাওয়াবে?

অনন্তরাম কথায় সায় দিলে মাথা দুলিয়ে। অনন্যোপায় হয়ে চুপ ক'রে রইলো। অনন্তরামের বুকের পাঁজরাগুলোয় যেন ব্যথা ধ'রেছে। বুকে কেন যেন কষ্ট হচ্ছে। মনে যেন কঠিন দাগা পেয়েছে অনন্তরাম।

ঝোড়ো হাওয়ায় আবদুলের দাড়ির পক্ককেশ উড়ছিল। আবদুলও যেন কথায় কথায় চলে গেছে অন্য কোথাও, অন্য জগতে। চোখে ফুটে উঠেছে নির্লিপ্ত দৃষ্টি। বললে,—বুড়াকে বসিয়ে খাওয়াতে পারো তো বল, দেখো আমি দু'দিনে সায়েস্তা ক'রে দিই। মাগীকে লোপাট ক'রে দিই দুনিয়া থেকে।

অনন্তরামের পেশীবহুল ও কষ্টির মত কালো দেহটা যেন ভেঙ্গে প'ড়েছে ক'দিনেই। অনন্তরাম কথা বললে হতাশ হাসি হেসে। বললে,—মিঞা, মাগীকে লোপাট ক'রলে দুনিয়ায় আর একটা মাগীও কি মিলবে না? রূপেয়া ফেললে, জড়োয়া গয়না ফেললে, তুমি বল' না কাকে তোমার চাই?

—সামনেওয়ালা ভাগো!

ফটকে ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি হয়। একটা সুবৃহৎ ফীটন ফটকের মুখে লেগেছে না? গাড়ীটার কচকে পালিশ, ওয়াইন রঙের ফীটন গাড়ী। চালকদের মস্তকে উষ্ণীষ উড়ন্ত।

অনন্তরাম বললে—পিসীমার গাড়ী না?

আবদুল এক লহমায় দেখে নিয়ে বল্লে,—হাঁ পিসীমার ফীটনই বটে।

ফীটন গৃহাভ্যন্তরে পৌছলে গাড়ী থেকে পিসীমা নামলেন না, নামলো জহর আর পান্না। সঙ্গে আরও কত কে, কাপ্তেনী পোষাকে আরও কত কে। গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী পরিধানে আরও কত কে।

কোঁচানো ধুতি, গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবী আর পাম্প্ আর লপেটা জুতোর ভিড় দেখা যায়। বাবুরা বাগান-বাড়ীতে ফয়রা দিতে গিয়েছিলেন। কি জন্যে আগমন কে জানে! জহর আর পান্নার সঙ্গে এসেছে একদল ইয়ার-বন্ধু। মাথায় পাতা-কাটা সিঁথি; গলায় রঙীন আলপাকার রুমাল; চোখে কাজল; কোঁচানো কাঁচির ধুতি লুটোচ্ছে—যেন লক্কা পায়রা ব'লে ভ্রম হয়।

অনন্তরাম বললে,—ফৌজ সঙ্গে এনেছে। মাটি করেছে দেখছি!

বেশী দূর যেতে হয় না, বৈঠকখানায় ঢুকেই গৃহের অধিপতিকে দেখতে পেয়ে চীৎকার ক'রে উঠলো জহর আর পান্না। উল্লসিত হ'লে যেমন চীৎকার করে। বললে,—হুর্‌রে, হুর্‌রে, হুর্‌রে!

ধড়মড়িয়ে জেগে ওঠে কৃষ্ণকিশোর। অবাক চোখে চেয়ে থাকে। জহর চেঁচাতে চেঁচাতে এগিয়ে সম্পর্কের ভাইকে স্রেফ্ একটা চুমু খেয়ে বলে,—ভায়া, তোমাদের বাজনার ঘরটা খোলাও মাইরী। আচ্ছা আচ্ছা বাজিয়ে এনেছি, শুনে তাক্ লেগে যাবে!

তৎক্ষণাৎ হুজুর তলব করেন,—কে আছিস? কে কোথায় আছিস?

মুহূর্ত্তের মধ্যে খানসামা হাজির হয়। সেলাম ঠুকে বলে,—জী হুজুর।

হুজুর হুকুম করেন, বাজা-ঘরকা চাবি লে আও।

হয়তো দলে ছিল গুণী কেউ-কেউ। গাইয়ে-বাজিয়ে।

কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই বাড়ো হাওয়ার সকল ছন্দমুখর হয়ে ওঠে। কোন্ বাদ্যযন্ত্রে ঘা পড়ে কে জানে। তত, শুষির আনদ্ধ না ঘন? কনসার্ট বাজে হয়তো। নয়তো হয়তো শুধুই অর্গ্যান।

—বৌ আছো?

—কে, অনন্তরাম? চমকে ওঠে যেন রাজেশ্বরী।

—হ্যাঁ বৌমা।

রাজেশ্বরী যেন প্রকৃতিস্থ হয়ে নেয়। অনন্তরাম ডাকছে শুনে ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করে,—কি বলছো?

অনন্তরাম দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই বলে—পিশীর ছেলে দু'টি দলবল এনে বাজনার ঘর খুলে ব'সেছে। হুজুর হুকুম করলেন, জনা বারো-তেরোর মত জল-খাবার পাঠাতে। কাকে বলবো, তাই তোমাকে বলতে এয়েছি! গোলাপজল চাইছে, পানও চাইছে।

ব'সেছিল, উঠে প'ড়লো রাজেশ্বরী। বললে,—আমি [illegible]চ্ছি। সদ্যস্নাত এলায়িত কেশ দুলে উঠলো। [illegible]শ্বরী সিঁড়ির দিকে এগোয়। পায়ে অলক্তকের লালিমা,—শব্দহীন, ধীর পদক্ষেপে রান্নাবাড়ীর দিকে চলে রাজেশ্বরী। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ, ধীরে ধীরে যেতে থাকে। যেতে যেতে মাথায় গুণ্ঠন টেনে দেয় কখন। তবুও ঢাকা পড়ে না ঘন কেশজাল।

তুঁতে রঙের শাড়ী সিঁড়ির পথে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সদরে তখন বাজনার সঙ্গে তবলা চলেছে। এস্রাজের সঙ্গে মিষ্ট-মধুর বাঁশী। বাইরে তখন আকাশ থেকে ঝির-ঝির বৃষ্টি পড়ে আবার। স্বচ্ছ হয়েছে আকাশ। পেঁজা তুলার মত ছিন্ন-ছিন্ন শুভ্র মেঘ এখানে-সেখানে। শরতের আকাশ!

ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টা পড়তে থাকে ঢং-ঢং। বোধ হয় আটটা-ন'টা বাজে।

সম্পর্কের ভাইকে পাশে নিয়ে বসে জহর আর পান্না। মজলিসী আড্ডা জমে যায় যেন। জহর শুধোয় কানে-কানে,—এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুম কেন? বৌটি কোথায়? রাতে ঘুমোতে দেয়নি তো?

বৌ। রাজেশ্বরী।

হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায়, ঘরে বৌ আছে! কি করছে এখন কে জানে? ক্ষণেকের জন্য বৌয়ের প্রতি মনে যেন করুণার উদ্রেক হয়। কতক্ষণ দেখা পাওয়া যায়নি রাজেশ্বরীর। হয়তো কত ব্যস্ত হয়ে আছে। হয়তো অভিমান ক'রে আছে। কাল থেকে হয়তো আছে অনাহারে। গান-বাজনা মুহূর্ত্তের মধ্যে শ্রুতিকটু লাগে কানে। কৃষ্ণকিশোর বললে,—বৌ এখানেই আছে। ঘুমোতে দেয়নি নয়, ঘুমটা ভাল হয়নি।

ঠাট্টার হাসি হেসে জহর বললে,—কেন, চোখে বুঝি তেল-হাত বুলিয়ে দিয়েছিল? যা, যা মুখ-হাত ধুয়ে শীঘ্রি আয়!

—না না। কি জানি কেন ঘুম হয়নি। কৃষ্ণকিশোর লজ্জিত হয়ে বলে।

ঘুম না হওয়ার কারণটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে যেন। গহরজানের ঘরে রাত্রি যাপনের মধু-মুহূর্ত্ত। টায়রা দোল ক'রে কত খুশীভরা হাসি হেসেছিল গহরজান। ব'লেছিল কত মিষ্টি-মিষ্টি কথা। গহরজানের রূপপ্রভা—দেখতে দেখতে যেন দগ্ধ হয়ে যেতে হয়! গহরজান, গহরজান, গহরজান—মনটা যেন জুড়ে আছে গহরজান!

কিন্তু গহরজানের ঘরে তখন অন্য মানুষ।

একশো টাকার নোট হাতে পেয়ে লোভ সামলাতে না পেরে অচেনা একজন লোককে ঘরে বসিয়েছে গহরজান। লোকটি বিচিত্র, টাকা দিয়ে ঘুমোতে এসেছে। শুধু খাবে আর ঘুমোবে, আর কিছু নয়। গহরজান দরজার শিকলি তুলে দিয়ে স্নান শেষে প্রাতরাশ করছিল ডালিমকে কোলে নিয়ে। তেলেভাজা খাচ্ছিল। আলুর চপ, পেঁয়াজী আর বেগুনী। কিনে আনিয়েছে দু'-চার আনার এক ঠোঙা।

লোকটা ঘরে কি করছে কে জানে!

গহরজান আলুর চপে কামড় দিতে দিতে উৎসুক হয়ে ওঠে। লোকটি তখন উঠে ব'সে আছে। ঝুলি খুলে ব'সে আছে। মুখে স্মিত হাসি ফুটিয়ে সঙ্গোপনে পড়ছে একটা সুদীর্ঘ চিঠি।

···ধীরানন্দ, তুমি অবশ্যই জানিও, মাত্র কয়েক জনকে হত্যা করিয়া আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। দেশের প্রতিটি মানুষের মনে শৃঙ্খল-মোচনের সদিচ্ছা জাগরিত না হইলে মুষ্টিমেয় দেশনেতাদিগের দ্বারা কোন কিছুই সম্ভব হইবে না। ধীরানন্দ, তুমি তোমার সঙ্গীদিগকে আমার বক্তব্য জ্ঞাত করিও। তাহারা যাহাতে গ্রামে গ্রামান্তরে যাইয়া···

বাইরে তখন আকাশ থেকে ঝির-ঝির বৃষ্টি পড়ছে। ক্ষীণ সূর্য্যালোকে যেন অসংখ্য কাচকাটি চিক্-চিক করছে। পেঁজা তুলার মত ছিন্ন-ছিন্ন শুভ্র মেঘ থমকে আছে আকাশে। ঝ'ড়ো হাওয়ায় শিউলীর মধুগন্ধ। পুজোর মরশুম লেগেছে শহর কলকাতায়। কত দেরী আর দুর্গাপুজার?

হয়তো এঁটেল মাটি চেপেছে খড়ের প্রতিমায়। মূর্ত্তি-গঠনের প্রথম পালা চলেছে ঘরে-ঘরে। প্রতিমার ডাকের সাজ সাজিয়ে দোকান খুলে ব'সেছে দোকানী। বেশ্যার দুয়োরে ধর্ণা দিয়েছে কুমোর। প্রতিমা নির্ম্মাণ হবে, মাটি চাই। গণিকালয়ের মাটি।

[ক্রমশঃ।

কেনোপনিষদ

চিত্রিতা দেবী

শান্তিপাঠ

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু,
সহ বীর্য্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গুরু ও শিষ্য আমাদের দোঁহে, একসাথে রাখো প্রভু,
বিদ্যার ফল যেন ভোগ করি দুজনে।
সমান শক্তি দাও যেন মোরা শিখিতে শিখাতে পারি।
অধীত বিদ্যা হোক তেজস্বী, আসুক চিত্তে বল,
বিদ্বেষ ভরে দোঁহারে দুজনে, কখনো না যেন দেখি॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্
প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি
চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং।
মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং, মা মা
ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্তু
অনিরাকরণং মেহস্তু। তদাত্মনি নিরতে
য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমার সকল অঙ্গ, আমার চক্ষু কর্ণ প্রাণ,
বাক্য আমার, শক্তি আমার,
(তাঁহারি মাঝারে) পুষ্টি করুক লাভ
আমি যেন তা'রে কখনো না ভুলি, আমার জীবনময়
তিনি যেন মোরে না করেন কভু ত্যাগ।
তাঁর সাথে মোর, মোর সাথে তাঁর,
কখনো না যেন তিলেক বিরহ রয়।
তাঁতে প্রতিষ্ঠ ঔপনিষদ চির সনাতন ধর্ম্ম
বিরাজ করুক আমার চিত্তময়।

প্রথম খণ্ড

ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥১

কার এষণায় এ মন সচল
কার প্রেষণায় প্রাণ চঞ্চল,
চোখ দেখে কার জন্য,
কাহার আদেশে চিত্ত ভরিয়া,
কথা বাহিরায় বাক্য গড়িয়া,
কান শোনে কার জন্য ॥ ১

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥২

চক্ষুর চোখ, বচনের বাক্ তিনি কর্ণের কান,
তিনিই সকল মানসের মন, তিনি পরাণের প্রাণ,
জ্ঞানী জানে তাই সকলি তাঁহার, মিথ্যা অহংকার।
এই জ্ঞানে তার গতি অমৃতে, ইন্দ্রিয়দের পার॥

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি
নো মনঃ
ন বিদ্মো ন বিজানীমো
যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥৩

অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো
অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং
যে নস্তদ্‌ব্যাচচক্ষিরে ॥৪

যদ্‌বাচাঽনভ্যুদিতং যেন
বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি
নেদং যদিদমুপাসতে ॥৫

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো
মতম।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং
যদিদমুপাসতে ॥৬

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন
[illegible]ক্ষুংষি পশ্যতি।
[illegible]ক্ষ ত্বং বিদ্ধি নেদং
যদিদমুপাসতে ॥৭

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন
শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং
যদিদমুপাসতে ॥৮

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন
প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং
যদিদমুপাসতে ॥৯

নয়ন তাঁহারে পায় না দেখিতে,
বাক্য পারে না কহিতে,
মনও কভু তাঁরে, পারে না
ধরিতে মনে,
নিজেই জানি না তাঁহার স্বরূপ,
তোমারে বুঝাব কেমনে ॥৩
জানা ও অজানা হইতে পৃথক্
মনের ধারণাতীত,
এই তো শুনেছি গুরুর ব্যাখ্যা,
জানি না তাঁহার রীত ॥৪
বাক্য যাঁহার প্রকাশ, অথচ পারে না,
যাহারে বুঝাতে অথবা বুঝিতে,
তিনিই ব্রহ্ম, তাঁরে জানো,
আর যেও না বাহিরে,
অন্য কাহারে পূজিতে ॥ ৫
চিত্ত যাঁহাতে চেতনাপূর্ণ,
কল্পনা নারে ধরিতে
তিনিই ব্রহ্ম, তাঁরে জানো,
আর যেও না বাহিরে,
অন্য কাহারে পূজিতে ॥ ৬
চোখ যাঁর দ্বারা পায় দেখিবারে,
যাঁরে নাহি পায় দেখিতে,
তিনিই ব্রহ্ম, তাঁরে জানো,
আর যেও না বাহিরে,
অন্য কাহারে পূজিতে ॥ ৭
কাণ যাঁর দ্বারা পায় শুনিবারে,
যাঁরে নাহি পায় শুনিতে,
তিনিই ব্রহ্ম, তাঁরে জানো,
আর যেও না বাহিরে,
অন্য কাহারে পূজিতে ॥ ৮
প্রাণ যাতে প্রাণ পায়,
প্রাণে সে তো বাঁচে না,
সেই ব্রহ্ম জানো তারে,
আর নেই সাধনা ॥ ৯

চন্দ্র-সূর্য্য

"রমেশ দত্ত মহাশয়ের কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেম। সেখানে বঙ্কিমও উপস্থিত ছিলেন। রমেশ বাবু তাঁকে পুষ্পমাল্য দিয়ে অভ্যর্থনা করতেই বঙ্কিম ঐ ভিড়ের মধ্যে আমার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত ক'রে রমেশ বাবুকে বললেন—"আমাকে কেন, ঐ যুবকটি এই মাল্যের উপযুক্ত। এঁকে চিনে রাখ। উনি 'সন্ধ্যার' উপর যে কবিতা লিখেছেন তা কলিন্সের সন্ধ্যা-সম্বন্ধীয় কবিতার চেয়ে ঢের ভাল।"

—রবীন্দ্রনাথ।

ক্লিওপ্যাট্রা চরিত্র—শেক্সপিয়র ও বার্ণার্ড শ'য়ের নাটকে

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (প্রেসিডেন্সী কলেজ)

শেক্সপিয়র পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক বলে স্বীকৃত হয়েছেন। সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও জটিলতার বিচার করলে তাঁর তুলনা হতে পারে অপর কোন শিল্পীর সঙ্গে নয়—স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মার সঙ্গে। অথচ প্রত্যেক শতাব্দীতেই দুই-এক জন মনীষী তাঁর প্রতিভার সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই কাজ করেছিলেন ভলটেয়ার, উনবিংশ শতাব্দীতে করেছেন টলষ্টয়, বিংশ শতাব্দীতে করেছেন বার্ণার্ড শ'। বার্ণার্ড শ' শেক্সপিয়রের সমালোচনা লিখেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে; কিন্তু তাঁর প্রভাব বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে। তাই তাঁকে বিংশ শতকের লেখক বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। বার্ণার্ড শ' শুধু সমালোচক ন'ন, নাট্যকারও। তিনি শেক্সপিয়রের সমালোচনা করেই নিরস্ত হ'ননি, নাটক লিখেও শেক্সপিয়রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং তাঁর নাটক শেক্সপিয়রের নাটকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কি না, সাতঙ্কারে সবিনয়ে এই প্রশ্ন তুলেছেন। শেক্সপিয়র ক্লিওপ্যাট্রার কাহিনী নিয়ে নাটক লিখেছিলেন—Antony and Cleopatra। বার্ণার্ড শ' এন্টনীকে বাদ দিয়ে জুলিয়স সীজারকে প্রাধান্য দিয়ে লিখেছেন : Cæsar and Cleopatra. ক্লিওপ্যাট্রার কাহিনী উভয় নাটকেরই উপজীব্য। সুতরাং নাটক দু'খানির বিচারের পূর্ব্বে ইতিহাস ও কিংবদন্তীতে ক্লিওপ্যাট্রার যে পরিচয় পাওয়া যায় তার আভাস দিতে হবে।

ক্লিওপ্যাট্রার মুখ (ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত)

২

ক্লিওপ্যাট্রা ছিলেন মিশরের রাণী; তাই শেক্সপিয়রও বলেছেন যে তাঁর রং ফর্সা ছিল না। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। প্রকৃত পক্ষে ক্লিওপ্যাট্রা ছিলেন খাঁটি গ্রীক্‌বংশসম্ভূতা। যাতে গ্রীক্‌বংশের রক্তের সঙ্গে অপর রক্তের মিশ্রণ না হয় সেই জন্য মিশর-রাজবংশের বিবাহাদি নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ক্লিওপ্যাট্রার স্বামী ছিলেন তাঁর স্বীয় ভ্রাতা চতুর্দশ টলেমি। ভাই-বোন্ শুধু যে স্বামি-স্ত্রী ছিলেন তাই নয়, তাঁরাই ছিলেন মিশর দেশের যুগ্ম সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী।

রাজ্যলাভের সময় এঁদের বয়স ছিল খুব কম। ক্লিওপ্যাট্রার জন্ম আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৬১ অব্দে। কিছু দিন পরে মিশরীয় রাজনীতিতে এক সঙ্কট সমুপস্থিত হলো। ক্লিওপ্যাট্রা ও তাঁর স্বামী-ভ্রাতা টলেমির মধ্যে ভীষণ বিরোধ দেখা দেয়। ক্লিওপ্যাট্রা মিশর থেকে বিতাড়িত হয়ে সিরিয়াতে যেয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হ'ন। তখন কর্ম্মব্যপদেশে মহামানব জুলিয়স সীজার মিশরের রাজধানীতে উপস্থিত হ'ন এবং এই গৃহবিবাদে কোন্ পক্ষ গ্রহণ করলে রোমের সুবিধা হবে সেই বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। ক্লিওপ্যাট্রার বয়স তখন একুশ, টলেমির বয়স তের। সীজার ও তাঁর পরামর্শদাতারা টলেমির পক্ষ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ বলে মনে করলেন। এমন সময় গ্রীস-দেশীয় এক কার্পেট-ব্যবসায়ী সেখানে উপস্থিত হলেন ও সেনাপতিরা কার্পেট দেখতে কৌতূহলী হলেন। কিন্তু কার্পেটের বোঝা খুলে দেখা গেল যে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন পরমাসুন্দরী ক্লিওপ্যাট্রা। শুধু যে রূপেই তিনি বিধাতার সৃষ্টির বিস্ময় তা নয়; তাঁর বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, তাঁর অতুলনীয় [illegible] [illegible]ছেন; ও লাস্যবিলাসে সেনাপতি-সংসদ্ বি[illegible] [illegible]র মনে এই জাতীয় [illegible] সীজার তাঁর ছলাকলায় বন্দী হলেন। [illegible] তাঁকে করে সীজার ক্লিওপ্যাট্রার পক্ষ অবলম্বন করলেন। টলেমি পরাজিত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন এবং ক্লিওপ্যাট্রা মিশরের একচ্ছত্র রাণী হলেন। শুধু তাই নয়; সমরশ্রান্ত, কূটবুদ্ধি সীজার তাঁর ইন্দ্রজালে ধরা পড়ে গেলেন। সীজার যখন রোমে গেলেন, তখন রোমের প্রভুত্বেও তাঁর মন তৃপ্তি পেল না। তিনি ক্লিওপ্যাট্রাকে রোমে নিয়ে এলেন: সেখানে ক্লিওপ্যাট্রা প্রকাশ্য ভাবে সীজারের প্রেয়সী হিসেবে বসবাস করতে লাগলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৪ অব্দে সীজারের মৃত্যু হয়। পঞ্চবিংশবর্ষীয়া ক্লিওপ্যাট্রা রোমের খেলা গুটিয়ে মিশরে ফিরে এলেন।

তিনি যখন রোমে যান তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন সীজারের ঔরসজাত তাঁর পুত্র এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পঞ্চদশ টলেমি, যিনি ছিলেন নামে মাত্র মিশরের যুগ্ম সম্রাট্। ক্লিওপ্যাট্রা বিষ প্রয়োগে টলেমিকে হত্যা করিয়ে, মিশরে ফিরে এসে নিজেকে ও পুত্র সীজারিয়নকে মিশরের যুগ্ম অধিপতি বলে ঘোষণা করলেন।

এর পরে রোমে চলল ভীষণ গৃহবিবাদ—সীজারের হত্যা[illegible] ব্রুটাস্, ক্যাসিয়াস্ এবং সীজারের অনুরক্ত শিষ্য এন্টনী [illegible] দৌহিত্র ও দত্তকপুত্র অক্টেভিয়সের সঙ্গে। যুদ্ধে এন্টনী

জয়ী হলেন। এই যুদ্ধে ক্লিওপ্যাট্রা ব্রুটাস্ প্রভৃতির পক্ষাবলম্বন করেছিলেন বলে এন্টনী এলেন তাঁর বিচার করতে। এখন ক্লিওপ্যাট্রার বয়স আটাশ; তাঁকে তরুণী বলা যায় না। কিন্তু যে লাস্যলীলায় বিজয়ী সীজার বন্দী হয়েছিলেন বিচারক এন্টনীও সেই জালেই ধরা পড়ে গেলেন। এন্টনী ও ক্লিওপ্যাট্রার প্রেমকে সুস্থ, স্বাভাবিক প্রেম বলা যায় না, কিন্তু এর মহিমা অতুলনীয়। এন্টনী ও অক্টেভিয়স্ সীজারের মধ্যে ক্রমে মনোমালিন্য দেখা দিল। একবার এন্টনী ক্লিওপ্যাট্রার বন্ধন ছিন্ন করে রোমে এসে অক্টেভিয়সের বোন অক্টেভিয়াকে বিবাহ করে অক্টেভিয়সের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু ক্লিওপ্যাট্রার দুবাকর্ষণ মোহমন্ত্র আবার তাঁকে মিশরে ফিরিয়ে নিয়ে এল। এবার আরম্ভ হলো এন্টনী ও অক্টেভিয়সের মধ্যে যুদ্ধ। বিরাট রোম সাম্রাজ্যের এই দুই প্রতিযোগী অধীশ্বরের ভাগ্য নির্ণীত হলো একটিয়ামের যুদ্ধে। এই যুদ্ধে রণবীর এন্টনী চালিত হলেন ক্লিওপ্যাট্রার বুদ্ধিতে। তাঁর উচিত ছিল স্থলযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া, কিন্তু ক্লিওপ্যাট্রার কথায় তিনি অক্টেভিয়সকে নৌ-যুদ্ধে আহ্বান করলেন। যুদ্ধের ভাগ্য যখন অনিশ্চিত তখন ক্লিওপ্যাট্রা তাঁর নিজের যাটখানা রণতরী নিয়ে পালিয়ে গেলেন এবং এন্টনীও যুদ্ধ ছেড়ে ক্লিওপ্যাট্রার সঙ্গে মিলিত হলেন। তার পরের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করা যেতে পারে। এন্টনী আত্মহত্যা করলেন; অক্টেভিয়স সমগ্র রোম সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হলেন। অক্টেভিয়সের ইচ্ছা ছিল সগৌরবে ক্লিওপ্যাট্রাকে বন্দী করে নিয়ে যাবেন এবং তাতে তাঁর বিজয় [illegible] হবে। ক্লিওপ্যাট্রার মনে কি ছিল ঠিক করে [illegible] চতুরতার কাছে অক্টেভিয়স পরাজিত হলেন। তিনি অক্টেভিয়সের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়িয়ে বিষধর সর্প এনে আত্মহত্যা করে অক্টেভিয়সের বিজয়-গৌরবে খানিকটা গ্লানিমা এনে দিলেন।

৩

ক্লিওপ্যাট্রাকে সহজ ভাবে দেখলে বলতে হবে তিনি বারবনিতা। সীজার ও এন্টনীর কথা বাদ দিলেও তিনি এক সময়ে সীজারের প্রতিদ্বন্দ্বী পম্পের ছেলের রক্ষিতা ছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন তিনি হয়ত অক্টেভিয়স সীজারকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিলেন। শুধু তাঁর যৌন লালসার কথাই বলি কেন? তাঁর প্ররোচনায় তাঁর ভাই পঞ্চদশ টলেমি ও ভগিনী আর্সিনো নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু শুধু নীতির দিক দিয়ে বিচার করলে ক্লিওপ্যাট্রার পরিচয় মিলবে না। তিনি তদানীন্তন কালে শ্রেষ্ঠ বিদুষী বলে পরিচিত হতে পারতেন। কথিত আছে যে তিনি অন্ততঃ দশটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। জুলিয়াস সীজার সুলেখক ছিলেন; এন্টনী বাক্-চাতুর্য্যে রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস পরিবর্ত্তিত করে দিয়েছিলেন। অথচ এঁরা ক্লিওপ্যাট্রার বিরুদ্ধাচরণ করতে এসে তাঁর মায়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। এই মায়া কি রূপের মায়া? ক্লিওপ্যাট্রা অবশ্য রূপসী ছিলেন। কিন্তু আটাশ বছরের বিগতযৌবনা মহিলার রূপের জৌলুস না থাকারই কথা। আর যদিই বা থাকে তবে সেই রূপ নিশ্চয়ই শুধু দেহসৌষ্ঠব নয়, বরং তাঁর নিশ্চয়ই এমন কোন প্রতিভা ছিল [illegible] যার বাহন মাত্র। জুলিয়স সীজার তিনটি মহাদেশে তাঁর বিজয়ের ধ্বজা প্রোথিত করেছিলেন; কোন বাধা, কোন বিপত্তি, কোন আকর্ষণ তাঁকে লক্ষ্যচ্যুত করেনি। তিনি এই বিদেশিনীর ছলাকলাকে অতিক্রম করে উঠতে পারেননি কেন? ক্লিওপ্যাট্রার শত্রুরা বলে বেড়াত যে, তাঁর রাজ্যের প্রকৃত মালিক ছিল তাঁর এক খোজা ভৃত্য ও তাঁর পরিচারিকা আইরাস ও চারমিয়ান। কিন্তু যদি তাই সত্য হয় তা হলে তিনি সীজার, এন্টনী ও পম্পের মত লোককে বশীভূত করলেন কি করে?

অন্য দিক্ থেকেও তাঁর চরিত্রের রহস্যময়তা নিবিড়তর হয়ে পড়ে। এন্টনীর সঙ্গে তিনি যুদ্ধে যেতে চেয়েছিলেন কেন? তিনি কি এন্টনীর সঙ্গসুখ লাভের জন্যেই যুদ্ধেও সঙ্গিনী হয়েছিলেন অথবা মনে করেছিলেন যে অক্টেভিয়সের সঙ্গে দেখা হলে এন্টনী আবার রোমে ফিরে যাবেন? না, এন্টনীর সঙ্গে সুদীর্ঘ পরিচয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর উপরে একান্ত ভাবে নির্ভর করা সম্ভব নয়? কিছু দিন পূর্ব্বেই পারথিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধে এন্টনী পর্য্যুদস্ত হয়েছিলেন; তাই ক্লিওপ্যাট্রা মনে করে থাকতে পারেন যে একাকী এন্টনী অক্টেভিয়সের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন না। সুভদ্রা অর্জ্জুনের সারথি হ'ননি, কিন্তু ক্লিওপ্যাট্রা এন্টনীর সতীর্থ হতে চেয়ে থাকবেন।

কিন্তু তিনি সেনাপতিদের সুচিন্তিত মত উপেক্ষা করে নৌযুদ্ধের পক্ষে মত দিলেন কেন? বিরোধী সমালোচকেরা মনে করেন, নৌযুদ্ধে জাহাজ নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সুবিধার জন্যই তিনি এরূপ সিদ্ধান্ত করেছিলেন। সঙ্কট-মুহূর্ত্তে তিনি যে পালিয়েছিলেন তারই বা কারণ কি? এন্টনীকে পরিত্যাগ করে অক্টেভিয়সের সঙ্গে সন্ধি করার উদ্দেশ্যই কি তাঁকে প্রণোদিত করেছিল? অথবা তিনি কি ভরসা করেছিলেন যে, যে ইন্দ্রজালের কাছে প্রৌঢ় জুলিয়স সীজার আত্মসমর্পণ করেছিলেন, বালক অক্টেভিয়স তার বন্ধনে ধরা দেবেন এবং তিনি নূতন সাম্রাজ্য গড়ে তুলবেন? তাঁর নিজের উদ্দেশ্য যাই থাক, অক্টেভিয়স যে তাঁকে এন্টনী থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। ক্লিওপ্যাট্রা অক্টেভিয়সের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়েছিলেন, নিজের জন্যে ও নিজের সন্তানের জন্যে। সে কি অক্টেভিয়সের সঙ্গে সন্ধি করার জন্যে না তাঁকে প্রবঞ্চনা করার উদ্দেশ্যে? তিনি অক্টেভিয়সের কাছে স্বীয় সম্পত্তির যে হিসেব দিয়েছিলেন তা' সত্য নয়; এই প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্য কি? তাঁর প্রবঞ্চনা যে ধরা পড়লো তাও কি বহু ছলনাময়ীর নূতন ছলনা মাত্র? একটি বিষয়ে কিন্তু সন্দেহের অবকাশ নেই। যিনি রোম সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট্ হয়েছিলেন তিনি এই রমণীর মন বুঝতে পারেননি। জুলিয়স সীজার তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিলেন, অক্টেভিয়স্ তাঁকে এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু উভয়েই তাঁর কাছে পরাস্ত হয়েছেন; অক্টেভিয়স্ বিজয়ী হয়ে দেশে ফিরে গেছেন, কিন্তু বিজয়ের প্রধান গৌরব ক্লিওপ্যাট্রা কেড়ে রেখে দিলেন।

৪

এই পরম রহস্যময়ী রমণীর জীবনে যে সকল অমীমাংসিত প্রশ্ন আছে শেক্সপিয়র তাদের উত্তর দিতে চেষ্টা করেননি। ঐতিহাসিক ক্লিওপ্যাট্রাও এ সকল প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন

কি না সন্দেহ। শেক্সপিয়র তাঁর জীবনের সমস্যামূলক ঘটনাগুলি এড়িয়ে যাননি; তিনি তাদের যথাযথ বর্ণনা দিয়েছেন। সেই বর্ণনা যত মনোহারীই হউক অন্য প্রধান শ্রেণীর লেখকের আয়ত্তাতীত নয়। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে ক্লিওপ্যাট্রার চরিত্রের রহস্যটি এমনি ভাবে প্রকাশ করেছেন যে তাঁর প্রত্যেক কার্য্য সুসমঞ্জস বলে মনে হবে অথচ প্রত্যেকটিরই পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হবে। বাস্তব জীবনের জটিল চরিত্রের মধ্যে এই সুসামঞ্জস্য ও বিরুদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। শেক্সপিয়রের ক্লিওপ্যাট্রার মধ্যে বাস্তব জীবনের এই নিগূঢ় রহস্যময়তা চরম অভিব্যক্তি পেয়েছে। প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি কাহিনীকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখা যেতে পারে, কিন্তু মালার মধ্যে সূত্রের মত ক্লিওপ্যাট্রার ব্যক্তিত্ব তাদের মধ্যে ঐক্য এনে দিয়েছে। নাটকে একাধিকবার তাঁকে গণিকা বলে বর্ণনা করা হয়েছে; তাঁর ইতিহাস তো স্বৈরিণীরই ইতিহাস। কিন্তু যে এনোবার্বাস তাঁর সম্পর্কে তীব্রতম ব্যঙ্গ করেছেন, তিনিই তাঁর প্রভাব অনতিক্রমণীয় বলে স্বীকার করেছেন। এণ্টনী তাঁর জন্য বিশ্বসাম্রাজ্য ত্যাগ করেছেন, অথচ এণ্টনী তাঁর সম্পর্কে ঘৃণ্যতম সন্দেহ পোষণ করেছেন। এণ্টনী মনে করেছেন যে ক্লিওপ্যাট্রার ইঙ্গিতেই তাঁদের নৌ-সেনাবাহিনী অক্টেভিয়সের পক্ষাবলম্বন করেছে। অথচ অনতিকাল পরেই ক্লিওপ্যাট্রার মোহপাশে বন্দী হয়ে এণ্টনী সগৌরবে মৃত্যু বরণ করেছেন। ডোলাবেলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ক্ষণেকের; অথচ এই ক্ষণেকের পরিচয়ের ফলেই ডোলাবেলা প্রভু অক্টেভিয়সের মনের কথা তাঁর কাছে ফাঁস করে দিয়েছেন।

স্বৈরিণীই হউন আর প্রেমিকাই হউন, ক্লিওপ্যাট্রার চরিত্রের মূল সূত্র কোথায়? ক্লিওপ্যাট্রা অগ্নিশিখা; শিখার সূত্র খুঁজতে যাওয়া বোধ হয় ভুল। কিন্তু শিখারও আধার আছে এবং সেই আধারের স্বরূপ সন্ধান করতে হবে। ক্লিওপ্যাট্রার চরিত্রে নীচতম প্রবৃত্তির সমাবেশ দেখা যায়; তিনি বোনকে হত্যা করেছেন, ভাইকে হত্যা করেছেন, অফুরন্ত লালসা চরিতার্থ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তবু কেন মনে হয় যে তাঁর সমস্ত পাপ প্রবৃত্তির, সমস্ত স্বার্থপরতার মধ্যে মহনীয়তার ছাপ রয়েছে? তার কারণ তিনি হচ্ছেন অপরাজেয় প্রাণশক্তির প্রতীক। তাঁর বুদ্ধি হ্যামলেট, ফলষ্টাফ বা ইয়াগোর সঙ্গে তুলনীয়; তাঁর কল্পনা কবিজনোচিত। কিন্তু তাঁর চরিত্রের সব চেয়ে বড় লক্ষণ হচ্ছে তাঁর প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য। তিনি জীবনকে ভোগ করতে চান সমস্ত দেহ-মন দিয়ে। যারা ভোগবিলাসী তারা সাধারণতঃ ভোগের দাস হয়ে পড়ে, কিন্তু ক্লিওপ্যাট্রার মধ্যে সেই কাঙালপনা নেই। তাঁর রিরংসাবৃত্তি আত্মোপলব্ধির নামান্তর মাত্র: তিনি নিজেকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন বিষয় থেকে মুক্ত হয়ে নয়, বিষয়ের মধ্যে ডুবে থেকে। তাঁর মধ্যে ভোগীর লিপ্সা ও যোগীর অনাসক্তি উভয়েরই সমন্বয় হয়েছে। এই আসক্তি ও অনাসক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিল্পীর সৃজনী-প্রতিভা। নিজের হাসি-কান্না ও ভ্রূভঙ্গী, গ্লানি, দৈন্য প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব ও অনুভাবকে ঠিক সেই ভাবেই সজ্জিত করেছেন যেমন করে শিল্পী তার মাল-মশলাকে বিন্যস্ত করেন।

বোধ হয় এই শিল্পী-যোগী-ভোগীর মনোবৃত্তি নিয়েই এই হরিণী সীজার-সিংহের গহ্বরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কার্পেটের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসার মধ্যে যে চমৎকার উৎপাদনের আনন্দ আছে তাই অংশতঃ তাঁকে প্রণোদিত করে থাকবে। অবশ্য সীজারের সহিত সাক্ষাৎকারের সঙ্গে তাঁর জীবন-মরণ সমস্যা জড়িত ছিল। কিন্তু অভিযান হিসাবেও এর তুলনা নেই। তবু তখন তাঁর যৌবনোদ্গম হলেও প্রতিভার স্ফুরণ হয়নি। তাই তিনি ভবিষ্যৎ কালে এই অধ্যায়কে তুচ্ছ করে বলেছিলেন যে তখন তিনি ছিলেন বিজয়ী সীজারের সম্ভোগের টুকরা মাত্র। কিন্তু এণ্টনীর সাহচর্য্যে তিনি নিজেকে চিনতে পেরেছেন; শুধু তাই নয়, নিজেকে উচ্চস্তরে উন্নীত করেছেন। অক্টেভিয়ার সঙ্গে এণ্টনীর বিবাহের সংবাদে তিনি খুবই বিচলিত হয়েছিলেন। কিন্তু একটু পরেই তাঁর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করে উঠেছে। কল্পনা-নেত্রে তিনি অক্টেভিয়াকে নিজের পাশে দাঁড় করিয়ে দেখেছেন এবং নূতন প্রতিদ্বন্দ্বিতার শিহরণে তাঁর দেহ-মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

তিনি যুদ্ধে গিয়েছিলেন কেন? যুদ্ধে গিয়ে নৌযুদ্ধের পরামর্শই বা দিয়েছিলেন কেন? যিনি বাগ্‌যুদ্ধে সীজার ও এণ্টনীকে পরাস্ত করেছিলেন, চরম ভাগ্যপরীক্ষার দিনে তিনি সীমন্তিনী গৃহিণী হয়ে আড়ালে বসে থাকবেন তাও কি সম্ভব? স্থলযুদ্ধ ও জলযুদ্ধের আপেক্ষিক সুবিধা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যে কূট তর্ক হয়েছে তা' বুঝবার চেষ্টা তিনি করেননি। নৌযুদ্ধে তিনি বহু রণতরীর মালিক, সমুদ্রবক্ষে সুসজ্জিত তরীর উপরে আসীনা রণনেত্রীর ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হবেন, এর কাছে স্থলযুদ্ধের আকর্ষণ কোথায়? বার বার ভাগ্যদেবী তাঁর কাছে হার মেনেছেন; এইবারই বা তার ব্যত্যয় হবে কেন? তাঁর মনে এই জাতীয় যুক্তির উদয় হওয়া সম্ভব। কিন্তু তিনি পালিয়েছিলেন কেন? ভয়ে না অক্টেভিয়সের সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য? এণ্টনীকে ছেড়ে তিনি অক্টেভিয়সের মনোহরণ করার ইচ্ছা করেছিলেন কি? এই অনুমানের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে উভয়তঃ যুক্তির অবতারণা করা যেতে পারে। ক্লিওপ্যাট্রা আগুনের শিখা; যে অনুভূতি বা অভিজ্ঞতায় নিজেকে নিঃশেষে উপলব্ধি করা যায় তাই তাঁর কাম্য। অক্টেভিয়স্, এণ্টনী, এমন কি নিজের জীবন এই উপলব্ধির ইন্ধন মাত্র। যদি অক্টেভিয়সের সাহচর্য্যে এই উপলব্ধি সম্ভব হতো, হয়ত তিনি তাঁকে গ্রহণ করতেন। কিন্তু অক্টেভিয়স তো এণ্টনী ন'ন। ক্লিওপ্যাট্রা নিজেই বলেছেন, অক্টেভিয়সের জীবন তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর, কারণ তিনি ভাগ্যকে পরাস্ত করে সমারোহ সহকারে ভোগ করতে পারেন না; তিনি ক্রীতদাসের মত ভাগ্যদেবীর নির্দেশ অনুসরণ করে কৃপা কুড়িয়ে বেড়ান। তাই এণ্টনীর গৌরবময় সহমরণ অক্টেভিয়সের অনুগ্রহে পাওয়া জীবনের চেয়ে অনেক বেশী ঐশ্বর্য্যবান্, বিশেষতঃ যখন সেই মৃত্যুর সঙ্গে অক্টেভিয়সের পরাজয় জড়িত হয়ে আছে।

৫

উপলব্ধির এই যে মহিমা, নিজেকে এই ভাবে নিঃশেষে পাওয়া অথবা নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়া—বার্ণার্ড শ' এর মহিমা স্বী[illegible] করেননি। বার্ণার্ড শ' বিবর্তনে বিশ্বাসী; তিনি প্রা[illegible] উদ্দেশ্যের উপর লক্ষ্য রেখেছেন। তাই যে সম্ভোগ, [illegible]

যে অনুভূতি আপনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাকে তিনি স্বীকার করতে পারেননি। কবি কীট্‌স্‌-সম্পর্কে একটা কথা প্রচলিত আছে যে তিনি হলেন অপূর্ণ খ্যাতির কবি অর্থাৎ তাঁর প্রতিভা বিকশিত হলে তিনি যে যশ লাভ করতে পারতেন অকালমৃত্যুর জন্যে তা সম্ভব হয়নি। এই আখ্যাটি অন্য অর্থেও প্রযুক্ত হতে পারে। অনেক সাহিত্যিক যে কথা প্রকাশ করতে চান, ঠিক তা প্রকাশ করতে পারেন না। তাই তাঁদের রচনা যত উচ্চাঙ্গেরই হ'ক না কেন, এক দিক্‌ থেকে তা খণ্ডিত। বার্ণার্ড শ' প্রাণশক্তির প্রচারক, কিন্তু তাঁর রচনায় প্রাণশক্তি সর্ব্বত্র সঙ্কুচিত হয়েছে; দূরের জিনিসের কাছে নিকটের জিনিস ছোট হয়ে গেছে। শেক্সপিয়রের ক্লিওপ্যাট্রার মধ্যে প্রাণশক্তির যে সহজ লীলা-চাঞ্চল্য দেখা যায়, বার্ণার্ড শ' যে বালিকার চিত্র এঁকেছেন তার মধ্যে তার কণামাত্র মিলবে না।

আর এক দিক্‌ থেকেও একটু কৌতুক অনুভব করা যেতে পারে। বার্ণার্ড শ' নিজেকে বাস্তববাদী বলে প্রচার করেছেন, এবং শেক্সপিয়রের রচনার রোমাণ্টিক অলীকতার নিন্দা করেছেন। বাস্তববাদীর প্রধান গুণ সত্যনিষ্ঠা। রোমাণ্টিক লেখক হয়েও শেক্সপিয়র ইতিহাসের যথাযথ অনুবর্ত্তন করেছেন; কোন কোন জায়গায় মনে হয় যে তিনি যেন প্লুটার্কের লেখার পদ্যরূপ দিচ্ছেন মাত্র। কিন্তু বাস্তববাদী শ' সর্ব্বত্র ইতিহাসকে পরিবর্ত্তিত করেছেন। ক্লিওপ্যাট্রার সঙ্গে যখন জুলিয়স সীজারের দেখা হয় তখন তাঁর বয়স ছিল ষোল নয়, একুশ। বার্ণার্ড শ' লিখেছেন যে রোমান সৈন্যের অভ্যাগমের ভয়ে বালিকা ক্লিওপ্যাট্রার এক ছোট পিরামিডের ভিতরে আশ্রয় নেওয়ার পর অভিযাত্রী বাহিনীর সেনাপতি জুলিয়স সীজার সেখানে উপস্থিত হ'ন এবং তাঁদের সেখানে যে সাক্ষাৎ হয় তা একেবারে আকস্মিক। ক্লিওপ্যাট্রার কার্পেট-অভিযানও শ'য়ের রচনায় রূপান্তরিত হয়ে দেখা দিয়েছে। ফ্যারস দ্বীপে সীজার যখন আলোক-গৃহ বা লাইট-হাউসে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন প্রহরীদের এড়িয়ে কার্পেট-বিক্রেতার কার্পেটের ভিতরে ঢুকে ক্লিওপ্যাট্রা সীজারের কাছে উপস্থিত হ'ন। ঐতিহাসিক ক্লিওপ্যাট্রার অভিযানের সঙ্গে এই অভিযানের পার্থক্যের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইতিহাসে আছে যে মহামতি সীজার শুধু ক্লিওপ্যাট্রার মোহে মুগ্ধ হ'ন নাই, তিনি কিছু কাল মিশরে বাস করেন এবং রোমে ফিরে গিয়ে ক্লিওপ্যাট্রাকে আনান এবং সীজারের মৃত্যু পর্য্যন্ত ক্লিওপ্যাট্রা তাঁর রক্ষিতারূপে রোমেই বসবাস করতেন। বার্ণার্ড শ'য়ের নাটকে দেখি যে সীজার মিশরে অবস্থান কালেই ক্লিওপ্যাট্রার কথা ভুলে গেছেন: যাবার সময় শুধু একবার বলেছিলেন, "কি যেন ভুলে গেছি।" ক্লিওপ্যাট্রা উপস্থিত না হলে তাঁর কথা তাঁর মনেই পড়ত না।

বলা বাহুল্য, এই ক্লিওপ্যাট্রা শেক্সপিয়রের ক্লিওপ্যাট্রা নয়, কিংবদন্তী ও ইতিহাসের ক্লিওপ্যাট্রাও নয়। এই ক্লিওপ্যাট্রা ভীতা, ত্রস্তা বালিকা, ধাত্রী ও পরিচারিকাদের দ্বারা লাঞ্ছিতা, জুলিয়স সীজারের ক্ষণেকের খেলার পুতুল। সীজার এঁকে একটু মানুষ করতে চেয়েছেন, সীজারীয় ঢঙ্‌ও কিছু শিখিয়েছেন—এই পর্য্যন্ত। এর না আছে মনের তেজ, না আছে বুদ্ধির দীপ্তি, না আছে অনুভবের ঐশ্বর্য্য। বার্ণার্ড শ' নাটকের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁর রচনা শেক্সপিয়রের চেয়ে ভাল কি না। তিনি একবার বলেছেন যে তিনি সীজারের চিত্র এঁকেছেন শেক্সপিয়রের উপরে টেক্কা দিয়ে; তাঁর সীজার শেক্সপিয়রের সীজার-এণ্টনীর উন্নততর সংস্করণ। প্রসঙ্গান্তরে তিনি বলেছেন যে শেক্সপিয়রের চেয়ে ভাল নাটক তিনি লেখেননি; লেখা সম্ভবও নয়। এই পরস্পরবিরোধী উক্তি একেবারে তাৎপর্য্যহীন নয়। শেক্সপিয়র ছবি এঁকেছেন প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য, জটিলতা ও রহস্যময়তার; বার্ণার্ড শ' চেয়েছেন বুদ্ধি দিয়ে প্রাণশক্তিকে উদ্ভাসিত করতে। এঁদের লক্ষ্য ও কৃতিত্বে পার্থক্যের অবধি নেই।

যদি ক্লিওপ্যাট্রার চরিত্রকেই তুলনার মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করা হয় তা' হলে শ'য়ের প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি আধুনিক নারীর স্বাধীন চিন্তাকে জাগ্রত করেছেন, কিন্তু এক জোন অব আর্ক ছাড়া কোথাও মহামানবীর চিত্র আঁকেননি। সাধারণত: তাঁর আদর্শ রূপ পেয়েছে অতিমানবে, অতিমানবীতে নয়। তিনি অনাগত ভবিষ্যতের ছবি খুঁজেছেন অতীত ইতিহাসে এবং জুলিয়স সীজারকে ভাবী মানবের প্রতিরূপ করে উপস্থাপিত করেছেন। এই মহামানব অপরের দ্বারা চালিত হ'ন না, এঁর হৃদয়ে সব প্রবৃত্তিই জায়গা পায় কিন্তু কোন প্রবৃত্তিই জায়গা জুড়ে বসতে পারে না। আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগারই হ'ক, আর ক্লিওপ্যাট্রার মোহিনী মায়াই হ'ক, কোন জিনিসেরই কোন চরম মূল্য নেই এঁর কাছে। ইনি অবিচলিত কণ্ঠে ক্লিওপ্যাট্রাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর মত সেনাপতির কাছে দীনতম সৈনিকের জীবন ক্লিওপ্যাট্রার জীবনের চেয়ে অধিক মূল্য বহন করে। তিনি বিশ্বজয়ী বীর; সমস্ত জীবন যুদ্ধ করে বহু লোকের প্রাণ হরণ করেছেন; কিন্তু নরহত্যায় তাঁর রুচি নেই। অন্তত: তিনি শাস্তি, বিচার, প্রতিহিংসা প্রভৃতি উপাধি দিয়ে তাকে ঝাপ্‌সা করে দেখেননি। তিনি বীতরাগভয়ক্রোধ; তাঁর অন্তরের আলোক তাঁকে পথ দেখিয়ে চলেছে এবং সেই আলোক সমস্ত অস্পষ্টতার আবরণ দূর করে জীবনের অন্তরতম রহস্যের সম্মুখে তাঁকে প্রধাবিত করেছে। সেই রহস্যের শেষ সন্ধান তিনি পাননি; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রোমান বলেছেন যে রোম হচ্ছে উন্মাদের স্বপ্ন এবং রহস্যাবৃত স্ফিংসের মধ্যে তিনি স্বীয় জীবন-জিজ্ঞাসার প্রতিরূপ দেখতে পেয়েছেন। এই চিত্রে শেক্সপিয়রের নাটকের সমৃদ্ধি, গভীরতা, প্রশস্ততা বা জটিলতা নেই, কিন্তু এই চিত্র স্বীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল। শেক্সপিয়র মানব-হৃদয়ের অলিতে-গলিতে আলোক-সম্পাত করেছেন, তিনি মানবের উচ্চতম অভীপ্সা ও গভীরতম বিষাদকে ভাষা দিয়েছেন। বার্ণার্ড শ' এই বর্ণসমারোহ পরিহার করে অতন্দ্র বুদ্ধি এবং সংযত প্রবৃত্তির ছবি এঁকে তাঁর প্রতিভার মৌলিকতা প্রমাণ করেছেন। তাঁর রচনায় ইতিহাস সঙ্কুচিত হয়েছে, মনুষ্য-হৃদয়ের ভাবসমূহ তাদের যোগ্য মর্য্যাদা পায়নি, কিন্তু নূতন আদর্শের আলোকরশ্মি ভবিষ্যতের জয়যাত্রার আভাস দিয়েছে।

৪ |

প্রতিভা বসু

বোজা চোখের তলায় কী দেখতে পেলো অনসূয়া? নারকোল-সুপুরির বেড়া-ঘেরা একটি দোতলা বাড়ির একটি ছোটো ঘরে একটি ষোলো বছরের সুখী মেয়ে জানালায় বসে বসে উপন্যাস পড়ছে একমনে! মাঝে মাঝে তার চোখ পড়ছে নীচের বাঁধানো-ঘাট পুকুরে, পুকুরে হিজল গাছের ছায়া, পাশে প্রকাণ্ড পাকুড় পাতার ঝিরিঝিরি কাঁপন। বিতান ঢাকা স্নান ক'রে উঠে কাপড় ছাড়বার ঘর।

ক'দিন আগের কথা? এই তো সেদিন, সেদিনও তার ষোলো বছর বয়স ছিলো। কুসুমপুরের বাড়িতে এই তো সেদিনও সে কত সুখী ছিলো। ঘুঘু-ডাকা শাঁ-শাঁ দুপুরে বাগানে বাগানে ঘুরে বেড়াতো, পেয়ারা চিবোতো বসে বসে, জামরুল তলায় গিয়ে কোঁচড় ভরে জামরুল কুড়োতো, ঝড় উঠলে উদ্দাম আনন্দে ছোট ভাই-বোনের সঙ্গে দৌড়-ঝাঁপ, ইচ্ছে ক'রে হেরে যাওয়া, মা-বাবার চোখ এড়িয়ে এলানো এলানো লম্বা আমডালে উঠে বসে পা ঝোলানো—এই তো সব সেদিনের স্মৃতি। তার পর সন্ধেবেলা মালির সঙ্গে ঝারি নিয়ে কাড়াকাড়ি; রজনীগন্ধা আর চামেলীর গন্ধে ভরে যেতো সারা বাড়ি।

মস্ত জমি। এ-মাথা ও-মাথা হেঁটে বেড়াতেই পরিশ্রম। অবিনাশ বাবু সৌখীন মানুষ আর তাঁর সুযোগ্য সহকারী সব সন্তানের মধ্যে সব চেয়ে প্রিয় অনসূয়া। আম জাম কাঁটাল কলার বড় বাগান তাঁর পৈতৃক, কিন্তু শাক-সবজি আর ফুল তাঁর নিজস্ব। বাপে-মেয়ে দু'জনে মিলে প্ল্যান্ ক'রে সাজিয়েছিলো সেই সব বাগান। টালির প্রশস্ত রান্না-ঘরের পিছনে জালঘেরা প্রকাণ্ড কিচেন গার্ডেন। বাড়ির সামনে বারান্দার তলায় কোণাচে-কোণাচে ইটের মালার ফাঁসে বিলিতি রঙিন ফুল, তাদের মাথা বারান্দা পর্য্যন্ত উঁচু, বারান্দার বর্ডার। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গোল সবুজ, লন, গোল ক'রে ঘাস-ফুল ঘিরে আছে তাদের। দু'পাশ দিয়ে সাপের মতো পেঁচিয়ে রাস্তা চলে গেছে সদরের ফটক পর্য্যন্ত। লাল রংয়ের সুরকি-ঢালা সেই রাস্তার দু'পাশে রজনীগন্ধার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। গেটের দু'পাশে দু'টি হাসনুহানার ঝাড়, বাঁশ দিয়ে গোল-করা মাথায় কখনো কুঞ্জলতা, কখনো, ঝুমকো ফুল, কখনো মাধবী, যে ঋতুতে যেটা হয়।

ডাইনে-বাঁয়ে একটু দূরে-দূরে ছোট-ছোট চৌকো-চৌকো ক'রে এক-একটি ফুলের বিছানা। পূব দিকে একেবারে কোণে একটি মস্ত বকুল ফুলের গাছ, অবিনাশ বাবু বাঁধিয়ে নিয়েছেন চার পাশে, গরমের সময়ে ওখানে তিনি সবাইকে নিয়ে পাটি পেতে বসেন। তখন হাতে তাঁর একটি তালপাখা থাকে বটে, কিন্তু হাওয়ার জোরে নাড়তে হয় না সেটা।

কিচেন গার্ডেনটি কিছু দিন পরেই অনসূয়ার মা স্বামী ও কন্যার হাত থেকে নিজের হাতেই নিয়ে নিয়েছিলেন। এবং তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে এক বছরের পরিশ্রমে তিনি এমন ফসল ফলিয়েছিলেন, বালিহাটির একজিবিশনে তাঁর সেই ক্ষেতের লাউ-কুমড়োই ফার্ষ্ট হ'য়েছিলো সেবার। অহংকারে তিন দিন তিনি চোখ টান ক'রে রইলেন।

ষোলো বছরের পলিমাটি জমেছে সেই সব দিনগুলোর উপর। তবু, তবু কি ভোলা যায়? মুছে ফেলা যায় সব হৃদয় থেকে? এই তো, চোখের তলায় সব ভিড় ক'রে এসেছে আজ। আর ঘুম নেই। ঘুমেরা দুর্বল, তারা তাদের সরিয়ে দিয়ে নেমে আসতে পারছে না চোখের পাতায়। চোখের পাতা বুজে আসছে না ভারি হ'য়ে, অতন্দ্র, নির্ঘুম জ্বালা-ভরা চোখ কেবলি খুলে-খুলে যায়।

ভাই-বোনেরা তার চেয়ে অনেক ছোট। তার যখন পুরো দশ বছর বয়স তখন তার মা দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিলেন। এখনো স্পষ্ট মনে আছে সেই দিনটি। একতলার পূব-কোণ ঘরটিতে মা গিয়ে শুলেন, মা'র পিসিমা ব্যাকুলিত হয়ে রইলেন তাঁর কাছে, বাবা অস্থির হ'য়ে ছুটোছুটি করতে

ডাক্তার এলো, পেত্নীর মতো চেহারার সোজা ড্রেস করা, বড়ি খোঁপা বাঁধা, ফিতে বাঁধা জুতো পায়ে ধাত্রী এলো এক জন, দাই এলো একটা—দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল; আর সেই বন্ধ দরজার রন্ধ্র বেয়ে-বেয়ে মা'র সুতীব্র কান্না শেলের মতো এসে বিঁধতে লাগলো তার বুকে। বাগানে জামতলায় ব'সে দুই হাঁটুতে মুখ লুকিয়ে কী কান্নাই কেঁদেছিলো সে। এক সময় বাবা গিয়ে খুঁজে-খুঁজে ধরে নিয়ে এলেন তাকে, 'আয়, আয়, দেখবি আয়, কী সুন্দর একটা বোন হ'য়েছে তোর। আর হ'য়েই কি বলছে জানিস? কোয়াকোয়া, অর্থাৎ কই? কই? দিদি কই?'

বুকের মধ্যে যেন শিরশির ক'রে উঠেছিলো সেই লাল টুকটুকে একরত্তি মানুষটাকে দেখে। তার নামই কি স্নেহ?

জীবন আলো ক'রে দিলো সেই কালো-কালো চুলে ঘেরা হাসি-হাসি শিশুমুখ। তার পর পাঁচ বছরের মধ্যে আরো দু'টি ভাই।

কুসুমপুর বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। ঠিক গ্রামও অবিশ্যি নয়, সাবডিভিশন সহর। হাই ইস্কুল আছে, কাছারি আছে, হাসপাতাল আছে, সপ্তাহে একটি ক'রে মস্ত হাট বসে। দৈনন্দিন বাজারও কম উল্লেখযোগ্য নয়। সেখানে সবাই সকলকে চেনে, সবাই সকলের দাদা দিদি খুড়ি জেঠি।

রেষারেষি, ঝগড়া, হিংসে, সরিকি বিবাদ, পরচর্চ্চা, কুৎসা, দলাদলি, সামাজিকতা,—গ্রামের যা বৈশিষ্ট্য, কুসুমপুরেও তার ব্যতিক্রম ছিলো না। একে সুখে থাকতে দেখলে বুক জ্বলে যায়, এর মেয়ের ভালো বিয়ে হ'লে তার মেয়ের বাবা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। ভাব আর ঝগড়া যেন একেবারে হাত-ধরাধরি ক'রে আছে সর্ব্বদা।

অবিনাশ বাবু সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, নেহাৎ নির্বিরোধী মানুষ। বারোয়ারীর বৈঠকখানায় তিনি তামাক টানতে-টানতে সন্ধ্যাও কাটান না, বাড়ি-বাড়ি ঘুরেও বেড়ান না লোকের হাঁড়ির খবর নিতে। আর তাঁর স্ত্রীও নেহাৎ শান্ত স্বভাবের মানুষ, উপরন্তু তাঁর অসম্ভব বই পড়ার ঝোঁক। সংসারের কাজকর্মের পর যতটুকু তিনি অবকাশ পান বই পড়েন গোগ্রাসে। গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ যা যেখানে পান। তিনটি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা আসে তাঁর নামে। গ্রামের একমাত্র লাইব্রেরী 'কুসুমপুর ইনষ্টিটিউসনের' মেম্বার তিনি, মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন দেখে কলকাতা থেকেও বই আনান হয় তাঁর জন্য, কাজেই সময় কাটাবার আর ভাবনা কী? দু'-চার জন বাছা বাছা মনের মতো বন্ধু-সমাগমে মাঝে মাঝে ভরে ওঠে বাড়ি, দোতলার খোলা ছাদে আসর সরগরম হয়। অনসূয়ার মা চা তৈরী করেন, নারকেলের খাবার দেন, তামার টাটে বেল ফুলের রাশি ভেজা ন্যাকড়ায় ঢাকা থাকে। বাতাসে গন্ধ ছড়ায়।

কী সুন্দর সে সব দিন! কোথায় গেল? কেন গেল? কার দোষে এমন হ'লো? কে দায়ী সে জন্যে! তার বাবা? কাকা? বন্ধু-বান্ধব? আত্মীয়-পরিজন কেউ? না, না, কেউ না, কাউকে অভিযোগ করতে পারে না সে, দোষ তার একলার, তার একলার দোষেই এত বড় একটা সর্ব্বনাশ ঘটে গেল, ঘটতে পারলো। কেন এত বড় একটা ভুল সে করেছিলো জীবনে? কেন এই কালি লেপন করেছিলো নিজের মুখে, সকলের মুখে? ষোলো বছর পরের এই সর্ব্বজাতি সর্ব্বভাব সমন্বয়ের একমাত্র নিবাস কলকাতা শহরেও কি এ ঘটনা অবিরল? অনিন্দ্য? আর ওখানে, কুসুমপুরে, ঐ ক্ষুদ্র মফঃস্বল সহরের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে এক জন গ্রাম্য ভদ্র মেয়ে হয়ে এমন কাণ্ড সে করেছিলো কেমন ক'রে? ঠিক্, তার মতো মেয়ের গতি তো এই হওয়া উচিত। হঠাৎ জুড়োনো আগুনে ফুলকি উঠলো। দাঁতে দাঁত চাপলো অনসূয়া। চকমকির ঘর্ষণে যেমন বিদ্যুৎ চমকে ওঠে, তেমনি জ্বলে উঠলো তার বুক।

নিজের কথার নিজেই প্রতিবাদ করলো মনে মনে। না, না, না, তার এই যন্ত্রণার জন্য কক্ষনোই নিজে দায়ী নয় সে। কে দায়ী, তাও সে জানে। সর্ব্বান্তঃকরণে জানে। হয়তো সে ভুল করেছিলো অন্যায় করেছিলো, হয়তো কোনো এক দিন এর চেয়েও মর্মান্তিক কষ্টে পড়তো। পড়তো পড়তো, সে জন্যে আর তো কেউ দায়ী হ'তো না, অভিযোগ করবার তো থাকতো না কেউ? কিন্তু তার কাকা, কাকা-নামধারী সেই নিষ্ঠুর কপট হৃদয়হীন মানুষটা, যাকে দেখলে এখনো তার খুন চেপে যায়, সে কেন তার শুভাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে মহাসমারোহে এতো বড়ো একটা উপকার করতে গিয়েছিলো? তা নৈলে তো আজ অনসূয়া—আজ অনসূয়া কী! হঠাৎ কী মনে ক'রে যেন তার নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে এলো।

অথচ অন্যায়ে যিনি এতো বড়ো দণ্ডধারী, অভাবে তিনি সহায় নন। ষোলো বছর ধরে সে যে আগুনে জ্বললো, যে গ্লানি, যে লজ্জা, যে দুঃখ সে নিঃশব্দে বহন করলো, সে গ্লানি, সে লজ্জা নিবারণের কোনো ইচ্ছে তার ছিলো না, কেবল ধিক্কার দিয়ে তাকে তীব্রতর করবার উৎসাহ ছিলো প্রচুর।

অনসূয়া কি ভুলে গেছে সে সব দিনের কথা? অনসূয়া কি ক্ষমা করেছে? তুষের আগুন কি ধিকি-ধিকি জ্বলছিলোই না তার বুকের মধ্যে ষোলো বছর ধরে? আজ এখন এই মুহূর্ত্তেও কি জ্বলছে না?

৫

অবিনাশ বাবু সেই গ্রামের স্কুল-মাষ্টার। সস্তা চাল, বাগানে ফল, গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ। দুঃখের কথা ওঠে কিসে? আর নারকোল-সুপুরি তো অপর্য্যাপ্ত। ধনী না হ'লেও, স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিলো না তাদের। সেকালের এক-এ পাশ, বিদ্যানুরাগী মানুষ, ভালো পড়ান। স্কুলে সুনাম ছিলো। গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে এক জন। লোকেরা তাঁকে সম্মান করতো, ভালোবাসতো, ছেলেরা পড়তে চাইতো তাঁর কাছে, ভালো ইংরিজি জানতেন বলে হেডমাষ্টারের পরেই তার মাইনে ছিলো। আর সে মাইনে সংসারের পক্ষে যথেষ্ট। কেনো বই, আনো শাড়ি, লাগাও ভোজ, কারো জন্মদিনে বহুমূল্য উপহার আনানো হোক্ কলকাতা থেকে, খাওয়া-পরার মতো আনন্দের খোরাকও যোগাতো সেই টাকা।

অনসূয়া লেখাপড়ায় মনোযোগী, দেখতে ভালো, আশে-পাশের সকলের চাইতে ঢের বেশী বুদ্ধিমতী, বাবার গৌরবের বিষয়। তাঁর সব সন্তানের মধ্যে সব চাইতে আদরের। ঐ গ্রাম্যশহরে অবিনাশ বাবুর কন্যা দস্তুরমতো বিখ্যাত। সব-কিছু মিলিয়ে সেই শহরে সত্যিই একটু বিশেষ ছিলো সে।

গ্রামে মেয়েদের হাইস্কুল ছিলো না, জমিদারের বৃত্তিতে প্রাইমারী স্কুল চলতো একটি। অবিনাশ বাবু একবার প্রস্তাব করলেন,

কো-এডুকেশন' প্রচলন করা হোক, মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গেই স্কুলে ঢুক না। এ নিয়ে পরিশ্রম করলেন অনেক, কমিটি গঠন করলেন, গেলেন এস. ডি. ওর বাংলোয়, গেলেন জমিদারের দপ্তরে, সব ব্যবস্থা ক'রে নিজের মেয়েকেই প্রথম নিয়ে গেলেন স্কুলে, ক্লাশে, অনসূয়া তখন পনেরো পূর্ণ হ'য়ে ষোলো ধর-ধর।

তার পর এই নিয়ে কী দলাদলি, ঝগড়াঝাঁটি, মাথা ফাটাফাটি! ত কাণ্ডই না হ'লো সেই বছর। নির্বিরোধী মানুষটির একটি বিরুপক্ষ সৃষ্টি হ'লো শুধু, আর কোনো লাভ হ'লো না। মা বললেন, বিশ্রী সহর সত্যি, এখানে আবার কেউ কারো জন্ম ভালো করে?'

'প্রথম প্রথম সব জায়গাতেই এই হয়, তাই বলে কি হাল ছেড়ে দিলে চলে? কো-এডুকেশনটা স্কুলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বোধ হয় না হওয়াই ভালো। এবার একটা মেয়েদের হাইস্কুলের জন্যই চেষ্টা করবো আমি।' নিজের আদর্শে অটল বাবা।

'তার চেয়ে মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করো, কাজ হবে।'

'বিয়ে! এখুনি?'

'এখুনি মানে? বয়স কম হ'লো নাকি।'

'তুমি থামো। ঐটুকু মেয়ের কাছে আর বিয়ে বিয়ে কোরো না।'

'শীতল বাবুর মেয়ে ওর চেয়ে এক বছরের ছোট, তারও তো বিয়ে হ'য়ে গেল। দক্ষিণের বাড়ির নাটুর বিয়ে হলো, সুজিতের বোনের'—

'উঃ, কার সঙ্গে কার তুলনা!' বাবা প্রায় কঁকিয়ে উঠলেন।

'এত বাড়াবাড়ি কোরো না, মেয়ে তোমার দেখতে যেমনই হোক, টাকা এত প্রচুর নেই যে—'

'দয়া ক'রে তুমি একটু চুপ করো। ওর জন্যে একটু কম ভাবো তুমি'—বিনীত অনুরোধে যেন আনত হয়ে পড়লেন বাবা।

তখনকার দিনে সেই গ্রামে পনেরো-ষোলো বছর বয়স নেহাৎ কম বয়েস বলে গণ্য ছিলো না, অনসূয়ার চেয়ে কত সব ছোট-ছোট মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেল চোখের সামনে, কাজেই মা'র সেই ভাবনাটা অপরাধের ছিলো না। তাছাড়া সে সময়ে বড়ো-বড়ো ঘর থেকে অনেক ভালো-ভালো বিয়ের প্রস্তাবও এসেছে তার। মেয়েই তো! এক দিন তো দিতেই হবে পরের ঘরে, ভালো ঘর ভালো বর পেলে তো দিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এই ছিলো মা'র যুক্তি। 'আচ্ছা আচ্ছা, ম্যাট্রিকটা দিক তো।' স্ত্রীর সেই যুক্তি থেকে উদ্ধার পাবার এই শেষ অস্ত্রটি ব্যবহার করেছেন অবিনাশ বাবু।

অনসূয়াকে নিয়ে বাবার এই বাড়াবাড়িটা অবিশ্যি কোন দিনই পছন্দ করেননি কাকা, কিন্তু কী যে পছন্দ করেছেন তারও কোন নির্দ্দিষ্ট চেহারা ছিলো না। মাঝে মাঝে অনসূয়ার মনে হ'তো কাকা যেন ভালো চোখে দেখছেন না তাকে। লেখা-পড়ায় তার এই আসক্তি, যেন পছন্দ হচ্ছে না তাঁর, খুব ভালো কোন সম্বন্ধ এলেও তেমন উৎসাহিত হ'তে দেখা যেতো না তাঁকে। তবে তিনি কী চাইতেন?

অনসূয়ার চাইতে তিন বছরের ছোট তাঁর নিজের মেয়েটি, কলকাতার স্কুলে পড়তো। বয়সেই অনসূয়ার চাইতে ছু'বছরের ছোট কিন্তু পড়াশুনোয় তার ছু'বছর তলায় ছিলো। স্বাস্থ্যহীন নীরক্ত কালো রং প্যাতলা চুল এইটুকু ছোট্ট একটি মেয়ে। কাকা কি তার গ্রাম্য ভাইঝির সঙ্গে নিজের শহুরে মেয়েটিকে তুলনা ক'রে ঈর্ষায় কাতর হ'তেন? মনে মনে ভেবেছে অনসূয়া। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রায়ই এই কথা ভাবিয়েছে তাকে। কিন্তু লজ্জিতও হ'য়েছে সে জন্যে, নিজেকে সে ছোট মনে করেছে, দাম্ভিক মনে করেছে, গুরুজনের প্রতি এই অহেতুক মানসিক অসম্মান অন্যায় মনে হ'য়েছে তার।

৫

কাকা ওকালতি করতেন কলকাতা শহরে। সেখানেই তাঁর বসবাস ছিলো। ওখানকার ইট-কাঠে হাঁপ ধরলে কিম্বা প্রসবান্তে স্ত্রীর শরীর খারাপ হ'লে এখানে চলে আসতেন চেঞ্জে। দেশটাই তাঁর একচেটে বায়ু-পরিবর্ত্তন কেন্দ্র। সমুদ্রের কাছে এই গ্রাম, পুকুরের টাট্‌কা মাছ এ-বাড়িতে, টাটকা দুধ, চাল আর মুসুরির ডাল তো এখানকার একটা বিশেষ আকর্ষণ। আর সব চাইতে যেটা আরামদায়ক সেটা হচ্ছে বৌদির অক্লান্ত পরিচর্য্যা। কাজের তাড়ায় নিজে হয়তো বেশী দিন সেই আরাম উপভোগ করতে পারতেন না, কিন্তু স্ত্রী এবং পাঁচ-ছ'টি ছেলে-মেয়েকে রেখে দিয়ে পুষিয়ে নিতেন সেটা।

ভাইয়ের প্রতি অবিনাশ বাবুর কেমন একটা অস্বাভাবিক দুর্বলতা ছিল। তিনি যে কী খুশীই হ'তেন ও'রা এলে! তবে কাকা কেন তাঁর দাদাকে সেটুকু আনন্দ জুগিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন না? তাছাড়া এ-বাড়ির এক জন অংশীদারও তো তিনি? যদিও তাঁদের এই পৈতৃক বাড়ির বারো-আনি অংশই অবিনাশ বাবুর নিজের তৈরী। আগে কী ছিল? ঝোপ, ঝাড়, জঙ্গল, আর জঙ্গলের মধ্যে এই পাকা বাড়িটির একটি ভগ্নাবশেষ। অবিনাশ বাবু নিজেও অনেক দিন পর্য্যন্ত বিদেশেই কাজ করতেন। মা-বাপ ছিলো না, স্ত্রী আর ভাইকে নিয়েই তাঁর সংসার। বিকাশকে কলকাতা বোর্ডিংয়ে রেখে পড়াতেন। সে ছুটিতে ছুটিতে আসতো, স্বামি-স্ত্রীর নির্জন সংসার মুখর হ'য়ে উঠতো। বি-এ পাশ ক'রে ল' পাশ করলো বিকাশ, ওকালতিতে বসলো বহু অর্থ ব্যয় ক'রে কলকাতা শহরে, বিয়ে ক'রে দাদার ধারের ভার কিছুটা লাঘব করলো। তখন অনসূয়া সবে জন্মেছে। আর অনসূয়া যখন তিন বছরের তখন দেশে এসে স্থায়ী হ'লেন অবিনাশ বাবু।

বিয়ে করেছিলেন অল্প বয়সে। করেছিলেন মানে বিধবা রুগ্ন মা'র পরিচর্য্যার জন্য করতেই হয়েছিলো। বিকাশ তখন দশ বছরের বালক আর অবিনাশ বাবু উনিশ। মাঝখানে আরো চারটি ভাই-বোন হারিয়েছিলেন তিনি, তার পর এই বিকাশ। মা'র ক্ষীণায়ু ক্ষীণতর হ'তে হ'তে এক দিন আস্তে নির্বাপিত হ'য়ে গেল, বিকাশকে পিতৃস্নেহে লালন করতে লাগলেন তিনি। আর তার শিক্ষার জন্য, স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যেই চাকরী নিতে হ'লো বিদেশে। অনসূয়া যখন জন্মালো অবিনাশ বাবু তখন তিনের ঘর ধরে ফেলেছেন। এই ছোট্ট কণিকাটুকু যে স্বর্গের সুষমা নিয়ে এক দিন আসবে তাঁদের ঘরে এমন একটা স্বপ্নও যখন আর তাঁরা দেখেন না ঠিক তখন এক মাথা চুল আর গোলাপী রং নিয়ে যেন হঠাৎ এক দিন অনসূয়া ঝরে পড়লো তাঁদের সংসারে। বয়স্ক পিতা-মাতার দুর্বার স্নেহ উদ্বেলিত হ'য়ে উঠলো। কৃষির দপ্তরে টুরের চাকরী করতেন, ভালো

ছিলো, বড়ো দরের উন্নতি ছিলো সেই চাকরীতে কিন্তু হঠাৎ মত বদলে গেল তাঁর। মেয়েকে এক দিনও না দেখে থাকাটা যেন চরম ক্ষতি মনে হ'তে লাগলো। যে ক্ষতিপূরণ এ চাকরীতে কেন, পৃথিবীর কোন-কিছুতেই আর সম্ভব নয়। প্রস্তাবটা অনসূয়ার মা-ই তুললেন, 'চলো না, আমরা দেশে গিয়েই থাকি। তোমার এই রোজ রোজ ট্যুরের চাকরী আমারো আজকাল আর ভালো লাগে না।'

না-লাগার অবিশ্যি কারণ ছিলো। মেয়ে জন্মাবার আগে তিনি নিজেও যেতেন সঙ্গে, কিন্তু মেয়ে বুকে ক'রে আর সেটা সুবিধে হ'লো না। ঘোরাঘুরি করলে কিছু-না-কিছু অনিয়ম হবেই শিশুর। সেটা অসম্ভব। চোদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হ'য়ে যে মেয়ের চব্বিশ বছর বয়সে সন্তান জন্মায় সেই মা'র পক্ষে তার শিশু যে কতখানি, সে কথা শুধু সেই মায়েরাই জানেন। জীবন থেকে আরো অনেক কিছুর মতো এই স্বামিসঙ্গটুকুও তাঁকে বাদ দিতে হ'লো।

দেশের জমিজমা তো বারো ভূতেই লুঠে খায়,(যদিও কথাটা সত্য নয়, কেন না পরে জানা গেল বছরে দু'-একবার কাকা আসেনই দেশে, যা পারেন, যতটুকু পারেন, গাছের আম জাম কাঁটাল কলা সবই তিনি নিয়ে যান তার কলকাতার ফ্ল্যাটে। নারকেল বিক্রী করেন, জমি ইজারা দেন।) নিজেরা গিয়ে থাকলে তেমন যত্ন নিলে ঐ থেকেই মোটামোটি খাওয়া-পরার সংস্থানটা হ'য়ে যাবে নিশ্চয়ই। কী দুঃখে আর পরের চাকরী করা! কথাটা মনে ধরলো অবিনাশ বাবুর। কিন্তু চাকরী তো একটা চাই-ই? বাড়ি-ঘর সংস্কার করতে হবে, মেয়েকে বড়ো করতে হবে—ওখানকার স্কুলে একটা চিঠি লিখলেন তিনি। ঐ স্কুল থেকেই এক দিন সসম্মানে সারা গ্রামের মুখ উজ্জ্বল ক'রে এণ্ট্রেন্স পাশ করেছিলেন, অল্প চেষ্টাতেই প্রায় বিনা চেষ্টাতেই একটা মাষ্টারি জুটে গেল তাঁর।

তার পর কাটা হ'লো জঙ্গল, বাড়ি সংস্কার করা হ'লো, রান্নার দালানের সব ইট কবে একবার এসে বিক্রী ক'রে গিয়েছিলেন কাকা শ' হিসেবে, জানতেন না অবিনাশ বাবু। সেই ঘর আবার তোলা হ'লো মাথায় টালি দিয়ে। জানালা-দরজা তাও শোনা গেল তিনিই বিক্রী করে গেছেন মাস কয়েক আগে। অবিনাশ বাবু বললেন, নিজেরা চুরি ক'রে বিকাশের নামে চালাচ্ছে। ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ লাগাবার চেষ্টা। বিকাশ শুনে রাগে লাল হ'লো চিঠিতে। মেয়ে হ'য়ে দাদা-বৌদি যে বদলেছেন একটু, সেটুকুও আভাসে-ইঙ্গিতে বাতাসের মতো ছড়িয়ে দিলো সেই চিঠিতে। সস্নেহে অবিনাশ বাবু বললেন, 'পাগলা'!'

তার পর বসাও দরজা, লাগাও জানালা, আনো সিমেণ্ট, বাড়াও, কমাও, তিন বছরের যত্নে চাকুরী-জীবনের সব সঞ্চয় খসিয়ে তৈরী হ'লো এই সুন্দর বাগানওলা দোতলা ভদ্রাসনটি। নতুন ক'রে পুকুর কাটিয়ে মাছ ছাড়া হ'লো, মাটি তোলানো হ'লো পুরোনো গাছের গোড়ায়, নতুন গাছ লাগানো হ'লো, ছাঁটা হ'লো অকেজো কাজ, কৃষি-বিভাগের সমস্ত বিদ্যে তিনি ফলালেন এই জমিতে। তার পর এক দিন সতেজ সবুজ পাতারা ডাল-পালা মেলে বিস্তীর্ণ হ'লো আকাশে। প্রচুর ফল-ফুল প্রসব ক'রে শীগগিরই অবিনাশ বাবুর যোগ্যতাকে অভিনন্দন জানালো।

পাঠাবার মতো সব ভাগই অবিশ্যি ভাইয়ের কাছে পাঠাতেন সমান অংশে, কিন্তু বাড়ির আদ্ধেক তো আর পাঠানো সম্ভব নয়? সেটাতে ভোগ-দখলের স্বত্ব রাখতে হ'লে আসতে হয়, থাকতে হয়। আজ এই বয়সে এই অভিজ্ঞতায় কাকাকে ভালো ভাবেই বিশ্লেষণ করতে পারে অনসূয়া, তখন সেই বয়সে শুধু একটা অনির্দিষ্ট খারাপ লাগার রেশ জড়িয়ে থাকতো মনে মনে। একটা অসন্তুষ্টির কামড়। বাবা-মা'র এত প্রিয়পাত্র কাকাকে পছন্দ করতো না সে। ভালোবাসতো না।

বাবা না হয় ভ্রাতৃস্নেহে অন্ধ ছিলেন, কিন্তু মা? মা-ও কি কিছু বুঝতেন না? মা তো পরের মেয়ে, মা'র সঙ্গে তো কাকার রক্তের সম্বন্ধ ছিলো না? তিনি তো নিরপেক্ষ হ'য়েই বিচার করতে পারতেন? তবে? তবে কেন নিজের অনলস স্বভাবের সমস্ত পরিশ্রম তিনি অম্লানবদনে খরচ করতেন এই লোকটির উপর? ভাবতে গিয়ে মনে মনে রাগ হ'লো অনসূয়ার।

অবিশ্যি কাকাও প্রতিদান দিতেন তাঁকে। লালপাড় ধনেখালির শাড়ী আনতেন, বিস্কুটের টিনে ভ'রে মিঠে পান আনতেন ভিজে ন্যাকড়ায় বেঁধে, বাবার জন্যে আনতেন বাদলরামের সুগন্ধি কিমাম। ছেলে-মেয়ের জন্যেও আনতেন বৈ কি। কত রকম দম-দেয়া খেলনা, লাল পিছ্‌লে-কাগজ মোড়া খয়েরী চকোলেট, তার জন্যে ফ্রক, শাড়ী—যখন আসতেন দস্তুরমতো সাড়া পড়ে যেতো একটা। তার পর যাবার আগে ধার চাইতেন বাবার কাছে, 'একদম ফুরিয়ে গেল, কেমন ক'রে যে গেল'—

'তাতে কী, তাতে কী', ব্যস্ত হ'য়ে উঠতেন, বাবা, 'আমার কাছে তো রয়েইছে, এই তো মাইনে পেলাম।'

'হ্যাঁ, আমি গিয়েই পাঠিয়ে দেব, ওরাও তো রইলো, খরচ তো আছে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, সে জন্যে আর ভাবতে হবে না তোকে।'

ঠিক-ঠিক জায়গায় ঠিক-ঠিক বুদ্ধিতে কাকা অদ্বিতীয়। তাঁর জিনিশপত্রগুলো জেগে থাকতো চোখের সামনে, তাঁর দেবার হাতের প্রশংসা ছড়িয়ে পড়তো পাড়ায়, আর দাম যোগাতে মাসের শেষে মাথা চুলকোতে হ'তো বাবার।

কিন্তু কাকীমাকে ভালোবাসতো অনসূয়া। কাকীমা'র সব কিছুই তার ভালো লাগতো। রোগা-রোগা হাতে হঠাৎ-হঠাৎ কাকীমা গলা জড়িয়ে ধরতেন তার, আদর করতেন, টানা-টানা চোখে হাসি-হাসি মুখে মিষ্টি গলায় ডাকতেন 'অমাই, অনিমণি!' অনসূয়া একেবারে গলে যেতো কাকীমা'র সরু উষ্ণ রোগা বুকের মধ্যে।

এখনো, আজও কাকীমা তার তেমনি ভালো আছেন, তেমনি ছোট্ট-খাট্ট সরল স্নেহে-ভরা মানুষটি, স্বামীর ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত। ঐ একটি মাত্র মানুষ, যিনি তাকে কোনো দিন দুঃখ দেননি, অসম্মান করেননি, এক দিনের জন্যে সায় দেননি স্বামী-ভাসুরের হৃদয়হীনতায়। একটা কটু কথা উচ্চারণ করেননি আজ পর্য্যন্ত। বার করা মেয়ে যখন ঘরে এলো অনসূয়ার মা পর্য্যন্ত ক'দিন ছোঁননি তাকে—কাকীমা জড়িয়ে ধরলেন দুই হাতে। তার চোখ বেয়ে বড়-বড় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়লো। কী ক'রে ভুললেন তিনি সেই দুঃখ? কোনো দিন তিনিও কি এই দুঃখের আস্বাদ জেনেছিলেন

জীবনে ? না কি শুষ্ক স্বার্থপরায়ণ স্বামীর ঘর করতে-করতে একটা রন্ধ্র খুঁজছিলেন নিজের ব্যর্থতাকে চোখের জলে ভাসিয়ে দেবার। বুকের ভেতর থেকে একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এলো অনসূয়ার। কণ্ঠার উঁচু হাড় আর একটু উঁচু হ'য়ে উঠলো। সরু একছড়া হার চিক্‌চিক্ করলো সেই হাড়ের উপর।

তার পর আরো এক জন মানুষকে তার মনে পড়লো ঝাপসা, অস্পষ্ট। কিন্তু এই মাত্রই কি মনে পড়লো? অভিনয়ের নেপথ্য সঙ্গীতের মত আজ ক'দিন ধরেই সেই অস্পষ্ট ঝাপসা মানুষটি কি তার হৃদয়কে মথিত ক'রে রাখেনি? সেই, সেই মানুষটা। আজ ষোলো বছর পরেও যার শত্রুতা ফুরোলো না তার সঙ্গে। সেই জন্তু, সেই পশু, সেই মনুষ্যনামধারী বর্ব্বর জানোয়ারটা।

অথচ কী আশ্চর্য্য! এক দিন সেই মানুষটাকেই সব চেয়ে বেশী ভালোবেসেছিলো সে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে এক দিন তার সমস্ত হৃদয় প্লাবিত হ'য়ে উঠেছিলো ভরা জোয়ারের মত। ঘন চুলে আঙুল ডুবিয়ে সে যখন আস্তে আস্তে কথা বলতো, মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাকতো অনসূয়া, বুদ্ধির আভায় উজ্জ্বল ঝকমকে দু'টি চোখের তারায় কত স্বপ্নই যে দেখতে পেতো। বিনম্র মধুর একটি অতি সুন্দর মুখ। অতি সুন্দর। মুখটা এখন আর মনে পড়ে না, মানুষটিকেই আর মনে পড়ে না। বরং মনে পড়লে রাগে চিড়বিড় ক'রে ওঠে সর্ব্বশরীর। তবু, তবু মনে পড়া চাই! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! অল্প বয়সের একটা বোকা মেয়েকে ঠকাতে একটু আঘাতও লাগলো না ওর পৌরুষে?

জেল? ফাটক? সশ্রম কারাদণ্ড? মাত্র তিন বছরের? তিন বছরের ফাটক বাস আবার একটা শাস্তি! সারা জীবন কেন ও প'চে প'চে মরলো না ঐ চারটে বোবা দেয়ালের ফোকরে বন্দী হ'য়ে। সমগ্র জীবন তো তার দিল ব্যর্থ ক'রে? সমস্ত কিছু থেকে বঞ্চিত করলো তো তাকে? আর নিজে? কোথায়? কোন নরকে পচছে এখন? কোন নরক থেকে স্মৃতি হ'য়ে আজ আবার ধোঁয়ার মতো পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠে এলো তার মনে? তার আজকের এই শুভক্ষণে, শুভদিনে। স্মৃতি! স্মৃতি! স্মৃতি! দম আটকানো, অন্ধকার কালো কালো গহ্বর সব। অনসূয়া কি উন্মাদ হ'য়ে যাবে এই স্মৃতির ভারে। অনসূয়া কি এই মুহূর্ত্তে এই লালপাড় অধিবাসের কোরা শাড়ি পরে, হাতে চিক্‌চিকে সোনার চুড়ি নিয়ে পালিয়ে যাবে এখান থেকে? যাবে সেখানে, যেখানে, সেই নরকে বসে বসে আজকের দিনেও সেই লোকটা শত্রুতা করছে তার সঙ্গে, স্মৃতির সমুদ্র সাঁতরে-সাঁতরে ঠিক এসে হাজির হ'য়েছে এই অন্ধকার টিনের ঘরে।

'বিনয়! আমাকে তুমি বাঁচাও। আমাকে তুমি ক্ষমা কর। আমাকে মুক্তি দাও এই যন্ত্রণাময় স্মৃতি থেকে। তুমি তো আর নেই, তুমি অস্পষ্ট, তুমি নিশ্চিহ্ন, তুমি তো শুধু একটা ইতিহাস মাত্র। তোমার চেহারা ভুলে গেছি আমি, তোমাকে ভুলে গেছি, তুমি যাও, তুমি যাও, আর আমাকে কষ্ট দিও না। দিও না।' হাতে হাত নিষ্পেষিত করলো অনসূয়া, হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজলো।

৬

বিনয়! বিনয়! বিনয়! সারা মন জুড়ে এই এক ধ্বনি, সারা বাড়ি জুড়ে এই এক শব্দ। বাবা বলেন 'চমৎকার!' মা বলেন 'সত্যি!' ছোট ভাই-বোনেরা মূর্চ্ছা যায় বিনয়দা'র নামে। আর অনসূয়া চৌধুরী? কুসুমপুরের শ্রেষ্ঠ মেয়ে? বিনয় রায়ের শান্ত স্নিগ্ধ সুশীলা মেধাবী ছাত্রীটি? নত মস্তকে বইয়ের বোঝা নিয়ে যে ম্যাট্রিকুলেশনের পড়া শেখে আর চোখে চোখ পড়লে দৃষ্টি নামায়—সে? জঘন্য। প্রেম বলে আবার আছে নাকি কিছু? কাকা ঠিকই বলেন, 'প্রেম করে কারা? দেহ বেচে যারা।' এই মর্মে তিনি একটা বক্তৃতাও দিয়েছিলেন সেই সময়ে। কিন্তু বক্তৃতায় কি কোন কাজ হ'য়েছিলো? যাতে হ'য়েছিলো সে হচ্ছে চাবুক। চাবুক—চাবুক ছাড়া কি এর আর অন্য ওষুধ আছে?

এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয় গুণে-গুণে কাকা নিজের হাতে চাবুক মেরেছিলেন, আর বাবা, তার সব চেয়ে বড় বন্ধু, ভাইয়ের প্ররোচনায় রক্ত-চক্ষে বলেছিলেন, 'বল্, বল্ হতভাগিনী, কী সাক্ষী দিবি তুই, কোর্টে দাঁড়িয়ে তুই কী বলবি?'

পাগলের মতো দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছিলেন মা, 'বল, ওরে বল, বল যে ওঁরা যা বলছেন তুইও তাই বলবি, তা নৈলে আমি রক্ষা করতে পারবো না তোকে, এঁরা মেরে ফেললেও আমি শব্দ করতে পারবো না।' আর সতেরো বছরের কচি কলাপাতার মতো নরম, মধুর মেয়ে অনসূয়া তার জলে-ভরা ভাসা-ভাসা দু'টি চোখ মেলে চুপ ক'রে তাকিয়ে ছিলো সাদা দেয়ালের দিকে। প্রাণ বেরিয়ে গেলেও কি সে পারে বিনয়কে কোনো অমঙ্গলে ঠেলতে?

ন্যাকা! শেষ পর্য্যন্ত তো বাপু হার মেনেছিলি সেই চাবুকের কাছে? তার পর তো কেমন সুন্দর গড়গড় ক'রে কাকার শেখানো বুলি আউড়ে গেলি কোর্টে দাঁড়িয়ে?

সত্যি কেমন সুন্দর গুছিয়ে বলেছিলো কথাগুলো। 'পুকুরে বিকেল বেলা গা ধুতে গিয়ে দেখে বিনয় দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই বলে, 'একবার আমাদের বাড়ি যাবে?'

অনসূয়া বললো, 'কেন?'

'দিদি পিঠে করেছেন, তোমাকে ডেকে নিয়ে যেতে বললেন।'

'মাকে বলি।'

'বলবার আর দরকার কী, এই তো বাড়ি, যাবে আর আসবে।'

এই বলে সে অনসূয়াকে তার দিদির বাড়িতে নিয়ে যায়, বাড়িতে কেউ ছিলো না সে সময়ে, অনসূয়াকে সে তার নিজের ঘরে বসিয়ে বলে, 'দিদি এখুনি আসবেন, ততক্ষণ তুমি এই মজার জিনিষটা ভাখো, শুঁকে ভাখো!'—কৌতূহলী হ'য়ে একটা লাল রংয়ের আরকের শিশি ওর হাত থেকে নিজের হাতে নেয় অনসূয়া, তার পর নাকের কাছে ধরার সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে।

এই সময় বিচারক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি গেলে কেন?'

অমনি সে নিজের বুদ্ধিতে জবাব দিল, 'এইটুকু বয়স থেকে চিনি, দাদা বলে ডাকি, কী ক'রে জানবো'—

'যখন দেখলে ওর দিদি বাড়ি নেই তখন ওর ঘরে ঢুকলে কেন?'

'ঢুকেছিলাম না জেনে, তার পরে ও বললো যে দিদি নেই।'

সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে বিনয়—দু'টি অপলক চোখ

অনসূয়ার বিশ্বাসঘাতক মুখের উপর নিবদ্ধ। দু'টি বলিষ্ঠ হাত পরস্পরনিবদ্ধ অবস্থায় বুকের উপর জড়ো ক'রে রাখা। বিচারক বললেন, 'ঠিক?' গম্ভীর-গলা জবাব দিল, 'ঠিক'। 'তুমি তাকে অজ্ঞান করেছিলে?' 'আমি তাঁকে অজ্ঞান ক'রেই বার ক'রে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

তার পর? তার পর আর কী, মেয়ে ভুলোবার যোগ্য শাস্তি! তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। দিদির টাকার জোরে বেঁচে গেলো, নইলে যাবজ্জীবন বাঁচতো না ওর!

৭

কেঁদেছিলো অনসূয়া! বাবা আর উকিল-কাকার সঙ্গে জানালা-বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি চড়ে বাড়ি আসতে-আসতে কেঁদেছিলো। বাড়ি এসে মা'র বুকে মুখ রেখে কেঁদেছিলো, বাবার কুঞ্চিত চোখকে অগ্রাহ্য ক'রেও কেঁদেছিলো। কাকার কদর্য্য গালাগালি, প্রতিবেশীদের ভিড়, ছোট-ছোট ভাই-বোনের বিস্ফারিত দৃষ্টি—কিছুই তখন তাকে বিরত করতে পারেনি সেই কান্না থেকে। তার লজ্জা ছিলো না, ভয় ছিলো না, একটা সুতীব্র ব্যথার হাহাকার ছাড়া আর কিছুই ছিলো না তার বুকের মধ্যে। তার পর কত বিনিদ্র রাত, কত দুঃসহ দিন কেটে গেল সেই একই বুক-ভাঙা অবিরাম, অবিশ্রাম একটা একটানা কান্নার স্রোতে। আর তার অনেক, অনেক দিন পরে এক দিন যখন নিজেরই অজান্তে নিজে নিজেই শান্ত হ'য়ে গেল সে, সেই সুন্দর সুকুমার নিরপরাধ একখানা অতিপ্রিয় মুখের উপর কখন আবরণ পড়লো একটি! অনসূয়া ভুলে গেল তাকে, ভুলতেই হ'লো, ভোলবার জন্ম উপড়ে ফেলে দিতে হ'লো তার রক্তকণিকা, যে-কণিকা সবে আকৃতি ধরেছিলো অনসূয়ার জঠরে!

আট মাসে বিনয়ের সঙ্গে আঠারোটা শহর ঘুরেছিলো সে। চব্বিশ বছরের যুবক আর সতেরো বছরের তরুণী, ভয়ে সেই অপরিণত ভীরু হৃদয় কত যে কেঁপেছিলো। কত ত্রাস, কত অনাহার, কত অনিদ্রা হিসেব আছে কোনো? গরুর গাড়িতেই হয়তো কাটলো তিন দিন, সাত দিন শুধু ট্যাক্সিতেই ঘুরেছিলো। রাস্তায়, ঘাটে, রেলে, ষ্টীমারে কোথাও কি শান্তি আছে? কোনো জায়গায় গিয়ে একসঙ্গে দশ দিনও টিকতে পারেনি ভয়ে। যদি ধরে ফেলে, যদি টের পেয়ে যায় কেউ? যদি আলাদা হ'তে হয় জীবনে, তা হ'লে তারা বাঁচবে কেমন ক'রে? পৃথিবীর সমস্ত এক দিকে আর তাদের যুগল-জীবন এক দিকে। মনে-মনে তারা কী প্রার্থনা করেছে? ঈশ্বরের কাছে কী চেয়েছে ব্যাকুল হৃদয়ে? শুধু দু'জনে আমরণ একসঙ্গে থাকার এতটুকু প্রতিশ্রুতি।

হায় রে! মূঢ়মতি বালিকা! বত্রিশ বছরের প্রায় প্রৌঢ় মহিলা সতেরো বছরের যুবতীকে স্মরণ ক'রে হাসলো মনে মনে। কত আবেগই ছিলো সেই অল্পবয়সী বোকা হৃদয়ে, কত কষ্টই না পেয়েছে তা নিয়ে। বাজে! বাজে! বাজে! সব বাজে! কী হ'লো তার পর? মরে গেল? গলায় দড়ি দিল, আগুন জ্বালালো কাপড়ে? কী। কী করলো সেই মেয়ে? কী করতে পারলো?

ভালোই করেছিলেন কাকা। মিছিমিছিই সে কাকাকে দোষ দেয়। উনি যদি সারা দেশ মন্থন ক'রে, ডিটেকটিভ লাগিয়ে, বাবার অর্থ অকাতরে ব্যয় ক'রে তখন তাকে ফিরিয়ে না আনতেন তা হ'লে কী-ই না হ'তে পারতো তার। কাগজে কাগজে যদি তার হরণ মামলার কাহিনী বড়ো অক্ষরে ছাপা না হ'তো তা হ'লে এত দিনে তার কী গতি হ'তো? কোন নরকে পড়ে থাকতো কে জানে? কাকাকে ধন্যবাদ দিতে হয় বৈ কি।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালো অনসূয়া, রক্ত জমে গেল।

সত্যি! এমন শুভাকাঙ্ক্ষী তার বাবাও ছিলেন না। তিনি তো বলেইছিলেন, 'শাসন না মেনে, মেয়ে যখন বেরিয়েই গেল ঘর থেকে, ব্রাহ্মণের মেয়ে হ'য়ে শূদ্র-সন্তানকেই যখন পছন্দ হ'লো তার, তখন সে যাক্। মরুক সে নিজের কপাল নিজেই পোড়াক। মিছিমিছি লোক-জানাজানি ক'রে মান খোয়ানো কেন?' কিন্তু কাকা চরিত্রবান লোক, তিনি কি দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে পারেন? পাপীকে সাজা না দিলে যে পাপ তাঁরই হবে। তাইতো কত কষ্ট স্বীকার ক'রেও ভাইঝিকে আবার ফিরিয়ে আনলেন ঘরে, মামলা ক'রে শাস্তি দিলেন সেই কুচরিত্র পাপিষ্ঠকে। তা নৈলে কে জানে, সেই পাপিষ্ঠ হয়তো এত দিনে কত অমঙ্গলের বীজ ছড়িয়ে বেড়াতো সারা পৃথিবীতে। ভালোবাসার ভান ক'রে আরো কত মেয়েকে ঘরের বার করতো। ভালো মানুষদের টেঁকাই দায় হ'তো সংসারে।

কেমন ছিলো সেই পাপিষ্ঠটা? কেমন ছিলো? মনের আনাচ-কানাচ আজ হাতড়ালো অনসূয়া। মনে পড়ে না। সব মুছে গেছে, ধুয়ে গেছে মন থেকে। কেবল স্মৃতি! স্মৃতির ভার! স্মৃতি তো কিছুতেই মোছে না, কেন মোছে না? কী নিষ্ঠুর স্মৃতি। কেন এমন ভার হ'য়ে চেপে থাকে বুকের উপর।

বাইরের রোদ আস্তে আস্তে মৃদু হ'য়ে নিবে গেল ঘর থেকে। অস্থির অনসূয়া একবার তাকালো বেলার দিকে, তাকালো নিজের দিকে, তাকালো আশে-পাশে। কেমন একটা অজানা আতঙ্কে দুরদুর করতে লাগলো বুকের ভিতরটা। ঘরের মধ্যে কত বার কত জন এলো, কত জন গেল, মা যে কী বললেন, কী করলেন, ঘরের দরজায় উঁকি মেরে মাথা নেড়ে কী জিজ্ঞেস করলেন বাবা, কিছুই যেন ভালো বুঝতে পারলো না সে। জোড়া তক্তপোষের যুগল শয্যায় চোখ রাখলো খানিক ক্ষণের জন্ম, আর তার তলায় সূর্য্যাস্তের লাল আভা ছড়ানো, আবির রংয়ের টিসু-শাড়ির আগুন। সাচ্চা জরির জ্যোতিতে চোখ ঠিকরে গেল তার।

আর কত ক্ষণ পরেই দেখা হবে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে, যিনি দয়ার অবতার, যিনি সব জেনেও বিয়ে করছেন এই তেত্রিশ বছর বয়সের আধবুড়ো মেয়েকে, যিনি তাকে পাঠিয়েছেন এই আগুন-লাগা টিসু-শাড়ি, যাঁর পুরো নামও এখন পর্য্যন্ত জানে না তারা। তিনিই আজ তার স্বামী হবেন। স্বামী! চমৎকার। অনসূয়া উঠে দাঁড়ালো।

৮

বেলা চারটা বাজতেই শালুকের টিনের ঘরে অন্ধকার নেমে এসেছে, আর একটু পরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে সেই

অন্ধকার। রাজ্যের পাখি এসে হাট জমাবে বকুল গাছের ডালে-ডালে, তাদের কিচির-মিচির থামতে থামতে রাত আসবে এই বাড়িতে। পাশের ঘরে কম্পোজিটর নিকুঞ্জ সরকার ফিরে আসবেন কাশতে কাশতে.বাঁকা হ'য়ে, বাবরিছাঁটা শশিশেখর আসবে শিষ্ দিতে দিতে, ননির মা হাত-মুখ মুছে, চুল বেঁধে পান খেয়ে, টিপ কপালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবেন গিয়ে গলির মোড়ে,—কেন দাঁড়ান? ননির বাবা নিরুদ্দেশ, তার আশায়?

ষোলো বছর আগে টিকতে না পেরে গ্রাম থেকে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে এক দিন অবিনাশ বাবু ভাইয়ের আশ্রয়ে এসে উঠেছিলেন, ভাই তাঁকে এই আশ্রয়ে রেখে গেছেন। তাঁর তিনতলা ফ্ল্যাটের চারখানা ঘরে তাঁরই তো থাকা দায়, এতগুলো লোক ধরবে কোথায়? এই দুঃখেই তো তাড়াতাড়ি বাড়ি তুলে নিলেন জমি কিনে। জল-ভরা চোখে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বাবা বললেন, 'ওকে যদি যেতে দিতাম ওর অদৃষ্ট নিয়ে, হয়তো ও সুখীই হ'তো। আমাকেও আজ এমন ক'রে ভিটেমাটি ছাড়া, গাঁ-ছাড়া হ'য়ে পথের ভিখিরি হ'তে হ'তো না এত বড় কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে।' মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কাকা ফোঁস ক'রে উঠলেন, 'এ রকম অন্যায় ক'রে যদি সুখীই হয়, তবে তো সে সুখ ভেঙে দেয়াই গুরুজনের কর্ত্তব্য।'

'হয়তো'—

'হয়তো কেন, নিশ্চয়ই। গোড়া থেকেই আমি জানতাম মেয়েকে আপনারা যে রকম প্রশ্রয় দিচ্ছেন তার একটা যোগ্য শাস্তি পেতেই হবে আপনাদের।'

'পেলাম।'

'আমি গিয়ে না পড়লে আপনাদের অদৃষ্টে আরো দুঃখ ছিলো। বামুন-শূদ্রে একটা বিয়ে হ'তেই বা বাধা ছিলো কী? মেয়ের স্নেহে আপনারা যে রকম অন্ধ!'

'এর চেয়ে আর একটু ভালো বাড়ি পাওয়া যায় না বিকাশ? অন্তত একটু ভদ্র।' বাবা হতাশ চোখে চার পাশে তাকালেন। মা বসে পড়েছেন দরজায়, চৌকাঠের উপর মাথায় হাত দিয়ে। ভাই-বোনেরা শ্যাওলা-ধরা তিন হাত চওড়া তিন হাত লম্বা উঠোনের কোণে এর মধ্যেই দু'টো নন্দদুলাল আর একটা তুলসী চারার সন্ধান পেয়ে কে কোন গাছের অধিকারী হবে তা নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। কাকা চোখ কপালে তুললেন, 'এ বাড়ি আপনাদের পছন্দ হয় না? কুড়ি টাকা ভাড়ায় এর চেয়ে ভালো বাড়ি আমি ছাড়া আর কেউ বার করতে পারবে কলকাতায়?' মা'র দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখুন বৌঠান, একটা কথা আপনাদের বলি, পাপীকে যে প্রশ্রয় দেয়, পাপ তাদেরও কম নয়। সমস্ত জীবন ও জ্বলুক পুড়ুক, পুড়ে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাক তবেই ও বুঝবে কত বড়ো অপরাধ ও করেছিলো। আর সেই আগুনের তাপ তার বাপ-মার গায়ে তো একটু লাগবেই।' মা বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন কাকার মুখের দিকে। কাকা আবার আঙুল নাড়লেন, 'বুঝুক, ফলটা বুঝুক ও।'

কী বুঝলাম! পশ্চিমের জানালা দিয়ে নিবে আসা সূর্য্যের লাল নরম মুখের দিকে প্রশ্নটি যেন নিক্ষেপ করলো অনসূয়া। একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটলো মুখে। [ক্রমশঃ।

কবি-কথন

জগন্নাথ বিশ্বাস

বায়রণী বিদ্রোহে ছিলো
পৃথিবীকে কঠিন বিদ্রূপ।
বুক পেতে পৃথিবীর সমস্ত চাবুক
সয়ে গিয়ে মেনেছিলো জীবনের একমাত্র রূপ:
ইস্পাত-আঘাত হানা,
ছিন্নভিন্ন বিহঙ্গের ডানা।

শেলীও জীবন-প্রিয়,
ছেড়ে গেলো জীবনেরে দূরে,
সাড়া দিলো আকাশের সুরে;
ছাড়া পেলো দূর নীলে-নীলে
অসীমে অকূলে।

পরম-সৌন্দর্য-লোভী;—
কবিরাই মৃত্যুর মতন
যন্ত্রণায় ক্ষয় হয়,
চোখে তবু অমৃত স্বপন!
(শুধু 'কবি' বলি কেন?
যারাই জীবন-লোভী
তারাই তো এক হিশেবে কবি।
তারা যে দেখেছে অন্য পৃথিবীর অন্তরের ছবি।)

জীবনের কঠিন ঋণ
ক্লিষ্ট তনু দিয়ে চলে শোধ;
যৌবন-বেদনা-তীর্থে
জীবনের কণ্ঠ অবরোধ;—
শোনো নাই কান পেতে
ঘননীল স্তব্ধ কোনো রাতে?

আমি পাই সারা রাতে
হৃদয়ের চারি পাশে সে কান্নার প্রচণ্ড আঘাত।
ওরা হাসে, বলে, হায়
এ কেবল মধুর বিলাস!—
উপহাস মানে না সীমানা।

মনেরে বোঝাই তাই; তবুও তো,
তবু তো এ মৃঢ় কান্না থামে না থামে না?

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

প্রথম অঙ্ক : তৃতীয় দৃশ্য

জিন্নৎ-উন্নিসা বেগমের প্রাসাদ

(জিন্নৎ, সভাচাঁদ, সাদুল্লা খাঁ, কোকলতাস খাঁ)

জিন্নৎ। কী, এত বড় স্পর্ধা সেই শয়তানীর যে আমাকে বলে বাঁদী ?

সভাচাঁদ। বেগমসাহেবা, আপনাকে যা বলে সে তো আর আপনাকে শুনতে হয় না, আমাদের যা বলে তা আমাদের শুনতে হয়। রাজসভায় যেতে হয় প্রাণটি হাতে ক'রে, কখন যে প্রাণপাখী পক্ষবিস্তার করবেন তার কোনো স্থিরতা নেই।

সাদুল্লা। সেদিন তো ঐ চিঠি-পড়া মাত্র আপনারও প্রাণদণ্ড হ'য়ে গিয়েছিল বেগমসাহেবা। নেহাৎ আমার ওপরে সে ভার পড়েছিল ব'লে—

জিন্নৎ। মিথ্যে বড়াই কোরো না সাদুল্লা খাঁ। সেদিনকার সমস্ত ঘটনা শুনেই আজ তোমাদের ডেকে এনেছি। একমাত্র জুলফিকার খাঁর অনুরোধে সেই শয়তানী আমার প্রাণদণ্ড মকুফ করেছে। ছি ছি, আমার বিষ খেয়ে মরতে ইচ্ছে করছে। একটা বাজারের বেশ্যার অনুগ্রহের উপর নির্ভর ক'রে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে—আমি আলমগীর বাদশার মেয়ে!

সাদুল্লা। আমাদেরও কি অপমানের সীমা-পরিসীমা আছে বেগমসাহেবা? নিত্য-নতুন অপমানের ডালি মাথায় নিয়ে দরবার থেকে বেরিয়ে আসতে হয়।

কোকলতাস খাঁ। ইম্‌তিয়াজ বেগমকে সেলাম করতে করতে ঘাড়ে আমাদের ব্যথা হ'য়ে গেছে বেগমসাহেবা।

জিন্নৎ। তোমাদের ঘাড়ে কলুর জোয়াল চাপিয়ে দিলেও ব্যথা হয় না। ছি, ছি! তোমরা পুরুষমানুষ? এত দিন কি ক'রে এই অপমান সহ্য করছ আমি শুধু সেই কথা ভেবে আশ্চর্য হ'য়ে যাচ্ছি!

সভাচাঁদ। কি করব বেগমসাহেবা?

জিন্নৎ। কি করবে? লজ্জা করছে না এ-কথা জিজ্ঞাসা করতে? কি করবে—সে কথা আমি ব'লে দেব তোমাদের! হিন্দুস্থানের বাদশার কর্মচারী তোমরা—কি করতে হবে তোমরা জান না? সেই কথা পরামর্শ করবার জন্যেই তো আজ তোমাদের ডেকেছি। (চারি দিকে চেয়ে) শোনো—বর্তমান বাদশাকে হত্যা ক'রে অন্য কারুকে সিংহাসনে বসাতে হবে। এ বিষয়ে আমি তোমাদের পরামর্শ চাই। ষড়যন্ত্রের জন্য অর্থ যা-কিছু খরচ হবে তা আমি দেব। ঐ বাজারের বেশ্যাটা—ঐ লালকুঁয়ার এসে আমার পায়ে প্রাণভিক্ষা চাইবে তবে আমার আক্রোশ মিটবে। আমি জুলফিকার খাঁকেও ডেকে পাঠিয়েছি, সে হচ্ছে উজির, তার সঙ্গে পরামর্শ করা আগে প্রয়োজন।

সভাচাঁদ। জুলফিকার খাঁকে ডাকাটা সমীচীন হয়েছে ব'লে তো মনে হচ্ছে না। কি বলেন সাদুল্লা খাঁ—আলিমুরাদ সাহেবের কি মত?

কোকলতাস খাঁ। (আলিমুরাদ)—জুলফিকার হচ্ছেন সম্রাটের বন্ধু। তিনি এসে সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দেখলে আমাদের সমূহ বিপদ।

সভাচাঁদ। বিশেষতঃ আমার। আমি তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী। আমার তো বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা।

জিন্নৎ। আপনাদের কোনো চিন্তা নেই। জুলফিকার এ

আপনারা পাশের ঘরে থাকবেন। অবস্থা বুঝে আমি আপনাদের ডাকবো।

সভাচাঁদ। আমাকে আর ডাকবেন না বেগমসাহেবা। উজিরের যা মতামত আমারও মতামত তাই।

(প্রহরীর প্রবেশ)—উজির সাহেব এসেচেন—আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

জিন্নৎ-উন্নিসা। আচ্ছা, আপনারা পাশের ঘরে বসুন। সময় হ'লেই আপনাদের সংবাদ দেবো। যাও, উজির সাহেবকে নিয়ে এসো।

[সকলের প্রস্থান।

শুনেছি জুলফিকার খাঁ জাহান্দার শা'র বন্ধু। সে যে চতুর রাজনৈতিক এও লোকপরম্পরায় শুনতে পাই। কিন্তু আমিও আলমগীর বাদশার মেয়ে। এ অপমানের শোধ নিতে—

(জুলফিকারের প্রবেশ)

আসুন উজির সাহেব—

জুলফিকার খাঁ। বেগমসাহেবা, এ অধীনকে স্মরণ করেছেন কেন?

জিন্নৎ। উজির সাহেব, আপনার মতন সুচতুর রাজনৈতিক রাজ্যের কর্ণধার, তবুও রাজ্যের চতুর্দিকে এত অশান্তি কেন?

জুলফিকার খাঁ। বেগমসাহেবা, আপনি কি বলছেন তা এ বান্দা ঠিক বুঝতে পারছে না—প্রকাশ ক'রে বলুন।

জিন্নৎ। আচ্ছা, প্রকাশ করেই বলছি। কাল রাত্রে আমি সম্রাটকে নিমন্ত্রণ করেছিলুম। তিনি আমার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য তো করেছেনই, তা ছাড়া সম্রাটের সেই প্রিয়পাত্রীটি—সেই বাজারের বেশ্যা—লালকুঁয়ার, প্রকাশ্য-দরবারে আমার প্রতি অত্যন্ত অসম্মানকর ভাষা প্রয়োগ ক'রে আমাকে সকলের সামনে অপমান করেছে।

জুলফিকার খাঁ। সে অপরাধ আমার নয়। সম্রাটের কাজের বিচার করার অধিকার আমার নেই, বেগমসাহেবা।

জিন্নৎ। আপনার প্রতি আমার অভিযোগ এই যে, আপনিও আমার সে অপমানের প্রতিবাদ করেননি।

জুলফিকার খাঁ। বেগমসাহেবা, এ বান্দায় প্রগল্‌ভতা মাপ করবেন। আমার জন্যই আপনি প্রাণদণ্ড থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। তা না হ'লে আজ প্রভাতেই আপনাকে জীবন্তে পুঁতে ফেলবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

জিন্নৎ। সে ঢের ভাল ছিল উজির। ঐ বাজারের বেশ্যাটার কাছে অপমানিত হওয়ার চাইতে সে যে ঢের ভাল ছিল। আমি সম্রাট আলমগীরের কন্যা—

জুলফিকার। আপনি অত্যন্ত ভুল করছেন বেগমসাহেবা। লালকুঁয়ার হয়তো বাজারের বেশ্যা ছিলেন কিন্তু তিনি এখন প্রধানা মহিষী। সম্রাটদের সঙ্গে বাজারের স্ত্রীলোকদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তো নূতন নয়। আপনার পিতা আলমগীর বাদশাও এ বিষয়ে মুক্ত ছিলেন না। প্রধানা বেগমের প্রতি আপনি যে ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন আলমগীর বাদশার বেগমের প্রতি সে ভাষা প্রয়োগ করলে আপনি কি কিছুতেই অব্যাহতি পেতেন? মনে রাখবেন বেগমসাহেবা যে, প্রধানা বেগমের মহানুভবতায় আপনি মুক্তিলাভ করেছেন। তাঁর প্রতি আপনি কৃতজ্ঞ থাকবেন।

জিন্নৎ। মহানুভবতা! যাক, ও-কথা যাক। আপনাকে যে জন্য ডেকে পাঠিয়েছি সে কথা কি বলতে পারি?

জুলফিকার। নিশ্চয় বলতে পারেন। যিনি প্রধানা বেগমকে ভয় করেন না—আমাকে ভয় করবার তাঁর প্রয়োজন নেই।

জিন্নৎ। কিন্তু তার আগে আপনাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে এ-কথা কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না।

জুলফিকার। আচ্ছা প্রতিজ্ঞা করছি।

জিন্নৎ। জাহান্দার শা সিংহাসনে বসবার পর থেকে রাজ্যে যে বিশৃঙ্খলা ও হাহাকারের বন্যা বইতে সুরু করেছে, সে কথা আপনি অস্বীকার করেন?

জুলফিকার। স্বীকার করি।

জিন্নৎ। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তাকে সরিয়ে দিয়ে অন্য কারুকে সিংহাসনে বসালে এই হাহাকার থামতে পারে?

জুলফিকার। হয়তো পারে—কিন্তু বেগমসাহেবা, সম্রাট আমার বন্ধু—

জিন্নৎ। আর রাজ্যের মঙ্গল আপনার কর্তব্য। আপনি উজির—উজির সাহেব, কর্তব্য বড় না বন্ধুত্ব বড়? আমরা স্থির করেছি, জাহান্দার শাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়ে আজুদ্দিনকে সিংহাসনে বসাবো।

জুলফিকার। আমরা! আমরা কারা?

জিন্নৎ। আপনি আমাদের দলে যোগ দিলে জানতে পারবেন তাদের নাম। তবে এটুকু জেনে রাখবেন আপনি ছাড়া রাজ্যের অন সব কর্মচারী আমাদের দলে আছেন। আপনারা যদি আজ সম্রাটকে তক্ত থেকে না নামান দু'দিন পরেই রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হবে। ইতিমধ্যেই জমিদারেরা খাজনা বন্ধ করেছে—তা বোধ হয় আপনি জানেন? বিদ্রোহের পর জাহান্দার শা দিল্লীর সিংহাসনে থাকবেন না—এ-কথা নিশ্চয়, সঙ্গে সঙ্গে আপনার উজিরি থাকবে কি না সে কথা একবার চিন্তা করে দেখবেন।

জুলফিকার। বেগমসাহেবা, আমি এখুনি আপনার কথার জবাব দিতে পারছি না। আমাকে চিন্তা করবার অবসর দিন।

জিন্নৎ। বেশ, আপনি সময় নিন। চিন্তা ক'রে যা স্থির হয় জানাবেন।

(জুলফিকারের প্রস্থান এবং সভাচাঁদ ও অন্য সকলের প্রবেশ)

সভাচাঁদ। বেগমসাহেবা খুব চাল দিয়েছেন যা হোক।

জিন্নৎ। আমি আলমগীর বাদশার মেয়ে।

সাদুল্লা। আমি কিন্তু জুলফিকার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না।

সভাচাঁদ। খাঁ সাহেব, ও-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। জুলফিকার আসফ খাঁর ছেলে। বিশ্বাসঘাতকতার গন্ধ পেলে ও কি আর স্থির থাকতে পারবে? কি বলেন আলিমুরাদ খাঁ সাহেব?

কোকলতাস খাঁ। ও বংশটাই বিশ্বাসঘাতক। কি ক'রে উজিরি যোগাড় করলে তা মনে আছে? ও বিশ্বাসঘাতকতা না ক আমার উজিরি কে মারত?

সভাচাঁদ। আমার মতে কিন্তু আজুদ্দিনকে তক্ত্ না দিয়ে মৈজুদ্দ্ল্লাকে দিলেই হ'ত ভাল—তা যাক্, আজুদ্দিন যখন বেগমের প্রিয়পাত্র তখন সেই পাক।

সাদুল্লা। হ্যাঁ—এক মাঘে তো আর শীত পালাচ্ছে না ; আজুদ্দিন আছে, ইজুদ্দিন আছে, মৈজুদ্দ্ল্লা আছে—ও এখন চলুল। তাহ'লে আজ আসি বেগমসাহেবা।

সভাচাঁদ। হ্যাঁ, আজ তাহ'লে বিদায় হই, কাল সন্ধ্যা বেলা আবার—

জিন্নৎ। হ্যাঁ, আজ গোপনে আজুদ্দিনকে একবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলবে।

সভাচাঁদ। আচ্ছা বলব। আজ তা'হলে আমরা বিদায় হই।

[সকলে কুর্নিশ ক'রে বিদায়।)

(পট পরিবর্ত্তন)

(দিল্লীর দেওয়ানি খাস, রাত্রি শেষ প্রহর, দূরে তখ্‌ত-এ-তাউস দেখা যাচ্ছে। সম্রাটের প্রবেশ। সম্রাটের চুল উস্‌কো-খুস্‌কো পাগলের মত, হাতে চাবুক।)

সম্রাট। চারি দিক নিস্তব্ধ। যেন পরিপূর্ণ শান্তির বুকে প্রাসাদখানা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। এর মধ্যে যে ষড়যন্ত্রের বিষাক্ত ধোঁয়া ঘনিয়ে উঠছে তা এর বাহ্যিক রূপ দেখে বুঝতে পারবার উপায়ই নেই। ঘরে ঘরে সকলে সুষুপ্তির কোলে গা ঢেলে দিয়েছে। হারেমের প্রহরীরা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত। তারা জানে যে ধরা পড়লে এ ঘুম আর ভাঙবে না, তবুও তারা নিশ্চিন্ত, কেবল অভাগা আমি—আমার চোখে ঘুম নাই। ঐ—ঐ তক্ত্—ঐ তক্তে যে বসেছে তার চোখে কি ঘুম আছে! আমার আগে কত অভাগ্য রাত্রে এই নির্জ্জন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে প্রেতের মতন এই গোলকধাঁধাঁয় ঘুরে মরেছে। প্রেতলোক থেকে তারা হয়তো আমার দুর্দ্দশা দেখছে আর হাসছে।

কিসের যেন শব্দ হ'ল না? প্রহরীটাও ঘুমোচ্ছে, দেব নাকি ঘা কয়েক চাবুক ওকে? চাবুকে চাবুকে চাবুকে চাবুকে একেবারে জর্জ্জরিত ক'রে দেব—দিল্লীশ্বরের চোখে ঘুম নেই আর ও নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোচ্ছে। ও—ও কিসের ছায়া? সম্রাট সাজাহান! হা হা, তাই বটে তাই বটে। তুমি না ময়ূর সিংহাসনের কল্পনা করেছিলে? তাই তোমার অতৃপ্ত আত্মা অভিশাপের মত আজও তখ্‌ত-এ-তাউসের সর্ব্বাঙ্গে ঘিরে রয়েছে। আমার মত অনেক পতঙ্গই তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তার পরে তার জ্বালা—উঃ—কি জ্বালা! সম্রাট সাজাহানের পাশে কে ও? ও চিনেছি চিনেছি, তুমি সেই হিন্দুস্থানের জিন্দাপীর না? সিংহাসনের চার পাশ ঘিরে ওরা কারা?—কাদের অতৃপ্ত কামনার দীর্ঘশ্বাস প্রাসাদের শিলায় শিলায় জড়িয়ে রয়েছে? দারা সেকো, সুজা, মুরাদ—সুলতান মহম্মদ, জাহান্ শা—তোমাদের বিষাক্ত নিশ্বাস ষড়যন্ত্রের গুপ্ত কথাগুলো আমার কানে ভাসিয়ে নিয়ে আসছে—আমি জানি, আমি জানি,—এই বাতাসে ষড়যন্ত্রের বিষ মিশে রয়েছে। (চীৎকার)—কে কে আজুদ্দিন—আজুদ্দিন, পুত্র আমাকে মেরো না—লালকুঁয়ার লালকুঁয়ার—বান্দা—

(প্রহরীর প্রবেশ)

জুলফিকার খাঁ—জুলফিকার খাঁকে ডাকো—এই প্রাসাদেই কোথাও আছে।

(লালকুঁয়ার ছুটে প্রবেশ করলে)

ইম্‌তিয়াজ। সম্রাট, সম্রাট—কি হয়েছে? এত রাত্রে আপনি শয্যা ছেড়ে উঠে এসেছেন কেন?

সম্রাট। এখনো পর্য্যন্ত তুমি ঘুমোয়নি ইম্‌তিয়াজ!

ইম্‌তিয়াজ। বড় গ্রীষ্ম বোধ হচ্ছিল ব'লে ছাতে পায়চারি করছিলুম।

সম্রাট। ও বুঝেছি প্রিয়তমে—সিংহাসনের বিষাক্ত বাতাসে তোমারও ঘুম নষ্ট ক'রে দিয়েছে। তোমার চিরবিনিদ্র দীর্ঘ রাত্রি দীর্ঘতর হ'য়ে উঠেছে।

ইম্‌তিয়াজ। না সম্রাট—আমি তো বেশ সুখে আছি, শান্তিতে আছি।

সম্রাট। শান্তিতে আছ? আশ্চর্য্য! চারি দিকে এই ঘোর ষড়যন্ত্র, চারি দিকে আমাদের দু'জনের বুকের ওপরে আঘাত উদ্যত হ'য়ে রয়েছে—এর মধ্যে তুমি শান্তিতে আছ?

ইম্‌তিয়াজ। চল সম্রাট, আমরা এই রাজত্বের অভিনয় ছেড়ে দিয়ে দূর কোনো পাহাড়-পল্লীতে গিয়ে নিভৃতে শান্তিতে বাস করি।

সম্রাট। তোমার কথাগুলো আমার বেশ লাগছে ইম্‌তিয়াজ। বাবর শাহের বংশধরদের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত কেউ রাজত্ব করতে করতে সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে ব'লে শুনিনি। কিন্তু তা আর হয় না ইম্‌তিয়াজ—আগুনে ঝাঁপ দেওয়া মাত্র পতঙ্গের পাখাগুলোই আগে পোড়ে। সিংহাসন ছেড়ে পালাতে হবে সেই দিন যেদিন পালাবার সমস্ত পথই রুদ্ধ হ'য়ে যাবে। এর মধ্যে এই যে ক'টা দিন—এই ক'দিনের মধ্যে আমাদের প্রেমে যেন কোনো মালিন্য না আসে, তোমার কাছে এই আমার অনুরোধ।

ইম্‌তিয়াজ। আপনি ও-কথা বলবেন না সম্রাট, আপনি কি জানেন না, আমার প্রাণ দিয়েও যদি আপনার মনের শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারতুম—

সম্রাট। জানি—জানি প্রিয়তমে। তোমার কাছে পাবো ব'লেই তো আরো বেশি ক'রে চাই।

ইম্‌তিয়াজ। সম্রাট, আর রাত্রি বোধ হয় বেশি নেই, চলুন শুতে যাই।

সম্রাট। চল ইম্‌তিয়াজ।

(ছুটতে-ছুটতে জুলফিকার খাঁ-এর প্রবেশ)

এই যে জুলফিকার খাঁ। উজির—আজুদ্দিন, আজুদ্দিনকে চাই।

জুলফিকার। কাকে সম্রাট? শাহজাদা আজুদ্দিন?

সম্রাট। হ্যাঁ, হ্যাঁ—শাহজাদা আজুদ্দিন।

(জুলফিকার প্রহরীকে ডাকিয়া)

জুলফিকার। শাহজাদা আজুদ্দিনকে সংবাদ দাও।

সম্রাট। (একটু অগ্রসর হ'য়ে গোপনে)—জুলফিকার খাঁ, রাজ্যের চারি দিকে আমার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলেছে, তুমি কিছু সন্ধান পেয়েছ?

জুলফিকার (চমকে উঠে)। না সম্রাট। আপনি এ কথা কোথা থেকে জানলেন সম্রাট ?

সম্রাট (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জুলফিকারের দিকে চেয়ে দেখে)। ষড়যন্ত্রের বিন্দুবিসর্গও তোমার কর্ণগোচর হয়নি ?

জুলফিকার। না সম্রাট, সমস্ত ব্যাপারটা কোনো উর্বর মস্তিকের কল্পনা ব'লে মনে হচ্ছে।

সম্রাট। ধর্ম সাক্ষী ক'রে বলছ জুলফিকার খাঁ—তুমি ষড়যন্ত্রের কিছুই জানো না ?

জুলফিকার। সম্রাট ষড়যন্ত্রের কোনো কথাই আমি জানি না। আজ জিন্নৎ-উন্নিসা বেগম আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন—তিনি বললেন যে তাঁরা আপনাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে অন্য কারুকে সিংহাসনে বসাতে চান।

সম্রাট। কেন—কেন ? আমার বিরুদ্ধে তাঁর কি অভিযোগ ? আমি তাঁর কি করেছি ?

জুলফিকার। সেদিন প্রকাশ্য দরবারে লালকুঁয়ার—

সম্রাট। চুপ রহো—বে-আদব—বে-তমিজ—তোমার—তোমার নাম কি ?

জুলফিকার। সম্রাট, আমার নাম জুলফিকার খাঁ।

সম্রাট। না না—তোমার নাম নসরৎ খাঁ—জুলফিকার খাঁ তোমার খেতাব। আমি সম্রাট, আমি তোমাকে কখনো নাম ধরে ডাকি না, আর তুমি, তুমি সাম্রাজ্যের এক জন সামান্য প্রজা, তুমি প্রধানা বেগমের নাম ধ'রে ডাকতে সাহস কর ?

জুলফিকার। সম্রাট আমাকে ক্ষমা করবেন, অকস্মাৎ এই সব ষড়যন্ত্রের কথা শুনে আমার মতিভ্রম হয়েছিল।

সম্রাট। ক্ষমা চাও ইম্‌তিয়াজ মহলের কাছে।

জুলফিকার। মহামান্যা সম্রাজ্ঞী, বান্দার বেয়াদবি মাপ করবেন।

ইম্‌তিয়াজ। জুলফিকার খাঁ, তুমি আমাদের বন্ধু। সেই বাঁদী জিন্নৎ-উন্নিসা কি কথা বললে সেই কথা বল।

জুলফিকার। জিন্নৎ-উন্নিসা বেগম বললেন যে, সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করবার ষড়যন্ত্রে তাঁর সঙ্গে রাজ্যের সমস্ত কর্মচারীই যোগ দিয়েছেন। তাঁদের দলে যোগ দেবার জন্য তিনি আমাকেও আহ্বান করলেন।

সম্রাট। তুমি কি বলেছ ?

জুলফিকার। সম্রাট সমস্ত ব্যাপারটা আমার মনে হয় জিন্নৎ-উন্নিসা বেগমের একটা চাল মাত্র। তিনি জানেন যে, আমি রাজ্যের সর্বপ্রধান কর্মচারী, আমাকে দলে ভেড়াতে পারলে অন্যদের দলে নেওয়া সহজ হবে। আমি এ বিষয়ে চিন্তা করব ব'লে তাঁকে ব'লে এসেছি—এদিকে সে ষড়যন্ত্রের মধ্যে অন্য কোনো রাজকর্মচারী আছে কি না গোপনে তার খোঁজ নিচ্ছি। কিন্তু সম্রাট আপনি ষড়যন্ত্রের কথা জানলেন কি ক'রে ?

সম্রাট। তুমি আগে ভালো ক'রে খোঁজ নাও। অঙ্কুরেই এই ষড়যন্ত্র নষ্ট করতে হবে।

জুলফিকার। সম্রাট, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি কৌতূহল নিবারণ করতে পারছি না। আপনাকে ষড়যন্ত্রের কথা কে বললে ?

সম্রাট। আমার মন। আজ, এই বোধ হয় ঘণ্টা দুয়েক আগে আমি প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। রঙমহালের কাছে আজুদ্দিনকে দেখে তাকে ডাকতেই সে যেন সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠল, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—এত রাত্রে কোথা থেকে আসছ ? সে বললে—জিন্নৎ-উন্নিসার বাড়ীতে তার নিমন্ত্রণ ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—জিন্নৎ-উন্নিসা আমার কিংবা ইম্‌তিয়াজ মহলের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করলেন ? আজুদ্দিন যেন চমকে উঠল। সে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললে—না—না—তিনি আপনাদের সম্বন্ধে কোনো কথাই বলেননি তো। এই ব্যাপারের সঙ্গে আর তোমার সঙ্গে জিন্নৎ-উন্নিসার যে কথাগুলো হয়েছে সেগুলো যোগ দিলে কি হয় উজির ? আমি স্থির করেছি আজুদ্দিনকে কারাগারে নিক্ষেপ করব।

জুলফিকার। কিন্তু সম্রাট, আমি তো শাহজাদা আজুদ্দিনের নামও করিনি।

সম্রাট (অগ্রসর হ'য়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জুলফিকারের মুখ দেখে)—না, তুমি তার নাম করনি।

(ব্যস্ত হয়ে আজুদ্দিনের প্রবেশ)

আজুদ্দিন। পিতা, আমায় ডেকেছিলেন ?

সম্রাট। হ্যাঁ পুত্র, আমি স্থির করেছি কিছু দিনের জন্য তোমায় কারাগারে প্রেরণ করব।

আজুদ্দিন। কেন পিতা, আমি তো কোনো অপরাধ করিনি।

সম্রাট। না পুত্র, অপরাধ তোমার কিছুই নেই। সম্রাটপুত্রদের মাঝে মাঝে কারাবাস করতে হয়।

আজুদ্দিন। পিতা, আমি চিরদিন আপনার আজ্ঞা ভৃত্যের মত পালন ক'রে এসেছি—এ কি তারই পুরস্কার ?

সম্রাট। হা—হা—পুরস্কার। পুরস্কার পাবে পুত্র, পাবে। কিন্তু এখন নয়। আজুদ্দিন, তুমি দিল্লীর সিংহাসন দেখেছ ?

আজুদ্দিন। দেখেছি পিতা, আমি দিল্লীশ্বরের পুত্র।

সম্রাট। এদিকে এসো—দেখ তো সিংহাসনটার দিকে চেয়ে।

(আজুদ্দিন সিংহাসনের দিকে চেয়ে রইল)

কেমন ! কি ভাব হচ্ছে মনের মধ্যে বল তো পুত্র ?

আজুদ্দিন। কিছু নয় পিতা।

সম্রাট। সে কি ? কোনো ভাব মনের মধ্যে উদয় হচ্ছে না ? মনে হচ্ছে না যে, পিতার বুকে ছুরি বসিয়ে দিই ! ভাইগুলোর চোখ উপড়ে ফেলি ! ঠিক বল—সত্যি বললে আমি তোমায় মুক্তি দেব।

আজুদ্দিন। পিতা, আমি শপথ ক'রে বলছি, আমার মনে ও-রকম কোনো ভাবের উদয়ই হচ্ছে না।

সম্রাট। তবুও, তবুও পুত্র তোমাকে কারাগারে যেতে হবে। তোমার আগে—আমার আগে—যারা এই সিংহাসনে বসেছে তাদের প্রায় সকলকেই কিছু কাল কারাগারে কাটাতে হয়েছে। কারাগার হচ্ছে সিংহাসনে ওঠবার প্রথম জয়তোরণ। ইম্‌তিয়াজ মহল—জুলফিকার খাঁ—চল আমরা আমার প্রাণাধিক পুত্র আজুদ্দিনকে সিংহাসন-বিজয়ের প্রথম জয়তোরণ অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি।

(যবনিকা)

দ্বিতীয় অঙ্কঃ প্রথম দৃশ্য

(ইজুদ্দিন ও জিন্নৎ-উন্নিসার কথা বলতে বলতে প্রবেশ)

জিন্নৎ। তুমি কোনো চিন্তা কর না ইজুদ্দিন। জাহান্দার শাকে কোন রকমে একবার বন্দী করতে পারলে সিংহাসন তোমার। তার পরে ঐ লালকুঁয়ার! সম্রাট-কন্যাকে বাঁদী বলার শোধ যদি না নিতে পারি—

ইজুদ্দিন। সম্রাটকে বন্দী করতে খুব বেশী বেগ পেতে হবে না। প্রাসাদের সকলেই তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট। আর প্রাসাদের বাইরে শহরের লোক তো—তাঁকে একবার পেলে হয়—

(কোকলতাস খাঁর প্রবেশ)

এই যে কোকলতাস খাঁ! আমি এইমাত্র দাদিকে বলছিলুম যে পিতার ওপর রাজ্যের লোক কি রকম অপ্রসন্ন।

কোকলতাস। ও, সে কথা আর বলবেন না বেগমসাহেবা। তারা যদি একবার সম্রাটকে বাগে পায় তাহ'লে আর আমাদের কিছু করতে হবে না।

জিন্নৎ। না, রাজ্যের লোক সম্রাটকে বাগে পাচ্ছে না! সম্রাট আর ওই মাগীটা তো সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। আমি শুনেছি যে প্রহরীও সব সময় কাছে থাকে না। রাজ্যের লোক যদি চাইত তাহ'লে কবে তাকে এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিত। রাজ্যের লোক এই রকম অত্যাচার চায়—

কোকলতাস। সাধারণ লোকে হঠাৎ সম্রাটের ওপর হস্তক্ষেপ করতে সাহস করে না।

জিন্নৎ। অত্যাচার কি শুধু সাধারণ লোকের ওপরেই হচ্ছে। সেদিন রাস্তা দিয়ে চিন্‌কিলিচ খাঁ যাচ্ছিলেন—এমন সময় ও-পাশ থেকে লালকুঁয়ারের বাঁদী জোহরা আসছিল। চিন্‌কিলিচ খাঁর মাহুত জোহরা বাঁদীর লোক-লস্কর দেখে পথ ছেড়ে দিতে একটু দেরি করেছিল, এই জন্য জোহরা বাঁদী তার হাতীর ওপর বসে চিন্‌কিলিচ খাঁকে যাচ্ছেতাই ক'রে গালাগাল দিতে দিতে চলে গেল। কথাটা নবাবসাহেব বাদশার কানে তুলেছিলেন, কিন্তু বাদশা জোহরার সাজার ব্যবস্থা না ক'রে নবাবকে সাজা দিতে হুকুম দিলেন। ভাগ্যে জুলফিকার খাঁর ওপরে সে ভার পড়েছিল, তাই তিনি মাঝে প'ড়ে সমস্ত ব্যাপারটা আপোষে মিটিয়ে দিলেন।—এই জোহরা সেদিন অবধি বাজারে ব'সে তরকারি বিক্রি করেছে। লালকুঁয়ারের বন্ধু ব'লে আজ তার এত বাড়াবাড়ি হয়েছে।

কোকলতাস। ঠিক বলেছেন বেগমসাহেবা, এখানে মানীর ইজ্জৎ নেই, গুণীর কদর নেই। সম্রাট আমার দুধভাই, ছেলেবেলা থেকে আমরা একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। সম্রাটের জন্য কত বার নিজের জীবন বিপন্ন করেছি তার ইয়ত্তা নেই। সম্রাট আমার কাছে বহু বার প্রতিজ্ঞা করেছেন যে সিংহাসন যদি তিনি কখনো পান তাহ'লে উজিরি আমার। কিন্তু সিংহাসন পাবার পর ঐ জুলফিকার খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আমার উজিরি কেড়ে নিলে। এর প্রতিশোধ আমি নেবোই নেবো। একবার যদি সম্রাটকে সরাতে পারি তাহ'লে জুলফিকার খাঁর বংশে বাতি দিতে কাউকে রাখব না। শাহজাদা এখন আমাদের সহায় থাকলে হয়।

ইজুদ্দিন। আমি তোমার সহায় আছি কোকলতাস খাঁ। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, সিংহাসন যদি পাই তো উজিরী তোমার। আর আমার হারেমের পাদিশা বেগমের পদ দাদি—তোমার।

জিন্নৎ। চুপ কর মূর্খ। তোমার হারেমের পাদিশা বেগমের পদে আমি পদাঘাত করি। রাজ্য পাবার আগেই ভাগ-বাঁটোয়ারা শুরু ক'রে দিয়েছেন! কি ক'রে সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করা যাবে আগে তার ব্যবস্থায় মন দাও।

ইজুদ্দিন। আমার মতে বিদ্রোহ না ক'রে গুপ্তঘাতক দিয়ে সম্রাটকে হত্যা করাই সুবিধা। তুমি কি বল দিদিমা?

জিন্নৎ। আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। আমি শুধু চাই সেই বাঁদীকে—সেই লালকুঁয়ারকে। শয়তানীকে এই বাড়ীর সামনে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে চাবুক লাগাব, তবে আমার মনের জ্বালা মিটবে।

ইজুদ্দিন। সম্রাটকে হত্যা করা সম্বন্ধে তোমার কি মত কোকলতাস খাঁ?

কোকলতাস খাঁ। শাহজাদা, আমি যুদ্ধ করতে জানি। গুপ্তহত্যার কায়দা-কানুন আপনারা আমার চেয়ে অনেক ভালো বোঝেন।

(সভাচাঁদের প্রবেশ)

জিন্নৎ। এই যে আপনার আসতে এত দেরি হ'ল যে রাজা?

সভাচাঁদ। ঐ জুলফিকার খাঁ—সকাল থেকে চোখে-চোখে রেখেছে। একটু নড়তে গেলেই পেছনে গুপ্তচর লাগায়। কত কষ্ট ক'রে কত পথ ঘুরে যে এখানে আসতে হয়েছে তার আর ঠিকানা নেই। কিন্তু দরজায় প্রহরী-টহরী কারুকে দেখলাম না কেন বেগমসাহেবা?

জিন্নৎ। আমি ইচ্ছে ক'রেই তাদের সরিয়ে দিয়েছি। আমাদের আজকের মন্ত্রণার কথা যাতে কেউ না জানতে পারে তার ব্যবস্থা করেছি।

সভাচাঁদ। সেটা কি সমীচীন হয়েছে বেগমসাহেবা। এখানে ফট ক'রে অন্য কোনো লোকও তো চ'লে আসতে পারে!

জিন্নৎ। এখানে বাইরের কোনো লোক আসতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সভাচাঁদ। কিছু বলা যায় না বেগমসাহেবা। এই ধরুন জুলফিকার খাঁ—

(জুলফিকার খাঁর প্রবেশ)

এই যে আসুন উজির সাহেব, আসুন—অনেক দিন বাঁচবেন আপনি। নাম করতে করতেই এসে পড়েছেন দেখছি।

জুলফিকার। আমার নাম আজকাল আপনার জপমালা হয়েছে দেখছি—তা কেন আমার নাম হচ্ছিল শুনি।

সভাচাঁদ। এঁ্যা—তাই তো—তাই তো—কি কথাটা হচ্ছিল আমাদের—বলুন না শাহজাদা—আমার যে আবার সব সময়ে সব কথা মনে আসে না—

জিন্নৎ। আচ্ছা, আমিই বলছি। আমি এঁদের সবাইকে আপনার বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলছিলুম খাঁ সাহেব।

জুলফিকার। আমার বিশ্বাসঘাতকতা!

জিন্নৎ। হ্যাঁ, আপনার বিশ্বাসঘাতকতা। আপনি সেদিন আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যে আমাদের মধ্যে যে কথা হবে সে কথা কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না। কিন্তু আপনি এখানে থেকে গিয়েই সে কথা সম্রাটের কানে তুলেছিলেন। তার ফলেই শাহজাদা আজুদ্দিন আজ বন্দী।

জুলফিকার। বেগমসাহেবা, আপনি অত্যন্ত ভুল করছেন। আমাকে কোনো কথাই সম্রাটকে জানাতে হয়নি। আপনার এখানে যে সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে তা সম্রাট আমার অনেক আগেই জানতে পেরেছেন। তার ওপরে সেদিন রাত্রে শাহজাদা আজুদ্দিন আপনার এখান থেকে ফেরবার সময় সম্রাটের সামনে পড়ে যান—তার ফলেই তিনি বন্দী হয়েছেন।

জিন্নৎ। মিথ্যা কথা, কে বললে আমার এখানে সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তুমি এ কথা বিশ্বাস কর জুলফিকার খাঁ?

জুলফিকার। সত্যি কথা বলতে কি বেগমসাহেবা, কথাটা অনেক দিন থেকে কানে আসছিল কিন্তু এত দিন বিশ্বাস করিনি। এই ক'দিন থেকে রাজা সভাচাঁদের হাল চাল দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছিল। আমি তার পেছনে গুপ্তচর লাগিয়েছিলুম—তাদের মুখেই সমস্ত সংবাদ পাচ্ছিলুম—আজ সুযোগ বুঝে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন ক'রে গেলুম। আচ্ছা, আসি বেগমসাহেবা—

[জুলফিকারের প্রস্থান।

কোকলতাস। যাও—মাথাটা একেবারে কেটে নিও। বিশ্বাসঘাতক কোথাকার—

সভাচাঁদ। আমি বেটা এবার গেলুম—বেগমসাহেবা কিছু বলছেন না যে!

জিন্নৎ। আমি ভাবছি—

ইজুদ্দিন। তুমি কিছু ভেবো না দাদি। আমি পিতাকে বলব যে আমরা জুলফিকার খাঁকে খেপাবার জন্যে মিথ্যে করে তাকে শুনিয়ে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলুম। তাহ'লেই তিনি জল হ'য়ে যাবেন এখন।

জিন্নৎ। তুমি একটি হস্তিমূর্খ। আমার বাড়ীতে সম্রাটের বিরুদ্ধে কোনো কথা ঠাট্টা হিসাবে হবে না সেটা বোঝবার মতন বুদ্ধি তোমার বাবার আছে।

সভাচাঁদ। ঠিক বলেছেন বেগমসাহেবা। শাহজাদা এখনও ছেলেমানুষ। রাজনীতি বোঝবার মত বুদ্ধি এখনো পাকেনি।

জিন্নৎ। আচ্ছা, সম্রাট এখন কোথায়?

ইজুদ্দিন। সম্রাট আজ সকাল বেলায় বেরিয়েছেন ইমতিয়াজ মহলকে নিয়ে—শুনলুম সারা দিন সহরময় মদ খেয়ে হল্লা ক'রে বেড়িয়েছেন। এতক্ষণে বোধ হয় প্রাসাদে ফিরেছেন?

জিন্নৎ। তাহ'লে আজ রাতে আর ওঠবার ক্ষমতা থাকবে না, কি বল?

ইজুদ্দিন। কিছু বলা যায় না দাদি। মদ খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়তে তো সম্রাটকে কখনো দেখিনি।

জিন্নৎ। সম্রাটের আজকের বেল্লোর কথা আমার কানে পৌঁছেচে। যত দূর সম্ভব আজ রাতে সে আর উঠবে না। কিন্তু ঐ জুলফিকার খাঁকে আমার ভয়।

সভাচাঁদ। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারও ভয় ঐখানেই—তার ওপর আমি আবার তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী—

কোকলতাস। বেগমসাহেবা, জুলফিকার খাঁকে ভয় করবার কিছু নেই। আর তিনি তো আমাদের মুখে ষড়যন্ত্রের কথা কিছুই শোনেননি। কিছু শুনেছেন অন্য লোকের কাছ থেকে আর বাকিটুকু অনুমান করেছেন।

জিন্নৎ। ঠিক বলেছেন খাঁ সাহেব। আচ্ছা আজ আপনারা বিদায় নিন। আমি পরে গোপনে আপনাদের কাছে সংবাদ পাঠাবো। জুলফিকার খাঁ যখন সন্দেহ করেছে তখন এখানে আর আমাদের সভা হবে না।

[ইজুদ্দিন ছাড়া আর সকলের প্রস্থান।

ইজুদ্দিন, আমাদের এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে জুলফিকার খাঁকে চাই। কোকলতাস, সভাচাঁদ এদের কারুকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।

ইজুদ্দিন। কিন্তু জুলফিকার খাঁকে দলে আনলে কোকলতাস খাঁ যে চটে যাবে।

জিন্নৎ। তা যাক্, জুলফিকার খাঁকে চাই-ই—তা না হ'লে সব পণ্ড হবে। তোমার গুপ্তঘাতক ঠিক আছে তো?

ইজুদ্দিন। (উৎসাহ ভরে)—সে ঠিক আছে। বল তো আজই—

জিন্নৎ। চুপ—না, আজ নয়—আমি ঠিক সময়ে তোমায় সংবাদ দেবো। জুলফিকারকে চাই-ই—। আচ্ছা, তুমি এখন যাও।

[ইজুদ্দিনের প্রস্থান।

বাঁদী—

(বাঁদীর প্রবেশ)

ওয়ালিউল্লা খাঁ।

[বাঁদীর প্রস্থান।

(ওয়ালিউল্লা খাঁর প্রবেশ)

ওয়ালিউল্লা খাঁ, ফরুখশায়ার কত দূর এগিয়েছে জানো?

ওয়ালিউল্লা। হুজুরাইন, প্রায় আগ্রা পর্য্যন্ত।

জিন্নৎ। তোমাকে যেতে হবে ফরুখশায়ারের কাছে—আমার পাঞ্জা নিয়ে যাবে, আর একখানা চিঠি। সাতটা উট ঠিক রেখো, আমি কিছু মোহর পাঠাবো।

ওয়ালিউল্লা। হুজুরাইন—

জিন্নৎ। চুপ—খুব গোপনে। মহলের কেউ যেন কিছু জানতে না পারে—যাও।

[ওয়ালিউল্লার প্রস্থান।

জুলফিকার জাহান্দারের বিরুদ্ধে যাবে না। দেখি ফরুখশায়ারকে দিয়ে কিছু হয় কি না—সেটাও তো অপদার্থ।

(পট পরিবর্ত্তন)

[ক্রমশঃ

বাংলা সাময়িক-পত্র

(ইং ১৮৯৬—১৯০০)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা ইতিপূর্ব্বে বর্ত্তমান বর্ষের 'মাসিক বসুমতী'তে ধারাবাহিক ভাবে ১৮৬৮ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র উদ্ভবের পর হইতে ১৮৯৬ সনের আগষ্ট মাসে সাপ্তাহিক 'বসুমতী'র প্রকাশকাল পর্য্যন্ত সমুদয় বাংলা পত্র-পত্রিকার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি।* আর-স্বল্পাধিক চারি বৎসর—অর্থাৎ ইং ১৯০০ সন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিলেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বাংলা সাময়িক-পত্রের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই প্রয়াস পাইব।

ইং ১৮৯৬

১। সমাজ ও সাহিত্য (মাসিক) : আশ্বিন ১৩০৩।

গরিবপুর (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ; ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়-প্রবর্ত্তিত ও তৎপুত্র সুকবি গিরিজানাথ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহার প্রথম পর্য্যায় ১৩০০ (?) সালে সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত ও কিছু দিন পরেই রহিত হইয়াছিল।

২। কিউরোপ্যাথিক চিকিৎসা (মাসিক) : আশ্বিন ১৩০৩।

সৈদাবাদ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত।

৩। স্নেহময়ী (মাসিক) : সেপ্টেম্বর ১৮৯৬।

সম্পাদক—ডবলিউ কেরী। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-মতে ইহার ২য় ভাগের ১১শ সংখ্যার প্রকাশকাল—২৮ জুলাই ১৮৯৭।

৪। ভিক্ষুক (মাসিক) : আশ্বিন ১৩০৩।

জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—সারদাকান্ত মৈত্র।

৫। বিবেক (মাসিক) : আশ্বিন ১৩০৩।

সম্পাদক—কামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায়।

৬। বৃহস্পতি (মাসিক) : কার্ত্তিক ১৩০৩।

সম্পাদক—বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী।

৭। তত্ত্ববোধ (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১৩০৩।

যশোহর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—ত্রৈলোক্যনাথ চূড়ামণি।

৮। শ্রীসনাতনী (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১৩০৩।

বাগবাজার, বসুপাড়া হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী।

৯। সচিত্র আয়ুর্ব্বেদ বা চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা : পৌষ ১৩০৩। পরিচালক—এস্, ভট্টাচার্য্য।

---

* ইহা প্রকাশিত হইবার পর আরও দু-চারখানি পত্র-পত্রিকার কথা জানা গিয়াছে ; সেগুলি—(১) যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'আলোচনা' (মাসিক), শ্রাবণ ১৩০১ এবং ১৩০৩ সালের বৈশাখ মাসে (ইং ১৮৯৬) প্রকাশিত : শ্রীহট্টের 'সচিত্র গাম ও গল্প', কে, পি, ব্যানার্জ্জী-সম্পাদিত 'মাসিক বিজ্ঞাপনী ও সংবাদ,' রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত বরিশালের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'বরিশাল হিতৈষী,' ও 'প্রভা' মাসিক পত্র।

১০। কান্তি (মাসিক) : পৌষ ১৩০৩।

কাঁথি, মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—তারকগোপাল ঘোষ।

১১। বিশ্বজীবন (মাসিক) : পৌষ ১৩০৩।

"জীবনবৃত্ত-বিষয়ক সচিত্র মাসিকপত্র।" সম্পাদক—মহেন্দ্রনাথ হালদার। "এক বৎসর পূর্ণ হইল" (দ্রঃ 'পূর্ণিমা,' পৌষ ১৩০৪)।

ইং ১৮৯৭

১২। হাফেজ (মাসিক) : জানুয়ারি ১৮৯৭।

বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্র। পরিচালক—শেখ আবদুর রহিম।

১৩। শিল্পতত্ত্ব ও পুষ্পাঞ্জলি (মাসিক) : মাঘ ১৩০৩।

দুইখানি স্বতন্ত্র পত্রিকা, একত্র প্রকাশিত ; প্রথমখানি শিল্প-সম্বন্ধীয়, দ্বিতীয়খানি সাহিত্য-বিষয়ক। সম্পাদক—শরচ্চন্দ্র দেব ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

১৪। সাবিত্রী (মাসিক) : মাঘ ১৩০৩।

মুরারপুর, গয়া হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—রামযাদব বাগচী, এম-ডি ; সহ-সম্পাদক—যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, বি-এ। "হিন্দু-রমণীদিগকে সাবিত্রীর ন্যায় করাই" এই স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল।

১৫। পন্থা (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০৪।

"আমরা হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্নিহিত অমূল্য সত্যগুলির উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া প্রবন্ধ লিখিব ও ধর্ম্মকথার আলোচনা করিব। সাম্প্রদায়িক কলহ ও বিবাদ যে অজ্ঞানতামূলক তাহা আমরা বিশদরূপে দেখাইবার চেষ্টা করিব এবং যাহাতে লোকের মন হইতে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ ভাব তিরোহিত হইয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উদার ভাবের উদয় হয় সাধ্যানুসারে তাহার যত্ন করিব।" সম্পাদক—বরদাকান্ত মজুমদার ও পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামি-সিদ্ধান্ত-বাচস্পতি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলাল গোস্বামী এবং চতুর্থ বর্ষে কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদক হন। 'পন্থা' দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

১৬। উৎসাহ (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০৪।

বোয়ালিয়া, রাজশাহী হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—সুরেশচন্দ্র সাহা। "যে কারণে একদিন উত্তরবঙ্গ হইতে 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই কারণে সেই স্থান হইতে আজ আবার 'উৎসাহে'র অভ্যুদয় হইল।" রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নিখিলনাথ রায়, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, শশধর রায়, জলধর সেন প্রমুখ বহু প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখকের রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছে। ১৩০৭, ২৯এ ফাল্গুন বসন্তরোগে সুরেশচন্দ্রের মৃত্যু হইলে ব্রজসুন্দর সান্যাল 'উৎসাহে'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন।

১৭। উদ্দীপনা (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০৪।

সম্পাদক—দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

১৮। পল্লীবাসী (পাক্ষিক) : বৈশাখ ১৩০৪।

কালনা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯। হরিভক্তিতরঙ্গিণী (পাক্ষিক) : আষাঢ় ১৩০৪।

বালী হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

২০। বীণা-বাদিনী (মাসিক) : শ্রাবণ ১৩০৪।

সম্পাদক—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। সঙ্গীত-বিষয়ক মূল প্রবন্ধ,

প্রচারিত পত্র, স্বরলিপিতে ব্যবহৃত চিহ্নের ব্যাখ্যা, নানা-বিষয়ক বাংলা ও হিন্দী গানের এবং গতের স্বরলিপি ইহার কলেবর পূর্ণ করিত। আয়ুষ্কাল দুই বৎসর। ডোয়ার্কিন্ এণ্ড সন ইহার প্রকাশক ছিলেন।

২১। নদীয়া দর্পণ (মাসিক): শ্রাবণ ১৩০৪।

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়। "প্রায় প্রত্যেক নগর এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পল্লী হইতে সাপ্তাহিক কিম্বা মাসিক পত্র প্রচারিত হইয়া থাকে। শিক্ষা সভ্যতার কেন্দ্র কৃষ্ণনগরে তাহার সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হয়।···কৃষ্ণনগরের চিরদিনের এই অভাব মোচন করাই পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ—নদীয়া একটি পুরাতন ঐতিহাসিক স্থান। বঙ্গদেশের ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ নদীয়া।···এ প্রকার স্থানের আদৌ ইতিহাস নাই। সেই অভাব মোচন করা পত্রের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।"

২২। নবীন লেখা ও সমালোচন ও সমালোচক (মাসিক ?): ভাদ্র ১৩০৪।

হাওড়া, খুরুট হইতে প্রকাশিত। পরিচালক—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

২৩। উৎসাহ (মাসিক): ভাদ্র ১৩০৪।

রংপুর ছাত্রসঙ্ঘের মুখপত্র। সম্পাদক—অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

২৪। খৃষ্টীয় শক্তি (মাসিক): ভাদ্র ১৩০৪।

সম্পাদক—কৃষ্ণচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৫। সনাতন ধর্ম্মকণা (মাসিক): আশ্বিন ১৩০৪।

চুঁচুড়া, মাধবীতলা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—দুর্গাদাস রায়। "বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচার ধর্ম্মকণার একমাত্র উদ্দেশ্য।"

২৬। **পুণ্য** (মাসিক): আশ্বিন ১৩০৪।

সম্পাদিকা—প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রী। 'এই পত্রে জনসমাজের উপযোগী সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ব, সঙ্গীত প্রভৃতি নানাবিষয়ক প্রবন্ধই স্থান লাভ করিবে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে গৃহস্থের এবং মানবমাত্রেরই সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন আহারের বিষয় প্রতি মাসেই থাকিবে। ইহাতে গাহস্থ্য ধর্ম্মের অনুকূল শিল্পবিদ্যা প্রভৃতিরও অভাব দূর করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করা হইবে।" 'পুণ্য' একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা ছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষের (১৩১০-১২) পত্রিকা হিতেন্দ্রনাথ ও ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যুগ্মসম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

২৬ক। ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক রিভিউ (মাসিক): অক্টোবর ১৮৯৭।

ইংরেজী-বাংলা মাসিক পত্র। সম্পাদক—প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

২৭। স্বাস্থ্য (মাসিক): কার্ত্তিক ১৩০৪।

সম্পাদক—দুর্গাদাস গুপ্ত, এম বি। পর-বৎসর বৈশাখ হইতে ইহার দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হয়।

২৮। চিত্তরঞ্জন (মাসিক): কার্ত্তিক (?) ১৩০৪।

নাট্রা, ২৪-পরগণা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—জ্ঞানজীবন চক্রবর্ত্তী।

২৯। **প্রদীপ** (মাসিক): পৌষ ১৩০৪।

উচ্চাঙ্গের সচিত্র মাসিক পত্র। সম্পাদক—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি অবসর গ্রহণ করিলে ১৩০৬ সালের ফাল্গুন (৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) হইতে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। গুপ্ত-মহাশয় মাত্র চারি মাস ইহার সম্পাদক ছিলেন। অতঃপর পঞ্চম বর্ষের প্রথমার্দ্ধ (পৌষ ১৩০৮—জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯) পর্য্যন্ত পত্রিকা পরিচালন করেন—স্বত্বাধিকারী বৈকুণ্ঠনাথ দাস। পঞ্চম বর্ষের শেষার্দ্ধ হইতে অষ্টম ভাগ (১৩১২) পর্য্যন্ত 'প্রদীপ' সম্পাদন করেন নূতন স্বত্বাধিকারী বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

ইং ১৮৯৮

৩০। **সংসার** (সাপ্তাহিক): ১৮ পৌষ ১৩০৪—১ জানুয়ারি ১৮৯৮।

সম্পাদক—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ। "'ভূপ্রদক্ষিণ'-প্রণেতা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন সংসারের পরিদর্শক হইতে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এই পত্রে রীতিমত লিখিবেন।"

৩১। **অন্তঃপুর** (মাসিক): মাঘ ১৩০৪।

"কেবল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত" মাসিক পত্রিকা। সম্পাদিকা—বনলতা দেবী, সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা। বনলতার মৃত্যু হইলে ৪র্থ বর্ষ হইতে ৮ম বর্ষ পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে হেমন্তকুমারী চৌধুরী, কুমুদিনী মিত্র প্রভৃতি পত্রিকাখানি পরিচালন করিয়াছিলেন।

৩২। **মালা** (মাসিক): মাঘ ১৩০৪—জানুয়ারি ১৮৯৪।

সম্পাদক—ব্যোমকেশ মুস্তফী। ইহার একটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩৩। ঘটক (মাসিক): মাঘ ১৩০৪।

আন্দুলবেড়িয়া, নদীয়া হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—মুকুন্দলাল ঘোষ।

৩৪। শিক্ষা (মাসিক): মাঘ ১৩০৪।

"এখানি হুগলীর অন্তর্গত হয়েড়া গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত বনমালী চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত" (দ্রঃ 'আলোচনা,' জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫)। ইহার ২য় বা ফাল্গুন-সংখ্যা ১৩০৪, চৈত্র মাসের 'পূর্ণিমা'য় সমালোচিত হইয়াছে।

৩৫। শিল্প শিক্ষা (মাসিক): ফাল্গুন ১৩০৪।

সম্পাদক—উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৬। **নির্ম্মাল্য** (মাসিক): বৈশাখ ১৩০৫।

সম্পাদক—রাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

৩৭। **অঞ্জলি** (মাসিক): বৈশাখ ১৩০৫—এপ্রিল ১৮৯৮।

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—রাজেশ্বর গুপ্ত। "এইখানি শিক্ষাবিষয়ক মাসিক পত্রিকা, বালক বালিকাদিগকে সুশিক্ষিত করা ইহার প্রাণ।"

৩৮। জননী (মাসিক): বৈশাখ ১৩০৫।

চুঁচুড়া, মাধবীতলা, হীরা প্রেস হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—প্রসাদদাস গঙ্গোপাধ্যায়।

৩৯। বাঙ্গালী (মাসিক): বৈশাখ ১৩০৫।

সম্পাদক—রাধানাথ মিত্র।

৪০। প্রসূন (পাক্ষিক) : বৈশাখ ১৩০৫।

সম্পাদক—নিত্যরঞ্জন কাব্যতীর্থ ও ভূতনাথ সেন।

৪১। প্রতিনিধি (মাসিক) : বৈশাখ (?) ১৩০৫।

দ্র: 'পূর্ণিমা,' জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫।

৪২। **প্রতিবাসী** (সাপ্তাহিক) : জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫।

৩১২।২ নং বেণিয়াটোলা, পটলডাঙ্গা হইতে প্রকাশিত এক পয়সা মূল্যের সংবাদপত্র। "আমাদের সহযোগী 'প্রতিবাসী' দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন" (সাপ্তাহিক 'অনুসন্ধান,' ৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬)।

৪৩। **ঋষি** (মাসিক) : আষাঢ় ১৩০৫।

সম্পাদক—রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ। "আমরা ঋষিপদে প্রণামপূর্ব্বক ঋষি-প্রদত্ত অমূল্য রত্নরাজি পাঠকবর্গসমক্ষে ক্রমশ: উপনীত করিতে থাকিব।"

৪৪। **কোহিনুর** (মাসিক) : আষাঢ় ১৩০৫।

কুমারখালি হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—এস, কে, এম, মহম্মদ রওসন আলী। হিন্দু ও মুসলমান—"উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তা বদ্ধমূল করাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য।" পর-বৎসর বৈশাখ হইতে ইহার দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হয়।

৪৫। কুসুম (মাসিক) : শ্রাবণ ১৩০৫।

"মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউশনের কতিপয় ছাত্র দ্বারা পরিচালিত।" (দ্র: 'প্রয়াস,' মার্চ্চ ১৮৯৯)

৪৬। বঙ্গ-গৃহ (মাসিক) : আশ্বিন ১৩০৫।

বাঁকীপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—অবিনাশচন্দ্র বসু।

৪৭। ভারতশ্রী (মাসিক) : আশ্বিন (?) ১৩০৫।

"অনুখাল বান্ধব বাণিজ্যাগার কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পত্রিকাখানিতে প্রতি মাসে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহার পরিচালনকর্ত্তা বামাচরণবাবু ও মহানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উভয়েই সুদক্ষ।" (দ্র: 'আলোচনা,' অগ্রহায়ণ ১৩০৫)

৪৮। নব চিকিৎসা বিজ্ঞান (মাসিক) : আশ্বিন ১৩০৫।

সম্পাদক—রাধামাধব হালদার।

৪৯। উদ্দীপনা (মাসিক) : আশ্বিন ১৩০৫।

পগেয়াপটি, বড়বাজার হইতে নারায়ণদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৫০। **আলাপিনী** (পাক্ষিক···) : ১ কার্ত্তিক ১৩০৫।

সঙ্গীতালোচনা ও শিক্ষা বিষয়িণী পাক্ষিক পত্রিকা। সম্পাদক—মন্মথনাথ দে। এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। "স্বরলিপির আলোচনা যাহাতে আরও বৃদ্ধি হয় এবং উহা দেখিয়া সহজে সকলে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে পারেন, সেই উদ্দেশে এই পত্রিকা প্রকাশ করা হইল। ইহার দ্বারা স্বরলিপি অভ্যাস খুব সুবিধাজনক হইবে আশা করা যায়। প্রতি খণ্ডে দুই তিন পৃষ্ঠা করিয়া কেবল গানের স্বরলিপি থাকিবে। সঙ্গীত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি এবং বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়াদিও ইহাতে বর্ণিত হইবে। সাধারণ প্রচলিত সহজ স্বরলিপি [দণ্ডমাত্রিক] পদ্ধতি অনুসারে এই পত্রিকা লিখিত হইতেছে।" 'আলাপিনী'র দ্বিতীয় বর্ষ মাসিক আকারে বৈশাখ ১৩০৭ হইতে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বহু গানের স্বরলিপি এই পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। সরলা দেবীর "অতীত গৌরব-বাহিনি মম বাণি!" গানটিরও স্বরলিপি ৩য় ভাগ পত্রিকায় স্থান পাইয়াছে।

৫১। **দৈনিক চন্দ্রিকা** : অগ্রহায়ণ (?) ১৩০৫।

"নূতন প্রাত্যহিক পত্র। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। কলিকাতা কলুটোলা, শোভারাম বসাকের লেন হইতে প্রকাশিত। বাঙ্গালায় দৈনিক সংবাদপত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'দৈনিক চন্দ্রিকা'—বাঙ্গালায় সেই অভাব পূরণ করিতে অগ্রসর।··· সুপ্রসিদ্ধ লেখক, 'হিতবাদী' প্রভৃতির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, 'রাজস্থানে'র প্রসিদ্ধ অনুবাদক শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'দৈনিক চন্দ্রিকা'র সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন।" (সাপ্তাহিক 'অনুসন্ধান,' ২১ পৌষ ১৩০৫)

৫২। যুবক (মাসিক) : পৌষ (?) ১৩০৫।

দ্র: 'আলোচনা,' মাঘ ১৩০৫।

৫৩। আর্য্যসমাচার (মাসিক) : ১৩০৫ সাল (?)।

১৫ চৈত্র ১৩০৫ তারিখের 'উদ্বোধনে' বিনিময়ে প্রাপ্ত এ পত্রিকার উল্লেখ আছে।

৫৪। **ঐতিহাসিক চিত্র** (ত্রৈমাসিক) : পৌষ ১৩০৫—জানুয়ারি ১৮৯৯।

রাজসাহী হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। "ইহা সাধারণত: ভারতবর্ষের, এবং বিশেষত: বঙ্গদেশের, পুরাতত্ত্বের উপকরণ সংকলনের জন্যই যথাসাধ্য যত্ন করিবে।" অক্ষয়কুমার আত্মকথায় বলিয়াছেন, "রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করিলে [১৩০৫ সাল] তাঁহার সহায়তায় এবং তাঁহার প্রস্তাবে ঐতিহাসিক চিত্র নামক ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করি। ঐ পত্র এক বৎসরের অধিক চলে নাই।" ('বঙ্গ-ভাষার লেখক,' পৃ: ৭৪৬)

৫৫। **প্রয়াস** (মাসিক) : জানুয়ারি ১৮৯৯।

সাহিত্য-সেবক-সমিতির উদ্যোগে শৈলেন্দ্রনাথ সরকার (প্যারীচরণের কনিষ্ঠ পুত্র) কর্ত্তৃক পরিচালিত। নবীন লেখকদিগকে উৎসাহ প্রদান দ্বারা বাংলা-সাহিত্য-সমাজের উন্নতি বিধান করাই 'প্রয়াসে'র উদ্দেশ্য ছিল।

৫৬। **উদ্বোধন** (পাক্ষিক···) : ১ মাঘ ১৩০৫।

"ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ক পত্র"। স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতির রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছে। সম্পাদক—স্বামী ত্রিগুণাতীত। দশম বর্ষ (১৩১৪—১৫) হইতে 'উদ্বোধন' মাসিক পত্রে রূপান্তরিত হয়। ইহা এখনও চলিতেছে।

৫৭। সংসারতত্ত্ব (মাসিক) : মাঘ ১৩০৫।

পালপাড়া, বরাহনগর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—হেমচন্দ্র মৈত্র।

৫৮। প্রচারক (মাসিক) : মাঘ ১৩০৫।

বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্র। সম্পাদক—মধু মিয়া।

৫৯। কোকিল (মাসিক) : মাঘ ১৩০৫।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত ও ছাত্রদিগের দ্বারা পরিচালিত। সম্পাদক—নিশিকান্ত ঘোষ।

৬০। বিশ্বসখা (মাসিক): ফাল্গুন ১৩০৫।

বসু, রায় এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৬১। কমলা (মাসিক): ফাল্গুন ১৩০৫।

টালাবাগান বান্ধব-সমিতি ও পাঠাগার হইতে প্রকাশিত। 'অতি অল্প মূল্যে সাধারণের মাসিক পত্রিকা পাঠের সুবিধার নিমিত্ত' 'কমলা'র আবির্ভাব। পরিচালক—মন্মথনাথ মিত্র।

৬২। **মেদিনী বান্ধব** (সাপ্তাহিক): বৈশাখ (?) ১৩০৬।

"মেদিনী বান্ধব। একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, মেদিনীপুর কোতবাজার হইতে প্রতি সোমবারে প্রকাশ হয়, আমরা রীতিমত এই পত্রিকাখানি পাইতেছি। আকার ক্ষুদ্র হইলেও বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে, আমরা নূতন সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।" (দ্র: 'আলোচনা,' জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬)

৬৩। **মানভূম** (সাপ্তাহিক ?): বৈশাখ ১৩০৬।

মানভূম হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—রাখালদাস ভট্টাচার্য্য কাব্যানন্দ। "সহযোগী 'মানভূম'কে আমরা মানের সহিত অভিবাদন করিতেছি। 'মধুময় মনোহর 'মানভূম' মাধুর্য্যের মহিয়সী মহিমায়-মণ্ডিত মনোহারিত্বে মানব-মন মোহিত' করিতে পারিলেই আমরা সুখী হইব।"

৬৪। বিকাশ (মাসিক): বৈশাখ ১৩০৬।

শোভাবাজার ভিক্টোরিয়া পাঠ সমিতির সাহিত্য সমালোচনী সভা হইতে প্রকাশিত। "কয়েকটী উৎসাহশীল যুবকের বিশেষ চেষ্টায় বিকাশের প্রকাশ।" সম্পাদক—ডা: রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।

৬৫। মেডিকেল জার্ণাল (মাসিক): বৈশাখ ১৩০৬।

ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—কেনারাম মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-মতে ইহার ৩য়-৪র্থ সংখ্যা 'মুকুর ও মেডিকেল জার্ণাল' নামে ১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ তারিখে প্রকাশিত হয়।

৬৬। নবদ্বীপ চন্দ্রিকা (মাসিক): বৈশাখ ১৩০৬।

সম্পাদক—কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬৭। **শ্রীগৌড়েশ্বর-বৈষ্ণব** (মাসিক): বৈশাখ (?) ১৩০৬।

"বৃন্দাবন হইতে 'শ্রীগৌড়েশ্বর-বৈষ্ণব' নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। 'শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু-সম্মত বিমল পথ প্রদর্শন করাই' ইহার উদ্দেশ্য" (সাপ্তাহিক 'অনুসন্ধান,' ৭ ভাদ্র ১৩০৬)

৬৮। **কাঙ্গাল** (সাপ্তাহিক): বৈশাখ ১৩০৬ (?)।

কুচবিহার হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র।

৬৯। ধর্ম্মজীবন (মাসিক): আষাঢ় (?) ১৩০৬।

মাদারিপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শীতলচন্দ্র বেদান্তভূষণ।

৭০। **বঙ্গভূমি** (সাপ্তাহিক): আষাঢ় ১৩০৬।

"নূতন সুলভ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'বঙ্গভূমি' মৃজাপুর ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত হইতেছে।" (দ্র: সাপ্তাহিক 'অনুসন্ধান,' ২৮এ আষাঢ় ১৩০৬)।

৭১। **সমীরণ** (সাপ্তাহিক): শ্রাবণ (?) ১৩০৬।

"কলিকাতায় দুইখানি নূতন সুলভ সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের আবির্ভাব হইতে চলিল। একখানি 'বঙ্গভূমি' প্রকাশিত হইতেছে; অপরখানি 'সমীরণ'—ফৌজদারী বালাখানা হইতে প্রকাশিত হইবে। আমরা উভয়ের দীর্ঘজীবন কামনা করি।" (সাপ্তাহিক 'অনুসন্ধান,' ২৮ আষাঢ় ১৩০৬)

৭২। **হরিভক্তি** (মাসিক): ভাদ্র ১৩০৬।

সম্পাদক—শ্যামাচরণ কবিরত্ন। হরিভক্তির স্থায়িত্ব ও উন্নতি-বিধানই পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য।

৭৩। **আলো** (মাসিক): ভাদ্র ১৩০৬।

কলিকাতা হিন্দু হোষ্টেলের কতিপয় ছাত্র কর্ত্তৃক পরিচালিত। সম্পাদক—অন্নদাচরণ সেন। ১৩০৭ সালের বৈশাখ হইতে ইহার কার্য্যস্থান চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হয়। 'পূর্ণিমা' (ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০৭) লেখেন:—"'আলো' চট্টগ্রাম হইতে আসিতেছে—কার্য্যস্থান এখন চট্টগ্রাম হাসপাতাল রোড। ভালই হইয়াছে। প্রথমেই 'মা' লইয়া নবীনচন্দ্র আলো করিয়া বসিয়াছেন।...নবীন-চন্দ্রের ন্যায় চট্টগ্রামের অনেক কৃতী সন্তানই আলোর বিকাশের জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছেন।"

৭৪। মধুকর (মাসিক) আশ্বিন ১৩০৬।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—পরেশনাথ ঘোষ।

৭৫। **বীরভূমি** (মাসিক): কার্ত্তিক ১৩০৬।

বীরভূম হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—নীলরতন মুখোপাধ্যায়।

৭৬। **বিশ্বদূত** (সাপ্তাহিক): অগ্রহায়ণ ১৩০৬।

"আলোচনা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'বিশ্বদূত' নামক একখানি সুলভ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সম্পাদনকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় এবার 'আলোচনা' প্রকাশে বড়ই বিলম্ব হইয়াছে,... যাঁহারা এত দিন হইতে 'আলোচনা'কে দয়া প্রদর্শনে জীবিত রাখিয়াছেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের নব প্রকাশিত 'বিশ্বদূত' সাপ্তাহিক পত্রের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া চিরবাধিত করিবেন, আমরা সকলের নিকট তাহার নমুনা পাঠাইলাম।" ('আলোচনা,' পৌষ ১৩০৬)

৭৭। শ্রীচৈতন্য পত্রিকা (মাসিক): অগ্রহায়ণ ১৩০৬।

সম্পাদক—সুশীলকৃষ্ণ গোস্বামী।

৭৮। ছাত্র (মাসিক): অগ্রহায়ণ ১৩০৬।

কতিপয় ছাত্র কর্ত্তৃক পরিচালিত। সম্পাদক—হরেন্দ্রকুমার মজুমদার।

৭৯। শিক্ষক-সুহৃদ (মাসিক): ১৩০৬ সাল (?)।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত এই নামের একখানি পত্রিকার উল্লেখ ৭ আষাঢ় ১৩০৬ তারিখের 'অনুসন্ধানে' পাইতেছি।

ইং ১৯০০

৮০। বিংশ শতাব্দী (মাসিক): পৌষ ১৩০৬ (জানুয়ারি ১৯০০)।

সম্পাদক—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

৮১। কৃষিতত্ত্ব (মাসিক) : মাঘ ১৩০৬।

"কৃষি-বিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্র।" বাগবাজার ইম্পিরিয়াল নর্শরী হইতে নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৮২। প্রচার (মাসিক) : ফাল্গুন (?) ১৩০৬।

"খ্রীষ্টীয়ান্ মাসিক পত্র ও সমালোচক।...ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত।" (দ্র: 'হরিভক্তি,' চৈত্র ১৩০৬)

৮৩। পরিব্রাজক (মাসিক) : চৈত্র ১৩০৬।

সম্পাদক—পঞ্চানন কাব্যরত্ন।

৮৪। **প্রভাত** (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১৩০৭।

উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র। সম্পাদক—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। রমেশ-চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ইহার লেখক এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইহার এলাহাবাদের সংবাদদাতা ছিলেন। 'প্রভাতে'র পরমায়ু এক বৎসর।

৮৫। **সাহিত্য-সংহিতা** (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০৭।

'সাহিত্য-সভা'র মুখপত্র। সম্পাদক—নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন। দ্বিতীয় বর্ষের দশ সংখ্যা (আষাঢ়-চৈত্র ১৩০৮) ও পঞ্চম বর্ষের (বৈশাখ-চৈত্র ১৩১১) পত্রিকা সম্পাদন করেন—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সখারাম গণেশ দেউস্কর, সরলা দেবী প্রমুখ প্রতিষ্ঠাপন্ন বহু সাহিত্যিকের রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছে।

৮৬। প্রকৃতি (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০৭।

ছাত্রবর্গ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্রিকা। প্রকাশক—বসন্তকুমার বসু। 'প্রকৃতি' প্রচারের উদ্দেশ্য—"ছাত্রগণের মধ্যে বাংলা ভাষার চর্চ্চা, অপরিচিতের মধ্যে সৌহৃদ্যস্রোত প্রবাহিত করা" এবং উদীয়মান লেখকগণের রচনা সাদরে স্থান দান করা।

৮৭। প্রভা (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০৭।

বাগবাজার হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

৮৮। ছায়া (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০৭।

সাহিত্য-সেবকমণ্ডলী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

৮৯। ইসলাম (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০৭।

সম্পাদক—মধু মিয়া।

৯০। লহরী (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০৭।

শান্তিপুর হইতে প্রকাশিত "নানাবিষয়িণী কবিতাময়ী সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।" সম্পাদক—মোজাম্মেল হক্।

৯১। শোভা (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০৭।

"শোভা—চুনা, পুটী হইলেও রুই কাতলার আস্বাদ দিতে বিরত থাকিবে না।" সম্পাদক—নবকৃষ্ণ ঘোষ।

৯২। বঙ্গীয় রহস্য (মাসিক) : বৈশাখ (?) ১৩০৭।

"পো: বদনগঞ্জ, জেলা হুগলি—শ্রীহেমগিরি চন্দ্র কর্ত্তৃক মাসিক আকারে প্রকাশিত, বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র, বঙ্গীয় রহস্যের গল্প আমাদের বেশ লাগিয়াছে।" (দ্র: "প্রভা,' ভাদ্র ১৩০৭)

৯৩। স্বাধীন জীবিকা (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭।

সম্পাদক—প্রতুলচন্দ্র সোম।

৯৪। **আরতি** (মাসিক) : আষাঢ় ১৩০৭।

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। ইহাতে কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের অনেকগুলি কবিতা মুদ্রিত হইয়াছে। দীর্ঘায়ু পত্রিকা।

৯৫। উদ্ধার ও উত্থান (মাসিক) : জুন ১৯০০।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত, ইঙ্গ-বঙ্গ পত্রিকা।

৯৬। রাজভক্তি (মাসিক) : শ্রাবণ (?) ১৩০৭।

"যাহাতে রাজভক্তি বীজ বালক বৃদ্ধ বনিতা হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয় তাহাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য।"

৯৭। কালিকাপুর গেজেট (মাসিক) : ভাদ্র ১৩০৭।

কালিপাহাড়ী, বৰ্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—কালীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয়কুমার জ্যোতিরত্ন।

৯৮। সর্ব্বধর্ম্মরক্ষিণী (মাসিক) : ভাদ্র ১৩০৭।

"যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত মহাত্মার উপদেশাবলম্বনে সংগঠিত মাসিক পত্রিকা।"

৯৯। **কৃষক** (সাপ্তাহিক...)। ৮ আশ্বিন ১৩০৭।

"কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।" সম্পাদক—নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার। সাধারণের সহানুভূতির অভাবে ছয় মাস পরে ১৩০৮ সালের বৈশাখ হইতে ইহা মাসিক পত্রে রূপান্তরিত হয়।

১০০। **শিল্প ও সাহিত্য** (মাসিক) : আশ্বিন ১৩০৭।

সম্পাদক—মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

১০১। **ত্রিস্রোতা** (মাসিক) : আশ্বিন ১৩০৭।

জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শশিকুমার নিয়োগী, এম-এ, বি-এল ও ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী, এম-এ, বি-এল। "অবতরণিকায় 'ত্রিস্রোতা' নাম দিবার কারণ ও পত্রিকার উদ্দেশ্য প্রকটিত। তাহা হইতে বুঝা যায় যে 'ত্রিস্রোতা' উত্তরবঙ্গের একটি প্রসিদ্ধ নদ এবং এই পত্রিকারও লীলাস্থল উত্তরবঙ্গ ; এই জন্য ইহার 'ত্রিস্রোতা' নাম রাখা হইল ; ইহার পর আরও একটি কারণ দেখান হইয়াছে, তাহা এই দার্শনিকগণের মতে মনোনদের তিনটি স্রোত—বুদ্ধি, ইচ্ছা ও ভাব। মনের এই তিনটি স্রোত আমাদের নিকট দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যরূপে দেখা দিতেছে। এই তিনটি বিষয় পত্রিকার আলোচ্য বলিয়া 'ত্রিস্রোতা' নাম রাখা হইয়াছে। উদ্দেশ্য :—পত্রিকা দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নতি-কল্পে সবিশেষ চেষ্টিত থাকিবেন ; কেবল রাজনীতি ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিষয় সকলের উপর বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইবে। যে সকল বিষয়ের ফল মন্দ হইতে পারে তাহা বিষবৎ পরিত্যক্ত হইবে। 'ত্রিস্রোতা' যেমন উত্তরবঙ্গকে শস্যশ্যামল করিয়া প্রবাহিত সেইরূপ এই পত্রিকাখানিও বঙ্গসাহিত্যকে নানা ফলফুলে সজ্জিত করিতে চেষ্টিত থাকিবেন।" (দ্র: 'কৃষক,' ৬ কার্ত্তিক ১৩০৭)

১০২। **প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী** (দ্বৈমাসিক) : আশ্বিন ১৩০৭।

প্রধান সম্পাদক—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে এই দ্বৈমাসিক পত্র প্রকাশিত হইত। ইহার প্রতি সংখ্যায় দুই তিনখানি প্রাচীন বাংলা পুথি ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত হইত।

১০৩। **শাস্ত্র-গ্রন্থ-প্রচার** (মাসিক) : আশ্বিন ১৩০৭। সম্পাদক—ফণিভূষণ কাব্যালঙ্কার।

১০৪। হিতৈষিণী (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১৩০৭। বরাহনগর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সাধারণের হিতসাধন উদ্দেশ্যেই 'হিতৈষিণী'র আবির্ভাব। সম্পাদক "সূচনা"য় লিখিয়াছেন :—"আমাদিগের বরাহনগর ও তন্নিকটবর্ত্তী পার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহের মধ্যে একখানি সংবাদপত্র নাই, এই অভাব সাধারণে অনেক দিন হইতে বুঝিতে পারিয়াছেন। বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া তৎপ্রতিকারার্থ কয়েক বার চেষ্টাও হইয়াছিল এবং সেই চেষ্টার ফলে তিনবার তিনখানি সংবাদপত্র (বরাহনগর পাক্ষিক সমাচার, বরাহনগর বার্ত্তাবহ, বরাহনগর সমাচার)* প্রকাশিত হয়।"

১৩০৭ সালে (ইং ১৯০০) কয়েকখানি সংবাদপত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; এগুলি বর্ষারম্ভে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে। পত্রিকাগুলি—

(১) দৈনিক সমাচার (সাপ্তাহিক)—দ্রঃ 'অনুসন্ধান,' ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭।

(২) নিবেদন (সাপ্তাহিক)—দ্রঃ 'প্রকৃতি', শ্রাবণ ১৩০৭।

১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'মহাজনবন্ধু' পত্রে বরিশালের সাপ্তাহিক 'বিকাশ' ও 'খুলনা' নামে একখানি সাপ্তাহিকের উল্লেখ পাইতেছি : এগুলি সম্ভবতঃ ১৯০১ সনে প্রকাশিত।

* এগুলির প্রকাশকাল :—'বরাহনগর বার্ত্তাবহ' পাক্ষিক আকারে ১২৭৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্মলাভ করে; প্রায় চারি মাস চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়। পর-বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে পুনঃপ্রচারিত হয়। 'বরাহনগর সমাচার' পাক্ষিক-রূপে ১৮৭৩ সনের জানুয়ারি (?) মাসে আবির্ভূত হয়; সম্পাদক—শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাই পরবর্ত্তী অক্টোবর (?) মাসে 'বরাহনগর পাক্ষিক সমাচার' নাম ধারণ করে বলিয়া মনে হয়।

তোমাকে পেলাম

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক-চৌধুরী

নদী প্রান্তর অনেক পেরিয়ে এখানে এলাম—
ধুলায় ধোঁয়ায় জল-ঝরা চোখ : তোমাকে পেলাম!
মহানগরীর গলিত পঙ্গু পায়ের চাপে
দলিত স্বপ্ন : বোবা কান্নায় বক্ষ কাঁপে :
পদ্ম-পাঁপড়ি-অধরে পঙ্ক, দীঘল চুলে
মনে হয় কালো মৃত্যুর পাল দিয়েছ তুলে।

তোমার গাঁয়ের কচি ঘাস-ঢাকা নরম মাটি,
দিগন্ত ছোঁয়া প্রান্তর, ঘন গাছের ছায়া
আমাকে পাঠাল : সোনালী ক্ষেতের সাগর দোলা,
কালো মেঘনার ফুলে-ফুলে-ওঠা বুকের মায়া
আমাকে পাঠাল : কন্যা তোমায় এখানে পেলাম,
তোমার দু'চোখে সজল দৃষ্টি বুলিয়ে গেলাম।

দেশের সবারে কী খবর দেব—কী দেখে এলাম?
বলব, দেশের দিগন্ত মাঠ দীর্ঘশ্বাসে
কন্যার বুকে স্বাক্ষর রাখে : কচি-কচি ঘাস
এখনো চোখের প্রান্তে জাগায় বোবা আশ্বাস।

মেঘনার কালনাগিনী ঢেউয়েরা লুকানো মনে—
কান্না বাষ্পে মেঘেরা ঘনায় সংগোপনে।
পদ্ম-পাঁপড়ি-অধরে সোনালি ধানের ধার—
দিগন্ত ছোঁয়া আকাশ জাগছে দু'চোখে তার।

জেন অস্টিনের

উনষাট

'কোথায় ছিলি এতক্ষণ লিজি?'—ঘরে ঢুকতেই জেনের প্রশ্নে টেবিলের বাকী সবাই সমস্বরে সায় দিল। উত্তরে এলিজাবেথ শুধু জানালে যে, ঘুরতে-ঘুরতে ফেরবার কথা ভুলেই গিয়েছিল তারা। বলতে বলতে মুখ লাল হয়ে উঠল এলিজাবেথের। কিন্তু তার কথায় আসল সত্য সম্বন্ধে কারুর মনেই কোন সন্দেহের ছায়া রেখাপাত করল না।

সন্ধ্যা কাটল নির্ঝঞ্ঝাটেই। আশ্চর্য হবার মত কোন কিছু ঘটল না। পারিবারিক স্বীকৃতি পেয়েছে যে দু'টি প্রেমিক তারা হাসি-গল্পে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল আর এখনও স্বীকৃতি পায়নি যে দু'জন তারা শুধু নিঃশব্দে রইল বসে। ডার্সির প্রকৃতি এমন নয় যে মনের সুখ বাইরের আনন্দ-প্রকাশে উপচে ওঠে। এলিজাবেথ ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত—বিপর্যস্ত। সে জানে সুখের কারণ ঘটেছে, কিন্তু হৃদয় দিয়ে এখনও তা পরিপূর্ণ উপভোগ করতে পারছে না সে। সব সত্ত্বেও অনেক অশুভের ছায়া-নৃত্য সে দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে। প্রকৃত তথ্য জানাজানি হলে যে পরিস্থিতি দাঁড়াবে তা সে সহজেই আন্দাজ করতে পারছে। সে জানে, একমাত্র জেন ছাড়া কেউই ডার্সিকে পছন্দ করে না এ-বাড়ীতে। বরং ভয় হয় ডার্সির সামাজিক প্রতিষ্ঠা, ধনাঢ্যতাও হয়ত দূর করতে পারবে না না এ তিক্ত বৈরীতা।

রাত্রে জেনের কাছে হৃদয়ের দুয়ার অবারিত করল এলিজাবেথ। সন্দেহ করা যদিও জেনের প্রকৃতিবিরুদ্ধ তবুও এ-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ

—'তুই ঠাট্টা করছিস। ডার্সিকে কথা দিয়েছিস—এ হতেই পারে না। আমার সঙ্গে তুই ছলনা করছিস—এ অসম্ভব।'

—'সুচনাতেই দেখছি বানচাল হবার উপক্রম। তোর উপরই আমার একমাত্র নির্ভর। তুই-ই যদি অবিশ্বাস করিস আর কারুরই তো বিশ্বাস হবে না। ও আমাকে এখনো ভালবাসে। বিয়েতে রাজী হয়েছি আমরা।'

জেন সংশয়িত দৃষ্টিতে তাকাল বোনের দিকে।

—'না, এ হতে পারে না। তুই তো ওকে অত্যন্ত অপছন্দ করতিস।'

—'আসল ঘটনার তুই কিছুই জানিস না। আগের কথা ভুলে যা। আগে হয়ত এখনকার মত এত ভালবাসতুম না ওকে। কিন্তু এখন সে সব কথা মনে রাখা অমার্জনীয় অপরাধ হবে। শেষ বারের মত আমি সে কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।'

জেন তবুও বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বোনের দিকে। এলিজাবেথ অতি অকপট ভাষায় ঘটনার সত্যতা পুনরাবৃত্তি করল।

—'এও কি সম্ভব? তবে তুই যখন এত করে বলছিস বিশ্বাস করতেই হবে। তোকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু একটা কথা—ক্ষমা করিস ভাই—এ বিয়েতে তুই কি সুখী হবি?'

—'এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ নেই। এ বিয়েতে আমাদের মত এত সুখী কেউ হবে না। দিদি, তুই খুশী হয়েছিস তো? এ রকম ভগ্নীপতি তোর পছন্দ তো?'

—'খু—উব পছন্দ। বিংলে বা আমি এর চেয়ে আর কোন কিছুতেই এত আনন্দ পেতাম না। এ বিয়ে অসম্ভব বলেই আমরা বহুবার আলোচনা করেছি। ডার্সিকে তুই আন্তরিক ভালবাসিস তো? সত্যিকার ভাল না বাসলে বিয়ে করিস না। কি করতে যাচ্ছিস সে সম্বন্ধে তোর কোন ধোঁয়াটে ভাব নেই তো রে লিজি?'

—'না। সকল কথা যখন শুনবি তখন তুইও রায় দিবি আমার স্বপক্ষে।'

—'অর্থাৎ—'

—'বিংলের চেয়েও তাকে আমি বেশী ভালবাসি। শুনে তুই হয়ত রাগ করবি।'

—'না, না, আর একটুও দেরী নয়। সব কথা খুলে বল। এ ভালবাসা কত দিন থেকে তোর মনে ফুল ফোটাচ্ছে?'

—'ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। আমি নিজেই জানি না কবে থেকে ভালবাসতে সুরু করেছি ওকে। খুব সম্ভবতঃ পেমবার্লিতে থাকতে।'

এলিজাবেথের অকপটতায় জেনের সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল। বললে সে—'এবার আমি জেনে খুব খুশী হলাম যে, তুইও আমার মত সুখী হবি। ডার্সির প্রতি বরাবরই আমার শ্রদ্ধা ছিল। তোকে ভালবাসায় আমার শ্রদ্ধা চিরদিনই অটুট থাকবে। বিংলের বন্ধু আর তোর স্বামী হিসেবে তোর আর বিংলের পরই সে আমার প্রিয়ভাজন। কিন্তু তুই আমার সঙ্গে বড্ড চালাকি খেলেছিস—সব চেপে রেখেছিলি আমার কাছ থেকে। পেমবার্লি আর ল্যাম্বটনে যা-যা ঘটেছে কিছুই তো বলিসনি আমাকে। আমি যতটুকু জানতে পেরেছি সেও তোর কাছ থেকে নয়—আর এক জনের কাছ থেকে।'

এলিজাবেথ তখন গোপন করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করল। বিংলের বিষয় সে জেনকে জানাতে চায়নি এবং নিজের মানসিক অবস্থার

জন্য বিংলের বন্ধুর কথাও গোপন রেখেছিল তার কাছ থেকে। কিন্তু এবার আর সে লিডিয়ার বিয়েতে ডার্সির কতখানি অংশ, একটুও গোপন করবে না দিদির কাছ থেকে। নিজের দোষ-ত্রুটি সবই স্বীকার করলে এলিজাবেথ। অর্ধেক রাত দু'বোনের এই ভাবেই গল্প করে কেটে গেল।

পরের দিন সকালে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে মা বললেন—'ঐ হাড়-জ্বালানো ডার্সিটা যেন আর না আসে' বিংলের সঙ্গে। সব সময় নাছোড়বান্দার মত ও কেন যে এখানে আসে! পাখী শিকার বা ঐ রকম যা হয় একটা কিছু নিয়ে ও থাকে যেন—আমাদের বিরক্ত করতে যেন না আসে। ওকে নিয়ে যে কি করি! লিজি, তুমি ওকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যেয়ো বাপু! যাতে না ও বিংলের পথের কাঁটা হয়ে উঠতে পারে।'

এ সুবিধাজনক প্রস্তাবে এলিজাবেথের পক্ষে হাসি সম্বরণ কঠিন হয়ে ওঠে, তবুও যখন-তখন ডার্সিকে এ রকম ভাবে বিদ্ধ করায় মনে মনে বিরক্তিই বোধ করে সে।

ডার্সিরা আসতেই বিংলে এমন কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল এলিজাবেথের দিকে এবং এমন আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করল তার সঙ্গে যে, সে যে সকল কথাই জেনেছে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না। বিংলে চেঁচিয়ে বললে—'জেন, তোমাদের এখানে কি আর এমন কোন অলি-গলি নেই যেখানে লিজি আবার পথ হারিয়ে ফেলতে পারে?'

মা বললেন—'লিজি আর কিটি বরং ডার্সিকে নিয়ে ওকহ্যাম পাহাড়ে বেড়াতে যাক। বেড়ানোর পক্ষে বেশ সুন্দর জায়গা। ডার্সি তো কখনো দেখেনি সেখানকার দৃশ্য।'

—'ওদের দু'জনের পক্ষে ভালই হবে'—বললে জেন—'তবে কিটির পক্ষে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে পড়বে। তাই নয় কি কিটি?'

কিটি গৃহে থাকার স্বপক্ষেই। ডার্সি পাহাড় থেকে চারি দিকের দৃশ্যাবলী দেখবার প্রবল কৌতূহল প্রকাশ করল। আর এলিজাবেথ —"মৌনং সম্মতি লক্ষনম্।"

এলিজাবেথ উপরে গেল পোষাক পালটাতে। মাও সঙ্গে সঙ্গে তাকে অনুসরণ করে উপরে এলেন।

—'মা লিজি, আমি সত্যিই দুঃখিত যে ঐ অপ্রিয় লোকটার সকল ঝামেলা তোমাকেই শুধু একা পোহাতে হবে। তুই অমত করিস নে। জানিস তো এ শুধু জেনের জন্যেই। এ ভাবে ছাড়া তো আর ওদের দু'জনের একলা গল্প করার সুযোগ নেই। রাগ করিস নে মা।'

বেড়াতে বেড়াতে এই সিদ্ধান্তই করা হোল যে আজকের মধ্যেই বাবার সম্মতি আদায় করতে হবে। মায়ের সম্মতি আদায়ের ভার এলিজাবেথ নিজে নিল। মা যে কি ভাবে এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন সে-সম্বন্ধে এখনও সে মনস্থির করতে পারেনি। সময় সময় ভয় হয়, ডার্সির বিপুল অর্থ ও আড়ম্বরও হয়ত মায়ের ঘৃণা জয় করতে পারবে না। যা হয় এ বিয়ের ভয়ঙ্কর বিপক্ষে যাবেন নয়ত অত্যন্ত খুশীই হবেন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর আচরণ এমন বিসদৃশ হবে যা এলিজাবেথ কখনো বরদাস্ত করতে পারবে না। মায়ের প্রথম আনন্দের আতিশয্য বা বিরুদ্ধ মতপ্রকাশের তীব্রতা—দু'য়ের কোনটাই ডার্সির গোচরীভূত হোক, এ অসহনীয় এলিজাবেথের পক্ষে।

সন্ধ্যা বেলা বাবা পাঠাগারে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এলিজাবেথ লক্ষ্য করল ডার্সিও উঠে তাঁর অনুবর্তী হোল। সঙ্গে সঙ্গে এলিজাবেথের উত্তেজনাও অত্যুগ্র হয়ে উঠল। বাবার সম্মতি পাওয়া সম্বন্ধে আশংকার কোন কারণ নেই। কিন্তু তাঁর প্রিয় কন্যা তাঁকে অসুখী, অনাগত ভয় ও অনুশোচনায় বিদগ্ধ করতে যাচ্ছে এ চিন্তা বেদনাদায়ক তার পক্ষে। যতক্ষণ না ডার্সি ফিরে এল সে কঠোর মর্মপীড়ায় সূচিবিদ্ধ হতে লাগল। ডার্সি ফিরে এলে তার মুখের মৃদু হাসি দেখে এলিজাবেথ অনেকটা আশ্বস্ত হোল। কিটির সঙ্গে সে যেখানে বসেছিল সেখানে এসে সূচি-শিল্পের প্রশংসার অছিলায় ডার্সি তার কানে কানে বলল— 'বাবা তোমায় পাঠাগারে ডাকছেন।'

এলিজাবেথ বাবার সঙ্গে দেখা করতে উঠে গেল।

বাবা চিন্তিত মুখে ঘরে পায়চারী করছিলেন। বললেন— 'মা লিজি, এ তুমি কি করতে যাচ্ছ? ডার্সিকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছ—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? তুমি তাকে তো বরাবর ঘৃণা করে এসেছ।'

এলিজাবেথ আমতা আমতা করে ডার্সির প্রতি তার ভালবাসার কথা জানাল।

—'অর্থাৎ ডার্সিকে বিয়ে করতে তুমি বদ্ধপরিকর। তার টাকা আছে সন্দেহ নেই—জেনের তুলনায় ভাল গাড়ী, ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ পাবে। কিন্তু এ-সব নিয়েই কি তুমি সুখী হতে পারবে?'

—'তোমার আর অন্য কোন আপত্তি আছে কি?'

—'আদৌ না। সবাই জানি ডার্সি গর্বিত মেজাজী লোক। কিন্তু তোমার পছন্দ হলে এ-সবের কোন মূল্যই নেই।'

—'আমি ওকে আন্তরিক কামনা করি'—অশ্রুসজল চোখে উত্তর দিল এলিজাবেথ—'ওকে আমি ভালবাসি। ওর অন্যায় অহমিকা বোধ নেই। খুবই অমায়িক ও। ওর প্রকৃত স্বরূপ তুমি কিছুই জান না বাবা। কাজেই ওর সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করে আমার মনে ব্যথা দিও না।'

—'লিজি'—বললেন বাবা—'ডার্সিকে আমি আমার সম্মতি দিয়েছি। ও এমন লোক যাকে আমি বিমুখ করতে পারি না। তুমি যদি তাকে পেতে স্থির সংকল্প করে থাক তোমাকেও বিমুখ করব না। কিন্তু তবুও ভাল করে ভেবে দেখ—এই আমার উপদেশ। স্বামীর প্রতি যদি প্রকৃত শ্রদ্ধা না থাকে তুমি নিজেও সুখী হতে বা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারবে না। অসম বিয়েতে তোমার সজীব প্রতিভাই তোমাকে ভয়ানক বিপদে টেনে নামাবে। তখন দুঃখ ও অপযশের বোঝা মাথায় নিয়ে বেড়াতে হবে চিরদিন। তুমি তোমার জীবন-সাথীকে শ্রদ্ধা করতে পারছ না এ বেদনা যেন আমায় কখনো স্পর্শ না করে। যা করতে যাচ্ছ সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নেই তোমার।'

অত্যন্ত উত্তেজিত হলেও এলিজাবেথের উত্তর হোল খুবই আন্তরিক। দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বার বার সে বলতে লাগল যে ডার্সিই তার মনোনীত প্রার্থী। কি ভাবে ধীরে ধীরে তার প্রতি শ্রদ্ধা রূপান্তরিত হয়েছে সমস্ত সে বুঝিয়ে বলল বাবাকে। ডা-

ভালবাসা হঠাৎ এক দিনের ফল নয়—বহু মাস বহু অনিশ্চয়তার সঙ্গে সংগ্রাম করে এ স্থায়ী রূপ নিয়েছে। এই ভাবে ডার্সির গুণরাজির উচ্ছ্বসিত প্রশংসার দ্বারা বাবার অবিশ্বাসকে জয় করে এ বিয়েতে তাঁর সম্মতি আদায় করে নিল এলিজাবেথ।

তার বলা শেষ হলে বাবা বললেন—'আর আমার বলার কিছু নেই মা। এই যদি হয় সে তোমায় পাওয়ার উপযুক্ত। ডার্সির চেয়ে অযোগ্য কারুর হাতে তোমাকে তুলে দিতে আমি রাজী হতাম না।'

ডার্সি সম্বন্ধে বাবার ধারণাকে আরো প্রীতিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে এলিজাবেথ লিডিয়ার জন্য ডার্সি যা-যা করেছে তাও জানালে বাবাকে। শুনে বাবার বিস্ময় শত গুণ হোল।

—'আজ সন্ধ্যায় দেখছি কেবল বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের ধাক্কা খাচ্ছি। তাহলে এ সমস্তই ডার্সির কীর্তি। সেই ঘটিয়েছে এ বিয়েটা—টাকা দিয়েছে—ছোঁড়াটার ঋণ শোধ করে কমিশনও যোগাড় করে দিয়েছে। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই। যাক্, অনেক ঝক্কি ও অর্থকৃচ্ছ্রতার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। তোমার মেশো হলে আমাকে নিশ্চয়ই তার ঋণ পরিশোধ করতে হোত। আজকালকার এই দুর্দম তরুণ প্রেমিকেরা যা-কিছু করে তাদের নিজস্ব রীতিতেই। আগামী কাল বরং আমি ঋণ পরিশোধের প্রস্তাবটা তার কাছে উত্থাপন করব। তোমায় ভালবাসার দোহাই তুলে সে বেশ লম্বা-চওড়া বক্তৃতার ঝড় বইয়ে দেবে এবং ঐখানেই সমস্ত কিছুর যবনিকাপাত হবে।'

এই সময় কলিন্সের চিঠি পড়ে মেয়ের বিব্রত বোধের কথা মনে পড়ায় মিঃ বেনেট এক চোট খুব হেসে নিয়ে মেয়েকে বিদায় দিলেন।

—'কিটি ও মেরীর জন্য যদি কোন তরুণ প্রেমিকের আবির্ভাব হয়, তাদেরও পাঠিয়ে দিয়ো পাঠাগারে—আজকে আমার পরিপূর্ণ অবকাশ আছে'—বললেন তিনি।

এলিজাবেথের মনের উপর থেকে একটা ভারী বোঝা নেমে গেল। আধ ঘণ্টা নিজের ঘরে বিরলে চিন্তার পর আবার সে সবার সঙ্গে যোগ দিল। আনন্দ-বিলাস করার সময় এখনও আসেনি সত্য কিন্তু সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হোল পরম শান্তির মধ্যেই। ভয় করবার মত আর কিছু নেই—নৈকট্য ও পরিচয়ের নিবিড়তা আসবে যথাসময়েই।

রাত্রে মা পোষাক ছাড়তে ড্রেসিং-রুমে ঢুকলে এলিজাবেথ তাঁকে অনুসরণ করল সেখানে। জীবনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি এলিজাবেথ জানাল মাকে এবং তার ফল যা দাঁড়াল অতি বিস্ময়কর। যা তিনি শুনেছেন কানে বহু ক্ষণ ধরে তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে লাগলেন। তার পর প্রকৃতিস্থ হলেন যখন তখন একবার চেয়ারে বসতে লাগলেন, আবার উঠে দাঁড়াতে লাগলেন। এই বিস্ময় প্রকাশ করছেন, আবার এই সৌভাগ্য-সূচনায় নিজেকে ধন্য মনে করতে লাগলেন।

—'হায় ভগবান! এ কি বিশ্বাস্য! এ রকমটি হবে কে ভাবতে পেরেছে। এ কি সত্যি? লিজি, তুই কত বড় লোক হবি? তোর তুলনায় জেন তো কিছুই নয়। ও কী আনন্দ! কি সুখের কথা! ডার্সি অতি খাসা ছেলে। ওকে অবহেলা করার জন্য আমার হয়ে তুই ক্ষমা চেয়ে নিস ওর কাছ থেকে। নিশ্চয়ই সে ক্ষমা করবে। সহরে বাড়ী হবে। কী মজা! তিন মেয়ের বিয়ে হোল। বছরে দশ হাজার আয়। হায় ভগবান, আমার কি হবে! আমি পাগল হয়ে যাব।'

মায়েরও যে এ-বিয়েতে পূর্ণ সম্মতি আছে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হোল তা। মায়ের এই মহা আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সাক্ষী একমাত্র সে—এতে খুশী হোল এলিজাবেথ। দ্রুত-পায়ে সে ফিরে এল নিজের ঘরে, কিন্তু ঘরে ঢোকার তিন মিনিটের মধ্যেই মা এসে আবার উপস্থিত হলেন সেখানে।' বললেন—'মা লিজি, আমি যে আর কিছুই ভাবতে পারছি না। বছরে দশ হাজার! এ যে লর্ডদের সৌভাগ্য! আচ্ছা, ডার্সি কি খেতে ভালবাসে বল্ তো, কাল রান্না করে দেব।'

ডার্সির প্রতি মা কী ধরণের আচরণ করবেন এ তার অশুভ সংকেত। এলিজাবেথ জানে এখনও অনেক কিছু করবার বাকি। কিন্তু আগামী কাল আশাতীত ভাল ভাবেই কাটল। তাঁর ভাবী জামাতাকে দেখে এমন বিহ্বল হয়ে পড়লেন মা যে, তার সঙ্গে বাক্যালাপ করারই সাহস হোল না। এলিজাবেথ লক্ষ্য করল বাবা ডার্সির সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করছেন। প্রতি পদক্ষেপে ডার্সি যে তাঁর শ্রদ্ধা অর্জন করছে এ কথাও জানালেন মেয়েকে—'সব ক'টি জামাইকেই আমি প্রশংসা করি। তবে উইকহামই বোধ হয় আমার সব চাইতে প্রিয়! জেনের বরের মত তোমার বরকেও আমার ভাল লেগেছে।'

ষাট

এলিজাবেথ আবার রঙ্গলিপ্স হয়ে উঠল। ঠিক কি ভাবে ডার্সির মন তার প্রতি প্রেমানুরাগে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে জানতে চাইলে সে।

—'ঠিক কখন তুমি আমায় ভালবাসতে আরম্ভ করেছ? উদ্যোগ-পর্ব সুরু হলে তাকে মনোহর ভাবে চালিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা তোমার আছে, জানি। কিন্তু উদ্যোগ-পর্বের সূচনটা হোল কী ভাবে?'

—'স্থান, কাল, কটাক্ষ বা ভাষা কিসে কখন যে প্রেমের ভিত্তি রচিত হয়েছে আমি নিজেই জানি না। বহু দূর কাল থেকেই এর সূচনা। মধ্য-পথ পর্যন্ত অগ্রসর না হওয়া অবধি আমি নিজেই জানতুম না যে আমি প্রেমে পড়েছি।'

—'গোড়ার দিকে আমার সৌন্দর্যের আকর্ষণ তুমি সফল ভাবে প্রতিহত করেছ—আর তখন আমার আচার-আচরণ অসৌজন্যোচিত হয়েছিল বলতে পার। তোমার মনে আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্য না নিয়ে কখনো কথা বলিনি আমি। সত্যি করে বল তো—আমার রূঢ়তার জন্যই কি ভালবেসেছিলে আমায়?'

—'তোমার মনের সজীবতা মন হরণ করেছিল আমার?'

—'এটাকে তুমি আমার ঔদ্ধত্যও বলতে পার। আসল কথা হোল ভদ্রতা, আনুগত্য, সম্মান তোমায় ক্লান্ত করে তুলেছিল। যে সমস্ত মেয়ে তোমার প্রশংসা অর্জনের আশায় তৃষিত নয়নে চেয়ে থাকত তোমার মুখের দিকে তোমার মনোরঞ্জনের জন্য—তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য সতত উৎসুক থাকত, তারা বিষিয়ে তুলেছিল তোমার জীবন। আমি তাদের সগোত্র নই বলেই আকর্ষণ করতে পেরেছিলাম তোমায়। তুমি নিজেকে যতই ঢাকতে চেষ্টা কর না

কেন অন্তরে অন্তরে তুমি মহান্, ন্যায়ানুগ। যারা সর্বক্ষণ তোমার মনোরঞ্জনে তৎপর তাদের তুমি ঘৃণা কর। আশা করি, কারণ নির্ণয়ের বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা করতে পেরেছি তোমায়। আমার ধারণা, আমার কারণ নির্ণয় খুবই যুক্তিসঙ্গত। সত্যি কথা বলতে কি, আমার সম্বন্ধে ভাল কিছুই তো জান না তুমি। আর প্রেমে পড়লে কেউ জানতেও চেষ্টা করে না ও-সব।'

—'নেদারফিল্ডে জেনের অসুখের সময় তোমার স্নেহপরায়ণতার পরিচয় পাইনি কি ?'

—'প্রিয়তম জেন। তার জন্মে কি কম করা যায় ? এটাকে তুমি গুণের পরিচয় বলতে পার না। আমার গুণাগুণ এবার তোমার করায়ত্ত—তুমি তাদের যদৃচ্ছা বাড়াবে। তবে আমি মাঝে-মাঝে তোমার সঙ্গে খুনসুড়ি করব—বিরক্ত করব তোমায়। এবার আমি তোমায় সোজাসুজিই জিজ্ঞেসা করছি—চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করতে এত অনিচ্ছুক ছিলে কেন ? প্রথম যেদিন এলে এখানে, আমায় দেখে অমন লজ্জায় মুশড়ে পড়েছিলে কেন ? এমন একটা ভাব দেখিয়েছিলে যেন আমায় তুমি গ্রাহ্যই কর না।'

—'কারণ, তুমি এত গম্ভীর আর নিঃশব্দ হয়ে বসেছিলে যে আমার একটুও সাহস হচ্ছিল না।'

—'কিন্তু আমি কেমন যেন বিব্রত বোধ করছিলাম'—

—'আমিও'—

—'খেতে যখন এলে তখন আমার সঙ্গে আরো গল্প করতে পারতে।'

—'যার মন নিঃসাড় সেই পারে'—

—'কিন্তু আশ্চর্য লাগে তোমায় যদি নিজের খেয়াল-খুশী মত যেতে দেওয়া হোত, তাহলে না জানি কত দিন চলত এই ভাবে। আমি যদি জিজ্ঞেসা না করতুম তোমার মুখ খুলতে কত দিন না লাগত। লিডিয়াকে সাহায্য করার জন্ম তোমায় ধন্যবাদ দেওয়ার সংকল্প নিশ্চয়ই গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। হয়ত এ কথা আমার উল্লেখ করা উচিত হয়নি—আর কখনো উল্লেখ করব না জীবনে।'

—'এ নিয়ে দুঃখ করবার কি আছে ? আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার অন্যায় চেষ্টা লেডী ক্যাথারিনের আমার সকল সংশয় দূর করে দিয়েছে। বর্তমান সুখ-সৌভাগ্যের জন্ম তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ঐকান্তিক ইচ্ছার নিকট আমি ঋণী নই। তোমার কাছ থেকে আবেদন আসার অপেক্ষায়ও ছিলাম না আমি। লেডী ক্যাথারিনের সন্দেহই আমার মনে আশা সঞ্চারিত করেছিল। তখন সব-কিছু জানার দৃঢ়সংকল্প হোল।'

—'লেডী ক্যাথারিন আমাদের অশেষ উপকার করেছেন। সে জন্ম তাঁর সুখী হওয়াই উচিত, কারণ, পরের উপকার করতে ভালবাসেন তিনি। কিন্তু তুমি নেদারফিল্ডে কেন এসেছিলে, বল দেখি ? শুধু কি বিব্রত হতে এসেছিলে ? না, গভীর কোন পরিবর্তনের প্রত্যাশায় ছিলে ?'

—'এখানে আসার আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তোমাকে চোখে দেখার—তোমার ভালবাসা পাওয়ার আদৌ সম্ভাবনা আছে কি না তাও বিচার করা। তোমার বোন এখনও বিংলেকে ভালবাসে কি না সেটাও বাজিয়ে দেখার ইচ্ছা ছিল।'

—'কিন্তু লেডী ক্যাথারিনের কপালে কি ঘটতে যাচ্ছে সে কথা তাঁকে জানানোর সাহস আছে তো তোমার ?'

—'সাহস দেখানোর চাইতে আমি চাই কালহরণ করতে। কিন্তু এ কথা তাঁকে জানাতেই হবে। এক টুকরো কাগজ পেলে এখনই লিখে জানিয়ে দিতে পারি।'

—'কিন্তু আমার মাসীকেও আর অবহেলা করা উচিত হবে না।'

ডার্সির ঘনিষ্ঠতা কত নিবিড় সে কথাটা গোপন রাখতে চেয়েছিল বলেই এলিজাবেথ এত দিন মাসীর চিঠির উত্তর দেয়নি। কিন্তু এখন এ আনন্দ-সংবাদ পেলে তাঁরা কত সুখী হবেন! তিনটি সুখের দিন থেকে মেসো-মাসীকে বঞ্চিত করায় এলিজাবেথ মনে মনে লজ্জা বোধ করতে লাগল। কাজেই অনতিবিলম্বে চিঠির উত্তর দিল এলিজাবেথ।

—'মাসি,

তোমার দীর্ঘ আনন্দপূর্ণ পত্রের জন্ম অনেক আগেই ধন্যবাদ জানান উচিত ছিল আমার। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, কী লিখব ভেবেই কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। সত্যিকার অস্তিত্ব ছিল না তার অধিক তুমি কল্পনা করেছিলে। কিন্তু এখন যত ইচ্ছা কল্পনার রঙ চড়াও। এবার কল্পনার লাগাম ছেড়ে দাও—কল্পনার পাখায় উধাও হয়ে উড়ে বেড়াও ক্ষতি নেই—যত দিন না আমাদের বিয়ের অতিরিক্ত কিছু ভাবছ তত দিন মারাত্মক ভ্রান্তি ঘটবে না। শীগ্‌গির চিঠির উত্তর দিও। এবং আগের চিঠিতে যা করেছিলে তার চেয়ে বেশী প্রশংসা কথা চাই তার। হয়ত এ-রকম কথা আরো অনেকেই বলেছে এর আগে কিন্তু এমন নিষ্ঠার সঙ্গে বলেনি কেউ নিশ্চয়ই। জেনের চেয়েও সুখী আমি। জেনের ওষ্ঠে হাসির মৃদু রেখা, কিন্তু আমার আনন উজ্জল হাসিতে বিভাসিত। তোমার প্রতি ডার্সির অকুণ্ঠ ভালবাসা নিও। ক্রিষ্টমাসের সময় পেমবার্লিতে তোমাদের আসা চাই-ই। ইতি—'

লেডী ক্যাথারিনকে ডার্সি যে চিঠি লিখল তার সুর আলাদা। কলিন্সের শেষ চিঠির জবাবে মিঃ বেনেট যা লিখলেন তা থেকেও সম্পূর্ণ আলাদা।

'কল্যাণীয়েষু—

তোমাকে অভিনন্দন দ্বারা বিব্রত করিতে বাধ্য হইতেছি। এলিজাবেথ ও ডার্সি অচির ভবিষ্যতে শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হইবে। লেডী ক্যাথারিনকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিও। কিন্তু আমি তোমার স্থলাভিষিক্ত হইলে এ ক্ষেত্রে ভাইপোর পার্শ্বেই দাঁড়াইতাম। তাহার নিকট হইতেই অধিক প্রত্যাশা করিতে পার। ইতি—'

আসন্ন বিয়ে উপলক্ষে বিংলের বোন বিংলেকে যে অভিনন্দন জানাল তা খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ হলেও অকৃত্রিম নয়। এমন কি, জেনকেও চিঠি লিখেছে সে আগের মতই প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানিয়ে। কিন্তু আর আত্মপ্রতারিত হবে না জেন যদিও চিঠি পড়ে বিচলিত হোল খুবই। বিংলের বোনকে বিশ্বাস না করলেও একটি বেশ নরম ও স্নেহমাখা জবাব দিল জেন।

কিন্তু ডার্সির বোন দাদার চিঠি পেয়ে দাদাকে যে পত্র লিখল তাতে কৃত্রিমতার লেশ মাত্র ছিল না। চারখানি পাতা ভরেও মনের আনন্দ নিঃশেষে প্রকাশ করতে পারলে না সে। বৌদির ভালবাসা পাওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা মূর্ত হয়ে উঠেছে চিঠির ছত্রে ছত্রে।

কলিন্সের নিকট হতে কোন চিঠি আসার আগেই তারা নিজেরাই লিউকাস লজে এসে উপস্থিত হোল। এই হঠাৎ আগমনের কারণ জানতেও দেরী হোল না কারুর। ভাইপোর পত্র পেয়ে লেডী ক্যাথারিন এমন অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছেন যে, শার্লটি এই ঝটিকা বর্ষণের হাত থেকে দূরে থাকার জন্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল। শার্লটি এই বিয়েতে মনে মনে খুশীই। এই সময় প্রিয় বান্ধবীর উপস্থিতিতে এলিজাবেথেরও অকৃত্রিম আনন্দ হোল। চলল কলিন্সের তোষামোদকারী সৌজন্ত প্রকাশ। ডার্সি প্রশংসনীয় ধৈর্যের সঙ্গে সব সহ্য করতে লাগল।

এলিজাবেথ এই সমস্ত বিরক্তিকর পারিপার্শিক থেকে ডার্সিকে সযত্নে রক্ষা করে যেতে লাগল। তার দৃষ্টি অনাগত সুখ ও শান্তি-ঘেরা পেমবার্লির স্নিগ্ধ পারিবারিক পরিবেশের দিকে। তার মন অদূর ভবিষ্যতের দিনগুলির চিন্তায় মশগুল যখন তারা এই উলঙ্গ বেহায়াপনা থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাবে।

একষষ্টি

বড় মেজ দু'টি মেয়ের এই ভাবে সুপাত্রস্থ হওয়ায় মায়ের মন কত হাল্কা হোল তা আর ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বিংলের বাড়ীতে গিয়ে ডার্সির গল্প করতে করতে কন্যাদের সুখ-সোহাগের কথায় তাঁর মাতৃস্নেহ বিগলিত হয়ে পড়ত। জেন, এলিজাবেথ ও লিডিয়া তিন জনে সুখী হোল, স্বামিগৃহে স্বামিসোহাগিনী হয়েছে। সুতরাং মাথার উপর থেকে কন্যাদায়ের বোঝা নেমে যাওয়ায় বেনেট-গিন্নীর স্বভাবেরই আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল।

মেজ মেয়েটি ছিল বাপের প্রিয়, নয়নের মণি। তাকেই বড়ো বেশী করে মনে পড়ত তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনে। এক-এক দিন এলিজাবেথকে দেখার অভিলাষ এত প্রবল হয়ে উঠত তাঁর যে, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবেই তিনি পেমবার্লিতে গিয়ে উপস্থিত হতেন। মেয়েও স্বামিগৃহে বাপের জন্ত উতলা হয়ে থাকত, বাপকে পেয়ে এলিজাবেথ তাঁকে নিয়ে কি করবে ভেবে পেত না। যত্নে আদরে সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ করে ঢেলে দেবার চেষ্টা করত এলিজাবেথ।

নেদারফিল্ডে বছর খানেক রইল বিংলে ও জেন। কিন্তু পিতৃগৃহের এত নিকটে আর বেশী দিন থাকা পছন্দ করলে না জেন। বিংলেরও আর ভাল লাগছিল না। সুতরাং এলিজাবেথদের জমিদারীর কাছাকাছি একটি ছোট জমিদারী নিয়ে জেন সেখানে বাসা বদল করল। দুই বোন কাছাকাছি হোল। দুই বন্ধুও পরস্পরকে কাছে পেল।

কিটি দুই দিদির কাছে ভাগ হয়ে কাল কাটাতে লাগল। লঙবোর্ণের ছোট গণ্ডীর বাইরে এসে তার ভালই হোল শরীর ও মনের দিক থেকে। শুধু মায়ের কাছে রয়ে গেল মেরী।

লিডিয়া ও উইকহামের বিবাহিত জীবন নিয়ে বোনেদের বা বাপ-মায়ের কারুরই মনে সুখ ছিল না। কখনো কখনো লিডিয়া এলিজাবেথকে চিঠি লিখত। 'ভাই দিদি, ভগবানের কৃপায় তোর ঐশ্বর্যের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। ডার্সিকে যদি তুই ভালবাসতে পেরে থাকিস, তার চেয়ে সুখের আর কিছু নেই। ভাই, এলিজাবেথ, তুই জানিস, উইকহাম যা রোজগার করছে আজকাল, তাতে আমাদের মোটেই চলে না সংসার। স্বচ্ছলতার কথা নাই তুললাম। যদি তুই ডার্সিকে বলে তাকে কোর্টে একটা চাকরী জোগাড় করে দিস, ভালই হয়। এ-কথা যেন ডার্সি না জানতে পারে যে, আমি তোকে এ-কথা জানাতে বলেছি।'

এলিজাবেথ জানে, লিডিয়া ও উইকহাম দু'জনেই যেমন খরচ-পত্তরে বেসামাল, কোন দিনই তাদের সাশ্রয় হবে না সংসারে। তবু বোনের অনুরোধ সে ঠেকাতে পারে না। যত বারই লিডিয়ার চিঠি পায়, নিজের হাত-খরচ থেকে বাঁচিয়ে কিছু-কিছু পাঠায় তাকে। যত বার বাসা বদল করে লিডিয়া, হয়ত জেন নয় এলিজাবেথ তাদের বাকী-পড়া বিল পরিশোধ করে তাদের ঋণমুক্ত করে। কিন্তু এ অভাবের শেষ থাকে না। ভালবাসা ও স্নেহ শেষে ঝিমিয়ে আসতে থাকে।

এলিজাবেথ ডার্সিকে ব'লে উইকহামের কিছু উন্নতির সুপারিশ করে দেয়। কিন্তু লিডিয়াকে সে আর বেশী প্রশ্রয় দিতে চায় না। কেন না সে জানে, ছেলেবেলা থেকেই আদর পেয়ে-পেয়ে লিডিয়ার এমন স্বভাব হয়ে গেছে যে, প্রশ্রয় পাওয়া ও পরনির্ভরশীলতা হয়েছে তার স্বভাবের অঙ্গ। জেনের অবস্থাও তাই। বিংলের মত লোকও লিডিয়ার আচরণে দিনে-দিনে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠতে থাকে।

লেডী ক্যাথারিন শুধু এলিজাবেথের বিয়েতে অসুখী হয়েছিলেন মনে মনে। সে কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেও তাঁর বাধেনি। ডার্সির চিঠির উত্তরে তিনি এমন কঠিন কটু-কণ্ঠে সে পত্রের জবাব দিয়েছিলেন যে, ডার্সি তা কিছুতেই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেনি। বিশেষ করে এলিজাবেথ সম্বন্ধে তাঁর জঘন্ত মন্তব্যগুলিতে ডার্সির চিত্ত তাঁর প্রতি বিমুখ হয়েছিল। কিছু দিনের জন্ত ডার্সি ও লেডী ক্যাথারিনের মধ্যে আর যেন কোন সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু এলিজাবেথ সে সম্পর্ক ছিন্ন হতে দিল না। ডার্সিকে বারংবার মিনতি করে সে লেডী ক্যাথারিনের সঙ্গে এই সাময়িক বিক্ষোভ মিটিয়ে নিতে চেষ্টা করলে। ডার্সির প্রবল অনুরোধে এবং এলিজাবেথ কেমন গিন্নীপনা করছে তা দেখবার লোভে, অবশেষে এক দিন লেডী ক্যাথারিন মস্ত গরিমা নিয়ে এসে দাঁড়ালেন ডার্সিদের বাড়ী। তার পর থেকে এলিজাবেথ তাঁকে আপন করে পেল পরম হিতৈষিণী হিসাবে।

মেসো মশাইকে কোন দিন ভুলতে পারলে না এলিজাবেথ। ডার্সিও তাঁকে ও মাসীমাকে শ্রদ্ধা করত। মেসো মশাই যে এলিজাবেথকে ডার্বিশায়ারে নিয়ে এসে তাদের মিলনের পথ রচনা করে দিয়েছিলেন, সে-কথা সুখী দম্পতী কোন দিনই ত ভুলতে পারে না।

—অনুবাদক : শিশির সেনগুপ্ত ও অনন্তকুমার ভাদুড়ী।

সমাপ্ত

কবীন্দ্র-রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা পত্র

জন্ম-উৎসব (৫০) : স্থান—টাউন-হল, আহ্বায়ক—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, সভাপতি—৺সারদাচরণ মিত্র

অভিনন্দন

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় করকমলেষু—

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের নবাভ্যুদয়ে নূতন প্রভাতের অরুণ-কিরণ-পাতে যখন নবশতদল বিকশিত হইল, ভারতের সনাতনী বাগ্‌দেবতা তদুপরি চরণ অর্পণ করিয়া দিগন্তে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনি দিগ্‌বধূগণ প্রসন্ন হইলেন, মরুদগণ সুখে প্রবাহিত হইলেন, বিশ্বদেবগণ অন্তরিক্ষে প্রসাদপুষ্প বর্ষণ করিলেন, ঊর্দ্ধব্যোমে ইন্দ্রদেবের অভয়ধ্বনি ঘোষিত হইল, নবপ্রবুদ্ধ সপ্তকোটি নরনারীর হৃদয় মধ্যে ভাবধারা চঞ্চল হইল। বঙ্গের কবিগণ অপূর্ব্ব স্বরলহরীর যোজনা করিয়া দেবীর বন্দনাগানে প্রবৃত্ত হইলেন; মনীষিগণ স্বহস্তাবচিত কুসুমোপহার তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

কবিবর, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গ-জননীর অঙ্কশোভা বর্দ্ধন করিয়া বাঙ্গালার মাটি ও বাঙ্গালার জলের সহিত নূতন পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গের নবজীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার অর্দ্ধস্ফুট চেতনাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছিল; সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণ জীবন স্পন্দিত হইল; সেই স্পন্দন-প্রেরণায় তোমার কিশোর হস্ত নব নব কুসুমসম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইল। তোমার পূর্ব্বগামিগণের স্নিগ্ধনেত্র তোমাকে বর্দ্ধিত করিল; অনুগামিগণের মুগ্ধনেত্র তোমাকে পুরস্কৃত করিল; বাগ্‌দেবতার স্মেরাননের শুভ্র জ্যোতি তোমার ললাটদেশে প্রতিফলিত হইল। তদবধি বাণী-মন্দিরের মণিমণ্ডিত নানা প্রকোষ্ঠে তুমি বিচরণ করিয়াছ; রত্নবেদির পুরোভাগ হইতে নৈবেদ্য-কণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী ভ্রাতা-ভগিনীকে মুক্ত হস্তে বিতরণ করিয়াছ; তোমার ভ্রাতা-ভগিনী দেবপ্রসাদের আনন্দ সুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। বীণাপাণির অঙ্গুলিপ্রেরণে বিশ্বযন্ত্রের তন্ত্রীসমূহে অনুক্ষণ যে ঝঙ্কার উঠিতেছে, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে তোমার অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও তুমি তাহা কর্ণগত করিয়াছ; সুপর্ণরূপিণী গায়ত্রীকর্ত্তৃক গন্ধর্ব্বরক্ষিত অমৃতরসের দেবলোকে নয়নকালে মর্ত্ত্যোপরি যে ধারাবর্ষণ হইয়াছিল, পৃথিবীর ধূলিরাশি হইতে নিষ্কাশিত করিয়া নরলোকে সেই অমৃত-কণিকার বিতরণে তোমার সহকারিতা গ্রহণদ্বারা তাঁহারা তোমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। পঞ্চাশৎ সংবৎসর তোমাকে অঙ্কে রাখিয়া তোমার

জয়ন্তী উৎসবে কবিগুরু

জন্মভূমি তোমাকে স্নেহপীযুষে বর্দ্ধন করিয়াছেন; সেই ভুবন-মনোমোহিনীর উপাসনাপরায়ণ সন্তানগণের মুখস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশ্বপিতার নিকট তোমার শতায়ুঃ কামনা করিতেছেন।

কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে

বঙ্গাব্দ ১৩১৮ শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

১৪ মাঘ সম্পাদক

জন্ম-উৎসব (৭০): আহ্বায়ক—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ

সভাপতি—মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়

আশীর্বচন

শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ,

তুমি যখন নিতান্ত বালক, তখন হইতেই তোমার কবিতায় বাঙ্গালী মুগ্ধ। তোমার যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তোমার প্রতিভা বিকাশ হইতে লাগিল। সে প্রতিভা যেমন একদিকে দেশ হইতে দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, তেমনি সাহিত্যেরও সকল মূর্ত্তিই আয়ত্ত করিতে লাগিল। সে প্রতিভা প্রথম প্রথম কবিতায় আবদ্ধ ছিল, ক্রমে গল্প, নাটক, নবেল-রচনা, ছোট গল্প, বড় গল্প, সমালোচনা, রাজনীতি, সমাজনীতি, কর্ম্মনীতি, এইরূপে সমস্ত সাহিত্য-সংসারে ছড়াইয়া পড়িল। তুমি সাহিত্যের যে মূর্ত্তিতেই হাত দিয়াছ, তাহাকে উদ্ভাসিত ও সজীব করিয়া তুলিয়াছ। কারণ, তোমার প্রাণ আছে, সে প্রাণে যেমন মধুরতা আছে, তেমনি তেজ আছে—যেমন মোহিনী-শক্তি আছে, তেমনি উন্মাদিনী শক্তি আছে—যেমন সূক্ষ্ম-দৃষ্টি আছে—তেমনি দূরদৃষ্টি আছে। তোমার প্রতিভা যেমন গড়িতে পারে, তেমনই ভাঙ্গিতে পারে—যেমন মাতাইতে পারে—তেমনই ঠাণ্ডা করিতে পারে—যেমন কাঁদাইতে পারে—তেমনি হাসাইতে পারে। কিমধিকং, তোমার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী, সর্ব্বতঃপ্রসারী এবং সর্ব্বতোমুগ্ধকারী। সঙ্গীতের সহিত সাহিত্যের মিলনে তোমার হাতে উভয়ের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, তোমাকেও যশোমন্দিরের উচ্চ চূড়ায় তুলিয়া দিয়াছে।

ইংরাজ রাজত্ব হইয়া অবধি তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ ধনে, মানে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, সদ্গুণে সাহসে বাঙ্গালায় অতি উচ্চ আসন অধিকার করিয়া আসিতেছেন। তোমার প্রতিভায় সেই বংশের গৌরব উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর—উজ্জ্বলতম হইয়া উঠিয়াছে। তোমার গুণে বাঙ্গালা ত চিরদিনই মুগ্ধ—ভারত গৌরবান্বিত, এখন পূর্ব্ব ও পশ্চিম, নূতন ও পুরাতন সকল মহাদেশই তোমার প্রতিভায় উদ্ভাসিত। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সমস্ত পৃথিবী আরও উদ্ভাসিত কর। তোমার বংশই দীর্ঘজীবীর বংশ, তুমি শতায়ু হও, সহস্রায়ু হও। তোমার বয়স যতই পাকিতেছে, অভিজ্ঞতা বাড়িতেছে, ততই মানুষের ব্যথায় তোমার মন গলিতেছে, তোমার বীণার ঝঙ্কার গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে। মানবের মঙ্গলের জন্য তোমার আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ যতই বাড়িতেছে ততই তুমি ব্যাকুল হইয়া মঙ্গলময়ের মঙ্গলাসনের সমীপবর্ত্তী হইতেছ। তোমার মঙ্গলবাসনা চরিতার্থ হউক, তোমার নাম অক্ষয় হউক, তুমি অমর হইয়া ভারতের মঙ্গলকামনা করিতে থাক। তুমি দিগ্বিজয় করিয়া, বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়া, আবার সোনার বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়াছ; তুমি আমাদের ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা ও স্নেহের উপহার স্বরূপ এই পুষ্পমাল্য গ্রহণ কর। বিধাতার সৃষ্টিতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সুরভি সব এই পুষ্পেই আছে। আমাদেরও যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সুরভি, তাহা তোমাতেই আছে। আইস, উভয়ের মিলন করিয়া দিয়া আমরা কৃতার্থ হই। ইতি—

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি

রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদের অভিনন্দন

(শরৎচন্দ্র কর্ত্তৃক লিখিত)

কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

তোমার সপ্ততিতম বর্ষ শেষে একান্ত মনে প্রার্থনা করি জীবন-বিধাতা তোমাকে শতায়ুঃ দান করুন; আজিকার এই জয়ন্তী উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হউক।

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্ম্মাণকল্পে দ্রব্য-সম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী সকল সাহিত্যাচার্য্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্ব্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্তমনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারম্বার নমস্কার করি। ইতি—

কলিকাতা, রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদ পক্ষে

রবিবার, কৃষ্ণতৃতীয়া শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

১১ই পৌষ, ১৩৩৮ সাল, বঙ্গাব্দ সভাপতি।

কবির উত্তর

বিপুল জনসঙ্ঘের বাণীসঙ্গমে আজ আমি স্তব্ধ। এখানে নানা কণ্ঠের সম্ভাষণ, এ যে আমারই অভিবাদনের উদ্দেশে সম্মিলিত, একথা আমার মন সহজে ও সম্যকরূপে গ্রহণ করিতে অক্ষম। সূর্য্যের আলোক বাষ্পসিক্ত ধূলিবিকীর্ণ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়, কোথাও বা সে ছায়ায় ম্লান কোথাও বা সে অন্ধকারের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, কোথাও বা সে বাষ্পহীন আকাশে সমুজ্জ্বল, কোথাও বা পুষ্পকাননে বসন্তে তাহার অভ্যর্থনা, কোথাও বা শস্যক্ষেত্রে শরতে তাহার উৎসব। দৈবকৃপায় আমি কবিরূপে পরিচিত হইয়াছি, কিন্তু সেই পরিচয়ের স্বীকার দেশবাসীর হৃদয়ে অনবচ্ছিন্ন নহে, তাহা স্বভাবতই বাধাবিরোধ ও সংশয়ের দ্বারা কিছু-না-কিছু অবগুণ্ঠিত। তাহাকে বিক্ষিপ্ততা হইতে সংক্ষিপ্ত করিয়া

বরণ হইতে মুক্ত করিয়া এই জয়ন্তী অনুষ্ঠান নিবিড় সংহতভাবে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া দিল—সেই সঙ্গে উপলব্ধি করিলাম দেশের সুপ্রতিপ্রসন্ন হৃদয়কে তাহার আপন অপ্রচ্ছন্ন বিরাটরূপে। সেই ঐশ্বর্য্য রূপ দেখিলাম পরম বিস্ময়ে, আনন্দে, সম্ভ্রমের সঙ্গে, মস্তক নত করিয়া।

অন্তকার এই প্রকাশ কেবল যে আমারই কাছে অপরূপ অপূর্ব্ব তাহা নহে, দেশের নিজের কাছেও। উৎসবের আয়োজন করিতে গিয়াই দেশশ্রী সহসা আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহার গভীর অন্তরের মধ্যে কতটা আনন্দ, কতটা প্রীতি নানা ব্যবধানের অন্তরালে অজস্র সঞ্চিত হইতেছিল। আবাল্যকাল দেশমাতার প্রাঙ্গণে গাহিয়াই আমার কণ্ঠসাধনা। মাঝে মাঝে মনে হইত উদাসীন তিনি, তখনও বুঝি-বা তাঁহার অগোচরেও সুর পৌঁছিয়াছিল তাঁহার অন্তরে; যখন মনে হইয়াছে তিনি মুখ ফিরাইয়াছেন তখনও হয়ত তাঁহার শ্রবণদ্বার রুদ্ধ হয় নাই। ভাল ও মন্দ, পরিণত ও অপরিণত, আমার নানা প্রয়াস তিনি দিনে দিনে মনে মনে আপন স্মৃতিসূত্রে গাঁথিয়া লইতেছিলেন। অবশেষে সত্তর বৎসর বয়সে যখন আমার আয়ু উত্তীর্ণ হইল, তখন তাঁহার সেই মালায় শেষ গ্রন্থি দিবার সময় আসন্ন, তখনই আমার দীর্ঘজীবনের চেষ্টা তাঁহার দৃষ্টিসম্মুখে সমগ্রভাবে সম্পূর্ণপ্রায়। সেইজন্যই তাঁহার এই সভায় আজ সকলের আমন্ত্রণ, স্নিগ্ধস্বরে তাঁহার এই বাণী আজ উচ্চারিত—"আমি গ্রহণ করিলাম।" সংসার হইতে বিদায় লইবার দ্বারের কাছে সেই বাণী স্পষ্ট ধ্বনিত হইল আমার হৃদয়ে। ত্রুটি বিস্তর আছে, সাধনার কোন অপরাধ ঘটে নাই ইহা একেবারে অসম্ভব। সেইগুলি চুনিয়া চুনিয়া বিচার করিবার দিন আজ নহে। সে সমস্তকে অতিক্রম করিয়াও আমার কর্ম্মের যে সত্যরূপ, যে সম্পূর্ণতা প্রকাশমান তাহাকেই আমার দেশ তাঁহার আপন সামগ্রী বলিয়া চিহ্নিত করিয়া লইলেন। তাঁহার সেই অঙ্গীকারই এই উৎসবের মধ্য দিয়া আমাকে বরদান করিল। আমার জীবনের এই শেষ বর, এই শ্রেষ্ঠ বর।

অনুকূলতা এবং প্রতিকূলতা শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষের মতই, উভয়েরই যোগে রাত্রির পূর্ণ আত্মপ্রকাশ। আমার জীবন নিষ্ঠুর বিরোধের প্রভূত দান হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু তাহাতে আমার সমগ্র পরিচয়ের ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ তাহার যা শ্রেষ্ঠ যা সত্য তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। আমার জীবনেও যদি তাহা না ঘটিত, তবে অন্তকার এইদিন সার্থক হইত না। আমার আঘাতপ্রাপ্ত শরবিদ্ধ খ্যাতির মধ্য দিয়া এই উৎসব আপনাকে প্রমাণ করিয়াছে। তাই আমার শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই তিথিকে প্রণাম করা আমার পক্ষে আজ সহজ হইল। যে ক্ষয়ের দ্বারা ক্ষতি হয় না, তাহাই বিধাতার মহৎ দান—দুঃখের দিনেও যেন তাহাকে চিনিতে পারি, শ্রদ্ধার সহিত যেন তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধা না ঘটে।

আপনাদের প্রদত্ত শ্রদ্ধা ও গৌরব আমি সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিতেছি। আপনাদের এই আয়োজন সময়োচিত হইয়াছে। জীবনের গতি যখন প্রবল থাকে তখন সম্মান গ্রহণ ও বহন করিবার দিন নয়। জীবন যখন মৃত্যুর প্রান্তে আসিয়া পৌঁছায় তখনই তাহা অপেক্ষাকৃত সহজে লওয়া যায়। কর্ম্মের গতি বেগময় জীবনের মধ্যে সম্মান, অনেক বিক্ষোভ ও বাদবিসম্বাদের সৃষ্টি করে। আজিকার দিনে আপনাদের হাত হইতে তাই সবিনয়ে দেশের শেষ সম্মান আমি গ্রহণ করিতেছি ও দেশবাসীকে আমার সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে শেষ নমস্কার জানাইয়া যাইতেছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অভিনন্দন

। শ্রীঃ।

রবীন্দ্র-প্রশস্তি

হে কবীন্দ্র,

বঙ্গদেশের সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগীদিগের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ভবদীয় সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে, সাদরে ও সগৌরবে বরণ করিতেছে।

কিশোর বয়সেই আপনি বঙ্গবাণীর অর্চনায় আত্মনিয়োগ করেন। তদবধি ব্রতধারী তপস্বীর ন্যায়, সুচিরকাল নিয়ম ও নিষ্ঠার সহিত অক্লান্ত-অকুণ্ঠ ভাবে তাঁহার আরাধনা করিয়াছেন। হে তাপস, আপনার সাধনার সিদ্ধি হইয়াছে—দেবী আপনার শিরে অমর বর বর্ষণ করিয়াছেন—আপনার ত্রিতন্ত্রীতে তাঁহার অমৃত বীণার অভয় মূর্চ্ছনা সঞ্চারিত করিয়াছেন। হে বয়োভয়মণ্ডিত মনীষী, আপনি শতায়ু হইয়া, এই মোহনিদ্রায় নিষুপ্ত জাতির প্রাণে বীর্য্য ও বলের প্রেরণা দ্বারা, তাঁহার সুপ্ত চেতনাকে প্রবুদ্ধ করুন এবং প্রতিভার কল্পলোকে বিরাজ করিয়া মুক্তহস্তে প্রাচ্যকে ও প্রতীচ্যকে নব নব সুষমা ও সৌন্দর্য্য, কল্যাণ ও আনন্দ বিতরণ করুন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ঊনচত্বারিংশ বৎসর ব্যাপিয়া আপনার উপচীয়মান শুভ সাহিত্য-সম্পদে বিপুল গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে। আপনার বক্তৃতার মন্ত্রে ইহার আন্ত বার্ষিক উৎসব মন্দ্রিত হইয়াছিল। আপনার পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ণ হইলে পরিষৎ আপনাকে অভিনন্দিত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। আবার আপনার স্মরণীয় ষষ্টিতম জন্মদিনে সম্বর্দ্ধনার সম্ভার সজ্জিত করিয়া, পরিষৎ আপনাকে সম্ভ্রমের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিল। কবি-জীবনের সেই সেই সন্ধিক্ষণে উচ্চারিত পরিষদের উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা আপনার কীর্ত্তি-ভাতিতে সমুজ্জ্বল হইয়া আজ সফলতার তুঙ্গ ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে। সু-ধন্য আপনি, মানবের বিনশ্বর দুঃখ-সুখের মধ্যে সত্যের শাশ্বত স্বরূপকে দর্শন করিয়াছেন, এবং খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড, বিভক্তের মধ্যে সমগ্র, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি, বহুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইয়া, যুগ-যুগান্ত-লব্ধ ভারতের সনাতন আদর্শকে ভাগীরথী-ধারার ন্যায় মর্ত্ত্যে আবার অবতীর্ণ করাইয়াছেন। হে সত্যদ্রষ্টা, আপনাকে শত শত নমস্কার।

হে বাণীর বরপুত্র, হে বিশ্ববরেণ্য কবি, 'বর্ণ-গন্ধ-গীতময়' এই বিচিত্র বিশ্ব যাঁহার সুরভি-শ্বাস, কবি-কোবিদের 'ধী'র অভ্যন্তরে মুখরিত প্রেম-প্রজ্ঞা-প্রতাপ যাঁহার সৎ-চিৎ-আনন্দের প্রচ্ছন্ন আভাস, সেই শঙ্কর বিশ্বম্ভর বিশ্বকবি আপনার চির-স্বস্তি ও শান্তি বিধান করুন; যদ্ ভদ্রং তদ্ ব আ সুবতু; আর, স বো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

ওঁ স্বস্তি। ওঁ স্বস্তি। ওঁ স্বস্তি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়,
সভাপতি।

কবির উত্তর

সাহিত্য-পরিষদের প্রথম আরম্ভ কালেই এই প্রতিষ্ঠান আমার অন্তরের অভিনন্দন লাভ করিয়াছিল এ কথা তাঁহারা সকলেই জানেন যাঁহারা ইহার প্রবর্ত্তক। আমার অকৃত্রিম প্রিয় সুহৃদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অক্লান্ত অধ্যবসায়ে এই পরিষদকে স্বভবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে বিচিত্র আকারে পরিণতি দান করিয়াছেন। একদা আমার পঞ্চাশংবার্ষিকী জয়ন্তীসভায় তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী এবং সেই সভায় তাঁহারই স্নিগ্ধ হস্ত হইতে আমার স্বদেশদত্ত দক্ষিণা আমি লাভ করিয়াছিলাম। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বর্ত্তমান জয়ন্তী-উৎসবের সূচনা-সভায় সভানায়কের আসন হইতে প্রশংসাবাদের দ্বারা আমাকে তাঁহার শেষ আশীর্ব্বাদ দান করিয়া গিয়াছেন। আমি অনুভব করিতেছি এই মানপত্রে আমার পরলোকগত সেই সহৃদয় সুহৃদদের অলিখিত স্বাক্ষর রহিয়াছে—যাঁহাদের হস্ত অদ্য স্তব্ধ, যাঁহাদের বাণী নীরব।

অদ্য পরিষদের বর্ত্তমান সভাপতি সর্ব্বজনবরেণ্য জননায়ক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এই যে মানপত্র সমর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিলেন, এই পত্রে সাহিত্য-পরিষদ বঙ্গ-ভারতীর বরদান বহন করিয়া আমার জীবনের দিনান্ত-কালকে উজ্জ্বল করিলেন—এই কথা বিনয়নম্র আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়া লইলাম।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী (টাউন-হল)

কলিকাতা নাগরিকবর্গের অভিনন্দন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের করকমলে—

বিশ্ববরেণ্য মহাভাগ,

তোমার জীবনের সপ্ততিবর্ষ পরিসমাপ্তি উপলক্ষে কলিকাতা নগরীর পৌরবৃন্দের পক্ষ হইতে আমরা তোমাকে অভিবাদন করিতেছি।

এই মহানগরী তোমার জন্মস্থান এবং তোমার যে কবিপ্রতিভা সমগ্র সভ্য-জগতকে মুগ্ধ করিয়াছে এই স্থানেই তাহার প্রথম স্ফুরণ। এই মহানগরীই তোমার ঋষিতুল্য জনকের ধর্ম্মজীবনের সাধনক্ষেত্র, এই মহানগরীই তোমার নরেন্দ্রকল্প পিতামহের আজীবন কর্ম্মক্ষেত্র এবং এই মহানগরীর যে-বংশ ভাবে, ভাষায়, শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছে, তুমি সেই বংশেরই অত্যুজ্জ্বল রত্ন—তাই তুমি সমগ্র বিশ্বের হইলেও আমাদের একান্ত আপনার জন। বিশ্বের বিদ্বজ্জন-সমাজের সমাদর লাভ করিয়া তুমি কলিকাতাবাসীরই মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ। তোমার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বঙ্গভাষাকে অপূর্ব্ব বৈভবে মণ্ডিত করিয়া জগতের সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তোমার অভিনব কল্পনাপ্রসূত শিক্ষার আদর্শ বাঙ্গলার এক নিভৃত পল্লীকে বিশ্বমানবের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে, এবং তোমার লেখনীনিঃসৃত অমৃতধারা বাঙ্গালী জাতির প্রাণে লুপ্তপ্রায় দেশাত্মবোধ সঞ্জীবিত করিয়াছে। হে মাতৃপূজার প্রধান পুরোহিত, হে বঙ্গ-ভারতীর দিগ্বিজয়ী সন্তান, হে জাতীয় জীবনের জ্ঞানগুরু, আমরা তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। বন্দে মাতরম্।

তোমার গুণগর্ব্বিত

কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্যবৃন্দের পক্ষে

শ্রীবিধানচন্দ্র রায়, মেয়র।

কবির উত্তর

একদা কবির অভিনন্দন রাজার কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহারা আপন রাজমহিমা উজ্জ্বল করিবার জন্যই কবিকে সমাদর করিতেন—জানিতেন সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী নয়, কবিকীর্ত্তি তাহাকে অতিক্রম করিয়া ভাবীকালে প্রসারিত।

আজ ভারতের রাজসভায় দেশের গুণিজন অখ্যাত—রাজার ভাষায় কবির ভাষায় গৌরবের মিল ঘটে নাই। আজ পুরসভা স্বদেশের নামে কবিসম্বর্দ্ধনার ভার লইয়াছেন। এই সম্মান কেবল বাহিরে আমাকে অলঙ্কৃত করিল না, অন্তরে আমার হৃদয়কে আনন্দে অভিষিক্ত করিল।

এই পুরসভা আমার জন্মনগরীকে আরামে, আরোগ্যে, আত্ম-সম্মানে চরিতার্থ করুক; ইহার প্রবর্ত্তনায় চিত্রে, স্থাপত্যে, গীত-কলায়, শিল্পে এখানকার লোকালয় নন্দিত হউক; সর্ব্বপ্রকার মলিনতার সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষার কলঙ্ক এই নগরী ক্ষালন করিয়া দিক,—পুরবাসীদের দেহে শক্তি আসুক, গৃহে অন্ন, মনে উত্তম, পৌরকল্যাণসাধনে আনন্দিত উৎসাহ। ভ্রাতৃবিরোধের বিষাক্ত আত্মহিংসার পাপ ইহাকে কলুষিত না করুক, শুভবুদ্ধি দ্বারা এখান-কার সকল জাতি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া এই নগরীর চরিত্রকে অমলিন ও শান্তিকে অবিচলিত করিয়া রাখুক—এই আমি কামনা করি।

বিদ্যাসাগর

করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যা ও করুণাপূর্ণ যাহার আধার
বিদ্যার সাগর যেবা, মহিমা অপার
মাতৃজাতির দুঃখে কাঁদি নিরন্তর
সংস্কারকরূপে রুদ্র যে ভাস্বর

বাঙলার বুকে জাগে মূর্ত্ত প্রতিভায়
ঈশ্বরচন্দ্র নাম নিজ মহিমায়
স্বজাতির সমাজের উন্নতির তরে,
নিবেদিনু ভক্তি আজ সে চরণ 'পরে।

তখন আমি জেলে

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

শঙ্করের মঠের ধীরেন সেন সবারই দাদা—ধীরেনদা। কনফারমড্ ব্যাচেলরই শুধু নন, স্বপাক আহার করেন এবং তাও বিশুদ্ধ নিরামিষ। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার নিশিপালন ও একাদশীর উপবাস নিয়মিত ভাবে করেন তিনি। ষ্টোভে দু'বেলা নিজের ঘরেই রান্না হয়। নিরামিষাশী বলেই তাঁর ঘি ও মাখন একটু বেশী প্রয়োজন হয়, আর সেরখানেক দুধের পায়েস তৈরী করতে হয় গোটা কতক কিসমিস ও পেস্তা দিয়ে আর বেশ খানিকটে এলাচ-গুঁড়ো ছড়িয়ে। নিরামিষাশী বলেই তাঁর জন্য আধ সের চিনি-পাতা দৈ-এর ব্যবস্থা আছে আর গোটা কয়েক মিষ্টি। ক্ষয়শীল শরীর এই সামান্যতেই কি টেঁকে? তাই রাত্রে খাবার পর তাঁর জন্য কিছু ফলমূল আসে—দু'টো কমলা, একটা আপেল, একটা ন্যাসপাতি, একপো' আঙুর, কিছু মনাক্কা ও একটি নারায়ণগঞ্জের লেমনেড নয়, সোডা।

জীবনধারণের জন্য নেহাৎ যা না-হলে চলে না, মাত্র তাই তিনি চেয়ে থাকেন, উদাস ভাবে এমনি মন্তব্য করে আকাশের পানে চেয়ে থাকেন তিনি। প্রতি মাসে কিচেন-ম্যানেজার বদলি হয় বটে, কিন্তু ধীরেনদা'র এই সামান্য খাদ্য-তালিকার পরিবর্তন নেই!

সমগ্র ভাবে দল-উপদল-নির্বিশেষে রাজবন্দীরা একটা মস্ত উপকার পেয়ে থাকেন তাঁর কাছ থেকে, আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে সে কথা স্মরণ করি। বন্দীদের পরীক্ষা দেবার হুজুগ তিনিই তোলেন। বাইরে রাজনৈতিক কাজের চাপে যাঁরা পরীক্ষার জন্য মাথা ঘামাতে পারেননি, এখানে ধীরেনদা মাথা ধার দেবার জন্য এগিয়ে এলেন! বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখালেখি করে, বার বার কমাণ্ডাণ্ট টবিনের অফিসে হানা দিয়ে তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন যে, শিবিরের মধ্যেই রাজবন্দীদের প্রতিদিন ক্লাস হবে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আর বাইরের কলেজের বিভিন্ন অধ্যাপক এসে বিভিন্ন বিষয়ে পড়িয়ে যাবেন। ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী থেকে বই আসবার ব্যবস্থাও তাঁরই ব্যবস্থাপনায় সম্ভব হলো।

পড়া ও পরীক্ষার জটিল বিষয়টির পরিচালনার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন ধীরেনদা। তিনি নিজে সেকালের গ্র্যাজুয়েট এবং প্রত্যেক চিঠিতেই নীচে নামের পর ছোট্ট করে রেজিষ্টার্ড নম্বরটি উল্লেখ করতে কিন্তু ভুলতেন না।

রাজনীতির কথা উল্লেখ করলেই ক্ষেপে যেতেন তিনি। শুদ্ধ বরিশালের ভাষায় যা বলতেন, তা তাঁর দেশের সৌজন্য ও নম্রতার নমুনা হলেও আমাদের মনে হতো ধীরেনদা বুঝি গাল দিচ্ছেন!

বন্দিজীবনটা যাতে আহার ও নিদ্রায় অপব্যয়িত না হয়, সে জন্য কম-বেশী সবারই চেষ্টা ছিল জ্ঞান অর্জ্জনের, শরীর গঠনের এবং নানাবিধ প্রক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য পালনের।

পরিষ্কার বুঝতে পারি, সে-যুগের দেশপ্রেমের সঙ্গে আজকের দেশপ্রেমের তফাৎ কোথায় ও কতখানি। সে-যুগে দেশপ্রেমকে বলা হতো স্বদেশী আর এ-যুগে একে বলা হয় পলিটিক্স্। পলিটিক্স্-এর বাংলা পরিভাষা নেই, অন্ততঃ ব্যবহৃত হয় না। স্বদেশী আর পলিটিক্স্ শুধু বিভিন্ন নয়, প্রায় পরস্পরবিরোধী। স্বদেশীর পাঠ গ্রহণ করতে হতো শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে, বিবেকানন্দ-বাণীতে, ঋষি বঙ্কিমের আনন্দমঠে এবং অশ্বিনী দত্তের ভক্তিযোগে কিংবা শ্রীঅরবিন্দের ধর্ম্ম ও জাতীয়তায়। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করে উঠে করতে হতো প্রার্থনা, ধ্যান, প্রাণায়াম ও ব্যায়াম। ব্রহ্মচারীর মতো শয়ন করতে হতো ভূমিশয্যায়, গ্রহণ করতে হতো নিছক সাত্ত্বিক আহার, সর্ব্বদা কৌপীন এঁটে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতে হতো। নারী জাতি স্বদেশীদের কাছে ছিল ভগিনী নয়, মাতা। দেশমাতারই প্রতীক বলে মনে করতো তারা নারীকে। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ নির্ম্মল ব্যক্তিগত চরিত্র ব্যতীত দেশসেবার অধিকারই নেই বলে মনে করতো সে-যুগের স্বদেশীরা। গীতা স্পর্শ করে তারা বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করতো।

আর এ-যুগের পলিটিক্সের প্রশ্ন: চরিত্র কি, নির্ম্মলতার সংজ্ঞা কি, চরিত্রের সঙ্গে দেশসেবার সম্পর্ক কোথায়, দেশপ্রেমের মধ্যে নিছক জড়বাদ ব্যতীত অধ্যাত্মবাদের স্থান আছে কি? পলিটিক্স্ স্বদেশীদের ভাবাবেগের অনুশাসনকে উপেক্ষা করে এগিয়ে এসেছে বস্তুতন্ত্রবাদের উষর ময়দানে। গীতা ও কৌপীনকে এরা পেছনে ফেলে এসেছে। সমবেত প্রয়াসে পলিটিক্স-এ ষ্ট্রাটেজিকেই বড় করে দেখা হয়, স্বতন্ত্র ভাবে প্রয়াসীদেরকে নয়। তাই ব্যক্তির দুর্ব্বলতাকে পলিটিক্স্ থোড়াই কেয়ার করে চলে। আর মেহনতি জনতার দুর্ব্বলতাই-বা বলবো কাকে? সারা দিন জীবন্ত যন্ত্রের মতো হাড়ভাঙ্গা খাটুনি যেমন সত্য, সন্ধ্যায় তাড়ির দোকান আর একখানি নথ-নাড়ানো গজলও তেমনি অনিবার্য্য সত্য।

পলিটিক্স-এর মধ্যে খানিকটে গন্ধ পাই কূটনীতি ও চালাকীর আর স্বদেশী একেবারে দিনের আলোর মত স্পষ্ট। কোষবদ্ধ অসির মতো পলিটিক্স্ সুযোগের অপেক্ষা রাখে আর নাঙ্গা খড়্গের মতো স্বদেশী সর্ব্বদাই উদ্ধত, উন্মুখ। স্বদেশীর তাসগুলো সবই বিছানো টেবিলের 'পরে আর পলিটিক্স্ তাস চালানের কসরৎ করে। পলিটিক্স্ যাঁরা করেন, সবার ওপরে স্থান দেন তাঁরা আদর্শকে আর স্বদেশীরা সেই সঙ্গে যাচাই করে নিতে চায় আদর্শবাদীকেও। প্রশংসাপত্র দেখে নয়, বক্তৃতা শুনে নয়, বাজিয়ে, ওজন করে, অনুভব করে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এ্যানালাইস্ করে। ছলে, বলে, কৌশলে অভিষ্ট অর্জ্জনই পলিটিক্সের কাম্য, স্বদেশী কিন্তু উদ্দেশ্যের সাধুতা ও প্রচেষ্টার ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে একটু বেশী রকম সতর্ক!

স্বদেশীতে স্থান নেই কোনো রেণুরই, না শহরের, না গ্রামের, আর পলিটিক্সে এঁরা শুধু সাথিনী নন, সখীও!

উৎকর্ষ বিচার নয়, আজকের পলিটিক্স্ গতকালের স্বদেশীরই সার্থক পরিণতি। অঙ্কুরের সঙ্গে কাণ্ডের আর মিল নেই। না থাকতে পারে। কিন্তু মাটির নীচেকার সৌকুমার্য্যহীন শিকড়কে অস্বীকার করে পারে কি নব নব কিশলয় দিকে দিকে তার শ্যামলিমা বিকীরণ করতে?...

পরীক্ষা পাশের পড়া ছাড়াও ক্লাশ হতো নানা রকমের—কোনোটা ইতিহাসের, কোনোটা অর্থনীতির, আবার কোনোটা আন্তর্জাতিক রাজনীতির। পণ্ডিত রাজবন্দীরা এই সব ক্লাশ নিতেন এবং কখনো দল-নির্ব্বিশেষে, কখনো-বা দলবিশেষে

শিক্ষানবিশ বন্দীরা তাতে যোগদান করতেন। যাঁরা আর্ট স্কুলে পড়তেন, তাঁরা প্রচুর ছবি আঁকতেন এবং আঁকা শেখাতেন।

সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক নানা নামীয় ও নানা জাতীয় হাতে-লেখা পত্রিকা বেরুতো। প্রত্যেকখানাই ছিল কোনো বিশেষ দলের মুখপত্র। পাঠক রাজবন্দীরাই। প্রত্যেক দলই তার অন্তরের কথা যুক্তিসহ করে প্রচার করতো বন্দীদের মধ্যে হয়তো সংখ্যাবৃদ্ধির আশায়। কিংবা নয়। পত্রিকাগুলিতে যেমন অনেক ছবি প্রকাশিত হতো, তেমনি হতো অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধ। কোনো কোনো পত্রিকা আবার যে-দলের মুখপত্র, সেই দলের বিশেষ সভায় আদ্যপান্ত পাঠ করা হতো।

কিন্তু দলনির্বিশেষে একখানাও পত্রিকা নেই। রাজবন্দীরা এর অভাব অনুভব করতে লাগলেন। কোনো দলের নিন্দা নয়, কুৎসা নয়, কারুর প্রতি কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির লড়াই নয়, অন্ধের মতো কোনো বিশেষ একটা মতকে অপরের স্কন্ধে চাপিয়ে দেবার অভিসন্ধি নয়, নিরপেক্ষ, বলিষ্ঠ ও নির্ভীক একখানি পত্রিকা বন্দীশিবিরে থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে সভা হলো এবং পত্রিকার নামকরণ হলো 'শৃঙ্খল।' পত্রিকাখানি একটি সর্বদলীয় সাহিত্য সভার পরিচালনাধীনে জনৈক সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর এই সম্পাদক পরিবর্তন করা হবে।

মনে আছে, প্রথম সম্পাদক হলেন বরিশালের বিনয় সেন আর পত্রিকাখানি লেখার ভার পড়লো আমার ওপর। আমার অপরাধ, আমার লেখা নাকি মেয়েলী ছাঁদের মত স্পষ্ট ও একই ছাঁচের। সাহিত্য সভার সদস্যদের সবার নাম আজ আর মনে পড়ে না, তবে এঁদের মধ্যে ছিলেন দেবজ্যোতি বর্মণ, নিবারণ দত্ত, বিনয় সেন, সুধীন সরকার, রাখাল ঘোষ, করালীকান্ত বিশ্বাস, অনন্ত দে ও আমি।

সমস্ত রাজবন্দীর এক মহতী সভায় সমগ্র পত্রিকাখানি নয়, এ থেকে নির্বাচিত কয়েকটি প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা পাঠ করা হতো এবং সর্বশেষে সম্পাদক সম্পাদকীয় পাঠ করতেন। সভান্তে কিচেন-ম্যানেজারগণ অবশ্যই জলযোগের ব্যবস্থা রাখতেন।

একদা ঢাকা জেলে রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতার প্যারোডি শুনিয়েই "ভক্ষণ সমিতির" ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদ অধিকার করে বসেছিলাম তরণী বাবুকে বঞ্চিত করে। 'শৃঙ্খলে'র প্রথম সংখ্যাতেই বেরুলো আর একটি প্যারোডি—"দাদার দাদা।" প্রথম সভাতে সুর করে সেই কবিতাটিই আবৃত্তি করলাম যেই মুহূর্তে, সেই মুহূর্তে সারা শিবিরে রটে গেল যে, জি-ও-সি শুধু কাঠখোট্টা মিলিটারী ম্যান নয়, কাব্যও জাগে তার মনে। কবিতাটি পাঠকদের উপহার দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

একটু উপক্রমণিকা প্রয়োজন। সে-যুগে দল গড়ার হুজুগ খুব বেশী ছিল। একটি দল তাই অসংখ্য উপদল ও গ্রুপে বিভক্ত ছিল। বৃহত্তর প্রয়োজনে সবাই হাত ও কাঁধ মেলাতে পরাঙ্মুখ না-হলেও ইংরেজ আমলের প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের মতো এদের স্বাতন্ত্র্যও যে খানিকটে ছিল, এবং না থাকলেও তারা যে নিয়মোত্তর অধিকার হিসেবে তা ভোগ করতো, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ফলে, বন্দীশিবিরে গ্রুপ-লীডার অর্থাৎ দাদা ছিল সংখ্যাতীত। এই সংখ্যাতীত দাদাদের ব্যঙ্গ করেই লেখা হয়েছিল আমার কবিতা কবি রবীন্দ্রনাথের "কৃষ্ণকলি" ভিত্তি করে। এখন আর পারি না বটে, কিন্তু সে-যুগে এমনি প্যারোডি বা গান লিখতে পারতাম খুব সহজে এবং বন্ধুরা তার প্রশংসাও করতেন।

সভাপতি হিমাংশু আইন ময়মনসিংহের উকিল। আইনজ্ঞই শুধু নন, পার্লামেন্টি নিয়ম-কানুন একেবারে কণ্ঠস্থ তাঁর। রুলিংগুলো যেমন নিয়মানুগ, তেমনি ব্যক্তিত্বের সঙ্গেই তা প্রয়োগ করেন তিনি। দেবজ্যোতি বর্মণের একটি সারগর্ভ অর্থনৈতিক প্রবন্ধ পাঠের পর হিমাংশু আইন ঘোষণা করলেন: অর্থনীতির জটিল প্যাঁচে নিশ্চয়ই আপনারা গম্ভীর হয়ে উঠেছেন, এবারে এক কাপ গরম কফির মতো একটি কবিতা আপনাদের উপহার দিচ্ছি—"দাদার দাদা।" পাঠ করবেন রচয়িতা স্বয়ং এবং দেখে বিস্মিত হবেন না যে, তিনি আমাদের জি-ও-সি। প্রবল হাততালির মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি সুরু করলাম:

দাদার দাদা তারেই আমি বলি,
ছ্যাবলা তারে বলে দুষ্ট লোক,
রাত্রিবেলা দেখেছিলাম মাঠে
কালো ফ্রেমে চশমা-আঁটা চোখ।
জামা গায়ে ছিল না তার মোটে,
শুধু চাদর পিঠের 'পরে লোটে,
ক্যাবলা? তা সে যতই ক্যাবলা হোক,
দেখেছি তার চশমা-আঁটা চোখ।

রাত্রি বেড়ে দশটা হলো যেই,
উঠলো বেজে টবিন চাচার বাঁশী,
দাদার দাদা ভাইকে ছেড়ে দিয়ে
ব্যারাক ঘরে ত্রস্তে উঠে আসি।
ঘড়ির পানে বারেক হানি ভুরু,
শয্যা নিয়ে পঠন করে সুরু।
মূর্খ? তা সে যতই মূর্খ হোক্,
দেখেছি তার দাদা হবার ঝোঁক।

পূবের আলো এলো জানলা-পথে,
সিপাই এসে দিল খুলে তালা,
ভাইকে এসে তুললো দাদা ডেকে
এবার সুরু বক্‌বকানির পালা।
আমার পানে দেখলে নাকো চেয়ে,
ভাবের ঘোরে নামলো মাঠে যেয়ে।
গবুচন্দর? যতই গবু হোক্,
তবুও সে আস্ত ছিনে জোঁক!

এমনি করে আসছে কত দাদা,
ভর্তি হয়ে উঠলো বন্দীশালা,
তাই বলে আর থাকবে না যে কেউ
দাদার গলায় পরিয়ে দিতে মালা।
এ সব ভেবে হঠাৎ রজনীতে
দুখের কালো ঘনিয়ে আসে চিতে।
কালতু? তা সে যতই কালতু হোক্,
দাদার দাদা তাকেই বলে লোক।

মনে পড়ে, সভান্তে আড়ালে ডেকে নিয়ে সত্য বাবু আমায় কয়েকটা অতিরিক্ত কাঁচাগোল্লা খাইয়েছিলেন প্রশংসাপত্রের পরিবর্তে।

১৩

ফুটবল খুব তাড়াতাড়িই নামিয়ে দিলাম আমরা। সম্পাদক নির্বাচিত হলেন কমরেড কৃষ্ণা রায়। কমরেড তাঁকে কেন বলা হতো জানি নে। কম্যুনিজম্-এর যে ক্ষীণ ধারা তখন সবে এসেছে, কৃষ্ণা বাবু তো তাতে পা ডোবাননি। তবে?

একটা কথা মনে পড়ে, কম্যুনিজমকে অত্যন্ত ধারালো ব্যঙ্গোক্তির সম্মুখীন হতে হতো তখন। এক জনের তেল, সাবান, টুথপেষ্ট প্রভৃতি অপরে নিয়ে গেলেই তাকে ব্যঙ্গ করে বলা হতো: এই রে, কম্যুনিজম চালাচ্ছে! মন্তব্য করা হতো একেবারে প্রকাশ্যেই: কমিউনিষ্টদের কী সুবিধে দেখেছিস্? পরের ওপর দিয়ে বেশ দিব্যি তেলটা সাবানটা চলছে আর এদিকে নিজের এ্যালাউন্সের টাকা দিয়ে কেনা হচ্ছে, Capital, Memories of Lenin আর Ten days that shook the world—বেশ মজা নয়?

খুব সমঝে চলতেন কমিউনিষ্টরা সে-যুগে। আকাশচুম্বী সমুদ্রে বারিবিন্দুসম তিন শতাধিক রাজবন্দীর মধ্যে মাত্র দশ-বারো জন। যেমন মাথা নীচু করে এসে তাঁরা খাবার-ঘরে প্রবেশ করতেন ব্রীড়াবনতা গ্রাম্যবধূর মতো, তেমনি নিঃশব্দে আহারান্তে বেরিয়ে যেতেন। বিতর্কমূলক সর্ব্বপ্রকার আলোচনাকেই সযত্নে চলতেন পাশ কাটিয়ে। কিন্তু এই দশ-বারো জনের জন্যই ছিল পৃথক্ একটি চৌকা। এঁরাই স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির উন্মাদনায় এমনি পৃথক্ হাঁড়ীর আশ্রয় নিয়েছেন, না সাধারণ বন্দীরাই এঁদের অপাংক্তেয় করে দিয়েছিল, তা জানা যায়নি। বক্রদৃষ্টিক্ষেপে আমিও যে তাঁদের বিঁধতাম না তা নয়, কিন্তু আজ স্বীকার করতে সংকোচ নেই যে, উত্তরকালে তাঁদের মধ্য থেকেই অনন্যসাধারণ একাধিক কর্ম্মীর সৃষ্টি হতে দেখেছি।···

খেলার মাঠটি দৈর্ঘ্যে ছোট। এক দিকের গোটা কয়েক আম গাছ কেটে ফেলার প্রস্তাব নিয়ে আমাদের প্রতিনিধিরা এক দিন প্রভাত নাগের নেতৃত্বে কমাণ্ডাণ্ট টবিনের অফিসে গিয়ে হাজির হলেন।

মিলিটারী ম্যান টবিন। একেবারে সদ্য ইয়োরোপ থেকে আমদানী। তাকে বোঝানো হয়েছে যে, আমরা সব War prisoner—যুদ্ধবন্দী। কোথায় ও কবে এই যুদ্ধ হলো, এই প্রশ্ন টবিনের মনে জাগতে পারে বলে তাকে এ-ও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আমরা গোপনে যুদ্ধের আয়োজন করছিলাম জার্ম্মানীর সহযোগিতায়। ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গেছে ইংরেজ গুপ্তচরদের কর্ম্ম-তৎপরতায়।

সুতরাং প্রতিনিধি দলকে অপেক্ষা করতে হলো কেবিনের বাইরে। সাহেব কার সঙ্গে কথা কইছেন।

গোপাল গুপ্ত একটু উগ্র রকমের লোক। বললেন: চলুন না প্রভাত বাবু, দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ি। ব্যাটা আমার লাট সাহেবের বাচ্চা আর কি!

অনন্ত দে ধীর প্রকৃতির মানুষ। বাধা দিলেন: একটুখানি দেখাই যাক না গোপাল বাবু! বেশী দেরী করলে তখন সে পথ আমাদের আটকায় কে?

প্রভাত নাগ সমর্থন করলেন: আর এসেছি যখন স্বার্থোদ্ধারে। সুতরাং কৌশলে—

সুধীন সরকার বললেন: ও-সব কৌশল টৌশল টবিন চাচার কাছে অচল প্রভাত বাবু! দেখবেন ওর গোঁ!

মিনিট দশেক পর টবিনের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সহকারী কমাণ্ডাণ্ট গিরিজা দত্ত এক বোঝা ফাইল নিয়ে। অপেক্ষমান প্রতিনিধিদের দেখে একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়লেন: আরে, আপনারা? অনেকক্ষণ এসেছেন বুঝি? সাহেবের কাছে যাবেন? একটু অপেক্ষা করুন প্লিজ, এক সেকেণ্ড! এই ফাইলগুলো রেখে আসছি।

পঁয়তাল্লিশ বছরের গিরিজা পঁচিশ বছরের যুবকের মতো সড়াক করে নিজের দপ্তরে প্রবেশ করে হাত খালি করেই বেরিয়ে এলেন আবার: ছি; ছি, ছি, আপনারা এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন এখানে? কতক্ষণ এসেছেন প্রভাত বাবু?

জবাব দিলেন গোপাল গুপ্ত: তা পনেরো মিনিট তো হবেই। সাহেব হয়তো কাজে ব্যস্ত, একটু অপেক্ষা করতে হবে! কিন্তু বসবার জায়গা—

বিলক্ষণ, সে কথা আর বলতে!—গিরিজা সীমাহীন বিস্ময়ে চশমা-ঢাকা চোখ দু'টি একেবারে কপালে তুললেন: পনেরো মিনিট এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন? কেন, বেয়ারাগুলো কি সব মরেছে নাকি?—এই দল বাহাদুর, ইধার আও!

দল বাহাদুর এসে বুটের আওয়াজ তুললো। গিরিজা কণ্ঠস্বরে প্রভুর গাম্ভীর্য্য এনে জিজ্ঞেস করলেন: ইন্ বাবুলোগ কব্ আয়া থা?

সায়েব, আধা ঘণ্টা হোগা!—দল বাহাদুর নিবেদন করলো।

এত্না টাইম তক্ বৈঠনে কেঁও নেই দিয়া তুম?

দল বাহাদুর মিনমিন করতে লাগলো। ভাবখানা এই, বলেছিলাম বসতে, কিন্তু এঁরা—

ঝুটা হায়!—গর্জ্জে উঠলেন গিরিজা: তুম বেয়াকুপ হায়, উল্লু হায়। ফের এইসা হোনেসে তুমারা নকরি হাম খতম কর দে গা!—যাও।

চলে গেল দল বাহাদুর আবার বুটের আওয়াজ তুলে। মহা দুঃখে গিরিজা একেবারে হতাশ হয়ে পড়লেন: আর বলেন কেন প্রভাত বাবু, এই সব জংলী নিয়ে কাজ করা যে কী হ্যাঙ্গাম, তা আর বলে শেষ করা যায় না। কোন্ জঙ্গল থেকে যে—

বাধা দিয়ে সুধীন সরকার বললেন: যাক্ সে কথা। এখন সাহেবের কাছে যাওয়া যাবে কিনা, তাই বলুন।

বিলক্ষণ, সে কথা আর বলতে।—গিরিজা প্রতিনিধি দলকে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে টবিনের কেবিনে প্রবেশ করলেন।

এই গিরিজা দত্ত। ঝানু লোক। যেমন প্রখর বুদ্ধি, তেমনি কৌশলে কাজ হাঁসিল করে নেবার ফন্দী এঁর কণ্ঠস্থ। আশ্চর্য্য, অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতেও এঁর মাথা একেবারে ঠাণ্ডা থাকে। টবিনের সামরিক গোঁয়ারতুমিকে যুক্তি ও কৌশলের প্রলেপ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখাই এঁর প্রধান কাজ। কূটবুদ্ধিতে ইংরেজের দোসর নেই। তাই সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে

সাহেবদের নিয়োগ করে তাদের সহকারী বা মন্ত্রণাদাতা হিসেবে বসিয়ে রাখতো বাঙালীদের। বাঙালী রাজবন্দীদের ভাবগতি এঁরাই তো নির্ভুল ভাবে বিচার করতে পারবেন। পান থেকে চুণ খসলেই রাইফেল চালাবার বিদ্যায় টবিন পটু, কিন্তু পড়ে-যাওয়া চুণকে তুলে লাগিয়ে আবার এক খিলি মিঠে পান তৈরীর কূট চালে গিরিজা দত্তের তুলনা নেই।

টবিন মনে করতো রাজবন্দীদের তরফ থেকে কোনো আবেদন এলেই তা অগ্রাহ্য করতে হবে, নইলে সরকারী প্রেষ্টিজ ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। তাই, আমাদের আম গাছ কাটবার প্রস্তাব প্রথমটা সে কানেই তুললো না, তার পর sweet mango fruit বলে নানা ওজর-আপত্তি তুললো, তার পর অকস্মাৎ গিরিজার চোখে চোখ পড়তেই সুর নরম করে বললো: আচ্ছা দেখা যাবে।

পরদিন সত্যিই দেখা গেল। গাছগুলো কেটে ফেলার ফলে আমাদের মাঠ প্রায় বিশ হাত বেড়ে গেল দৈর্ঘ্যে।

টিম তৈরী হলো অনেকগুলো। ব্যারাক ও দল-নির্বিশেষে যে যাকে পারে টেনে নিয়ে টিম গঠন করে ফেললো। কয়েকটি টিমের নাম মনে আছে, যথা, Y. L. R. (Young Light Runners), N. Y. R. (Nine Young Runners), Red-white, Retired Nine, Winners Nine এবং Biswagutani (বিশ্বগুঁতানি)। এর মধ্যে বিশ্বগুঁতানি টিমটির একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। এর খেলোয়াড় হবার যোগ্যতা সকলের ভাগ্যে জুটতো না। খেলা জানা-না-জানা ছিল গৌণ ব্যাপার, এ টিমে যোগদানের প্রধানতম যোগ্যতা অর্জন করতো তারাই, যাদের বুকের ছাতি অন্ততঃ চল্লিশ ইঞ্চি। বলকে লাথি মারলেই দূরে সরে যায় এবং প্রতিপক্ষকে নেহাৎ কুস্তি বা জুজুৎসুর প্যাঁচ না মেরে পা ছুঁড়ে রুখতে হবে—এই দু'টি সত্য অন্তরে গেঁথে রাখলেই বিশ্বগুঁতানির সভ্য হওয়া চলতো। এঁদের দলপতি ছিলেন বরিশালের অজিত দাস আর সভ্য ছিলেন টিটু নাহা, অনিল চক্রবর্ত্তী, দিলীপ দাস, সুধীর গুহ, রমেশ চক্রবর্ত্তী, অনিল চক্রবর্ত্তী ও আরো কয়েক জন।

দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে এপ্রিল মাসেই ফুটবল লীগ সুরু হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাসিক পত্রিকা 'শৃঙ্খলে'র বিশেষ দৈনিক সংখ্যা প্রকাশিত হতে লাগলো এই খেলাকে উপলক্ষ করে। যুগ্ম সম্পাদক ছিলাম বরিশালের বিনয় সেন ও আমি। প্রতিদিন অপরাহ্ণে খেলার মাঠের পাশের দেয়ালে সেঁটে দেয়া হতো দৈনিক 'শৃঙ্খল'। ভিড় পড়ে যেত পড়বার জন্য। খেলার ও খেলোয়াড়ের তীক্ষ্ণ সমালোচনা ছাড়াও থাকতো চমৎকার কার্টুন-ছবি খেলোয়াড়, রেফারী বা দর্শকদের নিয়ে। বীরেন ঘোষ এক দিন হেড করতে লাফিয়ে উঠে বল্ নাগাল না পেয়ে নির্ব্বিবাদে দু'হাত তুলে ভলি মেরে বসলো।—ব্যস্, আর যায় কোথা! পরদিনের 'শৃঙ্খলে' দেখা গেল তার ছবি। নীচে লেখা ষ্টাফ ক্যামেরাম্যান কর্ত্তৃক গৃহীত আর ক্যাপশন: Oh! my old days of Volley!

মাঠের এক দিকে ছিল ছাঁটাই-করা মেহেদীর বেড়া; লাইন থেকে প্রায় দশ হাত দূরে। তাহলে কি হবে, হরিদাস সেন এক দিন অমিয় মজুমদারকে চার্জ করে একেবারে সেই বেড়ার ওপরে নিয়ে গিয়ে পড়লো। অমনি পরদিন বেরুলো ষ্টাফ ক্যামেরাম্যানের ছবি আর ক্যাপশন: বেড়া সরাইয়া দিবার জন্ত টবিনের নিকট আবেদন জানানো হইয়াছে। এই জাতীয় কার্টুন অঙ্কনে পরদর্শী ছিলেন টিটু নাহা, অতুল গুপ্ত, নরেন সরকার প্রভৃতি।

বাইরে লীগ খেলায় যা হয়, আমাদের এখানেও তাই হতে লাগলো। পার্কার বা লেদার ট্রাঙ্কের লোভ দেখিয়ে খেলোয়াড় ভাগানো, রেফারীর ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা, প্রতিবাদ, প্রতিবাদের প্রতিবাদ, লীগ কমিটির অবিশ্রান্ত অধিবেশন, জরুরী বৈঠক, বিরোধী দলের সভা-কক্ষ ত্যাগ প্রভৃতি সবই চলতে লাগলো।

আমাদের টিমের নাম ছিল Y. L. R. এবং শশাঙ্ক (ওরফে কমেট) দাশগুপ্ত ছিল এর অধিনায়ক। খেলতো অশোক রায়, দীনেন ভট্টাচার্য্য, অমিয় মজুমদার, জ্যোৎস্না সরকার, বিভূতি চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, ভোলা বসাক, কমরেড কুশা রায় ও আমি। দীনেন ভট্টাচার্য্য, অমিয় মজুমদার, কমরেড কুশা রায় ও অশোক রায় ময়মনসিংহ পণ্ডিতপাড়া টিমে খেলতেন। এই টিম সে-যুগে দুর্দ্ধর্ষ মোহনবাগানের বিরুদ্ধেও পাল্লা দিত। কমেট ঢাকার এক জন নামজাদা খেলোয়াড় ছিল। আর সারা বিক্রমপুরেই তখন আমার খ্যাতি ছিল। সুতরাং লীগ চ্যাম্পিয়নশীপ আমাদের ভাগ্যেই যে জুটবে, তাতে আর সন্দেহ কি?

চ্যাম্পিয়নশীপ নির্দ্ধারণের শেষ খেলাটি ছিল ৩০শে এপ্রিল, ১১৩২ সাল। ভোরেই দেয়ালে-দেয়ালে কতকগুলো বেনামী প্রাচীরপত্র দেখা গেল: প্রবল জনরব যে, ওয়াই-এল-আরের অধিনায়ক কমেট দাশগুপ্ত প্রতিপক্ষ রেড-হোয়াইট দলের অধিনায়ক অনন্ত দে'র হোল্ডঅল দানের প্রতিশ্রুতিতে ভুলিয়া অসুস্থতার ওজর দেখাইয়া অত্তকার খেলায় অংশ গ্রহণ করিবেন না। এমনি রোমাঞ্চকর আরো কতকগুলি।

শিবিরের একমাত্র নির্দলীয় নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সংবাদপত্র 'শৃঙ্খলে'র দপ্তর বসে গেল। বিনয় সেনের বুলি আর আমার কলম। কলম হাতে নেয়া আর আগুনে হাত দেয়াকে বিনয় সেন একই রকম শক্ত কাজ মনে করতেন। অথচ ভদ্রলোক মুখে মুখে বলতেন চমৎকার কবিতা, সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও মুখরোচক সমালোচনা। এক তা' ফুলস্কাপ কাগজ নিয়ে পার্কার পেনটি খুলে সবে লেখা সুরু করেছি, এমনি সময় অকস্মাৎ কুমিল্লার সুকুমার ভৌমিক একখানা 'ষ্টেটস্‌ম্যান' এনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠলেন: হো গিয়া, বিজেন বাবু, কেল্লা ফতে হো গিয়া। মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ডগলাস শট ডেড্।

অ্যাঁ, কই দেখি।—বলে 'ষ্টেটসম্যানখানা' হাতে তুলে নিতেই সুকুমার বাবু বললেন: ওতে কোথায় পাবেন? সাবধানে ওটুকুতে কাঁচি চালিয়েছে শালা পবিত্র।—এই দেখুন।

প্রশ্ন করলেন বিনয় সেন: তবে সংবাদ পেলেন কি করে?

এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে সুকুমার বাবু জবাব দিলেন অনুচ্চ কণ্ঠে: কম্পাউণ্ডার একখানা আনন্দবাজার এনেছে লুকিয়ে।

সুতরাং বিপদে পড়া গেল। লীগ ফাইন্যালের গুরুত্ব যতই থাক, 'শৃঙ্খলে'র তাগিদ যতই থাক, এমনি উত্তেজনাকর সংবাদ পাবার পর বিনয় সেনের ভাষাও যেমন গেল ফুরিয়ে, তেমনি আমার কলমেরও যেন কালি গেল শুকিয়ে।

অবিশ্বাসী সম্পাদক তথাপি প্রশ্ন করলেন: আজকের লীগ খেলাটা পণ্ড করে দেবার জন্ত অনিষ্টকারীদের এ-ও একটা গুলবাজী নয় তো? আজকের প্রতিযোগী দল দু'টির একটিতে যে আপনি আছেন সুকুমার বাবু! . .

কিন্তু গুলবাজী মোটেই নয়। দাবানলের মতো সেই সংবাদ রটে গেল যে, মেদিনীপুরের নিহত ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ণেল পেডির শূন্ত আসনে এসেছিলেন মিঃ আর, ডগলাস। ৩০শে এপ্রিল জেলা বোর্ডের একটি সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন তিনি। জেলার নানা জাতীয় জটিল বিষয় নিয়ে যখন তাঁরা আলোচনায় নিমগ্ন, তখন অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করে দু'টি কিশোর, বালকও বলা যায়। ডগলাসের পশ্চাতে দেহরক্ষী ও জনকতক আর্দালী ছিল দাঁড়িয়ে। এদেরই দলে এসে দাঁড়ায় এরা নীরব দর্শক বা শ্রোতার মত। ডগলাস সাহেব একবার যেই সোজা হয়ে বসে কোনও ব্যাপারে সভাপতির রুলিং দিচ্ছিলেন, এমন সময় অকস্মাৎ পর-পর রিভলভার গর্জ্জে উঠলো দু'জনের হাতে। একটি গুলী এসে বিদ্ধ হলো চেয়ারের হেলান দেবার কাঠে আর একাধিক গুলী পিঠের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে ডগলাস সাহেবের ফুসফুস ফুটো করে দিল। সাহেব ঢলে পড়লেন প্রথমে চেয়ারে, তার পর মেঝেতে।

দেহরক্ষী ভ্যাবাচাকা খেয়ে হাত দিল রিভলভারে! কিন্তু ততক্ষণে আততায়ীদ্বয় পগার পার! সুতরাং সে দাঁড়িয়ে গেল প্রভুর মৃতদেহ রক্ষার জন্ত! আরদালী ও অন্তান্ত লোক দু'জনকে তাড়া করে অবশেষে এক জনকে ধরে ফেলে, তার নাম প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য বলে জানা গেছে।

—পড়ে রইলো দৈনিক 'শৃঙ্খলে'র বিশেষ সংখ্যা। বিনয় সেন গেলেন ইষ্টার্ণ ব্যারাকের দিকে, সুকুমার বাবু তো পূর্ব্বেই উধাও আর আমি ধীরে ধীরে গিয়ে হাজির হলাম ডবলিউ-বি চোদ্দ নম্বরে।

লীগ ফাইন্তাল পরদিন হবে বলে কমরেড কৃশা এক জরুরী বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলেন, সত্য বাবু বিশেষ ঘোষণা জানিয়ে দিলেন ব্যারাকে ব্যারাকে: আজ রাত্রিকালে প্রত্যেকের জন্য একটি করে বেলে হাঁসের রোষ্ট তৈরী হবে। রোষ্ট যাঁরা খান না, তাঁরা পূর্ব্বাহ্নে কিচেন-ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করুন।

রাত দশটা পনেরো মিনিটে দরজা বন্ধ হয়ে গেলে অমরকে ডাকলাম। সে নিঃশব্দে এসে আমার টেবিলের পাশে চেয়ারে বসলো। আড়-চোখে চেয়ে দেখলাম সমরেন্দ্র পাল ঘুমোবার উদ্যোগ করছেন। সুধাংশু বাবুও তাই। নিম্নস্বরে প্রশ্ন করলাম: প্রদ্যোৎ কেমন?

অমর রহস্যপূর্ণ চোখ তুলে চেয়ে রইলো আমার পানে, জবাব দিল না কিছু।

বললাম: কিন্তু আজকের সভা ও বৈঠকগুলোর সংবাদ পেয়েছ তো? প্রত্যেকটা গ্রুপই দাবী করছে এ কাজ তাদের ছেলেরাই করেছে। এমন কি, অনুশীলনের হুগলী গ্রুপ তো একটা প্রস্তাবই গ্রহণ করেছে যে, বাইরে যারা এখনো আছে, তাদের কাছে নির্দ্দেশ পাঠাবে প্রদ্যোতের মামলা চালাবার জন্ত একটা তহবিল গঠন করবার। শুনেছ তো সব কিছু?

এবার অমর মৃদু হাস্ত করলো মাত্র। এমনিই সে। এ-সব বিষয়ে তার মুখ খোলানো দুরূহ কাজ। আবার মন্তব্য করলাম: কিন্তু আই-বি ওকে দারুণ ঠ্যাঙাবে। পর-পর দু'টো ম্যাজিষ্ট্রেট গেল! সোজা কথা নয়। পেডি সাহেবও যায় গত এপ্রিলে। ঠিক এক বছর।

অমর এইবার কথা কইলো: ঠ্যাঙালেও কিছু বেরুবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু এই সব চালিয়াৎদের সভা ও প্রস্তাবের অবসানের জন্ত আরও বিস্তৃত সংবাদ প্রয়োজন, তাই না? ক্রেডিট নেবার হুজুগ তাহলে এক দিনেই যায় থেমে।

অমর নিঃশব্দে হাসলো এবং পুরু কাচের আড়াল থেকে রহস্যময় চোখ দু'টি মেলে আবার চেয়ে রইলো আমার চোখের পানে।

এর কয়েক দিন পরই সকল সন্দেহ ও গবেষণার সমাপ্তি ঘোষণা করে, ফাঁকি দিয়ে যারা ক্রেডিট নিচ্ছিলো, তাদের সবার মুখে চূণকালি লেপন করে, আলোচনা-সভা ও প্রস্তাবের মূলে কুঠার হেনে কম্পাউণ্ডার মারফৎ আনীত আর একখানা আনন্দবাজারে সংবাদ পাওয়া গেল যে, প্রদ্যোৎ পুলিশের নিকট যে বিবৃতি দিয়েছে, তাতে জানা যায়, মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে তার সহপাঠী অমর চট্টোপাধ্যায় বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা দেবার জন্ত তাকে নিয়ে যায় পরিমল রায়ের কাছে। তারই মুখে সে শুনেছিল যে, ঢাকা-বিক্রমপুর থেকে কে এক জন দাশগুপ্ত নাকি সর্ব্বপ্রথম মেদিনীপুরে এসে পরিমল রায়কেই সর্ব্বাগ্রে দলে ভর্ত্তি করে। এ-ও শোনা গিয়েছিল যে, দাশগুপ্ত ঢাকার বি-ভি দলের সভ্য।

ব্যস্, থেমে গেল দল ও উপদলের গুনগুনানি। সবাই বক্র দৃষ্টিক্ষেপে আমাদের ঘরের দিকে তাকিয়ে সরে পড়তে লাগলো একে-একে। পরিমল রায় তখনো এই শিবিরেই আছে আর অমর তো আমার ঘরে আমারই পাশের সীটে বাস করে!···

১৪

শুধু কম্পাউণ্ডার কেন, গোটা কয়েক গাড়োয়ালী সিপাইকেই আমরা রিক্রুট করে ফেলেছিলাম, যারা বাইরের যাবতীয় সংবাদ ও খানকতক নিষিদ্ধ সংবাদপত্র সরবরাহ করতো নিয়মিত ভাবে। কিন্তু এই গুপ্ত সংবাদ জানতো রাজবন্দীদের মধ্যে মাত্র ক'জন। সংবাদপত্র পড়বার সৌভাগ্যও জুটতো বাছা-বাছা বন্দীদের। অপরে পেত খবর মুখে-মুখে। দিবাকর সেনগুপ্তের সাকরেদ যারা বন্দী হয়ে এসে আমাদের গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহ করে "যথাস্থানে" প্রেরণ করতো, তারা দারুণ একটা সন্দেহ পোষণ করলেও ঠিক কোন্ পথে যে এই স্মাগলিং চলছে, তা হদিস করতে পারতো না।

পারবে কোত্থেকে? কম্পাউণ্ডার বঙ্কিম বাবু এমনি গম্ভীর হয়ে থাকেন যে, দেখে বিরক্ত হতে হয়। ডাক্তার সরকার ডাক্তারদেরই মতোই খুব আলাপী এবং ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে তিনি মেসোপোটেমিয়ার কোন্ রণাঙ্গণে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, প্রায়ই তারই কাহিনী সালংকারে আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি করে থাকেন। আর বঙ্কিম বাবু নীরবে এগিয়ে এসে টেবিলের পাশে থাকেন দাঁড়িয়ে। বন্দীরা কদাপি মিকশ্চার খান না, তাই কম্পাউণ্ডারের কাজ হচ্ছে প্রেসক্রিপশন

অনুযায়ী আলমারী খুলে পেটেন্ট ওষুধের বোতল বা শিশি বার করে দেয়া মাত্র!

কিন্তু এরই মধ্যে অকস্মাৎ রোগী যতীশ গুহ বলে উঠলেন: যাই বলেন ডাক্তার বাবু, ঐ অ্যাগারল হোক বা অ্যাগারয়েলই হোক, আপনার কারমিনেটিভ মিকশ্চারটাই আমার পক্ষে বেশ ভালো। রাত্রে খাবার পরে এক দাগ খেয়ে ঘুমুলেই আর দেখতে হবে না— সকাল বেলা ক্লিয়ার।

ডাঃ সরকারের বাঁধানো দাঁতের প্রায় বত্রিশটাই দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে যতীশ গুহ কম্পাউণ্ডারের পশ্চাতে তাঁর কম্পাউণ্ডিং কক্ষে প্রবেশ করলেন। সেখানে বঙ্কিম বাবু শুধু কারমিনেটিভই দিলেন, না আরও কিছু হস্তান্তর করলেন, তা জানা গেল না। এদিকে আমরা ডাঃ সরকারের মধ্য-প্রাচ্যের লোমহর্ষণকারী অভিজ্ঞতার কথা আবার শোনবার জন্য তাঁকে উসকিয়ে দিয়েছি; সুতরাং চলছে মেসিন বক্‌-বক্ করে। ওদিকে কাজ হাঁসিল হয়ে গেল।

রাত বারোটায় সমগ্র শিবির যখন গভীর ঘুমে অচেতন, তখন বারান্দায় পাহারা-রত বন্দুকধারী একটি সিপাই ইষ্টার্ণ ব্যারাকের চার নম্বরের দরজার শিকের সমুখে দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত রকমের গলার শব্দ করলো, অনেকটা খুসখুসে কাসির মতো। সুধাংশু ভটচায্যের মশারীতে সে শব্দ প্রতিধ্বনি তুললো। অন্ধকারেই বেরিয়ে এলেন ভটচায মশাই। প্যাকেট নিয়ে এসে আবার প্রবেশ করলেন মশারীর অভ্যন্তরে।

কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন সকালে সেন্সর করবার পর পাঠাতেন অনেকগুলো 'ষ্টেটস্‌ম্যান'। সেন্সর করবার জন্য আই-বি অফিসার পবিত্র সরকার ওখানে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত ছিলেন। যে কোনো সংবাদ তাঁর কাছে আপত্তিজনক মনে হতো, সেটুকুই তিনি সাবধানে কাঁচি চালিয়ে কেটে নিতেন, অপর পৃষ্ঠার ক্ষতির প্রতি দৃক্‌পাত করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন না তিনি। এমনি অস্ত্রোপচার করা জানালা-দরজাওয়ালা পত্রিকা আমাদের ভাগ্যে প্রায়ই জুটতো।

জুন মাসের প্রায় মাঝামাঝি গোপনে আমদানী একটি পত্রিকায় মারাত্মক একটি সংবাদ পাওয়া গেল। চট্টগ্রামের ধলঘাট গ্রামের একটি গৃহে এক দল গুর্খা সেনা হানা দেয় ক্যাপ্টেন ক্যামেরনের নেতৃত্বে। সেই গৃহে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার জনকতক পলাতক আসামী ছিলেন আর তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদেদার, নির্ম্মল সেন, অপূর্ব্ব সেন ও স্বয়ং মাষ্টারদা। কয়েক ঘণ্টা উভয় পক্ষ থেকে গুলী বর্ষণের পর দেখা যায় ক্যাপ্টেন ক্যামেরন বিপ্লবীদের গুলীতে নিহত আর গুর্খা সেনার গুলীতে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন বিপ্লবী অপূর্ব্ব ও নির্ম্মল সেন। প্রীতি ও মাষ্টারদা সতর্ক ও সশস্ত্র পুলিশ-বেষ্টনীর মধ্য দিয়েই নির্ব্বিঘ্নে পলাতক।...

সেদিন রাত্রে ভালো করে ঘুমই এলো না আমার। বার বার মনে হতে লাগলো মাষ্টারদা'র কথা। চট্টগ্রামের অনেক বন্দী ছিলেন। তাঁদের মুখে এই লোকটির অসমসাহসিক ক্রিয়াকলাপের কাহিনী বহু শুনেছি। পুলিশের সতর্ক তল্লাসীকে ফাঁকি দিয়ে তাঁরা দু'-একখানা ছবিও এনেছেন তাঁর। দেখেছিলাম সে ছবি। টাক-পড়া মাথা, চোয়াল উঁচু, গাল তোবড়ানো, ভগ্নস্বাস্থ্য আর শুনেছি খর্ব্বকায়। শুধু সাধারণ নয়, অতি শোচনীয় ভাবে নিম্নশ্রেণীর লোক বলে মনে হয়। ব্যক্তিত্ব তো দূরের কথা, দশ জনের সমুখে দাঁড়িয়ে কথা কইবার হিম্মৎ আছে বলে মনে হয় না। গলাবন্ধ কোটের নীচে পাতলা চামড়া দিয়ে ঢাকা খানকয়েক সরু হাড়ের কোটরে ধুক্‌-ধুক্ করে যে যন্ত্রটি চলছে, ছবি দেখে মনে হয় ক্যামেরনের একটা হুমকিতেই সেটা ঠক্ করে থেমে যাওয়া উচিত ছিল। শ্রদ্ধা তো দূরের কথা, আকৃতি দেখে মনে খানিকটে অবজ্ঞা জাগলেও নালিশ করবার কিছু নেই।

কিন্তু আশ্চর্য্য এবং বিশ্বের আশ্চর্য্যতম সত্য যে, এই অতি সাধারণ ইস্কুল-মাষ্টারটি চমক লাগিয়ে দিয়েছেন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে। একটি চুম্বকের মতো দুর্নিবার বেগে টেনে এনেছেন চট্টগ্রামের জাগ্রত যৌবনকে, অকস্মাৎ বৈদ্যুতিক অভ্যুত্থানে কুকুরের মতো বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন সেখানকার পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে। ড্যাবডেবে দু'টি চক্ষুর নীল সাগরের কোন্ অতলতলে আগ্নেয়গিরির অগ্নিকণা লুকিয়ে আছে, ছবি দেখলে আদৌ হদিস পাওয়া যায় না তার। যেন একটি অনির্ব্বাণ বয়লার; মোটা ইস্পাতের পাত দিয়ে ঢেকে অন্ধকার করে রাখা হয়েছে।

চট্টগ্রামের সূর্য্য সেন বাংলার তথা ভারতের বিপ্লব-সূর্য্যের একটি উত্তপ্ত রশ্মি। চট্টল-গগনে তাঁর উদয়। অস্ত নেই তাঁর। যুগে-যুগে কালে-কালে বিপ্লবীর রক্তরাঙা পথে সেই অম্লান রশ্মি আলোক বিকীরণ করবে।...

বহরমপুর বন্দীশিবিরের বন্দীবাহিনী বিপ্লবী নির্ম্মল ও অপূর্ব্ব সেনের উদ্দেশ্যে গার্ড অব অনার প্রদর্শন করলো। ওয়েষ্টার্ণ এনেক্সি ও ওয়েষ্টার্ণ ব্যারাকের মধ্যস্থলে সুউচ্চ বেদীর ওপর অপূর্ব্ব ও নির্ম্মল সেনের প্রতিকৃতি। এঁকেছেন তাঁরই কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পাশে হিমাংশু সেন এবং আরো উনিশ জন শহীদের নাম-ফলক।

এ সব ব্যাপারে কোনো সভাপতি থাকেন না, বক্তৃতাও হয় না। সেনাদল বেদীর পানে মুখ করে এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়ায়। জি-ও-সি মুখপাত্ররূপে চার পা এগিয়ে যান বেদীর পানে, তার পর ঠকাস্ করে বুটের শব্দ করে হুকুম করেন: In profound respect to the deathless martyrs Sa—lute!

জি-ও-সির সঙ্গে সঙ্গে সবাই স্যালুট করে।

তার পর জি-ও-সি বেদীর পরে ওঠেন। বেদীর উপর রক্ষিত প্রতিকৃতি ও নাম-ফলকগুলির আবরণ উন্মোচন করে মাত্র এক মিনিট বক্তৃতা করেন: কমরেডস্, আজ দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করছি, কমরেড নির্ম্মল ও অপূর্ব্ব সেন ইংরেজের গুলীতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, প্রীতিলতা ও মাষ্টারদা ক্যাপ্টেন ক্যামেরনকে হত্যা করে পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন। আজ আমরা স্মরণ করি শহীদ নির্ম্মলকে, শহীদ অপূর্ব্বকে আর বাংলা ও ভারতের অগণিত শহীদদের। আমাদের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় তাঁরা আশীর্ব্বাদ করুন, এই কামনা।

In memory of the innumerable martyrs, Comrades, Sa—lute!

সবাই স্যালুট করে।

সেদিনকার গার্ড অব অনার প্রদর্শনের শেষে চট্টগ্রামের জ্যোতিষর চক্রবর্ত্তী আমায় একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলেন: The real G. O. C. of the Liberation Army of India। সত্যিই আপনার সৈন্যবাহিনী পরিচালনা ও সমগ্র অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করবার বলিষ্ঠ রীতি বিপ্লবীদের পক্ষে অনুকরণীয়। আন্তরিক ধন্যবাদ!

বিশেষণে সবিশেষ লজ্জিত হলাম।

সৈন্যবাহিনীর কুচকাওয়াজ হতো প্রতিদিন ভোর ছ'টায়। সাড়ে পাঁচটায় সিপাই এসে দরজা খুলে দেবার পর মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে মাঠে এসে হাজির হওয়া কঠিন বলে সবাইকেই শয্যাত্যাগ করতে হতো রাত চারটেতে। যখন আর দশ মিনিট বাকি, তখন অর্ডারলি অমর চাটার্জ্জী প্রত্যেক ব্যারাকের নিকটে গিয়ে বাঁশী বাজিয়ে সৈন্যদের সতর্ক করে দিয়ে আসতো।

শুধু মিনিটের কাঁটাই নয়, সেকেণ্ডের কাঁটাটিও যখন বাটের কোঠায় এসে ঠেকতো, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে জলদগম্ভীর স্বর শোনা যেত জি-ও-সির: কমরেড্স্, ফল ইন্।

তার পর এক ঘণ্টা চলতো কুচকাওয়াজ। এক সেকেণ্ড দেরী হলেও কেউ রেহাই পেত না।

এক দিন হরিদাস সেন দেরী করে আসতে দশ মিনিট তাঁকে ডবল মার্চ্চ করতে হয়। আর এক দিন করালী বিশ্বাসকে অভিনব শাস্তি নিতে হয়। বাহিনীকে মার্চ্চ করবার হুকুম দিয়ে করালীকে নির্দ্দেশ দেয়া হলো সর্ব্বদাই সমগ্র বাহিনীর বিশ গজ সম্মুখে থেকে তাকে মার্চ্চ করতে হবে। লীডারের মতো মাতব্বরি পদক্ষেপে বেশ চলছিলেন করালীকান্ত। কিন্তু যেই বাহিনী এ্যাবাউট টার্ণ করলো, অমনি চোঁ-দৌড়ে করালীকে এসে আবার বিশ গজ সামনে স্থান নিয়ে মার্চ্চ করতে হলো। বাহিনী এবার রাইট টার্ণ করলো, আবার করালী দৌড়ে এসে স্থান নিল। এর পর বাহিনী বার বার দিক্ পরিবর্ত্তন করতে সুরু করলো আর বার বারই করালীকে দৌড়ে এসে পুরোভাগে স্থান নিতে হলো। এমনি দৌড়া-দৌড়ির শাস্তি পনেরো মিনিট ভোগের পর করালী রেহাই পেলেন সেদিনকার মত।

নিয়মিত কুচকাওয়াজে বন্দীদের মধ্যে এই বাহিনী যেমন হয়ে উঠেছিল জনপ্রিয়, তেমনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হতো সামরিক নিয়মাবলী। প্যারেডের মাঠে দ্বিজেন গাঙ্গুলী যে সর্ব্বাধিনায়ক জি-ও-সি, এ কথা প্রতি পদক্ষেপে মেনে চলেন সবাই। দলীয় চেতনা তাঁর যতই উৎকট থাক্, সমগ্র শিবিরে যতই নেতৃস্থানীয় হোন্ না কেন তিনি, সিনিয়রিটি তাঁর যত বেশীই থাক্, তথাপি এ কথা তাঁরা অন্তর দিয়ে মেনে চলতেন যে, বহরমপুর বন্দীশিবিরের সেনাবাহিনীর জি-ও-সি এক জন আর সে দ্বিজেন গাঙ্গুলী।

মেহেদীর বেড়াকে প্রথমে মনে করা হতো অনতিক্রম্য বাধা। সেনাদল মার্চ্চ করে তার সম্মুখীন হয়ে মার্ক টাইম করতো পরবর্ত্তী নির্দ্দেশের অপেক্ষায়। কিন্তু পরে শিক্ষা দেয়া হলো এই সামান্য বাধা লম্ফ দিয়ে উৎরে যেতে হবে। ফলে, অনেকেরই পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল মেহেদীর কাঁটায়।

সমগ্র আবহাওয়ার মধ্যেই এল নিয়মানুবর্ত্তিতা, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা। সামরিক কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে সৈনিকের মন গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছিল এই বাহিনী। তাই জেলা হিসেবে বেছে বেছে জন কতককে সেক্শন-কমাণ্ডার নিয়োগ করা হলো—কমেট, বীরেন ঘোষ, বিভূতি চৌধুরী, রংপুরের বিমল মৈত্র, ময়মনসিংহের বিমল চক্রবর্ত্তী, কুমিল্লার সমরেন্দ্র পাল, চট্টগ্রামের ত্রৈলোক্য বিশ্বাস, নোয়াখালীর হরিভূষণ মজুমদার, দিনাজপুরের করালী বিশ্বাস প্রভৃতি। মুক্তির পর এরা নিজেদের জেলায় এমনি সেনাবাহিনী গড়ে তুলবে, এই ছিল উদ্দেশ্য।

এক দিন সকালে কুচকাওয়াজের শেষে ঘরে এসে চা খাচ্ছি, এমন সময় এক জন বেয়ারা এল অফিস থেকে। নিবেদন করলো, বড় সাহেব আমায় একবার 'সেলাম' দিয়েছেন। আমি সেই সামরিক পোষাকেই অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম, 'সেলাম' দিয়েছেন বড় সাহেব নন, তাঁর মন্ত্রী গবুচন্দ্র—গিরিজা দত্ত।

মহা সমাদরে বসিয়ে বিনিয়ে-বিনিয়ে শুরু করলেন গিরিজা: সত্যি, ভারী চমৎকার প্যারেড করান আপনি। আমার সেপাইরা দেখেছে। ওরা বলে, একেবারে হাবিলদারের মতো। আপনি বুঝি ইউনিভারসিটি কোরে ছিলেন?

বললাম: না তো। ইউনিভারসিটিতে এখনও প্রবেশের সুযোগই পাইনি আমি। আটাশ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরী হয়, আমি তাতে 'বি' কম্পানীর প্লেটুন সার্জ্জেণ্ট ছিলাম।

গিরিজা বলে যেতে লাগলেন: আমি আপনার প্যারেড না দেখলেও আপনার গলার আওয়াজ শুনি। আমার বাড়ী থেকে স্পষ্ট শোনা যায়। আপনার ফুসফুসে বেশ জোর আছে তো! এক দিন অফিস থেকে সাহেবই আপনার গলা শুনতে পেয়ে আমায় ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। মিলিটারী ম্যান কিনা, তাই প্যারেড ওরা ভারী পছন্দ করে।

বলে গিরিজা দত্ত অহেতুক চারি দিকে একবার চেয়ে নিলেন, কেউ নিকটে আছে কি না। অহেতুক এ জন্য যে, এক দিকে দেয়াল ও তিন দিকে কাঠের পার্টিশন দিয়ে ঘেরা তাঁর কক্ষ, কক্ষের মধ্যে তিনি ও আমি। পার্টিশনের বাইরে যারা অন্য কাজে রত, তাদের আর দেখা যাবে কি করে? বোধ হয় পরের কথাগুলিতে গুরুত্ব সংযোজনা করবার জন্যই অকস্মাৎ গলা খাটো করে বললেন: কিন্তু জানেন তো দ্বিজেন বাবু, এক জন টিকটিকি এখানে বসে আছেন শ্যেন-দৃষ্টি মেলে, অতি সহজ জিনিষকে বাঁকা করে দেখাই যাঁর একমাত্র কাজ। আর শুধু কি দেখা, সঙ্গে সঙ্গে নলিনী মজুমদারের কানে তুলে না দিলে তাঁর ঘুমই আসে না।

গিরিজা দত্তের উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলাম: কি আর এমন তিনি কানে তুলবেন?

বিস্ময় প্রকাশ করলেন গিরিজা: বিলক্ষণ! বলেন কি, দ্বিজেন বাবু? এখানকার সূচ পড়ার সংবাদটিও সযত্নে উনি ওপরওয়ালার কানে বজ্রপতন হয়েছে বলে তুলে দিলে শুধু যে কর্ত্তব্য সম্পাদনই হবে তাই নয়, ওঁর প্রমোশনের পথ বেশ খোলসা হয়ে আসবে। এই জন্যই মশায় আই-বিতে কখনো গেলামই না আমার এই আটাশ বছর চাকরিতে। চান্স কি কম পেয়েছিলাম মশাই? ওখানে গিয়ে যে-সব নেমকহারামি কাজ করতে হয়, তা মশাই আমার ধাতে সয় না। ভদ্রলোকের ছেলে তো সবাই!

আসল কথায় আসার তাগিদ দিলাম: কি করেছেন পবিত্র সরকার?

বিরক্তিতে গিরিজার কণ্ঠ প্রায় ক্রুদ্ধের মতো শোনা গেল: কি আর করবেন। আমাদের সঙ্গে মিলে-মিশে বেশ ভালোই আছেন দেখে তাঁর সইবে কেন? অতএব বাহাদুরী নিলেন এবার আপনাদের ঐ প্যারেডের খবরটি বেফাঁস করে দিয়ে।

চমকে উঠলাম: কি হয়েছে?

ওপর থেকে নির্দেশ এসেছে আপনাদের প্যারেড নিষিদ্ধ করে দেবার। কেন, এতে দোষটা কি হচ্ছিলো বলুন তো? স্বাস্থ্যরক্ষা ছাড়া এর আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে, আমার এই আটাশ বছরের চাকরি নিয়ে তো বুঝতে পারছি না। ক্যাম্পের মধ্যে এটাকে সংঘবদ্ধ ব্যায়াম ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?—আর আপত্তিজনক কিছু দেখলে আমরাই তো পারি আপনাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একটা আপোষ-রফা করতে—

প্রশ্ন করলাম: কি, গভর্ণমেণ্ট আমাদের প্যারেড বন্ধ করবার হুকুম জানিয়েছেন নাকি?

আজ্ঞে, তাই তো দেখছি।—বলে গিরিজা মহা অপরাধীর মতো বলতে লাগলেন: মানে, এমনি ভাবে ইনি লাগিয়েছেন যে, আমাদের ডিসিপ্লিনের কোন সুযোগই আর দেয়নি। আরে, এতে Administration ও disciplineএর সত্যিই ক্ষতি হচ্ছে কি না, সে তো বুঝবো আমরা, যারা প্রতিদিন আপনাদের সুখ-দুঃখের ভাগ নিচ্ছি।—ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কী আর বলবো দ্বিজেন বাবু, এই করেই তো গেল বাঙালী জাতটা। ইস্, এতগুলো টাকা ব্যয় করে আপনারা পোষাক তৈরী করালেন, এখন যদি প্যারেড না হয়—

বাধা দিলাম: প্যারেড বন্ধ হয়ে যাবে কে বললে?

গভর্ণমেণ্ট যে বন্ধ করে দিয়েছেন দ্বিজেন বাবু!

জবাব দিলাম: প্যারেড করি আমরা, গভর্ণমেণ্ট নয়। আমরা তো বন্ধ করিনি। এই তো এখনই করে এলাম।

গিরিজা দু'চোখ কপালে তুলে ফেললেন: বিলক্ষণ, বলেন কি! সরকারী হুকুম না মানলে আমাদের যে চাকরি যাবে দ্বিজেন বাবু—

বললাম: তা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের আত্মমর্য্যাদার মূল্য আপনাদের চাকরির চাইতে অনেক বেশী।

গিরিজা এবার অফিসিয়েল মুখোস পরবার চেষ্টা করলেন: কিন্তু হুকুম তামিল করা ছাড়া গত্যন্তর নেই আমাদের।

হুকুম তামিল-করা ভৃত্যদের আরো কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় কি-কাজে স্বয়ং কমাণ্ডাণ্ট টবিন এসে গিরিজার কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে দেখেই বলে উঠলেন: হ্যালো জি-ও-সি, Perhaps you have received the Government order?

It has been communicated to me just now—জবাব দিলাম।

টবিন ক্রূর হাসিতে ঠোঁট দু'খানি একটুখানি প্রসারিত করে এবং নীল চোখে হাসির আভা ফুটিয়ে তুলে প্রশ্ন করলেন: Would you stop the Drill just from today?

উঠে দাঁড়ালাম, জবাব দিলাম: Certainly not. It shall go on as usual.

আহত টবিনের কণ্ঠে এবার বৃটিশ-সিংহের গর্জ্জন শোনা গেল: Do you realise I am the Commandant of this Camp and I know how to make you stop it?

সিংহ-গর্জ্জনেরই প্রতিধ্বনি শোনা গেল জি-ও-সির কণ্ঠে: And do you realise I am the G. O. C. and I have the courage to defy your orders?

দেরী নয়। গট-গট করে বেরিয়ে চলে এলাম। গেটের পাশেই দাঁড়িয়েছিল অভারলি অমর। সাংঘাতিক কিছু অনুমান করে নিয়েই প্রশ্ন করলো: গণ্ডগোল হলো নাকি কিছু?

হলো এবং আরও হতে পারে।—সবটা বললাম অমরকে। ঘরে ফিরে আসবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রেসিডেণ্ট পরেশ সান্ন্যাল সমর-পরিষদের জরুরী বৈঠক আহ্বান করলেন। ঐ দিন বিকেলেই স্পেশাল প্যারেডের প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো। ফল্ ইন্ চারটেতে। চললো বাহিনীর মার্চ্চ—লেফট রাইট লেফট, লেফট রাইট লেফট!

সংবাদ নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে বৃটিশ-সিংহের কানে। কানে পড়েছে গরম সিসে! প্রকাণ্ড গেটের মধ্য দিয়ে এসে ঢুকলো এক দল রাইফেলধারী সিপাই। কুচকাওয়াজ মাঠের প্রান্তে এসে দাঁড়ালো। ওৎ পেতে রইলো নেকড়ে বাঘের মতো।

চেয়ে দেখলাম। এ তো জানা কথাই। রাইফেলে নিশ্চয়ই গুলী ভরা আছে। প্রয়োজন শুধু জমাদারের হুকুম। সে হুকুমও কঠিন কিছু নয়।

কিন্তু মার্চ্চ আমরা করেই চলেছি অবিচ্ছিন্ন ভাবে—লেফট রাইট লেফট, লেফট রাইট লেফট…

নির্ভীক, নিঃশঙ্ক, ভয়-ডরহীন! [ক্রমশঃ।

গল্প হলেও সত্যি

ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মা গেছেন ছায়াছবি দেখতে—প্রেক্ষাগৃহে। প্রেক্ষাগৃহের দ্বারে টিকিট-পরীক্ষক ছেলেটির টিকিট চাইতে মা বললেন,—ও এখন মাত্র তিন বছরে পড়েছে। টিকিট লাগবে কেন?

টিকিট-পরীক্ষক ছেলেটিকে লক্ষ্য করে বললেন, না, হতেই পারে না। ওকে দেখাচ্ছে যেন ছ' বছরের।

মা তখন বললেন,—আপনি বিশ্বাস করুন, আমাদের বিয়েই হয়েছে মাত্র চার বছর। তেরোশো পঁয়তাল্লিশ সালের সাতুই—

টিকিট-পরীক্ষক বিরক্ত হয়ে বললেন, দেখুন মা, আমি টিকিটের দামটা শুধু চেয়েছি, আত্ম-চরিত শুনতে চাইনি।

বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতা ও ভারতীয় প্রাচীন প্রেম-কবিতা

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

১

বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতা ও ভারতীয় প্রাচীন প্রেম-কবিতা পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই, জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে—বিশেষ করিয়া বাঙলা দেশে—রাধাপ্রেমকে অবলম্বন করিয়া যে বৈষ্ণব-কবিতা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার ভিতরে বিবর্তন-জনিত বৈচিত্র্য, সূক্ষ্মত্ব এবং স্থানে স্থানে সুরগ্রামের উচ্চতা অবশ্যই লক্ষণীয়, কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষের সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার অভিনবত্ব একান্ত ভাবে স্বীকার্য নহে। রাধাপ্রেমের মোটামুটি কাঠামটি পূর্ববর্তী প্রেম-কবিতার ভিতর হইতেই গৃহীত হইয়াছে; প্রকাশ-ভঙ্গির ভিতরেও আমরা একই ভারতীয় ধারার অনুসরণ দেখিতে পাই; তবে পূর্ব-রচিত পটভূমির উপরে অধ্যাত্ম-তত্ত্বদৃষ্টির একটা জ্যোতির্ময় দীপ্তি এবং কবি-কল্পনার স্পর্শ-লাবণ্য তাহাকে আরও স্বচ্ছ করিয়াছে, মহিমান্বিতও করিয়াছে। রাধিকার বয়ঃসন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া তরুণীর প্রেম-চাঞ্চল্য, প্রেমের নিবিড়তা ও গভীরতা, মিলন-বিরহ, মান-অভিমান প্রভৃতি যাহা কিছু বর্ণনা আমরা বৈষ্ণব-কবিতার ভিতরেই পাই, পার্থিব নায়িকাকে অবলম্বন করিয়া এই জাতীয় প্রেমের বর্ণনা—এমন কি সেই প্রেমবর্ণনার কলা-কৌশল পর্যন্ত প্রায় সবই আমরা পূর্ববর্তী কাব্য-কবিতার ভিতরে পাই। তবে পূর্ববর্তীরা সম্ভোগকেই প্রধান করিয়া প্রেমকে অনেক স্থানে স্থূল করিয়া ফেলিয়াছেন; আর বৈষ্ণব-কবিগণ বিরহকে প্রধান করিয়া প্রেমের ভিতরে সূক্ষ্মতার ও অতলতার সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিরহ-অবলম্বনে যে প্রেমের সূক্ষ্ম এবং গভীর সুর তাহাই রাধাপ্রেমকে আধ্যাত্মিক লোকে উত্তরণ করাইতে সহায়ক হইয়াছে। বৈষ্ণব-কবিতাকে সাহিত্য হিসাবে বিচার করিতে গেলে দেখিতে পাই, পূর্ববর্তী কবিদের বর্ণিত প্রেম হইতে রাধাপ্রেমের যে পার্থক্য তাহা দুইটি কারণে ঘটিয়াছে, প্রথমতঃ একটি তত্ত্বদৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রভাব, অপরটি হইল বিরহকে অবলম্বন করিয়া প্রেমের রূপ হইতে অরূপে—প্রাকৃত মর্ত্যভূমি হইতে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামে যাত্রা।

এই প্রাকৃত-ভূমি হইতে অপ্রাকৃত ধামে যাত্রা কি ভাবে সুরু হইয়াছে এবং কি ভাবে সাধিত হইয়াছে—অর্থাৎ প্রাকৃত নায়িকাই আসিয়া কি করিয়া রাধাভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে পূর্ববর্তীদের প্রাকৃত নায়িকার সহিত পরবর্তীদের রাধিকার যোগ কতখানি সেই কথাটি নানা দিক্ হইতে দেখিয়া লওয়া প্রয়োজন। ইহা করিতে হইলে প্রাচীন ভারতীয় প্রেম-কবিতার সহিত পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-কবিতার খানিকটা তুলনা-মূলক আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-ধর্মে ও সাহিত্যে পূর্ববর্তী কালের মানবীয় কবিতা কি ভাবে গৃহীত হইয়াছে তাহার আলোচনা করিয়া রাধিকার সহিত ভারতীয় চিরন্তনী নায়িকার কি যোগ তাহার খানিকটা আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তাহাই এ-বিষয়ে আমাদের গাঢ় প্রত্যয় জন্মাইবার পক্ষে যথেষ্ট উপকরণ নহে। বর্তমান আলোচনায় আমরা পূর্ববর্তী কবিদের প্রেম-কবিতার সহিত ভাবে ও ভাষায় পরবর্তী বৈষ্ণব-কবিতার কি ভাবে যোগ রহিয়াছে তাহারই একটা ধারণা দিবার চেষ্টা করিব।

হালের 'গাহা-সত্তসঈ'র প্রাচীনতা স্বীকৃত বলিয়া সেইখান হইতেই আরম্ভ করা যাক। দীর্ঘবিরহিণী নায়িকাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,

> ণইউরসচ্ছহে জোব্বণক্কি অইপবসিএসু দিঅসেসু।
> অণিঅত্তাসু অ রাঈসু পুত্তি কিং দড্ঢমাণেণ। ১।৪৫

নদীজলের উদ্বেলতার মত হইল নারীর যৌবন; দিনগুলি চিরকালের জন্য চলিয়া যাইতেছে, রাত্রিও আর ফিরিবে না, এই অবস্থায় এই পোড়া মান দিয়া আর কি হইবে? এই পদটির সহিত তুলনা করুন চণ্ডীদাসের প্রসিদ্ধ পদ—

> কাল বলি কালা গেল মধুপুরে
> সে কালের কত বাকি।
> যৌবন-সায়রে সরিতেছে ভাটা
> তাহারে কেমনে রাখি।
> জোয়ারের পানী নারীর যৌবন
> গেলে না ফিরিবে আর।
> জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব
> যৌবন মিলন ভার।

দূরপ্রবাসী প্রিয় বহুদিন পরে ফিরিয়া আসিলে তাহার প্রেয়সী তাহাকে কি ভাবে মঙ্গলানুষ্ঠানের দ্বারা অভ্যর্থনা জানাইবে তাহার বর্ণনায় দেখি—

> রত্থাপইণ্ণণঅণুপ্পলা তুমং সা পড়িচ্ছএ এন্তম্।
> দারণিহিএহি দোহিঁ মঙ্গলকলসেহিঁ ব থণেহিঁ। ২।৪০

তোমাকে আসিতে দেখিয়া সে সকল মঙ্গল আয়োজন করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে; তাহার নয়নোৎপলের দ্বারা সে তোমার আগমন পথ প্রকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, আর তাহার দুইটি স্তনকে দ্বারনিহিত দুইটি মঙ্গলকলস করিয়া রাখিয়াছে। ঠিক অনুরূপ একটি শ্লোক ত্রিবিক্রমভট্ট রচিত বলিয়া শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে ধৃত হইয়াছে—

> কিঞ্চিৎকম্পিতপাণিকঙ্কণরবৈঃ পৃষ্টং ননু স্বাগতং
> ব্রীড়ানম্রমুখাব্জয়া চরণয়োর্ন্যস্তে চ নেত্রোৎপলে।
> দ্বারস্থস্তনযুগ্মমঙ্গলঘটে দত্তঃ প্রবেশো হৃদি
> স্বামিন্ কিং ন তবাতিথেঃ সমুচিতং সখ্যানয়ানুষ্ঠিতম্। (৩৫৩০)১

'অমরুশতকে'ও রহিয়াছে—

> দীর্ঘা চন্দনমালিকা বিরচিতা দৃষ্ট্যৈব নেন্দীবরৈঃ
> পুষ্পানাং প্রকরঃ স্মিতেন রচিতো নো কুন্দজাত্যাদিভিঃ।

---

১ তুলনীয়ঃ—
যৌবনশিল্পি-সুকল্পিত-নূতন-তনুবেশ্ম বিশতি রতিনাথে।
লাবণ্যপল্লবযাক্তৌ মঙ্গলকলসৌ স্তনাবস্যাঃ।—
কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, ১৫৫

সত্তঃ স্বেদমুচা পয়োধরযুগেনার্ঘ্যো ন কুম্ভাম্ভসা
স্বৈরেবাবয়বৈঃ প্রিয়স্য বিশতস্তন্ব্যা কৃতং মঙ্গলম্।

ইহার সহিত তুলনা করিতে পারি বিদ্যাপতির পদ,—

পিয়া জব আওব ই মঝু গেহে।
মঙ্গল জতহু করব নিজ দেহে॥
কনআ কুম্ভ করি কুচজুগ রাখি।
দরপন ধরব কাজর দেই আঁখি॥ ইত্যাদি ।১

প্রবাসী প্রিয়ের জন্য নায়িকা দিন গণিবে; কিন্তু প্রেমের আতিশয্যে প্রিয় আজ গিয়াছে, আজ গিয়াছে এইরূপ গণনা করিতে গিয়া দিবসের প্রথমার্ধেই বিরহিণী রেখায় রেখায় দেয়ালটিকে চিত্রিত করিয়া দিয়াছে।—

অজ্জং গওত্তি অজ্জং গওত্তি অজ্জং গওত্তি গণরীএ।
পঢ়ম ব্বিঅ দিঅহদ্ধে কুড্ডো রেহাহিঁ চিত্তলিও ॥৩।৮

ইহার সহিত তুলনীয় বিদ্যাপতির পদ—

কালিক অবধি করিঅ পিয়া গেল।
লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল॥
ভেল প্রভাত কহত সবহিঁ।
কহ কহ সজনি কালি কবহিঁ ॥২

বিরহে দিবসগণনার আর একটি পদে পাইতেছি—

হত্থেসু অ পাএসু অ অঙ্গুলিগণণাই অইগআ দিঅহা।
এণ্‌হিং উণ কেণ গণিজ্জউ ত্তি ভণিউ রুঅই মুদ্ধা ॥ ৪।৭

হাতের এবং পায়ের আঙ্গুল দিবস গণিতে গণিতে শেষ হইয়াছে, এখন আর কি ভাবে দিবস গণিবে এই কথা বলিয়া মুগ্ধা কাঁদিতেছে। এই প্রিয়-বিরহের দিবসগণনা প্রায় প্রত্যেক বৈষ্ণব-কবির পদেই নানা ভাবে পাই। বিদ্যাপতির রাধা বলিয়াছে—

কতদিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি নখর খোয়াওল
বিছুরল গোকুল নাম॥

আবার— এখন-তখন করি দিবস গমাওল
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরস গমাওল
ছোঁড়লু জীবন আসা॥ ইত্যাদি।

চণ্ডীদাসের পদে আছে—

আসিবার আসে লিখিনু দিবসে
খোয়াইনু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে
দু আঁখি হইল অন্ধ॥

এই ভাবটি জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির বহু পদেও পাওয়া যায়।

জ্ঞানদাসের একটি প্রসিদ্ধ পদে দেখিতে পাই, প্রেমের এক প্রকারের দেহবিকার ঢাকিতে গেলে অন্য বিকার আসিয়া বিপদ ঘটায়।—

গুরু গরবিত মাঝে থাকি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি অনেকেরই এই জাতীয় পদ আছে। যথা—

চণ্ডীদাস,— গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ভরে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল॥

বিদ্যাপতি— ধসমস করএ রহওঁ হিয় জাতি।
সগর সরীর ধরএ কত ভাঁতি॥
গোপহি ন পারিঅ হৃদয়-উলাস।
মুনলাহু বদন বেকত হো হাস॥ ইত্যাদি। (৩৩১)।

'গাহা-সত্তসঈ'র নায়িকাও বলিতেছে—

অচ্ছীইঁ তা থইস্সং দোহি বি হত্থেহি বি তস্সিং দিট্ঠে।
অঙ্গং কলম্বকুসুমং ব পুলইঅং কহ ণু ঢক্কিস্সম্॥ ৪।১৪

তাহাকে দেখিলে চক্ষু দুইটি না হয় দুই হাতে ঢাকিয়া রাখিব, কিন্তু কদম্ব কুসুমের ন্যায় পুলকিত অঙ্গকে কি করিয়া ঢাকিয়া রাখিব?

অমরুশতকেও দেখি—

ভ্রূভঙ্গে রচিতেঽপি দৃষ্টিরধিকং সোৎকণ্ঠমুদ্বীক্ষতে
কার্কশ্যং গমিতেঽপি চেতসি তনুরোমাঞ্চমালম্বতে।
রুদ্ধায়ামপি বাচি সস্মিতমিদং দগ্ধাননং জায়তে
দৃষ্টে নির্বহণং ভবিষ্যতি কথং মানস্য তস্মিন্ জনে॥

আমরা জানি—

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করু পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥

প্রভৃতি গোবিন্দদাসের একটি প্রসিদ্ধ অভিসারের পদ। এখানে দেখি অভিসারের জন্য রাধার সারারাত জাগিয়া সাধনা।

মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর-পন্থ-গমন ধনি সারয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥

ইহার প্রাকৃরূপ প্রথম দেখি—

অজ্জ মএ গন্তব্বং ঘণন্ধআরে বি তস্স সুহঅস্স।
অজ্জা ণিমীলিঅচ্ছী পঅপরিবাডিং ঘরে কুণই॥ ৩।৪৯

---

১ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত সংস্করণ।

২ তুলনীয় :—

অবনত বয়নে হেরত গীম।
খিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি ছীন॥

আবার, পদ-অঙ্গুলি দেই খিতিপর লেখই
পাণি কপোল-অবলম্ব।

"আজ আমাকে ঘন অন্ধকারে সেই কান্তের অভিসারে যাইতে হইবে, এই ভাবিয়া সেই বরনাগরী নিমীলিতাক্ষী হইয়া নিজের ঘরেই পদপরিপাটি করিতেছে।" ইহার দ্বিতীয় রূপ দেখিতে পাই 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে' উদ্ধৃত একটি কবিতার ভিতরে।১—

মার্গে পঙ্কিনি তোয়দান্ধতমসে নিঃশব্দসংচারকং
গন্তব্যা দয়িতস্য মেঽদ্য বসতির্মুগ্ধেতি কৃত্বা মতিম্।
আজানূদ্ধৃতনূপুরা করতলেনাচ্ছাদ্য নেত্রে ভৃশং
কৃচ্ছ্রাল্লব্ধপদস্থিতিঃ স্বভবনে পন্থানমভ্যস্যতি॥ ৫১১

"পঙ্কিল পথে মেঘান্ধতমসার ভিতরে নিঃশব্দ-সঞ্চারণে আজ আমাকে দয়িতের বাসস্থানে যাইতে হইবে; এইরূপ মতি করিয়া এক মুগ্ধা রমণী নূপুরকে জানু পর্যন্ত উঠাইয়া লইয়া, নয়নযুগল করতলে ভাল করিয়া আচ্ছাদিত করিয়া অতিকষ্টে পদস্থিতি লাভ করিয়া নিজের ঘরেই পথের অভ্যাস করিতেছে।"

আর একটি শ্লোকে দেখি—

পেচ্ছই অলক্খলক্খং দীহং নীসসই সুন্নঅং হসই।
জহ জম্পই অফুডত্থং তহ সে হিঅঅট্ঠিঅং কিং পি॥ ৩'১৬

"শূন্য দৃষ্টিতে বা লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে বার বার চাহিতেছে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, শূন্যের দিকে তাকাইয়া হাসিতেছে; অস্ফুটার্থ কথা বলিতেছে; এই সকল দেখিয়া মনে হয়, নিশ্চয়ই উহার হৃদয়ে কিছু রহিয়াছে।" এই কবিতার সহিত নব অনুরাগে অনুরাগিণী বিকলা রাধার প্রতি সখীদের উক্তিরূপে যে সকল কবিতা রহিয়াছে তাহার মিল আর তুলিয়া দেখাইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। পদটি রাধাপ্রেমের একটি উচ্চ ভাবের কবিতা বলিয়া প্রকাশ করিলে এ বিষয়ে অন্যথা চিন্তা করিবার আর কোন অবকাশ থাকে না।

একটি পদে আছে,—

পত্তনিঅম্বপ্‌ফংসা ণ্‌হাণুত্তিণ্ণাএ সামলঙ্গীএ।
জলবিন্দুএহিঁ চিহুরা রুঅন্তি বন্ধস্‌স ব্ব ভএণ॥ ৬।৫৫

"স্নানোত্তীর্ণা শ্যামলাঙ্গীর প্রাপ্তনিতম্বস্পর্শ চিকুরগুলি পুনরায় বন্ধন-ভয়ের জন্যই যেন জলবিন্দু দ্বারা রোদন করিতেছে।" এই পদের সহিত বিদ্যাপতির 'জাইত পেখল নহাএলি গোরী' বা 'কামিনি পেখল সননাক বেলা' প্রভৃতি পদ স্মরণ করা যাইতে পারে।

মগ্‌গং চ্চিঅ অলহন্তো হারো পীণুন্নআণ থণআণম্।
উব্বিগ্‌গো ভমই উরে জমুণাণইফেণপুঞ্জো ব্ব॥ ৭।৬১

"পীনোন্নত স্তনযুগলের পথ লাভ করিতে না পারিয়া হার যমুনা নদীর ফেনপুঞ্জের ন্যায় বুকের উপর যেন উদ্বিগ্ন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।" ইহার সহিত বিদ্যাপতির—

পীন পয়োধর অপরুব সুন্দর
উপর মোতিম হার।
জনি কনকাচল উপর বিমল জল
দুই বহ সুরসরি ধার।

অথবা বড়ু চণ্ডীদাসের—

গিএ গজমুতী হার মণি মাঝে শোভে তার
উচ কুচ যুগল উপরে।
হর্ষা সমান আকারে সুরেশ্বরী দুই ধারে
পড়ে যেন সুমেরু শিখরে॥

প্রভৃতির স্মরণ করা যাইতে পারে।

দুর্জয়মানহেতু নায়ককে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, অথচ পশ্চাত্তাপ ভোগ করিতেছে এমন নায়িকার প্রতি সখীর উক্তি পাইতেছি,—

পাঅপড়িও ণ গণিও পিঅং ভণন্তো বি অপ্পিঅং ভণিও।
বচ্চন্তো বি ণ রুদ্ধো ভণ কস্‌স কএ কও মাণো॥ ৫।৩২

"পাদপতিত হইলেও তাহাকে গণনা কর নাই, সে প্রিয় বলিলে তুমি তাহাকে অপ্রিয় বলিয়াছ; সে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেও তাহাকে রোধ কর নাই; বল, কাহার জন্য তুমি মান করিয়াছিলে?"

'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে'ও এই ভাবের অমরুর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।১

কর্ণে যন্ন কৃতং সখীজনবচো যন্নাদৃতা বন্ধুবাগ্,
যৎপাদে নিপতন্নপি প্রিয়তমঃ কর্ণোৎপলেনাহতঃ।
তেনেন্দুর্দহনায়তে মলয়জালেপঃ স্ফুলিঙ্গায়তে
রাত্রিঃ কল্পশতায়তে বিসলতাহারোঽপি ভারায়তে॥ ৪১৫

"(দুর্জয় মানহেতু) সখীজনের বচন কানে করিলে না, বান্ধবগণকে অবজ্ঞা করিলে, প্রিয়তম পদে নিপতিত হইলে কর্ণোৎপলের দ্বারা তাহাকে আহত করিলে; সেই জন্যই এখন চন্দ্র দহনের কারণ হইতেছে, চন্দনের প্রলেপ স্ফুলিঙ্গের মত লাগিতেছে, রাত্রি শতকল্পের মত লাগিতেছে এবং মৃণাল হারও ভারী বোধ হইতেছে।" ইহার সহিত আমরা তুলনা করিতে পারি রূপগোস্বামীর কবিতা—

কর্ণান্তে ন কৃতা প্রিয়োক্তিরচনা ক্ষিপ্তং ময়া দূরতো
মল্লীদামনিকামপথ্যবচসে সখ্যে রুষঃ কল্পিতাঃ।
ক্ষৌণীলগ্নশিখণ্ডিশেখরমসৌ নাভ্যর্থয়ন্নীক্ষিতঃ
স্বান্তং হন্ত মমাদ্য তেন খদিরাঙ্গারেণ দন্দহ্যতে॥
বিদগ্ধ-মাধব-নাটক, ৫ম অঙ্ক।

দুর্জয়মানে যে রাধা পদানত অনুনয়ী কৃষ্ণকে বক্র ভ্রূক্ষেপে ভর্ৎসনাদ্বারা প্রত্যাখ্যাত করিয়াছে, অথচ প্রত্যাখ্যাত প্রিয়ের জন্য সখীগণের নিকটে পশ্চাত্তাপ প্রকাশ করিতেছে, তাহার প্রতি এই জাতীয় উক্তি বৈষ্ণব-কবিতার ভিতরে বহু ভাবেই পাওয়া যায়। অমরু-কবি রচিত ঠিক এই জাতীয় একটি কবিতাকেই 'পদ্যাবলী'তে রূপগোস্বামী 'কলহান্তরিতা রাধার প্রতি দক্ষিণসখীবাক্য' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পদটি এই—

অনালোচ্য প্রেম্ণঃ পরিণতিমনাদৃত্য সুহৃদ-
স্ত্বয়া কান্তে মানঃ কিমিতি সরলে প্রেয়সি কৃতঃ।
সমাকৃষ্টা হ্যেতে বিরহদহনোদ্ভাসুরশিখাঃ
স্বহস্তেনাঙ্গারাস্তদলমধুনারণ্যরুদিতৈঃ। ২৩০

১ পদটি পরবর্তী বহু সংগ্রহগ্রন্থেও স্থান পাইয়াছে।

১ শ্লোকটি 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' ধৃত।

"হে সরলে, প্রেমের পরিণতি আলোচনা না করিয়া, সুহৃদ্‌গণকে অনাদর করিয়া প্রিয় কান্তের উপরে কেন মান করিয়াছিলে? তুমি স্বহস্তে এই বিরহাগ্নিতে উদ্দীপ্তশিখ অঙ্গারকে আলিঙ্গন করিয়াছ, এখন অরণ্যরোদন করিয়া কি ফল হইবে?" পদটি 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়', 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'সুভাষিতাবলী', 'সুক্তি-মুক্তাবলী' প্রভৃতি বহু সংগ্রহগ্রন্থে 'মানিনী' সম্বন্ধে পদের মধ্যে কিঞ্চিৎ পাঠান্তর সহ স্থান পাইয়াছে।

উপরে যে গাথাগুলি লইয়া আলোচনা করিলাম ইহা ব্যতীতও এই 'গাহা-সত্তসঈ'-তে এমন অনেক গাথা পাওয়া যায় যাহাকে স্পষ্ট ভাবে কোন বিশেষ বৈষ্ণব-কবিতার সহিত যুক্ত করিতে না পারিলেও তাহাদের দ্বারা অস্পষ্ট ভাবে অনেক বৈষ্ণব-কবিতার স্মরণ হয় এবং এই কবিতাগুলির সহিত বৈষ্ণব-কবিতার একটা স্বাজাত্য বেশ লক্ষ্য করা যায়। একটি গাথায় আছে—

ণ মুঅন্তি দীহসাসং ণ রুঅন্তি চিরং ণ হোন্তি কিসিআও।
ধণ্ণাও তাও জাণং বহুবল্লহ বল্লহো ণ তুমম্‌। ২।৪৭

"দীর্ঘশ্বাসও ফেলে না, দীর্ঘকাল কাঁদেও না, কৃশাও হয় না, সেই সব ধন্যা (নারী)—যাহাদের, হে বহুবল্লভ, তুমি বল্লভ নও।" এ পদটি বিরহিণী গোপীদের মুখে বহুবল্লভ কৃষ্ণের প্রতি অতি চমৎকার মানায়।

বসন্তকাল অপেক্ষা বর্ষাকালই বিরহিণীর বেদনাকে তীব্রতর করিয়া দেয়; তাই এক প্রোষিতভর্তৃকা নারী বলিতেছে,—

সহি দুম্মেন্তি কলম্বাইং জহ মং তহ ণ সেসকুসুমাইং। ২।৭৭

"হে সখি, (এই বর্ষাকালের) কদম্বফুলগুলি আমাকে যেমন করিয়া বেদনা দেয় অন্য (বসন্ত প্রভৃতিতে প্রস্ফুটিত) কোন ফুলই তেমন করিয়া ব্যথিত করে না।"

আর একটি গাথায় এক দূতী নায়িকার পক্ষ হইতে নায়কের নিকটেই গিয়াছে, অথচ নায়কের সহিত তেমন যেন কোন প্রয়োজন নাই, প্রসঙ্গচ্ছলেই যেন একটা সংবাদমাত্র দিয়া যাইতেছে, এমনই ভান করিয়া বলিতেছে—

ণাহং দুঈ ণ তুমং পিও ত্তি কো অম্হ এত্থ বাবারো।
সা মরই তুজ্ঝ অজসো তেণ অ ধম্মক্খরং ভণিমো। ২।৭৮

"আমি দূতী নই, তুমিও কোন প্রিয় নও, সুতরাং তোমার সঙ্গে এখানে আমার কি ব্যাপার? তবে সে মরিতেছে, তোমার নিন্দা হইবে, সুতরাং ধর্মের জন্য কথা বলিতেছি।" এই দূতী চাতুর্যে এবং মাধুর্যে পরবর্তী কালের বৃন্দাবন-লীলার রসিকা এবং চতুরা বৃন্দা, ললিতা প্রভৃতি দূতীগণকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। অপর একটি চতুরা দূতীকে বলিতে দেখি—

মহিলা সহস্সভরিএ তুহ হিঅএ সুহঅ সা অমাঅন্তী।
দিঅহং অণণ্ণকম্মা অঙ্গং তণুঅং পি তণুএই। ২।৮২

"ওগো ভাগ্যবান্‌, সহস্র মহিলাদ্বারা পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে তোমার হৃদয়; সে (তোমার প্রেয়সী নায়িকা) আর সেখানে স্থান লাভ করিতে না পারিয়া সমস্ত দিবসে অনন্যকর্মা হইয়া তনু অঙ্গকে আরও তনু করিতেছে।"

আর একটি গাথায় আবার নায়ক বলিতেছে—

আঅম্বন্তকবোলং খলিঅক্খরজম্পিরিং ফুরন্তোট্‌ঠিম্‌।
মা ছিবসু ত্তি সরোসং সমোসরন্তিং পিঅং ভরিমো। ২।৯২

"আতাম্রান্তঃকপোলা স্খলিতাক্ষরজল্পনশীলা স্ফুরদোষ্ঠী—'আমাকে ছুঁইও না' বলিয়া সরোষে সরিয়া যাইতেছে—এমন প্রিয়াকে আমি স্মরণ করিতেছি।" এই স্মরণের সহিত পরবর্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যে বর্ণিত খণ্ডিতা রাধার মূর্তিখানিও একবার স্মরণ করুন।

দুঃসহ বিরহ-বেদনায় ক্লিষ্টা এক নায়িকা বলিতেছে—

জম্মন্তরে বি চলণং জীএণ খু মঅণ তুজ্ঝ অচ্চিস্সম্‌।
জই তং পি তেণ বাণেণ বিজ্ঝসে জেণ হং বিজ্ঝা। ৫।৪১

"হে মদন, জন্মান্তরেও আমি আমার জীবন দিয়া তোমার অর্চনা করিতে প্রস্তুত আছি, যদি তোমার যে বাণের দ্বারা আমি বিদ্ধ হইয়াছি তুমি তাহাকেও (আমার প্রিয়কেও) সেই বাণ দিয়া বিদ্ধ কর।" আমরা পরবর্তী কালের চণ্ডীদাসের রাধার একটা আভাস ইহার ভিতরেই লাভ করিতে পারি। চণ্ডীদাসের সুর আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে আর দু'-একটি গাথায়—

বিরহেণ মন্দরেণ ব হিঅঅং দুদ্ধোঅহিং ব মহিঊণ।
উম্মূলিআই অব্বো অম্হাং রঅণাই ব সুহাইং। ৫।৭৫

"মন্দর যেমন ক্ষীরাব্ধি মন্থন করিয়া রত্নসকল নিষ্কাশিত করিয়াছিল, হায়! তেমনই বিরহও হৃদয় মন্থন করিয়া আমার সমস্ত সুখ উৎপাটিত করিয়াছে।"

কিং রুবসি কিং অ সোঅসি কিং কুপ্পসি সুঅণু এক্কমেক্কস্স।
পেম্মং বিসং ব বিসমং সাহসু কো রুন্ধিউং তরই। ৬।১৬

"কেন কাঁদিতেছ, কেন শোক করিতেছ, কেনই বা হে সুতনু সকলের উপরে করিতেছ কোপ? বিষের মত বিষম প্রেম, বল কে তাহা রোধ করিতে সমর্থ হয়।"

আমরা পূর্বে 'গাহা-সত্তসঈ' হইতে রাধা ও গোপীগণ লইয়া কৃষ্ণপ্রেমের যে কয়েকটি পদ উদ্ধার করিয়াছি সেই পদগুলি উপরে আলোচিত প্রেম-গাথাগুলির সহিত একসঙ্গেই স্থান পাইয়াছে। উপরের গাথাগুলির প্রকৃতি বিচার করিলে মনে হয়, জিনিসটি সঙ্গতই হইয়াছে। অধিকাংশ গাথাই এমন এক ধর্মের এবং এক ধরণের যে রাধা-কৃষ্ণের উল্লেখ থাকা-না-থাকা লইয়া তাহাদের ভিতরে একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা ছাড়া আকারে-প্রকারে আর কোনও মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা সর্বত্র সহজ নয়। পরবর্তী কালের সংগৃহীত 'প্রাকৃত-পিঙ্গল' ছন্দোগ্রন্থে যে প্রাকৃত গাথার উদ্ধৃতি দেখি তাহার বহু শ্লোকের সহিতও পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-কবিতার বর্ণনার মিল এবং সুরের মিল আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। যেমন:—

ফুল্লা-ণীবা ভম ভমরা দিট্‌ঠা মেহা জলে সমলা।
ণচ্চে বিজ্জু পিঅ সহিআ আবে কংতা কহু কহিআ।

"নীপগুলি পুষ্পিতা, জলশ্যামল মেঘগুলি ঘুরিয়া-বেড়ান ভ্রমরের মত দেখা যাইতেছে, বিজলী নৃত্য করিতেছে; হে প্রিয়সখি, আমার কান্ত কবে আসিবে?"১

১ বর্ণবৃত্তম, ৮১। তুলনীয়:—

গজ্জে মেহা নীলা কারউ
সদ্দে মোরউ উচ্চা রাবা।
ঠামা ঠামা বিজ্জু রেহউ
পিংগা দেহউ কিজ্জে হারা।

'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' হইতে আরম্ভ করিয়া 'সুভাষিতাবলী', 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'সূক্তিমুক্তাবলী' বা 'সুভাষিত-মুক্তাবলী', 'শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি', 'সূক্তিরত্নহার' প্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থগুলিতে আমরা বয়ঃসন্ধি-বর্ণনা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমের প্রায় সব অবস্থার বিবিধ বর্ণনা পাইয়া থাকি। এক 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'ই আমরা নারীসৌন্দর্য এবং নারীপ্রেমকে অবলম্বন করিয়া 'শৃঙ্গারপ্রবাহের যে বীচিসমূহ' প্রাপ্ত হই তাহা লক্ষণীয়। এখানে আমরা এই বয়ঃসন্ধি, কিঞ্চিদুপারূঢ়-যৌবনা, মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা, নবোঢ়া, বিস্রব্ধনবোঢ়া, কুলস্ত্রী (স্বকীয়া), অসতী (পরকীয়া), খণ্ডিতা, অন্তরতিচিহ্নদুঃখিতা, বিরহিণী, দূতীবচন, তদুক্তাখ্যান, উদ্বেগকথন, বাসকসজ্জা, স্বাধীনভর্তৃকা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, গোত্রস্খলিত, মানিনী (উদাত্ত মানিনী, অনুরক্ত মানিনী) প্রবসদ্ভর্তৃকা, প্রোষিতভর্তৃকা, অভিসারিকা (দিবাভিসারিকা, তিমিরাভিসারিকা, জ্যোৎস্নাভিসারিকা, দুর্দিনাভিসারিকা) প্রভৃতি সম্বন্ধে রচিত বহু শ্লোক। এই শ্লোকগুলির সহিত বৈষ্ণব-কবিতাগুলি মিলাইয়া পড়িলেই আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ্য পরিলক্ষিত হইবে। সমস্ত বিষয় লইয়া বিস্তারিত তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ এবং প্রয়োজনও আমাদের নাই ; সুতরাং বাছিয়া বাছিয়া কিছু কিছু সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি।

'সদুক্তিকর্ণামৃতে' রাজশেখর-কৃত১ একটি শ্লোকে উদ্ভিন্নযৌবনা নারীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে,—

পস্ত্যাং মুক্তান্তরলগতয়ঃ সংশ্রিতা লোচনাভ্যাং
শ্রোণীবিম্বং ত্যজতি তনুতাং সেবতে মধ্যভাগঃ।
ধত্তে বক্ষঃ কুচসচিবতামদ্বিতীয়ং চ বক্ত্রং
তদ্গাত্রাণাং গুণ-বিনিময়ঃ কল্পিতো যৌবনেন। ২।২।৪

"পদযুগল চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়াছে, লোচনদ্বয় তাহার আশ্রয় লইয়াছে ; শ্রোণীবিম্ব তনুতা ত্যাগ করিয়াছে, মধ্যভাগ (কটিদেশ) এখন তাহাকে সেবা করিতেছে ; বুক এখন (মুখকে ত্যাগ করিয়া) কুচযুগের সচিবতা গ্রহণ করিয়াছে, ফলে মুখ এখন অদ্বিতীয় (পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে অদ্বিতীয়, আবার স্ব-মহিমায়ই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দ্বিতীয়বিরহিতভাবেও অদ্বিতীয়)। এই ভাবে যৌবন আসিয়া তাহার গাত্রসকলের গুণবিনিময় করিয়া দিয়াছে।" শতানন্দের আর একটি শ্লোক দেখি—

গতে বাল্যে চেতঃ কুসুমধনুষা সায়কহতং
ভয়াদ্বীক্ষ্যেবাস্যাঃ স্তনযুগমভূন্নির্জিগমিষু।
সকম্পা ভ্রূবল্লী চলতি নয়নং কর্ণকুহরং
কৃশং মধ্যং ভুগ্না বলিরলসিতঃ শ্রোণিফলকঃ। ২।২।৫

"বাল্য গত হইলে চিত্ত কুসুমধনু (মদনের) দ্বারা সায়কহত হইয়াছে ; ইহা দেখিয়া ইহার স্তনযুগ ভয়েই যেন নির্গত বা নিষ্ক্রান্ত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছে, ভয়ে ভ্রূবল্লী কম্পিত হইতেছে, নয়ন কর্ণকুহরের দিকে চলিতেছে, মধ্যভাগ কৃশ হইয়া গিয়াছে, বলি বক্রতা লাভ করিয়াছে, নিতম্বযুগল অবসন্ন হইয়াছে।"

এই পদগুলির সহিত বিদ্যাপতির শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির কবিতা—

সৈসব জৌবন দরসন ভেল।
দুহু পথ হেরইত মনসিজ গেল॥
মদনক ভাব পহিল পরচার।
তিন জন দেল ভীন অধিকার॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
একক খীন অওক অবলম্ব॥
চরণ চপল গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতল জাব॥

অথবা,— দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খীন॥
আবে মদন বঢ়াওল দীঠ।
সৈসব সকলি চমকি দেল পীঠ॥
সৈসব ছোড়ল সসিমুখি দেহ।
খত দেই ভেজল ত্রিবলি তিন রেহ॥

অথবা,— সৈসব জৌবন দুহু মিলি গেল।
শ্রবনক পথ দুহু লোচন লেল॥

প্রভৃতির তুলনা করিয়া দেখুন। বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির কবিতায় রাধার শৈশবের পর যৌবনের প্রথম আগমনে যত শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তনের বর্ণনা রহিয়াছে তাহার অনেক জিনিসই টুকরা টুকরা হইয়া ছড়াইয়া আছে সংগ্রহগ্রন্থগুলির বয়ঃসন্ধি এবং 'তরুণী' বর্ণনার শ্লোকগুলির ভিতরে।১ [আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

ফুল্লা নীবা পীবে ভমরু দকখা মারুঅ বীজংতাএ।
হংহো হংজে কাহা কিজ্জউ আও পাউস কীলংতাএ। ঐ—১৮১
আরও তুলনীয়, ঐ, ৮১ ; ১৪৪ ইত্যাদি।

১ শার্ঙ্গধর পদ্ধতিতে (পিটার পিটারসন্ সম্পাদিত) কবির নাম নাই (৩২৮২)

---

১ তু: ভ্রুবোঃ কাচিল্লীলা পরিণতিরপূর্বা নয়নয়োঃ
স্তনাভোগো ঽব্যক্তস্তরুণিমসমারম্ভসময়ে।
বীর্যমিত্র (কবীন্দ্রবঃ), সদুক্তিকঃ (রাজোক)।
... ... ভ্রূ-লাস্যযোগ্যাগ্রহঃ।
তির্যগ্‌লোচনচেষ্টিতানি বচসি চ্ছেকোক্তিসংক্রান্তয়ঃ ইত্যাদি।
কবীন্দ্রবঃ।
তথাপি প্রাগল্‌ভ্যং কিমপি চতুরং লোচনযুগে। কবীন্দ্রবঃ
লীলাস্খলচ্চরণচারুগতাগতানি
তির্যগ্বিবর্তিতবিলোচনবীক্ষিতানি।
বামভ্রুবাং মৃদু চ মঞ্জু চ ভাষিতানি
নির্মারমায়ুধমিদং মকরধ্বজস্য। কবীন্দ্রবঃ
অপ্রকটবর্তিতস্তনমণ্ডলিকানিভৃতচক্রদর্শিন্যঃ।
আবেশয়ন্তি হৃদয়ং স্মরচর্যাগুপ্তযোগিন্যঃ।
গোসোক (সদুক্তিকঃ)।
অহমহমিকাবদ্ধোৎসাহং রতোৎসবশংসিনি
প্রসরতি মুহুঃ প্রৌঢ়স্ত্রীণাং কথামৃতদুর্দিনে।
কলিতপুলকা সদ্যঃ স্তোকোদ্গতস্তনকোরকে
বলয়তি শনৈর্বালা বক্ষস্থলে তরলাং দৃশম্।
ধর্মাশোক দত্ত (সদুক্তিকঃ)
এই প্রসঙ্গে 'সূক্তিমুক্তাবলী'-ধৃত 'বয়ঃসন্ধি পদ্ধতি' ও 'তারুণ্য পদ্ধতি' দ্রষ্টব্য।

চুম্বন

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

ভুবনে প্রথম নয়নের নীরে কে দিলো রচিয়া ঘুম-বন ?
সে যে গো প্রথম চুম্বন !

তার আগে ছিল মর্ত্য—স্বর্গ, ছিলো শুধু ভোগ-সুখ-হাস—
ছিল না মৃত্যু, ছিল না অশ্রু, ছিল নাকো শোকদুখপাশ !
ছিলো অমরের অধিকার—
দীপ্ত চেতনা-জ্যোতি তার—
চপল-চরণে ছিল না মরণে গতি তার !

আকাশ সেদিন কেঁদেছিলো সুখে, হয়েছিল তার মন-উদাস !
বাতাস ফেলেছে ঘনশ্বাস—
এ কি মানবের সুখ-দানবের দেশে বনবাস !
কে আনিলো ব্যথা সুখপাশ করি চূর্ণ ?
মরণ মথি' কে করিলো জীবন অমৃতপরিপূর্ণ ?
বেদনা-ক্ষরণ-চেতনায় নিয়ে এলো নব-মৌসুম্ কোন্
যোজনগন্ধা কুসুমের ? সে কি দেবদুর্লভ চুম্বন ?

সেদিন হতে যে মর্ত্য—মর্ত্য, স্বর্গ রহিলো মনে তার,—
স্বপ্নের মাঝে ব্যথা বাজে, কভু জাগে স্মৃতি অকারণে তার !
মর্ত্য রচিলো মরণ-বিরহ-স্বপ্ন-অশ্রু-ভুল-হার—
নিতি ঝরে পড়ে, নিতি সে ফোটায় ফুল তার !
ব্যথার সায়রে ফোটে তার রূপশতদল,
অশ্রুর পরে করে চুম্ অনুপ ঝলমল !
জীয়নকাঠিতে জাগালো নবীন-যৌবন—
সেই যে আদিম চুম্বন !

সেদিন পরশ লভিল পরম ভূমায়ই—
প্রথম কুমারে যেদিন প্রথম কুমারী
আপনারে দিয়ে আপনারে পেলো—সে-দান প্রথম চুমারি !

আদি-ঋষি যেন আদি-কবি হয়ে গাহিয়া উঠিল কোন্ গান—
"ওগো অমৃতপুত্রেরা, আজি পেয়েছি সুধার সন্ধান !
আঁধারের পারে তপনের মত জ্যোতি তার—
মনের দুয়ারে স্বপনের মত গতি তার।
এই দেহ মথি' সেই সুধা ওঠে অতনু-গতির বৈদেহী—
রূপালী পাত্রে উপচার রস দেহ-আরতির—মৈত্রেয়ী
অমৃত-আশায়—চাও যবে।
তোমার মাঝেই আছে সেই-মধু, দাও যদি তুমি পাও তবে।
এ-হৃদয় হয় মধুবৎ।
মধু-দেহ ভরে' মনোমধু ক্ষরে ; মধুর জীবন, মধু পথ।
আকাশ-বাতাস-ধরণীর ধূলি সবকিছু হয় মধুমৎ।"

বিশ্বে সেদিন কবে কেটে গেছে, পুরানো দিন তো আর নাই !
সেদিন এ-পথে যে-পথিক গেছে পায়ের চিহ্ন তার নাই !
আজি ধরণীর বক্ষে নবীন অঞ্চল—
শুধু হিয়া-মাঝে সেই সুর বাজে, আজো নাচে চিরচঞ্চল !
শুধু ফুল ফোটে আর ফুল টোটে—আছে আজো সে-কুসুমবন !
আছে সেই ব্যথা, আর আছে সেই চুম্বন !

আজি মর্ত্যের চোরা পথে প্রেম ভয়ে ভয়ে করে অভিসার—
সে-চরণ-ধ্বনি শুধু ওঠে রণি' ছন্দে ছন্দে কবিতার।
দিকে দিকে শির তুলেছে অধীর পাষাণ-বধির-কারাগার—
কই দীপ ? কই, কোথায় বা দ্বীপ ? অকূল অথির পারাবার !
আজিকে দৈত্য মেলেছে লক্ষ বাহুপাশ,
নৃত্য-ছন্দ-রস-আনন্দ-সৌন্দর্যেরই রাহুগ্রাস !
সে-অমৃত কই ? কই আনন্দ ? আগে চাই আর পিছু চাই—
দিকে দিকে শুধু—হা হা, কারার হাহাকার—আর কিছু নাই !
তিলে তিলে আজ মানুষ আপন বাঁধিছে মরণ-ফাঁস প্রাণে,
তারই হা-হুতাশ মেলেছে পিঙাস আঁধি-আবরণ আসমানে।
সে-গগন ব্যেপে হাহাকার ছেপে সুর কেঁপে ওঠে চুমচুম্—
কারার প্রাচীর পলকে মিলায়, প্রহরীর চোখ ঘুমঘুম্,
পাহারার বেড়া-বন্ধন
কোথা চলে যায় দৈবদয়ায়—বুঝি দৈবকীনন্দন
বসুদেব-সুত জন্ম নিলেন দৈবাৎ দেহদুর্গে,
বসুধার সুধা-বণ্টনে আর মারতে কংসাসুরকে।
দিকে দিগন্তে মিলনমন্ত্রে বাজে কোন্ সুর-গুঞ্জন—
বন্ধু বঁধুর নিলো কি মধুর চুম্বন ?

দুটি অধরের কপোতকূজনে দুজনের মধুগুঞ্জন !
মনমন্থন ওঠে সুধা কোন্ ক্ষণমন্থন চুম্বন ?
চুম্বনমধু উছলে না শুধু ধরণীর এই কারাতে,
চুম্বনধারা হয়ে পথহারা কাঁপিছে তারাতে তারাতে !
জোনাকি কি চায় আরেক জোনাকে পরাতে আলোর উল্কি—
প্রেম-কামনার চুম্কি ?
তাই কি আকাশে আঁধারের পাশে ফাটে উল্কার ফুল্কি ?
অণু যে ঘুরিছে অণুরে বেড়িয়া আপন নৃত্যছন্দে—
সেই অনুরাগে শ্রী-চৈতন্য মিলিছে নিত্যানন্দে !
চুম্বন আছে—তাই তো মানুষ বন্ধন-মাঝে গায় গান !
চুম্বন আছে—তাই চরাচর মরণের মাঝে পায় প্রাণ !
চুম্বন আছে—তাই তো ফুটেছে বিলকুল্
গগনকুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে নীল ফুল !
জীবনের স্রোত গ্রহে গ্রহে বেগে তাই ছোটে অভিযান-পথে—

অসীমের দেশে শেষে গিয়ে মেশে প্রাণ পেয়ে আন্ প্রাণ হতে।
চুম্বন আছে—তাই আনন্দে তালে তালে
নেচে যায় তারা পুলক-ছন্দে লোকে-লোকান্তে কালে কালে?
ভাঙে কারার সিংহদ্বার আর বিপ্লব-ধ্বজাটাই তো
ধরে যে মানুষ, পরের জন্য মরে যে মানুষ তাই তো।
দুঃখ জ্বালার এই বসুধার সুধা ওই—
অনাদি কালের অমর-ক্ষুধার ও-চুমোই!

সোনার কাঠির জাগরণ চুমু, রূপালী কাঠির নিদ্-মোহ—
বিধিবিরুদ্ধ মানুষের চির-বিদ্রোহ!
চুম্বন-টানে বাঁধা আছে তাই খসিছে চন্দ্রসূর্য না,
চুম্বন বুঝি অনাদি কবির গভীর ছন্দমূর্ছ'না!
চুম্বন যেন নটীর নৃত্য-গোপন মনের হর্ষ—
চুম্বন যেন মুকুল-ফোটানো মলয়বনের স্পর্শ!

মানুষের যত ব্যগ্র বাসনা দিশেহারা
আনন্দে যেন চুম্বনে আসি মিশে তারা!

চুম্বন যেন শিহরণ-তোলা মধুর দখিন থেকে হাওয়া,
চুম্বন যেন দূরে পথভোলা অচিন্ পাখীর ডেকে যাওয়া!
চুম্বন যেন নন্দন থেকে খসে-পড়া কোন্ মন্দার,
তুজন-যোজন সুরভি যোজনগন্ধার—
অধর-অতিথি ধরিবার লাগি খুলিলো কে প্রাণ-মন-দ্বার?
চুম্বন বুঝি কে দিলো শূন্যে গালে-গাল—
উষা-সন্ধ্যায় সেই-রাগে সে যে হয়ে ওঠে আজো লালে লাল!
আকাশের মত চুমুও শূন্য (আকাশ থেকেই আসে সব),
এক হাজার চুমু—হাজার শূন্য—একটি চুমুর পাশে সব—
প্রথম চুমুর রাসে সব।
এই জীবনের যা কিছু পাবার সহস্র গুণে মেলেই তো—
শূন্য হলেও—সে-একের পরে এলেই তো!
অধরে-অধরে মেলবার
পথে কি অনাদি পেলো তার আদি, অনন্ত পেলো শেষ তার?

চুম্বন যেন তুফানের মত উলরোল,—
বন্যার মত ঢেউয়ে ঢেউয়ে তার ফুললোল!
চুম্বন যেন 'ভালোবাসি' শুধু-বলে-যাওয়া,
জোৎস্নার মত মোহ-ছাওয়া মধু-গলে-যাওয়া!
চুম্বন যেন বিদ্যুতাহত চেতনা—
অভিসার-পথ-কণ্টক-ক্ষত-বেদনা!
চুম্বন-তৃষা দূরে-সরে-যাওয়া মরীচিকা—
মরণে মিলায় চির-জ্বালা-দাওয়া ওরই শিখা!

চুম্বন যেন পুলক রোঁয়াতে রোঁয়াতে—
মূর্ছা যেন সে ফুলের পেলব ছোঁয়াতে!
চুম্বন যেন আননে মাখায় কুমকুম্—
চুম্-চুম্ আনে নয়ন-পাখায় ঘুম-ঘুম্!
চুম্বন যেন যুঁই-ঝরে-পড়া বনতলে—
মন হানি' যেন মন-জানাজানি কোন্ ছলে!
কোন্ ঢেউ এসে লাগে অধরের কূলে হায়,
পলকে বিশ্বভুবন পুলকে ভুলে যায়!
প্রলয়ের দোলা লাগে সৃজনের মূলে হায়!
এ কোন্ সেতার সুরে বেঁধে দিলো বীণ্‌কার—
পরশে যে তার ক্ষণে বেজে ওঠে গান সেথা চিরদিনকার!

চুম্বন যেন অডোর মালার বন্ধনহারা বন্ধন—
চুম্বনে জাগে বন্দীশালার অপরূপ রূপ-নন্দন!
চুম্বন যেন নব-কিশলয়ে বনমর্মের মর্মর—
ধরার তৃষিত অধরে যেন-এ-ভরা ভাদরের ঝর্‌ঝর্!

চুম্বন যেন ধ্বংস—নতুন করে গড়িবার সাধনেই!
ধরাতীতে কোন্ ধরিবার তরে অধরের মায়া-ফাঁদ এই!
নব বন্যার আবর্ত চুমো, পুরনো-প্রেমের জোড়াতালি,
পঙ্কিল পথে শঙ্কিল গতি, মরুভূর বুকে চোরাবালি!
রুদ্র যেন সে এক হাতে করে অবিরাম সব নির্মূল,
আরেক হাতের প্রসাদে সে তার মুকুল ফোটায় বিলকুল্!

চুম্বন যেন শান্ত পরশ স্নিগ্ধ অমল প্রভাতের—
গভীর রাতের ফেনিলোচ্ছ্বাস উচ্ছল জল-প্রপাতের!
কৈশোরে সে যে কৌতুক-হাসি-খুশিঢালা খুশ-কুতূহল!
যৌবনে স্মৃতি-স্বপ্নের—তৃষা-বেদনা-জ্বালার তুষানল!
প্রেম কথা কয় চুম্বনে—যেন ঝরণার কলকল কথা,
চুম্বন যেন যুগান্তবাহী ক্ষণিকের চল-চপলতা!
চুম্বন যেন কিছুটা বিষের, কিছুটা সে গড়া অমৃতের—
গানে কিছু তার গাওয়া যায়, ফের কিছু থাকে ধরা অগীতের!
কিছুটা তাহার ফুলে ফুলে ওঠে দুলে দুলে;
কিছুটার ঢেউ লাগে তারকার কূলে কূলে!
কিছুটা তো পেলো—দিলো আর নিলো মন যার,
কিছুটা গোপনে ভুবনে ভুবনে দিলো মনে মনে ঝঙ্কার!
কিছু ঘরে ঘরে আরতির দীপ জেলে দিল,
কিছু গগনে গগনে জ্যোতির আসন মেলে দিল!
একটি বুকের বাঁশরীতে কিছু সুর ছায়,
বিশ্ববীণার তারে তারে কিছু মূরছায়!
কিছুটা তাহার শূন্যে মিলালো, কিছু লুটে নিলো ত্রিভুবন—
পলকের দান চির-অফুরান—চুম্বন!

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

৺মনোমোহন ঘোষ

জুরীদের কাছে জজের সংক্ষেপণা

জুরী ভদ্রমহোদয়গণ,—আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে তার নিজের সন্তানকে হত্যা করেছে—নিজের সন্তান, ছোট্ট মেয়ে, ১০ বছরের নীচু বয়স, যাকে সে খুবই ভালবাসত, যাকে মায়া-দয়া করত। প্রত্যক্ষদর্শী হল মৃত কন্যার চাইতে বয়সে ছোট আসামীর আর এক শিশুকন্যা। হত্যার মতলব কি তা পরিষ্কার না বোঝালে, অথবা আসামী যে উন্মাদ এ প্রমাণ না করলে এই নির্মম পাশব হত্যা বিশ্বাস করা চলে না। আসামীর এই কাজের হেতু সম্বন্ধে বাদী পক্ষ বলতে চায় যে, কদম আলি ফকীরের সঙ্গে আসামীর ঝগড়া ছিল। কদম আলির বৌএর সঙ্গে আসামীর অপরাধজনক ঘনিষ্ঠতা আছে সন্দেহ করে ফকীর আসামীর বিরুদ্ধে মামলা এনেছিল। তাই শত্রু কদম আলিকে একটা অভিযোগে জড়িয়ে ফেলবার জন্যে আসামী তার মেয়েকে খুন করেছে।

আপনাদের কাছে এ কথা গোপন করা অসম্ভব যে, নদীয়ায় এই মামলার বিচারে জুরীরা আসামীকে হত্যার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করলে, তার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু সরকারী উকীল ঠিকই বলেছেন যে, সেই কারণে আপনারা কোন মতে প্রভাবান্বিত না হয়ে মামলা যেন সম্পূর্ণ নতুন, এই ভাবেই আপনাদের বিবেচনা করতে হবে।

কি ভাবে আসামী তার সন্তান নেকজানকে হত্যা করেছে বলে বলা হয়েছে তা এই—২৭ মার্চ্চ, সোমবার বিকাল বেলা আসামী তার স্ত্রীকে তার ভাইয়ের বাড়ী পাঠায়। স্ত্রী একটা ছোট মেয়ে আর কোলের এক শিশুকে সঙ্গে নেয়। আসামীর কাছে থাকে দুই মেয়ে, নেকজান আর গোলক। বারান্দায় একই চ্যাটাইয়ে তিন জন ঘুমোয়। নেকজানের লাথিতে রাত্রে গোলকের ঘুম ভেঙ্গে যায়। গোলক চোখ খুলে দেখে যে, তার বাবা নেকজানের গলা এমন করে পা দিয়ে চেপে ধরেছে, নেকজানের রা বের হচ্ছে না, সে খালি ছটফট করছে। তার পর আসামী একটা শড়কী তার পেটে বসিয়ে দেয়। এর পর নেকজান আর নড়ে-চড়ে না। গোলক তাকে ঠেলে দেখে, ও মরে গেছে। এখন, যদি কাউকে কণ্ঠরোধ করে শড়কী-বিদ্ধ করা হয়, তখন আপনারা আশা করতে পারেন যে, লাসের ময়না তদন্তে কোন চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ নিশ্চয় আমাদের বলবেন যে, কণ্ঠরোধের লক্ষণ তিনি পেয়েছেন। তিনি এ-ও জানাবেন যে, মৃত্যু ঘটেছে হয় আংশিক কণ্ঠরোধে ও আংশিক অস্ত্রাঘাতের ফলে (অর্থাৎ দুই কারণের সম্মিলনে), অথবা সম্পূর্ণ কণ্ঠরোধের ফলে বা সম্পূর্ণ অস্ত্রাঘাতের ফলে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ডাক্তারী প্রমাণে নিম্নলিখিত অস্বাভাবিক ফল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে— ১। ডাক্তার লাস কেটে কণ্ঠরোধের কোন লক্ষণই দেখতে পাননি। ২। ডাক্তার লাস পরীক্ষা করে যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে তিনি পেটের ক্ষতকে মৃত্যুর কারণ বলে বলেছেন, কিন্তু সে ক্ষত মোটেই গুরুতর ক্ষত নয়। ৩। এই ডাক্তারের উচ্চতন চিকিৎসক, যাঁর কাছে রিপোর্ট দাখিল করা হয়, তিনি আমাদের বলেছেন যে, বেঁচে থাকবার সময় অথবা মরবার পর অস্ত্রাঘাতের ক্ষত হয়েছে এ সিদ্ধান্ত করবার মত পর্য্যাপ্ত উপকরণ রিপোর্টে নেই। ৪। এই উচ্চতন চিকিৎসকটি আমাদের বলেছেন যে, সাপের কামড়ে যে মৃত্যু হয়নি এ কথা নিশ্চিত করে বলবার পর্য্যাপ্ত হেতু লাস-পরীক্ষাকারী ডাক্তার পেয়েছিলেন বলে তিনি মনে করেন না। ৫। এই উচ্চতন চিকিৎসকটি এ কথাও আমাদের বলেছেন যে, পেটে সর্প দংশনের ফলে যদি শিশু মরে থাকে, তাহলে মৃত্যুর অল্পক্ষণ পরে কেউ দংশন-ক্ষত বড় করে দিয়ে থাকবে; মৃতদেহে যে সব লক্ষণ দেখা যায়, এ অনুমানের কোনটাই তাদের বিরোধী নয়।

মাত্র এই রকমের ডাক্তারী প্রমাণই আপনাদের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করে আপনাদের পক্ষে এ সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব যে, নেকজানকে কেউ খুন করেছে।

নেটিভ ডাক্তারটির জবানবন্দীর সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার প্রকাশ পায়, তা বোধ হয় আপনাদের মনে আছে। ময়না তদন্তের রিপোর্টের তিন কলমে তিনি লিখেছেন যে, ক্ষত ত্রিকোণাকার। তিনি বলেছেন যে, পুলিস ক্ষতটি ত্রিকোণাকৃতি বলে রিপোর্ট করেছিল, এই কারণে তিনি রিপোর্টে ক্ষত ত্রিকোণাকার লিখেছেন। তার পর দেহে এমন সব লক্ষণ ছিল যাতে কণ্ঠরোধ

বোর্ন-ভিটা যে কতো ভালো খেয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন !

ক্যাডবেরির বোর্ন-ভিটা পান করুন

আপনার শক্তি বাড়বে... শরীরেরও পুষ্টি হবে

পুষ্টিকর পানীয় বোর্ন-ভিটার পেয়ালা হাতে নিয়ে খেতে গেলে প্রথমেই মল্ট ও চকোলেটের গন্ধে মনটা ভরে উঠবে ··· তারপর পেয়ালায় চুমুক দিয়েই বুঝতে পারবেন জিনিসটা কতো ভালো ও সুস্বাদু। স্বাদ ও গন্ধের কথা ছেড়ে দিলেও বোর্ন-ভিটা অত্যন্ত পুষ্টিকর কারণ বোর্ন-ভিটা একাধারে পরিপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত সুষম একটি খাদ্য ও পানীয়। বোর্ন-ভিটা ছোটোবড়ো সকলেরই স্বাস্থ্য, শক্তি ও প্রাণ-প্রাচুর্যকে জাগিয়ে তোলে। এই জন্য ১৪,০০০-এরও বেশি চিকিৎসকের প্রত্যেকেই "ক্যাড-বেরির বোর্ন-ভিটা পান করুন" বলে থাকেন। বোর্ন-ভিটায় আপনার শক্তি বাড়বে ··· শরীরের পুষ্টিও হবে।

প্রতি পেয়ালায়:

শ্বেতসার দুগ্ধজ স্নেহ পদার্থ ডায়াস্টেজ	শরীরের বৃদ্ধি ও শক্তি যোগানের জন্য
প্রোটিন কোকো বাটার	শরীর গঠনের জন্য
খনিজ লবণ	অস্থি গঠনের জন্য
ভিটামিন এ ও ডি	রোগ প্রতি- রোধের জন্য

বোর্ন-ভিটা

একাধারে সংরক্ষণশীল খাদ্য ও পানীয়

CFY-11 BEN

প্রতিদিন ক্যাডবেরির বোর্ন-ভিটা পান করে আপনার স্বাস্থ্য গড়ে তুলুন !

ক্যাডবেরি-ফ্রাই (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড বোম্বাই — কলিকাতা — মাদ্রাজ

বলে সন্দেহ হতে পারে, অথচ এ সম্বন্ধে নেটিভ ডাক্তারটি কোন পরীক্ষাই করেননি। তিনি বললেন, ক্ষত দিয়ে কোন রক্তক্ষরণ হয়েছে বলে মনে হল না, অথচ অস্ত্রাঘাতের পূর্ব্বে রক্তপ্রবাহ স্থগিত হয়েছিল (সম্ভবতঃ এই একমাত্র কারণে রক্তক্ষরণ রুদ্ধ হতে পারে), এ সম্বন্ধে কোন পরীক্ষাই তিনি করলেন না, রিপোর্টেও এর কোন উল্লেখই তিনি করলেন না। দুঃখের সঙ্গে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এই কর্ম্মচারীটি অত্যন্ত খেয়াল-খুশী ভাবে ময়না তদন্ত করেছেন, তিনি এমন ভাবে কাজ করেছেন যাতে মনে হয় যে তাঁর পদোচিত দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি অবহিত নন। বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞের পদে তিনি অধিষ্ঠিত হলেও দেখছি, জীবন-মৃত্যুর ব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণ-তথ্য না পেয়েও তারই উপর আপনার ঢালোয়া মত দিয়ে দিলেন। ক্ষতের কথাই ধরুন। আপনারা শুনলে আশ্চর্য্য হবেন যে এই নেটিভ ডাক্তারটি বলছেন যে, বর্শা বিদ্ধ করলে যেমন ক্ষত হয়, ক্ষতটা তেমনি।

২৮শে তারিখ আসামী থানায় গিয়ে জানাল যে, তার সন্তানকে সাপে কেটে মেরেছে, তার পেটে সামান্য একটা ক্ষত দেখা যাচ্ছে। সামান্য—কথাটা লক্ষ্য করুন। সে নিশ্চয় জানত যে শীগগিরই ঘটনাস্থলে পুলিশ কর্ম্মচারী গিয়ে পড়বে। নেটিভ ডাক্তারটি যেমন ক্ষতের বর্ণনা দিয়েছেন, তেমন ক্ষতই যদি পুলিশ এসে দেখে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। তার পর হেড-কনষ্টেবল এল (স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সে বড় একটা ব্যস্ত হয়ে পড়েনি, গুরুতর একটা ব্যাপার না ঘটলে তার পক্ষে যে আচরণ আশা করা যেতে পারে, সে আচরণই সে করেছিল), এসে মফঃস্বলে চলতি যথারীতি ও মোটামুটি তদন্ত বা সুরথাল করে রিপোর্ট দিল: ক্ষত সামান্য, দেখতে তিন কোণা। সাক্ষী উমাচরণের কথা আপনাদের মনে আছে (এর সম্বন্ধে পরে আমি বলব)। উমাচরণ গ্রামের পঞ্চায়েৎ। সে যখন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, এক-টুকরো কাগজে ত্রিকোণ ও সরল রেখা এঁকে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ক্ষতের আকারটা কেমন ছিল? সে ত্রিকোণ দেখিয়ে দিল। এখন কথা হচ্ছে, মঙ্গলবারের এই তিন কোণা ক্ষতটা বুধ-বৃহস্পতিবারে কি করে চৌকো হল? মামলার এই অংশের সব বিষয় দেখে মনকে এমন এক পথ নিতে হয়, যা ধরে গেলে আমরা বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই। কিন্তু এ পথও চলবে অনিশ্চয়ের কাদার ভিতর দিয়ে। বর্ত্তমান মামলায় আপনাদের সব রকমের জল্পনা-কল্পনা থেকে মুক্ত হওয়া দরকার। প্রত্যক্ষ এই কথাই স্পষ্ট সামনে রাখতে হবে—"আসামীর অপরাধ প্রমাণ করতে সরকার পক্ষ পেরেছে কি?" তবু এ সব কথা আপনাদের সামনে এ জন্য উপস্থিত করলাম যে, এগুলো থেকে এ ধারণাই দৃঢ় হয় যে নেটিভ ডাক্তারটির রিপোর্ট একদম বাজে।

ডাক্তারী প্রমাণ আমাদের অন্ধকারে ফেলে রাখলেও, আপনারা শিশু গোলকের বলা কাহিনী যদি বিশ্বাস করেন, তাহলে এ সিদ্ধান্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট উপকরণ পাচ্ছেন যে, আসামী নেকজানকে খুন করেছে, আর সে খুন হত্যাপরাধ।

এইবার শিশুর বলা কাহিনী অন্যান্য সাক্ষীর জবানবন্দীর সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করে দেখব। এ-সম্পর্কে প্রারম্ভে এটুকু বলব—প্রত্যেক মামলার প্রত্যেকটি বিবৃতি বেশ ভাল করে যাচাই করা দরকার। সচরাচর যা করা হয়ে থাকে তার চাইতে আরও সযত্ন বিবেচনা যদি কোন মামলায় প্রয়োজন থাকে, তা এই মামলার মত মামলায়। এখানে ডাক্তারী প্রমাণ সাক্ষীদের কথা সমর্থন করছে না।

আপনারা এই ছোট মেয়েটিকে দেখেছেন। লক্ষ্য করে থাকবেন যে, মেয়েটা বুদ্ধিমতী। তার কাহিনীর প্রারম্ভে কথার বেশ অমিল দেখা যায়। আজ যা সে বলছে, তার সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যা বলেছিল, তার মিল নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে সে বলেছিল যে, পেচ্ছাপ চেপেছিল তাই তার ঘুম ভেঙ্গে যায়; এখানে বলেছে দিদির লাথিতে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। নদীয়ার জজের কাছে বলেছে, কি যেন গায়ে লাগতেই তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে বলছে, বিস্মরণ হয়েছিল, তাই ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ও-কথা বলে-ছিল। 'বিস্মরণ' বাংলা শব্দটার কথা মনে রাখবেন। কথার অমিলটা গুরুতর। এ থেকে এ সন্দেহ কি আপনাদের মনে জাগে না যে, আগের কথার চাইতে শুনতে ভাল একটা কাহিনী কেউ শিশুর মুখ দিয়ে বলিয়েছে? আর একটা কথা সব চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এই আদালতে সে বলেছে—হত্যার সময় তার বাপকে প্রশ্ন করলে বাপ ফকীরের উপর দোষ চাপাতে তাকে বলেছিল। এ সম্বন্ধে একটা শব্দও সে বনগাঁ বা নদীয়ায় বলেনি। এর ফল অবশ্য আমি যা আগেই বলেছি, অপরাধের মতলব সম্পর্কে কাহিনীর ভিত্তি তৈরী করা। এ সম্বন্ধে পরে আবার আমি বলব। আসামীর বৌকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম, তার উত্তরে সে বলে, মেয়ে তাকে বলে যে, তার বাবা তাকে বলেছিল—"কদম আলির ঘাড়ে দোষ চাপাবে।" এখন, আপনারা কি মনে করেন যে যদি আসামী সত্যি এমন কথা বলে থাকে, তা কি প্রকাশ পাবে মাত্র মামলার বর্ত্তমান অবস্থায়? যদি আসামী এমন কোন কথা না বলে থাকে তাহলে শিশু মিথ্যে কথা বলেছে। যদি সে মিথ্যা কথা বলে থাকে, তবে সে মিথ্যে নিশ্চয় কেউ তাকে শিখিয়েছে। এ-সম্পর্কে নিম্নলিখিত পরিস্থিতির প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করব:—আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে যে, এই মামলার শুনানী এই আদালতে আরম্ভ হয় শুক্রবার। সেদিন তিন জন সাক্ষীর জবানবন্দী নেওয়া হয়। শনিবারের প্রথম সাক্ষী হল মেয়েটি। শুক্রবার সে আদালতে হাজির ছিল। শনিবার তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, শুক্রবার আদালতে হাজির দিয়ে যাবার পর তাকে নিয়ে কি হয়েছিল। সে আমাদের বলে যে, তাকে আর তার মাকে ইনসপেক্টারের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে আর তার মাকে এক-এক করে ইনসপেক্টারের কাছে হাজির করা হয়। শিশুকে তার কাহিনী আবার বলতে বলা হয়। শিশুর কথা থেকেই অবশ্য এ কথা আসে যে, মাকেও এই একই কাজ করতে হয়। মা এ কথা অস্বীকার করছে। আপনারা এদের কথাগুলো যাচাই করে দেখবেন।

তার পর আপনারা লক্ষ্য করবেন যে, শিশুকে একটা খুব সহজ প্রশ্ন করা হয়—তার নানী, মায়ের মা বেঁচে আছে কি না। মেয়েটি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও পরে স্বীকার করে যে, নানী বেঁচে আছে (আর এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে বুড়ী একই বাড়ীতে থাকে)। একবার এ-সম্বন্ধে চাপ দিতে

সে বলেছিল—'মাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।" এ কথা ভাবাই যায় না যে, নানী যে তাদের একই বাড়ীতে থাকে, এ কথা বলতে শিশুর স্বাভাবিক কোন অসুবিধা থাকতে পারে। কাজেই আপনাদের সামনে রইল এই সত্যগুলো—(১) বাবা তার শত্রুর কাঁধে দোষ চাপাতে তাকে বলেছিল, এই সম্পূর্ণ নতুন কথা শিশু মামলার তৃতীয় বিচারের সময় বলছে; (২) সে বলছে, তার কাহিনীর মহড়া দেবার জন্যে, এই আদালত থেকে বেরুবার পর তাকে ইনস্পেক্টারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়; (৩) একটা ব্যাপার, যা তার কাছে দিন-রাত্রির মত বেশ ভাল জানা, সে সম্বন্ধে তাকে প্রশ্ন করা হলে সে বলল যে, তার মাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। আর এক কথা, আপনাদের মনে আছে যে, বয়স্কের মত শিশুকে সত্য পাঠ করান না হলেও, তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হল—সত্য কি? শিশু বলল—মিথ্যে বলা "পাপ"। সে এ কথাও জানাল যে ইনস্পেক্টার এ-সম্বন্ধে তাকে মহড়া দিয়ে নিয়েছে। এখন আমাদের বলতে হবে যে, এ-সব অবস্থা থেকে আপনারা শিশুকে সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত সাক্ষী বলে গণ্য করবেন, না শেখান সাক্ষী বলে ধরবেন? এ-কথা আপনাদের বলা নিষ্প্রয়োজন যে, শিশুরা যা দেখে তাই সহজে বলে, এ জন্য সাধারণতঃ শিশুর সাক্ষ্য মূল্যবান হলেও যদি তাকে শেখান-পড়ান হয়েছে বলে কোন সংশয়ের কারণ থাকে, তাহলে এই সাক্ষ্যের মূল্য নষ্ট হয়ে যায়। বাইরের প্রভাব মেনে নেবার প্রবৃত্তি শিশুর আছে।

তার পর মামলাটা আমাদের কাছে যে ধরণে উপস্থিত করা হয়েছে, তার কথাও ভাবুন। এঞ্জিন চালু করল আসামী। সে পুলিশকে বলল, শিশুর পেটে সামান্য একটা ক্ষত দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে তাকে সাপে কেটেছে। হেড-কনষ্টেবল রামদাস, সহজেই মনে করল এ ব্যাপারে বুদ্ধি খেলাবার মত কিছু নেই, তাই তার অধীনস্থ দ্বারকা রায়কে পাঠাল। বাদী পক্ষ এই লোকটাকে মামুলী সাক্ষী বলে গণ্য করে এসেছে। লাস সনাক্ত তাকেই করতে হবে। কিন্তু জেরায় দেখা গেল, সে একেবারে অনুপযুক্ত সাক্ষী। তদন্তের মুখ্য অংশ গ্রহণ করবার জন্য ইনস্পেক্টার তাকে নিযুক্ত করলেও এবং সে অনেক কিছু জানলেও, বোধ হয় এই মামলা-সংক্রান্ত অন্য কারু চাইতে বেশী জানলেও, যখনই কোন দরকারী প্রশ্ন তাকে করা হয়েছে, প্রায় সব প্রশ্নেই অজুহাত দেখিয়েছে—মনে পড়ে না। এই লোকটার উক্তি এত পরস্পরবিরুদ্ধ যে তা নথিভুক্ত করা শক্ত। নেটিভ ডাক্তারটি যখন ইনস্পেক্টারকে বললেন যে, ব্যাপারটা খুন, তখন ঘটনাস্থলে গিয়ে এ-বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে এই কর্ম্মচারীটিকে পাঠান হয়। সে আমাদের বলেছে যে, আসামীর স্ত্রী ও শিশুকন্যা কি জানে, তৎসম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাবাদ সে তাদের করেনি। এ কথা বিশ্বাস করাই শক্ত। আসামীর স্ত্রী এই কনষ্টেবলের কথার প্রতিবাদ করে বলেছে যে, সে কি জানে তা প্রথমেই বলে দ্বারকাকে।

আমি বলেছি, রামদাস খুব ব্যস্ত-সমস্ত হয়নি। মঙ্গলবার দ্বারকাকে পাঠিয়ে, নিজে গেল বুধবার। আগেই বলেছি, সে সর্পদংশনের অনুমান মেনে নিয়ে, সুরথাল করে সেই মত রিপোর্ট দেয়। তার পরবর্ত্তী আচরণ সম্বন্ধে আপনারা যা-ই ভাবুন না, সে-যে সদিচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে তখন কাজ করেনি, তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই। সে আমাদের বলেছে, পেটের উপরকার ক্ষত সে বেশ যত্ন করে পরীক্ষা করে দেখেছে যে, ক্ষত সামান্য ও তিন কোণা। সে এ-ও বলেছে যে আসামীর বৌকে সে জিজ্ঞেস করেছে, সে কি জানে বলতে। বৌ উত্তরে বলেছিল—"আমি ছিলাম না, কি করে ছেলে মরল বলতে পারি না।" সে আমাদের বলেছে যে, আসামীর দাওয়া খুঁড়ে ফেলে সাপের খোঁজ করা হয়। এই মেঝে খোঁড়া সম্বন্ধে অন্যান্য সাক্ষী কি ভাবে উত্তর দিয়েছে তা আপনারা শুনেছেন। মেঝে যে খোঁড়া হয়েছিল, তার সম্বন্ধে আপনারা নিঃসন্দিগ্ধ কি না ভেবে দেখবেন। আপনারা নিজেদের জিজ্ঞাসা করুন, সর্পদংশন অনুমানের আন্তরিক ধারণা তখন ছিল, কি ছিল না। এই ব্যাপারে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে, উমেশ গাজী নামে যে লোকটি মেঝে খুঁড়ে ফেলে বলে বলা হয়েছে, বাদী পক্ষ তাকে সাক্ষী মানেনি। তার স্ত্রী ধীরুকে সাক্ষী দিতে ডাকা হলে সে বলে যে, উমেশ মেঝেটা খোঁড়বার জন্যে কোদালী নিয়ে গেছল।

মামলার পরের ঘটনা নেটিভ ডাক্তারের ময়না তদন্ত। আপনাদের সুবিধার জন্য ডাক্তারের রিপোর্ট আমি আগেই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি, নতুন করে আর বলবার দরকার নাই। ফলে আসামীকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।

তখন ডাক্তার যে ইঙ্গিত দিলেন, সেই ইঙ্গিত অনুসারে কাজ করল দ্বারকা কনষ্টেবল (ইনস্পেক্টরের আদেশ অনুসারে) ও স্বয়ং ইনস্পেক্টার। আমি দ্বারকার জবানবন্দী বিচার করে দেখেছি। একটা অদ্ভুত কথা এই যে, ইনস্পেক্টারটিকে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করা হয়নি। এ বিষয়ে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করি। ধরে নেওয়া গেল যে, নেটিভ ডাক্তারটি একটা গভীর কাটা ক্ষত দেখতে পান। এ থেকে তিনি মাত্র এই সিদ্ধান্তই করতে পারতেন যে, একটা ধারাল অস্ত্র দ্বারা ক্ষতটা হয়েছে। কিন্তু দ্বারকা আমাদের বলেছে যে, ইনস্পেক্টার তাকে ঘটনাস্থলে গিয়ে শড়কীর খোঁজ করতে বলেন।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, ঘটনার পর কতকগুলো লোক সেখানে গিয়েছিল। কিন্তু এদের মধ্যে সাক্ষী মানা হল মাত্র উমাচরণ পঞ্চায়েৎকে। বাদী পক্ষ বলছেন, হত্যার পর আসামীর বাড়ীতে প্রথম গিয়েছিল বৃদ্ধা হারু, পরে গিয়েছিল আসামীর স্ত্রীর বোন ধীরু। লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয় যে, শিশুর কান্না শুনেই সম্ভবতঃ এই স্ত্রীলোকগুলি সেখানে গেছল, কিন্তু শিশু বলছে, সে কখন কাঁদেনি। প্রকৃত পক্ষে আংশিক প্রমাণে দেখা যায় যে, আসামীর কান্না প্রতিবেশীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। শিশু বলেছে, তার বাবা ঘরে ফিরে চীৎকার করে বলতে লাগল—"ওগো, কে কোথায় আছ দেখে যাও, কি করে আমার নেকজান মরল!" অবশ্য আসামীর স্ত্রী নদীয়ার জজকে বলেছিল যে, সে এসে দেখে যে, তার স্বামী কাঁদছে; কিন্তু এখানে এই স্ত্রীলোকটি বেশ জোর করেই বলেছে যে, আসামী মোটেই কাঁদেনি।

বৃদ্ধা হারু এই কথাগুলো বলেছে—শিশুর কান্না শুনে সে তার কাছে গিয়ে দেখল, আসামী বসে আছে জ্যান্ত আর মরা মেয়ে নিয়ে। গোলক তাকে বলল যে, তার বাবা নেকজানকে মেরে ফেলেছে। আসামী ভয় দেখাবার মত করে শিশুর উপর হাত তোলে, কিন্তু তাকে মারেনি। নদীয়াতে এই বৃদ্ধা বলেছিল, দুই বিষয়ে এখানে ভিন্ন কথা বলেছে। নদী

বলে ছিল, সে ক্ষত দেখেছে। এখানে সে বলেছে, ক্ষত সে দেখেনি। সেখানে সে বলেছিল, আসামী গোলককে গলা টিপে মারবে বলে ভয় দেখিয়েছিল; এখানে বলছে, সে তা করেনি।

আসামীর স্ত্রীর ভগিনী ধীরুকে প্রশ্ন করা হয়, সে আসামীর বাড়ীতে গিয়েছিল কি না। ধীরুর জবানবন্দী থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তার আগে তার স্বামী সেখানে গেছল। অথচ আগেই বলেছি, এই লোকটি নিশ্চিত ভাবে মূল্যবান সাক্ষী হলেও, তাকে সাক্ষ্যদান করতে আহ্বান করা হয়নি। এই মেয়েটি বলেছে যে, সে শবের কাছে পর্য্যন্ত যায়নি। শিশু তাকে বলেছিল, আসামী নেকজানের গলায় পা দিয়ে তাকে হত্যা করেছে। এ কথা সে বরাবর বলে এসেছে, কিন্তু শড়কীর কোন কথা বলেনি। রঙ্গমঞ্চে তার পর আনা হল আসামীর স্ত্রীকে। এই স্ত্রীলোকটি বলছে যে, আসামীর অপরাধের কথা তার কাছে ব্যক্ত করে শিশুটি। এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সাক্ষ্যদানের জন্যে এই তিনটি নারীকে বাদী পক্ষ যে হাজির করেছে, তার উদ্দেশ্যই হল, শিশুটি যা দেখেছে তা তার কাছে-ভিতের কাউকে না বলবার দরুণ যে বাধা সৃষ্টি হয়েছে, তা এড়ান ও অতিক্রম করা। বাদী পক্ষের বক্তব্য এই যে, শিশু হারুকে এ কথা একবার বলেছিল, আর একবার বলেছিল ধীরুকে, আর একবার বলেছিল তার মায়ের মাকে। লক্ষ্য করবেন—কোন দু'জনকে একত্রে বলেনি। এ রকমের বিচ্ছিন্ন বিবরণ দেওয়া খুব সোজা, আর জেরা করে বিশেষ সুবিধাও বড় একটা এতে হয় না। এতে প্রথম অসুবিধা এড়িয়ে যেতে গেলে আর এক অসুবিধা এসে পড়ে বলে আমার মনে হয়। দ্বারকা যখন প্রথম আসে আর তার পর পরই আসে রামদাস, আসামীর স্ত্রী তখন সব ব্যাপারই জানত। সে স্বীকার করছে যে, সে তার স্বামীকে পুলিশের কাছে বলতে শুনেছে যে, শিশুকে সাপে কামড়ে মেরেছে। স্বামী তাকে মতলব করে ঘরের বাইরে পাঠিয়েছিল এ যখন সে বুঝল, তখন স্বামীর সঙ্গে ভয়ঙ্কর ঝগড়া করল। এই ঝগড়ার বিবরণ স্ত্রীলোকটি স্পষ্ট খুঁটিনাটি করে দিয়েছে। সে তার স্বামীকে বলেছিল, আর তাকে ভাত দেবে না। স্বামী তাকে বলেছিল, তার হাতে আর সে ভাত খাবে না। আপনারা বোধ হয় বুঝতে পারছেন, এ একেবারে কাটাকাটি ব্যাপার। কিন্তু স্ত্রীলোকটি বলছে, দ্বারকা দ্বিতীয় বার গাঁয়ে না আসা পর্য্যন্ত সে কোন কথা কোন পুলিশকে বলেনি। কেন বলেনি? উত্তরে বলেছে, তাকে ডাকা হয়নি। রামদাস কিন্তু অন্য রকম বলছে। সে বলছে, সে জিজ্ঞেস করেছে স্ত্রীলোকটিকে, সে কি জানে বলতে। দ্বারকাও অন্য রকম কথা বলছে। দ্বারকা বলছে, স্ত্রীলোকটিকে সে কোন কথা জিজ্ঞেস করেনি। রামদাস যে সুরথাল রিপোর্ট দিয়েছে স্ত্রীলোকটির নাম তাতে আছে।

আগেই এ-বিষয়ে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছি যে, ঘটনা সম্বন্ধে যে সব গ্রামবাসীর কিছু-না-কিছু জানবার কথা, তাদের মধ্যে মাত্র এক জনকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়েছে। সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়েছে মাত্র উমাচরণ পঞ্চায়েতকে। সাক্ষ্যের সুরুতেই এই লোকটি বলেছেন, উমের্দ গাজী (আপনাদের মনে আছে যে এই লোকটি ধীরুর স্বামী, যে মেয়ে খুঁড়েছিল, অথচ একে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়নি) তাঁর কাছে এসে বলেছিল যে, নেকজান মরে পড়ে আছে, তাই আসামী আর গ্রামবাসীরা আসতে তাকে অনুরোধ করেছে। উমাচরণ গিয়ে লাস দেখতে পেয়ে আসামীকে জিজ্ঞেস করলেন, কি করে শিশু মারা গেল? প্রথমে আসামী তাঁকে বলল, সে কিছু বলতে পারে না। পরে বলল যে, সাপে কামড়েছে। উমাচরণ লাস পরীক্ষা করে দেখলেন একটা তিন কোণা ক্ষত। জবানবন্দীর অবশিষ্ট অংশে তিনি আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, তাঁর সন্দেহ হয়েছিল। বলেছেন যে, এক জায়গায় জঙ্গলে তিনি একখানি শড়কী আর এক জায়গায় একখানি জবাই করবার ছুরী দেখতে পেয়ে হুকুম দিয়ে আসেন, সেগুলি কেউ যেন না ছোঁয়। আর আসামীকে বলেন যে, ঘরে গিয়ে তিনি একটা রিপোর্ট লিখে দিচ্ছেন, সেই রিপোর্ট নিয়ে পুলিশে গিয়ে খবর দিয়ে আসতে। আসামীও রিপোর্ট আনতে তাঁর বাড়ী যায়নি, রিপোর্টও লেখা হয়নি। আসামীর পক্ষের কৌঁশুলি একে ষাঁড়-মোরগের গল্প বলে বর্ণন করেছেন। আমার মনে হয়, যোগ্য আখ্যাই দিয়েছেন। সুরথালের রিপোর্টে এই লোকটার নাম আছে। উমাচরণের পর রামদাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। রামদাসের সাক্ষ্য নেবার সময়ই ব্যাপারটা জানা যায়, আগে হলে সম্ভবতঃ উমাচরণকে এ-বিষয়ে কড়া জেরা করা হত।

আগেই আপনাদের বলেছি যে, অপরাধের কোন মতলব আছে কি নেই, তা প্রমাণ করবার আইনতঃ কোন প্রয়োজন বাদী পক্ষের নাই। তবু বাদী পক্ষ একটা মতলব দাঁড় করতে ও তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করা স্বভাবতঃ উপযুক্ত মনে করেছেন। কিন্তু মামলা এই আদালতে উপস্থিত হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মতলবের ব্যাপারটা নিছক গবেষণার বিষয় ছিল। এ কথা ঠিক যে, আপনার স্ত্রীর ইজ্জত নষ্ট করবার অভিযোগ কদম আলি ফকীর আসামীর বিরুদ্ধে এনেছে। এ আদালতে কদম আলির স্ত্রীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। তার কথা শুনে ন্যায়তঃ খুবই সন্দেহ হয় যে, আসামীর সঙ্গে তার একটা লটঘটি ছিল। মাত্র অনুমানের উপর মতলবের কথা রচনা করা হয়েছে। এ-বিষয়ে যখন স্বভাবতঃ এ আপত্তি উঠান হল যে, আসামী ফকীরের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেনি, তখন বাদী পক্ষ আর এক অনুমান উপস্থিত করে বললেন যে, সম্ভবতঃ আসামীর মতলব ঘুরে গেছল। যখন সে দেখল, তার অন্য শিশুকন্যা সত্য কথা প্রকাশ করে দিচ্ছে, তখন সে আর মতলব হাসিল করতে অগ্রসর হতে চায়নি। একে প্রমাণ বলে না—বলে কল্পনা। শিশু বলেছে যে, তার পিতা তার মতলবের কথা তাকে সে সময় বলেছিল। অর্থাৎ—আগে সব ভিত্তি করা হয়েছিল অলীকের উপর, এখন তা ভিত্তি করা হল মিথ্যার উপর।

সওয়ালে বলা হয়েছে—"এ কথা কি আপনারা বিশ্বাস করেন যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে সন্তান আর স্ত্রী এক জনকে ফাঁসীর দড়ীর কাছে এগিয়ে দেবে?" খুবই সত্যি যে, এ বিশ্বাস করতে মনে বড় ধাক্কা পায়। কিন্তু এ আদালতে সাক্ষ্য দেবার সময় সন্তানটি এমন একটা ঘটনাচক্রের আভাষ দিয়েছে যা ইঙ্গিতপূর্ণ। সে বলেছে যে, নদীয়ায় তার বাবা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবার পর তার মা আদালতের কাছে এক পবিত্র গাছের তলায় সিন্নী দেয়, আর সিন্নীর কিছু মিষ্টি তাকে খেতে দেয়। মা এ কথা অস্বীকার করেছে। আপনারা দু'জনের কথাই শুনেছেন, আপনারাই বলবেন কাকে বিশ্বাস করবেন। তার পর, স্ত্রীলোকটি স্বীকার করেছে যে, সে

জেলখানার আসামীকে দেখতে যায়নি। স্বীকার করেছে যে, "আপীল করতে খরচা লাগবে না, আদালতে এ কথা অনেকে তাকে বললেও আপীল করতে কোন চেষ্টাই সে করেনি। এই সব থেকে আপনারা যদি অনুমান করেন যে, স্ত্রীর মনে আসামীর সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ভাব আছে, তাহলে সব অসুবিধা দূর হয়ে যায়। মাত্র তাই নয়, মা, আর মায়ের যোগে শিশুটিকে অতি সহজেই কি করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে শেখান যেতে পারে তা অতি সহজে বোঝা যায়।

তাহলে আপনারা পেলেন—(১) খেয়াল-খুশী ময়না তদন্তের উপর ভিত্তি করে একটা পরস্পরবিরোধী ডাক্তারী রিপোর্ট—যার ফলে মৃত্যুর হেতু-সমস্যার সমাধান হয় নাই; (২) প্রত্যক্ষদর্শী শিশুর সাক্ষ্য—যাতে স্পষ্ট মিথ্যে আছে যাতে শেখান-পড়ান হয়েছে বলে বেশ সন্দেহ হয়; (৩) সাধারণ সাক্ষ্য-প্রমাণ যা বিশ্লেষণ করে আপনাদের বলেছি; (৪) মতলবের কাহিনী—যা প্রথমে ছিল নিছক আন্দাজ, যা বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্ম অতিরিক্ত কল্পনার দরকার ছিল, আর যা একটা মিথ্যা দিক এখন সমর্থন করছে; সর্ব্বশেষ (৫) স্ত্রীটি যে শত্রুভাবাপন্ন তার প্রমাণ। মামলাটা যে জটিল রহস্যে নিবদ্ধ এ-বিষয়ে অবশ্য কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ণ সত্য আবিষ্কার করা আপনাদের কাজ নয়। আপনাদের মাত্র এ-ই আবিষ্কার করতে হবে যে, আসামী যে অপরাধী তার প্রমাণ হল কি না।

২৪ জুলাই, ১৮৮২ স্বাঃ এ-সি-ব্রেট

জুরীরা আপনাদের মধ্যে যুক্তি-পরামর্শ করতে বিদায় নিলেন। এক মিনিটও লাগল না। ফিরে এসে দিলেন সিদ্ধান্ত একবাক্যে—আসামী নির্দোষ।

জজ হলেন সম্পূর্ণ একমত।

আসামী বেকসুর! মুলুকচাঁদ খালাস!

পরিচ্ছেদ পাঁচ

রহস্য উদ্‌ঘাটিত

হাইকোর্টে মামলাটি নদীয়া থেকে আলিপুরে পুনর্ব্বিচারের জন্ম পাঠালে, আমি আসামীর পক্ষ সমর্থন করব বলে স্থির করলাম। আসামীর উকীল বাবু অক্ষয়কুমার মুখার্জ্জীর অনুরোধে মনে করলাম, যদি আমি আসামীর সঙ্গে দেখা করি, তাহলে মামলা সম্বন্ধে আমার কাছে এমন কতকগুলি তথ্য হয়ত প্রকাশ করতে পারে যা দ্বিতীয় বিচারের সময় কাজে লাগতে পারে। তাই ১৮৮২, জুলাইয়ের মাঝামাঝি নদীয়া জেলে আসামীর সঙ্গে দেখা করি। সঙ্গে ছিলেন উকীল বাবু আর জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ ব্র্যাণ্ডার। ডাঃ ব্র্যাণ্ডার আমায় বললেন যে, আসামীর অপরাধ সম্বন্ধে সুরু থেকেই তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ হয়েছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, নদীয়ার বিচারের সময় আসামীর পক্ষ থেকে কেউ তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করেনি, করলে এমন কিছু হয়ত বলতে পারতেন যাতে আসামীর কিছু সাহায্য হয়ত হত।

জেলে পৌঁছবার পরই আসামীকে ডেকে আনা হল। আমার নাম তাকে বলবা মাত্র সে আমার পায়ের উপর পড়ে কাঁদতে লাগল। আসামীর সঙ্গে আলাপে যা বুঝা গেল তা তার সঙ্গে আমার নীচের কথাবার্ত্তায় প্রকাশ পাবে—

"আমার কিছু দোষ নেই হুজুর। আমার জান বাঁচান।"

"কিন্তু বল ত, তোমার মেয়ে মারা গেল কি করে? এ-সম্বন্ধে কিছু কথা তুমি যদি বলতে না পার, তাহলে তোমার মামলা চালান আমাদের কারু পক্ষেই সম্ভব হবে না।"

"আমি কিছু জানি নে হুজুর।"

"নিশ্চয় কিছু জান। সত্যি ব্যাপার কি তা যদি তুমি না বল, আমরা কিছু করতে পারব না। মামলা অত্যন্ত শক্ত।"

"আমি কিছু জানি নে, হুজুর।

"যদি না-ই জান, তাহলে তোমার নিজের মেয়ে বলেছে তুমিই খুন করেছ, তা সত্যি?"

"পুলিশ তাকে শিখিয়েছে। মেয়ে মিথ্যে কথা বলেছে। যা বলতে শিখিয়েছে, বৌ আর মেয়ে দু'জনা তাই বলছে।"

এই সময় অনুরোধ করতে ডাঃ ব্র্যাণ্ডার ও উকীল বাবুটি ঘর ছেড়ে গেলেন। আসামীর সঙ্গে আমার আলাপ চলতে লাগল—

"আমার ত দৃঢ় বিশ্বাস, কি করে তোমার মেয়ে মারা গেছে তা তুমি ঠিকই জান। মারা যাবার সত্যি কারণ যদি তুমি আমায় বুঝিয়ে না বল, তাহলে তোমার মামলা চালাতে আমার খুবই অসুবিধা হবে।"

"মাঠ থেকে ফিরে দেখি মেয়ে মরে আছে। কি করে মরল বলতে পারি নে। যা হয় করুন হুজুর, আমি কিছু জানি নে।"

"মুলুকচাঁদ! আমার মনে হয়, ইচ্ছে করে তুমি তোমার মেয়েকে মেরে ফেলনি। কিন্তু এ কথা কি করে বিশ্বাস করি যে, তুমি কিছু জান না। সত্যি কথা যদি বলতে না চাও, তাহলে তোমার মামলা চালান আমার পক্ষে অসম্ভব হবে, তোমার ফাঁসী হবে।"

"কিছু জানি নে, হুজুর।"

"ছেড়ে দাও সে কথা, কি করে তোমার মেয়ে মরল। এ-বিষয়ে আমার কিছু মাত্র সন্দেহ নেই যে, ওর গায়ে যে জখম, তার মরবার পরে করা হয়েছে। আর তুমি এ কথা সবই জান।"

এ কথা বলতেই আসামী চঞ্চল হয়ে উঠল, বিচলিত হয়ে সে আমার পা চেপে ধরল।

"বলুন হুজুর, বলুন, কি করে বুঝলেন মরার পরে জখম হয়েছে?"

"আমি বলছি, নিশ্চয় হয়েছে।"

"উমেশ গাজী, আমার ভগ্নিপোতের কাছে শুনেছেন বুঝি?"

"উমেশ গাজীর নামও শুনিনি। সে কি জানে বল ত?"

"যখন জখমের সব কথাই আপনি জানেন হুজুর, কসুর মাপ করবেন, আমি সব কথাই আপনাকে বলব। ঐ লোকটা, ঐ উমেশ গাজী, আমার সব মুস্কিলের গোড়ায়। সেই করল ঘায়েল, আমার পলা দিল, বলিস্ সাপে কেটেছে। যখন আমরা দেখতে পেলাম আমার নেকজান মরে গেছে, কি করে মরল হদিস পেলাম না, আমার ঐ ভগ্নীপোত উমেশ গাজী তার ছোট্ট ছুরিটা আনল, এনে কাটল। কাটার মুখ দিয়ে একটু খুন বেরুল না; মেয়ে যে তখন মরে গেছে কর্ত্তা।"

"তাহলে শড়কী? শড়কী তাহলে আদপেই ব্যবহার করা হয়নি?"

"না হুজুর, আমাকে খুনী সাব্যস্ত করবার জন্তে পুলিশ মেয়েকে হাত করবার আগে শড়কীর কোন কথাই ওঠেনি।"

"তোমার বৌ যখন ঘরে ফিরল, আর পুলিশ যখন এল, তার আগে তোমার মেয়ে তোমার দোষ দিয়েছিল?"

"একেবারে ঝুটা হুজুর! বেস্পতিবার রাতের আগে আমার দোষ কেউ দেয়নি। বুধবার রামদাস জমাদার এসে সাপ খুঁজতে উমেশ গাজীকে দিয়ে আমার ঘরের মেঝে খোঁড়াল। তখন সেখানে আমার মেয়ে গোলকও ছিল, আমার বৌও ছিল। এর পর দারোগা আমার মেয়ে-বৌকে ডেকে পাঠিয়ে তাদের বলেছিল যে, আমি কসুর স্বীকার করেছি, তাই তার ইচ্ছামত কথা তাদের দিয়ে বলিয়েছে। এক দিন আমায় যখন ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, পথে বৌএর সঙ্গে দেখা। সে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—"নেকজানকে খুন করেছ বলে কসুর স্বীকার করেছ, এ কথা সত্যি?" উত্তরে বলেছিলাম—"না না, মিথ্যে কথা।"

আমি তখন বললাম—"ক্ষতটা সম্বন্ধে সব কথা আমায় বললে, এতে খুশী হলাম। কিন্তু উমেশ গাজী অত বড় ক্ষত কেন করল?"

সে বলল—"পহেলা ত হুজুর, একটুখানি কাটা ছিল, পুলিশ যখন লাস নিয়ে বনগাঁ যায়, তখন পুলিশই বড় করে দেয়। তারা ত্রিশ টাকা চেয়েছিল, আমার কাছে তখন তাদের দেবার মত টাকা ছিল না।"

আর কিছু খবর পেলাম না। আলিপুরে দ্বিতীয় বার বিচারে আমি যখন আসামীর পক্ষ সমর্থন করি তখন শিশুর মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে কোন তথ্যই আমার জানা ছিল না। কিন্তু মনে মনে আমি নিঃসংশয় হয়েছিলাম যে, এ খুন খুন নয়। হয়ত আসামী সব কথা খুলে বলতে সাহস করছে না। কিন্তু আসামীর সঙ্গে আলাপে একটা অত্যন্ত দামী তথ্য পেলাম, তাতে আমার জেনে আনন্দ হল যে, হাইকোর্টে আমি যে অনুমান করেছিলাম, মৃত্যুর পর মরা মেয়ের অঙ্গের ক্ষত সাজান ও বাড়ান হয়েছে, তা সম্পূর্ণ সত্য। এই ব্যাপার একবার প্রমাণ করতে পারলে, এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, মামলার ডাক্তারী প্রমাণের উপর নির্ভর করা চলে না। কারণ ডাক্তারী প্রমাণ শিশুর মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে কোন আভাষই দিতে পারে না। উমেশ গাজী যে পুলিশের হুকুমে মেঝে খুঁড়েছিল—এ তথ্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম বিচারে এ-সম্বন্ধে কোন কথাই প্রকাশ পায়নি। দ্বিতীয় বিচারের সময় উমেশ গাজীর স্ত্রী ধীরুকে যখন জেরায় জিজ্ঞেস করা হয় যে, তার স্বামী এই ঘটনায় কি অংশ গ্রহণ করেছিল, তখন সে অচৈতন্ত হয় বা অচৈতন্ত হবার ভাণ করে। সে সময় যারা গোপন কথা জানত, তাদের কাছে এই বেহুঁস হবার ব্যাপারটা অর্থসূচক হয়েছিল। কিন্তু জজ বা জুরী বা জনসাধারণের কাছে সাক্ষীর কাঠরায় স্ত্রীলোকটির আচরণের বিশেষ কোন অর্থ ই ছিল না।

১৮৮২, ২৫ জুলাই। তার পর মুলুকচাঁদ চৌকীদার যেদিন বেকসুর খালাস পেল, সেদিন প্রাতে মুলুকচাঁদ, তার মেয়ে গোলকমণি আর তার মা আমার বাড়ীতে দেখা করতে এল। মেয়েটার সঙ্গে তখন আমার যা কথাবার্ত্তা হয়েছিল তা এই—

"কে তোর বোন্‌কে মেরে ফেলেছে রে?"

মেয়েটা কথা বলে না।

"বল না, কে খুন করল?"

মেয়েটার চোখে জল। বলে—"জানি নে।"

"তুই না চোখে দেখেছিলি, তোর বাপ খুন করছে?"

"না। আমি ত ঘুমিয়ে। আমি কিছু জানি নে।"

"এই সেদিনই ত আদালতে বললি—তুই নিজের চোখে দেখলি, তোর বাবা তোর দিদিকে খুন করছে?"

শিশু কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল—"ওরা যে আমায় সে কথা বলতে শিখিয়েছিল।"

"কে শিখিয়েছিল?"

"দ্বারিক কনষ্টেবল একখানা তরোয়াল দেখিয়ে বলেছিল—তোর বাবা তার শড়কী দিয়ে তোর দিদিকে খুন করেছে, এ কথা যদি না বলিস, তাহলে এই তরোয়াল দিয়ে তোর মাথা কেটে ফেলব। আর এ কথা যদি আদালতে বলিস, তাহলে তোর বাবাকে ছেড়ে দেবে, সে বাড়ী ফিরে আসবে। তাইতেই ও-কথা বলতে রাজি হয়েছিলাম।"

"তোর বাবাকে ফাঁসী দেওয়া হবে এ কথা যখন শুনলি, তার পরও তুই এ কথা কেন বললি?"

"মা আর দরোগা যে বললে, আগে যা বলেছি তাই আমায় বলতে হবে, নৈলে আমার সাজা হবে।"

মা মেয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে কোন কথা কইল না। তাকে অনেক প্রশ্ন করা হল। একটা কথারও জবাব দিল না। দেখে মনে হল, মনমরা হয়েছে, মনে তার কি একটা ঝড় বইছে।

বেকসুর খালাস পাবার কয়েক দিন পর। মুলুকচাঁদকে ডাকিয়ে আনলাম নেকজান সত্যি সত্যি কি করে মারা যায় তা বের করতে। তাতে-আমাতে যে সব কথা হয়েছিল তা এই—

"মুলুকচাঁদ, তুমি খালাস পেয়েছ জান ত! যদি সত্যি অপরাধও করে থাক, এখন আর তোমাকে কেউ সাজা দিতে পারবে না। তোমার কিছু ভয় নাই। এইবার ঠিক ঠিক বল ত, মেয়ে কি করে মরল।"

মুলুকচাঁদের দুই চক্ষু জলে ভরে এল। সে আমার পা দু'খানি জড়িয়ে ধরে বলল—"আমার জান বাঁচিয়েছ হুজুর, তোমার কাছে কখন মিছে কথা বলব না। দুনিয়ায় আমার চাইতে হতভাগ্য আর কেউ নেই। আমার ফাঁসী হওয়াই উচিত ছিল। ফাঁসী আমার পক্ষে ভাল ছিল।"

"তবে? তবে কি তুমিই খুন করেছ তোমার মেয়েকে? তুমি খুনী?"

"ঠিকই বলেছেন কত্তা, আমি খুনী। আমি আমার মেয়ের খুনী। কিন্তু ওর জান বাঁচাবার জন্ম খুশী মনে আমার জান ত দিতে পারতাম হুজুর!"

"ভয় নাই। সব কথা খুলে বল।"

মুলুকচাঁদ কাঁদে! চোখের জলে ওর বুক ভেসে যায়। সে বলে যায়—

"সেদিন সোমবার হুজুর। রাতে দু'টো মেয়ে নিয়ে শুয়েছি বারান্দায়। বৌ ঘরে নেই ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা আনতে গেছে। গোয়াল-ঘরে যেখানে আমার একটা গরু থাকে, তারই সুমুমুখু দাওয়ার ঠিক নামোর উঠোনে কিছু শাক-সজী লাগাম আছে। গাঁয়ের একটা ধম্মের ষাঁড় আমার বড় জালাতন করত।

ওকে তাড়াবার জন্যে বালিশের কাছে একখানা 'খেটে' রাখতাম (খেটে খুব ভারী, ১৪ থেকে ১৮ ইঞ্চ ঘেরের একখানা একগজী কাঠ-ঢেঁকীর মুশল), যখনই ষাঁড়টা আসত, এই 'খেটে' হাতে তাকে তাড়া করতাম।

অন্ধকার রাত। আকাশে মেঘ করেছিল। মনে হয় রাত তখন প্রায় দু'টো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনলাম, কতকগুলো পায়ের শব্দ। মনে হল ষাঁড়টা এসেছে আমারই দাওয়ার নামোয় আর গোয়াল-ঘরের উলটো দিকে। ষাঁড়টা আবার এসেছে মনে করে ওর কাছে না গিয়ে খুব জোরে ছুঁড়ে মারলাম 'খেটে'।

হঠাৎ—"মা গো!"—আমারই বাচ্চার গলা। চমক ভাঙল। বুঝতে পারলাম ওর গায়ে লেগেছে। আমি কিছু জানি নে হুজুর, ও অন্ধকারে কখন নেমে গেছে, বোধ করি পেচ্ছাপ ফিরতে।

ছুটে গেলাম। তুলে নিলাম কোলে। খাবি খাচ্ছে। কথা কইতে পারছে না। পিঠে ঘাড়ের ঠিক নামোয় খেটেটা গিয়ে লেগেছে। কিন্তু দেখুন কর্তা, পুলিশ বা গাঁয়ের লোকেরা পিঠের এই 'খেটের' দাগ নজরই করেনি।* বাতী জ্বাললাম। দেখলাম আমার বাচ্চা—কর্তা, আমার বাচ্চা আর নেই। নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

কী করব! কী করব! ইচ্ছে হল কুয়োতে ঝাঁপ দি। নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরি। দুই-এক ধাপ এগুলাম। হঠাৎ ভাবলাম ভগ্নীপোত উমেশ গাজীর সঙ্গে পরামর্শ করলে হয় না? পাশেরই বাড়ী। ঘুমুচ্ছিল। ডাকলাম। সব কথা বললাম। সে বলল—কী সর্বনাশ করেছ বল ত? কাল সকালেই ত পুলিশ এসে পড়বে, তোমার হাতে দড়ী দিয়ে দশ বছর মেয়াদে পাঠিয়ে দেবে।

জিজ্ঞেস করলাম—এখন কি করি তাই বল।

প্রথমে বলল—বোলো ষাঁড় গুঁতিয়ে মেরেছে।

কথাটা ভাল মনে হল না। এই ত 'সেদিন এক হামলায় এক জোয়ান ঘায়েল হয়। আমাদের গাঁয়ের কয়েক জন প্রমাণ দিল যে, ষাঁড়ে গুঁতিয়ে ঘায়েল করেছে। আদালত ও-কথা বিশ্বাস না করে আসামীকে সাজা দিয়েছে।

উমেশ গাজী বলল—ফকীরের সঙ্গে তোমার ত শত্রুতা, তার ঘাড়েই দোষ চাপাও না।

বললাম—তা হতে পারে না।

তখন সে বলল—সব চাইতে ভাল হবে, যদি বল সাপে কামড়ে মেরেছে।

কিন্তু সাপে কাটার দাগ ত নেই?

বলল—তা সহজেই করা যাবে। আমার আম-কাটার ছোট ছুরিখানা নিয়ে আসি, তা দিয়ে কামড়ের দাগ করা যাবে।

* যে ডাক্তার ময়না তদন্ত করেছিলেন, তিনি মেরুদণ্ড পরীক্ষা করা কর্তব্য মনে করেননি (দ্বিতীয় বিচারে তাঁর জেরার উত্তর দেখুন)। ডাক্তারটিকে জেরা করবার সময় মেরুদণ্ডের কোন আঘাতের সম্বন্ধে আমি কোন কথাই জানতে পারিনি, তবে শ্বাসরোধ মৃত্যুর লক্ষণ দেখে প্রশ্ন করেছিলাম। এই প্রসঙ্গে বলতে পারি যে, ডাক্তারদের ইংরেজী ভাষায় সাক্ষ্য বুঝবার মত বুদ্ধি-বিদ্যা আসামীর নেই। —মঃ ঘঃ।

এই না বলে সে তার ঘরে গিয়ে ছুরিটা এনে বলল—এ দিয়ে সাপে কাটার একটা দাগ করে ফেল।

বললাম—আমার মরা বাচ্চার গায়ে কাটাকুটা আমি করতে পারব না। যা ভাল বোঝ ভাই, তুমিই কর।

উমেশ পেটে একটা ছোট্ট কাটার দাগ করল।

জিজ্ঞেস করলাম—পেটে করলে যে?

বলল—সাপ যদি কামড়ায় হাতে বা পায়ে, তবে মেয়ে জেগে উঠল না কেন? কিন্তু পেটে কামড়ালে, সঙ্গে সঙ্গে অচৈতন্য হয়ে পড়বে।*

তার পর বলল—এইবার তোমার পেঁয়াজ ক্ষেতের পানে চলে যাও। একটু পরে ফিরে এসে আমাদের সব্বাইকে হাঁক-ডাক করে বলবে—মেয়েকে সাপে কেটে মেরেছে।

যা বলল তাই করলাম। মঙ্গলবার ভোরে চেঁচিয়ে প্রতিবেশীদের ঘুম ভাঙালাম। ওরা সবাই এল। মেয়েকে দেখল। সবাই ভাবল, সাপের কামড়ে নেকজান মারা গেছে। বৌ ঘরে ফিরবার আগেই থানায় গেলাম। থানার দারোগা গোলাম রহমান আমায় ভাল করেই চিনতেন, আমায় খুব ভালবাসতেন। গোপনে তাঁকে বললাম—আমার মেয়ের মরার খবর দিতে এসেছি, কিন্তু রাতে সে কি করে মারা গেল বলতে পারি নে। প্রতিবেশীদের কেউ কেউ বলছে—সাপে কেটে মেরেছে, কেউ বলছে আমার শত্রু ফকীররা হয়ত খুন করেছে। দারোগা আমায় পরামর্শ দিলেন—কখনো যেন কারু ঘাড়ে দোষ চাপিও না, খালি বলো, কি করে মেয়ে মরল বলতে পারি না। দারোগা বললেন, ঐ দিনই তিনি ছুটিতে যাচ্ছেন, তবে তিনি তাঁর জমাদারকে বলে যাচ্ছেন, যাতে জমাদার আমার দিকে টানে। দারোগা জমাদার রামদাস সরকারকে ডাকিয়ে এনে বললেন—এর মেয়েকে গিয়ে দেখে আসুন, লোকটার দিকে একটু টানবেন। ওর কাছ থেকে টাকা-কড়ি যেন না নেন। এ বড় গরীব, আমি জানি। কি করে ওর মেয়ে মরল, যান, গিয়ে তদন্ত করে আসুন। যদি সাপে-কাটা হয়, সেই মত রিপোর্ট করবেন।

আমার জবানী লিখে নিয়ে জমাদার থানা থেকে রওনা হলেন। কিন্তু আগে গেল দারিক কনষ্টেবল। জমাদার এলেন পরদিন বুধবার সকালে। আমার ঘরের মেঝে খুঁড়িয়ে, আমার প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জমাদার দারিক কনষ্টেবল ও গাঁয়ের কয়েক জন লোকের জিম্মায় লাস চালান দিলেন। আমি ওদের সঙ্গে গেলাম। রওনা হবার আগে শ্যাম মেথর ও অন্যান্য প্রতিবেশীরা আমায় বলল—পুলিশকে কয়েকটা টাকা দিলে আর হাঙ্গামা হবে না। ৬৲ টাকা দিতে চাইলাম। পুলিশ চাইল ৩০৲ টাকা। শেষে ধার করলাম ১৬৲ টাকা। শ্যাম মেথর আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে পুলিশকে দিতে গেল।

লাস নিয়ে বনগাঁ চলেছে। পথে ইছামতীর ধারে পোটখালি নামে একটা জায়গায় থামা হল। এখানে দারিক কনষ্টেবল

* একটা চলতি ধারণা যে, দেহের মর্মস্থলে সাপ কামড়ালে সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য লোপ হয়। মঃ ঘঃ।

বলল—দে শালা। খাবার পয়সা দে। আমায় কিছু দিসনি। না দিলে মুস্কিলে পড়বি।

বললাম—১৬ টাকা ত দিয়েছি।

ঘারিক বলল—সে টাকা পায়নি। বলল, যা গিয়ে টাকা নিয়ে আয়।

পোটখালি থেকে ফিরে গিয়ে কয়েকটা টাকা জোগাড় করে আনলাম। ফিরে এসে দেখি, কনষ্টেবল লাসের পাশে বসে ক্ষতটা পরীক্ষা করছে। ক্ষতটা বড় হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কে এ কাজ করেছে? পারের পাটনী সেখানে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, কনষ্টেবলটা কাটার ভেতর নীলের ডাঁটা ঢুকিয়ে দিচ্ছিল। শুনে কনষ্টেবল রেগে উঠে পাটনীকে মারতে উঠল। বলল—শালা, তুই দেখেছিস্? পারের পাটনী ভয় পেয়ে বলল—দেখিনি ত।

ডাক্তার লাস পরীক্ষা করবার পর পুলিশ বনগাঁয়ে আমায় গ্রেপ্তার করে, তার পর মেয়ে-বৌকে ডেকে পাঠাল। রাত্রিতে হাজতে কনষ্টেবলরা আমায় খুব মারপিট করে কসুর স্বীকার করতে বলল। খেজুরকাঁটা এনে নখ আর আঙুলের মাঝখানে বিঁধিয়ে দিতে লাগল। [মুলুকচাঁদ তার চার-পাঁচটা আঙুলের নখের ক্ষত দেখাল] ইনস্পেক্টার আর এক দারোগাকে (একে চিনি না) সঙ্গে করে এসে বলল—"কসুর স্বীকার কর,। তোর বৌ, মেয়ে তোকে দুষছে।

মারপিট চলল। স্বীকার করতে রাজি হই না। কনষ্টেবলরা বলল—যদি খুন না করে থাকিস, কদম আলি ফকীরের নামে দোষ কেন দিচ্ছিস্ না?

তার ঘাড়ে দোষ চাপাতে অস্বীকার করলাম।

জিজ্ঞেস করলাম মুলুকচাঁদকে—"প্রথমে সত্য গোপন করে গেলে কেন? সঙ্গে সঙ্গে যদি সত্যি কথা বলতে তাহলে তোমার কিছু হত না।"

বলে—"মুরুব্বু মারুব হুজুর, ভাবলাম কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। সত্যি কথা বললেও পুলিশ খুনী মামলায় আমায় জড়াবে।"

"কিন্তু জেলে যখন আমি তোমায় সত্য ব্যাপার জানাতে বার বার বললাম, তখনও কেন তুমি এ সব কথা গোপন করতে গেলে?"

"ভেবেছিলাম যদি সত্যি কথা বলি, তাহলে আপনি আমার মামলা হাতেই নেবেন না। কসুর মাপ করুন হুজুর!'

এই কথা বলে মুলুকচাঁদ খুব কাঁদতে লাগল।

"আচ্ছা, তোমার বৌটা ও-রকম করল কেন? তোমার ফাঁসীর হুকুম হোক, এ কেন সে চাইল?

"বৌকে অবিশ্বাস করব কেন হুজুর! সে ত তেমন কিছু করেনি। তবে সে হিংসে করত। সন্দেহ করত, কদম আলি ফকীরের বৌএর সঙ্গে আমার হয়ত লটঘটি আছে। বাড়ী ফিরে যখন দেখল তার বাছা মরে আছে, আমায় বলল—'জানি, তুমি ফকীরের বৌএর সঙ্গে থাকতে চাও, তাই এ কাজ করেছ। আর তোমায় ভাত দেব না।' আমিও বললাম—আর তোর রাঁধা ভাত আমায় খেতে হবে না।"

জিজ্ঞেস করলাম—"সে যখন বাড়ী ফিরল, তখন সব কথা তাকে বললে?"

"উমেশ গাজী ছাড়া আর কাউকে বলিনি, হুজুর! উমেশ হয়ত তার বৌ ধীরুকে বলে থাকবে। আমার মেয়ে গোলক ঘুমিয়েছিল। যখন জাগল তখন রোদ উঠে গেছে। ও কিছু দেখেনি। ধীরু, হারু, আর আমার বৌ পুলিশের ভয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছে হুজুর!"

"আচ্ছা, তোমার যখন ফাঁসীর হুকুম হল, তোমার বৌ সিন্নি দিয়েছিল। তার এ করবার কারণ কি বলতে পার?"

মুলুকচাঁদ বলল—"গাঁয়ের সবাই তাকে বলেছিল যে, আমার বিরুদ্ধে মামলা যদি ফেঁসে যায় তাহলে সেও বিপদে পড়বে। বৌ বলছে, সিন্নি দিয়েছিল কদম আলি ফকীর। কদম আলির কথায় বৌও সিন্নী দিয়েছিল।"

কথা শেষ হল। মুলুকচাঁদ চেয়ে রইল উদাস দৃষ্টিতে বাইরে শূন্য পানে। সর্ব্বাঙ্গ আলোড়িত করে এক দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে। গণ্ডের প্রায় শুকিয়ে-যাওয়া অশ্রু-খাদে আবার নামে বন্যা। মুলুকচাঁদ ডুকরে ডাকে—আল্লা! তার পর করুণ দৃষ্টিতে ফিরে চায় ব্যারিষ্টার মনোমোহনের দিকে। বলে—আসি কত্তা, সেলাম!

মুলুকচাঁদ চৌকীদার আর বাড়ী ফেরে না।

অনুবাদক: তারানাথ রায়

শেষ

পৃথিবীর আদম-সুমারী?

আপনি কি চতুর্দ্দিকে মানুষের ভীড় দেখছেন?

ট্রামে-বাসে, মাঠে-ময়দানে, রেঁস্তোরা, সিনেমা যেখানে যাচ্ছেন, দেখছেন অসংখ্য মানুষ? প্রিটোরিয়া থেকে পাকিস্তান কেন সিংহল থেকে হিরোসিমা যেখানেই আপনি যান না কেন, দেখবেন ঐ জনতা। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীতে। যেখানে বসতি সেখানেই জনারণ্য। কিন্তু বিব্রত বা বিরক্ত হলে চলবে না, ভীড়ের মধ্যে যে আপনিও এক জন। আপনিও যেমন অস্বস্তি বোধ করবেন, আপনাকে দেখে অন্যেও তেমনি স্বস্তিবোধ না-ও করতে পারে। কিন্তু কেন যে এই ভীড়, হয়তো আপনিও না-ও জানতে পারেন। পৃথিবীতে জনসংখ্যা কত ছিল এবং এখনই বা কত নিম্নলিখিত ফিরিস্তিতে দেখতে পাবেন।

১৯০০ সালে পৃথিবীতে জনসংখ্যা ছিল ১,৬০০,০০০,০০০
১৯৩১ " " " " ২,২০০,০০০,০০০
১৯৫২ " " " হয়েছে ২,৪০০,০০০,০০০

আরো মসৃণ ও সুন্দর মুখশ্রী

মুখশ্রী আপনার আরো কমনীয় ও সুন্দর হবে, যদি দুটি পণ্ড্স ক্রীমের সাহায্যে সৌন্দর্য্য-সাধনার বিখ্যাত দুটি নিয়ম মেনে চলেন।

প্রত্যেকের জন্যই দুটি ক্রীমের দরকার—কারণ একটিতে ময়লা কাটে, অপরটি মুখশ্রী রক্ষা করে। রাত্রিতে চাই, সারাদিনের ধূলি ও ময়লা দূর করার জন্য উচ্চাঙ্গের একটি তৈলাক্ত ক্রীম — পণ্ড্স কোল্ড ক্রীম। আর ভোরবেলা চাই, রঙ্-কালো-করা রোদের তাত থেকে মুখশ্রী বাঁচানোর জন্য হাল্কা, অদৃশ্য একটি ক্রীম—পণ্ড্স ভ্যানিশিং ক্রীম।

সৌন্দর্য্য-সাধনার দুটি উপায়ঃ

রোজ রাত্রে পণ্ড্স কোল্ড ক্রীম মুখে মেখে আস্তে আস্তে মালিশ করে বসিয়ে দিন। এর সুমিশ্রিত তেল লোমকূপের ভেতর থেকে সমস্ত ময়লা বার করে আনবে। তারপর মুছে ফেললেই দেখবেন, মুখখানি কেমন লাবণ্যে উজ্জ্বল!

রোজ ভোরে খুব পাত্লা ক'রে পণ্ড্স ভ্যানিশিং ক্রীম মাখুন। এ হাল্কা, অথচ চট্চটে নয়। মাখার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায় এবং অদৃশ্য একটি সূক্ষ্ম স্তর সারাদিন মুখশ্রী অক্ষুণ্ণ ও কমনীয় রাখে।

POND'S COLD CREAM

POND'S VANISHING CREAM

পণ্ড্স

সা হি ত্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

পূর্ণশশী দেবী—মহিলা কবি ও গ্রন্থকর্ত্রী। পঞ্জাব প্রদেশের আম্বালা নামক স্থানে কিছু কাল বাস। ইনি ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞা এবং বহু ফার্সী কবিতার অনুবাদ করেন। গ্রন্থ—স্নেহময়ী, মধুমিলন, সুখের বাসর, অনুরাগ, অভিশপ্তা, মেয়ের বাবা, ফল্গুধারা, প্রেমের পরশ, শাদাকালো, রূপহীনা।

পূর্ণানন্দ গিরি পরমহংস—তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ। জন্ম—১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মৈমনসিংহের কাটিহালি গ্রামে। প্রকৃত নাম—জগদানন্দ। অন্য উপাধি—যতি, পরিব্রাজক। বেদ, বেদান্ত, আগম ও তন্ত্রশাস্ত্রে বিশারদ। তন্ত্রগ্রন্থ—ষট্‌চক্রভেদ, বামকেশ্বর-তন্ত্র, শ্যামারহস্য-তন্ত্র, শাক্তক্রম (১৫৭১ খৃঃ), শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী, তত্ত্বচিন্তামণি (১৫৭৭ খৃঃ), তত্ত্বানন্দ-তরঙ্গিণী।

পূর্ণানন্দ স্বামী—সিদ্ধপুরুষ। জন্ম—বরিশাল জেলায় গুঠিয়া গ্রামে সেন-বংশে। মৃত্যু—১৩৪৩ বঙ্গ, ১৭এ কার্তিক। শিক্ষা—বি, এ, বি, এল। কর্ম—শিক্ষকতা, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে। আইন-ব্যবসায়, ভোলা (বরিশাল)—পরে সন্ন্যাস গ্রহণ এবং গিরি সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধানন্দ স্বামীজীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—শিবালয় (হৃষীকেশ)। গ্রন্থ—পূর্ণজ্যোতি (সংস্কৃত), Yoga & Perfection.

পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ—গ্রন্থকার। জন্ম—বাঁকীপুর। শিক্ষা—এম, এ, বি, এল। রায়বাহাদুর ও বিদ্যাবিনোদ উপাধিলাভ। গ্রন্থ—পৌরাণিক কথা, চৈতন্যকথা। অন্যতম সম্পাদক—ব্রহ্মবিদ্যা (১৩১১)।

পৃথু যশা—জ্যোতির্বিদ্। পিতা—বরাহমিহির। গ্রন্থ—ষট্‌পঞ্চশিকা, (প্রশ্ন-গণনা বিষয়ক ফল গ্রন্থ)।

পৃথীচন্দ্র ত্রিবেদী, রাজা—কবি। জন্ম—মুর্শিদাবাদ জেলার পাকুড়ের জমীদার-বংশে। পিতা—রাজা বৈদ্যনাথ ত্রিবেদী। গ্রন্থ—গৌরীমঙ্গল, ৫ খণ্ড (১২১৩), ভুষণ্ডীরামায়ণ।

পৃথীশচন্দ্র ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পতিতা ধরিত্রী, যৌবনের অভিশাপ, শিল্পী, মরা নদী, পতঙ্গ, কারটুন, বিবস্ত্র মানব, দেহ ও দেহাতীত।

পৃথীশচন্দ্র রায়—রাজনৈতিক নেতা ও সাংবাদিক। জন্ম—ফরিদপুরের অন্তর্গত উলপুরের বসু রায়চৌধুরী বংশে। মৃত্যু—১৯২৮ খৃঃ। পিতা—পূর্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী। প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক—The Indian World (মাসিক ও পরে সাপ্তাহিক), সম্পাদক—Bengali (দৈনিক)। গ্রন্থ—The Poverty and Problem in India.

প্যারীচরণ দাস—সাংবাদিক ও দেশব্রতী। জন্ম—শ্রীহট্ট জেলায় করিমগঞ্জে। কর্ম—উচ্চশিক্ষা-সমাপনান্তে ভারত সরকারের বৈদেশিক বিভাগে (কিছুকাল)। প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক—শ্রীহট্ট প্রকাশ (সাপ্তাহিক, ১৮৫৬)। গ্রন্থ—ভারতেশ্বরী কাব্য (১২৮৩)।

প্যারীচরণ সরকার—শিক্ষাব্রতী ও সাংবাদিক। জন্ম—১২৩০ বঙ্গ ২৮এ মাঘ কলিকাতা চোরবাগানে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১২৮২ বঙ্গ ১৫ই আশ্বিন। পিতা—ভৈরবচন্দ্র সরকার। মাতা—দ্রবময়ী। আদি নিবাস—কৃষ্ণনগর। শিক্ষা—হেয়ার সাহেবের পাঠশালা (চোরবাগান), ঢাকায়, কলিকাতা হেয়ার স্কুল (জুনিয়ার স্কলারশিপ, ১৮৩৮), সিনিয়ার বৃত্তি (হিন্দু কলেজ, ১৮৪৩)। কর্ম—শিক্ষকতা, হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল (১৮৪৩), প্রধান শিক্ষক—বারাসাত গভর্ণমেণ্ট স্কুল (১৮৪৫), কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল (বর্তমান হেয়ার স্কুল, ১৮৪৫), অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ (১৮৬৭)। প্রতিষ্ঠা—চোরবাগান প্রিপেরেটরী স্কুল, চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, Bengal Temperence Society (১৮৬৩), Well Wisher (মাসিকপত্র), হিতসাধক (সংবাদপত্র), School Book Press (মুদ্রাযন্ত্র)। গ্রন্থ—First Book of Reading, Tree of Temperence, Grammar, Geography. সম্পাদক—Education Gazette (১৮৬৬-৬৮), হিতসাধক (সংবাদপত্র), সাপ্তাহিক বার্তাবহ (সাপ্তাহিক, ১৮৫৬)।

প্যারীচাঁদ মিত্র—জনহিতব্রতী ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। ছদ্মনাম—টেকচাঁদ ঠাকুর। জন্ম—১২২১ বঙ্গ, ৮ই শ্রাবণ কলিকাতা নিমতলা পল্লীতে। মৃত্যু—১২৯৪ বঙ্গ, অগ্রহায়ণ। পিতা—রামনারায়ণ মিত্র। পূর্ব নিবাস—হুগলী পানিসেহালা। শিক্ষা—হিন্দু কলেজ ও গৃহে ফারসী ভাষা। অধ্যয়ন কালে প্রবন্ধ রচনায় Sir John Peter Grant কর্তৃক পুরস্কার লাভ। বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ। স্থাপনা—ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৩৫) এবং উহার গ্রন্থ-অধ্যক্ষ (১৮৬৭), The British India Society (১৮৩৭)। ইহার পর ব্যবসায় এবং পরবর্তী জীবনে জষ্টিস অফ দি পীস হন। ইনি বহু জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গ্রন্থ—আলালের ঘরের দুলাল (১২৬৪), মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকা কি উপায় (১২৬৬), রামারঞ্জিকা (১৮৬০), কৃষিপাঠ (১৮৬১), গীতাঙ্কুর (১২৬৮), যৎকিঞ্চিৎ (১৮৬৫), অভেদী (১৮৭১), ডেবিড হেয়ারের জীবনী (১২৮৫), এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের পূর্বাবস্থা (১৮৭১), আধ্যাত্মিকা (১২৮৬), বামাতোষিণী (১২৮৮)। সম্পাদক—মাসিক পত্রিকা (স্ত্রীপাঠ্য প্রথম মাসিকপত্র, ১৮৫৪), বেঙ্গল স্পেক্টেটর (দ্বিভাষিক মাসিক, ১৮৪২)।

প্যারীমোহন রুদ্র—সাহিত্যিক। সম্পাদক—হিতৈষী (মাসিক ১৮৭৮)।

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত—কবি। জন্ম—১৩০০ বঙ্গ হুগলী জেলার গোপীনাথপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৩৫৪ বঙ্গ। কর্ম—প্রথমে সরকারী অফিস, পরে অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ। সহকারী সম্পাদক—প্রবাসী, পঞ্চপুষ্প। গ্রন্থ—অরুণিমা, বেদবাণী, মেঘদূত, কোজাগরী, হালুম-বুড়ো, ভূতের লড়াই, বাঘসিংহের মুখে, লক্ষ্মীছেলে। সম্পাদক—উদয়ন, (মাসিক)।

প্যারীমোহন হালদার—সাহিত্যিক। সম্পাদক—দীপিকা (মাসিক, ১২৯৪)।

প্যারীলাল সিংহ—সাহিত্যিক। সম্পাদক—প্রচারিকা (মাসিক, ১২৭৭)।

প্যারীশঙ্কর দাশগুপ্ত—গ্রন্থকার। চিকিৎসক, এল, এম, এস।

গ্রন্থ—গার্গী, প্রহ্লাদ, অর্জুন, কর্ণ, লক্ষ্মণ, ফুল ও মুকুল, আর্যবিধবা, রাণা প্রতাপসিংহ, ধ্রুব, কমলিনী, স্ত্রীশিক্ষা।

প্রকাশচন্দ্র গুহ—সাংবাদিক। সম্পাদক—চারুমিহির (মৈমনসিংহ)।

প্রকাশচন্দ্র দাস—সাংবাদিক। নিবাস—চন্দননগর। সম্পাদক—যুগান্তর (চন্দননগর)।

প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সাংবাদিক। সম্পাদক—বীণাপাণি (মাসিক, ১২৯৪)।

প্রকাশানন্দ—অদ্বৈতবাদী। নামান্তর—মল্লিকার্জুন যতীন্দ্র। ১৬শ শতাব্দী। আচার্য জ্ঞানানন্দের শিষ্য। গ্রন্থ—সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

প্রকাশানন্দ স্বামী—বঙ্গীয় সাধু। জন্ম—১৮৭৪ খৃঃ। পূর্বনাম—সুশীলচন্দ্র চক্রবর্তী। পিতা—আশুতোষ চক্রবর্তী। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য। কিছুকাল মায়াবতীর উত্তরে পর্বতগুহায় অবস্থান। ধর্মপ্রচারের জন্য আমেরিকা গমন (১৯০৬)। সানফ্রান্সিসকো হিন্দু মন্দিরের অধ্যক্ষ। সম্পাদক—Voice of Freedom.

প্রগল্ভ মিশ্র—অদ্বৈতবাদী দার্শনিক ও সন্ন্যাসী। গ্রন্থ—খণ্ডনখণ্ডনম্।

প্রজাপতি দাস—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। গ্রন্থ—পঞ্চস্বরাসংগ্রহ বা গ্রন্থ (বঙ্গদেশে প্রচলিত খনার বচন এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে)।

প্রজ্ঞাকর মতি—বৌদ্ধ দার্শনিক। বিক্রমশীলা বিহারের অন্যতম দ্বারপণ্ডিত। অনুমান ১২শ শতাব্দী। গ্রন্থ—অভিসময়ালঙ্কার, বৃত্তিপিণ্ডার্থ, বোধিচর্যাবতার পঞ্জিকা।

প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, স্বামী—বৈদান্তিক। পূর্বনাম—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। জন্ম—১২৯১ বঙ্গ, ২৮এ শ্রাবণ বরিশাল জেলায় অন্তর্গত উজিরপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৩২৭ বঙ্গ, ২৫এ মাঘ কলিকাতা। পিতা—ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়। শিক্ষা—এফ. এ। বাল্যাবস্থা হইতেই দেশসেবক। কাশীতে ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী শিক্ষা। বরিশালে 'শঙ্কর মঠ' স্থাপন (১৩১৭)। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ (১৩১৯)। রাজদ্রোহ অপরাধে অন্তরীণ (১৩২২-২৬)। গ্রন্থ—বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (১৩১২), ২য় (১৩৩৩) ৩য় (১৩৩৪), রাজনীতি, কর্মতত্ত্ব, সরলতা ও দুর্বলতা, শিবমহিমস্তোত্র ও মণিরত্নমালা, সামবেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতি, তর্পণ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াবিধি।

প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির—বৌদ্ধ পণ্ডিত। ইনি রেঙ্গুন মহাবোধি সোসাইটীর অধ্যক্ষ। গ্রন্থ—প্রবাস সুহৃদ (১৯২৯), আহ্নিক ক্রিয়া, মিলিন্দ প্রশ্ন (রেঙ্গুন, ১৯৩১), নারকীয় দুঃখবর্ণনা (১৯৩০)।

প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী—গ্রন্থকর্ত্রী। জন্ম—জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশে। পিতা—হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গ্রন্থ—আমিষ ও নিরামিষ আহার, (১৯০০), ৩ খণ্ড, জারক। সম্পাদিকা—পুণ্য (১৩০৪-৮)।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ—রাজকর্মচারী ও বিদ্যোৎসাহী। জন্ম—১৮৩৫ খৃঃ ২৫এ ডিসেম্বর কলিকাতা বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটে। মৃত্যু—১৩২৭ বঙ্গ বিন্ধ্যাচলে। পিতা—হরচন্দ্র ঘোষ। শিক্ষা—প্রবেশিকা (হিন্দু স্কুল), বি-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ)। কর্ম—সহকারী গ্রন্থাধ্যক্ষ, এসিয়াটিক সোসাইটী, উীড ও জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীর রেজিষ্ট্রার। বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও সংস্কৃত, পালি ও তিব্বতী ভাষা শিক্ষা। অবসর গ্রহণের পর বিন্ধ্যাচলে বাস। গ্রন্থ—বঙ্গাধিপ পরাজয়, ৩ খণ্ড, Origin Durga Puja, On the culture of Bees in India, Country boats & crafts of India.

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—বাগ্মী ও গ্রন্থকার। জন্ম ১৮৪০ খৃঃ হুগলী জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া গ্রামে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৯০৫ খৃঃ ২৭এ মে। পৈতৃক নিবাস—হুগলী জেলার গৌরীভা। শিক্ষা—হুগলী কলেজীয় স্কুল, হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ (১৮৫৮)। কর্ম—বেঙ্গল ব্যাঙ্ক (১৮৫৮) ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা (১৮৫৯), ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। ইংরেজি, বাংলা, হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা। ভারতের সকল প্রদেশ, ইয়োরোপ, আমেরিকা ও জাপান ভ্রমণ। ফিমেল নর্মাল স্কুল স্থাপন (১৮৭০), পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়নে নিমন্ত্রিত (১৮৯০)। গ্রন্থ—স্ত্রীচরিত্র সংগঠন, Heartbeats, Spirit of God, Oriental Christ, Life & Teachings of Keshab Chandra Sen, Tour Round the world, Faith and Progress o Brahma Samaj. সম্পাদক—পরিচারিকা (মাসিক, ১২৮৫) Interpreter (মাসিক)।

প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সাংবাদিক। সম্পাদক—কাশীপুর-নিবাসী (বরিশাল)।

প্রতাপচন্দ্র রায়—অনুবাদক। জন্ম—১৮৪১ খৃঃ বর্ধমান জেলার সাঁকো গ্রামে। মৃত্যু—১৮৯৫ খৃঃ ১৩ই জানুয়ারি। পিতা—রামজয় রায়। মাতা—দ্রবময়ী। কর্ম—কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট পুস্তক বিক্রয় ব্যবসায়। দাতব্য ভারত কার্যালয় স্থাপন (১৮৭০), সি, আই, ই উপাধি লাভ (১৮৮৯)। গ্রন্থ—মহাভারত (বঙ্গানুবাদ), মহাভারতের ইংরেজি অনুবাদ, রামায়ণ (বঙ্গানুবাদ), পুরাণ।

প্রতাপচন্দ্র রায়চৌধুরী—সংবাদপত্রসেবী। জন্ম—(আনু) ১২৫৪ বঙ্গ ফরিদপুরের অন্তর্গত উলপুর গ্রামে বসু-রায়চৌধুরী বংশে। মৃত্যু—১৩১১ বঙ্গ। পিতা—ব্রজমোহন রায় চৌধুরী। কর্ম—ফরিদপুর কালেকটরীতে, তমলুক মুন্সেফ কোর্টের সেরেস্তাদারদের পদে। সম্পাদক—চিত্রকর (মাসিক, ১২৮৩), নৃপবর (মাসিক)।

প্রতাপ সিংহ—চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদ্। গ্রন্থ—অমৃতসাগর।

প্রতিভা চৌধুরী—মহিলা সঙ্গীতজ্ঞা। জন্ম—জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ী। মৃত্যু—১৩২৮ বঙ্গ। পিতা—হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বামী—স্যর আশুতোষ চৌধুরী। স্থাপনা—সঙ্গীত সঙ্ঘ। সম্পাদিকা—আনন্দ সঙ্গীত-পত্রিকা।

প্রতিভাসুন্দরী দেবী—মহিলা কবি। স্বামী—অনুরূপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এলাহাবাদ-নিবাসী)। কাব্যগ্রন্থ—বনফুল।

প্রতুলচন্দ্র সরকার—প্রসিদ্ধ যাদুকর। জন্ম—টাঙ্গাইল। শিক্ষা—করটিয়া কলেজ ও আনন্দমোহন কলেজ। যাদুবিদ্যা প্রদর্শনের জন্য ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ। যাদুসম্রাট উপাধিলাভ করেন এবং আমেরিকার International Brotherhood of Magicians এর ভারতীয় সদস্য। গ্রন্থ—হিপ্নোটিজম্, ছেলেদের ম্যাজিক, ম্যাজিকের কৌশল,

ম্যাজিক শিক্ষা, সহজ ম্যাজিক, সম্মোহন বিদ্যা (হিন্দী), ম্যাজিকের খেলা, মেসমেরিজম্, Hindoo Magic, 100 magics you can do.

প্রত্যক্ স্বরূপ—টীকাকার। টীকাগ্রন্থ—নয়ন-প্রসাদিনী (চিৎসুখাচার্যকৃত তত্ত্ব-প্রদীপিকার টীকা)।

প্রদ্যুম্নপ্রসাদ সিংহ—হিন্দী গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৮১ খৃঃ ভাগলপুর। হিন্দী গ্রন্থ—মন্দার মধুসূদন (১৯১১)।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র—গ্রন্থকার। জন্ম—শ্রীহট্ট। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের জ্ঞাতি-ভাই। গ্রন্থ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উদয়াবলী।

প্রদ্যুম্ন সূরী—জৈন আচার্য ও গ্রন্থকার। ১৩শ শতাব্দী। গ্রন্থ—বিচারসার প্রকরণ (পালি ভাষায়)।

প্রফুল্লকুমার দে—গ্রন্থকার। ছদ্মনাম—লীলাময় দে। জন্ম—১৯০৮ খৃঃ সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত রাজমহলে। পৈতৃক নিবাস—বিক্রমপুরের অন্তর্গত শেরপুর গ্রামে। শিক্ষা—সাহেবগঞ্জ, রাজমহল ও বহরমপুর। গ্রন্থ—অভিযান, অমিতাভের উচ্ছৃঙ্খলতা।

প্রফুল্লকুমার সরকার—সাংবাদিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৮৪ খৃঃ নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার নিকট, কুমারখালি গ্রামে। মৃত্যু—১৩৫১ বঙ্গ ৩১এ চৈত্র। শিক্ষা—বি. এ (১৯০৫), বি. এল (১৯০৮), বঙ্কিম পদক লাভ। কর্ম—আইন-ব্যবসায়, ফরিদপুর, ডাল্টনগঞ্জ; ঢেঙ্কানল রাজ্যে দেওয়ানীর কর্ম (১৯১২), অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে (১৯২১)। সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা (দৈনিক, ১৯২২—রাজনৈতিক মামলায় ধৃত হইয়া সম্পাদনা ত্যাগ—পুনরায় ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ সম্পাদনা)। গ্রন্থ—অনাগত, বালির বাঁধ, লোকারণ্য, ভ্রষ্টলগ্ন, বিদ্যুৎলেখা, শ্রীগৌরাঙ্গ, ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আত্মজীবনী (বঙ্গানুবাদ), রবীন্দ্রনাথ।

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—দেশকর্মী ও গ্রন্থকার। জন্ম—কুমিল্লা। প্রতিষ্ঠাতা—অভয় আশ্রম। পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী। গ্রন্থ—বিজ্ঞানের কথা (কুমিল্লা, ১৯২৯)।

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৫৬ বঙ্গ ১২ই আশ্বিন নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার নারায়ণপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৩০৭ বঙ্গ ভাদ্র নারায়ণপুর গ্রামে। পিতা—শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা—সারদাসুন্দরী দেবী। কর্ম—বিভিন্ন জেলায় কর্ম, অবশেষে পোষ্টমাষ্টার পদ প্রাপ্তি, পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, পোষ্টমাষ্টার জেনারেল (১৯০০)। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। গ্রন্থ—বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত, মণিহারা, গ্রীক ও হিন্দু, অনুভূতি।

প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৬৮ বঙ্গ। মৃত্যু—১৩০৮ বঙ্গ ১১এ অগ্রহায়ণ কলিকাতা। পিতা—পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থ—অন্ধবিলাপ (না), তোমারই (না), সংসার চক্র (উপ), গীতিনাট্য—দেববাণী, শকুন্তলা, সোনার স্বপন, মহাভারত নাট্যকাব্য।

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দময়ন্তীবিলাপ কাব্য (১২৭৪), সম্বরণবিজয় কাব্য (১২৭৬)।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য—রসায়নশাস্ত্রবিদ্। জন্ম—১৮৬১ খৃঃ ২রা আগষ্ট খুলনা জেলার অন্তর্গত রাড়ুলি গ্রামে। মৃত্যু—১৯৪৪ খৃঃ ১৬ই জুলাই বিজ্ঞান কলেজে। পিতা—হরিশ্চন্দ্র রায়। শিক্ষা—হেয়ার স্কুল (১৮৭০), প্রবেশিকা (অ্যালবার্ট স্কুল, ১৮৭৯), এফ. এ (মেট্রোপলিটান কলেজ, ১৮৮১), বি. এ পাঠের সময় গিলক্রাইষ্ট স্কলারশিপ (১৮৮২), বি. এস-সি (এডিনবরা), ডি. এস. সি (১৮৮৮, এডিনবরা), ডি. এস. সি (ডারহাম বিশ্বঃ), ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে গবেষণা দ্বারা পারদঘটিত একটি যৌগিক পদার্থ Mercurours Nittrite আবিষ্কার। সি. আই. ই উপাধি (১৯১৫) নাইট উপাধি (১৯১৯) লাভ। অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ, (১৮৮৯—১৯১৬), বিজ্ঞান কলেজের পালিত অধ্যাপক (১৯১৫—৩৭)। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল লিঃ (১৮৯৩), প্রতিষ্ঠাতা—Indian School of Chemistry (A School of Chemistry)। ইউরোপ ভ্রমণ (খৃঃ ১৯০৪, ১৯১২, ১৯২০, ১৯২৬)। ইনি ছাত্রবৎসল, দেশহিতৈষী সমাজ-সংস্কারক ছিলেন এবং চরকা ও খদ্দর এবং পল্লী উন্নয়ন কার্যে সতত কর্মব্যস্ত থাকিতেন। ইনি বিজ্ঞানের গবেষণায় জগদ্বিখ্যাত। গ্রন্থ—নব্য রসায়নী বিদ্যা, প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী (২ খণ্ড), খাদ্য-বিজ্ঞান, অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার, অধ্যয়ন ও সাধনা, সরল প্রাণিবিজ্ঞান, জাতিভেদ ও পতিত সমস্যা, বাঙালার মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার, India and the British Rule (পুস্তিকা), A History of Hindu Chemistry ২ খণ্ড (১৯০৭), Life & Experiences of a Bengali Chemist (১৯৩২), Essays on India (১৮৮৬), Maker and Modern Chemistry, The Rasarnavam or the Ocean of Mercury & other Metals & Mingles.

প্রফুল্লনলিনী ঘোষ—ঔপন্যাসিকা। 'সরস্বতী' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—মন্দারকুসুম (১৯১৫), নিমিত্তের ভাগী (১৩২২)।

প্রফুল্লময়ী দেবী—গ্রন্থকর্ত্রী। পিতা—হরদেব চট্টোপাধ্যায় (বাঁশবেড়িয়া-নিবাসী)। স্বামী—বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গ্রন্থ—আত্মস্মৃতি।

প্রফুল্লময়ী দেবী—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—চাষা, পূর্ণিমা।

প্রবোধকুমার সান্যাল—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৯০৭ খৃঃ। সৈনিক বিভাগে কর্ম, নানা দেশ ভ্রমণ, কিছুকাল দৈনিক 'যুগান্তরের' সাময়িকী বিভাগের সম্পাদক। গ্রন্থ—দুই আর দুয়ে চার, নিশিপদ্ম, কলরব, বন্যাসঙ্গিনী, কাজললতা, আমার কথাটি ফুরালো, যাযাবর, লাল রং, আগ্নেয়গিরি, পঙ্কতীর্থ, নদ ও নদী, দেবীর দেশের মেয়ে, অরণ্যপথ, এই যুদ্ধ, চেনা ও জানা, শুকনো পাতা, মহাপ্রস্থানের পথে, দেশদেশান্তর, প্রিয়বান্ধবী, রূপবতী, স্বাগতম্, মনে মনে, আঁকাবাঁকা, বন্দী-বিহঙ্গ, উত্তরকাল, অবিকল, সরল রেখা, জয়ন্ত, সায়াহ্ন, শ্যামলীর স্বপ্ন, রঙীন সুতো, নবীন যুবক, দিবাস্বপ্ন, তরুণী-সঙ্ঘ, অঙ্গরাগ, নীচের তলায়, জলকল্লোল, মল্লিকা (নাটিকা), আলো আর আগুন, পায়ে হাঁটা পথ, ভ্রমণ ও কাহিনী, মধুচাঁদের মাস। সম্পাদক—পদাতিক (সাপ্তাহিক), স্বদেশ (১৩৩৮)।

প্রবোধচন্দ্র দে—কৃষিবিদ্যাবিদ্। জন্ম—১৮৬২ খৃঃ। মৃত্যু—১৯৩৪ খৃঃ জানুয়ারি। কৃষিগ্রন্থ—কৃষিক্ষেত্র, সবজীবাগ, মালঞ্চ (১৩৩০), মৃত্তিকাতত্ত্ব, ফলকর, গোলাপবাড়ী, কার্পাসকথা,

উদ্ভিদ্ জীবন, উদ্ভিদ্ খাদ্য, ভূমিকর্ষণ, Potato Culture, ভারতে অর্থশাস্ত্র, Treatise on mango, পশুখাদ্য, আয়ুর্বেদীয় চা।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভারত ও ইন্দোচীন (১৩৩৪), India & China (১৯২৭), Pre-Aryan & Pre-Dravidian in India.

প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। শিক্ষা—এম, এ, বি-এল। গ্রন্থ—মাধিক।

প্রবোধচন্দ্র সরকার—গ্রন্থকার। জন্ম—মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা নামক স্থানে। গ্রন্থ—বিবিধ সঙ্গীত (১৮৯৬), শালফুল (উপন্যাস, ১৩০৪)।

প্রবোধচন্দ্র সেন—ছান্দসিক ও ঐতিহাসিক। জন্ম—১৮৯৭ খৃঃ ২৭এ এপ্রিল ত্রিপুরার অন্তর্গত কুলিয়া (মাতুলালয়ে)। এম, এ, অধ্যাপক, দৌলতপুর কলেজ (১৯৩২-৪২), রবীন্দ্র-অধ্যাপক, বিশ্বভারতী। গ্রন্থ—ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, ধর্মবিজয়ী অশোক, বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান, বাংলার হিন্দু-রাজত্বের শেষ যুগ, ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত, বাংলায় পুরাবৃত্ত চর্চা। সম্পাদিত গ্রন্থ—মেঘদূত।

প্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি। কাব্যগ্রন্থ—বুদ্ধবাণী (১৩১৬)।

প্রবোধ সরকার—গ্রন্থকার। জন্ম—১৯০৮ খৃঃ হাওড়ায়। শিক্ষা—কলিকাতায়। শিক্ষকতা, আদর্শ উচ্চ ইংরেজি স্কুল। গ্রন্থ—নারীপ্রগতি, তোমরা আর আমরা। সম্পাদক—দুন্দুভি (সাপ্তাহিক)।

প্রভাংশুকুমার ঘোষাল—সাহিত্যিক কবি। পিতা—প্রসন্নকুমার ঘোষাল (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট—১৯১০-১৯১৩), শিক্ষা—বি, এ বি, এল (১৯২৫)। কর্ম—আইন-ব্যবসায়, হাইকোর্ট। গ্রন্থ—আল্পনা (কাব্য, ১৩৫২)।

প্রভাকর গুপ্ত—বৌদ্ধ নৈয়ায়িক। ১০ম শতাব্দী। বিক্রমশীল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম দ্বারপণ্ডিত। গ্রন্থ—প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কার, সহাবলম্বনিশ্চয়, তর্কভাষা।

প্রভাকর মিত্র—বৌদ্ধ আচার্য ও গ্রন্থকার। ৭ম শতাব্দী। গ্রন্থ—মহাযানসূত্রালঙ্কার (চীনা ভাষায় অনুবাদ)।

প্রভাচন্দ্র—জৈন গ্রন্থকার। কবি প্রভাচন্দ্র নামে খ্যাত। ৯ম শতাব্দী এবং ইনি অনশনে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত স্বামী অকলঙ্কের শিষ্য। গ্রন্থ—পরীক্ষামুখসূত্র (টীকা), প্রভাবকচরিত্র, ন্যায়কুমুদ-চন্দ্রোদয় (টীকা), প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড।

প্রভাতকিরণ বসু—কবি ও কথা-সাহিত্যিক। জন্ম—কলিকাতায়। পিতা—যতীন্দ্রনাথ বসু। শিশু-সাহিত্যে কাকাবাবু বলিয়া পরিচিত। শিক্ষা—আই-এ ও বি-এ (বিদ্যাসাগর কলেজ)। কর্ম কলিকাতা হাইকোর্টের অনুবাদ বিভাগে। গ্রন্থ—পার্দানশিন (১৯২৭), দক্ষিণ হাওয়া (কবিতা, ১৯২৭), অতনুর তীর (ক), অসি ও মসী (ব্যঙ্গ কবিতা); শিশু-সাহিত্য—রাজার ছেলে, রূপনারায়ণের মাঝি, অভিশপ্ত বংশ, ঝড়ের প্রদীপ, হীরের টুকরো, ঝঞ্ঝা ও ঝঞ্ঝাট, জগাপিসি। সম্পাদক—ভাইবোন (মাসিক, ১৩৪৫), উদ্যান (মাসিক, ১৩৪৫), কল্যাণশ্রী (মাসিক, ১৯৫৩), আমাদের পাতা (বসুমতী), পল্লীশ্রী (মাসিক, বোলপুর, ১৩৫৮)। যুগ্ম-সম্পাদক—পাঠশালা।

প্রভাতকুমার চৌধুরী—সাহিত্যিক। সম্পাদক—অন্তর্ক্থা (১৩৩৩-৩৪)।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৭৯ বঙ্গ ২২এ মাঘ বর্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রামে (মাতুলালয়ে) মৃত্যু—১৩৩৮ বঙ্গ ২২এ চৈত্র। পিতা—জয়গোপাল মুখোপাধ্যায়। পৈতৃক নিবাস—হুগলী জেলার গুরুপ নামক স্থানে। শিক্ষা—প্রবেশিকা (জামালপুর উচ্চ ইংরেজি স্কুল, ১৮৮৮), এফ-এ (পাটনা কলেজ, ১৮৯১), বি-এ (ঐ, ১৮৯৫)। বি-এ পাঠের পর সরকারী টেলিগ্রাফ অফিসে চাকুরী। বিলাত-গমন (১৯০১), বার-এট-ল (১৯০৩)। আইন-ব্যবসায়—গয়া, রঙ্গপুর। অধ্যাপক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ছদ্মনাম—জানোয়ারচন্দ্র শর্ম্মা। গ্রন্থ—গল্প—নবকথা (১৩০৬), ষোড়শী (১৩১৩), শাহাজাদা ও ফকীর কন্যার প্রণয়কাহিনী, কাটামুণ্ড (১৩১৬), দেশী ও বিলাতী (১৩১৬), গল্পাঞ্জলি (১৩২০), গল্পবীথি (১৩২৩), পত্রপুষ্প (১৩২৪), হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প (১৩৩০), বিলাসিনী ও অন্যান্য গল্প (১৩৩৩), যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প (১৩৩৫), নূতন বউ ও অন্যান্য গল্প (১৩৩৫), জামাতা বাবাজী ও অন্যান্য গল্প (১৩৩৮)। উপন্যাস—রমাসুন্দরী (১৩১০), নবীন সন্ন্যাসী (১৩১৯), রত্নদীপ (১৩২২), জীবনের মূল্য (১৩২৩), সিন্দুরকৌটা (১৩২৬), মনের মানুষ (১৩২৯), আরতি (১৩৩১), সত্যবালা (১৩৩১), সুখের মিলন (১৩৩৪), সতীর পতি (১৩৩৫), প্রতিমা (১৩৩৫), গরীব স্বামী (১৯৩০), নবদুর্গা (১৯৩০), বিদায় বাণী (১৩৪০), অভিশাপ (ব্যঙ্গ কাব্য, ১৯০০)। সম্পাদক—মর্মবাণী (অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সহ, সাপ্তাহিক—১৩২২), মানসী ও মর্মবাণী (জগদীন্দ্রনাথ রায় সহ, মাসিক, ১৩২২)।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থাধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী। গ্রন্থ—রবীন্দ্রজীবনী, ভারতের জাতীয়তা, ভারত-পরিচয়, ভারতের জাতীয় আন্দোলন (১৩৩১), বঙ্গপরিচয় ১ম (১৩৪৩), রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশক ১ম (১৩৪০) ২য় (১৩৪৩), প্রাচীন ইতিহাসের গল্প (১৩১১), বাংলা দশমিক বর্গীকরণ (১৯৩৫), Indian Literature in China & Far East (১৯৩১)।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। নিবাস—গুপ্তিপাড়া। গ্রন্থ—অদলবদল।

প্রভাতচন্দ্র ঘোষে—সাহিত্যিক। জন্ম—মেদিনীপুরের মহিষাদলে। ইনি মহিষাদলে রাজ এষ্টেটের দেওয়ান। গ্রন্থ—দার্জিলিং (ভ্রমণ)।

প্রভাতচন্দ্র সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পদার্থতত্ত্ব উপক্রমণিকা (১৮৬৮), চারি খণ্ডের ভূগোল (১৮৭২)।

[ক্রমশঃ]

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

১৪

মস্কোর উপকণ্ঠে লেনিন পর্বতের উপর নির্মীয়মান নূতন বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৪৯এর ফেব্রুয়ারী মাসে কাজ আরম্ভ হয়েছে, ১৯৫১এর ডিসেম্বর মাসে কাজ শেষ হবে। এত দ্রুত একটা গোটা নগর শুদ্ধ সুবিশাল অট্টালিকা তৈরী, সোবিয়েত ইঞ্জিনিয়র ও শ্রমিকদের প্রশংসনীয় কৃতিত্ব। আমরা দেখলাম, মোটামুটি কাজ শেষ হয়ে এসেছে। প্রধান স্থপতি তাঁর কার্যালয়ে আমাদের পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে দিলেন। কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ষোলশ' বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠছে। কেন্দ্রীয় বিভাগটি ৩৬ তলা উঁচু, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরানো বাড়ী থেকে বিজ্ঞানের ছয়টি বিভাগ এখানে সরিয়ে আনা হবে। কেন্দ্রে থাকবে খনি-বিজ্ঞান ভূ-বিজ্ঞান যন্ত্র-বিজ্ঞান, গণিত ও ভূগোল বিভাগ, পাশের বাড়ীগুলোতে পদার্থবিদ্যা রসায়ন এবং জীববিজ্ঞান। একটা বিশেষ বাড়ী তৈরী হচ্ছে যেটা মানমন্দির বা জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণাগার। বিজ্ঞানের গবেষণা ও অগ্রগতির জন্ত এই বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠার প্রথম কিস্তীতে সোবিয়েত সরকার তিন কোটি রুবল ব্যয় করছেন। এই আবাসিক বিদ্যালয়ে ছয় হাজার ছাত্র ও ছ'শো অধ্যাপক থাকবেন। আমরা এর নমুনা দেখলাম। ছাত্রদের কক্ষগুলিতে পড়াশুনা বিশ্রাম ও সংলগ্ন স্নানাগারের ব্যবস্থা; আর অধ্যাপকদের জন্ত সুদৃশ্য আসবাবে সজ্জিত তিনখানি ঘর, স্নানাগার, রন্ধনশালা, বৈদ্যুতিক চুল্লী প্রভৃতি।

এ ছাড়া বার লক্ষ খণ্ড পুস্তক-সমন্বিত লাইব্রেরী—যন্ত্রচালিত টিউবের মধ্য দিয়ে যে কোন বই চাইবার দশ মিনিটের মধ্যে ছাত্র ও অধ্যাপকদের টেবিলে এসে পৌঁছবে। ছ'শো নব্বই বিঘে জমির ওপর তৈরী হচ্ছে বোটানিকেল গার্ডেন। দেশ-দেশান্তরের তরুলতার সমাবেশ ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের গবেষণার ব্যবস্থা। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সাজ-সরঞ্জামের বিবরণ শুনতে শুনতে প্রধান স্থপতিকে বললাম, আপনাদের প্রত্যেক পরিকল্পনাই বৃহৎ। তিনি হেসে বললেন, রাশিয়া বৃহত্তর।

শুনলাম, আগামী বছরেই কাজ আরম্ভ হবে, কোরিয়া ও চীন থেকে ছয় শত ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করবে। ভারতীয় ছাত্ররা এখানে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ পেতে পারে কি না, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি হেসে বললেন, নিশ্চয়ই পাবে। আমরা তো সব দেশের ছাত্র গ্রহণ করতে প্রস্তুত, কিন্তু বাধা আছে। প্রথম বাধা তোমাদের দেশে এক জন গ্রাজুয়েট যে পরিমাণ ইংরেজী শেখে, ততটা রুশ ভাষা শেখা দরকার। আমাদের অধ্যাপকরা ইংরেজী জানেন না। দ্বিতীয় বাধা, তোমাদের গভর্ণমেণ্ট জোয়ান ছেলে-মেয়েদের কি এ দেশে আসতে দেবে? শেষের বাধার উত্তর দেয়া কঠিন। প্রথম বাধার কথা শুনে আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিতরা উচ্চ হাস্য করবেন। ইংরেজী জানে না, তা'হলে অধ্যাপক হতেই পারে না, এমন কথা বললে এ দেশের শতকরা ৯৯ জন সায় দেবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা হতে পারে, এ কথা বলতে সাহস হয় না। পাঠশালায় ওটা চলতে পারে, কিন্তু কলেজে অচল। পরের ভাষায় জ্ঞানলাভের সাধনা পৃথিবীর কোন স্বাধীন দেশে নেই। মাতৃভাষা এ দেশে এতই অবজ্ঞেয় যে, ইংরেজী জানি না এ কথা বলা অপরাধ। রাশিয়ায় নামজাদা সাহিত্যিকদের দেখলাম, ইংরেজী জানেন না, এ কথা বলতে আমাদের মত লজ্জায় তাঁদের কর্ণমূল আরক্তিম হয়ে ওঠে না। সম্প্রতি আমাদের দেশে উত্তর-ভারতের গ্রাম্য কথ্যভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলে চালাবার উৎসাহ দেখছি। পণ্ডিত ব্যক্তিরা হায় হায় করছেন স্কুল-কলেজে ইংরেজীতে শিক্ষা না দিলে শিক্ষাই লোপ পাবে। এঁদের কুযুক্তির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"ইংরেজী হোটেলওয়ালার দোকান ছাড়া আর কোথাও দেশের লোকের পুষ্টিকর অন্ন মিলবেই না এমন কথা বলাও যা, আর ইংরেজী ভাষা ছাড়া মাতৃভাষার যোগে জ্ঞানের সম্যক্ সাধনা হতেই পারবে না এ-ও বলা তাই।"

হিন্দী বা হিন্দুস্থানীকে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রভাষারূপে মেনে নেয়া হয়েছে এতে আপত্তি করি নে, কিন্তু প্রাদেশিক প্রাচীন ও বেগবান ভাষাগুলিকে কোণঠাসা করে হিন্দী চালাবার উদ্যম দেখে দুঃখ পাই। অন্ততঃ আমাদের প্রতিবেশী বিহার প্রদেশে এই চেষ্টা চলেছে। বঙ্গভাষাভাষীদের বিদ্যালয়গুলির ওপর নোটীশ দেওয়া হয়েছে, হিন্দীর মাধ্যমে ইতিহাস বিজ্ঞান গণিত ভূগোল প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা না করলে সরকারী সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। পুরুলিয়ায় একটি পুরাতন মেয়েদের ম্যাট্রিক স্কুলের সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার মোহ এতই প্রবল। মাতৃস্তন্য যেমন শিশুর পক্ষে, তেমনি মাতৃভাষা জাতির সাংস্কৃতিক বিকাশ ও পুষ্টির জন্ত আবশ্যক। বহুভাষাভাষী ভারত এ ব্যাপারে রাশিয়ার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করবে, আমি এখনও এই আশা পোষণ করি।

রুশ ভাষা সকলেই শেখে : কিন্তু বিদ্যালয় থেকে কলেজ পর্যন্ত বিভিন্ন জাতির মাতৃভাষাতেই এখানে শিক্ষার ব্যবস্থা। জর্জিয়ার তিবলিসি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখলাম, উচ্চশিক্ষা জর্জিয়ান ভাষাতেই দেওয়া হয়। জর্জিয়ানদের মাতৃভাষা-প্রীতি এত প্রবল যে তারা নিজেদের মধ্যে জর্জিয়ান ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলে না। রুশদের সঙ্গে এরা রুশ ভাষায় কথা বলে, কিন্তু বিদেশীদের সঙ্গে কথা বলতে মাতৃভাষায় কথা বলে, তা' ইংরেজীতে অনুবাদ করে আমাদের দোভাষীকে বোঝাতে হয়েছে। উজবেকস্থানেও এই দেখলাম। উজবেকদের লেখ্য ভাষার বয়স মাত্র পঁচিশ বৎসর। এখানেও পঠন-পাঠন উজবেক ভাষায়, বহু রুশ জার্মান ফরাসী সাহিত্যের বিজ্ঞান-দর্শনের বই উজবেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

১৫

১৭ই জুলাই। মস্কো থেকে সকাল ৮টায় বিমান ছাড়ল। খারকোভ রষ্টভ ছেড়ে বিমান চলেছে, নীচে কৃষ্ণসাগরের নীল জল। সোকোনীতে বিমান থামল। চা-পানের পর ককেসাস পর্বতমালার ওপর দিয়ে অপরাহ্ণ ৭টায় বিমান জর্জিয়ার রাজধানী তিবলিসি বিমান-ঘাঁটিতে নামল। স্থানীয় লেখকসঙ্ঘ যথারীতি অভ্যর্থনা করলেন।

চারিদিকে পর্বতমালা-বেষ্টিত উপত্যকার অসমতল তিবলিসি শহর—মাঝখান দিয়ে খরস্রোতা কুরা নদী এঁকে-বেঁকে চলেছে; তার দু'পাশে ফার, পপলার, চেনার পাইন গাছের সার; মাঝে-মাঝে বাগান; নানা রংএর অজস্র ফুল। এ কোন স্বপনপুরীতে প্রবেশ করলাম! চওড়া পরিচ্ছন্ন রাস্তা, উজ্জ্বল স্নিগ্ধ-ভাতি বিদ্যুতালোকে চারদিক প্রসন্ন। হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছি, যদি সুউচ্চ সৌধমালা চারদিকে না থাকতো তাহলে দারজিলিং বলে ভ্রম হত। পুণা ও হায়দ্রাবাদ হাত ধরে মিলে-মিশে দাঁড়িয়েছে, এ কথা বললেও এ সুন্দরী নগরীর তুলনা হয় না। সম্মুখে পাহাড়ের চূড়ায়, প্রমোদ-ভবন আলোয় আলোময় হয়ে শোভা পাচ্ছে।

তিবলিসি—স্থায়ী সার্কাস-ভবন

ধ্যান ভেঙে গেল, কমরেড অকসানা দেবী ডাকছেন,—পাশ্‌লি, পাশ্‌লি। অর্থাৎ ত্বরা করো।

হোটেলের একতলায় একটি ভোজনকক্ষ—সুসজ্জিত টেবিলে নানাবিধ খাদ্য ও মদ্যের সমাবেশ। জর্জিয়ার প্রাচীন প্রথা অনুসারে ভোজসভার একজন নেতা নির্বাচন করতে হয়। জর্জিয়ার লেখক-সঙ্ঘের সভাপতি কবি গেয়র্গি লিওনিট্‌সে (Georgi Leonitze) ভোজসভার সভাপতি অর্থাৎ 'তামাদা' নির্বাচিত হলেন। এ দেশের নিয়ম খাদ্য-পানীয় সম্পর্কে 'তামাদা'র নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করতে হবে। লিওনিট্‌সে শালপ্রাংশু মহাভুজ পুরুষ, প্রশস্ত ললাটের নীচে উজ্জ্বল নীল চক্ষু, সুগঠিত দেহে যৌবনের প্রাচুর্য। জর্জিয়া আঙুর ও অন্যান্য ফলের উৎকৃষ্ট সুরার জন্য প্রসিদ্ধ। জর্জিয়ার 'শ্যাম্পেন', ফ্রান্সের পৃথিবী বিখ্যাত শ্যাম্পেনের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। ভোজন আরম্ভ হল। বারম্বার 'স্বাস্থ্যপান' এবং পানপাত্র এক চুমুকে নিঃশেষ করতে হবে। এখানে ভোজ-সভা এক বিরাট ব্যাপার; সন্ধ্যায় আরম্ভ হয়ে শেষ রাত্রি পর্যন্ত! পান ভোজন
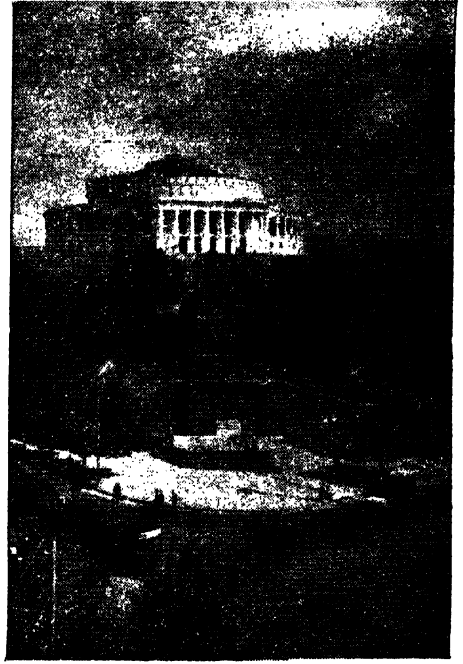
তিবলিসি পর্বত-শিখরে প্রমোদ-প্রাসাদ

নৃত্য গীত বিরামহীন ভাবে চলে। গল্প শুনলাম, কোন গ্রামে এক 'তামাদা' তিন দিন তিন রাত সমানে ভোজ-সভায় নৃত্য-গীত চালিয়েছিলেন। আমাদের 'তামাদা' এতটা নিষ্ঠুর না হলেও সহজে রেহাই দিলেন না; রাত্রি এগারোটায় নিয়ে গেলেন, পর্বতচূড়ার উপরে এক সুরম্য প্রমোদ-নিকেতনে। আবার ভোজ-সভা বসলো—নিস্তেজ সুরক্ষিত সুমিষ্ট সুরা। তবুও সুরা তো বটে! আমাদের 'তামাদা' এবং জর্জিয়ান লেখকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 'স্বাস্থ্যপান' আমাদের সাধ্যাতীত। আমরা কৌশলে সুরার পরিবর্তে গ্লাসে লিমোনেড ঢেলে ওঁদের 'স্বাস্থ্যপানে' আহ্বান করতে লাগলাম। 'তামাদা' খিটখিট করে চাইলেন, কিন্তু হটবার পাত্র তিনি নন। আমাদের লিমোনেডের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনি 'শ্যাম্পেন' দিয়ে পানপাত্র পূর্ণ করতে লাগলেন। রাত্রি একটায় সভা ভাঙলো, চরাচর পরিব্যাপ্ত চন্দ্রালোক আকাশে মোহ রচনা করেছে, নিম্নে অজস্র আলোকমালামণ্ডিত তিবলিসি নগরী।

তিবলিসি প্রায় হাজার বছরের পুরাতন সহর। সহরতলীতে সুতা, কাপড়, ইস্পাত ও জলবিদ্যুতের কারখানা গড়ে ওঠায় লোকসংখ্যা বেড়ে প্রায় তিন-চার লাখ হয়েছে। সহরে জর্জিয়ান ছাড়াও রুশ আর্মেনিয়ান তাজিক তুর্কী কাজাক প্রভৃতি মধ্য-এশিয়ার নানা জাতির লোক দেখতে পাওয়া যায়। গির্জা, মসজিদ এবং প্রাচীন প্রাসাদ-দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া পুরাতন নিদর্শন কম। এখন বাড়ী ঘর রাস্তা সবই আধুনিক। এর কারুকার্য, দেয়াল-চিত্র আসবাবপত্রে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে। জর্জিয়ানরা জাতীয় সাহিত্য ও শিল্পের অনুরাগী সুপ্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী বলে গর্ব বোধ করে থাকে।

উত্তর-পশ্চিম এশিয়ায় জর্জিয়া একটা ক্ষুদ্র দেশ। ১৮ হাজার ফুট উঁচু ককেসাস পর্বতমালার তরঙ্গায়িত কোলে কোলে অপূর্ব শোভাময় উপত্যকায় ভরা জর্জিয়ার উর্বর ভূমি কৃষ্ণসাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানেই বাকুর বিখ্যাত তেলের খনি—এ ছাড়া নানা স্থানে ম্যাঙ্গানিজ, তামা লোহার খনি আছে। সোভিয়েত আমলে তিবলিসিতে প্রকাণ্ড ইস্পাতের কারখানা গড়ে উঠেছে।

সাহসী, অতিথিবৎসল, পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান সুগঠিত-দেহ আর্যবংশীয় জর্জিয়ান জাতির দু'হাজার বছরের ইতিহাস—রাজ্য ও সাম্রাজ্য ভাঙা-গড়ার ইতিহাস। সম্রাট আলেকজেণ্ডার, বাইজানটাইন, চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর প্রভৃতি দিগ্বিজয়ীদের চতুরঙ্গবাহিনী এ দেশে প্রবেশ করেছে, তাদের ধ্বংসলীলার কাহিনী এরা ভোলেনি। যুগে যুগে এরা স্বাধীনতার যুদ্ধ করেছে। এদের লোকসঙ্গীত ও গাথার মধ্যে পূর্বপুরুষের মহান্ বীরত্ব-কাহিনী ছড়িয়ে আছে। দশম শতাব্দীর কবি রুস্তা ভেলীর কাব্যে গল্প আছে, এক ভারতীয় রাজকন্যা জর্জিয়ার রাণী ছিলেন। গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে জর্জিয়াকে রুশ-সাম্রাজ্য গ্রাস করে। শতাব্দীর শেষ ভাগে ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের সময় জর্জিয়ানরা বিদ্রোহ করেছিল, জার-গভর্ণমেণ্ট নিষ্ঠুর অত্যাচারে সে বিদ্রোহ দমন করে ফেলেন। প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী এই নিপীড়িত পরাধীন জাতির মধ্যেই মানবমুক্তির পুরোধা স্তালিনের আবির্ভাব।

তিবলিসিতে প্রথমেই চোখে পড়লো, পুরুষেরা বসন-ভূষণে একেবারে ইয়োরোপীয়, তবে সাধারণতঃ 'টাই' পরে না। মেয়েদের বসনে সাজসজ্জায় প্রাচ্যের অলঙ্কারপ্রিয়তা আছে, প্রসাধনে মস্কোএর নারীদের চেয়ে এরা বেশী সজাগ। খাদ্যের বেলায় এরা প্রাচ্যই আছে, আমাদেরই মত মশলা ব্যবহার করে, কাঁচা লঙ্কা ও কচি পেঁয়াজ খাবারের টেবিলের শোভাবর্দ্ধন করে। রান্নায় ইরাণী প্রভাব আছে, পোলাও ও কাবাব (শাসলিক) যথেষ্ট। এদের বাড়ী-ঘর আসবাবপত্র শিল্পকলায় ইরাণী-সংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্ট। পরাধীনতা এবং তার ফলে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার এবং সামন্তযুগের দাসত্বের পাঁক থেকে এরা মাত্র পঁচিশ বছর হল উদ্ধার পেয়েছে এবং আজ এদের দেহে-মনে পুরাতন গরিবী ও ভীরুতার কোন ছাপ নেই।

সর্বত্র যেমন এখানেও তেমনি শিশুপালনাগার, কিণ্ডারগার্টেন, হাসপাতাল, সংস্কৃতিভবন সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত। জর্জিয়ার লোকসংখ্যা ৩৩ লক্ষের মত; অথচ এদের বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস আকারে আয়তনে সাজসজ্জায় ভারতের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা বড়। জর্জিয়ার শিক্ষামন্ত্রী বললেন, এঁদের রাজস্বের অর্দ্ধেক শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়। তাঁদের বৃহৎ কারখানার আয় থেকে স্বাস্থ্য ও লোকহিতকর কাজ করা হয়। কাজেই শিক্ষার জন্য এত অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। পুলিশের ব্যয় রাজস্বের শতকরা সাত ভাগ মাত্র!

প্রথম রাত্রে যে পাহাড়ের চূড়ায় প্রমোদ-ভবনে আমরা মোটরে গিয়েছিলাম, সেই পাহাড়ে স্বতন্ত্র পথ দিয়ে ইলেকট্রিক রেলে (Finicular Railway) ওঠা গেল। সোজা খাড়া উপরে উঠে যায়—গা শির-শির করে। ট্রেণ থেকে নেমে ডান দিকে অগ্রসর হলাম। ষষ্ঠ শতাব্দীর পুরাতন গীর্জা। অনেক মূর্তি ও দেয়ালচিত্র আছে। এর প্রাঙ্গণে কবি ও লেখকদের সমাধি। এক পাশে আচ্ছাদনহীন কৃষ্ণ মর্মর পাথরে রচিত স্তালিন-জননীর সমাধি। ইনি অত্যন্ত সাদাসিধে ভাবে তিবলিসিতেই বাস করতেন। ১৯৩৭ সালে অতি বৃদ্ধা হয়ে ইনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এই তিবলিসি সহরেই খৃষ্টান পাদ্রীদের বিদ্যালয়ের ছাত্র স্তালিন মার্কসবাদে দীক্ষালাভ করেন। শ্রমিকদের বৈপ্লবিক সংস্থা গঠন করবার ভার নিয়ে তিনি ১৮৯৪ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত শ্রমিকদের মধ্যে কাটিয়েছেন, জেলে গিয়েছেন, জেল থেকে পালিয়ে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে বলশেভিক মতবাদ প্রচার করেছেন। ১৯০৩ সালে জেল থেকে পালিয়ে এসে স্তালিন এক গুপ্ত ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকে নিষিদ্ধ পুস্তক, সাময়িক পত্র, ইস্তাহার প্রভৃতি প্রকাশ করা হত। পুলিশ দু'বছর পাগলের মত ছাপাখানাটি খুঁজেছে। রাশিয়ান, জর্জিয়ান, আর্মেনিয়ান, আজারবাইজান নানা ভাষায় এখান থেকে বই, সাময়িক পত্র প্রকাশিত হত। আমরা এই গুপ্ত ছাপাখানাটি দেখলাম। একটি সত্তর ফিট গভীর কূপের মাঝামাঝি সুড়ঙ্গ কেটে বাড়ীর তলায় গর্ত্ত-গৃহ রচনা করা হয়েছিল। বাড়ীর পুলী মৈ-এর সাহায্যে কর্মীরা যাতায়াত করতেন। হাতে-চালানো ছাপাখানা এবং বিভিন্ন ভাষার হরপ ছিল। ১৯০৩ সালের ১৫ই এপ্রিল জারের পুলিশ ছাপাখানা আবিষ্কার করে। এ বাড়ীটা এখন মুজিয়ম।

তিবলিসি সহর যন্ত্রশিল্পের এক প্রধান কেন্দ্র। আমরা একটা জুতো ও মোজা-গেঞ্জীর কারখানা দেখলাম। দেখলাম, শ্রমিকদের

আবাস, বিশ্রামভবন, শিশুপালনাগার। সমস্ত দিন ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, একটা বৃহৎ বাগানে গেলাম বিশ্রাম করতে। বেলা পড়ে এসেছে, দলে দলে নরনারী আসছে, সঙ্গে ছেলেমেয়েরা। নানা স্থানে ছেলেদের খেলার জায়গা, কোথাও নাচ-গান হচ্ছে। এ যেন একটা আনন্দমেলা—জীবনের পরিপূর্ণ প্রাচুর্য চারদিকে ঝরণার জলের মত ছড়িয়ে পড়ছে।

এই বাগানে ছোটদের দু'মাইল লম্বা একটা রেলপথ আছে। ১৯৩৫ সালে এটি তৈরী হয়। দু'তিন জন বয়স্ক পরিদর্শক আছেন কিন্তু টিকিটবিক্রেতা, ষ্টেশনমাষ্টার, গার্ড, কনডাকটার ইঞ্জিনচালক সকলেই ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে। গাড়ী ও ইঞ্জিন আকারে প্রায় শিলিগুড়ী-দারজিলিং লাইনের গাড়ীর মত। জমকালো ইউনিফর্ম পরা ছোটদের ভারিক্কী চালে কাজকর্ম দেখে আমরা কৌতুক বোধ করলাম। এক রুবল ভাড়ায় যাতায়াত হয়, মাঝে চারটি ষ্টেশন। আমরা গাড়ীতে উঠে বসলাম, যাত্রীর মধ্যে ছেলেমেয়ে বেশী হলেও বয়স্ক নরনারীর অভাব নেই। বাঁশী বাজিয়ে গাড়ী ছাড়লো, একটি কিশোরী কনডাকটার গম্ভীর মুখে টিকিট পরীক্ষা করল। রেলওয়ে পরিচালনা ছেলেবেলায়ই হাতে-কলমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ভারী মজার খেলা বলে মনে হল।

১৬

১১শে জুলাই প্রভাতে তিবলিসি থেকে গোরী যাত্রা করা গেল। কুরা নদীর তীর দিয়ে মোটর চলেছে এঁকে-বেঁকে। পাহাড়ের কোলে গ্রাম, নদীর ওপারে ধানক্ষেত দেখলাম, আমাদের দেশের মতই আল দেওয়া। ধানের জমিতে জল আটকে রাখতে আলের দরকার হয়। ত্রিশ মাইল দূরে কুরা নদীর দু'পারে সহর—প্রাচীন রাজধানী। নদীর ওপর রোমানদের তৈরী সেতু এখনও রয়েছে। প্রাচীন দুর্গের প্রাচীর খাড়া রয়েছে—গঠনভঙ্গী ভারতের মুঘল যুগের দুর্গ-প্রাচীরের মত। ভিতরে একটা বৃহৎ গীর্জা ছাড়া কিছুই নেই। পঞ্চম শতাব্দীতে তৈরী এই গীর্জা হাজার বছর পর তিমুর-লঙ্গ লুঠ করেন। তার পর অনেক দিন সংস্কার হয়নি। গত শতাব্দীতে সংস্কার করা হয়েছে। এই গীর্জায় যীশুখৃষ্টের একখানা ছোট আগ্রীবা ছবি আছে। একদৃষ্টে চাইলে মনে হয়, ছবির চোখ ধীরে ধীরে বুজে যাচ্ছে এবং খুলছে। চিত্রকরের বাহাদুরী আছে।

চেনার ও ওক গাছের ছায়ায় ঢাকা এক গ্রামে এসে আমাদের মোটর থামলো—দলে দলে নরনারী আমাদের দেখতে এসেছে। ভোজ-সভা বসলো গাছতলায়—ভোজ্য-পানীয়ের বিপুল আয়োজন! জর্জিয়ান আতিথেয়তার উদার অজস্রতা! আমাদের তাড়া আছে, তাই মাত্র দু'ঘণ্টা পরে তাঁরা দুঃখের সঙ্গে বিদায় দিলেন। গাড়ী ছুটলো। পাহাড়ের চূড়া তরঙ্গায়িত; সুদৃশ্য গ্রাম, দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, শ্যামল বনভূমি; মাঝে-মাঝে দুরন্ত নদীকে বশ করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র দেখতে দেখতে আমরা স্তালিনের জন্মভূমি গোরীতে এসে উপস্থিত হলাম।

সেকালে গোরী ছিল ছোট গঞ্জের মত সহর—এখন তার পুরনো দিনের চেহারা একদম বদলে গেছে, কেবল পূব দিকে প্রাচীন

দিনের স্মৃতি নিয়ে পাহাড়ের ওপর পরিত্যক্ত বাইজানটাইন দুর্গ দাঁড়িয়ে আছে, গ্রীক্-রোমক, তুর্কী-মুঘল, ইরাণী-রাশিয়ানদের অভিযানে কত বার হাত-বদল হয়ে এখন নিস্তব্ধ। এ ছাড়া বাড়ী-ঘর-দোর, ট্রাম-বাস সবই আধুনিক; সামন্ততান্ত্রিক যুগের চিহ্ন বিলুপ্ত হয়েছে। প্রকাণ্ড হোটেল ও পান্থনিবাস হয়েছে ভ্রমণকারী ও তীর্থযাত্রীদের জন্ম। স্তালিনের জন্মভূমি বিশ্বমানবের মুক্তিকামীদের তীর্থক্ষেত্র ছাড়া আর কি?

ছোট উদ্যান, লাল ও সাদা গোলাপ চারদিকে ফুটে আছে—একদিকে নীল পাইনের গাছগুলি অস্তসূর্যের আলোর পুঞ্জ পুঞ্জ নীল মেঘের মত স্থির হয়ে আছে। তারি সম্মুখে চতুষ্কোণ মর্মরবেদী, মর্মর স্তম্ভের ওপর কাচের ছাদের নীচে পাশাপাশি দু'টো জাফরী ইটের তৈরী ছোট ঘর। একটিতে থাকতেন ভাড়াটেরূপে ভিসারিয়ান-দম্পতি। এক জন চর্মকার, অপর কৃষক-দুহিতা, অপর ঘরটি ছিল বাড়ীওয়ালার। দরিদ্র শ্রমিকের এই কুটিরে জননী ক্যাথারিনা ১৮৭৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর চতুর্থ সন্তান স্তালিনকে প্রসব করেন। পর পর তিনটি সন্তান সূতিকাগারেই মারা যায়। এটি বাঁচলো। পিতার ইচ্ছা পুত্রকে একজন উত্তম চর্মকাররূপে গড়ে তোলা, মা'র ইচ্ছা তাঁর পুত্র লেখাপড়া শিখে পাদ্রী হবে। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ বিধান অন্যরূপ। বহুনিন্দিত বহুবন্দিত স্তালিন, আজ বিশ কোটি বন্ধন-মুক্ত নরনারীর নেতা গুরু উপদেষ্টা—সর্বদেশের মানবমুক্তি-কামীদের শ্রদ্ধেয় দিশারী!

সেই তক্তপোষ, মলিন বিছানা, কাঠের তোরঙ্গ, টেবিলের ওপর কিছু সাধারণ ভোজ্যপাত্র, জলের জগ আর কেরোসিনের বাতি। নরকেশরী স্তালিনের জন্মস্থান—সম্ভ্রমে মাথা নত হল, যুক্তকর অজ্ঞাতসারেই করলো ললাট স্পর্শ। বাঙ্গলা ভাষায় স্তালিনের জীবনচরিত লেখকরূপে এ আমার জীবনে এক দুর্লভ সৌভাগ্য। বহু বর্ষ পূর্বে গোরক্ষপুর থেকে শালবন-ঘেরা লুম্বিনীতে গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান দেখে যে ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম, তেমনি ভাবাবেগে হৃদয় কানায়-কানায় ভরে উঠলো। আড়াই হাজার বৎসর ব্যবধানে দুই পৃথক্ মতবাদ, আদর্শ নিয়ে মানবমুক্তিকামী দুই মহাপুরুষের অভ্যুদয়! বুদ্ধদেবের মহিমা কীর্তন করে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গেয়েছিলেন, "আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভকতি-প্রণত চরণে যাঁর।" আমি যদি এ কথা বলি বিংশ শতাব্দীতে অর্দ্ধ জগৎ স্তালিনকে বন্দনা করে, তবে তা নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না। প্রভাতের ভানু আর মধ্যাহ্নের মার্তণ্ডে প্রভেদ থাকলেও যোগ আছে।

বুদ্ধদেব ও স্তালিনের নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করলে আমাদের দেশে অনেকের কানে তা বেসুরো শোনাবে, এ আশঙ্কা আমার মনে আছে। সে সময়ে আমার মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল তা অসঙ্কোচে খুলেই বলি। মানব-সভ্যতার শৈশব থেকে সমাজ-স্থিতির কতকগুলো 'আইডিয়া' (ধারণা?) সভ্যতার গতিপথের নিয়ামক। এর বিকাশ ও বিস্তারের ধারায় যতই বৈচিত্র্য থাকুক, স্ব-স্ব রূপে অনিত্য সংসারে এটা নিত্যবস্তু। বৈষ্ণবপদকর্তা বলেছেন, "স্বরূপ বিহনে রূপের জনম কখনো নাহিক হয়।" সমাজের বিবর্তনে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের মূলে একটা 'আইডিয়া' কাজ করছে। আইডিয়া মানসলোক থেকে বাস্তব-ক্ষেত্রে মূর্তি নেয়, বিলম্বে ও ক্লেশকর পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে অধিকারভেদের বিরুদ্ধে, মানুষের লোভ দুর্বুদ্ধির বিরুদ্ধে নৈতিক সংগ্রাম যুগে যুগে রূপ থেকে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রাচীন যুগে যা ছিল আধ্যাত্মিক হৃদয়াবেগ, বর্তমান যুগে তাই বস্তুতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ। বেদের ভাষায়, "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"

বাগানের বেঞ্চে বসে দেখছি, নানা দেশের নরনারী এসেছে স্তালিনের জন্মভূমি দেখতে। তীর্থদর্শনের স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে যাবার জন্ম ফটো তোলাচ্ছে। তিন জন ফটোগ্রাফার বেশ দু'পয়সা রোজগার করছে। আমাদের দেশে এবং সব দেশেই এমন আগ্রহ লোকের আছে। রোমে সেণ্ট পিটার্স চার্চেও দেখেছি, তীর্থযাত্রীরা চার্চের পরিপ্রেক্ষিতে ফটো তোলাচ্ছে। আমরাও ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালাম। মানব-প্রকৃতি সর্বত্রই এক রকম। আমরা যে ভাব নিয়ে পুরী, কাশী, বৃন্দাবন যাই, সেই ভাব নিয়ে এরাও এসেছে সুবৃহৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের নানা প্রান্ত থেকে।

পাশেই স্তালিন ম্যুজিয়ম। স্তালিনের ছাত্রজীবন ও পরিণত বয়সের অনেক নিদর্শন সাজিয়ে রাখা হয়েছে; ফটো ও ছবি প্রচুর। কিশোর বয়সে স্তালিন কবিতা লিখতেন এটা জানা ছিল না। প্রেমের কবিতা নয়, দেশপ্রেমের কবিতা। পরাধীনতার বেদনা ও জর্জিয়ান জাতীয়তাবাদ তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

স্থানীয় হোটেলে ভোজের আয়োজন। গোরীর লেখক ও কবিরা এসেছেন, শ্রমিকসঙ্ঘের নেতারাও আছেন। রকমারি সুস্বাদু সুরা এবং প্রচুর অন্ন-ব্যঞ্জনের সমাবেশ। তার চেয়েও বেশী উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা। ভারত ও সোভিয়েতের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করলেন একাধিক বক্তা। আমরাও কম গেলাম না। বহু দিন পর গৃহাগত প্রিয়জনকে দেখে যে আনন্দ হয়, এঁরা যেন সেই আনন্দে আত্মহারা। জর্জিয়া ও ভারত, হাজার হাজার বছর আগে আমাদের পিতৃপরিচয় একই ছিল,—সে নাড়ীর যোগ এখনো রয়েছে।

১৭

রাত্রি দশটায় গোরী থেকে ট্রেণ ছাড়লো, আমরা চলেছি কৃষ্ণসাগরের তীরে বন্দর ও স্বাস্থ্যনিবাস সুকুমীতে। চাঁদের আলোয় পাহাড় পাইন-বন ও আলোকিত গ্রামগুলির এক অপরূপ শোভা। সমতল ভূমির অধিবাসী বাঙ্গালীর সমুদ্র-পর্বতের ওপর একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। রূপের পূজারী বাঙ্গালী এই টানেই পুরীতে যায়, দারজিলিং, শিলং পাহাড়ে যায়। সারা দিনের শ্রমের ক্লান্তিতে চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো। ঘুম যখন ভাঙ্গলো তখন পূর্বাকাশ রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। পথের দু'ধারে ভুট্টার ক্ষেত, এরা বলে "ভারতীয় শস্য।" ভারত থেকেই হয়তো ভুট্টা এদেশে এসেছিল। একদিন এখানে দরিদ্রদের ভুট্টাই ছিল প্রধান আহার—যেমন আমাদের দেশের বিহার অঞ্চলে। এখন মানুষ হয়তো সখ করে খায়, আসলে পশুর খাদ্যরূপেই প্রধানত এর ব্যবহার।

কৃষ্ণসাগরের তীর দিয়ে ট্রেণ চলেছে। নিস্তরঙ্গ নীল জলের বিস্তারে সাদা পাল তোলা নৌকা ভাসছে, ছোট ষ্টীমারের চাকার

আবর্তে ফেনিল জলের তরঙ্গ। উপল-আস্তীর্ণ তটভূমিতে সমুদ্র-স্নানে ক্লান্ত নরনারীরা রোদ পোহাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে স্নান করছে। মাঝে-মাঝে সরবত, কুলপী বরফ আর ফলের দোকান। সমুদ্রের ধারে যেন মেলা বসে গেছে। রাশিয়ার নানা প্রান্ত থেকে শ্রমিকেরা সপরিবারে স্বাস্থ্যনিবাসে এসেছে।

বেলা দশটায় সুকুমী ষ্টেশনে ট্রেণ থামলো। জর্জিয়ান সুন্দরীরা অজস্র পুষ্পগুচ্ছ দিয়ে অভ্যর্থনা করলো—শত শত কণ্ঠে ভারতের জয়ধ্বনি। "স্বাধীন ভারত শান্তি আন্দোলনের অগ্রদূত হোক।" সুদূর বিদেশে আমরা জননী জন্মভূমির স্বাধীনতার গৌরব ঘোষণা করে বললাম, আমাদের জনসাধারণ ও নেতারা যুদ্ধের বিরোধী। শান্তিকামী স্বাধীন ভারত কোন শক্তিশিবিরের লেজুড় হয়ে হিংসা ও হত্যার অভিযানে যাবে না।

সমুদ্রের ধারেই একটা বড় হোটেলে এসে উঠলাম। বারান্দা থেকে দেখি, দু'দিকে যত দূর দৃষ্টি যায়, সমুদ্রতীর বাঁধান—পায়ে চলার রাস্তা এবং বাগান। তার পর বড় রাস্তা। বারিধির বিস্তারে ঘন অরণ্যে ঢাকা পাহাড়ের নীলাঞ্জন ছায়া গাঢ়তর। তীরে শুভ্র সমুন্নত সৌধমালা। সৌন্দর্যবোধ ও সুরুচি মিলিত ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে চারিদিকে।

এখানকার 'বোটানিক্যাল গার্ডেন' দেখবার মত। ১৮৮০ সালে এর পত্তন হয়, নানা দেশের গাছপালা ফল ও ফুল গাছের সমাবেশ। আমাদের শিবপুর বাগানের অন্ততঃ তিন গুণ, সংগ্রহ এর অনেক বেশী। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী এবং তাঁদের ছাত্রদের একটি বৃহৎ গবেষণাগার রয়েছে। উদ্যানে প্রবেশপথের পরেই কলাগাছের ঝাড়—ফিকে সবুজ রং-এর দীর্ঘ পাতাগুলি বাতাসে দুলছে। শুনলাম এখানে কলাগাছ যত্ন করলে হয়, কিন্তু তাতে ফল ধরে না, কেবল পাতারই বাহার। বহু সুমিষ্ট ফলের দেশে কলাগাছ কেন নিষ্ফলা হল, বুঝে উঠতে পারলাম না!

একটা পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে আমরা চূড়ায় উঠে গেলাম। শঙ্খধবল বিশ্রামাগার—চারদিকে কেয়ারী-করা বাগান। ধনী ও অভিজাতদের বিলাসভবন নয়, নবজাগ্রত জনসাধারণের আনন্দ-নিকেতন। এখান থেকে সমুদ্র-মেখলা সুকুমী নগর দেখলাম, সবুজ ফ্রেমে আঁটা ছবির মত।

সকালে প্রমোদভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। পঞ্চাশ মাইল রাস্তা পাহাড়ের ওপর উঠছি, যেন দেরাদুন থেকে মুসৌরী, অথবা কাঠগুদাম থেকে নাইনীতাল। পাহাড়ের গায়ে পাইন-বন খাড়া উঠে গেছে, ঝরণা গলে গড়িয়ে পড়ছে কলহাস্যে। দেখতে দেখতে পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে উঠে গেলাম। পর্বতশৃঙ্গ-বেষ্টিত রিৎসা হ্রদ—অতলস্পর্শ নীল জল থৈ-থৈ করছে। লরী ও বাসে এসেছে সমবায় কৃষিক্ষেত্র থেকে, কারখানা থেকে তরুণ-তরুণীরা। মোটর বোটে হ্রদে বেড়াচ্ছে অথবা দাঁড়টানা নৌকো নিয়ে বাইচ খেলছে। হ্রদের তীরে খাদ্য ও মদ্যের দোকান। লক্ষ্য করে দেখেছি, এরা কড়া মদ খায় না। আঙুরের রসে তৈরী রক্তিম সুরভি সুরাই এদের প্রিয়। প্রাচীন আর্যরা যে ঘরে-তৈরী আসব পান করতেন, সে ধারা এরা বজায় রেখেছে।

সুকুমীর চার পাশে অনেকগুলি ছোট-বড় স্বাস্থ্যনিবাস ও আরোগ্যশালা দেখলাম। এগুলি বিভিন্ন রিপাবলিক ও শ্রমিক ইউনিয়নের তৈরী। এর মধ্যে গাগরীর স্বাস্থ্যনিবাসটাই বৃহৎ। সর্বত্রই স্বাস্থ্যনিবাস ও আরোগ্যশালা পাশাপাশি রয়েছে। স্বাস্থ্য-নিবাসে শ্রমিক কৃষক বুদ্ধিজীবীরা বিশ্রাম ও ভ্রমণের আনন্দে চিত্ত-বিনোদন করে আর আরোগ্যশালায় থাকে রোগীরা, বিনা ব্যয়ে আহার শুশ্রূষা চিকিৎসার ব্যবস্থা। জল-চিকিৎসার নানা রকম ধারাযন্ত্র প্রত্যেকটিতে আছে। এগুলো সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। গ্রীষ্মকালে নানা প্রান্ত থেকে শত শত নরনারী এসেছে স্বাস্থ্যনিবাসে —এর আরাম যত্ন আসবাবপত্র আমাদের দেশের মধ্যবিত্তরা চিন্তাই করতে পারে না, ধনীদের পক্ষেও দুর্লভ।

যারা উদয়াস্ত খেটে উদরান্ন সংগ্রহ করে বা কারখানায় হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে কায়ক্লেশে বাঁচবার মত মজুরী পায়, তাদের বিশ্রাম শিক্ষা ও স্বাস্থ্যলাভের অধিকার আছে, আমাদের দেশে এ কল্পনা করাই কঠিন। এদের শিক্ষাবিধির মত স্বাস্থ্য ও আরোগ্যের ব্যবস্থাও সর্বব্যাপী। অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে অচিকিৎসায় কেউ মারা না যায়, এ সম্বন্ধে সোভিয়েত সরকার সতর্ক ও সজাগ। আমাদের রাজধানীর হাসপাতালের দরজা থেকে ফিরিয়ে দেয়া রুগ্ন নরনারীর হতাশা-মলিন মুখগুলো মনে পড়লো; মনে পড়লো হতদরিদ্র দেশের চৌষট্টি টাকা দাবী করা ডাক্তারদের প্রসন্ন মুখচ্ছবি। লোকাকীর্ণ বস্তীর বন্ধ ঘরে যক্ষ্মায় ভুগে কত লোক মরছে আর দশ জনের মরবার ব্যবস্থা রেখে যাচ্ছে, কে তার হিসেব নেয়! আমাদের দেশে বিরল-সংখ্যক দাতব্য চিকিৎসালয় অবশ্য আছে, গভর্ণমেণ্ট এবং দয়ালু ধনীদের খয়রাতি পাইকারী মিকচার না খেয়ে কেউ যাতে না মরে, সে ব্যবস্থা আমরা করেছি বই কি! এখানে সর্বত্র লোকসাধারণ বিনামূল্যে ওষুধ আর বিনা-ভিজিটে ডাক্তার পায়, আর পেয়েছে এই সব রাজপ্রাসাদ তুল্য আরোগ্যশালা। এগুলি কি কেবল আরোগ্যশালা? এ যে মানুষের বৃহৎ মিলনের আনন্দ-সম্মেলন। জার-সাম্রাজ্যে এরা ছিল পরস্পরবিচ্ছিন্ন পরিচয়হীন, বিচিত্র জাতের মানুষের পরস্পরের মেলামেশার কোন সুযোগ ছিল না, আজ উক্রেনের খনিমজুরের পাশের ঘরে বাস করছে মোঙ্গলিয়ার ইস্কুল মাষ্টার।

বৃটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্র অক্টোপাশের মত আমাদের যেমন ভাবে পিষে হাড়গোড় ভেঙ্গে পঙ্গু করে ফেলে রেখে গেছে, জারের আমলে এদেরও ছিল সেই দশা। কিন্তু এরা প্রাচীন ব্যবস্থা জড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পেরেছিল বলেই, আত্মকর্তৃত্বের জাদু মন্ত্রে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে, আমরা প্রাচীন শাসনযন্ত্রের ওপর ত্রিসিংহ মূর্তির ছাপ দিয়ে সেই আমলাশ্রেণীর ওপর চালাবার ভার দিয়েছি যারা আত্মসম্মান খুইয়ে বিদেশীর দাসত্ব করেছে, যে নিজেই অশ্রদ্ধেয় সে স্বজাতিকে শ্রদ্ধা করার মত চরিত্রবল কোথায় পাবে? এখানে সব দেখে-শুনে মনে হচ্ছে, ইংরাজ আমলের 'ল এণ্ড অর্ডারে'র মানুষ-পেশা যাঁতা কলটা ভারতসমুদ্রে বিসর্জন না দিতে পারলে, বহু কাল ধরে অপমানিত অবজ্ঞাত জনসাধারণের কল্যাণ নেই। খুবই দুঃসাধ্য, অন্য কোন পথও দেখি নে।

[ক্রমশঃ।

ভলগা থেকে গঙ্গা

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

[উনিশটি উপাখ্যানে খৃষ্টপূর্ব ৬০০০ বর্ষ থেকে ১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মানব সমাজের ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের আলেখ্য]।

(মূল গ্রন্থের ভূমিকা)

আজ মানুষ যে অবস্থায় আছে শুরুতে মানুষ তার থেকে অনেক দূরে ছিল—তার ক্রমবিকাশের পথে অনেক বাধা তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে। আমি আমার 'মানব সমাজ' নামের বইতে সমাজ-বিবর্তনের এক বৈজ্ঞানিক বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছি। সেই বিষয়টিরই আরও সহজ ব্যাখ্যার জন্ত—তার কাঠামো আরও সহজবোধ্য করবার জন্তই এই বই লিখছি। এই বইতে ভারত-য়ুরোপীয় জাতির কথাই বর্ণিত হয়েছে—ভারতীয় পাঠকেরা তাই এর সাথে অনেক বেশী নৈকট্য অনুভব করবেন। বহু শতাব্দী আগে মিশর, আসিরিয়া এবং সিন্ধু উপত্যকাতেও এই গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষেরা বাস করেছে—কিন্তু সেই সমস্তেরই বিবরণ দেবার চেষ্টা করলে সেটা—লেখক ও পাঠক উভয়ের পক্ষে বেশী কষ্টকর হত।

সেই যুগে প্রতি অধ্যায়ে সমাজের যা অবস্থা ছিল তার বিশদ বিবরণ দেবার চেষ্টা আমি করেছি। কিন্তু এই ধরণের প্রথম চেষ্টায় অবধারিত ভাবেই ভুল হতে পারে। আমার এই লেখা যদি অন্য লেখককে স্পষ্টতর ছবি আঁকতে সাহায্য করে তাহলেই আমার এই লেখা আমি সার্থক মনে করব। এই বইতেই যে-যুগ সম্পর্কে "বন্ধুল মল্ল" নামে উপাখ্যানটি লেখা হয়েছে—সেই যুগ সম্পর্কেই আমি "সিংহসেনাপতি" নামে স্বতন্ত্র একটি উপন্যাস লিখছি। ইতি—

হাজারীবাগ সেণ্ট্রাল জেল, রাহুল সাংকৃত্যায়ন।
২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২

(বাংলা অনুবাদকের ভূমিকা)

আমি মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের এই বইয়ের অনুবাদ করছি, বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত ভিক্টর কিয়েরনান-কৃত এই বইয়ের ইংরেজী সংস্করণ (পিপলস্ পাবলিসিং হাউস, বম্বে কর্তৃক প্রকাশিত) থেকে। তাই সুরুতেই মূল লেখক, ইংরেজী অনুবাদক এবং প্রকাশকদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সম্পর্কে নানা লোকে, নানা মতলবে, নানা বিবরণ দেবার চেষ্টা করে থাকেন। এ-সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ও পণ্ডিত রাহুলজীর এই লেখা—গল্পের আকারে এই বিবরণ—সহজবোধ্য ও বিজ্ঞানসম্মত তথ্যপূর্ণ বলেই আমার দেশবাসীর কাছে এই অনুবাদ আমি উপস্থিত করছি।

মূল বিষয় অবিকৃত রেখে ভাষার অবাধ সহজ গতি অব্যাহত রাখবার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি—এইটুকু শুধু বলতে পারি। তবে বন্দিশালায় ভাল অভিধানের অভাবে কিছুটা অসুবিধা যে হয়েছেই এ কথা বলাই বাহুল্য। সাফল্য-অসাফল্য পাঠকেরাই বিচার করবেন। ইতি—

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়
(রাজবন্দী)

বক্সা স্পেশাল জেল,
২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিশা উপাখ্যান

স্থান—উর্দ্ধ ভল্গার তীর। পাত্র—ইন্দো-য়ুরোপীয়।
কাল—খৃষ্টপূর্ব ৬০০০ বর্ষ।

বিকাল বেলা। কত দিন পরে আজ আবার সূর্য্যরশ্মির আশীর্বাদ দেখা দিয়েছে। মাত্র পাঁচ ঘণ্টা পূর্বে দিনের আলো ফোটা সত্বেও সূর্য্যতেজে কোন প্রখরতা ছিল না। আজ আকাশে অবশ্য কোন মেঘ নাই, বরফও পড়ছে না—কুয়াসা বা ঝড়ের কোন লক্ষণও ছিল না। সূর্য্য তার কিরণ ঢেলে দিয়ে নয়নাভিরাম পরিবেশ সৃষ্টি করেছে—আলোয়াঁপরশ লেগে মনে জেগে উঠছে আনন্দ। চারিদিকে কি দেখছি! নীল আকাশের নীচে সারা পৃথিবী যেন ঢাকা রয়েছে বরফে—সাদা কর্পূরের মত বরফ। গত চব্বিশ ঘণ্টায় নতুন করে তুষারপাত হয়নি—তাই মাটিতে বরফ জমে স্বচ্ছ ও শক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বরফের এই আস্তরণ সর্বত্র অবশ্য সমভাবে মাটি ঢেকে দেয়নি। উত্তর থেকে দক্ষিণে একটা রূপালি আঁকাবাঁকা রেখা যেন কয়েক মাইল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। আর অনেক দূরে পাহাড়ের দু'ধার দিয়ে একটা ঘন বনানীর প্রান্তভাগও দেখা যাচ্ছে। নিকট থেকে দেখা যাক এই বনানীকে। দু'ধরণের গাছ এই বনে সব থেকে বেশী দেখা যায়। একটা হচ্ছে শ্বেত বল্কলে ঢাকা বার্চ (ভূর্জ বৃক্ষ) গাছ—এখন সেগুলো পত্রহীন। আর অন্যটি হচ্ছে নিখুঁত ঋজু পাইন গাছ (দেবদারু গাছ)—তার ডালগুলোও বেরিয়েছে আগা থেকে কাণ্ড পর্য্যন্ত সমান কোণ তৈরী করে আর তার সূচের মত পাতাগুলো হচ্ছে উজ্জ্বল বা ঘন সবুজ রংএর। এখানে-সেখানে গাছের কাণ্ডে ও শাখা-প্রশাখার উপরেও বরফ জমে গিয়ে সুন্দর সাদা-কালোয় মেশানো সব নক্সা তৈরী হয়েছে।

শুধু কি এই? চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে এক ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক বা পাখীর আদরের কূজন অথবা কোন পশুর ডাক কোথাও কিছু শোনা যায় না!

পাহাড়ের সব থেকে উঁচু চূড়ার উপরের পাইন গাছে চড়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখা যাক। বরফ, মাটি আর এই পাইন-বন ছাড়া অন্য কিছুও হয়ত দেখা যেতে পারে। এখানে কি এই বড় বড় গাছ ছাড়া অন্য কিছু জন্মায় না? ছোট গুল্ম বা ঘাস

কি জন্মায় না এখানে? কি জানি বোঝা যায় না। শীতকালের দুই-তৃতীয়াংশ পার হয়ে এখন আমরা শেষ ভাগে এসে পৌঁচেছি। বরফের চাপ যে কতটা পুরু হয়ে উঠেছে, যার নীচে ভাঙ্গা গাছপালা পর্য্যন্ত সব চাপা পড়ে গেছে, তার গভীরতা মাপবার কোন উপায় নেই। হয়ত বার ফিট কিংবা তারও বেশী গভীর হতে পারে।

এই উঁচু পাইন গাছটা থেকে কি দেখা যায়? সেই একই বরফ, একই বনরাজি, একই উঁচু-নীচু পাহাড়ের সারি। হ্যাঁ, তবে পাহাড়ের ওপারে একটা জায়গা থেকে যেন ধোঁয়া উঠছে দেখা যাচ্ছে। এই প্রাণহীন, শব্দহীন প্রান্তরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী সত্যিই আশ্চর্য্য ব্যাপার! দেখাই যাক ব্যাপারটা—ঔৎসুক্যের নিরসন করা যাক।

ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা প্রকৃতপক্ষে উঠছিল কিন্তু অনেক দূরে—যদিও স্বচ্ছ নির্মেঘ আবহাওয়ায় মনে হচ্ছিল নিকটেই। এবারে আমরা জায়গাটার নিকটে চলে এসেছি। আগুনে মাংস ও চর্বি পোড়ার গন্ধ আমাদের নাকে এসে লাগছে। ছোট ছেলেমেয়ের কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছে। খুব লঘু-পায়ে আমাদের এগোতে হবে—আমাদের পায়ের শব্দ, এমন কি নিঃশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত যাতে ওরা শুনতে না পায়, তা না-হলে ওখানে যারা আছে তারা বা তাদের কুকুরগুলো আমাদের কি ভাবে অভ্যর্থনা করবে তা বলা যায় না।

তাই ত—প্রায় আধ ডজন ছেলেমেয়ে একটা ঘরের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে সব থেকে বড়টির বয়স আট বছরের বেশী হবে না—আর সব থেকে ছোটটি হবে বছর খানেকের। ঘরটা অবশ্য একটা প্রাকৃতিক পাহাড়ী গুহা। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে এটি যে কত বড় তা আমরা দেখতে পাচ্ছি না—কারণ ভেতরটা অন্ধকার, তা ছাড়া এটা দেখার চেষ্টা না করাই ভাল। বয়স্ক বলতে এই গুহার মধ্যে আছে এক বৃদ্ধা—মাথার চুলগুলো তার ধোঁয়াটে বা শণের মত রংএর হয়ে গেছে এবং সেগুলো জট পাকিয়ে গুচ্ছে-গুচ্ছে তার সারা মুখ ঢেকে ছড়িয়ে পড়েছে। এক্ষুনি একটা হাত দিয়ে মুখের ওপর থেকে সেগুলো সে সরিয়ে দিল। চোখের ভ্রূগুলোও তার ধোঁয়াটে হয়ে এসেছে—সারা মুখের চামড়া তার কুঞ্চিত—কুঞ্চন রেখাগুলো যেন তার মুখের মধ্য থেকেই বেরিয়ে এসেছে বলে মনে হচ্ছিল। আগুনের ধোঁয়া আর উত্তাপে গুহাটা পূর্ণ—বিশেষ করে যেখানে ছেলেমেয়েগুলো ও বৃদ্ধা বসে আছে সেখানটা। বৃদ্ধার গায়ে কোন বস্ত্র বা আবরণ নেই। তার শুকনো হাত দুটো পড়ে রয়েছে তার পায়ের কাছে মাটির উপর। চোখ দুটো তার ঢুকে গেছে গভীর কোটরে—চোখের ফিকে নীল রংএর মণি দুটোও এত নিস্তেজ যেন মনে হয় তার মধ্যে কিছু নেই, তবুও তার অন্তস্তলে এখনও যে কিছুটা উজ্জলতা আছে যাতে বোঝা যায় যে তার চোখের আলো একেবারে নিবে যায়নি। কান দুটো তার বেশ সজাগই আছে বোঝা যায়। ছেলেমেয়েগুলোর গলা সে বেশ শুনতে পাচ্ছে। একটি শিশু এক্ষুনি চীৎকার করে উঠলে সে তার দিকে চোখ ফেরাল। এদের মধ্যে এক জোড়া ছেলেমেয়ে আছে বছর দুয়েক বা কিছু বেশী বয়স হবে তাদের—দেখতে তাদের প্রায় একই রকম। দু'জনেরই চুলগুলো একটু হলদেটে—পাণ্ডুবর্ণ—ঐ বৃদ্ধার মতই—তবে একটু বেশী উজ্জল, বেশী সতেজ। দেহও তাদের হৃষ্টপুষ্ট, গায়ের রং কপিশ বা হলুদাভ, চোখগুলো বেশ বড় বড়, গভীর এবং নীল রংএর। ছেলেটি চীৎকার করে কাঁদছে, আর মেয়েটি দাঁড়িয়ে একটা হাড় মুখের মধ্যে দিয়ে চুষছে।

বার্ধক্যের ধরা গলায় বৃদ্ধা ডেকে বলল—"অগিন, এদিকে এসো অগিন, দাদু এদিকে এসো!"

অগিন না উঠে তার জায়গাতেই বসে কাঁদতে থাকল। তখন একটি আট বছরের ছেলে এসে ছোট ছেলেটিকে কোলে তুলে ঠাকুরমার কাছে নিয়ে এল। এই বড় ছেলেটির চুলের রং ছোটটির থেকে আরও বেশী সোনালী, কিন্তু চুলগুলো লম্বায় বড় এবং জটপাকানো। এই ছেলেটিও একেবারে উলঙ্গ এবং গায়ের রং এরও কপিশবর্ণ। শরীরটা এর কম স্থূল এবং সারা গা-ভর্তি এখানে-সেখানে নোংরা দাগ পড়েছে। বড় ছেলেটি ছোটটিকে বৃদ্ধার কাছে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল—"ঠাকুরমা, রোচনা ওর হাড়টা নিয়ে নিয়েছে, তাই অগিন কাঁদছে।"

এই বলে সে চলে গেল—ঠাকুরমা তার শুকনো হাত দুটো দিয়ে অগিনকে তুলে নিল। অগিন কাঁদতেই থাকল আর তার চোখ দিয়ে জলের ধারা বয়ে তার ময়লা-মাখা মুখের মধ্যে দুটো দাগ হয়ে গেল। বৃদ্ধা ছেলেটিকে চুমু খেয়ে এবং আদর করে বলল—"অগিন, কেঁদো না, আমি রোচনাকে মেরে দেব।"—এই কথা বলে সে গুহার ভিতে একটা চড় মারল। এই ভিতের অনাবৃত মাটিতে বহু বছর ধরে চর্বির ফোঁটা পড়ে পড়ে একটা পুরু স্তর পড়ে গেছে।

এর পরেও অগিনের কান্না থামল না এবং চোখ দিয়ে তার জলের ধারা বইতেই থাকল। ঠাকুরমা তার নোংরা হাত দিয়ে সেই জলের ধারা মুছিয়ে দিলে এতক্ষণ তার মুখের যে জায়গাটাতে মুগশিশুর মত গায়ের রং বেরিয়ে পড়েছিল সেটা ঢেকে গিয়ে একই মলিন রংএ সারা মুখটা ভর্ত্তি হয়ে গেল। তখন ছেলেটির কান্না থামানোর জন্তে বৃদ্ধা তার মুখে নিজের শুকনো একটা স্তন তুলে দিল। তার স্তন দুটো শুকনো লাউএর মত তার বুকের পাঁজরাগুলো থেকে ঝুলছিল—আর পাঁজরাগুলোও যেন মনে হচ্ছে তার লোলচর্ম ভেদ করে বেরিয়ে আসছে। অগিন একটা স্তন মুখে নিয়ে কান্না বন্ধ করল। এমনি সময়ে বাইরে থেকে কথাবার্ত্তার শব্দ শোনা গেল। অগিন স্তনটি মুখে নিয়েই সেদিকে তাকাতে থাকল। একটা নরম এবং মধুর স্বরের ডাক শোনা গেল—"অগিন—ন্—ন্!"

অগিন আবার কান্না সুরু করল। দুটি নারী প্রবেশ করল এবং তাদের মাথার কাঠের বোঝা এক কোণে ছুঁড়ে ফেলল। তার পর এক জন দৌড়ে গেল রোচনার দিকে, আর এক জন এল অগিনের দিকে। অগিন আরও জোরে কেঁদে উঠে "মা-মা" করে ডাকতে লাগল। তার মা তখন ডান হাত আলগা করে তার ডান দিকের স্তনের উপর শজারুর কাঁটা দিয়ে আঁটা সাদা লোমশ গরুর চামড়ার পোষাকটি খুলে ফেলে দিল। তার তরুণ দেহে শীতকালীন আহার্য্যের অস্বচ্ছলতার জন্তে মাংসের প্রাচুর্য্য না থাকলেও দেহটি তার অদ্ভুত সুন্দর। ছোট ছেলেমেয়ে দুটির মতই তারও গায়ের রং পিঙ্গলবর্ণ, চুলগুলো ধোঁয়াটে রংএর এবং জট নেই, ফলে তার কপাল বেয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তার রক্তাভ বৃন্ত এবং বর্ত্তুলাকার স্তন দুটো সুগঠিত চওড়া বুকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে—কোমরটা তার সরু—নিতম্ব দুটো গুরুভার এবং বেশ প্রশস্ত—উরুদেশ সুগঠিত ও মাংসল, পায়ের ডিম দুটো এদেশী লাঙ্গলের মত ক্রমে সরু হয়ে গেছে এবং যথেষ্ট পরিশ্রম সহ্য করতে পারার চিহ্ন তাতে স্পষ্ট। এই অষ্টাদশী মেয়েটি অগিনকে দু'হাতে কোলে তুলে নিয়ে তার সারা চোখ-মুখ চুমুতে ভরিয়ে দিল। অগিনের ছোট দাঁতগুলো লাল ঠোঁট দুটোর মধ্য দিয়ে হাসিতে চক্‌চক্‌ করতে লাগল—চোখ দুটো তার আধ-বোজা হয়ে এল এবং মুখের ওপর ছোট টোল খেতে দেখা গেল। এই তরুণী তখন খুলে ফেলা গরুর চামড়াটার উপর বসে অগিনের মুখে তার কোমল একটি স্তন তুলে দিল। অগিন সবগুলো আঙ্গুল দিয়ে স্তনটি ধরে চুমুক দিয়ে চক্‌চক্‌ করে খেতে আরম্ভ করল। এই সময় অন্য তরুণীটিও এই রকম নগ্ন অবস্থায় রোচনাকে কোলে নিয়ে তার পাশে এসে বসল। এদের দুজনের মুখের চেহারা দেখে বেশ বোঝা গেল যে, এই দুই তরুণী সহোদরা।

২

এদের এখানে রেখে এবার আমরা কিছুটা বাইরে দেখে আসি। একটা দিকে দেখা যাচ্ছে বরফের উপর চামড়া-বাঁধা পায়ের অসংখ্য দাগ—এইগুলো অনুসরণ করে এবার আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই। এই দাগগুলো বাঁক ঘুরে ওপারে পাহাড়ী জঙ্গলের মুখে এগিয়ে গেছে। আমরা জলদি হেঁটে উপরে চড়ে যাই;—কিন্তু নূতন-পড়া পায়ের দাগের যেন আর শেষ নেই। এই আমরা একটা বরফ-ঢাকা প্রান্তর পার হচ্ছি, তার পরেই আমরা প্রবেশ করছি পাহাড়ের ধার-ঘেঁষা ঘন জঙ্গলে—তার পর আবার এক বরফ-ঢাকা চড়াইতে উঠে গাছে-ঢাকা উৎরাইতে নেমে যাচ্ছি। অবশেষে নীচে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে আকাশচুম্বী বৃক্ষহীন এক পর্ব্বতচূড়া দেখতে পেলাম। এর উপরের তুষারস্তূপ যেন গিয়ে নীল আকাশ স্পর্শ করেছে। এই নীল আকাশের পটভূমিকায় কয়েকটি মানুষের দেহ-রেখা দেখা গেল—মনে হল তারা যেন পাহাড়ের ওপারে ক্রমে দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। তাদের পশ্চাতে যদি এই উজ্জ্বল আকাশ না থাকত তাহলে এদের আমরা দেখতে পেতাম না। এদের গায়ে যে গোচর্ম ছিল তা বরফেরই মত শাদা। তাদের হাতে যে অস্ত্র ছিল তাও একই সাদা রংএর। তাদের চেহারা ঠিক কি রকম, তা এই বিরাট বরফ-প্রান্তরের ওপারে ওদের দেখে বুঝতে পারা খুব কঠিন।

নিকটে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, এই দলের সামনে রয়েছে ৪০।৫০ বছরের সবলদেহা একটি নারী। তার উন্মুক্ত ডান হাতটা দেখেই তার শারীরিক সামর্থ্যের স্পষ্ট ধারণা করা যায়। তার চুল, মুখ, এবং সমস্ত দেহাকৃতিতেই গুহার মধ্যেকার তরুণী দুটির সাথে তার সাদৃশ্য আছে। তবে আকৃতিটা অপেক্ষাকৃত বড়। তার বাঁ হাতে রয়েছে বার্চ গাছের ৪।৫ ফিট লম্বা বর্শার মত একটি দণ্ড, আর তার ডান হাতে রয়েছে ঘষে ধার দেওয়া একটা পাথরের কুঠার, তার মাথাটা চামড়া দিয়ে কাঠের একটা হাতলের সাথে বাঁধা। এই নারীটির পিছনে রয়েছে ৪টি পুরুষ এবং দুজন স্ত্রীলোক। এদের মধ্যে একটি পুরুষ বোধ হয় এই অগ্রবর্ত্তিনী স্ত্রীলোকটি থেকে বয়সে কিছুটা বড় হতে পারে—বাকী কজন ছাব্বিশ বছর থেকে সুরু করে চৌদ্দ বছরের তরুণ। এই প্রবীণ লোকটির মাথার চুল আর সবারই মত খড়ের রংএর এবং তার মুখ এক জোড়া মোটা গোঁফে এবং একই রংএর দাড়িতে ভরা। তার স্বাস্থ্যও স্ত্রীলোকটির মতই পেশীবহুল এবং তারও দুহাতে অনুরূপ হাতিয়ার। অন্য দুজন পুরুষের মুখেও এরই মত ঘন দাড়ি গোঁফ—শুধু বয়সে পার্থক্য। অন্য নারী দুটির মধ্যে এক জনের বয়স বছর বাইশ, অন্যটির ষোল বা তার কাছাকাছি। গুহার মধ্যে যে বৃদ্ধা পিতামহীকে আমরা দেখে এসেছি তার এবং ঐ গুহাবাসী অন্যদের চেহারা দেখে এদের সাথে তুলনা করলে কোন সন্দেহ থাকে না যে, ঐ বৃদ্ধার দেহাকৃতিতেই এই সমস্ত স্ত্রী-পুরুষেরা সবাই গঠিত হয়েছে।

এদের হাতে হাড়ের, পাথরের এবং কাঠের হাতিয়ার দেখে এবং এদের চলার একাগ্রতা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এরা কি কাজে বেরিয়েছে।···পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে এই অগ্রবর্ত্তিনী নারীটি—আমরা যাকে এদের মা বলতে পারি—সে বাঁয়ে মোড় ঘুরল এবং অন্যান্য সবাই তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করতে থাকল। তারা যখন তাদের চামড়া-বাঁধা পায়ে বরফের উপর দিয়ে হেঁটে চলছিল তখন একটুও শব্দ হচ্ছিল না। তাদের সামনেই ঝুলছিল একটা উঁচু পর্ব্বতমুখ—অসংখ্য শিলাখণ্ড ছড়িয়েছিল তার চার·দিকে। শিকারীরা এবার আলাদা আলাদা ভাবে খুব ধীরে ও সতর্কতার সাথে অগ্রসর হচ্ছিল—এক-এক ধাপে যতটা বেশী এগোন যায়—এই ভাবে তারা পা ফেলছিল এবং পিছলে না পড়ার জন্ত হাত দিয়ে

পাথরখণ্ডগুলো ধরে ধরে এগোচ্ছিল। মা-ই সর্বপ্রথম একটা গুহামুখে গিয়ে পৌঁছুল। গুহার মুখে বরফের উপর প্রথমে সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল—কিন্তু কোন পদচিহ্ন সেখানে সে দেখতে পেল না। তখন সে একাই নিঃশব্দে গুহার মধ্যে গিয়ে ঢুকল। কিছু দূর গিয়ে গুহাটা এক দিকে মোড় ফিরেছে এবং সেখানে আলোও অনেক অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। অন্ধকার চোখে সইয়ে নেবার জন্যে কিছুক্ষণ সে থমকে দাঁড়াল এবং তার পর আরও এগিয়ে গিয়ে সে তিনটি বৃহদাকার ভল্লুক দেখতে পেল—একটা মর্দ, একটা মাদি এবং একটা বাচ্চা—তিনটাই মৃতপ্রায় অবস্থায় মাটিতে মাথা গুঁজে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন—জীবনের কোন লক্ষণই যেন তাদের নেই।

আস্তে আস্তে মা আবার ফিরে এসে তার দলবলের সাথে মিলিত হল। মায়ের মুখের উজ্জ্বলতা দেখেই তারা বুঝল যে, নিশ্চয়ই 'শিকার' মিলেছে। বুড়ো আঙুল দিয়ে কড়ি আঙুলটা চেপে ধরে বাকী তিনটা আঙুল মা তুলে ধরে দেখাল। পুরুষ দুজন তখন হাতিয়ার তুলে নিয়ে মায়ের অনুগামী হল গুহার মধ্যে—অন্য সবাই রুদ্ধনিশ্বাসে বাইরে অপেক্ষা করতে থাকল। গুহার মধ্যে গিয়ে মা দাঁড়াল মর্দ ভল্লুকটার পাশে, বয়স্ক পুরুষটি মাদি ভল্লুকটার পাশে, এবং অন্য জন বাচ্চাটার পাশে। তার পর একই সাথে তিন জনে তাদের বর্শামুখ দণ্ডগুলো দিয়ে এমন জোরে ভল্লুকগুলোর পার্শ্বদেশে আঘাত করল যে তাদের হৃৎপিণ্ড ভেদ করে গেল। জানোয়ারগুলো একবার কেঁপে উঠতেও পারল না। তাদের যাণ্মাসিক ঘুমের তখনও মাসাধিক কাল বাকী ছিল। কিন্তু মা বা তার দলের লোকেরা সেটা বুঝতে পারেনি বলেই তাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হল। তাই মর্দ ভল্লুকটাকে ধাক্কা দিয়ে নেড়ে দেখবার আগে তারা আরও কয়েক বার কাঠের বর্শা দিয়ে এগুলোর পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দেখল। তার পর তারা ভল্লুকগুলোর সুমুখের থাবা এবং মুখ ধরে টেনে গুহার মুখে বের করে নিয়ে এল। স্ফূর্তিতে তখন তারা প্রাণ খুলে হাসতে এবং গলা ছেড়ে চীৎকার করতে থাকল।

বাইরে এনে মর্দ ভল্লুকটাকে চিৎ করে ফেলে মা চকমকি পাথরের ছুরিটা তার চামড়ার পোষাকের মধ্য থেকে বের করে—ভল্লুকটার দেহে যেখানে ক্ষত হয়েছিল সেইখানে থেকে সুরু করে সেটার পেটের চামড়াটা ছাড়িয়ে ফেলল। এ রকম পরিষ্কার হাতে পাথরের ছুরি দিয়ে চামড়া ছাড়ান যথেষ্ট সামর্থ্য ও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। তার পর ভল্লুকটার নরম কলিজার একখণ্ড কেটে সে তার নিজের মুখের মধ্যে পূরল এবং আর একখণ্ড সব থেকে ছোট ছেলেটির—অর্থাৎ চৌদ্দ বছরের ছেলেটির মুখে তুলে দিল। বাকী সবাইও ভল্লুকটাকে ঘিরে বসল এবং মা তাদের সবাইকেই কলিজার মাংস খণ্ড-খণ্ড করে কেটে ভাগ করে দিল। প্রথম ভল্লুকটার কলিজা খাওয়া শেষ করে মা যখন দ্বিতীয় ভল্লুকটাতে হাত দিল তখন ষোল বছরের মেয়েটি বাইরে বেরিয়ে এসে একখণ্ড বরফ-কুচি মুখে পূরে দিল। প্রবীণ লোকটিও এর পর বেরিয়ে এসে একখণ্ড বরফ মুখে দিল এবং মেয়েটির একটা হাত চেপে ধরল। মেয়েটি একটুখানি বাধা দিয়ে শান্ত হয়ে গেল। তখন পুরুষটি মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল। এরা দুজন যখন হাতভর্তি করে বরফ-কুচি নিয়ে ভল্লুকগুলোর কাছে ফিরে এল তখন তাদের চোখ-মুখের রং দেখা গেল আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

পুরুষটি তখন বলল—"এবার দাও মা আমি কাটি, তুমি শ্রান্ত হয়ে পড়েছ।"

মা তখন ছুরিটা তার হাতে দিয়ে পাশে যে চব্বিশ বছরের যুবকটি দাঁড়িয়েছিল তার মুখটা ধরে একটু আদর করে তার হাত ধরে বেরিয়ে গেল।

এরা সকলে মিলে ভল্লুক তিনটার কলিজা খেয়ে ফেলল—ভল্লুকগুলো গত চার মাস ধরে না খেয়ে ঘুমোচ্ছিল বলে তাদের দেহে চর্বির ভাগ বেশী থাকার কারণ ছিল না। তবে বাচ্চা ভল্লুকটার মাংসই দেখা গেল অপেক্ষাকৃত নরম ও উপাদেয়,—তাই বাচ্চাটার মাংস এরা অনেকটা খেয়ে ফেলেছিল। তার পর সবাই পাশাপাশি শুয়ে এরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিল।

তাদের ঘরে ফিরবার সময় হয়ে এল। মর্দ এবং মাদি ভল্লুক দুটোর চার পা চামড়ার দড়ি দিয়ে বেঁধে লাঠিতে ঝুলিয়ে দুজন দুজন করে কাঁধে করে নিল। আর মেয়েটি বাচ্চা ভাল্লুকটাকে কাঁধে তুলে নিল এবং মা তার পাথুরে কুড়ুলখানি হাতে নিয়ে আগে আগে রওনা হল।

এই সব বনমানুষদের ঘড়ির সময়ের জ্ঞান ছিল না—তবে এটা তাদের ধারণা ছিল যে আজকের রাত চাঁদনী রাত হবে। তারা কিছু দূর যাবার পর সূর্য্য দিগন্তে ডুবে গেল বলে মনে হল—বাস্তবে কিন্তু তখনও সূর্য্য একেবারে অস্ত যায়নি—তার পর আরও কয়েক ঘণ্টা ধরে গোধূলি আলো রইল এবং এই আলো মিলিয়ে যেতে যেতে বিশ্ব-চরাচর চাঁদের আলোয় ভরে গেল।

তাদের গুহাশ্রয় তখনও অনেক দূরে—এমনি সময়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে মা থেমে গেল এবং মনোযোগ দিয়ে শুনে একটা শব্দ যেন সে ধরতে পেল। সকলেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ষোল বছরের মেয়েটি ছাব্বিশ বছরের যুবকটির কাছে গিয়ে বলল—"গর্‌র্‌, গর্‌র্‌, ক্রক্‌ ক্রক্‌ (অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ)!" মাও তার মাথা নেড়ে সায় দিল—

"হ্যাঁ—গর্‌র্‌, গর্‌র্‌, ক্রক্‌ ক্রক্‌।"—এবং রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার সাথে বলল—"প্রস্তুত হও।"

শিকারগুলো মাটিতে রেখে তারা সবাই হাতিয়ার শক্ত করে ধরল এবং পিঠেপিঠি দাঁড়িয়ে সব দিকে নজর রাখল। হঠাৎ এক দলে সাত-আটটা নেকড়ে বাঘ লক্‌লকে জিহ্বা বের করে তাদের দিকে ধেয়ে এল—সেগুলো নিকটে এসে দাঁত বের করে ওদের চারপাশে ঘুরতে থাকল—শিকারীদের হাতে কাঠের বর্শা এবং পাথরের কুঠার দেখে নেকড়েগুলো তাদের আক্রমণ করতে ইতস্তত করতে থাকল। ইতিমধ্যে যে কনিষ্ঠ ছেলেটি মাঝখানে ছিল সে তার লাঠির সাথে বাঁধা একটা কাঠ খুলে নিয়ে তার মাজায় বাঁধা শক্ত চামড়ার একটা দড়ি খুলে দুটো একত্র করে একটা ধনুক তৈরী করে ফেলল। তার পর তার কাছে লুকোন পাথরে মাথা-বাঁধান কয়েকটি তীর বের করে সেগুলো এবং ধনুকটা চব্বিশ বছরের যুবকটির হাতে গুঁজে দিয়ে তাকে মাঝখানে টেনে এনে নিজে গিয়ে তার জায়গায় দাঁড়াল। এই যুবকটি তখন ধনুকের গুণ টেনে তীক্ষ্ণ একটা শব্দ করে একটা তীর ছুঁড়ে মারল—একটি নেকড়ের পার্শ্বদেশে তীরটা গিয়ে বিঁধল। নেকড়েটা গড়িয়ে পড়ল কিন্তু পরে সামলে নিয়ে

মরিয়া হয়ে আক্রমণোদ্যত হল—এই সময় যুবকটি আর একটা তীর ছুঁড়ল, এবারের আঘাতটা হল মারাত্মক। এই নেকড়েটাকে প্রাণহীন হয়ে পড়ে যেতে দেখে অন্য নেকড়েগুলো তার কাছে ঘিরে এল এবং যে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল তা চাটতে শুরু করল। পরক্ষণেই মৃত নেকড়েটার দেহ খণ্ড-খণ্ড করে বাকীগুলো সব গিলতে শুরু করল।

এগুলোকে ভোজন-উৎসবে ব্যস্ত দেখে শিকারীরা তাদের শিকার তুলে নিয়ে নিঃশব্দ পায়ে দ্রুতগতিতে তাদের পথ ধরে এগিয়ে চলল। এবারে মা চলল সবার পিছনে এবং বার বার সে পিছন ফিরে তাকিয়ে নজর রাখতে থাকল। আজ আর বরফ পড়েনি, তাই চাঁদের আলোয় তাদের নিজেদের পায়ের দাগ অনুসরণ করে ফিরতে তাদের বেগ পেতে হচ্ছিল না। তাদের গিরিগুহা যখন আরও প্রায় এক মাইল দূরে তখন নেকড়ের পাল আবার তাদের এসে ঘিরল। আর একবার তারা শিকারগুলো মাটিতে রেখে হাতিয়ার নিয়ে তৈরী হয়ে দাঁড়াল। ধনুকধারী কয়েক বার তীর ছুড়ল কিন্তু একটাকেও আঘাত করতে পারল না কারণ নেকড়েগুলো একটুক্ষণের জন্যও স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছিল না। নেকড়েগুলো পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে হঠাৎ চারটেতে একসাথে ষোল বছরের মেয়েটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মা ছিল তার পাশেই—সে তার বর্শাটা একটা নেকড়ের পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সেটাকে মাটিতে ফেলে দিল। কিন্তু অন্য তিনটে নেকড়ে মেয়েটির উরুতে নখ বসিয়ে দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে চক্ষের নিমেষে তার পেট ফেড়ে ফেলে অন্ত্রনাড়ীগুলো টেনে বের করল। সবার নজর যখন ছিল এই মেয়েটিকে বাঁচাবার দিকে সেই সময় অন্য তিনটা নেকড়ে চব্বিশ বছরের যুবকটির অরক্ষিত পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, এবং আত্মরক্ষা করবার কোন সুযোগ না দিয়েই তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার দেহ ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে দিল। তার সঙ্গীরা যখন এদিকে ব্যস্ত সেই অবসরে মেয়েটিকে নেকড়েগুলো ৩০।৪০ ফুট দূরে টেনে নিয়ে গেল। মা তখন চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। যুবকটি তখন শেষ নিঃশ্বাসের জন্য রক্তাক্ত নেকড়েটার পাশে পড়ে হাঁপাচ্ছিল। এক জন মরণোন্মুখ নেকড়েটার খোলা চোয়ালের মধ্যে তার বর্শাটা ঢুকিয়ে দিল—এক জন তার মুখের সামনেটা চেপে ধরল এবং অন্যেরা তখন এই নেকড়েটার ক্ষতমুখে মুখ লাগিয়ে গরম নোণা রক্ত ঢোকে-ঢোকে পান করে নিল। মা এটির ঘাড়ের কাছের শিরাগুলো কেটে দিয়ে তাদের রক্তপানের সুবিধা করে দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে এ সব ঘটে গেল এবং তারা জানত যে—যে মুহূর্তে নেকড়েগুলো মেয়েটাকে খেয়ে শেষ করবে তখনই আবার আক্রমণ শুরু হবে। তাই মুমূর্ষু যুবকটিকে সেখানে ফেলে রেখে ভল্লুক তিনটা এবং একটা মরা নেকড়েকে কাঁধে তুলে নিয়ে তারা দৌড়তে শুরু করল এবং নিরাপদে তাদের গুহায় ফিরে এল।

গুহার মধ্যে তখন চড়বড় শব্দ করে আগুন জ্বলছিল এবং আগুনের আলোর মধ্যে শিশুরা এবং মেয়ে দুটো ঘুমোচ্ছিল। বুড়ী তাদের আসবার শব্দ পেয়ে কম্পিত ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করল—

"নিশা, তোরা এলি?"

"হ্যাঁ" বলে মা প্রথমে এক ধারে তার অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিয়ে চামড়ার পোষাকটি ছেড়ে ফেলে নগ্ন অবস্থায় সামনে এল, অন্যেরাও শিকারগুলো মাটিতে রেখে চামড়ার পোষাক ছেড়ে ফেলে নগ্নদেহে সারা শরীরে আগুন পোহাতে শুরু করল।

ইতিমধ্যে যারা ঘুমন্ত ছিল তারা সবাই জেগে উঠল। এরা ছেলেবেলা থেকেই সামান্য শব্দে জেগে উঠতে অভ্যস্ত হয়। খাদ্য-রসদ যা পাওয়া যায় তা অত্যন্ত সতর্ক ভাবে খরচ করেই মা তার এই পরিবারকে এ-পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে। হরিণ, খরগোস, বনগরু, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া প্রভৃতি শিকার করার সুযোগ শীতের শুরুতেই শেষ হয়ে গেছে—কারণ এখন এই সব প্রাণী দূরে দক্ষিণের সূর্য্যালোকিত গরম দেশে চলে গেছে। এই গোষ্ঠীটাও কিছুটা দক্ষিণে চলে যেত কিন্তু ঠিক সেই সময়টাতেই ষোল বছরের মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। মানুষের সে যুগের সংসার পরিচালনার নিয়ম অনুযায়ী গোষ্ঠীর কর্ত্রীর পক্ষে এক জনের জন্যে পরিবারের সবাঁর জীবন বিপন্ন করা বিধেয় ছিল না। কিন্তু এই ব্যাপারে মায়ের মনে কিছুটা দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল এবং তার ফলে আজ তাকে এক জনের পরিবর্তে দুজনকে হারাতে হল। শিকারযোগ্য প্রাণীদের এই অঞ্চলে ফিরে আসবার এখনও দু মাস বাকী—এই দু মাসের মধ্যে আরও কজনের জীবন হানি হবে কে জানে! তিনটা ভল্লুক এবং একটা নেকড়ের মাংস তাদের বাকী শীতকালের খোরাকের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

বেচারী ছোট ছেলেমেয়েগুলো খালি-পেটেই ঘুমিয়ে পড়েছিল—এখন তারা মহানন্দে মেতে উঠল। মা এবার নেকড়েটার কলিজাটা কেটে ছোটদের মধ্যে বেঁটে দিতে আরম্ভ করল এবং যে সময়ে ছেলেমেয়েরা আরামে খাচ্ছিল এবং স্বাদে ঠোঁট চাটছিল সেই অবসরে কোন ক্ষতি না করে মা নেকড়ের চামড়াটা ছাড়িয়ে ফেলল—কারণ লোমশ চামড়া খুব প্রয়োজনীয় জিনিস। মাংস কেটে ভাগ করে দিলে যাদের খুব ক্ষুধা লেগেছিল তারা কিছুটা কাঁচা খেয়ে নিল—তার পর বাকীটা আগুনে জ্বলন্ত কয়লার উপর সেঁকে নিয়ে খেতে শুরু করল। প্রত্যেকেই তাদের পোড়া মাংস থেকে মাকে আগে এক কামড় খাবার জন্যে অনুনয় করতে থাকল। মা শুধু বলল যে—"আচ্ছা, আজ সবাই পেট ভরে খাও, কাল থেকে আর এতটা পাবে না।"

পরে উঠে গিয়ে মা এক কোণ থেকে একটা মোটা চামড়ার থলি নিয়ে এসে বলল—"এই যে সোমরস, আজ রাতে সবাই খাও, পিয়ো, নাচো, স্ফূর্তি করো প্রাণ ভরে।"

বাচ্চাগুলো এক ঢোক করে এবং বড়রা বেশী করে সোমরস পান করতে পেল। এবং একটু পরেই তাদের মদোন্মত্ত উল্লাস দেখা দিল, চোখগুলো তাদের লাল হয়ে উঠল—হাসির ফোয়ারা উঠল তখন। এক জন গান ধরল—প্রবীণ লোকটি একটা কাঠির উপর আর একটা কাঠি দিয়ে বাজাতে আরম্ভ করল এবং অন্যেরা নাচতে শুরু করল। এটা হল অঢেল আনন্দের রাত্রি। এদের সবারই শাসনকর্ত্রী হচ্ছে মা—কিন্তু তার শাসন অন্যায় বা পক্ষপাতমূলক নয়। বুড়ী ঠাকুরমা এবং এই প্রবীণ পুরুষটি ছাড়া বাকী সবাই-ই তার সন্তান-সন্ততি, মা এবং এই প্রবীণ পুরুষটি আবার বুড়ী ঠাকুরমার ছেলেমেয়ে, কাজেই এদের মধ্যে "আমার" বা "তোমার" প্রশ্ন ওঠার সম্ভাবনা ছিল না, বস্তুত, মানুষের মনে সম্পত্তি বোধ জাগতে তখনও অনেক দেরী ছিল। এটা অবশ্য ঠিক যে, পুরুষ

ক'জনের উপরেই মায়ের অটুট কর্তৃত্ব ছিল সমভাবেই। যে যুবকটি আজ মারা গেল—সে ছিল একাধারে মায়ের স্বামী ও সন্তান—তার মৃত্যুতে যে মায়ের মনে দুঃখ হয়নি এটা বললে ঠিক বলা হবে না। কিন্তু এই যুগের জীবনযাত্রায় মানুষ অতীতের থেকে বর্তমানের কথা ভাবতেই বাধ্য হত। মায়ের এখন আর মাত্র দুজন 'স্বামী' বর্তমান রইল এবং তৃতীয় জন অর্থাৎ চৌদ্দ বছরের বালকটিও অল্প কালে তৈরী হয়ে উঠবে। আর মায়ের অধীনে যে শিশুরা এখন রয়েছে এদের যে ক'জন বড় হয়ে তার স্বামী হয়ে উঠবে তাও কেউ বলতে পারে না। মা ছাব্বিশ বছরের যুবকটিকে বেশী পছন্দ করে—তাই তিন জন তরুণীর ভাগে এখন মাত্র ঐ পঞ্চাশ বছরের পুরুষটিই রইল।

শীতকাল যখন শেষ হয়ে আসছে এমনি এক দিনে বুড়ী ঠাকুরমা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হল। নেকড়ে বাঘে তিনটি শিশুকে ধরে নিয়ে গেল এবং বরফ গলতে সুরু করলে প্রবীণ পুরুষটি এক দিন গরম জলস্রোতে পড়ে ভেসে গেল। এই ভাবে ষোল জনের পরিবারের মাত্র ন'জন বেঁচে রইল।

৩

এখন বসন্তকাল। দীর্ঘদিনের মৃত প্রকৃতি আবার নতুন করে রূপায়িত হতে সুরু করেছে। গত ছ'মাস ধরে যে বটগাছগুলো ছিল পত্রহীন, সেগুলোতে নতুন পাতার জন্ম হতে থাকল। বরফ গলতে সুরু করতে সবুজ গাছপালায় সারা পৃথিবী ছেয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। বাতাসে ভেসে আসছে নবজাত উদ্ভিদ আর কাঁচা মাটির ভিজে এবং মাদক গন্ধ। মরা পৃথিবী যেন নতুন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। গাছে-গাছে শোনা যেতে লাগল পাখীদের নানা সুরের কাকলী, ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা ডাক হল সুরু। গলে-যাওয়া বরফের স্রোতধারার পাশে বসে নানা জাতীয় জলচর পাখী স্বচ্ছন্দে পোকা-মাকড় খুঁটে খেতে আরম্ভ করেছে—রাজহাঁসগুলো আনন্দে জলকেলি সুরু করে দিয়েছে। সবুজ পাহাড়ী বনের মধ্যে দলে দলে হরিণগুলোকে দেখা গেল লাফালাফি করতে আর চরে বেড়াতে। এদের মধ্যে ভেড়া, ছাগল, বক্তমৃগ, গরুও দেখা যেতে লাগল এবং এখানে-সেখানে নেকড়ে আর চিতাবাঘগুলোকে দেখা গেল ওৎ পেতে বসে থাকতে ওগুলোকে মেরে খাবার জন্য।

শীতে জমে যাওয়া জলস্রোত আবার যখন বইতে সুরু করল তখন মানুষের দলগুলো—যারা স্থানে স্থানে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল তারাও আবার বেরিয়ে পড়ল। অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, চামড়া ও ছোট ছেলেমেয়েদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে, এবং নিত্য-ব্যবহার্য আগুন সংগে নিয়ে মানুষের দল আরও উন্মুক্ত অঞ্চলে অগ্রসর হতে থাকল। যতই দিন যেতে থাকল ততই তারাও গাছপালা ও পশুপক্ষীর মত আরও সজীব হয়ে উঠল—তাদের কুঞ্চিত চামড়ার নীচে আবার মেদমাংস জমতে সুরু করল। এদের পোষা রোমশ কুকুরগুলো মাঝে-মাঝে হরিণ বা ছাগল ধরে আনত আর কখনও বা তারা নিজেরাই ফাঁদ, তীর বা কাঠের বর্শা দিয়ে কোন কোন প্রাণী শিকার করত। তাছাড়া নদীতে মাছও ছিল এবং এই সময়টাতে ভলগার গোড়ার দিকে যারা থাকত তারা জাল ফেলে কখনও মাছ না পেয়ে খালি জাল তুলত না।

এই সময়টাতে রাত্রে ঠাণ্ডা পড়ত—তবে দিনের বেলা বেশ গরম থাকত—নিশার পরিবারও এই সময়ে ভলগার তীরে অন্যান্য পরিবারের সাথে এসে একত্র হয়েছিল। এই পরিবারগুলোর প্রধান ছিল মায়েরা, বাপ নয়। তাছাড়া কার বাপ যে কে সঠিক বলাও মুস্কিল ছিল। নিশার আটটি মেয়ে ও ছ'টি পুরুষ সন্তান হয়েছিল—তাদের মধ্যে, এখন তার ৫৫তম বছর বয়েস ; চারটি মেয়ে এবং তিনটি ছেলে বেঁচে আছে। তারা যে তার ছেলেমেয়ে এতে সন্দেহ ছিল না—কারণ তাদের জন্মই ছিল তার প্রমাণ, কিন্তু এদের মধ্যে কে যে কার বাপ তা বলা সম্ভব ছিল না। নিশার আগে তার মা সেই বুড়ী ঠাকুরমা যখন কর্ত্রী ছিল তখন তার পরিণত বয়সে তার অনেকগুলো স্বামী ছিল—এদের মধ্যে কেউ বা ছিল তার ভাই, আর কেউ বা তার ছেলে এবং এদের মধ্যে আবার অনেকে নিশার সাথে নাচ-গান করে তার প্রেমপাত্র হয়েছিল। তার পর নিশা যখন নিজে যুথকর্ত্রী হল—তখনও তার ভাই বা বয়স্ক ছেলেরা কেউ-ই আর তার বিভিন্ন সময়ের কামনা চরিতার্থ করতে অস্বীকৃত হতে সাহস করত না। কাজেই নিশার বর্তমান সাতটি সন্তানের পিতৃত্ব নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল না। নিশার পরিবারে সেই ছিল সবার থেকে বড় এবং সব থেকে শক্তিশালিনী। অবশ্য তার এই কর্তৃত্ব বোধ হয় আর বেশী দিন স্থায়ী হবে না—কারণ দু-এক বছরের মধ্যে সে নিজেও বুড়ী ঠাকুমাতে পরিণত হবে। এবং তার মেয়েদের মধ্যে সব থেকে শক্তিশালিনী হচ্ছে লেখা—সেই তার স্থান দখল করবে। অবশ্য এই অবস্থাতে লেখা ও তার বোনেদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বাধবে। প্রতি যুথের যে কর্ত্রী-মা, তার উপরেই দায়িত্ব তার গোষ্ঠীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা ; কারণ প্রত্যেক বছরেই কেউ না কেউ নেকড়ে বা চিতার মুখে, ভল্লুকের থাবায়, বুনো ষাঁড়ের শিংএ অথবা ভলগার স্রোতে প্রাণ হারাত। আর লেখার বোনেদের মধ্যে দু-এক জন হয়ত স্বাভাবিক ভাবেই পৃথক্ পরিবার গড়ে তুলবে। এই ভাবে পরিবারের শাখা বেরিয়ে যাওয়া তখনই বন্ধ হবে যখন এক জন মেয়ের নায়ক হয়ে উঠবে একজন পুরুষ—আজ যেমন আছে এক জন মেয়ে এক দল পুরুষের কর্ত্রী হয়ে।

নিশা দেখল তার মেয়ে লেখা শিকারে সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করছে—সে পাহাড়েও চড়তে পারে হরিণের মত দ্রুতগতিতে। একদিন তারা একটা মৌচাক দেখতে পেল—পাহাড়ের উপর এত উঁচুতে সেটা হয়েছিল যে, ভল্লুকদের এককালে বলা হত মধুভুক—তারা পর্য্যন্ত সেখানে চড়তে সক্ষম হয়নি। কিন্তু একটার পর একটা বাঁশ বেঁধে লেখা গিরগিটির মত সেগুলো বেয়ে উপরে উঠে রাত্রে মশাল জ্বেলে ছলো মৌমাছিগুলোকে পুড়িয়ে চাকটা ভেঙ্গে তার নীচে থলি ধরে কম করে বাট পাউণ্ড মধু পেড়ে আনল। লেখার এই দুঃসাহসিক কাজ স্থানীয় অন্য পরিবারগুলোর এবং তার নিজের পরিবারের লোকেদের প্রশংসা অর্জন করল। কিন্তু নিশা এতে আনন্দিত হল না। সে দেখল যে, পরিবারের পুরুষেরা এখন লেখার ইঙ্গিতে নাচতেই বেশী উৎসাহ পায় এবং তার প্রতি তাদের আগ্রহ ক্রমেই কমে আসছে—যদিও তাকে একেবারে খোলাখুলি অমান্য করতে তারা এখনও সাহস করে না।

কিছু কাল ধরেই নিশা একটা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করছিল। অনেক সময় তার ইচ্ছা হত ঘুমন্ত অবস্থায় লেখার গলা টিপে মেরে

ফেলতে। কিন্তু সে বুঝত যে লেখার গায়ে জোর বেশী এবং একা সে লেখার বিরুদ্ধে কৃতকার্য্য হবার ভরসা করত না। সে অন্যের সাহায্য চাইতে পারে কিন্তু তার এই দুষ্কর্মে অন্যে সঙ্গী হবে কেন? পরিবারের পুরুষেরা সবাই-ই লেখার প্রেম ও স্নেহের কাঙাল। নিশার অন্য মেয়েরাও তাকে সাহায্য করতে একই রকম নিরুৎসাহ হবে। তারাও লেখাকে ভয় করত—তারা জানত যে এই ধরণের কোন চেষ্টা করে তা যদি ব্যর্থ হয় তাহলে লেখার হাতে তাদের খুব কষ্ট পেয়ে মরতে হবে।...

সেদিন নিশা আপন-মনে বসে কি যেন ভাবছিল। হঠাৎ তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—লেখাকে জব্দ করবার এক সদুপায় তার মনে উদিত হল।

ঘণ্টা তিনেক মাত্র বেলা হয়েছে তখন। অন্য পরিবারের সকলেই তখন তাদের তাঁবুর পিছনে বসে নগ্নগায়ে রোদ পোহাচ্ছে—কিন্তু নিশা বসে আছে তার তাঁবুর সামনে। তার পাশে বসে লেখার তিন বছরের ছেলেটা খেলছে। নিশার হাতে ছিল পাতার ঠোঙায় ভর্তি কতকগুলো লাল রংএর মিষ্ট ফল। পাশ দিয়েই ভলগা নদী বয়ে চলেছে এবং নিশার সুমুখের জমি ঢালু হতে হতে ভলগার খাড়া তীর পর্য্যন্ত পৌঁছে গেছে। নিশা একটা ফল মাটিতে গড়িয়ে দিল—ছেলেটি দৌড়ে গিয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলল। তখন আর একটা ফল নিশা গড়িয়ে দিল—এটি কুড়িয়ে নিতে ছেলেটি আরও কিছু দূর এগিয়ে গেল। এই ভাবে নিশা দ্রুতগতিতে একটার পর একটা ফল গড়িয়ে দিতে থাকল এবং যত দ্রুত সে গড়িয়ে দিল তত দ্রুতই ছেলেটি সেগুলো ধরবার জন্য ছুটতে লাগল—এমনি করে এক সময়ে ছেলেটি পা হড়কে ঝপ্ করে ভলগার খরস্রোতে পড়ে গেল।

নিশার দৃষ্টি সেই দিকে যেতেই সে চীৎকার করে উঠল। লেখা একটু দূরে বসে দেখছিল। তার ছেলে ডুবে যাচ্ছে দেখে সে দৌড়ে নদীর ঘাটে এল। ছেলেটি তখন আধ-ডোবা অবস্থায় স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল। লেখা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরতে সমর্থ হল—ছেলেটি ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা জল খেয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল—তাছাড়া ভলগার বরফ গলা ঠাণ্ডা জল বর্শার মত যেন তার গায়ে বিঁধছিল। অনেক কষ্টে লেখা স্রোতের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে সক্ষম হচ্ছিল। এক হাতে সে তার ছেলেকে ধরেছিল—অন্য হাতে ও পা দিয়ে সে সাঁতার দেবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ সে টের পেল যে এক জোড়া জোরালো হাত তার গলা চেপে ধরেছে। কি ঘটছে তা বুঝতে আর লেখার আশ্চর্য্য হবার কারণ ছিল না। অনেক দিন ধরেই তার প্রতি নিশার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন সে লক্ষ্য করছিল এবং আজ দেখল যে, নিশা তার পথের কাঁটা তুলে ফেলার জন্য তাকে একেবারে সরিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে। নিশাকে তার সামর্থ্য টের পাইয়ে দেবার ক্ষমতা তার ছিল—কিন্তু একটা হাত তার ছেলেটার জন্য আটকা ছিল, এই হল মুস্কিল। নিশা যখন দেখল যে লেখা তার সব শক্তি প্রয়োগ করতে চেষ্টা করছে তখন সে তাকে ডুবিয়ে মারতে চেষ্টা করল এবং লেখার মাথার উপর তার বুক দিয়ে সে চেপে ধরল। এতক্ষণ পর লেখা প্রথম জলের নীচে তলিয়ে গেল এবং উপরে উঠতে চেষ্টা করতে গিয়ে তার হাত থেকে ছেলেটা ফসকে বেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে নিশা তাকে সঙ্কটজনক অবস্থায় এনে ফেলেছিল। কিন্তু হঠাৎ নিশার গলার নাগাল পেয়ে লেখা সব ক'টা আঙুল দিয়ে তার গলাটা চেপে ধরল। লেখা ততক্ষণে অজ্ঞান হয়ে গেছে এবং যে গুরুভার তাকে জলের নীচে টেনে নিচ্ছিল তার ফলে নিশারও আর সাঁতার দেবার সামর্থ্য রইল না। সে অনেক লড়াই করেও কিছু করতে পারল না! উভয়ে উভয়ের দ্বারা পিষ্ট অবস্থায় ভলগার স্রোতে ভেসে গেল। এর পর অবশিষ্টদের মধ্যে নিশা-পরিবারের সব থেকে বলিষ্ঠা মেয়ে রোচনা এই পরিবারের কর্ত্রী-মা নির্বাচিত হল।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

গল্প হলেও সত্যি

প্রেমিক-প্রেমিকা। পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা খুঁজে পায় না, যেখানে নিরিবিলিতে দেখা হয় দু'জনে, যেজন্য বাধ্য হয়ে ছায়াছবি দেখতে যাওয়ার নাম করে যেতে হয় 'চিত্রা'য়। মাত্র কয়েক দিনের জন্যে 'মুক্তি' ছবিটি তখন প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রচুর জনসমাগম হয়েছে, প্রেক্ষাগৃহ প্রায় পরিপূর্ণ। অতি কষ্টে দু'খানি টিকিট যদিও পাওয়া গেল, কিন্তু পাশাপাশি জায়গা কিছুতেই পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে দু'জনকে কিছু দূরে-দূরে পৃথক্-পৃথক্ বসতে হল। কিন্তু উদ্দেশ্য ছায়াছবি দেখা নয়, কিছুক্ষণের জন্য নৈকট্যানন্দ উপভোগ করা। প্রেমিক হতাশায় ম্রিয়মাণ হয়ে শেষ পর্য্যন্ত জিজ্ঞেস করলো পাশে যিনি বসেছিলেন তাঁকে,—আপনি কি একা আছেন?

লোকটি চুপচাপ থাকেন। কোন উত্তর দেন না। পুনরায় প্রেমিক ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। তখনও লোকটি কথা বলেন না। পুনরায় ঐ একই প্রশ্ন উচ্চারিত হয়। লোকটি তখন বিরক্ত হয়ে বলেন—কেন বলুন তো?

প্রেমিক বলে,—একা থাকলে, জায়গাটা বদল করতুম। আমার সঙ্গে একজন মহিলা আছেন, তাঁকে একা বসতে হয়েছে।

লোকটি ছায়াছবিতে চোখ রেখেই কথা বলেন। বলেন,—আমার সঙ্গে আছে আমার ফ্যামিলি। আমি সপরিবারে এসেছি।

অরবিন্দ ও ধর্ম্মসাধনা

এক দিন এক অতি বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসিয়া অরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কারাগারে আপনার যে ধ্যানের অবস্থা হইয়াছিল, তাহা হইল কিরূপে ?"

অরবিন্দ বলিলেন, "শুধু মনকে ঠিক করলে হবে না—সে একটা পথ বটে কিন্তু তাতে হয় না, সমস্ত ধ্যানের ভাব ঈশ্বর-চরণে ফেলে দিতে হবে, যাকে আত্মসমর্পণ করা বলে। তেমনি করে সবই তাঁকে দিয়ে দেখতে হবে, তিনি কি করেন। আমি কেবল সাক্ষীর ন্যায় দেখিব, তিনি সব করিয়ে দেবেন।"

আমার মাতা অরবিন্দের ধর্ম্মসাধনায় উন্নত অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সহিত ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অরবিন্দের নির্দ্দেশ মত প্রয়াস করিয়া যে ফল পাইয়াছিলেন তাহা অরবিন্দকে বলিলে অরবিন্দ বলেন যে 'পথ ত খুলিতেছে মনে হয়।' অরবিন্দের অভিজ্ঞতা আমার মাতার ধর্ম্মসাধনায় অনেক সহায় হইয়াছিল। আমার মাতার দৈনন্দিন লিপিতে এ সকল লিখিত আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক দিন আসিয়া আমার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, "নির্ব্বাসনের জন্য আপনারা যে দুঃখ পাইতেছেন, সেই দুঃখ-রূপ মূল্য দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায়। আপনার পিতার যে সাধনা ছিল সে ত' তাঁর সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয় নাই। আপনার ভিতরে বংশ-পরম্পরায় সে সাধনার বল থাকবেই।"

আমার পিতার নির্ব্বাসন-দণ্ডের মধ্যে তিনি একাধিক বার আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আমার মাতা, ভগিনী প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছেন। আমার মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর সহিত রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতা বিষয়ে আমার লেখা নিষ্প্রয়োজন এবং সেই সূত্রে ঐ পরিবারের সকলের সহিতই আমাদের দুই পরিবারের বিশেষ পরিচয় ছিল।

র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ও অরবিন্দ

বাঙ্গালা দেশের নয় জন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে নির্ব্বাসন-দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল, ইহা ইংলণ্ডের কতিপয় উদারপন্থী ও বিশ্বকল্যাণকামী পার্লামেণ্ট সভ্যদের নীতির বিরোধী হওয়ায় তাঁহারা পার্লামেণ্টে গভর্ণমেণ্টকে নানা প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করিতেন। তন্মধ্যে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড (পরে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী), মিঃ ফ্রেডারিক ম্যাকার্নেস (পরে জজ), মিঃ কিয়ের হার্ডি, মিঃ কটন প্রভৃতি অনেকে ছিলেন। সংবাদপত্রে
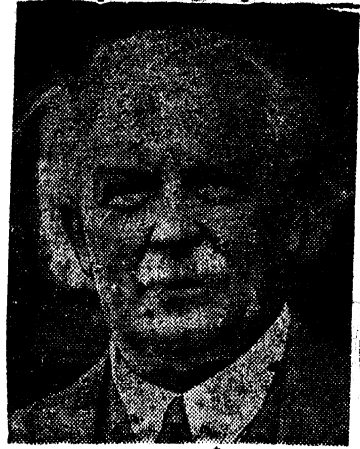
র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ড

তাঁহাদের নাম পাঠ করিয়া আমি তাঁহাদের নিকট আমার পিতার প্রতি অবিচারের কথা, আমাকে মাসিক ২ শত টাকা করিয়া ভাতা দিবার যে প্রস্তাব গভর্ণমেণ্ট করিয়াছিলেন তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বিচার দাবী করিবার কথা, আগ্রা জেলে আমার পিতাকে দিবারাত্রি তালা বন্ধ করিয়া রাখা ও কঠোর ব্যবহারের বিবরণ তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দেই। তাঁহারা আমার পত্রের উত্তরে আরও বিবরণ প্রভৃতি জানিতে চাহেন, আমিও তাহা ক্রমাগত পাঠাইতে থাকি। এই ভাবে পত্রের দ্বারা তাঁহাদের সহিত আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়।

আমার নির্ব্বাসিত পিতার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইতেছে তাহা প্রকাশ করিতে হাউস অফ কমন্সে নির্ব্বাসিত-দিগকে মুক্তি দিবার জন্য যে সকল ইংরেজ প্রশ্নাদি করিতেন তাঁহাদিগের নিকট জেলের কঠোরতার বিবরণপূর্ণ যে সকল পত্রাদি দিতাম অরবিন্দ জেল হইতে ফিরিয়া আসিবার পর সে সকল পত্র অতি যত্ন সহকারে দেখিয়া দিতেন।

১৯০৯ সালে মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড আমাকে পত্রে জানাইলেন যে, ভারতে আসিয়া তখনকার ভারতের অবস্থা জানিবার জন্য তিনি ইচ্ছুক হইয়াছেন, এবং সেই সময়ে তিনি আমাদের বাড়ী আসিয়া আমাদের সহিতও সাক্ষাৎ করিবেন। ১৯০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি আমাদের বাড়ীতে সস্ত্রীক আসেন। আমার মাতা ও ভগিনী স্বর্গীয়া কুমুদিনী বসু ও আমার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী এবং সরোজিনী দিদি তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া উভয়কে সন্দেশ, রসগোল্লা, কচুরী, সিংগাড়া ও অন্যান্য বাঙালীর খাদ্য খাইতে দেন। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ইংলণ্ডের বিখ্যাত প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের পরিবারে বিবাহ করিয়াছিলেন। যুবাকালে তিনি কয়লার খনিতে কয়লা তুলিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। আমার সহিত গভর্ণমেণ্টের যে সকল পত্র-বিনিময় হইয়াছিল ও যেরূপ কঠোর ভাবে আমার পিতাকে জেলখানায়

শ্রীসুকুমার মিত্র

মধ্যে একাকী রাখা হইয়াছিল মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে তাহার পূর্ণ বিবরণ দেই।

আমার পিতা যেখানে বসিয়া 'সঞ্জীবনী'র সম্পাদকতা করিতেন ও সকলের সহিত দেখাশুনা ও আলাপাদি করিতেন, সেই স্থানে আমার মাতা এক 'মটো' ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। "I will go in the strength of the Lord God." ইহা যে মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা তিনি যখন আমাদের বাড়ীতে আসেন তখন বুঝিতে পারি নাই। এইখানে অরবিন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তিনি তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে বহুক্ষণ আলাপ করেন। মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার Awakening of India নামক পুস্তক আমাকে এক খণ্ড উপহার দিয়াছিলেন। তাহাতে অরবিন্দ সম্বন্ধে নিম্নরূপ লিখিয়াছেন :

"But Bengal is perhaps doing better than making political parties. It is idealising India. It is translating nationalism into religion, into music and poetry, into painting and literature. I called on one whose name is on every lips as a wild extremist who toys with bombs and across whose path the shadow of the hangman falls. He sat under a printed text "I will go in the strength of the Lord God," he talked of the things which troubled the soul of man, he wandered aimlessly into the dim regions of aspiration, where the mind finds a soothing resting place. He was far more of a mystic than of a politician. He saw India seated on a temple throne. But how it was to arise, what the next step was to be, what the morrow of independance was to bring, to these things he had given little thought. They were not of the nature of his genius."

"বাঙ্গালা রাজনীতির দল গঠন অপেক্ষা ভাল কাজ করিতেছে—ভারতবর্ষকে ধ্যানধারণার বিষয় করিতেছে। বাঙ্গালা জাতীয়তাকে ধর্ম্মে, সঙ্গীতে ও কবিতায়, চিত্রকলায় ও সাহিত্যে রূপ দিতেছে। আমি এক জনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম—তাঁহাকে সকলেই উৎকট চরমপন্থী বলে—বলে, তিনি বোমা লইয়া খেলা করেন—তিনি যে কোন সময়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। তিনি যেখানে বসিয়াছিলেন, তাহার উপরে মুদ্রিত বাণী—'আমি ভগবানের শক্তিতে পরিচালিত হইব।' যে সকল বিষয় মানুষের আত্মাকে পীড়িত করে, তিনি সেই সকলের কথা বলিলেন ; যে আকাঙ্ক্ষায় রাজ্যে মানুষের চিত্ত শান্তি লাভ করে তিনি উদ্দেশ্যহীন ভাবে সেই রাজ্যে উপনীত হইলেন। তিনি রাজনীতিক অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভাবাচ্ছন্ন। তিনি ভারতকে মন্দিরের দেবাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়াছেন। কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভব হইবে এবং স্বাধীনতার নবপ্রভাতে কি হইবে—তিনি সে সকল সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তাও করেন নাই।"

রোহিণীতে অরবিন্দের মাতার বাংলোয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণ। (বাম হইতে দক্ষিণে)—রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগীন্দ্রনাথ বসু ও অরবিন্দের মাতা স্বর্ণলতা, রাজনারায়ণের তৃতীয়া কন্যা সুকুমারী ঘোষ, ঐ চতুর্থী কন্যা (কৃষ্ণকুমার মিত্রের পত্নী)।

র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের পুস্তকের এই অংশটির বিষয়ে একদিন শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে আমি প্রশ্ন করি। তিনি এক পত্রে তাঁহার যে অভিমত জানান, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"আমার মনে হয়, মিষ্টার ম্যাকডোনাল্ড অরবিন্দের সম্বন্ধে ভুল বুঝিয়াছিলেন। তিনি তখনও প্রাকৃত জগৎ হইতে অতি-প্রাকৃতে অধিক মনোযোগী হন নাই—এমন কি, অতিপ্রাকৃতে অধিক মনোযোগী হইয়াও তিনি তখন প্রাকৃত জগৎ ভুলেন নাই ; ক্রিপস মিশন হইতে ভারত-বিভাগ পর্য্যন্ত সকল ব্যাপারেই তিনি যে তাঁহার সুনিশ্চিত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, দেশ-বিভাগ বিলুপ্ত করিতেই হইবে, তাহাতেই আমার কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। মিষ্টার ম্যাকডোনাল্ড হয়ত মনে করিয়াছিলেন, তিনি

এক জন উগ্র বোমাবিলাসী দেখিবেন। কিন্তু অরবিন্দের ধাতুতে যে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ রাজনীতির সহিত সম্মিলিত ছিল এবং তিনি যাহা তাঁহার মাতামহের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়া তাহা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যে ভাবে স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিরাট পরিকল্পনা পরিচালিত করিয়াছিলেন এবং তুমি তাঁহার চন্দননগর হইতে পণ্ডিচেরী গমনের যে বিবরণ দিতেছ, তাহাতেই বুঝা যাইবে, তিনি প্রাকৃত ব্যাপারে সচেতন ছিলেন।"

নির্ব্বাসনে কৃষ্ণকুমার মিত্র

মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বে আমি ভারত গভর্ণমেণ্টকে পত্র দেই যে আমার পিতা কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহিত আমি পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে চাই। গভর্ণমেণ্ট উত্তর দিলেন যে আমার পিতা আগ্রা জেলে যে অবস্থায় আছেন তাহার বিবরণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যদি সংবাদপত্রে প্রকাশ না করি বা করিতে দেই এবং যদি এরূপ লিখিত অঙ্গীকার করিয়া দেই, তবেই আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে। আমি 'অরোদা'কে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি করি'। কারণ এরূপ হীনতা স্বীকার করিতে মন চাহিল না। তিনি বলিলেন, "তাঁহাকে দেখিবার জন্য তোমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে এবং যখন প্রয়োজনও আছে তখন রাজী হও।" তিনি ঐ সর্ত্তে পত্র মুসাবেদা করিয়া দিলেন। কিছু দিন পরেই সাক্ষাৎ করিবার আদেশ আসিল ও আমি আগ্রায় যাইয়া তথাকার উকিল স্বর্গীয় নিলমণি ধর ও স্বর্গীয় প্রফেসর নগেন্দ্র নাগের সহিত সাক্ষাৎ করি। নাগ মহাশয় দেশনেতা স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর জামাতা ছিলেন। এই দুই বাড়ীতে দেখা করিয়া বাহির হইবা মাত্র দেখিলাম গুপ্ত পুলিশ আমার পিছনে লাগিয়াছে। তৎকালে বাঙ্গালী দেখিলেই যুক্তপ্রদেশের গোয়েন্দা পুলিশ তাহাদের অনুসরণ করিত ও খবরাখবর লইত।

আগ্রা জেলের ভিতর তিন দফা প্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত একটি আলাদা অতি ক্ষুদ্র একতলা বাড়ীতে আমার পিতাকে সর্ব্বক্ষণ তালাবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। তাঁহার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিবার পরে জেলারকে বলি যে আমি একদিন আমার পিতাকে খাদ্য দিতে চাই। তাহাতে জেলার রাজী হন না। পরে বলিলেন, "তুমি তাঁহাকে খাদ্যের সহিত বিষ দিতে পার।" আমি চমকাইয়া গেলাম, "বলে কি?" অনেক বাদানুবাদের পরে তিনি এক বেলা আহার্য্য দিতে অনুমতি দিলেন। তখন স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ নাগের মাতা তথায় ছিলেন, এই কথা শুনিয়া তিনি আগ্রহের সহিত নানা প্রকার ব্যঞ্জন, মিষ্ট খাদ্য ইত্যাদি রন্ধন করিয়া দুই জন ভৃত্যের দ্বারা পাঠাইয়া দেন। জেল-দরজায় আমি তাহা পৌছাইয়া দেই। জেলে এক জন পশ্চিমদেশীয় কয়েদী আমার পিতার খাদ্য রন্ধন করিত। তাহা প্রায় অখাদ্য ছিল। ইহা শুনিয়া ইতিপূর্ব্বে আমি গভর্ণমেণ্টকে একজন বাঙ্গালী পাচক নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষা না করায় আমি অন্ততঃ এক দিনের জন্য খাদ্য দিবার অনুমতি লই। আমার পিতা নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলেন, "গয়ায় জঙ্গলে বুদ্ধদেব বহুকাল অনাহারে নির্ব্বাণ লাভের জন্য ধ্যান-ধারণার পরে যখন চক্ষু খুলিলেন তখন দেখেন যে সুজাতা তাঁহার জন্য পায়স রন্ধন করিয়া আনিয়াছে। সেই পায়স খাইয়া বুদ্ধদেব যে তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন, বহুকাল পরে বাঙ্গালী-রান্না খাইয়া আমার সেই কথা মনে হইয়াছিল।" জেলে প্রভাতে ও বিকালে এক ঘণ্টা ব্যতীত তাঁহাকে কেবল যে সমস্ত ক্ষণ তালাবদ্ধ করিয়া রাখা হইত তাহা নহে, তাঁহাকে একাকী থাকিতে হইত। তদ্ব্যতীত প্রথম ৫।৬ মাস তাঁহাকে পুস্তক বা লিখিবার সরঞ্জামও দেওয়া হইত না। এই সকল কঠোরতার ফলে তাঁহার হৃদ্‌রোগ হয়, পা ফুলিতে থাকে এবং সেই রোগেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

টহলরাম গঙ্গারাম

দেশের মধ্যে নীরবতা। নির্ব্বাসিতের মুক্তির জন্য ১৯০৯ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব ব্যতীত আর কোনও আন্দোলন ছিল না। স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন সম্পর্কে এক আবেগপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় সম্পর্কে 'মাদ্রাজ টাইমস' পত্রিকায় লেখা হইয়াছিল যে 'যিনি এরূপ বক্তৃতা করেন তিনি ঘোর বিপ্লবী।' ইংলণ্ডের হাউস অফ কমন্সের সভ্য মিঃ ম্যাকারনেস ও মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড আমাকে পত্র দেন যে তাঁহারা লণ্ডনের হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস আইন অনুসারে নির্ব্বাসিতদের মুক্তির জন্য এক দরখাস্ত করিবেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা চাঁদা তুলিয়াছেন। আমার পিতার আমমোক্তারনামা লইয়া আমার ইংলণ্ড যাওয়া প্রয়োজন। জানি না, কিরূপে এই কথা ভারতের সুদূর পশ্চিম প্রান্ত ডেরা-ইসমাইল খাঁ নামক সহরে মিঃ টহলরাম গঙ্গারাম ব্যারিষ্টারের নিকট পৌছে। তিনি আমাকে পত্র দেন যে 'তুমি কম বয়স্ক, কখনও বিদেশে যাও নাই; সুতরাং একাকী ইংলণ্ডে যাইয়া মুস্কিলে পড়িবে। আমি তোমার সহিত ইংলণ্ড যাইব এবং যাওয়া-আসার সমস্ত ব্যয়ভার আমি লইব।'

অরবিন্দ এই পত্র পাঠ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'বেশ ত', সে দেশে যাইয়া তাঁহার মুক্তির জন্য একবার চেষ্টা কর'। আমাকে উদারচেতা ও মহৎ মিঃ টহলরাম গঙ্গারামের সাহায্য লইতে হয় নাই।

এ স্থানে টহলরাম গঙ্গারামের বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। ১৯০৪ সালে তিনি উল্কার মত কলিকাতায় আসিয়া এই রাজধানীর সকল আন্দোলনের কেন্দ্র গোলদীঘিতে বক্তৃতা করিতে থাকেন। তাঁহার বক্তৃতায় ইংরাজের ... ও নানাভাবে দেশবাসীকে শোষণের বিবরণ

শ্রোতাদের বুঝাইয়া দিতেন এবং লর্ড কার্জ্জনকে গালাগালি দিতেন। বহুদিন তিনি এই ভাবে বক্তৃতা করিতে থাকেন। কি করিয়া তিনি বালক হেমচন্দ্র সেনকে ও অপর কয়েকজন বাঙ্গালী বালককে জুটাইলেন তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার বক্তৃতার পরে তিনি পুরোভাগে থাকিয়া এই সকল যুবক ও বালকগণকে লইয়া এক মিছিল করিয়া গোলদীঘি হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় ঘুরিতেন। তাহারা গান করিত

God bless our ancient Hind
Long live our mother Hind ইত্যাদি।

হেমচন্দ্র তখনও আজকার মত সুগায়ক হয় নাই।

কিছুকাল এইরূপ চলিবার পরে একদিন হঠাৎ গোলদীঘিতে কতকগুলি লোক তাঁহার বক্তৃতায় বাধা দিল ও ইট-পাটকেল ছুঁড়িতে লাগিল। শ্রোতারা দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল। পরদিন পুনরায় নির্ভীক টহলরাম গঙ্গারাম গোলদীঘিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বক্তৃতা করিতে আসিলেন। ক্রমে স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে ভীড় করিতে লাগিল। জনসাধারণ—বিশেষতঃ যুবকগণের মধ্যে তাঁহার প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অপর এক দিন তাঁহার সভায় কয়েকজন লোক গোলমাল আরম্ভ করিল ও তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া গোলদীঘির জলে ফেলিয়া ডুবাইয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তখন গোলদীঘির জলের চারিদিকে লোহার বেড়া ছিল না। টহলরাম তথাপি তাঁহার দৈনিক বক্তৃতা বন্ধ করেন নাই। যাহারা তাঁহাকে জলের মধ্যে ফেলিয়াছিল তাহারা হিন্দুস্থানী ছিল।

অপর একদিন একদল কাফ্রী গুণ্ডা বক্তৃতার সময় তাঁহাকে লাঠি লইয়া আক্রমণ করিয়া প্রহার করে। তিনি দৌড়িয়া কলেজ স্কোয়ারে আসিয়া আশ্রয় লন। আর একদিন বক্তৃতা দিবার পরে তাঁহার মাথার উপর বিষ্ঠা নিক্ষেপ করে ও তাঁহার মাথা ফাটাইয়া দেয়। তিনি "সঞ্জীবনী" অফিসে দৌড়িয়া আসিয়া আশ্রয় লন। তাঁহার বস্ত্র সকল ধৌত করিয়া মাথায় বরফ দিয়া রক্ত বন্ধ করা হয় ও লোকজন সঙ্গে দিয়া তাঁহার বাসায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেদিন কয়েকজন ফিরিঙ্গী ইঁদ্রু পিঁদ্রু রুল দিয়া তাঁহার নাক ফাটাইয়া দেয়, রক্তে তাঁহার বস্ত্র রঞ্জিত হইয়াছিল। তিনি 'সঞ্জীবনী' অফিসে দৌড়িয়া আসিলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কয়েকজন ফিরিঙ্গীও ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করে। আমি ঐ বাড়ীর বারান্দায় হঠাৎ আসিলে উহা লক্ষ্য করিলাম। আমার পিতাকে বলিলাম, গুণ্ডাগণ বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়াছে। তিনি একটি খুরকী লইয়া নীচে সদর দরজায় চলিয়া গেলেন, আমিও একটা লোহার পাইপ লইয়া গেলাম। যাহারা ভিতরে ঢুকিয়াছে তাহাদের ভোজালী-বিদ্ধ করিবেন বলায় তাহারা পলায়ন করে। সেবা-শুশ্রূষা করিয়া টহলরামকে মেডিকেল কলেজ-হাসপাতালে পাঠান হয়। কয়েক দিন পরে তিনি সুস্থ হন। ঐ সময়ে বহু যুবক হাসপাতালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত। ইহার পরে আদালতে তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা হয় এই বলিয়া যে, তাঁহার বক্তৃতায় বহু লোক জমে এবং তিনি জনসাধারণের জীবন বিপন্ন করিতেছেন। মামলা নিষ্ফল হয়।

টহলরাম গঙ্গারাম সম্বন্ধে আমার পিতা তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, "যীশুর পূর্ব্বে যেমন জনের আবির্ভাব হইয়াছিল, বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের পূর্ব্বে তেমনি টহলরাম আসিয়াছিলেন।"

কলিকাতার পার্কে পূর্ব্বে খৃষ্টান মিশনারীদের বক্তৃতা ও সভা হইয়াছে, কৃষকদের সভা হইয়াছে কিন্তু টহলরামের পূর্ব্বে কোনও রাজনৈতিক জনসভা পার্কে হয় নাই। তিনিই সর্ব্বপ্রথম কলিকাতার পার্কে রাজনৈতিক সভা সুরু করেন।

পার্কে বক্তৃতার অধিকার

বহু বৎসর পূর্ব্বে পার্কে সভা করার অধিকার লইয়া আদালতে মামলা হইয়াছিল। বিডন ষ্ট্রীট নামক রাস্তা ও বিডন স্কোয়ার নির্ম্মিত হইবার পর হইতে বিডন স্কোয়ারে ইংরাজ খৃষ্টান মিশনারীগণ খৃষ্টধর্ম্ম সম্পর্কে বক্তৃতা করিতেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহারা ওয়েলিংটন স্কোয়ার প্রভৃতি পার্কে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন এবং বহু ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী সেই সকল বক্তৃতা শুনিতে আসিত। তাহাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে শক্তিশালী একটি দল ছিল। তাঁহারা খৃষ্টানদের প্রচারের বিরোধী ছিলেন। খৃষ্টানদিগের পার্কে সভা করার পূর্ব্ব হইতে ভারত সভা এই সকল পার্কে কৃষকদের সভা করিয়া খাজানা আইন পরিবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন করিতেছিলেন। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল জমিদার সভার সেক্রেটারী ছিলেন, আবার মিউনিসিপ্যালিটির একজন সদস্য ছিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে মিউনিসিপ্যালিটির অধীন পার্ক সমূহে কোনও সভা হইতে পারিবে না এবং সে সম্বন্ধে তদন্ত করা হউক।

তৎকালে একই ব্যক্তি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও পুলিশ কমিশনার হইতেন। মিঃ হ্যারিসন এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহারই নামে হ্যারিসন রোড। তিনি পার্কে সভা করা নিষেধ-আজ্ঞা জারী করেন। ১৮৮১ সালের ১লা মে রবিবার বিডন স্কোয়ারে যখন রেভারেণ্ড জেমস ও রেভারেণ্ড ম্যাকডোনাল্ড খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন তখন পুলিশ তাঁহাদের বক্তৃতা বন্ধ করিতে চান। তাঁহারা অস্বীকার করেন। ইহা লইয়া মিঃ হ্যারিসন ও মিশনারীদের আলোচনা হয়। পার্কে সভা করিতে হইলে পুলিশের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে বলিয়া আদেশ হয়। ধর্ম্মপ্রচারকগণ আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া যথারীতি পার্কে বক্তৃতা করিয়া যাইতে থাকেন। পুলিশ মাঝে মাঝে বাধা দিতে লাগিল। মিশনারীগণ তাঁহাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে মনে

করিলেন। মিঃ হ্যারিসন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানরূপে ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও অপর চারিটি স্কোয়ারে এবং পুলিশ কমিশনার মিঃ হ্যারিসনের লাইসেন্স ব্যতীত বক্তৃতা করা নিষেধ করিলেন। বিডন স্কোয়ারে মিঃ কেরী ও রেভাঃ বমফোর্ড বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলে পুলিশ নিষেধ করে। তাহার পরে মিশনারীদের নামে শমন বাহির হয়। মিশনারীগণ এই অবৈধ আদেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন।

জনসাধারণের অধিকার রক্ষা ও বজায় রাখিবার জন্য যাঁহারা চিরদিন সংগ্রাম করিয়াছেন সেই মিঃ মনোমোহন ঘোষ ও মিঃ টি পালিত এই মামলায় মিশনারীদের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে মিঃ আবদুর রহমান এবং মিঃ সেল মিশনারীদের পক্ষ অবলম্বন করেন। গভর্ণমেণ্ট পক্ষে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ জ্যাকসনকে নিযুক্ত করা হয়। আদালতের বিচারে পুলিশের আদেশ বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয় এবং মিশনারীগণ মুক্তি পান। এই ভাবে স্কোয়ারে বক্তৃতা করিবার অধিকার স্বীকৃত হয়।

যে জেমস সাহেব খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন তিনি বাঙ্গালী কবির মত গানও রচনা করিয়া তাঁহার সাহেবী ভাঙ্গা বাঙ্গালায় গাহিতেন। একটির কতকাংশ মনে আছে—

জেমস সাব্ বোলে ভুমণ্ডলে
এমনি বেপার হোয়ে ঠাকে।
কারু পাটে ডুটো ডুটো
কারু পাটে কচু সিড্ড॥

* * * *

ইতিপূর্ব্বে অন্য এক পুলিশ কমিশনারও জনসাধারণের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় কলিকাতা সহরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইডেন উদ্যানের সৌন্দর্য্য তিনিই বৃদ্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া সহরবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। তাঁহার চেষ্টায় তৈয়ারী সৌন্দর্য্যপূর্ণ ইডেন উদ্যানে ছিন্ন কন্থা-পরিহিত দরিদ্র, ফিনফিনে ধুতি পরা বাঙ্গালী বাবু, জাহাজের খালাসী ঢুকিবে ইহা তাঁহার সহ্য হইল না। সে জন্য তিনি আদেশ দিলেন তাঁহার লিখিত অনুমতি ব্যতীত কেহ বাগানে প্রবেশ করিতে পারিবে না। চৌরঙ্গীর অধিবাসী সকল তাহাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করায় উত্তেজিত হইল। তাহার ফলে তৎকালীন পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট এবং হাইকোর্টের প্রবীণ ব্যারিষ্টার মিঃ ব্রান্সন বিনা অনুমতিতে উক্ত উদ্যানে প্রবেশ করেন। তাহার পরদিন পুলিশ কমিশনারের আদেশ নাকচ করা হয়।

কবি রবীন্দ্রনাথও মিশনারীদের খৃষ্টধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে এক কবিতায় লিখিয়াছেন,

ওরে ওরে ভাই বিশু পথে শুনি জয় যীশু
কেমনে এ নাম করিব সহ্য আমরা আর্য্য শিশু

* * * * * *

পুলিশ আসিছে গুঁতা উঁচাইয়া এই বেলা দাও দৌড়
ধন্য হইল আর্য্য ধর্ম্ম ধন্য হইল গৌড়

অরবিন্দের মুন্সিয়ানা

আমার পিতার নির্ব্বাসনের এক বৎসর চলিয়া যাইবার পরে আমার দুই ভগিনী শ্রীমতী কুমুদিনী ও শ্রীমতী বাসন্তীর স্বাক্ষরে এক দরখাস্ত পাঠাই। তাহাতে লেখা ছিল যে তাঁহারা দুই জনে স্বেচ্ছায় পিতার সহিত অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কারাবরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের নিঃসঙ্গ পিতার পরিচর্য্যা করিতে পারেন। তাঁহাদের পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন এ সময়ে তাঁহাকে নিরানন্দে ও একাকী থাকিতে হইতেছে। সুতরাং তাঁহাদের একজনকে তাঁহাদের পিতার নিকট থাকিয়া সেবা করিতে অনুমতি দেওয়া হউক। ইহাতে গভর্ণমেণ্ট রাজী হন নাই। আমার মাতার স্বাক্ষরে আমি গভর্ণমেণ্টকে পুনরায় এক পত্র দেই। পত্রে এই কথা লেখা ছিল যে, পিতার বয়স হইয়াছে, এ সময়ে তাঁহার পরিচর্য্যার প্রয়োজন, বিশেষতঃ, যেহেতু তাঁহাকে একাকী রাখা হইয়াছে তখন আমার মাতাকে তাঁহার সহিত থাকিতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হউক।

It is now almost a year and there seems no immediate prospect of release. Under such circumstances the place of an Indian wife is at her husband's side, her duty to minister him and alleviate his lot with the consolation her companionship can give. I do not think the Government will refuse my husband or myself this favour which is not inconsistent with the status or manner of confinement of a state prisoner and while it can do no injury to any one, will remove all cause of grief from both of us. I have read that the Government has declared that the deportation meant not to punish but to prevent and that no charge is preferred against or imputed to my husband. It cannot therefore be the Government's wish to add the heavy punishment of enforced solitude of whatever confinement they may think necessary and I have no doubt they will be glad to avoid it now that a means is offered to them by permitting me to share my husband's lot in Agra jail.

আমি যে পত্র লিখিয়াছিলাম অরবিন্দ তাহার কতকাংশ পরিবর্ত্তন করিয়া ও তাঁহার নিজ ভাষায় ও যুক্তিতে উপরোক্ত ইংরাজী অংশ জুড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ভাব ও ভাষা উপরোক্ত পত্রে পাঠক সম্যক্ উপলব্ধি করিবেন বলিয়া ইংরাজী অংশই উদ্ধৃত করা হইল। গভর্ণমেণ্ট এবারও রাজী হইলেন না। আমি পত্রগুলি ও তাহার উত্তর সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া দেই। এই পত্রগুলি প্রকাশে আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। ভারতের সকল স্থানের শিক্ষিত ও রাজনীতিবিদ্গণ এই দুই পত্র পাঠে উত্তেজিত হইয়া উঠেন। আমি আরও চাহিয়াছিলাম যে, ঐ আগ্রা সহরেই বন্দী সাজাহানকে তাঁহার দুহিতা জাহানারা নিজেও বন্দীর মত থাকিয়া যে ভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, আমার দুই ভগিনী সেইরূপে আমরণ আমার পিতার পরিচর্য্যার সুবিধা লাভ করুক। [ক্র

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

ভঁইষ—মহিষ, বয়ার, লুলাপ।
ভইড়—চরণ, পদ, পা, ভড়।
ভইল—আকৃতি, অবয়ব, চিহ্ন।
ভক্ত—ভজনশীল, সেবক, অন্ন।
ভক্তদাস—অন্নদাস, ভাতুড়িয়া।
ভক্তবৎসল—ভক্তানুগ্রাহক, ভক্তস্নেহী।
ভক্তবিটল—কাল্পনিক ভক্ত, কপট ভক্ত।
ভক্তি—অত্যন্ত শ্রদ্ধা, অনুরাগ, বিভাগ।
ভক্ত্যা—নট, যুবা নর্ত্তক।
ভক্ষক—খাদক, ভোজনকারী, ভোক্তা।
ভক্ষণ—ভোজন, আহার, খাওন, অদন।
ভক্ষণীয়—ভোজনীয়, খাদ্য, ভক্ষ্য।
ভক্ষ্য—খাদ্য, ভোজনীয়, আহারযোগ্য।
ভগ—ঐশ্বর্য্যাদি গুণ, যোনি, উৎপত্তিস্থান।
ভগবান—ভগবিশিষ্ট, পরমেশ্বর।
ভগিনী—স্বসা, সহোদরা, পিতার কন্যা।
ভগ্ন—ভাঙ্গা, খণ্ডিত, পরাস্ত, বিচ্ছিন্ন, নাশ, খণ্ড, বিপর্য্যয়।
ভগ্নাংশ—হতাশ, হতোদ্যম, নির্ভরসা।
ভঙ্গরঙ্গ—লীলা, ভাব, ভঙ্গী, বিলাস।
ভঙ্গী—ইঙ্গিত, অঙ্গবিন্যাস।
ভঙ্গুর—বক্র, ভগ্নোন্মুখ, নশ্বর, নদীর বাঁক।
ভজন—উপাসনা, সেবা, আরাধনা, অর্চনা।
ভঞ্জন—খণ্ডন, ভাজন, নাশন, ঘুচান।
ভট—যোদ্ধা, সেনা, ভৃত, চণ্ডাল।
ভট্ট—মীমাংসক, স্তুতিপাঠক।
ভট্টাচার্য্য—গৌড়ীয় পণ্ডিতের উপাধি।
ভটভট—বকবক, অনর্থক বাক্য, প্রতিধ্বনি।
ভড়ক—ভড়ঙ্গ, ফাঁকী, চাতুরী, প্রবঞ্চনা।
ভণন—কথন, ভাষণ, গ্রন্থ রচন।
ভণ্ড—ধূর্ত্ত, ভাঁড়, কৌতুকী, নর্ত্তক, প্রতারক।
ভণ্ডামী—ফাঁকী, ভেঙ্গানি, চাতুরী।
ভণ্ডুল—ব্যাঘাত, ভঙ্গ, প্রবঞ্চনা, গোলমাল।
ভন্‌ভনান—ভ্রমরের শব্দ, ঘুণঘুণান।
ভদ্র—উত্তম, বিলক্ষণ, বিশিষ্ট, শুভ।
ভদ্রাসন—বসতির বাটী, বাস্তবাটী, ভিটা।
ভন্দড়—নকুল-বিশেষ, ভোঁদড়।
ভব—জন্ম, উৎপত্তি, সংসার, মঙ্গল, শিব।
ভবদীয়—আপনকার, আপনার।
ভবানী—দুর্গা, শিবের পত্নী, পার্ব্বতী।
ভবিক—কল্যাণ, শুভ, ভব্য, মঙ্গল।
ভবিতব্য—যাহা হইবে, অবশ্যম্ভাবী।
ভব্য—সম্ভব, উচিত, ভাবী, শুভ, সভ্য।
ভমরী—বুর্মা, তুরপণ, ভেদক-অস্ত্রবিশেষ।
ভয়—ত্রাস, শঙ্কা, আতঙ্ক, ভীতি।
ভয়ঙ্কর—ভয়ানক, শঙ্কাজনক, ঘোর, দারুণ।
ভয়শীল—ভীত, ত্রস্ত, ডরালু, ভীরু।
ভয়ানক—ভয়ঙ্কর, শঙ্কাজনক, ত্রাসজনক।
ভয়ার্ত্ত—ভয়াতুর, ভীত, ভীরু, ত্রস্ত।
ভর—অতিশয়, পূরা, ঢের, অধিক, চাপ।
ভরণ—ভরণ্য, বেতন, পণ, উপজীবিকা।
ভরত—পক্ষিবিশেষ, তাঁতী, নামবিশেষ।
ভরদ্বাজ—পক্ষিবিশেষ, গোত্রবিশেষ।
ভরসা—আশা, আশ্বাস, প্রত্যয়, সাহস।
ভরসাতী—সাহসী, আশাপন্ন, ভরসাযুক্ত।
ভরা—পরিপূর্ণ, বোঝাই, ভার, চড়তি।
ভরাট—বুজান, পূরাণ, ভরপূরণ।
ভরাণি—বেতন, ভৃতি, ভরণ্য।
ভর্জ্জন—ভাজন, ঝলসান, নির্জ্জল পাক।
ভর্জ্জনকপাল—ভাজাখোলা, স্বেদনী।
ভর্ত্তব্য—পোষণীয়, প্রতিপাল্য।
ভর্ত্তা—পতি, স্বামী, প্রতিপালক, রক্ষক।
ভর্ত্তী—বোঝাই, ভার, পরিপূর্ণতা, ভরা।
ভর্ৎসন—তিরস্করণ, নিন্দন, ধমকান।
ভল্ল—ভেলা, উড়ুপ, বাণবিশেষ।
ভল্লুক—ভালুক, হিংস্র জন্তুবিশেষ।
ভষণ—বুক্কন, ভেউ-ভেউ করণ, ঝকড়ন।
ভস্ম—ছাই, পাঁশ।
ভা—দীপ্তি, শোভা, প্রভা, প্রতিবিম্ব।
ভাই—ভ্রাতা, সহোদর।
ভাও—মূল্য, অর্ঘ্য, দাম।
ভাঁজ—মিশ্র, মলা, খাইদ, পাট।
ভাঁজন—দোমড়ান, পাটকরণ, মিশান।
ভাঁজা—দোমড়া, পাট, চুনট, কোঁকড়ান।
ভাঁজাল—মিশ্রিত, ভাঁজযুক্ত, দোমড়ান।
ভাঁটা—বর্ত্তুল, লৌটি, আফাকল, স্রোত।
ভাঁড়—কৌতুকী, প্রবঞ্চক, ক্ষুদ্রমৃৎপাত্র।
ভাঁড়ামী—ভণ্ডামী, ফাঁকী, প্রবঞ্চনা।
ভাঁড়ার—ভাণ্ডার, কোষ, দ্রব্যাগার।
ভাক্ত—কাল্পনিক, কৃত্রিম, অন্নদাস।
ভাগ—অংশ, বিভাগ, বণ্টন, কপাল।
ভাগবত—বিষ্ণুপরায়ণ, পুরাণগ্রন্থ:
ভাগাভাগি—অংশাংশি, সাধারণ।
ভাগিনী—ভাগিনেয়ী, ভগিনীর কন্যা।
ভাগিনেয়—ভাগিনা, ভগিনীর পুত্র।
ভাগী—কপালিয়া, অংশী, দায়ী।
ভাগীরথী—গঙ্গা, সুরনদী।

অর্দ্ধেক রূপসী...

রূপ-চর্চ্চার রীতি-নীতি বদলায় যুগে যুগে···নূতন এসে করে পুরাতনের স্থান অধিকার। কিন্তু নারী—চিরন্তনী নারী—সে তার কেশসম্পদের নিরাপত্তা-রক্ষায় নিজের মধ্যে জেগে রয়েছে চিরদিন···কেশই যে তার অর্দ্ধেক রূপ। সে-রূপ সাধনায় এ-যুগের সর্ব্বগুণান্বিত আঙ্গিক **জবাকুসুম।**

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

পঞ্চানন ঘোষাল

রাত্রি দশ ঘটিকা থানার ঘড়ীতে বহুক্ষণ হলো বেজে গিয়েছে, চারি দিকে নিঃসাড় নিঃশব্দ ; কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত থানার নবাগত ভারপ্রাপ্ত অফিসার নরেন বাবু একটি-একটি করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে থানার যাবতীয় কাগজপত্র দেখে নিচ্ছিলেন। এমন সময় জুনিয়ার অফিসার প্রণব বাবু এবং তাঁর সাথী সান্ত্রীদল রূপাগাছি অঞ্চল হতে প্রায় বিশ জন বাছা-বাছা বদমায়েসকে পাকড়াও করে থানায় এসে নরেন বাবুর আফিস-ঘরে ঢুকে পড়লেন।

টেবিলের উপরকার দুইখানি পেপার-ট্রেতে গাদা-লাগানো কাগজপত্র হতে মুখ তুলে নরেন বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'ওঃ, প্রণব বাবু! এসে গিয়েছেন আপনি? আজ সর্ব্বশুদ্ধ কতো জন দাগী ধরা পড়লো? আরে, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন, বসে পড়ুন ঐ চেয়ারটায়।' সামনের একখানি চেয়ারে বসে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, 'বিশ জন লোক ধরেছি, সব বেটা পুরানো চোর। ওদের এক জনের পকেটে একটা ঔষধের শিশি পাওয়া গিয়েছে, সাধারণ ঔষধ বলে মনে হয় না, বোধ হয় ক্লোরোফর্ম হবে।' 'এঁ্যা, তাই না কি?' উৎসাহিত হয়ে নরেন বাবু বললেন, 'গুড! এই রকম কাষ আমি চাই। বেশ্যা-পল্লীতে কিছু দিন এই রকম অপরাধ-নিরোধমূলক ধরপাকোড় চালিয়ে যাও, দেখবে, মার্ডার আর ড্রাগিঙ কেস্ এমনিই বন্ধ হয়ে যাবে। হুঁ।'

নরেন বাবু ছিলেন এক জন নাম-করা থানাদার, তাঁর দাপটের কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত। চোর-বদমায়েসরা তাঁর নাম শুনলেই সদাসন্ত্রস্ত। অধিকন্তু তিনি ছিলেন এক জন সাচ্চা মানুষ, সততার দিক হতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়! পুলিশী বা রক্ষীগিরিকে তিনি পেশারূপে গ্রহণ করেছিলেন, চাকুরীরূপে নয়, তাই তাঁর ভিতরের মানুষটিকে কম লোকই বুঝতে পেরেছে। কেউ কেউ যে তাঁকে নির্দ্দয় ও পাষণ্ডরূপে ভুল বোঝেনি তাও না। কিছু কাল যাবৎ এই থানার এলাকাধীন নাগরিকগণ চোর গুণ্ডা বদমায়েসদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তাদের মুহুর্মুহু আবেদনে ও নালিশে বিব্রত হয়ে নরেন বাবুর গুণমুগ্ধ উর্দ্ধতন রক্ষীমহল নরেন বাবুকে বিশেষ করে বেছে এই মেছুয়াবাজার থানায় ভারপ্রাপ্ত অফিসাররূপে বদলি করেছিলেন। প্রণব বাবুকে একটু অপেক্ষা করতে বলে নরেন বাবু হাতের বাকি কাজটুকুতে মনোনিবেশ করছিলেন,—এমন সময় দরজায় পাহারারত সিপাই তাঁকে একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়ে গেলো। কার্ডটাতে লেখা ছিল, শ্রীবিহারীলাল, শাখারিটোলা রোড।

নাম-লেখা কার্ডের উপর চোখ বুলিয়ে নরেন বাবু ভেবে নিলেন, নামটা যেন ইতিপূর্ব্বে বহু বার তিনি শুনেছিলেন। অলক্ষ্যে তাঁর মুখ দিয়ে বার হয়ে এলো, 'ওঃ বুঝেছি। আচ্ছা, ঠারনে বলো উনকো।' এর পর তিনি প্রণব বাবুকে উদ্দেশ করে বললেন, 'দেখুন তো প্রণব বাবু, চেনেন এঁকে?' আড়-চোখে কার্ডে-লেখা নামটা দেখে নিয়ে প্রণব বাবু বললেন, 'স্যার, এঁর কথাই ইতিপূর্ব্বে এক দিন আপনাকে বলেছিলাম। ইনি এক জন সাংঘাতিক লোক, সাবধানে কথাবার্ত্তা করবেন এঁর সঙ্গে। বড়সাহেবদের সঙ্গে এঁর খুবই খাতির আছে, পূর্ব্বেকার বড়বাবুর ইনি এক জন বন্ধু ছিলেন। এতো রাত্রে কি মতলবে এসেছেন কে জানে?' 'হুঁ তাই না কি?' ভ্রূকুটী করে নরেন বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'মাঝে মাঝে উনি তাহলে থানায় আসেন বুঝি? ওঁর যাতায়াত এখনও অব্যাহত আছে?' উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, 'আপনি আসার পর উনি এই প্রথম এলেন। তবে জামীন-টামীনের জন্য ওঁর লোকজনেরা প্রায়ই থানায় এসেছে। ওঁর নাম করে পেটি-কেসের জামীন-টামীনও নিয়ে গিয়েছে। ঐ লোকটা যে কি, তা' স্যার, বোঝা শক্তো। সেবারে রেড-ক্রশে বিশ হাজার টাকা তুলে দিলেন, তিনি নিজেও এই তহবিলে দু'হাজার টাকা দিয়েছেন। তবে আমার সন্দেহ, স্যার, যতো টাকা তিনি তুলেছিলেন সরকার বাহাদুরের নাম করে তার সব টাকা তিনি ঐ তহবিলে থোড়াই জমা দিয়েছেন। এই সবই স্যার পুলিশের আর ম্যাজিষ্ট্রেটের বড়কর্ত্তাদের হাতে রাখবার মারপ্যাঁচ আর কি?'

মেছুয়াবাজার থানার ভার গ্রহণ করার পর হতে নরেন বাবু এলাকার চোর-গুণ্ডাদের সঙ্গে বর্ণচোরা ভদ্রলোক দালাল ও বদমায়েসদেরও সন্ধান করে ফিরছিলেন। এদের মধ্যে বহু ধনী ব্যক্তিও ছিলেন, কেহ কেহ চোরাকারবার ও নিষিদ্ধ মাল পাচার করেও ধনী হয়েছেন। এঁদের বাড়ী, গাড়ী, লোক-লস্করেরও অভাব ছিল না। এঁরা সাক্ষাৎ ভাবে অপরাধীদের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকলেও অপরাধীদের অর্থ ও প্রভাব দ্বারা সাহায্য করে তাদের লাভের মালের হিস্যা গ্রহণ করেছেন। বহু অফিসারকে এঁরা এঁদের মোটর-যান ব্যবহার করতে দিয়েছেন এবং তাঁদের বাড়ীতে ও বাগানে মুহুর্মুহু ভোজনের নিমন্ত্রণ করে তাঁরা এঁদের হাত করে নিয়েছেন। এই সকল অফিসাররা এঁদের চাল-চলন হতে এক দিনও এঁদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারেননি, বরং এঁদের প্রকৃত পুলিশ-বন্ধুরূপে বুঝে তাঁরা আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন।

নরেন বাবু এইরূপ যে কয়েক জন ভদ্রলোকের নাম সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তার মধ্যে বিহারী বাবুও ছিলেন এক জন। প্রণব বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে কইতে নরেন বাবুর বিহারী বাবু সম্পর্কে শুনা দুই-একটি পুরাতন কাহিনীও মনে পড়ে গেল। নরেন বাবু তাঁর নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, প্রণব বাবু, আসতে বলুন ওঁকে। যাতে উনি আর কখনও থানায় না আসেন, সেই বন্দোবস্তই করছি। ওই সব চালাকি অন্ততঃ আমার কাছে চলবে না।'

'এই যে স্যার', ঘরে ঢুকে বিহারী বাবু বললেন, 'এলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করতে। এই কাছাকাছিই থাকি আমি।

আপনার প্রিডিসেসাররা আমাকে খু-উব চিনতেন। আমার বাড়ীতেই প্রধান আড্ডা ছিল, হেঁ হেঁ। এই যে প্রণব বাবু! হেঁ হেঁ, আমার কথা এঁকে বলেননি বুঝি এখনো? যখন যা দরকার হবে তা বলবেন আমাকে, এই সাক্ষী-টাক্ষী জোগাড়, জিনিসপত্র, যা কিছু চাইবেন, হেঁ হেঁ। আপনাদের বড়কর্ত্তারাও আমাকে বিলক্ষণ চেনেন, তা আসবেন আমার ওখানে মাঝে-মাঝে। আপনি তো শুনেছি প্রণব বাবুর মতন ড্রিঙ্ক-ট্রিঙ্ক করেন না,—তা দুই-এক গ্লাস লিমনকসই নয় খাবেন, আমার ওখানে সব কিছু বন্দোবস্তই আছে, হেঁ হেঁ।'

এতক্ষণে নরেন বাবুর ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। তিনি কোনওরূপে আত্মদমন করে বসেছিলেন। তিনি মুখের সিগারেটটা সজোরে দেওয়ালের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন, 'হুঁ, আপনার নামই বিহারী বাবু? আপনার নাম আমি বহু বার শুনেছি এবং আমি এ-ও শুনেছি যে, আপনি এক জন এ্যরিসটোক্রেটিক দালাল ছাড়া অন্য কিছুই নন। আপনাদের মত লোকেরাই ভালো ভালো অফিসারদের নানারূপ লোভ দেখিয়ে নষ্ট করে দিয়ে থাকেন। আমি চাই না আমার কোনও অফিসারের সঙ্গে আপনি মেলা-মেশা করেন। ভবিষ্যতে অকারণে আপনি যদি থানায় আসেন, কিংবা কাউকে জামীনে নেবার চেষ্টা করেন, কিংবা কোনও মামলার তদবীর করতে চান তাহলে আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবো।'

এরূপ রূঢ় কথা ভদ্রলোক বোধ হয় বহু দিন কারুর নিকট শোনেননি, রক্ষীমহলে এরূপ ব্যবহার তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল। রুদ্ধ আক্রোশে তিনি নরেন বাবুর দিকে একবার চাইলেন, তার পর ক্রোধান্বিত স্বরে বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, আমি চলেই যাচ্ছি, কিন্তু আপনিও এখানে কতো দিন টেঁকেন তাও দেখবো। আমি আপনার রূপাগাছির মক্কেল নই যে জুলুম করে অতো সহজে রেহাই পাবেন। এখন হতে আমি যে পথে যাবো তা আপনার কল্পনার বাইরে। হাঁ, যাবার আগে একটা সদুপদেশও দিয়ে যাচ্ছি, রূপাগাছির বেশ্যা-পল্লী অঞ্চলে পুলিশী জুলুম একটু কমিয়ে আসুন, তা না হলে আপনার এমন বিপদ ঘটবে যে, আপনার কোন মক্কেলই আপনাকে তখন রক্ষা করতে পারবে না।'

ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বিহারী বাবু থানা-বাড়ী হতে দ্রুত-পদে বার হয়ে এলেন। থানা-বাড়ীর সম্মুখে রাজপথে তাঁর বড়ো বুইক গাড়ীখানা অপেক্ষা করছিল। ড্রাইভার এগিয়ে এসে গাড়ীর দরজা খুলে দিতেই তিনি ভিতরে বসে হুকুম করলেন, 'চালাও সিদা নয়া সড়ক পকড়কে।' তার পর দেহটা পিছনের গদির উপর গড়িয়ে দিয়ে অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন, 'এ্যাঃ, আমাকে তাড়িয়ে দিলে, এতো বড়ো আস্পর্দ্ধা! আমাকে হর্ব্বাট সাহেব, বোমপাস্ সাহেব পর্য্যন্ত খাতির করে চলেছে! এ তো সেদিনকার একটা খোকা ইনেসপেক্টার, তেং তেরি নিকুচি করেছে, দেখে নেবো আমি সব কটাকেই। উঃ! কি অপমান!'

অফিস-ঘরের ভিতর হতে নরেন বাবু এবং প্রণব বাবু শুনতে পেলেন বিহারী বাবুর দামী বুইক গাড়ীখানা মাত্র বার দুই হর্ণ দিয়ে হুস্ হুস্ করে দূরে চলে গেলো। মোটরের আওয়াজ বিলীন হওয়া মাত্র, প্রণব বাবুর লক্ষ্য পড়েছিল অফিস-ঘরের অর্দ্ধমুক্ত দরজার দিকে। প্রণব বাবু সহসা লক্ষ্য করলেন, এক ব্যক্তি দরজার এক পার্শ্বে চুপ করে কান পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রণব বাবু নরেন বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে চেঁচিয়ে উঠলেন—'দেখুন স্যার, ও লোকটা আবার কে? এই কোন্ হ্যায় হুঁয়া পর? এই সিপাহী পাকড় লে আও উনকো ইধার।'

এক জন বে-উর্দ্দী সিপাহী দরজার পার্শ্ব হতে সলজ্জ ভাবে বার হয়ে এসে নরেন বাবুকে সেলাম করে বললো, 'হাম সিপাহী হ্যায় হুজুর।' 'কেয়া? সিপাহী হ্যায়'? ধমকে উঠে নরেন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'উঁহি পর কেয়া করতা থা? যো বাবু চলা গয়া অভি উনকো চিনতা তুম?' উত্তরে স্মিত হাস্যে সিপাহী বললো, 'জরুর হুজুর, এলাকামে রয়নেওয়ালে উ তো এক খানদান শরীফ আদমী হ্যায়।'

সিপাহীর উত্তরে বিরক্ত হয়ে নরেন বাবু প্রণব বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার হে প্রণব বাবু? বদমায়েস লোকটা যে দেখছি তোমাদের থানাশুদ্ধ লোককে মোহিত করে রেখেছে। নাঃ! ধীরে ধীরে বহু সংখ্যক সিপাহীকে এই থানা হতে অন্যান্য থানায় বদলী করে দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে দেখছি। একমাত্র তুমি ছাড়া যে এখানকার আর কাউকেই আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'না স্যার, এখানকার বহু লোক বিহারী বাবুর উপর নানা কারণে চটেও আছে', প্রণব বাবু উত্তর করলেন, 'তারা আমাদের সোৎসাহেই সাহায্য করবে। ওপরয়ালাদের সঙ্গে আলাপ থাকায় লোকটা এতো দিন আমাদের কাউকে কাউকে একেবারেই গ্রাহ্য করতো না, সুবিধে পেলে আমাদের বিরুদ্ধে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নালিশ জানিয়েও এসেছে। সবই দেখতাম স্যার, বুঝতামও স্যার সব, তবে এতো দিন ভয়ে চুপ করেছিলাম। কিন্তু স্যার একটা কথা, এতো শীঘ্র লোকটাকে না চটালেই ভালো হতো। কি জানি স্যার, বুঝতে পারছি না, লোকটার দলে বহু "পোষা চোর-গুণ্ডা" আছে, পয়সাও ওদের যথেষ্ট আছে, একটু সাবধানে থাকবেন স্যার! লোকজন আর পিস্তল না নিয়ে বার হবেন না।' 'হুঁ'—একটু চিন্তিত ভাবে নরেন বাবু উত্তর করলেন, 'একটু ট্যাক্টফুলি প্রোসিড্ করলেই হতো। ভুল হয়ে গেল, যাক্, যা যখন দিয়েছি, তখন ওকে শেষই করবো। ওরা সব সাপের মতো, ওদের ঘা দিয়ে ছাড়তে নেই। এবার থেকে লোকটার বিরুদ্ধে যতো অভিযোগ দায়ের হবে, তা ভয় পেয়ে উড়িয়ে দেবেন না, রীতিমত তা নথিভুক্ত করে তদন্ত সুরু করে দেবেন, বুঝলেন?'

কথায়-বার্ত্তায় ও কাষ-কর্ম্মে প্রায় বারোটা বাজতে চলেছে। প্রণব বাবু এবং নরেন বাবু তাঁদের সলা-পরামর্শ শেষ করে ভাবছিলেন, এইবার গাত্রোত্থান করে ভোজন ও নিদ্রার জন্যে উপরতলায় আপন আপন কোয়াটারে উঠে যাবেন কি না, এমন সময় সম্মুখের বারাণ্ডায় ঠক্ করে একটা ভারি দ্রব্য পতনের আওয়াজ হলো। ঐ পতনের আওয়াজ নরেন বাবুর কানে যাওয়া মাত্র নরেন বাবু অভ্যাস মত চীৎকার করে বললেন, 'এই কোউন লাঠি ফেকা, জলদী পানি পিরাও।'

এক জন সিপাহীর হাত হতে তার ভারি লাঠিটা অসাবধানতা বশতঃ পড়ে যাওয়ায় ঠক্ করে আওয়াজ হয়েছিল। চলতি প্রবাদ মত থানার ভিতর এই ভাবে লাঠি পড়লে নাকি থানায়

আগুন জ্বলে, রক্ষী ও অফিসারদের কপালেও; অর্থাৎ মামলায় মামলায় ঐ দিন কোতোয়ালী ভরে যায় এবং অফিসারদেরও দিন-রাত খেটে-খেটে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হয়। কবে এই কুসংস্কার রক্ষীমহলে প্রথম প্রচলিত হয়েছিল আজ আর তা কেউ বলতে পারে না, কিন্তু প্রত্যেক পুরানো অফিসার গুরুপরম্পরায় এ শিক্ষা করেছেন এবং মনে-প্রাণে বিশ্বাস না করেও তাঁরা তা আজও পর্য্যন্ত মেনে চলেন। কোতোয়ালী সমূহের প্রত্যেক সিপাহীও এই কুসংস্কার এবং 'লাঠির উপর জলসিঞ্চন'রূপ এর প্রতিবেধক সম্বন্ধে সদা সচেতন। এই কারণে সিপাহীটি লজ্জিত হয়ে বলে উঠলো, 'গোস্তাফি মাফ্ কর দিজিয়ে হুজুর, উসমে হাম আভি পানি ডাল দেঙ্গা।' কিন্তু কুসংস্কার সকল সময়ই কুসংস্কাররূপে স্বীকৃত হলেও, এর প্রকোপ সময়-সময় প্রকট হয়ে উঠে অবিশ্বাসীদের চমকিত করে দেয়, ওদের মনে ভয়ের উদ্রেকও করে। একটু পরেই পাশের অফিস-ঘর হতে এক জন মুন্সী বাবু এসে জানালেন, 'স্যার, একটা বড়ো চুরি কেস এসে গিয়েছে, ৫০ হাজার টাকার গহনা ও টাকা চুরি!'

'এঁ্যা', বিব্রত বোধ করে নরেন বাবু বললেন, 'পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের চুরি? কৈ, ফরিয়াদী কৈ?' 'এই যে স্যার', মুন্সী বাবু এক ব্যক্তিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই ব্যক্তি বলছে, বাড়ীর তালা ভেঙে তার সর্ব্বস্ব চুরি হয়েছে।' এর একটু পরেই অফিসের দ্বিতীয় মুন্সী এসে খবর দিলে, 'আরও পাঁচটা চুরি কেসের ফরিয়াদী থানায় এসেছে, এখানে তাদের ডেকে আনবো স্যার?'

নরেন বাবু বিব্রত হয়ে ভাবছিলেন, এতোগুলো মামলা তাঁরা সামলাবেন কি করে! সহসা তাঁর লক্ষ্য পড়লো এক জন বালকের দিকে। বালকটি কাতরাতে কাতরাতে নালিশ জানালো, 'বাবু সাহেব! নয়া সড়ককে আতাথা, পিছুসে এক আদমী ছুরী মারকে ভাগ গয়া।'

এতো রাত্রে এতোগুলি অভিযোগকারীর একত্রে আগমন প্রণব বাবুকেও কম আশ্চর্য্যান্বিত করে নাই, কিন্তু তিনি এতো দিন এই কোতোয়ালীতে বহাল থাকায় প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝে নিতেও তাঁর বাকি থাকেনি। নরেন বাবু পুরাতন বিচক্ষণ ও জবরদস্ত অফিসার হলেও এই থানাতে তিনি নূতন এসেছেন, এখানকার হাল-চাল সম্বন্ধে তিনি একেবারেই ওয়াকিবহাল ছিলেন না। ইসারায় নরেন বাবুকে তাঁর নিজস্ব অফিস-ঘরে সরিয়ে এনে প্রণব বাবু বললেন, 'বুঝতে পারলেন স্যার কিছু? বিহারী বাবুর চাল এইবার সুরু হলো। মনে হচ্ছে, চুরি-কেসের সব কয় জন অভিযোগকারী বিহারী বাবুরই লোক। এঁদের তিনি মিথ্যা মামলার বুক্নী শিখিয়ে থানায় পাঠিয়েছেন। এ ছাড়া তাঁর তাঁবের গুণ্ডাদের দিয়ে নিরীহ পথিকদের ছুরী মারাতেও সুরু করে দিয়েছেন। এর পর এক সপ্তাহ পরে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত পেশ হবে 'নূতন ভারপ্রাপ্ত অফিসার ক্রাইম কন্ট্রোল করতে পারছেন না, তাঁকে এখুনিই সরিয়ে দেওয়া হোক ইত্যাদি লিখে। কিন্তু, ওইখানেই এর শেষ নয়, কপালে বহু নিগ্রহ আছে। আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছি, লোকটার লোকবল ও অর্থবল অসীম।' 'হুঁ' ধীর ভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করে নরেন বাবু বললেন, 'কুছ পরোয়া নেই, আমি এ জন্যে প্রস্তুত। ভুলচুক কিছুটা যখন হয়েই গিয়েছে, তখন তার সম্মুখীনও হতে হবে, শুধু শুধু ডিসেক্শন বা পোষ্টমর্টম্ করে কোনও লাভ নেই। প্রত্যেকটি মামলা আমি নিজে তদন্ত করে প্রমাণ করবো সব কয়টিই মিথ্যা, আমাদের হায়রাণী করবার জন্য দায়ের করা হয়েছে, এবং ঐ ছুরী-মারা মামলার জন্যে দায়ী ঐ বিহারী বাবু স্বয়ং।'

'কিন্তু মুস্কিল হবে স্যার এক জায়গায়', উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, 'ঐ রকম ভূরি ভূরি মিথ্যা মামলার মধ্যে দুই-একটা অনুরূপ সত্য মামলাও আসবে। এই সময় ঐগুলোও মিথ্যা মনে করে আমরা ভালো লোকের উপরও অবিচার করে বসবো, স্নায়ুর যুদ্ধকে আমি বড়ো ভয় করি স্যার! এমনিই তো দিন-রাত খাটা-খাটুনি, তার উপর এই অশান্তি, এই যা। আরও একটা কথা বলে রাখি স্যার, বিহারী বাবু মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করতেও ওস্তাদ, ওঁর গুণমুগ্ধ বহু সাধারণ মানুষও আছে যারা ওঁর জন্যে প্রাণ দিতে পারে, কারণ বাইরে ওঁর কিছুটা উদ্দেশ্যমূলক দান-ধ্যানও আছে।

প্রণব বাবুর বক্তব্য শেষ হলে ধীর-গম্ভীর ভাবে নরেন বাবু মাত্র একটি শব্দ উচ্চারণ করলেন, 'হুঁ!' এবং তার পর একান্ত নির্ভরতার সঙ্গে প্রণব বাবুর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু, আপনাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি তো? এই থানার ভিতরে-বাইরে আমি 'আপনি' ছাড়া আর একটি লোকও খুঁজে পাচ্ছি না, যার সহযোগিতার উপর আমি নির্ভর করতে পারবো।'

উত্তরে প্রণব বাবু ভাসা-ভাসা চোখ তুলে নরেন বাবুর দিকে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত করলেন মাত্র, চোখ দিয়ে তিনি মনের ভাষা ফুটিয়ে তুলেছিলেন। প্রণব বাবুর ঠোঁটের কোণের ক্ষীণ হাসিটুকু লক্ষ্য করে নরেন বাবু ইতিমধ্যেই আশ্বস্ত হয়েছিলেন। এইবার তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে প্রণব বাবুকে বললেন, 'আপনিই একমাত্র ভরসা, এখন ডাকুন দেখি অভিযোগকারীদের একে-একে। ওদের বুঝিয়ে দেবো, আমিও কম শয়তান নই। না হয় দুই-এক রাত্রি জেগেই কাটাবো, আর কি?'

কয়েকটি মামলা বেছে বেছে নিজের ফাইলে রেখে অপর কয়টা সেকেণ্ড অফিসার প্রণব বাবু এবং থানার থার্ড ও ফোর্থ অফিসারদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে নরেন বাবু প্রণব বাবুকে বললেন, 'আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ পরামর্শ আছে, আসুন, এখানে এসে বসুন। এলাকা এবং থানা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করে নরেন বাবু বললেন, 'হুঁ', শান্তিভাঙ্গা বস্তীটা কোন্ রাস্তায় পড়বে?' উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, 'এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়, কিন্তু কেন স্যার?' 'একটা জব্বর খবর পাওয়া গিয়েছে', নরেন বাবু সোৎসাহে জানিয়ে দিলেন, 'ওখানে কাল রাত্রে পুরনো চোরদের হুল্লোড় বসবে। আমরা দু'জনায় একত্রে ঐ বস্তীটা 'কুপ' করে রেইড করবো। এখন আজ রাত্রের মত উঠে পড়া যাক, তুমিও যাও খাওয়া-দাওয়া কর গে।'

প্রণব বাবু এবং নরেন বাবু উপরে উঠে পড়ছিলেন, এমন সময় শিশুপুত্র সহ অফিস-ঘরের দুয়ারে এসে পথ আগলে দাঁড়ালেন এক জন দুঃস্থা নারী। সামান্য মাসিক মাহিনায় চাকুরিয়া এই থানারই জনৈক বাঙালী সিপাহীর তিনি বিবাহিতা স্ত্রী। আজ সকালেই তার স্বামীকে এক গুরুতর অপরাধে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করে চাকুরী হতে তাকে চিরবিদায় দেবার সকল ব্যবস্থা নরেন বাবু সম্পূর্ণ করে

ফেলেছিলেন। ভদ্রমহিলা সারা দিন নরেন বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করে এতো রাত্রে থানায় এসেছেন তাঁর স্বামীর চাকুরীর জন্য ভিক্ষা করতে। মেঝের উপর মাথা ঠুকে কেঁদে পড়ে মহিলাটি নরেন বাবুকে অনুরোধ করে বললেন, 'এই শিশুপুত্রটির মুখের দিকে চেয়ে দেখুন, আপনি তো ওকে সাজা দিচ্ছেন না, আপনি সাজা দিচ্ছেন আমাদের।'

এরূপ অবস্থায় মানুষ মাত্রেরই দয়ার উদ্রেক হয়। পুলিশ অফিসার হলেও প্রণব বাবুও এক জন মানুষ। মহিলাটির কাতর আবেদনে দয়ার্দ্র হয়ে প্রণব বাবু নরেন বাবুর দিকে চোখ ফেরালেন। কিন্তু নরেন বাবু ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তিনি অমানুষ হয় তো নন, কিন্তু তিনি অতিমানুষ। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই উভয় প্রকৃতির মানুষই বিপজ্জনক। মাথা নেড়ে নরেন বাবু জানিয়ে দিলেন, 'উহুঁ', মাপ করবেন। এখানে আছি শাসন-কার্য্যের জন্যে। দয়াধর্ম্মের জন্যে নয়। মিছামিছি আমাদের সময় নষ্ট করবেন না।'

সম্মুখের অফিস-ঘরে কয় জন মুন্সী বাবু থানার সেরেস্তার কাম-কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। এঁদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে মহিলাটি বললেন, 'এঁদের জিজ্ঞেস করুন। এঁরা সকলেই আমার ঘরের অবস্থা জানেন। এই শহরে আমাদের কোনও আত্মীয়-স্বজনও নেই যাদের দুয়ারে গিয়ে এক রাত্রির জন্যও আমি দাঁড়াতে পারি।' নরেন বাবুর ক্রমশঃই ধৈর্য্যচ্যুতি হয়ে আসছিল, কর্ম্মরত মুন্সী বাবুদের ধমক দিয়ে তিনি বললেন, 'কে এঁকে আমার কাছে আসতে বলেছে, তোমাদের সব চালাকি আমি বুঝি। শেষ বারের মত সকলকে সাবধান করে দিচ্ছি। আরও দুই-এক জনকে সাবড়াবো আমি। ওঁকে অনাথ আশ্রমে যেতে বলো।'

গজরাতে গজরাতে প্রণব বাবুকে নিয়ে নরেন বাবু উপরে উঠে গেলে, মুন্সী তারক বাবু তার সহকর্ম্মীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আচ্ছা আপদ তো! একেবারে জ্বালিয়ে খেলে। নিশ্বাস ফেলবারও উপায় নেই। এলাকা-শুদ্ধ লোকের ভাত-ভিত্তি তো বন্ধ, মরেও না লোকটা। যেখানে যায় সেইখানে জ্বালায়।'

'কিছু ভাববেন না তারক বাবু', উত্তরে সহকারী মুন্সী বাবু নরেন বোস বললো, 'বেশী দিন এখানে টেঁকতে হচ্ছে না, দেখলেন না খোদ বিহারী বাবুর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করলো? আজ পর্য্যন্ত তো দেখলাম না, কোনও থানাদার বিহারী বাবুর সঙ্গে বিবাদ করে এই থানায় টিকতে পেরেছে। দুই-এক দিনের মধ্যেই বাছাধনকে ত্রাহি ত্রাহি করে এই থানা ছেড়ে দৌড় দিতে হবে।'

প্রকাণ্ড একটা বস্তীগ্রাম।

যত দূর দেখা যায়, শুধু মাটির ঘর আর নীচু ছাউনি, ছেঁচা বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট উঠান। এখানে-ওখানে পাতলা আঁকা-বাঁকা পথ প্রায় প্রত্যেক বাড়ীটি পরিক্রমণ করে এধার-ওধার চলে গিয়েছে। দুই ধারের বাড়ীগুলির চালের নীচু ছাউনি রাস্তার উপরটা প্রায় ঢেকে দিয়েছে, তাই দিনের আলোতেও এখানে লোকে লম্প নিয়ে যাতায়াত করে। শহরের ভিতরও যে এমন স্থান আছে তা সভ্য মানুষের ধারণারও বাইরে।

এই বস্তীগ্রামের মধ্যস্থলে খালি কুঠির একটা কামরায় এই দিন পুরানো চোরদের হুল্লোড় চলছিল। এ অঞ্চলের নাম-করা তাঁলাতোড় কিষনিয়া দলবল সহ পূর্ব্ব রাত্রে বড়বাজারের এক প্রতিষ্ঠ জহুরীর দোকানে সিঁদ কেটে ত্রিশ হাজার টাকার একটা ভালো কাম করেছে, তাই আজকের এই আনন্দোৎসবের আয়োজন। একে একে সাঙ্গোপাঙ্গ প্রায় সকলেই এসে গিয়েছে—রুকমনিয়া ছুমনিয়া মদনিয়া এবং আরও অনেকে। মাটির দেওয়ালে পাঁকাটার সাহায্যে কয়েকটি সিনেমা-স্টার ছবিও টাঙানো ছিল। একটি ছবির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মদনিয়া বলে উঠলো, 'মাইরী মাইরী, মেয়েটা যদি জ্যান্ত হতো। কি রকম প্যাটপ্যাট করে চেয়ে আছে দেখ।'

ছেঁড়া চাটাইএর উপর থেবড়ে বসে একটা দেশী মদের পাঁইটের ছিপি খুলতে খুলতে কিষনিয়া বলে উঠলো, 'এই-ই, খবরদার ও হচ্ছে আমার মেয়েমানুষ। ওদিকে নজর দিবি না।' মাটির ভাঁড়ে মদটুকু ঢেলে ফেলে ঢক-ঢক করে সেটুকু নিঃশেষে পান করে কিষনিয়া হুকুম করলো, 'এই-ই, আয় নেমে আয়, শীগ্‌গির নেমে আয়।'

টলতে টলতে কিষনিয়া ছবিটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। মদনিয়া এইবার বোতলটা কিষনিয়ার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বোতলের মুখটা মুখের মধ্যে পূরে তরল পদার্থের বাকিটুকু গলাধঃকরণ করে উত্তর দিল, 'এই-ই, কি বাজে-বাজে বকছিস কাগচের বিবির সঙ্গে! ঐ দেখ, আসলি চিজ এরা সব এইচে গেছে, মাইরী, অ-ঐ দেখ।' মদনিয়ার কথায় পিছন ফিরে কিষনিয়া দেখলো প্রায় সাত-আট জন বিভিন্ন বয়সের বারবনিতার সঙ্গে মেয়ে-যোগাড় করার দালাল চিটলভাই কানু ঘরে ঢুকছে।

এই মেয়েদের দলের মধ্যে পাতলা শীর্ণকায়া যোড়শীদের সহিত মোটা কালো ধুমসো চেহারার প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকেরাও আছে। রাত্রের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে বিভিন্ন বস্তী হতে তারা পুরানো চোরদের এই মহা হুল্লোড়ে যোগ দিতে এসেছে।

কিষনিয়া কিন্তু তখন উন্মত্ত মাতাল, মদেতে না হলেও মনেতে। মাতাল আজ তাকে হতেই হবে। কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করে কিষনিয়া ছুটে এসে সিনেমা-স্টার ছবিটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মনের আবেগে দাঁতের ঘায়ে এবং নখের আঁচড়ে ছবিটার মুখ ও গলা সে ক্ষত-বিক্ষত করে দিল। কিষনিয়ার এই আচরণ অপরাধী সমাজে কোনও এক নূতন জিনিষ নয়। সমাগত পুরুষরা তাদের খসখসে কালো মলিন উরুতের উপর চাপড় দিতে দিতে দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ শুরু কোরলো, 'কেয়া বাৎ, কেয়া বাৎ, মাবে-এ খেল, ভেলে লেগে যা, আরে হায় হায়।'

পুং-রাক্ষসদের এই খুশ-মেজাজ ও তারিফের সমর্থন করে সমাগত রাক্ষসীরা এ ওর গায়ের উপর ঢলে পড়ে হো-হো করে অট্টহাসি হেসে উঠলো, কেউ কেউ আবার খিল-খিল করে চাপা হাসিও হেসে নিলো। এই সব স্ত্রীলোকদের এক জন বর্ষীয়সী নারীর সঙ্গে কিষনিয়ার পূর্ব্ব হতেই সদ্ভাব ছিল। একমাত্র সেই সক্রোধে প্রতিবাদ জানিয়ে বলে উঠলো, 'মুখপোড়া মিনসে, রকম দেখে বাঁচি না!' এই স্ত্রীলোকটার নাম ছিল বামি বেওয়া। এরূপ দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির স্ত্রীলোক এ অঞ্চলে কমই দেখা যায়। কিন্তু তার চেয়েও দুর্দ্ধর্ষ ছিল এই কিষনিয়া, তা না হলে এক নাগাড়ে দু'বছর পর্য্যন্ত তারা একসঙ্গে বাস করতে পারত না। [ক্রমশঃ।

তিলোত্তমাসম্ভবম্

পুলকেশ দে-সরকার

আফগান পাহাড়ের মাথায় নিরাকার হিম-নীহারিকা থেকে অবতীর্ণা সৌন্দর্যের তিলোত্তমা ক'লকাতার ভীড়ে হারিয়ে গেছে। শ্রীলক্ষ্মীর আবিষ্কারে অক্টোপাসের হাত ছাড়িয়ে নিখিল বিশ্ব মন্থন সুরু করেছে কলম্বসের সন্তানেরা। লাটসাহেবের পাঁচ গজ দূর থেকে, হাজার লোকের সারাজঙ্গল তাড়িয়ে আনা বাঘ-শিকারের মতো অবশেষে বায়ুমণ্ডলবিদারী ম্যাসাচুসেটস ভবনের নীচের তলায় শীততাপ নিয়মিত দুই শত বর্গ-ফুটের প্রখ্যাত নাচঘরে মায়াজাল পড়ল সুন্দরীশ্রেষ্ঠা স্বর্ণমৃগীর বন্ধন-প্রত্যাশায়।

নির্বোধ লোকসমাজের বহু ঊর্ধ্বস্তরীভূত হর্ম্যলোক কাল-বৈশাখীর দুরন্ত বাত্যায় আন্দোলিত হ'য়ে উঠেছে।

দেবী-আবাহনে স্বতোৎসারিত নানা উপাচার নৈবেদ্যের চূড়ার মতো হয়েছে পর্বতপ্রমাণ। চীনা-সংস্কৃতিকে লজ্জা দিয়ে যুগল পদারবিন্দ বন্দনায় পাটা কোম্পানী দিয়েছে জলশীততাপ-নিরোধী সু, সঙ্কো লিমিটেড এনেছে উজ্জ্বল চীনাংশুকের রামধনু মোজা, কামস্কাট্কা রেয়োঁ দিয়েছে কচি কলাপাতা রঙের নগ্নিকা শাড়ী, স্যার গ্যালাহাডের পৃষ্ঠপোষিত কুটিরশিল্পপ্রসূতির পয়োধরা-প্রদর্শনী বক্ষাবরণ; এসেছে সর্বঋতুজয়ী গার্‌ষ্টিনের প্রসাধনী কস্তুরী সাবান, ইউনিভার্সাল কসমেটিক্সের ওষ্ঠাধর-রঞ্জনী, ডাইহার্ড এণ্ড ডাইহার্ডের দুর্জয় গিরিশৃঙ্গ থেকে বিমানে সমাহৃতা সুবাসী স্নো, রোজ এণ্ড রুজ ব্রাদার্সের কপোল-লাঞ্ছনার লালিমা, আর সিনথেটিক ড্রাগ হাউসের কৃষ্ণকুন্তলদামে রসসঞ্চারী হেয়ার লোসন। গোলকুণ্ডা, গোলকোষ্ঠ আর সমুদ্রগর্ভ থেকে অপ্রাকৃতিক আঘাতে উদ্গীর্ণ সহস্র প্যাটার্ণের হীরাসোনা-মণিমুক্তার আভরণ; কানে গলায়, কব্জিতে, তাগায় তা দুল্‌বে, জড়াবে, ঝল্‌সাবে আর বাঁধ্‌বে।

ইণ্ডো-আমেরিকান্ এজেন্সীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর স্যার ভি ভেল্লোডি চারদিকে অভূতপূর্ব সমর্থনের অভিনন্দনপত্রগুলি পড়ে অভিভূত হ'য়ে পড়লেন এবং আত্মতৃপ্তিতে মোটা চশমাটা টেবিলের ওপর রেখে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। খাস মার্কিণ সাহেবের মুসলমান ওস্তাদ দিয়ে কাটানো পাতলুনের পকেট থেকে নরম ঘিয়ে রঙের চার ভাঁজ করা রুমাল আলতো ভাবে ঘাড়ে গলায় মুখে ঘুরিয়ে নিতেই মনে পড়ে গেল। আজ এক মাস এই আয়োজন চল্‌ছে। এক মাস ধরে সব ক'টা রোজকার খবরের কাগজে তিনি আফগান পাহাড়ের নিরাকার হিম-নীহারিকা থেকে অবতীর্ণা সৌন্দর্যের তিলোত্তমা সন্ধানের সংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন, এক মাস ধরে সচিত্র পাটা কোম্পানীর উপানৎ, সঙ্কো লিমিটেডের উজ্জ্বল চীনাংশুকের রামধনু মোজা, কামস্কাট্কা রেয়োঁর কচি কলাপাতা রঙের নগ্নিকা শাড়ী, স্যার গ্যালাহাডের পয়োধরা-প্রদর্শনী বক্ষাবরণ, সর্বঋতুজয়ী গার্‌ষ্টিনের কস্তুরী সাবান, ইউনিভার্সাল কসমেটিক্সের ওষ্ঠাধর-রঞ্জনী, ডাইহার্ড এণ্ড ডাইহার্ডের দুর্জয় গিরিশৃঙ্গ থেকে সমাহৃতা স্নো, রোজ এণ্ড রুজ ব্রাদার্সের কপোল-লাঞ্ছনার লালিমা, সিনথেটিক ড্রাগ হাউসের কৃষ্ণকুন্তলদামে রসসঞ্চারী হেয়ার লোসন দুই-তিন কলামে সাজিয়ে বিজ্ঞাপিত করেছেন সারা দেশের সমস্ত সংবাদপত্রে, অবশেষে কাজু বাদাম ও আলু ভাজার ডিস্ এগিয়ে দিয়ে সাংবাদিকগণকে আপ্যায়িত করেছেন। তিলোত্তমা সন্ধানের ঢাক ঢোল তাঁরই টেবিলে লাগানো বিজলী বোতামের চাপে বেজে উঠেছে। সারা ক'লকাতার ঊর্ধ্বস্তরীভূত হর্ম্যলোকে হাই ব্লাডপ্রেসারের হৃৎস্পন্দন জাগালেন ইণ্ডো-আমেরিকান্ এজেন্সীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর স্যার ভি ভেল্লোডি।

আজ সেই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হবে রাত্রি ১১টায় বায়ুমণ্ডলবিদারী ম্যাসাচুসেট্‌স ভবনের নীচের তলায় দুই শত বর্গ-ফুটের প্রখ্যাত নাচঘরে—যখন সকল উৎকণ্ঠিত প্রত্যাশাকে রূপ দিয়ে ধরা দেবে ক'লকাতার ভীড়ে হারিয়ে যাওয়া সুন্দরীশ্রেষ্ঠা তিলোত্তমা।

চার ভাঁজ করা নরম ঘিয়ে রঙের রুমাল মুখে গলায় ঘাড়ে আল্‌তো ভাবে বার পাঁচেক রগড়িয়ে আন্‌তেই অকস্মাৎ আবার যেন মনে পড়ে গেল। টেবিলের বাঁ পাশে লাগানো বিজলী-বোতাম টিপ্‌তেই চার সেকেণ্ডের মধ্যে এসে দাঁড়াল উর্দিপরা বেয়ারার শ্রীবশম্বদ দাস। স্যার ভেল্লোডি সাম্‌নে থেকে পার্কার, ওয়াটারম্যান, শেফহার্ডের কলম তিনটি একে-একে তুলে নিতে-নিতে আবেগহীন কণ্ঠে বল্‌লেন, সোফার। বলেই উঠ্‌লেন। মানিব্যাগ ঠিক আছে কিনা দেখ্‌লেন। পত্রগুলি আর একবার চোখ বুলোলেন। তার পর না দেখে বেয়ারারের দিকে একটা ষাইশ এগিয়ে দিলেন। বেরিয়ে গেলেন।

সোফার গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিয়ে একটু দূরে রাস্তার ওধারে স্থির ক'রে রাখ্‌ল, তার পর একটি বিড়ি বের ক'রে ঘুমের আমেজ আনার ভঙ্গিতে হাত-পা ছড়িয়ে দিল। ফস্ করে মুখের কাছে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল, তার পর একরাশ ধোঁয়া, তার পর ধোঁয়া-কুণ্ডলী।

স্যার ভেল্লোডি লিফ্‌টে উঠে এলেন। ৭ নং ফ্ল্যাটে—কম্‌সেকম ৩৬টি ফ্ল্যাট আছে যে পাকা-বাড়ীর, তার ৭ নং ফ্ল্যাটে। দরজার পাশে ঠিক জায়গাটিতে হাত পড়তে ভেতর থেকে দরজা খুলে গেল; একখানি মুখ বিস্ময়ে-আতঙ্কে বলে উঠল, ওঃ আপনি!

স্যার ভেল্লোডি জবাব দিলেন না। দরজা আরও খানিকটা খুলে গেল। ঢুক্‌লেন। প্রথম ছোট্ট ঘরটা পেরিয়ে দ্বিতীয় প্রশস্ততর ঘরটায় ঢুক্‌লেন। ইজিচেয়ারটা পাশে রেখে বড় সোফায় বসলেন, সোজা হ'য়ে বসলেন, গা এলিয়ে দিলেন না। অনুগতা সেই মুখখানির দিকে না তাকিয়ে বললেন, ব'সো। তার পর মিনিট খানেক আর কিছু বল্‌লেন না।

সিগারেট শেষ হয়েছে, প্লাষ্টিকের একেবারে নূতন ডিজাইনের আধার বের করলেন, সস্নেহে বাঁ হাতে একটি তুলে নিলেন, নির্লিপ্ত ভাবে মুখের সিগারেট জল-দেয়া ভস্মাধারে চেপে ধরলেন, ততোধিক নির্লিপ্ত ভাবে বাঁ হাতের সিগারেট ওষ্ঠাধরে রাখলেন, মুখের কাছে আগুন জ্বল্‌ল, তার পর এক রাশ ধোঁয়া, তার পর ধোঁয়া-কুণ্ডলী।

শ্রীলতা!

বলুন।

ভস্মাধারে সিগারেট টোকা মেরে ভেল্লোডি বল্‌লেন, তুমি আমার আবিষ্কার, এ কথা মানো?

শ্রীলতা মাথা নীচু ক'রে বলল, শত লোকের ভদ্রবস্তির কথা মনে করলে আজও শিউরে উঠি।

আমারই কথার প্রতিধ্বনি। শ্রীকান্তকে মনে পড়ে?

আপনি মনে না করিয়ে দিলে মনে পড়ে না।

তোমার বিয়ে-করা স্বামী শ্রীকান্ত। কোথায় আছে জানো?

আপনি না বললে কোন ঔৎসুক্য নেই।

তোমার ছেলেটি থাকলে আজ কত বছরের হ'ত?···বলতে পারবে না তো তুমি? ও এক দুঃস্বপ্ন মাত্র। কেটে গেছে।··· ভগবানের ইচ্ছে তুমি বিশ্ববন্দিতা হবে, তাই তো তুমি আমার আবিষ্কার। শ্রীলতা!

বলুন।

আজকের দিনটা জান?

বলেছিলেন, আজ আমার মহা পরীক্ষা।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ তুমি। আজ তোমার মাথায় পড়বে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা তিলোত্তমার মুকুট! এক মাস ধরে আয়োজন করেছি। এর মানে জানো?

আজ্ঞে না।

নদীর স্রোত দেখেছো কখনো? গ্রামের মেয়ে—দেখেছো বৈ কি। ও হ'চ্ছে জলের স্রোত, জলকণা মাত্র। ও যদি টাকার স্রোত হ'ত?

আমি ভাবতে পারি নে।

সকল ভাবনা আমার। এক মাস ভেবেছি। এক মাস কাজ করেছি। তিলোত্তমার যাচাইয়ে নিয়োগ করেছি সাত জন বিচারক। আমি—আমি তাদের রাজী করিয়েছি। এক মাস ধরে মন্থন চলেছে। শ্রীলক্ষ্মী উঠবেন! শ্রীলক্ষ্মীর হাতের কব্জিতে থাকবে পয়েলা নম্বরের ইঙ্গিত। শ্রীলতা হবে সেই শ্রীলক্ষ্মী।

আমি?

তুমি, শ্রীলতা, আমার আবিষ্কার! বিচারকেরা তা জানে। হাতের কব্জিতে থাকবে ইঙ্গিত, এক নম্বর। বনেদী ঘরের, ভদ্র ঘরের, অভদ্র ঘরের, হাসপাতালের, সেলুনের, ক্লিনিকের, হ্যাঁ, আরও পাঁচ জায়গার সুন্দরীরা থাকবে পর-পর নম্বর দেয়া। বিচারকেরা বিচার করবেন। ভাল কথা, তোমার নাচ-শেখা শেষ হয়েছে?

আপনি তো দেখলেন না এক দিনও?

শ্রীলতা, আমি যে ওস্তাদদের কাজে লাগাই, তাদের কাজ দেখতে হয় না। আর, জলতরঙ্গের সঙ্গে তোমার কণ্ঠ-সাধনা?

শোনাবো?

চলি! প্রস্তুত হ'য়ে থেকো। হ্যাঁ, মতিবাঈকে তুমি দেখেছো কখনো?

অদ্ভুত সুন্দরী!

পঞ্চমা, পঞ্চমা সে। যে প্রথমা সে আমার আবিষ্কার।

স্যার ভেল্লোডির গাড়ী এই পথ বরাবর ছুটে গেল।

'মিস্ বেঙ্গল', যিনি 'মিস্ ইণ্ডিয়া' নামটিও জয়লাভ করলেন, সেই ইন্দ্রাণী রহমান। সদাহাস্যময়ী ইন্দ্রাণীকে নর্ত্তকীরূপে দেখবার ভাগ্য হয়তো এখনও পর্যন্ত কেউ লাভ করেননি। কিন্তু ইন্দ্রাণীর নাচ আমরা দেখেছি কলিকাতা রাজভবনে শিল্পী সুভো ঠাকুরের একক প্রদর্শনীর উদ্বোধন দিনে। চিত্রটি বাঁকুড়ার শ্রীআশারাম চট্টোপাধ্যায় গৃহীত।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা থেকে লোক দাঁড়িয়ে গেছে ম্যাসাচুসেট্‌স ভবনের নীচের তলায় মায়াজালের আশে-পাশে। গাড়ী-চলাচল বন্ধ হবার উপক্রম; ক্রসবেল্টের ট্রাফিক পুলিশ ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। তবু ভীড় বাড়ে। সংবাদপত্র কত লোক পড়ে? কত লোক পড়ে জেনেছে আজ তিলোত্তমার আবিষ্কার হবে রাত্রি ১১টায়, হয়তো সে মায়াজালে পড়বে এই পথেই—এই সদর দরজার পথে? কত লোকে শুনে জেনেছে স্বর্ণমৃগীর সম্ভাব্য আগমনবার্তা? কত লোক ভীড় দেখে দাঁড়িয়েছে সমুদ্রমন্থনে শ্রীলক্ষ্মীর অভ্যুত্থান প্রত্যক্ষ করবে বলে?

চোখ ঝলসে-যাওয়া আলো ঠিকরে পড়ছে ম্যাসাচুসেট্‌স ভবনের কাচের প্রাচীর থেকে—সূর্য্যের আলো, পশ্চিমে হেলে-পড়া শেষ কটাক্ষ-রশ্মি। আলো সোজা পথে চলে; সোজা পথে মস্ত মাঠ পার হ'য়ে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সোজা ঠিকরে পড়েছে ম্যাসাচুসেটস ভবনের সার্শীতে। ক্রশবেল্ট-আঁটা বুক-চেতানো ট্রাফিক পুলিশের ব্যস্ত বিচরণের চার দিকে লোক দাঁড়িয়ে আছে।

সদর কবাট খোলা, প্রবেশ নিষেধ লেখা নেই; তবু বাইরে থেকে সন্ত্রস্ত উঁকি মারার সাহস নেই তাদের যাদের নাম জনসাধারণ।

শ্রীমতী ভারতবর্ষ ইন্দ্রাণী

অন্য কোন নাম নেই এদের, আর কোন পরিচয় নেই এদের। ফুটপাথে যারা সংসার পেতে বসেছে এরা তাদের কেউ নয়, ঝাঁকা মাথায় যারা বাজারে বাবুর পেছনে ঘোরে এরা তাদের কেউ নয় বা পাটের কেঁসোয় যারা কলের মজুরী করে এরা তাদেরও কেউ নয়; এরা রসিক, সচেতন, সতৃষ্ণ কৌতূহলী জনসাধারণ; কাগজ পড়ে নয় তো শোনে, রকে বসে নয় তো সওদাগরী অফিসের চেয়ারে, মাঠে দূর থেকে খেলা দেখে নয় তো ট্রামে টিকিট না কেটে চেঁচিয়ে খেলার সমালোচনা করে, রেশনের দোকানে কিউয়ে দাঁড়িয়ে উজীর-নাজির মারে, নয় তো সিনেমায় অবেলায় কিউ দিয়ে দাঁড়ায়, বৌকে আদর করতে গিয়ে মারে; নয় তো বিড়ি ফুঁকতে-ফুঁকতে পাশের বাড়ীর সবে-শাড়ী-পরা মেয়ের দিকে সলোল দৃষ্টিবাণ ছাড়ে, আর ক্রশবেল্ট আঁটা বুক-চেতানো ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে খেজুরে আলাপ করে, নয় তো গুঁতো খেয়ে খুসীতে সারা শরীর দুলিয়ে ছুটে পালায়, আবার ফিরে আসে। এরা জানে, ম্যাসাচুসেট্স ভবনে চওড়া সার্শীর কবাট যত দরাজ করেই খোলা থাকুক অথবা ধাতুর অক্ষরে অক্ষয় ইংরাজী স্বাগতম্ লেখাই থাকুক—ওখানে জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ। ওতে ঢুকতে নির্দিষ্ট রকমের চেহারা চাই, নির্দিষ্ট পরিমাণের বড়োয়ানার স্বর্ণদণ্ড চাই, চাই নির্দিষ্ট ষ্টাইল। ক্রশবেল্ট-আঁটা বুক-চেতানো ট্রাফিক পুলিশের আশে-পাশে এ কথা জনসাধারণ জানে। জানে, যারা মোটর করে আসবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে ট্রাফিক পুলিশ আর ড্রাইভারকে বলবে রাস্তার ওধারে গাড়ী দাঁড় করিয়ে রাখতে।

জনসাধারণ থেকে অকস্মাৎ উর্ধ্বস্তরীভূত মিসেস্ মৃধা মুখার্জি আয়নার স্বচ্ছ পরিবেশ ছেড়ে কিছুতেই নড়তে পারছেন না। স্বামী নিশীথ রাতের অন্ধ-তমসায় তিন দিন একই কথা উচ্চারণ করেছেন: মৃ. রাস্তায় অগণিত লোকের সাক্ষাৎ মেলে, সাক্ষাৎ মেলে না তোমার, তোমার সৌন্দর্যের। অপরূপা তুমি। অকস্মাৎ উর্ধ্বস্তরীভূত মিসেস্ মুখার্জি সলজ্জ খুসীতে স্বামীর কথা রাত্রির দৌর্বল্য মনে ক'রে মনের কোণেই সঞ্চিত রাখতেন। বাড়ীর ঝি গঙ্গার মা কিন্তু বাড়িয়ে তুলল ভয়ানক। এমনটি আর হয় না গো মা, এত বাড়ী কাজ করু, ও মা, তুমি যেন মা সগ্গ থেকে উব্বশী নেমে এয়েছো! সাহঙ্কার খুসীতে মিসেস্ মুখার্জি একেও দাসীর তোষামোদ গণ্য করে 'তাকে' তুলে রেখেছিলেন। কিন্তু গোলমাল বাধালো তিলোত্তমা-আবিষ্কারে আত্মনিযুক্ত মিঃ মুখার্জির সামাজিক অনুষ্ঠানে অতিমাত্রায় প্রগতিশীল বান্ধবেরা; তারা বেশীর ভাগ মৃধা মুখার্জির দিকে তাকিয়ে ক্ষণিক মিঃ মুখার্জির দিকে তাকিয়ে পুনঃ পুনঃ এই কথা বলেছেন যে, ডানাকাটা পরী সত্যিই যে মর্ত্তে নামতে পারে মিঃ মুখার্জির সৌভাগ্য না দেখলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন না। লাকী চ্যাপ!

সগ্গের পরী মৃধা মুখার্জি আয়না থেকে মুখ সরাতে পারেন না। আজ তিলোত্তমার আবিষ্কার হবে তাঁর মধ্যে স্বামীর সামান্য অসম্মতিতে তাই ঠিক হয়েছে, বান্ধবদের উগ্র আগ্রহ। কিন্তু তাদের আগ্রহকেও উত্তীর্ণ করে গেছেন আজ অকস্মাৎ উর্ধ্বস্তরীভূত মৃধা মুখার্জি স্বয়ং। আয়না থেকে মুখ সরাতে পারেন না তিনি; এত সুন্দর, এত সুন্দর তিনি, বিশ্বের সৌন্দর্যকণা তিল-তিল জড় করেই কি হয়েছেন মৃধা? প্রসাধনের গন্ধমাদন আজ তাঁর টেবিলে, এই থেকে বিশল্যকরণী আহৃত তো হবেই, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় আসবে থিয়েট্রিকালসের অঙ্গ-সজ্জাকর নূর মহম্মদ। শেষ পাকা প্রসাধনের স্পর্শ দেবে সে, তার পর···তার পর···

কেশসজ্জা-বিশেষজ্ঞা মিসেস্ মরগ্যানথিউর কারবার আজ বন্ধ; রুদ্ধ ঘরের আড়ালে আজ জগৎ তোলপাড়। তার মেয়ে মিস্ মেরী হবে তিলোত্তমা—ম্যাসাচুসেট্স ভবনের নীচতলায় নাচঘরের মায়া-জালে। পাঁচ বছর আগে মেরীর দেহে একবার বসন্তের ছোঁয়া লেগেছিল, তার আবির ধুয়ে-মুছে গেছে, মুখমণ্ডলে রয়েছে নাতি-গভীর শুষ্ক ক্ষতচিহ্ন; তার পর মনোদুঃখে মিঃ মার্কিণ ইয়াঙ্কের সঙ্গে কিছু দিন রেঁদেভ্যুতে মেতে ছিল মনের কোকিলকে উপেক্ষা করতে পারেনি ব'লে; কিন্তু স্বদেশের ডাকে ইয়াঙ্ক যখন বিদেশের দয়িতাকে ফেলে গেল, তখন কেশসজ্জা-বিশেষজ্ঞা মা মিসেস্ মরগ্যানথিউ দিলেন আশ্রয়। বসন্তের ক্ষতচিহ্নে পুডিংয়ের পূর্ণতা দিয়ে মুখশ্রীর পরিবর্তন যাই হোক, কেশসজ্জা নিয়ে একের পর এক পরীক্ষা চল্‌ছে অবিরাম—চাই সেই কেশসজ্জা যা একমাত্র ত্রিভুবনমনলোভা তিলোত্তমাকেই মানায়। আজ কারবার বন্ধ, আজ অন্তরালে তোলপাড়।

তোলপাড় আজ নির্বোধ লোকসমাজের বহু উর্ধ্বস্তরীভূত হর্ম্যলোক। সৌন্দর্য-সচেতন বেম্‌ব্রিজ-পাশ মেয়ে মায়া মঙ্গলম্, পাশের বাড়ীর অনিবার্য দৃষ্টিকে সজোরে জানালা বন্ধ করে বার বার অপমান করেন যে মায়া মঙ্গলম্, সৌন্দর্যের জোরে সনাতনীর ঘরে পড়ে হাতাবেড়ি-খুন্তীসার সেই মায়া মঙ্গলম্ রান্নাঘরের তোলা-জলে নিজের চেহারার প্রতিবিম্বে অশ্রু বিসর্জন করছেন। স্বামী তাঁকে না হতে দেবেন তিলোত্তমা, না দেবেন দেখতে কে হবে তিলোত্তমা। মেমেরা পর্যন্ত তাঁর আনইউজুয়াল বিউটীর তারিফ করেছে, বলেছে মোঙ্গলয়েড কার্ভ বা থাকলে·········সেই মায়া মঙ্গলম্ অশ্রু বিসর্জন করছেন রান্নাঘরে তোলা-জলের প্রতিবিম্বে। আজ তোলা-জল সমুদ্র হবে।

সমুদ্র গণ্ডূষে পান করবে আজ জহ্নু মুনিরা ম্যাসাচুসেট্স ভবনের নীচতলায় দুই শত বর্গ ফুটের নাচঘরে। তিলোত্তমা আবাহন হবে ইতালীয়ান্‌দের জাজ বাজনা আর বলনৃত্যের ঐক্যতানে। ঠিক হয়ে গেছে কর্মসূচী। নির্দিষ্ট কালো বো কণ্ঠে সেঁটে সাদা সাদা-নয় হাওয়াইয়ান সার্ট আর কালো পান্তালুন পরে যাত্রাগানের ছোকরাদের ঘাঘরা-পরা নাচ নয়, কলেজী-মেয়েদের বন-মহোৎসব নৃত্য নয়, এ নৃত্য···কিন্তু সে আরম্ভ হবে আটটায়, সাড়ে আটটায়, চলবে দশটা, সাড়ে দশটা। হবে খানাপিনা, ছাপা মেনু টেবিলে বেঁটে দেয়া থাকবে আগেই কাঁটা-চামচ-প্লেটের পাশে। রাত আটটা থেকে সুরু। গণ্ডূষে সমুদ্র পান করবেন জহ্নু মুনিরা।

জনসাধারণের কৌতূহলের অবধি নেই। সাংবাদিকেরা এলেন। সাড়ে সাতটা থেকে আসতে লাগলেন। সাড়ে দশটায় তিলোত্তমার আবিষ্কার। কিন্তু এলেন ওঁরা আগেই সাড়ে সাতটায়। কিছু না ফস্‌কে যায়। ওঁরা এলেন যাঁর যাঁর কোম্পানীর গাড়ীতে, যে গাড়ীগুলো একেবারে ভেঙে না পড়ে টিকে আছে, নয় তো সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড মিলিটারী জীপে, মোটরে চড়ার মর্যাদা যতটুকু আয়ত্ত করা যায় কোম্পানীর ড্রাইভারের সৌজন্যে। কর্তব্যের খাতিরে ওঁদের আসা, যাঁর যেমন সাধ্যায়ত্ত

পোষাক; একটু উঁচু চেয়ারের যাঁরা তাঁরা হরলালকার সেলে-কেনা স্যুটে, নীচু চেয়ারের যাঁরা তারা সপ্তাহে-একদিন-পাণ্টানো ধুতি-পাঞ্জাবীতে একটু আগেভাগেই এলেন আর গাড়ীবারান্দা থেকে করিডর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে যাঁদের এখানে অবাধগতিতে আসা সম্ভব তাঁদেরকে শ্লেষহিংসার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। এঁদের অনেককে এঁরা বারে বারে এই ধরণের অনুষ্ঠানে দেখেছেন, নানা ভূমিকায় দেখেছেন, নানা রূপে দেখেছেন, মুখস্থ হ'য়ে গেছে এঁদের চেহারাগুলো, কণ্ঠস্থ হ'য়ে গেছে এঁদের কথাগুলো, নয়ন-যুগলে গেঁথে গেছে এঁদের আচরণগুলো—এরা আকাশচারী প্রজাপতি আর মধুপের দল।

আসতে লাগলেন প্রজাপতি আর মধুপের দল যাঁর যাঁর মোটরে উড়ে—আসতে লাগলেন তাঁরা যাঁরা বাড়ীর ছোট সীমানায় আর কিছুতেই নিজেদের আগ্রহাতিশয্যকে বন্দী রাখতে পারছিলেন না, আয়নার কাছে ছুটোছুটি ক'রে যাঁরা ক্লান্ত বোধ করছিলেন, অথবা যাঁরা সামাজিক স্ত্রী বা স্বামীকে এড়িয়ে অপর কোন পরমাত্মীয় বা পরমাত্মীয়ার সঙ্গলাভের জন্ম উৎকণ্ঠিত হ'য়ে পড়েছিলেন।

উৎকণ্ঠিত হ'য়ে যাঁরা বাড়ীতে স্বামী বা অন্ত কোন সাথীর গৃহ-প্রত্যাবর্তন বা গৃহাগমনের অপেক্ষায় ছিলেন তাঁরাও স্বামীর বা সাথীর গাড়ীতে আসতে লাগলেন। জীবনে এমন অনুষ্ঠান কি নাকের ডগা দিয়ে পালিয়ে যেতে দেয়া যায়, দেয়া যায় জীবনকে এমন ক'রে ব্যর্থ হ'তে দিতে, যাদের জীবনে 'ওমর খৈয়াম' একমাত্র সত্য দর্শন?

'ওমর খৈয়াম' যাঁদের ব্যবহারিক জীবনে সত্য, অথচ সত্য যাঁদের নিঃসহায় অন্তরাল জীবনে মনুসংহিতা, তাঁরাও এলেন কাঁটায়-কাঁটায় আটটায়, নেমেই যাঁরা ঘড়ি দেখেন, সেকেণ্ডের সরু ঘূর্ণমান কাঁটাওয়ালা ঘড়ি, নেমেই যাঁরা সমুখ দিয়ে চেয়ে ঘুপ্ ক'রে মোটরের দরজা বন্ধ করেন, মোটর ছেড়েই যাঁরা গম্ভীর পদচারণায় অগ্রসর হন, কিন্তু জনতাকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে যাঁরা খুসী হন, কিন্তু জনতার কাছে যেতে ঘেন্না করেন, জনতার দৃষ্টি তাঁদের ওপর পড়ুক এ যাঁরা চান কিন্তু জনতার দিকে তাকাতে যাঁরা হীনতা বোধ করেন। তাঁরা এলেন আটটায় কাঁটায়-কাঁটায়।

কাঁটায়-কাঁটায় আটটায় খোলা হল ম্যাসাচুসেট্‌স ভবনের নীচের তলায় শীততাপনিয়মিত দুই শত বর্গ-ফুটের প্রখ্যাত নাচঘর। দরজার প্রান্তসীমা থেকে ইতালীয়ান বাজনদার আর নাচনদারদের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের প্রান্তসীমা পর্যন্ত অসংখ্য টেবিলে মাথা উঁচু ক'রে আছে জলহীন কাচের গেলাসে ডোবানো সাদা ভাঁজ-করা ঝোলের অধোগতি থেকে জামা-কাপড়-বাঁচানোর হাতমোছা। গন্ধহীন পুষ্পগুচ্ছের আধার, ছোট-বড় চীনামাটির থালার পাশে চকচকে ছুরি, কাঁটা, চামচ।

ধাঁজকাটা গোলকধাঁধায় জল ঢেলে দিলে জলস্রোত যেমন সব কোণে ঠিক-ঠিক পৌঁছে যায় এই নানা ভাবাবেগাকুলে স্ফীতচিত্ত জনতাও তেমনি সব টেবিলের পাশে বসানো লাল গদী-আঁটা চেয়ারে-চেয়ারে বসে গেল। এঁদের টেবিল-চেয়ার ছিল সংরক্ষিত, সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত অধিকার সম্বন্ধে এঁদের চেতনা অতিপ্রখর, এঁরা জীবনের ঘাটে-মাটে সংরক্ষিত অধিকার কায়েম করেছেন, এঁরা সম্পত্তি কত পবিত্র তা জানেন, আর জানেন স্ত্রী কারও সম্পত্তি নয়; কোন এক যুগে স্ত্রী গো-সম্পদের মর্যাদা পেত এ শুনে এঁরা হাসেন, পরস্ত্রীর সঙ্গে এঁরা রসিকতা করতে জানেন চমৎকার। তাই এঁরা ঔদার্যের প্রতিযোগিতায় স্ত্রীকে ছেড়ে দেন বন্ধুর পাশে, স্বামীকে ছেড়ে দেন বান্ধবীর পাশে। একই টেবিলে কাঁটা-চামচে মাংস তুলে গালে ফেলতে লাগে বেশ, তেমনি আরাম হাসতে, সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে হাসতে; হেলে ঢলে সুগন্ধি ছড়িয়ে হাসতে, ডিনারের লম্বা থালায় চাটনির মতো কাতুকুতুর রসিকতায় হাসতে।

আরাম—আরও আরাম নাচতে। এ আট টাকা মাইনের, লোকের কাছে চেয়ে-নেয়া বিড়ি-খেকো যাত্রাগানের ছোকরাদের ঘাগরা নাচ নয়, এ কলেজের শিক্ষিতা মেয়েদের শাড়ী-আঁটা মরুবিজয়ের কেতন ওড়ানো বন-মহোৎসব নৃত্য নয়, এ বল-নৃত্য। ৪৫ ডিগ্রীতে একের বাঁ হাতের পাণি অপরের ডান হাতের পাণিতে সস্নেহে স্থাপন ক'রে, একে অপরের কোমরে-কাঁধে হাত রেখে এক দুই তিন চার পদক্ষেপ; কিন্তু তা নয়, লম্বা হোক, বেঁটে হোক, এর ওর হৃৎস্পন্দন টেলিফোনে যেন কথা কয় এমন ক'রে চেপে ধরতে হবে বুকের রিসিভার একে অপরের, যেন শোনা যায় লাপডাপের বাণী, কাছে আরও কাছে,—প্রদেশে প্রদেশে বিভক্ত সারা দেহের ভারতবর্ষ, দুই ভারতবর্ষের দুই মধ্যপ্রদেশে থাকবে ঘনিষ্ঠ সংযোগ, সংযুক্ত তাল, এক দুই তিন চার, দ্রুত লয়ে নয়, ঠায়ে। বিদেশী ওস্তাদের কাছে মোটা মাইনে দিয়ে শেখানো-নৃত্য।

এল এক দীর্ঘায়তা। পদনখ তার দেখা যায় না। গাঢ় কালো একরাশ ঘাগরার কাপড় উঠেছে বহু দূর বেয়ে, হাঁটু, নাভি ছাড়িয়ে আরও কিছু দূর, তার পর নেই, একেবারে নেই। গাঢ় তমসার অস্তিত্ব যেখানে সীমানা টেনেছে সেখানে, ঠিক সেখানে দীর্ঘায়তা মা হ'লে যেখানে নবজাত ক্ষীরনালীর সন্ধানে অতি ছোট দু'টি ঠোঁট রাখত। ঠিক এইখানে আবরণ শেষ, আভরণ শেষ, লজ্জা শেষ, মুখেও তার চিহ্নমাত্র নেই। দীর্ঘায়তা কঠিনদেহ লোহার ঘোরানো চেয়ারে স্থাপন ক'রে, আজ বাজনদারদের দেয়া সাদা সিগারেট লাল নখের চাপে ধরে লাল রঙের ঠোঁটে রাখে, ফস্ ক'রে আগুন জ্বলে, তার পর একরাশ ধোঁয়া, তার পরই ধোঁয়া-কুণ্ডলী। দীর্ঘায়তা ধোঁয়া-কুণ্ডলীর মাঝে বসে থাকে বিশ্রামকালে যখন অভ্যাগতেরা গোগ্রাসে মাংস চিবোয় নয় তো গণ্ডুষে সমুদ্র পান করে, কণ্ঠাবধি উন্মুক্ত নগ্নতা নিয়ে মাইকের কাছে বিজাতী শান্তিনিকেতনী ঢংয়ে গান ধরে আদরিণীর ভঙ্গিতে ঘুরে পড়ে, কানে-কানে স্বরভাব ইসারার মতো। সুড়সুড়ি জাগে চার পায়ে, সুড়সুড়ি লাগে চার হাতে, সুড়সুড়ি লাগে দুই হৃৎপিণ্ডদেশে, কান্নার গতিবেগ জাগে সর্বাঙ্গে। তার পর টেবিল ছেড়ে উঠে আসেন মিঃ কারমাকার মিস্ মাথাইকে নিয়ে, মিঃ ম্যাকফার্সান মিসেস্ লুবেককে নিয়ে, শ্রীভারতন্ শ্রীমতী বৃধিকাকে নিয়ে·····সব হলটায় মাইক্রোফোনের বাক্স-স্পীকার বসানো আছে, হাতে-পায়ে-হৃদয়ের সুড়সুড়ি হলের কোথায় কোথায় পৌঁছে যায়; নূতন নূতন অর্ডারে বয়স্ক-বৃদ্ধ বয়েরা ছুটোছুটি করে, খালি প্লেট ভরে যায়, খালি গ্লাসে টলটল ক'রে ওঠে অসাধারণ জল, ফস্ ক'রে জ্বলে আগুন, তার পর ধোঁয়া, আরও পরে ধোঁয়া-কুণ্ডলী,

শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত নাচঘরের উত্তাপ এখন কত? এই ধোঁয়ার কুয়াসা কি কাটবে? বিখ্যাত সাতচল্লিশ বৎসরের লেডী রস্ নাচছেন, পিটার্স'ন কোম্পানীর তরুণ ম্যানেজারের সঙ্গে নাচছেন, সারা হলটার মেজে ঘষে' নাচছেন, মৃদু ভাষে কথা কইছেন অপ্রাসঙ্গিক, কথা কইতে হয়। আকণ্ঠ-উন্মুক্ত নগ্নতা নিয়ে গান গাইছে দীর্ঘায়তা কঠিনদেহ নৃত্য-গীতিকার। এই নৃত্যের ছন্দে এক দুই এক-দুই পায়ে কখন বেরিয়ে আসবে কলকাতার ভীড়ে হারিয়ে যাওয়া সুন্দরীশ্রেষ্ঠা তিলোত্তমা?

তিলোত্তমা আছে এই ভীড়ের মাঝেই; তবু তাকে আবিষ্কার করা দায়; সম্ভাব্য তিলোত্তমাদের গায়ে ক্রমিক নম্বর সাঁটা আছে, তবু তিলোত্তমার আবিষ্কার কঠিন; অনেকেই খানাপিনায় এসেছেন, বসেছেন, কাসছেন, হাসছেন, নাচছেনও, তবু এঁদের অনেকেই নম্বর-সাঁটা তিলোত্তমা দলে নেই কেন, তা বলা কঠিন, যেমন বলা কঠিন এরাই কেবল নম্বর-সাঁটা তিলোত্তমা-গোষ্ঠী হ'ল কেন? ঐ মুখা মুখার্জি বার বার মাথার চুল ঝেঁকে মুখখানাকে এগিয়ে ধরছেন, বাড়ীর ঝি গঙ্গার মা'র কথা কানে বাজে, যেন সগ্‌গো থেকে উর্বশী নেমে এয়েছো মা! শ্রীলতা কোথায়, শ্রীলতা!

নাচছে, সমস্ত হলটা নাচছে। বয়স্ক বেয়ারার গোষ্ঠী আর সাংবাদিক-গোষ্ঠী গোত্রহারার মতো ওদের খানাপিনা আর নাচ হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে। বয়স্ক বেয়ারার গোষ্ঠীর কাছে এ নাচ, এ খানাপিনা নূতন নয়, তবু নিত্য-অভিনব; ওদের জীবনে বিবিকে পরের হাতে বিলিয়ে নাচতে নেই, তাই অভিনব। খানা ও পিনার স্বাদ ওরা জানে, জানে না অমন অনর্গল অফুরন্ত মাণি-ব্যাগ খালি ক'রে অর্ডার দিতে।

সাংবাদিকেরা আমন্ত্রিত প্রয়োজনে। এ প্রচারের যুগে সংবাদ-বাহী ওঁদের চাই। কিন্তু শোবার ঘরের দেয়ালে-দেয়ালে নরম লেজের টিকটিকির মতো ওঁরা নির্জীব সাক্ষী। ওঁরা গণ্য প্রয়োজনে, নইলে নগণ্য, জাত-মাননীয় নয়, তাই অমাক্ত। এঁরা কোম্পানীর গাড়ীর মর্যাদা নিয়ে আসেন, আসেন কোম্পানীর সামাজিকতার দাবী নিয়ে, কিন্তু এঁদের স্তর নীচে, বহু নীচে। এঁরা খানাপিনার স্বাদ যদি পায় তো ঐ বয়স্ক বয়-গোষ্ঠীর মতো সে উচ্ছিষ্টের স্বাদ, বয়-গোষ্ঠীর মতোই ভাবতে পারেন না তাঁদের বাংলা বিবি পরের সঙ্গে শরীর লাগিয়ে নাচবেন বা লজ্জার মাথা খেয়ে তাঁরাই আসবেন নাচতে আর কোথাও থেকে এক-একটি মেয়েকে কুড়িয়ে নিয়ে। ওঁরা স্ত্রীর আদরের মিনসে, ওঁদের স্ত্রীর হাতে মুড়ো ঝাঁটার ভয়, আরও ভয় সমাজকে। তবু ব্যতিক্রম আছে এঁদের ভেতরে যাঁরা বেতনভুক্ হ'য়েও স্বাধীনতার ভাণ করেন, যাঁদের বিয়ার খেয়ে নেশা হয়, বারো আনার নেকটাইকে যাঁরা আড়াই টাকার মার্কিণী নেক্‌টাই বলে চালান আর বরিশালীয়া ইংরিজী বুলির মাঝে যাঁরা পাইপ টানেন। ফরমায়েসী লেখায় বিক্রীত-বিকৃত মসীজীবী।

তাঁরাও তাকিয়ে দেখছেন। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রীতে হাতখানি হাতে রেখে নাচছেন মিসেস্ গ্রিথোরা মিঃ ব্রিজেসের সঙ্গে, নাচছেন শ্রীলোহারাম চন্টনিয়ার সঙ্গে মিস্ শান্তনু পায়ে-পায়ে।

গান থামল। মেজে থেকে সাপের মতো এরা সরে পড়ল টেবিল-চেয়ারের অলিতে-গলিতে। অকস্মাৎ একরাশ আলোর ঝাপটা পড়ল সেই মেজেতে, আবার তেমনি অকস্মাৎ নিবে গেল।

নাচঘরের বেয়ারার প্রধান ছুটে এল—স্থায়ী মঞ্চের তলাকার একখানা সাদা তক্তা টেনে বের করল, টেনে এই মেজের মাঝখানে বসালো; তারও ওপর বসালো একটি বড় জলচৌকি। আবার আলোর ঝাপ্‌টা এল এইখানটায়, এই জলচৌকিতে, আবার নিবে গেল। আর একটি সুইচে ঘরের অন্য সব আলো জ্বলল। কালো বো কণ্ঠে ঘোষক এলেন, মাইক্রোফোনে বললেন, এবার বিচারকেরা বসবেন, তার পর আসবেন একে একে সুন্দরীরা······ঘোষকের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই নানা ধ্বনি ও হাততালির ঝড় বয়ে গেল।

সুন্দরীরা আসবেন, তিন মিনিট তেত্রিশ সেকেণ্ড ক'রে দাঁড়াবেন, বিচারকেরা দেখবেন, আপনারাও দেখবেন অবশ্য, বিচারকেরা রায় দেবেন, আবার ওঁরা আসবেন, আবার দেখবেন আপনারা, বিচারকেরা, বিচারকেরা রায় পাকা করবেন, তার পর সর্বশ্রেষ্ঠা তিলোত্তমাকে সঙ্গে করে আসবেন দ্বিতীয়া······

আবার হাততালি আর মেছুয়াবাজারের বিশেষ এক রকম মুখে আঙুলপোরা কর্ণবিদারী শিষ্, আবেগকম্পিত শরীরের উদ্ভট গোঙানি, ধোঁয়া, ধোঁয়া-কুণ্ডলী, কাচের আধারে পড়ে অগ্নিতরলিকায় বান্ধবীর বাণীময় প্রতিবিম্ব।

বিচারকেরা এলেন; সমানাধিকারের যুগোত্তীর্ণ স্বপ্নরাজ্যের চার জন বিখ্যাত মহিলা, তিন জন প্রখ্যাত পুরুষ। নারীর চোখে নারী, পুরুষের চোখে নারী। ছেলের ভাবী বৌকে স্বামীর চোখে দেখায় বিশ্বাস হয় না গিন্নীর, নিজে দেখতে হয়, ভবিষ্যতে মনোবাদ তো ওর সঙ্গেই হবে, ছেলেরও বিশ্বাস হয় না মাকে, সে নিজে দেখে। এখানে বিচারকের আসনে মহিলা চার, পুরুষ তিন, পাকা বিচারক, কালের চিহ্ন যাঁদের চোখের আশে-পাশে গভীর, পঁয়তাল্লিশ সাতচল্লিশ বাহান্ন বছরের স্মৃতি এঁকেছে যেখানে অতল কালিমা। চোখে প্রাকৃতিক আলো গেছে ম্লান হয়ে, জ্বলে উঠেছে কৃত্রিম হাজার শক্তির দামিনী আলো। খাতা, পেন্সিল, আরও কি সব সরঞ্জাম তাঁদের সামনে।

ঘরে আর সব আলো নিবে গেল। মেজেয়-রাখা সাদা রঙের তক্তায় বসানো জলচৌকিতে হাজার শক্তির আলো হ'ল কেন্দ্রীভূত—অন্ধকারে বসে থাকা ঊর্ধস্তরীভূত হর্ম্যালোকবাসীর অক্ষিপটে তীব্র আলোর তির্যক্ গতি। অগ্নিতরলিকার স্বাভাবিক গতিপ্রভাবে উত্তেজনার উত্তাপ গুঞ্জনের বাষ্প ছড়াচ্ছে। পূব দিক্‌কার বাম কক্ষের অন্ধকার অপসারণ করতে করতে এলেন প্রথমা সুন্দরী।

শ্রীলতা!

ওস্তাদ শিখিয়েছে পদক্ষেপ, নটীর মুদ্রায় তার জঙ্ঘার উৎক্ষেপ আর প্রক্ষেপ, আকাশে দোলায়মান শিথিল হাতে যেন আহ্বান। সঙ্গো লিমিটেডের উজ্জ্বল চীনাংশুকের রামধনু মোজায় জড়ানো, পাটা কোম্পানীর জলশীততাপনিরোধী পদাধারে সযত্নে-রাখা নরম পায়ে উঠে আসে শ্রীলতা জলচৌকিতে—হাজার শক্তির আলো ঠিক্‌রে পড়েছে যেখানে। মেসোকেপালিক করোটিতে কালো উলের কাস্তি চুলে নির্ঘাৎ পড়েছে সিন্‌থেটিক ড্রাগ হাউসের রসসজ্জারী হেয়ার লোসন। বেণীবাঁধা নয়, ছড়ানো, সুবিন্যস্ত ছড়ানো চুল। তিন আঙুল কপালের নীচে সূক্ষ্ম ভ্রূ কামানো না আঁকানো? পার্সীয়ান চোখা নাক নয়, দ্রাবিড়ী নয়,

বোঁচা, কিন্তু নিগ্রোছাঁদের নয়, মোগলের ছাঁচ, মোটার ওপর চোখা। হরিণের কালো চোখ দেখা যায় না শ্রীলতার নয়নে, শ্রীলতা বিড়ালাক্ষি, কবে পর্তুগীজের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল কে বলবে? পটলের মতো ছড়ানো নয়, আধখানা টোবা পেঁয়াজের মতো গোল। গালে মাংস আছে, হাস্‌লে টোল পড়ে না একটুও, খাঁজ পড়ে না নাকের কাছে, চোয়াল একটু সাম্‌নে ঝোঁকা, দাঁতে দাঁত লাগে না সহজে, ওপরের পাটি থেকে নীচের পাটি একটু এগোনো, মাংস খেতে এদের দূরত্বের অভিমান টের পাওয়া যায় না, হাসলে পাওয়া যায়, হাস্‌লেই মনে হয়, আপনি কি ম্যাক্‌লিন দিয়ে দাঁত মাজেন? ঝুমকো-দোলানো কানে বিকৃতি-বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। সামান্য বোঁচা নাকের চাপা প্রশ্বাসের রন্ধ্রজোড়ার নীচে দ্বিতীয় বন্ধনীর মতো মুখগহ্বরের কোলাপসিবল ওষ্ঠদ্বার পাৎলা; ভেতরের নরম ঝিল্লী-ওল্টানো পৌনে এক সিকি ইঞ্চি, তারই ওপর ইউনিভার্সাল কস্‌মেটিক্সের ওষ্ঠাধর-রঞ্জনীর ঘন প্রলেপ। ওপরেও তাই, নীচেও তাই। কিন্তু এর বিস্তৃতিই শ্রীলতার বৈশিষ্ট্য। আকর্ণবিস্তৃত শ্রীলতার খোলা হাসি, আকর্ণবিস্তৃত বদন-ব্যাদান, আকর্ণবিস্তৃত লালিমায় ছিন্নমস্তার রুধিরসৌন্দর্য, পর্য্যুদস্ত প্রাকৃতিক মুখমণ্ডলে ডাইহার্ড এণ্ড ডাইহার্ডের দুর্জ্জেয় গিরিশৃঙ্গ থেকে বিমানে সমাহৃতা সুবাসী স্নো-লেপনীর সৌকর্য, মাংসালো নিটোল কপোলে রোজ এণ্ড রুজ ব্রাদার্সের লালিমা, বাড়ন্ত থুৎনীর সূক্ষ্মক্ষেত্র সামান্য দ্বিধাবিভক্ত। অকস্মাৎ মরালের মতো গ্রীবায় লুকানো কণ্ঠমণি আদমের আপেল, হয়তো বা উৎকণ্ঠায়ই কিঞ্চিৎ বহির্মুখী, সরল রেখার স্কন্ধ বাহুসংযোগ অবধি, আফ্রিকানদের মতো দীর্ঘবাহু। কিন্তু দুই বাহুসংযোগ থেকে স্যার গ্যালাহাডের পয়োধরা-প্রদর্শনী বক্ষাবরণী আবৃত নাভিদেশ পর্যন্ত বক্ষভাগ ত্রিকোণাকৃতি নয়, ক্রমান্বয়ে সোজা দু'দিক চেপে এসে এতটুকু কোমরে শেষ হয়নি, বরং খানিকটা চৌকোণো, আফগান পাহাড়ের চূড়ার মতো পীনোন্নত নয়। নিতম্বদেশ তরাই উপত্যকার মতো উদার প্রশস্ত নয় তেমন। সর্বাঙ্গে কামস্কাট্‌কা রেঁায়ার কচি কলাপাতা রঙের নগ্নিকা শাড়ী বা নিও-মস্‌লিন। গোলকুণ্ডা গোল্ডকোষ্ট আর সমুদ্রগর্ভ থেকে রস্ এণ্ড রস্ ব্রাদার্সের অপ্রাকৃতিক উদ্যোগে উদ্‌গীর্ণ বিচিত্র প্যাটার্ণের হীরা-সোনা-মণি-মুক্তার আভরণ কানে গলায় কব্জিতে ভাগায় জ্বলছে ঝল্‌সাচ্ছে।

প্যাটাগোনিয়ানদের মতো দীর্ঘাকৃতি নয় শ্রীলতা, বুস্‌ম্যানের মতো খর্বাকৃতি নয়, সে কাফির নয়, হটেনটট নয়, তাতার নয়, বাঙালী বা গুজরাটী ঘরের আর্য-দ্রাবিড়ীয় অসংখ্য বর্ণসঙ্করের অসংখ্য মেয়ের এক জন। বিচারকেরা ঝুঁকে বেঁকে দেখলেন, লিখলেন, ঘাড় কাৎ করলেন। শ্রীলতা আবার অন্ধকারে অপসৃতা হ'ল। তার পর···তার পর···তার পর এলেন দক্ষিণ-আফ্রিকার বারোলঙের মতো বব-ছাঁটা একরাশ দেশী চুল ঝাকৃতে ঝাকৃতে মিসেস্ সুধা মুখার্জি।

সাধারণ মোঙ্গল-দ্রাবিড়ী বাঙালী ঘরের বুস্‌ম্যানের মতো বেঁটে, সংসারের কাজকর্ম ফেলে চানের ঘরে অনেকক্ষণ ধরে ঘষা-মাজা রংয়ের বৌ। কানের ভেতর দিয়ে মর্মে যে কথা গেঁথে গেছে তা সুরঝঙ্কারে বাজে, তুমি গো মা সগ্‌গো থেকে নেমে এয়েছো, স্বর্গের পরী যে মর্ত্ত্যে নেমে আসে, এ মিঃ মুখার্জির সৌভাগ্য না দেখলে

বহুমূত্র
সাতদিনেই
আরোগ্য হয়।

যত জটিল বা দীর্ঘদিনের হউক না কেন অধুনাতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার "ভেনাস চার্ম" ব্যবহার করিলে বহুমূত্র সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হয়। এই রোগের প্রধান প্রধান উপসর্গ-সমূহ: যথা—অস্বাভাবিক তৃষ্ণা, ক্ষুধা, প্রস্রাবে অতিরিক্ত চিনি এবং চুলকানি প্রভৃতি। এই রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করিলে কার্বাঙ্কল, ফোঁড়া, ছানি এবং অন্যান্য জটিলতা দেখা দেয়। হাজার হাজার লোক "ভেনাস চার্ম" ব্যবহার ক'রে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাইয়াছে। ব্যবহারের পরের দিন থেকেই প্রস্রাব হইতে চিনি দূরীভূত হয় ও প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। মাত্র ২।৩ দিনের মধ্যেই আপনি যে অর্দ্ধেকের বেশী নিরাময় হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিবেন। খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে কোন বিধি-নিষেধ নাই। ঔষধের বিবরণাদি সমন্বিত বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য পুস্তিকার জন্য লিখুন:— প্রতি ৫০টি ট্যাবলেটের শিশির মূল্য ৩৸০, ডাকমাশুল ফ্রি।

ভেনাস রিসার্চ ল্যাবরেটরী
হইতে প্রাপ্তব্য।
পোষ্ট বক্স ৫৮৭, কলিকাতা (M.B.)

বিশ্বাস হ'ত না, মৃধা, রাস্তায় অনেক লোকের দেখা মেলে তোমার দেখা মেলে না, তোমার সৌন্দর্যের·····"

বুস্‌ম্যানের মতো বেঁটে মৃধা মুখার্জি বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালে শাড়ীর আড়ালে ব্লাউজটা ভরে ওঠে ঠিকই, কণ্ঠ থেকে আয়তন বড় ছোট, আরও ছোট। কোমর থেকে জঙ্ঘা পর্য্যন্ত দেহের বিস্তৃতি, কিন্তু অনাবশ্যক মেদ-মাংসের বিপুল প্রাচুর্য, মিসেস্ মৃধা মুখার্জি, তিলে তিলে নয়, তালে তালে তালোত্তমা। ফিক্ করে হাসলেন মৃধা মুখার্জি, হাস্‌তে হয়, অনর্থক হাসতে হয়, হাস্‌তে জানতে হয়, দাঁত বের করে হাস্‌তে হয়। সুমুখের দু'টো দাঁতের খানিকটা এনামেল খেয়ে ফেলেছে পোকায়, দেখেই চীৎকার করতে ইচ্ছে হয়, দাঁতের পুকা ভাল কোরব······, হাস্‌লে সে দু'টো দাঁতও প্রকাশ্য হ'য়ে যায়; তবু হাস্‌তে হয়, গায়ের তাল-তাল মাংস নাচিয়ে হাস্‌তে হয়। তিন মিনিট তেত্রিশ সেকেণ্ড উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল, মৃধা মুখার্জি নড়তে চান না, দর্শক-সমাবেশের আয়নায় যেন নিজের মুখ দেখছেন, গঙ্গার মা'র প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে না চার দিকে? যেন সগ্‌গো থেকে নেমে এয়োছো মা!······

ইয়েস্ মিসেস মুখার্জি···

মৃধার চৈতন্য এল, হাত দু'টো যৌন আবেদনের শেষ মুদ্রায় আকাশে তুলেই ছেড়ে দিয়ে গঙ্গার মা'র সগ্‌গো থেকে নেমে-আসা মৃধা মুখার্জি ঘনান্ধকারে অপসৃতা হ'লেন, কানের পর্দায় অস্ফুট ঘ্ন ঘ্ন ধ্বনি।

ঘ্ন পেছনে নানা রকম শিষের আওয়াজ স্তিমিত হ'তে না হ'তেই মিসেস্ ময়গ্যানথিউর ফিরে-পাওয়া বসন্তাক্রান্ত মেয়ে মিস্ মেরী কোণের হাল্কা অন্ধকার সরিয়ে হাজার শক্তির আলোয় আবির্ভূত হ'তেই, জ্বরের ওপর জ্বর আসার মতো, ঝাউবনে অবিশ্রান্ত শনশনে হওয়ার মতো, মেছোবাজার থেকে উঠে এল শিষের আর অনাভিধানিক উল্লাসের আর্তনাদ। মিস্ মেরীর কানের ওপর থেকে, কপাল থেকে, পেছনের ঘাড় থেকে উঠেছে ঘন চুলের আফগান পাহাড়, সে পাহাড়ের শেষ নয় সূক্ষ্মাগ্র চূড়ায়, সে পাহাড়েরর শেষ মালভূমিতে। মাথায় বসানো কালো ছোট চ্যাপ্টা ড্রামের মতো; তারই নীচে টুলটুলে দুই চোখ, চুলের টানে মুখশ্রী খানিকটা ছুঁচোলো দেখালেও ওর মুখমণ্ডলের গোলাকৃতি নিঃসংশয়ে আভাসিত; গোলাকৃতি শ্রবণেন্দ্রিয়ের বহিরাবরণ, নাকের চূড়ো আর ফুটো দু'টোও গোলাকার, ঠোঁট জোড়া ছোট আর গোল, থুৎনীটা ওপরে চুলের টান না পড়লে অর্ধচন্দ্রাকৃতি বলে স্বীকৃত হতে পারে। এই অর্ধচন্দ্র আবক্ষ পরিব্যাপ্ত কিন্তু বক্ষস্ফীতিতে মন্বন্তরের স্মৃতি জাগরূক। একেবারে দুধের মতো অথবা রাজহংসের পালকের মতো শ্বেতাভ বস্ত্রাচ্ছাদন। কিন্তু লোকের দৃষ্টি নিবদ্ধ ঐ মাথায় বসানো কালো চৌকো চুলের ড্রামটার ওপর, মিসেস্ ময়গ্যানথিউর সর্বক্ষণের দৃষ্টিও যেখানে নিবদ্ধ, কেশবিন্যাসে কেশবিলাসিনীরা সর্বকালে যেখানে আবদ্ধ হবে।

ইয়েস মিস্ মেরী······

তার পরে এলেন······

আরও এলেন······

এলেন মতিবাঈ। ক্ষণকালের জন্য মেছোবাজারের শিষও যেন স্তব্ধ হ'য়ে গেল। সামান্য গাম্ভীর্যের সঙ্গে নির্লজ্জতার সমাবেশ যে মুখমণ্ডলে তার কপালের নীচে নীচে নাসা-সঙ্গমস্থল থেকে কানের প্রায় শীর্ষভাগ পর্যন্ত একটানা কেশঘন ভ্রূ। রক্তিম অচ্ছোদপটল, বোঝা যায় না নেত্র-গোলকে এই নেশা কিসের আর কি ঔৎসুক্যে কোটর এমন বিস্ফারিত! ধনুকের মতো একটু সামান্য বাঁকা নাক, পাৎলা দু'টি ঠোঁটের প্রান্তসীমায় এসে হঠাৎ যেন দূরে দাঁড়িয়ে গেছে। মতিবাঈ অকারণে হেসে উঠলেন, আর রংমাখা গালে টোল পড়তে দেখেই মেছোবাজারের বিস্মৃত আর্তনাদ ধ্বনিত হ'য়ে উঠল। মতিবাঈ বৃত্তাকার প্রগণ্ড পর্যন্ত অংশফলক ঘুরিয়ে একটু পিছন-ফিরে দাঁড়ালেন। নিটোল উরঃফলকের পর শারীরস্থানের নতি কটি অবধি ব্যাপ্ত, শিল্পীর শিল্পীর দিক্‌চক্র-রেখাঙ্কনের মতো পরিব্যাপ্ত হয়েছে শ্রোণীভার, ঋজু সুষুম্নাকাণ্ড পর্শুকাদেশে ঈষৎ আনত যেন, ঘূর্ণ্যমান ধরিত্রীর ছন্দ তার ঊর্ধ্বস্থিতে। মতিবাঈ। বিখ্যাত সৌখীন নর্তকী মতিবাঈ। তিন মিনিট তেত্রিশ সেকেণ্ড পর ধীরে অপসৃতা হলেন। হাজার শক্তির আলো ব্যর্থতায় সাদা কাঠের জলচৌকিতে পাণ্ডুর হ'য়ে রইল।

সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করার আহ্বানে এর পর যিনি এসে দাঁড়ালেন তিনি সকলের মনে জাগালেন এক বিস্মিত জিজ্ঞাসা, তার পরই সমস্ত হলটা প্রকাশ্য সরব হাসিতে ফেটে পড়ল। খোঁপায় মনোহারী দোকানে কেনা ঝিনুকের সাঁওতালী ফুল সেঁটে এই মেয়েটি একটু আগে মাংস চিবোচ্ছিল। আধো অন্ধকার থেকে তিনিই প্রকাশিত হলেন হাজার শক্তির আলোয়। জলচৌকিতে বসানো ছেলের হাতের তৈরী তাল কাদার পুতুল অথবা ঝোলা ডালের বড়ি; যত ওপরের দিকে টেনে তোলা যায় তত থ্যাবড়া হ'য়ে ব'সে পড়ে। করোটিকা ঘুরে থুৎনী ঘুরে একই ব্যাসের নিখুঁত বৃত্ত, উত্তর-দক্ষিণে পৃথিবীর মতো একটু চাপা, কাদার মতো রং, রকমারি ওয়াক্স-স্রোতে চকচকে। সরু কপালের নীচে একটু নাকের মতো কিছু অনুমান করা যায়, ইচ্ছে হয় ঐ নাসারেখাকে শক্ত লোহার চিম্‌টে দিয়ে তুলে রাখার। পাঁচের-খাদের মতো হাসি, তাতে কালিমা, আর ওরই ফাঁকে একটি শ্বদন্ত, ঐ একটি মাত্র শ্বেত-চিহ্ন সারা দেহে। সৌন্দর্য-সচেতন মিসেস্ সম্বরম্ হাসির হুল্লোড়কে স্তুতির প্রবলাবেগ মনে করে একবার নৃত্যভঙ্গিমায় খানিকটা ঘুরে এলেন। ঝলকে ঝলকে হাসি উঠতে লাগল, তিন মিনিট চৌত্রিশ সেকেণ্ডে মিসেস্ সম্বরম্ তাঁর তিলোত্তমার সঙ্কল্প নিয়ে অপসৃতা হলেন, জলচৌকির সাদা আলো ঝক্‌ঝক্ করতে লাগল।

তার পরও এরা-ওরা ও অনেকে এল-গেল। তারও পর হলের সমস্ত আলো জ্বলে উঠল।

সাংবাদিকদের গলা শুকিয়ে কাঠ। সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে এগারোটা, একবিন্দু জল পর্যন্ত নয়, শুধু তাকিয়ে দেখায় যাঁদের অধিকার সেই সাংবাদিকদের। সাংবাদিকরা দর্শক নয়, বিচারক নয়, ঘটনার পরিবাহক ওঁরা, হাঁ করে দেখে ওঁদের গলা শুকিয়ে কাঠ!

ঘোষকের ঘোষণায় ঐ শুষ্ক কণ্ঠনালী খানিকটা সরস হ'য়ে এল। ঘোষক জানালেন, এবার সব সুন্দরী একবারে আস্‌বেন, আর একবার বিচারকেরা তাঁদের নির্ভুল রায় মিলিয়ে দেখবেন, আপনারাও দেখবেন, তার পর বিচারকদের রায় মেনে নিয়ে হাজির করা হবে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা তিলোত্তমাকে।

প্রত্যাশার আবার মুখে আগুন-পোরা শিসের ঘূর্ণিবায়ু হলটাকে যেন দুমড়ে দিল। ছায়াছবির মতো সুন্দরীরা এলেন, এসে দাঁড়ালেন। রেশন দোকানের সারি দিয়ে দাঁড়ানো নয়, ক্যামেরার মুখোমুখি উরঃফলক যতটা সম্ভব স্ফীত ক'রে একটু হাসি, দাঁত বের-করা হাসিমুখে দাঁড়ানো। ফোটোগ্রাফারদের অতি তৎপরতা আর ক্যামেরার সবিদ্যুৎ ক্লিক-ক্লাক শব্দে খিল্‌খিলে হাসি পায়।

সম্ভবত শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য এল। ঘোষক জানালেন, এবার সুন্দরীশ্রেষ্ঠা তিলোত্তমাকে নিয়ে আসবে দ্বিতীয়া। কলকাতার ভীড়ে হারিয়ে যাওয়া তিলোত্তমাশ্রেষ্ঠার আবিষ্কার হয়েছে।

হলঘরে আবার চাঞ্চল্য জাগে। এবার রহস্য-মৎস্যের চক্ষু বিদীর্ণ করবেন অজ্ঞাতবাসী অর্জুন, আস্‌বেন দ্রৌপদী বরমাল্য নিয়ে। রহস্য-মৎস্যের চক্ষু বিদীর্ণ হ'ল মুহূর্তেই, এলেন দ্রৌপদী নয়,

শ্রীলতা!

তার সঙ্গে এলেন দক্ষিণ-আফ্রিকার বারলণ্ডের মতো বব-ছাঁটা একরাশ দেশী চুল ঝাঁকৃতে ঝাঁকৃতে মিসেস্ মৃধা মুখার্জি, গঙ্গার মা'র সগ্‌গের পরী।

এবার আর শিষের, চীৎকারের শেষ নেই। শেষ হবে কিনা কেউ জানে না। ছবিতোলার শেষ নেই, শেষ হবে কিনা কেউ জানে না। চার দিককার নেবানো আলোয় উর্ধস্তরীভূত হর্ম্য-লোকবাসী জনতার ওঠা-বসার শেষ নেই, শেষ হবে কিনা কে জানে?

অন্ধকার ভেদ ক'রে হাজার শক্তির আলোয় এগিয়ে এলেন স্যার ভেল্লোডি। শ্রীলতার মাথায় পরিয়ে দিলেন তিলোত্তমার মুকুট, প্রগণ্ড থেকে শ্রোণিদেশব্যাপী দুলিয়ে দিলেন তিলোত্তমা-পরিচয়। শ্রীলতার রোজ এণ্ড রুজ ব্রাদার্সের লালিমা-লাঞ্ছিত দুই কপোলে গভীর স্নেহবোধে ইণ্ডো-আমেরিকান্ এজেন্সীর ডাইরেক্টরের অধরস্পর্শ হ'ল। হলটায় ঠোঁটে-ঠোঁটে সুড়সুড়ি জাগল, সুড়সুড়ি জাগল লোবিংসে, তার পর সমস্বরে মেছোবাজারী ধ্বনি। ঘোষক এগিয়ে এসে তড়িৎগতিতে মিসেস্ মৃধা মুখার্জির গণ্ডদেশ দু'হাতে চেপে দু'টি চুম্বন-চিহ্ন আঁকলেন। সমস্ত হল উন্মত্তের মতো উঠে পড়্‌ল, তার পর বন্ধু-বান্ধবী স্ত্রী-স্বামী বিক্ষিপ্ত হ'য়ে কেমন একাকার হ'য়ে গেল, জগচৌকির আলোয় জাগানো ধ্বনি সারা হলে জাগালো প্রতিধ্বনি। ফোটোগ্রাফারদের ভীড় ঠেলে সাংবাদিকেরা ছুটে গেলেন তিলোত্তমার দু'টি বাণী পেন্সিলে লিখবেন বলে। শ্রীলতা হেসে বল্‌ল, আমি বাংলা জানি না, ইংরাজীও জানি না, হিন্দী তো জানিই না।

সাংবাদিকেরা এই বাণীই লিখে নিলেন বিজলী উদ্দামতায়, আর সাফল্যের গৌরবে সার্কাস ক্লাউনের মতো ভীড় ঠেলে বেরোতে লাগলেন বাইরে।

স্যার ভেল্লোডি নিষ্কম্প দেহে, নিষ্কম্প পদভারে শ্রীলতার হাতখানি নিজের বাহুকক্ষে জড়িয়ে এগোতে লাগলেন দরজার দিকে। জনতার সহস্র চক্ষুর আলো ঠিক্‌রে পড়্‌ছে অপস্রিয়মান যুগলের ওপর।

ওঁরা লিফ্‌টে উঠে এলেন ৭নং ফ্ল্যাটে—কম্‌সে-কম ৩৬টি ফ্ল্যাট আছে যে পাকাবাড়ীর, তার ৭নং ফ্ল্যাটে।

প্রবেশের জন্য দরজা ফাঁক ক'রে ধরে স্যার ভেল্লোডি ডাক্‌লেন, তিলোত্তমা!

বলুন।

শ্রীকান্ত নাদারকে মনে পড়ে?

কে শ্রীকান্ত?

তোমার বিয়ে-করা স্বামী?

কিন্তু শ্রীলতা তো মরে গেছে।

স্যার ভেল্লোডি তিলোত্তমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হ'য়ে, কানের কাছে কি গালের কাছে ঠিক বোঝা গেল না, অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, শ্রীকান্ত বেঁচে আছে আমেরিকায়। কিন্তু বাঁচা-মরার ব্যবধান কতটুকু একবার দেখ তাকিয়ে……

শ্রীলতা আর্তনাদ ক'রে বল্‌ল, ও—কি!

বিভলভার! তুমি আমার আবিষ্কার এ কথা ভুলেও যেন ভুল না হয়। তিলোত্তমা একনিষ্ঠা সতী! ব'লে স্যার ভেল্লোডি আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না। অকস্মাৎ ঘুরে অচঞ্চল পদক্ষেপে নীচে নেমে যাবার জন্য লিফটের খাদের কাছে গিয়ে সজোরে বোতাম টিপলেন।

এ্যাটম

যামিনীমোহন কর

এ্যাটম-বম

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে দুটো দল গড়ে উঠেছিল। এক দল নিউক্লিয়াসের চেইনের মত ক্রমিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিশ্বাস করতেন আর এক দল সে সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতেন। যাঁরা বিশ্বাস করতেন তাঁদের মতে বিস্ফোরণ যে হবেই এমন কথা স্বীকার্য্য নয়। যদি কোন ইউরেনিয়াম লবণ জলে গুলে দেওয়া যায়, তবে ভঙ্গজনিত দ্রুত নিউট্রোন সমূহ মন্দা হয়ে যাবে, ফলে নিউক্লিয়াস ভঙ্গের গতিও কমে যাবে। সে ক্ষেত্রে বিস্ফোরণের সম্ভাবনাও কমে যাবে। ফ্রান্সের পেরাঁ বলেন যে, ইউরেনিয়াম-মিশ্রিত জলে ক্যাডমিয়ামের মত কোন দ্রব্য দিলে মন্দা বেগের নিউট্রোন সমূহকে শোষণ করে নেবে। তাহলে চেইন-প্রতিক্রিয়াকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা চলতে পারে, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত বন্ধও করা যাবে। সুতরাং বিস্ফোরণ যে হবেই এমন কোন কথা নেই।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি নাগাদ নিউক্লিয়াস ভঙ্গের আরও অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হল। তখন দেখা গেল যে মন্দগতি নিউট্রোন সমূহের চেইন-প্রতিক্রিয়া আরও মন্দীভূত করে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আবার দ্রুতগতি নিউট্রোন সমূহের চেইন-প্রতিক্রিয়াকে আরও অনেক বেশী দ্রুত করে এক ভীষণ প্রচণ্ড বিস্ফোরণ করাও সম্ভব। এই দ্বিতীয় প্রক্রিয়া থেকেই এ্যাটম-বমের উৎপত্তি। এ মারণাস্ত্র হল ব্রহ্মাস্ত্রের সামিল। আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ সংস্থা থেকে ঠিক হল, ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিকরা নিউক্লিয়াস ভঙ্গ সম্পর্কে নতুন আবিষ্কার যা করবেন, সে সব প্রকাশ করতে পারবেন না। বৈজ্ঞানিকরা হয়ে পড়লেন রাজনৈতিকদের আজ্ঞাবহ দাস মাত্র। স্বাধীনতা ফেললেন হারিয়ে। সর্ব্বদেশীয় বিজ্ঞান হয়ে গেল একদেশীয়। প্রত্যেক সরকার নিজের বৈজ্ঞানিকদের লুকিয়ে রাখলেন লৌহ-যবনিকার অন্তরালে। যেন কোন জাতি জানতে না পারে অন্য জাতিটা কতটা অগ্রসর হয়েছে।

ইউরেনিয়ামের বিভিন্ন আইসোটোপের মধ্যে এই ব্যাপারে ২৩৫ নম্বর সব চেয়ে কার্য্যকরী। এর দ্বারাই এ্যাটম-বম তৈরী হয়। কারণ এর নিউক্লিয়াসকে ভাঙ্গা যায়, এবং মন্দ ও দ্রুত দু'রকম নিউট্রোনই নির্গত হয়। তবে ক্ষয়ের জন্য ভর কমতে থাকে। অন্ততঃ পক্ষে যতটা ভর না হলে বিস্ফোরণ হবে না, তাকে সংকট-ভর বলা হয়। তার কম নিলে চেইন-প্রতিক্রিয়া ক্ষয়ের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। মোটামুটি হিসেব করে দেখা গেছে এক থেকে একশ' কিলোগ্রামের মধ্যে বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম-২৩৫ দিয়ে বোমা তৈরী করা চলে, আয়তন ও শক্তি হিসেবে। এক কিলোগ্রাম থেকে প্রায় $8 \cdot 2 \times 10^{20}$ আর্গ শক্তি নির্গত হয় অর্থাৎ সব চেয়ে বিস্ফোরক টি-এন-টির কুড়ি হাজার টনের বিস্ফোরণের শক্তির সমান! কি প্রচণ্ড তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। প্লুটোনিয়াম-২৩৯ দিয়েও বোমা তৈরী করা চলে।

খুব কম সময়ের মধ্যে খুব বেশী শক্তি ছাড়া পেলে বিস্ফোরণ হয়। ভাঙ্গনশীল কোন দ্রব্যকে এই কাজে লাগাতে গেলে দু'টো জিনিষের ওপর নজর রাখতে হবে। বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম-২৩৫ বা প্লুটোনিয়াম-২৩৯ সংকট-ভরাপেক্ষা অধিক পরিমাণে নিতে হবে, যাতে চেইন-প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে, বন্ধ না হয়ে যায়। আর ভাঙ্গন যতটা সম্ভব দ্রুত নিউট্রোন দ্বারা করতে হবে যাতে ক্রিয়াটা অত্যন্ত দ্রুত হয়। এতে করেও দেখা যায় যে, বিস্ফোরণ হয় না। তাজা বোমা না হয়ে মরা বোমা হয়ে যায়। ধীরে ধীরে গরম হয়ে সংকট-ভরাপেক্ষা ছোট ছোট টুকরায় ভেঙ্গে যায়। চেইন-প্রতিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। খুব বেশী হলে সামান্য একটা তুঁই-পটকার মত বিস্ফোরণ হতে পারে। এ্যাটম-বম তৈরী করতে গেলে এ ব্যাপার ঘটতে দেওয়া চলবে না। যে রকম করে হোক, নিউট্রোন সমূহের গতি হ্রাস বন্ধ করতেই হবে। নিউক্লিয়াস ভঙ্গের জন্য যতগুলি নিউট্রোন নির্গত হবে প্রত্যেকটিকে কাজে লাগাতে হবে, প্রতিক্রিয়ার গতি উত্তরোত্তর যাতে বৰ্দ্ধিত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ গুণীতকের সাধারণ অনুপাত বা গুণনীয়ক এককাপেক্ষা বড় রাখতে হবে যাতে শক্তি ছাড়া পাওয়ার হার অত্যন্ত বেশী হয়ে যায়।

বায়ুতে সব সময় দু'-চারটে নিউট্রোন ছড়ান থাকেই। ফলে সংকট-ভরাপেক্ষা বেশী দ্রব্য থাকলে চেইন-প্রতিক্রিয়া আপনা থেকেই আরম্ভ হয়ে যাবে, রোধ করা যাবে না। সেই জন্য বোমায় দু'-তিন টুকরো থাকা উচিত, যার প্রত্যেকটির ভর সংকট-ভরাপেক্ষা কম। বোমা ফাটাবার অর্থাৎ আগুন দেবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তারা থাকবে পৃথক ভাবে। ঠিক মুহূর্ত্তে টুকরোগুলো চক্ষের পলক ফেলতে না ফেলতে একত্র হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এত দ্রুত একত্র করার কারণ এই যে, বায়ুর বাজে নিউট্রোন চেইন-প্রতিক্রিয়া চালু না করে দেয়। করে দিলে বোমার জোর কমে যাবে। যদি ঠিক ফাটাবার মুহূর্ত্তে টুকরোগুলো বিদ্যুৎবেগে একত্র হয়ে যায়, তাহলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হবে, নচেৎ নয়। প্রতিফলন ও প্রতিক্রিয়ার সহায়ক

হিসেবে এমন মৌল ব্যবহার করা হয়, যার ভরাঙ্ক খুব বেশী, পরমাণবিক ওজন খুব বেশী, যে নিউট্রোন সমূহকে প্রায় শোষণ করে না বলা চলে, আবার নিউট্রোনদের দ্রুতগতিতে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করে না। মৌলের ভরাঙ্ক বেশী হওয়াতে বিস্ফোরকের প্রসারণে বাধা দেয় অর্থাৎ আরও বেশী চাপ পড়ে। তার ফলে বিস্ফোরণের স্থায়িত্ব এবং শক্তি অধিকতর হয়।

যেহেতু সংকট-ভরাপেক্ষা কম আয়তনে বিস্ফোরণ হতে পারে না, সুতরাং পরীক্ষার জন্ত ছোট এ্যাটম-বোমা তৈরী করা সম্ভব নয়। পুরাপুরি বোমা তৈরী করেই পরীক্ষা চালাতে হবে। পরীক্ষার জন্ত প্রথম এ্যাটম-বোমা ফাটান হয় ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই, নিউ মেক্সিকোর আলামোগর্দোতে। কাগজে-কলমে হিসেব করে প্ল্যানানুযায়ী। তার পর শৌর্য্যে, বীর্য্যে, রণ-কৌশলে জাপানকে আঁটতে না পেরে, ইঙ্গ-মার্কিণ রণকর্তারা মেঘের আড়াল থেকে তু'টো এ্যাটম-বোমা ফেলে, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে হিরোশিমা ও নাগাসাকিকে ধ্বংস করে জাপানকে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করলে। তাদের অমানবতা ও এ্যাটম-বোমার ধ্বংস-শক্তি দেখে বিশ্ববাসী শঙ্কিত স্তম্ভিত হয়ে গেল। যুদ্ধের আইন-কানুন, কোন-কিছুর প্রতিই তারা সম্মান দেখালে না। নিরীহ শিশু নারী বৃদ্ধকে হত্যা করতে তাদের বিবেকে আটকাল না। প্রায় বছর খানেক পরে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বিকিনে এ্যাটলে তু'টো এ্যাটম-বোমা ফাটান হল, একটা শূন্যে, আরেকটা জলের তলায়। উদ্দেশ্য ছিল সামরিক সম্ভার প্রকরণে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে এই বোমার কি রকম প্রতিক্রিয়া হয় তা পরীক্ষা করা। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল ও মে মাসে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের এনিওয়েটক এ্যাটলে মার্কিণ পরমাণবিক শক্তি কমিশনের তরফ থেকে তিনটে উন্নত এবং নতুন ধরণের বোমা ফাটান হয়; এবার উদ্দেশ্য ছিল এই শক্তি কি উপায়ে সামরিক এবং অসামরিক কার্য্যে ব্যবহার করা যায় সেই সম্পর্কে পরীক্ষা করা। শুনা যায়, এর থেকে ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্ত অনেক মাল-মশলা পাওয়া গেছে। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসেও পরীক্ষামূলক ভাবে কমিশনের তরফ থেকে বোমা ফাটান হয়েছে। ফলাফল সম্বন্ধে সরকারী ভাবে এখনও কিছু জানা যায় নি।

এ্যাটম-বোমা বিস্ফোরণের ফলে যে প্রচণ্ড তাপ উদ্ভূত হয়, তার টেম্পারেচার দশ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। প্রায় সূর্য্যের আভ্যন্তরীণ তাপের সমান। ফলে ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামের ভাঙ্গা-অভাঙ্গা সব-কিছুই প্রচণ্ড চাপের গ্যাসে পরিণত হয়। এই অত্যুত্তপ্ত গ্যাস ছাড়া পেয়ে হঠাৎ প্রসারিত হওয়ার ফলে অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে। বিস্ফোরণের প্রলয় লীলায় বেশ বড় অংশ গ্রহণ করে। ভাঙ্গনের শক্তির কিছুটা গামা বিকিরণরূপে নির্গত হয়। এই বিকিরণ শরীরের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী। জীবনী-শক্তি নষ্ট করে দেয়। কিছুটা শক্তি বিটা গামা তেজষ্ক্রিয়তার রূপ নেয়। প্রচণ্ড তাপের জন্ত জীব মারা যায়, গাছ-পালা পুড়ে যায়, বিস্ফোরণের স্থান হতে বহু দূর পর্য্যন্ত এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিস্ফোরণের বহু দিন পরেও এর প্রতিক্রিয়ার কুফল দেখা যায়। পুরুষত্বহানি, ক্যান্সার, শ্বেত কণিকার আতিশয্যে রক্ত দূষিত হওয়া (লিউকেমিয়া) ইত্যাদি বহুবিধ রোগ দেখা দেয়।

শান্তিনিকেতনের দুটি উৎসব

শ্রীসুব্রত কর

শান্তিনিকেতন আশ্রমের অন্যান্য অনুষ্ঠান-দিবসের চেয়ে "গান্ধী-পুণ্যাহ" দিনটির মূল্য কম নয়। আশ্রমবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে এ দিনটিকে স্মরণ করে থাকে। গান্ধিজীর জন্ম ও মৃত্যুদিন অনেক জায়গায় পালন করা হয়। বই পড়ি, সভাসমিতি করি, কিন্তু এ সব ক'রে আমরা মহাত্মাজীর সম্বন্ধে কর্তব্য কতটুকুই বা করতে পারি? তাঁকে দেখতে হবে তাঁর কাজের ভিতর দিয়ে।

মহাত্মাজী দেখতে ছিলেন এক জন সাধারণ লোক। সাধারণকে নিয়েই তাঁর কাজ চলেছে। কি হলে স্বাধীন হওয়া যায়, সকলের ভিতর তিনি তারই মন্ত্র দিয়ে বেড়াতেন। তিনি শুধু বক্তা ছিলেন না। যা বলতেন, তাই ক'রে দেখাতেন।

গান্ধিজী নিজের কাজ নিজে করার পক্ষপাতী ছিলেন। কাপড়, জামা, বাসন, বাড়িঘর এ সমস্ত নিজেই পরিষ্কার করতেন। কাজটা খুব কঠিন নয়, কিন্তু এর জন্যও আমাদের লোকের দরকার হয়। সে-লোক কাজে ফাঁকি দিচ্ছে কিনা,—তার জন্য আবার আরেক জন লোকের দরকার পড়ে। এর চেয়ে নিজে করে নিলে কাজটি ভালো হয়। মনের জোর বাড়ে। একেই বলে আত্মনির্ভরতা। সহজে ব্যাপারটির মীমাংসা হল। কিন্তু এই আত্মনির্ভরতা বাড়াবার জন্য দেশে চলেছিল কত কাল ধ'রে কত সভা, কত বক্তৃতা। গান্ধিজীর একটি কথাই ছিল,—যদি প্রকৃত স্বাধীনতা পেতে হয় তবে অনেক দিন আমাদের মেথরগিরি করতে হবে। ভারতবর্ষে আমাদের বস্তিগুলির আশ-পাশ থাকে নোংরা। এই নোংরামির জন্যই লোকের ক্ষতি হয়। স্বাস্থ্য ভালো থাকে না, লোক দুর্বল হয়ে যায়। স্বাস্থ্যই জাতির উন্নতির পথ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যের একটি বড়ো দিক। এ জন্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে গান্ধিজী এত প্রয়োজনীয় মনে করতেন।

গান্ধিজী প্রথম কাজে নামেন দক্ষিণ-আফ্রিকায়। সেখানে বর্ণবৈষম্য ছিল প্রধান সমস্যা। কালো আদমিরা ব্যবসাতে সেখানে সুবিধা করেছিল। কিন্তু শ্বেতকায়রা সেটা সহ্য করবে কেন? তারা ভারতীয়দের সমস্ত সুখ-সুবিধা বন্ধ করে দেয়। তাই নিয়ে এক আন্দোলন শুরু হয়। এতেই গান্ধিজী প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময় চার্লস এনড্রুজ এবং পিয়ার্সন সাহেব তাঁকে সাহায্য করতে যান কবিগুরুর বাণী নিয়ে। গান্ধিজী সে যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন।

ছাত্র ও কর্মীদের নিয়ে গান্ধিজীর অনুগামীদের একটি দল দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে শান্তিনিকেতনে আসেন। 'দেহলি' নামক ঘরটিতে তাঁরা থাকতেন। এদিকে গান্ধিজী ছিলেন ইংলণ্ডে। কাজের লোক তিনি। ১৯১৪ সনে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধে। আহত সৈন্যদের সেবা-শুশ্রূষার কাজে লেগে গেলেন তিনি ভারতীয়দের একটি দল গ'ড়ে নিয়ে। এর পরে তিনি ভারতে ফিরে এলেন।

আশ্রমে হঠাৎ এক দিন শোনা গেল গান্ধিজী আসছেন। শিক্ষক ও ছাত্রমহলে সাড়া পড়ে গেল। গুরুদেব তখন কলকাতায়। এদিকে গান্ধিজী এসে উপস্থিত। আশ্রমের রাস্তায়-রাস্তায় গেট সাজানো হল। সম্পূর্ণ বৈদিক প্রথানুসারে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে তাঁকে আশ্রমবাসী অভ্যর্থনা করলেন। আশ্রমে এসেই ঘুরে-ঘুরে তিনি সব জায়গাটা দেখতে লাগলেন। ছাত্রদের সঙ্গে মিলে গেলেন। তিনি যে তাদের অতিথি, এ কথা কারো মনেই হল না। পরদিন সভা বসল। আশ্রমের দলবল গান শোনাল। গান্ধিজী বললেন, আমাদের সব কাজ নিজেদেরই করতে হবে। যত দূর সম্ভব, বিদেশীর হাত থেকে আমরা রেহাই পাবার চেষ্টা করব। হঠাৎ যুদ্ধ ক'রে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে রাতারাতি স্বাধীন হ'তে পারব না। আগে আমাদের চরিত্র গঠন করতে হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে। এ না হলে আজ হয়তো ইংরেজ যাবে কিন্তু কাল আবার আমেরিকা এসে হানা দেবে। তখন দেশে রয়েছে বিদেশী গবর্ণমেন্ট। বিদেশী পোষাক ও আচার-ব্যবহার দেশ ছেয়ে ফেলেছে। গান্ধিজীর কাছে তাঁর বোম্বের অভ্যর্থনার চেয়ে শান্তিনিকেতনের অভ্যর্থনা বেশি ভালো লেগেছিল। বোম্বের সাজানো-গোজানো অনেকটা ছিল বিদেশ-ঘেঁষা। এই সমস্ত বিদেশী অনুকরণের প্রতি তিনি ছিলেন খাপ্পা। আমাদের দেশে ভালো জিনিস থাকতে অন্যের জিনিসের উপর কেন নির্ভর করে থাকব? শান্তিনিকেতনের অভ্যর্থনায় দিশি সাজসজ্জা ও রীতিনীতি দেখে—এ কথাগুলি তাঁর আরো বেশি ক'রে মনে হ'তে লাগল, কিন্তু শান্তিনিকেতনেরও যাতে আরো স্বাবলম্বন বাড়ে এ জন্য তিনি আশ্রমে জল তোলা, বাসন মাজা, রান্না করা সমস্ত কিছুই নিজেদের করার প্রস্তাব তুললেন। বললেন, চাকর বা মেথর ব'লে কোনো পদার্থই আশ্রমে থাকবে না।

কিন্তু এই উক্তিতে মাষ্টার ও কর্মীদের মধ্যে দুটি ভাগ হল। এক দল বলতে লাগলেন, তবে তো পড়াশুনা কিছুই হবে না। এ সব কাজই শুধু চলতে থাকবে। আরেক দল গান্ধিজীর বাণীকেই মানল।

আগের দলের উত্তর গান্ধিজী দিয়েছিলেন। বলেছিলেন,—'বই প'ড়ে জেনে কী করবে? তাতেও তো রয়েছে কাজেরই প্রেরণা।' এই কাজের জন্য যদি পড়াটা বন্ধ থাকে তাতেই বা ক্ষতি কী? বইয়ের শিক্ষাটাই কি প্রধান? যা হোক, শেষ কালে সকলে একমত হল। ছাত্রদের একবার বলাতেই তারা রাজী। তার পরে রীতি-মতো কাজ শুরু হয়ে গেল। চাকর-বাকরদের ছুটি দেওয়া হল। কাজে যারা একেবারে অনভিজ্ঞ, তারাও লেগে গেল। একটি দল হল রান্নার, একটি বাসন মাজার, আরেকটি দল হল আশ্রম পরিষ্কার করার। এ ছাড়াও জোয়ান-জোয়ান লোকেরা লেগে গেল জল তোলার কাজে।

এ ক্ষেত্রে গান্ধিজী রবীন্দ্রনাথেরও পরামর্শ নিয়েছিলেন। গুরুদেব তাঁর নিজের মন্তব্য হঠাৎ ইচ্ছামতো কোনোখানে দিতেন না।

তিনি ব্যাপারটি ভালো করে জানলেন। তার পরে রায় দিলেন, উত্তম, যদি মাষ্টার ও ছাত্র সকলে একমত হয় তবে কাজটি চলতে পারে। আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করার ছিল যে, রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে যা ফুটে উঠত, সে সব আদর্শ গান্ধিজীর কাজের মধ্যে প্রকাশ পেত।

কিছু দিন পরে গুরুদেব আশ্রমে ফিরে এলেন। তিনি সুরুলে রইলেন। সে সময় সেখানে বসে তিনি তাঁর 'ফাল্গুনী' নাটক রচনা করেন। কেহ কেহ মনে করেন, সে নাটকের 'দাদা'-র মধ্য দিয়ে তিনি গান্ধিজীর প্রতিমূর্তি কিছুটা এঁকে থাকতে পারেন।

প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময়ে গুরুদেবের কাছে সমস্ত দিনের কাজের রিপোর্ট যেত। গান্ধিজী আরেকটি বিষয় ছাত্রদের বলেছিলেন,—কাজ করো। তার পর যা সময় থাকে তাই তুমি তোমার পড়ার কাজে লাগাও। তবে কাজ ও পড়া দুই-ই চলবে:—কিন্তু, কাজটা বেশ কিছু দিন চলার পর সকলেরই কেমন বিরক্তি বোধ হতে লাগল। সকলের ধাতে সইল না। সন্ধ্যার সময় ছাত্রেরা এক-একটি দলে মিলে এই কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করত। অনেকে বলতে লাগল,—পারব না। কথাটা গান্ধিজীর কানেও গেল। তিনি বললেন, ঠিক আছে। জিনিসটি যদি এত সহজেই হয়ে যেত, তাহলে তো স্বাধীন হবার জন্ম কিছুমাত্র ভাবতে হত না। দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হলে অনেকেই হোঁচট খেয়ে পড়বে। তাদেরই বার বার পথ চিনিয়ে দিতে হবে।

এর পর হঠাৎ এক দিন গান্ধিজী হরিদ্বারে যাবেন ব'লে ঠিক করলেন। সেখানে কুম্ভমেলা হচ্ছিল। এর মধ্যে একটি দুঃসংবাদ পৌঁছল। গান্ধিজীর গুরু গোখলে মারা গেছেন। মধ্যে তিনি একবার বোম্বে গিয়ে ঘুরে এসেছিলেন। ফিরে এসে হরিদ্বারে যাত্রা করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সারা ভারতবর্ষটা প্রথমে ঘুরে দেখা। কারণ, গোখলে তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে প্রথমেই রাজনীতির ক্ষেত্রে নেমো না। ভারতের লোকের মনোভাব জানবে, তার পরে কাজ করবে। তাই তিনি কোনো জায়গায় একটানা বেশি দিন বসে থাকতে পারতেন না। শান্তিনিকেতনে এই কাজ উপলক্ষ্যে ছিলেন ১৫ দিন। যে-দিনটিতে তিনি সবাইকে এখানে নিজেদের কাজে নিজেদের প্রবৃত্ত করান, সেদিনটি হচ্ছে ১০ই মার্চ। ১১ই মার্চ তিনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে যান বাইরের কাজে।

তার পর থেকে প্রতি বছরের মতো এবারেও ঐ ১০ই মার্চ এল। আশ্রমে গান্ধিজীর আদর্শের প্রতি ও তাঁর পুণ্য-সংযোগের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্ম শান্তিনিকেতন আশ্রমে সেদিন ছুটি ছিল। কিন্তু ভোর না হ'তে প্রতিবারের মতোই আশ্রমে লেগে গিয়েছিল এক কাজ-কাজ উৎসব। ছেলে-বুড়ো সকলে মিলে আশ্রমের সকল স্থানের ময়লা ঘুচিয়ে ফিরছিল। রান্না-বান্না, বাসন মাজা—সব কাজেই সকলের কী উৎসাহ! আগের দিনই কর্মীদের নাম ও কাজের এলাকা প্রকাশ্য স্থানে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল। সেদিন বিকেলে আমবাগানে এক জন অধ্যাপক ছেলেদের মধ্যে "গান্ধী-পুণ্যাহে"র সব কথা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কাজের দিনটিতে সকালে গৌর-প্রাঙ্গণে সকলে জমা হল। শিশুরা গেল প্রাঙ্গণ-পরিষ্করণে। বড় ছেলেমেয়েরা গেল রান্নায়। থালা-বাসন মাজার কাজও তারাই করল। প্রতি দলে এক জন ক'রে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন। গাছের তলাগুলি শুকনো পাতায় ছেয়েছিল। বকুল ও আমের ডাল ভেঙে ঝাঁটা তৈরি ক'রে নিয়ে চলছিল ঝাঁটের পালা। দু'মিনিটে সব সাফ হয়ে গেল। এক জায়গায় ময়লা জড়ো ক'রে সব পুড়িয়ে দেওয়া হল।

আগে আগে আশ্রমের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর রান্নাঘরে এদিনে খাবার ব্যবস্থা থাকত। কিন্তু আজ-কাল জিনিসপত্রের অনটনের দিনে তা সম্ভব হয় না। রান্নাঘরের উপরেই কাজের চাপটা পড়ে বেশি। আশেপাশের জায়গা থেকে সে-ঘরের ভিতরের আনাচ-কানাচ অবধি সব সাফ করা চাই। ঠাকুর-চাকরদের সেদিন ছুটি। কাজেই সেখানে প্রায় দক্ষযজ্ঞ লেগে গিয়েছিল। কেউ বলছিল, 'গেলাম গেলাম', 'হাত পুড়ে গেল', কেউ বা বঁটিতে আঙুল কেটে ফেলছিল; আইডিন, ব্যাণ্ডেজ সমস্তই এসে হাজির। মস্ত-মস্ত ড্রামে জল ভর্তি করে রাখা চাই। কারো নাম ধ'রে কেউ হাঁক পেড়ে চলছে—একটু সাহায্য করার জন্ম। ছেলেদের মনে উৎসাহ জাগাবার জন্ম এক দল আবার বাজনা বাজিয়ে শোনাচ্ছেন। উদ্দেশ্য মহৎ—পরিশ্রমটা একটু হালকা করে দেওয়া। সমস্ত আওয়াজ মিলিয়ে একটি চাপা আওয়াজ দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল। সব আনন্দ খাবার হল-ঘরে খেতে-খেতে পায় প্রকাশ। আলুনি, পোড়া বা আধসেদ্ধ—যাই হোক—সবই উৎসাহের মুখে অমৃত হয়ে ওঠে। নিজেদের হাতের রান্না! কত বা তার নাম! খেতে খেতে মহোৎসবের মতো ধ্বনি। কোনো দিকে একটু ক্লান্তি নেই। এই ভাবে কাজের ভিতর দিয়েই শান্তিনিকেতনে গান্ধিজীকে প্রতি বছর আনন্দের সঙ্গে অনুভব করার চেষ্টা হয়ে থাকে। ছুটির সাজ-পরানো এ যেন একটি কাজের উৎসব।

[আগামী বারে সমাপ্য।

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১২

ওদিকে বিঠুরেও পেশোয়ার উত্তরাধিকারীদের ভাগ্যাকাশে অনুরূপ বিপর্যয় এসেছিল—ঝাঁসীর দুর্ঘটনার কয়েক বছর পূর্বেই। পিতা মোরপন্থের কাছেই রাণী পেশোয়ার মৃত্যুসংবাদ এবং সেই সঙ্গে ইংরেজের সন্ধি-সর্ত ভঙ্গের কাহিনী শুনে স্তম্ভিত হন। তখন রাণী নিজেই স্বামিশোকে অভিভূতা, বাইরের কোন ব্যাপারেই তিনি মন নিবিষ্ট করতে পারতেন না। তবুও বিঠুরের এই দুর্ঘটনা তাঁর মনে গভীর বেদনার সঞ্চার করে, নিজের মনেই তিনি ভাবতে থাকেন—যে ইংরেজের প্রতি পেশোয়ার এত বিশ্বাস ও উচ্চ ধারণা ছিল, সেই ইংরেজ পেশোয়ার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অত বড় ঐতিহাসিক সন্ধিপত্র ছিঁড়ে ফেলে তাঁর উত্তরাধিকারী দত্তকদিগকে বৃত্তি থেকে বঞ্চিত করলেন? নানা সাহেবের সম্বন্ধেও রাণী শুনেছিলেন, ইংরেজদের সঙ্গে তিনি খুব মেলামেশা করে থাকেন, নানা ভাবেই ইংরেজের তোয়াজ করে আনন্দ পান, এমন কি তাদের সঙ্গে খানাপিনা করতেও নাকি বাধে না, অথচ, সেই নানা সাহেবকেই পৈতৃক বৃত্তি থেকে বঞ্চিত করল ইংরেজ? তাই তিনি গম্ভীর মুখে

পিতাকে তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'ইংরেজের এত বড় অন্যায় হিন্দুস্থানের লোক সহ্য করবে বাবা ? কেউ কোন প্রতিবাদ করলে না ? পন্থজী মৃদু হেসে উত্তর করেন—'ইংরেজের অগ্নিগর্ভ কামান আর জবরদস্ত সেপাই যে দেশশুদ্ধ লোকের মুখ বন্ধ করে রেখেছে মা, প্রতিবাদ কে করবে ?' রাণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন—'পেশোয়াজীর মুখ চেয়ে নানা ভাই ত ইংরেজের সঙ্গে খুব খাতির জমিয়েছিলেন শুনেছি, তবুও ইংরেজ এমনি করে তাঁদের সর্বনাশ সাধলে ! এখন নানা সাহেব কি করবেন বাবা ? অন্তত তাঁর ইংরেজ-মোহ ত কেটে গেছে ?' মুখখানা ভার করে পন্থজী বলেন—'নানার প্রকৃতি বোঝাই মুস্কিল মা ! আমরা এই খবর পেয়ে তাঁকে যখন সান্ত্বনা দিতে গেলাম, তাঁর মুখ দেখে কে বলবে যে তিনি এ ব্যাপারে ভেঙে পড়েছেন বা মনে কিছুমাত্র আঘাত পেয়েছেন ! আমাদের দেখেই হো-হো করে হেসে বললেন—আমি জানতাম যে পিতাজীর অতি-ভক্তির বখশিস্ এই ভাবেই ইংরেজ দেবে। তাই ঐ তসবিরখানার সামনে দাঁড়িয়ে বলছিলাম—'পিতাজী, ওপর থেকে দেখুন—কোটি কোটি টাকা আয়ের সাম্রাজ্য ছেড়ে দিয়ে আট লাখ টাকার বৃত্তিতেই তুষ্ট হয়ে যে ইংরেজের সঙ্গে দোস্তী করেছিলেন, আমাদের ক'ভাইকে মাথার দিব্যি দিতেন—ইংরেজকে তোয়াজ করতে যাতে পাণ থেকে চুণটুকুও না খসাই ; এখন দেখুন—আপনি চোখ বুজতে না বুজতে আপনার সেই ইংরেজ অত বড় জমকালো সন্ধিপত্রখানা চোতা কাগজের মতন ছিঁড়ে ফেললে ! তবুও ইংরেজের ওপর বিশ্বাস হারাইনি—তোয়াজ করে চলিছি।' রাণী নিবিষ্ট মনে কথাগুলি শুনে বলেন—'পেশোয়া এখন স্বর্গে, তাঁর ভুল-ভ্রান্তির জন্যে ছেলেদের ভুগতে হবে। কিন্তু নানা ভাইয়ের ভুল কি এখনো ভাঙেনি বাবা ?' পন্থজী উত্তর করেন—'তা জানি না মা, তবে তিনি ভারতের ইংরেজ সরকারের এই হুকুমের বিরুদ্ধে বিলেতের সরকারের কাছে নালিশ করবেন। তাঁর পক্ষ থেকে আজিমউল্লা বিলেতে যাবে ওঁর এজেণ্ট হয়ে।' রাণী জিজ্ঞাসা করেন—'আজিমউল্লাটি কে ?' পন্থজী জানান—'নানা সাহেবের এক শিষ্য। ইংরেজের হোটেলে খানসামার কাজ করত এই আজিম। নানা ত ইদানীং ইংরেজী হোটেলে যাওয়া-আসা করতেন। সেখানে আজিমকে দেখে ভারি খুসি হন। ছেলেটি চালাক-চতুর, আর চটপটে। নানা তাকে বিঠুরে এনে নিজের হাতে তৈরী করেন ; এক জন ইংরেজকে মাইনে করে রেখে ইংরিজী লেখাপড়া শেখান। সেই এখন নানার ডান হাত। নানা তাকেই বিলেত পাঠাচ্ছেন ঐ ব্যাপারে তদ্বির করতে।' রাণী এ খবর শুনে চুপ করে থেকে জোরে একটি নিশ্বাস ফেলে বলে ওঠেন—'একেই বলে কালচক্রের গতি। মহামানী পেশোয়ার বংশধরকে আজ বৃত্তির জন্যে বিলেতের ইংরেজ দরবারে আর্জী পাঠাতে হচ্ছে—এক দিন ঐ বিলেতের রাজার দূত পেশোয়ার দরবারে কোঙ্কণ প্রদেশে বাণিজ্যের সনদ পাবার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসে আর্জী জানিয়েছিল। নিয়তির কি বিচিত্র লীলা !'

বিচিত্র লীলাই বটে ! একদা যে স্বনামধন্য পেশোয়া বাজীরাও ধূমকেতুর অনলোজ্জ্বল পুচ্ছের মত এক অজেয় রণবাহিনী চালনা করে সারা ভারতে শিহরণ তুলে পেশোয়া-চক্রকে সার্বভৌম শক্তির মর্যাদা দিয়েছিলেন—দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহ, নিজাম চিন কিলিচ খাঁ আমক শা, গুর্জরপতি নবাব সরবুলন্দ খাঁ, মালবেশ্বর গিরিধর রাও প্রমুখ তৎকালের পরাক্রান্ত শক্তিসমূহ পেশোয়ার প্রভুত্ব স্বীকার করে যৌথ দানের সর্তে আবদ্ধ হয়েছিলেন, সেই বংশের শেষ পেশোয়া ঐ মহান্ পেশোয়ার গৌরবান্বিত নাম গ্রহণ করে শুধু যে পৃথিবীর ইতিহাসের এক বিরাট পুরুষের অপরাজেয় নামটিকে হীনতার বন্ধন পরিয়ে কলঙ্কিত করলেন তা নয়—সেই সঙ্গে হিন্দুস্থানে মহান্ পেশোয়ার বিপুল প্রতিষ্ঠার ধ্বংসস্তূপের উপর ইংরেজের সার্বভৌম ক্ষমতাপ্রাপ্তির বিজয়-পতাকা প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ হলেন, ১৮১৮ অব্দের অভিশপ্ত দিবসে। ১৭৫৭ অব্দে পলাশী যুদ্ধে স্বাধীন নবাবী আমলের অবসানে ভারতের মাটিতে ইংরেজ-প্রভুত্বের ভিৎ ওঠে, আর—এরই ষাট বছর পরে ১৮১৮ অব্দে পেশোয়া রাজশক্তির পতনে সেই ভিতের উপর সাম্রাজ্যবাদের অজেয় দুর্গ তুলে ইংরেজ দিক্‌বিজয়ে প্রবৃত্ত হয়। ১৮১৮ অব্দে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে পুরুষানুক্রমে বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তির বিনিময়ে সমগ্র রাজপাট ইংরেজের হাতে ছেড়ে দিলেন। চতুর ইংরেজ এই সামরিক জাতটাকে হাড়ে-হাড়ে চিনেছিলেন। তাই সন্ধিবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে অতীত প্রতিপত্তির মোহ যাতে এই পরাজিত মারাঠা নৃপতিকে পুনরুত্তেজিত না করে তোলে বা পুনরায় মারাঠা-চক্র সংগঠনে সমর্থ না হন, সে জন্য তাঁকে তাঁর পূর্ব রাজধানী পুণা থেকে অনেক তফাতে—কানপুর থেকে কয়েক ক্রোশ দূরবর্তী বিঠুর প্রদেশে নূতন আবাস-ভবনে বসবাস করতে বাধ্য করলেন। এর পর দীর্ঘ সাতাশ বছর তিনি বেঁচেছিলেন, কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন দিন তিনি হৃতরাজ্য উদ্ধারকল্পে সচেষ্ট হননি, এমন কি ইংরেজের বিরুদ্ধে কোনরূপ ষড়যন্ত্রেও যোগ দেননি—বরং সন্ধিপত্রে ব্রাহ্মণসুলভ প্রতিশ্রুতি বজায় রেখে ইংরেজের বিপদে অর্থ ও লোকবল দিয়ে সাহায্যই করেছেন বরাবর। বার্ষিক বৃত্তি ছাড়াও বিঠুর জায়গীরের বিপুল আয় থেকে তিনি অতুল ঐশ্বর্যশালী হয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের বন্ধন, প্রতিশ্রুতি, সন্ধিপত্র সব ছিন্ন হয়ে গেল তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে।

দ্বিতীয় বাজীরাও অপুত্রক ছিলেন। বিঠুরে এসে তিনি পর পর কতিপয় দত্তক গ্রহণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর দত্তক পুত্রের অনুকূলে এই ভাবে এক উইল করেন—'ধুন্দুপন্থ নানা আমার প্রথম পুত্র, গঙ্গাধর রাও আমার সর্বকনিষ্ঠ ও তৃতীয় পুত্র, এবং সদাশিব পন্থদাদা আমার দ্বিতীয় পুত্র পাণ্ডুরঙ্গ রাওএর পুত্র—এই তিনটি আমার পুত্র ও একটি পৌত্র। আমার মৃত্যুর পর আমার সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র ধুন্দুপন্থ নানা মুখ্য প্রধানরূপে আমার পেশোয়ার গদীর অদ্বিতীয় অধিপতি হবে। ১৮৩৯ অব্দে এক উইলে তিনি জ্যেষ্ঠ দত্তক পুত্র নানা সাহেবকে পেশোয়ার গদী এবং সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী বলে উল্লেখ করেন।

পণ্ডিত রামচন্দ্র পন্থ ছিলেন পেশোয়ার পরম বন্ধু এবং সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। পেশোয়ার মৃত্যুর পর উইল অনুসারে ইনি নানা সাহেবের পক্ষ থেকে বৃত্তিপ্রার্থী হলে লর্ড ডালহৌসী—দত্তক পুত্র বৃত্তিপ্রাপ্ত হতে পারেন না, এই অজুহাতে নানা সাহেবকে বৃত্তি হতে বঞ্চিত করে সন্ধিপত্রের সম্মান ও পূর্ব মিত্রতার গৌরব নষ্ট করলেন। অবশ্য, বিঠুরের জায়গীরে হস্তার্পণ করলেন না বটে, কিন্তু জায়গীরের অধিবাসীদিগকে ইংরেজের আদালতে দেওয়ানী ও

ফৌজদারী শাসনের অধীন বলে সিদ্ধান্ত জানালেন। বিঠুরে এসে অবধি পেশোয়াই ছিলেন বিঠুর অঞ্চলের সর্বময় স্বাধীন অধিপতি।

মৃত্যুকালে পেশোয়া জ্যেষ্ঠ দত্তক নানা সাহেব এবং তাঁর কনিষ্ঠদের কাছে ডেকে বলে যান—রাজা হয়েও আমি রাজ্যহীন হয়ে চলেছি—রাজপাট তোমাদের জন্যে রেখে যেতে পারলাম না। কিন্তু যে ধনসম্পত্তি ও সুনির্দিষ্ট বৃত্তি রেখে যাচ্ছি, নিঝঞ্ঝাটে রাজার হালেই বংশানুক্রমে তোমাদের জীবনযাত্রা চলবে যদি ইংরেজের সঙ্গে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি রেখে চলো।

ইংরেজের সঙ্গে সম্প্রীতি রেখে চলবার জন্যে পেশোয়া পুত্রদিগকে বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ পুত্র নানাকে প্রায়ই উপদেশ দিতেন। এর কারণ হচ্ছে, নানার প্রকৃতির দিকে চেয়ে কতকগুলি লক্ষণ দেখে পেশোয়া মধ্যে মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হতেন। পেশোয়া-কুলের অতীত গৌরব ও প্রতিপত্তির দিকে নানার অনুরাগ পেশোয়ার চিত্তে সন্দেহের রেখাপাত করে। তিনি জানতেন যে, এই প্রকৃতির ছেলেরাই উত্তরকালে সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। এরা কথা কম বলে, কিন্তু এদের কোন কোন কথা যেন অন্তর বিদ্ধ করে। এক কালের যোদ্ধা ও বিচক্ষণ রাজনীতিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নানার গম্ভীর প্রকৃতি ও দু'টি আয়ত চক্ষুর অস্বাভাবিক দীপ্তি বুঝি ধরা পড়ে গিয়েছিল। সেই জন্যেই তিনি প্রায়ই ইংরেজদের অসাধারণ শক্তি-সামর্থ ও রণনীতির সুখ্যাতি করে তাদের প্রতি অনুরক্ত থাকবার জন্যে অনুরোধ করতেন নানাকে।

কে জানে কেন, নানা ইদানীং ইংরেজের সঙ্গে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি রীতিমত বজায় রেখেই চলছিলেন। পেশোয়াই অবশ্য এর সূচনা করে দেন। তাঁরই ব্যবস্থায় কানপুর থেকে এক জন পাদরী বিঠুরে এসে নানাকে ইংরেজী শেখাতে থাকেন। নানার হাতের হস্তাক্ষর দেখে খুশি হয়ে পেশোয়া তাঁকে নিজের সেক্রেটারীর পদে বাহাল করেন। বন্ধুদের কাছে বলতে থাকেন—'পুরোনো সেক্রেটারীর চেয়ে নানা বেশী কাজের লোক। তাই ত বলি, ওদের বয়সে আমরা তলোয়ার চালিয়েছি, আর অদৃষ্টের ফেরে ওরা চালাচ্ছে কলম।' পিতার কথা শুনে নানার দুই চোখ জ্বলে ওঠে। একদা যে লোক লক্ষ লক্ষ সেনা চালনা করেছেন, একটা বিশাল রাজ্য চালনা করতেন যিনি, তাঁর মুখে আজ এই কথা! এ কি বৃত্তিভোগের পরিণাম? ইংরেজের টাকা কি এমনি করে মানুষকে যাদু করে?

কিন্তু এই সময় থেকে নানা মনের সঙ্গে সংগ্রাম করে মনকে সবলে দমন করে নিজেকে কৃত্রিম ইচ্ছার তালে তালে চালাতে লাগলেন। এখন থেকে প্রায়ই তিনি কানপুরে যান, সেখানকার অফিসারদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেন খুব সহজে। নানার সুন্দর চেহারা, মিষ্টি কথা এবং তোষামোদে কানপুরের হোমরা-চোমড়া ইংরেজরা পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে পিঠ চাপড়ে তাঁর প্রশংসা করেন। পেশোয়ার কানেও এ খবর গিয়ে পৌঁছাত; তিনি তাতে খুবই সন্তুষ্ট হতেন। সবাই দেখে, নানা যেন জোর করে মুখের গাম্ভীর্যকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, এখন সে মুখ সর্বদাই হাস্যময়। কানপুরের ইংরেজ-ললনারা এই সদাহাস্যমুখ সুদর্শন ছেলেটির পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—নানার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে তাদের কি আকুলি-ব্যাকুলি!

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, পণ্ডিত রামচন্দ্র পন্থ যেদিন অত বড় দুঃসংবাদ বহন করে এনে নানাকে শোনালেন, তখনও তাঁর মুখে সেই অপরূপ হাসি! এত বড় বিপর্যয়ের আঘাত সাধারণ কথা নয়; কিন্তু নানাকে এ জন্য কিছু মাত্র উদ্বিগ্ন বা বিপন্ন বলে বুঝা গেল না; ইংরেজের তরফ থেকে এমন একটা আঘাত এক দিন আসবেই, তিনি যেন অনেক আগে থেকেই মনে মনে একটা ঠিক দিয়ে রেখেছিলেন। বিঠুরের যাঁরাই এই খবর পেয়ে নানার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন সহানুভূতি প্রকাশের উদ্দেশ্যে, তাঁরা প্রত্যেকেই স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন এই হাস্যমুখ মানুষটির অপূর্ব মুখভঙ্গি দেখে।

কানপুরে ইংরেজদের ক্লাবেও এই দুঃসংবাদ প্রচারিত হয়েছে, সেখানে নানার সঙ্গে প্রত্যেকেরই আলাপ। সন্ধ্যার সময় তাঁরা সমবেত হয়ে নানার দুর্ভাগ্যের কথাই আলোচনা করছেন, প্রত্যেকের মুখ বিষণ্ণ; তাঁদের মনে হচ্ছিল, সরকার এ ভাবে সন্ধিপত্র ছিন্ন করে ইংরেজ জাতির সততা ও সত্যনিষ্ঠার কণ্ঠ ছিন্ন করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে সন্ধিপত্র লঙ্ঘনের কুখ্যাত দৃষ্টান্তরূপে এ ঘটনা অমর হয়ে থাকবে। এই আলোচনার মধ্যে হঠাৎ নানা এসে উপস্থিত। সেই সুদর্শন চেহারা, মনোহর বেশভূষা, মুখে সেই অম্লান হাসি। অবাক হয়ে সবাই চেয়ে থাকেন নানার মুখের দিকে।

বিহসিত মুখে নানা বললেন: ভালো করে ভোজের ব্যবস্থা হোক, আজকের ভোজের সব খরচ আমার।

নানার বিপদে সমবেদনার ভাষাও কারও মুখ দিয়ে আর নির্গত হতে চায় না, সবাই ভাবে—নানা কি তামাসা করছেন? এক জন ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন: এ কি কাণ্ড! লর্ড ডালহৌসীর সিদ্ধান্তের খবর পেয়েও···

ভদ্রলোকের কথা বন্ধ হয়ে যায়, সবটা বলতে বাধে। নানা তেমনি হাসিমুখে বলেন: তাতে কি হয়েছে? লর্ড ডালহৌসী কলকাতায়, আমরা কানপুরে। তিনি এখানে থাকলে, তাঁকেও আলাদা একটা ভোজ দিতাম।

জনৈক ইংরেজনন্দিনী মিহি সুরে বললেন: কিন্তু নানা, আপনার এত বড় বিপদের দিনে···

কথাটায় বাধা দিয়ে নানা বলে উঠলেন: আজকের বিপদই হয়ত ভবিষ্যতের সম্পদকে ডেকে আনবে। আমি ও-সবের পরোয়া করি না মিস্! আনন্দ করুন, খালি আনন্দ।

সত্যই কানপুরের ক্লাবে সেদিন প্রমোদের প্রবাহ বহে গেল। নানাই তার ব্যয়ভার বহন করলেন। এই প্রসঙ্গে শ্বেতাঙ্গ-মহলেও রীতিমত চাঞ্চল্য উঠল। তাঁরা বললেন: হয় লোকটা খুব চাপা, ক্ষতিটা গায়ে মাখছে না; নয় ত, মৃত পেশোয়ার সঞ্চিত এত টাকা পেয়েছে—এত বড় ক্ষতিকে গ্রাহ্যই নেই!

কিন্তু নানার মনের সত্যকার ভাব বুঝি দেবতারও অনধিগম্য ছিল। সেই মজলিসে রূপসী শ্বেতাঙ্গিনীরা যখন হাসিমুখে কৌতুক করে তাঁকে ইণ্ডিয়ান কিউপিড বলে তারিফ করে, তারই মধ্যে নানার মুখ যেন হঠাৎ বদলে যায়, তাঁর সুন্দর চোখের কালো কালো দু'টি তারা সাপের চোখের মত জ্বলে ওঠে; আবার পরক্ষণে তিনি নিজেকে সামলে নেন। ভোজের পর অশ্বপৃষ্ঠে বিঠুরে ফেরবার সময় কত কথাই তিনি ভাবতে থাকেন, প্রাসাদে প্রবেশ করে চিত্রগৃহে পেশোয়া প্রথম বাজীরাওএর দৃপ্ত প্রতিকৃতির পানে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে আহ্বান জানাতে থাকেন: নেমে এসো, নেমে এসো, হে আমার ইষ্ট, আশা আমার পূর্ণ করো! [ক্রমশঃ।

বঙ্কিম-সাহিত্যে নারী

উমা ঘোষ

বঙ্কিম-সাহিত্যে নারীর ভূমিকা দেখিতে গেলে একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্যে প্রেয়সী বা স্ত্রী ছাড়া একটিও মূল চরিত্র নাই। পার্শ্ব-চরিত্রে যে দুই-একটি নারী আছে তাহা মাত্র মূল চরিত্রকে ফুটাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে। বঙ্কিম দেশকে 'মা' বলিয়া সমগ্র দেশকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার সমগ্র সৃষ্টিতে একটিও 'মা' নাই যে তার স্নেহধারা দ্বারা অথবা চিন্তাধারা দ্বারা একটি সন্তানকেও সঞ্জীবিত করিতে পারিয়াছে। বঙ্কিম-সাহিত্যে একটিও কন্যা নাই, একটিও ভগিনী নাই—যাহারা তাহাদের যোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে পারে। বঙ্কিম-সাহিত্যে পুরুষের ভোগ চরিতার্থ করিবার জন্যই যেন নারী কামনার পাত্র হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নারী তাহার সমস্ত সত্তাকে বিসর্জন দিয়াই বঙ্কিম-সাহিত্যে 'আদর্শ নারী' হইয়াছে। বঙ্কিম-সাহিত্যে নারীর এই একটি মাত্র ভূমিকা উপেক্ষা করিবার নহে। পুরুষের ভোগ্যরূপে নারীকে পরিপূর্ণ মানবীয় সত্তাহীন করিবার জন্য বঙ্কিমের আয়োজন অত্যন্ত কৌশলপূর্ণ। সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্য যদিও বিভিন্ন বিষয় লইয়া এবং বিভিন্ন সমস্যা লইয়া আলোচিত হইয়াছে কিন্তু নারীর প্রেম ছাড়া আর কোন সত্তাকে সেখানে স্থান দেওয়া হয় নাই। এমন কি, আনন্দমঠের শান্তির চরিত্র কিংবা 'দেবী চৌধুরাণী' সম্পর্কে ঐ একই বক্তব্য। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র ভ্রমর-রোহিণী, 'বিষবৃক্ষের' সূর্য্যমুখী বা কুন্দের চরিত্র এবং অন্যান্য সামাজিক উপন্যাস অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই একই বক্তব্য বলিয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র আয়েষা, তিলোত্তমা, বিমলার চরিত্রেও অন্য কোন কিছু বলিবার নাই।

বঙ্কিম-সাহিত্যের এক জন আধুনিক সমালোচক বলিয়াছেন যে, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করাই বঙ্কিমের সাহিত্যের উদ্দেশ্য এবং মধ্যযুগীয় এই ব্যবস্থার অসারতা প্রমাণ করাই বঙ্কিমের বক্তব্য। কিন্তু বঙ্কিম-সাহিত্যে নারী সম্পর্কে তাঁহার একমাত্র বক্তব্য 'প্রেম'। সেই 'প্রেম' লইয়াই আলোচনা করিলে দেখা যায়, বঙ্কিমের বক্তব্য মধ্যযুগীয় ভাবধারা পরিত্যাগ করিয়া অগ্রগতির পথে যাত্রা করে নাই। মানুষের সহিত আছে মানুষের চিরন্তন সম্পর্ক কিন্তু স্বার্থবাদী মানুষ সে সম্পর্ক স্বীকার করে না। তাই মানুষে মানুষে আড়াল করিয়া দাঁড়ায় তাহার অর্থনৈতিক সম্পর্ক—আড়াল করিয়া দাঁড়ায় মানুষের গড়া সামাজিক ব্যবস্থা—আড়াল করিয়া দাঁড়ায় মানুষের গড়া কৃত্রিম ধর্ম্মভেদ, জাতিভেদ। কিন্তু শিল্পীর ধর্ম্ম এই বিভেদকে অস্বীকার করা। মানুষের সাথে মানুষেয় চিরন্তন মিলনের সুরই শিল্পীর বক্তব্য এবং এইখানেই তাঁহার সার্ব্বজনীনত্ব। সেই শিল্পীই শিল্পী হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে, কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে যাহার সুর বাজিয়া ওঠে। শিল্পীর ধর্ম্ম মানুষের ধর্ম্ম। 'প্রেম' সম্পর্কে বঙ্কিমের ধারণা হইতেছে যে, বিবাহ দ্বারা যে প্রেম পবিত্র হয় নাই তাহা প্রেমই নহে, তাহা শুধু মাত্র বিকার। বিবাহ দ্বারা নারী ও পুরুষের যে সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি হয় ইহার কোন ব্যতিক্রমকে তিনি স্বীকার করেন নাই। নারী যখন পুরুষের জীবনের সঙ্গী নহেন, ভোগ্যা হইয়া পুরুষের কাছে আসিয়াছেন তখনই তিনি তাহাদের পবিত্রতম সম্পর্ক দেখিতে পাইয়াছেন। নারীর জীবনের মুক্তি তিনি একই পথে দেখিতে পাইয়াছেন। সামন্ততান্ত্রিক এই বিবাহপ্রথার মূল কথাই হইতেছে—নারীর জীবনের সমস্ত সত্তাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া পুরুষকে তাহার প্রভু করিয়া দিতে হয়। ভালবাসা বা প্রেম কখনই আসিতে পারে না যদি সেখানে দুইটি সত্তার অস্তিত্ব না থাকে। বঙ্কিমের পূর্ব্বেও মধ্যযুগের প্রথম ভাগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণ এ কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া যে প্রেমের দর্শন জগতব্যাপী খ্যাতি লাভ করিয়াছিল তাহাতে সত্যই অত্যন্ত সুক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। আমি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কথাই বলিতেছি।

সেই যুগের প্রেমের ভিত্তি সম্পর্কে যাহারা চিন্তা করিয়াছিলেন তাহাদের কাছেও এ কথা অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল যে, প্রেম যেখানে দায়মুক্ত অর্থাৎ কোন বন্ধন যেখানে নাই সেখানেই প্রেম পবিত্রতার দাবী করিতে পারে। আয়ানের সামাজিক স্ত্রী রাধা, তবুও সেখানে তাহাদের সম্পর্ক পবিত্র নয়, কারণ সেখানে প্রেম নাই। রাধা কৃষ্ণের স্ত্রী নহেন, এমন কি রাধা কুমারীও নহেন যে ভবিষ্যতে তাহার সহিত কোন সামাজিক সম্পর্কের সম্ভাবনা থাকিবে, তথাপি রাধা-কৃষ্ণের প্রেম পবিত্রতম বলিয়াই বৈষ্ণব দার্শনিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। এই ভালবাসারই জয় গাহিয়াছে সমগ্র বৈষ্ণব-দর্শন—সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্য। বৈষ্ণব-দর্শনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ও দ্বারকায় রাণীগণ হইতে রাধার প্রেম শ্রেষ্ঠ। কারণ,—প্রেমের মাঝখানে কোন বন্ধন আড়াল করিয়া দাঁড়ায় নাই। কিন্তু দার্শনিকগণ প্রেমের মূলসূত্র ঠিকই ধরিতে পারিয়াছিলেন যে, মানুষের সহিত আছে মানুষের চিরন্তন সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের উপরে সামাজিক বন্ধন নহে। তাই তাহারা প্রথামুক্ত—বন্ধনমুক্ত

প্রেমের কথা লিখিতে পারিয়াছিলেন। জীবনের মর্ম্মকথা কহিতে পারিয়াছে বলিয়াই সাধারণ মানুষের কাছে তাহার আবেদন এত বেশী; শুধু মাত্র আধ্যাত্মিকতার দ্বারা ইহা সম্ভব হইত না। আধ্যাত্মিকতার আড়ালে বৈষ্ণব-দর্শনে যে জীবনস্রোত বহিতেছে তাহারই সুরে কথা কহিতে পারিয়াছিল বলিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বৈষ্ণব-সাহিত্য-জীবনের ভিত্তিমূলে নাড়া দিতে পারিয়াছে। আজিকার দিনে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তিতে সমান অধিকারের দাবীতে বিবাহ এবং সেই বিবাহের ভিতর প্রেমের অবাধতা ও পবিত্রতা কল্পনা করা সেদিনের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই প্রেমের সর্ব্বপ্রধান সূত্র আবিষ্কার করিয়াও তাহাকে নিষ্কামের ভিত্তিতে অপার্থিব রূপ দেওয়া বা sublimate করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

বঙ্কিম-সাহিত্য মধ্যযুগের নহে। আধুনিক যুগের আরম্ভই বঙ্কিমের আবির্ভাবে। বঙ্কিম-সাহিত্য আধুনিকতার লক্ষণে পরিপুষ্ট। বিশেষ বঙ্কিম-সাহিত্য ব্যক্তি-জীবনের রূপ—তার আশা, নিরাশা, তার আবেগতার আকুলতার দ্বন্দ্ব লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। আধুনিকতার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ এই ব্যক্তি-জীবনের রস। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অসাধারণ প্রতিভায় অপূর্ব্ব রস সৃষ্টি করিয়া সেদিনকার শিক্ষিত শ্রেণীর মন জয় করিয়া লইয়াছিলেন—সেদিনকার শিক্ষিত সমাজ যে আসন তাঁহাকে দিয়াছিল আজও সে আসন বিচ্যুত হয় নাই—হওয়ার প্রয়োজনও আসে নাই। তথাপি এ কথা আমরা নিশ্চয়ই মনে করিতে পারি, মধ্যযুগে বাস করিয়াও কঠিন সামাজিক বন্ধনের ভিতর জীবনের মর্ম্মকথা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—বঙ্কিমের সাহিত্যে তাহার আরো অগ্রগতির সম্ভাবনা ছিল। তাঁহার প্রতিভাদৃপ্ত রস-সমৃদ্ধ সাহিত্যের মারফৎ যে প্রচারকার্য্য চালাইয়াছেন তাহাতে তিনি সমাজের পুরানো প্রথা ও সংস্কারকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন। মানুষের সহিত মানুষের যে চিরন্তন সম্পর্ক আছে তাহাকে অস্বীকার করিয়া যে সব প্রথা বা সংস্কার সৃষ্টি করিয়া মানুষের উপর মানুষ নির্ম্মম শোষণ ও প্রভুত্ব চালায় তিনি তাহারই জয় গাহিয়াছেন। মধ্যযুগের সামাজিক শাসনে সে সকল প্রথা শোষণের জন্ম সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা হইতে তিনি নূতনতর কোন মুক্তির পথ দেখান দূরের কথা, তাহার সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিও তিনি সহ্য করিতে রাজী ছিলেন না।

ভদ্দোরলোকের মেয়ে

শ্রীবারি দেবী

ভদ্রলোকের মেয়ে হওয়া নয়কো কিছু অপরাধ,
সে নামেতে এত কেন দিয়েছো ভাই অপবাদ?
কে বলেছে উপেক্ষিতা ছিলাম মোরা ইতিহাসে—
আজো মোদের যশের জ্যোতি জ্বলে ভারত-মহাকাশে।
সনাতনী নিয়ম দেখে দোষ দিয়েছো রকমারী,
গুণও যে তার ছিলো কিছু উল্লেখ নেই কিছু তারি।
ষোল আনা পাওনা যদি সবাই আদায় করতে চায়,
ত্যাগের বাণী ভারতেরে কে তবে শোনাবে হায়?
প্রকৃতি ও পুরুষ দোঁহে এক বস্তু কভু নয়
পুরুষ জনম কঠোর যেমন, নারী কোমলতাময়।
পুরুষ বৃক্ষ, নারী লতা, এ ছাড়া ত গতি নাই,
প্রাকৃতিক নিয়ম এটা এ দুনিয়ায় দেখি তাই।
স্থল, জল ও নভঃ মাঝে প্রাণী জগৎ দেখ চেয়ে,
পুরুষেরই শ্রেষ্ঠ আসন, তার অধীনে যত মেয়ে।
খনা দেবী বিদ্যাবতী পুরুষেরই রাখতে মান
জিহ্বা কেটে স্বইচ্ছায় করেছিলেন আত্মদান।
পুরাণ ও ইতিহাসে অগ্নিশিখা কত মেলে,
কত মহামানবেরে ভারত-নারী জন্ম দিলে।
ভারত-নারী স্বামী-পুত্র তরে করবে আত্মদান,
নয়কো এটা অগৌরবের নাই তো এতে অপমান।
লেলিন, ষ্ট্যালিন, মাও-সে-তুং, যতই নীতি করুক বদল
সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, ফলবে নাকো, তার সুফল।
মনীষীরা আসেন শুধু ঐতিহাসিক প্রয়োজনে,
ভাঙা-গড়া, চলতে থাকে, ধর্ম্ম, সমাজ, দেহে, মনে।
চিরস্থায়ী নয়কো সেটা কালের স্রোতে ভেসে যায়,
আবার আসে নূতন মানব, নূতন বিধান তারা চায়।
প্রতীচ্যের ঢেউ লেগেছে, প্রাচ্য-নারীর মনে-প্রাণে,
ভারত-নারী ভেসে চলে, সর্ব্বনাশা স্রোতের টানে।
আত্মসুখের তরে জাগে তাদের প্রাণে ব্যাকুলতা
হারিয়েছে আজ মনঃশক্তি বাড়ে জীবন জটিলতা।
আজকে নারী বিলাসিনী সতীত্ব আজ ধূলায় লোটে
দিশাহারা উদ্ভ্রান্ত মরীচিকায় পানে ছোটে।
উত্তম গাছ নষ্ট হলে, কোথা পাবে শ্রেষ্ঠ ফল?
নষ্ট ধর্ম্ম, মানবতা, ভারত চলে রসাতল।
পঙ্ক-মাঝে আজো আছে বহু ভারত-পঙ্কজিনী
মৃত ভারত-শিশুর লাগি অমৃত আনিবে জিনি।
পথহারা পথিকেরে, দেবে আলো চিরন্তনী
তারাই আবার আনবে ফিরে ভারতমাতার লুপ্ত মণি।
ভদ্রলোকের মেয়ে মোরা এটা খুবই সত্য কথা
প্রাণ দিলেও মান দেব না এটাই মোদের ভদ্রতা।
বিশ্বনারী হতে বহু পৃথক্ হন ভারত-নারী
বিশ্বনারী বিস্মিত হন শুনে উপাখ্যান তারি।
রেশান যুগের মাপা চাউল যদিও বড় দুঃসময়
অতিথ-ফকির মোদের ঘরে তবুও দু'টি অন্ন পায়।
পূজা-পার্ব্বণ ব্রত-নিয়ম একেবারে দিইনি তুলে
পরার্থে আত্মদান, আজো মোরা যাইনি ভুলে।
হিন্দু-দর্শন মিথ্যা বলে করি নাকো উপহাস
পুণ্যলোভী আজো মোরা পাপ কার্য্যে লাগে ত্রাস।
গুরুজনে প্রণাম করি, ছোটোর লাগি স্নেহ ঝরে
তুলসীতলায় জ্বালি প্রদীপ শঙ্খ বাজে মোদের ঘরে।
তীর্থে মোরা আজো ছুটি সয়ে সকল কষ্ট-বাধা
সত্যনারায়ণ, চণ্ডীপূজা করি, শুনি পুরাণ-কথা।
নব্য আলোক যতই লভি তবু মোরা ভারত-নারী
স্বামী পুত্র দেশের তরে, আজো জীবন দিতে পারি।
ভদ্র মেয়ের নামটি নিয়ে কোরো না ভাই পরিহাস,
ফাঁসির দড়ি নয় সে মোদের, সে যে মোদের ফুলের ফাঁস।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত

শ্রীমীরা মিত্র

"গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি
বাহির মনে,
চির দিবস মোর জীবনে।
নিয়ে গেছে গান আমারে,
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে
গান দিয়ে হাত বুলিয়ে বেড়াই
এই ভুবনে।"

গানের সোনার কাঠি কবিকে জগতের দৈনন্দিন গ্লানি থেকে মুক্ত করে নিয়ে গেছে, অনুভূতির উর্দ্ধ স্তরে যেখানে জেগেছে তাঁর চরম উপলব্ধি, তাই গানের মাধ্যমে কবি প্রকাশ করতে পেরেছেন তাঁর সাধনালব্ধ চেতনা,—তাই বিশ্বের হাটে শ্রেষ্ঠ পণ্য হিসাবে বিকালো তাঁর "গীতাঞ্জলি"। প্রাণে প্রাণে যে পৌঁছে দিলে কবির হৃদয়ের আবেদন, ঘরে ঘরে জাগালে সাড়া। আর কোন শ্রেণীর সঙ্গীত এই রকম স্থান-কালের ভেদ ঘুচিয়ে, বিদেশী বিজাতীয় মানুষের প্রাণে আবেদন জানাতে পারেনি আজ পর্য্যন্ত।

এ ক্ষেত্রে কবিগুরু সুরসৃষ্টির দিক থেকে ভারতীয় ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন কি না, সে প্রসঙ্গের আলোচনা করার আগে মনে হয়, আদর্শ লক্ষ্য ও সাধনার দিক থেকে কবির গানে বারে বারে পেয়েছি ভারতের চিরদিনের শান্তিময় সুরটি, যার ভিতর দিয়ে উপলব্ধি করেছি তপোবনের শান্ত-আবেষ্টনীর মাঝে শাশ্বত ভারতকে। কবির সাধনা,—তাঁর হৃদয়ের ব্যাকুলতা মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে তাঁর গানের মধ্যে। ভারতীয় সঙ্গীতের ধারাও যেমন বয়ে চলেছে তার লক্ষ্যকে অটুট রেখে, কবির গীতিনির্ঝরিণীও তেমনি প্রবাহিত হয়েছে সেই লক্ষ্যের পথে। তাই বাইরের তাৎপর্য্যকে প্রাধান্য দিতে মন উঠে না। সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ উৎস যদি প্রাণের নিভৃত অনুভূতির মাঝেই হয়, তার চরম উৎকর্ষ যদি জগতের পলে পলে দহন ও সংঘাতের উর্দ্ধে বিচার ও তর্কের পারে বিশুদ্ধ আনন্দোপলব্ধির দ্বারা পরিমাপ করা হয়, তবে কবিগুরুর গানের সঙ্গে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিরোধ কোথায়? কবির জীবনে দেখি সাধনার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করেছে সঙ্গীতই, অন্য কোন শাস্ত্র বা পন্থা নয়। কবি বলেছেন, "গানের স্পন্দন আমাদের চিত্তের মধ্যে যে আবেগ জন্মিয়ে দেয় সে কোন সাংসারিক ঘটনামূলক আবেগ নয়। সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণ-কম্পন চলেছে গান শুনে সেইটেরই বেদনাবেগ যেন আমরা চিত্তের মধ্যে অনুভব করি।"—(ছন্দ)। বাণীর সাধক কবি কিন্তু, বাণীর সাধনায় অভীষ্টসিদ্ধ হ'তে পারেননি, তাই তাঁর বাণী মিশেছে সুরে, বাণীকে অতিক্রম করে সুর তাকে পৌঁছে দিয়েছে লক্ষ্যের দ্বারে। সেখানেই তাঁর গানের সার্থকতা। সেখানেই তাঁর গানের উৎস—

"যে আনন্দে বচন নাহি ফুরে
সেই আনন্দ মেলে তাহার সুরে।"—(গীতাঞ্জলি)

আরও বলেছেন—"বাক্য যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানে গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্ব্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে।"—(জীবনস্মৃতি) বাণীর অপূর্ণতা পূর্ণ করে সুর, তাইতে কবির সুরের সাধনা। এ সাধনায় যখনই এসেছে ব্যর্থতার আভাষ তখনই তাঁর মন কেঁদে উঠেছে "গাবার মত হয়নি কোন গান।" তাঁর সঙ্গীত-সাধনায় সার্থকতার সন্দেহের অবকাশ থাকে না, যখন তা তাঁর ব্যষ্টি জীবনের মধ্যে দিয়ে দেখি।

"মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই
গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই।"—(গীতাঞ্জলি)

সমস্ত সাধনার মতন সঙ্গীতেও থাকে প্রতিটি সাধকের স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি, না হ'লে সাধনার পর্য্যায়ে তাকে ফেলা যায় না; আর শিক্ষা বা অনুকরণ কোন ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়াতীত জগতের নাগাল পায় না। ভারতীয় রাগ-রাগিণীর বাঁধা-পথেও গায়ক যতক্ষণ না আপন ভাবে বিভোর হ'য়ে পথের সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন, ততক্ষণ তাঁর পক্ষে গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভবপর নয়। তবে সাধকের অভ্যস্ত পদ হয়তো তাঁদের সম্পূর্ণ অচেতন মুহূর্ত্তেও হয়তো তাঁদের রাগের নির্দ্ধারিত পথে পরিচালিত করে আর আনন্দের পরিপূর্ণ উদ্ভাসিত রূপের ছটায় সাধক হয়ে পড়েন আত্মহারা। জোয়ার যখন আসে তখন কূল ছাপিয়ে ছোটে, তীরের বাঁধন আর তাকে বেঁধে রাখতে পারে না। পূর্ণ আনন্দের ঢেউও গায়ককে অতিক্রম করে ভাসিয়ে নিয়ে যায় শ্রোতাকেও। এখানেই এক হ'য়ে মেশে গায়ক ও শ্রোতার অনুভূতি। আর তাতেই একের রসে অন্যে মজে। কবির গান রচনার ইতিহাস একটু দেখলেই দেখা যাবে যে যখনই ভাবের প্রাচুর্য্য তাঁর ভাষাকে রুদ্ধ করেছে তখনই উদ্ভূত হয়েছে তাঁর সঙ্গীত। ভাবে আত্মহারা হ'য়ে তিনি গান গেয়েছেন। ঠাকুর-বাড়ীতে তখনকার সঙ্গীত-বিদ্‌দের যাওয়া-আসা ও রীতিমত চর্চ্চার দ্বারা সেখানকার আবহাওয়ায় সৃষ্ট হয় ভারতীয় সঙ্গীতের একটি অপূর্ব্ব পরিবেশ। তার মাঝেই উন্মেষিত হয় কবির সঙ্গীতানুভূতি। তাই তাঁর সঙ্গীতকে নিঃসংশয়ে ভারতীয় বলতে বাধে না। তাঁর গানের ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণীর ওপর। গানের বেলায়ও ঠিক তাই, গায়ক ও শ্রোতার প্রাণ যখন এক সুরে মেলে তখন কানকে লঙ্ঘন করে সুর ঝংকৃত হয় হৃদয়ের তন্ত্রে। আবার একটি মাত্রার ব্যতিক্রমে সার্থক সুর সৃষ্টি হ'তে পারে না। যেমন একটি বেসুরো তার শুধু যে সুরের সাড়া না দিয়ে তার পূর্ণতাকে ক্ষুণ্ণ করে এমন নয়, সে সুরের সাবলীল বিকাশকে আরো অনেক বেশী মাত্রায় করে প্রতিহত। তেমনি এক জনের রসগ্রহণের বিমুখতাও রসসৃষ্টির বিরোধিতা করে। এই জন্যেই সেতারের তারে-তারে আঘাত করে মিলিয়ে নেওয়া, এই জন্যেই গায়কের সুরের লীলা। আর এই জন্যেই সমষ্টির মাঝে ব্যষ্টির সাধনা এত দুরূহ।

গানের বেলা বার বার দেখি কবির সাধনা প্রকাশ পেয়েছে আত্মকেন্দ্রিকরূপে। তাঁর গানের সার্থকতা তাঁর নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির মধ্যে। তাঁর দরকার মিটলে সে গান আর কেউ গ্রহণ করুক আর নাই করুক তাতে তাঁর গানে বিফলতার ছায়া পড়ে না। কারুর প্রয়োজনে লাগে ভালো, না লাগলেও ক্ষতি নেই। বহুর মধ্যে একের সাধনায় শেষের মাঝে অশেষের উপলব্ধিতে

তাঁর গান তাঁকে এনে দিয়েছে পরম মূল্য। তাই কবি গেয়েছেন—

"শেষের মধ্যে অশেষ আছে এই কথাটি মনে
আজকে আমার গানের শেষে জাগছে ক্ষণে ক্ষণে"—(গীতাঞ্জলি)

এই যে মহান্ অনুভূতি,—এই অনুভূতি যে গান তাঁকে এনে দিয়েছে সে গান কি ক্ষুদ্র হ'তে পারে ?

তাঁর সমস্ত ক্রটি-বিচ্যুতি ঢাকা পড়ে যায় তাঁর উৎসর্গের প্রভায়। তাঁর সকল রাগের অপূর্ণতা আপনি পূর্ণ হয় তাঁর আত্মনিবেদনের গভীরতায়। "তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।"...কবি আকুল প্রাণে গেয়েছেন :—

"যেন শেষ গানে মোর সব রাগিণী পূরে
আমার সব আনন্দ মেলে তাহার সুরে।"—(গীতাঞ্জলি)

তাই তাঁর কবি-মনের ব্যাকুলতা—

"হেথা যে গান গাইতে আসা আমার হয়নি সে গান গাওয়া
আজও কেবলি সুর সাধা আমার কেবল গাইতে চাওয়া।"—
(গীতাঞ্জলি)

শেষ পর্য্যন্ত পরম তৃপ্তির মাঝে অবসান লাভ করেছে। সুরের সাধনার সাফল্যে বিভোর হ'য়ে নিবিড় প্রেরণায় কবি গেয়ে ওঠেন :—

"অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে
সে বীণা আজি উঠিল বাজি হৃদয় মাঝে
ভুবন আমার ভরিল সুরে
ভেদ ঘুচে যায় নিকট দূরে।
সেই রাগিণী লেগেছে আমার সকল কাজে।"—(অরূপ রতন)

কোন সাধনা এর চেয়ে বেশী দিতে পারে বলে মনে হয় না। যে সাধনায় মানুষ এই চরম পাওয়া পায় সে সাধনার মূল্য নিরূপণ করতে যাওয়ার মতন ভ্রম আর নেই। যা বুদ্ধির অগম্য তাকে বিচার-তর্কের গণ্ডীতে টেনে এনে শ্রেষ্ঠত্ব স্থির করতে যাওয়াও অসাধ্যে ব্রতী হওয়া মাত্র।

গান তখনই সত্য হয় যখন তা বিনা আয়াসে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে উদ্ভূত হয়। কবির নিজের দিক থেকে তাঁর গান যেমন সত্য, আমাদের দিক থেকেও তেমনি সত্য হ'য়ে ওঠে শুধু তখনই যখন আমরা গান গাই নিজের তাগিদে। আমাদের ভাব আপনা হতেই খোঁজে অভিব্যক্তি তাঁর গানের মাঝে। ভাব যেখানে অজ্ঞাতসারে গানকে তার বাহন করে গানও সেখানে সহজ গতিতে ভাবকে সম্প্রসারিত করতে পারে। গানই সেখানে বড়, গাওয়াটা নয়। সে গান কখনো পুরানো হয় না। এই জন্যেই পাখীর চিরদিনের এক গানেও কখনো একঘেয়েমির ছায়া পড়ে না।

অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, কবিগুরুর গানের অনুশাসন তাঁর গানকে আনাড়ীর হাতে হত্যা হ'তে দেয় যার জন্য তার মাধুর্য্য আজও বেঁচে আছে। কিন্তু নিয়ম থাকলেই তার ব্যতিক্রম থাকে আর স্থানানুযায়ী তা থাকাও উচিত। নয় তো 'ভাব-ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ' 'শ্রবণ-তৃপ্তি-দায়ক' মানুষের 'হৃদয় সিঞ্চিত' রসে পুষ্ট তাঁর এই অমর সঙ্গীত বেঁচে থাকবে নিশ্চয়ই, কিন্তু সঙ্গীতের কাছে আমরা যতখানি প্রত্যাশা করি ততখানি কি সে আমাদের দিতে পারবে ?

এখন থেকে ঠিক ১০০ বছর আগে যখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রথম স্থাপিত হয়

কলকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের নাম শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। আজ থেকে একশো বছর আগে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবর উক্ত এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় ৺রামগোপাল ঘোষ ও ৺দিগম্বর মিত্র প্রভৃতির উদ্যোগ ও উৎসাহে। এই এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পিছনে আছে কালা আইন বা Black Act. বেথন সাহেব তখন ব্যবস্থা-সচিব। তিনি ঐ আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপি গভর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভাতে উপস্থিত হওয়া মাত্র ভারতবর্ষীয় ইংরাজগণ আইনটিকে 'কালা আইন' নামকরণ ক'রে তদ্বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করলেন। ইংরাজ-সম্পাদিত সংবাদপত্র সমূহ অকথ্য ভাষায় আইনকারীদের গালাগালি বর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইংরাজের অত্যাচারে প্রজাবর্গ অসহ্য হয়ে ওঠায় এবং নীলকরদের প্রতি যথেচ্ছ উৎপীড়ন হওয়ায় ভারতবর্ষীয় কতিপয় ইংরাজই ঐ অত্যাচারী ইংরাজদের (যারা কোম্পানীর ফৌজদারী আদালতের বাইরে থেকেও সুপ্রীম কোর্টের দোহাই দিয়ে) দুর্ব্যবহারের প্রতিরোধকল্পে উক্ত আইন মঞ্জুর করাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। অবশেষে ঐ আন্দোলনকারী ইংরাজদের অভীষ্টই পূর্ণ হয়। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের আদেশে কালা আইন ব্যবস্থা-সভা থেকে অন্তর্হিত হয়।

কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে তখন কথা বলার মত লোক কে আছেন ? ৺রামগোপাল ঘোষ ইংরাজদের নীতির প্রতিবাদকল্পে দেশবাসীকে সমবেত হওয়ার মন্ত্র দিলেন। বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণই বুঝলেন ঐক্য ব্যতীত অন্য উপায় নেই। তখন দেশীয় শিক্ষিত দলের দু'টি সভা ছিল। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত Bengal Landholders' Association বা বঙ্গদেশীয় জমিদার-সভা এবং জর্জ টমশন-প্রতিষ্ঠিত British India Society.

তখন ঐক্য প্রয়োজন। প্রশ্ন উঠলো যে, ঐ দু'টি সভা একত্র করা যায় কি না। রামগোপাল ও দিগম্বরের ঔৎসুক্যে ঐ সম্মিলন-কার্য্য সমাধা হয়। ১৮৫১ সালে দেশবাসীর সমবেত প্রচেষ্টায় দেশবাসীর হিতার্থে স্থাপিত হ'ল সুবিখ্যাত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন। প্রথম কমিটিভুক্ত নামের তালিকা প্রদত্ত হচ্ছে :

রাজা রাধাকান্ত দেব—সভাপতি
রাজা কালীকৃষ্ণ দেব—সহ-সভাপতি।

রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ দেব, হরিমোহন সেন, রামগোপাল ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত (রামবাগান), কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত। সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সহ-সম্পাদক দিগম্বর মিত্র।

শুনা যাচ্ছে উক্ত সভা শতবার্ষিকী উৎসব পালন করবে সম্প্রতি। উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হোক্।

মাষ্টার মশাই

বারীন্দ্রনাথ দাশ

কলেজ স্কোয়ারের বাসষ্টপে যখন ভীড় জমে আসে কলেজ-ছুটি-হওয়া ছেলেদের আর মেয়েদের, আর আশুতোষ বিল্ডিং-এর পেছন দিকে ঢলে পড়ে বেলা চারটের সূর্য, পথ-চলতি ট্রামের মধ্যে হয়তো এক-আধ জনের মনে পড়ে যায় কয়েক বছর আগের একজনের কথা, যাঁকে আর কোনো দিন দেখা যাবে না ছাত্রছাত্রীদের ভীড়ের মধ্যে দু'নম্বর বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে। শুধু মনে পড়বে সবার মাথা ছাড়িয়ে ওঠা একটি দীর্ঘ সুপুরুষের হাসি-হাসি মুখ। আকাশের দিকে বিস্তৃত বলিষ্ঠ হাতে একটি ঘন-ঘন আন্দোলিত ছাতা। আর অতীতের ওপার থেকে ভেসে আসবে গতি কমিয়ে-আনা দু'তলা বাসের ঘড়ঘড়ে আওয়াজ এবং একটি গুরুগম্ভীর হাঁক—"ওরে ব্যাটাচ্ছেলে, রোখ্‌কে—"

যথ-চলতি দু'নম্বরেই আমার সঙ্গে মাষ্টার মশায়ের প্রথম আলাপ, তখন সবে নতুন ঢুকেছি পোষ্টগ্র্যাজুয়েটে।

দুনিয়ার সবাই মাষ্টার মশাইয়ের চেনা। বেলা চারটের দু'নম্বরে প্রায়ই এ-কলেজের ও-কলেজের ছাত্রেরা এবং মাষ্টারেরা। মাষ্টার মশাই বাসে উঠতেই বহু লোক মাষ্টার মশাইকে জায়গা ছেড়ে দিতে ব্যস্ত। মাষ্টার মশাই এর পিঠ চাপড়ে ওর গাল টিপে তার কুশল প্রশ্ন করে এসে বসলেন আমারই পাশে। বসেই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই কে রে?"

"আমি?" জীবনে সেই শুধু একবার আমি ভেবে পেলুম না আমি কে।

বললেন, "তোকে তো আমার আগে-আগে আশুতোষ বিল্ডিং থেকে বেরুতে দেখলুম। নতুন এসেছিস্ বুঝি? কি সাবজেক্ট?"

"ইকনমিক্স।"

"নাম কি তোর?"

"সলিল রায়।"

"সলিল?" নাক সিঁটকালেন মাষ্টার মশাই, "তোকে এই ম্যাদম্যাদে নাম দিয়েছে কোন্ ব্যাটাচ্ছেলের বাপ? নাম হবে এই যেমন ভীম, অর্জুন, মেঘনাদ, সিংহবাহু, রাবণ এমন কি হনুমান নামও অনেক ভালো। ইয়া-ইয়া পালোয়ানের মতো নাম রাখবি, শরীরও বানাবি তেমনি। তা' নয়, হাওয়ার মতো শরীর, জলের মতো নাম, কাদার মতো বুদ্ধি, আগুনের মতো মেজাজ, আকাশের মতো ফাঁকা ভবিষ্যৎ। পঞ্চভূতে মিলে কি ভূতই তৈরী হয়েছিস্ রে তোরা আজকালকার বাঙালীর বাচ্চারা!"

"ভগবান আমাকে যে ভাবে—", বিনয় করবার চেষ্টা করলুম।

"পাঠিয়ে দে তোর ভগবানকে আমার কাছে, ব্যাটাচ্ছেলেকে শিখিয়ে দি। নয়া-নয়া বাঙালীর বাচ্চা কি করে পয়দা করতে হয় আমার কাছে এসে তালিম নিয়ে যাক। জানিস্ আমি কে?"

"হ্যাঁ,"—দেশ-বিদেশের লোক তাঁকে চেনে, আমি চিনবো না?

তিনি বলে চললেন, "আমি প্রফেসার বিভূতি মজুমদার। নাম শুনেছিস্? যদি না শুনে থাকিস তোর বাপকে জিজ্ঞেস করিস, যদি কারো বাপ আমার নাম না শুনে থাকে-সে তার সাচ্চা বাপ নয়।"

এই দীর্ঘপথ এঁর বক্তৃতা শুনতে শুনতে যেতে হবে? মনে মনে উসখুস করছিলুম।

হঠাৎ বললেন, "তোর সিগারেট বার কর।"

অবাক হয়ে তাকালুম তাঁর মুখের দিকে।

হেসে ফেললেন। বললেন, "আমার জন্যে নয় রে। একটা পথ যাবি। উসখুস করছিস। ভাবছিস বুড়োটা পাশে এসে বসলো। পথটা সিগারেট না খেয়েই যেতে হবে। এ্যাঁ? ও-সব কিছু নয়। খা, খা, সিগারেট বার করে খা। বুড়োদের সামনে সিগারেট খেতে নেই ও-সব কমপ্লেক্স ঝেড়ে ফেল মন থেকে। আমাদের সম্মান অতো হাল্কা নয় যে সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।"

এসপ্ল্যানেড পেছনে ফেলে ময়দান ডাইনে রেখে বাস যখন দ্রুততম গতিতে ছুটলো চৌরঙ্গী দিয়ে, মাষ্টার মশায় জিজ্ঞেস করলেন, "আজ কি পড়াচ্ছিলো তোদের ক্লাসে বল।"

বিপদে পড়লুম। একটি ক্লাসও তো করিনি। ইউনিয়ান রুমে বসে আড্ডা দিয়েছি আর বসন্ত কেবিনে চা খেয়েছি।

মুখে যা এলো বললুম, "কীন্‌স্‌এর ফাণ্ডামেন্ট্যাল ইকোয়েশান্‌স্।"

"এরই মধ্যে?" মাষ্টার মশাই বললেন, "কি বুঝলি বল।"

"ভালো করে বুঝিনি।"

"বেশ করেছিস।" বলে একটু চুপ করে রইলেন। জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ বাইরের ময়দানের দিকে। তার পর আস্তে আস্তে বললেন, "কীন্‌স্‌কে আমি প্রথম মোলাকাত করি উনিশশো উনিশে, প্যারীতে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পীস্-ট্রীটি নিয়ে তখন খুব হৈ-চৈ চলছে……।"

জগু বাবুর বাজার পেরিয়ে খেয়াল হোলো কীন্‌স্‌এর ব্যক্তিগত জীবন থেকে কখন তিনি ফাণ্ডামেন্ট্যাল ইকোয়েশান্‌স্‌এ চলে এসেছেন। এবং আমার ক্রমশঃ ভালো লাগতে শুরু করেছে কীনশিয়ান অর্থনীতির মূলসূত্রগুলো। ভুলে গেলুম যে অধ্যাপক মজুমদার দর্শন-বিভাগের অধ্যাপক। তন্ময় হয়ে শুনে গেলুম তাঁর অর্থনৈতিক চক্র-আবর্তনের বিশ্লেষণ।

হাজরার মোড়ে আমাকে নামতে হবে। উঠে পড়লুম, "আমি এবার নামবো।"

বললেন, "আচ্ছা, যা।"

আরেক জন আমার উঠে-পড়া জায়গায় বসে পড়লো।

নেমে এলুম বাস থেকে।

বাস যখন ছাড়লো, তখনো দেখি অধ্যাপক মজুমদার কীনশিয়ান অর্থনীতি বুঝিয়ে যাচ্ছেন একমনে, খেয়াল নেই যে আমি নেমে গেছি, আমার জায়গায় বসে পড়েছে আরেক জন লোক।

* * * *

অধ্যাপক বিভূতি মজুমদারের পৃথিবী জুড়ে নাম এ যুগের এক জন অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসেবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক খ্যাতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপক পেয়েছেন যদিও ছাত্রমহলের কাছে বিভূতি মজুমদারের মতো জনপ্রিয়তা ও ভালোবাসা কোনো কেউ আজো পাননি। পোষ্টগ্র্যাজুয়েটে এমন কোনো অধ্যাপক নেই যাঁর ক্লাস ছাত্রেরা একবার না একবার পালায়নি, কিন্তু প্রফেসার মজুমদারের ক্লাস তো তাঁর নিজের ছাত্রেরা পালাতোই না, বরং অন্য ক্লাস পালিয়ে অন্য বিভাগের ছাত্রেরা তাঁর ক্লাস শুনতে আসতো।

তার পরদিন আমি গেলুম তাঁর ক্লাস শুনতে।

ক্লাস শেষ হতে ভীড়ের মধ্যে মিশে-বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ তাঁর গর্জন শুনতে পেলুম।

"ওরে সলিল রায়! শুনে যা'।"

কাছে যেতেই বললেন, "কী রে, বছরের শুরু থেকেই নিজের ক্লাস পালাতে শুরু করেছিস? শোন, কাল তোকে বলতে ভুলে গেছিলুম। আমার বাড়িতে প্রত্যেক দিন বৈঠক বসে জানিস তো? আজ এসে আমার সঙ্গে মোলাকাত করিস সেখানে। মিসেস্ মজুমদারকে বলেছি তোর কথা। আসিস আজ। খুসী হবেন তোকে দেখলে।"

এমনি ভাবে চিরকাল বহু ছাত্রের আমন্ত্রণ হয়েছে তাঁর বাড়িতে। এমনি ভাবেই বাঙলার ছাত্রসমাজকে চিরকাল আপনার করে নিয়েছেন তিনি। যদিও জানতুম সে কথা, তবু মনে হোলো যেন আমার সঙ্গেই বিশেষ ভাবে অন্তরঙ্গতা করলেন মাষ্টার মশাই,—যেমনি মনে হয়ে এসেছে বাঙলা দেশের বহু ছাত্রেরই।

সন্ধ্যেবেলা তাঁর লেকভিউ রোডের বাড়িতে গিয়ে দেখি বেশ ভীড় সেখানে। দু'-এক জন অতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, বিভিন্ন কলেজের দু'-তিনজন বিখ্যাত অধ্যাপক, দু'জন বিদেশী সংবাদপত্র-প্রতিনিধি আর কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী। ছোটো-বড়োর ভেদাভেদ নেই সেখানে। মাষ্টার মশায়ের বৈঠকের আবহাওয়ায় সবারই সমান সাচ্ছন্দ্য।

আমি যেতেই একজন একজন করে সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, যেন আমিও একজন বিশিষ্ট অভ্যাগত। বললেন, "এর নাম তোরা শুনিস্‌নি। কিন্তু কয়েক বছর পরে শুনবি। এ গল্প লেখে।"

আমি অবাক। কি করে জানলেন মাষ্টার মশাই?

তখন সবে লিখতে শুরু করেছি। আগের রোববারে একটি গল্প বেরিয়েছে অমৃতবাজারে। সেটা মাষ্টার মশায়ের চোখ এড়াতে পারেনি।

সেখানে আমার চেনাও ছিলো একজন। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের রিসার্চস্কলার সাধনা ব্যানার্জী।

"আরে, সাধনাদি', তুমি এখানে?"

সাধনাদি' হেসে বললে, "তুমিও এসে জুটলে এখানে?"

"তুই একে কি করে চিনিস," মাষ্টার মশায় জিজ্ঞেস করলেন।

"আমরা অনেক দিনের বন্ধু", সাধনাদি' বললে।

আলাপ হোলো মাষ্টার মশায়ের স্প্যানিশ স্ত্রী মিসেস্ ডলোরেস মজুমদারের সঙ্গে।

আরি একজনের সঙ্গে আলাপ হোলো। মাষ্টার মশায়ের মেয়ে বন্দনা।

যাকে পোষ্টগ্রাজুয়েটের ছেলেমেয়েরা বলতো সিনরিটা বন্দনা।

* * * *

তিন মাস কেটে গেল। প্রায়ই যেতুম মাষ্টার মশায়ের বাড়ি। কখনো কখনো ভীড় থাকতো অনেক লোকের। দেশ-বিদেশের লোক আসতো সেখানে। গল্প শুনতুম নানা দেশের। অর্থনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক তর্কের বন্যায় ভেসে যেতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অনন্যসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করা মাষ্টার মশায়ের নিজস্ব বিশ্লেষণগুলো শুনে যেতুম মুগ্ধ হয়ে।

আর কখনো বা লোকজন বড়ো একটা থাকতো না। শুধু মাষ্টার মশায়, মিসেস মজুমদার, বন্দনা, সাধনাদি' আর আমি। বন্দনা বেহালা বাজাতো, পিয়ানো সঙ্গত করতেন মিসেস্ মজুমদার আর ইউরোপীয় সঙ্গীতের বিশ্ববিখ্যাত সুরকারদের গল্প শোনাতেন মাষ্টার মশাই।

আর মাঝে মাঝে মাষ্টার মশাই আর আমি একা। বহু গল্প শোনাতেন তাঁর নিজের দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর, তাঁর দেখা লোকজনদের। বলতেন, "যদি তোর দেখবার চোখ থাকে, অনেক গল্পের মালমশলা পাবি এর মধ্যে। যদি গল্পের মতো গল্প লিখতে চাস তো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়। দুনিয়া চষে বেড়া। গল্পের অফুরন্ত মালমশলা চারদিকে ছড়িয়ে আছে। আর একটা কথা। কোনো বাঁধনে জড়িয়ে পড়িস নে। গল্প লেখা একটা সাধনা। গল্পের জন্যে জীবনের অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়। সেবার জানিস একদিন সন্ধ্যায় নেমন্তন্ন খেতে গেছিলুম সমারসেট মমের রিভিয়েরার বাড়িতে…"

* * * *

একদিন সন্ধ্যেবেলা। চুপচাপ বসে চা খাচ্ছি কফি-হাউসে। সাধনাদি' এসে একটি চেয়ার টেনে বসলো। বললে, "তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি কয়েক দিন থেকে। খবর নেই কেন বলো তো?"

আমি কোনো উত্তর দিলুম না, পট থেকে কফি ঢাললুম কাপে।

"মুখ অতো শুকনো কেন", সাধনাদি' জিজ্ঞেস করলে।

"বড্ডো ক্লান্ত", বললুম আমি।

"হুঁ"। কিছুক্ষণ কোনো কথা বলল না সাধনাদি'। তারপর বললে, "কাল বন্দনা তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলো।"

"কেন, পরশুও তো ওদের বাড়ি গেছি।"

"জিজ্ঞেস করছিলো বন্দনা, মাষ্টার মশায় নয়।"

"মানে?"

"মানে বন্দনার সঙ্গে তোমার দেখা নেই কয়েক দিন।"

"কেন পরশু দিনও তো বন্দনার সঙ্গে।"

সাধনাদি' বললে, "সে তো দেখা হয়েছে মাষ্টার মশায়ের বাড়িতে। কিন্তু তেরো নম্বর ঘরে তো দেখা হয়নি?"

চোখ তুলে তাকালুম সাধনাদি'র দিকে। "তোমায় বলেছে বুঝি?"

সাধনাদি' হাসলো। কিছু বলল না।

বললুম, "কি করবো বলো। বন্দনা আমার গল্পগুলো পড়তে চায়। যদি কেউ বলে আমার গল্প ভালো লাগে মনে মনে একটু খুসীও হই। আমার গল্প পড়ে ভালো লেগেছে, সেটুকু শোনবার দুর্বলতায় কয়েক দিন নিরিবিলি বসে বসে কয়েকটি গল্প শুনিয়েছি। কিন্তু আমার লেখা গল্প তো অফুরন্ত নয় যে ওকে প্রত্যেক দিন একটা একটা করে শোনাবো। এ কয় দিন লিখিনি। তাই ওর কাছে যাইওনি। যেদিন আবার লিখবো, গিয়ে শুনিয়ে আসবো।"

সাধনাদি' বললে, "দেখ, ভবিষ্যতে কি হবে জানি না, হয়তো তোমার গল্প ছাপা হবে, বই হয়ে বেরুবে, পাঠকও অনেক পাবে। কিন্তু প্রথম জীবনের না-ছাপানো গল্পগুলোর যে দু'চারটি মুগ্ধ পাঠক-পাঠিকা পাওয়া যায় তাদের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলোর একটা আলাদা মাধুর্য আছে, তাদের অবহেলা করছো কেন?"

"তুমি কি আমায় ঠাট্টা করছো?" জিজ্ঞেস করলুম সাধনাদি'কে।

"তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি শুধু ঠাট্টার?"

সাধনাদি'র কথায় একটা গভীরতম সহানুভূতির ছোঁয়া আমাকে একটু দোলা দিয়ে গেল।

বললুম, "সাধনাদি'!"

"কি?"

"অমিতার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।"

"সে যে হবে আমি জানতুম", সাধনাদি' বললে।

"কেন?"

"ওর সঙ্গে না হলে আমার সঙ্গেই তোমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতো। কিন্তু সেটা তো আমাদের কুষ্টিতে লেখেনি। সেই জন্মেই।"

আমি চোখ তুলে সাধনাদি'কে তাকিয়ে দেখলুম, জেলের কয়েদী যেমনি করে ঘরের দেওয়াল আর ছাদ আর গরাদ-দেওয়া জানলা তাকিয়ে দেখে।

* * * *

অমিতা মুখার্জীর সঙ্গে আমার আলাপ রবীন্দ্রপরিষদে। আমার মতো সেও ছিলো একজন কার্যকরী কমিটির সদস্য। পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্র-জন্মতিথির অনুষ্ঠানের কয়েকটি ভার পড়েছিলো আমার আর ওর উপর।

দু'জনে একসঙ্গে মিলে সে কাজগুলো করতে গিয়ে দু'জনে মিলে আরো অনেক কিছু করবার স্বপ্ন দেখতে সুরু করলুম।

সাধনাদি'র সঙ্গে দেখা হওয়া কমে এলো। সাধনাদি' কিছুই বললে না।

তারপর একদিন সাধনাদি আমাকে আর অমিতাকে চায়ের নেমন্তন্ন করলো তার বাড়িতে। সারাটাখন তিনজনেই গল্প করলুম প্রচুর, হাসলুম অজস্র আর খেলুম অফুরন্ত। কিন্তু লক্ষ্য করলুম যে অমিতা সমস্ত কথাবার্তার ফাঁকে আমাকে আর সাধনাদি'কে মেপে দেখবার চেষ্টা করছে। কি বুঝলো সেদিন সেই জানে। আর আমার সঙ্গে দেখা করলো না দিন সাত-আট। বললে, বাড়িতে প্রচুর কাজ।

তারপর আজ কলেজ ছুটি হতে ক্লাসের বাইরে এসে আমায় বললে, "সলিল, আজ আমায় বাড়ি পৌঁছে দেবে?"

খুব খুসী হয়ে তক্ষুনি রাজি হয়ে বেরিয়ে পড়লুম তার সঙ্গে। ট্রামে যেতে যেতে গল্প করলুম নানারকম, নিজেদের সম্বন্ধে, অন্য সবার সম্বন্ধে।

ট্রাম থেকে নেমে ওর বাড়ি পর্যন্ত যেতে হেঁটে যেতে হয় বেশ খানিকটা পথ।

একটি শ্যামলা পার্কের পাশ দিয়ে গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঢাকা সেই পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললে, "একটা কথা তোমায় কয়েক দিন ধরে বলবো ভাবছিলুম।"

শুনলাম।

শুনে ফিরে এলাম কফি-হাউসে—একা।

খেয়াল হোলো সন্ধ্যে হয়ে এসেছে সাধনাদি' এসে যখন জিজ্ঞেস করলে, "মুখ অতো শুকনো কেন?"

* * * *

মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে আমার একটা সহজ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো বয়েসের তারতম্যটা অস্বীকার করে।

সেদিন রাত্তিরে মাষ্টার মশায়ের বাড়িতে আমি আর উনি বসেছিলুম আধো-অন্ধকার বারান্দায়। আমায় একটু আনমনা দেখে মাষ্টার মশায় কোনো গুরু প্রসঙ্গের মধ্যে না গিয়ে একথা-সেকথায় একটু একটু করে জেনে নিলেন কি ব্যাপার।

শুনে হাসলেন প্রচুর। হেসে বললেন, "এর জন্মে এত মন খারাপ কেন রে? এ রকম কতো হয় জীবনে, চিরকাল ধরেই হয়ে আসছে। অতো ভাবিস নে। এ-সব জীবনে স্থায়ী কিছু নয়, কিন্তু এ-সবের প্রয়োজন আছে অনেক, এ ধরণের ব্যাপারগুলো মনকে গড়ে দিয়ে যায়।"

"আপনাদের সময়ে ছাত্রজীবন অনেক সহজ ছিলো। এতো ঝামেলা ছিলো না জীবনে—", আমি বলুম।

"ছিলো না?" মাষ্টার মশাই বললেন। মাষ্টার'মশাইয়ের মন অনেক সুদূর অতীতে ফিরে গেল যেন! আস্তে আস্তে বললেন, "আমাদের সময়ে এতো ছাত্রছাত্রী ছিলো না পোষ্টগ্র্যাজুয়েটে কিন্তু এ সমস্ত মিষ্টি অশান্তিগুলো ছিলো। এই যে মেয়েটি, কি নাম বললি তার, অমিতা মুখার্জী, সে সিভিল সার্জন সুশান্ত মুখার্জীর মেয়ে তো? শোন তা'হলে। অমিতার মা ছিলো প্রতিমা ব্যানার্জী, বিয়ের আগের নাম বলছি তার। সে পড়তো আমাদের এক ইয়ার নীচে। তার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব ছিল হিমাদ্রি গুপ্তের সঙ্গে। নাম শুনেছিস হিমাদ্রি গুপ্তের? অতো বড়ো সেণ্টার ফরওয়ার্ড জন্মায়নি। তোদের জন্মের আগে মোহনবাগানে খেলতো। সে যখন আমাদের সঙ্গে পড়তো তখনই ফুটবলে তার খুব নামডাক। সেই হিমাদ্রি গুপ্তের গল্প বলি শোন।

সেই সময় আমাদের সঙ্গে পড়তো অঞ্জলী ঘোষ, ওই যে কবিতা লেখে, এখন অঞ্জলী বোস, নামজাদা ব্যারিষ্টার সেই প্রশান্ত বোসের স্ত্রী। অঞ্জলী বেশ কবিতা লিখতো, তখনকার দিনে প্রবাসী, ভারতী প্রভৃতিতে তার কবিতা ছাপতোও। আমার সঙ্গে বেশ একটা দহরম-মহরম ছিলো অঞ্জলীর সঙ্গে। অঞ্জলী কবিতা লিখতো, আমি শুনতুম। আমি হেগেল, হার্ডার, নীটসে, স্পেংলারের মুড়ো চিবিয়ে লম্বা লম্বা খটমটে প্রবন্ধ লিখতুম আর অঞ্জলী শুনতো। সেবার কলেজের লিটারারি সেমিনার থেকে নববর্ষ উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান হবে। রবীন্দ্রনাথ আসবেন। খাবার-দাবার আয়োজন করবার ভার পড়লো অঞ্জলী আর হিমাদ্রির উপর। ব্যস্—কাম ফতে। নববর্ষে আমরা কি খেলাম আমরাই জানি। লুচি এলো, আলুর দম এলো না। লোকজন যা এলো, তাদের প্রয়োজনের চার ডবল এলো সন্দেশ। কিন্তু রসগোল্লা চার ভাগের এক ভাগ লোককেও কুলালো না। ওদিকে প্রত্যেক ফুটবল-ম্যাচে অঞ্জলী যেতে সুরু করলো। ভেবে ছাখ, তখনকার দিনে মেয়েরা ফুটবল খেলা দেখবে কেউ ভাবতেও পারতো না। শুধু মেমসায়েবেরা যেতো। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো সর্বনাশ কি হোলো জানিস? সেণ্টার ফরওয়ার্ড হিমাদ্রি গুপ্ত ফুটবল শিকেয় তুলে কবিতা লিখতে সুরু করলে। উঃ, কি কবিতা যে? আমার এখনো মনে আছে—

অঞ্জলী আঁখি দুটি ছলছলি যায়
মোর হিয়া টলমলি পিছু পিছু ধায়

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—।"

আমিও হেসে ফেললুম। হাসির তোড়ে মনের ভার হঠাৎ কেমন করে যেন হাল্কা হয়ে গেল।

"তারপর কি হোলো জানিস?" মাষ্টার মশাই বললেন। "ঠিক তোরই মতো ব্যাপার। তুই আর সাধনা যে রকম ছেলেবেলার বন্ধু, তেমনি ছেলেবেলার বন্ধু ছিলো প্রশান্ত বোস আর অঞ্জলী ঘোষ। ঢাকার মালখানগরে একই জায়গায় ওদের বাড়ি। একই সঙ্গে খেলাধূলো করে ওরা বড়ো হয়েছে। কলেজেও ওরা পড়তো এক বছর উপরে নীচে। প্রশান্ত বুঝলি এদের ব্যাপার-স্যাপার চুপচাপ লক্ষ্য করছিলো এদ্দিন। কিছু বলেনি। তারপর সে একদিন অঞ্জলীকে আর হিমাদ্রিকে তাদের বাড়ি খাওয়ার নেমন্তন্ন করলে। প্রশান্তের বাড়ি গিয়ে হিমাদ্রির চক্ষুস্থির। হিমাদ্রি খুব সাধারণ ঘরের ছেলে। প্রশান্তরা খুব ধনী। তাদের ঐশ্বর্য দেখে হিমাদ্রি নিজের অবস্থা সম্বন্ধে একটু বেশী রকম ওয়াকিবহাল হোলো, যা নিয়ে সে এদ্দিন ভাবেনি। আর দেখলো প্রশান্তর বাড়ির আবহাওয়ায় অঞ্জলী অনেক বেশী সহজ, সেখানে সহজেই সে খাপ খেয়ে যায়। আর আঁচ করলে যে অঞ্জলী আর প্রশান্তর বন্ধুত্বের পেছনে তাদের অভিভাবকদের একটা অনেক দিনকার মতলবও চেগে রয়েছে। বুঝলি? হিমাদ্রি বুদ্ধিমান ছেলে, ভাবলো যে আর নয়, মায়া বাড়বার আগেই সরে পড়া ভালো। সে অঞ্জলীকে এতো ভালবাসতো যে অঞ্জলীর একজন ফুটবল খেলোয়াড়ের বৌ হওয়া থেকে একজন ভাবী ব্যারিষ্টারের বৌ হওয়াই বেশী বাঞ্ছনীয় মনে করলে। সে নিজে থেকেই অঞ্জলীকে বললে যে তুই বাবা কেটে পড়্। অঞ্জলী তাকে নিষ্ঠুর বললে, হৃদয়হীন বললে, কতো কি বললে, কিন্তু হিমাদ্রি শুনলো না। মনের দুঃখে সে ফুটবল খেললো না সেই বছর কিন্তু আর দেখা করলো না অঞ্জলীর সঙ্গে।

তারপর আমার কি দুর্গতি বোঝ্‌? অঞ্জলী আর আমার প্রবন্ধ পড়ে না। শুধু আমাকেই কবিতা শোনায়। সে-সব কবিতা তো আজ বাঙলা সাহিত্যের সম্পদ। ওই যে পড়িসনি:

বিদায়ের গানে গানে ভরে দাও ছলনার ভাষা
বিরহের ফাঁকিতেই থাকে চির মিলনের আশা।

সুতরাং বুঝলি গাধা, এ-সব কিছুই নয়। আসল কথাটা কি জানিস্? সবাই দুনিয়াটাকে দেখে একটা মিষ্টি সংসারী মনের দৃষ্টিকোণ থেকে। হিমাদ্রির সংসার-প্যাটার্ণের সঙ্গে যে-রকম অঞ্জলী খাপ খেলো না, সে-রকম অমিতার সংসার-প্যাটার্ণের সঙ্গে তুই খাপ খেলি না। শুধু একটা কারণে হিমাদ্রি সে কথা ভাবলে আর আরেকটা কারণে অমিতা এ কথা ভাবলে। মোদ্দা কথাটা একই।

তাই আর ভাবিস নে। যতো পারিস একটার পর একটা প্রেম করে যা, একটার পর একটাকে ছাড় আর একটার পর একটা বাঙলা সাহিত্যের নয়া নয়া সম্পদ বানিয়ে যা। তুই হাসছিস, ভাবছিস মাষ্টার মশায় পাগল কিন্তু একদিন বুঝবি, মাষ্টার মশায় কি সার কথাই বলেছিলো। এবার বাড়ি যা, অনেক রাত হয়েছে।"

* * * *

মাষ্টার মশায়ের গল্প শুনে সাধনাদি' তার পরদিন একটু হাসলো। বললে, "জানো, উনি একটা কথা এড়িয়ে গেছেন?"

"কি?"

"তাঁর নিজের কথা। ওই যে একটুখানি আভাষে বলে গেলেন তাঁর প্রবন্ধ পড়ে শোনাতেন অঞ্জলী ঘোষকে, আর অঞ্জলী তাঁকে পড়ে শোনাতো তার কবিতা, সেইটুকুর মধ্যে আরেকটা মিষ্টি ট্র্যাজেডী চিরকালের অটোগ্রাফ খাতায় একটি সোনালী স্বাক্ষর রেখে গেছে।"

আমি চুপ করে শুনলুম।

সাধনাদি' আস্তে আস্তে বললে, "মাষ্টার মশাই যে আজ এত-বড় হয়েছেন, তার পেছনে প্রথম যে মেয়েটির প্রেরণা, সে অঞ্জলী ঘোষ,——আমাদের আজকের দিনের বাঙলা সাহিত্যের বিখ্যাত মহিলা কবি।

* * * *

নিউ মার্কেটের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলো। এসে আশ্রয় নিলুম লাইট হাউসের গাড়িবারান্দার নীচে। দেখি বন্দনাও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

"হাল্লো সিনরিটা!"

"হাল্লো সলিল," একটু হেসে বন্দনা বললে, "তুমি কোত্থেকে?"

বৃষ্টি থামতে বন্দনা বললে, "আমি যাচ্ছি পার্ক ষ্ট্রীট। তুমি কদ্দূর?"

"ভবানীপুর অবধি।"

"আমি হেঁটে যাচ্ছি। বেশ চমৎকার মেঘলা দিন। তুমি কি পার্ক ষ্ট্রীট পর্যন্ত আমার সঙ্গে আসবে?"

"নিশ্চয়ই!" আমি তক্ষুনি রাজি।

লিণ্ডসে ষ্ট্রীট থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গী দিয়ে দু'জনে হাঁটতে সুরু

করলুম। বন্দনা বললে, "সলিল, আর তো গল্প এনে আমায় দেখালে না?"

"আর লিখিনি", আমি বললুম, "আরেকটা লিখলেই দেখাবো।"

"থাক আর দেখাতে হবে না", বন্দনা বললে, "গল্প আজকাল আর আমার ভালো লাগে না।"

আমি হাসলুম একটু।

বন্দনা বললে, "তুমি বড্ডো স্বার্থপর।"

"কেন?"

বললে, "ভেবেছিলুম তুমি আর আমি বেশ ভালো বন্ধু হতে পারবো। তুমি বাঙলায় গল্প লিখবে, আমি সেগুলো ইংরেজিতে আর স্প্যানিশে অনুবাদ করবো। কিন্তু তোমার দেখলুম কোনো উৎসাহ নেই। তোমার এক বন্ধু আছে সাধনাদি'। ব্যস, তার বেশী বন্ধুত্বের পরিধি বাড়াতে তুমি রাজি নও। কেন, একজন লোকের তিন-চারজন বন্ধু থাকতে পারে না?"

আমি হেসে বললুম, "কেন? আমি কি এমন কোনো ভাব দেখিয়েছি যে তোমার সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা আছে?"

বন্দনা বললে, "আমি ঠিক সে-কথা বলতে চাইছি না।"

"কি বলতে চাইছো?"

"বোঝবার মতো বুদ্ধি তোমার আছে সলিল, কিন্তু বোঝবার মতো মন নেই", বন্দনা বললে।

আমি বললুম, "জানো বন্দনা, কিছুদিন আগে তোমার বাবা একদিন আমায় বলেছিলেন, 'জীবনে যদি উন্নতি করতে চাও বুদ্ধি খরচা কোরো, কিন্তু মন খরচ কোরো না'।"

বন্দনা বললে, "সে জন্তেই তোমার মতো লোক আর আমার মতো লোকের মধ্যে কোনো দিন মিল হবে না। আমরা চাই জীবনে সুখী হতে, তোমরা চাও জীবনে উন্নতি করতে।"

* * * *

সাধনাদি'কে এসে বল্লুম, "জানো সাধনাদি', বন্দনা আমায় বলেছে বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার আছে, কিন্তু বোঝবার মতো মন নেই।"

"কি বোঝবার মতো?" সাধনাদি' জিজ্ঞেস করলে।

"যে জিনিষটা বন্দনা আমাকে বোঝাতে চাইছিলো, অথচ আমি বুঝতে পারছিলুম না।"

সাধনাদি' হাসলো। কোনো কথা বলল না।

"কি সাধনাদি', হাসলে কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলুম।

সাধনাদি' বললে, "অনেক দিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা।"

"কি কথা?"

"অঞ্জলী ঘোষের বাড়িতে সেদিন বেড়াতে গেছিলেন মাষ্টার মশাই। সঙ্গে একটি নতুন লেখা প্রবন্ধ। প্রবন্ধের বিষয়টা ছিলো "প্রেমের সমাজতত্ত্ব এবং আদিম মানব।" প্রবন্ধটা অঞ্জলীকে পড়ে শোনানোর পর মাষ্টার মশাই বললেন, 'চলো অঞ্জলী, একটুখানি পার্কে বেড়িয়ে আসি।' অঞ্জলী চোখ বুজে বসেছিলো একটি ইজিচেয়ারের উপর। চোখ না খুলেই বলল, 'আমার সঙ্গে প্রশান্তর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। একটু বোসো। প্রশান্ত আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। তারপর একসঙ্গে বেরুবো।' মাষ্টার মশায় একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রবন্ধটা কি রকম লাগলো?' অঞ্জলী বললে, 'বড্ড শক্ত। বুঝতে পারলুম না। কি বলতে চাইছো।' তখন মাষ্টার মশাই আস্তে আস্তে বললেন, 'বোঝবার মতো বুদ্ধি তোমার আছে অঞ্জলী, কিন্তু বোঝবার মতো মন নেই'।"

"সে কথা বললেন কেন", আমি জিজ্ঞেস করলুম।

"বোকা ছেলে', সাধনাদি' বললে, "এ-কথা বোঝোনি যে একটি সহজ সাদা কথা মাষ্টার মশাই মুখ ফুটে বলতে পারেননি বলে একটা গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধের মারফতে সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায় এবং দার্শনিক ভাষায় বলতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই সহজ কথাটা সহজভাবে সোজাসুজি বললে হয়তো তাঁর জীবনটা অন্ত রকম হোতো।"

"কি আর হোতো", আমি বললাম, "অঞ্জলীকে পেতেন, কিন্তু এতবড়ো প্রতিভা হতেন না।"

"বলা যায় না", সাধনাদি' বললে, "একজনকে বিয়ে করলে প্রতিভা হওয়া যায় না, আর তাকে বিয়ে না করলে প্রতিভা হওয়া যায়, এটা নেহাৎ ছেলেমানুষের মতো কথা হোলো, সলিল!"

"এখন সিনরিটা বন্দনা আমাকে কোনো একটি সহজ কথা সহজভাবে সোজাসুজি না বললেই আমি বাঁচি", আমি বললাম।

"সে আশা সুদূরপরাহত", বললে সাধনাদি'।

"কেন?"

"শঙ্কর বোসকে চেনো?

"কমার্সের শঙ্কর বোস?"

"হ্যাঁ", সাধনাদি' বললে, "বন্দনা তার সঙ্গে খুব গভীরভাবে প্রেমে পড়েছে।"

"সে কি?" আমি অবাক, "সেদিনই তো বন্দনার সঙ্গে ওর ভীষণ ঝগড়া হয়ে গেল?"

* * * *

শঙ্কর বোস ছিলো সিক্সথ্ ইয়ারের ছাত্র, ষ্টুডেণ্ট্স্ ইউনিয়ানের প্রেসিডেণ্ট।

কমার্স বিভাগের একজন অধ্যাপক, প্রফেসার চৌধুরী একদিন প্রফেসার্স রুমে বসে বললেন, এই বাজারে লংক্লথ পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু শঙ্কর বোস আমাকে কনট্রোল দরে এনে দিয়েছে কুড়ি গজ লংক্লথ।

বিকেল বেলা ক্লাস শেষ হতে মাষ্টার মশাই আমায় ডেকে বললেন, "শঙ্করকে একবার ডেকে নিয়ে আয় তো। বলিস্, আমি ডাকছি।"

বুঝলুম মাষ্টার মশাই কেন তাকে ডাকছেন। তার আগের দিন মিসেস্ মজুমদার বলছিলেন তাঁর কিছু লংক্লথ খুব জরুরী দরকার।

একটু অসোয়াস্তি বোধ করলুম। কারণ আমি জানতুম যে শঙ্কর কনট্রোল দরে লংক্লথ আনেনি। সে কালোবাজার থেকে কালোবাজারের দরেই কিনেছে। কিনে এনে কনট্রোল দরে প্রফেসার চৌধুরীকে দিয়েছে যাকে ছাত্রমহলে বলে "নাইন্থ্ পেপার্মিং" করবার জন্তে, কারণ প্রফেসার চৌধুরী ফোর্থ পেপারের এক্জামিনার।

কিন্তু বলি-বলি করেও মাষ্টার মশাইকে সে-কথা বলা হোলো না।

তারপর যথাসময়ে চক্ষুলজ্জায় পড়ে শঙ্করকে লংক্লথ এনে দিতে হোলো মাষ্টার মশায়ের জন্তেও।

শঙ্করের বন্ধুরা ঠাট্টা করে বললে, "প্রফেসর চৌধুরীকে তো লংক্লথ দিলি নাইন্‌থ্ পেপারিং করতে, কিন্তু মাষ্টার মশাইকে দিলি কিসের আশায়? তিনি তো ফিলসফির প্রফেসার।"

উত্তরে শঙ্কর মাষ্টার মশায়ের সুন্দরী কন্তাকে উপলক্ষ করে যা বললে, সেটা বন্ধুরা ভীষণ উপভোগ করলে। এবং ক্রমে ক্রমে শঙ্করের কোনো এক বন্ধুর বান্ধবীর মারফৎ সেটা মেয়েদের কমনরুমে রটে গেল।

বন্দনা একদিন আমায় ডেকে বললে, "শঙ্কর ছেলেটিকে একটু দেখিয়ে দেবে?"

করিডরে শঙ্কর বোসকে ডেকে বন্দনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলুম। প্রথম আলাপেই বন্দনার ভাষায় বোঝা গেল যে তার শিরায় শিরায় উত্তপ্ত স্প্যানিশ রক্ত বইছে।

কলহের ভাষার আকর্ষণে চারদিকে ভীড় জমতে লাগলো একটি পিরিয়াড শেষ হওয়া ছেলেদের আর মেয়েদের।

আমি এক-পা' এক-পা' করে পেছন দিকে সরে চলে গেলুম সেখান থেকে।

* * * *

তার কয়েক দিন পরের কথা। সাধনাদি'র সঙ্গে গেছি মাষ্টার মশায়ের বাড়িতে। গিয়ে দেখি শঙ্কর বসে আছে।

"আয়। তোরা একে নিশ্চয় চিনিস। তোদের ইউনিয়ানের প্রেসিডেণ্ট। পি-জি'র নামকরা ছেলে। কিন্তু এর আরেকটি পরিচয় জানিস? এ হোলো আমাদের বিখ্যাত কবি অঞ্জলী বোসের ছেলে।"

সাধনাদি'র কাছে আগেই শুনেছিলুম, বন্দনার সঙ্গে শঙ্করের পরিচয় ঝগড়া করে সুরু হলেও, তার পরের পর্য্যায়' মধুরতমের ধার ঘেঁষে চলেছে।

মাষ্টার মশাইকে দেখলুম শঙ্কর বোসকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন।

"আরে তুই হতভাগা এতদিন বলিস্‌নি কেন যে তুই প্রশান্ত আর অঞ্জলীর ছেলে! আমরা সবাই একই সময়ে কলেজে পড়তুম যে। তোর বাপের সঙ্গে কতো ক্লাস পালিয়ে রেস্তর'ায় খেয়েছি। তোর মা আর আমি বসে কতো তাঁর লেখা কবিতা পড়েছি, আমার লেখা প্রবন্ধ আলোচনা করেছি। তোর মা-বাপের কাছে তুই শুনিস্‌নি আমার কথা?"

শঙ্কর বললে, হ্যাঁ, সে কতো-শতবার শুনেছে। তার মা-বাপ দিনরাত প্রফেসার বিভূতি মজুমদারের নাম করেন।

সাধনাদি' আমায় এক ফাঁকে আস্তে আস্তে বললে, আমি যে কোনো মেয়ের কাছে তোমাকে বাজি ধরতে পারি সলিল, শঙ্করের মা-বাপ কোনো দিন ভুলেও মাষ্টার মশাইএর নাম করেন না।

মাষ্টার মশাই আমাকে আর সাধনাদি'কে বললেন, "আরে, তোরা আসবি আগে থেকে জানাস্‌নি কেন? তা'হলে আমি টিকেট কাটিয়ে রাখতুম। এরা সিনেমায় যাচ্ছে।"

"না, না, তা'তে কি", বললে সাধনাদি', "আমরা আরেক দিন আসবোখন" বলে উঠে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে উঠলুম আমিও।

"আরে, তোরা উঠছিস কেন? সিনেমায় তো যাচ্ছে ওরা। আমি আছি। বোস, বোস।"

মিসেস্ মজুমদার, শঙ্কর আর বন্দনা সিনেমা দেখতে গেল। আমি, সাধনাদি' আর মাষ্টার মশাই গল্প করতে বসলুম বারান্দায়।

মাষ্টার মশাই বললেন, "বন্দনা আর শঙ্কর ভীষণ ভালোবাসে দু'জনে দু'জনকে। আচ্ছা পাগল দু'জনে। আজ শঙ্কর আমার অনুমতি চাইতে এসেছিলো বন্দনাকে বিয়ে করবার। বললুম, আরে গাধা, পরীক্ষাটা পাশ করে নে, তারপর দেখা যাবে। মিসেস্ মজুমদারের তো ভীষণ পছন্দ শঙ্করকে। মেয়েটিকে এখন যেন পার করতে পারলে বাঁচে।"

আমরা কেউ কিছু বললুম না। সাধনাদি' তাকালো আমার দিকে। আমি তাকালুম সাধনাদি'র দিকে।

মাষ্টার মশাই বললেন, "আজ আমার মনে পড়ছে সেই পুরোনো দিনগুলোর কথা। শঙ্করের মা আমাকে কতো কবিতা শুনিয়েছে। আর কতো বছর দেখা নেই। সেই ওর বিয়ের পর আমি বিলেত যাওয়ার আগে শুধু একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলো:

তোমার হৃদয়ে ছিলো আশা,
ভাষা আর খুঁজে পেলো না যে—
আমার কলমে ছিলো ভাষা,
প্রাণ পেলো কবিতার মাঝে।

সেই শেষ, তারপর থেকে আর কোনো যোগাযোগ নেই। আজ সেই অঞ্জলীর ছেলে এসে বিয়ে করতে চাইছে বন্দনাকে, এর চেয়ে বেশী আনন্দের কিছু আমি ভেবেই পাচ্ছি নে। কি রে? তোরা চুপ করে আছিস কেন? একটা কিছু বল।"

সাধনাদি' জিজ্ঞেস করলে, "ওঁদের সঙ্গে আপনার আর দেখা নেই অনেক দিন, না?"

"বহুদিন। ভাবছি এবার একদিন ওদের বাড়ি গিয়ে ওদের ডিনারের নেমন্তন্ন করে আসবো। তোরাও আসবি সেদিন। আমার মনে না থাকলেও আসবি।"

"এই বিয়েতে ওঁদের মত আছে?" সাধনাদি' জিজ্ঞেস করলে।

হঠাৎ মাষ্টার মশাই চুপ করে গেলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "তাই তো, সে কথা তো ভেবে দেখিনি? কিন্তু, আরে, এ যে আমার মেয়ে। অঞ্জলী বা প্রশান্তর আপত্তি করবার কি আছে?"

* * * *

তার পরদিন ছিলো রোববার। সকালবেলা সাধনাদি'র ওখানে যেতেই বললে, "চলো, একবার শঙ্করদের বাড়ি বেড়িয়ে আসি।"

"ওদের বাড়ি?" আমি অবাক। "কেন?"

"চলো না। প্রশান্ত বোস আমার বাবার বিশেষ বন্ধু, কাকাবাবু বলে ডাকি। বহুদিন যাইনি। গেলে খুসী হবেন।"

"তোমার না হয় কাকাবাবু। কিন্তু আমি গিয়ে কি করবো। কাউকে চিনি না, জানি না"

"গেলেই জানবে, [illegible]

সে কলকাতায় থাক[illegible]

পাটিতে না কিসে [illegible]

"কিসের সুযোগ ?"

"অতো প্রশ্ন কোরো না। চলো দেখবে।"

সাধনাদি'কে দেখে প্রশান্ত বাবু খুব খুসী। "এসো মা এসো। এদ্দিন পরে ছেলেকে মনে পড়লো ? এটি কে ?—ও, বোসো বোসো। তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুসী হলুম। যে আমার এই ছোট্টো মায়ের বন্ধু, সে আমারও বন্ধু, আমার বাড়ি তারই বাড়ি। দাঁড়াও তোমার কাকীমাকে ডাকি। ওরে বেয়ারা, মেমসায়েবকে বল আমার মা এসেছে।"

অঞ্জলী বোসও এসে যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে।

"শঙ্কর কোথায় ?" সাধনাদি' জিজ্ঞেস করলে।

অঞ্জলী দেবী বললেন, "ও কোথায় এক ষ্টিমার-পার্টিতে গেছে। মাস কয়েক বাদে পরীক্ষা। পড়াশুনো একেবারে করে না। কি যে করবে পরীক্ষায় ভাবছি।"

তারপর বিভিন্ন বিষয়ের অজস্র অকারণ আলোচনার পর সাধনাদি' আচমকা জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা কাকীমা, শঙ্কর আপনার একমাত্র ছেলে। আপনাদের বয়েস হয়ে যাচ্ছে। শঙ্করের বিয়ে-থা দেবেন না ?"

অঞ্জলী দেবী বললেন, "হ্যাঁ, মেয়ে দেখছি। পরীক্ষার পর ওকে বিলেত পাঠাবো। তার আগেই বিয়েটা দিয়ে দিতে চাই।"

সাধনাদি' বললে, "আচ্ছা, প্রফেসার বিভূতি মজুমদার তো আপনাদের সঙ্গে পড়তেন, বিশেষ বন্ধু ছিলেন তো আপনাদের।"

দু'জনেই একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। অঞ্জলী দেবী বললেন, "হ্যাঁ, তা' এককালে ছিলেন।"

সাধনাদি' ওঁদের গাম্ভীর্য গায়ে না মেখে বললে, "ওঁর একটি বেশ সুন্দর মেয়ে আছে। নাম বন্দনা। লেখাপড়ায় খুব ভালো মেয়েটি।"

"হুম্, শুনেছি", অঞ্জলী দেবী বললেন, "শঙ্কর আজকাল ওকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে বটে।"

প্রশান্ত বাবু বললেন, "তা' করুক না, এই বয়েসে ও-রকম এক-আধটু হয়ে থাকে।"

"বাড়াবাড়িটা ভালো নয়", অঞ্জলী বললেন।

"তুমিও তো এককালে—"

"প্রশান্ত !"

সাধনাদি' আমার দিকে তাকালে। আমি তাকালুম কড়িকাঠের দিকে। সেখানে ফ্যান ঘুরছে যদিও, গুমোট গরমটা কাটছে না মোটেই।

চলে আসবার সময় গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন অঞ্জলী দেবী। সাধনাদি'কে বললেন, "বিভূতির সঙ্গে তোমাদের প্রায়ই দেখা হয়, না ?"

আমি একটু অবাক হলুম তাঁর নরম-হয়ে আসা গলার স্বরে। ঘরের ভেতর বিভূতি মজুমদারের প্রসঙ্গ তিনি প্রত্যেক বারই গম্ভীর ঔদাস্যে তুচ্ছ করছিলেন।

মনে হোলো, সাধনাদি' যেন তেমন কিছু বিস্মিত হয়নি। বললে, "হ্যাঁ, প্রায় প্রত্যেক দিনই দেখা হয়।"

"ছাত্রেরা ওঁকে খুবই ভালোবাসে না ?"

সাধনাদি' বললে, "হ্যাঁ, ভীষণ ভালোবাসে।"

অঞ্জলী পথ-চলতি দু'-চারটি দুরন্ত পথিকের দিকে আনমনে তাকিয়ে বললে, "সে ছাত্রছাত্রীদের ভালোবাসে ?'

"নিশ্চয়ই", সাধনাদি বললে।

"মুখ ফুটে কোনো দিন তোমাদের বলেছে সে কথা ?" অঞ্জলী বললেন।

আমি আরো অবাক।

সাধনাদি' বললে, "মুখ ফুটে বলবার দরকার হয় না। তাঁর ব্যবহারেই—"

"ব্যবহারে। হুঁ :—" অঞ্জলী ম্লান হাসি হাসলো।

সাধনাদি'ও একটি করুণ সহানুভূতির হাসি হাসলো, কিন্তু যাওয়ার মুখে শেষ মেয়েলী খোঁচাটি বিঁধিয়ে গেল অঞ্জলীকে।

"উনি তো আপনার খুব বন্ধু ছিলেন। ওঁর মেয়ের সঙ্গে শঙ্করের বিয়ে দিন না।"

অঞ্জলী বললেন, "সে হয় না। বাঙালী মায়ের মেয়ে হলে দিতুম। বিভূতি মজুমদার যে শেষ পর্যন্ত মেমসায়েব বিয়ে করবে আমি ভাবতে পারিনি।"

সাধনাদি' আমার দিকে তাকালো। ওর চোখ দু'টি আমায় বললে, "ব্যথাটা কোথায় বুঝলে ?'

আমি বুঝলুম। ব্যথাটি মেমসায়েব বিয়ে করায় নয়, বিয়েটাই করায়। মাষ্টার মশায় চিরকুমার থাকলেই তিনি মনে মনে খুসী হতেন হয়তো।

ঠিক বেরিয়ে আসবার মুখে অঞ্জলী জিজ্ঞেস করলেন তাঁর শেষ প্রশ্নটি, "বিভূতি মজুমদারের বৌকে আমি দেখিনি। লোকে বলে বেশ সুন্দর দেখতে। সত্যি ?"

সাধনাদি' কি একটা উত্তর দিতে গেল। কিন্তু ততক্ষণে এ-সব আমার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। বললুম, "চলো তাড়াতাড়ি, বাসটা এসে পড়লো।"

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

রমাপতি বসু

... আগমনে কেন জানি না পরমেশ্বর অলক্ষ্যে খুব একটুখানি ... একটি ইজিচেয়ারের উপর। চোখ না ... নয়। জোর সত্তেয়ো কি ... প্রশান্তর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। একটু ... হঠাৎ মনে হবে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। তারপর একদ... রূসের জৌলুষটা তার একটু ম্লান হ'য়ে গেছে। তবু তার চেহারার মধ্যে ঝিঁকে লাবণ্যের আভাষ পাওয়া যায়।

আজ কয়েক দিন হ'লো সতী পরমেশ্বর সেনের বাড়ী চাকরী করতে এসেছে। গৃহস্থের কাজে সহায়তা করার জন্ত এবং সাংসারিক

আপনি কি কখনো

কিনবেন না সত্যি, কিন্তু ঠিক এই রকমই অবস্থাটা দাঁড়ায় যখন কেউ বেশী-শক্তির ব্যয়বহুল ব্যাটারী সেট ব্যবহার করেন; অথচ কম-শক্তিক্ষয়ী সেটও আছে যাতে সুন্দর আওয়াজ পাওয়া যায়। যে রেডিও সেট অতিরিক্ত আওয়াজ বার করে তার ব্যাটারী অল্পেই অযথা নষ্ট হয়।

কম-শক্তিক্ষয়ী সেটে ব্যাটারীও অনেক কম খরচ হয় আর তাতে টাকার সাশ্রয় হয়। সুতরাং, যখনই ব্যাটারী সেট দরকার হবে, কম-শক্তিক্ষয়ী সেট কিনবেন — তাতে আপনার রেডিও থেকে কান ফাটানো আওয়াজের পরিবর্তে সুন্দর শ্রুতিমধুর সুর বেরুবে।

ব্যাটারীর প্রয়োজনে সব সময় ব্যবহার করুন

এভারেডী রেডিও ব্যাটারী

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রেডিও ব্যাটারী

ন্যাশনাল কার্বনের তৈরী

সকল প্রকার কাজে অভিজ্ঞ—পরিচারিকা চাই, বলে পরমেশ্বর যখন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, তখন সতী সরাসরি এসে দেখা করে বিজ্ঞাপনদাতার কাছে। সতীকে দেখে পরমেশ্বর সেন কেন জানি না প্রথমেই চাকরীতে বহাল করার অভিমত প্রকাশ করে ফেলেন। কিন্তু পরমেশ্বরের স্ত্রী সারদা দেবীর প্রথমেই সতীকে দেখে রাখার আপত্তি ছিল।

পরমেশ্বর সতীর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি জানো না সারদা, মেয়েটি নিশ্চয় খুব দুঃখী। আর তা ছাড়া বাস্তুহারা। এদের ঠাঁই দেওয়া উচিত।' সারদা দেবী স্বামীর ওপর কোন কথাই কোন দিন বলেননি, তাই তিনি পরমেশ্বরের এই কথায় রাজী হ'য়ে যান। কিন্তু সারদা দেবী নিজের মনকে সহজ করে নিতে পারেননি। মনে তাঁর দ্বিধা থেকে যায়। দ্বিধা থেকে যায় সতীর বয়সের জন্ত। তা যা হোক, সতী যদি ঠিক ভাবে কাজ করে যায়, তবে সারদা দেবীর তাতে কিছু এসে-যায় না।

প্রথম ক'দিন সতীর বেশ অসুবিধা হ'য়েছিল এই বাড়ীতে। আর অসুবিধা হওয়া তো স্বাভাবিক। কেন না, প্রথমত, সতী হচ্ছে খাঁটি পূর্ববঙ্গের মেয়ে। যতই চালাক-চতুর সে হোক না কেন, এ দেশের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের সঙ্গে তার আদৌ পরিচয় নেই। দ্বিতীয়ত, সে কোন দিন স্বপ্নেও ভাবেনি যে গৃহস্থের বাড়ীতে এই ভাবে তাকে আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু সতী কেন এলো?

সতীর পরিচয় একটু সংক্ষেপে না দিলে আমার এ কাহিনী অসমাপ্ত থেকে যাবে। তা ছাড়া আপনারা কি ভাবে তাকে বিচার করবেন? সতীর বাবা ছিলেন বরিশালের কোন এক স্কুলের মাষ্টার। ছাত্রদের তিনি খুব প্রিয় ছিলেন। পড়ানো ছিল তাঁর নেশা। সতীরা তিন বোন। সতীই বোধ হয় সবচেয়ে বড়ো। বাড়ীতে মাষ্টার মশাই একটি কোচিং ক্লাশ খুলেছিলেন। ছাত্রের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। পরেশ ছিল সতীর বাবার সব চেয়ে প্রিয় ছাত্র। তিনি একটু বেশীই স্নেহ করতেন পরেশকে। আর এই স্নেহই হ'লো সবের কাল।

দেশবিভাগের ফলে বাস্তুত্যাগ করা যখন খুব বেশী প্রবল ভাবে দেখা দিল, তখন সকলের অজ্ঞাতে পরেশ সতীকে নিয়ে চলে আসে কোলকাতায়। মাষ্টার মশাই বা সতীর মা-বোনেরা কোলকাতায় পৌঁছেছিল কি না—তা আমার জানা নেই, তবে সতীকে নিয়ে পরেশ উঠেছিল তার মামাতো বোনের বাড়ী। কয়েক দিন সেখানে থাকার পর পরেশ বিবাগী হ'য়ে চলে যায়, আর সতী তখন পরেশের মামাতো বোনের একটি বোঝা হ'য়ে পড়ে। লেখাপড়া কিছু শিখেছিল বলে সতীর আশা ছিল নার্সিং ট্রেনিং নেবে। কিন্তু মুরুব্বীর জোর না থাকলে এ-সবের সুযোগ পাওয়া যায় না। তাই সতী একদিন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে হাজির হয় পরমেশ্বর সেনের বাড়ীতে। কিন্তু কাজটা যে একেবারে ঝি-গিরি তা কিন্তু সতী ঠিক ঠাউরে উঠতে পারেনি। তা হোক, মেয়েরা তো দু'মুঠো অন্নের জন্ত কত কি না করতে বাধ্য হয়। সতী না হয় দাসীবৃত্তি করবে। পারিবারিক মর্যাদার কথা সে নিজের মন থেকে সম্পূর্ণ ভাবে সরিয়ে দিয়ে নতুন এক জীবন সুরু করেছে।

যে কোনো পরিবেশের মাঝে মেয়েরা যেমন খাপ খাইয়ে নিতে পারে, পুরুষরা সে রকম পারে না। তাই দেখা যায়, পরমেশ্বর সেনের বাড়ীতে এই ক'দিনেই সতীর সুখ্যাতিতে সকলে পঞ্চমুখ। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে সতীর কাজের বেশ যাগ আছে। এ-বাড়ীর সকলেই চায় সতী তার কাজ করুক। সে অসাধারণ মেয়ে—তাই সকলের মন জুগিয়ে সে কাজ করে যায়। আর সত্যি কথা বলতে কি, তার কোন অবসরই নেই।

পরমেশ্বর বাবুর বাড়ীতে দু'বেলায় কমপক্ষে আশীখানা পাত পড়ে। তাঁর পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ে। বড়ো ছেলে শরৎ বিপত্নীক। শরতের তিনটি ছেলে-মেয়ে, ছোট ছেলেটা এই সবে চার বছরে পা দিয়েছে। মেজ ছেলে বিজয় ডাক্তার। তার অবশ্য ছেলে-পুলে কিছু নেই—তবে স্ত্রী অনুরাধা জটিল স্ত্রীরোগে আক্রান্ত বলেই শয্যাত্যাগ করা নিষেধ। সেজ ছেলে সমর ঘোর সংসারী। সাত বছর তার বিয়ে হ'য়েছে—পাঁচটি ছেলের বাপ। ন' ও ছোট রাত্রে বাড়ী আসে। সমস্ত দিন কোথায় থাকে, কি করে তা কেউই জানে না। পরমেশ্বর বাবুর ন' ছেলে বিপিন কংগ্রেসের একজন চাই বলে সে জাহির করে থাকে—আর ছোট ছেলে বিধান কম্যুনিষ্ট। এ ছাড়া আরো অনেক পোষ্য।

সতীকে বাসন-মাজা বা ঘর-ঝাঁট দিতে হ'তো না বটে, কিন্তু এদের প্রত্যেকের ফাই-ফরমায়েস খাটা ও সমানে তিনতলা বাড়ীর ওপর-নীচ করা কম কথা নয়! তবু সতী সকলের সঙ্গে বেশ মানিয়ে নিয়ে চলে। আর সতীর এই প্রশংসা বাড়ীর পুরোনো ঝি কালোর মা ও তার নাতনী বিন্দীর মোটেই সহ্য হয় না। মাঝে মাঝে কালোর মার মুখ থেকে এ কথাও শোনা যায়—সোঁয়াপোকার মত তো গতর। বয়সকালে আমাদেরও ও-রকম কদর ছিল বাবুদের বাড়ীতে। প্রত্যহ এই ধরণের কথা শোনা যেত এ বাড়ীর অন্যান্য ঝি-চাকরদের মুখে। শুধু বাড়ীর পুরোনো পাচক মুকুন্দ এই সব কথা কোন দিন বলেনি বরং প্রতিবাদ করতেও তাকে দেখা যেত।

সতী এদের কোন কথায় কোন দিন থাকতো না। বেশীর ভাগ সময় সে সারদা দেবীর পিছু-পিছুই ঘুরতো। আর তা ছাড়া গৃহিণী যদি খুশী থাকে তবে সতীর চাকরীও যে বজায় থাকবে এ কথা সে নিজে ভাল করে জানতো। কিন্তু তবু সতীকে তার নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক সময় অনেকের মন জুগিয়ে চলতে হ'তো।

শরতের ছোট ছেলেটা সতীকে দেখলে কোলে উঠে বসতো আর কিছুতেই নামবে না। তার অবশ্য ছেলেটার জন্ত মায়া হ'তো। 'আহা—মা-মরা ছেলে!' অনেক সময় সতী একে কোলে নিয়েই কত কাজ করে যেত।

ছেলেটা একটু খুশী মেজাজে থাকলে সতীকে মা বলে ডাকতো। মা ডাকটা সতীর শুনতে যে ভালো না লাগতো তা নয়। একদিন শরৎ আড়াল থেকে দেখে—তার ছেলে সতীকে 'মা'-'মা' বলে ডাকছে। শরতের সঙ্গে সতীর চোখ চাওয়া-চাওয়ি হ'তে লজ্জার লাল হ'য়ে যায় সে। শরৎ কিন্তু লজ্জা পায় না মোটে। একদিন নির্জনে পেয়ে শরৎ সতীকে বলে: 'তোমার কি শুনার নেই? ছেলেটা যে ও-রকম ভাবে তোমাকে আঁকড়ে-আঁকড়ে ধরে—তুমি কি···' শরতের কথা শেষ হওয়ার আগে সতী নেমে যায় একতলায় সারদা দেবীর কাছে।

দুপুর বেলা খোদ বাড়ীর কর্ত্তা পরমেশ্বরের গা-হাত-পা টিপে দেওয়াই ছিল সতীর দৈনন্দিন কাজ। সে কর্ত্তার সেবা করতো বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে আর তা ছাড়া পরমেশ্বর বাবুর কথাবার্ত্তা শুনলে মনে হয় লোকটি বেশ খাঁটি ও সজ্জন। তাই দুপুর বেলা যখন সকলে বিশ্রাম করার সুযোগ পেত, তখন সতী অম্লান বদনে সেবা করতো পরমেশ্বর বাবুর। অনেক সময় তিনি সতীকে সস্নেহে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তার বিপর্যস্ত ভাগ্যের জন্য সমবেদনাও জানাতেন। কিন্তু সেদিন পরমেশ্বর বাবুর স্নেহাধিক্য সতীর মনকে খুব বেশী পীড়িত করে। কোন রকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে আসে সারদা দেবীর ঘরে।

সারদা দেবী জিগেস করেন: কি হ'লো?

সতী বলে: বাবা ঘুমিয়ে পড়েছেন—তাই আপনার কাছে শুতে এলাম।

সারদা দেবী সতীর মনের কোন কথাই জানেন না। তাই বললেন: মেঝেতে শোও না বাছা! একটু বিশ্রাম করো। খাটুনি যে তোমার দিন-দিন বেড়েই চলেছে।

সতী শুয়ে পড়ে মাটিতে। চোখ বুজিয়ে চিন্তা করে এ কি হ'লো? কর্ত্তা যদি বিরূপ হয় তবে তার ঠাঁই কোথায়? এখানকার অন্ন তার বুঝি শেষ হ'লো। চোখ বুজিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার ভাণ করে থাকে সে। চিন্তা করে তার কি করা উচিত। মাঝে মাঝে সে অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। সেদিন রাত্রে ঘরের দরজা দিয়ে শুতে ভুলে গিয়েছিল সতী। মাঝ রাতে ছোট ছেলে বিধান এসে সতীর গায়ে হাত দিয়ে খুব আস্তে আস্তে ডাকছে, সতী—সতী! সতীর ঘুম তখনও আসেনি। ভয়ে শরীরটায় তার কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। বিধান অন্ধকারে সতীকে ভাল করে ঠাহর করতে না পেরে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। সতী আর পারলো না। সে চমকে ওঠার ভাণ করে উঠে বসলো। বিধান অবশ্য এই পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই সে একটু থতমত খেয়ে বলে ওঠে: ভয় নেই, আমি ছোট বাবু। আমার এই ইস্তাহারের বাণ্ডিলটা তোমার কাছে রেখে দাও। দেখ, পার্টির খুব দরকারী আর কেউ যেন জানে না। সতী আর কি করবে? বলে: না, কারুকেই এ কথা বলবো না। বিধান মুখটাকে বেশ গম্ভীর করে বেরিয়ে যায় সতীর অন্ধকার ঘর থেকে।

সতী সেদিন কিন্তু এত আড়ষ্ট হ'য়ে যায়নি যত আড়ষ্ট হ'য়ে গেছল আজ দুপুরে। শুয়ে শুয়ে সে কত কথাই ভাবে। ভাবে তার কি অপরাধ? কার অভিশাপে সে এই অভিশপ্ত জীবন বয়ে চলেছে?

হঠাৎ মস্-মস্ করে জুতোর আওয়াজ শোনা যায়। সতী মটকা মেরে পড়ে থাকে। হ্যাঁ, ন'ছেলে বিপিনই এসেছে। গলার একটু আওয়াজ করেই সে ঘরে ঢুকলো। তার পর ডাকে: মা—মা। সারদা দেবী তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। আর কোন সাড়া পাওয়া যায় না বিপিনের।

অনেকক্ষণ বাদে সতী চোখ পিট্-পিট্ করে চেয়ে দেখে বিপিন একদৃষ্টে চেয়ে আছে সতীর দিকে। সে জোর করে চোখ বুজিয়ে পড়ে থাকে। তার পর কখন যে সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে—তা সে নিজেই জানে না। রোদের তেজ তখন বেশ কমে গেছে। সারদা দেবী উঠে পড়েন।

মেঝেতে যে সতী আজ শুয়েছিল—তা সারদা দেবীর খেয়াল ছিল না। তার ওপর গৃহিণীর ঘরে—এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোনোর কথা মনে পড়তেই তিনি দপ্ করে জ্বলে ওঠেন। সারদা দেবী সতীর গায়ের কাপড়টা টেনে দিয়ে বলেন: ওঠো গো বাছা, সোমত্ত মেয়েছেলে দিন-দুপুরে কি এমনি বেসামাল হ'য়ে শুতে আছে?

সতীর কানে এই কথাগুলো পৌঁছতে সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে।

বিপিনের আগমন ও সারদার এই কটাক্ষের কথা চিন্তা করতে করতে সতীর মুখটা লাল হ'য়ে যায়। ভাবে—এ তারই দোষ। কি প্রয়োজন ছিল দুপুর বেলা সারদা দেবীর ঘরে এসে শোয়া? তার তো ঘর ছিল! কিন্তু সতী ইচ্ছে করে যায়নি দুপুর বেলা তার ঘরে শুতে। নীচের ঘরে তাকে একলা পেলে ঝি-চাকরেরা বেশ মস্করা লাগিয়ে দেয়। এ সব সহ্য করতে পারে না সতী। আর কি করেই বা সে পারবে? আসলে তো সে কোন দিন এই কাজে অভ্যস্ত নয়? আজ সে নিরুপায়। সে কারণে গৃহস্থের বাড়ীতে দৈহিক পরিশ্রম করে সে নিজের অন্নের সংস্থান করার চেষ্টা করছে। এর মধ্যে আর অন্যায় কোথা? কাজটা নীচ? তা কি করবে সতী? এ তো তার নিষ্ঠুর ভাগ্যের পরিহাস ছাড়া কিছুই নয়!

এই আবহাওয়া সতীর আর সহ্য হয় না। সন্ধ্যে বেলা মেজ

উকুনের নতুন ওষুধ
নিউট্রল-লাইসাইড

"আমি আপনার ল্যাবরেটারীর উকুনের ঔষধের কথা আর বর্ণনা করিতে পারিলাম না। কী অমোঘ ঔষধ যে পাঁচ বছর ধরিয়া কোন ঔষধে কাজ হয় নাই অথচ আপনার ল্যাবরেটারীর ঔষধ একবার ব্যবহার করিয়া আমি এবং আরও ৫ জন মহিলা উপকৃতা হইয়াছেন। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।"

মিসেস বসু, কলিকাতা—২৬

প্রতি প্যাকেটের জন্য দুই আনার ডাকটিকেট পাঠাইবেন।

বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার কয়েকটি জেলায় এই "লাইসাইড" পরিবেশক প্রয়োজন। উচ্চহারে কমিশন দেবো।

Dept. M. B.

১৯, বগুড়া রোড; কলিকাতা-১৯

ছেলে বিজয়ের রুগ্না স্ত্রী অনুরাধার কাছে কাজ করার হুকুম হ'য়েছে সারদা দেবীর। সতী গৃহিণীর নির্দেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে। বহুদিন শয্যাশায়ী থাকার জন্ত অনুরাধার মেজাজটা বেশ ঝাঁঝালো হ'য়ে গেছে আজকাল। অনুরাধা সতীকে অন্তমনস্ক দেখে বলে: সন্ধ্যে বেলায় কি স্বপ্ন দেখছো না কি? বললাম না মাথার দিকের জানলাটা খুলে দাও?

সতী লজ্জিত হ'য়ে বলে: আমি খেয়াল করিনি মেজ বৌদিদি! অনুরাধা বলে: পেটভাতে আছ—এ সব খেয়াল না করলে চলবে কেন?

অনুরাধার কথাগুলি ছুঁচের মতন গিয়ে বেঁধে সতীর বুকে। চোখ তার জলে ভরে যায়। মনে মনে ভাবে, এর চেয়ে অনাহারে দিন কাটানো ঢের ভালো।

নিজের সঙ্গে অনুরাধার ভাগ্যের কথা ভেবে সতী মনে মনে বলে, ভগবান তাকে এক কঠিন পরীক্ষা করে চলেছেন। তা যদি না হবে, তবে অনুরাধা পালঙ্কে শুয়ে থাকে আর সতী তার সেবা করে? অনুরাধার চেয়ে সতী কোন্ অংশে ছোট? না—না, এ সব অসহ্য মনে হয় তার। এ বিদ্রূপ, এ তামাসা আর ভাল লাগে না। এত দিন সে সবই সহ্য করে এসেছে, কিন্তু আজ যেন তার মন এ সবে কিছুতেই সায় দিচ্ছে না।

এ বাড়ীতে আসার পর—যা কিছু আজ পর্যন্ত ঘটেছে—সব কথাই মনে পড়ে যায় সতীর। মনটা তার একেবারে মুষড়ে যায়।

* * *

পরের দিন সকালে সারদা দেবী পরমেশ্বরকে ডেকে বলেন, শুনেছ—সতী চলে গেছে?

পরমেশ্বর জানতেন সতী চলে যাবে, তবুও বিস্মিত হওয়ার ভাণ করে বললেন: তাই না কি?

সারদা দেবী বললেন: শুধু সতী নয়—মুকুন্দও চলে গেছে। পরমেশ্বর কিন্তু এ সংবাদের জন্ত প্রস্তুত ছিলেন না। তাই একটু উত্তেজিত হ'য়ে বলেন: মুকুন্দও গেছে?

সারদা দেবী একটু বক্র হাসি হেসে বলেন: মুকুন্দর পেটে-পেটে এত বুদ্ধিও ছিল!

পরমেশ্বর আর কোন জবাব দেননি। শুধু তিনতলার ঘরে ওঠার সময় নিজের মনে মনে একটু হেসেছিলেন।

যুদ্ধ

নীলিমা মুখোপাধ্যায়

পাহাড়ী ঝর্ণার মতন হাততালি দিয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ওলান। এককালি ছোট্ট উঠোনটা মুখরিত লতা-বিতানে আলো হয়ে উঠেছে। আনন্দের আতিশয্যে ঝর-ঝর করে অবিশ্রাম কথা বলে চলে ওলান। "কি রে"···একপাশে লতিয়ে-ওঠা ছোট্ট একটা সয়াবিন লতার গায়ে হাত দেয় ওলান। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে নরম ডাঁটা শির-শির করে ওঠে। আসন্ন প্রসব-বেদনায় আনন্দে নুয়ে-নুয়ে পড়ে অঙ্কুরোদ্গম বীজের লাল আভাস।

"আমার আগেই যে তুই ফলে গেলি রে!" সন্তর্পণে সস্নেহে ছোট্ট ঝাড়টাতে অল্প অল্প দোলা দেয় ওলান। সবে মাত্র ভোর হচ্ছে। সুগভীর কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে এককোঁটা রোদের রেখাও দেখা দেয়নি আকাশে। অসহ্য শীতের প্রকোপে সমস্ত শরীর বুঝি জমে যায়। ঘুম ভেঙে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে চেং লিং। ক্ষেতে যাবার সরঞ্জাম জোগাড় করে। ওর জল গরম করবার জন্ত রান্না-ঘরে যায় ওলান। দুধহীন এক গ্লাস গরম চা আর ওলানের হাতে তৈরী কতগুলো চিনি-জমানো কেক খেয়ে নিয়ে বলদজোড়া তাড়িয়ে নিয়ে মাঠের দিকে নেমে যায় চেং লিং। ওলান গোয়ালে যায়। খুঁট খুলে জাবনা দেয় একটা দুধোলা গাইকে। "সব দুধ বাছুরকে খাইয়ে দিয়েছ তো লোভী ভূত?" দু'হাতে গরুটার নধর গলা জড়িয়ে ধরে অকারণ হাসিতে ভেঙে পড়ে ওলান।

ছোট্ট সংসার তবু কাজের আর শেষ নেই ওর। সংসারের ছোটখাটো কাজ সেরে ও মাঠে যায়, চেং লিংএর পাশে দাঁড়িয়ে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে। যৌবনের সবটুকু শক্তি নিংড়ে দিয়ে ওরা মাঠে ফসল ফলায়। সোনার ফসল। পাকা ধানের শিষে-শিষে সোনার রং ওদের তরুণ চোখে স্বপ্ন আনে। চাষীর স্বপ্ন। যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তা শীগগির ফলবতী হবে। ওলান মা হবে। ছোট্ট সংসার শিশুর কল-কাকলীতে ভরে উঠবে। পরিশ্রম করবে ওরা। আরো পরিশ্রম। চাষীর জীবন। দুঃখ-কষ্টকে তো ভয় করে না ওরা? জীবনের সঙ্গে অবিশ্রাম যুদ্ধ করে ওরা। জোর করে কেড়ে রাখে ওদের বেঁচে-থাকাটুকু। অজস্র পরিশ্রমে ফসল ফলায় মাঠে আর তারই সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন দেখে সন্তানের, সংসারের, শান্তির।

মাঠ থেকে বাড়ি ফেরে চেং থমথমে আষাঢ়ের মেঘের মতন মুখ নিয়ে।

"কি হোয়েছে গো তোমার আজ?" ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে ওলান।

"যুদ্ধ বাধছে আবার।" ভারী গলায় ছোট্ট করে উত্তর দেয় চেং।

"যুদ্ধ?" শঙ্কিত হয়ে ওঠে ওলান। "কোথায়?"

"মহাচীনে।" এতক্ষণে শোনা কথা বিজ্ঞের মতন আর এক জনকে বলতে পেয়ে কিছুটা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে চেং।

"মহাচীন? সে আবার কোথায়?"

পরিষ্কার করে ব্যাপারটা চেং নিজেই জানে না। চাষী তারা, মাঠের ফসল নিয়েই ব্যস্ত, অন্ত কথা ভাববার তাদের না আছে উৎসাহ না কৌতূহল।

"সে আমাদের মাতৃভূমি।" নিজের অজ্ঞতা ঢাকতে তোতা-পাখীর মতন শোনা কথা আওড়ায় চেং।

"তা যুদ্ধ কেন?" আবার শঙ্কিত প্রশ্ন তোলে ওলান।

"বাঃ, আমাদের মাতৃভূমিকে আমরা পরের হাত থেকে রক্ষা করব না? আমাদের ফসল অন্যে দখল করবে?" মুখস্থের মতন কথাগুলো আবার বলে চেং। গম্ভীর বিষণ্ণ ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে ওলান। কথা বলে না চেং-ও।

"যুদ্ধ করে দেশ রক্ষা করলে আমাদের ফসল আর কেউ কেড়ে নেবে না?" নীরবতা ভেঙ্গে আবার প্রশ্ন করে ওলান।

এবার ইতস্তত করে চেং। এ কথা ত তাকে কেউ বলেনি। "ঠিক বুঝতে পারছি না"···কিছুক্ষণ ইতস্তত করে আমতা-আমতা করে উত্তর দেয় চেং, "জমিদার আর মহাজন"··· ঠিক জানি না ওলান।"

"আমি জানি।" উত্তর দেয় ওলান। দেশে যুদ্ধোযুদ্ধি তো কম হলো না, আমাদের দুঃখ ঘুচল এক দিনের জন্যে?"

"তা বলে দেশ···" বড় বড় বক্তৃতার ঝঙ্কার তখনও চেংএর কানে।

"তুমি থাম বাপু" এবার বিরক্ত ভাবে ঝঙ্কার তোলে ওলান। গরীব কখনো বাদশা হয় না। আমরা চাষী মানুষ ফসল পেলেই হোল। যুদ্ধ হোল না হোল আমাদের কি বয়ে গেছে?"

উত্তর দেয় না চেং। এ প্রশ্ন যে তার নিজেরই মনে। চাষী সে। সবল বলিষ্ঠ হাতে অস্ত্র চালায় সে। সে অস্ত্রে বন্ধ্যা উষর পৃথিবীর বুক চিরে বেরোয় মানুষের বাঁচবার ইন্ধন। মানুষ মারার অস্ত্র তার হাতে উঠবে কেন? প্রয়োজন কেন?

কিন্তু তবু তো বয়ে যায় না। লাঙ্গল ফেলে সকলকে তুলে নিতে হয় বন্দুক। সবাই। কোন জোয়ান-মরদ বাদ যায় না, কেবল দাঁত যাদের ওঠেনি আর যাদের পড়ে শেষ হয়ে গেছে তারাই অসহায় অবহেলিতের মতন পড়ে থাকে ঘরের কোণে।

"আমি কি করে থাকব চেং?" কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ওলান।

ওর মাথাটা টেনে নিয়ে নীরবে সান্ত্বনা দেয় চেং।'

"আমাদের ক্ষেতের কি হবে?"

"ভগবান দেখবেন ওলান। আবার যদি ফিরে আসি···"

"ওঃ মা গো, আমি তাহলে বাঁচব না চেং" অসহ্য আবেগে ফুঁপিয়ে ওঠে ওলান।

রাত শেষ হয়ে আসে প্রায়। ভোরের আকাশের এক টুকরো ক্লান্ত চাঁদ করুণ হয়ে ওঠে সুনিবিড় কুয়াসার আবরণে। "আর একটু পরেই বেরোতে হবে।" অসহায় ভেজা-গলায় যেন নিজের মনেই স্বগতোক্তি করে উঠে পড়ে চেং। সারা গ্রাম জেগে ওঠে ভোর হবার অনেক আগেই। মাঠে যাবার ডাক না—ফসল ফলাবার স্বপ্ন নয়। অবোধ অসহায় অশ্রু বাঁধ ভেঙ্গে নামে মেয়েদের চোখে, পুরুষের কঠিন মুখ আরও কঠিন হয়ে ওঠে অসহায় আক্রোশে।

ভোরের সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে চেং। ছোট থলিটা তবু হাতে তুলে দেয় ওলান।

"আসি ওলান। সাবধানে ভাল ভাবে থেক। যে ছেলেকে আমি দেখতে পেলাম না······"

দুর্বার কান্নার আবেগে ভেঙ্গে পড়ে ওলান। দু'হাতে সজোরে চেপে ধরে সামনের বেড়াটা। পায়ের তলায় পিষে যায় মুঞ্জরিত লতাবিতান।

এগিয়ে যায় চেং। সামনে সীমাহীন চলায় পথ—অজানা, বন্ধুর। পেছনে পড়ে থাকে ওলান, পড়ে থাকে সংসার, সুখ শান্তি।

* * * *

সমস্ত গ্রামের বুকে নিস্তব্ধতা যেন জমাট বেঁধে ওঠে। কথা যেন সব ফুরিয়ে গেছে! সকাল থেকে রাত যে যার নিজের কাজ করে যায় যন্ত্রের মত। ওলানের দিন আর কাটে না। মাঠে দেখা দিয়েছে নতুন ফসলের মরসুম। সোনা-গলান টুকরোর মতন ঝিক্‌-ঝিক্‌ করে সোনালী ধানের পরিপূর্ণ শীষগুলো। কাস্তে হাতে মাঠে এসে দাঁড়ায় ওলান। অনেক—অনেক কাজ এখন বাকি। সামনে আছে তার অনাস্বাদিত ভবিষ্যৎ। গড়ে তুলতে হবে সংসার।—কিন্তু একা, কত একা সে সৃষ্টির দায়িত্ব ভার তার।

সকাল-সন্ধ্যে দিনের যে কোন মুহূর্তে যে কোন বাড়ি থেকে ওঠে ক্রন্দনের রোল। দূরাগত প্রিয়জনের এসেছে কোন সংবাদ—হয় মৃত্যুর নয় জখমের। প্রথম প্রথম গ্রামবাসী সকলেই ছুটে যেত প্রতিবেশীর বাড়ি। সান্ত্বনা সহানুভূতিতে ভুলিয়ে দিতে চাইত তাদের বেদনা। কিন্তু এত দিনে সে উৎসাহটুকু নিঃশেষ হয়ে এসেছে তাদের। বড় একঘেয়ে বড় নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের এই অসহায় বেদনাভার। তাই মানুষের আর্ত ক্রন্দনের রোলে সান্ত্বনা আর জোগায় না তাদের মুখে, শুধু চোখে-চোখে ফুটে ওঠে বোবা পশুর অসহায় আর্ত চাহনি। দিন আর কাটে না ওলানের। দিন শেষ না হতেই ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দেয় মেঝের ওপর। অনেক কাজ এখনও বাকি। তার শরীরের মধ্যে যে ক্ষুদ্র প্রাণটুকু বাইরের খোলা পৃথিবীর আলো দেখবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে তাকে মুক্তি দিতে হবে। অনেক—অনেক দিনের অপেক্ষার পর সময় ঘনিয়ে এল। হয়তো···হঠাৎ তীক্ষ্ণ কর্কশ একটানা এক সুরে চিন্তাজাল ছিঁড়ে যায় তার। এ স্বর সে চেনে। এখুনি পালাতে হবে। প্রাণটুকু নিয়ে ভীতু ইঁদুরের মতন ঢুকতে হবে গর্তে। ডাকছে। একঘেয়ে একটানা যান্ত্রিক সুরে ডেকে চলেছে সে অদৃশ্য স্বর। কানে আসে ওলানের। কিন্তু উঠবার শক্তি কই? সীমাহীন ক্লান্তি আর আলস্য নিয়ে মেঝের ওপরেই এলিয়ে থাকে সে। বাইরে জানলার পাশ দিয়ে শোনা যায় ভীত আর্ত মানুষের পলায়নের শব্দ। পালাচ্ছে সব। মুহূর্তের মধ্যে এত দিনের গড়া সংসার সুখ-শান্তি পেছনে ফেলে অসহায় ভাবে ছুটে চলেছে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে—হয়তো আরও গভীরতম বিপদের মুখে। কান পেতে শোনে ওলান ওদের অস্থির পদশব্দ। বোমা পড়তে আরম্ভ করেছে। জানে ওলান একটি একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ মুহূর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে তাদের এত দিনকার তিল তিল সাধনার সৃষ্টি। হঠাৎ উঠতে চেষ্টা করে ওলান। ফসল জ্বলে যাচ্ছে। তাদের এত দিনের এত পরিশ্রমের এত আশার সোনার ফসল জ্বলে যাচ্ছে মুহূর্তেরও ভগ্নাংশের সময়টুকুর মধ্যে। ধস্‌-ধস্‌ করে ভেঙ্গে পড়ে কয়েক গজ দূরের একটা বাড়ি। চমকে উঠে সামনের দেয়ালটা ধরে ফেলে ওলান। এমনি করে কি মুহূর্তের ব্যবধানে কি ঝরঝর করে ভেঙ্গে পড়বে তার সংসার তার জীবন তার সমস্ত ভবিষ্যৎ? কিন্তু তার শরীরের মধ্যে অনন্ত অন্ধকারের ভেতর থেকে যে বন্দী আত্মাটুকু অসহ্য আবেগে স্পন্দিত হচ্ছে একটু প্রাণ

একটু আলো একটু বাতাসের জন্যে, তা-ও কি মুছে যাবে? একটু আলোর অধিকারও কি তাকে দেবে না পৃথিবী? হঠাৎ অসহ্য ভয়ে তার সমস্ত শরীরটা কেঁপে ওঠে—শির-শির করে ওঠে। বাঁচতে হবে। তার বাঁচার ওপর নির্ভর করছে ভবিষ্যতের খানিকটা সৃষ্টি। কাঁপা অশক্ত পা দু'টো টেনে নিয়ে চলতে চেষ্টা করে ওলান। সামনে খানিকটা পথ। খানিকটা ধ্বংসলীলা পার হয়ে গেলেই মিলবে আশ্রয়। একটু মাথা গুঁজে নিশ্বাসটুকু টিকিয়ে রাখবার অবকাশ। ছুটতে চেষ্টা করে ওলান। কিন্তু শরীরের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণাটা যে পাক দিয়ে উঠছে! দাঁতে দাঁত চেপে ওলান নিজের শরীরটা চেপে ধরে। পালাতে যে হবেই। বাইরে অবিশ্রান্ত চলেছে অগ্নিবর্ষণ। এর মধ্যেই পালাতে হবে। কিন্তু চোখে যে অবিশ্বাস্য রকম অন্ধকার নেমে আসছে। হাত দিয়ে পথ হাতড়ে ছুটতে চেষ্টা করে ওলান। কিংবা হয়তো সবটুকু পথই এখনও বাকি! একটু শুতে পারলে ভারী দেহটা শুধু একটু মাটির বুকে এলিয়ে দিতে পারা যেত! চেতনা হারিয়ে যাবার আগে ওলান হাত দিয়ে মাটি স্পর্শ করতে চেষ্টা করে। কি যেন একটা আওয়াজ হোল? ভীষণ আকাশ বিদীর্ণ করা আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কি যেন সব ভেঙ্গে পড়ছে? ওলান মাটি স্পর্শ করে শুয়ে পড়েছে। ঘুম আসছে না কি? কিন্তু কি যেন অসহ্য যন্ত্রণায় পাক দিয়ে দিয়ে বসছে শরীরের প্রত্যেকটি স্নায়ুতন্ত্রীতে? অসহ্য যন্ত্রণায় ওলান নখ দিয়ে খামচে ধরে মাটির বুক। নখের ছুঁচলো ডগাগুলো ঢুকে যায় রক্তে কাদা-হয়ে-ওঠা মাটির বুকে।

* * * * *

বিপদের মেঘ কেটে গেছে। সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে ভীত আর্ত্ত মানুষগুলি ফিরে গেছে যে যার জায়গায়। কর্ত্তব্যরত সরকারী সংবাদদাতা অজস্র ধ্বংসস্তূপের মাঝ দিয়ে এসে দাঁড়ায় বাড়ীর সামনে। চেংএর মৃত্যুসংবাদ সরকারী মতে জানাতে হবে তার স্ত্রী, পরিজন আর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীকে। সবে সকাল হয়েছে। সেই এক টুকরো আবছা আলোয় পোড়া ইট-কাঠের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তারা খুঁজে পায় ওলানের উলঙ্গ রক্তাক্ত দেহ। মৃতদেহের নাড়ীর সঙ্গে তখনও জড়িয়ে আছে তাল-পাকানো রক্তাক্ত খানিকটা মাংসপিণ্ড। একটা কাঠের টুকরো দিয়ে আলগোছে মাংসপিণ্ডটা নাড়াতে চেষ্টা করে ওরা। বর্ত্তমানের প্রতিভূ ভবিষ্যতের মানুষ। এক মানুষের সৃষ্টি অপরের ধ্বংসের ইন্ধন অসাড় এক মানবক।

ভ্রম সংশোধন

মাসিক বসুমতীতে যেমন কিছু ভুল ছাপা হয় না, তেমনি ছাপায় ভুলও থাকে না বললেই হয়। কিন্তু গত কয়েক সংখ্যায় কয়েকটি মারাত্মক ভুল ছাপা হয়ে গেছে। পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টিও হয়তো এড়িয়ে গেছে যেজন্য এখনও পর্য্যন্ত একটিও প্রতিবাদ-পত্র দপ্তরে পৌঁছয়নি। কিন্তু ভুল কয়েকটি সংশোধিত না হ'লে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে ক্ষুণ্ণ করা হয়, যেজন্য ভুল ক'টি শোধিত হচ্ছে। যথা:

গত ফাল্গুন সংখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মগৃহের আলোকচিত্র বিভাগে গৃহলগ্ন পথটির নাম হবে 'গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের লেন'।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার লিখিত ছবির মেলার লেখায় শিল্পী সুনীলমাধব সেনগুপ্তের নাম ভুলক্রমে 'সুনীলকুমার' হয়েছিল।

চৈত্র-সংখ্যা মাসিক বসুমতীর প্রচ্ছদেই ভুল থেকে গিয়েছিল। শালুক ফুলের আলোকচিত্রশিল্পী রণজিৎ রায়চৌধুরী নয়, 'ক্ষীরোদ রায়'।

গত সংখ্যায় 'শ্রীঅরবিন্দ এ্যাক্রয়েড ঘোষ' রচনাটিতে স্বর্গীয়া কুমুদিনী বসুর প্রতিকৃতির নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ভুলক্রমে লেখা হয়েছে, কুমুদিনী শ্রীঅরবিন্দের মাসতুতো ভগিনী ছিলেন।

ভুল স্বীকার করলেই ভুলের মার্জ্জনা। পাঠক-পাঠিকা মার্জ্জনা করবেন না?

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আদৌ অপ্রকাশিত আলোকচিত্রটি কবির তিরোধানের কিছু পূর্ব্বে শ্রীকাঞ্চন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত হয়েছিল। কবি তখন চিত্র-অঙ্কনে ব্যাপৃত ছিলেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

জাপানের মার্কিণ-তাঁবেদারী স্বাধীনতা—

গত ২৮শে এপ্রিল (১৯৫২) জাপানের সহিত শান্তিচুক্তি কার্য্যকরী করা হইয়াছে। শান্তিচুক্তি কার্য্যকরী হওয়ার অর্থ জাপানের সহিত যুদ্ধাবস্থার অবসান। কিন্তু এই শান্তিচুক্তি কার্য্যকরী হওয়াকেই অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে যে-ভাবে জাপানের সার্ব্বভৌম স্বাধীনতা লাভ বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াস বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। শান্তিচুক্তি কার্য্যকরী হওয়ায় জাপান স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, এ কথার মত সত্যের অপলাপ যেমন আর কিছু হইতে পারে না, তেমনি জাপান নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় এই সন্ধির সর্ত্তাবলী মানিয়া লইয়াছে, এ কথাও সত্য নয়। গত ৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৫১) সান্‌ফ্রান্সিসকোর 'অপেরা হাউসে' জাপশান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার পরেই সম্পাদিত হয় জাপ-মার্কিণ নিরাপত্তা চুক্তি। অতঃপর শাসন-পরিচালন সংক্রান্ত জাপ-মার্কিণ চুক্তি (U. S. Japen Administrative Pact) সম্পাদিত হয়। এই শাসন-পরিচালন সংক্রান্ত চুক্তির সর্ত্তাবলী গোপন রাখা হইয়াছে। কেন গোপন রাখা হইয়াছে তাহা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই চুক্তির সর্ত্তাবলী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সন্তোষজনকরূপে নির্দ্ধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাপশান্তিচুক্তি অনুমোদন করে নাই। এই চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া জাপানের বিরোধী দলগুলি সম্মিলিত ভাবে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। হয়ত জাপশান্তিচুক্তি, জাপ-মার্কিণ নিরাপত্তা-চুক্তি এবং শাসন-পরিচালন সংক্রান্ত জাপ-মার্কিণ চুক্তির সর্ত্তাবলী মানিয়া লওয়া ছাড়া জাপানের আর গত্যন্তর ছিল না। মিঃ শিগেরু যোশিদার পরিবর্ত্তে আর কেহ যদি জাপানের প্রধান মন্ত্রী হইতেন, তাহা হইলে তিনিও হয়ত এই সর্ত্তাবলী মানিয়া লইতে বাধ্য হইতেন, কিন্তু জাপানের সহিত যুদ্ধাবস্থার অবসান হওয়ায় জাপান যে মার্কিণ-তাঁবেদারী স্বাধীনতা লাভ করিল তাহাতে জাপান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একটি উপনিবেশে পরিণত হইল, এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। এ সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে জাপ-শান্তিচুক্তির কথা এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

পৃথিবীর নিম্নলিখিত ৪৮টি দেশ জাপ-শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছে: অষ্ট্রেলিয়া, আর্জ্জেণ্টিনা, বেলজিয়ম, বলিভিয়া, ব্রাজিল, ক্যাম্বোডিয়া, কানাডা, সিংহল, চিলি, কলম্বিয়া, কোষ্টারিকা, ডোমিনিক্যান রিপাবলিক, ইকোয়েডর, মিশর, এল সালভাডোর, ইথিওপিয়া, ফ্রান্স, গ্রীস, গুয়াতেমালা, হাইতি, হণ্ডুরাস, ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ, ইরাক, ফ্রান্স, লেবানন, লাইবেরিয়া, লুক্সেমবুর্গ, মেক্সিকো, নেদারল্যাণ্ডস, নিউজিল্যাণ্ড, নিকারাগুয়া, নরওয়ে, পাকিস্থান, পানামা, প্যারাগুয়ে, পেরু, ফিলিপাইন, সৌদী আরব, দক্ষিণ-আফ্রিকা, সিরিয়া, তুরস্ক, বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, উরুগুয়ে, ভেনেজুয়েলা এবং ভিয়েটনাম। জাপ-শান্তিচুক্তি সম্মেলনে সোভিয়েট ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড এবং চেকোস্লোভাকিয়া যোগদান করিলেও শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করে নাই। ভারত, ব্রহ্মদেশ এবং যুগোস্লাভিয়া এই সম্মেলনে যোগদান করিতে বিরত ছিল। কম্যুনিষ্ট চীনকে এই সম্মেলনে আমন্ত্রণই করা হয় নাই। বৃটেনকে খুশী করিবার জন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চিয়াং কাইশেক গবর্ণমেণ্টকেও আমন্ত্রণ করে নাই। জাপ-শান্তিচুক্তিতে যে-সকল দেশ স্বাক্ষর করিয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দেশগুলি এই চুক্তি অনুমোদন করিয়াছে: আর্জ্জেণ্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল, কানাডা, ফ্রান্স, মেক্সিকো, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্থান, বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। ভারত শান্তিচুক্তি সম্মেলনে যোগদান না করিলেও ২৮শে এপ্রিল তারিখেই (১৯৫২) ভারত গবর্ণমেণ্ট জাপানের সহিত যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘোষণা করিয়াছেন। যথাসম্ভব সত্বর ভারত জাপানের সহিত পৃথক্ একটি শান্তিচুক্তি করিবে বলিয়াও ঘোষণা করা হইয়াছে। কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্ত নিম্নলিখিত দেশগুলির নিকট জাপান পত্র দিয়াছে: ভারত, যুগোস্লাভিয়া, ইটালী, ভেটিকান, স্পেন, ডেনমার্ক এবং পশ্চিম-জার্ম্মাণী। সুইডেন এবং সুইজারল্যাণ্ড যুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিল বলিয়া এই দুইটি দেশের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক যথানিয়মেই স্থাপিত হইতে পারিবে। কিন্তু জাপানের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী দেশ রাশিয়া এবং কম্যুনিষ্ট চীনের সহিতই যুদ্ধাবস্থার অবসান হইল না। অবশ্য ফিলিপাইনের সহিতও যুদ্ধাবস্থার অবসান হয় নাই। কারণ, ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন লইয়া ফিলিপাইন পার্লামেণ্টে শান্তিচুক্তি অনুমোদিত হওয়া বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

জাপ-শান্তিচুক্তি কার্য্যকরী হওয়ার অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বলিয়াছেন, এই চুক্তি জাপানের ইতিহাসে নূতন যুগ সৃষ্টি করিল। কথাটা এক হিসাবে খুবই ঠিক। এশিয়াতে জাপানই ছিল পশ্চিমী শক্তিবর্গের সমকক্ষ রাষ্ট্রশক্তি। আজ শান্তিচুক্তির পরিণামে পরাজিত জাপান পরিণত হইল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশে। শান্তিচুক্তি অনুসারে জাপানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দখলকার অবস্থার অবসান হইল বটে, কিন্তু উহা শুধু কাগজে-পত্রে। জাপানে মার্কিণ সৈন্ত অবস্থান করিবে, থাকিবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নৌঘাঁটি ও বিমান-ঘাঁটি। কত কাল ধরিয়া জাপানে মার্কিণ সৈন্ত অবস্থান করিবে, নৌঘাঁটি ও বিমানঘাঁটিগুলি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দখলে থাকিবে, কি শান্তিচুক্তিতে কি নিরাপত্তা চুক্তিতে কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। এই সকল মার্কিণ সৈন্তের উপর জাপ গবর্ণমেণ্টের কোনরূপ নিয়ন্ত্রণাধিকার থাকিবে না, জাপানের আইন-কানুন তাহাদের উপর প্রযোজ্য হইবে না, তাহারা ভোগ করিবে extra territorial অধিকার। এই অধিকার ভোগ কোন দেশের পক্ষে যে কিরূপ

অপমানজনক চীন তাহা ভাল করিয়াই অনুভব করিয়াছে। চীনে অন্ত দেশের লোকের এই বিশেষ অধিকার দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের সময় বিলোপ করা হইয়াছে। সুতরাং জাপানের ইতিহাসে যে নূতন যুগ আরম্ভ হইয়াছে, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের এ কথা খাঁটি সত্য বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। শান্তিচুক্তি কার্য্যকরী হওয়ার অনুষ্ঠান উপলক্ষে জাপ প্রধান মন্ত্রী মিঃ যোশিদা বলিয়াছেন, "এতদিন পরে আমরা মুক্তিলাভ করিলাম। আজ আমরা স্বাধীন। জাপান আজ সম-মর্য্যাদার ভিত্তিতে সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে জাতি-গোষ্ঠীতে যোগদান করিতেছে।" সত্যই কি তাই? মিঃ যোশিদার এ কথা না বলিয়া হয়ত উপায়ান্তর নাই। কিন্তু জাপানের জনগণ তাঁহার সহিত একমত নহে। জাপ-শান্তিচুক্তি জাপানের মার্কিণদখলকার অবস্থার যে একটুকুও পরিবর্ত্তন করে নাই, এ কথা জাপানের জনসাধারণও বুঝিতে পারিয়াছে। বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়াই এই শান্তিচুক্তির তাহারা বিরোধী। মিঃ যোশিদার দৃষ্টিতে জাপান স্বাধীন হইলেও পররাষ্ট্র-নীতি তো দূরের কথা, আভ্যন্তরীণ নীতি নির্দ্ধারণের অধিকারও জাপান লাভ করে নাই। সামরিক নীতি নির্দ্ধারণ করিবার অধিকার হইতেও জাপানকে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। মিঃ যোশিদার দৃষ্টিতে ইহারই নাম স্বাধীনতা হইতে পারে, কিন্তু জাপানের জনসাধারণ এই তথাকথিত স্বাধীনতার স্বরূপ বুঝিতে ভুল করে নাই। তাই স্বাধীনতা লাভের তিন দিনের মধ্যেই, ১লা মে তারিখেই তাহাদের অন্তরের রুদ্ধ বিক্ষোভ প্রবল বিস্ফোরণে ফাটিয়া পড়িয়াছিল। এই বিক্ষোভ যে কিরূপ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল ১৮ শতের অধিক লোক হতাহত হওয়াতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। বিক্ষোভ প্রদর্শন হাঙ্গামায় পরিণত হইয়াছিল কেন এবং কিরূপে, সে-সম্বন্ধে কোন সংবাদই প্রকাশ করা হয় নাই কেন, তাহা কি তাৎপর্য্যপূর্ণ নয়? মে-দিবসের এই বিক্ষোভ দমনের জন্ত শুধু ২৫ হাজার জাপানী পুলিশই নিযুক্ত করা হয় নাই, মার্কিণ সৈন্তবাহিনীকেও ডাকা হইয়াছিল। ইহাতেও জাপানের স্বাধীনতার স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়।

মে-দিবসের বিক্ষোভ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী রূপ গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই উহাকে কম্যুনিষ্টদের কারসাজী বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। শ্রমিক, ছাত্র প্রভৃতি শ্রেণীর প্রায় তিন লক্ষ লোক মেইজি পার্কে সমবেত হইয়া 'মার্কিণরা জাপানকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া পদানত রাখিয়াছে' এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। বিক্ষোভকারীদের 'মার্কিণরা ফিরিয়া যাও', আমাদিগকে রেহাই দাও,' 'আমরা যুদ্ধ চাহি না' প্রভৃতি ধ্বনির মধ্যে জাপানের মার্কিণ-তাঁবেদারী স্বাধীনতার প্রতি জাপানী জনগণের তীব্র বিক্ষোভ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মে-দিবসের এই বিক্ষোভ প্রদর্শনকে পি-টি-আই-রয়টারের সংবাদদাতা জাপানের স্বাধীনতা লাভের পর শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্টদের প্রতিবাদের প্রথম অভিব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মার্কিণ সমাজতন্ত্রী নেতা মিঃ নরম্যান টমাস উহাকে 'বিপ্লবের ড্রেস-রিহার্সেল', 'কম্যুনিষ্টদের ক্লাসিক্যাল পদ্ধতি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাতে আমরা বিস্মিত হই নাই। সিংহলে ভারতীয়দের সত্যাগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া টিউনিশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই যেখানে কম্যুনিষ্টদের হস্ত যাঁহারা দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদের দৃষ্টিবিভ্রম কোন দিনই দূর হইবে না। জাপানের ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য-সংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষ। ইহারা কম্যুনিষ্টবিরোধী বলিয়াই খ্যাত। কিন্তু ইহাদের মার্কিণ-বিরোধিতা কম্যুনিষ্ট-বিরোধিতা অপেক্ষাও তীব্রতর। জাপ শ্রমিকরা জাপ-মার্কিণ নিরপত্তা-চুক্তির ঘোরতর বিরোধী। মে-দিবসের বিক্ষোভ প্রদর্শনকে কম্যুনিষ্ট-প্ররোচিত ব্যাপার বলিয়া মনে করিবার যেমন কারণ নাই, তেমনি মে-দিবসের ঘটনা উপলক্ষে ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, জাপানে অবস্থিত মার্কিণ সৈন্তবাহিনীকে শুধু কম্যুনিষ্টদের হাত হইতেই জাপানকে রক্ষা করিতে হইবে না, জাপানীদের হাত হইতেও জাপানকে রক্ষা করিতে হইবে।

তোতা পাখীর মত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শিখানো বুলি আওড়াইয়া জাপ প্রধান মন্ত্রী মিঃ যোশিদা বলিয়াছেন, 'কম্যুনিষ্টদের সশস্ত্র আক্রমণ-আশঙ্কা নিরোধের জন্য আমাদের নিজস্ব রক্ষাবাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে।' কম্যুনিষ্ট আক্রমণ-আশঙ্কা সম্বন্ধে তিনি আরও বলিয়াছেন, 'দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দিগন্ত আজ কম্যুনিষ্টদের আক্রমণ-আশঙ্কায় মসীকৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে।' কম্যুনিষ্টদের আক্রমণ-আশঙ্কা বলিতে তিনি যে সোভিয়েট রাশিয়া এবং কম্যুনিষ্ট-চীন কর্ত্তৃক জাপান আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাকেই বুঝাইয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া এবং চীন এ পর্য্যন্ত কোন দেশ আক্রমণ করে নাই, বরং আক্রান্তই হইয়াছে। অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিলে সশস্ত্র জাপানকেই বরং সোভিয়েট রাশিয়া এবং চীনের ভয় করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে দেখা যায়। জাপান সর্ব্বপ্রথম তাহার সামরিক শক্তির পরীক্ষা করে ১৮৯৪ সালে চীনের সহিত যুদ্ধে। এই যুদ্ধেই এশিয়ার শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে জাপানের অভ্যুদয়ের সূচনা। তার পর আসিল ১৯০৪ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে শুধু নৈতিক সাহায্যই দেয় নাই, অর্থনৈতিক সাহায্যও দিয়াছে এবং কূটনৈতিক দিক সমর্থন করিয়াছে। রুশ-জাপান যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই জাপান এশিয়ার বৃহৎ শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করে। প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তিবর্গের পক্ষে যোগদান করিয়া জাপান পশ্চিমী শক্তিবর্গের সমকক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইল। ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লবের পর সভপ্রসূত সমাজতন্ত্রী রুশরাষ্ট্রকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। পূর্ব্ব দিক হইতে এডমিরাল কোলচাককে সাহায্য করিবার জন্ত যাহারা অগ্রসর হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে শুধু মার্কিণ বাহিনীই ছিল না, জাপ বাহিনীও ছিল। জাপানের চীন-বিজয়ের পরিকল্পনার বীজ ১৯২৭ সালের 'টানাকা-পত্রে'ই নিহিত ছিল। সমগ্র চীন দখলের প্রথম পর্ব্ব হিসাবে ১৯৩১ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে। জাতিসঙ্ঘ বা লীগ অব নেশান্‌সের কাছে চীন কোন প্রতিকার পায় নাই। ১৯৩৪ সালের 'আমাউ-ঘোষণার' কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৩৭ সালে জাপান এক ছুতো পাইয়া চীন আক্রমণ করিল। এই আক্রমণের পালা চলিতে থাকিতেই ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সহিত জাপানের যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। এই যুদ্ধে পরাজিত জাপানকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আবার সশস্ত্র করিয়া তুলিতেছে এশিয়ায় তাহার উপনিবেশ বিস্তারের উদ্দেশ্তে। অজুহাত দেখানো হইয়াছে কম্যুনিজমের নিরোধ।

মিঃ যোশিদা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, জাপানের অনুরোধেই মার্কিণ সৈন্যবাহিনী জাপানে মোতায়েন রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা চিরকাল বলবৎ থাকিবে না বলিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে এবং জাপ জনসাধারণকে ধোঁকা দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মার্কিণ বাহিনী কত কাল জাপানে মোতায়েন থাকিবে তাহা কি শান্তি-চুক্তিতে, কি নিরাপত্তা-চুক্তিতে কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। অধিকন্তু জাপ-শান্তিচুক্তি অনুসারে যে কোন যুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে জাপ সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করা চলিবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই আজ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বেনামদার হইয়া উঠিয়াছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নামে কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। সুতরাং কোরিয়া যুদ্ধে জাপ সৈন্য-বাহিনী নিয়োজিত হইতে পারে। ব্রহ্মদেশে, মালয়ে, ইন্দোচীনে কোনখানেই কম্যুনিজম নিরোধের অজুহাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নামে জাপানী সৈন্য নিয়োগ করিবার পক্ষে কোন বাধা হইবে না। ভবিষ্যতে চীন এবং রাশিয়ার সহিত যদি যুদ্ধ বাধিয়া উঠে তাহা হইলে ঐ যুদ্ধও চলিবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নামে। সুতরাং এই যুদ্ধেও জাপানী সৈন্য নিয়োগ করা চলিবে। জাপ-শান্তিচুক্তির বলে জাপানের লোকবলের উপরেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যই বহাল থাকিবে। জাপানের শিল্পের উপরেও থাকিবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য। শিল্পপ্রধান জাপানের শিল্পবল, লোকবল সমস্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া জয়ের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিতে পারিবে। জাপানের প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী নিজের স্বার্থে জাপানের প্রতিকূল শান্তিচুক্তিকে অভিনন্দন করিতে পারে। কিন্তু এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে জাপানের আর অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নির্দ্দেশে জাপ গবর্ণমেণ্ট ফরমোসাস্থিত চিয়াং কাইশেক গবর্ণমেণ্টের সহিত চুক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছে। জাপানী পণ্যের প্রধান বাজার চীনের মূল ভূখণ্ড। অথচ কম্যুনিষ্ট চীনের সহিত চুক্তি করিবার এবং বাণিজ্য করিবার কোন অধিকার জাপানের নাই। জাপানের ষ্টেট-মিনিষ্টার মিঃ কাৎসুও কাজাকাই অবশ্য বলিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্ট-চীন যদি জাপানের সহিত শান্তিচুক্তি করিতে চায় তাহা হইলে নীতিগত দিক হইতে এই প্রস্তাব জাপানের পক্ষে অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণ নাই। তাঁহার এই উক্তি জাপ প্রধান মন্ত্রী এবং জাপ পররাষ্ট্র-মন্ত্রীর সুস্পষ্ট ঘোষণার বিরোধী। তাঁহারা স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়াছেন যে, কোন কম্যুনিষ্ট দেশের সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবার নীতি তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু মিঃ কাৎসুও কাজাকাইয়ের উক্তির মধ্যে যে জাপানের সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষাই রূপায়িত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে কম্যুনিষ্ট দেশগুলি অকম্যুনিষ্ট দেশগুলিকে আক্রমণ করিবার জন্য তৈয়ারী হইয়াই রহিয়াছে। কম্যুনিজম নিরোধের সশস্ত্র প্রয়াস চলিতেছে কোরিয়ায়। পরাজিত জাপান হইল ভাবী সশস্ত্র প্রয়াসের ঘাঁটি। চিয়াং কাইশেকের ফরমোসা আর একটি ঘাঁটি। মার্কিণ সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যে ফরমোসাস্থিত চিয়াং কাইশেক গবর্ণমেণ্ট পরিপুষ্ট হইতেছে। ব্রহ্মদেশের চীন-সীমান্তে ৩০ হাজার জাতীয়তাবাদী চীনা সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছে। চীনের বহুপে প্রদেশে কম্যুনিষ্টবিরোধী বিদ্রোহ হওয়ারও সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। মার্কিণ নৌবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ কিম্বল বলিয়াছেন, "জাতীয়তাবাদী চীনারা চীনের মূল ভূখণ্ড আক্রমণ করিলে আমরা পাশে দাঁড়াইয়া বাহবা দিব।" শুধু বাহবা দিয়াই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ক্ষান্ত থাকিবে কি? মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইঙ্গিতে জাপান যে চিয়াং কাইশেককে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে না, তাহাই বা কে বলিবে? কোরিয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভঙ্গ করিলে চীনের উপর বোমাবর্ষণ এবং চীনের উপকূলভাগ অবরোধ করিবার যে হুমকী দেওয়া হইয়াছে, তাহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক। জাপ-শান্তিচুক্তি বলবৎ হওয়ার আধ ঘণ্টা পরে সোভিয়েট রাশিয়া এই চুক্তিকে 'সুদূর প্রাচ্যে নূতন যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য চুক্তি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। পূর্ব্বে উল্লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিলে জাপ-শান্তিচুক্তিকে সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য চুক্তি ছাড়া আর কিছু বলা যায় কি? রাজনৈতিক ও শিল্পনৈতিক দিক হইতে উন্নত জাপানের অসন্তুষ্ট এবং অনিচ্ছুক জনগণকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে অবশ্যই নামাইতে পারিবে। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধীন জাপানের জনগণ যদি কম্যুনিষ্টদিগকেই মুক্তিদাতা বলিয়া বরণ করিয়া লয়, তাহা হইলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে কি?

মস্কো অর্থনৈতিক সম্মেলন—

গত এপ্রিল মাসের (১৯৫২) প্রথম ভাগে সোভিয়েট ইউনিয়নের রাজধানী মস্কো নগরীতে আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলনের যে নয় দিনব্যাপী অধিবেশন হইয়া গেল, সম্মেলনের পূর্ব্বে উহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছিল। সম্মেলনের পরেও এই সন্দেহের ঘোর কাটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ২রা এপ্রিল (১৯৫২) এই সম্মেলন আরম্ভ হয় এবং পৃথিবীর ৪৮টি দেশ হইতে ৪৭১ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন অর্থনীতিবিদ্, ব্যবসায়ী, ট্রেড ইউনিয়নপন্থী এবং রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, বৃটেন হইতে লর্ড বয়েড ওর এবং ভারত হইতে ডাঃ জ্ঞানচাঁদ ও শ্রীযুক্ত লালচাঁদ হীরাচাঁদ এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, পশ্চিম ইউরোপের বিশেষ করিয়া বৃটেনের বৃহৎ শিল্প-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা যে যোগদান করেন নাই এ কথা সত্য। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই সম্মেলন বর্জ্জন করিয়াছিল। কিন্তু ইহার জন্য সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের দায়ী করিতে পারা যায় না। বিলাতের 'টাইমস' পত্রিকার মস্কোস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "প্রথমে যেরূপ স্থির করা হইয়াছিল তদনুযায়ী পশ্চিম ইউরোপের জনমত-নির্ব্বিশেষে সকল মতের লোকেরই সম্মেলনে যোগদান করা উচিত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বৃটিশ প্রতিনিধি দলে পার্লামেণ্টের সকল দলের সদস্যই থাকা উচিত ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ পার্লামেণ্টে রক্ষণশীল দলের এক জন মাত্র সদস্য আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াও সম্মেলনে যোগদান করিলেন না। উদারনীতিকগণ পিছাইয়া পড়িলেন এবং শ্রমিক দলের ৪ জন সদস্যের মধ্যে ৩ জনই বিভানপন্থী।" তথাপি 'টাইমস' পত্রিকার উক্ত সংবাদদাতা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই যে, এই সম্মেলন যে কোন স্থানে অনুষ্ঠিত

হইলেও উহা উল্লেখযোগ্য ঘটনাই হইত, সোভিয়েট রাজধানীতে হওয়ার দরুণ উহার গুরুত্ব বর্দ্ধিত হইয়াছে মাত্র।

মস্কোর এই আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আহূত হয় নাই। উহা ছিল সম্পূর্ণ বে-সরকারী সম্মেলন। বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা এবং সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিতর দিয়া পৃথিবীর জনগণের জীবন-যাত্রার মানের উন্নতি সাধনই ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই সম্মেলন মস্কোতে হওয়ায় এবং প্রথমে 'শান্তি-সম্মেলন'ই উহার উদ্যোগী হওয়ায় এই সম্মেলনের প্রতি পশ্চিমী শক্তিবর্গের গভীর সন্দেহ সৃষ্টি হয়। বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন এই সন্দেহ বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই সম্মেলনে যোগদান করার ফলে বৃটেনের কোন লাভ হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না। অথচ এই সম্মেলনে বাণিজ্য সংক্রান্ত যে চুক্তি হইয়াছে তাহাতে বৃটেনেরই লাভ হওয়ার কথা। এই সম্মেলনে বৃটিশ প্রতিনিধিরা প্রায় তিন কোটি পাউণ্ড মূল্যের বাণিজ্য-চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। পোল্যাণ্ডের কয়লার পরিবর্ত্তে বৃটিশ বস্ত্র ক্রয়ের এবং দেনা-পাওনা মিটাইবার সহজ ব্যবস্থাকেও বৃটিশ সংবাদপত্রসমূহ সুনজরে দেখিতে পারেন নাই। 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকা (১১শে এপ্রিল, ১৯৫২) বলিয়াছেন যে, প্রস্তাব লোভনীয় বটে, তাই বলিয়া পাশ্চাত্য দেশগুলির বঁড়শী গিলিবার পক্ষে কোন যুক্তিই থাকিতে পারে না। 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' (৮ই এপ্রিল, ১৯৫২) বলিয়াছেন, "আসল কথা, সম্মেলনের উদ্দেশ্য হইল পশ্চিমী দেশগুলিকে বুঝাইবার চেষ্টা করা যে, তাহারা যদি পুনরস্ত্রসজ্জা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গঠনের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার না দেয়, তাহা হইলে নিমেষের মধ্যে তাহাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার অবসান ঘটিবে।" ল্যাঙ্কেশায়ারে কাপড়ের কলগুলির ১ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিক বেকার বসিয়া থাকে তাও ভাল, কিন্তু রুশ ব্লকের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি করা সঙ্গত নয়, ইহাই যেন বৃটিশ সংবাদপত্রসমূহের মনোভাব। পাছে আমেরিকা অসন্তুষ্ট হয়, এই আশঙ্কাই যে এই মনোভাবের মূলে রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য ভারত গবর্ণমেণ্টও কম্যুনিষ্ট দেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানি করা অনুমোদন করিবেন কি না, তাহাতেও সন্দেহ আছে। নয়াদিল্লীস্থিত 'নিউইয়র্ক টাইমসে'র সংবাদদাতা তাঁহার প্রেরিত বিবরণে বলিয়াছেন যে, নেহরু গবর্ণমেণ্ট রাজনৈতিক কারণে কম্যুনিষ্ট দেশগুলির সহিত দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্য-চুক্তি করিতে উৎসাহী নহেন। ভারতীয় প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে কোন বাণিজ্য-চুক্তি করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।

মস্কো অর্থনৈতিক সম্মেলনে ঠাণ্ডা-যুদ্ধ এবং বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। সুতরাং পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্যের জন্যই এই সম্মেলন আহূত হইয়াছিল, এইরূপ ধারণা মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। বক্তৃতা অপেক্ষা বাণিজ্য-চুক্তির জন্য আলোচনাই প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। এমন কি, সামরিক কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর আরোপিত বাধা-নিষেধের নিন্দা করিয়া কোন প্রস্তাব পর্য্যন্ত সম্মেলনে গৃহীত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের চতুর্থ দফা কর্ম্মসূচীর অনুকরণে ষ্ট্যালিন-পরিকল্পনা গঠনের জন্য পাকিস্থানের প্রতিনিধি দলের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করা হইয়াছিল। সম্মেলনে কোন প্রচার-কার্য্য না হইলেও মার্কিণ-নীতির দুর্ব্বলতা স্বভাবতই উদ্‌ঘাটিত না হইয়া পারে নাই। ডাঃ জ্ঞানচাঁদ তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, ভারতের চিরস্থায়ী ডলার-ঘাটতির প্রতিকারের জন্য বাণিজ্যকে বহুমুখী করা আবশ্যক। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রীযুক্ত লালচাঁদ হীরাচাঁদ। সোভিয়েট ব্লক এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। পশ্চিম ইউরোপে ডলার-ঘাটতির সমাধান করিতে অসমর্থ হওয়ার একমাত্র কারণ মার্কিণ-নীতি। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার আমদানি-বাণিজ্যের চারি দিকে সু-উচ্চ শুল্ক-প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছে বলিয়া ইউরোপীয় পণ্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা কঠিন। এদিকে আবার পূর্ব্ব ও পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্য বন্ধ করিবার জন্য আমেরিকা চাপ দিতেছে। রবার প্রভৃতি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যাদিও কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে প্রেরণ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহার উদ্যোক্তাও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। সুতরাং ডলার ঘাটতির জন্য দায়ী যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অকম্যুনিষ্ট দেশগুলির মহাজনে পরিণত হইয়াছে। তাহার কথা ফেলিবার উপায় নাই। কাজেই মস্কো সম্মেলনে যে-সকল বাণিজ্য-চুক্তি হইয়াছে সেগুলির ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা বলা কঠিন। কারণ, এই চুক্তিগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

সাম্রাজ্যবাদী জোট—

সাম্রাজ্যবাদীরা একজোট হইয়া টিউনিশিয়ার প্রশ্ন নিরাপত্তা পরিষদের কর্ম্মসূচীতেও স্থান দিল না। ফ্রান্স-টিউনিশিয়া বিরোধ সম্পর্কে দশটি আরব-এশিয়া দেশকে নিরাপত্তা পরিষদে বক্তৃতা দিবার জন্য পাকিস্থান যে প্রস্তাব করিয়াছিল, প্রথমেই তাহা অগ্রাহ্য হয়। বৃটেন এবং ফ্রান্স এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক, গ্রীস এবং নেদারল্যাণ্ড ভোট দেন নাই। চিলি ফ্রান্স-টিউনিশিয়া প্রশ্ন নিরাপত্তা পরিষদের কর্ম্মসূচিভুক্ত করিতে, কিন্তু উহার আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিতে প্রস্তাব করিয়াছিল। এই প্রস্তাবটিও ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে। রাশিয়া, চীন, ব্রাজিল, চিলি এবং পাকিস্থান এই পাঁচটি রাষ্ট্র উল্লিখিত প্রস্তাব দুইটি সমর্থন করিয়াছিল। অতঃপর ১৩টি এশীয়-আফ্রিক-রাষ্ট্র প্রশ্নটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ অথবা সম্ভব হইলে এই প্রশ্ন আলোচনায় জন্য সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। আগামী অক্টোবর মাসে (১৯৫২) সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবে। উহার পূর্ব্বে বিশেষ অধিবেশনের অনুষ্ঠান করিতে হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিকাংশ সদস্যরাষ্ট্র কর্ত্তৃক উহা আহূত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ অন্ততঃ ৩১টি সদস্যরাষ্ট্র কর্ত্তৃক আহূত না হইলে সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হইতে পারিবে না। ইহার জন্য দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা চলিতেছে।

যদি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা সম্ভব হয়ও এবং তাহা

সম্ভব না হইলে অক্টোবর মাসে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনেও যদি টিউনিশিয়ার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহা হইলেও লাভ কিছুই হইতে পারে না। সাধারণ পরিষদে টিউনিশিয়ার প্রশ্ন আলোচিতই শুধু হইতে পারিবে। যদি কোন কার্য্যকরী পন্থা গৃহীত না হইতে পারে, তাহা হইলে শুধু আলোচনা করিয়া কি লাভ হইবে? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যদি টিউনিশিয়ার স্বাধীনতার দাবী পূরণের জন্য হস্তক্ষেপ না করে তাহা হইলে সাধারণ পরিষদে টিউনিশিয়ার প্রশ্ন উত্থাপিত হইলেই টিউনিশিয়াবাসীরা সন্তুষ্ট হইতে পারিবে কি?

ফ্রান্স দাবী করিতেছে, টিউনিশিয়ার প্রশ্ন তাহার ঘরোয়া ব্যাপার। বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেনও তাঁহার সাম্প্রতিক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, 'ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ফ্রান্স ও টিউনিশিয়ার মধ্যে যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা ফ্রান্সেরই ঘরোয়া ব্যাপার এবং উহা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের আওতার মধ্যে পড়ে না। ১৮৭৮ সালে বার্লিন কংগ্রেসে বৃটিশের সমর্থন এবং ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে বিরোধ বাধাইবার জন্য বিসমার্কের প্ররোচনায় ১৮৮১ সালে ফ্রান্স টিউনিশিয়া দখল করে। বে-উপাধিধারী সামন্ত নৃপতির সহিত ১৮৮১ সালে ফ্রান্সের যে সন্ধি হয় তাহাতে টিউনিশিয়া ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। বৃটেন ইতিপূর্ব্বে কোন দিনই টিউনিশিয়াকে ফ্রান্সের ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করে নাই। কিন্তু আজ টিউনিশিয়ায় ফ্রান্সের সাম্রাজ্য হারাইবার আশঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় বৃটেনের দৃষ্টিতে টিউনিশিয়া ফ্রান্সের ঘরোয়া ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। তাহা না হইলে মালয়ের প্রশ্নও নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য ফ্রান্সের উক্ত দাবী সম্পর্কে নীরব। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার যুক্তি ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই অনুকূল হইয়াছে। মার্কিণ রাষ্ট্র-সচিব ডীন একিসন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের টিউনিশিয়া নীতি বুঝাইতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, এই বিশেষ সময়ে এই বিশেষ প্রশ্নটি উত্থাপন করা সমাধানের উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মনে করে না। তিনি মনে করেন যে, টিউনিশিয়ার যেমন স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা আছে তেমনি আছে ফ্রান্সেরও পরিকল্পনা। সুতরাং ফ্রান্স ও টিউনিশিয়ার মধ্যে আলোচনা করিবার সময় দেওয়া আবশ্যক। তাহাতে যদি সমস্যার সমাধান না হয়, তাহা হইলে বিষয়টি সম্পর্কে পুনরায় বিবেচনা করা যাইতে পারিবে। ইহা যে 'অশুভস্য কালহরণে'র নীতি সে-কথা বলাই বাহুল্য। টিউনিশিয়াবাসীর উপর নয়াদস্তুর পার্টির যথেষ্ট প্রভাব। এই পার্টির নেতাদিগকে বন্দী করিয়া ফ্রান্সের খয়েরখাঁ বাক্কোচির সহিত মীমাংসার প্রয়াস দ্বারা টিউনিশিয়ার স্বাধীনতার দাবী পূরণ করা সম্ভব হইবে না। নিরাপত্তা পরিষদ যে সাম্রাজ্যবাদীদের সাম্রাজ্য রক্ষার একটি তীক্ষ্ণ অস্ত্রে পরিণত হইয়াছে, টিউনিশিয়ার ব্যাপারে তাহার আর এক দফা পরিচয় পাওয়া গেল।

ইসলামী ব্লক—

একটি ইসলামী ব্লক গঠনের জন্য পাকিস্থান বারটি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীদের এক সম্মেলনের যে আয়োজন করিয়াছিল, তাহা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। নিম্নলিখিত ১২টি রাষ্ট্রের নিকট নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ করা হইয়াছিল

আফগানিস্থান, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ, ইরাক, জর্ডান, লেবানন, লিবিয়া, সৌদী আরব, সিরিয়া, তুরস্ক এবং ইয়েমেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৯ সালের নবেম্বর মাসে পাকিস্থানের উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী অর্থনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত সম্মেলন আহ্বানের পূর্ব্বে চৌধুরী খালেকুজ্জমান ইসলামীস্থান গঠনের আলোচনা করিবার জন্ম একটি সম্মেলন আহ্বান করিতে চাহিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে মধ্য-প্রাচীর মুসলিম রাষ্ট্রগুলিও তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। উহারই পরিণতি-স্বরূপ করাচীতে আন্তর্জ্জাতিক ইসলামী অর্থনৈতিক সম্মেলন হইয়াছিল। কিন্তু উহা সরকারী সম্মেলন ছিল না। অতঃপর গত ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৫২) করাচীতে একটি ইসলামী সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। ইহার পর ইসলামিক ব্লক গঠনের জন্ম বারটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীদের যে সম্মেলন আহ্বানের আয়োজন করা হয়, তাহার উদ্যোক্তা পাকিস্থানের পররাষ্ট্র-সচিব স্যার জাফরুল্লা খাঁ। এপ্রিল মাসে (১৯৫২) এই সম্মেলন হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল। ইসলামী ব্লক গঠনের প্রস্তাব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের সমর্থনও লাভ করিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উহার অনুষ্ঠান অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্ম স্থগিত রাখা হইল কেন, তাহা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ।

মালয়ে নির্য্যাতনের হিংস্রতা—

জেনারেল স্যার জেরাল্ড টেম্পলারকে মালয়ের হাই কমিশনার নিযুক্ত করিবার সার্থকতা নির্য্যাতনের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনের বীভৎসতার মধ্যে ক্রমেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। কম্যুনিষ্ট গরিলাদিগকে খাদ্য যোগাইবার অজুহাতে গ্রামকে গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া গ্রামশুদ্ধ লোককে জেলে পুরা হইতেছে। বৃটিশের বিশেষ আস্থাভাজন মালয়ী নেতা মিঃ ডাত্তোওন বলিয়াছেন যে, গরিলাদের প্রতি মালয়ীদের কোন সহানুভূতি নাই। ক্ষুদ্র সহর তানজন মালিন এই ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করিতেছে। এখানে মালয়ীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাহারাই সাহায্য করিয়াছে গরিলাদিগকে। এই সহরের নিকটে কম্যুনিষ্ট গরিলাদের কার্য্যকলাপের জন্ম এই সহরের লোকদের রেশন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুনগেই পেলাক নামক আরও একটি সহরকে পাইকারী ভাবে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। এখানেও মালয়ীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

শুধু যে পাইকারী শাস্তিই দেওয়া হইতেছে তাহা নয়। মালয়ে রাসায়নিক যুদ্ধও সুরু করা হইয়াছে। ইহাতে গরিলাদের যত ক্ষতি না হউক মালয়বাসীরাই বিরাট অন্নাভাবের সম্মুখীন হইবে। হিংস্র বীভৎসতার শেষ এখানেই হয় নাই। সম্প্রতি বিলাতের 'ডেইলী ওয়ার্কার' পত্রিকায় প্রকাশিত মালয় হইতে প্রেরিত একটি ফটোতে দেখা যায়, জনৈক বৃটিশ সৈনিক এক জন কম্যুনিষ্ট গরিলার ছিন্নমুণ্ড লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বৃটিশ কমন্স সভায় এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে উপনিবেশ-মন্ত্রী অলিভার লিটিলটন প্রকৃত ঘটনাই ফটোতে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন। তিনি ইহাও বলেন যে, গরিলাদের মুণ্ডচ্ছেদ করা বর্ণিওর নরমুণ্ডশিকারী আদিম অধিবাসী ডায়ার্কদের কাজ। মালয়ে কম্যুনিষ্ট দমনের জন্ম ২৬৪ জন ডায়ার্ককে বৃটিশ ফৌজে গ্রহণ করা হইয়াছে।

মালয়ে কম্যুনিষ্ট গরিলার সংখ্যা কখনও পাঁচ হাজারের ঊর্দ্ধে

শৈশব থেকেই শিশুদের দাঁতের যত্নের জন্ম নিম টুথপেষ্ট ব্যবহার করতে শেখান

কারণ :

(১) নিম টুথপেষ্টে নিম দাঁতনের সব গুণ তো আছেই, তার সঙ্গে দাঁত ও মাড়ীর পক্ষে উপকারী প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নানা উপাদানও আছে। তার ফলে নিম টুথপেষ্ট ব্যবহার করলে দাঁত শক্ত ও সুন্দর হয়; পাইওরিয়া হয় না; মাড়ী শক্ত হয়; মুখের দুর্গন্ধও দূর করে।

(২) এই টুথপেষ্টে দাঁতের এনামেল বা মাড়ীর পক্ষে সামান্য ক্ষতিকরও কোন জিনিষ নেই।

(৩) সীসক বিষ যাতে সংক্রামিত হতে না পারে, এজন্য মূল্যবান টিনের টিউবে পাওয়া যায়।

নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল নিম টুথপেষ্ট-এর সঙ্গে বাজারের সাধারণ পেষ্ট-এর তুলনা করা চলে না।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

বলিয়া আমরা শুনি নাই। ইহাদিগকে দমনের জন্ত ৩৮ হাজার বৃটিশ, গুর্খা, মালয়ী এবং অন্তান্ত উপনিবেশিক সৈন্ত নিয়োজিত আছে। তাছাড়া ৮ হাজার স্থানীয় লোককেও গ্রহণ করা হইয়াছে। আর আছে রয়েল এয়ার ফোর্স এবং অষ্ট্রেলিয়ান এয়ার ফোর্স। মালয়ে বিদ্রোহের পঞ্চম বর্ষ সুরু হইতে আর বেশী দেরী নাই। কিন্তু জেনারেল টেম্পলার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, বিদ্রোহ দমন করিতে আরও তিন বৎসর সময় লাগিতে পারে।

কোরিয়া যুদ্ধবিরতির ভবিষ্যৎ—

কোরিয়া যুদ্ধবিরতি আলোচনার ভবিষ্যৎ অনুমান করা সত্যই কঠিন। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫২) কোজে দ্বীপের মার্কিণ-বন্দীশিবিরে যে হাঙ্গামা হইয়া গেল তাহাও খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই হাঙ্গামার ফলে কত জন কম্যুনিষ্ট বন্দীর যে মৃত্যু হইয়াছে তাহা জানিবার উপায় নাই। যুদ্ধবিরতি আলোচনায় অচল অবস্থা চলিতেছে যুদ্ধবন্দী বিনিময়, বিমানঘাঁটি মেরামত এবং পরিদর্শক-মণ্ডলীতে রাশিয়াকে গ্রহণের প্রশ্ন লইয়া। সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ যে, রাশিয়াকে পরিদর্শক নিয়োগের দাবী কম্যুনিষ্টরা পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধবন্দী বিনিময় লইয়া প্রধান সমস্যা দেখা দিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দাবী করিতেছে যে, বহু কম্যুনিষ্ট বন্দী ফিরিয়া যাইতে চায় না। তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে আমেরিকা রাজী নয়। কম্যুনিষ্টরা জানাইয়াছিল যে, ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছুক এইরূপ বন্দীর সংখ্যা যদি ১ লক্ষ ১৬ হাজার হয়, তাহা হইলে আপোষ করিতে তাহারা রাজী আছে। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে গণনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, ১ লক্ষ ৭৩ হাজার কম্যুনিষ্ট বন্দীর মধ্যে মাত্র ৭৩ হাজার ফিরিয়া যাইতে রাজী।

ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লক হইতে ইহাই প্রচার করা হইয়া থাকে যে, কম্যুনিষ্ট যুদ্ধবন্দীরা স্বেচ্ছায় কম্যুনিজম মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া মার্কিণ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে। মার্কিণ গণতন্ত্রে তাহাদের অনেকের বিশ্বাস এমনই উগ্র হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহারা স্বেচ্ছায় তাহাদের শরীরে কম্যুনিজমবিরোধী উল্কী (tattoo) পরিয়াছে। দশ হাজার কম্যুনিষ্ট যুদ্ধবন্দী নিজেদের রক্ত দিয়া গণতন্ত্রের জন্ত জীবন দিবার জন্ত প্রতিশ্রুতি-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে। কম্যুনিষ্ট যুদ্ধবন্দীদের শরীরে জোর করিয়া কম্যুনিজমবিরোধী উল্কী পরাইয়া দেওয়া হইয়া থাকিলে বিস্ময়ের বিষয় হয় না। ইহাতে মুক্তিলাভের পর কম্যুনিষ্টদের কাছে তাহারা অবিশ্বাসী হইয়া থাকিবে। জোর করিয়া তাহাদের দ্বারা প্রতিশ্রুতি-পত্র লিখাইয়া লওয়াও বিস্ময়ের বিষয় নয়।

পরলোকে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস—

বৃটিশ শ্রমিক দলের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা এবং বৃটেনের প্রাক্তন অর্থসচিব স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস গত ২১শে এপ্রিল (১৯৫২) জুরিখে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। প্রায় দুই বৎসরের অধিক কাল যাবৎ তিনি রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বৃটিশ শ্রমিক দলের একটি সুদৃঢ় স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

বিখ্যাত স্বর্ণ শিল্পী ঃ—

বি, সরকারের পৌত্র,

শ্রীনারায়ণ সরকারের

পরিচালনায়

আধুনিকতম অলঙ্কার শিল্প প্রতিষ্ঠান

★

বি, বি, সরকার কোং লিঃ

১৬০-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

ফোন:—বি, বি, ১২৫৩

রঙ্গপট

রমেন চৌধুরী

এক দুই তিন…

উঁহু, থামলে চলবে না, গুণে যান, হ্যাঁ—পাঁচ ছয় সাত…এই সাত-সাতটা ফ্লোর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কলকাতার সব চেয়ে বড়ো ষ্টুডিয়ো ইন্দ্রপুরী। পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যে মনোরম এই ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিয়োর স্থান নিউ থিয়েটার্সের পরেই; যদিও আয়তনে এর জুড়ি আর কেউ নয়। শুধু কি আয়তন, প্রোজেকশন থিয়েটারই বা কোন্ ষ্টুডিয়োর আছে? আবার অতি-আধুনিক আর একটা প্রোজেকশন থিয়েটার তৈরি করতে যেজন্যে এই সাতটা ফ্লোরের একটা ছেড়ে দিচ্ছেন কর্তৃপক্ষ। তার পর ধরুন ক্যামেরা। কোটেড লেন্সওলা মিচেল ক্যামেরাই চারটে, সুপার পার্ভো দু'টো, আইমো-ডেব্রি ইত্যাদি সাইলেণ্ট ক্যামেরা গোটা আষ্টেক; ক্যামেরা ট্রলি চারটে, ভেলোসিলেটর (যাতে ক্রেনের কিছুটা কাজ করে) দু'টো, একটা ডিলাক্স মডেল ফোর চ্যানেল আর. সি. এ. রেকর্ডিং মেসিন, দু'টো আর. সি. এ. সাউণ্ড ট্রাক, একটা আর্ট রিব্‌স্, একটা বি. এ, দু'টো ফিড্‌লেটন, সেভিয়লা তিনটে, ব্যাক প্রোজেকশন মেসিন একটা, তিনটে এডিটিং রুম; এ ছাড়া ল্যাবরেটরীতে অটোমেটিক ডেভেলপিং মেসিন একটা, ডেব্রি প্রিণ্টিং মেসিন দু'টো।

ইন্দ্রপুরী প্রায় দশ বিঘে জমির ওপর অবস্থিত। পুকুর, বাগান, ফাঁকা চত্বর—সব মিলে চিত্রকর্মীদের হাঁফ ছাড়বার একটি সুন্দর জায়গা।

প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর এ-বাড়ির কর্মীরা—তাঁদের মধ্যে শ্রীগৌর দাস, জে. ডি. ইরাণী, শ্রীশিশির চ্যাটার্জি, শ্রীপাঁচুগোপাল দাস শব্দবিভাগে, ক্যামেরায় শ্রীসুবোধ ব্যানার্জি ও শ্রীমুরারি ঘোষ,

ষ্টুডিও-পরিচিতি

রূপসজ্জায় শ্রীশৈলেন গাঙ্গুলী এবং রসায়নাগারে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের নাম উল্লেখনীয়। চিত্রশিল্পী সুরেশ দাস, অজয় কর, অনিল গুপ্ত, পঞ্চু চৌধুরী, বিশু চক্রবর্তী, সম্পাদক কালী রাহা, বিনয় ব্যানার্জি, রবীন দাস প্রভৃতি অনেকেই একদা এখানে স্থায়ী কর্মী ছিলেন; এখন ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের কাজে আসা-যাওয়া করে থাকেন। এখানে নিজস্ব ছবি ওঠার চেয়ে ভাড়াটিয়া দলের ছবি ওঠে অপর্যাপ্ত। এমন দিনও গেছে, দিন-রাত এ-ফ্লোরে ও-ফ্লোরে বহু প্রতিষ্ঠানের অনেক ছবি উঠেছে একসংগে ধারাবাহিক ভাবে। কর্মীদের নিশ্বাস ফেলবার সময় থাকেনি।

টলিউড ষ্টুডিয়ো হোলো এই ইন্দ্রপুরীর প্রথম দিনের অভিধা। বাঙ্‌লা কোনো দিনই সোনার ছিলো না জানি, তবু আজকের তুলনায় সেদিনকে প্ল্যাটিনাম বলতে আমি একটুও দ্বিধাবোধ করছি না। সেদিন মানে ধরুন ১৯০৪ সাল। এই যে গড়ের মাঠ—ওখানে ম্যাডান কোম্পানী 'এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বায়োস্কোপ' নাম দিয়ে দু'-তিনশো ফুটের ছবি দেখিয়ে বেড়াতেন। কিন্তু বেশি দিন সরকারী অনুমতি বহাল রইলো না, ময়দানের পাট ঘুচলো। বাধ্য হয়ে ম্যাডান সাহেব সামনের গ্র্যাণ্ড হোটেলের তলায় 'থিয়েটার রয়্যাল'-এ ব্যবস্থা করলে ছবি দেখাবার।

ম্যাডান সাহেব—জে, এফ ম্যাডান, ভারতবর্ষের চিত্রশিল্পের একজন Land mark! বম্বের মিঃ ফাল্‌কেরও আগে তিনি এদেশে ছবি নির্মাণ করেছেন এবং তার আগে হেথা-সেথায় নানা রকম ছবি দেখিয়ে বেড়িয়েছেন অপূর্ব উৎসাহে। এই অবশ্য-স্মরণীয় মানুষটিকে আমরা ভুলেও মনে করিনি সেদিনকার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবে। কিন্তু তাই বলে কি ম্যাডান সাহেবের নাম লুপ্ত হ'য়ে যাবে? তাঁর কীর্ত্তি যে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে রয়েছে। কি করে? ভারতবর্ষের বহু ছবিঘরই তো তাঁর তৈরি করা। আজ হয়তো সে সব হাত পাল্টে অন্যের কুক্ষিগত হয়েছে, তবু জনক তো বটে। বংশ-পরিচয় দিতে গেলে অজ্ঞাতেও বেরিয়ে যাবে

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও
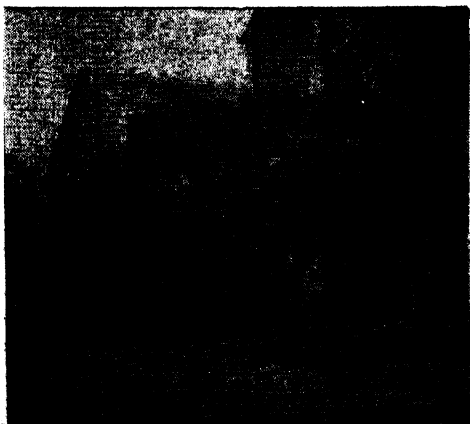
"......তোমার দৃষ্টি তোমার মন, তোমার ভাষা সমস্তই পথ চলিয়ে, পাঠকের মনকে রাস্তায় বের করে আনে। তোমার লেখা চলেছে শাব্দিক পথ দিয়ে নয়, ভৌগোলিক পথ দিয়ে নয়, মানুষের পথ দিয়ে। কত শতাব্দী ধরে দুঃসাধ্য সাধনব্রত মানুষের দুর্গম যাত্রার প্রয়াস নিরবচ্ছিন্ন বয়ে চলেছে—এই তীর্থযাত্রী তারই প্রতীক। ......কৌতুক ও কৌতূহল পাঠককে স্থির থাকতে দেয় না।" —রবীন্দ্রনাথ

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

মহাপ্রস্থানের পথে

ভ্রমণ কাহিনী—প্রবোধ সান্যাল :: পরিচালনা—কার্তিক চট্টোপাধ্যায় :: সঙ্গীত—পঙ্কজ মল্লিক
চিত্রশিল্পী—অমূল্য মুখোপাধ্যায় :: শব্দযন্ত্রী—শ্যামসুন্দর ঘোষ :: শিল্প-নির্দেশক—সুধেন্দু রায়

●

ভূমিকায় : বসন্ত চৌধুরী, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, অভি ভট্টাচার্য, শিশির, নীতীশ, গৌরীশঙ্কর, মলিনা, মায়া বোস, রাজলক্ষ্মী, মায়া মুখার্জি, বন্দনা দাসগুপ্তা, মনোরমা, আশালতা প্রভৃতি।

●

"মহাপ্রস্থানের পথে"

চিত্রখানিও অপরূপ রূপরসে কৌতুক কৌতূহলে, ঘটনাপ্রবাহে পরম গতিশীল, পরম রমণীয়।

●

চিত্রা, প্রাচী, ইন্দিরা

এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে চলিতেছে।

একমাত্র পরিবেশক—অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড

ম্যাডান সাহেবের নাম। সে সময় শতাধিক চিত্রগৃহের অধিস্বামী ছিলেন উনি। এ-হেন ম্যাডান সাহেব, লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক জে, এফ, ম্যাডান জীবনের প্রত্যূষে ছিলেন সামান্য ব্যালে। কোরিন্থিয়ান থিয়েটারে মাইনে ছিলো মাত্র পাঁচ টাকা। কিন্তু ভারতীয় চিত্র-জগতের মুকুটবিহীন সম্রাট ভাগ্যদেবীর অদৃশ্য হস্তের নিয়ন্ত্রণে পথের ধুলা থেকে প্রাসাদের শিখরে আরোহণ করলেন। যত্ন না করলে প্রসাদ মেলে না, সেই কর্ম-যজ্ঞের সূচনা হোলো গড়ের মাঠে ছবি-দেখানোর তাঁবু থেকে।

আগেই বলেছি, ময়দান থেকে ছবি দেখানোর পাট তুলে নিয়ে ম্যাডান কোম্পানী 'থিয়েটার রয়্যালে' হাজির হয়েছেন। সেখানে কিছু দিন দেখাতে না দেখাতে পড়লো আবার বাধা। অশুভ ইংগিত। কিন্তু তাতে ভগ্নোৎসাহ হলেন না কর্মযোগী। এখনকার গ্লোব সিনেমায় (সেদিনের গ্র্যাণ্ড অপেরা হাউসে) গেলেন উঠে। ছবি দেখানো চলতে থাকলো। এর মধ্যে কিন্তু পরবর্তী জীবনের প্রযোজক-পরিচালক, তৎকালীন একনিষ্ঠ কর্মী প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী মশাই যোগ দিয়েছেন ম্যাডান কোম্পানীতে।

গাঙ্গুলী মশাই একই ধরণের কাজে বিরক্ত হ'য়ে ১৯১০ কি ১৯১১ সালে ম্যাডানের সংস্রব ত্যাগ করলেন। এ সম্পর্কচ্ছেদ অবিশ্যি সামান্য কিছু দিনের, পরে যখন ম্যাডানের জামাই রুস্তমজীর প্রচেষ্টায় ম্যাডান কোম্পানী নির্বাক্ ছবি তোলা শুরু করলেন, গাঙ্গুলী মশাইকে ফিরে আসতে হোলো। ম্যাডানের প্রথম ছবি 'হরিশ্চন্দ্র' উঠলো; তার পর তোলা হোলো 'বিল্বমংগল'। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'দুর্গেশনন্দিনী,' 'দেবীচৌধুরাণী,' 'কপালকুণ্ডলা,' 'বিষবৃক্ষ,' 'মৃণালিনী,' 'রজনী'—অর্থাৎ ঋষি বংকিমের প্রায় সমুদয় রচনারাজি এবং 'সরলা,' 'কাল-পরিণয়,' 'মাতৃস্নেহ,' 'পরীক্ষিৎ,' 'শ্রীমন্ত,' 'বিবাহ বিভ্রাট,' 'ইরাণের রাণী' প্রভৃতি সে সময়ের অবিস্মরণীয় ছায়াছবি উঠল এর পর। বাঙলা ছবির অধিকাংশই গাঙ্গুলী মশায়ের পরিচালনাধীনে গৃহীত হোলো। এজরা মীর প্রভৃতির পরিচালনায় হিন্দি ছবিও উঠলো কিছু।

রুস্তমজী মারা গেলেন, ম্যাডানও নেই; ছেলেরা মোটেই সুবিধে করতে পারছেন না—রায় বাহাদুর শুকলাল কারনানী আসা-যাওয়া করছেন, টাকাও দিয়েছেন। তাঁর হাতেই ষ্টুডিয়োর ভার এসে গেল। নাম পরিবর্তিত হয়ে ইন্দ্র মুভিটোন হোলো ৩৪।৩৫ সালে। এখন যে-নাম—এই নামকরণ হয়েছে আজ বছর দশেক। রায় বাহাদুরের হাতে এসে ষ্টুডিয়ো ক্রমেই শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হয়েছে। কায়ক্লেশে দু'টি ফ্লোর সাতটিতে উন্নীত হয়েছিলো, তার একটি প্রোজেকশন থিয়েটারে রূপান্তরিত হ'তে চলেছে। গোড়ায় যে ফিরিস্তি দিয়েছি ষ্টুডিয়োর উপকরণের—তার সবি হয়েছে বর্তমান ব্যবস্থাপনায়। এঁদের প্রযোজনায় অগণিত বাঙলা-পাঞ্জাবী-উর্দু-হিন্দি ছবি উঠেছে, তার মধ্যে বড়ুয়া সাহেবের 'চাঁদের কলংক,' 'সুবে-সাম,' নিরঞ্জন পালের 'ব্রাহ্মণ-কন্যা,' জ্যোতিষ বন্দ্যো'র 'দেবর,' 'মিলন,' 'কলংকিনী' এবং পাঞ্জাবী ও হিন্দি ছবি 'হীর শেয়াল,' 'শশি হুন্নু,' 'ইরাদা,' 'রাণী,' 'আরজু,' 'মার দে পাঞ্জাব' প্রধান। ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাতীত প্রথম শ্রেণীর ছবির চিত্রগ্রহণ এখানে হয়েছে, তার মধ্যে 'বন্দী,' 'সন্ধি,' 'দেবী চৌধুরাণী,' 'চন্দ্রশেখর,' 'নারীর রূপ,' 'শহর থেকে দূরে,' 'মানে-না-মানা,' 'আনন্দমঠ,' 'অভিমান' প্রভৃতি ছবির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের।

কলা-কুশলী

শব্দযন্ত্রী মধু শীল

আজকে ছায়াছবির সংগীতাংশ (কি ছেলে কি মেয়ে কণ্ঠের গান) প্লে-ব্যাক করেন অন্য কণ্ঠ-শিল্পীরা অর্থাৎ অভিনেতা বা অভিনেত্রীর গান জানা না থাকলেও চলবে, তাঁদের হ'য়ে গাইবার জন্যে বহুবাজারে চলতি বড়বাজারের ছাপ-মারা অনেক গায়ক-গায়িকা আছেন। কিন্তু গোড়াকার দিনের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে না এর অস্তিত্ব। শব্দ-যন্ত্রী মধু শীল মশাই প্রথম প্লে-ব্যাক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন 'চোখের বালি' ছবিতে ১৯৩৭ সালের শেষ ভাগে। এর কল্যাণে চিত্র-জগতের এক চূড়ান্ত অসুবিধা চিরতরে দূর হয়েছে। শুধু এই একটি কারণেই শ্রীযুক্ত শীলের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মানুষ সুশ্রী সুন্দর হলেই হয় না; মুখে তার ভাষা না থাকলে সবই যেমন নিষ্ফল, ছবির সম্বন্ধেও সে কথা প্রযোজ্য। কথা ও শব্দ ধারণের জন্যে ছবির রাজ্যে যাঁরা কর্মব্যস্ত, তাঁদের দায়িত্ব কতখানি তা বাইরে থেকে পরিমাপ করা যায় না। মধু বাবু শুধু শব্দ-যন্ত্রীই নন শব্দ-বিজ্ঞানীও বটেন। ১৯০২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুস্কুলে পড়াশুনার ফাঁকে বালক বয়স থেকে তাঁর যন্ত্রের সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক স্থাপিত হ'তে দেখা যায়। কিন্তু তাই বলে
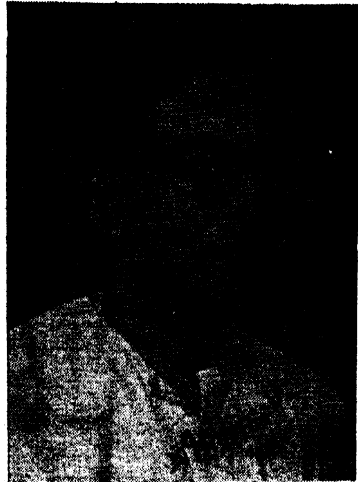
মধু শীল

দেবী ভারতীর প্রসাদ-লাভে বাধা পড়লো না, বরং বৃত্তি নিয়েই ম্যাট্রিক ও আই-এ পাশ করলেন। বি, এস-সি পরীক্ষায় পদার্থ-বিজ্ঞানে অনার্সে ফার্ষ্টক্লাশ পান। ফলিত রসায়ন বিদ্যায় (Applied Chemistryতে) প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম, এস-সি'র ডিপ্লোমা লাভ করেন।

রেডিয়ো ইত্যাদি নিয়ে পাঠ্যাবস্থা থেকেই গবেষণা করছিলেন, পাশ করার পর সেদিকে বেশি মনোনিবেশ করেন, কিন্তু হঠাৎ পিতৃদেবের মৃত্যুতে বাধা পড়লো। বাধ্য হয়ে তিনি এম, এল, সাহার দোকানে কাজ নিলেন। সেখানে সাউণ্ড রিপ্রোডিউসিং বিষয়ে নানা ভাবে জ্ঞান আহরণ করতে থাকেন। তার ফল ফলে যখন হাওড়ার পিকাডিলি সিনেমায় (তৎকালীন নাট্যপীঠে) নিজ হাতে লাউড স্পীকার ও এম্প্লিফায়ার প্রভৃতির পূরো ব্যবস্থা করে দেন।

১১৩২ সালে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হ'লে সেখানকার রেকর্ডিং-এর যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করলেন মধু বাবু। কিন্তু নানা কারণে এই কোম্পানী ছেড়ে তাঁকে অরোরা ফিল্মে যোগ দিতে দেখা যায়। তার পরেই যান প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী মশায়ের ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রিজে (বর্তমান কালী ফিল্মে)। প্রথম ভারতীয় হিসাবে মধু বাবু আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রের যন্ত্রী হলেন—এর আগে ওয়েষ্টার্ণ ইলেকট্রিক ও আর, সি, এ, শব্দযন্ত্র বিদেশীরা পরিচালনা করতেন। অপূর্ব অধ্যবসায়ে ও পরিশ্রমে এই দুরূহ কাজটিকে আয়ত্তে এনে ফেললেন শীল মশাই। ছবি উঠতে শুরু করলো—'বিল্বমংগল', 'ঋণমুক্তি,' 'তরুণী,' 'মণিকাঞ্চন'। কালী ফিল্মে মধু বাবুর সর্বশেষ ছবি 'চোখের বালি,'—এই ছবিতেই প্রথম সফলতার সংগে অটোমেটিক সিন্‌ক্রোনাইজিং পদ্ধতির প্লে-ব্যাক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। নিজের পরিকল্পিত রি-রেকর্ডিং যন্ত্রে প্রথম কাজ করেন 'মুক্তিস্নান' ছবিটিতে। বাঙলা দেশে রি-রেকর্ডিং-এর সূত্রপাত এই সময়েই। তার পর প্লে-ব্যাকে কণ্ঠশিল্পীর সাহায্য গ্রহণ—সে কথা শুরুতেই উল্লেখ করেছি।

বরানগরে (বি, টি, রোডে) অধুনালুপ্ত ফিল্ম প্রোডিউসারের গোড়াপত্তন থেকে মধু বাবু সব কাজ করেছিলেন। কোনো পরিশ্রমে কাতর হননি কোনো দিন এই অক্লান্ত কর্মীটি।

ডাবিং (ভাষান্তরিতকরণ) পদ্ধতির কোনো নির্দিষ্ট ব্যবস্থা আমাদের এখানে না থাকায় শীল মশাই এদিকে মনোযোগী হ'য়ে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলেছেন এবং তাতেই 'বিদ্যাসাগর' ছবিটিকে ভাষান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। হিন্দি 'রত্নদীপ'এর রি-রেকর্ডিং ও গান রেকর্ডিং মধু বাবুই করে দিয়েছেন।

বর্তমানে মধু শীল মশাই এম, এল, সাহা লিমিটেড, সি, সি, সাহা লিমিটেড এবং হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রডাক্টস লিমিটেডের টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার ও অন্যতম পরিচালক।

টকির টুকিটাকি

মহাপ্রস্থানের পথে

যাত্রা নয়, চিত্ররূপ! পাণ্ডবদের না, এম, টি'র! একদা-পরিব্রাজক-সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন কেদার-বদরী, গুপ্তকাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থে তীর্থে, তার সার্থক ছায়াছবি পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে

যুগে যুগে জাতির জীবনে দুর্যোগ এসেছে, এসেছে ঝঞ্ঝা—সেই সঙ্কট বিমোচনের সংগ্রামে নারী কতখানি মূল্য দিয়েছে তারই এক জ্বলন্ত আলেখ্য—

নীলদর্পণ

কল্পনা নয়, বানানো গল্প নয়, সমগ্র কৃষ্ণনগরে সেদিন সকলের চেয়ে সুন্দরী মেয়ে ছিল হরমণি। নীলকুঠির ছোট সাহেবের পাপদৃষ্টিতে যেদিন পতিত হলো সে, সেদিন তার চোখ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল যে বুকের রক্ত, 'ক্ষেত্রমণি'র অশ্রুধারায় ফুটে উঠবে তারই মূর্ত্তরূপ। আপনাদেরও দু ফোঁটা চোখের জল হয়তো পড়বে আজ সেই অভিশপ্তা বালিকার উদ্দেশ্যে!

নীলদর্পণ

স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-নিরক্ষর, প্রত্যেকটি দর্শকের অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখে পর্দার বুকে যে ঘটনাপ্রবাহ, নীল চাষের সেই ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ বিন্যাস।

নীলদর্পণ

মুভিল্যাণ্ড লিমিটেডের সশ্রদ্ধ নিবেদন ও গোল্ডেন ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্সের সকল পরিবেশন

মিনার, বিজলী, ছবিঘর, আলোছায়া ও সহরতলীর ন'টি চিত্রগৃহে চলিতেছে।

নির্মাণরত ছিলো, এত দিনে কলকাতা এবং মফঃস্বলে মুক্তিলাভ করলো। দৃশ্যে-গানে- অভিনয়ে এ ছবিটি নাকি চিত্ররাজ্যে সাড়া আনবে। অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী আদি নবীন-প্রবীণের একত্র সমাবেশ হয়েছে 'মহাপ্রস্থানের পথে'।

ভোর হ'য়ে এলো

'চিত্রভারতীর' অভিনব উত্তম। তাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পরিচালক দেবকী বসু পুরোহিতের দায়িত্ব নিয়েছিলেন শুভ সূচনা-দিনে। যদিও প্রকৃত পূজারী হচ্ছেন সত্যেন বসু।

শ্রীমতী পিক্‌চার্সের

'দর্পচূর্ণ'! সূচনা ইতিমধ্যে হ'য়ে গেছে। গতদিনের সফলতায় আমরা নিঃসন্দেহে ধারণা করতে পারি এই প্রচেষ্টাও এঁদের জয়যুক্ত হবে।

সধবার একাদশী

অসম্ভব কথা—কিন্তু সেদিন সধবাদেরও একাদশী করতে হয়েছিলো আর তারি বাস্তব-চিত্র ৺দীনবন্ধু মিত্রের এই বইখানি। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' চিত্রের পরবর্তী প্রয়াস মুভিল্যাণ্ড লিমিটেডের 'সধবার একাদশী'। অক্ষয় তৃতীয়ায় শুভ-লগ্নে ডাঃ কালিদাস নাগ মহোদয়ের পৌরোহিত্যে এর মহরৎ সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন জ্ঞানী-গুণীজনের উপস্থিতিতে উৎসব-সভা শ্রীমণ্ডিত হয়েছিলো। শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায় এরও চিত্র-নাট্য রচনা করছেন।

বৌদি'র বোন

আগতপ্রায় এক দল কুশলী টেকনিসিয়ানের পরিচালনায় কল্যাণে। চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন হাসির ছবি নাকি এখানি। বাঙালী আমরা হাসতে জানি না সে অপবাদ দূর করবার ইচ্ছা কর্তৃপক্ষের আছে জেনে খুশি হয়েছি।

আঁধি

বইয়ের পাতায় ছিলো এবারে সেলুলয়েডের ফিতেয় উঠতে চলেছে। অগ্রদূত পরিচালক-গোষ্ঠীর পরবর্তী উত্তম সৌরীন্দ্র-মোহনের-উক্ত রচনা। এম, পি,-চিত্রটির কার্য্যারম্ভের সংকেত করেন কানন দেবী, রাধামোহনের, চিত্রগ্রহণ হয় ১১শে এপ্রিল।

আবার শরৎচন্দ্র!

এবার 'শুভদা'। প্রথম দিনের রচনা, তুলছেন এম, পি প্রোডাকসন বাঙলা ও হিন্দি ভাষায়। শরৎ-প্রীতির এখন বিরতি প্রয়োজন, না হলে ভিড়ের মাঝে উত্তম অধম হতে কতক্ষণ।

নাগা পাহাড়ের দেশে

অরণ্য-চিত্র। তাকে প্রকৃত রূপ দেবার জন্যে পরিচালক বি, কে, দালাল গিয়েছিলেন সদলে আসাম। প্রয়োজনীয় দৃশ্যাবলীর চিত্রগ্রহণ সেরে এখন তাঁরা স্বস্থানে প্রত্যাগত। বিপিন মুখার্জি, মলয়া সরকার, বেণু মিত্র, নবাগতা রত্না গোস্বামী প্রভৃতিকে বিভিন্ন চরিত্রে দেখতে পাওয়া যাবে। এ আয়োজন করছেন কল্পতরু ফিল্মস।

নব উদ্যম

প্রযোজক বিমল দে'র। আন্তর্জাতিক খ্যাতি-লব্ধ 'ছিন্নমূল' (বাঙলা) ছবির প্রযোজক আর একখানি সময়োপযোগী কাহিনী নির্বাচন করেছেন। কাহিনীর রচয়িত্রী শ্রীমতী শান্তি দাশগুপ্তা। এক জন প্রখ্যাত পরিচালক এই নব উদ্যমের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। সংগীতের ভার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কালোবরণের ওপর।

সাবিত্রী

রাধার নির্মাণরত পৌরাণিক প্রচেষ্টা, দ্রুতগতি সমাপ্তমুখে। যমুনা সিংহ, সমর রায়, অপর্ণা, নীতীশ, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস প্রভৃতি নবীন-প্রবীণের সমন্বয় হয়েছে ছবিটিতে।

—সাহিত্য-পরিচয়—

(প্রাপ্তি-স্বীকার)

শ্রীরামদাস প্রশস্তি—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সম্পাদিত। সি থি বৈষ্ণব সম্মিলনী, ৩৬ নং মণ্ডলপাড়া লেন, পোঃ কাশীপুর, কলিকাতা-৫। মূল্য দুই টাকা আট আনা।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের ধারা—শুভ গুহঠাকুরতা। 'দক্ষিণী' প্রকাশন বিভাগ, কলিকাতা-২৯। মূল্য পাঁচ টাকা।

অমরত্ব—শ্রীবাসুদেব মাইতি। ইউনিভার্সাল পাব্লিশার্স, ২১১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ১৸০।

হসন্তিকা—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। এস, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷০।

ছেলেদের বিবেকানন্দ—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। আনন্দ হিন্দুস্থান প্রকাশনী, ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৸০।

গুরুদাসের বিয়ে—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। এস, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷০।

অন্ত ইতিহাস—শ্রীসিদ্ধার্থ রায়। ইণ্ডিয়ানা লিঃ, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৩৲।

পৃথিবীর প্রেম—শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বুক কর্পোরেশন লিঃ, ৪এ, ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা। মূল্য ৩৲।

স্মৃতিকথা—শ্রীমৃণালকান্তি বসু। ৪৬, সাউথ এণ্ড পার্ক, কলিকাতা। মূল্য ৫৲।

বাঁশী ডাকে যে—শ্রীদুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বুক কর্পোরেশন লিমিটেড, ৪এ, ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

নানা দেশের নানা গল্প—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়। সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

শিশুমন—শ্রীরমেশ দাস। সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সী, ১০৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা। মূল্য ২৷৷০।

সামুদ্রিক রত্ন—পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী। ১৪১।১সি, রসা রোড, কলিকাতা। মূল্য ৫৲।

পারের খেয়া (৫ম খণ্ড)—শ্রীশিশিরকুমার দত্ত। বুক হাউস, ২৯, রসা রোড, কলিকাতা। মূল্য ৷৷৵০।

ইওর হেলথ—(১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২) ডাঃ এ, ডি, মুখার্জ্জী, ২৩, সমবায় ম্যানসনস্, কর্পোরেশন প্লেস, কলিকাতা। মূল্য ৸০।

কবিগুরু—শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। ওরিয়েণ্ট প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিঃ, ৮১।৩, হরিশ চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৩৸০।

আবার নেহরু গভর্ণমেণ্ট

"এই শ্রীহীন, দুর্গত, উত্তরোত্তর অধোগামী দেশকে লইয়া ফাঁকা ভাববিলাসী আদর্শবাদী দলের পর দল কত না ছিনিমিনি খেলিতেছেন, কত না শ্রেণীহীন, শোষণবিহীন সমাজ গড়িতেছেন, ধর্ম্মহীন, রামহীন রামরাজ্য ও বানর-রাজ্যের প্রহেলিকা দেখাইতেছেন, কথা ছাড়া কাজের নমুনা কাহারও কাছে পাওয়া যাইতেছে কি? নেহরুজী তাঁহার পাঁচ শতাধিক চরানুচর লইয়া দেশ গঠনের নামে দল গড়িবেন এবং পৃথক-পৃথক ভাবে বামপন্থী কংগ্রেসবিরোধী ও দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস-বিরোধী ফ্রণ্ট সেই দল ভাঙ্গিবার উদ্দেশ্যে আত্মকলহে রুগ্ন কংগ্রেস পার্টির কাছা ধরিয়া টানিবে, তবে দেশের কল্যাণ করিবে কে? এই দল ভাঙ্গাভাঙ্গির পলিটিক্স সুসভ্য পাশ্চাত্যের অনুকরণে সকল নেতা ও কর্ম্মীকে পাইয়া বসিল, তবে ভাগের মায়ের গঙ্গাযাত্রার উপায় রহিল কোথায়? অবশ্যম্ভাবী গণ-বিক্ষোভকে পাশ কাটাইয়া এইরূপে বৈধ গণতান্ত্রিক পার্টি পলিটিক্স-এর মাধ্যমে ধন-ধান্যপূর্ণ ইউরোপীয় দেশগুলির রাজনীতি-বিলাস চলিতে পারে, অর্দ্ধাশনে অনশনে জীর্ণ অর্দ্ধ-উলঙ্গ ভারতের চলিবে কি? চারি দিকে নেতৃমুখে উচ্চারিত বড় বড় আশার ও আদর্শের বাণী শুনিয়া কপালে করাঘাত করিয়া বিপন্ন দেশবাসী আজ এই কথাই কি ভাবিতেছে না?" —দৈনিক বসুমতী।

কলিকাতার প্রতিবাদ

"নিছক আমলাতন্ত্রসুলভ জিদের বশে অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতার ও বিভ্রাটের পথে পা না বাড়াইয়া এবং তদ্দ্বারা জাতির গুরুতর ক্ষতি না ঘটাইয়া এখনও গতিভঙ্গ করা কর্তৃপক্ষের অবশ্য কর্তব্য। ব্যবস্থা ভাল কিম্বা মন্দ—সে তর্ক না হয় এখন চাপা থাকুক। কিন্তু যে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের একটি বিরাট অংশ এত প্রবল আপত্তি জানাইতেছে—নিছক সরকারী ক্ষমতার জোরে তাহা বলবৎ করিতেই বা কর্তৃপক্ষ এত জিদ করিতেছেন কেন? জনসাধারণের দাবীও খুব বেশী কিম্বা অযৌক্তিক নয়। করযোড়ে ও নতশিরে তাহারা মাত্র আবেদন জানাইয়াছিল যে, সাধারণের আস্থাভাজন কয়েক জন বেসরকারী ব্যক্তি ও সরকারী বিশেষজ্ঞ সহ একটি কমিটি গঠন করা হউক। ইঁহারা যে পরামর্শই দিন না কেন—সরকার যেন তাহাই বলবৎ করেন। তাহাতে কোন আপত্তি উঠিবে না। সদ্য-প্রবর্তিত ব্যবস্থার মধ্যে গলদ না থাকিলে প্রস্তাবিত কমিটিও যে ইহা অনুমোদন করিবেন—সে সম্পর্কে সন্দেহ নাই। তবু সরকার সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতেছেন কি যুক্তিতে? আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে একটা সাধারণ নীতি আছে যে,—"শুধু ন্যায়বিচারই যথেষ্ট নহে। এমন ভাবে বিচার করিতে হইবে যাহাতে সর্বসাধারণের ধারণা হয় যে, ন্যায়বিচার হইতেছে।" সরকারী নীতি সম্পর্কেও এই উক্তি প্রযোজ্য। "শুধু ন্যায্য ও জাতীয় স্বার্থের অনুকূল কাজ করাই যথেষ্ট নহে। এমন ভাবে কাজকর্ম চালাইতে হইবে যাহাতে সাধারণের ধারণা হয় যে, ন্যায্য ও জাতীয় স্বার্থের অনুকূল কাজ হইতেছে।" আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণের মনে যে ইহার বিপরীত ধারণা রহিয়াছে—সে কথা সরকারও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অন্ততঃ পক্ষে এই কারণেও পুনর্বিন্যাসের ব্যবস্থা স্থগিত রাখিয়া বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা উচিত।" —যুগান্তর।

মেডিকাল কলেজ সংস্কার

"নূতন ব্যবস্থায় মেডিকাল কলেজে যে সকল বিভাগ খোলা হইবে তাহার মধ্যে যৌনব্যাধি চিকিৎসা বিভাগ খুলিবার প্রস্তাবটিই বিশেষ ভাবে বিরুদ্ধ সমালোচনার বিষয় হইয়াছে। যেখানে এপেণ্ডিসাইটিস, হার্নিয়া প্রভৃতির ন্যায় দুশ্চিকিৎস্য গুরুতর ব্যাধির চিকিৎসার জন্য লোকে হাসপাতালে স্থান পায় না, সেখানে যৌনব্যাধি চিকিৎসার বিভাগ স্থাপনা, তাহার অধ্যক্ষ, সহকারী প্রভৃতির নিয়োগ—এই সকল আড়ম্বর কেন করা হইতেছে দুর্বোধ্য! যে শ্রেণীর রোগীর চিকিৎসার নামে এই আড়ম্বর তাহাদের পক্ষে লোকদৃষ্টির অন্তরালেই চিকিৎসিত হইতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক। সুতরাং এই বিভাগটির জন্য আড়ম্বরে অর্থের ও উদ্যমের অপচয় হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। পরিশেষে একটা কথা সরকারকে ও মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ জানাইব। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হাসপাতাল দরিদ্রের জন্য, অসহায়ের জন্য; হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য লোকে যে দান করে, হাসপাতালের জন্য সরকারী অর্থের ব্যয় অনুমোদিত হয়, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য সমাজে যাহারা দরিদ্র ও সম্বলহীন তাহাদের যেন বিনা চিকিৎসায় প্রাণ দিতে না হয়। ধনীর বা বিলাসীর প্রয়োজন সাধনের জন্য হাসপাতাল নহে—তাহার অন্য ব্যবস্থা। কলিকাতা মেডিকাল কলেজে ও হাসপাতালে সংস্কারের নামে এমন কোনো ব্যবস্থা যেন না করা হয়—যাহাতে উহা মূল লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারে।"

ক্রমেই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িবে

"সহযোগী 'বর্দ্ধমান বাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দুর্নীতি দমন বিভাগের গাফলতি' শীর্ষক সংবাদে জানা যায় যে, জেলা ম্যিলিক অফিসের কর্ম্মচারীদের যোগসাজসে মিথ্যা নামে বহু টাকা আত্মসাৎ করিবার একটি চুরি ধরাইবার জন্ত জনৈক ভদ্রলোক গত ২১শে মার্চ্চ জেলা দুর্নীতি দমন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীঅমর ভট্টাচার্য্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া শুধু বিফল-মনোরথ হন নাই, পরন্তু উক্ত ব্যক্তিকে অমর বাবুর নিকট হইতে তিরস্কৃতও হইতে হইয়াছিল। ঘটনা সত্য হইলে ইহা অতীব বেদনার কথা। দেশের দুর্নীতি দমনের জন্ত সাধারণের অর্থে যাঁহাদিগকে সরকারী বিভাগ হইতে নিযুক্ত করা হয়, কার্য্যক্ষেত্রে জনসাধারণ তাঁহাদের নিকট হইতে কোনরূপ সহযোগিতা না পাইলে দেশবাসী জাতীয় সরকারের উপর ক্রমেই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িবে।"

—বর্দ্ধমান।

দামোদর পরিকল্পনার ছবি

"দামোদর বন্তার স্থায়ী প্রতিকারের দাবীতে দক্ষিণ বর্দ্ধমানের প্রবল গণ-আন্দোলনই আজিকার বিশ্ববিখ্যাত দামোদর পরিকল্পনার মানসরূপ প্রদান করিয়াছে। দামোদর বন্তা প্রতিকার সমিতির দাবী ইংরেজ আমল হইতেই স্বীকৃত হইয়াছে, স্বাধীন ভারতেও বিখ্যাত মোহনপুর হানাবাঁধ এক উজ্জল অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু যে ভাবে বন্তাপীড়িতদের দাবী গ্রহণ করিয়া আমাদের জাতীয় সরকার অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহাতে যে ভাটা পড়িয়াছে তাহা অকপটেই বলা যাইতে পারে। এত অর্থ ব্যয় করিয়া যে মোহনপুর হানা বাঁধা হইল তাহাকে সম্পূর্ণ রূপায়িত করিয়া সুষ্ঠু পন্থায় কৃষিকার্যে লাগান হইল না। ঐ অঞ্চলের একটি হানায় বাঁধ দেওয়া হইল, কিন্তু দক্ষিণ বাঁধে আরো যে বহু হানা হইয়া বৎসর বৎসর গ্রামগুলিকে প্লাবিত করিতেছে তাহার জন্ত কোন কিছু করা হইল না। দামোদর দক্ষিণ তীরস্থ প্লাবিত অঞ্চলের খণ্ডঘোষ, রায়না ও জামালপুর থানা এলেকার যে অসংখ্য হানা হইয়া সহস্র ধারায় ন্তায় গ্রামগুলির উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই করা হইল'না। সব বিষয়ই দামোদর পরিকল্পনার ছবি দেখাইয়া ভুলাইয়া রাখা যায় না।" —দামোদর।

যুব-আন্দোলন

"জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে যুব-সম্মেলনের আন্দোলন সংবাদ আমরা পাইতেছি। যুব-সমাজের মধ্যে এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্দোলন যথার্থই আশার সংবাদ। যুব-সমাজই যথার্থ জাতির মেরুদণ্ড। জাতিকে শক্তিশালী করিয়া প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত যুব সমাজের অভ্যুত্থান একান্ত অপরিহার্য্য বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু বর্ত্তমান আবহাওয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আশার আলোক দূরে সরিয়া যাইতেছে এবং স্বতঃই অনুভূত হইতেছে যে, কর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্ত যুব-সমাজে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। কর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া জাতীয় উন্নয়ন কোন দিনই সম্ভব হয় নাই, আজিও হইবে না। বর্দ্ধমান জেলার যুব-আন্দোলনের যাঁহারা উদ্যোক্তা তাঁহাদিগকে এই জন্তই আমরা স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, যুব-সমাজকে, ছাত্র-সমাজকে কর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত করিবার সর্ব্বপ্রকারের প্রয়াস যুব-সমাজ গ্রহণ করিলেই যুব-সমাজ, ছাত্র তথা সমগ্র জাতি উপকৃত হইবে, ঐশ্বর্যশালী হইবে।" —বর্দ্ধমানের কথা।

পারমিট প্রথা কি?

"পারমিট প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে কালক্রমে ভারতীয় ইউনিয়নের হিন্দুরা পূর্ব্ব-পাকিস্তানের হিন্দুদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করিতে বাধ্য হইবে। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের হিন্দুরাও নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে সব সময়ই সন্দেহ পোষণ করিবে এবং কোন সুযোগ পাইলেই পাকিস্তান ত্যাগ করিবে। যাহারা নেহাৎ দায়ে ঠেকিয়া থাকিতে বাধ্য হইবে তাহারা কালক্রমে ধর্ম্ম ও কৃষ্টি বিসর্জ্জন দিয়া সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সঙ্গে একীভূত হইয়া যাইবে। এ অনুমান মোটেই কষ্ট-কল্পিত নয়। ইতঃপূর্ব্বে পাকিস্তানী নেতারা যৌথ নির্ব্বাচনের যে প্রবল বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছেন তাহার মূলেও ঐ একই কারণ বিদ্যমান। যাহা হউক, পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের প্রতি আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা যেন এই অবাঞ্ছিত পারমিট প্রথা প্রবর্ত্তন না করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দেন।" —জনশক্তি।

ছাটিয়া বাদ?

"প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির চূড়ান্ত স্থান নির্ব্বাচন-কার্য্য মেদিনীপুরে আরম্ভ হইয়াছে এবং যেটুকু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে আমাদের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইতেছে। শুনা যাইতেছে যে, মহকুমা নির্বাচক সমিতি যে স্কুলগুলিকে প্রধান ও সহায়ক হিসাবে অনুমোদন দিয়াছেন এবং যে সংখ্যা ধার্য্য করিয়াছেন তাহার কোন মূল্য জেলা-সমিতি দিতেছেন না। সরকারী দুই হাজার লোক-সংখ্যার আইন ও অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্ত তাঁহাদের হাত-পা বাঁধা বলিয়া শুধু কাটা-ছাঁটা করিলে তেমন কথা ছিল না; কিন্তু যে স্কুলগুলিকে মহকুমা ছাঁটিয়া বাদ দিয়াছেন, কয়েক ক্ষেত্রে শুনি, সেগুলির মধ্য হইতেও কোন কোনটিকে তাঁহারা অনুমোদন দানের প্রয়াস পাইতেছেন। ইহা সত্য হইলে খুবই দুঃখের কথা। কারণ, তাহা হইলে মহকুমায় মহকুমায় খসড়া নির্ব্বাচন করাইবার বা সেই সূত্রে প্রাথমিক স্কুলগুলির শিক্ষক, কর্তৃপক্ষ ও সমিতির সদস্যদের কয়েক দিন ধরিয়া লোক-দেখান হায়রাণ করাইবার কোন দরকার ছিল না। ইহাতে জেলা স্কুলবোর্ড আরও অপ্রিয় হইয়া উঠিবেন না কি?" —প্রদীপ।

অবহেলিত আসাম

"আসাম সরকার ইতিমধ্যে ফাইনান্স কমিশনের কাছে গত পাঁচ বৎসরের আয়-ব্যয় উল্লেখ করিয়া এক স্মারকলিপি পেশ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, আসামের সর্ব্বদলের নেতৃবৃন্দ ও বিধানসভার সদস্যগণ একযোগে ফাইনেন্স কমিশনের নিকট আসামের দাবী উপস্থিত করিলে আসামের ভবিষ্যৎ উজ্জল হইবে আসাম ভারতের একপ্রান্তে অবস্থিত। তার সমস্যা বহু ও বিচিত্র। —এই সমস্ত বিবেচনা না করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার আসামের প্রতি অবিচার চালাইয়া আসিতেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের ২৭২ দফা মতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া আসামের চা ও তৈলশিল্প হইতে উদ্বৃত্ত শুল্কের একটা মোটা অংশ অনায়াসে দিতে পারেন। আসামে অর্থের অভাব বশতঃ তাহার প্রাকৃতিক সম্পদকে রাষ্ট্রের কল্যাণে নিয়োজিত করা সম্ভব হইতেছে না। যদি কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব্বের মনোভাব বর্জ্জন করিয়া আসামকে সাহায্য করেন তবে

ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্নপ্রায় আসাম অদূর ভবিষ্যতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে। ফাইনেন্স কমিশন সব দিক বিবেচনা করিয়া আসামের ন্যায্য দাবী পূরণে সাহায্য করিলে আসামের জনগণ সুখী হইবে।" —যুগশক্তি।

সংস্কার আবশ্যক

"কাঁথি-ভগবানপুর সুদীর্ঘ ৪২ মাইল রাস্তার মধ্যে এগরা হইতে ভগবানপুর পর্য্যন্ত ২৬ মাইল কাঁচা রাস্তা রহিয়াছে। ঐ কাঁচা পথটিই প্রধানতঃ অমর্শী, পটাশপুর ও ভগবানপুর অঞ্চলবাসীদের প্রধান ও প্রয়োজনীয় পথ। ঐ পথ দিয়া প্রতিনিয়ত যানবাহন ও মালবোঝাই ট্রাক আদি যাতায়াত করে। জেলাবোর্ড হইতে এই পথটির সংস্কার সাধিত হয়। বর্ত্তমান বৎসর কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টায় ঐ রাস্তার অধিকাংশ পুলের পুনর্নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে; কিন্তু আমাদের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, অমর্শী ও ভগবানপুরের পুল দুইটি অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, যে কোন মুহূর্ত্তে দুর্ঘটনা ঘটিয়া যানবাহন ও যাত্রী-সাধারণের অশেষ দুর্গতি ঘটিতে পারে। কর্ত্তৃপক্ষের এই পুল দুইটি পুনর্নির্ম্মাণ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে না। এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টির কথা চিন্তা করিয়া আমরা জেলাবোর্ড কর্ত্তৃপক্ষকে সত্বর সংস্কার সাধনে ব্রতী হইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।" —নীহার।

কংগ্রেসের বাড়ী

"চৌরঙ্গিতে ক্যালকাটা ক্লাবের উল্টা দিকে কংগ্রেস একটি মস্ত বাড়ী কিনিয়াছে। ক্যালকাটা ক্লাবের মদের ফোয়ারা ও বল ডান্সের তালের রেশ কংগ্রেসের বাড়ীতে পৌঁছিয়া সভ্য ও প্রেস্টিজের মর্য্যাদা রাখিতে পারিবে। কংগ্রেসের আজ কাল পয়সা হইয়াছে, নেটিভ পাড়ার সস্তা বাড়ীতে কুলাইবে না। চৌরঙ্গিতে বাড়ী চাই। বুঝিলাম। কিন্তু বাড়ীটা কার? কে এমন মহাপ্রাণ যে এত বড় একটা বাড়ী কংগ্রেসকে দান করিতে আসিল? সভার মিশ্র বলিয়াছেন যে, জমিটা কুমার বিশ্বনাথ রায়ের। কিন্তু বাড়ীর মালিকের নাম করিতে লজ্জা পাইয়াছেন। আমরা জানিতে পারিলাম এই ব্যক্তির নাম বালমুকুন্দ বাজোরিয়া। হাওড়ায় ইহার বিরাট ময়দা-কল আছে। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের প্রধান মন্ত্রিত্বকালে ইহার ময়দা-কলের বিরুদ্ধে রিপোর্ট হয় এবং সরকারী কন্‌ট্রাক্ট কাটা যায়। প্রফুল্ল সেনের আমলে সে উহা ফিরিয়া পাইবার জন্য খুব চেষ্টা করে, কিন্তু আফিসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা বাধা দেওয়ায় কন্‌ট্রাক্ট পায় না। ধীরে ধীরে বালমুকুন্দ অতুল্য ঘোষদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইয়াছে, বি-পি-সি-সির ফাইনান্স কমিটিতে ঢুকিতেছে। জহরলালের কংগ্রেসে 'ইন্‌টিগ্রিটি ও এফিসিয়েন্সির' যে সব অবতার ভীড় করিতেছে তাহাদের মধ্যে বালমুকুন্দের স্থান খুব নীচে নয়। বাড়ী দান করিয়া বালমুকুন্দ ময়দা-কল চালাইবার চেষ্টা করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই! 'যুগান্তর' বাড়ীর কথা লিখিলেন কিন্তু মালিকের নাম চাপিয়া গেলেন কেন?" —যুগবাণী।

চিড়া, মুড়ি, খৈ

"মেদিনীপুর হইতে এবং হাওড়া জেলা হইতেও কলিকাতায় চিড়া মুড়ি খৈ চালান যায়। চাউল কন্‌ট্রোলের হুড়াহুড়িতে কলিকাতার কুলী, মজুর, মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ ইহা খাইয়াও জীবন ধারণ করিতেছে। ট্রেণে চাউল ধরার জন্য মেয়ে-পুলিশের ব্যবস্থাও আছে। কেহ এক মুঠা চাউল কলিকাতায় লইয়া না যায় তথাপি- ট্রেণে, নৌকায়, ষ্টীমারে চাউল গিয়া সহরবাসীর প্রাণ বাঁচাইতেছে। সুতরাং ইহাও ত অসহ্য। পুলিশরা বরদাস্ত করিতে পারিতেছে না। এই দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্যের যুগে আরও কিছু পাওয়া গেলে সুবিধাই হইত। ইহা ভাবিয়া তাহারাই ষড়যন্ত্র করিয়া গবর্ণমেণ্টের কান ভারী করিয়াছে যে, হায়! হায়! ঠাকুর কি করিতেছে, অর্দ্ধেক চাউলই যে চিড়া মুড়ী ও খৈ হইয়া রেলে, নৌকায়, ষ্টীমারে, কুলীর মাথায় কলিকাতায় পৌঁছিতেছে, সুতরাং তোমার কন্‌ট্রোল কোথায় রহিল? অতএব ব্যবস্থা কর, চিড়াকেই আগে ধর। এক পোয়া চিড়া এক সের হইয়া লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। আমাদেরও কুলাইতেছে না; আমরা যে দু-দশ সের ধরি তার অর্দ্ধেক যায় সরকারে, আমাদের পেট অচল হইতেছে! এ জন্য চিড়াকেও কনট্রোল কর, দামের গুরুত্ব দিয়া! কুটনীরা হাসিয়া বলিতেছে, কর কর ঠাকুর! —মেদিনীপুর হিতৈষী।

চাউল-সঙ্কটে

"রামপুরহাট এলেকায় চাউল-সঙ্কট গত বৎসর অপেক্ষা অধিকতর শঙ্কাজনক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে রামপুরহাটে চাউলের দর ২৩৲ টাকা প্রতি মণ হইয়াছিল এবং সেই সময়েই সদাশয় সরকার-অনুমোদিত কয়েকটি দোকানের মাধ্যমে ১৬৷৽ প্রতি মণ চাউল বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া এই সঙ্কট মোচনের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই ব্যবস্থার সুফল সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গিয়াছিল। কয়েক দিন মধ্যেই চাউলের দরও হ্রাস পাইয়াছিল—বাজারে লুকানো চাউলও প্রকাশ্যে বিক্রয় হইতে সুরু করিয়াছিল। এ বৎসর এই সময়ে চাউলের দরও যেমন অত্যধিক বৃদ্ধি হইয়াছে চাউলের বিক্রেতাগণের "আমদানী নাই—কি করিব" ধ্বনি ততোধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। —রাঢ়দীপিকা।

গুপ্ত কথা

পুত্র—লেডী মাউণ্টব্যাটেন কে বাবা?

পিতা—ভারত ভাগ করিয়া কয়েক কোটি লোককে উদ্বাস্তু আর সমগ্র দেশকে পঙ্গু করিয়াছেন যে মাউণ্টব্যাটেন, তাঁহার স্ত্রী।

পুত্র—তবে কলিকাতায় এ-আই-সি-সি অধিবেশন শেষে একই প্লেনে নেহেরুজী আর লেডী মাউণ্টব্যাটেন দিল্লী গেলেন, নেহেরুজী বিলাত গেলে মাউণ্টব্যাটেনদের বাড়ী গিয়া পিঠা-পায়স খান, খেলার মাঠে পাশাপাশি বসিয়া ফটো ওঠান কেন—ভারতবর্ষের এত বড় শত্রুর স্ত্রীর সঙ্গে?

পিতা—ও-কথা জিজ্ঞাসা করিতে নাই বাবা! —নিশান।

মুনাফাখোরদের জয়

"মুর্শিদাবাদ জেলায় ধান্য ও চাউলের দুর্ম্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতা যে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে দুশ্চিন্তার কারণ বর্ত্তমান। ধান্য চাউলের সহিত অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মূল্যও সমানে ঊর্দ্ধগামী হইয়াছে। এই মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ মুনাফাখোরদের প্রচণ্ড লোভ। বীরভূম হইতে মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ হইতে নদীয়া বা ২৪ পরগণা নানা ভাবে চাউল পাচার করার পশ্চাতে এই মুনাফার লোভ কার্য্য করিতেছে। আর দুঃখের কথা, সামান্য ঘুষ বা অর্থের পরিবর্ত্তে যাহাদের উপর

ধান্ত চাউল পাচার বন্ধ করায় বা বেষ্টন-রক্ষীদের সাহায্য করার দায়িত্ব আছে, তাহারাও কর্ত্তব্য সম্পাদনে অবহেলা করিতেছে। এই ভাবে ধান্ত চাউল পাচার বন্ধ না হইলে মুর্শিদাবাদ জেলায় চাউলের দুর্ম্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতা বন্ধ হইবে না এবং এই ভাবে চলিতে থাকিলে জেলাবাসীর ভাগ্যাকাশে সত্বর দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া যে দেখা দিবে, তাহা বলাই বাহুল্য।" —মুর্শিদাবাদ সমাচার।

নিয়মিত লেন-দেন আছে

"জেলা বোর্ডের স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যবস্থাধীনে থানায় থানায় হেলথ ইনস্পেক্টার নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে ভেজাল তেল ধরার কাজও অন্তর্ভুক্ত আছে। এই তেল ধরার ব্যাপারে ইন্‌সপেক্টারগণের বিরুদ্ধে আজ-কাল চারি দিক হইতে নানা অভিযোগ আসিতেছে। এবং এই অভিযোগ ক্রমশঃই বাড়িতেছে। এই তেল ধরার ব্যাপারটি সমগ্র জেলার থানায় থানায় দুর্নীতির নামান্তররূপে অভিহিত হইতেছে ও তীব্র জন-সমালোচনার বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। বোর্ড এবং জনগণের এ বিষয়ে আশু দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। —মুক্তি।

ঘুষোঘুষি

"যদি সংবাদপত্র বিনা দোষে প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধে এরূপ কলঙ্ক প্রচার করে তবে তাঁহার উচিত আদালতে তাঁহার নিষ্কলঙ্ক প্রমাণ করিয়া নিজের এবং কংগ্রেসের মান রক্ষা করা। কাগজওয়ালারা ডাঃ রায়ের খুব ভরসা করিয়া বলিয়াছেন, "আমরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে সবিনয়ে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, তাঁহার মেধা ও ব্যক্তিত্ব দেশের কল্যাণে ততক্ষণ আসিবে না, যতক্ষণ তাঁহার চারি দিকে একটি অবাঞ্ছনীয় চক্র, দুর্নীতির বেড়াজাল তাঁহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে।" আমরা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করি—দুই পক্ষই 'ঘোষ'। দু' টুকরো সোনাকে জোড়া দেয় সোহাগা। ডাঃ রায়ের সোহাগ উভয়ের মাঝে পড়িয়া জোড়া দিবে নিশ্চয়। জাতীয়তাবাদী কাগজ আর জাতীয় কংগ্রেস কেন এ বিবাদ করছে, সেটা দপ্তর ভাগ নিয়ে নয় তো?

বাগবাজারের মদনমোহন
কালিঘাটের কালী—
গলায় গলায় আবার হবে,
ক্ষণিক গালাগালি।"

—জঙ্গিপুর সংবাদ।

আচার্য্য রায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা

বিগত ১৫ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেডের ১৬৮, মাণিকতলা মেন রোডস্থ কারখানায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ব্রোঞ্জনির্ম্মিত একটি আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের যুবকবৃন্দকে আচার্য্য রায়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ
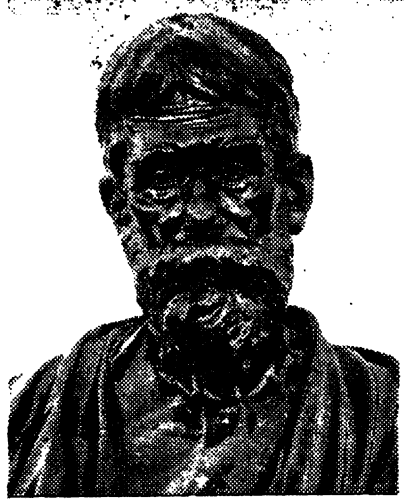
আচার্য্য রায়ের ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি

হইয়া কাজ করিবার আহ্বান জানান। ডাঃ মুখার্জী বলেন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন পরম মানবহিতৈষী, নির্য্যাতিত মানব-সমাজের হিতার্থে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া গিয়াছেন। আচার্য্য রায়ের স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিনি দেশের শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী বা ডিপ্লোমার মোহ ত্যাগ করিয়া যেটুকু জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন তাহার দ্বারা ব্যবসায় ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিবার আহ্বান জানান। বোর্ড অফ ডাইরেক্টর-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে শ্রীটি সি রায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত অভ্যাগতদের স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।

শোক-সংবাদ

মন্তেসারি শিক্ষাব্যবস্থার উদ্ভাবক ডাঃ মারিয়া মন্তেসারি গত ১ই মে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের ফলে অকস্মাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮১ বৎসর হইয়াছিল। ডাঃ মন্তেসারি জাতিতে ছিলেন ইতালীয়। শিক্ষা-পদ্ধতি সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক জন অগ্রদূত। এই মহীয়সী মহিলার পরলোকগমনে আমরা ব্যথিত হইয়াছি ও তাঁহার পুণ্য স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মিত্র গত ৫ই মে তারিখে পাটনায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি 'ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া'র পাটনা শাখার সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গবিপ্লব যুগে ফণীন্দ্রনাথ দেশের মুক্তি-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়া বহু দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়াছিলেন। ফণীন্দ্রনাথ সাংবাদিক মহলে সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। আমরা তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেশিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্কেচ্
(অপ্রকাশিত)
—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত
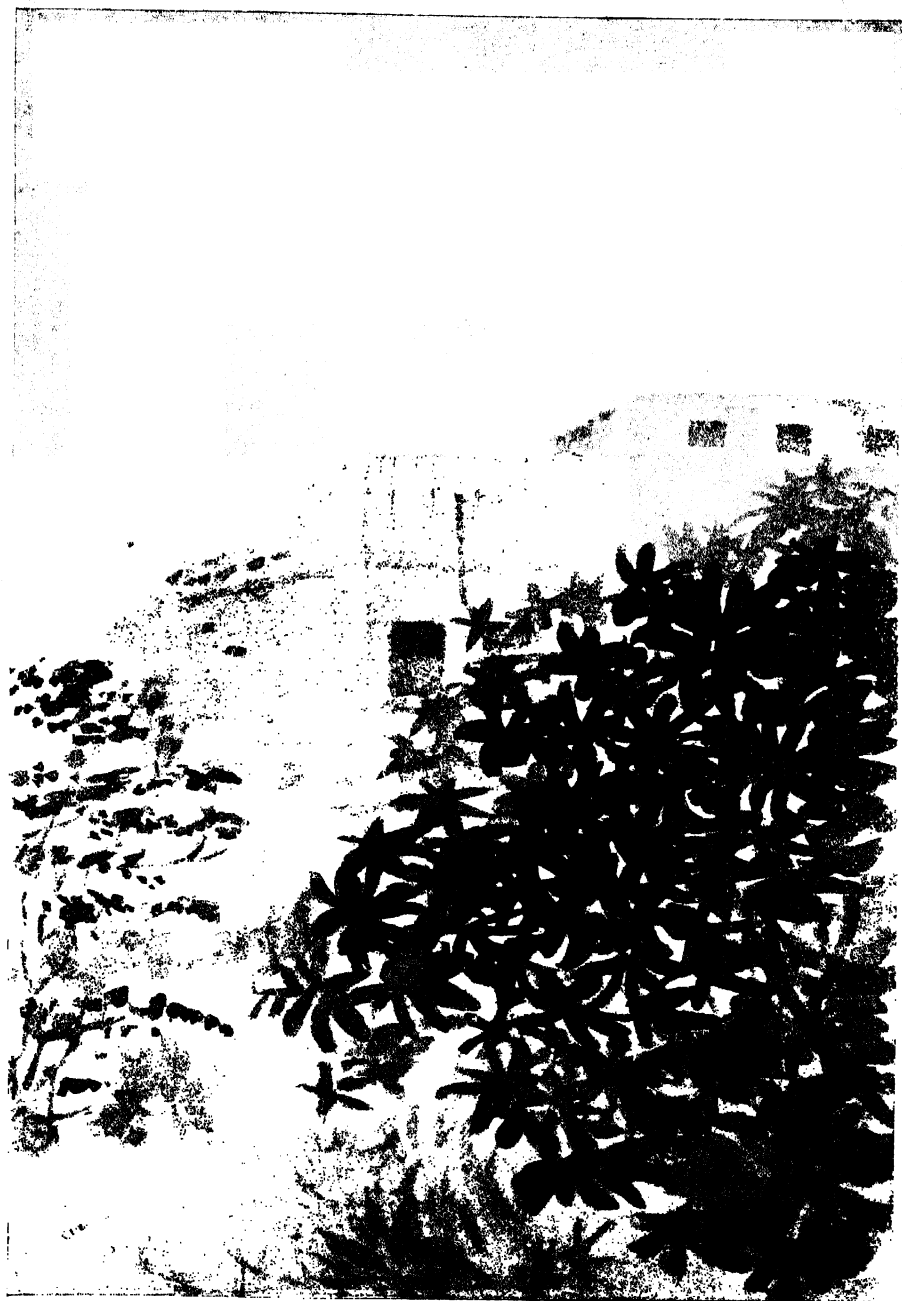
স্কেচ
(অপ্রকাশিত)
—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

[অমল মিত্রের সৌজন্যে

৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

প্রথম খণ্ড] [দ্বিতীয় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ

১৩৫৯

৩১শ বর্ষ

কথামৃত

"ব্যাকুল হৃদয়ে যে তাঁহার নিকট যায় তাহার কিছুই আবশ্যক নাই, কিন্তু সচরাচর সেরূপ ব্যাকুলতা দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই গুরুর প্রয়োজন হয়। গুরু এক হইলেও উপগুরু অনেক হইতে পারে। যাহার নিকট কিছু শিক্ষা পাই তিনিই উপগুরু। অবধৌত এরূপ ২৮টি উপগুরু করিয়াছিলেন।"

—

"তর্ক করিও না। তুমি তোমার মতের উপর যেমন নির্ভর কর অপরকে তাহার মতের উপর সেইরূপ নির্ভর করিতে দাও। বৃথা তর্কে কিছু ফল হইবে না। ঈশ্বরের কৃপা হইলে সকলেই আপন ভুল বুঝিতে পারিবে।"

—

"কাঁচা ময়দা গরম ঘৃতে ফেলিয়া দিলে ছক্ ছক্ করিয়া শব্দ হয় এবং যে পরিমাণে ময়দা ভাজা হইতে থাকে সেই পরিমাণে শব্দেরও হ্রাস হইয়া আইসে। অল্প জ্ঞান পাইলে মনুষ্য বক্তৃতাদিতে বাহ্য আড়ম্বর করিতে থাকে কিন্তু জ্ঞানের গভীরতা জন্মিলে আর আড়ম্বর সম্ভবে না।"

—

"বাষ্পীয় শকট গুরুভারবিশিষ্ট দ্রব্য সকল বহন করিতে অনায়াসে দ্রুতবেগে চলিয়া যায়; বিশ্বাসী ভক্ত সন্তানও মহা ভারাক্রান্ত সংসারের গভীর পরীক্ষার মধ্যে স্থির ও শান্ত থাকিয়া অনায়াসে সমুদায় দুঃখ যন্ত্রণা অপমান বহন করেন।"

—

"ময়লা আয়নাতে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হয় না, কিন্তু স্বচ্ছতে হয়। মায়ামুগ্ধ ময়লা অপবিত্র হৃদয় ঈশ্বরের আভা দেখিতে পায় না, কিন্তু বিশুদ্ধ আত্মা পায়, অতএব বিশুদ্ধ হইবার চেষ্টা কর।"

—

"বিবেক ও বৈরাগ্য ব্যতীত শাস্ত্রপাঠ বৃথা। বিবেক ও বৈরাগ্য ব্যতীত ধর্ম্মলাভ অসম্ভব।"

—

"মানুষ,—মান হুঁষ, অর্থাৎ যাহার হুঁষ আছে তাহাকেই মানুষ বলা যাইতে পারে।"

শ্রীশ্রী৺সিংহবাহিনী দেবীর মূর্ত্তি

যদুলাল-শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গপীঠ

যদুলাল মল্লিকের দক্ষিণেশ্বর বাগান ও বাড়ী

শ্রীরাসবিহারী মল্লিক (৺যদুলাল মল্লিকের পৌত্র)

খ্যাতনামা মল্লিক-বংশের কুলদেবী শ্রীশ্রী৺সিংহবাহিনী দেবীকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব অতি জাগ্রতা ও আরাধ্যা দেবী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ সখা শ্রীযুক্ত যদুলাল মল্লিকের ৬৭ নং পাথুরিয়াঘাটস্থ বাসভবনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ১৮৮৩ সালে ২১শে জুলাই আগমন করিয়া তথায় শ্রীশ্রী৺সিংহবাহিনী দেবীর অপূর্ব্ব মহিমা দর্শন করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া ঘোর সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। সমাধি ভঙ্গ হইলে "আমি প্রসাদ খাব" বলিয়া নিজে চাহিয়া ক্ষীর, ফলমূল মিষ্টান্নাদি প্রসাদ ভক্ষণ করেন (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ৩য় ভাগ ৪র্থ খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ)। সমাধিমন্দির পাঠে বুঝা যাইবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রী৺সিংহবাহিনী মাতাকে বিরূপ আরাধ্যা ও জাগ্রতা দেবী বলিয়া মানিতেন ও ভক্তি করিতেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীযদুলাল মল্লিকের অন্তরঙ্গ পারিষদ ও উপদেষ্টা ছিলেন এবং ইঁহার পাথুরিয়াঘাটস্থ বাসভবনে ও দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের সংলগ্ন বাগানবাটীতে সদাসর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। ঠাকুর যদুলালকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও ইঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং ইঁহার পরিবারবর্গের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করিতেন। সে কারণেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পুস্তকে যদুলালের বিষয় বহু ক্ষেত্রেই উল্লেখ আছে। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযদুলাল মল্লিকের সহিত ধর্ম্মালোচনা এবং শ্রীমদ্ভাগবত চর্চ্চা ও উপলব্ধি করিতেন। সেইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব সন্তুষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং বলিয়াছেন, "যদু খুব হিঁদু, ভাগবত থেকে অনেক কথা বলে" (কথামৃত ৪র্থ ভাগ ১৮১ পৃঃ)। "তোমার ঈশ্বরেও মন আছে আবার সংসারেও মন আছে।" (কথামৃত ৩য় ভাগ ৪৪ পৃঃ)।

শ্রীযদুলাল মল্লিক জয়পুর এবং গোয়ালিয়ারের মহারাজদ্বয়ের গুরু ও শ্রীবৃন্দাবনধামের ব্রহ্মচারী সিদ্ধযোগী শ্রীগিরিধারী সরণ বাবার শিষ্য ছিলেন। জিরাট-বলাগড়ের অদ্বিতীয় শ্রুতিধর ভাগবতাচার্য্য পণ্ডিত জগদানন্দ গোস্বামীর নিকট শ্রীযদুলাল মল্লিক ভাগবত ও ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। যদুলাল শ্রীধর স্বামীর টীকা সহ সমস্ত ছন্দানুযায়ী সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত আবৃত্তি করিতেন। হিন্দুধর্ম্মসভার সভাপতি রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ধর্ম্মসভায় যদুলালের ধর্ম্মালোচনায় ও স্বাধীন-চিন্তায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "শিশু প্রামাণিক" আখ্যা দিয়াছিলেন। পণ্ডিত ভারতচন্দ্র শিরোমণি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যদুলালের নিকট আসিয়া বাক্যালাপ করিতেন। যদুলাল ধর্ম্ম, বিদ্যা ও কর্ম্মচর্চ্চা করা ছাড়া বৃথা বাক্যালাপে সময় নষ্ট করিতেন না।

শ্রীযুক্ত যদুলাল মল্লিকের দক্ষিণেশ্বর বাগানবাটী ৺কালীমাতার ঠাকুরবাড়ীর ঠিক দক্ষিণ দিকে গঙ্গার তীরে অবস্থিত। প্রায় ৫০ বিঘা জমির উপর সুন্দর বাগান এবং কমবেশী ১৬ কাঠা জমি জুড়িয়া তিনতলা প্রাসাদোপম সদর বাড়ী, ইহা ছাড়া অন্দরমহল ইত্যাদি বাড়ী ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঐ বাগানবাটী গঙ্গার সেতুর জন্য অধিকৃত হইয়াছে। সদর বাড়ী ভূমিসাৎ করিয়া সেতু তৈয়ার করা হইয়াছে। এই বাগানবাটী আধ্যাত্মিক ও সামাজিক হিসাবে তীর্থস্থান ও পীঠস্থান বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কারণ এই বাগানবাটীতেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীযদুলাল মল্লিকের বৈঠকখানায় বালক যীশু ক্রোড়ে মেরীমাতার (মেডোনা) ছবি দর্শন করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন এবং স্বপ্নাবেশে যীশুখৃষ্টের দর্শন হয় এবং যীশু শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যে বিলীন হইয়া যান। শুনা যায়, এই বাগানেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামী বিবেকানন্দকে শিষ্য অবস্থায় প্রথম শ্রীভগবানের জ্যোতি দর্শন করান।

৺যদুলাল মল্লিকের দক্ষিণেশ্বরের বাগান-বাড়ী

এই বাগানের দক্ষিণে গঙ্গার তীরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীর বাগানস্থিত বৃক্ষের ন্যায় বৃহৎ পঞ্চবটী
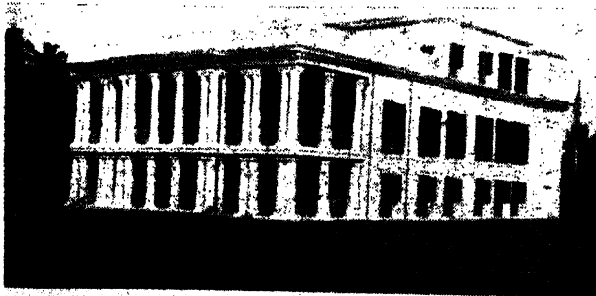
বৃক্ষ ছিল এবং গঙ্গার তীরে পাকা ঘাট ও ঘাটের সিঁড়ির দুই পার্শ্বে পাথর-বাঁধান প্রশস্ত চাতাল ছিল, উহা এখনও বিদ্যমান আছে। উক্ত পঞ্চবটী-তলে এবং যদু মল্লিকের ঘাটের চাতালে বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব যদুলাল মল্লিকের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত ও ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন। অন্যান্য মহাপুরুষ ও ভক্তেরও সমাগম হইত।

যদু মল্লিক মহাশয় এই বাগানবাটীতে আসিলেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে খবর দিয়া লইয়া যাইতেন। ঠাকুরও কখনও তাঁহার আমন্ত্রণ লঙ্ঘন করিতেন না। যদু বাবু প্রায়ই বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ঐ বাগানে সপরিবারে বাস করিতেন। সেই সময়ে একদিন সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আসিবার জন্য খবর দিয়া পাঠান। ঠাকুর যাইবেন বলিয়াছিলেন কিন্তু ভক্ত-সমাবেশে সে কথা ভুলিয়া যান। একটু রাত্রে এই আমন্ত্রণের কথা তাঁহার মনে হয়। তৎক্ষণাৎ তথায় গিয়া ফটকের গরাদ দিয়া ঠাকুর নিজ পা ঢুকাইয়া তিন বার পদার্পণ করিয়া 'আমি আসিয়াছি' এই কথা তিন বার বলিয়া নিজ সত্য রক্ষা করেন। এই বাগানের বৈঠকখানায় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলাপ হয়, তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যতীন্দ্রমোহনকে জিজ্ঞাসা করেন, 'সংসারীর ঈশ্বর-চিন্তা করা উচিত কিনা?' ইহাতে মহারাজ বলেন, 'সে চিন্তায় ফল কি? রাজা যুধিষ্ঠিরকেও একটি মাত্র মিথ্যা কথার জন্য নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল।' ইহাতে ঠাকুর বলেন, 'তুমি যুধিষ্ঠিরের সমস্ত গুণের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল নরক দর্শনের কথা মনে রাখিয়াছ। ইহা অতি হীনবুদ্ধির কথা।'

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে শ্রীযুক্ত যদুলাল মল্লিক এই বাগানবাটীতে অতি মনোরম ও মহা সমারোহযুক্ত সামাজিক উৎসব ও ভোজের ব্যবস্থা করেন। এই উপলক্ষে পাথুরিয়াঘাটা মেও হাসপাতালের নিকট গঙ্গাঘাট হইতে সুসজ্জিত এবং গীতবাদ্য সহ বজরা এবং ময়ূরপঙ্খী নৌকাযোগে যদুলাল মল্লিক মহাশয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের সহিত দক্ষিণেশ্বর বাগানে যাত্রা করেন। ঐ বাগান এবং বাটী পতাকা-শোভিত ও আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল। নাচ, গান, নানা প্রকারের ব্যায়াম ক্রীড়া, সার্কাস এবং আতসবাজীর বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া সকলকে ভূরিভোজ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সুব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। লাট সাহেবের প্রধান সম্পাদক, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ১৮৮০ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নামক তৎকালীন ইংরাজি সংবাদপত্রে এই উদ্যান-উৎসবের বিষয় বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছিল।

যদু মল্লিকের মাতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বাৎসল্য ভাবে ভজনা করিতেন। সেই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ উক্ত মহিলা-মহলেও আতিথ্য গ্রহণ জন্য পদার্পণ করিতেন এবং উক্ত মাতাঠাকুরাণীকে শ্রদ্ধা করিতেন। যদু মল্লিকের মাতার বাৎসল্য-ভাবাবেশ ভজনার ও যদু মল্লিকের বাগান প্রসঙ্গ কথা যাহা শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা পুস্তকে লিখিত আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"যদু মল্লিকের মা একদিন ঠাকুরকে বাড়ীর ভেতর খাওয়াচ্ছেন, খুব দেরী হচ্ছে দেখে দেবেন বাবু (ইটালীর দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার) চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এমন সময় হামাদের সব বাড়ীর ভিতরে খাওয়াবার জন্য নিয়ে গেল। খেয়ে উঠে দেবেন বাবু উনার (ঠাকুরের) পায়ে ধরে কান্না জুড়ে দিলেন। হামনে তো কুছু বুঝলুম না। পেছে একদিন দেবেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করলুম। দেবেন বাবু বললেন, দেখো, আমার মনে বড় কু গেয়েছিল। আমি ঠাকুরকে সন্দেহ করেছিলাম কিন্তু যাবার পথে দেখলুম যে, যদুর মা ঠাকুরকে খাওয়াচ্ছেন আর কাঁদছেন। তাতে বুঝলুম তার বাৎসল্য-ভাব। আর আমি (দেবেন বাবু) ভেবেছিলাম অন্য কথা। ঠাকুর অন্তর্যামী কিনা? তাই আমার (দেবেন বাবুর) সন্দেহ ঘুচিয়ে দিলেন (১৮৮৪)। একদিন ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় ঠাকুর ওনার সাথে দেখা করিতে এসেছিলেন। ঠাকুর তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য যদু মল্লিকের বাগানে গিয়েছিলেন। যদু মল্লিকের বাগানে ঠাকুর মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেন। দক্ষিণেশ্বরে বেশী লোকজন থাকলে তিনি মাঝে মাঝে রাখাল ভাইকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আর ভবনাথ ভাইকে সঙ্গে করে ওখানে নিয়ে যেতেন। শুনেছি, নোরেন ভাইকে (স্বামী বিবেকানন্দ) উনি ওখানেই সব (সর্ব্বময়কে) দেখিয়েছিলেন। যদু বাবু বাগানে এলে ওনাকে ডেকে পাঠাতেন আর বসে বসে তাঁর গান শুনতেন। ঠাকুরকে গান শুনাবার জন্য তিনি একজন লোক আনতেন। তার ভারী মিঠে গলা ছিল। ঠাকুর তার গানের সুখ্যাতি করতেন। একদিন ঠাকুরকে তিনি (গিরীশ বাবুর) চৈতন্যলীলার গান শুনাইলেন। তাতেই ত ওনার থিয়েটার দেখবার ইচ্ছা হলো।" (১৮৮৪ এর ঘটনা)।

ইহা অতীব আনন্দের ও গৌরবের বিষয় যে, অধুনা এই স্মরণীয় উদ্যানবাটীর অবশিষ্ট যে মহিলা-মহল ও রন্ধনশালা ছিল তাহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার রেল কোম্পানীর নিকট হইতে লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মহামণ্ডলকে বিক্রয় করাইয়াছেন। এখন এই পুণ্যস্থানে মহামণ্ডলের কর্ত্তৃত্বাধীনে আন্তর্জ্জাতিক অতিথিশালা ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির স্থাপিত হইয়াছে।

মহামান্য ডক্টর শ্রীযুক্ত সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের (India's Ambassador to the U. S. S. R.) সভাপতিত্বে এবং প্রধান অতিথি মহামান্য ডক্টর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জি (পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণর) উপস্থিতিতে ১লা জানুয়ারী ১৯৫২ শ্রীরামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের আন্তর্জ্জাতিক অতিথিশালা দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চাশ কল্পতরু উৎসবে অত্রবর্ণিত ইতিবৃত্তের সংক্ষিপ্ত অনুলিপি চিত্রাকারে মৎকর্ত্তৃক উপঢৌকনস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।
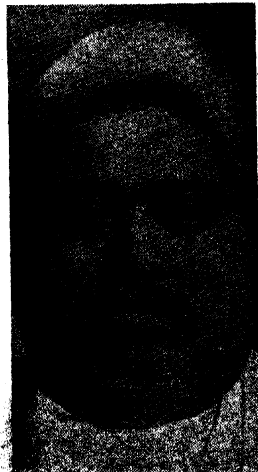
৺যদুলাল মল্লিক

র‍্যামশে ম্যাকডোনাল্ড
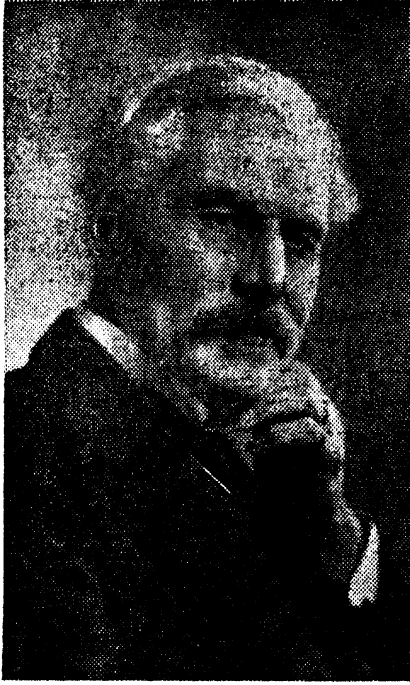
নির্ব্বাসিতের পত্নী ও কন্যাগণ সকল প্রকার অসুবিধা ও বিড়ম্বনা মাথায় লইয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিয়া নির্ব্বাসিতের পরিচর্য্যা করিতে চাহিতেছেন, তথাপি গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে সে সুবিধা দিবেন না, এই কথা কলিকাতার জনসাধারণ সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া বিক্ষুব্ধ হইল।

নির্ব্বাসিতের মুক্তি

এই সময়ে গোলদীঘিতে এক সন্ধ্যায় রামপুরহাটের স্বর্গীয় পণ্ডিত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীত করেন—

নীতিবন্ধন ক'রোনা লঙ্ঘন
রাজশক্তি-সার প্রজার রঞ্জন,
হইয়ে রক্ষক, হয়ো না ভক্ষক,
অবিচারে রাজ্য থাকে না কখন।
ক'রেছ কলুষে এ রাজ্য অর্জ্জন,
কলুষ কল্মষে ক'রো না শাসন,
অবাধে হবে না দুর্ব্বল দলন,
দুর্ব্বলের বল নিত্য নিরঞ্জন॥

ধ্বংস কংশাসুর যদুবংশ দল,
চন্দ্র, সূর্য্যবংশ গেছে রসাতল,
গৌরব বিহীন পাঠান মোগল,
হয় পাপ পথে সবারি পতন,
কাল-জলধিতে জলবিম্ব প্রায়,
উঠে কত শক্তি কত মিশে যায়,
তোমরা কি ছিলে উঠেছ কোথায়,
আবার পতনে লাগে কতক্ষণ!

আগ্রা জেলে পিতার সহিত সাক্ষাতের পরে আমি লক্ষ্ণৌ যাইয়া স্বর্গীয় বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও কবি এ, পি, সেনের সহিত সাক্ষাৎ করি। তাঁহাকে আমার পিতা অত্যন্ত ভালবাসিতেন। দেশের নীরবতা ও এ দেশের কেহই নির্ব্বাসিতদের মুক্তির জন্য তখন কিছু করিতেছেন না এই কথা তাঁহাকে বলি, তাহাতে তিনি মিঃ গোখলেকে এই সম্বন্ধে পত্র দিবেন বলিলেন।

মিঃ গোখলে কলিকাতা আসিয়া আমাকে বলেন, "তুমি বিলাতে যাইয়া মামলা করিও না। আমি চেষ্টা করিতেছি। দেখি কি করিতে পারি।" আরও এক মাস চলিয়া গেল। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে বলিলেন এবং ইহাও বলিলেন, 'আমি কিছু না করিতে পারিলে তোমার ইচ্ছামত কার্য্য করিও।' ইংলণ্ডে মিঃ রামসে ম্যাকডোনাল্ড, সার হেনরী কটন প্রভৃতিকে সব কথা জানাইলাম। অরবিন্দও আমাকে সেইরূপ উপদেশ দিলেন।

১৯১০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী আমার পিতাকে মুক্তি দেওয়া হয়। গভর্ণমেণ্ট আমার পিতার ব্যবহারের জন্য যে সকল জিনিষ-পত্রাদি দিয়াছিলেন তাহা ফেলিয়া রাখিয়া কেবল কয়েকখানি পুস্তক লইয়া তৎক্ষণাৎ আমার পিতা কলিকাতা রওনা হন। এলাহাবাদ ষ্টেশনে মেজর ডি, বসু ও সার তেজ-বাহাদুর সাপ্রু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সার তেজ-বাহাদুর বলেন, 'আপনার দুই কন্যা ও স্ত্রী স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিবার জন্য যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া জনসাধারণের মনোভাব অত্যন্ত কঠোর হইয়াছিল ও তাহারা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল।' আরা ষ্টেশনে ব্যারিষ্টার সি, আর, দাশ আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে, 'আপনি আমাকে যে ভার দিয়াছিলেন, সে কার্য্য আমি সম্পাদন করিয়াছি।' এইখানেই আমার পিতা জানিতে পারেন যে অরবিন্দ মুক্তি পাইয়াছেন। যাহার জন্য তিনি এত পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাঁহার সে শ্রম সফল হইয়াছে জানিতে পারিলেন।

পরদিন কলিকাতা পৌছিলে যুবকগণ সমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা করে। ৬ কলেজ স্কোয়ারের সম্মুখে এক বিরাট জনতা সমবেত হয়। অরবিন্দ ঐ বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া আমার পিতার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। প্রায় দুই বৎসর পরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার সময়ে আনন্দে কাঁদিয়া ফেলেন

শ্রীঅরবিন্দ অ্যাক্রয়েড ঘোষ

শ্রীসুকুমার মিত্র

সুরেন্দ্রনাথ দ্বিপ্রহরে আসিলেন। আমার পিতা বিপদ-মুক্ত অরবিন্দকে দেখিয়া আনন্দিত হন। কিন্তু উভয়ে একসঙ্গে বেশী দিন থাকা ঘটিল না। দশ-বার দিন পরে অরবিন্দ গৃহ ছাড়িয়া গেলেন, আর ফিরিলেন না।

অরবিন্দের আত্মগোপন

১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষার্দ্ধে এক দিন পূর্ব্বাহ্নে যখন অরবিন্দের সহিত 'কর্ম্মযোগিন'এর প্রুফ দেখিতেছিলাম তখন অরবিন্দের অন্যতম কর্ম্মী স্বর্গীয় রামচন্দ্র মজুমদার আসিয়া অরবিন্দকে বলিলেন যে 'কর্ম্মযোগিনে' লিখিত কোনও প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহের মামলা হইবে বলিয়া তিনি সঠিক খবর পাইয়াছেন। ইহা শুনিয়া আমি চিন্তিত ও চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। অরবিন্দের দিকে লক্ষ্য পড়ায় দেখিলাম এ খবরে তিনি নির্ব্বিকার ও সম্পূর্ণ উদাসীন। অন্যান্য দিনের ন্যায়ই আহারের পরে নিশ্চিন্ত চিত্তে শ্যামপুকুরে 'কর্ম্মযোগিন' কার্য্যালয়ে গমন করেন। রাত্রে আর ফিরেন নাই। ইহাতে আমার মাতা ও বাটীর অন্যান্য সকলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। আমরা চিন্তিত থাকিব বুঝিয়া পরদিন রাম বাবু আসিয়া আমায় চুপি চুপি বলিলেন যে, অরবিন্দকে তাঁহারা চন্দননগরে পাঠাইয়াছেন। কি ভাবে উক্ত কার্য্যালয়ের সম্মুখে উপস্থিত পুলিশ গুপ্তচরের চক্ষে ধূলি দিয়া আহিরীটোলা ঘাটে তাঁহাকে নৌকায় উঠাইয়া দিয়াছেন তাহাও বলেন। সেদিন ২১এ ফেব্রুয়ারী। আমার নিকট তাঁহার কথিত বিবরণের সহিত 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণের মিল নাই।*

পরে জানিতে পারিয়াছি যে, সেই সন্ধ্যা রাত্রে যাত্রা করিয়া অরবিন্দ, স্বর্গীয় বীরেন্দ্র ঘোষ ও স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সারা রাত্রি চন্দ্রকিরণ-উদ্ভাসিত নদী দিয়া নৌকা বাহিয়া প্রত্যুষের পূর্ব্বে চন্দননগর পৌছেন। স্বর্গীয় বীরেন্দ্র বাবুকে অরবিন্দ তথাকার শ্রীচারুচন্দ্র রায়ের নিকট সাহায্য করিবার অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। শ্রীচারুচন্দ্র রায় মাণিকতলা বোমার মামলায় অন্যতম আসামী ছিলেন কিন্তু তিনি খালাস পান। সম্ভবতঃ অরবিন্দ মনে করিয়াছিলেন যে অগ্নিযুগের সহকর্ম্মী বলিয়া তাঁহাকে তিনি সাহায্য করিবেন। কিন্তু হয়ত তাঁহার যে মনের বা মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা অরবিন্দ জানিতেন না। প্রেরিত লোককে চারু বাবু বলিলেন যে, তিনি অরবিন্দকে সাহায্য করিতে অসমর্থ এবং চন্দননগরে আশ্রয়লাভের চেষ্টা না করিয়া অরবিন্দের ফ্রান্সে যাওয়া উচিত। অরবিন্দ নৌকায় বসিয়া রহিলেন। লোক-মুখে শ্রদ্ধেয় মতিলাল রায় শুনিতে পাইলেন যে অরবিন্দ নৌকায় আছেন। ইহা শুনিয়া দ্রুতপদে নদীতীরে আসিয়া আগ্রহের সহিত অরবিন্দকে লইয়া তিনি সকলের অগোচরে তাঁহাকে স্থান দিলেন তাঁহার কাঠের গুদামে। অরবিন্দ যে চন্দননগর আসিয়াছেন তাহা তিনি কাহাকেও জানাইলেন না। এমন কি তাঁহার পত্নীকেও তাহা জানিতে দেন নাই। মতি বাবু নিজে বাহির হইতে অরবিন্দের জন্য দুই বেলা আহার্য্য আনিয়া তাঁহাকে দিতেন।

বহির্গমন সম্পর্কে বাদ-প্রতিবাদ

অরবিন্দের 'কর্ম্মযোগিন' অফিস ৪ নং শ্যামপুকুর লেন হইতে বহির্গমন ও তথা হইতে হাঁটিয়া গঙ্গার ঘাটে যাওয়া সম্বন্ধে চারি জন বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। ১৩৫১ সালের ফাল্গুন মাসের 'উদ্বোধন' পত্রিকায় শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী অরবিন্দের জীবনী সম্পর্কে এক প্রবন্ধে লেখেন যে 'কর্ম্মযোগিন' অফিসের দেওয়াল টপকাইয়া তিনি এবং অপর কয়েক জন পাশের বাড়ী দিয়া বাহিরে চলিয়া যান। ইহাতে পণ্ডিচেরী আশ্রমের স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী* ১৩৫২ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রতিবাদ করিয়া প্রকাশ করেন যে, অরবিন্দ ঐ বাড়ীর সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া
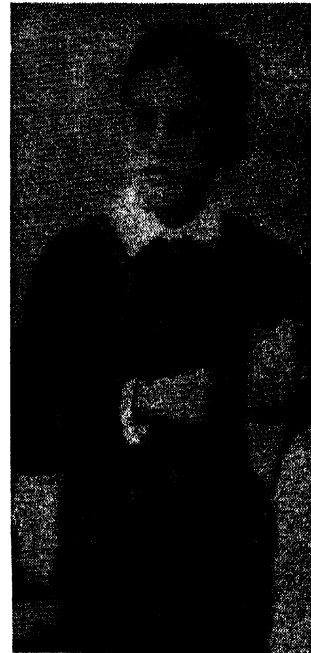
বাল্যকালে শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

---

* ১৩৫২ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে ৺সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রাবণ মাসে ৺রামচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক 'প্রবাসী' পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধ।

* সুরেশ বাবু রংপুরের স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র এবং দেওঘরের দিগড়িয়া পাহাড়ে বোমার পরীক্ষা কালে নিহত প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতা'।

পণ্ডিচেরী যাত্রার পূর্ব্বে শ্রীঅরবিন্দ

গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে স্বর্গীয় বীরেন্দ্র ঘোষ, স্বর্গীয় রামচন্দ্র মজুমদার ও সুরেশ বাবু নিজে ছিলেন। উক্ত বাড়ীর প্রতি গোয়েন্দা পুলিশ নজর রাখিত। কিন্তু তাঁহারা যখন চন্দননগর যাইবার জন্য ঐ বাড়ী হইতে বাহির হইলেন তখন গোয়েন্দা পুলিশ উপস্থিত ছিল না। তাহার কারণ অনুমান করিয়া সুরেশ বাবু লিখিয়াছেন যে, অরবিন্দ প্রত্যহ বৈকালে 'কর্ম্মযোগিন' অফিসে আসিতেন এবং রাত্রি নয়টায় ৬ কলেজ স্কোয়ারে ফিরিয়া যাইতেন। ঘটনার দিনও নির্দ্দিষ্ট কালে উক্ত স্থানে তিনি আসেন। নিয়মিত ভাবে রাত্রি নয়টার পূর্ব্বে তিনি বাড়ীর বাহির হইবেন না স্থির করিয়া গোয়েন্দা পুলিশ সম্ভবতঃ অন্যত্র আরাম করিতে গিয়াছিল। স্বর্গীয় রামচন্দ্র মজুমদার অপরিসর গলি দিয়া তাঁহাদিগকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া যান। নৌকায় অরবিন্দের সহযাত্রিরূপে স্বর্গীয় বীরেন্দ্র ঘোষ ও স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী চন্দননগর যাত্রা করেন।

'উদ্বোধন' পত্রিকায় গিরিজা বাবু লিখিয়াছেন যে, "কর্ম্মযোগিন' অফিস হইতে বাহির হইয়া বাগবাজার মঠে যাইয়া অরবিন্দ পরমহংসদেবের পত্নী শ্রীমাকে প্রণাম করেন এবং গণেন মহারাজ ও ভগিনী নিবেদিতা অরবিন্দকে বাগবাজার ঘাটে পৌছাইয়া দেন। সুরেশ বাবু তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। স্বর্গীয় রামচন্দ্র মজুমদার ১৩৫২ সালের শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, কেবলমাত্র গঙ্গার ঘাটে পৌছিবার পূর্ব্বে বোসপাড়া লেনে অরবিন্দ বাবু ভগিনী নিবেদিতার বাসায় গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন।" পণ্ডিচেরী আশ্রমের শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ১৩৫২ সালের 'প্রবাসী' পত্রিকায় ফাল্গুন সংখ্যায় অরবিন্দের নিজের সমর্থনে লিখিয়াছেন যে, অরবিন্দ বাগবাজার মঠেও যান নাই এবং ভগিনী নিবেদিতার সহিতও সাক্ষাৎ করেন নাই। আমাকে যখন রাম বাবু অরবিন্দের চন্দননগর গমনের বিবরণ দিয়াছিলেন তখনও তিনি এই দুই যায়গায় যাওয়ার কথা বলেন নাই বরং আহিরীটোলা ঘাটে সরাসরি যাইয়া নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলেন এই কথাই বলেন।

১৩৫২ সালের বৈশাখের 'প্রবাসী'তে সুরেশ বাবু লিখিয়াছেন যে "কর্ম্মযোগিন' অফিসে রাম বাবু যাইয়া অরবিন্দকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার নামে আবার ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে।" অরবিন্দ কয়েক মুহূর্ত্ত যেন কি ভাবলেন —কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র তারপর বললেন—'আমি চন্দননগর যাব'। * * * অরবিন্দ উঠে দাঁড়ালেন * * *।" উক্ত বৎসরের শ্রাবণ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে রাম বাবু লিখিয়াছেন যে "এক গোয়েন্দা পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট তিনি সংবাদ পান যে সামসুল আলমের হত্যার মামলা সম্পর্কে অরবিন্দের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইবে। পূর্ব্বে আরও দুই স্থান হইতেও তিনি এ সংবাদ পাইয়াছিলেন।" রাম বাবু লিখিয়াছেন—"সংবাদ পাইয়াই আমি কৃষ্ণকুমার বাবুর বাড়ী ছুটিলাম এবং শ্রীঅরবিন্দকে সংবাদ দিলাম।" যখন তিনি এই সংবাদ দেন তখন পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। তাহার পর অরবিন্দ 'কর্ম্মযোগিন' অফিসে আসিলেন। রাম বাবু লিখিয়াছেন, "প্রথমে জামিনদার ঠিক করিয়া রাখিবার পরামর্শ হইল। পরে বলিলেন নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। আমি ভগিনী নিবেদিতার বাড়ী গেলাম। * * * ভগিনী নিবেদিতাকে সকল ঘটনা বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, 'Tell your chief to hide and the hidden chief through intermediary shall do many things.' * * * এই সংবাদ লইয়া আমি অপিসে ফিরিলাম। অরবিন্দ বাবু বলিলেন "All right arrange."

নলিনী বাবু ১৩৫২ ফাল্গুনের 'প্রবাসী'তে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "সোজা ঘাটে যাওয়া, সুরেশচন্দ্রের বিবৃতিতে এ কথা স্পষ্ট। আসলে নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দের এই চন্দননগরে যাত্রার বিষয়ে কিছুই জানতেন না। এক-আধ দিন পরে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে খবর পাঠান 'কর্ম্মযোগিন'-সম্পাদনার ভার গ্রহণ করতে, তখনই তিনি ব্যাপারটি জানতে পেরেছিলেন। কারণ সমস্ত ঘটনাটি ঘটে একান্ত আকস্মিক ভাবে। ঠিক কি হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বলেছেন, তিনি শুনলেন যে আপিস খানাতল্লাসী হবে, তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হতে পারে; তখনই তিনি হঠাৎ "আদেশ" পেলেন চন্দননগর চলে যেতে এবং সেই মুহূর্ত্তেই। তিনি কাজও করলেন সেই অনুসারে সঙ্গী সাথী কাউকে কিছু বললেন না, একান্ত গোপনে সকলের অজ্ঞাতে (তখন উপস্থিত আমরা যে কয়েক জন ছিলাম অবশ্য তাদের ছাড়া) মিনিট পনেরর মধ্যে ব্যাপারটি ঠিকঠাক হয়ে গেল।"

অরবিন্দ কিরূপে 'কর্ম্মযোগিন' অফিস হইতে বাহির

হইলেন সে সম্বন্ধে স্বর্গীয় রামচন্দ্র মজুমদার কিম্বা শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত নীরব। স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এ সম্বন্ধে প্রকাশিত অন্য বিবরণ অমূলক বলিয়াছেন ও উপহাস করিয়াছেন। স্বর্গীয় রামচন্দ্র মজুমদার সুরেশ বাবুর বিবরণের অনেক ভুল ধরিয়াছেন। আবার এই দুই জনের বিবরণের অনেক বিষয় শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ভুল ও কল্পনা-প্রসূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাও অরবিন্দ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইবার পরে তিনি লিখিয়াছেন।

চন্দননগরে অরবিন্দ

তাঁহার অন্তর্দ্ধানের কয়েক দিন পরে আমি অরবিন্দের নিকট হইতে পেন্সিলে লিখিত একটি পত্র পাই। তাহাতে তিনি কিছু কাগজ-পত্র, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি চাহিয়া পাঠান এবং সেই সঙ্গে কিছু টাকাও পাঠাইতে বলেন। তাঁহার টাকা আমার নিকট গচ্ছিত থাকিত। এই ভাবে সপ্তাহে দুই-তিনবার আমার কাছে নানা কার্য্যের জন্য তাঁহার প্রেরিত যুবক তাঁহার পত্রাদি লইয়া আসিত। বাড়ীর কেহ জানিত না যে তিনি কোথায় আছেন,—তাহা আমি জানি। কলিকাতায় বহু সংবাদপত্রে তাঁহার অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা প্রকাশিত হইতেছিল। এই সময় স্বর্গীয় শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী-সম্পাদিত 'সার্ভেন্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে 'অরবিন্দ যোগ সাধনের জন্য আত্মগোপন করিয়াছেন।' তথাপি জনসাধারণের কৌতুহল নিবৃত্ত হইল না এবং সংবাদ-পত্র সমূহ প্রায় প্রত্যহ তাঁহার সংবাদের জন্য খোঁচাইয়া কৌতুহল জাগরিত রাখিত। অবশ্য গুপ্ত পুলিশ কোনও দিন নিশ্চেষ্ট ছিল না। পুলিশ আমার উপর প্রকাশ্যে নজর রাখায় আমি বাড়ীর বাহিরে যাওয়া বন্ধ করিয়াছিলাম। কোন সংবাদপত্রের সহিত সম্পর্কিত ব্যক্তি প্রায়ই অরবিন্দ কোথায় আছেন তাহা জানিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া হঠাৎ আসিতেন। একদিন এক গুপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারী (প্রিয়লাল বসু) আসিয়া আমাকে বলেন, "অরবিন্দ বাবু কোথায় আছেন তাহা জানিবার জন্য আমি আসিয়াছি।" ঐ লোকটির গোপন বৃত্তি আমি জানিতাম। তিনি বলিলেন যে, তিনি যখন এই উদ্দেশ্যে আমাদের বাড়ী আসা স্থির করেন তখন তাঁহার সহ-কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে এখানে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে "ঐখানে গেলে মারিয়া তোমার হাড় গুঁড়া করিয়া দিবে।" তথাপি তিনি সত্য খবর জানিবার জন্য আসিয়াছেন এরূপ বলিলেন।

মাণিকতলা বোমার মামলা হইবার পর হইতে আমাদের বাড়ীতে তৎকালে প্রায় ৪।৫ মাস অন্তর খানাতল্লাসী হইত এবং প্রায়ই অগোচরে গোয়েন্দা আসিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িত। গভীর রাত্রেও এইরূপ লোক ধরিয়াছি। অনধিকার প্রবেশ বলিয়া থানায় দিয়া মামলা করিলে কোনও ফল হইবে না বুঝিয়া সকলকেই উত্তম-মধ্যম প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দিতাম। তখন নূতন যিউযুৎসু প্রভৃতি শিখিয়াছি, তাহারও পরীক্ষা হইয়া যাইত। উক্ত গোয়েন্দার এই উক্তি সেইজন্য।

মতি বাবু আমায় বলিয়াছেন, একদিন তাঁহার পত্নী ঐ কাঠের গুদাম পরিষ্কার করিবার জন্য ছোট ও সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া সম্মার্জ্জনী হস্তে উক্ত ঘরের অপর দরজা দিয়া প্রবেশ করেন এবং ঘরের মধ্যে এক জন অপরিচিত পুরুষকে দেখিয়া জিভ কাটিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়েন ও সম্বিৎ ফিরিলে দ্রুত চলিয়া যান। পরে অন্ন লইয়া মতি বাবু ঐ ঘরে প্রবেশ করিলে অরবিন্দ তাঁহাকে উৎসাহের সহিত বলেন, Moti, Moti, I have seen Kali. মতি বাবু অবাক হইয়া যান। পরে মতি বাবুর নিকট তাঁহার স্ত্রী জানিতে চাহেন গুদাম-ঘরে কাহাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। তখন মতি বাবু অরবিন্দের পরিচয় দেন। এই ভাবে মতি বাবু অরবিন্দকে সকলের অগোচরে স্থান দিয়াছিলেন এবং দুই-এক বার বাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া শেষে এক বাড়ীতে চন্দননগর ত্যাগ করা পর্য্যন্ত স্থান দেন। অরবিন্দের কালী দর্শনে তাঁহার শিশুর মত সরলতা প্রকাশ পাইতেছে।

১৯১০ সালের মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে অরবিন্দ আমাকে লিখিলেন যে, তিনি বিদেশে যাইতে চাহেন তজ্জন্য সব ব্যবস্থা যেন করিয়া রাখা হয়। টাকা-পয়সার জন্য তিনি তাঁহার কয়েকটি বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত কয়েকটি পত্র আমার নিকট পাঠাইয়া দেন। তিনি আমাকে নির্দ্দেশ দেন যে আমি যেন নিজে টাকা আনিয়া লই। তদনুসারে, কি ভাবে অরবিন্দ চন্দননগর হইতে কলিকাতা আসিবেন, কি যান ব্যবহার করিবেন, কোন্ পথে আসিবেন, যাত্রার দিন স্থির করা ইত্যাদি সকল ভারই লইতে হয়। প্রতি খুঁটিনাটিতে, প্রতি পদক্ষেপে সতর্কতা ও দূরদৃষ্টি লইয়া কার্য্য করা স্থির করি। তখন ছয় জন পুলিশের গুপ্তচর সর্ব্বক্ষণ আমাদের বাড়ীর সম্মুখে গোলদীঘিতে বসিয়া আমার প্রতি দৃষ্টি রাখিত। আমি বাড়ীর বাহির হইলেই আমার পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিত। এক জন আবার সাইকেল লইয়া চলিত—তাহার এক কারণ ছিল। ইহাদের চক্ষে ধূলি দিয়া দিবাকালে নানা স্থানে কয়েক দিন যাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনি। অতঃপর অরবিন্দ লিখিলেন যে তিনি পণ্ডিচেরী যাইবেন। তথায় পাঠাইবার ভার সমস্তই আমার উপর পড়িল। যেহেতু আমি বাড়ীর বাহির হইলেই গুপ্ত পুলিশ প্রকাশ্য ভাবে আমার সঙ্গ লইত ও সর্ব্বদা পার্শ্বে থাকিত সেই হেতু আমি নিজে অরবিন্দকে পণ্ডিচেরী পাঠাইবার ব্যবস্থা না করিয়া আমার বিশ্বস্ত দুইজনকে নানারূপ নির্দ্দেশ দিয়া কার্য্য করাইয়াছি। এক জনকে যাহা বলিয়াছি অপর জনকে তাহা জানাই নাই এবং দুই জনকে একত্র হইতে দেই নাই। ১৯১০ সালের মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটীর বিশ্বস্ত কর্ম্মী শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়কে তাহার কলেজ ষ্ট্রীটের মেস-বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনিয়া অরবিন্দের দুইটি টাল ট্রাঙ্ক তাঁহার বাসায় লইয়া রাখিতে বলি।

প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়াছিল। পরে তাহা মেসে লইয়া গেল।

পণ্ডিচেরী যাত্রা

অরবিন্দকে রেলে পণ্ডিচেরী না পাঠাইয়া ফরাসী জাহাজে করিয়া পাঠান স্থির করি।—কারণ রেলে ভ্রমণ করিলে দীর্ঘ পথের মধ্যে বহু লোক তাঁহাকে চিনিবার সম্ভাবনা ছিল এবং পুলিশের গুপ্তচরের দৃষ্টিগোচর হইবারও সম্ভাবনা থাকায় এবং পুলিশ সম্ভবতঃ সকল ষ্টেশনে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছে মনে হওয়ায় রেলে যাওয়া বিপজ্জনক মনে করি। তৎকালে কলিকাতা সহরে Messegaries Maritimes নামক এক ফরাসী জাহাজ কোম্পানীর অফিস ছিল। ফরাসী জাহাজ ব্যতীত অন্যান্য কোম্পানীর জাহাজও কলম্বো যাইত কিন্তু অন্যান্য জাহাজ পণ্ডিচেরী থামিত না। ফরাসী জাহাজে কলম্বোর টিকিট কিনিয়া পথিমধ্যে পণ্ডিচেরী নামিয়া পড়ার সুবিধা ছাড়াও, ফরাসী জাহাজের যাত্রী হইলে একটি রাজনৈতিক সুবিধা ছিল এই যে, বঙ্গদেশের তথা বৃটিশ-ভারতের সমুদ্রতট হইতে ৩ মাইল সমুদ্র অতিক্রম করিলেই ঐ জাহাজের যাত্রিগণ ফরাসী আইনের অধীন হইল। ইহাই আন্তর্জ্জাতিক আইন। সুতরাং অরবিন্দ ও তাঁহার সহযাত্রীকে বৃটিশ-ভারতের পুলিশ হইতে নিরাপত্তা পাইতে হইলে সাগর দ্বীপের ৩ মাইল সমুদ্রমধ্যে পৌঁছিলে, তাঁহারা ফরাসী রাজ্যে পৌঁছাইবার সামিল হইলেন এবং বৃটিশ পুলিশের নাগালের বাহিরে গেলেন। যে নিরাপত্তার জন্য তিনি পণ্ডিচেরী যাইতেছিলেন তাহা তিনি কলিকাতা হইতে দক্ষিণে আন্দাজ ৮০ মাইল ভ্রমণ করিয়া সমুদ্রবক্ষে সেই নিরাপত্তা পাইবেন। রেলে ভ্রমণ করিলে এ সুবিধা তিনি পাইতেন না। ইহা ব্যতীত আন্তর্জ্জাতিক আইনে রাজনৈতিক কারণে যাহারা বিদেশী রাজ্যে আশ্রয় লয় তাহাদের ধরা যায় না।

ঐ জাহাজ কলিকাতা হইতে কলম্বো যাইত ও পথিমধ্যে কয়েকটি স্থানে থামিত। তন্মধ্যে পণ্ডিচেরী অন্যতম। অরবিন্দ যাইবেন পণ্ডিচেরী কিন্তু শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়কে টিকিট কিনিতে বলি কলম্বোর, কারণ পণ্ডিচেরীর টিকিট কিনিলে সরকারের যদি সন্দেহ হয় যে রেলে না যাইয়া এই দুই যাত্রী জাহাজে পণ্ডিচেরী যাইতেছে কেন? তদুপরি পুলিশের যদি সন্দেহ হয়, তবে কলম্বোতে বাঙ্গালী যাত্রীর প্রতি দৃষ্টি দিবে। জাহাজের সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট জাহাজ কোম্পানীর অফিসে ক্রয় না করিয়া Thomas Cook কোংর অফিসে ক্রয় করিবার জন্য শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়কে বলি। ইহার কারণ এই যে, পুলিশ যদি সন্দেহ করে তবে উক্ত ফরাসী কোং হইতে অল্প সময়েই সংবাদ পাইবে যে দুই জন বাঙালী যাত্রী যাইতেছে। কিন্তু Thomas Cook হইতে টিকিট কিনিলে যাত্রীদের বিবরণ ফরাসী কোম্পানীর নিকট পৌঁছাইতে কিছু সময় যাইবে। এই সকল কার্য্যে সময় প্রধান কথা। 'সঞ্জীবনী'র গ্রাহক-তালিকা হইতে দুই জন গ্রাহকের নাম বাছিয়া লওয়া হইল। এক জন রংপুরের ও এক জন ডিব্রুগড় মহকুমার অধিবাসী। উঁহাদের প্রত্যেকেই এমন গ্রামে বাস করিতেন যাহা থানা, রেল ও ষ্টীমার-ষ্টেশন হইতে অনেক দূরে। সত্য ঐ নামের কেহ আছে এবং কলম্বো গিয়াছে কি না, পুলিশ তাঁহাদের সন্ধান করিতে যাইলে যাহাতে অল্প সময়ে সন্ধান না করিতে পারে সেজন্য এই ব্যবস্থা। মনগড়া নাম ও ঠিকানা না দিয়া, প্রকৃত কাহারও নাম ও ঠিকানা দেওয়ার কারণ এই যে, পুলিশ যদি সন্ধান করিতে চাহে তবে ধাঁধায় পড়িবে এবং সত্য কথা জানিতে বিলম্ব হইবে। ততক্ষণে অরবিন্দ নিরাপদ হইবেন। শ্রীমান্ নগেন্দ্র যখন Thomas Cook কোংতে ইঁহাদের নামে ডুপ্লে জাহাজের (Dupleix) টিকিট ক্রয় করিতেছিল তখন এক জন ইংরাজ কর্ম্মচারী প্রদত্ত নামের যাত্রীর নাম শুনিয়া মন্তব্য করেন "jaw breaking name।"

অরবিন্দের সহিত উক্ত জাহাজে স্বর্গীয় বিজয় নাগের যাইবার কথা ছিল। সেজন্য দুই জনের জন্য একটি দুই বার্থ-বিশিষ্ট সেকেণ্ড ক্লাস ক্যাবিন ভাড়া করিতে উপদেশ দিয়া যাত্রীদের নাম-ধাম লিখিয়া যে টাকার প্রয়োজন তাহা নগেন্দ্রকে দেই। দুই বার্থের ক্যাবিন ভাড়া করিবার কারণ এই যে, অন্যান্য যাত্রীর সহিত মিশিতে বা তাহাদের কাহারও ইঁহাদের সহিত কথা বলিবার সুবিধা হইবে না কিম্বা চিনিবারও সম্ভাবনা কম হইবে। ইঁহারা ক্যাবিন হইতে বাহির না হইলেও সন্দেহ হইবে না, যেহেতু জাহাজের ক্যাপটেনকে অজুহাত দেখান হইয়াছিল যে একজন ম্যালেরিয়া-পীড়িত যাত্রী। নগেন্দ্র দুই খানি টিকিট কিনিয়া আনিল এবং বলিল, দুই জন যাত্রী মাত্র যাইতে পারে এরূপ ক্যাবিন ভাড়া করিয়াছে ও আমাকে টিকিট দেখাইলে আমি সেগুলি তাহার নিকট রাখিতে বলিলাম। নগেন্দ্র বিস্মিত হইল বুঝিলাম।

[ক্রমশঃ।

মেয়ে পাওয়া যায়নি

"তোমরা জানো না—আমরা জন্ম নিয়েছিলুম স্ত্রীলোকহীন জগতে। আমাদের সময়ে বাংলার বিধাতাপুরুষ স্ত্রীলোক গড়েননি। তখন মেয়েদের কাছে এগোতেই সাহস হতো না। আমরা মেয়েদের খুঁজে বেড়িয়েছি, কল্পনায় গড়েছি, কবিতায় রচনা করেছি মানস-সঙ্গিনীকে।"

—রবীন্দ্রনাথ।

আত্ম-স্মৃতি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

[বন্ধুবর শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের 'জীবন-জলতরঙ্গ' নামে একখানি উপন্যাস সম্প্রতি বাহির হইয়াছে; ইহা আমার অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু 'বসুমতী'-সম্পাদক শ্রীমান্ প্রাণতোষ ঘটকের ইহা জানার কথা। কারণ, উপন্যাসখানি 'বসুমতী'তেই ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহা হউক, আমার 'জীবন-জলতরঙ্গ' পাছে সংঘাতের সৃষ্টি করে এই আশঙ্কায় সম্পাদক মহাশয় নাম বদলাইয়া 'আত্মস্মৃতি' রাখিলেন। তাঁহার শিরোনামাই আমি শিরোধার্য করিলাম।—লেখক]

সদ্য-লব্ধ বিজ্ঞানের জ্ঞান ও কাব্য-কল্পনার মোহে বাঁকুড়া কলেজ-হস্টেলের নোটিশ বোর্ডে তো জাহির করিলাম—

"মিথ্যা কথা কে বলে যে হারিয়ে গেছে
কিছু কি আর হারায়?"

কিন্তু হিসাব খতাইতে গিয়া দেখিতেছি, মহাকালের তরঙ্গাঘাতে বহু অমূল্য সম্পদই হারাইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানের বিচিত্র মহিমায় আরও অনেক হারাইতে বসিয়াছি। মালদহের মহানন্দা ও দীনু পণ্ডিতের পাঠশালা এবং পাবনার দিগন্তবিস্তার পদ্মা মাত্র স্মৃতির ভাণ্ডারে অক্ষয় হইয়া আছে, বাকি কথা অস্পষ্ট কুয়াশার মধ্য হইতে বহু কষ্টে আহরণ করিতেছি। কিন্তু পরিণত কৈশোরে যে দিনাজপুরের সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল, সাহিত্য-জীবন-জলতরঙ্গের প্রঘাতে তাহার কথা সাময়িক ভাবেও হারাইয়া যাওয়া উচিত হয় নাই। পুস্তকগত বিদ্যা ছাড়া সাহিত্যের বাস্তব জীবনগত পাথেয় এখান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম, বিশেষ করিয়া দুইটি মানুষের কাছ হইতে। তাঁহাদের কথা এইখানেই বলিয়া রাখি।

রতন

বর্ত্তমানে পশ্চিম দিনাজপুর অর্থাৎ বালুরঘাটের উকিল শ্রীনরেন্দ্রমোহন সেন ওরফে রতন আমার স্ফুটনোন্মুখ সাহিত্য-জীবনের আদি-অকৃত্রিম সঙ্গী ও সমঝদার। পরে বহু মানুষের সংস্পর্শে আসিয়াছি, কিন্তু সেই অপরিপক্ব ছাত্রাবস্থা হইতেই এমন গভীর চিন্তাশীল মানুষ আমার নজরে পড়ে নাই। এমন নির্ভীক স্বাধীনচেতা পুরুষও আমি কম দেখিয়াছি। এই কারণে তাঁহাকে বহু দুঃখ বরণ করিতে হইয়াছে, পৈতৃক পরিবার হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন এবং চিরজীবন অনুসৃত দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক মতবাদকেও পরিত্যাগ করিয়া শেষ পর্যন্ত বামপন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। গান্ধীজীর খাঁটি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া এবং আগষ্ট-বিপ্লবে নেতৃত্ব করিয়া যিনি বার বার কারাবরণ করিয়াছেন, তাঁহাকে যে কত দুঃখে

ষষ্ঠ তরঙ্গ

দিনাজপুরের স্মৃতি

আজ সরিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে, তাঁহার অনমনীয় স্বাধীন মতকে শ্রদ্ধা করি বলিয়াই তাহা আমি বুঝি।

পাবনা হইতে দিনাজপুর পৌঁছিয়াই বালুবাড়িতে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী দিনাজপুরের সরকারী উকিল রায় যতীন্দ্রমোহন সেনের (অধুনা কলিকাতা কালীঘাট-নিবাসী) জ্যেষ্ঠপুত্র আমার সহপাঠী এই নরেন্দ্রমোহনের সঙ্গে পরিচিত হইলাম। অত্যল্পকাল মধ্যে পরিচয় এমন ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল যে, পাড়ার প্রবীণারা আমাদিগকে রাম-লক্ষ্মণ দুই সহোদরের মত জ্ঞান করিতে লাগিলেন। পড়াশুনায় তাঁহার খ্যাতি ছিল না, কিন্তু তার্কিক বলিয়া নাম ছিল। সাহিত্য-সমাজ-রাজনীতি বিষয়ক নানা আলোচনায় পরস্পর ঘনিষ্ঠ ও একান্ত অনুগত হইয়া পড়িলাম। বাড়িতে অভিভাবকদের দৃষ্টি ছিল প্রখর, সুতরাং বিশ্রম্ভ আলাপের নিভৃত স্থান বাছিয়া লইতে হইয়াছিল—আমাদের পল্লীর পূর্বদক্ষিণে অবস্থিত দিগন্ত-প্রসারিত আম-জাম-কুরচি-সোঁদাল (কর্ণিকার) এবং বিবিধ কণ্টকগুল্মলতার জঙ্গলে, অরণ্য বলিলেও ভুল হইবে না। পরিবেশ ও পটভূমি ছিল একেবারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র—এই অরণ্যস্থিত একটি প'ড়ো বাড়িতেই আমাদের পূর্বোল্লিখিত সন্ত্রাসবাদীদের আখড়া বসিত। স্কুলের অবকাশ-দিনে পক্ষীকূজনমুখর উদাস দ্বিপ্রহরে আমরা দুইজন বালক সেই বনভূমির নির্জন তৃণাস্তৃত প্রান্তরে বসিয়া বা দেহ এলাইয়া দিয়া গভীর মনোনিবেশ সহকারে কাব্য ও সমাজ-রাজনীতি চর্চা করিতাম, চিন্তা ও কল্পনার মুক্ত অবাধ গতি আমাদিগকে দূর দিগ্‌দেশে লইয়া যাইত। অপরিণত বুদ্ধিতে রাষ্ট্র-সমাজ-ধর্ম-শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য নানা বিষয়ে স্বাধীন চিন্তার মক্স করিতে করিতে একান্ত নিজস্ব এক ধরণের মতবাদ আমরা গড়িয়া তুলিয়াছিলাম।

নরেনের তখন লেখা আসিত না। পরে কারা-জীবনের নির্জন অবকাশে তিনি মাতৃভাষায় গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ এবং ইংরেজী ভাষায় রাজনৈতিক প্রবন্ধ অনেক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু বাল্যে তাঁহার বাণী সম্পূর্ণ মূক ছিলেন। আমি অনর্গল কবিতা লিখিতাম, রতন ছিলেন আমার অনুরাগী পাঠক ও শ্রোতা। যে জ্বালাময়ী স্বদেশী কবিতাগুলি একদিন হুতাশনসাৎ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, একমাত্র তিনিই তাহার সবগুলির সঙ্গে পরিচিত হইবার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

কৈশোরের শিক্ষা ও প্রস্তুতির কালে আমরা পরস্পর পরিপূরক ছিলাম, একে অন্যের জীবনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিলাম। কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে উভয়েই উভয়কে যুক্তি সরবরাহ করিতাম; অন্য সহপাঠীদের কাছ হইতে আমরা একটু স্বতন্ত্র থাকিতাম। দিনাজপুরে যখন প্রথম পদার্পণ করি, তখন সবে ইউরোপীয় প্রথম মহাসমর বাধিয়াছে, যুদ্ধশেষ বা শান্তিচুক্তি হয় আমি যখন বাঁকুড়ায়, ১৯১৮ ১১ই নবেম্বর। সুতরাং সমগ্র সামরিক উত্তেজনার কাল দিনাজপুরে উভয়ে একত্র ছিলাম, আলাপ-আলোচনা তর্কাতর্কি হাতাহাতির কারণের অভাব কোনও দিনই হইত না। এই যুদ্ধ লইয়া আমাদের দুইজনের জীবনে একটু বিপর্যয়ও ঘটিয়াছিল, যাহার উল্লেখ আবশ্যক। সাহিত্যিক খাণ্ডবদহনের পর আমি তখন প্রায় দেওয়ানা, লেখাপড়ায় বিতৃষ্ণা আসিয়াছে, ইংরেজকে এ দেশ হইতে উৎখাত করিতে না পারিলে কিছুতেই শান্তি নাই, মনের এইরূপ অবস্থা। এমন সময় দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সুললিত ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় দিনাজপুরের তরুণ সম্প্রদায়কে ইংরেজের পক্ষে সৈন্যদলে যোগদানে উৎসাহিত করিবার জন্য সেখানে আসিলেন। পক্ষ ও বিপক্ষ দুই দলে তুমুল সোরগোল পড়িয়া গেল, আমরা বিপক্ষে। কিন্তু বক্তৃতা শুনিয়া ব্যুমার্যাঙের বিচিত্র রীতি অনুযায়ী হঠাৎ অন্যপ্রান্তে নিক্ষিপ্ত হইলাম। স্থির করিয়া ফেলিলাম, ইংরেজের হইয়াই লড়িতে যাইব। দিনাজপুরে সরকারী চাকুরিয়া অভিভাবকদের নাকের উপর নাম লেখানো সম্ভব নয়। সুতরাং পলাইয়া কলিকাতা যাওয়াই স্থির হইল। ভাড়ার চিন্তা মাথাতেই আসিল না, ইংরেজের পক্ষ সমর্থনে যুদ্ধ করিতে যাইব আমাদের আবার ট্রেন ভাড়া কি! বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। আমরা বিনা টিকিটে ভ্রমণের জন্য ধৃত হইয়া পার্বতীপুর জংশনের ইংরেজ ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে নীত হইলাম। সেই স্নেহপরায়ণ বৈদেশিক বৃদ্ধ কি বুঝিলেন জানি না, তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া নানা হিতোপদেশ দিয়া বাড়ি পাঠাইয়া দিলেন। সেদিন এই দুর্বিপাক না ঘটিলে বঙ্গভারতীয় দরবারে যে আর একজন হাবিলদার কবির আবির্ভাব ঘটিত, তাহা হলফ করিয়া বলিতে পারি।

যুদ্ধে গেলাম না বটে, কিন্তু সামরিক প্রবৃত্তিটা কেমন করিয়া মনের মধ্যে আসন গাড়িয়া বসিল, অতি তুচ্ছ কারণে পাড়ার ছেলেদের এবং সহপাঠীদের সহিত মারপিট দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। নালিশে নালিশে জর্জরিত পিতা আমাকে মারিতে মারিতে এলাইয়া পড়িলেন। আমার ভ্রূক্ষেপ নাই, আমি তখন উদাসীন এবং মরীয়া। একদিন দিনাজপুরের পরবর্তী ষ্টেশন কাউগাঁর একটি মেলায় স্বদলবলে গিয়া লুঠতরাজ পর্যন্ত করিয়া আসিলাম। ধরা পড়িয়া লেখাপড়ায় দক্ষতার গুণে হেডমাষ্টার মহাশয়ের কাছে রেহাই পাইলাম। ঠিক এই সময়ে সত্যেনের আবির্ভাবে আমার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইল এবং নূতন বন্ধুত্বের মোহে সাময়িক ভাবে রতনের সহিতও বিচ্ছেদ ঘটিল। আগেই বলিয়াছি, তখনই আমার সম্পাদক-জীবনের সূত্রপাত। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে নূতন বিদায় লইতেই দুই পুরাতন বন্ধুতে দ্বিগুণ আবেগে পুনর্মিলিত হইলাম। মিলনের স্থান পরিবর্তিত হইল, সত্যেনদের বাড়ি ছিল কাঞ্চন নদীর তীরে এক উদ্যানের মধ্যে। অভ্যাসের আকর্ষণে কাঞ্চন নদীকে আর ছাড়িতে পারিলাম না। নির্জন কাঞ্চন নদী-তীরে প্রত্যহ বৈকালে আবার আমাদের সাহিত্য-সমাজ-রাজনীতির আসর বসিতে লাগিল, সন্ধ্যা গড়াইয়া রাত্রি অবধি নক্ষত্রখচিত আকাশের তলে দুই বন্ধুর কল্পনাবিলাস চলিত। 'রাজহংসে'র "তমসা-জাহ্নবী" কবিতায় সেই যুগের এই পরিচয় আছে—

"মিলাল পদ্মার ছায়া, স্বচ্ছজল চপল কাঞ্চন,
কিশোরীর বেণী যেন, হাঁটুজল শহরের ধারে;
ভুলে-যাওয়া কবিতার অকস্মাৎ আবৃত্তির মত—
গান গেয়ে ওঠে প্রাণ, কৈশোর যৌবনে আসি মেলে।

রেল-লাইনের সাঁকো, প'ড়ো বাড়ি, আমের বাগান
নির্জন সন্ধ্যায় যেথা মেঘে মেঘে রঙের বিন্যাস,
গানে গানে উন্মাদনা। স্নান করি শান্ত নদীজলে
দেবতা-মন্দিরে যেন দেখা দিল তরুণ পূজারী।"

দিনাজপুর জিলা-স্কুল ছাড়িয়া আমি গেলাম বাঁকুড়ায়; রতন কলিকাতায় মাতুলালয়ে থাকিয়া কলেজে পড়িতে লাগিলেন। ছুটির সময় দিনাজপুরে আবার মিলিতাম বটে, কিন্তু সাময়িক ভাবে। আমি বি. এস-সি পড়িতে কলিকাতায় আসিলে আবার দীর্ঘস্থায়ী মিলন হইয়াছিল। তাহার পর আমাদের জীবনের গতি ভিন্নমুখী হইয়াছে। আমি সাহিত্য এবং নরেন রাজনীতিকে মুখ্য অবলম্বন করিয়া জীবন-নদীতে পাড়ি দিয়া চলিয়াছি, মাঝে মাঝে তরণী পরস্পর সংলগ্ন হইলেও বিচ্ছেদের পারাবারই অপার। রাজনৈতিক প্রয়োজনে তিনিও সাহিত্যিক হইবার সাধনা করিয়াছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের আসামীরূপে জেলে গিয়া 'বিক্ষোভ' নামে এক সুবৃহৎ উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, আমিই তাহা দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহাতে আমাদের দুইজনেরই কৈশোর ও যৌবনের কাহিনী উপন্যাসে রূপান্তরিত হইয়াছে।

পণ্ডিত মহাশয়

বালুবাড়িতে সেই কালে একজন মহাপুরুষ বাস করিতেন, দিনাজপুরে পৌঁছিবা মাত্রই সর্বাগ্রে তাঁহার নাম শুনিয়াছিলাম। তিনি সেখানে 'পণ্ডিত মহাশয়' নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁহার আসল নাম ভুবনমোহন কর, পরে মহর্ষি ভুবনমোহন নামে সর্বত্র খ্যাত হন। আমি যখন তাঁহাকে দেখি, তখনই (১৯১৪) তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ, শ্মশ্রুগুম্ফ এক হইয়া আবক্ষ প্রসারিত, সাদা ধবধব করিতেছে। সৌম্যদর্শন প্রশান্তমূর্তি, মুখখানি আরও সুন্দর, করুণায় মণ্ডিত, কপালের আব তাঁহার মুখ-সৌন্দর্যকে কেমন যেন প্রশান্ততর করিয়াছিল। ঢাকার কোন্ স্কুলের হেড পণ্ডিতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কোনও সূত্রে দিনাজপুর আসেন, সেও প্রায় পঁচিশ বৎসর হইতে চলিয়াছে। তিনি ধর্মবিশ্বাসে একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম ছিলেন এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রচার তাঁহার শেষ-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বালুবাড়ির বটতলায় চৌমাথাস্থিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদের বাসগৃহের সংলগ্ন ছিল তাঁহার দাতব্য ঔষধালয়। বটতলায় খেলিতে গিয়া প্রত্যহ প্রাতে এই ঋষিতুল্য মানুষটিকে দেখিতাম। দেখিতাম, দলে দলে বিচিত্র ধরনের স্ত্রী পুরুষ আসিয়া তাঁহার নিকটে দৈহিক দুঃখ নিবেদন করিয়া নিরাময় হইবার ঔষধ ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছে; সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত একাদিক্রমে এই কার্য চলিতেছে—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, বিরক্তি নাই। মুখে সস্নেহ ও সহাস্য বরাভয়, কম্পমান হাত প্রেসক্রপশনের পর প্রেসক্রপশন লিখিয়া চলিয়াছে; পাঁচ-সাতজন স্বেচ্ছাসেবক কম্পাউণ্ডারি করিয়াও কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। এই অপরূপ দৃশ্য প্রত্যহ দেখিতে দেখিতে কৌতূহলী বালকের মন ভক্তি ও শ্রদ্ধার আকর্ষণে তাঁহার সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত। দেখিয়া ভরসা হইত—মুচি মুদ্দফরাস চামার মেথর, এমন কি, গলিতকুষ্ঠরোগী—কেহই তাঁহার নিকট অস্পৃশ্য বা অপাংক্তেয় ছিল না, শিশু বালক কিশোরদের তো অবাধ গতি ছিল। নরেন দিনাজপুরেরই ছেলে, পণ্ডিত মশাই তিন পুরুষে তাঁহাদের চিনিতেন। নরেনকে পুরোভাগে রাখিয়া একদিন গুটি গুটি তাঁহার কাছে গিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি দেখিলাম আমার পরিচয় জানিতেন, সস্নেহ আশীর্বাদে আমাকে অভিষিক্ত করিয়া, অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া প্রশ্ন করিলেন, তুমি বাংলা চিঠিপত্র লিখতে পার? তোমার হাতের লেখা কেমন? বানানজ্ঞান আছে তো? সেই সহৃদয় প্রশ্নগুলি আমার কানে এখনও বাজিতেছে। আমার হাতের লেখা ভাল ছিল না—এখনও ভাল নয়, তাই সসঙ্কোচে ভয়ে ভয়ে নিবেদন করিলাম, বাংলা লিখতে পারি কিন্তু হাতের লেখা ভাল নয়। তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, ছুটির দিনে দুপুরে অবসরমত এসো। বাহির হইতে নিত্য দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের দৈনন্দিন রুটিন আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল, অনুমানে বুঝিতে পারিলাম, কাজের মানুষ তিনি, এই বালককেও কাজে লাগাইতে চান, রোগীদের চিঠিপত্রের জবাব দিবার কাজে আমাকে যোগ দিতে হইবে। তাঁহার নিজের হাতে জড়তা আসিয়াছিল, লিখিতে গেলে হাত কাঁপিত। মহত্তের কাজে আমারও স্থান হইবে জানিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম।

পণ্ডিত মহাশয়কে সঠিক জানিতে ও বুঝিতে হইলে তাঁহার দৈনন্দিন কাজের তালিকাটি জানা প্রয়োজন। প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে তিনি শয্যাত্যাগ করিতেন, প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া কিয়ৎকাল উপাসনায় বসিতেন, মৃদু মৃদু ভগবদ্‌প্রসঙ্গের গান গাহিতেন—রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র গান তাঁহার মুখে অনেক শুনিয়াছি, ধর্মগ্রন্থ পড়িতেন। তাহার পর, সমাহিত হইয়া বসিয়া সেই দিন যে সকল কঠিন রোগী দেখিয়া আসিয়াছেন হোমিওপ্যাথির পুস্তক ঘাঁটিয়া উপসর্গানুযায়ী তাহাদের ঔষধ নির্ণয় করিতেন। যাহারা দূর হইতে অথবা মুখোমুখি সাক্ষাতের লজ্জা বাঁচাইবার জন্য নিকট হইতেও অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাধির ঔষধ প্রার্থনা করিয়া পত্র দিত, নিজে বহু কষ্টে তাহাদের জবাব লিখিতেন। ধীরে ধীরে ভোর হইয়া আসিত, বিচিত্র পাখীদের কলকাকলীতে সুবৃহৎ বটবৃক্ষের সুনিভৃত শাখা-প্রশাখা মুখর হইয়া উঠিত, রাজপথে একটি দুইটি করিয়া পথিক-চলাচল সুরু হইত, তিনি খোলা ডিস্‌পেন্‌সারির গদিহীন শুষ্ক কাঠের চেয়ারে আসিয়া বসিতেন; অধীর রোগীরা ততক্ষণ এক এক করিয়া জমায়েত হইয়াছে, নিদ্রা-কাতর তরুণ কম্পাউণ্ডারদের শুধু আসিবার অপেক্ষা। তাহাদের জন্য অবশ্য কখনই আটকাইত না। পণ্ডিত মহাশয়ের কৃপায় পাড়ার ছেলেরা প্রায় সকলেই এই কাজে অল্পবিস্তর দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, আমিও শুধু সামনের রাস্তায় পায়চারি করিতে করিতে ইউপেটোরিয়াম পারপিউলা, বেল্ল, ইপিকাক, চায়না, নাক্স, কার্বোভেজ, আর্নিকা, সালফার, মায় রাস্ টক্‌স্ পর্যন্ত ঔষধের যথাযথ প্রয়োগ অধিগত করিয়াছিলাম। উত্তরবঙ্গের বহু শহরে ও গণ্ডগ্রামে হোমিওপ্যাথির বর্তমান (পার্টিশন পর্যন্ত) ব্যাপক প্রসার পণ্ডিত মহাশয়ের কল্যাণেই ঘটিয়াছে, তাঁহারই শিষ্য-প্রশিষ্যেরা বহু স্থলে বহু গরীবের মা-বাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যাহা হউক, প্রেসকৃপশন ও ডিস্‌পেন্‌সিং-এর কাজ অচিরাৎ আরম্ভ হইত এবং বেলা বারোটা পর্যন্ত সমানে চলিতে থাকিত। গড়পড়তা প্রত্যহ প্রায় দুই শত রোগীর পরীক্ষা ও ঔষধ-ব্যবস্থা হইত, প্রত্যেককে নিজ নিজ শিশি লইয়া আসিতে হইত। ঠিক মধ্যাহ্নে পণ্ডিত মহাশয় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতেন এবং পাশে রক্ষিত লাঠিটি অবলম্বন করিয়া বাহিরে আসিতেন। পাড়ার বা কাছাকাছি অন্য পাড়ার যে সকল বৃদ্ধ, শিশু বা মহিলা রোগী ডিস্‌পেন্‌সারিতে আসিতে অপারগ হইতেন, এখন হইতে বেলা একটা পর্যন্ত তিনি স্বয়ং পদব্রজে গিয়া তাঁহাদের দেখিতেন। শ্রান্ত ঘর্মাক্ত কলেবরে ফিরিয়া আসিয়া বটতলায় ছোট্ট একটি মাদুর পাতিয়া বসিয়া তিনি প্রথমটা কাঁধের গামছা ঘুরাইয়া শ্রান্তি দূর করিতেন। জামা বা পিরহান তিনি কখনই ব্যবহার করিতেন না, খাট মোটা ধুতি এবং একখানি গামছা তিনি উত্তরীয়-স্বরূপ ব্যবহার করিতেন। বাড়ির ভিতর হইতে এক বাটি সরিষার তেল আসিত, তিনি বসিয়া বসিয়া নিজেই সর্বাঙ্গে তাহা মাখিতেন। এই সময়ে তাঁহার আশেপাশে উপবিষ্ট ব্যক্তিরা বহু শাস্ত্রীয় সৎপ্রসঙ্গ শুনিতে পাইত। বেলা দুইটা নাগাদ স্নান সমাধা করিয়া তিনি বাড়ির উঠানে আহারে বসিতেন, বৃষ্টির দিনে বসিতেন ভিতরের বারান্দায়। আয়োজনের মধ্যে পাত্রের আয়োজনই একটু বিশেষ—থালা, বাটি, গেলাস, সমস্তই পাথরের, আমিষের ছোঁওয়া তিনি একেবারেই বরদাস্ত করিতে পারিতেন না তাই এই স্বাতন্ত্র্য। নিরামিষ আহার্যের আয়োজন যৎসামান্য—মোটা ভাত, একটা ডাল, একটা শাকডাঁটার তরকারি, কখনও বা অম্বল। আহারের পরিমাণ বিপুল, আশী বছর বয়সেও তিনি যাহা আহার করিতেন, জোয়ান পুরুষদেরও তাহা বিস্ময়ের উদ্রেক করিত। তিনি একাহারী ছিলেন, তাঁহার হাতের সঙ্গে মুখের সাক্ষাৎ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র একবার ঘটিত। পাথরের বাসন ও নিরামিষ ব্যবহার করিলেও অন্য কোনও সংস্কার তাঁহার ছিল না। অতি নিম্নশ্রেণীর পতিত অন্ত্যজদের নিমন্ত্রণ তিনি সানন্দে গ্রহণ করিতেন। পাথরের পাত্রগুলি লইয়া বহুদিন তাঁহাকে ডোম-মেথরদের পাড়ায় নিমন্ত্রণ রক্ষায় যাইতে দেখিয়াছি। আহারের পর বটতলায় আর একটু দীর্ঘায়তন মাদুর বিছাইয়া বিশ্রাম করিতেন, নিদ্রাকর্ষণও হইত, তিনি বলিতেন—ভাতঘুম। অবশ্য বর্ষাকালে বিশ্রামের স্থান-পরিবর্তন হইত। ঘড়িতে যখন ঠিক টং টং করিয়া তিনটা বাজিত তিনি উঠিয়া পড়িতেন, চিঠিপত্র দোয়াত কলম কাগজ আসিত, সেদিনকার সংবাদপত্র হাতে লইয়া তিনি বসিতেন, মুন্সী যে থাকিত সে একটির পর একটি পত্র পড়িত এবং তাঁহার নির্দেশ মত জবাব লিখিত। তাঁহার একটি একঘোড়ার

পাল্‌কিগাড়ি ছিল, কোচোয়ান তত্‌ক্ষণে সেটিকে প্রস্তুত করিয়া সামনে হাজির করিত, ঘোড়ার সম্মুখে ঘাসের আঁটি মেলিয়া ধরিয়া সে ঘোড়ার পিঠে সাদর সশব্দ চাপড় মারিয়া প্রভুকে জানান দিত—যান প্রস্তুত। চিঠিপত্রের দপ্তর বন্ধ হইত, তিনি শহরের দূর প্রান্তে রোগী দেখিতে বাহির হইতেন। ঘোড়াটি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, সুযোগ পাইলেই তাহাকে আদর করিতেন, প্রখর রৌদ্রের সময় তাহাকে গাছের ছায়ায় দাঁড় করাইয়া নিজে হাঁটিয়া যাইতেন, ঝড়বাদলে ঘোড়াকে কোনও নিরাপদ আশ্রয়ে রাখিতে না পারিলে স্বস্তি পাইতেন না। ঘোড়াটিও প্রভুর কম অনুগত ছিল না। তাহার প্রভুভক্তির প্রমাণস্বরূপ এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রভুর দেহরক্ষার পরেই এই অবলা জীবটি আহার্য সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে এবং অচিরকালমধ্যে প্রভুর অনুগামী হয়। রোগী দেখিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই তিনি ফিরিতেন, সদ্য-দৃষ্ট রোগীদের ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ডিস্‌পেন্‌সারির চেয়ারে বসিয়া অপেক্ষা করিতেন। একে একে ছাত্রেরা আসিয়া জুটিত, তিনি হোমিওপ্যাথি শিক্ষা দিতেন। রাত্রি আটটা পর্যন্ত ক্লাস চলিত। তাহার পর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত প্রিয় গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া শয়ন করিতেন। এইরূপ প্রত্যহ। যতদিন দিনাজপুরে ছিলাম ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই, তাঁহাকে অসুস্থ বা অক্ষমও কখনও দেখি নাই। আমি যখন পাকাপাকি রকম দিনাজপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় 'প্রবাসী'র চাকুরি লইয়াছি, তখন তাঁহার দেহ ভাঙিয়া পড়ে। বয়স তখন নব্বইয়েরও অধিক। তাঁহাকে কলিকাতায় চিকিৎসার্থ আনা হয়, কিন্তু কোনও ফল হয় না। তিনি নিজে আগ্রহ করিয়া দিনাজপুরে ফিরিয়া যান এবং সেখানেই চিরশান্তি লাভ করেন। বলা বাহুল্য, তিনি চিরকুমার ছিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রদের সংসারে আজীবন বাস করিলেও তিনি তাঁহাদের নিজস্ব ছিলেন না, সকলের আত্মীয় ও প্রিয় ছিলেন। তাঁহার সেবাকার্য্যের ব্যয়ভার বহন করিতেন গবর্মেণ্ট, মিউনিসিপালিটি, এবং স্থানীয় সহৃদয় জনসাধারণ। সকলের সাহায্যে তাঁহার সেবাকার্য একদিনের জন্যও ব্যাহত হয় নাই।

আমি সময় পাইলেই পণ্ডিত মহাশয়ের পত্রনবিসি করিবার জন্য অপরাহ্ণে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতাম। এই কাজ নরেনের পছন্দমাফিক ছিল না। পণ্ডিত মহাশয়কে এই প্রত্যক্ষ সেবা পরোক্ষে আমার সাহিত্য-সাধনার সহায়ক হইয়াছিল। বৃহৎ বৃহৎ হৃদয়-বিদারক মর্মান্তিক চিঠিগুলি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতাম, তিনি মোদ্দা জবাবটা সংক্ষেপে বলিয়া দিয়া সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিতেন, আমি বানাইয়া গুছাইয়া জবাব লিখিতাম। পথ্য ও ঔষধের নাম লাঞ্ছিত হইলেও তাহা ছিল রীতিমত বিদ্যালয়ের কম্পোজিশন ও এসে-রাইটিং-এর সাধনা। এই সময়ে পণ্ডিত মহাশয় বহু বিচিত্র ঘটনার কথা, সারা জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের কথা, শাস্ত্রের কথা অতি সরস ভাবে বলিতে থাকিতেন। ছাপা পুস্তকের অতিরিক্ত এই শিক্ষা আমার সাহিত্যিক ও ব্যবহারিক জীবনে বহু উপকারে লাগিয়াছে। মাঝে মাঝে তাঁহার নিকটে কলিকাতা ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মসমাজের খ্যাতনামা প্রচারকেরা আসিতেন, তাঁহাকে দর্শনেচ্ছু অন্য সাধু ব্যক্তিদেরও সমাগম হইত। বহু সৎপ্রসঙ্গ আলোচিত হইত, আমরা শুনিতাম। মেথরাণীদের তিনি সর্বদা জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী মা বলিতেন; কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত দুশ্চরিত্র পুরুষেরও চারিত্রিক সংযমের তারিফ করিয়া বলিতেন, ইনি ইচ্ছা করিলে ইহা অপেক্ষাও তো খারাপ হইতে পারিতেন। শুনিয়া আমরা কখনও হাসিতাম, কখনও বিস্মিত হইতাম। তাঁহাকে কখনও ক্রুদ্ধ ও ধৈর্যহীন হইতে দেখি নাই, জোরে কথা বলিতেও শুনি নাই। তাঁহার চিত্তের প্রশান্তি ও স্থৈর্য কিছুতেই বিচলিত হইত না, চরমতম দৈহিক ক্লেশও তাঁহার মুখে রেখাপাতমাত্র করিতে পারিত না। যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা, যে সাধনা ও তপশ্চর্যা তাঁহার জীবনকে এই ভাবে গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিল, তাহার বিশদ ইতিহাস কেহ লিপিবদ্ধ করে নাই। যে অসাবধানী অথচ সৌভাগ্যবান মানুষদের সংসর্গে তিনি আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার কথামৃত ধরিয়া রাখিতে যত্নবান হন নাই, কালের বিপুল প্রবাহে সে সকলই আজ হারাইয়া গিয়াছে। যাঁহারা ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন, তাঁহার আদর্শে তাঁহারা সকলেই কিছু না কিছু অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। ডাঃ প্রিয়রঞ্জন সেন এই সৌভাগ্যশালীদের একজন। আমি সেই কিশোর বয়সেই তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার অব্যবহিত পরে নিতান্ত অপটু হাতে একটি

প্রশস্তি লিখিয়াছিলাম। ছন্দ ও রবীন্দ্রপ্রভাবের দোষ যাঁহারা ধরিবেন না, তাঁহারা ইহার মধ্যেই অবোধ বালকের দৃষ্টিতে সেই মহৎ মানুষটিকে দেখিতে পাইবেন।

"ভুবন মোহন কর তোমরাই হে মহাপুরুষ,
নহে তারা সুবর্ণ-কিরীটি শোভে মস্তকে যাদের।
ভুবনমোহন-তুমি, নাহি জানি কোন্ মহাক্ষণে
কোন্ স্বর্গলোক হতে পাপতাপ-ভরা এ ধরায়
অবতীর্ণ হ'লে আসি, বিতরিলে করুণা অপার
অভাগা পতিত দলে। কর্মযোগী তুমি, ডুবে আছ
মহাকর্মসমুদ্রের মাঝে, ঊর্দ্ধে দেবতার পানে
আছে তবু চিত্ত স্থির তব। শুনি নাই কভু, তুমি
কর্মমাঝে আত্মহারা হয়ে তাঁহারে করেছ হেলা
কর্ম যাঁর অভিপ্রেত ; সুখে দুঃখে আহারে বিহারে
প্রতি পলে প্রতি দণ্ডে প্রতি মুহূর্তেতে জপিতেছ
মুখে প্রিয় নাম, কর্মফলস্পৃহা ত্যজি অবিরাম
তাঁরি পদে সঁপিতেছ জীবনের অর্জ্জিত গৌরব।
আপনার শান্তিসুখ হে সন্ন্যাসী, দিলে বিসর্জন
নিবারিতে দুঃখশোক তাপিত জনের। না করিলে
ভীষ্মসম দারপরিগ্রহ। পূজিলে আজন্ম কাল
মাতৃজ্ঞানে রমণী জাতিরে। তুমি চাও পারে যেন
এই ভ্রষ্টজাতি ধর্মরূপ বর্মমাঝে লভিবারে
পরম আশ্রয়। ঘৃণা নাহি করি' পতিত-অন্ত্যজে
বুঝে যেন এরা সার—মানুষের কর্ত্তব্য মহান্
স্নেহ করা তাপিতেরে, প্রেম করা দীনহীনজনে।
ভুবনমোহন তুমি, যশ চাহ নাই এ ভুবনে
একাকী নীরবে শুধু করিয়াছ দুস্থজনসেবা,
তোমারে প্রণমি, করি এ প্রার্থনা দেবতার কাছে
তোমার আদর্শ যেন ঠাঁই পায় প্রতি ঘরে ঘরে॥"

আমার এই সামান্য জীবনে মানুষের মহত্তম প্রকাশ আমি তাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আজ প্রায় দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পরে তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে পাইয়া আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। নরেন্দ্রমোহন ও ভুবনমোহন এই দুইজনের মোহন স্মৃতি দিনাজপুরে আমার বাল্য ও যৌবনপ্রবাসকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে, আমার সাহিত্য-জীবনের সঙ্গেও এই স্মৃতি কম জড়িত নয়।

কবিগুরুর চিঠি

ওঁ বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

আমি তোমার কাছে
বড় লজ্জায় পড়িয়া [illegible] [illegible]
[illegible] হারাইতে এবং ভুলিতে আমার
মত-এমন অদ্বিতীয় নাই। [illegible]
যে সময় তোমার চিঠি পাইলাম
তখন জবাব দিবার অবকাশমাত্র
[illegible] - [illegible] আশীর্বাদ

এই সংখ্যার পত্রগুচ্ছ বিভাগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত পত্র প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত চিঠির প্রথমাংশের প্রতিলিপি কবিগুরুর নিজ হস্তাক্ষর।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

চুয়াত্তর

এ কে?

পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, নাগ-যজ্ঞ-উপবীতী। সর্বাঙ্গে বিভূতি, নাগালঙ্কার। ধূম্র, পীত, শ্বেত, রক্ত আর অরুণ—পঞ্চ বর্ণের পঞ্চ মুখ। ত্রিনয়ন, জটাজূটধারী। শিরে গঙ্গা, ললাটে চন্দ্রকলা। বামকরে কপাল, পাবক, পাশ, পিনাক আর পরশু। দক্ষিণ করে শূল, বজ্র, অঙ্কুশ, শর আর বরমুদ্রা। লোচন আনন্দ-সন্দোহে উল্লসিত। কান্তি হিমকুন্দেন্দুসদৃশ। কোটি চন্দ্রসমপ্রভ। বৃষাসনে বিরাজিত। এ কে? এ তো সেই শিব-শান্ত উমাকান্তকে দেখছি।

সিমলে স্ট্রীটে সুরেশ মিত্তিরের বাড়িতে এসেছে রামকৃষ্ণ।

বেলফুলের গোড়ে মালা এনেছে সুরেশ। নিচের দিকে তোড়ার মত করা ফুলের থোপনা, মাঝে মাঝে রঙিন ফুল আর জরির তবক। রামকৃষ্ণের গলায় মালাটি পরিয়ে দিয়ে পায়ের কাছে প্রণাম করল সুরেশ।

কিন্তু সহসা রামকৃষ্ণের এ কী হল?

মালা গলা থেকে খুলে দূরে ফেলে দিল রামকৃষ্ণ।

নিমেষে ম্লান হয়ে গেল সুরেশ। কী না-জানি সে সেবাপরাধ করে বসেছে। কিন্তু জলের গ্লাশে শশীর যখন পা ঠেকে গিয়েছিল তখন তো এত বিমুখ হয়নি রামকৃষ্ণ। সে-জল খেয়েছিল শান্ত মুখে।

সমাধি ভাঙবার পর এক ঢোঁক জল খায় রামকৃষ্ণ। যন্ত্রচালিতের মত হাত বাড়িয়ে দেয়, আর তক্ষুনি জল-ভরা গ্লাশটি এগিয়ে দেয় শশী। শশী মানে শশিভূষণ ভটচাজ, উত্তরকালের রামকৃষ্ণানন্দ। সে দিন রাম দত্তের বাড়িতে কি হল, তাড়াতাড়িতে জলের গ্লাশে পা ঠেকে গেল শশীর। জল বদলাবার আর সময় নেই, রামকৃষ্ণ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

সেই জলের গ্লাসই এগিয়ে ধরল শশী। রামকৃষ্ণ তাই খেল নিশ্চিন্ত হয়ে।

শশীর অপরাধ তো জানিত অপরাধ। সুরেশ তো বুঝতেই পাচ্ছে না কোনখানে তার বিচ্যুতি হয়েছে। শশীর যদি ক্ষমা হয়, তবে তার কেন হবে না?

এই জলের গ্লাসে পা ঠেকে যাওয়া নিয়ে চিরকাল অপেক্ষা করেছে শশী। কিন্তু ঠাকুর তো জানতেন তার অন্তরের স্বচ্ছতা। তাই তো তাকে ক্ষমা করলেন অনায়াসে। সুরেশের মন কি তেমনি পরিষ্কার নয়?

জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে কাট-কাটা রোদ্দুরে শশী এসে হাজির। মুখ-চোখ লাল, এক হাঁটু ধুলো। ঘাম ঝরছে গা বেয়ে।

'এ কি করেছিস তুই?' ঠাকুর ক্ষিপ্র হাতে তাকে পাখা করতে লাগলেন। 'এই রোদ্দুরে কেউ আসে?'

শশী নিবৃত্ত করতে চায় ঠাকুরকে, ঠাকুর কোনো-কিছুই শুনতে রাজি নন। বোস একটু চুপ করে, আগে খানিক ঠাণ্ডা হ।

গায়ের ঘাম মরেছে এতক্ষণে। বল এইবার কি বলবি।

বলবার কিছু নেই। এই দেখুন বরানগরের বাজার থেকে আপনার জন্যে কিছু বরফ কিনে এনেছি।

চাদরের খুঁট খুলে এক টুকরো বরফ বের করল শশী।

ঠাকুরের আনন্দ তখন দেখে কে? বললেন, 'দেখ, দেখ। এই গরমে মানুষ গলে যায়, কিন্তু শশীর বরফ গলেনি। কি করে গলবে? শশীর ভক্তি-হিমে বরফ জমাট হয়ে রয়েছে।'

ভক্তি-হিমে জল জমে যখন বরফ হয় তখনই ঈশ্বর সাকার। যখন জ্ঞান-সূর্যে গলে যায় বরফ, তখন

রে যে-জল সে-ই জল, তখন আবার তিনি নিরাকার। ভক্তের জন্যে তাঁর রূপ, জ্ঞানীর জন্যে অরূপ। কিন্তু দুয়ের জন্যেই সমান অপরূপ।

তবে কি সুরেশের ভক্তি নেই?

ভক্তমাল থেকে একটি গল্প বলল রামকৃষ্ণ। যে ভক্ত সে কী মনোভাব নিয়ে দান করবে। তার মধ্যে অভিমানের এতটুকু আঁশ থাকবে না। অহংকার ত্যাগ করলেই তবে ঈশ্বর ভার নেন। মালা যে দিলি মালার মধ্যে যে তোর একটু অহংকারের জ্বালা আছে। মালার মধ্যে যে অনেক চেকনাই। অনেক কেরামতি। তারই জন্যে তোর মনের মধ্যে একটু অহংকারের জ্বর।

অহংকার হচ্ছে উঁচু ঢিপি। সেখানে কি জল জমে? জল জমে নিচু জমিতে, খাল জমিতে। সেই ঢিপিকে খাল করে দাও। তবেই জমবে ভক্তির জল।

সুরেশ কাঁদতে লাগল।

লাটু ছিল উপস্থিত। সে তাজ্জব বনে গেল। ঠাকুরের রসদদারদের মধ্যে একজন এই সুরেশ মিত্তির, তবু তার দান তিনি গ্রহণ করলেন না। আর, চেয়ে দেখ, তারই জন্যে কাঁদছে সুরেশ মিত্তির।

না কাঁদলে হবে কেন? কান্না দিয়ে পথের ধুলো ধুয়ে দিলেই তো তিনি আসবেন। ভক্তি-প্রদীপের তেলটিই তো অশ্রুজল।

এই যে বিশ্ব এ হচ্ছে বিস্তীর্ণ ব্যথার পত্রপট। ভক্তকে পাচ্ছেন না বলে ভগবানের কান্না। তাঁর অসীম শক্তির শুকনো রঙগুলি তিনি প্রেমের অশ্রুতে গুলে-গুলে এই বিচিত্র বর্ণ বেদনার ছবি এঁকেছেন। মনের মধ্যে যদি সেই কান্না না থাকে তবে এ চিঠির মর্মোদ্ধার করব কি করে? এই চিঠির মধ্যেই তো আনন্দের সংবাদ।

কীর্তনে নিয়ে এসেছে সুরেশ। নিজে গান গেয়ে রামকৃষ্ণ তাকে উচ্চভাবে উদ্দীপ্ত করে তুলল। অর্ধবাহ্যদশায় এসে হঠাৎ সেই ত্যক্ত মালা গলায় পরে উঠে দাঁড়াল। গান ধরল গলা ছেড়ে:

'আর কী সাজাবি আমায়—

জগৎ-চন্দ্র-হার আমি পরেছি গলায়—'

ফের আখর দিতে লাগল: 'আমি জগৎ-চন্দ্র-হার পরেছি। অশ্রুজলে সিক্ত-করা জগৎ-চন্দ্র-হার পরেছি। প্রেমরসের ভাবন দেওয়া জগৎ-চন্দ্র-হার পরেছি—'

চোখের কান্না মুছে ফেলে চেয়ে ছাখ আমাকে। আমি দূরে আছি যে বলে, সেই নিজে দূরে রয়েছে। আমাকে দেখতে আবার নতুন কী আয়োজন হবে! দেখব বলে তাকালেই দেখতে পাবি চোখের উপর। 'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং।' ইট কাঠ মাটি পাথর সব আমি। আকাশ বাতাস আগুন জল পাখি পতঙ্গ। একটা গাছ দেখছিস সামনে? ঐ বৃক্ষ-রূপে তো আমিই দাঁড়িয়ে। সমস্ত কান্নার পারে আমিই তো আনন্দ-তীর।

কিন্তু সে দিন সুরেশের বাড়িতে গাইয়ের জোগাড় নেই।

রামকৃষ্ণ শুধোন: 'ভজন গাইতে পারে এমন কেউ নেই তোমাদের পাড়ায়?'

আছে বৈ কি। সুরেশ ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে বেরুল। গৌর মুখুজ্জে লেনের বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন।

নরেন তখন গানের স্রোতে ভাসছে। ভগবান আছে কি নেই জানি না, কিন্তু দেহ-ভরা প্রাণ আছে, কণ্ঠ-ভরা গান আছে। আর, এই প্রাণ আর গান এ যেন আর কার দানোচ্ছ্বাস। তাই নরেন গায়, 'অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি।' কখনো বা:

'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ,
তোমারি রচিত ছন্দ মহান বিশ্বের গীত।
মর্তের মৃত্তিকা হয়ে ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত॥'

'ওরে বিলে, বাড়ি আছিস?' দরজায় সুরেশ মিত্তির দাঁড়িয়ে।

ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে কাছে এল নরেন।

'চল আমার বাড়ি চল। গান গাইবি।'

একবার গানের নাম শুনলেই হল, নরেন উচ্ছলিত। ক'দিন বাদে একজামিন, দুপুর বেলা হয়তো পড়ছে নরেন, বন্ধু এসে বললে, রাত্তিরে পড়িস, এখন দুটো গান গা। তবে বাঁয়াটা নে— বলেই বই-টই ঠেলে ফেলে নরেন তানপুরা নিয়ে বসল। ইস্কুল-কলেজে টেবিল চাপড়ে বাজিয়েছে বলেই কি আর এখন বাঁয়া বাজাতে পারবে—গান শুনতে চেয়ে বন্ধু পড়ল মুস্কিলে। মোটেই শক্ত নয়, এমনি করে শুধু ঠেকা দিয়ে যা—বাজনার বোল বলে দিল নরেন। ঠেকার অভাবে ঠেকবে না, নরেন তানে-লয়ে তন্ময় হয়ে গান ধরল উদার গলায়।

কখন দুপুর গড়িয়ে গেল আস্তে আস্তে, কিছু খেয়াল নেই—একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছে অনবরত। সন্ধ্যায় আলো দিয়ে গেল চাকর, তবু আসর ভাঙছে না। রাত দশটায় এল খাবার তাড়া, তখনই বুঝি প্রথম হুঁস হল। দিব্য ভূমি থেকে নেমে এল স্থূল ভূমিতে।

গানই হচ্ছে একমাত্র জ্ঞান যে জ্ঞানের ওপারে একজন আছেন। জ্ঞানের ওপারে যিনি আছেন তাঁকে একমাত্র গান দিয়েই স্পর্শ করা।

অন্তরের কান্নাটিও একটি গান। আকুলতাটিও একটি সুর।

গানের নাম শুনেই কোমর বাঁধল নরেন। চলল সুরেশ মিত্তিরের বাড়িতে।

রামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রের প্রথম দর্শন হল সূর্যের সঙ্গে সমুদ্রের।

এ কে! চমকে উঠল রামকৃষ্ণ। এ যে তার সেই স্বপ্নে-দেখা সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষি!

সে এক অপূর্ব দর্শন হয়েছিল রামকৃষ্ণের।

সমাধি অবস্থায় জ্যোতির্ময় পথ ধরে উর্দ্ধে নভোমণ্ডলে উঠে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ। পার হল পৃথিবী, পার হল জ্যোতিষ্কলোক। ক্রমে-ক্রমে চলে এল সূক্ষ্মতর ভাবলোকে। যতই উপরে উঠছে, পথের দুপাশে দেখতে লাগল দেব-দেবীরা বসে আছেন। সেখানেও উর্দ্ধগতি ক্ষান্ত হল না। উঠে এল ভাবরাজ্যের চরম চূড়ায়। সেখানে দেখল একটি জ্যোতির রেখা দিয়ে দুটি বিশাল রাজ্যকে আলাদা করা হয়েছে। খণ্ড আর অখণ্ডের রাজ্য, দ্বৈত আর অদ্বৈতের দেশ। রামকৃষ্ণ অখণ্ডের রাজ্যে এসে ঢুকল। সেখানে আর দেব-দেবী নেই—দিব্য দেহের অধিকারী হয়েও এখানে আসবার অধিকার নেই তাদের। অনেক নিচে ভাবলোকে তাদের বাসা। সেই অখণ্ডলোকে সাতটি ঋষি বসে আছে ধ্যানলীন হয়ে। প্রাজ্ঞ, প্রবীণ ঋষি। আশ্চর্য হল রামকৃষ্ণ। যেখানে দেব-দেবী আসতে পারে না সেখানে এই ঋষিরা এল কি করে? বুঝল জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে পবিত্রতায় এরা দেবদেবীকেও হার মানিয়েছে। এদের মহত্ত্বচিন্তায় অভিভূত হল রামকৃষ্ণ। সহসা দেখতে পেল সেই অখণ্ডলোকের পরিব্যাপ্ত জ্যোতিপুঞ্জের কিয়দংশ ঘনীভূত হয়ে একটি দেবশিশুর আকার নিলে। একটি অমলকান্তি দেবশিশু। দেবশিশুটি তার মৃদুল-কোমল বাহু দুটী দিয়ে একজন ঋষির গলা জড়িয়ে ধরল, তার ধ্যান ভাঙাবার জন্যে ডাকতে লাগল কলভাষে। ধ্যান ভাঙল ঋষির, আনন্দময় অনিমেষ চোখে দেখতে লাগল শিশুকে। এ যেন তার কত কালের প্রিয়জন, তার হৃদয়রতন। কি যেন বলবে বলে এসেছে। প্রসন্ন-প্রভাত চোখ দুটি তুলে শিশু বললে ঋষিকে, 'আমি চললুম তুমি এস।' কোথায় চললে? পৃথিবীতে। তুমিও এস আমার পিছু-পিছু। স্নেহস্নাত চোখে চেয়ে থাকতে-থাকতে ঋষি আবার ধ্যানস্থ হল। রামকৃষ্ণ দেখল, ঋষির সেই দেহ থেকে একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে জ্যোতির্বর্তিকারূপে নেমে গেল পৃথিবীতে।

নরেন্দ্রকে দেখেই চমকে উঠল রামকৃষ্ণ। এ যে সেই ঋষি!

তবে ঐ শিশুটি কে?

শিশুটি স্বয়ং রামকৃষ্ণ।

বিবেকানন্দ ঋষি, রামকৃষ্ণ শিশু। তার মানে কি? বিবেকানন্দ পরিপূর্ণ জ্ঞান, রামকৃষ্ণ পরিপূর্ণ প্রেম। বিবেকানন্দ সংহত তেজ, রামকৃষ্ণ বিগলিত সারল্য।

বিবেকানন্দ তাই হিমালয়, রামকৃষ্ণ মানস-সরোবর।

পঁচাত্তর

একটি ভজন গাইল নরেন।

উন্মনা হয়ে গেল রামকৃষ্ণ। কাদের বাড়ির ছেলে? কোথায় থাকে? কোথা থেকে এসেছে? কি করে পথ চিনল এ গলির?

আরো একখানা গান হল।

এগিয়ে এল রামকৃষ্ণ। কাছে এসে নরেনের অঙ্গলক্ষণ দেখতে লাগল। বলল, কথার সুরে মিনতি মাখিয়ে বলল, 'একবারটি দক্ষিণেশ্বরে এসো আমার কাছে। কেমন, আসবে?'

উন্মনা হয়েই ফিরল দক্ষিণেশ্বরে। আর নিঃসঙ্গতার অন্ধকারে।

কে যেন নেই। কে যেন আসবে বলে আসেনি। দেখা দিয়েই চক্ষের পলকে পালিয়ে গেছে।

প্রতিক্ষণ উচাটন। প্রতিক্ষণ তার পায়ের শব্দ শুনছে উৎকর্ণ হয়ে। সে যে আসে আসে আসে।

পৃথিবীর সমস্ত সুরে-ছন্দে তার আগমনী বাজছে। কিন্তু সে আসছে কই? দেখা দিচ্ছে কই চোখের সামনে! কোথায় সেই চারু-হারী-রুচির-মনোহর? রুচ্য রম্য কান্ত কাম্য? তাকে না দেখে কেমন করে থাকব?

অন্ধকারে তার গন্ধ টের পাচ্ছি, কিন্তু সে কি অন্ধকারে আমার কান্না শুনতে পাচ্ছে না? বিশ্ববীণায় সে এত স্বর বুনছে, সেখানে কি বাজছে না এই গীত-হারা নীরবতা?

'ওরে, তুই কে জানি না। কী হবে জেনে? তবু তুই একবার আয়। তোকে না দেখে যে থাকতে পারছি না। তোকে ছাড়া সব অন্ধকার। একেবারে একা।'

নির্জনে গিয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদে রামকৃষ্ণ। যেমন ভিজে গামছা নিংড়োয় তেমনি করে বুকের ভিতরটাকে জোর করে নিষ্পীড়ন করছে। চোখে ঘুম নেই, মুখে রুচি নেই, সব সময়ে কেবল ইতি-উতি তাকায়, ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলে, কিন্তু সে আসে না।

সে শুধু আসে আসে আসে।

শেষকালে মার কাছে কেঁদে পড়ে রামকৃষ্ণ। মা, একবারটি তাকে এনে দে। ওকে না পেলে কেমন করে থাকব! কার সঙ্গে কইব আমার প্রাণের কথা? আমি রাজ্য চাই না, স্বর্গ চাই না, মোক্ষ চাই না, তুই শুধু ওকে এখানে নিয়ে আয়। আমি ওর কনককাঞ্চনছবি আর একবার দেখি।

রাত্রে শুয়ে আছে রামকৃষ্ণ, কে যেন তাকে তার গা ঠেলে তুলে দিল। বললে, 'আমি এসেছি।'

রামকৃষ্ণ চেয়ে দেখল, নরেন।

ধড়মড় করে উঠে বসল। এসেছিস? এত রাত্রে, মধ্যরাত্রে? তাতে কি? তাই তো আমি আসি, যখন চরাচর সান্দ্র-স্তব্ধ, সুষুপ্তিগত। কিন্তু কই, কই তুই?

কেউ নেই।

এই তুই সাকার, আবার তুই নিরাকার? এই তুই সমুপস্থিত গান, আবার তুই পলায়মান সুর! আর কত তোর পথ চেয়ে বসে থাকব? আমায় ঘর নেই আমি পথই সার করেছি। তুই এসে আমাকে পথের খবর দিয়ে যা। কোন পথে মিলবে সেই পথ-পতিকে?

ঝরে গেছে নরেনের আসক্তে। তার এফ-এ পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, বাবা তার জন্যে এখন পাত্রী খুঁজছেন। তার খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, সে চলেছে দক্ষিণেশ্বর! ধাপধাড়া গোবিন্দপুর এর চেয়ে অনেক ভালো জায়গা।

কিন্তু বাবা শুধু পাত্রীই দেখছেন না, দেখছেন তার টাকার ওজনটা। মেয়েটি শামলা, তাই তার দশ হাজার টাকা জরিমানা। তা ছাড়া ছেলে দেখুন। ছেলে আমার সোনা-বাঁধানো হাতির দাঁত।

কিন্তু নরেন ঘাড়ে এক ঝাঁকরানি দিয়ে সব নস্যাৎ করে দিলে।

মেয়ে কালো বলে নয়, নয় বা বাবা পণ নিচ্ছেন বলে। সে বিয়ে করবে না কেননা সে ঈশ্বরসন্ধানে হবে দুর্গমের যাত্রী, দুরারোহ ও দুরবগাহের। সে-পথ ক্ষুরধারের মত নিশিত-দুস্তর।

বিশ্বনাথের সংসারেই প্রতিপালিত রাম দত্ত, তাকে তাই ধরলেন বিশ্বনাথ। বললেন, 'বিলের ঘাড়ে একটু ঘি ডলো, কি এক গোঁ ধরেছে, বলছে বিয়ে করবে না—'

রাম দত্ত লাগল ঘটকালিতে। কিন্তু নরেন তো ঘট নয় যে কালি মাখাবে, নরেন আকাশ, তাতে লাগে না কিছু কামনার কালিমা।

'যদি সত্যি ধর্ম লাভ করতেই চাও তবে মিছে ব্রাহ্মসমাজে না ঘুরে দক্ষিণেশ্বরে যাও। মূর্তিমান ধর্মকে দেখে এসো।'

যেতে হয়তো যাব, তুমি বলবার কে! এমনিই ভাব নরেনের। তুমি বলবে বললেই যাব? তুমি কি আমার অভিভাবক? তুমি কি আমার বিবেক?

আমার খুশি আমি যাব না।

নতুন গাড়ি হয়েছে সুরেশের। দুশো টাকা মাইনে হয়েছে রাম দত্তের। হাসি পায়, সব নাকি ঠাকুরের কৃপায়। এতই যখন কৃপা, নরেন ভাবল মনে-মনে, জগৎ-সংসারের সমস্ত দুঃখ-দারিদ্র্য এক দিনে দূর করে দিক না। তবে বুঝি কেমন ঠাকুর!

নতুন গাড়ি কিনে রামকৃষ্ণকে একদিন চড়াল সুরেশ।

সুরেশের বাড়ি এলে রামকৃষ্ণকে ঘিরে আজকাল ছেলে-ছোকরারা ভিড় করে। 'ছোট ছেলেগুলোকে আপনি বকাচ্ছেন—' সুরেশেরই বাড়িতে থাকে এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সে একদিন হঠাৎ রামকৃষ্ণকে আক্রমণ করলে।

'তুমি কী করো?' শান্ত বয়ানে প্রশ্ন করল রামকৃষ্ণ।

'আমি আপনার মতো ছেলে বকাই না, আমি জগতের হিত করি।'

'যিনি এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন পালন করছেন তিনি কিছু বোঝেন না আর তুমি সামান্য মানুষ, তুমি জগতের হিত করছ? ঈশ্বরের চেয়ে তুমি বেশি বুদ্ধিমান?'

চুপ করে গেল সরকারী চাকুরে।

সেই সরকারী চাকুরের পিছনে লেগে গেল পাড়ার ছেলেরা। কি হে, জগতের হিত করছ নাকি? কতটা হিত আজ করলে জগতের?

কৃষ্ণদাস পালকে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ 'মানুষের কি কর্তব্য?'

কৃষ্ণদাস বললে, 'জগতের উপকার করব।'

'হ্যাঁ গা, তুমি কে?' বললে রামকৃষ্ণ, 'আর কা উপকার করবে? আর, জগৎ কতটুকু গা, যে তুমি উপকার করবে?'

ঈশ্বরকে ভালোবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরে ভাব-ভক্তি মানেই ঈশ্বরে ভালোবাসা। নিষ্কাম কর্ম করতে-করতেই ঈশ্বরে ভক্তি-ভালোবাসা আসে। আর এই ভক্তি-ভালোবাসা থেকেই ঈশ্বরলাভ। এই ঈশ্বরলাভই মানুষের কর্তব্য। জগতের উপকার মানুষে করে না, তিনিই করছেন। যিনি চন্দ্র-সূর্য করেছেন, যিনি মা-বাপের বুকে স্নেহ দিয়েছেন, মহতের চিত্তে দয়া দিয়েছেন, ভক্তের প্রাণে ভক্তি দিয়েছেন—তিনিই। বাপ-মার মধ্যে যে স্নেহ দেখ সে তাঁরই স্নেহ। দয়ালুর মধ্যে যে দয়া দেখ সে তাঁরই দয়া। তুমি কাজ করো আর না করো, তিনি কোন না কোন সূত্রে তাঁর কাজ করবেনই করবেন। তাঁর কাজ আটকে থাকবে না।

জগতের দুঃখ দূর করবে তোমার স্পর্ধা কি? জগৎ কি এতটুকু? বর্ষাকালে গঙ্গায় কাঁকড়া হয় দেখেছ? তেমনি অসংখ্য জগৎ আছে—অফুরন্ত। যিনি জগতের পতি তিনিই সকলের খবর নিচ্ছেন। তোমার মিথ্যে মাথা ঘামাতে হবে না। তোমার কাজ হচ্ছে তাঁকে আগে জানা। তাঁর জন্যে ব্যাকুল হওয়া। শরণাগত হওয়া। ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য।

এমন নরদেহ ধারণ করেছ একবার ঈশ্বরদর্শন করবে না? এত কিছু দেখলে, এত কিছু ধরলে, দেখবেনা-ধরবেনা শুধু ঈশ্বরকে? জীবনে এত রোমাঞ্চ খুঁজছ, নেবে না একবার ঈশ্বর-শিহরণ?

গঙ্গার দিকে পশ্চিমের দরজায় কার ছায়া পড়ল।

কে? চঞ্চল হয়ে উঠল রামকৃষ্ণ। এ কার ছায়া? কার আভাতি?

আর কার। চোখের সামনে নরেন। সপ্ত ঋষির একজন।

সুরেশ মিত্তিরের গাড়িতে করে এসেছে। সঙ্গে সুরেশ, আরো ক'জন সমবয়সী ছোকরা। কিন্তু সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র এই নরেন্দ্রনাথ। সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন-বিযুক্ত। শরীরের দিকে লক্ষ্য নেই, বেশেবাসে উদাসীন, গায়ে ময়লা একখানা চাদর, বাইরের কোনো কিছুতে কৌতূহল নেই, সমস্ত কিছুর সঙ্গে অবন্ধন, সমস্ত কিছুই যেন তার শিথিল। শুধু ধ্যানের আবেশে চোখের তারা উপর দিকে উঠে আছে। ঘুমুলেও হয়তো সম্পূর্ণ বোজে না তার চোখ। চোখ সুমুখ-ঠেলা। দেখলেই মনে হয় ভিতরে কিছু আছে।

বিষয়ীর আবাস কলকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার এল কোত্থেকে? সত্ত্বগুণই তো সিঁড়ির শেষ ধাপ। তার পরেই ছাদ।

এসেছিস? আয়—

মনের ব্যাকুলতা চেপে রাখল রামকৃষ্ণ। মেঝেতে মাদুর পাতা, বসতে বলল নরেনকে। যেখানে জালা, তার কাছেই বসল নরেন। তার সহচর বন্ধুরাও বসল আশে-পাশে। কিন্তু তারা সব ডোবা-পুষ্করিণী। ডোবা-পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন বড় দীঘি—যেন ঠিক হালদার পুকুর।

চুম্বকের টানে লোহা আসে, না, লোহার টানে চুম্বক ছোটে—কে করবে এ রহস্যের সমাধান? প্রিয়তন্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রামকৃষ্ণ।

বলে, 'একটা গান ধর।'

গান তো নয়, মানস-যাত্রী হংস।

নরেনের সমস্ত শরীর যেন সুরে-বাঁধা। সমস্ত প্রাণ-মন ঢেলে ধ্যানারূঢ় হয়ে সে গান ধরলে:

'মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে॥'

'আহা, কি গান!' ভাবে উঠে গিয়েছিল রামকৃষ্ণ, নেমে এসে বললে, 'আরেকখানা গা।'

'যাবে কি হে দিন বিফলে চলিয়ে'—সুধা-ঢালা কণ্ঠে গান ধরল নরেন: 'আছি নাথ, দিবানিশি আশা পথ নিরখিয়ে ॥'

পাখির ওড়াই যেমন বিশ্রাম, নরেনের গানই যেন ধ্যান। ও স্বতঃসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধ।

নিত্যসিদ্ধ হচ্ছে মৌমাছি। শুধু ফুলের উপর বসে মধু পান করে। তার মানে হরিরস পান করে, বিষয়-রসের দিকে যায় না।

মা, তোর কী কৃপা। তুই এত দিন পরে নিয়ে এসেছিস আমার মন-ঠাণ্ডা-করা আপন জন।

কালীঘরের খাজাঞ্চি ভোলানাথ মুখুজ্জেকে জিগগেস করেছিল রামকৃষ্ণ: 'নরেন্দ্র বলে একটি কায়েতের ছেলে, তার জন্যে আমার মন এমন হচ্ছে কেন? সে আমার কে।'

ভোলানাথ বললে, 'এর মানে ভারতে আছে। সমাধিস্থ লোকের মন যখন নিচে আসে, তখন সত্ত্বগুণী লোকের সঙ্গে বিলাস করে। সত্ত্বগুণী লোক দেখলে তবে তার মন ঠাণ্ডা হয়।'

আমি বিলাস করব। আমি শুঁটকে সাধু হব না।

ছিয়াত্তর

গান শেষ হওয়া মাত্র নরেনের হাত ধরল রামকৃষ্ণ। হাত ধরে টেনে আনল উত্তরের বারান্দায়। বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলে ঘরের দরজা।

শীতকাল। উত্তুরে হাওয়া আটকাবার জন্যে থামের ফাঁকগুলো ঝাঁপ দিয়ে ঘেরা। নিশ্চিন্ত, নিরিবিলি জায়গা। ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবার পর কারু সাধ্য নেই এখানে উঁকি মারে।

নিরিবিলিতে কিছু উপদেশ দেবে বোধ হয় রামকৃষ্ণ, নরেন তাই কৌতূহলী হয়ে রইল।

কিন্তু এ কি, রামকৃষ্ণের মুখে কোনো কথা নেই। রামকৃষ্ণ কাঁদছে। আকুল হয়ে কাঁদছে।

যেন কত দিনের গভীর পরিচয়, বলছে তেমনি স্নেহস্বরে, 'এত দিন কোথায় ছিলি?'

নিঃশব্দ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল নরেন।

'তোর কি মায়া-দয়া নেই? এত দিন পরে আসতে হয়! কত ক্ষণ থেকে দিন, দিন থেকে মাস, মাস থেকে বছর আমি তোর জন্যে বসে আছি—তোর তা খেয়াল নেই। তোর মনে পড়ল না আমাকে?'

নরেনের হাত ধরে বিলাপের মত করে বলছে, কিন্তু আসলে এ আনন্দ-প্রলাপ। এ দুঃখ প্রীতিকণ্টকিত দুঃখ। এ অশ্রু স্নেহার্দ্রগাঢ় সুধাধারা।

এ বাণী নবনীসমানা অমিয় বাণী।

'বিষয়ী লোকের কথা শুনে-শুনে আমার কান পুড়ে গেল। প্রাণের কথা আর কাউকে বলা হল না। বলতে না পেয়ে এই দ্যাখ আমার পেট ফুলে রয়েছে। এইবার তুই এসেছিস, এবার বাহির দুয়ারে কপাট লেগে ভিতর দুয়ার খুলে যাবে। হরিকথারতিতে কেটে যাবে দিন-রাত। তুই এসেছিস, তার মানে ভক্তের হৃদয়ে ভগবান বিশ্রাম করতে এসেছে। ভক্তের হৃদয়েই তো ভগবানের বিশ্রাম।'

নরেন চিত্রলিখিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। নিস্পন্দ, নিঃসাড়।

'মাকে সে দিন অনেক করে বললাম। কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী শুদ্ধ ভক্ত না পেলে কেমন করে থাকব পৃথিবীতে? কার সঙ্গে কথা কইব? কাঁদতে-কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর কী হল জানিস না বুঝি?'

নরেন তাকিয়ে রইল উৎসুক হয়ে।

'মাঝ রাত্তে তুই এলি আমার ঘরে। আমায় তুললি গা ঠেলে। বললি, আমি এসেছি।'

'কই আমি তো কিছু জানি না।' নরেনের মুখে হাসির একটি রেখা ফুটল। বললে, 'আমি তো আমার কলকাতার বাড়িতে তখন তোফা ঘুম যাচ্ছি।'

'তুমি জানো না বৈ কি। তুমি যদি না জানো, তবে আর কে জানে।' রামকৃষ্ণ সহসা হাত জোড় করল। দেববন্দনার ভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'কিন্তু আমি জানি প্রভু, তুমি সেই পুরাণ পুরুষ, তুমি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, তুমি নররূপী নারায়ণ। তুমি আমার জন্য রূপধারণ করে এসেছ। শুধু আমার জন্য নয়, সমস্ত জীবের জন্য এসেছ। এসেছ সমস্ত ভুবনের দৈন্যদুঃখদুরিত দূর করতে—প্রণতজনের ক্লেশহরণ করতে—'

কে এ উন্মাদ! নইলে আমি সামান্য বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে, আমাকে এ সব কথা বলছে! কে এ বচনরচনপটু! এ সব কি আমি প্রহেলিকা শুনছি? আমি আছি তো আমার মধ্যে? নরেন স্থান-কাল একবার যাচাই করে নিল। সব ঠিক আছে। শুধু

পাত্রই অপ্রকৃতিস্থ। লোকে যে বলে দক্ষিণেশ্বরে এক পাগলা বামুন আছে, ঠিকই বলে।

পাগল নয় তো কি। পাগল না হলে কি মানুষের মধ্যে ঈশ্বর দেখে। যাকে দেখা যায় না শোনা যায় না তার জন্যে অশ্রুবর্ষণ করে কেউ? এমন কাণ্ডজ্ঞানশূন্যের মত কথা বলে?

কিন্তু পাগল বলে এক কথায় উড়িয়ে দেবার মত সায় পায় না মনের মধ্যে। পাগল কি এমন হিরণ্ময় হয়? হয় কি এমন পুলকোদ্ভিন্নসর্বাঙ্গ? বচনে কি এত মধু থাকে? কথা কি হয় শ্রবণমঙ্গল? এমন লোকার্তিহর হাসি কি তার মুখে থাকে? কণ্ঠে ও চাহনিতে, স্পর্শে ও কাতরতায় থাকে কি এমন মেদুর-মেঘের মমতা, অমৃতবর্ষণ স্নেহ?

কে জানে। কী হবে বিচার-বিতর্ক করে? এ যেন এক তর্কাতীত, তত্ত্বাতীত অনুভূতি। শুধু দেখা যাক। শুধু শোনা যাক। নিরুদ্ধ নিশ্বাসে থাকি শুধু নিশ্চল হয়ে।

'তুই একটু বোস। তোর জন্যে খাবার নিয়ে আসি।' দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকল রামকৃষ্ণ।

চকিতে ফিরে এল খাবারের থালা নিয়ে। প্রায় পাগলের ব্যাকুলতায়। যদি এই ফাঁকে পালিয়ে যায় ননীচোর। যদি অন্ধকারে অন্তর্ধান করে!

না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে নরেন। বর্তমান-ভবিষ্যৎ কিছুই নির্ণয় করতে পারছে না। শুধু ভাবছে, আমি কি সার্ধ-ত্রিহস্ত পরিমিত মাংসপিণ্ডময় সামান্য একটা দেহ? না, কি আমি বিরাট, আমি মহান, আমি অনন্তবলশালী পরমাত্মা?

থালায় কতগুলি সন্দেশ, মাখন আর মিছরি।

হাতে করে নরেনের মুখের কাছে খাবার তুলে ধরল রামকৃষ্ণ। বললে, 'খা, হাঁ কর।'

সে কি, আমার বন্ধুরা যে রয়েছে সঙ্গে।' মুখ সরিয়ে নিতে চাইল নরেন। দিন, আমার হাতে দিন, ওদের সঙ্গে ভাগ করে খাই।

কে শোনে কার কথা।

'হবে'খন, ওরা খাবে'খন পরে—আগে তুমি খাও।' জোর করে মুখে পুরে দিতে লাগল রামকৃষ্ণ।

কৌশল্যা হয়ে রামকে খাইয়েছি, যশোদা হয়ে ননীগোপালকে। খা, এই নে আমার হৃদয়বেদ্য নৈবেদ্য। তুই জানিস না তুই কে? তুই সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী নারায়ণ।

জোর করে সবগুলি খাবার খাইয়ে দিলে।

'বল, আবার আসবি। দেরি করবি না একেবারে। ঠিক তো?' রামকৃষ্ণ মিনতি জানাল। বললে, স্বর নামিয়ে বললে, 'কিন্তু দেখিস, একা-একা আসবি।'

পাগল? কিন্তু এমন দরদী-মরমী হয় কি করে? কথা কি করে হয় এমন অমিয়জড়িত?

'আসব।'

'আর শোন, একটু বেশি-বেশি আসবি। প্রথম আলাপের পর বরং একটু ঘন-ঘনই আসে। কেমন, আসবি তো?'

'চেষ্টা করব।'

ঘরের মধ্যে ফের চলে এল দুজনে। একদৃষ্টে নরেন দেখতে লাগল রামকৃষ্ণকে। পাগল কি এমন সদালাপ করে, পাগলের কি ভাবসমাধি হয়? পাগল কি ঈশ্বরের জন্যে পাগল হয়?

'লোকে স্ত্রী-পুত্রের জন্যে ঘটি-ঘটি চোখের জল ফেলে,' বলতে লাগল রামকৃষ্ণ, 'কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে কাঁদে কে? কাশী যাওয়া কী দরকার যদি ব্যাকুলতা না থাকে। ব্যাকুলতা থাকলে এইখানেই কাশী। এত তীর্থ, এত জপ, হয় না কেন? যেন আঠারো মাসে বৎসর। হয় না তার কারণ, ব্যাকুলতা নেই। যাত্রার গোড়ায় অনেক খচমচ খচমচ করে, তখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় না। তারপর নারদ ঋষি যখন ব্যাকুল হয়ে বৃন্দাবনে এসে বীণা বাজাতে-বাজাতে ডাকে আর বলে, প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন। তখন কৃষ্ণ আর থাকতে পারেন না। রাখালদের সঙ্গে সামনে আসেন আর বলেন, ধবলী রও। ধবলী রও!'

'দেখা যায় ঈশ্বরকে?' কে একজন জিগগেস করলে।

'তিনি আছেন, আর তাঁকে দেখা যাবে না? যেকালে তিনি আছেন সেকালে দ্রষ্টব্য হয়েই আছেন।'

'আছেন?'

'জগৎ দেখলেই বোঝা যায় তিনি আছেন। কিন্তু তাঁর বিষয়ে শোনা এক, তাঁকে দেখা আর-এক। কিন্তু দেখার উপরেও বড় কথা আছে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা। কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ খেয়েছে। দেখলেই আনন্দ, খেলেই বল-পুষ্টি।'

সমস্ত যেন প্রত্যক্ষ করেছে এমনি প্রজ্বলন্ত অনুভূতি। পাগল বলতে চাও বলো। কিন্তু আর

ঊর্ধ্বস্থান ত্যাগ দেখ। ঈশ্বরের জন্যে সর্বস্বত্যাগ। দেখ তার আয়সী-কঠিন পবিত্রতা। তার অমল-ধবল আনন্দ। তার অতল-গভীর শান্তি। এ যদি পাগল হয় তবে পাগলের আরেক নাম সচ্চিদানন্দ।

নরেনের মনে হল পরম তীর্থে বসে আছি। যার দ্বারা মানুষ দুঃখ থেকে পার হয় তার নাম তীর্থ। জল ত্রাণ করে না, উলটে ডুবিয়ে মারে। নৌকোই তীর্থ, সেই উত্তীর্ণ করে দেয় নদ-নদী। রামকৃষ্ণ সেই ভবসাগরতারণি। সকল তীর্থের সার।

এবার উঠতে হয় নরেনের।

প্রণাম করল। প্রেমস্মিতস্নিগ্ধহাস্যে তাকিয়ে রইল রামকৃষ্ণ।

কোথায় আর যাবি, কত দূর? তোকে এই তীর্থপ্রদ পাদসরোজপীঠে আসতেই হবে বারে-বারে। তোকে নির্বিতর্ক হতে হবে, নিঃসংশয় হতে হবে। অবগাহন করতে হবে এই করুণাঘন অগাধ সমুদ্রে। বেরুতে হবে জগজ্জয়ের মশাল নিয়ে।

আজ যা।

'আর কোনো মিঞার কাছে যাইব না।' গাজীপুর থেকে লিখছে বিবেকানন্দ: 'এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে intense sympathy বদ্ধজীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই।...তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই—আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালবাসা আমার পিতা-মাতায় কখনো বাসে নাই। ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা কঠোর সত্য এবং তাঁহার শিষ্যমাত্রেই জানে। বিপদে, প্রলোভনে, ভগবান রক্ষা করো, বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি—কেহই উত্তর দেয় নাই—কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন, নিজে অন্তর্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন। যদি আত্মা অবিনাশী হয়—যদি এখনও তিনি থাকেন, আমি বারংবার প্রার্থনা করি, হে অপারদয়ানিধে, হে মমৈকশরণদাতা রামকৃষ্ণ ভগবন, কৃপা করিয়া আমার এই নরশ্রেষ্ঠ বন্ধুবরের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো। আপনার সকল মঙ্গল, এ জগতে কেবল যাঁহাকে অহেতুক দয়াসিন্ধু দেখিয়াছি, তিনিই করুন।'

আজ যা। আবার আসিস। দেখিস দেরি করিস নে যেন।

'মনের কথা কইবো কি সই কইতে মানা
দরদি নইলে প্রাণ বাঁচে না।
মনের মানুষ হয় যে জনা
নয়নে তারে যায় গো চেনা
সে দু-এক জনা।
সে যে রঙ্গে ভাসে প্রেমে ডোবে
করছে রসের বেচাকেনা॥
মনের মানুষ মিলবে কোথা
বগলে তার ছেঁড়া কাঁথা,
ও সে কয় না কথা।
মনের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা॥'

কেশব সেনকে বললে রামকৃষ্ণ: 'জগদম্বা তোমাকে একটা শক্তি, মানে বক্তৃতা-শক্তি, দিয়েছেন বলে তুমি জগৎমান্য হয়েছ, কিন্তু মা দেখাচ্ছেন নরেন্দ্রের ভিতর আঠারোটা শক্তি আছে। নরেন্দ্র খানদানি চাষা, বারো বছর অনাবৃষ্টি হলেও চাষ ছাড়ে না।'

নরেন্দ্র খাপখোলা তরোয়াল।

মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় রুই—আর সব পোনা, কাঠিবাটা। অন্যেরা কলসী-ঘটি, নরেন্দ্র জালা।

'ওর মদ্দের ভাব—পুরুষভাব; আর আমার মেদি ভাব—প্রকৃতিভাব।'

ওরে, আয়, দেখা দে। সেই যে আসবি বলে গেলি, আর এলি না। আমি যে তোর জন্যে পথ চেয়ে বসে আছি। তুই এলে আমি বিহ্বল হই, বিবশ হয়ে পড়ি; জানি, সব জানি, তবু তুই আয়।

[ক্রমশঃ।

আত্ম-তৃপ্তি

"কিন্তু মানুষের প্রীতিলাভ করেছি অজস্র এবং যে হেতুক সে প্রীতি অধিকাংশ পরিমাণে অপরিচিত অনাত্মীয়দের কাছ থেকে পেয়েছি এই জন্যে তাকে আমি সর্বমানবের দান বলে নতশিরে গ্রহণ করি।"

—রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্র

ওঁ

[পত্রখানি স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্রী ও স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা, "সুপ্রভাতে"র সম্পাদিকা স্বর্গীয়া কুমুদিনী বসুকে লিখিত। শ্রীসুকুমার মিত্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

বোলপুর

কল্যাণীয়াসু,

আমি তোমার কাছে বড় লজ্জায় পড়িয়া কবুল করিতেছি যে হারাইতে এবং ভুলিতে আমার মত আর দ্বিতীয় নাই। কলিকাতায় যে সময় তোমার চিঠি পাইলাম তখন জবাব দিবার অবকাশমাত্র ছিল না—বোলপুরে আসিয়াই তোমাকে চিঠি লিখিতে যেন না ভুল হয় এই বলিয়া মনকে একটু বিশেষ তাগিদ দিয়াছিলাম এবং চিঠিখানিও পাছে হারায় বলিয়া বিশেষ কোনো একটা নিরাপদ স্থানে রাখিয়াছিলাম—সেইটেই অন্যায় কাজ হইয়াছিল এবং সেই জন্যই আজ পর্য্যন্ত সে চিঠি আমার নজরে পড়ে নাই।

তোমাদিগকে আমরা নিতান্তই আত্মীয় বলিয়া জানি। তোমার মাতামহের সঙ্গে আমাদের যে নিকট-সম্বন্ধ ছিল তাহা তোমরা ঠিক জান না—কেন না শেষ বয়সে দেওঘরে যাপন করিয়া আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ ঘটিত না। কিন্তু আমাদের জীবনরচনার সঙ্গে তাঁহার স্মৃতি চিরদিনের মত জড়িত হইয়া আছে।

অতএব তোমরা আমার কাছে কিছু দাবী করিলে উড়াইয়া দিতে পারি না। এদিকে মুস্কিল হইয়াছে এই যে কবিত্বকাণ্ড এক রকম শেষ করিয়া বসিয়া আছি—বীণা বেণু ছাড়িয়া এখন ইস্কুলমাষ্টারিতে ভর্ত্তি হইয়াছি—ছন্দে বন্ধে লিখিবার কথা এখন মনেও উদয় হয় না—লিখিতে বসিলে বোধ হয় বিভ্রাট ঘটিতে পারে—"বোধ হয়"টুকু তোমাদের কাছে মান বাঁচাইবার জন্য বলিলাম কিন্তু সত্যই মনের মধ্যে কবিতা লেখার কোনো তাড়া নাই তাহার একমাত্র কারণ, ক্ষমতা নাই। কবিতা ফুরাইয়াছে বলিয়াই থামিয়াছে, কাজেই সরস্বতীর সঙ্গে একটা কোনো সম্বন্ধ রাখিবার জন্যই ছেলে পড়াইতেছি।

পুরানো খাতাপত্র খুঁজিলে হয়ত কিছু পাওয়া যাইতে পারে—কিন্তু সে ত তোমার সুপ্রভাতের নবীন কিরণে মানাইবে না—সে সমস্ত অত্যন্ত জীর্ণ। যাই হোক তোমার প্রার্থনা আমি ব্যর্থ করিতে পারিব না। অতএব দুই একদিনের মধ্যেই আবার একবার ছন্দের বেতালটাকে তন্ত্রমন্ত্র পড়িয়া ডাক দিব। কিন্তু বেশি কিছু আশা করিয়ো না—যাহা পারি তাহার ত্রুটি হইবে না কিন্তু সাধ্য এখন অল্পই।

আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়ো। ঈশ্বর তোমার তরুণ জীবনকে মঙ্গলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সার্থক করুন। ইতি ৭ই বৈশাখ ১৩১৪।

আশীর্ব্বাদক

(স্বাঃ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নেপোলিয়ানের পত্র

[১৭৯৬ সালের মার্চ মাস। ফরাসী বাহিনীর একজন উচ্চাকাংখী তরুণ অফিসার মাত্র তখন নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। তৎকালীন ফরাসী অভিজাত সমাজের হাস্যময়ী লাস্যময়ী যৌবনা হলেন মেরী জোসেফিন। জেকবদের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন তার

স্বামী ফ্রান্সেরই একজন প্রাক্তন অভিজাত। সুতরাং তরুণ বয়সে কনিষ্ঠ এই অফিসারকে বিবাহ করতে সম্মতি দিয়ে সেদিন মেরী জোসেফিন অভিজাত সমাজকে আশ্চর্য করেছিলেন সন্দেহ নেই। নেপোলিয়ান লিখেছিলেন যে, মেয়েটি তার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়েছে। তিনি আহারে রুচি পান না। নিদ্রায় শান্তি পান না। বন্ধু-মহলে আনন্দ পান না। যশের লোভ কমে গিয়েছে। লিখেছিলেন—'তোমার তুষ্টির জন্যই আমি যুদ্ধ জয় লাভ করতে চাই···কি যে অন্তহীন ভালবাসায় ভরে দিয়েছ আমায়'—

এই সময়েই নেপোলিয়ান নির্বাচিত হন ইতালী অভিযানের প্রধান সেনাপতির পদে। বিবাহের দু'দিন মাত্র পরে নেপোলিয়ান প্যারিসের মধুযামিনীর আশা পরিত্যাগ করে রণক্ষেত্রে যাত্রা করেন। স্বামী নবপরিণীতা বধূকে কাছে পাবার জন্য আকুল হয়েছিলেন কিন্তু সামরিক দপ্তরের নিষেধে তা সম্ভব ছিল না, এমন কি পত্নীর চিঠি যেত তাঁর কাছে কদাচিৎ। মিলানে পদার্পণ করলেন যেদিন বিজয়ী সেনাপতি, সেই দিনই সামরিক দপ্তরের নিষেধাজ্ঞা রহিত হোল এবং জোসেফিন স্বামীর সান্নিধ্যে যেতে পারলেন।

নেপোলিয়ানের প্রণয়ার্ত হৃদয়ের চিঠিগুলি অমর হয়ে আছে।]

ভেরোনা, ১৩ই নভেম্বর, ১৭৯৬

ভালবাসি না, একটুও ভালবাসি না; তোমায় বরং ঘৃণা করি আমি। দুষ্ট মেয়ে। একটা চিঠি লেখো না আমায়। স্বামীকে একটুও ভালবাসো না তুমি। তুমি ত জান তোমার চিঠি পেলে কত খুশী হয় তোমার বর, তবু ছ'লাইন একখানা চিঠি পাঠাও না তুমি।

কেন এমন করো? কি এমন কাজে তুমি ব্যস্ত যে প্রণয়মুগ্ধ প্রিয়জনকে একটু লিখে পাঠাতে পারো না? যে স্নিগ্ধ অব্যয় প্রেমের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তা সরিয়ে রেখেছ কিসের তাগিদে, শুনি না? কোন সে অনুপম প্রাণী, তোমার সেই নতুন প্রণয়ী; যে তোমার প্রতিটি মুহূর্ত ঘিরে আছে, তোমার দিন-রাত্রি আগলে আছে, স্বামীর প্রতি মনোযোগে তোমায় বাধা দিচ্ছে? জোসেফিন, একটু সতর্ক থেকো। কোন দিন নিশীথ রাত্রে তোমার দ্বারের আগল ভেঙে আমি গিয়ে উপস্থিত হব।

সত্যি বড় উতলা হয়ে আছি প্রিয়ে তোমার সংবাদ না পেয়ে;

কেহ হয়ত শাস্তি এড়াইয়া যাইতে পারে, কিন্তু একটা সমগ্র জাতির সম্মান ক্ষুণ্ণ করিয়া কখনই কেহ দণ্ডের হাত এড়াইতে পারিবে না। বিশ্বাসঘাতকদের এবার আমরা চিনিতে পারিয়াছি। ইতালীর হৃৎপিণ্ডে এখনও দামামা বাজিতেছে। সমগ্র দেশের মর্মে স্পন্দন না জাগিলেও ব্যাধির মূল জানিয়াছি—তাহা সমূলে উৎপাটিত করিতে পারিব।

নিষ্ফল বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া বিশ্বাসঘাতকতা ও দুর্বৃত্ততা দ্বারা জনসাধারণের মনোবল ভাঙ্গিতে সক্ষম হইয়াছে সত্য, কিন্তু জনসাধারণ এই বিশ্বাসঘাতকতা ও দুর্বৃত্ততা কখনো ভুলিবে না। যে মুহূর্তে তাহারা এই আতংকের হাত হইতে আত্মস্থ হইতে পারিবে আবার ভীষণ বিদ্রোহানল তীব্র প্রচণ্ডতায় জ্বলিয়া উঠিবে। সেদিন নিঃশেষে ধ্বংস করিবে সেই সব কাপুরুষদের—যারা এই বিদ্রোহকে কালিমা-লিপ্ত করিয়াছে। চিঠির উত্তর দিও। তোমার এবং মা ও ছেলেমেয়েদের কুশল সংবাদ চাই। আমার জন্য চিন্তা করিও না। আগের চেয়ে আমার শরীর ঢের ভাল—আমি নিজেকে ও আমার বারশ' সশস্ত্র অনুগামীকে অজেয় মনে করি। রোম এবার একটি মহান্ ইতিহাস রচনা করিবে। সমস্ত সাহসী বীরেরা চারি দিকে সমবেত হইয়াছে—ভগবান আমাদের সহায়। বিদায়। ইতি—

তোমার গিসোপ্পি।

[এই পত্র লেখার দশ দিন পরে রোম অবরোধের যুদ্ধে গারিবল্ডি বিরাট সাফল্য লাভ করেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি আহত হয়েছিলেন কিন্তু তবুও তিনি সারা দিন অশ্বপৃষ্ঠ ত্যাগ করেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি বিশ্বস্ত অনুগামীদের নিয়ে ভেনিসে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হন। ফরাসী, স্প্যানিশ ও অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যরা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে, কিন্তু তিনি তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে পার্বত্য পথে পালিয়ে যান। এই সময় আনিটাও সঙ্গিনী ছিলেন স্বামীর। তিনি পথে আহতদের শুশ্রূষা করেছেন—সাহস দিয়েছেন স্বেচ্ছাসেবকদের মনে। কিন্তু হঠাৎ তিনি নিজেই পীড়িত হয়ে পড়লেন—দেহের শক্তি দ্রুত নিঃশেষিত হতে লাগল। জলের জন্য আর্তনাদ করতে লাগলেন তিনি, কিন্তু এক বিন্দু জলও ছিল না সঙ্গে। শেষে গহন অরণ্যে স্বামীর কোলে মাথা রেখে অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করেন এই মহীয়সী নারী]

পুরুষ-পরীক্ষা

পুরুষের বন্ধুবর্গকে দেখলেই পুরুষকে চেনা যায়।

পুরুষ, ঘোড়া এবং কুকুর কখনও একে অন্যের সখ্যে ক্লান্ত হয় না।

পুরুষের সহ্যশক্তি মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেলেও থাকে।

পুরুষের মুখে হাসি না থাকলে দোকান খোলা উচিত নয়।

পুরুষ তত বৃদ্ধ যত সে মনে করে, নারী তত যত নারীকে দেখায়।

পুরুষ হ'লো বুদ্বুদ।

পুরুষই যত কিছুর মাপকাঠি।

পুরুষ কামনা করে, ঈশ্বর বাধ সাধেন।

পুরুষকে ইঞ্চিতে মাপা যায় না।

পুরুষ কখনও একসঙ্গে বাঁশী বাজাতে এবং মদ্যপান করতে পারে না।

পুরুষ সুখী বা দুঃখী হয় যেমন সে মনে করে।

পুরুষ, যে সকল রকম কাজে পটু, রবিবারে তাকে ভিক্ষা মাগতে হয়।

পুরুষ খড় হ'লেও সোনার মহিলার সমতুল্য।

পুরুষ বিস্মিত হ'লেই অর্দ্ধেক পরাভূত হয়।

পুরুষ যা পারে করে, ঈশ্বর যা ইচ্ছা করেন।

পুরুষ, নারী এবং দানব—তিনটিই তুলনার বস্তু।

—ইংরাজী প্রবাদ থেকে অনূদিত।

ক
ব
রী

—চঞ্চল মিত্র
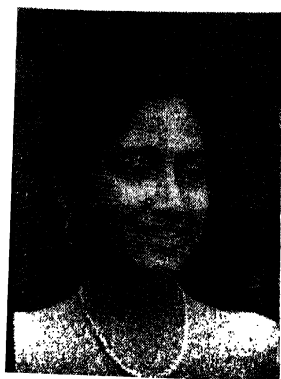
—মনোজ ঘোষ

—অনিল ঘোষ

ক
ব
রী

প্রতিযোগিতা

বিষয়

কলকাতা

প্রথম পুরস্কার ১৫৲ দ্বিতীয় পুরস্কার ১০৲

তৃতীয় পুরস্কার ৫৲

ছবি পাঠানোর শেষ দিন ২২শে আষাঢ়

—তপন মতিলাল

সূর্য্যমুখী

—হিমাংশু পাল

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar
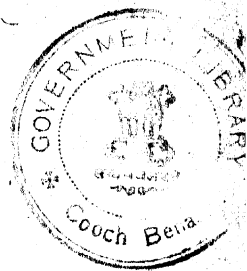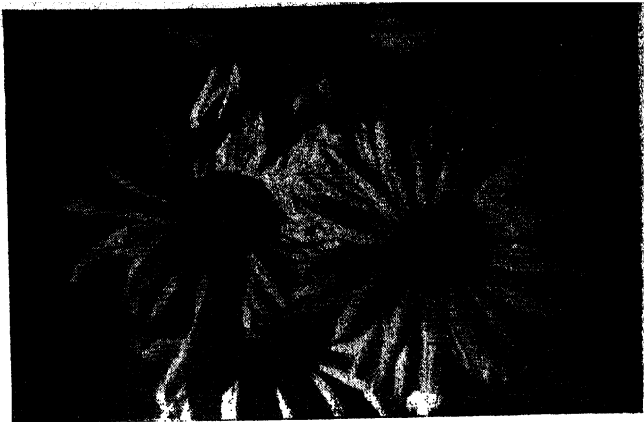
কেশচর্চ্চা

—পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী

—পরিমল গোস্বামী

ঘুরিয়ে দেখুন

—অর্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক

আকাশ-পাতাল

অ, আ, ই
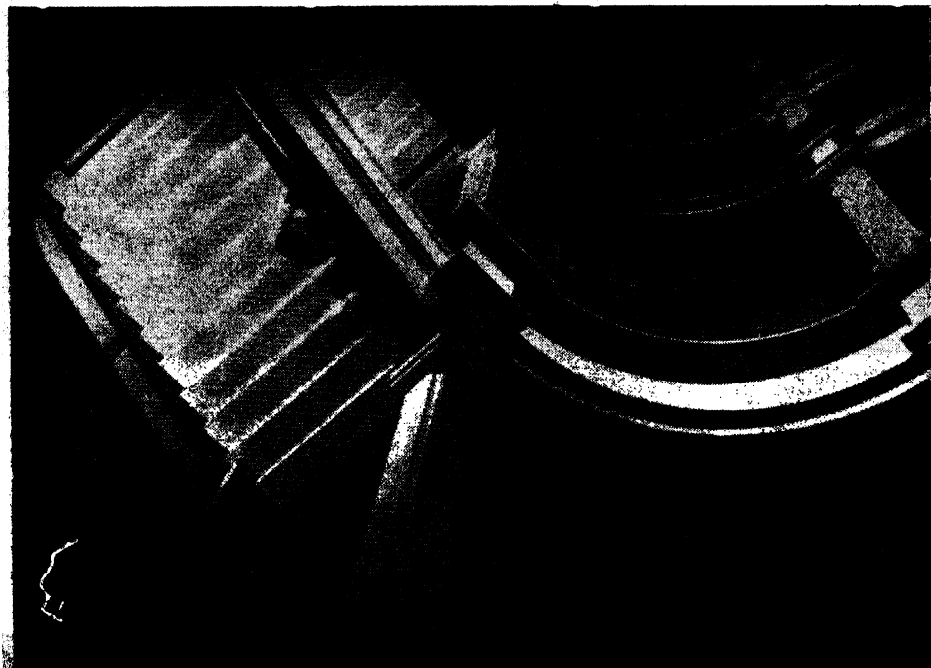
ঘেমে উঠেছিল রাজেশ্বরী।

ভাঁড়ার ঘর। দু'-মানুষ উঁচুতে জানলা। যেন গারদ-ঘর। জেলের সেল। হাওয়া ঢোকে না। কড়িকাঠের শিকেগুলো স্থির অচঞ্চল হয়ে থাকে। নর্দমার মুখে থান ইট। পোকা-মাকড় যাতে না ঢুকতে পায়। মেয়েদের মহল, যে জন্য দু'-মানুষ উঁচুতে জানলা। আলো আসে কি না আসে। ঘেমে উঠেছে রাজেশ্বরীর কপাল, জামার পিঠ ভিজে গেছে হয়তো। বদ্ধ ঘর, তবুও ঘরে আছে নানা ফলের গন্ধ। পাকা ফলের সুগন্ধ। দড়িতে টাটকা কদলী, ঝুড়িতে আঙুর, আপেল, খেজুর। কাঁচা ডাব। আখ। তেকাটায় আমসত্ত্ব। হাঁড়িতে নাড়ু। শিকেয় লাউ-কুমড়ো। চীনা মাটির জারে বাদাম-পেস্তা। জালায় ঘি। বঁটিতে বসেছিল রাজেশ্বরী। শশা কাটছিল।

দাসী-মহলে চাঞ্চল্য পড়েছে। রূপোর গেলাশ-রেকাব বেরিয়েছে। গোলাপপাশ বেরিয়েছে। পানের ডিবে। ফল আর মিষ্টি একেক রেকাবে। জলে ক্যাওড়া।

—ক'জন আছে গানের ঘরে?

ঘোমটার ভেতর থেকে শুধোয় রাজেশ্বরী। ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞেস করে।

হুজুর তাড়া দেওয়ায় অনন্তরাম জল-খাবারের কত দূর খোঁজ করতে আসে। বলে,—আছে জনা বারো-তেরো। এক দল যাকে বলে।

রূপোর ফুলকাটা রেকাবের সারি। ফল আর মিষ্টান্ন সাজায় ব্রাহ্মণী। উপকরণ জোগায়। পেস্তা কুঁচোয়! রেকাবীতে দেয় গোলাপী প্যাড়া, অমৃতি জিলাপী, ক্ষীরের ছাঁচ। মিছরী-মাখন।

মোমের মত দু'টো হাত, চাঁপার কলির মত আঙুল। হাতে দু'-তিন প্যাটার্ণের চুড়ি। ভাঁড়ারে শব্দ শোনা যায় ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন। বঁটিতে বসেছিল রাজেশ্বরী।

আখরোট কাঠের ট্রে বেরিয়েছে কয়েকটা।

অনন্তরাম ট্রে সাজায় রেকাবীতে। একটাতে জলের গেলাশ। দাসীদের কে একজন ডিবে বসিয়ে দিয়ে যায়। পান-মশলা। সুপুরি-জর্দ্দা।

অনন্তরাম বললে,—ভুলেই গিয়েছি বলতে। ভাবছি যে কি যেন বলি নাই! মনে প'ড়েছে—

রাজেশ্বরী ভাবে কিছু বুঝি ত্রুটি হয়েছে। ভুল হয়ে গেছে কিছু। ভয়ে ভয়ে বললে,—কি অনন্ত?

কাঁধের ফর্সা তোয়ালেটা প'ড়ে যায়-যায় হয়েছিল। তোয়ালেটা ঠিক করতে করতে বললে অনন্তরাম,

—লবঙ্গ-আদা চেয়েছিল। বলতেই ভুলেছি। মনেই নাই।

ঝুড়ি থেকে আদা তুলে কুঁচোতে থাকে রাজেশ্বরী। বলে, ব্রাহ্মণীকে বলে,—দাসীকে লবঙ্গ দিতে বলুন।

অনন্তরাম বললে,—বৌ, দেখো তুমি, বলে যাচ্ছি আমি। পিসীর ছেলে দু'টি চট ক'রে উঠছে না।

রাজেশ্বরী ভাবলে, নাই বা উঠলো। ঘরে থেকে যদি দিন কাটে, ভালই তো। ক্ষণেকের জন্য। রাজেশ্বরী যেন ভাবতে চায় না কিছু। আর ভাববে না, যা ইচ্ছা হোক। আজকে কেন যখন-তখন বুকটা ছাঁৎ-ছাঁৎ করে! ঠাগমাকে মনে পড়ছে ঘন-ঘন। ঠাগমার বুক-ভরা ডাক শুনছে যেন কানে। দন্তহীন মাড়ি, ডাকছেন যেন অস্ফুট কথায়।

—তুমি খাও বৌ। না খেলে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হয়।

ব্রাহ্মণী ফিস-ফিস কথা কয়। কথা বলে কত যেন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। বলে,—মুখে কিছু দাও। কথা শোন ভালমানুষের মেয়ের মত।

রাজেশ্বরী ফ্যাল-ফ্যাল চেয়ে থাকে কাজল-কালো চোখে। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন অনুমানে বোঝে ব্রাহ্মণী কি বলতে চায়। বলে,—না বামুনদিদি, আমি আগে নাট-মন্দির থেকে ঘুরে আসি।

কথা শুনে খানিক থেমে থাকে ব্রাহ্মণী। ভেবে-চিন্তে বলে,—যেতে-আসতেই বেলা কাবার হয়ে যাবে যে বৌ! ও-বেলায় যেও বৌ। মুখে কিছু দাও এখন।

—তা হোক।

বললে রাজেশ্বরী। ভিজে হাত আঁচলে মুছতে মুছতে বললে মিনতির সুরে,—তা হোক। আমি ঘুরে আসি।

—কি বলবো বলো! বললে ব্রাহ্মণী।

—বিনো, চলো তো আমার সঙ্গে। আমি নাট-মন্দিরে যাবো।

কথা বলতে বলতে উঠে পড়ে রাজেশ্বরী। ভিজে চুলের খোঁপা ছিল মাথায়। খোঁপাটা খুলে দেয়। কেশের রাশি লুটিয়ে পড়ে পিঠে। কণ্ঠে আঁচল বেষ্টন করে ভক্তিভাবে। বলে,—বামুনদি, যদি আর কিছু চেয়ে পাঠায় তো দেবেন।

একটা চাপা কলরোল থেকে থেকে ভেসে আসে।

যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সহাস্য উল্লাস। বর্ষা-দিনের হিমকণাবাহী হাওয়া বইছে এলোমেলো। সুরের ঝঙ্কার লেগে হয়তো মাতাল হয়েছে হাওয়া। শুভ্র প্রাতঃকালের আলোয় গাছে-গাছে ডাকছে পাখী। বুলবুলি আর শালিক। যতই হোক, বাজরত যন্ত্রসঙ্গীত শুনে মুগ্ধ

হ'চ্ছে হয়। অর্গ্যান বেজে চলেছে না অন্য কিছু? হয়তো কেউ পিয়ার্ডোফোন বাজাচ্ছে। কে জানে!

দুঃসময়ে কানে যদি কেউ গান-বাজনা শোনায় তৃপ্তি পাওয়া যায় না। তবুও নাট-মন্দিরে যেতে যেতে বাজনা শুনে হতচকিতের মত দাঁড়িয়ে পড়ে রাজেশ্বরী। পিসীর ছেলেরা তবে নেহাৎ অকর্ম্মা নয়, ভাবে রাজেশ্বরী। কার ভেতর কি আছে কে বলতে পারে? পিসীমা, হেমনলিনী, শ্বশুরদের একমাত্র ভগিনী, তিনিও যে সঙ্গীতরসিক। এখনও ধ'রে বসলে রবিবাবুর গান গাইতে তিনি লজ্জাবোধ করেন না। এখনও সুর আর স্বরলিপি খুলে গান তুলতে দেখা যায়।

প্রণাম-শেষে চলে আসছিল রাজেশ্বরী।

পূজায় রত ব্রাহ্মণ অপরাজিতা পুষ্পে শালগ্রামশিলা স্পর্শ করে। বলে,—মা লক্ষ্মী, চরণের ফুল নিয়ে যাও।

রাজেশ্বরী হাত মেলে। চাঁপার কলির মত আঙুল। যেন অলক্তক মেখেছে করতলে। দু'-আঙুলে দু'টি আঙটি। একটা চুনীর, আরেকটা পল্‌কি হীরের।

পুরোহিত ছিলেন নাট-মন্দিরেই, কোন থামের আড়ালে। গলকম্বল দোলাতে দোলাতে কখন এসে দাঁড়িয়েছেন পেছনে। বিড়-বিড় করছেন,—ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ—

পুষ্প আর ধূপ। চন্দন আর অগুরুর সুগন্ধি: গন্ধতৈল।

নাট-মন্দিরে পবিত্র হাওয়া। পবিত্র গন্ধে ভ'রে আছে নাট-মন্দির। বেদীর অন্য পাশে একজন ব্রাহ্মণ। বেদ না উপনিষদ পাঠ করছেন। নয় তো চণ্ডীপাঠ করছেন। চড়াইয়ের ঝাঁক মন্দিরের দালানে। আতপ তণ্ডুল চয়ন করছে।

—বধূমাতা!

পুরোহিত বললেন কম্পিত কণ্ঠে। করে উপবীত ধারণ ক'রে। বললেন,—কিঞ্চিৎ সময় আমি অপব্যয় করাতে চাই। কিছু বক্তব্য ছিল।

ফ্যাল-ফ্যাল চোখ তুলে তাকায় রাজেশ্বরী। চেয়ে থাকে সরল দৃষ্টিতে। চোখের মণিতে আকাশের ছায়া দেখা যায়। অপরাজিতা পুষ্প হাতে পিষ্ট হ'তে থাকে।

পুরোহিত বললেন,—শশীবৌয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তো?

রাজেশ্বরী বললে,—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি তো প্রায়ই—

—হ্যাঁ, আমি জানি। বললেন পুরোহিত। কেন কে জানে সামান্য হাসি ফুটে ওঠে ওষ্ঠপ্রান্তে। বলেন,—শশীবৌ ডেকে পাঠিয়েছিলেন কাল। অনেকক্ষণ যাবৎ বাক্য-বিনিময় হয়। কথা বলতে-বলতে শালগ্রামশিলার বেদীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন। মুখে সেই মৃদু হাসি। বলেন,—এখন যদি গৃহস্থকর্ম্ম থাকে অন্য সময়ে—

রাজেশ্বরীর সঙ্গে ছিল বিনোদা। বললে,—কচি বৌ, এখনও মুখে কিছু প'ড়লো না। কথা তো পালাচ্ছে না। ডাকলেই বৌ আসবে। চল' বৌ চল'। কথা পালাচ্ছে না।

পূর্ণশশীকে ক'দিন দেখেছে রাজেশ্বরী যে কথা বলবে। [illegible] —মর্যাদা কথা।

রাজেশ্বরী চললো ক্লান্তপদে। গৃহাভিমুখে চললো।

বিনোদা পেছন-পেছন যায়। বলতে-বলতে যায়,—ঢের দেখেছি আমি। সত্যনারাণের পাঁচালী মুখস্থ নেই, পুরোহিত হয়েছে!

বর্ষা-মুখর সকাল। শীত পড়ো-পড়ো হয়েছে। গাছে-গাছে শালিক আর বুলবুলি নাচানাচি করছে। একেক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে থেকে-থেকে। হাওয়ায় শীতের আমেজ পাওয়া যাচ্ছে!

আঃ। ভাঁড়ারের গুমোট থেকে বেরিয়ে ঘর্ম্মাক্ত কপালে ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ পেয়ে বলতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু রাজেশ্বরীর মাথায় গুণ্ঠন।

অদূরে কাছারীর দালানে জটলা পাকিয়ে বসেছিল মনোহরপুরের এক দল মানুষ। রৌদ্রদগ্ধ রঙ; চোখে-মুখে গ্রাম্য দৃষ্টি। চাষ করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে লাঙল চালায় মাঠে। মাটিকে হয়তো চেনে, মানুষকে চেনে না। কাছারীর দালানে কৌতূহলী চোখে তাকিয়েছিল প্রজাগণ। কুলবধূকে দেখছিল। দেখছিল কি সুলক্ষণা দেহাকৃতি! কত বিনম্র যেন বধূটি। কত কচি।

রাজেশ্বরীর তখন চোখ ফেটে প্রায় জল নেমেছে।

পিত্রালয়ের জন্য মনটা অধীর হয়ে উঠছে যখন-তখন। ঠাগমাকে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। প্রত্যেকটা ঘর যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে—জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত যে-ঘর দেখে এসেছে রাজেশ্বরী। ডাকছে যেন রাজেশ্বরীকে। ঠাকুমার আদো-আদো ডাক কানে ভাসছে যেন। পূজা আসছে, কত আমোদ-আহ্লাদ করতো ঠাগমা। জল নামে রাজেশ্বরীর চোখে।

তুঁতে রঙের আটপৌরে শাড়ী-পরিহিতা ঐ যে যাচ্ছে—মনোহরপুরের প্রজাগণ লক্ষ্য ক'রে দেখে জমিদার-বধূকে। স্তব্ধ-বিস্ময়ে দেখে। কাছারীর দালানে চ্যাটাই বিছিয়ে বসেছে খাজাঞ্চী। মনোহরপুরের মানুষদের নাম ধাম গোত্র লিখছে। খাজনার টাকা জমা করছে। খাজাঞ্চীর চোখে চশমা রূপোর ফ্রেমের, কানে কলম। টাকা বাজিয়ে দেখে নেয় খাজাঞ্চী। দলের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে। বলে,—কি দেখছো কি অন্নদা? বৌ যা হয়েছে, দেখবারই মত। যাকে বলে তোমার ডানাকাটা পরী।

দলের প্রতিনিধি অন্নদা, কথা শুনে লজ্জা পায়। বোকা-হাসি হাসে। বলে,—হবেই তো মশাই। হবেই তো।

খাজাঞ্চী বললে,—হবে তো বটে, এখন কি খাওয়া হবে বলো। প্রাতর্ভোজন কি করবে বলো?

অন্নদা যেন বিনয়ে কেমন হয়ে যায়। বলে,—দু'টি ক'রে মুড়ী দিয়ে যান না মশাই!

খাজাঞ্চী বলে,—তোমরা দেখছি নেহাতই গেঁয়োভূত! এয়েছো জমিদার-বাড়ী, খেয়ে যাও মনের সুখে। মুড়ী খাবে কি বলছো অন্নদা! ওরে, কে কোথায় গেলি গেরস্থকে বলে আয় প্রজাদের খাবার দেবে। জল-খাবার দেবে।

পিয়ার্ডোফোন বেজে চ'লেছে না কি! অন্দরে গিয়েও শুনতে পায় রাজেশ্বরী। যন্ত্রসঙ্গীত শুনতে পায়। পিসীর ছেলেদের দলে হয়তো গুণী আছে কেউ-কেউ। গাইয়ে-বাজিয়ে! ভেতরে পৌছতেই হঠাৎ কোথা থেকে হাজির হয় অনন্তরাম। বলে,—বৌদিদি, একটা হুকুম ক'রে দাও।

'—অনন্ত, কি বলছো বল'। বললে রাজেশ্বরী। বললে ভয়ে-ভয়ে। কোন ত্রুটি হয়ে থাকে যদি।

—বৌদিদি, হুকুম দাও প্রজাদের জল-খাবার দেবে। বেচারীদের খেতে-দেতে দাও বৌদিদি, নাম করবে। আশীর্ব্বাদ করবে। অনন্তরাম কথাগুলি একদমে বলে যায়।

রাজেশ্বরী বললে স্তিমিত কণ্ঠে,—অনন্ত, ঠিক হয়েছিলো তো?

জয়ের হাসি হাসলে অনন্তরাম: বললে হাসতে-হাসতে,—পড়তে পেয়েছে কিছু কি বৌদিদি? একটা কেউ কিছু ফেললে না!

—অনন্ত,—কথা বলতে গিয়ে থেমে যায় রাজেশ্বরী। জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা বোধ করে। বলে,—অনন্ত,—

দুঃখের হাসি হাসে অনন্তরাম। ডাকে সাড়া দেয় না। শব্দহীন হাসি-মাখানো মুখ। কয়েক মুহূর্ত্ত যেতে না যেতেই বললে,—বুঝতে কি আর বাকী আছে বৌদিদি। যা বলতে চাইছো বল' না।

বিনোদা খেঁকিয়ে উঠলো যেন হঠাৎ। ছিল রাজেশ্বরীর পেছনে। বললে,—তুমিই বা কেমন ধারার মানুষ অনন্ত? বলেই দাও না যা জানতে চায়।

অনন্তরাম বললে,—হ্যাঁ হ্যাঁ, হুজুরের খাওয়া হয়েছে। খেয়েছে মুখ্যুটা। সদরে মুখ-হাত ধুয়েছে, ধুয়ে খেয়েছে। তুমি ভেবো না বৌদিদি।

মনের কথার উত্তর পায় রাজেশ্বরী।

যা জানতে চায় জানিয়ে দেয় অনন্তরাম। তবুও মন থেকে কৈ খুশী হয় না তো রাজেশ্বরী। হাসে না, কথাও বলে না। কাজল-কালো চোখ তুলে দেখে শুধু। ক্লান্ত দেহ, রাজেশ্বরী ভাবছিল ঘরে গিয়ে শুয়ে প'ড়বে। ভাবতে ভাবতে এগোয় রাজেশ্বরী।

অনন্তরাম ডাকে পেছন থেকে। বলে,—চললে যে বৌদিদি!

রাজেশ্বরী ঘুরে দাঁড়ায়। ক্ষণেকের জন্যে যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে অনন্তরাম। হঠাৎ যেন দেখতে পায় রাজেশ্বরীর রূপৈশ্বর্য্য। কুমোরটুলী থেকে গড়ানো নয় তো? অনন্তরাম ক্ষণেকের জন্য জ্ঞান হারিয়ে দেখে রাজেশ্বরীর কত রঙ। কত অপরূপ মুখাকৃতি। কত লাবণ্য দেহে।

রাজেশ্বরী বললে,—আমি কি বলবো? বিনোদা বল', কি দেবে প্রজাদের?

বিনোদা মুখ খিঁচিয়ে উঠলো। বললে,—তিলের নাড়ু আছে ঘরে, মোয়া আছে। খাগ্‌ না কত খাবে। তুমি চল্‌ তো। আর দেরী করলে—

রাজেশ্বরী চলে। যন্ত্রের মত চলে।

বিনোদা আগে আগে যায়, রাজেশ্বরী যন্ত্রের মত ধীরে ধীরে এগোতে থাকে।

অনন্তরাম শুধু নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন ক্ষণেকের জন্যে জ্ঞান হারিয়ে দেখে রাজেশ্বরীর রূপৈশ্বর্য্য। বিমুগ্ধের মত দেখে। টম কুকুরকে হঠাৎ পায়ের কাছে দেখে চমকে ওঠে অনন্তরাম। তুঁতে রঙের শাড়ী অদৃশ্য হয়ে যায়। টমকে পুতুলের মত বুকে তুলে নেয় অনন্তরাম। বলে,—হুজুরকে না দেখে তুমি ব্যাটা পর্য্যন্ত কেমন হয়ে গেছো দেখছি!

ভাষা নেই, টম নির্ব্বাক্‌ হয়ে থাকে। প্রজাদের কথা মনে প'ড়ে যায় অনন্তরামের। টমকে ছেড়ে দিয়ে ভাঁড়ারের দিকে যায়। ভাঁড়ার থেকে কাছারীতে ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে তিলের নাড়ু আর মোয়া। প্রজাদের প্রাতর্ভোজন।

দাসীদের কে একজন। অনন্তরামকে খুঁজতেই হয়তো আসছিল। ঘোমটার ভেতর থেকে বললে দাসী,—বৌদিদি বললেন অনন্ত, তোমাকে দাদাবাবু ডাকলেই যেন পায়। তুমি গানের ঘরের কাছেই থেকো।

—যথা আজ্ঞা। বললে অনন্তরাম। যেতে যেতে বললে—তোমাদের বৌদিদি খেলে কিছু?

দাসী বললে,—বৌদিদি খেতে বসলো এ্যাতক্ষণে। তোমাকে দাদাবাবু ডাকলেই যেন পায়।

গানের ঘরে তখন হুল্লোড় চ'লেছে।

জহর আর পান্নাদের সঙ্গে হয়তো গুণী আছে কেউ-কেউ। গাইয়ে-বাজিয়ে। নয় তো এই মধুর বাদ্যযন্ত্র কে বাজাবে? হাওয়ায় সুরের দোলা লাগবে কেন? মার্গ-সঙ্গীতের সুর।

কেউ গায়, কেউ বাজায়।

কেউ তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আধা-শোয়া হয়ে থাকে। গান-বাজনা শোনে চক্ষু মুদিত ক'রে। তারিফ করে। বলে,—বাহবা, বাহবা!

কখনও খাম্বাজ, কখনও বাহার; কখনও পিলু বারোয়াঁ, কখনও ছায়ানট এবং কখনও ইমন চলতে থাকে। শ্রোতৃবর্গের আশা যেন মিটতে চায় না। একটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ধরা হয়।

অনেক, অনেক দিন বাদে কৃষ্ণকান্তর যন্ত্র-মন্দির বাদ্যগীতে যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। মূক যন্ত্র ভাষা খুঁজে পায় যেন।

কৃষ্ণকিশোর বললে চুপি-চুপি জহরের কানে,—আসছি আমি। দেখি তোদের খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হয়েছে।

জহর তাকিয়া ছেড়ে বসলো। বললে,—ঝুটা কথা কেন? বল্‌ না যাচ্ছি বৌ দেখতে।

কৃষ্ণকিশোর বলে,—বলে না দিলে খাওয়া হবে না তোদের।

জহর বললে,—ডিমের খিচুড়ী করতে বল্‌।

পান্না বললে,—বাটা মাছ ভাজতে বল্। বেশ ডিমেল বাটা হওয়া চাই।

জহর বললে,—আমার শুধু খিচুড়ী হ'লেই চলবে।

শুধু খিচুড়ী হ'লেই যদি চ'লতো ভাবনা ছিল না। বাটা মাছ পাওয়া যায় কোথায়। ডিমেল বাটা মাছ। কুমু থাকলে ভাবতে হ'ত? মা কুমুদিনী থাকলে? কৃষ্ণকিশোর ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। গায়ক গান থামায় না, বাদ্যকার বাজিয়ে চলে।

বর্ষা-দিনের হাওয়া আসে ঘরে। হাওয়ায় যেন শীতের আমেজ। কড়িতে সাদা বেলজিয়াম কাচের ঝুলন্ত আলো। আলোর ঝাড় একটা। একশো আলোর ঝাড়। একশো বাতির। মাঝে মাঝে হাওয়ার বেগে ঝনন্-ঝনন্ শব্দ হয়। পলা-তোলা কাচের টুকরো ঠোকাঠুকি হয়। ঠুং-ঠাং শব্দ মিলিয়ে যায় গান-বাজনার শব্দে। আলোর ঝাড়টা তবুও দুলছিল। লক্ষ লক্ষ হীরা মাণিক জ্বলছিল যেন।

গাছে গাছে ডাকছিল শালিক আর বুলবুলি। শিমুল গাছের তুলা উড়ছিল পাখীর ঠোকর-মারা ফুল থেকে।

কাছারীর দালানে খাতাঞ্চী খাতায় লিখছিল নাম-ধাম গোত্র। জমির মাপ। খাজনার নিরিখ। লিখছিল, মৌজা মনোহরপুর—

রাজেশ্বরী ছিল ভঁাড়ারের সামনের দালানে।

পিঁড়েয় বসেছিল। দাসীদের কে একজন হাতপাখা চালাচ্ছিল কাছে দাঁড়িয়ে। বৌ যে ঘামছে। কুল-কুল ক'রে ঘামছে। ভিজে গেছে রাজেশ্বরীর জামার বুক-পিঠ। হাতের তালু।

ব্রাহ্মণী দূরে ছিল। ধুচুনীতে চাল ধুচ্ছিল।

প্রায় ছুটতে ছুটতে এলো এলোকেশী। রাজেশ্বরীর কাছে গিয়ে বললে,—রাজো, ঘরে সোয়ামী গেছে। যা না তুই।

বুকটা যেন ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে রাজেশ্বরীর।

হৃৎপিণ্ডের গতি কত হয় কে জানে! কথা শুনে বলে না কোন কথা। কাজল-কালো চোখ তুলে চেয়ে থাকে ক্যাল-ক্যাল। এলোকেশীর কথা কানে শুধু বাজে না, বাজে যেন বুকের অন্তস্তলে। এলোকেশী বলে,—উঠলি না যে? ওঠ, ঘরে যা।

বাধ্য হয়ে উঠে পড়লো যেন রাজেশ্বরী। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে ক্লান্ত পায়ে চললো। সিঁড়ির দিকে চললো। মুখে কোথায় হাসি ফুটবে, রাজেশ্বরীর মুখে যেন বর্ষার মেঘ নেমেছে। ভ্রূ দু'টো ধনুকের আকার হয়েছে।

ঘরে তখন চাবির আলমারীর চাবি খুলেছে কৃষ্ণকিশোর। কোথাকার চাবি চাই। সিন্দুকের চাবি। চাবির আলমারী উন্মুক্ত। ঘরে পা দিয়েই দেখতে পেয়েছে রাজেশ্বরী। মনে মনে বেশ বিস্মিত হয়। হয়তো চুড়ির ঝুন-ঝুন শব্দ শোনা যায়। কৃষ্ণকিশোর বললে,—আমি তোমাকে ডাকছিলাম।

এলোকেশী ঘরের দরজার কপাট দু'টো ভেজিয়ে দেয় বাইরে থেকে। কাল থেকে দেখা নেই, ভাবে এলোকেশী। দেখুক, বৌটাকে দেখুক। দিনের আলোয় ভাল ক'রে দেখুক মেয়েটাকে। আহা কত রূপ মেয়েটার! চোখে পড়লো না। ভাবে এলোকেশী।

দরজা ভেজালে কি হবে, জানলা ক'টায় পর্দা থাকলেও খোলা জানালা। ঘরে আলো যথেষ্ট। দেখে কৃষ্ণকিশোর। দিনের উজ্জ্বল আলোয় দেখে মেয়েটাকে। কচি-কচি মুখ। মোমের মত গঠন। চোখে শিশুর দৃষ্টি। আর কাজল।

—সিন্দুকের চাবি চাই। বললে কৃষ্ণকিশোর।

পায়ের তলা কাঁপতে থাকে যেন। রাজেশ্বরী বলে,—চাবি তো আমি জানি না!

কৃষ্ণকিশোর বললে,—চাবি আমি পেয়েছি। তোমাকেও থাকতে হবে। সিন্দুক খুলবো।

কি উত্তর দেবে রাজেশ্বরী।

তবু ভাল, যা হবে, রাজেশ্বরীর চোখের সমুখে। রাজেশ্বরী তো আছেই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কপালের ঘাম মোছে আঁচলে। কৃষ্ণকিশোর বললে,—কোথায় ছিলে তুমি? পিশীমার ছেলেদের দেখছি ওঠবার নাম নেই।

—ভাঁড়ারে ছিলাম। বললে রাজেশ্বরী। বললে,—নাটমন্দিরে গিয়েছিলাম।

কৃষ্ণকিশোর আলমারীতে চাবি দিতে দিতে বললে,—ওদের খাওয়ার জোগাড় করতে হবে। ডিমের খিচুড়ী খেতে চাইছে, ডিমওলা বাটা মাছ খেতে চেয়েছে।

—বেশ। বললে রাজেশ্বরী।—আমি বলে আসি বামুনদিকে। অনন্তকে বাজারে পাঠানো হোক।

একটা চাবির গোছা, লক্ষ্য ক'রে দেখে রাজেশ্বরী। কৃষ্ণকিশোরের হাতে হয়তো সিন্দুকের চাবি। বুকটা ধড়ফড় করতে থাকে রাজেশ্বরীর। সিন্দুকের চাবি কি হবে!

কৃষ্ণকিশোর বললে,—চল' আমার সঙ্গে যে-ঘরে সিন্দুক আছে।

সাহসে বুক বেঁধে শুধোয় রাজেশ্বরী,—সিন্দুক খুলে কি হবে? কেন খুলবে সিন্দুক? কাল থেকে কোথায় ছিলে তুমি?

—চল' না দেখবে। বিশেষ দরকার আছে। বললে কৃষ্ণকিশোর।—গান শুনতে গিয়েছিলাম, শেষ হ'তে দেরী হয়েছিল।

কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর। রাজেশ্বরী দাঁড়িয়ে থাকে হতাশ মনে। চোখে হতাশ দৃষ্টি ফুটিয়ে। গান শুনতে শুনতে দেরী হয়েছে। কে গান গাইলো। কোথায় গাইলো। কি গান?

গান নয়, কথা। গহরজানের কথা যদি এখন গান হয়। গানের মতই কানে শোনায় গহরজানের কথা। মিষ্টি

মিষ্টি কথা। মুক্তো-ঝরা হাসি আর মিষ্টি মিষ্টি কথা। কিন্তু আরেক রাজেশ্বরী কোথা থেকে এলো? ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয় রাজেশ্বরীর। আয়নায় প্রতিফলিত হয়েছে রাজেশ্বরী —যার রূপৈশ্বর্য্য ফিরেও দেখলো না কেউ। যার আয়ত আঁখিযুগলের মূল্য দিলো না কেউ, যার শুভ্র রঙ শুধু নামেই।

সিন্দুকের চাবি কি হবে! ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হয় যেন। রাজেশ্বরী ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় যে-ঘরে সিন্দুক আছে। সারি সারি লোহার সিন্দুক। সোনা-রূপো-হীরা-জহরৎ আছে। ঘড়-ভর্ত্তি গিনি আর টাকা আছে। চাবিবদ্ধ সিন্দুকে। বুকটা ধড়ফড় করে রাজেশ্বরীর। হৃৎপিণ্ডের গতি কত হয় কে জানে!

কৃষ্ণকিশোর ততক্ষণে খুলে ফেলেছে সিন্দুকের কুলুপ।

নীল আর বেগুনী রঙের ভেলভেটের বাক্স বেরিয়েছে কেন? ঐটা তো ব্রেস্‌লেটের বাক্স, ঐটায় আছে গলার কলার, ঐগুলোয় আছে চুড়ি। আর্ম্‌লেটের বাক্সটা কি খোলা? মন্দিরের চূড়ার মত বাক্সটায় নিশ্চয় মুকুট আছে।

একটায় কাজ মিটতে না মিটতে আরেকটা সিন্দুক খোলার কি প্রয়োজন হচ্ছে! ঘড়া-ভর্ত্তি গিনি কোথায় আছে, খুঁজতে থাকে কৃষ্ণকিশোর। গয়নাগাটির দরকার নেই, ঘড়-ভর্ত্তি গিনি চাই। বুকটা ধড়ফড় করে রাজেশ্বরীর। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে খোলা সিন্দুকের সামনে। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হয়।

বর্ষা-দিনের এলোমেলো হিমেল হাওয়া বইতে থাকে। শীতল হাওয়ার স্পর্শে রাজেশ্বরীর ঘর্মাক্ত কপালটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কিন্তু পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে যে! রাজেশ্বরীর মনে হয়, সে বুঝি প'ড়ে যাবে আচমকা। প'ড়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে। ক্লান্ত দেহটা থেকে থেকে এলিয়ে পড়তে চায়।

—কে গুলী ছুঁড়ছে কোথায়? বললে রাজেশ্বরী।

কৃষ্ণকিশোর সিন্দুক হাতড়ায়। বলে,—কৈ, না তো। কোথায় গুলী?

—ঐ তো দুম-দুম শব্দ হচ্ছে। বললে রাজেশ্বরী। বললে,—সিন্দুক খোলা হচ্ছে বাসি পোষাকে?

—তোমাকে খুব মানাবে।

হঠাৎ যেন কথা বললে কৃষ্ণকিশোর। কি খুঁজে পেয়েছে কে জানে। বললে,—খুব মানাবে তোমাকে।

শুনে খুশী হ'ল না রাজেশ্বরী। বললে না কোন কথা। কৃষ্ণকিশোর একটা নীল ভেলভেটের খোলা বাক্স তুলে ধ'রলো। রাজেশ্বরী হতাশ চোখ মেলে দেখলো। খোলা বাক্সতে দেখলো একটা টায়রা। কুচো হীরের টায়রা। শুধু হীরের টায়রা। আলোর স্বাদ পেয়ে ঝলমল করছে। দেখলে চোখ ঠিকরে যায়।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—তোমার টায়রাটা হারিয়ে গেলো যে। এইটে রাখো তোমার কাছে।

রাজেশ্বরী মোমের মত হাত পেতে ধরলো বাক্সটা। বললে,—সিন্দুকে যা-কিছু আছে আমারই তো। আমাকেই দিতে হচ্ছে?

হাসলো কৃষ্ণকিশোর রাজেশ্বরীর কথায়। হাসলো সম্মতির হাসি। রাজেশ্বরী বললে,—চাবি দিচ্ছো যে? ঘড়াটা যে প'ড়ে রইলো।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—ঘড়াটা থাকবে। ঘড়াটা তোমার ঘরে যাবে।

—কেন? বললে রাজেশ্বরী।

কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবলো কৃষ্ণকিশোর। বললে,—টাকা চাই যে।

—কেন? বললে রাজেশ্বরী।

কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবলো কৃষ্ণকিশোর। বললে,—কি জানি কেন, কাছারী থেকে হাজার বারো টাকা চাইছে। বিশেষ প্রয়োজন।

—প্রজাদের টাকা পেয়েছো তো? মনোহরপুরের প্রজাদের টাকা। সাহসে বুক বেঁধে ভয়ে-ভয়ে বললে রাজেশ্বরী।

—তুমি জানলে কোত্থেকে? বললে কৃষ্ণকিশোর। হাসতে হাসতে বললে,—জমিদারীর কাজকর্ম্ম তুমি যে জানো না। প্রজা যেমন আমাদের খাজনা দেয় গভর্ণমেণ্টকে আমাদের খাজনা দিতে হয়। না দিলেই সূর্য্যাস্ত আইনে পড়তে হবে। জমিদারী বিকিয়ে যাবে। জমিদারীর কাজকর্ম্ম তুমি যে জানো না। জানলে—

কথা বলতে বলতে এগিয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর। রাজেশ্বরীর কাছে এগিয়ে যায়। দু'বাহুতে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে রাজেশ্বরীকে। প্রথমে ছাড়াতে চেয়েছিল রাজেশ্বরী, কিন্তু মুক্তি পায় না। চোখ দু'টো মুদিত ক'রে থাকে। মুখের কাছে মুখ এগিয়ে ধরে কৃষ্ণকিশোর।

কিন্তু জোর ক'রে ছাড়িয়ে নেয় রাজেশ্বরী। বলে,—ছিঃ, কে কোথায় দেখবে, ছাড়ো!

কৃষ্ণকিশোর বলে,—ঘড়াটা থাক এখানে। ঘরটায় চাবি দিয়ে চাবিটা আঁচলে রাখো। আমি চাইলে দিও। আমি দেখি জহর পান্নার দল কি করছে।

যন্ত্র-মন্দিরে তখন গীত ও বাদ্য থেমে গেছে। হয়তো জিরোচ্ছে গাইয়ে-বাজিয়ে। তাকিয়ায় হেলে পড়েছে সকলে। এখন শুধু ঠুং-ঠাং শব্দ। একশো আলোর আলো। বেলোয়ারী কাচের ঝুলন্ত আলোটা হাওয়ার বেগে দুলছিল থেকে থেকে। ঝনন্‌-ঝনন্‌ শব্দে। লাল ভেলভেটের তাকিয়ায় হেলে পড়েছিল সকলে। বলাবলি করছিল যে, শুধু গান ভাল লাগে না। গানের সঙ্গে চাই সুধাপাত্র। নেশা না ক'রে রেওয়াজ হয়? শুধু গান ভাল লাগে না। গানের সঙ্গে চাই নাচ। নাচ গান চাই। সুরা আর নারীর সঙ্গে চলবে গান। নাচ আর গান।

[৩২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

যাযাবর

আখ্যান

যে-কথা কাউকে বলার নয় বলে শিবনাথ স্ত্রীর কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করলেন, সে-কথা তাঁর অন্তর্য্যামী ছাড়া আরও দু'-এক জন জানে। সে কাহিনীটুকু সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু সামান্য নয়।

কলেজে সংস্কৃতের শিক্ষক অঘোর বাচস্পতির কাছে প্রত্যহ পাঠ নিতে যেতেন শিবনাথ। বিপত্নীক বাচস্পতির গৃহে রাশীকৃত জড় পুথি পুস্তক ব্যতীত একটি সজীব প্রাণী ছিল। সে তাঁর মেয়ে শৈলবালা। প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা মেজেতে মাদুর বিছিয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নবীন ছাত্রের কাছে ব্যাখ্যা করতেন কাব্য, ব্যাকরণ বা সাহিত্য। গৃহকর্ম্ম সমাপনান্তে গৃহের অপর প্রান্তে ছুঁচ দিয়ে জীর্ণ জামা-কাপড়ের ছিদ্র সংস্কার করতো শৈলবালা।

পিতলের পিলসুজের উপর জ্বলছে রেড়ীর তেলের প্রদীপ। প্রাচীন কবিগণের রচনার অন্তর্ঘন সাহিত্যরস, সুপণ্ডিত অধ্যাপকের উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তি এবং স্বল্পপরিসর গৃহের রহস্যময় মৃদু দীপালোক কিছু দিনের মধ্যেই সীবনরতা তরুণীর এই নিঃশব্দ অথচ নিয়মিত উপস্থিতিকে শিবনাথের চক্ষে একটি বিশেষ মাধুর্য্য দান করল। তাঁর ভাবপ্রবণ হৃদয়ের উদ্দীপ্ত কল্পনায় বাদুড়বাগানের অপরিচ্ছন্ন গলির ক্ষুদ্র গৃহ-কোণবাসিনী সামান্য শৈলবালা ধীরে ধীরে সংস্কৃত সাহিত্যের মহীয়সী নায়িকাদের সঙ্গে এক হয়ে মিলে গেল। শিবনাথের মনে হলো, ঋষি কণ্বের আশ্রমে এই ছিল সেই তরু-আলবালে জলসিঞ্চনরতা শকুন্তলা, বল্কলবন্ধনেও যাঁর দেহসৌষ্ঠব শৈবালবেষ্টিত কমলকলিকার ন্যায় রম্য। তিনি কল্পনা করলেন, এই সেই পর্য্যাপ্ত যৌবনপুঞ্জে অবনমিতা উমা, অঙ্গে যাঁর অরুণার্করক্তিম বসন, কর্ণে যাঁর চূতপল্লব, অলকে যাঁর নবকর্ণিকার। বরষার ভরা নদীর মতো শিবনাথের তরুণ হৃদয় শৈলবালার প্রতি গভীর অনুরাগে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

প্রকৃতি-বিচারে মানুষকে নাকি সাধারণতঃ দুটি বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক,—যারা হৃদয়ের দ্বারা চালিত। দুই,—যারা মস্তিষ্কের দ্বারা। কিন্তু সংসারে এই দুই শ্রেণীর বাইরে আরও এক জাতের লোক আছে। তাদের ভাবাবেগ অত্যন্ত প্রখর, অথচ বিচারবুদ্ধিও কম সচেতন নয়। ইতঃ নষ্ট এবং ততঃ ভ্রষ্ট দলের এই হতভাগ্যেরা না উপভোগ করতে পায় দুঃসাহসিকতার স্বল্পায়ু আনন্দ, না খুশি হয় হিসেবী বুদ্ধির সনাতন নিরাপত্তায়। এরা ইমোশানের স্রোতে ভেসে যেতে শঙ্কিত; অথচ ইণ্টেলেক্টের ঘাটে বসে থেকেও তৃপ্ত নয়। অনুভূতি ও বুদ্ধিবৃত্তির নিরন্তর অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত মানুষের দলে ছিলেন শিবনাথ। তাঁর অদৃষ্টে দুঃখভোগ অবধারিত।

আর্থিক বা সামাজিক কোন দিক দিয়েই শিবনাথ ও শৈলবালার দুই পরিবার সমপর্য্যায়ে নয়। এমন কি তাদের জাত পর্য্যন্ত বিভিন্ন। সুতরাং পরিণয়ের মধ্য দিয়ে শিবনাথের প্রেম যে তার চরম ও সার্থক পরিণতি লাভ করবে প্রচলিত সামাজিক রীতিতে তার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না। নিজ হৃদয়াবেগের এই অবশ্যম্ভাবী নিষ্ফলতার কথা শিবনাথের অজ্ঞাত ছিল না। অথচ শৈলবালার প্রতি আপন তরুণ হৃদয়ের সুতীব্র আকর্ষণ দমন করাও তাঁর পক্ষে সাধ্যাতীত। এক দিকে যুক্তিহীন হৃদয়াবেগ ও অন্য দিকে সতর্ক বুদ্ধির বিচার বিশ্লেষণ,—নিজ মনের এই দুই বিপরীতধর্ম্মী ভাবধারার পীড়নে শিবনাথ যখন ক্ষত-বিক্ষত, তখন হঠাৎ একদিন জানতে পারলেন রং শুধু তাঁর একার মনেই লাগেনি। বসন্তের যে যাদুমন্ত্র তরুশাখাকে পল্লবিত করেছে, সে লতার গ্রন্থিতেও মুকুল ফোটাতে ছাড়েনি।

গৃহে গৃহিণী না থাকায় এত কাল শৈলবালার বাড়ন্ত গড়ন ও বিবাহে বিলম্ব সম্পর্কে পাড়ার আর পাঁচ জন হিতৈষিণী মহিলার গভীর উৎকণ্ঠার কথা বাচস্পতি মশায়ের কানে এসে পৌঁছয়নি। তাই যেদিন তাঁর এক আত্মীয় পত্রযোগে এ বিষয়ে বিস্তর তিরস্কার ও উপদেশ বিতরণ করলেন, সেদিন বৃদ্ধ অধ্যাপকের প্রথম খেয়াল হলো,—তাই তো, মেয়েকে তো পাত্রস্থ করা দরকার। কিন্তু তার উপায়টা জানা না থাকায় প্রথম যার সঙ্গে দেখা সেই শিবনাথকেই জিজ্ঞাসা করলেন।

চমকিত শিবনাথ বিবর্ণ হয়ে অস্পষ্ট উচ্চারণ ও অসংলগ্ন উক্তি দ্বারা অনেক চেষ্টায় যা বললেন, তার মোটামুটি ভাবার্থটা এই যে, অতঃপর তাঁর পরিচিত মহলে শৈলবালার যোগ্য পাত্র কেউ আছে কিনা সন্ধান করে দেখবেন। সে সন্ধ্যায় চন্দ্রাপীড়ের উপাখ্যান অধ্যাপকের ব্যাখ্যায় যথেষ্ট প্রাঞ্জল হলো না এবং বাণভট্টের সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ শব্দগুলির মধ্যে ছাত্রটি কেবলই হোঁচট খেয়ে পড়তে লাগল। গৃহকোণে অপর প্রাণীটির নিয়মিত উপস্থিতিতেও সেই প্রথম ব্যাঘাত ঘটল।

পাঠ শেষে শিবনাথ যখন বাড়ি ফেরেন, প্রত্যহই শৈলবালা প্রদীপ হাতে অন্ধকার সিঁড়িটায় পথ দেখিয়ে দেয়। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না।

শিবনাথ শৈলবালাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাকে আজ এতক্ষণ দেখিনি যে? এ কী, তোমার মুখ এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? কোন অসুখ-বিসুখ করেনি তো?"

শৈলবালা তার দুই চক্ষু শিবনাথের পানে বিস্ফারিত করে রুদ্ধশ্বাসে বলল "কেন আপনি আমাকে এখান থেকে তাড়াতে চাইছেন? আমি আপনার কী ক্ষতি করেছি?"

বিস্মিত শিবনাথ বললেন, "আমি তোমাকে তাড়াবার চেষ্টা করছি? সে কী? কৈ, আমি তো—"

"করছেন না তো কী? বাবার সঙ্গে এতক্ষণ কিসের পরামর্শ করছিলেন?"

শিবনাথ বললেন, "পরামর্শ কোথায়—ওঃ, সে তোমার বিয়ের কথা যা হচ্ছিল—তা, মানে, তোমার বিয়ে—সে তো ভালোই—এ কী তুমি কাঁদছ?" বলে শিবনাথ ডান হাতের তর্জ্জনী দিয়ে শৈলবালার আনত চিবুকটি তুলে ধরতে চেষ্টা করলেন।

শৈলবালা এক পা পিছিয়ে আঁচল দিয়ে চক্ষু মার্জ্জনা করে বলল, "আমার ভালো ভেবে আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আপনার যদি আমাকে দেখলেই দুশ্চিন্তা ঘটে, তবে বরং এখানে আর পড়তে আসবেন না।"

শিবনাথ বিস্মিত হলেন। এ তো সঙ্কুচিতা, অপরিণতবুদ্ধি বালিকার উক্তি নয়! শৈলবালার দিকে ভালো করে আর একবার তাকিয়ে দেখলেন, প্রথম যৌবনোন্মেষ তার দেহকে সুঠাম, কপোলকে আরক্তিম ও দৃষ্টিকে ভাবগম্ভীর করেছে। শিবনাথের কাছে কিছু আর অস্পষ্ট রইল না। তাঁর প্রণয়-বেদনা নিরর্থক হয়নি, রূপকথার সোনার কাঠির মতো তা তাঁর কল্পলোকের রাজকন্যাকে জাগিয়ে তুলেছে,—একথা জেনে তাঁর সর্ব্বদেহ অপরিসীম পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

কিন্তু সে আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। এই নিষ্ফল হৃদয়াবেগ তাঁদের উভয়ের,—বিশেষ করে শৈলবালার—কল্যাণ করবে না, জীবনকে বিড়ম্বিত করবে, এ চিন্তায় শিবনাথ কেবলই ক্লিষ্ট হতে লাগলেন। ঠিক এই সময়ে বিয়ের কথা উঠল বিখ্যাত দত্তসাহেবের পরিবারে।

শিবনাথের পিতা বৈকুণ্ঠনাথের অর্থ ছিল প্রচুর, কিন্তু আশানুরূপ মর্য্যাদা ছিল না। মনে মনে এ জন্যে তাঁর ক্ষোভ ছিল যথেষ্ট। তাই বৈবাহিক সম্পর্কের লিফটে চেপে তিনি সম্ভ্রান্ত মহলের উপর-তলায় উঠতে উৎসুক ছিলেন। দত্তসাহেব কলকাতার অভিজাতমণ্ডলীর একটি স্তম্ভবিশেষ। কোর্ট সার্কুলারে ঘন ঘন তাঁর নাম ছাপা হয়, দৈনিক কাগজে ইণ্টারভিউ। রয়টারের খবরে তাঁর বিলাতে গতিবিধির নিশানা থাকে। বৈকুণ্ঠনাথ পুলকিত হলেন।

পাত্র যিনি, তাঁর মনে তখন তীব্র অস্বস্তি। নিজকে তাড়াতাড়ি যে-কোন এক জায়গায় শক্ত করে বেঁধে ফেলার ব্যগ্রতায় শিবনাথ প্রায় চোখ বুজেই সম্মতি দিলেন। এ দেশে যুবকেরা স্ত্রী ঘরে আনে ঠিকুজির নির্দ্দেশে, বৃদ্ধেরা দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করে বন্ধুদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে। শিবনাথ বিয়ে করলেন আত্মরক্ষার্থে। দু'দিন পরেই জানতে পারলেন, এর চেয়ে মারাত্মক ভুল জীবনে আর কখনও করেননি।

শিবনাথ ভেবেছিলেন, স্ত্রী এসে অধিকার করলেই অবাধ্য হৃদয় আর নিরর্থক চঞ্চল হওয়ার অবকাশ পাবে না। শৈলবালাকে ভোলা সহজ হবে। মূঢ় জানতেন না যে, বাড়ির মতো হৃদয়েরও ভ্যাকেণ্ট পজেশান না দিলে নতুন লোকের সেখানে প্রবেশ অসাধ্য। শোনেননি যে, মানুষের মনই হলো একমাত্র স্থান, যেখানে বে-আইনী দখলকারীর বিরুদ্ধেও ইজেক্টমেণ্ট স্যুট চলে না। শিবনাথ যাকে ভালোবাসলেন, তাকে বিয়ে করতে পারলেন না।

যাকে বিয়ে করলেন, তাকে ভালোবাসতে পারলেন না। তাদের দু'জনেরই দুঃখের কারণ হলেন। নিজেও সুখী হলেন না।

শিবনাথের বিয়ের কয়েক মাস পরেই অঘোর বাচস্পতির মৃত্যু ঘটল। শৈলবালা চলে গেল কোথায় দূর-সম্পর্কীয় কোন এক আত্মীয়ের বাড়িতে। শিবনাথ তার আর কোন সংবাদ বা সন্ধান পেলেন না।

কিন্তু কাছে থেকে যে ছিল দৃষ্টির আনন্দ, দূরে গিয়ে সে হলো চিন্তার সুখ। সামনে যে ছিল কামনার পাত্র, আড়ালে সে হলো ধ্যানের ধন। মলী সেনের পক্ষে কোন মতেই সম্ভব ছিল না সেই অদৃশ্য প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করা।

সংসারে যে দুষ্কৃতকারীর নীতিবোধ আছে তার শাস্তি ঘটে দু'দিকে। শিবনাথেরও সর্ব্বাপেক্ষা বড় অসুবিধা ছিল তাঁর আপন বিবেক। তিনি না পারেন সাধারণ অত্যাচারী স্বামীদের ন্যায় নিষ্ঠুরতায় স্ত্রীর সুখ-দুঃখ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে, না পারেন তাঁর প্রতি নিজ অন্যায় আচরণের লজ্জা এড়াতে। অথচ স্ত্রীর যা প্রাপ্য তা দেওয়াও তাঁর সাধ্যের অতীত। অনুপস্থিত শৈলবালার প্রতি এক কল্পিত অথচ সুদৃঢ় আনুগত্য বোধের দ্বারা উপস্থিত মলী সেনের প্রতি কর্ত্তব্যে তিনি কেবলই বিচ্যুত হতে থাকেন।

শৈলবালা কোন অজ্ঞাত স্থানে কেমন করে জীবন কাটাচ্ছে সে চিন্তা শিবনাথের মনকে দিবারাত্র আচ্ছন্ন করে রইল। কখনও তিনি কল্পনা করতেন, সে আত্মীয়-পরিজনের সমুদয় অনুরোধ, অনুনয়, তিরস্কার ও লাঞ্ছনা অগ্রাহ্য করে আজও অনূঢ়া জীবন যাপন করছে। নিজ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কঠোর পরিশ্রমে দেহ তার দুর্ব্বল, স্বাস্থ্য তার নষ্ট। কিন্তু সেই ক্ষীণকায়া নারী তার উদার হৃদয়ের গোপন মণি-কোঠায় আজও শিবনাথের মূর্ত্তিকেই সযত্নে রক্ষা করছে। সেখানে তাঁর নিত্য আবাহন, নিত্য স্তব-স্তুতি পাঠ। নিজের কল্পনায় শৈলবালার সেই অবিচল বিশ্বস্ততার পাশে আপন আচরণ তুলনা করে নিজেকে তিনি বারংবার ধিক্কার দেন।

আবার কখনও বা কল্পনা করেন,—পরের গলগ্রহ-জীবন থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য কোন একজনের স্ত্রী হওয়া ছাড়া হয়তো শৈলবালার আর অন্য গতি ছিল না। তাই অনাকাঙ্ক্ষিত পতিগৃহে দুর্ভাগিনীকে দিনের পর দিন অনিচ্ছুক গৃহিণীর দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে। নিজের কঠিন হৃদয়বেদনা গোপন করে নিয়মিত সাজিয়ে দিতে হচ্ছে আপিসের রান্না, স্কুলের টিফিন, বা রোগীর পথ্য। শৈলবালার বিবাহিত জীবনের সেই দুরূহ ভূমিকা কল্পনা করে শিবনাথের নিজ দুঃখ তুলনায় অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হলো। এমনি ভাবে, শিবনাথ ও মলী সেন—এই স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে স্মৃতি ও কল্পনায় মিশে শৈলবালা এক দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতের মতো অচল অটল হয়ে রইল। তাকে কেউ অতিক্রম করতে পারল না।

বিবেকের তাড়নায় মাঝে মাঝে মলী সেনের প্রতি মনোনিবেশ করেন শিবনাথ। চেষ্টা করেন তাঁকে নিজ অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করতে। সে প্রয়াস সফল হয় না। সে দোষ সবটা শিবনাথের নয়, মলী সেনেরও নয়। জন্মগত সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ফলে যে দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব শিবনাথ লাভ করেছেন, তার সঙ্গে মলী সেনের ধ্যান, ধারণা ও আচার আচরণের মিল নেই। তিনি শৈশবে ন্যানি, কৈশোরে মেট্রণ ও যৌবনে গভর্নেসের হাতে মানুষ হয়েছেন। পটলডাঙ্গার বাড়িতে তাঁর রীতি নীতি ধুতির সঙ্গে টাইএর মতোই সঙ্গতিহীন। শিবনাথ ও মলী সেনের অভিভাবকেরা এ কথাটা ভুলে ছিলেন যে, গরুর গাড়ির সঙ্গে প্যাকার্ড ক্লিপার জুড়ে দিলে আর যাই হোক, আরোহীদের যাত্রাগতি স্বচ্ছন্দ হয় না।

শিবনাথের এক বন্ধু এসে বলল, চিত্রায় কি একটা ভালো ছবি হচ্ছে। শিবনাথ আপিস থেকে ফোন করে স্ত্রীকে বললেন যথাসময়ে তৈরী হয়ে থাকতে। স্বামীর কাছ থেকে এই সামান্য সহৃদয়তার ইঙ্গিতটুকু মলী সেনের হৃদয়কে স্পর্শ করল। তিনি খুশিতে চঞ্চল হয়ে বললেন "ওঃ, হাউ নাইস। কিন্তু বাংলা সিনেমায় গিয়ে কী হবে? আটত্রিশ বছরের হাতীর মতো মোটা নায়িকা পঞ্চাশ বছরের ভুঁড়িওয়ালা নায়কের সঙ্গে গান গেয়ে গেয়ে প্রেম করবে! সিকেনিং। তার চাইতে চল এম্পায়ারে।"

শিবনাথের উৎসাহ নিমেষে অন্তর্হিত হলো। চোখ বুজে অষুধের বড়ি গেলার মতো স্ত্রী নিয়ে গেলেন সিনেমায়। সেখানে দেখা হলো ব্যারিষ্টার

অশোক নন্দীর সঙ্গে। মলী সেনের পুরানো বন্ধু। ইন্টারভ্যালের সময় সে এসে জিজ্ঞাসা করল, "হাউ এবাউট এ ড্রিঙ্ক?"

মলী সেন যতোই এড়াতে চান, সে ততোই নাছোড়বান্দা। শেষটায় অগত্যা রাজী হতে হয়। তিন্ জন সিনেমার বারে এলে অশোক নন্দী শিবনাথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "হোয়াটস্ ইওর পয়জন?"

বেচারা শিবনাথ এ সব বিলাতী রসিকতার অর্থ জানেন না। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকেন।

মলী সেন তাড়াতাড়ি বললেন, "আমাদের দু'জনেরই সফট্।"

"ডোন্ট বি এ্যাবসার্ড।" বলে অশোক বেয়ারাকে হুকুম করল, নিজের জন্য একটা হুইস্কি অ্যাণ্ড সোডা। হ্যাঁ, বড়া। আর মলী সেনের জন্য শেরী। শিবনাথকে বহু পীড়াপীড়িতেও লেমন স্কোয়াসের উপরে তোলা গেল না।

অশোক শিবনাথের নিম্বুপানি নিয়ে দু'-চারটে ঠাট্টার চেষ্টা করল। কিন্তু শিবনাথ গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। এ সব চপল আলাপ, লঘু কৌতুক ও অপরিচিত রীতি নীতি তাঁর কাছে অসার ও অন্তঃসারহীন চরিত্রের সুস্পষ্ট লক্ষণ মনে হলো। বিশেষ করে স্ত্রীর এই প্রকাশ্যে মদ্যপান তাঁর মনকে গভীর বিরক্তিতে ভরে দিল।

মলী সেন বুঝলেন, স্বামী খুশি হননি। কিন্তু কারণ খুঁজে পান না। ড্রিঙ্ক সম্পর্কে তাঁর নিজের বিশেষ কোন আসক্তি নেই। কিন্তু তাঁর একবিন্দু উদরে গেলেই ধর্ম্ম নষ্ট হয়—এমন অনুশাসনও মানেন না। তাঁদের সমাজে উৎসবে, নিমন্ত্রণে মেয়েরা সবাই একটু আধটু পোর্ট, শেরী বা ভার্মুথ পান করেন, এ তিনি জ্ঞান হওয়া অবধিই দেখে আসছেন। এ নিয়ে এত অনর্থ করার কী আছে? শিবনাথের এত গোঁড়ামিরই বা মানে কী? অশোকের অত অনুরোধের পরেও নিজের জেদ বজায় রাখা তাঁর উচিত হয়নি।

অপরাহ্ন বেলায় স্বামি-স্ত্রীর সান্নিধ্যটুকু যতখানি আনন্দের সম্ভাবনা নিয়ে সুরু হয়েছিল, সন্ধ্যা বেলায় তার চতুর্গুণ তিক্ততায় তার পরিসমাপ্তি ঘটল।

বাইশে মাঘ শিবনাথের জন্মদিন। দোকানে বেরোবার সময় মলী সেন তাঁকে সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে বিকেলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার অনুরোধ করলেন। শিবনাথের ভালো লাগল। তাঁর জন্মদিনের কথা অন্য একজন স্মরণ করে রেখেছে, এ তথ্যটুকু মনকে খুশি করে। সন্ধ্যায় গৃহে এসে দেখলেন, মস্ত উৎসবের আয়োজন, বিরাট ভোজের ব্যবস্থা, প্রচুর জনসমাগম।

ঘরের সিলিং থেকে ঝুলছে নানা রঙের জাপানী লণ্ঠন। টিপায়ের উপর জড় হয়ে আছে নানা জনের লেখা ইংরেজীতে শুভকামনার চিঠি ও টেলীগ্রাম। উর্দ্দি-পরিহিত ফারপোর বেয়ারারা পরিবেশন করছে নানাবিধ সুস্বাদু ভোজ্য ও পানীয়। এক কোণের টেবিলে মলী সেনের দেওয়া প্রেজেন্ট। সাহেবী দোকান থেকে কেনা দামী টয়লেট কেস। তাতে সবুজ ফিতায় বাঁধা কার্ডে লেখা, মেনি হ্যাপি রিটার্নস।

শিবনাথ কিছুমাত্র প্রসন্ন হলেন না। মনে পড়ল আগেকার এমনি একটি জন্মদিনের স্মৃতি। সন্ধ্যা বেলায় মেজেতে কার্পেট বিছিয়ে শৈলবালা তাঁকে খেতে দিয়েছিল নিজ হাতে প্রস্তুত সাধারণ অন্ন-ব্যঞ্জন। সব শেষে ছোট পাথরের বাটিতে নলেন গুড়ের পায়েস—জন্মদিনের অবর্জ্জনীয় উপচার। তাঁকে উপহার দিয়েছিল একটি রুমাল। তাঁর এক কোণে রেশমের সূতায় কাজকরা শিবনাথের নামের ইংরেজী আদ্য অক্ষরটি। সেদিনের উৎসবে তার উপলক্ষ্য ও উদ্যোক্তা ছাড়া বাইরের তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশাধিকার ছিল না। সেদিনের আহার্য্য স্নেহের দ্বারা ধন্য এবং উপহার প্রিয়হস্তের চিহ্ন দ্বারা মহার্ঘ ছিল। আন্তরিকতায় স্নিগ্ধ ও প্রীতিতে পূর্ণ সেই সামান্য আয়োজনের কাছে আজিকার বহু আড়ম্বরপূর্ণ এই হট্টগোলকে শ্যামলীর পাশে খৈতানভবন বা ঝুনঝুনওয়ালা ম্যানসনের ন্যায় বিকৃতরুচির উৎকট নিদর্শন মনে হলো।

হায়, মলী সেনের কোন কাজ শিবনাথের রুচিকর হয় না, কোন সেবায় মিলে না স্বাদ। শিবনাথের কোন আচরণে মলী সেন পান না সন্তোষ, কোন কথায় পান না প্রীতির আভাষ।

মলী সেন ও শিবনাথের শয্যা পৃথক। স্বামী দোকানের হিসাবপত্রের খাতা পরীক্ষা করে অনেক রাত্রিতে যখন শুতে আসেন, স্ত্রী তখনও একক শয্যায় জেগে প্রতীক্ষা করেন। প্রত্যাশা করেন

একটু মধুর আহ্বান, একটু নিবিড় স্পর্শ, একটু সোহাগ সম্ভাষণ। রাতের পর রাত সে আশা বিফল হয়। সে নিশিজাগরণ বৃথা যায়। মলী সেন কল্পনাও করতে পারেন না যে, দুটি পাশাপাশি শয্যার মধ্যবর্ত্তী কয়েক হস্ত পরিমিত ফাঁকের মধ্যে দুস্তর পারাবারের মতো বিরাজ করছে অদৃশ্য শৈলবালার অবিস্মরণীয় স্মৃতি! তাকে শিবনাথ কোন দিন লঙ্ঘন করতে পারলেন না।

শিবনাথদের বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে শব নিয়ে যায় শ্মশানে। একদা গভীর নিশীথে শবযাত্রীদের কণ্ঠে বিকট হরিধ্বনি শুনে মলী সেনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। অন্ধকার গৃহে একা বিছানায় তাঁর ভয় হতে লাগল। তাড়াতাড়ি উঠে শিবনাথের শয্যায় এসে শুলেন। নিজের ডান হাত দিয়ে শিবনাথকে বেষ্টন করে ভয় দূর করলেন।

স্ত্রীর স্পর্শে শিবনাথেরও নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছিল। আপন বক্ষের উপর স্ত্রীর সুগোল সুকুমার বাহুখানি তাঁকে সঙ্কুচিত করল। নিজকে যেন অপরাধী মনে হলো। ধীরে ধীরে মলী সেনের বাহুটি তিনি পাশে নামিয়ে দিলেন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো মলী সেন সে-শয্যা পরিত্যাগ করে নিজের বিছানায় ফিরে এলেন। শিবনাথের শয্যার অংশ গ্রহণের যে অন্য আর একটা বিশেষ অর্থ হতে পারে সে কথা উপলব্ধি করে লজ্জায় ও ক্ষোভে তিনি মৃত্যুকামনা করলেন। ছিঃ ছিঃ! শিবনাথ তাঁকে কী মনে করলেন! তিনি যে শুধু অন্ধকারে ভয় পেয়েই শিবনাথের পাশে গিয়েছিলেন, সে কথাটা চেঁচিয়ে তাঁকে জানিয়ে দিতে ইচ্ছা করল তাঁর।

মলী সেন নিজের শয্যায় ফিরে গেলে শিবনাথও অনুতপ্ত হলেন। স্ত্রী যে ভীত সচকিত হয়ে তাঁর শয্যায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাঁর অকারণ রূঢ়তায় অপমানিত ও ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেলেন এই কথা ভেবে শিবনাথের তীব্র অনুশোচনা হলো। তিনি মাথার কাছের আলোটা জ্বেলে দিয়ে সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কী ভয় করছে? আলোটা কি জ্বেলে রাখবো?"

নিজের বালিশে মুখ ঢেকে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মলী সেন বলে উঠলেন, "না, না, আমার একটুও ভয় করছে না। তোমাকে কিছু করতে হবে না।"

শিবনাথ আলোটা নিবিয়ে দিলেন।

সারা রাত মলী সেনের চোখে ঘুম এল না। মাঝে মাঝে শববহনকারীদের তীক্ষ্ণ চীৎকার রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মলী সেনের কানে আসতে লাগল। বিবর্ণ মুখে দুই হাতে বিছানা আঁকড়ে দাঁত চেপে তিনি একা শুয়ে রইলেন।

পরদিন নিজের শয্যা তিনি অপসারিত করলেন পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে।

দিনের পর দিন গেল কেটে, বছরের পর বছর হলো গত। শিবনাথ ও মলী সেনের হৃদয়ে কোন যোগাযোগ ঘটল না। একজন রইলেন শিলার মতো অসাড়। অন্য জন রইলেন হিমের মতো শীতল। এবং উভয়ের মিলিত সত্তা রইল মরুর মতো উষর।

দু'জনেই জীবন সম্পর্কে হলেন মোহহীন, বিগতস্পৃহ। শিবনাথ ভাবেন মৃত্যুর আর বাকী আছে কত? মলী সেন ভাবেন, মৃত্যুর আর বাকী আছে কী?

[ক্রমশঃ।

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে উড়িষ্যার কোণারকস্থিত সূর্য্যমন্দিরগাত্রের চিত্র মুদ্রিত হইল। চিত্রটি শ্রীশান্তিনাথ মুখোপাধ্যায় গৃহীত।

সঙ্গীতজ্ঞ স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(তৃতীয় পর্যায়)

Cooch Be

সঙ্গীতকে গ্রহণ করেছিলেন বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে, আমোদ বা বিলাসিতার নিদর্শনরূপে নয়, তাই স্কুল-কলেজের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গান-বাজনার অনুশীলনকেও শ্রদ্ধার সমাদর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রাচীন-পন্থীদের বহুকালজীর্ণ অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তিনি করেছিলেন জেহাদ ঘোষণা। তখনকার যুগে তো বটেই, এখনকার এই বৈজ্ঞানিক যুক্তির যুগেও এমন অনেক প্রাচীনপন্থী আছেন—যাঁরা গান-বাজনাকে ভাবেন লেখাপড়ার অন্তরায়, সঙ্গীতকে দেন না শিক্ষার (Education-এর) মূল্য ও সমাদর। স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু এ-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে করেছিলেন অভিযান, সঙ্গীতকলাকে দিয়েছিলেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমান মর্যাদা ও আসন, সঙ্গীতের কৌলিন্য হয়েছিল তাই উন্নত ও সুরক্ষিত। অবশ্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীও সঙ্গীতের মর্যাদাকে রেখেছিলেন এদিক থেকে তখন অক্ষুণ্ন।

ইংরেজী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে হেমন্তের শেষ ভাগে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হয় সিমুলিয়ায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীতে। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে দেখে চিনেছিলেন তাঁর লীলার প্রধান সহচররূপে, প্রাণের নিবিড় সম্বন্ধও তাই রচিত হয়েছিল সেই প্রথম দিনের দেখায়। বিশেষ ক'রে নরেন্দ্রনাথের দেবনিন্দিত কণ্ঠের গান পাগল করেছিল শ্রীরামকৃষ্ণকে। তাই নিমন্ত্রণ জানালেন তিনি নরেন্দ্রনাথকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য। নরেন্দ্রনাথের প্রতি ভালবাসা যেন আকুল ক'রে দিয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়কে। সুরেন্দ্রনাথ ও পরে ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের কাছে নরেন্দ্রনাথের নাম ও পরিচয় তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের বাড়ীর প্রতিও শ্রীরামকৃষ্ণের মন তখন কম বড় আকৃষ্ট হয়নি।

নরেন্দ্রনাথের এফ. এ. পরীক্ষা তখন শেষ হয়েছে। শিমুলিয়ার বিখ্যাত দত্তবংশে নরেন্দ্রনাথের জন্ম। দত্তবংশের গৌরবে তখন কলকাতা সমুজ্জ্বল। নরেন্দ্রনাথ বিদ্যোৎসাহী, মেধাবী, বুদ্ধিমান, সঙ্গীতসেবী, বাদক, নৃত্যামোদী, সুঠামদেহী, বলিষ্ঠ, ধর্মশীল ও বিনয়ী, সুতরাং বিবাহের নানান্ সম্বন্ধ আসতে লাগল সেই উপযুক্ত পাত্রের উদ্দেশ্যে। পিতা বিশ্বনাথ দত্তও উৎকণ্ঠিত পুত্রের বিবাহের জন্য, চেষ্টার তাই কার্পণ্য ছিল না সেদিক থেকে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের যুবক। পাশ্চাত্য জড়বাদের প্লাবন সারা বাঙ্গালার বুকে তখন অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার ধারা সৃষ্টি করলেও নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সে-সব থেকে নির্মুক্ত। ভোগসর্বস্ব-বাদের মোহ তাঁর কাছে লাঞ্ছিত হয়েছিল। অপার্থিব শান্তিলাভের তিনি ছিলেন কাঙ্গাল, তাই এখানে-সেখানে কলকাতার সকল সমাজের ধর্মাচার্যদের কাছে গিয়ে জানিয়েছিলেন তিনি তাঁর অধ্যাত্মজ্ঞানের পিপাসার কথা। ব্রাহ্মসমাজ তখন গড়ে উঠেছিল খৃষ্টানধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ক'রে হিন্দুধর্মের নূতন বেশ নিয়ে, নাস্তিকতার অন্ধকারে ধর্ম ও ভগবদ্‌বিশ্বাসের জেলেছিল তা সহস্র প্রদীপের আলো, হতাশ সমাজ-জীবনকে দিয়েছিল আশা ও নব চেতনার ব্যঞ্জনা। নরেন্দ্রনাথ হাজির হয়েছিলেন একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে ও ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "মশায়, ভগবানকে কি আপনি দেখেছেন? ভগবান সত্যিকারের আছেন কি-না?" সরলচিত্ত মহর্ষি উত্তর দিয়েছিলেন: "বাবা, উপনিষদাদি শাস্ত্রে তো পড়েছি—তিনি আছেন, কিন্তু আমি তাঁকে দেখিনি কখনো।" যুবক নরেন্দ্রনাথ হতাশার আগুন বুকে নিয়ে ফিরে এলেন বাড়ীতে, জানার আকাঙ্ক্ষা ও আকুলতা আরো উদ্দীপিত হয়ে উঠলো, ভগবান-দেখা মানুষের অনুসন্ধানে তখন তিনি হলেন পাগল ও আত্মহারা।

রামচন্দ্র দত্ত তখনো নরেন্দ্রনাথের পিতার সংসারে প্রতিপালিত। রামচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই যাতায়াত করেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে অসামান্য মহামানব ও এমন কি অবতার বোলেও তিনি বিশ্বাস করেন। নরেন্দ্রনাথের ধর্মভাব ও প্রাণের আকুলতা দেখে তিনি বললেন: "নরেন, দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের কাছে চলো, তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে, মনে শান্তিও পাবে।" নরেন্দ্রনাথ তখনো ব্রাহ্মসমাজের রীতিমত একজন সভ্য; সুকণ্ঠী সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে সমাদর তাঁর সেখানে প্রচুর। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎকারও হয়েছে একবার, গান-পাগল পূজারী সাধকের ওপর শ্রদ্ধা-ভালবাসাও জেগেছে তখন গোপনে, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে স্নেহের নিমন্ত্রণও তিনি পেয়েছেন এর আগে। কাজেই দক্ষিণেশ্বরে যাবার বাধা তাঁর কিছুই ছিল না। তিনি সম্মত হলেন রামচন্দ্র দত্তের কথায়। কিন্তু তাঁকে সঙ্গে ক'রে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গেলেন তাঁরই প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে গেল তাঁর আরো দু'-তিন জন সহপাঠী।

নরেন্দ্রনাথ তখন সেই মাত্র এফ-এ. পরীক্ষা দিয়েছেন সেকথা আগেই বলেছি। বি.এ. পরীক্ষার আগে তিনি দক্ষিণেশ্বর গিছলেন একবার শ্রীরামকৃষ্ণেরই সঙ্গে। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন ছাত্র, সঙ্গীত-শিক্ষার হাতেখড়ি এর আগেই হয়েছে। উচ্চাঙ্গ তথা ক্লাসিকাল সঙ্গীতের সাধনা তখন তিনি রীতিমত ভাবেই করেন; সুরের প্রবাহ চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁর হৃদয়ে তরঙ্গায়িত হয়ে খেলত; অবিশ্রান্ত-ধারা প্রবাহিণীর মত রাগ-রাগিণীদের আলাপ গুন্-গুন্ শব্দ ক'রে তিনি প্রায় সকল সময়েই করতেন; ভূতে পাওয়ার মত গানের সুর তাঁকে অধিকার ক'রে বসেছিল, অথচ সকল কিছু-জানার আকুলতা ছিল তাঁর অন্তরে জাগ্রত জাগপ্রদীপের মত।

নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হয়ে প্রবেশ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরে পশ্চিমের গঙ্গার দিকের দরজা দিয়ে। শরীরের দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল না, মাথার চুল ও বেশভূষা ছিল পারিপাট্যবিহীন, সবই যেন ছিল আলগা ও দৃষ্টি অন্তর্মুখী। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের মেজেতে ছিল মাদুর পাতা, নরেন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে বসলেন যেদিকে ছিল গঙ্গাজলের জালাটি বসানো। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথকে দেখে আনন্দে আটখানা, [illegible]

পরিচিতের মত নরেন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে তিনি বললেন : "কি রে, এসেছিস ? এতদিন পরে ? বস্।" কিছুক্ষণ বসার পরই নরেন্দ্রনাথকে তিনি বললেন একটি গান করতে। নরেন্দ্রনাথের গানের সুর তো তাঁর ভেতরে অজপা-জপের মতই চলেছিল সারা দিনরাত্রি। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় তাই দ্বিরুক্তি তিনি করলেন না। ষোলআনা মন-প্রাণ ঢেলে ব্রাহ্মসমাজের সেই গানটি নরেন্দ্রনাথ ধরলেন,

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে।
বিষয়পঞ্চক আর ভূতগণ, ও সব তোর পর, কেহ নয় আপন,
পরপ্রেমে কেন হয়ে অচেতন, ভুলিছ আপন জনে।(১) প্রভৃতি

নরেন্দ্রনাথ ধ্যানমৌন, সমস্ত ঘরটি সুরের তরঙ্গে তরপুর, ভক্ত ও অভ্যাগতেরা নিস্তব্ধ নির্বাক্, গানটি গাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গভীর সমাধিতে মগ্ন হলেন। নরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার 'মন চল, নিজ নিকেতনে' গাইতে লাগলেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মন তখন সচ্চিদানন্দ-সাগরে নিমজ্জিত। সত্যই নরেন্দ্রনাথের গান পৃথিবীর মাটিতে শাশ্বত আনন্দলোকের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অপূর্ব গুরু ও শিষ্যের সেই লীলামাধুর্যের তখন সাক্ষ্য দেবার কেউ না থাকলেও তার পুণ্য স্মৃতিটুকু আজো পর্যন্ত বেঁচে আছে মৃত্যুঞ্জয়ী কালের বুকে।

* * * *

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীতশিক্ষা ও সাধনার কথাই আলোচনা করব আমরা এবারে। স্বামী বিবেকানন্দ তথা নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতানুরাগের সংস্কার পেয়েছিলেন তাঁর মাতা-পিতার কাছ থেকে। শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বসু তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দ' (১ম খণ্ড, ১৩৫৬) বইয়ে (পৃঃ ৫৭) উল্লেখ করেছেন : "সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যার প্রতি তাঁহার পিতা-মাতা উভয়েরই বিশেষ অনুরাগ ছিল। স্বামিজী বলিতেন, তাঁহার পিতা সুকণ্ঠ ছিলেন এবং নিধুবাবুর টপ্পা (২) প্রভৃতি গাহিতে পারিতেন। তাঁহার মাতা ভুবনেশ্বরীও বৈষ্ণব ভিক্ষুক ও রাতভিখারীদিগের ভজন-গান একবার মাত্র শুনিয়াই সুর-তাল-লয়ের সহিত আয়ত্ত করিতে পারিতেন।" প্রমথ বাবু তাঁর পুস্তকের 'বাল্যজীবনের শেষ কথা' পর্যায়ে নরেন্দ্রনাথের বাল্য-প্রতিভা সম্বন্ধে একটি নিখুঁৎ চিত্র অঙ্কন করেছেন—যা থেকে মনে হয়, নরেন্দ্রনাথ উত্তরকালে যে বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দে পরিণত হবেন—তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। জীবনের পূর্বকাল অনেক সময় উত্তরকালের উজ্জ্বল অরুণরাগের মহিমা প্রকাশ করে। প্রমথ বাবু আবার লিখেছেন : "সর্বাপেক্ষা তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল সঙ্গীতে। তিনি আশৈশব সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন ; অতি অল্প বয়সেই সঙ্গীতচর্চায় মনোনিবেশ করিয়া যতদিন পর্যন্ত না উৎকৃষ্ট গায়ক বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন ততদিন অধ্যবসায়ের সহিত সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর স্বভাবতই মিষ্ট ছিল, তাহার উপর শিক্ষা ও সাধনাগুণে উহা আরও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।"(৩)

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-প্রতিভা উৎকর্ষ লাভ করেছিল প্রকৃতি-দেবীর কল্যাণ-আশীর্বাদে। বংশগত ও পূর্বজন্মজাত সংস্কার এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়-সহকারে সাধনাও তাঁর কণ্ঠকে সুমধুর ও সঙ্গীত-জ্ঞানকে করেছিল বিচক্ষণ।

নরেন্দ্রনাথ যে সঙ্গীতশিল্পে শুধু কৃতকার্যতা লাভ করেছিলেন তা নয়। রন্ধনবিদ্যা, দাবাখেলা, নাটকানুষ্ঠান ও অভিনয়, বিভিন্ন ক্রীড়া ও ব্যায়াম, নৌকাচালানো, অসিচালনা প্রভৃতি বিষয়েও তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। আবাল্য তিনি ছিলেন তেজস্বী, প্রত্যুৎপন্নমতি, মেধাবী, প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন ও সহৃদয়, এজন্য শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার পথকে তিনি করেছিলেন বিচিত্র ভাবে সমুজ্জ্বল ও সুষমান্বিত।

পিতা শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথ দত্ত পুত্রের প্রতিভার কথা ভালভাবেই জানতেন, পুত্রকে তাই বিভিন্ন বিষয়ে সুযোগ-সুবিধা দেবার তিনি একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। বিশেষ ক'রে সঙ্গীতে অনুরাগ ছিল নরেন্দ্রনাথের ছেলেবেলা থেকেই। রামায়ণগান, কথকতা, রামপ্রসাদী, কীর্তন যে-কোন গানই তখন হোত সিমুলিয়া-পল্লীর কোন বাড়ীতে, নরেন্দ্রনাথের ছিল সেই সব স্থানে অবাধগতি। কণ্ঠ ছিল তাঁর সুমিষ্ট ও গন্ধর্বনিন্দিত, স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ, যে-গান তিনি একবার শুনতেন—গাইতেন হুবহুরূপে। বিশ্বনাথ দত্তের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি পুত্রকে তাই বিশুদ্ধ সঙ্গীতশিক্ষা দিতে মনস্থ করলেন, ব্যবস্থাও তার হোল সুচারুরূপে।

নরেন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গ ক্ল্যাসিকাল গান শিক্ষা করেন বেণী ওস্তাদের কাছে তা আগেই বলেছি। এই বেণী ওস্তাদের নাম নিয়ে মতবাদও বড় কম নেই। শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বসু তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দ' (১ম ভাগ, ১৩৫৬) পুস্তকে (পৃঃ ৭২-৭৩) উল্লেখ করেছেন : "সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিশারদ আহম্মদ খাঁর শিষ্য বেণী গুপ্ত নামে একজন ওস্তাদের নিকট তিনি সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন।" কিন্তু স্বামিজীর মধ্যম ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের মুখে আমরা শুনেছি : স্বামিজী উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন বেণী ওস্তাদের কাছে। বেণী ওস্তাদ ছিলেন বৈরাগী, সুতরাং দাস তাঁর পদবী হওয়া স্বাভাবিক এবং সেদিক থেকে ওস্তাদের নাম ছিল বেণী বৈরাগী বা বেণী দাস। শ্রদ্ধাস্পদ মহিমবাবু বলেন—'কি জানি বাবু, বেণী গুপ্ত—'গুপ্ত' নাম আমি শুনিনি, আমরা জানি বেণী বৈরাগী (দাস) বা বেণী ওস্তাদ।' সুতরাং এখন আমরা শোনার বা পড়ার দলের লোক—কার কথা বিশ্বাস করব ? আমাদের মনে হয়, পরম শ্রদ্ধেয় মহিমবাবুর তীক্ষ্ণ স্মৃতিজাত বেণী বৈরাগী নামই ঠিক। তবে তাঁকে সাধারণত বলা হোত বেণী ওস্তাদ।

শ্রদ্ধেয় প্রমথ বাবু আরো লিখেছেন : বেণী গুপ্তের (?) কাছে

১। গানটি সুরট-মল্লারে স্বামিজী গান করেছিলেন। গানের বাণী রচনা করেছিলেন অযোধ্যানাথ পাকড়াশী। বর্তমানে এই গানটি ভিন্ন রাগেও গাওয়া হয়। গানটির তাল একতাল। স্বামিজী যে-ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে স্বর-বিন্যাস ক'রে গান করতেন, শ্রীকমলকৃষ্ণ মিত্র "শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি" (২য় সংস্করণ ১৩৫৫) পুস্তকে (পৃঃ ৭২-৭৩) তার স্বরলিপির আভাস দিয়েছেন।

২। বাঙ্গালা দেশে তদানীন্তন সময়ে সঙ্গীতের প্রসঙ্গে আমরা পরে নিধুবাবুর টপ্পা-সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করার চেষ্টা করব।

৩। 'স্বামী বিবেকানন্দ', ১ম খণ্ড (১৩৫৬), পৃঃ ৫৭

নরেন্দ্রনাথ "সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন।" আমাদের মনে হয়, প্রমথ বাবু সঙ্গীতবিদ্যাকে সঙ্গীতশাস্ত্রের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছেন। তবে কিছু পরে আবার তিনি উল্লেখ করেছেন: "তদনুসারে নরেন্দ্র চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া ঐ ওস্তাদের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন।" অবশ্য সঙ্গীতশাস্ত্রও যে তিনি ওস্তাদজীর কাছে শিক্ষা করতে পারেন এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

নরেন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিক্ষা আরম্ভ করেন প্রবেশিকা শ্রেণীতে যখন তিনি পড়েন তখন থেকেই। শুধু গান নয়, তবলা, পাখোয়াজ প্রভৃতি বাদ্য এবং এস্রাজ, সেতার প্রভৃতি যন্ত্রসঙ্গীতও তিনি শিক্ষা করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমুদবন্ধু সেন বলেন, স্বামিজী যে কোন বাদ্যযন্ত্রই ভাল ক'রে বাজাতে পারতেন। বেণী ওস্তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় প্রমথ বাবু লিখেছেন: "ইনি কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয়বিধ সঙ্গীতেই পারদর্শী ছিলেন।" নরেন্দ্রনাথ সম্ভবত কণ্ঠসঙ্গীতের মতন যন্ত্রসঙ্গীতও বেণী ওস্তাদের কাছে শিক্ষা করেছিলেন। তবলার প্রাথমিক শিক্ষাও তাই; তবে শোনা যায়, তিনি রীতিমত তবলা শিক্ষা করেছিলেন নাকি একজন মুসলমান তবলচির কাছে। স্বামিজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেন, স্বামিজী বোলসহ একখানি তবলার বইও প্রকাশ করেছিলেন এবং তিনি তা স্বচক্ষে দেখেছেন। তাঁর তবলার বই প্রকাশিত হয়েছিল নাকি বটতলা থেকে, যেমন তাঁর লেখা 'ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব' ছেপেছিলেন একজন সঙ্গীতপুস্তক-প্রকাশক বটতলার ছাপাখানা থেকে(৪)। তবে তাঁর লেখা ও প্রকাশকের ছাপা 'ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব' বইখানির সন্ধান আজো পর্যন্ত আমরা পাইনি। এ ছাড়া তাঁর রচিত 'গানের বই'-ও একখানি নাকি ছাপা হয়েছিল, যার দু'-চারখানি গানমাত্র আমরা ভিন্ন ভিন্ন গানের সংগ্রহ-পুস্তকে এখন ছাপা দেখি। ব্যক্তিগত চেষ্টার মত বাঙ্গালা দেশের সর্বসাধারণের প্রচেষ্টা এই বইগুলির অনুসন্ধানে নিয়োজিত হওয়া উচিত। স্বামী বিবেকানন্দ কোন সঙ্ঘ, মঠ বা সমিতির নিজস্ব সম্পদ নন, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বের তথা বিশ্ববাসীর গৌরবের সম্পত্তি। অন্ততঃ বাঙ্গালা দেশের অনুসন্ধিৎসুদের সতর্ক দৃষ্টি এদিকে থাকা বাঞ্ছনীয়, কেননা স্বামী বিবেকানন্দের লেখা কোন বই, প্রবন্ধ, কবিতা ও গান বাঙ্গালার কেন, সারা ভারতবর্ষের জাতীয় সম্পদ।

শ্রদ্ধেয় প্রমথ বাবু আবার লিখেছেন: "বিশ্বনাথ বাবু বাল্যাবধি পুত্রের সঙ্গীতপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে উহাতে সম্যক্ অধিকার জন্মে না জানিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে নরেন্দ্র ওস্তাদের নিকট হইতে রাগ-রাগিণী শিক্ষা করেন ও তাল-মান-লয় সম্বন্ধে বিধিমত উপদেশ প্রাপ্ত হন।" তিনি আরো উল্লেখ করেছেন: নরেন্দ্রনাথ যেমন গান শিক্ষা করেছিলেন তেমনি বাজাইতেও বেশ শিখিয়াছিলেন, কিন্তু সঙ্গীতেই তাঁহার বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছিল। যেখানে যাইতেন সেখানেই গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইতেন,—সকলেই তাঁহাকে ওস্তাদের ন্যায় খাতির-যত্ন করিত এবং সঙ্গীত-সম্বন্ধে তাঁহাকে এক জন 'অথরিটি' (প্রমাণস্বরূপ) বলিয়া গণ্য করিত। প্রাচ্য সঙ্গীতের সহিত পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তুলনা দ্বারা তিনি সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং উক্ত শাস্ত্রের একজন অভিজ্ঞ সমালোচক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। * * * তাঁহার সঙ্গীতগুরু তাঁহার প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অন্যান্য শিষ্য অপেক্ষা তাঁহাকে অনেক অধিক বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা নিজের মুখোজ্জ্বল হইবে জানিয়া তাঁহাকে শিখাইবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেন।"(৫)

বেণী ওস্তাদের বাড়ী ছিল কলকাতায় মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে ঈশ্বর গুপ্তের বাড়ীর কাছে। ওস্তাদের বাড়ীর কাছাকাছি ছিল বিখ্যাত অম্বু গুহের বাড়ী ও কুস্তির আখড়া। বেণী ওস্তাদকে বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করলেও শিক্ষক বা ওস্তাদের খোঁজ-খবর সংগ্রহ করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ নিজে। এ-সংগ্রহের কাজে সাহায্যের অবদান ছিল তাঁর কুস্তির আখ্‌ড়ার সতীর্থদের। নরেন্দ্রনাথের শরীর ছিল সবল, বলিষ্ঠ ও সুঠাম এবং এই স্বাস্থ্যের পুরস্কার তিনি অর্জন করেছিলেন একদিকে নিজের বাল্যকাল থেকে কুস্তি, ডন, বৈঠক প্রভৃতি ব্যায়াম শিক্ষা করার আকুল ইচ্ছার ও অন্যদিকে কুস্তিগীর অম্বু গুহের সযত্ন শিক্ষাদানের জন্য।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রদ্ধেয় প্রমথ বাবু লিখেছেন: "নরেন্দ্র তাঁহার (ওস্তাদের) নিকট অনেক হিন্দী, উর্দু এবং ফার্সী গানও শিখিয়াছিলেন। ঐগুলির অধিকাংশ মুসলমানদিগের পর্বাদিতে গীত হয়" (পৃঃ ৭৩)। কিন্তু একথা সত্য যে, উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী (ক্ল্যাসিকাল) সঙ্গীত তথা ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা, গজল প্রভৃতি গান হিন্দী, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় রচিত। কিন্তু ঐগুলির অধিকাংশ যে মুসলমানদের পর্বের জন্য নির্ধারিত, তা ঠিক নয়। আমাদের মনে হয়, স্বামিজীর প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল প্রমথ বাবুর উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের খুঁটিনাটির সম্বন্ধে বিশেষ জানা ছিল না; কিন্তু তাই বোলে প্রসঙ্গ-বর্ণনার মধ্যে কোন দৈন্য তাঁর লেখনীতে এতটুকু প্রকাশ পায়নি।

শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমুদবন্ধু সেন বলেন: বেণী ওস্তাদের বাড়ী ছিল মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে। ওঁর বাড়ীতে ছিল হাপ্-আকড়াইয়ের দল। স্বামিজী (স্বামী বিবেকানন্দ) মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে অম্বু গুহের কাছে রীতিমত তখন কুস্তি-আদি ব্যায়াম শিক্ষা করেন। রাখাল মহারাজও (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ছিলেন তাঁর সহযাত্রী। অম্বু গুহের পাড়ায় কেন, প্রায় বাড়ীর কাছেই ছিল বেণী ওস্তাদের বাড়ী। বিদেশ (বাংলার বাইরে) থেকে অনেক হিন্দু ও মুসলমান গাইয়েও আসতেন মাঝে মাঝে বেণী ওস্তাদের বাড়ী। কাজেই আখ্‌ড়ার কাছাকাছি হওয়ায়

৪। শ্রদ্ধেয় প্রমথ বাবুও উল্লেখ করেছেন: "এমন কি, কোন দরিদ্র সঙ্গীতপুস্তক-প্রকাশককে তাঁহার পুস্তক বিক্রয়ের সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি 'ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব' সম্বন্ধে এক প্রকাণ্ড মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন।" আমরা শুনেছি—স্বামিজী ঐ নামে একখানি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন ও জনৈক প্রকাশক সেটি বার করেছিলেন বটতলা থেকে ছেপে। কিন্তু শ্রদ্ধেয় প্রমথ বাবুর লেখায় পাই—স্বামিজী অন্য একটি সঙ্গীতপুস্তকের সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখেছিলেন 'ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব' নাম দিয়ে।

৫। 'স্বামী বিবেকানন্দ,' ১ম ভাগ, ১৩৫৩, পৃঃ ৭-৩

কুস্তি শেখার পর নরেন্দ্রনাথ গান শিখতে যেতেন বেণী ওস্তাদের কাছে।(৬)

শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন: "মসজিদবাড়ী স্ট্রীটে অম্বু গুহের কাছে স্বামিজী ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ রীতিমত ভাবে কুস্তি শিখতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমায় বলেছিলেন: 'আমি সেই মাত্র ফেন্সতে শিখেছি, তারপর ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) কাছে চলে এলাম; আর শেখা হলো না'।"

স্বামী বিবেকানন্দ বেণী ওস্তাদের কাছেই বেশীর ভাগ সময় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন বলে আমাদের মনে হয়। অনেকে বলেন, কয়েকজন মুসলমান ওস্তাদের কাছ থেকেও সঙ্গীতের অনেক জিনিস তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। ধ্রুপদ, খেয়াল ঠুংরী, টপ্পা, গজল প্রভৃতির গান তিনি বিশুদ্ধ হিন্দী-উচ্চারণ ও রাগ-রূপসহ শিক্ষা করেছিলেন। এ-ছাড়া ব্রাহ্মসমাজের ধ্রুপদাঙ্গ ভজন, বাঙ্গালা টপ্পা ও টপ্-খেয়ালও তিনি অসংখ্য শিক্ষা করেছিলেন। প্রশংসাবাদ ও স্তুতিবাচকতার কথা ছেড়ে দিলে আমরা কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ও শ্রোতার মুখে শুনেছি, গলার স্বর তাঁর এতই সুমিষ্ট, সতেজ, সরল ও সুন্দর ছিল যে, যে-কোন রাগের আলাপই ভাব ও রসের পরিপূর্ণ মূর্তি নিয়ে প্রকাশ পেত তাঁর কণ্ঠে, পরিবেশ সৃষ্টি করত আনন্দঘন-লোকের!

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীতের ঘরাণা ছিল বিশুদ্ধ ও চাল ছিল যথার্থ কলাবিদ্দের পর্যায়ের 'খানদানী'। এর পরিচয় পেতে গেলে আমাদের মোটামুটি ভাবে আলোচনা করতে হবে বেণী ওস্তাদের ঘরাণা বা আচার্য-সম্প্রদায়।

কলকাতার তদানীন্তন বাঙ্গালী-সমাজের নামকরা ওস্তাদ বা সঙ্গীতাচার্যদের ভেতর বেণী ওস্তাদের নাম প্রসিদ্ধ ছিল। কেবল বাঙ্গালী-সমাজে কেন, নামকরা মুসলমান ও হিন্দুস্থানী ওস্তাদ-মহলের মধ্যে বেণী ওস্তাদের ছিল বেশ সুনাম ও সমাদর। বেণী ওস্তাদের প্রধান গুরু ছিলেন "সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিশারদ আহম্মদ খাঁ।" আহম্মদ খাঁ ছিলেন তখনকার কলকাতার অনেক মুসলমান ও হিন্দু-শিক্ষার্থীর গুরু। স্বামী বিবেকানন্দ ওস্তাদ আহম্মদ খাঁর কাছে কিছু শিক্ষা করেছিলেন কিনা জানি না। আহম্মদ খাঁ ছিলেন লক্ষ্ণৌয়ের শক্কর খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। আহম্মদ খাঁরা দু'ভাই; ছোট ভাইয়ের নাম মহম্মদ খাঁ।(৭)

কুমার শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (গৌরীপুর) উল্লেখ করেছেন: "আমার যতদূর ধারণা—আহম্মদ খাঁ (৮) মহম্মদ খাঁ ইঁহারা দুই ভাই ছিলেন। ইঁহারা শা সদারঙ্গের কাওয়াল শিষ্য-বংশীয়। এই বংশ বিলুপ্ত। শেষ বংশীয় দেলাবর খাঁ (দিলবর খাঁ?) রেওয়া-দরবারে ছিলেন। (৯) * * হদ্দু, হস্সু ও নথ্থু খাঁ এই তিন ভাই মহম্মদ খাঁর শিষ্য ছিলেন।"(১০) আহম্মদ খাঁ ছিলেন অদ্বিতীয় খেয়ালী, থাকতেন গোয়ালিয়রে। আহম্মদ খাঁ পরে বেনারসে কিছুদিন ছিলেন। কলকাতায়ও মাঝে মাঝে তিনি আসতেন ও থাকতেন। কেননা কলকাতায়ও তাঁর কয়েকজন নামজাদা হিন্দু ও মুসলমান 'শিষ্য' ছিলেন।" স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীতগুরু বেণী ওস্তাদও ঐ বিখ্যাত খেয়ালী আহম্মদ খাঁর শিষ্য তা আগেই আমরা উল্লেখ করেছি। আহম্মদ খাঁ খেয়াল গানের স্রষ্টা—শা সদারঙ্গের শিষ্য-বংশীয়, সুতরাং খেয়ালের আসল রূপ ও চাল তাঁদের গানের মধ্যে ছিল। বেণী ওস্তাদের ঘরাণা প্রামাণিক ও ভারতের শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর্গত। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ঐ বিশুদ্ধ ঘরাণার সঙ্গীতেরই অধিকারী। [ক্রমশঃ।

৬। বেণী ওস্তাদ স্বামিজীর শিমুলিয়ার বাড়ীতেও আসতেন গান শেখাতে আমরা শুনেছি।

৭। ১৩৪১ সালের আষাঢ় ৩য় সংখ্যা (১১১ পৃষ্ঠা) সঙ্গীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকায় 'আহম্মদ খাঁ ও মহম্মদ খাঁ' সম্বন্ধে ভুল সংবাদ ছাপা হয়েছে দেখা যায়। 'সংবাদ' নামক পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে: "যুক্তপ্রদেশের বান্দাসিটির অন্তর্গত কলাবৎ মহল্লার গায়ক-বংশীয় ওস্তাদ মহম্মদ খাঁ * *। সুপ্রসিদ্ধ খেয়ালী ওস্তাদ আহম্মদ খাঁ ইঁহারই পিতা ছিলেন। * * ইঁহারা বংশানুক্রমিক আদর্শ-সঙ্গীতের জন্য গোয়ালিয়র ও দাঁতিয়া মহারাজগণের বৃত্তিভোগী।"

৮। আহম্মদ বা আহাম্মদ খাঁ। অনেকে আহম্মদ খাঁ নামই বিশুদ্ধ বলেন।

৯। আহম্মদ খাঁর ছোট ভাই মহম্মদ খাঁও শেষে রেওয়ার রাজদরবারে এক হাজার টাকা মাইনের চাকরী করতেন। কিন্তু প্রথমে তিনি ছিলেন গোয়ালিয়রে দৌলত খাঁ সিন্ধিয়ার দরবারে।

১০। লেখককে লিখিত ইংরেজী ২৮।৩।৫২ তারিখের পত্র।

আজন্ম

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

তোমাকে দেখেছি কবে মনে নেই প্রথম প্রত্যুষে,
যখন আশ্চর্য্য প্রেমে কচি ঘাসে ঝরেছে শিশির,
নতুন রোদ্দুরে গন্ধে জেগে উঠে বুকের সোহাগ
এঁকে দিয়ে গেছে মনে ঠোঁটে করে সকালের পাখী।
তোমাকে ডেকেছি কাছে, অনুরাগে ধরেছি হৃদয়
এঁকেছি বিচিত্র ঢঙে ইমারৎ নিগূঢ় প্রেমের,
চুলের অরণ্য হতে ভেসে-আসা সৌরভ-বাতাসে
আমার স্বপ্নের জট খুলে গেছে, পেয়েছি তোমায়।

তোমাকে পেয়েছি আমি ইতিহাস-চেতনার আগে—
সৃষ্টির সুরুর হতে তুমি এক প্রসন্ন কাকলি,
রক্তের সমুদ্রে যেন তুমি স্নিগ্ধ দ্বীপের সঙ্কেত,
জীবন-সংগ্রামে তুমি মূর্ত কোনো অক্লান্ত সাধনা:
মৃত্যুর দুর্দ্ধর্ষ ভয় ভেঙে তুমি অক্ষয় আশ্বাস
তোমাকে পেয়েছি বলে আমি এক সম্পূর্ণ মানুষ!

প্রতিভা বসু

দ্বিতীয় খণ্ড

বিনয়

১

কারখানা থেকে খুব তাড়াতাড়ি আজ ফিরে এলেন মিঃ রায়। তাঁর গাড়ি এসে কাঁকর-বিছোনো গাড়িবারান্দায় থামতেই তকমা-আঁটা বেয়ারা ছুটে এলো কোথা থেকে, দরজা খুলে সেলাম ক'রে থমকে দাঁড়িয়ে রইলো পায়ে পা ঠেকিয়ে এক পাশে। রায় নামলেন। অর্দ্ধচন্দ্র গোল সিঁড়িতে ক্রেপসোলের মোটা জুতো নিঃশব্দে ফেলে ফেলে একতলার প্রশস্ত বারান্দায় উঠলেন, একটু থামলেন, বেয়ারা তাঁর টুপি রেখে দিল হ্যাট-র‍্যাকে। বাঁ দিকের কার্পেটমোড়া সিঁড়ি বেয়ে আবার সোজা তিনি উঠে গেলেন দোতলায়।

কাল রাত্রিতে একটুও ঘুমুতে পারেননি। বলতে গেলে সারাটি রাতই বিনিদ্র কেটেছে। আজ তিনি ক্লান্ত। শুধু ক্লান্তি নয়, আজকের এই চল্লিশ বছর বয়সের একজন লক্ষপতি ব্যবসায়ী, জীবন-যুদ্ধে যিনি সর্ব্বতোভাবে জয়ী, নিরপেক্ষ, আত্মনির্ভরশীল, তিনিও আজ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, উদ্‌ভ্রান্ত, ব্যাকুল।

খড়া-চূড়ো খুলিয়ে দিল বেয়ারা, সিল্‌কের মসৃণ পাজামা আর পাঞ্জাবীর উপর ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে দক্ষিণের পোর্টিকোতে এসে দাঁড়ালেন তিনি। এক ঝাপটা হাওয়া উঠে এলো সোজা সমুদ্র থেকে, একটু উত্তপ্ত কিন্তু মধুর। সুন্দর বারান্দা। এ বারান্দায় সমস্তটা আকাশ এসে লুটিয়ে পড়েছে কৃতজ্ঞতার মতো। আকাশের নীল ছায়া তার তুলো-পেঁজা মেঘ নিয়ে ছড়িয়ে আছে সমুদ্রের বুকে, এ বারান্দা থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তিনি। নিচে, বাগানের অজস্র লাল-নীলের উপর রোদ ঝলসাচ্ছে, কালো-হ'লদে প্রজাপতিরা উড়ে বেড়াচ্ছে পাখা মেলে, বড় বড় গাছের মাথায় তার প্রতিফলন।

গদি-আঁটা মখমলের কোমল ডিভানে তিনি গা এলালেন, পা থেকে সাদা বাছুর-চামড়ার নরম চটিটি আস্তে খসে পড়লো মারবেল পাথরের মেঝের উপর, একেবারে মিশে গেল।

ভৃত্যরা এখুনি খস্‌খস্‌ মেলে দিচ্ছে ঘরে ঘরে, দশটা বেজেছে। তাপ উঠে যাবে। বারোটা বাজলে জল ছিটানো হবে। এই নিয়ম। সারা বাড়ি চন্দনের গন্ধে আকুল।

না, এই বারান্দা এখন ঢাকতে দেবেন না মিঃ রায়। দৃঢ় একটি হাত মাথার তলায় রেখে আরেকটি হাতের দু'টি মোটা আঙুলের ফাঁকে অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট নিয়ে চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন উজ্জ্বল আকাশের দিকে। জীবনের অপরাহ্নে দাঁড়িয়ে তাঁর স্মৃতি-সমুদ্রও আজ উদ্বেল। এই বুড়ো বয়সে তাঁরও আজ বিয়ে, তাঁরও একটি কলঙ্কিত অধ্যায়ের উপর আর কয়েক ঘণ্টা বাদেই যবনিকাপাত।

এক ঝাঁক সমুদ্রপাখি উড়ে গেল ছায়া ফেলে ফেলে। সমুদ্রে ঢেউ ভাঙলো একটি, দূরে কোথায় কার গাড়ির সুরেলা হর্ণ বেজে উঠলো, তার পর চুপ। মস্ত বাড়ির স্তব্ধতায় কেবল মাথার উপরকার সাদা সাদা চারটি ব্লেডের ভ্রমর-গুঞ্জন। তানপুরোর চারটে তার। 'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক।' নিজের চব্বিশ বছর বয়সের ইচ্ছার প্রাবল্যে ভরা উদ্দাম সবুজ দিনগুলোর দিকে তিনি ফিরে তাকালেন।

২

এম-এ পরীক্ষা হ'য়ে গেল, দিদি বললেন, 'এবার বিলেত পাঠাবো তোকে।'

বিনয় বললো, 'সেখানে গিয়ে কী এমন দিগ্‌গজ হ'য়ে আসবো, মিছিমিছি তোমার টাকাগুলো খরচ হ'য়ে যাবে।'

'টাকা তো খরচ করবার জন্যই।'

'খরচ তো এ পর্য্যন্ত অনেকই করলে। এবার একটু আয়ের চেষ্টা দেখলে মন্দ কী।'

'নিশ্চয়ই মন্দ নয়, আমিও তো তার জন্যেই তৈরী হ'তে বলছি।'

'তৈরী যা হয়েছি তাতেই আমার চলবে। একটা ফার্স্ট ক্লাশ নিশ্চয়ই পাবো, একটা মাষ্টারিও নিশ্চয়ই জুটবে।'

'বাবার ইচ্ছে তোর মনে আছে তো? নিশ্চিন্ত মনে এখন বিশ্রাম নে কয়েক দিন, আমিও এদিকে টাকা-কড়ির যোগাড় করি, তার পর সুবিধে মত চলে যা।

প্রস্তাব লোভনীয় সন্দেহ কী! কিন্তু দিদির ঐ সামান্ত পুঁজি থেকে আর কত? যদিও এই নিঃসন্তান বিধবা দিদিটির সেই একমাত্র স্নেহের বন্ধন তবু তার তো নেবার একটা সীমা আছে? বাবা যতদিন জীবিত ছিলেন আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় ক'রে শেষ পর্য্যন্ত কিছুই রেখে যেতে পারেননি। বেশী বয়সের মাতৃহীন ছেলের উপর তাঁর স্নেহটা কিছু উগ্র ছিলো, বড্ড বেশী খরচ করতেন তিনি তার জন্তে। উঁচু মাশুলে মিশনারি ইস্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিয়েছিলেন ছেলেকে, পোষাক-আসাক, খাওয়া-পরা কিছুতেই কোন কার্পণ্য ছিলো না সংসারে। তার উপর চাকর-বাকররা হু'হাতে লুটতো, খরচ করতো অকারণে, ছড়াতো, ছিটোতো, লাট করতো, মাঝে মাঝে দিদি এসে রাশ টানতেন, তিনি চলে গেলে আবার যেই কে সেই।

তার পর তিনি একদিন অজ্ঞান অবস্থায় ফিরে এলেন আপিস থেকে। যাঁরা নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরাই ধরাধরি ক'রে বিছানায় এনে শুইয়ে দিলেন, বেলা তিনটে থেকে সমানে হাঁপিয়ে রাত দশটায় স্থির হ'লেন। এর মধ্যে একবারের জন্তেও চোখ খুললেন না, একটু নড়লেন না, এক ফোঁটা ওষুধ নিতে পারলেন না ভেতরে, কেবল নিশ্বাসের প্রবল উত্থান-পতনে নাকের একটা পাশ কেটে গেল। শিহরিত হ'য়ে হু'-হাতে মুখ ঢাকলো বিনয়।

টেলিগ্রাম পেয়ে দিদি এলেন, শূন্ত ঘরের দিকে তাকিয়ে মুহূর্ত্তের জন্ত থমকালেন একটু, কাপড় ছাড়বার অছিলায় ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। মাত্রই কয়েক মিনিট, তার পরেই ঈষৎ ফোলা-ফোলা চোখে বেরিয়ে এসে শান্ত মুখে বিধি-ব্যবস্থায় মন দিলেন। মৃত্যু তো তাঁর জীবনে নতুন নয়? ষোলো বছর বয়সে মা মারা গেছেন, উনিশ বছর বয়সে একমাত্র কন্তাকে হারিয়েছেন, আর বাইশ বছর বয়সে স্বামী। মৃত্যুতে তাঁর ভয় কী? তাছাড়া শোক করবারই বা সময় কোথায়? বিনয় আছে না? ঐ তো একটা বিন্দু, এই বিন্দুটিকে কেন্দ্র ক'রেই তো এখন তাঁর সব আশা, সব আকাঙ্ক্ষা। ও ছাড়া আর জীবনে কী রইলো তাঁর? ওকে রক্ষা করাই এখন সব চেয়ে বড়ো কর্ত্তব্য।

এগারো দিনের দিন ছোট একটি অনুষ্ঠান ক'রে, বিনা আড়ম্বরে শোককে তিনি বিদায় দিলেন। কয়েক দিন পরেই বিনয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষা, বরাবর সে ক্লাশে ফার্স্ট হ'য়ে এসেছে, মাষ্টার আশা করছেন তাকে দিয়ে, এখন সময় নষ্ট করলে চলে না। দিদির যত্নে, কৌশলে, ভালোবাসার উষ্ণতায় বিনয়ের মনও শান্ত হ'য়ে এলো অনেকটা। দিদি রইলেন তার কাছে, সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করলেন তাকে। পরীক্ষা হ'য়ে যাবার পরে, লম্বা ছুটিটা কাটিয়ে তাকে কলেজে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে, হষ্টেলে পাঠিয়ে তার পর একেবারে দেশে ফিরলেন। দেশে তাঁর ছোটখাট তালুকদারি আছে, সেখানে না থাকলে চলে না। আবার নতুন ক'রে কষ্ট পেলো বিনয়। আশৈশবের শত স্মৃতি-বিজড়িত একতলা বাড়িটি ছাড়তে মুচড়ে উঠলো বুকের ভেতরটা। নতুন ক'রে উপলব্ধি বাবা নেই। কলেজ ভালো না, হষ্টেল ভালো না, বন্ধু-বান্ধবে মন নেই, সব শূন্ত, সব ফাঁকা। দুঃখ ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুরই অস্তিত্ব সে ভুলে গেল কিছু দিনের জন্ত। কিন্তু আবার কবে একদিন কচিপাতায় ছেয়ে গেল গাছ, মন ডানা মেললো আকাশে, ফাল্গুন হাওয়া দিল ঝির-ঝির ক'রে, বসন্ত এলো জীবনে। সতেরো পূর্ণ ক'রে আঠারোয় পা দিল বিনয়। উন্মীলিত যৌবন তাকে এক অপরূপ জীবনের দরজায় এনে পৌঁছে দিল।

দিদি আছেন তার ইচ্ছার ছায়া হ'য়ে। তার আনন্দের উপকরণ যোগানোই তাঁর জীবনের একমাত্র সার্থকতা। টাকা চাই? পাঠাচ্ছি। ছুটিতে বেড়াতে যাবে? নিশ্চয়ই। কয়েক জন বন্ধু নিয়ে আসতে চায়? আসুক না। এই ছুটিতে তার দিদিকে কলকাতায় চাই? বেশ তো, বাড়ি নাও দু'মাসের জন্তে। তারও যেমন আবদারের সীমা নেই, দিদিরও তেমন পূরণের ক্ষমতা অসীম। একটা পাখির পালকের মত হালকা হাওয়ায় ভেসে গেল দিনগুলো। দু'টো বছর যেন দু'টো পলক। কিন্তু আর কত? ছোট্ট তালুকের মস্ত অংশ খসে গেছে এই ক' বছরে। কিন্তু দিদি তাঁর নিজের ইচ্ছেতে দৃঢ়। বিনয়ের কোনো আপত্তিতেই কান দিলেন না। একখণ্ড জমি বিক্রীর চেষ্টায় লোক লাগালেন দিক্‌বিদিকে। 'সবে তো পরীক্ষা দিলি', তিনি বললেন, 'পাঁচ-ছ' মাসের মধ্যে তোর যাওয়া আসা থাকা, সব খরচ আমি জোগাড় ক'রে ফেলবো দেখিস।'

'তত দিনে আমি মস্ত চাকরী নিয়ে তাক্ লাগিয়ে দেবো তোমাকে।'

'সেই আশাতেই তো আমি আছি।'—গভীর স্নেহে তিনি ভাইয়ের মাথায় হাত বুলোলেন।

এরই মধ্যে কোন এক দুপুরে, দিদির তাড়নায় বড্ড বেশী খেয়ে, প্রাত্যহিক নিয়মে একখানা বই মুখে নিয়ে অলস বেলা কী ক'রে কাটবে এমন একটি আধ্যাত্মিক বিষয়ে যখন উঁচু মগজকে কিঞ্চিৎ খাটিয়ে নিচ্ছিল বিনয়, ঘরের মধ্যে একটি মৃদু সৌরভ ছড়িয়ে পড়লো। চমকিত হলো সে। দিদি বাড়ি নেই, তিনিও তাঁর প্রাত্যহিক নিয়মে পাশেই জ্ঞাতি ভাসুরের বাড়ি সুখ-দুঃখের কথা বলাবলি করতে গেছেন সমবয়সী ননদ-জা'দের সঙ্গে। বই থেকে বিনয় চোখ সরালো। দরজার কাছে, একটি ছোট ছেলের হাত ধরে ঈষৎ আনত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। তার খোলা চুলের একটি পাকানো গুছি কাঁধের উপর দিয়ে বুকের কাছে এসে ছড়িয়ে আছে। কালো পাড় ঢাকাই শাড়ির আঁচলের তলায় রঙিন সুতোর কাজ-করা পাতলা ব্লাউজ, ঘেমেছে গরমে, রোদ লেগেছে মুখে, ফর্সা মুখ লাল; কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম।

'জ্যাঠাইমা বাড়ি নেই?' একটি পাখি ডেকে উঠলো ঘরের মধ্যে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসলো বিনয়—'হ্যাঁ, এই একটু—আসুন না আপনি।'

'ঘুমুচ্ছেন?'

'না, এইখানে—ওঁর ভাসুরের বাড়ি—আমি এখুনি ডেকে পাঠাচ্ছি।'

খাট থেকে নেমে মেয়েটিকে পাশ কাটিয়ে দেউড়িতে এসে দাঁড়ালো দ্রুত পায়। চাকররা গোল হ'য়ে তাস খেলছে সেখানে, সচকিত হ'য়ে উঠলো তারা।

ফিরে এলো তক্ষুনি; ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বললো, 'বসুন, এখুনি উনি এসে পড়বেন।'

সাবেকি আমলের মস্ত বাড়ি। এক সময়ে যে জাঁকজমক ছিলো চিহ্ন আছে তার। ঘরের ভেতর মেহগনির ভারি-ভারি হাঁপ-ধরা আসবাব-পত্র। মকরমুখ টেবিলের কালো বার্ণিশে সাদা হাত রেখে প্রকাণ্ড পিঠ-উঁচু চেয়ারটিতে জড়োসড়ো হ'য়ে বসলো মেয়েটি। আর ভাইটি ছুটে চলে গেল রান্নাঘরের পেছনে, যেখানে সারি সারি পেয়ারা গাছে রাশি রাশি পেয়ারা ধরে আছে। পড়ে যাচ্ছে, লোকেরা নিচ্ছে, পাখীতে ঠোকরাচ্ছে। পরীক্ষার পরের এই এক মাসের শান্ত সমুদ্রে এই একটু তরঙ্গ। ভালো লাগলো বিনয়ের। এখানকার দিন সত্যিই তার কাটতে চায় না, রাত্রি ফুরোতে চায় না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্লান্ত হ'য়ে। বই-পত্র সে যা নিয়ে এসেছিলো কবে তা শেষ হ'য়ে পুরোনো হ'য়ে গেছে। আগ্রহের সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করলো।

'ওটি বোধ হয় আপনার ছোটো ভাই?'

'হ্যাঁ।'

'খুব মিল আছে কিন্তু।'

মুখ নিচু ক'রে হাসলো মেয়েটি।

'আপনার বাবাকে আমি চিনি।'

'ও!'

'আপনাকেও একবার দেখেছিলাম কালিবাড়ির থিয়েটরে। তখন আপনি ছোট ছিলেন। দু'-তিন বছর আগের কথা বলছি।'

একদিকের কালো ধনুকের মত ভুরু একটুখানি বেঁকলো, বোধ হয় ছোট কথাটা মনোমতো হ'লো না।

'আপনার বাবা ভালো আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে বোধ হয় আপনি—'

'হ্যাঁ জানি। আমিও আপনাকে দেখেছি, আপনিও তখন—'

পাল্টা জবাবটা দিতে গিয়ে ও থামলো, তার পর দু'জনেই খানিকক্ষণের জন্য চুপ। গ্রামের নিস্তব্ধ দুপুর ঝুলে রইলো মাঝখানে। মুখোমুখি একটু বিব্রত বোধ করলো বিনয়। কিন্তু কী-ই বা করা—ভাবলো সে। অপর পক্ষ যদি এত নিস্পৃহ হয় তা হ'লে একা সে আর কত আলাপ উদ্ভাবন করতে পারে! একবার তো ভদ্রতা হিসেবেও ওর দু'-একটা প্রশ্ন করা উচিত? কিন্তু সে নির্বিকার। বিনয়ই আবার কথার অবতারণা করলো, 'দিদির কাছেও আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি।'

'আমার কথা?' হাসলো সে, মুহূর্তের জন্য একবার তাকালো বিনয়ের মুখের দিকে। বিনয় চোখ ফিরিয়ে নিল।

দিদি এসে পৌঁছুলেন। গা থেকে সিল্কের চাদরটা খাটের বাজুতে রাখতে রাখতে বললেন, 'ওমা তুই? কী রে অনসূয়া।'

'মা পাঠিয়ে দিলেন'—চেয়ার থেকে সে উঠে দাঁড়ালো।

'কেন?'

'আজ বিকেলে আপনারা যাবেন।'

'বোস্ বোস্। কিন্তু ব্যাপারটা কী শুনি দেখি?

অনসূয়া একখানা চিঠি দিল হাত বাড়িয়ে 'যেতেই হবে।'

চিঠিটা পড়তে এক মিনিটও লাগলো না। দিদি খুশী-গলায় বলে উঠলেন, 'ওমা, এর মধ্যেই ষোলো বছর পূর্ণ হ'লো তোর? তুই এলি কবে পৃথিবীতে শুনি?' সস্নেহে তাকে আদর করলেন, তার পর বিনয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই ছাখ বিনয়, আমাদের গ্রামের সেরা মেয়েকে ছাখ। অবিনাশ বাবুর মেয়ে। বলিনি তোকে?'

অনসূয়া কুণ্ঠিত মুখে হাসলো।

'ওর মা আর আমি এই গ্রামে একই দিনে বৌ হ'য়ে এসেছিলাম,' দিদির গলা একটু গম্ভীর হ'লো, অবিনাশ বাবু আর উনি এক সময়ে বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সে সব তো আজ সবই গল্পকথা। হ্যাঁ, ক'টার সময় যেতে হবে রে?'

'একটু তাড়াতাড়িই যেতে বলেছেন মা। আর—আর—ওঁকেও মা বিশেষ ভাবে—আপনি—আপনি যাবেন কিন্তু।'

বিনয়ের হ'য়ে দিদিই বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাবে বৈ কি, নিশ্চয়ই যাবে।'

একটু পরেই অনসূয়া চলে গেল। বিনয় আবার বিছানায় এলালো বই নিয়ে, দিদি পাশে বসে সেই প্রসঙ্গেরই জের টানতে লাগলেন, 'অতি সুন্দর পরিবার বুঝলি?'

'অনেক বার শুনেছি।'

'গ্রামে এই একটা বাড়ি যাদের সঙ্গে একটু মেলমেশা করা যায়।'

'হুঁ', বিনয় পাশ ফিরলো।

'যাবিতো, দেখবি, বাড়িটি যেন একখানা ছবি। বাগান, পুকুর, সব যেন সাজানো। জমিজমা তো কিছু নেই, সম্পত্তির মধ্যে ঐ তো কয়েক বিঘে জমির উপর একটা দালান। অথচ এমন সুন্দর ক'রে রেখেছে দেখলে আমাদের এ সব বাড়িকে একটা আঁস্তাকুড় মনে হয়। অথচ এই ছাখ, আমার শ্বশুর তো এ অঞ্চলে একটা সোজা ধনীলোক ছিলেন না? এতো বড়ো বাড়ি গ্রামে আর ক'টা আছে? অতিথিশালা, নাটমন্দির, পূজোমণ্ডপ—'

হাতের বইটা বন্ধ করলো বিনয়।

৩

একটু আনমনা হ'লেন মিঃ রায়। পরিষ্কার, স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠলো সেই সব দিন, সেই সূর্যাস্তের মুঠো-মুঠো আবির-ছড়ানো বিকেল, অবিনাশ বাবুর দক্ষিণজোড়া ফুলের বাগান, লাল টালির পেছনে সবুজ রংয়ের সবজির ক্ষেত। সুন্দরী তন্বীর মতো নারকেল-সুপুরির কুঞ্জ। থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাসের মতো হাওয়া বয়ে যায় তার ভেতর দিয়ে, পুকুরের জলে তার ছায়া কেঁপে কেঁপে ওঠে। অনসূয়া ঘুরে ঘুরে বাগান দেখালো তাঁকে। বিনয়কে।

বাঁধানো ঘাট পুকুরের লতাবিতানে এসে দাঁড়ালো। 'জ্যাঠাইমা না জানি কত কি বলেছেন আপনাকে, এই তো আমাদের বাগান পুকুর সব।'

মুগ্ধ বিনয় চার দিকে তাকালো। 'ভাবছি দিদির অবাধ্য হ'য়ে যদি না আসতুম, তাহি ঠকে যেতুম। এমন সুন্দর একটি স্মরণীয় বিকেলই বাদ পড়ে যেতো জীবন থেকে।'

'আসতে চাননি বুঝি?' চোখের কাজল-ডোবানো লম্বা পলক ছায়া ফেললো গালে, 'কেন?'

বিনয় মৃদু হাসলো, 'না এলেও তো কারো চোখে পড়তো না?'

'তা হ'লে আর দুপুরের রোদ্দুর ভেঙে সেনপাড়ায় যাবার দরকার ছিল কী? জ্যাঠাইমা তো বাড়ির মানুষ, তাঁকে তো কাল মালির হাতে চিঠি পাঠালেই চলতো।'

'আমার জন্যে?'

'অবিশ্যি আমার না গিয়ে আমার বাবার যাওয়াটাই বোধ হয় উচিত ছিলো বেশী। কিন্তু তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন—'

বিনয় আনত হ'লো, 'মার্জনা চাইছি, অন্যায় হ'য়েছে। অনুমতি করেন তো একটু বসি এখানে'—সান-বাঁধানো চত্বরের উপরই বসে পড়লো বিনয়। সারা শরীরে চঞ্চল হ'য়ে উঠলো অনসূয়া, 'ও কি, আমি এক্ষুনি মাদুর নিয়ে আসছি একটা, আপনি উঠুন। একদম নোংরা হ'য়ে যাবে জামা-কাপড়—'

'কিচ্ছু দরকার নেই', বিনয় বাধা দিল। 'আপনি না হয় এটা পেতে বসুন', হাতের মস্ত সুগন্ধি রুমালটা ছুঁড়ে দিল সে।

'আমি—আমি বসবো না। মা একা-একা' মস্ত মোটা পাকুড় গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সে ছবির মতো দাঁড়ালো। জন্মদিনের উপহার, একটু জমকালো শাড়ি পরেছে। টালি রংয়ের জরির কাজ-করা সুদৃশ্য ঢাকাই জামদানী। কপালে ছোট ছোট চন্দনের ফোঁটা, ঈষৎ বাদামী ছাঁদের মুখ, হাসলে একটি ছোট টোল পড়ে গালে। বিনয়ের চোখ একটু সময়ের জন্য থেমে রইলো সেখানে। ভাদ্রের মেঘ-ভাসা আকাশের তলায়, পুকুরের নির্জনে, রঙিন বাগানের পরিবেশে সব যেন কেমন অবাস্তব লাগলো তার। এক টুকরো মাটির শক্ত ঢেলা টুপ ক'রে জলে ছুঁড়লো সে, গোল গোল বৃত্তে ছড়াতে ছড়াতে জলের সেই ঢেউ গিয়ে কম্পন তুললো শালুক ফুলের গোল গোল ছাতার মতো সবুজ পাতায়। ফুলগুলো উঁচু হ'য়ে মাথা নাড়লো।

'আপনি সাঁতার জানেন?'

'জানি না?' ভ্রমরকৃষ্ণ ভুরু কৌতুকে নেচে উঠ্‌লো।

'আমাকে শিখিয়ে দিন্ না।'

সলজ্জ অনসূয়া চোখ নামালো।

'যদি সাঁতার জানতাম তা হ'লে এক্ষুনি ছিঁড়ে নিয়ে আসতাম ঐ ফুলটা।'

'ওটার জন্যে আর কষ্ট ক'রে সাঁতারের দরকার কী?' মৃদু হাস্যে জলের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালো অনসূয়া আর সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো বিনয়, 'পড়ে যাবেন, পড়ে যাবেন'—রীতিমতো ত্রাস ফুটলো তার গলায়। একটু কাপড় তুলে খানিকটা নেমে হিজল গাছের শুকনো ডাল দিয়ে আঁকসির মত ধীরে ধীরে অনসূয়া ফুলটা তীরের দিকে টেনে আনলো, তার পর হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে নিল। একটু ভিজলো অবিশ্যি শাড়িটা, কিন্তু ফুলটা হাতে ক'রে তীরে ওঠবার সময় খুসীতে উদ্ভাসিত দেখালো তাকে।

'নিন।' কাছে এসে দাঁড়ালো—'কাল যদি আসেন আরো ফুল আমি তুলে রাখবো স্নানের সময়।'

'আবার কাল আসবো?'

'দোষ কী।'

বিনয়ের যুবক-হৃদয় একটু কাঁপলো অত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। 'ও,' হঠাৎ কী মনে পড়লো তার পর। পকেট থেকে হলদে সাটিনে বো বাঁধা ছোট্ট একটি বহুমূল্য ফরাসী সেন্টের লাল বাক্স বার করলো সে।

অনসূয়া নিচু হ'য়ে পায়ের কাপড়টা নিংড়ে নিচ্ছিল, তার আনত মাথার ঘন কালো চুলের মাঝখানে সাদা সরু সিঁথিটির উপর চোখ রেখে বললো,—দেখুন তো এ গন্ধটা আপনার কেমন লাগে?'

মুখ তুললো অনসূয়া, 'না না ওকি—না।'

'এটাও নিন, খোঁপায় পরুন, সুন্দর দেখাবে কালো চুলে লাল ফুল।'

অনসূয়ার মুখে সূর্যাস্তের লাল ছায়া ভাসলো।

'মাদ্রাজী মেয়েদের দেখেননি? তাদের তো ফুল চা-ই-ই চুলে। আমার এতো ভালো লাগে। পরুন না, পরুন।' প্রায় ছেলে-মানুষের মতো আব্দার করলো বিনয়।

অনসূয়া মাথা নিচু ক'রে চুপ।

৪

বাইয়ের বারান্দা ততক্ষণে ভ'রে গেছে অতিথি-সমাগমে। অবিনাশ বাবু আপ্যায়ন করছেন তাঁদের। বিনয়কে দেখতে পেয়ে সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানালেন, 'এসো, এসো, তোমার কথাই হচ্ছিল।

বিনয় সহাস্যে উঠে এলো বারান্দায়, 'আপনার বাগান দেখছিলাম।'

'আমার বাগান!' অবিনাশ বাবু হাসলেন, 'তোমাদের কলকাতার চোখে তো এ সব বনবাদাড় হে!'

'চমৎকার। এটাকে পাব্লিক পার্ক ক'রে দেওয়া উচিত আপনার। তা হ'লে আমি রোজ এসে বসে থাকতুম।'

এবার হা-হা ক'রে হেসে উঠ্‌লেন তিনি। খুসী তাঁর শতধারে বিচ্ছুরিত হ'লো। 'বলো কী, এ্যাঁ? এ যে আমাদের একটা মস্ত সার্টিফিকেট। লিখিয়ে নিতে হয়। কী বলেন—' তিনি চার দিকে তাকালেন. চার দিক মাথা নাড়লো তাঁর দিকে তাকিয়ে।

অভ্যাগতেরা সকলেই প্রায় অবিনাশ বাবুর বয়সী, অধিকাংশই স্কুলের শিক্ষক। সকলের সঙ্গেই আলাপ করিয়ে দিলেন তিনি। তার পর বললেন, 'তোমার কাছে আমাদের কিন্তু একটা আবেদন আছে আজ।'

'আমার কাছে আপনাদের কী আবেদন'—বিনয় সবিনয়ে হাসলো।

'তুমি তো এখন নিশ্চয়ই কিছু দিন এখানে আছ।'

'কেন বলুন তো?'

'এঁরা সবাই বলছিলেন'—সবাই এখানে সায় দিল—'সে সময়টা যদি, অন্ততঃ মাস পাঁচেকের জন্যও তুমি আমাদের স্কুলের ম্যাট্রিকের ছেলেদের ইংরিজিটা একটু দেখে দাও—আমাদের হেডমাষ্টার অর্থাৎ যামিনী সেন ভারি চমৎকার লোক। তাঁর নিজেরই এসে আজ এখানে তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করবার ইচ্ছে ছিলো কিন্তু—'

'অবিনাশ বাবুই আমাদের হেডমাষ্টার ধরে নিতে পারেন।'

অবিনাশ বাবু কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন, 'না, না, তা নয়, তবে—আসলে হয়েছে কি জান? আমাদের ইংরিজির টীচ ভারি দুর্ব্বল। ছেলেরা দু'বছর ধরে একেবারেই ভালো করতে পারছে না। তাই যামিনী বাবু তোমার কাছেই আমাদের মারফৎ এই আবেদনটা পাঠাচ্ছেন, তোমাকে রাজী হ'তেই হবে।'

'বেশ তো! ভালো কথাই তো। তবে আমি ঠিক কদ্দিন থাকবো সেটা—'

'শুনলাম বিলেত যাচ্ছ? তা বোঠান যে রকম বললেন তাতে তো মনে হচ্ছে—কিছু বিলম্বই আছে তার।'

'আমি কাল আপনাকে ঠিক ক'রে বলবো'—

'বেশ, বেশ, সেই ভালো, একটু ভেবে-চিন্তে নাও।'

ভেতর থেকে খাবার ডাক নিয়ে এলো দু'বছরের মেয়ে বুলু। সবাইকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

যোলো বছরের জন্মদিনে আয়োজনটা একটু বিশেষই হয়েছিলো সেদিন। বাড়ির তৈরী অতি সুখাদ্য, সুস্বাদু, আর সুদৃশ্য সব আহার্য্য। লুচি বেগুনভাজা ছোলা:র ডাল থেকে আরম্ভ ক'রে, ডিমের কচুরি, মাছের চপ, নারকেলের দুধ দিয়ে চিংড়ি মাছের মালাইকারি, আলুবখরার চাটনি পর্য্যন্ত। মিষ্টির লাইনের সব নাম এখন আর কিছুতেই মনে আনতে পারবেন না মিঃ রায়, কিন্তু তার চেহারা, তার আস্বাদ এখনো যেন ইচ্ছে হ'য়ে লেগে আছে মনের মধ্যে। কত যে নারকেলের খাবার করেছিলেন ভদ্রমহিলা। মস্ত থালার উপর তাদের কত চেহারা! ছোট ছোট তাজমহল, পানসী নৌকা, কৃষ্ণনগরের বুড়ো, ঠাট্টাভাজনদের জন্তে টিকটিকি গিরগিট,—সব তৈরী করেছেন নারকোল দিয়ে, খড়কে কুঁড়িয়ে কুঁড়িয়ে। কী করে করেছিলেন আশ্চর্য্য!

অনসূয়া পরিবেশনে সাহায্য করছিলো তার মাকে, খেতে খেতে একবার চোখ তুলে লক্ষ্য করলো বিনয়—কালো খোঁপায় মস্ত একটি লাল পদ্ম। চোখ নামিয়ে নিল সে। জন্মদিনের চা-পার্টিতে এসে রাত্তিরের ভোজ সমাপ্ত ক'রে, কেয়াফুলের জল আর কেয়া-খয়েরের পান খেয়ে অত্যন্ত পরিতৃপ্তি সহকারে বাড়ি ফিরলো সবাই।

রাত্তিরে শোবার আগে দিদি বললেন, 'কেমন লাগলো?'

বিনয় বললো 'ভালোই তো।' তার পর আরো রাত্তিরে, ভাদ্রের গুমোট ভেঙে যখন অবিরল ধারে বৃষ্টি নামলো, পচা পুকুরের ধারে ব্যাঙ ডাকলো মোটা গলায়, ঝোপে-ঝাড়ে ঝিঁঝিঁর ডাক বন্ধ হ'লো, শরতের একটি শিরশিরে ঠাণ্ডায় ভাঙা-ভাঙা ঘুমে, পায়ের উপর চাদর টেনে নিতে নিতে কেমন যেন একটা মধুর ভালো লাগায় ছেয়ে গেল বিনয়ের সমস্ত হৃদয়। দিদি এসে মাথার কাছের জানালাটা বন্ধ ক'রে দিলেন।

৫

শুধু স্কুলেই নয়, অনসূয়ার মাষ্টারিতেও বহাল হ'লো বিনয়। প্রথম প্রথম ছুটির দু'দিন, অর্থাৎ শনিবার আর রবিবার বিকেলে, তার পর সপ্তাহে চার দিন, পূজোর ছুটির পরে একেবারে সাত দিন। পরীক্ষা এসে গেছে, এখন না খাটলে চলে না। অবিনাশ বাবু মেয়েকে পড়িয়েছেন অনেক কিন্তু পরীক্ষার জন্তে তৈরী করেননি। সে দায়িত্ব বিনয় নিল। এক দিন দিদি বললেন, 'একমাথা বিদ্যে কি তুই এই মাষ্টারিতেই ক্ষয় করবি?'

'মন্দ কী। বসে থাকার চেয়ে তো ভালো।'

'আমার তো টাকা প্রস্তুত, এবার তো ইচ্ছে করলেই যেতে পারিস্।'

'ভাই লণ্ডনফেরতা না হ'লে বুঝি দিদির সম্মান থাকবে না?'

'তা তো থাকবেই না, যে যার যোগ্য।'

'জমিদারী লাটে উঠিয়ে এ সব খরচ যোগানো মোটেও আমার ভালো লাগছে না।'

'লাটে উঠ্‌লে নিশ্চয়ই যোগাতাম না, কিন্তু অত সব কথায় তোর দরকার কী? তুই যোগাড়-যন্ত্র কর।'

'শীতটা কাটিয়ে যাওয়াই আমার সুবিধে।'

'শীত তো কাটলোই।' দিদির মুখে একটি ছায়া পড়লো। একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন, 'অবিনাশ বাবুর মেয়েকে কি তোর রোজই পড়াতে হয় আজ-কাল?'

'রোজ।'

'পরীক্ষার তো দের দেখি।'

'দেরি!' চোখ কপালে তুললো বিনয়, 'আর মাত্র তিনটে মাস। লাফিয়ে চলে যাবে।'

'একবার কলকাতা যাবো ভাবছিলাম।'

'কেন? দরকার আছে?'

'না, তেমন আর কী? যাই না অনেক দিন, থেকে আসতাম দু'-এক মাস। আমি ভাবছি মার্চ মাসের মধ্যেই তোকে ঠিক-ঠাক ক'রে পাঠিয়ে দেব।'

'মার্চ মাস!' মনে মনে একটু হিসেব করলো বিনয়। 'মার্চ্চ মাসে হবে না, এপ্রিলের মাঝামাঝি রওনা হবো, তত দিনে ওর পরীক্ষা-টরীক্ষা সারা।'

দিদির মুখের ছায়া গভীর হ'লো। খানিক চুপচাপ থেকে বললেন, 'কাল অবিনাশ বাবুর ভাই এসেছিলেন।'

'কে? ঐ লম্বা ভদ্রলোক?'

'পরিচয় হয়নি?'

'ঐটুকুই মাত্র। এলেনই তো বুঝি বুধবার।'

'লোকটাকে আমার কোন দিনই ভালো লাগে না, অবিনাশ বাবু এত ভালো, অথচ ওঁর ভাই—'

'কেন এসেছিলেন?'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না। প্রত্যেক বছরই তো দু'-একবার আসেন, আমার সঙ্গে কবে দেখা করেছেন মনেও পড়ে না।'

'ভাইঝিকে পড়াই বলে কৃতজ্ঞতা?' বিনয় হেসে ব্র্যাকেট থেকে পাঞ্জাবী টেনে গায়ে দিল বেরুবার জন্তে।

'কৃতজ্ঞতা না হোক—উপলক্ষ্যটা যেন তাই-ই 'মনে হলো।'

'অর্থাৎ!'

'অর্থাৎ—যদি মাছ না ছুঁই পানি, উকিলি বুদ্ধি তো, কত প্যাঁচে যে কথা কইতে পারে লোকটা! তোর ভগ্নীপতি বলতেন, ও আর জন্মে হয় নাপিত নয় শেয়াল ছিলো। আমার মনে হয় কী জানিস, তোর যাওয়াটা ওঁর বেশী পছন্দ নয়।'

ফিরে দাঁড়ালো বিনয়—'কোথায় যাওয়া ? ওঁদের বাড়ি ? না অনসূয়াকে পড়ানো ?'

'দু'টোই।'

'কেন ? তাতে ওঁর কী ?'

'সেটা অবিশ্যি উনিই জানেন। তবে কথাবার্ত্তার ধরণে আমার এই মনে হ'লো।'

একটু থমকে থেকে বিনয় বললো, 'যাক গে, আমি তো আর ওঁর বাড়ি যাচ্ছি না, ওঁর মেয়েকেও পড়াচ্ছি না, কাজেই ওঁর ইচ্ছের উপরও নির্ভর করছে না কিছু।'

'তোর না করতে পারে কিন্তু অবিনাশ বাবুর পরিবারে এই ভাইয়ের অসম্ভব প্রতিপত্তি। অবিনাশ বাবু বলতে গেলে ওঁর কথাতে ওঠেন বসেন।'

'কেন ?'

'এই এক রকম অন্ধতা।'

'বাজে।' বৈঠকখানা-ঘরের দরজা খুলে বাইরে এলো বিনয়, সেনপাড়া ডিঙিয়ে চৌধুরীপাড়ার মোড়ে এসে বড় দীঘির ধারে দাঁড়ালো একটু, বিকেলের ঝাপসা আলোয় হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ, তার পর কী ভেবে আবার ফিরলো। এই সময়টায় দিদি ঘরে ঘরে আলো দেখান, প্রদীপ জ্বালেন লক্ষ্মীর পটের কাছে, হাত-পা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে চুপচাপ বসে থাকেন আসনে। একেবারে নিঃশব্দে। চার পাশ থেকে মশার গান ওঠে, জড়িয়ে ধরে দিদিকে, দিদি নড়েন না। আসন পেতে বসে পূজো-আহ্নিক করার কী মানে হয় তা বিনয় জানে না কিন্তু এই একাগ্রতাটা কেমন ভালো লাগে তার। এই একাগ্রতা সে জানে, পড়তে বসলে চিরকালই সে এই একাগ্রতা অনুভব করেছে নিজের মধ্যে। কিন্তু দিদি কী ভেবে একাগ্র হন ? ঈশ্বরকে ! না তাঁর মৃত সন্তানকে ! না কি বহু দিন আগে হারিয়ে-যাওয়া স্বামীর মুখ ? কী জানি ! পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে দিদির দিকে তাকিয়ে পা টিপে নিজের ঘরে চলে এলো সে। ঘসা কাচের ডোমের তলায় টেবল-ল্যাম্পের নরম আলো ছড়িয়ে আছে সেই ঘরে। পরিষ্কার নিভাঁজ বিছানা, গুছোনো আলনা, থাকে-থাকে বই সাজানো টেবিল। দিন পাঁচেক আগে মস্ত এক পার্শেল এসেছে বই বন্দী হ'য়ে, ঝক্-ঝক্ করছে সেই বইগুলো। এর মধ্যে অনসূয়ার মা'র জন্যেও দু'খানা ছিলো, ভদ্রমহিলা ভারি ভালোবাসেন পড়তে। আনিয়ে দিয়েছে বিনয়। কেউ পড়তে ভালোবাসে দেখলেই ভালো লাগে তার। ও-বাড়ির ছোট ছেলে-মেয়েগুলোও পড়তে লিখতে ভালোবাসে। এই জন্যেই ও-বাড়িটা এত ভালো লাগে বিনয়ের। কিন্তু থাক্, আর যাবে না সে। দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে না যাওয়াই ভালো, এটা তো ঠিক, উনি যখন মুখ ফুটে বলেছেন কথাটা, তখন বিষয়টা অবহেলার যোগ্য নয়। এ রকম তো দিদি কখনো বলেন না, তার ইচ্ছেতে, তার স্বাধীনতাতে তো আজ পর্য্যন্ত তিনি কথা বলেননি।

নতুন বইয়ের সারি থেকে একটা বই তুলে নিল হাতে। কোরা গন্ধটা শুঁকলো একটু, একটু পরেই চোখ নিবিষ্ট হ'লো সেই নিঃশব্দ কালো অক্ষরের রহস্যে।

[ক্রমশঃ।

আপনি কি জানেন ?

১। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে কে প্রথম "গুরুদেব" নামে ডাকলেন ?

২। পলাশীর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে যে মুসলমান বিশ্বাসঘাতক ইংরাজকে মিত্র ক'রেছিল এবং নবাবী পেয়েছিল সেই দুষ্ট ব্যক্তির পুত্র মীরণের অপঘাতে মৃত্যু হয়েছিল। সিরাজ-পত্নী আমিনা বেগমের অভিশাপে নাটকের মতই বিয়োগান্ত ঘটনাটি কি ?

৩। বঙ্গসমাজ বর্ণনা প্রসঙ্গে সে যুগের বাঙলা দেশে এক জন বিশিষ্ট বাঙ্গালী মনীষী লিখেছিলেন : "লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনি বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন।" লেখক কে ?

৪। এক জন বিদেশী শিক্ষক, শিক্ষা দিয়েছিলেন কত বিখ্যাত বাঙালী গুণীকে ; ছাত্রদের বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় ছাত্রদের অভিভাবকদের দ্বারা লিখিয়ে নিতেন : "বালক যদি অপরিচ্ছন্ন অবস্থাতে স্কুলে আসে তাহা হইলে অভিভাবককে জরিমানা দিতে হইবে।" কে সেই বিদেশী মাষ্টার ?

৫। ইং ১৮০২ খৃষ্টাব্দে কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড শ্রীরামপুরে পৌঁছেছিলেন। এই মিশনারীত্রয় বাঙলায় প্রথম যাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন সেই ব্যক্তির নাম ?

৬। বস্ত্রাভাবের দুঃসময়ে দেশবাসী প্রায় নগ্ন হলেও 'ক্যালিকো' নামটি সকলেই শুনেছেন। 'ক্যালিকো' কথাটির উৎপত্তিতে কোন্ দেশের বস্ত্রশিল্প জড়িত বলতে পারেন ?

[উত্তর ২২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

দ্বিতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় দৃশ্য

(দিল্লীর দেওয়ানি খাস—নিয়ামৎ খাঁর টলতে টলতে প্রবেশ)

নিয়ামৎ। বাবা, বরাতে নেইক ঘি, তার ঠক্‌ঠকালে হবে কি! অমন মূলতানের সুবেদারিটা পাওয়া গেল তা ঐ লক্ষ্মীছাড়া জুলফিকার খাঁর জন্য কাজটা হ'য়েও হ'ল না। উচ্ছন্নে যাও, উচ্ছন্নে যাও, বোলো পোরা হ'য়ে এসেছে কিনা। আরে বাবা, আমার সঙ্গে লেগে কি তুই পারবি? ছিলুম বাইজির ভেড়ুয়া আর বরাতগুণে হ'য়ে পড়েছি আজ সম্রাটের দোস্ত্। (এক জায়গায় ব'সে) উঃ, সারা দিন সম্রাটের সঙ্গে হুল্লোড় ক'রে এখন খোঁয়াড়ি ধরেছে। প্রাসাদের সবই দেখছি তো ভোঁ-ভাঁ। একপাত্র সরাব না পেলে তো পা সিধে হবে না। (উঠে দাঁড়িয়ে একটু চলতে গিয়ে পা পিছ্‌লে) কি বাবা পা, পিছ্‌লে যাচ্ছ কেন? দেওয়ানিখাসের মেজেতে কি বাবা স্যাওলা পড়েছে? (সিংহাসনের দিকে চেয়ে) সিংহাসনটা ফাঁকা রয়েছে, একবার গিয়ে ব'সে পড়ব না কি? যাক বাবা মূলতানের সুবেদারি গেছে, এক লহ্‌মার জন্যে সুলতানি ক'রে নিই।

(সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগল—ইতিমধ্যে ইমতিয়াজমহলের প্রবেশ)

ইমতিয়াজ (ব্যস্ত ভাবে)। কে ওখানে—কে?

নিয়ামৎ (চম্‌কে)। এই যে সম্রাজ্ঞী, আমি—আমি নিয়ামৎ।

ইমতিয়াজ। এত রাত্রে তুমি এখানে কি করছ?

নিয়ামৎ। আজ্ঞে, সন্ধ্যের সময় আপনাদের সঙ্গে কেল্লার মধ্যে ঢুকে পড়েছিলুম। আপনারা ভেতরে চলে গেলেন আর আমি বাইরের গোলকধাঁধায় পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ইমতিয়াজ। সম্রাটকে দেখেছ এখন?

নিয়ামৎ। আজ্ঞে না সাম্রাজ্ঞী।

ইমতিয়াজ। আচ্ছা, রঙমহলের প্রহরীদের ডাক তো।

নিয়ামৎ (চীৎকার)। এই প্রহরী—প্রহরী—

(প্রহরীর প্রবেশ)

ইমতিয়াজ। তোমরা সম্রাটকে দেখেছ?

প্রহরী। না হুজুরাইন।

ইমতিয়াজ। কেল্লার মধ্যে উজির এসেছেন?

প্রহরী। তা তো জানি না হুজুরাইন।

ইমতিয়াজ। এখুনি খোঁজ কর। উজির, কোকলতাস খাঁ বা সাদুল্লা খাঁ যাকে দেখবে—পাঠিয়ে দাও। তাঁরা সবাই কেল্লার মধ্যেই আছেন।

[প্রহরীর প্রস্থান।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

নিয়ামৎ, তুমি যাও—দেখ সম্রাট্‌ কোথায় আছেন।

নিয়ামৎ। তাজ্জব! সম্রাটকে সম্রাটই খুঁজবে—

ইমতিয়াজ। যাও—যাও—যাও—কি উজবুগের মত দাঁড়িয়ে আছ?

[নিয়ামতের প্রস্থান।

ইমতিয়াজ। কি আশ্চর্য! চারি দিকে এই ষড়যন্ত্র—

(সাদুল্লা খাঁর প্রবেশ)

এই যে সাদুল্লা খাঁ, সম্রাটের কোনো খোঁজ জানেন কি? তিনি হারেমে নেই।

সাদুল্লা। সে কি সম্রাজ্ঞী!

ইমতিয়াজ। শীগ্‌গির খোঁজ করুন। সমস্ত প্রহরীদের জিজ্ঞাসা করুন, কেউ জানে কি না দেখুন।

সাদুল্লা। আমি এখুনি যাচ্ছি।

[সাদুল্লা খাঁর প্রস্থান।

ইমতিয়াজ। সম্রাট কি আবার বাজারে হৈ-হৈ করতে বেরুলেন। ওদিকে ফরুখ্‌শায়ার তো আগ্রা অবধি পৌঁছে গেছে। কোনো দিকে হুঁশ নেই।

(জুলফিকার খাঁর প্রবেশ)

জুলফিকার। সম্রাজ্ঞী, আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন?

ইমতিয়াজ। হ্যাঁ জুলফিকার খাঁ—সম্রাটের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি প্রাসাদের কোথাও নেই।

জুলফিকার। সে কি!

ইমতিয়াজ। হ্যাঁ উজির সাহেব, আপনি শীগগির খোঁজ করুন।

জুলফিকার। সন্ধ্যারাত্রে আপনারা যখন প্রাসাদে ফিরলেন তখন সম্রাট আপনার সঙ্গে ছিলেন কি?

ইমতিয়াজ। আমরা দু'জনে একই রথে চ'ড়ে প্রাসাদের মধ্যে ঢুকেছিলুম। আমাকে হারেমে নামিয়ে দিয়ে রথ-চালক তাঁকে নিয়ে রঙমহলের দিকে চলে গেল।

জুলফিকার। রথ-চালকও কি সুরাপান করেছিল?

ইমতিয়াজ। হ্যাঁ, সম্রাট অনেক বার তাকে খাইয়েছেন। রথ চালাতে চালাতে একবার রাস্তায় সে পড়ে পর্যন্ত গিয়েছিল।

জুলফিকার। আচ্ছা আপনি হারেমে যান, আমি এখুনি তাঁর সন্ধান করছি।

[ইমতিয়াজমহলের হারেমের দিকে এবং জুলফিকার খাঁর অন্য দিকে প্রস্থান।

(নিয়ামতের প্রবেশ)

নিয়ামৎ। দিল্লীর কেল্লা তো দেখছি সাংঘাতিক জায়গা। বাদশাকে বাদশাই হজম ক'রে ফেললে। আর বেশিক্ষণ এখানে থাকা নয়, স'রে পড়ি। কিন্তু বাদশাই বা গেলেন কোথায়, তাজ্জব করলে দেখছি! আজ তাঁর মেজাজটা শরিফ ছিল, মুলতানের সুবেদারির কথাটা একবার পাড়ব মনে করেছিলুম, তা তিনিই গেলেন গায়েব হ'য়ে—এখন বলি কাকে? লালকুঁয়ারকে কথাটা একবার বলব না কি? কিন্তু সে জুলফিকার খাঁর বিরুদ্ধে কিছু করবে বলে তো মনে হয় না।

(ইমতিয়াজের প্রবেশ)

এই যে সম্রাজ্ঞী—

ইমতিয়াজ। সম্রাটের দেখা পেলে নিয়ামৎ।

নিয়ামৎ। না সম্রাজ্ঞী, প্রাসাদের সব জায়গা আতিপাতি ক'রে খুঁজে দেখলুম কিন্তু কোথাও তাঁর দেখা পেলুম না।

ইমতিয়াজ। কোথায় তিনি যেতে পারেন নিয়ামৎ খাঁ, আন্দাজ করতে পার?

নিয়ামৎ। আজ্ঞে আন্দাজ তো আমার কিছু হচ্ছে না। বাজার থেকে ফিরেছিলেন তো?

ইমতিয়াজ। আমরা দু'জনে একসঙ্গে প্রাসাদের মধ্যে ঢুকেছিলুম। আমি সাদুল্লা খাঁকে বাজারে পাঠিয়েছি—তুমি একবার যাও।

নিয়ামৎ। আচ্ছা যাই, এই এখুনি যাচ্ছি—

ইমতিয়াজ। দাঁড়ালে কেন—কিছু বলবার আছে?

নিয়ামৎ। আজ্ঞে একটু আরজি আছে।

ইমতিয়াজ। আরজি! কি আরজি?

নিয়ামৎ। আজ্ঞে, সম্রাট কয়েক দিন আগে আমায় মুলতানের সুবেদারি দিয়েছিলেন। তা জুলফিকার খাঁ—

ইমতিয়াজ। আঃ—এই কি তোমার সুবেদারির আরজি শোনবার সময় নিয়ামৎ—

নিয়ামৎ। আজ্ঞে, অন্যায় হ'য়ে গিয়েছে, আমি যাই—

(সাদুল্লা খাঁর প্রবেশ)

ইমতিয়াজ। কি সাদুল্লা খাঁ, বাদশার দেখা পেলে?

সাদুল্লা। আজ্ঞে না সম্রাজ্ঞী, বাইরে তো কোথাও সম্রাটের দেখা পেলুম না।

ইমতিয়াজ। তবে উপায়?

সাদুল্লা। তাই তো সম্রাজ্ঞী, এ তো ভারি আশ্চর্য কাণ্ড হ'ল দেখছি!

ইমতিয়াজ। তুমি একবার কোকলতাস খাঁর খোঁজ কর। দেখা হ'লে বলবে আমি এখুনি একবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

[সাদুল্লার প্রস্থান।

নিয়ামৎ, তুমি জিন্নৎ-উন্নিসা বেগমের বাড়ী চেন?

নিয়ামৎ। খুব চিনি।

ইমতিয়াজ। তুমি একবার সেখানে খোঁজ নাও। খুব সাবধান, কেউ যেন না জানতে পারে তুমি কিসের জন্য গিয়েছ।

নিয়ামৎ। বহুৎ খুব—আমি এখুনি চললুম।

[নিয়ামতের প্রস্থান।

ইমতিয়াজ। কি করব? নানা রকম সন্দেহ আমার মাথার মধ্যে একসঙ্গে ঘুরপাক খাচ্ছে। শাহ্‌জাদাদের সংবাদ দেব? এ শত্রুপুরীর মধ্যে কার সঙ্গেই বা পরামর্শ করি? জুলফিকার খাঁ সেই যে গিয়েছে তার আর দেখা নেই। দেখি, কোকলতাস খাঁ কি বলে—

[হারেমের দিকে প্রস্থান।

(সম্রাট ও জুলফিকার খাঁর প্রবেশ)

সম্রাট। কি! কি বললে! কোকলতাস খাঁ!

জুলফিকার। হ্যাঁ জনাব।

সম্রাট। কোকলতাস! আমাদের আলি মুরাদ?

জুলফিকার। হ্যাঁ সম্রাট।

সম্রাট। তোমার কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না জুলফিকার খাঁ! কোকলতাস খাঁ—

জুলফিকার। বিশ্বাস করা না-করা সম্রাটের অভিরুচি—

সম্রাট। তুমি নিজের চোখে দেখে এলে?

জুলফিকার। হ্যাঁ সম্রাট। আর জিন্নৎ-উন্নিসা বেগমের বাড়ীতে যে সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলে সে কথা তো আপনার অবিদিত নয়?

সম্রাট। কিন্তু সে ষড়যন্ত্রে কোকলতাস খাঁ যোগ দিতে পারে এ যে আমার স্বপ্নেরও অগোচর!

জুলফিকার। সম্রাট, রাজ্যের চতুর্দ্দিকে ষড়যন্ত্র চলেছে, তার ওপরে ফারুখশায়ার আগ্রা অবধি এসে পড়েছে, আমার মতে কালই যুদ্ধযাত্রা করা যাক, আগ্রায় গিয়ে যুদ্ধের বন্দোবস্ত করতেও তো কিছু দিন লাগবে।

সম্রাট। এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে কাল পরামর্শ করব উজির। আজ আমায় বিশ্রাম করতে দাও, আমি বড় পরিশ্রান্ত।

জুলফিকার। যো হুকুম।

[জুলফিকারের প্রস্থান।

সম্রাট। প্রহরী!

(প্রহরীর প্রবেশ)

কোকলতাস খাঁ কেল্লায় এসেছেন? দেখ—এখুনি তাকে একবার খবর দে।

[প্রহরীর প্রস্থান।

(অন্য দিক দিয়া ইমতিয়াজমহলের প্রবেশ)

ইমতিয়াজ। সম্রাট—সম্রাট—কোথায় গিয়েছিলেন আপনি? আপনাকে প্রাসাদের কোথাও দেখতে না পেয়ে আমি ভয়ানক ভয় পেয়েছিলুম।

সম্রাট। ও, তাহ'লে জুলফিকার খাঁকে তুমিই আমার খোঁজে পাঠিয়েছিলে?

ইমতিয়াজ। শুধু জুলফিকার খাঁ নয়, সাদুল্লা খাঁ, নিয়ামৎ আর প্রহরীরা আপনার খোঁজে চার দিকে ছুটোছুটি করছে—শুধু কোকলতাস খাঁর এখনো দেখা পাইনি। তাঁরও তো আজকে কেল্লার মধ্যে থাকবার কথা না?

সম্রাট। কোকলতাস খাঁ—(চিন্তিত ভাবে)—কোকলতাস খাঁ—

ইমতিয়াজ। এতক্ষণ কোথায় ছিলেন সম্রাট?

সম্রাট। এতক্ষণ! এতক্ষণ! এক সুন্দরীর অঙ্কে বিভোর হয়ে পড়েছিলুম। কি মোহিনী শক্তি তার ইমতিয়াজ! সাম্রাজ্য, সম্রাজ্ঞী, সিংহাসন, যুদ্ধবিগ্রহ সব সে ভুলিয়ে দিয়েছিল—

ইমতিয়াজ। কে—কে সেই সুন্দরী সম্রাট?

সম্রাট। আচ্ছা—তুমিই আন্দাজ কর।

ইমতিয়াজ। সত্যি কথা বলতে কি সম্রাট, আপনার কথা আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না।

সম্রাট। তাহ'লে তোমার কি মনে হয়—কোথায় ছিলুম আমি?

ইমতিয়াজ। আমার মনে হয়, আপনি প্রাসাদের কোনো গুপ্তকক্ষে যুদ্ধ সম্বন্ধে মন্ত্রণা করছিলেন।

সম্রাট (হাস্য)। হ্যাঁ, মন্ত্রণাই করছিলুম, তবে মানুষের সঙ্গে নয়। যে ঘরে আমাদের মন্ত্রণা চলছিল—সে ঘরের কথা শুনলে তুমি চমকে উঠবে সম্রাজ্ঞী!

ইমতিয়াজ। সম্রাট, আপনার কথা শুনে আমার ভয় করছে। থাক্—আমার আর শুনে কাজ নেই। সারা রাত্রি ঘুমোননি, চলুন শোবেন চলুন।

সম্রাট। কে বললে সারা রাত্রি ঘুমোইনি। আজ বড় সুখেই ঘুমিয়েছি। সিংহাসনে বসে অবধি এমন নিশ্চিন্ত সুখে আমি আর ঘুমোইনি। কোথায় শুয়েছিলুম জানো?—চমকে উঠো না—আস্তাবলে—খড়ের গাদায়। শীতের চোটে একবার ঘুম ভেঙে যেতে দেখি আমার চারি দিকে সারি সারি সব বয়েল শুয়ে রয়েছে, আর তারি মাঝে আমি—হিন্দুস্থানের সম্রাট শুয়ে আছি! বয়েলগুলোর গায়ে মোটা মোটা কম্বল—একবার ইচ্ছে হ'ল একটার গা থেকে কম্বল তুলে নিয়ে নিজের গায়ে চাপা দিই—কিন্তু তা পারলুম না। একগাদা খড় পাশ থেকে টেনে নিয়ে চাপা দিয়ে শুয়ে পড়লুম।

ইমতিয়াজ। কি সর্বনাশ—সেখানে গেলেন কি ক'রে?

সম্রাট। রথওয়ালা তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আমার কথা স্রেফ ভুলে গিয়েছিল।

ইমতিয়াজ। না—এর মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র আছে ব'লে মনে হচ্ছে।

সম্রাট। তুমি কি ভাবছ, রথওয়ালা মনে করলে আমাকে প্রাসাদের চেয়ে আস্তাবলেই মানাবে ভাল!

ইমতিয়াজ। রহস্য নয় সম্রাট—কাল সকালেই রথওয়ালাকে এর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

সম্রাট। না না ইমতিয়াজ—সে বেচারীর কোনো দোষ নেই। অত্যধিক সুরাপান করেছিল সে, আর সে জন্য আমিই দায়ী। শাস্তি যদি দিতে হয়তো আমাকেই দাও।

(কোকলতাস খাঁর প্রবেশ)

এই যে কোকলতাস খাঁ—কোথায় ছিলে?

কোকলতাস। আমি এই প্রাসাদেই ছিলুম সম্রাট। শুনলুম সম্রাজ্ঞী আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন তাই ছুটে আসছি।

ইমতিয়াজ। তোমায় যে জন্য ডেকেছিলুম সে কাজ হয়ে গিয়েছে।

কোকলতাস। তাহ'লে বান্দা এখন বিদায় হ'তে পারে?

সম্রাট। না না, আলি মুরাদ, তোমাকে একটু প্রয়োজন আছে আমার—একটু দাঁড়াও। ইমতিয়াজ তুমি অগ্রসর হও—আমি এখুনি আসছি।

[ইমতিয়াজের প্রস্থান।

আলি মুরাদ—ভাই—তোমার মা'র কথা মনে আছে?

কোকলতাস। মনে আছে সম্রাট।

সম্রাট। আমাদের সেই ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে? পিতার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরেই আমাদের বাল্যজীবনটা কেটেছে, কি বল আলি মুরাদ!

কোকলতাস। হ্যাঁ সম্রাট।

সম্রাট। চারি দিকে সেই উৎকণ্ঠা—অস্ত্রের ঝঞ্চনা, আহতের আর্ত-রবের মাঝে কি নিশ্চিন্ত সুখেই আমাদের সেই দিনগুলো কাটত ভাই!

কোকলতাস। সম্রাট, সে বয়স ছিল—

সম্রাট। আমাকে বলতে দাও আলি মুরাদ। তোমার হয়তো আরো মনে পড়বে—বিপক্ষের সঙ্গে যেদিন যুদ্ধ বাধত সেই গোলমালের অবসরে আমরা শিবিরের এক দিকে চলে গিয়ে সাম্রাজ্য চালানোর অভিনয় করতুম। মনে আছে—মনে আছে আলি মুরাদ সেই খেলার কথা—

কোকলতাস। মনে আছে বই কি সম্রাট—সে সব কথা আজও জগন্ত ছবির মত আমার মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে পড়ে যে সে অভিনয়ে আপনি হতেন সম্রাট আর আমি হতুম উজির।

সম্রাট। সম্রাটের ভূমিকা তো আমি এখনো অভিনয় করছি আলি মুরাদ, কিন্তু সাম্রাজ্য চালাতে হ'লে উজিরের ভূমিকা কেবল অভিনয় করলে চলে না। তুমি কি জান না যে জুলফিকার খাঁকে যদি উজিরি না দিতুম তাহ'লে তার বাবা আসাদ খাঁ আমার কত বড় সর্বনাশ করত?

কোকলতাস। সম্রাট, যেতে দিন সে কথা—আপনি কি বলছিলেন বলুন।

সম্রাট। আমি বলছিলুম কোকলতাস খাঁ যে আমাদের সে খেলার মধ্যে গুপ্ত ষড়যন্ত্র, বন্ধুকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্ত তার শত্রু-গৃহে মন্ত্রণা এ সব তো কিছুই হ'ত না!

কোকলতাস। সম্রাট, আপনি কি বলছেন আমি তা বুঝতে পারছি না?

সম্রাট। বুঝতে পারছ না! হা হা—তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছ। আলি মুরাদ তো এত নির্বোধ নয়!

কোকলতাস। সম্রাট, আপনি স্পষ্ট করে বলুন।

সম্রাট। স্পষ্ট ক'রে কি ক'রে বলি। সে কথা যে আমি মুখে উচ্চারণ করতে পারছি না ভাই! সে কথা যে আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না।—এ কি! আলি মুরাদের চোখে জল!—বীর নির্ভীক কোকলতাস খাঁ—তোমার চোখে জল!—

কোকলতাস। (হাঁটু গেড়ে) সম্রাট—সম্রাট, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি অভিমান-চালিত হ'য়ে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিলুম। আমার প্রতি যে শাস্তি ইচ্ছা বিধান করুন।

সম্রাট। (কোকলতাসকে তুলে) শাস্তি—যে শাস্তি দেব তাই নিতে পারবে কোকলতাস খাঁ?

কোকলতাস। হ্যাঁ সম্রাট।

সম্রাট। (চারি দিকে চেয়ে)—এই ছোরাখানা নিয়ে টপ ক'রে আমার বুকে বসিয়ে দিয়ে তুমি পালিয়ে যাও। কাল সকালে নিজেকে উজির ব'লে ঘোষণা ক'র।

কোকলতাস। সম্রাট—হত্যা করা আমার পেশা নয়। আমি আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছি বটে, কিন্তু হত্যা করায় সমর্থন কখনো করিনি।

সম্রাট। তাহ'লে আমাকে হত্যা করবার প্রস্তাবও উঠেছিল। কে এ প্রস্তাব করেছিল?

কোকলতাস। শাহজাদা ইজুদ্দিন।

সম্রাট। হো হো হো (উচ্চ হাস্য)

(বেগে ইমতিয়াজের প্রবেশ)

ইমতিয়াজ। সম্রাট—সম্রাট—আপনি কি পাগল হ'লেন না কি?

সম্রাট। পাগল হইনি সম্রাজ্ঞী, আনন্দে অধীর হয়েছি। জানো সম্রাজ্ঞী, পুত্র ইজুদ্দিন আমাকে হত্যা করতে চায়।—হ্যাঁ, ইজুদ্দিন আমাদের বংশের ছেলে বটে!

(জুলফিকারের প্রবেশ)

কি জুলফিকার খাঁ?

জুলফিকার। সম্রাট, আমাদের ফৌজ যুদ্ধে হেরে আগ্রার দিকে পেছিয়ে এসেছে। আজকে এখুনি যদি আমরা যুদ্ধযাত্রা না করি তাহ'লে জয়ের সম্ভাবনা খুবই কম।

সম্রাট। বেশ, তাহ'লে এখুনি যুদ্ধযাত্রা করা হোক।

জুলফিকার। কিন্তু সম্রাট, যুদ্ধের নাম শুনেই সৈন্যরা চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। অনেক দিন তারা বেতন পায়নি—টাকা না পেলে তারা হাঙ্গামা বাধাবে ব'লে মনে হচ্ছে।

সম্রাট। টাকা—তা টাকা তাদের দিয়ে দাও উজির। গরীব তারা, টাকার জন্যেই তো প্রাণ দিতে এসেছে।

জুলফিকার। রাজকোষে অর্থ নেই বললেই চলে। যা আছে তাতে আমাদের বাহিনীর চার ভাগের এক ভাগেরও বেতন দেওয়া চলে না।

সম্রাট। তুমি এক কাজ কর উজির। দিল্লীর এই প্রাসাদে সম্রাটদের বিলাসের জন্য যত সোনা-রূপার পাত্র আছে সব কেটে কেটে সৈন্যদের মধ্যে ভাগ ক'রে দাও। তোষাখানায় যত সোনা-রূপার গহনা আছে সৈন্যদের বিলিয়ে দাও। তাতে যদি না কুলোয় তাহ'লে আগ্রার কেল্লায় আমাদের পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত যে ধনরত্ন আছে তাই দিও। ফরুখশায়ারের সেনাপতি কে?

জুলফিকার। আবদুল্লা খাঁ।

সম্রাট। সাদুল্লা খাঁ কোথায়? তাকে দেখছি না যে বড়।

(সাদুল্লার প্রবেশ)

এই যে সাদুল্লা খাঁ,—ইজুদ্দিন—শাহজাদা ইজুদ্দিনকে ডাক।

[সাদুল্লার প্রস্থান।

আবদুল্লা খাঁর ভাই হুসেন আলি খাঁও ফরুখশায়ারের সঙ্গে আসছে?

জুলফিকার। হ্যাঁ সম্রাট—তারা দুই ভাই-ই দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা ব'লে শুনেছি।

সম্রাট। কোনো চিন্তা নেই। আমার দিকেও জুলফিকার খাঁ, কোকলতাস খাঁ—দুই দুর্দ্ধর্ষ বীর আছে।

(ইজুদ্দিনের প্রবেশ)

এই যে ইজুদ্দিন, বড় খুশি হয়েছি পুত্র—বড় খুশি হয়েছি। তুমি না কি আমাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছ?

ইজুদ্দিন। কোকলতাস খাঁ আমার নামে মিথ্যে ক'রে লাগিয়েছেন বুঝি?

সম্রাট। দুঃখিত হ'য়ো না পুত্র, আমি খুশিই হয়েছি তোমার কথা শুনে। সম্রাট-বংশের ঠিক ধারাটি তুমি পেয়েছ—আমি প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি হিন্দুস্থানের সিংহাসন তুমি পাবে।

ইজুদ্দিন। সম্রাট, সমস্ত সংবাদ না শুনেই বিচার করবেন না।

সম্রাট। আর বিচার করবার সময় নেই পুত্র! সম্রাট-সৈন্য আজই আগ্রায় যাচ্ছে—ফরুখশায়ারের বিরুদ্ধে। তুমি প্রস্তুত হও, তোমাকেও যুদ্ধে যেতে হবে।

সাহিত্য-সভা

শ্রীকালিদাস রায়

মফঃস্বল শহরের সাহিত্যিক সভা,
সভা ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ কাজেই সধবা।
সভাপতি হ'য়ে আমি মঞ্চ'পরে হয়েছি আসীন
বসিয়াছে দুই পাশে জন দশ যাহারা প্রবীণ,
দাঁড়ায়ে উদ্যোক্তা যারা। পুরোভাগে প্রসারিত হল,
গ্যালারিমণ্ডিত দিব্য, আলোকে উজ্জ্বল।
হলে কিন্তু নাই লোক। সম্মুখের বেঞ্চি কয়খানা
স্ত্রীলোক শিশুতে পূর্ণ, আর পথ হ'তে ধ'রে আনা
জন পাঁচ উদাসী পথিক,
কি হইবে এ সভায় জানে না ক ঠিক।
নাচ কিংবা বাজি হবে এই ভরসায়
শিশুরা বসিয়া আছে ঠায়।

দেখি আর মনে মনে হাসি,
জানি সাহিত্যের দাম এর বেশি হইনি প্রত্যাশী।
দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলভাড়া
কলিকাতা হ'তে মোরে দিয়াছে ইহারা।

চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় খাওয়াছে মোরে,
দেখিবার যাহা কিছু দেখায়েছে শহরে মোটরে,
বিন্দুমাত্র ত্রুটী এরা করে নাই যত্ন আপ্যায়নে,
আমার যা প্রাপ্য তার ঢের বেশি দিয়েছে ক'জনে।
সমাপ্ত আসল কাজ, নেই কোন ক্ষোভ,
সব চেয়ে বাজে কাজ—বক্তৃতায় নেই মোর লোভ।
ভালো হ'ল মৃদু কণ্ঠে দু'কথায় সারা যাবে কাজ,
নিষ্ক্রিয় 'মাইক'পাশে চেঁচাইতে হবে না ক আজ।
আমি ত হ'লাম খুশী। চেয়ে দেখি উদ্যোগী যাহারা
লজ্জায় কুণ্ঠায় তারা সারা,
দেখি তাহাদের মুখে মালিন্যের ছায়া
হ'ল বড় মায়া।
জোড় হাতে একজন আগাইয়া কয় জড়োসড়ো,
"ফুটবল ম্যাচ এক এ শহরে আছে খুব বড়।
আমাদের সভা সুরু হোক,
এখনি আসিবে স্যার মাঠ হ'তে দলে দলে লোক।"
হায় মূঢ় জানে না যে ম্যাচ হয় শেষ
দশ ঘণ্টা উন্মাদনা কোলাহলে চলে তার রেশ।

ইকুদ্দিন। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

সম্রাট। ব্যস্—সব ঠিক হ'য়ে গেল। জুলফিকার খাঁ, কোকলতাস খাঁ—তোমরা আজই তাহ'লে যাত্রা কর। আমি এখন থেকে সিংহাসনে গিয়ে বসছি—সিংহাসন আমি ছাড়ছি না জুলফিকার খাঁ! তোমরা ফরুখশায়ারকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে আমার সামনে এনে দাঁড় করাবে—তার শাস্তিবিধান ক'রে তবে আমি সিংহাসন ছাড়ব।

জুলফিকার। সে কি সম্রাট! আপনি কি যুদ্ধে যাবেন না?

সম্রাট। না, আমি আর সেখানে কি করতে যাব! তোমরা যাচ্ছ, আমার আর যাবার প্রয়োজন কি?

কোকলতাস। কিন্তু সম্রাট, আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকলে সৈন্যদের মধ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা হবে। তাছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে সম্রাটের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়।

(সম্রাট করুণ দৃষ্টিতে সিংহাসনের দিকে চাইতে লাগলেন।)

জুলফিকার। আপনি ভয় পাবেন না সম্রাট, এ যুদ্ধে আমাদের জয় সুনিশ্চিত।

সম্রাট। ভয়!—না না, ভয় আমি পাইনি জুলফিকার খাঁ। যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে আমার কোনো ভয় নেই। তুমি জানো না, জুলফিকার খাঁ, এই কোকলতাস খাঁ জানে—যুদ্ধক্ষেত্রেই আমি মানুষ। কামানের ধ্বনির মধ্যেই আমার জ্ঞানোন্মেষ হয়েছে, প্রভাতের বাতাস আমার কানে চিরদিনই আহতের আর্ত্তস্বর বয়ে নিয়ে এসেছে। আমার পিতা যৌবনের প্রথম থেকেই মৃত্যুদিন অবধি শিবিরে, তাঁবুতেই বাস করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে তাঁর এমন অভ্যেস হ'য়ে গিয়েছিল যে ইট-পাথরের ঘরে তাঁর ঘুমই হ'ত না। সেই পিতার পুত্র আমি। যুদ্ধে যেতে আমার কোনো ভয়ই নেই। তবে কি জানো, তোমাদের বলি—ঐ যে দেখছ সিংহাসন, ঐ সিংহাসন অনেক সম্রাটের মৃত্যুর কারণ হয়েছে, কিন্তু আমি জানি সিংহাসনই আমার রক্ষাকবচ। আমি জানি, যতক্ষণ আমি সিংহাসনে থাকব ততক্ষণ আমার কেউ কিছু করতে পারবে না। আসুক ফরুখশায়ার, তার আবদুল্লা খাঁ, হুসেন খাঁ—বড়া সৈয়দের বাহিনী নিয়ে—আমি সিংহাসনে ব'সে আছি দেখলে প্রস্তুত কুকুরের মত তারা পালিয়ে যাবে।

জুলফিকার। সম্রাট—যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি যদি উপস্থিত না থাকেন তাহ'লে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে। হয়তো আমাদের পরাজয়ও হ'তে পারে।

সম্রাট। তুমি কি বল কোকলতাস খাঁ?

কোকলতাস। সম্রাট—আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে না থাকলে আমাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

সম্রাট। তাহ'লে চল—আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই। কিন্তু তার আগে জুলফিকার খাঁ, প্রতিজ্ঞা কর, যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করবে না?

জুলফিকার। সম্রাট, আমি আপনার বান্দা। আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দুটুকুও যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আপনাকে পরিত্যাগ করব না।

সম্রাট। কোকলতাস খাঁ, যুদ্ধে আমাদের জয় নিশ্চিত।

[ক্রমশঃ।

GOVERNMENT ... Cooch B

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকে বলে, রসকস নেই, ভোঁতা মানুষ।

বাড়ীর লোক আরও বাড়িয়ে বলে, দয়ামায়া নেই, হৃদয়হীন নিষ্ঠুর মানুষ।

কেনই বা বলবে না লোকে, ঘরের এবং বাইরের? বয়স ত্রিশ পেরিয়েছে, স্বাস্থ্য ভাল, চেহারা ভাল, চাকরী করে তিনশ' টাকা মোটা বেতনের। অথচ একটা অদ্ভুত নিরুত্তেজ যান্ত্রিক জীবন যাপন করে চলেছে। তার যেন কোন সখ নেই আবেগ নেই উত্তাপ নেই।

বৌ চায় না, নেশা করে না, সিনেমা দ্যাখে না, জুয়া খেলে না। মেয়েদের সাথে মেলামেশা, বন্ধুর সাথে মজার কথা রসের কথা কেচ্ছার কথা, কোন কিছুতে রুচি নেই। কাউকে স্নেহমায়া দেয়ও না, নিজের জন্য চায়ও না।

অথচ গোমড়া মুখেও দিন কাটায় না, ব্যথা বেদনা বিষণ্ণতার আমেজ মেলে না তার কাছে। তাহলেও অন্ততঃ অনুমান করা যেত সকলের অজ্ঞাতে হয়তো জীবনে তার কিছু একটা ঘটেছে, মনটা কোন কারণে বিগড়ে গেছে অথবা হয়তো ভেঙেই গেছে। সাধারণ ভাবে লোকের সঙ্গে মেলামেশা হাসিগল্প বজায় আছে ঠিকই। রোয়াকের বৈঠকে নগদ নগদ উত্তেজক সংবাদ ও সমস্যা নিয়ে গলাবাজির সময় হাজির থাকলে তার গলাও অন্যের চেয়ে কম চড়ে না।

রাত্রে দিব্যি ঘুমায়। পেট ভরে খায়। সংসারের খুঁটিনাটি সব বিষয়ে নজর রাখে, কঠোর নিয়মে সংসার চালায়। বাপ-মা ভাই-বোনের সংসার।

বিয়ের কথা বললে হেসে উড়িয়ে দেয়।

হাসে সত্যই কিন্তু এমন এক কঠোর দৃঢ়তার সঙ্গে কথাটা উড়িয়ে দেয় যে পীড়াপীড়ি করার সাহস হয় না বাড়ীর লোকের।

কল্পনা মুখ বাঁকিয়ে বলে, বিয়ে করবে কি! বৌ তো আর পুতুলটির মত উঠবে বসবে না, আমরা যেমন করি। বৌয়ের চেয়ে কর্তালি ভাল লাগে দাদার।

আল্পনা বলে, ভাল লাগে না ছাই! দাদার ভাল লাগালাগিই নেই। কর্তালি করতে হবে তাই কলের মত করে! দাদার বুকটা পাথর দিয়ে গড়া।

পিঠাপিঠি দুটি বোন। বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে দুজনেরি। আজকালকার বিয়ের বয়স দাদার সম্পর্কে তাদের সমালোচনার মূল কথাটি সম্পর্কে সকলেই একমত। সুনীল যে বিয়ে করে না তার অন্য কোন কারণ নেই, তার ধাতটাই একমাত্র কারণ।

[illegible] সে ওই রকম।

স্নেহমায়া প্রেমভালবাসা তিতো নয় তার কাছে, সে কোন স্বাদই পায় না ওসবে। ঘরসংসারে তার বিতৃষ্ণা নেই, রোগশোক দুঃখযাতনা ভরা জীবনের উপর মনটাও তার বিষিয়ে যায়নি—তাহলে তো বৈরাগ্য আসত!

ওর হৃদয়টাই ভোঁতা, অনুভূতির বালাই নেই। অনুরাগের তাপেও গলে না, বিরাগের হিমেও জমে না।

সংসার চলে সুনীলের আয়ে। ভূপেশ পেনসন পায় মোটে পঞ্চাশ টাকা। সংসারে তাই সুনীলের কথার ওপরে আর কথা নেই। কিন্তু সে হম্বিতম্বি করে না বা কড়া শাসনে সকলকে দাবিয়েও রাখে না। ভূপেশ বরং দিনে দশ বার রাগে আর চেঁচামেচি করে।

তবু সকলে নিষ্ঠুর ভাবে সুনীলকেই। তার সংসার চালাবার হৃদয়-বর্জিত নীতিটার জন্য। এ নীতিতে প্রয়োজনের আপেক্ষিক ওজন ছাড়া কোন হিসাব নেই, কারো এতটুকু সখ বা আব্দার প্রশ্রয় পায় না।

প্রাণপণে লাগাম টেনে খরচ করার প্রয়োজনটা সবাই বোঝে বৈ কি। দুটি বোন একটি ভাই কলেজে আর দুটি ভাই একটি বোন স্কুলে পড়ে—কঠোর হিসাব ছাড়া এত বড় সংসার কি এই আয়ে চলে? কিন্তু এ কেমন হিসাব সুনীলের! সব রকম বিলাসিতা নয় বাদ গেল, একদিন পরে এক বেলা এক টুকরো মাছ খাওয়া থেকে রোজের এক সের দুধ মেপে মেপে কে কতটুকু খাবে আর কে এক ফোঁটাও খাবে না সে নিয়ম পর্যন্ত সব কিছু মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু সামান্য পয়সায় মেটানো যায় এমন দুটো-একটা তুচ্ছ সাধও কেন বাতিল হয়ে যাবে? সুনীল কেন ভুলেও একদিন অল্প দামের একটি উপহার এনে কারো মুখে হাসি ফোটাবে না? ছোট বোনটিকে দুটো পুতুল কিনে দিলেই কি অচল হয়ে যাবে সংসার। ভূপেশ তো সামান্য হাত-খরচের টাকা থেকে মেয়েকে পুতুল কিনে না দিয়ে পারে না? এবং তাতে সংসারের অনটন বেড়েও যায় না।

তবু হয়তো একটু কম হৃদয়হীন ভাবা যেত তাকে বুড়ো মা-বাবা আর ভাই-বোনদের তুচ্ছতম সাধ-আহ্লাদও মেটাতে পারে না বলে একটু যদি ম্লান দেখাত তার মুখ, একটু যদি সে আপশোষ করত। সে যেন গ্রাহ্যও করে না।

কল্পনার একটি শাড়ী না হলেই নয়। কলেজে পরে যাবার কাপড় নেই। মায়ার পরনের শাড়ীখানা দেখে হঠাৎ কি অদম্য সাধই যে জাগল কল্পনার, সেও ওই রকম শাড়ী পরবে।

ওখানার দাম ষোল টাকা। সুনীল তাকে তের টাকার একখানা কাপড় কিনে দেবে।

মা বলে, তিনটে টাকার মামলা তো, দে কিনে।

সুনীল মাথা নাড়ে।

এ মাথা নাড়ার মানে জানে কল্পনা। অনেক দিন পরে দাদার কাছে সে কেঁদে ফেলে বলে, তের টাকা ষোল টাকায় এত তফাৎ তোমার কাছে?

—অনেক তফাৎ।

—তবে আরও কম দামের কিনে দাও।

—ঘরে পরবার হলে তাই দিতাম। কলেজ যাবি না এ কাপড় পরে?

কিন্তু এবার ছাড়ে না কল্পনা। ভূপেশের কাছে তিনটি টাকা আদায় করে সুনীলের কেনা কাপড় বদলে সাধের কাপড়টি কিনে আনে।

সুনীল রাগে না, কিছু বলে না। ফিরেও তাকায় না।

সন্ধ্যার পর মায়াদের বাড়ীর স্কুলে সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং শেখাতে গেলে মায়া বলে, কল্পনার কাছে শাড়ীর ব্যাপার শুনলাম। সত্যি, কি করে পারেন আপনি?

—না পেরে উপায় নেই তাই পারি।

মায়া একটু সংশয়ভরে তাকায়। বলে, তিনটে টাকায় কি আসত-যেত? আপনি নাকি খুকুকে পুতুল পর্য্যন্ত কিনে দেন না! ছোট্ট বোনটিকে পুতুল দিলে ফতুর হবেন?

মায়া কখনো এ ভাবে কথা বলে না, তার কাজের মানে বোঝার চেষ্টা করার বদলে একেবারে সমালোচনা করে বসা!

সুনীল বলে, অনেক দিন পরে কল্পনা আজ আব্দার ধরেছিল। চাকরী পাওয়ার গোড়ার দিকে প্রত্যেকে দিনে অন্ততঃ দশটা আব্দার করত। আজকাল আর বড় একটা কেউ কিছু চায় না আমার কাছে। খুকুকে পুতুল দিলে কি হত জানেন? কল্পনাকে তের'র বদলে ষোল টাকার কাপড়টা দিলে? আবার সবাই এটা দাও ওটা দাও সুরু করে দিত। একটা মেটালে দশটা মেটাতে পারব না, সে আশা জাগিয়ে লাভ কি।

—সে তো বুঝলাম, কিন্তু পারেন কি করে তাই ভাবি।

—আপনি পারছেন কি করে? আপনার মা তো আজও কাঁদাকাটা করেন!

—এটা অন্য জিনিষ। বিয়ে করব না নিয়ে একটা বড় লড়াই হয়ে গেছে, মা-বাবা মেনে নিয়েছে, চুকে গেছে। মা মাঝে মাঝে একটু সখের কান্না কাঁদে। কিন্তু এসব টুকিটাকি ব্যাপারে শক্ত থাকা—আচ্ছা, আদুরে বোনটি পুতুল চাইলে না দিয়ে আপনার কষ্ট হয় না?

সুনীল ধীরভাবে বলে, কি জানি, টের পাই না। বোনটি সবার আদুরে কিন্তু আমার আদুরে নয় বলে বোধ হয়। আদর করতে ইচ্ছা হয় না।

মায়া চেয়ে থাকে।

সুনীল একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে, কি ভাবছেন? আমি কি ভীষণ মানুষ?

মায়া সায় দিয়ে বলে, সত্যি তাই ভাবছি। আপনি সত্যি ভীষণ মানুষ, না আপনার মনের জোরটা ভীষণ, মনের জোরে নিজেকে কন্‌ট্রোল করেন।

সুনীল মাথা নাড়ে, না, নিজেকে কন্‌ট্রোল করতে হয় না। বাড়ীর লোকের ন্যাকামি ভাল লাগে না করব কি!

—তবে ওদের জন্ম এত খাটছেন কেন? সারাদিন আপিস করে ফের এখানে খাটতে আসেন, সে তো ওদেরি জন্ম?

সুনীল একটু হাসে। একথা আমিও ভেবেছি। নিজেই জানি না আপনাকে কি জবাব দেব বলুন? তবে আমার মনে হয়, একটা কিছু তো করতে হবে মানুষকে, তাই ওদের জন্ম খাটছি। আপনি যেমন বিয়ে না করে পাঁচটা কাজ নিয়ে আছেন।

মায়া বলে, ঠিক হল না। আমি স্বাধীন জীবন ভালবাসি তাই বিয়ে করতে চাই না—এটা আমার নিজের রুচি, নিজের সুখ-শান্তির হিসাব। আপনার সব হিসাব তো শুধু বাড়ীর লোকের সুখের জন্ম।

সুনীল বলে, তাহলে আপনি যেমন স্বাধীন জীবন ভালবাসেন, আমিও তেমনি বাড়ীতে কর্ত্তালি করতে ভালবাসি।

তারা দুজনেই ভাবে, সত্যই কি তাই? না আর কোন মানে আছে তাদের এরকম জীবন যাপনের?

মায়া ভাবে, বিয়ের নামে না হয় তার বিতৃষ্ণা কিন্তু এমন একটা পুরুষ কি জগতে নেই যার জন্ম প্রাণটা তার একটু উতলা হয়? চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স হল, আজও হৃদয়টা যেন ঠাণ্ডা বরফ হয়ে আছে! অন্য দিকে না হোক, বাড়ীর মানুষ বাইরের মানুষের হাসি-কান্নায় তার হাসি পাক কান্না আসুক, শাড়ী পড়তে সিনেমা দেখতে বেড়াতে ভালবাসুক, আরামবিলাস পছন্দ করুক—ওই দিক দিয়ে তার হৃদয়টাও কি সুনীলের মত ভোঁতা?

সুনীলের সঙ্গেই তো কতকালের পরিচয়, সকলের চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতা। এমন সহজভাবে প্রাণ খুলে কথা তো আর কারো সঙ্গে বলতে পারে না। অথচ এই সুনীলকে পর্য্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বেশী আর কিছু ভাববার চেষ্টা করলে মোটেই জমে না ভাবনাটা, একটু রোমাঞ্চও হয় না!

একটা আতঙ্ক বোধ করে মায়া। একটা অদ্ভুত দুর্ব্বোধ্য কষ্ট অনুভব করে।

সুনীল নিজের ঘরে বসে ভাবে। রাত্রের খাওয়া শেষ হয়নি, সংসারের কলরব কানে ভেসে আসে। সত্যি, এটা কার সংসার? কেন সে এই সংসার নিয়ে মেতে আছে, আয় বাড়াবার জন্ম সকালে আরেকটা টুইসনি খুঁজছে?

অথচ ভালবাসা তো টের পায় না বাড়ীর মানুষগুলির জন্ম। সে কি সত্যই সৃষ্টিছাড়া মানুষ, রক্তমাংসের তৈরী নিছক একটা যন্ত্র?

এমনি একটা বাঁকা যন্ত্র যে তার দেহটার নিয়মমত শুধু ভাতের খিদে পায় অন্য কোন খিদে পায় না!

একমাত্র মায়া ছাড়া কোন মেয়ের সঙ্গে মিলতে মিশতে পর্য্যন্ত ভাল লাগে না। কল্পনা আল্পনার বন্ধুরা আসে, চেনা পরিবারের মেয়েরা আসে, কেউ কেউ ভাব করার চেষ্টাও করে তার সঙ্গে। ভাব কিন্তু হয় না কারও সঙ্গেই। বিবাহিতা বয়স্কা মেয়েদের সঙ্গ তবু দুদণ্ড সহ্য হয়, কমবয়সী মেয়েদের সম্পর্কে কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা বোধ করে।

মায়ার সঙ্গে পর্য্যন্ত তার শুষ্ক নিরস বন্ধুত্বের সম্পর্ক—বোধ হয় ওই জন্মই সম্পর্ক! মায়ার মেয়েলি ভাব এত কম না হলে, ন্যাকামি তাদের আবেগ রহিত মেলামেশায় আমদানি করতে চাইলে ওকেও হয়তো সে সইতে পারত না।

এ কি বিকার? কোন মানসিক রোগ?

মায়ার মতই একটা অজানা আতঙ্ক বোধ করে সুনীল।

দরজায় দাঁড়িয়ে রেবা বলে, আসব?

পাড়ায় মাস তিনেক হয় বসাকদের বাড়ীর একতলায় নতুন ভাড়াটে এসেছে সুধীরবাবু, রেবা তার মেয়ে। তিন মাসের

কল্পনাদের সঙ্গে খুব ভাব জমিয়ে ফেলেছে, সুনীলের সঙ্গেও ভাব করার তার প্রবল ইচ্ছা। অন্য ক'জনের চেয়ে এ বিষয়ে তার অনেক বেশী অধ্যবসায় দেখা যায়। সুনীল আমল না দিলেও সে দমতে রাজী নয়!

বোধ হয় খেলা করছে তাকে নিয়ে। ইয়ার্কি জুড়েছে! কতবার তাকে যেতে বলেছে তাদের বাড়ী, সুধীর চার-পাঁচ বার যেচে এসে তার সঙ্গে আলাপ করে গেছে, সে একবারও যায়নি।

তবু রাত ন'টার সময় আবার একলা এসে ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে রেবা হাসিমুখে বলছে, আসব?

দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে সুনীল গম্ভীর মুখে বলে, কি খবর?

রেবা তার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে সানন্দে বলে, ভারি সুখবর। বাবাকে রাজী করিয়েছি। কাল টাইপরাইটিং শিখতে আপনার স্কুলে ভর্তি হয়ে যাব।

সুনীল উদাস ভাবে বলে, বেশ তো!

গলা চড়িয়ে বলে, কল্পনা, আমি এখন খাব, যায়গা কর।

রেবার সুন্দর চোখ দুটি রাগে ঝলসে উঠে সজল হয়ে আসে।

—আজ সত্যি অপমান হলাম। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো? ঠিক যেন শত্রু এসেছি এ রকম করেন কেন আমার সঙ্গে? আমি তো কিছুই করিনি আপনার?

—কি জানেন—

কিন্তু কে তখন তার কথা শোনে। রেবা উঠে দাঁড়িয়েছে, জল শুকিয়ে আবার বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে তার চোখে। তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে সে বলে, কতবার বলেছি, আপনি আমার দাদার মত, আমায় আপনি বলবেন না। তুমি আর মুখে এল না আপনার? বেশ তো, সেটা বুঝলাম। আপনি ঘনিষ্ঠ হতে চান না, আমায় পছন্দ করেন না। সেটা একশো বার হতে পারে। কিন্তু কি অপরাধটা আমি করেছি যে সাধারণ ভদ্রতাটুকুও বজায় রাখতে পারেন না? ভদ্রলোকে তাই করে। যাকে ভাল লাগে না তার সঙ্গে ওই ভদ্রতার সম্পর্কটুকুই থেকে যায়।

কল্পনা এসে দাঁড়িয়েছিল। চলে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে রেবা আরেকটু ঝাল ঝেড়ে যায়। বলে, আগেও এরকম অভদ্রতা করেছেন, আমি গায়ে মাখিনি। ভেবেছি, অন্য কারণ আছে, আপনার হয়তো মন খারাপ, বিনা কারণে কেউ ওরকম অসভ্যতা করে! আপনি কি পাগল?

মা জিজ্ঞাসা করে, রেবা অত চটল কেন রে?

সুনীল বলে, খালি ঘরে বসতে বলিনি, তাই অপমান হয়েছে। মেয়েটার কি বুদ্ধি! এত রাতে ফাঁকা ঘরে গল্প করতে গিয়েছে।

মা বলে, তাতে কি হয়েছে? সন্ধ্যে রাত, আশেপাশে আমরা এতগুলি লোক রয়েছি, দুদণ্ড কথা বলতে গেলে কি হয়? ও সে রকম মেয়ে নয়, ওটুকু বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। ভদ্রলোকের মেয়ে কথা কইতে ঘরে গেছে বলে অপমান করে তাড়িয়ে দিলি!

মার ভর্ৎসনাতেও বড্ড ঝাঁঝ ফোটে আজ!

অনেক রাত্রি পর্যন্ত সেদিন ঘুম আসে না। ওই দুর্বোধ্য আতঙ্কের চাপটা বেড়ে গিয়েছে।

কোন সঙ্গত যুক্তি সত্যাই খাড়া করা যায় না রেবাকে অপমান করার স্বপক্ষে। স্বেচ্ছায় বিচার-বিবেচনা করে যদি সে এটা করত, নারীকে নরকের দ্বার ভেবে করত, তাহলেও একটা মানে থাকত তার কাজের। এমন কিছু রেবা সত্যই করেনি যাতে তার রাগ বা বিতৃষ্ণা জাগা উচিত। তার গায়ে ঢলেও পড়েনি, তার সঙ্গে ছ্যাবলামিও জুড়ে দেয়নি। আর পাঁচজনের সঙ্গে যে ভাবে মেলামেশা করে, তার সেকেলে মা পর্য্যন্ত আজকাল যে রকম মেলামেশায় কোন দোষ খুঁজে পায় না, তার সঙ্গেও সেই ভাবেই মিশতে মিশতে চেয়েছে রেবা, ভদ্রভাবে স্বাভাবিক ভাবে।

এতই খারাপ লাগল সেটা তার যে ওকে অভদ্র অসভ্যের মত অপমান না করে পারল না। এ তো তারই অসংযম!

পাগল না হোক, সে নিশ্চয় ভয়ানক ভাবে বিকারগ্রস্ত। সে নিশ্চয় কঠিন মানসিক রোগে ভুগছে।

জীবন সম্পর্কে তার সব ধারণা ভুল। হিসাবনিকাশ ভুল। লোকে ঠিক কথাই বলে, সকলের হৃদয় আছে, শুধু তার হৃদয় নেই, সে অস্বাভাবিক।

অত্যন্ত ভীরু ক্ষীণ একটা আওয়াজ যেন কানে আসে। প্রথমটা ধরতেই পারে না সুনীল। তারপর সচেতন হয়ে টের পায় খোলা জানালায় বাইরে দাঁড়িয়ে কল্পনা মৃদুস্বরে ডাকছে, দাদা!

সুনীল দরজা খোলে। বলে, কি হল?

কল্পনা বলে, কেন মিছে ভাবছ? অপমান করেছ বেশ করেছ। তুমি তো ডেকে আনোনি, ও যেচে-যেচে আসে কেন তোমার কাছে?

তার ইচ্ছা অগ্রাহ্য করে কেঁদে-কেটে ভূপেশের কাছে বাড়তি টাকা নিয়ে কল্পনা নিজের পছন্দসই কাপড়খানা কিনেছিল। রোজ যে দাদা রাত দশটা না বাজতে আলো নিবিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সেই দাদা আজ আলো নিবিয়ে শুতে পারছে না দেখে সেই কল্পনাই মরিয়া হয়ে উঠে এসেছে দাদাকে একটু স্নেহ জানাতে। হয়তো বা স্নেহ জানিয়ে ঘুম পাড়াবার আশা নিয়েও!

সুনীল আজ মিথ্যা বলে। তার অনিদ্রার কারণ যে রেবা সংক্রান্ত ঘটনা নয়, সংসারের চিন্তা, এই মিথ্যাটা।

—আমি খরচের হিসেব করছিলাম। খরচ বেড়ে যাচ্ছে। সামনের অঘ্রাণে তোর যে বিয়ে দেব, জমা থেকে খরচ করলে হবে কি করে?

কল্পনা স্তব্ধ হয়ে থাকে। মুখ কালো করে থাকে।

—খরচ তোরা কমাতে দিবি না। আর বোধ হয় কমানোও যায় না খরচ। তাহলে অন্য ভাবে বস্তিতে গিয়ে বাঁচার ব্যবস্থা করতে হয়। তার চেয়ে আমি ভাবছি কাল থেকে সকালে একটা টিউসনি করব। দুটো অফার পেয়েছি, কোনটা নেব ভাবছিলাম।

কল্পনার মুখ একটু হাঁ হয়ে গেছে দেখা যায়।

সুনীল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, আমার শরীরটা খারাপ হয়েছে নাকি রে? ঠিক মত খাচ্ছি তো?

কল্পনাও হঠাৎ যেন তার কথার জবাবেই কেঁদে ফেলে। কিন্তু এ তো তারও জানা কথাই যে সুনীলের কাছে কান্নার মানে আছে কিন্তু বিশেষ কোন দাম নেই।

তাই প্রাণপণে কান্না চেপে, দু-একবার গলা ঝেড়ে সে স্পষ্ট ভাষায় বলে, দাদা, কাল থেকে তুমি যদি আমায় জুতো মারো লাথি মারো, আমি জানব আমার কোন রোগ সারাতে জুতো

মেরেছ লাথি মেরেছ। তুমি আমার ভার বইছ, আমি তোমার ঘাড়ে চেপে রয়েছি, এটুকুও খেয়াল হয়নি এ্যাদ্দিন !

কল্পনার এই ভাবপ্রবণতায় আতঙ্ক যেন আরও বেড়ে যায় সুনীলের। কিন্তু বিছানায় বসে আর সে প্রশ্রয় দেয় না আতঙ্ককে।

ক'দিন আগে আপিসের চেনা লোকের কাছ থেকে যৌন বিষয়ে সাধারণের জন্য লেখা একখানা বই এনেছিল—বড় একজন বৈজ্ঞানিকের লেখা বই। ক'দিন পড়বার সময় হয়নি। বিজ্ঞানের কথা, পড়তে ভালই লাগে। অনেক অজানা কথা, আশ্চর্য্য অদ্ভুত কথা জানতে পারে, কিন্তু তার নিজের সমস্যার কোন হদিস পায় না।

তবে পড়তে পড়তে এক সময় ঘুম এসে যায়।

সকালে টিউসনির সন্ধানে যায়।

দু'যাগায় যাবে। প্রথম বাড়ীটি বেশী দূরে নয়, মিনিট পাঁচেকের পথ। চেনা লোকের মুখে জেনেছিল ওদের মাষ্টার চাই। দ্বিতীয় বাড়ীটি কিছু দূরে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত ঝেড়েছিল।

উচ্চ না হলেও যাদব পদস্থ চাকুরে। পরিচয় না থাকলেও পথে বাজারে বাসে অনেক বার দেখা হয়েছে, মুখ-চেনা ভুজনেরি।

সুনীল বলে, বিপিনবাবুর কাছে শুনছিলাম আপনাদের একজন মাষ্টার দরকার।

যাদব অমায়িক ভাবে বলে, হ্যাঁ, বিপিন বাবু আপনার কথা বলেছেন। আসুন, বসুন। উমা, এক কাপ চা এনো তো।

—আমি চা খাই না।

বার-তের বছরের একটি ছেলে পড়ছিল, পড়ার টেবিলের অন্য পাশে বসেছিল রেবার বয়সী উমা। রেবার চেয়েও সুশ্রী আর একটু ঢ্যাঙা। সুনীলের সঙ্গে চমৎকার মানায় !

উমা খুশী হয়ে বলে, চা খান না তো? বেশ করেন। দেখলে তো বাবা। ওঁর কাছে শেখো, ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা খাওয়া কমাও, পেট ভাল থাকবে।

যাদব হাসে।—বেশ তো, শেখা যাবে। এখন কাজের কথা বলি। আমার মেয়েই ওকে অ্যাদ্দিন পড়াচ্ছিল, নিজে ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়েছে। এখন আর পেরে উঠছে না, তাই একজন লোক রাখব। এই বাজারে আরেকটা খরচ বাড়ল—কি আর করা যায়! সকালে এক ঘণ্টা পড়াবে, আমি—সুনীলের মুখের দিকে চেয়ে খানিক ইতস্ততঃ করে হঠাৎ যেন মরিয়া হয়েই বলে ফেলে, আমি ত্রিশ টাকাই দেব।

উমা সাগ্রহে বলে, কাল-পরশুই আরম্ভ করুন। বেচারার বড় অসুবিধা হচ্ছে।

দ্বিতীয়টি বাগানওলা মস্ত বাড়ী। দেখেই বোঝা যায় মালিক পয়সাওলা লোক। গেটে দারোয়ান ছিল, খবর পাঠিয়ে হুকুম আনিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়।

মোটা-সোটা ফর্সা সুন্দরী এবং সুসজ্জিতা একটি মেয়ে বলে, বসুন। এত সকালেই আপনারা আসতে আরম্ভ করলেন !

—আপিস যেতে হবে।

সুনীলের নাম শুনে এক বাণ্ডিল দরখাস্ত থেকে তারটি বেছে নিয়ে সে বলে, আমিই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, আমার নাম নন্দা দেবী। এই যে আপনি লিখেছেন, আপনি আনম্যারেড কিন্তু খুব বড় একটা ফ্যামিলি চালান, এটা আরেকটু খুলে বলুন তো ?

সব শুনে নন্দা বলে, এক ঘণ্টা পড়াবেন, আমরা পঁচিশ টাকা দেব। এক কাপ চা আর বিস্কুট বা টোষ্ট—

—আমি চা খাই না।

নন্দা আশ্চর্য্য হয়ে বলে, সে কি? সবাই চা খায় আপনি খান না কি রকম ?

—এক কাপ দুধ পাই না, চা খাব কেন? একটু দুধ যে পায় না, তার চা খাওয়া উচিত নয়। বড় খারাপ নেশা দাঁড়ায়। ভাতের খিদে চা খেয়ে মেটানো যায়, তাই না এত আদর।

নন্দা একটু ভেবে প্রশ্ন করে, আপনি কি তাহলে আসবেন কাল থেকে ?

অর্থাৎ তাকে পছন্দ হয়েছে। সুনীলকে একটু ভাবতে হয়।

যাদবের বাড়ী কাছে, বেতন পাঁচ টাকা বেশী। এখানে অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হবে, নয় বাসের পয়সা যাবে। তবু ভেতর থেকে জোরালো তাগিদ আসে, এই কাজটাই ভাল, এটা নিয়ে নাও।

সুনীল বলে, তাই আসব। মাইনেটা ত্রিশ করতে পারেন না ?

—এখন পারছি না। পড়ান, পরে বিবেচনা করব।

সুনীল ভাবে, পরে মানে তো আট-ন' মাস পরে তার ছাত্র পরীক্ষায় কেমন ফল করে তাই দেখে !

কিন্তু কেন ?

কেন যাদবের বদলে নন্দাদের বাড়ীর কম মাইনে বেশী অসুবিধার কাজটা নেওয়া ?

নিজেকে এই প্রশ্ন করে সুনীল। প্রশ্ন করতেই হবে, সোজা বাস্তব একটা হিসাব নাকচ করে দিলে তার মানে খুঁজতেই হবে।

মায়াও প্রশ্ন করে, কেন? ওরা বড়লোক, হয়তো কোন সুবিধা করে দেবে, এই প্রত্যাশা করছেন ?

সুনীল বলে, বড়লোক বলেই প্রত্যাশা কম করছি। খুব কৃপণ। ছেলের বাবাকে চোখেও দেখলাম না, মেয়েই সব। খুব হিসেবী পাকা মেয়ে।

মায়া একটু হাসে।—মেয়েটাকে পছন্দ হয়েছে বলে ?

সুনীলও হাসে।—ওরে বাবা! ওই মেয়ে আমায় পাত্তা দেবে? আপিসের বড়বাবুর মত পঁচিশ টাকার মেহনৎ আদায় করে ছাড়বে।

মায়া খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে।

—তাহলে ওই জন্যই এ কাজটা নিয়েছেন। ওদিক দিয়ে কোন ভয় নেই, আপনাকে পাত্তাও দেবে না !

সুনীল নির্বাক্ হয়ে চেয়ে থাকে।

মায়া আবার বলে, যাদববাবুর মেয়ের বেলা ভয় আছে, তার ওপর আবার বিয়ের যুগ্যি মেয়ে, বয়সে চেহারায় আপনার সঙ্গে খাসা মানায় !

সুনীল নির্বোধের মত চেয়েই থাকে।

মায়া হাসে না। তাকেও খুব বিচলিত মনে হয়। মৃদুস্বরে সে যেন নিজের মনেই বলে, এবার বুঝেছি আপনার ব্যাপারটা। আপনার হল ফাঁদের ভয়, আপনি ফাঁদ এড়িয়ে চলেন।

সুনীল এবার বলে, কিন্তু কেন? এটা কি রোগ না বিকার?

মায়া বলে, রোগবিকার কেন হবে? আপনার ধাতটাই এ রকম।

তখনকার মত মায়ার কথাটা খুব মনে লাগে। তার ধাতটাই এ রকম, সে অস্বাভাবিক নয়, বিকারগ্রস্ত নয়।

কিন্তু জিজ্ঞাসার জের কি এত সহজে মেটে এ জগতে! ধীরে ধীরে আবার প্রশ্ন জাগে, কেন তার ধাত এ রকম কেন?

ছেলে খোঁজা হচ্ছিল কল্পনার জন্য, দুটি লাগসই ছেলে জুটে যায়। কল্পনা আর আল্পনা দুজনকেই একদিনে সুনীল পার করে।

ভূপেশ বলেছিল, টাকা?

—যোগাড় করব।

যোগাড় মানে ধার।

মোটা টাকাটাই দেয় মায়ার বাবা ধীরেন। বলে, মায়ার বিয়ের জন্য জমা ছিল। তোমার বোনের বিয়েতেই লাগুক। ব্যাঙ্কে পড়ে থাকাও যা, তোমার কাছে থাকাও তাই। তুমি ব্যাঙ্কের রেটেই সুদ দিও।

দুটি বয়স্কা বোন বিদায় হয়, দুটি কলেজগামিনী বোন, কিন্তু ঘাড়ের বোঝা হাল্কা হয় না সুনীলের। শুধু আশা এই যে পরে একদিন বোঝা হাল্কা হবে, ধারটা যেদিন শোধ হয়ে যাবে। যতদূর সম্ভব চুলচেরা হিসেব কষে সুনীল বার করে বোন দুটির জন্য সব মিলিয়ে মাসে কত খরচ হত এবং সেই পরিমাণ টাকা সে ঋণশোধের জন্য কেটে নেয়। যেমন চলছিল, তেমনি চলে সংসার।

ধীরেন বলে, এত ব্যস্ত কেন? আরও কম করে দিলেও পার। আমার তো তাগিদ নেই।

সুনীল বলে, না, ঢিলে দিয়ে লাভ নেই। বোনেরা যেটুকু রেহাই দিয়েছে, অন্যেরা শুষে নেবে। তার চেয়ে ধার শোধ হোক। এতেও কম দিন লাগবে না!

দেখা যায় বাড়ীর মানুষ সত্যই কিছু আরাম আশা করছিল। ছোট ভাই অনিলের বিদ্রোহে সেটার চরম প্রমাণ মেলে। ভূপেশের সঙ্গে একদিন তার লড়াই বেধে যায় হাত-খরচের টাকার জন্য। সকালবেলা সুনীল তখন সবে ছেলে পড়িয়ে ফিরেছে।

ভূপেশের তিরস্কারের জবাবে অনিল গলা ফাটিয়ে চেঁচায়, বেশ করি সিগারেট খাই, সিনেমা দেখি। সবাই করে, আমি কেন করব না? দাদা সেকেলে একটা মেসিন বলে আমিও মেসিন হব! বড় হয়েছি আমায় হাত-খরচ দেবে না তোমরা? এ কি আব্দার নাকি!

ভূপেশ তর্জন গর্জন করে। সুনীল শুধু বলে, তোমায় তো হাতখরচ দেওয়া হয়।

—ওতে হয় না।

—তোমায় নিয়ে বসে তোমাকে জিজ্ঞেস করে খরচের হিসেব করেছিলাম।

অনিল গোমড়া মুখে বলে, তখন ছোট ছিলাম।

সুনীল উদাস ভাবে বলে, ফার্ষ্ট ইয়ারে ছোট ছিলে, সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেই বড় হয়ে গেছ? বেশ, হাতখরচ বাড়াতে না বলেই চ্যাঁচামেচি জুড়েছ কেন?

—চাইলে তো পাই না।

—মিছে কথা বোলো না। আমার কাছে চাওনি। যা দরকার সব পাচ্ছ, হাতখরচ দরকার হলে পাবে না কেন?

অনিল মরিয়া হয়ে বলে, আমার আজকেই তিনটে টাকা চাই।

—চাই বললেই হয় না জানো। কেন চাই বলতে হবে। সত্যি দরকার থাকলে দেব।

—একজন বন্ধুকে সিনেমা দেখাব নেমন্তন্ন করেছি।

সুনীল মাথা নাড়ে, তাতে তিন টাকা লাগে না।

—আমার একজন মেয়ে-বন্ধু।

—মেয়েটির বাড়ীতে জানে?

—জানে।

সুনীল তাকে তিনটি টাকা দেয়। ভূপেশ ক্ষুব্ধ চোখে চেয়ে থাকে। সুনীলের কাছে কোন খরচটা জরুরী কোনটা নয় মাথামুণ্ডু বোঝা দায়।

অনিল চলে যেতেই ভূপেশ বলে, এটা তোমার উচিত হল না। সংসারে কত কি হচ্ছে না, ওকে তুমি মেয়ে-বন্ধু নিয়ে সিনেমা দেখার জন্য টাকা দিলে!

সুনীল বলে, উপায় কি? সে শিক্ষা তো দাওনি, আমাকেও দিতে দেবেন না। নিয়ে যাবে বলেছে, এখন না নিয়ে গেলে বিশ্রী রকম লজ্জা পাবে। মনটা বিগড়ে যাবে। বাধ্য হয়েই দিতে হল।

মুখে যাই বলুক, মনে কিন্তু দ্বিধা থেকে যায়। হিসেব কি ঠিক হয়েছে? ধমকে দেওয়াই কি উচিত ছিল? কিন্তু তার ওসব বালাই নেই বলেই সে তো মেয়ে-বন্ধু থাকার আনন্দ, তাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাওয়ার আনন্দের প্রয়োজন বাতিল গণ্য করতে পারে না অন্যের জীবনে!

বাঁচা তো যায় জীবন থেকে অনেক কিছুই ছাঁটাই করে। আশেপাশে কত চাকুরের সব রকম বাহুল্যবর্জিত রুক্ষ সাদা-মাঠা জীবন, কষ্টকর জীবন। অলিতে-গলিতে বস্তি কলোনিতে কত অসংখ্য মানুষ প্রাণপণে কোন রকমে শুধু বেঁচেই আছে।

কিন্তু তার তো সে অজুহাত নেই। সামান্য হলেও মানুষের মত বাঁচার জন্য দরকারী কিছু কিছু বাহুল্য বজায় রাখতেই তো সে সকাল বেলা টুইসনি নিয়েছে। অনিলের একটু আনন্দ পাওয়ার দাবী সে অগ্রাহ্য করবে কোন মুখে?

মায়া সব শুনে বলে, সত্যি। আমি অবশ্য অন্য দিক দিয়ে ভাবছিলাম। অনিলের মেয়ে-বন্ধুটি কে জানেন? আমাদের ছায়া।

—তাই নাকি!

—মা আজ আগে থেকেই মেজাজ কড়া করে এসে আমায় বললে, শোন, অনিল ছায়াকে সিনেমায় নিয়ে যেতে চায়, আমরা অনুমতি দিয়েছি। তুই যেন আবার বারণ করিসনে। তোর তো সব বিষয়েই কড়াকড়ি আর বাড়াবাড়ি।

মায়া চিন্তিত ভাবে তাকায়।—অথচ সত্যি আমি কড়াকড়ি করি না। বাড়াবাড়ি করলে কে শুনছে আমার কথা? আপনার তবু জোর আছে, আপনার রোজগারে সংসার চলে। আমি তো সত্যি স্বাধীন নই, বাবার ছেলে নেই বলেই যেটুকু ভোগ করছি।

আমার স্বাধীনতা মানেই শেষ পর্য্যন্ত বাবার ইচ্ছা আর অনিচ্ছা। আমি আজ ভাবছিলাম, এ স্বাধীনতা হারাতে আমার তবে এত ভয় কেন ? বাপের চেয়ে বরং স্বামীর ওপরেই বেশী জোর খাটানো চলে।

—জোর থাকলে চলে বৈ কি।

—আমিও ঠিক তাই ভেবেছি। জোর খাটবে না এটাই আমার আসল ভয়। আমার স্নেহ-মমতা আছে কি নেই বাবা তা দেখতে আসবে না। কিন্তু স্বামী তো আর ছেড়ে কথা কইবে না, তার পাওনা দিতেই হবে। আমি জানি আমার সে সাধ্য নেই। বাবার সঙ্গে মানিয়ে চলছি কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বনবে না। আমার ভয়ের কারণ হল এই। কেমন, ঠিক না ?

এত দিনে নিজের হৃদয়-মনের গভীর-রহস্য ভেদ করতে পেরেছে বলে মায়াকে বেশ খুসী মনে হয়। কিন্তু সে ভড়কে যায় সুনীলের প্রশ্নে।

—বনবে না ধরে নিচ্ছেন কেন ? বাবার যা কিছু আছে অর্দ্ধেক পাবেন, বাবাকে যেটুকু মানেন সেটুকু মেনে চললেই অনেক স্বামী কৃতার্থ হয়ে যাবে।

মায়া মাথা নাড়ে।—সে তো অন্যভাবে মানিয়ে চলা। আমি জানি আমি কিছুতেই পারব না। ভাবলেও বিশ্রী লাগে। গা ঘিন-ঘিন করে। আমার মধ্যে রসকস নেই।

—কেন নেই ?

মায়া বিব্রতভাবে হেসে বলে, যাঃ, আপনি সব গুলিয়ে দিলেন। ভাবছিলাম আসল ব্যাপারটা বুঝি স্পষ্ট বুঝে গিয়েছি। তা তো নয়, রসকস নেই কেন এটাই আসল প্রশ্ন। সবার আছে আমার নেই কেন ?

—আমারও কিন্তু নেই।

সেদিন ছিল ছুটি।

এক রকম কিছু না ভেবেই সুনীল প্রস্তাব করে, বহুদিন সিনেমা দেখি না। যাবেন ?

—বেশ তো। চলুন না।

—ওরা কোনটাতে গেছে জানেন ? সেখানে গেলে জানা যেত ওদের কি রকম ছবি পছন্দ। ছবিগুলি শুনছি নাকি যাচ্ছেতাই হচ্ছে।

মায়া বলে, ছায়াকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওর কোন চেনা মেয়ে দেখেছে, সে নাকি বলেছে, ছবি ভাল নয় কিন্তু বেশ মজার ছবি।

—তাহলে হাসির ছবি হবে। হাল্কা ভাঁড়ামির ছবি। তবু চলুন দেখে আসি।

অনিল আর ছায়া দেখেছে বিকালের শো। চৈত্রের মাঝামাঝি, বেলা খানিকটা বড় হয়েছে। ভিড়ের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে অনিল ক্ষুব্ধস্বরে বলে, এখুনি বাড়ী ফিরতে হবে। কবে পাশ করব, চাকরী পাব, তবে দুটো টাকা পাব। এমন রাগ হয় ভাবলে !

ছায়া হাতের একগাছি চুড়ি খুলে তার হাতে তুলে দেয়, কথা

বিখ্যাত স্বর্ণ শিল্পী :—
বি, সরকারের পৌত্র,
শ্রীনারায়ণ সরকারের
পরিচালনায়
আধুনিকতম অলঙ্কার শিল্প প্রতিষ্ঠান

বি, বি, সরকার কোং লিঃ
১৬০-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ফোন :—বি, বি, ১২৫৩

বলতে গিয়ে চাপা উত্তেজনা আর আবেগে গলা তার কেঁপে যায়।

—মরে গেলেও বাড়ী যাব না এখন। এটা বিক্রী কর।

—বাড়ীতে কি বলবে?

—বলব হারিয়ে গেছে।

অনিলের বিবেক নয়, পৌরুষে একটু বাধে। ইতস্ততঃ করে বলে, তোমার চুড়ি বিক্রী করে—

ছায়া ফুঁসে বলে, তোমার টাকা আমার চুড়িতে তফাৎ আছে নাকি? ছবিতে দেখলে না মেয়েটা কি ভাবে—

এ যুক্তির পরে আর কথা কি!

সন্ধ্যাবেলা সেই ছবি দেখতে যায় সুনীল আর মায়া। শো ভাঙবার পর ভিড়ের সঙ্গে রাস্তায় নেমে এসে তারা দুজনেই যেন হাঁফ ছাড়বার জন্য খানিকক্ষণ বাক্যহারা হয়ে থাকে।

শেষে মায়া বলে, গা ঘিন-ঘিন করছে। বাড়ী গিয়ে হাজার নাইলেও তো কাটবে না। ঠিক যেন দেশের বাড়ীর খাটা পায়খানার তলায় গিয়ে গড়াগড়ি দিয়ে এলাম।

সুনীল বলে, সে গা ঘিন-ঘিন দু'-একবার সাবান ঘষে নাইলেই কেটে যায়। এরা যে চোখ দিয়ে কান দিয়ে মনে প্রাণে ইনজেকসন করে দিয়েছে ঘেন্নার জিনিব।

—বাড়ী যেতে পারব না। চলো একটু ফাঁকা যায়গায় বেড়িয়ে আসি।

—লেকে যাবে?

—নাঃ।

—নদীর ধারে যাই চলো?

—চলো।

সুনীল বলে, ট্রামে বাসে যেতে হবে কিন্তু, ট্যাক্সির টাকা নেই।

মায়া বলে, ট্রামে বাসে যাওয়াই ভাল। দশটা ভালমানুষের ভিড়ে গা-ঘেঁসাঘেঁষি করে একটু স্বস্তি পাব। সত্যি বলছি তোমায়, সিনেমায় ভিড় যদি না হত, রাগের মাথায় জ্ঞান হারিয়ে আমি একটা কেলেঙ্কারি করে বসতাম।

নদী মানে কলকাতাওয়ালী গঙ্গা।

সুনীল বাসের ডাণ্ডা ধরে ঝুলছিল। সহরতলীতে বাস একটু হাল্কা হলে সে লেডিজ সিটেই মায়ার পাশে বসবার সুযোগ পায়। পায় শুধু এইজন্য যে এ পাশের লেডিটির বয়স ষাট পেরিয়ে গিয়েছে।

সুনীল খেয়াল করিয়ে দেয়ার জন্য বলে, ফিরতে কিন্তু অনেক রাত হয়ে যাবে।

মায়া বলে, ছেলেমানুষি কোরো না। রাত হলে হবে।

গঙ্গার গা ঘেঁষে মাটিতেই তারা বসে। জীবন্ত বড় নদীর যে ব্যাপ্তি তার একটা বিশেষ প্রভাব আছে, সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রভাব। সীমাহীন সমুদ্র মনকে বিস্ময়ে উতলা করে তোলে, জীবনের অসীম বৈচিত্র্য ভুলিয়ে মনে পড়িয়ে দেয় শুধু পৃথিবীর সঙ্গে জীবনের সীমাবদ্ধ সম্পর্ক, গ্রহতারা ভরা মহাশূন্যের মানে বোঝার সঙ্গে জীবনের মানে খোঁজা জড়িয়ে দিতে আকুলি-বিকুলি করে প্রাণটা। কিন্তু নদীর এপার থেকে দেখা যায় দূরের ওই তীর, যে তীরে দেখা যায় মানুষ বেঁধে রেখেছে ঘরবাড়ী কারখানা। চোখের সামনে দিয়ে নদীর বুকে চলাচল করে নৌকাভরা মানুষ। আর মাল বোঝাই নিয়ে নৌকা স্টিমার।

নদীর প্রসার তাই ব্যাকুল করে না, এনে দেয় শান্ত উদারতা।

মায়া হঠাৎ বলে, তুমিও টের পাওনি, আমিও টের পাইনি! এ যেন আজব কাণ্ড মনে হচ্ছে।

সুনীল বলে, মোটেই না। জীবনকে আমরা সস্তা ভাবতে পারি না, করব কি? আমরা ধরেই রেখেছি, ওরকম হাল্কা ভাব যখন আসছে না, আমাদের ওসব বালাই নেই।

মায়া একটু হাসে।—আসলে তুমিও জানতে আমি তোমার ঘর করতে যেতে পারব না, তুমিও দায় ফেলে এসে বাবার ঘরজামাই হবে না। কাজেই আমরা টের না পেয়েই খুসী থেকেছি।

সুনীলও হাসে।—আর অন্য কারো কথা ভাবতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে সাড়া পাইনি, ভেবেছি আমরা খাপছাড়া। সস্তা নই বলে আপশোষ করেছি।

দুজনের হাসি একসঙ্গে মিলিয়ে যায়।

সুনীল বলে, কিন্তু এ তো ভারি বিপদ হল! আমার ভাই তোমার বোনের কাছে জীবনটা যদি এমন খেলো হয়ে যায়—?

তারা চিন্তিত ভাবে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

উত্তর

১। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

২। বজ্রাঘাতে মীরণের মৃত্যু হয়।

৩। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ গ্রন্থের লেখক শিবনাথ শাস্ত্রী।

৪। ডেভিড হেয়ার।

৫। পীতাম্বর সিং নামে জনৈক কায়স্থ।

৬। বাঙলা। ক্যালিকো 'ক্যালিকাট' (Calicut) বা কলকাতা শব্দ থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতা ও ভারতীয় প্রাচীন প্রেম-কবিতা

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

২

বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতা সাহিত্য হিসাবে কি করিয়া প্রেম-কবিতার প্রাচীন ভারতীয় ধারাটির উপরেই প্রতিষ্ঠিত আমাদের পূর্ববর্তী প্রবন্ধে সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে সেই আলোচনারই অনুসরণ করিয়া তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে আমাদের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিব।

তরুণী নারীর একটি চমৎকার বর্ণনা পাইতেছি সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্‌ধৃত একটি পদে,—

> দৃষ্টা কাঞ্চনযষ্টিরদ্য নগরোপান্তে ভ্রমন্তী ময়া
> তস্যামদ্ভুতমেকপদ্মমনিশং প্রোৎফুল্লমালোকিতম্।
> তত্রোভৌ মধুপৌ তথোপরি তয়োরেকোঽষ্টমীচন্দ্রমা-
> স্তস্যাগ্রে পরিপুঞ্জিতেন তমসা নক্তংদিবং স্থীয়তে। ২।৪.২

কাঞ্চনবর্ণা নবযৌবনা তরুণী কাঞ্চনযষ্টির ন্যায় নগরোপান্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আজ দেখিয়া আসিলাম। তাহার একটি অদ্ভুত পদ্ম (মুখপদ্ম) রহিয়াছে, তাহা কখনও নিমীলিত হয় না, সর্বদাই প্রস্ফুটিত। তাহাতে রহিয়াছে দুইটি ভ্রমর (দুইটি চক্ষু), তাহার উপরে রহিয়াছে পরিপুঞ্জিত অন্ধকার (কাল কেশজাল)—সে অন্ধকার দিনরাত্রিই অবস্থিত আছে। নায়িকার এই বর্ণনার সহিত আমরা বৈষ্ণব-কবিতার শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ অবলম্বনে রাধার বর্ণনাগুলি বেশ মিলাইয়া লইতে পারি।১

মুগ্ধা নায়িকার চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

> বারংবারমনেকধা সখি ময়া চূতদ্রুমাণাং বনে
> পীতঃ কর্ণদরীপ্রণালবলিতঃ পুংস্কোকিলানাং ধ্বনিঃ।
> তস্মিন্নদ্য পুনঃ শ্রুতিপ্রণয়িনি প্রত্যঙ্গমুৎকম্পিতং
> তাপশ্চেতসি নেত্রয়োস্তরলতা কস্মাদকস্মান্মম ॥২

"বারংবার আমি সখি, বহুভাবে আম্রতরুর বনে কর্ণগহ্বর-পথে কোকিলের ধ্বনি পান করিয়াছি; আজ সেই ধ্বনি কানে পৌঁছিতেই কেন অকস্মাৎ আমার প্রত্যঙ্গ উৎকম্পিত হইতেছে, চিত্তে তাপ জন্মিতেছে, নেত্রযুগলের তরলতা দেখা দিয়াছে?"

ইহারই যেন আবার প্রত্যুক্তি দেখিতে পাই অমরুর একটি শ্লোকে সখীবচনের ভিতরে।—

> অলসবলিতৈঃ প্রেমার্দ্রার্দ্রৈর্মুহুর্মুকুলীকৃতৈঃ
> ক্ষণমভিমুখৈর্লজ্জালোলৈর্নিমেষপরাঙ্মুখৈঃ।
> হৃদয়নিহিতং ভাবাকূতং বমদ্ভিরিবেক্ষণৈঃ
> কথয় সুকৃতী কোঽয়ং মুগ্ধে ত্বয়াদ্য বিলোক্যতে।১

"তোমার এই চাহনির দ্বারা—যে চাহনি আলস্য-মাখা, প্রেমনীরে সিক্ত, পলে পলে মুকুলীকৃত, ক্ষণে ক্ষণে অভিমুখে লজ্জাচঞ্চল ভাবে প্রসারিত, পলকবিহীন এবং যে চাহনি তোমার হৃদয়নিহিত ভাবাকূতি উদ্‌গিরণ করিতেছে—এই চাহনিতে, বল কোন্ সে সুকৃতী যাহাকে আজ তুমি বার বার দেখিতেছ?"

অমরসিংহের নামে ধৃত একটি শ্লোকে আছে,—

> কুচৌ ধত্তঃ কম্পং নিপততি কপোলঃ করতলে
> নিকামং নিঃশ্বাসঃ সরলমলকং তাণ্ডবয়তি।
> দৃশঃ সামর্থ্যানি স্থগয়তি মুহুর্বাষ্পসলিলং
> প্রপঞ্চোঽয়ং কিঞ্চিত্তব সখি হৃদিস্থং কথয়তি ॥২

"তোমার কুচযুগ কম্পিত হইতেছে, কপোল করতলে নিপতিত হইতেছে, নিঃশ্বাস বায়ু সরল অলককে প্রবলভাবে সঞ্চালিত করিতেছে, মুহুর্মুহু বাষ্পসলিল তোমার দৃষ্টিশক্তিকে নিরুদ্ধ করিতেছে, এই সকল প্রপঞ্চ, হে সখি, তোমার হৃদয়স্থিত (ভাবকেই) বলিয়া দিতেছে।"

ইহার সহিত আমরা আরও তুলনা করিতে পারি,—

> শ্বাসেষু প্রথিমা মুখং করতলে গণ্ডস্থলে পাণ্ডিমা
> মুদ্রা বাচি বিলোচনেঽশ্রুপটলং দেহে চ দাহোদয়ঃ।
> এতাবৎকথিতং যদস্তি হৃদয়ে তস্যাঃ কৃশাঙ্গ্যাঃ পুনঃ
> তজ্জানাসি নমু ত্বমেব সুভগ শ্লাঘ্যা স্থিতিস্তত্র যা ॥৩

"তাহার শ্বাসসমূহে দীর্ঘ বিস্তৃতি, মুখ করতলে, গণ্ডস্থলে পাণ্ডিমা, বাক্যে মুদ্রা (অর্থাৎ বাক্য যেন অবরুদ্ধ), চক্ষুতে অশ্রুরাশি, দেহে দাহের উদয়; এই পর্যন্ত ত (মুখে) বলিলাম,—সেই কৃশাঙ্গীর হৃদয়ে যাহা আছে, হে সুভগ, তাহা একমাত্র তুমিই জান; সেখানে (তাহার হৃদয়ে) যাহা আছে তাহাই শ্লাঘ্য।"

'শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি'তে উদ্‌ধৃত একটি শ্লোকে দেখি—

> গোপায়ন্তী বিরহজনিতং দুঃখমগ্রে গুরূণাং
> কিং ত্বং মুগ্ধে নয়নবিসৃতং বাষ্পপূরং রুণৎসি।
> নক্তং নক্তং নয়নসলিলৈরেষ আর্দ্রীকৃতস্তে
> শয্যোপান্তঃ কথয়সি দশামাতপে দীয়মানঃ। ৪

"গুরুগণের অগ্রে বিরহজনিত দুঃখ গোপন করিতে করিতে হে মুগ্ধে, কেন তুমি নয়নবিগলিত বাষ্পপ্রবাহকে রুদ্ধ করিতেছ? রাত্রিতে রাত্রিতে নয়নসলিলের দ্বারা আর্দ্রীকৃত এই যে তোমার শয্যাপ্রান্ত—যাহা তুমি রৌদ্রে দিয়াছ—তাহাই তোমার দশার কথা বলিয়া দিতেছে।"

পূর্বোদ্‌ধৃত এই সকল কবিতার সহিত আমরা পূর্বরাগে বিধুরা রাধিকার চিত্রও স্মরণ করিতে পারি।—

১। এই প্রসঙ্গে রাধিকার রূপবর্ণনায় যে সকল উপমাদি দেওয়া হয় তাহার সহিত নিম্নোদ্‌ধৃত শ্লোকটির তুলনা করা যাইতে পারে।

> লাবণ্যসিন্ধুরপরৈব হি কেয়মত্র
> যত্রোৎপলানি শশিনা সহ সংপ্লবন্তে।
> উন্মজ্জতি দ্বিরদকুম্ভতটী চ যত্র
> যত্রাপরে কদলকাণ্ডমৃণালদণ্ডাঃ। সদুক্তিক: (বিকটনিতম্বায়াঃ) ২।৪।৪

২। সদুক্তিক:, ২।৫।১

১। সূক্তিমুক্তাবলী, সখীপ্রশ্নপদ্ধতি, ৪; শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি, ৩৪১৬

২। সদুক্তিক:, ২।২৫ ১

৩। সূক্তিমুক্তাবলী, ৪৪।৮

৪। শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি, ১৭৯৫

নিশসি নেহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে সঘন বয়ন অবলম্ব।
খেনে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ।
অবিরল পুলক-মুকুলে ভরু অঙ্গ।

* * * *

ভাব কি গোপসি গোপত না রহই।
মরমক বেদন বদন সব কহই।
যতনে নিবারসি নয়নক লোর।
গদগদ শবদে কহসি আধ বোল।
আন ছলে অঙ্গন আন ছলে পন্থ।
সঘনে গতাগতি করসি একন্ত।
দূরে রহু গৌরব গুরুজন লাজ।
গোবিন্দ দাস কহ পড়ল অকাজ।

আবার— কি তুহুঁ ভাবসি রহসি একান্ত।
ঝর ঝর লোচনে হেরসি পন্থ।
কহ কহ চম্পক-গোরী।
কাঁপসি কাহে সঘন তনু মোড়ি।
ঘাম কিরণ বিন্দু ঘাময়ি অঙ্গ।
না জানিয়ে কাহুক প্রেম-তরঙ্গ।
জলধর দেখি বহয়ে ঘন শ্বাসে।
বিশোয়াস করু রাধামোহন দাসে।

অথবা চণ্ডীদাসের পদ :—

এ সখি সুন্দরী কহ কহ মোয়।
কাহে লাগি তুয়া অঙ্গ অবশ হোয়।
অধর কাঁপয়ে তুয়া ছল ছল আঁখি।
কাঁপিয়ে উঠয়ে তনু কণ্টক দেখি।
মৌন করিয়া তুমি কিবা ভাব মনে।
এক দিঠি করি রহ কিসের কারণে। ইত্যাদি।

বলরাম দাসের একটি পদে দেখি :—

শুনইতে কাণহি আনহি শুনত
বুঝইতে বুঝই আন।
পুছইতে গদগদ উত্তর না নিকসই
কহইতে সজল নয়ান।
সখি হে, কি ভেল এ বরনারী।
করহুঁ কপোল থকিত রহু ঝামরি
জনু ধনহারি জুয়ারি।
বিছুরল হাস রভস রস-চাতুরী
বাউরি জনু ভেল গোরি।
খনে খনে দীঘ নিশসি তনু মোড়ই
সঘন ভরমে ভেলি ভোরি।
কাতর-কাতর নয়নে নেহারই
কাতর-কাতর বাণী।
না জানিয়ে কোন দুখে দারুণ বেদন
ঝরঝর এ দুই নয়ানি।
ঘন ঘন নয়নে নীর ভরি আওত
ঘন ঘন অধরহিঁ কাঁপ।
বলরাম দাস কহ জানলু জগ মাহ
প্রেমক বিষম সন্তাপ।

এই পূর্বরাগের বিরহের ভিতরে দেখিতে পাই—

ত্বাং চিন্তাপরিকল্পিত সুভগ সা সম্ভাব্য রোমাঞ্চিতা
শূন্যালিঙ্গনসঙ্কসদ্ভুজযুগেনাত্মানমালিঙ্গতি।
কিঞ্চান্যদ্বিরহব্যথাপ্রশমনীং সংপ্রাপ্য মূর্চ্ছাং চিরাৎ
প্রত্যুজ্জীবতি কর্ণমূলপতিতৈস্তন্নামমন্ত্রাক্ষরৈঃ।১

"হে সুভগ, চিন্তাপরিকল্পিত তোমাকে [উপস্থিত] মনে করিয়া সে রোমাঞ্চিতা [বালা] শূন্যালিঙ্গনে প্রসারিত হস্ত দ্বারা নিজেকে আলিঙ্গন করে। আরও কি বলিব, অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিরহব্যথা প্রশমনী মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া আবার কর্ণমূলে তোমার নাম-মন্ত্রাক্ষর পতিত হইলেই পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে।"

প্রিয়ের নাম-মন্ত্রাক্ষর কানে গিয়া যে বিরহিণীর সকল ব্যাধি—মূর্চ্ছা অপনীত হয় ইহা শুধু পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যাইতেছে না, ইহার ধারা অনেক পূর্ব হইতেই প্রবাহিত। এই ধারারই পরিণতি পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব-সাহিত্যে যেখানে দেখি—

গুরুজন অবুধ মুগধমতি পরিজন
অলখিত বিষম বেয়াধি।
কি করব ধনি মণি মন্ত্র-মহৌষধি
লোচনে লাগল সমাধি।
খেনে খেনে অঙ্গ ভঙ্গ তনু মোড়ই
কহত ভরমময় বাণী।
শ্যামর নামে চমকি তনু ঝাঁপই
গোবিন্দ দাস কিয়ে জানে।

অথবা— তহিঁ এক সুচতুরি তাক শ্রবণ ভরি
পুন পুন কহে তুয়া নাম।
বহুক্ষণে সুন্দরী পাই পরাণ ফিরি
গদগদ কহে শ্যাম শ্যাম।
নামক অছু গুণ না শুনিয়ে ত্রিভুবন
মৃতজন পুন কহে বাত।
গোবিন্দ দাস কহ ইহ সব আন নহ
যাই দেখহ মঝু সাথ।

আমরা জানি, বৈষ্ণব সাহিত্যের বিরহিণী রাধার

বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা।

আর একটি পদে বিরহিণী রাধার বর্ণনায় দেখি—

বিরহে ব্যাকুল ধনি কিছুই না জানে।
আন-আন বরণ হইল দিনে দিনে।
কম্প পুলক স্বেদ নয়নহি ধারা।
প্রণয়-জড়িমা বহু ভাব বিথারা।
যোগিনি যৈছন ধ্যানি-আকার।
ডাকিলে সমতি না দেই দশবার।

১। সূক্তিমুক্তাবলী, ৪৪।২৩

উনমত ভাতি ধনি আছয়ে নিচলে।
জড়িমা ভরল হাত পদ নাহি চলে ।১

রাজশেখরের বর্ণিত বিরহিণীও এইরূপ যোগিনী।—

আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা
নাসাগ্রে নয়নং যদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ।
মৌনং চেদমিদং চ শূন্যমখিলং যদ্বিশ্বমাভাতি তে
তদ্‌ব্রূয়াঃ সখি যোগিনী কিমসি ভো কিংবা বিয়োগিন্যসি ।২

"তোমার আহারে বিরতি, সমস্ত বিষয়গ্রামে পরা নিবৃত্তি; আর তোমার নাসাগ্রে নয়ন, মন একতান; এই তোমার মৌন, এই যে অখিল বিশ্ব তোমার নিকট শূন্য বলিয়া আভাত হইতেছে; হে সখি আমাদিগকে বল, তুমি কি তাহা হইলে যোগিনী হইলে, না বিয়োগিনী (বিরহিণী) হইলে?"

লক্ষ্মীধর কবিরও অনুরূপ একটি কবিতা দেখিতে পাই,—

যদ্দৌর্বল্যং বপুষি মহতী সর্বতশ্চাম্পৃহা য-
ন্নাসালক্ষ্যং যদপি নয়নং মৌনমেকান্ততো যৎ।
একাধীনং কথয়তি মনস্তাবদেষা দশা তে
কোঽসাবেকঃ কথয় সুমুখি ব্রহ্ম বা বল্লভো বা ।৩

"দেহে তোমার দৌর্বল্য, সব দিকেই মহতী অস্পৃহা, তোমার নয়ন নাসালক্ষ্য, তোমার একান্ত মৌনভাব; তোমার এই দশা বলিয়া দিতেছে, 'একাধীন' হইল তোমার মন। কে সেই এক, সেই কথা বল, হে সুমুখি; সে কি ব্রহ্ম না বল্লভ?"

বিরহে 'দশমী দশা'-প্রাপ্ত নায়িকার পক্ষ হইয়া দূতী গিয়া নায়ককে বলিতেছে

নীরসং কাষ্ঠমেবেদং সত্যং তে হৃদয়ং যদি।
তথাপি দীয়তাং তস্যৈ গতা সা দশমীং দশাম্ ।৪

"তোমার এই হৃদয় সত্যই যদি নীরস কাষ্ঠ হয়, তথাপি ইহাকে (এই তরুণীকে) তাহা দাও, কারণ এ দশমী দশা (অর্থাৎ মৃত্যুতুল্য অবস্থা) প্রাপ্ত হইয়াছে।"

নায়িকার তানব-দশার বর্ণনায় রাজশেখর বলিয়াছেন,—

দোলালোলাঃ শ্বসনমরুতশ্চক্ষুষী নির্ঝরাভে
তস্যাঃ শুষ্যত্তগরসুমনঃপাণ্ডুরা গণ্ডভিত্তিঃ।
তদ্‌গাত্রাণাং কিমিব হি বহু ব্রূমহে দুর্বলত্বং
যেষামগ্রে প্রতিপদুদিতা চন্দ্রলেখাপ্যতন্বী ।৫

"তাহার শ্বাসবায়ু দোলার মত চঞ্চল, চক্ষু দুইটি যেন দুইটি নির্ঝর, তাহার গণ্ডভিত্তি শুকাইয়া-যাওয়া টগর ফুলের মত পাণ্ডুর, আর তাহার গাত্রাদির দুর্বলতার কথা আর বেশী কি বলিব, তাহাদের সম্মুখে প্রতিপদে উদিতা চন্দ্রলেখাও অতন্বী বলিয়া মনে হয়।"৬

প্রেমোদ্বেগের অনেকগুলি চমৎকার বর্ণনা পাই প্রাচীন প্রেম-কবিতার ভিতরে। একটি শ্লোকে দেখি,—

সৌধাদুদ্বিজতে ত্যজত্যুপবনং দ্বেষ্টি প্রভামৈন্দবীং
দ্বারাৎ ত্রস্যতি চিত্রকেলিসদসো বেশং বিষং মন্যতে।
আস্তে কেবলমব্জিনীকিসলয়প্রস্তারিশয্যাতলে
সংকল্পোপনতত্বদাকৃতিবশায়ত্তেন চিত্তেন সা ।১

"অট্টালিকায় বাস করিতে উদ্বেগ বোধ করে, আবার উপবনও ত্যাগ করে, চন্দ্রের কিরণকেও দ্বেষ করে; চিত্রকেলি গৃহের দুয়ার হইতে যেন ভয়ে সরিয়া যায়, বেশ-ভূষা বিষের মত মনে করে; শুধু পদ্মকিশলয়ে রচিত শয্যাতলে শয়ন করিয়া আছে—সংকল্পে উপনত তোমার আকৃতির বশায়ত্ত চিত্ত লইয়া।"

বিষং চন্দ্রালোকঃ কুমুদবনবাতো হুতবহঃ
ক্ষতক্ষারো হারঃ স খলু পুটপাকো মলয়জঃ।
অয়ে কিঞ্চিদ্‌বক্রে ত্বয়ি সুভগ সর্বে কথমমী
সমং জাতাস্তস্যামহহ বিপরীতপ্রকৃতয়ঃ ।২

"চন্দ্রালোক বিষ, কুমুদবনের বাতাস আগুন, হার ক্ষতক্ষার; আর সেই চন্দন পুটপাক-স্বরূপ। অহে সুভগ, তুমি কিঞ্চিৎ বক্র হইয়াছ বলিয়া কি তাহার কাছে সকলই যুগপৎ বিপরীত হইয়া গিয়াছে?"

'সদুক্তিকর্ণামৃতে' উদ্‌ধৃত ধোয়ীক কবিকৃত আর একটি এই জাতীয় কবিতা দেখিতে পাই।—

হারং পাশবদাচ্ছিনত্তি দহনপ্রায়াং ন রত্নাবলীং
ধত্তে কণ্টকশঙ্কিনীব কলিকাতল্পে ন বিশ্রাম্যতি।
স্বামিন্ সম্প্রতি সান্দ্রচন্দনরসাৎ পঙ্কাদিবোদ্বেগিনী
সা বালা বিষবল্লরীবলয়তো ব্যালাদিব ত্রস্যতি ।৩

এই সকলের সহিত জয়দেবের 'নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্', 'স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্। সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্।' প্রভৃতির স্মরণ করা যাইতে পারে। বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনে জয়দেবের প্রায় অনুবাদই রহিয়াছে; বিদ্যাপতি এবং পরবর্তী কালের কবিগণের কবিতায় দেখিতে পাই বিবিধভঙ্গে ইহারই ভাবানুবাদ বা পুনরাবৃত্তি।

আর একটি শ্লোকে আছে,—

ন ক্রীড়াগিরিকন্দরীষু রমতে নোপৈতি বাতায়নং
দূরাদুদ্বেষ্টি গুরূন্ বিরজ্যতি লতাগারে বিহারস্পৃহাম্।
আস্তে সুন্দর সা সখীপ্রিয়গিরামাশ্বাসনৈঃ কেবলং
প্রত্যাশাং দধতী ত্বয়া চ হৃদয়ং তেনাপি চ ত্বাং পুনঃ ।৪

এখানে দেখিতে পাইতেছি যে 'সুন্দরে'র সম্বন্ধে সখীগণের যে প্রিয়বাক্যের আশ্বাসন—শুধু সেই আশ্বাসনেই সুন্দরী প্রাণ ধরিয়া আছে; বৈষ্ণব-কবিতার ভিতরে এই ভাবটি রাধার বিরহ প্রসঙ্গে বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমরা এখানে লক্ষ্য করিতে পারি যে, উপরিধৃত শ্লোকগুলির রচনাকারও ধোয়ী

১। পদকল্পতরু, ১৮৬৪

২। 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে' (৪১৬) কবির নাম নাই; অন্য বহু সংগ্রহগ্রন্থে রাজশেখরের নামে।

৩। কবীন্দ্রব:, ৪২৮; সদুক্তিক:, ২।২৫।৫

৪। সদুক্তিক:, ২।৩১।২

৫। সদুক্তিক:, ২।৩৪।১

৬। তু:—'প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী' ইত্যাদি, বিদ্যাপতি।

১। সদুক্তিক: ২।৩৫।১

২। ঐ, ২।৩৫।৩

৩। সদুক্তিক: ২।৩৫।৫

৪। সদুক্তিক: ২।৩৫।৪

ইদানীং নাথ ত্বং বয়মপি কলত্রং কিমপরং
ময়াপ্তং প্রাণানাং কুলিশকঠিনানাং ফলমিদম্ ।১

"আমাদের প্রথমে এমন হইয়াছিল, এই তনু (তোমার তনুর সহিত) অভিন্ন ছিল। তাহার পরে তুমি হইলে প্রেয়, আমি হইলাম হতাশা প্রিয়তমা ; এখন আবার তুমি হইলে নাথ, আমরা সকলে হইলাম তোমার বনিতা। প্রাণটা কুলিশকঠিন হওয়ায় এই ফলই আমি লাভ করিলাম !"

অচল কবির মানিনী বলিয়াছে,—

যদা ত্বং চন্দ্রোঽভূরবিকলকলাপেশলবপু-
স্তদার্দ্রা জাতাহং শশধরমণীনাং প্রকৃতিভিঃ।
ইদানীমর্কস্ত্বং খরুরুচিসমুৎসারিতরসঃ
কিরন্তী কোপাগ্নীনহমপি রবিগ্রাবঘটিতা ।২

"তুমি যখন চন্দ্র ছিলে—(চন্দ্রকলার ন্যায়) অবিকলকলা দ্বারা পেশল ছিল তোমার বপু—আমি ছিলাম তখন চন্দ্রকান্তমণি—চন্দ্রকান্তমণির স্বভাববশতঃ আমি তখন দ্রবীভূত হইয়া যাইতাম ; এখন তুমি হইলে সূর্য, খরকিরণের দ্বারাই এখন সমুৎসারিত হয় তোমার রস ; আমিও তাই এখন কোপাগ্নিবর্ষণকারিণী সূর্যকান্তমণির রূপে রূপান্তরিত হইয়াছি।"

এই মানিনীকে সখীরা প্রবোধ দিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

পাণৌ শোণতলে তনূদরি দরক্ষামা কপোলস্থলী
বিন্যস্তাঞ্জনদিগ্ধলোচনজলৈঃ কিং ম্লানিমানীয়তে।
মুগ্ধে চুম্বতু নাম চঞ্চলতয়া ভৃঙ্গঃ ক্বচিৎকন্দলী-
মুন্মীলন্নবমালতীপরিমলঃ কিং তেন বিস্মার্য্যতে ।৩

"হে ক্ষীণমধ্যা সুন্দরি, রক্তবর্ণ করতলে রক্ষিত তোমার ঈষৎকৃশ গণ্ডস্থল অঞ্জনে মিশ্রিত নয়নজলে মলিন করিতেছ কেন? হে মুগ্ধে, ভৃঙ্গ চপলতা হেতু কখনও হয়তো কদলী পুষ্প চুম্বন করিয়া ফেলে, কিন্তু তাহাতে কি প্রস্ফুট নব মালতীর সুগন্ধ বিস্মৃত হইতে পারে ?"

অভিসারের দুই একটি পদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সারা রাত্রি জাগিয়া নিজের ঘরে বসিয়া অভিসারের সাধনার সুন্দর বর্ণনা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি। অভিসারের বিবিধ এবং বিচিত্র বর্ণনা পাওয়া যায় এই সংগ্রহ গ্রন্থগুলির ভিতরে। বৈষ্ণব-কবিতার ভিতরে যেমন দেখিতে পাই, রজনীর ঘন তমসার ভিতরে বিঘ্নবহুল দুর্গম পথে যেমন একমাত্র মদন সহায়ে রাধা 'একলি কয়ল অভিসার', এখানেও সেই মদনসহায়ে একেলা অভিসারের বর্ণনা পাইতেছি। একটি শ্লোকে অভিসারিণীকে প্রশ্ন করা হইতেছে, "এই ঘন নিশীথে হে করভোরু, তুমি কোথায় যাইতেছ ?" অভিসারিণী জবাব করিল, "প্রাণেরও অধিক প্রিয় যে জন, সে যেখানে থাকে সেইখানে যাইতেছি (প্রাণেরও অধিক প্রিয় বলিয়া প্রাণকে তুচ্ছ করিয়াই যাইতেছি)।" প্রশ্ন হইল, "হে বালা, একাকিনী তুমি ভয় পাইতেছ না কেন ?" উত্তর হইল,

১। সদুক্তিক: ২।৪৭।২
২। সদুক্তিক: ২।৪৭।৫
৩। ঐ, ২।৪৮।৫

"কেন, পুষ্পিতশর মদনই ত আমার সহায় রহিয়াছে।১ তার পরে দেখিতে পাই, জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সকল বৈষ্ণব কবির ভিতরেই অভিসারের কতকগুলি সাধারণ কৌশল, আবার বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অভিসারের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কৌশল বর্ণিত হইয়াছে। জয়দেবে যেমন সংক্ষেপে দেখিতে পাই—

মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্ ॥

ইহারই অতি বিস্তৃত সকল বর্ণনা দেখিতে পাই পরবর্তী বৈষ্ণব কবিতার ভিতরে। পূর্ববর্তী কবিতাসমূহেও এই একই কৌশলরীতির বর্ণনা রহিয়াছে।২ লক্ষ্মণসেনেরও চমৎকার একটি অভিসারের পদ রহিয়াছে।৩

বৈষ্ণব-কবিতায় যেমন অভিসারের বহুবিধ বর্ণনা রহিয়াছে তেমনি 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র মধ্যে দিবাভিসার, তিমিরাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার, দুর্দিনাভিসার প্রভৃতির পাঁচটি করিয়া শ্লোক উদ্ধৃত রহিয়াছে। গোবিন্দ দাসের দিবাভিসারে যেমন দেখিতে পাই,—

গগনহিঁ নিমগন দিনমণি-কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি।
ঐছন জলদ করল আঁধিয়ার।
নিয়ড়হিঁ কোই লখই নাহি পার ॥
চলু গজ-গামিনী হরি-অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার ॥

তেমনই সুভট কবির সদুক্তিকর্ণামৃতে ধৃত একটি শ্লোকে দেখি—

অবলোক্য নর্তিতশিখণ্ডিমণ্ডলৈ-
র্নবনীরদৈর্নিচুলিতং নভস্তলম্।
দিবসেঽপি বঞ্জুলনিকুঞ্জমিশ্বরী
বিশতি স্ম বল্লভবতংসিতং রসাৎ ।৪

১। ক্ব প্রস্থিতাসি করভোরু ঘনে নিশীথে
প্রাণাধিকো বসতি যত্র জনঃ প্রিয়ো মে।
একাকিনী বদ কথং ন বিভেষি বালে
নম্বস্তি পুষ্পিতশরো মদনঃ সহায়ঃ ॥

কবীন্দ্রবঃ ৫০৯ ; শ্লোকটি আরও বহু সংগ্রহগ্রন্থে (কোথায় কোথায় অমরুর নামে) উদ্ধৃত আছে।

২। বক্ত্রপ্রোতদুরন্তনূপুরমুখাঃ সংযম্য নীবীমণী-
র্মুদ্‌গাঢ়াংশুকপল্লবেন নিভৃতং দত্তাভিসারক্রমাঃ।
কবীন্দ্রবঃ ৫২২ ; সদুক্তিকর্ণামৃতেও ধৃত হইয়াছে।

তুঃ মন্দং নিধেহি চরণৌ পরিধেহি নীলং
বাসঃ পিধেহি বলয়াবলিমঞ্চলেন। ইত্যাদি। নাকের।
সদুক্তিক: ২।৬১।২

উৎক্ষিপ্তং সখি বর্তিপূরিতমুখং মূকীকৃতং নূপুরং
কাঞ্চীদাম নিবৃত্তঘর্ঘররবং ক্ষিপ্তং দুকূলান্তরে।
যোগেশ্বরের, সদুক্তিক: ২।৬১।৩

৩। মুক্তাভরণানি দীপ্তমুখরাণ্যুত্তংসমিন্দীবরৈঃ ইত্যাদি।
—সদুক্তিক: ২।৬১।৫

৪। সদুক্তিক: ২।৬৩।১

"ময়ূরমণ্ডলের নৃত্যপ্রবর্তক নবীন মেঘের দ্বারা নভস্তল আবৃত দেখিয়া অভিসারিকা দিবসেই রসবশে বল্লভভূষিত বঞ্জুলকুঞ্জে প্রবেশ করিল।"১

তিমিরাভিসারে যেমন দেখিতে পাই, রাধা সর্বভাবে নীলবেশে সজ্জিতা হইয়া অন্ধকারের সহিত নিজেকে মিলাইয়া দিতে চাহিয়াছে,২ তেমনি জ্যোৎস্নাভিসারের সময় দেখিতে পাই, রাধা অমল ধবল বেশে জ্যোৎস্নার সহিত নিজেকে মিলাইয়া লইয়া অভিসার করিয়াছে।

সমুচিত বেশ করহ বর চন্দন
কপুর খচিত করি অঙ্গ।
দুগ্ধ-ফেন-সিত অম্বর পরিহর
কুঞ্জহি চলহ নিশঙ্ক। (গৌরমোহন)
কুন্দ কুমুদ গজ মোতিম হার।
পরিহল হৃদয়ে ঝাঁপি কুচ-ভার। (কবিশেখর)

প্রাচীন কবিতার ভিতরেও ঠিক এই প্রথা বা কলাকৌশলই দেখিতে পাই।৩ গোবিন্দদাসের একটি প্রসিদ্ধ পদ রহিয়াছে,—

যাহাঁ পহুঁ অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাহাঁ তাহাঁ ধরণি হইয়ে মঝু গাত।
যে-সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ।
এ সখি বিরহ-মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুলচন্দ।
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ।
যো-বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ চাহি হোই মৃদু বাত।
যাহা পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম।
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন-গোরি।
সো মরকত-তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি।

সমগ্র পদটিই রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' ধৃত নিম্নলিখিত প্রাচীন শ্লোকটির ভাবানুবাদ।—

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তি স্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরম্।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গনে
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তে২নিলঃ।

রাধা-প্রেমকে অবলম্বন করিয়া দ্বাদশ শতাব্দী হইতে যে বৈষ্ণব-কবিতা রচিত হইয়াছে তাহার সহিত দ্বাদশ-শতক এবং তাহার বহু পূর্বকাল হইতে রচিত পার্থিব প্রেম-কবিতার এই যে আমরা মিল দেখাইবার চেষ্টা করিলাম তাহা রাধাবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একদিক হইতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়াই আমরা এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করিয়াছি। আমরা দেখিতে পাই, দ্বাদশ শতকের জয়দেব ব্যতীত অন্যান্য কবিগণ রচিত রাধা-প্রেমের কবিতা এবং দ্বাদশ শতকের বহু পূর্ব হইতে রচিত রাধা-প্রেমের কবিতা সমসাময়িক পার্থিব প্রেমের কবিতার সহিত সমসুরেই গ্রথিত; জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-কবিতার সহিতও ভারতীয় চিরপ্রচলিত পার্থিব প্রেম-কবিতার ধারার গভীর মিল রহিয়াছে। সাহিত্যের দিক হইতে তাই বিচার করিলে আমরা রাধার পরিচয়ে বলিতে পারি, রাধা হইল ভারতীয় কবিমানস-ধৃত নারীরই একটি বিশেষ রসময়ী বিগ্রহ। বৈষ্ণব সাহিত্যে যত শৃঙ্গার বর্ণনা রহিয়াছে, রসোদ্‌গার, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা প্রভৃতির বর্ণনা রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণই ভারতীয় কাব্য-সাহিত্য এবং রতিশাস্ত্রকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এই প্রাকৃত রচিত স্থূল সূক্ষ্ম নানা-বৈচিত্র্যময় সুনিপুণ বর্ণনা যে সর্বদা প্রাকৃত প্রেমের দৃষ্টান্তে অপ্রাকৃত প্রেমের একটা আভাস দিবার জন্যই লিখিত হইয়াছিল এ কথা স্বীকার করা যায় না। প্রথমে ইহা ভারতীয় প্রেম-কবিতার ধারার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, পার্থক্য রেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে অনেক পরে। পরবর্তী কালে গৌড়ীয় গোস্বামিগণ কর্তৃক যখন রাধাতত্ত্ব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইল তখনও সাহিত্যের ভিতরে রাধা তাহার ছায়া-সহচরী মানবী নারীকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই; কায়া ও ছায়া অবিনাবদ্ধভাবে একটা মিশ্র রূপের সৃষ্টি করিয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনায় আমরা বঙ্গীয় রাধার এই মিশ্র রূপের পরিচয় বেশ স্পষ্ট করিয়াই পাইয়া থাকি।

১। তুঃ—দিবাপি জলদোদয়াদুপচিতান্ধকারচ্ছটা—ইত্যাদি।
—ঐ, ২।৬৩।৩

২। তুঃ— মৌলৌ শ্যামসরোজদাম নয়নদ্বন্দ্বেঽঞ্জনং ইত্যাদি।
—ঐ, ২।৬৪।২

বাসো বর্হিণকণ্ঠমেচকরুচো নিষ্পিষ্টকস্তূরিকা
পত্রালীময়মিন্দ্রনীলবলয়ং ইত্যাদি।—ঐ, ২।৬৪।৩

৩। তুঃ—মলয়জপঙ্কলিপ্ততনবো নবহারলতাবিভূষিতাঃ
সিততরদন্তপত্রকৃতবক্ত্ররুচো রুচিরামলাংশুকাঃ।
শশভৃতি বিততধাম্নি ধবলয়তি ধরামভিব্যক্তাং গতাঃ
প্রিয়বসতিং ব্রজন্তি সুখমেব মিথো নিরস্তভিয়োঽভিসারিকাঃ।

কবীন্দ্রবঃ (৫২৫) কবির নাম নাই, সদুক্তিকর্ণামৃতে (২।৬৫।২) বাণের নামে।

আরও তুঃ— মৌলৌ মৌক্তিকদাম কেতকদলং কর্ণে স্ফুটৎকৈরবং
তাড়ঙ্কঃ করিদন্তকঃস্তরতটী কর্পূরবেণুংকরা। ইত্যাদি।
সদুক্তিক: ২।৬৫।৩

ছবি ছবি

"সব ছবিই ছবি—ভারতীয়, অজন্টীয়, ও সব কিছু না।"
—রবীন্দ্রনাথ।

ভল্গা থেকে গঙ্গা

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দিবা উপাখ্যান

স্থান—মধ্য-ভল্গার তীর। পাত্র—ইন্দো-স্লাভ।
কাল—খৃঃ পূঃ ৩৫০০ বর্ষ।

এই কাহিনী হচ্ছে ২২৫ পুরুষ আগের এক আর্য্য-গোষ্ঠীর। সে সময়ে এরা ছিল ভারতবর্ষ, রাশিয়া ও পারশ্যব্যাপী এক শ্বেত-জাতির অন্তর্ভুক্ত—যাদের বলত ইন্দো-স্লাভ অথবা "শতবংশ"।

"দেখ দিবা, বড় বেশী রোদ্দুর, তোমার সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। এসো, এখানে এই পাথরটার উপর একটু বসি।"

"আচ্ছা, বেশ, সুরশ্রবা।" এই কথা বলে দিবা এসে সুরশ্রবার পাশে একটা বড় পাইন গাছের ছায়ায় একখণ্ড সমতল পাথরখণ্ডের উপর বসল।

দিবার কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম পিঙ্গলবর্ণ মুক্তার মত ঝল্‌মল্ করছিল। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু ছিল না, কারণ সময়টা একে গ্রীষ্মকাল, তায় দুপুর বেলা এবং এরা দুজনে হরিণ শিকারের পিছনে বহু ক্ষণ ছোটাছুটি করে হয়রাণ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু চার দিকের দৃশ্য এমন মনোরম যে, তা দেখলেই যেন শ্রান্তি দূর হয়ে যায়। পাহাড়ের উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত সবুজ বনে পূর্ণ—ধারোলো পাতা-ভর্তি বড় বড় পাইন গাছের প্রসারিত শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে সূর্য্যের আলো টুকরো-টুকরো হয়ে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আর এই বড় গাছগুলোর নীচে গাছের গুঁড়িগুলোর মাঝে-মাঝে নানা রংএর ফুল-ফলের লতাগুল্ম ভর্তি। একটু ক্ষণ বিশ্রামের পর এই তরুণ-তরুণী তাদের শ্রান্তি ভুলে গেল—চার দিকের প্রকৃতির নানা রঙে-বর্ণে-গন্ধে তাদের মন ভরে উঠল।

যুবকটি তার হাতের তীর-ধনুক এবং কুঠার একখণ্ড পাথরের পাশে রেখে দিয়ে নিকটের এক স্বচ্ছসলিলা শান্তস্রোতা নদীতীরের লতা-গুল্ম থেকে সাদা, লাল, বেগুনী নানা রঙের ফুল তুলতে সুরু করল। যুবতীটিও তার অস্ত্র-শস্ত্র এক পাশে রেখে দিয়ে তার সোনালী রঙের চুলের গোছা হাত দিয়ে গোছাতে আরম্ভ করল—তখনও তার মাথার তালু ছিল ঘামে ভেজা। কিছুক্ষণ সে নিঃশব্দগামিনী ভল্গার দিকে তাকিয়ে দেখল—চতুর্দিকের পাখীর কূজনে তার মন মোহিত হয়ে উঠল—তার পর দৃষ্টি পড়ল পুষ্পচয়নকারী যুবকের প্রতি। যুবকের চুলের রঙও তার নিজের মতই সোনালী বর্ণের, কিন্তু যুবকের চুলের সাথে নিজের চুলের তুলনা করতে তার মন চাইল না—যুবকের চুলগুলো তার মনে হল অনেক বেশী সুন্দর। যুবকের মুখে ছিল সোনালী রঙের এক চাপদাড়ি। আর সেগুলো ছাপিয়ে দেখা যাচ্ছিল তার কপিশ বর্ণের নাক, গাল ও কপাল। তরুণীর নজর পড়ল তরুণের লোমশ হাত দুটোর উপর—আর তার মনে পড়ল আর এক দিনের কথা, যেদিন যুবক ঐ শক্ত হাত দুটো দিয়ে পাথুরে কুড়ুলের এক আঘাতে একটা প্রকাণ্ড দাঁতাল শূয়োর হত্যা করেছিল। সেদিন ঐ হাত দুটো মনে হয়েছিল কি প্রচণ্ড শক্তিশালী আর আজ সেই হাত দুটো দিয়েই ও ফুল তুলছে—এখন মনে হচ্ছে হাত দুটো কত কোমল। কিন্তু এখনও তার হাতের শক্ত মাংসপেশীগুলো এবং হাত-ঘোরানোর সময় কব্জির কাছে যে শিরাগুলো জেগে উঠছে তার থেকেই বোঝা যাচ্ছে ঐ হাত দুটো কত শক্তি ধরে।

তরুণীর একবার ইচ্ছা হল ওর কাছে গিয়ে ঐ হাত দুটোকে একবার আদর করতে—এই মুহূর্তে ঐ হাত দুটো তার এত মনোমুগ্ধকর মনে হচ্ছিল। তরুণের উরুদ্বয়ের দিকে তার নজর পড়ল—প্রতি পদক্ষেপে সেখানে মাংসপেশীগুলো কেমন সুন্দর জেগে উঠছে। উরুদ্বয় দিবার মনে সত্যিই খুব বিস্ময় জাগাল—চর্বির আধিক্য নেই কিন্তু পেশীগুলো শিরাবহুল আর তার নীচের পায়ের গুল দুটোও কেমন মজবুত—গোড়ালী দুটোও কেমন সরু।

সুর এর আগে কখনও কখনও দিবার ভালবাসা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে—কথায় নয়, হাবে-ভাবে। নাচের সময় কখনও কখনও সে নিজের কৃতিত্ব দেখিয়ে দিবার মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার সমগোত্রের অন্য যুবকেরা যখন দিবার সাথে নাচের সুযোগ পেয়েছে, যখন হয়ত মাঝে-মাঝে তারা দিবার ওষ্ঠে চুম্বন এঁকে দিতেও অনুমতি পেয়েছে—কিংবা তাদের অঙ্কশায়িনীও হয়েছে—সে সময়ে অভাগা সুরের দিবার কাছ থেকে একটিও চুম্বন বা আলিঙ্গন জোটেনি—এমন কি নাচের সময় সুর তার হাত ধরবারও সুযোগ পায়নি।

সুর এই সময় এগিয়ে এল অঞ্জলি ভরে ফুলের অর্ঘ্য নিয়ে। সুরের নগ্ন দেহের—তার আয়ত বক্ষ এবং ক্ষীণ অথচ পেশীবহুল কটিদেশের পূর্ণবিকশিত সৌন্দর্য্যের দিকে তাকিয়ে আজ এখানে বসে দিবার মনে দুঃখ জেগে উঠল। কেন সে এত দিন সুরের কথা ভাবেনি! বস্তুত এর জন্যে দিবার অপরাধ বেশী নয়—সুরের লজ্জাই তাকে এত দিন মুখ ফোটাতে দেয়নি। যে আঘাত করতে জানে দরজা ত শুধু তার সুমুখেই খোলে!

সুর এগিয়ে এলে দিবা হাসিমুখে বলল—"কি সুন্দর ফুলগুলো, কি মিষ্টি গন্ধ!"

উপলখণ্ডের উপর ফুলগুলো রেখে সুর বলল—"তোমার ঐ সোনালী চুলে আমি যদি এই ফুলগুলো সাজিয়ে দিতে পারি তাহলে এ ফুলের শোভা আরও বেড়ে যাবে।"

"আচ্ছা সুর! সত্যিই কি আমার জন্যে তুমি এই ফুলগুলো তুলে এনেছ?"

"হ্যাঁ, তোমার জন্যেই ত। এই ফুলগুলো দেখে আর তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার জলপরীদের কথা মনে পড়ল।"

"জলপরী?"

"হ্যাঁ, সুন্দরী জলপরীদের কথা—যারা সন্তুষ্ট হলে সব মনস্কামনা পূর্ণ হয় আর যারা রুষ্ট হলে প্রাণেও বাঁচা যায় না!"

"আমাকে তোমার কি ধরণের পরী বলে মনে হয়, সুর?"

"রুষ্টা পরী নিশ্চয়ই নয়।"

"কিন্তু আমি ত তোমার প্রতি কখনও সোহাগ দেখাইনি সুর!" এইটুকু বলে দিবার মুখ দিয়ে আর কথা সরল না—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল সে।

সুর বলল—"না, না, দিবা, তুমি ত আমার উপর কখনও রুষ্টা হওনি! আমাদের ছেলেবেলার কথা তোমার মনে পড়ে?"

"সেই তখনও তুমি এমনি লাজুক ছিলে।"

"কিন্তু তুমি ত আমার উপর কখনও রাগ করোনি।"

"সে সময়েও আমি নিজে উপযাচিকা হয়ে তোমাকে চুমু খেতাম।"

"ঠিকই, কি মিষ্টিই না লাগত সে চুমু!"

দিবা সখেদে বলল—"কিন্তু যখন থেকে আমার এই বর্তুলাকার স্তনভার পূর্ণ হয়ে উঠল—আমাদের গোষ্ঠীর সমস্ত যুবকেরা আমাকে পাবার জন্যে যখন উন্মুখ হয়ে উঠল—সেই সময় থেকেই তোমার কথা আমি ভুলে গেলাম।"

"তোমার তাতে দোষ ছিল না, দিবা!"

"তবে কার দোষ?"

"আমারই, কারণ আমাদের গোষ্ঠীর ছেলেরা যখন তোমাকে চুমু খেতে চেয়েছে তুমি তখন তাদের চুমু খেতে দিয়েছ, কেউ আলিঙ্গন করতে চাইলে তুমি তাকে আলিঙ্গন করেছ। আমাদের মধ্যে যে কোন যুবক শিকারে বা নাচে কৃতিত্ব দেখিয়েছে কিংবা সুন্দর সুপুরুষ কোন যুবককে তুমি কখনও ত নিরাশ করোনি!"

"কিন্তু তুমিও ত সেই রকমই ছিলে সুর,—তুমি ত তাদের থেকেও বেশী কর্মঠ, ক্ষিপ্রগতি এবং সুদেহ—আমি তোমাকে ত নিরাশ করেছি।"

"না দিবা, আমি ত কখনও আমার কামনা প্রকাশ করিনি।"

"না, ভাষায় তুমি করোনি। এমন কি বাল্যকালে যখন আমরা এক সাথে খেলা করতাম, তখনও তোমার কোন ইচ্ছা তুমি ভাষায় প্রকাশ করতে না। তা সত্ত্বেও দিবা তখন সব বুঝত। কিন্তু তার পর দিবা তার সুরকে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু দেখ, অন্য যে দিবা (অর্থাৎ দিন) সে কি কখনও তার সুরকে (অর্থাৎ সূর্য্যকে) ভোলে? না, তা ভোলে না। তাই এই দিবাও আর কখনও তার সুরকে ভুলবে না।"

"তাহলে আবার আমরা আমাদের ছেলেবেলার সেই দিবা আর সুর হয়ে উঠব?"

"হ্যাঁ,—এবার তাহলে আমি তোমাকে একবার চুমু খাই।"

এই বলে ছোট দুটি শিশুর মত এই উলঙ্গ তরুণ-তরুণী দুটি তাদের ফুল্ল অধর দুটি মিলিয়ে দিল—এবং দিবা সুরের তিসি ফুলের মত নীল চোখ দুটোর উপর তার দৃষ্টি রেখে বলল—"তুমি আমার নিজের মায়ের ছেলে আর আমি তোমার কথাই ভুলে গিয়েছিলাম!"

দিবার চোখ জলে ভরে এল—সুর তার গাল দিয়ে ঘষে দিবার চোখের জল মুছে দিয়ে বলল—"না, তুমি ত কখনও আমাকে ঠকাওনি। তুমি যখন বড় হয়ে উঠলে, তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার চোখ, তোমার সারা দেহ যেন পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং আমি তোমার থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম।"

"মনের দিক দিয়ে নিশ্চয়ই নয়, সুর!"

"সে কথা—"

"না, না, তোমাকে বলতে হবে। তুমি বলো, আর কখনও তুমি আমাকে ভয় করবে না?"

"না, আর কখনও তোমাকে ভয় করব না···আচ্ছা, এবার আমি তোমার চুলে এই ফুলগুলো সাজিয়ে দিই, কেমন?"

সুর লম্বা গাছের ছাল থেকে আঁশ বের করে তাই দিয়ে লাল, সাদা, বেগুনী নানা রঙের ফুলে সুন্দর একটা মালা গাঁথল। দিবার চুলগুলোকে একত্র করে তার পিঠের উপর দিয়ে সেগুলো ছড়িয়ে দিল। এই সময় গরম কালে ভল্গা-তীরের তরুণ-তরুণীরা হামেশাই জলে নেমে স্নান করত এবং সাঁতার কাটত, তাই দিবার সদ্য-ধোয়া চুলগুলোতে কোন জট ছিল না। সুর মালাটা দিবার চুলে তিন ভাঁজ কটিবন্ধের মত করে সাজিয়ে দিয়ে একটা প্রান্ত তার কপালের উপর ঝালরের মত করে ঝুলিয়ে দিল—তার দুপাশে রইল দুটো রক্ত রঙের এবং মাঝখানে সাদা রঙের ফুলের সারি।

২

দিবা তখনও সেই পাথরখণ্ডের উপর বসেছিল। সুর একটু পিছনে হটে গিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। কি সুন্দর দেখাচ্ছিল দিবাকে! সুর আরও একটু পিছনে সরে গেল—তখন দিবাকে যেন আরও সুন্দর দেখাল—শুধু দূরে ব'লে ফুলের গন্ধটা সে পাচ্ছিল না। সুর ফিরে এসে দিবার গালের উপর গাল রেখে তার পাশে বসল। দিবা তার সাথীর চোখের উপর চুমু খেল এবং তার ডান হাতটা সুরের পিঠের উপর তুলে দিল। সুর তার বাঁ-হাত দিয়ে দিবার কটিদেশ জড়িয়ে নিয়ে বলল—"দিবা, ফুলগুলোকে এখন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।"

"ফুলগুলোকে না আমাকে?"

সুর উপযুক্ত জবাব খুঁজে না পেয়ে একটু থেমে বলল—"আমি একটু দূর থেকে যখন তোমাকে দেখছিলাম—তখন তোমাকে বেশী সুন্দর দেখাচ্ছিল—আরও দূর থেকে যখন দেখলাম তখন আরও বেশী সুন্দর দেখাচ্ছিল!"

"আর যদি ভল্গার ওপার থেকে আমাকে দেখতে হয়—তাহলে?"

সুরের চোখে আতঙ্কের ছায়া ফুটে উঠল—সে তাড়াতাড়ি বলল—"না, না—অত দূর থেকে নয়। বেশী দূরে গেলে ফুলের গন্ধ পাওয়া যায় না, আর তোমার মুখটাও অস্পষ্ট হয়ে যায়।"

"বেশ, তাহলে তুমি কি চাও? আমাকে দূর থেকে দেখতে, না, আমার কাছে থাকতে?"

"তোমার কাছে থাকতে দিবা! সূর্য্য যেমন করে দিবার সাথে মিশে থাকে তেমনি করে।"

"আচ্ছা, আজ তুমি আমার সাথে নাচবে ত?"

"নিশ্চয়ই।"

"আজ সারা দিন তুমি আমার সাথে থাকবে ত?"

"হ্যাঁ।"

"সারা রাত ?"

"নিশ্চয়ই !"

দিবা তখন সুরকে জড়িয়ে ধরে বলল—"তাহলে আজ অন্য কোন পুরুষকে আমি আমার কাছে আসতে দেব না।"

এই সময় এক দল তরুণ ও তরুণী শিকারী সেখানে এসে হাজির হ'ল। তাদের কণ্ঠস্বর শোনা সত্ত্বেও এরা দুজনে আগের মত দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ রইল।

নবাগতরা পৌঁছুলে তাদের এক জন বলল—"আজ তুমি সুরকে তোমার সঙ্গী বেছে নিয়েছ, দিবা ?"

দিবা তাদের দিকে ফিরে বলল—"হ্যাঁ, এই দেখ, সুর আমাকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে।"

এক জন তরুণী কলকণ্ঠে ব'লে উঠল—"সুর, তুমি ত' ভারী সুন্দর মালা গাঁথো ! আমার চুলেও এমনি করে সাজিয়ে দাও না।"

দিবা বলল—"না, আজ নয়, আজ সুর আমার একার। কাল তোমাকে দেবে।"

"তাহলে কালকে সুর আমার হবে।"

"না, কালও সুর আমার থাকবে।"

"দিবা, সুর কি সব দিনই তোমার থাকবে ? সেটা ঠিক হবে না।"

দিবা বুঝল যে সে ভুল করছে, তাই সে বলল—"না বোন, সব দিন নয়, শুধু আজ আর কাল সারা দিন-রাত।"

ক্রমে আরও অনেক দক্ষ শিকারী সেখানে এসে হাজির হ'ল, একটা কাল কুকুরও এল তাদের সাথে—সেটা এসেই সুরের পা চাটতে লাগল। সুরের মনে পড়ল সে যে-হরিণটা শিকার করেছিল সেটার কথা। সে দিবার কানে কানে কি বলে ছুটে চলে গেল।

২

এই গোষ্ঠীর আবাস-গৃহ ছিল এক বিরাট চালাঘর—তার দেওয়ালগুলো কাঠের এবং উপরের চাল খড়ের। পাথরে কুড়ুল ধারাল হ'লেও শুধু তাই দিয়ে ভারী ভারী কাঠের গুঁড়ি কাটা সম্ভব না। কুড়ুল দিয়েই অনেক কাজ সারলেও বড় গাছের গুঁড়িগুলো কাটার কাজে তারা আগুনও ব্যবহার করেছে। ঘরটা স্বাভাবিক ভাবেই খুব বড়—কারণ নিশা-বংশের সমস্ত লোকদের জন্যই অর্থাৎ অতীত কালের নিশা নাম্নী কোন নারীর সমস্ত বংশধরদের জন্যই এই ঘরটা তৈরী হয়েছিল। এই বংশের সকলেই একই গৃহে বাস করে—একই সাথে শিকার করে—ফল মধু সবই একত্রে আহরণ করে। সবাই এক জন কর্ত্রীকে মানে এবং সকলের জীবিকার ব্যবস্থাই পরিচালিত হয় সমষ্টিগত ভাবে বংশের এক কর্তৃমণ্ডলীর দ্বারা। গোষ্ঠীর ব্যক্তিবিশেষের জীবনের কোন ঘটনাই সমষ্টি-জীবনের বাইরে ছিল না—শিকার, নাচ, প্রেমচর্চা, গৃহনির্মাণ, চামড়ার গাত্রবস্ত্র তৈরী—সমস্ত ক্রিয়াকলাপেই গোষ্ঠীর মধ্যেকার কয়েক জনের নির্দেশ গৃহীত হ'ত এবং এদের মধ্যে প্রধান ছিল কর্ত্রী-জননীর।

এখানকার এই ঘরে নিশা-বংশের সেক্‌ল' নরনারী বাস করে। এক অর্থে তাদের সবাইকেই একটা পরিবারভুক্ত বলা চলে—আবার অন্য অর্থে কয়েকটি পৃথক্ পরিবারের সমষ্টিও বলা চলে। এক জন জীবিতা জননী এবং তার সন্তান-সন্ততিদের একটা আধা-পরিবার ধরা যায় এবং এটা হয় এই কারণে যে পরিবারের সবাই-ই পরিচিত হয় মায়ের নামে। উদাহরণস্বরূপ দিবার ছেলে-মেয়ে হ'লে দিবার মা তখন জীবিত না থাকলে তারা সবাই পরিচিত হবে দিবার সন্তান বলেই। কিন্তু খাদ্যসামগ্রী, ফলমূল বা মাংস—যা-ই তারা সংগ্রহ করুক সেটা কিন্তু শুধু তাদের হবে না। বংশের সমস্ত স্ত্রীপুরুষের সংগৃহীত খাদ্যবস্তু একত্র জমা হয় এবং সবাই মিলে ভাগ করে সেটা খায়। খাদ্যবস্তু কিছু সংগৃহীত না হ'লে বংশ-সমেত সবাই-ই একত্রে আমরণ উপবাস করে। গোষ্ঠী থেকে পৃথক্ করে ব্যক্তিবিশেষের কোন বিশেষ অধিকার থাকে না। প্রবৃত্তি যেমন তাদের কাছে স্বাভাবিক—গোষ্ঠীর রীতি ও অনুশাসনের প্রতি বিশ্বস্ততাও তাদের কাছে তেমনি স্বাভাবিক।

এই ঘরটাও তাদের অস্থায়ী বাসস্থান। কারণ যে-মুহূর্তে শিকারযোগ্য জীব এখান থেকে চলে যাবে—ফলমূলের অভাব ঘটবে সেই মুহূর্তেই গোষ্ঠীসমেত সকলে এ জায়গা ছেড়ে নতুন অঞ্চলে সরে যাবে। বহু যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে তারা জানে—কোথায় কখন শিকার পাওয়া যাবে। এরা যখন চলে যাবে তখন খড়ের চাল ধ্বসে যাবে—কিন্তু কাঠ-পাথরের দেওয়ালগুলো আরও কয়েক বছর খাড়া থাকবে। তাদের নতুন মৃগয়া-অঞ্চলে তারা নতুন ঘর তুলবে, নতুন দেওয়াল নতুন চাল তৈরী করবে। ঘরের পাশে থাকবে তাদের ভাঁড়ার, আর অন্য ধারে হেঁসেল—এরা এখন হাত দিয়ে মাটির বাসন তৈরী করতেও শিখেছে—তাছাড়া জীব-জানোয়ারের মাথার খুলিও তারা পাত্র হিসাবে ব্যবহার করতে শিখেছে। তারা মাংস কাঁচাও খায় কিংবা তাজা মাংস পুড়িয়েও খায়—কারণ শুকনো মাংস রান্না করে খাওয়ার রীতি নেই। ভল্‌গার এ অঞ্চলে মধুও পাওয়া যায় প্রচুর এবং তার জন্যে মধুপায়ী ভল্লুকের সাক্ষাৎও মিলত প্রচুর। নিশা-বংশের লোকেরা মধু খুব পছন্দ করে—মিষ্টি হিসাবে খাবার জন্যেও বটে, মদ হিসাবে পানের জন্যেও বটে।

আজ রাত্রে এদের গৃহে গানের আসর বসেছে। নারী-পুরুষ সকলেই গলা ছেড়ে, সজীব কণ্ঠে গান ধরেছে। গানের আসর এদের চামড়া পিটিয়ে গাত্রবস্ত্র তৈরীর কাজের সময়েও হয়। কারণ এরা সব কাজই যে শুধু সমবেত ভাবে করে তাই নয়—কাজের সাথে-সাথে শ্রান্তিহরণের ব্যবস্থাও করে। গান হচ্ছে তাদের সমবেত কার্য্যকলাপের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান—সমবেত কণ্ঠে গান করে এরা শ্রমের বোঝা লাঘব করে। কিন্তু আজকের আসরের সাথে শ্রমের কোন সম্পর্ক নেই। একবার নারী-কণ্ঠের ললিত সুরের লহরী শোনা যাচ্ছে আর অন্য বার শোনা যাচ্ছে পুরুষ-কণ্ঠের পরুষ ও গম্ভীর সুর।

কুটীরের মধ্যে একটা ঘেরা অংশে গোষ্ঠীর স্ত্রী-পুরুষ, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সকলে সমবেত হয়েছে। মাঝখানে দেবদারু কাঠের আগুন জ্বলছে—আগুনের ঠিক সিধে উপরে কুটীরের চালে ছিদ্র আছে। মেয়ে-পুরুষে মিলে সুরের তালে তালে গাইছে—গানের পদে এই শব্দগুলোই বোঝা যাচ্ছে—"অগ্নি এসেছে……"

মনে হচ্ছে, এরা যেন মধ্যস্থ এই আগুনের কাছে প্রার্থনা করছে। একটু পরেই কর্ত্রী-জননী এবং গোষ্ঠীর মন্ত্রণা-পরিষদের লোকেরা

আগুনের মধ্যে মাংস, চাব, ফল ও মধু আহুতি দিতে আরম্ভ করল। এই ঋতুতে এই গোষ্ঠীর শিকার খুব ভাল হয়েছে—প্রচুর ফল ও মধু আহরিত হয়েছে এবং কেউ জানোয়ার বা অন্য গোষ্ঠীর শত্রুদের দ্বারা নিহত হয়নি। তাই আজ পূর্ণিমার রাত্রে গোষ্ঠীর মানুষেরা অগ্নিদেবতার কাছে শ্রদ্ধা ও প্রার্থনা নিবেদন করছে। কর্ত্রী-জননী এক পাত্র সোমরস আগুনের মধ্যে আহুতি দিল এবং গোষ্ঠীর অন্য সবাই অগ্নিকুণ্ডের চার পাশে ঘিরে দাঁড়াল। এরা সবাই এখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ—জন্মের দিনে মানুষের যেমন কোন আভরণ থাকে না—তেমনি নিরাভরণ আজ এরা। এটা শীতকালও নয়—গরমের দিনে অন্য পশুর চামড়া নিজেদের দেহের উপর চাপাতে এরা অস্বস্তি বোধ করে। এদের সবার দেহই কি সুন্দর সুগঠিত! কারও পেটেই ভুঁড়ি গজায়নি—চর্বি জমে কারও দেহ স্থূলও হয়নি। একেই বলে দেহ-সৌন্দর্য্য—সুন্দর স্বাস্থ্য। স্বাভাবিক ভাবেই এদের সবার মুখশ্রীই এক ধরণের—কারণ এরা সবাই-ই নিশার বংশধর। একই পিতা, ভ্রাতা বা পুত্রের সন্তান। স্বাস্থ্য ও শক্তিতেও এদের সবার সমান অধিকার। দুর্বল বা বিকলাঙ্গের পক্ষে এই ধরণের জীবনে টিঁকে থাকা—প্রকৃতি ও পশু-জগতের শত্রুতার মুখে বেঁচে থাকাও সম্ভব নয়।

কর্ত্রী-জননী সবার সুমুখে থেকে সবাইকে কুটীরের বৃহৎ অংশে নিয়ে এল। সকলে কুটীরের মাটীলেপা মেঝেতে এসে বসল। থলির পর থলি-ভর্তি সোমরস এল—নিজেদের পাত্র ভরে ভরে তারা পান করতে আরম্ভ করল—কারও পাত্র ছিল মাথার খুলি, কারও পাত্র হাড় বা শিং-এর খোল, আর অন্যদের পাত্র পাইন গাছের পাতায় তৈরী। যুবক-যুবতী, প্রবীণ-প্রবীণা, ঠাকুর্দা-ঠাকুরমা সবাই-ই পানাহারে লিপ্ত হ'ল। সব দল দল করে পৃথক্ পৃথক্ হয়ে বসে থাচ্ছিল। অবশ্য এটাই সাধারণ রীতি ছিল না। বৃদ্ধাদের মনে পড়ছিল—তাদের বয়সকালে তারা জীবনের আনন্দ কি ভাবে উপভোগ করেছে এবং বুঝল যে এখন যুবক-যুবতীদেরই পালা—কোন কোন তরুণী অবশ্য যে-সব বৃদ্ধেরা জীবন-সায়াহ্নে এসে পৌঁছেচে তাদের মুখেও মদের পাত্র তুলে দিচ্ছিল। এক দল তরুণ-তরুণীর মাঝখানে বসেছিল দিবা—তার হাত ছিল আজ রিভুর কাঁধে। সুর আজ বসেছে দামার সাথে।

পান·আহার, নৃত্য-গীত এ সবের পর—একই ঘরের মধ্যেই প্রেমিক-প্রেমিকারা পরস্পরের অঙ্কশয্যায় শয়ন করে রইল···। রাত্রিশেষে ঘুম থেকে উঠে কোন কোন স্ত্রী-পুরুষ গৃহকর্মে লিপ্ত হ'ল, কেউ কেউ শিকারে বেরিয়ে গেল, কেউ ফল আহরণে গেল, আর গোলাপবদন শিশুরা কেউ হয়ত তার মায়ের কোলে কেউ বা গাছের ছায়ায় বিছানো চামড়ার উপর শুয়ে রইল—কেউ বা একটু বয়স্ক বালক-বালিকার কোলে-কাঁধে চেপে ঘুরতে লাগল—আর কেউ বা ভল্‌গার বালুচরে লাফাঝাঁপি করে বেড়াতে লাগল।

নিশার যুগের তুলনায় এ যুগের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা অনেক বেশী শান্ত ও সন্তুষ্ট। গোষ্ঠীটা এখন আর এক জন মায়ের অধীনে নেই—অনেক জীবিতা মায়ের ছেলেমেয়ে এখন একত্রে এক গোষ্ঠীতে বা বৃহৎ পরিবারে সমবেত হয়েছে এবং এখনকার কর্ত্রী-জননীর ক্ষমতা নিরঙ্কুশ নয়। গোষ্ঠী-পরিষদই এখন দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। আজ আর তাই কোন নিশার আপন কন্যাকে জলে ডুবিয়ে মারবার প্রয়োজন হয় না।

৩

দিবা এখন চার পুত্র এবং পাঁচ কন্যার জননী এবং পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে সে এখন নিশা-বংশের কর্ত্রী-জননী নির্বাচিত হয়েছে। গত পঁচিশ বছরে এই বংশের লোকসংখ্যা বেড়ে তিন গুণ হয়েছে। এই বাড়-বাড়ন্তের জন্য যখন সুর দিবাকে চুমু খেয়ে অভিনন্দন জানাত তখনই দিবা বলত—"এ সবই হয়েছে অগ্নির কৃপায়, সূর্য্য-দেবতার দয়ায়। অগ্নি ও সূর্য্যদেবতা যারই সহায় হন—সে যেখানেই যাক, ভল্‌গা-স্রোতের মতই তার ঘরে মধুর বন্যা বইবে, দলে দলে হরিণ আসবে বনে তার আহার যোগাবার জন্য।"

কিন্তু নিশা-গোষ্ঠীর সমস্যাও বেড়েছে। কারণ ইতিপূর্বে যে-অঞ্চলে একবার এরা আস্তানা নিয়েছে পুনর্বার সেই অঞ্চলে আস্তানা নিয়ে তারা সন্তুষ্ট হতে পারত না। কারণ এখন তাদের যৌথ বাসগৃহই শুধু যে তিন গুণ বড় করে গড়ার দরকার হ'ত তাই নয়—মৃগয়াক্ষেত্রও দরকার হ'ত তিন গুণ বড় হবার। বর্ত্তমানে তারা যে মৃগয়াভূমির কাছে আশ্রয় নিয়েছে তার ওপারে আস্তানা নিয়েছে উষা-বংশের লোকেরা। উভয়ের সীমানার মাঝখানে ছিল একটি অনধিকৃত বনভূমি। সময়ে সময়ে নিশা-গোষ্ঠীর লোকেরা শুধু যে এই অনধিকৃত এলেকাতেই শিকার করতে যেত তাই নয়—উষা-গোষ্ঠীর অঞ্চলের মধ্যেও তারা ঢুকত। গোষ্ঠীর মন্ত্রণা-পরিষদ দেখল যে, এতে করে উষা-গোষ্ঠীর সাথে সংঘর্ষও বেধে যেতে পারে, কিন্তু এর প্রতিকারের কোন উপায় ছিল না। এক দিন মন্ত্রণা-পরিষদে দিবা বলল—"ঈশ্বর আমাদের এতগুলো জীব যখন দিয়েছেন তখন এই সব বন তাদের উপযুক্ত খাদ্যেও নিশ্চয় পূর্ণ থাকবে। এই সব বন ছাড়া অন্যত্র কোথাও থেকে ত আমাদের খাদ্যের সংস্থান হতে পারে না। এই বনে যে সব ভল্লুক, গরু, ঘোড়া ইত্যাদি আছে তা অন্যকে ছেড়ে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়—যেমন সম্ভব নয় ভল্‌গা নদীর মাছ না ধরা।"

উষা-গোষ্ঠীর লোকেরা দেখল যে নিশা-গোষ্ঠীর লোকেরা অসংখ্য অন্যায় কাজ করে চলেছে। একবার-দুবার উষা-গোষ্ঠীর মন্ত্রণা-পরিষদ নিশা-গোষ্ঠীর মন্ত্রণা-পরিষদের সাথে আলোচনাও করল এবং স্মরণ করিয়ে দিল যে আবহমান কাল থেকে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কোন দিন সংঘর্ষ হয়নি এবং তারা এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিল যে প্রতিবার শীতের সময় তারাই এখানে এসে থাকে। কিন্তু নিশা-গোষ্ঠীর লোকেদের পক্ষে অনাহারের মুখে ন্যায়ের কথা বিবেচনা করতে পারার আশা করা সম্ভব না। যখন অন্য সব আইন অকেজো হয়ে যায় তখন জংলী আইনের আশ্রয়ই নিতে হয়। উভয় গোষ্ঠীই ক্রমে প্রস্তুতি সুরু করে দিল। এক গোষ্ঠীর খবর অন্য গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছুত না—কারণ একালের মানুষদের জন্ম, জীবন, মৃত্যু, বিবাহ সবই তাদের নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত।

নিশা-গোষ্ঠীর এক দল লোক এক দিন পাশের বনে মৃগয়া করতে গিয়ে উষা-গোষ্ঠীর লোকেদের দ্বারা অতর্কিতে আক্রান্ত হল। সেই অবস্থায় তারা ধাঁটী নিয়ে লড়াই চালাতে থাকল—কিন্তু তারা এসেছিল অপ্রস্তুত অবস্থায় এবং সংখ্যাতেও তারা বেশী ছিল না। তাই কয়েক জন সঙ্গীকে মৃত অবস্থায় ফেলে রেখে এবং আহতদের সাথে নিয়ে পালাতে বাধ্য হ'ল। কর্ত্রী-জননী সব ঘটনা শুনল—মন্ত্রণা-পরিষদ বসল সব ব্যাপার আলোচনা করতে এবং শেষে গোষ্ঠীর

সাধারণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হ'ল। সেখানে সবিস্তারে ঘটনা বর্ণিত হ'ল, যারা নিহত হয়েছে বার বার তাদের নাম উচ্চারিত হতে থাকল—আহতদের সবার সমানে হাজির করা হ'ল। তাই ভাই ও ছেলেরা, মা, বোন ও কন্যারা সকলে রক্তাক্ত প্রতিহিংসার দাবী তুলল। রক্তের বদলে রক্তপাত করতে না পারলে গোষ্ঠী-নীতির ব্যত্যয় হয় এবং গোষ্ঠী-নীতির বিরোধিতা করার কল্পনাও কেউ করতে পারত না। তাই সিদ্ধান্ত হ'ল যে, বংশের নিহত ব্যক্তিদের হত্যায় প্রতিশোধ নিতেই হবে। নাচের সঙ্গীত যুদ্ধসঙ্গীতে পরিবর্তিত হ'ল। শিশু ও বৃদ্ধদের রক্ষার জন্য কয়েক জন স্ত্রী-পুরুষকে রেখে বাকী সকলে ধনুক, কুঠার, বল্লম, লাঠি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে এবং দেহরক্ষার জন্য কঠিনতম চর্মের বর্মে সুসজ্জিত হয়ে তারা যুদ্ধযাত্রা করল। সামনে চলল বাদকেরা আর তার পিছনে চলল অস্ত্রধারী স্ত্রী-পুরুষেরা। প্রধানা হিসাবে দিবাই হ'ল পরিচালিকা। বাদ্যযন্ত্রের শব্দে দূর-দূরান্তর নিনাদিত হ'ল—সারা বনভূমি হুঙ্কারে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল—পশু-পক্ষীরা ত্রাসে দিগ্‌বিদিকে পালাতে সুরু করল।

একটু পরেই তারা নিজেদের অঞ্চল অতিক্রম করে মধ্যবর্তী অধিকৃত এলেকায় প্রবেশ করল। কোন সীমারেখা না থাকা সত্ত্বেও এই সব বনবাসীরা প্রত্যেকেই সীমান্ত সম্পর্কে জ্ঞাত থাকত এবং এ ব্যাপারে তারা মিথ্যা বলতে পারত না। মিথ্যা বলার কৌশলই তখন পর্য্যন্ত মানব সমাজে অজ্ঞাত ছিল এবং বলতে চেষ্টা করা তাদের পক্ষে খুব দুরূহ ছিল।

অন্য গোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে যারা বনে শিকারের জন্য এসেছিল তারা তাদের আপন গোষ্ঠীর কাছে সংবাদ নিয়ে গেল এবং উষা-গোষ্ঠীর যোদ্ধারাও ময়দানে এল। তারা স্বাধিকার রক্ষার জন্যই—বস্তুত তাদের মৃগয়া ভূমি রক্ষার জন্যেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'ল। কিন্তু অপর পক্ষ তখন আর ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে প্রস্তুত ছিল না। উষা-গোষ্ঠীর এলেকার মধ্যেই যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। উভয় পক্ষ থেকেই বর্ষাধারার মত শন্-শন্ শব্দে পাথরমুখী তীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষিত হতে থাকল—কুঠারে কুঠারে, বল্লমে বল্লমে, লাঠিতে লাঠিতে সংঘর্ষে উভয় পক্ষেই আহত হ'তে থাকল। হাতিয়ার ভেঙ্গে বা হারিয়ে গেলে স্ত্রী বা পুরুষ যোদ্ধারা হাতে হাতে দাঁতে দাঁতে অথবা মাটী থেকে পাথর কুড়িয়ে তাই দিয়েই প্রতি-আক্রমণ করতে থাকল।

নিশা-গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা ছিল উষা-গোষ্ঠীর সংখ্যার দ্বিগুণ, কাজেই উষা-গোষ্ঠীর পক্ষে জয়লাভ ছিল অসম্ভব। কিন্তু একটি বালকও জীবিত থাকা পর্য্যন্ত তাদের যুদ্ধ করা ছাড়া গত্যন্তরও ছিল না। দিনের আলো সুরু হবার পূরো তিন ঘণ্টা পরে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। উষা-গোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশ লোক বনের মধ্যেই নিহত হ'ল—আহত নয়—নিহতই, কারণ বন্যযুদ্ধে আহত শত্রুকে জীবিত রাখা ছিল রীতিবিরুদ্ধ। বাকী এক-তৃতীয়াংশ তখন জলাশয় তীরে গিয়ে শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে গেল। কয়েক জন জননী, শিশু ও বৃদ্ধদের নিয়ে তাদের আবাসভূমি ছেড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল—কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। প্রতিহিংসাপরায়ণ শত্রুরা তাদের অনুসরণ করে ধরে ফেলল—স্তন্যপায়ী শিশুদের ধরে ধরে তারা পাহাড়ের উপর আছড়ে গুঁড়িয়ে দিল, বৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষদের গলায় পাথর বেঁধে জলাশয় জলে ডুবিয়ে দিল। তাদের বাসগৃহের মধ্যে যে মাংস, ফল, মধু এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী ছিল সে সব বের করে নিয়ে এসে—অবশিষ্ট জীবিত নারী ও শিশুদের সেই ঘরে বন্ধ করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্য থেকে এই হতভাগ্য জীবন্ত মানুষদের আর্তনাদ শুনে নিশা-গোষ্ঠীর লোকেরা উল্লসিত হয়ে উঠল। তারা অগ্নিদেবতার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাল এবং শত্রুর সঞ্চিত মদ ও মাংসে দেবতা ও নিজেদের উদর পরিতৃপ্ত করল।

দিবা খুবই উল্লসিত হয়ে উঠল। সে নিজে তিনটি শিশুকে মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পাথরে আছড়ে মেরেছে এবং তাদের মাথা ফেটে যাবার সময় যে আওয়াজ হয়েছে তা শুনে সে প্রেতিনীর মত অট্টহাসি হেসেছে। আজ পানাহারের পর সুরু হ'ল নৃত্য। ঐ আগুনের সামনেই দিবা তার তরুণ ছেলে বাসুকে নিয়ে নাচতে সুরু করল। নাচের তালে তালে এই দুটি উলঙ্গ নরনারী পরস্পরকে আলিঙ্গন আর চুম্বন করতে লাগল—কখনও বা ছাড়াছাড়ি হয়ে নিজেদের ঘিরে ঘিরে নাচের ভঙ্গিমা দেখাতে লাগল। সকলেই বুঝল যে আজকের রাতে বাসুই হবে তাদের নেত্রীর নর্মসঙ্গী এবং বাসুও তার জয়োন্মত্তা মায়ের কামনাকে অবহেলা করতে চাইল না।

এই গোষ্ঠীর মৃগয়াভূমি এখন চার গুণ বেড়ে গেল এবং শীতকালে তারা কোথায় থাকবে সে দুশ্চিন্তাও তাদের দূর হয়ে গেল। মাত্র একটা ব্যাপারে তাদের দুশ্চিন্তা দেখা দিল তা হচ্ছে—উষা-গোষ্ঠীর যে লোকেদের তারা হত্যা করেছে তারা এবার প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়ে, জীবিত অবস্থায় যা তারা করতে পারেনি, তাই এখন পূর্ণ করবে। যেখানে তাদের ঘরটা পোড়ানো হয়েছিল সেটা একটা প্রেতের আড্ডায় পরিণত হ'ল এবং নিশা-গোষ্ঠীর কেউ সেখান দিয়ে একা বা দুজনে পার হ'তে সাহস করত না। বহু বার শিকারীরা না কি দেখতে পেয়েছে যে, শত শত উলঙ্গ নরনারী সেখানে এক অগ্নিকুণ্ডের চার পাশে নৃত্য করছে। বাসভূমি পরিবর্তনের যেদিন প্রয়োজন হ'ল সেদিন এই পথ দিয়ে এই গোষ্ঠীর লোকদের যেতে হ'ল—কিন্তু তখন দিনের বেলা, এবং তারা চলেছিল সকলে একত্রে। এখনও কোন কোন দিন এমন ঘটত যে রাত্রির অন্ধকারে ঘুমন্ত অবস্থায় দিবা দেখতে পেত যে দুগ্ধপোষ্য শিশুরা যেন মাটী থেকে লাফ দিয়ে উঠে তার হাত ধরতে যাচ্ছে—আর সে আতঙ্কে চীৎকার করে জেগে উঠত।

৪

সত্তর বছর পার হয়েও দিবা বেঁচে রইল। এখন সে আর কর্ত্রী নয়—তবু গোষ্ঠীর সকলেই এই বৃদ্ধ বয়সে তাকে শ্রদ্ধা করত, কারণ তার বিশ বছরের নেত্রীত্বে সে বংশের বৃদ্ধি এবং কল্যাণের জন্য অনেক কিছু করেছে। এই বিশ বছরে তাদের বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে কয়েক বার সংগ্রাম করতে হয়েছে—বহু ক্ষয়-ক্ষতিও স্বীকার করতে হয়েছে—যদিও শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হয়েছে তারাই। এখন তাদের দখলে কয়েক মাসের উপযোগী মৃগয়াভূমি আছে। দিবার ধারণা—এ সবই দেবতার অনুগ্রহের পরিচয়—যদিও আজও কখনও কখনও তার স্বহস্তে নিহত সেই শিশুরা তার স্বপ্নের মধ্যে এসে উৎপাত সৃষ্টি করে থাকে।

শীতকাল এসে গেছে। ভল্গার স্রোত জমে গেছে—তার উপর কয়েক মাসের সঞ্চিত তুষারস্তূপের দিকে দূর থেকে তাকালে মনে হয়, রৌপ্যচূর্ণের অথবা পেঁজা তুলায় একটা আঁকা-বাঁকা রেখা চলে গেছে। নদী থেকে দূরে গাছগুলোর উপরেও প্রাণহীন বরফের স্তূপ জমে উঠেছে। নিশা-বংশ ইতিমধ্যে সংখ্যায় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে—তাই তাদের আরও বেশী খাদ্যসংগ্রহের প্রয়োজন হয় এখন। সাথে সাথে কাজের লোকও তাদের বেড়েছে—তাই যেদিন তারা কাজে বেরোয় সেদিন তাদের ভাণ্ডারে তারা প্রভূত খাদ্য সংগ্রহও করতে পারে। এমন কি শীতকালেও পোষা কুকুর নিয়ে তারা কখনও কখনও মৃগয়ায় বেরোয় এবং কিছু কিছু শিকারও পায়। শিকারের নূতন পন্থাও তারা উদ্ভাবন করেছে। হরিণ, গরু, বুনো ঘোড়া প্রভৃতি যে সমস্ত পশু সাধারণত তারা শিকার করে—খাদ্যের অন্বেষণে সেগুলো বন থেকে বনান্তরে ঘুরে বেড়াত। এই বনবাসী লোকেরা লক্ষ্য করেছিল যে মাটীতে বীজ পড়লে তাতে অঙ্কুর জন্মায়—তাই তারা ভিজে মাটীর বুকে ঘাসের বীজ ছড়াতে আরম্ভ করল। তার ফলে সেখানে ঘাস জন্মাতে সুরু করলে—তৃণভোজী পশুরাও আরও কিছু বেশী দিন সেই অঞ্চলে থেকে যেত।

একদিন ঋক্ষশ্রবার শিকারী কুকুরটা একটা খরগোসের পিছনে তাড়া করল—ঋক্ষশ্রবাও ছুটল তাদের পিছনে। সারা শরীরে তার ঘামের বন্যা ছুটল—তাই আরও দ্রুত এগিয়ে যাবার জন্যে সে তার চামড়ার পোষাকটি খুলে কাঁধের উপর ফেলে নিতে একটুখানি থামল। ইতিমধ্যে কুকুরটি তার দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছিল—অবশ্য বরফের উপর তার পথের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তার দমও ফুরিয়ে গিয়েছিল তাই একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে একটা কাঁটাগাছের গুঁড়ির উপর সে একটু বসল। তার দম ফিরে আসবার আগেই সে অনেক দূর থেকে কুকুরের ডাক শুনতে পেল। সে তক্ষুণি উঠে দৌড়তে সুরু করল। শব্দটা ক্রমেই আরও নিকটে এগিয়ে এল এবং একেবারে কাছে এসে সে দেখতে পেল যে একটা দেবদারু গাছে হেলান দিয়ে একটি অপূর্ব সুন্দরী তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। সাদা চামড়ার একটা পোষাক তার পরনে, তার মাথার সাদা টুপীর নীচে থেকে তার গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী চুল আলুলায়িত—আর তার পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা মৃত খরগোস। ঋক্ষ এসে পৌঁছুলে তার কুকুরটা প্রবল চীৎকার করতে করতে তার দিকে এগিয়ে এল। ঋক্ষ মেয়েটির মুখের দিকে চাইল। মেয়েটি একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল—"বন্ধু, এটি কি তোমার কুকুর?"

"হ্যাঁ, আমার—কিন্তু তোমাকে ত ইতিপূর্বে আমি কখনও দেখিনি?"

"আমি কুরুবংশের মেয়ে। এটি ত আমাদেরই এলেকা।"

"কুরুবংশ!"

ঋক্ষ চিন্তামগ্ন ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। কুরুরা তাদের প্রতিবেশী এবং এই দুই বংশের মধ্যে কয়েক বছর ধরে বিরোধ চলছে—বিরোধ কয়েক বার যুদ্ধের পর্য্যায়েও পৌঁছেচে। কুরুরা অবশ্য উসা-বংশের থেকে বেশী বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে—তারা বুঝতে পেরেছিল যে যুদ্ধে জয়ী হবার তাদের পক্ষে কোন সম্ভাবনা নেই। তাই তারা পলায়নই বেশী কার্য্যকরী মনে করেছে। অস্ত্রের জোরে তারা রক্ষা না পেলেও পলায়ন-বৃত্তিতে তারা আত্মরক্ষা

করতে পেরেছে। নিশা-বংশের যোদ্ধারা প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল যে তারা কুরুবংশ ধ্বংস করবে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তারা প্রতিজ্ঞা-পূরণে সফল হয়নি।

তরুণী বলল—"তোমার কুকুরই এই খরগোসটি মেরেছে, কাজেই এটি তুমি নাও।"

"কিন্তু এটি ত কুরুবংশের মৃগয়া-অঞ্চলেই নিহত হয়েছে ?"

"হ্যাঁ, তা হয়েছে। কিন্তু আমি কুকুরের প্রভুর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।"

"অপেক্ষা করছিলে ?"

"হ্যাঁ, এই খরগোসটি তাকে দেবার জন্যে।"

কুরুবংশের নাম শুনেই ঋক্ষর মনে ঘৃণা জেগে উঠেছিল—কিন্তু তরুণীর নম্র আলাপে তার সে মনোভাব দূর হয়ে গেল। সৌহার্দ্যের মনোভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সে বলল—"তুমি আমাকে আমার কুকুরটি ও মৃত খরগোসটি ফিরিয়ে দিয়েছ এবং কুকুরটি আমার কাছে খুবই মূল্যবান।"—

"সত্যি এটি খুব ভাল শিকারী কুকুর।"

"এই জাতীয় কুকুরের মধ্যে সব থেকে ভাল কুকুর। আমার গলার স্বর শুনলেই ও আমার কাছে দৌড়ে আসে।"

"এটির নাম কি ?"

"শম্ভু।"

"তোমার নাম কি বন্ধু ?"

"ঋক্ষশ্রবা—রোচনার পুত্র।"

"রোচনা! আমার মায়ের নামও ছিল রোচনা। ঋক্ষ, তোমার যদি কোন তাড়া না থাকে তাহলে এসো এখানে কিছুক্ষণ বসি।"

ঋক্ষ তার ধনুক ও চামড়ার পোষাকটা বরফের উপর রেখে মেয়েটির পায়ের কাছে বসে জিজ্ঞাসা করল—"তোমার মা কি এখন জীবিত নেই ?"

"না, নিশা-বংশের সাথে যুদ্ধে মা নিহত হয়। মা আমাকে খুব ভালবাসত"—এই কথা বলতে বলতে তরুণীর চোখে জল ভরে এল।

ঋক্ষ হাত দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলল—"যুদ্ধটা কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!"

"সত্যি—কত প্রিয়জন এতে করে ধ্বংস হয়।"

"তা সত্ত্বেও যুদ্ধের শেষ নেই।"

"কি করে শেষ হবে—যত দিন না এক পক্ষ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়! এখন শুনছি নিশা-বংশের লোকেরা আবার আমাদের আক্রমণ করবে। আমি ভাবি—নিশা-বংশের লোকেদের মধ্যে তোমার মত কত যুবকই ত রয়েছে।"

"আবার কুরুবংশের মধ্যে তোমার মত কত তরুণীও রয়েছে।"

"তবুও আমরা পরস্পরকে হত্যা করি। কেন এমন হয় ঋক্ষ ?"

ঋক্ষর মনে পড়ল আর তিন দিন পরেই তার বংশের লোকেরা কুরুবংশকে আক্রমণ করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। সে জবাবে কিছু বলবার আগেই তরুণী আবার বলল—"কিন্তু এবারে আমরা আর যুদ্ধ করব না"—

"যুদ্ধ করবে না ? কুরুরা যুদ্ধ করবে না ?"

"না, আমাদের সংখ্যা এত কমে গেছে যে আমাদের জয়ের আর কোন আশা নেই।"

"তাহলে তোমরা কি করবে ?"

"ভল্‌গার তীর ছেড়ে আমরা বহু দূরে চলে যাব। এই প্রিয় নদী—মাতা ভল্‌গাকে আর আমরা দেখতে পাব না। তাই ত আমি এখানে আসি—আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এর ঘুমন্ত স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকি।"

"তাহলে আর তোমরা ভবিষ্যতে ভল্‌গাকে দেখতে পাবে না!"

"না—এখানে জলকেলিও করতে পাব না। ভল্‌গার এই গভীর জলে সাঁতার-কাটা কতই না আরামের ছিল!"—তরুণীর গণ্ড বেয়ে আবার অশ্রুধারা নামল।

ঋক্ষ দুঃখের স্বরে বলল—"সত্যি, তোমাদের পক্ষে এটা খুবই দুঃখের হবে—খুবই নির্ম্মম আঘাত হবে এটা তোমাদের প্রতি।"

"এই হ'ল বনবাসী জীবনের নিয়ম।"

"হ্যাঁ, জঙ্গলের নিয়ম এমনিই বটে।"

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়

আত্মরূপ শ্লাঘায় শাহজাদী জেব্‌উন্নিসা

("The song of Princess Zeb-Unnisa in praise of her own beauty" কবিতা অবলম্বনে)

সরোজিনী নাইডু

এ চারু আনন হইতে যখন অবগুণ্ঠন তুলি,—
মোর রূপানলে অন্তরতলে গোলাপ-বালা যে দহে ;
ম্লান হয় তার রূপের পশরা, বেদনায় ওঠে দুলি,—
অশ্রু-কাতর ক্রন্দন-ধ্বনি পরিমল হ'য়ে বহে।

বাতাসের বুকে ভাসে যবে মোর কুঞ্চিত কেশদল,—
চমরী-পুচ্ছ তুচ্ছ হয় যে তাহার রূপের পাশে।
পশু না হইলে, হইত তাহারা লজ্জায় চঞ্চল,
আহার নিদ্রা তেয়াগি ডাকিত আপন সর্ব্বনাশে।

কুঞ্জবনের মাঝে চ'লি যবে লীলাচঞ্চল পায় ;
লীলাঙ্কিত সে পদক্ষেপেরই সংগীত ঝংকার—
শুনি পিককুল ভুলি কলগান সহসা থামিয়া যায় ;
সে সুর-ধ্বনিতে, শত সাধনায় নারিবে বারংবার।

অনুবাদক—শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী।

অর্দ্ধেক রূপসী...

রূপ-চর্চ্চার রীতি-নীতি বদলায় যুগে যুগে···নূতন এসে করে পুরাতনের স্থান অধিকার। কিন্তু নারী—চিরন্তনী নারী—সে তার কেশসম্পদের নিরাপত্তা-রক্ষায় নিজের মধ্যে জেগে রয়েছে চিরদিন···কেশই যে তার অর্দ্ধেক রূপ। সে-রূপ সাধনায় এ-যুগের সর্ব্বগুণান্বিত আঙ্গিক **জবাকুসুম**।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

লেখক-মঞ্জুষা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

প্রভাবতী দেবী, সরস্বতী—মহিলা সাহিত্যিক। জন্ম—১৯০৫ খৃঃ ২৮এ সেপ্টেম্বর ২৪-পরগনার অন্তর্গত খাঁটুরা গোবরডাঙায়। পিতা—গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (দিনাজপুর কোর্টের আইন-ব্যবসায়ী)। বাল্যকাল হইতে দিনাজপুরে শিক্ষালাভ এবং সাহিত্য-সাধনা। বিভিন্ন সাময়িকপত্রের লেখিকা। সরস্বতী উপাধি লাভ, লীলাপদক পুরস্কার লাভ (১৩৫৩)। গ্রন্থ—অন্ধা (১৯২১), স্নেহের মূল্য, বিজিতা, সংসারপথের যাত্রী, জাগরণ, আয়ুষ্মতী, হৃদয়ের চাঁদ, বিসর্জন, দানের মর্যাদা, নূতন যুগ, বঙ্গপল্লী, পথের শেষে, প্রেমময়ী, তরুণের অভিযান, খেয়ার শেষে, মুক্তির আহ্বান, পারের আলো, প্রতিষ্ঠা, ব্রতচারিণী, দূরের আশায়, দায়ী, বিধবার কথা, ঘূর্ণিহাওয়া, মুক্তিস্নান, সহধর্মিণী, পথ ও পান্থ, মায়ের আশীর্বাদ, তীর্থযাত্রী, মাটির দেবতা, জাগৃহি, দুনিয়ার দান, শেষের দাবী, সুখের ঘর, পরদেশী, বোধন, শুভা, নিশীথের আলো, গৌরী, প্রতীক্ষায়, ঝড়ের পরে, জীবনসঙ্গিনী, অমলপ্রসুন (১৩০৭), স্বামি-স্ত্রী, সোনার সংসার, মুক্তির আলো, চলার পথে, পথের সম্বল, ধ্রুবতারা, গৃহলক্ষ্মী, উদয় অস্ত, মা, প্রভাতী (কাব্য), ব্যথিতা ধরিত্রী, যুগান্তর, ঢেউয়ের দোলা, মুখর অতীত, নীড় ও বিহঙ্গ, ধূলার ধরণী, পান্থপাদপ।

প্রভাবতী পাইন—মহিলা সাহিত্যিক। যুগ্ম-সম্পাদিকা—অর্ঘ্য (ত্রৈমাসিক, ১৩৩৪)।

প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—চিকিৎসক ও গ্রন্থকার। জন্ম—হুগলী জেলার অন্তর্গত মহানাদ গ্রামে। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক। গ্রন্থ—মহানাদ বা বাঙ্গালার গুপ্ত ইতিহাস, গো-জীবন বা হোমিওপ্যাথীর পশুচিকিৎসা, হোমিওপ্যাথীর ব্রহ্মাস্ত্র।

প্রভাসচন্দ্র সেন—গ্রন্থকার। শিক্ষা—বি. এ। গ্রন্থ—কায়স্থ-তত্ত্ববিচার।

প্রমথ চৌধুরী—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। ছদ্মনাম—বীরবল। জন্ম—১৮৬৮ খৃঃ যশোহর জেলায়। মৃত্যু—১৩৫৩ বঙ্গ (২রা সেপ্টেম্বর)। পিতা—দুর্গাদাস চৌধুরী (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট)। পৈতৃক নিবাস—পাবনা জেলায় হরিপুর। শিক্ষা—কৃষ্ণনগর কলেজ, এন্ট্রান্স (হেয়ার স্কুল), এফ-এ (সেণ্ট জেভিয়ার), বি-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ), এম-এ (ঐ, ১৮৯৪), বার-এট-ল। কর্ম—আইন ব্যবসায় (১৮৯৭), জগত্তারিণী পদক লাভ (১৯৩৮)। গ্রন্থ—বীরবলের হালখাতা, চার ইয়ারী কথা, আত্মকথা, সনেট পঞ্চাশৎ, নীললোহিতের আদি কথা, ঘোষালের ত্রিকথা, তেল, নুন, লকড়ি, হিন্দু-সঙ্গীত (ইন্দিরা দেবী সহ, ১৩৫২)। সম্পাদক—সবুজপত্র (১৩২১-৩৪), বিশ্বভারতী।

প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। এম-এ। কর্ম—সরকারী শিক্ষাবিভাগ, বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর। গ্রন্থ—নবীনা জননী (১২৯৮)।

প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আলোকের পথে, চাঁদিনী, মিলনশঙ্খ, হিন্দু-মুসলমান, বাঙ্গালী বীর, নুরজাহান, বাঙ্গালীর বৌ, রাজার ছেলে, মাতাল, দোকানদার, বাঙ্গালার মা, বাঙ্গালার রাণী, দেবতার দান।

প্রমথনাথ দাস—চিকিৎসক। শিক্ষা—এম-বি। সম্পাদক—প্রসূতি-শিক্ষা (মাসিক, ১২৯২)। গ্রন্থ—রোগনিদান ও চিকিৎসা (১৮৯৫)।

প্রমথনাথ তর্কভূষণ—বিখ্যাত পণ্ডিত। জন্ম—১২৭১ বঙ্গ পৌষ মাসে ২৪-পরগনার অন্তর্গত ভট্টপল্লীতে। মৃত্যু—১৩৫১ বঙ্গ ৮ই জ্যৈষ্ঠ কাশীতে। পিতা—তারাচরণ তর্করত্ন (কাশীরাজের সভাপণ্ডিত)। মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ। ডি-লিট্ (হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়—১৩৪৮)। অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ, সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ (১৯২২), পরে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগের অধ্যক্ষ। গ্রন্থ—পূর্বমীমাংসার্থ সংগ্রহ (১৮৯৯), রাসরসোদয় (১৮৯৯), বিজয়প্রকাশ (১৯৪৮ সং) ব্যাপ্তিপঞ্চক মাথুরীরহস্যবিবৃতি (১৯৫৪ সং), সনাতন হিন্দু, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, চণ্ডী, বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ, উপদেশসাহস্রী, সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসার-সংগ্রহ, সাংখ্যসূত্রম্ (১৯১৩), মায়াবাদ (১৩৫০)। সম্পাদক—বঙ্গসাহিত্য (১৩২১), সাহিত্য-সংহিতা (১৩২৪—২৮)।

প্রমথনাথ দাস—চিকিৎসক। শিক্ষা—এম, বি। চিকিৎসা-ব্যবসায়। গ্রন্থ—রোগনিদান ও চিকিৎসা, ১ম ভাগ (১৮৯৫)।

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। জন্ম—মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরে। সম্পাদক—সুরভি (১৩১১)।

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—অর্থনীতিবিদ্ ও শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৮৯৭ খৃঃ নভেম্বর। এম-এ, ডি-এস-সি, বার-এ্যাট-ল। অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২০-৩৫)। গ্রন্থ—A Study of Indian Economics.

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—মাধুরী (১৩২৪-২৭)।

প্রমথনাথ বসু—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৫৫ খৃঃ ১২ই মে ২৪-পরগনার অন্তর্গত গৈপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৩৪১ বঙ্গ ১৫ই বৈশাখ। গ্রন্থ—স্বামী বিবেকানন্দ, ৪ খণ্ড (১৩২৯—৩৩)।

প্রমথনাথ বসু—গ্রন্থকার। নিবাস—রাঁচী। গ্রন্থ—Epochs of Civilisation, A History of Hindu Civilisation.

প্রমথনাথ বিশী—সমালোচক ও গ্রন্থকার। ছদ্মনাম—প্র. না. বি এবং কমলাকান্ত। জন্ম—১৯০২ খৃঃ রাজশাহী জেলায় জোয়াড়ী গ্রামে। শিক্ষা—শান্তিনিকেতন। অধ্যাপক শান্তিনিকেতন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রিপন কলেজ; বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় বিভাগে। গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত। গ্রন্থ—রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ২ খণ্ড, রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহ, কোপবতী, গালি ও গল্প, গল্পের মত, যুক্তবেণী, অকুন্তলা, মৌচাকে ঢিল, বিচিত্র উপল (প্র), চিত্র চরিত্র, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন (১৩৫১), অশ্বত্থের অভিশাপ, চলনবিল, জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার, শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব, শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব, গভর্ণমেণ্ট ইন্সপেক্টর, ডিনামাইট, পরিহাসবিজল্পিতম্, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্র-কাব্যনির্ঝর, ডাকিনী,

বাঙ্গালীর জীবনসন্ধ্যা, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য। সম্পাদক—শান্তিনিকেতন (১৩৩১)।

প্রমথনাথ মল্লিক—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৭৬ খৃঃ ১ই এপ্রিল কলিকাতার প্রসিদ্ধ মল্লিক-বংশে। মৃত্যু—১৩৫০। পিতা—যদুনাথ মল্লিক। ইনি বাল্যকালাবধি সাহিত্যানুরাগী। রায়বাহাদুর (১৯২২ খৃঃ) ও ভারতবাণীভূষণ উপাধি (সং ১৯৬৭) লাভ। গ্রন্থ—সচিত্র কলিকাতার কথা, ২ খণ্ড (১৩৩৮), মহাভারত (১৩৪২), চণ্ডী (১৩১৭), অবকাশ-লহরী (১৯০১), দয়া, দুটি কথা (১৮১৮), The Mahabharat, Origin of Caste, The History of Vaisyas of Bengal (১৯৩৪)।

প্রমথনাথ ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রা।

প্রমথনাথ মিত্র—গ্রন্থকার। জন্ম—হুগলী জেলার চন্দননগরে। চন্দননগরের পুস্তকাগারের সম্পাদক। গ্রন্থ—মোহম্মদ মুহসীন (জীবনী, ১৮৮০)।

প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বুকের বোঝা (১৩২২), পদাঙ্ক-কামনা (১৩২২)।

প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। এম, এ। গ্রন্থ—ইতিহাস ও অভিব্যক্তি, India & Her Cult & Education, Approaches to Truth (১৯১৪)।

প্রমথনাথ রায়-চৌধুরী—কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৭১ বঙ্গ ফাল্গুন ময়মনসিংহের সন্তোষের জমীদার-বংশে। মৃত্যু—১৯৪১ খৃঃ। পিতা—দ্বারকানাথ রায়-চৌধুরী। মাতা—বিন্ধ্যবাসিনী। বাল্যকাল হইতেই ইনি কবিতা-রচনায় নিপুণ। গ্রন্থ—(কাব্য) গৈরিক, গীতিকা, গৌরাঙ্গ, কাব্যগ্রন্থ ৩ খণ্ড, পাথেয়, পাষাণ, গান, চিত্রচরিত্র, আখ্যায়িকা, তাজ, নীলা, গৌরব-গীতিকা; নাটক—চিত্তোরোদ্ধার, জয়-পরাজয়, ভাগ্যচক্র, দিল্লী অধিকার, হাম্বির (১৩২২), আক্কেল সেলামি (প্রহসন, ১৩২২), আরতি (১৯০১), দেশভক্তি, স্বপন, দীপালি (১৯০৮)। গল্প—গাথা, কথা বনাম কাজ, পদ্মা, পাথার, যমুনা।

প্রমথনাথ শর্মা—[ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য]।

প্রমথনাথ সরকার—ঐতিহাসিক। সম্পাদক—ঐতিহাসিক (১৩২৮)।

প্রমথনাথ সান্যাল—সাহিত্যিক। জন্ম—হুগলী জেলার চুঁচুড়ায়। বি, এ, এবং শাস্ত্রী উপাধিলাভ। সম্পাদক—পল্লীশ্রী, ব্রাহ্মণসমাজ, সাহানা (সাপ্তাহিক), সাহিত্য-সংবাদ (১৩১৮-৩৬)।

প্রমদাচরণ সেন—শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৫১ খৃঃ ১৮ই মে কলিকাতা ইণ্টালী অঞ্চলে। মৃত্যু—১৮৮৫ খৃঃ ২১এ জুন। পৈত্রিক বাসস্থান সেনহাটী। শিক্ষা—প্রবেশিকা (হেয়ার স্কুল, ১৮৭৬), সেণ্ট জেভিয়ার কলেজ হইতে গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান (১৮৭১)। ব্রাহ্মধর্মগ্রহণ। কর্ম—শিক্ষকতা, নকিপুর স্কুল, কলিকাতা সিটি স্কুল। গ্রন্থ—মহাজীবনের আখ্যায়িকাবলী, চিন্তাশতক, সাথী। প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক—সখা (শিশুপাঠ্য মাসিক, ১৮৮৩-১৮৮৫)।

প্রমীলা (বসু) নাগ—মহিলা কবি। জন্ম—১৮৭১ খৃঃ অক্টোবর, কৃষ্ণনগরে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৩০৩ বঙ্গ ২৭এ কার্ত্তিক। স্বামী—গঙ্গাকান্ত নাগ (ঢাকার বারুদী জমীদার)। শৈশবে মাতামহ রামলোচন ঘোষের (সবজজ, কৃষ্ণনগর) নিকট শিক্ষা। ইনি বিভিন্ন তাৎকালিক সাময়িক পত্রের লেখিকা। কাব্যগ্রন্থ—প্রমীলা (১২৯৭), তটিনী (১৮৯২)।

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়—শিল্পী ও লেখক। শিল্পকার্যে বহু দেশ ভ্রমণ। মানস-সরোবর দর্শন (১৯১৮)। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। গ্রন্থ—হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর (১৯৪৮), প্রাণকুমার, তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ, ২ খণ্ড, হরি যাকে রাখেন।

প্রমোদকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—একতা (১৩২৯-১৩৩২)।

প্রয়াগ দত্ত—চিকিৎসক ও আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ্‌। গ্রন্থ—বিজ্ঞান-করী (টীকা)।

প্রশস্তপাদ—দার্শনিক পণ্ডিত। ৪-৫ শতাব্দী। গ্রন্থ—পদার্থ ধর্মসংগ্রহ (বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্য), বৈশেষিকদর্শনম্‌।

প্রশান্ত মহলানবিশ—সংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌। জন্ম—১৮৯৩ খৃঃ ২৯এ জুন কলিকাতা। শিক্ষা—ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল, বি, এস্‌ সি (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৯১২), এম, এ, ট্রাইপস্‌ (১৯১৯ ও ১৯২৪ কেম্ব্রিজ)। অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ (১৯১৫), অধ্যক্ষ (ঐ, ১৯৪৫-৪৮)। মেটিওরলজিষ্ট (১৯২২-২৬), বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌ প্রধান (১৯৪১-৪৫), ভারত-সরকারের সংখ্যাতাত্ত্বিক পরামর্শদাতা। সম্পাদক—সংখ্যা (সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কীয় পত্রিকা, ১৯৩০), বিশ্বভারতী (১৯২১-৩১)।

প্রসন্নকুমার কর-চৌধুরী—সাহিত্যিক। সম্পাদক—তত্ত্বকল্পলতা (মাসিক, ১২৮৮)।

প্রসন্নকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শোক (বর্দ্ধমান, ১৯০১), পরলোক (১৯০১)।

প্রসন্নকুমার গুহ—সাহিত্যিক। সম্পাদক—নবীন (ঢাকা, মাসিক, ১২৮৯)।

প্রসন্নকুমার ঘোষ—সাহিত্যিক ও কবি। জন্ম—১৮৫০ খৃঃ মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরে। মৃত্যু—১৯২৭ খৃঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারী। পিতা—মহেশচন্দ্র ঘোষ। গ্রন্থ—কুসুমকণিকা, বিদ্যা-দর্শন, মাইকেলের জীবনী, মেঘনাদবধ-কাব্যের টীকা। সম্পাদক—সুরভী (মাসিক, ১৩১৮)।

প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়—পণ্ডিত ও সঙ্গীতজ্ঞ। জন্ম—১২৫৫ বঙ্গ ১৭ই মাঘ বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্গত রাজবাড়ীখলির নিকট বথেয়ক নামক গ্রামে। মৃত্যু ১৩০৬ বঙ্গ ১০ই জ্যৈষ্ঠ। পিতা—রামজয় চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষকতা, ঢাকা জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে। ইনি বহু সঙ্গীত রচনা ও যাত্রা ও কবির দলের গান বাঁধিতেন। গ্রন্থ—সঙ্গীতময়, ২ খণ্ড।

প্রসন্নকুমার দানিয়াড়ী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রতিবাদ-গ্রন্থ (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ বিষয়ক ২য় গ্রন্থের প্রতিবাদ।)

প্রসন্নকুমার দে, লালা—সাহিত্যিক। সম্পাদক—রসরাজ (মাসিক, ১৮৯১), শ্রীহট্টমিহির (সাপ্তাহিক, ১৮৯৭)।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮০৩ খৃঃ ১লা ডিসেম্বর জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বংশে। মৃত্যু—১৮৬৮ খৃঃ। পিতা—

গোপীমোহন ঠাকুর। কর্ম—সরকারী উকীল (অবসর গ্রহণ—১৮৫০)। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ক্লার্ক অ্যাসিস্ট্যাণ্ট, বড়লাটের শাসন-পরিষদের প্রথম ভারতীয় সভ্য, সি, আই, ই উপাধি লাভ (১৮৬৬), অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন, ল্যাণ্ডহোল্ডারস্ সোসাইটী (১৮৩৮)। গ্রন্থ—সংস্কৃত দায়ভাগ (সংকলন), জমিন্দারী কার্যের নিয়মপত্র (১৮৬৮), An appeal to my countrymen (পুস্তিকা)। সম্পাদিত গ্রন্থ—বিবাদ-চিন্তামণি। সম্পাদক—অনুবাদিকা (১২৩৮ বঙ্গ), Reformer (১৮৩১)।

প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন—দার্শনিক ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দেবীমাহাত্ম্য, কৃষ্ণজীবনী (১২৯৫), প্রবন্ধরত্ন, শ্রীগৌরাঙ্গচরিত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বেদবিষয়ে দার্শনিকদিগের মত, ভাবসিন্ধু।

প্রসন্নকুমার মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বালক-চিকিৎসা (১৮৭০), Treaties on the Disease of Children (১৮৬২)।

প্রসন্নচন্দ্র গুহ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রামপালের বিবরণ (ঢাকা, ১৮৬১), কাব্যতরঙ্গিণী (১৮৯৭)।

প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী—পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আর্যজীবন, শ্রীশ্রীচণ্ডীরহস্য, বৃহৎ তন্ত্রসার, যোগাম্বুধি, কাতন্ত্রধাতুবৃত্তি, সাধন-প্রদীপ, শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী (সানুবাদ)। সম্পাদক—পল্লীবাসী (পাক্ষিক ; ১৩০৪)।

প্রসন্নকুমার সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সম্ভাবকৌমুদী (১৮৭৪)।

প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্তী—কবি। গ্রন্থ—সরল কবিতা (১৮৭৫) পদ্যমঞ্জরী (১৮৬৮), সাহিত্য-প্রবেশ (১৮৬১), শিশু-প্রবেশ (১৮৭৫), হিতাবলী (১৮৬১), কাব্যতরঙ্গিণী (১৮৯৭), মৌখিক অঙ্কের হিসাব (১৮৬১)।

প্রসন্নচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। নিবাস—চুঁচুড়া (হুগলী)। গ্রন্থ—হিন্দুবিলাস (১৮৭৫)

প্রসন্নচন্দ্র সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কৃষিকার্যের মত (১৮৬৭)।

প্রসন্নচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি। কাব্যগ্রন্থ—দময়ন্তী বিলাপ কাব্য।

প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী—ব্যবহারজীবী ও সাহিত্যিক। জন্ম—১২৬১ বঙ্গ শ্রাবণ পাবনা জেলায়। মৃত্যু—১৩৪০ বঙ্গ আষাঢ়। শিক্ষা—বি, এ (১৮৭৭), আইন পরীক্ষা (১৮৭৯)। আইন ব্যবসায়, পাবনা, সরকারী উকীল (পাবনা, ১৮১৫—১১২৮) গ্রন্থ—গায়ত্রীর শঙ্করভাষ্য ও সায়নভাষ্য (টীকা), Confessions of Evidence of Accomplices, Prosecutions in false cases.

প্রসন্নময়ী দেবী—মহিলা কবি। জন্ম—১৮৫৭ খৃঃ সেপ্টেম্বর পাবনার হরিপুর গ্রামের জমীদারবংশে। মৃত্যু—১৯৩১ খৃঃ ২৫এ নভেম্বর। পিতা—দুর্গাদাস চৌধুরী (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট)। স্বামী—পাবনার গুইগাছা-নিবাসী কৃষ্ণকমল বাগ্‌চী। বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাচর্চা ও কবিতা রচনা করেন। মাত্র দশ বৎসর বয়সে বিবাহিতা ও বিবাহের দুই বৎসরের মধ্যেই স্বামী উন্মাদ-রোগাক্রান্ত হইলে ইনি পিত্রালয়ে আসিতে বাধ্য হন এবং তদবধি ইনি সাহিত্য-সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন। ইঁহার কাব্যে ছন্দ ও ভাষার বৈচিত্র্য বিশেষ ভাবে মনকে আকৃষ্ট করে। ইনি বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী, সুসাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর অগ্রজা। গ্রন্থ—আধ আধভাষিণী (১৮৭০), বনলতা (কাব্য, ১৮৮০), অশোকা (উপ, ১৮৯০), নীহারিকা ১ম (১৮৮৪), ২য় (১৮৮৯), আর্যাবর্ত (ভ্রমণ, ১৮৮৯) পূর্বস্মৃতি (১৮৭৫) যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতবর্ষে শুভাগমন (১২৭৫)। তারা চরিত (১৯১৭) পূর্বকথা (ঐ)।

প্রসাদ দাস—পদকর্তা। পিতা—করুণাময় মজুমদার (বিক্রমপুর-নিবাসী)। শ্রীনিবাস-কর্তৃক 'কবিপতি' উপাধিলাভ। গ্রন্থ—পদচিন্তামণিমালা।

প্রসাদদাস গঙ্গোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—জননী (মাসিক, ১৩০৫, চুঁচুড়া মাধবীতলা)

প্রসাদদাস গোস্বামী—দার্শনিক পণ্ডিত। গ্রন্থ—আত্মবোধ, দীর্ঘজীবন কিসে হয়, পাতঞ্জল যোগসূত্র।

প্রসাদ ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—তারা তিন জন, বাস্তবের দু' পৃষ্ঠা, যে ফুল না ফুটিতে, পৃথিবীর ছন্দ, জনতার ইঙ্গিত, মানময়ী বয়েজ স্কুল।

প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী—গ্রন্থকার। নিবাস—চন্দননগর। গ্রন্থ—The Necessity of Learning French by the Educated Native India.

প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার—পণ্ডিত। জন্ম—বসিরহাট সবডিভিসনের পুঁড়া গ্রামে। পিতা—কন্দর্পসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য। অধ্যাপনা কার্যে বরাহনগরে বাস। গ্রন্থ—গঙ্গাস্তোত্র (১৮৪১)।

প্রাণকৃষ্ণ বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ইংরাজগুণবর্ণন (শ্রীরামপুর, ১৮৭১)।

প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর—পণ্ডিত। জন্ম—২৪-পরগনার হরিনাভী গ্রামে। মৃত্যু—১৮৫৫ খৃঃ ৭ই মে। পিতা—রামধন শিরোমণি। কর্ম—অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ (১৮৪৬)। ইনি সুপ্রসিদ্ধ নাট্য-কার রামনারায়ণ তর্করত্নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। গ্রন্থ—কুলরহস্য (১৮৮৪), শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাশতকম্ (১৮৪৫), ধর্মসভাবিলাস (চম্পূ-কাব্য, ১৮৫০), শ্রীশিবশতকস্তোত্ররত্ন (১৮৫৪), শরীরোৎপত্তিক্রম (মৃত্যুর পরে প্রকাশিকা—১৮৬০)। সম্পাদক—সমাচার-চন্দ্রিকা (সাপ্তাহিক)।

প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস—গ্রন্থকার। জন্ম—কলিকাতার উপকণ্ঠে খড়দহে। মৃত্যু—১৮৩৬ খৃঃ। পিতা—রামহরি বিশ্বাস। গ্রন্থ—রত্নাবলী (চিকিৎসা-সংগ্রহ), প্রাণকৃষ্ণৌষধাবলী (১৭৮৭ শক)।

প্রাণচন্দ্র বাবু—মঙ্গলকাব্য রচয়িতা। নামান্তর—পরাণচন্দ্র বাবু। ইনি বর্ধমানাধিপতি তেজচন্দ্র বাহাদুরের দেওয়ান। ইঁহার অষ্টম পুত্রকে মহারাজ তেজচন্দ্র পোষ্যপুত্র লইয়াছিলেন। গ্রন্থ—হরিহর-মঙ্গল সঙ্গীত (১৮৩১ খৃঃ)।

প্রাণতোষ ঘটক—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৩৩০ বঙ্গ ১০ই জ্যৈষ্ঠ চন্দননগরের বিখ্যাত ঘটক-পরিবারে। পিতা—প্রসিদ্ধ শিল্পপতি শ্রীভবতোষ ঘটক। শিক্ষা—প্রবেশিকা (টাউন স্কুল, ১১৩১), আই, এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১১৪১), বি-এ (ঐ, ১১৪৩)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় এম, এ ও আইন পাঠকালে বসুমতী পত্রিকায় যোগদান এবং দৈনিক ও মাসিক বসুমতীর সাহিত্যবিভাগের পরিচালনার ভারগ্রহণ। বিবাহ—

বসুমতীর স্বত্বাধিকারী স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চতুর্থী কন্যা শ্রীমতী আরতি দেবীর সহিত (১১৪৫)। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের গল্প ও প্রবন্ধ লেখক হিসাবে খ্যাতিলাভ। চিত্রশিল্পেও ইতিমধ্যে খ্যাতি অর্জন। গ্রন্থ—পঙ্গপাল (গল্প)। সম্পাদক—নববাণী (সাপ্তাহিক, ১৩৫৪-৫৫), মাসিক বসুমতী রজত-জয়ন্তী সংখ্যা (১৩৫৩), শারদীয়া দৈনিক বসুমতী (১৩৫৩-১৩৫৬), সাহিত্য-গ্রন্থিকা-সিরিজ (১১৪৫), মাসিক বসুমতী (১১৫১)।

প্রাণনাথ—আয়ুর্বেদবিদ্। গ্রন্থ—রসপ্রদীপ।

প্রাণনাথ দত্ত—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৪৭ বঙ্গ পৌষ মাসে কলিকাতা নিমতলা দত্তবাড়ী। মৃত্যু—১২১৫ বঙ্গ ৩১এ ভাদ্র কলিকাতা টালা। পিতা—লোকনাথ দত্ত। শিক্ষা—ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, প্রবেশিকা (হিন্দু স্কুল), গৃহে সংস্কৃত ও পার্সী। ইঁহার চিত্রবিদ্যার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। বিভিন্ন সংপ্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত। সুচারু যন্ত্র (মুদ্রাযন্ত্র) স্থাপন। গ্রন্থ—সংযুক্তা-স্বয়ম্বর নাটক (১২৭৪), প্রাণেশ্বর নাটক (১২৭০), হাতেমতাই (অনুবাদ), শিল্পশিক্ষা (অপ্র)। সম্পাদক—বিবিধার্থ-সংগ্রহ, বসন্তক (মাসিক), রচনা-রত্নাবলী (মাসিক, ১২৬৪), রহস্য-সন্দর্ভ (মাসিক, ১৮৬৩)।

প্রাণনাথ বৈদ্য—আয়ুর্বেদবিদ্। গ্রন্থ—ভৈষজ্যসারামৃতসংহিতা, রসপ্রদীপ, বৈদ্যদর্পণ।

প্রাণনাথ সিদ্ধ—আয়ুর্বেদবিদ্। গ্রন্থ—রসদীপ।

প্রাণনাথ পণ্ডিত—জ্যোতির্বিদ্। ১৬৭৮ খৃঃ বর্তমান। গ্রন্থ—দৈবজ্ঞভূষণ, মেঘদূত (১৮৭২)।

প্রাণানন্দ কবিভূষণ—সাহিত্যিক। সম্পাদক—সচিত্র বিজ্ঞান-দর্পণ (মাসিক, ১২৮১)।

প্রাণারাম চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কালিকামঙ্গল।

প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নীলাম্বর (১৩২২)।

প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ইষ্টার বিদ্রোহ ও গরিলা যুদ্ধ, লেনিন ও সোভিয়েট।

প্রিয়নাথ গুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভূগোলবোধ (১৮৭১), সম্পাদক—আর্যোদয় (বহরমপুর, মাসিক, ১২৭৮)।

প্রিয়দর্শন হালদার—কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—যশোহরের কপোতাক্ষ নদের তীরবর্তী ধান্দিয়া গ্রামে। গ্রন্থ—শিশুরঞ্জন ভারত ইতিহাস, বিদ্যাসাগর জননী, ভগবতী দেবীর জননী, নিভৃত বিলাপ কাব্য (১৩১৩), শিশুরঞ্জন মহাভারত। সম্পাদক—আর্যভূমি।

প্রিয়নাথ চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৭০ বঙ্গ ২৪-পরগনার গোকর্ণী গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৫ বঙ্গ আশ্বিন মাসে। পিতা—ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তী। মাতা—বরদায়িনী। গ্রন্থ—মদ খাও নেশা ছুটিবে না, আনন্দতুফান (১২৯৩), জীবনপরীক্ষা, আহ্নিকক্রিয়া, কুমাররঞ্জন, দুঃখীর ইতিহাস বা জীবন্ত পিতৃদায়, জীবন-কুমার।

প্রিয়নাথ দাস—সাহিত্যিক। সম্পাদক—দর্শক (সচিত্র)।

প্রিয়নাথ বসু—সাহিত্যিক। সম্পাদক—শিক্ষা (মাসিক, ১২১৫)।

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা সবডিভিসনে। কর্ম—সরকারী পুলিশ বিভাগে। গ্রন্থ—অভয়া (১৩০২), আদরিণী (১৮৮৭), পারসীক গল্প (১৩০৪), ডিটেকটিভ পুলিশ ৬ খণ্ড (১৩০০-১৩০৫), ঠগিকাহিনী, বুয়ার যুদ্ধের ইতিহাস, বিলাতী উপন্যাস, একাদশ রহস্য, মাসিনি, পাহাড়ে মেয়ে, পঙ্কর্ণিকা, পাপের ভারে, রাজা সাহেব, তাত্তিয়া ভিল, বিলাপপদ্য (ক, ১২৮৩)। সম্পাদক—দারোগার দপ্তর (মাসিক, ১২৯২-১৩১৪)।

প্রিয়নাথ সেন—রসায়নবিদ্। গ্রন্থ—রসায়ন পদার্থবিজ্ঞান (১৮৭২), রসায়নসার-সংগ্রহ (১৮৭৩)।

প্রিয়নাথ সেন—ব্যবহারজীবী ও আইনজ্ঞ। জন্ম—১৮৭৪ বঙ্গ ফরিদপুরের জপসা গ্রামে। মৃত্যু—১১০১ খৃঃ। পিতা—দীননাথ সেন। আইন-ব্যবসায়, কলিকাতা হাইকোর্ট, ডি, এল। ঠাকুর আইন অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়। সম্পাদক—Law Journal। গ্রন্থ—প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি।

প্রিয়মাধব বসু—সাহিত্যিক। সম্পাদক—বিদ্যাদর্পণ (মাসিক ১৮৫৩)।

প্রিয়ম্বদা দেবী—মহিলা কবি। জন্ম—১৮৭১ খৃঃ। পাবনা জেলার অন্তর্গত গুণগাইছা গ্রামে। মৃত্যু—১৩৪১ বঙ্গ ফাল্গুন (১১৩৫)। পিতা—কৃষ্ণকমল বাগচী। মাতা—প্রসন্নময়ী দেবী (মহিলা কবি) স্বামী—তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (মধ্যপ্রদেশের ব্যবহারজীবী)। শিক্ষা—বি, এ (বীটন কলেজ)। দীর্ঘকাল নারী শিক্ষা প্রচারিকা ও ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলের কর্মাধ্যক্ষা। কাব্যগ্রন্থ—রেখা, পত্রপুষ্প, রেণু (১১০০), অংশু। গ্রন্থ—কথা-উপকথা, অনাথা, পঞ্চুলাল, ভক্তজীবনী।

প্রিয়রঞ্জন সেন—শিক্ষাব্রতী। এম, এ। অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থ—আরোগ্য দিগ্‌দর্শন (মহাত্মা গান্ধীভাষ্য অনুবাদ, ১৩২১), বাংলা সাহিত্যের খসড়া, বিবেকানন্দ-চরিত।

প্রীতিবিমল সূরি—জৈন পণ্ডিত। গ্রন্থ—চম্পক শ্রেষ্ঠ (১৫১৭ খৃঃ)।

প্রেমচাঁদ—হিন্দী সাহিত্যিক। নিবাস—কাশী। মৃত্যু—১৩৪৩ বঙ্গ আশ্বিন। প্রকৃত নাম—ধনপৎ রায়। সম্পাদক—হংস।

প্রেমচাঁদ কবিরত্ন—গ্রন্থকার। জন্ম—২৪-পরগনার কাঁচড়া-পাড়া গ্রামে। গ্রন্থ—জ্ঞানার্ণব (সংকলন)।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ—পণ্ডিত ও টীকাকার। জন্ম—১২১২ বঙ্গ বৈশাখ মাসে বর্ধমান জেলায় রায়না থানার শাকনাড়া গ্রামে। মৃত্যু—১২৭৩ বঙ্গ বৈশাখ কাশীতে। পিতা—রামনারায়ণ ভট্টাচার্য। শৈশব হইতে কবিতা ও সঙ্গীত রচনা। শিক্ষা—সংস্কৃত কলেজ (১৮২৬)। অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ (১৮৩১—১৮৬৪), তর্কবাগীশ উপাধিলাভ। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। টীকা-গ্রন্থ—রঘুবংশের টীকা শেষাংশ, পূর্বনৈষধ, রাঘব-পাণ্ডবীয়, কুমারসম্ভব, চাটুপুষ্পাঞ্জলি, মুকুন্দমুক্তাবলী, সপ্তশতী, অনর্ঘরাঘব, রামচরিত, কাব্যাদর্শ ; কাব্য—পুরুষোত্তমরাজাবলী ; নানার্থসংগ্রহ (অভিধান)।

প্রেমচাঁদ রায়—সাহিত্যিক। জন্ম—২৪-পরগনার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া গ্রামে। সম্পাদক—সম্বাদসুধাকর (১৮৩১)।

প্রেমদাস—বৈষ্ণব কবি। পূর্বনাম—পুরুষোত্তম মিশ্র সিদ্ধান্ত-বাগীশ। জন্ম—১৭শ শতকে নবদ্বীপের নিকটবর্তী ফুলিয়া গ্রামে। পিতা—গঙ্গাদাস মিশ্র। গ্রন্থ—চৈতন্যচন্দ্রোদয় (ব্যাখ্যা সমেত), বংশীশিক্ষা (১৭১৬ খৃঃ)।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। ছদ্মনাম—মহাস্থবির। জন্ম—১৮৯০ খৃঃ ১লা জানুয়ারি ফরিদপুরে। পিতা—মহেশচন্দ্র আতর্থী। নিবাস—কলিকাতা। শিক্ষা—ব্রাহ্মবালিকা বিত্তালয়, ব্রাহ্মবয়েজ বোর্ডিং এবং ডে স্কুল, কেশব একাডেমী, ডাফ কলেজ, সিটি কলেজ। পাঠ্যাবস্থায় ১৩ বৎসর বয়সে গৃহ হইতে পলায়ন ও সারা ভারত ভ্রমণ। কর্ম্ম—২১ বৎসর বয়সে কার মহলানবীশ এণ্ড কোম্পানীতে, হিন্দুস্থান ইনসিউরান্সে। বাল্যকাল হইতেই সাহিত্য-রচনা। ভারতবর্ষ, সঙ্কল্প, ভারতী প্রভৃতি মাসিক-পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে কর্ম। বিভিন্ন ব্যবসায়, বর্তমানে সিনেমাজগতের সহিত সংশ্লিষ্ট। গ্রন্থ—বাজীকর (গল্প), ঝড়ের পাখী, চাষার মেয়ে, অচলপথের যাত্রী, দুই রাত্রি, আনারকলি, ডানপিটে, প্রবাসী, মহাস্থবির জাতক ৩ খণ্ড, প্রভাত-সঙ্গীত, অরুণা, ভারতের পিতামহ, কল্পনা দেবী। সম্পাদক—নাচঘর (সাপ্তাহিক, ১৩৩২), যাদুঘর (১৩৩৪—৩৭), বেতার জগৎ।

প্রেমানন্দ দাস—কবি। গ্রন্থ—চন্দ্রচিন্তামণি।

প্রেমানন্দ ভারতী—হিন্দুধর্ম প্রচারক। জন্ম—১৮৫৭ খৃঃ। মৃত্যু—১৯১৪ খৃঃ। পূর্বনাম—সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকা গমন। গ্রন্থ—প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ (ইং)। সম্পাদক—Light of India (আমেরিকা)।

প্রেমানন্দ স্বামী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কর্মের পথে (১৩৩২), পত্রাবলী (১৩২১)।

প্রেমেন্দ্র মিত্র—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৩১১ বঙ্গ ভাদ্র কাশীতে। শিক্ষা—কাশী, মির্জাপুর, ঢাকা ও কলিকাতা। কর্ম—শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা ও ব্যবসায়। বর্তমানে সিনেমা-জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। গ্রন্থ—পুতুল ও প্রতিমা, প্রথমা, পঞ্চশর, বেনামী বন্দর, পাঁক, পিঁপড়ে পুরাণ, বাঁকালেখা, সম্রাট্, ফেরারী ফৌজ, কুয়াসা, ভাবীকাল, মৃত্তিকা, মিছিল, উপনয়ন, নিশীথ নগরী, আগামীকাল, অরণ্যপথ, প্রেম যুগে-যুগে, নতুন খবর, অভিযোগ। সম্পাদক—কালিকলম (১৩৩৩), সংবাদ, নবশক্তি, রংমশাল। সহ সম্পাদক—বাংলার কথা, বঙ্গবাণী।

প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১৩০৪ বঙ্গ ৩রা মাঘ সাঁওতাল পরগনার (পূর্ব বাংলার) অন্তর্গত দুমকা শহরে (মাতুলালয়ে)। পিতা—ঔপন্যাসিক ও অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পৈতৃক নিবাস—হুগলী জেলার জীরাট গ্রামে। ইনি বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যানুরাগী। ছোট গল্পলেখক (প্রথম গল্প, ১৩২১)। গ্রন্থ—সুরের রেশ (গল্পসংগ্রহ, ১৩৩৬), ভাঙ্গা-গড়া (উপন্যাস, ১৩৪০)।

ফকিরউল্লা—মুসলমান সঙ্গীত শাস্ত্রবিদ্। ঔরঙ্গজেব কর্তৃক নিযুক্ত কাশ্মীরের সুবাদার। সংস্কৃত ও পারসীক ভাষায় অভিজ্ঞ। গ্রন্থ—রাগদর্পণ বা রঙ্গদর্পণ (হিন্দুসঙ্গীত গ্রন্থ—১৬৬৫ খৃঃ ইহা রাজা মানসিংহের জন্য লিখিত)।

ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৮১ বঙ্গ ভাদ্র, (১৮৭৪ খৃঃ) হাওড়া জেলায় মাকড়দহ গ্রামে। মৃত্যু—১৩৩১ বঙ্গ ভাদ্র দেওঘরে। পিতা—মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষা—কলিকাতা। কর্ম—জি. এফ. কেলনার এণ্ড কোং-এর চাকুরী। বাল্যকাল হইতেই গল্প-রচনায় প্রতিষ্ঠা লাভ। গ্রন্থ—সুধা (১৩১১), তপস্যার ফল, দামোদরের মেয়ে, অনুভূতি, স্মৃতিরেখা, ঘরের কথা (১৩১৭), পথের কথা, পল্লীকথা, নবান্ন, ব্যর্থতা। সম্পাদক—মানসী (মাসিক, ১৩১৫—২০), পুষ্পপাত্র (মাসিক, ১৩৩৪)। সহ-সম্পাদক—পঞ্চপুষ্প (১৩৩৬—৩১)।

ফকিরচন্দ্র দত্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, দাবাখেলা।

ফকিরচাঁদ বসু—সাহিত্যিক। কর্ম—সহকারী সার্জেন। সম্পাদক—সমাজ-রঞ্জন (মাসিক, ১২৮৪)।

ফকির মুহম্মদ—মুসলমান কবি। জন্ম—চট্টগ্রাম। গ্রন্থ—জেলে খাঁ (কাব্য, ১২৪০)।

ফজলল করিম—স্বভাবকবি। জন্ম—১৮৮২ খৃঃ রঙ্গপুরের অন্তর্গত কাকিনা গ্রাম। বাল্যকাল হইতেই কবিতা-রচনা। পরি-চালনা—বাসনা (মাসিকপত্র)। গ্রন্থ—লায়লা-মজনু, আফগানি-স্তানের ইতিহাস, হারুণ অল রসিদের গল্প, খোজা মহিনউদ্দীনচিস্তার জীবনচরিত, মানসিংহ (১১০৩), তৃষ্ণা (কবিতা), মহর্ষি হজরত এমাম রব্বানী মোজাদ্দাকে আলফমানী, গাথা (কবিতা), পরিত্রাণ কাব্য, হজরত মহম্মদ-এর পবিত্র জীবনী (কবিতা)।

ফজলেল হক, এ, কে, মৌলভী—গ্রন্থকার। শিক্ষা—এম. এ, বি. এল। আইন ব্যবসায়, কলিকাতা হাইকোর্ট। বঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী। সম্পাদক—ভারত সুহৃদ (বরিশাল)।

ফটিকলাল দাস—গ্রন্থকার। নিবাস—চন্দননগর। শিক্ষা—বি, এ। গ্রন্থ—গণিত সহচর, সংস্কৃত শিক্ষাসহচর, ৩ খণ্ড, কারকপত্র, কুড়ানো ছেলে, সংস্কৃত ধাতুরূপ, French Pronunciations.

ফণিভূষণ কাব্যালঙ্কার—পণ্ডিত। সম্পাদক—শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রচার (মাসিক, ১৩০৭)।

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায়—প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—১২৮২ বঙ্গ যশোহর জেলায় তালখড়ি গ্রামে। মৃত্যু—১৩৪৮ বঙ্গ কাশীধামে। কর্ম—অধ্যাপক, দর্শন টোল, পাবনা, টিকমাণি. সংস্কৃত কলেজ কাশী, গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মহামহোপাধ্যায় উপাধিলাভ (১৯২৪ খৃঃ)। সংস্কৃত ভাষায় সকল দর্শনেই ইঁহার তুল্য অধিকার। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বহু প্রবন্ধের লেখক। গ্রন্থ—ন্যায়দর্শন (বাৎসায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি ও টিপ্পনী) ৫ খণ্ড (১৩২৪-১৩৩৫), ন্যায়-পরিচয় (১৩৩৭)।

ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ—গীতিনাট্যকার। গীতাভিনয় গ্রন্থ—পূজনীয়া, ভাগ্যদেবী, পাষাণী, বাসুদেব, রামানুজ, শৈব্যা বা হরিশ্চন্দ্র, সৈরিন্ধ্রি, চন্দ্রধর, একলব্য, ক্ষত্রিয় গৌরব ; নাটক—পুরোহিত।

ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—গ্রন্থকার। জন্ম—খুলনা জেলায় সেন-হাটি-গ্রামে। গ্রন্থ—উদ্বাস্তু (গল্প সংগ্রহ)।

ফণীন্দ্রনাথ পাল—গ্রন্থকার ও সাহিত্যিক। শিক্ষা—বি, এ। ইনি বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যসাধনা করিতেন। গ্রন্থ—ইন্দুমতী, সই মা (১৩১২), স্বামীর ভিটা, সুকুমার, জীবন্ত সমাধি, চক্রীর চক্র, পুষ্পরাণী, নারী, মধুমিলন, ছোট বৌ, মণিকাঞ্চন, ফিরে পাওয়া, শুভযোগ, বন্ধুর বৌ, বড় মা, রূপসী, ভৌতিক কাহিনী। সম্পাদক—গল্পলহরী (১৩৩২—৩৬), গল্পারতি (১৩৩৭—৩৮), যমুনা (১৩১১—১৩৩০), ঝঙ্কার (১৩২২)। [ক্রমশঃ।

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

ঢাকায় অনুশীলন সমিতি স্থাপন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় প্রমথনাথ মিত্রকে ঢাকায় লইয়া আসেন। এক ঘরোয়া বৈঠকে কতিপয় উকিল, যুবক ও ছাত্রদের নিকট প্রমথ বাবু বলেন যে "স্বদেশী, বিলাতি বর্জ্জন এ সবে কিছুই হইবে না; ক্ষমতা থাকে তো ইংরেজ তাড়াও।" উকিলের দল 'সম্ভবপর নয়' বলাতে প্রমথ বাবু উত্তেজিত হইয়া বলেন যে—"The sword has been drawn, it must be thurst in their breast of our enemies or in our own breast."

এই কথায় অনেকেই ভীত হইয়া আলোচনা-সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কেবল মাত্র কয়েকটি যুবক ও ছাত্র প্রমথ বাবুর প্রতি আকৃষ্ট হইল। সেই রাত্রেই প্রমথ বাবু সুহৃৎ-সমিতির আহ্বানে ময়মনসিংহে চলিয়া গেলেন। পরে ময়মনসিংহ হইতে ঢাকায় তিনি ফিরিয়া আসিলে, কয়েক জন যুবক গোপনে তাঁহার সহিত আলাপ করে। ঢাকায় যুবক দল ব্যতীত প্রমথ বাবুর আত্মীয় কলিকাতার ছাত্র তারকনাথ দাস (ইউরোপে বিপ্লব প্রচেষ্টার জন্য বিখ্যাত) এবং সুহৃৎ-সমিতির সদস্য ও প্রসিদ্ধ স্বদেশী সঙ্গীত-গায়ক ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীও এই গুপ্ত মন্ত্রণা-সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই আলোচনায় স্থির হইল—ঢাকায় একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। যুবক দলের মতানুসারে গুপ্ত সমিতির অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হইলেন উকীল আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। যোগেন্দ্রচন্দ্র নাগ (পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক) ও ডাক্তার নিশি চৌধুরীর প্রস্তাবে সমিতির পরিচালক নিযুক্ত হইলেন পুলিনবিহারী দাস। পুলিন বাবু বাল্যকালে বরিশালে গৃহশিক্ষক তারাপ্রসন্ন বসুর নিকট ভারতে গুপ্তভাবে সন্ন্যাসী দলের বিপ্লব প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও রচিত কাহিনী শুনিয়া প্রথম বিপ্লব-মন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাহার পর 'জন্মভূমি' নামক মাসিক পত্রিকায় মণিপুর যুদ্ধের বিবরণ পাঠে ইংরেজের ছলনা ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে পুলিন বাবুর মনে বিদ্রোহের ভাব আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে। তখন হইতেই ইংরেজকে ভারত হইতে তাড়াইবার বাসনা তাঁহার মনে জাগ্রত হয়।

তারকনাথ দাস পুলিন বাবুকে সঙ্গে লইয়া রংপুরে গুপ্ত সমিতি পরিদর্শনে গেলেন। তাহার পর তারক দাসের নির্দ্দেশক্রমে পুলিন বাবু ৪৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে অনুশীলন সমিতিতে আসিয়া তথাকার পরিচালক সতীশ বাবুর অতিথি হইয়া কলিকাতায় কর্ম্মপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জ্জন করেন। এই সময়ে কলিকাতার ছাত্র আন্দোলন অত্যন্ত জমিয়া উঠে ও কলিকাতায় ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন স্থাপিত হয়। ঢাকায় অন্ততঃপক্ষে দশ হাজার বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত সদস্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন বলিয়া এক নির্দ্দেশ দিয়া, প্রমথ মিত্র পুলিন বাবুকে ঢাকায় প্রেরণ করেন।

পুলিন বাবুর ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর বিপ্লবীদের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হইয়া গেল। কয়েক জন রাজপুত মিস্ত্রী সাহেবদের বন্দুক, রিভলবার প্রভৃতি মেরামত করিত। কয়েকটি যুবককে এই সকল মিস্ত্রীর নিকট হইতে বিভিন্নরূপ অস্ত্র মেরামত ও অংশ সংযোজন প্রক্রিয়া শিখাইয়া লওয়া হইল। ঢাকার গেণ্ডারিয়া খালের নিকট যে সরকারী দুর্গ ছিল, সেখানকার দুই-এক জন সিপাহীকে বশ করিয়া তাহাদের সাহায্যে চুরি করা দুই-চারিটি বন্দুক কিনিয়া প্রথম অস্ত্রশালা হয়। মিস্ত্রীদের নিকট হইতে সন্ধান লইয়া নবাব-বাড়ীর দুঃস্থ আত্মীয়গণের নিকট হইতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অস্ত্র-শস্ত্র এমন কি রিভলবার পর্য্যন্ত ক্রয় করা হয়। কলিকাতায় লোক পাঠাইয়া চীনা ও বাঙ্গালী নাবিকদের সাহায্যে গুপ্তভাবে রিভলবার আমদানীকারকদের নিকট হইতেও কিছু কিছু অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করা হইল।

পুলিন বাবুর প্রধান সহায় হইল ভূপেন্দ্রচন্দ্র নাগ ও আশুতোষ দাশগুপ্ত। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, আশু দাশই ছিলেন এই সমিতির মস্তিষ্ক। কর্ণেল নন্দীর পুত্র ইন্দ্রনাথ নন্দী দমদমের সিপাহিগণের সহায়তায় অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিত; তাহার নিকট হইতেও ঢাকার অনুশীলন সমিতির সদস্যগণ কিছু অস্ত্র ক্রয় করে। ঢাকা সমিতির সদস্যবর্গকে রীতিমত যুদ্ধের কায়দা শিক্ষা দিয়া নকল যুদ্ধের অভিনয়ও চলিতে লাগিল। লাঠিখেলা, ছুরিখেলা, বন্দুক-চালনা শিক্ষা, ড্রিল ও কৃত্রিম যুদ্ধের আকর্ষণে অনুশীলন সমিতির প্রসার খুব শীঘ্রই হইল।

সমিতির কার্য্য প্রসার হওয়ার ফলে ইহার সংগঠন-প্রণালী বিশেষ ভাবে বিধিবদ্ধ হয়। পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন বিপ্লবী-শাখার পরিচালক পুলিন দাসের এক প্রচারপত্রে জানা যায় যে, বিপ্লবকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য সমগ্র বাংলা দেশকে ডিভিসন, সাব ডিভিসন, পরগণা, জেলা ও মহকুমায় ভাগ করিয়া এক যোগসূত্রে গ্রথিত করা হয়। প্রধান বিপ্লবী সমিতির অধীনে শাখা-কার্য্যালয় সমূহের কার্য্যভার উপযুক্ত লোকের উপর ন্যস্ত হয়। শাখা কার্য্যালয়ের প্রধানগণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্যক্ বিবরণ প্রধান কার্য্যালয়ে জানাইতেন।

সমিতির সভ্যগণ সামরিক শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতেন, প্রত্যেক সভ্যকেই সমিতিতে যোগদানের পূর্ব্বে বিভিন্ন প্রকারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইত। প্রতিজ্ঞা চারি প্রকারের ছিল। (ক) আদ্য প্রতিজ্ঞা, (খ) অন্ত্য প্রতিজ্ঞা, (গ) প্রথম বিশেষ প্রতিজ্ঞা, (ঘ) দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞা।

আদ্য প্রতিজ্ঞা—"আমি কদাপি সমিতির সহিত সংস্রব ছিন্ন করিব না। আমি সকল সময়েই সমিতির বিধি-নিয়ম মানিয়া চলিব। আমি সমিতির কর্তৃপক্ষের আদেশ নির্বিচারে পালন করিব। আমি আমার নেতার নিকট কোন বিষয় গোপন করিব না এবং মিথ্যা বলিব না।"

অন্ত্য প্রতিজ্ঞা—"আমি সমিতির আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে অযথা আলোচনা বা কাহারও নিকট কোনও কিছু প্রকাশ করিব না। আমি পরিচালকের নির্দ্দেশ ব্যতীত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইব না। আমার সর্ব্বপ্রকার গতিবিধির বিবরণ সকল সময়ের জন্য পরিচালকের নিকট জানাইব। যদি কোন সময় সমিতির

বিরুদ্ধে কোন প্রকার ষড়যন্ত্রের বিষয় জ্ঞাত হই, তাহা হইলে অবিলম্বে পরিচালককে জানাইব এবং তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিব। যে কোন অবস্থায় যে কোন সময়ে পরিচালকের নির্দ্দেশ পালন করিব। সমিতির আইন অনুযায়ী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শিক্ষণীয় 'বিষয়সমূহ অন্য কাহাকেও শিক্ষা দিবার স্বাধীনতা আমার থাকিবে না। একমাত্র সমপ্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তিগণকে উক্ত শিক্ষা দেওয়া চলিতে পারে।"

প্রথম বিশেষ প্রতিজ্ঞা—"ওঁ বন্দে মাতরম্—আমি মাতা, পিতা, গুরুদেব, নেতা ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার বেষ্টনী পরিত্যাগ করিয়া যাইব না। আমি পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্নেহ, গৃহের মোহ সমস্ত পরিত্যাগ করিব। কোন প্রকার অজুহাত না দেখাইয়া গুরুদেবের আদেশ নির্বিচারে পালন করিব। যদি আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালনে অক্ষম হই তাহা হইলে ব্রাহ্মণের, পিতা-মাতার, এবং বিশ্বের দেশপ্রেমিকগণের অভিশাপ যেন আমার উপর বর্ষিত হইয়া আমাকে ভস্মে পরিণত করে।"

দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞা—"ওঁ বন্দে মাতরম্, আমি পরমেশ্বর, অগ্নি, মাতা, গুরুদেব ও অধিনায়কের সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমার জীবন ও ঐহিকের সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে আমি সমিতির প্রসারের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিব। আমি সমস্ত নির্দ্দেশ পালন করিব এবং সমিতির অন্তর্ভুক্ত যদি কেহ কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ করে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যথাশক্তি তাহার ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিব। আমি ইহাও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, সমিতির কোন গোপন বিষয় লইয়া কাহারও সহিত আলোচনা করিব না অথবা আমার বন্ধু বা আত্মীয়ের নিকট প্রকাশ করিব না। ইহা ছাড়া কোন বিষয়ে সমিতির কোন সভ্যের নিকট কোন প্রকার অযথা প্রশ্ন করিব না। যদি আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষায় অক্ষম হই অথবা বিরুদ্ধাচরণ করি, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, মাতা ও দেশপ্রেমিকগণের অভিশাপে আমি যেন ধ্বংস প্রাপ্ত হই।"

দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী প্রিয়নাথ আচার্য্য বলেন যে, "দুর্গাপূজার ছুটির পূর্ব্বে মহালয়ার দিনে রমেশ, আমি এবং ঢাকা সমিতির আরও কয়েক জন রমনার সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীতে পুলিন দাস কর্ত্তৃক দীক্ষিত হই। আমরা সংখ্যায় প্রায় ১০।১২ জন ছিলাম। পূর্ব্বেই আমরা আদ্য, অন্ত্য এবং বিশেষ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। সেই সময় মন্দিরে কোন পুরোহিত ছিল না। পুলিন দাস মহাশয় পূজা, হোম প্রভৃতি সমাপনান্তে আমাদের ছাপান প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিতে দেন এবং আমরা উহা দেবীর সম্মুখে পাঠ করি। মস্তকে তরবারি ও গীতা ধারণ করিয়া প্রত্যালীঢ়াসনে উপবিষ্ট হইয়া আমরা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি।"

এই আসন শিকারোদ্যত সিংহের প্রতীক।

দীক্ষাপ্রার্থী এবং দীক্ষাগুরু সকলেই পূর্ব্বদিন এক বেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া যথাবিধি সংযম করিয়া দীক্ষার দিনে উপবাসী থাকিয়া স্নানান্তে শুদ্ধভাবে দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইতেন। দীক্ষাকালে যথাসম্ভব রুদ্রভাব অবলম্বন করিবার মানসে দীক্ষাগুরু উত্তরীয় সহ কাবায় বস্ত্র পরিধান করিয়া মস্তকে, হস্তে, বাহুতে ও কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করিতেন। দীক্ষান্তে প্রত্যেক সভ্যকেই পর্য্যাপ্তরূপে বিশুদ্ধ ঘৃত ও চিনি সংযুক্ত টাটকা কাঁচা দুধ সেবন করিতে দেওয়া হইত।

সমিতির সভ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা নানা প্রকারের ছিল—তাহার মধ্যে গোপন প্রচারপত্র ও বক্তৃতার সাহায্য এবং ব্যক্তিগত সাহচর্য্য ও শিক্ষার মাধ্যম অন্যতম ছিল। সাধারণতঃ স্কুল, কলেজ হইতেই সভ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল। ইহা ছাড়া সভ্যদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্য হইতে এবং সেবাকার্য্য উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্য হইতেও সভ্য সংগ্রহ করা হইত। সাধারণতঃ এই সভ্য সংগ্রহ করিতেন সাধারণ শিক্ষক, অধ্যাপক, ও ব্যায়াম-শিক্ষকগণ। ছাত্রাবাস ও ছাত্রদের মেস প্রভৃতি সভ্য সংগ্রহের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। মেধাবী ছাত্রগণ তাহাদের সহপাঠী ছাত্রদের এবং নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাহাদের হৃদয় জয় করিতেন এবং পরে সমিতির সভ্য করিয়া লইতেন। সভ্যদের নিম্নলিখিত বয়স ও অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন স্তরভেদ ছিল—

প্রথম শ্রেণী—অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ;
দ্বিতীয় শ্রেণী—বিবাহযোগ্য যুবক ;
তৃতীয় শ্রেণী—বিবাহিত যুবক ;
চতুর্থ শ্রেণী—বৃদ্ধ ও সংসারী ব্যক্তি।

প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া এই চারিটি শ্রেণীকে আরও চারিটি ভাগে বিভক্ত করা হয়—

প্রথম শ্রেণী—পাঠনিরত বালকগণ ;
দ্বিতীয় শ্রেণী—অসম সাহসী যুবকগণ, যাহারা মৃত্যুকেও উপেক্ষা করিয়া যে কোন কার্য্য করিতে প্রস্তুত ;
তৃতীয় শ্রেণী—যাহারা মাত্র অর্থ সাহায্য করিবে ;
চতুর্থ শ্রেণী—আন্তরিক সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ।

প্রত্যেক সভ্যের উপর এই সমিতিকে সামরিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করার নির্দ্দেশ ছিল। নির্দ্দেশ অমান্য করিলে অপরাধ হিসাবে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল।

ভারতের এই বিপ্লব আন্দোলনকে শুঙ্খলযুক্ত করার জন্য রুশ-বিপ্লবের আদর্শ ও নিম্নলিখিত কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা হয়—

I—"A solid organization of all revolutionary elements of the country, allowing the concentration of all forces of the party where they are most necessary."

II—"A strict division of different branches or departments, i.e., persons working in one department ought not even to know that which is done in any other, and in no case should one control the direction of two branches."

III—"A severe discipline, especially in certain branches (military and terroristic), even of complete self sacrificing members."

IV—"A strict keeping of secrecy i.e, every member may only know what he ought to know,

and talk about business matters with companions who ought to hear such matters, and not with them who are not fit to hear."

V—"A skillful use of conspiring means i.e, paroles, ciphers, and so on."

VI—"A gradual developing of action, i.e, the party ought not at the beginning to grasp all branches but to work gradually; for instance—(1) organization of a nucleus recruited among educated people, (2) spreading ideas among the masses through the nucleus, (3) organization of technical means (military and terroristic), (4) agitation, and (5) rebellion.

বিপ্লব আন্দোলনের কর্ম্মপন্থা দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—সাধারণ ও বিশেষ। সাধারণ কর্ম্মপন্থার মধ্যে সংগঠন, প্রচার ও আন্দোলন। বিশেষ কর্ম্মপন্থাকে সাত ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় কর্ম্মধারাকে সামরিক বিভাগ বলা হয়। বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য রাসায়নিক ও বিস্ফোরক পদার্থ নিশ্মাণ ও সংগ্রহ সামরিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বিশেষ কর্ম্মপন্থার অন্যতম বিভাগের মধ্যে আর্থিক বিভাগ সন্ত্রাসবাদী বিভাগের সাহায্যে পরিচালিত হইত। সন্ত্রাসবাদী সভ্যগণ বিত্তশালীদের ভয় দেখাইয়া অর্থসংগ্রহ করিতেন। সমিতির প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে হিংস উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করা নিষিদ্ধ ছিল এবং মাত্র সাধারণের সাহায্য ও চাঁদার উপরেই নির্ভর করিত।

সমিতির নিয়মানুবর্ত্তিতা অত্যন্ত কঠোর ছিল। সন্ত্রাসবাদী এবং সামরিক বিভাগের সদস্যগণ যদি অধিনায়কের আদেশ পালনে অবাধ্য হন, তাহা হইলে তাঁহাদের মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। সমিতির সংগঠন সম্পর্কে বিস্তৃত নিয়মাবলী রচিত হয়; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অত্যন্ত কঠোরতার সহিত পালিত হইত—

জেলা সংগঠন

"শাখা-সমিতিগুলির পরিচালনা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে চলিবে। সমিতির সহিত সংস্রবে আসার পূর্ব্বে সংগঠন নিয়মাবলী তিনি অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ বার পাঠ করিবেন।"

"শাখা-সমিতিগুলির ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি সরকারী বিভাগ অনুযায়ী জেলাকে বিভক্ত করিবেন। বুদ্ধিমান ও উদারহৃদয় ব্যক্তির উপরে প্রত্যেকটি সাব ডিভিসনের ভার ন্যস্ত হইবে।"

* * * *

"যদি কোন জেলায় কোন দলের নিকট কোন অস্ত্র থাকে এবং ঐ অস্ত্র অপব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সমিতির অনুমতি লইয়া যে কোন প্রকারে উক্ত অস্ত্র হস্তগত করিতে হইবে। ইহা অত্যন্ত সাবধানে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যাহাতে ইহা দলের অজ্ঞাতসারে করিতে হইবে।"

* * * *

"সমিতির ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত কোন স্থানে বা কাহারও নিকট কোন সভ্য পত্র লিখিতে পারিবে না।"

* * * *

"যাঁহাদের নিকট অস্ত্র-শস্ত্র অথবা গোপন কাগজপত্র থাকিবে তাঁহারা কোন ক্রমে কোন প্রকার হিংসামূলক সংগঠন অথবা কোন প্রকার গণ্ডগোলে যাইবেন না; তাঁহারা এমন কোন স্থানে যাইবেন না যেখানে বিন্দুমাত্র বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।"

* * * *

"প্রত্যেক সদস্যদের মনে এই ধারণা থাকা উচিত যে, তাহারা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লব সংঘটনের চেষ্টা করিতেছেন—কোন প্রকার আমোদের জন্য নহে। যাহাতে কোন সভ্য এই মহান্ আদর্শ হইতে বিচ্যুত না হন সেই দিকে যেন দৃষ্টি রাখেন।" [ক্রমশঃ।

নাম না মান?

নামে কি বা আসে যায়? গেয়েছিলেন উইলিয়াম সেক্সপিয়র। গোলাপ ফুলকে যে নামেই অভিহিত করা যাক্, গোলাপ সুগন্ধ বিলায়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে নাম এবং নামের মর্য্যাদার জন্যই যত কিছু। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত যে কত ব্যক্তি ও বস্তুর নামকরণ করেছেন লিষ্টি করলে হয়তো আরেক খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের প্রয়োজন হয়ে উঠবে। নামে যদি কিছু না যায়-আসে তা হ'লে মহাত্মা গান্ধীকে কায়েদে আজম জিন্না, ষ্টালিনকে ট্রুম্যান এবং শ্রীজবাহিরলালকে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু নামে ডাকতে ক্ষতি কি? পদ্মফুলের নাম যদি হয় শালুক? কাকের নাম কোকিল? বাঙলার নাম বিহার?

নামের গণ্ডগোল করলে দুনিয়ায় ওলট-পালট হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। চিকাগোকে লেনিনগ্রাড নামে সম্বোধন করলে আরেক মহাযুদ্ধের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কেবল মাত্র সন্ন্যাসী ফকির ব্যতীত অন্যান্য মানুষের সকল কিছু চেষ্টার অন্তরালে আছে নাম বা খ্যাতিলাভের উদ্দেশ্য। নেহাৎ খুন বা ডাকাতি না করলে সহসা কেউ নাম পরিবর্ত্তন করেন না। নামই হ'ল সকল কিছুর তারতম্যের এক মাত্র মাধ্যম—যা না থাকলে চোরকে চোর এবং সাধুকে সাধুরূপে চেনা দায় হ'য়ে উঠতো। নামের আরেক অর্থ খ্যাতি, অর্থাৎ 'নাম' শব্দটাকে উল্টে দিলে 'মান' কথাটা সৃষ্ট হয়। মানুষ শুধু নয়, পুরাকালের দেব-দেবী থেকে দৈত্য-দানবদের পর্য্যন্ত একেক জনের শত শত নাম ছিল। অধিকাংশ মানুষের থাকে দু'টি নাম। এক ডাক নাম, আরেক রাশ নাম। ঘরে এক নাম, বাইরে আরেক নাম। এমন কি ছদ্মবেশে থাকতে হ'লেও চাই এক ছদ্মনাম। যে জন্য রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ' এবং শরৎচন্দ্রের 'অনিলা দেবী' নাম হয়ে আছে। নাম আবার যেমন হয় এক অক্ষরের তেমনি একটি নামেই খুঁজে পাওয়া যায় একাধিক অক্ষর। 'বা' বলতে কস্তুরবাকে যেমন বোঝায়, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বললে বাপুকে বোঝায়।

পৃথিবীতে একটি মাত্র শব্দের নাম প্রচলিত আছে ফরাসী দেশে। সেখানে ও কিংবা O নাম আছে প্রচুর লোকের। মার্ক টোয়েন উল্লেখ ক'রেছিলেন একটি ভারতীয় নাম, যে-নাম উচ্চারণ করতে দস্তুর মত কারসাজির দরকার। নামটি হচ্ছে:—

মঠপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্বামীভাস্করানন্দসরস্বতী।

মানুষের কবিতা

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

এই শুধু বলিবারে চাই—
সকলেরই মূল্য আছে, মানুষের মূল্য কিছু নাই।

কোন্ ঋষি খেয়ালের বশে কবে হায় গেয়েছিলে গান—
"অমৃতস্বরূপ মোরা অমৃত-সন্তান ?"
হায় কবি, নিদ্রাহীন চিরনিশি দেখেছো স্বপন—
তমসার পরপারে তরুণ তপন !
ভাবো মনে কেটে গেছে চির-রাত্রি, কিম্বা কেটে যাবে···
যুগ যুগ চলে যায়······তমসায় আর তামাসায়···
নব কবি গায় নবভাবে
সেই পুরাতন কথা !

রাত্রি নাহি শেষ হয়—না দেখায় হবার ব্যগ্রতা।

আমি আজ বলিবারে চাই,
শূন্যসম মূল্যহীন এরা—মানুষের কোনো দাম নাই।
তাই তার এত হেলাফেলা,
মানুষ-জীবন নিয়ে চিরদিনই ছিনিমিনি-খেলা।
জীর্ণপত্রে পুঁথির বিধান—
তারো মূল্য আছে, আছে তাহারো সম্মান !
কীটদষ্ট দলিত পুঁথির আছে দম্ভ, আছে অধিকার,
কোটি কোটি মানুষের জীবনে ব্যর্থতা রচিবার।
যুগজীর্ণ কঙ্কালের নির্দেশের ফেরে
মানুষের গতি রুদ্ধ, প্রাণ রুদ্ধ, প্রেম রুদ্ধ—
মানুষ না ছোঁয় মানুষেরে।
সনাতন শাস্ত্রের আদেশ—
আলোকের আনন্দের দেশে রমণীর চির-অপ্রবেশ।
ভুবনের রূপে-রসে-প্রেমে-যৌবনে-স্বাতন্ত্র্যে নাই দাবী—
জীবনে কেবল তার এক কারাগার হতে
অন্য কারাঘরে পড়ে চাবি।
সেই জীর্ণপত্রের অজীর্ণ কোনো ছত্র নিয়ে চলে খুনোখুনি ;
মানুষের জীবনের নব-নব কুরুক্ষেত্র
রচে নিত্য নব-কৃষ্ণ নতুন-ফাল্গুনি !
মানুষের জেদের নিকটে মানুষের জীবনের দাম
লেখে নিত্য অস্ত্রমুখে নব-নব ডায়ার ও শ্রীপরশুরাম !

নির্বিচারে শিশুবৃদ্ধ করিয়া সংহার
দেশে দেশে পূজ্য হয় তারা, খ্যাত হয় নব অবতার !
রাষ্ট্র-ধর্ম-শাস্ত্র-গুরু-মন্ত্র-তন্ত্রে দিয়া সিংহাসন
ষড়-যন্ত্রে চলিতেছে মানুষের শোষণ-শাসন।

আমি আজ চাহি তার নাম—
কোন্ যুগে মানুষের জীবনের, বলো ভাই, কে দিয়েছে দাম ?
কে বলেচে উচ্চকণ্ঠে ডাকি,
জীবন শুধুই সত্য, শাস্ত্র-রাষ্ট্র-সব-কিছু ফাঁকি ?
জীবন ভরিতে হবে আলোকে পুলকে প্রেমে গানে
জীবনবিরুদ্ধ যাহা, মিথ্যা তাহা, নাই তার মানে ;
হাজার বিধির চেয়ে একটি জীবন বেশি দামী—
রাষ্ট্র মানুষের দাস, তার নয় রাষ্ট্রের গোলামী—
গুরুবাদে মুক্তি নেই, মুক্তি শুধু যে পথচলায়—
অর্থের থাকে না অর্থ পুঁজি-ফাঁসে বাঁধিলে গলায়—
সৌন্দর্য্যেরে সম্পদেরে রমণীরে করি' অবরোধ
জীবন জীবন নয়—প্রাণধারণের দেনা শোধ ?
কোন্ বুদ্ধ কহিলো শুধাই—
রিক্ত করি' ব্যর্থ করি' নহে—পূর্ণ করি' জীবনেরে চাই ?
যুগে যুগে নব নব ধর্ম-অধিকারী
মানুষেরে করিলো কসাই, কিম্বা তারে করিলো ভিখারী।

তুচ্ছ শিল নোড়ানুড়ি মাটির পুতুল—
মানুষ তাহারো কাছে ক্ষুদ্র, নহে সে তাহারো সমতুল।
জীর্ণ ইট-কাঠে-গড়া মস্‌জিদ্-মন্দির—
ঝরিলো তাহারো লাগি, কতো রক্ত, কতো অশ্রুনীর !
ওই বুঝি ধর্ম গেলো—মানুষের চোখে নাই নিদ,
ভাখে না সে ধর্ম তার জীবনের ভিতে কাটে সিঁধ।
মানুষকে ভালোবাসা ধর্ম মানুষের—জানি আমি—
সহজ ও স্বতস্ফূর্ত—গানে যেন প্রাণের প্রণামী।
মানুষে মানুষ মারি' ধর্ম রাখে, হয় ধর্মবীর ;
ধর্ম ঠ্যালে মরণের পথে নির্বোধ দুর্ভাগাদের ভিড়।
ধর্ম ? হায়, সাদা চোখে দাদা, ভাখো তার ভয়াবহ রূপ—
তাজা জীবনের রাজাদের টেনে আনে মরণের ফেরে—
মেরে মেরে পাঁজা করে' বানায় সে কঙ্কালের স্তূপ !

ভালোবাসি সেই ধর্মেরে—
তার লাগি আত্মদান ? নরহত্যা ? ব্যর্থতা-বরণ ?
জীবনের সৃষ্টি আজ জীবনে করিলো আবরণ—
মানুষের আনিলো মরণ।
তুচ্ছ ফাঁপা ভাবের ফানুস—
মানুষ গড়েছে ধর্ম, ধর্মে কভু গড়েনি মানুষ !
কিন্তু হায়, তারো মূল্য আছে—প্রাণ দিয়ে শোধ করা চাই,
মানুষের কোনো মূল্য নাই।

মানুষের গড়া ভূয়ো ভৌগোলিক সীমা—
তাহারো মর্যাদা আছে, রয়েছে মহিমা।
তারো লাগি সৈন্যদল পুষ্ট হয় রক্ত-বৃষ্টি তরে,
লাঙলের ফাল্ ভাঙি তরবারি গড়ে।
একদল মানুষেরে সর্বভাবে করিয়া বঞ্চিত,
জীবন্ত অস্ত্রের মত কেল্লায় রাখে যে সুসজ্জিত,
চিরবন্দী হিংস্র পশুদল—
মানুষেরে মারিবার তরে তাহাদের জীবন কেবল !
দেশের সম্পদ যতো, শক্তি যতো, যতো কিছু ধন
সব দিয়ে চলে শুধু মানুষ-মারার আয়োজন।
মানুষেরে মারিবার তরে মানুষ যোগায় রাজকর,
মানুষে খাটায় মাথা,
রচে বসি' হিংসা-শাস্ত্র, ঘাতকের বীরত্বের গাথা—
নব নব অস্ত্র গড়ি' বিজ্ঞানের বলে
মানুষেরে বানায় বর্বর।
পৃথিবীরে ভাগযোগ করি মানুষ বানালো নানা দেশ—
হেথা হতে হোথা যদি যাবে,
কেন নাহি যায় বন্ধুভাবে ?
কেন পরে ভ্রাতৃরক্তমাখা দেশজয়ী জল্লাদের বেশ ?
পায়ের মাটিরে দিলো কিনা মানুষ মাথারো বড়ো ঠাঁই,
মাটিরো রয়েছে কিছু দাম ; মানুষের কোনো দাম নাই।

কখনো শুনেছো কারো মুখে—
বাঘেরে খেয়েছে বাঘ, ভালুক ভালুকে ?
মানুষে মানুষ খায়, খেয়ে বেঁচে থাকে প্রতিদিন—
রক্ত খায়, মাংস খায়, মেদমজ্জা খেয়ে করে ক্ষীণ—
খায় মন-আত্মা, খায় জীবনের অর্দ্ধেক নিশ্বাস—
অবশেষ-জীবন্ত-কঙ্কাল ফেলে দেয়, করো কি বিশ্বাস ?
যাও—যেথা যেথা কলকারখানা—যাও গ্রামে গ্রামে,
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করো মনুষ্যত্ব চড়েছে নিলামে।
মানুষের জীবনের হেলাভরে খেলা
যেথায় চলেছে দুই বেলা।
আদরের যাহা কিছু—হৃদয়ের যা কিছু পহেলা—
কানাকড়ি-দরে বিকে গরিবের যাহা কিছু দামী—
শয়তানে দিতে যে সেলামি।

খনি ভেঙে কুলি বহে শিরে করি কয়লার চাপ—
তারি সাথে বহে যেন দুনিয়ার তিক্ত অভিশাপ—
কালো ভয়ঙ্কর।
জঙ্গল কাটিয়া তারা বসায় সহর—
তার রক্তে বহে সেথা বিলাসের বিষম বহর।
সে-সহরে বিলাসীর লাগি রমণীরা রূপ দেয় ডালি,
নারীর নারীত্ব পায় দলি বড়লোক দেয় করতালি।
অমৃতের মৃতপ্রায় পুত্র যতো নগরীর পথে
দুর্বহ জীবন-বোঝা টেনে নিয়ে চলে কোনোমতে—
চিরদাসখতে।
ফুল্ল ফুল ঝরি' নিত্য চুমে নগরীর পথ-শিলা,
নিত্য নব অনাচার অত্যাচার মদিরার লীলা—
রমণীর রূপ-রস-জীবন-যৌবন
বিপণির পণ্য সেথা—ক্ষণিকের তুচ্ছ প্রয়োজন।

আর যারা গড়িলো সহর সর্বহারা বঞ্চিতের দল—
কোথা তারা ? সে-সহরে কোথায় তাদের ঠাঁই বল্ ?

পথ-পাশে—যে-পথ সে নিজ-হাতে করেছে নির্মাণ—
প্রাসাদের নীচে—পীচ্-এ—গড়েছে যা তার কালো ঘা
বিন্দু বিন্দু তারি রক্তদান—
সেথা ঐ দীনহীন মুষ্টি-অন্নে করে মারামারি—
কুকুরের জ্ঞাতি আজ—ওই তারা পথের ভিখারী !

সহস্রের রক্ত শুষি' খুসি-এক পুষ্ট করে দেহ,
ধনীর প্রাসাদ ওঠে, ভাঙি লক্ষ দরিদ্রের গেহ।
দৈন্যদীর্ণ-কক্ষ-মাঝে প্রাণ-জীর্ণ মানুষের দল
জীবন্ত-কবরে করে জীবনের লাগি কোলাহল ! !

তুমি বলো, ইহাদের তরে আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু,
অন্ন চাই, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু—
ইহাদের বুকে আশা, মূক মুখে ভাষা দেওয়া চাই ?

আমি বলি, নাই ভাই, ইহাদের কোনো দাম নাই।

মানুষের মানুষ শিকারী—
নারীরে করেছে বেশ্যা, পুরুষেরে করেছে ভিখারী।

মাষ্টারমশাই

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বারীন্দ্রনাথ দাশ

তিন-চার দিন পরের কথা। সাধনাদি'র সঙ্গে বসে গল্প করছি সাধনাদি'র বাড়িতে।

হঠাৎ দরজার ওপর ঝড় উঠলো।

দরজা খুলে দেখি মাষ্টার মশাই।

কোনো রকম ভূমিকার অপেক্ষা রাখলেন না তিনি।

"হতভাগা প্রশান্ত কী ভেবেছে আমায়। আমার পয়সা নেই, আমি ইউনিভার্সিটির গরীব মাষ্টার। আমি প্রশান্তর মতো বড়লোক নই। আমার ক্যাডিলাক গাড়ি নেই। আমার বৌ বিখ্যাত সাহিত্যিক নয়। কিন্তু আমি কে সে জানে না? আমি বিভূতি সরকার যাকে দুনিয়ার লোক জানে, যে মারা গেলে সহরের একটা বড়ো রাস্তার নাম বিভূতি মজুমদার এভিনিউ হতে পারে, তোদের নাতি-নাতনীরা যার ছবি ঘরে টাঙিয়ে রাখবে, বলবে, হ্যাঁ, এক বাপের ব্যাটা ছিলো বিভূতি মজুমদার, দুনিয়াকে সমঝিয়ে গেছে যে, হ্যাঁ, মগজে কিছু মাল ছিলো এক বাঙালীর বাচ্চার, তাকে কিনা প্রশান্ত হারামজাদা বললে, ডোণ্ট্ বি টু এমবিশাস্, তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দেবো, সে আশা কি করে করো? এমবিশাস্? ব্যাটাচ্ছেলে এমবিশানের কি জানে? ওকে বলে দিস, দশ-পনেরো বছর পরে ব্যারিষ্টার প্রশান্ত বোস কে তার নিজের ছেলেও মনে রাখবে না, কিন্তু দুশো বছর দু'হাজার বছর পরেও প্রফেসার বিভূতি মজুমদারকে লোকে ফুলচন্দন দিয়ে পূজো করবে।"

মাষ্টার মশায়ের হাতে এক কাপ চা' তুলে দিলো সাধনাদি', বললে, "অঞ্জলী দেবী কি বললেন?"

একটু গুম হয়ে থেকে মাষ্টার মশাই আস্তে আস্তে বললেন, "সে ছুঁড়ি আমার সঙ্গে মোলাকাতই করেনি।"

* * * *

জমাট মেঘে মেঘে আর ঝমঝমে বর্ষায় সহরের ভেজা রাজপথ দিয়ে আষাঢ় আর শ্রাবণ চলে গেল জনতার প্রবাহে। পরীক্ষা শেষ করে এম-এ'র ছাত্রছাত্রীরা জীবনের রাজপথে নেমে এলো। তাদের পেছনে বন্ধ হয়ে গেল আলো নিবিয়ে দেওয়া সিনেট হলের দরজা।

সে'দিন সন্ধ্যায় আকাশের একফালি চাঁদ যখন টুকরো টুকরো মেঘের ভীড়ের মধ্যে বিপর্যস্ত হয়ে উঠছিলো কলেজ ষ্ট্রীটের জনতায় অমিতা মুখার্জীর মতো, শঙ্কর বললে, "অমিতা মুখার্জীর সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে।"

"কার সঙ্গে?"

একটা মিষ্টি আলস্যে শুয়েছিলুম বিছানার উপর। একটা তেতো চঞ্চলতায় উঠে বসলুম।

"অমিতা মুখার্জীর সঙ্গে।"

আলস্যের মাধুর্যটুকু মেঘ হয়ে আকাশের মেঘের ভীড়ে ভেসে গেল। আলস্যের ক্লান্তিতে আবার শুয়ে পড়লুম বিছানায়।

"বিয়েটা ঠিক করেছেন বাবা আর মা," শঙ্কর বললে, "উপায় নেই, বিয়ে করতেই হবে। ওঁদের মনে আঘাত দিয়ে অন্য কাউকে বিয়ে করতে কিম্বা বিয়ে না করে থাকতে পারবো না।"

আমি মনে মনে ভাবছিলুম অমিতার কথা। একদিন সে বলেছিলো, "ছাত্রজীবনের মাধুর্যটুকু সব চেয়ে বেশী কোথায় জানো? যা কিছু মনে রাখবার সেগুলো কিছুতেই মনে থাকে না, পরীক্ষার খাতায় শূন্যের বেশী কিছু পাওয়া যায় না, আর যেগুলো মনে না রাখলে জীবনে সুখী হওয়া যায়, সেগুলো কিছুতেই ভোলা যায় না, আর জীবনের খাতায় তখন যেই নম্বরটা ওঠে সেটাও শূন্য।"

শঙ্কর বললে, "কিন্তু বন্দনাকে কিছুতেই ভুলতে পারবো না। তার কাছে চিরদিনের জন্যে অপরাধী হয়ে রইলুম।"

বন্দনার সঙ্গে তখন আমার আর দেখা নেই অনেক দিন, মাষ্টার মশায়ের বাড়িতে গেলেও দেখা হোতো না।

সাধনাদি'কে জিজ্ঞেস করেছিলুম ওর কথা।

সাধনাদি' বলেছিলো, "ওর কথা আর বোলো না। ওর জন্যে আমার অন্তত: কোনো সহানুভূতিই নেই। মেয়েটি নষ্ট হয়ে গেছে।"

বন্দনা তার জীবনের মোড় ফিরিয়ে নিয়েছিলো অন্য পথে। কলকাতার সমাজ-জীবনের ওপরতলায় নামজাদা দরজীদের তৈরী সুটের সুশোভন সজ্জায় যে সমস্ত অসামাজিক জীবেরা বিচরণ করে তাদের নিয়ে একটি সার্কাস পার্টি খুলেছিলো একটি নামজাদা ক্লাবে। তাদেরই মধ্যে একজন পোষ্টগ্র্যাজুয়েটের প্রফেসার ডক্টর অরুণ গুপ্ত।

ডক্টর অরুণ গুপ্তের একটা খ্যাতি ছিলো কলকাতায়, পণ্ডিত হিসেবে নয়, একজন লম্পট হিসেবে। বিদেশ থেকে সে নিয়ে এসেছিলো একটি সস্তা সৌখিন ডক্টরেট, কিন্তু একটি দামী সৌখিনতর লাম্পট্য। লোকে বলতো তার নাকি তিন বিয়ে। একটি গারো পাহাড়ে, একটি হামবুর্গে, একটি কলকাতায়। তবু সে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, কারণ কর্তৃপক্ষের একজন অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তির অন্ধ স্নেহ ছিলো তার উপর।

আর বিশ্ববিদ্যালয়ে মাষ্টার মশায়ের তিক্ততম শত্রু ছিলো এই অরুণ গুপ্ত।

কর্তৃপক্ষমহলে মাষ্টার মশায়ই প্রশ্ন তুলেছিলেন কেন সে বছর এত ভালো ছাত্র থাকতেও একটি অতি সাধারণ ছাত্রী অরুণ গুপ্তের সাবজেক্টে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়েছিলো, কেন অরুণ গুপ্ত তার নিজের রুমে কোনো ছাত্রের সঙ্গেই বড়ো একটা দেখা করতে চান না, অথচ ছাত্রীপরিবৃত হয়ে থাকেন সব সময়ই, কেন তাঁর বিভাগে রিসার্চের জন্যে অনুমোদন করা টাকা কোনো ভালো ছাত্র পায়নি, পেয়েছে একটি মেয়ে যে আজ পর্যন্ত কোনো সন্তোষজনক কাজ দেখাতে পারেনি।

কিন্তু অরুণ গুপ্তের কোনো ক্ষতি হোলো না এই অভিযোগে। অরুণ গুপ্তের অন্ধ মুরুব্বী তাকে আড়াল করে বাঁচিয়ে গেল প্রত্যেক বার, মাঝখান থেকে কতকগুলো মিথ্যে অভিযোগ সৃষ্টি হোলো মাষ্টার মশায়ের নামে, নিজের বিভাগে রিসার্চের টাকাকড়ি সংক্রান্ত কয়েকটি মিথ্যে কলঙ্ক মাষ্টার মশাইকে বিব্রত করে তুললো।

তারপর যেদিন সেই অরুণ গুপ্তের সঙ্গে আর অরুণ গুপ্তের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সৌখিন কলকাতার নিশীথকেন্দ্রগুলিতে দেখা যেতে লাগলো মাষ্টার মশায়ের মেয়ে বন্দনাকে, সেদিন থেকে সুরু হোলো মাষ্টার মশাইকে দেখে উন্নাসা মহলের চোরা বিদ্রূপের হাসি।

* * * *

হেষ্টিংস্ অঞ্চলের একটি ক্লাবে সাধনাদি'র সঙ্গে বসেছিলুম একদিন সন্ধ্যায়।

রাম্বার মাদকতাময় ছন্দে ডাল-ব্যাণ্ডে তখন চাঞ্চল্য জেগেছে। ফ্লোরে অজস্র যুগলের ভীড়, তাদের মধ্যে বন্দনাও।

বন্দনার সঙ্গে আমাদের দেখাশুনো তখন দূর থেকেই। একটুখানি হাসির মধ্যেই পরিচয়ের স্বীকৃতিটুকু সীমাবদ্ধ। এড়িয়েই চলে আমাদের।

এমন সময় সেখানে এলো শঙ্কর।

আমাদের দেখলো না, লক্ষ্যই করলে না সে।

এক পশলা নাচ শেষ হোলো, বন্দনা আর তার বন্ধু এসে বসলো একটি টেবিলে, তারপর সেই ছেলেটি উঠে গেল আরেকটি মেয়ের সঙ্গে, এবারের শ্লো ফক্সট্রটে যোগ দিলো।

শঙ্কর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল বন্দনার কাছে। একটি চেয়ার টেনে বসে পড়লো।

আমি বললুম, 'ব্যাপার কি বলো তো সাধনাদি'। শঙ্কর বন্দনার মোহ ছাড়তে পারলো না এখনো?"

"এদ্দিন পেরেছিলো," সাধনাদি' বললে, "কিন্তু আবার হার মানলো নিজের মনের কাছে।"

"আজ বাদে কাল তো সে বিয়ে করছে অমিতাকে", বললুম আমি।

"করছে না।"

"মানে?"

একটু চুপ করে থেকে সাধনাদি' বললে, তোমায় বলিনি এতক্ষণ, খবরটা তোমার কাছে কি ভাবে ভাঙবো ভেবে পাইনি। তুমি শুনে হয়তো—হয়তো—হয়তো—

"অতো ভনিতা করছো কেন? বলো না কি?"

সাধনাদি' আস্তে আস্তে বললে, "অমিতা কাল বিয়ে করেছে অরুণ গুপ্তকে।"

"কী?" আমার মুখ দিয়ে কথা সরলো না।

তারপরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, "শেষ পর্যন্ত সেই স্কাউণ্ড্রেলটাকে? তার আরেকটা বৌ আছে জেনেও?"

"ওসবে কি আসে-যায় বলো" সাধনাদি' বললে, "যদি নিজেরা জেনে-শুনে নিজেরাই পছন্দ করে বিয়ে করে।"

"কিন্তু দু'দিন বাদে তো অরুণ গুপ্ত অমিতার দিকে ফিরেও তাকাবে না তা'র অন্য বৌয়েদের মতো!"

সাধনাদি' দার্শনিকের মতো বললে, "অনেকের কাছে দু'দিনের সুখের দাম চিরদিনের দুঃখের থেকে অনেক বেশী সলিল।"

কিছু বলতে পারলুম না আমি। সাধনাদি' আস্তে আস্তে আমার হাতটি তার নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলো। বলল, "এর জন্যে দুঃখ করছো কেন সলিল, জীবনে যা পেলে না তাকে যদি এতো বেশী দাম দাও, যা পেলে তার দাম যে খুব সস্তা হয়ে যাবে।"

আমি কিছু বললুম না।

সাধনাদি' বললে, "ওদিকে একটি ট্র্যাজিক ড্রামা হচ্ছে দেখ।"

ওদের টেবিল বেশ কিছু দূরে, শোনা গেল না কোনো কথা। শুধু দেখলুম বন্দনার কঠিন সহানুভূতিহীন মুখে একটি হৃদয়হীন বাঁকা হাসি কাস্তের মতো ধারালো।

একটি হাত বুকে রেখে আরেকটি হাত আকাশের দিকে তুলে করুণ মুখ করুণতম করে অনেক কথা বলল শঙ্কর।

সব শুনে ঘাড় নাড়লো বন্দনা। তারপর উঠে চলে গেল।

শঙ্কর পাথর হয়ে বসে রইলো। তারপর যা' তাকে কোনো দিন করতে দেখিনি তাই করতে দেখলুম। বয়কে ডেকে সে একটি বড়ো পেগ হুইস্কির অর্ডার দিলে।

সাধনাদি' হেসে ফেলল, বললে, "চলো, আর কিছু দেখবার নেই এখানে।"

বাইরে আসতে দেখি বন্দনা একা একটি ট্যাক্সিতে উঠে পড়লো।

পথে সাধনাদি'র গাড়ি অতিক্রম করলো ট্যাক্সিকে। দেখলুম চোখে রুমাল চাপা দিয়ে বসে আছে বন্দনা।

* * * *

মাসখানেক পরে বন্দনা মাদ্রিদ রওনা হোলো। সারাসেনিক আর্টের উপর রিসার্চ করবে সেখানে।

মাষ্টার মশাই একগাল হেসে বললেন, "পাঠিয়ে দিলুম পাগলীকে। এখানে বড্ডো দুষ্টু হয়ে উঠেছিলো।"

আমরা কোনো কথা না বলে চায়ের কাপে চুমুক দিলুম।

"শঙ্করটা কই রে, ও আসে না কেন আজকাল," মাষ্টার মশাই জিজ্ঞেস করলেন।

সাধনাদি' আস্তে আস্তে বললে, "ও দেবদাস হয়ে উঠবার চেষ্টা করছে।"

"তাই নাকি রে?" মাষ্টার মশাইর হাসিতে ছাদ প্রায় ধ্বসে পড়ে-পড়ে। যেন খুব মজার কথা। "পাগল। তোরা সব আজকালকার ছেলেরা বদ্ধ পাগল। শোন তা'হলে। আমার নিজের জীবনের দু'-একটা মামুলী বাত শোন। তবে খবরদার সলিল, আমার জীবনী লিখলে এসব কথা লিখবি না যেন।—আচ্ছা, না, লিখিস, লিখিস। সত্যি কথা লেখা দরকার, লেখার হিম্মতও থাকা দরকার আর বলার হিম্মত বিভূতি মজুমদারের না আছে তো. কার আছে বল? তবে যাদের কথা বলছি ওদের নাম ধাম পাত্তা লিখবি না যেন।"

অগ্রজীর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সেবার যখন পুরীতে বেড়াতে গেছিলুম আমার সঙ্গে খুব দোস্তি হোলো প্রতিমা ব্যানার্জীর সঙ্গে। ও এখন সিভিল সার্জন সুশান্ত মুখুজ্যের বৌ। ওর মেয়েকে হয়তো চিনবি, তোদের সঙ্গে যে পড়তো অমিতা, সে। খুব দোস্তি তার সঙ্গে। সকাল-সন্ধ্যে সমুদ্রের পাড়ে হাওয়া খাই, ফিলসফির বোল-চাল শুনাই। দুনিয়াটা যে বিভূতি মজুমদারের জন্তে ইনতেজার করছে তাই বলি। বাঙলা সংস্কৃতির মোদ্দা কথা যে বিভূতি মজুমদারের এক নতুন দর্শন—যেটা তখনো পয়দা হয়নি—সে কথা সমঝাই।

তারপর তো কলকাতায় ফিরে এলুম। তখন কি হোলো জানিস। কী যে মেয়েদের ঝুটা দিল বুঝিনে, যতো দুর্বলতা দুনিয়ার যতো বখাটে গুণ্ডা চোয়াড় ছেলেদের জন্তে। সেই যে সেন্টার ফরওয়ার্ড হিমাদ্রি গুপ্তের কথা বলছিলুম, তার ফুটবলের একটা কিক্ দেখে বেমালুম বিভূতি মজুমদারের দর্শন ভুলে গেল। আমি বললুম, "যা, বেটি, যেখানে যাবি যা, যা করবি কর।" তোর মতো লেড়কি বাঙলা দেশে লাখ লাখ মিলবে, কিন্তু বিভূতি মজুমদার বাঙলা দেশে পয়দা হবে এই একটাই।

তারপর কি করলুম জানিস? তখনো তোদের শরৎ চাটুজ্যে দেবদাস লেখেনি। আমি শুরু করলুম জোর পড়াশুনো, আগে যা করতুম তার চার ডবল। আর ভাবলুম বিভূতি মজুমদার অনেকের কাছে গেছে। আর নয়। এবার তোরা আয় আমার কাছে। কে আছিস বাপের বেটি চলে আয়। বিভূতি মজুমদার তোদের দু'হাতে কাঁচকলা দেখিয়ে দেবে, তাই দেখে যা।

একদিন এলো। কে এলো জানিস? সেই প্রতিমা ব্যানার্জীই এলো। হিমাদ্রি তার বাপের কথা মতো সুবোধ বালকটি হয়ে এক পাড়াগাঁয়ের মেয়েকে বিয়ে করলে। কিন্তু বিভূতি মজুমদার কি আর ওসব ফাঁদে পা দেয় রে? কতো চোখের জল ফেললে সে, তা ফেল, যতো ফেলবি ফেল, তোদের চোখের জল সস্তা হতে পারে, কিন্তু বিভূতি মজুমদারের ফিলসফির দাম আছে, সেটা তোরা দিতে পারবি না।

তারপর এলো কমলা সান্ন্যাল। খুব নামজাদা ডাক্তার এখন। এখন তার যতো নাম, তখন তার বদনাম ছিলো ততো। আজ এই ছেলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাল ওই ছেলের সঙ্গে। কতো ছেলের যে মাথা চিবিয়ে খেয়েছে, কতো ছেলের সর্বনাশ করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। আমি বললুম, "আয়, তোকেও সমঝিয়ে দিই বিভূতি মজুমদার কী চীজ।"

সেই কমলি আমার কাছে এসে জল হয়ে গেল। আমি যখন বিলেত চলে যাচ্ছি, কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। বললুম, "তুই কে রে? দুনিয়া বিভূতি মজুমদারের জন্তে বসে আছে, তুই আমায় তোর আঁচলে বেঁধে রাখবি, কী শখ রে তোর?" আমি ফিরেও তাকালুম না। চলে গেলুম। বললুম, এবার বোঝ, কতো ধানে কতো চাল বোঝ। এতো ছেলের বুক ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিস, তোর মন যে লোহায় তৈরী নয় সেটা এবার বোঝ। যদি বুঝিস তো আমি বিভূতি মজুমদার আশীর্বাদ করে যাচ্ছি, জীবনে উন্নতি করবি। জীবনে উন্নতি সে করলোও।"

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন মাষ্টার মশাই। তারপর জানালা দিয়ে দূরের খাটালের মোষগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "মেয়েটি বড়ো ভালবাসতো আমায়।"

তারপর বললেন, "নে, নে, চা' খা। এ যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। আর কাপ করে ঢেলে নে।"

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, "সেবার বিলেত যাওয়ার পথে মার্সাইতে জাহাজে উঠলো ডলোরেস। স্প্যানিশ মেয়ে, সেও পড়াশুনো করতে যাচ্ছে বিলেতে। অবাক হয়ে দেখলুম আমি কিছু বলার আগেই সে আমার ফিলসফি বুঝে নিলে।

ফেরার পথে আবার আমারই সঙ্গে সে ফিরলো, একেবারে এই বাঙলা মুল্লুকে, মিসেস্ মজুমদার হয়ে।

রান্নাঘরে মিসেস্ মজুমদার রান্নার তদারক করছিলেন।

সেদিকে তাকিয়ে মাষ্টার মশাই বললেন, খুব কোমল, ভেজা ভেজা গলায়, "জীবনের কাছে আমি ঠকিনি।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিলেন মাষ্টার মশাই। হাসতে হাসতে বললেন, "জীবনটা বড্ডো মজার। যাদের নিয়ে আমাদের সেই দিনগুলো, তাদেরই ছেলেমেয়ে হয়ে তোরা আবার একই প্যাঁচে জড়িয়ে পড়বি কে ভেবেছিলো?"

চলে আসবার সময় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন মাষ্টার মশাই। শেষ কথা যেটা বললেন সেটা হোলো, "অরুণ গুপ্তের এতো রাগ কেন আমার ওপর জানিস? সে হিমাদ্রি গুপ্তের ছেলে বলে।"

হাসতে হাসতে দরজা বন্ধ করে দিলেন আমাদের পেছনে।

পথে নেমে একটু হেসে সাধনাদি' বললে, "একটা মজার ব্যাপার কি লক্ষ্য করছি, জানো? মাষ্টার মশায়ের জীবনের সঙ্গে মাষ্টার মশায়ের মেয়ের জীবনের অনেকখানি মিল।"

আমি গম্ভীর হয়ে বললুম, "অমিল আরো বেশী।"

* * * *

কলকাতার একটি বিখ্যাত মাসিকপত্রে বন্দনার লেখা প্রবন্ধ বেরুতো মাঝে মাঝে। সে বিদেশে যাওয়ার পথে ভ্রমণকাহিনী-গুলিও নিয়মিত ছাপা হতে লাগলো সেখানে, তবে সেগুলো প্রবন্ধ হয়ে আসতো না, আসতো বাপের কাছে চিঠি, বাপ সেগুলো পাঠিয়ে দিতেন মাসিকে। ক্রমে ক্রমে বাপ আর চিঠি পড়তেন না, মাসিকে ছাপা হলে পরে ছাপার অক্ষরে পড়তেন, সম্পাদকও আর পড়ে দেখতেন না, সোজাসুজি পাঠিয়ে দিতেন প্রেসে।

তারপর আমরা সবাই দল বেঁধে সেই প্রবন্ধ পড়তুম।

একদিন সেখানেই কেলেঙ্কারী হোলো।

"বাপি ডার্লিং—

এই চিঠি ছাপানোর জন্যে নয়। এটি তোমার জন্যে। আমি জানি তুমি আমাকে ক্ষমা করবে।

জাহাজে আসতে আসতে একজন স্প্যানিশ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো। চমৎকার লোক···।

পরে শুনি সে স্পেনের বিখ্যাত বুল-ফাইটার সেনর আঁদ্রে রিফানো।

বাঙালী মেয়ের মুখে নিখুঁত স্পেনিশ শুনে সে মুগ্ধ। পরে যখন শুনলো আমার মা স্পেনিয়ার্ড সে খুব খুশী। সেদিন সমুদ্রের বুক থেকে যখন রূপোর থালার মতো চাঁদ উঠলো, সে গীটার বাজিয়ে আমাকে স্পেনিশ গান শোনালো কয়েকটি। অদ্ভুত ভালো গানও গায় সে।

মাদ্রিদে এসে দেখি এদেশে বুল-ফাইটারের সম্মান পণ্ডিত মনীষী লীডার সায়েণ্টিষ্টদের থেকেও বেশী। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর পর আর কারো জন্যে যদি স্পেনিয়ার্ডরা পাগল তো সে বিখ্যাত বুল-ফাইটার সেনর আঁদ্রে রিফানো।

সেদিন আলফন্সো ষ্টেডিয়ামে ওর বুল-ফাইট দেখলুম। মেডেল-ঝোলানো জমকালো জামা পরে যে কী চমৎকার তাকে দেখাচ্ছিলো! একটি লাল সিল্কের কাপড় নেড়ে সে ক্ষেপিয়ে পাগল করে তুললে একটি উন্মত্ত ষাঁড়কে। তলোয়ারের খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত করে তুললো তাকে। সে যতো বার আঁদ্রেকে শিং বাগিয়ে আক্রমণ করলো ততো বার অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় তাকে এড়িয়ে তাকে জখম করলে আঁদ্রে। আর চারিদিকে লাখ লাখ দর্শকের উন্মত্ত হাততালি। তুমি যদি দেখতে তো গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতো তোমার।······

বাপি, রাগ করবে না? কাল আমি আঁদ্রেকে বিয়ে করেছি।···

রোববার দিন আমরা বার্সিলোনায় আঁদ্রের মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। ফিরে এসে ওদের কথা লিখবো তোমায়।

তোমার ডার্লিং—
বন্দনা"

স্তব্ধ হয়ে গেলুম আমরা।

সম্পাদক আস্তে আস্তে বললেন, "দোষ আমারই। না দেখে ছেপে ফেলেছি।"

মাষ্টার মশায় কিছু বললেন না।

সম্পাদক বললেন, "কয়েকশো কপি মোটে গ্রাহকদের কাছে চলে গেছে। বাজারে আর কপি ছাড়বো না।"

মাষ্টার মশাই বললেন, "না, যেমন বাজারে ছাড়ো, তেমনি ছেড়ে যাও। বই আটকে রেখো না।"

"কিন্তু মিস্ মজুমদারের চিঠিটা—"

"হয়েছে কি তাতে?" ফেটে পড়লেন মাষ্টার মশাই। "কে মিস্ মজুমদার? আমি তাকে চিনি না। ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করে যেই ষাঁড়, সেই ষাঁড়কে বিয়ে করেছে যেই গরু, সেই গরুকে আমি মেয়ে বলে স্বীকার করি না।"

সেদিন থেকে বন্দনার নাম মুখেও আনেননি মাষ্টার মশাই। ওর যতো চিঠি এসেছে, না পড়েই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছেন সব।

বিশ্ববিদ্যালয় মহলে সেই উল্লাসাদের চোরা বিদ্রূপের হাসিও

বহুমূত্র
সাতদিনেই
আরোগ্য হয়।

যত জটিল বা দীর্ঘদিনের হউক না কেন অধুনাতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার "ভেনাস চার্ম" ব্যবহার করিলে বহুমূত্র DIABETES সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হয়। এই রোগের প্রধান প্রধান উপসর্গ-সমূহ: যথা—অস্বাভাবিক তৃষ্ণা, ক্ষুধা, প্রস্রাবে অতিরিক্ত চিনি এবং চুলকানি প্রভৃতি। এই রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করিলে কার্বাঙ্কল, ফোঁড়া, ছানি এবং অন্যান্য জটিলতা দেখা দেয়। হাজার হাজার লোক "ভেনাস চার্ম" ব্যবহার ক'রে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাইয়াছে। ব্যবহারের পরের দিন থেকেই প্রস্রাব হইতে চিনি দূরীভূত হয় ও প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। মাত্র ২।৩ দিনের মধ্যেই আপনি যে অর্দ্ধেকের বেশী নিরাময় হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিবেন। খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে কোন বিধি-নিষেধ নাই। ঔষধের বিবরণাদি সম্বলিত বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য পুস্তিকার জন্য লিখুন:—প্রতি ৫০টি ট্যাবলেটের শিশির মূল্য ৬৷৹, ডাকমাশুল ফ্রি।

ভেনাস রিসার্চ ল্যাবরেটরী
হইতে প্রাপ্তব্য।
পোষ্ট বক্স ৫৮৭, কলিকাতা (M.B.)

আর সহ্য হয়নি তাঁর। কিছুদিনের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরী।

আমাদের সঙ্গেও দেখাশুনো করা ছেড়ে দিলেন একেবারে। তাঁর বাড়ির দরজা সবার কাছে বন্ধ হয়ে গেল চিরদিনের জন্যে।

তবে শুনলুম তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা ছিলো শঙ্কর, তাঁর প্রথম জীবনের স্মরণময়ী অঞ্জলীর ছেলে। শঙ্কর ভালো রেজাল্ট করেছিলো এম-এ'তে। নিজের প্রভাব খাটিয়ে একটি সরকারী বৃত্তি পাইয়ে দিলেন তাকে। সে ইকনমিক্স পড়তে বিলেত চলে গেল।

কিছুদিন পরে মাষ্টার মশাই নিজেও কানাডা চলে গেলেন অটাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী নিয়ে।

* * * *

বছর ঘুরে গেল, মাষ্টার মশায়ের খবর মাঝে মাঝে বেরুতো সংবাদপত্রে। দু'-তিনটা গবেষণামূলক বই বেরিয়ে গেছে তাঁর। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন তিনি। অজস্র সম্মান পেয়েছেন বিশ্বের বিদ্বান সমাজে। সরকারী স্বীকৃতি না পেলেও-ভারতের সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূতের সুকঠিন দায়িত্ব তিনি সাফল্যের সঙ্গে পালন করে যাচ্ছেন বাইরের পৃথিবীর কাছে ভারতীয় সংস্কৃতির ও সভ্যতার বাণী শুনিয়ে।

কিন্তু এদিকে কলকাতায় তাঁর খবর খুব বেশী রাখলো না কেউ। বাজারে জিনিষপত্রের দাম আকাশ ছুঁয়ে গেল। বেকার সমস্যায় নিপীড়িত হয়ে গেল বাঙলার মধ্যবিত্ত সমাজ। আধো অন্ধকার রান্নাঘরগুলোর মধ্যে নিরুপায় মধ্যবিত্ত বধূর করুণ ইতিহাস সৃষ্টি হয়ে চলল দিনের পর দিন। ঘোলাটে হয়ে উঠলো দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি।

* * * *

সারাদিন কাজকর্ম করে বাড়ি ফিরতুম অনেক রাত্তিরে। এসেই ঘুমিয়ে পড়তুম ক্লান্তির অবসাদে।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি শঙ্করের একখানি চিঠি। আগের দিন এসে পড়ে আছে।

চিঠিখানি পড়ে তক্ষুনি ছুটলুম সাধনাদি'র কাছে।

দেখি খবরের কাগজখানি হাতে নিয়ে খুব বিমর্ষ হয়ে বসে আছে সাধনাদি'।

বললুম, "এই দেখ, শঙ্করের চিঠি। পড়ো।"

"আজকের কাগজ পড়েছো?" সাধনাদি' জিজ্ঞেস করলো।

"পরে পড়বো। আগে চিঠিটা পড়ো।"

"তুমিই শোনাও পড়িয়ে," সাধনাদি' বললে।

পড়লুম।

"ভাই সলিল,

অনেকদিন পর তোমার কাছে চিঠি লিখছি। লিখছি এ জন্যে যে খবরটি শুনলে তোমরা খুসী হবে।

সেদিন একটি ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোরে গিয়ে হঠাৎ দেখা হোলো—কার সঙ্গে বলো তো?—বন্দনার সঙ্গে। সে অল্পদিন হোলো লণ্ডনে এসে সেল্‌সগার্ল'এর চাকরী নিয়েছে।

আমায় দেখে তার চোখের জল বেরিয়ে এলো।

তার কথা শুনলে তোমাদের চোখেও জল আসবে। মাস কয়েক আগে তার স্বামী আঁদ্রে ষ্টিফানো ষাঁড়ের গুঁতো খেয়ে মারা গেছে। তারপর বড়ো দুঃখে পড়েছিলো সে। স্বামীর আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে বাড়ি থেকে বার করে দেয়। একটা চাকরী নিয়েছিলো মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু স্পেনের জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে কানাডায় মাষ্টার মশায়ের কয়েক মন্তব্য মাদ্রিদের সরকারী মহলের কানে ওঠার পর, সে আর ওদেশে টিকতে পারলো না। একেবারে নিঃসম্বল হয়ে তাকে বেরিয়ে আসতে হোলো। লণ্ডনে এসে সে চিঠি লিখেছিলো মাষ্টার মশাইকে। কিন্তু মাষ্টার মশাই কোনো উত্তরই দেননি। বোধ হয় পড়েও দেখেননি তার চিঠি। তাই নিরুপায় হয়ে বন্দনাকে এই সামান্য চাকরী নিতে হয়।

সেদিন হাইড পার্কে একটি অদ্ভুত মিষ্টি সন্ধ্যা কেটেছে আমাদের।

আমি বিয়ে করছি বন্দনাকে। এদিকের ব্যবস্থা করে শীগগিরই মাষ্টার মশাইকে চিঠি লিখবো। আমি বন্দনাকে বিয়ে করছি শুনলে উনি খুবই খুসী হবেন। ওঁর কোনো রাগ থাকবে না বন্দনার ওপর। বন্দনাকে বড়ো ভালোবাসেন উনি।

আমরা বিয়ে করে সুইটজারল্যাণ্ড যাচ্ছি। বন্দনার মা আছেন সেখানে। বোধ হয় জানো না পেটে একটি অপারেশান হওয়ার পর তিনি স্বাস্থ্যপরিবর্তনের জন্যে সেখানে আছেন।

মাষ্টার মশাই মেক্সিকো এবং ইউ-এস-এ ঘুরে আবার অটাওয়ায় ফিরে এসেছেন।

সুইটজারল্যাণ্ড থেকে আমরা হয়তো কানাডায় যাবো।

আমার ভালবাসা জেনো। সাধনাদি'কে আমার প্রীতি জানিও। আজ এখানেই থামছি, পরে আরো লিখবো।—ইতি

শঙ্কর।"

সাধনাদি' খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে কাগজটা এগিয়ে দিলো আমার দিকে, বললে, "প্রথম পাতায় ডানদিকের কলমের শেষদিকটা পড়ো।"

পড়ে আমার হাত থেকে কাগজটা পড়ে গেল।

রয়টারের একটি পাঁচ লাইনের খবর—"গতকাল বিখ্যাত ভারতীয় দার্শনিক অধ্যাপক ডক্টর বিভূতি মজুমদারের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর শেষ সময়ে পরিজনবর্গ কেউই কাছে ছিলো না। মিসেস্ মজুমদার রয়েছেন সুইটজারল্যাণ্ডে। তাঁর মেয়ে বিখ্যাত বুল-ফাইটার স্বর্গীয় আঁদ্রে ষ্টিফানোর পত্নী সেনোরা বন্দনা ষ্টিফানো রয়েছেন মাদ্রিদে। অটাওয়ার ভারতীয়েরা তাঁর যথাযোগ্য অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।"

আরো বড়ো খবর ছিলো সেদিনকার কাগজে। উত্তর কোরিয়ান সেনা দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করেছে। সারা পাতা জুড়ে তারই বিবরণ।

এক কোণের একটি পাঁচ লাইনের খবর হয়তো সেদিন চোখে পড়বে না অনেকেরই।

আমার শ্রেষ্ঠ লেখা

"বৃক্ষবন্দনা ও বর্ষশেষ দুটি আমার আধুনিক সব লেখার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি।"

—রবীন্দ্রনাথ।

রক্তবীজ

রমাপদ চৌধুরী

নীলিমা মনে মনে ভেবেছিল চাকরীটা নিশ্চিত হয়ে যাবে। এর আগেও দু'-চার দিন এসে দেখা করে গিয়েছিল ও ছোট সাহেবের সঙ্গে, আভাষে ইঙ্গিতে এটুকু স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলো মিষ্টার ব্যানার্জ্জি, যে ভ্যাকান্সি যদি হয় আর নীলিমা যদি ইণ্টারভিউ পায় তা হ'লে চাকরীটা তারই জন্যে তোলা থাকবে। এমন কি, এর আগের সপ্তাহে যখন নীলিমা রুটিন মাফিক মনে পড়াতে এসেছিল তখনও ব্যানার্জ্জি বলেছিল, বেশি দেরী নেই আর, বড়ো সাহেব মিষ্টার গাঙ্গুলী স্বয়ং চেষ্টা করছেন একটা ভ্যাকান্সি তৈরী করবার জন্যে।

কিন্তু কোত্থেকে কি হয়ে গেল! পাঁচ মিনিট আগেও নীলিমা ভাবতে পারেনি, যে-চাকরীর জন্যে মাসের পর মাস রোদে পুড়ে জলে ভিজে এর-ওর-তার তাঁবেদারী করে বেড়িয়েছে ও, কাউকে ঠাণ্ডা কথায়, কাউকে মিষ্টি হাসিতে আর কখনো বা অনুনয়ে আব্দারে মন ভুলিয়ে যে-চাকরী পাবার স্বপ্ন দেখেছে ও এতদিন, তারই এপয়ণ্টমেণ্ট লেটারটা ও এমন ভাবে ছিঁড়ে কুচি-কুচি করে ফেলে দেবে!

যথারীতি সাজগোজ করে কাঁধে সাদা ফুটফুটে সাদা চামড়ার ব্যাগ ঝুলিয়ে ও যখন বড়ো সাহেব মিষ্টার গাঙ্গুলীকে নমস্কার করলো তখন এতটুকু হাত কাঁপেনি ওর, কার্পেট-বিছোনো মেঝে পার হয়ে বড়ো সাহেবের টেবিল অবধি হেঁটে যেতে পা টলেনি একবারও। বেশ সপ্রতিভ ভাবেই সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ও, 'বসতে পারি?' জিগ্যেস করেছিল মোলায়েম গলায়, আর গাঙ্গুলী সাহেবের "নিশ্চয়, নিশ্চয়, বসুন আপনি বসুন, মাফ করবেন, কাজের তাড়ায় ভুলেই গিয়েছিলাম" ধরণের উচ্ছ্বাসমুখর ভদ্রতায় ও একটুও বিগলিত না হয়ে প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছিল।

তার পর গাঙ্গুলী সাহেব জিগ্যেস করেছিলেন, তা হ'লে কবে থেকে আপনি জয়েন করতে পারবেন?

নীলিমা হেসে বলেছিল, যদি বলেন তো আজ থেকেই।

—না, না। আপনাকে তৈরী হয়ে নেবার জন্যে কিছু সময় দিতে হবে তো। আপনি বরং নেক্সট উইক থেকে···

—বেশ তো তাই আসবো। নীলিমা খুশিমুখেই জানিয়েছিল।

—কিন্তু আপনার টার্মসগুলো বোধ হয় ঠিক জানেন না। মানে, এই পোষ্টটা আমাকে হেড আপিসে লিখে নতুন করে ক্রিয়েট করতে হ'ল কি-না, তাই এখন মাইনেটা একটু কম।

নীলিমা বিনীত হবার চেষ্টা করেছিল, অভাবের সংসারে তবু তো কিছুটা কষ্ট কমাতে পারবো, মাইনে যা হোক্···

গাঙ্গুলী তা সত্ত্বেও মুখ কাঁচুমাচু করে বলেছিল, না, মানে এখন অবিশ্যি পঁচাত্তর টাকা দিচ্ছে, তবে দু'-এক মাসের মধ্যেই যাতে অন্ততঃ একশো হয় তার চেষ্টা আমি করবো। তা ছাড়া আপনার দাদা আমার বন্ধু ছিলেন, তিনি আজ নেই বলেই তো আর সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়নি?

—তার পরিচয় তো আপনি দিয়েছেন। এত ঘোরাঘুরি করে তো দেখলাম, আজকের দিনে চাকরী দেয়া সহজ নয়। আপনি আমার জন্যে যথেষ্ট করেছেন।

কথা কেড়ে নিয়ে গাঙ্গুলী বলেছিল, সেই কথাই বলছি। এখন এই মাইনেতে ঢুকলে, দু' মাসের মধ্যেই একটা লিফ্‌ট হয়ে যাবে। আর তা ছাড়া আমেরিকান কোম্পানীর আপিস, খেয়াল-খুশি মাফিক মাইনে বাড়ায় ওরা।

—আমার এখন পঁচাত্তর টাকা হ'লেই যথেষ্ট, না বাড়লেও ক্ষতি নেই। গাঙ্গুলীকে এত বেশি লজ্জিত হতে দেখে নীলিমা বলতে বাধ্য হয়েছিল।

আর গাঙ্গুলী এপয়ণ্টমেণ্ট লেটারটা নীলিমার হাতে দিয়ে বলেছিল, এটা আর পোষ্টে পাঠিয়ে কি হবে, ডাকের গোলমালে হারিয়ে যেতে পারে। তা হ'লে নেক্সট উইক থেকেই। কেমন?

কাগজটা হাতে নিয়ে নমস্কার করে উঠে দাঁড়িয়েছিল নীলিমা।—আচ্ছা নমস্কার। আসি তবে।

—হ্যাঁ। নেক্সট উইক থেকে। সোমবারই জয়েন করছেন তা হ'লে? বেশ। তার পর গাঙ্গুলীও উঠে দাঁড়িয়েছিল, বলেছিল, পঁচাত্তর থেকে একশো করে দেব বলছি, পাঁচশোও হয়ে যেতে পারে, কি বলেন? বলে হেসে উঠেছিল।

বিস্মিত সস্মিত চোখে ফিরে তাকিয়েছিল নীলিমা।

—বুঝলেন না? যেমন ব্যাপার-স্যাপার দেখছি, যুদ্ধ তো লাগলো বলে, একবার যুদ্ধটা লাগলেই দেখবেন আমাদের সকলেরই বরাত খুলে যাবে। আমেরিকান কোম্পানী, বুঝলেন না, পঁচাত্তর থেকে পাঁচশো হয়ে যাবে দু'দিনে। হো-হো করে প্রাণ খুলে হেসে ওঠে গাঙ্গুলী, আর পরমুহূর্ত্তেই নীলিমার চোখে চোখ পড়তেই হা··· মিলিয়ে যায় তার মুখ থেকে।

দুর্ব্বোধ্য বিস্ময়ে কিছুক্ষণ গাঙ্গুলীর মুখের দিকে ··· থাকে নীলিমা, আর ক্রমশঃ ওর চোখের তারায় যে··· বিরক্তি, ঘৃণা, ক্রোধ ধীরে ধীরে এসে জমা হয়। ··· ওর চোখের নরম পাপড়ির আড়ালে আড়ালে দু'··· হয়তো!

একদৃষ্টে বহুক্ষণ গাঙ্গুলীর মুখের দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকি··· থাকে নীলিমা, তারপর খুব ধীর-সুস্থির হাতে আস্তে আ··· এপয়ণ্টমেণ্ট লেটারটা একবার ভাঁজ করে, ছিঁড়ে ফেলে, আ··· ভাঁজ করে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলে, মাফ করবেন আমাকে, এ চাক··· আমি নিতে পারবো না। বলেই দ্রুত-পায়ে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নেমে পড়ে। যুদ্ধ, যুদ্ধ—একটা শব্দই বার বার ওর কানের চার পাশে ঘুরে বেড়ায়। যা ভুলে যেতে চায়, যা মুছে ফেলতে চায়, বারংবার তারই মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। আশ্চর্য্য!

স্বামী ওষুধ পাবে না, পথ্যি পাবে না। মণ্টুর ছ' বছর বয়েস হ'ল, এখনো ইস্কুলে ভর্ত্তি করা গেল না। ফুনির জন্যে নতুন একটা ফ্রক কেনা দরকার, উপায় নেই। দেওর হয়তো ফি দিতে পারবে না পরীক্ষার, আর ধার-ধোর করে ফি যদি বা জোটে তো সাত মাসের কলেজের বাকী মাইনেটা মেটাতে পারবে না। তা হোক্।

চাকরীটা না নিয়েও ভালই করেছে, ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরলো নীলিমা। বাসাই বটে। ট্রাম-লাইন থেকে পুরো পঁচিশ মিনিট ধরে এগলি-ওগলি করে উনবিংশ শতাব্দীর স্মৃতিমুখর একটি বিরাট পুরোনো পচা ধ্বসা প্রাসাদের দেয়ালে কাঁধ ঘষে ঘষে সরু একটা জ'লো গলি পার হয়ে ঘুঁটে-গোবরের নোংরা দুর্গন্ধ সহ্য করে

দু'টো পরিবারের অন্দর ডিঙিয়ে তবে ওদের ছোট্ট বাসা। এর চেয়ে বস্তির ঘরও হয়তো ভাল ছিল। ভাড়াও হয়তো কম হ'ত। কিন্তু, যে পথেই পা ফেলতে গেছে নীলিমা সেখানেই একটা বড়ো হরফের 'কিন্তু' এসে নাক ঢুকিয়েছে। সত্যি, উপকার পাবার মত, সাহায্য পাবার মত লোক আজ খুব কমই আছে নীলিমার, তবু এখনো তো পুরোনো দিনের অনেকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, আত্মীয়-স্বজনদের কেউ কেউ এখনো তো হঠাৎ এসে হাজির হয়, খোঁজ-খবর নেয়। তাই বস্তিতে উঠে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না নীলিমা। তার চেয়ে···

জুতো-জোড়া খুলে সযত্নে কাগজের বাক্সটায় ভরে কুলুঙ্গিতে তুলে রাখলে নীলিমা, ব্যাগটা ভরলে ভাঙা ট্রাঙ্কের ভেতর, শাড়ী আর ব্লাউস বদলে সে দু'টো ভাঁজ করে বিছানার বালিশের তলায় রাখলে—তিন মাস আগের ইস্ত্রির পালিশটা যাতে নষ্ট না হয়। ইতিমধ্যেই স্বামীর সঙ্গে দু'-এক বার দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল নীলিমার, রুগ্ন অসহায় দু'টো চোখ কি একটা প্রশ্ন করতে যেন ভয় পাচ্ছে।

—নাঃ, হ'ল না। ওরা অন্ত লোক নিয়েছে। একটু হাসবার চেষ্টা করে স্বামীর পায়ের কাছে এসে বসলো নীলিমা।

মৃন্ময় ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসে আরো ম্লান হয়ে গেল। বালিশে ভর দিয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করলো, পারলো না। পায়ের কাছ থেকে এগিয়ে এলো নীলিমা, মৃন্ময়ের মাথায় হাত রাখলে। সত্যি, এ রোগ-রাল্লা'র ব্যথা-কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে আর কত দিন কাটাতে হয়ে চ৬ওকে? ক্রমশঃই যে বিছানার সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে মৃন্ময়! রাজনীতি।তা। তিন মাস হয়ে গেল, আর তো এক্স-রে নেয়া হ'ল •'ল না ডাক্তারকে। ডাক্তারকে খবর দিলে সে আসতো সারাদিন চাওয়া দূরের কথা, নিজের থেকেই বলতো টাকা দিতে এসেই মা। কিন্তু সে তো মৃন্ময়কে বাঁচাবার জন্তে আসতো না, আসতো মৃন্ময়ের আয়ু কমিয়ে দেবার জন্তে। অন্ত ডাক্তার ডাকার কথাও ভেবেছে নীলিমা, ফিয়ের টাকাও জোগাড় করেছে, কিন্তু—গন্ত ডাক্তার আর এক্স-রে তো রোগ সারাতে পারে না? রোগ সারাবার ওষুধের দাম কোথায় পাবে ও, এ রোগের পথ্যিই বা জুটবে কোত্থেকে!

মৃন্ময় অনেকক্ষণ চুপ করে পড়ে থেকে হঠাৎ বললে, সানুর তো এমনিই পরীক্ষা দেয়া হবে না, ঐ একটা চাকরীর চেষ্টা করুক না?

নীলিমা হাসলে।—ঠাকুরপো চাকরী করবে? পনেরো বছরের একটা ছেলেকে কে চাকরী দেবে? আর আমিই যখন পাচ্ছি না, ও পারে কি করে?

পাশের ঘরে পড়ছিল সানু, ওদের কথা শুনে বই বন্ধ করেছিল। এবার উঠে এলো সে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

নীলিমা হেসে হাল্কা হবার চেষ্টা করলে।—কি ঠাকুরপো! পরীক্ষার ফি? মন দিয়ে পড়ো ভাই, সময়ে ঠিক জোগাড় করে দোব।

—না বৌদি, পরীক্ষা এবার আর দোব না। দিলে ফেল করবো। তার চেয়ে টাকাটা নষ্ট না করে আমি বরং একটা টুইশনি নিই। বিজন বলছিল, ওর এক ভাই ক্লাশ থ্রিতে পড়ে···

নীলিমা ধমক দেয়, খুব হয়েছে, তুমি এখন পড়তে যাও তো। পরীক্ষা দিতে না করতে হয় ক'রো।

সানু মাথা হেঁট করে সরে যায়, আবার বই নিয়ে বসে।

মৃন্ময় বলে, ও বেচারীকে বকলে কেন? সত্যিই তো, ও যদি কিছু রোজগার করতে পারে।

—হ্যাঁ, রোজগার করবে ঠাকুরপো। আজ দশটা টাকা পেলেই সব সমস্তা মিটবে, নয়? তারপর? ওর ভবিষ্যৎটা ভাবছো না কেন? আর, আর আমরাও তো ওর মুখ চেয়েই আছি। ভবিষ্যতে ঐ হয়তো আমাদের সুদিন আনবে।

—ভবিষ্যৎ! বিষণ্ন হাসি হাসলে মৃন্ময়। —সত্যি, ভবিষ্যৎ ছাড়া আর গতি কি, কে-ই বা চাকরী দিচ্ছে ওকে! নাঃ, যুদ্ধ-টুদ্ধ না লাগলে আর···

কথা শেষ করতে পারলো না মৃন্ময়। নীলিমা চিৎকার করে উঠলো হঠাৎ, চুপ করো, চুপ করো তুমি।

চমকে উঠলো মৃন্ময়। অর্থহীন ভাসা-ভাসা দু'চোখ মেলে ব্যথাহত দৃষ্টিতে তাকালো ও নীলিমার দিকে। দেখলে নীলিমার চোখে আক্রোশের আগুন।—চুপ করো, চুপ করো তুমি। ও কথা কোন দিন তুলো না তুমি, কোন দিন না। চিৎকার করে ধমক দিয়ে উঠলো নীলিমা। তারপর মৃন্ময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে লজ্জায় বিস্ময়ে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে মৃন্ময়, অসহায় শক্তিহীন দু'চোখের কোণ বেয়ে অভিমানের অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

লজ্জায় দুঃখে নীলিমার মুখ সাদা হয়ে গেল। ছি ছি! এ কি করলো সে। কত দিন, কত বছর কেটে গেছে এই দারিদ্র্যের মধ্যে, এমনি ব্যর্থতার মধ্যে, কৈ কোন দিন তো ধৈর্য্য হারায়নি ও? এমন কি গাঙ্গুলীর কথা শুনে ও যখন এমনি আক্রোশে ফেটে পড়েছিল ভেতরে ভেতরে, তখনো তো বাইরে কোন চাঞ্চল্য, কোন অধৈর্য্য দেখায়নি ও? অনেক শান্ত স্বরে জবাব দিয়েছিল, অনেক ধীর হাতে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল কাগজটা।

অথচ।

আস্তে আস্তে মৃন্ময়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে নীলিমা, মৃন্ময়ের কপালে ঠোঁট ছোঁয়ালে, তারপর হাসবার চেষ্টা করে বললে, রাগ করলে? লক্ষ্মীটি, শোনো, রাগ কোরো না, চোখ তোলো, তাকাও আমার দিকে, তাকাও তুমি। সত্যি, সারা দিন রোদে রোদে ঘুরে মাথার ঠিক ছিল না আমার। রাগ করোনি? বলো, রাগ করোনি তুমি?

মৃন্ময় হাসলো।—না, না, রাগিনি। ওঠো, মুখের কাছে মুখ এনো না, ছিঃ!

নীলিমা আব্দার ধরলে, না, উঠবো না আমি।

—ছিঃ, সরাও, মুখ সরাও। শোনো, মণ্টু, ফনির কথাটা ভাবো, ওদের তো বাঁচাতে হবে, ওদের···

নীলিমা জবাব দিলে না, নিঃশব্দে মৃন্ময়ের সারা মুখের ওপর ওর ঠাণ্ডা নরম হাতটা বুলিয়ে দিলে, চোখের জল মুছিয়ে দিলে শাড়ীর আঁচলে।

—ঠাকুরপো! মণ্টু আর ফনি ভাত খেয়েছে? তুমি—তুমি খেয়েছো তো? হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় নীলিমা জিগ্যেস করলে।

সানু ঘাড় নাড়লে।—আমি আর মণ্টু খেয়েছি, বৌদি।

পোস্তর তরকারীটা যা ফার্ষ্ট ক্লাশ হয়েছিল, মণ্ট আর আমি চেটে-পুটে খেয়ে দিয়েছি। হাসতে হাসতে সানু বললে।

নীলিমাও হাসল।—আমার জন্তে আর রাখোনি না কি ?

—ভাত আছে। পোস্তর তরকারী কিন্তু নেই। আমি কি করবো, মণ্টু যে খেয়ে দিলো।

—বেশ করেছে। আমার ক্ষিদেও নেই। রুনি খেয়েছে, না রাগ করে বেরিয়ে গেছে ?

সানু হেসে বললে, না বৌদি, ও তো বাসি ভাত খায় না।

—ও! দীর্ঘশ্বাস লুকোলো নীলিমা। বললে, দেখো তো ঠাকুরপো, কোথায় আছে রুনি, ডেকে নিয়ে এসো।

কিছুক্ষণ পরেই রুনিকে টানতে টানতে নিয়ে এলো সানু।

নীলিমা বললে, কি, খাবি না ? আয়, খাবি আয়।

—খেয়েছি তো আমি। অভিদা'দের বাড়ীতে খেয়েছি আমি।

নীলিমা আহত বোধ করলে। অভিদা'! সামনের তিনতলা নতুন বাড়ীটা ওদের। কিন্তু ওদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় রাখতেও ভয় হয় নীলিমার, ঘৃণা হয়। রুনি আর'মণ্টকে কত বার তাই নিষেধ করেছে নীলিমা, বলেছে, ওরা বড়োলোক, ওদের সঙ্গে ভাব রাখা তোমাদের সাজে না।

তবু রুনির মুখে অভিদা' আর অভিদা'। এটুকু বাচ্ছা মেয়ে, ও হয়তো অত-শত বোঝে না, তফাৎটা ভাবে শুধু বাড়ীর চেহারায়।

নীলিমা শান্ত স্বরে বললে, তুমি আবার ওদের বাড়ী গিয়েছিলে ?

—বাঃ রে, অভিদা' যে ডেকে নিয়ে গেল। মাসীমা যে খেতে দিলো আমায়, তাই তো খেলাম।

—না, ওদের বাড়ী যাবে না তুমি, যাবে না কোন দিন ওদের বাড়ীতে। ওরা বড়োলোক, আমরা গরীব। ওরা আমাদের ঘেন্না করে, তা জানো ?

রুনি চুপ করে রইলো, কোন কথা বললে না। তারপর হঠাৎ নীলিমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, জানো মা! অভিদা' বলেছে ওরাও না কি আমাদের মত গরীব ছিল। যুদ্ধের সময় ব্যবসা করে বড়োলোক হয়েছে।

না, নীলিমা রাগবে না আর। চটবে না কারো কথায়। কোন কথা না বলে থালায় ভাত বাড়তে সুরু করলে নীলিমা।

রুনি ডাকলে, মা!

—কি ?

—অভিদা' বলছিল, আবার না কি যুদ্ধ লাগবে। তখন না কি চেষ্টা করলে আমরাও বড়োলোক হতে পারবো।

চমকে চোখ তুলে তাকালে নীলিমা, রুনির মুখের দিকে। না, অধৈর্য্য হবে না নীলিমা, আক্রোশে ফেটে পড়বে না। রুনির মুখের দিকে তাকিয়ে দুঃখের হাসি হাসবার চেষ্টা করলে নীলিমা ; সে হাসি হাসি নয়, হাসির বিদ্রূপ।

সমস্ত দিন, সমস্ত সন্ধ্যা নীলিমার সারা মন জুড়ে গভীর এক অবসাদ, দুঃসহ বিষাদের ভারে নুয়ে রইলো। আশ্চর্য! যে কথা ভুলে যেতে চায় নীলিমা, যে বিষাক্ত দিনগুলোকে বিস্মৃতির সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে চায় বার বার, পৃথিবীশুদ্ধ সকলেই যেন সেই দৃশ্যগুলোই ওর চোখের সামনে তুলে ধরে, ওর কানের কাছে বার বার সেই একই কান্নার গান বাজায়। সমস্ত কাজের ফাঁকে নীলিমার উদাস ব্যথা কেবলই চমকে ওঠে।

পাশের ছোট্ট ঘরটিতে ওদের বিছানা পেড়ে দেয় নীলিমা, রুনিকে ঘুম থেকে তুলে খাইয়ে দেয়। রান্না ভালো হয়েছে কি না জিগ্যেস করে সানুকে, মণ্টুকে আদর করে ঘুম পাড়ায়, জলের গ্লাস রেখে আসে সানুর মাথার কাছে, মশারি টাঙাবার দড়িটা রুনি কোথায় নিয়ে গেছে খোঁজাখুঁজি করে। জানালার শিকে, আলনার আকসিতে, টেবিলের পায়ায় আর দেয়ালের পেরেকে দড়ি বেঁধে মশারি টাঙিয়ে বিছানার চতুর্দ্দিকে ভালো করে গুঁজে দেয় ধারগুলো, তার পর গরম তেল নিয়ে এসে মৃন্ময়ের বুকে মালিশ করে দিতে দিতে কোন ফাঁকে আবার কথাগুলো ওর মনের চার পাশে ভিড় করে আসে।

কত সুখের সংসারেই না ও মানুষ হয়েছিল! ঐশ্বর্য্য না থাক্ সে সংসারে শান্তি ছিল, সুখ ছিল।

দোতলার ফ্ল্যাটে ছোট্ট একটি পরিবার। নীলিমা, নীলিমার মা-বাবা, দাদা সুধাকান্ত আর বৌদি, নীলিমার ছোট্ট একটি ভাই শুভকান্ত আর বিধবা দিদি।

ভাল চাকরী করতেন নীলিমার বাবা, বেশ স্বচ্ছল ভাবেই কাটছিল ওদের দিনগুলো। সংসারে ছিল শান্তি আর শৃঙ্খলা।
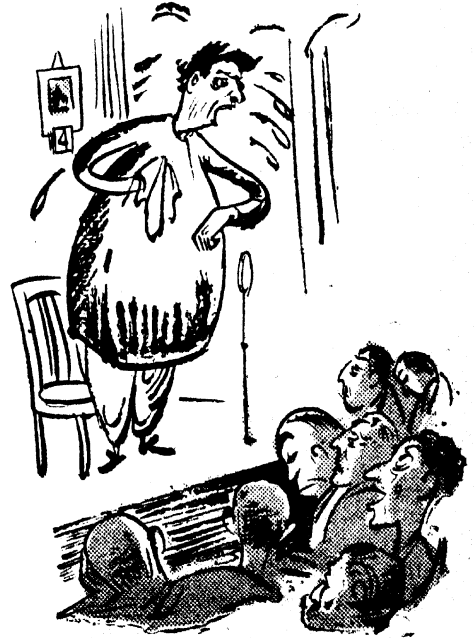
বক্তা :—আমি অনেকক্ষণ বলেছি বোধ হয়, অবশ্য কারণটা হচ্ছে আমার হাতে ঘড়ি নেই।

শ্রোতৃবর্গ :—কিন্তু পেছনের দেওয়ালে ক্যালেণ্ডার ত আছে।

এমনি সময় যুদ্ধের বিষাক্ত নিশ্বাস কোলকাতার বাতাস ভারী করে তুললো। এত দিন শুধু দিনে দিনে জিনিষের দাম বাড়ার মধ্যেই যুদ্ধের পরিচয় মিলছিলো। আর খবরের কাগজের পাতায়, আলাপে-আলোচনায়। তবু সে যুদ্ধ ছিল অনেক দূরে, তার অভিশাপ যতখানি, ভুল-চোখ বলতো, আশীর্ব্বাদও ততটাই। ধানের দাম বাড়ছিলো, দেশের লোকের হাতে আসছিল টাকা। চাকুরে মানুষদের বরাতও যেন খুলে গিয়েছিল। বেকারদের চাকরী খুঁজতে হ'ত না, চাকরীই খুঁজে বের করতো বেকারদের। আর মাসে মাসে বেড়ে চলেছিল এ-ও-তা পাঁচ রকমের এলাওয়েন্স।

হ্যাঁ, এরই ফাঁকে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল বটে, দেশ-জোড়া কাঙালের ভিড় ভেঙে পড়েছিল শহর কোলকাতার বুকে। কিন্তু নীলিমার দাদা তর্ক করেছে, বাবাও বলতেন, দুর্ভিক্ষ না কি যুদ্ধের জন্যে নয়। দুর্ভিক্ষ ভগবানের মার, কেউ রুখতে পারে না, বাবার কাছে বহুবার শুনেছে নীলিমা। আর দাদা বলেছে, দেশের লোকের বোকামিই না কি দুর্ভিক্ষের জন্যে দায়ী।

উঃ! সে সব দিনের কথা মনে পড়লেও ভয়ে শিউরে ওঠে নীলিমা। ফুটপাথে সারি সারি মড়া আর আধমরাদের রাশি, ডাষ্টবিনের পাশ দিয়ে হাঁটা যায় না নোংরা পচা খাবারের দুর্গন্ধে, ডাষ্টবিন ঘিরে কুকুরের দলের মত ভুখাজানদের কামড়াকামড়ি, লঙরখানার সামনে দেড় মাইল লম্বা কালো কালো কঙ্কালের লাইন, আর,—আর সকাল থেকে মাঝ রাত অবধি বাড়ীর আনাচে-কানাচে ছেলে-বুড়ো মেয়ে-মরদদের 'ফ্যান দে মা' 'ফ্যান দে মা' চিৎকারের বিরক্তি।

প্রথম প্রথম নীলিমাও বিরক্ত হ'ত। মনে হ'ত ঐ বুভুক্ষু মানুষগুলোই বুঝি বা সব শান্তি, সব স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে।

তার পর মানুষগুলো মরে ভূত হয়ে দুর্ভিক্ষের ছায়া সরিয়ে দিলো শহরের বুক থেকে। আর সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের ছায়া নয়, সশব্দ বিষ-নিশ্বাস শোনা গেল পথে পথে।

অতিকায় হিংস্র জন্তুর মত বিরাট বিরাট ট্রাক, লরী, ট্যাঙ্ক, এমফিবিয়া পিচের রাস্তা গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিলো। কি ভয়ঙ্কর তার গর্জ্জন, দন্তিল চাকায় তার কি ভীষণ অট্টহাস!

নীলিমার মনে আছে। একদিন, গভীর রাত্রিতে ঘুম-না-নামা চোখে জানালার গরাদ ধরে পথের দিকে তাকিয়েছিল নীলিমা। আর ওর চোখের সামনে দিয়ে সৈন্যবোঝাই ট্রাকের পর ট্রাক, ট্যাঙ্কের পর ট্যাঙ্ক স্তব্ধ স্তম্ভিত পৃথিবীর বুক বেয়ে সশব্দে গড়িয়ে গিয়েছিল। ব্ল্যাক আউটের রাতে যুদ্ধযানের সারিকে আসুরিক ছায়ার স্রোত মনে হয়েছিল। আর কি ভীষণ শব্দ তার, শান্ত নিস্তব্ধ রাতের বুকে কোন প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর উন্মত্ত হুঙ্কার যেন! যেন বেদনায় গুমরে-ওঠা পৃথিবীর মর্ম্মকান্নার গোঙানি!

কত ভয়ে ভয়ে, আশঙ্কায় উত্তেজনায় পথ চলতে হ'ত সেদিন। কপাটের এক পা বাইরে যেতেও বুক দুলে উঠতো নীলিমার। মার্কিণ আর ব্রিটিশ শ্বেতসৈনিকদের পৈশাচিক উল্লাস, আর পিশাচকায় নিগ্রো সৈনিকের অশ্লীল অট্টহাস!

তারপর। বিদ্রূপের হাসি হাসে নীলিমা আজও, তারপরের ঘটনার কথা মনে পড়লেই। কিন্তু, না, সুধাকান্তকে, দাদাকে ক্ষমা করেছে নীলিমা। দোষ দেয় না আজ তাকে। সত্যিই তো, নিজের অন্তর দিয়েই তো মানুষ অপরকে বিচার করে।

প্রতিদিন দাদার কাছে যুদ্ধের গল্প শুনতো নীলিমা। যুদ্ধেরই নয়, যোদ্ধারও। আব্রাহাম ম্যালিওনেস্কা আর ষ্টিফেন হিউজেস। দু'জন মার্কিণ সৈন্যের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সুধাকান্তর। আর খাশ আমেরিকান সৈনিকদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার গর্ব্বে মাটিতে পা পড়তো না সুধাকান্তর। কখনো আমেরিকা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, কখনো বা ম্যালিওনেস্কা আর হিউজেসের ঘরের খবর।

নীলিমা, নীলিমার বৌদি, আর বিধবা দিদি অণিমা সকলেই হাসাহাসি করতো সুধাকান্তকে নিয়ে। পেছনে পকেট-লাগানো গ্যাবার্ডিন না কি যেন, তারই প্যান্ট পরতে সুরু করেছে তখন সুধাকান্ত। হাঁটা-চলায় হাবে-ভাবে পুরোদস্তুর আমেরিকান হবার বাসনা যেন। আর দাঁতে চিবিয়ে নাকিসুরে কথায় কথায় ইংরেজি বলার সে কি ধুম! এ নিয়ে কতবার যে ওরা হাসাহাসি করেছে!

বৌদি ঠাট্টা করে বলতো, আমার বরাত মন্দ ঠাকুরঝি! দাদাটিকে তোমার ধরে রাখতে বোধ হয় পারলুম না। অমন মার্কিণের পাশে কি আর আমার মত লংক্লথকে মানায়, জর্জ্জেট চাই।

দিদি অনেক ছোট বয়সে বিধবা হলে কি হবে, বেশ আমুদে, মুখে সব সময়েই হাসিহাসি ভাব, কথায় রসিকতা। সে বলতো, তা মন্দ হয় না ভাই বৌদি, দাদার একটা বিলিতী বৌ এলে তবু মনের সুখে ইংরিজি বলতে পাবো দু'টো। বাংলা বলতে বড়ো কষ্ট হয় আমাদের, কত ভেবে-চিন্তে কথা বলতে হয়!

নীলিমা যোগ দিতো এ রসিকতায়; বলতো, সত্যি দিদি, কি মজা বলতো আমেরিকানদের, নাকি সুরে কথা বললেই ইংরিজি হয়ে বেরোয় কথাগুলো। ওরা এই সব বলাবলি করতো, আর হেসে লুটিয়ে পড়তো এ ওর গায়ে।

সুধাকান্ত কিন্তু চটে যেত ওদের রসিকতায়। বলতো, এই-জন্যেই তো এ দেশের কিছু হ'ল না। কারো ভালো দেখবার চোখ তো নেই আমাদের। জানিস আমেরিকার কুলি-মজুররা কত রোজগার করে? বিড়লার সমান।

কখনো বলতো, আমেরিকা? স্বপ্নের দেশ, সোনার দেশ! ওখানে একটা লোকও বেকার নেই, কেউ হাজার টাকার নীচে মাইনে পায় না। কত পয়সা ওদের, বিজনেসে অমন মাথা আর কারও নেই।

অণিমা হাসতো।—তা ঠিক বলেছিস দাদা, ঐ যে এগারো টাকা দিয়ে সিগারেট লাইটারটা কিনলি, তিন দিন গেল না। অমন জোচ্চুরির মাথা অন্য জাতের সত্যি নেই।

সুধাকান্ত রেগে যেত।—যা জানিস না তা নিয়ে মাথা ঘামাস না, ওরা তিন দিনের বেশি কোন জিনিস ব্যবহার করে না কি? সিনেমায় দেখবি, ওরা কাগজের গ্লাসে জল খায়, আর জল খেয়েই গ্লাসটা ফেলে দেয়।

নীলিমার বৌদি হেসে গড়িয়ে পড়তো এ কথায়। বলতো, দেখো না, ওর বিয়ের সময় যে মাটির গ্লাসে লোকজন খাওয়ানো হয়েছিল সেগুলো তুলে রেখেছে নীলা ঠাকুরঝির নিজের বিয়ের জন্যে।

আপনি কি কখনো

মশা মারবার জন্য বন্দুক দাগবেন ?

দাগবেন না সত্যি, কিন্তু ঠিক এই রকমই অবস্থাটা দাঁড়ায় যখন কেউ বেশী-শক্তির ব্যয়বহুল ব্যাটারী সেট ব্যবহার করেন ; অথচ **কম-শক্তিক্ষয়ী** সেটও আছে যাতে সুন্দর আওয়াজ পাওয়া যায়। যে রেডিও সেট অতিরিক্ত আওয়াজ বার করে তার ব্যাটারী অল্পেই অযথা নষ্ট হয়।

কম-শক্তিক্ষয়ী সেটে ব্যাটারীও অনেক কম খরচ হয় আর তাতে টাকার সাশ্রয় হয়। সুতরাং, যখনই ব্যাটারী সেট দরকার হবে, **কম-শক্তিক্ষয়ী** সেট কিনবেন — তাতে আপনার রেডিও থেকে কান ফাটানো আওয়াজের পরিবর্তে সুন্দর শ্রুতিমধুর সুর বেরুবে।

ব্যাটারীর প্রয়োজনে সব সময় ব্যবহার করুন

EVEREADY

TRADE-MARK

এভারেডী রেডিও ব্যাটারী

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রেডিও ব্যাটারী

ন্যাশনাল কার্বনের তৈরী

ঠাট্টা বুঝতে পেরে চুপ করে যেত সুধাকান্ত। বলতো, যাই বলো তোমরা, ম্যালিওনেস্কার মত লোক হয় না। কি অমায়িক, কি বিনয়ী, আমাদের দেশের প্রাণ খুলে গুণগান করতে কিন্তু আর কাউকে দেখিনি। ও অবশ্য আসলে লিথুয়ানিয়ার লোক, ওর ঠাকুর্দার বাবা পালিয়েছিল আমেরিকায়, তখন থেকেই ওরা আমেরিকান হয়ে গেছে। ওর বাড়ীর সব ফটো দেখালো আমাকে, ওর বোন নাকি এবার সাঁতারে ফার্স্ট হয়েছে তাদের ক্লাবে।

নীলিমা ঠোঁট টিপে-টিপে হাসি চাপতো।—তা হ'লে তাকেই বিয়ে করো না দাদা! বেশ মেমসাহেব বৌদি হবে আমাদের।

বিরক্ত হয়ে উঠে যেত সুধাকান্ত, প্রতিজ্ঞা করতো ওদের কাছে আর কোন দিন ওর আমেরিকান বন্ধুদের কথা তুলবে না।

কিন্তু না বলেও থাকতে পারতো না সুধাকান্ত। কোন দিন হঠাৎ এসে বলতো, জানিস অণি, হিউজেসের ফিঁয়াসে, ফিঁয়াসে মানে বাগ্‌দত্তা, ভাবী বৌ আর কি, তার জন্যে ইণ্ডিয়ান গানের রেকর্ড পাঠালে হিউজেস। আমিও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটা রেকর্ড উপহার পাঠালাম।

তখন না বললেও, সুধাকান্তর অনুপস্থিতিতে ওরা তিন জন হাসাহাসি করেছে।—কি ভাষা ভাই, ফিঁয়াসে। দাদা যাই বলুক, আসল মানে কি জানিস তো দিদি? প্রেম করতে গিয়ে ফেঁসে গেলেই ফিঁয়াসে হয়।

তারপর।—আজ ধুতি পাঞ্জাবী আর চাদর পরে গিয়েছিলাম, ম্যালিওনেস্কা বললে এমন কুল ড্রেস ও কোন দেশে দেখেনি।

কোন দিন।—রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ড বাজিয়ে হিউজেসের ফিঁয়াসে লিখেছে ইণ্ডিয়ান গানের মত সাবলাইম গান ও কখনো শোনেনি।

কখনও।—ম্যালিওনেস্কা বলছিল বাঙালী মেয়েদের মত পোষাক-পরিচ্ছদে এমন চমৎকার টেষ্ট কোন জাতের নেই।

এবং শেষে একদিন।—ম্যালিওনেস্কা আর হিউজেস একদিন আমাদের বাড়ীতে ইণ্ডিয়ান ডিস খেতে চায়, ইনভাইট করবো? বলবি মাকে? বাবা রাগ করবেন না তো?

সুধাকান্তর কাছে শুনে শুনে লোক দু'টোর সম্বন্ধে ওদের সকলেরই মনে একটা ঔৎসুক্য জেগেছিল। কেমন চেহারা ওদের, কি ভাবে কথাবার্তা বলে, হাব-ভাবই বা কেমন। সত্যিই তো, কপাটের আড়াল থেকেই নয় দেখবে। যেচে নেমন্তন্ন চেয়েছে যখন, না বলা কি উচিত?

মা'র কাছে কথা পাড়লে সুধাকান্ত।—জানো মা, ম্যালিওনেস্কার গলায় একটা ফিতেতে বাঁধা লকেট আছে, ওর মায়ের ছবি। ও রোজ ঘুমোবার আগে ওর মা'র প্যারালিসিস সারিয়ে দেবার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে।

মা বললেন, আহা বেচারী! মা'রও কি কষ্ট বল তো বাবা! ছেলে জীবন হাতে নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছে, এদিকে মায়ের হয়তো চোখে ঘুম নেই।

মা'ই বাবাকে বললেন, আহা, সুধার বন্ধু, হ'লেই বা সাহেব। মা-বাপ, ভাই-বোন, ঘর-সংসার ছেড়ে এত দূরে যুদ্ধ করতে এসেছে, দু'মুঠো ভাত খেতে চেয়েছে বন্ধুর বাড়ীতে, তাতে তোমার আপত্তি কিসের?

সত্যিই তো শেষ অবধি তাই মত দিতে হ'ল।

আর হিউজেসের প্রথম আগমনের দিনটা বেশ স্পষ্ট মনে আছে নীলিমার। বিনয়ী লাজুক-লাজুক মুখ নিয়ে ম্যালিওনেস্কার পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকলো ও, চৌকাঠে হোঁচট খেলো, কোথায় বসবে, কি ভাবে কথা বলবে, ভেবেই যেন সন্ত্রস্ত। নীলিমার বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই চটি ছুঁয়ে প্রণাম করলে ম্যালিওনেস্কা আর হিউজেস, হেসে বললে, আপনার ছেলে ইণ্ডিয়ান কাষ্টম সব শিখিয়ে দিয়েছে আমাদের।

মা আড়াল থেকে চোখ মুছলেন, আর ওরা তিন ননদ-বৌদি মুখে আঁচল চেপে হেসে লুটিয়ে পড়লো।

তারপর সহজ ভাবেই আসা-যাওয়া সুরু হ'ল ওদের। নীলিমারা দেখলে গায়ের রঙ ফর্সা হ'লেও, মুখে ইংরিজি বললেও লোকগুলো ভয় করবার মত নয়, অসুর নয়। খুব সহজ ভাবেই পরিবারের সকলের সঙ্গেই কেমন করে যেন মিশে গেল ওরা, বন্ধু হয়ে গেল। নীলিমা, নীলিমার বৌদি, এমন কি বিধবা দিদি অণিমাও ওদের সামনে চায়ের বাটি এগিয়ে দিতে সঙ্কোচ বোধ করলে না।

আর লোক দুটোর চোখেও তো কৈ কোন দিন অভদ্র ইশারা ধরা পড়েনি?

আশ্চর্য্য!

সেদিনটার কথা ভোলেনি নীলিমা, ভুলবে না। কিন্তু, কিন্তু সেদিনের কথা মনে পড়লেই যেন ভয়ে শিউরে ওঠে ও। একবার মনে পড়লে সারা রাত ঘুম আসে না ওর চোখে। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে। উষ্ণ আক্রোশে জ্বালা করে ওঠে চোখের কোণ দুটো।

ম্যালিওনেস্কা আর হিউজেসদের রেজিমেণ্ট পরের দিন ভোরেই নাকি বর্ম্মার যুদ্ধ-প্রাঙ্গণে চলে যাবে।

বিষণ্ণ বিষাদী মুখে ম্যালিওনেস্কা শুকনো হাসি হাসবার চেষ্টা করলে। নীলিমাকে বললে, মিস্, হয়তো ফিরতে পারবো না আর। জীবনের মেয়াদ বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে।

হিউজেসের চোখও যেন ভিজে-ভিজে মনে হয়েছিল। ও সুধাকান্তকে বলেছিল, বন্ধু, এই ক্যামেরাটা তোমাকে উপহার দিলাম, তোমার একটা ছবি আমার বোনের কাছে পাঠিয়ে দিও এক মাসের মধ্যে কোন চিঠি না পেলে। লিখে দিও, মৃত্যুর আগে অনেকগুলো শান্তির আর সুখের দিন হিউজেস যার সঙ্গে কাটিয়েছিল এ তারই ফটো।

মা আশীর্ব্বাদের ইচ্ছায় হাত তুলে বললেন, বাট, বাট, যুদ্ধে যাচ্ছো, যুদ্ধ হয়ে গেলেই ফিরে আসবে; আমি আশীর্ব্বাদ করছি। তোমার নিজের মা বেঁচে থাকলে যেমন ভাবে আশীর্ব্বাদ করতো, আমি তেমনি করেই আশীর্ব্বাদ করছি বাবা, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, তোমরা দু'জনেই তোমাদের এই বাঙালী মায়ের কাছে সুস্থ শরীরে ফিরে আসবে।

ওদের মঙ্গল কামনায় পাঁচ সিকে পয়সা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে মা তুলে রেখেছিল মানত করে।

নীলিমার বিধবা দিদি অণিমা এত দিন হাসি-ঠাট্টা করেছে, কত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। কিন্তু সেদিন সেই শুচিশুভ্র থান কাপড়ের বৈধব্য বেশে সবটুকুই যেন ব্যথার বেদনায় ম্লান হয়ে গিয়েছিল। এতটুকু

হাসি দেখা দেয়নি তার মুখে ; একটা কথাও বলতে পারেনি অনেকক্ষণ। নীলিমার মনে আছে, দিদির চোখ বেয়ে দর-দর করে জল গড়িয়ে পড়তে দেখেছিলো সেদিন। কাঁপা-কাঁপা হাতে নমস্কার জানিয়েছিল, থর-থর করে ঠোঁট-জোড়াও কেঁপে উঠেছিল তার কথা বলতে গিয়ে।

গাঢ় গলায় বলেছিল, তোমাদের ছোট বোন আমি, আমি বলছি, তোমাদের কোন বিপদ হবে না। সুস্থ শরীরে দেশে ফিরে যাবে তোমরা, মা কালী, রক্ষাকালী তোমাদের বাঁচাবেন। এই নাও ভক্তি করে এই মাদুলী দুটো রেখে দাও, তোমাদের কোন বিপদ হবে না।

ম্যালিওনেস্কা আর হিউজেস যখন বিদায় নিয়ে ফিরে গেল, নীলিমার স্পষ্ট মনে আছে, দু'জনের চোখেই দেখেছিল লুকোনো অশ্রু।

—I wish she was my own mother, they were my own sisters।

চোখ ছল-ছল করে উঠেছিল ওদের দু'জনেরই, পরস্পরকে বলেছিল : উনি যদি আমার নিজের মা হ'তেন, ওরা যদি আমার নিজের বোন হ'ত!

সে রাত্রে ঘুম আসেনি নীলিমার চোখে, বহুক্ষণ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ার আতঙ্কে ভীতত্রস্ত দুটি জীবনের কথা বার বার তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

তার পর। তার পর মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতাকে উপহাস করে অতিকায় জন্তুর মত বিরাট একটি ট্রাক ছায়া-ছায়া অন্ধকার ভেদ করে শব্দের হুঙ্কার তুলে এসে দাঁড়িয়েছে ওদের বাড়ীর দরজায়। আর ট্রাকবোঝাই একরাশ সৈন্যের কালো কালো প্রেতছায়া অট্টহাসে বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছে। সুরামত্ত মাতালের দল, শ্বেতসৈনিক আর নিগ্রো সৈন্যের দল চিৎকার করে, অর্থহীন গানের কলি আউড়ে, হৈ-হল্লা করে লাফিয়ে নেমেছে ট্রাক থেকে।

হেডলাইটের ঝকমক আলোয় নীলিমা চিনতে পেরেছে। ম্যালিওনেস্কা আর হিউজেস কাঁধ-ধরাধরি করে টলতে টলতে এগিয়ে এসে ওদের বাড়ীর কপাট দেখিয়ে দিয়েছে দলবলকে। আর সৈন্যের দল কপাটের ওপর লাথির পর লাথি মেরেছে। কপাট ভেঙে পড়েছে সে আঘাতে।

ভয়ে, বিস্ময়ে, কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে নীলিমা, নীলিমার মা, বাবা, বৌদি, দিদি—সবাই। পালাবার কথা, লুকোবার কথাও তখন ভুলে গেছে ওরা। যখন মনে হয়েছে পালানো উচিত, লুকোনো উচিত, তার আগেই মদের গন্ধে সারা ঘর ভরে গেছে। প্রেতের মত অশুচি ছায়া-শরীর ওদের ঘিরে ফেলেছে তখন। বাবা আর দাদা ছুটে গেছে বাধা দেবার জন্যে। ঐ দানব-শরীরের কাছে ওরা আর কতটুকু? বন্দুকের বাঁটের একটা ঘা কে যেন বসিয়ে দিয়েছে দাদার মাথায়, অজ্ঞান হয়ে ছিটকে পড়েছে দাদা। নিস্তব্ধ রাতের বুকে হঠাৎ একটা পিস্তলের গুলীর শব্দ। চিৎকার করে যন্ত্রণায় কাৎরাতে-কাৎরাতে নিশ্চুপ হয়ে গেছেন নীলিমার বাবা। ছোট ভাই শুভকান্ত কেঁদে উঠেছে সশব্দে, ভয়ে নীলিমার পা জড়িয়ে ধরেছে।

তার পর, তার পর ম্যালিওনেস্কা এগিয়ে এসেছে টলতে টলতে, উন্মত্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে মা'র ওপর।

নীলিমার চোখের সামনে। একটা ক্ষুধার্ত পশুর মত…

থপ-থপ করে এগিয়ে এসেছে হিউজেস, একটা ঝটকা টানে বিধবা দিদি অণিমাকে কাছে টেনে নিয়ে গেছে। সে কি ভীষণ ভয়াল চোখ…

কান্নায় চিৎকার করে উঠেছে বৌদি, একটা পৈশাচিক নিগ্রো-শরীরের ভারে স্তব্ধ হয়ে গেছে তার কান্না।

আর নীলিমা…কতক্ষণই বা ওর জ্ঞান ছিল? তবু যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, নীলিমার শুধু মনে পড়ে, একটার পর একটা প্রেতের ছায়া এগিয়ে এসে ওকে গ্রাস করেছে।

একটা পূরো দিন অজ্ঞান হয়ে ছিল নীলিমা। জ্ঞান হয়ে দেখলো ডাক্তার, পাড়াপড়শীদের অনেকে ভিড় করে এসেছে। লজ্জায় চোখ বুজলো নীলিমা।

কিন্তু কত দিন আর চোখ বুজে থাকা যায়? পিস্তলের গুলীতে বাবা মারা গেলেন। মা আত্মহত্যা করলো। বৌদি অন্তঃসত্ত্বা ছিল, আঘাতের ফলে এক মাস ধরে অসুখে ভুগে ভুগে মারা গেল। বিধবা দিদি হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলো একদিন, উনুন ধরাতে গিয়ে সারা গায়ে ছাই মাখতে সুরু করলে। তার পর কোন্ ফাঁকে কপাট খোলা পেয়ে কোথায় যে চলে গেল খোঁজ মিললো না।

সুস্থ শরীরে শুধু বেঁচে রইলো নীলিমা, সুধাকান্ত আর শুভকান্ত। চুপচাপ, উদাস, উদ্‌ভ্রান্ত। কারো সঙ্গে একটা কথাও

……এইবার মোজায় ঘর তোলার কথা লিখে নিন…

বলতো না সুধাকান্ত। এক মিনিটের জন্তেও বাইরে যেত না। শুধু অন্তমনস্ক ভাবে বসে থাকতো সদা-সর্ব্বদা। তারপর মাস দুয়েকের মধ্যে নীলিমার বিয়ের ব্যবস্থা করলো সুধা। আর বিয়ের পরদিনই খবর পাওয়া গেল একটা মিলিটারী ট্রাকে চাপা পড়ে সুধাকান্ত মারা গেছে। সে খবর শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল নীলিমা। কোন কথা বলেনি! আনন্দের আবেগ বুনে বাসর কাটায়নি ও, পর-পর এতগুলো মনভাঙা দুর্ঘটনা, এত বড়ো একটা ঝড় সহ্য করে কি কেউ সীঁথি-সিঁদূরের রোমাঞ্চ অনুভব করতে পারে? বিষণ্ন ব্যথার মধ্যেই সেদিন ও নিজেকে সমর্পণ করেছিল মৃন্ময়ের কাছে, মন্ত্রপাঠের সময় মৃন্ময়ের হাতের মধ্যে ওর হাতখানা কেঁপে উঠেছিল বার বার। মৃন্ময় ভেবেছিল, ভয়। ওর চোখের বেদনাশ্রু দেখে ভেবেছিল, এ বুঝি শৈশবের স্মৃতিতে গড়া মায়ামুগ্ধ ঘর ছেড়ে অনির্দ্দেশে পা দেয়ার ব্যথায় সজল।

মৃন্ময় জানতো না।

নীলিমার চোখে জল বয়েছিল একটি আকস্মিকতার অভিশাপকে স্মরণ করে, নীলিমার ভয়-ভীরু হাত কেঁপেছিল গোপন আত্মগ্লানিতে, জীবনের লুকিয়ে-রাখা একটি আত্মবিক্রায়ের অধ্যায়কে স্মরণ করে।

তার পরের দিন রাত্রেই খবর এলো, নীলিমা যা আশঙ্কা করেছিল তাই ঘটে গেছে। মিলিটারী ট্রাক চাপা পড়ে মারা গেছে সুধাকান্ত। কে যেন বললে, আজ-কাল হামেশাই তো হচ্ছে, একটু দেখে-শুনে না চললেই…

কেউ গালাগালি দিলে মিলিটারীর উদ্দেশে, বিদেশী সৈনিকদের উদ্দেশে।

নীলিমার মন বললে অন্য কথা। দীর্ঘ কয়েকটা মাস প্রতি মুহূর্ত্তে যে কারণে সশঙ্কিত থাকতো নীলিমা, সামান্ত শব্দে চমকে চমকে উঠতো যে ভয়ে, একটা মিনিট সুধাকান্ত চোখের আড়াল হ'লে যে আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠতো ওর, তাই ঘটে গেল। নীলিমা বুঝতে পারলে, কেন এই দীর্ঘদিন ধরে একটি অতিরিক্ত কথা না বলে, লোকালয় থেকে মুখ লুকিয়ে ঘরের কোণে নিঃসঙ্গ নিশ্চুপ দিনগুলো কাটিয়ে এসেছে সুধাকান্ত! কেন কর্ত্তব্য শেষ করার পর একটা সম্পূর্ণ দিনও বেঁচে থাকার সাধ জাগলো না সুধাকান্তর?

নিজেকে অত্যন্ত ভীরু, অত্যন্ত অপরাধী মনে হ'ল নীলিমার। যে লজ্জায়, যে গ্লানির অসহ জ্বালায় সকলেই পৃথিবী থেকে পালাবার পথ খুঁজলো, সেই গ্লানি, সে লজ্জা লুকিয়ে রেখে নতুন করে বাঁচবার এ কি দুঃসহ আশা তার!

তবু, সব ক্লেদ ধুয়ে-মুছে গেল একদিন। মৃন্ময়ের আদরে সোহাগে মনে হ'ল, আকাশে এখনো চাঁদ ওঠে, মেঘ এখনো রামধনু আঁকে নতুন নতুন। অতীতের নোংরা কপাট চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে আবার জীবন সুরু করতে চাইলে নীলিমা।

কিন্তু, যে পথেই হাঁটতে গেছে নীলিমা একটা মস্তো বড়ো 'কিন্তু' এসে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে।

মৃন্ময়ের সেই আনন্দ-উচ্ছ্বাস-ভরা রঙিন পাখনা থেকে শিশিরের মত জলের কণা পড়তে হয়েছে এই নোংরা না-আলো না-বাতাস অন্ধ গলির দুর্গন্ধময় ছোট্ট ঘরখানিতে। অভাব, দারিদ্র্য, রোগ-শোক। প্রতিটি মুহূর্ত্ত মৃত্যুর পথ চেয়ে অপেক্ষা করা। অসহায় দুঃখে মৃন্ময়ের চোখে-জল-ঝরানো কষ্টসহিষ্ণুতা, ক্লান্তিতে ভেঙে-পড়া শরীর নিয়ে রাত জেগে জেগে মৃন্ময়ের বুকে হাত বুলিয়ে স্বস্তি দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা।

ব্যর্থই।

ভোর হবার অনেক আগে, অন্ধকার ফিকে হওয়ার আগেই আবার কাশির দমকে-দমকে রক্ত উঠতে সুরু হ'ল। অসহ্য কষ্টে বুকে হাত চেপে বার কয়েক কাশে মৃন্ময় আর তার পরই পিকদানিতে ফিনকি দিয়ে কালো কালো রক্ত পড়ে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ভাবলে নীলিমা। কি করবে ও, কি করা উচিত?

তারপর ধীরে ধীরে পাশের ঘরে নিদ্রিত সান্ত্বকে ডেকে তুললে।

—ঠাকুরপো, ডাক্তার বাবুর কাছে যাও একবার, যেমন করে পারো হাতে-পায়ে ধরে নিয়ে এসো একবার।

দাদার মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত আশঙ্কায় তাকিয়ে দেখলো সান্ত্ব, তারপর ছুটে চলে গেল। বলে গেল, কিছু ভেবো না বৌদি, আমি এক্ষুনি ডেকে আনছি।

মৃন্ময় শুধু বিষণ্ন চোখে তাকালে নীলিমার দিকে, ইশারায় পাশে বসতে অনুরোধ জানালে।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, মিথ্যে চেষ্টা নীলিমা, আমি বুঝতে পারছি।

নীলিমা কি একটা বলতে গেল, মৃন্ময় বাধা দিলো। বললে, শোনো, একটা কথা তোমাকে বলবো বলেও কোন দিন বলতে পারিনি, একটা অপরাধ আমি স্বীকার করে যেতে চাই নীলিমা। জানি, সে অপরাধ তুমি ক্ষমা করতে পারবে না কোন দিন, তবু আমি তো শান্তি পাবো।

নীলিমা বললে, চুপ করো লক্ষ্মীটি, চুপ করো তুমি। ডাক্তার বাবু এলেই তুমি সেরে উঠবে, আমি বলছি তুমি সেরে উঠবে। এর আগেও তো কতবার এমন হয়েছে, কেন ভয় পাচ্ছো তুমি? কথা ব'লো না, চুপ করে থাকো একটু।

মৃন্ময় হাসলে।—এর আগে তো কখনো মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখতে পাইনি নীলিমা, বুঝতে পারিনি। এবার যে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নীলিমা, বলতে দাও, একটা কথা আমাকে বলতে দাও।

নীলিমা চুপ করে রইলো, কোন বাধা দিলো না, কোন কথা বললে না। একদৃষ্টে শুধু তাকিয়ে রইলো, আর ওর দু'চোখ বেয়ে দর-দর করে জল গড়িয়ে পড়লো নিঃশব্দে।

—তোমার ওপর আমি…লজ্জার আত্মগ্লানিতে সমস্ত মুখ যেন সাদা হয়ে গেল মৃন্ময়ের, বললে, আমি যে অপরাধ করেছি তার ক্ষমা নেই নীলিমা! আমি, আমি আমার অসুখ লুকিয়ে রেখে তোমাকে বিয়ে করেছিলাম।

বিস্ময়ে চমকে উঠলো নীলিমা, মৃন্ময়ের মুখের দিকে দুর্ব্বোধ্য দৃষ্টিতে তাকালে।

—হ্যাঁ, নীলিমা। হঠাৎ একদিন কাশতে কাশতে কয়েক ফোঁটা রক্ত বেরুলো থুতুর সঙ্গে। ভয়ে শিউরে উঠলাম আমি, সমস্ত দিন, সমস্ত রাত মনে হ'ল, আমি যেন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছি। মনকে বোঝাতে চাইলাম, হয়তো গলায় ঘা, নয়তো দাঁতের গোড়া থেকে পড়েছে। পরের দিন, তার পরের দিনও রক্ত পড়লো দু' ফোঁটা করে, ভোরের দিকে। খাওয়া-দাওয়া ভালো করবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ডাক্তার দেখাতে সাহস পেলাম না। সত্যিই যদি এ রোগ হয়ে থাকে, ডাক্তার হয়তো সারাতে পারে। কিন্তু অত টাকা কোথায় আমার? আর, আর সেরে যাবার পর কি বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলে ফিরে নেবে আমাকে? কিন্তু তার চেয়েও বড়ো দুঃখ কি ছিল জানো নীলিমা!

নীলিমা শুনছিলো ওর কথা, একমনে। হয়তো সব কথা ভালো করে বুঝতেও পারছিল না। হঠাৎ ও ভেঙে পড়লো মৃন্ময়ের বুকের ওপর।—আগে বলোনি কেন, বিয়ের পরই কেন বলোনি তুমি আমাকে? তা হ'লে এত দেরী হ'ত না, হয়তো সেরে উঠতে তুমি। আমি তো ছিলাম, আমি তো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না? কেন বলোনি তুমি, কেন?

মৃন্ময় হাসলে। বললে, বুঝবে না নীলিমা, তুমি বুঝতে পারবে না। দিনে দিনে ওজন কমে যাচ্ছে দেখলাম, প্রতিদিন জ্বর হচ্ছে বুঝতে পারতাম। আর কেবলি ভয় হ'ত। ভাবতাম, এমনি ভাবে জীবনে কোন ভালবাসা না পেয়ে, কোন মেয়ের স্পর্শ না পেয়ে, উত্তাপ অনুভব না করে মৃত্যু হওয়ার চেয়ে বড়ো ব্যর্থতা আর নেই। তাই অসুখ গোপন রেখে তোমাকে বিয়ে করলাম, আর বিয়ের পরেও তোমার সঙ্গ পাবার জন্যে, তোমাকে হারাবার ভয়ে কোন দিন বলতে সাহস পাইনি। আজ তোমাকে হারাবার ভয় নেই বলেই দূরে সরে থাকতে বলি, সেদিন পারতাম না।

নীলিমার চোখের জলে জামা ভিজে গেল মৃন্ময়ের। কান্নাচাপা গলায় নীলিমা বললে, ছিঃ ছিঃ, এমনি করে নিজের সর্বনাশ করে, ভেতরে ভেতরে এমনি করে রোগ বাড়িয়েছ তুমি?

মৃন্ময় হাসলে, ব্যথাহত হাসি। সেদিন রোগকে ভয় ছিল না আমার, মৃত্যুকে ভয় ছিল না। শুধু মনে হয়েছিল, মৃত্যু যখন আসছেই, জীবনকে ভোগ করে নিই। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের সব ন্যায়-অন্যায় বোধ উড়ে যায় নীলিমা!

মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের সব ন্যায়-অন্যায় বোধ উড়ে যায় নীলিমা! কথাটা আবার নতুন করে মনে পড়লো নীলিমার।

মৃন্ময় আবার কিছুটা সুস্থ হ'ল, ডাক্তার মত দিলো, হয়তো এ যাত্রাটা কোন রকমে কেটে যাবে। খরচ করে ভালো ভাবে চিকিৎসা করলে এখনো হয়তো বাঁচানো যেতে পারে মৃন্ময়কে। কিন্তু নীলিমার কানে এ সব কথা পৌঁছলো না। জানালার ধারে বসে বাইরের ছোট্ট এক ফালি আকাশের দিকে তাকিয়ে নীলিমা শুধু ভাবলে, 'মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের সব ন্যায়-অন্যায় বোধ উড়ে যায়!'

মিথ্যে নয় তা হ'লে, অপরাধ-স্থালনের মিথ্যা ভণিতা নয়! আব্রাহাম ম্যালিওনেস্কা আর ষ্টিফেন হিউজেস! দু'জনের কথা মনে পড়লো নীলিমার। মনে পড়লো সেই চিঠির কথা।

বহু দিন আগে হঠাৎ বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে হাজির হয়েছিল নীলিমা ওদের সেই পুরোনো ফ্ল্যাটে। নতুন বাসিন্দেদের বলেছিল, ঘুরে ঘুরে বাড়ীটা একবার দেখবো, এখানে আমরা ছিলাম কিনা এক সময়।

গৃহকর্ত্রী তখন আদর-আপ্যায়ন করে বসিয়েছিলেন ওকে, এনে দিয়েছিলেন একখানা চিঠি।—এ চিঠি কি আপনাদের, অনেক দিন থেকে পড়ে আছে, বুঝতে পারিনি বলে খুলেছিলাম, কিছু মনে করবেন না।

চিঠিটা নিয়ে চলে এসেছিল নীলিমা। দাদার চিঠি, সুধাকান্তর নাম—ঠিকানার ঘরে। কিন্তু কে লিখেছে এ চিঠি? উল্টে-পাল্টে দেখেছিল ও, যুদ্ধ-ফ্রন্টের অশুদ্ধি সেন্সারের ছাপ, নম্বর, তার ওপর এখানকার ডাকঘরের শীলমোহর।

চিঠিটা পড়েছিল নীলিমা। নাম সই ছিল না, কিন্তু নীলিমা বুঝতে পেরেছিল, এ চিঠি সেই দুটো অসুরের কোন একজনের লেখা। ক্ষমা চেয়েছিল সে সুধাকান্তর কাছে, লিখেছিল, "বন্ধু, তুমি জানো না, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য হ'লে মানুষ কতখানি অমানুষ হয়ে যায়। আমাকে তোমরা হয়তো শয়তান ভাবো, কিন্তু আসল শয়তান এই যুদ্ধ। নিজেদের মনুষ্যত্ব আমরা এই ডেভিলের কাছে বিক্রী করে দিয়েছি, তাই, আমরাও এক-একটি ক্ষুদে শয়তান হয়ে দাঁড়িয়েছি এই বিরাট শয়তানটার দাপটে। তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। সে রাত্রে প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর, আর এই ওয়ার-ফ্রন্টেও কতবার ইচ্ছে হয়েছে সুইসাইড করে আমার অপরাধের গ্লানি মুছে ফেলি। কিন্তু পারিনি,

আমি ভীতু, কাপুরুষ। জীবনকে আমি বড়ো বেশি ভালবাসি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ জীবনকে আরো বেশি করে ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো। তোমার মায়ের আশীর্বাদ, তোমার সেই বিধবা দিদির প্রার্থনা যদি এতদিনে অভিশাপে পরিণত হয়ে না থাকে তাহলে হয়তো সত্যিই দেশে ফিরে যেতে পারবো আমি জীবন নিয়ে। আজ রাত্রেই আমাদের জাহাজ ছাড়বে, দেশে ফিরে যাবো আমরা। আত্মহত্যা করার সাহস পাইনি আমি সত্যিই, কিন্তু দেশে ফিরে গিয়ে কোন দিন এই বড়ো শয়তানটাকে জাগতে দেবো না আমি। ভেবে দেখো, হয়তো চেষ্টা করলে আমাকে ক্ষমা করতে পারবে তুমি, হয়তো পারবে না, কিন্তু যুদ্ধকে কোন দিন ক্ষমা ক'রো না ভাই।"

এ চিঠি পড়ে সেদিন ক্রোধে-আক্রোশে সারা শরীরে জ্বালা অনুভব করেছিল নীলিমা, দাঁতে দাঁত চেপে এমন ভাবে চিঠিটা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলে দিয়েছিল যেন সেই পৈশাচিক মানুষ দুটোর শরীর ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলছে সে। অদ্ভুত এক আনন্দে, অসহ্য এক দুঃখে সারা রাত্রি তার চোখে ঘুম আসেনি সেদিন।

তারপর, দিনে দিনে সব বেদনা, সব আক্রোশ স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। মন বলেছিল, আমরাও এক একটি ক্ষুদে শয়তান হয়ে দাঁড়িয়েছি এই বিরাট শয়তানটার দাপটে!

মনে পড়ছিল,—মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সব ন্যায়-অন্যায় বোধ উড়ে যায় নীলিমা!

মৃন্ময়ের পায়ের কাছে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে একমনে ভাবছিল নীলিমা, মনে পড়ছিল।

এমন সময় হঠাৎ রুনি এসে দাঁড়ালো তার সামনে। চুপচাপ, চোখে চোখ পড়তেই কি যেন বলতে গিয়ে লজ্জায় চুপ করে গেল। তারপর অনেক চেষ্টা করেই যেন বললে, 'মা, অভিদা'র বড়দা এসেছেন, বড়ো ডাক্তার নিয়ে এসেছেন।

চমকে ধড়মড় করে উঠে পড়লো নীলিমা। দেখলো অভিজিৎ, অভিজিতের দাদা, আর বৃদ্ধ, কুব্জদেহ একটি দীর্ঘ শরীরের সৌম্যবিস্তৃত একজোড়া চোখ। মুখে বার্দ্ধক্যের হাসি।

নীলিমার মাথায় হাত দিয়ে বৃদ্ধ বললেন, ভয় কি মা, সব সেরে যাবে।

তারপর মৃন্ময়কে ভালো করে পরীক্ষা করে বললেন, এঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে মা, এখানে তো হবে না।

নীলিমা কেঁদে ওঠে।—না, না, হাসপাতালে না।

বৃদ্ধ হাসেন ধীরে ধীরে।—এ এক যুদ্ধ মা, এর নাম জীবনযুদ্ধ। মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে হ'লেও তো অনেক সৈন্যসামন্ত গোলাবারুদ দরকার হয়। একা একা এখানে পারবে কেন?

—কিন্তু, কিন্তু অত টাকা তো আমার নেই? না, না, হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে না, আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পাবেন না।

বৃদ্ধ ডাক্তার আবার নীলিমার মাথায় হাত রাখেন।—তুমিই বরং ওর কাছে চলো না মা, তুমিও আমাদেরই একজন হও না? আমরা সবাই তোমার স্বামীর জন্তে যুদ্ধ করবো, আর তুমিও, শুধু তোমার স্বামীর জন্তে নয়, সকলের জন্তে যুদ্ধ করবে। সেবা দিয়ে সাহস দিয়ে আরো অনেককে সারিয়ে তুলবে তুমি।

উৎসাহে আনন্দে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকায় নীলিমা।—পারবো, পারবো আমি? আমি যে কিছু জানি না।

সস্মিত হাসিতে মুখ ভরে যায় বৃদ্ধের। বলেন, যে একা একা এত বড়ো যুদ্ধ চালিয়ে এলো, সকলের সঙ্গে এক হয়ে সে লড়তে পারবে না? পারবে মা, পারবে।

নীলিমা তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করবে এর পর। ওর মন বলবে, যুদ্ধকে আমি ভয় পাই না। যুদ্ধ চাই, আমিও যুদ্ধ চাই।

পলায়ন

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

পাহাড়ের গায় অস্তসূর্যের রক্তিম আলো কিন্তু সবুজ কুয়াশার মত দেখাচ্ছে। বিকেলের এই শান্ত মূর্তিটা অনেক দিন পরে ফিরে এসেছে শক্তিময়ের জীবনে—কত দিন পরে তার হিসেব মিলবে না।

একটা কালো ফিতেকে কে যেন হেলায় ছুঁড়ে দিয়েছে ওই পাহাড় পর্যন্ত। ঘুরে ঘুরে উঠে গিয়েছে পথটা—কিন্তু কোথায়? ওখানে কি আছে শক্তিময় জানে না। জানবার প্রয়োজন তার ফুরিয়ে গেছে। এত দিন যা দেখেছে, যা বুঝেছে, যা সে জেনেছে সব কিছুই ত ভুল। আরও জানা ত অকারণ ভুলের সঞ্চয় ভারি করা।—না থাক, আর কিছু জেনে কাজ নেই। একখানা সাইকেল আর একটা ক্যামেরা—দুটোই অপ্রাণীবাচক, কিন্তু সঙ্গী হিসেবে আশ্চর্য রকমের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাজ করছে, শক্তিময় এদের দুজনকে পেয়ে যেন বাকী জীবনের খোরাক এবং রসদ কিনে নিয়েছে।

পথের পাশে অজস্র পলাশ ফুটেছে। রামগড়ের হাট থেকে বিকিকিনি সেরে ঘরে ফিরছে দলে দলে দেহাতী পুরুষ ও রমণী।

শক্তিময় সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। পাশের জঙ্গলে একটা মহুয়া-গাছের গায়ে সেটা ঠেসান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে বাঁকের মুখে এসে দাঁড়াল। কাছেই একটি বৃদ্ধা ভুঁইয়ে বসে বসে কি যেন করছে। শক্তিময় তার কাছাকাছি গিয়ে দেখল, বুড়ি কাপড়ের আঁচল ভর্ত্তি ক'রে ঝরে-পড়া পলাশ কুড়িয়েছে।

অন্তমনস্ক ভাবেই সে বললে—ঝরা ফুল দিয়ে কি হবে গো বুড়ি মা!

বৃদ্ধা ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াল, তার কুড়ানো ফুলগুলো ঝুর-ঝুর ক'রে পড়ে গেল মাটিতে। শক্তিময় বৃদ্ধার ভয়ার্ত দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে একটু বিস্মিত হ'ল। সে বললে—ক্যা মাঈ, ডর লাগা?

—হাঁ বেটা। বৃদ্ধার সরল উক্তি, তাজা-তাজা কম্পিত কয়েকটি

কথা। কিন্তু এতেই শক্তিময় বিচলিত হয়ে পড়ল। আহা বেচারী কতক্ষণ ধ'রে একটি-একটি ক'রে ঝরে-পড়া পাপড়িগুলো সংগ্রহ ক'রেছিল—কি জানি কেন? হয়ত মৃত কোনো ব্যক্তির স্মৃতি দিয়ে উদ্বুদ্ধ ওর মন। আরও একটা কথা—সারা বছর ধরে পলাশ যে স্বপ্নসঞ্চয় ক'রেছে, যে জীবনীশক্তি গাছের মর্মে রসসঞ্চার ক'রেছে তার পত্র-পল্লবে সব কিছু উজাড় ক'রে দিয়েই ওই রক্ত-পলাশ ফুটেছিল। সূর্যের পিপাসা জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ নরম মদিরা সব কিছু ওই পাপড়িগুলোর বুকে রয়েছে—তাই বুঝি ওই বুড়ি একটি-একটি ক'রে কুড়িয়ে তুলছিল। বৃদ্ধার দিক থেকে শক্তিময়ের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল পলাশ-গাছটার দিকে—আহা, একটিও পাতা নেই, সবগুলোই কি ফুল হ'য়ে পড়েছে ঝ'রে?

বুড়ি বললে—কি দেখ্‌ছ বেটা?

—কিছু না, তোমার সব ফুল যে পড়ে গেল মায়ী?

—তার জন্যে কিছু না। আবার কুড়িয়ে নেবো। যা ভয় পেয়েছিলাম—মনে হয়েছিল বুঝি পল্টনের লোক আমাকে ধ'রে নিতে এসেছে।

পাশেই মিলিটারী আস্তানা, সেই দিকে একবার তাকিয়ে বুড়ি আবার বসে গেল ফুল কুড়োতে। শক্তিময়ও তাকে সাহায্য করতে লাগল।

বুড়ি বললে—না বাবা তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। রাজার দুলাল তুমি কেন মাটিতে বসে আমার জন্যে কষ্ট পোয়াবে?

—তাতে কি হয়েছে। আমার জন্যে তোমার সময় নষ্ট হ'ল যে—

করুণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—সময় আমার বড্ড বাড়তি হয়ে পড়েছে বাবা। বুড়ো মানুষ, কাজ খুঁজে পাই নে—

শক্তিময় প্রশ্ন করলে—এ ফুল নিয়ে তুমি কি করবে?

অসহায় ভাবে বৃদ্ধা আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বললে—এ হচ্ছে রোদ-লাগার ওষুধ। এই ত সামনে গর্মিকাল আস্‌ছে—কত লোকের সর্দিগর্মি হয়, রোদ লেগে জ্বর হয় তখন কত উপকার হয়।

শক্তিময় বললে—এখন ত ফাগুন মাস—

বৃদ্ধা হাসলে, দাঁত নেই ওর একটিও—ভারি মিষ্টি হাসি। মাথার শাদা-শাদা চুলগুলোর মত পবিত্র চক্‌চকে ওর হাসি নিরুত্তপ্ত। বললে ও—এখন থেকে না কুড়িয়ে রাখলে তখন পাবো কোথায় বেটা? তখন ত পলাশ ফুটবে না। সব পাতা হয়ে যাবে—ছায়া দেবার চাকরী করবে গাছেরা। তখন কি আর ফুল-ফুটিয়ে সেজে বসে থাকবার সময়?

—আচ্ছা বুড়ি মা, তোমার কে আছে?

—আমার? এই তোমরা আছো বাবা, আর কে থাকবে। আর খোদা আছেন।

দুই বিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ল বৃদ্ধার কুঞ্চিত লোল গণ্ডদেশ বেয়ে ঝরা-পলাশের পাপড়ির মত।

শক্তিময় সরে এল—এখনই হয়ত দুঃখের ইতিহাস তার ভারি মনকে আরও ভারি ক'রে দেবে। সে আর দুঃখ পেতে চায় না—না, সুখেও তার কাজ নেই। হৃদয়াবেগের কোনো কলাকলাই তাকে যাতে ছুঁতে না পারে এমনই একটা মানসিক স্তরের সন্ধানে সে বেরিয়ে পড়েছে।

ভালোবাসা? না, তারও প্রয়োজন নেই। সে ত ভালোবাসা পায়নি এমন নয়, কণিকা তাকে সব কিছু দিয়ে ভালোবেসেছিল। কিন্তু শক্তিময় তা নিতে পারেনি। নিতে পারেনি তার কারণ সে জানে—গ্রহণ মানে ত শুধু নেওয়াই নয়, দিতে হবে। সে দেওয়া সব সময়ে যে আয়ত্তের মধ্যেই থাকবে এমন নয়, দাসত্বের শেষ বিন্দু পর্যন্ত দিয়েও হয়ত দাবির চাহিদা নিঃশেষে মিটবে না। অসম্ভব। নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে ভালোবাসা কিনতে পারবে না শক্তিময়—তাই এই পলায়ন। কণিকার চাহিদা কতখানি ছিল তা শক্তিময় বুঝতে পারেনি, চেষ্টাও করেনি—তবে আজ মনে হচ্ছে কণিকা তার জীবনকে ভরপুর ক'রে দেবার জন্যে নিজেকে উজাড় ক'রে দিতে প্রস্তুত ছিল। নইলে আত্মহত্যা করতে পারত কি?

পাহাড়ের পথে-পথে জীবনের পদচিহ্ন দেখবার নেশায় নিজেকে ডুবিয়ে দেবে শক্তিময়। তার আশা আছে, একটি নির্ভুল ছবি তুলে এই পৃথিবীকে উপহার দিয়ে যাবে। বিধাতার সৃষ্টিতে অনেক ভুল আছে—নইলে কেন এত বেদনা, এত কেন দুঃখ, দৈন্য কেন এত। শক্তিময়ের সাধনা হবে তার ব্যতিক্রম—নির্ভুল সৃষ্টির।

দূরে এসে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের দিকে ক্যামেরাটা চোখের সঙ্গে লাগিয়ে সে পরখ করতে লাগল—ওইখানে বুঝি নির্ভুল ছবির খোরাক ছড়ানো রয়েছে। মনে হচ্ছে যেন হাতছানি দিয়ে পাহাড়ের শ্যামল শাল-মহুয়ার বনেরা ডাকছে শক্তিময়কে।

সাইকেলখানাকে অবহেলা ভরে আকর্ষণ করল সে। তারপর চড়াই-এর দিকে উঠতে লাগল। তার পায়ে জোর আছে—অনেক অনেক দূর পর্যন্ত চড়াইতে সাইকেল ঠেলে উঠে যেতে পারবে। নির্ভুল চিত্র দিয়ে পৃথিবীর বুকে যুগান্তর আনবার ব্রত নিয়েছে যে, তাকে এটুকু কষ্ট করতে হবে বই কি।

মাইল দুই চলে আসবার পর শক্তিময় দেখলে সামনে চড়াই একেবারে খাড়া ওপরের দিকে উঠে গিয়েছে। একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে সে নাম্‌ল। পিছনের দিকে দৃষ্টি পড়তে অবাক হ'য়ে গেল—পশ্চিম আকাশে কে অত সিঁদুর ঢেলে দিয়েছে—কামনার চেয়েও কি গাঢ় লাল ওই রঙের রক্তিমতায় নেই! শক্তিময় অসহায় ভাবে ক্যামেরার দিকে তাকাল—ওই রঙ কি তুমি ধ'রে দিতে পারবে, চিরকালের পৃথিবীকে সব সময়ের জন্য? পরক্ষণে মনে হ'ল—কই বিস্ময় ছাড়া বেশি কিছু ত নেই ওই রক্তিমতায়। তবে কেন এই নাটকীয়তার প্রতি তার মমতা! থাক, ও ছবি আকাশই দিন দিন এঁকে চলুক আপন মনে—শক্তিময় তুলবে না ও-ছবি।

ওপাশের জঙ্গলে যেন কিছু একটা হেঁটে বেড়াচ্ছে? পায়ের শব্দ—ঝরা পাতার ওপর চলমান প্রাণীর পদক্ষেপ বনের স্তব্ধতায় একটা মর্মরধ্বনি জাগিয়ে তুলল। কোনো জানোয়ার হবে! হিংস্রও হতে পারে। শক্তিময়ের মনে বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হ'ল না। সে যে নিরস্ত্র এ কথাও ভাবলে না সে।

মিনিট কয়েক ধ'রে সেই শব্দ শুনেছে হয়ত—এক সময়ে

মিশ কালো একটি মানুষ বেরিয়ে এল, তার ঘাড়ে একখানা লাল গামছা, পরনের ধুতিটা মালকোঁচা দেওয়া, অনাবৃত দেহ।

শক্তিময়কে দেখে সে আকুল ভাবে প্রশ্ন করল—ঘোড়াটা দেখেছ বাবুসাহেব?

শক্তিময় বললে—না ত!

শক্তিময় ছবি খুঁজতে ব্যস্ত—কোনো ঘোড়া দেখে থাকলেও লক্ষ্য ক'রে দেখবার নজর তার ছিল না। অতএব সে দেখেনি।

লোকটি বললে—আজ সাত দিন হ'ল আমার সেই লাল ঘোড়াটা হারিয়েছে—আজও পর্যন্ত পেলাম না। যদি দেখতে পাও ত আমায় একটু খবর দেবে?

কালো চেহারার ওপরেও যে বিষণ্ণতা একটা মালিন্যের ছাপ এনে দেয় শক্তিময় এই লোকটিকে দেখে যেন নতুন অনুভব ক'রলে।

লোকটি সাগ্রহে তার হারানো ঘোড়ার রূপ বর্ণনা করতে লাগল—মাথার ঠিক মাঝখানে শাদা চক্র। পেটের ডান দিকে গাঢ় বাদামী আর শাদাতে মিশে গেছে—আর সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় লেজের সবটুকু দুধের মত ফর্সা শাদা। এমন ঘোড়াকে কেউ বেশি দিন লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

শক্তিময় ঘাড় কাৎ ক'রেই অনাসক্ত ভাবে উত্তর দেয়—আচ্ছা দেখব।

লোকটি কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়, সে বললে—সাত দিন আগে রামগড় বাজারের কাছে আমাদের তাঁবু পড়েছিল। সেদিন ওই রাঁচি-হাজারীবাগ রোডের ওপাশে আরও সবগুলো ঘোড়ার সঙ্গে গিয়েছিল বেটা, কিন্তু সবাই ফিরল তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। তারপর রোজই খুঁজি—তাকে পাই নে। দিন তিনেক আগে এক পল্টনের লোক বলেছিল যে, কোন্ একটা মাদী ঘোড়ার সঙ্গে এই পাহাড়ের কোলে সে ওই ধরণের একটা ঘোড়াকে যেন চরতে দেখেছে। তার কথা শুনে আমি রোজ যতখানি পারি পাহাড়ের কোলে কোলে খুঁজে বেড়াই।

শক্তিময় বললে—এ ভাবে খুঁজলে কি আর পাবে?

—না পেলে আর কি করব বলুন? পাঁচটা ঘোড়া নিয়ে তীর্থ করতে বেরিয়েছিলাম। তা আপনাদের আশীর্বাদে বৃন্দাবন, মথুরা, কাশী, গয়া হয়ে গেছে। এখন যাচ্ছি বৈদ্যনাথ। মোট মাটারী নিয়ে চারটে ঘোড়ার খুব যে কষ্ট হবে তা নয়। তবে ঘোড়াটা পথে পড়ে থাকবে—এই যা ভাবনা। দেখি আর দু'-চার দিন।

—তোমার নাম কি?

—লছমন। আমার দাদা রামঅবতার—আমরা পাঁচ ভাই। ক্ষেতিউতি আছে। কিন্তু বাবু আপনি একটু ঘোড়াটা দেখবেন—যদি পান একটা খবর পাঠিয়ে দেবেন না হয়—বড়কাখানা জংশনের কাছে আমাদের ওই একটাই তাঁবু আছে। গাড়ীভাড়া যাতায়াত দেবো—খবরটা যদি দয়া ক'রে আন।

হেসে উঠল শক্তিময়—আচ্ছা ভাই, খবর পেলে দেবো।

লছমন ট্যাঁক থেকে একটা দেশলাই বার করলে—ছোট্ট একটি বিড়ি বার ক'রে শক্তিময়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বললে—লিজিয়ে!

—আমি খাই নে।

—আচ্ছা বাবু, এখন বড়কাখানায় গাড়ি পাবো?

—খুব পাবে—সন্ধ্যের সময় ত ট্রেন।

—অতক্ষণ কে বসে থাকে, এই ত চার মাইল পথ, দেখতে দেখতে চলে যাই। যদি পথের মধ্যে কোথায় ব্যাটাকে পেয়ে যাই। তবে কি জানেন—ব্যাটা একটা ঘুড়ীর সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছে কি না, এখন ওকে খুঁজে পাওয়াই দায়। বাড়ির কথা কি মনে আছে আর? এই যে লছমন ছত্রি কত ছোলা হাতে ক'রে খাইয়েছে তার কথা কি একবারও মনে পড়বে বেইমানের?

শক্তিময় হাসলে।

লছমন শেষ বারের মত কাকুতি-মিনতি ক'রে বলে গেল—খবরটা যেন পাই বাবু! আমি বলি কি বৈজনাথজী ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না, দু'দিন পরেই যদি যাই ত কি ক্ষতি—একটা দুটো চারটে দিন ভালো ক'রে খুঁজলে চুম্‌কীকে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দাদাটা মহা ব্যস্ত—বলে, চল কালই সকালে।

—ঠিক কথা, ঈশ্বরের পালাবার কোনো পথ নেই। মানুষের দাসত্ব ক'রে যাবেন তিনি, যত দিন কোনো সুলতান মামুদ, আলমগীর, কোনো আব্দালী এসে তাঁকে মুক্তি না দেয় তত দিন তিনি বসে থাকবেন। তাঁর ত আর লছমনের ঘোড়ার মত চারটে পা নেই—

লছমন নির্বোধের বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে—আপনি কি বলছেন বাবুজী?

—তোমার দাদা ভারী ছটফটে লোক, তাই ভাবছি—

—ওটা হচ্ছে ঘোর বিষয়ী। এই যে আমরা পথে-পথে তীর্থ ক'রে বেড়াচ্ছি এই সময়টা চাষের কাজে লাগালে অনেক ফসল হতে পারত—এই ভাবনাতেই দাদার ঘুম হয় না। সে যাক গে, সবই আমার কপাল! আপনি মেহেরবানী ক'রে একটু খোঁজে থাকবেন, আহা চুম্‌কী আমার মেয়ের বড় পেয়ারের ঘোড়া।

—আচ্ছা ভাই।

লছমন ছত্রী দু'হাত তুলে নমস্কার ক'রে বিদায় নিল। এখান থেকে বড়কাখানা মাইল চারেক পথ, খানিকটা দূরে নদী পার হ'তে হবে, তারপর পাহাড়ের হাতছানি দেখতে দেখতে লছমন এক সময়ে বড়কাখানার জংশনে পৌঁছবে।

শক্তিময় আপন কাজে মন দিল।

মন্দ লাগছে না এ জায়গাটা—ঈশ্বর আছেন কি না জানবার জন্যে এখানে কেউ আসবে না, কেউ আসবে না অনুতপ্ত মনে গোপন ক্ষমা ভিক্ষার জন্য, আসবে না কেউ আশার প্রাচীরকে সোনা দিয়ে আচ্ছাদিত করবার দাবি নিয়ে। একজন এসেছিল হারানো ঘোড়ার খোঁজে—সেও চলে গেছে। শক্তিময় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একটি শিলাখণ্ডে আরাম ক'রে বসল।

পাথরের কঠিন মসৃণ স্পর্শে কিন্তু আশ্চর্য কোমল একটি হাতের ছোঁয়া লাগল শক্তিময়ের মনে। আচ্ছা, কণিকা এখন কি করছে? কণিকা যা-ই করুক শক্তিময়ের তাতে কি এসে-যায়? অথচ রোজ সকালে-বিকেলে এ ছাড়া তার কিছু জানবার উপায় ছিল না। তাদের সংসারের মোট ওই দু'খানি ঘরে তেরোটি প্রাণীর বাস। তেরো জন—দুটি পৃথক্ পরিবারের মানুষ। বিরাট একটা মানুষের ঢেউ-এ এসেছে ভেসে হাজার-হাজার মানুষ, লাখ-লাখ মানুষ। শক্তিময়ের দাদার শ্বশুরবাড়ির গোটা পরিবার এসে উঠেছে

তাদের বাসায়। মাথা গুঁজে থাকাও কষ্টকর। এক-এ মনের গঠন এক-এক রকম। অথচ উপায়ই বা কী! তবু যাচ্ছিল এক রকম ক'রে।

কিন্তু বৌদির বোন কণিকা উঠতি বয়সের মেয়ে। তাকে যে শক্তিময়ের খারাপ লাগে এমন নয়। সাধারণ চেহারা হিসেবে কণিকাকে সুরূপা না বললেও সুশ্রী এ কথা সবাই বলে, শক্তিময়েরও তাতে আপত্তি নেই।···

যেদিন একটা চাকরী জুটল শক্তিময়ের সেই দিন থেকেই কিন্তু পৃথিবীর মানুষেরা তার প্রতি কেমন অন্য রকম ব্যবহার শুরু করলো। বাইরের জগৎকে শক্তিময় কোনো দিনই তেমন আমল দেয়নি আর বাড়িতে দাদা-বৌদির কাছেও সে কোনো দিন আমল পায়নি। হঠাৎ ষ্টেট বাসের কণ্ডাক্টরী পেয়ে সে এ-বাড়িতে গণ্য হয়ে উঠল—নগণ্যতার খোলসটা কে কেড়ে নিয়েছে কখন শক্তিময় টেরও পায়নি। অভিনবত্বের দিক দিয়ে ভালোই লাগে। ছুটির দিনে দাদা ডেকে পরামর্শ করেন সংসারের অভাব-অনটনের প্রতিকার সম্পর্কে, বৌদি বলেন—'এবার তোমার বিয়ে দেবো।' শক্তিময় বলে—'মন্টু-ঝন্টুর গতি করো আগে!' বৌদি বলেন—'সে ত তোমার হাতেই রয়েছে।'

শক্তিময় অবাক হয়ে তাকায়,—এ বিস্ময়টা তার ভাণ, কারণ তার কানে অনেক কথাই এসে পৌছয়, শুনতে ইচ্ছে না থাকলেও শুনতেই হয়। কণিকার সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা এবং তার পরিবর্তে বৌদির মেজো ভাই শ্যামলের সঙ্গে মুন্টির বিয়ের ঘটকালি চলছিল। এখন শক্তিময়ের দশ দিনের পুরনো চাকরীর ওপর এই ব্যাপারটা পাকাপাকির উপক্রমে এসেছে। বৌদি বললেন—'যেন তুমি ভাজা মাছখানা উল্টোতে জানো না, মনে হচ্ছে। কণির সাথে দিবা-রাত্তির ফুসুর-ফুসুর গুজুর-গুজুর করো যে, তা কি আর কেউ ছাখে নাই?'

একটি বেকার ছেলে আর একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে উভয়েই ত পরিবারের সমান গলগ্রহ, এ কথা ত সবাই জানে। তারা যদি দু'জনে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে নিজের মনের ভার লাঘব করতে চায়, এর মধ্যে মাছ-ভাজাভাজির কি আছে?

···কিন্তু, ছিল। নইলে কণিকা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে কথা বলা বন্ধ ক'রে দিত না। নইলে মুন্টু মুখঝামটা দিয়ে বলতে পারত না—'চিরকাল তোমার লুঙী আর গেঞ্জী কাচার চাকরী আমাকে দিয়ে হবে না। বিয়ে ক'রে বৌ এনে তার ওপর যত পারো হুকুম চালিয়ো।'

শক্তিময়ের মৌন নির্লিপ্ততায় দু'খানা ঘরের বাকী বারোটি প্রাণী যেন মানসিক প্রতিরোধ গঠন ক'রে বসল।

কণিকার ভাঙা-ভাঙা হাতের লেখা এক টুকরো চিঠি খুঁজে পেল সেদিন শক্তিময় তার খাকী শার্টের বুক-পকেটে—"তুমি কি পাষাণ! আমাকে এমন ক'রে ভাসিয়ে দিতে পারবে? কিন্তু একদিন দেখবে আমি এর জবাব দিয়ে চলে যাবো—তখন

রাত্রে আসবে লতিকা তোমার খাতা নেবার জন্য আর তোমার সঙ্গে পরিচয় করবার জন্য। তোমায় যেতে হবে দ্বিজেনদা!

আশ্চর্য্যান্বিত হলাম: বাঃ, বেশ তো! অজানা এক বিয়ে-যাবো অজানা একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে? তোমার এক নতুন, তেমনি উদ্ভট!

চলেছে ধূসর নয়, আর তা আমি হতেই দোব না। তুমি সত্যি সেদিন ওই এক হবে, লতিকা সত্যিই তোমায় ভালো-পড়তে পারেনি? সারা। থেকে বার করলো লতিকার লেখা হাওড়া-পোস্তা-মানিকতলা হা মেলে ধরে বললো: এই দেখ, বীণা ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিল কণিকা। এবার বিশ্বাস হলো তো যে, লেখাটা কণিকার একান্ত নিজস্ব ম বলে এসেছি তোমায়ও নিয়ে বিশ্বাস করেনি। আরো বারো জনের।—বলে বীণা একেবারে পশ্চাতে দেখতে পেয়েছিল সে। তাছাড়া

ত ভুলতে পারবে না—যত দিন কণ্ডাক্টরীর স্বর্গটা দশটার হাতে ধরতে পারেনি তত দিন পৃথিবীর আর সবাই তাকে উপেক্ষা করেছে, করতে পারে তারা, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে কণিকা শক্তিময়ের প্রেমের কাঙাল হয়ে জীবন বিসর্জনে উদ্যত, সে-ও কি ক'রে উদাসীন থাকতে পেরেছিল? তবে কি কণিকাও ওদের মত পয়সার পূজো করে? শক্তিময়কে ভালোবাসা জানাবার কথা এতদিনে একবারও মনে হয়নি কেন কণিকার?···জবাব দেয়নি শক্তিময়। বাসের ঘণ্টা বাজিয়ে গাড়ী থামিয়েছে, প্যাসেঞ্জার নিয়ে আবার গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা মেরেছে। এমনি ক'রে পাঁচটা দিন বেশ কাটল। মাঝে মাঝে শক্তিময় আপন মনে হেসেছে কণিকার সংকল্পের অসারতা দেখে। বাসার দু'খানা ঘরের মানুষ আগের মতই তাকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখছে, মাঝে মাঝে তার জ্ঞান সঞ্চারের

—ও মশাই, শীগ্‌গির, দেখছেন না আমার স্বামী ডুবে যাচ্ছে?
—খুব ভাল ছবি হ'ত জানি, কিন্তু ফিল্ম নেই যে।

…টি
…বাবার সম্বন্ধে
… তাই, বৌদি মিষ্টি-
… বেঁকে বসে থাকলে ত
… জ্বালা। এদিকে ঘরের
… দাদার কাছে ত কিছু বলবার
… র কাছে কথা শুনতে শুনতে আর
… গেল হয়ে যাই আর কি!'
বসন্ত—কি তুমি বলতে চাও, স্পষ্ট বলো।
…তও তোমাদের সইবে না?
… ভার ক'রে বললেন—কি এমন বলেছি যে অসহ্য হ'ল
…

—আর কি বলবে? তোমাদের সব জানতে বাকী নেই—কথায় কথায় ভয় দেখিয়ে, চোখ রাঙিয়ে সুবিধে হ'ল না—এখন শুকনো আদর, পাখার বাতাস দিয়ে—ছিঃ, বৌদি—

ভাত সে খায়নি। উঠে গেল। দু'খানা ঘরের কোথাও যেন এতটুকু প্রাণচিহ্ন ছিল না সেই মুহূর্তে।

আপিসে বেরিয়ে একবার মনে হয়েছিল শক্তিময়ের—চুপ ক'রে থাকাটা কিছু নয়। প্রতিপক্ষের লোকেরা জানুক যে সে-ও একটা মানুষ। উঃ, কী চক্রান্ত ঘুলিয়ে তুলেছে সবাই মিলে, যেন বিয়ে হ'লেই সারা জীবনের সব সমস্যা ঘুচে যাবে! না, সে পারবে না ছাঁ-পোষা হয়ে মরতে-মরতে বেঁচে থাকতে।

কিন্তু তার পর?—

দেয়াল থেকে একখানা বালি খসে পড়ার মতই নিতান্ত সহজ ভাবে কণিকা খসে পড়ল জীবনের বিরাট দেহ থেকে খসে। সত্যিই কণিকা আত্মহত্যা করল। সেই দিনই বোধ করি শক্তিময়ের কথার জবাব দিয়ে গেল এই ভাবে। তিনতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মরল কণিকা।

শক্তিময় আঘাত পেল—সে আঘাত বড় কি তুচ্ছ তা বুঝে দেখবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না, সময়ও কম। কিন্তু একটা ব্যাপার সে লক্ষ্য করেছে!—কণিকার বাবার কাছে দু-একজন নেতার গতায়াত। চেনে বই কি সে এই নেতাদের। খবরের কাগজে একজনের বিবৃতি দেখা গেল—গভর্ণমেন্টের উদাসীনতার চরম নিদর্শন কণিকার অপমৃত্যু! বাস্তহারা পিতার অর্থাভাব। সরকার থেকে কোনো রকম সাহায্য না পাওয়ায় পরিবারের সকলকে দীর্ঘদিন উপবাস এবং অর্ধাশনে কাটাতে হচ্ছে। এই কষ্ট সহ্য করতে না পেরেই কণিকা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। কণিকার এই অপমৃত্যুকে উপলক্ষ্য ক'রে বড় বড় বক্তৃতা হ'ল শহরের আশে-পাশে। শক্তিময়দের ঘর দু'খানা সব সময়ের জন্যই লোকজনের গতায়াতে সরগরম থাকে। বাড়ির সকলেই এই মৃত্যুকে কেন্দ্র ক'রে অদ্ভুত উচ্ছ্বাসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। শক্তিময় শুধু চুপ ক'রে থাকে। কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না। না বলুক—এতেই সে ভালো আছে।

সত্যি সত্যিই কণিকার অপমৃত্যুর সুযোগে ওদের পরিবারের সুরাহা হয়ে গেল। কোথায় যেন কি একটা চাকরী মিলে গেছে কণিকার বাবার, ওর সেজো ভাইও একটা ব্যবসায়ের জন্য পাঁচ হাজার টাকা ধার পেয়ে গেল, বসন্তের জমিও গরই বিলি-বন্দোবস্তে ওরা পাবে। সংসারে হাসি উথলে …ল।

আশ্চর্য! কণিকার কথা ওদের মুখে বারেকের জন্যও শোনা যায় না। কণিকা মরে গেছে, কিন্তু শেষ চিহ্নটুকু রেখে গেছে এক জায়গায়। সে চিহ্ন বহন করতে হচ্ছে শক্তিময়কে। আজও শক্তিময়ের সঙ্গে ওরা কেউ বাক্যালাপ করে না। অদ্ভুত মনে হয়—গায়ে গায়ে ধাক্কা লেগে গেলেও কেউ কথা বলে না শক্তিময়ের সঙ্গে। তবু ভালো যে, কোনো একটা জায়গায় এখনও কণিকার মৃত্যুর আসল কারণটা মিথ্যে হয়ে যায়নি। শক্তিময়ের দুঃখ হয় না কণিকাকে না পাওয়ার জন্য—কারণ সে ত সত্যিই কণিকাকে কামনা করেনি? কিন্তু কণিকা মরে যাওয়াতে তার কষ্ট হয়েছে, সেটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এই ধোঁয়ার কালিতে বিষণ্ণ আবহাওয়াতে খুবই কষ্ট হয়েছে, জ্বালা করেছে মনের মধ্যেটা এদের অবিচার আর বিরূপতায়, তবু শক্তিময় সহ্য ক'রে গেছে। কোনো দিন একটি কথাও বলেনি সে মুখ ফুটে। প্রতিবাদ করা তার স্বভাব নয়। কণিকার মৃত্যু যেন তাকে আরও কূটস্থ ক'রে দিয়েছে। সে শুধু বাসের টিকিট কাটে আর বিড়ি খায়, বন্ধুদের স্থূল রসিকতায় নীরবে যোগ দেয় আর বাড়িতে যতক্ষণ থাকে বোবা হয়েই কাটায়।

হয়ত এই ভাবেই চলত। কিন্তু সেদিন যখন শুনল, কণিকার বাবা বেশ জোর-গলায় তার দাদাকে বলছেন—"আমার আর বুঝতে বাকী নাই। তোমার ভাই-এর মত চামাররে জামাই করতে ইচ্ছা ছিল না, অখনেও নাই—তবে তোমরা বার বার বলো তাই। ওর তো টাকা নগদ চাই পাঁচশ', এই জন্যে না এত কথা! তা দিমু যাও। মণিকার জন্য অবিশ্যি ভাবনা ছিল না, রূপে-গুণে রাজরাণী হওনের যোগ্য এই মেয়ে! তোমার ভাইর চেয়ে আমার মেজো ছেলে ত কম রোজগার করে না, না হয় কাটাকাপড় বিক্রীর টাকা। আরে টাকা আনে ত বটে! যাউক গিয়া। ব্যাপারটা মিটাইয়া নিলেই হয়। তারে কও গিয়া পাঁচশ' টাকাই পাইবে সেই হতভাগা!" অর্থাৎ কণিকার ছোট বোন মণিকার সঙ্গে শক্তিময়ের বিয়ের সম্পর্ক হচ্ছে, পাঁচশ' টাকা নগদও দিতে রাজী ওঁরা, মন্টুর সঙ্গে ওই ফেরীওয়ালা ছোকরার বিয়ে দিতে হবে, কারণ সে ছোকরাও পাত্র হিসেবে শক্তিময়ের চেয়ে খারাপ নয়! বাঃ।

এর পর শক্তিময় যদি রামগড়ে বন্ধুর কাছে পালিয়ে এসে থাকে ত তাকে দোষ দিতে হবে বই কি! একসঙ্গে দু-দুটো কন্যাদায় উদ্ধারের সম্ভাবনা আপাতত: ঘুচিয়ে দিয়েছে যে মূঢ় তাকে সামাজিক দণ্ডবিধি অনুসারে শাস্তি দেওয়া কি উচিত নয়? শক্তিময়ের সামনে এসে দাঁড়াল মণিকার বাবা, কলকাতা শহর থেকে তিনশ' মাইল দূরের এই পাহাড় জঙ্গলে হঠাৎ কি ক'রে এমন একটা বিপর্যয় ঘটল? পৃথিবীর কোথাও পালিয়েই কি নিস্তার নেই তবে?

চমকে উঠল শক্তিময়। নিজের ভুল ভেঙে, আপন-মনেই সে বনের মধ্যে একা-একা হাসতে লাগল—অবাধ প্রাণখোলা হাসিতে আর তার প্রতিধ্বনিতে পাহাড়টা গম্-গম্ করতে লাগল। আর কিছু নয়—একটা ঘোড়া এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। হয়ত ঘোড়াটা সেই লছমনের। তা হোক, শক্তিময় কিছু বললে না তাকে। বেচারী অনেক মোট বয়েছে। অনেক তীর্থের পথে পথে কত বোঝা বয়েছে। এখন ছাড়া পেয়েছে—ছাড়াই থাক। শক্তিময় জানাবে না লছমনকে!

রাত্রে আসবে লতিকা তোমার খাতা নেবার জন্য আর তোমার সঙ্গে পরিচয় করবার জন্য। তোমায় যেতে হবে দ্বিজেনদা!

আশ্চর্য্যান্বিত হলাম: বাঃ, বেশ তো! অজানা এক বিয়ে- যাবো অজানা একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে? তোমার ন নতুন, তেমনি উদ্ভট!

নয়, আর তা আমি হতেই দোব না। তুমি কি হবে, লতিকা সত্যিই তোমায় ভালো- ারী থেকে বার করলো লতিকার লেখা ন মেলে ধরে বললো: এই দেখ, বীণা । এবার বিশ্বাস হলো তো বে, বলে এসেছি তোমায়ও নিয়ে ।—বলে বীণা একেবারে

দশটায়

আপনার অনিন্দ্য মুখরাগ অম্লান রাখতে

এই দু'ভাবে যত্ন নেবেন

মুখখানি ফরসা ও মসৃণ রাখতে হলে দুটি ক্রীম আপনার চাই-ই—একটিতে ময়লা কাটবে, অপরটি মুখশ্রী নিখুঁত রাখবে। রাত্রিতে মাখবেন ত্বক নির্ম্মল রাখার জন্য সুমিশ্রিত তৈলাক্ত ক্রীম—পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম। আর দিনের বেলায় রঙ-কালো-করা সূর্য্যালোক থেকে মুখশ্রী বাঁচানোর জন্যে মাখবেন সুশীতল হাল্কা একটি ক্রীম—পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম।

আপনার 'রূপচর্য্যায়' এই নিয়ম মেনে চলুন:

রোজ রাত্রে
ত্বক নির্ম্মল করার জন্য সারা মুখে পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম মেখে মালিশ ক'রে বসিয়ে দিন। তাতে লোমকূপের সমস্ত ময়লা বেরিয়ে আসবে। তারপর মুছে ফেললেই দেখবেন, মুখখানি কেমন উজ্জ্বল ও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

রোজ ভোরে
হাল্কা ভাবে পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম মেখে মুখশ্রী নিখুঁত রাখুন। এ মাখবার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যাবে কিন্তু অদৃশ্য একটি সূক্ষ্ম স্তর দিনভোর রঙ-কালো-করা সূর্য্যালোক থেকে মুখশ্রী অম্লান রেখে দেবে।

পণ্ড্‌স

একমাত্র কনসেশায়েনার্স
জিওফ্রে ম্যানার্স এণ্ড কোং লিঃ
বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ।

মালা

মিশ কালো একটি মানুষ বেরিয়ে এল, তার ঘাড়ে একখানা লাল গামছা, পরনের ধুতিটা মালকোঁচা দেওয়া, অনাবৃত দেহ।

শক্তিময়কে দেখে সে আকুল ভাবে প্রশ্ন করল—ঘোড়াটা দে

প্রাণতোষ ঘটক

বাবুসাহেব ?

শক্তিময় বললে—না ত!

শক্তিময় ছবি খুঁজতে ব্যস্ত—কোনো ঘে

লক্ষ্য ক'রে দেখবার নজর তার ছিল না।

লোকটি বললে—আজ সাত দিন হ'

হারিয়েছে—আজও পর্যন্ত পেলাম

আমায় একটু খবর দেবে ?

...বিদারণ।

কালো চেহারার ওপ...নময়, ভঞ্জনি।

এনে দেয় শক্তিময় এই ...ঙ্গি, খণ্ডনা, খণ্ডিত!

লোকটি সা...

...অঙ্কহারক, বিভাজক।

লাগল

ভাজন—ভর্জ্জন, বালসান, পোড়ান।

ভাজন—পাত্র, উপযুক্ত, বিশ্বাসযোগ্য।

ভাজা—ভৃষ্ট দ্রব্য, ঝলসান, খরা।

ভাজি—পক্বব্যঞ্জনবিশেষ, ভাজা দ্রব্য।

ভাজু—ভাইজ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী।

ভাজ্য—অংশনীয়, ভাগযোগ্য, বণ্ট্য।

ভাট—স্তুতিপাঠক, রাজদূত, বন্দী।

ভাটী—আকা, পাজা, উনন, স্রোত।

ভাটী বেলা—অপরাহ্ণ, বৈকাল।

ভাড়া—বেতন, কর।

ভাণ—ব্যাজ, কাচ, ছল, ফাঁকী।

ভাণ্ড—ভাঁড়, কৌতুকী, ভণ্ড।

ভাণ্ডার—ভাঁড়ার, দ্রব্যাগার, কোষ।

ভাণ্ডারী—ভাণ্ডারাধ্যক্ষ, ভৃত্য।

ভাত—অন্ন, ওদন, সিদ্ধ তণ্ডুল, ভক্ত।

ভাতি—প্রভা, শোভা, আলোক।

ভাতুড়িয়া—ভাতুয়া, অন্নদাস, ভক্তদাস।

ভাদ্রবধূ—ভ্রাতৃবধূ, কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী।

ভানানিয়া—কুটুনিয়া, ধান্যপরিষ্কারক।

ভাপ—বাষ্প, উষ্ণজলাদির ধূম, উত্তাপ।

ভাব—তাৎপর্য্য, প্রণয়, ধাতুর অর্থ।

ভাবক—রসিক, ভাবগ্রাহী।

ভাবচোর—কুকবি, পদহর।

ভাবনা—চিন্তা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা।

ভাবার্থ—অভিপ্রায়, তাৎপর্য্য, অর্থ।

ভাবিত—চিন্তিত, উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত।

ভাবী—ভবিষ্যৎ, যাহা হইবে, আগামী।

ভাবুক—কল্যাণ, শুভ, মঙ্গল, হওয়নশীল।

ভাবুকী—ভণ্ড, কৌতুকী, অঙ্গভঙ্গীকর।

ভার—বহনীয় বস্তু, গুরুত্ব, ক্ষমতার্পণ।

ভারত—পুরাণবিশেষ, রাজ্যবিশেষ।

ভারতবর্ষ—জম্বুদ্বীপের খণ্ডবিশেষ।

ভারতী—বাণী, সরস্বতী, কাব্যোল্লেখ।

ভারী—ভারবাহক, গুরুতর, দুর্ব্বাহ্য।

ভার্য্যা—জায়া, পত্নী, দারা।

ভাল—কপাল, ভাগ্য, ললাট, অদৃষ্ট।

ভালবাসা—স্নেহ, প্রীতি, প্রেম।

ভালুক—ভল্লুক।

ভাষণ—কথন, বলন, কহন, বচন।

ভাষা—কথা, সংস্কৃত ভিন্ন বাক্য, বাণী।

ভাষ্য—টীকা, টিপ্পনী, সূত্রের বিবরণ।

ভাস্—বাহ্ন, দীপ্তি, শোভা, শকুনি পক্ষী।

ভিক্ষক—ভিক্ষুক, যাচক, ভিক্ষাকারী, ভিখারী।

ভিজা—আর্দ্র, সজল, অশুষ্ক।

ভিটা—বসতবাটী, গৃহাদির পোতা।

ভিড়—ভীড়, জনতা, লোকসমূহ, লোকারণ্য।

ভিৎ—ভিত্তি, কাঁথ, দেওয়াল, কুড্য।

ভিতর—মধ্য, অভ্যন্তর, অন্তঃপুর।

ভিন্ন—পৃথক্, স্বতন্ত্র, বিকসিত, অন্য।

ভিন্নতা—প্রভেদ, স্বাতন্ত্র্য, বিশেষ।

ভিন্নভাব—ভাবান্তর, মতান্তর।

ভীমরুল—দংশক কীটবিশেষ, ভীমরুল, ভেমরুল।

ভিষক্—চিকিৎসক, বৈদ্য, কবিরাজ।

ভীত—ত্রস্ত, ভয়যুক্ত, শঙ্কিত, ত্রাস, আতঙ্ক।

ভীম—দারুণ, ভয়ানক, দ্বিতীয় পাণ্ডব।

ভীমরথী—অতিশয় বুড়ামী, অতিপ্রাচীন।

ভীরু—ভয়শীল, ভীত, শঙ্কিত, ত্রস্ত।

ভীষণ—শঙ্কা

ভীম—ভয়া...ছ তুললো আমায় : জানো দ্বিজেনদা, তোমার জন্য

ভুঁড়ি—স্থূ...াছে। বল, কি খাওয়াবে? নইলে বলবো না

ভুক্ত—কু...মারা...ল দিচ্ছি।—একটু দাঁড়াও, আমি কাপড় ছেড়ে

ভুক্তন—

ভুক্তভো... ভিজ্যা বীণা পরে এল সামনে, সাড়ী আর শুধু মাত্র

ভুক্তাবশিষ্ট। বললো : বল, কি খাওয়াবে?

ভুক্তি—উ...কা...বে।

ভুজ—বাহু, ...াকাশের চাঁদ?

ভুজগ—ভু... তুমি যদি খেতেই পার, তাহলে না হয় আঁকশি

ভুড়ভুড়—বি...ড়ে আনবার কষ্ট স্বীকার করা যাবে।

ভুল—ভ্রান্তি, ...উঠলাম।

ভুসা—ধূমজনি...শ করলাম : কিন্তু খবরটা সত্যিই যদি সুখবর

ভুসী—যব-গোধূ... করছো সুখবর, আর আমি হয়তো তাকেই

ভু—পৃথিবী। ...হয়েছে হয়েছে, উপেন বাবুর চিঠি এসেছে,

ভুঁই—ভূমি, ক্ষেত্র ...প্রকাশ করলো : তাই হবে। তারপর?

ভুকম্প—ভূমিকম্প, ...এবার তোমায় নিয়ে যাবেন। মন

ভুগোল—মহীমণ্ডল, ...ার গেছে বদলে, তাই না?

ভুত—অতীত, গত, প্রেত ...ফিরিয়ে নিল। তারপর অকস্মাৎ

ভুতাত্মা—শিব, জীবাত্মা, দেহ ...উঠলো : দাঁড়াও, হাত দেখতে

ভুতি—বিভূতি, ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি, ...চক্র পড়েছে আর শুক্রের

ভুদেব—ব্রাহ্মণ, বিপ্র, দ্বিজাতি। ...থা বলবে?

ভুধর—গিরি, পর্ব্বত, রাজা, ভূপাল। ...স।

ভুমিকা—আভাষ, প্রস্তাবনা, ছদ্মবেশ। ...ন্ধ পরীক্ষা

ভুমিজীবি—কৃষিলোক, কৃষিকর্ম্মজীবি। ...দই

ভুমিষ্ঠ—ভূমিপতিত, জাত।

ভুয়ঃ—পুনর্ব্বার, পুনরায়, বারম্বার।

ভুরি—বহু, অধিক, প্রচুর, অনেক।

ভুর্জপত্র—বৃক্ষবিশেষের ত্বক্।

ভুষণ—অলঙ্কার, ভূষা, আভরণ।

ভুষিত—শোভিত, অলঙ্কৃত, ভূষাবিশিষ্ট।

ভুস্বামী—ভূম্যধিকারী, ভূপতি, রাজা।

ভুকুটি—কাপট্য, প্রবঞ্চনা।

ভৃঙ্গ—ভ্রমর, অলি, ষট্পদ, মধুকর।

ভৃঙ্গার—স্বর্ণময় ঘট, সুবর্ণ, লবঙ্গ।

ভৃঙ্গারিকা—ভৃঙ্গারী, ঝিঁঝিঁপোকা, ঝিল্লী।

ভৃঙ্গী—ভ্রমরী, শিবের ভৃত্য।

ভৃতি—বেতন, ভরণ্য, পরিশ্রমের মূল্য।

ভৃত্য—কিঙ্কর, দাস, ভৃতিভোগী।

ভৃমি—মোহ, রোগাদি জন্য অজ্ঞানতা।

ভৃষ্ট—ভাজা, পক্ক-দ্রব্যাদি, দগ্ধ।

ভেক—মণ্ডুক, বেঙ্গ, দর্দ্দুর।

রাত্রে আসবে লতিকা তোমার খাতা নেবার জন্য আর তোমার সঙ্গে পরিচয় করবার জন্য। তোমায় যেতে হবে দ্বিজেনদা!

আশ্চর্য্যান্বিত হলাম : বাঃ, বেশ তো! অজানা এক বিয়ে-বাড়ীতে যাবো অজানা একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে? তোমার প্রস্তাবটি যেমন নতুন, তেমনি উদ্ভট!

কিন্তু অসম্ভব নয়, আর তা আমি হতেই দোব না। তুমি কাঠের পুতুল হলে কি হবে, লতিকা সত্যিই তোমায় ভালোবেসেছে।—বলে বীণা আলমারী থেকে বার করলো লতিকার লেখা একটা চিরকুট, চোখের সামনে মেলে ধরে বললো : এই দেখ, বীণা তো তোমায় শুধু মিছে কথাই বলে। এবার বিশ্বাস হলো তো যে, এটা আর উদ্ভট উপন্যাস নয়?—আমি বলে এসেছি তোমায়ও নিয়ে যাবো নিশ্চয়ই!—বল, কথা দিলে দ্বিজেনদা!—বলে বীণা একেবারে আমার গা ঘেঁসে এসে দাঁড়ালো।

কিন্তু আমার কথার জন্য বয়েই গেছে বীণার। রাত দশটায় টেনে নিয়ে গেল সেই বিয়ে-বাড়ীতে খাতাখানা বগলদাবা করে। পরিচয় হলো লতিকার সঙ্গে।

তার পরের ঘটনাবলী সংক্ষিপ্ত হলেও গতিশীল ও রোমাঞ্চময়। বীণার বাসাতে কলেজ থেকে ফেরবার পথে বহু বিকেল রাত করে ফেললাম, ছুটির দিনে অনেক সকাল রেস্তোরাঁয় বসে বসে চা ও কেকের সঙ্গে একেবারে দুপুর হয়ে গেল, অনেকগুলো সন্ধ্যা নদীর বুকে ভাসমান নৌকোয় কাটলো। কখনো সাক্ষী রইলো বীণা, কখনো শুধু লতিকা ও আমি, আমি ও লতিকা। তখনকার সাক্ষী রইলেন হয়তো অশরীরী কোনো দেবতা!...

আমাদের সুবর্ণ সুযোগ দিয়ে অনেক সময়ই বীণা সরে যেত। কিন্তু সুযোগের সদ্ব্যবহার করবার মত মন কোথায় আমার? ...থায় আমার সে সময়? ভালো তাকে লেগেছিল সত্যি, কিন্তু

ভোরঙ্গ—...ভালোবাসতে পারলাম কই?

ভৌম—মঙ্গলগ্রহ, পা...র্থক্য আছে। অশোকাকে নিয়ে

ভ্যাসভ্যম—অসভ্য, মূর্খ, অবোধ, ...ত্রিশ মিলিমিটারের ক্ষুদ্র

ভ্রংশ—ধ্বংস, অধঃপতন, চ্যুতি। ...কার

ভ্রমণ—পর্য্যটন, ঘুরণ, গমনাগমন।

ভ্রমি—মূর্চ্ছা, মোহ, চক্র, ঘূর্ণবায়ু।

ভ্রষ্ট—দুষ্ট, চ্যুত, অধঃপতিত।

ভ্রাজক—পিত্ত, মায়ু।

ভ্রাজিষ্ণু—শোভান্বিত, বিভ্রাট, অলঙ্কৃত।

ভ্রাতা—একপিতৃজাত, ভাই, সহোদর।

ভ্রাতৃজ—ভ্রাতৃপুত্র, ভ্রাতৃব্য, ভাইপো।

ভ্রান্ত—ভ্রমযুক্ত, বিস্মৃত।

ভ্রামক—ভ্রান্তিজনক, বিস্মারক, চুম্বক।

ভ্রূ—নেত্রের ঊর্দ্ধলোমশ্রেণী।

ভ্রূকুটি—কটাক্ষ, বক্রদৃষ্টিপাত, ভ্রূক্ষেপ, ভ্রূভঙ্গ।

[ক্রমশঃ।

...নী পরে একেবারেই
দলে তখন সৈন্য

মালা

প্রাণতোষ ঘটক

মিশ কালো একটি মানুষ বেরিয়ে এল, তার ঘাড়ে একখানা লাল গামছা, পরনের ধুতিটা মালকোঁচা দেওয়া, অনাবৃত দেহ।

শক্তিময়কে দেখে সে আকুল ভাবে প্রশ্ন করল—ঘোড়াটা দে... বাবুসাহেব?

শক্তিময় বল্‌লে—না ত!

শক্তিময় ছবি খুঁজ্‌তে ব্যস্ত—কোনো দে... লক্ষ্য ক'রে দেখবার নজর তার ছিল না। ...

লোকটি বল্‌লে—আজ সাত দিন হ'... হারিয়েছে—আজও পর্যন্ত পেলাম ... আমায় একটু খবর দেবে? ...বিদারণ।

কালো চেহারার ও...ময়, ভণ্ডনি। এনে দেয় শক্তিময় এই ...ঙ্গ, খণ্ডনা, খণ্ডিত।

লোকটি সা... অঙ্কহারক, বিভাজক। লাগল...

...লো ভাবে না ...তে পারি না। ...থকে তাদের বার বারই ...থক্ জগতে। সঙ্গে তাদের ...দিন সে চিন্তা ...টিক চত্বরে তার ...কর ঐ প্রকাণ্ড দেখা দেয়, জানি, ...দের ভিড় লেগে শুষ্ক উত্তপ্ত হাওয়া ... চেষ্টা করে, জানি, ...হু করা দখিণ হাওয়ার যখন ঘরে ফিরে যাবার ...দের বাড়ীর ছাদে তখনো

ভাবিত—চিন্তিত, উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত।

ভাবী—ভবিষ্যৎ, যাহা হইবে, আগামী।

ভাবুক—কল্যাণ, শুভ, মঙ্গল, হওয়নশীল।

ভাবুকী—ভণ্ড, কৌতুকী, অঙ্গভঙ্গীকর।

ভার—বহনীয় বস্তু, গুরুত্ব, ক্ষমতার্পণ।

ভারত—পুরাণবিশেষ, রাজ্যবিশেষ।

ভারতবর্ষ—জম্বুদ্বীপের খণ্ডবিশেষ।

ভারতী—বাণী, সরস্বতী, কাব্যোল্লেখ।

ভারী—ভারবাহক, গুরুতর, দুর্ব্বাহ্য।

ভার্য্যা—জায়া, পত্নী, দারা।

ভাল্—কপাল, ভাগ্য, ললাট, অদ...

ভালবাসা—স্নেহ, প্রীতি, ...

ভালুক—ভল্লুক।

ভাষণ—কথন, ...

ভাষা—...

ভাজন—ভর্জ্জন, ঝলসান, পোড়ান।

ভাজন—পাত্র, উপযুক্ত, বিশ্বাসযোগ্য।

ভাজা—ভৃষ্ট দ্রব্য, ঝলসান, খরা।

ভাজি—পক্বব্যঞ্জনবিশেষ, ভাজা দ্রব্য।

ভাজু—ভাইজ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী।

ভাজ্য—অংশনীয়, ভাগযোগ্য, বণ্ট্য।

ভাট—স্তুতিপাঠক, রাজদূত, বন্দী।

ভাটী—আকা, পাজা, উনন, স্রোত।

ভাটী বেলা—অপরাহ্ণ, বৈকাল।

ভাড়া—বেতন, কর।

ভাণ—ব্যাজ, কাচ, ছল, ফাঁকী।

ভাণ্ড—ভাঁড়, কৌতুকী, ভ...

ভাণ্ডার—...

...দের ...আলোচনা করতেন ...একই শিবিরে বাস করলেও ...সীমাবদ্ধ থাকতো দলীয় পরিধির মাঝখানে। চাহ বা না চাই, একটা অদৃশ্য দেয়াল শির উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল অনুশীলন ও যুগান্তর দলের সীমানায়!

কিন্তু এ কথা কোনো বন্দীই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, বহরমপুরে এই বন্দীবাহিনী ছিল দলীয় স্বার্থ বা চিন্তার অনেক উর্দ্ধে। একটি বৃহত্তর পরিকল্পনা নিয়েই এর জন্মলাভ এবং এর সর্ব্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল যে সমর-পরিষদের ওপর, তাতে অনুশীলনেরও যথেষ্ট সংখ্যক সদস্য ছিলেন এবং তাঁদেরও ছিল পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার। সামরিক আওতার মধ্যে কোথাও দলীয় স্বার্থের গন্ধ ছিল না। তাঁরাও তা অনুভব করতেন।

তথাপি, অনুশীলনের বন্দীরা আমাদের ত্যাগ করলেন। অবশ্য এর ফলে সংখ্যা আমাদের তেমন উল্লেখযোগ্য ভাবে কমলো না, কারণ এই পৃথকীকরণের ছুরিকাঘাতে যতটুকু ক্ষত হলো, নতুন নতুন বন্দীরা এসে যোগদান করে তা অচিরে নিরাময় করে দিলেন।

অনুশীলনের বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা যখন ত্রিশের কোঠায় এবং সপ্তাহে মাত্র দু'দিন প্যারেড-মাঠে তারা আত্মপ্রকাশ করে, যুগান্তরে তখন নিয়মিত প্রতিদিনকার কুচকাওয়াজে যোগদান করে শতাধিক

...ও-সব জানতে নেই, মনে ...র কথা ভাবতে নেই। অজস্র ও ...কাজে ব্যাপৃত থেকে নিমেষের জন্যও ...থাকতে দিই না, পাছে হৃদয়াবেগের ভূত ...পে বসে। বহরমপুর বন্দীশালার গেট বন্ধ হবার ...মনের সবগুলো বাতায়নই শুধু বন্ধ করে দিইনি, তাতে তুলে দিয়েছি অর্গল, ঝুলিয়ে দিয়েছি পুরু পরদা! বাহিরকে আর ভেতরে আসতে না দেবার কঠোর ব্রত!

তবুও, লোহার নিশ্ছিদ্র কুঠরীর মধ্যেও কি জানি কি করে সাপ এসে পড়ে, সাপ দংশন করে, সে দংশনে মৃত্যু হয়!...সজাগ সতর্ক প্রহরাকে ফাঁকি দিয়ে কী করে কখন্ কোন্ পথে অকস্মাৎ এসে পড়ে হয়তো একমুঠো ফুলেল হাওয়া, এক ঝলক দক্ষিণা মলয়। সাজানো-গোছানো সুকঠিন তপশ্চর্য্যার পারিপাট্যে অকস্মাৎ আঘাত লাগে, তাতে দাগ ধরে, বিপর্য্যয় কাণ্ড বেধে যাবার উপক্রম হয়। ফুলেল হাওয়া তুলে ধরে কালবৈশাখীর কালো ফণা!......

অকস্মাৎ একদিন নীল খামে একখানা চিঠি এল। নীল রঙের কাগজে চমৎকার হরফে লেখা দীর্ঘ পত্র, চারটি পৃষ্ঠা ভর্ত্তি। লিখেছে লতিকা। লতিকা দাশগুপ্তা। বেথুনের বি. এ. ক্লাশের ছাত্রী। একেবারে স্পষ্ট নির্লজ্জ প্রেমপত্র। কোনো উপক্রমণিকা নেই, প্রস্তাবনা নেই, যবনিকা ওঠবার প্রাক্কালে কোনো ঐক্যতান নেই। একেবারেই নির্জলা নাটক!...'আমি তোমায় চাই, একান্ত করে নিজস্ব করে চাই। শুধু ভালো লাগেনি, তোমায় ভালবেসেছি সারা অন্তর দিয়ে, প্রতি রক্তকণিকা দিয়ে। তোমায় না পেলে ব্যর্থ হবে আমার জীবন, ব্যর্থতা নিয়ে বেঁচে থাকার কোনো সার্থকতা নেই।'

পরিশেষে এই ক'টি কথা লিখে শেষ করেছে: 'আমার কোনো খোঁজ তুমি আর না নিলেও আমি নিয়মিত তোমার সংবাদ সংগ্রহ

করি বীণার কাছ 'তুললো আমায় : জানো দ্বিজেনদা, তোমার জন্য অ:পক্ষা করবো শাছে। বল, কি খাওয়াবে ? নইলে বলবো না থাকবো তোমার:ঙ্গ দিচ্ছি।—একটু দাঁড়াও, আমি কাপড় ছেড়ে

আমারই শভিজ্ঞা বীণা পরে এল সায়া, সাড়ী আর শুধু মাত্র একেবারে আর্ত্ত। বললো : বল, কি খাওয়াবে ?
ফেলেছে লতিকা;হবে।
চারশো পৃষ্ঠা ‘াকাশের চাঁদ ?
চেয়ে কাটিয়ে তুমি যদি খেতেই পার, তাহলে না হয় আঁকশি করে বসলো লতিড়ে আনবার কষ্ট স্বীকার করা যাবে।
ক্লাশের ছাত্রী, ে উঠলাম।
এসে পৌছোবার পূর্বে করলাম : কিন্তু খবরটা সত্যিই যদি সুখবর কণ্ঠস্থ করে ফেলে করছো সুখবর, আর আমি হয়তো তাকেই এমনি চিঠি পেয়ে হয়েছে হয়েছে, উপেন বাবুর চিঠি এসেছে, বলেছে টবিনকে। তা
আর বলেছে, এই ই প্রকাশ করলো : তাই হবে। তারপর ? খোলস আর ভেতরে ে এবার তোমায় নিয়ে যাবেন। মন জেনেছে কি না কে জানে !ার গেছে বদলে, তাই না ?
ব্যারাকে ব্যারাকে চলছে কাণা ফিরিয়ে নিল। তারপর অকস্মাৎ এইবার সব আসবে একে একে উঠলো : দাঁড়াও, হাত দেখতে শ্লেষের তীরে বিঁধতে, মুখের ওপর ' চক্র পড়েছে আর শুক্রের আর ভাবতে পারি না। মাথার রগ দু'টো ে কথা বলবে ?

এই উত্তপ্ত মধ্যাহ্নেই চাদরখানায় আপাদ—স।
বুজে সটান শুয়ে পড়লাম। কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছিল—ম্ম পরীক্ষা কিন্তু যখন জাগলাম, তখন দেখি সেটা ১৯২১ সাল, কাশীতে—মই বিশ্ববিত্তালয়ের আই. এ. ক্লাশের ছাত্র আমি।···

মার্টিন কোম্পানীর চাকুরে সুন্দরদা বিপদে পড়লেন আমায় নিয়ে। পেছনে টিকটিকি লেগেছে। তাঁর রামাপুরার বাড়ীতে আমার অনুপস্থিতিতে হানা দিয়েছে ক'বার, অফিসেও গেছে।

কি সুখময় বাবু, চাকরিটি খোয়াবার ইচ্ছে আছে নাকি ?

সুন্দরদা প্রশ্ন করেন : কেন, বলুন তো ?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বলেন : আর কেন। বাড়ীতে পুষছেন কাল সাপ, সে সংবাদ রাখেন কি ?

কাল সাপ ?

হ্যাঁ, কাল সাপ! আপনার কলকাতা থেকে-আসা ভাতাটি একটি আস্ত টেরোরিষ্ট। গায়ে দিয়েছেন অবশ্যি কংগ্রেসী ছদ্মবেশ। বাঙালীটোলা কংগ্রেসের সহঃ-সম্পাদক আর বিবেকানন্দ সেবা সমিতির সম্পাদক হয়ে যতই কেন না ফাঁকি দেবার চেষ্টা করুন, আমাদের দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর।

সুন্দরদা তাঁকে নিয়ে অফিসের বাইরে বারান্দায় এলেন। একটা সিগারেট অফার করে চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করলেন : কেন, কিছু করেছে নাকি ?

ভদ্রলোক জবাব দিলেন : করেনি, কিন্তু করবার ফিকিরে আছে। সারনাথ ভটাচার্য্যের বাড়ী যায়, সেখানে আসে ত্রিলোক সিং আর অমরনাথ মেহরোত্র। সারা রাত জটলা চলে। আর

রাত্রে আসবে লতিকা তোমার খাতা নেবার জন্য আর তোমার সঙ্গে পরিচয় করবার জন্য। তোমায় যেতে হবে দ্বিজেনদা !

আশ্চর্য্যান্বিত হলাম : বাঃ, বেশ তো ! অজানা এক বিয়ে-বাড়ীতে যাবো অজানা একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে ? তোমার প্রস্তাবটি যেমন নতুন, তেমনি উদ্ভট !

কিন্তু অসম্ভব নয়, আর তা আমি হতেই দোব না। তুমি কাঠের পুতুল হলে কি হবে, লতিকা সত্যিই তোমায় ভালো-বেসেছে।—বলে বীণা আলমারী থেকে বার করলো লতিকার লেখা একটা চিরকুট, চোখের সামনে মেলে ধরে বললো : এই দেখ, বীণা তো তোমায় শুধু মিছে কথাই বলে। এবার বিশ্বাস হলো তো যে, এটা আর উদ্ভট উপন্যাস নয় ?—আমি বলে এসেছি তোমায়ও নিয়ে যাবো নিশ্চয়ই।—বল, কথা দিলে দ্বিজেনদা !—বলে বীণা একেবারে আমার গা ঘেঁসে এসে দাঁড়ালো।

কিন্তু আমার কথার জন্য বয়েই গেছে বীণার। রাত দশটায় টেনে নিয়ে গেল সেই বিয়ে-বাড়ীতে খাতাখানা বগলদাবা করে। পরিচয় হলো লতিকার সঙ্গে।

তার পরের ঘটনাবলী সংক্ষিপ্ত হলেও গতিশীল ও রোমাঞ্চময়। বীণার বাসাতে কলেজ থেকে ফেরবার পথে বহু বিকেল রাত করে ফেললাম, ছুটির দিনে অনেক সকাল রেস্তোরাঁয় বসে বসে চা ও কেকের সঙ্গে একেবারে দুপুর হয়ে গেল, অনেকগুলো সন্ধ্যা নদীর বুকে ভাসমান নৌকোয় কাটলো। কখনো সাক্ষী রইলো বীণা, কখনো শুধু লতিকা ও আমি, আমি ও লতিকা। তখনকার সাক্ষী রইলেন হয়তো অশরীরী কোনো দেবতা !···

আমাদের সুবর্ণ সুযোগ দিয়ে অনেক সময়ই বীণা সরে যেত। কিন্তু সুযোগের সদ্ব্যবহার করবার মত মন কোথায় আমার ? ‘থায় আমার সে সময় ? ভালো তাকে লেগেছিল সত্যি, কিন্তু হরেনদার ভালোবাসতে পারলাম কই ?
বোন। কিন্তু আমা৷শ পার্থক্য আছে। অশোকাকে নিয়ে মা-ও ! আমার জন্য তাঁর স্বতঃ—৬৲ পঁয়ত্রিশ মিলিমিটারের ক্ষুদ্র শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আজও স্মরণ করি। —াকার

দিদির ওখানেই পরিচয় হয় বীণার সঙ্গে। আঠারো বছর, আমার সমবয়সী। বিবাহিতা, একটি মেয়ে হয়েছে। কলকাতা থেকে কাশীতে এসেছে স্বাস্থ্যোদ্ধারে মাকে নিয়ে। যেমনি সরলা, তেমনি আলাপী। কিন্তু কেনো একটি বিষয়ে নয়। মুখে খৈ ফুটবে বটে, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে বিষয়বস্তু বদলে যাচ্ছে। যথা : দ্বিজেন-দা, আপনি বলে চা'য়ে চিনি কম খান ? আমার তো পুরো দু'চামচে চাই-ই আর তেমনি দুধ।—যাবেন আজ বিকেলে দশাশ্বমেধে, নৌকো করে বেড়াবো'খন ? ঐ কালীকীর্ত্তন শুনতে এত ভালো লাগে আমার !—মা, বেশ তো লোক তুমি, দ্বিজেনদা এসেছেন আর এখনো চায়ের জলটা ষ্টোভে চড়িয়ে দিতে পারোনি ?—আর পারি না বাপু একা সব দিক সামলাতে। যেদিকে না দেখবো, সেদিকেই—মিলি, ও মিলি, কোথায় গেলি, ছাদ থেকে কাপড়গুলো এখনো নামিয়ে আনিসনি ?
—দ্বিজেনদা, একটা বিয়ে করুন না দ্বিজেনদা !

এত শীগ‚গির ?—হেসে হয়তো প্রশ্ন করি।

বীণা জবাব দেয় : কেন, আঠারো বছরে মেয়েদের বিয়ে হয়,

হাত ধরে টেনে তুললো আমায়: জানো দ্বিজেনদা, তোমার জন্য একটা সুখবর আছে। বল, কি খাওয়াবে? নইলে বলবো না কিন্তু, আগেই বলে দিচ্ছি।—একটু দাঁড়াও, আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।

সরলা অনভিজ্ঞা বীণা পরে এল সায়া, সাড়ী আর শুধু মাত্র হাতওয়ালা বডিস। বললো: বল, কি খাওয়াবে?

যা খেতে চাইবে।

যদি চাই আকাশের চাঁদ?

তা দোব। তুমি যদি খেতেই পার, তাহলে না হয় আঁকশি দিয়ে চাঁদটাকে পেড়ে আনবার কষ্ট স্বীকার করা যাবে।

দু'জনেই হেসে উঠলাম।

একটু পরে প্রশ্ন করলাম: কিন্তু খবরটা সত্যিই যদি সুখবর না হয়? তুমি মনে করছো সুখবর, আর আমি হয়তো তাকেই বলবো কুখবর—ও, হয়েছে হয়েছে, উপেন বাবুর চিঠি এসেছে, তাই না?

বীণা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করলো: তাই হবে। তারপর?

বললাম: লিখেছেন এবার তোমায় নিয়ে যাবেন। মন তাঁর ভালো হয়ে গেছে, মত তাঁর গেছে বদলে, তাই না?

ছাই।—বলে বীণা মুখ ফিরিয়ে নিল। তারপর অকস্মাৎ আমার হাতখানা টেনে নিয়ে বলে উঠলো: দাঁড়াও, হাত দেখতে পারি আমি। দেখি—ভেনাসের একটা চক্র পড়েছে আর শুক্রের স্থানটিও বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে—সত্যি কথা বলবে?

মজা দেখতে ইচ্ছে হলো: বলবো। কর জিজ্ঞেস।

সীমাহীন অভিনিবেশ সহকারে রেখাগুলো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষা করে ভ্রূ কুঞ্চন করে বীণা অকস্মাৎ প্রশ্ন করে বসলো: নিশ্চয়ই কাউকে ভালোবেসেছ তুমি? বল, সত্যি কিনা?

জবাব দিলাম তেমনি: আজ্ঞে হ্যাঁ।

চোখ তুলে প্রশ্ন করলেন পরীক্ষক: তার নাম?

তৎক্ষণাৎ উত্তর এল: বীণা সরকার।

ধ্যেৎ।—বলে বীণা ছুঁড়ে ফেলে দিল আমার হাতখানা। তারপরই আবার টেনে নিল কোলের পরে, দু'হাতের মুঠোয়, আবার চোখে-মুখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য এনে বলতে লাগলো: সরকারও নয়, বীণাও নয়। আর-এক জন—

কে তবে?

লতিকা। লতিকা দাশগুপ্তা।

চমকে উঠলাম। লতিকা দাশগুপ্তা? সেই গায়িকা, বিরহিণী শ্রীরাধিকা? বীণা তাকে চেনে কি করে?

তারপর শুনলাম কি করে চেনে। শুধু চেনে নয়, দু'জনে বন্ধু। আর এখানে এসে নয়, সেই কলকাতা থেকে। সাহিত্য-সভার কথা লতিকা সব বলেছে বীণাকে আর সেই সঙ্গে আমার কথাও উল্লেখ করতে ভোলেনি। আমার লেখা "নিরুপায়" লতিকার নাকি খুব ভালো লেগেছে আর চুপি-চুপি জানালো বীণা, সেই সঙ্গে লেখককেও। অতএব, বীণা হুকুম করলো আমার সেই খাতাখানা তার চাই এবং সেই সঙ্গে আমাকেও।

প্রশ্ন করলাম: আমাকেও?

হ্যাঁ, তোমাকেও। আজই মিশিরপোখরায় একটা বিয়ে-বাড়ীতে রাত্রে আসবে লতিকা তোমার খাতা নেবার জন্য আর তোমার সঙ্গে পরিচয় করবার জন্য। তোমায় যেতে হবে দ্বিজেনদা!

আশ্চর্য্যান্বিত হলাম: বাঃ, বেশ তো! অজানা এক বিয়ে-বাড়ীতে যাবো অজানা একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে? তোমার প্রস্তাবটি যেমন নতুন, তেমনি উদ্ভট!

কিন্তু অসম্ভব নয়, আর তা আমি হতেই দোব না। তুমি কাঠের পুতুল হলে কি হবে, লতিকা সত্যিই তোমায় ভালো-বেসেছে।—বলে বীণা আলমারী থেকে বার করলো লতিকার লেখা একটা চিরকুট, চোখের সামনে মেলে ধরে বললো: এই দেখ, বীণা তো তোমায় শুধু মিছে কথাই বলে। এবার বিশ্বাস হলো তো যে, এটা আর উদ্ভট উপন্যাস নয়?—আমি বলে এসেছি তোমায়ও নিয়ে যাবো নিশ্চয়ই।—বল, কথা দিলে দ্বিজেনদা।—বলে বীণা একেবারে আমার গা ঘেঁসে এসে দাঁড়ালো।

কিন্তু আমার কথার জন্য বয়েই গেছে বীণার। রাত দশটায় টেনে নিয়ে গেল সেই বিয়ে-বাড়ীতে খাতাখানা বগলদাবা করে। পরিচয় হলো লতিকার সঙ্গে।

তার পরের ঘটনাবলী সংক্ষিপ্ত হলেও গতিশীল ও রোমাঞ্চময়। বীণার বাসাতে কলেজ থেকে ফেরবার পথে বহু বিকেল রাত করে ফেললাম, ছুটির দিনে অনেক সকাল রেস্তোরাঁয় বসে বসে চা ও কেকের সঙ্গে একেবারে দুপুর হয়ে গেল, অনেকগুলো সন্ধ্যা নদীর বুকে ভাসমান নৌকোয় কাটলো। কখনো সাক্ষী রইলো বীণা, কখনো শুধু লতিকা ও আমি, আমি ও লতিকা। তখনকার সাক্ষী রইলেন হয়তো অশরীরী কোনো দেবতা।···

আমাদের স্বর্ণ সুযোগ দিয়ে অনেক সময়ই বীণা সরে যেত। কিন্তু সুযোগের সদ্ব্যবহার করবার মত মন কোথায় আমার? কোথায় আমার সে সময়? ভালো তাকে লেগেছিল সত্যি, কিন্তু লতিকার মত ভালোবাসতে পারলাম কই?

অশোকার সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। অশোকাকে নিয়ে ফ্রেস্কো আঁকা চলে, কিন্তু লতিকার পঁয়ত্রিশ মিলিমিটারের ক্ষুদ্র একটি ছবি বুক-পকেটে ভরে রাখতে ইচ্ছে করে। অশোকার স্বর্ণপদক পেনডেন্টের মত গলায় দুলিয়ে বীরদর্পে যাওয়া যায় ক্লাবে, হোটেলে, সভা-সমিতিতে, আর লতিকার সঙ্গে চুরি করে কথা কইতে ভালো লাগে পার্কের কোণের বেঞ্চিতে। অশোকার সান্নিধ্য মনোরম আর লতিকা রক্তকণিকাগুলিকে নাচিয়ে তোলে। অশোকার সৌন্দর্য্য অনৈসর্গিক আর লতিকার রূপ রসালো রক্ত ও তাল-তাল মাংস দিয়ে গড়া। অশোকাকে মনে থাকে, আর লতিকা সারা মন জুড়ে বসে থাকে।···

কিন্তু আমার সর্ব্ব অন্তর পূর্ব্বেই যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে এক সুকঠিন ব্রত উদ্‌যাপনের দায়িত্বে! সেখানে আর তিলমাত্রও স্থান আছে কি?

আর এ তো আশাই করিনি আমি। উনত্রিশ সালের স্বপ্ন বত্রিশ সালে কখন্ চূর্ণ হয়ে গেছে, চাকা ঘুরে-ঘুরে কোথাকার ঘটনা পুরোনো বাসি হয়ে কোথায়, কোন্ ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে একেবারে অবলুপ্ত হয়ে গেছে, কে তার সংবাদ রাখে? হরেনদা'রা ঘটনাস্রোতে কোথায় চলে গেছেন, উপেন সরকারের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত বীণার আপোষ-রফা হয়ে গেছে কিনা, আই-এ পাস করে

লতিকা বি, এ, পড়ছে কিনা, তা জানবার আমার যেমন নেই উৎসাহ, তেমনি সময়েরও অভাব।

এই দুনিয়া-ছাড়া দুনিয়ায় অকস্মাৎ চেনা দিনের সুগন্ধ কেন? লোহার ঘরে কোন্ পথে প্রবেশ করলো কাল সাপ?···

কোথায় একটা কাঁটা বিঁধতে লাগলো, কোথা থেকে যেন কার চাপা গোঙানির শব্দ কানে আসতে লাগলো, অনুভব করলাম একটা আলোড়ন অন্তর-সমুদ্রে!

তুলে রাখলাম নীল চিঠি সযত্নে বাক্সের তলায় কাপড়ের ভাঁজে। নীল বিষ পান করে লতিকা লীন হয়ে যেতে চেয়েছিল। আমার কাছে নীল খামখানা একটি নীল অপরাজিতা মনে হলো, সন্ত বাগান থেকে চয়ন-করা অনাঘ্রাত ফুল!

১৭

সত্যিই, একটা ঘা খেলাম। দু'-এক দিনের মধ্যেই অবশ্য বুঝতে পারা গেল যে বন্ধুরা কেউ মাঝপথে আর খোলেনি এই চিঠি, তথাপি নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হতে লাগলো। রাগ করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম কোথায়? চোখ রাঙ্গালেই দেখতে পাই, বেল ফুলের কুঁড়ির মতো দাঁতগুলোর আভাস দেখিয়ে লতিকা খিলখিল করে হাসছে ছোট্ট ফ্রক-পরা মেয়ের মতো।

একদিন বলেছিলাম রাগ করে: কাল থেকে আবার ফ্রক-পরা সুরু করো তুমি।

প্রশ্ন এলো: কেন?

ব্যাখ্যা করলাম: কেন, এমনি হল্-কাঁপানো হাসি সাড়ীপরা মেয়েকে কখ্খনো মানায় না। বয় দু'বার উঁকি মেরে গেছে, লক্ষ্য করেছ? অন্যান্য কেবিনেও তো লোক আছে, সেটা বুঝি ভুলে যাও?

গম্ভীর হয়ে গেল লতিকা: তাহলে কি করতে হবে? হাসি বন্ধ করতে হবে?

প্রবোধ দিলাম: না গো, তা কি হয়? তোমার গালফোলা মুখ যে আমি কল্পনাই করতে পারি না লতু। তাই তো বলেছি ফ্রক পর, তাহলে হাসি চলবে।

মাথা নেড়ে লতিকা বললো: না, চলবে না। ফ্রক-পরার হাসি ধুতি-পরার সঙ্গে চলতেই পারে না।

আশ্চর্য্য হলাম: মানে?

মানে খুব সহজ। তোমায় হাফপ্যাণ্ট পরতে হবে আর হাতে নিতে হবে একটা গুলতি, বুঝলে?

বিস্ময় বেড়ে গেল আমার: হাফপ্যাণ্ট! গুলতি!

কাঁটা বিঁধিয়ে এক টুকরো কাটলেট আমার প্লেটে ছেড়ে দিতে-দিতে বললো লতিকা: বাঃ, তা নইলে ফ্রক-পরার সঙ্গে প্রেম জমবে কি করে শুনি?

এবারে চোখ দু'টো একেবারে কপালে উঠে গেল: প্রেম!

হ্যাঁ, প্রেম!—বেশ সহজ ভাবেই বললো লতিকা: আমায় যে ভালবেসে ফেলেছ, সে কথা অস্বীকার করতে পার? গায়ের জোরে না-না করে চীৎকার করতে পার বটে, কিন্তু তাতে মনের প্রতিধ্বনি পাবে না। কিন্তু ফ্রককে দেখে ভুলে যেতে পারে কে, ধুতি নয়, হাফপ্যাণ্ট, বুঝলে? তাই বলছি আমি ফ্রক পরলে তুমি পরো হাফপ্যাণ্ট।

কৌতুক অনুভব করলাম: কিন্তু ঐ গুলতি?

গম্ভীর হয়ে জবাব দিল সে: বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দুর্গ রক্ষার দল-মাদল কামান। জানোই তো, দুনিয়ায় একটি ছেলে ও একটি মেয়ে কোথাও নেই। হয় দু'টি মেয়ে একটি ছেলেকে কিংবা দুটি ছেলে একটি মেয়েকে ভালবাসে। যেমনি ছড়াছড়ি ওসমান-জগৎসিংহের, তেমনি ভিড় সূর্য্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর। তাই তোমার হাতে থাকবে গুলতি। 'হয় কর্ণ, নয় পার্থ ধরা হতে লইবে বিদায়।'

বলেই সেই বেল ফুলের হাসি। ছোট ছোট সাদা দাঁতে হল্-কাঁপানো শব্দ!

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী কিন্তু আর বেশী আগ্রহ দেখাননি। অবশ্য সেই সাহিত্য-সভায় পরে নানা ছুতোয় দিন কয়েক তাঁর ওখানে আমায় চায়ের নেমন্তন্ন করেছিলেন এবং অশোকাকে বার বার এগিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু কোথায় যেন বাধো-বাধো ঠেকলো, সম্মানজনক ব্যবধানটি বিশ্রিভাবে হাঁ করে রইলো। ভারী মিষ্টি মেয়ে অশোকা, অষ্ট্রেলিয়ান মধুর মতো। আর লতিকা একেবারে স্যাকারিন। স্রেফ স্যাকারিন! মিষ্টি বিষ!

সে সময় লাহোর কংগ্রেস থেকে ফেরবার পথে কাশীতে প্রতুল গাঙ্গুলী নেমেছিলেন। এক যুগান্তকারী সংবাদ দিলেন আমায় যে, ঢাকার বিপ্লবী দলের মধ্যে বৈপ্লবিক কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ে দু'টো ভাগ হয়ে গেছে সম্প্রতি। এক দলের নেতা অনিল রায়, লীলা নাগ প্রভৃতি আর অপর দলের নেতা হচ্ছেন সত্য গুপ্ত, ভূপেন রক্ষিত, রসময় সুর, মণি রায়, প্রফুল্ল দত্ত, প্রভাত নাগ (লীলা নাগের ভাই) প্রভৃতি।

সংবাদ পেয়ে সেদিনকার ট্রেণে সোজা চলে এলাম কলকাতায় সত্য গুপ্তের কাছে। স্বভাবতঃই অশোকা তখন একেবারেই হারিয়ে যায়। লতিকাও যে ধীরে ধীরে শুকিয়ে গিয়েছিল আমার মনে, তাও সত্য। কিন্তু আমি ভুলে গেলে কি হবে, সে তো ভোলেনি আমায়? নাছোড়বান্দা কাবুলীওয়ালার মত একেবারে ওৎ পেতে বসে আছে যেন অনন্ত কাল ধরে। বেরুলেই পড়তে হবে খপ্পরে। আমি মিনি নয় বলেই হয়তো বলবে: এ খোঁখা, হাফপ্যাণ্ট লিবে আউর গুলতি······

এই রঙীন তরঙ্গের তোড় কমে যেতে সময় লাগলো অবশ্য মাত্র ক'দিন। জীর্ণ বস্ত্রের মতো ক্ষণিকের এই চিন্তা-বিলাস ঝেড়ে ফেলে দিলাম মন থেকে। প্যারেড, খেলাধূলা আর 'শৃঙ্খল' নিয়ে একেবারে মেতে উঠলাম। নীল অপরাজিতা বাক্সের তলায় কোন্ কাপড়ের ভাঁজে মুখ থুবড়ে পড়ে-পড়ে শুকিয়ে গেল, মনেই পড়লো না তা।

২১শে জুন পাওয়া গেল আর একটি উত্তেজনাকর সংবাদ: ঢাকা শহরের একটি পোষ্ট অফিসে ২৮ তারিখে কালীপদ মুখার্জ্জী নামে একটি যুবক একখানা 'তার' করতে আসে—Operation successful—পোষ্টমাষ্টারের সন্দেহ হয়। তিনি তাকে একটু দেরী করতে বলেন কাজের ভিড়ের অজুহাত দেখিয়ে। আর সংবাদ পাঠান আই-বি অফিসে। পুলিশ সন্তর্পণে এসে কালীপদকে গ্রেপ্তার করে। কালীপদ তাতে বিন্দুমাত্রও চাঞ্চল্য না দেখিয়ে পুলিশকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে তার মেসে এবং স্পষ্টভাবে পরে যে বিবৃতি দেয়, তাতে স্বীকার করে যে, আগের দিন অর্থাৎ ২১

তারিখ রাত্রে স্পেশ্যাল অফিসার কামাখ্যা সেনকে নিদ্রিতাবস্থায় সেই হত্যা করেছে। রাত তখন গভীর। বাইরের রাস্তায় মাঝে-মাঝে টহলদার সিপাইয়ের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাগানের নীচু দেয়াল টপকে কালীপদ নাকি নিঃশব্দে প্রবেশ করে। জানালাও খোলা ছিল; তাই সে এসে হাজির হয় একেবারে নিদ্রিত কামাখ্যা সেনের খাটের পাশে। তারপর মশারিটি তুলে একবার··· দুবার···তিন বার···ব্যস্, জানালা টপকে, দেয়াল টপকে আবার সে নির্ব্বিবাদে সরে পড়ে।

কামাখ্যা সেন!!···অকস্মাৎ রক্তবিন্দুগুলি যেন সাপের মত কিলবিল করে উঠলো। সেই নোটোরিয়াস কামাখ্যা? সেই স্কাউণ্ড্রেল?···১৯৩০ সালে এই নরপুঙ্গব স্পেশ্যাল অফিসাররূপে সমগ্র বিক্রমপুর পরগণা চষে ফেলেছিল!···

অসহযোগ আন্দোলন তখন ভীষণ আকার ধারণ করেছে। আইন-সভার সদস্যগণ একে একে করছেন পদত্যাগ, স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে, 'ষ্টেটসম্যান' জাতীয় এক-আধখানা সংবাদপত্র ব্যতীত সমস্ত সংবাদপত্রের প্রকাশ স্থগিত রাখা হয়েছে সরকারী জুলুমের প্রতিবাদে, পথে-ঘাটে তৈরী হচ্ছে লবণ, প্রকাশ্য সভায় বাজেয়াপ্ত পুস্তক পাঠ চলছে, ১৪৪ ধারা সর্ব্বত্রই অমান্য করা হচ্ছে, উদ্বেলিত সাগরতরঙ্গের মত জাগ্রত জনতা সংগ্রামের পথে এগিয়ে চলেছে তুচ্ছ করে পুলিশের লাঠী ও চাবুক, গুলী ও বেয়নেট!

ঠিক সেই সময় সাব ডেপুটি কামাখ্যার ওপর ভার পড়লো বিক্রমপুরকে, বিশেষ করে শ্রীনগর, সেরাজদীঘা, তালতলা প্রভৃতি কয়েকটি থানার অধিবাসীদের সায়েস্তা করবার। কামাখ্যা পেল হাতে স্বর্গ! কারণ সে জানতো কৃতিত্ব দেখিয়ে প্রমোশন পাবার এই সুবর্ণ সুযোগ হারানো মূঢ়তা। সুতরাং সপাং সপাং গর্জ্জে উঠলো তার হাতের চাবুক, গুড়ুম গুড়ুম গর্জ্জে উঠলো তার কোমরবন্ধের রিভলভার। মহিলাদেরও কসুর করলো না কামাখ্যা সেন!···

সে সময় ঢাকা শহরে অকস্মাৎ দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিন্দু-মুসলমানে গলা-কাটাকাটি। সরকার পক্ষের প্ররোচনায় সেই দাঙ্গা তীব্রতর হয়ে বিক্রমপুরের কোনো কোনো গ্রামেও দেখা দেয়।

কিন্তু এর পূর্ব্বেই ঢাকা শহরের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের অফিসারেরা, মেজর বিনয় বোস, ক্যাপ্টেন দীনেশ গুপ্ত, লেফটেন্যাণ্ট বাদল গুপ্ত, সার্জ্জেণ্ট ননী চৌধুরী প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে সফর করে গড়ে তুলেছিলেন ভলান্টিয়ার বাহিনী, যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে এনেছিলেন নব জাগরণ। তার ফলে ঢাকা শহরের এই দাঙ্গার সময়ই বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে হিন্দু সংগঠন সৃষ্টি হয় ভলান্টিয়ার বাহিনীর নেতৃত্বে। কোথাও বিপদ আসন্ন হলেই কাঁসর বাজানো হতো আর দিকে দিকে প্রেরণ করা হতো বার্ত্তাবহ। দেখতে দেখতে যে-কোনো হাতিয়ার নিয়ে এসে জমায়েৎ হতো হাজারো হিন্দু অধিবাসী। এমনি সুশৃঙ্খল সংগঠনের ফলেই কিন্তু সরকারী শত প্ররোচনাতেও সে-বার শহরের দাঙ্গা গ্রামের দিকে তেমন ভাবে সংক্রামিত হতে পারেনি। সে সময় বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের ঢাকা ব্রেঞ্চের অধিনায়ক ছিলেন তেজোময় ঘোষ আর সহকারী ছিলেন জ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদার।

কলকাতা থেকে আমায় পাঠানো হলো বিক্রমপুরে আমাদের গ্রামে। অচিরেই সেখানে তৈরী হলো ভলান্টিয়ার বাহিনী। সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু তাতে যোগদান করলো। দৈনন্দিন কুচকাওয়াজ ও গ্রামের মেঠো পথে-পথে লাঠি নিয়ে বাহিনীর মার্চ্চ দেখে শান্তিকামীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেও প্রমাদ গুণলেন বাবা, মা, কাকা ও জ্যেঠারা! দাঙ্গা ঠেকিয়ে রাখতে পারলেও পুলিশকে ঠেকানো যাবে না। বিশেষ করে যদি কামাখ্যা সেন—

বললাম: কে কামাখ্যা সেন, তাকে চিনি না, দেখিওনি কোন দিন। কিন্তু আমাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করলে তাকেও রেহাই দোব না আমরা।

নিমের লাঠীখানা দু'মুঠোয় ধরে একেবারে স্তব্ধ হয়ে বাবা বসেছিলেন। পুত্রের জিদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

কিন্তু পাড়ার মুখপাত্র বিলাস কাকা সহজে ছাড়বেন কেন? বললেন: দেখ দ্বিজেন, আজকালকার ছেলে তোমরা যদি আমাদের, বুড়োদের কথা না মান, তাহলে কিছুই বলবার নেই। তবে তোমাদের বিপদ এলে তা সবার চাইতে বড় হয়ে লাগে আমাদেরই বুকে। তাই সময়-সময় গায়ে পড়েও উপদেশ দিতে এগিয়ে আসতে হয়।

বলে তিনি একটু থামলেন। দেবেন কাকা হুঁকোটা তাঁর হাতে তুলে দিতেই তিনি কুলীনদা'র অর্থাৎ আমার বাবার বয়স ও সম্পর্কের মর্য্যাদা রাখবার জন্ম হুঁকো নিয়ে বাইরে গেলেন ও এক মিনিট পর ফিরে এসে বসলেন।

দেবেন কাকা বিলাস কাকার বক্তব্যটাই আরো একটু পরিষ্কার করলেন: দেখ, আমাদের গ্রামের শতকরা আশী জনই মুসলমান। আমাদের অনুগত প্রজা হিসেবে পুরুষের পর পুরুষ ধরে এরা আমাদের শ্রদ্ধা করে আসছে। দেখেছ তো সদাকে, বজরালীকে? আজও এদের মনে কোনো দ্বিধা দেখা দেয়নি। আমাদের গ্রামে যখন কোনো আশঙ্কা নেই, তখন এমনি ভলান্টিয়ার দল তৈরী করে কি পুলিশকেই ডেকে আনা হবে না?

অশ্বিনী কাকা বিদেশে পাটের অফিসে অনেক কাল চাকরি করেছিলেন। কার্য্য-কারণ সম্পর্কে তাঁর একটু ধারণা আছে বলে তিনি মনে করেন। বললেন: তোমরা বল পুলিশই নাকি এই দাঙ্গা বাধাচ্ছে। তাই যদি হয়, তাহলে সেই পুলিশকেই কেন এদিকে টানছো? গ্রামের নিরাপত্তা কি তাতে করে রক্ষা করা যাবে? তারপর অন্য গ্রামে যদি দাঙ্গা লাগে, তবে তা থামাবার দায়িত্ব তোমার নয় বা আমাদের গ্রামের নয়। সে গ্রামেও তো লোক আছে।

এঁদের লজিকের পরেও কী বলে একেবারে চুপ করিয়ে দিতে হয় এঁদের, তা আমার বেশ জানা ছিল। আমাদের বাহিনী যে সাম্প্রদায়িক নয়, সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে যে কোনো গ্রামকে সাহায্য করাই যে এর উদ্দেশ্য, তা এঁদের বেশ করে বুঝিয়ে দিতে পারতাম। আর পুলিশের খাতায় আমার নাম আছে বলেই যে সমষ্টিগত কল্যাণের জন্ম আমি কোন ঝুঁকি নোব না বা অপরাপর সাহসী যুবকেরাও আসবে না আমার পাশে, এমনি উপসংহারের পেছনে যে যুক্তি ও মানবতার নামগন্ধ নেই, তাও বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করবো ভেবেছিলাম।

কিন্তু কিছুই পারা গেল না। অকস্মাৎ মজুমদার-বাড়ীর ছাদ

থেকে ভীষণ জোরে কাঁসর বেজে উঠলো। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালাম: বিলাস কাকা, আপনাদের সঙ্গে আমি আজ আর আলোচনা করতে পারলাম না। দেখি, কোথায় আবার লেগে গেল। একটি মুহূর্ত্ত আর এখানে অপেক্ষা করা চলবে না আমার।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হন্তদন্ত হয়ে একজন ভদ্রলোক সাইকেলে এসে নামলেন। ঘর্ম্মে তাঁর সারা শরীর সিক্ত, উত্তেজনায় সারা মুখমণ্ডল আরক্তিম। কম্পিত কণ্ঠে জানালেন, যোলঘর বাজার লুঠ সুরু হয়ে গেছে। আপনারা আমাদের বাঁচান।

বলে দিলাম: আমি এথ্খুনি যাচ্ছি! আপনি হাঁসাড়ায় শান্তি সোমের কাছে চলে যান। গিয়ে বলুন আর আমার কথাও জানাবেন যে, দ্বিজেন বাবুও দলবল নিয়ে গেছেন সেখানে।

লোকটি চলে গেল। আমিও ফিরে এলাম বাড়ীতে। খাঁকি মিলিটারী হাফ সার্ট'টা গায়ে দিলাম, মাথায় দিলাম হাইল্যাণ্ডার্স ক্যাপ, তাতে পিত্তল-ফলকে লেখা বি-ভি, বাঁশীটি নিলাম আর হাতে নিলাম একটি ষ্টিক-সোর্ড।

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, দক্ষিণের পুকুর-ঘাটের পাশে মা'র সঙ্গে দেখা।

আবার চলেছিস বুঝি?

থমকে দাঁড়ালাম: হ্যাঁ।

কোথায়?

যোলঘর বাজার লুঠ হচ্ছে এতক্ষণে বোধ হয় গ্রামেও লেগে গেছে।—অদূরে সদর সড়কে লোকজন ছুটাছুটি ক'রে চলেছে যোলঘরের দিকে। দেখিয়ে বললাম: ঐ দেখ মা, সবাই যাচ্ছে। সবে বাজার বসেছে এমনি সময়—

বলে চলে যাচ্ছি, আবার মা ডাকলেন: শোন্! কখন্ ফিরবি?

কি করে বলি, না গিয়ে তো আর অবস্থাটা বুঝতে পারছি না।

ছুটলাম। পেছনে মার কণ্ঠ শোনা গেল: তোর ভাত নিয়ে কিন্তু বসে থাকবো রে! তাড়াতাড়ি আসিস্।

যোলঘরগামী সড়কে এসে দেখি প্রায় শ'খানেক লোক জমে গেছে নানা রকম হাতিয়ার নিয়ে, লাঠী, হাণ্টার, ছোরা, রামদা, ষ্টিক-সোর্ড, ভোজালি, পূব-পাড়ার রমেশের হাতে একখানা খাপখোলা তরবারি। উভয় পার্শ্বের মুসলমান-বাড়ীগুলো থেকে ছেলেমেয়ে, বুড়ো-বুড়ী সবাই ভয়ে ভয়ে দেখছে। অকস্মাৎ কোথা থেকে ছুটে এল বছিরদ্দি।

কর্ত্তা!

জবাব দিল অপরে: যা, ভালোয় ভালোয় বাড়ী যা। এখন আর ঘাঁটাতে আসিসনি। নইলে মরবি।

তবু বছিরদ্দি গেল না। আমার সমুখে এল। বললাম: যোলঘরে মুসলমানরা নাকি বাজার লুঠ করছে?

আমি সঙ্গে যাবো কর্ত্তা?

বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে প্রশ্ন করলো ভূপেন: তুই?

জবাব দিল বছিরদ্দি: কেন? বাবুই তো বলেছেন, দাঙ্গা যে করে সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, সে মানুষের শত্রু আর সেই শয়তানকে ঠাণ্ডা করবার অধিকার সকলেরই, কি হিন্দু, কি মুসলমানের। তাই না কর্ত্তা?

অ্যাঁ, কী বলে বছিরদ্দি! আমাদের গ্রামের নগণ্য চাষী বছিরদ্দি! আমার নৌকোর স্থায়ী মাঝি বছিরদ্দি শেখ! মূর্খের মুখে এ কী কথা?

নৃপেন প্রশ্ন করলো: যাবি? পারবি মুসলমানের গলায় ছুরি চালাতে? জাত-ভাইকে পারবি মারতে?

বছিরদ্দি সহজ ভাবেই জবাব দিল: দাঙ্গাকারীকে জাত-ভাই বলে স্বীকার করি না আমি।—যাই কর্ত্তা আপনার সাথে?

সম্মতি দিলাম। নিমেষে সে বাড়ী থেকে নিয়ে এল একটি পুরো আঠারো ইঞ্চি দীর্ঘ নেপালী কুকরি। গেঞ্জির নীচে খাপখানা এঁটে বাঁধলো গামছা দিয়ে, তারপর বললো: আমি আছি কর্ত্তা আপনার সাথে সাথে।

ডবল মার্চ্চ করে বেরিয়ে পড়লো কেয়টখালী গ্রামের শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক।

গ্রামের সড়ক ক্ষেতের পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে গেছে। সে পথে গেলে দেরী হয়ে যেতে পারে বলে হুকুম দিলাম সোজা আমায় অনুসরণ করবার জন্য। নেমে পড়লাম ক্ষেতে, জল-কাদা, কাঁটা-গাছ, দীর্ঘ পাট গাছের ঝোপ সব অগ্রাহ্য করে একেবারে সোজা ছুটতে লাগলাম যোলঘরের দিকে। পাশেই বছিরদ্দি, লুঙ্গিটা সে হাঁটুর ওপর তুলে নিয়েছে।

যোলঘর বাজারে এসে দেখি, টিনের ঝাঁপ ফেলে-ফেলে দোকান-গুলো সব বন্ধ। বাজারে ক্রেতাও নেই, বিক্রেতাও নেই। কিন্তু ভলাণ্টিয়ারে একেবারে ভর্ত্তি, নানা স্থান থেকে ছুটে এসেছে সবাই। ব্যাপার কি? লুন্ঠনকারীরা তবে কি লুঠ শেষ করে সরে পড়েছে? কোথায় গেল? কোন্ দিকে?

কিন্তু ঘটনা যা শোনা গেল, তা চমকপ্রদ। যোলঘর গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মুরারি ঘোষ কিছু দিন ধরেই অতি দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিলেন শুধু দুর্নীতি ও স্বজনপ্রিয়তার দোষেই নয়, নারীঘটিত দুর্ব্বলতার জন্যও। কাজী-বাড়ীর মুসলমান জমি-দারেরা ছিল তাঁর উগ্র সমর্থক। কিন্তু তাহলে কি হবে? হিন্দু ও মুসলমান সবার কাছেই মুরারি প্রায় সমাজচ্যুত হয়ে উঠেছিলেন।

বাজারে আজ অতি বৃহৎ রোহিত মৎস্য উঠেছে শুনে মুরারি স্বয়ং পদার্পণ করেছিলেন ভুঁড়ি দুলিয়ে। সঙ্গে ছিল জনকতক মুসলমান মোসাহেব। দরে বনলো না, কারণ তিনি মনে করেছিলেন স্বয়ং মুরারিকে দেখে জেলে হয়তো মূল্য হাঁকবার দুঃসাহসই দেখাতে চেষ্টা করবে না। কিন্তু না-বেচবার মতলব এঁটেই জেলে দাবী করলো অযৌক্তিক মূল্য। আর যায় কোথা! মুরারির মোসাহেব দল এগিয়ে এল। তর্ক-বিতর্ক, বচসা, গালাগাল, তারপর হাতাহাতি, হুড়োহুড়ি, মারামারি।···বাজারে দৌড়োদৌড়ি পড়ে গেল। মুসলমান মোসাহেব আর হিন্দু জেলে—ব্যস্, তৎক্ষণাৎ বাতাসের মুখে রটে গেল এটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা!!

বেগতিক দেখে মোসাহেব-পরিবৃত মুরারি ঘোষ গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন কাজী-বাড়ীতে। কিন্তু মুরারি পলায়ন করলেও আছে তাঁর বাড়ী, তাঁর বৃহৎ অট্টালিকা, তাঁর পরিবার, তাঁর পরিজন। শয়তান গৃহস্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত তারা করতে বাধ্য!

নিশ্চয়ই !—অকস্মাৎ সেই ক্রুদ্ধ উত্তেজিত জনতা চীৎকার করে উঠলো : নিশ্চয়ই। মুরারিকে না পেলেও তার বাড়ীটা তো পাওয়া যাবে। এত বড় বদমায়েসের সাজা দিতে—

প্রতিধ্বনি শোনা গেল : নিশ্চয়ই। চল সব, মুরারির বাড়ী লুঠ করি গে।

বন্যার মতো সেই বিশাল জনতা এগিয়ে চললো। এই সাগরতরঙ্গ রুখবে কে? কার আছে সে ব্যক্তিত্ব, সে সাহস, সে বাগ্মিতা, সে যুক্তি?

বিচলিত হলাম! কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম মুহূর্ত্তের জন্য। শান্তি সোম দলবল নিয়ে এসে গেছেন তখন। বললাম সব। কিন্তু আমরা দু'জনেই বা কি করতে পারি? কতটুকু শক্তি আমাদের দু'টো গ্রামের? সেই সীমাহীন উদ্বেলিত সমুদ্রে মাত্র দু'টি তরঙ্গ বৈ তো নয়!···তবুও চেষ্টা করতে হবে। বছিরদ্দি কোথা থেকে মাথায় করে একটা টেবিল ও একটা টুল নিয়ে এল। স্বনির্ব্বাচিত সভাপতির মতো টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে সেই উত্তেজিত জনতাকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন শান্তি সোম : বন্ধুগণ, উত্তেজনায় অধীর হয়ে যুক্তি হারিয়ে ফেলবেন না আপনারা। মুরারি বাবু সমাজের ও গ্রামের কলঙ্ক হলেও তাঁর পরিবারের মহিলারা আমাদেরই মা ও বোন। তাঁরা কি দোষ করেছেন আমাদের কাছে? একের অপরাধে অপরের গর্দ্দান নেয়া হতো কাজীর আদালতে। এখন সেদিন নেই। মহিলাদের গায়ে কেন হাত দিতে যাবো আমরা?

এই প্রশ্নের জবাব কেউ দিল না। পক্ষান্তরে, শোনা যেতে লাগলো অসন্তোষের মৃদু গুঞ্জন। বেশ বোঝা গেল শান্তি সোমের যুক্তি ক্রুদ্ধ জনতার হৃদয় স্পর্শ করেনি। তথাপি তিনি বলতে লাগলেন : দাঙ্গা থামানো আমাদের কাজ, বাধানো নয়। বন্ধুগণ, ভিন গ্রামের লোক হয়ে আপনারা যদি এই গ্রামের একখানি বাড়ীও লুঠ করেন, তবে তার ফলাফলের কথা একবার ভেবে দেখবেন। তাতে কি ঘোলঘরে আমরাই এসে দাঙ্গা সৃষ্টি করবো না?

এ প্রশ্নেরও জবাব পাওয়া গেল না। মৃদু গুঞ্জন এবার তীক্ষ্ণ প্রতিবাদে আত্মপ্রকাশ করলো : আপনার বেদ ও পুরাণের উদারতা পকেটে ভরে রাখুন, শান্তি বাবু!

অপর কোণ থেকে এল ধারালো প্রশ্ন : এ কি স্কুলে মাষ্টারের বক্তৃতা শুনছি নাকি?

কাণের পাশে কে একজন গর্জ্জে উঠলো : বক্তৃতা দিয়ে পেট ভরে না মশাই! আমরা চাই খাদ্য! শালা মুরারির দশটা গোলাভর্ত্তি ধান আছে।—চল সব।

প্রতিধ্বনি শোনা গেল : চল।

তারপরই হল্লা সুরু হয়ে গেল। নানা ভাবে ও ভাষায় একসঙ্গে সবাই চীৎকার করে নিজের নিজের বক্তব্য বলতে সুরু করলো। মাথার ওপর সংখ্যাতীত হাতিয়ার উঁচু করে সেই বিক্ষুব্ধ জনতা এমনি হুড়োহুড়ি সুরু করে দিল যে, শান্তি সোম বৃথাই কয়েক বার এদের বোঝাবার চেষ্টা করে অবশেষে হতাশ হয়ে আমার পানে চাইলেন : কী করা যায় গাঙ্গুলী?

সত্যিই কি করা যায়? কী করা যেতে পারে? দৃষ্টিক্ষেপ করলাম চতুর্দ্দিকে। সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে সর্ব্বত্র প্রবলতম উন্মার অভিব্যক্তি। বাঁধ ভেঙে ফেলবার পূর্ব্বক্ষণে বন্যার জল যেমন ফুলে-ফুলে ওঠে, তেমনি গগনস্পর্শী হয়ে উঠেছে এদের ক্রোধ। যুক্তির তৃণখণ্ড কি করতে পারবে?···হাঁসাড়ার জনকতক ছেলেকে দেখলাম, কিন্তু কেয়টখালীর ছেলেরা সেই জনসমুদ্রে কোথায় হারিয়ে গেছে। জনতার প্রবল চাপ মাঝে মাঝে আমাদের ঠেলে ফেলবার উপক্রম করতে লাগলো। পাশে দেখলাম শুধু বছিরদ্দিকে, ছায়ার মত লেগে রয়েছে আমার সঙ্গে।

শান্তি সোম আবার ডাকলেন : দ্বিজেন!

—অকস্মাৎ লম্ফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। টুলের ওপর নয়, একেবারে টেবিলের ওপর। চীৎকার করে ডাকলাম : এই, কোথায় চলেছেন সব। কোথায় চলেছেন, তাই জিজ্ঞেস করছি। মুরারির বাড়ী লুঠ করতে? সে বাড়ীর মেয়েদের গায়ে হাত দিতে? তাদের হত্যা করতে? কী অধিকার আছে আপনাদের, শুনি? মুরারি কাজী-বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে বলে তার বাড়ী লুঠ করতে চান?—কেন, চলুন না, যাই একবার কাজী-বাড়ীতে? কাজী-বাড়ী লুঠ করতে পারবেন? সে হিম্মৎ আছে? ওদের তিন-তিনটে বন্দুককে অগ্রাহ্য করে কোন্ কোন্ গ্রাম আমাদের সঙ্গে কাজী-বাড়ী লুঠ করতে যেতে চান, আসুন এগিয়ে।

দ্বিধাগ্রস্ত দেখা গেল এবার জনতাকে। ওষুধ ধরেছে! যুক্তি নয়, শালীনতা নয়, বাগ্মিতা নয়, আমার স্পষ্ট কথার হুমকি ওদের বুকে ঘা দিয়েছে বোঝা গেল। যারা হল্লা করছিল, থেমে গেল তারা, যারা এগিয়ে চলেছিল, ফিরে দাঁড়াল। এই তো সুবর্ণ সুযোগ! বজ্রমুষ্টি শূন্যে আস্ফালন করে আবার সুরু করলাম : সিংহের মতো যারা বন্দুকের সম্মুখীন হতে পারে না, লজ্জা করে না তাদের শৃগালের মতো নিরস্ত্র মেয়েদের ঘরে ছোরা নিয়ে ঢুকতে?—এইখানে, এই টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে আমি স্পষ্ট ভাষায় চ্যালেঞ্জ করছি, কেউ আমাদের সঙ্গে আসুন আর না-ই আসুন, মুরারি ঘোষের বাড়ী যে লুঠ করতে যাবে— বলে একটু ইতস্ততঃ করছিলাম কী ভাবে শেষ করবো এই চ্যালেঞ্জের ভাষাটা, এমন সময় মূর্খ বছিরদ্দি দেখিয়ে দিল পথ। ঘ্যাঁচ করে টেনে বার করলো কোমর থেকে সেই নেপালী কুকরিখানা, এগিয়ে দিল আমার হাতে। সেই আঠারো ইঞ্চি কুকরিখানা মাথার ওপর তুলে ধরে চীৎকার করে বললাম : এই কুকরি রইলো তোলা তার জন্য।—আসুন, আসুন এগিয়ে, দেখি কার কত বড় বুকের পাটা! এই পথ রোধ করে দাঁড়ালো হাঁসাড়া আর কেয়টখালীর ছেলেরা।

বলেই বাঁ হাতে বাঁশী বার করে বাজিয়ে দিলাম তিনবার :

টা—ডট্

টা—ডট্

টা—ডট্

অর্থাৎ বিপদের সংকেত! কেয়টখালী ও হাঁসাড়া গ্রামের স্বেচ্ছাসেবকেরা যে যেখানে ছিল, ভিড় ঠেলে ত্রস্তে এসে জমায়েৎ হলো টেবিলের চারি পার্শ্বে। তাদের সংখ্যা প্রায় দু'শো।

কিন্তু এমন সময় অকস্মাৎ আবার চাঞ্চল্য দেখা দিল জনতার মধ্যে। কে যেন বলে উঠলো, পুলিশ এসেছে শ্রীনগর থানা থেকে, সঙ্গে কামাখ্যা সেন। সত্যিই, এমনি চরম মুহূর্ত্তে আবির্ভূত

উল্টো কথা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মৃগের নাভিতে কেন বিধি তুমি দিতে গেলে এত গন্ধ ?
মুক্তা বা কেন দিলে শুক্তিকে ?
বুঝি না তো দিল হেন যুক্তি কে ?
দিলে পুষ্পকে বর্ণ ও শোভা তদুপরি মকরন্দ ?

ব্যাঘ্র কেন বা প্রচণ্ড হবে পশুরাজ হবে সিংহ ?
এতই পশম কেন পাবে মেষ ?
মাছরাঙা এত রঙ্গিন বেশ ?
হুঙ্কার নাহি করিয়া, করিবে ঝঙ্কার কেন ভৃঙ্গ ?

কমায়ে শালের বিশালতা কর এরণ্ড দলে পুষ্ট ।
অবাধ অসম তব কারবার—
চলিতে পারে না বেশী দিন আর,
শোষণ পোষণ তোষণ নীতিতে কেহ নহে সন্তুষ্ট ।

ভগবান পাবে কেন চিরদিন পূজা ও অর্ঘ্য পাদ্য ?
গাধাকে কি হেতু করে না কো দান
উচ্চৈঃশ্রবা সম সম্মান ?
রাজ-সমারোহে কেন হবে না কো ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ ?

সব সাধনাই সিদ্ধি কে চায় ফলাতে হইবে সিদ্ধি ।
আলোকের কেন এত প্রাচুর্য্য ?
রবিবারে ছুটি পায় না সূর্য্য,
কেন ধান পাট সঙ্গে হবে না গঞ্জিকা-চাষ বৃদ্ধি ?

হলেন সেই স্বনামধন্য কামাখ্যা সেন। এত কাল শুধু নাম শুনেছিলাম, আজ চাক্ষুষ দেখা হলো।

দেখা নয়, একেবারে মুখোমুখি হলো। জনতা দু'পাশে সরে গিয়ে পথ করে দিল, কামাখ্যা সেন পাঁচ জন বন্দুকধারী সিপাই নিয়ে একেবারে সোজা এসে হাজির হলেন আমার টেবিলের পাশে।

আপনার নাম ?—গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

দ্বিজেন গাঙ্গুলী।

কোন্ গ্রামে বাড়ী ?

কেরটখালী।

কামাখ্যা একবার স্তব্ধ জনতার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করলেন। তারপর আবার প্রশ্ন করলেন : ভোজালি হাতে নিয়ে দাঙ্গা করবার জন্য আপনি সবাইকে উত্তেজিত করছেন ?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন শান্তি সোম : না। দাঙ্গা যাতে না বেধে যায়, তার জন্য চেষ্টা করছি আমরা।

শান্তি সোমকে কামাখ্যা সেন বিলক্ষণ চিনতেন। বললেন : ও—আপনিও এসে গেছেন দেখছি। ভালোই হলো, এবার পিস্ কমিটিতে বসা যাবে। গণ্ডগোল যখন কিছু হয়নি, তখন যাতে আর না হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

অকস্মাৎ আমার ক্যাপটার দিকে লক্ষ্য পড়লো কামাখ্যার : ওটা কাদের ক্যাপ ?

বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সে'র।

খুলুন তো, দেখি।

দৃঢ়স্বরে জবাব দিলাম : শুধু মৃতের প্রতি সম্মান দেখাবার কালেই বি-ভি টুপী খোলে।

বি-ভি! চমকে উঠলেন কামাখ্যা। নরপুঙ্গব স্পেশ্যাল অফিসার কামাখ্যা সেন। বললেন : বি-ভি। মানে ঢাকার বি-ভি ? মানে তেজোময় ঘোষ : সত্য গুপ্ত ? অর্থাৎ—

বাধা দিলাম : কারেক্ট করে বলুন মেজর সত্য গুপ্ত।

অ্যাঁ!—চোখ তুলে চাইলেন কামাখ্যা আমার পানে। তাতে শুধু অসীম বিস্ময় নয়, ক্রোধের অগ্নিকণাও দেখতে পেলাম।

কিন্তু সে আগুনে আর লঙ্কাকাণ্ড হলো না। কারণ সঙ্গে ছিলেন শান্তি সোম। অত্যন্ত স্থির ও যুক্তিবাদী শান্তি সোম। আর কামাখ্যা সেনও বোধ হয় নেপালী কুকরিখানার দৈর্ঘ্য মনে-মনে হিসাব করে দেখেছিলেন। খুব ভালো লাগেনি।

কামাখ্যা সেনের সঙ্গে এই আমার প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ। তারপর আজ পেলাম তার হত্যার সংবাদ। কালীপদ মুখার্জীকে চিনি না। কিন্তু বাংলার বিপ্লবী দলের অনেক দিনের পরিকল্পনা আজ তিনি কার্য্যে রূপায়িত করতে পেরেছেন বলে মনে-মনে তাঁকে জানালাম সশ্রদ্ধ অভিবাদন।···কিন্তু টেলিগ্রাম কেন করতে গেলেন তিনি ? এমনি দুর্বুদ্ধি কেন হলো তাঁর ? কিংবা এমনি নির্দ্দেশ কে দিয়েছিল তাঁকে ?···এমনি ধারা অনেকগুলো প্রশ্ন জাগলো মনে, যার উত্তর পেলাম না খুঁজে।

[ক্রমশঃ।

মাসিক বসুমতীর এজেন্ট কে কোথায় আছেন। কেউ কেউ ২৫খানি থেকে ৫০০খানি মাসিক বসুমতী প্রতি মাসে নিয়ে থাকেন। কেউ থাকেন বেলডাঙ্গায়, কেউ বারমোয়, কেউ গড়বেতায়, কেউ অম্বিকা-কালনায়, কেউ ফুলেশ্বরে, কেউ গলসিতে, কেউ জামুরিয়ায়, কেউ চিত্তরঞ্জনে, কেউ ওন্ডাগ্রামে ও কেউ নীলফামারীতে।

মাসিক বসুমতীর কতিপয় এজেন্ট

১। এ, বি, মালাকার (বেলডাঙ্গা)
২। এইচ, সি, প্রামাণিক (নবদ্বীপঘাট)
৩। এ, টি সরকার (কাটরাস গড়)
৪। এম, এম, গাঙ্গুলী (ত্রিবেণী)
৫। জি, জি, বিশ্বাস (কাটোয়া)
৬। এইচ, এস, পাইন (চন্দ্রকোনা রোড)
৭। ডি, কে, চৌধুরী (শিলচর)
৮। এস, এন, ঘোষ (পাথারদি)
৯। জি, ডি, দে (শ্রীরামপুর)
১০। কে, সি, গুপ্ত (মুর্শিদাবাদ)
১১। কে, এস, রায় (বেরমো)
১২। এস, এম, গোস্বামী (নিউ দিল্লী)
১৩। শ্রীমতী কনকলতা দেবী (খড়গপুর)
১৪। এ, কে, সাহা (আমতা)
১৫। কে, বি, গাঙ্গুলী (জামালপুর)
১৬। এস, এস, সরকার (জলপাইগুড়ি)
১৭। টি, এল, রায় (ধুবড়ি)
১৮। এস, কে, দে (রাণীগঞ্জ)
১৯। এন, এন, দাস (নিউ দিল্লী)
২০। মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল ষ্টোর (এলাহাবাদ)
২১। বি, কে, আইচ (বৰ্দ্ধমান)
২২। এস, এন, বিশ্বাস (গড়বেতা)
২৩। এইচ, কে. মহাপাত্র (বালেশ্বর)
২৪। ডি, সি, বিশ্বাস (বড়জামদা)
২৫। পি, সি, চৌধুরী (মেদিনীপুর)
২৬। এন, সি, চ্যাটার্জী (বেলুড়)
২৭। বি, এল, ভট্টাচার্য্য (ভদ্রেশ্বর)
২৮। জি, ডি, সিংহরায় (জঙ্গীপুর রোড)
২৯। এস, পাণ্ডে (বৰ্দ্ধমান)
৩০। এইচ, পি, সাহা (জিয়াগঞ্জ)
৩১। এল, এম. দত্ত (হুগলী ঘাট)
৩২। কে, কে, দে বিশ্বাস (দক্ষিণেশ্বর)
৩৩। পি, এন, মোদক (অম্বিকা-কালনা)
৩৪। এইচ, সি, ঘোষ (বার্ণপুর)
৩৫। বি, এল, সা এণ্ড সন্স (বারাকপুর)
৩৬। এস, কে, মুখার্জী (কাঁচরাপাড়া)
৩৭। এম, কে, ঘ্যানার্জী (সিউড়ী)
৩৮। এস, বি, সিং (ফুলেশ্বর)
৩৯। এস, পি, ঘোষ (সাইথিয়া)
৪০। এস, কে, দাস (আলিপুরদুয়ার)
৪১। এস, গাঙ্গুলী (রাঁচি)
৪২। এম, এন, দাস (বৈদ্যনাথধাম)
৪৩। এস, সি. মুখার্জী (মেচেদা)
৪৪। বি, সি, বোস (বৈঁচি)
৪৫। বি, এন, দাস (কাঁইহাট)
৪৬। আর, জি, ওঝা (কৃষ্ণপুর)
৪৭। ডি, পি, দাস (বাঁকুড়া)
৪৮। বি, কে, মিত্র (মধুপুর)
৪৯। এস, জি, সেন (গলসি)
৫০। এম, এল, সরকার (কালচিনী)
৫১। এ, কে, ভট্টাচার্য্য (গোবরডাঙ্গা)
৫২। এস, সি, ভট্টাচার্য্য (আগরতলা)
৫৩। এস, কে, রায়চৌধুরী (জামুরিয়া)
৫৪। জি, কুমার (সিঙ্গুর)
৫৫। ইউনাইটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স (টাটানগর)
৫৬। এ, এম, দাস (পুরুলিয়া)
৫৭। ঘোষ লাইব্রেরী (বহরমপুর কোর্ট)
৫৮। এম, বি, সিংহ (আরামবাগ)
৫৯। এন, এন, রায়চৌধুরী (টাকি)
৬০। মিক্সাডোজ বেনারস নিউজ পেপার এজেন্সী (বেনারস ক্যেন্টনমেন্ট)
৬১। পি, আর সেনগুপ্ত (হাইলাকান্দী)
৬২। এস, কে, শেঠ (মালদহ কোর্ট)
৬৩। শিলং স্পোর্টস (শিলং)
৬৪। জে, এন, সা (পাকুড়)
৬৫। আর, সি, ভট্টাচার্য্য (রবিপুর রোড)
৬৬। ডি, জি, মিত্র (বিষ্ণুপুড়ী)
৬৭। মেসার্স বি. এন, সুর এণ্ড কোং (দিল্লী জং)
৬৮। এ, কে, দত্ত (চিত্তরঞ্জন)
৬৯। এস, কে, ভট্টাচার্জী (ইছাপুর)
৭০। এস, কে, সরকার (কাটিহার)
৭১। মোহাম্মদ মসিহর রহমান (বাগেরহাট)
৭২। এ, কে, দাস (রাজসাহী)
৭৩। ওসমানী এণ্ড কোম্পানী (ময়মনসিং)
৭৪। আর, এল, সেন (চট্টগ্রাম)
৭৫। বি, এন, দাস (ধুলিয়ানগঞ্জ)
৭৬। শ্রীআশারাণী শীল (পানাগড়)
৭৭। পি, কে, রায় (বরাকর)
৭৮। জে, এন, অধিকারী (কৈলেশহর)
৭৯। আর, সি, শীল (কুমারধুবী)
৮০। রবীন ঘোষ (পুরী)
৮১। অমরেন্দ্রনাথ রায় (সান্তবাঁকুড়া)
৮২। আর, সি, পাধি (সম্বলপুর)
৮৩। বি, বি, রায়চৌধুরী (মল জংসন)
৮৪। রাধানাথ রায় (বাঁশজোড়া)
৮৫। এইচ, ব্যানার্জী (ওন্ডাগ্রাম)
৮৬। এস, বি, কুণ্ডু (নলহাটী)
৮৭। এ, এন, চক্রবর্ত্তী (নীলফামারী)
৮৮। কে, এস, রাজলক্ষ্মী (রায়পুর)
৮৯। নরেন্দ্রকুমার লোদ (কমলপুর)
৯০। কানাই দাস (শাওড়াফুলি)
৯১। বাগচী ব্রাদার্স (কুন্টি)
৯২। এস, কুমার এণ্ড ব্রাদার্স (ডিগবয়)
৯৩। বি, এল, মুখার্জী (ফুলিয়া)
৯৪। সুখদেওপ্রসাদ সিং (হিজলী)
৯৫। কো-অপারেটীভ বুক সোঃ লিঃ (সোনারপুর)
৯৬। এইচ, সি, ঘোষ (আসানসোল)
৯৭। [illegible] ([illegible])

একটি আজাদী সৈনিকের কথা

শৈলেন ভট্টাচার্য্য

১৯৪৬ সাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সবে মাত্র থেমে গেছে। যুদ্ধবন্দী আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের দিল্লীর লালকেল্লায় বিচার করা হল। বিচারে যারা খালাস পেল তারা বহু দিন ফেলে-আসা গ্রামে ফিরে গেল মা-ভাই-বোনদের কাছে। নেতাজীর দেহরক্ষা-বাহিনীর জমাদার হারুণ-অল্-রসিদ সংসারের একমাত্র অবলম্বন বৃদ্ধা মাকে পূর্ব্ববঙ্গের এক অখ্যাত গ্রামে ফেলে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল ১৯৪০ সালে। যত দিন যুদ্ধে ছিল তার মধ্যে এক দিনের জন্যও সে মাকে দেখতে যাবার সুযোগ পায়নি, ন'মাসে-ছ'মাসে মা'র চিঠি পেত কিন্তু যখন আজাদ হিন্দ ফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করে আজাদ হিন্দ ফৌজের দলভুক্ত হল, তখন সে সম্বন্ধটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে লালকেল্লা থেকে যেদিন সে মুক্তি পেল সেদিন আর কোন দিকে না তাকিয়ে ছুটে গেল তার গ্রামে মা'র কাছে। সারা রাস্তা উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে সে গ্রামে গিয়ে যা দেখল তাতে সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। তাদের সে খড়ের ঘরের কোন চিহ্ন নেই, সামনের ফসলের ক্ষেতটা শুকিয়ে খট্‌খট্ করছে, দেখলে মনে হয়, অন্ততঃ চার বছর ও-জমিতে লাঙ্গল পড়েনি। উদ্‌ভ্রান্তের মত সে তার মা'র খোঁজ করতে লাগলো, সামনে পরিচিত যাকে পেল তাকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করল তার মা'র কথা। পরিচিত লোকটি রসিদকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—আজ তিন বছর তার মা ইহলোক ত্যাগ করেছেন, রসিদের ঠিকানা না জানা থাকায় তার মা'র মৃত্যু-খবর জানান সম্ভব হয়নি। আজাদ হিন্দ ফৌজের নির্ভীক যোদ্ধা রসিদ ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেলল। আজ এই বিশাল পৃথিবীতে সে একা, সম্পূর্ণ অবলম্বনহীন। আবার সব তল্পিতল্পা গুটিয়ে দুর্ব্বল পায়ে সে যাত্রা করল অনির্দ্দিষ্টের পথে। তার পর এক শুভ মুহূর্ত্তে রসিদ এসে উপস্থিত হল আমাদের গ্রামে। দেশের কিশোরদের নিয়ে সে শুরু করে দিল তার নতুন জীবন। স্কুলে বাদাম ভাজা, লজেন্স বিক্রী এই সব হল তার পেশা। নিরহংকারী, সদাহাস্যময় হারুণ-অল্-রসিদ শিশুদের মধ্যে একাধিপত্য স্থাপন করল, দেশের ছেলেদের কাছে সে 'রসিদদা'তে পরিণত হল। যখন সে কিশোরদের মধ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের কাহিনী বলত তখন [illegible] মাঝে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠত যে মনে হত সে যেন এখনও যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছে। তার সে কাহিনীর মধ্যে ভয়-ভীতি-সুখদুঃখ সবই ছিল। নেতাজীর প্রতি আজাদ হিন্দ ফৌজদের কতখানি শ্রদ্ধা আছে তা আমরা কল্পনা করতে পারি না। রসিদদাকে দিয়েই বলছি, নেতাজীর কথা যখন বলত তখন তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসত। সে বলত, 'প্রত্যেক আজাদ সৈনিকের বুক চিরলে দেখতে পাবে সেখানে রয়েছে নেতাজীর ছবি।'

রসিদদা'র সারা দিনের সব চেয়ে জরুরী কাজ ছিল একটি। ভোর বেলা ঘুম হতে উঠে মুখহাত ধুয়ে ট্রাঙ্কের মধ্য হতে বার করত পুরানো একটি মিলিটারী পোষাক ও সের আড়াই ওজনের এক জোড়া বুট। সম্পূর্ণ মিলিটারীর সাজ সেজে দেওয়ালে টাঙান আই. এন. এ দপ্তর হতে প্রকাশিত নেতাজীর ছবিটির কাছে গিয়ে সেই পুরানো বুট জুতার গম্ভীর আওয়াজ করে দিত মিলিটারী স্যালুট। জুতার আওয়াজের সঙ্গে তার 'জয় হিন্দ' শব্দ পাড়া কাঁপিয়ে দিত। তার পর পোষাকটি আবার সযত্নে তুলে রেখে সে অন্য কাজে মন দিত।

প্রায় দু'বছর রসিদদা' আমাদের মাঝে ছিল। সহসা এক দিন সকালে দেখা গেল রসিদদা' তার তল্পিতল্পা গুটোচ্ছে, বললে— শাহনাওয়াজ তাকে ডেকেছেন গান্ধী মিশনে কাজ করবার জন্য।

রসিদদা' চলে গেল কিন্তু আমাদের মনে এমন একটি দাগ এঁকে দিয়ে গেল যে, তা আমরা কখনও ভুলতে পারব না।

গল্প কিন্তু সত্য

শ্রীশ্যামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাড়ীতে কাজ···বিয়ে-টিয়ে হবে হয়তো। চারি দিক আনন্দ-কলরবে মুখরিত। বাড়ীর একটা ঘরের কোণে একটি ছেলে গম্ভীর মুখে বসে আছে। হঠাৎ তার মা তাকে দেখে ফেললেন। মা তাকে সস্নেহে কাছে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন : তোর কি হয়েছে রে, অমন ক'রে বসে কেন? ছেলেটি কোন জবাব দিল না। গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রইল। মা জিজ্ঞাসা করলেন : রাগ হয়েছে বুঝি?

প্রত্যুত্তরে ছেলেটি শুধু মাথা নেড়ে জানাল সত্যিই সে রাগ করেছে। মা রাগের কারণ জানতে চাইলেন। ছেলেটি গম্ভীর মুখে জবাব দিল : মা, আমি আমার এক বন্ধুকে নেমন্তন্ন করব। কিন্তু সে ছোট-ঘরের ছেলে বলে বাড়ীর সকলের অমত।

মা বললেন : সত্যিই তো ; ছোট জাতের লোক বা ছেলেকে কখন বাড়ী আনতে আছে? তাদের খাওয়াতে গেলে আলাদা বাসন-পত্র দরকার ; ছোট জাত কিনা!

ছেলেটির মুখ লাল হ'য়ে গেল। কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল।

কাজ হ'য়ে গেল—

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ একে একে বিদায় নিলেন। এবার বাড়ীর লোকদের পালা······। সবাই এল ; কিন্তু ছেলেটি এল না। জানাল, সেই ছোট জাতের বন্ধুটির পাশে বসে খেতে না পারলে, সে খাবে না। বাড়ীর লোকে সব স্তম্ভিত। মা তাকে বোঝাবার জন্যে বার বার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তা ধোপে টিকল না। অবশেষে সেই বন্ধুটিকে ডাকতে হোল। ছেলেটি সেই তথাকথিত ছোট জাতের পাশে বসে খেতে লাগল।

এই ছেলেটি কে জান? এই ছেলেটি জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু!

এই উদাহরণটি তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনের কোন পরিচয় নয়,—তাঁর মহৎ চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শান্তিনিকেতনের দুটি উৎসব

শ্রীসুব্রত কর

দুই

শান্তিনিকেতনে একের পর এক উৎসব লেগেই আছে। তারই মাঝে চলে ক্লাস অফিস। হঠাৎ এক দিন হয়তো নোটিশ বেরল—কাল ছুটি। অনেকে ভুলে যায়—কেন ছুটি। শোনা গেল,—কাল 'দোল-পূর্ণিমা'। সকলের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। অতিথি-অভ্যাগতেরা দলে-দলে আসতে থাকল। বাড়ির সকলে পথ চেয়ে বসে আছে, হয়তো কারো আসবার কথা আছে। রাস্তায় ট্যাক্সি-রিক্সা চলার বিরাম নেই। নূতন গেষ্ট-হাউস হয়েছে আশ্রমের বাইরে। কোলাহলটা একটু সরে গেছে। সকলে আশ্রমের ভিতরটা দেখতে আসে। চাঁদনি রাত পেয়ে আগের দিন রাতে ছেলেরা খোলা মাঠে খেলতেই শুরু করে দিল। পরদিন পড়ার তাড়া নেই, ছুটি আছে। সেদিন গান্ধী-পুণ্যাহ উপলক্ষ্যে গোটা আশ্রমটা পরিষ্কার করা ছিল—চারিদিক ঝকঝকে তকতকে।

পরদিন সকালে দোল। দোলে বাসন্তী রঙের কিছু সকলকেই পরতে হয়, বিশেষ ক'রে ছেলেমেয়েদের। বসন্তে বাসন্তী পোষাক,—প্রকৃতির সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যায়। প্রকৃতির কোলেই আমরা মানুষ। বাপ-মা'র কারো সঙ্গে যদি সন্তানের কোনো দিকে কিছু মিল না থাকে, সে কেমন খাপছাড়া হয়। গুরুদেব প্রত্যেক ঋতুকে উৎসবের ভিতর দিয়ে বরণ করতেন নৃত্যে-গানে,—নানা রঙেও। বসন্তে বাইরের সাজে রংটি থাকত বাসন্তী, প্রকৃতির নবীনতার সাজ।

নাচের দল কতক্ষণে বেরবে, প্রশেসন দেখতে সকলে উৎসুক হয়ে থাকে। হঠাৎ দূর থেকে খোলের আওয়াজ ভেসে আসে। সারি বেঁধে নাচতে নাচতে নাচের দল বের হয়। এটি উৎসবের একটি বড়ো আকর্ষণ! কারো হাতে শঙ্খ, কারো ডালায় ফুল, কারো হাতে আবিরের থালা। সে সমস্ত গন্ধ-উপহার ছিটোতে ছিটোতে, শঙ্খ বাজিয়ে যেন বসন্তকে অভ্যর্থনা করে আনতে থাকে। ছোটো-বড়ো সমস্ত মেয়েই নাচে যোগ দেয়। আমবাগানের সভাস্থলটা দু'-তিন বার ঘুরে ঘুরে নাচ থামায়। যে যার জায়গা নিয়ে বসে পড়ে। আরম্ভ হয় অনুষ্ঠানের পর্ব। গুরুদেবের কবিতার আবৃত্তি হয়, আর হয় গানের পর গান। সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা ঋতুর বর্ণনা ক'রে তার তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন। শেষ গানটি হবার সময় ছোটো ছেলেমেয়েরা ব্যগ্র হয়ে থাকে আবিরের জন্ত। মাঝখানে এক থালা-ভর্তি আবির রাখা হয়। তাই নেবার জন্ত কাড়াকাড়ি প'ড়ে যায়। এ ছাড়া এমনিতেও সকলে বার-বার আবির কেনে। সভা ভাঙলেই আবির খেলার পালা। লাল রং-এ মাখা হয়ে যায় চারিদিক। বাতাসে আবিরের ছড়াছড়ি। জামা-কাপড় লাল হয়ে ওঠে। লোকজন চেনাই যায় না। ছেলেমেয়ের দল যাকে আক্রমণ করে তার আর রক্ষা থাকে না। ছোটোরা গুরুজনদের পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম করে, বড়রা তাদের কপালে আবির মাখিয়ে আশীর্বাদ করেন।

আমবাগানের সভার পরে আশ্রমের পুরানো কর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের সকলে মিলে একটু ঘরোয়া রকমে আসর জমিয়ে তোলে। নাচ গান আবৃত্তির পালায় আনাড়িদেরও এবার অংশ মেলে। নাচতে নাচতে কোনো এক জন ছেলে হঠাৎ এমন ভাবে বসে পড়ল যে, সকলে ভাবল নিশ্চয়ই সে পড়ে গেছে। কিন্তু তার সহচরটি যেমন দাঁড়িয়ে নাচছিল তেমনি তখনো নেচে যাচ্ছে। এক জন শিক্ষক ছুটে গেলেন,—আহা হা, বেচারী শেষটায় পা-টা ভাঙল! একটু পরে দেখা গেল, ছেলেটি কাঁদছে কই, সে যে মাটিতে লুটিয়ে হাত দুলিয়ে নাচছে। মাষ্টার মশাই হতভম্ব হলেন। হো-হো করে উঠল হাসির ধুম। ফাগের ফোয়ারা উড়ল বাতাসে। দল বেঁধে গানের চলন্ত মজলিস চলল শালবীথি ঘুরতে।

দুপুরের দিকটা খানিকটা শান্ত থাকে। তখন থেকেই আবির দেওয়া বন্ধ। রাত্রে জলসা ছিল। বড়ো ক'রে আসর সাজানো হয়েছিল গৌরপ্রাঙ্গণে। ইলেকট্রিক্ আলোগুলিকে কানা ক'রে দিয়ে চাঁদের আলো ছড়াচ্ছিল এবার রঙের বাহার। গান ভেসে আসে কোন সুদূর কাল থেকে—

কো তুঁহু বোলবি মোয়।···
হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল,
শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল,
বিকল ভ্রমর সম ত্রিভুবন আওল,
চরণকমলযুগ ছোঁয়।···

সেদিন গুরুদেবের "ভানুসিংহের পদাবলী" গাওয়া হল। নাচের দ্বারা সেগুলির অর্থ সকলের কাছে আরো সুন্দর ক'রে ফুটিয়ে ধরা হয়েছিল। রাধা ও কৃষ্ণের নাচই ছিল প্রধান। অনেক দিন পর নূতন ধরণের গান শুনে সকলেই সেদিন তৃপ্ত হয়েছিল।

উৎসবের দিনগুলি কেটে গেল। আরেক সকাল এল। ছুটি ফুরিয়ে গেছে। একে একে অতিথিরা চলে যাচ্ছে সবাই। স্কুল কলেজ অফিস সমস্ত কিছু খুলে গেল। এত আনন্দের পর মন কি স্থির হয়ে কাজে বসবে? কিন্তু দেখা গেল, মন বসল, আরো যেন ভাল করেই বসল। একঘেয়েমি কেটে গেছে। কাজে স্ফূর্তি লাগছে। শান্তিনিকেতনের উৎসবগুলিও কী যে কাজের জিনিস,—দু'দিন বাদে কাজে ব'সে তা বোঝা গেল।

জীবজন্তুর খেলাধুলা

দীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

জীবজন্তুরা খেলা করতে খুব ভালবাসে। খেলাও এদের একটা প্রকৃতিগত ব্যাপার। তবে, হ্যাঁ, এদের খেলার একটা নিছক অর্থ আছে। ছোট ছোট বাচ্চাদের বড় হতে হবে, শিকার ঠিক ঠিক ধরতে হবে যাতে করে বেহাত না হয়ে যায় এবং এই বিদ্যায় কায়েম না হলে তো জীবজন্তুর সংসার অচল। তাই মা বাচ্চাদের খেলার ভেতর দিয়ে নানা রকম ট্রেনিং দেয়। বাঘিনী শিক্ষা দেয়ার বিষয়ে একজন পাকা ওস্তাদ। কত কষ্ট করে, কত খেলিয়ে খেলিয়ে

এরা বাচ্চাদের উপযুক্ত করে তোলে। সেই সব জিনিষ নিজ চোখে না দেখলে হয় না। কয়েক বছর আগে আমি গরুর গাড়ীতে ডুয়ার্সে'র এক গভীর জঙ্গলের পাশ দিয়ে দিন-দুপুরে যাচ্ছিলাম। সাথে আমার এক সঙ্গী ছিলেন এবং গাড়োয়ান। গাড়ী টং-টাং শব্দ করে যাচ্ছে। গরুর গলায় ঘণ্টা—তারি থেকে ঐ শব্দটি হচ্ছিল। হঠাৎ দেখি গরুগুলি থমকে দাঁড়াল। ভীষণ ছটফট করতে লাগলো যেন জোয়াল থেকে ছাড়া পেলে বাঁচে। গাড়োয়ান বলে উঠলো 'বাঘ'। ভয়ে তো আমার প্রাণ শুকিয়ে গেল। যাই হোক, কোন রকম সাহস করে চার দিকে তাকালাম। গাড়োয়ান মাটিতে নেমে গরু দুটিকে সামলিয়ে রাখলো। বেশ খানিকটা দূরে দেখি একটা বাঘিনী রাস্তার ধারে একটা গাছের ছায়ায় তার বাচ্চা নিয়ে নানা রকম খেলা খেলছে। একবার ওৎ পেতে বসছে, আবার উঠছে, আবার লাফাচ্ছে—এই সব এবং আর কত কী! প্রায় ১৫ মিনিট এই ভাবে খেলা চললো। তার পর কি যেন সাড়া পেয়ে গভীর জঙ্গলের ভেতর আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। আমরাও বাঁচলাম। এক জন বিশিষ্ট প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ একবার এক জ্যোৎস্না রাত্তিরে দক্ষিণ-আমেরিকার এক সমতল ভূমিতে চারটি বাচ্চা পুমাকে নানা রকম ভাবে খেলতে দেখেন। সেই খেলা ছিল তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে তৈরী হবার উপায়স্বরূপ। আমি আলিপুর জুতে একটি বাচ্চা জলহস্তীকে ঘাস-পাতা দিয়ে নানা রকম ভাবে খেলতে দেখেছিলাম। একটি ছোট ছেলে ওপর থেকে ঘাস-পাতা জলে ফেলে দেয়—বাচ্চা জলহস্তীটি সেগুলিকে ধরে, তার পর খানিকটা খেয়ে ফেলে—বাকীটা জলে ঠেলে দেয়—একটু একটু করে সাঁতরায়, একটু করে খায়। আবার পাড়ের দিকে আসে, আবার সেই ঘাস-পাতার দিকে ছোটে। এই ভাবে সাঁতরানো পরিশ্রম বা খেলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চললো। এই তো গেল বাচ্চাদের কথা, এবার ধাড়ীদের দেখা যাক। যারা বড়, তাদেরও খেলার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। তাদের নখ দাঁতকে ধারাল রাখতে হবে, শরীরটিকে সক্রিয় রাখা দরকার। তাই শীতপ্রধান দেশে এমন নজীর বহু আছে যে, ভালুক বরফের পাহাড় থেকে মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে—আবার ওঠে, আবার পড়ে—অনেকটা না কি ছেলেমেয়েদের slip খাবার মতন।

একবার আমায় শিলিগুড়ীর কাছাকাছি জঙ্গলের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে যেতে হয়েছিল। সাথে তিন জন নাগপুরী মজদুর ছিল। তাদের হাতে তীর-ধনুক। ব্যাস, এই যা সম্বল। আকাশটা ছিল মেঘলা। রওনা হবার কিছুক্ষণ পরে টিপ্-টিপ্ করে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। তখন বিকেল তিনটে। বেশ খানিকটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে হবে—মাইল দুই-তিন। উপায় নেই। সারা বনটি নিশ্চুপ থমথমে ভাব। মাঝে মাঝে দু-একটি বনমুর্গীর ডাক। খানিকক্ষণ যাবার পরেই কি যেন খস্-খস্ শব্দ কানে এলো। ও বাবা! দেখি, দু'টি ভালুক বেশ খানিকটা দূরে একটু একটু দৌড়াচ্ছে, আর একটা গাছে নখ আঁচড়াচ্ছে। হয়ত ওদের খেলা হচ্ছিল। কিন্তু সে দৃশ্য উপভোগ করবার সাহস ছিল না। কেন না, ভালুকের মতন হিংস্র জানোয়ার আর দুটি আছে কি না সন্দেহ! এরা যদি একবার মানুষের পিছু নেয় তবে ওদের হাত থেকে রেহাই পাবার কোন পথ থাকে না। তাই ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে আমরা অন্য পথ ঘুরে গন্তব্য স্থলে পৌছাই। এক জন বিখ্যাত শিকারী আফ্রিকার জঙ্গলে কয়েকটি হাতীকে একটা মাটির ডেলা নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করতে দেখেন। আমিও আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে একটা-কাহিনী শুনি। সেটা হচ্ছে—উনি এক দিন সন্ধ্যে বেলায় সাইকেলে চা-বাগান থেকে বেরিয়ে একটি পাহাড়ের ঢাল দিয়ে খুব জোরে বাড়ী ফিরছিলেন। সেই পাহাড়টির নিচে একটা হাতীকে একটা টুপী নিয়ে লোফালুফি খেলতে দেখেন। এই ঘটনাটি বলবার সময় তাঁর মুখ যে খুবই শুকিয়ে উঠেছিল তা আমার বেশ মনে আছে। জঙ্গলে হরিণের লুকোচুরি খেলা, চিল কিংবা বাজের আকাশে অনেক দূর ওপরে উঠে পাখা বন্ধ করে মাটিতে পড়ে যাবার ভাণ, একটা হনুমানের আর কয়েকটিকে ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে যাওয়া, আলীপুর জুতে বনমানুষের সিগারেট নিয়ে খেলা এবং মাদ্রাজের একোরিয়ামে (Acquariam) নানা রকম মাছের খেলা দেখেছি।

গল্প হলেও সত্যি

শ্রীআজহারউদ্দিন খাঁন

কাকা আর ভাইপো।······

কাকা লেখেন, ভাইপো ছবি আঁকে। ভাইপো মুখে-মুখে ভাল গল্প তৈরী করতে পারে কিন্তু লিখতে পারে না। লেখার নাম শুনলে তার গায়ে যেন জ্বর আসে।

কাকা এক দিন ভাইপোকে বললেন, তুমি লেখো না কেন মুখে মুখে তো বেশ সুন্দর গল্প তৈরী করতে পার। এবার থেকে লিখতে আরম্ভ কর।······

ভাইপো বললে, লেখা! সে আমার দ্বারা হবে না। আর যা বলবেন তা সব করতে পারব—ঐ লেখার কথাটি বলবেন না, আমার পীলে চমকে যায়।······

কাকা তখন ভাইপোকে উৎসাহিত করে তোলবার জন্তে বললেন, তুমি লেখো, আমি তো আছি। যদি কিছু ভুল বেরোয় সে শুধরিয়ে নেয়া যাবে। তুমি আগে লেখো তো।······

এই কথাতেই ভাইপোর সাহস এলো। সে এক ঝোঁকে 'শকুন্তলা' লিখে কাকার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। কাকা তো দেখে অবাক! ভাইপো তো নিজের শক্তি দেখে আনন্দে আত্মহারা! তার নিজের ওপর বিশ্বাস এলো। যে নিজে এক দিন লিখতে ভয় পেতো সে ক্রমে 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', 'আলোর ফুলকি', 'ভূতপরীর দেশ', 'নালক', 'বুড়ো আংলা' প্রভৃতি লিখে সাহিত্যে অমরত্বের আসন অধিকার করে নিল।

এখন বলতে পার কাকা আর ভাইপোটি কে? কাকা হলেন রবীন্দ্রনাথ আর ভাইপো হলেন অবনীন্দ্রনাথ। তোমাদের মধ্যেও যারা লিখতে পার না বা লিখতে চেষ্টাই কর না তারা অবনীন্দ্রনাথের জীবন থেকে এই প্রেরণা নিয়ে নিজেদের সুপ্ত চেতনা জাগিয়ে তোল।

ঐতিহ্যময় ভারত

কুম্ভ মেলা—এলাহাবাদ

প্রতি ১২ বৎসর অন্তর পুণ্যতোয়া ভাগীরথী ও যমুনার সঙ্গমস্থলে শিব-পূজাকল্পে ধর্মানুরাগী লক্ষ লক্ষ হিন্দু আমাদের প্রজাতন্ত্রী ভারতের অন্যতম চিত্তাকর্ষক মেলা উপলক্ষে আসিয়া মিলিত হন।

এই মেলায় অধিকতর টাট্‌কা ও সুন্দর সেই জিনিষটির জন্য অবিরাম যে চাহিদা উপস্থিত হয়, ব্রুক বণ্ডের সেলসম্যানগণ তাহা মিটাইবার জন্য অক্লান্তভাবে কাজ করিয়া থাকেন।

ব্রুক বণ্ড চা

চমৎকার দেশীয় প্যাকেটে সেরা ভারতীয় চা

BBT/C/21
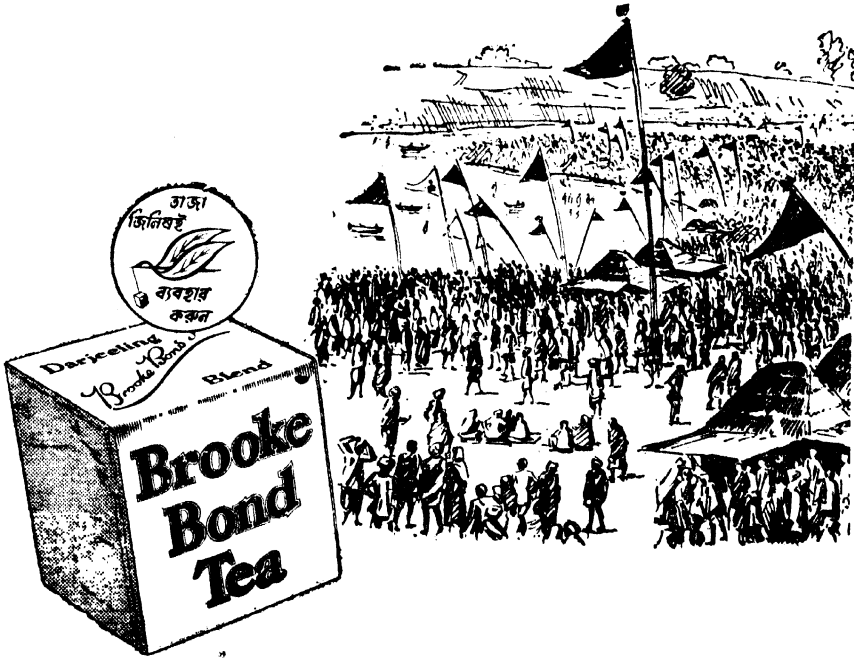
কেনোপনিষদ

চিত্রিতা দেবী

দ্বিতীয় খণ্ড

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি,
নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু
মীমাংস্যমেব তে ;
মন্যে বিদিতম্ ॥১

যদি মনে কর, তাঁহারে জেনেছ তুমি,
তবে জেনে রেখ, জেনেছ তাঁহারে,
খণ্ড ক্ষুদ্ররূপে,
তব ইন্দ্রিয়সীমাটুকু দিয়ে বেঁধে—
বিপুল তাঁহার অসীম অপরিচয়,
এখনো তোমারে বুঝিতে,
হইবে ধীরে।
(শিষ্য বললেন) মনে হয়,
আমি জেনেছি ॥ ১

নাহং মন্যে সুবেদেতি
নো ন বেদেতি বেদ চ
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন
বেদেতি বেদ চ ॥২

ভাল করে তাঁকে জানি, এই কথা
ভাবিতে পারি না আমি,
কিছুই তাঁহার জানি না, এমনও ভাবি না,
'জানি না'ও নয়, 'জানি' তাও নয়,
এই বাণী যিনি মর্মে বোঝেন,
তিনিই তাঁহার জ্ঞাতা ॥ ২

যস্যামতং তস্য মতং
মতং যস্য, ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং
বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥৩

যে ভাবে 'জানি না', সেই জানে কিছু,
যে ভাবে, জেনেছি, জানে না,
জ্ঞানী জানে, তিনি কখনো,
হন না জ্ঞাত,
অজ্ঞানী দল, বৃথা মনে করে,
— জেনেছে ॥ ৩

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং
হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং
বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্ ॥৪

তাঁহারই প্রকাশ সব জ্ঞানমাঝে,
একথা যে জানে মনে,
লভে সে অমৃত ধন,
আত্মারই ধ্যানে, লভে সে শক্তি,
অমৃতলাভের তরে,
আত্মবিদ্যা সহায়ে, সে লভে,
চরম মৃত্যুমুক্তি ॥ ৪

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥৫

এই জীবনেই তাঁহারে জানিলে,
সার্থক তব সত্তা।
নহিলে জানিও চরম ধ্বংস তব।
বিশ্বমাঝারে তাঁরে দেখে ধীর,
পার হয় যবে মায়া,
তখনই সে লভে,
অমৃত-মাঝারে অমৃতস্বরূপ
কায়া ॥ ৫

বামি বেওয়ার এই প্রতিবাদে কিষনিয়া চোখ রাঙিয়ে ঘুঁসি পাকিয়ে বললো, 'কি-ই—কি বল্লি, মাইরী মাইরী। বড্ড হিংসে হচ্ছে, না ? দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি তোরে।'

বামি বেওয়ার মেয়ে বামি ক্ষেপীও গোপনে মায়ের সঙ্গে এই হুল্লোড়ে যোগ দিতে এসেছিল, অধিক পারিশ্রমিকের অর্থাৎ বেশী পয়সার লোভে। পুরানো চোরদের এই হুল্লোড় বা জমায়েতে সে প্রথম যোগ দিতে এসেছে। কিষনিয়ার এই দানবীয় মূর্ত্তি দেখে ভয় পেয়ে সে বামি বেওয়াকে জড়িয়ে ধরে আঁতকে উঠলো, 'ও ম-আ মা। বড্ড ভয় করছে আমার।' কন্যাকে ভয় পেতে দেখে বামি বেওয়া বিব্রত হয়ে উঠলো, একটু ক্রুদ্ধও। ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়ের থুঁতনী ডান হাতের পাঁচ আঙুলে চেপে বামি বেওয়া চাপা-গলায় ধমকে উঠলো, 'চুপ কর ছুঁড়ী! আর হাসাস্‌নি। এখানে মা' কে তোর ? নেকী কোথাকার!'

এর পর নিমিষে শুরু হয়ে গেল পুরানো চোরদের এই বহু-আকাঙ্ক্ষিত হুল্লোড়। ঘুরে দাঁড়িয়ে কিষনিয়া বলে উঠলো, 'এই মদনিয়া, তুই আজ বামিকে নিবি। তুই হবি আমার জামাই, বুঝলি ? কাল কিন্তু আমি হবো তোর শ্বশুর, হে হে হে।' নেতাজীর হুকুম পাওয়া মাত্র মদনিয়া ছুটে এসে বামি ক্ষেপীর হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে মেঝের পাতা ছেঁড়া চাটাইএর উপর ধপ করে বসে পড়লো। সহসা মেঝের উপর ফেলে দেওয়ায় বামি ক্ষেপী তার হাড়-বার-করা পাছার উপরে বেশ একটু আঘাত পেয়েছিল। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে অস্ফুট স্বরে সে আর্ত্তনাদ করে উঠলো, 'ওঃ বাবা গো!' 'বাবা গো কি রে?' অসহায়া বামি ক্ষেপীর গালে একটা চড় কসিয়ে দিয়ে বোতলটা তার মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে মদনিয়া বললো, 'নে নে, শীগ্‌গির খেয়ে নে, ন্যাকামী-ট্যাকামী পরে হবে।'

বামি ক্ষেপী এরূপ হুল্লোড়ে অভ্যস্তা ছিল না, কিছু দিন গৃহস্থ-বাড়ীতে সে ঝি-গিরীও করেছে। তার মন ছিল বরং ভদ্রলোক-ঘেঁষা। ভয়ে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল কিন্তু এখন সে নাচার, ভেঁাচকানি খেতে খেতে মদটুকু গিলে ফেলে বামি ক্ষেপী অনুরোধ জানালো, 'ভেঁাচকানি লাগছে যে, একটু আস্তে আস্তে। ওঃ বাবাঃ, বাঁচান আপনি আমাকে—আমাকে রক্ষে করুন!' এই আপনি শব্দটি তার মুখ থেকে অলক্ষ্যে বার হয়ে এসেছিল। বামি ক্ষেপীর মুখে ভদ্রসমাজে প্রচলিত 'আপনি' শব্দটা মদনিয়াকে যেন চাবুক মেরে তার সকল নেশা ছুটিয়ে দিলে, বজ্জাতীও। 'ওরে বাপস্‌! ও ওস্তাদ!' বেশ একটু সন্ত্রস্ত হয়ে সরে দাঁড়িয়ে মদনিয়া বললো, 'এ যে আপনি-উপনি বলে কথা কয়, এ তো গেরোস্থো ঘরের মেয়ে। ও বাবা, এর মধ্যে আমি নেই। একে এক্ষুনি বার করে দে, নইলে সব মাটি!' বামি ক্ষেপীর নিকট হতে মদনিয়াকে সরে দাঁড়াতে দেখে আর এক জন বদমায়েস 'ছিনতাই রামু' তার পরিত্যক্ত স্থান দখল করবার জন্যে এগিয়ে আসছিল, মদনিয়া তাকে ধমক দিয়ে বললো, 'হট যাও ভাই, ই গৃহস্থিকী লেড়কী।' গৃহস্থ-কন্যার কথা শুনে আঁতকে উঠে দুই পা পিছিয়ে এসে ছিনতাই রামু বলে উঠলো, 'এঁ্যা, গৃহস্থিকী লেড়কী? কোন্‌ লে আয়া ইনকো? নিকাল দেও, নিকাল দেও!'

বামি ক্ষেপীকে যথাসম্ভব সসম্মানে ঘরের বাইরে রেখে এসে মদনিয়া গজরাতে-গজরাতে বললো, 'একটু দেখে-শুনে আনতে হয়, এদের কাণ্ডজ্ঞান নেই। আর একটু হলেই দোজাকে গিছলাম।'

এদিকে উন্মত্ত কিষনিয়ার সঙ্গে বামি ক্ষেপীর মাতা বামি বেওয়ার অশ্লীল বচসা শুরু হয়ে গিয়েছে এক প্রকার অকারণেই।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

পঞ্চানন ঘোষাল

এরূপ বচসা ও গালি-গালাজ না চালালে হুল্লোড় বোধ হয় জমে না। মাদুরের উপরে বসে বসে বামি বেওয়া মদের ঝোঁকে কিষনিয়াকে গাল পাড়ছিল, সহসা সে অকারণে ক্ষেপে উঠে ঘরের কোণ থেকে মাজা-ভাঙা তবলাটা তুলে নিয়ে সজোরে তা তার রাক্ষসের মাথার উপর বসিয়ে দিলে, প্রত্যুত্তরে কিষনিয়াও তার রাক্ষসীর মাথায় দিলো বোতলের একটা বাড়ি। বামি বেওয়ার গণ্ড বয়ে ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছিল, কিন্তু সেদিকে উপস্থিত কারুরই ভ্রূক্ষেপ নেই। কিষনিয়া জিভা দিয়ে তার গালের রক্তটুকু চক্‌-চক্‌ করে চেটে নিয়ে সোহাগভরে তাকে কাছে টেনে নিল।

কিষনিয়ার এই উন্মত্ততার মধ্যে নূতন কিছু ছিল না, তা সত্বেও সকলে তাকে সাবাস দিয়ে উঠলো। দলের রুকমনীয়া উৎসাহিত হয়ে উঠে পাশের এক নারীর ঘাড় কামড়ে দিলে, নির্য্যাতিতা নারীও ছাড়বার পাত্রী ছিল না। প্রত্যুত্তরে সে-ও রুকমনীয়ার চোখের মধ্যে আঙুল পূরে দিলে। রুকমনীয়া যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলো, কিন্তু রাগ করলো না। নাম-করা ছিনতাই হনুমানিয়া তখনও পর্য্যন্ত নির্বিকার চিত্তে মদ খাচ্ছিল। ভাঁড়ের সবটুকু তরল পদার্থ এক চুমুকে শেষ করে সম্মুখের এক নারীর হাত ধরে টান দিলে। মসীবর্ণা নারীটিকে রাক্ষসী বললেও অত্যুক্তি হয় না। একটা বোতল সে ইতিমধ্যেই শেষ করেছে; ক্ষেপে উঠে সে তার রাক্ষসের মুখে ঠাই করে একটা লাথি মারলো। হনুমানিয়ার একটা দাঁত ভেঙে রক্ত পড়ছিল, কিন্তু তা সত্বেও আহত হনুমানিয়া কাপড় দিয়ে রক্ত মুছে তার আততায়ীকেই আদর করে বুকে টেনে নিলে।

অর্দ্ধনগ্ন নর-নারীর এই গড়াগড়ি কামড়া-কামড়ি ও খিমচা-খিমচির কোনও বর্ণনার সৎসাহিত্যে স্থান নেই, কদর্য্যতা ও বীভৎসতার কারণে অধিক বর্ণনা সম্ভবও নয়। এইখানে নারীরা নর-রাক্ষসের অত্যাচার, উৎপীড়ন ও নিষ্পেষণ সহ্য করে বাধ্য হয়ে নয়, ইচ্ছা করে। বেশ্যা ও অপরাধী সমাজের লোকদের কষ্টবোধ থাকে কম, দৈহিক অসাড়তার কারণে প্রতিটি খিমচানী ও দংশন হতে এরা পায় অভূতপূর্ব্ব আনন্দ। এই সময় এদের দেখলে

মনে হবে, ওরা বীভৎস মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। পৃথিবীতে যদি কোথাও নরক থাকে তো তা এইখানেই।

পুরানো চোরদের এই মহা হুল্লোড় সারা রাত্রি এবং পরদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলবার কথা, কিন্তু সহসা বাইরে থেকে এক বাজখাঁই গলার কর্কশ আওয়াজ এসে এদের আনন্দের যোগসূত্র ছিন্নভিন্ন করে দিলে। বাইরে থেকে এই বস্তীবাড়ীর বাড়ীওয়ালা, দুর্দ্দান্ত গুণ্ডাসর্দ্দার শ্যামা পাঞ্জাবী চেঁচিয়ে উঠে বললো, 'এ-এই, মু'সামালকে, উল্টা-পাল্টা বাত একদম বন্ধ। বড়া বাবু খুদ আ'গয়া।' শ্যামা পাঞ্জাবীর সতর্ক-বাণী কানে পৌঁছবা মাত্র তালাতোড় সর্দ্দার কিষনিয়া সকলকে ধমক দিয়ে বললো, 'খবরদার ভাই সব, বিলকুল চুপ।' এর পর সে হুল্লোড়-ঘরের দরজাটা সাবধানে ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখতে পেলো,-সমগ্র বস্তীগ্রামের নূতন জমীন্দার খুদ বিহারীলাল গাঙ্গুলী রূপাগাঞ্জীর প্রখ্যাত মেয়েমানুষের দালাল ভৈরব বাবুর সহিত অভাবনীয় ভাবে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাড়াতাড়ি শ্যামা পাঞ্জাবী এবং বিহারী বাবুকে কুর্ণিশ জানিয়ে সসম্মানে তালাতোড় কিষনিয়া বললো, 'হুজুর খুদ আ'গয়া। খবর ভেজনে ভি মৈনে আ'যাতা। হুকুম ফরমাইয়ে, হুজুর!'

'চোপরাও বদমাস', ধমক দিয়ে বিহারী বাবু বললেন, 'বহুত নিমকহারাম তুম! মাহিনা গির যাতা, দেখা কিয়া এক রোজ?' 'মাফি মাঙতা বাবুসাব,' লজ্জিত ভাবে কিষনিয়া উত্তর করলো, 'সমঝে থে আজ ই যায়গা। বিশটো হাজার রুপিয়া নম্বরী নোট ভি থে হামিলোকর্কা পাশ। হুজুর মামুলি দোস্তরীমে তোড়ায় দেঙ্গে তো বহুত খুশ হোগা।' 'খুশ তো হোগা, লেকেন মেরা কাম ভী করো'—নরম হয়ে বিহারী বাবু বললেন, 'আন্দরমে উনলোক সব কৌন হ্যায়?'

'উনলোক হুজুর, সবকই শেয়ানা আছে', তালাতোড় কিষনিয়া উত্তর করলো, 'কাহে হুজুর, কুছ-কাম উম আছে?' কিছুক্ষণ চুপ করে ভেবে নিয়ে বিহারী বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কোহি চাকু মারনেওয়ালা আছে?' 'নেহি হুজুর,' উত্তরে কিষনিয়া বললো, 'উনলোক গামছাকো কাম করে, চাবিকো ভি, উনলোক বিলকুল তালাতোড় আছে, খুন-খারাপীকো উনলোক বহুত ডরতা, আউর ইস্‌মে উনলোক বহুত নারাজ ভি। লেকেন কহি আদমীকো কুঠিমে চুরী-উরি করানে জরুরত হোতে তো হুকুম ফরমায়িয়ে।'

তালা তোড়া বা ভাঙাকে পুরানো চোরেরা গামছা বা চাবির কায বলে। এই সকল পুরানো চোরেরা গুরু-পরম্পরায় যে সকল কায-কর্ম্ম শিক্ষা করেছে তা সহসা ছেড়ে দিয়ে অন্ত কোনও ভালো বা মন্দ কাযে আত্মনিয়োগ করতে কখনও সহজে রাজী হয় না। এদের সর্দ্দার কিষনিয়া, প্রস্তাবিত চাকুর কাযে অস্বীকৃত হওয়ায় বিস্মিত হবার কোনও কারণ ছিল না। একটু 'কিন্তু কিন্তু' করে বিহারী বাবু শ্যামা পাঞ্জাবীর দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি তাহলে ওস্তাদ?' চুপ করে একটু ভেবে নিয়ে শ্যামা পাঞ্জাবী উত্তর করলে, 'উ সব তো বাবুসাব হামি লোককো কাম আছে, লেকেন ঝুটমুট এক থানেদারকো চাকু মার দেঙ্গে? হামি লোককো তেনি শোচনে দিজিয়ে সাব। ই সব ছোটা-ছোটা কামমে হামাদের ওস্তাদকো ভী মানা আছে। হাঁ বাবুসাব! ওস্তাদ বুড়া তো বহুত রোজ মর গয়া, লেকেন উনকো উপদেশ হামি লোক বহুতসে মানতা হ্যায়। আভিতক উনলোক হামিলোককো কুছ লোকসান ভি কর চুকা নেহি, মেরী সাথী লোককোঁ সব বুছ বাত, পয়লা সমজানে হোগা নেহি তো উনলোক হামার বাত থোড়াই শুনবে, হুজুর।' 'হামসে উল্টা-পাল্টা বাত, মাত, করো, শ্যামা! হামি ভী বেকুউব নেহি আছে', উত্তরে ভৈরব বাবু বললেন, 'হামরা আদমী লোক উ রোজ ভী তোমরা তিন আদমী কো আদালতসে জামীন মঞ্জুর করায়কে ছোড়ায় লে' আয়া। তোমরা কি খেয়াল ইস থানেদারকো রাজমে কোকেন-উকেন কো কারবার পুরানো জামানে কো মাফিক চলেঙ্গে? কাল রাত ১০ বাজে মেরি উনসে ভেট ভি হুয়ে থে, তোমলোককো আস্তে হামকো বহু বেইজ্জত ভী হোনে হুয়া। মানী লোককো মান, কারবারী লোককো কারবার উস্ আদমী থোড়াই সমজথা।' 'আরে এ কেয়া বাত!' বিস্মিত হয়ে গুণ্ডাসর্দ্দার শ্যামা পাঞ্জাবী জিজ্ঞেস করলে, 'থানেকো নয়া বড়া বাবু খানা দানা আদমী নেহি হ্যায়? বিলকুছ খাতে পিতে নেই, এ কেইসেন থানেদার হ্যায়? আপ তো তাজুব কী বাত শুনাতা বাবুসাব!'

'পুলিশ ঘুষ খায় না ও ছাগল ঘাস খায় না' গুণ্ডাসর্দ্দার শ্যামসুদ্দিনের ধারণার বাইরে ছিল। কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল, পুরানো যুগ বহু দিন অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, এক্ষণে সূচনা হয়েছে সহজ ও সুন্দর এক নূতনতর যুগের। যুগ-পরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে প্রখ্যাত গুণ্ডাসর্দ্দার শ্যামা পাঞ্জাবী তখনও পর্য্যন্ত তা বুঝতে পারছিল না। শ্যামা পাঞ্জাবী চুপ করে আকাশ-পাতাল ভাবছিল, নূতন থানেদারের উপর তার শ্রদ্ধাও কম আসছিল না, কিন্তু তা বলে সে তার দুই পুরুষের পেশা বা কারবার উঠিয়েই বা দেয় কি করে!

শ্যামসুদ্দীন পাঞ্জাবীকে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করতে দেখে বিহারী বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কেয়া শোচতা ওস্তাদ?' উত্তরে শ্যামা পাঞ্জাবী বললো, 'শোচতা এই বাত, হুজুর। হামিলোক বড়ি বড়ি কাম করতা। ইস সব ছোটা কাম হ্যায়, ইসমে বদনামী ভী হোতা! আপ এক কাম করিয়ে না, রহমনিয়াকো বোলায় দেতা। উ ভী আপকো রেইত আছে। আজকাল বহুত ওস্তাদভী হইয়েছে। উন্‌সে যা কুছ সলা কর লিয়ে, হামিলোক তো আপকো মদতদারীমে হ্যায়ই, রহেগা ভী পুরা। বোলায় দে উনকে বাবুসাব!'

শ্যামা পাঞ্জাবীর এই সাধু প্রস্তাবে রাজী না হয়ে বিহারী বাবুর উপায়ও ছিল না। কারণ বিহারী বাবু ভালোরূপেই জানতেন যে, এই সকল চোর-বদমায়েস-গুণ্ডাদের দ্বারা কোনও ভালো কাজ করাতে হলে তাদের মান অভিমান ও মেজাজ বুঝে তা করাতে হয়।

রহমনিয়া তার বাঞ্ছিতা স্ত্রীলোক নিয়ে রাত্রে এই বস্তীরই একটি ছোট মাঠকুঠরীতে বাস করতো। শ্যামা পাঞ্জাবীর নির্দ্দেশ মাত্র এক ব্যক্তি ছুটে গিয়ে তাকে তাদের নিকট ডেকে নিয়ে এলো। চোখ রগড়াতে রগড়াতে টলতে টলতে রহমনিয়া বিস্ফারিত চক্ষে ভৈরব বাবুর দিকে একবার চেয়ে দেখলো। বড়ো বড়ো বদমায়েস এবং তাদের সর্দ্দার ও ওস্তাদের সঙ্গে ভৈরব বাবু হামেশা কারবার করলেও ছোট-খাটো চোর-ছ্যাঁচোড়দের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ ভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন খুবই কম। শ্যামা পাঞ্জাবী তাকে

করণীয় কার্য্যটি ভালোরূপে বুঝিয়ে দিয়ে হুকুম করলো, বাবুসাহেবের একটা কাম হাঁসিল করিয়ে দিবি, এই ছোটখাটো কাম, তোরা যা করিস, বুঝ-অ।' 'বাবুসাহেবের মেহেরবাণী' সসম্ভ্রমে রহমনিয়া উত্তর করলো, 'হামিলোকভী মামুলি বদমাস নেহি আছে।'

রূপাগাছী অঞ্চলের প্রখ্যাত মেয়েমানুষের দালাল ভৈরব ঠাকুর এতোক্ষণ বিহারী বাবুর পাশে দাঁড়িয়ে এদের এবম্বিধ আলাপ-আলোচনা নিবিষ্ট মনে শুনে যাচ্ছিল। ভৈরব ঠাকুরের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে বিহারী বাবু বললেন, 'হামসে তোমরা কুছ্ কাম নেহি। তুম কাল ই বাবুকো সাথ ১৩ নং সিঙ্গিবাগানমে মোলাকাত করো। এই শুনো, বহুত ইনাম্ ভী মিলেগা।'

'বহুত খুব হুজুর' বলে রহমনিয়া স্থান ত্যাগ করলে ভৈরব ঠাকুর বিহারী বাবুকে বললো, 'আর একটা কাজ করলে হয়, হুজুর! হারান বাবুকেও একটা খবর দিলে আরও ভালো হয়। ওরা ছেলে পাকড়াও করে ভিখ মাঙানোর কারবার আজ-কাল খুব ভালো চালাচ্ছে। থানার নূতন বড় বাবুর শুনেছি একটা ছোটা লেড়কা আছে। বহুবাজার এলাকায় তার মামার বাড়ীতে সে মানুষ হচ্ছে, চুরি করে নিয়ে এলে হয় না তাকে? লোকজনদের দিয়ে রোজ দশটা চুরি কেস লেখানো শুরু করে দিয়েছি, ছেলের দিকে থানাদার বাবুর নজর দেবার একটুকু সময় নেই, এই তো সুযোগ।'

প্রখ্যাত গুণ্ডা সামসুদ্দিন সাহেব এতোক্ষণ নিবিষ্ট মনে তাদের কথাবার্ত্তা শুনছিল। ভৈরব ঠাকুরের শেষের প্রস্তাবটা তার কানে যাওয়া মাত্র সে কানে আঙুল দিয়ে বলে উঠলো, 'আরে তোবা তোবা! এ কেয়া বাত, এত্না ছোটা কাম করনেকোভী আদমী দুনিয়ামে হ্যায়?'

বিহারী বাবু থানা হতে সোজা বাড়ী ফিরে কয়েক জন জাল-ফরিয়াদীকে থানায় পাঠাবার বন্দোবস্ত করে এবং কয়েক জন পোষা গুণ্ডাকে কয়েক জন পথচারীকে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে চাকু মারবার নির্দ্দেশ দিয়ে বালক দত্ত লেনে অবস্থিত প্রকাণ্ড এই বস্তী-বাড়ীতে তিনি এসেছিলেন কয়েক জন অধিকতর দুর্দ্দান্ত গুণ্ডার সন্ধানে; কারণ, নরেন বাবুকে কিংবা প্রণব বাবুকে নিরীহ পথচারীর পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। তাদের শায়েস্তা করতে হলে বেপরোয়া সুদক্ষ গুণ্ডা বদমায়েসের প্রয়োজন আছে। মাঝ পথ হতে তিনি মেয়েমানষের দালাল বিঠ্‌লভাই কানুকেও তাঁর গাড়ীতে তুলে নিয়েছিলেন, যদি তাকেও কোনও কাযে প্রয়োজন হয়, এই ভেবে। প্রকৃত পক্ষে অপমানে, ক্ষোভে ও লজ্জায় এই দিন তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, নিদারুণ প্রতিশোধ না নেওয়া পর্য্যন্ত তাঁর শান্তি নেই, ঘুমও নেই। বালক দত্ত লেনের এই বস্তী-গ্রামটার মালিক ছিলেন বিহারীলাল বাবু নিজে, দুর্দ্দান্ত গুণ্ডা-সর্দ্দার শ্যামা পাঞ্জাবী ছিল এই বস্তী-গ্রামের ইজারাদার, বিহারী বাবুর পক্ষ হতে এই বস্তী-গ্রামের অধিবাসী অসংখ্য চোর, গুণ্ডা ও বদমায়েসদের নিকট হতে সে ভাড়া উঠায়। সে নিজেও বস্তীর মধ্যস্থলে অবস্থিত একটা দু'তলা মাঠকোঠায় সপরিবারে বসবাস করে। বিবিধরূপ অপকর্ম্মে তাঁরা সমব্যবসায়ী হলেও উভয়ের অপকর্ম্মের আদর্শ ছিল বিভিন্নরূপ।

শ্যামা পাঞ্জাবীকে আর অধিক না ঘাঁটিয়ে বিহারী বাবু ভাবছিলেন, এইবার তিনি দলবল সহ বাড়ী ফিরবেন, এমন সময় সকলকে সচকিত করে দিয়ে শ্যামা পাঞ্জাবীর মাঠকোঠার একটা বারান্দা হতে ঢং-ঢং করে বিপদসূচক পাগলা ঘণ্টা বেজে উঠলো। শ্যামা পাঞ্জাবী ঘণ্টাধ্বনি শুনা মাত্র একটা লাফ দিয়ে পিছিয়ে এসে জানিয়ে দিল, "হুসিয়ার ভাই সব, পুলিশ! কোকেন খবোর দিয়া কোউন?"

বিহারী বাবু এইরূপ পরিস্থিতির জন্ম কিছু মাত্রও প্রস্তুত ছিলেন না। পুনরায় বেইজ্জত হবার আশঙ্কায় তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁকে অভয় দিয়ে তাড়াতাড়ি কিষনিয়া বললে, "হুজুর হামি লোককো মা-বাপ। দু'মিনিটমে বিলকুল সব ঠিক কর দেঙ্গা, খোদাকো মার্জ্জিমে মাল-মশালা ইহিপর মজুত হ্যায়।"

কিষনিয়া মিথ্যা বলেনি। রাত্রে উৎসবের জন্ম তারা গোটা কয়েক গোড়ে ফুলের মালা, কয়েক রেকাবী মিঠাই, গোটা দুই গ্যাসলাইট এবং দু'টা বেতের সস্তা চেয়ার আড্ডাঘরে মজুত রেখেছিল, বোধ হয় নিষ্প্রয়োজনেই। বিহারী বাবুর আগমনে চোর-বদমায়েসদের নেশা এমনিই কিছুটা ছুটে গিয়েছিল, এখন পুলিশের আগমনের সংবাদে তাদের বাকি নেশাটুকুও ছুটে গিয়েছে। কিষ-নিয়ার নির্দ্দেশ মত তারা সম্মুখের প্রাঙ্গণে একটা জলচৌকী রেখে তার উপর খাবারের সরাগুলো সাজিয়ে ফেললে, তার সঙ্গে রঙ-বেরঙের কিছু তাজা ফুলও রেখে দিলে। এই জলচৌকীর দুই পাশে ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে এক দিকে রক্তচক্ষু নর এবং অপর দিকে নারীর দল ঝিমুতে ঝিমুতে বসে পড়লো। কিষনিয়া তাড়াতাড়ি বেতের চেয়ার দু'খানা সম্মুখ ভাগে পেতে দিয়ে বিহারী বাবু এবং শ্যামা পাঞ্জাবীকে উদ্দেশ করে বললো, "মজাসে বৈঠ যাইয়ে হুজুর, আভি বিলকুল ঠিক হো গয়া।" ইতিমধ্যে এদের একজন গ্যাসবাতী দু'টো জ্বালিয়ে দিয়ে সারা প্রাঙ্গণটা আলোকিত করে দিয়েছে, দুই-এক জন তবলা যোগে ভজন-গানও সুরু করে দিয়েছে। সকল করণীয় কার্য্য নিখুঁত ভাবে শেষ করে কিষনিয়া একটি মোটা গোড়ের মালা বিহারী বাবুর গলায় এবং অনুরূপ অপর একটি ফুলের মালা শ্যামা পাঞ্জাবীর গলায় সযত্নে পারিয়ে দিয়ে, নিজে তাদের পায়ের নীচে বসে পড়লো।

এদিকে কিন্তু অদূরের মাঠকোঠা হতে পাগলা ঘণ্টা তখনও পর্য্যন্ত বেজেই চলেছে, দু-একটা চোরাই মাল এর-ওর ঘরে যা মজুত ছিল, তা ইতিমধ্যে এখানে-ওখানে সরে গিয়েছে, এমন সময় দেখা গেল পুলিশের চার-পাঁচটি দল বস্তীর চতুর্দ্দিকে ঘিরে সঙ্কীর্ণ পথ বেয়ে টর্চ্চলাইটের আলোকপাত করতে করতে উপরোক্ত হুল্লোড়-ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে। পাগলা ঘণ্টা থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, নরেন বাবুর নেতৃত্বে পুলিশের প্রথম দলটি বিহারী বাবু এবং শ্যামা পাঞ্জাবীর পিছনে এসে দাঁড়ালো। ইতিমধ্যে প্রণব বাবু এবং অপরাপর অফিসারদের নেতৃত্বে পুলিশের অপর দলগুলিও অকুস্থলে পৌঁছিয়ে গিয়েছে।

চতুর্দ্দিক রক্ষিবেষ্টিত বিহারী বাবুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নরেন বাবু উপস্থিত ব্যক্তিদের ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কৌউন আদমী ঘণ্টা বাজানে শুরু দিয়ে থে?" উপস্থিত বদমায়েসদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি জলচৌকীর তলা হতে একটা পূজার ঘণ্টা বার করে তা বাজাতে বাজাতে নরেন বাবুর দিকে কিছুটা এগিয়ে এসে বললে, "হামিলোক বাবুসাব। দেখতা নেহি, পূজা হোতে থি।"

ঘণ্টাবাদকের উত্তরে বিরক্ত হয়ে নরেন বাবু ধমকে উঠে

বললেন, "চোপরাও বদমায়েস।" উত্তরে ঘণ্টাবাদক বলে উঠলো, "গালি মাত্ দিয়ে বাবুসাব। হামরা চোর-বদমায়েস থোড়াই আছে। হামিলোক সবকই পুছিছি লোক আছে। পুছিয়ে না হামলোককো জমীদার সাবকো, উনি তো ঐহিপর খুদ মজুত হ্যায়।" খিঁচিয়ে উঠে নরেন বাবু উত্তর করলেন, "উ তো দেখতা হ্যায়। লেকেন কাহে আজে হিঁয়া আয়া হ্যায়। উনকো হিঁয়াপর আনেকো মতলব কেয়া ?"

"যা বলবার তা সোজাসুজি আমাকে বলুন, নরেন বাবু!" গম্ভীর ভাবে বিহারী বাবু উত্তর করলেন, "ওরা হচ্ছে আমার প্রজা। পালে-পার্ব্বণে নেমন্তন্ন করলে আসতে হয়। আপনারা সকল মানুষকে মানুষ না মনে করতে পারেন, কিন্তু মনে রাখবেন সমাজে বহু স্তর আছে। মানুষ সমাজের যে স্তরেই থাকুক না কেন, সে-ও মানুষ। তারা আপন-আপন সভ্যতার মাপকাঠি আঁকড়ে ধরে আপন-আপন ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী বেঁচে থাকে। এ ছাড়া আমার প্রজাদের সামনে আমাকে অপমান করবার আপনার কোনও অধিকার নেই। আপনারা জুতা পরে পূজা-প্রাঙ্গণে এসেছেন ; আমি আপনাদের নামে কমপ্লেন করবো।"

নরেন বাবু ছিলেন একজন পুরানো জাঁদরেল অফসার, জীবনে তিনি অনেক চোট খেয়েছেন, এইরূপ পরিস্থিতিতে তিনি ভয় পাবার পাত্র ছিলেন না। তীক্ষ্ণ শ্যেনদৃষ্টিতে উপস্থিত নরনারীর মুখাবয়ব দেখে নিয়ে তিনি বিহারী বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি তাহলে বলতে চান, এরা সকলে সাধু ব্যক্তি, এদের মধ্যে কেউ-ই চোর-বদমায়েস নেই ?"

"এদের মধ্যে চোর-বদমায়েস কেউ আছে কি না," বিহারী বাবু উত্তর করলেন, "তা জানবার ও জানাবার দায়িত্ব আপনাদের, আমার নয়। তবে এখোন এখানে যা কিছু হচ্ছে তা পূজার ব্যাপার। এইরূপ বাজে হামলা বা জুলুম অন্ততঃ আমি সহ্য করবো না! আপনাদের কর্ত্তৃপক্ষ আমার নালিশ না শুনেন তো আমি আদালতে যাবো।"

"আদালতে আপনি এমনেও যাবেন," উত্তরে নরেন বাবু বললেন, "আমার নাম নরেন মুখুয্যে, ভয় পাবার ছেলে আমি নই। তবে আপনারা কয়জন মাতব্বর ব্যক্তি আপাততঃ এখান থেকে যেতে পারেন এবং এতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। আমরা পাকা খবর নিয়ে তবে এখানে এসেছি, বুঝলেন ?" এর পর প্রণব বাবুকে উদ্দেশ করে নরেন বাবু হুকুম করলেন, "নো কারদার আরগুমেণ্ট প্রণব বাবু! বৃথা তর্ক-বিতর্ক করার আর কোনও প্রয়োজন নেই। ডাকুন সব কয়জন সিপাহীকে, এদের সব কয়জনকে বেঁধে একে একে কয়েদী-গাড়ীতে ওঠাতে বলুন।"

নরেন বাবুর হুকুম পাওয়া মাত্র সিপাহী-সান্ত্রির দল প্রণব বাবুর তত্ত্বাবধনে বিহারী বাবুর দলের কয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে বাকি সব কয়জন নরনারীকে ধমক দিয়ে একে একে প্রাঙ্গণের উপর দাঁড় করিয়ে দিলে। নরেন বাবু নিজে এগিয়ে এসে তাঁর হাতের ছড়ির ঘায়ে তথাকথিত পূজার জলচৌকীটাকে উল্টিয়ে দিয়ে একজন সিপাহীকে হুকুম করলেন, "কেয়া দেখতা হ্যায়, উঠাও সব চিজ। কোহি চিজ ইঁহা পর ছোড়কে নেহি যায়গা।" বিহারী বাবুর চক্ষের সম্মুখে পুলিসের দল উপস্থিত নরনারীদের সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে মেষপালের মত তাড়িয়ে তাড়িয়ে বস্তীর বাইরে বড় রাস্তার উপর রাখা কয়েদী-গাড়ীর দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বিহারী বাবু এবং তাঁর সাকরেদগণ এজন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। সহসা নরেন বাবু এবং তাঁর সান্ত্রিদলকে বাধা দেওয়া কেহই সমীচীন মনে করেন নেই। রুদ্ধ আক্রোশে ফুলতে ফুলতে বিহারীলাল বাবু সহকারীদের উদ্দেশ করে বললেন, 'ঠিক হ্যায়। হামলোক ভি দেখ লেঙ্গে।"

সারা থানা সরগরম করে প্রায় ৪০ জন অপরাধী নরনারী সহ সান্ত্রিদল ক্লান্ত দেহে যখন থানায় ফিরলো তখন থানার ঘড়ীতে প্রায় দু'টা বেজে গিয়েছে। অফসারদের মধ্যে কেউ কেউ এইরূপ অভাবনীয় সাফল্যের জন্য খুবই খুশী, কেউ কেউ ভাবছিলেন এই ব্যাপারে গোলমাল না বাঁধে। তবে এই রেইড্ সম্পর্কে যা-কিছু দায়িত্ব তা বড়বাবুর, অপর কাউর এতে কোনও দুশ্চিন্তাই নেই।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে নরেন বাবু অফিস-ঘরে এসে প্রণব বাবুকে বললেন, "অন্ততঃ বিশ জন এদের মধ্যে দাগী পুরানো চোর বার হবে। এ আমার ধ্রুব বিশ্বাস প্রণব বাবু! আর মেয়েগুলো তো দেখাই যাচ্ছে, বেশ্যা মেয়ে।"

"আমারও তাই মনে হয়, স্যার!" উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "দেখা যাক, টিপের কাগজে কি আছে। অন্ততঃ জনকতক দাগী চোর না বেরুলে, স্যার, আমাদের সকলকেই বিপদে পড়তে হবে। বিহারী বাবু তা'হলে আমাদের সহজে ছাড়বে না।"

"হুঁ" নরেন বাবু উত্তর করলেন, 'কিচ্ছু ঘাবড়ো না। পরের কথা পরে ভাবা যাবে। এখোন এদের নামে একটা করে কেস লেখবার বন্দোবস্ত করে উপরে চলে যাও। বিহারী বাবুর ভার আমার উপর রইলো। জানো তো আমার স্ত্রীর কয়দিন খুউব বেশী অসুখ। অনেকক্ষণ হলো বেরিয়েছি, এখোন উঠি আমি। তুমি মুন্সী বাবুদের কাযগুলো বুঝিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি উপরে চলে এসো। অন্যান্য অফসারদেরও ছেড়ে দাও, তাদের এখোনকার মত আর কোনও কায নেই, বুঝলে!"

আজিকার রাত্রির এই রেইডে নরেন বাবু এবং প্রণব বাবুর সহিত থানার থার্ড অফসার সুধীর বাবু, ফোর্থ অফসার রহমন সাহেব এবং ফিফথ্ অফসার বীরেন বাবুও ছিলেন। নরেন বাবু উপরে উঠে গেলে সুধীর বাবু তাঁর ক্লান্ত দেহটা একখানা চেয়ারের উপর গড়িয়ে দিয়ে বললেন, "বাবাঃ বাঁচা গেল। এতোক্ষণে একটু কথাবার্ত্তা কওয়া যাবে। ওঁর মতে প্রণবদা ছাড়া যেন আর কোনও অফসারই নেই। চব্বিশ ঘণ্টা খেঁক্ খেঁক্ খেঁক্, ভালো লাগে ভাই ?" উত্তরে বীরেন বাবু বললেন, "কিন্তু প্রণবদা ছাড়া কাউকে তো ওঁকে কন্ট্রোল করতে দেখলাম না। প্রণবদা আছেন তাই রক্ষে আর কেউ ওঁকে সামলাতে পারবে ? না ভাই প্রণবদা, আমরা তোমার উপর খুউব খুশী।" আসামীদের নাম-গুলো একটা কাগজে লিখতে লিখতে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, "খুউব হয়েছে, আরও কিছু বলবে ?" উত্তরে রহমন সাহেব জানালেন, "ধীরেন ও সুধীরের যে বৌ আছে তা খেয়াল আছে ? কতোক্ষণ ওদের আটকে রাখবে ?" অপ্রস্তুত হয়ে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, "তা সত্যি ভাই, তোমরা উপরে যাও। বড়বাবুর হুকুম

তো পেয়েছোই, আর কেন ? আর তুমি রহমন সাহেবও, তুমিও উঠে পড়ো, আর কেন ? সাদী না হয় এখনোও হয়নি, কিন্তু বিবিসাহেবা কে হবেন, তা যখন আগে থেকেই ঠিক আছে, তখন বিছানায় শুয়ে তাঁর কথা একটু ভাবাও তো দরকার ! যাও, যাও, দেরী কেন ? তোমাদের জন্ত অন্ততঃ কিছুটা স্বার্থ আমি ত্যাগ করতে সদা প্রস্তুত।"

সুধীর বাবু, ধীরেন বাবু এবং রহমন সাহেব অনেকক্ষণ হলো কাযকর্ম্ম শেষ করে আপন-আপন কোয়ার্টারে উঠে গিয়েছেন। প্রণব বাবু তাঁর কাযকর্ম্ম শেষ করে তখনও পর্য্যন্ত তাঁর নির্দ্দিষ্ট চেয়ারটায় বসে ঝিমোচ্ছিলেন, উঠি-উঠি করেও তিনি যেন উঠতে পারছিলেন না। ঢং-ঢং করে থানার ঘড়ীতে চারটে বেজে গেল, অকারণে আর আফিস-ঘরে বসে থাকা চলে না। এইবার যে তাঁকে উঠে পড়তেই হবে, কিন্তু কোথায়, কিসের আকর্ষণে তিনি উঠে যাবেন ! একমাত্র শয়নের জন্ত বিছানো বিছানা ছাড়া কোয়ার্টারে এমন কোনও বস্তু বা ব্যক্তি নেই যে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবে। প্রণব বাবু ঘুমচোখে টলতে টলতে উপরে এসে দেওয়াল হাতড়ে সুইচ খুঁজে বিজলী বাতিটা জালিয়ে দিলেন এবং তার পর ইউনিফর্ম ছেড়ে কোনও রকমে তু'মুঠো খেয়ে নিলেন। ভৃত্য ভিখুরাম ভাতের থালি টেবিলে সাজিয়ে রেখে মনিবের জন্ত বহুক্ষণ বৃথাই অপেক্ষা করে তার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে এসে শুয়ে পড়েছিল, ঘুমিয়েও। তাকে এতো রাত্রে ডেকে তোলা সুশোভন নয়, অন্যায়ও বটে। ক্লান্ত দেহটা বিছানাটার উপর এলিয়ে দিয়ে প্রণব বাবু লক্ষ্য করলেন, শয়ন-কক্ষের বিজলী বাতিটা না নিবিয়েই তিনি শয্যাশায়ী হয়েছেন। উজ্জ্বল বিজলী বাতীর তীব্র আলো চোখের উপর পড়ে বারে বারে তাঁকে বিব্রত করছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিছানা ছেড়ে উঠে পড়বার যেন তাঁর আর শক্তি নেই, তাঁর দেহের প্রতিটি পেশীর মাংস কে যেন ভিতর হতে টেনে ধরছে। প্রণব বাবুর বারে বারে মনে হচ্ছিল, সুধীর এবং ধীরেন বাবুর মতন তাঁরও যদি একটা বৌ থাকতো, তাহলে সে অন্ততঃ একবার উঠে আলোটা নিবিয়ে দিতে পারতো। উন্মুক্ত জানালার পথে জ্যোৎস্নার আলো পাশের সাদা পাশ-বালিশটা আরও সাদা করে তুলছিল। ধীরে ধীরে পাশ-বালিশটা প্রণব বাবু কোলের কাছে টেনে নিয়ে তারকা-খচিত আকাশের মাঝখানে অধিষ্ঠিত চন্দ্রিমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। হালকা ছোট ছোট মেঘের উপর দিয়ে প্রকাণ্ড একটা চাঁদ যেন ভেসে চলেছে, এক্ষুনি বুঝি তা প্রণব বাবুর দৃষ্টির বহির্ভূত হয়ে যাবে। প্রণব বাবুর ইচ্ছা করছিল, এই সুন্দর দৃশ্য এক্ষুনি কাউকে ডেকে দেখিয়ে দেন, কিন্তু এতো রাত্রে কে তাঁর ডাকে সাড়া দেবে ? প্রণব বাবুর মনে পড়লো তাঁর কৈশোর জীবনের কথা, শীতের রাত্রে উপুড় হয়ে শুয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে যখন তিনি পড়তে বসতেন, তখন লেপ হতে হাত বার করা মাত্র শীতে তা কন্-কন্ করে উঠতো, প্রণব বাবুর ঐ সময় প্রায়ই মনে হতো, একটা যদি ছোট বৌ থাকতো তাহলে সে এইখানে বসে প্রয়োজন মত একটি একটি করে বইএর পাতা উল্টে দিতো, তাঁকে আর তাহলে লেপ হতে মাঝে মাঝে হাত বার করতে হতো না। আজ যৌবনের প্রারম্ভে নিশীথ রাত্রে প্রণব বাবুর যেন অনুরূপ একটি বৌএর প্রয়োজন হচ্ছিল অন্ততঃ শয়ন-ঘরের আলোটা নিবিয়ে দেবার জন্তে। প্রণব বাবুর ইচ্ছা হচ্ছিল, বালিশের তলা হতে পিস্তলটা বার করে ইলেকট্রিকের বাল্‌বটা এক গুলীতে উড়িয়ে দেবেন ; আত্মসংবরণ করে প্রণব বাবু মনস্থ করলেন, তিনি উঠে পড়ে আলোর সুইচটা নিবিয়ে দেবেন, কিন্তু উঠি-উঠি করে কখোন যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তা তাঁর খেয়াল ছিল না।

ভোরের দিকে বোধ হয় তাঁর একটু শীত-শীতও করছিল, তাই নিজের অজ্ঞাতেই তিনি বিছানায় অপর পাশে রাখা র‍্যাগটা টেনে নিয়ে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন। সহসা এক সময় প্রণব বাবু অনুভব করলেন, কে যেন তার বিছানার এক পাশে ব'সে মাথা হতে র‍্যাগটা তুই হাতে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। ঘুমন্ত অবস্থাতেই আগন্তুকের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে পুনরায় তিনি র‍্যাগটা জোর করে মুখের উপর টেনে নিলেন, কিন্তু আগন্তুকও নাছোড়বান্দা, র‍্যাগটা সে টেনে খুলে দেবেই। কিন্তু কে সে ? বৌ ? কিন্তু বিয়ে তো প্রণব বাবু এখনও করেননি। তবে কে এ, কোনও অশরীরী পরী-না কি ? ঘুমন্ত অবস্থাতেই বিরক্ত হয়ে প্রণব বাবু তাঁর ডান হাতখানা বার ক'রে আগন্তুকের হাতখানি চেপে ধরতেই তাঁর হাতে ঠেকলো কয়েকগাছা পাতলা সোনার চুড়ী।

'এঁ্যা, কে রে ?' বলে ধড়মড় করে র‍্যাগ সহ উঠে বসে প্রণব বাবু দেখতে পেলেন, একজন সুবেশা অল্পবয়স্কা নারী তাঁর খাটের উপর বসে রয়েছে। মোটা র‍্যাগটা প্রণব বাবুর মাথার উপর সজোরে চেপে ধরে মেয়েটি কলহাস্তে বলে উঠলো, 'খুউব, খুউব বাবা ! সকাল পর্য্যন্ত ঘুম হচ্ছে মুড়ি দিয়ে, দেবো র‍্যাগটা আরও চেপে ? মুখ হতে র‍্যাগটা জোর করে স'রিয়ে দিয়ে খাট হতে নেমে দাঁড়িয়ে প্রণব বাবু বিস্মিত হয়ে দেখলেন, একজন সুবেশা অপরিচিতা নারী তাঁরই খাটের উপর বসে পা তুলাচ্ছে। প্রণব বাবুকে চোখ মেলে চেয়ে দেখে মেয়েটিও কম আশ্চর্য্য হয়নি, অপ্রস্তুত হয়ে মেয়েটিও তাড়াতাড়ি বিছানা হতে নেমে মেঝের উপর দাঁড়ালো। এর পর ভয়ে লজ্জায় অতিষ্ঠ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে মেয়েটি বললে, 'ওঃ আপনি ! আমি, আমি মনে করেছিলাম ?······আচ্ছা, তিনি ! তিনি কোথায় ?'

'কা'কে খুঁজতে এসেছেন এখানে ? সত্য করে বলুন,' সন্দিগ্ধ ভাবে প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'নিশ্চয়ই আপনাকে ভৈরব বাবু পাঠিয়েছে ?' দেওয়ালের দিকে আরও কিছুটা পিছিয়ে এসে মেয়েটি কাঁদ-কাঁদ স্বরে জানালো, 'ভৈরব বাবুকে তো চিনি না। আমি সুরেন্দ্র বাবুকে খুঁজতে এসেছিলাম, সত্যি বলছি বিশ্বাস করুন। আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে যেতে দিন।'

[ক্রমশঃ।

"শত্রু সৃষ্টি করা শক্তিরই লক্ষণ—বিশ্ববিধাতারও শত্রুর অভাব নাই।"

—রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞ মা

শ্রীনির্ম্মলেন্দু ভট্টাচার্য্য

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের জনসাধারণের সঙ্গেই ব্রহ্মজ্ঞ মার পরিচয় অল্প। তিনি বলতেন, "মানুষ যদি নিজের রুচি ও বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করে ভগবানকে পাওয়ার স্বাধীন পথ বেছে নেয়, তাহলে সাধকের পক্ষে সাধনা আরোও বেশী ফল দিয়ে থাকে।" যদিও সমাজের রীতি-নীতিকে অনর্থক আক্রমণ করতেন না এবং সাধারণের পক্ষে পূজো-আর্চ্চার দরকার আছে মানতেন, সব সময় সত্যের সন্ধানে বিচারশীল মন নিয়ে চলার ওপরই তিনি বেশী জোর দিতেন। এমন কি, দীক্ষা নেওয়ার ফলে মনের স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ গতিতে বাধা পড়বার কোন সম্ভাবনা থাকলে তাও তাঁর মোটেই পছন্দসই ছিল না।

পূর্ব পাকিস্তানের ত্রিপুরা জেলার বিতারা গ্রামে শ্রীঅভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী ও তাঁর স্ত্রী শ্যামাসুন্দরী ঘরকন্না করছিলেন। নিষ্ঠাবান্ অভয়াচরণকে শুধু কাছের ও আশে-পাশেরই নয়, দূরেরও লোকজন শ্রদ্ধা-ভক্তি করত প্রচুর এবং অকুণ্ঠিত ভাবে। পেট চলার জন্যে বাপ-পিতামহের জমিজমা আর যজমানদের একটু দেখাশোনা ছাড়া প্রায় সবটুকু সময়ই তাঁর কেটে যেত ভগবানকে ডাকতে। আবার কোন লোক বাড়ীতে এলে তাদের খাওয়ান-দাওয়ান ও যথাসাধ্য পরের উপকার করা, এরও বিরাম তাঁর ছিল না। ধর্মলাভের উদ্দেশ্যে বহু তীর্থও তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। আর শ্যামাসুন্দরী ছিলেন, যেমন হয়ে থাকে, 'বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ', পাড়াগাঁয়ের সরলা, স্নিগ্ধা, বিনম্রা নারী। পতির মুখের দিকে চেয়ে তাঁরই সংসারকে, পরিজনকে, পাড়াপড়শীকে আপনার মনে করে সারা দিন সকল কাজ করে বেড়ান। এমনই এক পরিবারে বাংলা ১২৮৬র ১ই ফাল্গুন যিনি এসে হাজির হলেন তাঁর নাম কাদম্বিনী। কাদম্বিনীরা পাঁচ ভাই, চার বোন। সব সময় বাপের কাছে কাছে থাকতেন, তাই মনে হত তাঁকেই অভয়াচরণ বেশী ভালবাসেন। এঁরা ছিলেন শাক্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক। বাপ-মায়ের আদরের সঙ্গে সঙ্গে আরো দুজনের স্নেহের অকৃপণ ধারায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন কাদম্বিনী। একজন তাঁর এক কাকা, আর একজন তাঁর পিসতুত ভাই শ্রীঅনঙ্গমোহন ভট্টাচার্য্য। যাতে তিনি স্বাধীন ভাবে নিজের পথে চলতে পারেন, এর জন্যে অনঙ্গ মোহন যথেষ্ট চেষ্টা করতেন। এ ছাড়া পাড়াপড়শীদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে কাদম্বিনীর খুব দহরম-মহরম ছিল, তাঁদের একজন হলেন প্রতিবেশিনী কায়স্থ স্ত্রীলোক, আর একজন অন্নদা নামে বামুনের মেয়ে। ছোট-বেলায় খেলাধূলো বড় একটা করতেন না, দেখতেই ভালবাসতেন। আবার খেলতে থাকলেও খেলার মাঝে হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে চলে যেতেন। জিগ্যেস করলে বলতেন যে, তাঁর ভাল লাগছে না। খেলনা, কাপড়-চোপড় বা খাওয়া-দাওয়া পেলে ছোট ছেলেমেয়েদের খুব আহ্লাদ হয়, কাদম্বিনীর কিন্তু তেমন কিছু হত না। কোন স্পৃহা আছে বলেই মনে হত না। ভাল খাওয়া-পরার কথা শুনলে মহা বিরক্তি বোধ করতেন, এ বহু বারই দেখা গিয়েছে। আর ওসবে পছন্দ বলে কিছু তাঁর ছিল না। সাদা কাপড় চাওয়ায় একবার অলক্ষুণে বলে থামকা বকুনিও খেতে হয়েছিল।

শ্মশানে মড়া পোড়ান হচ্ছে দেখে এঁর মনে কি রকম প্রশ্ন জেগেছিল, তা নীচের কথোপকথন থেকে বোঝা যাবে।

কাদম্বিনী। এখানে কি হচ্ছে ?

অভয়াচরণ। একজন মারা গেছে, তাকে পোড়ান হচ্ছে।

কাদম্বিনী। মরে গেল কই ?

অভয়াচরণ। সে ত জানি না।

কাদম্বিনী। সকলে মরবে কি ? আমিও কি মরব ? আপনিও মরবেন, মাও মরবেন ? সকলকেই পোড়াবে ?

অভয়াচরণ। হ্যাঁ, সকলেই মরবে এবং সকলকেই পোড়াবে।

কাদম্বিনী। কবে কে মরবে ?

অভয়াচরণ। তার ত কিছুই ঠিক নেই। এখনই মৃত্যু আসতে পারে।

তখন খুব অল্প বয়েস, সাত কি আট। শোনা যায়, মড়া এবং মড়া পোড়ান দেখে তাঁর মনে গভীর চিন্তা উপস্থিত হয় এবং তাঁর সমগ্র জীবনের ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। সাথীদের এই সময়ে বলতেন, "চল রে আমরা মড়া মড়া খেলি।"

সবটারই মূল কারণ অনুসন্ধান করা তাঁর প্রকৃতিগত ছিল। হয়ত ভীষণ ঝড় উঠেছে, বাড়ীঘর কাঁপছে। ভয় লাগছে। কেন লাগছে এবং কি করে না লেগে পারে ভাবতে লাগলেন।

ছেলেবেলায় স্কুলে যখন পড়তেন, জানা গেছে তাঁর স্মৃতিশক্তি এক আশ্চর্য্য ধরণের ছিল। যে ক'বছর পড়েছিলেন স্মৃতিশক্তির যথেষ্ট পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন এবং প্রতি বছরই প্রথম হতেন।

সে সময়ের পাড়াগাঁয়ের সাধারণ নিয়ম অনুসারে ন' বছরে পা দিতেই বাপ-মা বিয়ে দিয়ে দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বিয়েতে তিনি নাকি আপত্তি করেছিলেন; কিন্তু এত অল্প বয়সের মেয়ে, সে বোঝেই বা কি, তার মতামতের মূল্যই বা কি ?

আপত্তির কথা কানে তোলা কেউ দরকারই মনে করেনি। সঙ্গিনীদের সে সময় তিনি বলেছিলেন, বিয়ের কথা শুনেই তাঁর ভয় লাগে, বিয়ে তাঁর দরকার নেই। তবে সমাজের নিয়ম অনুসারে একান্তই যদি হয়, তবে বৈধব্যটা তাড়াতাড়ি আসুক, এই তাঁর ইচ্ছে। এই কথা শুনে বাপ-মা প্রভৃতি অভিভাবকেরা যে তাঁর ওপর যারপরনাই রেগে গিয়ে তিরস্কার করেছিলেন, তা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে।

বিয়ে যথাসময়ে হয়ে গেল। অল্প বয়স। তাই বিয়ের পর ক'বছর বাপের কাছেই কাটল। স্বামী তখন চাঁদপুরে চাকরি করছেন। এক-আধ বার স্বামীর কাছে যে না এসেছেন তা নয়। কিন্তু স্বামীকে দেখলেই যেন ভীষণ ভয় পেয়েছেন এই ভাবে চীৎকার করতেন। কালের দৃষ্টিতে এই করছে মনে করে তাঁকে তাই পৃথকই রাখা হত। কেউ উপদেশ দিত, এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করবার দরকার নেই, বয়েস হলে কমে যাবে। কাজেই স্বামীর সঙ্গে একসাথে থাকা আর হয়নি। এগার বছর বয়েসের সময় একদিন খবর এল স্বামী চাঁদপুরে কলেরায় মারা গেছেন। সকলে কান্নাকাটি করছে। কিন্তু কাদম্বিনী কাঁদছেন না। তিনি নাকি এ সংবাদে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

বিধবা হয়ে কাদম্বিনী বরাবর বাপের বাড়ীতে বসবাস করতে লাগলেন। অবশ্য কখনো সখনো শ্বশুরবাড়ী পুটিয়ায় গিয়েও থাকতেন। এই সময়ে ইনি দীক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি বলেছেন সামাজিক রীতি-নীতির বিরুদ্ধে যেতে চান্‌নি বলেই দীক্ষা নিয়েছিলেন। কিন্তু এর দ্বারা তাঁর মনে কোন কাজ হয়নি। আর এর নিয়ম ধরে সাধন-ভজনও তিনি করেননি। পরবর্তীকালে অনুষ্ঠান করে দীক্ষা দিতেও তাঁকে কেউ কোন দিন দেখেনি। ধর্মের কোন অনুষ্ঠান করতে তাঁকে দেখতে পাওয়া যেত না। কি করে ধর্ম পাওয়া যায় জিগ্যেস করলে স্বাধীন ভাবের অনুশীলন করতেই বলতেন।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সহজে হজম হয় এ রকম সাত্ত্বিক আহার পছন্দ করতেন। মাংস বা মাছ ছেলেবেলা থেকেই খেতেন না। তবে আমিষ আহারীদের আক্রমণ করেও কিছু বলতেন না।

কুড়ি বছর বয়েস থেকে তাঁর বৈরাগ্য প্রবল ভাবে বেড়ে চলল। রাতের বেলা কাছাকাছি এক ফুলবাগানে গিয়ে ধ্যানে বসতেন, কখনো শ্মশানে ঘুরতেন। নিশীথ রাতের নীরবতা তাঁর খুব প্রিয় ছিল। অনেক সময়েই বলতেন, "রাত্রিবেলা আত্মচিন্তার উৎকৃষ্ট সময়; এমন সুন্দর নিস্তব্ধ রাত্রিবেলা মানুষ শুধু ঘুমিয়ে কাটায়, এ বড় আপশোষের কথা।" চিরদিনই রাতে ঘুম বড় কম। তাই সকালে উঠতে বেশ একটু বেলা হয়ে যেত। ক্রমে কাজকর্মে একটা অনিচ্ছা ও বিরক্তি ভাব আসতে লাগল। পাড়ার বিষ্ণুমন্দির বা ঘরের কোণই কেবল খুঁজতেন। পারিবারিক বা সামাজিক উৎসবাদির সময় লোকজনের কাছ থেকে সরে পড়ে নিভৃতে গিয়ে থাকতেন, সঙ্গে হয়ত বাছা বাছা দু'-এক জন সঙ্গিনী! তার ফলে নানা কথার আর বিরাম ছিল না। কেউ বলত কাজ করতে চায় না, কেউ বলত কুণো, কেউ বা লাজুক, আবার কেউ অলক্ষ্মী, ভুতে পেয়েছে—কত কথাই না সইতে হত! কিন্তু নিজের ইচ্ছে ছাড়া এক কণা কাজও ইনি করতেন না বা এঁকে দিয়ে কেউ করাতে পারত না। সাংসারিক সকল ব্যাপারে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর উদাসীনতায় লোকে যে মন্তব্য করত, তার সম্বন্ধে তিনি কখন কখন বলেছিলেন, "বিষয়াসক্ত লোক উদাসীনতার মর্ম কিছুতেই বুঝতে পারে না। তারা ভাবে যে উদাসী লোক ভবঘুরে লোকের মত অলস ও অকর্মা। কিন্তু মনকে বিষয়-বাসনা থেকে শূন্য না করতে পারলে উদাসীন ভাব উপস্থিত হয় না।"

লোকের সঙ্গে বড় একটা না মেশার ফলে তাঁর বৈশিষ্ট্য লোকের অজানাই রয়ে গেল। তাঁর জীবনের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে যদি কেউ তাঁকে কিছু প্রশ্ন করত, তাহলে তিনি বেশ বিরক্তি প্রকাশ করতেন। বলতেন, "জ্ঞানলাভের জন্যে তৃষ্ণা আর বিচারশীল মন না থাকায় লোকে অলৌকিকত্বের ওপর ঝুঁকে পড়ে। অলৌকিক শক্তি দেখিয়েছেন এ রকম কারো কথা শুনলে দুঃখ করে বলতেন, "অবিচারে দেশটা গেল।"

যদিও সাধারণতঃ ঠাট্টা-তামাসা বা রঙ্গ-রস পছন্দ করতেন না এবং স্বল্পভাষী ছিলেন, অনেক সময় রীতিমত রসিকতা করতেও তাঁকে দেখতে পাওয়া যেত। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্তদের মধ্যে 'অন্তরঙ্গ' ও 'বহিরঙ্গ' কথা শুনে একদিন পরিহাস করতে করতে বলেছিলেন, "তোরা ত কস (বলিস্) অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ, আমি দেখি সবই জলতরঙ্গ (অর্থাৎ ব্রহ্মসাগরের ঢেউ)!" কোন কথা শুনে হয়ত হাসতে লাগলেন, এবং তা চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমন কাণ্ড! কারও নিন্দে কখনও কেউ তাঁকে করতে শোনেনি। তবে কারও স্বভাবের কোন বৈশিষ্ট্যকে উপলক্ষ করে বিশুদ্ধ হাস্যরস অনেক সময় পরিবেশন করতেন। আবার হয়ত একটু পরেই এমন গম্ভীর হয়ে পড়লেন যে, মানুষটির সঙ্গে কেউ আর কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না।

যত দূর জানা যায়, কাদম্বিনী সূক্ষ্ম কাজে বড় নিপুণা ছিলেন। চিত্রবিদ্যায়ও বেশ হাত ছিল। তাছাড়া রান্নাবান্না, বখন

শ্রীশ্রী[illegible] মা

রাঁধতেন, সুস্বাদু হওয়ার খ্যাতি ছিল। সব চেয়ে বেশী অনুরাগ দেখা যেত গানের ওপর। গ্রামের শূন্য ভিটে বা শ্মশানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। আর তত্ত্ববিষয়ক গান সংগ্রহ করে বা রচনা করে গাইতেন। নিজে ইচ্ছে করে বই পড়ে জ্ঞানলাভের স্পৃহা তাঁর মধ্যে বড় একটা কেউ দেখেনি। হাতের কাছে ধর্ম সম্বন্ধে বই পেলে না পড়তেন তা নয়, তবে প্রধানতঃ তা চিত্তবিনোদনের জন্যে, এ কথা শুনেছি। পিসতুত ভাই অনঙ্গমোহন অনেক সময় এই রকম বই এনে দিতেন। তাঁর সঙ্গে কাদম্বিনী বই সম্বন্ধে আলোচনাও করতেন।

সাপে কামড়ায়নি, তবু সাপে কামড়ালে যেমন হয় তেমন ভাবেই একবার অচেতন হয়ে পড়লেন। ক'দিন পরে আবার 'সাপ, সাপ' করতে আরম্ভ করেন। সাপের সঙ্গে দেখা নেই, অথচ গায়ে সাপের কামড়ের রক্তপাত! আর একদিনও এমন হল। লোকে বললে, মনসা দেবী ভর করেছে। সাপের কামড় সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন করলে উত্তর দিতেন না। দিলে ওসব ঘটনা মিথ্যে বলতেন। আর সেই সঙ্গে বৃথা ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের চর্চ্চা করতে অনুরোধ জানাতেন। এখন থেকে লোকে ভয়ও করত, ভক্তিও করত। ফলে নির্জ্জনে স্বাধীন ভাবে থাকবার সুযোগ তিনি পেলেন। একটা আলাদা ঘরে একলা থাকার বন্দোবস্তও তাঁর করে দেওয়া হল। খাওয়া-দাওয়ারও ব্যবস্থা আলাদা।

ব্রহ্মজ্ঞ মা বলে পরিচিতা এই মহিলাটির জীবনের অন্যান্য নানা ঘটনার মতই এই নতুন নামকরণ কবে থেকে হয়েছে এবং কে করেছিলেন ঠিক মত জানতে পারা যায় না।

একবার ব্রহ্মজ্ঞ মা কলকাতায় এসেছিলেন। সে সময় বলরাম বসুর বাগবাজারের দোতালা বাড়ীতে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে দেখা হয়। স্বামীজী বাড়ীর লোকজনদের ডেকে বললেন, "ইনি একজন খুব উচ্চ সাধু।" মায়ের ভক্তদের বলেছিলেন, "এঁর শরীরের যত্ন নেবেন, নইলে শরীর টিকবে না।"

আর এক সময় বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। স্বামীজী বলেছিলেন, "মা, স্বামীজীর (বিবেকানন্দের) আদেশে মঠের দায়িত্ব নিয়ে আছি। আমার অনেক বন্ধন। কই মন ত এখনও সমাধির রসে মজল না?"

রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য ও ভক্তদের দেখে তিনি অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "ঠাকুর পরমহংসদেবের সম্প্রদায়ের এই বিশিষ্টতা যে, এখানে খাঁটী সত্যের ভাব দেখা যায়, কোন অবিচার ও মিথ্যাচার এখানে নেই।"

তাঁর প্রিয় ভক্ত রসিকমোহন বসু এক পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখে বলে ফেলেছিলেন, "আহা, কি সুন্দর চন্দ্রকিরণ! এই পূর্ণিমার চাঁদ কত মনোহর!" শুনে অমনি ইনি উত্তর দিয়েছিলেন, "দরিদ্র লোকের ছেলেরা সামান্য একটু গুড়মিষ্টি পেলেই খুশী হয়। এই সৌন্দর্য্য হতে ঢের বড় সৌন্দর্য্য রয়েছে; ঢের বড় আনন্দ রয়েছে।"

ধর্ম সম্পর্কে কোন রকমের সাম্প্রদায়িকতা বা সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ মার উমেদালি নামে এক মুসলমান ভক্ত ছিলেন। এই উমেদালি তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সন্ন্যাস নিয়ে স্বামী ওমানন্দ নাম গ্রহণ করেন।

[illegible] এই মানুষটিকে কেউ কোন দিন ভগবানের নাম করতে দেখেনি। তবে মহাপুরুষদের নাম উচ্চারণ করতে তাঁকে দেখা গেছে।

এই আশ্চর্য্য মানুষটির কাছে তাঁর কথা জানতে চাইলে উত্তর হত, "আমার জীবনের রহস্য জানবার ও উপলব্ধি করবার শক্তি তোমাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। আমার জীবনটা কেমন জান? মনে কর, যেন একটা লোককে একটা বাক্সে বন্ধ করে এনে এক নিবিড় অরণ্য মাঝে ছেড়ে দিল। তখন সে কোন দিশে না পেয়ে যেরূপ ইতস্ততঃ ঘোরে-ফেরে, পথের অনুসন্ধান করে, বনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে না, সে স্থান থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়, আমার জীবনের গতিও তদ্রূপ ছিল। শিশুকাল হতেই কোন জিনিষের প্রতি, কোন আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আমার মনের টান ছিল না, আমি বিদেশে পতিত পথিকের মত উদাস মনে দিন যাপন করতাম। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জগতের বিভীষিকা পর্য্যবেক্ষণ করে জগতের অতীত সত্যানুসন্ধানে মন স্বতঃই অনুপ্রাণিত হত। মনে মৃত্যু-চিন্তা প্রবল আকারে খেলা করত।"

না খেয়ে থাকা লেগেই ছিল। মাঝে মাঝে প্রায়ই শরীরকে ক্লেশ দিয়ে উপোষ। একবার একসঙ্গে বাইশ দিন এই ভাবে কাটিয়ে দিলেন। এ রকম ভাবে শরীরকে রীতিমত অগ্রাহ্য করে দীর্ঘ দিন চলায় যৌবনেই দেহ ভেঙ্গে পড়ল। সেবা-শুশ্রূষা ও দেখা-শুনো করবার উপযুক্ত লোকের অভাবে তা আরো বাড়ল। কিন্তু তবু দেহটাকে সুস্থ রাখবার খেয়াল তাঁর হল না।

শরীর দুর্ব্বল হয়ে পড়তে লাগল। কখনও মাথাধরায় ভুগছেন, কখনও শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। খাওয়ার ইচ্ছে ক্রমেই কমের দিকে। শেষে আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতেন না। শুয়ে শুয়েই কাটাতেন। তাঁর জীবন যে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে আসছে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি ভক্তদের বলতেন, "মন কিছুর ওপরই আটকায় না। মন কিছু অবলম্বন না করলে কি করে জীবিত থাকা যায়?" ভক্তেরা ব্যাকুল হয়ে উঠলে ধীরস্থির ভাবে বলতেন, "তোমরা যে যাই বল না কেন, আমার মন আর কারো প্রতি আকৃষ্ট নেই, কোন দৃশ্যে রস পায় না, মন চায় কেবল চিরবিশ্রাম, অনন্ত বিরাম, অনন্ত বিরাম।"

দেখতে দেখতে রোগের অবস্থা চলেছে খারাপের দিকে। শরীরের যন্ত্রণা বাড়ছে বই কমছে না। অম্বলের উপসর্গও তাই। কণ্ঠনালীতে জ্বালা। আহারে সম্পূর্ণ অরুচি। কণ্ঠনালীতে ও মাথায় বরফ চাপান হচ্ছে, যদি একটু জ্বালা কমে। এদিকে আবার বহু রকম ওষুধপত্র ও পথ্য তাঁর পছন্দ নয়, তাই যথাসম্ভব কম করে দেওয়া হচ্ছে।

শেষে চোখের দৃষ্টিও বদলে গেল। এক দিকে তাকালে মনে হত অন্য দিকে চেয়ে আছেন। এলোপ্যাথি ও কবিরাজী চিকিৎসা বন্ধ করে মিহিজামের একজন ডাকসাইটে ডাক্তারকে দেখান হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। বাংলা ১৩৪১এর ১৮ই কার্ত্তিক সকালে ভক্তদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে কিছু সৎপ্রসঙ্গ করে দুপুরের আগে তিনি দেহত্যাগ করে চলে গেলেন। সে সময় তাঁর বয়েস ৫৪ বছর ৮ মাস ১০ দিন।

ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের শরীররক্ষার পর তাঁর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত সজ্জনগণ বিহারের দেওঘরে (নির্ব্বাণমঠ) ও পাকিস্তানে ত্রিপুরায় (বিত্তারা সিদ্ধাশ্রম, পোঃ সাচার) আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

গত যুগের জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী

৺কৈলাসবাসিনী দেবী

[কৌতুককর ও তথ্যপূর্ণ এই ডায়েরীর লেখিকা ৺কৈলাসবাসিনী মিত্র ছিলেন গত যুগের প্রসিদ্ধ দেশনায়ক বাগ্মী লেখক ও সমাজ-সংস্কারক কিশোরীচাঁদ মিত্রের (১৮২২—১৮৭৩) পত্নী। বহুবিবাহ প্রথার নিরোধ, স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার, রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি বহুবিধ কল্যাণকর বিষয়ে তৎকালীন হিন্দু কলেজের ছাত্র ও Indian Field পত্রিকার সম্পাদক কিশোরীচাঁদ বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন; পরে কলিকাতার অন্যতম ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মাদ্রাজ হইতে প্রত্যাগত, নিরাশ্রয় মাইকেল তাঁহারই সিঁতি-সাতপুকুরস্থ উদ্যান-বাটীতে প্রথম আশ্রয় লাভ করেন এবং তাঁহারই আদালতে কিছুকাল 'ইণ্টারপ্রেটার' নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিশোরীচাঁদের অগ্রজ ছিলেন ডিরোজিওর শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্র, যিনি 'টেকচাঁদ ঠাকুর' এই ছদ্মনামে 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখিয়া বাংলা সাহিত্যে চিরন্তন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কৈলাসবাসিনী এরূপ উপযুক্ত স্বামীর সংসর্গে যথোচিত শিক্ষা ও উদার মনোভাব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার লিখিত এই ডায়েরী পাঠেই বুঝা যায়। ইঁহার বর্ণনা ও পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি সত্যই বিস্ময়কর। তৎকালীন কিছু কিছু তথ্যও ইহাতে পাওয়া যাইবে। এই ডায়েরী আরম্ভ হইয়াছে ১২৫৩ সালে। কিশোরীচাঁদের একমাত্র কন্যা কুমুদিনীর কথাও এই ডায়েরীতে উল্লিখিত হইয়াছে। কিশোরীচাঁদের দৌহিত্রবংশ এখনও বিদ্যমান। দৌহিত্রদের মধ্যে ৺সতীশচন্দ্র, ৺কিরণচন্দ্র ও ৺প্রবোধচন্দ্র দে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে এক জন ডাক্তারী পরীক্ষায় ও দুই জন আই. সি. এস পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া জীবনে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র দের পুত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও বর্ত্তমানে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গবেষণা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দের নিকট হইতে আমরা এই ডায়েরী প্রাপ্ত হই, এবং তিনি এই ডায়েরী সম্পাদনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।—সম্পাদক]

শ্রীশ্রীজগদিশ্বর সরনং

১২৫৩ সালে আসাড় মাসে আমি প্রথম রামপুর যাই ৬ তারিকে। নিমতলা ছাড়ী ৮ ঘণ্টার সময়। ১২ ঘণ্টা অর্থাৎ দুই প্রহরের সময় সেইখানে আহার আদি হয়। সে রাত্র আমরা সুকসাগর ছাড়ায়ে থাকি। তার পরো দিবস আমরা কাঁলা [কালনা] যাই বৈকালে। সেইখানে সে রাত্র থাকি। আমরা কাঁলার দেবালয় দেকি। একসো ৮টি সিবলংগ একটি কালো আর একটি সেত বর্ণ প্রস্তা করা তাহা দেকি। অতি উত্তম বড় পরিষ্কার। তার পাসে নালজির বাটি রামসিতার বাটি। অন্ত অন্ত অনেক ঠাকুর আছেন আমরা দেখে এলাম। সে রাত্র সেইখানে আহার আদি হয়। তার পর দিন ঘোসালপুর থাকি। আর যেখানে থাকি সেইখান অতি রমনিয় বোধ হয়। তার পর দিবস পলাসির ঘাটে থাকি। সেইস্থানে ইংরাজ ও নবাবে প্রথম যুদ্ধ হয়। সে স্থান দেখে মন কত্তো পরফুল্ল হয় মনের ভাব কত্তো প্রকার হয় তাহা অনব্যচনিয় হয়। সেই স্থান দেকে মনের কত ভাবের উদয় হল তাহা সুমুদয় প্রকাশ হয় না। যদিও সেই সময়ে আমার পুত্রসোক অতি প্রবল ছেল তথাপি বাড়ি আসিয়া অনেক সান্তনা হল। তার পরদিন রাত্র ১১টার সময় আমোরা বহরামপুর পৌছাই সেইখানে আমরা থাকিবো। সেইখানে আমার স্বামি আসিবেন। তার পরদিন বেলা ১টার সময় আমার স্বামি ও নিলমনি বসাক ২যোনে য়েলেন। আমার স্বামিকে দেকে সকলেই সোকে বিভল্য হলেন। তথাপি সকলে মাতা হেট করে বসে রহিলেন। যখন আমার স্বামি তাঁর মার কোলে মাতা দে শুয়ে কাঁদিতে লাগলেন তখন আমার কি য়াবস্থা কি দুঃখু তাহা নিকিতে লিকনি অক্ষম। আমি জে এখন নিখিতেচি কিন্তু চকের জলে কাগচ ভিযে জাচ্চে। আমার শাসুড়ি ঠাকুরানি আমার খোকাকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি সেই অবদি পেরায় মিতুবত্ত ছিলেন। তাতে জখন বাবুকে অত্তো কাতর দেকিলেন তাত্তে মূর্চ্ছা জাবেন সে কি আসচর্য্যো কথা। এর আগে আমার দিদি ও ভাতরের কাল হইয়া ছেল। তিনি তখন বড় হইয়াছিলেন ২০ কি ২৫ বত্‌সরের সময়। তাঁকে আমি দেকি নাই। যদি কেউ বলিছেন জে তোমার অমন ছেলে গেলো তাতে প্রান ধরতে পারলে আর একটা এক বচরের ছেলের জন্ত পাগোল হবে, তাতে তিনি বলিছেন সে যে আমার দুঃখু। এ যে কি দুঃখু তাহা আমি বলিতে পারিনে। আমার মাইখেকো ছেলের পুত্র শোক। আমি কি করে শয্য করিব। হায় সেই সন্তান যখন তাঁব কোলে, পুত্রশোকে কাতর, তখন তিনি জ্ঞান সুন্ন হবেন তার আশচয্য কি। শ্রীশ্রীযগদিশ্বর ইচ্ছাতে যে তিনি শুভ্র সুস্ত হলেন সেই পরন নাব [লাভ]। আহা জননির কি স্নেহ সন্তানের পৃতি। এমন স্নেহমই মাতাকে কত্তো কুসন্তানে কত্তো অনাদর করে। হায় সে নরাধমের কি গতি হবে। তারা মনে করে বুজি যে একাবারে এত্তো বড় হয়ে পৃথিবিতে আমি আছি। সে যা হক সেদিন আমরা সেইখানে থাকি। তার পরদিবস আমরা সেই বোটে করে মুরসিদাবাদে বেড়াত্তে যাই। সে দিবস নবাবের এক মাতার কাল হয়। সেই জন্তে সেখানে সেদিন বড় ধুম ধাম হচ্ছেল। নবাব সাহেব আপনি মাটি দিত্তে সঙ্গে জাচ্ছেলেন। আমি বোটে থেকে তাহা দেকিলাম। তার পরে আবার বহরামপুরে রাত্র আসিলাম। তার পর দিবস আমার স্বামির সঙ্গে রামপুর জাত্রা করিলাম। আমার পালকিত্তে এই দিকে গেলেম আর তাঁরা সেই বোটে করে কলিকাতা গেলেন। আমাকে রাকিত্তে গেছেলেন আমার শাযুড়ি ঠাকুরানি আর তাঁর পুত্র আর আমার ন ভাসুর মহাসয় আর লকযোন তাঁহারা সকলে ফেরে গেলেন। আমি আমার স্বামি আরেক জোন ব্রাহ্মণ কন্তা তিনি আমাদের বাটিতে অনেক দিন ছেলেন তিনি আমার সঙ্গে জান। বজোরায় জলে জেত্তে আর কোন আশ্চয্য হয় নাই। কেবল পাড়ির দেবার সময় খুব তফান হয়ে ছেল পদ্মায়। তাহাত্তে বড় ভয় হয় নাই। তার দুই কারণ বড় বজোরা, দ্বিতিয় কারণ পুত্র সোক। সে সময় মরনে কি ভয়। তৃতিয় কারণ ভয়-নিবারোন সঙ্গে আছেন আমার কি ভয়। কিন্তু বামন মাসি অনেক চেঁচাচেঁচি করেছিলেন। তার পর আমরা বেলা ১১ ঘণ্টার সময় রামপুর পৌচাই। সেখানে আমার স্বামি বাড়ি ভাড়া করে রেকে

ছেলেন। বাড়িটি ছোটো কিন্তু দোতালা ও পরিস্কার। আমাদের তাহাতে বেস পোস যেতো। ছ্রাবোন মাসে আমার দিদিরও গর্ভ হয়। সেখানে আর কিছু আশ্চয্য ঘটনা হয় নাই। কেবল সেই সালে দ্বারিকানাথ ঠাকুরের মিত্যু হয় বিলাতে। তার পরে কলিকাতায় আমি ফাল্গুণ মাসে। তখন আমার ৮ মাস গৰভ। আমার স্বামি আমাকে রেকে সেই মাসে যান ১৫ দিনের ছুটি হয়েছেল। আমি বাটিতে রহিলাম চৈত্র মাসে আমার সাদ হল। আমার জারা সাদ দিলেন। আমি সবার ছোটো আমার আদর সবার কাচে। ১২৫৪ সালে বৈসাক মাসের ৭ তারিখে মঙ্গলবার আমার একটি কন্তা সন্তান হলো ১১ ঘণ্টার সময়। তাহাতে শকলে বলেন জা হইয়াচে তাই ভাল। ছেলে মানুসের কতো হবে। কিন্তু আমার শাস্তুড়ি ঠাকুরানি বড় দুঃখিত হলেন। বলেন জে সোনা হারিয়ে কাঁচ পাইলাম। আমার স্বামি বড় আহ্লাদিত হইলেন। চিটি নিকিলেন তোমার একটি কন্তা হইয়াচে সুনে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা বর্ণনা জায় না। শ্রীশ্রীজগদিশ্বরের ইচ্ছাতে তুমি ভালো য়াছ ও আমার কন্তাটি ভালো আচে শুনে আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম। তুমি মনে কিচু দুঃখিত হও না। শ্রীশ্রীজগতপিতার কাচে সব সমান। আমাদের কাচে সব সমান ভাবা উচিত। তুমি আমাকে কবে চিটি নিকিতে পারিবে আমি সেই আসায় রহিলাম। আমি ওঁকে চিটি কি করে নিকি। আমাদের জে শুতিকাগার তাহা এক প্রকার গারোদ ঘর। জদিও আমি বড় নকের কন্তা, বড় নকের বৈউ, বড় নকের স্ত্রী তথাপি সেই সামান্ত নকের মতন থাকিতে হইবে। নামোর ঘর জল উঠিতেছে, তার উপর দরমা মাদুর কম্বল পাড়া একটি বালিস এই বিচানার সঙ্গে। খাওয়া ঝাল ও চিঁড়া ভাজা। ধোপা নাপিত বন্দ। পোয়াতির এই দুরাবোস্থা। ও দিকে দাই নাপিত বাজোনদরে হিঝিরে অবাবিরদার। কিন্তু পঞ্জাতিকে জে বিছেনা দিলে ফেলা জাবে সেইটে বড় বাজে খরচ। জাঁরা শহরে দোতালার উপর খাটে ও গদিতে শোন, তাঁদের একাবারে এ নরক কি করে সহ্য হয় সেই ক্ষিণ ও দুবল আবস্থায় তাহা বলিতে পারি না। সেই সগগিয় পিতার ইচ্ছাতে শব্য হয় ভাল ঘরে। কিম্বা ওপরে প্রশব হলে অতো আগুনের আবিশ্চক থাকে না। এই অবোস্থা তাহাতে এক মাস কিছু ছুঁতে পাবে না, ঘরে আসিতে পাবে না। তাহা আমার স্বামি জানে না, কেবল কি চিটিতে নেকেন তুমি কি নিষ্টুর তুমি কি নির্দয়, আমি কেলেস পেলে তুমি য়েতো শুকি হও তাহা আমি এতোদিন জানিতাম না। তোমাকে আমি কি চিটিতে অনুরোদ করি এক নাইন নিকিতে তাহা তুমি নেকো না। কিন্তু আমি আর তোমাকে চিটি নিকিবো না। আমি বড় ভাবিত হইলাম, জদি দুই দিন কি তিন দিন চিটি না নেকেন তা হলে মরে জাবো। কি করি সুতিকা পুজোর দোত ও কলম ছেলো তাইতে নিকিলাম। এটা নিকিলাম কেন তার কারন য়েই জে আমরা বউকাল কি করে কাটায়েছিলাম। কিন্তু শকল কালে সুক ও দুঃখ আচে কোন ভাবনা ছেলো না খাওয়া কি পরা কি ব্যেম কি কেউ আসুক কোন ভাবানা ছেলো না। সকল কালে সুক ও দুঃখ আচে, কি গরমিকাল কি বরষাকালে কি শিতকালে, কি বউকাল কি গীম্নিকালে। তার পরে আশ্বিন মাসে আমার সামি য়েলেন, আমার কন্তার সেই মাসে অন্ন প্রাসোন হল। রাসনাম হরিপুরা, ডাক নাম কুমুদিনী।

তার পরে আমার স্বামি কার্তিক মাসে রামপুর গেলেন আমাকে রেকে গেলেন। তাহাতে আমি বড় দুঃখিত হইলাম ও সেই কার্ত্তিক মাশে আমার বড় জর হইলো। চার মাস সেই জর আর পেটে বেদনা রহিল। তার পরে ফাল্গুন মাসে আমি রামপুর জাই। সেখানে গে বেদনা বাড়ে। বেডকোট শায়েব চিকিৎসা করেন। এখানে নেলর শাহেব ও দরি বাবু দেকেন। কিচুতে ব্যেদনা ভালো হলো না, কতো জোঁক বোশায়েচি তাহা বলা জায় না। কোতো বেলেস্তারা বসান হলো কিচুতে ভাল হলে না। শেষে এক জোন দাই ভাল করে। আমি জে দিন রামপুর পৌছি সেই দিন আমার স্বামি একটি সভা থাপনা করেন। আর সেখানে কোন ভারি বিসয় হয় নাই। রামপুরে দুই বৎসর থাকেন। তার পরে নাটুরে এসেন। ১২৫৬ সালে নাটুর মহাকুমা সৃজন হয়। আগে বাবু সেইখানে ডিপটি মাজিষ্টের হন। আগে যেখানে জেলা ছেলো সেখানে বান আসাতে জেলা ভেঙ্গে রামপুরে জেলা হয়। সেখানে রাজধানি সেখানে হাকিম না থাকিলে চলে না এই জন্ম মহাকুমা হয়। সবাই জানেন সেখানে রানি ভবানির রাজধানি। তাঁর নাম কোথায় না আচে, তাঁর কিত্তি কোথায় না রাছে। আমরা জখন সেখানে জাই তখন সেখানে তাঁর উত্তরাধিকারীরা রাজত্ত করেন। বড় তরপ আর ছোটো তরপ দুই জোন রাজা। আর তারির কাচে দিগাপতি। সেখানে এক বড় জমিদার ছেলেন তাঁকে এঁরা বড় অমান্ত করিতেন। তাহাতে তিনি বড় দুঃখিত ছেলেন! বাবুকে বলে কএ রাজা হবার চেষ্টা কত্তেন। বাবু ভালো পরামর্শ দিতেন, তাহা তিনি সুনিতেন। নাটুর থেকে রামপুর রাস্তা করে দিলেন। আর জার ভালে করলেন। প্রশন নাথ একাডিমি নামক একটি ইসকুল কল্লেন। তাহাতে খুব নাম। পোসমাসে আমরা নাটুরে জাই। সে বচর আশ্বিন মাসে বাটি আসা হয় নাই। ১২৫৮ সালে আমার স্বামি বলেন চল তবে আমরা মপশলে জাই। তোমাকে রাপুর (রামপুর ?) নে জাবো। আমি বল্লুম আচ্ছা অনেক দিন এখানে আছি একবার ব্যেড়ায়ে আসি। সেখান থেকে য়েসে যবদি আর সেখানে জাই নাই। এজন্তে সেখানের বন্ধুদের দেকিতে বড় ইচ্ছা হল। আমরা প্রথম দিন নাটুর থেকে ছেড়ে পিরগঞ্জে য়েসে খায়াদায়া হয়। বইকালেতে আমরা যাই পাকপাড়াতে। সেখানে একটি নিলকুটি আছে, সেখানে আমার স্বামি খানা খেলেন রাত্রে, সে শায়েবের নাম পেক্ক সাহেব। তাঁর মেম বইকালে আমার বজোরায় এলেন। অনেক কতা বাতারা হলো। তিনি বড় ভদ্র নক। আমি সেলাই দেকাইলাম আমার, তিনি তাঁর সেলাই দেকালেন। তিনি কুটিতে গেলেন আমি খায়া দায়া করিলাম। আমার স্বামি বজোরায় য়েসে শুলেন। পাকপাড়ার কোলে যে নদি তাঁর নাম বড়াল, নাটুরের কোলে জে নদি তাঁর নাম নারদ, কেউ কেউ বলে ঝুম ঝুমি নদি। তার পরদিন আমরা শরদা যাই। সেখানে একটি কুটি তার কোলে পদ্মা নদি। সেখানে বাবু খায়া দায়া কল্লেন। কুটিতে সেখানে একটা মকোদামা হল, তার স্বামি তাকে বড় মেরে ছেলো, হাতা পোড়ায়ে গায়ে দাগ দেছেলো, তাহা আমি দেকিলাম বোটে বসে। তার পিতা একখানি নৌকা করে য়েনেছেলো। বাবু মকোদামা কল্লেন। সেই রাত্র আমরা রাজাপুর যাই। সেখানে একটি কুটি। সে সায়েবের নাম মেকলাউট। তার কোলে পদ্মা নদি। সে রাত্র সেখানে খানা খান। তার পরদিন বাবু গেলেন লালপুর। লালপুরের

কুটির শায়েবের নাম মিল। সেখানে থানা য়াচে পাকপাড়া ও সয়দা য়াজাপুর আর নালপুর। যে সকল বাবুর য়েলেকা। ব্যেয়াচ্চেন আর থানা দেকা হচ্ছে। আর আমাকে পদ্মা ঘুরন হচ্ছে। তার পর দিন গাঁয়ে তদারক ছেল য়ে য্যনে সেদিন হাত্তিতে গেলেন। আর হুকুম দে গেলেন বোট নালপুরমে নে যায়। আমার বড় বিরক্ত বোধ হলো, বসে বসে পা ধরে গেলো। কোত্তা বা রামপুর কোত্তা বা আমি। আশিন মাসের ভরা পদ্মায় ঘুরে মর্ছি আমি কেবল তুপান খেয়ে! তাই ঘটলো। কোস খেনেক জেতে জেতে ভয়ানক তুপান উটিল। এক এক ঢেউ পর্ব্বত প্রমান। আবার কাচাড় ভেঙ্গে পড়িতে নাগিল। ধরে নে জাবার যো নাই। ছোটো নৈউকা কতো ধারে মারা গেলো। ধারে ঢেউ নেগে ২ ঝপাত্ত ২ করে মাটি পড়িতে নাগিলো। এক ২ চাপ একতোলা বাড়ির মতন কোনটা দোতোলা বাড়ির মতন। তাহাতে আমি বড় ভয় পেত্তে লাগিলাম। আমি কি মাজি মাল্লা সকলে ভয় পেলে। তার পরে এক জায়গাতে কাচাড় নাই সেখানে চড়া সেই খানে নাগাবো মনে করলে। মনে কল্লে কি হবে জত্তো নাগাত্তে চেষ্টা করে ততো মাজখানে পুঁতে বসে। আবার কত্তো কষ্টে তোলে ওপারে নে যায়। তখন আমি বলিলাম জে নাটুরে মাজি চোকে দেকিলাম, আগে কানে শুনেছিলাম। তাহাতে তারা বলে আমরা কি করিবো। কি করি? আমার কন্যাটি কোলে করে বসে রহিলাম। মনে করি একবার জগদিশ্বরের স্মরণ করি তাহাও মুখে বেরুল না। আমার কন্যাটিকে কোলে করে বসে রহিলাম তার কারণ এই, যদি ডুবে যাই তা হলে যেখানে ভেসে উটিব সেইখানে কন্যেটি সহিত্ত উটিব। জখন জেখানে তুফান হইত্তো আমার এই কর্ম্ম। কাপড়েত্তে আর আমাত্তে আর আমার কন্যাত্তে বেশ করে কসে বাঁদুম। কিন্তু মানুসের কি সন্তানের উপর স্নেহ। মুকে জগদিশ্বরের নাম বাহির হয় না কিন্তু কর্ম্মে ত্রুটি হলো না। সে জাহক। এক এক বার মাজিদের বলিলাম জে নাটুরে মাজি কানে শুনেছিলাম চোকে দেখিলাম। তারা বলে আমরা কি করিবো আমাদের কি সাদ। আমরা এত্তো চেষ্টা কচ্ছি কিন্তু নাগাতে পাচ্ছি না, তা কি করিবো। তার পরে অনেক কষ্টে একটা চড়াত্তে নাগালো ব্যেলা তখন ২টো নাগাত্ত। চাকোর চাকোরানি সকলে নেবে পলো। জত্তো ব্যেলা তারা নাত্তে খেত্তে পায়নি। তাদের তো স্নান হলো তারা খায় কি। রান্নার পানশি দেখত্তে পেলে না। সে ছোটো পানশি সে একাবারে লালপুরে পৌচেছে। বজরায় কিচু খাবার নাই, কি করে। বজরায় কেবল কদমের মিচরি আর দুদ থাকিত্তো। শেদিন দুদ পায় নাই তাদের মিচরিত্তে কি হবে। আট ন জোন হাত্তির মুকে দুব্বোঘাশ। তাত্তে চৈকিদার খুঁজে ব্যাড়াত্তে নাগিলো। খুঁজিত্তে খুঁজিত্তে এক যোন চৈকিদার পাইলো। সে বলে মাজিষ্টর বাবু থানাত্তে এশেচেন, সকলে হাজিরা দিত্তে গেছে, আমি কেবল একোলা আচি, আর য়েখানে দোকান নাই, আমার ঘরে চাল কাট আচে। তারা বলে তাই আন। তাই য়েনে দিলে। পাঁচ জাত্ত কি করে। তাই ভেবে শকলে খেলে। আমি শেই শময় বাবুকে চিটি নিকিলাম। সেথান থেকে থানা এক কোস হবে। শেই চৈকিদারকে চিটি দিলুম ৫ টার সময় চিটির জবাবো য়েলো।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

১৮

জুগদিদি। এরা বলে গ্রাম, কিন্তু এসে দেখি সহরেরও বাড়া। কুমী থেকে ট্রেনে আড়াই ঘণ্টার রাস্তা। বৃষ্টি মাথায় করে পান্থশালায় এলাম, প্রশস্ত রাস্তা বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত। সকালে দেখি, সম্মুখে বাগান, অন্য পাশে বড় বড় দোকান—দলে দলে কৃষকরমণী এসেছে সওদা করতে এবং বেচবে বলে কাঁকালে করে এনেছে শূকরছানা। দেখে ভ্রম হয় যেন কলকাতার চৌরঙ্গীপাড়ার সৌখিন দোকানে মেমসাহেবেরা বাজার করতে বেরিয়েছেন। আমার সঙ্গীরা তখনও ঘুমুচ্ছেন, একাই বেরিয়ে পড়লাম। এখানকার মেয়েরা মস্কোএর মত নয়, পোষাক ও প্রসাধনে পারিপাট্য আছে, অলঙ্কারও প্রচুর। সম্মুখে ভীড় দেখে এগিয়ে গেলাম, ঘড়ীর দোকান—ঘড়ী মেরামতের খদ্দেরদের ভীড়। হাতঘড়ীর চল এখন বিশ্বব্যাপী। এখানেও তরুণ-তরুণীদের হাতে সোনার বকলস দেয়া হাতঘড়ীর ছড়াছড়ি। পথে অনেকে হেসে অভিবাদন করে, আমিও হেসে নমস্কার করি, কথা বলবার উপায় নেই। বাগানের বেঞ্চে এসে বসেছি, পাশে একজন আরাম করে পাইপ টানছেন। ঘনিষ্ঠ হয়ে আলাপ সুরু করলেন। আমি যত বলি, ইংরিজী, হিন্দী, তিনি তা কানেই তোলেন না। নিজের বক্তব্য অনর্গল বলে যাচ্ছেন। এমন সময় আমাদের সঙ্গী আনাতোলি এসে হাজির, নিষ্কৃতি পেলাম। শুনলাম, কমরেড তাঁদের গ্রামের সমৃদ্ধি কি ভাবে চা-বাগানের দৌলতে বেড়ে গেছে, তারই গল্প শোনাচ্ছিলেন।

ছোটো চা-বাগান ও একটা চা তৈরীর কারখানা দেখলাম। আমাদের দেশের ডুয়াই-এর চা-বাগানগুলোর মতই। কারখানা অর্থাৎ কাঁচা চায়ের পাতা নানারকম প্রণালীর মধ্য দিয়ে শুকিয়ে যে ভাবে চা হয়, তাও আমাদের দেখান হল। এমন কারখানা আমাদের দেশেও আছে, এখানে কেবল সেই কুলী ও কুলীবধূ। চা-বাগানের কারখানার চারদিকে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় কর্মীরা বাস করে, ছোট ছোট পারিবারিক বাড়ীও আছে। এ ছাড়া ক্লাব নাচঘর থিয়েটার শিশুপালনাগার কিণ্ডারগার্টেন রয়েছে। চায়ের পাতা মেয়েরাই তোলে। একটি কারখানায় থান ইটের মত চা তৈরী হয়, এগুলি মঙ্গোলিয়া, কাজাকস্থান ও সাইবেরিয়ায় চালান যায়।

জুগদিদির চারদিকে সমবায় কৃষিক্ষেত্র। এই কৃষির দৌলতেই গ্রাম সহর হয়েছে। এদের গ্রাম্য ম্যুজিয়ম দেখে বিস্মিত হলাম। প্রস্তর-যুগ থেকে আধুনিক যুগের কত ঐতিহাসিক নিদর্শন এরা সংগ্রহ করেছে। জর্জিয়ান কুটিরশিল্প ও চিত্রকলার সংগ্রহ প্রচুর। একটা কক্ষে স্থানীয় সামন্তরাজার সংগৃহীত বিলাস-সামগ্রী ও তৈজসপত্র। ইনি প্যারিসে নেপোলিয়নের ব্যবহৃত চেয়ার-টেবিল কিনেছিলেন, তাও দেখলাম এরা যত্ন করেই রেখেছে। এখানে লোকে দেশের শিল্প, খনিজ সম্পদ, সংস্কৃতি ও চারুকলার সঙ্গে পরিচয় লাভ করে। এক জায়গায় প্রাচীন আমলের অভিজাতদের মূল্যবান চীনেমাটির বাসন, স্ফটিক পানপাত্র থরে থরে সাজানো, তার পাশেই কৃষকদের পোড়ামাটির মলিন পাত্রগুলি। লোকে এক নজরেই পুরনো দিন আর হাল আমলের তফাৎটা বুঝতে পারে।

ম্যুজিয়মের পাশেই খেলার মাঠ। একধারে তিনতলা ষ্টাডিয়াম, প্রায় ১৫।২০ হাজার লোক বসতে পারে। গ্রামেও এমনটা সম্ভব হয়েছে। এখানে ফুটবল খেলা হল। তারপর সুরু হল ককেসিয়ানদের জাতীয় ক্রীড়া ঘোড়দৌড়। জাতীয় পোষাকে সজ্জিত পুরুষ, নারী ও কিশোর বালকরা ঘোড়া ছুটিয়ে অনেক রকম দুঃসাহসিক খেলা দেখালো। শত্রুর ব্যূহে প্রবেশ করে ভল্ল নিক্ষেপ এবং পলায়মান শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন; দর্শকগণ করতালি দিয়ে উৎসাহিত করতে লাগলো। প্রায় পঞ্চাশটি দ্রুত ধাবমান অশ্বারোহীর পুরোভাগে পতাকাবাহী নব্বই বৎসরের বৃদ্ধ, শুভ্রকেশ ও শ্মশ্রু বাতাসে উড়ছে। দেখে অবাক হলাম। এ দেশের নরনারী দীর্ঘজীবী হয়। আশী-নব্বই বছরেও এরা যুবার মত কর্মক্ষম।

বেলা পড়ে আসছে, আমরা একটা বৃহৎ সমবায় কৃষিক্ষেত্রে গেলাম—নাম 'বেরিয়া খোলকোজ'। বেরিয়া বলশেভিক আন্দোলনে স্তালিনের দক্ষিণহস্ত ছিলেন। ইনি জর্জিয়ার একজন মুখ্য নেতা, বর্তমানে সোবিয়েত রাশিয়ার অন্যতম মন্ত্রী।

ডিরেক্টর কৃষিক্ষেত্রের যে পরিচয় দিলেন, তা মোটামুটি এই,—১৯৩০ সালে ৫৭টি পরিবার এবং ১৬১ হাজার রুবল সম্পত্তি নিয়ে এই কৃষিক্ষেত্রের পত্তন হয়। ১৯৫১ সালে ২৭০টি পরিবার এবং মোট সম্পত্তির মূল্য ১১০ লক্ষ ৬ হাজার রুবল। পূর্বে এ অঞ্চলে কেবল ভুট্টার চাষ হত। সোবিয়েত কৃষিবিজ্ঞানীদের সহায়তায় চা ও ফলের চাষ সুরু হয়। মোট জমি ১৫৮০ হেক্টর (১

হেক্টর, ২'৪৭ একর)। চা, আঙুর, ফল, তরিতরকারী এবং ভুট্টার চাষ হয়। এ ছাড়া সমবায়ের এবং ব্যক্তিগত পশু-পাখী পালন আছে। সমবায়ে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা ৮৭৪।

১৯৫০ সালে মোট আয় হয়েছে নয় হাজার লক্ষ রুবল। দৈনিক মাথা-পিছু মজুরী ৪২ রুবল। বেতন ও বোনাস নিয়ে কৃষকেরা পেয়েছে ৫ হাজার লক্ষ ৭১ হাজার রুবল। সরকারী ট্যাক্স ২ লক্ষ ৫০ হাজার রুবল দিয়ে বাকী অর্থ হাসপাতাল স্কুল ক্লাবের জন্ত ব্যয় হচ্ছে। সমবায়ের বিশটি ছেলেমেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, তাদের খরচ দেয়া হয়। বেতন ভাতার নগদ অর্থ ছাড়া, প্রত্যেক পরিবার বছরে দু'টন শস্য পায়। গৃহ-পালিত পশু ও ফল-তরকারীর বাগান থেকেও বাড়তি আয় আছে। এই কৃষিক্ষেত্রে ৪০ জন 'স্যোসালিষ্ট হিরো' এবং ২১৭ জন সম্মানিত পদকধারী রয়েছে।

তাসকেণ্টে লেখকের সম্বর্দ্ধনা

আমরা চারদিক ঘুরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং কৃষকদের বাড়ীঘর আসবাবপত্র দেখলাম। স্বচ্ছলতা ও সাফল্যের ছাপ সর্বত্র। একজন বৃদ্ধ কৃষক, বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে, আগের দিনের গল্প বললেন। বলশেভিকরা যখন প্রস্তাব করলো, এভাবে চলবে না, সমবায় কৃষিক্ষেত্র গঠন করতে হবে, উত্তেজিত আলোচনায় গ্রাম ভরে উঠলো। নিজের জমি না হলে কি কেউ মন দিয়ে চাষ করবে, সব পয়মাল হয়ে যাবে। সকলে মিলে সব জমির মালিক হবে, এমন অসম্ভব কথা কে কবে শুনেছে? যাদের জমি নেই, ভাগচাষী, মালিক হওয়ার লোভে তারা তো রাজী হয়ে গেল, ছোট ছোট কৃষকরাও নিমরাজী; কিন্তু কুলাকরা (জোতদার) কিছুতেই রাজী হয় না।

সভা ডাকা হল। তরুণ বলশেভিকরা সমবায় কৃষিক্ষেত্র ও যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক চাষের ভাবী সমৃদ্ধি বর্ণনা করলো। কলে চাষ ফসল-কাটা ফসল-ঝাড়াই হবে, এমন আজগুবী কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। বক্তৃতা শেষ হবার পর একজন প্রবীণ কৃষক বলতে লাগলেন, তোমরা সহুরে কেতাব পড়া, আমাদের মনের ভাব ও অবস্থা বোঝ না। আমি এখনও মরিনি এর মধ্যেই দু'ছেলে জমি ভাগ-বাঁটোয়ার সলা-পরামর্শ করছে। আমার দুই বেটার বউ আরো উৎসাহী। গরু ঘোড়া হাঁস মুরগী তারা ভাগ করে ফেলেছে, ভেড়া হল তিনটি। কি ভাবে ভাগ করা যায়! ছোট বউ বলে একটা ভেড়া কশাইএর দোকানে বেচে দিয়ে টাকাটা ভাগ করে নিলেই হবে। যেখানে এক মায়ের পেটের দু'ভাই একত্র মিলে মিশে চাষ করতে চায় না সেখানে তোমরা গ্রামশুদ্ধ লোককে একসঙ্গে চাষ করাতে চাও?

কিন্তু তাও হল ধীরে ধীরে। অল্প জমি আর কয়েক ঘর কৃষক নিয়ে কাজ আরম্ভ হল। এলো কলের লাঙ্গল। চাষের নূতন পদ্ধতি ও ফলন দেখে ক্রমে লোকের বিশ্বাস হল, বলশেভিকরা ভাল কথাই বলছে। কৃষিকাজে আদিম ব্যবস্থা অতিক্রম করে আমরা যন্ত্রযুগে এসেছি অনেক অবুদ্ধির খেসারত দিয়ে। আজ আমার বাড়ী দেখছো, এখানে ছিল আমার বাপ-দাদার মাটির কুঁড়ে, সেই অন্ধকূপে ভেড়া-ছাগলের সঙ্গে শুয়ে আমার শৈশব কেটেছে। এখন ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ে, ক্লাবে গান গায়, রঙীন পোষাক পরে নাচে—আমার নাতনী তিবলিসিতে কৃষি-বিজ্ঞান কলেজে পড়ছে। প্রাচীন কালের দুঃখ-দারিদ্র্য ও আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বলতে বলতে তিনি মুখর হয়ে উঠলেন।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কি আপনাদের মধ্যে কলহ হয় না? কেউ যদি কাজ ফাঁকি দেয় তার কি ব্যবস্থা?

বৃদ্ধ বললেন, মতভেদ ঘটে বই কি। কাজ নিয়ে নয়, কাজের

বিখ্যাত উজবেক লোকনটি-ষ্টালিন-পুরস্কারপ্রাপ্তা তামারা খানুম

পদ্ধতি নিয়ে। ওগুলো নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নেয়া হয়; না মিটলে ডিরেক্টর মধ্যস্থ হয়ে যে মীমাংসা করেন তাই আমরা মেনে নেই। ফাঁকি দেওয়ার কথা ওঠে না, কেন না আমাদের কাজ একঘেয়ে নয়। যে অপারগ, তার খাটুনী কমিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

পাইন গাছ ঘেরা সবুজ ঘাসে ঢাকা উন্মুক্ত মাঠে বিরাট বিদায়-ভোজ। চক্রাকারে আমাদের নিয়ে দেড়শ' নরনারী বসলেন। পাঁচশ' লোক খেতে পারে এমন মাছ মাংস রুটি পনীর ও বিবিধ পিষ্টক। সুমিষ্ট সুরার ছড়াছড়ি। গরুর শিংএর বৃহৎ শিঙ্গায় মদ্যপান। ভোজ-সভার কর্তা 'তামাদা' তিন বোতল মদ শিঙ্গায় ঢেলে এক চুমুকে পানপাত্র নিঃশেষ করলেন। আমি তো দেখে শিবনেত্র। অতিথিদের জন্যও ঐ ব্যবস্থা। অপারগতা জানিয়ে নিষ্কৃতি পেলাম। জর্জিয়ান যুবক-যুবতীরা সুসজ্জিত হয়ে নৃত্য-গীত শুরু করলো। বাদ্যযন্ত্র তাল সুর ও সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় ভারতীয় আভাস আছে। প্রেয়সী নারীর চিত্তজয় করতে তরবারি আস্ফালন করে নৃত্যের বলিষ্ঠ সুষমা ভাল লাগলো। দীর্ঘাঙ্গী গৌরবর্ণা সুগঠিত-দেহ শুভ্রবসনা তরুণীদের সমবেত সঙ্গীত ও লোকনৃত্য নয়নময় হয়ে দেখলাম। জীবন্ত জাতির প্রাণের প্রাচুর্য এদের, সারা অঙ্গে উচ্ছলিত, পদক্ষেপের দৃঢ়ভঙ্গিতে সফল শক্তির গতিচ্ছন্দ লীলায়িত হয়ে উঠছে। সেই অপরূপ সন্ধ্যায় হাসি আনন্দে তন্ময় হয়ে আছি; এমন সময় কমরেড অকসানা দেবীর পরিচিত আহ্বান—পাশলি, পাশলি। বিদায় নেবার সময় হয়েছে।

১৭

লেখকসঙ্ঘ ও নাগরিকদের বিদায়ভোজ রাত্রি তিনটেয় শেষ হল। শেষ রাত্রেই আমরা তিবলিসি থেকে বিমানে যাত্রা করলাম। ২৪শে জুলাই বিকেল ৪টায় মস্কৌএ ফিরে এলাম। মুষলধারায় বৃষ্টি ও প্রখর বাতাস, তেমনি শীত। ন্যাশনাল হোটেলের পরিচিত ঘরে প্রবেশ করে বাঁচলাম। চা খেতে খেতে জানালা দিয়ে দেখি, বৃষ্টিধারাস্নাত গাছগুলি দুলছে, নীচের রাস্তায় ভুঁইচাপা ফুল ফুটছে। ধূসর আকাশের নীচে ক্রেমলীন প্রাসাদদুর্গ আপন অটলোন্নত মহিমায় দাঁড়িয়ে ধারাস্নান করছে। পথ জনহীন। বর্ষার ধারায় প্লাবিত কলকাতার কথা মনে পড়লো। ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি ইলিশগুঁড়ী বৃষ্টি হলেই মধ্য-কলকাতায় কোমর-জল। আপিস-ফেরত বাবুর দল, কলেজের ছাত্র, ইতর, ভদ্র সকলই গোপাল-কাছা হয়ে জুতো জোড়া কাঁধে তুলে মন্থরপদে চলছে। অর্দ্ধ শতাব্দী দেখছি, কারো মুখে নালিশ নেই। যুবা বয়সে বিদ্যাধরী নদীর মরণদশা নিয়ে খবরের কাগজে বিলাপ করেছি। কিন্তু কিছুই হয়নি, হল না। ইঞ্জিনিয়রিং বিদ্যার পরাকাষ্ঠার দিনেও সহরের বর্ষার জলনিকাশের ব্যবস্থা হয় না। কেন হয় না? আমরা সহ্য করি বলেই হয় না। আমরা মুখ বুজে কর্পোরেশনের ট্যাক্স গুণি। দাবী-দাওয়া নেই। মনে আছে, প্রথম মেয়র হয়ে ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন, শ্যামবাজারের সঙ্গে চৌরঙ্গী পাড়ার কোন পার্থক্য রাখবো না। কিন্তু পার্থক্য রয়ে গেছে। কর্তাদের ভাবিয়ে না তুলতে পারলে, তারা ভাববে কেন? তাই চৌরঙ্গীর সাহেব-পাড়ায় রাস্তা খোয়া বের করা নয়, দু'পাশে ফুলবাগান পাড়া-বাহার উদ্যানগুলি সুরচিত ও সুরক্ষিত। আর আমাদের পাড়ার রাস্তা, কতকগুলো ছোট-বড় গর্তের যোগফল হয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে; মা-বাপ মরা অনাথের মত। আমরা সহ্য করি, কেন না আমাদের বুদ্ধি অলস, আত্মকর্তৃত্বের অধিকার যে মানুষের অধিকার পুঁথির এই তত্ত্বটা আমাদের মগজে তর্কবুদ্ধি শানাবার চর্মই রয়ে গেল, আত্মরক্ষার বর্ম হল না। তাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা পরবশতার পাঁকে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল। নানা দুঃখকে যারা দৈবের মার বলে নিরুপায় ভীরুতায় সয়ে যায়, তাদের মানসিক দাসত্বের গ্রন্থি না খুললে, কোন দুঃখেরই প্রতিকার সচেষ্ট হয়ে উঠবে না।

ইয়োরোপের ইতিহাসে অনেক রক্তাক্তক্রিয়র মধ্য দিয়ে মানুষ মুক্তি পেয়েছে। তার পরিপূর্ণ প্রবল মূর্তি রাশিয়ায় এসে প্রত্যক্ষ করেছি। আচারবিচার বিধিবিধানে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা মানুষ ধর্মমোহে আচ্ছন্ন হয়ে নিজেকে অশ্রদ্ধা করতো, দাস তৈরীর সেই পাকা কারখানাটা ধূলিসাৎ করে দিয়েছে বলেই, যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরুদ্ধ প্রথার বন্ধন থেকে এরা মুক্তি পেয়েছে। সেই মুক্তির আনন্দ ও বিস্তার এদের সমাজ-জীবনে দীপ্যমান। বাইরের কোন অন্ধ বাধ্যতা দ্বারা এরা পরিচালিত, বিদ্বেষে অন্ধ ছাড়া এমন কথা কেউ বলবে না।

এবারে মস্কৌএ এসে বিখ্যাত স্তালিন অটোমোবাইল ফ্যাক্টরী দেখলাম। বহু বিভাগে বিভক্ত বিশাল কারখানা। এর তিন প্রধান বিভাগ থেকে প্রতি সাড়ে তিন মিনিটে একখানা করে বাস, মোটর গাড়ী ও লরী বেরিয়ে আসছে। বিভিন্ন বিভাগে তৈরী অংশগুলি কেমন করে স্তরে স্তরে জোড়া দেয়া হচ্ছে, তা ঘুরে ঘুরে দেখতে অনেক সময় লাগলো। মেয়ে পুরুষ দুই-রকম শ্রমিকই আছে; প্রজ্বলিত চুল্লী বা হাপর ও হাতুড়ী পেটার কাজে মেয়েদের নিয়োগ করা হয় না। আমরা শ্রমিকদের খাটুনীর পরিমাণ ও সময় নিয়ে প্রশ্ন করলাম। একজন রসিক শ্রমিক বললে, 'ছোট গোলামকে খাটাবার তরে এখানে বড় গোলাম চাবুক উঁচিয়ে নেই। ট্রেড ইউনিয়নের বাঁধা নিয়মে আমরা কাজ করি।' কাজ চলেছে ঘড়ীর কাঁটার মত।

এই কারখানার হাউস অফ কালচার বা সংস্কৃতি-ভবন একটা বৃহৎ ব্যাপার। বিরাট প্রাসাদ—বড় বড় হলে খেলাধূলা ছবি-আঁকা, বই বাঁধাই নানাবিধ হাতের কাজ শেখার ব্যবস্থা। শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা এখানে শিক্ষা ও আমোদ-প্রমোদ দুই-ই পাচ্ছে। একটা বড় হলে ঢুকে দেখি ছেলেমেয়েরা নানা রকম খেলনা নিয়ে মেতে আছে, এ দৃশ্য কত সুন্দর, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ছোটদের ও বড়দের দুটো সিনেমা হল ও থিয়েটার, বক্তৃতামঞ্চ, তারপর লাইব্রেরী! শ্রমিকরা টেকনোলজী অর্থাৎ যন্ত্রবিজ্ঞান শিক্ষা করে উন্নত হতে পারে তারও দরাজ ব্যবস্থা। এদেশে এসে যতগুলো কারখানা দেখেছি, সর্বত্রই এসব আছে। আর আছে শিশুপালনাগার, কিণ্ডারগার্টেন, প্রসূতি-ভবন, চিকিৎসালয়। কৃষক শ্রমিকের রাষ্ট্রে এ হবে না তো আর কোথায় হবে? এখন দেখে আর অবাক হই নে!

নিখিল রাশিয়ার ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় আপিস। কলকাতার লালদীঘির দপ্তরখানার প্রায় তিন গুণ। সমাজতান্ত্রিক

১৪,০০০-এরও বেশি চিকিৎসক বলেন

ক্যাডবেরির বোর্ন-ভিটা পান করুন

আপনার শক্তি বাড়বে...শরীরেরও পুষ্টি হবে

ক্যাডবেরির বোর্ন-ভিটা একাধারে পরিপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত সুষম একটি খাদ্য ও পানীয়। শরীরের ক্ষয়প্রাপ্ত কোষগুলির পুনর্গঠনের জন্য এবং আপনার হৃতস্বাস্থ্য, শক্তি ও প্রাণ-প্রাচুর্যকে জাগিয়ে তুলতে যে পুষ্টির প্রয়োজন তা এই স্বাস্থ্যপ্রদ পানীয় বোর্ন-ভিটার প্রতি পেয়ালা থেকেই পাবেন। ছোটোবড়ো সকলের জন্যই ক্যাডবেরির বোর্ন-ভিটাকে একাধারে একটি অতি-প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয় বলা চলে — এবং এ যে সত্যি কতো ভালো তা আপনি খেলেই বুঝতে পারবেন।

সেইজন্যই তো চিকিৎসকেরা বলে থাকেন সুস্বাদু বোর্ন-ভিটা পান করুন। বোর্ন-ভিটা খেলে আপনার শক্তি বাড়বে — শরীরেরও পুষ্টি হবে।

প্রতি পেয়ালায়

শ্বেতসার দুগ্ধজ স্নেহ পদার্থ ডায়াস্টেজ	শরীরের বৃদ্ধি ও শক্তি যোগানোর জন্য
প্রোটিন কোকো বাটার	শরীর গঠনের জন্য
খনিজ লবণ	অস্থি গঠনের জন্য
ভিটামিন এ ও ডি	রোগ প্রতি-রোধের জন্য

বোর্ন-ভিটা
একাধারে সংরক্ষণশীল খাদ্য ও পানীয়

প্রতিদিন বোর্ন-ভিটা

পান করে আপনার স্বাস্থ্য গড়ে তুলুন।

ক্যাডবেরি-ফ্রাই (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
বোম্বাই — কলিকাতা — মাদ্রাজ

সমাজে শ্রমিকদের গঠন-কাজের ধারা নিয়ন্ত্রিত করবার স্নায়ুকেন্দ্র। আমরা একটা বড় হলঘরে সমবেত হলাম। চার-পাঁচ জন বয়স্ক শ্রমিকনেতা আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে জানা গেল ছয়ষট্টি প্রকার বিভিন্ন কারখানা, শিল্প, দপ্তরখানা শিক্ষালয়ের নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত। শ্রমিক শিক্ষক ও কেরাণীর মোট সংখ্যা তিন কোটি নব্বই লক্ষ। এর মধ্যে তিন কোটি ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য। শাখা ও আঞ্চলিক শ্রমিক-সঙ্ঘগুলির বছরে দু'বার নির্বাচন হয়। কেন্দ্রীয় কমিটি যন্ত্রের উন্নতি, শারীরিক শ্রম লাঘব, শ্রমিকদের মর্যাদা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক উন্নতি প্রভৃতি বিবেচনা করে সংস্কারের প্রস্তাব করেন, সর্বজনের সমর্থনে তা অনুমোদিত হলে বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান তা গ্রহণ করেন এবং গভর্ণমেণ্টও সেই ভাবে আইন সংশোধন করেন।

সদস্যরা উপার্জনের শতকরা এক ভাগ মাসিক চাঁদা দেয়। এ ছাড়া কারখানা ও গভর্ণমেণ্টও নির্দিষ্ট হারে অর্থ দেন। এই অর্থে এঁরা বর্তমানে ৯ হাজার ৫শ' সংস্কৃতি-ভবন, ক্লাব ও শিক্ষালয়, ১০ হাজার ছোট-বড় রেড ক্লাব এবং ৮ হাজার ৫শ' লাইব্রেরী ও পাঠাগার (বই ৫ কোটি) পরিচালনা করেন। শ্রমিকরা বার্দ্ধক্যে বা রোগে অকর্মণ্য হয়ে পড়লে 'স্যোশাল' ইন্সিওরেন্স ভাণ্ডার থেকে তাদের ভরণপোষণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিকদের কর্তব্য ও অধিকার, অতি নির্দিষ্ট ভাবে বিধিবদ্ধ।

(১) যারা কলকারখানায় কাজ করছে, দপ্তরখানা কিম্বা উচ্চতম অথবা কারিগরী বিদ্যালয়ে বিশেষ বৃত্তির শিক্ষালাভ করছে, সেই সব সোবিয়েত রাষ্ট্রের নাগরিক মাত্রই ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হতে পারবে।

(২) ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যদের এই সব অধিকার আছে—

(ক) ইউনিয়নের সাধারণ সভায় যোগদান;

(খ) ইউনিয়নের সংস্থা, সম্মেলন এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা ও নির্বাচিত হওয়া;

(গ) ইউনিয়নের কাজের উন্নতির জন্য প্রস্তাবাদি উত্থাপন করা;

(ঘ) ট্রেড ইউনিয়নের সভা-সমিতি, কংগ্রেস এবং সংবাদপত্রে, স্থানীয় অথবা উচ্চতর ইউনিয়নগুলির কর্মকর্তাদের সমালোচনা করা প্রশ্ন করা বিবৃতি দেওয়া অথবা অভিযোগ উপস্থিত করা;

(ঙ) যে পরিচালকবর্গ সম্মিলিত চুক্তিভঙ্গের অথবা প্রচলিত শ্রমিক আইন, 'সোশ্যাল' ইনসিওরেন্স, সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণের বিধিবদ্ধ নিয়ম লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী, সেখানে ট্রেড ইউনিয়নের নিকট সুবিচার প্রার্থনা করা;

(চ) কারো কাজকর্ম ও আচরণ সম্বন্ধে যখন ইউনিয়ন কোন মন্তব্য প্রকাশ করে তখন সেখানে ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিতি দাবী করা।

(৩) প্রত্যেক ইউনিয়ন সদস্যের কর্তব্য—

(ক) পৌর ও শ্রমিক শৃঙ্খলা সর্বপ্রযত্নে মেনে চলা;

(খ) সোবিয়েত পদ্ধতির অটল ভিত্তি জনসাধারণ ও সমাজ-তান্ত্রিক সম্পত্তি, দেশের ঐশ্বর্য ও শক্তির উৎস, শ্রমজীবীদের সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির প্রাণশক্তির উৎস নিরাপদ রাখা ও রক্ষা করা;

(গ) যোগ্যতার সমুন্নতি এবং স্ববৃত্তি পরিপূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করা;

(ঘ) স্ব স্ব শ্রমিকসঙ্ঘের নিয়মতন্ত্র মেনে চলা এবং নিয়মিত ভাবে চাঁদা দেওয়া।

(৪) প্রত্যেক সদস্যই নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাবার অধিকারী—

(ক) যারা সদস্য নয়, তাদের থেকেও বেশী পরিমাণে রাষ্ট্রের 'সোশ্যাল' ইনস্যিওরেন্স ভাণ্ডার থেকে সদস্যরা অর্থসাহায্য পাবে; এই সাহায্য পাওয়া অবশ্য রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুনের অধীন;

(খ) বিশ্রামাগার, সেনাটোরিয়াম, স্বাস্থ্যনিবাস প্রভৃতিতে যাওয়ার ছাড়পত্র বিতরণে এবং ছেলেমেয়েদের শিশুপালনাগার, কিণ্ডারগার্টেন এবং তরুণ পাইওনিয়র্স শিবিরে পাঠাবার অগ্রাধিকার;

(গ) ট্রেড ইউনিয়ন ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজন মত সাহায্য;

(ঘ) শ্রমিকসঙ্ঘ থেকে বিনামূল্যে আইনের পরামর্শ;

(ঙ) প্রত্যেক সদস্যের পরিবারবর্গের নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক ও খেলাধূলার প্রতিষ্ঠানে যোগদান;

(চ) স্ব স্ব শ্রমিকসঙ্ঘের পারস্পরিক সহায়ক সমিতির সদস্য হবার অধিকার।

বলা বাহুল্য, শ্রমিকদের কর্তব্য ও অধিকারের এই ধারাগুলি আমি ওদের মুদ্রিত নিয়মতন্ত্র থেকে বলছি। এর মধ্যে দুর্লভ বা দুরূহ কিছু নেই। কিন্তু এই নিয়মের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজের আত্মীয়তা নিবিড় হয়ে উঠেছে এইটে চোখে দেখে এলাম। পশ্চিমী সভ্যতার ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বুলি তোতাপাখীর মত আমরাও কপচাই, কিন্তু তলিয়ে দেখি নে, ঐ বুলির আড়ালে দানবীয় লোভ, মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ককে কি গভীর অনৈক্যে কলুষিত করে দিয়েছে। আমাদের দেশে যা দেখি, তা কেবল ধনী-নির্ধনের ভেদ নয়, জাতিভেদ ধর্মভেদ তো আছেই, তার ওপর শিক্ষা বিদেশী ভাষায় হওয়ায়, শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং "ছোটলোকের" মধ্যে সামাজিক আত্মীয়তা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বেচ্ছাচারের এই চেহারা কত কুৎসিত! ছলে বলে কৌশলে আমি বড় হব, আমি ভোগ করবো, মানুষকে দূরে ঠেকিয়ে রেখে অপমান ও বঞ্চনা করা সমাজজীবনে কত বিচিত্র আকারে প্রকাশিত! সোবিয়েত রাশিয়ার মানুষ এই সব অতিক্রম করার কঠিন পণ করেছে, ওদের শ্রমিকসঙ্ঘের গঠন ও পরিচালনা প্রণালী পরস্পরের প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা।

২০

৩০শে জুলাই অপরাহ্নে তাসকেণ্টে আসা গেল। নগর-উপকণ্ঠে বাগান-ঘেরা একটি বাংলোয় এসে উঠলাম। আগের রাত্রে মস্কোএ লেখকসঙ্ঘের অভ্যর্থনা-সভায় বক্তৃতা ও নৃত্যগীতের পালা মিটতে রাত্রি দুটো হয়েছিল, তারপর আড়াই হাজার মাইল বিমানে পাড়ি দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বিকেল বেলা; আমাদের দেশের

মতই গরম। স্নান আহার শেষ করে বিশ্রাম। অনেক দিন পর মশলাসহ নদীর মাছের সুস্বাদু ঝোল সহযোগে পোলাও খাওয়া গেল।

মধ্য-এশিয়ার প্রজাতন্ত্র দেশগুলির মধ্যে উজবেকিস্তান সর্ববৃহৎ—উজবেক জাতিই সংখ্যাগরিষ্ঠ, জনসংখ্যা ৬৬ লক্ষ। তাসকেণ্টের অধিবাসীই সাড়ে সাত লাখ। অন্যান্য সব জাতের মতই এরাও মিশ্র জাতি। এদের ধমনীতে মোঙ্গল ও তাতার রক্ত আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই জাতের মধ্যেই দিগ্বিজয়ী তিমুরের অভ্যুত্থান—দিল্লী থেকে মস্কো বার নিষ্ঠুর অভিযানে কম্পান্বিত হয়েছিল। এখান থেকেই তিমুরের বংশধর বলে কথিত বাবর ফারগানা থেকে দিল্লীতে এসে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সমরখন্দের সঙ্গে হিন্দুস্থানের যোগাযোগ কয়েক শতাব্দীর। দার্শনিক আলবেরুণী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী উলুক বেগ, কবি আলীশকোয় নাভাইএর খ্যাতি একদিন সমগ্র প্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ যে ভাবে সমগ্র প্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, ঠিক সেই ভাবেই সাহসী, রণনিপুণ পরিশ্রমী, ও শিল্প ও কারুকলায় উন্নত উজবেকদের জাতীয় জীবনের ওপর অন্ধকার নেমে এলো। জার-সাম্রাজ্যবাদ-কবলিত উজবেক জাতি—মোল্লাতন্ত্র ও জারতন্ত্রের শোষণ-শাসনে, দরিদ্র কৃষক-মজুর ও যাযাবরে পরিণত হল। কিন্তু অক্টোবর বিপ্লব ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিল। ১৯২৪-২৫ থেকে এক নূতন অভ্যুত্থান। সেদিন এরা আমাদের দেশের চেয়েও পিছিয়ে ছিল,—শতকরা ১৮ জন ছিল নিরক্ষর। রুক্ষ মরুভূমির কৃপণ মাটিতে মাথা খুঁড়ে যা পেত, তার অধিকাংশই, সেখ ও বেগের (অভিজাত) দল নানা ছলে কেড়ে নিত। কিন্তু এক জায়গায় ওদের সঙ্গে আমাদের মিল ছিল। সে হল ধর্ম, সম্প্রদায় নিয়ে কলহ। জারের আমলে ওরা আমাদের মতই ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মাথা ফাটাফাটি করতো। সাম্রাজ্যরক্ষার এই ভেদনীতির বিষাক্ত শিকড়, আত্মসম্বিৎহীন সমাজকে টুকরো টুকরো করেও একত্র বেঁধে রাখে, যেমন বট-অশ্বত্থের শিকড় পুরানো পরিত্যক্ত মন্দিরের শ্রীহীন বিকৃত ঠাটকে আঁকড়ে ধরে থাকে।

এর দুঃখ ও অপমান আমরা জানি। এই ভেদনীতির আর এক রূপ 'ল এণ্ড অর্ডার' অর্থাৎ শান্তি ও শৃঙ্খলা। ইংরাজ শাসকেরা জাঁক করে বলতেন,—কেবল কি হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতায়ও তোমরা পরস্পর কত বিভক্ত ও বচ্ছিন্ন, আমরা তোমাদের পিনালকোডের আওতায় ঐক্য দিয়েছি। আমরা চলে গেলে তোমরা কাটাকাটি করে মরবে। মারামারি মাথা ফাটাফাটিটা অনেক ইংরাজ পছন্দ করতেন না বটে, তবে রেষারেষিটা থাকুক, এটা তাঁরা চাইতেন। তাই ইংরাজ আমলে আমরা একশাসন পেয়েছিলাম, একজাতীয়ত্ব পাইনি। এক ভারতীয় 'নেশন'রূপে গড়ে উঠবার বনিয়াদ ছিল, মালমশলারও অভাব ছিল না, তবুও পরিণামে সাম্প্রদায়িক বিরোধটা ক্রমে বিচ্ছেদে পরিণত হয়ে ভারতের ইতিহাসে এক শোকাবহ পরিণতি লাভ করলো এবং আমরা তা স্বীকার করে নিলাম।

এখানে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অবসানের ইতিহাসের ধারা সম্পূর্ণ আলাদা। বলশেভিক বিপ্লবীরা, ক্ষমতা হাতে পাবার বহু পূর্বেই রাশিয়ার সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতি ও সম্প্রদায়গুলির সমস্যা মীমাংসা করে রেখেছিল। এ ভার একদিন লেনিন স্তালিনকে দেন। স্তালিনের রচিত "মার্কসবাদ এবং জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন',—রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে তাঁর অবিস্মরণীয় দান। স্তালিনের এই মৌলিক গবেষণার ভিত্তিতে ১৯১৭ সালেই নবগঠিত সোবিয়েত সরকার ঘোষণা করেছিলেন,—(১) রাশিয়ার জনসাধারণের সকলের অধিকার সমান; (২) স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সকলের; (৩) জাতিগত ধর্মগত কোন বিশেষ সুবিধা ও বাধা বিলুপ্ত করা হল; (৪) সমস্ত সংখ্যালঘু জাতি বা গোষ্ঠীর আত্মোন্নতির স্বাধীনতা অবাধ।

অতএব যা ঘটলো, তা ক্রমোন্নতি নয়—বিভিন্ন শ্রেণী, সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও অধিকারের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা নয়; একেবারে ঔপনিবেশিক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা। প্রাচীন অভিজাতশ্রেণী এবং রুশ শাসকশ্রেণী বাধা দিয়েছিল প্রচুর। কিন্তু বিপ্লবীরা ভড়কে গিয়ে তাদের সঙ্গে আপোষ করেনি, তারা শোষকশ্রেণীকে এক হাতে উচ্ছেদ করেছে, আর এক হাতে শোষকশ্রেণীর উৎপত্তির কারণগুলি নির্মূল করে ফেলেছে।

নূতন অর্থনৈতিক বনিয়াদের ওপর সমাজব্যবস্থা পত্তন করতে বেগ পেতে হয়েছে। অশিক্ষা ও ধর্মমূঢ়তায় এরা ছিল আচ্ছন্ন। নারীদের অবরোধমুক্তি এবং শিক্ষাদানের সূচনায় মোল্লারা ক্ষেপে গিয়েছিল। তার অনেক কৌতুককর কাহিনী

শুনলাম। বিপ্লবীরা রুশ বর্ণমালায় উজবেক কথ্য ভাষায়, পাঠ্য-পুস্তক, ব্যাকরণ তৈরী করলো—দেশের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হল লৌকিক শিক্ষায়তন। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের সমান অধিকারবোধ জাগ্রত হল। সমঅধিকারভোগী বৃহৎ মানব-পরিবার দানা বেঁধে উঠলো, নিজস্ব শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্য নিয়ে উজবেকীরা আজ সোবিয়েত রাষ্ট্রে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এখন উজবেকিস্তানে একজনও নিরক্ষর নেই। মেয়েরা 'পাঞ্জারা' (বোরখা) ফেলে অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করছে। এদের নাগরিক জীবনে রুশ-সংস্কৃতির তুশো বছরের ছাপ সুস্পষ্ট। মেয়ে-পুরুষ সকলেরই পোষাকে ইয়োরোপীয় ঢং। তবে পুরুষেরা আলখেল্লা ও টুপী ছাড়েনি, মেয়েরাও সোনা-রূপো ও মূল্যবান পাথরের ঝালর-দেওয়া টুপী পরে তু'পাশে লম্বা বেণী তুলিয়ে দেয়—চোখে দেয় কাজল ও সুর্মা, অলঙ্কারেরও প্রাচুর্য আছে।

পঁচিশ বছর পূর্বে যে সব মেয়ে অন্তঃপুরে ছিল দাসী-বাঁদি হয়ে, কিম্বা কোন বেগের বহু পত্নীর অন্যতমা, নয়া সমাজব্যবস্থায় শিক্ষার প্রসারে তাদের সহজ স্বচ্ছন্দ মুক্তি দেখলে চমক লাগে। জড়প্রথার দাসত্বে অভিভূত সনাতন প্রাচ্যের অবগুণ্ঠিত জীবনের এই অসঙ্কোচ আত্মপ্রকাশ দেখতে পাওয়া এক দুর্লভ সৌভাগ্য। উজবেক মেয়েরা কলকারখানায় কাজ করছে, ট্রাম-বাস চালাচ্ছে, সরকারী কার্যালয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রঙ্গমঞ্চে সর্বত্র যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করছে। কৃষিবিজ্ঞানী, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়র, বৈজ্ঞানিক, লেখিকা, গায়িকা, নর্তকীর সংখ্যা মেয়েদের মধ্যে কম নয়। উজবেক রিপাবলিকের ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট নারী। একদিন তাঁর দপ্তরখানায় আমাদের চা-পানের আমন্ত্রণ হল। গিয়ে দেখি, প্রতিনিধিস্থানীয়া কয়েক জন মহিলাও রয়েছেন। শুনলাম, সুপ্রীম সোবিয়েতের মহিলা সদস্য তের জন, উজবেক পার্লামেণ্টের মহিলা সদস্য একশ' জন। শাখা সোবিয়েত মণ্ডলীতে নারী সদস্য চৌদ্দ হাজার। এখানকার ৪৭ হাজার শিক্ষক অধ্যাপকের মধ্যে ১১ হাজার নারী, মহিলা ডাক্তার চারশ'। মাত্র পঁচিশ বছরে মধ্যযুগীয় বর্বর সামাজিক ব্যবস্থায় অধিকার-বঞ্চিতা নারীরা চার শতাব্দী অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

গৃহকর্মের সঙ্কীর্ণ পরিবেশের মধ্যে, স্বামী পুত্র আত্মীয়বর্গের সেবা এবং অকল্যাণের ভয়ে বার ব্রত দেবতার কাছে মানত করা এই নিয়ে যখন ছিল মেয়েদের জীবন, যখন পুরুষ-রচিত শাস্ত্রবিধির বন্ধনের কড়াকড়ি ছিল কঠোর, তখনো গৃহকর্মের গণ্ডী কেটে অনেক নারী নিজেদের প্রতাপ ও প্রতিভা বিস্তার করেছেন, সব দেশের ইতিহাসেই তার নজীর আছে। ইতিহাসে ধন্যা এই সব মহীয়সী নারীদের নিয়ে আমরাও গর্ব করে থাকি। পুরুষ সমাজের বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করে কি সামাজিক অবস্থায় তাঁরা স্বকীয় চেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তা আলোচনা করলে বোঝা যাবে ওটা নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম।

নব্য ইয়োরোপের স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলনের তরঙ্গে প্রাচ্যও আন্দোলিত হয়েছিল। বিগত শতাব্দীতে বাঙলা দেশে সুরুতে রক্ষণশীল ও সংস্কারকদের বাদানুবাদের দীর্ঘ ইতিহাস আলোচনা করতে চাই নে। পরিবর্তন হয়েছে প্রচুর, সমাজের বিরুদ্ধতার জোর কমে গেছে। ধর্মের নামে যে সব অনুশাসন মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে,—তার বন্ধন থেকে সমাজের শিক্ষিত স্বচ্ছল স্তরে নারীরা কিছুটা মুক্তি পেলেও সমাজের সর্বস্তরে তার প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়নি। আমাদের দেশের অধিকাংশ পুরুষ, এমন কি শিক্ষিতবর্গের মনেও এই ধারণা রয়েছে যে, কোন অবস্থাতেই মেয়েদের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয়, তাতে পারিবারিক জীবন হবে অশান্তিময়, সমাজে বাড়বে উচ্ছৃঙ্খলতা। যে বিধি-নিষেধ পুরুষ মানে না, যে আচার তারা পালন করে না, মেয়েদের বেলায় তারই কড়াকড়ি। মেয়েদের আমরা স্বাধীনতা দিচ্ছি, শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছি, কিন্তু তা আধুনিক সভ্যতার প্রতি ভদ্র দায়িত্ববোধের চক্ষুলজ্জায়, কতক যন্ত্রযুগের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে, নিরুপায় হয়ে। মনটা রয়েছে মনু পরাশর জীমূতবাহনের যুগে।

রামমোহনের যুগে, বিধবাদের স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারবার অনুকূলে সমাজপতিরা এই যুক্তি দিয়েছিলেন যে, বিধবারা ব্যভিচারিণী হয়ে ধর্মহানি ঘটাবে। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রস্তাবের বিরোধিতায় শাস্ত্রবাক্যের কুযুক্তির সঙ্গে বড় বড় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা এ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, এ অধিকার দিলে নারীরা স্বামীদের বিষ দিয়ে হত্যা করে মনোমত পতি অন্বেষণ করবে। এর একশ' বছর পরে "হিন্দু কোড বিলের" বিরুদ্ধে দেবীরূপিণী ভারত-নারীর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভারতসন্তানগণ তারস্বরে চীৎকার করে বলছেন, মেয়েরা সম্পত্তির অধিকার পেলে দেশশুদ্ধ নারী স্বৈরিণী হয়ে যাবে, আর বিবাহবিচ্ছেদ আইনসঙ্গত হলে বউ নিয়ে ঘর করা চলবে না। মেয়েরা মনুষ্যোচিত স্বাধিকার বিসর্জন দিয়ে অন্ধ সংস্কারের মধ্যে মুগ্ধা হয়ে থাকুক,—এই নির্বোধ প্রত্যাশা যাদের, তাদের যুগধর্মের নিয়মে পরাভব মানতেই হবে।

পুরুষ-রচিত বিধি-ব্যবস্থায় আমাদের দেশের অন্তঃপুরিকারা অপমানবোধহীন ভয়ত্রস্ত নিরানন্দ জীবন যাপন করতেন। এক জড় প্রথার অন্ধ আনুগত্যকে নিষ্ঠা মনে করে অবোধের যে সান্ত্বনা, তাই দিয়ে নিজেদের ভোলাতেন, এও দেখেছি। আর অর্দ্ধ শতাব্দী পরে দেখছি, আমাদের দেশের মেয়েরাও বিশ্বচিত্ত উদ্বোধনের আহ্বানে, দেশের বিবিধ মঙ্গল কর্মশালার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে কল্যাণলক্ষ্মীর মত দাঁড়িয়েছেন। দীর্ঘকাল মনে এই আশা পোষণ করেছি, এঁরাই জ্ঞানের দীপ হাতে অবজ্ঞাত ভগিনীদের মনের অন্ধকার কোণ আলোকিত করে তুলবেন। [আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

ভাষা ছিল না

"মোপাসাঁর মত যে-সব বিদেশী লেখকদের কথা তোমরা প্রায়ই বলো, তাঁরা তৈরী ভাষা পেয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ভাষা গড়তে হ'লে তাঁদের কি দশা হ'তো জানি নে।" —রবীন্দ্রনাথ।

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স

১৬৭ সি, ১৬৭ সি/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও বহুবাজার ষ্ট্রীটের সংযোগস্থল)
আমাদের পুরাতন শোরুমের বিপরীতদিকে ফোন- এভিন্যু ১৭৬১ গ্রাম-ব্রিলিয়াণ্টস,

ব্রাঞ্চ—হিন্দুস্থান মার্ট, বালিগঞ্জ ফোন—পি. কে. ৪৪৬৬

শ্রীরমেন চৌধুরী

ষ্টুডিয়ো-পরিচিতি

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম

মনের অমিলের জন্যেই প্রযোজক-পরিচালক প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী, চিত্রশিল্পী যতীন দাস, শিল্প-নির্দেশক বটু সেন প্রভৃতি কলাকুশলীরা ম্যাডান ষ্টুডিয়োর যাবতীয় বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়লেন মুক্ত আকাশের তলে। খুশির হাওয়া অবিশ্যিই দোলা দিয়েছিলো তাঁদের বিরূপ মনের কোণে-কোণে··· অচিরে শুভ সূচনা দেখা দিলো। ম্যাডান ষ্টুডিয়োর (এখনকার ইন্দ্রপুরীর) সামনের যে-পথ গোড়ে অভিমুখে চলে গেছে, সেই পথে বেশ কিছুটা এগিয়ে আবার ফেললেন তাঁবু, গড়ে উঠলো নব প্রচেষ্টায় নতুন ইমারত···সামনে-পিছনে ফুলে-ফলে-ভরা বৃক্ষবাটিকা। নাম চাই—ভূমিষ্ঠের পরিচয়। অগোণে তা-ও সমাধা হোলো। দেরি লাগলো না একটুও ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর জন্ম-বিবরণী জানতে দেশের সাধারণের। ষ্টুডিয়োর সংখ্যাবৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট হলেন তাঁরা।

কাজ শুরু হ'য়ে গেল গাঙ্গুলী মশায়ের পরিচালনাধীনে—১৩২ সালের মাঝামাঝি 'যমুনা পুলিনে' গৃহীত হোলো। আলোকচিত্রী যতীন দাস, আর, সি, এ,-কোম্পানীর শব্দযন্ত্রী মিঃ উইলম্যান ও তাঁর ভারতীয় সহকারী সি, এস, নিগম, শিল্প-নির্দেশক বটু সেন প্রভৃতি আলোকচিত্র, শব্দযন্ত্র ও শিল্প-নির্দেশনায় প্রত্যক্ষ সাহায্য করলেন গাঙ্গুলী মশাইকে। সে সময়ে যতীন দাস, শৈলেন বসু, প্রবোধ দাস, কৃষ্ণগোপাল ক্যামেরায়, সাউণ্ডে উইলম্যান, ব্রাডবার্ণ আর ল্যাবরেটরীতে ভুল মাষ্টার ও অন্যান্যকে দেখা গেছে। অবিশ্যি সি, এস, নিগম বছর খানেক পরে স্বাধীন শব্দযন্ত্রী হয়েছিলেন।

বি, এল, খেমকা ছিলেন ষ্টুডিয়োর কর্ণধার, যদিও রায় বাহাদুর মতিলাল চামেরিয়ার অর্থে পুষ্ট হয়ে উঠেছিলো সকল আয়োজন।

এক দিনের রাজা বা 'কিং ফর এ ডে' আকতার নওয়াজের পরিচালনায় উঠলো—এ হোলো কোম্পানীর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। বোম্বায়ের বিখ্যাত কারদার প্রোডাক্সনের কর্ণধার এ, আর, কারদারের প্রথম দেখা সেদিন এখানেই পাওয়া গেছে; 'আওরাৎ কা পেয়ার', 'চন্দ্রগুপ্ত' (উর্দু), 'সুলতানা', 'বাঘী সিপাহী'—সব ক'টি এই কারদার-পরিচালিত চিত্র, তখনকার দিনের দর্শকের চিত্ত ও প্রচুর বিত্ত আকর্ষণের গৌরবের অধিকারী। এরই ফাঁকে নরেশ মিত্র মশায়ের 'সাবিত্রী' (বাঙলা) প্রস্তুত হয়।

শুধু ভারতে নয়, পাশ্চাত্যেও তখনকার ছবি আলোড়ন জাগিয়েছিল চিত্রামোদীদের হয়তো সে কথা মনে নেই। সে ছবি হোলো 'সীতা' (হিন্দি)। পৃথ্বীরাজ, দুর্গা খোটে ইত্যাদি আজকের দিনের অতিখ্যাত শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, পরিচালক ছিলেন দেবকীকুমার বসু। ভিনিসের প্রদর্শনীতে তৎকালের শ্রেষ্ঠ ছবির জয়মাল্য লাভ করেছিলো এই সীতা। এর পর মধু বোস তৈরি করেন 'সেলিমা'। এ সবই ৩৪।৩৫ সালের ঘটনা। এই সময়েই গাঙ্গুলী মশাই তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রীজ গঠন করবার জন্যে এখানকার মায়া-ডোর ছিন্ন করেন।

ছত্রিশ সালে গুলহামিদ তুললেন 'খাইবার পাস'। কিন্তু এতাবৎ যত ছবি কোম্পানীর উঠেছিলো সে সবকে surpass করে গেল একখানা ছবি। বলুন তো কি নাম? হাসিখুশি হৈ-চৈ-ভরা বাঙলার কমেডিয়ানদের একত্র সমাবেশ, যাকে বলে একটি সংসার—কি বললেন, তাকে সোনা সংযুক্ত করতে হবে? তা ঠিক, কাঁড়ি কাঁড়ি সোনা দিয়েছে এই 'সোনার সংসার' ছবিটি! ইষ্ট ইণ্ডিয়ার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়েছে দেবকী বসুর অনবদ্য সৃষ্টিটি। এমন একখানি সুন্দর ছবি কই বিশেষ তো দেখি না আজ-কাল?

এ, এস, প্যাণ্ট'র পরিচালনায় এইবার একখানা ছবি গৃহীত হয় পারস্য ভাষায়, নাম তার 'লায়লা মজনু'। মিঃ খেমকার নেতৃত্ব বা কর্তৃত্বের মেয়াদ এই পর্যন্ত। এখন রায় বাহাদুর স্বয়ং ভার গ্রহণ করলেন, ছবি উঠলো: 'রাঙা বউ', 'যখের ধন', 'মিলাপ', 'ব্যবধান', 'নিমাই সন্ন্যাস,' 'আহুতি', 'মহাকবি কালিদাস'—নীরেন লাহিড়ী, জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরি ভঞ্জ, ফণি বর্মা, ডি, জি, কারদার প্রভৃতি পরিচালকের তত্ত্বাবধানে।

'এ-জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি'—সেই জন্যেই না জ্বলে আগুন, বাধে যুদ্ধ জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে! লোভের হুতাশন ছারখার করে দেশ-দেশান্তর, কত জনপদ পরিণত করে শ্মশানে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ বিভীষিকার অন্ধকারে ঢেকে গেল ভারতের মাটি আর আকাশ। সেই অবকাশে এখানকার সৈন্যবাহিনী দখল করে নিলো এই সাজানো ষ্টুডিয়োটি। সত্যিই সাজানো ছিলো ইষ্ট ইণ্ডিয়ার চার ধার! এখন অতীতের কংকাল বর্তমান (যদিও এ-ও নেহাৎ নিন্দনীয় নয়), সে সময়ের শোভা অতি অরসিকেরও মন হরণ করতে পারতো। বাদশাহী হারেমের অভ্যন্তরের স্নানাধার একটি নির্মিত হয়েছিলো ষ্টুডিয়ো প্রাঙ্গণে 'সেলিমা' ছবিতে দেখাবার জন্যে, তার বিগত-শ্রী রূপটি এখনও চোখে পড়ে। জল এখনও আছে, তবে কাক-চক্ষুর মত টলটল্ করে না। শুনলুম, অবিলম্বে ষ্টুডিয়োর আমূল সংস্কার করা হবে।

প্রয়োগ-শিল্পী দেবকীকুমার বসুর 'কবি' ও 'রত্নদীপ' যে সাড়া জাগাইয়াছিল, 'মন্দির' তারই পুনরাবৃত্তি করিল!

শ্রী · পূর্ণ · ছায়া

(২-৩০, ৫-৪৫, ৯) (৩, ৬, ৯) (৩, ৬, ৯)

অজন্তা শ্যামশ্রী পারিজাত গৌরী মায়াপুরী নেত্র উদয়ণ

(বেহালা) (হাওড়া) (শালকিয়া) (উত্তরপাড়া) (শিবপুর) (দমদম) (শেওড়াফুলি)

পরিবেশক: কল্পনা মুভিজ লিঃ

ষ্টুডিয়োর হাল এমন হবে না-ই বা কেন? ন' বছর ধরে সৈন্যদের লরী মেরামতের ঠেলায় সব ওলট-পালট হয়ে গেছে, এর নিজের মেরামতি এখন আশু প্রয়োজন! তা নইলে দু'টি প্রশস্ত ফ্লোরে কাজ নেহাৎ কম হতে পারবে না। ফ্লোর তো দু'টি বললুম, কিন্তু উপস্থিত একটি ধরতে হবে। অন্যটি অদৃষ্টের ফেরে ৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে (মিলিটারীর কাছ থেকে ফেরত পাওয়ার পরই) অগ্নিদেবের জঠরে আশ্রয় নিয়েছে। তার কাঠামোটি টিকে আছে এবং সেখানে শীগ্‌গিরই মাথা তুলবে নব দেহে চিত্র-নির্মাণ-কক্ষটি!

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম অতীত ঐতিহ্য বজায় রাখতে আবার নব উদ্যমে কোমর বেঁধেছেন। এবার আছেন চিত্রশিল্পী যতীন দাস, বীরেন দে, শব্দযন্ত্রী মধু শীল, শচীন চক্রবর্তী, শিল্প-নির্দেশক বটু সেন, পরিচালক নীরেন লাহিড়ী, ফণি বর্মা ইত্যাদি। অতি-আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়েই এঁরা কাজ করছেন। উপস্থিত দু'খানি বাঙলা চিত্র নির্মীয়মান—'কাজরী'র পরিচালক নীরেন লাহিড়ী এবং 'বিশ্বামিত্র' পরিচালনা করছেন ফণি বর্মা।

তারপর? শুধালাম সচিব কুমুদরঞ্জন দাস মশাইকে। চা ততক্ষণে এসে গেছে, শ্রীযুক্ত দাস অমায়িক হাস্যে চায়ের পেয়ালাটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, আগে গলাটা ভিজিয়ে নিন তো!

মিঃ বোথরা এখন নেতৃত্ব করছেন; ভালো লাগলো তাঁর আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা। শ্রীযুক্ত দাস যে আগ্রহ ও ধৈর্য নিয়ে আমায় সাহায্য করেছেন সেজন্যে সকলের পক্ষ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। বন্ধুর সংখ্যা যে আমার একটি বৃদ্ধি হোলো এ-কথা সানন্দে আমি স্বীকার করছি।

কলা-কুশলী

শিল্প-নির্দ্দেশক বটু সেন

শ্রীবটকৃষ্ণ সেন অমায়িক, ভদ্র, মিশুক প্রকৃতির মানুষ, অহংকারের নাম-গন্ধ নেই। হাসিমুখে সকলের সব কথা শোনেন, উত্তর দেন একটু ধীরে ধীরে। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা

শিল্প-নির্দ্দেশক বটু সেন

ফুটে ওঠে কথার মাঝে—ছায়াছবির রাজ্যে তা কাটালো বৈ কি জীবনের অমূল্য অনেকগুলি বছর।

বটু সেন শিল্প-নির্দেশক। ছায়াছবির গল্প অনুযায়ী পরিবেশ সৃজন হোলো শিল্প-নির্দেশক বা art direetorএর প্রথম ও প্রধান কাজ; এক কথায় বলতে পারা যায়, দৃশ্যাদি দিয়ে কাহিনীকে সাজানো—যিনি যত জাত-শিল্পী তাঁকে দিয়ে ততই ছবিকে প্রাণবন্ত করে তোলা যায়। তাই বলে এ-কাজকে 'জলবৎ তরলং' বলে কেউ যেন ভেবে বসবেন না, অত্যন্ত শক্ত কাজের অন্যতম এটি। আজকালকার অধিকাংশ ছবির art direction অবশ্যি 'ঠেক্ দেও' গোছের হচ্ছে, না আছে তার কলা-কৌশল, না আছে মুন্সিয়ানা। যাই হোক, বটু বাবুকে প্রথম শ্রেণীর পর্য্যায়ে ফেলা চলে চোখ বুজে। অসংখ্য চিত্রে তিনি সফলতার সংগে এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করেছেন, দু'হাতে কুড়িয়েছেন দর্শক ও কলারসিকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। কলকাতার এক বিশিষ্ট পরিবারে বটু সেন জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৮ সালে। শিশু বয়েস থেকেই ছবি আঁকায় তীব্র অনুরাগ থাকায় তাঁকে গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি করে দেয়া হয়। সেখান থেকে সসম্মানে ছাড়-পত্র নিয়ে বটু বাবু যথাসময়ে বেরুলেন। অ্যালফ্রেড থিয়েটারের স্বনামধন্য শিল্পী দিনসা ইরাণীর তখন খুব নাম-ডাক—হাতে-কলমে শিক্ষানবিশী শুরু করলেন তাঁর কাছে বটু সেন। বেশ কিছু দিন শিক্ষা অর্জন করে তিনি যোগ দিলেন তৎকালীন ম্যাডান ষ্টুডিয়োয়; অবিশ্যি অল্প কাজ।

১৯৩২ সালে প্রযোজক-পরিচালক প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী প্রভৃতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীতে চলে আসেন, ইনিও তাঁদের সংগে হাজির হলেন সেখানে। শিল্প-নির্দেশক হিসাবে পুরোপুরি ভাবে এই সময় থেকে এঁকে দেখা যেতে লাগলো। দীর্ঘ দিনের জ্ঞান-সঞ্চয় প্রকাশ পেল 'হিন্দি সীতা' ও 'সোনার সংসার' ছবির মাঝে। সাধারণ দর্শকের সংগে চিত্র-জগতেরও অনেক রথীরা বিস্মিত দৃষ্টি মেলে লক্ষ্য করলেন নবাগত শিল্পীকে। সুনামের সমাগম শুরু হোলো। এর পর 'আউরাৎ কা পেয়ার', 'সুলতানা', 'ঝুটা সিপাহী', 'মিলাপ', 'সেলিমা', 'রাঙা বউ', 'পথের শেষে', 'ব্যবধান', 'আহুতি', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'মহাকবি কালিদাস', 'দেবযানী' ইত্যাদি হিন্দি ও বাঙলা এবং মাদ্রাজী 'নন্দনার', 'লবকুশ', 'দক্ষযজ্ঞ', 'ভক্ত কুচেলা', 'বরবিক্রয়', 'নলদময়ন্তী', 'সাবিত্রী', 'সতী অনসূয়া', 'ধ্রুব', 'প্রহ্লাদ' ছবির শিল্প-নির্দেশনা করেন বটু বাবু। এ ছাড়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আরো ছবির কাজ করেছেন। যুদ্ধের হিড়িকে ইষ্ট ইণ্ডিয়ার কাজ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ হ'য়ে গেলে সেন মশাই প্রথম দিনের কর্মস্থলে ফিরে এলেন শিল্প-নির্দেশক হয়ে। নব উদ্যমে একে একে শিল্প-নির্দেশ দিলেন 'বন্দী', 'সন্ধি', 'শহর থেকে দূরে', 'মানে না মানা', 'রায় চৌধুরী', 'যোগাযোগ', 'ভাবী কাল', 'চাঁদের কলংক', 'আমিরি', 'সাধারণ মেয়ে', 'দেবী চৌধুরাণী', 'জিপ্‌সী মেয়ে', 'নারীর রূপ', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'বাগ্‌দাদ', 'আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ' প্রভৃতি চিত্ররাজির। এখন শ্রীযুক্ত সেন স্বাধীন শিল্প-নির্দেশক, কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের সংগে চুক্তিবদ্ধ নন, তাই সকলের ডাকে সাড়া দেবার সুযোগ রয়েছে তাঁর। ইষ্ট ইণ্ডিয়ার 'বিশ্বামিত্র' ও 'কাজরী' ছবির শিল্প-নির্দেশনায় উপস্থিত এঁকে দেখা যাবে।

টকির টুকিটাকি

ইতিহাস

শরৎচন্দ্রের 'মন্দির' রচনার—অনেকেরই আজ জানা নেই। না থাকলেও ক্ষতি ছিলো না, কিন্তু চিত্ররূপা সেই 'মন্দিরের' চিত্ররূপ দিয়েছেন, আর তা প্রদর্শিত হচ্ছে শহরে ও শহরতলীতে। ১৯১১ সালে এই মন্দির গল্পটি শরৎ-মাতুল সুরেন গাঙুলী মশায়ের নামে কুন্তলীন পুরস্কার পায় এবং উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। সেই গল্প অবলম্বন করেই দেবকী বসু চিত্রনাট্য করেছেন, পরিচালনা চন্দ্রশেখর বসুর।

যুগান্তর ছায়া প্রতিষ্ঠান

যুগান্তকারী শরৎ-রচনা 'বিন্দুর ছেলে'কে রূপায়িত করবার দুরূহ দায়িত্ব নিয়েছেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ পরিচালক নরেশ মিত্র দিয়েছেন চিত্ররূপ, চিত্ত বসু ব্যস্ত আছেন এর পরিচালনায়। মলিনা দেবী ও পাহাড়ী সান্যালকে দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে দেখা যাবে, সেই সংগে দেখা মিলবে সন্ধ্যারাণী, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কানু বন্দ্যো প্রভৃতির। বহু প্রতীক্ষিতের মুক্তি সমাসন্ন।

কার পাপে

কে সাজা পায়! কতো দিন ধরেই এই অদ্ভুত কাণ্ড চলে আসছে—রামের দোষে হচ্ছে শ্যামের তিলে তিলে মৃত্যু। কিন্তু উপায় কই? মানুষ বড়ই অসহায়!···যৌন-ব্যাধি ও তার প্রতিকারের পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে এম, পি-র নির্মীয়মান ছবি 'কার পাপে'। নেতৃত্ব করছেন কালীপ্রসাদ ঘোষ। এই ধরণের বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক।

ভারত চিত্রম্

চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন পরিচালক সুশীল মজুমদারের সংগে। আজও যে-ধরণের কাহিনীর চিত্ররূপ দেয়া হয়নি, যে-গল্পে আমাদের সমাজের খাঁটি রূপ ফুটে উঠবে পুরোপুরি—তেমনধারা বিষয়-বস্তু নিয়েই রচিত হচ্ছে চিত্রনাট্য। শিল্পী-নির্বাচন এগুচ্ছে। এটির সংগীত-পরিচালনা করবেন সুরশিল্পী কালোবরণ।

ধ্রুব

আসছে রূপালি-পর্দার প্রশস্ত বুকে। আয়োজনের ভার রলিক্স্ পিক্চার্সের, তত্ত্বাবধান পরিচালক চন্দ্রশেখর বসুর। কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ দিচ্ছেন মুখর হবার ভাব ও ভাষা।

বিশালাক্ষী পিক্চার্স

চিত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করবার আয়োজন করেছেন—'এরাই মানুষ'! এ-বিষয়ে সহযোগিতা করতে অগ্রসর হয়েছেন শোভা সেন, জহর,সমর, কানু, রবি রায়, তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি শিল্পীরা। প্রভাত চক্রবর্তীর পরিচালনায় এ-সবই অনুষ্ঠিত হবে।

রাত্রির তপস্যা

শুরু হয়ে গেছে 'বীণা' 'বসুশ্রী'র রম্য প্রেক্ষাগৃহে। সুশীল মজুমদারের নির্দেশেই রাত্রির তপস্যা—বর লাভ হোক, কামনা করি।

বর্ষার গান

যাকে বলে 'কাজ্‌রী'—শুনেছেন? আমাদের শোনা এবং দেখার ব্যবস্থা করছেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী। ধীরেন লাহিড়ী সুর-সংগতি ও পরিচালনা দিয়ে ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করতে ব্যস্ত, রূপ-শিল্পীরা প্রত্যক্ষ সাহায্যে অকৃপণ হয়ে আছেন। ভরা বাদরে গান মুখর হবে বলে মনে হয়।

ওয়েষ্টার্ণ ফিল্মস্-এর

'খুনী'—নিরবচ্ছিন্নই হত্যাকারী নয়। রোমাঞ্চের গন্ধ থাকলেও এ কাহিনীতে আছে মনস্তত্ত্বের জটিল সমস্যা। ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিয়োতে শীগ্‌গিরই ধীরেশ ঘোষের পরিচালনায় স্যুটিং আরম্ভ হবে।

শ্যামলী

এম. ভি. প্রোডাকৃশনের আগতপ্রায় অর্ঘ্য। পরিচালক হচ্ছেন বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ছায়া দেবী, পরেশ ব্যানার্জি, জহর গাঙুলী প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পীর দর্শন পাওয়া যাবে ছবিখানিতে।

চন্দ্রাবতী

এবার পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করছেন—তাঁর প্রথম ছবির নাম পরিবর্তিত করে 'প্রাচীর' রাখা হয়েছে। চিত্রগ্রহণ অবিলম্বে শুরু হবে।

উকুনের নতুন ওষুধ
নিউট্রল-লাইসাইড

"আমি আপনার ল্যাবরেটারীর উকুনের ঔষধের কথা আর বর্ণনা করিতে পারিলাম না। কী অমোঘ ঔষধ যে পাঁচ বছর ধরিয়া কোন ঔষধে কাজ হয় নাই অথচ আপনার ল্যাবরেটারীর ঔষধ একবার ব্যবহার করিয়া আমি এবং আরও ৫ জন মহিলা উপকৃতা হইয়াছেন। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।"

মিসেস বসু, কলিকাতা—২৬

প্রতি প্যাকেটের জন্য দুই আনার ডাকটিকেট পাঠাইবেন।

বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার কয়েকটি জেলায় এই "লাইসাইড" পরিবেশক প্রয়োজন। উচ্চহারে কমিশন দেবো।

Dept. M. B.

১৯, বণ্ডেল রোড ; কলিকাতা-১৯

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

কোজে বন্দীশিবিরে হত্যালীলা—

গত ছয় মাস ধরিয়া কোজে দ্বীপের মার্কিণ বন্দীশিবিরে কি ঘটিয়াছে, এই বন্দীশিবিরে রক্ষিত ৮০ হাজার চীনা ও উত্তর-কোরীয় যুদ্ধবন্দীদের উপর কি নৃশংস অত্যাচার চলিয়াছে, সে সংবাদ কিছুই প্রকাশিত হয় নাই বলিলেও ভুল হয় না। সংবাদ পাওয়াও যে খুব কঠিন তাহাতেও সন্দেহ নাই। গত ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে (১৯৫২) কোজে বন্দীশিবিরে হাঙ্গামা হওয়ার যে ছিটাফোঁটা সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রকৃত অবস্থাকে গোপন করিবার প্রয়াস বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। কোজে বন্দীশিবিরে কোরিয়া যুদ্ধে বন্দী চীনা ও উত্তর-কোরীয় সৈন্যদিগকে রাখা হইয়াছে। বন্দীশিবির সাধারণ জেলখানা নয়। আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে কিম্বা সালেম জেলে হাঙ্গামার সহিতও বন্দীশিবিরে হাঙ্গামার তুলনা চলিতে পারে না। কোরিয়ায় যুদ্ধ চলিতেছে, কোজে বন্দীশিবিরের বন্দীরা যুদ্ধবন্দী। কোজে বন্দীশিবিরে গত ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে (১৯৫২) যে হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে তাহার সহিত এই শিবিরের কর্তৃপক্ষ যুদ্ধবন্দী সম্বন্ধে জেনেভা-চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন কি না, এই গুরুতর প্রশ্ন যেমন জড়িত রহিয়াছে তেমনি কোরিয়া যুদ্ধবিরতি আলোচনার উপর উহার প্রতিক্রিয়া এবং আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে উহার ভয়াবহ পরিণতিও উহার সহিত নিবিড় ভাবে জড়িত। তথাপি এই হাঙ্গামার প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ত মোটেই হইত না, যদি গত ১০ই এপ্রিল (১৯৫২) কোজে বন্দীশিবিরে আর একটি হাঙ্গামা না ঘটিত এবং কোজে বন্দীশিবিরের অধিনায়ক (Camp Commandant) ব্রীগেডিয়ার জেনারেল ফ্রান্সিস টি. ডড্, কম্যুনিষ্ট বন্দীদের হাতে বন্দী না হইতেন, তাঁহাকে মুক্ত করিবার এবং শিবির দখল করিবার জন্ত তথাকথিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক সৈন্ত ও ট্যাঙ্ক প্রেরণ না করিতেন এবং ব্রীগেডিয়ার জেনারেল কলসন্ যদি ব্রীগেডিয়ার জেনারেল ডড্‌কে মুক্ত করিবার জন্ত কম্যুনিষ্ট যুদ্ধবন্দীদের দাবী স্বীকার করিয়া তাহাদের সহিত চুক্তি না করিতেন। উল্লিখিত ঘটনায় কোজে বন্দীশিবিরের ঘটনার প্রতি বিশ্ববাসীর সত্ৰাস দৃষ্টিই শুধু আকৃষ্ট হয় নাই, মার্কিণ সংবাদপত্র সমূহ পর্য্যন্ত এমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত বিব্রত না হইয়া পারেন নাই। কোজে ক্যাম্পে সব ভাল, এ কথা মার্কিণ সংবাদপত্রসমূহও আর স্বীকার করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারাও নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করিতেছেন।

কোজে বন্দীশিবিরে প্রথম হাঙ্গামা হয় ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫২)। কিন্তু এই হাঙ্গামার কারণের সূত্রপাত যে বহু দিন পূর্ব্বেই হইয়াছে এখন তাহা ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বন্দীবিনিময় যুদ্ধবিরতির একটি অপরিহার্য্য প্রধান অঙ্গ। কিন্তু কোরিয়া যুদ্ধবিরতি আলোচনায় বন্দীবিনিময় যে একটা গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করিবে তাহা আলোচনার প্রথম ভাগে তথাকথিত সম্মিলিত বাহিনীর অধিনায়কের পক্ষ হইতে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধবন্দীদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের অভিযোগ উপস্থিত করা হইতেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল। তথাকথিত সম্মিলিত বাহিনীর অধিনায়কবর্গ এমন একটা ভাব দেখাইতে লাগিলেন যে, নৈতিক দিক হইতে তাঁহারা কম্যুনিষ্টদের অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরে অবস্থিত। কম্যুনিষ্টরা নরপিশাচ, এ কথা অ-কম্যুনিষ্টরা বিনা প্রমাণেই স্বীকার করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অক্টোবর মাসের (১৯৫১) শেষ ভাগে যখন এক হাজার কোরীয়, ভিয়েটনাম ও ইয়েমেন বন্দীকে পরমাণু বোমার পরীক্ষার জন্ত জাহাজ বোঝাই করিয়া অজ্ঞাত স্থানে প্রেরণের সংবাদ প্রকাশিত হইল। নাভেদায় এই সকল বন্দীর উপর পরমাণু বোমার পরীক্ষা করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। উল্লিখিত সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর কম্যুনিষ্টগণ কর্তৃক বহুসংখ্যক যুদ্ধবন্দী নিহত হওয়ার অভিযোগের মধ্যে অনেক বাড়াবাড়ি আছে বলিয়া স্বীকার করা হয়। বস্তুতঃ, এই অভিযোগ মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে এবং স্বীকার করা হইয়াছে যে, উভয় পক্ষের শিবিরেই বহু যুদ্ধবন্দী রোগে ভুগিয়া মারা গিয়াছে।

কম্যুনিষ্টদের হাতে যে পরিমাণ যুদ্ধবন্দী আছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী যুদ্ধবন্দী আছে তথাকথিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর হাতে। বন্দীবিনিময়ের ব্যাপারে উহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়েই কম্যুনিষ্টরা বহু যুদ্ধবন্দী হত্যা করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করিয়া চাপ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু এই চাপ অপ্রত্যাশিত ভাবে ব্যর্থ হওয়ায় তথাকথিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর অধিনায়কের পক্ষ হইতে এক-এক জন বন্দীর পরিবর্ত্তে এক-এক জন বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব কম্যুনিষ্টদের নিকট গত ১১ই ডিসেম্বর (১৯৫১) উপস্থিত করা হয়। কিন্তু কম্যুনিষ্টরা দাবী করে যে, উভয় পক্ষের সমস্ত যুদ্ধবন্দীকেই মুক্তি দিতে হইবে। ইহার পর গত ৮ই জানুয়ারী (১৯৫২) সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের পক্ষ হইতে উল্লিখিত প্রস্তাবকেই রকমফের করিয়া উপস্থিত করা হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, এক-এক জন বন্দীর পরিবর্ত্তে এক-এক জন বন্দীর মুক্তি সম্পূর্ণ হওয়ার পর যে-সকল কম্যুনিষ্ট বন্দী অবশিষ্ট থাকিবে তাহাদের মধ্যে যাহারা ফিরিয়া যাইতে চাহিবে শুধু তাহাদিগকেই মুক্তি দেওয়া হইবে। এই প্রস্তাব হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অধিকাংশ কম্যুনিষ্ট বন্দীকে ছাড়িয়া না দেওয়ার অভিপ্রায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গোড়া হইতেই পোষণ করিয়া আসিতেছে এবং উহার জন্ত প্রস্তুতিও চলিতেছিল বন্দী-শিবিরে। এই প্রস্তুতি যে কি ভাবে চলিতেছিল তাহার আভাষ মাত্রই পাওয়া যায় ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের কোজে বন্দীশিবিরের হাঙ্গামায়। এই হাঙ্গামা সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক রেডক্রশ কমিটি যে-রিপোর্ট প্রদান করেন অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহা চাপিয়া রাখিবার

"সংক্রামক রোগ থেকে বাড়ীর লোকদের নিরাপত্তার জন্যে আমি কি ব্যবস্থা ক'রে থাকি!"

"আমি আগে তেমন গ্রাহ্য করতাম না, কিন্তু ডাক্তারবাবু একদিন বললেন যে খালি-চোখে দেখা যায় না এমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবাণু নাকি সব জায়গায়ই ছড়িয়ে আছে, এমন কি যা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মনে হয় তাতেও — সেই থেকে আমি হুঁশিয়ার হয়ে গেছি। তিনি আমায় একথাও বলেছেন যে, শরীরের কোথাও যদি ক্ষুদ্র একটু ক্ষতও থাকে তবে আগে থাকতে সতর্ক না হ'লে সেই নগণ্য কাটা বা ছেঁড়া চামড়ার মধ্য দিয়ে দুষ্ট জীবাণু শরীরে ঢুকতে পারে ও সাংঘাতিক সব রোগ জন্মাতে পারে। এই সংক্রমণের আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকার জন্ত ডাক্তাররা উৎকৃষ্ট কোনো জীবাণুনাশক ওষুধ, যেমন 'ডেটল' ব্যবহার করতে বলেন"।
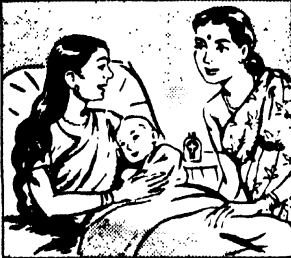
জীবাণুনাশক 'ডেটল' প্রসবের সময় প্রসূতিকে নিরাপদ রাখে। প্রসবপথের ভিতরে কিংবা মুখে অতি সামান্য ক্ষত থাকলেও তা থেকে সূতিকাজর কি অন্য কোনো সাংঘাতিক অসুখ দেখা দিতে পারে — এমন কি চিরতরে বন্ধ্যা হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়, কাজেই সময় থাকতেই জীবাণুনাশক ওষুধ ব্যবহার করা উচিত।

কেটেকুটে যাওয়া কিংবা আঁচড় খাওয়া তো ছেলেদের লেগেই থাকে। তৎক্ষণাৎ 'ডেটল' লাগিয়ে জীবাণু সংক্রমণের আশঙ্কা দূর করবেন। 'ডেটল' সম্পূর্ণ নির্দোষ — শিশুদের জন্য নির্ভয়ে ব্যবহার করা যায়।

গলা ব্যথা হ'লে মনে করবেন, সম্ভবতঃ মুখ ও গলার আর্দ্র ত্বকে ভয়ঙ্কর রোগ-জীবাণুরা বাসা বেঁধেছে। জীবাণুনাশক 'ডেটল' অল্পমাত্রায় জলে মিশিয়ে নিয়মিত কুলকুচো করবেন। নিজের অথবা ঘরের অন্যান্য জিনিস ধোয়ার সময়ও 'ডেটল' ব্যবহার করবেন।

'ডেটল' বিষাক্ত নয়, এতে কোন বিষক্রিয়া হয় না বা দাগও লাগে না। স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায় — জ্বালা বা যন্ত্রণা হয় না। আজই জীবাণুনাশক 'ডেটল' কিনুন।

'ডেটল' স্নিগ্ধ ··· মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষার আদর্শ উপকরণ। এ সম্পর্কে লিখিত "মডার্ন হাইজিন ফর উইমেন" (মহিলাদের আধুনিক স্বাস্থ্যরক্ষা) পুস্তিকাটি বিনামূল্যে দেওয়া হয় — চিঠি লিখুন।

'DETTOL'

আধুনিক জীবাণুনাশক

অ্যাটলাণ্টিস (ঈস্ট) লিঃ

পোঃ বক্স ৬৬৪, কলিকাতা ১

DBI-1

চেষ্টা হইয়াছে। জেনেভা-চুক্তি ভঙ্গ করিয়া কোজে বন্দীশিবিরের কম্যুনিষ্ট বন্দীদের উপর কিরূপ নির্য্যাতন চালান হইয়াছে, তাহারা যাহাতে ফিরিয়া যাইতে না চায় তাহার জন্ম কিরূপ বলপ্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার বিবরণ আন্তর্জ্জাতিক রেডক্রশের মুখপত্র 'Revue Internationale de la Croix Rouge' পত্রিকার এপ্রিল (১৯৫২) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বিলাতের 'ডেইলী ওয়ার্কার' পত্রিকার ১৫ই মে তারিখের সংখ্যায় আন্তর্জ্জাতিক রেডক্রশ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর রয়টার জেনেভা হইতে উক্ত রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিবেশন করেন। এই ব্যাপারে এইরূপ ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নীতি অ-কম্যুনিষ্টদের মনেও গভীর সন্দেহ সৃষ্টি না করিয়া পারে নাই।

৫ই এবং ২২শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে রেডক্রশের প্রতিনিধিগণ কোজে বন্দীশিবির পরিদর্শন করিয়া যে প্রথম রিপোর্ট প্রদান করেন তাহাতে কোজে ক্যাম্পে স্থান, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা যে বহু ত্রুটিপূর্ণ এ কথা উল্লেখ করা হয়! তাঁহারা বন্দীদের নিকট হইতে এই মর্ম্মে বহু অভিযোগ পাইয়াছেন যে, সিগম্যান রী'র ক্যাম্প-গার্ডরা তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। কিন্তু আসল ব্যাপার, ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কি ঘটিয়াছিল। ৯ই হইতে ১৭ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত রেডক্রশ প্রতিনিধিগণ যুদ্ধবন্দীদের কম্পাউণ্ড পরিদর্শন করেন। কিন্তু ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের হাঙ্গামার কথা শুনিয়াই তাঁহারা ৬২ নং কম্পাউণ্ডে গিয়াছিলেন। এই তারিখের ঘটনার সূত্রপাত হইয়াছিল ৮ই ও ৯ই ফেব্রুয়ারী।

গত ৮ই এবং ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রেডক্রশের প্রতিনিধিবর্গ যখন ৬২নং কম্পাউণ্ড পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন তখন বন্দিগণ তাঁহাদিগকে জানায় যে, তাহারা পৃথক্ ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করার (rescreening) বিরোধী এবং তাহারা দক্ষিণ-কোরিয়াতেই থাকিতে চায় বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে যে বিবৃতি আদায় করা হইয়াছে তাহা তাহাদের উপর চাপ দিয়া। তাহাদের এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় কোজে ক্যাম্পের তদানীন্তন অধিনায়ক কর্ণেল ফিটজেরাল্ডের (Col. Fitzgerald) রেডক্রশের প্রতিনিধিবর্গের নিকট ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্রে। ঐ পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, "যুদ্ধবন্দীরা এবং অসামরিক ইণ্টার্নীরা নূতন করিয়া জিজ্ঞাসাবাদের (rescreening) পক্ষপাতী কি না সে সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত প্রত্যেকে পৃথক্ ভাবে এবং গোপনে যাহাতে প্রকাশ করে তাহার জন্ম উচ্চতর হেড কোয়ার্টার্স হইতে নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। কিন্তু ৬২ নং কম্পাউণ্ডের বন্দীরা এই পদ্ধতি মানিতে অস্বীকার করে। কাজেই এই বিষয় সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পর ইহা চূড়ান্ত ভাবে স্থির করা হয় যে, "বন্দীদিগকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিবার জন্ম সৈন্ম নিয়োগ করা হইবে।" এই সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টার ফলেই ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ঘটনা ঘটিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ব্রীগেডিয়ার জেনারেল কলসন ব্রীগেডিয়ার জেনারেল ডডের মুক্তির জন্ম নিম্নলিখিত সর্ত্তে কম্যুনিষ্টদের সহিত চুক্তি করিয়াছিলেন, 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্সরা বহু যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করিয়াছে,' 'ভবিষ্যতে যুদ্ধবন্দীদের সহিত মানুষের মত ব্যবহার করা হইবে,' এবং 'আর জোর করিয়া জিজ্ঞাসাবাদ (forcible screening) অথবা যুদ্ধবন্দীকে পুনরস্ত্রসজ্জিত (rearming) করা হইবে না।' মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দেশরক্ষা বিভাগ ব্রীঃ জেঃ কলসন এই সকল সর্ত্তে সম্মত হওয়ায় উহার কঠোর নিন্দা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, "ঐগুলির কোনই ভিত্তি নাই। কিন্তু কর্ণেল ফিটজেরাল্ডের উক্ত পত্র হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কম্যুনিষ্ট বন্দীদের অভিযোগ সবগুলিই সত্য। তিনি অবশ্যই উক্ত পত্রে এই কথাও বলিয়াছেন যে, এই (৬২ নং) কম্পাউণ্ডের কম্যুনিষ্ট আন্দোলনকারীরা সংখ্যায় বেশী। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্সদিগকে আক্রমণ করিবার জন্ম তাহারা (কম্যুনিষ্ট আন্দোলনকারীরা) এক ব্যাটেলিয়ন যুদ্ধবন্দীকে উত্তেজিত না করা পর্য্যন্ত সব কিছুই নির্ব্বিবাদে চলিতেছিল।" তাঁহার উক্তি শুনিয়া মনে হয়, কম্যুনিষ্ট আন্দোলনকারীদের (Communist agitators) কথা বলিলেই সব চাপা পড়িয়া যাইবে বলিয়া তিনি মনে করেন। কম্যুনিষ্ট আন্দোলনকারীদের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও ইহা কর্ণেল ফিটজেরাল্ডের উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, যুদ্ধবন্দীরা দক্ষিণ-কোরিয়াতেই থাকিয়া যাইতে চায়, তাহাদের নিকট হইতে এই স্বীকারোক্তি জোর করিয়া আদায় করিবার জন্মই কোজে ক্যাম্পে সৈন্স আমদানী করা হইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান যে-মানবতার বড়াই করিয়াছেন সে-কথা বাদ দিলেও যুদ্ধবন্দীদের উপর সৈন্স লেলাইয়া দিয়া তাহাদের নিকট হইতে জোর করিয়া স্বীকারোক্তি আদায় করা জেনেভা-চুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী।

কোজে ক্যাম্পে ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের হাঙ্গামায় হতাহতের যে হিসাব সরকারী ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, মার্কিণ সৈন্স একজন এবং যুদ্ধবন্দী ৭৮ জন নিহত হইয়াছে এবং যুদ্ধবন্দী আহত হইয়াছে ১৩৬ জন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বহু যুদ্ধবন্দীকে যে নির্ব্বিচারে হত্যা করা হইয়াছে, ইহা মনে না করিবার কোন কারণ নাই। এই তারিখের ঘটনা সম্পর্কে যুদ্ধবন্দীদের মুখপাত্র রেডক্রশের প্রতিনিধিদের নিকট এক বিবৃতি দিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন যে, ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই, চারি ঘটিকার সময় এক রেজিমেণ্ট সশস্ত্র সৈন্স কোনরূপ সতর্ক করিয়া না দিয়াই কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করে। অধিকাংশ যুদ্ধবন্দীই তখনও নিদ্রিত। কতক বন্দীকে অবিলম্বেই একটি তাঁবুতে পুরিয়া পাহারাধীনে রাখা হয় এবং সৈন্সরা অন্যান্য তাঁবু ঘেরিয়া ফেলে। ব্যাপার কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া যে-সকল বন্দী তাঁবুর বাহিরে আসিয়াছিল তাহাদের উপর গুলীবর্ষণ করা হয়। সকলকেই হত্যা করা হইবে, এই আশঙ্কা করিয়া ব্যাপার কি জানিবার এবং আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বন্দীরা বাহিরে আসিয়া পড়ে এবং সৈন্সরা তাহাদের উপর গুলী চালায়। উক্ত মুখপাত্র ক্যাম্প-কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। তাঁহার একজন সঙ্গী সৈন্স-অধিনায়কের সহিত উক্ত মুখপাত্র যাহাতে কথা বলিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। ক্যাম্প-কমাণ্ডার কর্ণেল ফিটজেরাল্ড বেলা প্রায় আটটার সময় ঘটনাস্থলে আসেন। তাঁহার সম্মুখেই গুলীবর্ষণ চলিতে থাকে। অনেক বন্দী নিহত হওয়ার পর

ক্যাম্প-কমাণ্ডার বন্দীদিগকে বসিয়া পড়িতে নির্দ্দেশ দেন এবং বন্দীরা তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করে। অতঃপর উক্ত মুখপাত্রের অনুরোধে ক্যাম্প-কমাণ্ডার তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অবস্থা পরিদর্শনে রাজী হন। এই পরিদর্শনের সময় তাঁহারা আহত বন্দীদের কাতর আর্ত্তনাদ শুনিতে পান। খাবার-ঘরে রান্না-ঘরের লোকদিগকে পাহারাধীন দেখিয়া উক্ত মুখপাত্র তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধ প্রতিপালিত হয় নাই। কম্পাউণ্ড গেটে যাওয়ার পথে তাঁহারা ৪০ জন বন্দীকে গলার সঙ্গে হাত বাঁধা অবস্থায় দেখিতে পান। তাহাদের দেহে রাইফেলের কুঁদার আঘাত ছিল। সৈন্যরা নিহত ও আহতদিগকে হাসপাতালে লইয়া যাইতেও বাধা দিয়াছিল। উক্ত মুখপাত্র সৈন্যদের মৃত বন্দীদের দেহে পদাঘাত করিতে দেখিয়াছেন। মৃত কি না তাহা পরীক্ষা না করিয়াই দেহগুলি লরীতে ছুঁড়িয়া ফেলা হইয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস তাঁহাদের মধ্যে কতকের মৃত্যু হয় নাই। মৃতদেহ গণনা করিতে কিম্বা হাসপাতালে লইয়া যাইতে দেওয়া হয় নাই। ইহাই বন্দীদের মুখপাত্রের বর্ণিত ১৮ই ফেব্রুয়ারীর হাঙ্গামার বিবরণ। ইহার পর কোজে ক্যাম্পে দ্বিতীয় হাঙ্গামা হয় ১৩ই মার্চ্চ (১৯৫২)। এই হাঙ্গামায় ১২ জন যুদ্ধবন্দী নিহত এবং ২৬ জন আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এই হাঙ্গামা সম্পর্কে রেডক্রশ প্রতিনিধিবর্গ তদন্ত করিবার কোন সুযোগ পাইয়াছেন কি না, তাহা জানা যায় না। অতঃপর ১০ই এপ্রিল হয় তৃতীয় হাঙ্গামা। এই সময়ই ব্রীগেডিয়ার জেনারেল ডড বন্দী হইয়াছিলেন।

কম্যুনিষ্ট যুদ্ধবন্দীদিগকে ফিরাইয়া না দেওয়ার জন্ত আয়োজন করা হয় অনেক পূর্ব্ব হইতেই। তৃতীয় হাঙ্গামার পূর্ব্বে ২রা এপ্রিল তারিখে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর কর্তৃপক্ষ গণনা করিয়া জানান যে, ১ লক্ষ ৭৩ হাজার বন্দীর মধ্যে মাত্র ৭৩ হাজার বন্দী বাড়ী ফিরিয়া যাইতে রাজী। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, অধিকাংশ বন্দীকেই কম্যুনিষ্টরা জোর করিয়া যুদ্ধে পাঠাইয়াছিল। তাহারা কম্যুনিষ্টদের নিপীড়ন হইতে মুক্তি চায়। এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট হওয়া সত্যই অত্যন্ত কঠিন। চার্চ্চ অব ইংলণ্ডের মুখপত্র 'চার্চ্চ টাইমস্' পর্য্যন্ত এই যুক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। উক্ত পত্রিকা লিখিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্ট বন্দীরা ফিরিয়া গেলে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে হয়ত তাহাদিগকে হত্যাও করা হইতে পারে, এ কথাটা বন্দীশিবিরের কর্তৃপক্ষ বেশ ভাল করিয়া কম্যুনিষ্ট বন্দীদিগকে সমঝাইয়া দিয়াছেন। এই জন্তই এত অধিক সংখ্যক বন্দী ফিরিয়া যাইতে অনিচ্ছুক। এই সমঝাইয়া দেওয়ার জন্ত কিরূপ বলপ্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা উক্ত পত্রিকা অনুমান করিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু বন্দীদের গায়ে কম্যুনিজম-বিরোধী উল্কী পরাইয়া দেওয়া এবং তাহাদের দ্বারা নিজের রক্তে গণতন্ত্রের জন্ত জীবন দিবার প্রতিশ্রুতি-পত্র লিখাইয়া লওয়া হইতেই সমঝাইয়া দেওয়ার পদ্ধতিটা বুঝিতে পারা যায়। একটি বৃটিশ পত্রিকার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, ফরমোসা হইতে চিয়াং কাইশেকের ২১ জন এজেন্ট আনাইয়া বন্দীদিগকে কম্যুনিজম-বিরোধী তালিম দেওয়া হইয়াছে। 'টাইম' পত্রিকা লিখিয়াছেন, যে, কুয়োমিন্টাঙ্গের এজেন্টরা বন্দীশিবিরে গুপ্তচরের কাজ করিতেছে। সুতরাং ইহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না যে, প্রথমে বন্দীদিগকে ভাল ভাবে বুঝাইয়া পড়াইয়া ফিরিয়া না যাইতে রাজী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহাতে ব্যর্থ হওয়ার পর পৃথক্ ভাবে গোপনে জিজ্ঞাসাবাদ করার (forcible screening) ব্যবস্থা করা হয়। বন্দীরা তাহাতে আপত্তি করার ফলেই প্রথম ও দ্বিতীয় হাঙ্গামা হয়। ইহাতে ক্যাম্প-কর্তৃপক্ষ নিরস্ত না হওয়ায় ১০ই এপ্রিল বন্দীরা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিদ্রোহ যে কিরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা কোজে ক্যাম্প দখল করিতে ট্যাঙ্ক ও সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

কোরিয়ার যুদ্ধ যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই চালাইতেছে, এ সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহহীন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধ এবং যুদ্ধবিরতির আলোচনার সহিত ধনতন্ত্র এবং সাম্যবাদের আদর্শগত সঙ্ঘাতকে জড়িত করিয়াছে। প্রথমতঃ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইহা স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিয়াছে যে, লাল-চীনকে কিছুতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ২০শে মে (১৯৫২) বলিয়াছেন যে, "ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সহস্র সহস্র বন্দী তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে প্রবল ভাবে বাধা দান করিবে। কারণ, তাহারা মনে করে যে, হয় ক্রীতদাসত্ব, না হয় মৃত্যু তাহাদের জন্ত অপেক্ষা করিতেছে।" তাহা হইলে পাছে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় এই আশঙ্কাতেই কি ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৩ই মার্চ্চ এবং ১০ই এপ্রিল কোজে বন্দীশিবিরের বন্দীরা হাঙ্গামা বাধাইয়াছিল? তিনি আরও বলিয়াছেন, "আমরা

তরল আলতা

বললে বোঝায় সুপ্রসিদ্ধ পি, সি, দাসের "সুবাসিত তরল আলতা" অর্দ্ধ-শত বৎসর ধ'রে সুনাম অক্ষুন্ন রেখে সম-ভাবে চ'লে আসছে। মাত্র একবার ব্যবহারেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয় – কারণ তারপর আর কোন আলতায় মেয়ে-দের মন ভরে না.......

আলতা-সিঁদুর-স্নো-ক্রীম
সকল সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠানেই পাওয়া যায়।

মানুষের ক্রীতদাসত্বের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতি ক্রয় করিব না।" কথাটা শুনিতে বেশ! তিনি বিশ্ববাসীর কাছে বড়াই করিয়া ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, নৈতিক দিক হইতে তাঁহারা কম্যুনিষ্টদের অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরে অবস্থিত। উত্তর কোরীয় ও ভিয়েটনাম যুদ্ধবন্দীদের উপর পরমাণু বোমা পরীক্ষা করার মধ্যে কোন্ নৈতিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়? সান্‌ফ্রান্সিস্কো হইতে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৫২) টেলিপ্রেস এজেন্সী যে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, দুই হাজার জাপ-যুদ্ধবন্দীকে ছয়টি মার্কিণ জাহাজে বোঝাই করিয়া কেরলাইন দ্বীপপুঞ্জ হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব্ব ও উত্তর অঞ্চলে প্রেরণ করা হইয়াছে। এই সকল জাপ-বন্দীদের উপর না কি পরমাণু বোমার পরীক্ষা করা হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আজ জাপানকে তাহার মিত্র বলিয়া মনে করে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে সুদূর প্রাচ্যে জাপান ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ এক এবং অভিন্ন। এই জন্যই কি জাপ-যুদ্ধবন্দীদের উপর পরমাণু বোমার পরীক্ষা করিতে নৈতিক জ্ঞানে একটুকুও বাধে না?

যুদ্ধবিরতি আলোচনার পরিণতি কি হইবে, তাহা অনুমান করা সত্যই কঠিন। বন্দীবিনিময়ের ব্যাপারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে প্রস্তাব করিয়াছে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের দৃষ্টিতে তাহা শুধু চূড়ান্তই নয় ন্যায়সঙ্গত-ও বটে। এইরূপ মনোভাব যুদ্ধবিরতির পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। বস্তুতঃ আলোচনার গোড়া হইতে তথাকথিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর অধিনায়কবর্গ যেরূপ ঔদ্ধত্যপূর্ণ মেজাজ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে ভরসা করিবার কিছুই দেখা যায় না।

জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ—

গত ২৬শে মে (১৯৫২) পশ্চিম জার্ম্মাণ ফেডারেল রিপাবলিকের অফিস ভবনে বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং পশ্চিম জার্ম্মাণী যে-'শান্তি-সন্ধি-চুক্তি'তে স্বাক্ষর করিয়াছে তাহাতে জার্ম্মাণ সমস্যা শুধু অধিকতর জটিল হইয়াই উঠে নাই, পশ্চিম ইউরোপকে একটি রুশবিরোধী সশস্ত্র শিবিরে পরিণত করার পথও পরিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার পরের দিনই অর্থাৎ ২৭শে মে প্যারী নগরীতে ইউরোপীয় সেনাবাহিনী গঠনের জন্য ফ্রান্স, পশ্চিম জার্ম্মাণী, ইটালী, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড এবং লুক্সেমবুর্গের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী যে-ইউরোপীয় সেনাবাহিনী গঠিত হইবে তাহাতে পশ্চিম জার্ম্মাণী দিবে তিন লক্ষ সৈন্য। এই চুক্তি 'শান্তি-সন্ধি-চুক্তিরই' অনুপূরক মাত্র। প্রকৃত পক্ষে এই চুক্তি করিবার উদ্দেশ্যেই 'শান্তি-সন্ধি-চুক্তি' বা 'বন্ কনভেনশন' সম্পাদিত হইয়াছে, একথা মনে করিলেও ভুল হইবে না। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র-সচিব-চতুষ্টয় সম্মেলন অচল অবস্থার মধ্যে অবসান হওয়ার পর পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয় পশ্চিম জার্ম্মাণী সম্পর্কে যে-নীতি গ্রহণ করেন 'বন্ কনভেনশন' সম্পাদন এবং ইউরোপীয় সেনাবাহিনী গঠনের চুক্তি তাহারই পূর্ণ পরিণতি।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন আকস্মিক ভাবে পরিসমাপ্ত হওয়ার পর ১৯৪৮ সালের মার্চ্চ মাসে লণ্ডনে পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয়ের এক সম্মেলন হয় এবং এই সম্মেলনে জার্ম্মাণীর মার্কিণ, বৃটিশ এবং ফরাসী-অধিকৃত অঞ্চলত্রয়ে যৌথ শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মার্শাল পরিকল্পনার সূত্রপাত হইয়াছে ইহার অনেক পূর্ব্বেই, ১৯৪৭ সালের ৫ই জুন হারবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে তদানীন্তন মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মিঃ মার্শালের যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণার মধ্যে। মার্শাল পরিকল্পনা পরিণতি লাভ করে ১৯৪৯ সালের মার্চ্চ মাসে সম্পাদিত উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তির মধ্যে। 'সামরিক সাহায্য' সংক্রান্ত পঞ্চম ধারাটিই এই চুক্তির প্রাণস্বরূপ। এই সামরিক সাহায্য সংক্রান্ত চুক্তিই শেষ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় রক্ষা কমিউনিটির (E. D. C.) মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে। উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয়। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমী শক্তিবর্গ পশ্চিম জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধাবস্থার অবসান করিবার সিদ্ধান্ত করেন এবং ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে উহা কার্য্যকরী করা হয়। এই ভাবে পশ্চিম জার্ম্মাণী সম্পর্কে পশ্চিমী শক্তিবর্গের নীতি ইউরোপীয় রক্ষাব্যবস্থায় জার্ম্মাণ সৈন্য গ্রহণের দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে থাকে।

জার্ম্মাণ সৈন্য গৃহীত না হইলে পশ্চিম ইউরোপের রক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী হইতে পারে না, ইহাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সুদৃঢ় বিশ্বাস। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অনুযায়ীই উত্তর আটলাণ্টিক কাউন্সিলের সেপ্টেম্বর (১৯৫০) অধিবেশনে পশ্চিম ইউরোপীয় রক্ষা-ব্যবস্থায় পশ্চিম জার্ম্মাণীর অংশগ্রহণের প্রকৃষ্ট উপায় কি তাহা নির্দ্ধারণের জন্য উত্তর আটলাণ্টিক অর্গেনিজেসানের রক্ষা (Defence) কমিটিকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দ্দেশের প্রেরণা হইতেই তদানীন্তন ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ প্লেভাঁর ইউরোপীয় বাহিনীর পরিকল্পনা ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসে রচিত হয়। পশ্চিম-জার্ম্মাণীর কোন জাতীয় সেনাবাহিনী থাকিবে না, জার্ম্মাণ জেনারেল ষ্টাফ-ও থাকিবে না, অথচ পশ্চিম ইউরোপের রক্ষাব্যবস্থায় পশ্চিম জার্ম্মাণী অংশ গ্রহণ করিবে, এই অদ্ভুত ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য পশ্চিম জার্ম্মাণীকে রাজী করাইতে হইলে তাহাকে অন্ততঃ অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সহিত সমমর্য্যাদা দেওয়া আবশ্যক। এই প্রয়োজনীয়তা হইতেই পশ্চিম জার্ম্মাণী হইতে দখলকার অবস্থার অবসান যেমন করা হইয়াছে, তেমনি গঠন করা হইয়াছে ইউরোপী রক্ষা কমিউনিটি (European Defence Community)। কিন্তু বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই ইউরোপীয় ডিফেন্স কমিউনিটির সদস্য নয়। আবার পশ্চিম জার্ম্মাণীও উত্তর আটলাণ্টিক গোষ্ঠীর সদস্য নয়। অথচ উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তিতে যে-সামরিক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি আছে তাহা যদি পশ্চিম জার্ম্মাণীকে দেওয়া না হয় এবং পশ্চিম জার্ম্মাণীও যদি ঐরূপ প্রতিশ্রুত না দেয়, তাহা হইলে ইউরোপীয় ডিফেন্স কমিউনিটি অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্য উত্তর আটলাণ্টিক গোষ্ঠী এবং ইউরোপীয় ডিফেন্স কমিউনিটির মধ্যে একটা চুক্তি (protocol) সম্পাদিত হইয়াছে। উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তিপত্রের পঞ্চম দফায় আক্রান্ত হইলে সামরিক সাহায্য দেওয়া ও পাওয়ার যে প্রতিশ্রুতি আছে এই চুক্তি দ্বারা ঐ প্রতিশ্রুতি ইউরোপীয় ডিফেন্স কমিউনিটির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিকেও দেওয়া হইয়াছে। তা ছাড়া ফ্রান্স

ইহাও চাহিয়াছিল যে, ব্রুসাল্‌স্ চুক্তিতে বৃটেন, ফ্রান্স এবং বেনেলুক্স দেশত্রয়ের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি আছে তাহা ইটালী ও পশ্চিম জার্ম্মাণী সম্পর্কেও প্রযোজ্য হইবে। ইহার জন্তও আর একটি চুক্তি হইয়াছে। পারস্পরিক সামরিক সাহায্য দান সম্পর্কে বৃটেন এবং ইউরোপীয় ডিফেন্স কমিউনিটির মধ্যেও একটি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি ইউরোপীয় ডিফেন্স কমিউনিটি যাহাতে সুসংহত অবস্থায় থাকে তৎপ্রতি তাহাদের গভীর আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স একটি ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছেন। এই ঘোষণার মূল কথা এই যে, ইউরোপীয় রক্ষা কমিউনিটির কোন সদস্যের উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার তাহারা ঘোর বিরোধী।

বন্ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় পশ্চিম জার্ম্মাণীতে বৈদেশিক দখলকার অবস্থার অবসান হইল এবং পশ্চিম জার্ম্মাণী প্রায় পূর্ণ সার্ব্বভৌম ক্ষমতা লাভ করিল, এই কথাই প্রচার করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে চাপ শান্তিচুক্তির কথাও স্বভাবতই মনে না পড়িয়া পারে না। কিন্তু এ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করিবার সামান্য স্থানও আমরা এখানে পাইব না। বন চুক্তির যত মাহাত্ম্যই প্রচার করা হউক না কেন, পশ্চিম জার্ম্মাণীর জনসাধারণ এবং গবর্ণমেণ্টের বিরোধী দলগুলি এই চুক্তিতে সন্তুষ্ট হয় নাই। দখলকার ত্রিশক্তির সহিত চুক্তির সর্ত্তাবলী নির্দ্ধারণ সংক্রান্ত আলোচনায় পশ্চিম জার্ম্মাণীর পক্ষ একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন ডাঃ এডেনেয়ুর। আলোচনা শেষ পর্য্যায়ে পৌছিবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার মন্ত্রিসভার সহযোগীদিগকেও চুক্তির সর্ত্তাবলী জানান নাই। যখন জানাইলেন, তখন সর্ত্তাবলীতে তাঁহারা এত বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন যে, নিজ নিজ দলের সহিত আলোচনা না করিয়া সম্মতি দিতে তাঁহারা রাজী হন নাই। চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পূর্ব্বেই উহার বিরুদ্ধে পশ্চিম জার্ম্মাণীতে যথেষ্ট বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল। জার্ম্মাণ জাতীয় সেনাবাহিনী সহ ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন জার্ম্মাণী গঠন সম্পর্কে সোভিয়েট প্রস্তাব পশ্চিম জার্ম্মাণীর জনগণের মনোযোগ বিশেষ ভাবেই আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। বন্ পার্লামেণ্টের কোন কোন সদস্য প্রস্তাবিত চুক্তিকে 'নূতন ভার্সাই' বলিয়া অভিহিত করিতেও ত্রুটি করেন নাই। এইরূপে চারি দিক হইতে প্রবল বাধার সম্মুখীন হইয়া পশ্চিম জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলার ডাঃ এডেনেয়ুর পশ্চিম জার্ম্মাণীর জনগণ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আশঙ্কা দূর করিবার উদ্দেশ্যে বাধ্য হইয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এই চুক্তি সম্পাদিত হইলে ঐক্য-জার্ম্মাণী গঠনে উহা কোন বাধা সৃষ্টি করিবে না এবং পশ্চিম জার্ম্মাণী যে-সকল চুক্তি করিবে ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণীর উপর তাহা বাধ্যকর হইবে না। বস্তুতঃ, নির্দ্ধারিত সময়ে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে কি না সে-সম্বন্ধেও একটা সন্দেহ জাগিয়াছিল। রাশিয়ার প্রস্তাব সমস্যাকে অধিকতর জটিল করিয়া তোলে।

রাশিয়া ১০ই মার্চ্চ (১৯৫২) তারিখের পত্রে পশ্চিম জার্ম্মাণী সম্পর্কে প্রস্তাব করে, পশ্চিমী শক্তিবর্গ তাহার উত্তর দেয় ২৫শে মার্চ্চ। এই উত্তরে তাহারা জার্ম্মাণীতে জার্ম্মাণ জাতির নিরাপত্তার উপযোগী অবস্থা এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার অস্তিত্ব আছে কি না তাহা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গঠিত কমিশন দ্বারা তদন্ত করিবার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর প্রদান করে। রাশিয়া এই পত্রের উত্তর প্রদান করে ৯ই এপ্রিল (১৯৫২) তারিখে। এই পত্রে রাশিয়া জানায় যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিয়োজিত কমিশন দ্বারা তদন্তের ব্যবস্থা দ্বারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের ১০৭ ধারা লঙ্ঘিত হইবে, তা ছাড়া উহার কোন প্রয়োজনও নাই। কারণ, চতুঃশক্তির সকলেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য এবং তাহারা সকলেই জার্ম্মাণীতেই রহিয়াছেন। এই পত্রে রাশিয়া জার্ম্মাণ শান্তিচুক্তি সম্বন্ধে চতুঃশক্তি সম্মেলনের প্রস্তাব করে। পশ্চিম জার্ম্মাণীতে বিক্ষুব্ধ জনমত এবং পশ্চিম ইউরোপের জনমত বর্ত্তৃক রুশ প্রস্তাবের সমর্থনের সম্মুখে পশ্চিমী শক্তিত্রয় এক সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছিলেন। কারণ, চতুঃশক্তি সম্মেলন হইলেই পশ্চিম জার্ম্মাণীর সহিত চুক্তি নির্দ্ধারিত সময়ে সম্পাদিত হইবে না এবং ইউরোপীয় বাহিনীতে জার্ম্মাণ সৈন্য পাইতেও বহু বিলম্ব হইয়া যাইবে। জনমতকেও ঠাণ্ডা রাখা যায়, অথচ রাশিয়ার উপরেও দোষ চাপান চলে এইরূপ পন্থা হিসাবে পত্রবিনিময় চালাইয়া যাওয়ারই সিদ্ধান্ত করা হয় এবং রাশিয়ার ৯ই এপ্রিলের পত্রের উত্তর প্রদান করা হয় ১৩ই মে (১৯৫২) তারিখে। রাশিয়া এই পত্রের যে উত্তর দেয় তাহা বন চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পূর্ব্বদিন পশ্চিমী শক্তিবর্গের হাতে পৌছে।

বন্ চুক্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, পশ্চিম জার্ম্মাণীতে দখলকার অবস্থার অবসান হইয়াছে শুধু নামে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে দখলকার অবস্থাকেই অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের ২০ ডিভিশন সৈন্য পশ্চিম জার্ম্মাণীতে অবস্থান করিবে। তাহারা ভোগ করিবে 'এক্সট্রা টেরিটোরিয়েল' অধিকার। ইহারই নাম দখলকার অবস্থার অবসান। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে শুধু রাইনল্যাণ্ডই মিত্রশক্তিবর্গের দখলকারত্বে ছিল। পশ্চিম জার্ম্মাণী যে প্রায় পূর্ণ সার্ব্বভৌম অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহার স্বরূপও ইহার মধ্যেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। জার্ম্মাণীর কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পকে বিকেন্দ্রীকৃত করিয়া মিত্রপক্ষ যে সকল আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন সেগুলি বহাল রাখিতে হইবে। ইহার একমাত্র অর্থ এই যে, পশ্চিম জার্ম্মাণীতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছে তাহার কোন পরিবর্ত্তন করা চলিবে না। বার্লিনের ব্যাপার এবং সমগ্র জার্ম্মাণীর প্রশ্ন তিন মিত্রশক্তি নিজেদের হাতে রাখিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্ব্ব-জার্ম্মাণী এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত পশ্চিম-জার্ম্মাণীর সম্পর্কের প্রশ্নগুলি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নিজের হাতের মুঠায় রাখিয়াছে। ইহার অর্থ ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনের ব্যবস্থা শুধু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই করিতে পারিবে। অবশ্য একটি বিষয়ে পশ্চিম জার্ম্মাণী পূর্ণ স্বাধীনতাই পাইয়াছে। এই স্বাধীনতা পূর্ব্ব জার্ম্মাণীর সহিত ঠাণ্ডাযুদ্ধ পরিচালনের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা। উল্লিখিত দখলকার অবস্থার অবসান এবং প্রায় পূর্ণ সার্ব্বভৌম ক্ষমতা লাভের বিনিময়ে পশ্চিম জার্ম্মাণীকে দিতে হইবে ১২ ডিভিশন সৈন্য, কয়েক হাজার বিমান এবং উপকূলরক্ষী নৌবাহিনী। মোট জার্ম্মাণ সৈন্যের সংখ্যা তিন লক্ষেরও বেশী হইবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মিত্রশক্তিবর্গ জার্ম্মাণীর সৈন্যসংখ্যা

এক লক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। নূতন যুদ্ধের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তুতিতে পশ্চিম জার্ম্মাণীর এই অংশ গ্রহণের তাৎপর্য্য পশ্চিম জার্ম্মাণীকে যুদ্ধ-ভূমিতে পরিণত করিতে, জার্ম্মাণ যুবকদিগকে কামানের খোরাকে পরিণত করিতে, জার্ম্মাণীর সমস্ত শিল্পসম্পদকে যুদ্ধের প্রয়োজনে নিয়োজিত করিতে, এবং রাশিয়ার সহিত ঠাণ্ডা ও সশস্ত্র যুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রগামী পতাকাবাহী হইতে পশ্চিম জার্ম্মাণীর রাজী হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

পশ্চিম জার্ম্মাণীকে এই যে নামেমাত্র স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে তাহাও আবার কাড়িয়া লওয়ার ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করা হয় নাই। পশ্চিম জার্ম্মাণী যদি আক্রান্ত হয়, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার যদি বিপর্য্যয় ঘটে, শৃঙ্খলারক্ষায় যদি বিঘ্ন ঘটে কিম্বা এই তিনটি ব্যাপার গুরুতররূপে বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহা হইলে ত্রয়ী মিত্রশক্তি পুনরায় পশ্চিম জার্ম্মাণীর সার্ব্বভৌম ক্ষমতা হস্তগত করিতে পারিবেন। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার বিপর্য্যয় অথবা শৃঙ্খলারক্ষার বিঘ্ন ঘটার অর্থ কি? ডাঃ এডেনেয়ুর পশ্চিম জার্ম্মাণীকে ইউরোপীয় রক্ষা কমিউনিটির অন্তর্ভুক্ত করার গোঁড়া সমর্থক। সুতরাং তাঁহার শাসনই যে গণতান্ত্রিক শাসন তাহাতে সন্দেহ নাই। সোশ্যাল ডেমোক্রাটেরা কমুনিষ্টবিরোধী হইলেও গোঁড়া মার্কিণবিরোধী। বন্ পার্লামেণ্টে সোশ্যাল ডেমোক্রাট দলের নেতা ডাঃ সুমাচের ডাঃ এডেনয়ুরকে 'Chancllor of the Allies' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ভাবী সাধারণ নির্ব্বাচনে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের ক্ষমতা পাওয়ার সম্ভাবনা উপেক্ষার বিষয় নয়। এইরূপ অবস্থায় সোশ্যাল ডেমোক্রাট গবর্ণমেণ্টের পরিণাম 'ক্র-নিং'-এর গবর্ণমেণ্টেরই পরিণতি লাভ করিবে এবং মার্কিণ আশ্রয়ে অভ্যুদয় ঘটিবে সহস্রশীর্ষ নূতন হিটলারের। ইতিমধ্যেই গণতন্ত্র রক্ষার জন্ত নাৎসী সমরনায়কদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া গোয়েবলের ভবিষ্যদ্বাণীকেই সার্থক করা হইতেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সর্ব্বশেষ নোটে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণীর জনগণকেই শান্তিচুক্তি ও জাতীয় ঐক্য সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। বিলাতের 'টাইমস' পত্রিকা এই উক্তিকে হুমকী (threats) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। জার্ম্মাণরাই যদি জার্ম্মাণীর ঐক্য বিধান করে তবে তাহাতে দোষের কি আছে? দোষের আছে এই যে, এইরূপ ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী আমেরিকার যুদ্ধ-পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করিতে রাজী হইবে না। এই জন্তই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে জার্ম্মাণীর ঐক্যটা শুধু মানসিক আবেগের ব্যাপার মাত্র। কারণ, রুঢ় অঞ্চলের শিল্প অস্ত্রসজ্জার বিপুল সহায় হইবে। পশ্চিম জার্ম্মাণীর জনশক্তি ব্যতীত পশ্চিম ইউরোপের রক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী হইবে না। 'নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান এণ্ড নেশান' পত্রিকা যাহাকে 'unrivalled physical asset of the harlot of Europe' (ইউরোপীয় গণিকার অতুলনীয় দৈহিক সম্পদ) বলিয়াছেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি তাহার দিকে চাহিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। পশ্চিম জার্ম্মাণী ছাড়া কম্যুনিজম এবং রাশিয়াকে ধ্বংস করিবার আর উপায় নাই। অনিবার্য্য তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামই ইহার একমাত্র পরিণতি।

১৯৬০ সালের পূর্ব্বেই যুদ্ধ বাধিবে—

এক দিকে চলিতেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক গঠিত নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের বৈঠকের পর বৈঠক, আর এক দিকে চলিতেছে যুদ্ধের বিপুল প্রস্তুতি। যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতির মধ্যে নিরস্ত্রীকরণের ক্ষীণ ব্যর্থ প্রয়াসের কোন সার্থকতাই যে নাই নানা ভাবেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম যে অনিবার্য্য সে-সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। কেবল যুদ্ধ কবে আরম্ভ হইবে, ইহাই শুধু অনুমান করা সম্ভব হইতেছে না। গত ১ই মে (১৯৫২) প্যারী হইতে প্রকাশিত বিখ্যাত ফরাসী সান্ধ্য পত্রিকা 'Le Monde'-এ মার্কিণ নৌযুদ্ধ সংক্রান্ত প্রধান কর্ত্তা এডমিরাল ফেচ্‌টেলার কর্তৃক মার্কিণ জাতীয় পরিষদের নিকট প্রেরিত গোপন রিপোর্টের যে-অনুলিপি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, এডমিরাল ফেচ্‌টেলার বলিয়াছেন যে, ১৯৬০ সালের পূর্ব্বে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এই গোপন রিপোর্টটি তিনি গত ১৮ই জানুয়ারী (১৯৫২) প্রেরণ করেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রস্থিত বৃটিশ সামরিক গুপ্তচর বিভাগ কোন উপায়ে উহা হস্তগত করিয়া ২৪শে জানুয়ারী বৃটেনের ফার্ষ্ট লর্ড অব এডমিরাল্টির নিকট প্রেরণ করে। এই গোপন রিপোর্টে ভাবী তৃতীয় মহাসমরের যে-পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় ভূমধ্যসাগর, নিকট ও মধ্যপ্রাচ্য, দার্দেনেলিস, সুয়েজ এবং জিব্রাল্টারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার চতুর্থ দিবসে রুশ বিমানবাহিনী ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ডস্, বেলজিয়ম এবং ফ্রান্সের ঘাঁটিসমূহ দখল করিতে পারিবে এবং পশ্চিম ইউরোপের সৈন্যবাহিনী তিন দিনের বেশী রুশ সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরোধ করিতে পারিবে না, এই আশঙ্কার উপর তিনি তাহার পরিকল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী ভূমধ্যসাগরই হইবে প্রধান রণক্ষেত্র। উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত ঘাঁটি সমূহ হইতে এবং মিত্র আরবদের সহযোগিতায় সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালানো সম্ভব হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের যত দূর সম্ভব নিকটে সিরিয়ায়, ইরাকে এবং মিশরে ঘাঁটি নির্ম্মাণের উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়াছেন। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে নৌবাহিনীর কর্তৃত্ব লইয়া আমেরিকার সহিত বৃটেনের যে টাগ-অব-ওয়ার চলিতেছে এবং আরব জাতীয়তাবাদীদের সম্পর্কে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের নীতিতে আমেরিকা কেন সন্তুষ্ট নয়, তাহার কারণের সন্ধানও ইহার মধ্যেই পাওয়া যায়। এডমিরাল ফেচ্‌টেলার মনে করেন যে, আরব সৈন্যদিগকে সুশিক্ষিত ও অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত করিলে তাহারা অন্ততঃ সাময়িক ভাবে হইলেও উত্তর আফ্রিকা এবং নিকট-প্রাচ্যকে রক্ষা করিতে পারিবে এবং এই সময়ের মধ্যে অধিকাংশ মিত্রপক্ষীয় সৈন্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে নিয়োগ করা সম্ভব হইবে। পূর্ব্ব-ইউরোপের জনগণের গণতন্ত্র-শাসিত দেশগুলিতে (Peoples Democracies) প্রতিরোধ বাহিনীর অস্তিত্বের কথাও তিনি বলিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্ব-ইউরোপে রাশিয়ার মিত্রদেশগুলিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পঞ্চম বাহিনী গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে মনে করিলে ভুল হইবে না। তাঁহা

আক্রমণ পরিকল্পনার প্রধান কথা হইল এই যে, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া এবং রুমানিয়ার বিরুদ্ধে চলিবে প্রধান আক্রমণ। তুরস্ক ককেশাস এবং বুলগেরিয়া, গ্রীস বুলগেরিয়া, এবং টিটোর যুগোস্লাভিয়া বুলগেরিয়া এবং হাঙ্গেরীকে আক্রমণ করিবে। ভূমধ্য-সাগরীয় রক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব এইখানেই বুঝা যায়।

এডমিরাল ফেচটেলারের যুদ্ধ-পরিকল্পনার যেটুকু প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বৃটেনের ভূমিকার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু বৃটেনে মার্কিণ ঘাঁটি সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, বৃটেনে শীঘ্রই মার্কিণ বিমানবহরের জন্য ৩৮টি বিমানঘাঁটি নির্ম্মাণের কাজ শেষ হইবে। তা ছাড়া, পরমাণু বোমা বহনের বিমানের জন্য আরও চারিটি ঘাঁটি নির্ম্মিত হইয়াছে। উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি, ইউরোপীয় ডিফেন্স কমিউনিটি, ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনী প্রভৃতি সমস্তই ভাবী তৃতীয় মহাসমরের জন্য প্রস্তুতির অঙ্গবিশেষ। ১৯৬০ সালের পূর্ব্বেই যুদ্ধ আরম্ভ হইবে বটে, কিন্তু উহার পূর্ব্বে কবে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে তাহাই শুধু বুঝা যাইতেছে না। ১৯৬০ সালের আর আট বৎসর বাকী !

জর্ডানের রাজা তালাল সিংহাসনচ্যুত—

জেনেভা হইতে ১ই জুনের (১৯৫২) সংবাদে প্রকাশ যে, জর্ডানের রাজা তালালকে সিংহাসনচ্যুত করা হইয়াছে এবং তাঁহার স্থলে রাজা করা হইবে তাঁহার সপ্তদশবর্ষীয় পুত্র প্রিন্স হোসেনকে। রাজা তালাল মানসিক রোগগ্রস্ত বলিয়াই নাকি এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। গত ৩রা জুন (১৯৫২) জর্ডানের প্রধান মন্ত্রী পার্লামেণ্টের এক বিশেষ অধিবেশনে বলিয়াছেন যে, রাজা তালাল আর কখনও রাজত্ব করিতে পারিবেন না এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ মনে করেন, তাঁহার রোগ দুরারোগ্য। তালালের ব্যাধিটা যেমন রহস্যপূর্ণ তেমনি তাঁহার ভাগ্যে যে ইহাই ঘটিবে তাহাও অনুমান করা কঠিন ছিল না। গত জুলাই মাসে (১৯৫১) রাজা আবদুল্লা যখন নিহত হন তখন তালাল চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। আসলে ইহা তাঁহার নির্ব্বাসন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। রাজা আবদুল্লা নিহত হওয়ার পর তালাল সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিবেন কি না সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট আশঙ্কা সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশেষে তালাল জর্ডানের রাজা হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ফাঁড়া কাটে নাই।

রাজা তালালের আর যতই সদ্‌গুণ থাকুক তিনি তাঁহার পিতা রাজা আবদুল্লার নীতির সমর্থক ছিলেন না। কাজেই সিংহাসন হইতে তাঁহাকে অপসারিত করিবার প্রয়াস যে চলিতেছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। গত এপ্রিল (১৯৫২) হইতেই আবার তাঁহার মানসিক ব্যাধি বৃদ্ধি পাওয়ার ধূয়া তোলা হয়। জর্ডানের প্রধান মন্ত্রী তেওফিক আবদুল হোদা দাবী করিতে থাকেন যে, রাজা তালাল গুরুতর মানসিক ব্যাধিতে ভুগিতেছেন এবং রাজা তালাল তাহা দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করেন। অবশেষে সকলে মিলিয়া তাঁহাকে প্যারীতে যাইতে রাজী করান। কিন্তু প্যারীতে পৌঁছিবার পর তিনি কোন নার্সিং হোমে যাইতে অস্বীকার করেন। ফরাসী আইন অনুসারে তাঁহাকে নার্সিং হোমে আটক রাখিবার ব্যবস্থা করিবারও কোন উপায় ছিল না। অবশেষে তাঁহাকে সুইজারল্যাণ্ডে লইয়া যাওয়া হয়। তিনি যত দিন বিদেশে থাকিবেন তত দিন তাঁহার চলা-ফেরা নিয়ন্ত্রণ করা বড় সহজ হইবে না। ইতিমধ্যে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা হইয়াছে এবং রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য তিন জনের একটি কমিটিও গঠন করা হইয়াছে। এই অবস্থায় তিনি দেশে ফিরিলেও তাঁহার কোন ক্ষমতা থাকিবে না এবং রাজপরিষদ যে-কোন স্থানে তাঁহাকে চিকিৎসাধীন রাখিতে পারিবেন। রাজা আবদুল্লার নীতি অনুসরণ না করাতেই রাজা তালালের এই পরিণতি !

দ্বিতীয় চিয়াং কাইশেক—

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় আর একটি চিয়াং কাইশেক তৈয়ার করিয়াছে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেণ্ট সিগম্যান রীকে। তাঁহার স্বৈরাচারী শাসনের পরিচয় কোরিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বে যেমন পাওয়া গিয়াছে, এখনও তেমনি পাওয়া যাইতেছে। ১৯৫০ সালের শেষ ভাগে তথাকথিত সম্মিলিত বাহিনী কর্ত্তৃক সিউল দখলের পর সিগম্যান রী যে কি ব্যাপক অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড চালাইয়াছিলেন বৃটিশ সংবাদপত্রেও তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি তাঁহার স্বৈরাচারের আর এক দফা সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার শাসনতন্ত্রের যে-সংশোধন করিতে চাহিয়াছিলেন, এই বৎসরের (১৯৫২) প্রথম ভাগে দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় পরিষদ তাহা অগ্রাহ্য করে। ইহার পর গত ২৫শে মে (১৯৫২) তিনি সামরিক আইন জারী করেন এবং জাতীয় পরিষদের ১২ জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। সিগ্‌ম্যান রীর বিরোধী জাতীয় পরিষদের ৪০ জন সদস্য আত্মগোপন করিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন।

জাতীয় পরিষদ সামরিক আইন প্রত্যাহার করিবার নির্দ্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট রী এই নির্দ্দেশকে আমল দেন নাই। জাতীয় পরিষদের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোরিয়া কমিশন সিগম্যান রীর নিকট প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। ফলে দক্ষিণ কোরিয়া গবর্ণমেণ্ট কোরিয়া কমিশনকে কোরিয়া হইতে বহিষ্কৃত করিবার হুমকী দিয়াছেন। অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং অষ্ট্রেলিয়া সিগম্যান রীর নিকট কড়া চিঠি লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। নোটের ফল কিছু হইবে কি না তাহা বলা কঠিন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জোরেই যে সিগম্যান রী এইরূপ হুমকী দিতে সাহস করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কম্যুনিজম নিরোধের আয়োজনের পরিণামে এশিয়ার দেশগুলিতে মার্কিণ তাঁবেদারী শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে সিগম্যান রী তাহার নমুনা মাত্র দেখাইতেছেন।

সেরেৎসির চিরনির্ব্বাসন—

বৃটেনের টোরী গবর্ণমেণ্ট সেরেৎসি খামাকে চিরদিনের জন্য বামনগাওটো উপজাতির সর্দ্দারের পদ হইতে এবং তাঁহাকে স্বদেশ ও স্বজাতির মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া গত ২৭শে মার্চ্চ (১৯৫২) নির্দ্দেশ জারী করিয়াছেন এবং বামনগাওটো উপজাতিকে নূতন সর্দ্দার মনোনীত করিবার নির্দ্দেশ

দেওয়া হইয়াছে। সেরেৎসি খামা একজন ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করায় বৃটেনের শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট ১৯৫০ সালের মার্চ্চ মাসে বেচুয়ানাল্যাণ্ডের বামনগাওটো উপজাতির সর্দ্দারের পদের অধিকার হইতে তাঁহাকে পাঁচ বৎসরের জন্ত বঞ্চিত করিয়া অস্থায়ী ভাবে তাঁহার নির্ব্বাসনের আদেশ প্রদান করেন। এই আদেশের যুক্তি হিসাবে শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছিলেন, সেরেৎসি একজন ইংরাজ মহিলাকে বিবাহ করায় উপজাতীয়দের মধ্যে গণ্ডগোল সৃষ্টি হইতে পারে। পাঁচ বৎসর পরে এই আদেশ সম্পর্কে পুনর্ব্বিবেচনা করা হইবে বলিয়াও ঘোষণা করা হইয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে গত অক্টোবর মাসে (১৯৫১) টোরি গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পাঁচ বৎসরের দুই বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই টোরী গবর্ণমেণ্ট সেরেৎসি খামার অস্থায়ী নির্ব্বাসনের আদেশকে স্থায়ী নির্দ্দেশে পরিণত করিয়াছেন। সেরেৎসি খামা রুথ নাম্নী ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করিবার পর তাঁহার কাকা শেকেড খামা সাম্রাজ্যবাদীদের এজেণ্ট প্রভোকেটর হিসাবে উপজাতীয়দের মধ্যে সেরেৎসির বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি নিজে সর্দ্দার হইবেন, এই আশাও যে তাঁহার ছিল না তাহা নয়। কিন্তু বামনগাওটো উপজাতি সেরেৎসিকেই তাহাদের সর্দ্দার বলিয়া গ্রহণ করিতে রাজী হয় এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট শেকেড খামাকেও নির্ব্বাসিত করেন।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সেরেৎসিকে জেমেইকাতে একটা চাকুরী দিবার অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এই অনুগ্রহ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। বামনগাওটো উপজাতির কোটলায় (কাউন্সিল) বৃটিশ রেসিডেণ্ট কমিশনার স্থায়ী নির্ব্বাসনের আদেশ যখন পাঠ করেন, তখন উহার বিরুদ্ধে অস্ফুট ভাষায় ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ উত্থাপিত হইয়াছিল এবং কয়েক জন কোটলা হইতে চলিয়াও যান। এই আদেশ সম্পর্কে পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্ত এক দল উপজাতীয় প্রতিনিধি কমনওয়েলথ রিলেশন সেক্রেটারী লর্ড সেলিসবারির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু লর্ড সেলিসবারি তাঁহাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেন যে, সেরেৎসি খামা এবং তাঁহার ইংরেজ-পত্নীকে কিছুতেই বেচুয়ানাল্যাণ্ডে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। এই আদেশ সুদৃঢ় এবং চূড়ান্ত। এই প্রতিনিধি দলের সহিত বামনগাওটো উপজাতির অস্থায়ী সর্দ্দার কেয়াবোকা খগমানিও লণ্ডনে গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, দেশে ফিরিয়া তিনি এই পদ পরিত্যাগ করিবেন। 'সেরেৎসির জীবিত কালে আমি সর্দ্দার হইতে রাজী নই', ইহাই তিনি বলিয়াছেন। ইহাতে বৃটেনের জেদ একটুকুও নরম হইবে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকার পাশেই কৃষ্ণকায় সেরেৎসি ইংরেজ পত্নী লইয়া ঘর করিবেন, ডাঃ মালানের পক্ষেও ইহা অসহ্য বোধ হইবে। বেচুয়ানাল্যাণ্ড সম্পর্কে দক্ষিণ-আফ্রিকা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ জারী করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এশিয়ার ঘটনাবলী হইতে সাম্রাজ্যবাদীরা কিছু শিক্ষা করিবেন, ইহা প্রত্যাশা করা সম্ভব নয়।

—সাহিত্য-পরিচয়—

(প্রাপ্তি-স্বীকার)

চলন্তিকা—(সপ্তম সংস্করণ) শ্রীরাজশেখর বসু। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ নং বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে ছয় টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস—(সমসাময়িক দৃষ্টিতে) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ নং ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

নূতন খাতা ও অন্যান্য কবিতা—৺কিরণধন চট্টোপাধ্যায়। অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র সম্পাদিত। গুপ্ত প্রকাশনী, ৮ নং গুপ্ত লেন, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

রবীন্দ্রনাথের গান—শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অভিযান পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৪নং এলগিন রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প নাভানা, ৪৭ নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

কবিকথা শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। সুপ্রকাশনী; ৩ নং সার্কাস রেঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী। ক্যালকাটা বুক ক্লাব, ৮৯ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

চর ভাঙা চর—কাজি আফসারউদ্দিন আহমদ্। ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবুবাজার, ঢাকা, পূর্ব্ব-পাকিস্তান। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

যৌন-জীবন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ইণ্টারন্যাশানাল পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৩ নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দু'টাকা।

সঙ্গীত-সোপান—শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ। মহাজাতি প্রকাশক, ১৩ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

মেঘ ডাকে শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী। নমামি প্রকাশ মন্দির, ৮।২ নং গোপ লেন, কলিকাতা। মূল্য দু' টাকা বারো আনা।

মর্ম্মর—অক্ষয় চট্টোপাধ্যায়। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দু' টাকা আট আনা।

আমাদের গান—রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (ছাত্রাবাস)। ১৮ নং যদুলাল মল্লিক রোড, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা।

বন-জ্যোৎস্না—মণীন্দ্র গুপ্ত। কমলা বুক ডিপো, ১৫ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার আনা।

প্রিয়া ও পরকীয়া—অবিনাশচন্দ্র সাহা। ভারতী লাইব্রেরী, ১৪৫ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দু' টাকা।

আজকাল দেখা যাচ্ছে যে কেশপ্রসাধনে মহাভৃঙ্গরাজ তৈল অধিকাংশ নরনারীরই প্রিয় হয়ে উঠেছে। এর কারণ মনে হয় আয়ুর্বেদীয় মতে প্রস্তুত এই বিশুদ্ধ কেশতৈলের অসাধারণ গুণ। ক্যালকেমিকোর সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ কেশতৈল বাজারে "ভৃঙ্গল" নামে সুপরিচিত এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়। "ভৃঙ্গল" সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদীয় প্রণালীতে প্রস্তুত। আয়ুর্বেদের মতে এ তৈল মাথায় মাখলে কেশপতন নিবারিত হয়, শিরোরোগ দূর হয়, ঘাড়ের পিছনদিকের শিরার যন্ত্রণাযুক্ত মাথা-ধরায়, চক্ষু ও কর্ণরোগে এই তৈলের নাস নিলে এবং শরীরে আভাঙ করে মর্দন করলে বিশেষ উপকার হয়। নিয়মিত এই তৈল ব্যবহারে ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ উদ্গত হয়। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ শীতল রাখে, ইন্দ্রলুপ্তি, খালিত্য প্রভৃতি কেশরোগ উপশমিত হয় এবং কেশের সৌষ্ঠব বাড়ে। (আয়ুর্বেদ সংগ্রহ পৃঃ ৬০২)

সুতরাং, ক্যালকেমিকোর প্রস্তুত মহাভৃঙ্গরাজ কেশতৈল—'ভৃঙ্গলে'র বহু অনুকরণও আজ বাজারে প্রচলিত হয়েছে। তাই জনসাধারণকে সতর্ক করার জন্য আমরা তাঁদের জানাতে চাই যে মহাভৃঙ্গরাজ কেশতৈল চাহিদা অনুযায়ী প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করতে হলে এর জন্য বড় কারখানা ও ব্যাপক আয়োজন দরকার। কারখানা সংলগ্ন অনেকটা প্রশস্ত স্থান থাকা চাই। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সুসম্পূর্ণ অনুশীলনাগার চাই, আয়ুর্বেদে সবিশেষ অভিজ্ঞ একাধিক রাসায়নিক চাই, বিবিধ যন্ত্রপাতি ও সুদক্ষ সহকারীসহ অসংখ্য লোকবল থাকা দরকার। শহরের কেন্দ্রস্থলে দু'একখানি মাত্র ঘর নিয়ে বসে চাহিদামত প্রচুর পরিমাণে 'মহাভৃঙ্গরাজ তৈল' প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। কবিরাজ মহাশয়দের মতো অল্প দু'চার শিশি তৈরি করা যেতে পারে, কিন্তু তার দাম পড়ে যায় অনেক বেশি।

'ভৃঙ্গরাজ' একপ্রকার ভেসজ লতা বিশেষ। যাকে গ্রাম্যভাষায় 'ভীমরাজ' বলে। এর কিন্তু দুটি বিভিন্ন শ্রেণী আছে। ঈষৎ রক্তাভ ও ঈষৎ পীতাভ। এই শেষোক্ত লতাই আয়ুর্বেদের মতে সর্বগুণযুক্ত। অপরটি নয়। এ ছাড়া, 'কেশরাজ' লতা, যাকে গ্রাম্যভাষায় 'কেশুরিয়া' বলে, সেগুলিও কেশের পক্ষে উপকারী ; কিন্তু 'কেশরাজ' ভৃঙ্গরাজের সঙ্গে সমগুণযুক্ত নয়। ভৃঙ্গরাজের রস আয়ুর্বেদে কেবলমাত্র কেশতৈলে প্রয়োগের কথাই বলা হয়নি, অন্যান্য রোগের প্রতি-কারার্থেও ব্যবহার হয়, যেমন চর্মরোগ নিবারণে, অম্ল ও পিত্তাধিক্যে ভৃঙ্গরাজের রস বিশেষ উপকারী। বাংলা-দেশের জলাভূঁই ও নামাল জমিতে ভৃঙ্গরাজলতা প্রচুর উৎপন্ন হয়। আমরা বহু দুর্গম অঞ্চল থেকেও আমাদের কারখানার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় ভৃঙ্গরাজ-লতা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করি। সে সকল স্থানে মোটরলরী প্রবেশের কোনও পথ নেই। সে অঞ্চলে এক মাত্র সচল যানবাহন—গরুর গাড়ী। কোথাও কোথাও নৌকা ও শালতি নিয়ে গিয়ে জলপথে ভৃঙ্গরাজ সংগ্রহ করে আনতে হয়। ভৃঙ্গরাজ বারো মাসই পাওয়া যায়,

চিত্র নং ১

চিত্র নং ২

[বি:]

চিত্র নং ৩

তবে মাঘ ফাল্গুনেই এই লতা খুব বেশী জন্মায়। আমরা সকল সময় তাজা ভৃঙ্গরাজই ব্যবহার করি, কারণ টাট্‌কা তাজা লতাপাতার রসের যে তেজ, উপকারিতা ও গুণ শুষ্ক ভৃঙ্গরাজের লতাপাতায় তা থাকে না।

মহাভৃঙ্গরাজ কেশতৈল প্রস্তুতপ্রণালী সম্বন্ধে জানা থাকলে, জনসাধারণকে আর কাগজে বিজ্ঞাপিত যে কোন ব্যবসায়ীর প্রস্তুত বাজে ভৃঙ্গরাজ তৈল কিনে প্রতারিত হতে হবে না। ভৃঙ্গরাজ তৈল প্রস্তুতের প্রথম কাজ হল আসল ভৃঙ্গরাজ লতা সংগ্রহ করা, যার মধ্যে ঈষৎ রক্তাভ লতা এবং 'কেশরাজ' মিশানো না থাকে। বিপুল পরিমাণ ভৃঙ্গরাজ লতা গরুর গাড়ী ও ঠেলাগাড়ী বোঝাই হয়ে আমাদের কারখানায় আসে (চিত্র নং ১)। তারপর হয় এর ঝাড়াই বাছাই। এর পর লতাগুলি একটি বৃহৎ চৌবাচ্চার জলে ফেলে বেশ ক'রে ধুয়ে মুছে নির্মল করে নেওয়া হয় (চিত্র নং ২)। ধোয়ার পর আমাদের কারখানার রাসায়নিক অনুশীলনাগারে এর ডালপালা সব কিছুর গুণাগুণের একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে দেখা হয় তাতে শতকরা কত পরিমাণ ভেষজশক্তিসম্পন্ন রস নির্গত হতে পারে।

ভৃঙ্গরাজ তৈল প্রস্তুতের সময় ভৃঙ্গরাজের রস এবং তিলতৈল এর প্রধান উপাদান হলেও এর মধ্যে এমন আরও কতকগুলি আয়ুর্বেদোক্ত 'কল্ক' উপকরণ মেশাতে হয় যার জন্য এ তৈলের গুণ বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

সংগৃহীত ভৃঙ্গরাজ লতাগুলি ঝাড়াবাছা ও ধোয়া-মোছার পর রাসায়নিক অনুশীলনাগারের পরীক্ষান্তে চলে আসে রসনিষ্কাশণ বিভাগে। এখানে প্রথমাবস্থায় লতাপাতাগুলিকে একটি পেষণযন্ত্রে থেঁৎলে নেওয়া হয় (চিত্র নং ৩)। তারপর সেই পিষ্ট অবস্থায় সেগুলি আসে রসনিষ্কাশন যন্ত্রের মধ্যে। এখানে যান্ত্রিক গুরুভারের প্রবল চাপে সমস্ত লতাপাতার রস নির্গত হয়ে রসাধারে সঞ্চিত হয় (চিত্র নং ৪)। এইবার তিল তৈলের সঙ্গে এই ভৃঙ্গরাজ রস সংমিশ্রণের পূর্বে তিল তৈলকে রসপাকের উপযোগী করে নেবার জন্য তিল তৈলের সঙ্গে অনেক কিছু মালমশলা চূর্ণ করে নিয়ে মেশাতে হয়। আমরা বিশুদ্ধ তিল তৈল ব্যবহার করি। এ জন্য ব্যবহারের আগে রসায়নাগারে পরীক্ষা করে দেখে নেই তিল তৈলে কোনও ভেজাল আছে কি না! 'মহাভৃঙ্গরাজ তৈল' আয়ুর্বেদীয় পাক তৈলগুলির অন্যতম। ভৃঙ্গরাজ তৈলের এই পাক দু' রকম। মূর্চ্ছাপাক ও রসপাক।

মূর্চ্ছাপাক—আমাদের কারখানায় এক একবারে দশ মণ তিল তৈলকে উত্তপ্ত করে নিয়ে তার পর তেলের ফুটন্ত অবস্থা শান্ত হলে, অর্থাৎ ফেনা মরে এলে, সেই গরম তেলে চূর্ণীকৃত সজল, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাঠ, লোধ, রক্তচন্দন, গেড়িমাটি, বেড়েলা, দারুহরিদ্রা, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, কুচ, আমলা, যষ্টিমধু ও শ্যামলতা প্রভৃতি কল্ক দ্রব্য প্রত্যেকটি দশ সের হিসাবে

চিত্র নং ৪

চিত্র নং ৫

মিশিয়ে সাত থেকে পনর দিন পর্য্যন্ত বড় বড় আধারে ভরে মূর্চ্ছাপাকে রাখা হয়। আয়ুর্বেদ বলে—'এই মূর্চ্ছাক্রিয়ার দ্বারা পাকতেলের দুর্গন্ধ নিরাকৃত হইয়া তৈল সুগন্ধ ও অরুণ বর্ণ হয়।' এই যে গরম তেলে সাত দিন থেকে পনেরো দিন পর্য্যন্ত বিচূর্ণ সজল কল্কদ্রব্য মিশিয়ে মূর্চ্ছাপাকে ফেলে রাখা হয়, তাতে সমস্ত উপাদানগুলির প্রয়োজনীয় গুণ তৈলের মধ্যে প্রবিষ্ট, সংহত ও সমাহিত হয়।

রসপাক—মূর্চ্ছাপাকে প্রস্তুত তিল তৈল এক একবারে দশ মণ পরিমাণ নিয়ে তার সঙ্গে ভৃঙ্গরাজের টাট্‌কা রস চল্লিশ মণ মিশিয়ে অগ্নির উত্তাপে রসপাক করতে হয়। প্রতি মণ তৈলের মধ্যে ধীরে ধীরে চার মণ পরিমাণ রস একটু একটু ক'রে খাইয়ে খাইয়ে অত্যন্ত ধৈর্য্য ও পরিশ্রমের সঙ্গে ক্রমে এই দশ মণ ভৃঙ্গরাজ তৈল প্রস্তুত করতে হয়। (চিত্র নং ৫) আমাদের কারখানায় প্রতি মাসে দু'শো মণ পরিমাণ মহাভৃঙ্গরাজ তৈল প্রস্তুতের ব্যবস্থা রয়েছে। শেষপাকের পর ভৃঙ্গরাজ তৈলকে সুরভিত করে নেবার অব্যবহিত পূর্বে সমস্ত তৈল সযত্নে পরিস্রুত করে নেওয়া হয়। (চিত্র নং ৬)

এই প্রস্তুত প্রণালী থেকে বোঝা যায় যে মহাভৃঙ্গরাজ তৈল ক্রেতাদের বিপুল চাহিদা অনুযায়ী প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা কোনও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একেবারেই সাধ্যায়ত্ত নয়। সুতরাং 'মহাভৃঙ্গরাজ তৈল' যাঁরা ব্যবহার করেন, তাঁদের সর্বপ্রথম দেখা দরকার যে প্রস্তুতকারকদের প্রয়োজনোপযোগী সে আয়োজন ও ব্যবস্থা আছে কি না। আমাদের কারখানায় মাসে যে দু'শো মণ তৈল প্রস্তুত হয়, তার জন্য প্রচুর ভৃঙ্গরাজ লতার প্রয়োজন হয়। এই লতাগুলির রস নিষ্পেষণের পর তার যে পর্বতপ্রমাণ ছিবড়া জড় হয়, সেগুলি ফেলবার জন্যই তো একটি প্রশস্ত ময়দানের প্রয়োজন। অতএব এ কথা বলাই বাহুল্য যে শহরের মধ্যে বসে প্রচুর পরিমাণে ভৃঙ্গরাজ তৈল প্রস্তুত করা যায় না।

আমাদের কারখানায় পাকতৈলের অপ্রিয় গন্ধ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বিলীনান্তে অনুপম সুগন্ধ সংযোগে সুবাসিত মহাভৃঙ্গরাজ তৈল প্রস্তুত করে এর নিজস্ব একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে 'ভৃঙ্গল'। আমরা যথাযথভাবে আয়ুর্বেদীয় প্রণালী অনুসরণ করেই "ভৃঙ্গল" প্রস্তুত করি; তাই কেশতৈলের মধ্যে 'ক্যালকেমিকো'র "ভৃঙ্গল" আজ সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বজনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

চিত্র নং ৬

"ভৃঙ্গল" ব্যবহার করলে কেশ পতন বন্ধ হয়, কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশরাজিতে মস্তিষ্ক ভরে ওঠে; মাথা ঠাণ্ডা রাখে, স্নায়ুমণ্ডলী শান্ত থাকে, রক্তের বর্দ্ধিত চাপ কমায় এবং দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধনে সাহায্য করে। বর্ণে, গন্ধে, গুণে ও উপকারিতায় ক্যালকেমিকোর প্রস্তুত "ভৃঙ্গল" যে আয়ুর্বেদীয় শ্রেষ্ঠ মহাভৃঙ্গরাজ তৈল, ব্যবহারকারীমাত্রই তা স্বীকার করবেন।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ;

৩৫, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২৯এর প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত

কিয়ৎক্ষণের বিশ্রাম গেছে।

গানের ঘরে গান হচ্ছে না যদিও। মাটালান শেষ হয়ে গেছে। টরপডিয়নের বাক্স খোলা হয়েছে। সুমধুর কলকৌশলে কে জানে কে বাজাচ্ছে টরপডিয়ন।

Terpodion, a curious musical instrument like harmonium, made by Buschmann, ব'লেছিলেন ডিউক অব সাকস্ কোবার্গ—Duke of Sax Cobourg. টরপিডিয়নের শব্দ সুমধুর। সূক্ষ্ম কলকৌশল।

লোহার ডাবুতে খিচুড়ীর ডাল তুলছিল রাজেশ্বরী। ভঁাড়ারের বদ্ধ ঘরে হাওয়া চলে না। ডাল তুলছিল তো তুলছিলো কতক্ষণ ধ'রে। ঘেমে উঠেছিল গলার খাঁজ।

গুলী ছুঁড়লো কে না দাসী ডাকলো, হাত থেকে ভাজা মুগের ডালের জালায় পড়ে গেল লোহার ডাবুটা।

দাসী বললে,—বৌদিদি!

ডাক শুনে চমকে উঠলো আর হাত থেকে আচমকা পড়ে গেল ডাবুটা।

দাসী বললে,—দেখোই না কে? ডাকছে যে।

রাজেশ্বরী দেখলে দাসী ঘোমটা টেনেছে মাথায়। ভঁাড়ার থেকে বেরিয়ে দেখলে। অনেকক্ষণ ধ'রে দেখলে।

—ডেকেছিলে তুমি?

—হ্যাঁ। কি রান্না হবে বললে না? বললে রাজেশ্বরী। শাড়ীর আঁচলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললে।

ডাকের প্রয়োজন শুনে হাঁফ ছাড়লো কৃষ্ণকিশোর। বললে,—তুমি যা বলবে।

মুখে হাসি ফুটলো না রাজেশ্বরীর। কাছে গিয়ে বললে, —চল' কথা আছে। ঘরে চল'। ঘড়া আমি দেবো না। কিছুতেই নয়। আমি আড়াল থেকে কথা বলবো কাছারীর লোকের সঙ্গে। টাকা চায় তো দেওয়া যাবে।

কথাগুলো হেসে উড়িয়ে দিতে চায় কৃষ্ণকিশোর। কিন্তু রাজেশ্বরী হাসে না। কথা বলে চ'লে যায়, ভঁাড়ারে গিয়ে ঢোকে।

—বেশ কথা। বেশ কথা। বলে কৃষ্ণকিশোর। হাসতে হাসতে বলে,—শুনবো তোমার কথা। টরপডিয়ন বাজাচ্ছে এখন। আমি যাচ্ছি শুনতে।

টরপডিয়ন, অপূর্ব্ব কলকৌশলের সঙ্গে বাজাতে হয়। হারমনিয়ম অপেক্ষা শুনতে সুমধুর।

গহরজানকে টাকা দিতে হবে। বেশ কয়েক হাজার। ডালিমের বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। কি এলোমেলো কথা বলছে রাজেশ্বরী। টরপডিয়ন শুনতে শুনতে মনে তুফান ওঠে। গহরজানকে বিমুখ করা যায় না।

গহরজানের ঘরে তখন অন্য মানুষ।

নেহাৎ ঝঞ্ঝাট করছে না, অন্য মানুষ তো। তেলে-ভাজা খাবার খেয়ে মুখে বার্ডসাই ধরিয়ে মাদুরে শুয়েছিল তখন গহরজান। ডালিম ছিল কাছেই। বুকের কাছে। গহরজান ভাবছিল মানুষটা কি বেওকুফ। শুধু শুধু টাকা দিয়ে ম'লো।

কাঁচুলীর ভেতর একশো টাকার নোট বুকে বিঁধছিল থেকে থেকে। বুকে ফুটছিল গহরজানের।

বর্ষা-দিনের এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়া চলছিল থেকে থেকে। গাছে গাছে শালিক আর বুলবুলি ডাকছিল। দোকানে দোকানে হল্লা চলেছে।

ডাকের সাজ, সিঁদুর-চুপড়ি আর গিল্টির গয়না বিক্রী হচ্ছে। খেমটা নাচ, যাত্রা, আখড়াই আর আতরওলার ভিড়।

গহরজান ভাবছিল লোকটা কি বেওকুফ। লোকটি তখন চিঠি পড়ছে।

ধীরানন্দ,

মানুষের মত মানুষ হওয়ার চেষ্টা করিও। তোমাকে অধিক লেখার প্রয়োজন নাই, তত্রাপি লিখিতেছি। তুমি কয়েক জন উদারচেতা ছাত্র একত্র করিয়া লোকশিক্ষার কার্য্যে ব্রতী হও। নাইট-স্কুল স্থাপন করো, গ্রন্থাগার নির্ম্মাণ করো, গ্রামে গ্রামে কূপ খনন করাও, পুষ্করিণী পরিষ্কার এবং গ্রামের কুটীর-শিল্প যাহাতে বিনষ্ট না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি দাও। আমি শ্রীমতী——কে মানভূমে পাঠাইয়াছি। অধিবাসীদিগের যাহাতে চারিত্রিক উন্নতি হয় তজ্জন্য ইতোমধ্যে শ্রীমতী—— দুইটি বিদ্যালয় এবং—

এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়ায় দরজা কাঁপে। চমকায় ধীরানন্দ।

[ক্রমশঃ।

নর্ত্তকী নয়

গত সংখ্যায় আলোকচিত্র বিভাগে শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় গৃহীত শ্রীমতী নমিতা রায়ের চিত্রের 'নর্ত্তকী' নামকরণ হওয়ায় আলোকচিত্রশিল্পী ক্ষুণ্ণ হয়ে পত্র দিয়েছেন। উক্ত নাম আপত্তিকর হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ ব্যতীত গত্যন্তর নেই। কলিকাতা রাজভবনে কুমার-সম্ভব নৃত্যনাট্যে উক্ত চিত্রটি গৃহীত।

জয়তু !

বাঙলার পশ্চিমাঞ্চলে সুবিখ্যাত ড: শ্রীবিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের নেতৃত্বে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। খ্যাত এবং অখ্যাত ত্রিশ জন ব্যক্তি এই মন্ত্রিসভায় আছেন। ১৪ জন মন্ত্রী এবং ১৬ জন উপমন্ত্রী। হয়তো যোগ্য ব্যক্তি মিলে নাই, যেজন্য ডাঃ রায়কে একাধিক দপ্তর গ্রহণ করতে হয়েছে। পূর্ব্বতন মন্ত্রীদের মধ্যে হুগলীর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়কে লওয়া হয়েছে। ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে বাঙলার পশ্চিমাঞ্চল সুখ ও শান্তিতে বিরাজ করুক। —মাসিক বসুমতী।

বারো হাত কাঁকুড়ের

"সাধারণ নির্ব্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস এসেম্বলী পার্টির নেতারূপে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গত বুধবার যে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন, তাহাতে মন্ত্রিসভার গঠন-পদ্ধতিরই শুধু পরিবর্ত্তন করা হয় নাই, মন্ত্রীর সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ডাঃ রায়ের প্রাক্তন মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রী সহ মোট ১৩ জন মন্ত্রী ছিলেন। উক্ত মন্ত্রিসভার আমলে পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী থাকিলেও ডেপুটী মন্ত্রীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। নূতন মন্ত্রিসভায় ডাঃ রায় মন্ত্রীর সংখ্যা মাত্র এক জন বৃদ্ধি করিয়াছেন বটে, কিন্তু ডেপুটী মন্ত্রী গ্রহণ করিয়াছেন ১৬ জন। পশ্চিমবঙ্গের মত একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের এত বিপুলকায় মন্ত্রিসভা যে সকলের কাছেই 'বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি'র মত বলিয়াই মনে হইবে, ডাঃ রায় নিজেও তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। সেই জন্যই মন্ত্রিসভার গঠন-পদ্ধতি এবং মন্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন, 'পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের আর্থিক দুরবস্থা সত্ত্বেও উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে। এই জন্য মন্ত্রীর সংখ্যা, বিশেষ করিয়া তরুণ-বয়স্ক মন্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমি প্রয়োজন মনে করিয়াছি।' তাঁহার এই উক্তি হইতেই ইহা অনুমান করিলে ভুল হইবে না যে, ক্ষুদ্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আর্থিক অবস্থা যে এত বৃহৎ মন্ত্রিমণ্ডলীর গুরু ব্যয়ভার বহনের উপযুক্ত নয়, তাহা তিনি নিজেও বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতেছেন। তথাপি মন্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বহুসংখ্যক ডেপুটী মন্ত্রী গ্রহণের পক্ষে যে যুক্তি তিনি দিয়াছেন, তাহার সারবত্তা অস্বীকার করা না গেলেও উহার আরও বিশেষ গুরুতর কারণ থাকিলেও বিস্ময়ের বিষয় হইবে না।" —দৈনিক বসুমতী।

লে হালুয়া

"প্রফুল্ল সেনের আমলে প্রতি বৎসর ৫০ হইতে ৬০ লক্ষ মণ চাউল চুরিতে কিম্বা অপচয়ে নষ্ট হইতেছে: চাউলের ক্রয় ও বিক্রয়ে সর্বাধিক মার্জিন রাখিয়া ১২ টাকার চাউল ১৬ টাকা মণে বেচিয়াও বৎসরে আড়াই কোটি তিন কোটি টাকার লোকসান ইনি দেখাইতেছেন। খাদ্য-দপ্তরের গুদামে ইঁদুরের উৎপাত, অফিসে অসৎ আর অপোগণ্ডদের রাজত্ব। এই দুই-এর মাঝে পড়িয়া পশ্চিম-বাংলার লক্ষ লক্ষ নরনারী অন্নাভাবে মরিতেছে, ১৩৫০ সালের মহা মন্বন্তরের বিভীষিকা পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে। অপচয়ের তদন্ত করিবার জন্য যে লোক-দেখানো কমিটি গঠন করা হইল, তাহার অন্যতম সদস্য হইলেন সেন মহাশয়ের আস্থাভাজন শ্রীরজনী প্রামাণিক। প্রধানতঃ ঐ ব্যক্তিটির উচ্ছৃঙ্খল মনোভাবের

ফলেই প্রকৃত অবস্থা উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে নাই; শ্রীমায়াতরু হালদার ইঁহার মতে মত দিতে পারেন নাই, তাই রিপোর্টও যথারীতি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। প্রফুল্ল সেন দুর্ভিক্ষের স্রষ্টা, রজনী প্রামাণিক তাঁহার সহকারী। ডাঃ রায় এই দুই জনের এক জনকে পুনর্বার ঠিক সেই দপ্তরটিই দিয়াছেন, অপর জনকে করিয়াছেন তাঁহার ডেপুটি। যোগ্যতার এমন পুরস্কার আর কোথায় মিলিবে? ডাঃ রায়ের তরুণ রক্ত আমদানীর নীতি অনুযায়ী বাগবাজারের শ্রীমান তরুণকান্তি ঘোষ ডেপুটির পদ পাইয়াছেন। ইঁহার একমাত্র পরিচয় ইনি 'অমৃতবাজার পত্রিকার' একমাত্র মালিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। তরুণদের মন্ত্রিত্বে ট্রেনিং দেওয়াতে আমাদের আপত্তি নাই, সে ক্ষেত্রেও যোগ্যতার মাপকাঠি থাকা দরকার। নিছক স্বার্থের তাগিদে ও আত্মপ্রচারের তাড়নায় অপোগণ্ডদের আসরে নামাইয়া বাঁদর নাচ নাচানো ভাল কথা নহে।" —লোকসেবক।

পুতুল নাচের ইতিকথা

"আহা! এমন বৃহৎ সুখী ও একান্ত অনুগত পরিবারবর্গ লইয়া বিধান বাবু রামরাজত্ব করিতে থাকুন। বৈষ্ণব ভক্ত আরও গুটিকতক বাড়ুক। গরীব প্রজাদের লাল রক্ত সাদা হউক, আমরা প্রতিবাদ করিব না—পরম সুখে দিব অস্থি-মেদ-মজ্জা লাগে যতটুকু। শুধু একটি দুঃখ—বিধান বাবু তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, নতুন আগন্তুকরা তাঁহাদের ন্যায় বৃদ্ধের স্থান গ্রহণ করিবে শাসন-ক্ষেত্রে। এই মওকায় নয়া মন্ত্রী যে ঝানু হইয়া উঠিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেগুলি কাজে লাগাইবার সুযোগটু[illegible] পাইবেন কী? তত দিন কী কংগ্রেসকে সুযোগ দিবে সা[illegible]

জনতা? বিধান বাবুর এতো আশা, এতো চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে?...আহা, এই সুখী পরিবার! এমন পুতুল নাচ!"

—গণবার্ত্তা।

শাসকচক্র

"অবশ্য কংগ্রেস শাসকগোষ্ঠীর চরম অযোগ্যতা ও দেউলিয়াপনার পরিচয় মেলে মন্ত্রিসভার দপ্তর বণ্টনের মধ্যে। ত্রিশ জনকে লইয়া এক বিরাটকায় মন্ত্রিসভা গঠিত হইল, অথচ পাঁচটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের ভার গ্রহণ করিবার মত ডাক্তার রায় ছাড়া আর কোন্ দ্বিতীয় ব্যক্তি নাকি সেখানে নাই। অন্য সব মন্ত্রীরা যদি এতই অযোগ্য হইবেন, তবে ইঁহাদের মন্ত্রিসভায় নেওয়া হইল কোন যুক্তিতে? মন্ত্রিসভার অন্যান্য সভ্যের অযোগ্যতাই শুধু ডাক্তার রায়ের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার একমাত্র কারণ নয়। দেশী ও বিদেশী শোষকরা পশ্চিমবঙ্গের শাসন-ব্যবস্থাকে একেবারে নিজেদের কব্জার মধ্যে রাখিতে চায় বলিয়াই ডাক্তার রায় স্বরাষ্ট্র, অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য, উন্নয়ন প্রভৃতি বিভাগের দায়িত্ব নিজের হাতে লইয়াছেন। এই ভাবে মুষ্টিমেয় ধনিকের একটি শাসকচক্র আবার পশ্চিমবঙ্গের উপর চাপিয়া বসিল। জনগণ তো দূরের কথা, এমন কি কংগ্রেসের সাধারণ সমর্থকবৃন্দের সহিতও এই পরগাছা চক্রের সত্যিকার কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং এই চক্র অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। তবে মিলিত আন্দোলনের জোরে এখন হইতেই ইহার পথরোধ করা হইবে কি না, দেশের জনসাধারণ তাহাই আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করিবেন।"

—স্বাধীনতা।

নেহরু মন্ত্রিসভা

"পণ্ডিত নেহরুর নূতন মন্ত্রিসভা কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই কাপড় রপ্তানীর ঢালা হুকুম দিয়াছেন। দেশে কাপড়ের অভাব ঘুচে নাই, দামও কমে নাই। আমরা কাপড়ের মিলের ব্যালান্স শীট হইতে দেখাইয়াছি যে মিলওয়ালাদের অডিট-করা হিসাব মতেই একখানা ধুতি বা শাড়ীর উৎপাদন ব্যয় মোট দুই টাকার বেশী পড়ে না, সাড়ে চার টাকা জোড়া কাপড় বিক্রী হওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্ট উৎপাদন ব্যয় হিসাব করিয়া তদনুসারে দাম ছাপিবার ব্যবস্থা করিলে লোকে অনেক সস্তায় কাপড় পাইত। কিন্তু ধনিক শ্রেষ্ঠীদের লুণ্ঠনের সহায়ক মন্ত্রিসভা তাহা করিতে পারে না বলিয়াই করে না। হরেকৃষ্ণ মহাতাব শ্রেষ্ঠীদের হাতের পুতুল ছিলেন এবং তাহাদেরই ইঙ্গিতে চলিতেন। তৎসত্ত্বেও বোধ হয় প্যাটেলপন্থী বলিয়া তাঁহাকে তাড়ানো হইয়াছে। শিল্প ও বাণিজ্য-সচিব পদে এবার এক জন ব্যবসায়ীকে বসানো হইয়াছে। কৃষ্ণমাচারী সানলাইট সাবানের এজেণ্ট ছিলেন। লিভার ব্রাদার্স ভারতে কারখানা খুলিবার পর তাঁহার এজেন্সি শেষ হয়। কার্য্যভার গ্রহণের প্রথম সপ্তাহে কাপড় রপ্তানীর ঢালা হুকুম দিয়া নূতন শিল্প-বাণিজ্য সচিব কোন্ পথে চলিবেন এবং কাহাদের স্বার্থ দেখিবেন তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। অর্থ-সচিব ভূতপূর্ব্ব আই-সি-এস দেশমুখ খাদ্যে সাবসিডি দেওয়ার মত টাকা নাই ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সিংঘানিয়াদের বন্ধু কিদোয়াইও বলিয়াছেন যে খাদ্যে সাবসিডি এখন বন্ধই থাকিবে। ভারতীয় ধনিক শ্রেষ্ঠীর দল মূল্যমান স্বাভাবিক স্তরে আসিতে দিতে চায় না, সব জিনিষের দাম চড়াইয়া রাখিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় ভাত-কাপড় মহার্ঘ করিয়া রাখা। এই চেষ্টাই প্রবল ভাবে চলিতেছে এবং এই জন্যই ভারত সরকার মূল্যমানের স্বাভাবিক স্তরে আগমনে এত বাধা দিতেছে। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা নেহরুর নিজস্ব টীম, ২১ জনের মধ্যে ৭ জন তাঁহার প্রদেশের লোক। মন্ত্রীদের অধিকাংশই অকংগ্রেসী, কিন্তু নেহরুর বিশ্বাসভাজন। গোপালস্বামী আয়েঙ্গারকে দিয়া রেলে উত্তরপ্রদেশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পর নেহরু এবার তাঁহাকে দেশরক্ষা মন্ত্রী করিয়াছেন। দেশরক্ষা বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদে কুর্গী ও বাঙ্গালীদের প্রাধান্যে ইউ-পি এবং পাঞ্জাবীদের অনেক দিন ধরিয়া চক্ষু টাটাইতেছে। ভাল ভাল বাঙ্গালী অফিসারদের সুযোগ প্রাপ্তিমাত্র অবসর লইতে বাধ্য করা হইতেছে। গোবরস্বামীকে শিখণ্ডী করিয়া দেশরক্ষা বিভাগের কর্তৃত্ব কুক্ষিগত করিবার জন্য এবার এখানেও প্রাদেশিকতা ঢোকানো হইবে, ইহাদের অতীত কার্য্যকলাপ দেখিয়া এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।"

—যুগবাণী।

মন্ত্রী কি জিনিষ?

"পশ্চিমবঙ্গ ভালই চলিতেছে। এক দিকে অন্নকষ্ট, অর্থাভাব, অপর দিকে দলে দলে উদ্বাস্তুদের আগমন। উদ্বাস্তুদের আগমনের বিরাম নাই। কারণ অতি স্পষ্ট। সমস্ত মিলাইয়া দেখিলে আমরা কোথায় চলিয়াছি তাহা ভাবিতেও পারা যায় না' এইরূপ অবস্থাতেও পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিত্ব কাহার ভাগে পড়িল না পড়িল, তাহা লইয়া গবেষণার অন্ত নাই। মন্ত্রী যিনিই হউন না কেন, তাহা লইয়া সাধারণ লোক বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে না। অন্নকষ্টে, গৃহহারাদের দুর্দশায় দেশ যেখানে ভরপুর সেখানে মন্ত্রিত্বের গদী লইয়া কাড়াকাড়ি, দলাদলি চলিতে পারে কিন্তু তাহা দেশের দুঃখ দূর করিতে পারে না। আজ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক ভাবে অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে। ভাতের বদলে আটা খাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। এরূপ অবস্থায় কে মন্ত্রী হইল না হইল তাহা লইয়া যাহারা কাজ হাসিল করিতে চায় তাহারাই মাতিবে, অন্য কেহ নহে। মন্ত্রী কি জিনিষ তাহা গত পাঁচ বৎসর মানুষ দেখিয়াছে এবং কোনো কোনো মন্ত্রীকে দূর হইতে চক্ষেও দেখিয়াছে।"

—ত্রিস্রোতা।

দুর্ভিক্ষ! দুর্ভিক্ষ!!

"গত এক মাস যাবৎ সহরে যে ভাবে কাতারে কাতারে ভিখারী ছেলে মেয়ে যুবা বৃদ্ধ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহা কখনো পূর্বে দেখা যায় নাই। উহারা ব্যবসায়ী ভিক্ষুক নয়। তাহাদের সকলেই কৃষক শ্রেণীর লোক। গ্রামাঞ্চলে ধান-চাউলের অভাবেই তাহারা সহরে ভিক্ষুকের বেশে আসিতে বাধ্য হইয়াছে। শূন্যভাণ্ডার গৃহস্থেরা আজ বিপন্ন। এত দিন ধারকর্জ্জ করিয়া ধানের ব্যবস্থা করিয়াছিল, প্রতিবেশীর ভাণ্ডার নিঃশেষিত হওয়ায় এখন আর ধারকর্জ্জও মিলে না। বহু অঞ্চল হইতে আমরা অনাহার ও অর্দ্ধাহারের খবর পাইতেছি। বন্যাপীড়িত অঞ্চলের গৃহস্থবাড়ীতে এক বেলার বেশী কাহারো অন্ন জুটে না। কোন কোন পরিবারে এক বেলারও অন্নের সংস্থান নাই, তাহারা কাঁটাল-বীচি ও সীম-বীচি খাইয়া আছে। ঐ সকল দুঃস্থ কৃষক-পরিবারকে কৃষিঋণ মঞ্জুর

করার জন্য স্থানীয় কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ গভর্ণমেণ্টের কাছে সুপারিশ করিয়াছেন। অগৌণে যাহাতে কৃষিঋণ মঞ্জুর, স্থানে স্থানে প্রয়োজন মত রিলিফ কেন্দ্র খোলা ও নিয়ন্ত্রিত দরে ধান-চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়, তজ্জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে আমরা আকুল আবেদন জানাইতেছি। অনাবৃষ্টির জন্য এ বৎসরও আউস ভাল হইতেছে না; লোক কপর্দ্দকহীন, ধানের ভাণ্ডার শূন্য, খাদ্যাভাবে স্বাস্থ্যহীন তনু, অপুষ্টিজনিত রোগে রক্তহীন চেহারা—আমাদের এই কৃষককুলকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, গভর্ণমেণ্টের আশু কৃষিঋণ মঞ্জুর, বীজ-ধান প্রদান ও সুলভ দরে ধান-চাউল বিতরণ ভিন্ন আমরা অন্য উপায় দেখিতেছি না। আমরা আশা করি, গভর্ণমেণ্টের কাছে আমাদের এই আবেদন ব্যর্থ হইবে না।" —কাছাড়।

হেস্তনেস্ত হোক

"মানভূম সিংভূম প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা হেস্তনেস্ত হইয়া যাওয়া মঙ্গল। উদ্বাস্তদের খাতিরেই হউক বা বাংলা ভাষাভাষীদের দাবীতেই হউক, পশ্চিমবঙ্গ ঐ অঞ্চলগুলি পাইবে কি না এবং ঐ অঞ্চলের লোক এ রাজ্যের সরকারের আওতায় আসিতে চাহে কি না—তাহা ঠিক করিয়া জানিয়া লওয়াই ভাল। নতুবা কোনো একটা গণ্ডগোলের সূত্রপাত হইলেই সিংভূম-মানভূমের লোভ দেখাইয়া লোকচিত্তকে বিভ্রান্ত করার খেলা বরাবরই চলিবে। দাবী, প্রত্যাখ্যান, বাদানুবাদ, গালাগালি সবই হইবে, তাহার পর উচ্চতম কোনো নেতা "চুপ করিয়া থাক, এখনও সময় হয় নাই"—বলিয়া মুরুব্বীর মত সব থামাইয়া দিবেন এবং সকলেই শান্তশিষ্টের মত চুপ করিয়া যাইবে। এই খেলা এত বার হইয়াছে যে সাধারণ লোকে ইহাকে একটা সাজানো ব্যাপার বা ধাপ্পাবাজী মনে করিতে সুরু করিয়াছে। সংসদের এই অধিবেশন চলা কালেই এ খেলার শেষ হউক। আমাদের মনে হয়, কংগ্রেসের হেফাজতে পশ্চিমবঙ্গ মানভূম, সিংভূম কখনই পাইবে না। না পাক, দুঃখ করিব না—কিন্তু কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তদের আগমনে এখানের ভূমির যে অত্যধিক চাপ পড়িয়াছে কেন্দ্রকে তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। এখানের প্রতিনিধিরা কেন্দ্রের উপর সেই চাপ আনুন। 'কাটান' দিবার নানা অজুহাত আছে জানি কিন্তু কাটান দেবার অর্থ সমাধান নয়। কেন্দ্রকে এই সোজা সত্যটি বুঝাইবার দায় এখানের প্রতিনিধিদের।" —নিশানা।

উপায় কোথায়?

"সরকারী নিয়মে চাউলের দর ২৫৲ টাকার অধিক হইলে রেশনিং ব্যবস্থার প্রচলনের কথা আছে। ইতিপূর্ব্বে বহরমপুর সহরে চাউলের দর ২৮৲ টাকা উঠিলে, তৎকালীন জেলা কর্তৃপক্ষ সহরে রেশনে চাউল দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী সে যাত্রা টিকিয়া যান। বর্ত্তমানে চাউলের দর ৩০৲ টাকা পার হইয়াছে, কিন্তু সহরে রেশনে চাউল দেওয়ার ব্যবস্থা হয় নাই। মজুর ও চাষীশ্রেণীর সহিত তুলনায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পূর্ণ অসহায়। নিরুপায়ের মত তাঁহারা সর্ব্বত্র মনের হাহাকার মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হইতেছেন। বহুপোষ্য প্রতিপালক মধ্যবিত্ত সমাজের বিত্তের সীমাবদ্ধতা সব দিক ঠিক

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রী ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায়

রাখিয়া জীবন যাপনের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা উপস্থাপিত করিয়াছে। কাজেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বাঁচাইয়া রাখিবার ব্যবস্থার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি জীবনযুদ্ধের যে স্থানে তাহাদের রাখিয়া দিয়াছে, বর্ত্তমানে সে স্থান হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় কোথায়? শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এখন অনেক কথাই শোনা যায়। কিন্তু অর্থনৈতিক যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হইলেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহনশীলতা যে অপরিসীম নয়, ইহাও মনে রাখিতে হইবে। মধ্যবিত্ত সমাজকে তাই অন্নহীন, বিবস্ত্র ও অসহায়

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন

অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে হইবে, যাহাতে বর্ত্তমানে স্বল্পবিত্ত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরম বিলুপ্তি না ঘটে। খাদ্যাভাবে নিষ্পিষ্ট এই ভদ্র জনতার দিকে সরকারী বিভাগের দৃষ্টিদানের সময় হইয়াছে। সহরাঞ্চলের সর্ব্বত্র রেশন প্রথায় নিয়মূল্যে চাউল সরবরাহ তাহার প্রারম্ভিক সোপান মাত্র। আমরা এদিকে জেলা কর্ত্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।" —মুর্শিদাবাদ সমাচার।

বিনা রসিদে চৌকিদারী ট্যাক্স আদায়

"বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, ঝাড়গ্রাম থানায় কোন কোন ইউনিয়নে গত বাং সন ১৩৫৮ সালের চৈত্র মাসের মধ্যে আদায়কারী পঞ্চায়েৎগণ ঐ সালের চৌকিদারী ট্যাক্স ইউনিয়নবাসিগণের নিকট এককালীন আদায় করিয়া লইয়াছেন। ট্যাক্স আদায়দাতাগণ পঞ্চায়েতের নিকট রসিদ চাহিলে তাঁহারা সে সময় বলিয়াছেন যে সরকার হইতে রসিদ বহি না পাওয়ার জন্ত তাঁহারা বর্ত্তমানে রসিদ দিতে পারিতেছেন না; রসিদ বহি যখনই পাওয়া যাইবে তখনই চৌকিদার মারফত আদায়ী চৌকিদারী ট্যাক্সের রসিদগুলি পাঠাইয়া দিবেন। গ্রামবাসিগণ সরল বিশ্বাসে যথারীতি ট্যাক্স আদায় দিয়াছে কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসের এক সপ্তাহ শেষ হইল এখনও ট্যাক্সদাতাগণ আদায়কারী পঞ্চায়েৎগণের নিকট হইতে তাহাদের রসিদ প্রাপ্ত হয় নাই। এদিকে ঝাড়গ্রাম থানা ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের তোড়-জোড় পূরামাত্রায় চলিতেছে। গত বাংলা বৎসরে যাঁহারা চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় দিয়াছেন তাঁহারাই ইউনিয়ন বোর্ডের ভোটার শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন বা সভ্য-পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন। এক্ষণে বিনা রসিদে যাহাদের নিকট হইতে ট্যাক্স আদায় করা হইয়াছে তাহাদিগকে ভোটার শ্রেণীভুক্ত না করিলে ট্যাক্স আদায়দাতাগণের আপত্তি কেবলমাত্র অরণ্যে রোদন হইবে। ভোটারের দাবী প্রতিপন্ন করার জন্ত কোন নিদর্শনও পাইবেন না, ইউনিয়ন বোর্ড দখল করার জন্ত বর্ত্তমান সরকার মনোনীত পঞ্চায়েৎ বোর্ডের ইহা পরিকল্পিত প্রস্তুতি বলিয়াই মনে হইতেছে। এ বিষয়ে আমরা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।" —নির্ভীক।

হোমিওপ্যাথি

"কাল্না মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে ২ নং ওয়ার্ডের কমিশনার নাকি পেয়ে—ব'সেছেন। ফু-নম্বরেতর ওয়ার্ডগুলির কম-মিশনার অপেক্ষা সংশ্লিষ্ট ভদ্রলোকের মিশন এক-আধটু কম হ'লে এমন কথা উঠ্‌তে পেত কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া, রাহু-কেতুর প্রকোপ যাতে চাঁদের একটু কমে, তার জন্ত এই হোমিওপ্যাথি দাওয়াই মন্দ কি?" —পল্লীবাসী।

আবগারীতে ফাঁকি

"বীরভূম জেলায় অবস্থিত সরকারের আবগারী বিভাগটি একমাত্র মাসের শেষে মাহিনা গুণিয়া লইবার সময় ব্যতীত সকল সময়েই 'শিব-নেত্র' হইয়া বসিয়া সারা সৃষ্টির প্রতি পরম উদাসীন থাকেন। এই তুরীয়-ভাব কি 'জল-বিছুটী' না লাগাইলে ঘুচিবে না? রামপুর-হাটের সহরতলী ব্রাহ্মণীগ্রামের চোলাই কারবার আর সহরের মধ্যস্থলে অস্বাস্থ্যকর ও সামাজিক অকল্যাণকর পচুই মদ, তাড়ির দোকানাদির অবস্থান সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্ত বারংবার অবহিত করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি আবগারী বিভাগের চেতনার কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। আমরা একদা শুনিয়াছিলাম যে, সহরের মধ্য হইতে মদ ও তাড়ির দোকান অপসারিত করার জন্ত আবগারীকর্ত্তাগণ কয়েক দফা স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের তথা প্রতিষ্ঠানের মতামত সংগ্রহ করিয়া—ঐ সকল দোকান অপসারণের অনুকূলেই সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর বৎসরাধিক অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তাহা কার্য্যকরী হয় নাই। কোন্ মধু-মায়ার নয়নাঞ্জন কর্ত্তাদের দৃষ্টি পুনরায় স্তিমিত করিয়া দিল?" —রাঢ়-দীপিকা।

কোথা প্রতিকার

"দিয়েছি যাদের হাতে আমাদের শাসনের ভার,
আমাদের সুরক্ষণ, নিরাপত্তা, শান্তি, সুবিচার;—
শাসন না করি' যদি হানে তারা বিঘ্ন পদে পদে,—
শোষণ পীড়ন করে,—হেয় করে অহংকার মদে;
বিচার না করি' যদি অহরহ করে সে চালাকি,
আপন অন্যায়ে ঢাকি,' ন্যায়েরে কৌশলে দেয় ফাঁকি;
তবে বল আর—
অভিযোগ কার কাছে—কোথা অন্যায়ের প্রতিকার?
নিচের শাসনযন্ত্রে নিয়ত রাখিতে নিয়ন্ত্রণে,—
সগৌরবে বৃত যারা ন্যায়ের মহোচ্চ সিংহাসনে;
সেই তারা হয় যদি অন্যায়ের নিষ্ক্রিয় দর্শক,
স্বার্থবশে, স্নেহবশে অন্যায়ের নিত্য সমর্থক;
বিচারের দাবী হ'তে মুক্ত রাখে অপরাধী জনে,
নিত্য ব্রতী নিজেদের চক্রান্তের ধারা সংরক্ষণে;
তবে বল আর—
আবেদন কার কাছে—কোথা অন্যায়ের প্রতিকার?
এ বিভ্রান্তি মাঝে দেশ ভাবিতেছে—কোথা প্রতিকার?
এ দূষিত ধারা হ'তে কোন্ পথে কি ভাবে উদ্ধার?"
—মুক্তি।

বাঙলায় ধূম্রজাল

"স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য বাঙালীই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বলিদান দিয়াছে। বাংলা আজ খণ্ড-বিখণ্ড, লক্ষ লক্ষ বাঙালী সন্তান আজ বাস্তুহারা, অসামাজিক জীব এবং মৃত্যুপথযাত্রী। এত চরম লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও আশা করিয়াছিল সুদিন আসিবে। কিন্তু সুদিন তো দূরের কথা, সুদীর্ঘ দুর্দ্দিন তার ভাগ্যকে অস্তাচলগামী করিয়া তুলিয়াছে। দেখিয়া-শুনিয়া মনে হয়, স্বাধীন ভারতের কর্ণধারগণের যেন এদিকে লক্ষ্য নাই। উপরন্তু ভাবগতিকে বোধ হয় তাঁহারা চান না বাঙ্গালী তাহার পুরানো গৌরব ফিরিয়া পাক। বিভক্ত বঙ্গকে একটা সুপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য হিসাবে গড়িয়া উঠিতে হইলে তাহার আরও জায়গার প্রয়োজন। সেই হিসাবে যাহা বাঙলার একান্ত নিজস্ব জায়গা এবং যাহা অতীতে বাঙলারই অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই মানভূম, সিংভূম ইত্যাদি জায়গায় অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন।

সতীশচন্দ্র পাঁচ বৎসর ধরিয়া বিজ্ঞান সম্মত যুক্তি প্রদর্শন করা ...ধীনতা-সংগ্রামের দিনে আজিকার শাসক-প্রতিষ্ঠান প্রথম ...সংগ্রামী কংগ্রেসের নীতির কথা মনে পড়াইয়া দেওয়া কিন্তু আজিও এই সমস্যা ধূম্রজালের মধ্যে রহিয়া কোনই সমাধান হয় নাই।" —বীরভূমবার্ত্তা।

রাজেন্দ্র-রাজ্যে দুর্ভিক্ষ!

...খবরের কাগজ খুলিয়া রোজ যাহা পড়িতেছি তাহাতে বিশ্বকবি ...নাথের "রাজারাণী" নাটকের রাজ্যশাসনের কথা কেবলই মর্মে পড়িতেছে। অধিক কথা না বলিয়া কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—

কিছু না, কিছু না
শুধু ক্ষুধা, হীন ক্ষুধা, দরিদ্রের ক্ষুধা।
অভদ্র অসভ্য যত বর্ব্বরের দল
মরিছে চিৎকার করি ক্ষুধার তাড়নে।
অভাগ্যের দুরদৃষ্ট,
চিরদিন কেটে গেছে অর্দ্ধাশনে যার
আজো তার অনশন হল না অভ্যাস
এমনি আশ্চর্য্য!
দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা
বেঁচে যায় দয়া হয় যদি, নহে তো
কাঁদিয়া ফেরে পথপ্রান্তে মরিবার তরে।
রাজা কি নির্দ্দয় তবে? দেশ অরাজক?
—অরাজক কে বলিবে? সহস্র রাজক।
কে তারা? বিদেশী?
—রাণীর আত্মীয় তারা প্রজার মাতুল
যেমন মাতুল কংস মামা কালনেমি।

থাক আর পুঁথি বাড়াইব না। বন্দে মাতরম্!"

—আসানসোল-হিতৈষী।

অধম লোক কাহাকে বলে?

"সম্প্রতি ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি জহরলালজী এক স্থানে বাণী দিবার সময় বলিয়াছেন—কথা কম বলিয়া কাজ বেশী করিতে হইবে। শ্রীজহরলালজীর শ্রীমুখ হইতে এই উপদেশামৃত বাহির হইয়াছে শুনিয়া কে না আনন্দিত হইবে? তাঁহার বচন তিনি মানিয়া চলিলে এই নিরন্ন ভারতে কোন অভাব থাকিবার কথা নয়। স্বাধীনতা পাইবার আগে এবং পরে তিনি যত কথা বলিয়াছেন তত কাজ হইলে আজ ভারত সত্য সত্যই রামরাজ্য কেন, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর সুখের রাজ্য হইত। অধার্ম্মিক, দাগাবাজ, কালাবাজারী সব কেহ বা লাইটপোষ্টে ঝুলিত, আবার অনেকে তাহা দেখিয়া রত্নাকরের মত দস্যুবৃত্তি পরিহার করিয়া বাল্মীকি হইয়া যাইত! কিছু দিন আগে তিনি নির্ব্বাচনী প্রচারে বাহির হইয়া বলিয়াছিলেন—ভারতীয় কাল্‌চারে তাঁহার বিশ্বাস নাই। কথা কম, কাজ বেশীর সম্বন্ধে এবার যা বলিয়াছেন, তাহা কিন্তু ভারতীয় কবির কথার সঙ্গে বেশ মিল খায়। ভারতীয় প্রাচীন কবি সংস্কৃত কবিতায় সমগ্র মানবমণ্ডলীকে 'উত্তম', 'মধ্যম' ও 'অধম' এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া 'উত্তম'কে কাঁটাল গাছের, 'মধ্যম'কে আম গাছের এবং 'অধম'কে কুল নামক ফুল গাছের সহিত তুলনা করিয়াছেন। যাঁহারা কথা না দিয়া একেবারেই কার্য্য করিয়া থাকেন তাঁহারাই 'উত্তম' লোক। যাঁহারা প্রথমে কথা দিয়া পরে তাহা কার্য্যে পরিণত করেন, তাঁহারাই 'মধ্যম' লোক। যাহারা কথা দেয়, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করে না, তাহারাই 'অধম' লোক।"

—জঙ্গিপুর সংবাদ।

জমি সমস্যা

"অনাবাদী পতিত জমিগুলির জলসেচ ও জলনিকাশ ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার করিয়া চাষাবাদ পুনঃপ্রবর্ত্তন করার সমস্যা তো আছেই, ইহা ছাড়াও বর্দ্ধমান জেলায় আবাদী জমি স্বাভাবিক ভাবে চাষাবাদ করিয়া যাওয়ার মধ্যেও অনেক রকমের সমস্যা দেখা দিয়াছে। কোথাও বা শ্রমিক-সমস্যা, কোথাও বা অর্থ-সমস্যা, আবার কোথাও বা সার, বীজ প্রভৃতির সংগ্রহ সমস্যা স্বাভাবিক চাষাবাদকে সময়ে সময়ে ব্যাহত করিতেছে। এই সমস্যা হইতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে বর্দ্ধমান জেলার কৃষকদের মধ্যে সমবায় সমিতি গঠনের দ্বারা চাষাবাদ করিবার যে আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা যথার্থই আশার কথা। কিন্তু এই সমস্ত সমিতি সময় সময় অর্থের অভাবে তাহাদের ঈপ্সিত কার্য্যে প্রচুর বাধা পাইতেছে। সম্প্রতি কোঅপারেটিভ বিভাগ ও ব্যাঙ্ক এই সমস্ত সমিতিগুলির কাজে সন্তুষ্ট হইয়া সকল রকম সাহায্য করিতে উৎসুক হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ইহার দ্বারা সমগ্র জেলাবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইবেন বলিয়া আমরা মনে করি।"

—বর্দ্ধমানের কথা।

হত্যাকারীদের শাস্তি চাই

"কায়েমী স্বার্থ রক্ষার্থে অন্ধ হইয়া মানুষ যে কত দূর নৃশংস হইতে পারে তাহার আরেকটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল রামচন্দ্রপুরের হত্যাকাণ্ড! বহু দিন ধরিয়াই ভাগচাষ আইন পাশ হইয়াছে। সেই আইনানুযায়ী এদেশের চাষের প্রথামত ভাগচাষী উৎপন্ন শস্যের তিন ভাগের দুই ভাগ পাইবার অধিকারী। এত দিন জানিয়া-শুনিয়াই স্থানীয় জমিদাররা চাষীদের ন্যায্য অংশ ফাঁকি দিয়া উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধেক আদায় করিয়া যাইতেছিল। গত দুই বৎসর ধরিয়া কৃষাণ পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে উলুবেড়িয়া থানার বিভিন্ন গ্রামে আইনানুযায়ী 'তে-ভাগা' আন্দোলন সুরু হয় এবং বহু শত চাষী একযোগে তাহাদের ন্যায্য পাওনা আদায় করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। তখন হইতেই সুরু হইল স্বার্থান্ধ জমিদারদের একজোটে চাষীদের এই ন্যায়সঙ্গত দাবীকে দাবাইয়া দিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা—গুণ্ডা পাঠাইয়া চাষীদের ধান লুঠ করার চেষ্টা!"

—উলুবেড়িয়া-সংবাদ।

জেলাবোর্ড ফেল

"বীরভূম জেলাবোর্ডের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর অধিকার সংকুচিত রাখিয়া স্বদলীয় প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য কংগ্রেস

সরকার যে কুখ্যাত অধ্যায় রচনা করিলেন, তাহা অন্য কোন স্বাধীন দেশের গভর্ণমেন্টে কল্পনা করিতেও লজ্জিত হয়। ১৯৫১ সালের ১২ই জুন বীরভূম জেলার অধিবাসিগণ ২১টি আসনের জন্য লড়াই করিয়া কংগ্রেসকে মাত্র ৮টি আসন দিয়া যে রায় দিয়েছিল তাহাকে ব্যাহত করিবার জন্য কংগ্রেস সরকার স্বায়ত্ত-শাসন আইনের পিছনের দরজার ছিদ্র অন্বেষণের জন্য যথাসময়ে চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনের প্রথম সভা আহ্বান না করিয়া কালক্ষেপ করত: একদা শুভ অক্টোবরে আবিষ্কার করিলেন যে, যেহেতু এক মাসের মধ্যে চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন করা সম্ভবপর হয় নাই তজ্জন্য স্বায়ত্ত-শাসন আইনের ২৩ (ক) ধারায় সরকার বাহাদুর চেয়ারম্যান মনোনয়ন করিবেন। সরকার বাহাদুরের এই ভ্রমাত্মক টীকাভাষ্যের প্রতিবাদ করিয়া সেদিন ১১ জন অকংগ্রেসী সদস্য প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু স্বাধীন দেশের পরাধীন নাগরিকের কথা কে শুনে? সুদীর্ঘ ৭ মাস গড়িমসী করিয়া কংগ্রেস ত্যাগ এবং কংগ্রেসে পুনঃপ্রবেশের মাশুল দিয়া শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৭ই এপ্রি... মদ, তাড়ির ... অবলম্বনের জন্য মনোনীত করা হইল।"

জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইতে... ...গের চেষ্টনায়

"কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা দিন দিনই হ্রাস পা... ছিলাম যে, প্রতীকারকল্পে কিছু দিন পূর্ব্বে কংগ্রেস সভাপতি ... করার জন্য নেহরু নির্দ্দেশ জারী করিয়াছিলেন যে, যথাসম্ভব নূতন রক্তের দ্বারা করিয়া কংগ্রেস কমিটি সমূহ পুনর্গঠিত করিতে হইবে। ...সারের কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে অনেক ক্ষেত্রেই পুরাতন ও ...াধিক রক্তই রহিয়া যাইতেছে। সেদিন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ... মধ্যে গঠনের প্রহসন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে কংগ্রেসসেবীদের এমনই দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে যে প্রাদেশিক কমিটীতে এক জনের অধিক নূতন সদস্য সংগ্রহ করা গেল না এবং এই এক জনকেও বা কেন নেওয়া হইল তাহার কারণ জনসাধারণের অজ্ঞাত নয়। শিলচরেও পশ্চিম বঙ্গেরই অনুরূপ ঘটনার সূত্রপাত দেখা যাইতেছে!" —জনশক্তি।

দক্ষিণখণ্ডের শিবপ্রতিষ্ঠা

যজ্ঞস্থল

ধীরাজেশ্বর শিবমন্দির

ই. আই. রেলের সালার ও গঙ্গাটিকুরী ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী বহরান হল্টের নিকটস্থ দক্ষিণখণ্ড গ্রামে। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত দক্ষিণখণ্ড গ্রামের উত্তর প্রান্তে ১০৮ শ্রীমৎ দ্বারিকানাথ-দেবের বা দক্ষিণখণ্ডের সাধু বাবার সঙ্কল্পিত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধু বাবার মূল সাধনাক্ষেত্র এই স্থানেই ছিল। এখান হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়া তিনি ভারতের নানা স্থানে বহু আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া সনা...ধর্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি সাধু বাবার ...লের দক্ষিণখণ্ডের আশ্রমে শিবপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এক বিরাট উৎসব হইয়া গিয়াছে। বহু বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করেন। অসংখ্য ভক্তের সমাগমে আশ্রমটি কোলাহলমুখরিত হইয়া উঠে। পূজা, হোম, গীতা ও চণ্ডীপাঠ, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, রামায়ণ গান, রাধাকৃষ্ণের লীলা-কীর্ত্তন, নহবৎ বাদ্য প্রভৃতি মিলিয়া এক অপূর্ব্ব দিব্য আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। পূজামণ্ডপটি পুষ্প দ্বারা মনোরম ভাবে সজ্জিত করা হয়। বাংলার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠানটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যম...ত হয়। অগণিত ভক্ত-সমাগম হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের আহার ও বাসস্থান সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লওয়া হয় এবং তাহার ফলে কাহাকেও কোন অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অসংখ্য নরনারী ও দরিদ্রনারায়ণকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করান হয়। এই উৎসব উপলক্ষে একটি প্রকাণ্ড মেলা বসে। স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকারা সমাগত ভক্তবৃন্দকে নানাবিধ ভাবে সাহায্য করেন। বামনদাস বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম এ ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আশ্রম-সমিতির সভ্য শ্রীসত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন।
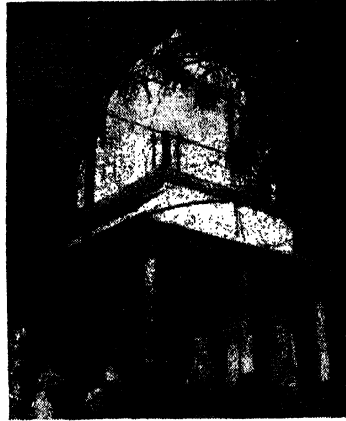
সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

প্রথম খণ্ড]　　[তৃতীয় সংখ্যা

আষাঢ়

১৩৫৯

৩১শ বর্ষ

M. no - 48/22

কথামৃত

অনুতাপের অশ্রু আর আনন্দের অশ্রু চক্ষুর দুই দিক দিয়া বাহির হয়। নাসিকার দিকে চক্ষের যে কোণ সেখান দিয়া অনুতাপের অশ্রু এবং অপর দিক দিয়া আনন্দাশ্রু বাহির হয়।

—

তেলা হাতে কাঁটালের আঠা লাগে না, বিশ্বাসী হৃদয় পরীক্ষায় ভীত হয় না।

—

গ্যাসের আলো নানা স্থলে নানা ভাবে জ্বলিতেছে, কিন্তু সমুদায়ই ভিতরে ভিতরে সেই এক আধার হইতে আসিতেছে। নানা দেশীয় ও জাতীয় বিভিন্ন বিভিন্ন উজ্জ্বল ধর্মালোকও সেই এক পরমেশ্বর হইতে আসিতেছে।

—

মুক্তি হবে কবে? আমি যাবে যবে।

—

ঝড় উঠিলে অশ্বত্থ গাছ বট গাছ চেনা যায় না। জ্ঞান চৈতন্যের উদয় হইলে জাতিভেদ থাকে না।

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

মাষ্টার মশাই
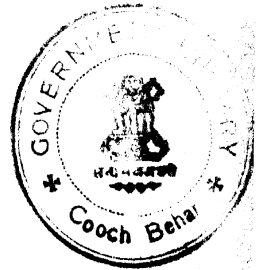
শ্রীঅমল মিত্র

"গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী। মা-কালীর মন্দির। বসন্ত কাল ইংরেজী ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। * * * মাষ্টার সিধুর সঙ্গে বরাহনগরে এ-বাগানে ও-বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন। আজ রবিবার, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৪ই ফাল্গুন,—অবসর আছে, তাই বেড়াতে এসেছেন। * * * ভবতারিণীর মন্দির হইতে বৃহৎ পাকা উঠানের মধ্য দিয়া পাদচারণ করিতে করিতে দুই জনে আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। * * * তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, ঘরে আর অন্ত কেহ নাই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে একাকী তক্তপোষের উপর বসিয়া আছেন। সবে ধুনা দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত দরজা বন্ধ। মাষ্টার প্রবেশ করিয়াই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিতে অনুজ্ঞা করিলে, তিনি ও সিধু মেজেতে বসিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় থাকো, কি করো, বরাহনগরে কি করতে এসেছ?" ইত্যাদি। মাষ্টার সমস্ত পরিচয় দিলেন। * * * আর কিছু কথা-বার্ত্তার পর মাষ্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "আবার এসো।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যাঁকে সস্নেহে বললেন, "আবার এসো"—সেই ভাগ্যবান মানুষটি—১২৬১ সালের ৩১শে আষাঢ় (ইংরাজী ১৮৫৪, ১৪ই জুলাই) শুক্রবার কলকাতার সিমলা অঞ্চলে শিবনারায়ণ দাসের লেনে জন্মগ্রহণ করেন। নাম শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত কিন্তু সকলের কাছেই আজ তিনি মাষ্টার মহাশয় বা 'শ্রীম' নামেই পরিচিত। পিতা শ্রীমধুসূদন গুপ্ত এবং মাতা শ্রীমতী স্বর্ণময়ী,—উভয়ের কাছ থেকেই মহেন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন ধর্ম্মপ্রবণতা, সরলতা ও আরও বহু সদ্‌গুণাবলী। ছেলেবেলায় মায়ের সঙ্গে কালীঘাটে গিয়ে বালক মহেন্দ্রনাথের মন বলি দেখে এমনই বিষাদে ভরে উঠল যে, মনে মনে তিনি ভাবলেন, "বড় হলে বলি তুলে দেব।" বাল্যকাল থেকেই এমনি ছিল তাঁর কোমল স্বভাব।

হেয়ার স্কুলে পাঠকালেই তীক্ষ্ণমেধাবী মহেন্দ্রনাথ রামায়ণ-মহাভারতের প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং দেবদেবীর কথা, স্তোত্র প্রভৃতির প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ দৃষ্ট হল। ভবিষ্যতের "শ্রীম" ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগলেন। ১৮৭৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি, এ, পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হবার পূর্ব্বেই তিনি গভীর ভাবে অধ্যয়ন করলেন পাশ্চাত্য দর্শন, ইতিহাস, বাইবেল, বিজ্ঞান ও সাহিত্য। সংস্কৃত সাহিত্যও বাদ পড়ল না। এবং ছাত্রাবস্থায় এই সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁকে দিয়েছিল বিশেষ আনন্দ। কলেজের পাঠ শেষ করবার পূর্ব্বেই স্বর্গীয় ঠাকুরচরণ সেন মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী নিকুঞ্জ দেবীকে বিবাহ করলেন মহেন্দ্রনাথ (১৮৭৩) এবং বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইন অধ্যয়নের জন্য ভর্ত্তি হলেন। এই সময় দারুণ অর্থাভাব বশতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র মহেন্দ্রনাথ বাধ্য হলেন পড়াশুনা ত্যাগ করে স্নেহময় পিতাকে দুর্দিনে সাহায্য করবার নিমিত্ত এক সওদাগরী অফিসে চাকরী গ্রহণ করতে। কিন্তু আদর্শবাদী ও ধর্মপ্রাণ মহেন্দ্রনাথ নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলেন না সওদাগরী অফিসের আবহাওয়ায়। অল্প দিনের মধ্যেই ত্যাগ করলেন সে চাকরী এবং তাঁর স্বাভাবিক বিদ্যানুরাগ তাঁকে অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী করল। প্রথমেই যোগ দিলেন নড়াল উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকরূপে। অল্প দিনেই অর্জ্জন করলেন প্রভূত খ্যাতি ও ছাত্রদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। তার পর কলকাতার সিটি, রিপণ, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, মডেল ও মেট্রোপলিটান্ প্রভৃতি স্কুলে দক্ষতার সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের পদে কার্য্য করে ১৯০৫ সালে ঝামাপুকুরের মর্টন ইন্‌ষ্টিটিউসন ক্রয় করলেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার বহু দিন পরে ৫০ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে এই স্কুল-বাড়ীর চারতলায় তাঁর ঘরখানিতে সমবেত হতেন ঠাকুরের শিষ্য ও অন্যান্য বহু ভক্তবৃন্দ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মহেন্দ্রনাথ তাঁর গুরুর অমূল্য বাণী তাঁদের শোনাতেন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও অনুভব করতেন না কোন ক্লান্তি বা অবসাদ। পরন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আলোচনাতেও তাঁর সমস্ত হৃদয়-মন আনন্দে ভরে উঠত। তাঁর কাছে এর চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা বা আনন্দ জীবনে আর কি হতে পারে?

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভাবোদ্দীপক ও অপূর্ব বক্তৃতাগুলি বহু শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন বাঙালীকে করেছিল মুগ্ধ ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট। ব্রাহ্মসমাজ তখন আর একদিক দিয়ে সকল সংস্কৃতিরই কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। যুবক নরেন্দ্রনাথের মতন মহেন্দ্রনাথও সুরু করলেন ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত। গভীর ভাবে পাশ্চাত্য দর্শনাদির অধ্যয়ন ও 'কমল কুটীরে' কেশবচন্দ্রের মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা শ্রবণ,—ধীরে ধীরে এনে দিল তাঁর মনে নিরাকার ব্রহ্মের প্রতি অনুরাগ। তখনও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেননি। এই ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত কালেই শান্তিপ্রিয় মহেন্দ্রনাথের সাংসারিক জীবনে অশান্তি এলো ঘনিয়ে। আত্মীয়-স্বজনের নীচতা ও স্বার্থপরতা এমনই আঘাত হানল তাঁর মনে যে, সংসার তাঁর কাছে বিষবৎ ঠেকল। মর্ম্মাহত মন চঞ্চল হয়ে উঠল সাংসারিক জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে। ভক্তের ব্যাকুল ডাক পৌঁছল ভগবানের কানে। ১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের এক সন্ধ্যার প্রাক্কালেই দক্ষিণেশ্বরে মহেন্দ্রনাথ যেন সন্ধান পেলেন তাঁর চিরবাঞ্ছিতের। অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন দাঁড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে। শান্তিতে ভরে গেল বিক্ষিপ্ত মন। তাঁর "বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ-কথা কহিতেছেন আর সর্ব্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে।" সেই প্রথম দিনের দর্শনেই মহেন্দ্রনাথের মন অভিভূত হয়ে পড়ল, গভীর ভাবে আকৃষ্ট হলো চিরদিনের মতন সেই মহাপুরুষের প্রতি। ঠাকুরও চিনলেন তাঁর অনুরাগী ভক্তকে প্রথম দর্শনেই। এক সময় বললেন, "তোমার ঘর, তুমি কে, তোমার অন্তর বাহির, তোমার আগেকার কথা, তোমার পরে কি হবে—এ সব ত জানি।" বললেন আরো, "সাদা চোখে গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ দেখেছিলাম, তার মধ্যে তোমায় যেন দেখেছিলাম।" মহেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিবেদন করেছিলেন তাঁর গুরুর পায়ে। জগৎ-সংসারের আর সকলই মুছে গেল তাঁর মন থেকে, খালি জেগে রইল মনে ঠাকুরের চিন্তা, ঠাকুরই হলেন তাঁর সর্ব্বক্ষণের ধ্যান। তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি

নির্দ্দেশ পালন করতে লাগলেন নিজের জীবনে। ঠাকুরকে দেখবার জন্ম, তাঁর কথামৃত পান করবার জন্ম, তাঁর অপার করুণা লাভ করবার জন্ম সে কী তীব্র ব্যাকুলতা! বাড়ীতে থেকে পেতেন না কণা মাত্র শান্তি, মন যে পড়ে আছে দক্ষিণেশ্বরের সেই উত্তর-পশ্চিমের ছোট ঘরখানিতে। এমন এক উন্মাদনা এলো প্রাণে যে প্রায়ই দেখা যেত, গ্রীষ্মের কড়া রোদ্দুরকে তুচ্ছ করে যানবাহন-হীন রাস্তায় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে একাকী চলেছেন হেঁটে মহেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে। শুধু তাই নয়। ঠাকুর যাবেন ষ্টার থিয়েটারে 'বৃষকেতু' অভিনয় দেখতে, সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ, যাবেন বিদ্যাসাগরকে দেখতে, মহেন্দ্রনাথ সঙ্গে। যদু মল্লিকের বাড়ী, "কমল কুটীর", ব্রাহ্মসমাজ, সিঁদুরেপটি মল্লিকবাড়ী যেখানেই ঠাকুর যান—তাঁর কথামৃত পান করবার জন্যে, তাঁর প্রাণমাতান সঙ্গীত শোনবার জন্যে সঙ্গে চলেছেন মহেন্দ্রনাথ। ঠাকুরও বুঝেছিলেন ভক্তের মনের কথা, তাই বলরামের বাড়ী যাবার আগে বললেন, "আমি বলরামের বাড়ী কলকাতায় যাবো, তুমি যেয়ো, সেখানে গান হবে।" এমনি করে দিনের পর দিন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ ক'রে, তাঁর শিশুসুলভ সরলতা ও অতুলনীয় ভগবৎ-প্রেম দর্শনে এবং তাঁর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ লাভ ক'রে মহেন্দ্রনাথ ধন্য হলেন। ছেলেবেলা থেকেই অভ্যাস ছিল ডায়রী লেখা। সেই অভ্যাসের দরুণই যেদিন ঠাকুরের সঙ্গে যা কথাবার্ত্তা হত একেবারে সাল-তারিখ দিয়ে লিখে রাখতেন ডায়রীতে। তার পরে একদিন গুরু-ভাই রামচন্দ্র দত্তের অনুরোধে লিখলেন "কথামৃত"। বাংলা দেশকে, বাঙালী জাতিকে মহেন্দ্রনাথের এই হল শ্রেষ্ঠ অবদান। পৃথিবীর ধর্ম্ম-সাহিত্যে এ কীর্ত্তি অবিনশ্বর হয়ে রইল। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর বাণী ভারতের নানা প্রদেশে এবং ভারতের বাইরে সুদূর পশ্চিমে ও আমেরিকায় পৌঁছে দিলেন। মহেন্দ্রনাথ বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী তাঁর 'কথামৃতে'র ভেতর দিয়ে। প্রকৃতই অমৃতের সন্ধান পেল বাঙালী। মহৎ কার্য্যের ব্রতীকে জয়রামবাটী থেকে আশীর্ব্বাণী পাঠালেন শ্রীশ্রীমা। লিখলেন—

বাবাজীবন,—

> তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলে, সেই কথাই সত্য। এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে আবশ্যক মত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। ঐ সকল কথা ব্যক্ত না করাইলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই, জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।"

স্বচ্ছ সরল ভাষায় লেখা 'কথামৃত' পড়তে পড়তে সত্যাই মনে হয়, ঠাকুর যেন সামনে বসে "ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।" ১৮৮২ থেকে ১৮৮৬ সালের কত দিনের কত সুস্পষ্ট ছবি জেগে ওঠে মনে। কখন দেখি নরেন্দ্র, গিরিশ, ভবনাথ, বাবুরাম, নিরঞ্জন, রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্ত-পরিবৃত হয়ে ঠাকুর তাঁর ছোট ঘরখানিতে বসে, তাঁর অননুকরণীয় সহজ সরল ভাষায় বেদ, পুরাণ,

---

ces merveilles de l'Amour mystique, qui me paraissent les chefs-d'oeuvre de l'art Bhakti. (Surtout les chants de Chandidas)

3 Est-ce que les drames de Girish sont traduits et publiés en anglais?

Je voudrais aussi vous questionner sur un point d'histoire. Avez-vous connaissance de la date, à laquelle Ramakrishna rencontra Devendranath Tagore? Swami Ashokananda m'avait dit d'abord 1869 ou 1870, puis 1863. Cette dernière date me paraît, logiquement, peu probable, car elle appartient à une période de la vie où Ramakrishna semblait trop occupé de ses propres recherches intérieures pour aller visiter les autres. Mais la logique n'est pas la règle infaillible des existences. Et je souhaiterais d'être, par vous, renseigné à ce sujet.

Excusez-moi d'avoir recours à vos souvenirs (que je vous envie affectueusement). Veuillez croire, cher Mr Mahendranath Gupta, à mon respect et à mon fraternel dévouement en la mémoire de Sri Ramakrishna.

Romain Rolland

মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে ফরাসী ভাষায় লিখিত রোলাঁর পত্রের শেষাংশ

তন্ত্র প্রভৃতির গূঢ় তত্ত্ব তাঁদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন। কখন দেখি যুবক নরেন্দ্রনাথ তাঁকে প্রশ্ন করছেন, "আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন?" কেশব প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সঙ্গে ঠাকুর কীর্তনানন্দে মত্ত, সমাধিস্থ। আবার কখন দেখি মাষ্টার ও নরেন্দ্রকে সম্বোধন করে বলছেন, "তোমরা দু'জনে ইংরাজীতে কথা কও ও বিচার কর, আমি শুনব।"

ভক্ত রামচন্দ্রের অনুরোধে কথামৃত লেখবার পূর্ব্বেই মহেন্দ্রনাথ ১৮৯৭ সালে "The Gospel of Sri Ramkrishna" প্রকাশ করেন। দূরে ফেলে-আসা মধুর দিনগুলির নিখুঁৎ বর্ণনা পড়ে মুগ্ধ হয়ে ডেরাডুন থেকে লিখলেন স্বামিজী, "My dear M. * * * * It is indeed wonderful. The move is quite original and never was the life of a great teacher brought before the public untarnished by the writer's mind as you are doing. The language also is beyond all praise—so fresh, so pointed and withal so plain and easy. I cannot express in adequate terms how I have enjoyed them. Strange isn't it? * * * * I now understand why none of us attempted his life before. It has been reserved for you—this great work.***"

বিদেশ থেকেও এলো প্রশস্তি-বাণী। ফরাসী দার্শনিক রোলাঁ লিখলেন, "* * * Their exactitude is almost stenographic. * * * The book containing the conversations recalls at every turn the setting and the atmosphere. Thanks for having disseminated the radiance of the beautiful smile of your Master."

পরবর্ত্তী কালে রোলাঁ লিখেছিলেন ঠাকুরের জীবনী। The Gospel of Sri Ramkrishna পাঠ ক'রে কেবল যে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন তা নয়, মহেন্দ্রনাথের প্রতি রোলাঁর জন্মেছিল সুগভীর আস্থা—যে জন্ত Life of Ramkrishna রচনাকালে যখনই মনে জাগতো কোন বিষয়ে কোন সংশয়, তখনই তিনি অনুসন্ধানের জন্ত পত্র দিতেন মহেন্দ্রনাথকে। 'মাসিক বসুমতী'র পাঠক-পাঠিকাদের জন্ত এই লেখার সঙ্গে ফরাসী ভাষায় মহেন্দ্রনাথকে লেখা রোলাঁর একটি সুদীর্ঘ পত্রের শেষাংশ উদ্ধৃত করা হ'ল। এই পত্রাংশ লক্ষ্য করলেই জানা যাবে, প্রতিটি তত্ত্ব ও তথ্যের জন্ত কতখানি রোলাঁ নির্ভর করতেন মহেন্দ্রনাথের ওপর।

বহু বৎসর পরে অল্ডাস্ হাক্সলী এই "The Gospel of Sri Ramkrishna" পুস্তকের ভূমিকা লেখার কালে লিখেছিলেন, * * * 'M' produced a book unique, so far as my knowledge goes, in the literature of hagiography." ইংরাজী ছাড়া ফরাসী প্রভৃতি আরও কয়েকটি ভাষায় 'কথামৃত' প্রকাশিত হয়েছে।

১১৩২ সালের ৩রা জুন "কথামৃত"র পঞ্চম ভাগ শেষ করলেন মহেন্দ্রনাথ রাত ১টায়। আরব্ধ কর্ম্ম সমাপনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ততম গৃহী ভক্ত মহেন্দ্রনাথ পরের দিন অর্থাৎ ৪ঠা জুন সকাল সাড়ে ৬টায় গেলেন চলে নশ্বর দেহ ত্যাগ করে। গঙ্গাতীরে কাশীপুরের শ্মশানঘাটে ঠাকুরের সমাধিস্থানের পাশে সৎকার করা হল তাঁর পার্থিব দেহ।

মহেন্দ্রনাথের ১৩।২ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাটী আজ ঠাকুরের ভক্তদের তীর্থস্থান বলে পরিগণিত। সেখানে সযত্নে রক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত পাদুকা, গাত্রবস্ত্র, কেশ, নখ এবং শ্রীশ্রীমায়ের জপের মালা, সিঁদুর কৌটা প্রভৃতির পূজা হয় নিত্য। স্নেহ ক'রে চৈতন্ত ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গের যে ছবি ঠাকুর দিয়েছিলেন মহেন্দ্রনাথকে, আজও তা সযত্নে টাঙানো আছে ঠাকুর-ঘরে। এই বাড়ীতেই শ্রীশ্রীমা কখন কখন এসে মাসাধিক কাল কাটিয়ে যেতেন। এই বাড়ীরই একতলার ঘরে কলেজের ছাত্র নরেন্দ্রনাথ কত দিন তাঁর শেক্সপীয়রের পাঠ নিয়েছেন শিক্ষক মহেন্দ্রনাথের কাছে। তানপুরার সঙ্গে তাঁর সুমধুর কণ্ঠে গেয়েছেন কত দিন কত গান। আজ আমরা অনেকেই এই তীর্থস্থানের খবর হয়ত জানি না, কিন্তু বহু রামকৃষ্ণ-ভক্ত সুদূর পশ্চিম ও আমেরিকা থেকে আসেন তাঁদের শ্রদ্ধা-নিবেদন করতে উত্তর-কলকাতায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র স্মৃতি-জড়িত এই বাড়ীটিতে।

আগামী সংখ্যা থেকে

মহাকবি দণ্ডী বিরচিত

দশকুমার চরিত

অনুবাদ ক'রেছেন শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

জাহাজের ক্যাবিন ভাড়া

১লা এপ্রিল নগেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে অরবিন্দের ষ্টিল ট্রাঙ্ক দুইটি 'ডুপ্লে' জাহাজের ভাড়া-করা ক্যাবিনে রাখিয়া আসিতে বলিলাম এবং টিকিট দুইখানি জাহাজের ক্যাপটেনকে দেখাইয়া ক্যাবিন বন্ধ করিয়া আসিতে নির্দ্দেশ দিলাম—নগেন্দ্র জাহাজে ট্রাঙ্ক রাখিয়া আসিয়া আমাকে জানাইল।

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলাম যে, দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে নৌকা ভাড়া করিয়া গঙ্গা নদী বাহিয়া উত্তর দিকে যাইতে হইবে। নদীবক্ষে একটি বিশেষ রঙের পতাকা-বিশিষ্ট নৌকা দেখিলে তাহার আরোহীদিগকে নিজ নৌকায় উঠাইয়া লইয়া কেল্লার ঘাটে অবস্থিত DUPLEIX জাহাজে উঠাইয়া দিতে বলিলাম। তাহার হস্তে গৃহে প্রস্তুত একটি পতাকা দিলাম এবং তাহার নৌকার উচ্চ স্থানে উহা লাগাইয়া দিতে বলিয়া দিলাম। অনুরূপ পতাকা অপর নৌকায় থাকিবে ইহাও জানাইয়া দিলাম। সুরেন্দ্রনাথ আমাকে প্রশ্ন করিল না কিম্বা কৌতূহলীও হইল না। নির্দ্দেশমত কার্য্য করিবার জন্য সে রওনা হইল। এই সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

চন্দননগর হইতে যে নৌকা কলিকাতার দিকে আসিতেছিল সেই নৌকা হইতে অরবিন্দ আমাদের প্রেরিত নৌকায় উঠিয়া নদীবক্ষে নৌকা বদল করিবেন, এরূপ স্থির ছিল।

অরবিন্দ চন্দননগর হইতে যে নৌকায় আসিবেন, যাহাতে তাহা চিনিতে পারা যায় তজ্জন্য আর একটি গৃহে তৈয়ারী পতাকা তাঁহার প্রেরিত লোক মারফৎ তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেই এবং যাহাতে দূর হইতে দেখা যায় তজ্জন্য নৌকার উচ্চ স্থানে সেটিকে বসাইতে বলিয়া দেই। ইহা ব্যতীত অরবিন্দের এবং বিজয় নাগের দুইটি কল্পিত নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিলাম। উক্ত নামের সত্যই দুই জন লোক আছে তাহা জানাইয়া তাহাদের বাসস্থানের নিকটস্থ মোটামুটি ভৌগোলিক বিবরণও লিখিয়া দিলাম। ইহার কারণ এই যে, যদি কেহ কোনও প্রশ্ন করিয়া বসে তখন এ সব না জানিলে তাঁহারা উত্তর দিতে পারিবেন না। অরবিন্দের প্রেরিত যুবককে বলিয়া দেওয়া হয় যে, অনুরূপ পতাকা-বিশিষ্ট যে নৌকা কলিকাতা হইতে উজাইয়া উত্তর দিকে যাইবে তাঁহারা যেন চন্দননগরের ভাড়া-করা নৌকা তাহার নিকটে লইয়া গিয়া সেই নৌকায় উঠেন। বহু নৌকার মধ্যে চিনিবার জন্য নিশানের ব্যবস্থা করা হয়।

অরবিন্দ শেষ রাত্রিতে চন্দ্রালোকে চন্দননগর হইতে নৌকায় কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীমতিলাল রায় তাঁহার নৌকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পথের মধ্যে নৌকা পরিবর্ত্তন করিবার সতর্কতামূলক ব্যবস্থার কথা উত্তরপাড়ার শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিতেন। তিনি বিজয় নাগের সহিত এই নৌকায় সহযাত্রী ছিলেন। কোন্ দিন কোন্ সময় অরবিন্দ যাত্রা করিবেন তাহা আমি স্থির করি। এ কথা অরবিন্দ ব্যতীত শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,

ঋষি রাজনারায়ণ বসুর সহধর্ম্মিণী নিস্তারিণী বসু

তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ স্বর্গীয় মন্মথনাথ বিশ্বাস, উত্তরপাড়ার স্বর্গীয় রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (মিছরী বাবু) ও বিজয় নাগ জানিতেন। আর কাহাকেও এ কথা জানিতে দেওয়া হয় নাই।

নৌকা পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থার কারণ এই যে, যদি কোনও ক্রমে পুলিশ (বিশেষতঃ তখনকার দিনে গুপ্ত পুলিশ অধ্যুষিত চন্দননগরের পুলিশ) জানিতে পারে যে, একখানি নৌকা করিয়া দুই ব্যক্তি চন্দননগর হইতে, রেল ভ্রমণের সহজ উপায় থাকিতে, সরাসরি কলিকাতায় যাইয়া ফরাসী জাহাজে উঠিয়াছে ও মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই কথার সত্যতার প্রমাণ পায়, তাহা হইলে পুলিশের সন্দেহ হইবে এবং হয়ত নদীপথে কলম্বোগামী জাহাজ আটক করিয়া অরবিন্দকে ধরিতে চেষ্টা করিবে। আমার প্রেরিত যুবকদ্বয় অল্পবয়স্ক ছিল, সেজন্য নির্দ্দেশমত কার্য্য করিতে না পারায় নৌকায় যোগাযোগের ব্যতিক্রম হয় এবং তাহার ফলে উক্ত ব্যবস্থার অনেক গোলযোগ হইয়া যায়।

কলিকাতা হইতে প্রেরিত নৌকা করিয়া সোজাসুজি কেল্লার ঘাটে যাইয়া নদীর দিক হইতে 'ডুপ্লে' জাহাজে অরবিন্দের উঠিবার কথা ছিল, কিন্তু নির্দ্দেশমত কার্য্য না হওয়ায় সংযোগ-সূত্র হারাইয়া গেল।

শ্রীসুকুমার মিত্র

নদীর দিক হইতে যাহাতে অরবিন্দ জাহাজে উঠিতে পারেন জাহাজের ক্যাপটেনের সহিত তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল—কারণ মনে হইয়াছিল যে, যদি বৃটিশের গুপ্তচর জাহাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাকে তাহা হইলে স্বভাবতঃ সে তীর হইতে জাহাজে উঠিবার সিঁড়ির যে ব্যবস্থা তাহার প্রতিই দৃষ্টি রাখিবে। তীরের বিপরীত দিক হইতে জাহাজের গাত্র বাহিয়া যে অল্প-পরিসর গুটান সিঁড়ি থাকে তাহা ব্যবহার করিলে গুপ্তচর জানিতে পারিবে না। তদুপরি নদীর দিকে আলোর জ্যোতি কম থাকে বলিয়া কেহ জাহাজে উঠিলে (যদিই বা কেহ জাহাজের প্রতি সে দিক দিয়াও লক্ষ্য রাখিয়া থাকে) তথাপি সহজে তাহাকে চেনা যাইবে না। চন্দননগরে অরবিন্দ যে বাড়ীতে থাকিতেন তথায় ম্যালেরিয়া-পীড়িত এক অসুস্থ ব্যক্তি বাস করিতেছেন, এই কথাই প্রতিবেশীদের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অসুস্থ ব্যক্তি নৌকায় আসিয়া জাহাজে উঠিবেন এবং সমুদ্র-বায়ু সেবনের দ্বারা স্বাস্থ্য লাভ করিবার উদ্দেশ্যে কলম্বো যাইতেছেন ক্যাপটেনকে সেই অজুহাত দেখাইয়া বিপরীত দিকের সিঁড়ি দিয়া উঠিবার বন্দোবস্ত করা হয়।

অরবিন্দের হঠাৎ কলেজ স্কোয়ারে আগমন

আমার প্রেরিত নৌকার সহিত চন্দননগরের নৌকার সাক্ষাৎ হইল না। অপর দিকে বিপ্লবী দলের অন্যতম নেতা উত্তরপাড়াবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অনেকক্ষণ কলিকাতা হইতে প্রেরিত নৌকার সন্ধান করিতে না পারিয়া অগত্যা বৈকালে অরবিন্দকে লইয়া হাবড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে নৌকা লাগাইয়া স্বর্গীয় মন্মথনাথ বিশ্বাসকে আমার নিকট পাঠাইয়া সমস্ত গোলযোগের কথা জানাইলেন। এদিকে আমার প্রেরিত সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জানাইয়াছিল যে, তাহারা অরবিন্দের নৌকা দেখিতে পায় নাই। তাহা শুনিয়াই অরবিন্দের আর যাওয়া হইল না মনে করিয়া আমি বিশেষ চিন্তিত হই ও নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়কে পুনরায় জাহাজে পাঠাইয়া ক্যাবিন হইতে অরবিন্দের জিনিষপত্র নামাইয়া আনিতে বলিয়াছিলাম। কারণ, পরদিন প্রাতেই 'ডুপ্লে' জাহাজ ছাড়িবার কথা। ট্রাঙ্ক সহ ফিরিয়া আসিয়া নগেন্দ্র বলিল যে, ডাক্তার যাত্রীদের পরীক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এদিকে মন্মথ বাবুর নিকট সকল কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে বলিয়া দেই যে, তাঁহারা যেন নৌকা করিয়া সোজা কেল্লার ঘাটে যান। জিনিষপত্রাদি পুনরায় পাঠাইতেছি বলিয়া দিলাম। নগেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিয়া অরবিন্দ প্রভৃতি চারি জন তাহার জন্য কেল্লার ঘাটে অপেক্ষা করিতেছেন, জানাইলাম। জাহাজের ডাক্তারের বাড়ী যাইয়া তাঁহার নিকট স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইয়া সার্টিফিকেট সহ জাহাজে উঠিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম।

জাহাজ হইতে ফিরাইয়া আনা জিনিষপত্রাদি যেগুলি তাহার বাসায় ছিল তাহা পুনরায় জাহাজে রাখিয়া আসিতেও নির্দ্দেশ দিলাম। তদনুসারে নগেন্দ্র তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। তখন আন্দাজ রাত্রি ৭টা বাজিয়াছে। এদিকে সন্ধ্যার পরে শ্রদ্ধেয় অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'সঞ্জীবনী' অফিসের দ্বিতলে আসিয়া উপস্থিত। তিনি চুপি-চুপি আমাকে বলিলেন, অরবিন্দ নীচে গাড়ীর মধ্যে আছেন। ইহা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। বাড়ীর অপর দিকে সর্ব্বক্ষণ যে ছয় জোড়া চক্ষু এ বাড়ীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছে তাহাতে অরবিন্দ আসিয়া নূতন বিপদে পড়িতে পারেন বলিয়া চঞ্চল হইয়া তাড়াতাড়ি নীচে যাইয়া দেখিলাম, এক দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্ধ ঠিকা-গাড়ীতে অরবিন্দ স্থির ও নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া আছেন। গাড়ীর মধ্যভাগের দুই দিকের জানালা খোলা। ইহা আমাকে আরও ত্রস্ত করিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "করিয়াছ কি? ঐ দেখ গোলদীঘিতে ছয় জন গুপ্তচর বসিয়া আছে। অবিলম্বে জাহাজ-ঘাটে (অর্থাৎ কেল্লার ঘাটে) চলিয়া যাও, আমি জিনিষপত্রাদি ও লোক পাঠাইয়া দিয়াছি।" তাঁহারা চলিয়া গেলেন। তাঁহার সহিত ইহাই যে আমার শেষ সাক্ষাৎ, তাহা কে জানিত!

কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অভাবে অথবা কর্ম্মে নিবিষ্টতার অভাবে নৌকায় যোগাযোগ হইল না ও যে ক্রম-অনুসারে সমস্ত কার্য্য হইবে স্থির ছিল, তাহা পণ্ড হওয়ায় যে হয়রাণি ও

সরোজিনী ঘোষ (১৯০৬ '৭)

উদ্বেগ হইল তাহার জন্য, দেখিলাম, অরবিন্দের মনে কোন বিরক্তি নাই, কোন চিন্তা নাই। এমনি ছিল তাঁহার সংযম। আমার ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য হইল না, তজ্জন্য আমাকে তিরস্কার করিলেন না কিম্বা দোষ-ক্রটি ধরিয়া কোন কথা বলিলেন না। পুনরায় আমি যাহা স্থির করিয়া দিলাম তাহাই যেন শেষ কথা। আবার আমার নির্দ্দেশ মত তিনি চলিয়া গেলেন। ভুল-ক্রটির জন্য কিছু বলিলেন না। নির্ব্বাক নিঃসংশয় চিত্তে তিনি যাত্রা করিলেন।

আমাদের বাড়ীতে এক বৃদ্ধ আসিলে অরবিন্দ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, সমস্তই ঈশ্বর চরণে সমর্পণ করিয়া দেখ, তিনি কি করেন। প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিলাম, অরবিন্দ সমস্ত সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন।

অধিক রাত্রে নগেন্দ্র গুহ রায় আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল যে অরবিন্দ ও তাঁহার সহযাত্রীকে নির্ব্বিঘ্নে জাহাজে উঠাইয়া দিয়াছে। নগেন্দ্র আমাকে বলিল যে, একটি বন্ধ ঘোড়ার গাড়ী কেল্লার ঘাটে অপেক্ষা করিতেছে দেখিয়া সেই গাড়ীর নিকট যাইয়া অমরেন্দ্র বাবুকে দেখিয়া জানিতে পারিল যে, তাঁহারা তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বাক্স দুইটি লইয়া অরবিন্দের গাড়ীতে উঠাইল। ডাক্তার যাত্রীদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। যাত্রীদের ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা ব্যতীত কাহাকেও জাহাজে ভ্রমণ করিতে দেওয়া হয় না। এই সঙ্কটে পড়িয়া নগেন্দ্র কতকটা হতাশ হইয়া ভাবিল, এত করিয়াও সফল হওয়া গেল না! তথাপি চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া জাহাজের ক্যাপটেনের নিকট হইতে য়ুরোপীয় ডাক্তারের বাড়ীর ঠিকানা জানিয়া লইল। জাহাজেই এক জন বাঙ্গালী কুলীর সাহায্যে বাক্স দুইটা উঠান নামান হইয়াছিল, সে বলিল ডাক্তারের বাড়ী সে জানে। এদিকে রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে ক্যাপটেন বলিয়া দিয়াছেন যে, রাত্রি দশটা-এগারটার মধ্যে উক্ত ডাক্তার প্রদত্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সার্টিফিকেট সহ জাহাজে উঠা চাই, নচেৎ যাওয়া হইবে না।

জাহাজঘাটার কাছাকাছি গভর্ণমেণ্টের গুপ্তচর থাকিতে পারে ঐ সময়ে সে কথা মনে করিবার অবকাশ ছিল না। মরিয়া হইয়া প্রকাশ্য রাজপথে নামিয়া, অনেক ফিটন গাড়ী থাকিলেও একটি পাল্কী গাড়ী করিয়া য়ুরোপীয় ডাক্তারের থিয়েটার রোডের বাড়ীর উদ্দেশে তাঁহারা যাত্রা করিলেন। তথায় ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা ও ব্যবস্থা করিয়া দিতে এই কুলী যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। ডাক্তার নৈশ আহারের পরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। বেয়ারাকে কিছু টাকা দিয়া ডাক্তারকে সংবাদ দেওয়া হইল। আধ ঘণ্টা পরে ডাক্তার অরবিন্দ ও বিজয় নাগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নগেন্দ্রকুমার তাঁহাদের টিকিট দুইখানি ও ডাক্তারের ফিজের ৩২৲ টাকা অরবিন্দের হাতে দিল। তাঁহারা ডাক্তারের ঘরে অনুমান পনের মিনিট ছিলেন। যেমন চন্দননগরে যে বাড়ীতে অরবিন্দ ছিলেন তথায় পাড়ায় প্রচার করা হইয়াছিল যে, ঐ বাড়ীর বাসিন্দা ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছেন, তদনুসারে জাহাজের ক্যাপটেনকেও জানান হইয়াছিল যে, একজন ম্যালেরিয়া রোগী স্বাস্থ্যলাভের জন্য সমুদ্র ভ্রমণে যাইতেছেন, তেমনি এই ডাক্তারের নিকটও সেই কথা বলা হইল—ডাক্তারের প্রশ্নের ফলে। কয়েক মিনিট আলাপের পরে অরবিন্দের ইংরাজী শুনিয়া ডাক্তার প্রশ্ন করেন, "আপনি কি ইংলণ্ডে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন?" অরবিন্দ তাহা স্বীকার করিলেন। অতঃপর ডাক্তার উভয়কে স্বাস্থ্য-পরীক্ষার সার্টিফিকেট দিলেন। তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে অবিলম্বে জাহাজে যাওয়া প্রয়োজন। উৎকণ্ঠার পর উৎকণ্ঠা! সঙ্গী সকলেরই মুখে উদ্বেগ ও চিন্তা কিন্তু অরবিন্দ শান্ত, স্থির; প্রকৃতই তিনি চিন্তা-ভাবনার অতীত।

যাত্রা

যাত্রীদের লইয়া গাড়ী যখন কেল্লার ঘাটে আসিল, তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। জিনিষপত্র লইয়া চারি জনে রিজার্ভ করা ক্যাবিনে প্রবেশ করিলেন। বিজয় নাগ অরবিন্দের জন্য বিছানা করিলেন। বাক্স প্রভৃতি গুছাইয়া রাখা হইল, অমর বাবু কতকগুলি নোট লইয়া অরবিন্দকে দিয়া বলিলেন যে, এগুলি 'মিহরী' বাবু দিয়াছেন। অমর বাবু অরবিন্দকে

সরোজিনী ঘোষ (১৯১০)

নমস্কার ও নগেন্দ্রকুমার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ক্যাবিন হইতে বাহির হইলেন। অমর বাবু অনেক রাত্রে উত্তরপাড়ায় স্বগৃহে পৌছেন। অরবিন্দের বাঙ্গলা ত্যাগ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় অমরেন্দ্র বাবু পরে বলিয়াছিলেন, "আমি কি জানিতাম যে, চিরদিনের জন্য তিনি বাঙ্গলা দেশ ছাড়িয়া গেলেন! তাহা হইলে আমি তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতাম। তাঁহাকে দিয়া বাঙ্গলার নেতৃত্ব করাইতাম।"

মধ্য-রাত্রির পরেও আমি উদ্বেগপূর্ণ চিত্তে 'সঞ্জীবনী' অফিসে নগেন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। নগেন্দ্রকুমার সরাসরি 'সঞ্জীবনী' অফিসে আসিয়া অরবিন্দের যাত্রার সমস্ত বিবরণ, উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের কথা এবং কি করিয়া সকল বিভ্রাট কাটাইয়া উঠিল তাহা বলিল। (১)

পরদিন ও তাহার পরদিনও (৩রা এপ্রিল ১৯১০) অতি উৎকণ্ঠার সহিত কাটাইয়াছি। আশঙ্কা হইয়াছিল, পুলিশ যদি কোনক্রমে সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে জাহাজ হইতে নামাইয়া আনে! যখন দুই দিন কাটিয়া গেল অথচ তাঁহার গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইলাম না, তখন বুঝিলাম তিনি নিরাপদ।

অরবিন্দকে জাহাজে পাঠাইয়া দিবার পরদিন সম্ভবতঃ সৌরেন বসুকে টাকাকড়ি দিয়া ও সাহেবী পোষাক পরাইয়া সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনিয়া দিয়া রেলযোগে পণ্ডিচেরী পাঠাইয়া দিলাম। তাঁহার সহিত বাবা ভারতী ও চিদাম্বরম পিলের নিকট দুইখানা পত্র দিলাম। তাহাতে লিখিয়া দিলাম যে, অরবিন্দ এই প্রথম পণ্ডিচেরী যাইতেছেন, সে জন্য তাঁহার অসুবিধা হইবে, তাঁহারা যেন তাঁহাকে সাহায্য করেন। এই দুই জনের কাহাকেও আমি চিনিতাম না। শুধু সংবাদপত্রে তাঁহাদের দেশসেবার কথা পাঠ করিয়াছিলাম। স্বর্গীয় চিদাম্বরম পিলে জাহাজ চালাইয়া বৃটিশ জাহাজের সহিত সফল প্রতিযোগিতা করেন। তাঁহার জাহাজেই অধিক সংখ্যক ভারতবাসী যাত্রী যাইত, বৃটিশ জাহাজে যাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল। ইহাতে বৃটিশের লোকসান হইতে থাকে, তাহার ফলে নানা চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই সকল কারণে তাঁহার নাম সংবাদপত্রের পাঠকগণ সকলেই জানিতেন। জন-সভায় বৃটিশ-রাজ-বিরোধী বক্তৃতা করায় এবং স্বদেশ-সেবার জন্য বাবা ভারতীর কারাদণ্ড হওয়ায় তাঁহার নামও ভারতের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা দেশ-বিখ্যাত নেতা অরবিন্দকে দুর্বিপাকে সাহায্য করিবেন, এই বিশ্বাস ও আশা লইয়া তাঁহাদের পত্র দিয়াছিলাম। অপরিচিতের প্রথম ও শেষ পত্রের মর্য্যাদা তাঁহারা রক্ষা করিয়াছিলেন ও অরবিন্দকে স্থান দিয়াছিলেন। কিন্তু কোথায় তাঁহারা সকলের অগোচরে অরবিন্দকে লইয়া পণ্ডিচেরীতে নিরুদ্দেশ থাকিতে সাহায্য করিবেন, তাহা না করিয়া তাঁহারা ৪ঠা এপ্রিল হৈ-চৈ করিয়া অরবিন্দকে জাহাজ হইতে অভ্যর্থনা করিয়া নামাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করেন! ইহাতে পণ্ডিচেরীর পুলিশ ও জনসাধারণ জানিতে পারিল যে, অরবিন্দ পণ্ডিচেরী পৌছাইলেন। তখন কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহে এ সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই।

অরবিন্দের হঠাৎ অন্তর্দ্ধানে এবং বহু দিন তাঁহার সংবাদ না পাইয়া দেওঘরে অরবিন্দের মামা মাসী প্রভৃতি, বিশেষতঃ অরবিন্দের মাতামহী রাজনারায়ণ বসুর পত্নী, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন। তাঁহারা কলিকাতায় আমাদিগের নিকট অরবিন্দের সংবাদের জন্য পত্র লিখিতেন কিন্তু তাঁহাদিগকে অরবিন্দ সম্বন্ধে কোন কথা জানাইতে পারিতেছিলাম না।

পূর্ব্বস্মৃতি

এই সময়ে আমি যেরূপ উৎকণ্ঠার মধ্যে কয়েক দিন কাটাইয়াছি ও অরবিন্দ যেমন নিশ্চিন্ত ভাবে চলিয়া গেলেন তাহাতে তখন আমার মনে ১৯০৮ সালে 'যুগান্তরে' যে কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা মনে পড়িল। মাণিকতলায় বারীন্দ্র দাদা প্রভৃতি পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হইলে 'যুগান্তরে' প্রকাশিত হইয়াছিল—

না হইতে মাতঃ বোধন তোমার
ভাঙ্গিল রাক্ষস মঙ্গল-ঘট
জাগো রণচণ্ডী, জাগো মা আমার
আবার পূজিব চরণ-তট।
ঐ গঙ্গাজল রয়েছে পড়িয়া
জবা বিল্বদল যায় শুকাইয়া

* * * *

ইহা প্রকাশের কিছুদিন পরে এক উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা 'যুগান্তরে' প্রকাশিত হয়। তখন এ শ্রেণীর কবিতা দেখা যাইত না। এই কবিতা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আমিও ইহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। পুলিশের উৎপাতে তাহা নষ্ট হয়। আমার প্রথম দুই ছত্র মনে ছিল, তাহাই অন্য এক পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছি। অরবিন্দ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ লিখিবার কালে আমার মাতার ডায়েরীতে উহা পাইয়া নিয়ে উহা উদ্ধৃত করিলাম। হয়ত এ কবিতার আর কোথায়ও অস্তিত্ব নাই। মাণিকতলা বোমার মামলায় নিম্ন আদালতে যখন আসামীদের বিচার হইতেছিল, তখন এই কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতায় আসামীদের মনোভাব প্রকাশ পাইতেছে।

আমি মরণ আজিকে বরণ করিব
শরণ তবু মা চাই!
আমি মরণ আজিকে দমন করেছি
অশ্রু তাহাতে নাই

---

(১) শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী গমনের পূর্ণ বিবরণ ১৩৫৭ সালের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের 'নব্যভারতী' নামক মাসিক পত্রিকায় শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায় লিখিত 'দেবতা বিদায়' নামক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

শত বেদনা আমার কামনা আজিকে
লাঞ্ছনা সুখে বহিব
তবু শরণ কভু না মাগিব।
আজি মঙ্গল নহে সম্বল মোর
সহায় চাহি না দৈব
বিপদ বরেছি সম্পদ ফেলি
অশনি মাথায় লইব
বৃশ্চিক শত দংশনে রত
তবু যন্ত্রণা তাহাতে নাই,
আমি বজ্র ধরিতে চাই,
আজি বিশ্বে কাহারে করি নাকো ভয়
ভয়েরে করেছি জয়
শাসন বাঁধন কিছুই মানি না
ঝঞ্ঝা প্রলয় লয়
শয়ান শিয়রে কৃপাণ ঝুলিছে
মরণ নিঃসংশয়
তবুও করি নাকো ভয়।

নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত অরবিন্দকে শেষ বার দেখিয়া বার বার মনে হইতেছিল "শয়ান শিয়রে কৃপাণ ঝুলিছে!"

অরবিন্দ কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইবার ৭।৮ দিন পরে এক রবিবার বৈকালে এক ব্যক্তি আসিয়া আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। তাঁহাকে উক্ত ভদ্রলোক বলিলেন যে, তখন কলিকাতার গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে ভারতের Director General of Criminal Investigation, সার চার্লস ক্লেভল্যাণ্ড রহিয়াছেন। তাঁহার নিকট সাঙ্কেতিক ভাষায় পণ্ডিচেরী হইতে এক টেলিগ্রাম আসিয়াছে। ঐ ভদ্রলোক সাঙ্কেতিক ভাষা তর্জ্জমা করিয়া থাকেন। উক্ত টেলিগ্রামে তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, অরবিন্দ পণ্ডিচেরী গিয়াছেন। তিনি আমার পিতাকে বলিলেন যে, অরবিন্দের অন্তর্দ্ধানে তাঁহারা নিশ্চয়ই চিন্তান্বিত আছেন সেই জন্যই তিনি অরবিন্দের পণ্ডিচেরী গমনের এই সংবাদ দিয়া গেলেন। অরবিন্দ নিরাপদ জানিয়া আমার পিতা আশ্বস্ত হইলেন, আর দরজার আড়াল হইতে আমি এই সংবাদ শুনিয়া আনন্দিত হইলাম এবং জানিলাম, আমার শ্রম ও চেষ্টা সফল হইয়াছে। পরে আমার সাহায্যকারী নগেন্দ্র ও সুরেন্দ্রকে সে কথা জানাইলাম।

যেদিন হইতে অরবিন্দ নিরুদ্দেশ হন সেদিন হইতে আমার পিতা অরবিন্দের জন্য অত্যন্ত চিন্তান্বিত ছিলেন। পুনরায় তাঁহাকে মামলায় ফেলা হইবে ভাবিয়া তিনি নির্ব্বাসন হইতে যে হৃদ্‌রোগ লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা বৃদ্ধি পায়। আমার পিতা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জানিতেন না যে, তাঁহার পুত্র অরবিন্দের পণ্ডিচেরী গমনে কি করিয়াছিল।

অরবিন্দ পণ্ডিচেরী গমন করিবার পরে তাঁহার নিকট আমি প্রথম দিকে কয়েক বার নোয়াখালির স্বর্গীয় হেমচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতির নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তাহাও ব্যাঙ্ক ড্রাফট কিনিয়া—যাহাতে প্রেরকের নাম পুলিশ জানিতে না পারে।

অরবিন্দ বাঙ্গলা দেশ ত্যাগ করিবার পরে মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহকর্ম্মিগণ আমার কাছে আসিতেন। ক্রমেই তাঁহাদের আসা বন্ধ হইল। একদিন স্বর্গীয় রামচন্দ্র মজুমদার যতীন্দ্রনাথ মুখার্জিকে (বাঘা যতীন) সঙ্গে লইয়া আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, পাঁচ হাজার টাকার প্রয়োজন, সংগ্রহ করিয়া দাও। তখন জানিতাম না যতীন্দ্রনাথ জার্ম্মাণী হইতে জাহাজভরা অস্ত্র-শস্ত্র ভারতের তীরে নামাইবার জন্য অর্থ চাহিতেছেন।

একদিন স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র দত্ত আসিয়া আমাকে সাবধান করিয়া দিলেন। কিছুদিন পরেই দিল্লীতে লর্ড হার্ডিংএর উপর বোমা পড়িল এবং রাসবিহারী বসু কয়েক মাসের মধ্যে জাপানে চিরদিনের মত চলিয়া গেলেন।

[ক্রমশঃ।

আগামী সংখ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম্মব্যাখ্যা

ডাঃ শ্রীসুহৃদ্‌চন্দ্র মিত্র

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সাতাত্তর

বাড়ি ফিরে এল নরেন। ফিরে এল তার নিভৃত ঘরের অন্ধকারে।

চক্ষু মেলে কী দেখে এল সে দক্ষিণেশ্বরে। বৈরস্য ও নৈরাশ্যের মরুভূমিতে এ কে সজলতা ও সরসতার অভিষেক! দৈন্য ও মালিন্যের মাঝে এ কে প্রসাদপবিত্র আনন্দ! ধূলি ও গ্লানির রাজ্যে নির্মলশ্যামল নির্মুক্তি! নিত্য অভাবের দেশে অমৃত-পুঞ্জিত পরিপূর্ণতা! স্বপ্ন দেখে এল, না কি নরেন? না কি রঙ্গমঞ্চের অভিনয়?

যাই বলো, পাগল ছাড়া কিছু নয়। পাগল না হলে বলে কি না ঈশ্বরকে দেখা যায় স্বচক্ষে? কি করে দেখবে? যে নির্বিকার নিরাধার গুণাতীত লোকাতীত, যে অবাঙমনসগোচর, সে কখনো ধরা দেয় চোখের সমুখে? তুমি দাঁড়াও, আমি দেখি—বললেই সে কি আকারিত হয়? যে অকায়, তার আবার আকার কি! যে অসঙ্গ তার আবার সীমা কোথায়! যে অরূপ সে তো দিগদেশ-কালশূন্য।

নরেন পড়েছে, যা আত্মা তাই ঈশ্বর। আত্মা অজ, তার জন্ম নেই। অমর, তার মৃত্যুও নেই। নিরবয়ব বলেই অজ। নির্বিকার বলেই অবিনাশী। এ হেন যে আত্মা সে আবার মূর্তি ধরবে কি? মূর্তি ধরলে কোন মূর্তি ধরবে? যে ব্যাপী তার পরিচ্ছেদ কোথায়, পৃথকত্ব কোথায়?

কিন্তু এমন ভাবে বললেন, উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেই স্থির-স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দুই চক্ষের আলোয় কোথাও যেন এতটুকু ছায়া থাকে না সন্দেহের। দেখা যায় ঈশ্বরকে—এ যেন চোখের সামনে এই দেয়াল দেখার মত। ভোরে উঠে সূর্য দেখার মত। রাত্রে উঠে অন্ধকার দেখার মত। কথার মধ্যে এতটুকু গায়ের জোর নেই, এ যেন সরল জল-ভাত। এ যেন বিশ্বাসের পাষাণে আন্তরিকতার শিলালিপি। সত্যের কষ্টিপাথরে সারল্যের স্বর্ণাক্ষর।

কিন্তু কি হলে, কি করলে দেখা দেবেন ঈশ্বর? খুব করে বিনতি-মিনতি করব? স্তুতি-চাটুক্তি করব? তা হলেই কি ঈশ্বর কান পাতবেন? মিথ্যে কথা। আমাকে যদি কেউ খোসামোদ করে, আমি তো বেজায় চটে যাই। যা আমার কাছে বিরক্তিকর, তাই ঈশ্বরের কাছে সুখকর হবে? আর, নিজেকে যে অত্যন্ত ছোট বলে ভাবব সেটাও তো মিথ্যে ভাবা হবে। আমিই তো দীনের দীন হীনের হীন নই—আমার চেয়েও তুচ্ছ, আমার চেয়েও অধম লোক আছে অনেক সংসারে। তাই মিথ্যে কথায় বাজে কথায় ঈশ্বর মুগ্ধ হবেন এ ক্ষুদ্রতা যেন আমার না হয়। তা ছাড়া আমার চেয়ে অনেক যিনি বেশি বোঝেন, তিনি আমারই আদেশ-অনুরোধের অপেক্ষা করছেন, এ বুদ্ধি স্পর্ধার নামান্তর। তিনি কি করবেন না-করবেন তা আমার বলা না-বলায় ঠিক হবে না। তাই যতই কেননা 'দেখা দাও' 'দেখা দাও' বলে দেয়ালে মাথা ঠুকি, মাথাই ভাঙবে, দেয়াল নড়বে না একচুল।

ঈশ্বর কি একটা বস্তু? একটা দ্যুতি? একটা দ্যোতনা? তাঁকে কি করে দেখা যাবে?

তাঁকে দেখা যায় না। তিনি কি শিলা, না দারু, না ভূমি? তিনি কি কাঠ-খড়, না তাম্র-পিত্তল?

আর, তাঁকে দেখেই বা আমার কী লাভ? তাঁকে দেখলেই কি আমার তাপ-ত্রয় ঘুচে যাবে? তাই যদি হত, তবে এত যাঁর করুণা আর ঐশ্বর্য, তিনি দর্শন দিয়ে সমস্ত জীব-জগৎকে একযোগে মুক্ত করে দিতেন। লোকের শোক-ক্রন্দন দৈন্য-অনুনয়ের জন্যে বসে থাকতেন না।

কে বলে তিনি প্রত্যক্ষীভূত নন? 'বল দেখি রে তরুলতা, আমার জগজ্জীবন আছেন কোথা?'—এ

কান্নার প্রয়োজন কি। তিনি তো হাতের কাছেই আছেন, এই আমার চোখের কাছে। তাঁকে আবার দেখব কি, পাব কি। তাঁকে তো প্রতিক্ষণেই দেখছি, প্রতিক্ষণেই তো ডুবে রয়েছি, মিশে রয়েছি তাঁতে। যিনি সর্বত্রস্থ, তাঁর আবার দূর-নিকট কি—যিনি সর্বব্যাপী, তিনি তো অন্তরে-বাহিরে সমান বর্তমান। তিনি তো আমার মধ্যেও আছেন। চমকে উঠল নরেন। মনে পড়ল দক্ষিণেশ্বরের সেই স্তববাণী: 'তুমিই সেই পুরাণ পুরুষ, তুমিই সেই নররূপী নারায়ণ—'

আমিই সেই?

'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং?' আমিই কি সেই ওঙ্কারগম্য সঙ্গহীন শিব? মনোবাগতীত প্রকাশ-স্বরূপ? নিরাকার, অত্যুজ্জ্বল, মৃত্যুহীন?

কে বলে?

উন্মাদ! যে বলে সে উন্মাদ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যদি সে উন্মাদ তবে সে এত ভালোবাসে কেন? চেনে না-শোনে না, নিজেকে লুকিয়ে রাখে-সরিয়ে রাখে, অথচ আলো-বাতাসের মত আপ্রাণ ভালোবাসে, সে কি উন্মাদ?

দূর ছাই, ভাবব না তার কথা। কিন্তু না ভেবে থাকো তোমার সাধ্য কি। থেকে-থেকেই সে লোক কেবল উঁকিঝুঁকি মারে। বলে, যদি তুমি আছ তা হলে আমিও আছি।

যদি আমি আছি তা হলে তুমিও আছ। এই 'তুমি'টির কি কোনো মানস মূর্তি নেই? নেই কোনো মানুষ মূর্তি? থেকে-থেকেই ঠাকুরের মোহন মূর্তি দেখা দেয় চোখের সামনে। দয়াঘন আনন্দকন্দ জগদ্বন্ধু।

দূর ছাই, যাই আরেকবার দক্ষিণেশ্বর। তাঁকে আরেকবার দেখে আসি।

এ কি শুধু অলস কৌতূহল, না, আর কোনো অনিবার্য আকর্ষণ? যদি আকর্ষণই হয় তবে এর পেছনে যুক্তি কি? চুম্বক লোহাকে টানে, সূর্যে-চন্দ্রে জোয়ার-ভাটা খেলে এর মধ্যে সঙ্গত ব্যাখ্যা কোথায়? আর যারই উদ্দেশ্য-উপলক্ষ থাক, ভালোবাসা অহেতুক। তিনি যে ভালোবাসেন। তাঁর ভালো-বাসায় যে হিসেব নেই, জিজ্ঞাসা নেই।

সূর্যের আলোতেই যেমন সূর্যকে দেখি তেমনি তাঁর করুণাতেই তাঁকে দেখব।

মাস খানেক পরে আবার এক দিন হাজির হল দক্ষিণেশ্বরে। পথ যেন আর শেষ হতে চায় না। কে জানত এত দূরের রাস্তা আর এত কষ্টকর! সেদিন সুরেশ মিত্তিরের গাড়িতে করে এসেছিল বলে বুঝতে পারেনি। যাই, ফিরে যাই। বৃথা এই সন্ধান-ক্লান্তি। পথশ্রমের হয়তো শেষ আছে কিন্তু পণ্ডশ্রমের শেষ কই।

কিন্তু, যাই বলো, নেই আর ফিরে যাওয়া। চুম্বকের টানের কাছে লোহা নিরুপায়, সূর্য-চন্দ্রের কাছে নদী ইচ্ছাশূন্য। এ গতি নিরঙ্কুশা। এ গতি কৃষ্ণাকর্ষী।

দক্ষিণেশ্বর কোন দিকে যাব বলতে পারেন?

আরো উত্তরে যাবে। সেখানেই আছেন সেই লোকোত্তর। উত্তর দেবেন সুদক্ষিণ বলে।

সেদিনের মতই ছোট তক্তপোশটিতে বসে আছে রামকৃষ্ণ। যেন কার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে। ঘরে লোক-জন নেই। যেন কথা কইবার লোক নেই সংসারে। উদাস, নিরালম্বের মতো চেয়ে আছে শূন্য চোখে। যেন উৎকর্ণ হয়ে শুনছে কার পদধ্বনি।

তুই এসেছিস? নরেনকে দেখে আহ্লাদে ফেটে পড়ল রামকৃষ্ণ। আয়, আয়, বোস আমার পাশটিতে। মুখখানি শুকিয়ে গেছে দেখছি। কিছু খাবি?

একটু দূরে কুণ্ঠিত হয়ে বসল নরেন। রামকৃষ্ণ সরে আসতে লাগল। তোর কুণ্ঠা, কিন্তু আমার অজস্রতা। তুই দূরে বসিস আর আমি সরে সরে আসি। চুম্বকই শুধু লোহাকে টানে না, লোহাও ডাকে চুম্বককে।

পাগল না-জানি অদ্ভুত কি করে বসে তারই ভয়ে সঙ্কুচিত হল নরেন। ঠিক তাই, রামকৃষ্ণ তার ডান পা নরেনের গায়ের উপর তুলে দিলে। মুহূর্তে কী যে হয়ে গেল বোঝা গেল না। মনে হল দেয়াল-দালান সব যেন মহাবেগে উড়ে চলেছে, বিরাট আকাশের ব্যাপ্তির মধ্যে মিশে যাচ্ছে এই ক্ষুদ্র আমিত্বের অস্তিত্ব। আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়ল নরেন। আমিত্বের নাশই তো মৃত্যু। সেই মৃত্যুই বুঝি এখন উপস্থিত।

চেঁচিয়ে উঠল নরেন: 'ওগো, তুমি আমার এ কী করলে? আমার যে মা-বাপ আছেন।'

খল খল করে হেসে উঠল রামকৃষ্ণ। তাই আছে না কি? যখন তোর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল,

জিজ্ঞাসাও করিনি, তোর বাপের নাম কি? তোর বাপের কখানা বাড়ি? আয়-আদায় কত?

আমার মদ খাওয়া নিয়ে কথা। যেখানে আমার এক বোতলেই কাজ হয়ে যায়, সেখানে শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে সে হিসেবে আমার দরকার কী!

নরেনের আর্তস্বর কি রকম যেন লাগল বুকের মধ্যে। তার বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল রামকৃষ্ণ। স্নেহস্নাত করুণাকোমল হাত।

'তবে থাক, এখন থাক, একেবারে কাজ নেই। কালে হবে। আস্তে-আস্তে হবে।'

অমনি নিমেষে আবার সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। সেই ঘর সেই দেয়াল—সেই এখানে-ওখানে। তবে এটা কী হয়ে গেল চকিতের মধ্যে? ভোজবাজি? এই কি যন্ত্র-তন্ত্র-ইন্দ্রজাল?

না, কি এই জীবনেই জন্মান্তর ঘটে গেল নরেনের?

কিছু না, কিছু না। হিপ্‌নটিজম জানে লোকটা, তারই প্রভাবে সহসা সম্মোহিত করে ফেলেছে। তাই বা মেনে নিতে মন সায় দিচ্ছে কই? আমি এমন একজন দৃঢ়কায় লোক, এত আমার মনের জোর, আমিই এত সহজে অভিভূত হয়ে পড়ব? যাকে পাগল বলে ঠাউরেছি, হব তারই হাতের পুতুল? কে জানে কি শক্তি ধরে লোকটা, দরকার নেই তার কাছে এসে, ভেল্‌কি লাগিয়ে কি অঘটন ঘটায় তার ঠিক কি!

অমনি পরমুহূর্তেই মন আবার রুখে দাঁড়াল। পালিয়ে যাবার কোনো মানে হয় না। লোকটা যদি পাগলই হয় তবে প্রমাণ করতে হবে সেই পাগলামি। কঠিন-কঠোর পাথরকে যে এক নিমেষে এক তাল কাদা বানাতে পারে এক কথায় তাকে পাগল বললেই তার ব্যাখ্যা হয় না। শিশুর অধিক সারল্য, মার অধিক ভালোবাসা আর ফুলের অধিক শুচিতা—এদের সমাহারে পাগলামির জন্ম হয় এ কখনো শুনিনি। না, বিচার-বিশ্লেষণ করে একটা শান্ত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুতেই হবে। দাঁড়াতে হবে এ প্রশ্নের মুখোমুখি, করতে হবে এ রহস্যের উন্মোচন। প্রহেলিকা বলে পালিয়ে যাব না। কুহেলিকা বলে আচ্ছন্ন হতে দেব না নিজেকে। আয়ত্তাতীতকে আনতে হবে ইয়ত্তার মধ্যে। সংশয় থেকে আসতে হবে সংকল্পে। হয় এসপার নয় ওসপার। হয় প্রত্যাখ্যান নয় সমর্পণ।

তাই ঠাকুর যখন এক দিন বললেন, 'নরেন্দ্র, তুই কি বলিস। সংসারী লোকেরা কত কি বলে। কিন্তু দ্যাখ, হাতী যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চীৎকার করে, কিন্তু হাতী ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তখন তুই কী মনে করবি?'

নরেন্দ্র বললে, 'আমি মনে করব কুকুর কেউ-ঘেউ করছে।'

না, পালিয়ে যাব না। যে যাই বলুক, একটা হয়-নয় করে যাব। এই পরম-অদ্ভুতের স্বরূপ বুঝব ঠিক-ঠিক। হটে যাব না, ছেড়ে দেব না, শানের উপর আছড়ে-আছড়ে টাকা বাজিয়ে নেব। দেখব এতে কতটা খাদ, কতটা ভেজাল, কতটা মেকি।

সব আবার সহজ হয়ে গেল। দুজনে যেন সৌভাগ্যের দিনের আত্মীয়, নিঃসঙ্গবাসের বন্ধু।

কত অন্তরঙ্গ কথা, কত রঙ্গ-রস, কত হাস্য-পরিহাস। তার পর আবার কাছে বসে খাওয়ানো। গায়ে হাত বুলিয়ে দেওয়া। ছেড়ে দিতে মন-কেমন-করা। আসন্ন সন্ধ্যা তো নয়, ঘনায়মান বিষণ্ণতা। ও এবার চলে যাবে। ওর আবার বাড়ি আছে, বাপ-মা আছে—

রামকৃষ্ণের চোখ ছলছল করে এল।

আর-সব কিছুরই হয়তো সমাধান মেলে, মেলে না শুধু ভালোবাসার। সূর্যের আলোর হয়তো ব্যাখ্যা হয় কিন্তু চন্দ্রে কেন এত ভুবনপ্লাবন জ্যোৎস্না?

এবারে তবে উঠি।

'কিন্তু আবার শিগগির আসবি বল—। যেমন নতুন পতি ঘন-ঘন আসে তেমনিই আসবি বেশি-বেশি। ওরে, তোকে যখন দেখি, তখন আমি সব ভুলে যাই।'

আসব।

প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল রামকৃষ্ণ।

হাজরা বললে, 'তুমি ছোকরাদের কথা এত ভাবো কেন? যদি নরেন-রাখাল নিয়েই ব্যস্ত থাকো তবে ঈশ্বরকে ভাববে কখন?'

বলরাম বোসের বাড়ি যাচ্ছে রামকৃষ্ণ, মহা ভাবনা ধরলো। সত্যি, কথা তো ভুল বলেনি। ও

পাটোয়ারি বুদ্ধি, ওর চুল-চেরা হিসেব। সত্যিই তো, যখন থেকে রাখাল-নরেন এসেছে তখন থেকে ওদের কথাই তো বুক জুড়ে রয়েছে। মায়ের কথা ভুলে আছি।

মাকে তাই বললে রামকৃষ্ণ। মা, এ কেমন তরো হল? তোমাকে ছেড়ে এখন যে কেবল ছোকরাদেরই চিন্তা করছি। হাজরা মুখের উপর কথা শুনিয়ে দিলে।

মা বুঝিয়ে দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন তিনিই মানুষ হয়েছেন। শুদ্ধ আধারে তাঁরই বিশদ বিকাশ। ঘোল ছেড়ে মাখন পেয়ে তখন বোধ হয় ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল।

সমাধি-দর্শনের পর হাজরার উপর রাগ হল শালা আমার মন খারাপ করে দিয়েছিল।

তার পর আবার ভাবলে, হাজরার দোষ কি। সে জানবে কেমন করে?

তাঁকে দেখার পর সবতাতেই তাঁকে দেখা যায়। মানুষে তাঁর বেশি প্রকাশ। তার মধ্যে যারা আবার শুদ্ধসত্ত্ব তাদের মধ্যে তিনি আরো উচ্চারিত। সমাধিস্থ ব্যক্তি যখন নেমে আসে তখন কিসে সে মন দাঁড় করাবে? তাই তো সত্ত্বগুণী ভক্তের দরকার। ভারতের এই নজির পেয়ে তবে বাঁচল রামকৃষ্ণ।

ভাবসমুদ্র উথলালেই ডাঙায় এক বাঁশ জল। নদী দিয়ে সমুদ্রে আসতে হলে এঁকে-বেঁকে আসতে হয়। বন্যা এলে আর ঘুরে যেতে হয় না। তখন নদীতে-সমুদ্রে একাকার। তখন ডাঙার উপর দিয়েই সোজা চলে যাবে নৌকো।

ভগবানের লীলা যে আধারে বেশি প্রকাশ সেখানেই তাঁর বিশেষ শক্তি। জমিদার সব জায়গায় থাকেন, কিন্তু অমুক বৈঠকখানায়ই তাঁর বিশেষ গতিবিধি। তেমনি ভক্তই ভগবানের বৈঠকখানা। ভক্তের হৃদয়েই তাঁর বিশেষ শক্তির উদ্ভাসন। যেখানে কার্য বেশি সেখানেই বিশেষ শক্তির রূপচ্ছটা।

'বুঝলে হে', কেশব সেনকে বলছে রামকৃষ্ণ: 'যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্ম, পুরুষ। যখন কর্মময়ী তখন শক্তি, প্রকৃতি। যিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি। আনন্দময় আর আনন্দময়ী।'

একটু থেমে আবার বললে, 'যার পুরুষ-জ্ঞান আছে তার মেয়ে-জ্ঞানও আছে। যার বাপ-জ্ঞান আছে তার মা-জ্ঞানও আছে।'

কেশব একটু হাসল।

'যার সুখ-জ্ঞান আছে তার দুঃখ-জ্ঞানও আছে। যদি রাত বুঝি তবে দিনও বুঝেছি। যদি বলি আলো তবে আবার বলব অন্ধকার। তুমি এটা বুঝেছ?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি।'

'মা মানে কি? মা মানে জগতের মা। যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন, তিনি। যিনি সর্বদা রক্ষা করছেন তাঁর ছেলেদের। আর যে যা চায়, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, সব দিচ্ছেন দু হাতে। ঠিক যে ছেলে সে মা ছাড়া থাকতে পারে না। তার মা-ই সব জানে। ছেলে খায় দায় বেড়ায়—অত-শত জানে না। কি, বুঝেছ?'

কেশব ঘাড় নাড়ল। আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝেছি।

আটাত্তর

ব্রাহ্ম ভক্তদের সঙ্গে ষ্টিমারে করে বেড়াতে গিয়েছে রামকৃষ্ণ।

ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে যখন বান ডাকে তখন তার অনাশ্রয় আত্মাকে তা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সমুদ্র হচ্ছে নিরাকার ঈশ্বর আর তার লহরী হচ্ছে সাকার।

ভাবমগ্ন হয়ে বসে আছে রামকৃষ্ণ, একজন একটি দূরবীন নিয়ে তার কাছে এল। বললে, 'এর ভিতর দিয়ে একবার দেখুন।'

এর ভিতর দিয়ে তাকালে কী এমন আর দেখা যাবে। যিনি অণু হতে অণীয়ান তাঁকে বিশালতম করে দেখছি। যিনি দবিষ্ঠ তাঁকে দেখছি অন্তিকতম করে। ব্রহ্মকে দেখতে দূরবীন লাগে না। তাঁর তো দূরের বীণা নয়, তাঁর হচ্ছে অন্তরের বীণা।

সেদিন আবার এক ষ্টিমার এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। ষ্টিমারে রেভারেণ্ড কুক আর মিস পিগট। ব্রাহ্ম-ভক্তরা নিয়ে এসেছে তাদের। ধর্ম বিষয়ে বড় এক-জন বক্তা এই কুক সাহেব—রামকৃষ্ণকে দেখতে বড় সাধ। রামকৃষ্ণকে দেখতে মানে মূর্তিমান ভারত-বর্ষকে দেখতে। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মকে দেখতে।

খবর পেয়ে রামকৃষ্ণ নিজেই এল নদীর ঘাটে।

সকলের পিড়াপিড়িতে উঠে গেল ষ্টিমারে। উঠে গেল গভীর ভাবাবেশের মধ্যে। পশ্চিমের জ্ঞান বিমুগ্ধ চোখে দেখল এই ভারতীয় ভক্তি। ভক্তির

পায়ের কাছে জ্ঞান মাথা নোয়ালো। উপলব্ধির কাছে স্তব্ধ হল বক্তৃতা।

তোমাদের কেবল লেকচার দেওয়া আর বুঝিয়ে দেওয়া। তোমাকে কে বোঝায় তার ঠিক নেই। তুমি বোঝাবার কে হে? যাঁর জগৎ তিনি বোঝাবেন। তিনি এত উপায় করেছেন, আর এ উপায় করবেন না? বেশ করছি, আমি মাটির প্রতিমা পূজা করছি। এতে যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে, তা তিনি কি জানেন না যে তাতে তাঁকেই ডাকা হচ্ছে?

নিশ্চয়ই হচ্ছে। যে মাকে লক্ষ্য করে গান বা প্রার্থনা করছে রামকৃষ্ণ সে মা যেন চোখের সামনে জলজীয়ন্ত দাঁড়িয়ে। কথা বা গানের ভাষাও প্রাণ-তপ্ত। কে বলে সে শুধু মৃৎমূর্তি, কে বা বলে সে শুধু শূন্যরূপা? সে মা সর্বসাম্রাজ্যদায়িনী মহামায়া। অতিবিস্তীর্ণকান্তি কাননকুন্তলা পৃথিবী।

আপনি শুতে জায়গা পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। নিজে জানি না, পরকে বোঝাই। এ কি অঙ্ক না ইতিহাস, না সাহিত্য যে পরকে বোঝাব? এ যে ঈশ্বরতত্ত্ব। নুনের পুতুল হয়ে যেই গেছে সমুদ্র মাপতে সেই গলে গেছে। যে গলে যায় সে আবার ফিরে এসে বলবে কি!

আবার জাহাজ এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। ঘরে বসে বিজয় গোস্বামী আর হরলালের সঙ্গে কথা কইছে রামকৃষ্ণ। জাহাজে কেশব এসেছে—ব্রাহ্মভক্তরা এসে বললে। চলুন একটু বেড়িয়ে আসবেন আমাদের সঙ্গে।

এক কথায় রাজি! কেশব যখন আছে তখন আবার কথা কি! বিজয়কে নিয়ে নৌকোয় উঠল রামকৃষ্ণ। নৌকোয় উঠেই সমাধিস্থ।

নৌকো থেকে জাহাজে তোলাই মুস্কিল। কেশব ব্যস্তসমস্ত হয়ে সব তদারক করছে। অনেক কষ্টে বাহ্যজ্ঞান আনতে পারলেও ঠিক-ঠিক পা ফেলতে পারছে না রামকৃষ্ণ। ভক্তের গায়ের উপর ভর দিয়ে আসছে।

ক্যাবিনে আনা হল। বসানো হল চেয়ারে। কেশব লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলে। সঙ্গে-সঙ্গে অন্যান্য ভক্তরা। যে যেখানে পেল বসে পড়ল মেঝেতে। বিস্তর ভিড় চারদিকে। যারা ঢুকতে পায়নি তারা শুধু এখানে-ওখানে উঁকিঝুঁকি মারছে। স্পর্শন না পাই শুধু একটু দর্শন হোক। যদি দর্শনও না জোটে পাই যেন তার একটু অমৃতবর্ষণ।

ঘরের জানলাটা খুলে দিল কেশব। বিজয়কে দেখেই সে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। যে একদিন অত্যাগ-সহন বন্ধু ছিল সেই আজ বিরুদ্ধ-বৈরী। অথচ ছায়াসন্ধানে দুজনেই এক তরুমূলে সমাগত। একই নদীর ঘাটে এসে অঞ্জলিতে করে একই পিপাসার বারি তুলে নিয়েছে।

সমাধি ভেঙেছে রামকৃষ্ণের। তবু এখনো ঘোর রয়েছে ষোল আনা। মাকে বলছে, 'মা, আমাকে এখানে তুই আনলি কেন? বেড়ার ভিতর থেকে কি পারব এদের রক্ষা করতে?'

এদের যে সব কাম-কাঞ্চনে হাত-পা বাঁধা। বেড়ার মধ্যে সব বেড়ি পরে বসে আছে। ওদেরকে কি পারব আমি মুক্ত করতে?

গাজীপুরের নীলমাধব বাবু আছেন। গাজীপুরের সেই সাধু পওহারী বাবার কথা উঠল। পওহারী মানে পও-আহারী, অর্থাৎ কিনা বায়ুভুক্ সন্ন্যাসী।

মাটিতে বিরাট এক গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে ধ্যান করে পওহারী। উপরে ছোট একটি আশ্রম, সেখানে প্রেমাস্পদ-প্রভু রামচন্দ্রের পূজা আর নিজের হাতে বিরাট ভোগ রান্না করে দরিদ্রের মধ্যে পরিবেশন। এই তার সাধন-ভজন। নিজের খাবার বেলায় এক মুঠো তেতো নিম পাতা নয়তো গোটা কয় কাঁচা লঙ্কা। তার পর গর্তের মধ্যে এক এক সময় এত দীর্ঘ কাল সমাধিস্থ হয়ে থাকে, লোকে ভেবে পায় না সাধু খায় কি? সাপের মত নিশ্চয়ই শুধু বাতাস খেয়ে থাকে, সেই থেকে তার নাম হয়েছে পওহারী।

এরই আশ্রমে এক দিন চোর এসেছিল। পোঁটলা বেঁধে জিনিস-পত্র নিয়ে গিয়েছিল চুরি করে। পওহারী বাবা দেখতে পেয়ে তার পিছু নিল। ভয় পেয়ে পোঁটলা ফেলে চম্পট দিলে চোর। তবু পওহারী বাবা তার পিছু ছাড়ে না। জিনিস পেয়ে গিয়েছে তবু ছাড়ান-ছোড়ান নেই। চোর কি করে পারবে সাধুর সঙ্গে, জোরে ছুটে চোরকে ধরে ফেললে পওহারী। কোথায় চোর কাকুতি-মিনতি করবে, পওহারী বাবাই স্তুতি-বিনতি করতে লাগল। চোরের পদপ্রান্তে পোঁটলা নামিয়ে রেখে করজোড়ে ক্ষমা চাইলে। বললে, অনেক ব্যাঘাত ঘটিয়েছি প্রভু, তাই নিশ্চিন্ত মনে পোঁটলাটি তোমার নেওয়া হল না। আমাকে ক্ষমা করো। নাও এই সামান্য উপচার। এ পোঁটলা আমার নয়, এ তোমার।

'সেই পওহারী বাবা', বললে একজন ব্রাহ্মভক্ত, 'নিজের ঘরে আপনার ছবি টাঙিয়ে রেখেছে।'

নিজের দিকে আঙুল দেখালো রামকৃষ্ণ। বললে, 'এই খোলটার!'

বালিশ আর তার খোল—তার মানে দেহী আর দেহ। বাইরেটা দেহ, অন্তরে দেহী, তার মানে অন্তর্যামী। দেহের ছবি নিয়ে কি হবে? ছাপ নাও সেই অন্তরজ্ঞের।

তিনি এক, তাঁর নাম আলাদা, রূপ আলাদা। একই ব্রাহ্মণ, যখন পূজা করে তখন তার নাম পূজুরি; যখন রান্না করে তখন রাঁধুনে। একই লোক, যখন মার কাছে তখন ছেলে, যখন স্ত্রীর কাছে তখন স্বামী, যখন ছেলের কাছে তখন বাপ। একই জল, কেউ বলে জল কেউ বলে পানি কেউ বলে ওয়াটার। একই ভাব, নানান নামের টুকরোয় ফেটে পড়ে। একই শুভ্রতা, রূপ নিয়েছে সাত-রঙা রামধনু।

'কালীর কথা বলুন।' জিগগেস করল কেশব। 'কালী কালো কেন?'

'দূরে আছে বলে কালো দেখায়। জানতে পারলে আর কালো নয়। তখন আলো। আকাশ দূর থেকেই নীল, যদি কাছে যাও দেখবে রঙ নেই—শাদা। সমুদ্রের জলও তাই—দূর থেকেই নীল, কাছে থেকে শাদা।'

'তিনি যদি লীলাময়ী ইচ্ছাময়ী, তবে তিনি তো ইচ্ছে করলেই আমাদের সকলকে মুক্ত করে দিতে পারেন—তাই দেন না কেন?'

'তাও তাঁরই ইচ্ছে। তাঁর ইচ্ছে তিনি এই সংসারের ছকে জীব-জন্তর ঘুঁটি চেলে-চেলে খেলা করেন। বুড়িকে আগে থাকতেই ছুঁয়ে ফেললে ছুটোছুটি হয় না। ছুটোছুটি না হলে খেলে সুখ কই? খেলা চললেই বুড়ির আহ্লাদ।'

তবে কি আমরা বুড়ির আহ্লাদের জন্যে কেবল ছুটোছুটিই করব?

করলেই বা। মন্দ কি। খেলা চলছে এই তো বেশ। যে ছেলে ছুটোছুটি করে খেলছে আর যে ছেলে বসে আছে মার কোল চেপে, এদের মধ্যে কোন ছেলেকে মার বেশি পছন্দ?

'সব ত্যাগ না করলে কি পাওয়া যাবে না ঈশ্বরকে?' জিগগেস করলে এক ব্রাহ্মভক্ত।

'তা যাবে না। কিন্তু ত্যাগ তো মনে। মন নিয়েই কথা। সংসার করছ করো কিন্তু মন রাখো ঈশ্বরের হাতের মুঠোয়।'

'সেই তো কঠিন।'

'মোটেই কঠিন নয়। এক পাশে পরিবার, এক পাশে সন্তান নিয়ে শোওনি? দুজনকে আদর করোনি দুভাবে? দুই জন দুই ভাব, কিন্তু মন এক। মন নিয়েই সব। যদি সাপে কামড়ায়, আর যদি জোর করে বলো, বিষ নেই, বিষ ছেড়ে যায়। যদি বলো আমি মান-হুঁস মানুষ, যদি বলো আমি ঈশ্বরের সন্তান, কে আমাকে বাঁধে, দেখবে তুমি নির্বন্ধন, তুমি নির্মুক্ত। তুমি মহাবীর।'

রামকৃষ্ণ তাকাল কেশবের দিকে। বললে, 'তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল পাপ আর পাপী। খৃষ্টানদেরও তাই। যে রাত-দিন কেবল পাপী-পাপী করে সে পাপীই হয়ে যায়। যে কেবল বলে আমি বদ্ধ আর বদ্ধ সে বদ্ধই হয়ে থাকে। বলো আমি রাজরাজেশ্বরের ছেলে, আকাশজোড়া আমার মুক্তি, আকাশজোড়া আমার নির্মলতা, আমাকে ছোঁয় কে, আমাকে কে আটকায়!'

ভাটা পড়ে এসেছে। এবার ফেরা যাক। অমৃত কথা শুনতে-শুনতে কত দূর চলে এসেছে জল ঠেলে কারু খেয়াল নেই।

কোঁচড়ে করে মুড়ি নারকেল খাচ্ছে সবাই। হঠাৎ বিজয়ের দিকে নজর পড়ল রামকৃষ্ণের। কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। তার পাশে আরেক চেয়ারে কেশব ব'সে। সেও তেমনি জড়সড়। মিটে গেছে ঝগড়া তবু যেন মিশ খাচ্ছে না।

রামকৃষ্ণ তাকাল একবার বিজয়ের দিকে, তার পর কেশবের দিকে। বললে, 'তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ যেন সেই শিব-রামের যুদ্ধ। জানো তো, রামের গুরু শিব। দুজনে যুদ্ধও হলো, আবার সন্ধিও হলো। কিন্তু শিবের চেলা ভূত-প্রেত আর রামের চেলা বানর—ওদের ঝগড়া-কিচকিচি আর মেটে না।'

সবাই হেসে উঠল।

'মায়ে-ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে, এও প্রায় তেমনি। মার মঙ্গল আর মেয়ের মঙ্গল এ দুটো যেন আলাদা। এর মঙ্গলেই যে ওর মঙ্গল এ খেয়াল কারুর হয় না। তোমাদের ওর একটি সমাজ আছে এখন আবার এর একটি দরকার।'

আবার হাসির রোল।

'তবে এ সব চাই। যদি বলো ভগবান নিজে লীলা করছেন, সেখানে জটিলে-কুটিলের কী দরকার। জটিলে-কুটিলে না থাকলে যে লীলা পোষ্টাই হয় না।'

বুড়ি-ছোঁয়ার খেলাটিও তাই জটিল-কুটিল। যদি গোলকধাঁধার পথ না হত তবে জমত না খেলা, রগড় হত না। বলতেই বলে, ছশো মজা, পাঁচশো রগড়।

জাহাজ এসে থামল কয়লাঘাটে। গাড়ি আনা হল। কেশবের ভাইপো নন্দলালের সঙ্গে গাড়িতে উঠল রামকৃষ্ণ।

উঠেই মুখ বাড়িয়ে ব্যাকুল স্বরে ডেকে উঠল, কই, কই তিনি কই?

কাকে রামকৃষ্ণ খুঁজছে বুঝতে কারু দেরী হল না। তাঁকে ডেকে আনল। হাসি-হাসি মুখে কেশব এসে দাঁড়াল সামনে। ভূমিষ্ঠ হয়ে রামকৃষ্ণের পায়ের ধূলো নিল।

ইংরেজটোলার মধ্য দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। ঝকমক করছে রাস্তা, ঝকঝক করছে বাড়ি ঘর। গ্যাসের আলো জ্বলছে অন্দরে-বাইরে। আকাশে আবার পূর্ণিমার প্লাবন। পিয়ানো বাজিয়ে গান করছে মেমসাহেবরা। সর্বত্র যেন আনন্দভাতি। সব দেখে-শুনে রামকৃষ্ণও হাসতে-হাসতে চলেছে। হঠাৎ এক সময় বলে উঠল, আমি জল খাব। তেষ্টা পেয়েছে আমার।

এখন কী হবে। রাস্তার মাঝখানে এখন কী করা যায়।

নন্দলাল নামল গাড়ি থেকে। সামনেই ইণ্ডিয়া ক্লাব। সেখান থেকে কাচের গ্লাশে করে জল নিয়ে এল।

সানন্দে সেই জল খেল রামকৃষ্ণ।

নবাগত শিশু যেমন কলকাতা দেখে তেমনি ভাবে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল গাড়ি-ঘোড়া, দোকান-দানি, দেখতে লাগল শহরের ইট-পাথরের উপর জ্যোৎস্নার অকার্পণ্য।

নন্দলাল নেমে গেল কলুটোলায়। গাড়ি এসে থামল সুরেশ মিত্তিরের বাড়ির সামনে।

সুরেশ বাড়ি নেই। এখন গাড়িভাড়া কে দেবে?

'ভাড়াটা মেয়েদের কাছ থেকে চেয়ে নে না—'

দোতলার ঘরে ঠাকুরকে এনে বসাল সকলে। ফরমাস দিয়ে নতুন একখানা ছবি আঁকিয়েছে সুরেশ—ঠাকুর কেশবকে সকল ধর্ম সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয় দেখাচ্ছেন। সেই ছবি দেয়ালে টাঙানো। মেঝেতে ফরাস পাতা, তার উপর তাকিয়া। রামকৃষ্ণ বসল সেখানে, বসেই বললে, ওরে তোরা নরেনকে কেউ ডেকে আন।

চাষারা হাটে গরু কিনতে যায়। গরু বাছবার চিহ্ন কি? ল্যাজের নিচে হাত দিয়ে দেখে। ল্যাজে হাত দিলে যে-গরু শুয়ে পড়ে সে-গরু কেনে না। ল্যাজে হাত দিলে যে-গরু তিড়িং-মিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে সেই গরু পছন্দ করে। নরেন আমার সেই গরুর জাত—ভিতরে জ্বলন্ত তেজ। সে চিঁড়ের ফলার নয়, সে ভ্যাদ-ভ্যাদ করে না।

আহা, এখানে এক রকম, ওখানে আরেক রকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেন জুজুর ভয়ে চুপ করে বসে, আবার যখন চাঁদনিতে এসে খেলে তখন তার আরেক মূর্তি। এরা নিত্যসিদ্ধের থাক, সংসারে বদ্ধ হয় না কখনো। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। ওরে, কই, এখনো তো এল না নরেন্দর।

নরেন এসেছে, নরেন এসেছে, রব উঠল চার দিকে। রামকৃষ্ণের আনন্দের আগুন দ্বিগুণ হয়ে উঠল।

'আজ কেমন জাহাজে করে বেড়াতে গিয়েছিলাম—' বলতে লাগল নরেনকে, 'সঙ্গে বিজয় ছিল কেশব ছিল, এরা সব ছিল। এদেরকে জিগগেস কর্, কত আনন্দ হল আজ। কেমন বিজয়-কেশবকে মায়ে-ঝিয়ে মঙ্গলবার শোনালুম, বললুম সেই জটিলে-কুটিলের কথা।'

নরেন শুনতে লাগল অতৃপ্য কর্ণে।

ওরে আমার আনন্দের ভাগ তোকে কিছু না দিলে আমি যে একা-একা বইতে পারি না।

[ক্রমশঃ।

জেনে রাখা ভাল

খৃষ্টপূর্ব ৫৯ সালে রোমে সংবাদ-পত্র প্রচলিত ছিল। যদিও হস্তলিখিত সংবাদ-পত্র, তবু প্রাত্যহিক ঘটনা লিখিত হত ঐ দৈনিক কাগজে—যার নাম ছিল Acta Diurna.

রাতের কলকাতা

চৌরঙ্গী
—বি, বি, বক্সী
(প্রথম পুরস্কার)

জেনারেল পোষ্ট অফিস
—চপলকুমার মিত্র
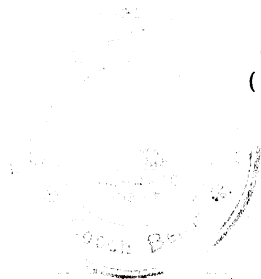
সেণ্ট, পলস্, ক্যাথিড্রাল
—আশীষকুমার মিত্র
(তৃতীয় পুরস্কার)

খুকু
—লক্ষ্মীনা রায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতার গঙ্গাতীর
—অর্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক
(দ্বিতীয় পুরস্কার)

সাট্সুমা ভাস্‌
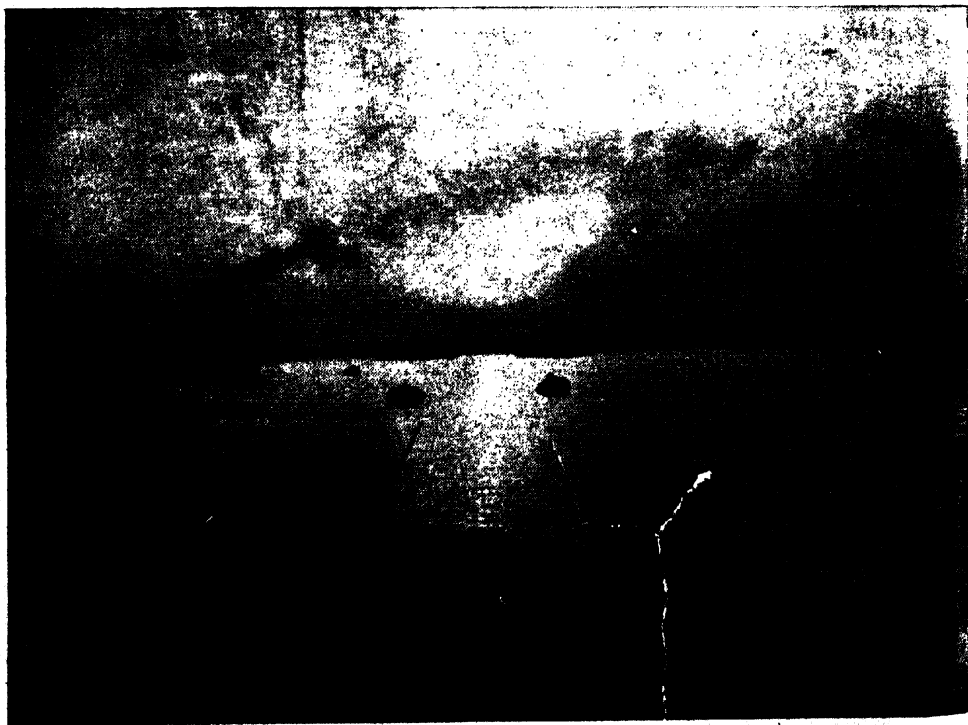
—যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া)

প্রতিযোগিতা

বিষয়

পাখী

প্রথম পুরস্কার ১৫৲ দ্বিতীয় পুরস্কার ১০৲

তৃতীয় পুরস্কার ৫৲

[ছবি পাঠানোর শেষ দিন ২০শে শ্রাবণ]

ঠনঠনিয়া, কলকাতা

—অনিল ঘোষ
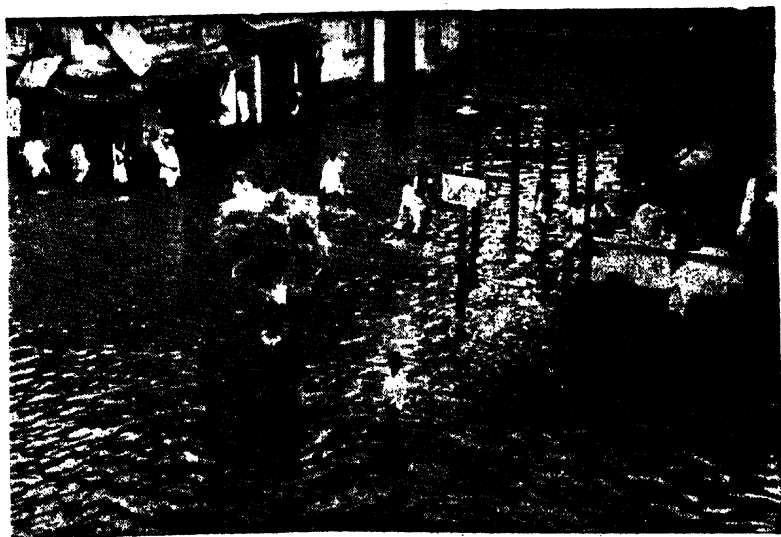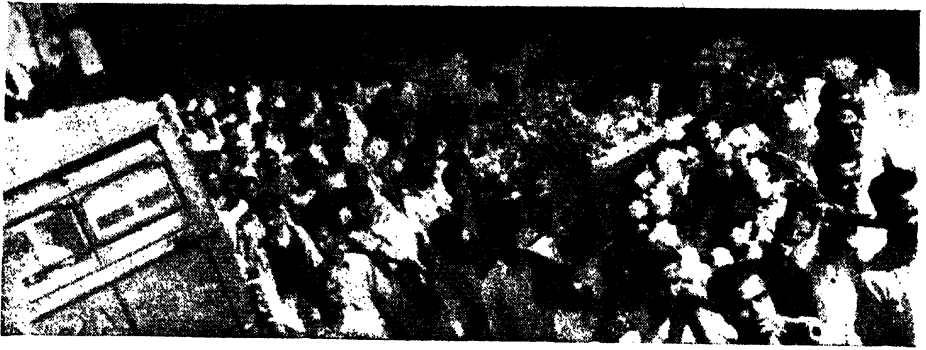
শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের শবযাত্রা — চঞ্চল মিত্র

কলকাতা বেতার-কেন্দ্রে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ —শ্রীপরিমল গোস্বামী

৺শিবরতন মিত্রকে লেখা অপ্রকাশিত পত্র

সঙ্কল্প কার্য্যালয়
৬৬নং মানিকতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা, ৩রা ভাদ্র ১৩২১

প্রিয় শিবরতন বাবু,

আপনার পত্র পাইয়া উত্তর স্বয়ং দিতে পারি নাই বলিয়া বড়ই দুঃখিত। আমি শয্যাগত ছিলাম। মাত্র কয়েক দিন উঠিয়াছি। আপনি যে দয়া করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিবেন তাহাতে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

আপনার নামে "সঙ্কল্প" পাঠাইলাম। যাতা কর্ত্তব্য করিবেন। আশা করি ভাল আছেন। কলিকাতায় কবে আসিবেন? ইতি

ভবদীয়
স্বাঃ—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

20 Mayfair
Ballygunge
12।3।26

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইলাম। আপনারা যে বীরভূমের সম্মিলনের সাধারণ সভার ভার আমার উপর ন্যস্ত করিতে চান, এ আমার পক্ষে অতি সৌভাগ্যের কথা।

দুঃখের বিষয় এই যে, কিছু দিন হইতে আমার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে সে কারণ আমাকে শীঘ্রই একটা স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে হইবে। শরীরের এ অবস্থায় আমি কোনও সভার নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিতে সাহসী হই না।

আমি যে আপনাদের উপরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না তাহার জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। ইতি

স্বাঃ—শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

Rose Bank—Darjeeling
11th June, 1922

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার শুভ কামনাপূর্ণ পত্র পাইলাম। এ সম্মান আমাকে করা হয় নাই; আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গলা সাহিত্যকে সম্মানিত করিয়াছেন; সুতরাং এ সম্মানের অধিকারী আপনারাই। এই ভাবে সম্মানটি গ্রহণ করিলেই আমি কৃতার্থ হইব। আপনার পত্র পাইয়া বড় আনন্দ লাভ করিলাম। নিবেদন ইতি

গুণমুগ্ধ
স্বাঃ—শ্রীজলধর সেন।

শ্রীশঃ

হাজারীবাগ
২৬।৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার অনুগ্রহ-লিপি অনেক ঘুরিয়া হাতে আসিয়াছে। যদি, অসুবিধা না হয়, তবে প্রথম বৎসরের এক সেট পাঠাইলে প্রভূত উপকার হইবে। কারণ, আপনারা Exchange-এ যাহা পাঠাইয়াছিলেন তাহা Common Room হইতে হারাইয়া গিয়াছে। আজকাল Matriculation-র কাগজ দেখিতে বড় ব্যস্ত। সুস্থ হইলে প্রবন্ধ পাঠাইব। আপনার বই কত দূর?

ভবদীয়
স্বাঃ—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

শ্রীহরি

১১ কাঁটাপুকুর লেন
বাগবাজার, কলিকাতা

সুহৃৎবরেষু,

আমি বিছানায় পড়িয়া আছি—উঠিয়া বসিবার শক্তি নাই। কত কাল যে এই ভাবে থাকিব তাহা ভগবান জানেন। সময় সময় মনে হয় এইবার ভবলীলা শেষ হইবে। আপনি আসিলেন, আমার সঙ্গে দেখা করিয়া গেলেন না—কি জিনিষ আমার জন্য আনিয়াছিলেন কার্ত্তিকের কাছে তাহার খবর দিয়া লুব্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

ভবদীয়
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।
৬ই জানুয়ারী, ১১৩০

মেহেরপুর
3 Apr. 1915

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইলাম। আমার 'ফটো' আপনাকে পাঠাইতে পারিলাম না, কারণ আমার ন্যায় মাতৃভাষার অকিঞ্চন সেবকের ফটো আপনার গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়া সাধারণের নিকট আমার হাস্যাস্পদ হইবার আগ্রহ নাই। যদি কাহাকেও কিছু দান করি, তবে তাহা নিঃস্বার্থ ভাবেই করিব; সেজন্য প্রতিদানে কিছু পাইবারও আগ্রহ নাই।

আপনার পুস্তকালয়ে অনেক উৎকৃষ্ট ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক আছে, তাহাদের পার্শ্বে আমার অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস ও গল্পের পুস্তক স্থান পাইবার যোগ্য নহে তাহা আমি জানি; তবে আমার পত্র পাইয়া আপনি নিতান্ত শিষ্টাচারের অনুরোধেই আমার কোন কোন পুস্তক ভবিষ্যতে গ্রহণ করিবেন, এইরূপ আশা দিয়াছেন; আপনার যাহাতে কষ্ট হয়, এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আমি কখনই অনুরোধ করিব না। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ আপনি আমার কোনও পুস্তক ক্রয় করুন এরূপ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া আমি পূর্ব্বপত্রে আপনার নিকট হইতে পুস্তক ফেরৎ আসিবার কথা লিখি নাই, এবং আপনি সে ভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিলেই অনুগৃহীত হইব। মাতৃভাষার সেবকগণের বর্দ্ধমানের মহারাজা অধিক নাই। নিবেদন ইতি

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

Meherpur
26th Mar, 1915.

সবিনয় নিবেদন,

আমি কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় গিয়াছিলাম, বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া আপনার পত্র পাইলাম, উত্তর লিখিতে বিলম্ব হইল—ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন। আপনার সহিত আমার চাক্ষুষ আলাপ না থাকিলেও আপনার ন্যায় বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদের পরিচয় আমার অজ্ঞাত থাকিবার সম্ভাবনা নাই, বিশেষতঃ আপনি পূর্ব্বে মাতৃভাষার সেবাব্রতে আমার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; মৎপ্রণীত কোনও পুস্তক ফেরৎ দেওয়ায় আমি তাহার পর হইতে আপনাকে আর মৎপ্রণীত কোন পুস্তক পাঠাই নাই। সম্ভবতঃ আপনার বিখ্যাত পুস্তকালয়ে ঐ শ্রেণীর পুস্তক রাখিবার যোগ্য নহে বলিয়াই উহা ফেরৎ দিয়াছিলেন, সুতরাং আমার আক্ষেপের কোন কারণ নাই।

মৎপ্রণীত 'নবাই' প্রবন্ধটি পল্লীচিত্রের তৃতীয় সংস্করণে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। একই প্রবন্ধ বিভিন্ন পুস্তকে প্রকাশিত হওয়া সঙ্গত কিনা বুঝিতেছি না, তবে উহা গ্রহণ করিলে যদি আপনার কোনও উপকার হয় তাহা হইলে আপনি উহা অসঙ্কোচে ব্যবহার করিতে পারেন, তবে প্রবন্ধটা যে আমার রচিত, আপনার পুস্তকে একথা আপনার স্বীকার করা নানা কারণে প্রার্থনীয় হইবে। পল্লীচিত্রে ও পল্লীবৈচিত্র্যে যে সকল প্রবন্ধ বাদ পড়িয়াছে এবার সেগুলি একত্র সম্বদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিতেছি। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরিশ বাবুও আমাকে পত্র লিখিয়া আমার দুইটী চিত্র স্বীয় পুস্তকের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সে জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার পর্য্যন্ত আবশ্যক মনে করেন নাই, বোধ হয় তিনি মনে করিয়াছেন আমার প্রবন্ধ দুটী গ্রহণ করিয়াই তিনি আমাকে যথেষ্ট গৌরবান্বিত করিয়াছেন—এ অবস্থায় দান স্বীকার করা বাহুল্য মাত্র। নিবেদন ইতি— বিনীত

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

শ্রীশঃ

মেহেরপুর
২১এ মাঘ, ১৩১০

বিপুল সম্মানভাজনেষু,

সবিনয় নিবেদন,

মৎপ্রণীত 'জাল মোহান্ত' ও 'পিশাচ পুরোহিত' প্রভৃতি উপন্যাস পাঠে সাহিত্যরসলিপ্সু বঙ্গীয় পাঠক সমাজ যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করিলেও অনেক উচ্চশিক্ষিত সাহিত্যরসজ্ঞ পাঠক ও সমালোচক আমাকে জানাইয়াছিলেন, যে সকল উপন্যাস কেবল আমোদ প্রদানের উদ্দেশ্যেই বিরচিত হয়, যাহাতে কোন মহৎ চরিত্র বা উচ্চ মনোবৃত্তির বিকাশ নাই, কোনও চিরন্তন সত্য, ধর্ম্মনীতি, স্বদেশপ্রীতি বা আত্মত্যাগের গৌরব যাহাতে বিচিত্র বর্ণরাগে উদ্ভাসিত হয় নাই সেরূপ উপন্যাস কখনও স্থায়ী সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারে না। বঙ্গসাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে এরূপ উপন্যাসই তাঁহারা আমার নিকট প্রত্যাশা করেন। অদ্ভুত ঘটনার ইন্দ্রজালে বা বিষয়-বৈচিত্র্যে পাঠক সমাজকে আমোদিত করিতে পারেন বঙ্গসাহিত্যে এরূপ লেখকের অভাব নাই। আমার লেখনী ঐ উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত হয়, ইহাই তাঁহাদের আন্তরিক কামনা। চিন্তাশীল ও সুশিক্ষিত স্বদেশীয় পাঠক মহোদয়বৃন্দের এই অনুজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আমি পাশ্চাত্য আদর্শে সাহিত্যবোধা বঙ্কিমচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণে "দর্পহারী শিখ" নামক একখানি নূতন উপন্যাস বহু পরিশ্রমে রচনা করিয়াছি। সম্প্রতি তাহা প্রকাশিত হওয়ায় আপনার পূর্ব্বানুগ্রহ স্মরণ করিয়া আপনার করকমলে প্রেরণ করিলাম। পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের পৌত্র এই উপন্যাসের নায়ক। ইহাতে আমি শিক্ষিত সমাজের রুচিকর অনেক মনোজ্ঞ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি। পুস্তকখানি আপনার মনোরঞ্জনে সমর্থ হইলেই আমার লেখনী ধন্য হইবে।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী
বিনয়াবনত
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

বিশ্বকোষ অফিস
কলিকাতা
1935

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্রানুসারে বিশ্বকোষের ২২শ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাঠান হইয়াছে পাইয়া থাকিবেন। বিশ্বকোষের প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ হইয়া শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। প্রথম ভাগের মুখপত্রের পরপৃষ্ঠায় বিশেষ বিশেষ শব্দ ও তাহার লেখকগণের তালিকা প্রকাশিত হইবে। যিনি যে শব্দ লিখিতেছেন তাহার তালিকা আমার পুত্রের নিকট ছিল। তাহার অকাল মৃত্যুতে সেই তালিকা খুঁজিয়া পাইতেছি না। এ কারণ আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি যে যে ব্যক্তির জীবনী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন অবিলম্বে সেই সেই শব্দের তালিকা পাঠাইয়া কৃতার্থ করিবেন। বহু দিন আপনার লেখা পাওয়া যায় নাই। অদ্বৈতাচার্য্য পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে। তাহার পরের শব্দ যাহা সত্বর পাঠান উচিত মনে করেন পাঠাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছি।

ভবদীয়
নগেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কিছুদিন হইল পত্র দিয়াছি, উত্তর না আসায় চিন্তিত আছি। বিশ্বকোষ যাহাতে প্রতি মাসে চার খণ্ড প্রকাশিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সুতরাং পূর্ব্বেই প্রেসকপি প্রস্তুত রাখিতে হইবে। আপনার তালিকা হইতে নিম্নলিখিত শব্দগুলি পাঠাইলাম। অভিরাম দাস, অভিরাম দ্বিজ, অমরচন্দ্র দত্ত, অমরনাথ রায়চৌধুরী, অমর মাণিক্য, অমর সিংহ, অমর সিংহদ্বিজ, অমলা দেবী, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ, অমূল্যচরণ বসু, অমৃতলাল গুপ্ত, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতনাথ মুখোপাধ্যায়।

সম্ভবতঃ উক্ত জীবনীগুলি আপনার লেখা আছে। আশা করি অতি সত্বর পাঠাইয়া দিবেন। দিতে দেরী হইলে বাদ পড়িয়া যাইবে। অন্ততঃ "অভ" অংশ অবিলম্বে পাঠাইবার চেষ্টা করিবেন। বিলম্বে পাঠাইলে কাজে লাগিবে না। লিখিতে বিলম্ব থাকিলে পত্রপাঠ জানাইয়া সুখী করিবেন।* নিয়ত কুশলপ্রার্থী

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

---

* পত্রকয়খানি শ্রীঅমলেন্দু মিত্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত

আকাশ-পাতাল

অ, আ, ই

ঝড়-ঝঞ্ঝা যা-কিছু হোক কাছারীর কাজ থামে না।

কাছারীটা ঝিমোচ্ছে, কাজ করছে যত বেতনভুক্। প্রাইভেট ষ্টেটের কাছারী, কাজ চলেছে ঠিকঠাক। গলতি নেই কোথাও। খাতায় ভুল পাওয়া যাবে না। ছকে ফেলা কাজ, ছক মিলিয়ে কাজ চলেছে ধীর-মন্থর গতিতে। লেজার মিলিয়ে কাজ। ভাউচার সীষ্টেমে। খাতাঞ্জী আছে পেমেণ্ট করছে। ক্যাস-বুকের দুই গ্রন্থ রেজিষ্ট্রী আছে। খতিয়ান আছে। তৌজি অনুযায়ী কাজ। নায়েব আছে, খরচার বিল তৈরী ক'রে দেয়। রোকড় খাতা খোলা আছে; কাজ চালায় নায়েব। রিপোর্ট আসছে মফঃস্বল কর্ম্মচারীদের, রিটার্ণ দিচ্ছে হেড-নায়েব। আদায় ওয়াশীল, জমাজমির বন্দোবস্ত, নামপত্তন, নামখারিজ, মামলা-মকদ্দমা—কত হেফাজত! তদন্ত চলে কাজের, কাজও চলে। ঝড়-ঝঞ্ঝা যা-কিছু চলুক কাজ থামে না কাছারীর। কতগুলো বিভাগ কাছারীতে, কত ডিপার্টমেণ্ট। আমিন সেরেস্তা, জমা সেরেস্তা, খাতাঞ্জী সেরেস্তা, মকদ্দমা সেরেস্তা, মহাফেজ সেরেস্তা, মুন্সী সেরেস্তা। বিভাগ কত!

কর্ম্মচারীদের মধ্যে ভাগাভাগি হয় কি না খোদাতালা জানেন, ভাগাভাগি আছে বিভাগে। দলাদলি আছে। টিটকারী আর চিপটেনের বাক্য বয় হাওয়ায়। কাছারীতে কাজ চলে তবু। ছকে ফেলা কাজ।

হঠাৎ বর্ষা। হঠাৎ নেই।

ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘরের পর্দ্দা কেঁপে উঠলো। নেটের পর্দ্দা আকাশী রঙের। ফুল-লতাপাতা আঁকা। খাটের ব্যাটম ধ'রে ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়িয়েছিল রাজেশ্বরী। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ফুটে উঠেছিল চোখে-মুখে।

শাড়ী আর জামা দু'টো বদলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়লো রাজেশ্বরী। পা চললো না যেন। মনে মনে ঠিক করলো, বাধা দিতেই হবে,—ঘরের টাকা বাইরে যাবে না,—সিন্দুকের ঘড়া থাকবে সিন্দুকে।

—অনন্ত! অনন্ত!

ডাকতে ডাকতে হঠাৎ ঘর থেকে বেরোয় রাজেশ্বরী। ডাকে, জোর-গলায় ডাকে,—অনন্ত! অনন্ত!

ফাঁকা বাড়ী। কোন্ দিক থেকে প্রতিধ্বনি ডাকলো, —অনন্ত! অনন্ত!

—কেন লা রাজো? ডাকছিস কেন অনন্তকে?

কোথা থেকে হাওয়ার মত দেখা দেয় এলোকেশী। বার্দ্ধক্যের জরায় কাঁপতে কাঁপতে এলো।

রাজেশ্বরী দম ছেড়ে বললে,—এলো, আড্ডা থেকে ডাকাতে পারিস অনন্তকে দিয়ে?

—কেন লা? তোকে যেন কেমন মনমরা লাগছে! ডাকছি আমি অনন্তকে। তুই ঘরে যা। স্নেহমাখা কথা এলোকেশীর।

কাঁপতে কাঁপতে কথা বললে এলোকেশী। কুঁজো হয়ে চললো কাঁপতে কাঁপতে।

কত দূর চলে গিয়েছিল এলোকেশী, ডাকলে রাজেশ্বরী। বললে,—আচ্ছা, থাক্ এলো। ডাকতে হবে না তোকে। থাক্।

ফিরে এলো এলোকেশী। বললে,—বলবি না বুঝি আমাকে?

এলোকেশীকে হাত ধ'রে ঘরে টেনে নিয়ে যায় রাজেশ্বরী। চোরকে যেমন টানে মানুষ, এলোকেশীকে ঘরে ধ'রে নিয়ে যায় রাজেশ্বরী। ঘরে গিয়ে ফিস-ফিস কথা বলে,—সিন্দুক থেকে ঘড়া বেরোচ্ছে যে! এলো, কি করি বল্ তো? ঠাগ্‌মাকে ডাকাবো?

এলোকেশী জিব কাটলো। গালে দিলো হাত। ঘোর বিস্ময় প্রকাশ করলো মুখভঙ্গীতে। কথা কইলো না। চোখ পাকিয়ে থাকলো কতক্ষণ।

রাজেশ্বরী বললে,—চুপ ক'রে আছিস যে?,

—ঘরোয়া কথা, ডাকবি ঠাগ্‌মাকে? বললে এলোকেশী, কথায় বিজ্ঞতা ফুটিয়ে।

—তবে? মুখে যেন কথা জোগায় না রাজেশ্বরীর। জানলার বাইরে আকাশে চোখ তুলে তাকায়। মীমাংসা খোঁজে হয়তো। কিংকর্ত্তব্য।

—তোকেও বলি রাজো, তুই যেন কেমন-ধারার! বলে এলোকেশী।

আকাশ থেকে চোখ নামায় না রাজেশ্বরী। শুনতে পায় না যেন দাসীর কথা। এলোকেশী বললে,—সোয়ামীদের এ্যাত ধরে না কি মেয়ে মানুষে? একটা একটা পুরুষের যে দু'-দু'টো মাগী থাকে। কত পুরুষ বাড়ীতেই ফেরে না! মাসান্তে আসে কি আসে না।

—অ্যাঁ? হঠাৎ কথার মাঝে শুধোয় রাজেশ্বরী। এলোকেশীর ফিসফাস কথায় চমকে ওঠে যেন।

এলোকেশী ইদিক-সিদিক দেখে। দেখে কেউ শুনছে কি না। কেউ দেখলো কি না দেখে। বলে,—সমাজে যা চলন আছে কেউ থামাতে পারে? সমাজ যেমন হবে তেমনি চলবে তো মানুষ! ঠাগ্‌মা কি করবে তোর? আসবে কেন মাথা গলাতে?

কানে যেন বিষ ঢেলে দেয় এলোকেশীর কথাগুলো। মন থেকে যেন মেনে নিতে পারে না রাজেশ্বরী। তাই ব'লে অন্যায়কে মানতে হবে! সমাজ যদি জাহান্নামে যায় যেতে হবে জাহান্নমে! ন্যায়-অন্যায় থাকবে না? বিচার-বিবেচনা?

রাজেশ্বরী বললে,—দাঁড়িয়ে থাকিস না এলো, ভাঁড়ারে যেয়ে দেখাশুনো ক'রগে যা। বামুনদিদিকে জোগান দিগে যা।

এলোকেশী প্রত্যুত্তরে বলে,—আমি যাবো, আর তুমি একলাটি ব'সে থাকবে বুঝি?

—হ্যাঁ! বললে রাজেশ্বরী।—মন চাইছে না কোথাও যেতে। লোকের কাছে মুখ দেখাতে। তুই যা ভাই। শরীলটা আমার ভাল লাগছে না। বুকে কষ্ট হচ্ছে।

—ভেবে ভেবেই মলি যে তুই। বললে এলোকেশী।—

খাটের এক ধারে বসলো রাজেশ্বরী। দুগ্ধফেননিভ শয্যা। শিমুল তুলোরি বালিস। ম্যাঞ্চেষ্টারের রেশমের আবরণ। নেটের মশারি ঝালর দেওয়া।

রাজেশ্বরী বললে,—এলো, কাছারীতে খোঁজ করাতে পারিস, সিন্দুক থেকে টাকা বেরোচ্ছে কেন? বলছে যে বাকী খাজনা শোধ করতে হবে।

ঠোঁট ওলটায় এলোকেশী। বিস্ময় প্রকাশ করে। বলে,—কাছারীতে মেয়েমানুষে যাবে কম্‌নে দিয়ে? অনন্তকে বলতে হবে। সুবিধে পেলে খোঁজ করবে।

—হ্যাঁ, ঠিক ব'লেছিস্। আমিই বলবো অনন্তকে। তুই যা ভাই। বামুনদিদিকে জোগাড় দিগে যা। আর্ত্ত-কণ্ঠে কথাগুলি বললে রাজেশ্বরী। যেন কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে।

সত্যিই বুকটা ধড়াস-ধড়াস করছে রাজেশ্বরীর।

ভেবে ভেবে যেন কূল-কিনারা পায় না। বিপরীত দেওয়ালের গায়ে আলমারী। আলমারীতে সুবৃহৎ আয়না। আয়নায় রাজেশ্বরীর প্রতিবিম্ব। চোখে পড়তেই অভিমানে মুখটা ঘুরিয়ে নেয় রাজেশ্বরী। কি হবে দেখে, যে-রূপের কোন মূল্য দেয় না কেউ। বৃথাই রূপের ডালি। তবুও রাজেশ্বরীর চোখে-মুখে যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ফুটে উঠেছে। ধনুকের মত বাঁকা হয়ে আছে ভ্রূযুগল। দ্রুত হয়ে আছে হৃদ্‌গতি। কপাল আর হাতের তালু ঘামছে থেকে-থেকে।

মুখটা ঘুরিয়ে নেয় রাজেশ্বরী আয়নায় প্রতিমূর্ত্তি দেখে। আয়নার ভেতরেও রাজেশ্বরী। ফরাসডাঙ্গার তাঁতের শাড়ী গেরিমাটি রঙের। ফিকে লাল রঙের অর্গাণ্ডির জামা। শাড়ী আর জামা দু'টো কখন বদলেছে রাজেশ্বরী।

ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘরের জানলার পর্দ্দা কেঁপে কেঁপে ওঠে। ঘরের ভেতর অপূর্ব্ব এক সুগন্ধ। ক'দিন আগে একটা শিশি খুলেছে রাজেশ্বরী,—একটা সেন্টের শিশি। তত্ত্বে পেয়েছিল বিয়ের। এলিজাবেথ আর্ডেনের তৈরী বোধ করি গার্ডেনিয়ার গন্ধই ভুর-ভুর করছে ঘরে।

মর্ম্মর মূর্ত্তির মত অচল হয়ে বসে থাকে রাজেশ্বরী। মাঝে মাঝে হাওয়ার স্পর্শ পেয়ে দুলতে থাকে চূর্ণ কুন্তল। গালে হাত দিয়ে বসে থাকে রাজেশ্বরী। পটে আঁকা ছবির মত দেখায় যেন। ভাবে, এলোকেশীর যুক্তিপূর্ণ কথা। ভাবে, সমাজে অন্যায় চলবে তাই ব'লে? সমাজ যদি জাহান্নমে যায়, যেতে হবে জাহান্নমে! দুঃসময়ে অন্য কাকেও মনে পড়ে না রাজেশ্বরীর, মনে পড়ে পিতামহীকে। ঠাগ্‌মাকে। তিন কুলে কেউ নেই রাজেশ্বরীর, আছে ঐ বৃদ্ধা। শোক আর তাপে জর্জ্জরিতা।

—গোলাপী আতর আছে বৌদিদি?

ঘরের বাইরে থেকে হঠাৎ শুধোয় বিনোদা। ভাবনায় মগ্ন ছিল রাজেশ্বরী কথা শুনে চমকে উঠলো যেন। বললে, —অ্যাঁ, কি বলছো?

ঘরের ভেতর ঢুকলো বিনোদা। বললে,—আতর আছে বৌদিদি? গোলাপী আতর? বামুনদি চাইছে, পায়েসে দিতে হবে।

ব্রাহ্মণী পায়স তৈরী করছে। চিড়ের পায়স। পিসীর ছেলেদের সাঙ্গোপাঙ্গদের জন্য প্রস্তুত করছে অমৃত। ছোট এলাচের গুঁড়ো আর আতর চাইছে ব্রাহ্মণী।

দেরাজ খুলে আতরের বাক্স বের করলো রাজেশ্বরী। কত জাতের আতর আছে বাক্সে। চন্দন, খস, মৃগনাভি, বেলা, কত কি। গোলাপী আতরের শিশিটা দেয় বিনোদাকে। বলে,—কাজ মিটলে দিয়ে যেও শিশিটা।

বিলাতী গার্ডেনিয়ার সঙ্গে দেশী আতরের মিশ্রিত সুবাস বইতে থাকে ঘরে। বিনোদা চ'লে গেলে রাজেশ্বরী জানলার ধারে যায়। একদৃষ্টে দেখে দূরের এক গৃহশীর্ষ। সেখানে ছিল হাওয়ার গতি-নির্ণয়ের যন্ত্র। ওয়েদার-কক্। দেখছিল ঘূর্ণায়মান যন্ত্রটা দুরন্ত হাওয়ায় ঘুরছে কত দ্রুতগতিতে।

আর আকাশের অনেক উঁচুতে ছিল এক ঝাঁক চিল। উড়ছে কত ধীরগতিতে। ঘোলাটে মেঘলা আকাশ। গঙ্গাজলের মত রঙ হয়ে আছে আকাশের। রাজেশ্বরী ভাবছিল, কাছারী থেকে খোঁজ পাওয়া যায় কি করলে। কি আছে কাছারীতে, কারা আছে?

কাছারীর কাজে কিন্তু বিরতি পড়ে না।

ঝড়-ঝঞ্ঝা যা-কিছু হোক, কাজ থামে না কাছারীর। কাগজের বুকে কালির আখর পড়ে। দেশী কালিতে লেখার কাজ চ'লেছে। দপ্তর তোলাপাড়া হচ্ছে। কোন্ সালের কোন্ কাগজ কখন প্রয়োজন হয় কে জানে! দলিলের রেজিষ্ট্রী, ম্যানেজারের হুকুমের ফাইল, ম্যাপের রেজিষ্ট্রী, দাখিলা বইয়ের ইস্যু রেজিষ্ট্রী। দপ্তর পাড়তে হয় র‍্যাক থেকে। প্রাপ্ত ও প্রেরিত পত্রের রেজিষ্ট্রী হাতড়াতে হয়। ডাকঘরের রেজিষ্ট্রী ঘাঁটতে হয়। কাছারীর তক্তপোষে স্তূপীকৃত হয় খতিয়ান, রোকড় ও রেকর্ড। হাত কড়্চা আর দাখিলা কড়্চা খোঁজাখুঁজি হয়। বকেয়ায় বাকি উঠানো হয়।

কাছারীর কাজকর্ম্ম রাজেশ্বরী কোত্থেকে জানবে? কখন

কি কাজ হয়, কাদের কি কাজ বুঝবে না রাজেশ্বরী। তবুও বুঝতে চায়, জানতে চায় জমা-খরচ। কত জমা পড়লো আর খরচা হ'ল কত। সিন্দুকে কেন হাত পড়লো? ঘড়া কেন বেরিয়েছে!

যত ভাবে তত বুক ধড়ফড় করে রাজেশ্বরীর। ভেবে যেন কূল পায় না! বাকী খাজনা দিতে হবে, কথাটা মিথ্যা নয়তো! মনগড়া কথা যদি হয়? অস্বস্তি বোধ করে রাজেশ্বরী। ব'সে দাঁড়িয়ে সুখ পায় না যেন। খেয়ে ঘুমিয়ে। ঝম-ঝম বৃষ্টি পড়ে হঠাৎ। ঝড়ো-কাক ডাকে গাছে গাছে। ধীর মেঘগর্জ্জন শোনা যায় দূর-আকাশে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় ঘরের পর্দ্দা কেঁপে ওঠে।

অনেক, অনেক দূর থেকে যেন ভেসে আসে যন্ত্রসঙ্গীত। মজলিস্ বসেছে বৈঠকখানায়। গান-বাজনার আড্ডা। রাজেশ্বরীর কানে বিষ ছড়িয়ে দেয় ঐ মধুর শব্দ। বিশ্রী লাগছে যেন দিনটা। বসে দাঁড়িয়ে শান্তি পায় না রাজেশ্বরী। ক'দিন থেকে এমন হয়েছে যে, সময় নেই, অসময় নেই যখন-তখন কানে শুনছে মেঘগর্জ্জনের মত শব্দ। কে যেন কোথায় গুলী ছুঁড়ছে। বন্দুক দাগছে। চমকে চমকে উঠছে রাজেশ্বরী। একা-একা থেকে দম আটকে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। একটা কথা কওয়ার পর্য্যন্ত লোক পাওয়া যায় না। পুরোহিত মশাই কি বলছিলেন নাট-মন্দিরে, ভাবতে চেষ্টা করে রাজেশ্বরী। পূর্ণশশী, শশীবৌ ডেকেছিল পুরোহিত মশাইকে। ডেকে, কি বলেছে গূঢ় কথা। ভেবে পায় না কিছু রাজেশ্বরী। শশীবৌকে মনে পড়ে। বেশ মানুষ তিনি, কেমন চমৎকার কথা বলেন। কত রূপ শশীবৌয়ের। যেন লক্ষ্মী প্রতিমা। বামুনদিদি এতক্ষণে কি করছে কে জানে! কত দূর এগিয়েছে রান্নার। কি রাঁধা হ'ল এতক্ষণে!

—বৌদিদি!

ডাক শুনে জানলা থেকে ফিরে দাঁড়ায় রাজেশ্বরী। ঘোমটা টানে মাথায়। বলে,—কে?

—আমি বৌদিদি! অনন্ত।

—কি বলছো? ভয়ে সিঁটকে জিজ্ঞেস করে রাজেশ্বরী।

অনন্তরাম বললে, আমতা আমতা ক'রে বললে,—বৌদিদি, গোটা দুই টাকা আমি চাইছি।

রাজেশ্বরী বললে,—কেন অনন্ত?

অনন্তরাম কথা বলতে গিয়ে থেমে যায়। বলে,—ভিক্ষে চাইছি বৌদিদি। ট্যাঁক গড়ের মাঠ হয়ে আছে যে। গামছাটা ছিঁড়ে কুটি-কুটি হয়ে গেছে, জামাটা জায়গায় জায়গায় ফেঁসে গেছে। একটা গামছা আর একটা ফতুয়া কিনবো। দু'টো টাকা যদি দাও। হুজুরকে বলতেই সাহস হয় না যে!

রাজেশ্বরীর মুখে স্মিতহাস্য ফুটে ওঠে। বলে,—ও, এই কথা? দাঁড়াও দিচ্ছি আমি টাকা।

অনন্তরাম কথার জের টানে। বলে,—হুজুর তো বৈঠকে বসেছেন। কাছারী থেকে চাইতে মন লাগে না। একশো কৈফিয়ৎ দাও, তবে যদি টাকা মেলে। দেবেও হয়তো টাকা, মাইনে থেকে কেটে দেবে। কিন্তু মাইনে তো পাই আটটি টাকা। তুমি যদি দয়া কর, না হয় কর্জ্জই দাও।

দেরাজ খুলে তখন ক্যাশ-বাক্সটা বের করছে রাজেশ্বরী।

পিত্রালয় থেকে পাওয়া ক্যাশ-বাক্স। লাল আখরে নাম লেখা আছে বাক্সের ডালায়—শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবী। বাক্সে আছে একটা হাতীর দাঁতের কৌটা। বৌভাতে পাওয়া মুখ-দেখানি টাকা আছে কিছু। আছে ক'টা গিনি। কয়েকটা মোহর। প্রীতি-উপহার পেয়েছে রাজেশ্বরী। দিয়েছে কত কে। কৌটা থেকে রূপোর দু'টো চকচকে টাকা বের করে বাক্স তুলে রাখে। দেরাজে চাবি দিতে দিতে বলে,—টাকা তুমি নাও অনন্ত। কর্জ্জ দিচ্ছি না। তোমাকে দিতে হবে না।

—জাতে মোরা নীচু বৌদিদি, আশীর্ব্বাদ কি ফলবে? তবুও প্রার্থনা করছি, মঙ্গল হোক তোমার। ভাল হোক। সিঁদূর অক্ষয় হোক। অনন্তরাম বললে প্রার্থনার সুরে।

রাজেশ্বরী অনন্তরামের কথায় কান দেয় না। রাজেশ্বরী ভাবছিল, অনন্তরামকে বলবে, না, বলবে না। সিন্দুক থেকে ঘড়া বের হওয়ার কথাটা অনন্তরামকে জানিয়ে কাছারীতে খোঁজ করাবে?

—অনন্ত! মুখ থেকে কথাটা যেন অতর্কিতে বেরিয়ে যায়। রাজেশ্বরী বলে,—অনন্ত, কি করা যায় বলতো?

—কি বৌদিদি? শুধোয় অনন্তরাম।

—অনন্ত! রাজেশ্বরীর কণ্ঠ কে যেন চেপে ধরছে। কথা বলতে গিয়ে কথা আসছে না মুখে। তবুও বললে রাজেশ্বরী,—সিন্দুক থেকে একটা ঘড়া বেরিয়েছে শুনেছো?

বিস্মিত হয়ে ওঠে যেন অনন্তরাম। বলে,—না, শুনি নাই তো।

রাজেশ্বরী দীপ্ত কণ্ঠে কথা বলে। বলে,—হ্যাঁ, বেরিয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে যে জমিদারীর খাজনা বাকী পড়েছে। টাকা চাই।

—এ্যাঁ? অনন্তরামের কথায় বিস্ময়। বলে,—কি বলছো বৌদিদি! খাজনায় টাকা বাকী থাকবে কেন? তুমি ভেবো না, তুমি ভেবো না। আমি তল্লাস করছি। ক'রে জানিয়ে যাচ্ছি তোমাকে।

রাজেশ্বরী দাঁড়িয়ে থাকে ফ্যাল-ফ্যাল চোখে। টাকা দু'টো ট্যাকে গুঁজতে গুঁজতে তৎক্ষণাৎ চলে যায় অনন্তরাম। কাছারীর দিকে যায় তড়িৎ গতিতে। রাজেশ্বরীর মুখের কথাগুলি কানে শুধু শোনে না অনন্তরাম, শুনে যেন অন্তরে ঘা খায়। ঘুরন্ত পৃথিবীটাকে যেন পাক খেতে দেখে। কানে যেন তালা লেগে যায়। পায়ের তলায় মাটি কাঁপতে থাকে। সিন্দুক থেকে ঘড়া বেরিয়েছে, টাকাভর্ত্তি ঘড়া। অনন্তরামের সকল আশা আরেক বার চূর্ণ হয়ে যায়। কাছারীর দিকে যেতে যেতে বিড়-বিড় করতে থাকে। আশাহত মনের

অস্ফুট বিকাশ। কচি বৌটার মুখখানা দেখে মায়া হয়, মমতা হয় অনন্তরামের। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হয়।

রাজেশ্বরী সত্যিই কিন্তু কাঁদে। দর-দর বেগে হঠাৎ জল পড়ে কপোল বেয়ে।

একা-একা ঘরে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। রুদ্ধ আবেগ ফেটে পড়ে যেন তপ্ত অশ্রুধারায়। কত কথা মনে পড়ে রাজেশ্বরীর। কাল্পনিক কত কথা। কত অমঙ্গলের কথা। রাত্রে বাড়ীতে না থাকা, টায়রা হারিয়ে যাওয়া, সিন্দুক থেকে ঘড়াভর্ত্তি টাকা বেরিয়েছে—সকল কিছু মিলিয়ে কত দুঃখের কথা মনে উদয় হয় রাজেশ্বরীর। ভাবতে পারে না, ভাবনার জাল ছিঁড়ে যায়। গান-বাজনার মজলিসে এখন কি হচ্ছে কে জানে। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে রাজেশ্বরী। যন্ত্রসঙ্গীত শোনা যাচ্ছে না তো। মজলিস ভেঙেছে হয়তো। বাজনা গেছে থেমে। ক্লান্ত হয়ে প'ড়েছে হয়তো গাইয়ে-বাজিয়ের দল। হয়তো ক্ষণেকের জন্য বিরতি পড়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরা হবে গান। বাজবে বাজনা। কিন্তু কাছারীতে কি হচ্ছে এখন?

ঝড়-ঝঞ্ঝা যা কিছু হোক, ছকে ফেলা কাজ থামে না, কাছারীর।

কাছারীতে ঢুকে কা'কে যেন খোঁজে অনন্তরাম। ব্যস্ত-চোখে।

অনন্তরামকে দেখে কর্ম্মরত গমস্তা খাতা থেকে চোখ তোলে। কানে কলম তোলে কেউ কেউ। চোখের চশমা খোলে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কেউ। হেড-নায়েব বলেন,—কিছু বলছো অনন্ত?

—আজ্ঞে হাঁ, বলছিলাম কিছু। বলে অনন্তরাম বিনম্র কণ্ঠে।—কথাটি সকলের সমক্ষে কিন্তু বলবার নয় নায়েব মশয়।

এক মুহূর্ত্ত চেয়ে থাকেন হেড-নায়েব। অপলক দৃষ্টিতে। বলেন,—অপেক্ষা কর তুমি। আমি উঠছি। বাজারের ফর্দ্দটা কমপ্লিট করেই উঠছি আমি। বাটা মাছ কত দাম ব'লেছিলে অনন্ত?

—ছ'সিকে হুজুর। বললে অনন্তরাম।

—লেড়ো বিস্কুট?

—তিন আনা হুজুর। বললে অনন্তরাম ক্ষণেক ভেবে।

—পেঁয়াজ?

—পাঁচ পো পাঁচ পয়সা।

হেড-নায়েব বললেন,—দু'মিনিট দাঁড়াও, টোটালটা দিয়েই উঠছি আমি।

ঝড়ো-হাওয়ায় গাছের পাতা মর্ম্মর করে। হেলতে-দুলতে থাকে বৃক্ষশীর্ষ। হাওয়ায় যেন জলের রেণু। খানিক আগে বৃষ্টি থেমে গেছে। ঝড়ো-কাক ডাকছে কাছারীর আলসেয়। মজলিসে গান ধ'রেছে কে। বেহাগ ধ'রেছে কে। চাঁটি পড়ছে ধুন-ধন তবলায়। ক্ল্যারিওনেট না ফ্লুট বেজে চলেছে মিষ্টমধু।

ঘড়ি-ঘরে ঘড়ি বেজে চলেছে ঢং-ঢং। দেখতে দেখতে বেলা বয়ে গেছে।

আর, একা-একা ঘরে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে তখন রাজেশ্বরী। রুদ্ধ আবেগ ফেটে পড়ছে তপ্তঅশ্রুপাতে। কাছারী থেকে ফিরে কি বলবে অনন্তরাম? বুকটা ধড়াস-ধড়াস করে রাজেশ্বরীর। কি শুনবে অনন্তরামের মুখ থেকে? এলিজাবেথ আর্ডেনের গার্ডেনিয়ার সুগন্ধ ঘরে। এলোমেলো হাওয়ায় দেওয়ালের ছবি কম্পমান হয়। পর্দ্দা উড়তে থাকে। থেকে থেকে চমকে ওঠে রাজেশ্বরী। অনন্তরাম এলো না কি? কতক্ষণ গেছে অনন্ত? রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষায় থাকে বুঝি রাজেশ্বরী। কতক্ষণে দেখা পাওয়া যাবে অনন্তরামের। কি বলবে অনন্ত, কে জানে?

হেড-নায়েব ফর্দ্দের খাতা তুলে উঠে পড়লেন তক্তপোষ থেকে। কাছারী থেকে বেরিয়ে দালানে গিয়ে বললেন,—কি বলছো বল'?

অন্যান্য গমস্তা ও আমলাগণ বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে। হেড-নায়েবের পিছু-পিছু যায় অনন্তরাম। বলে,—নায়েব মশয়, কথাটি কি সত্য?

হেড-নায়েব বললেন—আমি তো বুঝতে পারছি না অনন্ত তোমার বক্তব্যটা?

ইতিউতি দেখে অনন্তরাম। দেখে কেউ দেখছে না তো। শুনছে না তো কেউ। দেওয়ালেরও কান আছে। অনন্তরাম ফিসফিস কথা কয়। বলে,—হুজুর সিন্দুক থেকে একটি ঘড়া বের ক'রেছে। বৌমা খোঁজ করতে বলেছে, জমিদারীর খাজনা বাকী প'ড়েছে? কাছারীতে টাকা নেই, সিন্দুক থেকে টাকা না দিলে চলবে না?

একটি চোখ ঈষৎ মুদিত ক'রে কথাগুলো শুনলেন হেড-নায়েব। খানিক ভেবে বললেন,—বৌমাকে বল' কথাটি ঠিক। টাকা চাই। খাজনা বাকী পড়েছে এক সালের।

অনন্তরামের চোখে বুঝি আনন্দাশ্রু দেখা দেয়।

চোখ দু'টো চিকচিকিয়ে ওঠে। বলে,—তবে আর কথা কি আছে! খাজনা বাকী পড়লে দিতে তো হবেই। ঠিক আছে নায়েব মশয়। মাফ করবেন আমাকে। আমি তবে যাই, যেয়ে বলিগে বৌটাকে। কেঁদে-কেঁদে চোখ দু'টো রাঙা ক'রে ফেলেছে বৌটা।

হেড-নায়েব বললেন,—হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি বল'গে। হুজুর ঠিক কথাই বলেছে। বৌমাকে ভাবতে মানা করগে যাও। আমি যখন আছি তখন—

অনন্তরাম কথার মাঝেই কথা বলে,—ঠিক কথাই তো। আপনার মত একজন সুদক্ষ মানুষ থাকতে গণ্ডগোল হয় কখনও। কোন দিকে চোখ নেই আপনার? পিঁপড়ে পর্য্যন্ত আপনার চোখ এড়াতে পারে না। তবে মশয়, যাই আমি?

—হ্যাঁ যাও। বৌমাকে ভাবতে মানা কর'গে আমি যখন আছি। হেড-নায়েব কথা বলেন অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে।

সত্য কথা যখন, বলতে বাধা কি! হেড-নায়েবের কথার সুরে বিকৃতি নেই। মুখাবয়বের নেই কোন পরিবর্ত্তন।

অনন্তরাম বিনম্র কণ্ঠে বললে,—আপনার মত একজন সুদক্ষ লোক থাকতে—

—তবে? বললেন হেড-নায়েব।

—তবে হুজুর যাচ্ছি আমি। বললে অনন্তরাম।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি যাও।

অনন্তরাম অনুমতি পেয়ে চ'লে যেতেই পুনরায় একটি চোখ ঈষৎ মুদিত করলেন হেড-নায়েব। হাসলেন যেন ঈষৎ। হাসিতে ফুটে উঠলো কি এক অজানা রহস্য। মুখের অর্দ্ধস্ফুট হাসি যেন মিলায় না। হেড-নায়েব কাছারীতে ঢুকে বললেন,—তামাক সাজো তো বিষ্টু।

বিষ্টু ওরফে বিষ্ণু হেড-নায়েবের সহকারী। হুকুম পেয়ে একটা থেলো হুঁকো এক কোণ থেকে তুললো বিষ্ণু। কল্কের পোড়া ছাই ফেললো একটা মাটির গামলায়। উবু হয়ে বসলো তামাক সাজতে।

হেড-নায়েবের মুখের অর্দ্ধস্ফুট হাসি মিলায় না। হাসি লেগে থাকে যেন ওষ্ঠাধরে। মনে মনে কি ভাবতে থাকেন হেড-নায়েব। বলেন,—চটপট নাও বিষ্টু। এক কল্কে তামাক খেয়েই যাবো হুজুরের কাছে।

বিষ্ণু বললে—একটু বিলম্ব করুন মশায়। বর্ষায় টিকে-গুলান পর্য্যন্ত স্যাঁৎ-স্যাঁৎ করছে। ধরতেই চাইছে না।

হেড-নায়েব বললেন,—তবে তামাক থাক এখন। ঘুরে আসি আমি।

বিষ্ণু বললে,—ব্যস্ত হন কেন মশায়? আমি কি ঘুমোচ্ছি দেখছেন?

হঠাৎ যেন দমকা হাওয়া কাছারীতে ঢুকে তাণ্ডব-নৃত্য করতে লেগে যায়। কাগজ-পত্র ওড়াওড়ি করতে থাকে। দেওয়ালে আছে দুর্গা, জগদ্ধাত্রী আর গন্ধেশ্বরীর ছবি। ফ্রেমে বাঁধানো কালীঘাটের রঙীন পট, হাওয়ার বেগে দুলে উঠলো। ঝড়ো-হাওয়া উড়ে এলো কোথা থেকে। ফোঁড়া-ফাইলের আলগা কাগজ ঘন ঘন কাঁপতে লাগলো। আমলাদের সকলে যে যার কাগজ ও খাতা সামলাতে লাগলো। কড়িকাঠের চালিটা দুলছে—পড়ে যাবে না তো ছিঁড়ে। ঠোঁটের ক্ষীণ হাসি মুছে হেড-নায়েব বললেন,—দেখবেন মশায়গণ, কাগজপত্তর গেলে বিপদের অবশেষ থাকবে না। আচ্ছা বর্ষা লেগেছে বটে। তিষ্ঠোতে দেয় না।

দিন তো নয়, যেন আঁধার নেমেছে সাঁজের। ময়লা আকাশে আলো আছে কি নেই।

আকাশের অনেক উচুতে এক ঝাঁক চিল, স্থির ডানা মেলে উড়ছে না ভাসছে। রাশি রাশি মেঘ উড়ে আসছে দিক্‌চক্র থেকে। মেঘের সঙ্গে যেন লুকোচুরি খেলছে ঝাঁক ঝাঁক চিল। ঝড়ো-কাক ডাকছে বৃক্ষশীর্ষে। কাছারীর আলসেয়। শুকনো পাতা নাচছে হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

[৪৮৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

যাযাবর

আখ্যান

দৃশ্যপট এবং আলোক সম্পাতের সুষ্ঠু সমন্বয়ের উপরেই নির্ভর করে মঞ্চসজ্জার সৌকার্য্য। তাঁদের কাজের এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে বীরেশ্বর ও নিখিলকে ঘন ঘন আলাপ আলোচনা করতে হয়।

ষ্টেজে প্রথম দৃশ্যটি সেট করা হয়ে গেছে। শুধু পটোত্তলনের অপেক্ষা।

মলী সেনের মতো নিখিলেরও নাটকের সুরতেই পার্ট। তিনি ইন্দ্রজিতের পোষাক পরে প্রস্তুত। পরবর্ত্তী দৃশ্যের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কী যেন দু'-একটা খুঁটিনাটি আলোচনা করছিলেন বীরেশ্বরের সঙ্গে।

সত্যসিন্ধু এসে বললেন, "রয় সাহেব, ক্ষমা প্রার্থনা করতে এলেম।"

নিখিল বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ক্ষমা প্রার্থনা? আমার কাছে? কী জন্যে?"

"অত্যন্ত আগ্রহ সত্ত্বেও আপনাদের অভিনয়ের শেষ অবধি থাকা সম্ভব হবে না। একটা টাইফয়েডের কেস আছে বেহালায়। আমি মিনিট পনর-কুড়ি পরে চলে যাবো। ত্রুটি মার্জ্জনা করতে হবে।"

"ত্রুটি কিসের? আমাদের নাটক এমন কিছু নয় যে সবাইকে শেষ অবধি বসে দেখতেই হবে।"

"কথাটা বড় মিথ্যে নয়; শেষ দৃশ্য অবধি ভালো অভিনয় এমেচার থিয়েটারে খুব কমই হয়।" বললেন বীরেশ্বর।

নিখিল বললেন, "আমার তো এই প্রথম; আগে কখনও অভিনয় করিনি। বেশ নার্ভাস বোধ করছি। ভয় হচ্ছে, অডিটরিয়াম থেকে হাততালি দিয়ে বসিয়ে না দেয়।"

"তালি বাজানো ছাড়া হাতের আর দু'-চারটে মারাত্মক ব্যবহারও আছে যে।" কৌতুকভরে মন্তব্য করলেন বীরেশ্বর।

তিনজনই একসঙ্গে উচ্চ হাস্য করলেন।

সত্যসিন্ধু বললেন, "না, না, মিছে ঘাবড়াচ্ছেন কেন? মিসেস মল্লী সেনের প্রডাকশনে লরেন্স অলিভিয়র বা শিশির ভাতুড়ীকে দেখার প্রত্যাশা নিয়ে কেউ আসে না। টিকিট যারা কেনে, তারা জানে দুর্গতদের সাহায্যের জন্য অভিনয়, ব্যবসা হিসেবে নয়।"

"কিন্তু নায়িকার পার্টটা কোন ব্যবসাদারী থিয়েটারের চাইতে খারাপ হবে, একথা ভাববেন না যেন, ডক্টর ঘোষ। রিহার্সেলে যতটুকু দেখেছি, মঞ্জুশ্রীর ভূমিকায় মিসেস সেনের চাইতে আর কেউ ভালো করতে পারবে, আমার মনে হয় না। আশ্চর্য্য ক্ষমতা। মনে হয় যেন বিলেতী সিনেমার নামকরা অভিনেত্রীদেরও হার মানাতে পারেন।" দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন নিখিল।

"আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত, মিষ্টার রয়। অভিনয়ে মিসেস সেনের জুড়ি মেলা ভার।" সত্যসিন্ধু বললেন। তাঁর অধরপ্রান্তে একটুখানি হাসির আভাষ দেখা গেল কী? কী জানি! স্পষ্ট বোঝা গেল না।

বীরেশ্বর বললেন, "শুধু অভিনয়ে নয়, অর্গেনাইজিং এবিলিটিও আশ্চর্য্য। এরকম একটা বৃহৎ ব্যাপার, কত তার ঝামেলা, কত তার সমস্যা। সমস্তই একা সামলাচ্ছেন।"

"এই দলাদলির দেশে এতগুলি ছেলেমেয়েকে দিয়ে একসঙ্গে কিছু করানোটাই কি সহজ কথা? আমি তাঁকে যত জানছি ততই অবাক হচ্ছি। বাস্তবিক, অসাধারণ মহিলা মিসেস সেন।" সশ্রদ্ধ প্রশংসায় মন্তব্য করলেন নিখিল।

"ঠিক কথা, রয় সাহেব। তবে এ বিষয়ে আপনার খুব ওরিজিন্যালিটি আছে ভেবে যেন গর্ব্বিত হবেন না। মিসেস সেন সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে আরও দু'-এক জনের এরকম মনে হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে শেষ পর্য্যন্ত জানলেই জানা যায় যে, আগের জানাটা কত সামান্য। কিন্তু এ প্রসঙ্গ এখন থাক। অল্প আলোচনায় এমন সংক্ষিপ্ত প্রশস্তি দ্বারা মিসেস সেনের বিবিধ গুণগ্রামের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার হবে না। এপিকের বিষয়বস্তুকে কি সনেটে লেখা যায়?"

নিখিল কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। সত্যসিন্ধু তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "না, মিষ্টার রয়, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি আপনার মতের বিরোধিতা করছিনে। সমর্থনই করছি। কপালে ছাপ নেই বলেই চিনতে পারছেন না যে, আপনি আর আমি একই ট্রেণের যাত্রী, একই পার্টির মেম্বর।" বলে সত্যসিন্ধু হাস্য করলেন। সে হাসিতে কিছু কৌতুক, কিছু ব্যঙ্গ আর কিছু বুঝি বা অনুকম্পার আভাষ ছিল।

নিখিল কী বলবেন, ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইলেন। বীরেশ্বরও কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

ব্যাকুল আর্ত্তনাদে এই নীরবতা ভঙ্গ করে অকস্মাৎ আবির্ভূত হলেন মান্নামাসি।

"সত্য, আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।"

"কেন, কী হয়েছে?" প্রায় একই সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন সচকিত সত্যসিন্ধু, বীরেশ্বর ও নিখিল।

মান্নামাসি বললেন, "গৌরী গোপনে বিয়ে করেছে।"

"বিয়ে করেছে? কবে?" জিজ্ঞাসা করলেন সত্যসিন্ধু।

"আজ। ঘণ্টা কয়েক আগে। দুপুরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। আমি ভেবেছি, এসেছে এখানে। তা নয়, গেছে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের আপিসে। লুকিয়ে বিয়ে করে এসেছে তিন আইনে।"

"তাই নাকি? তা বেশ তো, এতে সর্ব্বনাশের কী আছে, মান্নামাসি? বরটি কে?"

"এক দোকানী। একে সর্ব্বনাশ বলব না তো বলব কী?"

"দোকানী?"

"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। শ্যামবাজার না কোথায় যেন খদ্দরের দোকান করে খায়। লবণ তৈরী করে জেলও খেটেছে বার দুই। এ সমস্তই গৌরীর বাপের কৃতকর্ম্মের ফল। ছোকরা ল' কলেজে তাঁরই ছাত্র ছিল। আমাদের বাড়িতে ঘন ঘন আসতো। তিনি খুব পছন্দ করতেন, বলতেন, এমন ভালো ছেলে নাকি আর হয় না। দেশের কাজে তার নিষ্ঠা দেখলে নাকি সকলেরই শ্রদ্ধা হয়। আমি কখনও আমল দিইনি। ভালো না হাতী! অপদার্থের একশেষ। তা না হলে ফাষ্ট ক্লাশে এম, এ,—ল পাশ করে কেউ কাপড় বেচতে যায়?"

"আপনাদের বাড়িতেই গৌরীর সঙ্গে তার পরিচয় অনেক দিনের বুঝি?"

"হ্যাঁ, তার বাবাই সোহাগ করে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন যে। এক সময়ে তাঁর এমন দুর্ব্বুদ্ধিও

হয়েছিল যে মেয়েকে ঐ হতভাগাটার সঙ্গে মিশে পাড়ায় পাড়ায় স্বদেশী করতে পাঠাবেন। গৌরীরও মনে মনে ঐ রকমই খানিকটা ইচ্ছে ছিল বোধ হয়। শেষে শুধু আমার ভয়েই দুজনে সে মতলব ছেড়েছিল। কিন্তু এর চাইতে সেও যে ছিল ভালো।"

সত্যসিন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি কিছুই জানতেন না? গৌরী যে এ ছেলেটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তা কি আগে অনুমান করেননি?"

"ঘুণাক্ষরেও না। সে যে এমন আহাম্মুকি করতে পারে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি কোনদিন। একটা সামান্য দোকানীর প্রেমে পড়বে আমার মেয়ে, এ যে ধারণারও অতীত। ছিঃ, ছিঃ, লোকের কাছে আমি মুখ দেখাব কেমন করে?"

গৌরী মেয়েটি অত্যন্ত লাজুক ধরণের। এত নিরীহ ও নির্জ্জীব যে তার প্রবল প্রতাপান্বিত মার পাশে সে প্রায় কারো চোখেই পড়ে না। ক্যাঙ্গারু-মাতা যেমন আপন বুকের কোটরে সন্তান বহন করে ফেরে, মান্নামাসিও তেমনি তাকে সর্ব্বদা নিজ আঁচলের ঢাকায় ঘিরে রেখেছিলেন। সেও যে কোন একজন মানুষের মনোহরণ করতে পারে, তাকে ভালোবেসে, জননীর অসন্তুষ্টি অগ্রাহ্য করে গোপনে বিয়ে করার সাহস সঞ্চয় করতে পারে, সত্যসিন্ধু একথা কখনও কল্পনা করেননি।

ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত সন্দেহ নেই। কিন্তু তা বলে মান্নামাসির এত শোকার্ত্ত হওয়ারই বা মানে কী?

মানেটা মান্নামাসিই বুঝিয়ে দিলেন।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন, "তোমরা তো জানো সত্য, এই মেয়ের বিয়েই ছিল আমার রাত্রি-দিনের ধ্যান, জ্ঞান। কী না করেছি তার একটা ভালো বিয়ের জন্যে? মেম রেখে শিখিয়েছি বিলেতী আদব-কায়দা। ক্লাবে মার্কারের কাছে শিখিয়েছি টেনীস। সোসাইটিতে পার্টিতে নিয়ে বেড়িয়েছি, যাতে বড় ঘরের ছেলেদের সঙ্গে চেনা জানা হয়। হায়, হায়, এই তার পরিণতি! শেষ-কালে আমার জামাই হলো একটা কুল-শীল-হীন দোকানদার! হতভাগা মেয়ের গলায় দেয়ার কি দড়ি জুটল না?" চোখ দিয়ে তাঁর জল ঝরতে লাগল।

চোখ মুছতে মুছতে বললেন, "জীবনে কোনদিন সুখী হতে পারলেম না। ছেলে-মেয়েরা বাপের স্বভাব পাবে না তো পাবে কার? বেঁচে থাকতে তাঁকে নিয়ে মনস্তাপের অবধি ছিল না। মরার পরে তাঁর মেয়েকে নিয়েও দুঃখ পাব চিরকাল। এই আমার বিধিলিপি!"

সহানুভূতির স্বরে সত্যসিন্ধু বললেন, "না, মান্নামাসি, দুঃখ কিসের? গৌরী তার নিজের মনোনীত পাত্রকে বিয়ে করেছে; তাতে ক্ষতি কী? তাঁকে নিয়ে সে যদি সুখী হয়, তবে আমাদের খেদ কেন? আপনি প্রসন্নমনে তাঁদের দু'জনকে গ্রহণ করুন, ভগবানের কাছে তাঁদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করুন।"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে জবাব দিলেন মান্নামাসি, "কী বললে? তাদের আশীর্ব্বাদ করবো? কক্ষণও না। আমি অভিসম্পাত করবো। তেমন মা আমি নই। আমার সমস্ত আশা আকাংখা ব্যর্থ করে দিয়ে এত বড় আঘাত যে দিল, তাকে আমি কোনদিন ক্ষমা করব না।"

এতক্ষণ সত্যসিন্ধুর সঙ্গেই কথা বলছিলেন মান্নামাসি। মনের উত্তেজনায় উপস্থিত অপর ব্যক্তি দুটিকে লক্ষ্যই করেননি। হঠাৎ নিখিলের দিকে দৃষ্টি পড়তেই মান্নামাসির সমস্ত ক্ষোভ দুর্জ্জয় ক্রোধে পরিণত হলো। তিনি কঠিন কণ্ঠে বললেন, "এই যে নিখিল রয়েছে দেখছি এখানে। বলুক সত্যি করে আমি চেষ্টা করেছিলেম কি না। গোড়াতেই যদি বিয়েটা হয়ে যেতো তবে কি গৌরী আজ ঐ অপদার্থ দোকানীটার খপ্পরে পড়ত? না, তখন যে তোমাদের এঞ্জিনীয়র সাহেবের গ্রাহ্যই নেই। কেন, গৌরী কোন্ অংশে ওর অযোগ্য? তা গ্রাহ্য হবে কেন? বুদ্ধি-শুদ্ধি কি কিছু আর অবশিষ্ট আছে ওর? সবই যে আর একজনের পায়ে বিসর্জ্জন দিয়ে বসে আছেন। লজ্জা করে না। সেই যে বলে, কড়ি দিয়ে কিনলেম, দড়ি দিয়ে বাঁধলেম, হাতে দিলেম মাকু! এখন শুধু ভ্যাঁ করাটুকুই বাকী! শুনছি, মিসেস সেনের বন্ধু বলে নাকি আবার জাঁক করেও বেড়ান। ছিঃ, ছিঃ, বলি আজকালকার ছেলেদের কি কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু নেই? তোমরা কি ভাতের বদলে ঘাস খাও?"

রাগে মান্নামাসির যেন আর দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান রইল না।

হতবাক নিখিল বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে

রইলেন মান্নামাসির পানে। তাঁর সেই বিব্রত বিত্রস্ত অবস্থা মান্নামাসির মনে করুণার বদলে প্রতিহিংসার উদ্রেক করল।

"হঃ, বন্ধু! তোমার মতো এমন আর ক' ডজন বন্ধু আছে মিসেস সেনের, তার খোঁজ রাখ, গডাচর চণ্ডু? জানো, আর কতজন এর আগে তোমার মতো বন্ধু হয়ে নিজেদের নাক-কান কেটেছে? সত্যসিন্ধুকেই না হয় একবার জিজ্ঞাসা করে দেখো।" প্রায় চীৎকার করে বললেন মান্নামাসি।

সত্যসিন্ধু তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বললেন, "মান্নামাসি, আপনি তো বোধ হয় এখানে অভিনয় দেখতে আর থাকবেন না। বাড়ি যেতে চানতো, আমি গাড়ী করে রেখে আসতে পারি।"

সত্যসিন্ধুর কথায় মান্নামাসি নিজের উত্তেজনা সম্পর্কে সচেতন হলেন। তাই তো, তিনি যে মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন! নিজের অসংযত ভাষণের জন্য লজ্জিত বোধ করলেন। একটু চুপ করে থেকে সহজ কণ্ঠে বললেন, "না, তোমাকে আর কষ্ট দিতে চাইনে। দয়া করে আমাকে শুধু একটা ট্যাক্সি আনিয়ে দাও।"

"চলুন, আমি ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি।" বলে বীরেশ্বর মান্নামাসিকে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

কিছুক্ষণ সত্যসিন্ধু ও নিখিল দু'জনেই চুপ করে রইলেন। তারপর অনেকটা যেন আপন মনেই বললেন সত্যসিন্ধু, "বেচারী মান্নামাসি, আশা করেছিলেন বিরাট, আশাভঙ্গে আঘাতও পেয়েছেন কঠিন।"

নিখিলের কানে এ মন্তব্য আদৌ পৌঁছেছে কিনা তা বোঝা গেল না। তাঁর চিন্তাকুল চেহারা থেকে অনুমান করা শক্ত নয় যে, মান্নামাসির অপ্রিয় ভাষণ তাকে শুধু আঘাত করেনি, বিচলিতও করেছে।

কিছুটা সঙ্কোচের সঙ্গে নিখিল বললেন, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা—যদি কিছু মনে না করেন—কথাটা—"

"আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আপনার প্রশ্ন আমি বুঝেছি। দেখুন, মিষ্টার রয়, আমি আপনার চাইতে বয়সে বড়, সে হিসেবে অভিজ্ঞতাও বেশী। আমার কথা শুনুন, সংসারে যার কাছে যতটুকু পাওয়া যায় তার কাছে ততটুকুর জন্যেই কৃতজ্ঞ থাকা ভালো। না, না, মিষ্টার রয়, এ তর্কের কথা নয়, এ অনুভূতির কথা। পাথরের নুড়িকে শালগ্রাম ভেবে যদি অর্ঘ্য দিয়েই থাকেন তাতেই বা ক্ষোভ কিসের? পূজার আনন্দ তো মূর্ত্তিতে নয়, আনন্দ ভক্তের মনে।"

বীরেশ্বর ফিরে এলেন। বললেন, "মান্নামাসিকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে এলেম।"

সত্যসিন্ধু বীরেশ্বরের প্রবেশ বা উক্তি কোনদিকেই মনঃসংযোগ না করে নিজের কথারই জের টেনে বললেন,—"হয়তো আমার কথাগুলি অনেকটা সারমোনাইজিংএর মতো শোনাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, মিষ্টার রয়, এ আমার নিজ দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা। একদিন আমিও আপনারই মতো মনে মনে দগ্ধ হয়েছি, মানুষের প্রতি, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করেছি। কিন্তু আজ আমি আমার মনের স্থৈর্য্য সম্পূর্ণ ফিরে পেয়েছি। সংসারে কারো সম্পর্কে কোন অভিযোগ নেই আমার।"

নিখিল জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন করে তা সম্ভব হলো?"

"সংসারে অতি নগণ্য ঘটনা থেকেও যে মাঝে মাঝে কী বৃহৎ পরিবর্ত্তন ঘটে, তা আমাদের কল্পনার বাইরে। লালাবাবুর গল্প শুনেছেন হয়তো। সেই যে 'বেলা গেল'র কাহিনী। এও অনেকটা সে রকমই। এত অকিঞ্চিৎকর যে আমার নিজেরই বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে।" বলে সত্যসিন্ধু ক্ষণেক নীরব রইলেন। বোধ করি, নিজের মনে মনে সমস্ত বিষয়টা একবার পর্য্যালোচনা করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলতে সুরু করলেন।

"মাস ছয়-সাত আগের কথা। এক সন্ধ্যায় চেম্বারে একটি মহিলা এলেন। রোগী। এমন কতই আসে। ব্যক্তি হিসাবে কারো সম্পর্কেই ডাক্তারের কোন ঔৎসুক্য থাকে না। কিন্তু এ মহিলাটি অন্য পাঁচজনের চাইতে স্বতন্ত্র। আশ্চর্য্য বুদ্ধির দীপ্তি তাঁর দৃষ্টিতে, অসাধারণ দৃঢ়তার আভাস তাঁর ভাষণে ও আচরণে। মহিলা বিবাহিতা। স্বামীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে ঈষৎ হেসে বললেন, "তাতে তো আপনার রোগ নির্ণয়ে কোন সাহায্য হবে না।"

বীরেশ্বর বললেন, "আশ্চর্য্য তো!"

"হাঁ, সেজন্যেই বোধ হয় একটু বিশেষ মনোযোগ দিয়ে চিকিৎসা সুরু করলেম তাঁর। প্রতি দু'হপ্তা অন্তর আসেন তিনি। পুঁথিপত্র ঘেঁটে অনেক যত্নে

ব্যবস্থা করি অষুধের। রোগের উপশম দেখিনে। সন্দেহ হলো, মহিলা নির্দ্দেশ মতো বিশ্রাম নিচ্ছেন না। জিজ্ঞাসা করতে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, তিনি খেটে খান। আমি আশ্বাস দিলেম, আমাকে ফিজ দিতে হবে না। স্মিত হাস্যে জবাব দিলেন, "ডাক্তারকে পয়সা না দিলে অষুধে উপকার হয় না।" অর্থাৎ বিনীত অথচ সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন, কারো কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নেওয়ার পাত্রী তিনি নন। মাস দুই নিয়মিত এলেন। তারপরে তাঁর আর দেখা নেই।"

নিখিল বললেন, "অন্য কোন ডাক্তারের কাছে গেছেন বোধ হয়।"

"না, তা নয়। হঠাৎ আজ সকালে তিনি আবার এসেছিলেন। চেহারা দেখেই বুঝলেম, অসুখ কমেনি, বেড়েছে। যথারীতি পরীক্ষার পর মনোভাব যথাসাধ্য গোপন রেখে স্বাভাবিক স্বরে বললেম, "আপনার স্বামী কিম্বা অন্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে একবার—।" তিনি বাধা দিয়ে শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "আপনার যা বলার আমাকেই বলতে পারেন।" আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে বললেন, "আপনি অনর্থক বিব্রত বোধ করবেন না। আমি জানি আমার কী হয়েছে। আপনি কত দিন মিয়াদ মনে করেন?"

নিখিল মন্তব্য করলেন, "এ্যামেজিং।"

সত্যসিন্ধু বললেন, "প্রশ্নের পাশ কাটিয়ে বললেম – পুষ্টিকর খাদ্য, পরিপূর্ণ বিশ্রাম এবং প্রয়োজনীয় পরিচর্য্যা পেলে সারতে—সব চেয়ে ভালো হয় কোন স্যানিটরিয়ামে, কশৌলী, ধরমপুর কিম্বা—।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "বাড়িতে থাকলে অন্য লোকের ছোঁয়াচ লাগার আশঙ্কা আছে খুব?" আমি বললেম, "তা আছে।" মহিলা প্রতিবারের মতো নিয়মিত ব্যাগ থেকে টাকা বের করে পুরো ফিজের টাকাটা রাখলেন আমার টেবিলে। বললেন, "আপনি আমার যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।" ছোট্ট একটি নমস্কার করে ধীরে ধীরে চলে গেলেন। জানেন মৃত্যুর এত মুখোমুখী দাঁড়িয়ে, অথচ ভয় বা বিচলনের কিছুমাত্র চিহ্ন নেই আচরণে।"

বীরেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন, "তারপর?"

সত্যসিন্ধু বললেন, "অবিবাহিত ডাক্তারের পক্ষে কোন মহিলা পেশেন্টের সম্পর্কে অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশটা বিপজ্জনক। তবুও খোঁজ-খবর নিয়ে যে সকল বিক্ষিপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করেছি তাদের মধ্যে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য নেই। কেউ বলেন, মহিলা কোন এক মেয়ে স্কুলে শিক্ষয়িত্রী। আত্মীয় পরিজন কেউ কোথাও নেই। নেই যদি তবে সে কথা বলতে বাধা কী? আবার কেউ বলেন, মহিলার সবাই আছে, স্বামী একজন আর্টিষ্ট। আছে যদি তবে সে কথা গোপন করার প্রয়াস কেন? সত্যি বলছি, মিষ্টার রয়, স্বভাবে শান্ত, ব্যবহারে মধুর ও মনোভাবে তেজস্বিনী এই মহিলা আমার কাছে যেন সংকেতহীন এক বিরাট রহস্য।"

নিখিল ও বীরেশ্বর দু'জনেই চুপ করে রইলেন।

সত্যসিন্ধু একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, "আমি ডাক্তার। অহরহঃ চোখের সামনে রোগীকে মরতে দেখতে হয়। তাতে বিচলিত হলে চলে না। কিন্তু মৃত্যুকে এমন প্রত্যক্ষরূপে এর আগে যেন কখনও উপলব্ধি করিনি। বোধ হয়, এই মহিলা তাঁর আপন স্বভাবের বৈশিষ্ট্য দ্বারা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিলেন বলেই তাঁর আসন্ন অবধারিত মৃত্যু আমার কাছে সমস্ত ভয়াবহ নির্ম্মমতায় এমন স্পষ্ট হয়ে উঠল। জীবন যে কত ক্ষণিকের এবং মানুষ যে কত অসহায় তা যেন এই প্রথম যথার্থরূপে বুঝতে পারলেম। সে মুহূর্ত্তেই সংসারের সমস্ত কলহ, বিরোধ, মান, অপমান নিতান্ত তুচ্ছ এবং একান্ত অর্থহীন মনে হলো। কথাটা শুনতে যতই কেন না অবাক লাগুক মিষ্টার রয়, আমার রোগী সুবালার কাছে আমি সত্যি কৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে নতুন জীবনদর্শনের ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন।"

"কী নাম বললেন তার?" ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন বীরেশ্বর।

"সুবালা। মিসেস সুবালা বোস। কেন, চেনেন নাকি এ নামের কাউকে?"

বীরেশ্বরের গলার ভিতরে কী একটা স্প্রীংএর মতো সজোরে চেপে ধরল যেন। বহু আয়াসে সেখান থেকে জড়িত উচ্চারণে এক অক্ষরের যে শব্দটা নির্গত হলো তা এতই মৃদু সেটা হ্যাঁ, কিম্বা না, তা ঠিক বোঝা গেল না।

সত্যসিন্ধু বিদায় নিতেই বীরেশ্বর ছুটে গেলেন টেলীফোনের কাছে। একবার নো-রিপ্লাই ও দু'বার রং কনেকশানের পর লাইনটা পেলেন।

"হ্যালো, কে কথা বলছ? ও নিধু, মাকে একবার ডেকে দে তো। মা নেই? বেরিয়েছেন? কখন? কখন ফিরবেন বলে যাননি? হেঁটে বেরিয়েছেন কী? ট্যাক্সিতে! খোকন সঙ্গে আছে তো? খোকনকে, কী বললি? খোকনকে আগেই সিনেমা দেখতে পাঠিয়েছেন? হ্যালো, হ্যালো—যাঃ (খট্ খট্ খট্) হ্যালো, হ্যালো মিস—ইয়েস, আই হ্যাভবিন কাট অফ্। ইয়েস পি কে ফোর-জিরো-নাইন-থ্রি। হ্যালো, হ্যালো, কে নিধু,—হ্যাঁ আমি। তা, কি বলছিলি তুই? ছোট সুটকেশটায় খান কয়েক জামা কাপড় গুছিয়ে নিয়ে গেছেন? কোথায় যাচ্ছেন জিজ্ঞেস করিসনি কেন? জিজ্ঞেস করিছিলি; বেশ। কী বললেন তিনি? কিছু বলেননি? কী বলছিস শুনতে পাচ্ছিনে। হ্যাঁ, চাবি; চাবির কী হয়েছে? চাবি তোর হাতে দিয়ে গেছেন? আমাকে দেওয়ার জন্যে? হ্যালো, একটু চেঁচিয়ে বল দিকিন। হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি। চিঠি? কার চিঠি? আমার? মা লিখে রেখে গেছেন, আমার জন্যে? কোথায় সে চিঠি? টেবিলের উপরে রেখেছিস তো শীগগির নিয়ে এসে খুলে পড় দেখি। ওঃ তুই পড়তে জানিসনে। কী মুস্কিল!"

হতবুদ্ধি বীরেশ্বর কী করবেন ভেবে পেলেন না।

ধীরে ধীরে তাঁর স্মরণ হলো, হ্যাঁ, কিছুদিন থেকে সুবালাকে কেবলই জানালার পাশে ইজিচেয়ারটায় চুপচাপ বসে থাকতে দেখেছেন বটে। সে কী তবে —কী জানি। বীরেশ্বর তো ভেবেছেন স্কুলের খাটুনির পরে সুবালা বিশ্রাম করছেন। কিম্বা কিছু ভাবেনইনি। অহর্নিশি যাদের দেখা যায় তাদের চেহারার পরিবর্ত্তন স্বভাবতঃই চোখে পড়ে না। কিন্তু এখন বীরেশ্বরের মনে হতে লাগল, তাই তো, সুবালার চোখে মুখে ইদানীং একটা ক্লান্তি ও অবসাদের ছাপ [illegible] যেন।

কিন্তু সুবালা হঠাৎ গেলেন কোথায়?

তার চাইতেও বেশী অবোধ্য বিষয় আছে। কী কারণে সুবালা আপন অসুস্থতার কথা বীরেশ্বরের কাছে এতদিন একবারও উল্লেখ করেননি? কেন তাঁকে দেননি আপন দুরারোগ্য ব্যাধির সামান্যতম ইঙ্গিত? কেন নেননি প্রাত্যহিক শিক্ষকতার অহেতুক পরিশ্রম থেকে অন্ততঃ সাময়িক বিশ্রাম?

মীমাংসাবিহীন দুরূহ সমস্যার মতো সুবালা চিরকাল বীরেশ্বরের কাছে এক দুর্জ্জেয়, দুর্ব্বোধ্য চরিত্র। অভিজ্ঞতার অতীত। পরিচিতির ঊর্দ্ধে।

নিখিল একা বসে ভাবছিলেন মান্নামাসির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ও প্রকাশ্য তিরস্কার।

সংসারটা কি আগাগোড়াই ছলনা? মানুষের মুখগুলি কি সব মুখোশ? এতদিন মিসেস সেনের যে আচরণকে তিনি সহজাত সৌজন্য মনে করে শ্রদ্ধান্বিত হয়েছেন সে তবে শুধু একটা পোজ? যাকে সৌহার্দ্দ্য ভেবে পুলকিত হয়েছেন সে ত'হলে নিছক ককেট্রী!

ক্ষোভে ও দুঃখে নিখিলের চোখে সমস্ত পৃথিবীটাই যেন বিবর্ণ মনে হলো। বাস্তবিক, কী নির্ব্বোধ তিনি। মান্নামাসি যে তাকে ভর্ৎসনা করে গেলেন, সে তো অহেতুক নয়। সত্যি, তিনি অবজ্ঞারই পাত্র।

সত্যসিন্ধুর উক্তিগুলি নিখিলের কাছে ছেলেদের কপিবুকের নীতিকথার মতো মনে হলো। সত্য, কিন্তু অবাস্তব। জীবনদর্শনের অর্থ কী? তার ইঙ্গিত বলে সত্যসিন্ধু যে কবিত্ব করে গেলেন তারই বা অস্তিত্ব আছে কোন্‌খানে? না, ডাক্তার সাহেব, উপদেশের মলমে মনের ক্ষত শুকায় না।

কিন্তু একান্তে বসে আত্মধিক্কৃতির সময় এখন কোথায়? আজ রাত্রির এই উৎসব আয়োজনের মধ্যে তাঁর মর্ম্মবেদনার তো অবকাশ নেই। যবনিকার এক প্রান্তে প্রেক্ষাগৃহে প্রতীক্ষাকুল অসংখ্য নরনারী, অপর প্রান্তে এই মনোরম দৃশ্যপট, এই উজ্জ্বল দীপালোক, এই সুমধুর আবহ সঙ্গীত, এই জরি ঝলমল সাজ-সজ্জার সমারোহ। এই স্বপ্নময় পরিবেশে ইলেকট্রীক্যাল এঞ্জিনীয়র এন, সি, রয়ের তো কোন অস্তিত্ব নেই। এই মুহূর্ত্তে তিনি মগধের রাজতনয় ইন্দ্রজিৎ। বিদেশিনী রাজকন্যা মঞ্জুশ্রীর প্রেমের দ্বারে তৃষ্ণার্ত্ত অতিথি।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং করে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বেজে উঠল। অভিনয় আরম্ভের পাঁচ মিনিট পূর্ব্বেকার সঙ্কেতধ্বনি।

"ফাইভ মিনিটস টু সেভেন, টেইক পজিশান, এভরিবডি।" দূর থেকে ষ্টেজ ম্যানেজারের কণ্ঠে নির্দ্দেশ শোনা গেল।

নিখিল কালবিলম্ব না করে ষ্টেজে আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে আসন গ্রহণ করলেন। [ক্রমশঃ।

জ্ঞানান্বেষণ

(অপ্রকাশিত)

৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

ডিরোজিওর ছাত্রগণ সকলেই বেশ শিক্ষিত ছিলেন। এই সমস্ত শিক্ষিত ('educated') সম্প্রদায়কে লোকে 'এজু' ('এজুকেটেড' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ) বলিত। এই 'এজু'দের বিদ্যাশিক্ষা হিন্দু কলেজেই হইয়াছিল। আর সেখানে বাঙলা ভাষার অনুশীলনের ব্যবস্থা ছিল না। ক্রমশঃ এই 'এজু'রা বঙ্গভাষার সাহিত্যের আলোচনার জন্য একটি সভা স্থাপন করিলেন। সভার নাম হইল 'সাহিত্য-সমালোচনী সভা'। দমদমায় 'তিলিপুকুরে' তদানীন্তন হিন্দু কলেজের ছাত্র রসিককৃষ্ণ মল্লিকের বাগানবাড়ী ছিল। সেইখানেই এই সভা স্থাপিত হইয়া 'এজু' বন্ধুদের বৈঠক বসিত। সভায় প্রবন্ধ পড়া হইত, বক্তৃতাও হইত। কিন্তু সভ্যদের নিজস্ব কোন কাগজ না থাকায় প্রবন্ধাদি মুদ্রিত হইতে পারিত না। শেষে সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে একখানি সাময়িক পত্র বাহির হইবে—আর তাহার নাম হইবে—'জ্ঞানান্বেষণ'।

১৮৩১ সালের মে মাসে দক্ষিণাচরণ মুখোপাধ্যায় সাপ্তাহিক 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রকাশের জন্য গভর্ণমেণ্টের আদেশ প্রার্থী হইয়া আবেদন করিলেন। ৩১এ মে গভর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিলেন। ফলে ১৮৩১ সালের ১৮ই জুন কলুটোলা হইতে তারকচন্দ্র বসুর সম্পাদনে প্রথম সংখ্যা বাহির হইল।

জ্ঞানান্বেষণের শিরোভাগে নিম্নলিখিত কবিতাটি মুদ্রিত হইত।

"এহি জ্ঞানমনুষ্যাণামজ্ঞানতিমিরং হর।
দয়াসত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর॥
বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন।
দয়া সত্য উভয়কে করিয়া স্থাপন॥
লোকের অজ্ঞানরূপ হর অন্ধকার।
একেবারে শঠতারে করহ সংহার॥"

জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদক

প্রথম সম্পাদক—তারকনাথ বসু (১৮৩১ খৃঃ ১৮ই জুন হইতে ১৮৩৫ খৃঃ ১৯এ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)। তারক বাবু হুগলীর কালেক্টর নিযুক্ত হইলে দ্বিতীয় সম্পাদক হইলেন—রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮৩৫ খৃঃ ২০এ সেপ্টেম্বর)। ইনি ছিলেন হেয়ার স্কুলের হেড মাষ্টার। রসিককৃষ্ণ বর্ধমানের ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইলে তৃতীয় সম্পাদক হইলেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণারঞ্জন রাজনৈতিক কার্যে ব্যাপৃত থাকায় সময় পাইতেন না বলিয়া সম্পাদকত্ব ত্যাগ করেন (১৮৩৯ সালের ২৩এ (?) নভেম্বর)। হিন্দু কলেজের পণ্ডিত রামচন্দ্র মিত্র ও প্রেসিডেন্সী কলেজের পুরাতন সেক্রেটারী হরমোহন চট্টোপাধ্যায় বিশিষ্ট লেখকরূপে জ্ঞানান্বেষণে লিখিতেন। কিন্তু দক্ষিণারঞ্জন সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ করিলে ইঁহারা কাগজখানি চালাইতে থাকেন। মধ্যে ১৮৩৯ সালের নভেম্বরের গোড়ায় ইঁহারা রামগোপাল ঘোষকে সম্পাদকীয় ব্যবস্থার ভার লইবার জন্য তাঁহার বাড়ীতে একটি অধিবেশন করিয়া পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বীকৃত হন নাই। আর কিছু দিন চলিয়া ১৮৪০ সালের নভেম্বর মাসে জ্ঞানান্বেষণ উঠিয়া যায়।

ইস্কুল থেকে পালিয়ে

বিদ্যায়তনে শিক্ষাগ্রহণ না ক'রে কি কেউ শিক্ষিত হয়?

স্কুল-পালানো ছাত্রদের কাছে বিষয়টি হয়তো মুখরোচক হ'তে পারে। শিক্ষালয়ের কঠিন ও দুরূহ শিক্ষাপদ্ধতির ভয়ে এবং লেখা-পড়ার মনোযোগের অভাবের জন্যই বিদ্যালয় থেকে পালাতে হয় ছাত্রকে। বছরে বছরে পরীক্ষা দিতে হ'লেও অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। পরীক্ষাকেও ভয় করে কত ছাত্র। কিন্তু ভাল ছেলে কখনও কি পালায়? স্কুল থেকে পালানো ছেলে কি কখনও ভাল হয়? যুগে যুগে দেশ যাঁদের দেশের ভাল ছেলে বলছে তাঁদের কেউ কখনও কি স্কুল থেকে পালিয়েছেন?

বিখ্যাত মনীষিদের কাকেও কাকেও পালাতে হয়েছে বিদ্যায়তন থেকে। বাঁধাধরা পড়াশুনার গণ্ডীতে গিয়ে পালাতে হয়েছে একাধিক ব্যক্তিকে—যাঁদের কণ্ঠে জয়মাল্য দিয়েছে দেশবাসী। স্কুল-পালানো ছেলেদের মধ্যে প্রথমে যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হ'লেন ৺কেশবচন্দ্র সেন। বিদ্যালয়ে পদার্পণ না ক'রেও যে মানুষ শিক্ষিত হ'তে পারে তার প্রমাণ বিদেশেও আছেন কয়েকজন। যথা, জর্জ বার্ণার্ড শ, এইচ. জি ওয়েল্‌শ্‌ এবং আইভ্যান বুনিন। আরও আছেন। এ্যাব্রাহাম লিঙ্কন, [illegible]সে ম্যাকডোনাল্ড, হিটলার এবং মুসোলিনী—যাঁরা শিক্ষালয়ের ছাত্র ছিলেন না।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং ঔপন্যাসিক ন্যূট হামসুনের নাম প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষকেও বাদ দেওয়া যায় না।

যাঁরা প্রতিভারূপে পরিচিত হন তাঁদের শিক্ষার জন্য কি যোগ্য বিদ্যালয় নেই না বিদ্যালয়ের শিক্ষা মানুষের প্রতিভা বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয়? প্রশ্ন জটিল। উত্তর যে জন্য এখনও আছে অমীমাংসিত। তবুও বলতে হয়, বিদ্যালয়ের শিক্ষা মানুষকে পরিপূর্ণ শিক্ষিত করতে পারে না। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ ক'রেও পাঠ নিতে হয় মানুষকে মানুষেরই কাছে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সপ্তম তরঙ্গ

নিষিদ্ধ কথা ও সিদ্ধি

কোনও পাকাপোক্ত গৃহিণীকে যদি সামান্য কয়েক ঘণ্টার নোটিশে দীর্ঘদিনের জন্য বিদেশে যাইতে হয়, তাঁহার অভ্যস্ত সাবধানতা সত্ত্বেও সেখানে গিয়া তিনি যেমন নারকেল-কুরুনি বঁটি, ফুলবড়ি অথবা মুড়িতে মাখিয়া খাইবার গোটা ভাজার অভাবে করাঘাত করিয়া আপন ললাটকে স্মৃতিভ্রংশ-দোষে ধিক্কার দিতে থাকেন, আমারও সেই অবস্থা হইয়াছে। আসলে উভয় ক্ষেত্রে দোষ স্মৃতির নয়, দোষ তাড়াহুড়া করার। যথোপযুক্ত প্রস্তুত হইয়া পথে বাহির হওয়া হয় নাই, যাঁহারা তাগিদ দিয়াছেন তাঁহারা সে সময় দেন নাই, ফলে অনেক অতিপ্রয়োজনীয় বস্তু অর্থাৎ কাজের কথাও ফেলিয়া যাইতে হইয়াছে। একে একে তাহা মনে পড়িতেছে। ভুল-ভ্রান্তিও ঘটিয়া যাইতেছে, যেমন, "আমার শৈশব কবিতাবলী"র প্রথম কবিতা "ব্যাস-বন্দনা" রচনার তারিখ ৬ই বৈশাখ, ১৩২০—১৩২১ নয়। ফেলিয়া-আসা একটা কথা স্মরণে তুলিয়া ধরিলেন আমার প্রায় চল্লিশ বছর আগের হারানো বাল্যবন্ধু—পাবনা জিলা স্কুলের ক্লাস সিক্স-সেভেনের সহপাঠী অয়স্কান্ত বক্সী, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বহু-প্রশংসিত নাটক 'ভোলা মাষ্টারে'র লেখক। সেদিন পথে হঠাৎ দেখা। তিনি বলিলেন, দিনাজপুর জিলাস্কুল ম্যাগাজিনেই তোমার সম্পাদক-কাজের হাতেখড়ি, এ কথা সত্য নয়। তুমি পাবনা জিলাস্কুলেই একটি ম্যাগাজিন সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলে, আগাগোড়া তোমারই হাতের লেখায়। ঘটনাটা মনে পড়িল বটে, কিন্তু সে সেলেটের লেখা কালের ফুৎকারে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। তবে তথ্যের ভুল সংশোধন করিতে আমি বাধ্য।

'জীবন-জলতরঙ্গ' প্রথম "পরিচয়"-অধ্যায় লেখার পর, ৪ঠা জানুয়ারির (১৯৫২) "দিনলিপি"তে লিখিয়াছিলাম :

"দ্বিতীয় তরঙ্গ কোথা হইতে আরম্ভ করিব? নানা রকমের চিন্তা মাথায় আসিতেছে। যদি আমার সম্পূর্ণ অন্তর্জীবন ভবিষ্যৎ কালের জন্য তুলিয়া রাখিয়া যাই অর্থাৎ আমি না থাকিলে তাহা যদি প্রকাশ হয় তাহা হইলে আমার বুদ্ধি ও মনের বিকাশের সঙ্গে দেহধর্মেরও ক্রমপরিণতি দেখানো প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানেই মাসে মাসে ধারাবাহিক ভাবে যদি এই জীবন সাধারণের গোচরে আসে তাহা হইলে এই শেষের ইতিহাস গোপন রাখিতে হইবে। শুধু কাব্যজীবন, কেমন করিয়া আমার জীবন-বীণার তারে বাহিরের আঘাত লাগিয়া সুরের ব্যঞ্জনা জাগিল, ধীরে ধীরে ছন্দায়িত হইল আমার মনের ভাব—সেইটুকুই লিখিতে পারিব। আমার মনে হয়, তাহা করাই সমীচীন। রবীন্দ্রনাথ তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য কবিরা আগাগোড়া সমস্ত উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন—যৌনজীবন ও সাহিত্য-জীবনকে তাঁহারা তফাৎ করেন নাই। আমি যখন 'অজয়' লিখি (১৯২৭-২৮) তখন সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছিলাম। কিন্তু 'অজয়' উপন্যাসের আকার লইয়াছিল, সত্য ইতিহাস হইয়া উঠিতে পারে নাই। সুতরাং তাহা আরম্ভেই খণ্ডিত হইয়াছিল, ইঙ্গিতমাত্র দিয়া আমাকে বিদায় লইতে হইয়াছিল। আজ পঁচিশ বৎসর পরে আবার সেই সমস্যাই উঠিতেছে। যৌবনের বিপুল প্রাণধর্ম সত্ত্বেও তখন যাহা সত্যের মুখ চাহিয়াও করিতে পারি নাই, আজ তাহা করিব কেমন করিয়া? সুতরাং কাব্য ও জীবন দুই ভাগে নিজেকে উদ্ঘাটিত করিতে হইবে। একটি আপাততঃ প্রকাশিতব্য, অন্যটির প্রকাশ মুলতুবি থাকিবে।"

তবে একটা কথা স্বীকার করিতেই হইবে। আদি-রস বা "লিবিডো"র উত্তাপ বা ভাবনা ছাড়া পৃথিবীর কোনও শিল্পীর জীবন সম্পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, সাহিত্য-শিল্পীর জীবন তো নয়ই। ইহার প্রকাশ কোথাও উদ্দাম, কোথাও সংহত; সংহতি যত বেশি, শিল্পীর সাহিত্য-জীবনের প্রভাব ও পরিমাণ তত বেশি। সুতরাং সাহিত্যিকের প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন যৌনজীবন কদাচ উপেক্ষণীয় নয়। যাঁহাদের হাতে লেখনী তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই নিজেদের ক্যাসানোভা অথবা শুকদেব করিয়া তুলিতে পারেন, সকল

কাহিনীর তথ্যগত মর্যাদা আমরা ইচ্ছা করিলে না দিতেও পারি ; কিন্তু এ কথা না মানিয়া উপায় নাই —একজন কালিদাস, একজন শেক্সপীয়র, একজন গ্যেটে অথবা একজন শেলী, একজন কীট্‌স, একজন রবীন্দ্রনাথ—প্রত্যেকেরই সাহিত্যপ্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের অন্তরালে রক্তেমাংসে গড়া মোহিনী—এক বা একাধিক আছেনই, জীবনদেবতা বা "ইনটেলেক্‌চুয়াল বিউটি" থাকুন আর নাই থাকুন। বায়রন, অমরু, ভর্তৃহরি এবং আরও অনেকে এই বিষয়ে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি করেন বলিয়াই স্থূল ; এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং, ক্রীশ্চিনা রসেটির মত বহু মুখচোরা পুরুষ-কবি আত্মগত থাকিয়াই সূক্ষ্ম। স্থূল বা সূক্ষ্ম তাঁহারা যাহাই হউন, যৌনপ্রেমের অপবিত্র অথবা পবিত্র স্পর্শ সর্বত্রই বিদ্যমান, কোথাও চেতন, কোথাও অবচেতন। মোট কথা, রূপান্তরিত "লিবিডো"ই শুধু সাহিত্যের নয়, সকল শিল্পসৃষ্টিরই প্রাণ।

সাহিত্যিকের গর্ব লইয়া আমি যখন আত্মস্মৃতি লিখিতে বসিয়াছি, এই একান্ত দেহসংস্কার বা প্রাণ-ধর্মের অতীত আমি নহি তাহা বলাই বাহুল্য। ফলাও করিয়া লেখার মত কাহিনীও আমার জীবনে অনেক আছে কিন্তু তাহা আমার সাহিত্য-জীবন-জলতরঙ্গের ঊর্ধ্ব বা দৃশ্যমান সমতলের সামগ্রী নহে, অতি গভীর নিম্নস্তরে তাহা আজ সুধীরে প্রবাহিত। উদ্দাম আবর্তের কাল কাটিয়া গিয়াছে, এখন চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে উপরে টানিয়া তুলিবার প্রয়োজনও অনুভব করিতেছি না। প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ ও আমেরিকার সাহিত্যিক-শিল্পীসমাজে এই আদিম জৈবসংস্কারকে সামঞ্জস্যহীন বা বি-ষম ভাবে অর্থাৎ অত্যন্ত মোটা করিয়া ধ্যাবড়া রঙে প্রকট করিবার একটা দুষ্প্রবৃত্তি দেখা গিয়াছিল। তাহার ঢেউ যথাকালে আমাদের বাংলা সাহিত্যেও লাগিয়াছিল। ফলে যে রূঢ় তালঠোকা বিকৃতি প্রকাশ পাইয়াছিল তাহার প্রতিবাদেই আমি বিজ্ঞানের ছাত্রজীবন হইতে সাহিত্যের ভোজপুরী জীবনে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। যে পথ বাছিয়া লইয়াছিলাম তাহার জন্যই কালধর্মকে অর্থাৎ যৌনপ্রবণ আত্মপ্রকাশ পদ্ধতিকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলাম। সুতরাং সেদিন যাহা প্রকাশ করিবার স্বাভাবিক সুযোগ ছিল তাহা জীবনের গভীরে তলাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মানুষের জীবন-সংস্কার বা প্রাণধর্ম যে তাহার যুক্তি-আদর্শ অপেক্ষাও প্রবলতর ও শক্তিশালী, তাহা প্রমাণ করিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে কবিতার আকারে মাঝে মাঝে তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'রাজহংসে'র "পান্থ-পাদপ" কবিতাটি এই জাতীয় নানা ইঙ্গিতে পূর্ণ। দিনাজ-পুরের স্মৃতির সঙ্গে আমার যৌন-জীবনের উন্মেষ-কাহিনী জড়িত। আমার স্মৃতির ছায়া-ছবি-পর্দায় সেদিনের সেই অবোধ কিশোরের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নবজাগরণ কি মূর্তি ধরিয়াছে, "পান্থ-পাদপ" হইতে সেইটুকু মাত্র দেখাইয়া আমি এই নিষিদ্ধ কথা বন্ধ করিব। সাহিত্য ও শিল্পজীবনের রসদ বহু নিষিদ্ধ স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, বহু সহৃদয় ব্যক্তি বহুভাবে আমার প্রাণধারাকে পুষ্ট করিয়াছেন, দেওয়া-নেওয়ার সেই বিচিত্র ও ব্যাপক কাহিনী আপাতত মুলতুবি রাখিয়া আরম্ভের নমুনাটুকু মাত্র পরিবেশন করিতেছি—আজ ইহা নিতান্ত হাস্যকর ছেলেমানুষির মত শুনাইলেও আমার অন্তর্জীবনের উন্মেষে এই ঘটনা কম প্রভাব বিস্তার করে নাই :

"মনটারে সাদা পরদা বানায়ে স্মৃতির আলোকে দেখি,
কত ছায়াছবি ভেসে ওঠে পর্দায়—
মনের কবরে একটি একটি চলিয়াছে শবাধার,
জীবনে তাহারা থাকে নাই বেশি দিন।
স্মৃতির এ শোভাযাত্রায় তারা বিলম্ব নাহি করে।
কারো সাথে কারো নাহি কোনো যোগ, শুধু চলে সারি সারি—
আমারই খেয়ালে দ্রুত কি বিলম্বিত।
প্রখর রৌদ্রে মধ্যদিনের দাহে—
প্রভাতে যখন দিবসের কাজ শুরু,
সে স্মৃতি-খেলায় নাহি মোর অবকাশ।
রজনী যখন আঁধারিয়া আসে, গগনে ঘনায় কালো,
দূরে কোথা শুধু প্রহরী পেচক জাগে,
মেঘে মেঘে যবে ধূসর আকাশ, আলো আবছায়া হয়,
অবিরল ধারে আকাশের ধারা ঝরে ;
একাকী আমার বাতায়নে বসি—মন-বাতায়নে সখী,
স্তব্ধ পুলকে দেখি চলিয়াছ সবে—
কারো চেনা শুধু সিঁথির সিঁদুর, কারো গুণ্ঠনখানি,
কারো চেনা শুধু কণ্ঠের কালো তিল,
শাড়ি পরিবার ভঙ্গিটি শুধু কারো লাগে চেনা-চেনা,
কেহ ধরা দাও পিছন ফিরিয়া চেয়ে—
পথে যেতে যেতে ক'রে মুছে গেছে চরণে অলক্তক।
চেয়ে চেয়ে মোর ঝাপসা যে হয় আঁখি।

সবে চ'লে যায়, তুমি শুধু সখী, দাঁড়াও কি যেন ছলে,
তোমারে দেখেছি কাঞ্চন-নদীতীরে।
ফুলের ফসলে ভরা সাজিখানি ছিল না দখিন হাতে,
বাম হাতে নাহি ছিল লীলা-শতদল।
তুমি ছিলে আর ছিল বালুচর, মাছরাঙা উড়ে উড়ে
খরদৃষ্টিতে দেখে আর দেখে শিশু-মৎস্যের খেলা ;
ও-পারের বন ঝাপসা হইয়া আসে।
কিছু মনে নাই, মনে আছে শুধু সীমাহীন পটভূমি,
সাঁকোর উপরে চলে আলোকিত ট্রেন।
তুমি আর আমি—তারপরে ছবি, নগরীর ধূলি-ধোঁয়া,
বালিগঞ্জের পথে ছুটে চলে ডজগাড়ি একখানা,
রঙিন-শাড়ির বিজলি-ঝলক-রেখা,
অতি সুমধুর কলহাস্যের ধ্বনি,
তারপরে মনে নাই।
তবু আজো সখী, কেন নাহি জানি রয়েছি প্রতীক্ষায়,
কিশোর মনের তুমিই প্রথম প্রেম।"

প্রথম প্রেমের সেই শীতল স্নিগ্ধতা কবে যে ধূমায়িত হইয়া অগ্নিদহন-জ্বালায় লেলিহান হইয়া উঠিয়াছে, চপলচটুল গিরি-নির্ঝরিণীই কখন যে খরমরু-বালুতাপে শুকাইয়া গিয়া নিষ্ঠুর মরীচিকার রূপ ধরিয়া অসহায় পথিককে ছলনা করিয়াছে, সে কাহিনী যেমন কৌতূহলপ্রদ তেমনি চমকপ্রদ। কিন্তু বাহিরের কৌতূহল ও চমক ছাড়াও অন্তর-গভীরে ইহারা কম সুফলপ্রদও হয় নাই—আমার কাব্যজীবন সেই ফলভারে আনত হইয়া পড়িয়াছে। আমি অতি সহজেই বলিতে পারিয়াছি—

"ভাটায় যখন টানছে আমায়
সাতসাগরের পাকে,
জোয়ার এসে হাতছানিতে
বাঁকে বাঁকেই ডাকে।
মরণ বলে, দিন ফুরালো,
জ্বাল্ রে এবার মনের আলো ;
জীবন বলে, চাঁদ উঠেছে
দেখ্ রে বনের ফাঁকে।

বিবাগী কয়, জড়াস নে আর
এ সংসারের জালে,
ভোগী দেখায় ফুটেছে ফুল
কৃষ্ণচূড়ার ডালে।

সন্ধ্যা হ'ল, সন্ধ্যা হ'ল,
হাঁকছে মরণ, তল্পি তোল ;
জীবন বলে, পাত রে আবার
বাসর-শয্যাটাকে।

বাঁকুড়া কলেজ হষ্টেলের নোটিশবোর্ড-কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে বহুদিনের মানসিক নিষ্ক্রিয়তা-ব্যাধি যেন মায়ামন্ত্রবলে দূর হইল ; যৎসামান্য খ্যাতির সুযোগও মিলিয়া গেল। পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা-নোয়াখালি অঞ্চলে নিদারুণ ঝড়বৃষ্টিতে আক্রান্ত উদ্বাস্তু ও উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের আর্তনাদ উঠিল। রিলিফ চাই। সমগ্র ওয়েস্‌লিয়ান মিশনারী কলেজ ভিক্ষায় বাহির হইবে, গান চাই। সঙ্গে সঙ্গে গান বাঁধিয়া দিলাম। প্রথম কয়েকটি লাইন মনে আছে—

"ওঠ জাগো ভাই, শোন হাহাকার,
ফাটিছে গগন পূববাংলার—
ঘরদোর গেছে, জোটে না আহার
ডুবিল তাহারা ডুবিল।
এল কি ঝঞ্ঝা করাল ভীষণ
গৃহহারা হ'ল কত গৃহীজন……"

সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া খ্যাত থার্ড ইয়ারের শ্রীবিনয়কুমার সেন (অধুনা পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পরিবহন-সচিব) কর্তৃক সুর যোজিত হইল ; হারমোনিয়ম সহযোগে কলেজের ফোর্থ-ইয়ার থার্ড-ইয়ারের ধাড়ী-ধাড়ী ছেলেরাও আমার সেই গান উচ্চকণ্ঠে প্র্যাকটিস করিয়া ভিক্ষায় বাহির হইল। কলেজের প্রিন্সিপাল আর্থার এডওয়ার্ড ব্রাউন সঙ্গে চলিলেন। তিনি বাঙালীর মত বাংলা বলিতে পারিতেন। তিনিও গান ধরিলেন। সদ্য কলেজ-প্রবিষ্ট আমি, আমার মনের বিচিত্র অনুভূতি অনুমেয়। আত্মপ্রত্যয় চট্ করিয়া বাড়িয়া গেল, নিজের লেখা গান উচ্চকণ্ঠে সকলের সঙ্গে গাহিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। হষ্টেলসংলগ্ন দীঘিতে সোল্লাসে সকলে মিলিয়া সাঁতার কাটিয়া স্নান করিলাম। পূতপবিত্র মনে ঘরে আসিয়া প্রায় গীতা-ভাগবৎ পাঠের ভঙ্গিতে 'বলাকা' হইতে পাঠ করিলাম—

"দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।

বহ্নিবন্যা তরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাস ঝটিকার মেঘ,
ভূতল গগন
মূর্ছিত বিহ্বল করা মরণে মরণে আলিঙ্গন—"

কিন্তু সুদূর ইউরোপের রণক্ষেত্র অথবা বাংলার প্রত্যন্ত কুমিল্লা-নোয়াখালি হইতে ভাসিয়া-আসা মৃত্যুর গর্জন নয়, এক বিচিত্র মুক্তপক্ষ ছন্দের ঝংকার আমার চিত্তকে আবিষ্ট করিল। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের চরণে চরণে নিগড়বদ্ধ একঘেয়ে পয়ারের পর মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের শৃঙ্খলমুক্ত মেঘগর্জন আমার মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে নাই, কারণ অতি শৈশব হইতেই কর্ণের কবচকুণ্ডলের মত সে ছন্দ আমার অধিগত ছিল, প্রায় সহজাতও বলিতে পারি। ঈশ্বর গুপ্তের যুগের কাব্যপাঠকদের চিত্তে মধুসূদন হঠাৎ আবির্ভাবের যে চমক সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অতি-পরিচয়ের দরুন সে চমক ভোগের সুযোগ ও অবকাশ আমাদের কালের পাঠকদের ছিল না ; চৌদ্দ অক্ষরের চরণ ডিঙাইয়া আমরা অতি সহজেই ভিন্ন চরণে পদপাত করিতে শিখিয়াছিলাম, মিলও আর আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যদিও 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন' ও 'চিত্রাঙ্গদা'য় মধুসূদনের নাগাল ধরিতে পারেন নাই, সুকৌশলী সেনাপতির মত তিনি চরণ-উপচানো পয়ারে মিলের বন্ধন যোজনা করিয়া "বিদায়-অভিশাপ", "কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ", "গান্ধারীর আবেদন" প্রভৃতি কবিতাকে যে ভাবে ব্যূহবদ্ধ করিলেন তাহাতে মধুসূদনের মহড়া লওয়া তাঁহার পক্ষে সহজ হইল। এই পদ্ধতির চরম করিয়া ছাড়িলেন 'বলাকা'য়, মিল বজায় রাখিয়া চৌদ্দ অক্ষরের খাঁচাটা তিনি ভাঙিয়া দিলেন। সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর অবগাহন স্নানান্তে আমি যেন সহসা ছন্দবোধের বরলাভ করিলাম। আমার কাছে—

"মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে বেগের আবেগ
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।"

অর্থের বা ভাবের দিক দিয়া এই সুবিখ্যাত পংক্তিগুলি সেদিন ততখানি পুলকের সৃষ্টি করিতে পারিল না, যতখানি করিল ছন্দের দিক দিয়া। আমি এক পরম রহস্যের সম্মুখীন হইলাম। অবিলম্বে রহস্য গভীরতর হইল 'পলাতকা'য়—যখন পড়িলাম :

"বয়স ছিল আট
পড়ার ঘরে বসে বসে ভুলে যেতেম পাঠ।
জানলা দিয়ে দেখা যেত মুখুজ্যেদের বাড়ীর পাশে
একটুখানি পোড়ো জমি, শুকনো শীর্ণ ঘাসে
দেখায় যেন উপবাসীর মতো।"

এই আকস্মিক আবিষ্কারই আমার জীবনে অপ্রত্যাশিত বরলাভের সামিল হইল, যাহার পূর্ণ প্রকাশ 'রাজহংসে' এবং 'মানস-সরোবরে'। সূত্রপাত সেই দিন সেই সন্ধ্যায়। ছিন্ন বসনের মত লঘু মেঘখণ্ডের অন্তরাল হইতে কৌমুদী সেদিন নিখিল বিশ্বের মনোহরণ করিবার জন্য জ্যোৎস্নার জাল বিস্তার করিতেছিল। আমাদের হষ্টেলসংলগ্ন দীঘির জলে তাহার প্রতিবিম্ব যে মায়া বিস্তার করিয়াছিল, বিজ্ঞানের ছাত্র হইলেও তাহার প্রভাব অতিক্রম করিবার শক্তি আমার ছিল না। সঙ্গীরা অনেকেই একে একে আড্ডা দিবার লোভে আমার ঘরে ঢুকিয়া "আমার ভাব লাগিয়াছে" দেখিয়া আমাকে উপহাস করিয়া চলিয়া গেল। আমি খাতা পেন্সিল লইয়া লিখিতে বসিলাম। কি লিখিয়াছিলাম, তাহা হারাইয়া না গেলেও আজ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। এই কবিতাটি সম্বন্ধে এই কথাটিই সত্য যে, একটি সুবৃহৎ রবীন্দ্র-বন্দনা রূপে 'বলাকা'র ছন্দে ইহা আমার নব কাব্যাভিযানের প্রথম পদক্ষেপ—বাঁকুড়া কলেজ হষ্টেলের দোতলায় দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘরে আমি নিভৃতে অসমসাহসিকতার সঙ্গে এই পদক্ষেপ করিয়াছিলাম, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে।

এই ধাক্কায় পরবৎসরেই বহু ছোট বড় গীতি-কবিতার সঙ্গে "বর্ষাযাপন" নামক একটি দীর্ঘ গীতি-নাট্য রচনা করিয়াছিলাম, ইহার কেন্দ্রগত চরিত্র কবি—আমি স্বয়ং। আমার সাহিত্য-খ্যাতি যদি কোনদিন আমার আবর্জনাকেও মূল্যবান করিয়া তুলিতে পারে সেদিন "বর্ষাযাপনে"র রস বাঙালী পাঠক উপভোগ করিবেন। আজ তাহা যাপ্য হইয়াই থাক্‌

ঠিক এই সময়েই একটি উদ্দেশ্য

মদনভস্ম

(কুমারসম্ভব)

শ্রীকালিদাস রায়

সমাধিমগ্ন হরেরে অদূরে হেরি' আসীন,
মকরকেতুর শরসন্ধান কল্পনা হ'ল শূন্যে লীন।
কাঁপিতে লাগিল শিথিল পাণি,
হস্ত হইতে স্রস্ত যে ধনু তাহা না জানি'।
হেনকালে সেথা ভূধরসুতা
অর্ঘ্য লইয়া সহচরী সহ আবির্ভূতা।
হেরিয়া তাঁহার অপরূপ রূপে আলোকিত সারা বনস্থলী,
মীনকেতনের নির্বাণপ্রায় বীর্য্যবহ্নি উঠিল জ্বলি'।
গৌরী নমিতে শঙ্করপদে অলক হইতে কর্ণিকার
খসিয়া পড়িল চরণে তাঁর।
অবসর বুঝি হায় কামদেব পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে
ভাবে ছাড়ি কি না ছাড়ি ফুলবাণ হরের বুকে।
বার বার দেয় ছিলায় টান
সাহস হয় না ছুঁড়িতে বাণ।
মন্দাকিনীর রৌদ্রে শুকানো পঙ্কজবীজে গাঁথিয়া মালা
শিবের চরণে দেন উপহার শৈলবালা।
উপহার নিতে বাড়ালেন যবে শম্ভু হাত,
করি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত,
সময় বুঝিয়া ছুঁড়িলেন শর সম্মোহন
পুষ্পধনুতে মীনকেতন।
চন্দ্রোদয়ের আরম্ভে যথা চঞ্চল মহাসিন্ধুজল,
কিঞ্চিৎ যেন টলিল হরের ধৈর্য্যবল।
তিনটি নয়নে দৃষ্টি দিলেন প্রমথপতি
বিম্বাধরায় মুখের প্রতি।
বিচলিত হ'ল চিত্ত সহসা শৈলজার,
স্ফুটকদম্ব সম শিহরিল অঙ্গ তার।
সঙ্কোচ লাজে ফিরালেন তিনি পঙ্কজ সম আননখানি।
চিত্তবিকারে কুপিত হইয়া পিনাকপাণি
সবলে করিয়া আত্মজয়,
বিচলিত মন—হেন অঘটন কেন বা হয়
চারি দিকে তিনি চাহিলেন তার খুঁজিতে হেতু
দেখিলেন দূরে—মকরকেতু—
টানিয়াছে ছিলা দখিণ করে
তাঁহার বক্ষ করিয়া লক্ষ্য বিঁধিতে তারে।
তপের বিঘ্নে রুদ্রের রোষ উঠিল জেগে
তৃতীয় নয়ন হইতে দহন ছুটিল বেগে
ভয়ে রতিপতি মুদিল আঁখি
ফেলি ফুলধনু দুই হাত দিয়া বদন ঢাকি'।
অন্তরীক্ষে ত্রস্তকণ্ঠে মিনতি জানাল দেবতাগণ
'সংহর ক্রোধ, সংহর ক্রোধ'—সে আবেদন
ধরায় আসার আগে মহেশ
করিলেন স্মরে ভস্মশেষ।
বনস্পতিরে দহিয়া অশনি লুকায় মেঘে,
তেমনি মদনে দহি শঙ্কর ত্বরিত বেগে
স্বগণের সহ চলিয়া গেলেন বনান্তরে
রমণীসঙ্গ ত্যাগের তরে।

আমাকে রচনা করিতে হইয়াছিল, কলেজ হষ্টেলের এক ভোজে ডাইনিং-হলে অভিনীত হইবার জন্য। অষ্টাশি জন বোর্ডার একসঙ্গে বসিয়া খাইতে পারে এত বড় হল। অভিনেতা ও গায়ক আমরাই। হষ্টেলে তখন দুই দল, প্রকাশ্যে বাচনিক এবং গোপনে চোরাগোপ্তা লড়াই চলিতেছে। বিবাদের মূল কারণ এক দল টিকিওয়ালার ছুঁৎমার্গ ও গোঁড়ামি, ডাইনিং-হলেই যাহা সর্বাধিক প্রকট। আমরা উচ্ছৃঙ্খল, অনাচারী—দলে ভারী। নাটিকাটির নাম দিয়াছিলাম "টিকি ও টাকা"—'বলাকা'র ছন্দে ন্যারেশন বা বিবৃতির ফাঁকে ফাঁকে গান, গানই সংখ্যায় প্রচুর। সামান্য রিহার্সাল দিয়া আমরা ভোজের রাত্রে প্রায় অ্যাটম বোমার মত ফাটিয়া পড়িলাম। অভিনয় ও গানের চাইতে হল্লা এত বেশি হইল যে, প্রিন্সিপাল ব্রাউন পর্যন্ত তাঁহার অদূরবর্তী কুঠী হইতে হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন, হষ্টেল সুপারিন্টেডেন্ট স্পুনার তো তৎপূর্বেই চ্যাচাইয়া গালি দিয়া ঘায়েল হইয়াছিলেন। তিনি মিন্‌মিনে মেয়েলি প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু ব্রাউন—একেবারে সুন্দরবনের কেঁদো বাঘ। গাঁকগাঁক করিয়া এমন ধমক দিলেন যে, এক নিমেষে সমস্ত বিরোধের অবসান ঘটিয়া গেল, আমরা পরম পরিতৃপ্তির সহিত গাণ্ডেপিণ্ডে পোলাও-মাংস সাবাড় করিয়া দিলাম, মাঝরাত্রে আবার রান্না চড়াইতে হইল।

যদিও "মিসফায়ার" হইয়া গেল, এই "টিকি ও টাকা" হইতেই আমি প্রথম অনুভব করিলাম যে ব্যঙ্গে বা স্যাটায়ারে আমি মর্মান্তিক হইতে পারি। আর একটা অস্ত্র যেন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। ইহার প্রয়োগ যদিও আরও পাঁচ ছয় বৎসর পরে 'শনিবারের চিঠি'তে সার্থক ভাবে শুরু হইয়াছিল, অস্ত্রটি হাতে পাওয়া মাত্র তাহাতে গোপনে গোপনে শান দিতে থাকিলাম এবং কোনও উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনা ঘটিবার পূর্বেই আই.এস-সি. পরীক্ষা দিয়া চিরদিনের জন্য বাঁকুড়া ত্যাগ করিলাম।

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

মই—বাঁশের বাঁশুই, সিড়ী, সিঁড়ি।
মকরকেতন—মকরধ্বজ, কন্দর্প, কামদেব।
মকরন্দ—মধু, ভ্রমর, কোকিল।
মক্ষিকা—মছি, মাছী।
মখ—যজ্ঞ, যাগ, ইজ্যা, ক্রতু।
মগ্ন—ডুবা, বুড়া, জলে ব্যাপ্ত, জলাকীর্ণ।
মঙ্গল—কুশল, কল্যাণ, তৃতীয় গ্রহ।
মঙ্গলৈষী—হিতৈষী, কল্যাণেচ্ছুক।
মঙ্গল্য—মঙ্গলজনক, শুভদায়ক।
মজ্জন—ডুবন, মগ্ন হওন, বুড়ন।
মজ্জা—অস্থির মধ্যগত ধাতু।
মজ্জাভেদী—মর্ম্মপীড়ক, দুঃসহ।
মঞ্চ—মাচা, মঞ্চক, ভারা, মাচান, বেদী।
মঞ্জন—মার্জ্জন, মাজন।
মঞ্জীর—নূপুর, পাদভূষণ।
মঞ্জুল—মনোজ্ঞ, মনোহর, সুন্দর।
মটুক—কিরীট, শিরোভূষা, মুকুট।
মঠ—টোল, চৌবাড়ী, সন্ন্যাসীদিগের গৃহ।
মড়ক—মারী, মহামারী, স্পর্শাক্রামক রোগ।
মড়ল—মোড়ল, মণ্ডল।
মড়া—শব, মৃতদেহ, মরা।
মড়কা—শুষ্ক, খর, ঠুনকা, টুস্কা।
মণি—রত্ন, পদ্মরাগ প্রভৃতি।
মণিকার—রত্নপরিষ্কারক, রত্নজীবী।
মণ্ড—জুষ, কলপ, মাড়, লেই, লেহাই।
মণ্ডন—জড়ান, মোড়ান, বেষ্টন, অলঙ্কার।
মণ্ডল—বর্ত্তুল, গোল।
মণ্ডলী—সমাজ, সমূহ, সভা, সম্প্রদা।
মত—ধারা, অভিপ্রেত, সম্মত।
মতন—মত, ধারা, রীতি, তদনুরূপ।
মতভেদ—মতের পার্থক্য, মতান্তর, ভিন্নমত, রূপান্তর।
মতামত—স্বীকৃতাস্বীকৃত, গ্রাহ্যাগ্রাহ্য।
মতি—বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, মুক্তা।
মত্ত—মাতাল, বিক্ষিপ্তচিত্ত।
মৎস্য—মাছ, মীন, জলচর জীব।
মদ—মদ্য, সুরা, মদিরা, অহঙ্কার।
মদীয়—স্বীয়, অস্মদীয়, মৎবিষয়ক।
মদ্যশালা—মদ্যগৃহ, মদিরালয়।
মধু—মৌ, মদ্য, চৈত্র মাস।
মধুকর—ভ্রমর, অলি, ভৃঙ্গ, দ্বিরেফ, মধুমক্ষিকা, মধুপ।
মধুধাতু—স্বর্ণমাক্ষিক, মণিবিশেষ।
মধুর—মিষ্ট, মৃদু, মনোহর।
মধ্য—অন্তর, অন্তরাল, ভিতর, মাঝ।
মধ্যদেশ—বঙ্গরাজ্য, ভারতবর্ষ, মধ্যভাগ।
মধ্যলোক—পৃথিবী, মর্ত্ত্যলোক।
মধ্যস্থ—মধ্যস্থিত, মধ্যবর্ত্তী, মাঝের।
মধ্যস্থল—অভ্যন্তরস্থল, কেন্দ্র, কেন্দ্রমধ্য।
মন—অন্তঃকরণ, চিত্ত।
মনন—অভিলাষ, চিন্তন, ইচ্ছা, ধ্যান।
মনস্কাম—মনস্কামনা, বাসনা।
মনস্থ—অভিপ্রায়, মনোগত, সাধ।
মনস্বী—প্রশস্তান্তঃকরণ, শুদ্ধমনা।
মনীষা—বুদ্ধি, ধী, প্রজ্ঞা, মেধা।
মনুজ—মনুষ্য, মানুস, মানব, মর্ত্ত্য।
মনোজ্ঞ—মনোরম, মনোহর, সুন্দর।
মনোনীত—মনোমত, অভিলষিত।
মনোভঙ্গ—চিত্তবিচ্ছেদ, মনোমালিন্য।
মনোমত—মনোনীত, বাঞ্ছিত, মনোজ্ঞ।
মন্তব্য—বিচারণীয়, গ্রাহ্য, মান্য।
মন্তা—অনুমতিকর্ত্তা, অনুমন্তা।
মন্ত্রণা—পরামর্শ, যুক্তি, বিবেচনা।
মন্ত্রদাতা—গুরু, ইষ্টদেবতা, ঠাকুর।
মন্ত্রী—অমাত্য, ধীসচিব, মন্ত্রণাদাতা।
মন্থর—মন্দগামী, ঢীলা, অলস।
মন্থান—মন্থনদণ্ড, ঘাগরী, ঘোলমহনী।
মন্দ—অপকৃষ্ট, কদর্য্য, অধম, মৃদু।
মন্দা—সুমূল্য, সুলভ, অল্প।
মন্দাকিনী—স্বর্গগঙ্গা, স্বর্ধুনী, সুরনদী।
মন্দাক্ষ—হ্রী, লজ্জা, ত্রপা, ব্রীড়া।
মন্দাগ্নি—অজীর্ণ, অল্পাগ্নি, অপাক।
মন্দাদর—হতাদর, অমনোযোগী।
মন্দার—দেবতরু, পারিজাত বৃক্ষ।
মন্দির—দেবালয়, গৃহ, জজ্ঘা।
মন্যু—ক্রোধ, রাগ, কোপ, ঈর্ষ্যা।
মন্বন্তর—অন্নাভাব, দুর্ভিক্ষ।
মমতা—স্নেহ, বাৎসল্য।
ময়রা—মদক, মিষ্টান্নকারী।
ময়লা—ম্লান, মলিন, অপরিষ্কৃত।
ময়ুখ—কিরণ, রশ্মি, তেজ, অগ্নিশিখা।
ময়ূর—শিখী, ভুজঙ্গভুক, বর্হিন, নীলকণ্ঠ।

অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্বিজানীহি,
কিমেতদ্ যক্ষমিতি ; তথেতি ॥ ৭

তখন তারা বললে, বায়ুকে।
হে বায়ো, জান গিয়ে তুমি,
কে এই মহান যক্ষ।
—'তাই হোক', বললে বায়ু॥ ৭

তদভ্যদ্রবৎ, তমভ্যবদৎ, কোঽসীতি ;
বায়ুর্বা অহমস্মীত্যব্রবীন মাতরিশ্বা
বা অহমস্মীতি ॥ ৮

বায়ু গেল তাঁর কাছে।
তুমি কে গো?
বললেন তিনি।
আমি প্রবহমান, গন্ধবহ,
চলনবান বায়ু,
আমি ব্যোমচারী মাতরিশ্বা,
বললে সে ॥ ৮

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্যমিতি, অপীদং
সর্বমাদদীয় যদিদং
পৃথিব্যামিতি ॥ ৯

এমন তোমাতে, কি শক্তি আছে,
প্রশ্ন করেন তিনি।
—আমি পারি গ্রহণ করতে,
এই ধরণীর সব।
বায়ু বললে সগর্বে ॥ ৯

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি ;
তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন,
তন্ন শশাকাদাতুম্ ;
স তত এব নিববৃতে—নৈতদশকং
বিজ্ঞাতুম্ যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১০

তার সামনে রাখলেন তিনি।
একটি মাত্র তৃণ,
বললেন,—গ্রহণ কর একে।
পূর্ণ উৎসাহে উড়ে এল বায়ু,
পারল না তুলে নিতে,
—সেই একটি মাত্র তৃণ।
ফিরে এল মাথা হেঁট করে।
বললে, জানতে পারলেম না',
বুঝতে পারলেম না',
কে এই মহান যক্ষ ॥ ১০

অথেন্দ্রমব্রুবন—মঘবন্নেতদ্ বিজানীহি,
কিমেতদ্ যক্ষমিতি ; তথেতি।
তদভ্যদ্রবৎ, তস্মাৎ তিরোদধে ॥ ১১

তখন তারা বললে ইন্দ্রকে,
—হে মঘবন,
দেখ যদি তুমি পার
একে জানতে।
'তাই হোক', বললে ইন্দ্র,
আর এগিয়ে গেল কাছে।
সেই মুহূর্তেই,
তিনি অন্তর্দ্ধান করলেন ॥ ১১

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম
বহুশোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্।
তাং হোবাচ—কিমেতদ্যক্ষমিতি ॥ ১২

তখন সেই আকাশে,
ইন্দ্র দেখতে পেলেন,
বহু শোভমান', স্ত্রীরূপিণী
হৈমবতী উমাকে।
প্রশ্ন করলেন তাঁকে।
কে এই মহান যক্ষ ॥ ১২

তৃতীয় অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

যুদ্ধক্ষেত্র—সম্রাটের শিবির

[যুদ্ধক্ষেত্রের কোলাহল শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, মাঝে মাঝে কামানের ভীষণ শব্দ শোনা যাচ্ছে। সম্রাটের মূর্তি দস্তুর মত উন্মাদের মত। তিনি পদচারণা করছেন, হাতে সেই চাবুক।]

সম্রাট। (কামানের শব্দ, সম্রাট মাটিতে চাবুক আছড়ে)—ইয়া—ইয়া—চালাও জোরসে। পিষে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেল। এবার শীতে বর্ষা নেমেছে—হেদায়েৎ—হেদায়েৎ—ইয়া (কামানের শব্দ) চালাও জোরসে—একটা প্রাণীও রাখব না—হেদায়েৎ—হেদায়েৎ—

(হেদায়েৎ আলির প্রবেশ)

হেদায়েৎ—এবার শীতে বর্ষা নেমেছে কেন জানো ?

হেদায়েৎ। হুজুর, যুদ্ধক্ষেত্রে—

সম্রাট। চুপ রহো—আমি যা বলছি তার জবাব দাও—এবার শীতে বর্ষা নেমেছে কেন জানো ?

হেদায়েৎ। না সম্রাট !

সম্রাট। এই যুদ্ধে যে পক্ষ হারবে বর্ষার জল সে পক্ষের সমস্ত হতাহতকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে—রক্তের চিহ্নমাত্র সেখানে থাকবে না—(কামানের শব্দ) ইয়া—তার পরে বসন্তের আগমনে সেখানে ফুলবাগিচা তৈরি হবে। তিন মাস আগে যে এখানে ভীষণ যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, তার চিহ্নমাত্র সেখানে থাকবে না। বাঁদী—

(বাঁদীর প্রবেশ)

—সরাব—সরাব দাও।

(বাঁদী সরাব এনে দিলে।)

—(সরাব পান ক'রে)—হেদায়েৎ, যুদ্ধের সংবাদ কি ?

হেদায়েৎ। কোকলতাস খাঁ হুসেন আলি খাঁর দলকে আক্রমণ করেছেন। ভীষণ যুদ্ধ চলেছে সম্রাট !

সম্রাট। চলুক, চলুক—তুমি কাছাকাছিই থেকো হেদায়েৎ। আমার হুকুম না পেলে কোথাও যেও না

[হেদায়েতের প্রস্থান।

বাঁদী—সরাব—(সরাব পান)

(নিয়ামতের প্রবেশ)

কে ?—নিয়ামৎ ? যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছ নিশ্চয় ?

নিয়ামৎ। হ্যাঁ, না—সম্রাট !

সম্রাট। তোমার হাতিয়ার কোথায় গেল নিয়ামৎ ?

নিয়ামৎ। সম্রাট, আমি কোকলতাস খাঁর পাশে-পাশেই ছিলুম। যুদ্ধ বাধতেই সেই ছুটোপাটির মধ্যে অস্ত্রগুলো যে কোথায় গেল তা বুঝতেই পারলুম না। তাই ছুটতে ছুটতে সম্রাটের শিবিরে চলে এলুম।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

সম্রাট। বেশ করেছ নিয়ামৎ। ছুটে হাঁপিয়ে গিয়েছ নিশ্চয় ?

বাঁদী—সরাব—সরাব—নিয়ামৎকে সরাব দাও।

নিয়ামৎ। (সরাব পান ক'রে) আঃ—এতক্ষণে প্রাণটা জুড়োল।

সম্রাট। এবার তো তাজা হয়েছ—যাও, এবার যুদ্ধে যাও।

নিয়ামৎ। আমার আর যুদ্ধে যেতে হবে না সম্রাট ! ও একা কোকলতাস খাঁ-ই এই লড়াই ফতে করবে। হ্যাঁ—লড়ছে তো কোকলতাস খাঁ।

সম্রাট। কোকলতাস খাঁ খুব লড়ছে বুঝি? আর জুলফিকার খাঁ কি করছে? সে কোথায়?

নিয়ামৎ। জনাব জুলফিকার খাঁ এখনো আক্রমণ করেননি। তিনি তাঁর সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করছেন। কোকলতাস হেরে গেলেই তিনি গিয়ে আক্রমণ করবেন। কিন্তু সে আর হচ্ছে না—আজকের যুদ্ধ কোকলতাসই ফতে করবেন।

সম্রাট—আচ্ছা, আন্দাজ ক'রে বল তো কে আজকের যুদ্ধ ফতে করবে? জুলফিকার খাঁ—না কোকলতাস খাঁ? হেদায়েৎ—

(হেদায়েতের প্রবেশ)

জ্যোতিষীকে খবর দাও।

[হেদায়েতের প্রস্থান।

হ্যাঁ বল তো কে যুদ্ধ ফতে করবে?

নিয়ামৎ। জাঁহাপনা, আমার মনে হচ্ছে—

(জ্যোতিষীর প্রবেশ)

সম্রাট। এই যে জ্যোতিষী, গুণে বলে দাও তো আজকের যুদ্ধ কে ফতে করবে?

জ্যোতিষী। জাঁহাপনা, আমি এতক্ষণ এই গণনাই করছিলুম। বড়ই জটিল আর কঠিন এই গণনা—

সম্রাট। হ্যাঁ হ্যাঁ—কঠিন বটে, কিন্তু যুদ্ধ করা তার চেয়েও ঢের বেশি কঠিন। এই বাঁদী—সরাব। দেখ এই যুদ্ধ কে ফতে করতে পারবে? কোকলতাস না জুলফিকার?

(বাঁদীর প্রবেশ, কামানের ধ্বনি)

(সরাব পান করিয়া)—ইয়া ইয়া—শোভন আল্লা—এ কামান কোকলতাসের।

জ্যোতিষী। সম্রাট—যত দূর দেখা যাচ্ছে, এ যুদ্ধ জুলফিকার খাঁ—

(দূতের প্রবেশ)

দূত। সম্রাট—হুসেন আলি খাঁ আহত, তার সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, আবদাল্লা খাঁ আবার তাদের জড় ক'রে কোকলতাসের দলকে আক্রমণ করেছে।

জ্যোতিষী। সম্রাট, এ যুদ্ধ কোকলতাস খাঁ-ই ফতে করবে।

সম্রাট। ঠিক বলেছ জ্যোতিষী—তোমায় আমি পুরস্কৃত করব।

(কামানের ধ্বনি)

ইয়া—ইয়া—না এ কামানের ধ্বনি তো আমাদের নয়! হেদায়েৎ—হেদায়েৎ—

(হেদায়েতের প্রবেশ)

যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ নাও—ভাল ক'রে সংবাদ নিয়ে এসে আমাদের বল।

(জ্যোতিষী, দূত ও হেদায়েতের প্রস্থান ও ইমতিয়াজের প্রবেশ)

ইমতিয়াজ। জাঁহাপনা, সম্রাট-ফৌজ না কি চারি দিকে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পালাচ্ছে—

সম্রাট। ভুল করেছ ইমতিয়াজ! সে সব সম্রাট-সৈন্য নয়, ফরুকশায়ারের সৈন্য। কিছু ভয় নেই, আমাদের জয় সুনিশ্চিত। তুমি তোমার বাঁদীদের ডাক—আমাদের নাচ-গান সুরু হোক। নিয়ামৎ—নিয়ামৎ—

(হেদায়েতের প্রবেশ)

হেদায়েৎ। সম্রাট, কোকলতাস খাঁ ভীষণ আহত হয়েছেন।

সম্রাট। এ্যাঁ—কোকলতাস্ আহত? কোকলতাস—বন্ধু!—এই জন্যই আমি গোড়া থেকেই যুদ্ধ করতে চাইনি। জানো সম্রাজ্ঞী, কোকলতাস আমার দুধ-ভাই। কত দিন—কত দিন—তখন আমরা কতটুকু! চল হেদায়েৎ—চল আমায় তার শি...রে নিয়ে চল।

(সম্রাটের প্রস্থান ও নিয়ামতের প্রবেশ)

নিয়ামৎ। যাই বাঁদীদের খবর দিই, সম্রাট ফিরলেই তো গান বাজনা সুরু করতে হবে।

ইমতিয়াজ। এখন আর বাঁদীদের ডাকতে হবে না। তুমি এক কাজ কর—একবার বাইরে ফিরে যুদ্ধক্ষেত্রের ঠিক সংবাদ নাও।

নিয়ামৎ—আমার আর সংবাদ নেবার দরকার হবে না সম্রাজ্ঞী! কোকলতাস খাঁ একাই যুদ্ধ ফতে করেছে।

ইমতিয়াজ। তোমায় আমি লড়াই ফতে করতে বলছি না, আমি বলছি বাইরে গিয়ে যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে এস।

নিয়ামৎ। সংবাদ নিয়ে এসেই তো বলছি সম্রাজ্ঞী! আমি তো সম্রাটকে যুদ্ধের সংবাদ দিতেই এসেছিলুম। কোকলতাসের পাশে দাঁড়িয়েই আমি যুদ্ধ করছিলুম কিন্তু দেখলুম সে যা লড়ছে, আমার আর থাকবার দরকার নেই।

ইমতিয়াজ। তবু তুমি আর একবার যাও, আমার বড্ড ভয় করছে।

নিয়ামৎ। কিছু ভয় করবেন না হুজুরাইন। আমি যখন বলছি—আচ্ছা আমি যাচ্ছি যাচ্ছি—

(যেতে যেতে ফিরে এসে)

সম্রাজ্ঞী, একটা কথা এই বেলা বলে রাখি।

ইমতিয়াজ। কি কথা?

নিয়ামৎ। যুদ্ধে যদি আমাদের জয়—যদি কেন নিশ্চয়ই জয় হবে—তাহ'লে মুলতানের সুবেদারিটা এবার আমার চাই-ই চাই—

ইমতিয়াজ। আচ্ছা সে হবে এখন—তুমি যাও।

নিয়ামৎ। এই চললুম—

(প্রহরীর প্রবেশ)

ইমতিয়াজ। কি সংবাদ প্রহরী?

প্রহরী। সম্রাট কোথায়?

ইমতিয়াজ। সম্রাট একটু বাইরে গিয়েছেন। যুদ্ধের কোনো সংবাদ আছে?

প্রহরী। সম্রাজ্ঞী, ও পক্ষের হুসেন আলি খাঁ ভীষণ আহত। তার সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাচ্ছে।

নিয়ামৎ। কেমন, আপনাকে বলিনি সম্রাজ্ঞী যে আমাদের জয় হবেই হবে। যাও প্রহরী, তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে যাও—সেখান থেকে এই রকম সব ভালো ভালো খবর নিয়ে এসো—সম্রাজ্ঞী বড় উতলা হয়েছেন।

[প্রহরীর প্রস্থান।

দেখলেন সম্রাজ্ঞী, আপনি মিছে উতলা হচ্ছেন। এ যুদ্ধে আমাদের জয় সুনিশ্চিত। আমার সেই কথাটা ভুলবেন না।

ইমতিয়াজ। আচ্ছা সম্রাটকে আমি তোমার কথা বলব—নিশ্চয়ই বলব।

(নিয়ামতের প্রস্থান ও জুলফিকারের প্রবেশ)

এই যে সেনাপতি, যুদ্ধের সংবাদ কি? আমাদের জয় তো সুনিশ্চিত?

জুলফিকার। সম্রাজ্ঞী, যুদ্ধের কথা এখনও কিছু বলা যায় না। আমাদের কোকলতাস খাঁ নিহত, ওদের হুসেন আলি খাঁ আহত। কোকলতাসের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাবার উপক্রম করছে। ওদের সেনাপতি আবদুল্লা খাঁ সমস্ত বাহিনী নিয়ে হঠাৎ আমাদের আক্রমণ করেছে। আমার সৈন্যরা তাদের গতিরোধ করছে। এ সময়ে সম্রাটকে একবার চাই-ই।

ইমতিয়াজ। সম্রাটকে! সম্রাটকে কেন সেনাপতি? তোমরা রয়েছ—একা সম্রাট গিয়ে কি করবেন?

জুলফিকার। সম্রাট গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়ালে কোকলতাসের সৈন্যরা আর পালাতে পারবে না। তারা যদি এ সময় পেছন থেকে আক্রমণ করে তাহ'লে আমাদের জয় সুনিশ্চিত। বলুন সম্রাজ্ঞী—সম্রাট কোথায়? (কামান ধ্বনি)

এ সময়ে সম্রাটকে দেখলে সৈন্যরা—

ইমতিয়াজ। যুদ্ধক্ষেত্রে গেলে তো সম্রাট আহতও হতে পারেন?

জুলফিকার। শুধু আহত নয় হয়তো নিহতও হতে পারেন—আবার সুস্থ দেহেও ফিরতে পারেন। কিন্তু সেখানে এ সময় উপস্থিত না হ'লে আমাদের পরাজয় হবেই। বলুন সম্রাজ্ঞী—সম্রাট কোথায়? আমি বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারছি না—

ইমতিয়াজ। কিন্তু সেনাপতি—

জুলফিকার। সম্রাজ্ঞী, বিলম্বে সর্বনাশ হবে—বলুন সম্রাট কোথায়?

ইমতিয়াজ। সম্রাট গিয়েছেন কোকলতাস খাঁর শিবিরে।

[জুলফিকারের প্রস্থান।

কি জানি, সম্রাটকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে আমার মন কিছুতেই চাইছে না। লাহোর যুদ্ধক্ষেত্রেও তো আমি তাঁর পাশাপাশি ছিলুম কিন্তু তখন তো এ আশঙ্কা হয়নি? সম্রাটকে নিয়ে কি পালিয়ে যাবো? সম্রাটকে ডেকে পাঠাই—আমার হাতী তো প্রস্তুতই আছে।

(সম্রাটের প্রবেশ)

জাহাঁপনা—

সম্রাট। হ্যাঁ প্রিয়তমে—কোকলতাস খাঁ চলে গেল। শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু, আমার জন্য তার দেহের শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়ে গিয়েছে। আমাকে তার কিছুই অদেয় ছিল না। আমিই তাকে কিছু দিতে পারিনি। তার কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলুম যে, আমি যদি কখনো সম্রাট হই তাহ'লে উজিরের পদ তাকে দেব—সে প্রতিজ্ঞা আমি রাখিনি—অথচ তারই মাতৃস্তন্যে আমার এই দেহ পুষ্ট।

ইমতিয়াজ। সম্রাট, জুলফিকার খাঁ এইমাত্র আপনার খোঁজে এইখানে এসেছিল।

সম্রাট। ও—জুলফিকার খাঁ এসেছিল! ইমতিয়াজ, তুমি একবার আমাকে তীর্থদর্শনের আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছিলে না? তোমার সে সাধ আমি পূর্ণ করতে পারিনি।

ইমতিয়াজ। সম্রাট—তীর্থদর্শন পরে হ'তে পারবে—

সম্রাট। হয়তো নাও হ'তে পারে ইমতিয়াজ! গত ক'দিনের ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ, বৃষ্টি ও দুর্জয় শীতের পর আজ পূর্বাকাশে সূর্যোদয় দেখে মনে হয়েছিল—আজ আমার সুপ্রভাত। বালসূর্যের স্নিগ্ধ কিরণ যখন আমার গায়ে এসে লাগল, আমার মনে হল আমার পরলোকগতা জননী যেন সূর্যকিরণকে দূত করে আমার কাছে আশ্বাসবাণী প্রেরণ করেছেন। কে জানত প্রিয়তমে—কে স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল যে সেই সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনবন্ধু আজই—যেদিন তাকে আমার সব থেকে বেশি প্রয়োজন—সেদিন আমাকে ছেড়ে চলে যাবে?

ইমতিয়াজ। সম্রাট, এখন ওসব কথা না ভেবে—

সম্রাট। না, ভাবনা আমার কিছুই নেই। কোকলতাসের শিবির থেকে ফিরছিলুম এমন সময় দেখলুম, একটা আগুনের গোলা ছুটে যমুনার বুকে গিয়ে পড়ল। সেদিকে চোখ ফেরাতেই নীল আকাশের গায়ে তাজের সাদা গম্বুজ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমি দাঁড়িয়ে গেলুম। এদিকে যুদ্ধের ভীষণ কোলাহল—আর্তনাদ—কামানের শব্দ—আর তার সম্মুখে সেই জমাট-বাঁধা চোখের জল। বিহ্বল হ'য়ে তাজের দিকে চেয়ে আছি এমন সময় গম্বুজের পাশ থেকে চাঁদ বেরিয়ে যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাক দিলে। আমার তখুনি তোমার কথা মনে পড়ল প্রিয়তমে! মনে পড়ল তুমি তীর্থ-দর্শন করতে চেয়েছিলে—তোমার সে সাধ আমি পূর্ণ করতে পারিনি। চল ইমতিয়াজ, আমরা ঐ তীর্থে গিয়ে বসি, তোমার কোনো ভাবনা নেই—জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।

ইমতিয়াজ। চলুন সম্রাট—এই যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে আমরা চলে যাই।

[সম্রাট ও ইমতিয়াজের প্রস্থান।

(নিয়ামতের প্রবেশ)

নিয়ামৎ। সম্রাট প্রধানা বেগমকে নিয়ে যুদ্ধে গেলেন না কি? এবার আমার সুবেদারি মারে কে? যদি জুলফিকার খাঁ—

(জুলফিকারের প্রবেশ)

জুলফিকার। কোথায়? সম্রাট কোথায়?

নিয়ামৎ। সম্রাট তো এইমাত্র এখানে ছিলেন—সম্রাজ্ঞীকে নিয়ে কোথায় গেলেন।

জুলফিকার—আঃ, এ সময় সম্রাট গেলেন কোথায়?

(রাজা সভাচাঁদের প্রবেশ)

সভাচাঁদ। এই যে সেনাপতি—আপনি এখানে!—ওদিকে আমাদের সমস্ত সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারছে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাচ্ছে।

জুলফিকার। এ সময় যদি একবার বাদশাকে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড় করাতে পারতুম তাহ'লে নিশ্চয় আমাদের জয় হ'ত।

সভাচাঁদ। আমার বিশ্বাস, সম্রাট সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ হ'তে দেখে পলায়ন করেছেন।

(হেদায়েতের প্রবেশ)

জুলফিকার। এই যে হেদায়েৎ—সম্রাটকে দেখেছ?

হেদায়েৎ। সম্রাটকে দেখিনি কিন্তু সম্রাজ্ঞীর হাতী দেখলুম দিল্লীর দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে। হাওদা পরদায় ঘেরা।

জুলফিকার। কি সর্বনাশ! তাহ'লে রাজা আপনার অনুমানই যথার্থ। হেদায়েৎ, তুমি গিয়ে সম্রাটপুত্রদের মধ্যে যাকে পাও

নিয়ে এসো। তাদের এক জন কারুকে পেলে আমি এখুনি সৈন্যদের ফিরিয়ে আনতে পারি।

(বাইরে ফরুখশায়ারের জয়ধ্বনি)

সভাচাঁদ। সেনাপতি—সম্রাটপুত্ররা আগেই লম্বা দিয়েছেন।

জুলফিকার। তবে—তবে কি যুদ্ধে জিতেও আমাদের পরাজয় হ'ল?

(আবদুল্লা খাঁ ও ফরুখশায়ারের অন্যান্য লোকের প্রবেশ)

আবদুল্লা খাঁ। খাঁ সাহেব, আমি ফরুখশায়ারের তরফ থেকে আপনার কাছে এসেছি।

জুলফিকার। আপনার বক্তব্য প্রকাশ করুন।

আবদুল্লা। আপনার সৈন্যরা পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ। ফরুখশায়ার আপনাকে অনুরোধ করেছেন, এ সময়ে আপনি আর কেন তাঁর বিরোধিতা করছেন? জাহান্দার শার মত তিনিও দিল্লীর সম্রাটের বংশধর। জাহান্দার শা যখন পরাজিত হয়েছেন তখন আপনি ফরুখশায়ারের দলে যোগ দিন—এতে আপনার মঙ্গল হবে।

জুলফিকার। খাঁ সাহেব, আপনি আপনার শিবিরে ফিরে যান। আমার জবাব এখুনি জানাব আপনাকে।

[আবদুল্লা খাঁর প্রস্থান।

জুলফিকার। কি কর্তব্য—এখন আমি কি করি?

হেদায়েৎ। খাঁ সাহেব, আমার মতে আপনি আপনার দলবল নিয়ে এখুনি দাক্ষিণাত্যে আপনার রাজ্যের দিকে পলায়ন করুন। ফরুখশায়ার আপনাকে সহজে ছাড়বে ব'লে মনে হয় না। আপনি বাহাদুর শার হয়ে তাঁর পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, সে কথা ভুলে যাবেন না।

সভাচাঁদ। কিন্তু তার আগে আপনি আপনার বৃদ্ধ পিতার কথা ভেবে দেখবেন। আপনাকে না পেলে ফরুখশায়ারের সমস্ত রাগ তাঁর ওপরে পড়বে। আপনি দিল্লীতেই যান।

জুলফিকার। ঠিক বলেছেন রাজা! আমি এখুনি দিল্লীর দিকেই চললুম। আমার মনে হচ্ছে, সম্রাটও সেই দিকেই গিয়েছেন। সেখানে গিয়ে আর একবার ফরুখশায়ারকে বাধা দেবার চেষ্টা করব। তার পরে যা হবার তাই হবে। এখানে এই রকম নিশ্চেষ্ট অবস্থায় কাটালে আবদুল্লা খাঁর হাতে বন্দী হওয়াও অসম্ভব নয়। আমি এখুনি চললুম—আর অপেক্ষা করবার সময় নেই। [জুলফিকারের প্রস্থান।

হেদায়েৎ। আর আমরা কোথায় চলেছি রাজা?

সভাচাঁদ। নতুন বাদশার তাঁবুতে।

পটপরিবর্তন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জিন্নৎউন্নিসার প্রাসাদ

জিন্নৎ ও ওয়ালিউল্লা খাঁ (গুপ্তচর)

জিন্নৎ। খবর?

গুপ্তচর। বেগম সাহেবা, আবদুল্লা খাঁর লোকেরা তাঁকে এমন ক'রে আগলে রেখেছে যে সেখানে পৌঁছয় কার সাধ্য? শেষ কালে আপনার পাঞ্জা দেখাতে তবে ফরুখশায়ারের সঙ্গে দেখা করতে দেয়।

জিন্নৎ। আমার চিঠি দিলে তাকে?

গুপ্তচর। হাঁ, হুজুরাইন। চিঠি পড়ে তিনি বললেন—শীঘ্র তিনি তাঁর বিশ্বস্ত লোক দিয়ে বিস্তারিত উত্তর পাঠাবেন।

জিন্নৎ। আর কিছু বললেন?

গুপ্তচর। আজ্ঞে হাঁ বললেন। প্রথমে আপনার অর্থ-সাহায্যের জন্য আপনাকে প্রচুর ধন্যবাদ জানালেন। তার পর বললেন, তুমি ফিরে বেগম সাহেবাকে জানিও যে তাঁর হুকুম আমি শিরোধার্য্য ক'রে নিয়েছি। অচিরেই আমি লালকুঁয়ার ও জাহান্দার শাকে বন্দী ক'রে দিল্লীতে নিয়ে যাচ্ছি।

জিন্নৎ। (উল্লাসে) সুভনাল্লা! আল্লা তাঁকে দীর্ঘজীবন দান করুন। তাঁকে তন্দুরস্ত রাখুন। একবার আসুক সেই—

গুপ্তচর। কিন্তু বেগম সাহেবা—

জিন্নৎ। এঁ্যা—কিছু বলছ কি?

গুপ্তচর। আজ্ঞে হাঁ বলছিলুম—কিন্তু বলতে আমার সাহস হচ্ছে না বেগম সাহেবা—

জিন্নৎ। অভয় দিচ্ছি—নির্ভয়ে বল।

গুপ্তচর। ফরুখশায়ার বললেন বটে শীগগির দিল্লীতে এসে আপনাকে অভিবাদন করবেন কিন্তু হালচাল দেখে মনে হয় না যে তিনি দিল্লীতে আসতে পারবেন—অন্তত শীগগির যে আসতে পারবেন না—এ কথা জোর ক'রে বলা যেতে পারে।

জিন্নৎ। কেন বল তো?

গুপ্তচর। হুজুরাইন! অবশ্য সঠিক কিছুই বলা যায় না—তবে আমি যা দেখে এসেছি—

জিন্নৎ। (উৎকণ্ঠিত ভাবে) কি দেখে এসেছ তুমি?

গুপ্তচর। বেগম সাহেবা, জাহান্দার শার পক্ষে যুদ্ধ জয় প্রায় সুনিশ্চিত। কোকলতাস খাঁর দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণে বড়াসৈয়দদের বাহিনী বিধ্বস্তপ্রায়—এই তো দেখে এসেছি।

জিন্নৎ। কোকলতাস খাঁ বুঝি খুব লড়ছে?

গুপ্তচর। হাঁ—হুজুরাইন!

জিন্নৎ। আর জুলফিকার খাঁ?

গুপ্তচর। তিনি তখনো যুদ্ধে নামেননি। তাঁর সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের এক পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন।

জিন্নৎ। কেন? কিসের অপেক্ষা করছেন তিনি?

গুপ্তচর। জানি না, তবে লোকপরম্পরায় শুনলুম যে, কোকলতাস খাঁ যতক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রে আছেন ততক্ষণ তিনি দূরেই থাকবেন। কোকলতাস খাঁ হত, আহত কিংবা পলাতক যা-হোক একটা কিছু হ'লে তবে তিনি আসরে নামবেন।

জিন্নৎ। কোকলতাস ও জুলফিকারের মধ্যে যে শত্রুতা—তা সবাই জানে। তবুও যুদ্ধের সময় এ-রকম নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকার কারণটা তো ধরতে পারছি না!

গুপ্তচর। জুলফিকার খাঁ মনে করেছেন, কোকলতাস খাঁ হত কিংবা আহত হলে তিনি ফরুখশায়ারের বিধ্বস্তপ্রায় সৈন্যদলকে পরাস্ত করে জয়লাভের সমস্ত বাহাদুরিটাই নিজে নেবেন। কে এই যুদ্ধ ফতে করেছেন এই তর্ক যদি কোনো দিন ওঠে—

জিন্নৎ। তাই তর্ক ওঠবার আগেই মীমাংসাটা করে রাখছেন! ভালো—ভালো—

(বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। হুজুরাইন, আসাদ খাঁ আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছেন।

জিন্নৎ। কে আসাদ খাঁ? উজির জুলফিকার খাঁর পিতা?

বাঁদী। হাঁ—হুজুরাইন!

জিন্নৎ। আসাদ খাঁ দেখা করতে এসেছেন? তবে—তবে কি চাকা ঘুরে গেল না কি? ওয়ালিউল্লা খাঁ—

গুপ্তচর। আজ্ঞে বেগম সাহেবা—

জিন্নৎ। তোমার অনুমান ভুল হ'য়েছে—সে আসছে—ফরুখশায়ার আসছে—বাঁদী—বাঁদী—(এক মুহূর্ত অপেক্ষার পর) আচ্ছা, ডাকো আসাদ খাঁকে। [বাঁদীর প্রস্থান।

তুমি জুলফিকার খাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে দেখেছ?

গুপ্তচর। হাঁ বেগম সাহেবা!

জিন্নৎ। আচ্ছা তুমি এখন অন্তরালে যাও—প্রয়োজন হ'লেই যেন দেখা পাই। দেখো আসাদ খাঁ যেন তোমাকে দেখতে না পায়।

বাঁদী। যো হুকুম।

(গুপ্তচরের প্রস্থান ও আসাদ খাঁর প্রবেশ)

আসাদ। বেগম সাহেবা, আশা করি অধীনকে ভুলে যাননি।

(জিন্নৎ আসাদ খাঁর কথা বা কুর্ণিশের জবাব না দিয়ে তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।)

আমি অত্যন্ত বিপদে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি বেগম সাহেবা—

জিন্নৎ। সেটুকু অনুমান করে নেবার মত বুদ্ধি আল্লা আমাকে দিয়েছেন আসাদ খাঁ। আজ তিন বছর ধরে অসংখ্য বার আমি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি কিন্তু একবারও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অবকাশ আপনার হয়নি।

আসাদ। বেগম সাহেবা, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলুম। শয্যা ত্যাগ করে উঠে আসব এমন অবস্থা আমার ছিল না। প্রকৃত পক্ষে আমি এখনও অসুস্থ—

জিন্নৎ। বটে! তবে কিসের জন্য এই অসময়ে রোগশয্যা ত্যাগ করে আমার কাছে এসেছেন? আশা করি, আমি আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাইনি।

আসাদ। বোধ করি যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ আপনি পেয়েছেন?

জিন্নৎ। না, যুদ্ধের সংবাদের আমার প্রয়োজন কি? তবে যতটুকু শুনেছি, তাতে মনে হয় জাহান্দার শাই জয়লাভ করেছেন।

আসাদ। হুজুরাইন! যুদ্ধে আমাদের সম্পূর্ণ পরাজয় হয়েছে। ফরুখশায়ার যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন।

জিন্নৎ। (উচ্ছ্বসিত আনন্দে হাততালি দিয়ে) হা হা হা হা, বলেন কি খাঁ সাহেব, ফরুখশায়ার যুদ্ধে জয়লাভ করেছে! হো হো হো হো—বড় দুঃসংবাদ—বড় দুঃসংবাদ দিলেন আপনি আসাদ খাঁ। হাহা—হা, জাহান্দার শা হেরে গেল। বলুন বলুন—আপনি আর কি জানেন বলুন?

আসাদ খাঁ। হুজুরাইন, কোকলতাস খাঁ হত, জাহান্দার শা পলাতক।

জিন্নৎ। আর আপনার পুত্র উজির জুলফিকার খাঁ—সে কোথায়?

আসাদ। সে কোথায়, তার খবর এখনো পাইনি।

জিন্নৎ। কেন—পালিয়েছে বলতে লজ্জা হচ্ছে বুঝি?

আসাদ। হুজুরাইন, ফরুখশায়ারের দল-বল দিল্লীতে আসতে আরম্ভ করেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনিও নিজে সহরে প্রবেশ করবেন ব'লে শুনেছি—এখন...

জিন্নৎ। (হাস্য) বড় দুঃসংবাদ দিলেন খাঁ সাহেব—জাহান্দার শা হেরে গেল! (হাস্য)

আসাদ। হুজুরাইন, ফরুখশায়ারের পিতার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছিলুম—সেই থেকে আমরা তার পরম শত্রু হ'য়ে আছি। তার প্রধান সহায় সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ও আমাদের সুনজরে দেখেন না। আমার বিশ্বাস, তারা দিল্লীতে প্রবেশ ক'রে প্রথমেই আমাদের হত্যা করবে।

জিন্নৎ। আপনার অনুমান মিথ্যা নয়—আমারও তো তাই বিশ্বাস।

আসাদ। হুজুরাইন! আমি জানি, ফরুখশায়ার আপনাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। আপনি যদি আমাদের হয়ে তাঁর কাছে একটু সুপারিশ করেন—

জিন্নৎ। না—আমি তা করব না।

আসাদ। হুজুরাইন, দয়া করুন—একবার ভেবে দেখুন—

জিন্নৎ। না—না—না—আসাদ খাঁ!—আপনি ও আপনার ছেলে বরাবর আমার শত্রুতা করে এসেছেন—আজ এ-কথা বলতে লজ্জা করছে না আপনার? সুপারিশ করা তো দূরের কথা, যাতে ফরুখশায়ার পৌঁছবার আগে আপনি দিল্লী ছেড়ে পালাতে না পারেন তার ব্যবস্থা আমি করব।

আসাদ। হুজুরাইন, আমি বৃদ্ধ—এ বৃদ্ধের প্রতি দয়া করুন—

জিন্নৎ। না—না—না—। যান আপনি—দয়া—

(আসাদ গমনোদ্যত)

শুনুন— (আসাদ ফিরল)

একটি মাত্র সর্তে আমি আপনাদের হয়ে ফরুখশায়ারের কাছে সুপারিশ করতে পারি।

আসাদ। বলুন বেগম সাহেবা!

জিন্নৎ। জাহান্দারের সঙ্গে সেই স্ত্রীলোকটা আছে? সেই লালকুঁয়ার?

আসাদ। হাঁ বেগম সাহেবা!

জিন্নৎ। তারা কোন্ দিকে পালিয়েছে কিছু জানেন?

আসাদ। খবর পেয়েছি তারা দাক্ষিণাত্যের দিকে পালিয়েছে।

জিন্নৎ। ভুল খবর পেয়েছেন খাঁ সাহেব। তখ্‌ত-এ-তাউসের মায়া কাটিয়ে দক্ষিণের দিকে চলে যাবার লোক জাহান্দার শা নয়। আমার বিশ্বাস, সে দিল্লীরই আশে-পাশে আছে এবং ফরুখশায়ার সহরে পৌঁছবার আগেই সে এসে পৌঁছবে। আপনারা যদি লালকুঁয়ারকে হাত-পা বেঁধে আমার পায়ের কাছে এনে ফেলতে পারেন তবেই আমি আপনাদের হ'য়ে ফরুখশায়ারের কাছে সুপারিশ করতে পারি। যান—যান—

[আসাদ খাঁর প্রস্থান।

ওয়াজিলউল্লা খাঁ—

(গুপ্তচরের প্রবেশ)

বাঁদীদের ভালো ক'রে বাড়ী সাজাতে বল—রাত্রে রোশনি দেবার ব্যবস্থা কর, দিল্লীতে আবার নতুন বাদশা আসছে।

[ক্রমশঃ।

যবনিকা

ভল্গা থেকে গঙ্গা

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অমৃতাশ্ব উপাখ্যান

স্থান—মধ্য এশিয়া, পামীর অধিত্যকা, [পাত্র—ইন্দো-ইরাণিয়ান, সময়—খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ বর্ষ।

[২০০ পুরুষ পূর্বেকার আর্য্য জাতির অবস্থা সম্পর্কে এই উপাখ্যান। এঁরা তখন ছিলেন ভারত ও ইরাণের গৌরবর্ণ অধিবাসীদের একটি শাখা। উভয় স্থানেই এঁরা 'এরিয়ান' (আর্য্য) বলে অভিহিত হতেন। পশুপালনই ছিল তখন এঁদের প্রধান উপজীবিকা।]

যাঁরা কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য দেখেছেন তাঁরাই কিছুটা ধারণা করতে পারবেন ফারঘানার দৃশ্য—তার হরিৎ পাহাড়, উজ্জ্বল নদী-স্রোত এবং ঝর্ণাধারায় পরিবৃত সৌন্দর্য্য কি মনোরম ছিল! শীত তখন শেষ হয়ে গেছে—বসন্ত ঋতু সমাগত, মধু মাসের বর্ণাঢ্য এই পার্বত্য উপত্যকাকে ভূস্বর্গে পরিণত করেছে। পশুপালকেরা তাদের শীতাবাস পার্বত্যগুহা অথবা পাথরের কুঁড়ে-ঘরগুলো ছেড়ে বিস্তীর্ণ গোচারণভূমি অঞ্চলে বেরিয়ে এসেছে। তাদের ঘোড়ার লোমের স্কন্ধাবারগুলো—অধিকাংশই তার লাল রং এর—সেখান থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। এমনি সময় একটা স্কন্ধাবার থেকে একটি তরুণী বেরিয়ে এল। জল তুলবার একটা ভিস্তী (মাসা) কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে—সে এগিয়ে চলল উপলখণ্ডের মধ্যে কলনাদিনী ঝর্ণার প্রান্ত লক্ষ্য করে—ঝর্ণাটা যেখানে হাসতে হাসতে ছুটে চলেছিল পাথরগুলোর মধ্য দিয়ে সেই দিকে। তরুণীটি তখনও তাঁবু থেকে বেশী দূরে যায়নি, এমন সময় সে একটি পুরুষকে দেখতে পেল। পুরুষটির পরনেও তারই মত ভারী সাদা পশমী পোষাক—সেটা দু'ভাঁজে তার ডান কাঁধের কাছে এমন ভাবে আঁটা যাতে মাত্র তার ডান হাত, ডান কাঁধ এবং ডান পাশের কিছুটা ও হাঁটুর নীচের পায়ের অংশ মুক্ত থাকে। তার চুলের রং হলদে, এবং তার চুল ও দাড়ি সুন্দর ভাবে আঁচড়ান। তাকে দেখে সুন্দরী যুবতীটি একটু দাঁড়াল, পুরুষটি হেসে বলল—"সোমা, আজ যে অনেক দেরীতে তুমি জল আনতে যাচ্ছ!"

"হ্যাঁ, ঋজ্রাশ্ব! কিন্তু তুমি—তুমি যে বড় এদিকে এলে আজ! পথ ভুলে না কি?"

"না, পথ ভুলে নয় সখী, আমি তোমার কাছেই এসেছি।"

"আমার কাছে? এত দিন পরে?"

"আজ আবার তোমার কথা মনে হল, সোমা!"

"আচ্ছা, তাহলে একটু চলো, আমি জলটা নিয়ে আসি। তার পর একত্রেই ঘরে যাব, অমৃতাশ্ব খাওয়ার জন্য বসে আছে।"

কথা বলতে বলতে দু'জনে ততক্ষণে ঝর্ণার ধারে এসে গিয়েছিল, সেখান থেকে জল নিয়ে তারা ফিরল।

পুরুষটি বলল—"আচ্ছা অমৃতাশ্ব বোধ হয় অনেক বড় হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ, তুমি ত ওকে অনেক দিন দেখোনি, তাই না?"

"প্রায় চার বছর।"

"ওর বয়স ত এখন বার বছর হ'ল—আর জানো ঋজ্রাশ্ব, ওকে দেখতে অনেকটা তোমার মত হয়েছে।"

"কেন হবে না? তখন—তখন তোমার প্রিয়তমদের মধ্যে আমিও ত একজন ছিলাম, তাই না? আচ্ছা, অমৃতাশ্ব এত দিন কোথায় ছিল?"

"ওর মামাদের কাছে—বাহ্লিকদের কাছে।

যুবতী জলপাত্রটি নিয়ে তাদের তাঁবুর মধ্যে গেল এবং তার স্বামী কৃচ্ছ্রাশ্বকে অতিথির আগমন-বার্তা জানাল। স্বামি-স্ত্রী তখন একত্রে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল, অমৃতাশ্বও এল তাদের পিছনে পিছনে; ঋজ্রাশ্ব গৃহকর্তাকে নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি সখা, কেমন আছ?"

"অগ্নির কৃপায় ভালই আছি ভাই, এসো, এসো। আমরা ঘোটকীর দুধ ও মধু দিয়ে সোমরস তৈরী করছিলাম এখন।

"মধু ও সোমরস? কি ব্যাপার, এই সকালেই এই সব?"

"আমাদের ঘোড়াগুলো যেখানে চরছে আমি সেখানে একবার এক্ষুণি যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম, বাইরেই আমার জন্যে ঘোড়া তৈরী রয়েছে দেখোনি?"

"তাহলে তুমি কি আজ সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে আসতে পারবে না?"

"দেরী হতে পারে হয়ত, যা হোক, আমি তার জন্যেই এই থলি-ভর্তি সোমরস এবং ভাল নরম অশ্ব-মাংস সংগে নিয়েছি।"

"অশ্ব-মাংস?"

"অগ্নি আমাদের কৃপা করেছেন—তাঁর দয়ায় আমি অশ্ব-মাংসের সংস্থান করতে পারি, আর আমি ত আজ-কাল প্রায় সব সময়ই অশ্বপালন করছি।"

"তাহলে ত দেখছি তোমার নামের অর্থই ভুল হয়ে গেছে ('কৃচ্ছ্রাশ্ব' শব্দের অর্থ—যার অশ্বের অভাব আছে।)"

"আমার বাবা-মার সময়ে বলতে গেলে আমাদের একটাও ঘোড়া ছিল না, তার জন্যেই তাঁরা আমার ঐ নাম দিয়েছিলেন।"

"কিন্তু এখন ত তোমাকে 'ঋদ্ধাশ্ব' বলেই (যার অনেক অশ্ব আছে) ডাকা উচিত।"

"সে হবে'খন। এখন চল ত ভেতরে যাই।"

"তার থেকে এসো না কেন, এই পাইন গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসের উপরেই বসি।"

"বেশ। সোমা, তাহলে খাবারটা বাইরেই নিয়ে এস। আমাদের অতিথিকে আজ পেট ভরে সোমরস এবং মাংস খাওয়ান যাক।"

"তা দিচ্ছি। কিন্তু কৃচ্ছ্র, তুমি না ঘোড়াগুলোকে দেখতে যাবে ঠিক করেছিলে?"

"সে আমি যাব। আজ না পারি, কাল যাব। এসো ঋজ্রাশ্ব, এখানে বসা যাক।"

সোমা সোমরসের থলিটা এবং পানপাত্র নিয়ে এল। অমৃতাশ্ব দুই বন্ধুর মাঝে গিয়ে বসল। সোমা থলিটা এবং পাত্রগুলো মাটিতে রেখে বলল—"দাঁড়াও, আমি কম্বল নিয়ে আসি।"

ঋজ্রাশ্ব বলল—"না, না, এই নরম সবুজ ঘাস কম্বলের থেকে অনেক ভাল।"

"আচ্ছা ঋজ্র, তুমি কি নুণ দিয়ে সিদ্ধ করা মাংস খেতে পছন্দ করো, না আলুণে সেঁকা মাংস? মাংসটা একটা আটমেসে ঘোড়ার বাচ্চার, খুব নরম মাংস।"

"সোমা, বাচ্চা ঘোড়ার মাংস সেঁকাই আমার ভাল লাগে। আমি মাঝে মাঝে একটা ঘোড়ার বাচ্চা আস্তই একবারে পুড়িয়ে নিই। এতে সময় লাগে—কিন্তু আস্বাদটা খুবই মিষ্টি হয়। আর সোমা, তোমাকে কিন্তু আমার এই মদটুকু তোমার মিষ্টি ওষ্ঠ দিয়ে ছুঁইয়ে মিষ্টি করে দিতে হবে।"

কৃচ্ছাশ্ব বলল—"ঠিক, ঠিক। ঋজ্র আজ অনেক দিন পরে ফিরে এসেছে।"

"বেশ, আমি এক্ষুণি আসছি। আগুনে খুব জোর আছে—মাংস সেঁকতে বেশীক্ষণ লাগবে না।"

গৃহকর্তাকে মদের পেয়ালার পর পেয়ালা ভর্তি করতে দেখে ঋজ্র জিজ্ঞাসা করল—"এত তাড়াতাড়ি খাচ্ছ কেন?"

"ও! সোমরস কি মধুর! সোমার হাত থেকে সোম! এ যে অমৃত! যে কেউ এ পান করবে সেই অমর হবে। নাও, খাও—খেয়ে অমর হও।"

"খুব অমর হয়েছ! যে পরিমাণে তুমি পেয়ালার পর পেয়ালা খেয়ে চলেছ তাতে একটু পরেই ত তুমি মৃতপ্রায় হয়ে পড়বে।"

"তুমি জান না ঋজ্র, আমি এই মদ কি পরিমাণে ভালবাসি।"

একটা চামড়ার বারকোশে করে তিন ভাগে সেঁকা মাংস নিয়ে এল সোমা।

সে কৃচ্ছকে জিজ্ঞাসা করল—"তাহলে তুমি সোমাকে ভালবাস না?"

কৃচ্ছ—"সোমা এবং সোম দুই-ই আমার প্রিয়।"

ইতিমধ্যে কৃচ্ছর গলার স্বর বদলে গিয়েছিল, চোখও তার রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিল। সে আবার বলল—"তাছাড়া আজ আর সে খোঁজে তোমার কি যায়-আসে?"

সোমা বলল—"তা ঠিক। আজ ত আমি আমার অতিথির—ঋজ্রর।"

একটু হাসবার চেষ্টা করে কৃচ্ছ বলল—"শুধু অতিথি নয়, পুরানো বন্ধুও!"

ঋজ্র তখন সোমার হাত ধরে টেনে তাকে কাছে বসিয়ে তার মুখে সোমরসের একটি পূর্ণপাত্র তুলে ধরল। সোমা দু'-এক চুমুক খেয়ে বলল—"এবার তুমি খাও, ঋজ্র। আজকের এই দিনটার জন্য আমাদের কত দিন অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছে।"

এক নিশ্বাসে পাত্রটি নিঃশেষ করে সেটা রাখতে রাখতে ঋজ্র বলল—"তোমার অধরের স্পর্শে কি মধুরই না লাগল এই পানীয়—পাত্র!"

মদের মাত্রাধিক্যের ফল ইতিমধ্যেই কৃচ্ছর উপর ফলতে সুরু করেছিল। সে তাড়াতাড়ি আর এক পাত্র ভর্তি করে সোমার দিকে এগিয়ে দিয়ে জড়িত কণ্ঠে বলল—"স্ সোমা…এইটুকুও ম্ মিষ্টি করে দা…ও।"

সোমা পাত্রটি তার ওষ্ঠে একটু ছুঁইয়ে ফিরিয়ে দিল। বালকটি (অমৃতাশ্ব) বয়স্কদের এই রসালাপে কোন উৎসাহ বোধ না করে তার সমবয়সীদের সাথে খেলতে চলে গেল। কৃচ্ছাশ্ব মাথা দোলাতে দোলাতে বিলোল চক্ষে জিজ্ঞাসা করল—"সো…মা আমি…গ্ গান গাইব?"

"নিশ্চয়ই। কুরু-বংশে তোমার মত গায়ক আর কে আছে?"

"ঠিক! আমার মত গ্-গায়ক কেউ নেই। আ—চ্ছা শোন… আমাকে আর একটু সো…ম দা…ও।"

"এই হয়েছে। দেখ কৃচ্ছ, তোমার গান শুনে পশুপাখী সব বন ছেড়ে পালাচ্ছে।"

"বে…শ…ব্, বেশ।"

এই অবেলায় সোম পান করা অবশ্যই অমৃতত্ব প্রাপ্তির লক্ষণ নয়। সাধারণত সন্ধ্যার পরেই সোমপান চলে কিন্তু কৃচ্ছাশ্বের পক্ষে যে কোন অজুহাতই যথেষ্ট। কৃচ্ছ যখন এই ভাবে নেশায় অচেতন হয়ে পড়ল তখন ওরা দুজনে (ঋজ্র এবং সোমা) পাত্র রেখে দিয়ে নদীর তীরে পাহাড়ের উপর আরামের জায়গার খোঁজে বেরুল। নদীটা ছিল এখানে দু'টো পাহাড়ের মাঝে একটা সমতল জায়গা দিয়ে প্রবাহিত, তার চলার পথে যে অসংখ্য উপলখণ্ড ছড়িয়ে ছিল তার উপর স্রোতের আঘাতে এক কলনাদের সৃষ্টি হচ্ছিল। স্থানে স্থানে পাথরের নুড়িগুলোর মধ্যে জল আটকে তাতে ছোট ছোট মাছগুলোর উচু-উচু ডানা চকচক করছিল। নদীর ধার দিয়ে শুকনো জমির উপর দাঁড়িয়েছিল শাল আর পাইন গাছের সারি। তার মধ্যে পাখীর সুমিষ্ট কূজনে সৃষ্টি হচ্ছিল এক মোহিনী মায়া, ফুলের গন্ধ-ভরা মৃদু বাতাসের হিল্লোল দেহ স্পর্শ করছিল যেন সোহাগভরে।

এই স্বর্গীয় বনশোভায় এই দু'টি নরনারী বহু দিনের অদর্শনের পর তাদের অতীতের প্রেম আবার জাগিয়ে তুলছিল। তাদের স্মৃতিতে ভেসে আসছিল সেদিনের কথা, যখন সোমা ছিল সুকেশিনী ষোড়শী, বসন্ত উৎসবের সময়ে সেবার ঋজ্রাশ্ব গিয়েছিল তার মাতুলালয়ে বহ্লিকদের দেশে। সোমা ছিল তার মামার মেয়ে। ঋজ্রাশ্বও তার এক জন প্রেমাস্পদ হয়ে উঠল। এই সময় সোমার যারা প্রেমাকাঙ্ক্ষী তাদের মধ্যে এক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হল, কৃচ্ছাশ্ব জয়মাল্য পেল, ঋজ্র ও অন্য প্রতিযোগীরা পরাজয় স্বীকার করে নিল। আজ তাই সে কৃচ্ছাশ্বের স্ত্রী। কিন্তু সেকালের সেই অনিয়ন্ত্রিত যুগে নারীরা তখনও পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত হয়নি। তাই সময়ে সময়ে পরপুরুষের কাছে প্রেম নিবেদন করতে তাদের বাধত না। তাছাড়া তখন পর্য্যন্ত অতিথি বা বন্ধু এলে নিজের স্ত্রীকে উপভোগ করতে দিয়ে তার অভ্যর্থনা করার রীতি সদাচার বলেই মনে করা হত। তাই সত্যি সত্যি সেদিনের জন্য সোমা ছিল ঋজ্রাশ্বেরই উপভোগ্যা।

সেদিন সন্ধ্যায় এই বসতি অঞ্চলের সকলের এক সমাবেশ ছিল গোষ্ঠীপতির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। সোম, মধুরস, সুগন্ধ গো-মাংস

এবং অশ্বমাংসের ভূরি ব্যবস্থা ছিল সেখানে। গোষ্ঠীপতির পুত্রের জন্মোপলক্ষে এই উৎসব আয়োজন হয়েছিল।

সন্ধ্যা পর্য্যন্তও বৃচ্ছাশ্ব হাঁটা-চলা করার মত সুস্থতা ফিরে পেল না, তাই তার হয়ে সোমা এবং ঋজ্রাশ্বই এল উৎসবে যোগ দিতে। বহু রাত্রি পর্য্যন্ত পানাহার, নৃত্যগীতের স্ফূর্তি চলল। সোমার গীত এবং ঋজ্রাশ্বের নৃত্য যথারীতি সমস্ত কুরুদের প্রশংসা অর্জন করল।

২

"মাধুরা, তুমি বেশী শ্রান্ত হয়ে পড়োনি ত?"

"না, ঘোড়ায় চাপতে আমার কোন কষ্ট হয় না।"

"কিন্তু ঐ দস্যুরা তোমাকে বড় বর্বর ভাবে ধরে নিয়ে গিয়েছিল!"

"হ্যাঁ, বহ্লিকরা এসেছিল পাকৃথাদের যুবতী মেয়েদের আর অশ্ব-গবাদি পশু চুরি করে নিয়ে যেতে।"

"গরু-ঘোড়া চুরি করলে দুই বংশের মধ্যে বৈরিতা চলে অনেক দিন ধরে, কিন্তু মেয়ে চুরি করলে বৈরিতা বেশী দিন স্থায়ী হয় না। কারণ, শেষ পর্য্যন্ত শ্বশুরকুলকে জামাইদের সাথে আপোষ করতেই হয়।"

"আচ্ছা, আমি কিন্তু তোমার নামটা এখনও জানি না। তোমার নামটা কি বল না?"

"আমার নাম অমৃতাশ্ব—আমি কুরুবংশের বৃচ্ছশ্রবার পুত্র।"

"ও, কুরুবংশ ত আমার মাতুলবংশ।"

"যাক্, মাধুরা, এখন ত তুমি নিরাপদ। এখন তুমি কোথায় যেতে চাও বল।"

একটা আনন্দের আভায় জ্বল-জ্বল করে উঠল মাধুরার মুখ কিন্তু পরক্ষণেই সেটা নিবে গেল। অমৃতাশ্ব বুঝল—তাই কথার মোড় ঘোরাবার জন্ত সে বলল—"পাকথা-বংশের কয়েক জন মেয়ে আমাদের গাঁয়েও আছেন।"

"তাঁদের সবাইকেই কি জোর করে আনা হয়েছে?"

"না, তাঁরা সবাই-ই প্রায় আমাদের মাতুলগোষ্ঠীর মেয়ে।"

"তাই বল! কিন্তু দেখ—মেয়েদের জন্তে এই লুঠপাট, নরহত্যা এ-সব আমার বড়ই দুষ্কৃতি বলে মনে হয়।"

"আমারও তাই মত, মাধুরা, এর ফল হয় এই যে—স্ত্রী ও পুরুষেরা জানতেই পারে না যে তাদের পরস্পরের জন্তে প্রেম বা ভালবাসা রইল কি না।"

"তাই নিজের খুড়তুত, মামাত বোনদের বিয়ে করাই পুরুষদের পক্ষে অনেক ভাল—কারণ, তাহলে উভয়ে উভয়কে আগের থেকেই চিনতে পারে।"

"তোমার কি এ রকম কোন প্রেমাস্পদ আছে মাধুরা?"

"না, কারণ আমার বাবার কোন বোন নেই।"

"তাহলে অন্ত কাউকে কি তুমি ভালবেসেছ?"

"না, বিশেষ কাউকে না।"

"তাহলে—তুমি কি আমাকে 'সুখী' করতে রাজী আছ?"

বিহ্বলা তরুণী তার চক্ষু নত করল।

অমৃত বলতে লাগল—"জানো মাধুরা, এমন দেশও আছে যেখানে মেয়েরা স্বাধীন, কোন পুরুষের অধীন তারা নয়।"

"আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না, অমৃতাশ্ব।"

"সেখানে কেউ তাদের চুরি করতে পারে না, কেউ কোন নারীকে চিরকালের জন্তে নিজের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকতেও বাধ্য করতে পারে না। সেখানে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার।"

"তারা পুরুষদের মত অস্ত্রধারণও করতে পারে?"

"অবশ্যই—মেয়েরা সেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন।"

"সে দেশ কোথায় অমৃত? মানে···অমৃতাশ্ব?"

"না, মাধুরা, তুমি আমাকে অমৃত বলেই ডাকো। হ্যাঁ, আর সে দেশ হচ্ছে অনেক দূরে, পশ্চিম দেশে।"

"তুমি সেখানে গিয়েছ, অমৃত?"

"হ্যাঁ, সেখানে মেয়েরা সারা জীবনই স্বাধীন থাকে—বন্ত হরিণীর মত স্বাধীন—বনের পাখীর মত স্বাধীন।"

"তাহলে সে দেশ ত বড় সুন্দর! সেখানে কোন মেয়েকে কেউ কখনও বন্দী করতে পারে না?"

"জীবন্ত ব্যাঘ্রিনীকে বন্দী করতে পারে কে?"

"আচ্ছা সেখানকার পুরুষেরা কেমন?"

"তারাও স্বাধীন।"

"সন্তান-সন্ততিরা?"

"সেখানকার পরিবার-জীবন আমাদের থেকে পৃথক্ ধরণের। সেখানে এক পল্লীর সকলে মিলে একটি পরিবার।"

"কিন্তু সেখানে একজন পিতার করণীয় কি থাকে?"

"সেখানে পুরুষেরা পিতা হিসাবে পরিচিত হয় না, কোন নারী কোন বিশেষ পুরুষের স্ত্রী হয় না, সে তার খুসী মত প্রেম-নিবেদন করতে পারে।"

"তাহলে কেউ তার পিতাকে চেনে না?"

"পরিবারের সমস্ত পুরুষই তার পিতা।"

"কি অদ্ভুত নিয়ম, মা গো!"

"এর কারণ হচ্ছে—সেখানকার মেয়েরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। তারা যুদ্ধ করতেও যায়, শিকার করতেও যায়।"

"আচ্ছা, তারা কি অশ্ব-গবাদি পশুপালন করে?"

"সেখানে অশ্ব-গবাদি পশু বনে হরিণের মত স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে।"

"তারা কি মেষ-ছাগাদি পশু পালন করে?"

"তারা পশুপালন বলে কিছু জানে না। বনের পশু আর জলের মাছ শিকার করে এবং জঙ্গল থেকে ফল আহরণ করে তারা খায়।"

"আর কিছু না? তাহলে তারা ত দুধও খেতে পায় না?"

"এক শিশুকালে মাতৃস্তন্তে ছাড়া অন্ত দুধ তারা খায় না।"

"তারা অশ্বারোহণও করে না?"

"না, তাছাড়া পশুচর্ম ছাড়া অন্ত গাত্রবস্ত্রও তারা ব্যবহার করে না।"

"তাহলে তাদের ত অনেক কষ্ট পেতে হয়?"

"কিন্তু তাদের মেয়েরা অন্তত পুরুষদের মত সমান অধিকার ত পায়! তারা পুরুষদের সাথে একত্রেই ফল আহরণ করে, শিকার করে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে কুঠার ও তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধও করে।"

"আমার এ সব খুব ভাল লাগে। আমি অস্ত্রবিদ্যাও শিখেছিলাম কিন্তু পুরুষদের মত যুদ্ধযাত্রা করার সুযোগ কই আমাদের?"

"এখন পুরুষরা এ কাজ নিজেদের কাঁধেই তুলে নিয়েছে। পুরুষরাই এখন অশ্ব, মেষ, ছাগ, গবাদি পশুচারণ করে—মেয়েদের তারা একেবারে গৃহিণী বানিয়ে ফেলেছে—শুধু গৃহপালিত প্রাণীতে নয়।"

"আর তারা যুবতী মেয়েদের যেন বলপূর্বক হরণের সামগ্রীতে পরিণত করেছে। আচ্ছা অমৃত, এ কথা কি সত্যি যে, সে দেশে নারীহরণ হয় না ?"

"সেখানে বংশের ছেলেমেয়েরা স্ব-জনের মধ্যেই বাস করে, বাইরের থেকে স্ত্রী গ্রহণ বা অন্যকে কন্যাদানের প্রশ্নই সেখানে ওঠে না।"

"বেশ নিয়ম ত।"

"কিন্তু এখানে তা অসম্ভব।"

"কাজেই এখানে যুবতী নারীরা বলপূর্বক লুণ্ঠিতই হতে থাকবে।"

"তাই ত অবস্থা! কিন্তু মাধুরা, তোমার মত কি বললে না ?"

"কি সম্পর্কে ?"

"আমার ভালবাসা সম্পর্কে।"

"আমি ত এখন তোমার ক্ষমতার অধীনেই, অমৃত।'

আমি ত তোমাকে ক্ষমতার জোরে পেতে চাই নে।"

"আচ্ছা, তুমি আমাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে দেবে ত ?"

"আমার ক্ষমতা অনুযায়ী তা নিশ্চয়ই দেব।"

"শিকার করতে যেতে ?"

"যত দিন আমার পক্ষে সম্ভব।"

"কেন, শুধু তত দিন পর্য্যন্ত কেন ?"

"কারণ আমাকে ত বংশের প্রধানদের নির্দ্দেশ মেনে চলতে হবে, মাধুরা! তবে আমার দিক দিয়ে, আমি তোমাকে সব সময়ে স্বাধীন নারী হিসাবেই দেখব।"

"আমার খুসী মত ভালবাসার অধিকারও আমি পাব ?"

"আমাদের মিলন হবে প্রেমের ভিত্তিতেই। কিন্তু, হ্যাঁ, ভালবাসার ব্যাপারেও তোমার স্বাধীনতা থাকবে।"

"তাহলে আমি তোমার প্রেমপাত্রী হতে রাজী, অমৃত!"

"তাহলে এখন আমরা কুরুগৃহে ফিরে যাব—না—পাকথা-গৃহে ?"

"যেখানে তোমার ইচ্ছা।"

তখন অমৃত তার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে মাধুরার প্রদর্শিত পথে পাকথা গ্রামে এসে পৌছুল। গ্রামে দেখা গেল—কোন তাঁবুতে হয়ত একজন নিহত হয়েছে, কোথাও একজন আহত হয়েছে, কোন তাঁবু থেকে মেয়ে লুণ্ঠিত হয়েছে। চারি দিকে তাই শোকের ধ্বনি উঠছে। মাধুরার মা কাঁদছিলেন, তার বাবা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিলেন, এমন সময়ে তাদের পটাবাসের সামনে এসে ঘোড়া থামল।

অমৃতাশ্ব অবতরণ করলে মাধুরা লাফিয়ে নামল এবং তাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে পটাবাসের মধ্যে প্রবেশ করল। কন্যার হঠাৎ আবির্ভাবে তার পিতামাতা প্রথমে ত নিজেদের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। তার পর তার মা তাকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে অশ্রুবর্ষণে তার মুখমণ্ডল ধুইয়ে দিলেন। শান্ত হয়ে এলে তার বাবা তাকে প্রশ্ন করতে সুরু করলেন। মাধুরা তখন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করল।

"বহ্লিকেরা যে সমস্ত পাকথা মেয়েদের হরণ করেছিল তাদের নিয়ে চলছিল। যে লোকটি আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল সে সবার পেছনে পড়ে গিয়েছিল। আমি তখন একটু সুযোগ পেয়েই ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ি। সে আমাকে আবার ধরে ঘোড়ার উপরে তুলবার চেষ্টা করছিল। আমি যখন তার সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিলাম তখন হঠাৎ এক তরুণ অশ্বারোহী সেখানে এসে হাজির হল। সে বহ্লিক পুরুষটিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান ক'রে তাকে আহত ক'রে মাটিতে ফেলে দিল। সেই নবাগত যুবকটি একজন কুরুবংশীয়—সেই এবং সে-ই আমাকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছে।"

তার বাবা জিজ্ঞাসা করলেন—"তাহলে সে তোমাকে অপহৃতা হিসাবেই ব্যবহার করেনি ?"

"না, সে বলপ্রয়োগে আমাকে পেতে চায়নি।"

"কিন্তু আমাদের দেশাচার অনুযায়ী তুমি তারই অধীন।"

"আমি তাকে ভালবাসি, বাবা।"

তখন তার বাবা বেরিয়ে এলেন অমৃতাশ্বকে অভ্যর্থনা করতে এবং তাকে পটাবাসের মধ্যে নিয়ে এলেন। এই ব্যাপারটা গ্রামবাসীদের কাছে প্রথমে অবিশ্বাস্য মনে হল, কিন্তু অমৃতাশ্ব যখন মাধুরাকে তার পিতৃগৃহ থেকে স্বগৃহে নিয়ে রওনা হল তখন সে সকলের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি অর্জ্জন করল।

৩

অমৃতাশ্ব কুরু-বসতির প্রধান পদে উন্নীত হ'ল। অনেক মেষ, ছাগ, গরু ছাড়াও বহু অশ্বের মালিক হ'ল সে। তার চার পুত্র এবং স্ত্রী মাধুরা সবাই এই পশুপালন ও গৃহকর্ম দেখা-শোনা করত। তাছাড়া গ্রামের কয়েকটি গরীব পরিবারও এই কাজে সাহায্য করত—ভৃত্য হিসাবে নয়, ঘরের লোক হিসাবেই। একজন কুরুকে অন্য একজন কুরুর সমান স্তরেই থাকতে হ'ত। তাই পঞ্চাশেরও বেশী পরিবার বাস করত অমৃতাশ্বের যাযাবর তাঁবুতে। গ্রামের প্রধানের দায়িত্ব ছিল সমস্ত ঝগড়া-দ্বন্দ্বের বিরোধ মীমাংসা করা: জলপথ, স্থলপথ এবং জনস্বার্থের অন্যান্য ব্যাপার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও ছিল এই ভাবে প্রধানের। তাছাড়া যে বিপদের আশঙ্কা থাকত সব সময় সেই যুদ্ধের সময়ে সৈন্যদের পরিচালনা করাই ছিল তার প্রধান কাজ। যুদ্ধে কৃতকার্য্যতাই ছিল বস্তুত কোন মানুষের পক্ষে প্রধানের পদে উন্নীত হবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান গুণ।

অমৃতাশ্ব ছিল সাহসী যোদ্ধা,—পাকথা, বহ্লিক এবং অন্যান্য গোষ্ঠীদের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে সে নিজের সাহসের পরিচয় দিয়েছিল। মাধুরাকে সে যে কথা দিয়েছিল তাও সে রেখেছিল, তার পাশাপাশি থেকেই মাধুরা শুধু যে ভল্লুক, নেকড়ে এবং বাঘ শিকার করত তাই নয়, বিভিন্ন যুদ্ধেও সে অংশ গ্রহণ করেছে। গোষ্ঠীর কোন কোন লোক অবশ্য এটা সমর্থন করত না, তা সত্যি, কারণ তাদের মত ছিল যে মেয়েদের কাজ অন্দর-মহলে।

যেদিন প্রথম অমৃতাশ্ব গোষ্ঠীর প্রধান নির্বাচিত হ'ল সেদিন সেই উপলক্ষ্যে সমস্ত কুরুপল্লী উৎসবের অনুষ্ঠান করল। এমনি সব উৎসবের দিনে বংশের ছেলেমেয়েরা সবাই স্বাধিকার পেত খুসী মত সাময়িক ভাবে প্রেম দেওয়া-নেওয়া করার।

তখন গ্রীষ্মকাল—গরু-ঘোড়াগুলো সব ছাড়া ছিল, যাতে করে নদীর তীরে এবং পাহাড়ের উপর স্বাধীন ভাবে তারা চরে বেড়াতে পারে। গোষ্ঠীর লোকেরা ভুলেই গিয়েছিল যে তাদের বহু শত্রু আছে, বস্তুত তাদের পশুসম্পদের উন্নতি তাদের শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধিই করেছিল। কুরুবংশ যখন ভল্গাতীরে বাস করত তখন তাদের কোন গৃহপালিত পশু ছিল না—সে সময়ে তাদের খাদ্য-সংস্থান করতে হত বন থেকে এবং যদি তারা শিকার জোটাতে না পারত বা মধু ফলমূল আহরণ করতে না পারত তাহলে তাদের উপবাসেই থাকতে হত। এখন তারা গরু, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল, গাধা প্রভৃতি শিকারযোগ্য অনেক পশুকে গৃহপালিত করে তুলেছে। এদের থেকেই এখন তারা পশমী কাপড়ের ব্যবস্থা করে, এবং মাংস, দুধ, চামড়া প্রভৃতি সংগ্রহ করে। এদের মেয়েরাও এখন কাপড় বুনতে এবং কম্বল তৈরী করতে দক্ষতা অর্জন করেছে। কিন্তু মেয়েদের এই দক্ষতা সত্ত্বেও তারা সমাজে তাদের অতীত দিনের মর্য্যাদা ফিরে পায়নি। আজ তাই মেয়েরা নয়, পুরুষেরাই শাসন করে। কর্তৃত্ব এখন আর কোন প্রধানা বা গোষ্ঠী উপদেষ্টা-মণ্ডলীর হাতে নেই, কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয়েছে এক একজন যোদ্ধা পুরুষের হাতে, সে তার স্বজনদের মতামতের প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধা দেখালেও অধিকাংশ সময়েই স্বমতেই সিদ্ধান্ত নিত। সম্পত্তির দিক দিয়েও অতীতে মাতৃপ্রধান সমাজে যেমন গোষ্ঠী সমেতই একত্র বাস এবং একত্র শ্রম করত—আজ তার বিপরীতে প্রত্যেক পরিবারেই স্বকীয় ভাবে গরু-ভেড়ার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পরিবারের সুখ-দুঃখের বোঝা তার (পরিবারেরই) নিজস্ব—অবশ্য দুর্দিন এলে সারা গোষ্ঠীই এখনও অতীতের পদ্ধতি গ্রহণ করে।

সেদিন কুরুগোষ্ঠীর লোকেরা সবাই পশুপালনের দুশ্চিন্তা থেকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও রেহাই পাবার জন্যে কর্তার বাড়ীর উৎসবে মেতে উঠেছিল। যুবকেরা গীতবাদ্যের তালে তালে নৃত্যের আবেশে সোম আর যুবতী নারী ছাড়া অন্য বিষয়ে চিন্তা করতে পারছিল না। রাত্রি যখন তিন ভাগ পার হয়ে গেছে তখনও নাচের আসর শেষ হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না; এই সময় হঠাৎ চারি দিক থেকে ভয়ার্ত কুকুরের ডাক শোনা গেল—মনে হল সবগুলো কুকুর যেন একই সাথে উপত্যকার উপর দিকে দৌড়তে সুরু করেছে। অমৃতাশ্ব ছিল সেই ধরণের মানুষ যারা প্রচুর মদ খেলেও শুধু চোখের রং একটু ঘোরালো হওয়া ছাড়া যাদের বিবশতার কোন লক্ষণ দেখা দিত না। কুকুরের ডাক শুনে সে নিঃশব্দে উঠে গিয়ে কাঠের হাতলওয়ালা পাথরের মুগুরটা নিয়ে যে দিক থেকে কুকুরের আওয়াজ আসছিল নদীর ধার ধরে সেই দিকে এগিয়ে চলল। কিছু দূর গিয়ে সে যখন সূর্য্যাস্ত যায়'যে পাহাড়টার ওপারে তার পাদদেশে পৌঁছুল তখন সে চাঁদের আলোয় একটি স্ত্রীলোককে তার দিকে আসতে দেখতে পেল। একটু থেমে স্ত্রীলোকটি নিকটে আসলে সে দেখতে পেলো যে আগন্তুকা হচ্ছে মাধুরা স্বয়ং।

সে উত্তেজিত ভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—"পুরুরা আমাদের গরুর পাল হরণ করছে।"

"গরুর পাল হরণ করছে! আর এই সময় আমাদের যুবকরা সব মাতাল হয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে! তুমি কত দূর পর্য্যন্ত গিয়েছিলে, মাধুরা?"

"কি ঘটছে তা বোঝবার জন্য যতটা যাওয়ার দরকার ততটাই।"

"তারা কি সব গরু নিয়ে যাচ্ছে?"

"যা দেখলাম তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল যে তারা অনেকক্ষণ ধরে আমাদের ছেড়ে-দেওয়া গো-মেষাদিকে আটক করেছে।"

"এখন কি করা উচিত মনে কর মাধুরা?"

"এখন আর নষ্ট করবার মত একটুও সময় নেই।"

"কিন্তু আমাদের যুবকেরা যে পরিমাণে মাতাল হয়ে আছে তাতে তারা ত দাঁড়াতেই পারবে না।"

"যে ক'জনকে তুমি সংগে নিতে পার তাই নিয়েই এখনই তুমি দস্যুদের আক্রমণ করো।"

"ঠিক বলেছ, কিন্তু একটা কথা মাধুরা! তুমি আমার সাথে এখন এসো না। যে সমস্ত যুবকেরা মাতাল হয়ে আছে তাদের অর্দ্ধেকেরই নেশা ছুটে যাবে এই সংবাদ শুনে, আর বাকীদের তুমি দই খেতে দাও গিয়ে। যেমন যেমন তারা সুস্থ হয়ে উঠবে সেই মত তাদের তুমি আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।"

"আর যুবতীদের?"

"পল্লীর প্রধান হিসাবে আমার কর্তৃত্ব আজ আমি ব্যবহার করতে পারি এবং যুবতীদেরও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিতে পারি। আমাদের অতীতের বিস্মৃত রীতিকে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে।"

"ঠিক আছে, আমি এক্ষুণি যুদ্ধের সম্মুখ সারিতে যাবার চেষ্টা করছি না—তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাও।"

প্রধানের নির্দেশে তক্ষুণি সব বাজনা থেমে গেল এবং উৎসবে মত্ত যুবক-যুবতীরা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে অনেকেরই সত্যি সত্যি এই অশ্ব-গবাদি হরণের সংবাদ শুনে নেশা ছুটে গেল। বিহ্বল দৃষ্টির পরিবর্তে তাদের চোখে-মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ফুটে উঠল।

বজ্রগম্ভীর স্বরে গোষ্ঠী প্রধান ঘোষণা করল—"কুরুকুলের যুবক-যুবতীগণ, আমাদের সম্পত্তি নিশ্চয়ই শত্রু পুরুদের হাত থেকে আমরা ছিনিয়ে আনতে পারব। আজ বড় ভীষণ সংগ্রাম হবে। তোমাদের মধ্যে যারা শক্ত আছ তারা হাতিয়ার তুলে নাও, অশ্বারূঢ় হও, আমাকে অনুসরণ করো। আর যারা এখনও নেশাগ্রস্ত রয়েছ তারা মাধুরার কাছ থেকে দধি নিয়ে পান করো, আর যে মুহূর্তে নিজেকে সবল বলে মনে করবে তখনই যত শীঘ্র পারো এসে আমাদের সাথে মিলিত হোয়ো। নারীবৃন্দ, আজ তোমাদেরও আমি যুদ্ধে যোগ দিতে অনুমতি দিচ্ছি। আমরা আমাদের পিতামহদের কাছ থেকে শুনেছি যে অতীতে কুরুবংশের নারীগণও পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতেন, আর আজ রাতে তোমাদের প্রধান হিসাবে, আমি অমৃতাশ্ব নির্দেশ দিচ্ছি যে তোমরাও যুদ্ধে আমাদের অনুগমন করো।"

এক মুহূর্তে ৪০টি অশ্ব একত্রিত হ'ল, ইতিমধ্যে পুরুরাও তাঁদের লুণ্ঠিত পশুপালকে উপত্যকার ঊর্দ্ধমুখে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছিল। কুরুরা দু'ঘণ্টা ধরে প্রবল বেগে ঘোড়ার পিঠে দৌড়ে রাত্রি অবসানের সম-সময়ে বহু দূরে শত্রুদের সাক্ষাৎ পেল। পুরুরা যে বিরাট পশুপাল সংগ্রহ করেছিল সেগুলোকে দ্রুতগতিতে চালাই রাস্তায় পরিচালনা করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না; তাই বাতাসেও পাহাড়ের গায়ে চাবুক আস্ফালন করে পশুপালকে সন্ত্রস্ত করে

তাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। অমৃতাশ্ব দেখল যে পুরুরা সংখ্যায় প্রায় একশ জন কিন্তু এই অবস্থায় ৪০ জন সঙ্গী নিয়ে তাদের আক্রমণ করা উচিত কি অনুচিত, এ বিষয়ে বেশীক্ষণ মাথা ঘামাতে সে তখন প্রস্তুত ছিল না। তার বিরাট শৃঙ্গাগ্র বর্শা আস্ফালন করে সে আক্রমণের আদেশ দিল।

অর্ধেক সংখ্যা নারী সমেত কুরু-যোদ্ধাগণ নির্ভয়ে দ্রুতবেগে অশ্বপরিচালনা করল। পুরুরা পশুপাল নিবৃত্ত এবং সংযত রাখার জন্য কিছু লোককে রেখে বাকী সকলে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নীচে নেমে এল এবং তাদের উচ্চারূঢ় অবস্থার সুযোগ নেবার জন্যে ঝর্ণা-ধারার পাশে সমতল জমিতে এসে স্থান গ্রহণ করল এবং সেখানে কুরুদের আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে লাগল। এইবারেই অমৃতাশ্বের শক্তির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল। সে এবং তার অশ্ব 'অমৃত' দুইয়ে মিলে যেন এক শক্তিতে পরিণত হ'ল। শত্রুর মধ্যে যে একবার তার শৃঙ্গমুখ বর্শার আঘাত পেল সে আর দ্বিতীয় আঘাত পর্য্যন্ত অশ্বপৃষ্ঠে থাকতে সক্ষম হল না। পুরুরা ভুল করেছিল তাদের তীর-ধনুক এবং পাথুরে কুঠারের উপর ভরসা করে। তাদেরও যদি কুরুদের মত ঐ পরিমাণে শৃঙ্গমুখ বর্শা থাকত তাহলে কুরুরা কোনক্রমেই তাদের রুখতে পারত না।

এক ঘণ্টা ধরে লড়াই চলল—কুরুদের এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য ইতিমধ্যে অকর্মণ্য হয়ে পড়া সত্ত্বেও তারা তখনও ডেঁটে রইল, কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে তাদের আশঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ দেখা দিল। ঠিক এই সময় আরও ৩০ জন নতুন কুরু অশ্বারোহী সৈন্য দ্রুতগতিতে এসে যুদ্ধে যোগ দিল। এতে করে যুদ্ধরত কুরুসৈন্যদের মনোবল ফিরে এল এবং পুরুরা প্রচণ্ড ভাবে আক্রান্ত হয়ে দ্রুত পিছু হঠতে সুরু করল। এদের বিপন্ন দেখে যে সমস্ত পুরু-সৈন্য পশুপাল রক্ষার জন্য ছিল তারা সহযোগিতার জন্যে এগিয়ে এল—কিন্তু একই সময়ে মাধুরা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে আবির্ভূতা হল, নতুন আরও ৪০ জনের এক দল নারী ও পুরুষ সৈন্য নিয়ে। আরও দেড় ঘণ্টা এই মারাত্মক সংগ্রাম চলল। ইতিমধ্যে অধিকাংশ পুরুসৈন্য হয় আহত বা নিহত হয়েছিল—অবশিষ্টরা এবার পালাতে সুরু করল।

কুরু-সৈন্যরা শত্রুর আহতদের স্থানান্তরিত করতে যেটুকু সময় লাগল তার পরেই ৮ মাইল দূরে উঁচুতে পুরুদের অঞ্চল আক্রমণ করল। তাদের আক্রমণের সাথে-সাথেই পুরুরা পটাবাস ছেড়ে পালাতে সুরু করল। তাদের গো-মেষাদিও চারি দিকে চরে বেড়াচ্ছিল কিন্তু কুরুরা প্রথমে শত্রুদের ধ্বংস করার দিকেই নজর দিল। পুরুরা চারি দিকে আক্রান্ত হল এবং তাদের অবস্থা খুব সঙ্গীন হয়ে উঠল—পাহাড়ের মধ্যে পালাবার সম্ভাবনাও তাদের খুব কমই রইল। তাদের উপত্যকাটি ছিল খুবই সঙ্কীর্ণ এবং এখান থেকে পাহাড়ের উপরে ওঠার পথও ছিল ভীষণ চড়াই। খাড়াই—অবশ্য তা সত্ত্বেও কয়েক জন স্ত্রী-পুরুষ ঘোড়ার পিঠে চড়ে এই খাড়াই পথে উঠে প্রাণরক্ষার চেষ্টা করছিল। তারা চড়াই বেয়ে কিছু দূর উঠে এমন একটা জায়গায় পৌছুল যার পর অশ্বপৃষ্ঠে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। তারা তখন পায়ে হেঁটে এগিয়ে যাবার জোর চেষ্টা করল—কিন্তু ইতিমধ্যে কুরুরা তাদের পিছনে এসে পড়েছিল। বৃদ্ধ এবং শিশুরা দ্রুত উঠতে পারছিল না তাই তাদের কিছুটা সুযোগ দেবার জন্য এদের মধ্যেকার কয়েক জন যোদ্ধা একটা সঙ্কীর্ণ গিরিপথে প্রতিরোধের জন্য রুখে দাঁড়াল। তাদের সংখ্যাশক্তির উপযুক্ত ভাবে কাজে লাগাতে না পেরে কুরুদের এই পথ পরিষ্কার করতে অনেকক্ষণ ধরে লড়াই চালাতে হল।

উভয় পক্ষই এখন পায়ে হেঁটে অগ্রসর হচ্ছিল—কিন্তু পুরুদের আর ১০।১২ জন লোক মাত্র অবশিষ্ট ছিল। কয়েক দিন ধরে তাদের বংশের অবশিষ্টাংশকে তারা রক্ষা করতে সমর্থ হল। তার পর কয়েক জন সাহসী নারীকেও সংগে নিয়ে তারা এক দুরধিগম্য পথে যাত্রা করে তাদের স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করে পাহাড় পার হয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেল।

কুরুরা কয়েক-জন শিশু, স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধকে এখানে-ওখানে লুক্কায়িত অবস্থায় প্রাণভিক্ষার্থিরূপে খুঁজে বের করল। এই পিতৃ-শাসিত সমাজের রীতিতে তখনও দাস গ্রহণ পদ্ধতি ছিল না—তাই শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত পুরুষরা নির্বিচারে নিহত হল। আর স্ত্রীলোকেরা অপহৃতা হল। পুরুদের সমস্ত গৃহপালিত পশুও কুরুদের সম্পত্তিতে পরিণত হল। উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত সবুজ নদীর সমস্ত উপত্যকাটাই এখন কুরুবংশের চারণভূমিতে পরিণত হ'ল। গোষ্ঠীপ্রধান নির্দেশ দিল যে—এই এক জমানার জন্য প্রত্যেক পুরুষ একাধিক স্ত্রী রাখতে পারে। এই সর্বপ্রথম কুরুবংশে সতীন দেখা গেল।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়

বাজে কথার লোক নয় কামাল পাশা

তুর্কীর বিশ্ববিখ্যাত দেশনেতা মুস্তাফা কামাল ছিলেন গম্ভীরতম প্রকৃতির লোক। তিনি প্রায় কথা বলতেন না বললেই হয়। সমগ্র জীবনে তিনি মাত্র একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন—যে বক্তৃতা একাদিক্রমে এক সপ্তাহ চলেছিল। ইং ১৯২৭ সালের ১৬ই অক্টোবর গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্ব্লীতে উক্ত বক্তৃতা দেওয়া হয়। প্রত্যহ সাত ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা চলতো। আমাদের দেশনেতাদের কাছে হয়তো বিষয়টা হাস্যকর মনে হবে। কিন্তু বাক্-সংযম যে নেতাদের পালনীয়, মুস্তাফা কামাল এবং ষ্টালিনকে দেখেই শিক্ষা করা যায়।

প্রতিভা বসু

৫

দু' দিন স্কুল ছুটি ছিল। অবিনাশ বাবুর সঙ্গেও দেখা হ'লো না বিনয়ের। তৃতীয় দিন ঘুম থেকে উঠেই তাঁর ব্যস্ত-ব্যাকুল গলা শোনা গেল, 'বিনয়, বিনয় কই হে?'

ডাক শুনে চমকে উঠলো বিনয়, তার সচেতন মন হঠাৎ উপলব্ধি করলো এই রকম একটি আহ্বানের প্রত্যাশায় সে অধীর আগ্রহে উন্মুখ হ'য়ে ছিলো দিন আর রাত। দু'দিন না গিয়ে অনেক বিষয় মনে মনে বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছে সে। ভেবেছে, বুঝেছে, তর্ক করেছে, খণ্ডন করেছে, অস্থির হ'য়ে একা-একা ঘুরে এসেছে নদীর ধারে কিন্তু আজ এই সুন্দর শীতের সকালে, সব কুয়াসা ঠেলে একটি জ্যোতির্ময় আলোকে সে খুব ভালো ক'রে দেখতে পেল নিজেকে। মন যেন প্রস্তুত হ'য়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। আলোয়ান জড়িয়ে বাইরে এসে বললো, 'আসুন, এই ভোরে?'

'তা হ'লে ভালো আছ তুমি।' আশ্বস্ত হ'লেন। 'আমি আরো ভাবলাম কী জানি অসুখ-বিসুখ করলো নাকি।'

'না, না, ভালোই আছি। ঘরে আসুন।'

'না, ঘরে আর আসবো না, বৌদি কই? তাঁর সঙ্গে একটু দেখা ক'রে যাই, আমার আবার নীলক্ষেতে যেতে হবে একটু।'

'আসুন, আসুন, বা, তা কি হয়?' মাথার আঁচল তুলতে তুলতে দিদি এলেন, 'ঘরে না হয় আইবুড়ো মেয়ে নেই, ছেলে তো আছে? তার তো বিয়ে হবে না না বসলে।'

'বটে, বটে,' দু'পা উঠলেন সিঁড়িতে। 'সোনার আবার মূল্যের ভয়।' বুক সমান উঁচু প্লিন্থ., দিদিও নামলেন দু'সিঁড়ি, 'এক কাপ চা অন্তত খেয়ে যান।'

'আমার বড়ো তাড়া বৌদি, নীলক্ষেতের রাস্তা—জানেন তো রোদ চ'ড়ে গেলে ভারি কষ্ট হয় হাঁটতে।'

'নীলক্ষেতে কেন?'

'আর বলেন কেন, আজকাল! গাছ ছ' নারকেল নিল, দশ গাছ শুপারী অর্দ্ধেক টাকা দিয়ে বললো এই কালই বাকী টাকা নিয়ে আসবো কর্তা—ব্যস্, তিন দিনের মধ্যে আর পাত্তা নেই তার।'

'বিক্রী করলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, বিকাশ এসেছে কি না, ওর কিছু টাকার দরকার'—

'ও!'

'সেই টাকাটা আদায় করতে যেতে হচ্ছে আবার তিন মাইল ঠেঙিয়ে, বুঝলেন না, বুড়ো তো হ'লাম, শরীরে এখন আলস্য হয়েছে।'

'তা বিকাশ ঠাকুরপো নিজে গেলেই তো পারতেন, আপনার তো আবার ইস্কুলও আছে।'

'না, না, ও কোত্থেকে হাঁটবে এই বিতিকিচ্ছিরি রাস্তায়! ওদের এক পা হাঁটলে ট্রাম, বাস—আর এই সব গ্রামের এঁদো রাস্তা—তাহ'লে তুমি ভালোই আছ, এ্যাঁ? যাওনি দেখে আমি আবার'—তিনি উঠানে নামলেন। 'আজ যাবো।' বিনয়ও নেমে এলো সঙ্গে সঙ্গে, কথা বলতে বলতে এগিয়ে দিলো বাদামতলা পর্য্যন্ত। তিনি চ'লে গেলেও দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। একটু রোদের তাপ, একটু হাওয়া, বেশ লাগলো দাঁড়িয়ে।

বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে, চা খেয়ে, আরো অনেক পরে বিনয় রওনা হ'লো অনসূয়াদের বাড়ি। পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার ছেয়ে এলো। ফটক খুলতেই ছুটে এলো তার ছোট বোন বুলু, অনেকটা অনসূয়ারই মত দেখতে, অত ফর্সা না। বিনয় সাগ্রহে দু'হাতের ফাঁকে তাকে জড়িয়ে নিল। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'আসেননি যে?'

'রাগ করেছিলাম।'

'কেন?'

'তোমরা আজকাল মোটে খাতির-যত্ন কর না, কোথায় কোথায় থাকো।' 'তাইতো, বাজে কথা কেবল।' ছ' বছরের মেয়ে, ক[illegible]য়

একেবারে গিন্নী। বিনয় তার আঙুল ধ'রে বারান্দায় উঠলো, কেমন নিস্তব্ধ বাড়ি, 'মণ্টু সণ্টু কই?' মণ্টু চার বছরের, সণ্টু এক। সণ্টুকে আজ মা মেরেছেন, তাই ঘুমিয়ে পড়েছে কাঁদতে কাঁদতে।'

'কেন? মেরেছেন কেন?'

'রাস্তার একটা নেড়ি কুকুরের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে চুমু খাচ্ছিল। তার পর সেটার গলায় দড়ি বেঁধে আবার রান্নাঘরে নিয়ে এসেছে মার কাছে—বলে ও আমাদের চাকর হবে।' হেসে ফেললো বিনয়। 'তাই জন্যে মারলেন?'

'মেরেছেন তো ভারি, আসলে কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন ব'লেই যত কান্না—'

'মা কই?'

'কতো সব রান্না হচ্ছে বিনয়দা'—বুলু কানের কাছে ফিসফিসোলো, 'কাকা কালই চলে যাবেন কি না, তাই পোলাও, মাংস, বাবা আবার বড়ো বড়ো রসগোল্লা এনেছেন তালতলার বাজার থেকে—' লোভে তার চোখ আতুর হ'য়ে উঠলো।

'দিদি কই' এতক্ষণে আসল নামটি উচ্চারণ করলো বিনয়।

'দিদি পড়ছে।'

'তবে চলো সে ঘরেই যাই।'

'আমি যাবো না, গেলে দিদি বকে দেয়।'

'সাধ্য কী! আমি আছি না।' কী জানি কেন, প্রত্যেক দিনের মত সহজ গতিতে অনস্থয়ার ঘরে যেতে পা চলছিলো না। বুলুকে শিখণ্ডী ক'রে সিঁড়ি বেয়ে সে তার ঘরে পৌঁছলো।

পেছন ফিরে আলোর তলায় নিচু হ'য়ে চিঠি লিখছে অনসূয়া, একটুখানি দাঁড়িয়ে দেখলো বিনয়, বুলু ডাকলো, 'দিদি!' অনসূয়া চোখ ফিরিয়েই উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ঠেলে। বোনের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললো, 'বাবা এসেছেন?'

'না।'

'কাকা বাড়ি নেই?'

'রেবতী কাকার বাড়ি গেছেন যে।'

'ও!' যেন এতক্ষণে খেয়াল হ'লো বিনয়কে 'আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না। তুমি পড়তে যাও বুলু।'

বুলু চলে গেলো, বিনয় বসলো মুখোমুখি চেয়ারে। টেবিলের বইগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বললো, 'কী পড়বেন আজ?'

'পড়বো না।'

'কাজ আছে কোনো?'

'না।'

'তবে?'

অনসূয়া জবাব দিল না।

'চলে যাবো?'

'সেটা তো আপনার ইচ্ছের উপরই নির্ভর করে।'

'আপনার কী ইচ্ছে?'

'বুদ্ধিমানেরা সর্ব্বদাই নিজের ইচ্ছের অধীন।'

'আর হৃদয়বানেরা?' বিনয় হাসলো।

'তারা তো সব বোকা। সেণ্টিমেণ্টাল।'

'আমাকে কী মনে হয়? হৃদয়বান না বুদ্ধিমান?'

'বুদ্ধির খ্যাতিই তো শুনে আসছি ক'মাস ধ'রে।'

'হৃদয়ের তো আর খ্যাতি হয় না, ওটা অনুভবের। আপনার কী মনে হয়?'

'জানি না।'

'নীল কাগজে কাকে চিঠি লিখছিলেন?'

একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আপনাকে।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ'

'কী লিখছিলেন?'

'আপনার অনেকগুলো বই প'ড়ে আছে এখানে, সেগুলো ফেরৎ দেবার কথা, তাছাড়া আপনার কলমটা, রেক্সিনে বাঁধাই খাতাটা'—

'আর?'

'আর কিছু মনে পড়ছে না।'

'সব ঠিক ক'রে রেখেছেন?'

'রেখেছি।'

'চিঠিটা?'

'শেষ হয়নি।'

'যতটুকু হয়েছে তাই দিন।' বিনয় হঠাৎ হাত বাড়ালো প্যাডের উপরে, তৎক্ষণাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়লো অনসূয়া, 'না, না কিছুতেই না, কক্ষনো না।'

'আমার চিঠিই তো!'

'হোক, আমি দেবো না।' কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেললো [illegible] কাগজ, উঠে গিয়ে জানলা গলিয়ে ফেলে দিল নিচে। [illegible] জানলার শিক ধ'রেই দাঁড়িয়ে রইলো পিছন ফিরে।

'তা হ'লে আজ পড়বেন না?'

'না।'

'না-পড়লে ফেল করবেন।'

'জানি।'

'তবে পড়বেন না কেন?'

'"কেন"র কি কোন কৈফিয়ৎ আছে?'

'আছে বৈ কি।'

'থাকলে তো আপনার কাছেও কেউ সেই কৈফিয়ৎ দাবী করতে পারে।'

'করুক না।'

'থাক।'

'আপনি কি ঐ জানলার ধারেই দাঁড়িয়ে থাকবেন?'

'কী এসে যায়?'

'মুখ না-দেখলে কথা বলতে ভালো লাগে না।'

'না-লাগলে আর কী করা যায়!'

'শুনুন!'

'বলুন।'

'এখানে আসুন।'

'বলুন' এবার জানলা থেকে স'রে এলো অনসূয়া। খুলেপড়া খোঁপা হাতে জড়িয়ে বেঁধে নিয়ে গুছিয়ে বসলো চেয়ারে। 'বলুন।'

'আপনি কি রাগ করেছেন?'

'কার উপর?'

'ধরা যাক এই অভাজনের উপরই।'

'না।'

'তবে কী হ'য়েছে?'

'কিছু হয়নি। আপনি বসুন, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি, বাবা ব'লে গেছেন তিনি আসবার আগে আপনি যেন চ'লে না যান।'

'বাবা আসবার আগে তাঁর কন্যাটিও যেন চ'লে না যান সেই নির্দেশ দিয়ে যাননি তিনি?'

অনসূয়া চোখ তুললো, একটু ঝুঁকলো বিনয়, 'মনে হচ্ছে এখুনি বৃষ্টি নামবে। কিন্তু কেন এই মেঘ? আসিনি ব'লে?' চোখে চোখ রেখে নিজে থেকেই গাঢ় হ'য়ে এলো গলার স্বর। একটা ঢেউয়ের মতো ব'য়ে গেল কয়েকটা সেকেণ্ড। তার পর দু'জনেই চোখ সরিয়ে নিল পরস্পরের মুখ থেকে।

৬

আস্তে-আস্তে খ'সে পড়লো এক-একটি সোনামোড়া দিন। এক-একটি ফুলের নরম পাপড়ি। শীতের ক্ষণিক বেলা বসন্তের দীর্ঘতায় দল মেললো ধীরে ধীরে, গুটির জঠর থেকে, মসৃণ, শীতল সিল্কের কোমল স্পর্শের মতো অনসূয়ার জানলার তলা সন্ধ্যা-মালতীর গন্ধে উতলা হ'লো, অবিনাশ বাবুর ফলের বাগানে মুঠো-মুঠো আমের মুকুল ঝ'রে পড়তে লাগলো। ফাল্গুনের বিখ্যাত হাওয়া, সমুদ্র থেকে উঠে এসে ছড়িয়ে পড়লো কুসুমপুরের গাছে গাছে, ডালে ডালে, কচি কচি জামরুল-পাতায়। আট মাস কাটলো।

ইতিমধ্যে পরীক্ষা হ'য়ে গেছে অনসূয়ার। বিনয়ের ইস্কুলের চাকরীও শেষ। তার যাবার পালা এবার। এ যাওয়া তো যেমন-তেমন যাওয়া নয়, একেবারে সমুদ্রযাত্রা। দিদি ছলোছলো চোখে অযুতকোটি ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করলেন, জীবনের তো এই একটিই মাত্র অবলম্বন তাঁর, মা-বাপ, ভাই-বোন, স্বামি-সন্তান সবই তো তাঁর এই এক বিনয়ের মধ্যেই নিহিত, সেই বিনয়কে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার ক'রে কোথায় তিনি পাঠিয়ে দিচ্ছেন? তাঁরই গরজ, তাঁরই ইচ্ছেয় ভাই চলেছে সেখানে, থেকে থেকে ভাই কান্না উঠছে বুকের মধ্যে। বিনয় গম্ভীর, বিষণ্ণ। এত কী ভাবছে সে? ভাবছে। অনেক কথাই ভাবছে! তিন বছর কি সোজা সময়? জীবনের কত উত্থান-পতন হ'য়ে যেতে পারে একটি পলকে—আর এ তো তিন-তিনটি বছর। ক'দিন থেকে অনসূয়ার সঙ্গে তার দেখা হচ্ছে না ভালো ক'রে, ক'দিন থেকে কেন, বলতে গেলে পরীক্ষার পর থেকেই এ অবস্থা চলেছে। এখন আর পড়াতে হয় না, গেলে ছোটরা এসে ঘিরে ধরে, অবিনাশ বাবু গল্প করেন, ঘোমটা টেনে তাঁর স্ত্রী আসেন এগিয়ে, আর সকলের মাঝখানে কখনো অনসূয়া আসে, কখনো আসে না। বিনয় জল চায়, চা চায়, কোন দিন মশলা। নিত্যি নতুন উদ্ভব। নম্র নত অনসূয়া বেরিয়ে আসে সে সব হাতে ক'রে ধীরে ধীরে, চোখে চোখ পড়ে মুহূর্তের জন্য, একটু দাঁড়ায় বা বসে, কিন্তু কথা বলার অবকাশ হয় না।

যাবার আগের দিন দুপুরের রোদ্দুরে, ধুলো-ভরা আগুন রাস্তা বেয়ে সে অবিনাশ বাবুর ফটকে এসে দাঁড়ালো। অনসূয়া কি জানতো সে কথা? সে কি এই প্রতীক্ষাতেই ছিলো? জানলা থেকে তৎক্ষণাৎ স'রে গেলো তার মুখ, ত্রস্ত পায়ে সে বেরিয়ে এলো বাইরের বারান্দায়। বিনয়, বললো 'বাগানে চলো।'

অসহ্য তাপ গাছের ছায়াকেও উত্তপ্ত ক'রেছে, তবু পুকুরধারের লতা-বিতানেই একটু ঠাণ্ডা। জলের ছোট ছোট তরঙ্গে লক্ষ হীরের কুচি, সেই দিকে তাকিয়ে পাকুড়-গাছের ঘনছায়ায় বসলো দু'জন।

একটু সময় কথা বললো না কেউ। তারপর বিনয় বললো, 'চিঠি লিখো।'

মুখ নিচু করলো অনসূয়া।

'আমি তিন বছর পরে আবার ঠিক ফিরে আসবো তোমার কাছে।'

'তুমি—তুমি কি সত্যিই যাবে?' অনসূয়ার ব্যাকুল গলা যেন কেঁদে উঠলো।

'যাবো না?'

'কালই?'

'কালই যেতে হবে।'

'আমার কথা কিছু ভাবলে না?'

'কী ভাববো?' একটু হাসলো বিনয়, 'ভালোই থাকবে, ওখানে গিয়ে প্রত্যেক সপ্তাহে আমি চিঠি লিখবো তোমাকে। তুমি আমাকে ভুলে যাবে না তো?'

'ভুলবো?' অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট ক'রে উঠলো অনসূয়া। মুখ তুললো, ভেজা-ভেজা গাল, চোখের দীর্ঘপল্লব ঝাউপাতার মতো ঝাপসা। বিনয় তার হাত নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে কাঁপা-কাঁপা রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে রইলো চুপ ক'রে।

'কিছুতেই কি থেকে যেতে পারো না?' আবার বললো অনসূয়া।

"তুমি তো সবই বোঝো। এই আট মাসও আমার এখানে কাটানো উচিত ছিলো না, এবার আর কী অজুহাতে আমি এখানে প'ড়ে থাকবো বল? আমাকে আর মাসখানেকের মধ্যেই জাহাজে চড়তে হবে।'

'তবে আমার—আমার কী হবে?'

'পাগলামী কোরো না—শোনো'—

'তুমি কি কিছু জানো না?'

'কী জানবো?'

'জেনেও চ'লে যাচ্ছ?'

'কী জেনে চ'লে যাচ্ছি অনসূয়া?'

'বাবা বলেননি?'

'কই, না'—

অনসূয়া একটু চুপ ক'রে রইলো, তার পর হঠাৎ ভেঙে পড়লো কান্নায়, 'আমাকে—আমাকে ওঁরা—বিয়ে দেবেন।' থেমে-থেমে, ভেঙে-ভেঙে বেরিয়ে এলো কথা ক'টি।

'বিয়ে!' বিনয়ের বুকের মধ্যে ঐ গরমেও শীতের শিরশিরানি ব'য়ে গেল, 'বিয়ে দেবেন?'

'হ্যাঁ।'

'কবে স্থির হ'লো?'

'স্থির হ'য়েছে কি না জানিনে, চেষ্টা চলেছে।'

'আমাকে আগে বলোনি কেন ?'

'সুযোগ পাইনি।'

'চিঠি পাঠাওনি কেন ?'

'ভেবেছিলাম বাবার কাছে শুনেও বোধ হয় তুমি চুপ ক'রে আছ। হয়তো, হয়তো—'

'হয়তো এই আমার চরিত্র। ক'মাস এই চরিত্রেরই পরিচয় দিয়েছি আমি। কী ক'রে ভাবতে পারলে ?'

'রাগ কোরো না, আমাকে উপায় ব'লে দাও।'

'কিন্তু তোমার মা-বাবা কি কিছুই বোঝেন না ?'

'কী বুঝবেন ?'

'আমি তো লুকোতে কখনো চেষ্টা করিনি। তোমার মা-ও কি লক্ষ্য করেননি ?'

'জানিনে।'

তাহ'লে তাঁদের বলবো ?'

'বলবে ?'

'বলবো না ? না বললে কী ক'রে হবে।'

'ওঁরা যদি রাজী না হন ?'

'যদি রাজী না হন' মুখে-মুখে বললো বিনয়, তার পরেই বললো, 'কেন রাজী হবেন না ? না হবার কী আছে ?'

'আমার সঙ্গে যে তোমার জাতের অমিল।'

'ধর্মের তো আর অমিল নেই ? তা নৈলে না হয় একটা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া যেতো,' হাসলো বিনয়। একটু লঘু স্বরে বললো, 'না হয় ধর্মান্তরই গ্রহণ ক'রে ফেলতাম। কিন্তু সামান্য একটা কায়েত-বামুনের বিভেদে আর কী বীরত্ব দেখাতে পারি ? কী মহত্ত্ব লুটিয়ে দিতে পারি তোমার পায়ে ?'

এক ঝাপটা গরম হাওয়া ছুটে এলো এক রাশি ধুলো উড়িয়ে পাতা খসিয়ে। অনসূয়া আস্তে বললো, 'আমার ভয় করে।'

'কিসের ভয় !' অনসূয়ার পিঠ-ভরা কথা চুলের একটা গুছি টেনে নিয়ে আঙুলে জড়িয়ে ছেড়ে দিল বিনয়, 'ভেবেছিলাম বিলেত থেকে ফিরে এসেই এ ব্যাপারের মীমাংসা করবো ; কিন্তু দেখছি সেটা পিছিয়ে এটাই আগে করা দরকার। ভালোই হ'লো।'

'শুধু তো বাবার কথা নয়, আমার কাকাও তো আছেন ?'

'কী আশ্চর্য্য ! বিয়ে তো আমি আর তুমিই করবো, ওঁরা যদি এই সামান্য কারণে—কিচ্ছু ভেবো না, কিচ্ছু ভেবো না। আমি আজই আমার প্রার্থনা জানাবো তোমার বাবাকে। যাই এবার, যাওয়ার বদলে বিয়ের ব্যবস্থা করিগে, কি বল ?' হঠাৎ খুশীতে ছল-ছল ক'রে উঠলো বিনয়ের গলা, যেন এ রকমই একটা উপলক্ষ্য খুঁজছিলো সে। চিন্তার বদলে বরং হালকাই লাগলো মনটা !

বাড়ি ফিরে এলো। বাড়ি ফিরেও একটা অহেতুক আনন্দ জড়িয়ে রইলো তাকে। বই নিয়ে বসলো একটি, খোলা রইলো পাতা, চোখ চ'লে গেল অনেক, অনেক দূরের আকাশে, যেখানে একটি বিন্দু হ'য়ে একটি শঙ্খচিল পাখা মেলে স্তব্ধ হ'য়ে আছে।

৮

স্কাউণ্ড্রেল। হঠাৎ হাতের সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেয়ারের হাতলে একটা ঘুসি মারলেন মিঃ রায়। পরমুহূর্ত্তেই সচেতন হ'লেন। ছি, এত জয়ী হ'য়ে এখনো এই দুর্ব্বলতা ! কোন দিনই তো তিনি দুর্ব্বল ছিলেন না, ভীরু ছিলেন না। যদি তা-ই হবে তাহ'লে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এমন ধৈর্য্য, এমন শক্তি, এমন সাহস, পরিশ্রম, আহার নিদ্রা, মান সম্মান সমস্ত দিয়ে তিলে তিলে কি গড়ে তুলতে পারতেন এই সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য ? না কি সমস্ত পৃথিবীকে অগ্রাহ্য ক'রে, সমাজ, সংস্কার সব-কিছুরই শিকল ছিঁড়ে একদিন এই অনসূয়াকে নিয়েই তিনি বেরিয়ে পড়তে পারতেন কোনো এক নিরুদ্দেশ যাত্রায় ? কিসের ভয় ? কোনো দুর্ব্বলতা কী ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলো তাঁকে ?

কিন্তু বিকাশ ! বিকাশ চৌধুরী ! সেই পিঠ কুঁজো কালো, ছোট চোখে সোনার ফ্রেমের বড়ো চশমাওলা উকিলকাকা অনসূয়ার, তাকে মনে পড়লে আর স্থির থাকতে পারেন না তিনি। না, আজও না, এই ষোলো বছর পরেও না। এই ষোলো বছর পরেও তাঁর পুরোনো ঘা কাঁচা হ'য়ে ওঠে। ছবির মতো একটার পর একটা দৃশ্য ভেসে ওঠে তাঁর চোখের সামনে।

সেই বিকেলে, যেদিন বিনয় প্রস্তাব করেছিলো অবিনাশ বাবুর কাছে, অবিনাশ বাবু গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। তিনি ভাবতে পারেননি, তিনি কল্পনাও করতে পারেননি এমন একটা ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে তাঁকে। তিনি ভালো মানুষ ছিলেন, অনেক বিষয়ে আধুনিক ছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ হ'য়ে কায়স্থের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন মনের এতটা প্রসার তাঁর ছিলো না। গ্রামে বাস ক'রে সমাজের আইন ভেঙে জাতিচ্যুত হবার মতো শক্তি ছিলো না তাঁর। সেটা তাঁর দোষ নয়, সংস্কার ছাড়তে মানুষের অনেক জীবন কেটে যায়, সে কথাই তিনি বলেছিলেন বিনয়কে। তাঁর কথা বিনয় বুঝেছিল, কিন্তু বিকাশ ?

মেয়ের কান্নায় টিঁকতে না পেরে অনসূয়ার মা বলেছিলেন, 'জাত ধুয়ে কি আমি জল খাব ? ও-ই যদি সুখী না হ'লো তাহ'লে আমারই বা সুখ কী ? তাছাড়া কোনো মেয়ে যদি একজনকে ভালোবাসে, তাকেই স্বামী হিসেবে দেখে তাহ'লে কী ক'রে সে আরেকজন পুরুষের স্ত্রী হ'তে পারে ? সে তো অসম্ভব। অধর্ম !'

মেয়েকে জেরা ক'রে ক'রে বিনয়ের সঙ্গে তার সম্বন্ধের গভীরতা জেনে নিয়েছিলেন তিনি। অবিনাশ বাবু মাথা নেড়েছিলেন। বিনয়কে তাঁরা ভালোবাসতেন, পছন্দ করতেন ; কেবলমাত্র এইটুকু বাধায় এত-বড়ো একটা দুঃখের ঘটনা ঘটবে এতে তাঁদের মনেও কিছুটা আঘাত লাগছিলো বই কি। কিন্তু বিকাশ এলো ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে, দণ্ড হাতে নিয়ে, তাদের পবিত্র কুল রক্ষা করতে। বক্তৃতা দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে অবিনাশ বাবুকে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিলো সে। তাঁর অন্যায় সম্বন্ধে, অপরিণামদর্শিতা সম্বন্ধে, তাঁর মেয়ের চরিত্রহীনতা সম্বন্ধে অবহিত করলো তাঁকে। এবারেও মাথা নাড়লেন অবিনাশ বাবু। বিয়ে ! বিয়ে দিতে হবে পক্ষকালের মধ্যে, যে-ই হোক, যার সঙ্গেই হোক। ব্রাহ্মণের মেয়েরা ঘাটের মড়া ধ'রে বিয়ে করতো আগে কৌলীন্য রক্ষা করবার জন্য। লেখাপড়া ! লেখাপড়া শিখে তো এই হ'লো। স্ত্রীলোককে প্রশ্রয়

দিলে তো তারা এই হয়। এজন্যেই তো শাস্ত্রে আছে তাদের অসূর্য্যম্পশ্যা ক'রে রাখা। একটা মেয়ের জীবনের মূল্য কতটুকু! তার জন্যে কি এত বড় পরিবার নরকে ডুববে? সতেরো বছরের মেয়ে ঘরে রাখাও যা সাপ নিয়ে বিছানায় শোয়াও তা।

অনসূয়াকে দিলেন দরজা-বন্ধ ঘরে ঠেলে পাঠিয়ে। থাকো এই চারদেয়ালে বন্দী হ'য়ে যতদিন না বিয়ে দিয়ে বার করতে পারি বাড়ি থেকে। কান্না! কাঁদো যত পারো। বিয়ে করবে না? গলায় কলসী বেঁধে ভাসিয়ে দেব আড়িয়ল নদীর জলে। বিনয়ের নাম আর একবার উচ্চারণ ক'রে ছাখোনা, সাঁড়াশি দিয়ে জিব টেনে খসিয়ে ফেলি কি না।

দিদি বললেন, 'বিনু, এবার তুই চলে যা।' 'না।' 'হাজার চেষ্টা করলেও আমি আর এখানে বিয়ে দিতে পারবো না তোর।' বিনয় তাকিয়ে রইলো বাইরে। দিদি পিঠে হাত রাখলেন 'মিছি মিছি নিজেও দুঃখ পাবি, ওর দুঃখও বাড়াবি। বিকাশকে তুই জানিস না। ও সর্ব্বোনাশ ক'রে ছাড়বে।'

'দেখি না, কতদূর পারে।'

'লক্ষ্মী ভাই, আমার কথা শোন, তুই চ'লে যা। হয়তো ভালোই হবে তাতে।'

'আমি চ'লে গেলেই সর্ব্বনাশ হবে দিদি, যাকে-তাকে ধ'রে একটা বিয়ে দিয়ে দেবে ওর।'

'ওদের মেয়ে ওরা যা খুসী তাই করবে, তুই আমি কে বল? ওর বাপ আছে, মা আছে—তারা'ই যদি নির্ব্বোধ হয়—' দিদি সজল হ'লেন।

'না দিদি, এ সময়ে আমাকে যেতে বোলো না। আমি যেতে পারবো না, পারবো না।' দিদির হাত চেপে ধরলো সে।

সেটাই কি তিনি ভুল করেছিলেন? ভাবলেন মিঃ রায়। আরো অনেক বারের মতো আবারো তিনি বিশ্লেষণ করলেন নিজেকে, অনসূয়াকে বিয়ে করতে চাওয়াটাই কি তার বোকামী হ'য়েছিলো? অন্যায় হয়েছিলো? অপরাধ হয়েছিলো? যৌবনে তো মানুষ কত কিছুই করে, কত প্রেম, কত দৃষ্টি-বিনিময়, কত হাতে হাত ঠেকানো—কিন্তু সেটাকেই অমন একটা গভীরতার পর্য্যায়ে নিয়ে যায় কে? তিনিই কি নিয়ে গিয়েছিলেন? ইচ্ছে করে? কেউ কি কাউকে ইচ্ছে ক'রে ভালোবাসতে পারে? ভালোবাসা তো জন্মায়! সে তো কারো ইচ্ছার অধীন না? যে ফসল আমরা বুনি না, যে জমি আমরা দেখি না,—সেই প্রাণকণিকাটিও তো আমরা উপড়ে ফেলতে পারি না? বুকের ভেতর কোথায় কোন নিভৃতে যে বাসা বেঁধে থাকে! মিঃ রায় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বয়সের পক্ষে সতেজ চেহারা তাঁর ফুটে উঠলো পাৎলা পাঞ্জাবীর মসৃণ আচ্ছাদন থেকে। আরেকটি সিগারেট ধরালেন। খুব বেশী অভ্যস্ত নন তিনি এই নেশায়, নেশাটাই ঠিক তার ধাতস্থ নয়, তবু মনের কোনো অস্থিরতার সঙ্গে তাল রাখবার জন্য এটা চাই-ই তার। হাতের ঘড়িতে নজর করলেন। উঠতে হবে আর একটু পরেই, বারোটায় গিয়ে পৌঁছতে হবে এরোড্রোমে। এবার ভেবেছিলেন ট্রেণে যাবেন, হ'লো না। কত কাল ট্রেণে চড়েন না। ট্রেণ প্রায় একটা স্মৃতির মতো। গোটা ভারতবর্ষটা হুস্ ক'রে পার হ'য়ে যাবেন, পাঁচ ঘণ্টায়। কী দেখতে পাবেন এরোপ্লেনের উঁচু থেকে? নদী পাহাড় সব সমান। একটু হাসি ফুটলো, কাল থেকে আজ এখন এই বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত কতবার যে একথাটা মনে ক'রে তিনি কৌতুক বোধ করেছেন। যারা তখন জীবন পণ ক'রে লড়াই করেছিলো তাঁকে হারিয়ে দিতে, আর কয়েক ঘণ্টা পরে যখন আবার তিনি দাঁড়াবেন গিয়ে তাদের মুখোমুখি তখন তারা কী বলবে? কী করবে? সে-কোনো একটা লোককে ধ'রে এনে কন্যা সম্প্রদান করার কী কৈফিয়ৎ দেবে সেই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-সন্তানরা? না কি তাড়িয়ে দেবে? আবার ধরিয়ে দেবে পুলিশে?

মস্ত রুমাল বার ক'রে তিনি কপালের ঘাম মুছলেন। মনে পড়লো সেই মোটাসোটা ইনস্‌পেকটরটিকে। আঃ! কী কান্নাই কেঁদেছিলো অনসূয়া, সেই কান্না-ভেজা মুখ এখনো যেন মনে লেগে আছে। লোকটাকে খুঁজে বরযাত্রী করলে কেমন হয়? কাকার সঙ্গেও বেশ বন্ধু-সম্মিলন হবে। বর-কনে দেখে মনটা কি বেশ খুসী হবে না? সেই কবে দেখা হয়েছিলো দারজিলিংয়ের ঝকঝকে সানিকটের বারান্দায়। কবে? কদ্দিন আগে? ষো-লো বছর? এর মধ্যেই ষোলো বছরের পাতা খসলো সেই সুন্দর সুশ্রী দিনগুলোর উপর। মিঃ রায় পাৎলা চুলে আঙুল চালালেন। এই তো সেদিনের কথা, এই তো সেদিন কালো কুচকুচে অন্ধকার রাত্রে অনসূয়া আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো দরজা খুলে, রঙিন কাপড়ে গা মুড়ে। হাতের মুঠোয় তিনি তুলে নিলেন তার নরম ঠাণ্ডা হ'য়ে যাওয়া হিম হাত। 'ভয় কী!'

'বিনয়!'

অনু!'

'আমাকে কখনো ছেড়ে যাবে না তো?'

'মৃত্যুর আগে না।'

সে আরো, আরো কাছে স'রে এলো। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ভয়, প্রতিটি নিশ্বাসে ভয়। গাছ থেকে পাতাটি খসলে সে কেঁপে ওঠে, পাখির পাখা-ঝাপটানিতে জড়িয়ে ধরে নিবিড় হাতে। আর সেই ভয় কি একদিন দু'দিন? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। বাজের তাড়া-খাওয়া ছোট পাখির মত দেশ থেকে দেশান্তর ছুটোছুটি। তবু, তবু কী সুখ! সেই তুলনাহীন সুখের কথা ভেবে আজও ভালো লাগলো মিঃ রায়ের।

অবশেষে দারজিলিং। জলাপাহাড়ের উপর মিলিটারী ব্যারাকের আওতায় একলা একটি ছোট্ট নির্জ্জন বাড়ি। সামনে যতদূর চোখ চলে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে অজস্র ফুলের বন্যা। পেছনে গভীর খাদ নিবিড় সবুজে ঢাকা। না, আর ভয় কী! সাত মাস কেটে গেছে, অনসূয়ার পিতৃব্যের উত্তম কি এখনো নিবে আসেনি? তা ছাড়া এখানে, এই একলা বাড়ির ছোট্ট সংসারে কে আসবে তাদের খুঁজে বার করতে?

একটি থালা, একটি গ্লাস, একটি বিছানা একটি স্পিরিট-ল্যাম্প। আর কী! দু'জন মানুষের সংসারে আর কতটুকু লাগে? দু'টো শরীর তো একটা হৃদয়েরই দু'টো ভাগ? দেয়ালে ঝোলানো আয়না আর চিরুণী। দেয়ালতাকে দাড়ি কামাবার ব্লেড আর চুলের কাঁটা। পাশাপাশি ধুতি আর শাড়ি, গেঞ্জি আর ব্লাউস। সকাল বেলা অনসূয়ার কত কাজ! তার কত বড় সংসার। সতেরো বছরের মেয়ের মুখে কাঁচা লাবণ্যের ঢল নামে তখন,

তাকিয়ে-তাকিয়ে আর চোখ ফেরে না। স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়ে চায়ের জল চাপায়, নিচু হয়ে ঘর ঝাঁট দেয়, টুকটাক ঘুরে বেড়ায় এখানে-ওখানে—চব্বিশ বছরের বিনয়ের উদ্বেলিত যুবক-হৃদয় ভালোবাসার ভারে ভারি হ'য়ে ওঠে। পরিষ্কার পেয়ালায় চা নিয়ে আসে সে, সোনালি চায়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধোঁয়া উঠতে থাকে, সঙ্গে ফুলকাটা প্লেটে কখনো বিস্কুট, কখনো কেক। বিছানায় তোয়ালে পেতে, চারটি পা লেপের তলায় জড়াজড়ি ক'রে অতি মনোরম ব্রেকফাষ্ট। বাইরে উজ্জ্বল হ'য়ে রোদ ওঠে, প্রজাপতির মেলা বসে ফুলবাগানে, বিনয় আলস্য ভেঙে ওঠে তারপর। দাড়ি কামায়, বরফ-কাটা ঠাণ্ডা জলে স্নান করে হুস্ হুস্ ক'রে—পোষাক পরে, মাথা আঁচড়ায় অনসূয়ার গায়ে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে, অনসূয়া চালের সঙ্গে ডাল, ডালের সঙ্গে আলু, আলুর সঙ্গে ডিম আর পেঁয়াজ দিয়ে খিচুড়ি বসিয়ে দেয় স্পিরিট ল্যাম্পে, তারপর শীতকাতুরে শরীরে লাল টুকটুকে মোটা কোট চাপিয়ে বেড়াতে বেরোয় জঙ্গলে। জানা আছে ঐটুকু স্পিরিট ল্যাম্পের মিটমিটে আগুনে পাক্কা চারটি ঘণ্টা লাগবে চাল ডাল সেদ্ধ হ'তে। এসে নামাবে, নামিয়ে মাখন দিয়ে একথালায় ঢেলে নেবে সবটা!

কবেকার কথা? এই তো সেদিন। এখনো তো মিঃ রায় সেই উত্তপ্ত সুখস্রোত অনুভব করতে পারেন বুকের মধ্যে। এক দিন একটা ছোটখাট ভোজের ফর্দ্দ তৈরী হ'লো মাথা খাটিয়ে, হিসেব ক'রে দেখা গেছে এখনো যা টাকা আছে বিনয়ের হাতে তাতে আরো মাস তিনেক চলবার পক্ষে যথেষ্ট। অনসূয়া বললো, 'চল এবার এখান থেকে পালাই।'

'পালাবো কী! রেজিষ্ট্রিটা ক'রে নি এবার, তারপর না-হয় আর একবার নির্ভয়ে হানিমুনে বেরুনো যাবে।'

'আমার কেমন ভয় করছে ক'দিন থেকে।'

'ভয়েরও একটা অভ্যেস আছে দেখছি।' নিশ্চিন্ত সুখে বিনয় দুই হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়েছে অনসূয়াকে, 'কিছু ভয় নেই আর। দু'জন সাক্ষী জোগাড় করেছি, রেজিষ্ট্রারকে নোটিশ দিয়েছি বিয়েটা হ'য়ে যাওয়াই ভালো।'

ততদিনে কি সমস্ত বাংলা দেশের সমস্ত খবরের কাগজে ছবি বেরিয়ে যায়নি তাদের? মুখে মুখে কি এই চাঞ্চল্যকর খবর নিয়ে অনেক রকম গুজবই রটনা হ'তে থাকেনি দিনের পর দিন? রেজিষ্ট্রারও কি পড়েননি কাগজ? শোনেননি কিছু?

বোকা! বোকা! বিনয়, আস্তো একটি মূর্খ তুমি। কী বুদ্ধিতে তুমি তোমার নাম-ঠিকানা দিয়ে এসেছিলে রেজিষ্ট্রারের কাছে? চমৎকার বিয়ে দিতে এলেন তিনি। এত আকাঙ্ক্ষিত বিয়ে, তার মধ্যে কি অনসূয়ার কাকা উপস্থিত না থেকে পারেন? বিয়ের তারিখের নির্দিষ্ট দুপুর কোলাহলে ভ'রে উঠলো। ছোট্ট বাংলো—মাননীয় অতিথিদের পদপাতে সরগরম হলো। নতুন কাশ্মীরি কাজ করা লাল টুকটুকে শাড়ি পরেছিল অনসূয়া, নিজের হাতে বোনা দামী পশমের ব্লাউস—পায়ে লাল মখমলের নতুন জুতো। কাল বিনয় গিয়ে কিনে এনেছিল সব। আর বিনয় ধুতি পরেছে লম্বা কোঁচায়, সিল্কের পাঞ্জাবী, কাজকরা সাদা শাল, নতুন স্যাণ্ডেল পায়ে, ফুলবাবু।

'আসুন, আসুন।'

দরজায় টোকা শুনে সাগ্রহে এগিয়ে গেল সে। অনসূয়া বিছানার টান করা বেডকভার আর একটু টান করলো,—তাড়াতাড়ি খাবার ঠিক করতে গেল ভাড়া করা প্লেটে।

'এ কী!' আৎকে উঠলো বিনয়। আকর্ণ হাসিতে ফেটে পড়লো বিকাশ। 'এলাম, তোমাদের বিয়ে দেখতে এলাম'—চকিতে পেছন ফিরে তাকালো অনসূয়া তারপরেই—একটা আতঙ্কিত আওয়াজ ক'রে ছুটলো সে বাথরুমের দরজা দিয়ে বাড়ির পেছন দিকের খাদে, যেখানে নিবিড় সবুজ—বুক পেতে আছে সমস্ত শীতলতা নিয়ে। লাফিয়ে গিয়ে চুলের মুঠি ধরলো বিকাশ—বিনয় বাঘের থাবায় সে হাত মুচড়ে দিল।

'লাগাও, লাগাও হাতকড়া, হারামজাদা বদমায়েস।' চিৎকার ক'রে উঠলো বিকাশ, 'ভদ্রলোকের মেয়ে ফুসলে বার ক'রে আনার মজা এক্ষুনি টের পাবি তুই।'

উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো অনসূয়া—'না না না, আমি স্বেচ্ছায় এসেছি, কেউ আমাকে নিয়ে আসেনি। তোমরা ছাড়ো, ছাড়ো ওঁকে, ছেড়ে দাও।'—তার চুল খুলে গেল, শাড়ি খ'সে গেল, আঁচড়ে-কামড়ে মুহূর্ত্তে পাগল ক'রে দিল সকলকে। রেজিষ্ট্রারের মুখ-চোখ ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিল, 'ওরে বিশ্বাসঘাতক, নিষ্ঠুর, এই জন্যেই তুই রোজ এসে এসে চা খেতিস, বৌমা ডাকতিস, নজরে রাখতিস এই দিনটার জন্যে।' আর তুমি? তুমি আমার পরম হিতৈষী কাকা! আমার বাবার খেয়ে আমার বাবাকে ঠকিয়ে আমাকে উদ্ধার করতে এসেছ।' এক টানে তার চশমা ফেলে দিল, মারতে উদ্যত হাতে প্রচণ্ড এক কামড় বসিয়ে রক্তাক্ত ক'রে দিল।

কে রোখে তাকে? একা সে একশো। বোধ নেই, চৈতন্য নেই, লজ্জা নেই, তারপর এক সময় মাটিতে লুটিয়ে পড়লো শুকনো লতার মতো।

৯

তারপর সেই মেয়েই একদিন ছেড়ে গেল তাকে। কেন গেল? কেমন ক'রে পারলো? একটা ব্যাকুল জিজ্ঞাসায় সমস্ত হৃদয় মথিত হ'য়ে উঠলো আজ মিঃ রায়ের। অনসূয়া! তুমি কি জান তারপর কত কষ্ট, কত দুঃখ, কত অপরিসীম লজ্জা অপমানের দরজা আমাকে ডিঙোতে হ'য়েছে তোমার ঐ সুন্দর লাবণ্যমাখা মুখের সামান্য কয়েকটি কথার জন্য? নেংটি আর কোর্ত্তা প'রে প্রচণ্ড রোদে জ্বলতে জ্বলতে আর প্রবল বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে জেলের চোর বদমাস আর খুনীদের সঙ্গে—যখন পাথর ভেঙে হাতে ফোস্কা পড়েছে, মাটি কুপিয়ে বুকের পাঁজরা খ'সে এসেছে—তখন আমার কী মনে হ'য়েছে? সেই যন্ত্রণা আমার কা'কে মনে ক'রে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে? তুমি জানো? তুমি কি ভুলেও কোন দিন ভেবেছ সেই কথা? মিঃ রায়ের চোখে লাল ছিটে পড়লো। নিশ্বাস ঘন হ'লো।

আর বেচারা দিদি! হতভাগিনী। ভাইকে মানুষ ক'রে কী সুখই হ'লো তাঁর? তাঁর গায়েরই সমস্ত সোনার মূল্য দিয়ে যাকে একদিন রক্ষা করতে চেয়েছিল বিনয়, সেই মেয়েই শেষে একদিন সর্ব্বনাশ করলো তাদের। 'বালিকা অপহরণের আসামী'

কে প্রমাণ করলো সে কথা? অনসূয়া। অনসূয়া? হঠাৎ একটা ক্ষমাহীন আক্রোশে দপ ক'রে জ্বলে উঠলো বুকটা।

ভ্রাতার অপরাধে এবং অনুপস্থিতিতে দিদিকেও কি কম নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছে ঐ গ্রামে? এমন কি পুলিশের হাঙ্গামা থেকেও রেহাই পাননি তিনি। দিদি যখন আর গ্রামে টিঁকতে না পেরে কলকাতা এসে বাসা নিলেন, খবরটা জেনে দিদির সঙ্গে একবার দেখা করতে চেয়েছিল বিনয়। হাজার হোক ভদ্রলোকের ছেলে, চেহারা সুন্দর, আর যত বদমায়েসই হোক, মানুষটা তো বিদ্বান কম নয়—কর্তৃপক্ষ একটু নেকনজরে দেখতেন তাকে; দয়া ক'রে অনুমতি দিলেন তক্ষুনি। কিন্তু দিদি বলেছিলেন, 'আমার ভাই। আমার ভাইয়ের তো কবে মৃত্যু হ'য়েছে।' কত দুঃখে বলেছিলেন একথা বিনয় তা জানে। তাই অভিমান করতে পারেনি। জেলখানার কুঠুরির দেয়াল মাত্র মুহূর্তের জন্যেই ঝাপসা হয়েছিলো তার কাছে। তার বেশী না। তারপর একদিন তাঁর মৃত্যু-খবর এলো। বোবা চোখে দেওয়ানজির চিঠির সেই খবরটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেই প্রথম বিনয় ভেঙে পড়েছিলো কান্নায়। আজ মনে হয়, দিদির কথাই তাঁর শোনা উচিত ছিলো প্রথম থেকে। ভুল করেছিলেন তিনি, ভুল, মহাভুল—যে ভুল আর জীবনে শোধরানো যাবে না। সেদিনের বিনয়কে ভেবে আজকের গণ্যমান্য বিনয় রায় জোরে জোরে নিশ্বাস নিলেন।

১০

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যেদিন রাস্তায় এসে দাঁড়ালো বিনয়, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে আবার জেল ফটকের মধ্যেই তাকিয়েছিলো। এখন কোথায় যাবে সে? কে আছে তার? কী করবে এখন? জেলের খুনী আসামীরা মন্দ ছিলো কি বন্ধু হিসেবে? জেলখানাই বা কি এমন খারাপ ছিলো? ফটকের বাইরে, মস্ত বড়ো তেঁতুল গাছের ছায়ায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একথাই তার মনে হ'লো। পা খালি, পরনে হাফ প্যান্ট, মুখশ্রী কেমন? জানে না সে। এই ক' বছরে একবারের জন্যও মুখ দেখতে ইচ্ছে করেনি তার। ঢোঁক গিলে ধীরে ধীরে পা ফেললো রাস্তায়, হঠাৎ দূরে একজন বন্ধুকে দেখে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিলো পদক্ষেপ। বন্ধু তার দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ হাঁ ক'রে রইলো তারপরেই মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে গেল তাকে ছাড়িয়ে। অল্প একটু সময়ের জন্য নিশ্চল হ'য়ে পড়েছিলো সে, তারপর ঠোঁট বেঁকেছিলো হাসির রেখায়। মানুষ মানুষের প্রতি যে কত নিষ্ঠুর, কত হিংস্র তা সে সময়ে খুব ভালো ক'রেই জেনেছিলো। আজকের দিনে সে-সব প্রশ্ন অবান্তর, সে-সব দিন মুছেও গেছে জীবন থেকে, তবু, তবু তার জ্বালা আজও কেন দহন করে?

কিন্তু না—আর না, আজকের এই সুন্দর রোদে ভরা, উজ্জ্বল, মধুর দিনে সকলকে মনে মনে ক্ষমা করলেন মিঃ রায়। আজ তো আর তিনি চব্বিশ বছর বয়সের 'নারীহরণ' মামলার ঘৃণিত দুশ্চরিত্র নিঃসম্বল আসামী নন? আজ তিনি একজন প্রৌঢ়, সম্ভ্রান্ত বহুমান্য ভদ্রলোক। মালাবার পাহাড়ে তাঁর চমৎকার বাড়ি। বিশেষজ্ঞদের নিপুণ হাত সাজানো ঘর, বারান্দা, সিঁড়ি, বাগান, লনের এই সবুজ ঘাস, আর বছর ভ'রে ফুল। তাঁর কোনটা আজ ঈর্ষাযোগ্য নয়? কোনটার দিকে মানুষ আজ না তাকিয়ে থাকতে পারে? বম্বাইয়ের মান্য বরেণ্যরা কে না আজ তার বন্ধুতার জন্য লালায়িত? তবে? তবে আর কেন এই রাগ? সত্যিই যার উপরে তাঁর রাগ করা উচিত তাকেই যদি ক্ষমা করতে পারলেন, তবে আর অন্যেরা! সমস্ত দুঃখের উৎস কি তাঁর অনসূয়াই নয়?

সমুদ্রের খালাসী হ'য়ে ভেসেছিলেন ভাগ্যের সন্ধানে। সম্বলের মধ্যে একটি মাত্র জিনের প্যান্ট আর একটি সার্ট! আর কী! মার গলার একছড়া হার পেয়েছিলেন, গলিয়ে গলিয়ে সেই হারের সামান্য তলানি। কত দেশ, কত মানুষ, কত বিচিত্র চরিত্র, ছলা, কলা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, মোট মাথায় নিয়ে কুলিগিরি, অবশেষে আমেরিকা। সোনার খনি। আজ ভাবলে বীরত্বের বই কি! কিন্তু তখন! সম্বলহীন একজন কালো মানুষের পক্ষে তখন কি খুব সুখের হয়েছিলো সে সব ঐশ্বর্য্যের দেশের জলহাওয়া?

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন। অনাহার, অনিদ্রা, এক সূর্য্যোদয় থেকে আরেক সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত, যতক্ষণ না দেহ অবশ হ'য়ে এলিয়ে এসেছে ততক্ষণ কি এক পলকের জন্যও থেমেছেন? সে কি একদিন দু'দিন? একমাস দু'মাস। বছরের পর বছর একই ভাবে, একই কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কেটে গেছে রাত কেটে গেছে, আবার সকাল হ'য়েছে, আবার দিন আর রাত। আর যখনই অবসর হ'য়েছে নিজের নিভৃত ঘরের অন্ধকারে তখুনি মনে পড়েছে এই অনসূয়াকে। ব্যর্থ হ'য়ে গেছে সব। মুহূর্তে একটা তিক্ত স্বাদ ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেহে-মনে। বুকের মধ্যে যেন জ্বালা ক'রে উঠেছে; কী শাস্তি, কী শাস্তি তিনি দেবেন তাকে, কী শাস্তি তিনি দিতে পারেন এই মেয়েকে?

অথচ এখন আর তার উপর একটুও রাগ নেই! কবে যে সে জ্বালা মুছে গেছে অন্তর থেকে, কবে যে অনসূয়াই মুছে গেছে তাঁর জীবন থেকে, কিছুই আজ মনে পড়ে না। দশ বছরের মধ্যে কখনো কি তিনি ভেবেছেন সে কথা? অনসূয়ার চেহারা পর্য্যন্ত আজ ঝাপসা তাঁর কাছে। সে কেমন ছিলো? কত গভীর ছিলো তার অপরাধ? কী জানি!

এই তো সবে একটুখানি গুছিয়ে বসেছেন, যন্ত্র আজ চলে তাঁর ইঙ্গিতে, দৈহিক পরিশ্রমে আর নয়। দীর্ঘ জীবন পেরিয়ে জীবনের কুসুমিত মুহূর্তের সবখানি উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়ে অর্জন করেছেন এই সামান্য অবকাশ, সামান্যতম শান্তি। আবার এলো অনসূয়া! কেন এলো? আর এলো যখন তখন তো কই কোনো প্রতিশোধই নিতে পারলেন না? বরং কোথায় যেন বেদনার একটা ছলছলানি, যেন একটা হারিয়ে যাওয়া সুখকে আবার অনুভব করলেন তিনি মনের মধ্যে। তবে কি মনের অগোচরে এতদিন লুকিয়ে ছিলো সে-ই? সমস্ত জীবন ভ'রে কি তবে ঐ একটি মানুষের কাছেই তার হৃদয় আবদ্ধ হ'য়ে আছে? এখনো, এখনো কি তিনি তাকেই ভালবাসছেন সমস্ত সত্তা দিয়ে? না কি এই তার যোগ্য প্রতিশোধ? না, না, প্রতিশোধ কেন? অনসূয়ার কাছে কি কোনো ঋণ নেই তার? যে মেয়ে একদিন একমাত্র তাঁর জন্যই সমস্ত ভাসিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলো রাস্তায়, তাকে তিনি

অস্বীকার করবেন কেমন ক'রে? কিসের জোরে? সেটা কি মনুষ্যত্ব? অতবড় একটা মিথ্যার মুখোমুখি হয়তো সে দাঁড়িয়েছিলো কিন্তু তবু—তবুও সে ক্ষমার যোগ্য। এই যে যোলো বছর ধ'রে এমন একটা কলঙ্কের বোঝা বহন করলো অনসূয়া তাতেই কি তার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়নি? তাছাড়া সেই দুঃখভোগের জন্ম দায়ী তো তিনিই।

মনে মনে অনুতপ্ত হ'লেন মিঃ রায়। সত্যি এর অনেক আগেই অনসূয়াকে তাঁর খোঁজ করা উচিত ছিলো। মূঢ় গুরুজন। অদম্য অধিকারবোধে কত ক্ষতিই তোমরা করো সন্তানের। অহংকার পরিতৃপ্তির জন্ম বলি দিতেও দ্বিধাহীন। তা নৈলে কাগজে আর অবিনাশ চৌধুরী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপন বেরোয় মেয়ের বিয়ের জন্ম? 'বয়স্থা দুঃখী কন্যার জন্ম যে-কোনো জাতের, যে কোনো গোত্রের, যে-কোনোরকম একজন দয়াবান পাত্র চাই।'

মিঃ রায় হাসলেন। হায় রে পিতা! এই মেয়েকে এক দিন তুমি কত ভালোই না বেসেছ। এই মেয়ের কথা বলতে তোমার পিতৃহৃদয় কতই না উদ্বেলিত হ'য়েছে। আর আজ? আজ তোমার বয়স্থা দুঃখীকন্যার জন্ম কতটুকু মমত্ব বোধ? আজ তাকে একটা 'যে কোনো' স্তূপে সমাধি দিতে ব্যস্ত। বম্বের কে না কে এক ব্যবসায়ী—মিঃ রায়. এইটুকু পরিচয়ই আজ মেয়ের পাত্র হিসেবে যথেষ্ট। তার পুরো নামটাতেও কোন প্রয়োজন নেই তোমার। কী তোমরা? কী? নিজের ঘাড় থেকে এখন বোঝা নামলেই শান্তি, না? তবে না একদিন সন্তানের মঙ্গলের কথা ভেবেই আমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে? যে মানুষ তাকে আত্মার অধিক ভালোবাসতো, যে মানুষ সমস্ত জীবন বিকিয়ে দিতো তোমার মেয়ের সুখের জন্ম! আজ কী চমৎকার পরিচয়ই দিচ্ছ পিতৃস্নেহের।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ রায়। উপরে হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন। ঘুম পাচ্ছে ছেলেমানুষের মতো। নাঃ, সময় হ'লো, যা হোক খেয়ে নিতে হয় কিছু। চটিটি পায়ে গলিয়ে ধীরে ধীরে তিনি লম্বা বারান্দা পার হ'লেন। ঘরে ঘরে নতুন বার্নিশের গন্ধ। ঘরে ঘরে ঝকঝক করছে নতুন জিনিশ। দেয়ালে আবার রং লাগিয়েছেন তিনি, পালিশ দরজা আবার পালিশ করিয়েছেন। একবার শোবার ঘরে এলেন। তাকালেন বিচক্ষণের মতো। হ্যাঁ ঠিক, ঠিক হ'য়েছে। একক শয্যা যুগল হ'য়েছে এখানে। ছোট ওয়ার্ডরোপের বদলে মস্ত ভারি আয়নাওলা বার্মাটিকের মেয়ে আলমারি এসেছে ঘরে, পূব-দক্ষিণ কোণে লম্বা আয়নার চকচকে ড্রেসিং-টেবিল। মস্ত বিছানার উপর কাশ্মীরী কাজ করা বহুমূল্য বেডকভারটির দিকে তাকিয়ে ক্ষণিকের জন্ম একটি কালো চুলের, কালো চোখের মেয়েকে যেন প্রত্যক্ষ করলেন তিনি। মন্থর পা ফেলে নতুন কার্পেটের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবলেন, সে কি আসবে? সত্যিই আসবে? সে কি সত্যিই ঘুরে বেড়াবে এই বাড়িতে, এই ঘরে ঘরে, এই সিঁড়িতে, এই বাগানে, বাগানের লনে। আজ তিন দিন ধ'রে মিঃ রায় কি পাগলের মতো তার আয়োজনেই আত্মহারা ছিলেন?

স্মৃতি! শুধু তো স্মৃতিতেই আজ পর্য্যবসিত সব। তবু কী মধুর! কী মধুর সেই স্মৃতি! কী আশ্চর্য্য! অনসূয়ার স্মৃতিতেও এত সুখ?

[ক্রমশঃ।

নজরুল ইসলাম

শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

সেদিন হয়নি ভুল। মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্যেও
অগ্নিমন্ত্র-সাধকেরা এ-প্রচণ্ড জ্যোতিষ্ককে ঠিক
চিনেছিল। প্রজ্বলন্ত দীপ্তি তার কী অপরিমেয়,
অনল ছন্দের স্পর্শে জীবন্ত! পৃথিবী গৈরিক
বৈশাখের কৃচ্ছ্রতায়,—তবু তার স্বপ্ন সুসবুজ;
পত্র ঝরা শেষ হলে বসন্তের নূতন সৃষ্টিতে
গভীর আগ্রহ ভরা। কাল্পনিক বিলাস গম্বুজ
দূরে ফেলে সে এসেছে মানুষের আপন মাটিতে!

বিদ্রোহী বাঙলার আত্মা পেল তার প্রকাশের বাণী
স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি পদক্ষেপে; আগামীর
সূর্য স্বপ্নে অন্ধকারে পথ চলে মুক্তির সেনানী,
কণ্ঠে গান—এ-তুফান পাড়ি দিয়ে পেতে হবে তীর!

বিপ্লবী মানসস্রষ্টা হে বিদ্রোহী নজরুল ইস্লাম
তোমার উদ্দেশে দিই রক্তজবা রাঙানো সেলাম!

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

১৪

যখন বাংলা দেশে বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত সমিতি সকল দানা বাঁধিতেছিল ঠিক সেই সময় বাংলা দেশ বিভক্ত হইল। লর্ড কার্জ্জন ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর ঘোষণা করেন বাংলা দ্বিধা-বিভক্ত হইবে। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বাংলাদেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল, কিন্তু সেই জনমতকে অগ্রাহ্য করিয়া কর্তৃপক্ষ ১৯০৪ সালের ১৫ই অক্টোবর বাংলা দেশকে বিভক্ত করেন। বঙ্গভঙ্গের অপমান বাঙ্গালী নীরবে সহ্য করিল না। বাংলা দেশের হৃদয়ে অপমানের যে তীব্র অনল জ্বলিয়া উঠিল দেখিতে দেখিতে তাহা মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে ছড়াইয়া পড়ে।

বক্তৃতায়, প্রবন্ধে ও গানে বিলাতী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। কান্তকবি রজনীকান্ত সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির রচিত সঙ্গীত—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি মনীষীদের প্রবন্ধ ও যশস্বী গায়ক রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতিবিশারদ হেমচন্দ্র সেন প্রভৃতির গানে বাঙ্গালী উদ্বোধিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিন পালের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বাঙ্গালী স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। সেই সময় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের লেখনী অনল উদ্‌গিরণ করিতে থাকে। সরকার হিন্দুসমাজ হইতে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা তখন ব্যর্থ হইয়াছিল। মুসলমানগণ দলে দলে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিলেন। ঢাকার নবাব আতাউল্লা বাহাদুর, ব্যারিষ্টার আবদুল রসুল, মৌলভী আবদুল কাসেম, আবুল হোসেন, দেদার বক্স, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, লিয়াকৎ হোসেন, ইসমাইল সিরাজী, আবদুল হালিম গজনভী প্রভৃতি বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দ দিকে দিকে স্বদেশীর বার্ত্তা প্রচার করিতে লাগিলেন। দেশীয় খৃষ্টান-সমাজ জমিদার-সমাজ ও নারীসমাজ স্বদেশীর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। বিলাতী বর্জ্জনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে নানা সমিতি ও সংঘ গঠিত হইল, মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতার "ব্রতী সমিতি", সুরেশচন্দ্র সমাজপতির "বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়", ভবানীপুর কালীঘাট অঞ্চলে স্থাপিত "সন্তান-সম্প্রদায়" এবং চিত্তরঞ্জন দাশের ভবনে স্থাপিত "স্বদেশী মণ্ডলী" প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মফঃস্বলের সমিতিগুলির মধ্যে বরিশালের "স্বদেশ-বান্ধব সমিতি" ও ময়মনসিংহের "সুহৃদ সমিতি" স্বদেশী প্রচারে অগ্রণী হয়।

স্বদেশীর ভাববন্যায় কখন যে শহর-পল্লী প্লাবিত হইয়া গেল কেহ তাহা টের পাইল না। বাঙ্গালীর সংকল্পকে আত্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যেই শক্তির সন্ধান করিতে লাগিলেন। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এই নব ভাব জাগরণের জন্য দেশীয় সংবাদপত্রগুলি আগাইয়া আসিল। ইংরাজী 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'বেঙ্গলী' এবং বাংলা 'সঞ্জীবনী' ও 'হিতবাদী' এ বিষয়ে আত্মনিয়োগ করে। এই সময় আরও কয়েকটি পত্রিকা নব ভাবের বাহন হইয়া পর-পর প্রকাশিত হয়। মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা 'নবশক্তিতে' ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যায়' নব ভাব প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মবান্ধব বাংলা দেশে আত্মশক্তি উন্মেষের নায়ক। "ভারতবর্ষের উন্নতি ভারতবাসীর দ্বারাই সম্ভব" এই কথা তিনি অতি সোজা ও সরল ভাষায় বাঙ্গালীর সম্মুখে ধরিয়া তুলিলেন। তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে শুনাইলেন, "রাজনীতি ক্ষেত্রে ভিক্ষাবৃত্তি নিষ্ফল।"

১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন) বঙ্গভঙ্গের দিনটিকে ক্ষোভ ও দুঃখের প্রতীক করিয়া তুলিবার জন্য নেতৃবৃন্দ আয়োজন আরম্ভ করিলেন। এই দিনে রবীন্দ্রনাথ উভয় বঙ্গের মিলনের চিহ্নস্বরূপ রাখীবন্ধন ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ক্ষোভ প্রকাশের জন্য "অরন্ধন" পালন করিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইল। বঙ্গভঙ্গ বাংলার হৃদয়তন্ত্রীতে কত গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, তাহা সেদিনের কার্য্য-বিবরণীর ভিতর দিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন সর্ব্বত্র হরতাল—কাজকর্ম্ম যান-বাহন চলাচল সব বন্ধ। রাখীবন্ধনের মিলন-মন্ত্র রবীন্দ্রনাথ রচিত 'রাখী-সঙ্গীত' শত-সহস্র কণ্ঠে গীত হইল। সেদিন রাখীবন্ধন উৎসব সম্পন্ন হয় বিডন স্কোয়ার ও সেণ্ট্রাল কলেজ-প্রাঙ্গণে।

অপরাহ্নে আপার সারকুলার রোডে মিলন-মন্দিরের (Federation Hall) ভিত্তি স্থাপিত হয়। দেশসেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ সর্ব্বজনপ্রিয় আনন্দমোহন বসু তখন রোগশয্যায়। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার এই রোগশয্যা মৃত্যুশয্যায় পরিণত হইয়াছিল। তিনি এক প্রকার মৃত্যুশয্যা হইতেই আসিয়া এই সভার সভাপতিত্ব করিলেন। ৫০ হাজার কণ্ঠে বিপুল "বন্দে মাতরম্" ধ্বনির মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক আনন্দমোহনের অভিভাষণ পাঠের পর আনন্দমোহন বসুর স্বাক্ষরিত একটি ঘোষণা-পত্র পঠিত হইল। ঘোষণাপত্রটি ইংরাজীতে পাঠ করিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী ও বাংলায় পাঠ করিলেন রবীন্দ্রনাথ। উক্ত ঘোষণা-পত্রে বলা হয় যে, "যেহেতু বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া পার্লামেণ্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্য্যে পরিণত করা সঙ্গত মনে করিয়াছেন, সেই হেতু আমরা শপথ গ্রহণ করিতেছি যে, বঙ্গভঙ্গের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙ্গালী জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমস্ত বাঙ্গালী জাতি, আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব তাহার সকলই প্রয়োগ করিব।"

বরিশালে স্বদেশী আন্দোলন এত প্রবল ও ব্যাপক হইয়া উঠিল যে, সরকার বরিশালকে "Proclamed District"—'আইন শৃঙ্খলাভঙ্গকারী' জেলা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বস্তুত বরিশালবাসীর একনিষ্ঠ কর্ম্মতৎপরতায় স্বদেশী আন্দোলন বিশেষ সাফল্য লাভ করে। অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রেরণায় 'স্বদেশ-বান্ধব' সমিতি নিয়মিত ভাবে স্বদেশী প্রচারে ব্রতী হন। মুকুন্দ দাস স্বদেশী গানে বরিশালবাসীকে মাতাইয়া তুলিলেন। অশ্বিনীকুমারের

অন্যতম সহযোগী মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বঙ্গের নারী-সমাজকে কাচের চুড়ী ছাড়িয়া দিবার আহ্বান জানাইলেন।

কবির আহ্বানে নারী-সমাজ আশ্চর্য্য ভাবে সাড়া দিল। অশ্বিনীকুমার-প্রমুখ পাঁচ-ছয় জন নেতা বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের জন্য এক অনুরোধ-পত্র প্রচার করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ সরকার বরিশালের এই প্রতিরোধ শক্তি ভাঙ্গিয়া দিবার উদ্যোগ আয়োজনে ব্রতী হন। বরিশাল শহরে বানরীপাড়া কেন্দ্রে ও অন্যান্য স্থানে গুর্খা সৈন্য মোতায়েন করা হইল। বানরীপাড়ায় সরকারী অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যামফিল্ড ফুলারের প্রাণনাশের চেষ্টা চলিয়াছিল। বিলাতী দ্রব্যের আমদানী করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বুলার সাহেব বরিশালে এক বাজার খুলিলেন, কিন্তু ক্রেতা নাই। একমাত্র দোকানী 'হৃদয়' বুলারকে বিদ্রূপ করিয়া গান গাহিল, "এ বাজারে আমি একা দোকানদার ভাই!" স্বদেশী আন্দোলন প্রতিরোধকল্পে সরকার কঠোর দমননীতি অবলম্বন করিলেন। সভা, শোভাযাত্রা, সংকীর্ত্তনের মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা, 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের জন্য শাস্তিবিধান, বালকদের দণ্ডদান এবং কারাগারে প্রেরণ, পিটুনী পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করিয়া সরকার সর্ব্বপ্রকার আন্দোলন দমনে উদ্যোগী হইলেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন, বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাসে শোণিত-রেখায় আপনার বিশিষ্ট স্থান করিয়া লইয়াছে। ১৩০৬ সালের ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল স্বদেশীর পীঠস্থান বরিশাল শহরে এই সম্মেলনের অধিবেশন হইবে স্থির হয়। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ব্যারিষ্টার আবদুল রসুল সভাপতিত্ব করিবেন। ইতিপূর্ব্বে লাট ফুলারের চীফ সেক্রেটারী মিঃ পি, সি, লায়নের নির্দ্দেশে রাস্তাঘাট এবং পার্ক প্রভৃতিতে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়। এই নির্দ্দেশ অমান্য করার অপরাধে বহু যুবককে বেত্রদণ্ড ও অন্যবিধ দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল।

সম্মেলনের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু প্রতিনিধি বরিশাল পৌঁছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ও অ্যাণ্টি সার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ,—বিপিনচন্দ্র পাল, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, আনন্দচন্দ্র রায়, যাত্রামোহন সেন-প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে যোগদানের জন্য ১৩ই এপ্রিল বরিশালে উপস্থিত হইলেন। জেলার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ষ্টেশনে কেহই 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিলেন না। 'অ্যাণ্টি সার্কুলার সোসাইটি'র সভ্যগণ কিন্তু ইহাতে মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। অবশেষে স্থির হইল যে, সম্মেলনের প্রথম দিন রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়া 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিবেন ও শোভাযাত্রা সহকারে সভামণ্ডপে গমন করিবেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিতে করিতে শোভাযাত্রা বাহির হইল। পথের আশে-পাশে বহু পুলিশ মোতায়েন ছিল। 'বন্দে মাতরম্' ব্যাজ-পরিহিত 'অ্যাণ্টি সার্কুলার সোসাইটির' সভ্যগণ যেমনি হাবেলী হইতে রাস্তায় পদক্ষেপ করিলেন, অমনি পুলিশ তাঁহাদের উপর লাঠি চালাইতে আরম্ভ করিল। লাঠি চালনার ফলে শোভাযাত্রাকারীদের মধ্যে অনেকে আহত হইলেন। ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেচারাম লাহিড়ী, ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার আঘাতই হইল সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। লাঠির আঘাতে চিত্তরঞ্জন পার্শ্ববর্ত্তী পুকুরের জলে ছিটকাইয়া পড়িলেন। শোভাযাত্রার প্রথম অংশ কিছু দূর আগাইয়া গিয়াছিল। প্রথম গাড়ীতে ছিলেন সভাপতি রসুল এবং পশ্চাতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু-প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পদব্রজে চলিতেছিলেন। পুলিশ কর্ত্তৃক লাঠি চার্জ্জের সংবাদে নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসেন। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কেম্প একমাত্র সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করেন। বে-আইনী শোভাযাত্রা পরিচালনার দায়ে ২০০৲ টাকা জরিমানা হয়। ইহা ছাড়া আদালত অবমাননার দায়ে আরও ২০০৲ টাকা জরিমানা ধার্য্য হয়।

এদিকে বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১১০৫ সালের মাঝামাঝি বারীন্দ্র যখন কংগ্রেস অধিবেশনে প্রচারের উদ্দেশ্যে অরবিন্দ-লিখিত অগ্নিদীপ্ত ভাষায় আপোষবিরোধীমূলক "No compromise" ও 'ভবানী-মন্দিরে' পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি লইয়া দ্বিতীয়বার বাংলা দেশে আসিলেন তখন বাংলার বৈপ্লবিক ধারা অনেক বেশী জমাট বাঁধিয়াছে। বুয়ার যুদ্ধে ক্ষুদ্র বুয়ার জাতির দৃঢ়তাপূর্ণ সংগ্রাম এবং জাপানের নিকট রাশিয়ার ন্যায় এক প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্রের ভীষণ পরাজয় বাঙ্গালীর প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছে। বাঙ্গালী তরুণ মাত্রেই ক্রুগ্নি, নোগুচি, নোগি প্রভৃতি বীরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহাদের পথকেই প্রকৃত দেশসেবার পথ বলিয়া মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সে জন্য অনুশীলন ও আত্মোন্নতি সমিতি প্রভৃতিও দল বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পাইতে লাগিল।

ভবানী-মন্দিরের বর্ণনা প্রসঙ্গে বারীন্দ্রকুমার বলেন যে, "ভবানী-মন্দির ছিল ১৬ পাতার চটি বই, অরবিন্দের নিখুঁৎ কবিত্বময় (Intutive) প্রজ্ঞাদীপ্ত ভাষায় ইংরাজীতে লেখা। এই অপূর্ব্ব পুস্তিকার বাংলা অনুবাদও হ'য়েছিল ব'লে অবিনাশ না কি মত প্রকাশ ক'রেছে, আমার কিন্তু এর বাংলা অনুবাদের কথা স্মরণ নেই। হিন্দু বাংলার জন্য পারমার্থিক ভিত্তিতে শক্তির নব প্রেরণায় জাতি-গঠনের এমন অনুপম আয়োজনের পুস্তিকার বাংলায় অনুবাদ হওয়াই খুব সম্ভব। ভবানী-মন্দিরের স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে এই চটি বইএর আরম্ভে লেখা ছিল—"Far from the contamination of modern cities and as yet little trodden by man in a high and pure air steeped in calm energy—"আধুনিক নগরীর মলিনতা ও কোলাহলের বাহিরে, জন-মনুষ্যের গতিবিধি নাই—এমন তুঙ্গ গিরিশিখরের শুদ্ধ পবিত্রতার কোলে এই ভবানীর-মন্দির নির্ম্মিত হবে। এখানে মাতৃপদে দীক্ষিত সন্তান দল সমর্পিত সাধনায় শক্তি সংগ্রহ করবেন—মায়ের সেবা ও কর্ম্মের জন্য। ছত্রপতি শিবাজী-পূজিতা ভবানীর চতুর্ভুজার রূপের ছিল এই পুস্তিকার যথাযথ বিবরণ ও স্তবস্তুতি, ভাবগম্ভীর ভাষায় ছিল মায়ের আবাহন; দেশের কাজে এতদর্থে ছিল অকুণ্ঠ অর্থ সাহায্যের আবেদন।'

বারীন্দ্রকুমার বাংলা দেশে দ্বিতীয় বার আসার পর সর্ব্বপ্রথম দেবব্রতকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করেন। ' দেবব্রতের বাড়ী ছিল সেই সময় ষ্টার থিয়েটারের পিছনে। নূতন কেন্দ্রের বাড়ী খুঁজিয়া

বাহির করা হইল দেবব্রতেরই বাড়ীর নিকটে গ্রে ষ্ট্রীট ও নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের সংযোগ-স্থলে রাজাদের' একটি ঘোড়ার আস্তাবলের উপর। একখানি বড় হল, রাস্তা হইতে সরু গলির ভিতর দিয়া সিঁড়ি উপরে উঠিয়া গিয়াছে। এই ঘরখানিতেই বারীন্দ্রকুমার ও দুই-এক জন কর্ম্মী বাস করিতেন। পরে খুলনার সুধীর সরকার আসিয়া যোগদান করেন। ইঁহার সঙ্গে সুদক্ষ কম্পোজিটার ব্রাহ্মণ যুবক যোশী আসিয়া মিলিত হন। সিঁড়ি হইতে উঠিবার মুখের স্থানটুকু পার্টিশনে ঘিরিয়া কিছু টাইপ কিনিয়া এই যুবককে 'ভবানী-মন্দির' কম্পোজ করিতে দেওয়া হয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে এই যুবকটি ভবানী-মন্দির ও 'No compromise' নামক পুস্তিকা দুইটির কম্পোজ সমাপ্ত করেন। পরে সুধীর সরকার ও আর একটি ছেলেকে লইয়া বারীন্দ্রকুমার কালীতলার গুপ্তপ্রেসে শেষ রাত্রে দ্বার বন্ধ করিয়া ভবানী-মন্দির পুস্তিকা ছাপেন। গুপ্তপ্রেসের কর্ত্তারা এই সর্ত্তে প্রেস ব্যবহার করিতে দিতে রাজী হন যে, তাঁহাদের সাধারণ কর্ম্মচারীরা চলিয়া গেলে গভীর রাত্রে প্রেসের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। পরে পুস্তিকা ছাপিয়া এই অবৈধ কাজকর্ম্মের সমস্ত নিদর্শন নিশ্চিহ্ন করিয়া রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই প্রস্থান করিতে হইবে।

ভবানী-মন্দির ছাপা শেষ হইলে দক্ষিণ-ভারতের গুপ্ত সমিতির নেতা বৃদ্ধ খাপার্দ্দে ও ডাঃ মুঞ্জেকে পাঠান হয় এবং গোপনে অনুরাগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

ইহার পর বারীন্দ্রকুমার অন্যতম কর্ম্মী হরিশ ঘোষকে সঙ্গে লইয়া বাহির হন ভবানী-মন্দিরের স্থান অন্বেষণে। প্রথমে মীর্জ্জাপুরে গিয়া ডাক্তার কৈলাস বসুর পাইক-বরকন্দাজ ও শিকারী সাঁওতাল দল লইয়া শোণ নদীর তীরে রোটাসগড় দুর্গের নিকট কাইমুর পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করেন। সমস্ত উচ্চ গিরিমালাটি অনুসরণ করিয়া তাঁহারা এক মাসের মাথায় বিন্ধ্যাচলের ডেহরি-অন-শোণের ষ্টেশনের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। "কৌয়াখো" নামক দুর্গম ব্যাঘ্রসঙ্কুল বনে জলপ্রপাতের উপর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া চারিটি খোঁটা পোঁতা হয়। স্থির হয়, কৈলাস বাবু এই জমি ভবানীর নামে ব্রহ্মোত্তর হিসাবে দান করিবেন। কিন্তু এত কষ্ট করিয়া অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা স্থানে ভবানী-মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্ভব হয় নাই। নানা কাজে ও যুগান্তরের অগ্নিগর্ভ প্রকাশে 'মা ভবানীর' পীঠস্থান রচনার কার্য্য স্থগিত রহিল।

গ্রে ষ্ট্রীট ও নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে বিপ্লবীদের নূতন আড্ডার বর্ণনা প্রসঙ্গে বারীন্দ্রকুমার বলেন যে, "এই বড় লম্বা হলঘরে ছেলেরা উপযোগী মানুষ ধরে ধরে আনতো ও আমি অনর্গল বক্তৃতায় তাদের বিপ্লবী ক'রে তুলতাম। দেবব্রতের ঘরেও বসতো আলোচনার বৈঠক। হরিশ ঘোষ এইখানে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়, কারণ সে ঐ গ্রে ষ্ট্রীটের কোন একটি প্রেসের সঙ্গে ছিল যুক্ত। আমরা ভবানী-মন্দিরের স্থান অন্বেষণের কাজ শেষ ক'রে ফিরে এসে আবার লাগি লোক সংগ্রহের ও কেন্দ্র রচনার কাজে। তখন যতীন দা' প্রব্রজ্যায় চলে গেছেন, আমাদের বাংলা কেন্দ্রের সভাপতি সাহেব পি, মিত্র মশাই ডুবে আছেন তাঁর অনুশীলন সমিতির লাঠি, ছোরাখেলার কাজে, আবার আমি এসে পূর্ব্ব যোগাযোগ স্থাপন ক'রে কাজে নামলাম বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ এবারকার চালক ও নেতা হ'লেন শ্রীঅরবিন্দ।

"বিপ্লব মন্ত্র নিয়ে দ্বিতীয় বার দেশে ফিরে আমাদের পুরাতন মেদিনীপুরের কেন্দ্র, বাঁকুড়ার কেন্দ্র, রংপুর, ঢাকার কেন্দ্র ক্রমশঃ নূতন প্রেরণায় নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলতে হোল। তারা এত দিন স্বদেশীর বন্যায় ক্রমশঃ গা ভাসিয়ে বিপ্লবী পন্থার কুটিলতা থেকে অনেকখানি সরে যাচ্ছিল। বিপ্লবের রক্তরাঙ্গা মৃত্যু-গহন আয়োজনে আশু ফলের মত্ততা ও নেশা নাই; পার্ব্বত্য নদীর জলের মতই চঞ্চল গণমনের গতি ও স্বভাব, পথে বন্ধুর পাষাণস্তূপের কঠিন বাধা পেলে সে উত্তাল প্রবাহমান স্রোত বাধাকে এড়িয়ে ঘুরপথে নরম মাটি ক্ষয় ক'রে পথ কেটে চলে। আমাদের ১১০২ সাল থেকে ১১০৪ সাল অবধি প্রতিষ্ঠিত বহু শাখাগুলি স্বদেশীর চটুল রঙে যাচ্ছিল রাঙিয়ে; সে আন্দোলন তার প্রধূমিত অবস্থা কাটিয়ে যেমন প্রজ্বলিত অবস্থা লাভ ক'রেছিল, তেমনি দেশের রুদ্ধ সঞ্চিত রোষ ও তাপ নানা বহিঃপ্রকাশে ফেটে পড়তে চাইছিল।

"স্বদেশী আন্দোলন বিপ্লব-যজ্ঞেরই বাহ্য দ্বার! এই আন্দোলন দেশ-আত্মার জঠরাগ্নির মধ্যে সঞ্চিত অগ্নিকে ইন্ধন যুগিয়েছিল; স্বদেশী ব্যর্থতাই সশস্ত্র বিপ্লবকে অনিবার্য্য ক'রে এনেছিল, তবু স্বদেশী সশস্ত্রে বিপ্লব নয়। বরিশাল কনফারেন্সে পুলিশের লাঠির ঘায়ে দেশ-যজ্ঞ পণ্ড হোল, এই ঘটনার ফলে বহু নরমপন্থীকে উগ্রপন্থীতে পরিণত করে। বরিশালের পুলিশ সুপার কেম্প ও ম্যাজিষ্ট্রেট ইমার্সন এই যজ্ঞমণ্ডপে আগুন দেবার বৈধ আইনের ছিলেন ভাড়াটে গুণ্ডা, সেখানে সুরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকুমার আদি নরমপন্থীর উপর চললো উৎপীড়ন! অরবিন্দ এ দক্ষযজ্ঞ নাশের ছিলেন নীরব নির্ব্বাক্ দ্রষ্টা।

"এর দুই মাস আগে ১১০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কিন্তু মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্স হ'য়ে চুকেছে, সেখানে আমাদের মেদিনীপুর গুপ্তচক্রের কর্ম্মীরা ছিল প্রচ্ছন্ন ভাঙনের সেনারূপে। সত্যেন বসুর ইঙ্গিতে বালক ক্ষুদিরাম এই কনফারেন্সে কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনীতে গুপ্ত প্রচারপত্র "সোনার বাংলা" ও "No compromise" বিতরণ করতে গিয়ে ধরা পড়ে; সত্যেন বসুর চেষ্টায় ক্ষুদিরাম মুক্তি পায়। তখন সত্যেন কালেক্টরীতে একটি কেরাণীগিরির চাকরী করতেন। এই ঘটনার কর্ণধার সন্দেহে ম্যাজিষ্ট্রেট সত্যেনকে কড়া জেরা করেন। আত্মপক্ষ সমর্থন না ক'রে নীরব থাকায় তার কেরাণীগিরিটি খসে যায়। ১১০৬ সাল বহিরঙ্গ স্বদেশীর প্রজ্বলিত অবস্থা ও অন্তঃসলিলা সশস্ত্র মৃত্যু-যজ্ঞের ঠিক সন্ধিক্ষণ; অরবিন্দ আমাদের গ্রে ষ্ট্রীটের বাসায় এসে কিছু দিন ছিলেন। এই ঘরে বড় কুতার্কিক মানুষের বিপ্লবী-বিরোধী মতি ফেরাবার জন্য আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্কজাল খণ্ডন ও বিস্তার করতাম, নীরব অরবিন্দ ... মৌনী হ'য়ে বসে শুনতেন। আগন্তুকরা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারতো না—এই নীরব শ্রোতাটি স্বরূপতঃ কে।"

[ক্রমশঃ।

গল্পকার শরৎচন্দ্র

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচরিতা রায়

শরৎচন্দ্র

"ভবানীপুর সাহিত্য সম্মিলনে" অভিভাষণ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেন, "মানুষ বিরহ-কাতর হইয়া প্রিয়জনের নিকট পত্রে নিজের মনের গোপন ব্যথা জানায়, ছোট গল্পের জন্ম সেখানে। প্রণয়পত্র হইতে ছোট গল্পের উদ্ভব। হৃদয়ের প্রেমের সমস্তটুকু সংক্ষিপ্ত আকারে রিক্ত করিবার উপায় ছোট গল্প, ইহা সমগ্র জীবনের কথা নহে।" তাই শরৎচন্দ্রের গল্পগুলি আবেগপ্রধান মনোবিশ্লেষণ-মূলক। ছোট গল্পগুলির মধ্যেও তাঁর কবি-মানসের প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ছিল ঔপন্যাসিক প্রতিভা, তাই তাঁর ছোট গল্পগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উপন্যাসধর্মী হ'য়ে উঠেছে। তাঁর ছোট গল্পের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তির বিশ্লেষণ, ঘটনার বাহুল্য দেখা যায়। কিন্তু ছোট গল্পে থাকা উচিত রসের এককত্ব। শরৎচন্দ্রের ছোট গল্পের প্লটগুলি বেশীর ভাগই উপন্যাসধর্মী। তাই ছোট গল্পের সমাপ্তিতে যে ইঙ্গিতময়তা, ভাবের ঐক্যবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়, তা' সর্বক্ষেত্রে রক্ষিত হয়নি। চরিত্রের বহুলতা, ঘটনার বৈচিত্রতা, রসের বিভিন্নতা, সমস্যার জটিলতা ছোট গল্পের পরিপন্থী।

আমাদের জীবনে সমস্যা দেখা দেয় সমাজ ও পরিবারকে কেন্দ্র করে। সেখানকার স্নেহ-প্রেম আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের অভিঘাতে আমাদের নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায় তরঙ্গ ওঠে। সেখানেই দেখা দেয় গল্পের খোরাক। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বন্দ্বের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে শরৎচন্দ্রের রচনারীতি রবীন্দ্র-প্রভাবিত হ'লেও একটু ভিন্ন জাতের। তাই শরৎচন্দ্রের গল্পে বাস্তবতা আরও তীব্র ও স্পষ্ট, সেখানে কাব্যিক প্রকাশ অপেক্ষা জীবন-সত্যের প্রকাশই অধিক। তাই আবেগ সেখানে ভাবের গভীরতারই পরিপোষক। "তাঁহার গল্পগুলিতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র সংঘাতগুলি অন্তর্বিপ্লবের বিদ্যুৎ-চমকে দীপ্ত হইয়া উঠে। তিনি কোথাও কেবল ঘটনা-বৈচিত্র্য বা কাব্য-সৌন্দর্য্যের জন্য কোন দৃশ্যের অবতারণা করেন না—প্রত্যেক দৃশ্যই চরিত্রের উপর আলোকপাত করে।" তাই দেখা যায় যে আমাদের জীবন-সত্যের ওপরই শরৎচন্দ্রের ছোট গল্পগুলি রচিত। সেখানে বাহ্যিক ঘটনা-বাহুল্য অপেক্ষা ব্যক্তিমানস ও সমাজ-সত্তার সংঘাতজাত যে বিক্ষোভ—সেটাই তাঁর গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য। শরৎচন্দ্রের সমাজবোধ ও নরনারীর পরিচয়ের নিবিড়তা ও জীবন-জিজ্ঞাসার প্রভাব তাঁর গল্পগুলিকে একটা স্বাভাবিক ব্যাপ্তি দান করেছে। তাই সাংকেতিকতা অপেক্ষা দ্বন্দ্বময় গভীরতাই তাঁর ছোট গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য। শরৎচন্দ্রের গল্প বলবার ভংগীটি হৃদয়গ্রাহী, রচনা-রীতি সহজ সরল অথচ মর্ম্মস্পর্শী, সংলাপে পল্লবিত বিস্তার নেই, শিল্প-জ্ঞানে পরিমিতি বোধ এবং ঘটনা নির্বাচন-ক্ষমতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি নিজেই বার বার বলেছেন যে অন্য লেখকের যে জন্য ভাবনা হয়, সেই প্লটের জন্য তাঁকে কোন দিনও চিন্তা করতে হয়নি। তাই তাঁর ছোট গল্পগুলির আন্তর সুরের মধ্যে একটা সমতা থাকলেও, চরিত্রগুলি তাঁর কবি-মানসেরই প্রকাশ হ'লেও, প্রকাশভঙ্গী ও প্লটের দিক দিয়ে প্রত্যেকটি গল্পই অভিনব।

তাঁর ছোট গল্পের প্রকাশিত সংখ্যা হচ্ছে ৩৫। তা' ছাড়া বর্তমানে লুপ্ত ছোট গল্পের সংখ্যাও আপাততঃ যা' সন্ধান করে পাওয়া যায় তা' হচ্ছে দু'টি—অভিমান, পাষাণ। কাক-বাসা (বা বাসা উপন্যাস), ব্রহ্মদৈত্য (উপন্যাস) বর্তমানে লুপ্ত।

শরৎচন্দ্রের গল্পগুলির রচনা-কালের ধারা ঠিক করা অত্যন্ত দুরুহ। কারণ, প্রকাশের তারিখের সঙ্গে রচনা-কালের কোন সাদৃশ্য নেই। ব্রজেন বাবু দেখিয়েছেন যে, অনেক পূর্বেকার রচনা বহু পরে প্রকাশিত হয়েছে। তবুও আমরা যত দূর সম্ভব পরিশ্রম করে একটা ধারাবাহিক রচনা-কাল নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছি, সেই ভাবেই ছোট গল্পগুলি আলোচনা করে তাঁর কবি-মানসের ক্রম-বিকশিত জাগরণ দেখাতে চেষ্টা করবো।

শরৎচন্দ্র-রচিত প্রাথমিক রচনা যা' প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে 'বাগান' নামাঙ্কিত খাতার পৃষ্ঠায় রচিত গল্পগুলি শরৎ-সাহিত্যের আদি যুগের। 'বাগান' তিন খণ্ডে সমাপ্ত—প্রথম খণ্ডে 'কাশীনাথ', 'বোঝা', 'অনুপমার প্রেম'; দ্বিতীয় খণ্ডে 'কোরেল গ্রাম' (পরবর্তী কালে ছবি), শিশু (পরবর্তী কালে বড়দিদি) ও চন্দ্রনাথ; তৃতীয় খণ্ডে হরিচরণ, দেবদাস ও সুকুমারের বাল্যকথা (পরবর্তী কালে বাল্যস্মৃতি)।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'কাশীনাথ' গল্পটি আলোচনা করবার আগে গল্পটি সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মতামত জানা দরকার। শরৎচন্দ্র বলেন," ···কাশীনাথ ···ছেলে বেলার হাত পাকানোর গল্প।···লোকে হয়তো মনে করবে আমার লেখার ক্ষমতা কাশীনাথের অধিক নয়। এটাতে যে নাম খারাপ হয়··· আমার কাশীনাথটা অতি ছেলে বেলাকার লেখা।" কাশীনাথ গল্প রচনায় শরৎচন্দ্রের ব্যক্তি-জীবনের প্রভাব যথেষ্টই পড়েছে। শরৎচন্দ্র শৈশবে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত। তিনি ছিলেন সংসার সম্পর্কে নির্লিপ্ত, ভবঘুরে প্রকৃতি। কাশীনাথ-চরিত্র এই ছাঁচে গঠিত। প্রত্যক্ষ জীবনে কাশীনাথ ছিলেন শরৎচন্দ্রের সহপাঠী এবং তাঁর পণ্ডিত মশাইয়ের পুত্র। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়বার সময় এই গল্পের প্লট ও নাম নির্ণীত হয়েছিল।

কাশীনাথ গল্পে শরৎচন্দ্রের কবি-মানসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রথম ধরা যায়। তা'ছাড়া শরৎ-সাহিত্যের ট্র্যাজিডির যে স্বরূপ, কাশীনাথ গল্পে তারও পরিচয় পাই। সুতরাং শরৎচন্দ্রের কবি-মানস ও ট্র্যাজিডির স্বরূপ সম্পর্কে কয়েকটি কথা সাধারণ ভাবে বলে নেওয়া দরকার।

শরৎ-কবি-মানস

শরৎ-সাহিত্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে দু'টি বিভিন্ন মানস-প্রবণতাকে কেন্দ্র করে। তিনি যখন সজ্ঞানশিল্পী তখন তিনি সমাজসেবীর মনোভাব নিয়ে নানা সহানুভূতিপূর্ণ সম্ভাবনার ইঙ্গিত ঐ সমস্ত চরিত্রে ফোটাতে চেয়েছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের অবচেতন মনে ক্রিয়াশীল ছিল যে প্রকৃতিটি, সেখানে শরৎচন্দ্র ব্যাখ্যাতা ন'ন, স্রষ্টা। স্রষ্টা শরৎচন্দ্র সামাজিক বিচারের মানদণ্ডে চরিত্রগুলির ভাল-মন্দ, অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করেননি, চরিত্রগুলির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব জাত যে অন্তঃপ্রকাশ, চিত্তের সূক্ষ্ম অনুভূতির উন্মোচন ঘটেছে তা' জীবন-জিজ্ঞাসারই সমাধান। সেখানকার চরিত্রগুলির প্রকাশ তাঁর সজ্ঞান শিল্পিমনের বিকাশ হয়। সৃষ্টির মোহে তাঁর নিজস্ব চরিত্রের একটা গোপন দিক পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাই শরৎ-সাহিত্যের যে দ্বন্দ্ব তা সর্ব ক্ষেত্রেই সমাজ-সত্তা বা ব্যক্তি-সত্তার দ্বন্দ্ব, এমন কোন মতামত নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। যেখানে শরৎচন্দ্রের সজ্ঞান মনের প্রকাশ ঘটেছে সেখানে তিনি সত্যিকারের স্রষ্টা হয়ে উঠতে পারেননি। তাই শরৎ-সাহিত্যের নায়ক-নায়িকার যে ট্র্যাজিডির স্বরূপ তা নর-নারীর প্রেম-প্রকৃতিকে কেন্দ্র ক'রে দেখা দিয়েছে; সেখানে সামাজিক বাধা প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। দু'টি নরনারী—এক পক্ষ উদাসীন, অনাসক্ত, আত্মভোলা পুরুষ, অন্য পক্ষের তাই নানা ছলাকলা, সৌন্দর্যের জাল-বিস্তার, মোহসৃষ্টির চেষ্টা, হৃদয়ের তীব্র আকর্ষণ। এই দুই প্রকৃতির দ্বন্দ্বজাত যে জীবনরস, শরৎ-সাহিত্যের মূল রসই হচ্ছে তাই। সেদিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, শরৎ-সাহিত্যের ট্র্যাজেডির আবির্ভাব তিন দিক থেকে—বহির্দ্বন্দ্বমূলক, অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক এবং দ্বন্দ্বহীন। উপন্যাসগুলির মধ্যেই এই কবি-মানসের প্রকাশ সুষ্ঠুভাবে ঘটেছে। ছোট গল্পের মধ্যে বা উপন্যাসধর্মী গল্পগুলির মধ্যে এই মানসের প্রকাশ তত স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায় না। তাই উপন্যাসগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবার ইচ্ছা রইলো।

প্রেম-প্রকৃতি ও ট্র্যাজেডির স্বরূপ বিশ্লেষণ

সমগ্র শরৎ-সাহিত্যের প্রাণসত্তা সঞ্জীবিত হয়েছে নারী-পুরুষের সম্বন্ধকে ভিত্তি করে। এ সম্বন্ধ প্রধানত প্রেম-প্রকৃতির ওপরই নির্ভরশীল। শরৎচন্দ্রের আদর্শানুযায়ী নারীই প্রেম-স্বরূপা। সুতরাং শরৎচন্দ্রের প্রথম যুগের ছোট গল্প-পর্যায়ের রচনা থেকে আরম্ভ করে পরিণত যুগের উপন্যাস পর্যন্ত লেখকের নিজের এবং তাঁর পরিকল্পিত নায়ক-নায়িকার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শরৎচন্দ্রের অবচেতন মনে নর-নারীর প্রেম-সম্পর্কের বিচিত্র অভিব্যক্তিকে একটি পরীক্ষামূলক ধারায় এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা ছিল বলে মনে হয়। কারণ, শরৎচন্দ্র প্রথম যুগের রচনায় নর-নারীর সম্পর্ককে যে পরিস্থিতিতে স্থাপন করে জীবন-জিজ্ঞাসার উত্থাপন করেছেন তার পরবর্তী স্বরূপ সম্পূর্ণ অভিনব। এখন প্রধান প্রশ্ন এই যে, শরৎচন্দ্র নিজেই ক্রমশ: সামাজিক এবং মানসিক সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন ক'রে উঠেছেন, না, এ শুধু তাঁর স্রষ্টা-মনের বিভিন্ন ধারায় সৃষ্টি-কুশলতার পরিচয়? সমাজ-পোষ্য বাঙালী জীবনে নর-নারীর প্রেমে যে "পাপের চিহ্ন" বদ্ধমূল হয়ে সামাজিক চেতনায় স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল, শরৎচন্দ্র তাঁর প্রথম যুগের রচনা "কাশীনাথে" সেই সামাজিক বন্ধনকে ছিন্ন করতে পারেননি; হয়তো তাঁর মন তাতে সায় দেয়নি। তাই বিবাহিত জীবনেই প্রেম-বোধকে সর্বপ্রথম সক্রিয় করে তুলতে চেয়েছেন। কাশীনাথ ও কমলা যথাক্রমে স্বামি-স্ত্রী হয়েও সমস্ত জীবনে মনে-প্রাণে সামঞ্জস্য আনতে পারেনি—কিন্তু কেন? স্বামি-স্ত্রীর চিরাচরিত বন্ধন সেই অগ্নি সাক্ষী করে মন্ত্র পাঠ করবার সময়ই তো অক্ষয় হ'য়ে উঠেছিল। শরৎচন্দ্রই প্রথম বোঝালেন, স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্ক ঐ আখ্যাটুকুর মধ্যে নিহিত নেই, আছে অন্তর সত্তায়। সেখানে যে অহরহ পুরুষ ও নারীর প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে আকর্ষণ-বিকর্ষণের লীলা চলেছে, তার প্রতি চোখ বুজে থাকলে সামাজিক দিকটাই প্রধান হয়ে উঠবে। সুতরাং যদিও শরৎচন্দ্র বিবাহিত স্বামি-স্ত্রীকে কেন্দ্র করে 'কাশীনাথে' জীবনের অনিবার্য দুঃখময় অধ্যায়ের ইতিলিপি রচনা করেছেন, তবুও এ কথা বলা যায়, জীবন-সমস্যার যে প্রধান অংশটিতে তিনি আলোকপাত করেছেন তার অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনাকে প্রকাশিত করতে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। 'কাশীনাথ' রচনায় শরৎচন্দ্রের সংস্কার বিমুক্তি তাঁর অস্পষ্ট চেতনায় হয়তো ঘটেছিল, কিন্তু সমাজ-অসমর্থনকে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস বা সাহস তখনও দেখা দেয়নি। 'কাশীনাথে'র কাহিনীকে এক হিসেবে শরৎ-সাহিত্যের ট্র্যাজিডির উদ্বোধন বলা যেতে পারে। এক দিকে সামাজিক শক্তি, অপর দিকে অবৈধ-প্রণয়ের অপ্রতিহত আকর্ষণ চরিত্রকে কতটুকু নিয়ন্ত্রিত করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য না করেও, এ কথা অস্বীকার করা চলে না স্বতন্ত্র চরিত্র-বৈশিষ্ট্যই জীবনে সমস্যার বন্ধনকে করেছে আরও জটিলতর। সুতরাং সধবা কমলা, বিধবা রমা, গৃহত্যাগিনী সাবিত্রী, স্বামী কর্তৃক লাঞ্ছিতা অন্নদা, স্বামী বর্তমানে অপরের প্রতি আসক্তা অচলা, সমাজনীতি বিরোধী কমল যথাক্রমে সামাজিক দায়িত্ববোধের কাছে কখনো করেছে আত্মসমর্পণ, কখনো জানিয়েছে অস্বীকৃতি, কিন্তু সব ক্ষেত্রে প্রধান

হয়ে উঠেছে তাদের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য। উদাসীন-প্রকৃতি কাশীনাথের নির্লিপ্ততা কমলাকে করেছে ক্ষুব্ধ, তার প্রেম বারে বারে প্রতিহত হয়েছে—তাই স্বামি-স্ত্রীর চিরন্তন বোঝা-পড়ার নজিরেও কাশীনাথ-কমলার অন্তরের ব্যবধান মিলনে পর্যবসিত হয়নি।

'পল্লী-সমাজে' শরৎচন্দ্র আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। এখানে নর-নারীর প্রেম-প্রকৃতির মহনীয়তা আরও মর্মস্পর্শী এবং অনিবার্য। কিন্তু সমাজ-সমর্থিত সীমাকে এখানে শরৎচন্দ্র অতিক্রম করেছেন। রমা বিধবা, সুতরাং বাল্য-প্রণয়ের সূত্র ধরে রমেশের প্রেমকে বরণ করবার ক্ষমতা সে হারিয়েছে। এখানে রমা-রমেশের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য উভয়ের মিলনে পরিপন্থী হয়েছে কি না, শরৎচন্দ্র তা' স্পষ্ট করে জানাননি। কিন্তু তখন পর্যন্তও যে লেখক সমাজের দায়িত্বকে—তা' অমূলকই হোক আর যথার্থ হোক—অস্বীকার করতে পারেননি তা' বোঝা যায়। বিধবা রমা ও বলিষ্ঠ-চিত্ত রমেশ সমাজের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি তখনও প্রতিষ্ঠা করতে উদ্‌গ্রীব হয়, তাই শরৎচন্দ্র সমস্ত গ্রন্থখানিতে সামাজিক জীবনের বৈপরীত্য-পূর্ণ চিত্র আঁকতেই রইলেন ব্যস্ত এবং রমা-রমেশের প্রেম-প্রকৃতি সমাজের যূপকাষ্ঠে আত্মসমর্পণ করেই রইলো নিষ্ক্রিয়। এক হিসেবে বলা যেতে পারে, সমাজ-বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করে তার গুরুত্ব সামলে নিতেই তিনি ব্যস্ত ছিলেন—বিধবা রমার প্রেমের প্রতি সুবিচার হয়তো তিনি সমাজের মুখ চেয়েই উপেক্ষা করেছেন। সুতরাং শরৎচন্দ্র নর-নারীর চিত্তের অসহনীয় দ্বন্দ্বের বিচিত্র আবর্তনে যখন সৃষ্টি-প্রবণ হয়ে উঠেছেন—সেখানে সমাজের এবং জাতির দুর্বলতার প্রতি তীব্র আঘাত করে উচিত-অনুচিতের সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করতে সেননি। নর-নারীর আদিম প্রবৃত্তিতে সামাজিক নিষ্ঠার বাইরেও যে একটা সহজাত অনুভূতি বিরাজমান, যা পরস্পরকে নিয়ত কখনো করেছে আকৃষ্ট; কখনো দূরে সরিয়ে দিয়েছে; শরৎচন্দ্র নর-নারীর বিভিন্নতর সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে দেখতে চেয়েছেন। এ প্রচেষ্টায় শরৎচন্দ্র অগ্রসর হয়েছেন নারী-চরিত্রের সহায়তায়। শরৎ-চন্দ্রের দৃষ্টিতে পুরুষ 'শেকল-ছেঁড়া-পাখী।' নারী যত বার যত রূপেই তাকে প্রেমের খাঁচায় বন্দী করুক না কেন বারে বারেই সে শেকল কেটে উড়ে যাবে। তাই রাজলক্ষ্মীকে সারা জীবন শ্রীকান্তের গেরুয়া বসন মুক্ত করাতেই কেটেছে। বিধবা রমা রমেশকে স্বামিরূপে গ্রহণ করার বিপক্ষে সমাজ-শক্তি যতই প্রধান হয়ে দেখা দিক না কেন রমা-রমেশের দিক থেকে তাদের ব্যক্তিগত কৈফিয়ৎ শরৎচন্দ্রকে বিশেষ সচেতন করেনি।

'চরিত্রহীনে' সাবিত্রী তার প্রেম-মহিমার জয়গান করে জানালো, সতীশের সামাজিক সম্ভ্রম সে স্ত্রী হিসেবে দাবি জানিয়ে ক্ষুণ্ণ করতে চায় না। নারীর ত্যাগ-নিষ্ঠাই তার প্রেমের মর্যাদা বহন করেছে। অন্য দিকে কিরণময়ী সমাজ লঙ্ঘন করতে গিয়েও নির্লিপ্ত উপেন্দ্রের কাছে মর্যাদা পেল না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নর-নারীর প্রণয়ের স্বরূপ পরিকল্পিত করেও শরৎচন্দ্র অবৈধকে বৈধরূপে প্রমাণ করবার দৃঢ়তা তখনও সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করতে পারেননি। তিনি বাঙলা দেশের নারী সমাজে যে কঠোর হৃদয়-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত দেখেছেন, সেখানে নারীর দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে ব্যথার ইতিহাস লিখতে গিয়েও,

বিখ্যাত স্বর্ণ শিল্পী ঃ—
বি, সরকারের পৌত্র,
শ্রীনারায়ণ সরকারের
পরিচালনায়
আধুনিকতম অলঙ্কার শিল্প প্রতিষ্ঠান

বি, বি, সরকার কোং লিঃ
১৬০-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ফোন ঃ—বি, বি, ১২৫৩

তিনি প্রায়ই হয়েছেন পথভ্রষ্ট। প্রকৃতপক্ষে তখনই শরৎচন্দ্রের শিল্পি-মন জাগ্রত হয়েছে।

'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলা মহিমের মতো উদার-গভীর চরিত্র স্বামীর সান্নিধ্যেও সুরেশের আকর্ষণকে অবহেলা করতে পারেনি। নারীর প্রেম-প্রকৃতি পুরুষের নিষ্ক্রিয়তায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে,—অচলা তাই সুরেশের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেই মহিমের মহত্ত্ব উপলব্ধি করেছে। এখানে শরৎচন্দ্র স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্ককে মহিমান্বিত করবার উদ্দেশ্য গ্রহণ করেছেন কি না জানি না, কিন্তু মহিমের ঔদাসীন্য অচলাকে চঞ্চল ক'রে সুরেশের আকর্ষণে আত্ম-সমর্পণের পথ দেখিয়েছে। বাঙলার সমাজে এক নারীর পক্ষে দু'জন পুরুষকে একই সময়ে ভালবাসা যায় কিনা অচলার জীবনে সেই প্রশ্নের পরীক্ষা উপস্থিত হয়েছিল। মহিমের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য অচলার জীবনে এনেছে ট্র্যাজিডি; মহিম-অচলা চির নৈকট্যের সম্মুখীন হবার মুহূর্তে দেখা দিয়েছে সুরেশ, এবং মহিম চরিত্রের নিস্তরঙ্গ গভীরতা অচলার জীবনে যে অভাব-বোধের সৃষ্টি করেছে তার ক্ষতিপূরণ করতে গিয়ে জীবনকে অচলা করে তুলেছে আরও ক্ষতপূর্ণ।

"শ্রীকান্ত" গ্রন্থে অভয়া চরিত্রে শরৎচন্দ্র প্রথম সমাজকে অস্বীকার করবার ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন। বিবাহের কয়েক ঘণ্টা মন্ত্র পাঠের ফলে স্বামীর যে স্ত্রীর ওপর অধিকার জন্মে, সেই অধিকারের সুযোগ নিয়ে যদি স্বামী স্ত্রীকে তীব্র অত্যাচারে লাঞ্ছিত করে, তবে স্ত্রীর পক্ষে কি কর্তব্য? অভয়া প্রতিবাদ জানিয়েছে,—সে রোহিণীকে দিয়ে প্রেমের সত্য পথ দিয়ে নূতন জীবনকে অভিনন্দন জানিয়েছে। তার ভাবী সন্তানরা তাদের মায়ের পরিচয় দানে সমাজের কাছে কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেও সত্য-ভ্রষ্ট হবে না—এই অভয়ার বিশ্বাস। সুতরাং অভয়া সামাজিক বিধানকে অন্যায় বলে প্রতিপন্ন করতে সাহসী। তার প্রেম-প্রকৃতি আত্ম-প্রতিষ্ঠ। বিপর্যস্ত রোহিণী বাবু নারীর স্নেহপুটে চেয়েছে আশ্রয়, অভয়ার অভয় বাণী তার জীবনে এনেছে চরিতার্থতা। বাঙালী সমাজ-অসমর্থিত যে জীবন অভয়া গ্রহণ করেছে, তা' বাঙলা দেশে বাস করে নয়, ব্রহ্মদেশে। শরৎচন্দ্র এখনও সম্পূর্ণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি। তার পরিচয় পাই রাজলক্ষ্মীকে দিয়ে। এই অভয়াকে রাজলক্ষ্মী শ্রদ্ধা করে, কিন্তু অভয়ার অনুভূতি তার জীবনে সম্ভব হয়নি। রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের জীবন-সমস্যা সমাজগত বা ব্যক্তিগত যুক্তি শৃঙ্খলার বাইরে। তাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, রাজলক্ষ্মীর প্রেম শ্রীকান্তকে যত বার বন্ধনগ্রস্ত করতে চেয়েছে—শ্রীকান্ত যেন আরও হয়ে উঠেছে ভবঘুরে—। শ্রীকান্তও রাজলক্ষ্মীর আকর্ষণকে ভুলতে পারে না—তার নিঃসহায় জীবনে রাজলক্ষ্মীর সেবা-যত্ন-আকুল আগ্রহবোধ যে কতখানি স্থান অধিকার করেছে তা' শ্রীকান্ত জানে। কিন্তু রাজলক্ষ্মীকে তো সামাজিক জীবনে গ্রহণ করা চলে না। সে যে আর "রাজলক্ষ্মী" নেই, পিয়ারী বাইজী। শরৎচন্দ্র এই গ্রন্থে সমাজকে আর একবার বোধ হয় পরখ করতে চাইলেন—বাইজীর সঙ্গে প্রেম কি করে সম্ভব? সে জন্যই কি রাজলক্ষ্মী চরিত্রে সতীত্বের মান নিরূপণ করতে বারে বারে তার গুণগান করেছেন? কিন্তু এ তো চরিত্র-ব্যাখ্যা! নর-নারীর হৃদয়ে যে প্রেম উভয়কে কেন্দ্র ক'রে আকর্ষণ-বিকর্ষণের লীলা সঞ্জীবিত করে, শিল্পী শরৎচন্দ্রের অবচেতন মনে সেই রূপদর্শনের ইচ্ছাও কম বলবতী হয়ে ওঠেনি। তাই বোধ হয় দরদী সমালোচকের মতো কেবল রাজলক্ষ্মীর চরিত্র-মাধুর্য্যের প্রশস্তি রচনা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তিনি দেখেছেন, এক দিকে যেমন রাজলক্ষ্মী ঐ উদাসীন পুরুষ শ্রীকান্তকে বাঁধতে না পেরে অন্তর্দ্বন্দ্বে হয়েছে বিক্ষুব্ধ এবং শ্রীকান্তকে ঈর্ষা-কাতর করে তোলবার জন্য ব্যগ্র হয়েছে, তেমনি বিপরীত পরিচয় পাই যখন শ্রীকান্ত প্রকৃতই তার ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ রাজলক্ষ্মীর হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছে। রাজলক্ষ্মী যেন ভালবাসে সেই উদাসীন ভবঘুরে লোকটিকেই। চিত্তদৌর্বল্যে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর প্রেমের অনুগত হয়ে থাকবে এ যেন রাজলক্ষ্মীকে তৃপ্তি দিতে পারেনি। এমনি ভাবে সমগ্র 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থে আমরা দেখেছি, উভয়ের মিলনে বাধা এসেছে তাদের নিজের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য থেকে। সমাজের ভয়কে এক সময় রাজলক্ষ্মী অতিক্রম করেছে, কারণ সে জানে তার প্রেমের মহনীয় শক্তির স্বরূপকে। অভয়ার মতো সমাজের বিরুদ্ধে রুক্ষ উক্তি হয়তো সে করেনি, আচার-নিয়ম-নিষ্ঠায় সে সমাজকে মেনেছে—কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা, শ্রীকান্তের নির্লিপ্ত প্রকৃতি এবং রাজলক্ষ্মীর অনন্যসাধারণ নারী-প্রকৃতি তাদের জীবনে ট্র্যাজিডিকে রূপ দিয়েছে।

এর পরে শরৎচন্দ্রের "শেষ প্রশ্ন"—প্রকৃতই কি একনিষ্ঠ প্রেমের বা আত্মত্যাগের কোন সার্থকতা আছে? মন যেখানে শুকিয়ে যায়, কি হবে জোর ক'রে বিবাহের বন্ধনকে দৃঢ় করে? অভয়া চেয়েছে স্বামী-গৃহ-সন্তান অর্থাৎ সমাজে প্রতিষ্ঠা। কিন্তু কমল প্রাধান্য দিয়েছে মনের বাঁধনকে। প্রেমের একনিষ্ঠতার দোহাই দিয়ে নর-নারীর ঘনিষ্ঠতাকে চিরস্থায়ী করা যায় না। কমল-চরিত্র শরৎচন্দ্রের "শেষ প্রশ্নের" একটি সুদীর্ঘ প্রশ্ন-সঙ্কুল তালিকা। এই চরিত্রকে সামনে রেখে শরৎচন্দ্র যেন কমলা-রমা-সাবিত্রী-রাজলক্ষ্মী-অন্নদা দিদির জীবন-বৃত্তের যাচাই করেছেন। 'কমল' শরৎচন্দ্রের বুদ্ধি-বৃত্তিকে জাগ্রত করে প্রস্ফুটিত। হৃদয়-বৃত্তির প্রাধান্যে পুষ্ট শরৎ-সাহিত্যের পূর্বযুগের নারীচরিত্রগুলি মৃণালের কাঁটায় আহত হ'য়েছে বটে, তবুও সাহিত্য-বিচারের মানদণ্ডে 'কমল' ম্রিয়মাণ। কিন্তু কমলা-রমা-রাজলক্ষ্মী-অন্নদা-সাবিত্রী-অভয়া চরিত্রগুলি তাদের নামের মধ্যে দিয়ে যে ব্যঞ্জনা জাগিয়েছে তার লাবণ্যটুকু চির ভাস্বর।

শরৎচন্দ্রের কবি-মানস সংস্কার মুক্ত হয়েছে বলেই 'কমল' চরিত্রের আবির্ভাব—এ কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা সবটুকু বলেন না। শরৎ-মানস কিন্তু একই জায়গায় স্থির হ'য়ে আছে। অভিজ্ঞতা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের দর্পণটিও তাঁর এমনই স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে যে, প্রতিভার প্রতিবিম্বনে সাত রঙা রামধনুর মতো কমলা-রমা-সাবিত্রী-অচলা-অভয়া-রাজলক্ষ্মী-কমল শরৎ-সাহিত্যাকাশে ক্রমোজ্জ্বল। [ক্রমশঃ।

জেনে রাখা ভাল

পাখীর কোন ঘ্রাণশক্তি নেই। কয়েক জাতের পাখী আছে যাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই নেই।

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

বহরমপুরের গরমের কথা আজও মনে পড়ে। সারা জীবন মনে থাকবে। এখানে একশো ডিগ্রি উঠলেই সাধারণতঃ আমরা আঁকুপাঁকু করতে থাকি। তার পর যদি আরও দু'-চার ডিগ্রি বেড়ে যায়, তাহলে তো ছাত্র দল প্রাতঃকালীন স্কুলের জন্য ধর্মঘট করে বসে আর চাকুরেরা জানালায় ও দরজায় ঝলিয়ে দেন খস্‌খস্‌। কিন্তু উত্তাপ যদি আরো বেশ কয়েক ডিগ্রি বেড়ে যায়, ব্যারোমিটারের পারা একেবারে বারো বা তেরোয় গিয়ে ঠেকে, তাহলে? তাহলে এখানকার আমরা হয়তো আলুসেদ্ধই হয়ে যাবো কিংবা বেগুন-পোড়া!

কিন্তু বহরমপুর বন্দীশিবিরে স্কুল ছিল না আর আমরা ছিলাম না চাকুরে, মহামান্য ইংলণ্ডের রাজা ও ভারতের সম্রাটের সম্মানিত অতিথি। জানালায়-দরজায় খস্‌খস্‌ নয়, আছে চিক্‌। সাবধানে সেই চিক্‌গুলো ফেলে দিতাম আমরা এবং নর্দমা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যে বালতির পর বালতি জল ঢেলে তৈরী করা হতো কৃত্রিম লেক! সেই লেকের তক্তপোষ-দ্বীপে বকের মতো সমাধিস্থ হয়ে বসে-বসে কাটাতে হতো আমাদের প্রত্যেকটি দুপুর।

র‍্যাকেটের ওপর জামাগুলো যেন সদ্য-নামানো পটেটো চিপ্‌স্‌, গায়ে দিলে গা পুড়ে যেতে পারে! জুতোগুলো যেন বয়লার থেকে বার-করা কয়লার টুকরো, জলে না ভিজিয়ে নিলে ছোঁবার উপায় নেই! তেমনি টেবিল, তেমনি চেয়ার, তেমনি বই, তেমনি সব!

হু-হু করে বইছে হাওয়া এলোপাথাড়ি, কিন্তু তাতে আগুনের হল্‌কা শাহারা বা গোবির। চিল্কার মিষ্টি হাওয়া সেখানে রূপকথা! অগ্নিপুচ্ছ দুলিয়ে দুলিয়ে সেই হাওয়া সর্বত্র ছড়িয়ে যাচ্ছে অগ্নিকণা! কিন্তু রক্ষা যে, হাওয়ায় আদ্র'তা একেবারে নেই বললেই হয়। তাই গরমে আগুন হয়ে উঠি, ঘেমে আর নেয়ে উঠতে হয় না।

রাত্রিটা কিন্তু তেমন অসহ নয়। দুপুরের সেই গরম হাওয়াটাই রাত্রে কেমন নরম হয়ে আসে অনেক ক্রোধের পর মুচকি হাসির মতো। আর রাত বারোটার পর থেকেই সেই নরম হাওয়া কেমন ভিজে-ভিজে লাগে দরদী অশ্রুর মতো। তখন চাদরখানা টেনে নিলে মন্দ লাগে না।

সুতরাং এই উত্তাপের রাজ্যে বর্ষার জনপ্রিয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। আকাশে মেঘ দেখলেই ময়ূরের মতো পেখম ধরে নৃত্য শুরু করিনি অবশ্য, কিন্তু আনন্দে যে আটখানা না-হয়ে, একেবারে তিন-আটা-চব্বিশখানা হয়ে পড়তাম এবং আসন্ন আনন্দোৎসবের প্রারম্ভিক ঐক্যতানের মত সকলেই যে চার-আটা-বত্রিশটি দন্ত বিকশিত করে সরবে ও সবিস্তারে সকলের কাছেই এই আনন্দ-সন্দেশ পৌঁছে দিতাম, সে কথা বেশ মনে পড়ে। মেঘের গর্জন আমাদের কানে বাঁশীর সুর হয়ে উঠতো, দমকা হাওয়ার দাপাদাপিকে মনে হতো গৌরীশঙ্কর ডিঙিয়ে-আসা মোলায়েম মৌসুমী বায়ু, আর আকাশ চিরে-চিরে সর্পিল বিজলী আমাদের মনেও চমক্‌ মারতো!

তার পর যেই ঝর-ঝর করে নেমে এল বারিধারা, বেরিয়ে পড়লাম আমরা সকালিক, মধ্যাহ্নিক, বৈকালিক, সান্ধ্য অথবা নৈশ, অর্থাৎ ভোর পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত যে কোনো সময়ের আনন্দ ভ্রমণে। ডবলিউ বি চোদ্দ নম্বরের সবাই বেরুতো, তার পর অমর ও আমি, মতি সিং ও নৃপেন পাল, নীরেন সেন ও কুসুম গোঁসাই, সত্য বাবু, করালীকান্ত, রমেশ দাস, রবী, জীবন, জ্যোৎস্না, গুরখা—কে নয়? দেখাদেখি উৎসাহিত হয়ে বেরিয়ে পড়তো টালী ব্যারাকেরও অনেকে। লাল নুড়ি-ছড়ানো রাস্তায় রাস্তায় চলতো দলে-দলে ভ্রমণ। ছাতা নিয়ে নয়, বর্ষাতি নিয়ে নয়, এমন কি, ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে নয়। অফিসে যেতে হলে যেমন ধোপদুরস্ত ধুতি ও পাট-ভাঙা জামা পরে যাই, যেমন পালিশ-করা জুতো পায়ে দিই, ঠিক তেমনি ভাবে। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, জল জমে প্রথমে জুতো ও পরে হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবে গেল, তবুও নির্বিকার ভাবে চলেছে আমাদের আনন্দ-ভ্রমণ।

সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজও কিন্তু এই বর্ষায় বন্ধ তো থাকতোই না, এমন কি, একটি সেকেণ্ডও পিছিয়ে দেয়া হতো না। ফিটফাট পোষাক এঁটে জুতো-মোজা পরে এই দারুণ বৃষ্টির মধ্যেই চলতো আমাদের প্যারেড। আর দেয়ালের ওপরকার গুমটিতে বর্ষাতি গায়ে এঁটে রাইফেলধারী সান্ত্রী আমাদের এই পাগলামী নির্বাক্‌ বিস্ময়ে চেয়ে দেখতো ভিজে দাঁড়কাকের মতো। কিন্তু প্রবল বর্ষায় আমাদের নিউমোনিয়া দেখা না দিলেও অসহ্য গরমে আমাদের মাথা ধরিয়ে দিত।

ওয়েষ্টার্ণ ব্যারাকের তেরো নম্বরে থাকতো গণেশ সাহা। ময়মনসিংহের অধিবাসী। বড়লোকের ছেলে। স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ। রাজবন্দীদের মধ্যে এক দলের ছিল দারুণ পড়বার ঝোঁক। যে-কোনো বই পড়া শুরু করলেই হলো আর তা যদি মূল্যবান কোনো বই হয় আর একবার ভালো লেগে যায়, তাহলে আর রক্ষে নেই। নাওয়া বাদ, খাবার-ঘরে খেতে যাওয়া বাদ, এমন কি নিদ্রা বা বিশ্রামও বাদ, চললো ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সকালের পর বিকেল, বিকেলের পর রাত্রি, তার পর আবার সকাল, আবার বিকেল··· অর্থাৎ একেবারে মলাট থেকে শুরু করে মলাটে না পৌঁছানো পর্য্যন্ত একটানা। টিপয়ের ওপর চাকর দিয়ে যাচ্ছে চা ও জলখাবার, দুপুরের ডিস ও রাত্রের প্লেট।

এই অদ্ভুত পড়ুয়াদেরই এক জন এই গণেশ সাহা।

হঠাৎ এক দিন ভোর বেলা গণেশ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই চোদ্দ নম্বরে প্রবেশ করলো। কমেটের মশারি তুলে ডেকে তুললো. তাকে বিশেষ কথা আছে জানিয়ে।

কমেট মিলিটারী-ম্যানের মত চট্‌ করে উঠে বসলো। জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইতেই গণেশ বললো: দেখুন কমেট বাবু, আমাদের ভেতরকার কথা যাতে কর্তৃপক্ষের কানে না যায়, তাই করা উচিত নয় কি?

কমেট তৎক্ষণাৎ সায় দিল। গণেশ বলতে লাগলো: আমিও তাই বলি। আমাদের কথা আমাদের মধ্যেই থাকা উচিত। টবিনের কানে যদি একবার যায়, তাহলে কী ভাববে টবিন, বলুন তো? কী লজ্জার কথা হয়ে দাঁড়াবে তাহলে? এমনি লজ্জা দেবার সুযোগ কেন দোব আমরা ওকে? অতএব, আমাদের কথা কারুকেই না জানানো উচিত। তাই না কমেট বাবু?

কমেট আবার সায় দিয়ে একটু বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলো: কেন, টবিন কোনো কথা জেনে ফেলেছে না কি?

না, জানেনি এখনও। হয়তো কখনও জানতে পারবে না।—বলে সংশয় প্রকাশ করলো গণেশ: কিন্তু তবু সতর্ক হতে হবে তো।

দেয়ালেরও কান আছে। কোথাকার কথা কোথায় চলে যায় বাতাসের মুখে। কিন্তু, তাই বলে কথা না বলে তো থাকতে পারবে না মানুষ? কথাই তো জীবন। কিন্তু সে কথা টবিনের কানে কেন যাবে, কমেট বাবু? কেন ও বলবার সুযোগ পাবে— ওগো, তোমাদের সব কথা জানি।

বলেই অকস্মাৎ গণেশ মাথা ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক ভালো করে দেখে নিয়ে ফিসফিস করে অনুরোধ জানালো: আমার সেই কথাটা কিন্তু কাউকেও বলবেন না কমেট বাবু!

কি কথা?—প্রশ্ন করলো বিস্মিত কমেট।

কিন্তু সে প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে আবার অনুনয়-বিনয় করতে লাগলো গণেশ: সত্যি, তাহলে টবিনের কাছে আর মুখ দেখানো যাবে না। বলবেন না তো? কথা দিচ্ছেন তো কমেট বাবু?

কিন্তু কথা না নিয়েই সে উঠে দাঁড়ালো এবং যতীশ বাবু, মনোরঞ্জন, নীতিশ, সবাইকে একে-একে ডেকে তুলে সবিনয়ে জানাতে লাগলো ঐ একই অনুরোধ: আমার সেই কথাটা কিন্তু কাউকেও দয়া করে বলবেন না।

বাইরে বারান্দায় যার সঙ্গে দেখা হতে লাগলো, তাকেই ঐ একই অনুরোধ জানিয়ে যেতে লাগলো। দূর দিয়ে যে চলে যাচ্ছিল, হাঁক দিয়ে তাকে ডেকে এনে জানাতে লাগলো সেই একই অনুরোধ। শিবিরের চাকর-বাকর, ধোপা-নাপিত সবাইকে ডেকে-ডেকে ঐ একই বক্তব্য পেশ করতে লাগলো। যাকে একবার বলেছে, তাকে আবার এবং বার বার বলতে লাগলো। এমনি করে সারা শিবিরের প্রত্যেক ঘরে গিয়ে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে এসে নিজের ঘরে ঢুকলো এবং এই জুলাইয়ের গ্রীষ্মে একটা পুলওভার গায়ে চড়িয়ে সটান শুয়ে পড়ে গণেশ হাত-পাখা চালিয়ে হাওয়া খেতে লাগলো।

পরিষ্কার বোঝা গেল যে, পাগল হয়ে গেছে গণেশ! দেখা গেল, তার টেবিলে আধ-খোলা হয়ে পড়ে আছে Psychoanalysis of Mind সম্বন্ধে লেখা খুব মোটা একখানা দুর্বোধ্য বই। পাশেই নোট খাতা। মর্ম উপলব্ধি করে নোট লিখছিল সে। মনোবিকলন অধ্যয়ন করতে করতে কখন্ যে তার নিজেরই মন যুক্তিময় বুদ্ধির রাশ ছিন্ন করে মস্তিষ্কের গ্রন্থিগুলি বিকল করে দিয়েছে, টের পায়নি গণেশ।

পাগল হয়ে গেছে গণেশ।

পাগল হয়ে গেছে!

সর্ব্বত্র আতঙ্ক দেখা দিল। সংবাদ নিয়ে জানা গেল, পূর্ব্বে এই বন্দীশিবির ছিল পাগলা গারদ। দুর্দ্দান্ত শ্রেণীর বন্দীরাই থাকতো এখানে। মোটা শিকল দিয়ে মেঝের সঙ্গে বেঁধে রাখা হতো তাদের। মাঝে মাঝে চাবুকও চালানো হতো তাদের ওপর। কিন্তু পাগলামির কি কোনো বীজাণু আছে? চুণকাম করবার পরও দেয়ালে দেয়ালে তারা বেঁচে থাকতে পারে কি?···অদ্ভুত আতঙ্ক! কিন্তু যুক্তিহীন এই আতঙ্কে এমনিই অভিভূত হয়ে পড়লাম আমরা যে, দেখতে দেখতে অধ্যয়নের উৎকট উৎসাহ সাধারণ ভাবে কমে গেল। আর প্রতিদিনই ভোরে উঠে একে অপরের কথা বা কাজ লক্ষ্য করতো গভীর অভিনিবেশ সহকারে, পরখ করে দেখতে চেষ্টা করতো গণেশের হাওয়া গায়ে লেগেছে কি না।···

বন্ধুরা অবশ্য দলে দলে এসে যুক্তিজাল বিস্তার করে বা বিতর্কে কোণঠাসা করে চেষ্টা করলেন গণেশের পাগলামি রোগ সারাতে। কিন্তু কোনো ফল দেখা গেল না। গণেশ সময় মত নাওয়া-খাওয়া বা শোওয়া সম্বন্ধে বেশ সচেতন, অথচ যার সঙ্গে দেখা হয়, তাকেই অত্যন্ত গম্ভীর মুখে একবার অনুরোধ জানায়: দেখুন, আমার সেই কথাটা দয়া করে টবিনের কানে আর তুলবেন না। বুঝলেন, my earnest request,···

ধীরেনদা' ছুটে এলেন, দেখলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গেলেন। গণেশ এবার আই, এ, পরীক্ষা দেবে। ধীরেনদা'র অনেক অনুরোধে সম্মতি দিয়েছিল সে। এক জন ছাত্র কমে গেল।

গণেশের বাড়ীতে ও গভর্ণমেন্টের কাছে টেলিগ্রাম প্রেরণ করা হলো। ওর বাবার অনুরোধে ও তদ্বিরে গণেশকে স্থানান্তরিত করা হলো ময়মনসিংহ জেলে। বাবা চিকিৎসা করাবেন কবিরাজী মতে।

গণেশের চলে যাবার দিনটি আজো মনে আছে আমার। বেচারার জিনিষপত্র সবই অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সিপাই এসেছে ওকে নিয়ে যেতে। গণেশ বেরিয়ে এসেই কমেটকে সবলে জড়িয়ে ধরে হাঁউমাউ করে কেঁদে ফেললো। কমেট জিজ্ঞেস করলো: এ কি, কাঁদছিস কেন রে? বাড়ীতে যাচ্ছিস্ তো!

ক্রন্দনভাঙ্গা স্বরে জবাব দিল গণেশ: কেন আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন কমেট বাবু, আমি তো কারুর কথা অফিসে লাগাইনি?

না, না, তাড়ানো নয়। আপনার স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে। আপনার চিকিৎসা করাবেন কি না, তাই ময়মনসিংহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আপনাকে।—বললো মনোরঞ্জন।

বাধা দিয়ে বললো গণেশ: ও-সব সান্ত্বনা দেবেন না আমায় মনোরঞ্জন বাবু! জানি, ওরা আমায় অফিসে নিয়ে গিয়ে মারবে স্ত্রাণ্ডকাফ লাগিয়ে।—কিন্তু আমি কি কোনো গোপন কথা বলে দিয়েছি যে, এই শাস্তি আমার?

তার পর এক সময় গণেশ অফিসের গেটে এল। প্রত্যেককে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলো, চোখের জলে প্রত্যেকের জামা ভিজিয়ে দিল, প্রত্যেককে মনে রাখবার জন্ম জানালো আকুল আবেদন আর ওর সেই কথাটি না-বলবার জন্ম জানিয়ে গেল কাতর অনুরোধ।

গেট বন্ধ হলে ফিরে এলাম নিজের ঘরে। কিন্তু কেমন খালি-খালি মনে হতে লাগলো। কী যেন হারিয়ে গেছে!···

এই দারুণ গ্রীষ্মেই এক দিন একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটে গেল। পূর্ব্বেই বলেছি, টবিন মনে করতেন, যা আমরা চাইবো তাতে সম্মতি না দিলেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হবে। তাঁর আরও একটা নীতি ছিল, রাজবন্দী হ'লেও আমরা যে বন্দী, আইন ও শৃঙ্খলার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই বৃটিশ গভর্ণমেন্টের পরম শত্রু, এই অনির্ব্বাণ সত্য মনে রেখে তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টা করতেন আমাদের তা বুঝিয়ে দিতে। তাঁর অফিসে গিয়ে কিছু বলবার পূর্ব্বেই ঝপ্ করে তাঁর সম্মুখে চেয়ারে বসে পড়ে সিগারেটে একটা মোক্ষম টান মেরে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে তার পর কথা সুরু করাটাকে লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল টবিন খুব অপমানজনক মনে করতেন। লড়াই প্রত্যাগত ইংরেজের বাচ্চার প্রেষ্টিজ জ্ঞান ছিল সীমাহীন উৎকট! আমরাও তাই সুযোগ পেলেই একটা ঘা দিয়ে মজা দেখতাম।

আহারের পুষ্টিবিধানের জন্য-

ক্যাডবেরির বোর্ন-ভিটা পান করুন

আপনার শক্তি বাড়বে... শরীরেরও পুষ্টি হবে

গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে সমৃদ্ধ দেশেও বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য-সম্পন্ন দেহ গড়ে তোলার উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য লোকে পায় না। কিন্তু আপনি যদি আপনার দৈনন্দিন খাদ্যের সঙ্গে ক্যাডবেরির **বোর্ন-ভিটা** পান করেন তা হলে পুষ্টির দিক থেকে আপনার কোনো অভাব হবে না। কারণ ছোটোবড়ো সকলের পক্ষেই **বোর্ন-ভিটাকে** একাধারে পূর্ণাঙ্গ ও বিজ্ঞানসম্মত সুষম একটি খাদ্য ও পানীয় বলা চলে। **বোর্ন-ভিটা** যে সত্যি কতো ভালো তা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারবেন। এ জন্যই ১৪,০০০-এরও বেশি চিকিৎসকের প্রত্যেকেই "ক্যাডবেরির **বোর্ন-ভিটা** পান করুন" বলে থাকেন। **বোর্ন-ভিটায়** আপনার শক্তি বাড়বে··· শরীরের পুষ্টিও হবে।

প্রতি পেয়ালায়

শ্বেতসার দুগ্ধজ স্নেহ পদার্থ ডায়াস্টেজ	শরীরের বৃদ্ধি ও শক্তি যোগানোর জন্য
প্রোটিন কোকো বাটার	শরীর গঠনের জন্য
খনিজ লবণ	অস্থি গঠনের জন্য
ভিটামিন এ ও ডি	রোগ প্রতি-রোধের জন্য

বোর্ন-ভিটা
একাধারে সংরক্ষণশীল খাদ্য ও পানীয়

প্রতিদিন

ক্যাডবেরির বোর্ন-ভিটা

পান করে আপনার স্বাস্থ্য গড়ে তুলুন!

···রাত্রেও খাবেন! রাত্রে শোয়ার আগে বোর্ন-ভিটা খেলে স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় গাঢ় সুনিদ্রা এনে দেবে।

ক্যাডবেরি-ফ্রাই (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড বোম্বাই — কলিকাতা — মাদ্রাজ

CFY-10 BEN

এক দিন দ্বিপ্রহরে আই, এ, ক্লাশের ইংরাজী পড়ানো হচ্ছে। বাইরে থেকে প্রফেসর এসেছেন। আমরা প্রায় ত্রিশ জন ছাত্র তাঁর বক্তৃতা শুনছি। প্রফেসর একমাত্র পড়ার বিষয় ছাড়া অন্য কোনো কথা বলবার অধিকারী নন। সঙ্গে এক জন হাবিলদার এসেছেন লক্ষ্য রাখবার জন্য।

অসহ্য গরম, তাই চিকগুলো সব খেসে দেয়া হয়েছে। মনোযোগ দিয়ে যেমন কথা শুনছিলাম, তেমনি টেরই পাইনি কখন্ টবিন চার্চ এই দারুণ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে সারপ্রাইজ ভিজিটে বেরিয়েছেন সদলবলে। দু'-চার জায়গায় ঢুঁ মারবার পর আমাদের এখানে কোনো আইন অমান্য করা হচ্ছে কি না, তা পরখ করবার জন্য একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে সোজা এসে আমাদের ক্লাশে প্রবেশ করলেন।

প্রফেসর মধ্যপথে বক্তৃতা থামিয়ে অভিবাদন জানালে টবিন স্মিত হাস্যে তা গ্রহণ করে পর-মুহূর্ত্তে আমাদের পানে চেয়েই একেবারে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আমরা সবাই নীরবে বসে আছি। কী সাংঘাতিক কথা! সম্মুখে দণ্ডায়মান মহামান্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি, আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, আর আমরা পরম নিশ্চিন্তে রয়েছি তখনো বসে! সিংহকে দেখে ভেড়ার পাল বিন্দুমাত্রও বিচলিত নয়! প্রেষ্টিজ বুঝি রসাতলে যায়!

গর্জ্জন করে উঠলেন টবিন: Will you stand up?

গর্জ্জনের কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

হাতের বেটন উঁচিয়ে টবিন আবার করলেন প্রশ্ন: Won't you stand up?

বেশ কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল। জবাব দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো না একটি ছাত্রও।

টবিনের এবার ধৈর্য্যের সীমারেখা প্রায় অতিক্রম হয়ে এল। বাইরের একশো বারোর অনেক বেশী উঠলো ওঁর মাথার মধ্যেকার পারা। চোখ-মুখ লাল, কান দু'টি একেবারে রক্তে টুসটুসে, কাঁপছে টবিন।

এক পা এগিয়ে এসে টেবিলের ওপর বেটনের একটা প্রচণ্ড ঘা মেরে চীৎকার করে উঠলেন: You people, I know how to make you stand up—

তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেল জ্যোৎস্না সরকার। জানিয়ে দিল তৎক্ষণাৎ সর্ব্বসম্মত অভিমত: No, we shall not stand up. বলেই বসে পড়লো।

No!!—ক্রোধে, বিস্ময়ে টবিন দিশেহারা-প্রায়।—You still dare to sit down. All right, I shall see—

বলেই গট-গট করে বেরিয়ে গেলেন। পশ্চাতে বৃহৎ লাঙ্গুলের মত সড়াক্ করে বেরিয়ে গেল ডজন খানেক সিপাই! কিন্তু দরজার বাইরে যাওয়া মাত্র ক্লাশের ত্রিশ জনই একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠলো। পুরো এক মিনিট স্থায়ী সেই অট্টহাসি।

নিশ্চয়ই এই বিদ্রূপ টবিনের কানে গেছে।

প্রফেসর বেচারা কিন্তু ঘাবড়ে গেলেন। বার বার অনুরোধেও বক্তৃতা আর তেমন জমাতে পারলেন না। আর সব চেয়ে মজা এই যে, আমাদের ঘর-কাঁপানো অট্টহাসিতে তাঁর মুখের কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। সর্ব্ব অবয়বে একটা প্রস্তরের বর্ম এঁটে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। মহা অপরাধ যেন করে ফেলেছেন তিনিই।

টবিনের বেগে প্রস্থানের ফল মিনিট দশেকের মধ্যেই পাওয়া গেল। অফিস থেকে তলব এল প্রফেসরের। সেই যে তিনি গেলেন, ব্যস, আর ফিরলেন না। আপোষ-রফার জন্য ধীরেনদা' অবশ্য ছুটে গেলেন অফিসে। কি কথা হলো জানি নে। অন্ততঃ সুফল যে কিছুই হয়নি, তা ধীরেনদা'র মুখ দেখেই টের পাওয়া গেল; বেশ বোঝা গেল, রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েটের বরিশালীয় যুক্তি লাল মুখের প্রেষ্টিজের ইস্পাতে ঘা খেয়ে ফিরে এসেছে। শোনা গেল, গবুচন্দ্রও ছিলেন পাশেই; কিন্তু হবুচন্দ্র এবার যেন ১৩ ধারার ক্ষমতাবলে শাসনযন্ত্র নিজের মুষ্টিবদ্ধই করে রাখলেন। টললেন না এক-চুলও!...

১৯

ভাবলাম, যাক্, বাঁচা গেল। ধীরেনদা'র তাগাদায় ও তিরস্কারে এই বয়সে সপ্তাহে দু'দিন উত্তপ্ত ও অসহ দ্বিপ্রহরে এসে এই নীরস আই-এ ক্লাশ করতে হতো। এবার সে হাঙ্গামা চুকে গেল।

কিন্তু একটা কিছু না নিয়ে যে বন্দীরা কিছুতেই চুপ করে বসে থাকবে না। কিছু না পেলে তারাই একটা কিছু সৃষ্টি করে নেয়, তার পর টানতে থাকে তার জের।

এক দিন উষা পাল ও ধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় এসে হাজির গোপাল ঘোষকে সঙ্গে করে। থিয়েটার করতে হবে। জিজ্ঞেস করলাম: তা এতে আমার কি করবার আছে?

বলেন কি!—বিস্ময় প্রকাশ করল উষা: সংবাদ কি আমরা সংগ্রহ না করেই এসেছি? বিক্রমপুরের হাঁসাড়া-কেয়টখালীর দিকে অভিনয়ে যে আপনার নামডাক খুব, তা আমরা জেনে গেছি। গোপালদা' যদি আপনার সঙ্গে জোটেন, তা হলে এখানেই তো আমরা ষ্টার-মিনার্ভা সৃষ্টি করে দেখিয়ে দিতে পারি—

বাধা দিলাম: কিন্তু দেখাবে কাকে? আমাদের দর্শক কোথায়?

ধীরঞ্জন বললো: এই তিনশো ত্রিশ জনের ত্রিশ জনই না হয় থাকবে ষ্টেজে, বাকি তিনশো জন দর্শক তো পাওয়া যাবে? তার পর চাকর-বাকর আছে, ধোপা-নাপিত আছে, সিপাইরাও কি আর দেখতে আসবে না? চাই কি, গিন্নিরাও আসতে পারে সপরিবারে।

কি বই?

সীতা আর মন্ত্রশক্তি।—বললো উষা।

রাজি না হয়ে আর উপায় আছে? সুতরাং মহলা সুরু হয়ে গেল নিয়মিত ভাবে। ক্রমে ক্রমে আরও অনেক "মিউট মিল্টনের" সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়লো। দেখা গেল, আমাদের মধ্যে শক্তিশালী নটেরও অভাব নেই।

কিন্তু এ্যামেচার ক্লাবে যা হয়, এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। ভূমিকা-লিপি প্রতিদিনই পরিবর্ত্তিত হতে লাগলো এবং মহলায় জনসমাগম শনৈঃ শনৈঃ হ্রাস পেতে লাগলো। দেখা গেল, হরিপদ চক্রবর্ত্তীর যেমন নায়কোচিত চেহারা ও স্বাস্থ্য, অভিনয়েও তিনি তেমন পারদর্শী। 'শৃঙ্খলে'র সম্পাদক বিনয় সেনও চমৎকার

অভিনয় করেন, তেমনি উষা এবং সতীশ। নারী-চরিত্রের অদ্বিতীয় অভিনেতা হচ্ছেন রবী লাহিড়ী, ধীরঞ্জন, সুধীর ঘোষ ইত্যাদি।

ঘন ঘন পরিবর্ত্তনের পর চূড়ান্ত ভাবে যে ভূমিকা-লিপি দাঁড়ালো, তাতে সীতা নাটকে আমার ভূমিকা নির্দ্দিষ্ট হলো লব, আর মন্ত্রশক্তিতে মৃগাঙ্ক। রামের ভূমিকাই ছিল, কিন্তু সীতারূপী ধীরঞ্জনের নাকি আমায় "প্রাণেশ্বর" বলে ডাকতে ভারী হাসি পায়। তাই গোপাল ঘোষ এলেন রক্ষাকর্ত্তারূপে বাল্মীকির ভূমিকা বিনয় সেনকে দিয়ে। ব্যবস্থাপনার অধিনায়করূপে এগিয়ে এলেন কামাখ্যা রায় অর্থাৎ কামাখ্যাদা'।

কিন্তু এই নাটকাভিনয়ের পূর্ব্বেই একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন হলো। তাতে অর্কেষ্ট্রা পার্টির ঐক্যতান, বাঁশী, সেতার, এস্রাজ, বেহালা প্রভৃতির একক বাজনা, আবৃত্তি এবং অবশেষে বিভিন্ন নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয়। দীনবন্ধু ঘোষাল কেরিকেচারের ভার নিল। রাখাল ঘোষ এরও পর একটি একাঙ্কিকা কৌতুক নাটকের ব্যবস্থা করলেন।

সাজাহান নাটকের নির্ব্বাচিত দৃশ্যের অভিনয়ে আমি নাটমঞ্চে দেখা দিলাম সাজাহানরূপে। লোলচর্ম বৃদ্ধের মতো ন্যুব্জদেহ, বাম অঙ্গ পক্ষাঘাতে পঙ্গু ও সর্ব্বদা কম্পমান এবং খঞ্জের মতো চলাফেরা, অথচ চক্ষে আগুনের ফুলকি আর কণ্ঠস্বরে বজ্রের নির্ঘোষ! সে যুগে এই ভূমিকায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরীর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। তাঁর অভিনয় তথনো আমার দেখবার সৌভাগ্য না হলেও বিশ্ববিশ্রুত প্রশংসা আমি শুনেছি এবং এই দুরূহ ভূমিকাটি কেমন অদ্ভুত সাফল্যের সঙ্গে তিনি অভিনয় করে থাকেন, তাও বহুমুখে জানতে পেরেছি। এই শোনা ও জানার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে এবং সেই সঙ্গে নিজের চিন্তা, যুক্তি ও মৌলিকতা মিলিয়ে এমনি অভিনয় আমি সেদিন করে ফেললাম যে, পরের মাসের 'শৃঙ্খল' পত্রিকায় আমোদ-প্রমোদ বিভাগে লিখবার জন্য এগিয়ে এলেন স্বয়ং বিনয় সেন পার্কার হাতে নিয়ে। ঘোষণা করলেন, সমালোচনা লিখবেন তিনি নিজে এবং প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যা লিখেছিলেন, হুবহু ভাষা তার মনে না থাকলেও ভাবার্থ আজো ভুলিনি। তিনি লিখেছিলেন: 'দ্বিজেন বাবুর অনবদ্য অভিনয় দেখতে-দেখতে মাঝে মাঝে অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় দেখছি বলে আমাদের ভ্রম হয়েছে। স্বাস্থ্যবান যুবক হয়ে এবং বিশেষ করে সেনাবাহিনীর জি-ও-সি হয়ে কী ভাবে যে তিনি এক লোলচর্ম্ম অশীতিপর বৃদ্ধের ভূমিকায় এমনি অনন্যসাধারণ অভিনয় করলেন, তা মনে করে বিস্মিত হতে হয়।'

সুতরাং সীতা ও মন্ত্রশক্তির অভিনয়কালে দর্শকের ভিড় পড়ে গেল এবং স্বয়ং গিরিজা দত্তও এলেন সপরিবারে এবং টবিন সাহেবকেও সঙ্গে নিয়ে। অভিনয় শুরু হবার কিছুক্ষণ পর টবিন স্মিত হাস্যে বিদায় নিলেও গিরিজা সপরিবারে বসে রইলেন একেবারে শেষ পর্য্যন্ত। পরদিন আমায় অফিসে ডাকিয়ে অজস্র প্রশংসা করলেন।

আমাদের নাটকাভিনয় এত জমে গেল যে এর পর জনকতক বন্দী উৎসাহী হয়ে একটা ষ্টেজই তৈরী করবার সংকল্প করলেন এবং চাঁদা তোলা তৎক্ষণাৎ শুরু হয়ে গেল।

টবিনের সঙ্গে খিটিমিটি ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। চিঠি লেখা নিয়ে, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিয়ে, পীড়িত বন্দীদের চিকিৎসা নিয়ে, খেলার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে, ঠিকাদার কর্তৃক জিনিষপত্র সরবরাহ নিয়ে—কী নিয়ে নয়?

পূর্ব্বেই বলেছি টবিন যুক্তির ধার ধারতেন না। কোনো ব্যাপারে বেশীক্ষণ আলোচনা চললেই তাঁর মিলিটারী মস্তিষ্কের সেলগুলিতে রক্তের প্লাবন দেখা দিত। শিক্ষিত বন্দীদের প্যাঁচালো যুক্তির কোদাল পায়ের তলায় মাটি কেটে দিচ্ছে বলে মনে হতো তাঁর। সুতরাং প্রায়ই আলোচনার মাঝখানটিতেই লাল মুখ আরও আরও লাল করে অকস্মাৎ যবনিকা টেনে দিয়ে নিতান্ত অভদ্রের মতো এমনি আচরণ করতেন যে, গোপাল গুপ্ত তো এক দিন পায়ের স্যাণ্ডেলই প্রায় খুলে ফেলেছিলেন! সঙ্গে ঠাণ্ডা-মেজাজী সুধীন সরকার না থাকলে সেদিনই একটা মারাত্মক কাণ্ড বেধে যেত। আমাদের দাবীগুলো নিয়ে প্রতিনিধি দল যখন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে গেলেন, টবিন তখন প্রথম দিকে বেশ ভারিক্কি চালে আলাপ সুরু করলেন। কিন্তু গোঁয়ারতুমি-ভর্ত্তি তাঁর মন্তব্যগুলো ক্ষুরধার যুক্তির ফলকে প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য সুধাংশু ভট্টাচার্য্য যখন কেটে ফেলতে শুরু করলেন, তখন একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে অকস্মাৎ টবিন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর উদ্ধত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন: তোমাদের দাবীগুলো একেবারেই অযৌক্তিক। অতএব, এবার পথ দেখতে পার।

সেই পথ নির্ব্বাচনের মারাত্মক সভাটাই হলো আগষ্ট মাসের শেষ দিকে। দলভেদ, মতভেদ, পথভেদ যতই থাক, পৃথক্ পৃথক্ চৌকায় camp politics অর্থাৎ ঘরোয়া রাজনীতির কচকচি যতই চলুক না কেন, অনুশীলন-যুগান্তরের ধূমায়িত রেষারেষি যতই থাক না কেন,—বৃহত্তর প্রয়োজনে, যেখানে সমগ্র বন্দীশিবিরের ব্যাপার জড়িত, যেখানে সাধারণ ভাবে বন্দীদের আত্মমর্য্যাদা আহত, সেখানে, সেকালে দেখেছি, সরাই, দল-উপদলনির্বিশেষে এসে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছেন, হাতে হাত রেখে সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করেছেন।

একালে অগ্রগামী চিন্তাধারা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তিবাদ সৃষ্টি করেছে এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোষ, অপরের ওপর নির্ভর করবার ক্ষীণতম দুর্দ্দিনও যার দেখা দেয় না কোনো কালেই। শম্বুকের মতো নিজের চারি দিকে যে অনতিক্রম্য গণ্ডী তুলে রেখেছে, সেই স্বল্প-পরিসরতার মাঝেই লাভ করে সে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দ। চরম শান্তি তার সেইখানেই সমাহিত। প্রাণের বিপুলতা ক্ষ্যাপা বন্যায় উদ্বেলিত হয়ে উঠলেও কোনো কালেই তা প্রাচীর ডিঙিয়ে যাবার উদারতা দেখাবে না। একালে তাই দেখতে পাই ফাইল-দুরস্ত ঐক্য, শতাধিক সর্ত্তযুক্ত মিলন। একালে তাই জনমতেরই লজ্জাকর পরাজয় ঘটেছে বার বার ব্যক্তির প্রতিযোগিতার আসরে। সেকালের দল সংগঠনের মূলে আবেগ ছিল অনেকখানি, মন দিয়ে মন জয় করবার সংকল্প ছিল দুর্জ্জয়, পরিণামের অনিশ্চয়তা স্বীকার করে নিয়েই সেকালে আন্তর্দলীয় সহযোগিতার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হতো। 'বস্তুতন্ত্রবাদের' হাপরে পুড়িয়ে একালের নিছক কলা-কৌশলের খেলা নয়, সেকালের ষ্ট্র্যাটেজির পশ্চাতে ছিল সৈনিকের ভাবাবেগময় সংকল্প, তার সর্ব্বান্তরিক শপথ।

তাই তো দেখলাম, বিনা প্রতিবাদে, বিনা বিতর্কে, বিনা আলোচনায় আগষ্টের সেই স্মরণীয় সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো

মারাত্মক এক প্রস্তাব: পনেরো দিনের সময় দিয়ে টবিনকে দেয়া হবে এক চরম পত্র। আমাদের দাবীগুলো যদি না মেনে নেয় সে, তাহলে আজ থেকে ষোড়শ দিবসেই প্রয়োগ করা হবে একবারেই বন্দীর তীক্ষ্ণতম অস্ত্র—অনশন। আমৃত্যু অনশন! প্রথম সুরু করবে বিশ জন, তার পর প্রতি সপ্তাহে নতুন দশ জন করে তাদের সঙ্গে যোগ দেবে।

একটি শক্তিশালী সর্ব্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে সেদিনকার মত সভার কাজ শেষ হলো।

চরম পত্রকে টবিন কিন্তু পরম কৌতুক সহকারে গ্রহণ করে প্রথমটা বেশ নরম-গলায় জিজ্ঞেস করলেন: Are you determined to die?

জবাব দিলেন প্রভাত নাগ: Ofcourse, if our demands are not conceded to.

পাগল যেমন অকারণে খিলখিল করে হেসে ওঠে, তেমনি করে উচ্চ হাস্য করে উঠলেন টবিন। বেরিয়ে যাবার মুখে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে গেলেন: I am sorry you will have to lose your life then.

গিরিজা কিন্তু গ্রহণ করলেন সাগ্র-জয়াকরের গৌরবময় ভূমিকা। দু'টি পরস্পরবিরোধী ফোর্সের একটির যদি সামান্য একটু কম বেগ থাকে, তাহলেই তো একটা রেজাল্টেন্ট বার করা যেতে পারে। আর সেটা যদি সহনীয় হয়, তাহলেই তো গ্রহণীয় বলে উভয় পক্ষকেই আবেদন জানানো যায়। বিস্তর মাথা ঘামিয়ে ফেললেন গিরিজা দত্ত। গোটাকতক দাবী তো এখনই মিটিয়ে দেয়া যায়, কয়েকটার সম্বন্ধে সাহেবের সঙ্গে একটু পরামর্শ দরকার, দু'তিনটে দাবী যা আছে, তা গভর্ণমেন্টকে না জানিয়ে কিছু করা সঙ্গত হবে না, আর বাকি তিনটে?—ও তিনটে ছেড়ে দিন প্রভাত বাবু, একটা মিটমাট হয়ে যাক।

জবাব দিলেন অনন্ত দে: অনশনে দু'চার জন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবার পর ছাড়াছাড়ি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে, গিরিজা বাবু। আজ উঠি।

বিলক্ষণ, তা কি হয়?—হাল ছাড়তে চাইলেন না গিরিজা: স্বীকার করি, আমাদের অনেক ত্রুটি আছে। কারণ, আমাদের হাত-পা বাঁধা। কিন্তু সবগুলিই কি আমাদের দোষ, সেটাই বিবেচনা করে দেখবার জন্য অনুরোধ জানাই আপনাদের। এক জায়গায় বাস করে কেন ঝগড়া করবো আমরা, সেটাই আমি বুঝতে পারছিনি। মীমাংসার পথ তো একটা বার করতে হবেই।

সে তো খোলাই আছে।—জবাব দিলেন দেবজ্যোতি: সব পথই গেছে বন্ধ হয়ে, খোলা আছে একটি মাত্র দিক। সেই দিকেই তো যাবো বলে স্থির করেছি আমরা। আলোচনা অনেক হয়ে গেছে এই শিবির খোলবার পর থেকেই। এত বেশী যে, সবই শেষ পর্য্যন্ত আলোচনাতেই পর্য্যবসিত হয়ে যায়।

যতীশ গুহ যোগ দিলেন: তাই এবার একটু কাজ করা যাক, কি বলেন গিরিজা বাবু? কাজের ঝুঁকিটা অবশ্য বেশী হয়ে গেছে। তা আর কি করা যাবে। ক্ষুদিরামের কাছে না গিয়ে হয়তো যাওয়া যাবে যতীন দাসের কাছে। কিন্তু তাঁরা ওখানে গিয়ে বোধ হয় এক ঘরেই থাকেন। তাই না গিরিজা বাবু? ওখানে তো টবিন নেই।

গম্ভীর হয়ে গেলেন গিরিজা ও-দু'টি নাম শুনে। শুধু বললেন: দিয়ে যান এ্যাপেলিকেশন। দেখা যাক্ কোনো মীমাংসা সম্ভব কিনা।

কিন্তু কোনো মীমাংসাই সম্ভব হলো না। আমাদের পুরো প্রস্তুতি চলতে লাগলো। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনশন-সংগ্রামের প্রস্তুতি! ভিড় পড়ে গেল প্রথম দলের তালিকা তৈরীর সময়। যতীন দাসের বংশধরেরা মৃত্যুর উল্লাসে নৃত্য করে উঠলো। যতীন দাস ছিলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের'ই মেজর। সুতরাং বি-ভি দলের কাছে এসে পৌঁছোল যেন স্বর্গতঃ সেই অমর শহীদের অনুচ্চারিত আদেশ!…

সংগ্রাম পরিষদ নিজেরা বাছাই করে যে তালিকা প্রস্তুত করলেন, তাতে স্থান পেল পঁয়ত্রিশ জন। বি-ভির ছিল শুধু বীরেন ঘোষ। মুষ্টিযোদ্ধা, ইস্পাতদেহী, বহরমপুর বন্দীশিবির সেনাবাহিনীর অন্যতম সেকশন কমাণ্ডার বি, ঘোষ।

সমগ্র শিবিরে নেমে এল থমথমে ভাব! আসন্ন কালবৈশাখীর উপক্রমণিকার মত। বুলেটের বিরুদ্ধে বুলেট নয়, আঘাতের উত্তরে প্রত্যাঘাত নয়। একেবারে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। হৃদয় দিয়ে, মনোবল দিয়ে শত্রুকে ঘায়েল করার চেষ্টা। পরিষ্কার গান্ধীজীর টেক্‌নিক! প্ররোচনায় উত্তেজিত হলে চলবে না। ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে, ভেবে-চিন্তে প্রতিটি পাদক্ষেপ! শত্রুপক্ষ চাইবে আমাদের ক্ষেপিয়ে তুলতে। যুক্তিহীন কথার ঝড় সৃষ্টি করে, বিতর্কের ঝগড়া লাগিয়ে, হয়তো আড়াল থেকে দু'খানা ইট ফেলে দিয়েই চাইবে আমাদের হিংস্র করে তুলতে। তার পরই হুকুম হবে: ফায়ার!

অবশ্য, আমরা জানতাম, আমাদেরই মতো ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে, বিন্দুমাত্র প্ররোচনা ব্যতীতই ইংরেজের বাচ্চা টবিন অনায়াসে গুলী চালাবার হুকুম দিতে পারে। জিভে তার এতটুকুও জড়তা দেখা দেবে না।

অনশনকারীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবার জন্য এবং তাঁদের উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে সাধারণ ভাবে সকল বন্দীই পত্র লেখার সুযোগ ত্যাগ করলেন, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিলেন, রান্না-ঘরের কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করা হলো, খেলাধূলা একেবারে বন্ধ করে দেয়া হলো, হাতখরচের টাকা থেকে একটি জিনিষও কেউ আর কিনলেন না, গান-বাজনা, ঐক্যতান বাদন সব থেমে গেল। কোলাহলমুখর শিবিরে নেমে এল মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা। সবারই মুখের হাসি শুকিয়ে গেছে, কথা ফুরিয়ে গেছে। সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ স্থগিত। শুধু প্রতিদিন 'শৃঙ্খল' পত্রিকার বিশেষ দৈনিক সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে অনশনকারী বন্ধুদের অবস্থা ও কর্ত্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতার বার্ত্তা নিয়ে। কার্টুন নয়, রস-রচনা নয়, ছুরির ফলার মতো ধারালো মাত্র কয়েকটি সংবাদ—কার বমনোদ্রেক দেখা দিয়েছে, কে শয্যাগ্রহণ করেছেন, কার টেম্পারেচার হচ্ছে আর সেই সঙ্গে উদ্ধৃত টবিনের স্পর্দ্ধোদ্ধত মন্তব্য: Let them die!

সত্যিই, একটি-একটি করে দিন গড়িয়ে যাচ্ছে আর একটু একটু করে এগিয়ে চলেছেন এঁরা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। আত্মসম্মান যেখানে আহত, ন্যূনতম অধিকার যেখানে পদদলিত, জীবনের মূল্য সেখানে অকিঞ্চিৎকর—এই এঁদের সর্ব্ব অন্তরের বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করে গেছেন টেরেন্স ম্যাকসুইনী।

অর্দ্ধেক রূপসী...

রূপ-চর্চ্চার রীতি-নীতি বদলায় যুগে যুগে···নূতন এসে করে পুরাতনের স্থান অধিকার। কিন্তু নারী—চিরন্তনী নারী—সে তার কেশসম্পদের নিরাপত্তা-রক্ষায় নিজের মধ্যে জেগে রয়েছে চিরদিন···কেশই যে তার অর্দ্ধেক রূপ। সে-রূপ সাধনায় এ-যুগের সর্ব্বগুণান্বিত আঙ্গিক **জবাকুসুম।**

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ **জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা**

তার পর মেজর যতীন দাস গেঁথেছেন তা পাকা করে আর আজ পঁয়ত্রিশ জন বিপ্লবী বন্দী খাড়া করে তুলছেন অটল বিশ্বাসের ইমারত!

রাত্রে বিছানায় গা এলিয়ে দিতাম বটে, কিন্তু ঘুম আসতো না বহুক্ষণ! বার বারই মনে হয়েছে এই পঁয়ত্রিশটি পরিবারের কথা। ক্ষীয়মান আশা নিয়ে আজো তাঁরা অপেক্ষা করছেন সুপ্রভাতের। কিন্তু দীর্ঘ রজনী যে দীর্ঘতর হতে চলেছে এবং পুঞ্জীভূত অন্ধকার অজগরের মতো ফণা তুলে যে সব-কিছু গ্রাস করতে ধেয়ে আসছে, সে দুঃসংবাদ কি পৌঁছেচে তাঁদের কাছে?

২০

কেটে গেল পূরো একটি সপ্তাহ। প্রথম-প্রথম অনশনব্রতীরা দল বেঁধে বিকেলে, সূর্য্যাস্তের অনেক পর আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে এলে, বেড়াতে বেরুতেন। দিন সাতেক পর থেকে আর তা সম্ভব হলো না; হলেও বন্ধু বন্দীরা তা বন্ধ করে দিলেন। প্রথম সপ্তাহ শেষে আবার কাড়াকাড়ি পড়ে গেল এই দলে যোগ দেবার জন্য। সংগ্রাম পরিষদ বাছাই করলেন তা থেকে এবার পঁচিশ জনকে। প্রথম সপ্তাহের পঁয়ত্রিশ জন বৈকালিক ভ্রমণ ত্যাগ করলেও দ্বিতীয় সপ্তাহের এঁরা আবার তা শুরু করলেন।

অকস্মাৎ এক দিন শোনা গেল অনুশীলনের অরবিন্দ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। সে মাত্র পনেরো মিনিট। ঘাবড়াবার কিছু নেই তাতে। আবার এক দিন দেখলাম যুগান্তরের হিমাংশুর বেশ জ্বর দেখা দিয়েছে। ডাঃ সরকার এসেছেন। পরীক্ষা শেষ করে অনেক দ্বিধার সঙ্গে বললেন: অবশ্য আপনাদের নীতি নিয়ে তর্ক করবার অধিকার নেই আমার। কিন্তু হিমাংশু বাবু এত দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে, শুধু লেবু-জল দিয়ে কতখানি আর শক্তি দিতে পারবেন ওঁকে? Vitality কমে গেলে ওষুধ দিয়ে কি আর রোগ সারানো যায় নিরঞ্জন বাবু?

সবাই চিন্তিত হয়ে উঠলো। নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো: কি করা যেতে পারে তাহলে?

ইতস্ততঃ করে সরকার বললেন: যদি বলেন, তাহলে না হয় কিছু গ্লুকোজ ইনজেকশন—

একশো তিন জ্বরের মধ্যেও হিমাংশু শুনতে পেয়েছে সে কথা। রক্তবর্ণ চক্ষু দু'টি উন্মীলন করে ধুঁকতে ধুঁকতে জবাব দিল সে নিজে: ইনজেকশনই যদি নিতে পারি, তাহলে খেতে দোষ কি ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার বাবু থাবড়ে গেলেন: না, তা বলছি না, তবে—

তবে-টবে থাক্, ডাক্তার বাবু! যদি পারেন, খানিকটে বুদ্ধির ইনজেকশন দিয়ে দেবেন আপনাদের মনিবকে। বলবেন তাঁকে, বরিশালের ভাষাও যেমন মিঠে ভদ্রতার অপেক্ষা রাখে না, তেমনি বরিশালের গোঁ-ও একেবারে বন্য শূকরের গোঁএর মত। ষ্টার্ট করলে একেবারে ফিনিশ পর্য্যন্ত না গিয়ে সে নিশ্বাস ফেলতে জানে না।

নীরবে বিদায় নিলেন সরকার।

প্রথম দিনের অনশনব্রতীরা সবাই শয্যা গ্রহণ না করলেও আর বেরুতেন না মাঠে। ইজিচেয়ারে বসে বই পড়তেন। কেউ খেলতেন তাস, কেউ বা ব্যায়াম। কিন্তু আমার আজো স্পষ্ট মনে পড়ে, অনশনের বোধ হয় চতুর্দ্দশ দিবসেও বিকেলে মাঠে বেড়াতে দেখেছি বি-ভির বীরেন ঘোষকে। সেই মুষ্টিযোদ্ধা বীরেন ঘোষ, ঢাকা জেলে যার প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে ধরাশায়ী হয়েছিলেন একদা ডেপুটি জেলর আশু বাবু।

খেলাধুলা বন্ধ, প্যারেডও স্থগিত। তাই পায়চারী করছিলাম মাঠে। দেখি হাসপাতালের পথ দিয়ে আসছে বীরেন। দেখা হতে জিজ্ঞেস করলাম: শরীর কেমন?

ঠিক আছে। জবাব দিল বীরেন।

চেয়ে দেখলাম। মুখমণ্ডলের সেই প্রাণ-প্রাচুর্য্যের দীপ্তি খানিকটে কমে গেছে। হাতের মোটা মোটা আঙুলগুলোও যেন একটু সরু মনে হলো! বিরাট থাবার ব্যাপ্তিও বুঝি কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত। কেমন যেন ঢ্যাঙ্গা-ঢ্যাঙ্গা মনে হচ্ছে ইস্পাতদেহী বীরেন ঘোষকে। কণ্ঠ যেন বেশ দীর্ঘ হয়ে গেছে। কিন্তু কণ্ঠস্বরে এখনো অনুরণিত সেই ঢাকা জেলের বীরেন ঘোষের অটল শপথ। ঘুষি দিয়ে নয়, এবার মনোবল নিয়ে একবার দেখে নেবে সে। পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন কাকে বলে বীরেন তা জানে না।

সংগ্রাম পরিষদের সদস্যগণ এবং সাধারণ ভাবে সকল বন্দীই অনশনব্রতীদের খোঁজ-খবর নিতেন সারা দিন। সংগ্রামে যে আমাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত, এই সুসংবাদ পরিবেশন করে উৎসাহিত করে তুলতেন তাদেরকে। শুধু তাই নয়, এই পনেরো দিনের মধ্যে সারা শিবির দু'দিন খাদ্য প্রত্যাখ্যান করে নিরম্বু উপবাস করেছে সহবন্দীদের প্রতি সহানুভূতির নিদর্শনস্বরূপ।

তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম দিন যে তালিকা প্রকাশিত হলো, তাতে আমারও নাম রয়েছে। সুতরাং সকাল বেলাই ভারী মাত্রায় ক্যাষ্টর অয়েলের জোলাপ নিলাম ও চাদরে দেহ আবৃত করে সটান বিছানায় শুয়ে থাকলাম। এবার অনশনব্রতীর সংখ্যা দাঁড়ালো আশী জন।

কোথা দিয়ে প্রথম দিন কেটে গেল, সকালের মিঠে রোদ পড়ন্ত বেলার বিষণ্ণ আলোয় নিষ্প্রভ হয়ে এল, কখন ধীরে ধীরে নেমে এল সন্ধ্যার আর্দ্র অন্ধকার, টেরই পেলাম না তা। ভাবাবেগের গতিবেগে একেবারে প্রথম দিনটা যেন ছুটে পালিয়ে গেল তাড়া-খাওয়া হরিণশিশুর মতো।

দ্বিতীয় দিনের সকালে ঘুম ভাঙতেই অকস্মাৎ মনে হলো গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। জল খেলাম পূরো দু' গ্লাস লেবুর রস দিয়ে। প্রথমে মনে হলো গলা পর্য্যন্ত ভরে গেছে, কিন্তু তার পরই পাকস্থলীর কোন কোণে ওটুকু জল যে তলিয়ে গেল, হদিস পেলাম না তার। ভেজা গলা আবার শুকিয়ে গেল। মনে পড়লো, কাল খাইনি। কিন্তু দিনে ও রাতে কি খেতে পারতাম, মনে পড়লো তা। কিচেন সরকারী তত্ত্বাবধানে যাবার পর খাদ্যের অবনতি যে হয়েছে শোচনীয় ভাবে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু ওরাই যা দেয়, একেবারে অখাদ্য নয় তা। সকালে খান কয়েক লুচি আর আলুর তরকারি; দুপুরে ডাল, তরকারি, মাছ, দৈ আর রাত্রে মুড়িঘন্ট, ছোলার ডাল আর আলু-পটলের ডালনা। এই মেনু চলছে সেই যেদিন আমরা চৌকার তত্ত্বাবধান ছেড়ে দিয়েছি সেদিন থেকে। কাল কিন্তু এগুলো খাইনি!

অনশন যাঁরা এখনো করেননি, তাঁরা গিয়ে খেয়ে আসেন,

আর যাঁরা অনশনব্রতী, সরকারী তত্ত্বাবধানে তাঁদের পূরো খাদ্যও পরিপাটি করে সাজিয়ে এনে তাঁর টেবিলে রেখে দেখা হয়। না খেলে সকালের জলখাবার দুপুরে, দুপুরের খাবার বিকেলে আর রাত্রের খাবার পরদিন ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাদের মনোবলের ওপর এটা একটা প্রচণ্ড আঘাত বৈ আর কিছু নয়। টেবিলে সাজানো থরে থরে সুস্বাদু আহার্য্য, অথচ স্পর্শও করবো না তা! প্রলোভন জয় করতে হবে।

দ্বিতীয় দিনের সকালে মনে হলো এমনি অটুট মনোবল কাল দেখিয়েছি আমি। দিনের বেলায় কী খাবার এনে রেখে গিয়েছিল, ভ্রূক্ষেপও করিনি তার প্রতি, কিন্তু রাত্রের খাবারগুলো চোখে পড়েছিল। মুড়ীঘণ্ট থেকে কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ নাকে আসতেই ফিরে একবারটি দেখেছিলাম। তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম, কর্ম্মচারীরা পুকুর চুরি চালাচ্ছে। পাশ করিয়ে নিচ্ছে হয়তো ঘি, গরম মসলা, কাটারিভোগের চিড়ে আর রুইয়ের মাথার বিলটি, আর দিচ্ছে গোটাকতক কাতলা বা মৃগেল মাছের মাথা আলু-পেঁয়াজ দিয়ে আচ্ছা করে ঘুটে, কড়া ঝাল দিয়ে আর হাঁটুপ্রমাণ ঝোল রেখে। ঘি যাচ্ছে বোধ হয় গিরিজা বা পবিত্রের বাড়ীতে। আর শুধু কি ঘি? তেলের টিনও নিশ্চয়ই জমাদারদের ও বাবুদের বাড়ীতে যায়। তাই ঐ কাতলা ও মৃগেলের মাথাগুলোই সাঁতলে নেয়নি ভালো করে। তাই তো এমনি বোঁটকা গন্ধ!

আর, আমরা কিচেন ছেড়ে দেবার পর আমাদের চাকর-বাকর-বাবুর্চ্চিরাও বেশ ফাঁকি দিচ্ছে। তাই তো দেখলাম আলু-পটলের ডালনাতে সব আস্ত আস্ত মশলার গুঁড়ো লেগে রয়েছে। আর কী রং ডালনার ঝোলের! ফ্যাকাসে!

রং সম্বন্ধে বাড়ীতে সবার চাইতে খিটমিটি করেন আমার মা। ফরিদপুর জেলার খালিয়া গ্রামের ধনী জমিদার কুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আদুরে কন্যা গিরিবালা। সেকালের জমিদার। নায়েব-গোমস্তা, পাইক-পেয়াদা, চাকর-বাকরে ভর্ত্তি খালিয়া গ্রামের বিখ্যাত "বড়বাড়ী"। জমিদারকন্যা যেমন পারতেন ঢেঁকিতে ধান ভানতে, বালি দিয়ে মুড়ী আর খৈ ভাজতে, তেমনি আহার্য্য সম্বন্ধেও ছিল তাঁর শ্যেন দৃষ্টি! হলুদ ও লঙ্কায় টকটকে রং না হলে মা তা ছুঁতেনই না। মায়ের খানিকটে রুচি-পছন্দ ছেলেতেও যে সংক্রামিত হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

সরকারী লোকগুলো জানেই তো যে, আমরা এই খাবার স্পর্শও করবো না, তাই বোধ হয় নিজেরাও হেলায়-ফেলায় যা-খুশী তাই যেমন-তেমন করে নেড়ে-চেড়ে দিয়ে যায় যেমন থালা সাজিয়ে, তেমনি ফিরিয়েও নিয়ে যায় থালা ভরে।

দ্বিতীয় দিনের রাত্রির কথা মনে পড়ে। অনেকক্ষণ ঘুম এলো না। বিকেলে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে —
দিনের বেলায় বিছানা-বালিশ রোদে
তাই বালিশে কেমন একটা মিষ্টি
উত্তাপটা কেমন আপন-আপন মনে
কেন?······

সাধারণ অনশনের সপ্তদশ দিবসে,

আশ্চর্য্য, কর্ত্তৃপক্ষের টনক আজো নড়েনি। টবিন একেবারে পুরো-দস্তুর মিলিটারী দেখা যাচ্ছে।

সকাল বেলা আমার ঘরে এলেন ভোলা বাবু, সংবাদ দিলেন, টবিন আজ প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠিয়েছে।

অকস্মাৎ অন্ধকারে যেন একটা আলোকের ফ্ল্যাশ দেখতে পেলাম। প্রতিনিধিদের যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, নিশ্চয়ই টবিন তখন আপোষের কথাই পাড়বেন। কিংবা ও ব্যাটা হয়তো গররাজীই ছিল, কিন্তু কলকাতা থেকে এসেছে সরকারী হুকুম। এবার চাঁদ যাবেন কোথায়?

ভোলা বাবু বললেন: অনুশীলনের ননী সেনের দারুণ বমির ভাব দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝেই। বমির ভাব এলেই ননী সেন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। তাছাড়া ওদের আরো দু'জনের দারুণ জ্বর দেখা দিয়েছে। ডাঃ সরকার বলে গেছেন নিউমোনিয়া হতে পারে।

জিজ্ঞেস করলাম: তাহলে?

তাহলে আর কি!—জলের মত বললেন ভোলা বাবু: আজ যদি মীমাংসা না হয়ে যায়, তাহলে অনশন চালানো মুশকিল হবে। ... স্পষ্টই বলেছেন, এই cause এর জন্য তো ছেলেদের

... : তাহলে?

...nourable retreat; নইলে আরও ... হয়তো মতভেদ দেখা দেবে আর ... divide and rule নীতি প্রয়োগ ...বুর বিছানার নীচে নাকি পেন্সিলে-... পাওয়া গেছে। তাতে নাকি পবিত্রকে ...ভেদের কথা ও অনশন-সংগ্রাম আর ...র কথা লেখা আছে।

...ব বীরেন

অবশেষে কতকগুলি বাস্তব অসুবিধে ও খানিকটে অবমাননাকর আচরণের প্রতিবাদে তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করে নেবে নিঃসহায়ের মতো? এমনি নীরব সত্যাগ্রহীর মৃত্যুই কি বিপ্লবীর কাম্য?

বেলা বারোটা বাজতেই দেখলাম, চাকর হরিমোহন এসে আমার খাবার টেবিলে রেখে গেল। সঙ্গে যে সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি আবার এক গ্লাস জল ভরে রাখবার হুকুম জানিয়ে গেলেন। হরিমোহনও হাসি চেপে এক গ্লাস জল টেবিলের ওপর রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আজকে দেখছি আবার রান্না হয়েছে মুর্গীর মাংস! অর্থাৎ অন্ততপক্ষে আশী জনের বরাদ্দ মাংসটুকু বিকেলে হুল্লোড় করে অফিসে বসে যেমন সবাই খাবে, তেমনি ছাঁদা বেঁধে নিয়েও যাবে গিন্নী ও আণ্ডাবাচ্চাদের জন্য। খাবার লোক নেই, তার আবার মাংস! কিন্তু অকস্মাৎ এই মেনু পরিবর্ত্তন কেন? লোভ দেখানো আর ক্রমেই তা তীব্রতর করে দেখানো?

মনে পড়ে গেল, এই অনশন-সংগ্রাম সুরু হবার পূর্ব্বে যেদিনই সত্য বাবু মুর্গীর মাংসের ব্যবস্থা করতেন, সেদিন শুধু আমি নয়, ডবলিউ-বি চোদ্দ নম্বরের সবাই যথারীতি সবার শেষে খেতে গিয়ে আর ভাত বা অন্য কিছু খেতাম না, খেতাম শুধু মাংস। বিলম্বে যাবার জন্য পাছে আমাদের ভাগ্যে অবশিষ্ট আলুর জুস্ ও গোটা কতক মাংসহীন ঠ্যাং মাত্র জোটে, তাই সত্য বাবু রান্না হওয়া মাত্রই বড় এক ডেকচি মাংস পৃথক্ করে রাখতেন আমাদের জন্য। সদাশয় সত্য বাবু! খাইয়ে খুশী হতে যেমন ঢাকা জেলে দেখেছিলাম নগেন বাবুকে, তেমনি এখানে দেখছি সত্য বাবুকে। মহানুভব ব্যক্তি!

আর আমরা এক-এক জন প্লেটের পর প্লেট সাবাড় করে চলেছি নিবিষ্ট মনে সাধনা করবার পোজ নিয়ে। অপরের প্লেটে মাংসের পাহাড় ধূলিসাৎ হলো কিনা, ভ্রূক্ষেপও নেই সেদিকে। সে কাজ সত্য বাবুর, আমাদের হোষ্টের। প্লেটের পাশে জমছে শুধু চূর্ণীকৃত অস্থি। স্তূপ হয়ে উঠেছে।

খাঁটি গাওয়া ঘি, পেঁয়াজ, রসুন ও ঝাল দিয়ে সত্য বাবু রান্না ... করতেন, মুর্শিদাবাদের নবাব-বাড়ীর বাবুর্চ্চিও তার কাছে ... যায়। আহারের বিবরণ শুনে-শুনে আমাদের ...ম বাবুর ভারী লোভ হলো এক দিন স্বাদ গ্রহণের। ...স খেয়ে গেলেন মাংস আর পোলাউ। তার পর অসুখে ভুগতে ...ছিল প্রায় দিন পনেরো। ...নশাই ঝোল? শুধু ঘি আর তেল। ... হাতের ঘি ছাড়াতে। পেটের আর

...টা বাজে। আর ঘণ্টা তিনেকের ... আসবে আমাদের প্রতিনিধিদের ... দিনের অনশনে সমগ্র শিবিরে ...য়েছে। নিয়ম-নিষ্ঠা একেবারে ... অবশিষ্ট নেই কোথাও। ... দেয়া যায় না। আমাদের ...মরা, কিন্তু জীবনের ... বিপ্লবীর

অসংখ্য কাজ আছে। জেলের মধ্যে সারা জীবন কাটিয়ে দিলে সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে নাম ছাপতে পারে, সভা করে গলায় ফুলের মালা পড়তে পারে, অভিনন্দন-পত্রও পাওয়া যেতে পারে সুদৃশ্য রূপোর কাসকেটে, কিন্তু দেশের কাজ তাতে কতখানি হবে, বিপ্লবের রক্তরাঙা পথে সর্ব্বহারাদের কতটুকু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে, এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। কঠিনতম যে দায়িত্ব কিশোর বয়সেই স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়ে আমরা যাত্রা সুরু করেছি, সে দায়িত্ব পালনে অণুমাত্রও শিথিলতা দেখালে দেশবাসীর কাছে তার কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য আমরা। জেলীয় জীবনের বিশ্রি অসুবিধাগুলির জন্ম আমরা জানাতে পারি তীব্র প্রতিবাদ, দেখাতে পারি ক্রুদ্ধ বিক্ষোভ এবং এতেও যদি সুফল কিছু না হয়, তাহলে—আমার মনে হয়, এক দিন সদলবলে বিদ্রোহ করে জেল ভেঙে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে সশস্ত্র সিপাইয়ের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াইতে প্রাণ দিতে পারি। কিন্তু, নিরুপায়ের মতো, শিবিরের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিনা প্রতিবাদে নেহাৎ গোবেচারা ভদ্র ব্যক্তির মতো বর্ণহীন মৃত্যু আমাদের জন্ম নয়!······

তবে আপোষ আজ হয়ে যাবেই। যদি হয়, তাহলে দু'-এক দিনের মধ্যেই আবার চৌকা আসবে আমাদের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে। আবার সত্য বাবুর হোটেল দ্য প্যারী! কিন্তু আর মাংস-মাছ ভালো লাগে না। এবার বলবো শাক-সবজী ও তরকারি চালাতে। সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে পাতলা করে মুসুর ডাল। মাছ চলতে পারে। তবে আর রুই-কাতলা নয়, এবার ছোট মাছের ঝোল গোলমরিচ আর আদা দিয়ে আর কালজিরে ফোড়ন। পাতিনেবু তো থাকবেই।

গরম পড়েছে অসহ্য। ঘরের অন্যান্য অধিবাসীরা কে কোথায় পালিয়েছে একটুখানি ঠাণ্ডার প্রত্যাশায়। একা আমি। সময়ও যেন আর কাটতে চায় না। সেই কখন্ বিকেল হবে, আমাদের প্রতিনিধিরা যাবেন অফিসে। মিটমাটের সংবাদ এলেই হয়তো আজ রাত্রে পাওয়া যাবে ঘোলের সরবৎ, কমলালেবুর রস। কিন্তু সতেরো দিন যাঁরা অনশনে আছেন, তাঁদের কথা পৃথক্। আমার তো সবে আজ তৃতীয় দিবস। ঘোলের সঙ্গে সরু চালের এক মুঠো ভাতও আমার পক্ষে অন্যায় কিছু হবে না। এমন কি, ঐ যে মুর্গীর মাংস রেখে গেছে, ও থেকে দু'খানা আলু তুলে খেলেই কি অমনি আমাশা ধরে যাবে? তিন দিনে শরীরের যন্ত্রগুলো এমন কিছু বেতো হয়ে যায়নি যে, দু'খানা আলুর টুকরোও হজম হবে না!

মাংসের বাটিটা হাতে তুলে নিলাম। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলাম, সত্যিই রান্না বিশ্রি, মাছের ঝোলের মত। বেশী সেদ্ধ করে ফেলেছে, হাড়-মাস আলাদা হয়ে গেছে। তবুও মুর্গীর মাংস, সেরা মাংস। আপোষ তো হয়ে যাবেই আজ, মাত্র দু'-তিন ঘণ্টা বাকি। কী আর এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে যদি দু'খানা আলু মুখে তুলে দিই···

আঃ, একেবারে অমৃত! এত চমৎকার রান্না, তা তো রং দেখে বোঝা যায়নি। বর্ণচোরা আমের মত। আর একটা—

এমন সময় ঝড়ের বেগে এসে ঢুকলেন ভোলা বাবু।

দ্বিজেন বাবু, আপোষ হয়ে গেছে। টবিন নিজেই নোটিশ দিয়ে অনেকগুলো দাবী মেনে নিয়েছে। বাকিগুলোর জন্ম আমাদেরও বর্ত্তমানে আর তাগাদা নেই। পরে হবে, এই স্থির হলো সমর পরিষদের বৈঠকে এই মাত্র।—আমি আসছি আপনার সরবৎ আর লেবুর রস নিয়ে।

ভোলা বাবু বেরিয়ে যেতেই মনে হলো জীবনে এত বড় সুখকর সংবাদ কখনও পাইনি, আর বোধ হয় পাবোও না। এবার আর চুরি করে দু'টো আলু কেন, সবগুলো আলুই খেতে পারি। আর পূরো বাটিটাই সাবাড় করে দিলে কার কি বলবার আছে? কারণ—The hungerstrike is over—ভার্সাই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে?

[ক্রমশঃ।

শরৎচন্দ্র

কমলাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্কিম উষা আর রবির উদয়
তাহার পরেতে যার নব অভ্যুদয়
জাগাল বাঙালী জনে নিজ মহিমায়
ধন্য সে শরৎচন্দ্র নভ-নীলিমায়
সমাজের নিষ্ঠুরতা ঘুচাল যে জন
বর্ত্তমান বঙ্গ মাঝে সে মহাভাজন
সাহিত্যিকরূপে জাগে বঙ্গভূমি 'পরে
নিবেদিনু শ্রদ্ধা সেই দরদীর তরে।

সা হি ত্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

ফণীন্দ্রনাথ বসু—শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৯৬ (আনু) খৃঃ। মৃত্যু—১৯৩২ খৃঃ বিহার প্রদেশে নালন্দায়। শিক্ষা—এম, এ, পি-এইচ-ডি। কর্ম—অধ্যাপক, শান্তিনিকেতন, পরে নালন্দা কলেজ (বিহার শরীফ)। ইনি ইংরেজি ও বাংলা বহু সাময়িক পত্রের লেখক। গ্রন্থ—Indian Teachers of Buddhist University (মাদ্রাজ ১৯২৩), Indian Teachers in China (মাদ্রাজ, ১৯২৩), The Indian Colony of Champa, The Indian Colony of Siam, The Hindu Colony of Cambodia, The Principles of Indian Silpa-sastra, A Hundred years of the Bengali Press, Life of Sir Asutosh Mukherjee, Story of Rings (অনুবাদ যুগলাঙ্গুরীয়), স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবনী, স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনী; সম্পাদিত গ্রন্থ—প্রতিমা-মান-সমান।

ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। জন্ম—১৩০৪ বঙ্গ ১৬ই আশ্বিন ২৪-পরগণা জেলার পানিহাটি গ্রামে। পিতা—হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শিক্ষা—প্রবেশিকা (কামারহাটি সাগর দত্ত ফ্রি স্কুল, ১৯১৫), আই, এ (উত্তরপাড়া কলেজ), বি, এ (কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ), এম, এ (১৯২১)। কর্ম—সাংবাদিকতা; দৈনিক বসুমতী (১৯২০-১৯২৭), বাংলার কথা, বঙ্গবাণী, সাপ্তাহিক হিতবাদী, ভারতবর্ষ (১৩৪২), বহু জন-প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত। নিখিল বঙ্গ সাময়িক পত্র সংঘের সভাপতি। সম্পাদক—ভারতবর্ষ (মাসিক, ১৩৪৫)।

ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। শিক্ষা—বি, এ। গ্রন্থ—তিন বন্ধু, চোর ও ডিটেক্‌টিভ, অল্প বুদ্ধি।

ফণীন্দ্রমোহন ঘোষ—গ্রন্থকার। জন্ম—ব্রিটিশ চন্দননগর। শিক্ষা—বি. এ। গ্রন্থ—ভারতভিক্ষা, শান্তিকণা।

ফতে আলি হোসেনী—হিন্দী গ্রন্থকার। গ্রন্থ—তজ-কিরাত-উল-মুয়ারাই (জীবনী সংগ্রহ)।

ফরিদুদীন, মৌলভী—সাংবাদিক। সম্পাদক—জগদুদ্দীপক ভাস্কর (সাপ্তাহিক, ১৮৪৬। ইহা মুসলমান পরিচালিত দ্বিতীয় সংবাদপত্র। ইহাতে ফার্সি, উর্দু, হিন্দী, ইংরেজি ও বাংলা এই পাঁচটি ভাষায় রচনা থাকিত)।

ফয়জউল্লা, শেখ—বঙ্গীয় কবি। জন্ম—১৫শ শতাব্দী (আনু)। গ্রন্থ—গোরক্ষ-বিজয় বা মীনচেতন।

ফাজিল শাহ,—মুসলমান কবি। জন্ম—১৮৪৮। কাব্যগ্রন্থ—প্রেমরতন।

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১৯০৫ খৃঃ বীরভূমের রামপাড়া কোলাগ্রামে। আই. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন। কর্ম—'বঙ্গলক্ষ্মী' মাসিক পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে। গ্রন্থ—হিজুর নদীর কূলে, কাশবনের কন্যা, আকাশ-বনানী জাগে, ধরণীর ধূলিকণা, পথের ধুলো, জলে জাগে ঢেউ, ভাগীরথী বহে ধীরে, জীবন কন্দ, চিতা বহ্নিমান, হে মোর দুর্ভাগা দেশ (১৩৫৬), জ্যোতির্গময়, গুণধর ছেলে (শি), তুঁহু মম জীবন, হৃদয় দিয়ে হৃদি (১৩৫২), স্বাধীনতা হীনতায়, (১৩৫৩), মধুরাত্তি জাগর, স্বাধীনতা সংগ্রাম, প্রিয়া ও পৃথিবী, আশার ছলনে ভুলি, কালরুদ্র, নীলাঙ্কক, উদয়ভানু, জাগ্রত যৌবন, বহ্নিকন্যা।

ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী—মহিলা সাহিত্যিকা। মৃত্যু—১৩৩২ বঙ্গ। স্বামী প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী। সম্পাদিকা—নব্য ভারত (১৩২৮-১৩৩২)।

ফেরদৌসী—মুসলমান কবি। জন্ম—৯৪১ খৃঃ। মৃত্যু—১০২০ খৃঃ। গজনীর মামুদের সভাকবি। গ্রন্থ—শাহ্‌নামা।

ফেলু ওস্তাগর—গ্রন্থকার। জন্ম—২৪ পরগনা। গ্রন্থ—আত্তায়ের চার ইয়ার (১২০৭ বঙ্গ)।

ফৈজী—কবি ও গ্রন্থকার। শেখ অবুল ফৈজের সাহিত্যিক উপাধি। জন্ম—১৫৩৭ খৃঃ ১৬ই সেপ্টেম্বর। মৃত্যু—১৫৯৫ খৃঃ ৪ঠা অক্টোবর আগ্রা। ইনি সম্রাট্ অকবরের সভা-কবি। আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃতে জ্ঞানবিজ্ঞ। বহু কবিতা লেখেন। রাজকীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যে সম্রাট্ ইহার পরামর্শ লইতেন। গ্রন্থ—দিবান-ই-ফৈজী, কথাসরিৎসাগর (ফার্সী অনুবাদ), লতিফাহ-ই-ফৈজী, লীলাবতী (ফার্সী অনুবাদ—১৫৮৫ খৃঃ), মহাভারত (ফার্সী অনুবাদ), মবারিক উল-কলম, নল-দমন (১৮৩১ খৃঃ মুদ্রিত), নসিদ অসুসফর, বীজগণিত (ফার্সী অনুবাদ), শরিফ-অল-মরিফং (বেদান্ত-দর্শনের অনুবাদ), সরাতি-উ অল-ইলহাম (কোরানের বিশদ ব্যাখ্যা—১৫৯৩ খৃঃ)।

ফৈজুন্নিসা চৌধুরাণী—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—রূপ-জালাল (উপ, ঢাকা, ১৮৭৬)।

বংশমণি—কবি পণ্ডিত। নেপালরাজ প্রতাপমল্লের (১৬৩৯-১৭৮১ খৃঃ) সভাপতি। গ্রন্থ—গীতদিগম্বর (নাটক, ১৬৫৫ খৃঃ)।

বংশী দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভজনরত্ন (শ্রীকৃষ্ণ ভজনের মাহাত্ম্য)।

বংশী দাস, দ্বিজ—কবি। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলায় পাতুয়াইর গ্রামে। গ্রন্থ—পদ্মপুরাণ (গীত, ১৫৭৫ খৃঃ)।

বংশীধর—চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্। গ্রন্থ—বৈদ্যকুতূহল।

বংশীধর দ্বিবেদী—জ্যোতির্বিদ্। গ্রন্থ—কর্মমঞ্জরী।

বংশীবদন দাস—বৈষ্ণব কবি। জন্ম—১৪১৪ খৃঃ নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফুলিয়া পাহাড়ে। পিতা—ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়। মাতা—ভাগ্যবতী। গ্রন্থ—দীপকোজ্জ্বল, দীপান্বিতা।

বকাইমোল্লা—কবি। বাবরের সমসাময়িক। গ্রন্থ—মসনবী।

বকুল কায়স্থ—অসমীয়া গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কিতাবত মঞ্জরী (১৪৩৪ খৃঃ)।

বক্তঃস্থলাচার্য—গ্রন্থকার। জন্ম—১৫শ শতাব্দী। গ্রন্থ—অদ্বৈতবিতাঙ্কুর বিবরণ-দর্পণ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্য-সম্রাট্। জন্ম—১২৪৫ বঙ্গ ১৩ই আষাঢ় (১৮৩৮ খৃঃ ২৭এ জুন) নৈহাটীর অন্তর্গত কাঁটাল-পাড়ায়। মৃত্যু—১৩০০ বঙ্গ ২৬এ চৈত্র (১৮৯৪ খৃঃ ৮ই এপ্রিল)। পিতা—যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ডেপুটী কালেক্টর), শিক্ষা—হুগলী

কলেজ (মুহম্মদ মহসিন কলেজ, ১৮৪১), জুনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষা (১৮৫৪), সিনিয়ার বৃত্তি-পরীক্ষা (১৮৫৬), এনট্রান্স পরীক্ষা (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৮৫৭), বি. এ (ঐ, ১৮৫৭), এই সময় চাকুরী করিতে করিতে বি. এল (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৮৬৯)। কর্ম—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর (১৮৬০) বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে। অবসর গ্রহণ (১৮৯১, ১৪ই সেপ্টেম্বর)। কবিতা রচনা আরম্ভ—সংবাদ-প্রভাকর পত্রে। ইঁহার 'বন্দে মাতরম্' গানে দেশবাসী ইঁহাকে ঋষি আখ্যায় ভূষিত করেন। প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাছে ইঁহার বাংলা লেখার হাতে খড়ি। গ্রন্থ—ললিতা (গল্প, ১৮৫৮), দুর্গেশ-নন্দিনী (উ, ১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (উ, ১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), ইন্দিরা (১৮৭৩), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), লোকরহস্য (১৮৭৪), বিজ্ঞান-রহস্য (১৮৭৫), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রাধারাণী (১৮৭৫), কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫), বিবিধ সমালোচনা (১৮৭৬), রজনী (১৮৭৭), উপকথা (ক্ষুদ্র উপন্যাস, ১৮৭৭), রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী (১৮৭৭), কবিতা পুস্তক (১৮৭৮), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), প্রবন্ধ পুস্তক (১৮৭৯), সাম্য (১৮৭৯), রাজসিংহ (ক্ষুদ্র কথা, ১৮৮২), আনন্দ মঠ (১৮৮২), মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত (১৮৮৪), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস (১৮৮৬), কৃষ্ণচরিত্র ১ম (১৮৮৬), সীতারাম (১৮৮৭), বিবিধ প্রবন্ধ ১ম (১৮৮৭), ২য় (১৮৯২), ধর্মতত্ত্ব ১ম (১৮৮৮), সহজ রচনা-শিক্ষা, সহজ ইংরেজি-শিক্ষা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৯০২), Rajmohan's wife (১৯৩৫, মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।) সম্পাদক—বঙ্গদর্শন (১৮৭২)।

বঙ্কিমচন্দ্র দাস—গ্রন্থকার। জন্ম—চট্টগ্রাম জেলার পটিয়কোরা নামক স্থানে। গ্রন্থ—জহরব্রত।

বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত—শিশু সাহিত্যিক। শিশুদের জন্য বহু নাটক রচনা করেন। শিশুনাট্য গ্রন্থ—গুরু রামদাস, বীর রমণী, চিতোর গৌরব, কর্ণ, নদের পাগল, রক্তের লেখা, আক্কেল গুড়ুম, হর্ষবর্ধন প্রেমের পথে, টাকার পুঁথা, রাজশ্রী।

বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র—কবি। জন্ম—১২৬৭ বঙ্গ আশ্বিন মাসে। পিতা—রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর। শিক্ষা—প্রবেশিকা (মেট্রোপলিটান স্কুল), এফ. এ (ঐ, কলেজ), বি-এ (ঐ), এম্ এ ও বি, এল (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৮৮১ ও ১৮৮২)। কর্ম—মুন্সেফ (১৮৮৭), সবজজ (১৯০৮), ছোট আদালতের জজ (১৯১৩)। ইনি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে কবিতা রচনা করেন। কবিভূষণ উপাধি লাভ (কাশীতে ১৯১৬)। কাব্য গ্রন্থ—চীবর, আকিঞ্চন (১৩২০)।

বঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী—গ্রন্থকার। শিক্ষা—বি, এল। গ্রন্থ—বীরকেশরী নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, সম্রাট আকবর, মহাভারত-মঞ্জরী (১৩০১)।

বঙ্কুবিহারী কর—জীবনীকার। গ্রন্থ—মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মৌনী বাবা।

বঙ্কিমবিহারী দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কুসুম যুগল (১৮৯৮), ত্রিবেণী (১৯০১), শ্মশান (১৮৯৭)।

বঙ্কুবিহারী ধর—গ্রন্থকার ও সাহিত্যিক। ইনি বহু নাটক ও উপন্যাস রচনা করেন। গ্রন্থ—উপন্যাস—কাকীমা, গৌরীদান (১৯০৯), পিশিমা, কনে মা, বিষবিবাহ, সতী কি কলঙ্কিনী, বৌমা, বেয়ান ঠাকরুণ, নাটক—সুখের বাসর, রাবণবধ্যা মৈথিলী, উর্বশী-উদ্ধার, বভ্রুবাহন, অঞ্জলি, আর্যকাহিনী (জীবনী), গাভী-পরিচর্যা। সম্পাদক—বসুধা (১৩১২-২২)।

বঙ্কুবিহারী সান্যাল—সাহিত্যিক। সম্পাদক—বঙ্গহিতৈষিণী (পাক্ষিক, কালিঘাট, ১২৮১)।

বঙ্গচন্দ্র মজুমদার—গ্রন্থকার। ঢাকা-নিবাসী। গ্রন্থ—সরমা-বিলাপ (১৯০১)।

বঙ্গ সেন—আয়ুর্ব্বেদবিদ্। জন্ম—আনুমানিক ১৫শ শতাব্দীর পূর্ব্বে। গ্রন্থ—চিকিৎসা মহার্ণব। বঙ্গদত্ত বৈদ্যক, সুবর্ণসার।

বজ্রবারাহী—বৌদ্ধ সাধিকা। গ্রন্থ—মহামুদ্রাভিগীতি।

বটুবিহারী চট্টোপাধ্যায়—নাট্যকার। গ্রন্থ—হিন্দুমহিলা নাটক (১৮৬৯ খৃঃ)।

বদি উদ্দীনে কাজি—প্রাচীন বঙ্গীয় মুসলমান কবি। গ্রন্থ—চিহু ইমান।

বদ্রিনারায়ণ চৌধুরী (প্রেমধন)—হিন্দী গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৫৫ খৃঃ মির্জাপুরে। হিন্দী গ্রন্থ—ভারত-সৌভাগ্য আর্যাভিনন্দন, বর্ষবিন্দু, কাজরী-কাদম্বিনী, যুগলমঙ্গল-স্তোত্র, রামাভিষেক, কলম কী কারিগরী। সম্পাদক—আনন্দ কাদম্বিনী বা নাগরী নীরদ (পত্রিকা)।

বন দুর্লভ—বঙ্গীয় কবি। নামান্তর—বনদুর্লভ। নিবাস—চট্টগ্রাম (আনু)। ১৮শ শতাব্দী। গ্রন্থ—দুর্গাবিজয়।

বনমালী—জ্যোতির্বিদ। গ্রন্থ—ভাস্বতীতত্ত্ব-প্রকাশিকা, স্ফুট-চন্দ্রার্কী (১৬১৮ খৃঃ)।

বনমালী আচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রহস্যার্ণব (তন্ত্রগ্রন্থ)।

বনমালী বেদান্ততীর্থ—গ্রন্থকার। শিক্ষা—এম. এ। অধ্যাপক, গৌহাটী কটন কলেজ। গ্রন্থ—ধর্ম সমাজ ও স্বাধীন চিন্তা।

বনমালী মিশ্র—জ্যোতির্বিদ। গ্রন্থ—জ্যোতিষসার মঞ্জরী (১৬২৭ খৃঃ)।

বনলতা দেবী—সাহিত্যিকা ও মহিলা কবি। জন্ম—১২৮৭ বঙ্গ ৬ই পৌষ কলিকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরে। মৃত্যু—১৩০৭ বঙ্গ ১৮ই কার্ত্তিক মধুপুরে। পিতা—শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সমাজ-সংস্কারক)। ভ্রাতা—স্যর অ্যালবিয়ান রাজকুমার ব্যানার্জি। স্বামী—শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার (জীবনী কোষ-প্রণেতা)। গৃহে ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা। গ্রন্থ—বনজ (কাব্য)। সম্পাদিকা—অন্তঃপুর (মাসিক, ১৩০৪—১৩০৭। ইহাতে কেবল-মাত্র মহিলাদিগের রচনা প্রকাশ হইত)।

বনাচার্য—জ্যোতির্বিদ্। গ্রন্থ—চন্দ্রাভরণ (জাতক গ্রন্থ)।

বনিজ মুহম্মদ—বঙ্গীয় মুসলমান কবি। গ্রন্থ—ইমাম-সাগর।

বনোয়ারীলাল গোস্বামী—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৬৮ বঙ্গ (আনু) পাবনা জেলায় হাপসিয়া গ্রামের বৈষ্ণব-বংশে। মৃত্যু—১৩৪৫ বঙ্গ বৈশাখ। মোক্তারি পাশ করিয়া আইন-ব্যবসায়। গ্রন্থ—সাধক-চিন্তামৃত, নরোত্তম-আশ্রয়-নির্ণয়।

বনোয়ারীলাল গোস্বামী—কবি ও শিক্ষাব্রতী। জন্ম—শান্তিপুরে

পিতা—জয়গোপাল গোস্বামী (গোবিন্দ দাসের কড়চা—আবিষ্কারক) প্রধান পণ্ডিত, গাইবান্ধা বিদ্যালয়। গ্রন্থ—কাব্যহার, খিচুড়ী, পোলাও, বেণুবন। সম্পাদিত গ্রন্থ—গোবিন্দ দাসের কড়চা (ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন সহ)। সম্পাদক—মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী (মাসিক)।

বনোয়ারীলাল চৌধুরী—জীবতত্ত্ববিদ্। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলার সেরপুর জমীদার-বংশে। মৃত্যু—১৯৩১ খৃঃ ৪ঠা মার্চ কলিকাতা বালিগঞ্জে। সহ-সম্পাদক—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

বনোয়ারীলাল মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। নিবাস—সৈদাবাদ, বহরমপুর। সম্পাদক—মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী (পাক্ষিক, ১২৭৭)।

বন্দী মিশ্র—আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ্। পিতা—জগদীশ মিশ্র। গ্রন্থ—যোগসুধানিধি।

বন্দে আলী মিয়া—বঙ্গীয় মুসলমান কবি। জন্ম—১৯০৭ খৃঃ পাবনা জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে। শিক্ষা—ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করিয়া ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল, গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বহু দিন কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগে বিজড়িত ছিলেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে কবিতা ও ছোট গল্প লেখক। গ্রন্থ—প্রথম পুস্তক চোর জামাই (শিশু), (শিশু পাঠ্য) মেঘকুমারী, জঙ্গলের খবর, মৃগপরী; উপন্যাস—নীড়ভ্রষ্ট (১৩৫৬), ঘূর্ণিহাওয়া (১৩৫৪), জাগ্রত-জীবন (১৩৫৬), অস্তাচল (১৩৪০), পরিহাস (১৩৪২), প্রেমের বহ্নিশিখা (১৩৫৮), নারীরহস্য (১৩৫৪), নবী কলঙ্কময়ী (১৩৫৪), তাসের ঘর (১৩৫৮); কবিতা—ময়নামতীর চর (১৩৩১), পদ্মানদীর চর (১৩৫৩), মধুমতীর চর (ঐ), অনুরাগ (১৩৪১), লীলাসঙ্গিনী (১৩৫৭), সুরলীলা (১৩৪৩), মিঞ্জার (১৩৪৭), সোনালি স্বপন (১৩৫৫)।

বপ্পভট্টি—জৈন কবি। জন্ম—৭-৮ম শতাব্দী। গ্রন্থ—সরস্বতী-স্তোত্র, চতুর্বিংশতি জিনস্তুতি।

বরদগুরু আচার্য—তার্কিক পণ্ডিত। নামান্তর—প্রতিবাদী ভয়ঙ্করম্ অন্নন। জন্ম—১৪শ শতাব্দী। পিতা—দেশিক। গ্রন্থ—সপ্ততিরত্নমালিকা (কাব্য), তত্ত্বত্রয়চুলুক-সংগ্রহ।

বরদনায়ক সূরি—জৈন গ্রন্থকার। জন্ম—১৫শ শতাব্দী। গ্রন্থ—চিদচিদীশ্বরতত্ত্ব-নিরূপণম্।

বরদরাজ—বৈয়াকরণ। গ্রন্থ—লঘুকৌমুদী, মধ্যকৌমুদী, সারকৌমুদী (সিদ্ধান্তকৌমুদী অবলম্বনে)।

বরদরাজ বা বরদাচার্য—দার্শনিক পণ্ডিত। জন্ম—১১শ শতাব্দী শেষ পাদে। পিতা—রামদেব মিশ্র। গ্রন্থ—ন্যায়দীপিকা, তার্কিকরক্ষা, ন্যায়কুসুমাঞ্জলির বোধিনী টীকা, বসন্ততিলক (ভাণগ্রন্থ)।

বরদাকান্ত ঘোষ—গ্রন্থকার। নিবাস—ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী হাসাইল গ্রামে। বিদ্যারত্ন উপাধিলাভ। গ্রন্থ—সতীত্ব, পদ্মপ্রসূন, রাজভক্তি, অমৃতরেণু, শান্তি, আকাশ, ব্রহ্মপুত্রমাহাত্ম্য, কায়স্থ-সখা।

বরদাকান্ত দাস—ধর্মপ্রচারক। ইনি স্বামী কৈবল্যানন্দ নামে পরিচিত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী। পূর্বাশ্রম—মেদিনীপুর জেলার কাঁথির অন্তর্গত বামুনিয়া নামক গ্রামে। পিতা—গোবিন্দপ্রসাদ দাস। গ্রন্থ—দীক্ষিতের নিত্যকৃত্য ও পূজাপদ্ধতি (১৩৩২), বেদান্ত্যায় (১৩৪৩)।

বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—বরিশাল। শিক্ষা—এম, এ, বি, এল। আইন-ব্যবসায়ী। গ্রন্থ—বুদ্ধ (শিশু)।

বরদাকান্ত মজুমদার—শিশু সাহিত্যিক। ইনি শিশুদের উপযোগী বহু গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ—সতীচিত্র, বেহুলা, ভীষ্ম, পার্বতী, ধ্রুব, শৈব্যা, উষা, সতীরাণী, সাবিত্রী সত্যবান, চন্দ্রহাস, সুভদ্রা, শর্মিষ্ঠা, আবার বলো, সীতা, চিন্তা, দময়ন্তী, খুকুরাণীর খেলা। সম্পাদক—শিশু (১৩১১—২৪)।

বরদাকান্ত সেনগুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অতুলচন্দ্র (১৩০১), প্রতিভা (১২৯১), হীরাবাই (১৩০১)।

বরদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—বৈষয়িকবন্ধু (১২৯০)।

বরদাচরণ ঘোষ, নেতা—সাহিত্যিক। খৃষ্টধর্মাবলম্বী। সম্পাদক—বঙ্গবধূ (খৃষ্টতত্ত্বমূলক মাসিকপত্র, ১৮৮২)।

বরদাচরণ মিত্র—কবি ও সমালোচক। জন্ম—১৮৬২ খৃঃ কলিকাতা কুমারটুলীর মিত্র-বংশে। মৃত্যু—১৯১৫ খৃঃ। পিতা—বেণীমাধব মিত্র। পূর্বনিবাস—নদীয়া জেলার চাকদহ গ্রামে। শিক্ষা—এম, এ (১৮৮২), ষ্ট্যাটুটারি সিবিল সার্ভিস (১৮৮৬)। কর্ম—দায়রা জজ (১৮৯৪)। পঠদ্দশা হইতেই সাহিত্যসাধনা। গ্রন্থ—প্যারীচাঁদ মিত্র ও কিশোরীচাঁদ মিত্রের জীবনী, মেঘদূত (বঙ্গানুবাদ), অবসর (কাব্য)।

বরদাচার্য—জ্যোতির্বিদ। গ্রন্থ—গ্রহরত্নমালিকা।

বরদাচার্য—অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত। নামান্তর—মড়াভূবম্মল। ১৩শ শতাব্দী। রামানুজাচার্যের ভাগিনেয়। গ্রন্থ—তত্ত্বসার, সর্বার্থচতুর্থাংশম্।

বরদাচার্য—গ্রন্থকার। পিতা—দেবরাজ। গ্রন্থ—তত্ত্বনির্ণয়।

বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত—নাট্যকার। নাট্যগ্রন্থ—মিশরকুমারী, সত্যভামা, ডালিম, নর্তকী, নাদিরশাহ, শ্রীদুর্গা, সুভদ্রা, কর্মবীর, সবুজসুধা, একলব্য, প্রেমের তুফান।

বরদাপ্রসন্ন সোম—রাজকর্মচারী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৪৪ খৃঃ হুগলীর চুঁচুড়ার জমীদার-বংশে। মৃত্যু—১৯১২ খৃঃ। পিতা—দুর্গাচরণ সোম। শিক্ষা—প্রবেশিকা (হুগলী কলেজ, ১৮৬৬), বি-এ (ফ্রি চার্চ ইনষ্টিটিউসন, ১৮৬৯), বি-এল (১৮৭০)। কর্ম—মুন্সেফ পরে সব-জজ। অবসর গ্রহণ (১৯০১)। প্রতিষ্ঠা—সংস্কৃত বিদ্যালয় (ভট্টপল্লী), রায় বাহাদুর উপাধি লাভ (১৯০১)। গ্রন্থ—গয়া ও গয়েলী, Relief Act.

বরদাপ্রসাদ চক্রবর্তী—সাংবাদিক। সম্পাদক—গৌড়প্রভা (১৩৩৬-৩৯)।

বররঙ্গ—দ্বৈতবাদী। জন্ম—১০ম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে। গ্রন্থ—গদ্যত্রয়।

বররুচি—উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম। গ্রন্থ—সংস্কৃত অভিধান, প্রাকৃত-প্রকাশ, নীতিরত্ন।

বররুচি—জ্যোতির্বিদ্। গ্রন্থ—ভার্গবমুহূর্ত (১৪৯১ খৃঃ)।

বররুচি—টীকাকার। নামান্তর—কাত্যায়ন। গ্রন্থ—দুর্ঘটবৃত্তি (কাতন্ত্র টীকা)।

বরাহমিহির—জ্যোতির্বিদ্। পিতা—বরাহ। জন্ম—১ম খৃঃ পূর্ব শতাব্দী। মহারাজ শকারি বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত। গ্রন্থ—বৃহৎসংহিতা (মূল)।

বরাহমিহির—জ্যোতির্বিদ্। জন্ম—৫০৫ খৃঃ মগধে কাম্পিল্ল নগরে। মৃত্যু—৫৮৭ খৃঃ। পিতা—আদিত্য দাস (জ্যোতির্বিদ্)। ইনি অবন্তীপতি যশোধর্মা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম। গ্রন্থ—বৃহজ্জাতক, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, যোগযাত্রা (৫৭৫ খৃঃ), বিবাহ-পটল (৫৭২), লঘুসংহিতা, বৃহৎসংহিতা, লঘুজাতক।

বরুণ ভট্ট—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। ১০৪০ খৃঃ গুর্জর প্রদেশের রাজধানী ভিলমল নগরে বর্তমান ছিলেন। গ্রন্থ—খণ্ডখাদ্যের টীকা (ব্রহ্মগুপ্তকৃত)।

বলেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। গ্রন্থ—এলোকেশী (উপ, ১৩০১)। সম্পাদক—ইন্দিরা (১৩১২-১৩)।

বর্ধমান উপাধ্যায়—দার্শনিক পণ্ডিত। জন্ম—১৩শ শতাব্দী। পিতা—গঙ্গেশ উপাধ্যায়। টীকা-গ্রন্থ—তত্ত্ব চিন্তামণি-প্রকাশ, ন্যায়নিবন্ধ-প্রকাশ, ন্যায়পরিশিষ্ট-প্রকাশ, প্রমেয়-নিবন্ধ-প্রকাশ, কিরণাবলী-প্রকাশ, ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি-প্রকাশ, ন্যায়লীলাবতী-প্রকাশ, খণ্ডন-খণ্ড-প্রকাশ, দত্তবিবেক।

বর্ধমান উপাধ্যায়—বৈয়াকরণ। গ্রন্থ—ভানরত্ন মহোদধি (ব্যাকরণ গ্রন্থ, ১১৪০ খৃঃ)।

বর্ধমান সূরি—জৈন আচার্য। গ্রন্থ—আচারদিনকর।

বর্ধমান সূরি—জৈন গ্রন্থকার। অভয়দেব সূরির শিষ্য। গ্রন্থ—শকুন-রত্নাবলী।

বলদেব পালিত—কবি। জন্ম—১৮৩৫ খৃঃ। মৃত্যু—১৯০০ খৃঃ ৭ই জানুয়ারী। পিতা—বিশ্বনাথ পালিত (বাঁকীপুর প্রবাসী)। পৈতৃক নিবাস—হালিসহরের কোণাগ্রাম। শিক্ষা—বাঁকীপুর গুলজার-বাগের বিদ্যালয়। কর্ম—ছাপরা, দানাপুর মিলিটারী পে অফিস। অবসর গ্রহণ (১৮৮০)। স্থাপনা—মধ্য-ইংরেজি বিদ্যালয় (দানাপুর, ১৮৬৬, বর্তমান নাম দানাপুর বলদেব একাডেমি)। কাব্যগ্রন্থ—কাব্যমঞ্জরী (১২৭৫), কাব্যমালা (১২৭৬), ললিত কবিতাবলী (১২৭৭), ভর্তৃহরি কাব্য (১২৭১), কর্ণার্জুন কাব্য (১২৮২)।

বলদেব বিদ্যাভূষণ—বৈষ্ণব দার্শনিক পণ্ডিত। জন্ম—১৮শ শতাব্দী বালেশ্বর জেলা। ইনি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য। ইনি জয়পুরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে শাস্ত্রীয় তর্কে পরাজিত করেন। গ্রন্থ—ব্রহ্মসূত্রের উপর গোবিন্দভাষ্য, বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য, প্রমেয়-রত্নাবলী (ভক্তিমীমাংসা-গ্রন্থ), সিদ্ধান্তরত্ন বা ভাষ্যপীঠক, গীতাভাষ্য, বেদান্তস্যমন্তক, উপনিষদ্‌ভাষ্য।

বলভদ্র—জ্যোতির্বিদ্। পিতা—দামোদর। গ্রন্থ—হোরারত্ন (১৬৫৫)।

বলভদ্র—আয়ুর্বেদবিদ্। গ্রন্থ—নবরত্ন-বিবাদ, বৃন্দসংগ্রহযোগ।

বলভদ্র মিশ্র—জ্যোতির্বিদ্। জন্ম—১৫৬৪ শকে রাজমহল নগরে। গ্রন্থ—হায়নরত্ন (১৬৪২)।

বল্লভাচার্য—গণিতজ্ঞ। পিতা—শ্রীধরাচার্য (গণিতজ্ঞ)। টীকাগ্রন্থ—কল্পবল্লী (সূর্যসিদ্ধান্তের টীকা)।

বলরাম—গ্রন্থকার। ইনি কলিকাতা ঠাকুর-বংশের পূর্বপুরুষ। পিতা—পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ। গ্রন্থ—প্রবোধপ্রকাশ।

বলরাম কবিকঙ্কণ—বঙ্গীয় কবি। জন্ম—মেদিনীপুর। চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর গীতের গুরু। গ্রন্থ—চণ্ডীর উপাখ্যান (১৬শ শতাব্দী)।

বলরাম চক্রবর্তী, কবিশেখর—পদকর্তা। গ্রন্থ—কালিকামঙ্গল (ইহ প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান)।

বলরাম দাস—কবি ও পদকর্তা। জন্ম—১৫৩৭ খৃঃ বর্ধমান জেলায় শ্রীখণ্ডের কবিরাজ-বংশে। গুরুদত্ত নাম—নিত্যানন্দ দাস। পিতা—আত্মারাম দাস (কবি)। গ্রন্থ—প্রেমবিলাস, গৌরাঙ্গাষ্টক, বীরচন্দ্রচরিত, রসকল্পসার, কৃষ্ণলীলামৃত, হাটবন্দনা, কুঞ্জভঙ্গের একুশপদ।

বলরাম দেব—গ্রন্থকার। জন্ম—চট্টগ্রামের অন্তর্গত নবগ্রামে। পিতা—কমলাপতি। গ্রন্থ—স্বপ্ন-অধ্যায়।

বলরাম দ্বিজ—কবি। গ্রন্থ—মনসার গীতি।

বলাই দেবশর্মা—রস-সাহিত্যিক। জন্ম—বর্ধমান জেলা। ইনি বসুমতী প্রভৃতি বহু মাসিকপত্রে বহু রচনা প্রকাশ করেন। সম্পাদক—আর্য (বর্ধমান)।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—চিকিৎসক ও কথা-শিল্পী। জন্ম—১৩০৬ বঙ্গ ৪ঠা শ্রাবণ পূর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রামে। আদি নিবাস—হুগলী জেলায়। ছদ্মনাম—বনফুল। পিতা—সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়। শিক্ষা—মণিহারী, সাহেবগঞ্জ ও কলিকাতায়। আই. এস-সি (হাজারিবাগ), এম. বি., বি. এস (কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পাঠ করিয়া পাটনা মেডিকেল কলেজে পরীক্ষা—১৯২৭)। কর্ম—চিকিৎসা-ব্যবসায়, প্রথমে কলিকাতা, পরে মুর্শিদাবাদ আজিমগঞ্জ হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার, বর্তমানে স্বাধীন ভাবে

ভাগলপুরে। কবিতা ও ছোট গল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত। উপন্যাস রচনায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন। শরৎ পুরস্কার লাভ (১৯৫২), ইঁহার প্রথম কবিতা 'সাধারণত' (প্রবাসী ১৯১৮)। গ্রন্থ—তৃণখণ্ড, মৃগয়া, রাত্রি (১৩৪৮), কিছুক্ষণ, বৈতরণীতীরে, সে ও আমি, নির্মোক, দ্বৈরথ (১৩৪৪), জঙ্গম, ১ম (১৯৪৩), ২য়, ৩য়, ৪র্থ, বিন্দুবিসর্গ, অগ্নি (১৩৫৩), বনফুলের কবিতা, স্বপ্ন-সম্ভব (১৩৫৩), সপ্তর্ষি, বনফুলের আরও গল্প, বনফুলের গল্প, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৫৬), বাহুল্য, মন্ত্রমুগ্ধ, শ্রীমধুসূদন (না), বিদ্যাসাগর (না, ১৩৪৮), মধ্যবিত্ত (না), কঙ্কি (না), আহ্বনীয়, চতুর্দশী (না), অঙ্গারপর্ণী (কা), ভূয়োদর্শন, সিনেমার গল্প, রূপান্তর, দশভান (না), অদৃশ্যলোকে, মানদণ্ড (১৩৫৫), বন্ধন-মোচন, ডানা, ২ খণ্ড, নঞতৎপুরুষ (না), ভীমপলশ্রী, স্থাবর, আরও কয়েকটি, নবদিগন্ত, করকমলেষু (কা)।

বলাইচাঁদ সেন—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—জ্ঞানচন্দ্রিকা (মাসিক, ১৮৬০)।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—কবি ও সাহিত্যিক। জন্ম—১২৭৭ বঙ্গ ২১এ কার্ত্তিক, জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরবংশে। মৃত্যু—১৩০৬ বঙ্গ ৩রা ভাদ্র। পিতা—বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাতা—প্রফুল্লময়ী। শিক্ষা—সংস্কৃত কলেজ, প্রবেশিকা (হেয়ার স্কুল, ১৮৮৬)। বালক, ভারতী, সাহিত্য, সাধনা প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় ইনি বহু প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করেন। গ্রন্থ—চিত্র ও কাব্য (প্রবন্ধ, ১৩০১), মাধবিকা (কাব্য, ১৩০৩), শ্রাবণী (কাব্য, ১৩০৪)।

বল্লভ—প্রাচীন কুলপঞ্জীকার। গ্রন্থ—গ্রামভাব-নির্ণয়।

বল্লভদেব—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পাণ্ডববিজয়।

বল্লভভট্ট—আয়ুর্বেদবিদ্‌। গ্রন্থ—বৈদ্যবল্লভা (টীকা)।

বল্লভাচার্য—মৈথিল দার্শনিক পণ্ডিত। ১২শ শতাব্দী। গ্রন্থ—ন্যায়লীলাবতী।

বল্লভাচার্য—অণুভাষ্যকার। নামান্তর—বল্লভদীক্ষিত। জন্ম—১৫শ শতাব্দী বারাণসীর নিকট চম্পারণ্য নগরে। মৃত্যু—১৫৩১ খৃঃ বোম্বাই শহরে। পিতা—লক্ষ্মণভট্ট। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বিষ্ণু স্বামীর সম্প্রদায়ভুক্ত। গ্রন্থ—বেদান্তের অণুভাষ্য, সুবোধিনী (টীকা), জৈমিনীসূত্রভাষ্য, পূর্বমীমাংসাকারিকা, ভাগবতপ্রদীপ, বিষ্ণুপদ (হিন্দী ভাষায়)।

বল্লালসেন—বঙ্গের সেনবংশের প্রসিদ্ধ রাজা। ১২শ শতাব্দী। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত (১১১৯ খৃঃ)। পিতা—বিজয় সেন। মাতা—বিলাস দেবী। ইনি পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর। বৌদ্ধপ্লাবিত গৌড়দেশকে পালবংশের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া সমাজ-সংস্কার করেন। ইনি কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। গ্রন্থ—দানসাগর, অদ্ভুতসাগর, (বল্লালসেন কর্তৃক আরম্ভ ও লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক সমাপ্ত) আচারসাগর।

বশিষ্ঠ—বাস্তশিল্পশাস্ত্রবিদ্‌। গ্রন্থ—জ্ঞানসাগর বাশিষ্ঠতন্ত্র।

বসন্তকুমার ঘোষ—সাহিত্যিক। জন্ম—যশোহর জেলায়। সম্পাদক—অমৃতপ্রবাহিণী (পাক্ষিক, যশোহর, ১৮৬৩)।

বসন্তকুমার বসু—গ্রন্থকার ও সাহিত্যিক। গ্রন্থ—শান্তিময়ীর গল্প। সম্পাদক—নির্মাল্য (১৩১৬—১৩১৯)।

বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—হুগলী জেলার অন্তর্গত চন্দননগর। শিক্ষা—বি. এ। 'সরস্বতী' উপাধিলাভ। গ্রন্থ—গুরুগোবিন্দ সিংহ, ঘর ও বার, ব্যক্তি ও সমাজ সংস্কার, সরল হিন্দী শিক্ষা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, সমাজ ও সহধর্মিতা, ভারতের মেয়ে, ভক্তিকণা, সতীসাধনা, কৃষ্ণার্জুনসংবাদ, ৩ খণ্ড, রাষ্ট্রতত্ত্ব, ধনবিজ্ঞান, সেকালের মেয়ে ও জেসুইট, নিবন্ধ, নাগরিক।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—বাঁকুড়া জেলায় গোলিয়া নামক স্থানে। এম. এ। গ্রন্থ—ভ্রমণ-কাহিনী, মেবার-মহিমা (কবিতা), সুরেশের শিক্ষা, ভগবৎপ্রসঙ্গ, প্রাকৃত প্রকাশ।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৯৭ খৃঃ বর্ধমান জেলায় কাটোয়ায়। কর্ম—ডাক-বিভাগে চাকরী। গ্রন্থ—সুন্দরী (উপ), শাপমুক্তি (ঐ), মীরাবাই (নাটক), রবীন্দ্রের ছন্দ, পত্রচিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রের জীবনী, ধ্বনী, মন্দির, পঞ্চপাত্র, চিত্র ও চিত্ত, সপ্তস্বরা। সম্পাদক—দীপালী (সাপ্তাহিক)।

বসন্তকুমার দত্ত—চিকিৎসক। সম্পাদক—হোমিওপ্যাথী (মাসিক, ১২৮২ বঙ্গ)।

বসন্তকুমার দাস—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৮৫ খৃঃ। বি. এ. বি. টি। শিক্ষকতা, ফরিদপুর জেলা স্কুল। গ্রন্থ—বনলতা, বাসন্তী, উমা, সরল পথ।

বসন্তকুমার ভট্টাচার্য—জ্যোতির্বিদ্‌। জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। জ্যোতির্ভূষণ উপাধিলাভ। গ্রন্থ—সামুদ্রিক-রহস্য, জ্যোতিষ-রহস্য, জ্যোতিষ-শিক্ষা, স্বপ্নফল-বিজ্ঞান, জাতক-রহস্য, নারীজাতক, বৃহৎ জ্যোতিষসংগ্রহ, বিবাহ-রহস্য, জাতক প্রশ্ন-গণনা, জ্ঞানযোগ, হংসতত্ত্ব, সংসার, খনার বচন, সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধি।

বসন্তকুমারী দাসী—মহিলা কবি বরিশাল-নিবাসিনী। গ্রন্থ—কবিতামঞ্জরী।

বসন্তকুমারী মিত্র—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—রণোন্মাদিনী (১২৯১)।

বসন্তকুমারী রায়—গ্রন্থকর্ত্রী। স্বামী—নরনারায়ণ রায় (বরিশাল জেলার রায়ের-কাটি-নিবাসী)। গ্রন্থ—কবিতামঞ্জরী, রোগাতুরা, বসন্তকুমারী, বাসন্তিকা, বালিকাবিনোদ, যোষিদ্বিজ্ঞান।

বসন্ত ভট্ট—জ্যোতির্বিদ্‌। গ্রন্থ—বসন্তরাজ বা শকুনার্ণব (১১৬৪ খৃঃ)।

বসন্ত রায়—কবি ও পদকর্তা। জন্ম—১৪৩৩ খৃঃ ভুরশুট পরগনায়। মৃত্যু—১৪৮১ খৃঃ। পিতা—ভবানন্দ মজুমদার। গ্রন্থ—বসন্তকুমার।

বসন্তলাল মিত্র—সঙ্গীতজ্ঞ ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে চন্দননগরে। ইনি মাদ্রাজ হইতে 'সঙ্গীত-পারিজাত' ও কাশ্মীর হইতে 'রত্নাকর' নামক দুইখানি সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। গ্রন্থ—বিবাহ বা উদ্বাহতত্ত্বের গূঢ়রহস্য, গান্ধর্ব সংহিতা (সঙ্গীত-বিষয়ক), নর্তকনির্ণয় (বঙ্গানুবাদ, অসমাপ্ত)।

বসিরুদ্দিন—গ্রাম্য কবি। জন্ম—মেদিনীপুর জেলায় নন্দীগ্রাম। গ্রন্থ—মহুন্দনীর পাঁচালী।

বসু বন্ধু—বৌদ্ধ দার্শনিক। জন্ম—৪র্থ-৫ম শতাব্দী পুরুষপুরের (পেশোয়ারের) কৌশিকগোত্রজ ব্রাহ্মণ কুলে। মৃত্যু—কাশ্মীর। গ্রন্থ—অভিধর্মকোষ, অভিধর্মকোষশাস্ত্র, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, মহাপরিনির্বাণ সূত্র, বজ্রচ্ছেদিক প্রজ্ঞাপারমিতা, পরমার্থসপ্ততি, বিংশতিকা (টীকা) ত্রিশরণসূত্রোপদেশ, ধর্মচক্রপ্রবর্তন সূত্রোপদেশ, কর্মসিদ্ধি-প্রকরণশাস্ত্র, রত্নচূড়সূত্র, চতুর্ধর্মোপদেশ, পঞ্চস্কন্দপ্রকরণ, ব্যাখ্যাযুক্তি, প্রতীত্যসমুৎপাদসূত্রের টীকা।

বসুমিত্র—বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। গ্রন্থ—অষ্টাদশ-নিকায়সূত্র।

[ক্রমশঃ

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স

১৬৭সি, ১৬৭সি/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও বহুবাজার ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে)
আমাদের পুরাতন শোরুমের বিপরীতদিকে ফোন—এভিন্যু ১৭৬১ গ্রাম—ব্রিলিয়ান্টস,

ব্রাঞ্চ—হিন্দুস্থান মার্ট, বালিগঞ্জ ফোন—পি. কে. ৪৪৬৬

গ্লাস্‌গোবাসী

উইলিয়ম সমর্সেট মম্

নেপল্‌স্ নগরে পা দিতেই যে ঘটনাটি কবি শেলির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, কোনও বড় শহরে প্রথমবার গেলেই তেমন অভিজ্ঞতা যখন তখন কারও ভাগ্যে হয় না: একটা দোকান থেকে এক ছোকরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরোল, পিছনে তার ছোরা হাতে একটা লোক। লোকটা তাকে ধ'রে গলায় এক কোপ দিয়ে সাবাড় ক'রে রাস্তায় ফেলে দিল! শেলির হৃদয় ছিল কোমল। ওটাকে ওদিককার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ব'লে দেখেননি তিনি। ঘৃণায়, আতঙ্কে তাঁর মন ভ'রে উঠেছিল। কিন্তু সহযাত্রী ঐ অঞ্চলের এক ষণ্ডা পাদ্রীর কাছে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করায় সে অট্টহাসি হেসে তাঁকে ঠাট্টা করতে লাগল। শেলি বলেছেন কারোকে মার লাগাতে এমন উগ্র ইচ্ছে আর কখনও তাঁর হয়নি।

আমি অবশ্য কখনও এত চাঞ্চল্যকর কিছু দেখিনি, কিন্তু প্রথম যেবার আমি অ্যাল্‌জিসায়ার'স্ যাই, আমারও একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা হয়। সে সব দিনে অ্যাল্‌জিসায়ারাস্ শহরটা ছিল অপরিচ্ছন্ন, অযত্নরক্ষিত। একটু বেশি রাত্রে পৌঁছে জাহাজঘাটের কাছেই একটা সরাইয়ে গেলাম। একটু জীর্ণগোছের দেখতে ছিল সরাইটা, কিন্তু ওর থেকে উপসাগরের ওপারে জিব্রল্টারের চমৎকার দৃশ্য পাওয়া যেত—পাকা, কাটাছাঁটা, দৃশ্য। সেদিন পূর্ণিমা। অফিস্ দোতলায়; একখানা ঘর চাইলে আলুথালু বেশে একটি ঝি আমাকে ওপরে নিয়ে গেল। সরাইওয়ালা তাস খেলছিল। আমাকে দেখে যে সে খুব উৎফুল্ল হ'ল এমন বোধ হ'ল না। আমার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে একটা নম্বর ব'লে দিল, তার পর আর আমার দিকে দৃকপাত না ক'রে খেলায় যোগ দিল।

ঝি ঘর দেখিয়ে দিলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী খাবার মিলবে?

সে জবাব দিল, "যা চাই।"

এই আপাতপ্রাচুর্য যে অলীক, তা আমি বেশ জানতাম। তাই বললাম, "কী আছে তোম'দের এখানে?"

—"ডিম আর মাংস।"

সরাইয়ের চেহারা দেখেই আন্দাজ করেছিলাম যে আর কিছুই মিলবে না। ঝি আমাকে সরু এক ফালি ঘরে নিয়ে গেল। দেয়ালগুলো চূনকাম করা, আর নীচু একটা মাচা, তার ওপর পরের দিনের মধ্যাহ্নভোজের জন্যে এক টেবিল পাতা। দরজার দিকে পিঠ দিয়ে একটি ঢ্যাঙা লোক গুটিসুটি হ'য়ে বসেছিল 'ব্রাসেরো' অর্থাৎ গরম ছাইভরা একটি পাত্র (যা আন্‌ডালুসিয়ার ঐ শীতকে তপ্ত রাখতে পারে ব'লে একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে) সামনে রেখে। টেবিলে ব'সে আমার যৎকিঞ্চিৎ আহারের অপেক্ষায় রইলাম। অচেনা লোকটির দিকে একবার অলস দৃষ্টিপাত করলাম; সে আমার দিকেই চেয়েছিল; চোখ পড়তেই অন্য দিকে তাকাল। আমি আমার ডিমের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। ঝি যখন অবশেষে সেগুলি নিয়ে এল, সে ফের মুখ তুলে চাইল। বলল: "কাল যাতে প্রথম নৌকো ধরতে পারি, এমনি সময় আমাকে জাগিয়ে দেবে।"

—"আচ্ছা সেনিয়র।"

উচ্চারণ শুনে বুঝলাম ইংরেজিই লোকটির মাতৃভাষা, আর শরীরের প্রস্থ আর টানা-টানা নাক-চোখ দেখে মনে হ'ল উত্তর দিকের লোক। স্পেনে খাঁটি ইংরেজের চেয়ে জোয়ান স্কটদেরই বেশি দেখা যায়। রিওটি-ন্টোর খনিতেই যাও বা জেরেস-এর [illegible] খানাতেই যাও, সেভীলেই যাও আর কাডিথেই যাও, শুনতে পাবে টুইড নদীর ওপারের ধীর ভাষা। কার্মোনার জলপাই কুঞ্জে, অ্যাল্‌জিসায়ারাস্-বোবাডিলার রেলপথে, এমন কি সুদূর [illegible] কর্কবনেও দেখা যাবে বহু স্কট্‌ল্যাণ্ডবাসীকে।

আহারান্তে আমি ছাইদানীর কাছে গেলাম। সময়টা শীতের মাঝামাঝি, হু-হু বাতাসের মধ্যে নৌকাযাত্রায় আমার রক্ত হিম হ'য়ে এসেছিল। আমি চেয়ার টেনে নিতেই ঐ লোকটি স'রে বসবার উপক্রম করল। আমি বললাম: "সরতে হবে না—দুজনার পক্ষে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে তো।"

একটা চুরুট ধরিয়ে ওকে আর একটা দিলাম। স্পেনে জিব্রল্টারের হাভানা কখনো অনাদৃত হয় না। হাত বাড়িয়ে ও বলল, "আপত্তি নেই।"

কথায় গ্লাস্‌গোর সুরেলা টান ধরতে পারলাম। কিন্তু আলাপে ওর কোনও উৎসাহ দেখা গেল না, ওর হাঁ-না-র কাছে আমার [illegible] জমানোর সকল চেষ্টাই ব্যাহত হ'ল। চুপচাপ ধূমপান করতে লাগলাম। যতটা লম্বা-চওড়া ব'লে ভেবেছিলাম, দেখলাম আসলে ও তার চেয়েও বিরাট—ইয়া চওড়া কাঁধ, লম্বা লম্বা হাত-পা; মুখখানা রোদে পোড়া, চুলগুলো ছোট-ছোট কোঁকড়ানো। [illegible] কঠোরতার ভাব সারা চেহারায়; নাক-মুখ-চোখ সব বড় বড় মোটা মোটা, চামড়া কুঁচকে গেছে। নীল চোখ দুটো ঘোলাটে। সারাক্ষণ ওর উস্‌কো-খুস্‌কো গোঁফে চাড়া দিচ্ছিল, ঐ অস্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে আমার সামান্য বিরক্তি বোধ হচ্ছিল। একটু বাদেই অনুভব করলাম যে, ও আমার দিকে চেয়ে আছে। সে তীব্র দৃষ্টি এত অস্বস্তিকর বোধ হ'তে লাগল যে, ও আগের মত চোখ নামিয়ে নেবে আশা ক'রে সোজা ওর দিকে তাকালাম। ও তাই করল বটে মুহূর্তের জন্যে, কিন্তু আবার চোখ তুলল। ঝাঁকড়া ভুরুর ফাঁক দিয়ে আমাকে খুঁটিয়ে দেখল। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল: "জিব্রল্টার থেকে এই আসছেন?"

—"হ্যাঁ।"

—"আমি কাল যাচ্ছি—বাড়ি ফেরার পথে। বাঁচা যাবে।"

শেষ দুটো শব্দ এমন দারুণ ভাবে বলল যে, আমি হাসলাম। বললাম, "স্পেন্ ভালো লাগছে না?"

—"না, স্পেন্ ঠিকই আছে।"

—"এখানে কি অনেক দিন আছেন?"

—"বহু দিন। বহু দিন।"

কেমন একটা দম আটকানোর ভাবে কথাগুলো বলছিল। আমার সাধারণ প্রশ্নটুকু ওকে যে রকম বিচলিত ক'রে তুলল, তাতে আমি বিস্মিত হলাম। খাঁচায় ভরা পশুর মত এদিক-ওদিকে দুপদাপ ক'রে বেড়াতে লাগল, একটা চেয়ার সামনে থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল, মুখে শুধু মাঝে-মাঝে ঐ এক কথা—আর্তনাদের মত—"বহু দিন! বহু দিন!" আমি নীরবে ব'সে রইলাম। সপ্রতিভ ভাব দেখাবার জন্যে ভস্মাধারটা নাড়লাম যাতে গরম ছাই-গুলো ওপরে উঠে আসে। আমার ওপরে ওর বিরাট বপু স্থির হ'য়ে দাঁড়াল, যেন আমার এই নড়া-চড়ায় আবার আমার

...স্বপ্নের কথা ওর মনে এল। তার পর ধপ ক'রে চেয়ারে ব'সে পড়ল।

প্রশ্ন করল, "আমার ব্যবহার কি অদ্ভুত লাগছে?"

আমি স্মিত হেসে বললাম, "অনেকের চেয়ে বেশি নয়।"

—"আমার মধ্যে অদ্ভুত কিছু দেখছেন না?" ও সামনে ঝুঁকল, যাতে আমি ভালো ক'রে দেখতে পাই।

—"না।"

—"সত্যি, অদ্ভুত কিছু দেখলে আপনি বলতেন, না?"

—"বলতাম।"

এ সবের কোনও অর্থ বুঝছিলাম না। সন্দেহ হচ্ছিল লোকটা নেশা করেছে। দু'-তিন মিনিট ও আর কিছু বলল না, আমিও ঘাঁটালাম না।

হঠাৎ ও শুধোল, "আপনার নাম কী?"—বললাম। শুনে ও বলল:—"আমার নাম রবার্ট মরিসন্।"

—"স্কটল্যাণ্ডে নিবাস?"

—"গ্লাস্‌গো। তবে এই হতচ্ছাড়া দেশে বহু বছর রয়েছি। তামাক আছে?"

দিলাম। পাইপটা ভ'রে নিল। জ্বলন্ত একখণ্ড কয়লা থেকে ধরাল। বলল: "আর থাকতে পারছি না। কত কাল যে আছি—কত কাল!"

আবার লাফিয়ে উঠে পায়চারী করবার একটা উদ্যম এসেছিল, কিন্তু চেয়ার আঁকড়ে ধ'রে সেটা সামলে নিল। মুখে-চোখে প্রচণ্ড চেষ্টার ভাব দেখতে পেলাম। আন্দাজ করলাম, সাময়িক মাৎলামির দরুনই এই অস্থিরতা। মাতালদের আমার ভারি বিরক্তিকর লাগে। স্থির করলাম চটপট শুতে চ'লে যাব।

ও ব'লে চলল, "একটা জলপাইবাগানের ম্যানেজার ছিলাম। গ্লাস্‌গো অ্যাণ্ড সাউথ অভ্ স্পেন্ অলিভ অয়েল্ কম্পানি লিমিটেডের অধীনে।"

—"ও!"

—"নতুন প্রণালীতে আমরা তেল ছাঁকি। ঠিক মত তৈরী করতে পারলে স্প্যানিশ তেল ঠিক অন্যান্য তেলের মতই ভালো হ'তে পারে। দামেও সস্তা পড়ে।"

নীরস, কাটাকাটা ব্যবসাদারী ভঙ্গীতে কথাগুলো বলছিল। শব্দ চয়ন করছিল স্কচ্‌সুলভ বাক্‌সংযমের সঙ্গে। বেশ প্রকৃতিস্থই মনে হ'ল।

—"জানেন নিশ্চয়, এথিহা হ'চ্ছে জলপাই ব্যবসার কেন্দ্রবিশেষ। ওখানে একজন স্প্যানিয়ার্ড আমাদের কাজকর্মের তদারক করত। কিন্তু আমি টের পেলাম ব্যাটা দু'হাতে চুরি করছে, তাই বরখাস্ত ক'রে দিলাম। আমি সেভীলে থাকতাম, মাল জাহাজবন্দী করার পক্ষে ওখানে থাকাই সুবিধে। তা দেখলাম যে এথিহায় পাঠাবার মত বিশ্বাসী লোক আর নেই, তাই নিজেই গেলাম। জায়গাটা জানা আছে কি?"

—"না।"

—"শহর থেকে দু'মাইল দূরে, সান্ লরেন্‌ৎসো গ্রামের ঠিক বাইরে আমাদের মস্ত জমি আছে, চমৎকার একখানা বাড়ীও আছে। ঠিক পাহাড়ের মাথায়, দেখতে বেশ সুন্দর, সব সাদা; বুঝলেন, আর একটু জীর্ণগোছের; ছাদে এক জোড়া বাবুই পাখী বাসা বেঁধেছিল। কেউ থাকতও না ওখানে, তাছাড়া দেখলাম, ওখানে থাকলে শহরের বাড়ী-ভাড়াটাও বেঁচে যায়।"

আমি মন্তব্য করলাম, "একটু ফাঁকা-ফাঁকা লাগত, না?"

—"তা লাগত।"

মিনিট দুয়েক নিঃশব্দে ধূমপান করল রবার্ট মরিসন্। আমি ভাবতে লাগলাম ওর এ কাহিনীর কোনও মাথামুণ্ডু আছে কি না। ঘড়ি দেখলাম। তীক্ষ্ণ ভাবে ও প্রশ্ন করল, "তাড়া আছে?"

—"বিশেষ নয়। তবে রাত হ'য়ে যাচ্ছে।"

—"তাতে কী?"

কাহিনীতে ফিরে গিয়ে বললাম, "হ্যাঁ, তা বেশি লোকের সঙ্গে তখন দেখা-সাক্ষাৎ হ'ত না বোধ হয়?"

—"না। এক বুড়ো আর তার স্ত্রী থাকত ওখানে, আমার দেখাশোনা করত, আর মাঝে মাঝে গাঁয়ে গিয়ে ওখানকার বস্তি ফের্নাণ্ডেথ-এর আর দোকানের দু'-এক জনের সঙ্গে পাশা খেলতাম। একটু ঘোড়ায় চড়তাম, শিকার করতাম, এই আর কি!"

—"খুব খারাপ ব'লে মনে হ'চ্ছে না তো এ ধরনের জীবন?"

—"এই বসন্তে ওখানে আমার দু'বছর পূর্ণ হ'ল। বাপ, মে মাসে যা গরমটা পড়ে, অমন আমি আর কোথাও দেখিনি। কোনও কাজ করা অসাধ্য। মজুরগুলো স্রেফ ছায়ায় শুয়ে ঘুম দিত। কিছু ভেড়া ম'রে গেল, কতক জন্তু ক্ষেপে গেল। ষাঁড়গুলো পর্যন্ত কাজ করতে পারত না। খালি পিঠ কুঁজো

...."বল, কোন্ পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী?"

ক'রে দাঁড়িয়ে হাঁপাত। হতভাগা রোদ একেবারে জ্বালিয়ে দিত; কী তার তাত! মনে হ'ত চোখ দুটো যেন মুণ্ডু থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। মাটি ফেটে চৌচির, ফসল সব ম'রে গেল। জলপাই তো সেবার সব নষ্ট হ'ল। একদম নরক। এক পলক ঘুম আসত না। আমি খালি ঘরে-ঘরে ঘুরে বেড়াতাম একটু হাওয়া পাবার জন্যে। জানলা বন্ধ ক'রে মেঝেয় অবশ্য জল ঢেলে রাখতাম, কিন্তু তাতে কোনও ফল হ'ত না। রাতেও ঠিক দিনের মতই গরম। যেন একটা উনুনের মধ্যে বাস করছি।

"শেষটায় ঠিক করলাম, নীচতলায় উত্তর দিকে একটা ঘরে বিছানা পাতব। ঘরটা এত কাল ব্যবহার হয়নি, সাধারণ আবহাওয়ায় খুব স্যাঁৎসেঁতে থাকত। মনে হ'ল ওখানে অন্তত কয়েক ঘণ্টার মত ঘুমোনো যাবে। কিছু না হ'ক, চেষ্টা ক'রে দেখার মত। কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। এপাশ-ওপাশ করতে লাগলাম, শেষে বিছানাটা অসহ্য তেতে উঠল। উঠে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। চমৎকার রাত। এমন জ্যোৎস্না, মাইরি বলছি, তাতে বই পড়া যেত। বাড়ীটা যে একটা পাহাড়ের ওপর ছিল, তা কি বলেছি? আমি পাঁচিলে ঠেস দিয়ে জলপাই গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইলাম। সমুদ্রের মত দেখাচ্ছিল। বোধ হয় তাতেই দেশের কথা মনে এল। ভাবলাম, ফার গাছের পাতায় ঝিরঝিরে হাওয়া আর গ্লাসগোর পথে লোকারণ্য! বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, নাকে যেন স্পষ্ট তার গন্ধ আসছিল, আর সমুদ্রের স্বাদ। সত্যি, ঘণ্টা খানেক ঐ হাওয়ার আমেজ পাবার জন্যে তখন আমি আমার সমস্ত টাকা-পয়সা দিয়ে দিতে পারতাম। ওরা বলে গ্লাস্গোর আবহাওয়া নাকি খারাপ। বিশ্বাস করবেন না ওদের কথা। আমার ভালো লাগে বেশ বৃষ্টি আর মেঘলা আকাশ আর ঐ ঘোলাটে সমুদ্র আর ঢেউ। ভুলে গেলাম যে স্পেনে আছি, জলপাইকুঞ্জের মাঝখানে। হাঁ ক'রে মস্ত একটা নিশ্বাস নিলাম, যেন লোনা হাওয়া খাচ্ছি।

"আর ঠিক সেই সময় একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। মানুষের গলা। খুব জোরে নয়, চাপা আওয়াজ। চার দিকের নিঃশব্দতার মধ্যে দিয়ে ভেসে এল যেন—যেন সে কি তা বলা যায় না। অবাক্ হলাম। ঐ সময়ে জলপাইবাগানে কে থাকতে পারে! তখন মাঝ রাত পার হ'য়ে গেছে। শব্দটা মানুষের হাসির মত। অদ্ভুত ধরণের হাসি। পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল—দমকা ভাবে।"

অবর্ণনীয় একটা অনুভূতিকে প্রকাশ করতে গিয়ে মরিসন্ শেষ শব্দটা ব্যবহার ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে দেখল, আমি সেটা বুঝলাম কি না। তার পর বলে চলল: "মানে, কেমন কাটাকাটা ভঙ্গীতে উঠতে লাগল; একটা বালতির মধ্যে ঢিল ছুঁড়লে যেমন হয়। আমি সামনে ঝুঁকে চেয়ে রইলাম। জ্যোৎস্নায় চার দিক দিনের মত পরিষ্কার, কিন্তু তবুও কাউকে দেখতে পেলাম না। শব্দটা থামল, কিন্তু আমি সেই দিকে চেয়ে রইলাম, যদি কাউকে ন'ড়ে উঠতে দেখতে পাই। মিনিট খানেকের মধ্যে ফের শুরু হ'ল, আরও জোরে। এবার আর চাপা হাসি বলা যায় না, খাঁটি অট্টহাসি। রাত্রি বেলাটা মুখর হ'য়ে উঠল তার শব্দে। চাকরগুলো জেগে উঠছিল না দেখে আশ্চর্য হলাম। একেবারে পাঁড় মাতালের হাসি।

"হেঁকে বললাম: 'কে ওখানে?'

"উত্তর এল এক ঝলক অট্টহাসি। বলতে বাধা নেই যে, একটু বিরক্তই হলাম। ইচ্ছে হ'ল নেমে গিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা কী। একটা মাতালকে মাঝ রাতে আমার এলাকায় হল্লা করতে দেওয়া চলবে না। সেই সময় হঠাৎ এক আর্তনাদ! চমকে উঠলাম। তার পর চীৎকার! লোকটা হাসছিল ভারী-গলায়, কিন্তু চীৎকারগুলো তীব্র, যেন একটা শুয়োরকে জবাই করা হ'চ্ছে।

'ও কী' ব'লে উঠলাম।

"লাফ দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে শব্দ লক্ষ্য ক'রে ছুটে গেলাম। মনে হ'ল কেউ খুন করছে কাউকে। কিছুক্ষণ কোনও সাড়া নেই, তারপর এক বুকফাটা চীৎকার! তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আর গোঙানি। কী রকম শোনাল বলব, ঠিক যেন কেউ মারা যাচ্ছে। একটানা একটা আর্তনাদ, তারপর সব শেষ। চুপ। এদিক ওদিক ছুটে বেড়ালাম। কারুকে দেখতে পেলাম না। শেষে আবার ঘরে ফিরে এলাম পাহাড় বেয়ে।

"বুঝতেই পারছেন সে রাতে ঘুমটা কেমন হ'ল। আলো ফুটে ওঠা মাত্র জানলা দিয়ে সেই আওয়াজটা যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে তাকালাম—দেখি জলপাই-বনের মধ্যে একখানা ছোট সাদা রঙের বাড়ী। ওদিকের জমিটা আমাদের ছিল না, আমি কখনও যাইনি ওদিকটায়। বাড়ীর ঐ অংশেও অল্পই গিয়েছি এর আগে, তাই বাড়ীটাও এর আগে কখনও দেখিনি। হোসে-কে জিজ্ঞেস করলাম ওখানে কে থাকে। সে বলল ওখানে একটা পাগল থাকত, আর তার ভাই আর একটা চাকর।"

এত দূর শুনে আমি বললাম, "ও, এই ব্যাপার? তাহ'লে তো প্রতিবেশীটি খুব সুবিধের নয়।"

মরিসন্ চট ক'রে ঝুঁকে প'ড়ে আমার কব্জি চেপে ধরল। আমার মুখের কাছে মুখ নিয়ে এল, চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত ক'রে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "সে পাগলটা নাকি কুড়ি বছর আগে মারা গিয়েছিল।"

আমার হাত ছেড়ে দিয়ে চেয়ারে এলিয়ে প'ড়ে হাঁপাতে লাগল ও। শেষে বলল: "আমি সেই বাড়ীটার চার ধারে ঘুরে এলাম। জানলাগুলো খিল দেওয়া, দরজায় তালা। ধাক্কা দিলাম। কড়া নাড়লাম, ঘণ্টা বাজালাম। তার টিং টিং আওয়াজ শুনলাম, কিন্তু কেউ এল না। বাড়ীটা দোতলা; ওপর দিকে চাইলাম। পাল্লাগুলো ক'ষে আঁটা, কোথাও কোনও প্রাণীর চিহ্ন নেই।"

আমি শুধোলাম, "বাড়ীটার দশা কেমন ছিল?"

—"ওঃ, একদম পচা। দেয়াল থেকে চূণ খ'সে পড়েছে, দরজা-জানলায় রঙের চিহ্ন নেই। ছাদের কয়েকখানা টালি মাটিতে প'ড়ে আছে, যেন ঝড়ে উড়িয়ে নিয়েছে।"

—"আশ্চর্য তো!"

—"আমার বন্ধু ফের্নাণ্ডেথ্, বক্তি, তার কাছে গেলাম। সেও ঐ হোসে-র বলা গল্পই আমায় শোনাল। আমি সে পাগলটার কথা জিজ্ঞেস করলাম, ফের্নাণ্ডেথ্ বলল কেউ তাকে কখনও দেখেনি। সাধারণ অবস্থায় নাকি সে আচ্ছন্নের মত থাকত, কিন্তু মধ্যে মধ্যে ব্যাধির প্রকোপ সাংঘাতিক হ'য়ে উঠত, তখন বহু দূর থেকেও তাকে হাসতে, তার পর কাঁদতে শোনা যেত। লোকে ভয় পেত। এমনি

এক প্রকোপের অবস্থায়ই সে মারা যায়, তার রক্ষকেরা তখনই স'রে পড়ে। তার পর আর কেউ ও-বাড়ীতে থাকতে সাহস করেনি।

"আমি আর ফের্ণাণ্ডেথ্‌কে বললাম না আমি কী শুনেছি। বললে হয়তো ও হাসত। সে রাতটা জেগে লক্ষ্য রাখলাম। কিন্তু কিছুই ঘটল না। কোনও সাড়াশব্দ নেই। ভোরবেলা অবধি অপেক্ষা ক'রে শেষে শুতে গেলাম।"

—"আর কখনও কিছু শোনেননি তো?"

—"এক মাস যাবৎ না। গুমোট চলল, আমিও পিছনের সেই ঘরেই শুতে লাগলাম। এক রাত্রে খুব ঘুমোচ্ছি, এমন সময় কী যেন ঘটল; কী বলব বুঝছি না, অদ্ভুত একটা অনুভূতি হ'ল, ঠিক যেন আমাকে সাবধান ক'রে দেবার জন্মে কেউ আস্তে ঠেলা দিল, আমি একেবারে সম্পূর্ণ সজাগ হ'য়ে উঠলাম। বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে ঠিক আগের মত শুনলাম একটানা চাপা হাসি, যেন কেউ পুরোনো একটা মজার কথা উপভোগ করছে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে শব্দটা নামতে লাগল, তার জোরও ক্রমে বাড়তে লাগল। মহা প্রাণখোলা অট্টহাসি। এক লাফে বিছানা ছেড়ে জানলার কাছে গেলাম। আমার পা কাঁপতে লাগল। ঐখানে দাঁড়িয়ে ঐ নিশুত রাতের বুকফাটা হাসি শোনা—ভয়ঙ্কর! তার পর সেই নীরবতা আর বেদনার্ত আওয়াজ আর ফুঁপিয়ে কান্না। অমানুষিক মনে হচ্ছিল। মানে, যেন কোনও জানোয়ারের ওপর অত্যাচার করা হ'চ্ছে। বলতে বাধা নেই যে, আমি ভয়ে কাঠ হ'য়ে গিয়েছিলাম। নড়তে চাইলেও বোধ হয় নড়তে পারতাম না। কিছুক্ষণ বাদে শব্দ থামল, হঠাৎ নয়, ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। কান পেতে রইলাম, কিছুই শুনতে পেলাম না। বিছানায় ফিরে গিয়ে মুখ ঢেকে রইলাম।

"তখন মনে পড়ল ফের্ণাণ্ডেথ্‌ বলেছিল যে, পাগলটার রোগ কেবল মধ্যে মধ্যে বাড়ত, অন্য সময় সে চুপচাপ থাকত: নিঝ্‌ঝুম, ফের্ণাণ্ডেথ্‌ বলেছিল। ভাবতে লাগলাম, নিয়মিত ভাবে ব্যাধি বাড়ত কিনা। হিসেব করলাম এই দুটো রাতের মাঝে ক'দিন কেটেছে। আটাশ দিন। দুই আর দুয়ে চার করতে বেশি সময় লাগল না। বুঝলাম পূর্ণিমার টানেই ও ক্ষেপে উঠত। আসলে আমি খুব ঘাবড়াবার লোক নই। সবটা তলিয়ে দেখতে স্থির করলাম, তাই পাঁজিতে দেখে নিলাম এর পরের পূর্ণিমাটা কবে পড়ছে—সেদিন আর শুতে গেলাম না। রিভলভারটা সাফ ক'রে টোটা ভ'রে রাখলাম। একটা লণ্ঠন ঠিক ক'রে বাড়ীর ছাতে ব'সে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বেশ শান্ত বোধ করছিলাম। সত্যি বলতে কি, মনে মনে একটু খুশিই হচ্ছিলাম ভয় পাচ্ছি না ব'লে। একটু বাতাস বইছিল, ছাতের ওপর তারই শোঁ-শোঁ শব্দ। জলপাই গাছের পাতায় তারই মরমরানি শোনা যাচ্ছিল, যেন সমুদ্রতীরের নুড়িতে ঢেউয়ের দোলা লাগছে। চাঁদের আলো উপত্যকার মধ্যে ঐ শাদা বাড়ীটার ওপর চকচক করছিল। বিশেষ প্রফুল্ল বোধ করছিলাম।

"অবশেষে একটু শব্দ পেলাম, চেনা সেই শব্দ; প্রায় হেসে উঠলাম। ঠিকই ধরেছি। পূর্ণিমা ছিল সেদিন; রোগটা একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধ'রে চলত দেখছি। ভালোই হ'ল। পাঁচিল ডিঙিয়ে জলপাই-বনে প'ড়ে সোজা ঐ বাড়ীতে ছুটে গেলাম। যত কাছে এগোতে লাগলাম, শব্দও জোরে হ'তে লাগল। বাড়ীটার সামনে এসে চেয়ে দেখলাম। কোথাও কোনও আলো নেই। দরজায় কান পেতে শুনলাম। পাগল হেসে কুটিকুটি হ'চ্ছে। দরজায় ঘুঁষি দিলাম, ঘণ্টা টানলাম। সে আওয়াজে যেন ও আরও মজা পেল, হো-হো ক'রে হেসে উঠল। আবার ধাক্কা দিলাম, আরও জোরে—যতই ধাক্কা দিতে লাগলাম, ওর হাসির মাত্রাও ততই বেড়ে যেতে লাগল। তখন আমি প্রাণপণে চেঁচিয়ে বললাম: 'দরজা খোল, নইলে ভেঙে ফেলব বলছি।'

"পিছিয়ে এসে সমস্ত শক্তি দিয়ে হুড়কোয় লাথি মারলাম। সারা দেহের ভার দিয়ে দোরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। মচমচ ক'রে উঠল। তখন সব জোর নিয়ে চাপ দিতেই হতচ্ছাড়া কপাট খ'সে পড়ল।

'পকেট থেকে রিভলভারটা বার ক'রে অন্য হাতে লণ্ঠনটা তুলে ধরলাম। দরজা খুলতে হাসির রোল আরও জোরে শোনা যেতে লাগল। ভিতরে ঢুকলাম। দুর্গন্ধে অজ্ঞান হবার যোগাড়।

—আচ্ছা, আপনি কি ফরাক্কাবাদ গিছলেন?

—না। কেন?

—আমাদের কি আশ্চর্য্য মিল দেখুন, আমিও যাইনি ওখানে।

মানে, ভেবে দেখুন, বিশ বছর জানলাগুলো খোলা হয়নি। সে অট্টশব্দে মরা লোকেরও জেগে ওঠবার কথা, কিন্তু এক মুহূর্ত আমি বুঝতেই পারলাম না ঠিক কোন্ দিক থেকে সেটা আসছে। মনে হ'ল দেয়ালগুলো যেন শব্দটাকে একবার সামনে একবার পিছনে ঠেলে দিচ্ছে। পাশের একটা দরজা খুলে একটা ঘরে ঢুকলাম। সব ফাঁকা, শাদা, এক টুকরো আসবাবও ছিল না। আওয়াজ বাড়তে লাগল, আমিও তার অনুসরণ করলাম। আর এক ঘরে ঢুকলাম, সেখানেও কিছু নেই। একটা দোর খুলতেই সিঁড়ির গোড়ায় এসে পড়লাম। ঠিক মাথার ওপরে পাগলটার হাসি। ওপরে উঠতে লাগলাম খুব সাবধানে, অতর্কিতে কিছু হ'তে দেব না। সিঁড়ির ডগায় একফালি বারান্দা। সেখান দিয়ে চললাম সামনে আলো ধ'রে, শেষে কোণের একটা ঘরের সুমুখে এসে থমকে দাঁড়ালাম। ভিতরেই ও আছে। আমার আর শব্দটার মাঝে শুধু পাৎলা একটা দরজার ব্যবধান!

"ভীষণ শোনাচ্ছিল। আমার শরীরের ভিতর দিয়ে একটা শিহরণ ব'য়ে গেল। কাঁপতে লাগলাম দেখে নিজেকে গাল দিয়ে উঠলাম। মানুষের মত শোনাচ্ছিল না মোটেও। কী বলব, আমি প্রায় ঘুরে দৌড় দিচ্ছিলাম আর কী। কোন মতে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে থাকতে বাধ্য করলাম। কিন্তু কিছুতেই হাতলটা ঘোরাতে পারলাম না। আর তার পর হাসিটাকে কে যেন ছুরি দিয়ে চিরে ফেলল, যন্ত্রণার একটা অব্যক্ত আওয়াজ শুনতে পেলাম। সেটা এর আগে কখনও শুনিনি, এত অস্ফুট যে, ও-বাড়ী অবধি পৌঁছোয়নি— তার পরে খাবি খাওয়ার শব্দ।

"স্পেনের ভাষায় কাকে বলতে শুনলাম, 'হ্যাঁ। আমায় খুন করছ। সরিয়ে নাও। ও, ভগবান্, বাঁচাও।'

"চীৎকার ক'রে উঠল সে। শয়তানগুলো অত্যাচার করছিল তার ওপর। দরজা ঠেলে আমি ভিতরে ঢুকলাম। দমকা হাওয়ায় একটা শার্সি খুলে গেল—ধবধবে চাঁদের আলোয় আমার লণ্ঠনের আলো স্তিমিত হ'য়ে গেল। একেবারে কানের কাছে, আপনার কথা যেমন স্পষ্ট শুনছি, তেমনি স্পষ্ট আর তেমনি কাছে হতভাগ্যের আর্তনাদ শুনলাম। সে দারুণ গোঙানি, ফোঁপানো আর প্রচণ্ড খাবি খাওয়া। ওর পরে কেউ আর বাঁচতে পারে না। শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছিল লোকটার। আমি ফের বলছি একেবারে কানের কাছে তার দম আটকানো ভাঙা কান্না শুনতে পেলাম। অথচ ঘরটা ছিল একদম ফাঁকা।"

রবার্ট মরিসন্ চেয়ারে এলিয়ে পড়ল। তার বিরাট কঠিন শরীরটাকে চিত্রশালার আলগা মূর্তির মত দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ধাক্কা দিলে তালগোল পাকিয়ে মেঝেয় প'ড়ে যাবে।

—"তার পর?" আমি প্রশ্ন করলাম।

পকেট থেকে ময়লা একটা রুমাল বার ক'রে সে কপালটা মুছল: "ভেবে দেখলাম গরমই হ'ক আর শীতই হ'ক, ও উত্তর দিকের ঘরে শোবার আর আমার সাধ নেই। তাই আমার পুরোনো ঘরে ফিরে এলাম। তার ঠিক চার হপ্তা পরে ভোর দুটোর সময় ঐ হাসির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল—ঠিক আমার হাতের কাছে। বলতে বাধা নেই যে, তখন আমি বেশ একটু ঘাবড়ে গিয়েছি, তাই পরের প্রকোপের সময়, মানে পরের পূর্ণিমায়, ফের্ণাণ্ডেথকে বললাম আমার সঙ্গে এসে সে রাতটা কাটাতে। আর কিছুই বললাম না। দুটো অবধি ব'সে দুজনে তাস খেললাম, সেই সময় আবার শুনতে পেলাম। ওকে জিজ্ঞেস করলাম কিছু শুনতে পাচ্ছে কিনা। 'না তো', ও জবাব দিল। আমি বললাম, 'কে যেন হাসছে।' ও বলল, 'আরে তোমার নেশা হয়েছে।' ব'লে নিজেও হাসতে লাগল। তখন আর পারলাম না, ধমকে বললাম, 'চুপ কর, আহাম্মক।' এদিকে হাসি ক্রমে বাড়তে লাগল। আমি চীৎকার ক'রে উঠলাম। দু'হাত দিয়ে কান চেপে ধ'রে শব্দটা আটকাবার চেষ্টা করলাম, একটুও ফল হ'ল না। শুনেই চললাম, শেষ যন্ত্রণার আওয়াজও শুনলাম। ফের্ণাণ্ডেথ সম্ভবতঃ ভাবল আমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। বলতে সাহস করল না, কারণ, জানত, বললে আমি ওকে খুনই ক'রে ফেলব। মুখে বলল শুতে যাচ্ছে, সকালে দেখি স'রে পড়েছে। ওর বিছানায় কেউ শোয়নি। আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েই স'রে পড়েছে।

'তার পর আর এথিহায় থাকা সম্ভব হ'ল না। একজন কর্মচারীকে ওখানে রেখে আমি সেভীলে ফিরে এলাম। তখনকার মত বেশ আশ্বস্ত বোধ করতে লাগলাম, কিন্তু সময় ঘনিয়ে আসতেই ভয় ধরল। অবশ্য নিজেকে বারণ করলাম বোকামি করতে, কিন্তু কী জানেন, পারলাম না। ব্যাপার হ'ল কি, আমার ভয় হচ্ছিল, শব্দটা আমার পেছু নিয়েছে। যদি সেভীলেও শুনতে পাই, তাহ'লে সারা জীবন শুনতে হবে। যে কোনও মানুষের সমান সাহস আমার আছে, কিন্তু হ্যাং, সব কিছুরই তো একটা সীমা আছে। রক্ত-মাংসের শরীরে আর সহ্য হ'তে পারে না। আমি জানতাম, এ রকম চললে বদ্ধ পাগল হ'য়ে যাব। এমন অবস্থা হ'ল যে, ক'ষে মদ ধরলাম। এমন একটা দারুণ আশঙ্কা— জেগে জেগে শুধু দিন গুণতাম। জানতাম আসবে। এলোও। সেভীলে ব'সে সেই হাসি আমি শুনলাম—এথিহা থেকে ষাট মাইল দূরে।"

আমি কী বলব স্থির করতে পারলাম না। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। শেষে শুধোলাম: "কবে শেষ শুনেছেন?"

—"ঠিক চার হপ্তা আগে।"

চমকে তাকালাম। বিচলিত বোধ করলাম।

—"তার মানে কী? আজ পূর্ণিমা নয় তো?"

গাঢ় ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানল ও আমার দিকে। কথা বলতে মুখ খুলল, কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল, যেন কথা বেধে গিয়েছে। মনে হ'ল যেন ওর বাক্‌তন্ত্র অবশ হ'য়ে গেছে—শেষটায় অদ্ভুত স্বরে জবাব দিল: "হ্যাঁ, আজ।"

আমার দিকে চেয়ে রইল, নীলাভ চোখ দুটো যেন রাঙা হ'য়ে জ্বলতে লাগল। মানুষের মুখে এমন আতঙ্কের ভাব কখনও দেখিনি। চট্ ক'রে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দড়াম্ ক'রে দরজাটা টেনে দিয়ে।

স্বীকার করছি যে, সে রাত্তে আমার ঘুমটাও তেমন কিছু ভালো হ'ল না।

অনুবাদক:—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়।

ভাঙা পাথরবাটি

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন জ্ঞানদাসুন্দরী। এতক্ষণ মুখর কণ্ঠকে অবিশ্রাম গতিতে উদারা থেকে তারায় তুলে অকস্মাৎ দুঃখে, খেদে, অপমানে নিজের মধ্যে একাকার হ'য়ে গিয়েছেন তিনি।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। পুত্রবধূ দময়ন্তীকে কেন্দ্র ক'রেই তাঁর এই অশ্রু-নাট্যের সূত্রপাত।

খেয়ে-দেয়ে ছেলে নকুল বেরিয়েছে আপিসে, সেই সঙ্গে জ্ঞানদাসুন্দরীও দু'দণ্ডের জন্য বেরিয়েছিলেন পাড়ার চাটুজ্জে-গিন্নীর দরজায়। স্বামীর মৃত্যুর পর গত সাত বছর ধ'রে ছেলের সংসার থেকে তিনি একরকম মুক্তি পেয়েছেন বললেই হয়। কাজকর্ম্ম এখন দময়ন্তীই সব নিজের হাতে গুছিয়ে নিয়েছে; সংসার এখন তার, সেই তো সব ক'রবে। কিন্তু তাই ব'লে জ্ঞানদাসুন্দরী কি একেবারেই নিরাসক্ত হ'য়ে বেঁচেছেন? তা নয়। নকুলের সংসারে দরকারে না এলেও গায়ে প'ড়েই তিনি নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন। রাখবেনই বা না কেন, আজ না হয় অদৃষ্টদোষে তাঁর সীঁথির সিঁদূর মুছেছে, তাই ব'লে কি তাঁর ছেলেকেও হারিয়েছেন তিনি? নকুল তো তাঁরই, তিনিই তো একদিন পেটে ধ'রেছিলেন নকুলকে! দময়ন্তী তার স্ত্রী হ'লেও জ্ঞানদাসুন্দরীর তুলনায় কতটুকু পেয়েছে সে নকুলকে?

তা নিয়ে অবিশ্যি তর্কের কিছু নেই। নকুল এমন ছেলে নয় যে, স্ত্রীকে ভালোবাসলেও মাকে সে অবহেলা ক'রবে। দময়ন্তীও যথেষ্ট সম্ভ্রম ক'রেই চলে শাশুড়ীকে। কিন্তু শাশুড়ীকে সম্ভ্রম ক'রলেও সংসার সম্পর্কে সাবধানতা তার কম। নতুন বউ হ'য়ে যখন সে এ ঘরে এলো, তখনই জ্ঞানদাসুন্দরী ভাঁড়ারের চাবি তার আঁচলে বেঁধে দিয়ে ব'লে দিয়েছিলেন, 'সারা জীবন আমি এগুলোকে সযত্নে আগ্‌লেছি, কোনো একটা জিনিষও এদিক-সেদিক হয়নি। তুমিও তা-ই রেখো বৌমা।'

—'রাখবো।' ব'লে হাসিমুখেই ভাঁড়ারের ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল দময়ন্তী।

দেখে-শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন সেদিন জ্ঞানদাসুন্দরী। বৌমাকে তাঁর বড় পছন্দ। পাড়ার চাটুজ্জে-গিন্নীর কাছেই সেদিন গিয়ে বড়-গলায় প্রশংসা ক'রে এসেছিলেন দময়ন্তীর: 'জানো অম্বিকা, এবারে আমি নিশ্চিন্ত। নকুল কি আমার তেমন ছেলে যে, বৌমা আমার খারাপ হবে?'

শুনে তৃপ্তির হাসি হেসে অম্বিকা ঠাকরুণ বলেছিলেন, 'বরটাও তো দেখ্‌তে হবে! আপনার বরাত ভালো দিদি।'

কিন্তু বরাতের বোধ করি কিছু পরিবর্ত্তন ঘ'টলো। দিন যত কাটতে লাগলো, অসাবধানী হাতের ছাপ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো দময়ন্তীর। যেখানে যে জিনিষ থাক্‌বার নয়, সেখানেই সে-জিনিষ অসাবধানে পড়ে থাকে, অন্যমনস্কতায় অলক্ষ্যেই কখনও কারুর পায়ের ঠেলা লেগে হয়ত কাঁসার বাটিটা একবার ঝন্‌ঝন্ ক'রে ওঠে, কিম্বা সদ্য-কিনে-আনা কাঁচের গ্লাসটাই হঠাৎ ভেঙে যায়। এ যে দময়ন্তীই ইচ্ছে ক'রে ভাঙে, তা নয়; ভাঙে হয়ত নকুল কিম্বা জ্ঞানদাসুন্দরীর পায়ের গুঁতো লেগেই, কিন্তু ভাঙ্‌বার আসল কারণ হ'চ্ছে দময়ন্তী। এই নিয়ে পর-পর কয়েক দিনই এক রকম সাবধান ক'রে দিয়েছেন জ্ঞানদাসুন্দরী, শুনে লজ্জা পেয়েছে দময়ন্তী, কিন্তু ত্রুটি শোধরায়নি। আসলে জ্ঞানদাসুন্দরীকে জব্দ করবার জন্য জেদ ক'রে যে এ সব কিছু করে দময়ন্তী, তা নয়। তার ধাতই এম্‌নি। সংসারে সবাইকেই তো কিছু আর এক ধাতে গড়ে পাঠাননি ভগবান, দময়ন্তীকেও পাঠাননি; এ জন্য ত্রুটি ধরা পড়লে সলজ্জে একপাশে সরে গিয়ে নিজেকে বরং ধিক্কারই দিয়ে থাকে দময়ন্তী, চেষ্টা করে—যাতে সংসার সম্পর্কে আরও বেশী সচেতন হ'তে পারে সে। কিন্তু যখনই অতিরিক্ত সচেতন হ'তে গেছে, পর-মুহূর্ত্তেই বৃহত্তর আরও কিছু একটা ত্রুটির ফাঁদে জড়িয়ে প'ড়ে শাশুড়ীর কাছে একেবারে অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছে সে। স্বামীকে গিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বলেছে, 'আমি আর পারি না তোমার সংসার নিয়ে বাপু। এবারে হয় দেখে-শুনে একটা ঝি-টি কাউকে রাখো, নয় তো আমাকে বাবার বাড়ী পাঠিয়ে দাও, কিছু দিন থেকে আসি। বিয়ের আগে কোনো দিন কুটোগাছটিও নেড়ে দেখিনি, দেখবার দরকারও হয়নি; বাবা-মা'র আদুরে মেয়ে ছিলাম আমি। এবারে তোমার এই সংসারের জন্যই দেখছি—মা'র কাছে থেকে ক'রে শিক্ষা নিয়ে আস্‌তে হবে।'

জবাবে নকুল ব'লেছে: 'কিছু একটা শিখবার জন্যেই যদি মা'র কাছে ছুটতে হয়, তবে এখানেও তো মা র'য়েছেন! ঘর-গেরস্থালীর কাজ শেখাতে আমার মা-ই এমন অপটু কিসে?'

এবারে স্বামীর কানের কাছে মুখ এনে একেবারেই চাপা-গলায় ধ্বনি তুলেছে দময়ন্তী: 'অপটুর কথা নয় গো, পটু ব'লেই যে ভয়!'

—'এই কথা!' ব'লে মুখ টিপে হেসে কোথায় এক জরুরি কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে প'ড়েছে নকুল।

মনের কথা খুলে ব'লে মনটা তবু একটু হাল্কা হয়। কিন্তু তারই কি উপায় আছে? একটু বাদেই একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে পড়েন জ্ঞানদাসুন্দরী, কটূক্তি না করলেও পুরোপুরি মিষ্টিমুখের সম্ভাষণ নয় তাঁর। বলেন: 'আচ্ছা, তুমি কি বলো তো বৌমা! এত বার এত ক'রে নিষেধ করি, তবু যদি তোমার হুঁস হয়। মাছ-কাটা বঁটিখানা খাড়া ক'রে রেখেছ দুয়োরের সামনে; কেউ দু'খানা হ'য়ে কেটে মরুক, এই কি তোমার ইচ্ছে? এক্ষুনি আমার পাখানি যাচ্ছিল আর কি! তা ছাড়া আমি বিধবা মানুষ, মাছের বঁটির ছোঁওয়া লেগে এই অবেলায় গিয়ে আমি আবার পুকুরে ডুব দিয়ে আসি, এই কি চাও তুমি? একটুও যদি সাবধান হ'তে পারলে আজ পর্য্যন্ত! একেই তো শ্লেষ্মায় দিনরাত কষ্ট পাচ্ছি, কোথায় দু'দণ্ড কাছে ব'সে বুকে একটু গরম কর্পূর-তেল মালিশ ক'রে দেবে, তা নয়, যত অনাছিষ্টির কাজ। বয়স হ'য়েছে, দু'দিন বাদে ছেলেপুলের মা হবে, এখনও যদি মতি স্থির ক'রে পাঁচ দিকে দৃষ্টি রেখে না চ'লতে পারো, তবে পারবে কবে শুনি?'

দময়ন্তীর আর এমন অবস্থা থাকে না যে, মাথা তুলে শাশুড়ীর সামনে দাঁড়ায়। দুঃখে, লজ্জায় নিজের মধ্যে একেবারে এতটুকু হ'য়ে যায় সে।

জ্ঞানদাসুন্দরী ততক্ষণে আবার পাড়ায় বেরিয়ে পড়েন, ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে বসেন চাটুজ্জে-গিন্নীর দাওয়ায়। এই একটি মানুষের সঙ্গেই তাঁর চিরকাল সুখ-দুঃখের সৌহার্দ্দ্য। অম্বিকা ঠাকরুণও তেম্‌নি শ্রদ্ধা করেন তাঁকে যথেষ্ট, দিদি ব'লে কাছে ডেকে শলা-পরামর্শ করেন, বুদ্ধি-যুক্তি নেন। বন্ধুত্বের সম্পর্ক হ'লেও জ্ঞানদা-সুন্দরীও তাঁকে ছোট বোনের মতই স্নেহ করেন। বলেন, 'জানো

অম্বিকা, বউটাকে যা ভেবেছিলাম, তা নয়। বড্ড গোঁতো। কোনো কাজের যদি কিছু দিশে থাকে! নিতান্ত চোখের সামনে ব'লেই দু'-পাঁচ কথা বলি, নইলে আমার আর কি! কথায় বলে—ভাতার নেই যার, পোড়া কপাল তার। কপাল তো পুড়েছেই, এখন কাশী গিয়ে পড়ে থাকতে পারলে শান্তি পেতাম।'

সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অম্বিকা ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করেন: 'কেন, নকুল কিছু বলে না বৌকে?'

—'তা বললে আর কথা ছিল কি!' থেমে জ্ঞানদাসুন্দরী সখেদে উচ্চারণ করেন: 'কষ্ট ক'রে পেটে ধরলে হবে কি, বিয়ের পর ছেলেও বৌ-চাটা হ'য়ে যায়। কলির ধরণই এই। নইলে আমাদের কর্ত্তাদেরও তো দেখেছি! শ্বশুরের ভিটেয় এসে দিন-রাত্রির মধ্যে ক'টাই বা কথা বলবার ফুরসৎ পেয়েছি আমরা, তার মধ্যেই গাল-মন্দ খেয়েছি হাজার গণ্ডা। আজকালকার ছেলেরা কি আর বউকে গালমন্দ করতে পারে, বউ-ই বরং চ্যাটাং-চ্যাটাং দু'কথা শুনিয়ে দেয় স্বামীকে।'

এবারে গালে হাত দিয়ে বসেন অম্বিকা ঠাকরুণ: 'ছিঃ, ছিঃ, ঘেন্নার কথা! নকুল মুখ বুজে সহ্য করে বৌয়ের মুখ-ঝামটা?'

—'না, না, তা কেন! মিথ্যে কথা ব'লে এ বয়সে পাপের ভাগী হবো না। বৌমা যে আমার মুখরা তা নয়, গুণ যথেষ্টই আছে; তবে কি জানো, ঐ এক ছিরি। সংসারের কাজ-কম্মের দিকে মন নেই তেমন।' বড় রকমের একটা নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে নিজেই থেমে পড়েন জ্ঞানদাসুন্দরী। একটু কাল চুপ করে থেকে আবার বলেন: 'আমি দেখে যেতে পারবো কিনা, জানি না; পেটে বাচ্চা এসেছে, এই সবে চার মাস। এর পর যখন ছেলের গু-মুত কাচতে হবে, তখন আর এমনটা থাকবে না বৌমা'র। আমার কপালে আছে চেঁচিয়ে মরা, তাই ম'রছি।'

উত্তরে কিছু একটাও আর না ব'লে নীরবে সহানুভূতি জানিয়েছেন অম্বিকা ঠাকরুণ। ধীরে ধীরে আবার উঠে প'ড়েছেন জ্ঞানদাসুন্দরী।

মা'র খুশীর জন্য মাকে শুনিয়ে কোথায় বৌকেই দু'কথা ব'লবে নকুল, তা নয়, উপযাচক হ'য়ে মাঝখানে একদিন সে মাকেই ব'লেছিল, 'তোমার বৌমার যে রকম শরীরের অবস্থা, তাতে দিন-কতক ওর বিশ্রামের দরকার। সংসারের কাজকর্ম্ম নিয়ে কিছু কাল তুমি যেন ওকে কিছু বলা-কওয়া কোরো না মা!'

যেন পুত্রবধূর উপর ফরমাস খাটাতেই এখন শুধু সংসারে টিঁকে আছেন জ্ঞানদাসুন্দরী! কথাটা ঘুরিয়ে ব'ললেও নকুল যে কি ব'লতে চাইল, তা বুঝে নিতে সময় লাগেনি তাঁর। ছেলে তাঁর পর হ'য়ে যায়নি, এ কথা ঠিক; কিন্তু মনের যে অবস্থা নিয়ে নকুল কথাটা ব'ললো, সে অবস্থাটাকেও যদি সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে পারতেন, তা হ'লে সমস্যা হয়ত অনেকখানিই চুকে যেতো। কিন্তু আদৌ সে পথ দিয়ে গেলেন না জ্ঞানদাসুন্দরী, ব'ললেন, 'তোর বৌকে আমি দিন-রাত খাটিয়ে মারি, এই কি তুই ব'লতে চাস নকুল? বেশ তো, এতই যদি চোখের বিষ হ'য়ে থাকি, তবে দে না আমাকে কাশী পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে! বাবা বিশ্বনাথের পায়ে গিয়ে শেষ নিশ্বাস ফেলতে পারি!'

—'তোমাদের নিয়ে আমি আর পারি না।' ব'লে কোথায় এক দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল নকুল, বাধা দিয়ে পুনরায় থেকিয়ে উঠলেন জ্ঞানদাসুন্দরী: 'কি পারিস না, বলি কি পারিস না শুনি? এতই যদি গলার কাঁটা হ'য়ে থাকি, তবে দে না দূর ক'রে! আমিও নিশ্চিন্ত হই, তোরাও বাঁচিস।'

অবস্থা অনুকূল নয় দেখে প্রস্থানোদ্যত পথেই দু'-এক পা ক'রে বেরিয়ে প'ড়লো নকুল। কিন্তু বেরিয়ে প'ড়েও নিশ্চিন্তে কাটেনি তার। পাছে এর প্রতিক্রিয়া গিয়ে দময়ন্তীকে ব্যাকুল ক'রে তোলে, এই ভয়। এই প্রথম সন্তান-সম্ভাবনা তার, সেদিক দিয়ে নকুলেরই কি কম স্বপ্ন! বাপ হবে সে, পিতৃত্বের আস্বাদ পাবে সে এই প্রথম—দময়ন্তীর নতুন মাতৃত্বকে ছাপিয়েও যেন প্রতিমুহূর্তে এই স্বপ্ন আকুল ক'রে তুলছিল নকুলকে। তাই ভয়, তাই সংশয়, তাই এমন দ্বিধা।

কিন্তু প্রতিক্রিয়া তো দূরের কথা, আসন্ন কিছু-একটা ক্রিয়ারই আভাস পাওয়া গেল না। আসলে দময়ন্তীরও যেমন বাপের বাড়ী যাওয়া হয়নি, জ্ঞানদাসুন্দরীর পক্ষেও তেমনি কাশীযাত্রা সম্ভব হয়নি। কিছু দিন তিনি এক রকম নির্ব্বাক্ ভাবেই কাটিয়ে দিলেন পুত্রের সংসারে। শুধু তাই নয়, দময়ন্তী সম্পর্কে বরং কিছুটা মমতাই ধীরে ধীরে তাঁর অন্তরকে এসে আশ্রয় ক'রলো। হয়ত নকুল পেটে আসবার সময়ে তাঁর নিজের শরীর ও মনের অবস্থাটা হঠাৎ বড় স্পষ্ট ভাবে মনে প'ড়ে থাকবে জ্ঞানদাসুন্দরীর! একদিন নিজে থেকেই উপযাচক হ'য়ে আদর ক'রে কাছে ডেকে নিয়ে বসালেন তিনি দময়ন্তীকে, তার পর তার বাপের বাড়ীর দু'-এক কথার অবতারণা ক'রে পরে এক সময় বললেন, 'সংসারে আমার নাতি আসছে, আমার প্রথম নাতি, আনন্দ কি আমারই তাতে কম! নকুলের কথা তুমি কিছু শুনো না বৌমা, কিছু যদি বোঝো ও! এ সময়ে একেবারে নিরেট ভাবে ব'সে থাকতে নেই, ওতে প্রসূতির পক্ষে খারাপ। একটু চলা-ফেরার উপরে থেকো, তবে খুব সাবধানে, দেখো আবার আছাড়-টাছাড় পোড়ো না যেন! এ সময়ে মেয়েদের আবার পায়ের ঠিক থাকে না।'

শুনে লজ্জায় জিভ্ কামড়ে ঘোমটার আড়ালে মুখ লুকিয়েছে দময়ন্তী। মনে মনে ভেবেছে, হাজার হোক, শাশুড়ী তাকে ভালো-বাসেন। সংসারে থাকতে গেলে ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে এমন দু'-এক কথা হ'য়েই থাকে, ও কিছু নয়। শাশুড়ী যদি ভালই না বাসবেন তাকে, তবে মিথ্যে এমন কিসের মোহে দাঁত কামড়ে প'ড়ে আছেন এখানে। দেখতে দেখতে মুহূর্ত্তের মধ্যে জ্ঞানদা-সুন্দরীর প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধায় মনখানি আপনিই ভ'রে ওঠে দময়ন্তীর।···

এম্নি ক'রেই দিন কাটছিল। অকস্মাৎ আবার একটা বজ্রপাত!

দময়ন্তী যতই সচেতন হ'তে চেষ্টা করুক্ না কেন, যাবে কোথায়! ভাঁড়ারের কাজ সেরে আসতে গিয়ে হঠাৎ তার হাত থেকে সুন্দর খোদাইয়ের কাজ-করা ভারী পাথরের বাটিটা ফস্কে মেঝেয় পড়ে গিয়ে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। এ যেন পাথরের বাটি নয়, যেন দময়ন্তী নিজেই ভেঙে টুকরো-টুকরো হ'য়ে গেল। নিজেকে যে সাম্লে নেবে সে, এমন অবকাশটুকু অবধি রইল না। ঠিক যেন সময় বুঝেই জ্ঞানদাসুন্দরী এসে সাম্নে

ঐতিহ্যময় ভারত

জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা—পুরী
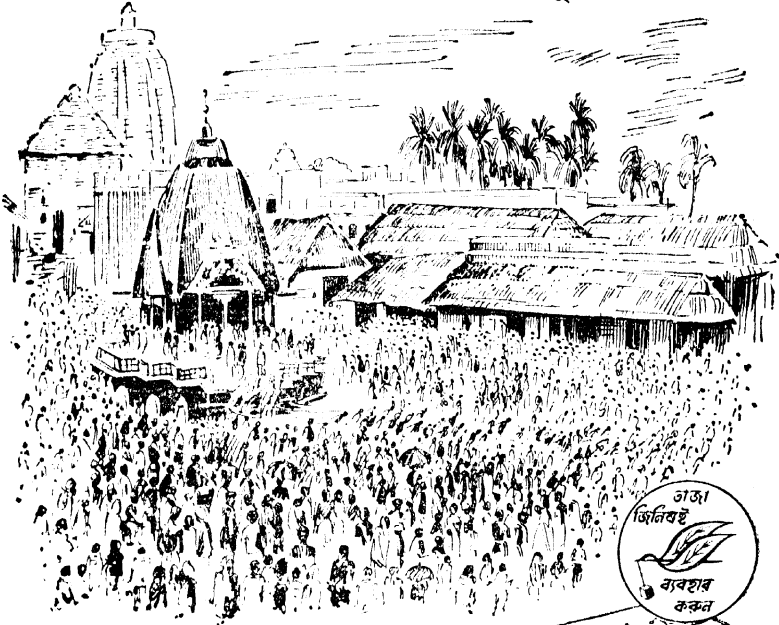
পুরীর জগন্নাথের রথযাত্রা হিন্দুদের অন্যতম বিরাট উৎসব। বৎসরে একবার জগন্নাথ তাঁহার মন্দির ত্যাগ করেন এবং তাঁহাকে রথে করিয়া সহরের এক মাইল বাহিরে বাগান বাটীতে লইয়া যাওয়া হয়।

মন্দির ও উৎসববহুল এই বিরাট দেশে আপনি সর্বদাই আপনার অতি নিকটে পাইবেন প্রীতিপ্রদ আরামদায়ক চায়ের দোকান—যেখানে শ্রমাপনোদনকারী সুগন্ধ এককাপ **ব্রুক বণ্ড চা** পান করে আপনি কিছুক্ষণের জন্য চিত্তবিনোদন করতে পারেন।

ব্রুক বণ্ড চা

চমৎকার দেশীয় প্যাকেটে সেরা ভারতীয় চা

BBT/C/22
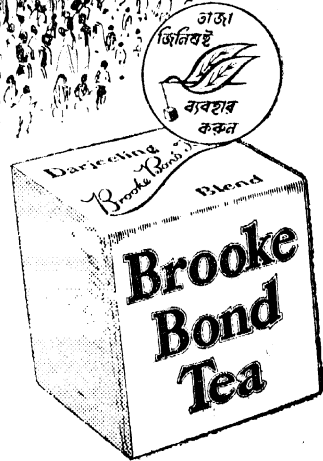
দাঁড়ালেন। আর শুধু কি দাঁড়ানো? অবস্থা দেখে চোখ তাঁর ততক্ষণে কপালে উঠে গেছে। উঁচু-গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি: 'শেষ পর্য্যন্ত আমার এত সখের এ বাটিটাকেও ভেঙে নিশ্চিন্ত হ'লে তো বৌমা? জানো—তোমার শ্বশুর ঠাকুরের কত আদরের ছিল এ বাটিটা? তুমি তো দেখছি, না করতে পারো—হেন কাজ নেই! ভাঁড়ারের চাবি তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলাম কি এই জন্যে? গত তিরিশ বছর ধরে নকুলকেও যেমন চোখের আড়াল হতে দিইনি, জিনিষগুলোকেও তেমনি কারুর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হইনি। তিল তিল করে গুছিয়ে রেখেছিলাম এগুলোকে এত কাল। তুমি একটি একটি ক'রে তার সব ক'টিকেই নিঃশেষ ক'রে এনেছ। তার আগে আমাকে নিঃশেষ করলে বাঁচতাম; তবে আর এ পোড়া চোখ দুটো দিয়ে দিনের পর দিন এমন অনাছিষ্টি দেখতে হতো না।'

অপরাধ স্বীকার করে নরম সুরে দময়ন্তী বললো, 'হঠাৎ যে হাত থেকে এমন ক'রে ফস্‌কে যাবে বাটিটা, ভাবতে পারিনি। ইচ্ছে করে কি কেউ কিছু ভাঙে, মা?'

—'না, ইচ্ছে ক'রে নয়, যা কিছু আজ পর্য্যন্ত অপচয় হ'লো, সব তোমার অনিচ্ছাতেই হ'য়েছে!' ইচ্ছে হ'লো—দু'পা এগিয়ে দময়ন্তীকে শক্ত হাতে একটা চড় কষিয়ে দেন জ্ঞানদাসুন্দরী। কিন্তু অনেক চেষ্টা করে নিজেকে সংযত ক'রে নিলেন তিনি। বললেন, 'তোমাকে আর অমন মিথ্যে কথা বানিয়ে ব'লতে হবে না বৌমা! নাম তো দময়ন্তী নয়, দামিনী; বাপ-মা বাছ-বিচার ক'রে কী নামই রেখেছিল! যেমন চাল-চলতি, তেমনি কথাবার্ত্তার ছিরি। সাজানো সংসারটাকে আমার যমের দুয়োরে পাঠিয়ে তবে তুমি ছাড়লে।'

দুঃখে নিজের মধ্যে ভেঙে পড়লো এবারে দময়ন্তী; ইচ্ছে হ'লো না—একটা মুহূর্ত্তও আর সে শাশুড়ীর সামনে এম্‌নি ক'রে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে থাকবার মতো শরীরের অবস্থাও নয় তার। দিন যতই এগিয়ে আসছে, শরীরের গ্লানি ততই তার একটু করে বাড়ছে বৈ কমছে না। প্রসবের আগে এ কমবার নয়। শরীরের সেই গ্লানির সঙ্গে মনের এই গ্লানি নিয়ে আর চ'লতে পারছে না সে। বললো, 'কোনো কথাই বিশ্বাস না ক'রে আমার যদি কেবল খুঁৎই বার ক'রবেন আর এম্‌নি ক'রে আমার বাপ-মাকে শাপান্ত ক'রবেন, তবে আপনি থাকুন আপনার সাজানো সংসার নিয়ে, আমি আজই মা'র কাছে চ'লে যাই।'—বলতে গিয়ে চোখ ফেটে জল এলো দময়ন্তীর।

কিন্তু সেটুকু লক্ষ্যে প'ড়লো না জ্ঞানদাসুন্দরীর। পুত্রবধূর কথায় বরং তিনি অপমানের কিছু স্পর্শ পেয়ে নিজেই এবারে শোবার ঘরের দুয়োরে গিয়ে পা ছড়িয়ে বসে অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন ক'রতে লাগলেন। সংসারে অনাসক্ত হ'য়েও অনাসক্ত মন নিয়ে পারছেন কোথায় তিনি একটা দিনও চ'লতে? পারা কি এতই সহজ? সারা জীবন যে-মানুষ সংসার নিয়ে কেঁদে মরলো, তার পক্ষে কি একটা দিনেই এমন কিছু নিরাসক্ত হওয়া সম্ভব? কিন্তু তাই ব'লে আসক্তি আছে ব'লেই কি এমন জ্বালায় জ্বলে ম'রতে হবে তাঁকে? নিজে নিজেই এ'বার উচ্চারণ ক'রলেন তিনি: 'দেমাক দেখ না, বাপের বাড়ী যাবার নাম ক'রে এ যেন আমাকে ভয় দেখানো! তাও তো বাপ এসে নিয়ে যায় না কখনও। আমার এত কালের এত সখের বাটিটা ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো ক'রলো, তবু ভালো-মন্দ দু'কথা ব'লতে পারবো না? কি সুখে আছি তবে এখানে?'—কি সুখে যে আছেন তিনি, তা অবিশ্যি তিনিই ভালো জানেন। নকুল কিম্বা দময়ন্তী অবশ্য তাঁর সুখে কোনো দিনই বাদ সাধতে যায়নি। তবু স্বামিহীন সংসারে আজ যে তাঁর মুখ ফুটেও দু'কথা ব'লবার ক্ষমতা নেই, তা তিনি অনেক আগেই বুঝে নিয়েছেন। কিন্তু বুঝে নিলেও বুঝে চ'লতে মন সায় দেয়নি। এই প্রসঙ্গে নিজের স্বামীকেই বড় স্পষ্ট ভাবে আর-একবার মনে প'ড়লো জ্ঞানদাসুন্দরীর। আম-কাঁটালের সময় সেবার, জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি, তাঁদের বিয়ের বছরেরই শেষাশেষি হবে; কাঁসার রেকাবীতে ভালো মিষ্টি দেখে ফজলী আম কেটে পাথরের ঐ বাটিটাতে কাঁটালের কোয়া খুলে অঘোরনাথের খাবারের পাত্রের সামনে এগিয়ে দিলেন জ্ঞানদাসুন্দরী। অঘোরনাথের দৃষ্টি কিন্তু আম বা কাঁটালের দিকে তত বেশী গেল না—যত বেশী গেল ঐ পাথরের বাটিটার দিকে। ব'ললেন, 'বাঃ, ভারী চমৎকার বাটিটা তো, এত সুন্দর খোদাইয়ের কাজ বড় বেশী চোখে পড়ে না। এ বাটি তুমি আবিষ্কার ক'রলে কোত্থেকে?'

মুগ্ধ হাসি হেসে জ্ঞানদাসুন্দরী বললেন, 'কোত্থেকে আবার! মনে নেই, আমার ছোট পিসীমার ননদ যে নিজের হাতে কারুকার্য্য ক'রে বিয়েতে যৌতুক দিয়েছিল আমাকে! অনেক কাল আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছিলাম, সুষমা ছিল আমার পাতানো সই। কাটমুণ্ডার ঐদিকে কোথায় ছোট পিসে মশাই কাজ করেন; সেখানেই কার কাছ থেকে যেন সুষমা শিখেছিল পাথরের এই কাজ। কেন, বিয়ের পর তো তুমি সব জিনিষই দেখেছিলে, এরই মধ্যে ভুলে গেছ?'

হয়ত দেখেছিলেন অঘোরনাথ, হয়ত বা দেখেননি, তা নিয়ে বিন্দুমাত্রও তিনি চিন্তা করতে গেলেন না, হেসে ঠাট্টা ক'রে ব'ললেন, 'এমন জিনিষ যে তৈরী ক'রতে পারে, সে না জানি এর চাইতেও কত সুন্দরী!'

—'কেন, লোভ হয় নাকি?' দুষ্টু চোখের মিষ্টি চাহনি তুলে ধ'রেছিলেন জ্ঞানদাসুন্দরী।

—'হয় না আবার!' অঘোরনাথ ব'ললেন, 'লোভটা যে তুমিই ধরিয়ে দিলে!'

কথা ঘুরিয়ে নিয়ে জ্ঞানদাসুন্দরী ব'ললেন, 'জানিই তো, আমাকে তোমার মনে ধরেনি, পষ্ট ক'রে তা খুলে ব'ললেই তো পারো! কালই আমি সুষমাকে চিঠি লিখে দেবো, তবে দোজবরে সে আবার রাজি হ'লে হয়!'

দুধের বাটিতে পাথরের বাটিটা থেকে কাঁটালের গোলা ঢেলে নিতে নিতে অঘোরনাথ অপাঙ্গে একবার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে ব'ললেন, 'শেষ কালে এই কাণ্ড ক'রবে নাকি তুমি? তোমাকে ছাড়তে হ'লে আমি গলায় দড়ি দেবো।'

কথাগুলো মনে প'ড়লেও আজ হাসি পায়। উত্তরে জ্ঞানদাসুন্দরী ব'লেছিলেন, 'আমাকে তবে ভালোবাসো তুমি, বলো?'

—মুখ ফুটে না ব'ললে কি কিছুই বুঝতে পারো না?' ব'লে কাঁটালের গোলাসুদ্ধ দুধের বাটিতে চুমুক দিলেন অঘোরনাথ।

কিন্তু এই নিয়ে পাল্টা কিছু আর ব'লতে গেলেন না

জ্ঞানদাসুন্দরী, ব'ললেন, 'সুষমাকে আমি সব চাইতে বেশী ভালো-বাসতাম। তার ভালোবাসার দানকে তাই তোমার জন্তেই রেখে দিয়েছি। এখন থেকে এ বাটিতেই তুমি দুধ খাবে।'

শুনে খুসীতে বুকখানি ভ'রে উঠেছিল অঘোরনাথের। সেই থেকে মৃত্যুর আগে পর্য্যন্ত ঐ পাথরের বাটিটাতেই দুধ খেয়েছেন তিনি। অলক্ষ্যে আত্মতৃপ্তিতে সারা মন আচ্ছন্ন হ'য়ে যেতো জ্ঞানদাসুন্দরীর।—ভাবতে গিয়ে কান্নার উচ্ছাসে নিজের মধ্যে একেবারেই ভেঙে প'ড়লেন তিনি।

খটখটে দুপুরের রোদ মাথার উপরে। ধীরে ধীরে বেলা ক্রমেই হেলে প'ড়ছে। তখনও খাওয়া হয়নি জ্ঞানদাসুন্দরীর। প্রতিদিন তাঁকে খেতে বসিয়ে তবে নিজে ভাত বেড়ে নিয়ে বসে দময়ন্তী। আজ সে'ও এত বেলা অবধি অভুক্ত র'য়েছে। বুক ধড়ফড় ক'রছে, মাথা ঘুরছে সেই সকাল থেকে। বাধ্য হ'য়ে একবার সে ডাকৃতে এলো শাশুড়ীকে: 'বেলা যে যেতে ব'সেছে, ক্ষিদে ব'লেও কি আপনার কোনো বোধ নেই মা? আসুন, উঠে আসুন, খাবেন।'

অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠেই জ্ঞানদাসুন্দরী ব'ললেন, 'এমন অলক্ষুণে সংসারে আমি জলস্পর্শ পর্য্যন্ত ক'রতে চাই না। খাওয়া যে এ সংসারে আমার বন্ধ হ'য়েছে, তা আমি আগেই জান্‌তাম। আমাকে আর আদিখ্যেতা না দেখালেও চলবে, বৌমা!'

এবারে কিছুটা কঠোর হ'তে হ'লো দময়ন্তীকে, ব'ললো, 'তা হ'লে আপনি খেতে আস্‌বেন না, বলুন?'

—'না।' এক রকম চীৎকার ক'রেই উঠলেন এবারে জ্ঞানদাসুন্দরী।

আর মুহূর্ত্তের জন্তও শাশুড়ীর সাম্‌নে দাঁড়ালো না দময়ন্তী। দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে এসে সশব্দে দরজার খিল বন্ধ ক'রে শুয়ে প'ড়লো সে।

জ্ঞানদাসুন্দরী কিন্তু একটুও ন'ড়লেন না। তেম্‌নি ক'রেই পা ছড়িয়ে ব'সে ব'সে তিনি অশ্রুবিসর্জ্জন ক'রতে লাগলেন। ধীরে ধীরে গত ত্রিশ বছরের জীবনের অনেক কথাই মনে প'ড়তে লাগলো তাঁর। শুধু কি অঘোরনাথই, পাথরের ঐ বাটিটার সঙ্গে কত জনের কত স্মৃতিই না জড়িত! যেবার নকুল হ'লো, তার অন্নপ্রাশনের উপলক্ষে বাড়ীতে লোক আর ধরে না। দীঘাপতি থেকে বড় মাসীমা এলেন তাঁর দেওরকে নিয়ে, লালগোলা থেকে এলেন নকুলের সেজ কাকার পরিবার; বাড়ীতে যেন ক'দিন ধ'রে হাট ব'সে গেল। বড় মাসীমা বিধবা মানুষ, তাঁর হবিষ্যের যোগাড় ক'রে দিতে হ'লো আলাদা ক'রে; বাসন-পত্র তো আর সঙ্গে নিয়ে আসেননি, জ্ঞানদাসুন্দরীর নিজের যা ছিল, তাই দিয়েই কোনো রকমে ব্যবস্থা ক'রে দিতে হ'লো। তার মধ্যে ঐ বাটিটাও ছিল। খেতে বসে এক সময় মাসীমা জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'হ্যাঁ রে, এমন বাটি তুই কিন্‌লি কোত্থেকে রে?'

জ্ঞানদাসুন্দরী ব'ললেন, 'এ সব জিনিষ কি পয়সা দিয়ে বাজারে কিন্‌তে পাওয়া যায়? ছোট পিসীমার ননদ সুষমাকে তো তুমি দেখেছ, সে'ই নিজের হাতে খোদাই ক'রে বাটিটা আমাকে উপহার দিয়েছিল। সোনার গয়নাও বোধ করি এর কাছে লাগে না।'

অনেকক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে বাটিটার দিকে তাকিয়ে থেকে বড় মাসীমা ব'ললেন, 'সধবা মানুষ তুই, পাথর দিয়ে তুই কি ক'রবি? কিছু যদি মনে না করিস তো আমি যাবার সময় বাটিটা আমার সঙ্গে দিয়ে দিস। তোর মেসো মশাই সংসার থেকে চ'লে যাবার পর দরকার-অদরকারে কারুর কাছে তো মুখ ফুটে কিছু চাইতে পারি না! পেটের সন্তান ব'লতেও তো কেউ নেই! সন্তান বলতে সংসারে তোরাই আছিস। বাটিটা সঙ্গে দিলে বাকী জীবনটা আমার দিব্যি চ'লে যাবে।'

আব্দার আর কি! সংসারে মেসো মশাই না থাকলেও এমন দৈন্ত অবস্থায় পড়েননি বড় মাসীমা যে, তাঁকে এমন ছ্যাঁচলামি ক'রে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ ক'রতে হবে! মাসীমা'র এটা স্বভাব। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে জ্ঞানদাসুন্দরী ব'ললেন, 'তোমাকে বরং বাজার থেকেই দেখে-শুনে বাটি একটা কিনে দেবো। এটা তোমার জামাইয়ের ব্যবহারের জন্তে র'য়েছে।'

তবু কথা কাটতে ছাড়লেন না বড় মাসীমা: 'ওমা, সে কি কথা, জামাই পাথরের বাটিতে খাবে কি! মেয়েদের স্বামী থাকতে আর ছেলেদের বউ থাকতে কথায় বলে—মাছ, পান আর কাঁসা। অঘোরকে তুই পাথরে খাওয়াতে চাস্ কোন আক্কেলে?'

জ্ঞানদাসুন্দরী ব'ললেন, 'আক্কেল আবার কি! পাথর তো পবিত্র জিনিষ, তাতে আবার সধবা অধবার প্রশ্ন আছে নাকি?'

এই নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত বড় মাসীমার মুখ ভারী হ'য়ে উঠলো। রাগ ক'রে শেষ পর্য্যন্ত দীঘাপতি যাত্রার পূর্ব্বে বাজারের কেনা বাটিও তিনি স্পর্শ করলেন না। মনে মনে জ্ঞানদাসুন্দরী সেদিন উচ্চারণ

করেছিলেন : 'না নিলে তো রয়েই গেল। যে বাটি একবার নকুলের বাবাকে দিয়েছি, তাতে আর কারুর অধিকারই থাক্‌তে পারে না।'

সেই বাটিটা আজ এমন নির্ম্মম অবহেলায় দময়ন্তী ভেঙে ফেললো, কোন্ প্রাণে তা সহ্য ক'রবেন জ্ঞানদাসুন্দরী? অশ্রুতে সারা বুক তাঁর ভেসে যেতে লাগলো।...

বিকেলে আপিস থেকে নকুল বাড়ী এলো। আসার সময় পথে ডাক্তারের দোকান থেকে দময়ন্তীর জন্ত একটা পেটেণ্ট অষুধ নিয়ে ফিরলো। বাড়ীর অবস্থা তার জান্‌বার কথাও নয়, জানেওনি। কিন্তু এসে দোরগোড়ায় পা দিতেই চক্ষু তার স্থির! গেট্ পেরিয়ে বারান্দায় উঠতে জ্ঞানদাসুন্দরীর ঘরটাই আগে পড়ে। স্বভাবতঃই তাই মায়ের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ ঘ'ট; কিন্তু এমন ভাবে কোনো দিন তাঁকে কাঁদতে দেখেনি নকুল। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস ক'রলো, 'এ তোমার কি হলো মা, বসে বসে এম্‌নি করে কাঁদছো কেন?'

উত্তর নেই জ্ঞানদাসুন্দরীর কণ্ঠে।

ব্যাকুল হয়ে এবারে মা'র সাম্‌নে হাঁটু গেড়ে বসলো নকুল: 'বলি, কাঁদছো কেন এমনি করে তুমি? কি হয়েছে, খুলেই বলো না?'

—'কি আবার হবে।' বন্যার তোড়ের মতো মনের বাঁধ এবারে ধ্বসে পড়লো জ্ঞানদাসুন্দরীর।—'যা আমার কপালে আছে, তাই তো হবে! কাউকে দু'কথা তো ভালো-মন্দ বলবার উপায় নেই, বললেই আমিই লোক খারাপ হই। আর এই যে এত কালের এত ভালো বাটিটা ভেঙে গেল, আর কি ফিরে আসবে তা? আমি তো বাপু লোক খারাপ, বউকে কিছু বললে অমনি তুই আসবি মুখের উপর ওকালতি করতে—বৌমাকে তুমি যেন কিছু বলা-কওয়া কোরো না। বলি, তোর বউ কি আমার সাত জন্মের শত্তুর যে, তাকে কিছু বলা-কওয়া না ক'রে আমার পেটের ভাত হজম হয় না? তোর বাপের দুধখাবার বাটিটা পর্য্যন্ত আজ ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো ক'রে ফেললো, তাই নিয়ে দু'কথা ব'লেছি কি অম্‌নি মুখের উপর উল্টে অপমান! আমি আর একটা দিনও তোর সংসারে থাক্‌তে চাই না নকুল, আমাকে তুই কাশী পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে দে, আমি আজই রওনা হ'য়ে যাই।'—কথা শেষ ক'রতে গিয়ে অশ্রুর বেগ এবারে আরও অনেকখানি বেড়ে গেল জ্ঞানদাসুন্দরীর।

এই প্রথম আজ দময়ন্তীর উপর ক্রোধে ফেটে প'ড়লো নকুল। নিশ্চয়ই সে এমন কিছু কাণ্ড ক'রেছে—যার আঘাত মা সহ্য ক'রতে পারেননি। ব'ললো, 'তোমার বৌকে কি ভাবে সায়েস্তা ক'রতে হয়, দেখাচ্ছি। তুমি চোখের জল মোছ মা!'

ত্রস্তে উঠে নিজের শোবার ঘরের দরজায় এসে সামান্ত ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা। স্বামীর আসার শব্দ পেয়েই শয্যা ত্যাগ ক'রে উঠে দরজার খিল খুলে দিয়ে আবার গিয়ে মুখ গুঁজে শুয়ে প'ড়েছিল দময়ন্তী। ঘরে ঢুকেই নকুল জিজ্ঞেস ক'রলো, 'কি, বাড়ীতে আ[illegible] হঠাৎ এমন কি হ'য়েছে—যার জন্তে মা ব'সে ব'সে চোখের জল [illegible]ছেন?'

উত্তর নেই দ[illegible]র মুখে।

'[illegible] না—কথা [illegible] থাকে না?' [illegible]

রুদ্ধ স্বর এবারে এঘরের দেয়াল ডিঙিয়ে পাশের ঘরে জ্ঞানদাসুন্দরীর কানে পর্য্যন্ত গিয়ে স্পষ্ট বাজলো।

কিছুমাত্র দ্বিধা না ক'রে দময়ন্তী এবারে মুখ তুলে খাটের উপর উঠে ব'সলো। সারা মুখে তার শুধু যে একটা ক্লান্তির ছাপই স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে, তা নয়, সেই ক্লান্তিকে ছাপিয়েও প্রস্ফুট হ'য়ে উঠেছে একটা থমথমে বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্য। ব'ললো, 'ঘুমোইওনি, কথাও কানে গেছে। কিন্তু তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো ধৈর্য্য আমার নেই।'

সারা দিনের কর্ম্ম-ক্লান্তির পর এমন অবস্থা বা পরিবেশের জন্ত প্রস্তুত ছিল না নকুল। স্বভাবতঃই তাই দময়ন্তীর কথার ভঙ্গীতে মেজাজ তার সপ্তমে চ'ড়ে গেল। নিজের অলক্ষ্যেই এবারে সে চীৎকার ক'রে উঠলো: 'ধৈর্য্য না থাক্‌লেও মাকে যে তুমি অপমান ক'রেছ, তাতে আর মিথ্যে কি? বাবার দুধখাবার পাথরের বাটিটা যে ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো ক'রেছ, তাও মিথ্যে কথা, না কি বলো? বলি, কি পেয়েছ তুমি, ব'লতে পারো?'

বিয়ে হওয়া অবধি নকুলের এমন মূর্ত্তি কখনও দেখেনি দময়ন্তী। ব'ললো, 'তুমি প্রকৃতিস্থ থাক্‌লে অবশ্যই বলতে পারতুম, তা যাক্। সারা দিন মা না খেয়ে থেকে আমাকেও যে খেতে দিলেন না, আর আমাকে জড়িয়ে আমার বাবা-মাকে অপমানের একশেষ ক'রে যে ছাড়লেন উনি, সেগুলো মিথ্যে কি সত্যি, তাও তোমার মা'র মুখ থেকে শুনে এলেই বোধ করি ভালো ক'রতে!'

নকুল কিন্তু এতটুকুও দম্‌লো না। বললো, 'মার সঙ্গে এমন মান-অপমানের বালাই নিয়ে তোমাকে ম'রতে বলে কে? তোমাদের যন্ত্রণায় দেখতে পাচ্ছি ঘরে তিষ্ঠোনো আমার দায় হ'য়ে উঠলো। ঘরে ব'সে আরামে খেয়ে খুব কোন্দলপনা ক'রতে শিখেছ যা হোক্!'

রুদ্ধ আবেগে এবারে নিজের মধ্যে হু-হু ক'রে কেঁদে উঠলো দময়ন্তী। সকাল থেকেই তার শরীর ভালো যাচ্ছিল না, গা বমি-বমি ভাবটা লেগে আছে সর্ব্বক্ষণ। তার উপর সারা দিন অভুক্তাবস্থায় থেকে এখন আর ভালো ক'রে মাথা তুলেও বসতে পারছে না। মনে হ'চ্ছে—টাল সাম্‌লাতে না পেরে পড়ে যাবে সে। অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে শুধু একবার বললো, 'তোমাকে শুধু যন্ত্রণা দিতেই তো ভগবান তোমার সংসারে আমাকে পাঠিয়েছেন! ব'সে ব'সে আরামে খেয়ে খেয়েই তো কোন্দল ক'রে তোমাদের জীবন বিষময় ক'রে তুললাম আমি! এর চাইতে গলায় দড়ি দিয়ে কেন আমি ম'রলাম না।'

আবেগে অধীরতায় থরথর্ ক'রে কাঁপছিল সারা দেহখানি দময়ন্তীর। হঠাৎ মাথা ঘুরে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেল সে খাটের উপর।

এতক্ষণের অপ্রকৃতিস্থতা কাটিয়ে এবারে সত্যি সত্যিই সচেতন হ'তে হ'লো নকুলকে।...

যখন জ্ঞান ফিরলো দময়ন্তীর, চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলো—জ্ঞানদাসুন্দরীর কোলের উপর সে শুয়ে আছে; তাঁর সকরুণ দৃষ্টি থেকে স্নেহের বিগলিত ধারা ঝ'রে পড়ছে দময়ন্তীর স্বেদসিক্ত ললাটে। একটা ফিডিংকাপ তার মুখের সাম্‌নে এগিয়ে ধ'রে জ্ঞানদাসুন্দরী ব'ললেন, 'এই দুধটুকু খেয়ে নাও বৌমা।'

দময়ন্তীর আর এমন সাধ্য রইল না যে, 'মা' বলে।

ঘরের মেঝেতে পাথর বসানো, রোজ নিকোতে হয় না, কলে জল আসে, দূরে নদীতে জল আনতে যেতে হয় না, রোদ-বৃষ্টিতে ভিজে ক্ষেতে কাজ করতে হয় না, সেই জন্যেই ত বাবা আমাকে এখানে বিয়ে দিলে।"

"তা কুমীর শিকারে যে আয় হয়, সে আয় কি তোর শশুরে চাকুরীতে হয়?"

"কোথায় আর হয়? আমি এটা-সেটা চাইলে পাওয়া দূরে থাক বকুনি খেয়ে মরতে হয়। তাই ত আমিও কাজ করতে সুরু করেছি।"

"তোদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয় না?"

"তা কি আর না হয়।"

রাঁধুনী বাচ্চি বাঈ ফোড়ন কেটে বললে, "বাঈ, তুমি গুমানির কাণ্ড জান না, আমি এতটুকুন থেকে ওকে দেখে আসছি। ও বড় শয়তানী, ওর বরকে ধরে ও মারে। কোন কিছু বললে ও ডমরুকে নাকানি-চুবানি খাওয়ায়। ইঁদুর ধরবার সময় বিড়াল যেমন ওৎ পেতে ব'সে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঝগড়া লাগলে গুমানিও তেমনি বরের দিকে তেড়ে যায় মারতে।"

"ও গুমানি, সত্যি নাকি?" গুমানি লজ্জায় মুখে আঁচল টেনে দিলে। কালো মুখখানা লাল করে বললে, "ও আমাকে গালি দিলে আমিও গালি দেই। আমাকে মারতে গেলে, আমিও তেড়ে আসি মারতে।"

বাচ্চি বাঈ বললে, "ডমরু যদি কখনও রেগে বলে, হারামজাদী, তা গুমানি এত দুষ্টু যে, চার গুণ চেঁচিয়ে ডমরুকে এমন গালি দিতে থাকে যেন পাড়াশুদ্ধ শুনতে পায়—অমনি ডমরু ভয়ে কাঁচুমাচু করে চুপ করে যায়।"

গুমানি বউটার স্বভাবে কেমন একটা বৈচিত্র্য ছিল, যা সচরাচর দেখা যায় না। বউটা চঞ্চল, মুখরা, জীবনের আনন্দে উচ্ছল, আবার কেমন পাগলাটে স্বভাবেরও। এই যেমন সেদিন একরাশ কাপড় নিয়ে কাচতে বসেছে। কিছুক্ষণ পরই সুরু করে দিলে, "আমার সাবান কে নিয়ে গেছে, কে নিয়ে গেল কে নিয়ে গেল।" আমি বললুম, "কলতলায় ত কেউ যায়নি। ওদিকে কাপড়ের নীচেই আছে হয়ত। তা সে চেঁচান সুরু করেছে, "বলছি এই মাত্তর সাবানটা এখানে ছিল, এক্ষুনি নেই। নিশ্চয় কেউ নিয়েছে। এ সব জিনিষ হারালে আমার মাথা গরম হয়ে যায়। আমি পরের সোনাদানা চাই না, আমি কিছু চাই না, কে এমন কাণ্ডটা করলে।" ডমরু এসে ধীরে ধীরে কাপড়টা উল্টে-পাল্টে সাবানটা বের করে, ধীরে ধীরে বললে, "নে শয়তানী।"

আমি বললুম, "গুমানি, তুই এ রকম পাগলামী করিস কেন?"

সে চার বছরের মেয়ে ভোমলকে জড়িয়ে ধরে বললে, "বাঈ, আমি বড় দুঃখী। আমার একে একে সাত-সাতটা বাচ্চা মরে গিয়ে শুধু এই একটি আছে।"

আমি বললুম, "আহা বলিস কি, কি করে এমন হল?"

"সে কি করে জানি না। কোনটা এক মাসের, কোনটা দু'মাসের কোনটা জন্ম নিয়েই চলে গেছে, এই ত মাস ছয়েক আগে আমার কোলের দেড় বছরের ছেলেটা মারা গেল। সে বড় সুন্দর ছিল দেখতে, [illegible] মত কালো ছিল না, চোখ দুটো বড় বড়, মাথায় একরাশ কালো চুল, আধ-আধ স্বরে কথা বলত, সেই ছেলেটা তিন দিনের জ্বরে আমাকে ছেড়ে চলে গেল, তার চেহারাটা এখনও আমার চোখে ভাসে। ছেলে মারা যাওয়ার পর থেকেই আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে সব ভুলে যাই।" তার চোখ জলে ভরে গেল।

আবার বললে, "জান বাঈ, ছেলেবেলাটাও আমার বড় দুঃখে-কষ্টে কেটেছে। বিয়ের সময় ত আমি ছোট ছিলাম, একটু বড় হলেই শ্বশুরবাড়ীতে এলাম। আমার শ্বশুর-শাশুড়ী নেই, ভাসুর আর বড় জা। বড় জা'টি এত অমানুষ, কি বলব, আমাকে কি কষ্টই না দিয়েছে। ভোর ছ'টাতে উঠতেই আমাকে বাড়ী-বাসন মাজার কাজে লাগিয়ে দিত। এগারটা-বারোটা অবধি আমাকে উপোসে রাখতো, আমি ক্ষিধের জ্বালায় মরতুম, আমাকে একটু গুড়-পানিও খেতে দেয়নি। গিন্নী মায়েরা আমার শুকনো মুখ দেখে বলতেন, 'হ্যাঁ রে গুমানি, তুই কিছুই খাসনি বুঝি? একটু চা খেয়ে নে।' হয়ত চায়ের বাটিটা মুখে তুলব, অমনি জা এসে হাজির। চুপচাপ হাতের বাটি ঠেলে চলে যেতাম। কোন কোন গিন্নীমা হয়ত একটুকরো রুটি দিতেন, ঘরের পেছনে লুকিয়ে খেতুম। তবু ওর একটু মায়া হয়নি, ওর মনটা এমনি পাথরের ছিল। দুঃখের কথা কাকেই বা বলব, আমাদের দেশে বেশ বড় না হলে স্বামীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে না। তা যখন বেশ বড় হলুম, ঘর-বসত করতে এলুম, তখন দুর্গতি একটু কমল। আমার প্রথম সন্তানের জন্মের সময় জা আমাকে না বাপের বাড়ীতে পাঠালে, না নিজে যত্ন করলে। তোমার এই বাচ্চি বাঈই আঁতুরে আমাকে নিয়ে বসে রইল, দাইকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিলে, জন্মের পরই ছেলেটা মারা গেল, আমার কি কান্না, বাচ্চিবাঈই মার মত সান্ত্বনা দিলে, আমার জা'টি একবার উঁকি দিয়েও দেখলে না। বাচ্চি বাঈর স্বামী আমার ছেলেকে নিয়ে মাটি দিলে, এর পরই আমার রাগ ধরে গেল, আমি ওকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেলুম। শান্তিতে থাকতে লাগলাম। তা আমার এই জায়ের পাপের শাস্তি দেখ না! ওই যে মেয়েটাকে দেখ—যে মাঝে-মাঝে সড়কের উপর পড়ে চেঁচিয়ে কাঁদে, তার নাম শান্তা। সে ত আমারই জায়ের মেয়ে। এক মাত্র মেয়ে, মেয়েটা দেখতেও ভাল, বিয়েও হল মন্দ নয়। শান্তার ছেলেবেলা থেকেই মূর্চ্ছার ব্যারাম ছিল, কিন্তু ওর বরটা ভাল ছিল, ওকে ভালই রেখেছিল, ওদের একটা মেয়েও হয়েছে বছর দুয়েকের। এক শহরেই বাড়ী, তবু মায়ের আহ্লাদেপনা, মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাবে না। শান্তার বর কত বললে বেশ ত, আমাদের কাছে কিছু দিন থাক, তোমাদের কাছেও কত দিন থাক জা কি আর সে সব বোঝে? জামাইকে বলে, তুমি এখানে এসে থাক। জামাইর ত বড় গরজ! এই ত মাস দুয়েক হল আবার বিয়ে করে ফেলেছে। শান্তার কি কান্না, এখন দিনরাত মাকে বকে, বাপকে বকে, কখনও বা চেঁচিয়ে কাঁদে, কখনও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। মা'টা মেয়ের কেমন সর্ব্বনাশ করলে। দুঃখের কপাল আর কত বলব বাঈ, এই ত দিন দশেক আগের কথা, এক সকাল বেলায় শান্তা উনুনে এক হাঁড়ি চায়ের জল বসিয়ে উনুনের কাছেই আগুনতাতে বসে আছে, মা-বাপ দোরগোড়ায় নাতনিকে নিয়ে কথাবার্ত্তা বলছে। হঠাৎ শান্তার মূর্চ্ছা এল, সে গোঁ-গোঁ করে উনুনের

আপনি কি কখনো

নদী পাড়ি দিতে সমুদ্রের জাহাজ আনবেন ?
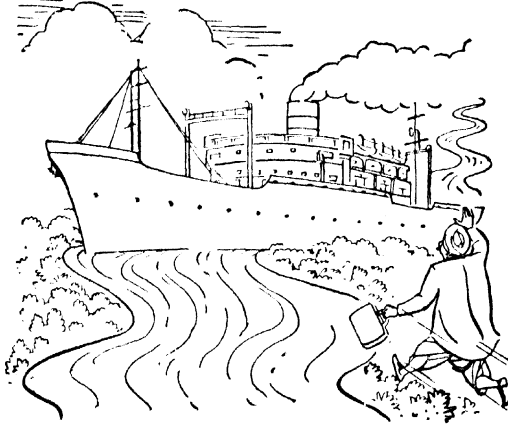
আনবেন না সত্যি, কিন্তু ঠিক এই রকমই অবস্থাটা দাঁড়ায় যখন কেউ বেশী-শক্তির ব্যয়বহুল ব্যাটারী সেট ব্যবহার করেন ; অথচ **কম-শক্তিক্ষয়ী** সেটও আছে যাতে সুন্দর আওয়াজ পাওয়া যায়। যে রেডিও সেট অতিরিক্ত আওয়াজ বার করে তার ব্যাটারী অল্পেই অযথা নষ্ট হয়।

কম-শক্তিক্ষয়ী সেটে ব্যাটারীও অনেক কম খরচ হয় আর তাতে টাকার সাশ্রয় হয়। সুতরাং, যখনই ব্যাটারী সেট দরকার হবে, **কম-শক্তিক্ষয়ী** সেট কিনবেন — তাতে আপনার রেডিও থেকে কান ফাটানো আওয়াজের পরিবর্তে সুন্দর শ্রুতিমধুর সুর বেরুবে।

ব্যাটারীর প্রয়োজনে সব সময় ব্যবহার করুন

EVEREADY

TRADE-MARK

এভারেডী রেডিও ব্যাটারী

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রেডিও ব্যাটারী

ন্যাশনাল কার্বনের তৈরী

উপরই পড়ে গেল। আহা, তোমাকে কি বলব বাঈ, সেই ফুটন্ত জলের হাঁড়িটা তার শরীরের উপর উল্টিয়ে পড়ল, মেয়েটা ত একেবারে অজ্ঞান। ডান দিকের কোমর থেকে পা অবধি ফোস্কা পড়ে গেছে, সবাই মিলে হৈ-চৈ করতে লাগল। অনেক পরে শান্তার হুঁস হল বটে, তবে শান্তা শুধু চীৎকারের উপরই আছে, ডাক্তারী মলম লাগাচ্ছে। সবাই বলছে, হবে না! দেবতার কোপে এমন হয়েছে! শান্তার প্রথম মেয়েটার চুল কাটাল, আর না দিলে দেবতার পূজা, না খাওয়ালে জ্ঞাতি ভাইকে।"

আমি বললুম, "চুল কাটবে, তাতে আবার দেবতার পূজো কি ?"

গুমানি বললে, "ওমা, তোমাদের দেশে বুঝি এ সব নিয়ম নেই ? আমাদের দেশে ধনী গরীব সব শিশুরই জন্মের চুল প্রথম কাটবার সময় দেবতার পূজো করে, সবাইকে খাওয়ায়।"

এক দিন আমি গুমানিকে বললুম, "তোর বড় বোন কোথায় থাকে রে ?"

"আমার আক্কা (দিদি) নর্ম্মদার তীরে মূলগাঁও বলে একটা গাঁ আছে সেখানে থাকে।"

"তুই সেখানে গিয়েছিস কখনও ?"

"হ্যাঁ, গেছি বৈ কি, একবার আক্কার সঙ্গে গিয়েছিলাম তা আমার ভাল লাগেনি।"

"কেন রে ?"

"ওখানকার ঘর-দোরগুলো অন্য রকম। ছোট পাড়াগাঁ, রেল নেই, মোটর নেই, গরুর গাড়ীতে আসতে-যেতে হয়। সারি সারি কুঁড়ে-ঘর, ছনের ছানি, মাটির দেওয়াল, লাল মাটি দিয়ে লেপে রাখে। প্রত্যেকের বাড়ীর সামনেই দুটো খুঁটিতে একটা মোটা বাঁশ বাঁধা থাকে, তাতে মাছ ধরার মোটা জাল রোদে শুকুতে দেয়। ঘরের ছাদে, কাঠের তক্তার উপর দেখতে পাবে কত রকম জিনিষ যত্ন করে তুলে রেখেছে। মাছ ধরার ছিপ, বঁড়শী, কুমীর ধরবার বঁড়শী, ভল্লা, কুড়াল, বড় মাছ ধরা ঝুড়ি, ধারাল ছুরি আরো কত কি! সারা ঘর-দোরে কেবলই আমি মাছের আঁশটে গন্ধ পেতাম, আর আমার গা বমি-বমি করত। যখন খুব মাছ ধরা পড়ে, তখন বিক্রী হয়ে ত অনেক মাছ বেশী থেকে যায়, ওগুলোকে খুব করে নুন দিয়ে রাখে, তার পর মোটা সুতো দিয়ে গেঁথে-গেঁথে রোদে শুকিয়ে শুকনো মাছ করে রাখে। যখন মাছ বেশী পাওয়া যায় না তখন ঐ শুকনো মাছগুলো খায় ও বিক্রীও করে।"

"কুমীর কি করে শিকার করে জানিস ?"

"হ্যাঁ, জানব না কেন ? আমার দাদা-মশায়ই ত কত কুমীর মেরেছে। ঠাকুর্দ্দার মুখে কত গল্প শুনেছি, দিদির মুখেও শুনেছি। আমার দিদি ত ভয়েই মরে কখন বা বর কুমীর ধরতে গিয়ে মারা যায়।"

"কেন, খুব ভয় আছে নাকি ?"

"বাবা, কুমীর ধরা যে বিপদের! শিকারীরা পাঁচ-সাত জন মিলে দল বেঁধে যায় কুমীর ধরতে! শুধু গরমের সময়টাই ওরা শিকার করে, কারণ তখন নদীর জল অনেক শুকিয়ে যায়। ওরা নদীর চড়াতে দিনরাত থাকে। ওখানেই তাঁবুর মত ছোট ডেরা বেঁধে রান্না খাওয়া শোওয়া সব করে। কুমীর ধরবার জন্য আলাদা খুব শক্ত আর মোটা দেখে বঁড়শী নেয়। ২৫।৩০ হাত মোটা মজবুত রশি, আর কুমীর কাটবার জন্য ধারাল কুড়াল, আর ছুরি দা সঙ্গে থাকে। মোটা মজবুত খুঁটি নদীর চড়া ছেড়ে শুকনো জমিতে খুব ভাল করে গেড়ে নেয়, যাতে একটুও না হেলে। তার পর তাতে সেই বিশ-ত্রিশ হাত মোটা রশি শক্ত করে বেঁধে অপর দিকে একটা লোহার তৈরি মজবুত বঁড়শী গাঁথে, আর তাতে পাঁঠা বা ভেড়া কেটে বড় মাংস গেঁথে সেই রশিটা নদীতে ছুঁড়ে দেয়। রশির মধ্যে বঁড়শীর উপর ভাগে অনেক-গুলো ঘাসের আঁটিও বেঁধে দেয় নিশানা রাখবার জন্য। কুমীর মাংসের লোভে এসে বঁড়শীতে মুখ দেয় আর মাংস খায়, খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বঁড়শীটা গলাতে আটকে যায়। যখন কুমীর লোহার বঁড়শী ছাড়াবার জন্য ছটফট্ করে তখনই ঘাসের আঁটি জলের নীচে চলে যায় আর রশিতে টান পড়ে। অমনি সবাই মিলে সেই রশি ধরে প্রাণপণে টানতে থাকে। ছোট বা মাঝারি গোছের কুমীর হলে তীরে টেনে তুলতে এত কষ্ট হয় না। কিন্তু যখন বেশ বড় কুমীর শিকার গেলে, তখন তাকে টানতে গেলে সেটা প্রাণপণে নদীর গভীর জলে ঢুকে যায়। বঁড়শীর রশি পঁচিশ-ত্রিশ হাত লম্বা থাকে। লোকেরা তখন সেটাকে ঢিলা করে ধরে সঙ্গে সঙ্গে সাঁতরে সাঁতরে চলে। তার পর মানুষে কুমীরে বহু ধ্বস্তাধ্বস্তি চলে। নৌকা থেকে কুমীর ধরাটা এত বিপদের নয়, কিন্তু কুমীরের সাথে সাথে সাঁতার দেওয়া ভয়ঙ্কর বিপদ। অনেক সময় লোক মারা যায়। কুমীরটাকে তীরে কোন রকমে তুলতে পারলে সবাই হুল্লোড় করে আনন্দে। তার পর কুড়াল দিয়ে কুমীরটার মাথা কেটে ফেলে। তার পর এরা কায়দা করে ধীরে ধীরে কুমীরের ছালটা কেটে বের করে নেয়। কুমীর ধরার পালাটা শেষ হলে তারা তাঁবু-টাবু গুটিয়ে জিনিষপত্তর নিয়ে চলে আসে। তাদের কাছ থেকে ব্যাপারীরা ছাল কিনে নেয় প্রতি ইঞ্চি তিন টাকা হিসেবে। কুমীর শিকারে আবার অন্য রকম লাভও হয়।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "সে কি রকম ?"

গুমানি বললে, "কখনও কখনও এমন কুমীর ধরা পড়ে যেটা মানুষ গিলে খেয়ে ফেলেছে। কুমীরটাকে কাটা-চিরা করবার সময় তার পেটের ভিতর থেকে মরা মানুষটার হাড়-গোড় বেরোয়। আর হাড়-গোড় মেয়েমানুষের হলে তাতে দু'-চারটা গয়নাগাটি পাওয়া যায়।"

পাশে গুমানির ভাইবৌ বসেছিল, সে ফোড়ন কেটে বললে, "কেন, আমার বড় ননদের মরদ ত কুমীর ধরে। তার অবস্থা খারাপ ছিল, ননদের গায়ে কোন দিন সোনা-দানা দেখিনি। সেবার নন্দাই একটা কুমীর কেটে অনেক গয়না পেল, তাই দিয়ে আমার ননদের বেশ ক'খানা গয়না হয়ে গেল, এখন সবাই তাকে বড়লোক বলে। কিন্তু কুমীর শিকারে বড় খটপটিও আছে। সরকার থেকে কুমীর শিকারের অনুমতি নিয়ে ছাড়পত্র নিতে হয়, থানায় থানায় নাম লেখাতে হয়। কুমীর ধরতে যাবার আগে পুলিশ থানায় সব নাম-ধাম-পাত্তা দিয়ে তবে শিকারে যেতে হয়।"

চার-পাঁচ দিন পর গুমানি এসে দু'-সব দিনের ছুটি চাইল। আমি বললাম, "কেন ?" সে বললে, তার জ্ঞাতি ভাইর বিয়ে।

সেদিন গুমানি বিয়ে-বাড়ীতেই বোধ হয় বেশ একটু দেরী ক

ফেললে। ডমরু সারা দিন খেটে-খুটে বাড়ীতে গিয়ে দেখে রান্না চড়েনি, গুমানি তখনও আসেনি। ডমরু গেল চটে। যেই গুমানি এল অমনি বললে, "হারামজাদী শালীর বেটি, যা পঞ্চায়েতী করতে চলে যা, রান্নার দরকার নেই।"

গুমানি ফোঁস করে বলে উঠল, "নবাব বাদশা, চুপ করে থাক্, গালি দিতে হয় আমাকে দে। আমার মাকে গালি দিস্ কেন? রোজগার ত এইটুকুন, আবার বড়মানষেমী! ঠিক সময়ে খানা চাই-ই।"

দু'জনে বহু ক্ষণ ঝগড়াঝাঁটি করে শান্ত হল। ডমরুর মুখ ভার, গুমানির চোখে জল। দু'জনে আসে কাজ করে যায়, কিন্তু ভাব দেখে মনে হয়, তাদের ঝগড়া মেটেনি। বিরোধটা সামান্য কারণে অকারণে বেড়েই চলেছে।

—দেখতে দেখতে গুমানির ভায়ের বিয়ের দিন এসে গেল। সকালে মণ্ডপ বাঁধা হয়েছে বাজনা বাজিয়ে। সড়কের অপর পারে বাড়ী। মধ্যে যেটুকু খোলা জায়গা, তাতেই খুঁটি গেড়ে দেবদারু পাতা আম পাতা কাগজের নিশান লাগিয়ে মণ্ডপ বানানো, সাজানো হয়েছে। এখন গায়ে হলুদ, পাড়ার জ্ঞাতি বউ-ঝিরা সব রঙ্গীন শাড়ী পরে সেজে-গুজে এসেছে, প্রত্যেকের হাতে একটা পিতলের কলসী, তারা নিমাড়ী ভাষায় গান গাইতে গাইতে চলল সরকারী কলতলায়।

মেরে বনে কী সজী হ্যায় বরাত
চমক রহী হ্যায় রাত সিতারে ওয়ালী
তেরে মুখ মে ছা রহী লালী
বনে কো সোহরা সোহেগা
লড়িয়োঁ কী সোভা বনী হ্যায় অজব নিরালী।

গান গাইতে গাইতে তারা জল ভরে ফিরে এল মণ্ডপে, তার পর খুব হুল্লোড় করে বরের গায়ে হলুদ মাখান হল। এ দেশে গানের খুব চল, হিন্দুস্থানী মেয়েরা বউরা বসে বসে গান গায়, বরের পক্ষ কনের পক্ষকে নানা রকম সুরসাল গালি দেয়। তাকে "বান্ধা" বলে। কনের পক্ষও ঠিক সেই রকম। বেহাই বেহান, এদের নিয়ে রসিকতা করে বান্ধা দেয়, দু'পক্ষেই দশপতি টাকা বকশিষ দেয় বউদের—ভাল করে বান্ধা গেয়ে অপর পক্ষকে গালি দেবার জন্যে। বিয়ের পর দু'দলের বউ-ঝিরা একত্র হয়ে সেই টাকা দিয়ে মিঠাই কিনে আনন্দ করে খায় আর তখন আবার সুরু হয় ইনিয়ে-বিনিয়ে নানা গানের পালা। গুমানি কালো মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল করে খুব হলুদ লাগাচ্ছে আর গান গাইছে দেখতে পেলাম।

এই বিয়েতে দু'পক্ষেই বেশ জুলুস হবে, কারণ বর হল এক শেঠের বাড়ী চাপরাশী, আর কনের বাপ হল সরকারী ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার। এই তিন-চার দিন পাড়া-পড়শীরও খুব হৈ-চৈ চলল। সকালে দেখা গেল, এক দল গাঁয়ের লোক পাগড়ী মাথায় বসে আছে সড়কের এক কিনারে, আর গুমানি আর দুটি বউ ডেকচি-লোটা নিয়ে সবাইকে গ্লাসে গ্লাসে চা ঢেলে দিচ্ছে, তারা পরম তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে। তিন রাত ধরে গানের মজলিস বসেছে। বড় সড়কের পাশে আর ঘরের সামনে

একটুকরা জমি পড়ে আছে তাতেই মণ্ডপ বাঁধা হয়েছে, আর ওখানেই রাত্তিরে নাচ-গান হবে। দু'টি গ্যাসলাইট ভাড়া করে এনেছে। ছোট ছোট বাচ্চারা যত দূর সম্ভব ভাল জামা-কাপড় পরে এধার-ওধার ঘুরছে। সন্ধ্যের সময় সব লোকেরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নাচের আসরে এসে জমা হচ্ছে। রাত দশটায় ঢোলের আর ঘুংগুরের আওয়াজ কানে আসতেই আমাদের বারান্দার পেছন দিকটায় গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখতে পেলাম সাজানো মণ্ডপের ভিতর একটা শতরঞ্চি পেতে রাখা হয়েছে। তার উপর একপাশে ঢোলকওয়ালা আর তবলাওয়ালা বসেছে। আর দুটো পুরুষলোক গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে মুখখানা কোমল করবার চেষ্টা করেছে। দু'জনের পরণে দু'খানা রঙ্গীন শাড়ী হালফ্যাসনে পরা। কানে লম্বা দুল, হাতে চুড়ি, গলায় হার, মাথায় পরচুলা—মন্দ নারীমূর্ত্তি সাজেনি। বাজনার তালে তালে দু'জনে কোমরে এক হাত রেখে অন্য হাত নানা ভাবে ঘুরিয়ে নাচছে আর গাইছে, আর সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরা বাহাবা বাহাবা বলে চেঁচাচ্ছে। সারা রাত এভাবে নাচ-গান চললো, ভোর বেলা সকলে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে ঢলে পড়ল।

আজ বিয়ে। সারাটা সকাল দফে দফে গানের আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। গরীবের বাড়ীর বিয়ে তবু তার জুলুস্ কত! চার-পাঁচটা গ্যাসলাইট এনেছে, ব্যাণ্ডপার্টি এনেছে, ছেলে-বুড়োর হৈ-চৈ। রাত ন'টায় "বরাত" (শোভাযাত্রা) বেরুবে। বরের জন্ম সাদা ধবধবে ঘোড়া এল। এই সাদা ঘোড়াটা হল "বরাতের" ঘোড়া। এ দেশে নিয়ম আছে, বিয়ের সময় বর ঘোড়ায় চড়ে বিয়ে করতে যায়, তা সে ধনীই হোক আর গরীবই হোক। ঘোড়াওয়ালারা দু'-তিনটা ঘোড়া বেশ তাজা আর সুন্দর দেখে যত্ন করে পোষে, বিয়ের মরসুমে ভাড়া দিয়ে বেশ দু'পয়সা রোজগার করে।

রাত ন'টার সময় বরকে মেয়েরা হাতে প্রদীপ নারকেল ইত্যাদির থালা নিয়ে আরতি করলে, বরের পরনে হলদে ধুতি, কপাল চন্দন-চর্চ্চিত, মাথায় উঁচু লম্বা সোলার মুকুট আর তা থেকে অনেকগুলো সোলার ফুলের মালা ঝুলে বরের মুখ ঢেকে দিয়েছে। বরের বাপ ভাই সবাই বরকে আশীর্ব্বাদ করে ঘোড়াতে বসিয়ে দিলে, ব্যাণ্ডপার্টি বেজে উঠল, সাদা ঘোড়া ধীরে ধীরে চলতে লাগল, আর সঙ্গে বাপ কাকা জ্ঞাতি-গুষ্ঠী সবাই চললো পদব্রজে শোভাযাত্রা নিয়ে, তিন-চারটা কুলীর মাথায় চাপানো গ্যাসলাইটগুলি আলো বিতরণ করতে করতে চলল। পরের দিন বাজনা বাজিয়ে বৌ নিয়ে এল। রাত্তিরে ভোজ হবে। বরের মা পিসি ভাইবৌ এরা সারা দিন বড় বড় পেতলের হাঁড়ি ভরে রান্না করছে, অরহর ডাল, ভাত, কলাইর ডালের দহিবড়া, আলুর তরকারী, জোয়ারের পাঁপরভাজা আর তৈরী করেছে লুচি, আটার হালুয়া আর দুধের পায়েস। আমি আমাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, হাতভরা রূপোর গয়না, গলায় রূপোর মোটা হাঁসুলী, কানে ভারী ভারী লম্বা ঝুমকা আর রং-বেরংএর রঙ্গীন শাড়ী পরে সেজে-গুজে বউ-ঝিরা কেমন কাজ করে যাচ্ছে, গুমানিও এধার-ওধার হাসিমুখে লাফাচ্ছে।

সন্ধ্যের পর দলে দলে লোক খেতে এল। প্রত্যেকে যে যার জলপাত্র নিয়ে বসেছে। সড়কের একপাশ দিয়ে দু'সার করে বিয়ের জ্ঞাতিগং[illegible] খেতে বসে গেল। সেদিনের বিকেলটা কিন্তু মেঘলা-মেঘলা ছিল, দেখতে দেখতে কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল, বিয়ের দল বোধ হয় ভাবলে যে, ভোজটা কোন রকমে খেয়ে নিতে পারবে। ওরা কলরব করে বসে গেল, বউ-ঝি ছেলেরা সামনে শালপাতা বিছিয়ে দিল, লোটাভর্ত্তি করে সবাইকে জল দিলে। লুচি আর হালুয়া পাতে পাতে পরিবেশন হয়ে গেল, সবাই আনন্দে খাওয়া সুরু করলে। বউরা ডাল-ভাতের বড় বড় হাঁড়ি বের করে ভাত পরিবেশন করবার উদ্যোগ করছে এমন সময় সারা আকাশের বুক চিরে বিজলী চমকে উঠল, কড়্-কড়্ করে ভীষণ আওয়াজ, মেঘে মেঘে ঠুকাঠুকি লাগল। কি দুর্ভাগ্য, চোখের পলকে ঝম-ঝম করে মুষলধারে বৃষ্টি নেমে গেল, হঠাৎ বহু কণ্ঠের আর্ত্তনাদ শুনে সবাই এদিকে ছুটে গেলাম। হায় হায়, দেখতে পেলাম, গাঁয়ের লোকেরা তাদের এত সাধের ভোজ ছেড়ে যে যার লোটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির থেকে আশ্রয় নেবার জন্য এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করছে, আর তাদের হৈ-চৈ চিৎকার, বৃষ্টিধারা, আর রাতের অন্ধকার এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার গড়ে তুলছে! সবগুলো শালপাতা একাকার। লুচির টুকরা আর হালুয়া ঘরে সরাতে পেরেছিল, তাই বেঁচেছে কিন্তু ডাল-ভাত সব বৃষ্টির জলে জলময় হয়ে গেল।

সামান্য বিবেচনা-বুদ্ধির দোষে গরীবদের ভোজ এ ভাবে নষ্ট হল বলে আমাদেরও বড় কষ্ট হল। সব অভুক্ত লোকগুলো নানা রকম কথা বলাবলি করতে করতে অপ্রসন্ন মুখে লোটাহাতে ভিজতে ভিজতে বাড়ী চলল। ডমরু তখন গুমানিকে বাড়ী ফিরতে বলে নিজেও ঘরে চলে এল। সারা দিন খাটুনীর পর খেতে বসে এই বিপত্তি, মেজাজ চটে আছে। তার বোধ হয় ইচ্ছে ছিল যে, গুমানি বিয়েবাড়ী থেকে কিছু খাবার এনে তাকে খাইয়ে তাজা করে যাবে। কিন্তু বৃথা আশায় ডমরু বহুক্ষণ বসে রইল, গুমানির পাত্তা নেই। সে রেগে আবার বিয়েবাড়ীতে গেল, দেখতে পেল গুটি কয়েক লোক ঘরের ভেতর বসে খাচ্ছে। আর অন্য দু'টি বউর সঙ্গে গুমানি তাদের পরিবেশন করছে। দেখেই ডমরুর সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠল, রুক্ষ স্বরে "গুমানি," "গুমানি" বলে চেঁচিয়ে উঠল। তা দেখে লোকগুলো হো-হো করে হাসতে লাগল। তখন ডমরু নিজকে সামলাতে না পেরে গুমানিকে মুখ খিঁচিয়ে গালি দিতে লাগল। গুমানি বীরবিক্রমে তেড়ে এসে ডমরুকে এক ধমক লাগালে। তার শরীরের, নাক-চোখের ভঙ্গি দেখে মনে হল দরকার পড়লে ডমরুকে দু'-চারটা থাপ্পড় লাগাবে। দু'-এক জন হৈ-চৈ করে উঠল, দু'-এক জন টীকা-টিপ্পনী কাটতে লাগল, কেউ ডমরুর পক্ষ অবলম্বন করলে না, এতে ডমরুর আঁতে ঘা লাগল। তার একটু বিশেষ কারণও ছিল। সে দেখতে পেল, কন্যাপক্ষের লোকদের মধ্যে সেই লোকটিও ছিল, যার সঙ্গে গুমানির ছেলেবেলায় বিয়ের আলাপ ঠিক হয়েছিল। সে লোকটি একটু মাতব্বর গোছের ছিল পোষাক-আষাকে ও কথাবার্ত্তায়। ডমরুকে সে বেশ অবজ্ঞার চোখে দেখে একটু ব্যঙ্গ করছিল। ডমরু নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে এল।

ভোরে ডমরু এসে প্রণাম করে বললে, "মা, ছুট চাই।"

আমি বললাম, "সে কি, তুই কোথায় যাবি?"

"কুমীর শিকার করতে।"

"সে কি? তুই পাড়াগাঁয়ে থাকবি নে, জাতব্যবসা করবিনে

যদি আপনার শিশুকে নিরুদ্যম, খিটখিটে ও বিষণ্ণ মনে করেন তাহ'লে আজই তাহাকে **কুমারেশ** খাওয়ান। কারণ এইগুলি সমস্তই লিভার পীড়ার উপসর্গ এবং সময়মত যত্ন না নিলে পরে বিপদ হইতে পারে।

প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে যে **কুমারেশ** আপনার ও আপনার শিশুর উভয়েরই প্রয়োজন। কুমারেশ আপনার লিভারের দৈনন্দিন কার্য্যে সহায়তা করে ও স্বাস্থ্যকে অক্ষুন্ন রাখে।

ও, আর, সি, এল, লিঃ

সালকিয়া • হাওড়া

বলেই ত তোর শ্বশুর গুমানিকে তোর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল, এখন আবার সেই ব্যবসাতেই চলে যাচ্ছিস্‌ ?"

"এই আয়ে চলে না মা।"

"তুই চলে যাবি ত গুমানি কি করে থাকবে।"

"সে শহুরে মেয়ে সহরেই থেকে খুশী হবে, সে কি আর আমার সঙ্গে গাঁয়ে যাবে ? যদি পারি আমি একটু-আধটু সাহায্য করব।"

ডমরু চলে গেল। বেশ বেলায় গুমানি এল আলুথালু বেশে। "মা, ডমরু কোথায় ? রাতেও ঘরে যায়নি, এখন পর্য্যন্ত চা খেতে আসেনি !"

আমি বললুম, "ডমরু চলে গেছে।"

"সে কি মা, কোথায় গেল, কেন গেল ?"

আমি বললাম, "সে আমি কি জানি, সে শুধু এই বলে গেল তুই শহুরে মেয়ে, তোর পেট ভরাবার জন্তে সে কুমীর শিকার করতে চলে যাচ্ছে।"

গুমানির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, সে মাথায় হাত দিয়ে চুপ করে বসে পড়ল। গুমানির মুখে আর সেই প্রাণখোলা হাসি নেই। মুখটা ভার করে সারা দিন প্রাণপণে খাটে। সে অনেক বলে-কয়ে ডমরুর কাজে অন্তকে লাগাতে দেয়নি। নিজেই করে যাচ্ছে তার কাজ। তার বিশ্বাস, দশ-বার দিন পরই ডমরুর রাগ পড়ে যাবে। সে চলে আসবে।

কিন্তু এক মাস গেল, ছু'মাস গেল, তিন মাস গেল ডমরুর কোন পাত্তা নেই। গুমানি অস্থির হয়ে গেল, কাজে আর তার মন বসছে না। সে তবু বলে, "ডমরু চলে গেল আমার উপর রাগ করেই বোধ হয়। আমি যে সেদিন বললুম রোজগার কতই বা করিস্‌ ? সিদা লোক, তাতেই রাগ করে চলে গেছে।"

সুখে-ছুঃখে অনেক দিন কেটে গেল, এক দিন একটি গেঁয়ো লোক এসে বললে, বাঈসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই। মুখে একজোড়া মোটা গোঁফ, মাথায় লাল পাগড়ী, হাতে একটা পাকা বাঁশের লাঠি। লোকটা প্রৌঢ়, মুখে-চোখে একটু আভিজাত্যের চিহ্ন। সে এসে প্রণাম করে বললে, "বাঈসাহেব, আমি ডমরুর কাছ থেকে এসেছি।"

আমি বললুম, "ডমরু কোথায়, তুমি তার কে ?"

লোকটি বললে, আমার নাম শিওচরণ, আমি ধনগাও গ্রামের পাটিল (মণ্ডল), আমি ডমরুর মামা হই, ডমরু নর্ম্মদার তীরে মুলগাওয়ে কুমীর ধরা ব্যবসা করছে, বেশ পয়সা পাচ্ছে, সে শীগগিরই সেখানে একটুকরা জমি কিনবে, ঘর-দোর ওঠাবে। তাই বাঈসাহেব, তোমাকে প্রণাম জানিয়েছে আর এই পনেরটা টাকা পাঠিয়েছে গুমানিকে দিতে, আর গুমানিকে পাঠিয়ে দিতে বলেছে।

আমি ডমরুর খবর শুনে খুব খুশী হয়ে গুমানিকে ডেকে পাঠালাম। গুমানি এলে বললাম, "ও গুমানি, এই দেখ ডমরুর মামা এসেছে, তোকে ডমরু পনের টাকা পাঠিয়েছে আর তোকে তার কাছে বোরগাঁওয়ে চলে যেতে বলেছে। সে বেশ ছু'পয়সা রোজগার করছে, ওখানে জায়গা-জমি করে বাড়ী-ঘর করবে।"

গুমানি মাথায় একটু কাপড় টেনে মামাশ্বশুরকে প্রণাম করলে। তার পর বেশ একটু নীচু-গলায় তার আপত্তি জানালে ওখানে যেতে। আমাকে বললে, "ও-সব জায়গায় ত আমি গিয়ে থাকতে পারব না, ওটা হল ঢীমড় পল্লী, যেদিকে চাও সেদিকেই শুধু দেখবে মাছের জাল রোদে শুকুতে দিয়েছে। মাছ রোদে শুকুচ্ছে, আর চার দিকে আঁশটে গন্ধ, তার চেয়ে ডমরুকে এখানে ফিরে আসতে বলো।"

ডমরুর মামাকে চা খাইয়ে গুমানির ওখানে যেতে আপত্তি জানিয়ে বিদেয় করে দিলাম। আরও ছু'চার মাস চলে গেল, গুমানি মাঝে-মাঝে খবর পায় ডমরু খুব রোজগার করছে, জায়গা কিনে একখানা পাকা কোঠা উঠিয়েছে। দিন কয়েক বাদ গুমানি এসে কাঁদ-কাঁদ মুখে বললে, ওর কাছে খবর এসেছে যে ডমরু আবার নাকি বিয়ে করবে। পাড়ার লোকরা গুমানিকে ছি ছি করতে লাগল, তুই কোথেকে এমন শহুরে হলি যে, নদীর তীরে বোরগাঁয়ে থাকতে পারবি নে ? তোর বাপ-দাদা তিন-পুরুষ ধরে মাছ মেরে কুমীর মেরে আসছে, আর তুই কোথেকে এত নবাবজাদী এলি ? এখন কেমন হবে দেখ, সুখে থাকতে ভূতে কীলোয়।

গুমানি ছু'-তিন দিন খুব কান্নাকাটি করলে, তার পর এক দিন এসে আমার কাছে ছুটি চাইলে। আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কোথায় যাবি ?"

"কোথাও না, এই আমার মামার গাঁয়ে থেকে ঘুরে আসছি। আমার জন্ত দশ-বার দিন তুমি অপেক্ষা করো বাঈসাহেব। আর এই বুড়ীমাকে এনেছি, ওকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নিও"—বলে গুমানি প্রণাম করে বিদেয় নিলে।

একখানা ছোট্ট বইল গাড়ী, তাতে ডোরা কাপড়ের ঘের দেওয়া, গুমানি এক হাতে তার মেয়েকে ধরে অন্ত হাতে একখানা কাপড়ের ছোট পুঁটুলি নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসল, সঙ্গে গেল পাড়ার একটি বুড়ো।

সাত-আট দিন কেটে গেল গুমানির পাত্তা নেই। দিন পনের পরে আমি গুমানির আশা ছেড়ে আর এক জন লোক নিযুক্ত করবার চেষ্টায় আছি, এমন সময় বাচ্চি বাঈ বললে, "আর দুটো দিন অপেক্ষা কর মা, নিশ্চয়ই গুমানি আসবে।"

তৃতীয় দিন ভোরে উঠে দেখি ডমরু-গুমানি যুগলে কাজে হাজির, আমি ত অবাক। ডমরুর একটু সলজ্জ ভাব, গুমানির মুখে জয়ের দীপ্তি। আমি বললাম, "ডমরু কোথেকে এল, ও না আবার বিয়ে করতে যাচ্ছিল।"

বাচ্চি বাঈ বলে উঠল, "বিয়ে করবে না ছাই, বিড়াল যেমন ইঁদুর ধরে, গুমানি অমনি করে ডমরুকে ধরে নিয়ে এসেছে।"

গুমানি একগাল হেসে মুখে কাপড় টেনে পালিয়ে গেল।

পুরুষ-সিংহ

"ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই যাহার নাকে এই চটিজুতাশুদ্ধ পায়ে টক করিয়া লাথি না মারিতে পারি।" —ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রেললাইন

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

সারা দিন অসহ্য গরমে আর রোদের তাপে আমি ছটফট করি। এই গরমে যখন আবার দৈত্যটা আমার ওপর দিয়ে নাচানাচি করে চলে তখন আমার আরও অসহ্য মনে হয়। সারা দিন গরমের পর রাত্রে ঠাণ্ডার একটু আরামে থাকি। ঘুম তো নেই, কি করি। একটা কথা বলার লোকও তো নেই যে দু'দণ্ড কথা বলে শান্তি পাই। তাই তো দিন-রাত বোবার মত মুখ বুজে পড়ে থাকি। যখন একটা আধটা লোক আসে তখন তার সঙ্গে খানিকটা কথা কয়ে নিই। কিন্তু মজা এই যে, যারা আসে তারা কথা কইতে আসে না। তারা আসে তাদের কথা শেষ কোরে ছুটি নিতে। এমন বোকামি যে তারা কি কোরে করে তা আমি ভেবে পাই না। আমি নিজের জ্বালায় জ্বলে মরি আর ঐ বোকারা আসে আমার কাছে জ্বালা জুড়োতে।

—কি ভাই, কি হোয়েছে? কত দিন থেকে বেকার বসে আছ? আমার কাছে নতুন যে এসেছে তাকে জিজ্ঞাসা করি।

—প্রায় দু'বছর।

—দু'বছর ধরেই হতাশ হোয়ে গেলে?

—কি করবো, আর যে পারি না।

—এত অল্প অধীর হোলে হয়? শিশুরাষ্ট্র বোলে কি একটু মায়াও হয় না?

—কি করবো, চোখের সামনে ভাই-বোনদের কষ্ট—

—থাম, থাম, তোমাদের কাঁদুনী আর শুনতে পারি না! সেই কষ্ট দেখতে পার না আর ছুটে আস এখানে!

—এসেছি নিরুপায় হোয়ে, কি করবো বল?

এই বেকারদের সঙ্গে কথা বলতে ভালই লাগে কিন্তু যখন কাঁদুনী সুরু হয় তখন আর থাকতে পারি না। কেবল ঐ এক হাহাকারের কথা। স্বাধীন সুখী জীবনের বদলে এ কি বিড়ম্বনা! আর নিজের দুঃখও কি কম। একটু বিশ্রাম নেই, ছুটী নেই, কোন রবিবারও নেই। এমন কি নিজের ভালমন্দ চিন্তা করবার অবসরও নেই। আমি কেবলই যন্ত্র। আমাকে যে ভাবে চালাবে আমি সেই ভাবেই চলবো। এই যে এত অত্যাচার এ আমি চোখের সুমুখে দেখেও সহ্য করছি! কারণ আমি অচল। অথচ আমি যদি একটু বেঁকে দাঁড়াই তবে!

—কি হোলো ভাই, ঘুম আসছে? তা সারা দিন খাওয়া নেই? ঘুম তো আসবেই! তুমি বরং একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি ঠিক সময় তুলে দেব।

—তুলে না দিলেও ক্ষতি নেই?

—একটু ক্ষতি আছে, কাগজের আধ কলম পাতা ফাঁক থাকবে।

আমার কথায় লোকটা থেমে গেল। না থেমে ওর উপায় নেই। ওদের প্রাণে সত্যিই জ্বালা নেই। জ্বালা থাকলে কখনও আমার মত অচল স্থবিরের কাছে আসে জ্বালা জুড়োতে! যাক্, লোকটা তো চলেই যাবে, তখন দুটো কথা ওর সঙ্গে বলে নিই। কতই তো এলো-গেল। কারও মনের কথা সব শোনা যায়নি। কেউ তার দুঃখের কথা বলতে চায় না। মনের দুঃখু মনেই চেপে চলে যায়। এও ছেলেমানুষ। আবেগে হয়ত তার সব দুঃখের কাহিনীই সে বলতে পারে! এ অবস্থায় এসে মানুষ অনেক সময় অনেক কথাই বলতে পারে।

—তোমার জীবনে এই বিতৃষ্ণার কাহিনীটা আমায় বলতে পার?

—কি শুনবে? শোনবার ধৈর্য্য হবে তোমার?

—আমার ধৈর্য্যকে কি তুমি জানো? তুমি ২° বছরের জ্বালা সহ্য করতে পার না! আর আমি ইংরাজের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সুরু থেকেই সব সহ্য করছি বুঝলে?

—তবে শোন!

—বল, কি তোমার দুঃখু, আর কেনই বা তুমি এলে?

—শোন—আমার বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গের কোন একটা গ্রামে। আমার বাবার আমি এক ছেলে ও দুটি মেয়ে। আমিই সব চেয়ে বড়। স্কুলের পড়া সেরে কলেজে পড়ব মনে করলাম এমন সময় বাবার চাকরী গেল। বাবার খুব আদুরে ছেলে ছিলাম আমি। কোন দিন সত্যিই কোন অভাব বোধ করিনি। বাবা সরকারী অফিসে চাকরী করতেন এবং মাইনে পেতেন নেহাৎ কম নয়। আমি যখন স্কুলের পড়া শেষ কোরে আসছি সেই সময় ইংরাজের বিরুদ্ধে দেশে প্রবল আন্দোলন দেখা দেয়। তখন চতুর্দ্দিকে আন্দোলনের সাড়া পড়ে গিয়েছে। দেশের জেলখানা দেশের লোকে ভর্ত্তি হোতে লাগলো। এখানে-ওখানে স্বদেশী ডাকাতি হোলো। কত দেশপ্রেমিক গুলীতে প্রাণ দিলো তার ঠিক নেই। সেই সময় এই আন্দোলনে আমার বাবাও ছিলেন। আমার মা বা আত্মীয়-স্বজন অনেক দিন তাঁকে এ আন্দোলন থেকে সরে আসতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা শোনেননি! শেষে একদিন সরকারী ভাবে বাবার এই আন্দোলনে থাকা জানাজানি হোয়ে যাওয়ায় তাঁর চাকরীটি গেল। আমার
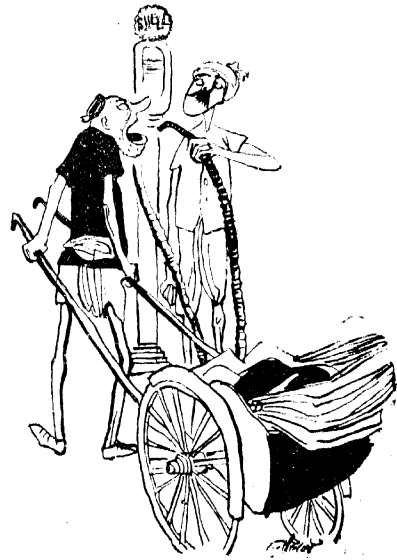
ঠিকে ভুল।

বাবাই ছিলেন সংসারের একমাত্র উপায়ক্ষম লোক। সুতরাং তাঁর চাকরী যাওয়াতে আমাদের সংসার অচল হোয়ে পড়লো। প্রথমটায় বাবাও মুষড়ে পড়েছিলেন। কিন্তু শেষে তিনি এতে আরো সক্রিয় ভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চাকুরী থাকায় তাঁর যেটুকু পিছুটান ছিলো চাকরী যাওয়াতে তাও আর থাকলো না। কত দিন পুলিশের তাড়া খেয়ে এদিক-ওদিক ঘুরলেন। শেষে কোথায় এক ব্যাঙ্ক লুট করতে গিয়ে পুলিশের গুলী খেয়ে তিনি মারা গেলেন!

—মারা গেলেন?

—হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে আমাদের আর দেখা হয়নি!

—সত্যি খুবই মর্মান্তিক ঘটনা।

—হাঁ, এর চেয়েও মর্মান্তিক ঘটনা শুনতে চাও!

—বল, কিন্তু এক দিক দিয়ে তাঁর এ মৃত্যু গৌরবের!

—গৌরবের বটে কিন্তু পেট ভরার নয়! সেদিন যে কি অবস্থায় পড়েছিলাম তা কাউকে বোঝাবার নয়। পুলিশের রাগ তখন গিয়ে আমাদের ওপরে পড়েছিলো।

—তোমাদের ওপরেও অত্যাচার চলেছে?

—চলেছে বৈ কি! কত কি ভয় দেখিয়েছে! সংসারের সমস্ত জিনিষ তচ্‌নচ্‌ কোরে ভেঙে দিনের পর দিন খানাতল্লাসী চালিয়েছে। পুলিশের অত্যাচারে বোনগুলো কেঁদেছে, চীৎকার করেছে তবু তাদের দয়া হয়নি।

—তারপর?

—তারপরও শুনতে চাও?

—বল না, তোমার ট্রেণের তো এখনও দেরী আছে!

তারপর সংসার আর চলে না। অনেক চেষ্টাতেও কোথাও কোন চাকরী পেলাম না। শেষে চাকরীর আশা ছেড়ে ফেরী আরম্ভ করলাম। কাপড়ের ছিট, প্যাণ্ট, সায়া, ব্লাউজ নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ফেরী করতে লাগলাম। বাড়ীতে বোনেরা তখন বড় হোয়ে উঠেছে তারাও কিছু-কিছু সেলাইএর কাজ শিখেছিলো। তাছাড়া বাবা বেঁচে থাকতে ওদের একটা সেলাইএর কল কিনে দিয়েছিলেন, সেইটা ছিলো আমাদের এক ভরসা। বোনেরা দিনরাত পরিশ্রম কোরে জামা, প্যাণ্ট, ব্লাউজ বানাতো আর আমি তাই ফেরী কোরে সংসার চালাতাম, এমনি কোরে সংসার চলতে লাগলো। তারপরই এমন ঘটনা সমস্ত দেশের ওপর দিয়ে ঘটে গেল যা ইতিহাস কোনদিন শোনেনি।

—কি হোলো, চুপ করলে যে?

—না, বলি।

দেশ ভাগ হোলো। আমাদের বিশ্বাসঘাতক নেতারা দীর্ঘ-দিনের যে আন্দোলন, দেশব্যাপী যে আত্মত্যাগের মূলমন্ত্র, লক্ষ লক্ষ প্রাণের যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নকে চুরমার কোরে দিয়ে চিরদিনের অখণ্ড এই দেশকে ছুরী দিয়ে কেটে দু'টুকরো কোরে ফেললেন। দেশ দু'টুকরো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কলজেও দু'টুকরো হোয়ে গেল। শুধু তাই নয় এক রাত্রে সমস্ত দেশের চেহারা পালটে গেল। যে রাম ছিলো রহিমের বন্ধু সেই রাম রহিমের শত্রু হোয়ে গেল। যে রহিম রামকে ছাড়া কোন কাজে লাগত না সেই রহিম রামকে শুধু উপেক্ষাই করলো না তাকে শাসাতে লাগলো এই বোলে যে, সে দেশের শত্রু, তার পক্ষে অন্যত্র সরে যাওয়াই মঙ্গল। শুধু এই দৃশ্য পূর্ববঙ্গেই হয়নি পশ্চিমবঙ্গেও ঐ একই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বন্ধুত্ব ছেড়ে রাতারাতি ঘুম থেকে জেগে যেন স্বপ্ন দেখে সেই বন্ধুর বুকে ছুরী তুলেছে। এমনি কোরে যে সব লোক ছিলো আমাদের পড়শী ও বন্ধু তারা কেন জানি না কোন্ মন্ত্রবলে এক রাত্রের মধ্যে শত্রু হোয়ে গেল। এরপর যতই দিন যেতে লাগলো ততই আমাদের ওপর সুরু হোল অত্যাচার হুমকি। ভয় দেখানো হোতে লাগলো আমাদের প্রায়ই। তাছাড়া মেয়েদের উদ্দেশ্যে অনেক কিছু অকথ্য আর আপত্তিজনক কথাবার্ত্তা দিনের পর দিন শুরু হোল। অবিশ্যি এই অবস্থায়ও আমাদের যথার্থ হিতৈষী ও ভাল লোকও সেখানে ছিল। ওদের মধ্যেই তারা আমাদের ওপর এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করতো এবং আমাদের আশ্বাস দিতো। কিন্তু ক্রমে ক্রমে গুণ্ডার দল এমন বেড়ে উঠলো যে ভাল লোকরাও আর কথা বলতেও পারলো না। তাদের শুদ্ধ আমাদের মত হুমকি দিয়ে শাসিয়ে দেওয়া হোলো। আমার বোনেরা তখন বড় হোয়ে উঠেছে। তাদের সুমুখেই তারা আমাদের যা-তা বলতো। রাগে সমস্ত শরীর কাঁপতো কিন্তু কিছু বলার উপায় ছিলো না। সমস্ত দেশ জুড়ে ঐ রকম অত্যাচার সুরু হোয়েছিলো। তাদের অত্যাচারে সরকারও ইন্ধন জোগাতো এবং অভিযোগ করলে কোন বিচারই তারা করতো না। এমন অবস্থায় একদিন তারা আমাদের বাড়ী এসে স্পষ্টই বললো।

—কি বললো?

—বললো, তোমাদের এখানে থাকার ইচ্ছা আছে নাকি?

—বললাম, আমরা চিরকাল এখানে রইলাম আর আজ যাব কোথায়?

—না, না, যেতে বলি না, বলি কি আমাদের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকো।

—কোনদিন তোমাদের ছাড়া আছি?

—না, না, তা বলি না, বলি কি, কাজ করতে হবে তো!

—কি কাজ?

—বলি কি, তোমার বোন দুটো আছে তো! তাদের কথাই বলছিলাম।

আমি সবই বুঝছিলাম, কিন্তু কি করবো। চুপ কোরে থাকলাম। আমাকে চুপ কোরে থাকতে দেখে তাদের সাহস বেড়ে গেল।

—বলছিলাম, আমাদের সাথেই তাদের বিয়েসাদি দাও না কেন! এখন তো আমাদেরই রাজ্য হোয়েছে!

—কি বল? আমি রুখে দাঁড়ালাম।

—হাঁ, হাঁ, যা বললাম ঠিকই, বুঝে দেখো। এই কথা বোলে ওরা দাঁত বার কোরে হাসতে হাসতে চলে গেল।

এমনি কোরে কয়েকটা দিন-রাত্রি গেল। ক্রমেই উত্তেজনা বাড়তে লাগলো। এখানে-ওখানে ২।১টা অত্যাচার সুরু হোলো। কোন কোন জায়গায় দাঙ্গা-হাঙ্গামাও চলতে লাগলো। ওরা পশ্চিমবঙ্গের জিগীর তুলে দিনের পর দিন পৈশাচিক কাণ্ড সুরু করতে লাগলো। আমাদের ওপরেও যে আক্রমণ হবে এ কথা আমরা আন্দাজ করলাম। এমনি এক অন্ধকার রাত্রে সুরু হোলো আমাদের ওপর আক্রমণ। আক্রমণকারীদের হাতে অস্ত্র। প্রথম

চোটেই তারা আমায় কাবু করলো। আমাকে মারার পর কোন সময় আমি জ্ঞান হারালাম। জ্ঞান গেলে দেখলাম পাশে মায়ের মৃতদেহটা পড়ে। সারা দাওয়ায় রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছে। গলার কাছে একটা ক্ষতচিহ্ন দেখলাম, আর দেখলাম পেটে আঘাত করার চিহ্ন স্পষ্ট। প্রাণ আছে কিনা জানবার জন্য নাকের কাছে হাত দিলাম, গায়ে হাত দিলাম, কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। সারা গা তখন ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হয়ে গিয়েছে। ঘরে গেলাম, বোনদের কাউকেই দেখতে পেলাম না। শুধু মেঝেয় এক জনের একটা ছেঁড়া ব্লাউজ দেখলাম আর এক জনের ফুটো ভাঙা কাচের চুড়ি।

—তারপর কি হোলো ?

—এর পরেও তুমি শুনতে চাও ?

তারপর অনেক কষ্টে এখানে লুকিয়ে চলে এলাম। কত জায়গা ঘুরলাম, দেশের কত মানুষের সঙ্গে দেখা হোলো কিন্তু কেউ আমার বোনেদের কথা বলতে পারলো না। অনেক রাত্রে ষ্টেশনের প্লাটফর্মে ঘুমিয়ে থাকতে থাকতে স্বপ্ন দেখলাম আমার বোনেরা যেন কাঁদছে। তারা যাবার সময় যে রকম কেঁদেছিলো আমাকে ডেকে, যেন ঠিক সেই কান্না শুনতে পেতাম স্বপ্নে। ঘুম ভাঙলে দেখতাম কেউ তো কোথাও নেই। সময় সময় মনে হয়, তারা বোধ হয় এখনও আমার অপেক্ষায় আছে। যেখানেই তারা থাক তারা অন্ততঃ বন্ধ জানালার কঠিন পাহারার ফাঁক দিয়েও রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে আমি আসছি কিনা দেখবার জন্য। হয়ত সারা জীবনই তারা তাকিয়ে থাকবে রাস্তার দিকে তাদের দাদার জন্য।

—তারপর তাদের আর পেলে না ?

—না, তারা কোথায় হারিয়ে গেল চিরকালের জন্য।

—এর জন্য যারা দায়ী তাদের চেনো ?

—চিনি, তারা কতকগুলো স্বার্থপর, ক্ষমতালোভী মীরজাফর!

—তুমি মরলে তাদের কোনো ক্ষতি হবে ?

—না।

—তবে তোমার মরে লাভ! এ মৃত্যু তো কাপুরুষের মৃত্যু। এত অত্যাচার সহ্য কোরে তার জবাব দেবে না? সমস্ত দেশে তোমার মত শত শত অত্যাচারিত যারা তারা, কয়েক জনের ভয়ে শুধু আত্মহত্যা করবে? ওই অত্যাচার চালিয়েও তারাই বেঁচে থাকবে আর তোমরা আত্মহত্যা কোরে তাদের অত্যাচার চালাবার পথকে আরো পরিষ্কার কোরে দিয়ে যাবে? জীবন কি শুধু নিজের জন্যই।

—তবে কি করবো ?

—মরবে? তবে রামেশ্বর-লতিকা-বকুলের মত মর না কেন! তেলেঙ্গানা, কাকদ্বীপ, কুচবিহারের পথের মৃত্যু কি কাম্য নয়? দেখেছো জীবনের দাবীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম সেদিন। শুনেছো সেই ভুখা মিছিলের কথা যেখানে সাত বছরের শিশু বুক পেতে দেয় বুলেটের সামনে। শুনেছো বৌবাজার, ডালহৌসী, উত্তরপাড়া, সালেম জেলের খবর। যদি মরতে চাও যাও ঐ মিছিলে মিশে। যদি মরতে চাও সংগ্রাম কোরে মর। এই আমার কথা। আমি মানুষ নই। আমি রেললাইন। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের লাল রক্তের নোনতা স্বাদেই যে আমার জন্ম!

দুমুঠো সময়

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

সেদিন তো মনে হ'লো পৃথিবীর কী এক বিস্ময়
তোমার দু'চোখে যেন ছেয়ে আছে;
সময়ের ঘর থেকে চুরি করা দুমুঠো সময়
খঞ্জনা পাখির মত পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে নাচে।
তাই বুঝি আকাশের কচি রোদে কেমন মদির
নেশা লাগে, ঘাসে-ঢাকা চর জাগে দুরন্ত নদীর
বুকে গাঢ় মমতায়, ভাবনার থরো থরো শাখে
কথার রক্তিম কুঁড়ি ফোটে কোন পাখিনীর ডাকে।

আমি তাই ফাঁদ পেতে যৌবনের জাদুটুকু দিয়ে,
যতো বার গিয়েছি এগিয়ে,
ততো বার ভীরু ভীরু ছোট সেই পাখিনীর ডানা
আচমকা খুঁজেছে ফের পলাতকা বনের ঠিকানা
শিকারীর হাত থেকে উড়ে গিয়ে ভোরের আলোয়
অবশেষে হয়েছে নির্ভয়।
সেই বাধা ক্রমে ক্রমে ব্যবধানে গড়ে সে-অবধি
দুই কূল ভাঙা এক খরস্রোতা নদী!
আলো-রঙ মুছে এলে, সেদিনের মনের জানলায়
সে বিস্ময় ম্লান হয়ে যায়!

ঝরে পড়ে কৃষ্ণচূড়া, পাতা-ঝরা মহানগরের
চৌমাথার মোড়ে মোড়ে ধুলো ওড়ে;
খর বৈশাখের
তৃতীয় নয়নে বুঝি এ-বসন্ত দগ্ধ হবে ফের!
তার আগে জীবনের এখনো যেটুকু
আছে পুঁজি
সর্বস্ব পণ করে জমে-ওঠা স্তূপ ঠেলে খুঁজি
ক্লান্ত হাতে আজো সে বিস্ময়;
সময়ের ঘর থেকে চুরি করা সেদিনের
দুমুঠো সময়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

২১

গ্রামের বাংলো থেকে রোজ তাসকেন্ট সহরে দু'বার যাতায়াত করছি। কিণ্ডারগার্টেন, ম্যুজিয়ম, রাষ্ট্রের বৃহৎ গ্রন্থাগার, পাঠভবন দেখে মনে হচ্ছে, এ এশিয়ার অনগ্রসর দেশ নয়, আধুনিক বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি এর সর্বাঙ্গে ঝলমল করছে। এই বৃহৎ সহরের চারদিকে বহু শিল্পকেন্দ্র রয়েছে। তুলোর দেশ বলে কয়েকটি কাপড়ের কল আছে। একটি বৃহৎ কাপড়ের কল দেখলাম, নাম "টেক্সটাইল কম্বাইন"। বোম্বাই বা আমেদাবাদের আট-দশটা কারখানা একত্র করলেও এর সমান হবে না। সাদা, রঙীন এবং নক্সাদার ছিট তৈরী হচ্ছে। সমস্ত মধ্য-এশিয়ার কাপড়ের চাহিদা এখান থেকেই জোগান দেওয়া হয়। ১৯৩৪ সালে এর পত্তন হয়, ১৯৪১ সালে তিন গুণ হয়েছে। আরো বাড়ানো হচ্ছে। দুই বর্গ-মাইল কারখানা,—ফুলের বাগান, সারিবদ্ধ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়ে পথ। সূতো তৈরীর কলের টাকু, তাঁত, ছিট ছাপবার রোটারী যন্ত্র সবই লেনিনগ্রাদ কারখানার তৈরী। এখানে উন্নত ধরণের ২৪টি তাঁতের তদারক করে একজন শ্রমিক। ৪৮খানা তাঁত একা দেখেন, এমন কয়েক জন ষ্টাকানোভাইট শ্রমিক দেখলাম। সমস্ত কারখানাটা ঘুরে দেখতে চার ঘণ্টা সময় লাগলো। সর্বত্র যেমন, এখানেও তেমনি কারখানা সংলগ্ন স্কুল, হাসপাতাল, প্রসূতিভবন, বিশ্রামাগার, সংস্কৃতিকেন্দ্র রয়েছে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, আনন্দ ও শিক্ষার ব্যবস্থা, স্তালিনগ্রাদের মতই।

বিকেলে একটা বৃহৎ সাধারণ উদ্যান দেখলাম। নাম গর্কী উদ্যান। এখানে সিনেমা, নাচঘর, পাঠাগার, বক্তৃতার হল প্রভৃতি রয়েছে। ছেলেমেয়েদের খেলাধূলার কত সাজ-সরঞ্জাম। এমন প্রমোদ উদ্যান তাসকেন্টে অনেক আছে। একটি উদ্যানে একশ' বিঘা জমির উপর কৃত্রিম হ্রদ। তার চারদিকে স্নান ও সাঁতার কাটবার ব্যবস্থা, ডিঙ্গী নৌকায় ছেলেমেয়েরা বাইচ খেলছে। ছোট্ট একখানা ষ্টীমারও রয়েছে হ্রদের মধ্যে বেড়াবার। চারিদিকে উপবন —খাবারের দোকান।

বাগান থেকে আমরা তাসকেন্টের নবনির্মিত নাট্যশালায় এলাম। চারতলা বিশাল ভবন, প্রেক্ষাগৃহে স্তরে স্তরে প্রায় দু'হাজার বসবার আসন। তিনতলায় সাতটি বড় বড় হলঘর। শ্বেত কৃষ্ণ নীল পীত নানা রংএর মর্মর পাথরের সূক্ষ্ম কারুকার্যে প্রাচীন শিল্পকলা অনুসরণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটির গঠনপ্রণালী স্বতন্ত্র—খিবা, বোখারা, সমরখন্দ, ফারগানা, তাসকেন্টের বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। বিশ বছর পূর্বে এদের নাটক, অভিনয়, নাট্যশালার কোন অস্তিত্ব ছিল না। এখন বহু নর্তকী ও গায়িকার খ্যাতি সমগ্র সোবিয়েত রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। বিখ্যাত লোক-নটি তামারা খানুমের কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখানে বিখ্যাত ও স্তালিন পুরস্কারের অধিকারিণী শ্রীমতী গালিয়া ইসমাইলোভা ও মুকারম তুর্গুনবায়েভার নৃত্য দেখলাম। ভারতীয় নর্তকীদের সঙ্গে এঁদের ভঙ্গীর সাদৃশ্য বিস্ময়কর। বাহুবল্লরীর লীলায়িত সঞ্চালন, আঙুলের মুদ্রা, গ্রীবাভঙ্গী, তালে তালে লঘু পদক্ষেপ, চঞ্চল চোখের চটুলতা—বার বার দেশের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। এই নৃত্য অসংস্কৃত ভাবে আবদ্ধ ছিল, বাদশা, সুলতানদের হারেমে বাঁদীদের মধ্যে, আজ শিক্ষিতা তরুণীরা তাকে জনগণের রসবোধ পরিতৃপ্ত করবার ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছেন।

এই জাতীয় নাট্যশালায় ৬২১ জন নর্তক নর্তকী অভিনেতা আছেন। আমরা যখন প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করলাম তখন সমগ্র জনতা দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। ভারতের নরনারী এই তাঁরা প্রথম দেখলেন। বলশেভিক বিপ্লবের গোড়ার দিকে স্ত্রী-স্বাধীনতা, 'পাঞ্জারা' বা বোরখা ও মোল্লাদের অনুশাসন বর্জন নিয়ে একটি তিন অঙ্কের গীতি-নাট্যের অভিনয় হল। নাটকের বিষয়বস্তু হল এক আধুনিক যুবক তার স্ত্রীকে পর্দার বাইরে এনেছে, সংবাদ পেয়ে মেয়ের বাপ চটে লাল! মোল্লারা বিচার করে বিবাহ-বিচ্ছেদের ফতোয়া দিলেন, বাবা মেয়েকে বাড়ীতে নিয়ে এলেন। সুন্দরী যুবতী—মোল্লাদের আনাগোনা চলে। এক বুড়ো মোল্লার সঙ্গে আবার সাদীর ষড়যন্ত্র চলছে, মায়ের আপত্তি, বাপ কান দেন না। এদিকে প্রতিবেশিনী মেয়েরাও চঞ্চল হয়ে উঠেছে, অন্দরমহলে প্রবেশ করেছে বিপ্লবের ঝড়ো হাওয়া। তারা ওর স্বামীর খবর আনে, উৎসাহ দেয়। গোঁড়া মুসলমান বাপ একদিন মোল্লাদের প্ররোচনায় স্ত্রীকে শাসন করতে গিয়ে খুন করে বসলো। মেয়ে আর সহ্য করতে পারলো না,—পাঞ্জারা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো, তার করুণ সঙ্গীতে প্রতিবেশিনী যুবতীরাও বোরখা-মেধ যজ্ঞে যোগ দিল। মিলনান্তক পরিসমাপ্তি! নাটকে গোঁড়া মোল্লাদের যে ভাবে বিদ্রূপ করা হল, তা' দেখে

দর্শকরা করতালি দিয়ে হেসেই কুটিপাটি, আমাদের দেশে এমন নাটকের অভিনয় কল্পনাও করা যায় না, হলে রক্তারক্তি কাণ্ড বেধে যেতো।

সমাজতান্ত্রিক নব জাতীয়তাবাদের প্রভাবে ধর্মবিধির অন্ধ অনুবর্তনা রাশিয়ার কোথাও নেই। শুনেছি, বিপ্লবের গোড়ার দিকে ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত সমাজ-জীবনের আড়ষ্টতার বিরুদ্ধে তরুণেরা বিদ্রোহ করেছিল। এখন ধর্মাচরণের স্বাধীনতা সকলে মেনে নিয়েছে। পাদ্রী, পুরোহিত, মোল্লারা এখনও গীর্জা-মসজিদ আগলে বসে আছেন, বুড়ো-বুড়িরা মাঝে মাঝে সেখানে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে যায়। কেউ ফিরেও চায় না। মনে আছে, প্রাগের হাপসবুর্গবংশীয় সম্রাটদের আমলের সুবৃহৎ প্রাচীন গীর্জায় কয়েক জন খৃষ্টীয় সাধুকে দেখে এক চেক যুবককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তোমরা তো গীর্জায় যাও না, তাহলে এঁরা কি করেন? যুবক হেসে উত্তর দিয়েছিল, They pray for themselves"—ওঁরা নিজেদের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করেন।

২২

ওরা আগষ্ট শুক্রবার। তাসকেণ্ট সহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে কাগানোভিচ কৃষিক্ষেত্রে চলেছি। সহর ছাড়িয়ে, পাকা পীচ-ঢালা রাস্তা, দু'ধারে গ্রাম, ক্ষেতে ভুট্টা আর গম চোখে পড়ল, আর দেখছি কাটা খালের মধ্যে জলস্রোত। দূরে অনতিউচ্চ শৈলমালার কোলে বহুকাল পতিত জমি জল পেয়ে সজীব ও সবুজ হয়ে উঠেছে। অবশ্য আমরা যে অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছি সেটা মরুভূমি নয়—তবু মধ্য এশিয়ার 'কারাকুম' বা কালো বালির মরু বিশাল স্থান জুড়ে আছে। এই মরু অচল নয়, সে তার শুষ্ক তৃষার্ত রসনা দিয়ে লেহন করে সরস মাটিকেও গ্রাস করে। প্রকৃতির এই খেয়াল চলেছে চিরকাল ধরে। মানুষের অবুদ্ধি গাছপালা অরণ্য নষ্ট করে মরুভূমিকে আমন্ত্রণ করেছে ঘরের দিকে। দিগ্বিজয়ীরাও প্রতিপক্ষের দুর্গনগরী অবরোধ করবার জন্য, জলের স্বাভাবিক ও হাতে তৈরী নহর ভেঙ্গে দিয়ে শত্রুকে কাবু করেছে, ফলে বহু নগর-জনপদ বালুকা-সমাধি লাভ করেছে।

বিপ্লবের পর থেকেই সোবিয়েত বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি পড়লো এই বিশাল মরুর ওপর। এদের প্রত্যেক পঞ্চবার্ষিকী সঙ্কল্পের মধ্যে মরুজয়ের সাধনা একটা মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। শুনলাম, কারাকুমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আমুদরিয়ার জলধারা নিয়ন্ত্রিত করার কাজে হাত দেয়া হয়েছে। এই নদী প্রথমে উত্তর-পশ্চিম খাতে চলতে চলতে বোখারার কাছে এসে খাড়া উত্তরমুখো হয়ে আজব সাগরে পড়েছে। পাঁচশ' বছর আগে পশ্চিমমুখো গিয়ে কাস্পিয়ান সাগরে পড়তো—তার শুকনো খাদ এখনও রয়েছে। নদীকে আবার যদি এই খাতে আনা যায়, তাহলে কাস্পিয়ান সাগরের উন্নতি হবে, আর বিস্তীর্ণ অঞ্চল শস্যশালিনী হয়ে উঠবে। এই সংকল্পের ফল তুর্কোমান কেনাল—৫০০।৬০০ মাইল লম্বা, শেষ হবে ১৯৫৬ সালে। আমি যেমন সহজে লিখছি, ব্যাপারটা অত সোজা নয়। মাটির উঁচু-নীচু, চার পাশের ঘাস, লতা-পাতা গাছ, বৃষ্টির জলের ঢলের স্বাভাবিক গতি প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা করে তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে, বাঁধ দিয়ে জলকে উঁচু করে নূতন খাতে বইয়ে দেওয়া হবে, তার মাঝে মাঝে বসবে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। গড়ে উঠবে নূতন জনপদ ও নগরী।

গাছের ঘন প্রাচীর দিয়ে খালগুলি রক্ষা করার ব্যবস্থা পথে যেতে যেতে দেখলাম—খালের ধারে নূতন বসতিও চোখে পড়লো। অসমতল উষর মাটির ঢেউএর নামি, কোলে কাপাসের ক্ষেত—গমের চাষ, ফলের বাগানও আছে। এইবার আমাদের গাড়ী বড় সড়ক ছেড়ে মেঠো রাস্তায় পড়লো—যেমন রৌদ্রের তাপ, তেমনি ধূলো। "ধূলায় ধূসর নন্দকিশোর" হয়ে আমরা গ্রামে প্রবেশ করলাম। পথের ওপর অপেক্ষা করছিল তরুণ-তরুণীরা—শিঙে বাজিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করা হল। তারপর সুরু হলো নৃত্যগীত। উৎসব-ভূষণে সজ্জিতা তরুণীদের লোকসঙ্গীত ও নৃত্যে ভারতীয় সাদৃশ্য প্রচুর। গ্রামের প্রধান মোড়ল এবং তাঁর সহকারীরা আমাদের নিয়ে সমিতির আপিসে বসালেন।

এই গ্রামে ৬৪০টি পরিবার, জনসংখ্যা তিন হাজার। জমির পরিমাণ ২৩৪০ হেক্তার (১ হেক্তার—২'৪৭ একর)। প্রধান ফসল তুলো, গম, ভুট্টা ও ধান; এ ছাড়া আঙুর, পীয়ার, আপেল, পীচ প্রভৃতি ফলের বাগান আছে। ১৯২৯ সালে এর পত্তন

তাসকেণ্ট রঙ্গমঞ্চে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সম্বর্দ্ধনা

হয়েছিল। ক্রমে খালের জল আর আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় সার দিয়ে চাষের প্রবর্তন হওয়ায়, জমির ফলন তিন গুণ চার গুণ বেড়েছে। বাড়তি আয় থেকে শিশুপালনাগার, কিণ্ডারগার্টেন, স্কুল, হাসপাতাল, সংস্কৃতিভবন নির্মিত হয়েছে।

জর্জিয়ার জুগদিদি সমবায় কৃষিক্ষেত্রের অধিবাসীদের স্বচ্ছলতার সঙ্গে এদের তুলনা হয় না, তবু মোটামুটি স্বচ্ছল। যারা মাটির দেয়াল-ঘেরা গর্তে বাস করতো, তেল কেনবার পয়সার অভাবে যাদের ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলতো না, সন্ধ্যার আগেই খাওয়া-দাওয়ার পাঠ চুকিয়ে নিতে হত; তাদের আজ পাকা ভিতের ওপর চওড়া রাস্তার দু'ধারে বাড়ী—বাড়ীর সামনে ফুলের বাগান, উঠানে মাচার ওপর দ্রাক্ষাকুঞ্জ, থলো-থলো আঙুর ফলে আছে। আমরা হাতের নাগাল পাওয়া সরস আঙুর সত্য তুলে খেলাম। এই আঙুর শুকিয়ে কিসমিস, মনাক্কা হয়; বেশীর ভাগ দিয়ে সুমিষ্ট স্বল্প সুরাসার-যুক্ত মদ তৈরী হয়; বড় বড় জালায় এই মদ রাখা হয় সম্বৎসরের পানীয়। গ্রামের পথে ও বাড়ীতে বিজলী আলো—কোন কোন কৃষকের বাড়ীতে রেডিয়ো ও বিজলীর রান্না করবার উনান আছে।

গ্রামের কেন্দ্রস্থলে প্রমোদভবন, সমবায় দোকান ও শস্য-ভাণ্ডার। পাশে একটা নূতন সংস্কৃতিভবন তৈরী হচ্ছে। দোকানে রেশম, পশম ও সুতি কাপড়, নানা রকমের মনোহারী ও প্রসাধন দ্রব্য, তৈজসপত্র রয়েছে। ফরাসী সুগন্ধিও আছে। কৃষকদের স্বচ্ছলতা ও ক্রয়-ক্ষমতার আভাস পাওয়া গেল। আমাদের দেশের শতকরা নব্বই জন কৃষক-পরিবার যে সব জিনিষ কিনবার কল্পনাও করতে পারে না, এরা তা নিত্য ব্যবহার করে। এদের সমবায় গোলায় সঞ্চিত গমের রাশি দেখে অবাক হলাম। গোলার কর্তা বল্লেন, প্রত্যেক পরিবার গড়ে দু'টন শস্য বছরে পায়। অনেকেই পুরোটা নেয় না, তাই এত বাড়তি শস্য জমে গেছে। এই বাড়তি গম হিসেব করে আমরা সহরের শ্রমিক ইউনিয়নের কাছে বেচে দেই। এই সমবায় কৃষিক্ষেত্রে গুটি পোকার চাষের প্রচলন আছে—কুটীরশিল্প হিসেবে উৎকৃষ্ট রেশমী বস্ত্র তৈরী হয়।

গ্রামপরিক্রমার সময় লক্ষ্য করলাম, এরা সকলেই উজবেক নয়। তাজিক, কাজাক, তুর্কোমান এমন কি কয়েক ঘর রুশ কৃষকও আছে। এদের গোষ্ঠীগত আচারপ্রথা ও বসনভূষণের বৈশিষ্ট্য দেখলেই বোঝা যায়। গ্রামের পূব দিকে উদ্যান—তার একদিকে একটা ছোটখাটো বাড়ীতে পুস্তকাগার ও খেলাধূলার সরঞ্জাম। একটু দূরে তার পাশে চেনার গাছের সার দেওয়া খালে কল্-কল্ করে জল চলেছে তুলোর ক্ষেতে। খালের ধারে বিরাট ভোজ-সভা বসলো। গ্রামের মাতব্বর নরনারীরা এসেছেন। প্রাচ্যের আতিথেয়তার অজস্রতা—ঘরে তৈরী ছয়-সাত রকম সুমিষ্ট সুরা। এমন সময় গ্রামের যুবক-যুবতীরা এসে নৃত্যগীত জুড়ে দিলেন। ভোজ সমাপ্ত হলে কৃষিক্ষেত্রের অধ্যক্ষ আমাদের উজবেক পোষাক উপহার দিলেন। আমাদের উজবেকী পোষাক পরিয়ে যুবতীরা নাচবার জন্য সাধাসাধি সুরু করলো। শেষ পর্যন্ত লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে এক প্রকার ভালুক নাচ নেচে অব্যাহতি পাই।

বেলা গড়িয়ে এসেছে, আমরা তুলোর ক্ষেত, ট্রাক্টর ও কৃষিযন্ত্র-পাতির ঘর, অশ্বশালা ও গোশালা দেখে অধ্যক্ষের বাড়ীতে গেলাম। আবার ভোজ-সভা বস্লো। তিনি পুরনো দিনের এবং কৃষিক্ষেত্রের ক্রমোন্নতির ইতিহাস শোনালেন। এঁর বয়স ষাটের কোঠা পেরিয়ে গেছে; দীর্ঘ সমুন্নত বলিষ্ঠ দেহ, কর্মী পুরুষ। বলতে লাগলেন, আমি আর দশজনের মতই ছিলাম ভূমিদাস। আমাদের এই গ্রামে ছিল আশী-নব্বই ঘর চাষী, দু'জন জোতদারের ছিল জমি, আমরা ছিলাম ভাগচাষী বা ভূমিদাস। প্রথম মহাযুদ্ধে জারের সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে গ্রাম ছাড়লাম, আকর্ষণেরই বা ছিল কি! বলশেভিক বিপ্লবের বার্তা নিয়ে আমরা পাঁচ বন্ধু "পার্টিজান" সৈন্য হয়ে গ্রামে ফিরে এলাম। স্থান হল না, মোল্লারা জোতদারের সঙ্গে যোগ দিয়ে লোক ক্ষেপাতে লাগলো—আমরা বনে-জঙ্গলে থেকে সহৃদয় কিষাণদের সহায়তায় দল গড়তে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত প্রতিবিপ্লবীদের হটতে হল। এরা যে কত দুঃখ পেয়েছে, না বোঝার ফলে কত ভুল করেছে, সে সব স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। লজ্জা হল লোকসাধারণের জীবনযাত্রা উন্নত করবার জন্য আমরা কি করেছি? কেবল বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখে যখন আমরা দিনগত পাপ ক্ষয় করেছি, এরা দু'খানা পোড়া রুটি খেয়ে সমবায় কৃষিক্ষেত্র গড়েছে, খাল কেটে এনেছে জল। উর্বর করেছে শুকনো মাটি। তারপর এলো বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদ্যায় সুপটু ওস্তাদেরা,—এলো ট্রাকটর, এলো শস্য ও তুলোঝাড়াই কল! বহু বছরের অচলায়তন কৃষক-জীবনের ধারাই আগাগোড়া বদলে গেল। আজ এরা রাষ্ট্রের দাক্ষিণ্যের দ্বারে প্রার্থী নয়; এরা কৃতী, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পাকা করে পেয়েছে বীরের আসন। আমাদের দেশে দেখি আরাম ঐশ্বর্য লাভের নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা আর এখানে দেখলাম, উৎপন্ন খাদ্য ও সম্পদ সকলের মধ্যে বণ্টনের সহৃদয় সহযোগিতা।

২৩

৪ঠা আগষ্ট শনিবার। অশ্রান্ত ভ্রমণে ক্লান্ত দেহ-মন, তবুও সমরখন্দের নাম শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। মধ্যযুগের রাজ্য, সাম্রাজ্য ও বাণিজ্যের কেন্দ্র সমরখন্দের খ্যাতি ও ঐশ্বর্য রূপকথার মত সমগ্র এশিয়া ও ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতের সঙ্গে সমরখন্দের নানা দিক দিয়ে সম্বন্ধ ছিল। একদিন যেমন তক্ষশীলা এশিয়ার জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার কেন্দ্র ছিল, মধ্যযুগে সমরখন্দ সেই স্থান অধিকার করেছিল। মুসলিম নরপতিরা চিরদিনই জ্ঞানচর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন, জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁরা ধর্মের গোঁড়ামী দেখাতেন না। বোগদাদ, ডামাস্কাসে শাসকেরা ইহুদী, খৃষ্টান পণ্ডিতদেরও সমাদর করতেন। তিমুর তাঁর রাজধানীতে সব জাতির বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এখানে আরব, ইরাণী, ইহুদী, খৃষ্টান ও চৈনিক বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন, চিকিৎসা, সাহিত্য, দর্শনের অধ্যাপনা করতেন। উত্তর ভারত থেকে বহু ছাত্র সমরখন্দে অধ্যয়ন করতে যেতো। এ ছাড়া সমরখন্দ মধ্য-এশিয়ায় শিল্প-বাণিজ্যের এক বৃহৎ কেন্দ্র ছিল। গালিচা, পশমী পোষাক, পশুচর্ম ও পশম, রেশম, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি ভারতে আমদানী হত। ইতিহাস ও মধ্যযুগীয় ভ্রমণকারীদের বিবরণ পাঠ করে সমরখন্দের কীর্তিত রূপের যে মোহময় মূর্তি মনের মধ্যে গড়ে তুলেছিলাম, বাস্তবের সংঘাতে তা খান-খান হয়ে ভেঙ্গে গেল। বিগতবৈভবা মথুরাপুরীর মতই এখানে কেবল স্মৃতি ও কিছু নিদর্শন রয়েছে। মধ্যযুগের ঐশ্বর্য ও বিলাস, দাক্ষিণ্য ও

দস্যুবৃত্তি, প্রেম ও ঈর্ষা, হিংসা ও হত্যা, এ সব পেছনে ফেলে স্বেচ্ছাচারী রাজ-মহিমাকে কবরে চিরপ্রসুপ্ত রেখে সমরখন্দ আধুনিক যুগে চলে এসেছে।

প্রতপ্ত মধ্যাহ্নে তাসকেণ্ট থেকে বিমানে চলেছি দক্ষিণ-পূব দিকে। দূরে বরফে ঢাকা তিয়েনসিন পর্বতমালা, নিচে অনতিউচ্চ শৈলশ্রেণীর কোলে সবুজ ক্ষেত—ছোট-বড় কাটা খালের জলে উর্বর হয়ে উঠেছে। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই বিমানঘাঁটিতে আসা গেল। অসহ্য গরম—যেন মে মাসের দিল্লী। প্রতীক্ষমান মোটরে সহরের দিকে চলেছি, মাঝে মাঝে পুরাতন পরিত্যক্ত কবরখানা, ভাঙ্গা মসজিদ পুরোনো দিনের স্মৃতির সাক্ষ্য—কোথাও বা উঁচু বালিয়াড়ী; বায়ুচালিত মরুবালুকা দিয়ে প্রকৃতি কত কাল ধরে এই সব নবল পাহাড় তৈরী করে চলেছেন, কে জানে। সহর দক্ষিণে রেখে এক জায়গায় এসে মোটর থামলো। সামনেই সরাইখানা, পাশে শীতল সুপেয় নির্মল জলধারায় বয়ে চলেছে গিরি-নির্ঝর। গাছতলায় সাধারণ টেবিল-চেয়ার। সরাইএর একটি বালক জল এনে দিল। তারপর কেটে দিল সমরখন্দের বিখ্যাত খরমুজা। এই ফলটা তাসকেণ্টেও খেয়েছি। কিন্তু এ যে খোদ সমরখন্দের। সম্রাট জাহাঙ্গীর উটের পিঠে করে চামড়ায় মশকে বরফচাপা দিয়ে এই ফল কাশ্মীরে নিয়ে যেতেন। সম্রাটের রসনা-বিলাসের তারিফ করে টুকরো টুকরো খরমুজা মুখে দিলাম। বরফের মত শীতল, সুস্বাদু এবং মনোরম সুগন্ধ। সম্রাটভোগ্য ফলই বটে!

অনতিদূরে উলুক বেগের ১৫শ শতাব্দীর মানমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। সোবিয়েত আমলে এর কিছুটা সংস্কার ও রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। দেখবার মত বিশেষ কিছু নেই। এর পর আমরা দিগ্বিজয়ী তিমুরের প্রাসাদদুর্গের সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম। একটা উঁচু স্থানের ওপর তৈরী স্তরে স্তরে উঠে গেছে। সম্মুখে তোরণদ্বার—সকলের ওপরে নীল রংএর টালিতে ছাওয়া বৃহৎ ডোম। ভিতরে বাসের মহল, তিমুরের স্ত্রী ও দাসীদের কবর, একটা মসজিদ, সেখানে প্রার্থনাবেদী এবং তিমুরের কোরান রয়েছে। সবটা মিলে বিশাল, কিন্তু না আছে শ্রী, না আছে কোন ছাঁদ। তারও অধিকাংশ ভগ্নস্তূপ। দিল্লী বা আগরার মুঘল স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষের তুলনায়, চেহারার মিল থাকলেও, সূক্ষ্ম কারুকার্যের রুচিবোধ নেই. কোন প্ল্যান তো নেই-ই। সম্রাটের খেয়ালে খাপছাড়া ভাবে তৈরী হয়েছে অগণিত দাসের অস্থি-মজ্জা-বসা-অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাস দিয়ে। যিনি জয় ও পরকীর্তি ধ্বংসের নেশায় দেশদেশান্তরে উল্কাবেগে ঘুরে বেড়িয়েছেন, জীবনটাই কাটিয়ে দিয়েছেন তাঁবুতে, তাঁর নিশ্চিন্তে প্রাসাদপুরীতে স্বর্ণসিংহাসনে বসে রাজ-মহিমা নিশ্চিন্তে উপভোগ করার সময় কোথায়? ভিতরের মসজিদ বা প্রার্থনা-ঘরে কারুকার্য বিশেষ কিছুই নেই, মলিন গালিচা পাতা রয়েছে। এক কোণে দু'জন ইমাম বসে আছেন বিষণ্ণ মুখে। বোঝা গেল, প্রার্থনার সময় আজানের ডাক শুনে বিশ্বাসী ভক্তেরা আজ আর আসে না। আমি ইঙ্গিত করতে এক জন উঠে এলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, এই কোরান স্পর্শ করতে পারি। অনুমতি দিলেন। সাদা তুলোট কাগজে বড় বড় কালো হরফে লেখা—ভারতের বা ইরাণের মধ্যযুগীয় কোরানগ্রন্থের মত নানা রংএর কারুকার্য নেই। দেখা শেষ করে বললাম, আমি হিন্দুস্থান থেকে এসেছি। শুনে খুশীতে তাঁর জরাকুঞ্চিত মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বাঁ হাতে আমার হাত ধরে, ডান হাত তুলে, ঈশ্বরের নামে আমায় আশীর্বাদ করলেন। মনে পড়ে গেল, দিল্লীর জুম্মা মসজিদের বৃদ্ধ ইমামের মুখখানি, তাঁরও স্তিমিত দৃষ্টিতে দেখেছিলাম অতীত দিনের স্বপ্নের ছায়া। ওঁর হাতে কয়েক রুবল গুঁজে দিলাম, বিহ্বল হয়ে আমার মুখের দিকে চাইলেন।

সহরের কেন্দ্রস্থলে তিমুরের বিশাল মসজিদ ভূমিকম্পে তিন-চতুর্থাংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। ফতেপুর সিক্রীর মত বৃহৎ খিলান দেওয়া তোরণটি কোনমতে খাড়া আছে। পশ্চিম দিকের অংশটা নানা ভঙ্গীতে ভেঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, যে কোন মুহূর্তে ধ্বসে পড়তে পারে, কাছে যাওয়া বারণ। এর সংস্কার বা পুনর্গঠন অসম্ভব।

অনতিদূরে তিমুরের পৌত্রের তৈরী মসজিদ ও মক্তব। এর মিনার চারটি খাড়া আছে। উত্তর ও দক্ষিণের তোরণদ্বার ও মুসাফিরখানা মেরামত হচ্ছে, পশ্চিম দিকের প্রাচীন বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস অনেকটা অক্ষত। সোবিয়েত গভর্ণমেণ্ট বহু অর্থব্যয়ে এর সংস্কার করছেন।

তিমুরের সমাধিসৌধ। খুব বড় নয়; ভেঙ্গে শ্রীহীন হয়ে গিয়েছিল। গম্বুজের নীল টালি বসান শেষ হয়েছে। আগাগোড়া সংস্কার চলেছে। ঐতিহাসিক স্মৃতিরক্ষায় কাজে সোবিয়েত গভর্ণমেণ্টের কার্পণ্য নেই। দেখলেই বোঝা যায়, ইরাণী স্থাপত্য-

রীতিতে সমাধিসৌধ তৈরী হয়েছিল। নীচের তলায় তিমুর-বংশের তিন পুরুষের বংশধর ও তাঁদের পত্নীদের কবর। দোতলায় কেন্দ্রস্থলে কৃষ্ণমর্মরে তৈরী হাত তিনেক উঁচু চতুষ্কোণ তিমুরের সমাধি, তার দু'পাশে উলুক' বেগ এবং তাঁর আর এক প্রিয়পুত্রের সমাধি। শিয়রে তিমুরের ধর্মগুরু পীরের সমাধি। লক্ষ লক্ষ ছিন্ন নরমুণ্ডের ওপর যাঁর জয়কেতন উড়তো—বিদ্রোহীর তরবারীর আঘাতে তাঁর মস্তকও মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। তিমুরের সমাধি থেকে কঙ্কাল তুলে দেখা গেছে, দেহ থেকে তার মস্তক বিচ্ছিন্ন। কঙ্কাল পুনরায় সমাহিত করা হয়েছে। কঙ্কাল দেখে জীবদেহ গঠনে কৌশলী সোবিয়েত বিজ্ঞানীরা তিমুরের এক পূর্ণাবয়ব মূর্তি তৈরী করেছেন। ম্যুজিয়মে সেই মূর্তিটা রয়েছে। তিনি খঞ্জ ছিলেন বটে, কিন্তু লম্বায় তাঁর ছ' ফুটের ওপর বলিষ্ঠ দেহ ছিল।

সমরখন্দ বিস্তীর্ণ সহর। অধিবাসীর সংখ্যা দু'লাখের ওপর। মধ্যযুগ ও বিংশ শতাব্দী এখানে হাত-ধরাধরি করে আছে। রাস্তায় অনাবৃত- মুখ আধুনিকাদের নিঃসঙ্কোচ চলা-ফেরার মধ্যে কয়েক জন আপাদ- মস্তক বোরখা বা পাঞ্জারায় ঢাকা নারীও দেখলাম। বড় বড় রাস্তায় ট্রাম-বাস চলছে, দু'পাশে আধুনিক সুউচ্চ হর্ম্যশালা। এখানকার গালিচা, পশমী ও রেশমী বস্ত্র, রৌপ্য, তাম্র এবং ব্রোঞ্জের তৈজসপত্র বিখ্যাত। এই সব শিল্পের কারখানা দেখবার সুযোগ ও সময় পেলাম না, ম্যুজিয়মে সুরক্ষিত নমুনা দেখেই কৌতুহল নিবৃত্তি করতে হল।

স্থানীয় শিক্ষাবিভাগের এক জন বড়কর্তা এক ভোজসভায় আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। প্রাচ্যের আতিথেয়তার ঔদার্য,—ভোজ্যবস্তুর বিপুল সমাবেশ। তিনি ভারত ও সমরখন্দের অতীত সম্পর্ক আলোচনা করে বললেন, পররাজ্য জয়, লুণ্ঠন, দাস-ব্যবসায়ের দিন শেষ হয়েছে। এই বিজ্ঞানের যুগে নানা দেশের মানুষ পরস্পরের নিকটতর হয়েছে। এমন দিন শীগ্‌গিরই আসবে, যখন আমাদের দেশ ও ভারতের মধ্যে বিমানপথ উন্মুক্ত হবে। সেদিন আমরা শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানের মধ্যে আরো ঘনিষ্ঠ হব।

সন্ধ্যায় তাসকেণ্টে ফিরে এলাম। স্থানীয় লেখক-সঙ্ঘের বিদায় সম্বর্দ্ধনায় উভয় দেশের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হল। উজবেক লোক-সাহিত্য প্রাচীন গাথা-গল্পে সমৃদ্ধ, সেগুলো এঁরা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। আধুনিক সাহিত্যও পেছিয়ে নেই। "সংস্কৃতি" শব্দটা আমাদের দেশে আজকাল ছোট-বড় বহু রসনা থেকে অহরহ টঙ্কার দিয়ে ওঠে। বাঙ্গলা দেশের তরুণেরা ক্লাব সঙ্ঘ প্রভৃতিতে সংস্কৃতি সম্মেলন করে থাকেন! আমাদের দেশের বিজ্ঞরা 'ভারতীয় সংস্কৃতি' বলে যার গৌরব ঘোষণা করেন, তার সমগ্র রূপটা যে কি, সে সম্বন্ধে তাঁদের নিজেদের মনেও কোন স্পষ্ট ধারণা আছে কিনা সন্দেহ! এ দেশে শতকরা আশী জনের জীবন-যাত্রার মানদণ্ড এত নীচু যে সহজাত প্রবৃত্তির আবেগে চালিত জীবনযাত্রা নির্বাহ ছাড়া আর কিছু তারা ভাবতেই পারে না। উজবেকদেরও ছিল সেই দশা। কৃষি, পশুপালন ও কুটীরশিল্পের একটা সনাতন ধারা অনুসরণ করে কায়ক্লেশে টিকে থাকার মধ্যে সংস্কৃতির বিলাসিতা চলে না। আজ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এসেছে কলকারখানা, বৈজ্ঞানিক প্রথায় জলসেচ ও কৃষিব্যবস্থা। মানুষ স্বচ্ছলতার মুখ দেখেছে বলেই সাহিত্য সঙ্গীত নৃত্যকলা নূতন প্রাণের প্রাচুর্যে ভরে উঠেছে। এখানকার সংস্কৃতির সম্পদ শ্রেণী-বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ নয়। যা সর্বমানবের সম্পদ তা লোক-সাধারণ জল-হাওয়ার মতই সহজে উপভোগ করছে।

২৪

৫ই আগষ্ট রবিবার মধ্যাহ্নে মস্কৌএ ফিরে এলাম। আমাদের সোবিয়েত রাশিয়া ভ্রমণ শেষ হল। ইয়োরোপ ও এশিয়ায় পরিব্যাপ্ত এই বিশাল দেশের একটা সামান্য অংশ মাত্র দেখবার সুবিধা পেয়েছি। আধুনিক যুগের আকাশচারী দ্রুত ধাবমান বিমান না থাকলে, দু'মাসে যা দেখলাম তা' এক বছরেও সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। এখানে যে একটা নূতন সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটছে, যে কোন সুস্পদৃষ্টি পর্যটকও তা' স্বীকার করবেন। 'হোটেল ন্যাশনালে' দু'-চার জন ইংরাজ ও আমেরিকান ভ্রমণকারীর সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি, এখানকার শ্রমিক ও মস্তিষ্কজীবিরা সুখ-স্বচ্ছন্দে আছে এটা তাঁরা অস্বীকার করেন না—তবে পশ্চিমা সভ্যতার রীতি-নীতি একদম ওলট-পালট করে দিয়ে যে সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা গড়ে উঠছে, তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কেউ কেউ সন্দিহান।

সোবিয়েতের সমালোচকেরা বলেন, মার্কসীয় অর্থনীতির গোঁড়ামীর জবরদস্তী দিয়ে লোকসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার যে প্রয়াস তা' টিকবে না। এ অপবাদটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। সোবিয়েত বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে বোঝা যাবে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি নিয়ে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে কোথাও অবরুদ্ধ করা হয়নি। যেখানে শিক্ষার ব্যাপ্তি ও বিস্তার অবাধ সেখানে চিন্তার বহুমুখী গতিকে ঠেকান যায় না। তা' এরা করেনি, করছে না বলেই, জীবনের সচ্ছন্দ বিকাশ এখানে সহজ হয়ে উঠেছে।

এক জন বলে উঠলেন,—সমস্ত ধনতন্ত্রী জগতের বিরুদ্ধতায় বেষ্টিত হয়ে যে বৈপ্লবিক আবেগে এরা সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমের পথে যাত্রা করেছে, তা' যখন সিদ্ধিলাভ করবে, তখন এই বৈপ্লবিক আবেগ শিথিল হয়ে যাবে। তারপর আজকের এই নিবিড় ঐক্য যাবে ভেঙ্গে—আবার শ্রেণীভেদ সমাজে মাথা-চাড়া দিয়ে উঠবে।

পশ্চিমা মানবহিতৈষীরা এই ভরসা নিয়েই আছেন। ভাবীকালের এই কাল্পনিক চেহারা নিয়ে তর্ক করা চলে না। ধর্ম আর তার অনুশাসন দিয়ে মানুষকে বেঁধে রাখতে তিন হাজার বছর কম বীভৎস চেষ্টা হয়নি, কিন্তু যুক্তিপন্থী বিজ্ঞান সে মোহ ভেঙ্গে দিয়ে মানুষের মুক্তিকে সম্ভব করেছে! এই বিজ্ঞানের সাধনাকেই সোভিয়েত গ্রহণ করেছে:—ধর্মমূঢ়তার স্থানে আর এক যুক্তিহীন মূঢ়তাকে তারা প্রশ্রয় দিচ্ছে, মনে এমনতর সন্দেহ জাগাবার কোন কিছু আমার চোখে পড়েনি। ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা সভ্যতার আওতায় আমাদের চিন্তাধারা ও লোকব্যবহার যে ছাঁচে ঢালাই হয়ে আছে তাই দিয়ে যখন অপরকে বিচার করি, তখন দৃষ্টি ঘোলাটে হবার সম্ভাবনা পদে পদে। সমবায় প্রথায় খাদ্য পণ্য সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতি সৃষ্টিতে এরা একত্র মিলেছে অথচ সোবিয়েত ভূমিতে কত আলাদা জাত, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় নিজেদের আচার নিয়ম রুচি ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ

করছে, কোথাও বাধা পাচ্ছে না—এই তো দেখলাম জর্জিয়ায়, উজবেকীস্থানে।

কি ছিল এদের আর কি হয়েছে, ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়। ১৯১৭-২২এ রুশ দেশের যে সব খবর, আমাদের দেশের বিদেশী ও স্বদেশী কাগজে 'রয়টারের' 'রাঁগা-সংবাদদাতা' পরিবেশন করতেন তা' পড়ে ভাবতাম, রাশিয়া রসাতলে তলিয়ে গেল বলশেভিকদের পাল্লায় পড়ে। শহরের চলাচলের রাস্তায় গজিয়েছে ঘাস, তার দু'ধারে পরিত্যক্ত পড়ো বাড়ী খাঁ-খাঁ করছে। গ্রামের ক্ষেত-খামার অকর্ষিত,—আগাছায় উঠেছে ভরে। কারখানার কল বিকল হয়ে মরচে-ধরা, রেল যান-বাহন অচল—ঘরে-বাইরে অশান্তি! এই পর্বতপ্রমাণ ধ্বংসস্তূপের ওপর নূতন রাশিয়া গড়া সম্ভবপর হয়েছে বিশ্ব-ধনতন্ত্রের প্রতিকূলতা ও কুৎসাপ্রচারের অপবিত্র আয়োজনকে ব্যর্থ করে।

নবীন রাশিয়া সবে মাত্র মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এমন সময় ইয়োরোপের অঙ্গনে প্রকাশ পেল নাৎসী-ফাসিস্ত বর্বরতা! পরের অধিকার লঙ্ঘনের বলদৃপ্ত নিষ্ঠুরতা নির্লজ্জ মূর্তিতে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো। দেখতে দেখতে অগ্নিগিরির গলিত আগ্নেয়-স্রাবের মত নাৎসী-বাহিনী দিগন্ত রাঙ্গিয়ে সোবিয়েত ভূমির ওপর গড়িয়ে চললো—প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসের কেতন উড়িয়ে। লেলিন-স্তালিনের সৃষ্টি বুঝি রসাতলে তলিয়ে যায়। কিন্তু আর এক দুর্বার শক্তি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সঞ্চিত হয়েছিল যা ধনতন্ত্রী জগতের সেয়ানা পলিটিসিয়ানদের কল্পনারও ছিল না। অঘটন ঘটলো। সোবিয়েত জনগণ দাঁড়ালো লাল-পল্টনের পশ্চাতে, শত্রুর গতি অবরুদ্ধ হল। চার বছর জীবনমরণতুচ্ছকারী যুদ্ধের মধ্যেও সোবিয়েত রাশিয়া গঠনকাজ ভোলেনি। জয়লাভ করার পরমুহূর্তে'ই সে নিরহঙ্কৃত কর্ত্তব্যের সাধনাকে অনুদ্বিগ্ন চিত্তে গ্রহণ করেছে।

এই সোবিয়েত রাশিয়ার জন-জীবন এবং সৃষ্টিকে দু'চোখ ভরে দেখলাম। যখন আমেরিকা তার সমস্ত ঐশ্বর্য্য রণদেবতার অর্ঘ্য রচনায় উৎসর্গ করছে; যখন আমেরিকার নেতৃত্বে জোটবদ্ধ সামরিক শক্তি অতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে তীরে পুরোনো ছুরি নূতন করে শানাচ্ছে, তখন এখানে এসে দেখি, এদের উদ্বেগ নেই, শঙ্কা নেই। আমেরিকা তাল ঠুকে বলছে, 'অদ্য যুদ্ধ ত্বয়া ময়া'; সোবিয়েত স্মিতমুখে বলছে, আমি শান্তি-নীতিতে বিশ্বাসী, মানুষের শুভবুদ্ধির ওপর আমার ভরসা আছে! বিশ্বশান্তির আগ্রহ ও অকৃত্রিম আবেগ দেখে আনন্দিত হয়েছি। মনুষ্যত্বের ওপর অবিচল বিশ্বাস নিয়ে, এই শান্তি-আন্দোলনের নেতা স্তালিন বিশ্ব-মানবকে আর একটা ভয়াবহ যুদ্ধের দুর্গতি থেকে রক্ষা করবার সাধনায় সমাসীন।

এই মহান্ লোকনায়কের দর্শনলাভের সুযোগ আমার হয়নি, অত কাছে গিয়েও এই অসাফল্যের দুঃখটা মনে রয়ে গেছে। আমরা মস্কো যাওয়ার পরই এক রবিবার সোবিয়েত বিমানবাহিনীর বার্ষিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সেখানে স্তালিন ও অন্যান্য নেতাদের দর্শন পাওয়া যাবে ভেবে উৎফুল্ল হয়েছিলাম, কিন্তু আবহাওয়ার দরুণ উৎসব স্থগিত রাখা হল। পরে যখন অনুষ্ঠান হল, তখন আমরা লেলিনগ্রাদে।

৫ই আগষ্ট রাত্রে ঘটা করে বিদায়ভোজ হল। মস্কোর সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা ভারত ও সোবিয়েতের স্থায়ী বন্ধুত্ব কামনা করে বক্তৃতা করলেন। আমরাও বললাম, আপনাদের বৃহৎ দেশের নয়া সমাজব্যবস্থা এবং গঠন ও পুনর্গঠনের কথা আমাদের দেশের সাধারণ লোক আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করে থাকে। আমরা যা দেখে গেলাম, তা' যথাযথ ভাবে দেশের লোককে জানাবো। বিশেষ ভাবে শিশু ও কিশোরদের লালন-পালন ও শিক্ষাদানের যে অকৃপণ আয়োজন আপনারা করেছেন, তা' থেকে আমাদের গ্রহণ করবার অনেক কিছুই আছে। বিশ্বশান্তি রক্ষার আগ্রহ নিয়ে আমরা আপনাদের সতীর্থ ও সহযাত্রী!

রাত্রি দুটোয় হোটেলে ফিরে এলাম। জানালা দিয়ে দেখি, ক্রেমলীন তার অচলপ্রতিষ্ঠ মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে; তার উত্তর তোরণের সমুন্নত ললাটে রক্ততারকার সমুজ্জ্বল জয়টীকা।

সমাপ্ত
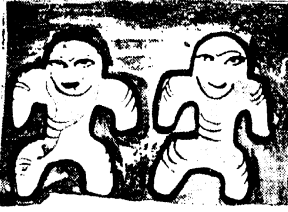
ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩

এর পর নানাকে প্রায়ই গোপনে পরামর্শ করতে দেখা যায় নানা শ্রেণীর নূতন নূতন লোকের সঙ্গে—সে সব লোক বিঠুরের নয়, কানপুরের নয়, কোথাকার লোক তারা, কে জানে, কি সব কথা নানার সঙ্গে তাদের হয় কেউ তা জানে না। এই সব লোকের যাতায়াত বাড়তে থাকলে ক্রমে সংশ্লিষ্ট মহল অর্থাৎ বিঠুরের লোক-জন জানতে পারেন যে, নানা সাহেব এখন বাণিজ্যে নামছেন, দেশী-বিদেশী মালপত্রের আমদানী-রপ্তানীর কাজ চালাবেন ; সেই জন্যেই নানা শ্রেণীর অপরিচিত লোকজন তাঁর কাছে আসে। এই লোকজনদের মধ্যে ইংরেজদের হোটেলের এক খানসামাকে হঠাৎ দেখে অনেকেই চমৎকৃত হলো। নানা নাকি লোকটিকে পছন্দ করে এনেছেন এবং তাঁকে নিজের অন্তরঙ্গ করবার জন্যে সেই ভাবে তালিম দিচ্ছেন।

এই লোকটির নাম হচ্ছে আজিমউল্লা। জাতিতে মুসলমান। নানার সঙ্গে এর পরিচয়ের ব্যাপারটিও বেশ কৌতুকাবহ। একদিন নানা কানপুরে গেছেন ; তাঁকে দেখেই সেখানকার রেসিডেন্সীর ইংরেজ তরুণীরা সহর্ষে ঘিরে ফেলে বলল—'খাওয়াতে হবে নানা সাহেব।' কেউ নানার কাছে খেতে চাইলে আর কথা নেই, তাকে না খাইয়ে নানা স্থির হতে পারেন না ; তাঁর জীবনে এ একটা মস্ত গুণ বা অভ্যাস। তরুণী বিবিদের নিয়ে নানা হোটেলে গিয়ে খানার ফরমাস দিলেন। নবাগত এক প্রিয়দর্শন তরুণ খানসামা টেবিলে খানার খাবার পরিবেষণ করছিল। তার সপ্রতিভ ভাবভঙ্গি, মিষ্ট চেহারা, প্রতিভাদৃপ্ত মুখ ও বলিষ্ঠ আকৃতি নানাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করল। ইংরেজ মেয়েরাও এই খানসামাটিকে খুব প্রীতির সঙ্গেই তারিফ করেছে ; তার কেতাদুরস্ত হাবভাব, আর ভাঙা-ভাঙা ইংরিজীতে কথা বলার কৌশল দেখে তারাও ভারি খুশি। যে ক'টি তরুণী খানার টেবিলে সেদিন ছিলেন, প্রত্যেকেরই ইচ্ছা—এই লোকটিকে ভাঙিয়ে নিজেদের বাঙলোয় নিয়ে যান—বাবুর্চিখানার ভার এর উপরেই ছেড়ে দেন। কিন্তু খেতে খেতেই এঁদের অজ্ঞাতে নানা কি কলকাঠি টিপে দিলেন কে জানে—পরদিনই হোটেল থেকে বিদায় নিয়ে খানসামাটি বিঠুরে নানার খাস-কামরায় এসে সেলাম করল, আর নানাও তৎক্ষণাৎ তাকে নিজের সেরেস্তায় বাহাল করে নিলেন। লোকে জানল, নানার এজেন্ট হয়ে এই ব্যক্তি সওদা করতে বেরুবে, তাই নানা তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে লায়েক করে নিচ্ছেন। সে যাই হোক, পরদিন থেকেই নানা আজিমউল্লার কার্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন—ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা যাতে সে মোটামুটি রকমে শিখতে পারে।

বিঠুরে আসার পর দ্বিতীয় বাজীরাও বহু অর্থব্যয়ে এক বিশাল শিবমন্দির তৈরী করান। নানা এখন করলেন কি, ঐ মন্দিরটি সামনে রেখে এর পিছনে এক নিভৃত আবাস-ভবন নির্মাণ করে তার নাম রাখলেন 'ব্রহ্মাবর্ত্ত।' এটিকে ছোট-খাটো একটি কেল্লা বললেও চলে। এই নিভৃত আবাসে এর পর নানার অন্তরঙ্গগণ সমবেত হতে থাকেন। নানার অন্তরঙ্গ হওয়াও বড় সহজ কথা নয় ; কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারলে নানা কাউকে আমল দেন না বা তার মুখদর্শনও করেন না। সুতরাং যাঁরা এই নিভৃত আবাস-ভবনে প্রবেশাধিকার পান, তাঁদের প্রত্যেকেই পরীক্ষাসিদ্ধ এবং নানার মন্ত্রণা-সভার সদস্য। সাধারণে জানে, এই মনোরম আবাস-ভবনটি নানা তাঁর প্রণয়িনীর জন্যেই নিজের রুচি অনুসারে নির্মাণ করিয়েছেন। কিন্তু অন্তরঙ্গগণ জেনেছেন যে, নানা ধুন্ধুপন্থ দ্বিতীয় পেশোয়া প্রথম বাজীরাওএর আদর্শে নিজের কর্মজীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রথম বাজীরাও ছিলেন একাধারে নিপুণ যোদ্ধা, বিচক্ষণ সেনাপতি, সুদক্ষ হিসাবনবিস, অসাধারণ বাগ্মী, বিখ্যাত রাজনৈতিক—কূটনীতির অদ্ভুত সাধক এবং পক্ষান্তরে তিনি ছিলেন পরম প্রেমিক। সে-যুগের শ্রেষ্ঠা রূপসী বুন্দেলার রাজকন্যা মস্তানীর প্রতি তাঁর অপূর্ব প্রেম ও তার রহস্যময় কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হয়ে আছে। নানাও যথাশক্তি ও বর্তমান কাল অনুযায়ী তৎপরতায় বাজীরাওয়ের দুর্লভ গুণগুলির অনুসরণ করে আনন্দ পান, আর মন্ত্রগুপ্তি ব্যাপারে বুঝি বাজীরাওকেও অতিক্রম করতে সমর্থ হন। আর একটি ব্যাপারেও নানা কৃতকার্য হন—প্রেমিকা সংগ্রহে। পেশোয়া বাজীরাওএর মস্তানীর মত নানা ধুন্ধুপন্থের প্রিয়তমা প্রণয়িনী আদ্‌লার কাহিনীও ইতিহাসবিশ্রুত। রূপে, গুণে, নাচে, গানে, দৈহিক শক্তি ও মস্তিষ্কের বুদ্ধি চালনায় এই তরুণীর কৃতিত্ব বিস্ময়াবহ। মন্ত্রগুপ্তি বিশারদ নানা অন্তরঙ্গদের সকলকেই সকল সময় মন্ত্রণা-সভায় আহ্বান করতে কুণ্ঠিত হতেন, কিন্তু তাঁর প্রণয়িনী আদ্‌লা প্রত্যেক মন্ত্রণা সভাতেই উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। নানার মনে এমন আশাও প্রচ্ছন্ন ছিল যে, পুণার দুর্গে পেশোয়ার বিজয় পতাকা স্থাপিত করেই তিনি 'মস্তানী-বাগে'র পাশে 'আদ্‌লা-বাগ' প্রতিষ্ঠা করে তাঁর প্রণয়িনীর স্মৃতিকেও কালজয়ী করবেন।

সে যাই হোক্, এখন বর্তমান প্রসংগে আসা যাক। ব্রহ্মাবর্ত্ত মন্দির-মঞ্জিলে নানা যে-গুপ্ত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হোন না কেন, ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর সম্প্রীতির কোন অসদ্ভাব দেখা গেল না। কানপুরে প্রায়ই যান তিনি এবং পলিটিক্যাল এজেন্টের মারফতে কলকাতায় বড়লাট লর্ড ডালহৌসীর দরবারে লোক-দেখানো আবেদনও করেন, জব্দ-করা পৈতৃক বৃত্তি যাতে লাট বাহাদুর পুনর্মঞ্জুর করেন। অথচ তিনি ভালো ভাবেই জানেন, তাঁর আবেদন গ্রাহ্য হবে না—এ সরকার শক্তের ভক্ত, নরমের কথা কানে তুলতে অভ্যস্ত নন। নানা

মাটি পেলেই বিড়ালে আঁচোড় দেয়। ইংরেজ জানে, তারা সন্ধি করেছিল যুদ্ধের পর যোদ্ধার সঙ্গে। সেই যোদ্ধার দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিশ্রুতি চুকে গেছে; আর সেই যোদ্ধার উত্তরাধিকারীকে তারা কেরাণী বানিয়েছে। এখন কেরাণীর দরখাস্ত ছিঁড়ে বাতিল কাগজের ঝুড়িতে ফেলাতে এ পক্ষ থেকে আর্ত স্বরে বার বার ভিক্ষুকের চীৎকারই উঠবে, সে চীৎকারে কান না দিলেও কোন ক্ষতি নেই।···কথাগুলো মনে মনে ভাবেন নানা; ভাবতে ভাবতে এক এক সময় তাঁর চোখ ছুটো জলে ওঠে; সঙ্গে সঙ্গে অমনি পৈতৃক দীর্ঘ তরবারি কোষমুক্ত করে পেশোয়া বাজীরাওএর আলেখ্যের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আপন মনে কত কি বলেন!

বছর ছুই আজিমকে তালিম দিয়ে নানা এমন ভাবে তাকে তৈরী করে নিলেন যে, কে বলবে—এই লোক একদিন ইংরেজদের হোটেলে খানসামার কাজ করত! যে-হাতে একদিন সে ডিসে খাবার সাজিয়ে খানার টেবিলে ধরে দিত, এখন সে কলম ধরে সেই হাতে মুসাবিদা করে; আবার প্রয়োজন হলে কলম কানে গুঁজে কোমরে বাঁধা খাপ থেকে তলোয়ার টেনে নিয়ে চালাতেও পিছপাও নয়! হঠাৎ একদিন সকলে অবাক হয়ে শুনল যে, নানার পক্ষ থেকে আজিমউল্লা ইংলণ্ডে রওনা হচ্ছে। উদ্দেশ্য, বড়লাট লর্ড ডালহৌসী নানার আর্জী সম্বন্ধে কোন সুবিচার না করায় নানা আজিমকেই তাঁর প্রতিনিধি করে খরচপত্র দিয়ে বিলাতে পাঠাচ্ছেন—সেখানকার কাউন্সিলে আপীল করবার জন্য।

ঠিক এই সময় নানা ঝাঁসীর সর্বনাশের কথাও শুনলেন। রাণী যে ইংরেজের হাতে রাজপাট ছেড়ে দিয়ে এই অন্যায় উৎপীড়নের জন্য বিচার-ভার উপরের অদৃশ্য শক্তির উপর অর্পণ করে তাঁরই আরাধনায় দিন কাটাচ্ছেন, গুপ্তচরমুখে এ খবরও নানা জ্ঞাত হলেন। নানা জানেন, তেজস্বিনী রাণী লক্ষ্মীবাঈ তাঁর বাহ্যিক আচরণে প্রসন্ন নন; নানা যে শৈশবের আদর্শ ভুলে কেরাণীর বৃত্তি গ্রহণ করেছেন, এ খবর পেয়ে রাণী তাঁকে পরিহাস করতেও কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ত আর দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি, রাণী ত নানার মনের কথা কিছুই এ পর্যন্ত শোনেননি; শুধু এইটুকুই শুনেছেন তাঁর পিতার মুখে—নানার কথাবার্তা, কার্যকলাপ সবই যেন রহস্যময়!

এমনি সময় নানার এক চিঠি এল রাণী লক্ষ্মীর কাছে। নানা সেই চিঠিতে লিখেছেন; তোমার ভাগ্য-বিপর্যয়ের কথা শুনিছি। আমাদের অবস্থার চেয়ে তোমার অবস্থাটি আরও ছুর্বিষহ। শুনলাম, তুমি বিশ্ববিধাতার দরবারে আবেদন জানিয়ে আধ্যাত্মিক তদ্বির করছ। আমি জানতাম যে আমাদের এ অবস্থা হবে! কিন্তু পিতাজীকে ত বুঝানো সম্ভব হয়নি—পরলোকে গিয়ে তিনি জানতে পেরেছেন ইংরেজ কি চীজ! তবে আমার পক্ষে বিধাতার দরবারে ধর্না দিয়ে বসে থাকবার অবসর নেই—তাই ইহলোকেই বোঝা-পড়ার তদ্বির চালাতে হচ্ছে। তুমি নানাকে ইংরেজের পদলেহী বা প্রমাদলোলুপ জেনে মনে মনে অবজ্ঞা কর নিশ্চয়ই; কিন্তু নানার স্বরূপও তোমার অজানা নয়। পিতাজী বর্তমানে সেই রূপের উপরে একটা আবরণ দিতে হয়েছিল—সে আবরণ এখনো খুলিনি। যেদিন খুলে ফেলব, সারা হিন্দুস্থান সেদিন টলমল করে উঠবে জেনো। এখনো আমাকে অভিনয় করতে হচ্ছে। সেই জন্যে আমার এক বিশ্বাসী এজেণ্টকে বিলাতে পাঠাচ্ছি; এর পিছনেও উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু দেশশুদ্ধ সবাই জানবে—নানা সাহেব জব্দ করা পৈতৃক বৃত্তি সম্পর্কে বিলেতের ইংরেজ দরবারে আপীল করতে তাঁর এক এজেণ্টকে পাঠাচ্ছেন। আমি তোমাকে এখনি বলছি—আপীলেও আমি হারবো; কিন্তু সেইটে সারা ছুনিয়াকে জানানোই দরকার হয়েছে। এখন আমার মনে হয়, তোমারও উচিত একজন এজেণ্ট পাঠিয়ে বিলেতে আপীল করে ওদের প্রধান ধর্মাধিকরণকে নেড়ে-চেড়ে দেখা।

নানার পত্র পড়ে রাণী অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন; পত্রের প্রতি ছত্রটি তাঁকে যেন উন্মনা করে তুলল। তবে কি তিনি নানাকে ভুল বুঝেছিলেন? তবে কি শৈশবে এই প্রতিভাবান ছেলেটিকে দেখে তার সম্বন্ধে যে সব আশা পোষণ করতেন, সে সব মিথ্যা নয়? এই দিন থেকে রাণীর অন্তরেও যেন নূতন একটি উদ্দীপনা ধীরে ধীরে শিখা বিস্তার করতে লাগল। এর পর রাণীও নানার দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করলেন—বিলাতের কাউন্সিলে তাঁর তরফ থেকে এক অভিযোগ পাঠালেন উপযুক্ত লোকের মারফৎ। কিন্তু রাণী সেই অভিযোগ-পত্রে যা লিখলেন, তাঁর মত তেজস্বিনী নারীর পক্ষেই তা সম্ভব এবং যোগ্যও বটে। রাণী তাঁর দরখাস্তে লিখলেন: ইংরেজ সরকার আমাদিগকে ঝাঁসী রাজ্য দান করেননি। দ্বিতীয় পেশোয়া প্রথম বাজীরাওয়ের শাসনকালে আমাদের পূর্ব-পুরুষরা অনেক পরাক্রমের কাজ করে তাঁদের শৌর্যের বলেই ঝাঁসী রাজ্য মহান্ পেশোয়ার দৌজন্যে অর্জন করেছিলেন। সুতরাং ঝাঁসীর উপর ইংরেজ সরকারের কোন অধিকার নেই। ন্যায় ও ধর্মের দিকে লক্ষ্য রেখে ইংরেজ জাতির কর্তব্য ঝাঁসী রাজ্য তার বৈধ উত্তরাধিকারীকে প্রত্যর্পণ করা।

কিন্তু এ আপীলের কোন ফল হলো না; নানা যা বলেছিলেন, তাই বর্ণে বর্ণে ফলে গেল। বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টর্স লর্ড ডালহৌসীর হুকুমই বাহাল রাখলেন নানার আবেদন সম্পর্কে। কিন্তু রাণীর আবেদনের কোন উত্তরই এল না ভারতবর্ষে। সম্ভবতঃ রাণীর আবেদনের তেজোদৃপ্ত কথাগুলি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্তারা পরিপাক করতে পারেননি।

বিলেতের কর্তৃপক্ষের রায় যেদিন নানা শুনলেন, মুসড়ে পড়লেন না—আর একবার কানপুরে গিয়ে ইংরেজ-মহলকে খাইয়ে দিলেন হোটেলে একটা বড় রকমের ভোজ দিয়ে।

এর পর ওদেশে ঘোরাঘুরির পর আজিমউল্লাও ফিরে এলেন ব্রহ্মাবর্তে; সেই সঙ্গে অনেক খবরও সংগ্রহ করে আনলেন। নানা এখন কাগজ-কলম নিয়ে হিসেব করতে বসলেন। ঝুনো কেরাণী ব'লে নানা আগে থেকেই ইংরেজ-মহলে নাম কিনেছেন; এখন থেকে সেই কেরাণীর কলমে নূতন রকমের মুসাবিদার উৎপত্তি হলো, বিলি হতে লাগল ভারতবর্ষের দিকে দিকে—যেখানে যত ক্যাণ্টনমেণ্ট বা সেনাবারিক আছে। মীরাট, বেরিলি, দিল্লী, রোহিলখণ্ড, ঝাঁসী, আগ্রা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কাশী, পাটনা, মায়—বাঙলা দেশের ব্যারাকপুরের ছাউনি পর্যন্ত। এই মুসাবিদার সঙ্গে তৈরী হলো অদ্ভুত রকমের ছুটো প্রতীক। এর ফলে সারা দেশ জুড়ে সুরু হলো আশ্চর্য রকমের এক মূক আন্দোলন। এমন অদ্ভুত আন্দোলনের কথা এর আগে আর কেউ কখনো শোনেনি;

আর—কোন রকম সাড়া-শব্দ না তুলে নীরবে সংগোপনে এ ভাবে সারা দেশকে জাগিয়ে তুলতে কোন দেশে কেউ কখনো দেখেনি। এ আন্দোলনে মুখের কথা নেই, হৈ-হুল্লোড় নেই; ধর-পাকড়ের পথে কাঁটা দিয়ে এ আন্দোলন চলল বন্যার স্রোতের মত অবিশ্রান্ত বেগে দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত—সাংকেতময় ছুটি বস্তু আর মৌখিক নির্দেশ বহন করে!

[ক্রমশঃ।

ফো-হি

যামিনীমোহন কর

মহাচীনের জনক ও প্রথম সম্রাট ফো-হি। বহু দিন ঐতিহাসিকরা বিস্ময় ও অবিশ্বাসের দোলায় দুলেছে। ফো-হি কি একজন ব্যক্তির নাম, না একটা যুগের নাম? তবে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নেই। নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ হয়েছে যে ফো-হি এক ব্যক্তিরই নাম এবং ইনি খৃষ্ট জন্মাবার ২১৫০ বছর পূর্ব্বে রাজত্ব করেন। আজকের সভ্য জগৎ তাঁর কাছে বহু ভাবে ঋণী। জগতে প্রথম সুসভ্য জাতি মহাচীন, এ বিষয়ে কোন ভুল নেই। ইংলণ্ড যখন বন্যদের লীলাভূমি, চীনে তখন ছাপা বই বিক্রী হচ্ছে। রোমকরা যখন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন চীনে নগরাদির পত্তন পুরোনো হয়ে গেছে। মিশর যখন কুসংস্কারে ডুবে রয়েছে, চীনে তখন উচ্চাঙ্গের দার্শনিক আলোচনা চলছে। চীনকে সভ্যতার অগ্রদূত করে তুললেন কে? সম্রাট ফো-হি শুধু সভ্যতাই দান করেননি, চীনকে এমন শক্ত বুনিয়াদে গড়েছিলেন যে, মিশর, বাবিল, আসুররাজ্য, গ্রীস, রোম ইত্যাদি উঠল, পড়ল, ধ্বংস হয়ে গেল, কিন্তু চীন মাথা উঁচু করে খাড়া রইল! মহাকালের পরাজয় ঘটল মহাচীনের কাছে।

ফো-হি যখন জন্ম গ্রহণ করেন, তখন চীনকে সভ্য বলা চলে না। দস্যুবৃত্তি করাই তাদের পেশা। কাঁচা ফলমূল বা মাংস তাদের খাদ্য। সুশৃঙ্খল ভাবে চাষের বা শিকারের ব্যবস্থা ছিল না। এমন কি বিবাহ, সংসারাদিরও তখন প্রচলন হয়নি। সন্তানেরা মাকে চিনত, বাপের পরিচয় জানত না। সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা।

ফো-হি হো-নানের শাসকপদে অধিষ্ঠিত হয়ে কড়া হাতে শাসন-বল্গা ধরলেন। প্রথমেই আইন-কানুন প্রণয়ন করলেন ও শিক্ষার জন্য শিক্ষালয়াদি স্থাপন করলেন। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সকলকে মুগ্ধ করল। ধীরে ধীরে দেশের প্রধান নেতা এবং পরে মহাচীনের প্রথম সম্রাট হয়ে বসলেন। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, দেশের লোকেরা তাঁকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতে লাগলো। প্রাচীন ইতিহাসে তাঁর দেবতার অংশে আবির্ভাবের উল্লেখ আছে। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। সে সময় তাঁর তুল্য বুদ্ধিমান ও কর্ম্মী ছিল না বললে অত্যুক্তি হয় না। তিনিই প্রথম বিবাহের ও সংসার-ধর্ম্ম পালনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন। তার ফলে গৃহাদি নির্ম্মাণ করতে হয়। বাপ স্বামীকে সন্তান ও স্ত্রীকে রক্ষা ও ভরণপোষণের ভার নিতে হয়। এতে কিছুটা শৃঙ্খলা হয়ত এসেছিল রাজধানীতে কিন্তু মহাচীন এক মহাদেশ প্রায়। সকলকে আয়ত্তে আনা মুখের কথা নয়। তখন তিনি গ্রাম ও সমাজ গড়ে তোলেন। এক একটা দলের শৃঙ্খলার জন্য একজন করে সর্দ্দার মনোনীত করেন। সর্দ্দারদের আইন-কানুনে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাঁরা আবার নিজের দলকে আইনানুগ করে তুলতে চেষ্টা করেন। রন্ধনবিদ্যাও তিনিই প্রথম চীনেদের মধ্যে চালান। কর্ম্মঠ লোকদের দিয়ে সরকারী ভাবে মাছ ধরা ও শিকারের ব্যবস্থা করেন। এতে তাদেরও আয়, সরকারেরও আয়। এর থেকেই পরে রাজস্ব প্রথার প্রচলন হয়। তিনিই প্রথম ধাতুর ব্যবহার শেখান চীনাদের। শিক্ষা দেন কি করে অস্ত্রাদি তৈরী করতে হয় শিকারের জন্য, আত্মরক্ষার জন্য। ভাল শিকারীদের নিয়ে পরে তিনি সৈন্যদল গঠন করেন। রসায়নশাস্ত্রেও তাঁর বিলক্ষণ দখল ছিল। খাদ্যদ্রব্যে নুন ব্যবহার করতে তিনিই প্রথম শেখান। নুনে জরিয়ে রাখলে যে খাদ্রদ্রব্য বহু দিন অবিকৃত রাখা যায় তাও তিনিই আবিষ্কার করেন। আজকের নোনা ইলিশ তাঁরই আবিষ্কারের ফল। বড় বড় গুদামে তিনি এই ভাবে বাড়তি খাদ্যদ্রব্য জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন যাতে ঘাটতির সময়ে লোক না খেতে পেয়ে মারা না যায়। আশ্চর্য্য, যিনি এত আবিষ্কার করলেন তিনি লাঙ্গল আবিষ্কার করতে পারেননি। তাঁর বংশধর চেন-নুং লাঙ্গলের আবিষ্কর্ত্তা।

কেবল খাওয়া আর বাঁচার কথা নিয়েই তিনি মসগুল ছিলেন না, ললিতকলার দিকেও তাঁর ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। বহু বাদ্যযন্ত্র তিনি সৃষ্টি করেন। ঢাক, বাঁশী ও একপ্রকার তারের যন্ত্রের তিনি আবিষ্কারক। কিন্তু এতেই কি তিনি সন্তুষ্ট! আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে লক্ষ্য করলেন চাঁদ, সূর্য্য ও তারকাদের গতি। আর তাই থেকে তৈরী করলেন পঞ্জিকা ও বর্ষ-গণনার প্রণালী। তার পর দিন রাত, পরে দিনকে ভাগ করে ঘণ্টা। মহাচীনে জন্ম হল সময়ের মাপকাঠি, জলঘড়ির।

চীনদেশে তখন লিখন-পদ্ধতির উদ্ভব হয়নি। তিনি এই বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। বিভিন্ন রকম গোল গোল চিহ্ন দ্বারা বিভিন্ন কথা প্রকাশ করার প্রণালী বার করলেন। একে অবশ্য লিখন-পদ্ধতি বলা চলে না, কিন্তু প্রকাশ-পদ্ধতি বললে দোষ হবে না। নেই মামার চেয়ে কানা মামাও ভাল। এই চিহ্নগুলির নাম পা-কুয়া।

আরও অনেক কিছুই হয়ত তিনি করেছিলেন। কিন্তু তখনও লিখন-পদ্ধতি প্রচলিত হয়নি। তাই তাঁর সকল কীর্ত্তিকাহিনী লিখে রাখাও সম্ভব হয়নি। হয়ত অনেক কিছুই বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবে গেছে। যতটুকু জানা গেছে তাতেই জগৎ স্তম্ভিত। এটুকু যে জানা গেছে তার কারণ, চীনারা তাঁকে দেবতা মনে করত। তাঁর কাহিনী বংশানুক্রমে মুখে মুখে চলে এসেছে পরে যখন লিখন-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়, তখন তাঁর জীবনী লেখা হয়েছে সেই সকল কিম্বদন্তী একত্র করে। কিছুটা হারিয়েছে, কিছুটা হয়ত আগাছা এসে পড়েছে, কিন্তু যা পাওয়া গেছে, তাতে তাঁকে দেবতা মনে করা আশ্চর্য্য নয়।

কথিত আছে যে তিনি ১১৫ বছর রাজত্ব করেন। হয়ত এটা একটু বাড়িয়ে বলা হয়েছে। তবে রাজ্যকাল যে দীর্ঘ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ তা না হলে এতগুলো সংস্কার তিনি করে উঠতে পারতেন না। চিন-চুতে তাঁর সমাধিমন্দিরে আজও পূজা দেওয়া হয়। বিদেশীরা বেড়াতে গেলে চীনবাসীরা

সসম্ভ্রমে কোংহির সমাধিমন্দির দেখায়। সশ্রদ্ধ গর্ব্বের সঙ্গে কোংহির জীবনী শোনায়। শেষে মাথা নীচু করে দেবতাকে সম্মান জানায়। তাদের কাছে কোংহি দেবতা-বিশেষ। আর সত্যই তো। বিরাট মহৎ ব্যক্তি তো দেবতাই বটেন।

রাজা লীয়ার

উইলিয়ম সেক্সপীয়র

১

রাজা লীয়ার বৃদ্ধ হ'য়েছেন। রাজকার্য্য চালান হ'য়ে পড়েছে অসম্ভব। মহা চিন্তার কথা। এত বড় রাজ্য ব্রিটেন কার হাতে দেবেন? কে চালাবে? তাঁর ত ছেলে নেই! তিন মেয়ে মাত্র সম্বল এবং এরাই তাঁর সিংহাসনের যুক্ত-উত্তরাধিকারী। দুই মেয়ে গনেরিল আর রিগানের বিয়ে হ'য়ে গেছে। বড় গনেরিলের স্বামী আলবানীর ডিউক আর মেজ মেয়ে রিগানের স্বামী কর্ণওয়ালের ডিউক। আর ছোট মেয়ে রাজার সব চেয়ে আদরের কর্ডিলিয়া এখনও কুমারী। আলবানী আর কর্ণওয়ালের ডিউক দুজনেই ব্রিটেনে এসে হাজির হয়েছেন, কারণ রাজা তিন মেয়েকেই ত তাঁর রাজ্য ভাগ ক'রে দেবেন।

আর দুজন সম্রান্ত অতিথি উপস্থিত ছিলেন রাজপ্রাসাদে —এই ব্যাপারের জন্যে। তাঁরা হ'লেন একজন ফ্রান্সের রাজা, অপর জন বার্গাণ্ডির ডিউক। এঁরা দুজনেই রাজা লীয়ারের কুমারী কন্যা কর্ডিলিয়ার পাণিপ্রার্থী।

* * * *

বুড়ো বয়সে স্নেহের লোভটা এতই বেড়ে যায়! রাজা লীয়ারের তিন মেয়ে ছাড়া আর কোন সন্তান নেই। বিপত্নীক রাজা এদের তিন জনকেই ভালবাসতেন প্রাণের চেয়েও বেশী। তাঁর ইচ্ছা, তাঁকে যে মেয়ে বেশী ভালবাসবে সেই রকম ভালবাসার ওজন ক'রে তিনি তাঁর রাজ্য তিন ভাগ করবেন। অবশ্য যদিও তিনি জানেন তিন মেয়েই তাঁকে ভালবাসে, বিশেষতঃ আদরের কর্ডিলিয়া, কিন্তু তবুও তাঁর ইচ্ছা তারা মুখ ফুটে জানাক কে কি রকম ভালবাসে—জানাক সর্ব্বসমক্ষে।

এই কথা নিয়েই রাজা আলোচনা করছিলেন তাঁর পাত্রমিত্রের সঙ্গে। তাঁদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা রাজানুরাগী কেণ্টের আর্ল'ও ছিলেন। আর উপস্থিত ছিলেন আলবানী আর কর্ণওয়াল—গনেরিল আর রিগানের স্বামী।

রাজা লীয়ার তাঁর তিন মেয়েকে ডেকে পাঠালেন।

বড় গনেরিল বলল, "বাবা, আমি আপনাকে যত ভালবাসি তা কথায় প্রকাশ করা যায় না, আমার এ দৃষ্টিশক্তি, আমার স্বাধীনতা, আমার জীবন, আমার স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, সম্মান সব-কিছুর চেয়ে বেশী আপনাকে ভালবাসি। আপনার ভালবাসার কাছে আমার ধন-সম্পদ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিছুই নয়।"

মেয়ে আমায় এত ভালবাসে! রাজা খুশী হ'লেন খুব, এই ভালবাসাই যে তাঁর অথর্ব্ব কালের সান্ত্বনা।

বললেন, "তোমার ওপর খুশী হয়েছি খুব মা, এই ভালবাসার বিনিময়ে আমি তোমায় দিলাম আমার রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ।"

তারপর তিনি দ্বিতীয়া কন্যা রিগানকে ডেকে বললেন, "মা, তুমি বল এবার, কতটুকু আমায় ভালবাস?"

রাজা তাঁর স্নেহান্ধ দৃষ্টিতে কখনও টেরও পাননি যে, বড় মেয়ের ভালবাসা সম্পত্তিরই লোভে। মেজ মেয়ে রিগানও বড় বোনের অনুসরণকারিণী। সে বলল:

"আমরা দুজনে সমান ধাতুতে তৈরী বাবা, দিদি অন্তরের যত ভালবাসা জানিয়েছে, তার চেয়েও বেশী ভালবাসি তোমায়। জীবনের ভোগ-লিপ্সা কিছুই নয় তোমার ভালবাসার কাছে।"

রাজা খুশী হ'য়ে তাকেও দিলেন রাজ্যের তিন ভাগের এক ভাগ।

এইবার তাঁর প্রিয় কন্যা কর্ডিলিয়ার পালা। যখন রাজা বড় আর মেজ মেয়ের কাছে ভালবাসার কথা জানছিলেন তখন কর্ডিলিয়া ভাবছিল, ভালবাসার পরিমাপ সে করবে কি ক'রে। ভালবাসাকে কি কখনো ওজন করা যায়? মুখে কি বলা যায় প্রকৃত ভালবাসার কথা। মুখে যে ভালবাসার প্রকাশ হয় সেই কি সব? সেই কি আসল? তাই রাজা যখন অপর দুজনের মত তাকেও সেই একই কথা জিজ্ঞাসা করলেন—সে গেল হকচকিয়ে; চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। রাজা অধীর হ'য়ে বললেন, "বল মা, কতটা ভালবাস তুমি আমায়।"

কর্ডিলিয়া বলল আস্তে আস্তে, "আমার কিছু বলবার নেই বাবা।"

"সে কি মা, বল মা বল—তুমিই আমার সব—বল তুমি—তুমি কি আমায় ভালবাস না?"

"ভালবাসি বাবা, কিন্তু মেয়ের পক্ষে যতটা ভালবাসা যায় ততটাই ভালবাসি তোমায়, তার বেশীর কথা কি ক'রে বলব?"

তার এ উত্তরের সরলতা রাজার কাছে অহঙ্কার ব'লে মনে হ'ল। বৃদ্ধ বয়স হওয়ায় তিনি তোষামোদ ভালোও বাসতেন—আর বুঝতেও পারতেন না যে, তোষামোদের মধ্যে সত্য আছে কি না। তাঁর মনে হ'ল, তিনি কর্ডিলিয়াকে স্নেহ ক'রে ভুল করেছেন—এই কি তাঁর প্রাণাধিকা কন্যার কথা! যার কাছে তাঁর সব চেয়ে বেশী আশা সেইখানেই যে পেলেন চরম আঘাত! ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন তিনি। সর্ব্বসমক্ষে কর্ডিলিয়ার এ সরলতা তাঁর কাছে অপমানজনক। তিনি যেমন দুঃখিত হ'লেন—রাগ হ'ল তার চেয়েও বেশী। বললেন তিনি—"তুমি আমার কেউ নও, তোমার সঙ্গে আমার যে রক্তের সম্পর্ক—সব ত্যাগ করলাম। এক কপর্দ্দকও দোব না তোমায়। রাজ্যের বাকী অংশ আমি ভাগ ক'রে দোব আমার অন্য দুই মেয়েকে—তোমাকে আমি বিসর্জ্জন দিলাম।"

সত্য সত্যই রাজা বাকী অংশ সমান ভাগে ভাগ ক'রে দিলেন তাঁর বড় ও মেজ মেয়েকে। কেণ্টের আর্ল ছিলেন খুব সদাশয় ও মহৎ। তিনি বুঝলেন অভিমানে ও রাগে রাজা অবিচার করছেন। কেউ না প্রতিবাদ করলেও তাই তিনিই প্রতিবাদ করতে গেলেন—কিন্তু রাজার ধমকে বাধ্য হ'লেন চুপ করতে। শুধু তাই নয়, কেণ্টের ওপর ক্রুদ্ধ হ'য়ে তিনি তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন রাজ্য থেকে। এমনি তখন তাঁর মনের অবস্থা। রাজকুমারী কর্ডিলিয়া এখন পথের ভিখারিণী বললেই চলে। হতাশ হ'য়ে ফিরে গেলেন তাঁর অন্যতম পাণিপ্রার্থী বার্গাণ্ডির ডিউক। কারণ কর্ডিলিয়া ছাড়াও তাঁর ছিল ইংলণ্ডের সিংহাসনের লোভ।

কিন্তু ফ্রান্সের রাজা প্রকৃতই ভালবাসতেন কর্ডিলিয়াকে। সম্পত্তি কিছুই নয় ভালবাসার কাছে। তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠল কর্ডিলিয়ার এইরূপ নিঃস্ব অসহায় অবস্থা দেখে। তিনি স্থির করলেন কর্ডিলিয়াকে বিয়ে করবেন—বিয়ে করবেন বিনা যৌতুকেই। রাজাকে জানালেন তাঁর মনের কথা। রাজাও বাঁচলেন, এ আপদ এখন বিদায় হ'লেই হয়।

সজল চোখে কর্ডিলিয়া বিদায় নেবার আগে তার দিদিদের বলল যেন তারা বাবার যত্ন নেয়—আপ্রাণ ভালবাসে। তার উত্তরে দিদিরা বলল মুখভঙ্গি ক'রে যে, তারা তাদের কর্ত্তব্য বেশ ভাল ভাবেই জানে—তাকে আর কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতে হবে না—প্রয়োজন নেই।

২

স্থির হ'য়েছিল রাজা তাঁর জীবনের অবশিষ্ট কাল গনেরিল ও রিগানের কাছে ভাগাভাগি ক'রে কাটিয়ে দেবেন।

এর পর কিছু দিন কেটে গেছে। রাজা লীয়ার যে নিজের পায়েই নিজে কুড়ুল মেরেছেন—ধীরে ধীরে তা বুঝতে আরম্ভ করলেন। মানুষ ঠেকে শেখে, বৃদ্ধ বয়সে তাঁর শিক্ষা পাবার দিন এসেছিল—তাই তিনি ঠেক খেতে লাগলেন। অর্থাৎ ইংলণ্ডের রাজারও যে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপপূর্ণ জীবন ছাড়া অন্য জীবনও আছে তা তিনি বুঝতেন না—কিন্তু যেটা বুঝতেন না—যে অবস্থাকে চিনতেন না—তাই অতর্কিতে তাঁকে আক্রমণ করল।

পূর্ব্বের কথামত রাজা আছেন বড় মেয়ে গনেরিলের কাছে—সঙ্গে আছে প্রায় একশ' পারিষদ আর একজন বয়স্য—ভাবে-ভঙ্গীতে যাকে খুবই বোকা ব'লে মনে হয় আর যে রাজাকে সর্ব্বদাই খুশী রাখবার চেষ্টা করে। কিন্তু আসলে যে সে বোকা নয় এবং সংসারের যে অনেক কিছুই তার নখদর্পণে সেটা কেউই জানে না। প্রতাপান্বিত রাজার যে দুর্দ্দশা হবে সেটা যেন তার জানা—তাই সে রাজার সংগে সংগেই থাকে। আজকাল গনেরিল রাজার আচার-আচরণে যে বিরক্ত হ'য়ে ওঠে—এটা বুঝতে পারে এই বয়স্য নামধেয় লোকটি। রাজাকে জানায়—কিন্তু রাজা বোঝেন না—অবশেষে একদিন এই দিন এল। ইতিমধ্যে রাজা আরেকটি লোক নিযুক্ত করলেন—সে সব কাজই পারে।

একদিন রাজা দেখেন গনেরিলের কোন চাকর তাঁর আদেশ পালন করতে রাজী নয়। এতে রাজার আত্মাভিমানে ঘা লাগে। নবনিযুক্ত চাকরটি আসলে ছিলেন কেণ্ট—রাজা তাঁকে তাড়ালেও তিনি রাজাকে ত্যাগ করতে পারলেন না। রাজাকে ভক্তি করতেন ব'লে রাজার অবিচারেও তিনি তাঁর পাশ ছাড়লেন না। রাজার প্রতি চাকরের এই যে পরোক্ষ অপমান—এ অপমানে তিনি চটে গেলেন। তাই রাজার মর্য্যাদার পরিচয় জানাতে তিনি সেই চাকরকে প্রহার করলেন। আসলে সে চাকরের কোনও দোষ ছিল না—গনেরিলই আদেশ করেছিল—রাজা যদি তার ব্যবস্থায় রাজী না হন তাহ'লে তারাও তাঁর কোন আদেশ পালন করবে না। তাই গনেরিলের রাগ যেন সপ্তমে উঠল। আজ সে রাজরাণী—রাজা লীয়ার কে—একজন পোষ্য মাত্র। গনেরিল স্পষ্টই রাজার মুখের ওপর শুনিয়ে দিল—"বুড়ো হ'য়ে তোমার দুর্বুদ্ধি হয়েছে। একশ' বয়স্যসভাসদ নিয়ে তোমার মজা চলছে আর আমার বাড়ীটাও হ'য়ে উঠেছে তাড়ীখানা। আবার তোমার চাকরের এমনি স্পর্দ্ধা যে, সে আমার চাকরের গায়ে হাত তোলে! এ সব অনাচার চলবে না এ বাড়ীতে থাকলে।"

"বুড়ো" লীয়ার তো শুনে অবাক্! এ সত্য সত্যই তাঁর মেয়ে গনেরিলের কথা ত? কিন্তু বেশীক্ষণ তিনি অবাক হ'য়ে থাকতে পারলেন না—রাগে তখন ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের সর্ব্বশরীর কাঁপছে। তিনি চীৎকার ক'রে বললেন—"বেশ, তুই আমার মেয়ে ন'স্, আমার আর এক মেয়ে আছে—আমি তার কাছে গিয়ে থাকব।" যাবার আগে তিনি অভিশাপ দিলেন গনেরিলকে, "তোর মতো মায়ের গৌরব বাড়াতে তোর যেন ছেলে না হয়—আর যদি হয় সে তবে কুপুত্র হবে—সর্ব্বক্ষণ তোকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারবে।"—এই বলে তো তাঁর ঘোড়া ছুটল কর্ণওয়ালের দিকে—সঙ্গে তাঁর সভাসদ্‌বর্গ।

এদিকে গনেরিলও নিশ্চিন্ত ছিল না—সেও পত্রদূত পাঠাল এক অশ্বারোহীকে।

এদিক থেকে রাজার দূত ছদ্মবেশী কেণ্ট—আর ওদিক থেকে গনেরিলের দূত অসওয়াল্ড। অসওয়াল্ডই রাজাকে উপেক্ষা করেছিল তাঁর আদেশ না শুনে আর সেই জন্যই কেণ্ট তাকে করেছিলেন প্রহার। এখনও তাকে দেখে তাঁর ক্রোধ সপ্তমে উঠল—লাঞ্ছিত হ'ল অসওয়াল্ড। রিগান যখন শুনল এ কথা—তখন সে গ্রাহ্যই করল না যে, ছদ্মবেশী কেণ্ট রাজার দূত। যেহেতু তিনি তার দিদির দূতকে প্রহার করেছেন তাই তাঁর পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিল।

কেণ্ট বাধা দিয়ে বলতে গেলেন—আমি যদি মা তোমার বাবার কুকুর হতাম তবে কি তুমি আমায় মাথায় ক'রে রাখতে না?—তার উত্তরে নির্ম্মম রিগান জবাব দিল—"তুমি তাঁর দুষ্ট চাকর ব'লেই তোমার এ শাস্তি।"

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীঅরুণকুমার দত্ত

ভবিষ্যদ্বাণী?

যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
এ বি শিখে, বিবী সেজে, বিলীতী বোল কবেই কবে;
আর কিছু দিন থাক রে ভাই! পাবেই পাবে দেখতে পাবে,
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

সারদামণির কথা

নির্ম্মলেন্দু ভট্টাচার্য্য

পাড়ার জমিদারের কাছ থেকে গয়নাগাঁটি চেয়ে নিয়ে বিয়ের দিনে মা ছেলের বৌকে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়েছেন। ফিরিয়ে দেওয়ার সময় হল। মা'র চোখ ছলছল। ছেলেটি করলে কি, বৌ যখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে, তার গা থেকে এক এক করে দিব্যি সব খুলে নিলে। বৌ টেরটিও পেলে না।

মেয়ের কাকা মেয়েকে বাপের বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসে ব্যাপারখানা দেখে রেগেই আগুন।

ছেলেটি বললে, "ওরা এখন যাই বলুক করুক না, বিয়ে ত আর ফিরবে না।"

সে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসের কথা। ছেলের বয়েস চব্বিশ, মেয়ের ছয়। ঘটনাটা ঘটল পশ্চিম-বাংলায় হুগলী জেলার কামারপুকুর গাঁয়ে, বিয়েতে পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষকে পণ দিল গুণে গুণে তিনশো টাকা।

মেয়েটি জন্মেছিল ১৮৫৩র ২২শে ডিসেম্বর, কামারপুকুর থেকে চার মাইল পশ্চিমে বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গাঁয়ে। বাবার নাম শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মায়ের শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী। এঁদের যথাক্রমে সারদা, কাদম্বিনী, প্রসন্নকুমার, উমেশ, কালীকুমার, বরদাপ্রসাদ ও অভয়চরণ নামে দুই মেয়ে, পাঁচ ছেলে হয়েছিল।

বিয়ের পর দু'-এক বার স্বামীর সঙ্গে মেয়েটির যা দেখা হয়েছিল তা নিতান্তই চকিতের মত। সে থাকত একাটি একাটি বাপের কাছে, স্বামী যেখানে থাকত সেখানেই গেল চলে। গাঁয়ের লোক ছেলেটার সম্বন্ধে যা-ইচ্ছে তাই বলে বেড়াতে কসুর করত না। ছুঁচের মত গায়ে এসে তা বিঁধত মেয়েটির। কিন্তু মুখে রা নেই। ভাবত গয়ে একবার স্বচক্ষে দেখে আসবে সত্যি কি রকম তিনি।

১৮৭২এর মার্চ্চে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় পুণ্যলোভাতুরা কয়েক জন আত্মীয়া গঙ্গায় চান করতে দল বেঁধে কলকাতায় আসলেন। সঙ্গে রামচন্দ্র আর উন্মুখ সারদা।

পথে তার জ্বর হয়েছিল। শুনে গদাধর(১) উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। নিজের ঘরে আলাদা বিছানায় সারদার শোয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। বার বার বলতে লাগলেন, "তুমি এত দিনে আসলে? আর কি আমার সেজ বাবু(২) আছে যে তোমার যত্ন হবে?"

---

(১) স্বামীর নাম শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায়, জন্ম ১৮৩৬ এর ১৭ই ফেব্রুয়ারী কামারপুকুরে। বাপ ক্ষুদিরামের প্রথম পক্ষের স্ত্রী অল্প বয়েসে মারা যান। তার পর বিয়ে করেন চন্দ্রমণিকে। চন্দ্রমণিই গদাধরের মা।

(২) কলকাতার জানবাজারের জমিদার শ্রীরাজচন্দ্র দাসের গৃহিণী রাসমণি। তাঁর চার মেয়ে। তৃতীয়া করুণাময়ী। করুণাময়ীর স্বামী শ্রীমথুরামোহন বিশ্বাস করুণাময়ী মারা গেলে চতুর্থা জগদম্বাকে গ্রহণ করলেন। নাম তাঁর সেজ বাবুই রয়ে গেল।

কঠোর ব্রহ্মচর্য্যপালন ও সাধনায় নিমগ্ন যুবক তাঁর উনিশ বছরের যুবতী বৌকে নির্জ্জনে জিগ্‌গেস করলেন, "কি গো, তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?" জবাব এল, "না, আমি তোমাকে সংসারপথে টানতে কেন যাব?" এতে কোন অস্পষ্টতা নেই, নেই কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব।

সারদার দক্ষিণেশ্বরে এই প্রথম আসার প্রায় আট বছর আগে সন্ন্যাসী তোতাপুরীর কাছে সন্ন্যাস নিয়ে গদাধর রামকৃষ্ণ পরমহংস হয়েছেন। তবে প্রচার তখনো সুরু হয়নি।

রোমাঁ রোলাঁ এই বিয়ে সম্বন্ধে লিখছেন, "মিস্ মেয়োর চোখে রামকৃষ্ণের বিয়েটি ডবল গর্হিত হয়ে উঠেছিল। পাঁচ বছর বয়েসের(১) বালিকার সঙ্গে তেইশ বছরের(২) যুবকের বিয়ে। যাঁরা লজ্জিত ও উত্তেজিত হয়েছেন, তাঁরা শান্ত হোন। এই বিয়েটি দুটি আত্মার বিয়ে। যৌন মিলনের দিক থেকে এই বিয়ে চিরদিনই ছিল অপূর্ণ।"

সারদার আনন্দের অপূর্ণতা কিন্তু কোন দিক দিয়ে ছিল না। সব সময়ে আনন্দে কানায় কানায় ডুবে থাকতেন। বলতেন, "হৃদয় মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রয়েছে, ঐ কাল হতে সর্বদা ঐরূপ অনুভব করতাম। সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কত দূর কিরূপ পূর্ণ থাকত, তা বলে বুঝাবার নয়।"

নিজের সব দাবী ও অধিকার ছেড়ে দেওয়ার মত উদারতা ও মহত্ত্ব সারদার প্রচুর পরিমাণে ছিল বলেই গদাধর একবার সারদাকে বলেছিলেন, "যদি তুমি আমাকে এই (মায়ার) জগতে টেনে আনতে চাও, তবে আমি তোমার বিবাহিত স্বামী হিসেবে তোমার সেবায় আসতে পারি।"

স্ত্রীর অবিরোধিতায় ও তাঁর অনুমতি নিয়ে গদাধর নিজের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন।

---

(১) সারদার বয়েস তখন পাঁচ পার হয়ে গিয়েছে।

(২) রামকৃষ্ণের বয়েস তখন চব্বিশ।

১৮৭২এর মার্চ্চ থেকে '৭৩এর নভেম্বর পর্যন্ত, '৭৪এর এপ্রিল থেকে '৭৫এর সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ও '৮৪ হতে গদাধরের শেষ দিন পর্যন্ত সারদামণি স্থায়ী ভাবে স্বামীর কাছে থাকবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

এই সময়কার এক দিনের এক ঘটনা। বিয়ে হল ছেলেপুলে হচ্ছে না। নানা লোকের নানা কথার অন্ত নেই। তাই এক দিন সাহস করে তিনি জিগ্গেস করে ফেললেন রামকৃষ্ণকে, "তাই তো, ছেলেপুলে একটা হবেনি, সংসারধর্ম বজায় থাকবে কিসে?" "একটা ছেলে কি খুঁজছ গো?" রামকৃষ্ণের কাছ থেকে জবাব এল অমনি, "তোমার এত ছেলেপুলে হবে যে, তুমি 'মা' বোলে তিষ্ঠাতে পারবেনি।"

জয়রামবাটীতে একবার শ্যামাসুন্দরীও এই দুঃখ করেছিলেন। তাই জামাইর কাছ থেকে উত্তরও পেয়েছিলেন, "শাশুড়ী ঠাকরুণ, সে জন্ম আপনি দুঃখ করবেন না। আপনার মেয়ের এত ছেলেমেয়ে হবে শেষে দেখবেন 'মা' ডাকের জ্বালায় আবার অস্থির হয়ে উঠবে।"

পরমহংসদেব বলতেন, "ও (অর্থাৎ সারদা) যদি এত ভাল না হত, আত্মহারা হয়ে তখন আমাকে আক্রমণ করত, তাহলে সংযমের বাঁধ ভেঙে দেহবুদ্ধি আসত কি না কে বলতে পারে?"

নিজের লেখাপড়া সম্বন্ধে সারদামণি পরবর্তী কালে ভক্তদের বলতেন, "কামারপুকুরে লক্ষ্মী (রামকৃষ্ণের মেজ বড় ভাই রামেশ্বরের মেয়ে) আর আমি বর্ণপরিচয় একটু একটু পড়তুম। ভাগনে(১) বই কেড়ে নিলে। বললে, 'মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখতে নাই। শেষে কি নাটক নভেল পড়বে?' লক্ষ্মী তার বই ছাড়লে না, ঝিয়ারী মানুষ কি না, জোর করে রাখলে। আমি আবার লুকিয়ে আর একখানি এক আনা দিয়ে কিনে আনালুম। লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসত। সে এসে আবার আমায় পড়াত। ভাল করে শেখা হয় দক্ষিণেশ্বরে; ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) তখন চিকিৎসার জন্যে শ্যামপুকুরে। একাটি একাটি আছি, ভব মুখুয্যেদের একটি মেয়ে আসত নাইতে। সে মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ আমার কাছে থাকত। সে রোজ নাইবার সময় পড়া দিত ও নিত।"

পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হলেও এবং স্কুলে গিয়ে লেখাপড়ার সুযোগ না পেলেও কথকতা, পাঠ, ছড়া প্রভৃতি থেকে শুনে শুনে সারদামণি অনেক কিছু শিখেছিলেন। বুড়ো বয়েসেও অনেক সময় তাঁকে সে সব আবৃত্তি করতে শোনা গেছে।

একবার জয়রামবাটী থেকে রামকৃষ্ণ ও সারদা কিছু দূরে ভাগনে হৃদয়ের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। সেখানে হৃদয় নাকি পরিহাস করে সারদাকে জিগ্গেস করেন, "মামী, মামাকে 'বাবা' বলতে পার?" দেবী উত্তর করলেন, "হাঁ, তিনি আমার বাবা, তিনি আমার মা, তিনি আমার ভাই, বন্ধু। তিনি আমার সব।' হৃদয় সকলকে বলে বেড়াতে লাগলেন।

সরলা সারদার প্রথম কলকাতায় এসে কি রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা শুনতে বেশ লাগে। "আগে জলের কল-টল ত কিছু দেখিনি, এক দিন কল-ঘরে গেছি, দেখি কল সোঁ সোঁ করে সাপের মত গর্জ্জাচ্ছে। আমি ত ভয়ে এক ছুটে মেয়েদের কাছে গিয়ে বলছি, 'ওগো, কলের মধ্যে একটা সাপ এসেছে, দেখবে এস। সোঁ সোঁ করছে।' তারা এসে বললে, 'ওগো, ও সাপ নয়, ভয় পেয়ো না। জল আসবার আগে অমনি শব্দ হয়।' আমি ত তখন হেসে কুটিপাটি।" এমন কাণ্ড!

গদাধর পত্নীকে বলতেন, "গাড়ীতে বা নৌকোয় যাবার সময় আগে গিয়ে উঠবে, আর নামবার সময় কোনও জিনিষ নিতে ভুল হয়েছে কি না, দেখে-শুনে সকলের শেষে নামবে।" অতি সাধারণ সাংসারিক বিষয় হতে অতি উচ্চ ধর্মজ্ঞান পর্য্যন্ত সব ব্যাপারেই তন্ন তন্ন করে গদাধর তাঁকে হাতে ধরে শেখাতেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফলহারিণী কালীপূজোর দিন রাতে গদাধর সারদাকে ষোড়শী পূজা করেন। এখন থেকে তাঁর সাধন-ভজন শেষ হয়ে গেল। তখন সারদার কুড়ি বছর চলছে। গদাধরের আটত্রিশ। দক্ষিণেশ্বরে গদাধরের ঘরে যেখানে গোল বারান্দার কাছে গঙ্গাজলের জালা থাকত, সেখানে হৃদয় বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।

ষোড়শী পূজোর পর তিনি প্রায় ছয় মাস দক্ষিণেশ্বরেই ছিলেন। দিনের বেলায় নহবৎ-ঘরে এবং রাত্রে স্বামীর বিছানার পাশে থাকতেন। স্বামীর জন্যে আলাদা করে রান্না করা ছাড়া অতিথি-অভ্যাগত ও ভক্তদের জন্যে রান্না তাঁর রোজই লেগে থাকত।

এক দিন দুপুর বেলা রামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বসে, সারদামণি ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন, কেউ কোথাও নেই। জিগ্গেস করলেন, "আমি তোমার কে?" অমনি উত্তর হল, "তুমি আমার মা আনন্দময়ী।"

গদাধরকে শিশুর মত ভুলিয়ে খাওয়াতে হত। সারদা বলেছেন, "ঠাকুরের (গদাধরের) ভাত বাড়বার সময় (দু'হাত দিয়ে দেখিয়ে) ভাতকে টিপে টিপে কম দেখাবে বলে সরুটি করে দিতুম। তিনি বেশী ভাত দেখলে ঘাবড়ে যেতেন। গোয়ালার দুধ আধ সের করে দেবার কথা; দেবার সময় অন্য জায়গায় বিক্রী করে তার যে দুধটা বাড়ত, সবটা দিয়ে যেত। আমি সেটাকে ফুটিয়ে ঘন করে রাখতুম।"

একবার মাসিক ঋতুর দরুণ তিন দিন সারদা গদাধরের রান্না করেননি। অন্যের রান্না খেয়ে গদাধরের শরীর হল খারাপ। তিনি সারদাকে ডেকে বোঝালেন পবিত্র মন নিয়ে কাজ করে গেলে ও অবস্থায়ও কোনই ক্ষতি নেই। তার পর থেকে সারদা মাসিক ঋতুর সময়েও রান্না করে দিতেই লাগলেন। গদাধর তাঁর রাঁধা জিনিষ খেয়ে বলতেন, "দেখ ত, তোমার রান্না খেয়ে আমার শরীর কেমন ভাল আছে।"

সন্ধ্যের পর। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে খাটের ওপর চোখ বুজে শুয়ে আছেন। সারদা তাঁর ঘরে খাবার রাখতে গিয়েছেন। গদাধর মনে করলেন লক্ষ্মী। বললেন, "দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস্।" সারদা যাওয়ার আগে জানিয়ে গেলেন তাই করা হয়েছে। সারদার গলা শুনতে পেয়ে গদাধর বলছেন, "আহা, তুমি! আমি ভেবেছিলুম লক্ষ্মী। কিছু মনে কোরো নি।" পরদিন সকালে নহবতে সারদার কাছে গিয়ে হাজির, "দেখ গো, সারা রাত আমার ঘুম হয়নি ভেবে ভেবে, কেন এমন রুক্ষ কথা বলে ফেললুম।"

আর একবার। সারদা ফল ও মিষ্টি দু'হাতে লোককে বিলিয়ে

---

(১) ক্ষুদিরামের বোন রামশিলার মেয়ে হেমাঙ্গিনী; হেমাঙ্গিনীর ছেলে হৃদয় মুখোপাধ্যায়।

দিয়েছেন। গদাধর বললেন, "এত খরচ করলে কি করে চলবে?" অভিমানে সারদা সামনে থেকে চলে গেলেন। গদাধর এদিকে ব্যস্ত; ভাইপো রামলালকে ডেকে বললেন, "ওরে তোর খুড়ীকে গিয়ে শান্ত কর। ও রাগলে আমার সব নষ্ট হয়ে যাবে।"

সারদার ওপর রামকৃষ্ণের এই অত্যন্ত শ্রদ্ধা ষোড়শী পূজোর পর থেকেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছে।

সারদামণি অনেক সময় স্বামীকে মেয়ে সাজিয়ে দিতেন পরিপাটী করে, স্বামী যাবেন দেবী কালীর কাছে পরিচর্য্যা করতে।

রাতের বেলা কিছু দিন রামকৃষ্ণের কাছে শোওয়ার পর নহবতেই দিনে ও রাতে সারদা থাকতে লাগলেন। সে সময় কোন উৎসাহী মহিলা ভক্ত আগ্রহ করে নিজে রামকৃষ্ণদেবকে খাওয়াতে আসতেন। কাজেই সারদার আর তাঁর সঙ্গে দেখাও হত না। সারদা বলেছেন, "কখনো কখনো দু'মাসেও হয়ত এক দিন ঠাকুরের (রামকৃষ্ণের) দেখা পেতুম না। মনকে বুঝাতুম, 'মন, তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস যে রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি?"

নহবতে থাকার সময় প্রথম প্রথম ঘরে ঢুকতে মাথা ঠুকে যেত। এক দিন কেটেই গেল। শেষে অভ্যেস হয়ে গিছল। দরজার সামনে গেলেই মাথা নুয়ে আসত। কলকাতা থেকে সব মোটা-সোটা মেয়েলোকেরা দেখতে যেত, আর দরজার দু'দিকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলত, 'আহা, কি ঘরেই আমাদের সীতালক্ষ্মী আছেন গো, যেন বনবাস গো!"

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় বারে দক্ষিণেশ্বরে আসবার সময় ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরও দু'জন বৃদ্ধা গোছের মেয়েছেলে ছিলেন। পিছিয়ে পড়া তাঁরা তিন জনে রূপোর বালা পরা, ঝাঁকড়া চুল, কালো রং, লম্বা লাঠিওয়ালা মানুষ দেখে ভয়েই অস্থির। সাহস করে সারদা তাকে 'বাপ' বলে ডেকে তার কাছ থেকে বাপের মতই ব্যবহার পেয়েছিলেন। আশ্চর্য্যের কিছু নেই!

জানা গেছে সারদা স্বামী পূর্ণানন্দ নামে কোন এক সন্ন্যাসীর কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ তাঁর জিবে একটি মন্ত্র লিখে দিয়েছিলেন। সারদা সে সময় দৈনিক লক্ষ জপ না করে কিছুই খেতেন না। রামকৃষ্ণ অনেক দেব-দেবীর মন্ত্রও সারদাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

সাধন-ভজনে সারদা অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী মহিলা ছিলেন এবং উচ্চ অবস্থা লাভ করেছিলেন সন্দেহ নেই। তাঁর সাধন কালের এক দিনের একটি ঘটনা সম্বন্ধে তাঁর বহু দিনের সঙ্গিনী যোগিন্-মা বলেন, 'নহবতে এসে দরজা একটু খুলে দেখি, মা (অর্থাৎ সারদা দেবী) খুব হাসছেন। এই হাসছেন, আবার একটু পরেই কাঁদছেন। দু'চোখ দিয়ে ধারার বিরাম নেই। কতক্ষণ এই ভাবে থেকে ক্রমে স্থির হয়ে গেলেন, একেবারে সমাধিস্থা।"

এক দিন রাতে কে বাঁশী বাজাচ্ছিল, বাঁশীর স্বরে সারদা আবিষ্টা হলেন, থেকে থেকে হাসতে লাগলেন।

বেলুড়ে এক বাড়ীতে এক দিন রাতে ধ্যান করছিলেন, সঙ্গে আরও দু-এক জন ভক্ত। অনেকক্ষণ পরে তাঁদের ধ্যান ভাঙল। কিন্তু সারদার ভাঙতে আরো দেরি। ভাঙার পর বলছেন, "ও যোগেন, আমার হাত কই, পা কই?"

রামকৃষ্ণ বেঁচে থাকতে দক্ষিণেশ্বরে নহবত-ঘরে শ্রীহরিশচন্দ্র মুস্তফিকে (পরে সন্ন্যাস নিয়ে স্বামী ত্রিগুণাতীত নামে পরিচিত) সারদা দীক্ষা দেন। রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর সেই বছরেই শ্রীযোগেন্দ্র-নাথ রায় চৌধুরীকে (স্বামী যোগানন্দ নামে পরে পরিচিত) বৃন্দাবনে দীক্ষা দেন।

লছমীনারাণ নামে এক মাড়োয়াড়ী রামকৃষ্ণপরমহংসকে একবার দশ হাজার টাকা দান করতে চায়। রামকৃষ্ণ সারদাকে নিতে বললেন। সারদা কিছুতেই রাজী হন না, বলেন, "তা কেমন করে হবে? টাকা নেওয়া হবে না; আমি নিলে ঐ টাকা তোমারই নেওয়া হবে।"

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট রামকৃষ্ণ দেহ ছেড়ে চলে গেলেন। সারদার তখন তেত্রিশ বছর চলছে।

স্বামীর মৃত্যুর পরও সারদা বরাবর দু'হাতে দু'গাছি বালা রাখতেন ও সরু লালপেড়ে কাপড় পরতেন।

রামকৃষ্ণ চলে যাওয়ার পর সারদা গেলেন কামারপুকুরে। সেখান থেকে কলকাতায় শিষ্যদের কাছে আসবার সময় রক্ষণশীল ও অনুদার গাঁয়ে কত কথাই যে উঠল! প্রচলিত সামাজিক

শ্রীমা

রীতি-নীতিকে স্পর্দ্ধার সঙ্গে অবজ্ঞা করতেন না বলে সারদা শুনেই যেতে লাগলেন। পরে লাহাদের প্রসন্নময়ী নামে এক ভারি ধার্মিক ও বুদ্ধিমতী বৃদ্ধা বিধবা এ বিষয়ে খুব উৎসাহ দেওয়ায় অনেকে যাবার মত দিলে।

সন্ধ্যের সময় রাস্তার ধারের বারান্দায় এক দিন হরিনামের ঝুলিটি নিয়ে জপে বসেছেন। সামনের মাঠ থেকে একটা কোলাহল কানে এল। একটি লোক এক স্ত্রীলোককে খুব মার লাগিয়েছে, লাথিরও বিরাম নেই। সারদার জপ বন্ধ হয়ে গেল। চীৎকার করে উঠলেন, "বলি, ও মিন্‌সে, বৌটাকে একেবারে মেরে ফেলবি নাকি, আঃ মলো যা!" সময় মত ভাত রান্না করে রাখেনি এই তার অপরাধ।

বলরাম বসুর চাকর 'ঠাকুর মা' 'ঠাকুর মা' করে ডেকে ঠাকুর-ঘরে কতকগুলি আতা দিয়ে গেল। যে ঝুড়িতে করে এনেছিল, নীচের তলার সাধুদের কথায় তা রাস্তায় ফেলে দিলে। সারদা দেখতে পেয়ে বললেন, "দেখেছ? কেমন সুন্দর চুপড়িটি ওরা (সাধুরা) তখন ফেলে দিতে বললে। ওদের কি? ওরা সাধু মানুষ, ও-সবে কি আর মায়া আছে? আমাদের কিন্তু সামান্য জিনিষটিও অপচয় করা সয় না। ওটি থাকলে তরকারির খোসাটাও রাখা চলত।" এই বলে ঝুড়িটি আনিয়ে ধুয়ে রেখে দিলেন।

রক্ষণশীল পল্লীগ্রামের সরলা স্ত্রীলোক হয়েও সারদা গুণের কাছে জাতিভেদ বুদ্ধিকে ছোট করতেন। শ্যামাদাস কবিরাজ সারদার আত্মীয়া রাধুকে দেখতে এসেছিলেন। সারদার কথায় রাধু তাঁকে প্রণাম করলেন। এ ঘটনায় কেউ কেউ রীতিমত অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, 'বৈদ্যকে প্রণাম করতে বললেন কেন?' সারদা সহজ দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'তা করবে না? কত বড় বিজ্ঞ, ওঁরা ব্রাহ্মণতুল্য, তাঁকে প্রণাম করবে না ত কাকে করবে?"

আর একবার বসন্ত থেকে সেরে উঠেছেন। গোলাপ-মা নামে এক মেয়েভক্ত সারদাদেবীর ঘরে ঢুকে তাঁকে মুখ নাড়তে দেখে বললেন, "মা, কি খাচ্ছ?" সারদা বললেন, "দুটো ডাঁটা চিবুচ্ছি।" সেই ডাঁটা শূদ্রের এনে দেওয়া এবং ভাতে ছোঁয়া শুনে জাত যাওয়ার ভয়াবহ বিপদ ঘটল বলে গোলাপ-মা চীৎকার করে উঠলেন। সারদা অম্লান বদনে জানিয়ে দিলেন, যে এনেছে সে ভক্ত এবং (তাই) সেও ছেলে; অতএব ওতে কোন দোষ নেই।

এ ত তবু ভাল। গাঁয়ে একবার এক মুসলমানকে বাড়ীর ভেতরে তাঁর নিজের ঘরের বারান্দায় যত্ন করে খাইয়ে, এঁটো জায়গা নিজেই ধুইয়ে দিয়েছিলেন। বললেন, আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজাদও (মুসলমানটির নাম) তেমন।"

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঁকুড়ার পুলিশ দুইটি স্ত্রীলোককে গর্ভাবস্থায় বন্দী করে হাঁটিয়ে থানায় নিয়ে গেছে এ খবর এক দিন শুনে সারদা শিউরে উঠলেন। বললেন, "এমন কোন বেটাছেলে কি সেখানে ছিল না যে দু'চড় দিয়ে মেয়ে দুটিকে ছাড়িয়ে আনতে পারত? পরে পুলিশ তাদের ছেড়ে দিয়েছে শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, "এ খবর যদি না পেতাম, তবে আজ আর ঘুমুতে পারতাম না।"

দক্ষিণ-ভারতে রামনাদে গিয়েছিলেন। রামনাদের রাজা মন্দিরের রত্নাগার খুলে দিলেন, আদেশ হল যদি কোন জিনিষ পছন্দ হয় তখনই যেন তা সারদাকে দেওয়া হয়। রামকৃষ্ণের স্ত্রী বললেন, "আমার আর কী প্রয়োজন? আমাদের যা-কিছু দরকার সব শশীই (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) ব্যবস্থা করছে।"

বিকেলে রাতের কুটনো কুটছেন। পরলোকগত সব চেয়ে ছোট ভাই অভয়চরণের অপ্রকৃতিস্থা স্ত্রী সুরবালা একখানা জ্বালানি কাঠ নিয়ে কুটনো কুটনির মাথায় এই মারে ত সেই মারে। একটা ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা। সারদাও উত্তেজিতা। বলছেন, "পাগলী, ঐ হাত তোর খসে পড়বে।" বলেই জিব কাটলেন। বললেন, "ঠাকুর, (পরমহংসদেবকে 'ঠাকুর' বলতেন) এ কি করলাম? এখন উপায় কি হবে? আমার মুখ দিয়ে কোন দিন কারও ওপর অভিসম্পাত বাক্য বেরোয়নি।"

সংসারাসক্ত লোক এসে সারদাকে কেবলই উত্যক্ত করে। শেষে বললেন সারদা, "তোমাদের বছর বছর ছেলে হবে; একটুও সংযম নেই; আমার কাছে এসে 'আমার উপায় কি?' বললে কি হবে?"

স্বদেশী যুগে গঠনমূলক কাজ না করে কেবলই হৈ-হল্লা করাকে পছন্দ করতে না পেরে এক দিন বলেছিলেন, "দেখ, তোমরা 'বন্দে মাতরম্' করে হুজুগ করে বেড়িও না, তাঁত কর, কাপড় তৈরী কর। আমার ইচ্ছা হয়, আমি একটা চরকা পেলে সুতো কাটি। তোমরা কাজ কর।"

ভক্ত পাগল হরিশের কাছে সারদার এ কোন্ রূপ? কামার-পুকুরে এসেছিল। সারদা পাশের বাড়ী থেকে আসছেন। হরিশ পিছু পিছু দৌড়ুচ্ছে। ধানের গোলার চার দিকে সারদা ছুটছেন ত ছুটছেন, হরিশ তার পেছনে। কেউ কাছে-পিঠে নেই। শেষে ক্লান্ত হয়ে সারদা আর পারলেন না। তার বুকে হাঁটু দিয়ে জিব টেনে ধরে গালে পটাপট চড় মারতে লাগলেন। তবে সে ঠাণ্ডা হল।

শ্রীসুরেন রায় নামে এক ভক্ত বলেছেন, "এক দিন বিকেলে তিনটে-চারটের সময় গিয়েছি, মা (সারদামণি) প্রসাদী দুধভাত রেখেছিলেন। এনে খেতে দিলেন। জীবনে কখনও মাতৃস্নেহের আস্বাদ পাইনি, হঠাৎ কেমন ভাবান্তর হল ও বলে ফেললাম, 'না খাব না, খাইয়ে না দিলে খাব না। মা (সারদামণি) পিঁড়ি পেতে দিয়ে খাওয়াতে বসলেন। তখনও বললাম, "না, খাব না, মুখে ঘোমটা দিয়ে খাওয়ালে খাব না।' মা তখন মুখের অবগুণ্ঠন খুলে ফেললেন এবং খাওয়াতে খাওয়াতে কোথায় আমার বাড়ী, এখানে কি করি ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।"

এক ভক্ত বলছেন, "মা, তুমি যে আমাদের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার কর, এটা আমাদের ভাল লাগে না।" মা বললেন, "বাবা, তোমরা যে আমার ছেলে। মা ছেলেমেয়ের কত গু-মুত পরিষ্কার করে, তোমরা ত সব বড় হয়ে আবার কাছে এসেছ। আমি কি অপরাধ করেছি যে তোমাদের ঐ সামান্য সেবাটুকুও করতে পাব না?"

পূব-বাংলার এক ভক্ত শ্রীদ্বারকানাথ মজুমদার জয়রামবাটীতে দীক্ষা নিয়ে দু'ক্রোশ দূরে কোয়ালপাড়ায় গিয়ে ভীষণ জ্বরে পড়েন এবং শেষে মারা যান। এই খবর পেয়ে সারদামণি অবিরাম কাঁদতে থাকেন।

স্বামী সত্যকাম নামে এক জন সাধুকে বলেছিলেন, "গেরুয়া পরে

কখনও মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়ো না। মন যখন ঠিক থাকবে না, আমার অনুমতি রইল, গেরুয়া ছেড়ে দিয়ে বিয়ে করবে। নেড়া-নেড়ীর দল করার চেয়ে বিয়ে করা ভাল।"

পেয়ারাফুলি, ছোট ল্যাংড়া ও 'টক-টক মিষ্টি-মিষ্টি' আম, ডুমুরের ডালনা, আমরুল, ঘিমে, ছোলা, মূলো প্রভৃতি শাক, মুড়ি, ফুটকড়াই, বেগুনি, ফুলুরি প্রভৃতি তাঁর প্রিয় খাদ্য ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যাওয়ার আগে তাঁর আশীর্বাদ নিতে এসে বলেছিলেন, "মা, যদি মানুষ হয়ে ফিরতে পারি, তবেই আবার আসব, নতুবা এই-ই।"

ভক্তদের বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় প্রভৃতি তাদের না জানিয়ে কত দিন যে কেচে দিয়েছেন তার কোন ঠিক নেই! সেলাই প্রভৃতি কাজে মেয়েদের খুব উৎসাহ দিতেন এবং নিজেরটা নিজেই সেলাই করে নিতেন। সেমিজ প্রভৃতি তাঁকে পরতে দেখা যেত না। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হিসেবে অভ্যস্তও ছিলেন না। ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশার বিরোধী ছিলেন। অবসর সময়ে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পড়তেন ও পড়াতেন।

সারদার সব চেয়ে ছোট ভাই প্রবেশিকা ও ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের পরীক্ষা পাশ করেছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর থেকে ছোট ছোট ভাইপোদের সম্বন্ধে সারদা বলতেন, "ওরা সব মুখ্যু-সুখ্যু হয়ে বেঁচে থাক।" কিছু বললে বলতেন, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোরা কি জানিস? আমি অভয়কে মানুষ করলুম, অভয় চলে গেল।"

শশিভূষণ (রামকৃষ্ণানন্দ) মৃত্যুশয্যায় সারদাকে দেখতে চান, সারদার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। সারদা তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে কাতর হয়ে বলেছিলেন, "আমার কোমর ভেঙে গেছে। গণেন নিতে এসেছিল, আমি ভাদ্র মাস বলে গেলুম না।"

১৯২০, ২০শে জুলাই, রাত দেড়টা। ৬৭ বছর বয়েস। স্বামীর মৃত্যুর পর দীর্ঘ ৩৪ বছর বেঁচে থেকে ও শত শত লোককে ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত করে সারদা শরীর ছেড়ে চলে গেলেন।

'প্রবাসী'র ১৩৩১এর বৈশাখ সংখ্যায় পরলোকগত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "সত্য বটে, রামকৃষ্ণ সারদামণিকে শিক্ষাদি দ্বারা গড়ে তুলেছিলেন; কিন্তু যাঁকে শিক্ষা দেওয়া হয়, শিক্ষা গ্রহণ করে তার দ্বারা উপকৃত ও উন্নত হবার ক্ষমতা তাঁর থাকা চাই। একই সুযোগ্য গুরুর ছাত্র ত অনেক থাকে, কিন্তু সকলেই জ্ঞানী ও সৎ হয় না। সোনা থেকে যেমন অলঙ্কার হয়, মাটীর তাল থেকে তেমন হয় না।"

গত যুগের জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী

৺কৈলাসবাসিনী দেবী

তোমার চিটি পাইয়া আমি যেন মৃত্যুদেহে প্রাণ পাইলাম। আমি আজ কোন কর্ম্ম করি নাই, শমস্তো দিন ভাবিতেছি, ঘাটে শায়েবের বোট বাঁদা আছে, শেই ছাদে বসে দুরপিন দে দেকিতেছি। আর কতো মনে কচ্চি যে একদিনে স্ত্রী কন্ত্যা হারালেম, হায় আমি কি হতোভাগা আমি জদি শঙ্গ থাকিতাম তাহলে শঙ্গে মরিতাম। আজ জদি তোমাদের কিছু হতো তা হলে আমি এই বোটে থেকে পদ্দায় ঝাঁপ দিতুম। তাতা কিছু আশ্চয্য নয়। বরং না দেয়আশ্চয্য। আমার মতন স্ত্রী কেউ পেরাপনা করে পায় না। আর আমার কন্তার মতন কন্তে কেউ পাবে না। আমার কন্তা রূপে নক্ষি গুণে সরোশ্বতি। আমি কুড়ি জোন কুলি পাটাতেছি, ধাঁদে ধাঁদে বজোরা আনিবে। জেখানে বাদিবে সেই থানের বালি কেটে কিম্বা পিট দে ঠেলে আনিবে। তা যদি না পারে তা হলে জেখানে তুমি থাকিবে সেইখানে আমাকে রাত্রে দেকিতে পাইবে, আমি হাতিতে জেখানে জাইবো তাই হলে।—চিটি পড়া হলে তার খানিক বাদে চার জোন বরকোন্দায আর কুড়ি জোন কুলি য়েল। সেই রকম করে নেগেলো। ৭টার সময় শেখানে পৌচিলাম। কাত্তিক মাসের হিমে বোটের ছাতে দুরপিন হাতে কেদেরা পেতে বশে আছেন। বোটে বোটে ভিড়ে দেয়। বোটে বোটে নাগায়ে দিলে আমার বোটে য়েলেন। সেখানে রান্না তয়ের ছেলো তখনি খাওয়া হলো। জদি কেউ মনে করেন জে শময় আমার কন্তা ৩ বৎসর শাত মাশের, তার গুণ আমরা কি করো জানিতে পারিবো, তার কারণ বৎকিঞ্চিৎ নিকি। আমার কন্তা জখন ৩ বৎসরের তখন একদিন কাঁচের পুত্তুল বেচতে আসিআছেল এক বাজোরা। আমার স্বামি বলেন কুমুদকে দেকিয়ে আন। আমার এক খুড়শশুর বলেন, তাকে দেকাবে কি, সে সব চাবে। বাবু বল্লেন আমার তোমন মেয়ে নয়। তাঁরা হাশিলেন, বলেন আচ্চা দেকা যাবে। তার পরে চাকর বাড়ির ভিতর বাজোরা শমেত আলে কুমুদ দেকে কলে জিজ্ঞাশা করে য়েশো কটি দেবেন। বাবু বলেন দুইটি দেবো। চাকর য়েশে বলে দুইটি দেবেন। আর কিছু না বলে দুইটি ব্যেচে দিলে। জাঁরা বলেছেলেন তাঁরা অবাক হলেন। বলেন একি ছেলে, য়েমনি শকল গুণ। ১০ মাশের মে ওকে বিদেশে ব্যড়াচি, দইবাৎ জদি পথে দুদ না পায় জেতো তাতে কিছু বলিতো না। আমি আগে নিকিয়াছি কাত্তিক মাসে আমার বড় পীড়া হইয়াছেল। তখন কুমুদ ৮ মাশের। সেই অবদি আমার দুদ চাড়ে। তথাপি দুদ না পেলে খেলা কত্তো খেতে চাইতো না।—শেখানে ৫।৬ দিন রহিলেন। আর শেখানের শব কায কর্ম্ম শারা হল। বল্লেন চল এইবার রামপুর জাই। আমি বললুম আমি আর রামপুর জাবো না। তাহাতে অনেক বলাতে আমি রাজি হইলাম। তার পরে রামপুরে গেলুম। শেখানে জেদিন জাই সেই দিন ভুত চতুদ্দশি, সব চতুর্দ্দিকে আলো দেবে। আমারা সেখানে সন্দে বেলা পৌচিলাম নিলমণী বাবুর বাশা। পদ্দা নদির ধারে। সেখানে চাপড়াসি খপর দিলে তখনি পাল্কী য়েলো। আমরা শেখানে গেলাম। শেইখানে দুই দিন থাকি। তিন দিনের দিন আমরা ভোরে ভোরে বজরায় উটি। আমার পাল্কীর দুই ধারে দুটি মার্ন্‌গের্ণ্য চাপরাশি অর্থাৎ বাবু ও নিলমণী বাবু তাঁরা আমার শঙ্গে শঙ্গে বরাবর য়েলেন। জে রকম করে বড় নোকদের ফেমেলি তুলিতে হয় সেই রকম করে তোলা হল। অর্থাৎ দাঁড়ের কাছ অবধি পাল মোড়া হল, শকলে শরে গেল, তার পরে আমি বজরায় উঠিলাম। পথে আর কোন তুফান হলো না। কোন ঘটনা হল না, আমার স্বামি কোথাও আড্ডা ফেলেন না। শন্দে ব্যেলা আমরা নাটুরে য়েলম। য়েশে বাঁচিলাম। কাত্তিক মাশে য়েশে অগ্রাণ মাশে বলেন আবার মপসলে জাবে। আমি হেশে বলিলাম আর নয়। তিনি বলিলেন কেন। আমি বলিলাম আবার আমাকে

তুফান খায়াবে পদ্মাতে, আর তুমি ব্যেড়াবে ডেয়ানা ডেয়ানা। এবারে পদ্মাতে জাবো না, গালিমপুর জাবো, শে বড়াল নদির ধারে, তাহাতে তোমার কোন কষ্ট হবে না, তুফান খেতে হবে না। আমি বলিলাম আচ্চা জাবো, তুমি জখন শঙ্গে থাকিবে তখন ভয় কি, তুপান হক কিম্বা জল হক কি ঝড় হক তাতে আমার ভয় হবে কেন। ও একবার বলিলাম। বলাতে বড় আহ্লাদিত হইলেন। জাবার শব প্রস্তুত হইলো। তার পর দিন খায়া দায়া হলো ব্যালা ১১ ঘণ্টার শময়। নাটুর থেকে ছেড়ে রাত্র ৮ ঘণ্টার শময় গালিমপুর পৌছাই। পথে কোন কেলেশ হয় নাই বরং আরাম হইয়াছেল। আমরা জে বজোরায় জাচ্চি বাবুর তাহাতে একখানি খাট পাতা আছে। খাটে বসে আমরা তাশ খেলিতে খেলিতে জাই। জানালার মুকের কাছে নদীর তামাশা দেকিতে ২ জাই। ক্রমে ২ ব্যেলা জতো পড়িতে নাগিল ততো নদীর আরো বাহার বাড়িতে লাগিল। আহা কি চমৎকার ঢেউ দেকিতে হলো। আর তার উপর জখন চপাত চপাত করে দাঁড়গুলি পড়িতে নাগিল তাহা কি মনহর দৃশ্য হইল। তাহা দেখিবার জন্নে আমরা খেলাতে ক্ষেন্তো দিলাম। দে জানালার কাছে বশে গল্প করিতে নাগিলাম। গ্রামের ধার দে আমরা জেতে নাগিলাম। কতো বৌ ঝি জল নে জাইতে নাগিলো তাহা আমরা দেকিতে নাগিলাম। ক্রমে ২ সূর্য্যদেব জখন লাল মুর্তি ধারণ করিলেন তখন নদির উপরে প্রকাণ্ড মুর্তি ধারণ হইল। তাহা দেকিতে অতি উত্তম হইল। আমার কুমদ বড় আলাদিত হইতে নাগিল। কখন দেকে, কখন হাশে, কখন খেতে চায়। তাহা দেখে আমরা কাছে আস্তে বলিলাম। আমাদের দেকে আরো আহ্লাদিত হইলো। একবার বাবুর কোলে একবার আমার কোলে নাপানাপি কত্তে নাগিলো। তার খানিক বাদে ঘাটে বোট নাগিল। রাত্র তখন ৮টা। শেদিন শুকল পক্ষের ত্রয়োদসি আবার চাঁদ। আমরা জেখানে পৌচিলাম শে জাগার নাম গাগিলপুর। শেখানে একটি নিলকুটি। শেটি বড়াল নদির ধারে। শেখানকার শাহেবের নাম জেনিং শায়েব। বাবু কুটিতে গেলেন আমি বোটে রহিলাম। মাজিমাল্লা শকলে উটে গেলো। চাকোর চাপড়াসি শব উটে গোলো। কেবল ঝি রহিল। তখন আমি জেখানে দাঁড় ফেলে শেইখানে গে বশিলাম। আমি আমার ঝিয়ে আর আমার কুমুদ। আবার জলের উপর চাঁদ উটিল তাহা দেকে আমার মনের ভাবও শেই রকম আমোদিত হইলো। শেখানে বসে ২ দেকিতে নাগিলাম। বাবুতে ও সায়েবে দুই জোনে খানা খেতে লাগিলেন। সে কুটি নদির ধারে। শেখানে ভাঙ্গন নাই। তখন আমার বয়েশ ১৭ কিম্বা ১৮ বৎসর। বাবুর বয়েশ ২৪ কিম্বা পচিশ বৎসর। আমি বশে ২ খানা খাওয়া দেকিতে নাগিলাম। শব পোশাক পরা চাপড়াশি ও খানশামা ঘুরিতে লাগিলো, তাহা দেকিতে কি উত্তম আমার চকে কি চমত্তকার লাগিলো। আমি হিমে বশে রহিলাম তাহাতে আমার কোন কেলেশ হলো না। তার পরে ১০ রাত্র বাবু বোটে শুতে য়েলেন। এই রকম আমোদে সেখানে ৭ দিন থাকি। তার পরে নাটুরে আশি। আরেকবার ওখানে বৈশাক মাসে জাই। আশাড় মাসে বলেন আবার মপশলে জাবে। আমি বলিলাম জাবো কিন্তু বসে বসে পা ব্যথা হয়। বাবু বলেন য়েবারে বসে থাকিতে হবে না। সামপুরে জাবো সেখানে কুটি খালি পড়ে আচে। সেখানে শায়েব নাই কুটিতে দুইজোনে থাকিবো। বোটে বসে কষ্ট পেতে হবে না। আমি বলিলাম আচ্ছা। তার পরে আমরা শামপুর গেলুম। সেখানে তোফা বাড়ি, জেন একটি রাজবাড়ি কিন্তু একতোলা। খুব উঁচু শুরু খট খট কচ্চে জেন দোতোলা বাড়ি। একদিকে নদি তিন দিকে মাট। সেখানে মানুশের গমাগম নাই। মাট হু হু কচ্চে। হাট নাই বাজার নাই। কেবল দুপুর বেলা কতোগুলি রাখাল গরু চরাতে আশে মাত্র। তা হতে আমার কোন ভয় হতো না। বাবু আর কোথাও জেতেন না, সেই বাড়িতে থাকিতেন, সেই খানে কাচারি করিতেন। আমরা শেখানে ১০ দিন থাকি। এক শনিবার কুঞ্জ বাবু ও খেতোর মহন বাবু য়েসেন। তাঁরা সে রাত্র সেখানে থাকেন। তাঁরা জান, আমারা নাটুরে আসি রাত্র তখন ৯টা। এই সালে নাটুরে ডাক্তারাখানা কল্লেন। তাহাতে লোকের বড় উপোকার হয়, কেন না সেখানে ডাক্তারখানা ছেল না। য়্যেমন কি ২৬ কোশের ভিতরে ছেলো না, কেবল রামপুর ছেলো, তাহাতে গরিবে অসুদ পেতো না। এক জোন সাহেব ছেলো কোম্পানির মাহিনা পেতেন। হাকিমদের দেকিতেন। আর জাঁরা বড় বড় নোক তাঁরা নিতেন। এ হল দাতোব্যো চিকিৎশালয়। গরিবের বড় উপকার হতে নাগিল, তাহাতে শকলের খুব শন্তোশ হইলো। সেখানে আমরা বড় সুকে ছিলুম। রাজধানি জায়গা সব পায়া জেতো। আগে ওখানে জেলা ছেল না বলে রামপুর যায়। শেখানে গেচে বটে কিন্তু পদ্দা পেটে পুচ্চেন। পদ্দা য়েমনি ভাঙ্গন ধরেচেন অতি অল্পদিনের মধ্যে বোধ হয় জেলাটি উদরশাৎ করিবেন। ওপারে অতো ভাঙ্গন নাই কিন্তু এপার দিন দিন ক্ষয় হত্তেচে। আমি রামপুরে ভাল ছিলাম কেননা সেখানে আমাদের দিশি নোক অনেক আছেন। তাদের স্ত্রী শবার শঙ্গে আচেন। কিন্তু বাবু আমাকে পাঠাতেন না কারো বাসাতে। কেবল নিলমনি বশাকের বাসাতে আর ক্ষেতর মহন মুকুয্যের বাসাতে পাটাতেন। সেই দুই জায়গাতে শকলে জমা হইতো। তাতে ভাব শাব হইত। ঘরে য়েসে নোক পাটান, চিটি নেকা, ছেলে পাঠান, তত্তোতাবাশ হতো। তাতে ভাব থাকিত। পূজার শময় এক সঙ্গে আসা হত্তো বোটে ২ দেকা হতো কথা হইতো। এক জাগাতে নাগান হলে তাশ খেলাও চলিতো। তার পরে হুগলি য়েশে ক্রেমে ২ ছাড়াছাড়ি হতো। কেউ হুগলি কেউ চানক সব উটিতেন। জাঁরা কলিকাতার তাঁরাও ছাড়াছাড়ি হতেন। বাড়ি নিকটে হলে কিন্তু আমাদের প্রায় সেদিন সেখানে থাকিতে হইতো। আমার এক পিসতুতো ভাশুর শেখানে শদর আলা ছেলেন, আশিতে ও জাইতে প্রায় এক রাত্র আমরা থাকিতাম। কিন্তু নাটুরে য়েশেও আমি ভাল আছি, য়েখানে কোন কেলেশ নাই। আমরা শর্ব্বোদা আমোদে আছি। জদিও তত নোক নাই তথাপি ক্ষেতোর মহন বাবুর স্ত্রী, তাঁর ভাগ্নে বউ আর তার বৌ, নাজিরের স্ত্রী ও তাঁর ভগ্নি ও অন্ন ২ পরিবার। আমারা শর্ব্বোদা আমোদ আহ্লাদে থাকিতাম। আমার স্বামি শদানন্দ তিনি কখন দুঃখিত থাকেন না। তাতে বয়েশের জোর ও মানের জোর। পদের জোর ও ধনের জোর। কাজে ২ তাতে আবার নেশার জোর জুটিল। তাঁর শঙ্গিদের নাম গুলি নিকি। দিগেপতির বাবু ও বুদ্ধু মিয়া ও কুঞ্জলাল বাড়ুয্যে ও নালয়ের তারানাথ ও ডাক্তার মহন মুকুয্যে তাঁর

ভায়েরা প্রধান। আর কুচোকাচা অনেক আছে তাদের নাম নিকিবার আবিশ্যক নাই। ওঁদের দল ভারি ছেলো, আমাদের দল কম ছেল। তাহাতে আমরা শুখি ছিলেম। তার কারণ য়েই জে আমরা স্ত্রীলোক আমাদের অন্তকরণ খুদ্বর, মন অল্প, কাজে কাজে অল্পতে তুষ্ট হই। অই স্বাধিনতায় আমরা তুষ্ট ছিলাম। ভোরে এক এক দিন নদিতে নাহিতে পাইতাম। শকলে একত্তোর হয়ে। রাত্রে হেঁটে শবাই শবার কাছে জেতে পারিত'ম। নাগোয়া নাগোয়া বাসা ছেল, দিনে গেলে পাল্কিতে জেতে হইতো। আমার কুটি নদির ধারে ছেল, পাকা বাড়ি শরকারি বাড়ি। তাঁদের বাংলা ছেলো যে পারে বড় বসতি নাই। কেবল আমাদের নোক জোন দিনের বেলা পুলিস বশিতো। রাত্রে কেউ থাকিতেন না। জেদিন বাবু রোদে জেতেন কি মপশলে যেতেন সেদিন আমরা শকলে বাগানে ব্যড়াতেম, তাহাতে মানা ছেলো না। আপনিও আমাকে নে বাগানে ব্যড়াতেন তাহাতে তাঁরা ব্যড়াতে পেতেন না। তাঁরা আমার স্বামির সহিত বেরুতেন না, আমিও তাঁদের স্বামির সহিত বেরুতোম না। কাজে ২ একেত্তোর ব্যেড়ান শকলের হতো না। আমার স্বামিকে শকলে য়েমনি ভাল বাসিতেন জে শকলে সেইখানে এক খানি ২ বাংলা করিলেন। পেরু শাহেব একখানি বাংলা কল্লেন, বুদ মিয়া একখানি বাংলা কল্লেন। ক্ষেত্তোর মহন বাবুর বরশাতে চার মাশ মাপ থাকে না। শরকারি হুকুম এই চারি মাশ মুর্শিদাবাদ থাকিবেন, তিনি তাহা না থেকে ওখানে থাকিতেন বরশা কালে। কুঞ্জ বাবুর হুকুম জে বরশা কালে রামপুর থাকিবেন কিন্তু তিনি তাহা না থেকে ঔখানে বরশা কাটাতেন। আমরা জখন আগে রামপুর ছিলেম তখন ওঁরা রামপুরে বরশা কাটাতেন। আমরা নাটুরে আসাতে ওঁরা নাটুরে বরশা কাটাতে লাগিলেন। বরশাটা আরো গোলজার হতো। নদি তাতকালে হেঁটে পার হয়া যেতো। কিন্তু বরশা কালে সেই নদি দেকতে বড় ২ নৌকা জেতো তাহা আমার জানালার কাছে। আমরা সন্ধ্যা বেলা ছাতে বসে তাস খেলিতাম আর নদির তামাশা দেকিতাম। বড় ২ মহাজোনি নউকা। রংপুর ও দিনাজপুরে জে শব মহাজুনি নৌকা, তারা রাঁধিত, খেতো ও গান গাইতো। রাত্রে জলের উপরের গান বড় মিষ্টি নাগে। মাজিরে জে বোটে দাঁড় ফেলে আর গান গায় তাহা কি চমৎকার শোনায় তেমন ভালো ২ গায়েকের মুকে শোনায় না, তেমন গান বড় ২ যাত্রাওয়ালাদের মুখে অতো ভাল লাগে না। ১২৫৬ এই শালে পূজার শময় আমরা কলিকাতাতে আশি পূজার সময় পঞ্চমি দিনে আমরা শান্তিপুরে পৌচাই সেদিন বেলাতে মাট ও ময়দান দেকিতে ২ আশিতেচি। তার পরে শহর দেকিলে মন কত সন্তোষ হর তাহা নিকিবার নয়। জদ্যপি নিকি তাহা বর্ণনা হয় না। জারা সে রকম দেকেচেন তাঁরা বুঝিতে পারিবেন। বাবুতে আমাতে একখানি বেঞ্চেতে বশে তাশ খেলিতেছি আর চার ধারের তামাশা দেকিতেছি। ক্রমে ২ সন্ধ্যা হল। সূর্য্যদেব নাল মূর্ত্তি ধারন করে গমন করিলেন তখন আমরা তাশ খেলিতেছি। শুকল পক্ষ জোছনা, আবার শেজ জেলে দেচে। আর কতো নৌকা জাচ্চে, তাহাতে গঙ্গা অমনি আলোময় হইয়াছে। কতো বোট জাচ্চে তাহাতে শাহেব ও মেম রহিয়াছে। কোন খানায় বাই রহিয়াছে, কোন নৌকাতে যাত্রা-ওয়ালারা গান গাচ্চে। বাইনাচে তাদের শঙ্গিরে বাজাচ্চে। পূজার পঞ্চমি। গঙ্গাদেবি জল পোরা। আশ্বিন মাস বরসায় শেষ এক ২ মস্ত মস্ত ঢেউ আশিতেচে। দেকে বোধ হচ্চে জেন গঙ্গাদেবি শেই শঙ্গে নৃত্য করিতেছেন। তখন আমরা খেলা রেকে দেখিতে নাগিলাম ও কুমুদকে আমাদের কাচে আনিতে বলিলাম। কুমুদ আমাদের কাছে য়েশে বড় আহ্লাদিত হইল। দুই কোলে নাপানাপি করিতে লাগিল। তাহাতে আমাদের ভয় হইল পাছে পড়ে যায়। সে জন্তে নে যাতে বলিলাম—একে একটা ঘরে রেকে তোমরা চার ছ জোনে চউকি দাও এ বড় মেত্তেচে, আমরা দুই জোনে একে পারি নাই। তাহা বলাত্তে তখনি নেগেলো। হাকিমের মুকের হুকুম, তখনি ৫।৬ জোনে কয়েদ করে নে বসে রহিল, আমোরা আবার গঙ্গা দেকিতে নাগিলাম। জ্যোৎস্না ভোবো ২ হত্তে নাগিল। এমন শময় একটা বড় বিপদ হইল তাহা শংখেপে নিকি। একখানা ছিপে কত্তোক-গুলা নোক আমাদের চাপড়াশিদের শঙ্গে মুকোমুকি করে ক্রমে হাতাহাতি বাদিলো। তাহাতে শকলে বলে এরা ডাকাত। তাহাতে বাবু শান্তিপুরের মাজিষ্টর শাহেবকে চিটি নেকেন। তাহাতে পুলিশ য়েশে তাদের ধরে। তাহাতে জানা গ্যেল জে ডাকাত নয় তারা রাজ হনমন্ত সিংহের নোক। দুই দল সমান, কাজে কাজে যুদ্ধ সমান বেধে ছেলো। কিন্তু তাদের নোকেদের ২০০৲ টাকা জরিবানা হল। আমাদের নোকেদের কিছু হল না। আর কোন ঘটনা হল না। বাড়ি আসা গেলো। এই বংশর নাটুরে বড় মারিভয় হয়। তাহাতে আমাকে রেকে গেলেন। আমার শাস্তড়ি ঠাকুরানির কাশি জাবার কথা ছেলো। তিনি বলিলেন আমি জাবো শেই শঙ্গে নে যাবো। বাবু গেলেন কাত্তিক মাসে, আমরা গেলুম অগ্রাণ মাশে। এই বার বড় আমোদে জাওয়া হল। মেলা মাশসাশুড়ি ও পিসশাস্তড়ি দিদিশাশুড়ি, মেলা নোক। আর চড়ায় নাওয়া চড়ায় খাওয়া, পথে ২ ঠাকুর দেকা, এই সকল হতে নাগিলো। যার সঙ্গে যা করি তার বারণ নাই কিন্তু একোলা গেলে কিম্বা কার শঙ্গে গেলে ঐ নিমতালার ঘাট তুলিতেন। আর জে ঘাটে নাবিবো সেই ঘাটে নাবাবেন পালমুড়ে পাল্কিসুদো, কেউ দেকিতে পাবে না। এইবার দেকিতে দেকিতে জাচ্চি। আর প্রথম বার শাশুড়ি রাকিতে গেচেলেন, তাহাতেও দেকেচিলুম। কিন্তু তাতে দুই ভাশুর শঙ্গে ছেলেন, আর পুত্র শোক শঙ্গে ছেল, এই কারন ভাল করে দেকি নাই। এবারে মনের শাধে দেখিলাম। বদ্দিবাটির কালি, মলুযোড়ের নিস্তারিণী, বাঁশব্যেড়ের হংশেশ্বরি, নগরদ্বিপের গরুড়, অগ্রদিপের গুপিনাথ, সব দেকিতে ২ জাইতে নাগিলাম। জখন চড়াতে রান্না হইতো তখন আমরা চারদিকে ব্যাড়াতেম। অগ্রাণ মাশ ক্ষেত খোলা পরিপুর্ণ, দেকিতে কি চমৎকার। রদ্দুরের তাত্ত কম। খেতে বশে ২ ক্ষেতের বাহার দেকিতাম। তাহাতে মন কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইতো তাহার বর্ণনা করা আমার শাধ্যে নয়। আহা কোন দিকে মুলার ফুল, কোন দিকে সরিশার ফুল, কোন দিকে মটর শুটির ফুল। কোন দিকে শিম কোন দিকে লঙ্কা অমনি ক্ষেত্ত আল করে রাখিআচে, তাহা দেকিতাম ক্ষেতের ধারে আড়িলিতে

ব্যোড়াস্তে২। বৈকালে শকলে কাপড় কাচিতেন সন্ধ্যা করিতেন আমার ওই দুই কর্ম্ম নাই। তখন ছেলো না। তাঁরা জলে থাকিতেন আমি ঝিদের শঙ্গে করে ক্ষেতের ধারে বশে থাকিতাম। তাঁদের শন্দে আহ্নিক হলে শকলে নৌকায় আশিতাম। য়ের আগে আমি কখন নৌকায় উটি নাই। এইবার নৌকা দেকিলাম এও খুব বড় তিনটা ঘর। তার পরে নাটুরে জাই। শেখানে ওঁরা ১৫ দিন থাকেন। তার পরে কাশি জান, মাকে জেরকম করে পাটাতে হয় শেই শব দে পাটালেন তাঁরা। আশিবার বেলা ১৫ দিন থাকেন, তার পরে নাটুর, এই পর্যন্ত সংখেপে শেষ করিলাম। ১২৫৬ এই শালে পোশ মাসে নাটুরে জাই। শেখান থেকে ১২৫৯ এই শালে বদলি হএ আশাড় মাশে জাহানাবাদে কর্ম্ম হয়। শেই মাহিনা ৩৫০ শাড়ে তিনশো। কেবল য়েলেন বাড়ি কাছে বলে। আমাকে কলিকাতায় রেকে শ্রাবোন মাশের ৫ তারিকে জাহানাবাদে জান। তিনি শেখানে গেলে শেই মাশে বড় ব্যেম হয়। আমার জর পেটে ব্যাতা হয়াতে অনেক কষ্ট পাই। আগে ডাক্তার দেকেন, তাতে ভালো না হয়াতে মেটিকেল কালেজের বিবি দেকেন। শ্রাবোণ ও ভাদ্র দুই মাশে ভাল হই। ১৫ আশিনে বাবু আমাকে দেকিতে আইলেন। তিন দিন ছেলেন, তখন ছুটি হয় নাই এ বৎশর পুজা শেষা মাশে। পুজার ছুটিতে আমার চতুখো ভাশুর ও শিবচন্দর দে জাহানাবাদে জান। এই জন্যে বাবুর পুজার শময় আসা হয় নাই। তাদের ছুটি ১২ দিন বাবুর এক মাশ। ঔই শঙ্গে আমার দ্বিতিয় খুড়শশুর জান। তাঁরা শকলে কাত্তিক মাশের ৮ তারিকে বাটিতে য়েশেন। বাবুও য়েলেন। তাহাতে আমাদের বাটিতে খুব আহ্লাদ আমোদ হলো। পুযার শময় দুই বাবু ঘরে ছেলেন না, তাহাতে বড় আমোদ হয় নাই, অমনি শামান্য জাত্তারা হইয়াছেল। তাঁরা আশিতে একদিন মহেশ চক্কোবত্তির জাত্তারা হলো। শেই বতশর আমার কাত্তিক পুজা নেয়া হয়। শেদিনও ঔ জাত্তারা হলো। ১ অগ্রাণ আমরা জাহানাবাদে জাই। এখান থেকে খেয়ে জাই রাত্র শেখানে গে খাই। সেবারে ডাকে জাই তা না হলে দুই দিন নাগে। শেখানে রাত্র গেলুম তার পর দিন শকাল উটে দেকি বাড়িটি নদির ধারে। নদির নাম দারকেশ্বর। বাড়িটি ভাল কিন্তু একতোলা। ঈশ্বরচন্দ্র ঘোশাল তয়ের করান। বাঙ্গালিদের থাকিবার ভালো অনেক ঘর। তাঁর দুটি স্ত্রী ছেলো। এ জন্য দুইটি ভাল শোবার ঘর, দুইটি নাইবার ঘর, সব দুই দুই। বাটির ভিতরে জে বাগান তাহাতে দুইটি চবুতারা চারখণ্ড বাগান। তাহাতে কেবল শোগন্দ ফুল ও একটি আঙ্গুর গাছ। আমার স্বামির বড় বাগানে শক। তিনি আরো বাড়ালেন। মাটির পাঁচিল আরো শরিয়ে দিলেন। আরো নানান রকম ফুল ও ফল বশালেন। তাহাতে বাগান আর ভালো হলো। বাহিরে বাগান শেও ভাল। নদির ধারে একটি বড চবুতারা আছে। বাড়িটি দেকে সুকি হইলাম বটে কিন্তু ভদ্র নোকের নাম মাত্র নাই। শকলি মাট। শামনে এক ঘর মচনমান আচে। কোটা বাড়ি। খাশি মিয়া তাঁর নাম। এইতো পল্লী। আমার বাটিতে নোক জোন অনেক আছে, তাহাতে কি হবে তাদের শঙ্গে কি কথা কবো। বাবুর একটি মশায়েব আর আমি, যেই তাঁর ভরশা। আমার কন্যাটি আর স্বামি মাত্র ভরোশা। আর কোন প্রাণির মুক দেখিতে পাইতাম না। তাতে জে বড় কষ্ট তা হতো না। জখন মপশলে যেত্তেন তখন আমি রবিমশেন কুরুযের মতন থাকিতাম। খেতুম শুতুম বই পড়তাম শিল্প কর্ম্ম করিতাম। আমার কন্যাকে শেকাতেম, আর এই বই নিকিতেম। আর কবে আশিবেন দিন গুনিতাম। য়েলে জেন বাচিতাম।*

[ক্রমশঃ।

* মূলের বানান অশুদ্ধ হইলেও যথাসম্ভব রক্ষিত হইয়াছে। সমগ্র মূলটি অতি যত্নের সহিত কাপি করিয়া দিয়াছেন ডক্টর দের কল্যাণীয়া দুহিতা শ্রীমতী সুধীরা বসু।—সম্পাদক

হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ

হিমালয় দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছে দেশ-বিদেশের কত কে!

কাব্যে ও সাহিত্যে পর্য্যস্ত হিমালয়-বন্দনা। দূর দূর দেশ থেকে দলে দলে পর্য্যটককে যেতে হয়েছে হিমালয়ের পাদপীঠে। হিমালয়ের সুউচ্চ শিখরে এখনও পৌছলো না কেউ। ভারতবর্ষের অন্যতম বিস্ময় হিমালয়কে কে আবিষ্কার করলে? কেউ কেউ বলবেন,—কেন, সার্ভে অব ইণ্ডিয়া অফিস।

বললেই বলতে হবে, যা বলেছেন বলেছেন। পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্রে কেউ যেন না লেখেন। লিখলেই শূন্য।

হিমালয়কে আবিষ্কার করা হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। পিকিং থেকে Jesuit Fathers নামে এক দল পর্য্যটক ভারতবর্ষে পৌছে হিমালয় আবিষ্কার করেছিলেন ঐ সময়ে।

হিমালয় নামটা মিথ্যা, সত্যিকার নাম 'চোমো লাংগ্‌মা' কিংবা Chomo Lungma.

ছয়

নানা কারণে গত দুই মাস বর্ত্তমান আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারিনি। আবার মূলকথার খেই ধরা যাক্।

আমাদের শেষ কথা ছিল এই : "মনোমোহন থিয়েটারে প্রদর্শিত হ'ল 'আঁধারে আলো'। ষ্টুডিয়োয় ছবির খণ্ডদৃশ্য তোলা দেখে হতাশ হয়েছিলুম। এখন গোটা ছবিখানি দেখে বুঝতে পারলুম, চলচ্চিত্রও আর্ট-পদবাচ্য হ'তে পারে।"

সিনেমার খণ্ডচিত্রগুলি আলাদা আলাদা ক'রে তোলা হয়। তাদের কারুর স্থায়িত্ব সিকি মিনিট, আধ মিনিট বা এক মিনিট। সেগুলি হচ্ছে সমগ্র রচনার অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তাদের মধ্যে ধারাবাহিকতা থাকে না এবং পরে কোন কোন অংশ ত্যাগ বা পরিবর্ত্তিত করাও চলে। পরিচালক নিজের পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে পরে পরে সাজিয়ে সেই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি কেটে-ছেঁটে ব্যবহার করেন।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছি, কোন কোন উপন্যাস রচনার সময়ে তিনি প্রথমে মনে মনে মূল আখ্যানবস্তু স্থির ক'রে নিয়ে লেখা সুরু করেছেন হয়তো শেষের দিকের বা মাঝখানকার কোন কোন ঘটনা থেকে। তিনি নাকি এই ভাবেই তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "চরিত্রহীন" রচনা করেছিলেন। কোন পাঠক মূল আখ্যানের কিছুই না জেনে যদি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন সেই সব ঘটনার বর্ণনা পাঠ করতে ব'সে যান, তাহ'লে নিশ্চয়ই রসগ্রহণ করতে পারবেন না। লেখক যখন আখ্যানের পারম্পর্য্য বজায় রেখে গোড়া থেকে ঘটনাগুলি পরে পরে সাজিয়ে দেন, তখনই সার্থক ও উপভোগ্য হয়ে ওঠে কথাগ্রন্থ।

অথবা ধরুন ফুলের মালার কথা। একগাছা মালা গাঁথবার জন্যে অনেক ফুল এনে জড়ো করতে হয়। তার ভিতর থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দু'-একটি ফুল তুলে নিয়ে কেউ বুঝতে পারে না মালার সৌন্দর্য্য। একই যোগসূত্রে ফুলগুলিকে সুকৌশলে গাঁথতে পারলেই মালা দেবে মালাকরের নিপুণ হাতের পরিচয়।

সিনেমারও প্রত্যেক খণ্ডদৃশ্য হচ্ছে মালার এক-একটি বিচ্ছিন্ন ফুলের মত। আলাদা আলাদা ক'রে দেখলে বোঝা যাবে না তাদের কোন মহিমাই। তারপর এমনি শত শত খণ্ড বা দৃশ্য নিয়ে পরিচালক যখন একটি সম্পূর্ণ চিত্রকাহিনীর মালা রচনা করেন, তখনই তা আকৃষ্ট করে দর্শকদের দৃষ্টি।

অভিনেত্রী দুই লাইন কথা ব'লে কেঁদে ফেলবেন। সমগ্র চিত্রের মধ্যে কতটুকুই বা এর স্থান? কিন্তু বিশেষজ্ঞ জানেন, এইটুকুর জন্যেই দরকার হ'তে পারে ত্রিশটি "সট্ বা খণ্ডদৃশ্য।" এবং প্রত্যেক দৃশ্যটি তুলতে হবে ক্যামেরাকে বিভিন্ন স্থানে স্থাপন ক'রে।

"সটে"র পর "সট্" নির্ব্বাচন ক'রে পরিচালক গল্পের বিভিন্ন ধারাকে নির্দ্দিষ্ট পথে চালনা ক'রে একই চরম পরিণামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। সর্ব্বদাই তাঁকে লক্ষ্য করতে হয়, গল্পের গতি কোথাও ঝুলে পড়ছে কি না? নাটকীয় ক্রিয়ার ধারা কোথাও ব্যাহত হচ্ছে কি না? ফুলের মত ধীরে ধীরে পাপড়ি ছড়িয়ে গল্পটি ক্রমশঃ ফুটে উঠে চরম পরিণতির দিকে যাচ্ছে কি না? পরস্পরবিরোধী ভাবগুলি সঙ্গতির মাত্রা রক্ষা করছে কি না? যা গৌণ, তা মুখ্য হয়ে উঠছে কি না? ঘটনাসংস্থান এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা পাত্র-পাত্রীর চরিত্র যথাযথ ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে কি না? এমনি আরো কত দিকে খরদৃষ্টি রাখা দরকার।

যাত্রাপথে চলচ্চিত্র

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

চিত্রকরের পটের মত পরিচালকের ফিল্ম। চিত্রকর রং ও তুলির সাহায্যে পটে ছবি আঁকেন। নট-নটীর সাহায্যে ফিল্মের উপরে চিত্ররচনা করেন পরিচালক। চিত্রকর না থাকলে রং ও তুলি ব্যর্থ। পরিচালনা না থাকলে নটনটীরাও অক্ষম হয়ে পড়েন। পরিচালকের পরিকল্পনার সঙ্গে নট-নটীদের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁরা হচ্ছেন দাবা-খেলোয়াড়ের হাতের ঘুঁটির মত। তাঁদের কারুর মান বেশী ও কারুর কম হ'তে পারে, কিন্তু তাঁদের নিজেদের কোন পৃথক্ সত্তা নেই, অন্ধের মত তাঁরা চালিত হন পরিচালকের ইচ্ছা অনুসারেই।

কাগজের উপরে গল্প লেখেন লেখকরা এবং পরিচালকরা গল্প লেখেন পর্দ্দার গায়ে। একই গল্প বিভিন্ন পরিচালকের হাতে পড়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। প্রত্যেক পরিচালকের পরিকল্পনার মধ্যে থাকে তাঁদের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি। এক-একটি গল্পকে এক-একজন পরিচালক ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চান। পাশ্চাত্য সিনেমায় বার বার দেখা গিয়েছে এই ব্যাপার। এদেশেও শরৎচন্দ্রের রচিত একই কাহিনী বিভিন্ন পরিচালক পর্দ্দার গায়ে নূতন নূতন ভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

এজন্যে অবাক হবার দরকার নেই। লেখকরা নাটক-নভেল লেখেন নিজের মনের মত ক'রে, কিন্তু যে কোন তীক্ষ্ণধী পরিকল্পক আখ্যানের বা চরিত্রের সৌন্দর্য্য নষ্ট না ক'রেই সেগুলিকে নব নব ভাবে রূপায়িত ক'রে তুলতে পারেন। সেক্সপিয়রের হ্যামলেট, ওথেলো, ম্যাকবেথ, কিং লিয়র ও সাইলক প্রভৃতি বিখ্যাত ভূমিকাগুলিতে ওদেশের সেরা সেরা নটরা বার বার দেখা দিয়েছেন।

কিন্তু প্রত্যেকেই দিয়েছেন নূতন নূতন conception বা ধারণা। এজন্যে নাটকের নাটকত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি—অথচ সেক্সপিয়রের নিজের ধারণার সঙ্গে ওঁদের ধারণার মিল থাকবার কথা নয়।

কিন্তু চিত্রনটদের নেই মঞ্চাভিনেতার সুযোগ ও স্বাধীনতা। এক্ষেত্রে চিত্রনাট্যের ভিতর থেকে নূতন নূতন অর্থ ও সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করবার ভার নেন পরিচালকরাই। ভালো গল্প না হ'লে কোন ছবি ভালো হয় না বটে, কিন্তু ভালো গল্পকে ভালো ক'রে বলতে পারেন কেবল ভালো পরিচালকরাই। গল্প লেখেন সাহিত্যিকরা, তাঁদের চিত্র-জগতের শিল্পী ব'লে মনে করাই ভুল। সিনেমার সর্ব্বপ্রধান শিল্পী হচ্ছেন পরিচালক। তাঁর উপরে আর কেউ নেই। একমাত্র তাঁর পরিকল্পনা অনুসারেই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন শত শত খণ্ডদৃশ্য পারম্পর্য্য অক্ষুণ্ণ রেখে পরস্পরের সঙ্গে মিলে-মিশে সৃষ্টি করে এক অখণ্ড রসরূপ। এইখানেই সিনেমা হয়ে ওঠে চারুকলা।

বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম যুগে শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো'র একটি খণ্ডদৃশ্য তোলার পদ্ধতি দেখে সিনেমা সম্বন্ধে আমি উচ্চ ধারণা পোষণ করতে পারিনি। কিন্তু তারপর একসঙ্গে সমগ্র ছবিখানি দেখবার পর আমার চোখ ফুটতে বিলম্ব হয়নি।

কিন্তু সেটা ছিল চলচ্চিত্রের নির্ব্বাক্ যুগ। সে সময়ের কথা একজন পাশ্চাত্য লেখক এই ভাবে ব্যক্ত করেছেন: "In the days of silent films, the movie director wrote skeleton scenarios, cut the film, sometimes wrote the subtitles, supervised the lighting and photography—and sometimes acted in the picture."

এদেশেও দেখা যেত প্রায় একই ব্যাপার। ধরুন ঐ 'আঁধারে আলো' ছবিখানিরই কথা। শিশিরকুমারই ষ্টুডিয়োর মধ্যে ছিলেন একাধিপতির মত। তিনি কাহিনী নির্ব্বাচন করেছেন, চিত্রনাট্য রচনা করেছেন (subtitleগুলিও সম্ভবতঃ তাঁর), সম্পাদনা করেছেন, আলোক-নিয়ন্ত্রণ ও ক্যামেরার কাজ তত্ত্বাবধান করেছেন, পরিচালনা করেছেন এবং প্রধান ভূমিকায় অভিনয়ও করেছেন।

কিন্তু সেদিন তোলা হ'ত কেবল ঘটনার ছবি, তাই চিত্রনির্ম্মাতার কাজ ছিল সহজ। একটি ভালো গল্প বেছে নিতে পারলেই লেখকের সঙ্গে আর বিশেষ সম্পর্ক রাখবার দরকার হ'ত না। চিত্রনাট্যে সংলাপ থাকত না, সংক্ষেপে ঘটনাগুলির বিবৃতি লিখে রাখলেই চলত। ছবি উঠত কেবল দিনের বেলায় মুক্ত স্থানে, আলো জোগান দেবার ভার গ্রহণ করতেন সূর্য্যদেব স্বয়ং। তখন আলোক নিয়ন্ত্রণ বলতে সাধারণতঃ বোঝাত, সূর্য্যালোকের প্রতিফলন। আলোকচিত্র গ্রহণের পদ্ধতিও ছিল না আজকের মত জটিল ও উন্নত। আর অভিনয় ছিল তো মূক ভাবাভিনয় মাত্র।

কিন্তু সচল ছবি সরব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার কার্য্যক্ষেত্র হয়েছে বহুধা বিভক্ত। ঘটনার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করলেই আর চিত্রনাট্য রচনা করা হয় না, সংলাপের জন্যে লেখকের কাছে ধর্ণা দিতে হয়। নট-নটীদের ভাবাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে করতে হয় বাক্যাভিনয়, সুতরাং পরিচালককেও হ'তে হবে একাধারে বাচিক ও আঙ্গিক অভিনয় সম্বন্ধে অধিকতর অভিজ্ঞ। ছবি ওঠে এখন ষ্টুডিয়োর ভিতরে দিনে-রাতে সব সময়ে। কৃত্রিম আলো নইলে চলে না এবং তা হচ্ছে একটা বিশেষ গোলমেলে ব্যাপার, তার জন্যে আবশ্যক বিশেষজ্ঞ আলোকনিয়ন্তা। এখন আর এক প্রধান ব্যক্তি হচ্ছেন শব্দযন্ত্রী। ছবি খালি কথা কয় না, গান গায়। তার জন্যে এসেছেন গীতিকার, সুরকার ও যন্ত্রসঙ্গীতবিদ্‌গণ। এঁদের সকলকে একসঙ্গে সামলাতে ও পথনির্দ্দেশ করতে হয় ব'লে পরিচালকের কর্ত্তব্যও হয়ে উঠেছে রীতিমত গুরুতর।

কর্ত্তব্য গুরুতর হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু এই গুরুভার বহন করতে পারেন, এদেশে এমন পরিচালকের সংখ্যা কয় জন? প্রমথেশ বড়ুয়া, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, নরেশচন্দ্র মিত্র ও দেবকীকুমার বসু প্রমুখ পরিচালকদের কথা এখানে ধরছি না। তাঁরা আমাদের সমালোচনার বাইরে। দেশবিভাগের পর বাংলা ছবির চাহিদা গিয়েছে ক'মে। সেই অনুপাতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ছবি তৈরির খরচ বেড়ে গিয়েছে ত্রিগুণ কি আরো বেশী। সেদিন একখানি পত্রিকায় কোন বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেছেন, আজকাল একখানি পূর্ণাঙ্গ বাংলা সামাজিক ছবি তুলতে গেলে দরকার হয় এক লক্ষ টাকার। ১৩৫৮ সালে বিভিন্ন ষ্টুডিয়ো থেকে সাঁইত্রিশখানি বাংলা ছবি মুক্তি লাভ করেছে। তাহ'লে কি বলতে হবে, ঐ সাঁইত্রিশখানি বাংলা ছবির পিছনে খরচ হয়েছে সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকা?

সেই নির্ব্বাক্ যুগে যখন এক-একখানি বাংলা ছবির জন্যে বরাদ্দ হ'তো পনেরো-বিশ হাজার টাকা, যখন রাম শ্যামের দল ছবি তোলবার জন্যে সর্ব্বদাই উসখুস করত এবং ছবিতে ভাষার অন্তরায় ছিল না ও দেশ বিভক্ত হয়নি ব'লে ছবির চাহিদাও ছিল অত্যন্ত অধিক, তখনও এদেশে বৎসরে আট-দশখানির বেশী নূতন ছবি উঠেছে ব'লে স্মরণ হয় না।

আজকের এই দারুণ দুঃসময়ে বাঙালী চিত্রনির্ম্মাতাদের ছবি তোলবার এত ঝোঁক এবং টাকা খরচ করবার জন্যে হাত এমন দরাজ হয়েছে কেন, তার ঠিক কারণটি আমি আন্দাজ করতে পারছি না। টাকার বাজার কি খুব সস্তা হয়েছে? দেশে উত্তম উত্তম পরিচালকের সংখ্যা কি ব্যাঙের ছাতার মত বেড়ে গিয়েছে? বাঙালী কি অতিশয় মরিয়া হয়ে উঠেছে? বাঙালীর মনীষা কি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে?

গত বৈশাখ মাসের "মাসিক বসুমতী"তে ১৩৫৮ সালে প্রকাশিত ভালো-মন্দ বাংলা ছবিগুলির একটা খতিয়ান দেওয়া হয়েছে। হিসাবনবিস নিজের নাম প্রকাশ করেননি, আশা করি, তিনি বিশেষজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। এক বৎসরে সাঁইত্রিশখানা বাংলা ছবির ধাক্কা সামলেও যিনি সুস্থ থাকতে পারেন, আমি তাঁকে অভিনন্দন দিতে অসম্মত হব না। নেই আমার সে সাহস, উৎসাহ ও কৌতূহল। অতএব তিনি যে রায় দিয়েছেন, এখানে সেইটিই দাখিল করা ছাড়া আমার আর অন্য উপায় নেই।

এই সালতামামিতে দেখা যাচ্ছে, সাঁইত্রিশখানার মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে গণ্য হয়েছে মাত্র দুইখানি ছবি—অগ্রদূতের দ্বারা পরিচালিত "বাবলা" এবং শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্রের দ্বারা পরিচালিত "পণ্ডিত মশাই"। দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে মাত্র ছয়খানি

ছবি। এগারোখানা ছবির জায়গা হয়েছে তৃতীয় শ্রেণীতে। কিন্তু "তৃতীয় শ্রেণী" কথাটা শুনতে বড় ভালো নয়। তবে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে, ঐ ছবিগুলি হয়েছে অপেক্ষাকৃত সহনীয় বা চলনসই!

তার পরেও আছে চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণী। প্রতিযোগিতায় যারা তৃতীয় শ্রেণীর নীচে পড়ে, তাদের কথা উল্লেখযোগ্যই নয়। ঐ হিসাব মানলে বলতে হয়, গত বৎসরে সাঁইত্রিশখানার মধ্যে বাজে ছবি তোলা হয়েছে আঠারোখানা। ওদের মধ্যে আবার আটখানা ছবি নাকি একেবারেই রাবিস।

গত বৎসরে সাঁইত্রিশ জন পরিচালক (তাঁদের সহকারীদের কথা না হয় আর ধরলুম না) প্রাণপণ চেষ্টা ও শ্রম ক'রে আমাদের উপহার দিয়েছেন দুইখানি মাত্র প্রথম শ্রেণীর এবং ছয়খানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ছবি! বাঙালীর মনীষা প্রশস্তিলাভের যোগ্য নয়।

সুবিখ্যাত স্যামুয়েল গোল্ডউইনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "একখানি ভালো ছবির জন্যে সব চেয়ে দরকারি কে—অভিনেতা, না পরিচালক, না প্রয়োগকর্তা, না অন্য কেউ?"

গোল্ডউইন জবাব দেন, "গল্পলেখক।"

আবার আর একটা কথা ভুললেও চলবে না। আগেই বলেছি, ভালো গল্প ভালো ক'রে বলতে না পারলে ভালো ছবি হয় না। সিনেমায় গল্প বলবার ভার থাকে না লেখকের উপরে। সে ভার গ্রহণ করেন পরিচালক। গল্পকে সুন্দর ক'রে তুলতে বা মাটি ক'রে ফেলতে পারেন তিনিই। সকলেই ব'লে থাকেন, আমার লেখা "যকের ধন" একটি ভালো গল্প। কিন্তু সিনেমায় প্রয়োজক শ্রীহরি ভঞ্জের কবলে প'ড়ে গল্পটি মাঠে মারা গিয়েছিল।

এবারের সাল্তামামিতেই দেখছি, তিন জন পরিচালক গ্রহণ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের তিনখানি উপন্যাস—"দুর্গেশনন্দিনী," "আনন্দমঠ" ও "কৃষ্ণকান্তের উইল"। কিন্তু তিন জনই তৃতীয় শ্রেণীর উপরে উঠতে পারেননি।

কলা-কুশলী

শ্রীরমেন চৌধুরী

চিত্র-সম্পাদক—বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক কথাটা শুনলেই চোখে ভেসে ওঠে একটি ছবি—চশমা চোখে অতি ব্যস্ত আধবয়সী কোনো লোক manascript, proof প্রভৃতির অরণ্যে নিঃশেষে হারিয়ে গেছেন, আবার ফিরে আসছেন বাস্তব-জগতে, calling bell বাজিয়ে সহকারী, কম্পোজিটার প্রভৃতিকে ডাকিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন কর্তব্য-কর্ম। কাজের মাঝেই আবশ্যকীয় আদেশ-নির্দেশ দেয়া চলছে, নিশ্বাস নেবার সময় নেই। বড় জোর এক কাপ চা কিংবা কড়া একটা চুরুটের জ্বলন্ত সংগ সাংবাদিকতার দুরূহ দায়িত্ব যথাযথ পালনে তাঁকে উৎসাহিত করছে। এ তো হোলো পত্র-পত্রিকার জগতের দিক; ছায়াছবির রাজ্যেও আছে এমনি এক সম্পাদকের দপ্তর। সেখানেও সম্পাদক মশায়ের ব্যস্ততার সীমা নেই। হাই পাওয়ার কয়েকটি বাল্‌বে ছোট বা মাঝারি ঘরটি তাঁর আলোকিত টেবিলের কাচের তলায় সময়ে সময়ে আলো জ্বলছে, এক পাশে মুভিঅলা (এ মেশিন চালিয়ে ছবির সব কিছু দেখে-শুনে নেয়া যায়) আর এক পাশে ওয়েষ্ট ফিল্ম ফেলবার

শুভ মুক্তি-প্রতীক্ষায়

পরিচালনা: বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরশিল্পী: শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠাংশে: সন্ধ্যারাণী

অন্যান্য চরিত্রে: জহর গাঙ্গুলী, ছায়া দেবী, পরেশ ব্যানার্জি, সমীরকুমার, সুপ্রিয়া ব্যানার্জি, শীতল ব্যানার্জি ও আরো অনেকে।

একমাত্র পরিবেশক:
ঝর্ণা ডিষ্ট্রিবিউটার্স

কালি রাহা

ড্রাম, সামনে-পেছনে সেলুলয়েডের ফিতে (ফিল্ম) খোলা, জড়ানো অবস্থায় স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে, টেবিলের ওপর splyser (ফিল্ম জোড়া লাগাবার মেশিন), ফিল্ম সিমেণ্টের (ফিল্ম জোড়বার আঠা) শিশি, কাঁচি ছড়ানো—পরিচালক কিংবা তস্য সহকারী এদিক-সেদিকে আসীন, তারি মাঝে যিনি তন্ময় হয়ে আছেন চিত্র-সম্পাদক মশাই। কখনো লাল পেনসিলে দাগাচ্ছেন পিক্‌চার নেগেটিভ, কখনো বা সাউণ্ড—সেটা ঠিক হোলো কি না মুভিওলা সে কথা তারস্বরে ঘোষণা করছে, তার পরই কচাৎ! কেটে ফেলে অপ্রয়োজনীয় অংশকে নির্মম হাতে দূরে সরিয়ে জোড়া দেবার দাঁড়ালো যন্ত্রে চাপিয়ে কিড়িক্ করে জুড়ে নিচ্ছেন। একটু ধোঁয়া বুদ্ধির গোড়ায় দিয়ে নিচ্ছেন না কেন? সর্বনাশ! সিগারেট কিংবা চুরুটকে যে respectful distance-এ রাখতে হয় এ রাজ্যে! সামান্য অনবধানতায় লংকা-দহন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। ভিটামিনের আকর ভারতীয় চা (?) একমাত্র এ ঘরের সম্মানিত অতিথি; টুংটাং-ধ্বনি ওঠে পেয়ালায়, কোনো দিকে কর্ণপাত করবার ফুরসৎ নেই এঁদের। ভারি শক্ত কাজ নেয়া আছে কাঁধে, একটু ত্রুটি হলেই হয়েছে আর কি! সবই হয়ে যাবে ভস্মে ঘি ঢালা! এ-কথা ভারি সত্যি যে, সম্পাদকের কাঁচির কল্যাণে বহু অখাদ্য ছবি জাতে ওঠে, আবার কাঁচা লোকের খপ্পরে পড়ে ঠিক উল্টোটিও হয়ে যায়। কাজেই চিত্র-সম্পাদক মশায়ের ওপর নির্ভর করে লক্ষ লক্ষ টাকার অনিশ্চিত ভাগ্য! পর্দার আড়ালের এই মানুষটিকে কোনো দিনই কেউ দেখতে-জানতে পায় না, কিন্তু এঁরা আছেন বলেই ছায়াছবি টিকে আছে!…

শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্র-সম্পাদক। আজ কিছু দিন যাবৎ তিনি পরিচালনায় বৃত হয়েছেন। তাঁর পরিচালিত পাঁচখানি ছবির দেখা আমরা পেয়েছি, আরও দু'টি মুক্তিপথে। সম্পাদনায় হাত পাকলে অর্থাৎ সফল সম্পাদক হলে সে মানুষের পক্ষে চিত্র-পরিচালক হওয়া মোটেই শক্ত নয় এবং অশোভনও হয় না। পরিচালক হতে হলে কয়েকটা বিষয়ে (যেমন ক্যামেরা, এডিটিং, গান) অবিশ্যি ওয়াকিবহাল হতে হবে (যদিও আজকাল শতকরা ৯৯'৯ জন হচ্ছে তার বিপরীত) আর সেই হিসেবে বিনয় বাবুর নতুন দায়িত্ব গ্রহণ উচিত হয়েছে। সে যাই হোক, শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ছায়াছবির জগতে পদার্পণ করেছিলেন অতি উৎসাহী একজন শিক্ষানবিশ—সম্পাদক শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তরে ঠাঁই পেয়ে গেলেন সহজেই। সেটা হোলো ১৯৩৫ সালের একেবারে গোড়ার দিক। অবিশ্যি তখনকার দিন বলেই বিনা আয়াসে এ ভাবে সুযোগ-সুবিধা মিলত, আজকাল নৈব নৈব চ! হাতে-কলমে শিখতে থাকলেন কাজ বাঁড়ুজ্জে মশাই—ছ'মাস যেতে না যেতে স্বাধীন কর্মের আহ্বান এসে গেল। খুলে গেল সম্ভাবনার সিংহদ্বার। সুশীল মজুমদার তুললেন 'তরুবালা', (সুশীল বাবুর এটিই প্রথম ছবি) বিনয় বাবু হলেন কাঁচি চালাবার দায়িত্বশীল কর্মী (সম্পাদক)। টি-জি-র 'দ্বীপান্তর' ছবিই বিনয় বাবুর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। এর পর কলকাতার মায়া কাটিয়ে এঁকে পাড়ি জমাতে হোলো সাগর-ধারে—ওয়ালটেয়ারে। 'কবি জয়দেব' (দোভাষী) উঠলো, উৎসাহের সঙ্গে বিনয় বাবু মেতে গেলেন তাঁর কাজে। এ হোলো '৩৭ সালের ঘটনা।

'কবি জয়দেব'এর কাজ সমাধা করে কলকাতায় ফিরলেন পরের বছর, যোগ দিলেন ফিল্ম কর্পোরেশনে। আবার সুশীল মজুমদার আর তাঁর ছবি—যথেষ্ট নাম-করা বাণী-চিত্র 'রিক্তা'…যোগ্যতার সংগেই ধরলেন কাঁচি চিত্র-সম্পাদক। এ ক'বছরে অভিজ্ঞতা বেড়েছে, কাজও করা হয়েছে কিছু সংখ্যক, তার প্রমাণ মিললো 'রিক্তা'য়। দর্শকসাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসায় সিক্ত হোলো ছবিটি—ছায়া দেবীর অভিনয় প্রতিভায় উদ্ভাসিত হয়েছিলো এটি। 'প্রতিশোধ', 'পাপের পথে', 'তটিনীর বিচার', 'অপরাধ', 'শাপমুক্তি' প্রভৃতির সম্পাদনায় বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম দেখা গেল এর পর। কর্মস্থল পরিবর্তন করে এইবার শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন ইন্দ্র মুভিটোনে (বর্তমান ইন্দ্রপুরীতে); 'কর্ণার্জুন', 'বন্দী', 'সন্ধি', 'চাঁদের কলংক', 'সুবে-সাম', 'রাণী', 'শহর থেকে দূরে', 'বন্দিতা'—তখনকার যথেষ্ট নাম-করা বহু চিত্রের মাধ্যমে ইনি যথেষ্ট সম্মান অধিকার করে ফেললেন।

পরিচালক-পদে উন্নীত হলেন বিনয় বাবু চুয়াল্লিশ সালে। চিত্ররূপা'র 'শান্তি' পরোক্ষ যুদ্ধক্লিষ্ট এ দেশের লোকের মনে শান্তির প্রলেপ দিতে হাজির হোলো এঁরই নেতৃত্বে। অবিশ্যি এর জন্যে চিত্ররূপা'র কর্তৃপক্ষকে ভ্যারাইটি ফিল্মের মালিককে নগদ দক্ষিণা দিতে হয়। কারণ বিনয় বাবু আগে এঁদের কাছে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন।

নতুন পদপ্রাপ্তি কিন্তু এঁকে পথভ্রষ্ট করতে পারেনি, এ কাজের ফাঁকে চিত্র-সম্পাদনাও করতে লাগলেন যথারীতি এবং তার পরিচয় পাওয়া গেল 'শ্রীর শংকরনাথ', 'নারীর রূপ', 'নিরুদ্দেশ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'তে। 'দেবী চৌধুরাণী' এঁর শেষ সম্পাদিত ছবি।

এখন ইনি পরিচালক পুরোপুরি। 'কড়ি ও কোমল', 'মনে ছিলো আশা', 'অভিমান', 'জিপ্‌সী মেয়ে', 'মিনতি'র সংগে আমরা সবাই পরিচিত হয়েছি ইতিমধ্যে, 'শ্যামলী' মুক্তির প্রতীক্ষায় এবং সদ্যআরব্ধ চিত্র অভিশাপ অদূর ভবিষ্যতের অপেক্ষায়।

চিত্র-সম্পাদক কালী রাহা

Film-wizard বড়ুয়া সাহেবের সহায়তা লাভে ধন্য হয়েছেন যে ক'জন টেক্‌নিসিয়ান—চিত্র-সম্পাদক কালী রাহা তাঁদের অন্যতম। কালী বাবুর মুখেই শুনলুম—স্বর্গত প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁকে হাতে ধরে সম্পাদনার কাজ শিখিয়েছেন তাঁর 'মায়া' ছবিটিতে। অবিশ্যি এর আগে শ্রীযুক্ত রাহা চিত্র-সম্পাদক সুবোধ মিত্রের কাছে সম্পাদনার টেক্‌নিক্যাল দিকটার যথাযথ শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁর সহকারী হিসাবে তারও আগে আমরা রাহা মশাইকে দেখতে পাই ল্যাবরেটরী অ্যাসিষ্টাণ্টরূপে সুবোধ গাঙ্গুলী মশায়ের প্রাইভেট ল্যাবরেটরীতে। ১৯৩১ সালে

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

নিউ থিয়েটার্স গড়ে উঠলে সুবোধ গাঙ্গুলী মশায়ের ইউনিট হিসাবে কালী বাবু যোগ দিলেন সেখানে রসায়নাগারের কাজের ফাঁকে সুবোধ মিত্রের ফাই-ফরমাস খাটা চলতে থাকে এবং সম্পাদকতার অলক্ষ্য মায়ায় জড়িয়ে পড়লেন। 'মায়া' চিত্রের কল্যাণে সাধারণ্যে প্রচারিত হোলো এঁর নব-পরিচয়, অ-দৃষ্ট অদৃষ্টের (?) শুভ সূচনা দেখা গেল জীবনে। 'মুক্তি' উঠলো বড়ুয়া সাহেবের পরিচালনায়—কালী বাবু সাফল্যের সংগেই দুরূহ কাজটি সারলেন। কুমার প্রমথেশ খুশি হলেন তাঁর আবিষ্কৃত জনের যোগ্যতায়। তাই 'অধিকার' ছবিতে কাঁচি চালাবার অধিকার সর্বাগ্রেই দিলেন। ফণি মজুমদারের 'সাথী' আর দেবকী বসুর 'সাপুড়ে'তে কাজ করে কালী বাবু চলে এলেন এম. পি.-তে।

'মায়ের প্রাণ' ছবি দিয়ে এম, পি'র সূচনা—সৃষ্টি দিবস থেকেই শ্রীযুক্ত রাহা উপস্থিত সেখানে। এর পর উঠলো 'উত্তরায়ণ', 'শেষ উত্তর', 'জবাব' (হিন্দি)—বড়ুয়া সাহেবের সুযোগ্য পরিচালনার অবদান। 'আমি বনফুল গো' কিংবা 'তুফান মেল যায় যায়' রবে আকাশ বাতাস প্লাবিত হোলো—ওই সার্থক ছবিগুলি সম্পাদনা করেছিলেন কালী রাহা। এর ফাঁকে ইন্দ্রপুরীর 'রাণী' ছবির কাজও ইনি করেন।

কিন্তু প্রবাস-যাত্রা ঘনিয়ে এলো, পরিচালক নীতীন বসুর সংগে চলে গেলেন সুদূর বোম্বাই। সেখানে বসু মশায়ের পরিচালনায় গৃহীত হোলো 'বিচার' (দোভাষী), 'মুজরিম' (হিন্দি) ও 'নৌকাডুবি' (দোভাষী)। দেখা মিললো সম্পাদক কালী বাবুর নাম রূপালী পর্দায় স্পষ্টাক্ষরে। বাঙলা ও বোম্বাই—দু'টি প্রদেশেই প্রতিষ্ঠা অর্জিত হোলো।

এস, বি, প্রোডাকৃশনের প্রথম ছবি 'দৃষ্টিদান' করতে নীতীন বাবু ফিরে এলেন বাঙলার রাজধানী কলকাতায়, কালী বাবুও এলেন। এ ছবির পর ভ্যানগার্ডের 'সাধারণ মেয়ে', 'গরবিণী', 'সেতু'-রচনায় সক্রিয় সাহায্য করলেন কালী বাবু তাঁর নিজস্ব যোগ্যতায়।

উপস্থিত এঁকে দেখা গেছে এম, পি'র 'বসু-পরিবার' চিত্রে। আহার-নিদ্রা ভুলে ব্যস্ত আছেন এখন 'কার পাপে' সম্পাদনায়। অর্থাৎ আবার যোগ দিয়েছেন এম, পি-তে। যোগ্য জনকে যোগ্য জায়গায় দেখতেই সকলে চায়, কাজেই এঁর পূর্বের প্রতিষ্ঠানে ফিরে আসা সর্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

টকির টুকিটাকি

পল্লীসমাজ

হ্যাঁ, পল্লীসমাজ আর village politics শহরে বসেই আবার প্রত্যক্ষ করার আয়োজন সম্পূর্ণ করে এনেছেন পরিচালক নীরেন লাহিড়ী এস, বি, প্রোডাকসনের পক্ষ থেকে। শরৎ-সাহিত্যের অন্যতম মিনার 'পল্লীসমাজ' ইতিপূর্বে চিত্রায়িত হয়েছে কিন্তু উল্লেখণীয় হয়নি সে বারের প্রয়াস! নব উদ্যম সার্থক হলেই শুভ।

রাধা ফিল্মস্-এর

আগতপ্রায় পৌরাণিক অর্ঘ্য

সাবিত্রী - সত্যবান

●

সাবিত্রীর সত্যনিষ্ঠা, স্থিরবিশ্বাস, কঠোর তপস্যা আজ আবার আমাদের ঘরে ঘরে মা-বোনের মাঝে মূর্ত্ত হোক, ধ্বংসপ্রায় বাঙালী জাতি অমিত তেজে জেগে উঠুক, বাঁচুক এবং বাঁচাক সবাইকে!

●

রচনা:

মন্মথ রায়

শ্রেষ্ঠাংশে:

যমুনা সিংহ ● সমর রায়

পদ্মা দেবী ● নীতীশ মুখার্জি

অপর্ণা ● গুরুদাস

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ● জ্যোতির্ময় কুমার

●

প রি বে শ ক

ছায়াবাণী লিমিটেড

আজ প্রোডাকশনের

'কপালকুণ্ডলা' আজকালের মধ্যে না হলেও অবিলম্বে মুক্তি পাবে বলে শোনা গেল। অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় এবার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন, এটি এখানের দ্বিতীয় কিস্তি। অনেক দিন অর্ধেন্দু বাবু আমাদের বঞ্চিত করে রেখেছেন, 'কপালকুণ্ডলা'য় যদি আবার কপাল খোলে।

কবি চন্দ্রাবতী

'ময়মনসিং গীতিকা'র পাতা থেকে সেলুলয়েডের ফিতায় উঠতে চলেছে। আগেও কয়েক বার চেষ্টা করেছেন কয়েকটি পার্টি, কিন্তু উদ্যম তাঁদের দানা বাঁধেনি। উপস্থিত এক টেকনি-সিয়ান সম্প্রদায় 'কবি চন্দ্রাবতী' নিয়ে ব্যস্ত আছেন—এঁদের credit এ আছে পূর্বতন 'মীমাংসা'। সব-কিছু ঝেড়ে ফেলে কবিভাবাপন্ন হতে দেখে আমরা আশ্বস্ত হয়েছি।

রাধা ফিল্ম্

রাধার পাহাড় ডিঙিয়ে 'ষোড়শী'কে করায়ত্ত করে ফেলেছেন কিছু দিন আগে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিলো প্রবল—বোধ হয় বয়েসের জন্যেই 'সর্বনেশে ষোল' কিনা! তাহলেও 'রাধার' (রাধানাথের?) ভাগ্য ভালো, জয়মাল্য তাকেই দিয়েছে 'ষোড়শী'। চিত্র-সাজে-সাজানো-পর্ব চলেছে এখন; অনুষ্ঠানে ত্রুটি মিলবে না—খবরে প্রকাশ। জীবানন্দ ও ষোড়শীর ভূমিকায় বিশিষ্ট রূপশিল্পীর দর্শন মিলবে।

গুপ্তধন

লাভের নেশা মানুষের আজো যায়নি। আজকের দুনিয়ায় উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খাটুনীর বিনিময়ে দু'মুঠো অন্ন সংস্থান হওয়াও যখন সবিশেষ কষ্টকর, সে সময় অন্য চিন্তা, বিশেষ করে ফোকটে পাওয়া গুপ্তধন হাস্যকর বৈ কি! তবু বলতে হচ্ছে 'গুপ্তধন-এর সন্ধান মিলবে পর্দায় এবং সে আয়োজন পাকা করতে বিমল মুখোপাধ্যায় কোমর বেঁধেছেন। শুভ মহরতে বীরেন ভদ্র 'করতালি কাষ্ঠ' (clap stick) বাজিয়েছেন, বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন।

নবদ্বীপ হালদার

ও আর পাঁচ জনে 'মিলে-মিশে' যে ছবিটি করতে মনস্থ করেছেন তার কাজ এগিয়ে চলেছে বলে জানা গেল। এঁদের উদ্যোগ প্রশংসনীয়, কারণ একের সেটা আঁটি, দশের সেটা লাঠি; আর সেই জন্যে আশা করা যায়, ছবিটি এ হেন ব্যবস্থায় উৎরে যাবে পরিচালনার কণ্টকিত পথ।

ঝিন্দের বন্দী

প্রযোজক রবি গুপ্তের পরবর্তী চিত্র-নিবেদন,—'দুর্গেশনন্দিনী'র পর বেশ কিছু দিন নীরবতা রক্ষা করে এবার মুখর হয়ে উঠছেন, শৃংখল-ঝংকারে—ঝিন্দের বন্দীর। পরিচালনায় আছেন প্রফুল্ল রায়। প্রফুল্ল হবার মতই এ সংবাদ, কিন্তু একটা কথা—Priaoner of Zenda বহুদৃষ্ট বহুখ্যাত চিত্র, তার মর্য্যাদা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রযোজকের অকুণ্ঠ অর্থব্যয় আর পরিচালক তথা বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মীর কলাকুশলতায় সার্থক হোক এই অভিনব প্রচেষ্টা, দূর করুক এই ধরণের পূর্ববর্তী প্রয়াসের পুঞ্জীভূত গ্লানি।

দীপালী পিক্চার্স

জানিয়েছেন তাঁদের প্রথম চিত্র রূপ নেবে 'শ্রীবৎস ও চিন্তা'য়। বহু চিন্তা করেই প্রযোজকেরা আবার ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতির সাহায্য নিতে অগ্রসর হয়েছেন। এঁদের কর্ণধার গণেশচন্দ্র খান প্রাথমিক কাজের বিলি-ব্যবস্থায় আপাতত ব্যস্ত।

মুক্তির দেরি নেই

বহু-প্রতীক্ষিত 'বিন্দুর ছেলে'র। যুগান্তর ছায়া-প্রতিষ্ঠান যে ভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন শরৎচন্দ্রের এই অনবদ্য কাহিনীটিকে, তাতে আশা করা যায় আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি শহরের কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হতে পারবে। ছবিটির প্রধান আকর্ষণ মলিনা দেবী ও পাহাড়ী সান্যালের অনন্যসাধারণ অভিনয়। খবরে প্রকাশ, 'বিন্দুর ছেলে'র মাধ্যমে এঁরা দু'জনেই নতুন করে প্রতিভার পরিচয় দেবেন এবং তা পূর্বতন খ্যাতি অনায়াসে অতিক্রম করে যাবে। আমরা মুক্তি-দিবসের অপেক্ষায় রইলুম দর্শকসাধারণের সংগে।

সাবিত্রী

সমাপ্তি-মুখে। মৃত্যু-মুখ থেকে যে মহীয়সী নারী পতিদেবতাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন সগর্বে, তাঁর বৈজয়ন্তী অবিলম্বে উড্ডীন হবে এখানকার চিত্র-প্রদর্শন-মন্দিরগুলিতে। রাধার পৌরাণিক-প্রয়াস সমাদর লাভ করবে ধর্মপ্রাণ দর্শকমণ্ডলীর কাছে—এ কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

শ্রীমতী পিকচার্সের

নবতম চিত্রার্ঘ্য 'দর্পচূর্ণ' মাঝপথে হাজির হয়েছে প্রস্তুতির। শ্রীমতী পিকচার্স ইউনিট-পরিচালিত শরৎচন্দ্রের অমর রচনার চিত্রায়ন সার্থকতার সংগেই সমাধা হচ্ছে। রূপশিল্পীদের মধ্যে আছেন কানন দেবী, রাধামোহন, জহর গাঙ্গুলী, পদ্মা দেবী ইত্যাদি অনেকে। নারায়ণ পিকচার্স এর পরিবেশনা করছেন।

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের অনুলেখক বাঙলার বসওয়েল ও শ্রীম নামে বিখ্যাত মাষ্টার মশাই অথবা ৺মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। বিগত ২৮শে আষাঢ় মাষ্টার মশাইয়ের তিথিপূজা উদ্‌যাপিত হয়েছে।

"সময়ে সামান্য সতর্ক হলে সহজেই সংক্রমণ রোধ করা যায়"

রোগবাহী জীবাণুই রোগ-সংক্রমণের কারণ। জীবাণু এত ছোটো যে খালি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু এরা ছড়িয়ে আছে সব জায়গায়। যে-বাতাস আপনি শ্বাসের সঙ্গে টেনে নেন, যে কোনো জিনিসে আপনি হাত দেন, এমন কি আপনার গায়ের ত্বকেও লক্ষ লক্ষ জীবাণু রয়েছে।

শরীরের কোথাও কেটে বা চামড়া উঠে গেলে সেই মুহূর্তেই ঝাঁকে ঝাঁকে জীবাণু আপনার শরীরে প্রবেশ করতে পারে। সামান্য একটু পিনের খোঁচাকেও তুচ্ছ করবেন না, তা থেকেই সারা শরীর বিষাক্ত হতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত অঙ্গহানি কি প্রাণহানিও ঘটতে পারে।

সুতরাং জীবাণুর হাত থেকে নিজে ও বাড়ীর সবাই নিরাপদে থাকতে চান তো 'ডেটল' ব্যবহার করুন — 'ডেটল' আধুনিক জীবাণুনাশক।

প্রসবপথের মুখে বা ভেতরে সামান্য একটু ক্ষত থাকলেও প্রসূতিজ্বর দেখা দিতে পারে, যা থেকে চিরতরে অকর্মণ্য বা বন্ধ্যা হয়ে থাকাও বিচিত্র নয়। ডাক্তাররা তাই জীবাণু-সংক্রমণের ভয় দূর করবার জন্য প্রসবের সময় প্রসূতিকে জীবাণুনাশক 'ডেটল' ব্যবহার করতে বলেন।

ক্ষতস্থান যত ছোটোই হোক তা যেন বিষাক্ত হতে না পারে। কেটেকুটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে 'ডেটল' লাগাবেন। ডেটল জীবাণু নাশ করে, বিষাক্ত সংক্রমণের পথ রুদ্ধ করে এবং ক্ষত শুকোতে সাহায্য করে।

ডাক্তারদের মতো আপনিও 'ডেটল' ব্যবহার করুন—'ডেটল' স্নিগ্ধ, এতে জ্বালা-যন্ত্রণা হয় না। 'ডেটল' লাগালে কাপড়ে বা গায়ে দাগ হয় না। শিশুরা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারে। খরচ খুব কম, একটুতেই অনেকটা কাজ হয়। মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে আদর্শ জীবাণুনাশক উপকরণ এই 'ডেটল'। "মডার্ণ হাইজিন ফর উইমেন" (মহিলাদের আধুনিক স্বাস্থ্যরক্ষা) পুস্তিকাটি বিনামূল্যে দেওয়া হয়—চিঠি লিখুন।

দাড়ি কামানোর জলে কয়েক ফোঁটা 'ডেটল' মিশিয়ে নেবেন, তাতে ছোট-খাটো কাটাকুটি বা আঁচড় আর বিষিয়ে ওঠার ভয় থাকবে না। বেশী জলে অল্প 'ডেটল' মিশিয়ে কুলকুচো করলে গলায় আরাম ও উপকার পাবেন।

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিঃ,
পোঃ বক্স ৬৬৪, কলিকাতা ১

D81-2

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

পঞ্চানন ঘোষাল

'সুরেন্দ্র বাবুকে চাইছিলেন ?' উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, 'ও বুঝেছি ! কিন্তু তিনি তো বদলি হয়ে গিয়েছেন, এ কোয়ার্টারে পূর্বে তিনি থাকতেন বটে, এখোন আমি এখানে থাকি।' উত্তরে মেয়েটি বললে, 'সত্যি বলছি তা জানতাম না, প্রায় দুই মাসের উপর আমি মামার বাড়ীতে ছিলাম, মাত্র কাল এসেছি।'

মেয়েটির কৈফিয়ৎ অবিশ্বাস্য ছিল না, কারণ থানা-বাড়ীর কোয়ার্টারগুলিতে এইরূপ 'কমেডি অব এরর,' প্রায়ই হয়ে থাকে। চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে অফসারদের কোয়ার্টার ছেড়ে অন্যত্র বদলি হয়ে যেতে হয়েছে, আত্মীয়-স্বজনকে খবর দিতে তাঁরা কদাচ সময় পেয়েছেন। এমন বহু বার ঘটেছে যে, একজন অফসার সকালে অন্যত্র গমন করেছেন, এবং অপর এক অফসার সপরিবারে ঐ দিনই বৈকালে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। হয়তো বা এই নূতন অফসারের লাজুক স্ত্রী কোনও এক ঘরে বসে পান সাজছেন, এমন সময় পূর্ববতন অফসারের এক ভ্রাতা 'বৌদি বৌদি' বলে ছুটে এসে ভদ্রমহিলার কোল ঘেঁসে বসে পড়লো। এবং এর কিছু পরে তাঁর ভুল বুঝতে পেরে ভদ্রলোক মরিয়া হয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়লেন দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। প্রণব বাবু মেয়েটির ভুল বুঝতে পেরে উত্তর দিলেন, 'না না, আপনাকে আমি বিশ্বাস করেছি, কিন্তু সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ?'

মেয়েটি প্রণব বাবুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করে আঁচলের খুঁটটা তার একটা আঙুলে জড়াতে সুরু করলো। এইবার প্রণব বাবুর নিকট বিষয়টা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে উঠলো। তিনি এইবার একটু ক্ষীণ হাসি হেসে বললেন, বুঝেছি ! সম্পর্কটা সাপে-নেউলের নয় ; সম্পর্কটা তা'হলে মধুর। তা' ভয় পাবেন না, সুরেন্দ্র বাবু আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।'

মেয়েটির মন এতক্ষণ পালাই পালাই করছিল, এইবার সে নিশ্চিন্ত হয়ে উত্তর দিলে, 'আপনি তাঁর বন্ধু বুঝি ? তাই আপনিও এতো ভালো। আপনিও কোয়ার্টারে একা থাকেন বুঝি ?' 'ভাগ্যিস কোয়ার্টারে একা থাকি।' প্রণব বাবু উত্তর করলেন, মা-বোনেরা এখানে থাকলে তাদের সঙ্গেই কথাবার্ত্তা ক'য়ে আপনি বিদায় নিতেন, আমার সঙ্গে কি তা'হলে এতো আলাপ করার সুবিধে হতো ?'

'আমাকে ভুল বুঝবেন না,' একটু কিন্তু-কিন্তু করে মেয়েটি উত্তর করলো, 'আমি ভালো-ঘরের মেয়ে। বাগবাজারে অ... নম্বরে থাকি, নিজেদের বাড়ীতে। খোঁজ নিয়ে দেখবেন আপুন। এখন আমি যাই, বড্ড ভয় করছে।' 'ভয়-ডর তা'হলে আপনার আছে,' হেসে ফেলে প্রণব বাবু উত্তর দিলেন, আচ্ছা তা'হলে আপনি যেতে পারেন। যদি আরও একটু বসতে চান তা'ও বসতে পারেন, এক কাপ চা তৈরী করতে তাহ'লে হুকুম দিই।' 'থাক্, আজ নয়,' উত্তরে মেয়েটি বললো, 'আমি এখন চলে যাবো।' প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি আপনাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবো ?' আঁতকে উঠে মেয়েটি উত্তর দিলে, 'না না, দরকার নেই। আপনি একদিন আমাদের বাড়ীতে যাবেন। আমার বাবার সঙ্গে আলাপ করে আসবেন।' প্রণব বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু, আপনার সঙ্গে তো দেখা হবে না।' উত্তরে মেয়েটি বললো, 'আগে তো বাবার সঙ্গে আলাপ করুন। আপনার সঙ্গে তর্ক করতে পারি না, আমি চললুম।'

কথা কয়টি ব'লে মেয়েটি হন-হন করে কোয়ার্টার হতে বার হয়ে যাচ্ছিল, প্রণব বাবু ছুটে এসে পথ অবরোধ করে বললেন, 'দাঁড়ান, দেখে আসি বাইরে কেউ আছে কি না। সন্ধ্যে বেলা একজন মেয়েকে বেচিলার কোয়ার্টার থেকে বার হয়ে আসতে দেখলে লোকে বলবে কি ? বিনা দোষে অপবাদ রটলে গায়ে বড়ো লাগে। অপরের প্রাপ্য যা, তা আমি নিজের ঘাড়ে নেবো কেন ?

প্রণব বাবু কোয়ার্টার হতে বার হয়ে এসে সিঁড়ির উপর ও নীচে ভালো করে দেখে নিলেন। মেয়েটিকে অপরের অগোচরে বার করে দিতে পারলে লোকে তাকে দেখলেও ক্ষতি নেই, কারণ কেউ-ই বুঝতে পারবে না, কোন্ কোয়ার্টার থেকে সে বার হয়ে এসেছে ? তাড়াতাড়ি একদমে মেয়েটিকে সিঁড়ির চাতালে ছেড়ে দিয়ে দরজার নিকট হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে প্রণব বাবু মনে মনে বলে উঠলেন, 'বাপস্ ! একখানা মেয়ে বটে !' কিন্তু প্রণব বাবুর এই "নিশ্চিন্তি ভাব" ছিল একান্তরূপ ক্ষণিকের। মেয়েটি অন্তর্হিত হওয়া মাত্র তাঁর মোহ বিদূরিত হয়ে গিছল। প্রকৃতিস্থ হওয়া মাত্র শঙ্কার সহিত প্রণব বাবু ভাবলেন, এতে ভৈরব বাবু চক্রান্ত নেই তো ? প্রণব বাবুর জানা ছিল যে, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এইরূপ বহু পোষা মেয়ে ভৈরব বাবুর তাঁবে আছে। এতো দেরীতে বিষয়টি নরেন বাবুর গোচরে আনাও যায় না, বিশেষ করে যখন তাকে আটকে রাখা হয়নি। সাত-পাঁচ ভেবে প্রণব বাবু মনস্থ করলেন, আপততঃ ঘটনাটি চেপে ফেলে মেয়েটির বাগবাজারের ঠিকানায় গোপনে খোঁজ-খবর করে দেখবেন, প্রকৃত পক্ষে মেয়েটি অসৎ উদ্দেশ্যে এইখানে এসেছিল কি না।'

মেয়েটি দ্রুতপদে সিঁড়ি ব'য়ে নীচে নেমে গেলে প্রণব বাবুর মনে হলো তাকে এতোটা আসকারা না দিলেই ভালো হতো। মেয়েটি যে ভালো মেয়ে নয় তা তো বোঝাই গিয়েছিল। নিজের দুর্ব্বলতার কথা ভেবে প্রণব বাবু লজ্জিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ভেবে নিলেন, এই রকম কোনও মেয়ের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হলে তিনি তাকে সহজে রেহাই

দেবেন না। সুস্থ মস্তিষ্কে মেয়েটির কথা চিন্তা করে প্রণব বাবু আপন মনে ব'লে উঠলেন, কি জঘন্য চরিত্রের এই মেয়েটা, গায়ে পড়ে আবার আলাপ জমাচ্ছিল! সহসা প্রণব বাবুর মনে অপর আর একটি বিষয়ের উদয় হলো। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর শয়ন-কক্ষে ফিরে এসে লক্ষ্য করলেন, দুইখানি মুক্তাখচিত সোনার কান-পাশা খাটের নিচে মেঝের উপর পড়ে রয়েছে। এর পর প্রণব বাবুর আর সন্দেহ রইলো না যে, মেয়েটিকে ভৈরব বাবুই তাঁর কাছে ছদ্মবেশে পাঠিয়েছে। ইচ্ছা করে ঐ অলঙ্কার তাঁর ঘরে ফেলে না গেলে নিশ্চয়ই সে এতক্ষণে পথ হতে ফিরে আসতো। সন্ত্রস্ত হয়ে প্রণব বাবু ভাবতে সুরু করলেন, অলঙ্কার দুইটি তিনি অধিকক্ষণ গৃহে রাখবেন কি না? ব্যস্ত হয়ে প্রণব বাবু বার হয়ে এসে নরেন বাবুর কোয়ার্টারের সম্মুখে এসে কলিং বেলের বোতামটা টিপে দিলেন। নরেন বাবু উর্দ্দী পরে প্রস্তুত হয়ে বোধ হয় এই সময় নীচে নামবার উপক্রম করছিলেন। তাড়াতাড়ি বার হয়ে এসে দরজার নিকট প্রণব বাবুকে দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খবর প্রণব, এতো সকালে? এসো, ভিতরে এসো।'

উভয়ে ভিতরে এসে বসবার কক্ষে বসে পড়লেন। টেবিলের উপর অর্দ্ধভুক্ত এক কাপ চা রাখা ছিল, বোধ হয় চা পান করতে করতে নরেন বাবু বার হয়ে পড়েছিলেন। নরেন বাবুর নির্দ্দেশে তাঁর ভৃত্য আর এক কাপ চা টেবিলে রেখে চলে গেলে নরেন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার, বলো, এইবার। যেন ভয় পেয়ে গেছো মনে হচ্ছে!' প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার স্ত্রী কেমন আছেন স্যার?' 'খুউব ভালো নয়। এমনি এক রকম আছেন', উত্তরে নরেন বাবু বললেন, 'এখোন তোমার ব্যাপার আগে বলো।'

একটু কিন্তু-কিন্তু করে প্রণব বাবু নরেন বাবুকে সকল কথা জানিয়ে দিলেন। সকল কথা শুনে নরেন বাবু বললেন, 'সোনার কানপাশা দুটোই ফেলে গেলেন, একটা নয়! আইডিয়া ভালোই। তোমার অবিভাবকরা কোথায় থাকেন প্রণব? ও থুড়ী, তোমার অবিভাবক তো তুমি নিজেই। আমি জিজ্ঞাসা করছি, তোমার বাবা-মা এখোন কোথায়? আরও একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, তোমার এখোন বয়স কতো?' 'কেনো স্যার, এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন?' প্রণব বাবু উত্তর করলেন, 'তাঁরা দেশের বাড়ীতে আছেন। আমার বয়স এখোন ২২ হবে, ২৩ও হতে পারে। আপনি কি স্যার, আমাকে এই ব্যাপারে সন্দেহ করছেন?'

প্রণব বাবু অপরাধীর ন্যায় কিন্তু-কিন্তু ভাব নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে আর একটি কথা বলতেও তাঁর সাহস হচ্ছিল না। তার মনে হচ্ছিল, কে জানে, নরেন বাবু ঘটনাটি কি ভাবে গ্রহণ করলেন। কিন্তু নরেন বাবু ছিলেন একজন সংসার-অভিজ্ঞ ব্যক্তি, প্রকৃত ঘটনা তিনি আন্দাজ করে নিতে পেরেছিলেন। প্রণব বাবুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নরেন বাবু গম্ভীর ভাবে বললেন, 'এই ব্যাপারে তোমাকে সন্দেহ করলে তোমাকে একদিনও এই থানায় রাখতাম না। আমি আমার ছেলেকেও ক্ষমা করি না, বাপকেও না। হাঁ, আর এখানে আমিই হচ্ছি তোমার গার্জেন। তোমার ভালো-মন্দ আমাকেই দেখতে হবে। এখোন কথা হচ্ছে এই, তোমাকে এখোন হতে খুউব সাবধানে থাকতে হবে। বিহারী বাবুও কম অভিজ্ঞ ব্যক্তি নন। অফসারদের বয়স দেখে তিনি টোপ ফেলছেন। মনে হচ্ছে, এই থানার বিদায়ী অফসররাও এই সব ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। এখোন এসো তো নীচে, এই সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট লিখে ফেলি। ট্র্যাপ আমরাই ওদের করবো, ওরা আমাদের ট্র্যাপ করবার বা ফাঁদে ফেলবার আগেই। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, এর মধ্যে বিহারী বাবুর কোনও হাত নেই। হয়তো এটি একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনাই হবে, কিন্তু চোখ খুলে কাজ করবেন, শত্রু আমাদের পদে-পদে। আচ্ছা, দেখা তো যাক, ঠিকানা মনে আছে তো?'

সম্মুখের টি-পয়ের উপর চা'এর দুটি কাপ তখনও পর্য্যন্ত তেমনি ভাবেই পড়েছিল। চায়ের পেয়ালা হতে ধূম কুণ্ডলী পাকিয়ে কিছুক্ষণ উপরে উঠে স্তিমিত হয়ে এসেছে। আর অধিক দেরী না করে উভয়ে পেয়ালা দুইটি মুখে তুলে ধরলেন। চায়ের কাপের কানায় একটা চুমুক দিয়ে প্রণব বাবু বললেন, পূর্ব্বেকার বড় বাবু এতো আবর্জ্জনার স্তূপ জড়ো করে রেখে গিয়েছেন যে আপনাকে তা মুক্ত করতে হলে এক বৎসর সময় লাগবে।'

'কিই, কি বললেন? এক বৎসর!' গম্ভীর হয়ে নরেন বাবু বললেন, 'তা' হলে চেনোনি আমাকে। আমি বড়ো হৃদয়হীন লোক। প্রয়োজন হলে ষ্টিম্ রোলার চালিয়ে দেবো। এই সব কাজে এক মাস আমি যথেষ্ট মনে করি। আমার নাম হচ্ছে, নরেন মুখুজ্জে।'

কয়েক চুমুকে চা পান শেষ করে নরেন এবং প্রণব বাবু উঠে পড়ছিলেন, সহসা সম্মুখের ঘর হতে বার হয়ে এসে নরেন বাবুর স্ত্রী বললেন, 'শুনছো, খোকাটাকে আনিয়ে নাও। আর আমি পারছি না।' নরেন বাবুর স্ত্রী সুধীরা দেবী প্রণব বাবু এখানে আছেন তা না জেনেই বেরিয়ে এসেছিলেন। সহসা প্রণব বাবুর প্রতি লক্ষ্য পড়ায় তিনি ধীরে ধীরে পেছিয়ে যাচ্ছিলেন। নরেন বাবু তাঁকে মানা করে বলে উঠলেন, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, যেয়ো না। এ আমার সেকেণ্ড অফসার প্রণব বাবু।' প্রণব বাবু এইবার তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে সুধীরা দেবীর পদধূলি গ্রহণ করলেন এবং তার পর নরেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খোকন আপনার ছেলে? এখানে নেই বুঝি সে।' 'না প্রণব', নরেন বাবু উত্তর করলেন, এখানে নেই, কখনও ছিলও না। সে মামার বাড়ী থাকে। থানায় কখনও ছেলে মানুষ হয়? এখানে এলে সে কি শিখবে? শিখবে গাল দিতে আর মানুষকে নিপীড়ন করতে। থানার উপরতলা হতে নীচের তলার ব্যবধান বেশী নয়। এই নিয়েই তো আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার যতো বিরোধ। থানাদারের ছেলে মানুষের মত মানুষ হয়েছে, কখনও তা শুনেছো তুমি? অবশ্য যারা গোয়েন্দা বা অনুরূপ বিভাগে বহাল আছে তাদের কথা স্বতন্ত্র।'

অদূরে অর্দ্ধচন্দ্রাকার একটি ট্রিপয়ের উপর একটি পাঁচ বৎসরের শিশুর ফটোচিত্র দণ্ডায়মান অবস্থায় রাখা ছিল। ফটোটির দিকে স্থিরদৃষ্টি রেখে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, 'কিন্তু স্যার, উনি তো অসুস্থ। এই সময় খোকাকে—।' ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে ইসারায় নরেন বাবু বললেন, 'চুপ।' এবং তার পর আর দ্বিরুক্তি না করে উঠে দাঁড়ালেন। প্রণব বাবু লক্ষ্য করলেন,

বড়বাবুর স্ত্রীর চোখ ইতিমধ্যে জলে ভরে উঠেছে। তিনি একটু ক্ষণও সেইখানে না দাঁড়িয়ে পাশের ঘরে ঢুকে পড়লেন কারুর কাছে বিদায় না নিয়েই। নরেন বাবুর কিন্তু সেই দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না, স্ত্রী সুধীরা দেবী অন্যত্র চলে গেলে, একটা সিগারেট ধরিয়ে নরেন বাবু বললেন, 'দুঃখ করলেই হলো কি না! আমার বিচার আমার কাছে। এ থেকে কেউ আমাকে বিচ্যুত করতে পারবে না। এখোন এসো প্রণব, নীচে যাই। এখোনও অনেক কাজ বাকি।'

প্রণব ও নরেন বাবু আফিস ঘরে নেমে এসে দেখলেন, পূর্ব্বদিনের মত এই দিনও থানা মামলায় মামলায় ভরে গিয়েছে। মারপিট, পকেটমার,বাড়ী হতে চুরি, চাকর কর্ত্তৃক চুরি, প্রবঞ্চনার মামলা—মামলার যেন আর পরিশেষ নেই। সময় তখন সকাল সাড়ে সাতটা, এখনও সারা দিন বাকি। প্রায় জন বারো অভিযোগকারী এখানে-ওখানে জটলা করছে, কিন্তু তাদের অভিযোগ গ্রহণ করবার জন্যে একজন রক্ষীও আফিসে উপস্থিত নেই। ভ্রূকুটী করে তাদের দিকে একবার তাকিয়ে নরেন বাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'আমি আর প্রণব ছাড়া থানায় কি আর অফসার নেই? থার্ড অফসার, ফোর্থ অফসার, এঁরা গেলেন কোথায়? এখোনো তাঁরা ঘুমুচ্ছেন। পাবলিককে এই ভাবে হ্যারাস করা চলবে না। পুরানো জমান চলে গিয়েছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে নেমে আসা চাই। তা' না হলে আমি রিপোর্ট লিখে দেবো।'

নরেন বাবুর হাঁক-ডাক ও চীৎকার নীচুতলার ছাদ ভেদ করে উপরতলার প্রত্যেক কোয়াটারেই পৌঁছে গিয়েছিল। থার্ড অফসার ধীরেন বাবু তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আফিসে এসে দেখলেন, ইতিমধ্যে সেইখানে অপর আর একটি ফ্যাঁসাদ ঘটে গিয়েছে। এলাকার কোনও এক ব্যবসায়ী না বুঝে এক ঝাঁকা ফল ও কিছু ফুল নূতন বড়বাবুকে উপহার দিতে এসেছে। লোকটিকে উপলক্ষ্য করে নরেন বাবুর চীৎকার একেবারে সপ্তমে চড়ে গিয়েছিল। সারা থানা মাত করে চীৎকার করে তিনি বলছিলেন, 'দিন লোকটাকে হাজতে ভরে। ঘুষ দিয়ে আমাকে ভোলাবে?' সুধীর বাবুকে সম্মুখে দেখে তাঁর রাগ না কমে আরও বেড়ে গেল। খিঁচিয়ে উঠে তিনি বলে উঠলেন, 'এতক্ষণে আসা হলো? রাত্রি তোমরাই জেগেছো, আমরা জাগিনি? যাও, একটা চুরি কেস্ নিয়ে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ো। আচ্ছা হাঁ, থাক! এগুলো ধীরেন বাবু আর রহমন সাহেব দেখবে। তুমি একটা কায করো। প্রণবের কাছ থেকে বাগবাজারের একটা ঠিকানা নিয়ে চটপট জেনে এসো, ঐ বাড়ীটাতে কারা বাস করে। কিন্তু খুব গোপনে, বুঝলে? প্রণব তুমি এখোন ওধারে আর যেয়ো না। হাঁ, আর একটা কথা!' নরেন বাবুর নির্দ্দেশ শেষ হবার পূর্ব্বেই তাঁর সামনে একজন বালক এসে দাঁড়ালো। দুই হাতে তার উদরের নিম্নদেশ সজোরে চেপে ধরে সে থানায় এসেছে। নরেন বাবুর নিকট এগিয়ে এসে বালকটি নালিশ জানালো, 'হুজুর, চাক্কু মার দিয়া। মেরি বুনাই হুজুর। তেনি দিল্লাকী করকে।'

নরেন বাবুর মন এমনিই বিষিয়ে ছিল, শালা-ভগিনীপোতের এই অভিনব ঠাট্টা বা দিল্লাকীর কথায় তাঁর রাগ এই বার সপ্তমে চড়লো। বালকটির হাতখানা মুঠি ক'রে ধরে তিনি খেঁকরে উঠলেন, 'উঠাও দেখি হাত, বদমাস কাঁহাকো।' পেশোয়ারী বালক কিছুতেই উদর হতে তার হাত উঠিয়ে নিতে রাজী হলো না। বিরক্ত হয়ে নরেন বাবু বললেন, 'বেটা দেখছি মস্ত শয়তান! কোন্ হ্যায় তুম? হামা পাঞ্জাবীকো কোহী? ঠিকসে বাতাও।'

বালকটির কিন্তু আর কথা বলবার একটুও ক্ষমতা ছিল না, সে কাতরাতে কাতরাতে তার পেটটা চেপে ধরে বসে পড়লো। নরেন বাবু কিন্তু তাকে ভুল বুঝলেন। জোর করে তার হাতটা সরিয়ে দেওয়া মাত্র ঝড়-ঝড় করে তার নাড়িভুঁড়ি ক্ষতের পথে বার হয়ে এলো। পেশোয়ারী বালকটিও অচৈতন্য হয়ে মেঝের উপর গড়িয়ে পড়লো। ঘটনাটির জন্য উপস্থিত কেউই প্রস্তুত ছিল না। স্তম্ভিত হয়ে নরেন বাবু কিছুটা পেছিয়ে এসে বললেন, 'বুঝেছি, পেশোয়ারী গুণ্ডার জান! যাক্, ইচ্ছে করে তো ওকে মারিনি। কৈ, কে আছো? এক্ষুনি একে হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও।'

তাড়াতাড়ি টেলিফোনের রিসিভার তুলে এ্যাম্বুলেন্সের জন্য ফোন করে প্রণব বাবু বললেন, 'ছেলেটাকে চিনি স্যার! ও রহমন গুণ্ডার ছেলে, ও-ও এক গুণ্ডা।' তার পর আফিসের একটা আলমারী থেকে কয়েকটা ফার্ষ্ট এইডের পটি বার করে উদরে বেঁধে দিতে দিতে প্রণব বাবু বললেন, 'বোধ হয় বাঁচবে না, স্যার!' উত্তরে নরেন বাবু বললেন, 'তাতে ক্ষতি কি? একটা গুণ্ডা তো কমবে। এ্যাম্বুলেন্সের অপেক্ষা না ক'রে থানার গাড়ীতেই পাঠিয়ে দাও ওকে। কর্ত্তব্য করে যাও। বাঁচে বাঁচবে, না হয় মরবে। নাও নাও, একটা কায নিয়ে থাকলে চলবে?' থানার লরীতে বালকটিকে একটি সিপাহীর জিম্মায় উঠিয়ে দিয়ে প্রণব বাবু ফিরে এসে দেখলেন, 'থার্ড অফসার সুধীর বাবু এতক্ষণে থানায় ফিরে এসেছেন। সুধীর বাবু অফিস-ঘরে ঢুকা মাত্র নরেন বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হলো, কিছু পেলেন? বাগবাজারের ঐ বাড়ীটাতে থাকে কারা?' উত্তরে সুধীর বাবু বললেন, 'সুবিধে হলো না স্যার!' বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, দেখি সুরেন বাবু বেরিয়ে আসছেন। প্রণব বাবু আসবার আগে তিনি এই থানাতেই বহাল ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন ওটা তাঁরই এক আত্মীয়ের বাড়ী।' 'ননসেন্স সব মাটী, নরেন বাবু উত্তর করলেন, আমাদেরই ভুল হয়েছিল, ঘটনা সম্বন্ধে ওকে ব্রিফড করে দেওয়া হয়নি। কিন্তু, ব্যাপারটা বোঝা গেল না। আচ্ছা, প্রণব তুমি নিজে দেখো, কিন্তু খুউব গোপনে।'

ঈদের উৎসব আগতপ্রায়—ইতিমধ্যেই রাস্তায় ডিউটি পড়ে গিয়েছে। অধিক সিপাহী-শান্ত্রী থানাতে মজুত নেই। প্রণব বাবু মাত্র দুই জন সিপাহী সহ রূপগাজী অঞ্চলে রোঁদে বার হচ্ছিলেন। ফোর্থ অফসার রহমন সাহেব তাঁর পথ অবরোধ করে বলে উঠলেন, 'কি? রোজ রোজ রূপগাজী!' রূপগাজী! আসুন আজ একটা সিনেমায় গিয়ে উঠি।' 'প্রায় দু'দিন ওধারে যাইনি,' উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, 'আজ না গেলে বড়বা[illegible]গ করবেন। কয়েক জনকে পাকড়াও করে এক্ষুনি [illegible]

বাজে-বাজে খেটে মরছেন', রহমন সাহেব প্রত্যুত্তর করলেন, 'আমরা তো কয়েদি নহি, চব্বিশ ঘণ্টা থানায় আটকা থাকবো। বড়বাবুর মত আপনিও দেখছি একেবারে কায-পাগল হলেন। শুনুন, জুপিটার সিনেমায় ন'টার শোতে আমরা যাচ্ছি, আপনিও একটু ঘুরে-ফিরে ওখানে হাজির হবেন। কে আর জানতে পারছে? বুঝলেন, আমরাও রক্ত-মাংসের মানুষ, যন্ত্র কেউ-ই নই।' 'চুপ' প্রণব বাবু উত্তর করলেন, 'বড়বাবু আসছেন।'

থানায় ঢুকে প্রণব বাবু এবং রহমন সাহেবকে একত্রে কথোপকথন করতে দেখে নরেন বাবু বললেন, 'কি ব্যাপার প্রণব, তুমি বেরোওনি এখনও। হাঁ, ভালো কথা, বাগবাজারের কোনও খবর পেলে?' 'হাঁ স্যার পেয়েছি', উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, 'ও কিছু নয়, ও একান্ত ব্যক্তিগত প্রেমের ব্যাপার। বিহারী বাবুর সঙ্গে ওদের কোনও সম্পর্ক নেই। ও-রকম গায়ে-পড়া মেয়ে তো প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। মিছামিছি হয়রানি হতে হলো। মাথা ঘুরিয়ে পিছিয়ে আসবার সময় দুটো পাশাই ওর পড়ে গিয়েছিল। কাল-পরশু ওকে অলঙ্কার দুটো ফেরত পাঠিয়ে দেবো।' 'না না, ওকে-ফোকে আবার কি?' খেঁকরে উঠে নরেন বাবু উত্তর করলেন, 'কাউকে দরদ দেখাবে না। ওর বাপ-মার কাছে সরাসরি ওগুলো পাঠিয়ে দেবে সব কথা তাদের জানিয়ে দিয়ে' এর পর তিনি রহমন সাহেবকে উদ্দেশ করে বললেন, 'কি ব্যাপার, সেজে-গুজে বার হচ্ছেন কোথায়? প্রণব বাবু ঘুরে না আসা পর্য্যন্ত একটু থানায় হাজির থাকবেন, প্রায়ই তো দেখি ডাইরী বহিতে 'প্রাইভেট কথা, সিনেমা' ইত্যাদি লিখে বার হয়ে যান। সিনেমা টিনেমা একটু কমিয়ে দিন, বুঝলেন। আচ্ছা, আপনি বসুন, আমি আসছি এক্ষুনি, আপনাকে নিয়ে একটা রেইড করবো।'

নরেন বাবু উপরে চলে গেলে রহমন সাহেব বললেন, 'ত্তেং তেরী, আপোদ!' হেসে ফেলে প্রণব বাবু বললেন, 'থাকুন আপনি বোসে, আমি তো চলি।' কথা কয়টি বলে প্রণব বাবু সিপাহী সহ ফুটের উপর নেমে পড়েছিলেন, এমন সময় একজন সিপাহী পিছন-পিছন দৌড়ে এসে জানালো, 'হুজুর টেলিফোঁক।' পিছন ফিরে প্রণব বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'টেলিফোঁক? কাঁহাসে আয়া? নাম পুছা?' উত্তরে সিপাহী জানালো, 'নেহি হুজুর', নেহি পুছা।'

অর্দ্ধপথ হতে ফিরে আসতে প্রণব বাবুর মন চাইছিল না। ধমক দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাহে নেহি পুছা?' সন্ত্রস্ত হয়ে সিপাহী উত্তর করলো, হুজুর বহু মিঠা গলা। একটি মেয়েকে কথা বলতে শুনে সিপাহী সাহস করে তার নাম জিজ্ঞেস করতে পারেনি। নারী-কণ্ঠের মিহি সুর তার যে ভালো লাগেনি তাও নয়। মুখের ভাষায় তার মনের কথা আচমকা বার হয়ে পড়ে থাকবে। সিপাহী একটু ভীত হয়ে পড়লো, লজ্জিতও। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সিপাহীর দিকে চেয়ে প্রণব বাবু ভাবলেন, কে আবার ডাকলো? তাঁর কোনও বৌদি কি? কই না, তারা তো কেউ কোলকাতায় নেই। থানায় ফিরে এসে প্রণব বাবু রিসিভারটি তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে? কে আপনি?'

টেলিফোনের ওপার থেকে উত্তর এলো, থুকু, থুকুরাণী। উত্তরের সঙ্গে একটা চাপা হাসিও শুনা গেলো—হি হি হি। ফিক-ফিক করে ওপারের মেয়েটি হেসেই চলেছে, হাঁ, মিঠা গলাই বটে। গলার স্বর শুনে বুঝা যায় তার বয়স সতেরোর ওপরে নয়। কিন্তু এই রকম কোনও মেয়ের সহিত তো তার ঘনিষ্ঠতা নেই। প্রণব বাবুর মনে সন্দেহ জাগলো। বিরক্তির সহিত প্রণব বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কে আপনি? কোথা থেকে ফোন করছেন? এক্ষুনি বলুন।' 'কোথা থেকে?' ফোনের ওপার হতে উত্তর এলো, 'এই, একটা জায়গা থেকে, যেখানকার নাম করতে নেই।'

কথা কয়টি উচ্চারণ করে ওপারের মেয়েটি পুনরায় চাপা হাসি হাসলো—ফিক্-ফিক্। এতক্ষণে প্রণব বাবুর নিকট বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠলো। মেয়েটি যে কে? কোথা হতে সে ফোন করছে, তা তাঁর বুঝতে বাকি থাকেনি। ঘৃণায় ও অবজ্ঞায় তার মুখটা বিকৃত হয়ে উঠলো। কিন্তু, কে ওই মেয়েটা? বড্ড আস্পর্দ্ধা দেখছি। ক্রুদ্ধ হয়ে প্রণব বাবু বলে উঠলেন, ভেবেছেন কি আপনারা? সকল অফসারকেই সমান মনে করেন, না? আর পাঁচ জনকে যে রকম দেখেছেন, আমি সেই রকমের অফসর নই, বুঝলেন। আপনার এই হাসিতে অন্তত: আমি ভুলবো না। কতো নম্বর থেকে আপনি বলছেন, এক্ষুনি বলুন, না বলেন এক্সচেঞ্জ থেকে জেনে নেবো। তার পর মজা দেখাবো আপনাকে।'

এতোটা বোধ হয় ওপারের মেয়েটি আশা করেনি, বরং সে ভদ্র ব্যবহারই আশা করেছিল। কিন্তু একটুও রাগ না করে সে উত্তর দিলো, 'অপর পাঁচ জন অফসারের মতো আপনাকে দেখিনি ব'লেই ফোন করছি। এই অঞ্চলের সকল মেয়েকে আপনিও সমান মনে করবেন না। আমি যা বলবো তা আপনার মঙ্গলের জন্যেই। এই মাত্র আমার চাকর এসে জানালো, রূপগাজির মোড়ের নিকট, দয়াল মিত্রির লেনের ধারে, দুই জন গুণ্ডা ছুরি হাতে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।'

রূপজীবিনী-মহল্লার কোনও মেয়ে এই ভাবে তাঁর সঙ্গে কথা কইবে প্রণব বাবুর তা ধারণার বাইরে ছিল। তাঁর মনে হলো, বোধ হয় কেউ এই মেয়েটাকে দিয়ে এইবার সত্য সত্যই তাকে ট্র্যাপ করে অপদস্থ করতে চেষ্টা করছে। পুলিশ কর্ম্মচারী তিনি, ঘরে-বাইরে তাঁর শত্রু। এ ছাড়া বেশ্যাপল্লীতে রাত্তের পর রাত্ত এই ভাবে হানা দেওয়া কেউই পছন্দ করছিল না। আজ এই জন্যে বিহারী বাবুর ন্যায় দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিদের বাদ দিলেও শহরের পদস্থ ব্যক্তি হতে সাধারণ মানুষ পর্য্যন্ত তাঁর শত্রু। প্রণব বাবুরা সকলেরই নানারূপ অসুবিধার কারণ হয়েছেন।

'ন্যাকামী রেখে দিন, আপনাদের কোনও কথাই বিশ্বাস করি না,' ক্রুদ্ধ হয়ে প্রণব বাবু বললেন, ' আমি রিসিভার নামিয়ে রাখছি, কখনো আর আমাকে ফোন করবেন না।'

থার্ড অফসার সুধীর বাবু তখনও পর্য্যন্ত আফিস-ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করছিলেন, প্রণব বাবুকে রাগারাগি করতে শুনে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি প্রণব বাবু, ব্যাপার কি? কে ও?' উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, 'কে জানে! একটা মেয়ে টেলিফোনেই আমাকে পটাতে চায়। বলে, আমাকে আজই কারা খুন করবে। ভয় দেখাচ্ছে আর কি? আবার রোক কি? বোধ হয় নাম-করা কাউর কেউ হবেন।' 'না প্রণব বাবু', কথাটা একেবারে ফেলে দেবেন না', সুধীর বাবু উত্তর করলেন, 'এই রকম একটা খবর আমিও শুনেছি। বেশী লোক-জন নিয়ে বেরুনো ভালো, বুঝলেন।'

[ক্রমশঃ।

উপনিবেশ চন্দননগরের শেষ অঙ্ক

শ্রীহরিহর শেঠ

কার্য্যত: হস্তান্তর (Defacto transfer) হইতে আইনানুগ হস্তান্তর (De jure transfer) পর্য্যন্ত।

বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি যথাসম্ভব তারিখ সহ দেওয়া হইল। যে সকল ভারতীয় আইন প্রয়োজনীয় সংশোধন সহ এই সময়ের মধ্যে প্রযোজ্য করা হইয়াছে, সুবিধার জন্ম তাহা শেষে দেওয়া হইবে।*

১৯৫০

২রা মে—ফ্রান্সের নিকট হইতে ভারত সরকারের নিকট চন্দননগর কার্য্যত: হস্তান্তরিত (De facto transfer) হয়। এই সংক্রান্ত সনদে ফ্রান্সের পক্ষে তদানীন্তন চন্দননগরের ফরাসী ভারতের কমিশনরের প্রতিনিধি মসিয়ে তাইয়্যর (G. H. Tailleur) ও নবনিযুক্ত ভারতীয় এ্যাড্‌মিনিষ্টেটর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই-এ-এস্ স্বাক্ষর করেন। আটটি ভারতীয় ফৌজদারী আইন প্রয়োগের কথা ঐ দিনই ঘোষিত হয়।

৩০শে জুন—র‍্যাশন্ বিভাগের হিসাব পরীক্ষার জন্ম গঠিত উপসমিতির রিপোর্ট হইতে উদ্ভূত র‍্যাশন্ বিভাগের চাউলের এজেন্টের মানহানিকর কার্য্যের অজুহাতে উপসমিতির সভাপতি সম্পাদক ও তিন জন সদস্যের প্রত্যেকের নামে এক এক লক্ষ টাকার এবং স্থানীয় "মর্ম্মবাণী" পত্রিকা সম্পাদকের নামে মানহানিকর মন্তব্যের জন্ম পরে পাঁচ লক্ষ টাকার দাবী দিয়া এজেন্ট শ্রীযুক্ত শ্রীদামচন্দ্র ভড় কলিকাতা হাইকোর্টে মোকদ্দমা রুজু করেন। এই ব্যাপার লইয়া সহরের ভিতরে ও বাহিরে বিশেষ আন্দোলন সৃষ্টি হয়।

১৫ই জুলাই—পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট বাস্তুহারাদের গৃহনির্ম্মাণকল্পে ১৯৫০—৫১র জন্ম ২০০০০০৲ টাকা লোন মঞ্জুর করেন।

১৬ই জুলাই—বঙ্গবিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "সুকুমার স্মৃতি প্রাথমিক বিভাগ" নামক নবগঠিত বাটীর উদ্বোধন হয়।

১৫ই আগষ্ট—স্বাধীনতা দিবসে সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া পুলিশ কমিশনর এক আদেশ জারি করায় ফরওয়ার্ড ব্লক্ ও কম্যুনিষ্ট সমর্থকেরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ও আদেশ অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করেন। পুলিশ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে নাই।

২৫শে সেপ্টেম্বর—আর্থিক কতকগুলি বিষয় মীমাংসার জন্ম যে যুক্ত কমিশন গঠিত হয় তাহার প্রথম সভা বসে। তাহাতে ফ্রান্সের পক্ষে তাহার কলিকাতাস্থ কন্‌সল্ জেনারেল মসিয়ে দেত্রি (M. Detrie) ও ভূতপূর্ব্ব চন্দননগরের ফরাসী ভারতের কমিশনরের প্রতিনিধি মসিয়ে তাইয়্যর (G. H. Tailleur) এবং ভারতীয় পক্ষে নব নিযুক্ত এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই-এ-এস্ ও পশ্চিমবঙ্গের ফাইন্যান্‌শিয়াল্ এ্যাড্‌ভাইসার শ্রীযুক্ত এস্. সি, মুখার্জ্জী উপস্থিত থাকেন। চন্দননগর শাসন পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাস ও চন্দননগরের ভূতপূর্ব্ব কোষাধ্যক্ষ মসিয়ে লুর্দ মারিয়ানা দাঁ (Lourdes Marianadin)ও ব্যবস্থামত বৈঠকে যোগদান করেন।

পণ্ডিচারীর নিকট চন্দননগরের যে সকল প্রাপ্য দাবী করিয়া ২০শে জুন ১৯৫০ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের নিকট তালিকা দেওয়া হয় তাহা এইরূপ :

(১)	কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির	২২৯৮৯৬৲
(২)	Reserve fund এর অংশ	৮০০০০০৲
(৩)	চন্দননগর বাজেটের টাকা হইতে ১লা মে ১৯৫০ পর্য্যন্ত পণ্ডিচারী কর্ত্তৃক গৃহীত	১৭৬২৭৲
(৪)	পণ্ডিচারী হইতে প্রাপ্য কমিশন (আদায়ী টাকার উপর)	৪৭১৫৮৲
(৫)	পেন্সন্ ফণ্ড	৮৭৭৬০৲
(৬)	Welfare fund পণ্ডিচারী কর্ত্তৃক জোর পূর্ব্বক গৃহীত ও পণ্ডিচারীতে স্থানান্তরিত	৪২৭৯০৲
(৭)	বেওয়ারিস সম্পত্তির টাকা	৬৫৯০৲
(৮)	আমানত জমা (পণ্ডিচারীতে স্থানান্তরিত)	৩৪৪৬০৲
	ভারত সরকারের খাদ্য সংক্রান্ত পাওনা (১৯৪৭ সালের পূর্ব্বের হিসাব)	১৬৮০৯১৲
	চন্দননগর পুলিশ বিভাগে খরচা (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশ বাহিনীর দরুণ ১৫ই আগষ্ট হইতে ১লা মে ১৯৫০ পর্য্যন্ত)	১০০০০৲
	মোট টাকা	২৩,৫১,৭৭৮৲

১১ই নভেম্বর—ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের কারাসমূহের ইনস্পেক্টর জেনারেলকে চন্দননগরের কারা ইনস্পেক্টর জেনারেল নিযুক্ত করেন।

২৭শে নভেম্বর—বিগত মে মাসে যে মিশ্র কমিশন গঠিত হয়, ঐ কমিশন চন্দননগরের উপর ফ্রান্সের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা ভারতীয় যুক্তরাজ্যে অর্পণে (De jure transfer) সম্মত হন এবং আর্থিক ও অন্যান্য বিষয়েও একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

১৯৫১

৬ই জানুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল মাননীয় ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু চন্দননগর হাসপাতালের নবনির্ম্মিত অপারেশন্ থিয়েটারের দ্বারোদ্‌ঘাটন ও মেটার্নিটী ওয়ার্ডের ভিত্তি স্থাপন করেন। পরে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়ের জন্মোৎসব সভায় যোগদান করেন। উভয় স্থলেই তাঁহাকে মানপত্র দেওয়া হয়।

২৫শে জানুয়ারী—সংখ্যালঘু মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত সি, সি, বিশ্বাস ও ডাঃ মালিক সরকারীভাবে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ সম্পর্কে তদন্ত করিতে ও অভিযোগাদি শ্রবণ করিতে আইসেন।

---

* এই ঘটনাপঞ্জীর উপাদান সংগ্রহ করিতে শ্রদ্ধাস্পদ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর শ্রীযুক্ত সুনীলবরণ রায় আই-এ-এস্ ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাস এবং শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর দত্ত বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, সেজন্ম আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।—লেখক

২১শে জানুয়ারী—কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণের সময় স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির সহিত এনডাউমেণ্টের দরুণ যে ষ্টক্ সার্টিফিকেট্ অর্পিত হইয়াছিল তৎপরিবর্ত্তে রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ১৩০২৬৫৮৵১১ ফেরৎ পাওয়া যায়।

২রা ফেব্রুয়ারী—ভারতের হস্তে চন্দননগরের আইনতঃ হস্তান্তর (De jure transfer) স্বীকার করিয়া ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে এক চুক্তিপত্র (treaty) স্বাক্ষরিত হয়। ভারতের পক্ষে ফ্রান্সস্থিত রাষ্ট্রদূত সর্দার হরদিৎ সিং মালিক এবং ফরাসী পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রধান অফিসার মসিয়ে দেলা টুরনেল (De le Tournelle) আপন আপন সরকারের পক্ষ হইতে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। উল্লেখ থাকে ফরাসী ও ভারতীয় পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবার পর হইতে উহা কার্য্যকরী হইবে।

এই চুক্তিপত্রটির একটি প্রস্তাবনা ও বারটি ধারা আছে এবং একটি পরিশিষ্টে অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে দলিলের খসড়া, চন্দননগর শাসনের বিষয় ও ঐ সম্পর্কে যে সকল পত্র বিনিময় হইয়াছে সেই সমস্ত আছে। চুক্তির বিশেষ ধারাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

সার্ব্বভৌমত্ব—ফ্রান্স পূর্ণ সার্ব্বভৌমত্ব সহ মুক্ত চন্দননগর সহরটি ভারতের হস্তে হস্তান্তর করিবেন। নাগরিকত্ব—এই চুক্তি কার্য্যকরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী প্রজা ও চন্দননগরের ডোমিসাইল্ ফরাসী ইউনিয়নের নাগরিকগণ ভারতীয় নাগরিকরূপে গণ্য হইবেন। তবে যাঁহারা ফরাসী জাতীয়তা বজায় রাখিতে ইচ্ছুক তাঁহারা ছয় মাসের মধ্যে এই সম্পর্কে ঘোষণা করিবেন এবং উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিলে ভারত সরকার ঐ সকল ব্যক্তিকে তাঁহাদের ধনসম্পত্তি স্থানান্তরিত করিতে অনুমতি দিবেন। সম্পত্তি ও দায়—ফরাসী সরকার ভারত সরকারের নিকট চন্দননগর এলাকার সমস্ত সরকারী সম্পত্তি অর্পণ করিবেন। চন্দননগরের সরকারী পরিচালনা ব্যাপারে ফরাসী সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত সমস্ত ব্যবস্থার দায় ও দায়িত্ব ভারত সরকার গ্রহণ করিবেন। হস্তান্তরের ফলে তৎপূর্ব্বের দেনা-পাওনা সম্পর্কে যে সকল অর্থনৈতিক প্রশ্নের উদ্ভব হইবে তাহা পরীক্ষা করিয়া মীমাংসার জন্য ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে যে একটি মিলিত কমিশন ইতিপূর্ব্বে গঠিত হইয়াছে, উভয় সরকারই ইঁহাদের সুপারিশগুলি বিবেচনা করিবেন। বিচার বিভাগ—ভারত সরকার ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের, ২রা মে তারিখের পূর্ব্বে ফরাসী বিচার বিভাগ কর্ত্তৃক প্রদত্ত ডিক্রী ও রায়গুলি কার্য্যকরী করার দায়িত্ব লইবেন। ঐ তারিখের পূর্ব্বে চন্দননগরের ফরাসী বিচার বিভাগ কর্ত্তৃক প্রদত্ত রায় ও ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীলগুলির হস্তান্তরের পূর্ব্বে প্রচলিত আইনানুযায়ী বিচার করা হইবে এবং উহা যে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিচারাধীন ছিল সেই কর্ত্তৃপক্ষই উহার ব্যবস্থা করিবেন। ভারত সরকার এই আপীলের সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করিবেন।

ফরাসী মুদ্রা প্রত্যাহার করিয়া ভারতীয় মুদ্রা চালু করিতে হইবে। ভারত সরকার চন্দননগরের সমস্ত পুরাতন কর্ম্মচারী ও এজেণ্টদের ভার লইবেন। যে সকল লাইসেন্সপ্রাপ্ত আইনজীবি ডাক্তার প্রভৃতি স্ব স্ব কার্য্যে নিরত আছেন, অতিরিক্ত গুণাবলী অর্জ্জন না করিয়াও যাহাতে বিনা বাধায় তাঁহাদের সকল সুযোগ-সুবিধা রক্ষা হয় এবং আবশ্যক হইলে তাঁহাদের লাইসেন্স পুনর্ব্বহাল হয় সে বিষয় ভারত সরকার আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করিবেন। (এই ধারাটি পরে সংযোজিত হয়।) যে সকল কর্ম্মচারীদের আবশ্যক হইবে না, তাঁহাদের তিন মাসের নোটিশ ও উপযুক্ত খেসারত দিয়া বিদায় দিতে পারিবেন। ফরাসী কর্ম্মচারী যাঁহারা ফরাসী জাতীয়তা রক্ষা করিতে ও ফরাসী সরকারের কর্ম্মে থাকিতে চান তাঁহারা তিন মাসের নোটিশ দিয়া তাহা করিতে পারিবেন।

সাধারণ ঐতিহাসিক মূল্য সম্বলিত দলিলপত্রাদি ফরাসী সরকার চন্দননগরে রাখিতে অথবা চন্দননগর হইতে লইয়া যাইতে পারেন। তবে স্থানীয় প্রয়োজনে যাহা কিছু দরকার তাহা ভারত সরকারের নিকটেই থাকিবে। ভারত সরকার চন্দননগরে ফরাসী কৃষ্টির ধারা জনমতানুসারে বজায় রাখিতে সাহায্য করিবেন। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃতি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা করিতে বা উহা বজায় রাখিতে চাহিলে তাহা করিতে দেওয়া হইবে।

৬ই ফেব্রুয়ারী—ভারতীয় পার্লামেণ্টে শ্রীযুক্ত বি, কে, দাস ও পণ্ডিত কুঞ্জরুর প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র বিভাগের সহকারী মন্ত্রী ডাঃ কেশকার (B. V. Keskar) বলেন, চন্দননগর আইনতঃ হস্তান্তরের (De jure transfer) পর কিছুদিনের জন্য কতকটা 'গ' শ্রেণীর ষ্টেটরূপে পরিগণিত হইতে পারে। সন্ধিপত্রে অনুরূপ কথা কিছু আছে কিনা জানিতে চাওয়ায় বলেন, পূর্ব্বের প্রতিশ্রুতি মত নগরের অধিবাসীদের অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ চন্দননগর পশ্চিম বাংলা বা কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্গত যেরূপ ইচ্ছা করিবে সেই মত ব্যবস্থা হইবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সে ইচ্ছা জানা যাইবে।

৭ই ফেব্রুয়ারী—আড়াই বৎসর পূর্ব্বে চন্দননগরে যে পৌরসভা গঠিত হইয়াছিল ভারত সরকারের অভিপ্রায় অনুসারে তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং ভারতের প্রচলিত প্রথা অনুসারে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারে নির্ব্বাচন না হওয়া পর্য্যন্ত চন্দননগরের স্বাধিকার রক্ষা করিয়া ১৯৪৭ সালের ৭ই নভেম্বরের দেক্রের দ্বারা মুক্ত নগরী প্রতিষ্ঠিত হইবার মত শ্রীহরিহর শেঠ, শ্রীভবতোষ ঘটক, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীব্রহ্মবরণ ঘোষ, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ভড়, শ্রীআশুতোষ মুখার্জ্জী, ডাঃ আশুতোষ দাস, শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীললিত-মোহন চ্যাটার্জ্জী এই নয় জন সদস্য লইয়া একটি অস্থায়ী এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ্ কমিশন গঠিত হয়।

৩রা মার্চ্চ—৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সহরের সেন্সাস্ আরম্ভ হইয়া অদ্য শেষ হয়। তাহাতে মোট লোকসংখ্যা স্থির হয় ৪৯২১২।

১২ই এপ্রেল—পৌরসভার নির্ব্বাচনের জন্য কমিশনের সিদ্ধান্ত-মত এই প্রথম সহরকে পাঁচটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করিবার আদেশ প্রচারিত হয়।

১০ই মে—১৯৫১-৫২র জন্য গৃহহারা মুসলমানদের পুনর্ব্বসতি-কল্পে ভারত সরকার ২০০০০৲ টাকা সাহায্য দান করেন।

১১ই মে—কমিশনের অধিবেশনে র‍্যাশন্ সংক্রান্ত উপসমিতির রিপোর্ট প্রত্যাহার করা ও শ্রীযুক্ত শ্রীদামচন্দ্র ভড়ের হাইকোর্ট হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়ার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়।

২৭শে মে—এক মহতী সভায় কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ নাহার। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন। উদ্বোধন করেন শ্রীযুক্ত মোহনলাল গৌতম। এবং পতাকা উত্তোলন করেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাস এ্যাডহক্ কমিটির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

২রা জুন—বহু সমালোচিত চন্দননগর জনকল্যাণ তহবিলের (Welfare Fund) যে মামলা স্থানীয় জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে দায়ের হইয়াছিল, বহু দিনব্যাপী বহু লোকের সাক্ষ্য গ্রহণান্তে অদ্য তাহার পরিসমাপ্তি হয়। বিচারপতি রায়দান কালে মামলার অভিযোগ স্বার্থপ্রণোদিত, বাহিরের চাপে কোন উদ্দেশ্য লইয়া ঘটনার বহু পরে আনীত, নগণ্য, ভিত্তিহীন বলিয়া মন্তব্য করিয়া উহা খারিজ করিয়া দেন। এই তহবিলের ৪২৭৮৯॥৵১০ যাহা আদালতে আটক ছিল, তাহা জনকল্যাণকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবার জন্য শাসনকর্ত্তার হস্তে প্রত্যর্পিত হয়। ইহা ছাড়া ব্যাংকে মজুত ৯১৬৬।৵১৫ টাকাও শাসনকর্ত্তার হস্তে ন্যস্ত হয়।

এই তহবিল ১৯৪৭ সালে মুক্ত নগরীর নব গঠিত শাসন পরিষদ কর্ত্তৃক সাধারণের অর্থানুকূল্যে সুরু করিয়া মোট ২৩৩৪৫৪৻১০ পয়সা সংগৃহীত হয়। উহা হইতে হাসপাতালের যন্ত্রপাতি খরিদে ২৮৫৬৯৲, জল কলের প্রসার ও পল্লীর জঙ্গল নর্দ্দামা পরিষ্কার প্রভৃতিতে ১৪৪১।০, শিক্ষালয়ের সরঞ্জাম খরিদাদি কার্য্যে ২৪১৩৭/০, র‍্যাশন বিভাগে ৯৭৬৮২৲ এবং অন্যান্য বিবিধ বাবদে ৩'৮৩৫৲ টাকা ব্যয়িত হয়। তহবিলের হিসাবপত্র চার্টার এ্যাকাউণ্টেণ্ট দ্বারা রীতিমত পরীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও, চন্দননগরকে ভারতভুক্ত করার দাবী করার ফলে অনুষ্ঠিত গণভোটের ঠিক প্রাক্কালে কতিপয় মত্ত-ব্যবসায়ী পরিষদ সভাপতির বিরুদ্ধে বেআইনী অর্থসংগ্রহ ও তহবিল তছরূপের নালিশ দায়ের করেন। সভাপতিকে ঐ সময় আটক রাখার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় মোকদ্দমা চাপা পড়িয়া থাকে। গণভোটের পর ২রা মে ১৯৫০ কার্য্যতঃ হস্তান্তর হইয়া যাইবার পর ফরাসী গভর্ণমেণ্ট ঐ মামলার বিচার দাবী করেন।

৪ঠা জুন—এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর শ্রীযুক্ত বি, কে, ব্যানার্জ্জী বদলি হন এবং তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত সুনীলবরণ রায় আই-এ-এস্ নূতন এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হইয়া আইসেন।

১৫ই জুলাই—পৌরসভার নির্ব্বাচনে নিম্নলিখিত পঁচিশ জন ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ ফ্রণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হন : ১নং ওয়ার্ড—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার পালিত, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র নেউগী, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার ভড় ও শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়। ২নং ওয়ার্ড—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র কুমার, শ্রীযুক্ত সন্তোষ-কুমার রক্ষিত, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দাস। ৩নং ওয়ার্ড—শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বলাইলাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ঘোষ। ৪নং ওয়ার্ড—শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ভড়, শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অংশুভূষণ মিত্র, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার ও শ্রীযুক্ত মহাদেব কুণ্ড। ৫নং ওয়ার্ড—শ্রীযুক্ত হরিপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ বসু, শ্রীযুক্ত সুনীল-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ নন্দী।

৮ই আগষ্ট—পৌরসভার সদস্যদিগের মধ্য হইতে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় শাসন পরিষদের সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র কুমার, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার রক্ষিত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার পালিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার ভড় সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এবং শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ভড় ও শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

১৭ই আগষ্ট—পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট ১৯৫১-৫২র জন্য বাস্তুহারাদের গৃহনির্ম্মাণকল্পে ১৫৪০০০৲ টাকা লোন মঞ্জুর করেন।

১লা অক্টোবর—Institute of Vocational Training নামক যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি ১৫ই আগষ্ট ১৯৫০এ হুগলী জেলার শিবপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরে ত্রিবেণীতে উঠিয়া আইসে, তাহা চন্দননগরে স্থানান্তরিত হয়।

৩রা নভেম্বর—রবীন্দ্র মানস সমিতির দ্বারা বালিকা ও কিশোরীদের নৃত্যগীত শিক্ষার বিদ্যালয় এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটরের বাটীতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২২শে নভেম্বর—দুর্গাচরণ রক্ষিত বঙ্গ বিদ্যালয় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৫ই ডিসেম্বর—শাসন পরিষদ কর্ত্তৃক শিক্ষাবিভাগের পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারণ, পরীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ের ব্যবস্থাদির জন্য টেক্সট্ বুক কমিটি নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে ইহার সভাপতি হন।

১৯শে ডিসেম্বর—শ্রীযুক্ত এস্, ভড় (জুনিয়র) র‍্যাশনের চাউলের তাঁহার এজেন্সির কণ্ট্রাক্ট ক্যান্সেল করার জন্য বর্ত্তমান কাউন্সিলের নামে কলিকাতা হাইকোর্টে খেসারত দাবী করিয়া যে মামলা দায়ের করিয়াছিলেন, তাহার শুনানির পর আদালত হইতে ইন্‌জাংশন আদেশ হয়।

১৯৫২

১৮ই জানুয়ারী—মুক্ত নগরীর আর্থিক অবস্থা বুঝিবার জন্য ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রেরিত শ্রীযুক্ত এম্, সেন আসেন এবং তাহা শেষ করিয়া ৩১শে মার্চ্চ ১৯৫২ চলিয়া যান।

অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন কর্ম্মচারীদের কলিকাতার ফরাসী কন্সাল মারফত প্রথম ত্রৈমাসিক পেনশন্ দেওয়া হয়।

১১ই ফেব্রুয়ারী—১৯৪৭ সালের ৭ই নভেম্বরের দেক্রে অনুসারে পৌরসভার মধ্যে বাৎসরিক নির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় শাসন পরিষদের সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র কুমার, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার রক্ষিত, শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অংশুভূষণ মিত্র ও শ্রীযুক্ত সন্তোষ ভড় সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

১১শে ফেব্রুয়ারী—সরকারী বিদ্যালয়সমূহের ৩য় শ্রেণী পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষা শিক্ষা নিষিদ্ধ করিয়া এবং ফরাসী বিভাগের

Certificat de langue indigèni এবং Brevet de langue indigèni পরীক্ষা এই বৎসর হইতে বন্ধ হইল এই মর্ম্মে সভাপতির এক আদেশনামা বিধিবদ্ধ হয়।

২২শে ফেব্রুয়ারী—১৯৫০ সালে দেনা-পাওনা বিষয় মীমাংসার জন্য যে যুক্ত কমিশন গঠিত হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাসের স্থলে শাসন পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লওয়া হয় ও কমিশনের কার্য্য শেষ করিয়া দেওয়া হয় এবং রিজার্ভ ফণ্ড, পেন্সন ফণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশ খরচা ও র‍্যাশন্ বিভাগের ফরাসী গভর্ণমেণ্টের নিকট পূর্ব্বের প্রাপ্য অমীমাংসিত বিষয়গুলি ambassadorial level দ্বারা নিষ্পত্তি হইবে স্থির হয়।

পানীয় জল সরবরাহের সুবিধার জন্য সহরের উত্তরাঞ্চলে যে ৬" টিউবওয়েল প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল তাহা চালু করা হয়। উপরের জলাধার নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে।

গরুটীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নূতন গৃহ নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়।

৩রা মার্চ্চ—হাটখোলার দয়ের ধার ও বোড়াই চণ্ডীতলা গঙ্গাতীর রক্ষা-কল্পে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে কাজ আরম্ভ হয়।

১৭ই মার্চ্চ—বিশেষ ট্রাইবুন্যালের বিচারে শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র পালিত বিধি অনুসারে বয়ঃক্রম কম থাকায় এবং শ্রীযুক্ত হরিপদ মুখোপাধ্যায় অপর সদস্যের সহিত এক পরিবারভুক্ত থাকার জন্য পৌরসভার সদস্যপদ হইতে অপসারিত হন।

১৯শে মার্চ্চ—কলিকাতার ফরাসী কন্‌সল্ জেনারেল এবং ভারতস্থিত ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সাংস্কৃতিক সদস্য মঃ জুর্নো (M. Journot) স্থানীয় সরকারী বিদ্যালয়ের ফরাসী বিভাগের C. E. P. E. ও B. E. পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব গ্রহণে সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি জানান এবং যদি স্থানীয় ব্যবস্থায় পরীক্ষা গ্রহণ ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তাহা মানিয়া লইতে অসম্মতি জানান। শাসন পরিষদ স্বতন্ত্র ফরাসী বিভাগ রাখার সার্থকতা না দেখিয়া, বর্ত্তমানে এই বিভাগে যে সকল ছাত্র আছে তাহাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিয়া ১৯৫৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে উক্ত বিভাগে নূতন ছাত্র গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

২৬শে মার্চ্চ—২রা মে ১৯৫০ হইতে ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৫০ পর্য্যন্ত বাস্তুহারাদের খাদ্য সরবরাহের জন্য পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট দান করেন মোট ১০২৫৮৲ টাকা।

৪ঠা এপ্রেল—প্যারিসস্থ ফরাসী জাতীয় পরিষদের পররাষ্ট্র কমিশন চন্দননগরকে ফরাসীদের হস্ত হইতে ভারতীয় রাষ্ট্রের হস্তে সমর্পণের চুক্তি অনুমোদনের জন্য রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্টকে ক্ষমতা দিয়া আনীত একটি বিল অনুমোদিত হয়।

১১ই এপ্রেল—ফরাসী সহর চন্দননগরের কর্ত্তৃত্ব ফ্রান্সের সার্ব্বভৌম অধিকারে হস্তান্তর-কল্পে ভারতের সহিত চুক্তি ফরাসী জাতীয় পরিষদে অনুমোদিত হয়।

১৯শে এপ্রেল—আইনানুগ হস্তান্তরের অনুমোদনে চুক্তিপত্রের

নবম অনুচ্ছেদে ফরাসী ও ভারত সরকারের দ্বারা চন্দননগরে ফরাসী সংস্কৃতি রক্ষা-কল্পে ব্যবস্থা থাকায়, পরিষদ ১১শে মার্চ্চ ১৯৫২ সরকারী বিদ্যালয়ের ফরাসী বিভাগে ছাত্র না লওয়ার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বাতিল করেন।

২০শে এপ্রেল—আইনানুগ হস্তান্তরের সন্ধিপত্র পার্লামেণ্ট হইতে চূড়ান্ত অনুমোদিত হওয়ায় পরিষদ সভাপতি চন্দননগরের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের অভিপ্রায় অনুসন্ধান উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠনে অগ্রণী হন।

১২ই মে—হাসপাতালের উন্নতি-কল্পে পৌরসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে স্বাস্থ্য-সদস্য ডাক্তার সন্তোষকুমার রক্ষিতের দ্বারা আহূত এক সভায় একটি হাসপাতাল কমিটি গঠিত হয়।

৪ঠা জুন—ভারতীয় লোকসভায় এক প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ, চন্দননগরের ভারতে অন্তর্ভুক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর যতদিন সংসদ সংবিধানের ২ অথবা ৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে আইন প্রণয়ন না হয়, ততদিন চন্দননগর কোনও রাজ্য অথবা রাজ্যের অংশ হইতে পারিবে না। ইহা সংবিধানের নবম অংশ অনুসারে শাসিত হইবে এবং ২৪৩ (২) অনুসারে রাষ্ট্রপতি আইন প্রণয়ন করিবেন। যতদিন পর্য্যন্ত না রাষ্ট্রপতি আইন প্রণয়ন অথবা সংস্কার করেন, ততদিন বর্ত্তমান আইনসমূহ (ইহা পুরাতন ফরাসী আইন হইলেও) বলবৎ থাকিবে। চন্দননগরের শাসনতান্ত্রিক মান নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে চন্দননগরবাসীদের পরামর্শ গ্রহণ করা হইবে।

৯ই জুন—চন্দননগরকে ভারতের হস্তে সমর্পণের উদ্দেশ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল উহা চূড়ান্ত ভাবে অনুমোদিত হইবার পর অদ্য ভারতের পক্ষে প্যারিসস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সর্দ্দার এইচ, এস্ মালিক এবং ফ্রান্সের পক্ষে ফরাসী পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী জেনারেল মঃ আলেকজেণ্ডার পারোদী অনুমোদন-পত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইহা দ্বারা আইনানুগ হস্তান্তর (De Jure transfer) সম্পন্ন হইল।

প্রকাশ, সংসদে আইন প্রণীত না হওয়া পর্য্যন্ত চন্দননগর নূতন রাজ্য অথবা রাজ্যের অংশ হিসাবে স্বীকৃত হইবে না। সংবিধানের ২৪৩ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এই অঞ্চল জনৈক চীফ, কমিশনর অথবা অনুরূপ শাসন কর্ত্তৃপক্ষের মারফত স্বয়ং রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক শাসিত হইবে।

৩০শে জুন—ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, শাসনতন্ত্রের ১ম খণ্ডে বর্ণিত ব্যবস্থা অনুসারে কতকটা আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক যতটা প্রয়োজন ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের অধীনে এড্‌মিনিষ্ট্রেটর মারফত চন্দননগর শাসিত হইবে। শ্রীএস্, বি, রায় চন্দননগরের এড্‌মিনিষ্ট্রেটর ও পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল এবং শ্রীবি, সি, সেন পুলিশসুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর পৌর-পরিষদ ও শাসন পরিষদ বাতিল করা হইল। এড্‌মিনিষ্ট্রেটরের সাহায্যের জন্য অনধিক পাঁচ জন সদস্য লইয়া একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইবে এবং তিনি এই পরিষদের চেয়ারম্যান হইবেন।

চন্দননগরের আর্থিক বিলিব্যবস্থা ভারত সরকারের আর্থিক বিলিব্যবস্থার অন্তর্ভূত হইবে। উপযুক্ত আইন কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক সংশোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রচলিত আইন ও প্রচলিত করসমূহ বলবৎ থাকিবে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নূতন ভোটার তালিকা রচিত হইলে মিউনিসিপ্যাল পরিষদের নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে চন্দননগরের অধিবাসীদের মতামত গ্রহণ করা হইবে।

যে সকল ভারতীয় আইন De facto transfer এর পর হইতে প্রযোজ্য হইয়াছে তাহার তালিকা :

1860	The Indian Penal Code	2nd May 1950
1887	The Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act	2nd May 1950
1872	The Indian Evidence Act	2nd May 1950
1873	The Indian Oaths Act	2nd May 1950
1897	The General Clauses Act	2nd May 1950
1898	The Code of Criminal Procedure	2nd May 1950
1908	Code of Civil Procedure	2nd May 1950
1950	The Preventive Detention Act	2nd May 1950
1878	The Indian Arms Act	17th May 1950
1894	The Prisons Act	17th May 1950
1884	The Indian Explosives Act	17th May 1950
1950	The Transfer of Prisoners Act	6th November 1950
1948	The Census Act	14th November 1950
1908	Explosives Substances Act	14th November 1950
1939	The Motor Vehicles Act	2nd April 1951
1887	Provincial Small Causes Court Act	27th July 1951
1946	Essential Supplies (Temporary Power) Act	22rd August 1951
1925	Indian Succession Act	4th September 1951
1940	Explosive Rules	31st January 1952
1861	Police Act	31st January 1952
1900	Prisoners' Act	1st April 1952
1869	Bengal Public Gambling Act	4th April 1952
1908	Indian Limitation Act	24th May 1952

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ড্রেস রিহার্সেল—

কোরিয়ায় তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের ড্রেস রিহার্সেলের দ্বিতীয় বৎসর পূর্ণ হইবার প্রাক্কালে উত্তর কোরিয়ার ইয়ালু নদী জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির উপর আকস্মিক ভাবে ব্যাপক বোমা বর্ষণ যে সুচিন্তিত ও সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ীই করা হইয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। পৃথিবীর সাধারণ মানুষ বিশেষ করিয়া এশিয়ার জনসাধারণ তো কোরিয়া যুদ্ধে এই বৃহত্তম বিমানহানায় বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত না হইয়া পারেই নাই, যে-সকল রাষ্ট্রশক্তি কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা করিতেছে, এই ব্যাপক বোমা বর্ষণের ব্যাপারে তাহাদের সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরামর্শ না করায় তাহারাও যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়াছে। তাহারা বুঝিতে পারিতেছে যে, কোরিয়া যুদ্ধের উপর তাহাদের কোন নিয়ন্ত্রণ অধিকার নাই, তাহারা মার্কিণী 'ঢাকের বাওয়া' ভিন্ন আর কিছুই নয়। প্রথম ব্যাপক বোমা বর্ষণ করা হয় ২৩শে জুন (১৯৫২) সোমবার। তথাকথিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পাঁচ শতেরও অধিক বিমান উত্তর কোরিয়ায় ইয়ালু নদীর পাঁচটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের উপর বোমা বর্ষণ করে। দেড় ঘণ্টাকাল বোমা বর্ষণ করা হইয়াছিল। এই পাঁচটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বৃহত্তম কেন্দ্রটি বোমা বর্ষণের ফলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। এই জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি সুইহো বাঁধের নিকটে ইয়ালু নদীতীরস্থ আণ্টুং হইতে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। উহা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। পূর্ব্ব-মাঞ্চুরিয়ার উন্নয়ন পরিকল্পনায় এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটির স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপর চারিটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের দুইটি চাংজিন রিজার্ভারের নিকটে এবং অপর দুইটি হামনাং-এর নিকটবর্ত্তী সেঙ্গচন্ নদীর উপর অবস্থিত। এইগুলিরও গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। ২৪শে জুন তারিখেও এই পাঁচটি বিদ্যুৎ উপাদন কেন্দ্রের চারিটির উপর দুই শত বিমানের হানা চলিয়াছিল। ইহার পর গত ৫ঠা জুলাই (১৯৫২) কায়োসেনের নিকটে দুইটি এবং পুরিয়ংয়ে একটি বিমান কেন্দ্রের উপর বিমান হইতে বোমা বর্ষণ করা হয়।

ইয়ালু নদীর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির উপর এই ব্যাপক বোমা বর্ষণ শুধু আকস্মিক ভাবেই করা হয় নাই, শুধু কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী রাষ্ট্রগুলির অজ্ঞাতসারেই এই বোমা বর্ষণ করা হয় নাই, এমন এক সময়ে করা হইয়াছে যখন কোরিয়া যুদ্ধবিরতির আলোচনা সাফল্যের দ্বারদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। কোরিয়া যুদ্ধবিরতির আলোচনা সাফল্য লাভ করার পক্ষে একমাত্র বাধা অবশিষ্ট আছে যুদ্ধবন্দীদের বিনিময়-সমস্যা। মার্কিণ রাষ্ট্র, বৃটেন এবং ভারতের মধ্যে আলোচনা দ্বারা এই সমস্যারও একটা সমাধান হইতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা যখন দেখা গিয়াছিল, সেই সময় আকস্মিক ভাবে এবং সহযোগীদিগকে না জানাইয়া এইরূপ ব্যাপক বোমা বর্ষণ যে গভীর উদ্দেশ্যপূর্ণ, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কোরিয়া যুদ্ধবিরতির আলোচনার ইতিহাসে আলোচনাকে ব্যর্থ করিবার প্রয়াস এই প্রথম নয়। বস্তুতঃ, আলোচনা যখনই সাফল্যের পথে এক ধাপ অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তখনই টোকিওস্থিত মার্কিণ সেনানায়ক এমন একটা কিছু করিয়াছেন যাহাতে সাফল্যের সম্ভাবনা ব্যর্থ হইয়া যায়। যুদ্ধবিরতির আলোচনা যখন শুধু যুদ্ধবন্দী-বিনিময়ের সমস্যায় আসিয়া দাঁড়াইল, তখনই টোকিওস্থিত মার্কিণ সেনানায়ক কোজে বন্দীশিবিরে হত্যালীলার অনুষ্ঠান করিলেন। আলোচনার গোড়াতেই কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধবন্দীদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল। ইহার পরে চলে নিরপেক্ষ অঞ্চলে পুনঃ পুনঃ বোমা বর্ষণ। ফলে জাপ শান্তি-চুক্তি সম্মেলনের প্রাক্কালেই যুদ্ধবিরতির আলোচনা ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। সুদীর্ঘ অচল অবস্থার পর ১৯৫১ সালের ১০ই অক্টোবর হইতে পানমুনজনে আবার আলোচনা আরম্ভ হয়। ইহার পর চলিল উত্তর কোরিয়ায় এবং চীনের কতকগুলি অঞ্চলে রোগ-বীজাণুদুষ্ট কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড় প্রভৃতি-পূর্ণ বোমা বর্ষণ। এক কথায় কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে রোগ-বীজাণু যুদ্ধ। তার পর কোজে বন্দী-শিবিরে হত্যালীলা। এ সম্পর্কে আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহার পর এই ব্যাপক বোমা বর্ষণ। ইহা যে যুদ্ধবিরতির আলোচনাকে বানচাল করিয়া পুনরায় ব্যাপক সংগ্রাম আরম্ভ করা এবং কোরিয়া যুদ্ধকে সম্প্রসারিত করার প্রয়াস তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু যে-সকল রাষ্ট্র কোরিয়া যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা করিতেছে, তাহারা কোরিয়া যুদ্ধের সম্প্রসারণ চায় না। তাহাদের ধারণা, কোরিয়া যুদ্ধের সম্প্রসারণ হওয়াই তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের প্রারম্ভ। তাহারা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ড্রেস রিহার্সেলকে ড্রেস রিহার্সেলই রাখিতে চায়। তবে উহা আরও দীর্ঘকাল চলুক, ইহাও তাঁহাদের অভিপ্রায়। বৃটিশ দেশরক্ষা মন্ত্রী লর্ড আলেকজাণ্ডারও এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ইয়ালু নদীর বিদ্যুৎ উপাদন কেন্দ্রগুলিতে ব্যাপক বোমা বর্ষণ সম্পর্কে বৃটিশ কমন্স সভায় যে তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে বোমা বর্ষণ অপেক্ষা বোমা বর্ষণের পূর্ব্বে বৃটেনের সহিত পরামর্শ না করার কথাই মুখ্যস্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

বোমা বর্ষণের পূর্ব্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়া যুদ্ধে তাহার সহযোগী রাষ্ট্রবর্গের সহিত পরামর্শ করিলে তাহারা বোমা বর্ষণে সম্মতি দিত কি না, সে-সম্বন্ধে কিছু অনুমান করিতে চেষ্টা না করাই

ভাল। কিন্তু কোরিয়া যুদ্ধটা কাহার যুদ্ধ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের, না সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের, এই প্রশ্নটাও উহার সহিত জড়িত। সুতরাং প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে, বোমা বর্ষণের নির্দ্দেশ কে দিয়াছিল এবং এইরূপ নির্দ্দেশ দিবার অধিকারী কে? এ কথা অবশ্য সত্য যে, ১৯৫০ সালের জুন এবং জুলাই মাসে কোরিয়া সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ যে-সকল প্রস্তাব গ্রহণ করেন, ঐগুলিই তথাকথিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমর-নায়কের ক্ষমতার মূল ভিত্তি। এই সকল প্রস্তাবে কোরিয়া যুদ্ধের ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমর-নায়কের উপর কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় নাই, এ কথাও সত্য। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকেই কোরিয়া যুদ্ধের ম্যানেজিং এজেন্সী দিয়াছে, ঐ সকল প্রস্তাবের এইরূপ অর্থও করা যায়। অন্ততঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ঐরূপ অর্থ-ই যে গ্রহণ করিয়াছে তাহা কোরিয়া যুদ্ধের ব্যাপারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আচরণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কোরিয়া যুদ্ধে তাহার ম্যানেজিং এজেন্ট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব আছে কি না, সে-সম্পর্কে প্রথম প্রশ্ন উঠে ইনচনে সৈন্য বিতরণের পর জেঃ ম্যাক আর্থারের অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা অতিক্রম করিবার সম্ভাবনা যখন দেখা দেয়। ১৯৫০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অতর্কিতে ইনচন বন্দরে বিপুল সৈন্য অবতরণ করাইতে সমর্থ হয় এবং অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা অতিক্রম করা হইবে কি না, এই প্রশ্ন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে উত্থিত হয়। কিন্তু ৭ই অক্টোবর (১৯৫০) এ-সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা সত্যই এক অদ্ভুত বস্তু। উহাতে অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা অতিক্রম করিয়া উত্তর কোরিয়া অভিযানের নামগন্ধও নাই। আছে শুধু কোরিয়ায় স্থায়িত্ব আনয়ন এবং সাধারণ নির্ব্বাচন দ্বারা ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক কোরিয়া গঠনের কথা। কিন্তু মার্কিণ সৈন্যবাহিনী উত্তর কোরিয়া দখল না করিলে সাধারণ নির্ব্বাচন ও ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠনের কথাই উঠিতে পারে না। কাজেই কার্য্যতঃ উক্ত প্রস্তাব উত্তর কোরিয়া অভিযানের ঢালা হুকুম ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারত তখনই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছিল যে, উত্তর কোরিয়ায় অভিযান চলিলে চীনও এই যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু প্রস্তাব যাঁহারা উত্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহারা তখন এই যুক্তিই দিয়াছিলেন যে, নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত মূল প্রস্তাবে যে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে তদনুসারে ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠনের জন্য উত্তর কোরিয়ায় অভিযান চালাইতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিকার আছে। অর্থাৎ কোরিয়া যুদ্ধের ম্যানেজিং এজেন্টের পূর্ণ কর্ত্তৃত্বই পুনরায় স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। কিন্তু প্রশ্নটা আবার উঠিয়াছিল ১৯৫১ সালের শীতকালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশনে। ঐ সময় এইরূপ দাবী করা হইয়াছিল যে, চীনা বিমান বাহিনী যদি ব্যাপক ভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীকে অথবা সরবরাহ কেন্দ্রগুলি আক্রমণ না করে, তাহা হইলে চীনের ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করা হইবে না। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র শুধু এইটুকুতেই রাজী হইয়াছিল যে, চীনা ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে যদি সময় থাকে, তাহা হইলেই শুধু কোরিয়া যুদ্ধে যাহারা সৈন্য দিয়াছে তাহাদের সহিত এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কোরিয়া যুদ্ধের এক পক্ষ প্রকৃতপক্ষে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শুধু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যাহা করিতেছে তাহাই সমর্থন করিয়া যাইতেছে। কাজেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি ইয়ালু নদীর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে বোমাবর্ষণের পূর্ব্বে অন্যান্য সহযোগীদের মতামত জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকে, তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে দোষ দেওয়া কঠিন! কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার সহযোগীদিগকে কোরিয়া যুদ্ধ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যাপার সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত মার্কিণ সহকারী স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ জন হিকারসন প্রতি সপ্তাহে কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিণ সহযোগীদিগকে এক সম্মেলনে আহ্বান করিয়া কোরিয়া যুদ্ধ সম্পর্কে তাহাদিগকে ওয়াকিবহাল রাখিয়া থাকেন। তা ছাড়া, কোরিয়ায় তাঁহাদের যে সংযোগ-রক্ষাকারী অফিসার (liason officer) আছেন, তাঁহাদের মারফৎও আসন্ন সামরিক ঘটনার কথা তাঁহাদিগকে জানান হয়। কিন্তু ইয়ালু নদীর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির উপর ব্যাপক বোমা বর্ষণের কথা বিন্দুবিসর্গও তাহাদিগকে পূর্ব্বে জানান হয় নাই। বিলাতের 'টাইমস্' পত্রিকার ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, তিনি যতটুকু জানিতে পারিয়াছেন, তাহাতে আসন্ন বিমানহানার কথা মিঃ একিসন ইউরোপ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে মার্কিণ রাষ্ট্র-বিভাগকেও জানান হয় নাই এবং মিঃ একিসন এ সম্পর্কে কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু এ কথা কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিবে কি? এই বিমানহানার সময় বৃটিশ দেশরক্ষা-সচিব লর্ড আলেকজাণ্ডার কোরিয়ায় ছিলেন। তাঁহাকেও এ সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে কিছু জানান হয় নাই। এ কথা খুবই বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর অধিনায়ক জেঃ মার্ক ক্লার্ক পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কিছুই জানিতেন না, মিঃ চার্চ্চিলের এই উক্তি শুধু হাস্যরস সৃষ্টি করিতেই সমর্থ। মিঃ চার্চ্চিল এবং মিঃ ইডেন এই বিমানহানা সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, পূর্ব্বাহ্নে এ সম্পর্কে তাঁহাদিগকে বিন্দুবিসর্গও জানান হয় নাই। কেন জানান হয় নাই, এই প্রশ্ন অপেক্ষা কেন জানান হইবে, ইহাই জিজ্ঞাসা করা বরং সঙ্গত। মার্কিণ রাষ্ট্র-সচিব মিঃ একিসন বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণকে বলিয়াছেন (৩০শে জুন ১৯৫২), "এই ব্যাপারে আপনারা আমাদের অংশীদার। আমরা আপনাদের সহিত পরামর্শ করিতে চাই; কিন্তু ভুলক্রমে (slip up) আপনাদিগকে জানান হয় নাই।" 'স্লিপ-আপ' কথাটা ভারী চমৎকার। 'স্লিপ ডাউন' 'স্লিপ থ্রু' আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু 'স্লিপ-আপ' সত্যই স্থান, কাল ও পাত্রোপযোগী হইয়াছে। কারণ, মিঃ একিসন স্পষ্টই বলিয়াছেন, "আপনাদের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে এ সম্পর্কে নির্ব্যূঢ় অধিকার আপনাদের আছে কি না, এই প্রশ্ন যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে আমি বলিব, 'না।' কিন্তু এ বিষয় লইয়া আমি তর্ক করিতে চাই না।" অতি সহজ এবং সরল উত্তর। বৃটেন বা অন্য কোন রাষ্ট্রের পরামর্শ লওয়ার কোন কারণও নাই। কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যখন প্রথম হস্তক্ষেপ করে তখন কাহারও সঙ্গে পরামর্শ করিয়া করে নাই। একান্ত অনুগত ব্যক্তির ন্যায় এবং রাশিয়ার অনুপস্থিতির সুযোগে নিরাপত্তা পরিষদ

কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই হস্তক্ষেপকে স্বীকার করিয়া লয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পোষাক পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

কোরিয়া যুদ্ধ সম্প্রসারিত হয়, ইহা মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট চাহেন না, চাহেন শুধু মার্কিণ সমরকর্তৃগণ, এ কথাও বলা হইয়া থাকে। কিন্তু মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট চীনের কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্টকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য করিতে রাজী নহেন, এ কথাও স্মরণ করা আবশ্যক। কম্যুনিষ্ট চীন শক্তিশালী হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই উহাকে ধ্বংস করিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি উদ্যোগী হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? বস্তুতঃ, কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করিবার প্রধান উদ্দেশ্যই হইল চীনকে যাহাতে যুদ্ধে জড়িত করিতে পারা যায় তাহার ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্য যে সিদ্ধির পথেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্যই যুদ্ধবিরতি আলোচনা যাহাতে ভাঙ্গিয়া যায় তাহার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হয় নাই। বেশী দিনের কথা নয়, কোরিয়া যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য 'বাচ্চা পরমাণু বোমা' (baby atom bombs) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে সুদূর প্রাচ্যে প্রেরণ করা হইয়াছে। বৃটেনকে এ সম্বন্ধে কিছুই জানান হয় নাই। কিন্তু চীনকে অবরোধ করা এবং চীনের ঘাঁটির উপর বোমা বর্ষণ করা সম্পর্কে মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট ও মার্কিণ সমরনায়কদের মধ্যে কোন মতভেদ আছে বলিয়া মনে হয় না। এ সম্পর্কে সুযোগ সৃষ্টির জন্যই যে, ইয়ালু নদীর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির উপর বোমা বর্ষণ করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ সময় চীনা বিমানবাহিনী যদি প্রতি-আক্রমণ করিত, তাহা হইলে ব্যাপক যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইত। ঐ বিমানহানার সময় ইয়ালু নদীর মাঞ্চুরিয়ার তীরস্থ বিমানঘাঁটি হইতে দুই শত 'মিগ' টাইপের জেট ফাইটার বিমান সারি বাঁধিয়া আকাশে উঠিলেও আক্রমণ করে নাই। মার্কিণ সুদূর প্রাচ্য বিমান-বাহিনীর কমাণ্ডার জেঃ উইল্যাণ্ড এই বিমানহানা উপলক্ষে বলিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্টরা যদি চায়, তাহা হইলে এই বিমানহানাকে ভবিষ্যতে আরও বেশী বিমানহানার সাধারণ ইঙ্গিতরূপে গ্রহণ করিতে পারে (may be taken as a general hint of more to come if the Communist want it that way)। অষ্টম আর্মীর কমাণ্ডার ভ্যান ফ্লিট বলিয়াছেন, "I wish the enemy would launch a major offensive......We would pile him on barbed wire and may be end the war." অর্থাৎ 'শত্রু ব্যাপক ভাবে আক্রমণ করে ইহাই আমি চাই। আমরা তাহাকে কাঁটা-তারের বেড়ায় চাপিয়া ধরিব এবং হয়ত যুদ্ধেরও শেষ হইবে।' কোরিয়া যুদ্ধের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক জেঃ ক্লার্ক বলিয়াছেন, "আলাপ-আলোচনার পথেই যুদ্ধের অবসান করিতে আমরা চাই। কিন্তু প্রতিপক্ষ যদি অন্য পথ অবলম্বন করে, তবে আমরাও রক্তক্ষয়কারী সংগ্রামের জন্য (bloody fighting) প্রস্তুত আছি।' কিন্তু ইয়ালু নদীর বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলির উপর ব্যাপক বোমাবর্ষণ আলাপ-আলোচনা দ্বারা যুদ্ধের অবসান ঘটাইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায় প্রমাণ করে না, বরং কম্যুনিষ্টরা যাহাতে প্রতি-আক্রমণ করে তাহারই উদ্দেশ্যে এই হানা দেওয়া হইয়াছিল, ইহাই বুঝা যায়। কম্যুনিষ্টরা প্রতি-আক্রমণ করিলেও চীনের ঘাঁটিগুলিতে বোমাবর্ষণ এবং চীনের উপকূল ভাগ অবরোধ করিবার সুযোগ মিলিত। ইহার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অথবা কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিণ সহযোগীদের অনুমোদন আবশ্যক হইবে না। কারণ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই বলিতে পারিবে যে, ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবে লাল চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। সুতরাং চীনের উপকূল ভাগ অবরোধ এবং চীনা ঘাঁটির উপর বিমান আক্রমণ উক্ত প্রস্তাবেরই ন্যায়সঙ্গত পরিণতি। গত ২৪শে জুন (১৯৫২) মার্কিণ দেশরক্ষা-সচিব মিঃ লোভেট এই বিমানহানা সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, উহার জন্য জেঃ ক্লার্ক ওয়াশিংটনস্থ জয়েণ্ট ষ্টাফ কমিটির নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হয়। এই বোমাবর্ষণ সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যান্য সদস্যদের সহিত যে পূর্ব্বে আলোচনা করা হয় নাই, তাহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, খুব জরুরী অবস্থায় বা স্বীয় সৈন্যগণের নিরাপত্তার জন্য জেঃ ক্লার্ক মার্কিণ জয়েণ্ট ষ্টাফ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনা না করিয়াই মাঞ্চুরিয়ায় বোমা বর্ষণের অনুমতি দিতে পারেন। সুতরাং ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, এই বিমানহানার সময় চীনা বিমান বাহিনী প্রতি-আক্রমণ করিলেই চীনের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া যাইত এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ উহা অনুমোদন না করিয়া পারিত না। উক্ত

উকুনের নতুন ওষুধ
নিউট্রল-লাইসাইড

"আমি আপনার ল্যাবরেটারীর উকুনের ঔষধের কথা আর বর্ণনা করিতে পারিলাম না। কী অমোঘ ঔষধ যে পাঁচ বছর ধরিয়া কোন ঔষধে কাজ হয় নাই অথচ আপনার ল্যাবরেটারীর ঔষধ একবার ব্যবহার করিয়া আমি এবং আরও ৫ জন মহিলা উপকৃতা হইয়াছেন। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।"

মিসেস বসু, কলিকাতা—২৬

প্রতি প্যাকেটের জন্য দুই আনার ডাকটিকেট পাঠাইবেন।

বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার কয়েকটি জেলায় এই "লাইসাইড" পরিবেশক প্রয়োজন। উচ্চহারে কমিশন দেবো।

Dept. M. B.
১৯, বণ্ডেল রোড ; কলিকাতা-১৯

ব্যাপক বিমানহানার উহা ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া স্বীকার করা কঠিন।

ছলে বলে কৌশলে লাল চীনের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া উহাকে ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ের সহিত কোরিয়া যুদ্ধের সম্পর্ক খুব নিবিড় বলিয়াই মনে হয়। ১৯৫০ সালের ২৫শে জুন উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবেশ করিবার সময় হইতেই কোরিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু সত্যই কি তাই? ১৯৪৯ সালের শেষ ভাগে সমগ্র চীনে কম্যুনিষ্টদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫০ সালের জুন মাসের শেষ ভাগে আরম্ভ হয় কোরিয়া যুদ্ধ। মধ্যবর্ত্তী ছয়-সাত মাস সময়ের মধ্যে কি ঘটিয়াছে তাহার সামান্যই জানিতে পারা যায়। উত্তর কোরিয়া আক্রমণ করিয়া চীনকেও উহার সহিত জড়িত করা এবং সেই উপলক্ষে চীন আক্রমণ করার পরিকল্পনা জেঃ ম্যাক আর্থার করিয়াছিলেন কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র করিয়াছিলেন, এই প্রশ্ন অবান্তর বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ১৯৫০ সালের জুন মাসে মিঃ ডুলেসের টোকিও এবং দক্ষিণ কোরিয়া ভ্রমণের অব্যবহিত পরেই কোরিয়ায় যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। উত্তর কোরিয়াই যে প্রথম আক্রমণ করিয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ না থাকিলেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জেদের জন্যই উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী সাব্যস্ত করা হয়। এ কথা অবশ্য বলা হইয়াছে যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোরিয়া কমিশন সিউল হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, উত্তর কোরিয়াই আক্রমণকারী। কিন্তু তাঁহারা কিরূপে তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। বস্তুতঃ, কোরিয়া কমিশন সিউল হইতে টেলিগ্রাম করিয়া কি জানাইয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করা হয় নাই। টেলিগ্রামখানা চাপিয়া রাখা হয়। বৃটিশ পার্লামেণ্টে কোরিয়া সম্পর্কে যে শ্বেতপত্র পেশ করা হয়, তাহাতেও উক্ত টেলিগ্রাম প্রকাশ করা হয় নাই। যদি সত্যই উহাতে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ থাকিত, তাহা হইলে উহা বেশ ফলাও করিয়াই কি প্রকাশ করা হইত না? সুতরাং লাল চীনকে আক্রমণ করিবার মুখবন্ধ হিসাবেই যে কোরিয়া যুদ্ধ সুরু করা হইয়াছে, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ফরমোসায় চিয়াং কাইশেকের বাহিনীকে পরিপুষ্ট করা হইতেছে, ব্রহ্মদেশে অবস্থিত চিয়াং কাইশেকের বাহিনীকেও সুসজ্জিত রাখা হইয়াছে। চিয়াং কাইশেক মাঝে মাঝে চীনের মূল ভূখণ্ড আক্রমণের হুমকী দিয়া থাকেন। লাল চীন শক্তিশালী হইয়া উঠিবার আগেই তাহাকে ধ্বংস করাই যদি কম্যুনিজম নিরোধের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে বিস্ময়ের বিষয় হয় না। কিন্তু কোরিয়ায় কম্যুনিজম নিরোধের নমুনা দেখিয়া এশিয়ার সাধারণ মানুষের শরীর যে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছে তাহাতেও সন্দেহ নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন অমান্য আন্দোলন—

গত ২৬শে জুন (১৯৫২) হইতে সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় 'মায়িবুয়ে ও আফ্রিকা', 'আফ্রিকা ফিরিয়া এস', এই ধ্বনির মধ্যে অশ্বেতকায়দের অন্যায় আইন অমান্যের অহিংস আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। জন-বিক্ষোভের মধ্য দিয়া গত ৬ই এপ্রিল (১৯৫২) আনুষ্ঠানিক ভাবে এই অহিংস সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। কিন্তু বাস্তব কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণের জন্য ২৬শে জুন পর্য্যন্ত এই আন্দোলন স্থগিত রাখা হয়। গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৫১) ডাঃ মোরোকার নেতৃত্বে আফ্রিকা জাতীয় কংগ্রেস যখন অশ্বেতকায়দিগকে শ্বেতাঙ্গদের তিন শত বৎসরের প্রভুত্ব হইতে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখনই প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলনের নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল। আফ্রিকা জাতীয় কংগ্রেস দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতীয় কংগ্রেস এবং বর্ণসঙ্করদিগকেও তাহাদের সহিত এই আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান জানায় এবং আগ্রহের সহিত তাহারা এই আহ্বানে সাড়া দেয়। বর্ণ বৈষম্যমূলক আইনগুলি প্রত্যাহার করিবার জন্য ডাঃ মালানকে মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হইয়াছিল। ইহার উত্তরে ডাঃ মালান ঘোষণা করেন যে, আইন অমান্য আন্দোলন দমনের জন্য গবর্ণমেণ্টের হাতে যত ক্ষমতা আছে তাহা প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করা হইবে না। বস্তুতঃ প্রথম আঘাতটা দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে আসে। দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতীয় কংগ্রেসের নেতা ডাঃ দাদুকে সহ সম্মিলিত ফ্রণ্টের দুই জন নেতাকে কম্যুনিজম নিরোধ আইন (Suppression of Communist Act) অনুসারে গ্রেফ্‌তার করা হয়। ডাঃ মালান আফ্রিকান, বর্ণসঙ্কর এবং ভারতীয়দের উপর অক্লান্ত ভাবে যে নিপীড়ন চালাইতেছেন, সে সম্বন্ধে নূতন করিয়া এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তিনিই ইহার জন্য একমাত্র দায়ী ইহা মনে করিলেও ভুল হইবে। ১৯১০ সালে নাটাল, অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট, ট্রান্সভাল, উত্তমাশা অন্তরীপ—এই চারিটি প্রদেশ লইয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন গঠিত হওয়ার পূর্ব্বেও ভারতীয়দের উপর কম নির্যাতন হয় নাই। এখানে সে সব ইতিহাস আলোচনা করিবার স্থান আমরা পাইব না। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন গঠিত হওয়ার পর হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় প্রভুগণ দৃঢ়হস্তে এবং ব্যাপক ভাবে অশ্বেতকায় নির্যাতনের যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, ডাঃ মালানের নীতির মধ্যে তাহাই পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করিয়াছে। গত তিন বৎসরের মধ্যে অশ্বেতকায়-বিরোধী যে চারিটি আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহার কথাই এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথমেই মিশ্র বিবাহ নিরোধ আইনের কথা বলা আবশ্যক। এই আইনটি হার্টজগ গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত দুর্নীতি দমন আইন বা Immorality Act-এরই সংশোধিত সংস্করণ। ইম্মরেলিটি আইনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন জাতির মধ্যে যৌন সম্বন্ধ নিষিদ্ধ করা হয়, কিন্তু বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয় নাই। মিক্সড ম্যারেজ এক্ট বা মিশ্র বিবাহ আইন দ্বারা শ্বেতকায় ও অশ্বেতকায় জাতির মধ্যে যৌন সম্বন্ধ এবং বিবাহ দুই-ই নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। সামাজিক দিক হইতে অপমানজনক আর একটি আইন—জনসংখ্যা রেজেষ্টারী করণ আইন বা পপুলেশন রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট। এই আইন অনুসারে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে তাহার জন্মগত বর্ণ অনুযায়ী নাম রেজেষ্ট্রী করিতে হয়। কিন্তু ভারতীয় ও আফ্রিকানদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক আইন হইল The Group Areas Act বা বর্ণানুযায়ী অঞ্চল বিভাগ আইন। এই আইন দ্বারা সমগ্র দেশকে বর্ণানুযায়ী বিভক্ত করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক বর্ণের জন্য নির্দ্ধারিত

অঞ্চলে সেই বর্ণের লোক ছাড়া অন্য বর্ণের লোক বাস করিতে পারিবে না। ভারতীয় অঞ্চলে কোন শ্বেতকায় লোক বাস করিতে পারিবে না। কোন ভারতীয় শ্বেতকায়দের অঞ্চলে বা আফ্রিকানদের অঞ্চলে বাস করিতে পারিবে না। এই আইন দ্বারা ভারতবাসীর যে বিপুল আর্থিক ক্ষতি হইবে, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে ভোটারদের পৃথক্ প্রতিনিধিত্ব আইনের (Separate Representation of Voters' Act) কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯১০ সালের দক্ষিণ-আফ্রিকা আইনে কেপ প্রদেশের অশ্বেতকায়দিগকে ভোটার হিসাবে শ্বেতকায়দের সহিত সমান রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। অশ্বেতকায়রা শুধু নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতে পারিত না। কিন্তু শ্বেতকায় অশ্বেতকায় সকল ভোটারের নামই এক ভোটার-তালিকায় লিখিত হইত। ১৯৩৬ সালে কেপ প্রদেশের আফ্রিকান ভোটারদের নাম সাধারণ ভোটার-তালিকা হইতে অপসারিত করা হয়। যে আইন দ্বারা এই বিধান করা হয়, বর্ণসঙ্কর সদস্যগণ তাহার অনুকূলে ভোট দেওয়ায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাওয়া সম্ভব হইয়াছিল। আজ বর্ণসঙ্করদিগকে উহার প্রতিফল দেওয়া হইতেছে। তাহাদের জন্য পৃথক্ ভোটার-তালিকা প্রণয়ন এবং পৃথক্ নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের ব্যবস্থার জন্য ভোটারদের পৃথক্ প্রতিনিধিত্ব আইন পাশ করা হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্ট এই ভোটারদের পৃথক্ প্রতিনিধিত্ব আইনকে শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া সাব্যস্ত করেন। ডাঃ মালান ইহাতে দমিয়া যান নাই। তিনি পার্লামেণ্ট হাইকোর্ট গঠনের জন্য এক আইন পাশ করাইয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা পার্লামেণ্ট বা হাউস অব এসেম্বলীর সদস্যগণ ইহার বিচারপতি। স্পীকারকে উহার প্রেসিডেণ্ট নিয়োগ করা হইয়াছে। এই পার্লামেণ্ট হাইকোর্টের একটি জুডিশিয়াল কমিটিও গঠন করা হইয়াছে। বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী উহার চেয়ারম্যান এবং নেশন্যালিষ্ট পার্টির দশ জন সদস্য উহার সদস্য-বিচারপতি। দরখাস্তের প্রথম শুনানী হইবে জুডিশিয়াল কমিটির নিকট। অতঃপর উহা পার্লামেণ্ট হাইকোর্টে প্রেরণ করা হইবে। ইতিমধ্যে এই আইন অনুযায়ী পার্লামেণ্ট হাইকোর্ট গঠিত হইয়াছে। ভোটারদের পৃথক্ প্রতিনিধিত্ব আইন বাতিল করিয়া সুপ্রীম কোর্ট যে রায় দিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে ডাঃ মালান এই পার্লামেণ্ট হাইকোর্টে এক দরখাস্তও করিয়াছেন। ইউনাইটেড পার্টির সদস্যগণ বিচারপতিরূপে পার্লামেণ্ট হাইকোর্টে আসন গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা পার্লামেণ্টের ২০৭ জন সদস্যের মধ্যে ১১৩ জনই নেশন্যালিষ্ট সদস্য। পার্লামেণ্ট হাইকোর্টকে সুপ্রীম কোর্ট অপেক্ষাও উচ্চতর ক্ষমতা দান করা হইয়াছে। এদিকে এই পার্লামেণ্ট হাইকোর্ট আইনকে শাসনতন্ত্র-বিরোধী সাব্যস্ত করিবার জন্য সুপ্রীম কোর্টে এক দরখাস্ত করা হইয়াছে। আগামী ৫ই আগষ্ট এই দরখাস্তের শুনানী আরম্ভ হইবে। সুপ্রীম কোর্ট শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যে-সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা পাইয়াছেন তাহা ত্যাগ করিতে রাজী হইবেন কি?
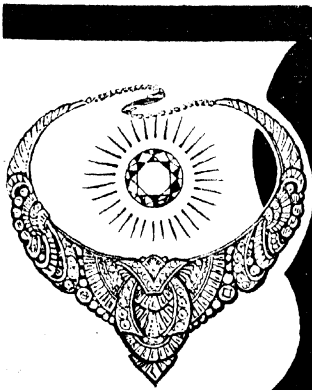
ফোন নং এভিনিউ ৪৮৮৬

রুষ্ট গ্রহকে তুষ্ট করিতে নির্ব্বাচিত গ্রহরত্ন ধারণ করুন।

আমরা ইহা অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকি।

IPB/E

পার্লামেণ্ট হাইকোর্ট যদি পৃথক্ প্রতিনিধিত্ব আইন সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তকে বাতিল করিয়া দেয় এবং সুপ্রীম কোর্ট যদি পার্লামেণ্ট হাইকোর্ট আইনকে বাতিল করেন, তাহা হইলে যে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হইবে সন্দেহ নাই! কিন্তু আফ্রিকান্, বর্ণসঙ্কর এবং ভারতীয়গণ মিলিয়া সমস্ত অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে অহিংস সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছেন। মালান গবর্ণমেণ্টও হটিবার পাত্র নহেন। গত মে মাসের (১৯৫২) শেষ ভাগে দক্ষিণ আফ্রিকা পার্লামেণ্টে আফ্রিকানদের প্রতিনিধি মি: সাম কানকে পার্লামেণ্ট হইতে এবং প্রভিনসিয়াল কাউন্সিল হইতে, মি: ফ্রেড কার্ণেসনকে মালান গবর্ণমেণ্ট বহিষ্কৃত করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কম্যুনিজম নিরোধ আইন অনুসারে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যে-সকল ভারতীয় আছে তাহাদের শতকরা ৯০ জনই সেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অ-শ্বেতকায়দের মধ্যে ভারতীয়দেরই শুধু ভোটাধিকার নাই। অবশ্য আফ্রিকানদের যে-ধরণের ভোটাধিকার আছে, ভারতীয়দিগকে সেই ধরণের ভোটাধিকার দিতে চাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা ঘৃণার সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। অশ্বেতকায়দের জন্য পৃথক্ বাস-ট্রেণে পৃথক্ কামরা, পৃথক্ সিনেমা-গৃহ প্রভৃতি দ্বারা পৃথক্ করিয়া রাখা হইয়াছে। অতঃপর এই গ্রুপ এরিয়াস এক্ট বা বর্ণানুযায়ী অঞ্চল বিভাগ আইন। এই আইন কার্য্যকরী করা হইলে ভারতীয়গণ যে কিরূপ ধনে-প্রাণে মারা যাইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, যদিও দৃষ্টতঃ এই আইনকে একটা নিরপেক্ষ রূপ দেওয়া হইয়াছে। প্রিটোরিয়া সহরে ৫৮৯১ জন ভারতীয়ের বাস। সেখানে তাহাদের বাড়ী ঘর, স্কুল, ব্যবসা ইত্যাদি আছে। সম্প্রতি প্রিটোরিয়া সিটি কাউন্সিল প্রিটোরিয়া সহরকে ইউরোপীয়দের জন্য নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলরূপে ঘোষণা করিবার জন্য ল্যাণ্ড টেনিওর এডভাইসারী বোর্ডের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন। প্রিটোরিয়া হইতে ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী একটি সহরের কতক অঞ্চল ভারতীয়দের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হইবে। প্রিটোরিয়ার এই ছয় হাজার ভারতীয়কে তাহাদের সমস্ত বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য ফেলিয়া রাখিয়া তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত সহরে চলিয়া যাইতে হইবে। এই সকল ত্যক্ত সম্পত্তির জন্য তাহারা কোন ক্ষতিপূরণ পাইবে না। এই সকল সম্পত্তিতে তাহাদের মালিকানা-স্বত্ব বিলোপ হইবে না বটে, কিন্তু ইউরোপীয়রা দয়া করিয়া নামমাত্র কিছু দাম যদি দেয় তাহা লইয়াই তাহাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। যেখানে তাহারা উঠিয়া যাইবে, সেখানে তাহাদের বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যবস্থা করিবার কোন বিধান নাই। ডারবানে ৬০ হাজার ভারতীয় আছে। তাহাদেরও এই অবস্থাই হইবে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই আইন প্রত্যাহার করাইবার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। অহিংস সত্যাগ্রহ ছাড়া আর কোন পথ তাহাদের সম্মুখে খোলা নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার অশ্বেতকায়দের সমস্যা নিছক বিদেশী শাসকের শাসন হইতে মুক্তির সমস্যা নয়। বৃটিশ এবং আফ্রিকানারগণও দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীতে পরিণত হইয়াছে। তাহাদেরই হাতে রহিয়াছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা। অশ্বেতকায়দের এই অহিংস স্বাধীনতা-সংগ্রামের ফল কি হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন। ইতিমধ্যেই এই আন্দোলনকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা সুরু হইয়া গিয়াছে। আফ্রিকানদিগকে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে। ফলে বিক্ষিপ্ত ভাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতে জাতীয় আন্দোলনকে ধ্বংস করিবার জন্য বৃটিশ আমলে এইরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামার সহিত আমরা পরিচিত। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও সেই নীতিই অনুসৃত হইতেছে।

মালয়ে মুক্তি-সংগ্রামের চারি বৎসর—

গত জুন মাসে (১৯৫২) মালয়ের মুক্তি-সংগ্রামের চারি বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। পাঁচ হাজার সশস্ত্র কম্যুনিষ্টকে দমন করিবার জন্য ৪০ হাজার বৃটিশ সৈন্য, ৭৫ হাজার স্থানীয় পুলিশ এবং ২৬ হাজার হোমগার্ড অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে। বৃটেন ছাড়াও রোডেশিয়া, ফিজি, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সৈন্য আনা হইয়াছে। নেপাল হইতে নেওয়া হইয়াছে গুরখা সৈন্য। অষ্ট্রেলিয়া দিয়াছে 'লিনকোলন্ স্কোয়াড্রন।' এই বিপুল বাহিনী লইয়া কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন যে-সংগ্রাম চালাইতেছে তাহার ফলে ১৯৪৮ সালের জুন হইতে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত ২৮৭১ জন কম্যুনিষ্ট নিহত এবং ১,৪৪৬ জন কম্যুনিষ্ট আহত হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। আত্মসমর্পণ করিয়াছে ৬৮১ জন কম্যুনিষ্ট। কিন্তু সশস্ত্র কম্যুনিষ্টের সংখ্যা পাঁচ হাজারের নীচে নামে নাই। সুতরাং কম্যুনিষ্টরা যে নূতন লোক সংগ্রহ করিতে পারিতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিরূপে ইহা সম্ভব হইতেছে?

১৯৪৮ সালের প্রথম ভাগেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মালয়ে ব্যাপক বিদ্রোহের আশঙ্কা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত দ্রুততার সহিত ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হইয়াছিল। ৬ই জুন (১৯৪৮) তারিখে কম্যুনিষ্টরা আত্মগোপন করিবার সিদ্ধান্ত করে। পুলিশ কম্যুনিষ্টদের আস্তানাগুলিতে হানা দিয়া দেখিল, প্রায় সমস্ত কম্যুনিষ্টই উধাও হইয়াছে। তার পর আরম্ভ হইল কম্যুনিষ্টদের সহিত সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম চারি বৎসর ধরিয়া অব্যাহত ভাবেই চলিতেছে। কবে এবং কি ভাবে এই সংগ্রামের শেষ হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন। ১৯৫০ সালের প্রথম ভাগে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট লে: জে: স্যার হেরল্ড ব্রীগস্‌কে মালয়ে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সর্ব্বময় কর্ত্তারূপে নিয়োগ করেন। তিনি মালয়ে পৌঁছিয়া ছয় মাসের মধ্যেই কম্যুনিষ্ট দমনের জন্য এক পরিকল্পনা গঠন করেন। উহাই ব্রীগস্ পরিকল্পনা নামে খ্যাত। জুলাই মাসেই (১৯৫০) এই পরিকল্পনাটি মালয়ের সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়।

জোহারের দক্ষিণ সীমা হইতে সিঙ্গাপুরের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত রাজ্যের পর রাজ্য হইতে কম্যুনিষ্টদিগকে বিতাড়িত করাই এই পরিকল্পনার মূল কথা। খাদ্য ও অর্থ পাওয়ার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলেই কম্যুনিষ্টরা জঙ্গল হইতে বাহিরে আসিতে বাধ্য হইবে, লে: জেনারেল ব্রীগস্ ইহাই আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু কম্যুনিষ্টরা তাঁহার এই উদ্দেশ্যকে বানচাল করিয়া দেয়। তাহারা তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র পাহাং এবং পেরাক রাজ্য স্থানান্তরিত করে। ব্রীগস্ পরিকল্পনার আর একটি বড় সমস্যা ছিল চারি লক্ষ চীনা স্কোয়াটার। তাহারা কম্যুনিষ্টদিগকে সাহায্য করে ইহাই ছিল গবর্ণমেণ্টের

বিশ্বাস। হাজার হাজার লোককে, গ্রামকে গ্রাম লোককে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অপসারিত করা হইয়াছে। কাঁটা তারের বেড়া দিয়া, পাহারা বসাইয়া তাহাদিগকে কম্যুনিষ্টদের হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। কম্যুনিষ্টদের দিক হইতে একটা বড় আঘাত আসিল ১৯৫১ সালের ৬ই অক্টোবর। ঐদিন বৃটিশ হাই-কমিশনার স্যার হেনরী গুরনেকে তাহারা হত্যা করে। অতঃপর বৃটেনে চার্চিল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশ ঔপনিবেশিক সচিব মিঃ লিটিলটন মালয় পরিদর্শন করিয়া আসিলেন এবং জানুয়ারী মাসে (১৯৫২) জেঃ স্যার জেরাল্ড টেম্পলার নিযুক্ত হইলেন মালয়ের হাই-কমিশনার। অবিলম্বেই সুদৃঢ় এবং চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে কম্যুনিষ্টদের সহিত তিনি সংগ্রাম সুরু করিলেন। কিন্তু তাঁহার বৃহত্তম আঘাত যাইয়া পড়িল সহস্র সহস্র নিরীহ এবং নির্দ্দোষ লোকের উপর। তাঁহার সাফল্যের সংবাদ যখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছিল সেই সময় সেলাঙ্গোর-পেরাক সীমান্তের ক্ষুদ্র সহর তানজন মালিমে কম্যুনিষ্টরা আর এক আঘাত হানিল। দুই জন ইউরোপীয় সহ ১২ জন পুলিশ নিহত হয় এবং আহত হয় ৮ জন। জেঃ টেম্পলার এই সহরের সকলকেই কঠোর শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিলেন। অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য প্রতিদিন ২২ ঘণ্টা-ব্যাপী সান্ধ্য আইন জারী হইল। প্রতিদিন মাত্র দুই ঘণ্টা দোকান খোলা থাকিবে। কেহই সহর ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। সমস্ত স্কুল এবং বাস-সার্ভিস বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। দোকানে চাউল বিক্রয় নিষিদ্ধ হইল। রেশনের পরিমাণ করা হইল প্রায় অর্দ্ধেক। এই কঠোর শাস্তিবিধানের সঙ্গে-সঙ্গে গৃহে-গৃহে একটি করিয়া প্রশ্নপত্র প্রেরণ করা হইল। ইহাতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি ছিল: আপনার অঞ্চলের কম্যুনিষ্টদের নাম কি? কোন্ কোন্ দোকান সন্ত্রাসবাদীদিগকে খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করে? কাহারা সন্ত্রাসবাদীদের জন্য খাদ্য ও দ্রব্যাদি ক্রয় করে ও চালান দেয়? সন্ত্রাসবাদীদের সংবাদবাহক কাহারা? কাহারা এজেণ্ট সংগ্রহ করে? তানজন মালিমে ও উলুবেরনামে কাহারা কম্যুনিষ্ট-পতাকা উত্তোলন করিয়াছিল? কম্যুনিষ্টদের প্রচারক কাহারা? বে-আইনী ভাবে অস্ত্র রাখিয়াছে এইরূপ কাহাকেও আপনি জানেন কি? এই সকল প্রশ্নের উত্তরদাতাদিগকে উত্তরপত্রে তাহাদের নাম দস্তখত না করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল। তের দিন পরে উল্লিখিত শাস্তি প্রত্যাহার করা হয়। প্রশ্নগুলির কি উত্তর পাওয়া গিয়াছিল তাহাও প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু ফল কি হইয়াছে?

প্রত্যেক কর্ম্মক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে জরুরী অবস্থায় নেশন্যাল সার্ভিসে যোগ দিতে বাধ্য করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। জেঃ টেম্পলার মালয়বাসী চীনাদের সহযোগিতা পাইবার

ঋষি দাসের
ছোটদের নিউটন ১।০
ছোটদের আইনস্টাইন ১।০
ছোটদের মার্কনী ১।০
শ্রুতিনাথ চক্রবর্তীর
রাণী রাসমণি ১৲
যোগেশচন্দ্র বাগলের
ভারতের মুক্তি-সন্ধানী ২॥০
সংকল্প ও সাধনা ১॥০
রবীন্দ্রকুমার বসুর
মুক্তি-সংগ্রাম ৪৷৷০
রোলাঁর আলোকে গান্ধীজি ১॥০
সুবোধচন্দ্র রায়ের
স্বরাজ ও সাধনা ১॥০
প্রফুল্লরতন গঙ্গোপাধ্যায়ের
নবজীবনের পথে হায়দরাবাদ ১॥০
গিরীন চক্রবর্তীর
দেশ বিদেশের লেখা ৩৲

ছোটদের অন্যতম মাসিক পত্রিকা
চয়নিকা
বৈশাখ হইতে গ্রাহক হইতে হয়
নমুনার জন্য চারি আনার ডাক টিকিট লাগে
বার্ষিক ৩৲
বৈচিত্র্য ভরা রচনায় সমৃদ্ধ ও জ্ঞান বিজ্ঞানের রত্নখনি।

ভূতনাথ ভৌমিকের
ডোমিনিয়ন ভারতের পথরেখা ২৲
খগেন্দ্রনাথ মিত্রের
গোর্কীর ছেলেবেলা ১॥০
মাঙ্গুসেনের অ্যাডভেঞ্চার ৷৷০
নির্মলকুমার বসুর
আরব্য উপন্যাস ২৲
কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য্যের
শ্রীমদ্ভগবতগীতা ২৲
রবীন্দ্রলাল রায়ের
বলিতে হাসব না ৷৷০
নলিনীকুমার ভদ্রের
আসামের অরণ্যচারী ১॥০
গদাধর নিয়োগীর
গল্প-বীথিকা ১৷৷০
H. Barik's
READY RECKONER ৩৲
PAY, WAGES INCOME TABLES ২৲

ভারতী বুক স্টল :: ৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

জন্যও চেষ্টা করিতেছেন। মালয়ে সম্প্রতি একটি নূতন চীনা রাজনৈতিক দল গঠিত হইয়াছে। আসলে ইহা মালয়ী-চীনা এসোসিয়েশনের নব কলেবর। বিশিষ্ট ধনী স্যার চেং লক তান এই নূতন দলের নেতা এবং বিশিষ্ট চীনা ব্যবসায়ীরা ইহার কর্ণধার। এই নূতন দল গোঁড়া কম্যুনিষ্টবিরোধী এবং এই দলের চেষ্টায় বহু চীনা ফেডারেল পুলিশ বাহিনীতে প্রবেশ করিয়াছে। এই নূতন দল গঠনের মূলে জে: টেম্পলারের ইঙ্গিত থাকাই সম্ভব। কিন্তু মালয়ের এই সংগ্রামের শেষ এখনও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। কম্যুনিষ্টদের নেতা চিন পেংকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরিয়া দিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। জীবিত অবস্থায় ধরিয়া দিলে ২,৫০,০০০ মালয়ী ডলার এবং তাহার সম্পর্কে প্রদত্ত সংবাদ অনুযায়ী তাহাকে গ্রেফ্তার করা হইলে ১,২৫,০০০ মালয়ী ডলার পুরস্কার দেওয়া হইবে। কিন্তু তাহার সন্ধান কেহই পাইতেছে না। মালয়ের অধিবাসীদের শতকরা ৯০ জনই কম্যুনিষ্ট দমনের ব্যাপারে নিস্পৃহ।

মিশরে আবার নূতন মন্ত্রিসভা—

ইঙ্গ-মিশর সমস্যা অবশেষে যে-ভাবে মিশরে মন্ত্রিত্ব-সঙ্কটের রূপ গ্রহণ করিয়াছে তাহা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। ছত্রিশ ঘণ্টাব্যাপী মন্ত্রিসভা-সঙ্কটের পর প্রধান মন্ত্রী হিলালী পাশা গত ২৮শে জুন (১৯৫২) শনিবার পদত্যাগ করিয়াছেন। রাজা ফারুক তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিয়া হোসেন শিরি পাশাকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন। পাঁচ দিন পর ২রা জুলাই (১৯৫২) তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করিতে সমর্থ হন। তাঁহার সহযোগীরা সকলেই স্বতন্ত্র সদস্য। হিলালী পাশা এবং তাঁহার মন্ত্রিসভা গত ১লা মার্চ্চ তারিখে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। চারি মাসের মধ্যেই তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইল। তাঁহার পূর্ব্বে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিলেন মাহের আলী পাশা। ২৬শে জানুয়ারী (১৯৫২) তারিখের হাঙ্গামার পর রাজা ফারুক নাহাশ পাশাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারণ করিবার পর আলী মাহের পাশা মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিলেন। মিশর পার্লামেণ্টের অধিবেশন স্থগিত রাখার ব্যাপারে যে সঙ্কট সৃষ্টি হয় তাহারই ফলে তিনি পদত্যাগ করেন বলিয়া প্রকাশ। তথাপি তাঁহার পদত্যাগের কারণটা দুর্জ্ঞেয় হইয়াই রহিয়াছে। কিন্তু হিলালী পাশার পদত্যাগের কারণ কিছুই প্রকাশ নাই। সুদান সমস্যা সম্পর্কে সুদান প্রতিনিধি দলের সহিত মিশর গবর্ণমেণ্টের আলোচনা শেষ হওয়ার পরেই তিনি পদত্যাগ করেন। এই আলোচনার ফলে সুদান সমস্যার সমাধান হওয়ার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় নাই। ইহাই তাঁহার পদত্যাগের কারণ বলিয়া স্বীকার করা কঠিন। হিলালী পাশা নিজে বলিয়াছেন যে, ওয়াফদী নেতারা কায়রোস্থিত কোন এক বিদেশী রাষ্ট্রদূতকে জানাইয়াছেন যে, হিলালী পাশাকে অপসারিত করিয়া ওয়াফদ দলের হাতে ক্ষমতা দিলে তাঁহারা মধ্য প্রাচী রক্ষা-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিবেন এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্রতি তাঁহাদের নীতি অধিকতর সন্তোষজনক হইবে। ওয়াফদী নেতারা কোন্ দেশের রাষ্ট্রদূতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা কিছুই প্রকাশ নাই। তবে এ সম্পর্কে মার্কিণ দূতাবাসের নাম অনেকেই উল্লেখ করিয়াছেন। মার্কিণ দূতাবাস হইতে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া উহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। মিশরে বিদেশী শক্তির ইঙ্গিতে মন্ত্রিসভার ভাগ্য নির্দ্ধারিত হওয়া একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। তথাপি ওয়াফদী নেতারা মার্কিণ রাষ্ট্রদূতের নিকট এইরূপ কোন প্রস্তাব করিয়াছিলেন মিশর-বাসীরা সহজে তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিবে না।

হয় ত হিলালী পাশা দ্বারাও প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় নাই। হয়ত এই জন্যই তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। নূতন প্রধান মন্ত্রী হোসেন শিরি পাশা পশ্চিমী শক্তি-বর্গের আশা পূরণ করিতে পারিবেন কি না তাহা অনুমান করা কঠিন। তিনি যে রাজা ফারুকের বিশেষ আস্থাভাজন তাহাতে সন্দেহ নাই। সঙ্কট কালে রাজা তাঁহার নিকট হইতে অনেক কাজ এ পর্য্যন্ত পাইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনটি সঙ্কট কালে তিন বার তিনি প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তিনি এইজন্য সঙ্কটকালীন প্রধান মন্ত্রী আখ্যাও লাভ করিয়াছেন। শিরি পাশা একজন ইঞ্জিনীয়ারই শুধু নহেন, তিনি একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী। তিনিও মিশরের সঙ্কট পাড়ি দিতে পারিবেন কি না তাহা বলা কঠিন।

মধ্য-আফ্রিকা ফেডারেশন—

উত্তর রোডেশিয়া, দক্ষিণ রোডেশিয়া এবং ন্যাসাল্যাণ্ড লইয়া প্রস্তাবিত মধ্য-আফ্রিকা ফেডারেশনের খসড়া শাসনতন্ত্র সম্বলিত যে শ্বেতপত্র বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁহাদের শেষ সম্বল আফ্রিকার উপনিবেশগুলি হাতছাড়া করিতে রাজী নহেন। গত এপ্রিল মাসে (১৯৫২) উল্লিখিত তিনটি উপনিবেশ গবর্ণমেণ্ট এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে প্রস্তাবিত মধ্য-আফ্রিকা ফেডারেশনের খসড়া শাসনতন্ত্র সর্বসম্মতি-ক্রমেই গৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু আফ্রিকান প্রতিনিধিগণ আহূত হইয়াও সম্মেলনে যোগদান করেন নাই। অবশ্য দক্ষিণ রোডেশিয়ার দুই জন আফ্রিকান সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী স্যার গডফ্রে হিউগিনস্ কর্ত্তৃক মনোনীত সদস্য। তাঁহাদিগকে দক্ষিণ রোডেশিয়ার আফ্রিকানদের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

এই নূতন পরিকল্পনার সহিত ভিক্টোরিয়া ফল্স্ সম্মেলনে গৃহীত পরিকল্পনার বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। যেটুকু পার্থক্য আছে তাহাও আফ্রিকানদের স্বার্থের প্রতিকূল। এই পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে। যে-সকল ব্যাপারে আফ্রিকানদের স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা সে-সকল ব্যাপারে দৃষ্টতঃ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু যে-ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে আফ্রিকানদের স্বার্থ রক্ষিত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। একজন গবর্ণর জেনারেল এবং একটি আইন সভা লইয়া কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে। এই আইন সভার সদস্য-সংখ্যা হইবে ৩৫ জন। তন্মধ্যে দক্ষিণ রোডেশিয়া হইতে ১৭ জন, উত্তর রোডেশিয়া হইতে ১১ জন

এবং ন্যাসাল্যাণ্ড হইতে ৭ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন। মোট ৩৫ জন সদস্যের মধ্যে আফ্রিকান প্রতিনিধি থাকিবে মাত্র ৬ জন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় কোন আফ্রিকান ফেডারেল মন্ত্রী থাকিবে না। তৎপরিবর্ত্তে একটি আফ্রিকান এফেয়ার্স বোর্ড গঠিত হইবে। উহার সদস্য-সংখ্যা হইবে সাত জন। গবর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক তাঁহারা মনোনীত হইবেন। এই সাত জন সদস্যের মধ্যে তিন জন হইবেন আফ্রিকান। সুতরাং আফ্রিকানদের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য থাকিবেন মাত্র ১ জন আফ্রিকান। তন্মধ্যে তিন জন গবর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক মনোনীত। আফ্রিকানদের স্বার্থের প্রতিকূল কোন বিল যদি কেন্দ্রীয় আইন সভায় উত্থাপিত হয় তাহা হইলে উক্ত আফ্রিকান এফেয়ার্স বোর্ড আপত্তি করিতে পারিবেন। এইরূপ অবস্থায় উক্ত বিলের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন আবশ্যক হইবে। কিন্তু বোর্ডের গঠনের দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, এইরূপ আপত্তি উত্থাপনের স্থল বিশেষ কিছুই থাকিবে না।

আফ্রিকানগণ এইরূপ ব্যবস্থায় যে সম্মতি দিবে না তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। কিন্তু মধ্য-আফ্রিকার ইংরাজ ঔপনিবেশিকগণ এইরূপ ফেডারেশনের দৃঢ় সমর্থক। কারণ, এইরূপ ব্যবস্থায় সমগ্র মধ্য-আফ্রিকায় তাহাদের অপ্রতিহত একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, মধ্য-আফ্রিকা পরিণত হইবে দ্বিতীয় দক্ষিণ আফ্রিকায়। এইরূপ ফেডারেশনের ব্যাপারে বৃটিশ শ্রমিক দলের আপত্তি হইবার আশঙ্কা অনুমান করিয়া দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী স্যার গডফ্রে হিউগিনস্ যে-সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, এই ফেডারেশন গঠনের ব্যাপারকে ইংলণ্ডের রাজনীতিকগণ যদি তাঁহাদের রাজনৈতিক দাবা খেলার বাজীতে পরিণত করেন, তাহা হইলে উত্তর আমেরিকার উপনিবেশ যেরূপ তাঁহারা হারাইয়াছেন আফ্রিকার উপনিবেশগুলিকেও সেইরূপ তাঁহাদিগকে হারাইতে হইবে।

জাপানে মার্কিণ-বিরোধী হাঙ্গামা—

কোরিয়া যুদ্ধের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে গত ২৫শে জুন (১৯৫২) জাপানে যে বিরাট হাঙ্গামা হইয়া গেল তাহার মধ্যে জাপানীদের মার্কিণ-বিরোধী মনোভাব প্রবল ভাবেই পরিস্ফুট হইয়াছে। এই হাঙ্গামা সংক্রান্ত সংবাদ যে-ভাবে পরিবেশন করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, দুই লক্ষ লোক শুধু হাঙ্গামা বাধাইবার জন্যই পথে বাহির হইয়াছিল। প্রকৃত ঘটনা কি তাহা কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। এই দুই লক্ষ লোক মার্কিণ-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে বাহির হওয়ার পর পুলিশের হস্তক্ষেপের ফলে বিক্ষোভ হাঙ্গামায় রূপান্তরিত হইয়াছে কি না, তাহাই বা কে বলিবে? এই প্রসঙ্গে জাপ-শান্তি-চুক্তি অনুযায়ী জাপানের স্বাধীনতা লাভের তিন দিনের মধ্যেই গত ১লা মে (১৯৫২) তারিখের হাঙ্গামার কথাও মনে হওয়া স্বাভাবিক। ঐ দিনও বিক্ষোভ প্রদর্শন হাঙ্গামায় পরিণত হইয়াছিল কিরূপে এবং কেন, সে-সম্বন্ধেও কোন সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। উহারও পূর্ব্বে গত ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৫২) উপনিবেশ-বিরোধী দিবস

অভিজ্ঞের উপদেশ
উৎকৃষ্ট কেশতৈল নির্বাচনের সময়
ক্যালকেমিকোর
ক্যাষ্টরল
বিশেষজ্ঞদের বিবেচনায় সব চেয়ে ভাল কেন? কারণ, এর প্রত্যেকটি উপাদান বিশুদ্ধ ও পরিশ্রুত। কেবল মাত্র ঔষধার্থে ব্যবহৃত খাঁটি দামী ক্যাষ্টর অয়েলে তৈরী। এর সুগন্ধ মনোমদ ও অনুপম। ব্যবহারে চুল বাড়ে, টাক পড়া বন্ধ হয়। গুণ ও পরিমাণ হিসাবে দাম সস্তা!
৫ আউন্স ও ১০ আউন্স সুদৃশ্য আধারে পাওয়া যায়।
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

(Anti-colonization day) উপলক্ষে আর একটি হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। এই তিনটি বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রত্যেক-টিকেই হাঙ্গামায় রূপান্তরিত করা হইয়াছে এবং উহার জন্ম দায়ী করা হইয়াছে কম্যুনিষ্টদিগকে। কোরিয়া যুদ্ধের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে বহু উত্তর কোরিয়গণও না কি হাঙ্গামায় যোগদান করিয়াছিল। বিদেশী সৈন্তের উপস্থিতি কোনা দেশের লোকই পছন্দ করে না। যদি কম্যুনিষ্টরাই হাঙ্গামার জন্ম দায়ী হয়, তাহা হইলে দুই লক্ষ লোকের সমাবেশ তাহারা করিতে পারিল কোন্ শক্তিতে, তাহা কি ভাবিবার বিষয় নয়? যোশিদা গভর্ণমেণ্ট যে "এণ্টি-সাব্‌ভার্‌সিভ একটিভিটি বিল' (হিংসাত্মক কার্য্য-নিরোধ বিল) উপাপন করিয়াছেন তাহার প্রতিক্রিয়ার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কম্যুনিষ্টদের দমন করাই এই বিলের উদ্দেশ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। জাপানের ট্রেড ইউনিয়ন-গুলি কম্যুনিষ্ট-বিরোধী হইয়াও এই বিলকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। তাহারা মনে করে, শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধতা ধ্বংস করিবার জন্মই এই আইন প্রয়োগ করা হইবে। এমন কি, উদারনীতিকরা পর্য্যন্ত আশঙ্কা করেন যে, এই বিল 'পুলিশ রাষ্ট্র' গঠনের সূচনা মাত্র।

২৫শে জুন তারিখের হাঙ্গামার বিবরণে বলা হইয়াছে যে, জনৈক মার্কিণ জেনারেলের গাড়ীর ভিতরে এসিডপূর্ণ বোতল এবং জলন্ত পেট্রোল নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। তাহাতে তাহার মুখ ও বক্ষদেশ না কি পুড়িয়া যায়। সংবাদে আরও দেখা যায়, এই মার্কিণ জেনারেল দক্ষিণ-পূর্ব্ব জাপানের কমাণ্ডাণ্ট জেঃ কার্টার ডবলু ক্লার্ক। তিনি কেন পথে বাহির হইয়াছিলেন? এই বিক্ষোভ দমনের জন্ম মার্কিণ সৈন্ত নিয়োগ করা হইয়াছিল কি?

মার্কিণ-বিরোধী বিক্ষোভকে কম্যুনিষ্টদের কারসাজী বলিয়াই শুধু অভিহিত করা হয় নাই, জাপ পুলিশ কর্তৃপক্ষ কম্যুনিষ্টরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা গঠন করিয়াছে বলিয়াও সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। কম্যুনিষ্টদের এইরূপ অভিসন্ধির কথা এই নূতন শোনা যাইতেছে না। এইরূপ অভ্যুত্থানের আশঙ্কার কথা প্রচার না করিলে কম্যুনিজম দমনের ভিত্তি তৈয়ার করা কঠিন। কম্যুনিষ্ট-বিরোধীরা কম্যুনিষ্টদের ১৯৫২ সালের ২৩শে জানুয়ারী তারিখের 'How to Raise Flower Bulbs' শীর্ষক একটি গোপন দলীল হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কিরূপে নূতন সামরিক নীতির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, তাহা এই গোপন দলীলে বলা হইয়াছে।

—সাহিত্য-পরিচয়—

(প্রাপ্তি-স্বীকার)

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার অমৃত বাণী—শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ; ১৫, কলেজ স্কোয়ার। দাম আড়াই টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা (১ম ভাগ)—স্বামী গম্ভীরানন্দ। উদ্বোধন কার্য্যালয়; ১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা। দাম পাঁচ টাকা।

সম্ভবামি যুগে যুগে—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাব্লিশার্স; ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট। দাম আড়াই টাকা।

অমৃত পথ যাত্রী—শ্রীসুবোধ ঘোষ। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাব্লিশিং কোং লিমিটেড, ৮সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

রবি-রশ্মি—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এ, মুখার্জ্জী এণ্ড কোং লিমিটেড; ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। দাম সাড়ে সাত টাকা।

বলাকা কাব্য পরিক্রমা—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন। এ, মুখার্জ্জী এণ্ড কোং লিমিটেড; কলিকাতা-১২। দাম সাড়ে চার টাকা।

প্রাগৈতিহাসিক—শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড; ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম আড়াই টাকা।

চাচা কাহিনী—সৈয়দ মুজতবা আলি। নিউ এজ্ পাব্লিশার্স লিমিটেড; ২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

মধুমালা—জসীম উদ্দীন। পাকিস্তান বুক ডিপো; ৪০, ইসলামপুর রোড, ঢাকা। দাম এক টাকা।

আমার দেখা রাশিয়া—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। নিউ এজ্ পাব্লিশার্স লিমিটেড, ২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

রোবাইয়াৎ-ই-ওমর-খৈয়াম—সি, সি, বসাক এণ্ড সন্স; ১২৭, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম সাড়ে চার টাকা।

ভাঙছে শুধু ভাঙছে—অমরেন্দ্র ঘোষ। কমলা বুক ডিপো; ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম সাড়ে তিন টাকা।

চর-ভাঙা চর—কাজি আফসারউদ্দিন আহমদ। ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবুরবাজার, ঢাকা। দাম সাড়ে তিন টাকা।

শুভা—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী। বিশ্বনাথ বুক ষ্টল; ৮৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪। দাম দুই টাকা।

পদ্য চণ্ডী—শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ। ৯৩।৪, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম এক টাকা চার আনা।

ভারতের কৃষি সমস্যা—ই, এম, এস, নাম্বুদ্রিপাদ। ন্যাশান্যাল বুক এজেন্সি লিমিটেড; কলিকাতা-১২। দাম বারো আনা।

ভারতের জাতি সমস্যা—সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। ন্যাশান্যাল বুক এজেন্সি লিমিটেড; কলিকাতা-১২। দাম পাঁচ আনা।

সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ—শ্রীরেবতী বর্ম্মণ। ন্যাশান্যাল বুক এজেন্সি লিমিটেড; কলিকাতা-১২। দাম সাড়ে তিন টাকা।

ব্রহ্মবিদ্যা—শ্রীগণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীগুরু লাইব্রেরী; ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

রাধা-মদনমোহন—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র। আর, কে, পাব্লিশিং কোং; ১১বি, গোকুল মিত্র লেন, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

গীত-দর্পন—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। আর, বি, দাস; ৮বি লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম চার টাকা।

চলাচল—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ম্যানসক্রুপট; ৬০।১বি, হরিশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৫। দাম সাড়ে চার টাকা।

মর্ত্ত্যের অমরাবতী—হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্য। মিত্র এণ্ড ঘোষ কোং; ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা চার আনা।

কবিতায় শৈশব—শ্রীরমেন চৌধুরী। প্রতিভা আর্ট প্রেস; ১১২এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

মনের কথা—ডাঃ হরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। মহেশ লাইব্রেরী; ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

বাংলা বর্ষ লিপি, ১৩৫৯ সাল—শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী: সংস্কৃতি বৈঠক; ১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা-২৯। দাম আড়াই টাকা।

প্রতিশ্রুতি—শ্রীবনবিহারী ঘোষাল। মজুমদার লাইব্রেরী; ১৮, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট। দাম দুই টাকা।

আকাশ-পাতাল

[৩৫৯ পৃষ্ঠার পর]

হেড-নায়েব ভাবছিলেন হুজুরের সঙ্গে দেখা হবে কতক্ষণে। ভাবছিলেন আর হাসছিলেন মৃদু-মৃদু। দুর্বোধ্য হাসি। ভাবছিলেন, গতকাল ডান হাতের তালু চুলকে উঠেছিল না? টাকা আসবে হয়তো হাতে। কিন্তু কোত্থেকে আসবে? হঠাৎ কথা বললেন হেড-নায়েব। বললেন,—এক ছিলিম তামাক সাজতে যে বাজী ভোর করে দিলে হে বিষ্টু!

বিষ্ণু কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে ফিরে তাকায়। বলে,—টিকেগুলান যে স্যাঁৎ-স্যাঁৎ করছে মশায়! ধরতেই চাইছে না।

হেড-নায়েব বললেন,—উদিকে হুজুরের সঙ্গে এখনই দেখা হওয়া চাই যে! তামাক তবে থাক। আমি ফিরে আসি।

বিষ্ণু বলে,—ব্যস্ত হন কেন মশায়। নেন ধরেন, তামাকু খেয়ে তবে যান।

হেড-নায়েব বলেন,—তাড়া কি আর শুধু শুধু দিচ্ছি! কাজ আছে, কথা আছে। হুজুরের সঙ্গে জরুরী কথা আছে যে বিষ্টু, বোঝ না তুমি?

বিষ্ণু বললে,—নেন না, খেয়েই তবে যান না। খেয়ে গিয়ে ক'ন না কথা হুজুরের সঙ্গে যত ইচ্ছা।

হুজুর তখন মুগ্ধ চিত্তে গান শুনছিলেন। বেহাগ শুনছিলেন।

লাল ভেলভেটের তাকিয়ায় হেলে প'ড়ে গান শুনছিলেন। রাত্রে ঘুম ছিল না চোখে, চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে আছে। গান শুনতে শুনতে চোখে বুঝি ঘুম নামে। ঘুমের জড়তায় আলস্য লাগে হয়তো। গান তো শুনছিলেন, কিন্তু থেকে থেকে মনটা যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে কৃষ্ণকিশোরের। সিন্দুক থেকে ঘড়া বেরিয়েছে দেখে রাজেশ্বরী যে বলেছে খোঁজ করবে। কাছারী থেকে লোক ডাকিয়ে আড়াল থেকে কথা কইবে। খোঁজ করবে, সত্যিই টাকা বাকী পড়েছে কি না খাজনার। শুনে পর্য্যন্ত মনটা চঞ্চল হয়ে আছে। অথচ টাকা যে দিতেই হবে গহরজানকে। না দিলে মান-মর্য্যাদা থাকবে না। কিছু না হোক ডালিমের বিয়ের খরচাটা তো দিতেই হবে। কোটি কোটি টাকা নয়, লাখো লাখো নয়, কয়েক হাজার টাকা। না দিলে মর্য্যাদার হানি হবে যে! দেখা যাবে না গহরজানের মুখের হাসি।

গহরজান, গহরজান, গহরজান।

কত রূপ গহরজানের। ঠিক যেন বেদুইনদের মত। রুখু-রুখু চুল গহরজানের। সুর্ম্মা-টানা চোখ। তরমুজ রঙের ঠোঁট, ডালিম-রাঙা দাঁত। মোমের মত নরম যেন দেহ। মুক্তো-ঝর' হাসি। হঠাৎ-পাওয়া গহরজানের হাসি হয়তো মিলিয়ে যাবে। মরীচিকার মতই মিলিয়ে যাবে গহরজান।

দরজায় হেড-নায়েবের আবির্ভাব হতে দেখে কৃষ্ণকিশোর বললে,—কিছু বলছেন?

হাসির ঝিলিক খেলে যায় হেড-নায়েবের মুখে। বলে,—হ্যাঁ হুজুর, জরুরী কথা ছিল। বিশেষ জরুরী।

মজলিস থেকে উঠে পড়ে কৃষ্ণকিশোর। গান থামে না, বাজনা থামে না। ফ্লুট থামে না। হেড-নায়েবের কাছাকাছি যেতেই তিনি বললেন,—হুজুর, খুব জোর ঘুরিয়ে দিয়েছি বিষয়টা। অতটা বুঝতেই পারিনি আমি।

বিস্ময়ের সঙ্গে বললে কৃষ্ণকিশোর,—কি হয়েছে?

হেড-নায়েবের ওষ্ঠে দুর্বোধ্য হাসির ইঙ্গিত। কথা বলতে চান না যেন। শুধু হাসি ফুটে ওঠে থেকে থেকে ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে। বললেন,—সিন্দুক থেকে হুজুরের ঘড়া নেওয়া হয়েছে কি?

হেড-নায়েবের মুখে অপ্রত্যাশিত কথা শুনে বিস্মিত হয় কৃষ্ণকিশোর। বলে,—আপনি জানলেন কোত্থেকে? বললে কে?

—হুজুর, খু—ব বাঁচিয়ে দিয়েছি। ব'লে দিয়েছি যে, হ্যাঁ টাকা থাকতি হয়েছে কাছারীতে। দু'টো বাঁধ বাঁধতেই খরচা হয়েছে হাজার চল্লিশ। ক্যাশ টাকা নেই কাছারীতে। খাজনা বাকী প'ড়েছে এক সালের। টাকা চাই যেখান থেকে হোক। হেড-নায়েব কথা বলেন হাসির রেশ টেনে। ক্ষীণ হাসি। কথা বলতে বলতে একটি চোখ মুদিত করেন।

অনন্যসাধারণ কেশবর্দ্ধক

সর্বত্র পাওয়া যায়

মূল্য ১।৵০

টস্ ফার্ম্মাসিউটিক্যাল প্রডাক্টস্ (ইণ্ডিয়া)

হেড অফিস: ১, লোয়ার রডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৭

কৃষ্ণকিশোরের মুখে ফুটে ওঠে গাম্ভীর্য্য। অপমান বোধের কাঠিন্য। কথা বলে না কিছু। চোখে তির্য্যক্ দৃষ্টি ফুটিয়ে হেড-নায়েবের কথা শোনে।

হেড-নায়েব কথা না থামিয়ে বলে যান। বলেন,—হুজুর অনুমতি দেন তো জিজ্ঞাস করি, টাকার প্রয়োজন হ'ল কেন? কাছারী থেকে টাকা চাইলেই তো পাওয়া যায়। হুকুম করলেই পাওয়া যায়। বিশ, পঁচিশ, দু'শো, পাঁচশো, শুধু হুকুমের অপেক্ষা।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—না নায়েব মশাই। দু'শো-পাঁচশো হ'লে চলবে না। টাকা চাই হাজার বিশেক। বিশেষ প্রয়োজন।

মুখ থেকে হাসি মুছে সহজ কণ্ঠে বললেন হেড-নায়েব,—তবে তো কথাই নেই। ঠিক আছে। টাকা যখন চাই তখন,—ঠিক আছে হুজুর ঠিক আছে। বিষয়টা হুজুর এক কথায় ঘুরিয়ে দিয়েছি আমি। ব'লে দিয়েছি টাকা জরুর চাই, নইলে—

কিয়ৎক্ষণ চুপচাপ থেকে বললে কৃষ্ণকিশোর,—আপনি পুরস্কৃত হবেন। কিন্তু কেউ যেন না জানতে পায়। ফাঁস হ'য়ে না যায়। কে খোঁজ করতে এসেছিল?

হেড-নায়েব হাতে হাত কচলাতে কচলাতে বললেন,—হুজুরের দয়া। তৃতীয় ব্যক্তি যদি কেউ জানতে পায় তখন হুজুর মুণ্ডচ্ছেদ ক'রে দেবেন আমার। যে শাস্তি দেবেন, মাথা পেতে নেবো আমি। আপনাদের পুরাতন ভৃত্য অনন্তরাম খোঁজ করে গেল আমার কাছে।

কৃষ্ণকিশোর কথার কোন প্রত্যুত্তর দেয় না। মুখে গাম্ভীর্য্য ফুটিয়ে শোনে হেড-নায়েবের কথা। হেড-নায়েব বললেন,—তবে হুজুর যাই আমি?

—হ্যাঁ। বললে কৃষ্ণকিশোর—আপনি অনুগ্রহ করে অনন্তকে দেখতে পাঠান গেরস্থের কাছে। আহারাদির কত দূর কি করলে। ভাল লাগছে না আমার। ওদের বিদেয় করতে পারলে বাঁচি আমি।

—হক্ কথা বলেছেন হুজুর। সময় নেই অসময় নেই গান-বাজনা ভাল লাগে কখনও? আমি হুজুর এই মুহূর্ত্তে পাঠাচ্ছি অনন্তকে। জেনেই বলছি।

কথার শেষে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন হেড-নায়েব।

অপলক চোখে কেন কে জানে কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে থাকে কৃষ্ণকিশোর। হঠাৎ যেন চোখে পড়ে কুচবরণ এক কন্যা। অদূরের এক গৃহের উপরের এক জানলায়। আইভিলতা দাঁড়িয়ে জানলায়। এলোমেলো হাওয়ায় উড়ছে আইভিলতার এলো কেশের বোঝা। যেন দেখতেই পায়নি আইভিলতা। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে নিজেকে হারিয়ে চলে গেছে যেন অন্য কোথায়। অন্য কোনখানে।

রাজেশ্বরী খোঁজ করিয়েছে অনন্তরামকে পাঠিয়ে।

ভাবতে থাকে কৃষ্ণকিশোর। অপমান বোধ করে মনে মনে। হেড-নায়েবের প্রতি খুশীতে ভ'রে যায় মনটা। ডিপ্লো[illegible]মা ঘুরিয়ে দিয়েছেন তিনি উপস্থিত বুদ্ধির প্রাখর্য্যে।

আইভিলতা বিবাগীর মত চেয়ে আছে দৃষ্টিহীন চোখে। আরও যেন ফর্সা হয়েছে আইভিলতা। মোটা হয়েছে। ছিল শ্বশুরালয়ে, ক'দিনের জন্য এসেছে পিত্রালয়ে।

কৃষ্ণকিশোর বৈঠকখানায় চ'লে যায়। ফরাসে গিয়ে বসে। লাল ভেলভেটের তাকিয়া টেনে নেয় একটা। ভাবে, রাজেশ্বরী অনন্তরামকে পাঠিয়ে খোঁজ করিয়েছে কাছারীতে। বেহাগ রাগের সুর কানে পৌঁছয় না হয়তো। তবলার বোল শুনতে পায় না। ফ্লুট না ক্ল্যারিওনেটের মিষ্টি আওয়াজ।

—বৌদিদি!

—কে, অনন্ত?

হ্যাঁ বৌদিদি। তুমি মিথ্যে পাঠিয়েছিলে আমাকে। কাছারীতে খোঁজ করলাম আমি। নায়েব মশায় বললেন, টাকা না পাওয়া গেলে এক সালের খাজনা বাকী পড়বে। অনন্তরাম কথ বলে ধীর চাপা কণ্ঠে।

কথা ক'টি শুনে চোখে হয়তো আনন্দাশ্রু দেখা দেয়। রাজেশ্বরী কথা শোনে রুদ্ধশ্বাসে। আয়ত আঁখিযুগল বিস্ফারিত ক'রে। শুনে লজ্জিত হয় কি না কে জানে! অশ্রুমাখা মুখে হাসির আভাষ। বলে,—সত্যি অনন্ত?

—হ্যাঁ বৌদিদি। কথাটি নিছক সত্য। খুশীভরা কণ্ঠে উত্তর দেয় অনন্তরাম। বলে, গিয়েছিলাম অন্য কারও কাছে নয়। খোদ নায়েব মশয়ের কাছে। তিনিই বললেন বিস্তারিত। বললেন যে, এক সালের বাকী খাজনা না দিলে মুস্কিল হবে।

দুই চক্ষু মুদিত করে রাজেশ্বরী। গেরিমাটি রঙের শাড়ীতে দেখায় বুঝি তপঃক্লিষ্টার মত। মনে মনে প্রণাম করে রাজেশ্বরী গৃহদেব তাকে। চক্ষু মুদিত করে থাকে কতক্ষণ। ভাবে, পূজা পাঠাবে কি না নাট-মন্দিরে। বলে,—আঃ বাঁচলাম। তুমি যাও অনন্ত। বাঁচালে আমাকে। আমি ভাবছি কত কথা। তুমি যাও, দেখো বামুনদিদি কত দূর কি করলেন।

অনন্তরামের কথাগুলি শুনে মনে মনে হয়তো লজ্জা বোধ করছিল রাজেশ্বরী। মিথ্যা ভেবেছিল কত কথা। মিথ্যা মনের ভুলে। দেরাজের ওপরে ছিল কতগুলো বই। দু'পাশে বুক-ষ্ট্যাণ্ড, মধ্যিখানে বই। প্রীতি-উপহার পাওয়া বই। বুক-ষ্ট্যাণ্ড দু'টোয় ছিল দু'টো শ্বেত পাতরের প্যাঁচা। লক্ষ্মী প্যাঁচা।

একটা বই টেনে নেয় রাজেশ্বরী। বই হাতে বসে খাটের দুগ্ধফেননিভ শয্যার এক পাশে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' পড়তে থাকে রাজেশ্বরী। কাঁটালপাড়ার ছাপা। এতক্ষণে সুস্থির হয়ে পড়ে রাজেশ্বরী। 'কপালকুণ্ডলা' পড়ে।

> "সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর পূর্ব্বে এক দিন মাঘ মাসে রাত্রি-শেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল—"

মনের ঝড় থেমে গেছে যেন রাজেশ্বরীর। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে এতক্ষণে।

বই খুলে বসতে পেরেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বই। উপন্যাস বই। কি একটা গল্প পড়েছিল রাজেশ্বরী, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা। প'ড়ে কি ভালই না লেগেছিল। শেষ না ক'রে উঠতে পারেনি। প'ড়ে মুগ্ধ হয়ে ভেবেছিল বঙ্কিমের অন্যান্য গল্প ক'টাও পড়বে একে একে। 'কপালকুণ্ডলা' পড়ছিল রাজেশ্বরী। পড়তে পড়তে ভাবছিল, বাঙলায় এত কথা

থাকতে ইংরাজী কথা লিখলেন কেন বঙ্কিমচন্দ্র—যা পড়ে বুঝতে পারে না রাজেশ্বরী। প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ ক'রে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আরম্ভে ইংরাজীতে কি লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র? প্রতি পরিচ্ছেদের প্রথম কথা ইংরাজীতে কেন? পরিচ্ছেদের আগে আগে বঙ্কিম বাবু জুড়ে দিয়েছেন সেক্সপীয়র, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি বিখ্যাত কবিদের একেক পংক্তি। কত চেষ্টা ক'রেও রাজেশ্বরী পড়তে পারে না কপালকুণ্ডলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ইংরাজী কথাটি :

"Ingratitude! Thou marbel-hearted fiend."
—King Lear.

'কপালকুণ্ডলা' পড়তে পড়তে কান পেতে থাকে রাজেশ্বরী। কোথায় কে কথা বলছে না? মাথায় গুণ্ঠনটা টেনে দেয় রাজেশ্বরী। যদি কেউ আসে। তিনি কথা বলছেন কি? রাজেশ্বরী কান পেতে থাকে। কোথায় কে? মনের ভুল, শুনতে ভুল করেছে। ভয় আর আশঙ্কায় কেমন হয়ে গেছে যেন রাজেশ্বরী। তবুও গুণ্ঠনটা টেনে দেয়। ঘোমটা টেনে পড়তে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় কি দখল, ভাবে কত নৈপুণ্য, গল্পের বিষয় কি রোমাঞ্চকর!

কোথায় কে? শুনতে ভুল করে রাজেশ্বরী।

তিনি তো মজলিসে। গানের আড্ডায়। বাজনার ঘরে। লাল ভেলভেটের তাকিয়া ঠেস দিয়ে কৃষ্ণকিশোর গান শুনছে, না ভাবছে কিছু? গহরজানের আকুল মিনতি, কখনও ভুলতে পারে কেউ? ডালিমের বিয়ের টাকাটা হাতে পেলে কত খুশীই না হবে গহরজান। হাসবে কত, মুক্তো-ঝরা হাসি। লজ্জার বাঁধ ভেঙ্গে যাবে গহরজানের। আর—

হাজার হাজার নয়, একশো টাকার কাগজের নোটটা পেয়ে খুশীভরা মনে তখন সিক্ত কেশের জট ছাড়াতে বসেছিল গহরজান। গঙ্গা থেকে ফিরতেই নোটটা সৌদামিনীর হাতে তুলে দিয়েছিল। বলেছিল,—দেখো মাসী, ওজগার করেছি।

সৌদামিনী আহ্লাদে উপছে প'ড়ে বলেছিল,—কোত্থেকে পেলি? দিলে কে বল্?

খিল-খিল ক'রে হেসে ফেলেছিল গহরজান। হাসতে হাসতে চোখ-মুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল। লুটিয়ে প'ড়েছিল। ব'লেছিল,—দেখো না যেয়ে ঘরে, কে ঘুমোচ্ছে!

সৌদামিনী বিরক্ত হয়ে বলেছিল,—হেঁয়ালী ছাড়, বল্ কে দিলে?

হাসতে হাসতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল গহরজান। বিশ্বাস করে না সৌদামিনী গহরজানের কথা। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গহরজান ব'লেছিল,—ঝুটা বাত আমি বলি না। বেশ তো তুমি যেয়েই দেখো। দরোয়াজা খুলতে মানা ক'রেছে। টাকা দিয়ে শুধু ঘুমোতে চায়।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সৌদামিনী, ঘোলাটে চোখে। বুঝতে পারে না গহরজানের কথা না ঠাট্টা। বিশ্বাস হয় না। শেষে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দু'দরজার ফাঁক থেকে দেখে, সত্যিই ঘরে কে। বিশ্বাস হয় না, ভাল ক'রে দেখে সৌদামিনী। দেখে ঘরের মানুষটিকে।

সৌম্যকান্তি গৈরিকধারী কে ঘুমোচ্ছে ঘরের তক্তপোষে। শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে আছে। দরজা থেকে ফিরে গিয়ে বললে সৌদামিনী,—কে বল তো গহর?

গহরজান বিরক্ত হয়ে বললে,—কে জানে কে! টাকা হাতে পেয়ে তবে ঢুকতে দিয়েছি ঘরে। এখন তুমি বোঝ। লোকটা চাইলে না কিছু। বললে, আমি ঘুমোতে চাই। ঘুম ভাঙলে রুটি আউর মাংস খেতে চেয়েছে।

দন্তহীন মাড়ি বের করে হেসে ফেললে সৌদামিনী। সৌদামিনীর আপাদ-মস্তক কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো হাসির বেগে। হাসতে হাসতে বললে,—কে বল তো?

গহরজান বললে,—তুমি চেনো না আমি চিনবো? কথা বলতে বলতে ডালিমকে বুকে তুলে নেয়। বলে,—আমি চললাম ঘুমোতে। ডেকো না আমাকে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

ঘুম চাই। উপোসী চোখ থাকলে মাথার ভেতরটা যেন কেমন করতে থাকে। দপ-দপ করতে থাকে কপালের দু'পাশ। দিনে না ঘুমোলে রাতে জাগবে কেমন ক'রে? ঘুম চাই। বর্ষা-দিনের হিম-শীতলতায় ঘুম-ঘুম পায় গহরজানের। নেশার মত লাগে যেন। চোখ জড়িয়ে আসে। গহরজান যেতে যেতে ভাবে, না যাবে না, লাখো টাকা দিলেও যাবে না অন্য কারও কাছে। থাকবে, বাঁধা হয়ে থাকবে। বারোয়ারী হয়ে বারো জনের কাছে লুটতে দেবে না নিজেকে। বিকিয়ে দেবে, যে টাকা দিয়েছে, যার কাছে পেয়েছে কিছু সোহাগ।

সোহাগের লোক তখন লাল ভেলভেটের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসেছিল মজলিসে।

হেড-নায়েব দরজায় দেখা দিয়ে ডাকে,—হুজুর!

আবার কেন ডাকে হেড-নায়েব! চমকে ওঠে যেন কৃষ্ণকিশোর। বলে,—কিছু বলছেন?

হেড-নায়েব বললে,—হুজুর, জায়গা হয়ে গেছে। আহারাদি প্রস্তুত হয়ে গেছে।

হয়তো ক্ষুধার্ত্ত হয়েছিল গাইয়ে-বাজিয়ের দল। বাজনা থেমে যায়। গানও সঙ্গে সঙ্গে থামে। জহর বললে,—ডিমের খিচুড়ী হয়েছে তো?

পান্না বললে,—ডিমেল বাটা বলেছিলাম মনে আছে?

কৃষ্ণকিশোর ভাবছিল কতক্ষণে বিদায় হবে পিশীর ছেলেরা আর সাঙ্গোপাঙ্গরা। বললে,—জানি না, চল্, খাবি চল্।

ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টা পড়তে থাকে ঢং-ঢং। কলের ভোঁ বাজতে থাকে। গানের ঘর শূন্য হয়ে যায়। অসহায়ের মত প'ড়ে থাকে বাজনা! লাল ভেলভেটের তাকিয়া। গোলাপপাশ। পানের ডিবে।

কলের ভোঁ বাজতে থাকে থমথম দুপুরের তন্দ্রা টুটে দিয়ে। ঘড়ি-ঘরের ঢং-ঢং শেষ হতে চায় না যেন। কলের ভোঁ থামে না। কতক্ষণ ধ'রে বেজে যায় থমথমে স্তব্ধ দুপুরের তন্দ্রা টুটিয়ে।

[ক্রমশঃ]

রামরাজত্বের তাজ্জব ব্যাপার !

"পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন মহাশয় তথাকথিত 'ইকনমিক সপে'র সাফল্যে খুবই উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। সাংবাদিকদের কাছে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের ৩১১টি দোকানে চাউল বিক্রয়ের যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তাহা খুবই সন্তোষজনক। কিন্তু সেন মহাশয় সন্তুষ্ট হইলেও, ক্রেতারা যে এ-ব্যাপারে আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন—তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলিলে সে কথা মনে হয় না। একে তো এই সব 'সস্তার' দোকানে চাউলের দাম লওয়া হইতেছে ৩০৲ টাকা মণ, তাহার উপর আবার চাউলের রূপ দেখিলে চক্ষু কপালে উঠিবার উপক্রম হয়। এ-রকম বিশ্রী চাউল ৩০৲ টাকা মণ দরে লোককে লইতে বাধ্য করা—চোরা-কারবারেরই নামান্তর নহে কি? অবশ্য চোরা-কারবারের সঙ্গে এই 'ইকনমিক সপের' তফাৎ একটা আছে; ফুটপাথের চোরাবাজার আইনসিদ্ধ নয় আর এই ইকনমিক চোরাবাজার পুরাদস্তুর আইনসম্মত। যে চাউলের দর কোন ক্রমেই ১৫।১৬ টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়—সেই চাউল ৩০৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া বাহাদুরী লওয়া সত্য সত্যই তাজ্জব ব্যাপার! কংগ্রেসী রামরাজত্বেই কেবল এ ধরণের ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব।" —দৈনিক বসুমতী।

পশ্চিমবঙ্গের দাবী

"আত্মপ্রতারণা ও ধাপ্পাবাজীতে কংগ্রেসের এক দল এত অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, ভারতবর্ষেরই একটা অংশের উপর ক্রমাগত অমানুষিক নির্য্যাতন চলিতেছে দেখিয়াও তাঁহারা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেসের মেজরিটির দাবীতে সেই উৎপীড়িত অংশের উপর নিম্নতম "ন্যায়বিচারের" দাবীও অস্বীকার করিতেছেন। পণ্ডিত নেহরু ইতিহাস পড়িয়াছেন নিশ্চয়ই। সুতরাং তাঁহাকে এ কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া অনাবশ্যক যে, ১৯৩৯—১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যতম মূল কারণ ছিল জার্মাণী ও জাপানের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য উপযুক্ত বাসস্থান বা ভূমির দাবী। জার্মাণী ও জাপানের "বাঁচিবার" যুক্তিতেই সেই দেশের নেতারা এই দাবী তুলিয়াছিলেন এবং যাহা শক্তিমানের দল অস্বীকার করিয়াছিলেন। পশ্চিম-বাঙ্গলার দাবী তার চেয়েও অনেক বেশী যুক্তিসঙ্গত।" —যুগান্তর

আর কত দিন ?

"দুর্গতদের দুর্ভাগ্য নিয়া এমন নিষ্ঠুর পরিহাস পৃথিবীর আর কোন দেশে হয় কিনা জানি না। এমন আত্মসন্তুষ্ট জনমত-উপেক্ষাকারী হৃদয়হীন সরকারী আমলাচক্রের হাতেই আজ কংগ্রেস রিলিফের ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়াছে। অগণিত মানুষকে তিলে তিলে সুপরিকল্পিত মৃত্যুর পথেই তাঁহারা ঠেলিয়া দিতেছেন। এই অভিনব সরকারী দয়া ও দাক্ষিণ্যের ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের এই অসাহয় ভাবে মৃত্যুবরণ দেশবাসী আর কত কাল নীরবে দর্শন করিবে?"

—লোকসেবক।

দেশব্যাপী শিল্পায়ন চাই

"শহরে ও গ্রামে বেকারের এক বিরাট বাহিনী। বিপুল সংখ্যক কৃষক ক্ষেতমজুর, ভাগচাষী ও নিঃস্ব কৃষকে পরিণত। শহরে যাহারাও বা চাকরিজীবী তাহাদেরও বিপুল সংখ্যক অতি নিম্ন আয়ের শ্রেণীভুক্ত। ইহাই আজ ঔপনিবেশিক সামন্ত ব্যবস্থা ও তাহার ধারক ও বাহক কংগ্রেসী শাসনের সর্ব্বনাশা পরিণতি। সেন্সাস রিপোর্ট ইহাই চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। বিধান সরকারের বাজেট, কমিউনিটি প্রোজেক্ট বা শহর-গ্রাম পরিকল্পনা, শ্রীনেহরুর পাঁচসালা পরিকল্পনা—কোথাও এই সঙ্কট সমাধানের পথ নাই। আছে ঔপনিবেশিক সামন্ত ব্যবস্থা কায়েম রাখিবারই প্রয়াস। সেন্সাস রিপোর্ট আজ ইহাই প্রমাণ করিয়াছে, সামন্ত ভূমি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া কৃষকদের ভিতর বিনামূল্যে জমি বিলি করিয়া কৃষকদের উৎপাদনে সাহায্য করা এবং দেশব্যাপী শিল্পায়ন করাই দেশকে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইবার একমাত্র পথ।" —স্বাধীনতা।

নেহেরু নাকে তেল দিয়া—

"জঙ্গলের জানোয়ার যাহা পারে, আজ মানুষের তাহাও অসাধ্য! একটি দুটি মায়ের কোলের সন্তান নয়, নেহরু "আবিষ্কৃত ভারতে"র প্রত্যহ কত জননীর কোলের শিশুই কংগ্রেসের সৃষ্ট 'দুর্ভিক্ষের' হাতে জবাই হইয়া যাইতেছে। শুধু তাহাই নয়, কত জননী নিজেদের হাতে শিশুদের গলা টিপিয়া মারিতেছে, তাহাদের বাজারে বিক্রী করিতেছে। কারণ, ঘরের অন্ন অদৃশ্য কাঁহারা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। এমন কি জননীদের বুকের দুগ্ধ পর্য্যন্ত ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। শুষ্ক স্তন হইতে এক ফোঁটা শিশুর পানীয় কোন মতেই ঝরানো সম্ভব নয়। কিন্তু তবু মানুষ বাঘ নয়; তাই খবরের কাগজে যতই অনাহার মৃত্যুর সংবাদ বাহির হউক, শিশুহত্যাকারীদের আজও নিদ্রাহীনতার কোন যন্ত্রণাই কালি মাখাইয়া দিতে পারে নাই। হরিণখালি, নবদ্বীপ, আরামবাগ, বারুইপুর, জলপাইগুড়ি যেখানেই যত মানুষ

মরুক, শিশু মরুক আর জননী অনাহারে অনিদ্রায় পুড়ুক—নেহরুজী নাকে তেল দিয়া এখন ঘুমাইতে পারেন স্বচ্ছন্দে।" —গণবার্তা।

ঠিকাদারের লোভ সামলাও

"জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, কালবৈশাখীর ঝড়ে জেলার কয়েকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের গৃহ ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের গৃহগুলি নির্ম্মাণ কালে ঠিকাদারগণ অতি মাত্রায় ফাঁকি দেওয়ার ফলে গৃহগুলি অত্যল্প কালের মধ্যেই নষ্ট হইতে বসিয়াছে। প্রায় পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে এই সমস্ত ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও গৃহগুলি রৌদ্র, বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের সামান্য দাপটও সহ্য করিতে না পারার কারণ সহজেই বুঝা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি কনষ্ট্রাকসন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে এই গৃহগুলি নির্মিত হয়। এই বোর্ড গৃহগুলির কি তত্ত্বাবধান করিয়াছেন? প্রদেশের স্বাস্থ্য-কেন্দ্রগুলির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঠিকাদারগণের অতিলোভ নিবারণে যত্নবান হইবার জন্য আমরা সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছি।" —বর্দ্ধমান।

বাহাত্তরের কবলে

"আমরা আমাদের প্রধান মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাইতেছি তাহার নব বৎসরে পদার্পণে। তিনি দীর্ঘজীবী হউন। তিনি বলিয়াছেন পলে পলে, অনুপলে, বিপলে তিনি নব জন্মগ্রহণ করিতেছেন। দেখিলাম, কম্যুনিষ্ট প্রভাবে প্রভাবিত ইঁহারা কেহই ভগবানকে ধন্যবাদ দেন নাই। শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলিয়াছেন—he is the greatest leader of Bengal. অতি সত্য কথা। নিরস্তে leader এ দেশে, বাংলা দেশে আর দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, নেতাজী নাই, অতএব অতুল্য বাবু সত্য কথাই বলিয়াছেন। তবে আমরা ঈশ্বরবিশ্বাসী বলিয়া ডাঃ রায়কে সাবধান করিয়া দিতেছি, তিনি সত্তরে পৌঁছিয়া কোন্ দিকে সত্বর হইতেছেন, "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ" কথাটা যেন ভুলিয়া না যান। "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ" যেন মনে না করেন, Security is mortals' chiefest enemy, Best safety lies in fear, তিনি যে বিরাট ৩০ জনের সুখী পরিবার গঠন করিয়াছেন তাহারা যেন সুখে স্বচ্ছন্দে enjoy the thrill of creation every moment, কিন্তু সে creation কোন্ পথে চলিতেছে তাহা জানিবার জন্য তিনি যেন নানা বেশে ট্রামে, বাসে, রেস্তোঁরায়, চায়ের আড্ডায় ভ্রমণ করেন ও স্বকর্ণে শোনেন তাহার creatorগণ কোন্ পথে কোন্ শ্রেণীর creation করিতেছেন, chaos না অন্য কিছু! তবেই বুঝিবেন তিনি সত্তর কি বাহাত্তর।" —নিশান।

মাঠে চরিবার জন্য উপমন্ত্রী?

"উপমন্ত্রিত্ব পাইয়া অনেকেই উৎসাহে আত্মহারা হইয়াছেন এবং সেক্রেটারিয়েটে ছুটাছুটি ও ফাইল ধরিয়া টানাটানি সুরু করিয়া দিয়াছেন। অনেক সেক্রেটারী মনে মনে বিরক্ত হইলেও কি জানি কিসে কি হয় ভাবিয়া চাকরির মায়ায় সব উপদ্রব সহ্য করিতেছেন। কিন্তু আলালের আফিসের দুলাল সুশীল দে সহ্য করিবেন কেন? তরুণকান্তি একটি ফাইল লইতে গেলে তিনি তাঁহার হাত হইতে ফাইল কাড়িয়া লয়েন ও বাজে বখামিতে সময় নষ্ট না করিয়া নিজের কাজ দেখিতে উপদেশ দেন। ডাঃ রায়ের কাছে গিয়া নালিশ করেন যে ফক্কড় ছোকরাদের জন্য কাজকর্ম্ম মাথায় উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। ডাঃ রায় চটিয়া নোটিশ দিলেন যে মাঠে চরিবার জন্য উপমন্ত্রী নিয়োগ করা হইয়াছে, তাহারা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া ফাইল টানে কোন্ সাহসে"? পার্লামেন্ট সেক্রেটারীরা দোয়াত কলম ও ব্লটিং পেপার পাইত, ইহারা না হয় কাগজ ও পিনকুসান পাইতে পারে। আবার কি?" —যুগবাণী।

ভাগীরথী বহুক

"ভাগীরথীকে বহতা রাখিবার জন্য গঙ্গা বাঁধ নির্ম্মাণের কার্য্যকে অগ্রগণ্য বিবেচনা করা উচিত। বর্ষাকালে ভাগীরথীর মোহানা পদ্মার সহিত মিলিয়া যায় বটে, কিন্তু নৌ চলাচলযোগ্য হইতে রীতিমত সময় লাগে। বর্তমানে মোহানার মুখ খুলিয়াছে এবং নৌ-চলাচল আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু নিশ্চিত ভাবে নৌ-চালনা করিবার উপায় নাই, মোহানার কাছে জলের গভীরতার কমি-বেশীর জন্য সাবধানে নৌ-চালনা করিতে হয়। ফরাক্কা ব্যারেজ হইলে এবং তাহার ফলে অন্যান্য খাত দিয়া ভাগীরথীতে পদ্মার জল বহাইবার ব্যবস্থা হইলে ভাগীরথীর মুখ সর্ব্বদা নৌ-চলাচলের যোগ্য থাকে। বিহার ও উত্তর-ভারতের সহিত কলিকাতার নৌ-সংযোগ একমাত্র ফরাক্কা ব্যারেজ নির্ম্মাণের দ্বারাই সম্ভব। পশ্চিম-বাংলার সীমান্ত রক্ষার জন্য এই বাঁধ আত্মরক্ষার প্রধান সহায়ক হইবে। মোটের উপর, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের প্রথম ও প্রধান দাবী বর্ত্তমানে ভাগীরথীকে বহতা রাখিবার ব্যবস্থা এবং তাহা ফরাক্কা ব্যারেজই পূর্ণ করিতে পারে।" —মুর্শিদাবাদ সমাচার।

কে ভাগ্য লিবি?

"যারা ভাগ্য চাহে, আমরা তাদের রোজ ভোরে উঠে নীচের প্রভাতী গানটি গাইতে বলি।

প্রভাতী সুরে

(ভজ) মুরজ মন্দ্রে বিধানচন্দ্রে মুখ্য মন্ত্রী আসনে।
অর্থ, স্বাস্থ্য বহু সেরেস্তা বিরাট স্বরাট্র শাসনে।
ক্ষুদ্র শিল্পে যাদব পাঁজা, সিদ্ধি, আফিং, মদ্য, গাঁজা,
শ্যামাপদ বর্ম্মণই তাজা করিবে ক্লান্তি নাশনে।
জলের মাছে, বনের গাছে, হেমচন্দ্র নস্কর আছে,
অজয় মুখোপাধ্যায় কাছে জলপথে, জলসেচনে।
খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত নহিলে পূর্ত্ত হইত লুপ্ত,
শ্রীমতী রেণুকা রায় নিযুক্ত (উৎ)বাস্তু পুনর্বাসনে।
খাদ্য, রিলিফ, সরবরাহ, প্রফুল্ল সেন গুণ গাহ,
শালগ্রাম-শিবচূর্ণ খাহো প্রতি গ্রাসে অন্ন সনে।
শ্রীরাধাগোবিন্দ রায়—পদধূলি সাথে নিজ মাথায়
উপজাতি উন্নয়ন-উপায় উন্নতি বিকাশনে।
স্পীকার-আসনে বাড়ায়ে মান, বাবু ঈশ্বরদাস জালান,
মন্ত্রীর পদে পাইল স্থান (লো)ক্যাল স্বায়ত্ত শাসনে।
কৃষি, সমবায়, সময় ভেদে আহার ডাক্তার আর আমেদে,
পান্না বসু ছাত্র মেধে, ভূমি রাজস্ব তার সনে।

(স)ত্যেন্দ্র কুমার বসুর হস্ত বিচার, আইন, নিল সমস্ত
রক্ষিতে দীন বিপদগ্রস্ত সুবিচারে সুশাসনে।"

—জঙ্গিপুর সংবাদ।

Go back to Village

"ইংরেজের আমলেও মানুষের মনকে প্রচার করে শিক্ষা দিয়ে তাদের বর্ত্তমান সভ্যতার দিকে, ধ্বংসের দিকে টেনে আনবার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। উচ্চ বিদ্যালয়গুলিই ছিল বিদেশী সভ্যতার প্রচারকেন্দ্র। গ্রামের বুদ্ধিমান ছেলেদের এরই সাহায্যে গ্রাম ছাড়িয়ে বাইরে আনার প্রথম কাজ সুরু হয়েছিল। আজ কয়েকখানি করে গ্রাম নিয়েই একটি করে উচ্চ বিদ্যালয় হয়েছে। আর গ্রাম ছাড়বার হিড়িকও বেড়েছে। এই হিড়িক বন্ধ করতে হবে। গ্রামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সরকারী সমাজ উন্নয়ন, পরিকল্পনা ইহারই প্রথম প্রয়াস।" —বর্দ্ধমানের কথা।

মিথ্যার বেসাতি

"দুই মুষ্টি ভাতের জন্য অনাহারক্লিষ্ট নর-নারী ক্যানিং ষ্টেশনে রাজ্যপাল ডাঃ মুখাৰ্জ্জিকে কাতর আবেদন জানায় এবং দুর্গত নর-নারী রাজ্যপালের পা ধরিয়া তাহাদের বাঁচাইবার জন্য আর্ত্ত ভাবে মিনতি করে। কিন্তু তথাপিও শুনিতে হইবে দেশে অনাহারে কেহ মরে নাই। এই যে শোচনীয় খাদ্যসঙ্কট ও অনশনক্লিষ্ট নরনারীর কাতর ক্রন্দন, তথাপি অনাহারে কেহ মরিতেছে না। ইহা তবে কি?" —ত্রিস্রোতা।

মানভূমকে বাঁচাও

"মানভূম বাঁচে কি করিয়া? সরকারের ভাণ্ডারে যখন অজস্র মাল তখন মানভূমের শিল্পাঞ্চলেও সরকার ঠিক মত সরবরাহ কেন করিতেছেন না বা করিতে পারিতেছেন না— যাহার জন্য চোরাই ও অবাঞ্ছিত পথে চাউল গিয়া শিল্পাঞ্চলের চাহিদা মিটাইতে হইতেছে?—ইহার সন্তোষজনক উত্তর কি সরকার প্রদান করিবেন বা করিতে পারিবেন? কোনো সরকারের দায়িত্ববোধ থাকিলে, জনগণের জিজ্ঞাসার উত্তর তৎপরতার সহিত দিতে সরকার কুণ্ঠিত থাকেন না। কিন্তু আমাদের বহু যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নের কোনোটিরও উত্তর আজও পর্য্যন্ত আমরা সরকারের কাছ হইতে পাই নাই। লক্ষ লক্ষ জনগণের জীবনের দায়িত্ব লইয়া সরকার নিয়তই ছেলেখেলা করিয়াছেন, লজ্জাকর বিভ্রান্তি ও অন্যায় বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থাসমূহ দ্বারা ও শোষণ দ্বারা সরকার জনগণের দুঃখ বাড়াইয়াছেন ও জনগণের প্রশ্নের দাবীতে নীরব থাকিয়াছেন।" —মুক্তি।

এমন ভাবে চাপ দিতে হইবে যে

"উদ্বাস্তুরা আজ নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন। চালের অসংখ্য ছিদ্র দিয়া ভরা বর্ষার জল ঘরে প্রবেশ করিতেছে, জীর্ণ কন্থায় শুইয়া ছেলে, বৃদ্ধ, যুবা ম্যালেরিয়ার ভুগিতেছে—ঔষধপথ্য কিছুই যে জুটিতেছে না তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। দোহালিয়া ক্যাম্পে লোক শৃগাল-ভেড়ার ন্যায় মরিতেছে। অন্যান্য ক্যাম্পের অবস্থাও অনুরূপই। ক্ষুধার জ্বালায় উদ্বাস্তু শেষ সম্বল কচুও খাইয়া নিঃশেষ দলে সহরে সমবেত হইতেছে তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার বিষয় সরকারের গোচর করার জন্য। কিন্তু এখানে আসিয়া পাইতেছে অপমান ও লাঞ্ছনা। এ অসহনীয় অবস্থা আর কত দিন চলিবে? পুনর্বাসন বিষয়ে গলদ ও ত্রুটির বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য পত্রিকা স্তম্ভে ও সভা-সমিতিতে আলোচনা, অনশন ও অবস্থান ধর্ম্মঘট, শোভাযাত্রা ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে চেষ্টা করা হইয়া গিয়াছে কিন্তু সরকার অচল অটল—কোনও প্রকার উদ্বেগের লক্ষণ তাঁহাদের মধ্যে দেখা যাইতেছে না। যাহা হউক, সরকারের উপর এমন ভাবে চাপ দিতে হইবে যে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হন।" —জনশক্তি

ধন্যবাদ

"একটি সামান্য পল্লী সাপ্তাহিক—'পল্লীবাসী'। রোগ ঠিক নির্ঘাৎ ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। শত রাক্ষুসী দৃষ্টির আওতা এড়াইয়া খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত কিদোয়াই প্রমাণ করিয়া গেলেন—আমরা যাহা বলিয়াছি তাহাই ঠিক। তাঁহাকে ধন্যবাদ। কত ছবি ছাপা, সভা-সমিতি, শ্লোগান শোভাযাত্রা—কিন্তু আসল কথা কেহই বলেন না। কলিকাতার সর্ব্বনেশে হাঁ বুজাইতে সারা দেশটায় যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে—এই সরল সত্য কথাটা না বলিয়া আবোল-তাবোল বকিয়া লাভ কি? সেই কলিকাতারই নেতা কলিকাতার কাগজ, কলিকাতার বাণী বিবৃতি সরফরাজী— কলিকাতায় বসিয়া ১১৲ টাকার রেশনে তুষ্টোদর হইয়া—পল্লীর দুঃস্থ গৃহস্থের জন্য কুম্ভীরাশ্রুমোচন—কেহই যে এ সব বুঝেন না, তাহা নহে, কিন্তু কেমন যেন দুর্ব্বলতা! প্রত্যেকেরই দলের টিকি বাঁধা কলিকাতায়। এ জন্য পশ্চিমবঙ্গের সব চাইতে সর্ব্বনাশীর লেলিহান রসনা দেখিয়াও ভয়ে ও ভক্তিতে কেহই দেবীর ঘট নাড়াইতে সাহস করে না। শত সাবাস্ শ্রীযুক্ত কিদোয়াই! এই রাক্ষুসীকে নাগপাশে আবদ্ধ করিবার ঘোষণা করিয়া সত্যকার সাহস, সহৃদয়তা ও দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ!" —পল্লীবাসী।

হৈ-হট্টগোল করবেন না

"নূতন বিধানসভার যাঁহারা মন্ত্রী (ও উপমন্ত্রী) হইলেন তাঁহাদের দায়িত্ব আজ অসীম। এদেশে কংগ্রেস থাকিবে, না কমিউনিজম হইবে—তাহা বহুলাংশে নির্ভর করিবে ইঁহাদেরই কার্য্যকলাপের উপর। আমাদের উক্তির গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হইয়াই আমরা এ কথা বলিতেছি। আগামী পাঁচ বৎসরে মন্ত্রীরা যদি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সফল করিতে পারেন তাহা হইলে দেশের দুর্গতি অনেকাংশে দূরীভূত হইবে এবং কংগ্রেস জন-চিত্তে সুদৃঢ় স্থান করিয়া লইবে—অন্যথায়, অর্থাৎ আগামী পাঁচ বছরও যদি গত সাড়ে চার বছরের মত হৈ-হট্টগোল করিয়া এবং যাবতীয় সমস্যাকে ধামাচাপা দিয়া কাটাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসের পতন অবশ্যম্ভাবী। ইহা স্মরণে রাখিয়াই কংগ্রেসী মন্ত্রিগণকে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে এবং কাজে লাগিয়া থাকিতে হইবে।" —নিশানা

শুধু অনুগ্রহপুষ্টদের জন্য?

"সরকারী ধান্য সংগ্রহের নীতি ও ধান্যের মূল্য নির্দ্ধারণের ফলে ... [illegible] ... লক্ষ্মীর খাজা তো দূরের কথা—

দুই বেলা পেট পুরিয়া খাইবার সংস্থান তাহার নাই। চাষের প্রধান সম্বল বলদ, খাদ্যাভাবে তাহাদেরও অবস্থা কাহিল হইয়া জীর্ণ-শীর্ণ অস্থিপঞ্জর লইয়া ধুঁকিতেছে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার হইতে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'অধিক খাদ্য ফলাও' নীতি লইয়া মাথাব্যথার অন্ত নাই। প্রতি বৎসরই তাঁহাদের পরিকল্পনার বেড়াজালের নমুনা দেখিতেছি। ঝুড়ি ঝুড়ি বেতার ভাষণের তুড়ি দিয়া বাজী মাৎ করিবার পরিহাস চাষী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। বলদ ঋণ, কৃষি ঋণ, ভূমি উন্নয়ন ঋণ প্রভৃতির নাম দিয়া বড় বড় দফা দেখাইবার স্বরূপ দেশবাসী জ্ঞাত আছেন। কৃষি ঋণ ও বলদ ঋণ প্রদানের যে সংবাদ আমরা পাইতেছি তাহাতে ইহাকে প্রহসন ছাড়া কিছু বলা চলে না।" —দামোদর।

ঠেকে গেছি প্রেমের দায়

"নিলাম ইস্তাহারগুলিকে নাগরিক সাংবাদিকরা সংবাদপত্র বলিয়া গণ্যই করেন না। কেনই বা করিবেন? ইহাদের মধ্যে অনেকেই ঐ নিলাম ইস্তাহার পাইয়া ইংরেজের ফ্যান চাটিয়াছেন, জাতীয়তার বিরোধিতা করিয়াছেন, কংগ্রেসের শত্রুতা করিতে দ্বিধা মাত্র করেন নাই। আজ ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কংগ্রেসের কুকুর হইতে তাহার জনাবের পর্য্যন্ত পা চাটিতেছে। সে যাহা হউক, মফঃস্বলের কতকগুলি শিষ্ট সাংবাদিক একটি সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিতেছেন জানিয়া ঐ প্রস্তাবিত সম্মেলনকে সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছি। কিন্তু রাজ্যপালকে এই সন্দেশ যজ্ঞে আহ্বানের প্রস্তাব করিবার হেতু কি? তিনি কি খ্যাতনামা সংবাদপত্রসেবী, লেখক? সাংবাদিকদের এই মনোবৃত্তিকে দাসমনোভাব বলিতে পারা যায়। শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকের লক্ষণ: রাজ্য ও রাজা ভাঙ্গিতে-গড়িতে, অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি। ষ্টেড সাহেবের লেখায় ইংলণ্ডে "কুমারী বলি" বন্ধ হইয়াছিল, হরিশ মুখার্জ্জীর আন্দোলনে নীলকর অত্যাচার বন্ধ হইয়াছিল। হরিশচন্দ্র যখন "পেট্রিয়টের" সম্পাদকীয় লিখিয়া লাট সাহেবের প্যালেসের সম্মুখ দিয়া যাইতেন, তখন তদানীন্তন বড়লাট তাঁহাকে অনুরোধ করিতেন: আজ আপনার এ লেখা বন্ধ রাখুন, আপনার অভিযোগের প্রতিকার করিব। ব্রহ্মবান্ধব যেদিন 'সন্ধ্যা'য় লেখেন: 'ঠেকে গেছি প্রেমের দায়' সেদিন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা শিহরিয়া উঠিয়াছিল। লালা লাজপত রায়ের নির্ব্বাসনে শ্রীঅরবিন্দ 'বন্দে মাতরমে' যে তিন-চারি ছত্র প্যারা লেখেন তাহাতে বৃটিশ রাষ্ট্রবিদ্‌রা ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সাংবাদিকতা হইতেছে—মহামহিম যুগ সৃষ্টি।" —আর্য্য।

দুর্ভিক্ষ তাড়াও, ওদেরকেও তাড়াও!

"সরকার যদি ঔদাসীন্যের যূপকাষ্ঠে দেশবাসীকে বলিদানের অপচেষ্টায় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের সংগ্রামে জনগণের সাথে হাত না মেলান, তবে নব-জাগ্রত গণদেবতার রুদ্র তাণ্ডবের প্রলয় পদক্ষেপ, এই অক্ষম, ক্লীব, দুর্ভিক্ষস্রষ্টা সরকারকে জন-মানসের অলঙ্ঘনীয় নির্দ্দেশে চলতে বাধ্য করবে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের মুক্তি-সংগ্রামের পথে, আর তা না হোলে শাসনের স্বর্ণ-সিংহাসন থেকে দেশী বিদেশী ধনিক স্বার্থের রক্ষক কংগ্রেসী সরকারকে টেনে নামিয়ে আনবে ইতিহাসের বিচারালয়ে অপরাধীর কাঠগড়ায়; তার যথাযোগ্য শাস্তিবিধানের জন্য। তাই বলি সাবধান! "বিচারপতি তোমার বিচার করবে, যারা আজ জেগেছে সেই জনতা।" সামনে তোমার খোলা দুটো পথ। হয় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য মহকুমা খাদ্য সম্মেলনে প্রস্তাবিত জনগণের নির্দ্দেশিত পথে এগিয়ে চলো! হাতে হাত মেলাও জন-মানুষের সাথে। আর তা না হোলে ইতিহাসের আদালতে গণদেবতার রুদ্ররোষের শাস্তি মাথা পেতে নেবার জন্য প্রস্তুত হও! আরও বলি, সচেতন হও, জনতার সৈনিকেরা ইস্পাত-কঠিন করে তোল তোমাদের শপথ আর ঐক্যের দৃঢ়তার হাতিয়ার। যদি সরকার জনতার নির্দ্দেশ অমান্য করার মরণ-দুঃসাহস দেখায় তবে সংগ্রামের রক্তঝরা পথে আমাদের অর্জ্জন করতে হবে মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ হোতে মুক্তি! তার প্রস্তুতি সুরু হয়ে গেছে মৌড়েশ্বর, হাবিশপুর ও পাথাই ইউনিয়নের জন-জমায়েতের মাঝে। মনে রেখো আমাদের ইস্পাত-কঠিন শপথ—"দুর্ভিক্ষ তাড়াও, ওদেরও তাড়াও।" —বীরভূমের ডাক।

আশারাম ট্রাষ্ট হাসপাতাল

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সস্ত্রীক কলিকাতা আশারাম ট্রাষ্ট পরিচালিত হাসপাতাল পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। (নিম্নের চিত্র দ্রষ্টব্য) এই হাসপাতালটির বৈশিষ্ট্য, ইহা একটি ব্যবসায়ী-পরিবার কর্ত্তৃক বার্ষিক প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। ইহাতে ৭০ জন রোগীর স্থান আছে এবং ইহাতে সর্ব্ববিধ চিকিৎসা হয়। রাজ্যপালের গমন উপলক্ষে ট্রাষ্টীরা তাঁহাকে দুঃস্থদিগকে বিতরণ জন্য ৫ শত কম্বল দিয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কবিগুরুর লিপিরক্ষক
সুধীর কর প্রণীত

ক বি ক থা — মূল্য ৩৸০

কাকা কালেলকর প্রণীত ও
বীরেন গুহ অনুদিত

বাপু দর্শন - মূল্য ২৲

সুপ্রকাশন
৩, সার্কাস রেঞ্জ, কলিকাতা

রাতমোহানা : রাতমোহানা : রাতমোহানা

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

নূতন আঙ্গিকে
নূতন
পরিপ্রেক্ষিতে
নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে
লেখা

★

বিচিত্র স্বাদের উপন্যাস!

রাতমোহানা

পি. কে. বসু য়্যাণ্ড কোং : কলিকাতা—৩১

রাতমোহানা : রাতমোহানা : রাতমোহানা

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনব গ্রন্থ
বিবাহিতের জন্য নিতাই পালের লেখা

প্রিয় ও প্রিয়া ২৷৷০ বিয়ের পর ২৲
প্রিয় যৌবন (এ্যালবামসহ) ২৲
সচিত্র রতিশাস্ত্র ১৷৷০
আসল 'কোকশাস্ত্র' (চিত্রসহ) ২৲

শশী কুটীর
৪৫, (বি) মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

ডাঃ কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্যের

ছন্দে শকুন্তলা	৩৲
স্বামীর ঋণ (২য় সং)	২৲
ভ্রমরী ২৷৷০ কাঁটাফুল	২৲
বন্দীর বান্ধবী	৩৷৷০
দস্যুর পশ্চাতে	১৸০
মিস্ত্রির মেয়ে	২৷৷০

সাহিত্য-কোণ, ৪৪৷সি বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৩

ডাঃ শরৎচন্দ্র বসাক এম. এ., ডি. এল. প্রণীত

ভূপর্য্যটন

অসংখ্য হাফটোন ফটো সহ পৃথিবীর প্রসিদ্ধ স্থান-
সমূহের প্রত্যক্ষ পরিচয় ৪৲

বিশিষ্ট লেখকদের লেখা

আঠারো বসন্ত

পড়বার ও প্রিয়জনকে উপহার দেবার শ্রেষ্ঠ পুস্তক ৩৷৷০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত
হাস্যরসোজ্জ্বল প্রেমোপন্যাস

প্রেমের পথ ঘোরালো

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত শতাধিক কার্টুন সহ ২৷৷০

শ্রীনবেন্দু ঘোষ প্রণীত
যুগান্তকারী উপন্যাস

পৃথিবী সবার ২৷৷০

আমাদের নিকট অন্যান্য যে কোন বইএর জন্য লিখুন

ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স
২৪, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা—২০

নাচ

—শ্রীমতী শীলা চট্টোপাধ্যায় অঙ্কিত

৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

প্রথম খণ্ড]　　[চতুর্থ সংখ্যা

শ্রাবণ

১৩৫৯

৩১শ বর্ষ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর সাক্ষাৎ

যেখানে গুণের বিকাশ, শ্রীরামকৃষ্ণ সেইখানেই আকৃষ্ট। একদিন তিনি মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত অর্থাৎ মাষ্টার মশাইকে বললেন,—"দেখ, বিদ্যাসাগরের কাছে আমায় একদিন নিয়ে যাবে? বিদ্যাসাগরকে দেখতে বড় সাধ হয়েছে।"

প্রায় বাল্যকাল থেকে পরমহংস বিদ্যাসাগরের নাম ও সুখ্যাতি শুনেছেন। বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর, তাঁর গুণের ইয়ত্তা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন,—"যাকে দশে মানে-গণে, তাতে শক্তির অধিক বিকাশ; সেইখানেই ঈশ্বরের অধিক কৃপা, জানবি।"

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাসাগর মশায়ের বিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক। কিছুদিন গত হ'লে একদিন বৈকালে একটি ভাড়া গাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ, ভবনাথ, হাজরা ও মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর থেকে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চললেন। গাড়ী বাদুড়বাগানের কাছে পৌছতেই শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন,—"মা! বিদ্যাসাগরকে দেখতে যাচ্ছি মা, আমার কিন্তু বিদ্যে নেই মা, লেখাপড়া কিছুই জানি না মা!"

এই কথা বলতে বলতে তিনি সমাধিস্থ হ'লেন। এমন সময়ে গাড়ী রাজা রামমোহন রায়ের গৃহের নিকটে পৌছলে মহেন্দ্রনাথ বললেন,—"মশাই, এই রামমোহন রায়ের বাড়ী।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ বিরক্তির সঙ্গে বললেন,—"উঁঃ! এখন ওসব কথা ভাল লাগছে না।"

মহেন্দ্রনাথ দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তখনও সমাধির ঘোরে আছেন। ক্রমে গাড়ী বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে পৌছলে ভবনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের হাত ধ'রে নামালেন। পরমহংসদেবের পরিধানে একটি সরু লাল-পেড়ে ধুতি ও একটি সাদা জামা, কোঁচার খুঁট স্কন্ধে ফেলা। জামার বোতাম খোলা ছিল। বিদ্যাসাগরের গৃহের চতুর্দ্দিকে বাগান। শ্রীরামকৃষ্ণ বাগানের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে বললেন,—"হ্যাঁ গা, এগুলো খোলা রয়েছে, তাতে কিছু দোষ হবে কি?"

মহেন্দ্রনাথ বললেন,—"না মশাই, আপনার ওতে দোষ হবে না।"

প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হয়ে সকলে দ্বিতলে উঠে যে ঘরে বিদ্যাসাগর মশাই উপবিষ্ট ছিলেন সেই ঘরে প্রবেশ করতেই ঈশ্বরচন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে প্রণামপূর্ব্বক বললেন,—"আসতে আজ্ঞা হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ একদৃষ্টে বিদ্যাসাগরের দিকে তাকিয়ে বললেন,—"এত দিন খাল-বিলে ছিলুম, আজ সাগরে এসে মিশলুম।"

বিদ্যাসাগর সহাস্যে বললেন,—"আগে মিষ্টি জলে ছেলেন, এখন নোনা জলে এলেন, তা খানিক নোনা জল নিয়ে যান।"

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন,—"তা কেন গো, অবিদ্যার সাগর নোনা হয়, তুমি যে বিদ্যার সাগর—তোমাতে কেন নোনা জল হবেক্? আমি ক্ষীর-সমুদ্রে এসেছি।"

বিদ্যাসাগর বিনয় সহকারে বললেন,—"আপনি যখন বলছেন, তা হবে।" কথার শেষে তিনি হুঁকা নিয়ে ধূমপান করতে থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সমাধির ঘোরে বললেন,—"তামুক খাব, তামুক খাব।"

বিদ্যাসাগর নিজের হুঁকাটি এগিয়ে ধরতেই শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন,—"না, কারুর হুঁকায় খাইনি ; তুমি কোল্কেটা দেও।"

বিদ্যাসাগর বললেন,—যদি কারুর হুঁকোয় খান না ত কোল্কেটা বা কেন ; আমি নূতন হুঁকো কোল্কে আনিয়ে দিচ্ছি।"

কিয়ৎক্ষণের মধ্যে একজন নূতন হুঁকোয় তামাক এনে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে ধরলেন। কিন্তু তিনি তখন পূরা সমাধিস্থ। কিছুক্ষণ অতীত হ'লে প্রকৃতিস্থ হয়ে হুঁকায় তামাক খেতে খেতে আর খেতে পারলেন না। কণ্ঠ শুষ্ক হয়েছে। বললেন,—"একটু জল খাব।"

মহেন্দ্রনাথকে বিদ্যাসাগর বললেন,—"বর্দ্ধমান থেকে মেঠাই এসেছে, আনাব, ইনি খাবেন কি ?"

মহেন্দ্রনাথ বললেন,—"আজ্ঞে বেশ ত আনান।"

ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর এক দৌহিত্রকে জলযোগের ব্যবস্থা করতে আজ্ঞা করলেন। কিন্তু বালকের ফিরতে বিলম্ব হওয়ায় স্বয়ং অন্তঃপুরে গেলেন এবং একটি রেকাবিতে চারটি মিঠাই এবং এক পাত্র জল এনে মেঝেয় রাখলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গীদের দেখিয়ে বললেন,—"এদের দেও।"

বিদ্যাসাগর বললেন,—"আপনি আগে গ্রহণ করুন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ এক কণা মুখে দিয়ে জলপান করলেন। অতঃপর মিঠাইগুলি সকলকে বিতরিত হ'ল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন,—"দেখ, সকল জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়েছে, বেদ ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরিয়েছে, তন্ত্র শিবের মুখ থেকে বেরিয়েছে, কাজেই এঁটো হয়েছে ; কিন্তু সচ্চিদানন্দকে কেউ মুখ দিয়ে বের কত্তে পারেনি, কাজেই তিনি উচ্ছিষ্ট হননি।"

বিদ্যাসাগর আশ্চর্য্য হয়ে বললেন,—"এ রকম সামান্য কথায় এমন গভীর ভাবের কথা কোথাও শুনিনি ত, অনেক শাস্ত্র পড়লুম কিন্তু এমন ভাবের কথা কৈ পাইনি !" কথা বলতে বলতে তিনি মহেন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন,—"তুমি কি এঁরই কথা বলছিলে ?"

মহেন্দ্রনাথ বললেন,—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

তখন বিদ্যাসাগর মহেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কোথায় জন্ম এবং বর্ত্তমানে কোথায় বসবাস। জেনে বললেন,—"কামারপুকুর যে আমাদের গ্রাম বীরসিংহের মাত্র তিন-চার ক্রোশ তফাতে।"

অতঃপর বিদ্যাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন,—"মশাই, ব্রহ্মের স্বরূপ কি ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ কথার কোন জবাব না দিয়ে গাইতে লাগলেন, "মন কি কর তত্ত্ব তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে—" গানটি শেষ ক'রে পুনরায় গাইলেন,—"কে জানে কালী কেমন ? ষড়দর্শনে না পায় দরশন", ইত্যাদি গানটি। গীত শেষে কিঞ্চিৎ ভাবস্থ হয়ে বললেন, —"তাঁর উদরের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, আর 'তাঁর ষড় দর্শনে না পায় দরশন'—বিশ্বাস করতে হয়। বিশ্বাসের এমনি জোর যে, একজন সমুদ্দুর পার হবে, বিভীষণ তার কাপড়ের খুঁটে একটা জিনিষ বেঁধে দিয়ে বললেন, 'তুমি এটা খুলে দেখ না ; এর জোরে তুমি পার হয়ে যাবে।' সে বেশ খানিকটা এসে একটু আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলে, 'বিভীষণ কি বেঁধে দিলে যে, তার গুণে জলের ওপর দিয়ে এমন হেঁটে চলেছি ? দেখি।' খুলে দেখে, একটি পাতায় কেবল 'রাম' এই কথাটি লেখা !' 'ও মা ! এই জিনিস,' যেমন এই ভাবা অমনি ডুবে যাওয়া !" এই ব'লে শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় গাইলেন, "দুর্গা দুর্গা বলে" ইত্যাদি ! এবং "মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে।"

গান শুনে বিদ্যাসাগরের হৃদয় একেবারে দ্রবীভূত হয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন,—"যিনি ব্রহ্ম, তিনিই ব্রহ্মশক্তি, যিনিই সগুণ তিনিই নির্গুণ, আর তাঁকেই মা কালী বোলে ডাকি। যখন নিষ্ক্রিয় তখন নির্গুণ, আর যখন তাঁর লীলা দেখি, তখন তাঁকে সগুণ ভাবি। পূজা, হোম, যাগ, সবই তাঁর প্রতি ভালবাসা আনবার জন্যে। যখন সেই ভালবাসা আসে, তখন ওসব কর্ম্ম কমে যায়। যতক্ষণ না বাতাস বয় ততক্ষণ পাখা নাড়তে হয়, আর হাওয়া এলে কে পাখার বাতাস খায় ? গেরস্থের বৌ অন্তঃসত্বা হ'লে গিন্নি তার কাজ ক্রমে কমিয়ে কমিয়ে দেয়। তার পর ছেলে হ'লে শাশুড়ী তাকে আর কোন কাজই করতে দেয় না ! তখন সে সেই ছেলেটিকে নিয়েই নাড়াচাড়া করে। তুমি যে সব কাজ করছো, সব সংকর্ম্ম, নিষ্কাম কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি হয়, জগতের কল্যাণ তিনি ছাড়া মানুষ করতে পারে না, এইটি জেনে কামনা ত্যাগ করে সংকর্ম্ম করলে তাঁর কৃপালাভ হয়।"

বিদ্যাসাগর—"কি চমৎকার কথা !"

রামকৃষ্ণ—"ওদেশে (কামারপুকুরের নিকট) ব্যাঙ্গাই নামে এক জমিদারের একজন লোক ছেল। জমিদারের মন-জোগান তার কাজ। একদিন আমড়ার অম্বল চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না হয়েছে। জমিদার আমড়ার অম্বল খেতে খেতে বললে আমড়ার অম্বল কেমন হে ? লোকটি বললে, মশাই তা আর কি বলব, মশাই, অতি পরিপাটি, আমড়ার অম্বলের মত কি আর অম্বল হয় ? আমড়া, জান ত, শাঁসের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, খালি আঁটি আর চামড়া, খাবার খেলে হয়—অম্বলশূল !"—দেখ আপনি ত সব জান, কত শাস্ত্র পড়েছ ; এ সব যা বললুম সব বাহুল্য। তবে এক কথা, রত্নের ভাণ্ডারে কত রত্ন আছে তা তার খবর নেই।"

বিদ্যাসাগর—"আপনি যা বলেন !"

রামকৃষ্ণ—"হ্যাঁ গো, বড় মানুষেরা সব চাকরদের নাম জানে না, মনে রাখতে পারে না, বাড়ির মধ্যে কোথায় কোন্ জিনিষটা আছে তাও জানে না। আপুনি একবার রাসমণির বাগান দেখতে যাবে, খুব চমৎকার জায়গা।"

বিদ্যাসাগর—"আজ্ঞে হ্যাঁ, যাব বই কি ; আপনি এলেন আর আমি যাব না, অবিশ্যি যাব।"

রামকৃষ্ণ—"আপুনি যেতে পারবেক্ নি।"

বিদ্যাসাগর—"সে কি মশাই, কেন যেতে পারব না, আমায় বুঝিয়ে দিন ?"

রামকৃষ্ণ—"আমরা জেলে ডিঙ্গি, খালবিলে যাই, আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। আপুনি জাহাজ, কেমন করে ছোট নদীতে যাবে, যদি চড়ায় আটকে যাও ?"

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ঊনাশি

বেড়াতে গিয়ে রাখাল একটি পয়সা কুড়িয়ে পেয়েছে। ভাবলে বাজে লোক যদি পায় নির্ঘাৎ মেরে দেবে। তার চেয়ে কাণা-খোঁড়া ভিক্ষুককে দিয়ে দিলে সদ্ব্যয় হবে পয়সাটার।

ঠাকুরের কাছে কথাটা গোপন করলে না। শিশু যেমন তার মাকে সব কথা খুলে বলে রামকৃষ্ণের কাছে রাখালের সেই রকম অনাবৃতি।

'একটা পয়সা কুড়িয়ে পেয়েছি। পথের ভিক্ষুক কাউকে দিয়ে দেব।'

ভেবেছিল ঠাকুর বোধ হয় খুশি হবেন, কিন্তু তিনি জ্বলে উঠলেন। তোর দানের জন্যে বিশ্ব-ভুবন বসে আছে। পয়সা তো আপনা থেকে তোর মুঠোর মধ্যে চলে আসেনি। তুই কুড়োতে গেলি কেন?

'বা, আমি যে যাচ্ছিলুম ও-পথে। পথের মধ্যে পড়ে রয়েছে।'

'যে মাছ খায় না সে মাছের বাজারেই বা যাবে কেন? তোর যখন নিজের দরকার নেই, তখন কেন তুই ও-পয়সা ছুঁতে গেলি?'

দে ফেলে দে পয়সা।

সেদিন স্নানের আগে ঠাকুরকে তেল মাখাচ্ছে রাখাল। কি খেয়াল হল রাখাল একটা প্রার্থনা করে বসল। প্রার্থনা আর কিছুই নয়, ভাবসমাধি চাই। রাখাল যত চায় রামকৃষ্ণ তত কঠিন হয়।

রাখালও নাছোড়বান্দা। দিতেই হবে আমাকে সেই ঈশ্বরিক অনুভূতির উচ্চতর অবস্থা।

রামকৃষ্ণ তখন কি করে, একটা নিদারুণ কথা বলে রাখালকে আঘাত করে বসল। সেই মর্মান্তিক আঘাতের যন্ত্রণা সইতে পারল না রাখাল। তেলের বাটি হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হন হন করে ছুটে চলল। থাকবে না আর সে দক্ষিণেশ্বরে। ফিরে যাবে কলকাতা।

কত দূর আর যাবে! ফটক পার হতে না হতেই পা ছুটো তার অবশ হয়ে পড়ল। সাধ্য নেই দাঁড়িয়ে থাকে। বসে পড়ল সেইখানে।

একেবারে নিরুপায়! এখন কি করি কোথায় যাই, যেন জলে পড়ল রাখাল।

নিরুপায়েরই উপায় আছে। জলেরই আছে আবার তীরাশ্রয়। ফটকের কাছে রামলাল।

'ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন নিয়ে যেতে।'

ক্ষমায় একেবারে মাতা বসুন্ধরার মত। দীন-পাবনী করুণার মুক্তধারা।

রামলালের পিছু-পিছু রাখাল চলে এল গুটি-সুটি। অধোবদন হয়ে দাঁড়াল ঠাকুরের সামনে।

'কি রে, পারলি? পারলি গণ্ডি ছাড়িয়ে যেতে?'

সন্ধ্যে বেলায় সেই রাখাল আবার বসেছে ঠাকুরের সামনে।

'রাখাল-নরেনও আছে, আবার আছে হাজরা। হাজরা হচ্ছে শুকনো কাঠ। জপ করে, আবার ওরই ভেতর দালালির চেষ্টা করে। সবাই বলে, ও এখানে থাকে কেন? তার মানে আছে। জটিলে-কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না।'

তার পর হঠাৎ রাখালের দিকে চোখ ফেরাল রামকৃষ্ণ। বললে, 'সকালে তখন তুই রাগ করেছিলি? তাই না? তোকে রাগালুম কেন? তার [illegible] আছে। ওষুধ ঠিক পড়বে বলে। পি[illegible] [illegible]পরই মনসার পাতা-টাতা দিতে হয়[illegible]

[illegible]পঙ্গীতে

তার পর আবার ঈশ্বরীয় [illegible]

[illegible]ন্ন করছে বিজয়,

মাষ্টারের দিকে চেয়ে। বল[illegible]

[illegible]দলে, পাহাড়ের উপরে

হয়। জগদ্ধাত্রী রূপের [illegible]

এসেছেন। স্বপ্নে মহাবীর

ধারণ করে আছেন। [illegible]

দিকেই ইসারা করেছিল।

যায়, নষ্ট হয়ে যায়। [illegible]

হজনে। দেখল এক অপূর্ব-

পারে তারই হৃদয়ে [illegible]

মহাপুরুষ। মাথা ঘিরে

রাখাল বললে, [illegible]

[illegible]ন্তু তাদের তিনি কাছে ঘেঁসতে

[illegible]ায় বললেন চলে যেতে।

'তার অসুখ হলেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। রাত্রি শেষ প্রহরে উঠে আমি কাঁদি। বলি, মা, কেশবের যদি কিছু হয়, তবে কার সঙ্গে কথা কবো।'

মাষ্টারের বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। বললে, 'এখন বোধ হয় ভালো আছেন।'

'কেশবের জন্যে মার কাছে ডাব চিনি মেনেছি। কলকাতায় গেলে দিয়ে আসব সিদ্ধেশ্বরীকে।' বলে তাকালেন মাষ্টারের দিকে। শুধোলেন, 'তোমার কি বিয়ে হয়েছে?'

'আজ্ঞে হাঁ, হয়েছে।'

যন্ত্রণায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ঠাকুর। 'ওরে রামলাল! যাঃ, বিয়ে করে ফেলেছে।'

মাথা হেঁট করে বসে রইল মাষ্টার। বিয়ে করা কি এতই দোষ?

আবার জিগগেস করলেন ঠাকুর 'ছেলে হয়েছে?'

বুকের মধ্যেটা ঢিপ-ঢিপ করছে মাষ্টারের। ভয়ে-ভয়ে বললে, 'আজ্ঞে, হয়েছে একটি।'

'যাঃ, ছেলেও হয়ে গেছে।' আবার কাতরোক্তি করে উঠলেন। পরে বললেন স্নেহস্বরে, 'তোমার মধ্যে যে ভালো লক্ষণ ছিল। আমি কপাল চোখ এ সব দেখে বুঝতে পারি—'

জানো, মানুষের মন হচ্ছে সরষের পুঁটলি। সরষের পুঁটলি ছড়িয়ে পড়লে কুড়ানো ভার হয়ে ওঠে। তেমনি কামিনী-কাঞ্চনে মন ছড়িয়ে পড়লে ছড়ানো মন কুড়ানো দায়।

অনেকের কাছে স্ত্রী একেবারে শিরোমণি। বলে, আমাকে কত ভালোবাসে, কত সেবা-যত্ন করে, তাকে ছেড়ে যাই কেমন করে? শিষ্যকে গুরু তাই এক ফন্দি শিখিয়ে দিল। একটা ওষুধের বড়ি দিয়ে বললে, এইটে খেলেই মড়ার মত হয়ে যাবি, তোর জ্ঞান থাকবে না। কিন্তু সব বেশ পাবি দেখতে-শুনতে। তার পর আমি এলে তোর চৈতন্য হবে। যেমন কথা তেমন কাজ। শিষ্যের বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। ওগো দিদি গো আমার কি হল গো, তুমি আমাদের কী করে গেলে গো— বলে আছড়ে-আছড়ে কাঁদতে লাগল স্ত্রী। লোক-জন সব জড়ো হল। খাট এনে তাকে ঘর থেকে বার করবার জোগাড় করলে। কিন্তু বড়ির গুণে লাশ এঁকে-বেঁকে আড়ষ্ট হয়ে যাওয়াতে দরজা দিয়ে তা বেরুচ্ছে না সিধেসিধি। তখন একজন একখানা কাটারি নিয়ে এল। দরজার চৌকাঠ কাটতে আরম্ভ করলে। দুম দুম শব্দ শুনে স্ত্রী ছুটে এল অস্থির হয়ে। ওগো, কী হয়েছে গো! কী করছ গো! ইনি বেরুচ্ছেন না তাই দরজা কাটছি। অমন কম্ম করো না গো! স্ত্রী চেঁচাতে লাগল। আমি এখন রাঁড়-বেওয়া হলুম, আমার আর দেখবার-শোনবার কেউ নেই। কটি নাবালক ছেলেকে মানুষ করতে হবে। এ দুয়ার গেলে তো আর হবে না। ওগো, ওঁর যা হবার তা তো হয়ে গেছে, ওঁর হাত-পা কেটে বার করো। ততক্ষণে গুরু এসে গিয়েছে। লাফিয়ে উঠল শিষ্য। হাঁক পাড়লে, তবে রে শালী, আমার হাত-পা কাটবে? এই বলে গুরুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল বাড়ি ছেড়ে।

জানো না বুঝি, অনেক স্ত্রী আবার ঢঙ করে শোক করে। কাঁদতে হবে বলে গয়না নৎ খুলে বাক্সের ভেতর রেখে আসে। তার পর আছড়ে পড়ে কাঁদে —ওগো দিদি গো, আমার কী হলো গো—'

এই স্ত্রী! এই সংসার!

'আচ্ছা তোমার পরিবার কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি?'

মাষ্টার ভরসা পেয়ে বললে, 'আজ্ঞে ভালো, কিন্তু অজ্ঞান।'

যেন লেখাপড়া শিখলেই জ্ঞান!

ঠাকুর একটু বিরক্ত হলেন। বললেন, আর তুমি এক মস্ত জ্ঞানী!

অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল মাষ্টারের।

শোনো, বারে বারে শোনো, এক জানার নাম জ্ঞান, অনেক জানার নাম অজ্ঞান।

চৈতন্যদেব দক্ষিণ দেশে ভ্রমণের সময় দেখলেন একজন গীতা পাঠ করছে, আর একজন একটু দূরে বসে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। চৈতন্যদেব তাকে জিগগেস করলেন, তুমি এ সব কিছু বুঝতে পারছ? সে বললে, ঠাকুর, আমি শ্লোক কিছুই বুঝতে পারছি না, আমি অর্জুনের রথ দেখতে পাচ্ছি আর তার সামনে ঠাকুর আর অর্জুন কথা কইছেন।

জানতেও বই লাগে না, চিনতেও বই লাগে না। অক্ষরজ্ঞান ছাড়াও সম্ভব সে অক্ষর-জ্ঞান।

কলকাতা যাবার পথে বিষ্ণুপুর ইষ্টিশানে গাড়ির অপেক্ষা করছেন শ্রীমা। হঠাৎ এক হিন্দুস্থানী কুলি তাঁকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল। কাঁদতে-কাঁদতে লুটিয়ে পড়ল পায়ের কাছে। বললে, 'তু মেরী জানকী, তুঝে ম্যায় নে কিতনে দিনোঁসে খোঁজা থা। ইতনে রোজ তু কাঁহা থী?'

তুই আমার মা জানকী। তোকে কত দিন ধরে খুঁজছি। তুই এত দিন কোথায় ছিলি?

মা তাকে শান্ত করলেন। বললেন, একটি ফুল নিয়ে আয়। ফুল নিয়ে কি করতে হবে বলে দিতে হল না কুলিকে। মার পাদপদ্মে নিবেদন করলে। মা তাকে দিয়ে দিলেন ইষ্টমন্ত্র।

কেশবেরও বড় সাধ রামকৃষ্ণের পা দুখানি ফুল দিয়ে পূজো করে। কিন্তু পাড়ার লোক, দলের লোক কি ভাববে এই ভেবে সাহস পায় না।

সেদিন রামকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হচ্ছিল কেশবের।

কেশব বললে, আরো বলুন।

রামকৃষ্ণ হেসে বললেন, 'আর বললে দলটল থাকবে না।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল কেশব। বললে, 'তবে আর থাক মশাই।'

এই দল-দল করতেই দলা পাকিয়ে গেল। তুমি দল-দল করছ আর এদিকে তোমার দল থেকে লোক ভেঙে-ভেঙে যাচ্ছে।

'আর বলেন কেন মশাই। তিন বচ্ছর এ দলে থেকে আবার ও দলে চলে গেল। যাবার সময় আবার গালাগাল দিয়ে গেল—'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি লক্ষণ দেখ না কেন? যাকে তাকে চেলা করলে কি হয়?'

যতক্ষণ মোড়লি করছ ততক্ষণ মা আসে না। মা ভাবে ছেলে আমার মোড়ল হয়ে বেশ আছে। আছে তো থাক।

যে ভাবছে, আমি দলপতি, দল করেছি, লোক-শিক্ষা দিচ্ছি, সে কাঁচা আমি। ঘি কাঁচা থাকলেই কলকলানি করে। মধু যতক্ষণ না পায় ততক্ষণই ভনভনানি করে মাছি। তুমি এখন ও সব ছাড়ো। পাকা ঘি, পাকা আমি হও। সালিশি-মোড়লি তো অনেক করলে, এখন তাঁর পাদপদ্মে বেশি করে মন দাও। বলে, কার দল কে করে। দল ভাঙে তো তোমার কি। বলে, লঙ্কায় রাবণ মলো, বেহুলা কেঁদে আকুল হলো।

তুমি দলে নও, তুমি শত দলে।

কিন্তু কিছুতেই পুরোপুরি হয় না কেশবের। সিদ্ধি মুখে নিয়ে শুধু কুলকুচোই করলে, পেটে ঢোকালে না। পেটে না ঢোকালে কি নেশা হবে?

অহেতুকী ভক্তি না হলে কি মিলবে ভগবানকে?

কেশব উপাসনা করছে। বলছে, হে ঈশ্বর, তোমার ভক্তিনদীতে যেন ডুবে যাই।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'ওগো, তুমি ভক্তিতে ডুবে যাবে কি করে? ডুবে গেলে চিকের ভেতর যারা আছে তাদের হবে কি! বেশি দূর এগোতে চেয়ো না – বেশি এগোতে গেলে সংসার-টংসার ফক্কা হয়ে যাবে। তবে এক কর্ম কোরো। মাঝে-মাঝে ডুব দিয়ো, আর এক-একবার আড়ায় উঠো।'

রামকৃষ্ণকে বাড়িতে নিয়ে এসেছে কেশব। অনেক ফুল নিয়ে এসেছে। অনেক ফুল দিয়ে পূজা করবে রামকৃষ্ণকে। প্রাণ ঢেলে পূজা করবে।

তাই করলে কেশব। কিন্তু—

কিন্তু পূজা করবার আগে ঘরের দরজা বন্ধ করলে। বন্ধ করলে, পাছে তার পাড়ার লোক, তার দলের লোক টের পায়।

মনে-মনে হাসলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'ও যেমন দরজা বন্ধ করে পূজা করলে, তেমনি ওর দরজাও বন্ধ থাকবে।'

কিন্তু বিজয়? মুক্ত অঙ্গনে সকলের চোখের সামনে ঠাকুরের পাদমূলে লুটিয়ে পড়ল। ঠাকুরের পা দুখানি ধরলে নিজের বুকের মধ্যে। রক্তমাখা প্রাণপুষ্প অর্ঘ্য দিলে ঠাকুরকে।

মহিমা চক্রবর্তী জিগগেস করলে, 'বহু তীর্থ করে এলেন, দেখে এলেন অনেক দেশ, এখন এখানে কী দেখলেন বলুন।'

'কি বলবো।' অশ্রুভরভর বিজয়ের কণ্ঠস্বর: 'দেখছি, যেখানে এখন বসে আছি, এখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা। কোনো-কোনো জায়গায় এরই এক আনা, দু আনা, বড় জোর চার আনা—এই পর্যন্ত। এখানেই পূর্ণ ষোল আনা দেখছি।'

'দেখ বিজয়ের কি অবস্থা হয়েছে। লক্ষণ সব বদলে গেছে। যেন সব আউটে গেছে। আমি পরমহংসের ঘাড় ও কপাল দেখে চিনতে পারি। বলতে পারি পরমহংস কিনা।'

নিজের কথা শুনবে না বিজয়। পরের কথা, একের কথা, প্রত্যক্ষের কথা শুনবে। বললে, 'এখানেই ষোল আনা।'

'কেদার বললে, অন্য জায়গায় খেতে পাই না—এখানে এসে পেটভরা পেলুম।'

মহিমা বললে, 'পেটভরা কি! উপছে পড়ছে।'

হাত জোড় করল বিজয়। বললে, বুঝেছি আপনি কে। আর বলতে হবে না।

ভাবারূঢ় অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'যদি তা হয়ে থাকে তো তাই।'

[ক্রমশঃ।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

অষ্টম তরঙ্গ

কলিকাতা

পরীক্ষা দেওয়া এবং পাসের খবর পাইয়া কলিকাতার স্কটিশ চার্চেস কলেজে ভর্তি হওয়ার মধ্যে পিতার কর্মস্থল দিনাজপুরে দীর্ঘ চারি মাসের নিশ্চিন্ত অবকাশ মিলিল। পণ্ডিত মহাশয়ের সেবা এবং রতনের সাহচর্য এই কালকে ভরিয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং সরস্বতীর শরণাপন্ন হইতে হইল। নকলে এবং ছাপায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য-উপন্যাস অনেকগুলি অধিকারে আসিয়াছিল। দিনাজপুরের বন্ধু অবনীকান্ত বসুর (অধুনা মৃত) কৃপায় এইবারে 'জীবন-স্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্র' প্রথম সংস্করণ (প্রকাশকাল যথাক্রমে ২৫ ও ২৮ জুলাই ১৯১২) আয়ত্তে আসিল। আয়ত্ত সকল অর্থে। অপূর্ব বিস্ময়-পুলকে চিত্ত ভরিয়া গেল। এতাবৎ-কাল মাতৃভাষায় বহু সদসৎ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু একজন লেখকের জীবন ও অলস চিন্তাধারা এমন সাহিত্যের সামগ্রী হইতে পারে তাহার আভাস-মাত্রও তৎপূর্বে পাই নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত' মনে সাহিত্য-অতিরিক্ত অন্য ভাবের সঞ্চার করিত, চার্লস ল্যাম্বের আত্মগত কথার মর্মগ্রহণ তখনও পুরাপুরি করিতে পারিতাম না। 'জীবন-স্মৃতি'তেই সর্বপ্রথম দেখিতে পাইলাম, একজন সাহিত্যিকের জীবন কোরক-অবস্থা হইতে কি ভাবে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, তাঁহার ছন্দসুরময় বাণী উন্মেষ লাভ করিয়া কেমন করিয়া লহরে লহরে সঙ্গীততরঙ্গে বিশ্বভুবন ছাইয়া ফেলিতেছে ; কি তাহার আয়োজন, কত দিক হইতে কত ভাবে তাহার ক্রমপরিপুষ্টি ! যে অগ্নি একদা প্রদীপ্ত তেজে প্রজ্বলিত হইবে তাহার সমিধ্-সংগ্রহেরই বা কি বিচিত্র সাধনা। কবির অস্ফুট কলগুঞ্জনই 'কড়ি ও কোমলে' শেষ পর্যন্ত বাঁধা পড়িয়া কি ভাবে অর্থময় হইয়া উঠিয়াছে—'জীবন-স্মৃতি' তাহারই অপরূপ কাহিনী ; 'ছিন্নপত্র' টুকরা টুকরা কথায় কবির অন্তর্গূঢ় জীবনের সরস ইঙ্গিত। নবরহস্যলোকের দ্বার এই দুইখানি গ্রন্থ এই সাহিত্যপথযাত্রীর মনের সম্মুখে খুলিয়া দিল। শুধু বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া নয়, কাগজ-ছাপাই-বাঁধাই-ছবিও অভিনবত্বের পরিচয় বহন করিয়া আনিল ; বই দুইখানি আমার মন ও গ্রন্থভাণ্ডারের মণিকোঠায় চিরস্থায়ী আসন লাভ করিল।

কিন্তু ইহারাও আমার দীর্ঘ অবকাশ-রঞ্জনের পক্ষে যথেষ্ট হইল না। যৌবনের উদ্‌গ্র কামনাতুর মন তখন অন্য খাদ্যের জন্য লালায়িত। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র তারকনাথ শিবনাথ রবীন্দ্রনাথ নয়, কাব্যে মধুসূদন রঙ্গলাল বিহারিলাল হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথও নয়, মহাজনপদাবলী মঙ্গলকাব্য ভারতচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তও নয়,—আরও কিছু, অন্য কিছু। হুতোমের 'নক্শা' পড়া হইয়া গিয়াছে, দীনবন্ধুও পড়িয়াছি, 'কামিনীকুমার' 'চন্দ্রনাথ'ও পড়া ; 'শ্রী শ্রীরাজলক্ষ্মী' 'মডেল-ভগিনী' 'এই এক নূতন' এবং 'হরিদাসের গুপ্তকথা'র মধ্যেও আর রস পাই না, বটতলার 'চুম্বনে খুন', 'বেশ্যার ছেলের অন্নপ্রাশন'ও নীরস মনে হয়—এই অবস্থায় বিলাতী বটতলার দিকে স্বতঃই লোলুপ দৃষ্টি প্রসারিত করিলাম। সন্ধানী উপদেষ্টারও অভাব হইল না। রেনল্ডস্-এর 'মিষ্ট্রিজ' হইতে আরম্ভ করিয়া কত যে খুদে-খুদে কদর্য কাগজে ও হরফে প্যারিস-মান্দ্রাজ-লাহোর-চন্দননগর হইতে ছাপা বই পড়িলাম, তাহার তালিকা প্রকাশ করিয়া এ যুগের মার্ক্স-মুগ্ধ তরুণদের মাথা খাইব না। মোটের উপর, দুষ্টা সরস্বতীর কৃপায় ছাপার অক্ষরের পথে 'অনঙ্গ-রঙ্গে' পারঙ্গম হইয়া উঠিলাম। আমার বাণী-সাধনার তিন নম্বর খাতা আগাগোড়া আষ্টেপৃষ্ঠে নানা ইঙ্গিতপূর্ণ কবিতায় এই কালের আদর্শ বিপর্যয়ের অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করিতেছে। নমুনাস্বরূপ একটি বড় কবিতার অংশ-বিশেষ এখানে উদ্‌ধৃত করিয়া আমার মনের সেই সময়কার অবস্থাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। এই কথা যদি আজ বলি, সেই সময় আমার সহচারী এবং পরে কলিকাতায় আমার সহাধ্যায়ী ও সহবাসী হষ্টেলবন্ধুরা এবং আরও পরবর্তী কালে মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ খ্যাতনামা সাহিত্যিকেরা এই আদিরসাত্মক কবিতাটিকে সবিশেষ তারিফ

করিয়াছিলেন, আশা করি, আমার অহমিকাকে সহৃদয় পাঠকেরা ক্ষমা করিবেন। কবিতাটি অতিশয় দীর্ঘ, আমার হাতের লেখায় নয় পাতা, সমগ্রটি আইনের চোখে নিরাপদও নহে। কয়েক পংক্তি তুলিয়া দিলেই ভাষা ও ছন্দে আমার ক্রমোন্নতির কথঞ্চিৎ পরিচয় সম্ভবত মিলিবে:

কলস কাঁখে বকুলবীথির পথে
বধূ যেথায় আনতে চলে জল,
সাঁঝের কোলে রয় না কেহ সেথা
আঁধার বিজন বকুলগাছের তল।
আমি রহি সেই আঁধারের মাঝে
দেখি বধূ আপন মনে চলে
ঘোমটা মুখে দেয় না সে তো লাজে
কলসখানি ভাসায় দীঘির জলে।
বসে গিয়ে বাঁধাঘাটের 'পরে
আঁচল পড়ে জলের তলে লুটি
বুকের পিঠের কাপড় পড়ে খ'সে
যত্নে মাজে ছোট্ট চরণ দুটি।
আঁধার হতে বাহির হয়ে এসে
আমি ধীরে দাঁড়াই ঘাটের পাশে;
বধূ করে আপন মনে গান
কলসিটি তার দীঘির জলে ভাসে।
একটি চরণ স্বচ্ছ জলতলে
জানুর 'পরে আরেকটি পা তুলে
গামছা ল'য়ে ঘষে আপন মনে,
বিশ্বজগৎ সব গেছে সে ভুলে।
কেশের রাশি বাঁধা মাথার 'পর,
স্রস্ত হয়ে বুকের আবরণ
কটিতটে লুটিয়ে এসে পড়ে,
নিরাবরণ দুইটি শ্রীচরণ।
সাঁঝের বাতাস বইতেছিল ধীরে
কলসিটি তাই ঢেউয়ের তালে নাচে
বকুল-ডালে একটি কোকিল শুধু
ডেকে কেবল প্রিয়ার দেখা যাচে।
আমি হঠাৎ শুধাই, "ওগো বধূ,
খুলে ফেল তোমার কেশপাশ
দেহের বসন যাক্ না গেছে স'রে
চুল এলিয়ে কর গায়ের বাস।"
চমকে উঠে লজ্জা পেয়ে বধূ
জলের মাঝে চকিতে দেয় ঝাঁপ,
পাষাণঘাটে বসন মরে কেঁদে
কাটল বুঝি জলের মনস্তাপ!
আবার বলি, "লজ্জা তোমার কেন,
আঁধার দেখ এল নিবিড় হয়ে,
হেরি শুধু চোখের আলো তব—
তাতে তোমার কিই বা গেল ব'য়ে।"
বধূ তখন ক্ষণিক হেসে কয়,
পূবগগনে মৃণাল বাহু তুলে,
"জ্যোৎস্না উঠে আঁধার হবে ক্ষয়
এ কথা কি গেছই তুমি ভুলে?
থেকো না আর ঘাটের পথ জুড়ে,
পথিক, তুমি যাও না আপন কাজে—
রাত্রি ক্রমে ঘনিয়ে আসে ওই,
যেতে হবে বকুলবনের মাঝে।"

ইহার পর আরও অনেক আছে, কিন্তু আর নয়; ছন্দ আর কাব্যকৌশল অনুমান করিতে না পারিলেও রসিকজন এই "বকুলবন" কবিতার বিষয়-বস্তু সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন এবং তাহা হইতে আমার তৎকালীন অজ্ঞাতকান্তাবিরহী মনের সকরুণ গুরু-বেদনা অনুভব করিবেন।

এই অস্পষ্ট অথচ তীক্ষ্ণ বেদনা লইয়া পাঠ্য-জীবনের শেষকালটুকু যাপন করিবার জন্য ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কলিকাতায় পদার্পণ করিলাম। ডাকযোগে স্কটিশ চার্চেস্ কলেজে তৎপূর্বেই ভর্তি হইয়াছিলাম। আসিয়া পৌঁছিতে একটু বিলম্ব হইল, সুতরাং টমরি-অগিলভি-ওয়ান-ডানডাস প্রভৃতি সাধারণ হস্টেলগুলিতে স্থান হইল না; খ্রীষ্টীয়ান-ছাত্র-অধ্যুষিত অগতির গতি ডাফ হস্টেলই আমাকে আশ্রয় দিল। সেকালের ডাফ হস্টেল একটা বিরাট দৈত্যের মত বিডন স্ট্রীটের উপর দাঁড়াইয়া থাকিত। প্রাসাদোপম অট্টালিকা তেমনই আছে, কিন্তু সামনে-পিছনে নূতন সংযোজনের ফলে ইহার ভয়াবহতা অনেকখানি দূর হইয়াছে। আমি দিনাজপুর হইতে মনসিজ-লাঞ্ছিত সরস সাহিত্যে পঙ্ক-স্নান করিয়া শুষ্ক ও তৃষিত ক্ষুধিত পাষাণের মত পাষাণনগরীর বেগম-বাদশাজাদীদের চটুলচপল হাসি নয়—ভূতের অট্টহাস্য-মুখর সেই বিপুলায়তন হর্ম্যের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইলাম। যে ঘরে আমাকে থাকিতে দেওয়া হইল, দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় তাহাকে বিরাট বলা চলে, পাশাপাশি পাতা চৌকিতে আমরা কয়েকজন শয়ন করিতাম। আমাদের একজন একদিন নিশীথ রাত্রে ভূত দেখিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল—মেয়ে-ভূত। কড়িকাঠে গলায় দড়িবাঁধা অবস্থায় সে নাকি ঝুলিতেছিল! আমরা ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট স্ক্রীমজার সাহেব সংবাদ পাইলেন, আমাদের

নিত্যখাদ্যভাগাপহারক তাঁহার সহকারী হেলিতে-দুলিতে অবিলম্বে দর্শন দিলেন। পুরাতন ইতিহাস শুনিতে শুনিতে আমরা শিহরিয়া উঠিলাম। বহুদিন পূর্বে উহা মেয়েদের বোর্ডিং ছিল। এক হতভাগিনী প্রেমে ব্যর্থ হইয়া ওই ভাবে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করে। সে-ই মাঝে মাঝে দর্শন দিয়া থাকে। ভয় পাইবার কিছু নাই। নানা অজুহাত দেখাইয়া এক এক করিয়া আমার নির্ভীক কক্ষসঙ্গীরা কক্ষান্তরে যাইতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত আমি একা সেই পেল্লায় ঘরে রহিয়া গেলাম। মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া বহুদিন অন্ধকারে দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া ভূত দেখিবার প্রবল চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু একদিন একটি কালো বেরাল ছাড়া ভয় পাইবার মত আর কিছু প্রত্যক্ষ করি নাই। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জোরেই পরবর্তী কালে ভূতবিশ্বাসী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ভূতের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিয়া প্রবল তর্ক করিয়াছি; বলিয়াছি, তেমন সুবর্ণ-সুযোগে যে-প্রেমাতুরা আমাকে একা পাইয়াও দেখা দেয় নাই তাহার জন্ম অলস এবং ভীত মানুষের কল্পনা হইতে। বিভূতিভূষণ ঘোরতর আপত্তি করিতেন, আমাদের আসর জমিয়া উঠিত। কিন্তু সে পরের কথা পরে বলিব।

সেই প্রাচীন ইষ্টকপ্রাসাদ যে এই ক্ষুধিত-পাষাণবৎ তরুণটিকে এমনিই নিষ্কৃতি দিল তাহা নয়। ডাফ হষ্টেলের পূর্বার্ধে আমরা থাকিতাম। পশ্চিমার্ধের দ্বিতল দীর্ঘকাল হইতেই তালাবদ্ধ ছিল। কলেজেরই একজন সাহেব অধ্যাপক প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে যোগ দিতে গিয়াছিলেন, আর ফেরেন নাই। তাঁহার যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি সেই দ্বিতলে রক্ষিত ছিল। একেলা দক্ষিণের বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে পার্টিশানের পরপারে দ্বিতলের ঘরগুলি সম্বন্ধে মনে উগ্র কৌতূহল জাগিত। কি আছে সেখানে, কি যে রহস্য সেই পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে জানিতে হইবে। রহস্যভেদ করিব। একদিন নির্জনতার সুযোগ লইয়া রেলিং টপকাইয়া রহস্য-লোকের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। খড়খড়ির ফাঁক দিয়া হাত গলাইয়া ছিট্‌কিনি খুলিতেও বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। হঠাৎ যে ধূলিজঞ্জালের মধ্যে গিয়া পড়িলাম তাহার ধাক্কা সামলাইতেই কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। শুনিয়াছিলাম, অধ্যাপকটি অবিবাহিত ছিলেন। তাহার প্রমাণ মিলিল আসবাবের অপ্রতুলতা দেখিয়া। ধূলিমলিন খানকয়েক বই, একটি বেতের বাক্সে কিছু কাগজপত্র, ফুটবল খেলার বুট, একান্ত পুরুষের ব্যবহার্য টুকিটাকি আরও কয়েকটা জিনিস। রহস্যের কণামাত্র বাহিরের কোথাও নাই—বহুদিনের পুরাতন অসংস্কৃত ধূলি-জঞ্জাল ছাড়া। ধূলির আবরণ সরাইয়া বইগুলি দেখিতে দেখিতে চারি খণ্ডে সমাপ্ত রলাঁ্যার 'জন ক্রিষ্টোফার' আবিষ্কৃত হইল। সেগুলি সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিব, অলস কৌতূহলবশে বেতের বাক্সটি একবার খুলিয়া দেখিলাম। প্রথমেই অতি চমৎকার সিল্কের ফিতায় বাঁধা একতাড়া চিঠি নজরে পড়িল, সেগুলি তুলিয়া লইতেই কয়েকটি ফোটোগ্রাফ ও এক্মাস গ্রীটিংস কার্ড, প্রত্যেকটিতে পরিষ্কার নারী-হস্তাক্ষরে একটি ইউরোপীয় রমণীর সুমধুর সংক্ষিপ্ত নাম। দেয়ালের অপর পার হইতে এতকাল যে রহস্যের আভাস পাইতেছিলাম, সহসা তাহার সহিত মুখামুখি হইয়া গেল। স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া চিঠিগুলি পড়িতে বসিলাম।

আমার সদ্য-অধীত 'মিষ্ট্রিজ অব দি কোর্ট অব লণ্ডনে'র লেখক রেনল্ডস ইংলণ্ডের কোনও শহরের পোষ্টমাষ্টার ছিলেন এইরূপ শুনিয়াছিলাম; সন্দেহ-জনক যাবতীয় চিঠিপত্রের রহস্য বেআইনী ভাবে ভেদ করিয়া তিনি তাঁহার গল্প-উপন্যাসের রসদ সংগ্রহ করিতেন; কি জাতীয় চিঠিপত্র সচরাচর তাঁহার ভাগ্যে জুটিত তাহার মোটামুটি আভাস তাঁহার রহস্য-গ্রন্থগুলিতেই পাওয়া যায়। তাঁহার পোষ্টাফিসকে মধ্যস্থ রাখিয়া যাঁহারা হৃদয়ের কারবার চালাইতেন তাঁহারা নূতন মহাদেশের নূতন মানুষ, আপাতত সভ্য হইলেও রক্তে মাংসে গড়া অতি জীবন্ত দেহসচেতন জীব, বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতিকে বশে আনিলেও স্বভাবসুলভ দেহধর্মকে প্রাচ্যবাসীর মত বুদ্ধ-প্রভাবিত নিবৃত্তিমার্গে বিসর্জন দিতে পারেন নাই। সুতরাং রেনল্ডসকে কখনও গরম-মসল্লাদার উপকরণের অভাব অনুভব করিতে হয় নাই। আমিও সেই-দেশীয় এবং সেই জাতীয় একজন স্বাধিকারপ্রমত্তা কুমারীর প্রেমপত্র ঘাঁটিতেছিলাম, উত্তাপে আমার হাত পুড়িয়া গেল, দেহ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কয়েকটি পত্র এখনও আমার সংগ্রহে আছে। সর্বাপেক্ষা নির্দোষ অংশ যাহা উদ্‌ধৃত করিতে পারি তাহা হইতেছে এই:

"Can you imagine me sitting at a small table in the bedroom in my nightgown and my hair down and my bare feet halfway in slippers writing to my darling little love in old Calcutta? Why are'nt you here now to kiss and cuddle me and to hold me as tight as possible to you, so that our lips meet, our chests, our knees and our feet. Would there be space for my old nightgown? And your pyjamas?"

বেতের বাক্সটি এবং চার খণ্ড 'জন ক্রিস্টোফার'সহ পলাইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম। সেই উদগ্র কামনা-সমুদ্র সন্তরণ করিয়া শেষ পর্বে একটি সকরুণ বিচ্ছেদ-কাহিনী আমার কল্পনাপ্রবণ মনকে আঘাত দিল। মহাযুদ্ধের তরঙ্গাভিঘাতে একটি পরিপূর্ণ আকাশ-প্রাসাদ ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। আমি রেনল্ডসের মত উদ্যোগী হইলে এই পত্রগুলির সাহায্যে একটি মনোরম কাহিনী রচনা করিয়া যশস্বী হইতে পারিতাম। আমার দুর্ভাগ্যবশে এগুলি সুফলপ্রসূ হইল না, আমার দেহটাকে নাড়া দিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া দুমড়াইয়া একেবারে বিপর্যস্ত করিয়া দিল। এই বিপর্যয় আমাকে প্রায় সর্বনাশের মুখামুখি আনিয়া ফেলিল।

ঠিক এই সময়ে একদিন টেবিলে আহার্য-পরিবেশনের ব্যাপার লইয়া হষ্টেলের মুসলমান 'বয়'কে বেদম প্রহার করিয়া বসিলাম। মামলা খোদ প্রিন্সিপাল ওয়াট সাহেবের কাছ পর্যন্ত পৌঁছিল, এবং আমি নিরুপদ্রব আশ্রম-সদৃশ ডাফ হষ্টেলকে নিষ্কৃতি দিয়া সেখানকার ভয়াবহ নির্জনতা-প্রসূত কামনাকূপ হইতে নিজেও নিস্তার পাইলাম। অগিল্‌ভি হষ্টেলের সুস্থ স্বাভাবিক কোলাহলমুখর যৌবনচঞ্চল পরিবেশে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। 'জন ক্রিষ্টোফার' আমাকে দূরবিসর্পী পথের সন্ধান দিল, গোপাল হালদার, পরিমল রায় (এক নং ও দুই নং) বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলাকান্ত সরকার, গিরিধর চক্রবর্তী, সুধীন্দ্র ঘোষ, অনুকূল লাহিড়ী, সুধীর সিকদার, সুধানলিনীকান্ত দে প্রভৃতি সহবাসী বন্ধুজন তাঁহাদের সাহিত্য-মজলিসে স্থান দিয়া পথভ্রষ্টকে আবার পথের সন্ধান দিলেন।

ডাফ হষ্টেলের নিষিদ্ধ দুর্গে রক্ষিত বেতের পেটকার অভ্যন্তরে সেই দিন যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম, যুদ্ধকালীন ইংলণ্ডীয় সাহিত্যের হঠাৎ অধঃপাতের কারণ বুঝিতে তাহা আমার সহায়ক হইয়াছিল। জেমস্ জয়েস, ডি. এইচ. লরেন্স, আল্‌ডুস হাক্সলি, কামিংস, স্পেণ্ডার, অডেন প্রভৃতি নব্যপন্থী সাহিত্যিকেরা দেহধর্মের বিকৃতিকে প্রাধান্য দিয়া পরবর্তী কালে যে সাহিত্য-সৃষ্টিতে তৎপর হইয়াছিলেন, তাহার আদিম প্রেরণার সন্ধান আমি অত্যাশ্চর্য ভাবে পাইয়াছিলাম। পশ্চিমের বুভুক্ষু মানবীদের নিদারুণ অতৃপ্তিজনিত লালসার উদগ্রতা-বৃদ্ধি এবং যুদ্ধসংক্রান্ত নানা বিক্ষোভে ও বিক্ষেপে পৌরুষের শোচনীয় পতন—ইহাই নানা ভাবে এই কালে ইংলণ্ডীয় সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কন্টিনেন্টেও অনুরূপ দৃষ্টান্তের অভাব ঘটে নাই। স্যানিন, ব্রেকিং পয়েন্ট, এ রুম ইন বার্লিন, উওম্যান অ্যাণ্ড মঙ্ক প্রভৃতি পুস্তকে ইউরোপের এই অধঃপতনের পরিচয় মিলিবে। মোটের উপর মহাযুদ্ধ-সঞ্জাত যে ভয়াবহ মহামারী ব্যাধি ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিতেছিল, তাহার প্রারম্ভিক সূচনা আমি পত্রাকারে দেখিয়া শুধু লুব্ধ হই নাই, আতঙ্কিতও হইয়াছিলাম। শোচনীয় পরিণাম হইতে আমাকে অংশত রক্ষা করিলেন মনীষী রম্যা রলাঁ 'জন ক্রিষ্টোফারে'র গঙ্গাস্নান করাইয়া, অংশত রক্ষা করিলেন অগিল্‌ভি হষ্টেলের সাহিত্যরসিক বন্ধুরা এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ।

ইতিমধ্যে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসিল। সত্যেনের সাহায্যে কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যুবকদের সঙ্গে তখন আমি একাত্ম হইয়াছি। ওয়েলিংটন স্কোয়ার অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর অধিনায়কত্ব প্রধানত সে-যুগের বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মীরা লাভ করিলেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে মহিলা-বিভাগের তদ্বির-তদারকের কাজে আমিও নিযুক্ত হইলাম। আমি মফস্বল হইতে সদ্য আগত এবং কলিকাতায় সম্পূর্ণ অপরিচিত এক সাধারণ ছাত্র মাত্র। কিন্তু এই স্বেচ্ছাসেবকের কাজের সুযোগ লাভ করিয়া আমি সপ্তাহ কালের মধ্যেই শুধু রাজনৈতিক মহলেই নয়, তদানীন্তন কলিকাতার অভিজাত ও বিদগ্ধ মহলে অল্পবিস্তর পরিচিত হইয়া উঠিলাম। মহাত্মা গান্ধী, অ্যানি বেসান্ট, চিত্তরঞ্জন-

দাশ প্রমুখ দেশনেতাদের সেবা করিতে গিয়া তাঁহাদের স্বাভাবিক সভাবহির্ভূত রূপ দেখিলাম, স্বেচ্ছাসেবক-নেতা-উপনেতাদের ক্ষমতা লইয়া কাড়াকাড়ি মারামারি এবং গোপন ও প্রকাশ্য প্রেমের দ্বন্দ্বে অশোভন ঈর্ষা-হানাহানি দেখিলাম, অতি সাধারণ মানুষ কেমন করিয়া কার্যক্ষেত্রে ও বক্তৃতামঞ্চে বিশেষ ও অসাধারণ হইয়া উঠিতে পারে তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম; মোটের উপর সেই সাত দিনের মধ্যেই সাত বৎসরের অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া আমি লায়েক হইয়া উঠিলাম। কলিকাতা-মণ্ডলীর সম্পূর্ণ বাহিরের লোক হইয়াও আমি যাহা দেখিবার ও শুনিবার সুযোগ পাইলাম বাহিরের ছেলেদের কদাচিৎ সে সুযোগ ঘটে। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইয়া গেল। একটা মহৎ অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকিবার গর্ব লইয়া আমি আবার হষ্টেলের আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিলাম, ঠিক আবুহোসেনের মত। হষ্টেলের বন্ধুদের কয়েকদিন অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, মনে হইল আমার বাদশাহী ন্যায্য আসন হইতে কে যেন আমাকে টানিয়া ছিঁড়িয়া পথে বসাইয়া দিল। কয়েকদিন খুব মনমরা হইয়া রহিলাম। যখন আবার আত্মস্থ হইয়া কাছের মানুষদের বন্ধু ও প্রিয়জন বলিয়া চিনিতে পারিলাম, তখন ডাফ হষ্টেলের ভূত আমার কাঁধ হইতে সম্পূর্ণ নামিয়া গিয়াছে, অলস মস্তিষ্কে শয়তানের কারখানা চুরমার হইয়াছে এবং আমি আবার সহজ ও স্বাভাবিক হইতে পারিয়াছি। ঠিক সেই অবস্থায় একটা নৈর্ব্যক্তিক নির্লিপ্ততাও মনের মধ্যে যে অনুভব করিয়াছিলাম তাহার প্রমাণ একটি চতুর্দশপদী কবিতায় রক্ষিত আছে দেখিতেছি। আমি সেই মুহূর্তে আর পথের ধুলার হাটের কোলাহলের মানুষ নই—উচ্চ বাতায়ন হইতে বিশাল সংসারকে প্রত্যক্ষ করিতেছি:

বাতায়নিক

সংসারের বহু ঊর্ধ্বে বাতায়ন হতে
বিশাল সংসার পানে শান্ত চক্ষে চাহি—
দেখি চলে মানব-প্রবাহ কত মতে
কত পথে, কোথাও বিরাম তার নাহি।
দলিয়া পিষিয়া এরা চলে পরস্পরে,
যন্ত্রণার আর্তস্বর ঢাকে কলরব—
নাহি শান্তি শ্রান্তিহারা বিশ্বচরাচরে
বন্ধনের বেদনায় ব্যথিত মানব।
স্বার্থের জঞ্জালে বন্ধ পথ দেবতার,
খর্ব ক্ষুদ্র আজ প্রেম স্নেহ ভালবাসা—
প্রতিঘাতে খুলিবে কি হৃদয়ের দ্বার,
রুদ্ধ বায়ু প্রবাহিয়া দিবে কভু আশা?
মুক্তির আশায় আজ ধরা কম্পমান,
বেদনা-বন্ধন হতে লভিবে কি ত্রাণ?

দেখিতে দেখিতে ১৯২১ আসিয়া গেল। কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর যে অসহযোগ-প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, তাহাকে কার্যকরী রূপ দিবার জন্য তোড়জোড় চলিতে লাগিল। আমি তখন সংস্পর্শ-সঞ্জাত উচ্চপদবী-আরূঢ়, অন্তরে অন্তরে নেতৃত্বের মহড়া দিতেছি। কলেজে পড়াশুনা প্রায় শিকায় উঠিয়াছে। দুষ্টামি বুদ্ধির নিত্য নব নব উদ্ভাবনা কলেজে পরীক্ষিত হইতেছে। কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া আর কিছু লাভ না হউক, নারী সম্বন্ধে মফস্বলের ছেলের যে স্বাভাবিক সঙ্কোচ ও সমীহা ছিল তাহা দূর হইয়াছে, তাহাদের সম্মুখে স্বতই আর মাথা নত হয় না, বাক্য রুদ্ধ হইয়া আসে না; যথেষ্ট সাহস লাভ করিয়াছি, তাহাদের মুখামুখি দাঁড়াইয়া চটপট্ উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে পারি, চপল-চটুলতা প্রকাশেও বাধে না। আমাদের সময়েই সর্বপ্রথম স্কটিশ চার্চেস্ কলেজে ছাত্রী-সমাগম আরম্ভ হয়। তৎপূর্বে সিটি কলেজে অধ্যাপকদের অন্তরালে ব্রাহ্ম-ছাত্রীরা কিছুদিন পড়িয়াছিলেন, শুনিয়াছিলাম। তাহার পর আমাদের সময়ে কলিকাতার কলেজের ইতিহাসে এই নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। আমাদের বি.এস-সি. ক্লাসে অঙ্কে অনার্স লইয়া একজন—বর্মী মাতা ও বাঙালী পিতার সন্তান, এবং আই.এ. ক্লাসে একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান—এই দুইজনকে লইয়া পাঁচ শত তরুণের কৌতূহল-কৌতুক মাতামাতি শুরু হইল। অর্ধবর্মিনী অতিশয় শান্ত ধীর প্রকৃতির, তাহার সহাস্য ধৈর্যের কাছে আমরা পরাজিত হইলাম। বেচারা ইঙ্গ-ভারতীয়া হইল সারা কলেজের টার্গেট। তখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় কক্ষবদলের রীতি ছিল, কোনও নির্দিষ্ট কক্ষে একই শ্রেণীর বরাবর ক্লাস বসিত না। উক্ত মেয়েটির জন্য কলেজের যাবতীয় ছাত্র রুটিন মুখস্থ করিয়া ফেলিল। আমি তাহাকে লইয়া একটা গান বাঁধিয়া বসিলাম। কেমিষ্ট্রি ক্লাসে অধ্যাপক বরুণ দত্তের উদারতার সুযোগ লইয়া হাতে হাতে

দশ-বারোটি নকল হইয়া গেল। ল্যাবরেটরি ঘরে সুর যোজনা ও প্র্যাকটিস হইল এবং অকস্মাৎ অপরাহ্নে একটি সঙ্কটত্রাণ ধাঁচের গানের শোভাযাত্রা ক্লাস-পরিবর্তনশীলা বেণীদোলানো মেয়েটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সারা হেদুয়া অঞ্চল সচকিত করিয়া দিল। গানটির প্রথমাংশ মনে আছে।—

হঠাৎ আমি বাইরে এসে অবাক চোখে চাহি,
সে যে চমক দিয়ে চলে গেল
আমার চোখে নিমেষ নাহি!
দুলিয়ে বেণী চলে আমার আগে
কি ভাব আহা, বুকের মাঝে জাগে
ও তার পায়ে চলার তালে তালে
উঠিনু গান গাহি!

কলেজ তোলপাড়। দেখিতে দেখিতে হোঁৎকা ওয়াট, সুচতুর ধীর স্থির আরকুহার্ট, চুলবুলে কিড বড় বাড়ির সিঁড়ির উপরে এবং বিজ্ঞান বিভাগের দ্বারপথে ছাত্রসূদন নিবারণ রায় রাগে গরগর করিতে করিতে দর্শন দিলেন। আমরা কয়েকজন বমাল গ্রেপ্তার হইয়া ফিজিক্স থিয়েটারে নীত হইলাম। "কে লিখেছে, কে লিখেছে" এ প্রশ্নের উত্তর নিবারণবাবু পাইলেন না। তিনি গোটা ক্লাসটাকেই এক টাকা করিয়া জরিমানা করিয়া ছাড়িলেন। সেখান হইতে কেমিস্ট্রি ক্লাসে ঢুকিতে যাইব, বরুণ দত্ত আমাকে পাকড়াও করিয়া বলিলেন, শয়তান, এ তোর কাজ, যা, বেশ করেছিস। আমাদের সেই ভক্তিভাজন সুরসিক সহৃদয় অধ্যাপকের কণ্ঠস্বর যেন আজও শুনিতে পাইতেছি।

এই সহশিক্ষা ঘটিত সহযোগ আন্দোলনের জের মিটিতে না মিটিতে অসহযোগের প্রবল বন্যায় কলিকাতার ছাত্রসমাজ ভাসিয়া গেল। আমাদের কলেজের পিকেটিং ইত্যাদির ভার আমি গ্রহণ করিলাম। প্রিন্সিপ্যাল ওয়াটের সঙ্গে ইহা লইয়া একদিন গুঁতাগুঁতি করিয়া এমনই মিথ্যা সোরগোল তুলিলাম যে, সুযোগ বুঝিয়া দেশবন্ধু সি. আর. দাশ হেদুয়ায় ছুটিয়া আসিয়া সভা করিলেন, সংবাদপত্রে ওয়াট সাহেব কর্তৃক "ইনডিসক্রিমিনেট কিকিং"এর সংবাদ বিঘোষিত হইল। সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের বেঞ্চে বসিয়া কালো চশমা আঁটা চোখে আমাদের মুখে সে কাহিনী শুনিয়া কবি সত্যেন্দ্রনাথ এতই উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন যে, পরের মাসের 'প্রবাসী'তে তাঁহার কটূক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ কবিতা "কোনও ধর্মধ্বজীর প্রতি" বাহির হইয়া নির্দোষ ওয়াটকে সারা বাংলা দেশে নিন্দিত ও ধিকৃত করিয়া দিল।

ইহারই মধ্যে বন্ধুবর গোপাল হালদার প্রভৃতির চেষ্টায় হাতের লেখা 'অগিলভি হষ্টেল ম্যাগাজিনে'র একটি সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন চলিতেছিল। তাঁহারা জোর করিয়া আমাকে দিয়া পাঁচ-পাঁচটি কবিতা লিখাইলেন, তন্মধ্যে একটি মহাত্মা গান্ধীর উপর ও একটি রবীন্দ্রনাথের উপর। রবীন্দ্রনাথের উপর লেখা কবিতাটি শেষ পর্যন্ত হাতের লেখা পত্রিকার পৃষ্ঠা উপচাইয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নিকট পৌঁছিল, এবং আমি রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সৌভাগ্য অর্জন করিলাম। পরবর্তী কয়েকটি তরঙ্গে "আমার রবীন্দ্রনাথ"কে আমি সর্বসাধারণের গোচরে আনিতে চেষ্টা করিব। পরে আবার গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন দিয়া কাহিনী শুরু করিব।

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি আদৌ অপ্রকাশিত আলোকচিত্র মুদ্রিত হ'ল। চিত্রটি শ্রীপরিমল গোস্বামী কর্তৃক কবিগুরুর শেষ বয়সে গৃহীত এবং কবি কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

যাযাবর

(আখ্যান)

নীরজা চলতে চলতেও আপন চিন্তাধারায় এমন গভীর নিমগ্ন ছিলেন যে, দুই গজ দূরে থেকেও সত্যসিন্ধুকে দেখতে পাননি। অবশেষে প্রায় তাঁর ঘাড়ের উপরে পড়তে পড়তে নিজেকে কোন মতে সামলে নিয়ে বললেন, "মাপ করবেন, আপনাকে ঠিক—"

সত্যসিন্ধু হেসে বললেন, "ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়ায় এমন লোককে ইংরেজীতে বলে সম্নামবুলিষ্ট। জেগে থেকেও স্বপ্নেচালিত যারা তাদের জন্য অন্ততঃ ডাক্তারী শাস্ত্রে কোন সংজ্ঞা আছে বলে জানিনে, নীরজা, ব্যাপারখানা কী ?"

নীরজা লজ্জিত হয়ে বললেন, "আপনাকে মোটেই দেখতে পাইনি।"

সত্যসিন্ধু কৌতুকজড়িত কণ্ঠে বললেন, "সংসারে ক্ষীণদৃষ্টি শুধু বৃদ্ধেরাই নন। একটা বিশেষ অবস্থায় তরুণ-তরুণীরাও চোখের অসুখে ভোগেন। তখন বিশেষ কোন ব্যক্তি ছাড়া আর কারুকে আর চোখেই পড়ে না।"

সত্যসিন্ধুর বলার ভঙ্গিতে নীরজাও হেসে ফেললেন। বললেন, "তাই না কি ? বড় বেয়াড়া অসুখ বলতে হবে, ডক্টর ঘোষ।"

"হ্যাঁ, জটিল তো বটেই। চোখে রঙ্গিন চশমা না পরেও রোগী তখন সব কিছুই রঙ্গিন দেখতে সুরু করে।"

"সে তো শুনেছি জনডিসের লক্ষণ। লীভারের দোষ থেকে হয়। তাদের ধরে ধরে এক কোর্স এমিটিন ইনজেকশান দিলে হয় না ?" কপট ঔৎসুক্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন নীরজা।

সত্যসিন্ধু নীরজার রসবোধ ও বাক্‌চাতুর্য্যে চমৎকৃত হলেন। সহাস্যে জবাব দিলেন, "না সিষ্টার, ডায়োগনেসিসে ভুল আছে। এ অসুখ লীভার থেকে নয়, হার্ট থেকে। কিন্তু ব্রিটিশ ফারমাকোপিয়ায় ওর অষুধ লেখা নেই।"

পরিহাসের আবরণে সত্যসিন্ধুর মন্তব্যগুলি যে আলোচনাকে ক্রমশঃই বাস্তবের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে কথা হৃদয়ঙ্গম করে নীরজা বিব্রত বোধ করলেন। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে বললেন, "আপনার কাছে একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে, ডক্টর ঘোষ। আজকালের মধ্যেই আপনার চেম্বারে একবার যাব ভাবছিলেম।"

সত্যসিন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রয়োজন আমার কাছে ? কারো অসুখ-বিসুখ সংক্রান্ত বোধ হয় ?"

নীরজা জবাব দিলেন, "না, প্রয়োজনটা আমারই।"

সত্যসিন্ধু জিজ্ঞাসু নেত্রে নীরজার পানে তাকালেন।

নীরজা কয়েক সেকেণ্ড নিজের মনে কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, "আপনার জানা-শোনা কোন হাসপাতালে আমার একটা কাজ জুটিয়ে দেন যদি তবে উপকার হয়।"

সত্যসিন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, "মিষ্টার রয়ের বাড়িতে যে কাজ, সে কি শেষ হয়ে গেছে ?"

"হ্যাঁ—না—হ্যাঁ—তা এক রকম শেষ বললেও হয়।" ইতস্ততঃ করে বললেন নীরজা।

সত্যসিন্ধুর কাছে বিষয়টা স্পষ্ট হলো না। জিজ্ঞাসা করলেন, "তার অর্থ ?"

নীরজা বললেন, "আসলে "মিষ্টার রয়ের বাড়িতে কাজ সামান্যই। ওঁর পিসিমাকে শুধু একটু দেখা-শোনা করা। তিনি অসুস্থ বা নিতান্ত অশক্ত নন। সারা দিনে ঘণ্টা দুই-তিনের বেশী কাজ নেই। নার্স না হয়ে যে কোন মেয়েমানুষ হলেই চলে।"

সত্য জিজ্ঞাসা করলেন, "মিষ্টার রয় তাই মনে করেন বুঝি ?"

"না, তিনি কিছু বলেননি।"

সত্য জিজ্ঞাসা করলেন, "পিসিমা কি খুব দজ্জাল, বদরাগী লোক ?"

"না, না। তিনি মাটির মানুষ। আমাকে প্রায় মেয়ের মতোই স্নেহ করেন।" জানালেন নীরজা।

সত্যসিন্ধু কিছুটা সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, "মাইনের কথাটা জিজ্ঞাসা করা অভদ্রতা, তবুও—"

"না, সে দিক দিয়ে বলার কিছুই নেই। হাস-পাতালে চাকরির প্রায় ডবল টাকা মেলে এখানে।" বললেন নীরজা।

"তবে ?"

"অসুবিধা,—মানে—কেন জানি না আর ভালো লাগছে না এ কাজ।" বললেন নীরজা।

"হুঁঃ, বুঝেছি।" বলে অর্থপূর্ণভাবে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন সত্যসিন্ধু।

সত্যসিন্ধুর হাসি ও মন্তব্যে নীরজা সঙ্কোচ বোধ করলেন। চোখ তুলে সত্যসিন্ধুর পানে তাকাতেও যেন লজ্জা হচ্ছিল তাঁর। মাটিতে চোখ রেখে বললেন, "বাঃ রে, এর মধ্যে আর বোঝাবুঝির প্রশ্ন আছে কোনখানে ?"

সত্যসিন্ধু পূর্ব্ববৎ সকৌতুকহাস্যে বললেন, "নেই ? কী জানি! হবেও বা। এসব হৃদয়স্য তত্ত্বং। সমস্তই নাকি নিহিতং গুহায়াং। থাক। এর চাইতেও বেশী ব্যাখ্যা করলে হয়তো তুমি লজ্জায় একেবারে মাটিতেই মিশে যাবে।"

নীরজা নতদৃষ্টিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর গায়ের রং অমন কালো না হলে কর্ণমূলে লালের আভা নিশ্চয়ই স্পষ্টতর হতো।

সত্যসিন্ধু বললেন, "ভাবছ, ধরলেম কী করে? কেন, সেটা এমন শক্ত কী? যার একটু সামান্য বুদ্ধি আছে, সে-ই অনায়াসে আঁচ করতে পারে। সহজ ডিডাক্‌সন্‌। খাটুনি নেই, মাইনে দ্বিগুণ, রোগী নির্ঝঞ্ঝাট। এ চাকরি যাঁর ভালো লাগে না, বুঝতে হবে তাঁর ভালো লাগার অন্য লক্ষ্য আছে। এবং সে লক্ষ্যে যে অলক্ষ্যে টান পড়েছে, তা তো তরুণ মনিবটির অবস্থা দেখেই অনুমান করা যায়। এলিমেণ্টারী, মাই ডিয়ার ওয়াটসন। হাঃ হাঃ হাঃ!"

হাসি শেষ হলে কণ্ঠে গাম্ভীর্য্য ও সহানুভূতি মিশিয়ে সত্যসিন্ধু বললেন, "নীরজা, আমি তোমারও শুভাকাঙ্ক্ষী। তাই বলছি; জেনে রেখো, সুখের উপরে কোন জবরদস্তি চলে না। সুতরাং যা পাওয়ার নয়, তা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে গেলে মান যায়, প্রাণও ভরে না। বোধ হয় হেঁয়ালীর মতো শোনাচ্ছে। আমার মুস্কিলই ঐখানে। ঠাট্টা করে করে এমনই অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে যে, এখন সিরিয়স কথা বলতে গেলেও লোকে সিরিয়সলী নেয় না। কমিক অ্যাক্টরকে হিরোর পার্ট দিলে যে দশা ঘটে। হাঃ হাঃ হাঃ।"

অতি-প্রয়োগে ব্যর্থ হয় দণ্ড, অতি-পীড়নে ভয়। অনুভূতিও অসার হয় অতিরিক্ত দুঃখভোগে। বলা বাহুল্য, সেটা বেদনার অবসান নয়, বেদনার অভ্যাস। ব্যথার অপস্মৃতি নয়,—বিস্মৃতি।

আপন নিষ্প্রেম বিবাহিত জীবনের শোকাবহ ব্যর্থতায় ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে মলী সেন তার অস্তিত্ব সম্পর্কেও যেন আর সর্ব্বদা সচেতন ছিলেন না। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মাটি যেমন কাঠিন্য লাভ করে, দুঃখের দহনে তিনিও তেমনি কঠোর ঔদাসীন্য অর্জ্জন করে-ছিলেন শিবনাথ সম্পর্কে আপন মনোভাব ও আচরণে। উপশমহীন ব্যাধির প্রতি অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নিশ্চেষ্টতার মতো স্বামীর বিমুখতাকেও তিনি তাঁর জাগ্রত অনুভূতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন সযত্নে। তাই আজ সন্ধ্যায় শিবনাথের সঙ্গে এই নূতন সংঘাত তাঁকে কঠিনভাবে আহত করল। অতর্কিত আঘাতে বহু পুরাতন ক্ষতস্থান থেকে পুনরায় রক্তক্ষরণের ন্যায়, দীর্ঘদিন পরে নতুন করে ব্যথায় ক্লিষ্ট হতে লাগল তাঁর মন।

শিবনাথের প্রতিটি উক্তি, প্রতিটি মন্তব্য বারম্বার পর্য্যালোচনা করে নির্জ্জন গৃহে ক্রোধে ও বিরক্তিতে দগ্ধ হতে লাগলেন মলী সেন। বিরক্তি নিজেরই প্রতি। আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি যে শিবনাথের কাছে নত হয়েছিলেন এই কথা মনে করে আপনাকে তিনি আর কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলেন না।

জগতে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে আছে দুঃখ। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় আছে অসম্মান। সেই আত্মাবমাননার লজ্জা দুস্তর। প্রাণভিক্ষার চাইতেও প্রেমভিক্ষা গ্লানিকর। প্রত্যাশাহীন মনের যে উদ্গত ঔদ্ধত্যে এতকাল শিবনাথের অনাদরকে তিনি উপেক্ষা করেছেন তাতে চিত্তে শান্তি না পেলেও সন্তোষ পেয়েছেন। বিনীত নিবেদন ও কাতর অনুরোধের দ্বারা মলী সেন নিজেকে আজ সেই ন্যূনতম আত্মতুষ্টি থেকেও বিচ্যুত করেছিলেন। নিশ্চিত প্রত্যাখ্যানের দ্বারা শিবনাথ শুধু যে মলী সেনের সেই ব্যাকুলতাকেই বিফল করলেন তা নয়, তাঁর দীনতাকেও প্রকট করে দিয়ে গেলেন পরিপূর্ণ নগ্নতায়। কোনোখানে তার আর এতটুকু আড়াল বা আবরণ রইল না। ছিঃ ছিঃ! তৃষ্ণার্ত্ত গরবিনী তাঁর সমুন্নত মঞ্চ থেকে নেমে এসে বিনম্র অঞ্জলি পেতেছিলেন নদীতে। হায়, সেখানে স্রোত বিশুষ্ক। জল মিলল না। অভাগিনীর দু'হাত ভরে উঠল শুধু পাঁক।

বেয়ারা এসে জানাল নিখিলের পক্ষে এখন আসা সম্ভব নয়।

সম্ভব নয়! মলী সেন বিস্মিত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমনে ঠিকসে বাতায়া থে?"

বাতিয়েছে বই কি। পরিষ্কারভাবে সে মেম-সাহেবের সেলাম দিয়েছে। কিন্তু সাহেব বলেছেন, তাঁর এখন ফুরসৎ নেই।

আশ্চর্য্য! মলী সেন ডেকে পাঠিয়েছেন, তার পরেও নিখিলের ফুরসৎ নেই! মলী সেনের বিশ্বাস হয় না। বেয়ারাটা অন্য কাউকে নিখিল বলে ভুল করেনি তো?

বেয়ারা মাথা নেড়ে বলল, ভুল সে একটুও করেনি। রয় সাহেবকে সে আচ্ছাসেই চেনে। ভারি বড়া এঞ্জিনর, দো হাজার তন্‌খা তলব। তাঁর দেমাকভি অনেক উঁচা। নিজের নোকরদের হোলীর দিন পাঁচ পাঁচ রূপায়া বকশিষ দেন। এ কথা সে আপনা কানসে শুনেছে। তাঁর দপ্তরমে চাপরাশীর কামও না কি বহুৎ আছে। হুজুর যদি থোড়া মেহেরবানী করকে সাহেবকে শুধু একদফে বলেন, তবে কালই তার বৈঠে হুয়ে বড় লেড়কার একটা নোকরী মিলতে পারে।

অসহিষ্ণু মলী সেন ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় আছেন এখন রয় সাহেব?

সে সঙ্কুচিত হয়ে জানাল, সাহেব ওদিকের সজ্জাকক্ষেই আছেন। মেমসাহেবের হুকুম হলে সে আবার এক্ষুনি গিয়ে তাঁকে বলতে পারে।

না, তার প্রয়োজন নেই। বেয়ারাকে বিদায় দিলেন মলী সেন।

সে বেচারা যেতে যেতে ভাবল, ছেলের চাকরির সুপারিশের কথাটায়ই মনিব চটে গেছেন। কিন্তু তার যুক্তি খুঁজে পেল না। ভাবল, মেমসাহেবের সঙ্গে এঞ্জিনর সাহেবের যখন এত দোস্তী, তখন তার ছেলের জন্য একটু বলে দিতে আপত্তি কিসের? এসব বড়লোকদের মেজাজের ঠিকানা পাওয়া যে তার মতো গরীব মানুষের সম্ভব নয়, অবশেষে এই সিদ্ধান্তেই তার বিশ্বাস দৃঢ়তর হলো।

মলী সেন অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন। তিনি ডেকে পাঠালে কোন পুরুষের সময়ের অভাব হয় জীবনে একথা তিনি এই প্রথম শুনলেন।

এক তাড়া প্রুফ হাতে নিয়ে ব্যস্তভাবে প্রবেশ করলেন সুরেন লাহিড়ী। অদ্যকার অনুষ্ঠানের প্রচারসচিব। বললেন, "এই যে মিসেস সেন, আপনাকেই খুঁজছিলেম। কালকের কাগজে যে রিভিয়ুটা ছাপা হবে তার প্রুফটা একবার দেখে দেন যদি।"

মলী সেন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "রিভিয়ুর প্রুফ? তার মানে? রাম জন্মের আগেই রামায়ণ লেখা হয়েছিল শুনেছি। নাট্য সমালোচনাও নাটক সুরু হওয়ার আগেই ছাপা থাকে নাকি?"

লাহিড়ী বিজ্ঞজনোচিত হাসি হেসে বললেন, "হুঃ, ঐখানেই তো পাবলিসিটি অফিসারের এফিসিয়েন্সী। কাগজে ভালো সমালোচনা ছাপাতে হলে অভিনয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলে চলে বুঝি? আমার টেক্‌নিকই আলাদা। ড্রেস রিহার্সেলের দিনে এডিটর, নিউজ এডিটর ও রিপোর্টারদের এনে এত আদর-আপ্যায়ন করেছি কি অমনি? অভিনয়ের সমালোচনাটা ফলাও করে আগেই লিখে রেখেছিলেম। কেক, স্যাণ্ডুইচের ফাঁকে এক সময় দিয়ে দিয়েছি তাঁদের হাতে। ওটাই কাল সকালে নিজস্ব নাট্য-সমালোচকের নামে ছাপা হয়ে যাবে দেড় কলাম। দেখবেন, এসব ট্রেড সিক্রেট যেন আবার কাউকে বলে দেবেন না।"

পাবলিসিটি অফিসারের ট্রেড সিক্রেট নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো মনের অবস্থা তখন মলী সেনের নয়। লাহিড়ীকে বিদায় করার উদ্দেশ্যে বললেন, "কিন্তু আমার তো এখন আর একটুও সময় নেই সুরেন বাবু, আমাকে মাপ করতে হচ্ছে।"

লাহিড়ী নাছোড়বান্দা। বললেন, "এ দু'মিনিটের ব্যাপার, আপনি শুধু চট করে একবার প্রুফগুলির উপরে চোখ বুলিয়ে দিন, কাটাকুটি সংশোধন যা কিছু আমি করছি।" ব্যাপারটার গুরুত্ব যাতে মলী সেন যথেষ্ট পরিমাণে উপলব্ধি করতে পারেন সেজন্য স্বর নীচু করে বললেন, "কাগজের আপিস থেকে এ ভাবে গ্যালী বাইরে আনা নিয়ম নয়। শুধু আমার সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব বলেই, এ খাতিরটা পাওয়া গেছে।"

বিশেষ খাতিরের জন্য অবশ্য মলী সেন বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। কিন্তু সুরেন লাহিড়ীর অধ্যবসায় তাঁর জানা ছিল। রিভিয়ুটা একবার না পড়া পর্য্যন্ত এখান থেকে উঠবেন এমন সম্ভাবনা অল্প।

হাত বাড়িয়ে কাগজগুলি নিয়ে দ্রুত তার উপরে দৃষ্টি চালনা করলেন মলী সেন।

নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা। ব্যবস্থাপনার, অভিনয়ের,

[৬৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

কপোত-কপোতী
—বি, বি, বকসী
(তৃতীয় পুরস্কার)

ম্যাকাও
—বি, এন, মিত্র

জলকেলি
—মদনমোহন বসু

মিলন দুঁহু তনু
—কেশব দত্ত
(প্রথম পুরস্কার)

শকুন-তলা
—প্রদ্যোৎ দে
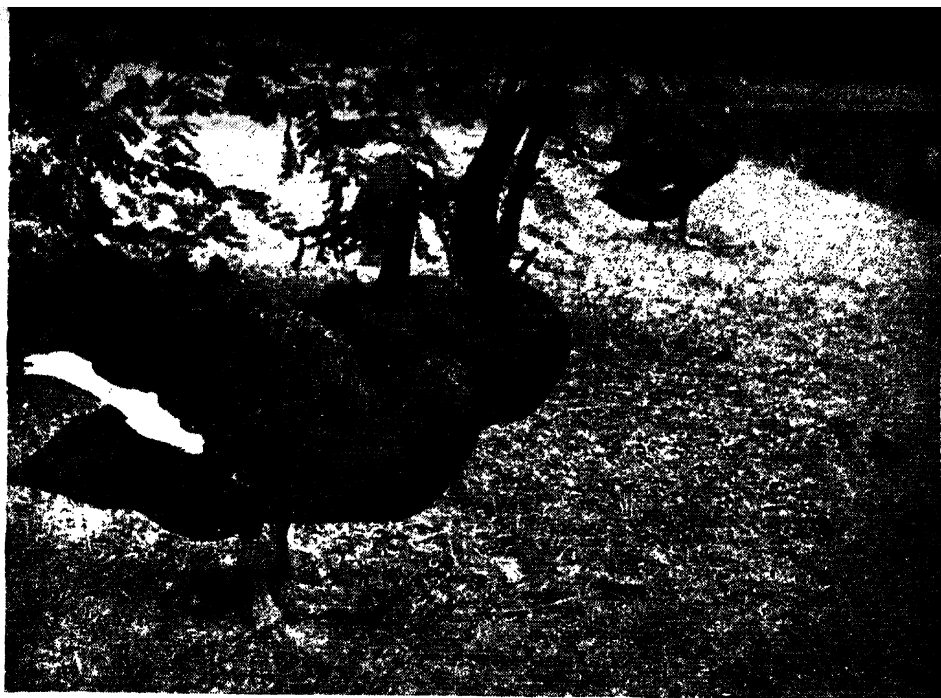
হংসমিথুন —চঞ্চল মিত্র

বিশ্রাম —প্রশান্ত গুপ্ত

পোষমান ঐ— —শি, সু, বসু (দ্বিতীয় পুরস্কার)

প্রতিযোগিতা

বিষয়

গ্রাম্য-পুকুর

প্রথম পুরস্কার ১৫৲ দ্বিতীয় পুরস্কার ১০৲

তৃতীয় পুরস্কার ৫৲

[ছবি পাঠানোর শেষ দিন ২২শে ভাদ্র]

দণ্ডী বিরচিত

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

OVERNM
Cooch E

রূপকের মধ্যে দিয়ে যাঁর প্রতীতি,—

যিনি—

ব্রহ্মাণ্ডছত্রের দণ্ড,

ব্রহ্মাভবন অম্ভোরুহের নালদণ্ড,

ধরণী-তরণীর কূপদণ্ড,

মন্দাকিনী-বাহিনীর পা ট্টকা-কেতুদণ্ড,

জ্যোতিশ্চক্রের অক্ষদণ্ড,

ত্রিভুবন-বিজয়ের স্তম্ভদণ্ড, এবং

দেবশত্রুদের কালদণ্ড,

সেই ত্রিবিক্রম নারায়ণের প্রসিদ্ধ

অঙ্ঘ্রিদণ্ড

তোমাদের মধ্যে বিতরণ করুক

শ্রেয়ঃ কল্যাণ ॥

পূর্ব্ব পীঠিকা

প্রথম উচ্ছ্বাস

মগধের রাজধানী ছিল "পুষ্পপুরী" নগরী। এই পুষ্পপুরীর কষ্টিপাথরে যাচাই করা হত দেশের অন্য সমস্ত নগর আর নগরী। দোকানে দোকানে ছড়াছড়ি; পণ্যের ভারে দোকান যেন ভেঙে পড়ছে; থরে থরে সাজানো রয়েছে মণিমুক্তার বিপুল সম্ভার। মহিমায় রত্নাকরবিশেষ ছিল মগধদেশশেখরীভূতা এই আমাদের পুষ্পপুরী।

সেখানকার রাজা ছিলেন—শ্রী"রাজহংস"।

গগন-হংস সূর্য্যই তাঁর একমাত্র তুলনা। শত্রু-সন্তাপী কী তাঁর রুদ্র প্রতাপ! তাঁর সমুদ্দণ্ড ভুজদণ্ড—সমুদ্র-মন্থী যেন মন্দরপাহাড়—রিপুসমুদ্রের তুরঙ্গকুঞ্জরমকরভীষণ বীর যোদ্ধৃবর্গের উত্তাল তরঙ্গগুলোকে কী আয়াসহীন বিক্রমেই না মাতিয়ে দিয়ে ঘুরত! সৌরভের মত ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর অতিশুভ্র অতিমান কীর্ত্তি দিগন্তরাল পরিপূর্ণ ক'রে দিয়ে। সে শুভ্রতার সঙ্গে তুলনা দিতে তাকে ডেকে আনতে হয়—শরৎকালের চাঁদকে, কুন্দকাশঘনসারকে, গিরীশের অট্টহাসকে। তাঁর কীর্ত্তির বারম্বার গাথাগান করে বেড়াত ইন্দ্রপুরীর তরুণ অপ্সরাদের দল।

ভাগ্যবান ছিলেন বটে, নৃপতি রাজহংস। যে ধরণীর শিখরে জ্বলজ্বল করে জ্বলে রত্নসুমেরু, সমুদ্রের বেলা-বলয়া যার মেখলা—সেই হেন ধরণী-রমণীর সৌভাগ্যের উপভোগে যিনি ভাগ্যবান, তাঁর আর অন্য কোন্ বিশেষণ দেওয়া চলে? এত ভোগের মধ্যেও যাগযজ্ঞে এবং বিদ্যায় ছিল তাঁর বিশেষ আকর্ষণ। তাঁর চারদিকে মোহবিস্তার করে রেখেছিল শিষ্ট বিশিষ্ট অনেক প্রতিভা। দেহসৌষ্ঠবের কথা এখনও বলা হয়নি রাজহংসের। বেশী বলব না; এই বললেই চলবে—ঘনদর্প কন্দর্পের সৌন্দর্য্যসহোদর ছিল তাঁর অনবদ্য হৃদ্য রূপ।

রূপের বর্ণনায় যখন পৌছোনো গেছে তখন আমাদের ক্ষণেক থামতেই হবে রাণী বসুমতীতে—লীলাবতীকুলের যিনি শেখরমণি। মহেশ্বরের লোচনাগ্নিতে যখন ভস্মীভূত হয়েছিলেন শ্রীমদন, তখনই বোধ হয় ভয়ে মদনের ভ্রমরসংহতি রূপায়িত হয়ে গিয়েছিল বসুমতীর কেশকলাপে,

তাঁর প্রেমের খনিখানি—বসুমতীর পদ্মজয়ী মুখে,

তাঁর জ্যা—বসুমতীর ভ্রূভঙ্গিতে,

তাঁর জয়ধ্বজের মীনযুগল—বসুমতীর জোড়া চোখে,

সেনা মলয়সমীর—নিঃশ্বাসে,

পথিকহৃদ্দলনকরবাল নবপল্লব—অধরবিম্বে,

জয়শঙ্খ—বসুমতীর লাবণ্যধর বন্ধুর গ্রীবায়

রথের পূর্ণকুম্ভদুটি—বসুমতীর চক্রবাকানুকারী স্তনযুগে,

কর্ণের কহ্লার—গঙ্গাবর্ত্তের মত নাভিতে,

যোগীজয়ী জৈত্ররথ—অতিঘন জঘনে,

এবং তাঁর অস্ত্রভূত ফুলদল রূপায়িত হয়ে গিয়েছিল বসুমতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনন্ততায়।

অমরাবতীর চেয়েও সুন্দরী এই পুষ্পপুরী নগরীতে, অনন্ত ভোগের মধ্যে লালিত হয়ে সুখে বাস করতেন রাণী বসুমতী, এবং শ্রীরাজহংসও সুখী হয়েছিলেন বসুমতীর মতই তাঁর রাণী বসুমতীকে সংলাভ করে।

রাজহংসের রাজকার্য্যসাহিত্য ধীর প্রজ্ঞার সঙ্গে বিচার করে দেখতেন তিন জন কুলামাত্য—পরমবিধানী ধর্ম্মপাল, পদ্মোদ্ভব, এবং সিতবর্ম্মা।

সিতবর্ম্মার দুটি পুত্র—সুমতি, সত্যবর্ম্মা,

ধর্ম্মপালের তিনটি পুত্র—সুমন্ত্র, সুমিত্র, কামপাল, এবং

পদ্মোদ্ভবের দুটি পুত্র—সুশ্রুত ও রত্নোদ্ভব। সর্ব্বসাকুল্যে সাতটি পুত্র।

এই পুত্রসমষ্টির মধ্যে সত্যবর্ম্মা ছিল অত্যন্ত ধর্ম্মশীল। একদা তার মনে হল, সংসারের কোথাও তো সার দেখি না; তীর্থযাত্রায় চলে গেল তার মন, এবং সে হ'ল তাই দেশান্তরী।

কামপাল বড় হয়েই দুবির্নীত হয়ে উঠল;—তার চারদিকে কেবল বিট, নট, এবং বারনারীর ভিড়। অগ্রজ দু'ভায়ের শাসন সে মানলে না;—শেষে একদিন বেরিয়ে পড়ল পৃথিবীতে চরতে।

রত্নোদ্ভবও অন্য ধরণের লোক ছিল। তার মন বসে গেল বাণিজ্যে। নিপুণ হয়ে উঠল সে। বাণিজ্যে সাফল্যলাভের আশায় তাকে চলে যেতে হ'ল সমুদ্রের পারে।

মহাকালের অনুশাসনে একে একে কুলামাত্য ধর্ম্মপাল পদ্মোদ্ভব এবং সিতবর্ম্মাকে চলে যেতে হল স্বর্গধামে। তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের চারটি পুত্র কুলামাত্য-পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রইলেন।

কিছু দিন গত হয়েছে। মধ্যে মগধরাজ্যে অবিশ্রান্ত চলেছিল যুদ্ধের আয়োজন, অস্ত্র-সংগ্রহ। রাজন্যেরা অদ্ভুত নৈপুণ্যের সঙ্গে কত যে বিচিত্র মহদস্ত্র রচনা করে ফেলেছিলেন তারও ইয়ত্তা নেই। সেই সব মহদায়ুধ রাজন্যদের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে, চতুরঙ্গবল সঙ্গে নিয়ে, যেন শেষনাগের ফণা কাঁপিয়ে হঠাৎ একদিন মগধনায়ক শ্রীরাজহংস সংগ্রামাভিলাষে রূঢ়রোষে বেরিয়ে পড়লেন; হেলাভরে আক্রমণ করলেন মালবনাথ মানসারকে। হ্যাঁ, মানসারই বটে। উৎকট মান ছাড়া আর কিছু কি সার রয়েছে তাঁর? হঠাৎ উঠল রণভেরীর ঝঙ্কার—সমুদ্রগর্জ্জনের চেয়েও ভীষণগম্ভীর সেই ঝঙ্কারের অহঙ্কার। সেই হঠ-নির্ঘোষের ধ্বনি শুনে ভয়ে উচ্চণ্ড হয়ে উঠল দিক্‌হস্তীদের বলয়। কিন্তু মালবনাথ মানসার হটে যাবার পাত্র নন। নব নব অভিযানে তিনিও বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছিলেন—অতৃপ্ত থাকত তাঁরও যুদ্ধ-দোহদ। অসংখ্য হস্তীসেনার শিরোভাগে মূর্ত্তিমান সংগ্রামের মত সাগ্রহে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

দুই সেনা যখন মিলিত হ'ল রণস্থলে রণসম্মর্দে, তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব এবং আমি মনে করি সঙ্গে সঙ্গে অবান্তর। কাব্য হিসাবে শুধু বলতে পারি—সেই শস্ত্রের উপর শস্ত্র, সেই হস্তের উপর হস্ত, সেই সংগ্রাম, সেই সংঘর্ষধ্বনির উপরে, সেই সৈন্যমৃত্যু-বাহুল্যের মধ্যে, কবির চোখে পড়েছিল একখানি দেবচারী পথ, —রথ-তুরগ-খুর-ক্ষুণ্ণ পৃথিবীর উৎসারিত ধূলায় আকুল সেই পথ—; এবং সেই দেবচারী পথে ধূলি-যবনিকার অন্তরালে দাঁড়িয়েছিলেন নব-বল্লভের বরণ-মাঙ্গলিক নিয়ে দিব্যকন্যাদের মধুসজ্জ।

শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় হ'ল মালবরাজ মানসারের। ক্ষীণ হয়ে গেল তাঁর সৈন্যবল। মানসার ধরা পড়লেন—মগধরাজ রাজহংসের মুঠোর মধ্যে এল তাঁর জীবন। কিন্তু মগধরাজ—আদিম দয়ার যিনি গুণগ্রাহী, শত্রু মানসারকে প্রতিষ্ঠাপিত করে দিলেন মালবরাজ্যেতেই।

শান্তি এল নিখিল রাজত্বে। রত্নাকর-মেখলা এই নিখিল পৃথিবী রাজহংসের এখন আয়ত্তাধীন।

কিন্তু রাজহংসের সন্তান ছিল না। তাই তিনি তাঁর মনপ্রাণ সমর্পণ করে দিলেন সমর্চ্চনায়,—একমাত্র যিনি কারণ—সেই নারায়ণের অর্চ্চনায়।

দুঃখের পরে সুখের মত একদা তাঁর অগ্রমহিষী বসুমতী —ভোর হয় হয় এমন সময়ে স্বপ্ন দেখলেন—কে যেন তাঁকে বলছে—"নাও, নাও এই কল্পবল্লীর ফল।" রাজহংসের কামনা-পুঞ্জের ফলের মতই বসুমতীর হ'ল গর্ভসঞ্চার। সারা রাজত্বে আনন্দ যেন আর ধরে না। খুলে গেল যেন ইন্দ্রের ভাণ্ডার। যেখানে যে আছে সুহৃৎ, যেখানে যে আছে রাজন্, সবাই আহূত হলেন। আনন্দিত আমন্ত্রণের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেল মহারাণীর সীমন্তমহোৎসব।

একদা সভায় সিংহাসনে সমাসীন রয়েছেন গুণাধীশ রাজহংস এবং তাঁকে বেষ্টন করে রয়েছেন সুহৃদ্‌রা, মন্ত্রিপুত্রেরা এবং পুরোহিতেরা,—এমন সময় দ্বারপাল ললাটে বদ্ধাঞ্জলি ন্যস্ত করে নিবেদন করল—"হে দেব, মহারাজের দর্শন-কামনায় জনৈক সাধু দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি পূজার্হ।"

অনুমতি এল। সেই সংযমী সাধু নীত হলেন রাজসমক্ষে সভায়। সেই সাধুটিকে আসতে দেখেই রাজহংস তখনি বুঝে নিলেন সমস্ত ব্যাপার। ইঙ্গিতে অন্তর্হিত হল সমস্ত অনুচর। কেবল সভায় রইলেন মন্ত্রীরা। সাধুটি আর কেউ নয়—ছদ্মবেশী এক গুপ্তচর। তার প্রণাম শেষ হলে মৃদু হেসে তাঁকে রাজহংস জিজ্ঞাসা করলেন "ওহে তাপস, দেশ-দেশান্তর ত তুমি ঘুরে এলে ছদ্মবেশে; কী সংবাদ সংগ্রহ করে আনলে?—দ্বিধা কোরো না বলতে।"

গুপ্তচরের ভ্রূ বঙ্কিম হয়ে গিয়ে ললাটে ফুটিয়ে তুলল একটি চিন্তার রেখা। অঞ্জলি রচনা করে সে বললে, "মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য করে—এই নির্দ্দোষ তাপসবেশের সাহচর্য্যে—আমি মালবেন্দ্রনগরে প্রবেশ করি। সেখানে অধিকতর গুপ্তভাবে অবস্থান করে, আমি মালবরাজের জ্ঞাতব্য যাবতীয় বৃত্তান্ত ভাল করে জেনে নিয়ে ফিরে এসেছি। মানী মানসার পরাজয় স্বীকার করে অত্যন্ত নৈরাশ্যের ভিতর দিয়ে কাল কাটাচ্ছিলেন; দেহের সমস্ত কষ্ট মন থেকে নির্দ্দয়ভাবে দূর করে দিয়ে মহাকাল-নিবাসী কালী-বিলাসী অনশ্বর মহেশ্বরের আরাধনায় এত কাল ছিলেন মগ্ন। তপঃপ্রভাবে এত দিনে তিনি সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন মহেশ্বরকে। ফলে, তিনি লাভ করেছেন "বীরারাতিঘ্নী" এক ভয়ঙ্করী গদা। গদা লাভ করে মানসার এখন নিজেকে বিবেচনা করেছেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি মহা অভিমানের বশবর্ত্তী হয়ে আপনার বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য বিপুল উদ্যোগে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এখন মহারাজ যা ভাল বিবেচনা করেন।"

মন্ত্রণার পরে মন্ত্রীরা স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেন, মহারাজকে উপদেশ দিলেন :

"মহারাজ, দৈববশে বলী হয়ে শত্রু আক্রমণের চেষ্টা করছে। দেবতা যেখানে সহায়, মানুষ সেখানে নিরুপায়। আমাদের পক্ষে যুদ্ধসংসর্গ এখন যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচনা করি না। সহসা দুর্গ-সংশ্রয়ই বিধেয়।"

মন্ত্রিগণ রাজহংসকে অনেক বোঝালেন, কিন্তু অথর্ব্ব-গর্ব্বভরে রাজহংস অগ্রাহ্য করলেন তাঁদের উপদেশ। আদেশ দিলেন—'রণসজ্জা', 'প্রতিযুদ্ধ'।

এদিকে মানসার নীলকণ্ঠদত্ত 'বীরারাতিঘ্নী' গদার আনুকূল্যে রণসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে অক্লেশে প্রবেশ করলেন মগধরাজ্যে।

মানসারের অভিযান এবং তার অসন্দিগ্ধ বার্ত্তা শ্রবণ করে রাজপুরীতে মন্ত্রীরা অবহিত হয়ে উঠলেন। ভূমহেন্দ্র মগধেন্দ্রকে তাঁরা অনেক করলেন অনুনয়।—শান্ত করতে পারলেন না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রাজকুলের তাঁরা একটি উপকার করতে পেরেছিলেন। শত্রু যেখানে প্রবেশ করতে পারে না, সেই হেন বিন্ধ্যাটবীর নিরাপত্তার মধ্যে তাঁরা মূলসৈন্যবলের সাহচর্য্যে সরিয়ে দিলেন শ্রীরাজহংসের অবরোধ—মহিষী, সন্তান-সন্ততি।

দৈবের দিব্যাস্ত্রের সম্মুখেও অপরাজিত রইল রাজহংসের চিত্ত; অপরাজিত অদীন রইল সৈন্যদের আগ্রহ; মৃত্যুর প্রশস্ততার মধ্য দিয়ে তারা তীব্রগতিতে অতিরোধে রুদ্ধ করল শত্রুর অভিযান। তার পরে ঘটে গেল আশ্চর্য্য এক যুদ্ধ! দেবরাজ ইন্দ্রের মত যুদ্ধ করতে লাগলেন রাজহংস; বিচিত্র আয়ুধের এবং বাণের স্থিরমুক্তি সত্ত্বেও জয়াকাঙ্ক্ষী মালবরাজকে তিনি বাহত করতে পারলেন না। নীলকণ্ঠদত্ত বীরারাতিঘ্নী গদা মানসারের হাত থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে প্রচার করে দিল মহেশ্বরের শাসনের অবন্ধ্যতা। মৃত্যু হল রাজহংসের রথের সারথির এবং রাজহংস হলেন সংজ্ঞাহীন। তাঁর রথের তুরঙ্গ দল—মুখে বলগা নেই, অক্ষত তাদের অঙ্গ, মূর্চ্ছিত রাজহংসকে বহন করে দৈবগতিকে প্রবেশ করল সেই মহারণ্যে সেই বিন্ধ্যাটবীতে, যেখানে স্থাপিত হয়েছিল রাজার অবরোধ।

জয়লক্ষ্মী বরণ করে নিলেন মালবেন্দ্ররাজকে। মানসার প্রবেশ করলেন পুষ্পপুরীতে, প্রজা এবং দেশ অবনত হয়ে স্বীকার করল তাঁর প্রভুত্ব।

এদিকে রাজা রাজহংসের রণক্লান্ত অমাত্যেরা—যাঁরা কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন—তাঁরা—রাত্রি শেষের বাতাসে সংজ্ঞালাভ করে কোনমতে আশ্বস্ত হয়ে চতুর্দ্দিকে খুঁজতে লাগলেন রাজহংসকে। কিন্তু কোথাও তাঁর খোঁজ পাওয়া গেল না। মাথা নীচু করে দীনের মত অমাত্যেরা উপস্থিত হলেন রাণী বসুমতীর নিকটে। তাঁদের মুখে নিখিল সৈন্যক্ষতি এবং রাজহংসের অদৃশ্য হওয়ার বার্ত্তা শ্রবণ করে বসুমতী মুখ ফুটে কোনো কথা বলতে পারলেন না। শোকের তরী তলিয়ে গেল পাথারে। তিনি স্থির করলেন "স্বামীর অনুমরণ—এই স্ত্রীর ধর্ম্ম।"

ভাবণের ভূষায় শীর্ণযুক্তিগুলিকে ভূষিত করে, অনেক মিনতি, অনেক অনুনয়ের শেষে অমাত্য এবং পুরোহিতেরা বললেন—

"কল্যাণি, মহারাজ রাজহংসের মৃত্যু এখনও অনিশ্চিত। তার উপর আর একটি সংবাদ আপনাকে জানাবার রয়েছে। দৈবজ্ঞেরা আমাদের জানিয়েছেন—অদূর ভবিষ্যতে আমাদের রাজবংশে শ্রীরাজহংসের ঔরসে ও আপনার গর্ভে যে সুকুমার কুমার জন্মগ্রহণ করবেন, সেই কুমারই একদা উদ্ধত শত্রুদের মথিত করে সার্ব্বভৌম নরপতিত্ব লাভ করবেন। সুতরাং এখন আপনার অনুসরণের অভিলাষ, আমাদের মতে, অনুচিত।" তাঁদের শেষ যুক্তি কর্ণে গ্রহণ করলেন রাণী বসুমতী, কিন্তু যেন মূর্চ্ছার মধ্য দিয়ে; কোনো কথা বললেন না, স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

তার পরে রাত্রি এল। রাত্রির অর্দ্ধেক যখন অতিবাহিত হয়ে গেছে, নিদ্রায় নিলীন হয়ে রয়েছে পরিজনদের নেত্র, সেনানিবাশে শব্দের লেশমাত্র নেই কোথাও, চারিদিকে কেবল বিরাজ করছে একখানি অনাবিল বিজনতা, রাণী বসুমতী নূপুরহীন-পদ-সঞ্চারে বেরিয়ে এলেন অবরোধের মধ্য থেকে। নিকটেই দীর্ঘ শাখা বিস্তার করে দাঁড়িয়েছিল একটি বিজন বট। মৃতি-রেখার মত বটের সেই শাখা। সেই শাখায় নিজের উত্তরীয়ার্ধ বন্ধন করে, মৃত্যুর পথ নিরঙ্কুশ করলেন। কিন্তু তখনি চলতে পারলেন না সেই পথে। কেঁদে ফেললেন, গুমরে গুমরে কাঁদতে লাগলেন। বিলাপের মত ভাঙা ভাঙা কথা, কণ্ঠের মাধুরীকে নীরস করে দিয়ে, বেরিয়ে আসতে লাগল;—শোনা গেল,—

"একদিন ফুলের ধনুক নিয়ে লাবণ্যের কন্দর্পের মত তুমি এসেছিলে—আজ বিদায়ের সময়—দেখা হ'ল না—জন্মান্তরে যেন তেমনি করেই তোমায় পাই।"

কিন্তু যে বটতরুর তলদেশে এই মৃত্যুপ্রবন্ধ চলেছিল, রাণী বসুমতী জানতেন না—সেইখানেই ভাগ্যদেবের লীলায়, পলায়নপর তুরঙ্গেরা মহারাজ রাজহংসের সংগ্রামরথখানিকে বহন করে নিয়ে এসেছিল এবং সেইখানেই চন্দ্রদেবের শীতল কিরণের সুখস্পর্শে জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলেন মহারাজ শ্রীরাজহংস, যদিও প্রচুর রক্তক্ষরণে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাঁর আঙ্গিক সমস্ত চেষ্টা। রাণী বসুমতীর বিলাপ শুনেই রাজহংস বুঝতে পারলেন—কার এই কণ্ঠস্বর! তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় হ'ল। তার পর নিত্যকালের আদরের আহ্বানখানি—তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে গেল—মর্ম্মের দিকে বসুমতীর। চমকে উঠলেন বসুমতী। দৌড়ে এলেন। দেখতে পেলেন।

একেই কি বলে আনন্দ? এই-ই কি সেই আনন্দ, যা দুঃখঝঞ্ঝার মধ্যেও ফুটন্ত পদ্মের একখানি ছবি এঁকে দিয়ে যায় মুখে? ভুল করেও আর পড়ছে না তো চোখের পলকখানি? চোখ দিয়ে দেখা নয়—এ যেন চোখের মধুপান! কণ্ঠ আপনা হতেই তার ধর্ম্ম-ধ্বনি উচ্চারণ করল।

অমাত্যেরা পুরোহিতেরা শুনতে পেলেন সেই ধ্বনি। দৌড়িয়ে এলেন তাঁরা। মহারাণী ও মহারাজকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ললাট দিয়ে তাঁরা ভজনা করলেন মহারাজের চরণপদ্ম, ভাষা দিয়ে তাঁরা প্রশংসা করলেন দৈবমাহাত্ম্য। অমাত্যেরা বললেন, "মহারাজ, নিশ্চয়, সারথির মৃত্যুর পরেই, রথ নিয়ে তুরঙ্গেরাই মহারাজকে অতিবেগে অরণ্যের মধ্যে নিয়ে এসেছে।"

রাজহংস তাঁদের বললেন, "সংগ্রামে আমার সমস্ত সৈন্য নিহত হয়েছে। শঙ্করদত্ত গদা নিক্ষেপ করে আমাকে নির্মম আঘাত

করেছিলেন মালবরাজ; আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ি। এখন এই নিশান্ত বাতাসে জ্ঞান ফিরে পেয়েছি।"

রাজহংসকে ফিরে পাওয়াতে মন্ত্রীরা বিবেচনা করলেন, 'দৈব এবার সুপ্রসন্ন হয়েছেন;—তাই তাঁরা যেন উৎসবের মধ্যে দিয়েই রাজাকে শিবিরে নিয়ে গেলেন। তাঁর অঙ্গ থেকে অশেষ শলাগুলিকে অতি যত্নে মুক্ত করে নেওয়া হ'ল এবং পরিজনদের মুখ-পদ্মে আনন্দ ফুটিয়ে রাজহংস হলেন ব্রণ-হীন।

শল্য এবং ব্রণের যাতনার লাঘব হ'ল বটে, কিন্তু বৃদ্ধি পেল মানসিক যন্ত্রণা। প্রতিকূল দৈবের ধিক্কারে ভেঙে পড়েছে যার পুরুষকার, তার কি বেঁচে থাকায় সুখ আছে? রাজহংসের সমস্ত শরীরের উপর অদ্ভুত একটি ছায়া পড়ল—দীনতার। দেবী বসুমতী তখন মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন এবং তাঁদের সম্মতি লাভ করে, স্থির করে ফেললেন সঙ্কল্প। শেষে রাজাকে বললেন—"দেব, ভূপালদের মধ্যে আপনি ছিলেন তেজোবরিষ্ঠ এবং গরিষ্ঠ। আজ আপনাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে বিন্ধ্যবনের বিজনতা। সম্পদ্ বুদ্‌বুদের মত,—বিদ্যুতের লতার মত, উদয়েই তার বিনাশ। সেইজন্যেই আমি বলি;—সমস্ত কিছুই দৈবায়ত্ত এই বিবেচনা করে যা করণীয় এখন তা করা উচিত। পুরাকালের রামচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র,—তাঁরা বিরাট বিরাট রাজা ছিলেন—ঐশ্বর্য্যে তাঁরা ইন্দ্রের উপমেয় ছিলেন। কিন্তু তাঁদেরও প্রথমে ভোগ করতে হয়েছিল—বিশেষরূপে—দৈবতন্ত্র দুঃখযন্ত্র। পরে তাঁরা রাজ্যসুখ ভোগ করেন। আপনারও তাই হবে। কিছুকাল দৈব-সমাধি বিরচন করে মানসিক ব্যথাটিকে দূর করে দিন।"

রাজহংস তখন সকলের অনুমতি নিয়ে নিজের ইষ্টসাধনের উদ্দেশ্যে একদা উপস্থিত হলেন তপস্যারত তপোধন বামদেবের কুটীরে। বামদেবকে প্রণাম করে গ্রহণ করলেন তাঁর আতিথ্য; নিজের দুঃখের কাহিনী নিবেদন করলেন তাঁর কাছে। আশ্রমের অপূর্ব্ব শান্তির মধ্যে কিছুকাল বিশ্রাম নিয়ে দূর করলেন শ্রান্তি। কারোর সঙ্গে বেশী কথা বলতেন না। কিন্তু মন থেকে কিছুতেই বিদায় নিতে চায় না রাজ্যাভিলাষ। ভুলতে পারেন না যে, তিনি সোমকুলাবতংস রাজহংস। শেষে একদিন মুনিবরকে বললেন,—

"ভগবন্, প্রবল দৈববলে বলী হয়ে মানসার আমাকে পরাস্ত করেছে। আমার রাজ্য সে করছে উপভোগ। তার মতই উগ্র তপস্যা বিরচন করে ঐ শত্রুকে আমি ধ্বংস করব, উচ্ছেদ করব। এখন লোক-শরণ্য আপনার কারুণ্যই আমার সম্বল। সেইজন্যেই আপনার মত নিষ্ঠাবানের কুটীরে আমার আগমন।"

ত্রিকালজ্ঞ তপোধন উত্তর দিলেন—

"সখে, তপস্যায় তোমার প্রয়োজন নেই; শরীরকে কৃশ করা ছাড়া অন্য কোনো উপকারেই লাগবে না তোমার এই তপস্যা। রাণী বসুমতীর গর্ভে তোমার যে পুত্র রয়েছে সে শীঘ্রই জন্মগ্রহণ করবে। সেই মর্দ্দন করবে-শত্রু। তাই বলি, কিছুকাল এখন তুষ্ণী অবলম্বন করে অবস্থান কর।"

বামদেবের বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে সহসা উত্থিত হল এক গগনচারিণী বাণী—"বাক্য সত্য, সত্য।"

শুভমুহূর্ত্তে পূর্ণগর্ভা রাণী বসুমতী প্রসব করলেন সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত একটি পুত্রসন্তান। ব্রহ্মকান্তি পুরোহিতদের বিধানানুযায়ী রাজহংস কুমারের জাতসংস্কারাদি ক্রিয়া করলেন সম্পন্ন; এবং অলঙ্কার ও সাজসজ্জা পরিয়ে আনন্দের ভিতর দিয়ে পুত্রের নামকরণ করলেন "রাজবাহন"।

সেই সময়ে রাজহংসের চারজন মন্ত্রী, যথা, সুমতি, সুমন্ত্র, সুমিত্র ও সুশ্রুত—তাঁদেরও যথাক্রমে দীর্ঘায়ুঃ চারটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করল। তাদের নাম,—প্রমতি, মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত ও বিশ্রুত। নতুন-জাগা চাঁদের মত তাদের দেখতে।

শৈশবক্রীড়া ও চাপল্যের রঙ্গমঞ্চে, রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্রদের মধ্যে বন্ধুত্বের সুখাভিনয় চলতে লাগল।

দুঃখসুখের মধ্য দিয়ে এই রকম করে বৎসরের পর বৎসর কেটে যায়। এমন সময় একদিন রাজহংসের সভায় উপস্থিত হলেন বৃদ্ধ এক তাপস। তাঁর সঙ্গে সুকুমার একটি কুমার। দেখলেই চোখে আনন্দ জাগে। আবার তার উপর কুমারটির অঙ্গে রাজলক্ষণ!। রাজা রাজহংসের হস্তে তাকে সমর্পণ করে তাপস স্নেহকাতর-কণ্ঠে বললেন, "রাজন্, অদ্ভুত এক ঘটনা!"

কিছু দিন পূর্ব্বে আমি কুশ সমিৎ ইত্যাদি আহরণের জন্যে একদিন এক গুল্মাকীর্ণ অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করেছি, এমন সময় হঠাৎ আমার চোখে পড়ল—একটি স্ত্রীলোক কাঁদছে, টপ্‌টপ্ করে চোখ দিয়ে ধারা ঝরছে—সঙ্গে কেউ নেই, নিতান্ত অনাথা। নির্জ্জন বনের মধ্যে কেন কাঁদছ—এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে কোনরকমে হাত দিয়ে চোখের জল মুছে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে—

'মুনিবর, মিথিলানায়ক আমার প্রভু। তাঁর কীর্ত্তির কথা দেবতারাও জানেন। তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধু মগধরাজের রাজধানী পুষ্পপুরীতে গিয়ে ছিলেন পরিবারবর্গ নিয়ে। সীমন্তিনী বসুমতীর তখন সীমন্তমহোৎসব। কিছু দিন সেখানে আমরা আছি—এমন সময় শঙ্করের বরে দৃপ্ত হয়ে মালবনাথ আক্রমণ করেন মগধনাথকে। ভীষণ যুদ্ধ হয়। আমাদের মিথিলানাথ মগধরাজের সাহায্য করেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও মালবনাথ জয়যুক্ত হন, আটক করেন আমাদের মিথিলানাথকে। শেষে বিজয়ী মানসারের কারুণ্য এবং নিজ পুণ্যের দাক্ষিণ্যে কোনক্রমে মুক্তিলাভ করে আমাদের মিথিলানাথ হতাবশেষ সৈন্য নিয়ে মিথিলার দিকে অগ্রসর হন। দুর্গম অরণ্যপথে সামান্য লোকবল নিয়ে তিনি চলেছেন এমন সময় হঠাৎ তাঁকে আক্রমণ করে মহাবল শবরেরা। মূল সৈন্যবল মহারাজের অবরোধটি রক্ষা করছিল বটে, কিন্তু চতুর্দ্দিক থেকে আক্রান্ত হওয়াতে তাঁকে সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে পালাতে হয়। আমি তাঁরি দুটি পুত্র-সন্তানের ধাত্রী। আমার মেয়েটিকে এবং কুমার দুটিকে সঙ্গে নিয়ে আমি মহারাজের অনুসরণ করি কিন্তু তাঁর গতির সঙ্গে চলে উঠতে পারলুম না। পিছিয়ে পড়লুম সেই জনহীন অরণ্যে। দৈবের দুর্বিপাক যখন আসে তখন এমনি করেই আসে। হঠাৎ দেখি সেই অরণ্যপথের মধ্যে একটি বাঘ দাঁড়িয়ে রয়েছে;—রূপ-ধরা যেন চণ্ডরোষ! বিকট হাঁ করে আমাদের উপর লাফিয়ে পড়ে। প্রাণ-ভয়ে আমি দৌড়তে গিয়ে প্রকাণ্ড একটা পাথরে হোঁচট্ খেয়ে নীচে পড়ে যাই। আমার হাত থেকে ফস্কে গিয়ে মিথিলারাজের

একটি ছেলে নীচে গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্য্য! সেখানে ছিল একটা মরা গরুর শব। তারি কোলের মধ্যে শিশুটি গড়িয়ে গিয়ে পড়ে, আশ্রয় পায়। বাঘ লাফিয়ে পড়ে সেই মরা গরুটার উপর। গোঁ গোঁ করে যেই বাঘ মরা গরুটাকে টানাটানি করতে যাবে অমনি কোথা থেকে দেখি একটা বাণ ছুটে এসে বাঘটার বুকে বিঁধল। সেখানে বাঘ-মারা বাণ-যন্ত্র পাতা ছিল—তাতেই রক্ষে! বাঘটা তো মরল, কিন্তু শবররা চক্ষের নিমেষে সেখানে উপস্থিত হয়ে গেল। বালকটিকে নিয়ে—আহা, কি সুন্দর কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো তার চুল—আমার চোখের সামনে দিয়ে উধাও হয়ে গেল। অন্য কুমারটিকে নিয়ে আমার মেয়েও যে তখন কোথায় অন্তর্ধান হয়েছে জানি না। আমি তখন অজ্ঞান। জ্ঞান হতে দেখি আমার কাছে একটি রাখাল দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই-ই দয়া করে আমাকে নিয়ে যায় তার নিজের কুটীরে। ক্ষত ধুইয়ে দেয়। এখন কিছু সুস্থ হয়েছি। আমি চলেছি মিথিলাপতির কাছে। কি যে করব জানি না, আমার মেয়েই বা কোথায় গেল তাও জানি না।'

এই বলে মহারাজ, সেই স্ত্রীলোকটি কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়।

দুঃখ হ'ল। আমি চিন্তিত হয়ে পড়ি। চিন্তা করে দেখলুম—মিথিলারাজ আপনার মিত্র। এই ঘোর বিপদের দিনে তাঁর বংশের অঙ্কুর বিনষ্ট হয়ে যাবে—এই চিন্তাই আমাকে বেশী কষ্ট দিতে লাগল। খুঁজতে বেরলুম। শেষে একটি সুন্দর চণ্ডিকামন্দিরে এসে উপস্থিত হই। কিরাতেরা দেখি, যুদ্ধে সাফল্যলাভের উদ্দেশ্যে দেবীর উপহারস্বরূপে একটি শিশুকে বলি দিতে নিয়ে এসেছে; এসে জড় হয়েছে চণ্ডিকামন্দিরে; তাদের মধ্যে তখন তর্ক চলেছে কি ভাবে বলি দেওয়া যায়!—গাছের ডাল থেকে ঝুলিয়ে খড়্গ দিয়ে কাটা, না, বালিমাটিতে গর্ত্ত খুঁড়ে তার মধ্যে কোমর পর্য্যন্ত পুঁতে তাগ করে বাণ দিয়ে বেঁধা, না, ওকে পালাতে দিয়ে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো।

আমি তাদের এই সব কথার মধ্যে বললুম, 'কিরাত-শ্রেষ্ঠ, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ভীষণ অরণ্যের মধ্যে পথ ভুলে গিয়েছিলুম। আমার ছোট্ট ছেলেটিকে গাছের ছায়ায় রেখে পথ খোঁজবার জন্য একটু এগিয়ে গিয়েছিলুম। সামান্য ক্ষণ। ফিরে এসে আর তাকে দেখতে পাই না। কোথায় গেল, কেই বা নিয়ে গেল—অনেক খুঁজেও বার করতে পারছি না।

'অনেক দিন হল, তার মুখ দেখিনি। কি যে করব ভেবে কূল পাচ্ছি না। কোথায়ই বা যাব? তোমরা কি তাকে কেউ দেখেছ?' কিরাতশ্রেষ্ঠ তখন বললে, 'ব্রাহ্মণ, একটি ছেলেকে আমরা পেয়েছি। এখানেই আছে। দেখুন ত এইটিই কি আপনার সেই ছেলে?—আচ্ছা! তাই না কি? চোখের মণি? তবে নিয়ে যান একে'—।

মহারাজ, একেই বলে—দৈব। কিরাতদের আশীর্ব্বাদ দিয়ে শিশুটিকে কাছে টেনে নিলুম। মুখে চোখে মাথায় ঠাণ্ডা জল দিয়ে ওকে আশ্বস্ত করে শঙ্কাহীন চিত্তে চণ্ডিকামন্দির থেকে বেরিয়ে পড়ি। সেই বালকটিকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। আপনি এর পিতৃস্থানীয়—একে আশ্রয় দিন। দীর্ঘায়ুঃ হোক্।"

মিথিলানাথ রাজহংসের সুহৃদ্। তাঁর বিপদে শোকে মুহ্যমান হয়েছিলেন রাজহংস এতদিন। কিন্তু এখন হঠাৎ তাঁর পুত্রটিকে দেখে বিষাদের মধ্যেও একটু সুখ পেলেন। শোকটিকে ঠোঁটের মধ্যে চেপে রেখে তিনি বালকটির নামকরণ করলেন "উপহারবর্ম্মা"।

স্নেহে উপহারবর্ম্মা লাভ করল রাজবাহনের সমকক্ষতা।

আর একদিন। শ্রীরাজহংস শবর-পল্লীর সমীপস্থ পথ দিয়ে তীর্থস্নানে চলেছেন, এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল, একটি শবরী। তার কোলে অনুপম-শরীর একটি শিশু। কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভামিনি, ভারী সুন্দর ছেলেটি তো? অঙ্গে রাজ-চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। তোমার গোত্র-সন্তান বলে তো মনে হয় না? আমাকে সত্য করে বল, এই নয়নানন্দটি কার, কেনই বা এর এমন দীনবেশ, কেমন করেই বা তোমার হাতে এসে এ পড়ল?"

রাজাকে প্রণাম করলে শবরী। গোপন না করে সহজভাবেই বললে—"রাজন্, মিথিলেশ্বর যখন আমাদের পল্লীর নিকটে এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে শবরসৈন্যেরা। আমার স্বামী এই শিশুটিকে অপহরণ করে নিয়ে আসেন, আমাকে সঁপে দেন। আমার কাছেই এ মানুষ হচ্ছে।"

শবরীর কথা শুনে রাজার স্মরণে পড়ল সেই মুনিকথিত দ্বিতীয় রাজকুমারের কথা। স্থির বিশ্বাস হ'ল। সাম এবং দানের দ্বারা শবরীকে আপ্যায়িত করে শিশুটিকে নিয়ে এলেন। নাম রাখলেন "অপহারবর্ম্মা"। দেবী বসুমতীর হাতে সমর্পণ করে দিয়ে বললেন, "মানুষ কর"।

কিছু দিন যেতে না যেতেই আবার একটি বালক! বামদেবের শিষ্য সোমদেব শর্ম্মা রাজার সম্মুখে একটি বালককে নিয়ে এসে উপস্থিত। মহারাজ আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেলেন। সোমদেব বললেন—

"মহারাজ, আশ্চর্য ব্যাপার! রামতীর্থে স্নান করে ফিরে আসছি, হঠাৎ দেখি, কাননের এক প্রান্তে একটি জীর্ণা স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে, আর তার কোলে সদ্যজাত এই জ্বলজ্বলে ছেলে। 'বৃদ্ধা, কেন বনের মধ্যে এই ছেলেটিকে নিয়ে এত কষ্ট করে ঘুরছ'—এই কথা সাদরে জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্লে, 'মুনিবর, আপনি বোধ হয় বৈশ্যশ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য কালগুপ্তের নাম শুনেছেন, যিনি কালযবন দ্বীপে থাকেন। এই (ভারত বা জম্বু) দ্বীপ থেকে মগধরাজের মন্ত্রীর পুত্র—"রত্নোদ্ভব" তাঁর নাম—সারা ভুবন ঘুরতে ঘুরতে বাণিজ্যের জন্যে সেই দ্বীপে গিয়ে পৌছোন। কালগুপ্তের মেয়ে সুবৃত্তাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। অনেক যৌতুক লাভ করেন। নতাঙ্গীর গর্ভসঞ্চার হয়। রত্নোদ্ভব নিজের সহোদরদের দেখবার কুতূহলে অনেক কষ্টে শ্বশুরের অনুমতি গ্রহণ করে শেষে একদিন সুবৃত্তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রবহণে আরোহণ করে পুষ্পপুরী যাত্রা করেন। কিন্তু এমনি ভাগ্য! সমুদ্রে ঝড় এল, ঢেউএর উপর ঢেউ, ভেঙে পড়ল পোত, তলিয়ে গেল সমুদ্রের অতল জলে। গর্ভবতী সুবৃত্তার আমি ধাত্রী ছিলুম। একটা কাঠের ফলক ভেসে যাচ্ছিল,—সুবৃত্তাকে নিয়ে সেইটিতে কোনরকমে উঠি এবং দৈবগতিকে ভাসতে ভাসতে তীরে এসে লাগি। রত্নোদ্ভব আর তাঁর বন্ধুরা সমুদ্রে তলিয়ে গেছেন অথবা অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করে তীরে এসে পৌঁছেছেন কিনা কিছুই জানি না। আজ এই বনের মধ্যে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করতে করতে সুবৃত্তা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন। নির্জ্জন বনের

মধ্যে থাকা অসম্ভব, কোথাও কাছে কোনো লোকালয় আছে কিনা খুঁজে বার করতেই হবে, অথচ কচি শিশুকে ফেলে রেখে কোথাও যাওয়া যায় না—তাই হতবুদ্ধি হয়ে শেষে স্থির করি—নাঃ, শিশুটিকে কোলে নিয়েই খুঁজি। শিশুটিকে নিয়ে কিছু দূরে তাই আমি এগিয়ে এসেছি।"

এইরকম কথাবার্ত্তা হচ্ছে, এমন সময় মহারাজ হঠাৎ দেখি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রকাণ্ড বন্য হস্তী। তাকেও দেখা, আর সঙ্গে সঙ্গে ধাত্রীর হাত থেকে ঘাসের উপর খসে পড়ে যায় কচি শিশু। নিকটেই একটি লতাগুল্ম ছিল। তার মধ্যে আমিও ত্রস্ত হয়ে প্রবেশ করি। কি হয়, কি হয়! তারপর, মহারাজ, যা দেখলুম তা এক ভয়ানক কাণ্ড! দেখি বন্য হস্তী শুঁড় দিয়ে যেই বাচ্ছাটিকে তুলে নিয়েছে—যেমন সে তুলে নেয় একখানা ঝরা পাতা—অম্নি কোথা থেকে তার কুম্ভে লাফিয়ে পড়ল একটা বিরাট সিংহ। কী ভীষণ তার গর্জ্জন! কেঁপে উঠল কানন। ভীত হস্তী আকাশে ছুঁড়ে ফেলে দেয় শিশুটিকে। কিন্তু, মহারাজ, বলতেই হবে—শিশুটি দীর্ঘজীবী হবে। গাছের ডালে একটি বানর বসেছিল—সে টপ করে, বোধ হয় পাকা ফল ভেবে, বাচ্ছাটিকে লুফে নেয়। পরক্ষণেই দেখলুম—ফল নয় দেখে বাচ্ছাটিকে গাছের প্রশস্ত স্কন্ধমূলে রাখল। রেখেই মর্কটটা পালাল। আমি তো ভয়ে অর্ধমৃত। দেখছিই তো দেখছি! নিশ্চয়ই শিশুটি সত্ত্বসম্পন্ন, তাই এত কষ্ট সহ্য করতে পেরেছিল! সিংহও হস্তীটাকে বধ করে ধীরে ধীরে বনের মধ্যে চলে গেল। তখন আমি লতাগৃহ থেকে বেরিয়ে এসে সোজা উঠে গেলুম গাছের উপরে। তেজঃপুঞ্জ বালকটিকে নামিয়ে নিয়ে বনান্তরে অন্বেষণ করেও যখন সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখতে পেলুম না, তখন আশ্রমে ফিরে এসে গুরুদেব শ্রীবামদেবের পাদপদ্মে রাখি। তাঁরি আদেশে আপনার কাছে আজ এই বালকটিকে আমার নিয়ে আসা।"

সমস্ত সুহৃদদের উপর একই রকম দৈবানুকূল্য দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন রাজহংস। কিন্তু তাঁর মন কেবল বলতে লাগল—রত্নোদ্ভবের তাহলে কি হ'ল! কি হ'ল!

বালকটির নাম রাখলেন "পুষ্পোদ্ভব"। সুশ্রুতকে আহ্বান করে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে মহারাজ তাঁর হাতে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে সমর্পণ করে দিলেন।

এবার কিন্তু অন্যরকম। একটি বালককে বুকে ক'রে রাণী বসুমতী নিজে রাজহংসের নিকট উপস্থিত হলেন। 'এটিকে আবার কোথায় পেলে'—এই বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে মহারাণী বললেন, "আর্য্য, ভয়ানক আশ্চর্য্য! রাত্রি তখন শেষ হয়ে আসছে—আমি গভীর নিদ্রায় মগ্ন; হঠাৎ মনে হ'ল কে আমাকে জাগাচ্ছে। চেয়ে দেখি, স্বর্গের একটি দিব্য মেয়ে,—চোখ ঝলসে যায়—এমন রূপ—আমার সামনে এই বালকটিকে রেখে বিনয়মধুর কণ্ঠে বলছেন, 'দেবি, আপনাদের মন্ত্রী ধর্ম্মপালের পুত্র কামপালের আমি বল্লভা, যক্ষকান্তা। মণিভদ্রের আমি নন্দিনী—"তারাবলী"। আপনার পুত্র রাজবাহন যথাসময়ে এই সমুদ্রবলয়িত-পৃথ্বীর অধীশ্বর হবেন—এই কথা জেনে এবং যক্ষেশ্বরের অনুমতি নিয়ে আমি আমার এই পুত্রটিকে আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। এ পরিচর্য্যা করবে বিশুদ্ধ-যশোনিধি রাজবাহনের। আপনি একে মনের মত করে মানুষ করবেন।'

বিস্ময়ে আমার চোখ বুঝি ফেটে পড়ে! সবিনয়ে কিছু নিবেদন করতে যাব—এমন সময় তিনি মিলিয়ে গেলেন,—অন্তর্ধান হয়ে গেলেন—! যক্ষিণীর কি সুন্দর দুটি চোখ!"

মহারাজেরও বিস্ময়ের অন্ত রইল না; তার উপর কামপাল আবার যক্ষকন্যাকে বিবাহ করেছে! রঞ্জিতমিত্র মন্ত্রী সুমিত্রকে আহ্বান করে মহারাজ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র "অর্থপাল"কে তার হাতে তুলে দিলেন, সর্ব্ববৃত্তান্ত জানিয়ে।

তার পরের দিন—আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য!—বামদেবের আর একটি শিষ্য—সেই আশ্রমেই তিনি থাকেন—আর একটি সুন্দর কুমারকে মহারাজের সম্মুখস্থ করে বললেন—

"দেব, তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে কাবেরী নদীর তীরে বিলোল-অলক এই বালকটিকে একটি স্থবিরার ক্রোড়ে দেখতে পাই। স্থবিরাটি কাঁদছিল। এটি কে, এত কান্নার অর্থই বা কি—এই সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে সে প্রকাশ করে বলে, 'দ্বিজোত্তম, আমার শোকের কাঁটা আপনিই উৎপাটন করতে পারবেন। শুনুন। মহারাজ রাজহংসের মন্ত্রী সিতবর্ম্মার কনিষ্ঠপুত্র সত্যবর্ম্মা তীর্থভ্রমণ করতে করতে এই দেশে আসেন। তিনি এই দেশের রাজার কাছ থেকে ব্রহ্মোত্তর জমি অগ্রহাররূপে (জায়গীর) পান। প্রথমে ব্রাহ্মণকন্যা কালীদেবীকে বিবাহ করেন, কিন্তু সন্তান না হওয়াতে তাঁরি ভগিনী কাঞ্চনকান্তি গৌরীদেবীকে পুনর্ব্বার তিনি বিবাহ করেন। গৌরীর এই ছেলেটি হয়, আমি এর ধাত্রী। কালীদেবীর হৃদয় কিন্তু ভরে গিয়েছিল অসূয়ার বিষে। ছল করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে এই ছেলেটিকে বাটী থেকে বার করে নিয়ে আসেন। তারপরে হঠাৎ আমার চোখের সামনেই, ছেলেটিকে ছুঁড়ে ফেলে দেন কাবেরীর জলে। আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। কিন্তু ঘটনা যখন ঘটে গেল তখন মুহূর্ত্তও স্থির থাকতে পারলুম না। আমিও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। এক হাতে ছেলেটিকে ধরলুম, অপর হাতে সাঁতার কাটতে লাগলুম। কিন্তু নদীর স্রোত বড় প্রখর ছিল। ভেসে যাচ্ছি। এমন সময় একটা গাছের ডাল হাতে এসে লাগল। ধরে ফেললুম। শিশুটিকে তার উপর শোয়ালুম বটে কিন্তু আমি কি জানতুম যে সেই ডালের উপরে একটি বিষধর সর্প রয়েছে? আমায় দংশন করে। তারপরে এইখানে তীরে এসে লেগেছি। বিষের জ্বালা আমার বাড়ছে। তাই কাঁদছিলুম,—আমার এই বোঝাটিকে কোথায় কার কাছে এই অরণ্যের মাঝে রেখে যাব? কার কাছে রেখে যাই?'

বলতে বলতে স্থবিরার ভাবান্তর লক্ষ্য করলুম। বিষের ক্রিয়া তখন বিশেষ আরম্ভ হয়েছে, জ্বালায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব শিথিল হয়ে আসছে। দেখতে দেখতে সেই স্থবিরা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মন্ত্র পড়ে বিষ নামাবার চেষ্টা করলুম কিন্তু ফল হ'ল না। ওষধি-বিশেষ যদি সমীপ-কুঞ্জে পাওয়া যায়—এই খোঁজে বেরিয়ে ফিরে এসে দেখি সব শেষ হয়ে গেছে। তার অগ্নিক্রিয়া করলুম। একবার মনে হ'ল ছেলেটিকে নিয়ে সত্যবর্ম্মার অগ্রহারে যাই। কিন্তু স্থবিরার কাছে সেই অগ্রহারের নামটি আমার জেনে নেওয়া হয়নি। বৃথা অন্বেষণ হবে—এই ভেবে, এবং মহারাজের অমাত্যতনয়ের মহারাজই অভিরক্ষিতা—মনে মনে এই আলোচনা করে, ছেলেটিকে নিয়ে সভায় এখন উপস্থিত হয়েছি।"

রাজহংস সবই বুঝলেন—সত্যবর্ম্মা কোথায় আছে—জানতে না পেরে মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু কি করবেন—নিরুপায়। শেষে মন্ত্রী সুমতিকে আহ্বান করে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র 'সোমদত্ত'কে তাঁর হাতে সঁপে দিলেন।

মহারাজের প্রসন্নতার স্নিগ্ধদৃষ্টিতে বাড়তে লাগল কুমারেরা।

শৈশবচাপল্যের অনাবিল উপভোগের মধ্য দিয়ে, কুমারমণ্ডলীর সম্মিলিত বন্ধুত্বে রাজকুমার রাজবাহন ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলেন। দশটি কুমারের চৌলক্রিয়া উপনয়নাদি সংস্কার সুসম্পন্ন হলে গেল। তারপরে সকলের এল শিক্ষার সময়। নিখিল-লিপিজ্ঞান, নিখিল-দেশীয় ভাষায় পাণ্ডিত্য, ষড়ঙ্গবেদ, কাব্য, নাটক, আখ্যান, আখ্যায়িকা, ইতিহাস, চিত্র, কথা এবং পুরাণগুলিতে অসামান্য নৈপুণ্য তাঁরা সকলেই অর্জ্জন করলেন। চাতুর্য্য দেখাতে লাগলেন ধর্ম্ম শব্দ জ্যোতিস্তর্ক-মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রে, কৌটিল্য-কামন্দকীয় প্রভৃতি নীতিতে। প্রশংসা লাভ করলেন বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের আলাপে, সংগীত-সাহিত্যের মনোহরণ প্রকাশে। শিক্ষার মধ্যে কিছুই বাদ পড়ল না। তাঁরা লাভ করলেন বৈনায়ক ও অশ্ববিদ্যায় পটুত্ব, আয়ুধপ্রয়োগে চণ্ডত্ব, মণিমন্ত্র-ওষধি প্রভৃতি মায়াপ্রপঞ্চে পারদর্শিতা, এমন কি চৌর্য্য এবং দ্যুরোদর প্রভৃতি কপটকলায় প্রৌঢ়ত্ব।

আচার্য্যদের নিকট থেকে সাশীর্ব্বাদ সর্ব্ববিদ্যা আহরণ করে যখন এই তরুণ কুমারমণ্ডলী অনলসভাবে রাজ্যে বিহার-বিচরণ করে ফিরতেন, তখন বৃদ্ধ রাজা রাজহংস অলিন্দে উপবেশন করে আনন্দে ভাবতেন—"আর আমার ভয় নেই, দুঃখের সমুদ্র এবার পার হব—আমি এখন শত্রুসুদুর্লভ।"

॥ ইতি দশকুমার-চরিতে কুমারোৎপত্তির্নাম প্রথম উচ্ছ্বাসঃ ॥

[ক্রমশঃ।

দণ্ডী কে ছিল

সংস্কৃত সাহিত্য জগতের একজন প্রধান কবি দণ্ডী। কেহ কেহ ইঁহাকে ব্যাসের পরই আসন দিতে প্রস্তুত। একটি উদ্ভট শ্লোক আছে—

"জাতে জগতি বাল্মীকে কবিরিত্যভিধীয়তে।
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি॥"

বাল্মীকি হইতেই "কবি" এই শব্দটি হইয়াছে অর্থাৎ বাল্মীকির পূর্ব্বে কেহ কবি এই আখ্যা পান নাই, তাহার পর ব্যাস জন্মগ্রহণ করিলে 'কবী' দুই জন কবি হইল, তাহার পর দণ্ডী হইতেই 'কবয়' তিন জন কবি হইলেন।

কেহ কেহ ঐ শ্লোকটি মহাকবি কালিদাসের রচিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু উহাকে মহাকবি কালিদাসের শ্লোক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, কারণ মহাকবি কালিদাসের বহু পরে দণ্ডী প্রাদুর্ভূত হন। তবে কালিদাসনামধারী পরবর্ত্তী কোন ব্যক্তির রচনা হইলে আপত্তি নাই।

উক্ত শ্লোকটি দেখিয়াই কালিদাস অপেক্ষা দণ্ডীকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিতে পারা যায় না। দণ্ডীর রচনা অপেক্ষা কালিদাসের রচনা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। তবে দণ্ডীর সুমধুর, সুললিত ও উত্তম ছন্দোবিন্যাস দৃষ্টে তাঁহাকেও মহাকবি বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, দণ্ডী তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে দশকুমারচরিত ও কাব্যাদর্শ এই দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। বেশী দিনের কথা নয়, অধ্যাপক পিসৃচেল্ সাহেব প্রকাশ করেন 'শূদ্রকরচিত মৃচ্ছকটিকা নামে যে নাটক আছে, তাহাই দণ্ডীর রচিত তৃতীয় গ্রন্থ।' —বিশ্বকোষ।

স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম্মব্যাখ্যা

শ্রীসুধাংশু...

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মনস্তত্ত্ব বিভাগ)

ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা সব সভ্য-সমাজেই সব সময়েই অল্পবিস্তর হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগ হইতে এ আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যখনই কোন বিশেষ সামাজিক দুর্ঘটনা, যেমন—যুদ্ধবিগ্রহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মহামারী প্রভৃতি ঘটে অথবা কোন নৈসর্গিক ঘটনার ফলে সমাজের প্রচলিত ধারা বিশেষভাবে ব্যাহত হয় তখনই লোকের মনে ধর্ম্মানুসন্ধিৎসা প্রবলভাবে জাগিয়া উঠে এবং ধর্ম্মালোচনার তীব্রতা এবং বিস্তৃতি বৃদ্ধি পায়। সামাজিক অবস্থা এবং ভাব ও চিন্তাধারার সঙ্গে ধর্ম যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, ইহা তাহারই প্রমাণ। হয়ত বলা যায় যে ধর্ম মূলত এক অপরিবর্ত্তনশীল চিরন্তন সত্য, সামাজিক অবস্থা ভেদে কেবলমাত্র তাহার বহিরাবরণের পরিবর্ত্তন হয় এবং সেই জন্যই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মকল্পনা, ধর্ম্মানুষ্ঠান দেখা যায়। এ কথা মানিয়া লওয়া খুবই সহজ, যুক্তিসঙ্গত ভাবে আপত্তি করিবার কোন হেতুই নাই। কিন্তু এ কথা শুধু মানিয়া লইয়া বসিয়া থাকিলে ধর্ম সম্বন্ধে কোন প্রশ্নেরই মীমাংসা হয় না, কোন দিকেই কিছুমাত্র অগ্রসর হওয়া যায় না। বস্তুত ঐ ধরণের অতিবিস্তৃত একটি সাধারণ তত্ত্ব সব বিষয় সম্পর্কেই প্রযোজ্য। কিন্তু সেগুলি আমাদের জীবনধারণের দৈনন্দিন ব্যাপারে আদৌ কার্য্যকরী হয় না। আপনার শরীর যাহা দিয়া তৈয়ারী আমার শরীরও তাহাতেই তৈয়ারী: বস্তুত সব মানুষের শরীরই একই উপাদানে নির্ম্মিত। এই সাধারণ তত্ত্ব হইতে আপনি কেন তেজোদ্দীপ্ত, অপরূপ দেহসৌষ্ঠব এবং অসামান্য সৌন্দর্য্যের অধিকারী হইলেন, যার জন্য আপনি যেখানে যান সেইখানেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং আমি বিকৃত-অঙ্গ, কালোর উপরে কালো রং কেন পাইলাম, যাহার জন্য পারতপক্ষে কেহ আমার দিকে ফিরিয়া তাকায় না। সে প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় না। আরও দূরে যাওয়া যায়; বিজ্ঞান ত বলেই যে জন্তু ও মানুষের শরীর নির্ম্মাণের বস্তু একই। তাহা মানিয়া লইলেও বোঝা যায় না একই উপাদানে তৈয়ারী একটি প্রাণী কেন আজ কলিকাতার চিড়িয়াখানায় পাতাহীন গাছের একটি ডাল হইতে আর একটি ডালে লাফাইয়া বেড়াইতেছে এবং কিচির-মিচির করিতেছে; আর একটি প্রাণী প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া অর্থের বলে সারা ভারতবর্ষে তাহার প্রভাব বিস্তার করিতেছে। গাছ-গাছড়া, জন্তু-জানোয়ার, মানুষ, এ সবেরই শরীর গঠনের দিক দিয়া সংযোগ আছে, কিন্তু তবুও তাহাদের পার্থক্য, প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য জানিবার প্রয়োজন হয়। নচেৎ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় না। বিভিন্ন বিজ্ঞান এই সব বিষয় অধ্যয়ন করে।

সমাজ এবং ব্যক্তি পৃথক্‌ভাবে দেখিলে ধর্মেরও দুইটি পৃথক্ রূপ আছে বলিতে হয়। একটি আমার নিজের ধর্ম এবং অপরটি

সমাজের ধর্ম। মানুষের মনে ধর্মভাব সহজাত কি না, যদি না হয়, তাহা হইলে কি অবস্থায় উহা তাহার মনে জাগ্রত হয়—এ বিষয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক আছে। বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তত্ত্বের দিক হইতে ঐ আলোচনার যথেষ্ট দাম আছে; মানুষের মনের স্বভাব জানিবার জন্য এ তর্কের এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তাও আছে। ধর্মের মূল কোথায় এই একটি কথা জানিবার জন্য আমাদের দেশে, শুধু আমাদের দেশে কেন, অন্য দেশেও অনেক মহাপুরুষ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, বহু কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের চিরকাল নমস্য, পূজনীয় হইয়া থাকিবেন। কিন্তু শুধু জ্ঞানই কি যথেষ্ট? না তাহা নহে। তাই যাঁহারা সে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন, সাধারণ লোকেদের জন্য তাঁহারা পথের নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পথ-নির্দ্দেশের সেই অমৃত উপদেশাবলী প্রতি ধর্মসম্প্রদায়ের পুরান পুঁথিতে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। আমরা আজও সেই সব নির্দ্দিষ্ট পন্থার আলোচনা করি, সেই সব উপদেশাবলী স্মরণ করি।

কিন্তু এই আলোচনার এই স্মরণের ফল আজ কি দেখা যায়? বক্তৃতামহলে এক ঘণ্টা পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় যোগদান করিয়া যখন বাহিরে আসি, সে আলোচনার কোন ছাপ মনে থাকে না। যাহা থাকে তাহা হইতেছে অমুকের বক্তৃতাভঙ্গী কি সুন্দর, অমুকের বাক্যবিন্যাস কি মধুর, যেন কবিতা। ঘটা করিয়া, লোক সংগ্রহ করিয়া আলোচনার উদ্দেশ্য তাহা হইলে কি? আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে, এইভাবে সভা-সমিতি করিয়া ধর্ম আলোচনা করা, যাহা আজকাল একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ফ্যাসান কথাটা নাই বলিলাম—তাহা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইতে বাধ্য, কারণ এই জাতীয় আলোচনায় বাগ্মিতা, বহু পুঁথিপাঠ, পুরান তর্ক-বিতর্কের সহিত পরিচিতি প্রভৃতি বহু গুণের পরিচয় মিলিলেও আসল বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না, প্রাণের যোগাযোগ ইহাতে থাকে না। সেই জন্যই আলোচনা ফলপ্রসূ হয় না। আলোচনার পূর্ব্বেও আমি যেমন ছিলাম পরেও ঠিক তেমনই থাকি।

এই ধরণের আলোচনার সহিত স্বামীজির ধর্ম আলোচনার কত প্রভেদ! স্বামীজির নিকট ধর্ম শুধু বক্তৃতার বিষয় কখনই ছিল না। ধর্ম জ্ঞানের, কর্মের, ভক্তির বিষয়। হিন্দু হইলেও ধর্ম বলিতে তিনি Universal Religion সার্ব্বভৌম ধর্মই বুঝিতেন, কোনরূপ গোঁড়ামির প্রকাশ তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁর ধর্ম প্রচারে ব্যক্তিগত ধর্ম ও সামাজিক ধর্মের মধ্যে কোন প্রভেদ তিনি করেন নাই। ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ সমাজের মধ্যেই হয়। তাই সমাজকে বাদ দিয়া ব্যক্তিগত ধর্মসাধনার কোন অর্থ নাই। অপরের ক্ষতি করিয়া নিজের উন্নতি করা যেমন স্বার্থপরতার পরিচয়, নিজে উন্নত হইয়া অপরের উন্নতির চেষ্টা না করাও তেমনি স্বার্থপরতারই দৃষ্টান্ত। তাই সকলের উন্নতিসাধন করাই তিনি তাহার ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন কালে যখন কয়েক জন গুরুভাই তাঁহাকে বলিলেন যে, এই সমস্ত বাহিরের কাজ করিতে আরম্ভ করিলে মন Spirit হইতে Matterএর দিকেই চলিয়া যাইবে সুতরাং ধর্মে আঘাত লাগিবে। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বজ্রনির্ঘোষে বলিয়াছিলেন, "Who cares for your Bhakti & Mukti? Who cares what the Scriptures say; I will go to hell cheerfully a thousand times if I can rouse my countrymen immersed in Tamas, and make them stand on their own feet and be Men inspired with the Spirit of Karma Yoga..I am not a follower of Ramkrishna or any one but of him, only serves and helps others without caring for his own Mukti (Life of Swami Vivekananda. By His Eastern & Western Disciples Vol. II. P. 617). প্রাণের কি গভীর পরিচয় আমরা এই কয়টি কথা হইতে পাই। অন্যের জন্য আত্মবলিদানের আদর্শ ইহা হইতে উচ্চতর আর কি কল্পনা করা যাইতে পারে? তিনি তাঁহার জীবন দিয়া এই আত্মোৎসর্গের ধর্মই পালন করিয়া গিয়াছেন। আজ কয়জন লোক আছেন, কয়জন ধার্মিক আছেন যাঁহারা এত বড়, এত মহৎ একটি কল্পনাকে, কার্য্যে পরিণত করা দূরে থাকুক, নিজেদের মস্তিষ্কের মধ্যে ধারণা করিতে পারেন, হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন?

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ধর্মের এই ব্যাখ্যা এখন একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ধর্মের সংস্কারকার্য্যে যাঁহারা নিজেদের নিযুক্ত করিয়াছেন সকলের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গী তীব্রভাবে জাগাইয়া তুলিবার যেন তাঁহারা চেষ্টা করেন। দুঃখে, দারিদ্র্যে, অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে আমাদের দেশ যে আজ জর্জ্জরিত ইহা একটি রাজনীতির slogan নহে, ইহা বাস্তব ঘটনা, কঠোর সত্য। লোকসংখ্যা বাংলা দেশে যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে সেই অনুপাতে দুঃখ-কষ্টও বাড়িয়া চলিয়াছে। কই সেই তরুণের দল, যুবকের সঙ্ঘ, যারা এই দুঃখ-কষ্ট লাঘবের কার্য্যে নিজেদের বিলাইয়া দিবে? গভর্মেন্টের নজরে পড়িয়া পরে উচ্চপদপ্রাপ্তির আশায় নহে, মৃত্যুর পর স্বর্গলাভের লোভেও নহে, ইহাই তাহাদের করণীয় কাজ মনে করিয়া যাহারা এই কার্য্যে অগ্রসর হইবে তাহারাই প্রকৃত ধার্মিক। ভারতবর্ষে ধর্মপ্রচার কার্য্যে ইহাই ছিল স্বামীজির মূল কথা। চিকাগো অভিভাষণেও তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন, "The Hindu does not want to live on words and theories......The Hindu religion does not consist in struggles and attempts to believe a certain doctrine or dogma, but in realizing, not in believing but in being & becoming." (The Chicago Address, P. 11, Udbodhan office.)

সুষ্ঠুভাবে এই ধর্মপালন করিতে হইলে নিজেকে উপযুক্ত ভাবে গড়িয়া তোলা প্রয়োজন, নিজের চরিত্র গঠন ও উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। তাহা সাধনা-সাপেক্ষ। এ সাধনা ধর্ম সাধনারই অঙ্গ। কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে প্রত্যেককেই নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। কতকগুলি বাধা আসে বাহির হইতে, কতকগুলি নিজের ভিতর হইতেই। দ্বিধা, সংকোচ, ভয়, এইগুলিই আভ্যন্তরীণ বাধা। মানুষের কর্মক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষুন্ন হয় তাহারই আর একটি মনোবৃত্তি দ্বারা—সে মনোবৃত্তি ভয়। ভয় মানুষকে, শুধু মানুষ নয়—জন্তু-জানোয়ারকেও যত বেশী পঙ্গু করে

এমন আর কিছুতে করে না। ভয়ের নানা কারণ থাকিতে পারে, নানারূপ পরিবেশে ভয়ের সঞ্চার হইতে পারে। যত কারণেই থাকুক না কেন, পরিবেশ যত রকমই হউক না কেন, মূলত ভয় মনের একটি অবস্থাবিশেষ। কোন একটি কারণে বা কোন একটি অবস্থায় সকলের মনে ত্রাসের সঞ্চার হইবেই এ কথা বলা যায় না। সুতরাং মনের গঠন ও তদানীন্তন মনের অবস্থার উপরই ভয়ের উৎপত্তি নির্ভর করে। কাজেই ভয়কে জয় করিবার সাধনা নিজেকে জয় করিবারই সাধনা। যে ধর্ম এই ভয়কে জয় করিবার সহায়তা না করে, স্বামীজির মতে সে ধর্ম ধর্মই নহে। **"The religion that does not infuse strength into the heart is no religion to me, be it of the Upanishad, the Gita, or the Bhagavatam. Strength is religion and nothing is greater than strength." (Life of Swami Vivekananda, by Eastern & Western Disciples, Vol II. p. 699).** চরিত্র গঠন সম্পর্কেও তিনি অশ্বিনী বাবুকে ঐ কথাই বলিয়াছিলেন। **"Make your students' character as strong as thunderbolt."** মনে এই জোর এই শক্তি থাকিলেই বাহিরের সব বাধা অতিক্রম করা যায়। মন হইতে ভয় বিতাড়িত হইলে সব জড়তাও দূর হয়, অনির্ব্বচনীয় আনন্দ মনকে আপ্লুত করে। তখন কর্মের পথ আপনা হইতেই পরিষ্কার হইয়া যায়।

ধর্মের যে ব্যাখ্যা স্বামীজি করিয়াছেন তাহা যে শুধু কালোপযোগী তাহা নহে। তাঁহার প্রত্যেক উক্তিটি বেদ-উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিদেশে এবং এখানে বহু বক্তৃতায় তিনি এই ভিত্তি দেখাইয়া দিয়াছেন। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম এই তিনের অপূর্ব্ব সমন্বয় তাঁহার ভিতর যেমন হইয়াছিল সাম্প্রতিক কালের মধ্যে এরূপ আর দেখা যায় নাই। কোন বিশেষ ধর্ম তাঁহার ধর্ম ছিল না, তিনি প্রচারও করেন নাই। কোন ধর্মে জ্ঞান, কোন ধর্মে কর্ম এবং কোন ধর্মে ভক্তির প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। তাহা হইতেই হয় ধর্মে ধর্মে সংঘর্ষের উৎপত্তি। কিন্তু স্বামীজির জীবনে এই তিনেরই সমাবেশ হওয়াতে তাঁহার ধর্ম হইয়াছে সার্ব্বভৌম ধর্ম। তাই তাঁহার ধর্মে সকল ধর্মেরই স্থান ছিল। কর্মে উচ্চনীচ ভেদ ছিল না; সেবায় স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের কোন প্রশ্নই উত্থিত হইত না। **Chicago**তে **Parliament of Religion**এর উদ্যোক্তারা কল্পনায় যে বিরাট আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছিলেন স্বামীজি ছিলেন তাহার মূর্ত্তিমান প্রতীক, জলন্ত দৃষ্টান্ত।

বাংলা দেশের নবজাগরণের মূলে স্বামীজির প্রভাব যে কতখানি বিদ্যমান, তাহা ঐতিহাসিকগণ বিবেচনা করিবেন। সে প্রভাব যে আজও ঠিক সেই ভাবেই কার্য্য করিতেছে তাহারই একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। অল্প বয়স হইতেই সুভাষচন্দ্রকে জানিবার সুযোগ আমার ছিল। স্বামীজি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মহান্ স্পর্শ পাইয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র স্বামীজির স্পর্শ না পাইলেও তাঁহার চিন্তাধারার, আবেগপূর্ণ প্রাণের, অসাধারণ কর্মশক্তির সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। সে পরিচয় স্পর্শের মতই কার্য্যকরী হইয়াছিল। স্বামীজির আদর্শে গঠিত হইয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজ তাঁহার কর্মের জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। স্বামীজির আদর্শ কিরূপ নিবিড়ভাবে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানিতাম। তাঁহার সব কর্মের প্রেরণা তিনি স্বামীজির উপদেশাবলী পুস্তকাদি হইতে পাইতেন। স্বামীজি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, **"Of the bones of the Bengali youths shall be made the thunderbolt that shall destroy India's thraldom."** ইহা কি সত্য হয় নাই? স্বামীজি অশ্বিনী বাবুকে বলিয়াছিলেন, **"Can you give me a few ‹t boys? A nice shake I can give to the world then."** প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ শক্তিকে এ **shake** কে দিয়াছিল?

সভা সমিতি সংসদে ধর্ম-আলোচনা হয়, ধর্ম-শিক্ষা হয় না। স্বামীজি যেভাবে শিক্ষা দিতেন সেইভাবে ধর্মশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা দেশে দেশে প্রবর্ত্তিত হউক, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

মগের মুল্লুক

মগের মলুক বা মগের মল্লুক প্রবাদবাক্যটি অনেকেই জ্ঞাত আছেন। কোনরূপ অন্যায় ও অত্যাচার হতে দেখলেই লোকে এই কথাটি ব্যবহার করে থাকেন। জনপ্রবাদটির কারণ আর কিছুই নয়, মগদস্যুগণ এক সময়ে কলকাতা পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছিল। এই মগেরা চট্টগ্রাম ও বর্ম্মার সীমান্তবর্ত্তী দস্যুসম্প্রদায়। নদীবক্ষে বাণিজ্যদ্রব্যাদি লুণ্ঠন, লোকজনকে ধরে নিয়ে যাওয়া, নদীগর্ভে লুণ্ঠন প্রভৃতি মগদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কলকাতার শাসকসম্প্রদায়কে অনেক সময় এই মগদের জন্য সবিশেষ চিন্তিত হতে হত। পর্টুগীজগণ চিরদিনই 'বোম্বেটে' নামে বিখ্যাত। মগেরা এই পর্টুগীজদের দলে নিয়ে বাঙলার নানা জায়গায় নদীবক্ষে লুঠপাট করে বেড়াতো। কখনও বা মগেরা তীরে নেমে বাড়ীঘরও জ্বালিয়ে দিত। গ্রামকে গ্রাম ভস্মসাৎ ও শিশুদের ধরে নিয়ে যেত। এই সকল আরাকানবাসী মগদস্যুদের উৎপাতে এক সময়ে কলকাতাবাসীদের পর্য্যন্ত উত্যক্ত হতে হত। সুন্দরবন, ঢাকা, ২৪ পরগণা প্রভৃতি বিভাগের নদীর মধ্যে মগদস্যুগণ অবাধে বিচরণ করত। তৎকালীন নবাবগণ এই মগদের দমনের জন্য বহু উপায়ে চেষ্টা করেও মগদের দমন করতে পারেননি। মগেরা প্রতি বছরে একেকটি দেশে আবির্ভূত হত। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজপত্রে দেখতে পাওয়া যায়, কর্ত্তৃপক্ষগণ এই মগদস্যুদের দমনের জন্য নানাবিধ উপায় চিন্তা করেছেন। এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের কাহিনী থেকেই 'মগের মুল্লুক' প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়।

বিদ্যাসাগরের উপাধি পত্র

[ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলেজের পাঠ সমাপন করিলে, কলেজ হইতেই বিদ্যাসাগর উপাধি প্রাপ্ত হন। বিংশতি-বর্ষীয় যুবক—"বিদ্যাসাগর!" এমন ভাগ্যবান্ এ সংসারে কয় জন? ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতিতে বিশারদ হয়, বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে কয় জন? কি অপূর্ব্ব বুদ্ধি-বিক্রম! কলেজের অধ্যাপক মাত্রেই বিস্মিত! যিনি ব্যাকরণের অধ্যাপক, তিনি ভাবেন, —"আমি ধন্য!" যিনি সাহিত্যের অধ্যাপক, তিনি বলেন,—"আমার অধ্যাপনা সার্থক!" যিনি দর্শন স্মৃতির অধ্যাপক, তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন,—"ঈশ্বরচন্দ্র নিশ্চিতই অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন।" প্রত্যেকেই প্রত্যেক শাস্ত্রের প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। প্রশংসাপত্রে সকল বিষয়ের ও তত্ত্ব-বিষয়ক অধ্যাপকের অভিমতি একত্র সমাবেশ দেখিতে পাইবেন, "বিদ্যাসাগর" উপাধি-লিখিত প্রশংসাপত্রে। এই পত্র, কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ রসময় দত্তের স্বাক্ষরিত। ১৭৬৩ শকের (১২৪৮ সালের) ২০শে অগ্রহায়ণের বা ১৭৪১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বরের প্রদত্ত উক্ত পত্রের অনুলিপি এই:—]

"অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে। অসৌ কলিকাতায়াং শ্রীযুতকোম্পানীসংস্থাপিতবিদ্যামন্দিরে দ্বাদশ বৎসরান্ পঞ্চ মাসাংশ্চোপস্থায়াধোলিখিতশাস্ত্রাণ্যধীতবান্।

ব্যাকরণম্	শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মভিঃ
কাব্যশাস্ত্রম্	শ্রীজয়গোপাল শর্ম্মভিঃ
অলঙ্কারশাস্ত্রম্	শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মভিঃ
বেদান্তশাস্ত্রম্	শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ
ন্যায়শাস্ত্রম্	শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মভিঃ
জ্যোতিঃশাস্ত্রম্	শ্রীযোগধ্যান শর্ম্মভিঃ
ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ	শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ

সুশীলতয়োপস্থিতস্যৈতস্যৈতেষু শাস্ত্রেষু সমীচীনা ব্যুৎপত্তিরজনিষ্ট। ১৭৬৩ এতচ্ছকাব্দীয় সৌরমার্গশীর্ষস্য বিংশতিদিবসীয়ম্।

(Sd.) Rasamay Dutta, Secretary.
10 Dec. 1841.

বিদ্যাসাগরের উপহার-পত্র

[মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উৎসাহের অন্ত ছিল না। শেষ বয়সে বাঙালী মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় কৃতকার্য্যতা দেখে তিনি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন। কলিকাতা বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা কুমারী চন্দ্রমুখী বসু যখন এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, বিদ্যাসাগর উৎসাহ প্রকাশ ক'রে চন্দ্রমুখীকে এক সেট সেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী উপহার দিয়েছিলেন। বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায় এই কথাগুলি লিখেছিলেন]

Sreemati
Kumari Chandramukhi Basu
who has obtained the Degree of Master of Arts
of the Calcutta University.
From her sincere well-wisher.,
Iswar Chandra Sarma.

মাকে লেখা বিদ্যাসাগরের পত্র

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মাতৃদেবী শ্রীচরণারবিন্দেষু।

প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনমিদম্—

নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে পূর্ব্বের মত নানা বিষয়ে সংস্পৃষ্ট থাকিলে অধিক দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না। এজন্য স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃতভাবে অতিবাহিত করিব। এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে এজন্মের মত বিদায় লইতেছি। মাতার নিকট পুত্রের পদে পদে অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং আপনকার শ্রীচরণে কতবার কত বিষয়ে অপরাধী হইয়াছি তাহা বলা যায় না। এজন্য কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বচনে প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া এ অধম সন্তানের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আপনকার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত মাস মাস যে ত্রিশ টাকা পাঠাইয়া থাকি, আপনি যতদিন শরীর ধারণ করিবেন কোন কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবেক না। তদতিরিক্ত আপনকার পিতৃকৃত্য ও মাতৃকৃত্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে বার্ষিক দুই শত টাকা প্রেরিত হইবেক। যদি কোন বিষয়ে আমায় কিছু বলা আবশ্যক বোধ করেন, পত্র দ্বারা লিখিয়া পাঠাইবেন। আমি অনেকবার আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিয়াছি এবং পুনরায় শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি, যদি আমার নিকট থাকা অভিমত হয়, তাহা হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব এবং আপনকার চরণসেবা করিয়া চরিতার্থ হইব। ইতি ১২ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৬ সাল।

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

ব্ল্যানফোর্ডকে লেখা বিদ্যাসাগরের পত্র

["এসিয়াটিক সোসাইটী"র আসিটান্ট সেক্রেটরী ও কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কর্ণগোচর হয়েছিল যে বিদ্যাসাগরের বেশভূষা এবং পায়ে চটি থাকার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ

বিদ্যাসাগরকে ভিতরে প্রবেশ করতে অনুমতি দেননি। তিনি সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি এসে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভিতরে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বললেন, "আমি আর যাইতেছি না, অগ্রে কর্ত্তাদিগকে পত্র লিখিয়া জানিব, এরূপ কোন নিয়ম আছে কি না; আর যদি থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতীকার করিতে পারি ত আসিব।" এই বলে তিনি সঙ্গিগণকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসেন। অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয় মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষকে ইংরেজিতে যে পত্র লিখেছিলেন সেই পত্রের মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হচ্ছে]

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ট্রষ্টির অনররি সেক্রেটরী

শ্রীযুক্ত এইচ, এফ, ব্ল্যানফোর্ড এস্কোয়ার সমীপেষু—

মহাশয়,

আমি গত ২৮শে জানুয়ারি এসিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরী দেখিতে যাই। আমার পায় দেশী জুতা ছিল বলিয়া, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিতে পাই নাই। জুতা না খুলিলে শুনিলাম, প্রবেশ নিষেধ। ইহার কারণ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কতকটা মনক্ষুণ্ণ হইয়া আমি ফিরিয়া আসিলাম।

দেখিলাম, যে সব দর্শক চটি জুতা পায়ে দিয়াছিল, তাহাদিগকে জুতা খুলিয়া হাতে করিয়া লইয়া, ফিরিতে হইতেছে। কিন্তু ইহাও দেখিলাম, কতিপয় পশ্চিমালোক দেশী জুতা পরিয়াই যাদুঘরের এদিক ওদিক ফিরিতেছে।

আরও দেখিলাম, সম্ভবতঃ কালীঘাটের প্রসাদী পুষ্পমাল্য গলায় পরিয়া যাহারা যাদুঘরে যাইতে চাহিতেছে, তাহাদিগকেও ফুলের মালা বাহিরে রাখিয়া যাইতে হইতেছে।

এই জুতা-রহস্যের কারণ আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। যাদুঘর তো সাধারণের আরাম-বিশ্রামের স্থান। এখানে এরূপ জুতা-বিভ্রাট দোষাবহ। যাদুঘর যখন মাদুর-মোড়া, কারপেটযুক্ত বিছানা বা কারুচিত্রিত নহে, তখন এ নিষেধ-বিধির আবশ্যকতাই বা কি? তা ছাড়া, পায়ে যাহাদের বিলাতী জুতা; কিন্তু আসিয়াছে পদব্রজে, তাহারা যখন প্রবেশ করিতে পাইতেছে, তখন তাহাদের সমান অবস্থাপন্ন লোকে, পায়ে শুদ্ধ দেশী জুতা বলিয়া প্রবেশ করিতে পায় না কেন, ইহা আমি ঠিক করিতে পারিতেছি না। অবস্থা যাঁহাদের ইহাদেরও অপেক্ষা উন্নত, আসেন গাড়ী পাল্কী করিয়া, তাঁহাদিগের উপরই বা এরূপ নিষেধ-বিধি প্রবর্ত্তিত হয় কেন?

পসার-প্রখ্যাতিতে নামে মানে হাইকোর্ট সকলের সেরা। সেখানেও যখন এরূপ ব্যবস্থা নাই, তখন সাধারণের আরাম-বিশ্রামের স্থানে এরূপ অসঙ্গত নিষেধ-বিধি দেখিয়া আমাকে অতি বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হইয়াছে।

এ কথা তুলিয়া আপনাদিগকে কষ্ট দিতে প্রথমে আমার ইচ্ছা হয় নাই। কিন্তু পরে ভাবিলাম যে, ট্রষ্টিদিগের ন্যায় বিশিষ্ট এবং শিক্ষিত ভদ্র লোক কর্ত্তৃক এই পাদুকার ব্যবস্থা অনুমোদিত হইয়াছে; কিন্তু ইঁহারাই আপন বাটীতে অথবা জনসমাজে কখনও এই অসম্মান-সূচক এবং বিরক্তিকর প্রথার সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ নাই; সুতরাং এ কথা তাঁহাদের কর্ণগোচর না করিলে, তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। অতএব আমার অনুরোধ, এ বিষয়ের মীমাংসা জন্য আপনি পত্রখানি অনুগ্রহ করিয়া ট্রষ্টিদিগকে দেখাইবেন।

স্বাঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

৫।২।৭৪

বিদ্যাসাগরকে লেখা ব্ল্যানফোর্ডের পত্র

[মিউজিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষ এতৎসম্বন্ধে ইংরেজিতে যে পত্র সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষকে লিখেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।]

এসিয়াটিক সোসাইটীর অবৈতনিক সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জানুয়ারি তারিখে এক জন দেশীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক এসিয়াটিক সোসাইটীসংলগ্ন পুস্তকাগারে প্রবেশ কালীন বহির্দ্দেশে পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। তৎসংক্রান্ত পত্রগুলি উক্ত সোসাইটীর অধ্যক্ষসভায় বিচারার্থ প্রেরিত হইল।

আপনার বশংবদ ভৃত্য

স্বাঃ হেনরি এফ ব্ল্যানফোর্ড,

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের ট্রষ্টিগণের অবৈতনিক সম্পাদক।

[মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষ, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ইংরেজিতে যে পত্র লিখেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ।]

কলিকাতা, ২৬শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

মহাশয়,

আপনি গত ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মিউজিয়াম প্রবেশ কালীন জাতীয় প্রথানুসারে বহির্দ্দেশে পাদুকা পরিত্যাগ বিষয়ে আপনার অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া যে পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা উক্ত মিউজিয়ামের ট্রষ্টিগণের গোচরার্থ অর্পণ করিয়াছি এবং প্রত্যুত্তরে আপনাকে অবগত করিতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, ট্রষ্টিগণ উক্ত প্রথা সম্বন্ধে কোন প্রকার আদেশ প্রচার করেন নাই বা এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই।

আপনার ব্যক্তিগত আবেদন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, উক্ত মিউজিয়াম, এসিয়াটিক সোসাইটীর অট্টালিকার মধ্যে আংশিকভাবে অন্তর্ভুক্ত। সোসাইটীর পরিচারকবর্গ মিউজিয়ামের ট্রষ্টিগণের আজ্ঞাধীন নহে। যে সমস্ত ভৃত্যের বিরুদ্ধে আপনি অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন, তাহারা মিউজিয়াম বা সোসাইটী সংক্রান্ত কি না, তাহা আপনার পত্রে প্রকাশিত নাই। যাহা হউক, আপনি যখন উল্লেখ করিতেছেন যে, সোসাইটীর পুস্তকাগারে যাইবার পথে অট্টালিকায় প্রবেশ কালীন উক্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, আপনার পত্রখানি উক্ত সোসাইটীর অধ্যক্ষসভার অবগতির জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

আপনার বশংবদ ভৃত্য

স্বাঃ হেনরি এফ ব্ল্যানফোর্ড,

অবৈতনিক সম্পাদক।

[পত্র লেখালিখি অনেক হইয়াছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা রক্ষা হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও আর কখন সোসাইটী বা মিউজিয়ামে যান নাই।]

বিদ্যাসাগরকে লেখা যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পত্র

[পাথুরিয়াঘাটার মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তদীয় ভ্রাতা রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মধ্যে বিষয় নিয়ে মতান্তর হয়। বিষয়ের গোল মিটাবার জন্য ১২৯২ সালের ২৫শে বৈশাখ বা ১৮৮৮

খৃষ্টাব্দের ৭ই মে উভয় ভ্রাতা নিম্নলিখিত সালিশীনামা লিখে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সালিশী হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।]

মাননীয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদনম্—

আমরা দুই সহোদর একাল পর্য্যন্ত একান্নবর্ত্তী থাকিয়া কালযাপন করিতেছিলাম। এক্ষণে সেরূপ কালযাপন করায় নানা অসুবিধা বোধ করিয়া পরস্পর পৃথক অন্ন হওয়া আবশ্যক হইয়াছে এবং তদুপলক্ষে বিষয়বিভাগও অপরিহার্য্য আপোষে সকল বিষয়ে সুশৃঙ্খলরূপে নিষ্পত্তি হওয়া অসম্ভাবনীয় বোধ করিয়া উভয়ে একমত হইয়া আপনাকে সালিশ নিযুক্ত করিয়া এই ভার দিতেছি, আপনি আমাদের উভয় পক্ষের নিকট হইতে সকল বিষয় অবগত হইয়া ও সবিশেষ তদন্ত করিয়া আমাদের স্থাবরাস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবেন আমরা উভয়ে অঙ্গীকার করিতেছি; আপনার কৃত বিভাগ মান্য করিয়া লইব সে বিষয়ে কোন ওজর আপত্তি করিব না, যদি করি বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে এতদর্থে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই সালিশনামা লিখিয়া দিলাম। অদ্যকার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে এই বিষয় নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন। ইতি সন ১২৯২ বার শত বিরানব্বই সাল তারিখ ২৫ বৈশাখ।

স্বাঃ শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।
স্বাঃ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

ঠাকুর ভ্রাতৃদ্বয়কে লেখা বিদ্যাসাগরের পত্র

[বিদ্যাসাগর মহাশয়, গোলযোগ মিটাবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা করেছিলেন এবং বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত কাগজ পত্র এনে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে পর্য্যালোচনা করতেন। নানা কারণে গোলযোগ মিটান দুঃসাধ্য ভেবে তিনি ১২৯২ সালের ১৫ই আষাঢ় বা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন উভয় ভ্রাতাকে নিম্নলিখিত পত্র লিখে সালিশীর ভার পরিত্যাগ করেন।]

বিনয়নমস্কারবহুমানপুরঃসর আবেদনমিদম্—

আপনাদের বিষয়বিভাগ সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তির ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু নানা কারণে এত বিরক্ত হইয়াছি যে, আমার ঐ বিষয়ে পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। এ জন্য নিরতিশয় দুঃখিত অন্তঃকরণে আপনাদের গোচর করিতেছি, আমি এ বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম। আপনাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হওয়া ও আন্তরিক সুখলাভ করা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। কিমধিকমিতি সন ১২৯২ সাল। ১৫ই আষাঢ়।

স্বাঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

বিধবা বিবাহের আবেদন পত্র

[বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আইন-বিষয়ক অনেক অন্তরায় ছিল। সেই অন্তরায় দূর করিবার অভিপ্রায়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় একটা আইন করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ইংরেজি অনুবাদ পড়িয়া, হিন্দু বিধবাদের বড় কষ্ট, হিন্দু বিধবাদের বিবাহ হওয়া উচিত, এতৎসম্বন্ধে আইন সংক্রান্ত অন্তরায় দূরীভূত হওয়া উচিত, রাজপুরুষদের মনে এইরূপ একটা সুদৃঢ় ধারণা হইয়া যায়। ইংরেজি অনুবাদ প্রচারিত হইবার পর, বিদ্যাসাগর মহাশয় আইন করাইবার জন্য তাৎকালিক প্রধান প্রধান রাজপুরুষদের সহিত পরামর্শ করিতেন। তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথায় মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পরামর্শে বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর বা ১৮৬২ সালের আশ্বিন মাসে এক হাজার লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন-পত্র ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করেন। আবেদন ইংরেজিতে হইয়াছিল যাহার মর্ম্মানুবাদ এই,—]

"ভারতের মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের সভা সমীপেষু—

"বঙ্গদেশের নিম্নস্বাক্ষরকারী হিন্দু প্রজাদিগের সবিনয় নিবেদন এই যে,—

"বহুদিন প্রচলিত দেশাচারানুসারে হিন্দু বিধবাদিগের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ।

"আবেদনকারিগণের মত এবং দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক দেশাচার নীতিবিরুদ্ধ এবং সমাজের বহুতর অনিষ্টকারক। হিন্দুদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রচলন আছে। অনেক হিন্দু কন্যা চলিতে বলিতে শিখিবার পূর্ব্বেও বিধবা হয়। ইহা সমাজের ঘোরতর অনিষ্টকারী।

"আবেদনকারীদিগের মত এবং দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, দেশাচারপ্রবর্ত্তিত প্রথা শাস্ত্রসঙ্গত নয় কিংবা হিন্দু অনুশাসনবিধির প্রকৃত অর্থসঙ্গতও নয়।

"বিধবা-বিবাহে আবেদনকারিগণের এবং অন্যান্য হিন্দুর এমন কোন বাধা নাই, যাহা বিবেকবুদ্ধির বিরুদ্ধ। এবম্প্রকার বিবাহে, সমাজ-প্রচলিত অভ্যাস হেতু এবং শাস্ত্রের কদর্থ জন্য ভ্রমাত্মক বিশ্বাস হেতু যে বাধা-বিঘ্ন হইতে পারে, তাহা তাঁহারা অগ্রাহ্য করেন।

"আবেদনকারিগণ অবগত আছেন যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর আদালতসমূহে প্রচলিত হিন্দু-আইনবিধি অনুসারে উক্ত প্রকার বিবাহ আইনবিরুদ্ধ এবং উক্ত প্রকার বিবাহে যে সমস্ত সন্তান-সন্ততি হইবে, তাহারা বিধিসম্মত সন্তান-সন্ততি মধ্যে পরিগণিত হইবে না।

"যে হিন্দুরা এরূপ বিবাহ বিবেকবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করেন না এবং সামাজিক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভ্রমসংস্কার সত্ত্বেও যাঁহারা উক্ত প্রকার বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা উপরোক্ত হিন্দু আইন প্রচলন কারণ এই প্রকার বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে অক্ষম।

"এবম্প্রকার গুরুতর সামাজিক অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইবার পক্ষে যে সব আইনসঙ্গত বাধা আছে, তাহা দূর করা ব্যবস্থাপক সভার কর্ত্তব্য। এই অনিষ্ট দেশাচার-অনুমত হইলেও বহুতর হিন্দুর পক্ষে ইহা অত্যন্ত কষ্টের কারণ এবং হিন্দু অনুশাসনবিধির প্রকৃত মর্ম্মবিরুদ্ধ।

"এই বিবাহের আইনসঙ্গত বাধা অন্তর্হিত হওয়া, স্বধর্ম্মপরায়ণ আস্থাবান্ বহুসংখ্যক হিন্দুর একান্ত অভিপ্রেত ও অনুমত। যাঁহারা বিধবা বিবাহ শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ বলিয়া স্থির বিশ্বাস করেন, যাঁহারা বিশেষ বিশেষ কারণে (কারণগুলি যদিও ভ্রান্তিপরিপূর্ণ) এইরূপ ব্যবস্থা সমাজের মঙ্গলজনক বলিয়া পোষকতা করেন, আইনসঙ্গত বাধা অন্তর্হিত হইলে, তাঁহাদের ভ্রমসংস্কার বিরুদ্ধ বলিয়া বিস্ময়ের কারণ হইলে, কোন প্রকার অনিষ্টের কারণ হইবে না।

"এরূপ বিবাহ স্বভাববিরুদ্ধ নয় কিংবা অন্য কোন দেশে দেশাচারে বা আইনে নিষিদ্ধও নয়।

"যাহাতে হিন্দু বিধবাদিগের পুনর্বিবাহ পক্ষে বাধা না থাকে এবং সেই বিবাহ-জাত সন্তান-সন্ততি যাহাতে বিধিসম্মত সন্তান-সন্ততি বলিয়া পরিগৃহীত হয়, তাহার জন্য আইন প্রচলন করিবার সঙ্গতিবিষয়ে মহামান্য ব্যবস্থাপক সভা আশু বিবেচনা করুন।"

(এক হাজার লোক স্বাক্ষরিত)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুতে দেশে যে শোক অনুভূত হইয়াছিল, তাহা অসাধারণ। লোক অনুভব করিয়াছিল—দেশে সত্য সত্যই "ইন্দ্রপাত" হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতিতে' "বীর্য্যবান" রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কথায় লিখিয়াছেন :—

"বাংলা দেশে এই একজন অসামান্য মনস্বী পুরুষ মৃত্যুর পরে দেশের লোকের নিকট হইতে বিশেষ কোনো সম্মান লাভ করেন নাই। ইহার একটা কারণ, ইঁহার মৃত্যুর অনতিকালের মধ্যে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু ঘটে—সেই শোকেই রাজেন্দ্রলালের বিয়োগ-বেদনা দেশের চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুতে বাঙ্গালার কবি হেমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া বহু লোক কবিতায় শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় দুইজন প্রসিদ্ধ কবি তাঁহার সম্বন্ধে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন—মধুসূদন দত্ত ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মধুসূদন বিদেশে বিদ্যাসাগরের স্নেহপরিচয়ে ধন্য হইয়া লিখিয়াছিলেন :—

"বিদ্যার সাগর তুমি, বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে
দীন যে, দীনের বন্ধু! উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্যবলে পেয়ে সে মহা-পর্ব্বতে
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ-চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ! কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদীরূপা বিমলা কিঙ্করী,
যোগায় অমৃত-ফল পরম আদরে
দীর্ঘশিরঃ তরুদল, দাসরূপ ধরি,
পরিমলে ফুল্ল-কুল দশ দিক ভরে,
দিবসে শীতল শ্বাস, ছায়া বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত-নিদ্রা ক্লান্তি দূর করে।"

হেমচন্দ্র বঙ্গব্যঙ্গে কলিকাতার তৎকালীন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ধনীদিগের বর্ণনা করিয়া গুণীদিগের বর্ণনার পূর্ব্বে প্রথমোক্তদিগকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

"এই ত গেল কল্‌কাতা তোর কল্কাপরার দল,
দেখবো এবার গোটাকতক দিক্‌পাল আসল।
দেখবো এবার আসর-মাঝে মনের রাজা যারা,
সব আসরে যাঁদের শিরে জ্বলে সোনার তারা।
তফাৎ সরো তফাৎ সরো ফড়িং ফিঙ্গের পাল,
আসর নিতে আসছে এবে বাজপাখী 'রয়াল।'

এই "মনের রাজা"—যাঁহার তুলনায় রাজা প্রভৃতি ফড়িং ফিঙ্গের মত নগণ্য—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

"আসছে দেখো সবার আগে বুদ্ধি সুগভীর,
বিদ্যের সাগর খ্যাতি জ্ঞানের মিহির।
বঙ্গের সাহিত্য-গুরু শিষ্ট সদালাপী
দীক্ষাপথে বৃদ্ধ ঠাকুর স্নেহে জ্ঞানবাপী।
উৎসাহে গ্যাসের শিখা, ড্রার্ফ্যে শাল কড়ি
কাঙাল-বিধবা-বন্ধু অনাথের নড়ি।
প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম, দাতাকর্ণ দানে,
স্বাতন্ত্র্যে শেঁকুল-কাঁটা, পারিজাত ঘ্রাণে।
ইংরিজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত 'ডিস'
টোল-স্কুলী অধ্যাপক দুয়েরই ফিনিস।
এসো হে দ্বিজের চূড়া বঙ্গ-অলঙ্কার;
দিক্‌পাল তোমার মত দেশে নাই আর।
দেখাও দেখি সহের-চাটা সহুরে রাজায়
কার শোভাতে জলুস বেশী আসর যুড়ে যায়।"

আরও একজন প্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাসাগরের কথা লিখিয়াছিলেন; পদ্যে নহে—গদ্যে। তিনি নবীনচন্দ্র সেন। তিনি ১২৮২ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ বিদ্যাসাগরকে তাঁহার 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উৎসর্গপত্র এইরূপ :—

দয়ার সাগর
পূজ্যতম পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
দেব!

যে যুবক দুঃখের সময়ে অশ্রুজলে একদিন আপনার চরণ অভিসিক্ত করিয়াছিল, আমি সেই যুবক আবার আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত হইল; কিন্তু আপনার আশীর্ব্বাদে ততোধিক আপনার অনুগ্রহে, আজি তাহার বদন প্রসন্ন, হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ! আপনার দয়াসাগরের বিন্দুমাত্র সিঞ্চনে দারিদ্রতা-দাবানল হইতে সেই যেই মানস-কানন রক্ষা পাইয়াছিল, আজি সেই কানন-প্রসূত একটি ক্ষুদ্র কুসুম আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত হইল,—এই কারণ তাহার এত আনন্দ! বঙ্গকবিরত্নগণ স্বীয় মানস উদ্যানজাত যে চিরসুবাসিত কুসুমরাশির দ্বারা আপনার ভারতপূজ্য পবিত্র নাম পূজা করিয়াছেন, আমি তদ্রূপ পবিত্র, পরিমলবিশিষ্ট কুসুম কোথায় পাইব? আমার হৃদয়—কানন; আমার উপহার বনফুল। কিন্তু মহর্ষিগণ পারিজাত কুসুমে যেই দেবপদ অর্চ্চনা করেন, দরিদ্র ভক্তের ক্ষুদ্র অপরাজিতাও সেই পদে সমাদরে গৃহীত হইয়া থাকে আমার এইমাত্র সাহস,—এইমাত্র ভরসা।

আপনার চিরানুগত
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

মধুসূদনের কবিতা ও নবীনচন্দ্রের "উৎসর্গ" কৃতজ্ঞতা-চন্দনলিপ্ত ভক্তিকুসুমার্ঘ্য। হেমচন্দ্রের বর্ণনা বিদ্যাসাগরের চরিত্রের বিশ্লেষণ—কৃত কার্য্যের পূর্ণ পরিচয়। তাহাতে কেবল সমসাময়িক সমাজে বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠত্বই বর্ণিত হয় নাই, পরন্তু তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিপুণভাবে ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগরের "বুদ্ধি সুগভীর" ও তিনি বিদ্যার সাগর—জ্ঞানের মিহির। যাহাকে "বিমল-বুদ্ধি" বলে তিনি তাহাই ছিলেন। সেই বুদ্ধিহেতু তিনি সংস্কারের দাসত্ব করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন—বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া যাহা গ্রহণযোগ্য মনে করিতেন, তাহাই গ্রহণ করিতেন—অবশিষ্ট সব অসার মনে করিয়া বর্জ্জন করিতে পারিতেন এবং সে সাহস তাঁহার প্রভূত পরিমাণেই ছিল।

তবে তাঁহার বিমলবুদ্ধি—আলোক যেমন কোন বর্ণের কাচের মধ্য দিয়া আসিলে বর্ণরঞ্জিত হয়, তেমনই দয়ায় রঞ্জিত হইত। সেই স্থানেই তিনি ভাবচালিত হইতেন। তাঁহার জীবনের যে কার্য্য সংস্কারপন্থীরা, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, তাহাও দয়ার দ্বারা প্ররোচিত। হিন্দু বালবিধবার দুঃখে তাঁহার যে করুণা উৎসমুখে বারির মত উদ্গত হইয়াছিল, তাহাই তাঁহাকে হিন্দুশাস্ত্র সন্ধান করিয়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রতিপন্ন করিবার কার্য্যে প্ররোচিত করিয়াছিল। সেই কারণে তিনি বহুবিবাহ নিবারণের জন্যও আগ্রহসম্পন্ন হইয়াছিলেন। আর অসাধারণ সাহস না থাকিলে তিনি বিঘ্নকঙ্করকণ্টকিত পথ অনায়াসে অতিক্রম করিয়া—সমাজের শাসন উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইতে পারিতেন না।

এই করুণাই তাঁহাকে বিদেশে অর্থাভাবে বিপন্ন মধুসূদনকে সাহায্যদানের আগ্রহ দিয়াছিল। মধুসূদনের সহিত তাঁহার নানা বিষয়ে প্রভেদ—বেশে, বাসে, উদ্বাহে—অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বিদ্যাসাগর "ব্রাহ্মণপণ্ডিত," মধুসূদন য়ুরোপীয়ের অনুকরণকারী। বিদ্যাসাগর দেশীয় বেশ ব্যতীত বিদেশী বেশ পরিধান করিতেন না, মধুসূদন দেশীয় বেশ বর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর হিন্দু—মধুসূদন হিন্দুধর্মত্যাগী। অথচ মধুসূদনকে বিপন্ন জানিয়া বিদ্যাসাগর তাঁহাকে সাহায্য না করিয়া স্থির হইতে পারেন নাই।

তিনি বিদ্যার সাগর ছিলেন। কিন্তু সেই বিদ্যা আপনার অর্থ বা যশঃ অর্জ্জনের জন্য প্রযুক্ত না করিয়া দেশবাসীর প্রকৃত কল্যাণ-সাধনের জন্য অকাতরে প্রযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন ও বিশ্বাস করিতেন, বিদ্যাই জাতিকে প্রকৃত উন্নতির সন্ধান দিতে পারে—জাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারে। সেই জন্য তিনি বিদ্যাশিক্ষার পথ সুগম করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহার ফল—'বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'সীতার বনবাস' পর্য্যন্ত বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালার বিস্তৃত ইতিহাস না লিখিয়া যে বালকপাঠ্য একখানি ইতিহাসমাত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে 'বঙ্গদর্শন' দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন—"যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।" বিদ্যাসাগরের মত পণ্ডিত ও লেখক যে মৌলিক রচনায় বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধ করেন নাই, তাহাতে ঐ কথাই বলিতে হয়। কিন্তু তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহা "মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি।" তাহা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান" প্রবন্ধে বুঝাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বে যে বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইত "তাহাতে কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তথনই বিলুপ্ত হইত; কেন না কেহ তাহা পড়িত না।" সেই সংস্কৃতানুসারিণী বাঙ্গালা ভাষা "প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। * * * বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।" সেই জন্য "প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোনপ্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না।"

"বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই" কিন্তু তাঁহার রচিত পুস্তকগুলি বিদেশী রচনা হইতে গৃহীত। কেন? বঙ্কিমচন্দ্র তাহার কারণ বুঝাইয়া গিয়াছেন—"বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবু যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সময়ের প্রয়োজনানুমত।" সেই জন্যই তিনি "বঙ্গের সাহিত্য-গুরু"।

আজ যে বাঙ্গালা ভাষা সর্ব্বভাবপ্রকাশক্ষম—যাহা আনন্দে উচ্ছ্বসিত, বিষাদে বিকুণ্ঠিত, লজ্জায় বিকুঞ্চিত, করুণায় বিগলিত, সন্দেহে বিচলিত, শোকে উচ্ছলিত, প্রেমে উদ্বেলিত হয়, বিদ্যাসাগরের ভাষা তাহা হইতে অনেক দূরে। কিন্তু বিদ্যাসাগর যদি ভাষার ভিত্তিস্থাপন না করিতেন, তবে যে পরবর্ত্তীরা তাহার উপর সৌধ নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন না, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা ভাষার যাদুকর বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বে কেহই তাঁহার মত সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারেন নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারেন নাই। রামমোহন রায়ের গদ্য রচনার সহিত বিদ্যাসাগরের গদ্য রচনা তুলনা করিলে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব বুঝিতে পারা যাইবে।

বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যে বিরাম-চিহ্ন প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহা পাঠের পথ সুগম করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, বাঙ্গালা ছাপাখানায় অক্ষর সাজাইবার প্রথাও তাঁহারই প্রবর্ত্তিত। অর্থাৎ যে সকল অক্ষরের ব্যবহার অধিক সেইগুলি নিকটে ও অবশিষ্টগুলি দূরে রাখিবার ব্যবস্থায় তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় প্রকট হইয়াছিল।

তিনি যখন 'বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ' হইতে 'সীতার বনবাস' পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে প্রচলিত বাঙ্গালা শিক্ষার ব্যবস্থা কি ছিল, তাহা যাঁহারা 'শিশুবোধক' দেখেন নাই, তাঁহারা সহজে বুঝিতে পারিবেন না।

বিদ্যাসাগরের উৎসাহ ও দৃঢ়তা উভয়ই অসাধারণ ছিল। সেই উৎসাহহেতু তিনি যে কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতেন, তাহাই সম্পন্ন না করিয়া নিবৃত্ত হইতেন না এবং তিনি সঙ্কল্পে দৃঢ়—অবিচলিত থাকিতেন।

যে মুহূর্ত্তে তিনি হিন্দু বালবিধবার অবস্থা দেখিয়া বেদনানুভব করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার প্রতীকার-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন মনে করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণরা কখনও নিষ্ঠুর হইতে পারেন না, নিষ্ঠুরতা তাঁহাদিগের ধাতুসহ নহে, বিদ্যাসাগর তেমনই মনে করিয়াছিলেন, হিন্দু শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণরা কখনই নির্ম্মম ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কথায় লিখিয়াছিলেন—"Priesthood, who of all mankind are the most tender towards life and who treat even animal life with a tenderness which other races fail to display towards fellow-men" সেই বিশ্বাস লইয়া বিদ্যাসাগর শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া আপনার বিশ্বাসের অনুকূল যুক্তি ও উক্তি উদ্ধার করিয়াছিলেন।

তিনি সমাজকে অবজ্ঞা করিতেন না—সমাজকে শ্রদ্ধা করিতেন। সেই জন্যই স্বীয় বিশ্বাসের সমর্থন শাস্ত্রে সন্ধান করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রতিপন্ন করায় তৎকালীন সমাজে যে বিক্ষোভ উত্থিত হইয়াছিল, তাহা আজ কল্পনা করাও, বোধ হয়, সম্ভব নহে। কিন্তু তাঁহার চরিত্রগুণ এমনই অসাধারণ ছিল যে, সে কাজেও রক্ষণশীল সমাজ তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে কার্পণ্য করেন নাই। তাহার একটি মাত্র প্রমাণই যথেষ্ট। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন স্বধর্মনিষ্ঠ তেমনই আচারনিষ্ঠ ছিলেন। তিনিও মাতৃশ্রাদ্ধে মাতার "স্বর্গ কামনায়" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে পান-পাত্র দিয়াছিলেন। বিধবাবিবাহের ঘোর বিরোধী বিহারীলাল সরকার বিদ্যাসাগরের জীবনকথা শ্রদ্ধা সহকারে লিপিবদ্ধ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার নানা মনীষী বিদ্যাসাগরের নানা কার্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

"তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বঙ্গভাষা। * * বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা গদ্যে ভাষানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। * * * বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্য-ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্য্যকুশলতা দান করিয়াছিলেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল অতিক্রম করিয়া সাফল্যলাভে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু যিনি সেই সেনানীর রচনাকর্ত্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।"

অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, বাঙ্গালীর মধ্যে বিদ্যাসাগরের উদ্ভব বিধাতার নিয়মের ব্যতিক্রম। আমাদিগের কিন্তু মনে হয়, ইংরেজী প্রবচনই সত্য—ব্যতিক্রমই নিয়ম প্রতিপন্ন করে। বাঙ্গালীর মধ্যে বিদ্যাসাগরের উদ্ভব অসম্ভব নহে এবং সে উদ্ভব স্বাভাবিক নিয়মে হইয়াছিল। গজ-মুক্তা গজেই হয়, কিন্তু সকল গজে তাহা হয় না। গোপালকৃষ্ণ গোখলে একদিন বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত বৈজ্ঞানিক, রাসবিহারী ঘোষের মত ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্, রবীন্দ্রনাথের মত কবি নাই। তিনি রাজনীতিকদিগের কথা ইচ্ছা করিয়াই বলেন নাই। ভারতীয় সাংবাদিকদিগের মধ্যে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সর্ব্বপ্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; বাঙ্গালী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দেশকে জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন; বাঙ্গালী সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস—স্বদেশে সুযোগ না পাইলেও—বিদেশে যাইয়া সেনাপতির কাজ করিয়াছিলেন; বাঙ্গালী তরুণরা "স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি" মনে করিয়া হাসিতে হাসিতে—দেশের জন্য—প্রাণ দিয়াছে।

বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যে বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন, বোধ হয়, তাহারই প্রাবল্যে তিনি বাঙ্গালার অতীত কীর্ত্তিকথা যেমন—বর্ত্তমানে তাহার আকাশে অন্ধকারের অবসান-সূচনাও তেমনই লক্ষ্য না করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"এই হতভাগ্য দেশে হতভাগ্য জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটা কঠোরকঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা জীব-বিদ্যা ও সমাজ-বিদ্যার পক্ষে একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দ্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখন কেহ নোয়াইতে পারে নাই, সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্নবিপত্তি ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখন ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্য্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগময়ী ইচ্ছা, যাহা সর্ব্ববিধ মিথ্যাচার ও কপটাচার হইতে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত ও স্বাধীন রাখিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর মধ্যে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই।"

দেশের ও দেশবাসীর জন্য ত্যাগস্বীকারে আগ্রহশীল রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালীকে আরও উন্নত, আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আরও সাধু দেখিবার আগ্রহেই যে ঐ উক্তি করিয়া বিদ্যাসাগর বাঙ্গালীর যে আদর্শের প্রতীক সেই আদর্শে সকলকে আকৃষ্ট করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি জানিতেন—বিদ্যাসাগরের আদর্শ খাঁটি বাঙ্গালীর আদর্শ; সে আদর্শের অনুসরণ বাঙ্গালীর পক্ষে যত সহজসাধ্য তত আর কাহারও পক্ষে নহে। তিনি স্বয়ংও সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত বিশেষ বিচার ও বিবেচনা না করিয়া কোন মন্তব্য করিতেন না। তিনি বিদ্যাসাগরের কার্য্যের সময় বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, সমসাময়িক প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীদিগের মধ্যে বিদ্যাসাগর একক নহেন—হিমাদ্রির বহু শৃঙ্গের মধ্যে তিনি অন্যতম, হয়ত উচ্চতম এবং সেই জন্যই তাঁহার উদয়াস্তভাস্বরকর-সমুজ্জ্বল অবস্থিতি সহজেই প্রশংসমান দৃষ্টি আকর্ষণ করে—শ্রদ্ধার অর্ঘ্য লাভ করে। সেই জন্য রমেশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

"তিনি যাঁহাদিগের সহিত একযোগে কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তখনকার দিনে এক একজন কর্ম্মবীর। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মধুসূদন দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি অনেকেই এই তালিকাভুক্ত। (খৃষ্টীয়) উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদিগের জাতীয় কার্য্যের ইতিহাস আশার শুভ্র আলোকে সমুজ্জ্বল এবং ইহার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের ইতিহাস সর্ব্বাপেক্ষা সুক্ষ্মভাবে জড়িত।"

বিদ্যাসাগরের এই বৈশিষ্ট্যের কারণ, তিনি দেশকে অজ্ঞতার অন্ধকার হইতে জ্ঞানের আলোকে আনিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য "বর্ণপরিচয়" ও সংস্কৃত শিক্ষার পথ সুগম করিবার জন্য "উপক্রমণিকা ব্যাকরণ" রচনা করিয়া অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন;—তিনি বাঙ্গালা শিক্ষার সোপান হইতে সৌধ পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত শিক্ষা-লাভ সহজসাধ্য করিয়াছিলেন। তিনিই এ দেশে উচ্চশিক্ষার সকল বিভাগের দ্বার মুক্ত করিবার জন্য প্রথম বেসরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা কেবল ত্যাগের সুমেরু-শিখরে অবস্থিত মানুষের পক্ষেই সম্ভব। তিনি যে স্থানে অবস্থিত ছিলেন, তথায় স্বার্থদুষ্ট বায়ু বহিতে পারে না। মধুসূদন দত্তের মৃত্যু উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

"আমাদের ভরসা আছে। আমরা স্বয়ং নির্গুণ হইলেও রত্নপ্রসবিনীর সন্তান। সকলে সেই কথা মনে করিয়া, জগতীতলে আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ করিতে যত্ন কর। আমরা কিসে অপটু? রণে? রণ কি উন্নতির উপায়? আর কি উন্নতির উপায় নাই? রক্তস্রোতে জাতীয় তরণী না ভাসাইলে কি সুখের

পারে যাওয়া যায় না ? চিরকালই কি বাহুবলই একমাত্র বল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ? মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি কি বৃথায় হইতেছে ? দেশভেদে, কালভেদে কি উপায়ান্তর হইবে না ? ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল। সেই পথে আবার চল ; আবার উন্নত হইবে।"

জ্ঞানোন্নতি যে যুদ্ধের জন্যও প্রয়োজন, তাহা নানা মারণাস্ত্র আবিষ্কারে ও য়ুরোপীয় জাতিসকলের বিজ্ঞানকে ধ্বংসের রথে যুক্ত করায় দেখিতে পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগর দেশে জ্ঞানোন্নতির পথের পথিপ্রদর্শক—"দীক্ষাপথে বুদ্ধ ঠাকুর !"

সেই জন্যই তাঁহার আদর্শ স্মরণীয় ও বরণীয়।

বিদ্যাসাগরের এই যে জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা ইহার মূলে কি ছিল ? দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অসাধারণ বুদ্ধিবলে তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, বিদ্যাসাগরের কার্য্যের উৎস দেশপ্রীতি, কারণ, "যিনি স্বদেশের স্বাধীনতা, গৌরব, তেজোবীর্য্য এবং মহত্ত্ব রক্ষা করিয়া মাতৃভূমির নাম উজ্জ্বল করেন, তিনিই পেট্রিয়ট।" বিদ্যাসাগর পেট্রিয়ট ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

"তিনি যদি একশত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতেন, শত সহস্র দরিদ্র লোককে আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, দশ কোটি বিধবার মৃত সাধব্য পুনর্জীবিত করিতেন, তাহা হইলে বলিতাম, তিনি মস্ত এক জন 'ফিল্যানথ্রপিষ্ট'। 'পেট্রিয়ট' তাঁহাকে বলিতেছি, আর এক কারণে। যখন তিনি উডরো সাহেবের অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া নিঃসম্বল-হস্তে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক লেখনী-যন্ত্রের দ্বারা জীবিকা সংস্থানের পথ কাটিতে আরম্ভ করিলেন, তখন বুঝিলাম যে, হাঁ ইনি 'পেট্রিয়ট' ; যেহেতু ইনি খাওয়া-পরা অপেক্ষা স্বাধীনতাকে প্রিয় বলিয়া জানেন। যখন দেখিলাম যে, ইনি উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার সারাংশ সমস্তই ক্রোড় পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ সে সভ্যতার কৃত্রিম কুহকাংশে পদাঘাত করিয়া স্বদেশীয় উচ্চ-অঙ্গের সভ্যতা বিদ্যা বিনয় দয়া দাক্ষিণ্য মহত্ত্ব ও সদাশয়তা—সমস্তই আপনাতে মূর্ত্তিমান করিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে, এই ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণ সত্য সত্যই 'পেট্রিয়ট'-ছাঁচে-ঢালা। যখন দেখিলাম যে, 'এদেশের কিছু হইবে না' বলিয়া তিনি অকেজো মৌখিক সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সংসর্গ-বিমুখ হইয়া বাষ্পগদগদ-লোচনে গৃহকোটরে ঢুকিয়া আপনাতে ভর করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন,—দীপ্ত দিবাকর অল্পে অল্পে তেজোরশ্মি গুটাইয়া অস্তাচল-শিখরে অবনত হইতেছেন, তখন বুঝিলাম যে, পূর্ব্ব জন্মে ইনি প্রাচীন রোম নগরের কোন এক জন খ্যাতনামা 'পেট্রিয়ট' ছিলেন।"

স্বদেশে বিদ্যাসাগর কখন আদর্শের অভাব অনুভব করেন নাই। হেমচন্দ্র বলিয়াছেন, তিনি দীক্ষাপথে বুদ্ধদেব, প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম, দানে দাতাকর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে আমরা বলিতে পারি, তিনি ত্যাগের আদর্শ দধীচিতে ও ভীষ্মে পাইয়াছিলেন। তিনি যেমন আপনার মতের সমর্থন হিন্দু শাস্ত্রে পাইয়াছিলেন, তেমনই তাঁহার আদর্শ হিন্দু পুরাণে পাইয়াছিলেন। অনেক আদর্শই দেশের বা কালের সীমায় আবদ্ধ নহে।

হেমচন্দ্র বলিয়াছেন, বিদ্যাসাগর "স্বাতন্ত্র্যে শেঁকুল কাঁটা।" তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের কারণ, তিনি অনুকরণ ঘৃণা করিতেন। অনুকরণ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম তোষামোদ ; কিন্তু উহা প্রশংসার সর্ব্বনিকৃষ্ট উপায়। সেই জন্য যাঁহারা তাঁহাকে রামমোহনের উত্তরাধিকারী বলেন, তাঁহারা ভুল করেন। এক সময় স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশে ফিরিয়া কেশবচন্দ্র সেনের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্য সম্পূর্ণ করিবেন এই আশা করিয়া সরলা দেবী যেমন ভুল করিয়াছেন, বিদ্যাসাগরকে রামমোহনের উত্তরাধিকারী বলিলে তেমনই ভুল হয়।

যাঁহারা অসাধারণ তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকে। কিন্তু রামমোহনের সহিত বিদ্যাসাগরের যে সাদৃশ্য তাহাতে অধিক গুরুত্বারোপের কোন কারণ বা প্রয়োজন নাই—থাকিতেও পারে না।

তাহার কারণ, বিদ্যাসাগর—বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে মনে করিতে হয়, তিনি তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনে সমাজের সকল স্তরের নরনারী-শিশুর কল্যাণ-সাধন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং সমাজের সকল দুঃখ, দৈন্য, দুর্দ্দশা ও গ্লানি দূর করিতে অসীম শক্তি প্রযুক্ত করিয়াছিলেন।

আমরা যদি আজ তাঁহাকে আদর্শ বাঙ্গালী বলিয়া অভিহিত করিয়া গৌরবানুভব করিবার চেষ্টা করি, যদি তাঁহাকে প্রকৃত বাঙ্গালীর গৌরবচ্ছটায় সমুদ্ভাসিত বলিয়া বিবেচনা করি এবং তাঁহার আদর্শের অনুসরণ করিতে চেষ্টা করি, তবে তাহা অসঙ্গত হইবে, এমন আমরা মনে করি না। কেন না, জাতির কল্যাণের জন্য যাহা সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন, তাহার জন্য বাঙ্গালীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। ভগীরথের সাধনায় গঙ্গা যখন সগর-সন্তানগণের উদ্ধার-সাধন-জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইতে সম্মত হইয়াছিলেন, তখন প্রশ্ন উঠিয়াছিল—কে তাঁহার অবতরণবেগ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে অনিবার্য্য ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবে ? যিনি সুধাভাগ অপরকে দিয়া স্বয়ং বিষভক্ষণ করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন, সেই মহাদেব সেই বেগ ধারণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং স্বর্গ হইতে অবতীর্ণা ত্রিপথগা তাঁহার জটাজালমধ্যে বহুকাল বিচরণ করিয়া অপগতভীমবেগ হইয়া কল্যাণরূপে এই পুণ্যভূমি ভারতে প্রবাহিতা হইয়াছিলেন। জাতির কল্যাণ যে স্বাধীনতা ব্যতীত সম্ভব নহে, সেই স্বাধীনতা যখন জাহ্নবীধারার মত এ দেশে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালী—বিদ্যাসাগরের বাঙ্গালার বাঙ্গালী—তাহার বেগ ধারণ করিয়া তাহাকে কল্যাণদায়ী করিয়া সমগ্র দেশে ব্যাপ্তির সুযোগ দিয়াছিল। সে গৌরব বাঙ্গালীর। আর যাহারা সেই পুণ্য কার্য্য করিয়াছিল, বিদ্যাসাগরের আদর্শ তাহাদিগের সম্মুখে সাফল্য-গৌরব-সমুজ্জ্বল হইয়া বিরাজিত ছিল। সে আদর্শ আজও তেমনই বিদ্যমান। আমরা যেন সেই আদর্শভ্রষ্ট না হই—যেন স্মরণ রাখি—বিদ্যাসাগর বাঙ্গালী ছিলেন, যেন বলিতে পারি, আমাদিগের সঙ্কল্প—

"তোমার চরণ স্মরণ করিয়া
চলিব তোমার পথে ;
তোমার ভাবেতে বুঝিব তোমায়
ধরি' এই মনোরথে।"

কেনোপনিষদ

চিত্রিতা দেবী

চতুর্থ খণ্ড

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ, ব্রহ্মণো বা
এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি।
ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ১

তস্মাৎ বা এতে দেবা অতিতরামিবা-
ন্যান্ দেবান—যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রঃ
তে হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পৃশুস্তে হ্যেনৎ
প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২

তস্মাদ্বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্
দেবান্ স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ,
স হ্যেনৎ প্রথমোবিদাঞ্চকার
ব্রহ্মেতি ॥ ৩

তস্যৈষ আদেশো—যদেতদ্বিদ্যুতো
ব্যদ্যুতদা ইতীন্ন্যমীমিষদা
—ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ৪

অথাধ্যাত্মং—যদেতদ গচ্ছতীব
চ মনোঽনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং
সঙ্কল্পঃ ॥ ৫

তদ্ধ তদ্বনং নাম, তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্।
স য এতদেবম্ বেদাভি হৈনং
সর্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি ॥ ৬

উপনিষদং ভো ব্রূহীতি;
উক্তা ত উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং
বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি ॥ ৭

তস্যৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা,
বেদাঃ সর্বাঙ্গানি, সত্যমায়তনম্ ॥ ৮

যো বা এতামেবং বেদ অপহত্য
পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে,
লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি।
প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৯

উমা বললেন,
তিনি ব্রহ্ম, বিজয় তাঁরই।
তোমাদের অভিমান মিথ্যা।
উমাবাক্যে, ব্রহ্ম উদ্ভাসিত হোল,
তাঁর চিত্তে ॥ ১

বায়ু অগ্নি আর ইন্দ্র,
প্রথমে গিয়েছিলেন তাঁর কাছে,
স্পর্শ করেছিলেন তাঁকে,
নিকটতমরূপে।
তাই তাঁরাই পেলেন সম্মান,
—আর সকলের চেয়ে বেশী ॥ ২

প্রথমে ইন্দ্র গিয়েছিলেন তাঁর কাছে,
—অনুভব করেছিলেন তাঁকে,
আত্মার আত্মীয়রূপে,
তাই তিনি পেলেন সম্মান,
আর সকলের চেয়ে বেশী ॥ ৩

এই তো তাঁর আদেশ—
এই যে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ,
এই যে নিমেষপাত হোল চক্ষে;
এই তাঁর উপদেশ ॥ ৪

সাধকের মন যেন তাঁর প্রতি ধায়।
যেন স্মরণ করে তাঁকে বার বার।
ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রূপে,
তাঁতে যেন হয় তার চিত্তের সঙ্কল্প ॥ ৫

পূজনীয়রূপে তিনি প্রখ্যাত,
কর তাঁর উপাসনা।
যে তাঁহারে ভজে, সব চরাচর,
যাচে তারি চির সঙ্গ ॥ ৬

(হে গুরু) আমায় উপনিষদের কথা বল,
(আচার্য্য)—উপনিষদের গোপন বিদ্যা,
বলেছি তোমায় আমি।
বলেছি তোমায়, ব্রহ্মবিষয়ে, নিগূঢ় তত্ত্বকথা ॥ ৭

তপ, দম, কর্মেই,
তার প্রতিষ্ঠা (উপনিষদের)
বেদ তাহার অঙ্গ, আর,
সত্য তাহার আবাস ॥ ৮

এমন করে যে জানে তাকে,
যে করে তার অনুসরণ।
পাপক্ষয় করে, অনন্তে তার স্থিতি ॥ ৯

ইতি কেনোপনিষদি চতুর্থ খণ্ড

গীতা পাঠ

শ্রীঅনিলবরণ রায়

অর্জ্জুন যুদ্ধ করিবার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হইয়া কৃষ্ণকে নিজ রথের সারথি করিয়া পরম উৎসাহের সহিত কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। কিন্তু উভয় সৈন্যের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া যখন তিনি দেখিলেন কাহাদের সহিত তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, কি ভীষণ রক্তপাত তাঁহাকে করিতে হইবে, তখন তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল, সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়িল—তিনি রথের উপর বসিয়া পড়িয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, "আমি যুদ্ধ কবিব না।" কৃষ্ণ নানা দিক্ দিয়া গভীর ভাবে অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া দিলেন, কেন তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে। ইহাই গীতার শিক্ষা।

ভারতে প্রাচীন কাল হইতেই আধ্যাত্মিকতাকে মানব-জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে—ইহাই ভারতের মর্ম্মবাণী, ভারতীয় সভ্যতার পরম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বৈদিক যুগে আধ্যাত্মিকতার সহিত সাংসারিক জীবনের সমন্বয় করা হইয়াছিল, জীবনকে আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করাকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল—কালক্রমে এই আদর্শ ম্লান হইয়া পড়ে, আধ্যাত্মিকতার জন্য সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাসের দিকেই ভারতবাসী ঝুঁকিয়া পড়ে। এই প্রবৃত্তির বশেই রাজার কুমার সিদ্ধার্থ পূর্ণ যৌবনে রাজ্য, স্ত্রী, পুত্র পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছিলেন। জাতির পক্ষে এই প্রবৃত্তি যে কত অকল্যাণকর, তাহার প্রমাণ গৌতম বুদ্ধের তিরোধানের পরেই ভারতের পরাধীনতার ইতিহাস আরম্ভ হয়। এই প্রবৃত্তিকে রোধ করিয়া আবার সেই বৈদিক আদর্শ অনুযায়ী আধ্যাত্মিকতার সহিত জীবন ও কর্ম্মের সমন্বয় করিবার জন্যই গীতার শিক্ষা প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদের অনুসরণে যে মায়াবাদের প্রচার করিলেন তাহাতে গীতার এই কল্যাণময় শিক্ষা চাপা পড়িয়া গেল, ভারতীয় জাতির চূড়ান্ত অধঃপতন হইল—তথাপি আজও ভারতবাসী সেই মায়াবাদের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। এই সন্ধিক্ষণে শ্রীঅরবিন্দ আবির্ভূত হইয়া আবার সেই বৈদিক ও গীতার সমন্বয়কে ভারতবাসী তথা জগৎবাসীর সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছেন।

অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, কর্ম্মবীর, তিনি চিন্তাশীল দার্শনিক নহেন—ক্ষত্রিয়ধর্ম্মটি ভাল বুঝেন তাই প্রথমে সেই ধর্ম্মটি ব্যাখ্যা করিয়া কৃষ্ণ বুঝাইয়া দিলেন, কেন অর্জ্জুনের যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য—সেই সূত্রে আত্মা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিলেন তাহা হইতেছে অধ্যাত্ম-জীবনের ভিত্তি। আমি এই দেহ নহি, আমি আত্মা—এই দেহেরই জরা, ব্যাধি, মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মা অজর, অমর, সচ্চিদানন্দ। এই একই আত্মা সকলের মধ্যে রহিয়াছে, ইহা ব্রহ্মের সহিত, ভগবানের সহিত এক, আপনাতে আপনি পূর্ণ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, পরম প্রেমময়, আনন্দময়। সকল মানুষকেই নিজ নিজ জীবন ও কর্ম্মে এই অন্তর্নিহিত ভগবানকে প্রকট করিতে হইবে। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালনের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া মানুষ এই ভাগবত-জীবনের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আটত্রিশটি শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে। এইটিকেই গীতার ভূমিকা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় এই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের সার মর্ম্ম—

"ভগবানকে জান, নিজেকে জান, মানুষকে সাহায্য কর। ধর্ম্মকে, ন্যায়কে রক্ষা কর, ভয় ও দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া অবিচলিত ভাবে সংসারে তোমার যুদ্ধের কার্য্য সম্পন্ন কর। তুমিই সেই অনন্ত অবিনাশী আত্মা, তোমার আত্মা অমৃতত্ব লাভের পথেই সংসারে আসিয়াছে; জীবন-মৃত্যু কিছু নয়, দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা কিছু নয়; কারণ এই সকলকে জয় করিতে হইবে, ইহাদের উপরে উঠিতে হইবে। তোমার নিজের সুখ, নিজের লাভের দিকে তাকাইও না, কিন্তু উপরের দিকে এবং চারি দিকে চাহিয়া দেখ—উপরে ঐ যে উজ্জ্বল চূড়ার দিকে তুমি উঠিতেছ ঐ দিকে দৃষ্টি রাখ, তোমার চারি দিকে এই যুদ্ধ ও পরীক্ষার ক্ষেত্র সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ কেমন সেখানে শুভ-অশুভ, উন্নতি-অবনতি পরস্পরের সহিত নির্ম্মম ভাবে দ্বন্দ্ব করিতেছে। মানুষ তোমাকে সাহায্যের জন্য ডাকিতেছে—বলিতেছে, তুমি তাহাদের শক্তিমান পুরুষ, তুমি তাহাদের সহায়, অতএব তাহাদিগকে সাহায্য কর, যুদ্ধ কর। যদি জান, উন্নতির জন্যই ধ্বংসকার্য্য আবশ্যক হয় তবে ধ্বংস কর—কিন্তু যাহাদিগকে ধ্বংস করিবে তাহাদিগকে ঘৃণা করিও না, যাহারা ধ্বংস হইবে তাহাদের জন্য শোক করিও না। সকল স্থানেই সেই এক সত্য বস্তুকে জানিও—জানিও সকল আত্মাই অমর এবং এই দেহ শুধু ধূলা। শান্ত, সমর্থ, সমতাপূর্ণ মনোভাব লইয়া তোমার কার্য্য কর। যুদ্ধ কর, বীরের মত পতিত হও কিংবা বীরের মত জয়লাভ কর। কারণ, ভগবান এবং তোমার প্রকৃতি তোমাকে এই কার্য্যটিই সম্পাদন করিতে দিয়াছেন।"

—শ্রীঅরবিন্দের গীতা।

গীতার মত এমন অমূল্য সম্পদ ভারতবাসীর গৃহে গৃহে বিরাজ করিলেও, ভারতের আজ এত অবনতি কেন? ভারতে আজও অধ্যাত্ম সাধনার বহু আশ্রম ও কেন্দ্র রহিয়াছে—তথাপি ভারতবাসীর মন পাশ্চাত্য ভাবে এমন প্রভাবিত হইয়া পড়িল কেন? ভারতে কম্যুনিজিম্ দিন দিন যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিতেছে তাহাতে ব্রিটিশ শাসন হইতে মুক্ত হইবার পর আবার হয়ত ভারতকে সোভিয়েট রুশিয়ার অধীন হইতে হইবে। অধ্যাত্ম আদর্শ হইতে চ্যুত হওয়ায় ভারতবাসীর দুর্দ্দশার চরম হইয়াছে, দেশ দুর্নীতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আসিয়াছে ব্যাপক দুঃখ ও দৈন্য, তথাপি কাহারও চক্ষু ফুটিতেছে না। ভারতের সাধন-কেন্দ্রগুলি আপন আপন ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে কাজ করিতেছে, আপন আপন ভাবে সাধনা করিতেছে। তাহাদের মধ্যে মতভেদ অনেক, কিন্তু ইহাতে কোন দোষ বা আপত্তি নাই, কারণ অধ্যাত্ম সাধনার অসংখ্য ধারা আছে, সবই আপন আপন ভাবে বিকাশ লাভ করুক। কিন্তু নিজেদের মধ্যে তাহারা যতই কার্য্যকরী হউক, বাহিরের জনসাধারণকে সাহায্য করিতে আসিলে তাহাদের মতভেদে লোকে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। এমন একটা প্রোগ্রাম বা কার্য্যপদ্ধতি নাই যাহাতে সকলে একযোগে কাজ করিতে পারে, একই কথা বলিতে পারে, একই আদর্শ সমস্ত ভারতবাসীর সম্মুখে ধরিতে পারে। ভারতের সাধন-কেন্দ্রগুলি যদি ইহা করিতে পারে তাহা হইলে পৃথিবীতে তাহারা নবযুগের সূচনা করিবে সন্দেহ নাই।

দেখা যাউক, কি বিষয়ে সকলে মিলিতে পারে। ভগবানকে ছাড়িয়া মানব-জীবনের কোন সমস্যারই সমাধান নাই—ইহা সকলেই স্বীকার করেন। দেহের অতিরিক্ত মানুষের আত্মা আছে, সে আত্মা অজর অমর, ভগবানের সহিত এক, চির-সচ্চিদানন্দ, সেই আত্মাকে জানিতে

হইবে, সেই আত্মজ্ঞানের ভিত্তিতে সমগ্র জীবন ও কর্ম্ম গঠিত ও পরিচালিত করিতে হইবে। এ কথাগুলি সকলেই স্বীকার করিবেন। এখন দেখা যাউক, এমন কোন শাস্ত্র আছে যাহা বেদ-বেদান্তের সার সংগ্রহ করিয়া এই কথাগুলি প্রকৃষ্ট ভাবে প্রকাশ করিয়াছে। সেই শাস্ত্র হইতেছে গীতা। ভারতের সকল সম্প্রদায়ই গীতাকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে এই যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ই গীতার এমন ব্যাখ্যা দিয়াছে, তাহাতে তাহাদের নিজ সাম্প্রদায়িক মতটিই সমর্থিত হয়, ফলে এক ব্যাখ্যার সহিত অন্য ব্যাখ্যার মিল হয় না, আর এই ব্যাখ্যা-সঙ্কটের জন্য গীতার মধ্যে যে অমৃত রহিয়াছে, সাধারণে তাহার সন্ধান পায় না। কিন্তু গীতা কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক মত সমর্থনের জন্য রচিত হয় নাই, ইহা মহান্ সমন্বয়মূলক গ্রন্থ। ইহাতে সকল মতেরই স্থান আছে, তাই সকল সম্প্রদায়ই ইহার মধ্যে নিজেদের মতের সমর্থন পায়। গীতার গভীর সমন্বয়টি যাহাতে লোকে বুঝিতে পারে, সে জন্য গীতার অসাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা প্রয়োজন—এইরূপ ব্যাখ্যাই দিয়াছেন শ্রীঅরবিন্দ। তিনিই একমাত্র ব্যাখ্যাকার যিনি নিজের মত প্রচারের জন্য গীতার শ্লোকগুলি লইয়া টানাবুনা করেন নাই, পরন্তু গীতার যেটি মূল শিক্ষা মন্ত্রশক্তিপূর্ণ ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন—উহা পাঠ করিলে আধ্যাত্মিকতার দিকে মানুষের মন আপনিই আকৃষ্ট হইবে, তাহাদের হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া যাইবে, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে।

তাই আমরা প্রস্তাব করিতেছি, ভারতের প্রতি সহরে, প্রতি পল্লীতে গীতা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক, সেখানে শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যার সাহায্যে গীতার দিব্য প্রাণময়ী শিক্ষা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করা হউক। ঠিক যেমন পুরাকালে গ্রামে গ্রামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হইত। মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্মপ্রচার, লোকের মনে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করা। এই একই উদ্দেশ্যে সকল দেশেই গির্জ্জা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। কিছু না কিছু ধর্ম্মভাব নাই, এমন লোক পৃথিবীতে আজ খুব কমই আছে। কোন না কোন ভাবে ভগবানের অস্তিত্বে অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করে, কোন না কোন রূপে ভগবানের আরাধনাও করে। কিন্তু ইহার ফল খুব বেশী নহে, ইহাতে মানব-চরিত্রের বিশেষ পরিবর্ত্তন বা উন্নতি হয় না—তাই এখনও জগতে এত দুঃখ ও অশান্তি। এখন আর শুধু মন্দিরে প্রতিমা দেখিলে বা পূজা করিলে চলিবে না, মানুষ মাত্রেরই হৃদয়-মন্দিরে ভগবান রহিয়াছেন, সেখানে তাঁহাকে আবিষ্কার করিতে হইবে, তাঁহার সহিত সজ্ঞানে মিলিত হইতে হইবে। ইহাই যোগ—এখন আর শুধু ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া থাকিলে চলিবে না, এখন চাই যোগসাধনা এবং গীতাই হইতেছে সেই সাধনার প্রকৃষ্ট শাস্ত্র। ভারতের সকল আশ্রম ও অধ্যাত্ম-কেন্দ্রগুলি যদি মিলিত ভাবে গীতা-প্রচারের প্রয়াস করেন, তাহা হইলে শীঘ্রই ভারতে এক মহান্ ও বিরাট অধ্যাত্ম আন্দোলনের সৃষ্টি করা যাইতে পারে। কলিকাতার গীতা-প্রচার সমিতি (১০৩ডি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪) এই উদ্দেশ্যেই কাজ করিতেছেন। তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করা সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য।

প্রিয়তম

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

তুমি প্রিয়, প্রিয়তম,
যত হও নিরমম,

পূজিব হে অবিরাম,
মূরতি সে অভিরাম,
হৃদয়-মাঝারে,
ভাসি' আঁখিনীরে ;

যদি চরণে দলে' যাও,
অহমিকা ভেঙে দাও,

তবু আমি অনিবার,
প্রিয় মুখ সুকুমার,
স্মরিব আদরে,
এ হৃদয়-পুরে !

শুধু, ভালবাসিবার,
নাহি কি গো অধিকার ?

সেটুকুও কেড়ে নেবে,
শেষে ঠেলে ফেলে দেবে,
দুখের মাঝারে,
নিরাশা-পাথারে!

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

চতুর্থ অঙ্ক

তালপাতের সরাই

[সরাই-এ চাঞ্চল্য। নানা শ্রেণীর লোক-জন আসা-যাওয়া করছে, কোথাও বা গান-বাজনা হচ্ছে—মাথা ন্যাড়া, দাড়ি-গোঁফ কামানো—সামান্য বেশে জাহান্দার শার প্রবেশ। সঙ্গে লালকুঁয়ার, বুর্খায় সর্বাঙ্গ ঢাকা, মুখের কাছে কাপড় সরানো।]

জাহান্দার শা। আর কত পালাবো ইমতিয়াজ, তামাম্ হিন্দুস্থানটা তো তিন দিনে হেঁটে পার হওয়া যায় না! ফরুখশায়ারের ফৌজ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা ধ'রে ফেলবার আগেই যদি দিল্লীতে পৌঁছুতে পারতুম—

(জনৈক লোকের প্রবেশ)

এই জায়গাটার নাম কি ভাই ?

লোক। এটা হচ্ছে তালপাত্।

জাহান্দার। এখান থেকে দিল্লী আর কত দূরে ?

লোক। বেশি দূর নয়—আট-দশ ক্রোশ হবে। তোমরা কোথা থেকে আসছ ?

জাহান্দার। আমরা আসছি ঝাঁসি থেকে।

লোক। ও, দিল্লীতে বাড়ী বুঝি ? রাস্তায় যুদ্ধের কোনো খবর পেলে ?

জাহান্দার। যুদ্ধের নানা রকম খবর পাচ্ছি। কোনটা ঠিক তা তো বুঝতে পারছি না। তোমরা কিছু খবর পেয়েছ ?

লোক। আমরা শুনেছি যে জাহান্দার যুদ্ধে হেরে দাক্ষিণাত্যের দিকে পালিয়েছে। ফরুখশায়ার দিল্লীর দিকে রওনা হয়েছে, এইখান দিয়েই তারা যাবে দিল্লীর দিকে।

জাহান্দার। ও,

[লোকের প্রস্থান।

কি ইমতিয়াজ, কথা কইছ না যে ?

ইমতিয়াজ। আমার বড় ঘুম পাচ্ছে সম্রাট !

জাহান্দার। ঘুমের আর দোষ কি ? আজ তিন দিন তিন রাত্রি না খেয়ে অনবরত পথে চলতে হচ্ছে—তোমার খুব খিদে পেয়েছে বোধ হয় ?

(এক জন লোকের প্রবেশ)

লোক। বাবা, কিছু ভিক্ষে দেবে ?

জাহান্দার। আমাদের তো কিছু নেই বাবা। যা ছিল পথে ফরুখশায়ারের সৈন্যরা সব কেড়ে নিয়েছে। তিন দিন আমাদের পেটে কিছু পড়েনি ! তোমার কাছে যদি কিছু খাবার থাকে আমাদের দিয়ে যাও—আমরা স্বামি-স্ত্রীতে প্রাণরক্ষা করি—আল্লা তোমার ভাল করবেন।

লোক। আহা, তোমরা তো তাহ'লে ভারি কষ্টে পড়েছ ! আমি বাবা, ভিখিরি মানুষ। এই মহম্মদ মিঞার মজজিদে সন্ধ্যে বেলায় কাঙালি-বিদেয়ের সময় খান কয়েক রুটি পেয়েছিলুম, একখানা তোমরা নাও।

[রুটি দান। জাহান্দার শা রুটি গ্রহণ করিল ও লোকটির প্রস্থান।

জাহান্দার। ইমতিয়াজ, দেখ দেখ, কি এনেছি। আল্লা—আল্লা এখনো আমাদের ত্যাগ করেননি। নাও, এই খেয়ে আপাতত খিদে-তেষ্টা মেটাও।

(জাহান্দার রুটি নিয়ে হাত বাড়িয়ে রইল, কিন্তু লালকুঁয়ার হাত বাড়াল না।)

লালকুঁয়ার। সম্রাট—সম্রাট—ফেলে দাও, ফেলে দাও এখুনি ফেলে দাও ঐ রুটি। ছি ছি—শেষ কালে তুমি ভিক্ষা করলে। আল্লা, আমার কপালে এই লিখেছিলে—

জাহান্দার। চুপ কর, চুপ কর,—আল্লার নিন্দা কর না। আমি বাদশার ছেলে, বিশ্ববিজয়ী আলমগীর আমার দাদা,—নিজেও বাদশা ছিলুম—ছিলুম কেন, এখনও আছি—আমাকে কখনো আল্লার নিন্দা করতে শুনেছ? আমি মুসলমান, আমার সামনে আল্লার নিন্দা কর না—বরং এই দুর্দিনেও একমাত্র তিনিই আমাদের সহায়—তার প্রমাণ দেখ এই খাবার, এস—হাসিমুখে আমরা এই ভাগ ক'রে খাই। (রুটি ছিঁড়ে দু'ভাগ ক'রে এক ভাগ এগিয়ে দিয়ে) নাও—ইয়া আল্লা—শুকর হুয় তেরা—অতি দুর্দিনেও তুমি এ বান্দাকে ভোলনি।

(পট পরিবর্তন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

আসাদ খাঁর বাড়ী

আসাদ ও জুলফিকার খাঁ

আসাদ। আমি খবর পেলুম যুদ্ধে তোমাদেরই জয় হয়েছে। কিন্তু অকস্মাৎ এ কি বজ্রপাত!

জুলফিকার। হাঁ পিতা, এ যুদ্ধে আমাদের জয় নিশ্চিত ছিল, কোকলতাস খাঁ শত্রুপক্ষকে প্রায় বিধ্বস্ত করে এনেছিল। ফরুখশায়ারের সেনাপতি ভীষণ আহত—জয় মুষ্টিগত, এমন সময়ে সংবাদ এল জাহান্দার শা লালকুঁয়ারের হাতী চড়ে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়েছেন, আমাদের সৈন্যরা হতোদ্যম হ'য়ে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ল। শত্রুপক্ষের মধ্যে জাহান্দারের পলায়নের খবর পৌঁছবা মাত্র আবদাল্লা খাঁ তার বাহিনীকে একত্র ক'রে আমাদের তীব্র আক্রমণ করলে। আমার সেনাদল নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কিছুক্ষণ যুদ্ধ চালিয়েছিলুম কিন্তু পলাতক বাদশার সৈন্য নিয়ে কতক্ষণ যুদ্ধ করা যায়?

আসাদ। বুঝলুম, তার পর?

জুলফিকার। তাই বৃথা প্রাণিহত্যা ক'রে লাভ নেই মনে ক'রে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চ'লে এলুম। যুদ্ধক্ষেত্রে যদি কোকলতাসের মতন আমার মৃত্যু হ'ত তো ভাল হ'ত, কারণ আমি জানি যে ফরুখশায়ার আমায় ছাড়বে না। তার পিতাকে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে জাহান্দারের সিংহাসনের পথ আমিই পরিষ্কার ক'রে দিয়েছিলুম। তার প্রতিশোধ সে নেবেই।

আসাদ। আমার তো তাই মনে হয়। দিল্লীতে এসে ভাল করনি বৎস। ফরুখশায়ারের লোকেরা এই বাড়ী দিন-রাত চৌকি দিচ্ছে। তারা জানে, হয় তুমি না হয় জাহান্দার দিল্লীতে এসেই এখানে আসবে।

জুলফিকার। জানি পিতা, তাই একবার মনে হয়েছিল দক্ষিণে আমার রাজ্যে চ'লে যাই। কিন্তু চলে যাবার কথা মনে হ'তেই আপনার কথা মনে হ'ল। মনে হ'ল আমাকে না পেয়ে ফরুখশায়ার আপনার ওপর ভীষণ অত্যাচার করবে। তাই সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য ক'রে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

আসাদ। ভাল করনি। তোমাকে পেলেও তারা আমাকে ছাড়বে না। তুমি পালালে অন্তত এই সান্ত্বনা দিয়ে মরতে পারতুম যে, আমি নির্বংশ হইনি। এখন—

(জাহান্দারের প্রবেশ

কে, কে আপনি?

জাহান্দার। আমাকে চিনতে পারছেন না আসাদ খাঁ? সত্যই আপনি ক্ষীণদৃষ্টি হয়েছেন।

জুলফিকার। চিনতে পারছেন না পিতা?—ইনি সম্রাট।

জাহান্দার। হা—(হাস্য), আমি ভারত-সম্রাট শাহান-শা-ই-গাজী মৈজুদ্দিন-জাহান্দার-শা—দাড়ি ও গোঁফজোড়া স্ব-ইচ্ছায় ত্যাগ করেছি, কিন্তু রাজ্যটা এখনো ত্যাগ করতে পারিনি।

জুলফিকার। কিন্তু সম্রাট, আপনি দিল্লীতে এলেন কেন? আমি শুনলুম আপনি দাক্ষিণাত্যের দিকে গিয়েছেন।

সম্রাট। হা—হা (হাস্য), তুমিও শুনেছ যে আমি দাক্ষিণাত্যের দিকে পালিয়েছি।—ভালো—ভালো—। কিন্তু তুমি দিল্লীতে এসেছ কেন জুলফিকার খাঁ?

জুলফিকার। দিল্লী আমার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক স্থান, তা জেনেও আমায় আসতে হয়েছে আমার বৃদ্ধ পিতার জন্য।

সম্রাট। অনায়াসলব্ধ বৃদ্ধ পিতার মায়া ত্যাগ ক'রে তুমি পালাতে পারলে না জুলফিকার খাঁ, আর বহু আয়াসলব্ধ আমার এই রাজ্য—আমার ময়ূর-সিংহাসন—সেই সুন্দরী তক্‌ত-এ-তাউসের মায়া—যার মোহ আমার বংশ-পরম্পরায় শোণিতধারায় প্রবাহিত হচ্ছে তাকে ত্যাগ ক'রে কি ক'রে পালাই বল তো? আরো একটা সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন।

জুলফিকার। কি সমস্যা সম্রাট?

সম্রাট। আমার বন্ধু আলিমুরাদ কোকলতাস খাঁ যখন প্রাণপাত করে যুদ্ধ করছিল—তখন তুমি, শুনলুম, তোমার অন্যান্য সৈন্য নিয়ে একধারে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলে—কথাটা শুনে তখন মনে হ'য়েছিল এটা দুষ্ট লোকের মিথ্যা রটনা—কিন্তু এখন দেখছি আমার অনুমান ভুল।

জুলফিকার। সম্রাট—

সম্রাট। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সত্য কথা বলবে কি?

জুলফিকার। সত্য বলব সম্রাট—আপনি জানেন এ বান্দা মিথ্যাকে ঘৃণা করে—

সম্রাট। বেশ বেশ, কথাটা শুনে বড় খুশি হলাম। এখন বল তো—কোকলতাস খাঁ যখন আবদাল্লা খাঁকে পরাজিত করলে—তখন যুদ্ধক্ষেত্রে ছবির মতন দাঁড়িয়ে না থেকে তুমি যদি তোমার সৈন্য নিয়ে তাকে সাহায্য করতে তাহ'লে এ যুদ্ধে আমাদের জয় হ'ত কি না?

জুলফিকার। হয় তো হ'ত সম্রাট, কিন্তু কোকলতাসের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ তা তো আপনি জানেন। তার সঙ্গে একত্র যুদ্ধ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না জাহাপনা!

সম্রাট। হো-হো (হাস্য)—হয় তো হ'ত (হাস্য)—হয় তো হ'ত—আর তাই জেনেও আমাদের পরাজয়কে নিশ্চিত করবার জন্য তুমি আক্রমণ না ক'রে সঙের মত দাঁড়িয়েছিলে। আমার

ক্ষমা কর জুলফিকার খাঁ! না—তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে পারলুম না।

জুলফিকার। সম্রাট, বৃথা এখানে সময় নষ্ট করবেন না—ফরুখশায়ার সসৈন্যে দিল্লীর সীমান্তে এসেছেন—এখুনি পলায়ন না করলে আপনার প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে।

সম্রাট। তাহ'লে তুমি কি করতে আছ! আলিমুরাদকে তার ন্যায্য উজিরি থেকে বঞ্চিত ক'রে তোমাকে সেই পদ দিয়েছিলুম কি এই কথা শোনবার জন্য? শয়তান! যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন ক'রে এখানে এসে আমাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে!

জুলফিকার। মিথ্যে কথা! যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছেন আপনি—আপনি না পালালে—

সম্রাট। চুপ রহো বদ্‌মাস্! আমার কাজের সমালোচনা করবার কোনো অধিকার তোমার নেই। তোমাকে যে কাজে পাঠানো হয়েছিল তাতে তুমি অবহেলা করেছ, সে জন্য তোমায় সাজা পেতে হবে। কি সাজা তোমায় দেবো—আমি—আমি তোমায়—

আসাদ। সম্রাট, আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত—কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন—ইতিমধ্যে আমরা পরামর্শ করে একটা কিছু বিহিত করছি—

সম্রাট। বেশ, আপনারা পরামর্শ ক'রে এখুনি আমায় সংবাদ দেবেন। আমি চললুম—

আসাদ। আপনি কোথায় চললেন?

জাহান্দার। কেল্লায়।

জুলফিকার। কি সর্বনাশ!

আসাদ। কেল্লা তো হুসেন খাঁর লোকে পরিপূর্ণ!

জাহান্দার। তা জানি—সেই জন্যেই তো সেখানে যাচ্ছি—দেখি—

আসাদ। সম্রাট, একটা কিছু বিহিত না হওয়া পর্যন্ত আপনি এইখানেই থাকুন।

জাহান্দার। আর তার উপায় নেই আসাদ খাঁ—কেল্লায় আমায় যেতেই হবে। ইমতিয়াজ আগেই সেখানে গিয়েছে—সে হয় তো আমার জন্য উৎকণ্ঠিত হচ্ছে। আচ্ছা আবার দেখা হবে— [প্রস্থান।

জুলফিকার। উন্মাদ—একেবারে উন্মাদ!

আসাদ। উন্মাদ নয় বৎস, শয়তান। ওকে এখানে রাখতে পারলে আমাদের বিশেষ সুবিধে হ'ত। ফরুখশায়ারের হাতে যদি আমরা ওকে আর লালকুঁয়ারকে সমর্পণ করতে পারতুম তাহ'লে হয় তো তোমার উজিরি ও আমার প্রাণ অক্ষুণ্ণ থাকত। সেটা বুঝতে পেরে শয়তান সরে গেল।

জুলফিকার। তাই তো—

আসাদ। চল একবার হুসেন খাঁর সঙ্গে দেখা করবার ব্যবস্থা করি গে। সময় নষ্ট করলে বিশেষ বিপদ হতে পারে।

(পট পরিবর্তন।)

তৃতীয় দৃশ্য

পুরাতন দিল্লীর ময়দানে তাঁবু শিবির

ফরুখশায়ার, আবদাল্লা খাঁ, হুসেন খাঁ, খাজা আসিম, তকব্বর খাঁ, প্রহরিগণ প্রভৃতি।

আবদাল্লা। জাহাঁপনা, রাজকোষ একেবারে শূন্য। আমার বিশ্বাস, যুদ্ধে নিজেদের পরাজয় অনিবার্য্য জেনে জাহান্দারের চতুর উজির আগে থাকতেই সব অর্থ সরিয়ে ফেলেছে।

ফরুখশায়ার। তাই তো আবদাল্লা খাঁ, এত কষ্ট করে সিংহাসন অধিকার করা কি শেষে ব্যর্থ হবে?

হুসেন। ব্যর্থ কেন হবে সম্রাট! আপনার অনুগ্রহে আমরা শীগ্‌গিরই জমিদারদের বুঝিয়ে দেব যে, হিন্দুস্থানের সিংহাসনে জাহান্দার শার বদলে বাদশা ফরুখশায়ার বসেছেন। রাজকোষ দু'দিনেই অর্থে পরিপূর্ণ হ'য়ে যাবে। তার আগে জুলফিকার খাঁ ও তার বাবা পাজি আসাদ খাঁকে সরাতে হবে। তারা যত দিন জীবিত থাকবে তত দিন কোনো না কোনো দিক থেকে বাধা আসবেই—

ফরুখশায়ার। তুমি তাদের ডেকে পাঠিয়েছিলে না?

হুসেন। হ্যাঁ সম্রাট, বার বার ডাকার পরেও তারা আসছে না দেখে আমি আজ আপনার নাম ক'রে ডেকে পাঠিয়েছি।

ফরুখশায়ার। তারা দিল্লী থেকে পালিয়ে যায়নি তো?

হুসেন। তারা পালাতে পারবে না সম্রাট! পাঁচ শত প্রহরী তাদের বাড়ী ঘিরে আছে। সংবাদ পেয়েছি তারা আজই আসবে।

ফরুখশায়ার। তকব্বর খাঁ, জাহান্দার শা কোথায়?

তকব্বর। তিনি দেওয়ানি খাসে বসে এখনও সম্রাটের ভূমিকা অভিনয় করছেন।

আবদাল্লা। জাহান্দার শাকে আর বেশি দিন অভিনয় করতে দেওয়া সঙ্গত হবে না সম্রাট! পাঞ্জাবে শিখ, আগ্রায় জাঠ ও সমস্ত হিন্দুস্থান জুড়ে মারাঠা প্রবল হ'য়ে উঠছে। শীগ্‌গিরই তাদের দমনের ব্যবস্থা করতে হবে। জাহান্দার শা জীবিত থাকলে ভবিষ্যতে আরো গোল বাধবার সম্ভাবনা।

ফরুখশায়ার। তা সব গোলমালের সম্ভাবনা আজই মিটিয়ে দাও না হুসেন খাঁ!

হুসেন। সম্রাটের আজ্ঞার অপেক্ষা মাত্র।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। আসাদ খাঁ ও জুলফিকার খাঁ।

ফরুখশায়ার। যাও, তাদের এখানে নিয়ে এসো—আচ্ছা হুসেন খাঁ, তুমি নিজে যাও।

হুসেন। যো হুকুম জাহাঁপনা।

[হুসেন খাঁর প্রহরীসহ প্রস্থান।

ফরুখশায়ার। তকব্বর খাঁ, তোমার লোকজন প্রস্তুত?

তকব্বর। জনাব!

(আসাদ খাঁকে নিয়ে হুসেন খাঁর প্রবেশ)

ফরুখশায়ার। (আসন থেকে উঠে)—আসুন খাঁ সাহেব! দিল্লীতে এসে অবধি আপনার প্রতীক্ষা করছি।

আসাদ। জাহাঁপনা, বান্দার অপরাধ মার্জনা করবেন। আপনার হুকুম অনেক আগেই আমার কাছে পৌঁছেছিল, কিন্তু বার্দ্ধক্যে এই শরীর অত্যন্ত অপটু, দু'দিন শয্যা ত্যাগ করবার ক্ষমতা ছিল না, তাই আসতে দেরী হ'ল।

ফরুখশায়ার। জুলফিকার ভাই আসেনি?

আসাদ। সে অপরাধী, আপনার সামনে আসতে শঙ্কিত হচ্ছে। যদি অভয় দেন তো এখুনি আপনার সমুখে এনে হাজির করি।

ফরুখশায়ার। সে কি কথা! আবদাল্লা খাঁ, এখুনি জুলফিকার খাঁকে নিয়ে এস।

আবদাল্লা। যো হুকুম জাহাঁপনা।

[প্রস্থান।

ফরুখশায়ার। আসাদ খাঁ, আমার পিতৃ-পিতামহের লীলাভূমি এই দিল্লী, কিন্তু এখানে প্রবেশ করতে হ'ল অবাঞ্ছিত আগন্তুকের মত।—এখানে আপনারাই হচ্ছেন আমার আত্মীয়।

(আবদাল্লা খাঁর সহিত প্রহরী পরিবেষ্টিত জুলফিকার খাঁর প্রবেশ) আসুন জুলফিকার ভাই।

(আসাদ খাঁকে)—

খাঁ-সাহেব, আপনার শরীর অসুস্থ, আপনাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখব না—আপনি বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম করুন।

আসাদ। আচ্ছা, আমি চললুম।

ফরুখশায়ার। হাঁ, আসুন। তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন। রাজ্যের চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা। এ সময়ে আপনার পরামর্শ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। কি বল আবদাল্লা খাঁ!

(আবদাল্লা খাঁ মাথা নীচু ক'রে কুর্ণিশ করলে মাত্র।)

আসাদ। আমি আপনার বান্দা। যখনই স্মরণ করবেন তখনি হাজির হব।

(জুলফিকারকে)—

দেখলে, সম্রাট কি রকম মহানুভব। তুমি আসতে ভয় করছিলে! আচ্ছা সম্রাট, আমি তাহ'লে এখন ওকে নিয়ে যাই—প্রয়োজন হলে—

হুসেন। জুলফিকার খাঁকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন সম্রাট। উনি গেলে—

ফরুখশায়ার। না আসাদ খাঁ। জুলফিকার ভাই এখন কিছুক্ষণ এইখানেই থাকবেন। আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

আসাদ। সম্রাট!—

ফরুখশায়ার। আপনি নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরে যান, আমি আশ্বাস দিচ্ছি।

আসাদ। তাই যাচ্ছি সম্রাট! আপনি যখন অভয় দিচ্ছেন তখন কোনো ভয় নাই।

[প্রস্থান।

ফরুখশায়ার। জুলফিকার খাঁ, রাজ্যের বিশেষ প্রয়োজনে আমরা আপনাকে এখানে ডেকে এনেছি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি এখনই নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধি দর্শন করে ফিরে আসছি। হুসেন খাঁ, জুলফিকার খাঁ-সাহেব আজ এইখানেই আহারাদি করবেন। আপনারা দেখবেন তাঁর যেন কোনো অসুবিধা না হয়। আমি খাবার পাঠিয়ে দিতে বলছি। খাঁ-সাহেব, আপনি বিশ্রাম করুন, আমি এখুনি ফিরে আসছি।

জুলফিকার। সম্রাট, একটি অনুরোধ—

ফরুখশায়ার। কি অনুরোধ জুলফিকার খাঁ?—

জুলফিকার। আপনি কি আমাকে হত্যা করতে চান?

ফরুখশায়ার। যদি বলি চাই!

জুলফিকার। তাহ'লে দোহাই আপনার—খাবারের সঙ্গে বিষ দিয়ে কুকুরের মত আমাকে হত্যা করবেন না।

(আবদাল্লা খাঁর ইশারায় তকব্বর খাঁ বেরিয়ে গেল এবং তখুনি আট-দশ জন কাল্‌মাক্ ক্রীতদাস নিয়ে ফিরে এসে জুলফিকার খাঁর চতুর্দ্দিকে ঘিরে দাঁড়াল।

ফরুখশায়ার। আমার পিতা আজিম-উস-শানকে তুমি দেখতে পারতে না—কেমন?

জুলফিকার। তিনিই আমায় দেখতে পারতেন না। যুদ্ধের সময় রাজ্যের সমস্ত কর্মচারীই যার যেদিকে ইচ্ছা সেদিকেই যোগ দিয়েছিল। আপনার পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে আমি কোনো অন্যায় করিনি।

ফরুখশায়ার। অন্যায় করেছ কি না এখুনি তা বুঝতে পারবে।

জুলফিকার। জনাব, আমাকে হত্যা করাই যদি আপনার ইচ্ছা থাকে—তাহ'লে ছল খোঁজবার আর প্রয়োজন কি? আপনার যা ইচ্ছা হয় করুন।

ফরুখশায়ার। বেশ তাই হবে, তকব্বর খাঁ—নিয়ে যাও।

[তকব্বর খাঁ, প্রহরীগণ ও জুলফিকার খাঁর প্রস্থান।

হুসেন খাঁ, জুলফিকারের মৃতদেহ ঐ শয়তান জাহান্দারের কাছে পাঠিয়ে দাও—জাহান্নমে যাবার আগে সে দেখে যাক তার প্রাণের দোস্ত আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে।

হুসেন। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

ফরুখশায়ার। আবদাল্লা খাঁ, তুমি এখুনি আসাদ খাঁর বাড়ী আক্রমণ ক'রে তার সমস্ত ধনরত্ন প্রাসাদে নিয়ে আসবে আর সেই শয়তান বৃদ্ধকে দূর ক'রে রাস্তায় বার করে দেবে।

আবদাল্লা। যো হুকুম—

[প্রস্থান।

ফরুখশায়ার। চল তকব্বর, এবার আহারাদি শেষ ক'রে শয়তান জাহান্দারকে জাহান্নমে পাঠাবার ব্যবস্থা করি গে।

[সকলের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

চতুর্থ দৃশ্য

দিল্লীর দেওয়ানি খাস।

জাহান্দার শা, লালকুঁয়ার ও তিন-চার জন প্রহরী। জাহান্দারের মাথায় পাগড়ী নেই—চুল উস্‌কোখুস্‌কো মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফ—হাতে চাবুক।

জাহান্দার। কাল নিয়ামৎ বললে কোকলতাস যুদ্ধে মরেনি, সে আবার সৈন্য সংগ্রহ করছে। এবার ফরুখশায়ারকে বন্দী ক'রে আমার কাছে ধ'রে নিয়ে আসবে।

লালকুঁয়ার। তার কথা বিশ্বাস করবেন না সম্রাট! নেশার খেয়ালে কখন কি বলে তার ঠিক নাই।

(মহম্মদ ইয়ার খাঁর উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রবেশ)

জাহান্দার। কি সংবাদ—মহম্মদ ইয়ার খাঁ?

ইয়ার খাঁ। অত্যন্ত দুঃসংবাদ জাহাঁপনা! ফরুখশায়ারের হুকুমে আবদাল্লা খাঁ আসাদ খাঁর বাড়ী লুঠ ক'রে তার সমস্ত ধন-সম্পত্তি নিয়ে গিয়েছে।

জাহান্দার। এঁ্যা! বল কি হে? তা গরীব আসাদ খাঁ বেচারীর ওপরে এ অত্যাচার কেন? তার বিশেষ কিছু ধন-সম্পত্তি ছিল ব'লে তো আমার জানা নেই।

ইয়ার খাঁ। জাহাঁপনা, সেখানে কুড়িখানা বয়েল গাড়ী বোঝাই শুধু মোহর ও অলঙ্কার বেরিয়েছে—তা ছাড়া—

জাহান্দার। আসাদ খাঁ কোথায়?

ইয়ার খাঁ। আবদাল্লা খাঁর লোকেরা তাকে রাস্তায় বার ক'রে দিয়েছে।

জাহান্দার। আর জুলফিকার খাঁ?

ইয়ার খাঁ। জাহাঁপনা, জুলফিকার খাঁ সম্বন্ধে নানান্ কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

জাহান্দার। তাই তো মহম্মদ ইয়ার খাঁ—এ সময় জুলফিকার খাঁ কোথায় গেল? আমি দেখেছি দরবারের সময় সে ঠিক স'রে পড়ে। আগ্রার যুদ্ধক্ষেত্র থেকেও সে ঠিক এমনি স'রে পড়েছিল—একটা কথা তোমায় বলি, তুমি এখন কাউকে ব'ল না। আমি ঠিক করেছি জুলফিকারকে বরখাস্ত ক'রে আলিমুরাদকে উজিরি দেব।

ইয়ার খাঁ। জাহাঁপনা, ফরুখশায়ারের ফৌজ কেল্লার মধ্যে আসতে আরম্ভ করেছে। আপনি কোন নিরাপদ স্থানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করুন।

জাহান্দার। তোমার অধীনে কত সৈন্য আছে ইয়ার খাঁ?

ইয়ার খাঁ। আমার অধীনে মাত্র হু'শো সৈন্য আছে জাহাঁপনা! তা দিয়ে ফরুখশায়ারের ফৌজকে ঠেকানো অসম্ভব। শুনেছি, এখুনি তারা কেল্লায় প্রবেশ করবে। আমি নৌকো ঠিক ক'রে রেখেছি—আপনি সম্রাজ্ঞীকে নিয়ে এখুনি পলায়ন ক'রে কোথাও আশ্রয় নিন। নচেৎ—

লালকুঁয়ার। তাই চলুন সম্রাট—

জাহান্দার। তাই চল প্রিয়তমে! আমরা এখান থেকে দক্ষিণে পালিয়ে যাই। সেখান থেকে মক্কায় গিয়ে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়ে দি। (যেতে যেতে সিংহাসনের দিকে চেয়ে) সুন্দরী তক্ত-এ-তাউস—বিদায়! বিদায়!

(ফিরে)—

না না—ইমতিয়াজ, আমার যাওয়া হবে না, আমি যেতে পারব না। দেখ, চেয়ে দেখ—তক্ত-এ-তাউস্ আমায় ইসারায় বারণ করছে। ওর কোল ছেড়ে কোথায় আশ্রয় পাব? আসুক ফরুখশায়ার তার সৈন্য নিয়ে। আমাকে ঐ সিংহাসনে ব'সে থাকতে দেখলে তারা প্রহৃত কুকুরের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

(বাইরে অনেক লোকের গোলমাল—জয় বাদশা—ফরুখশায়ারের জয়)

জাহান্দার। কিসের গোলমাল?

ইয়ার খাঁ। জাহাঁপনা, ফরুখশায়ার কেল্লার মধ্যে ঢুকে পড়েছে ব'লে মনে হচ্ছে।

লালকুঁয়ার। জাহাঁপনা—

জাহান্দার। কোনো ভয় নেই ইমতিয়াজ! তুমি এক কাজ কর য়ার খাঁ, তুমি ইমতিয়াজ বেগমকে কোনো নিরাপদ স্থানে রেখে এস।

লালকুঁয়ার। সম্রাট, আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।

(বাইরে ফরুখশায়ারের জয়ধ্বনি—ছুটতে ছুটতে নিয়ামতের প্রবেশ)

নিয়ামৎ। সম্রাট, সম্রাট—

জাহান্দার। কে—নিয়ামৎ খাঁ! যাও—মূলতানের সুবেদারি তোমায় দিলুম—এখুনি তোমার দলবল নিয়ে মূলতান যাত্রা কর।

নিয়ামৎ। সম্রাট, ফরুখশায়ার তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কেল্লার মধ্যে এসেছে—তারা আপনাকে হত্যা করবে।

লালকুঁয়ার। সম্রাট—(ক্রন্দন)—

জাহান্দার। কেঁদ না—কেঁদ না ইমতিয়াজ—তার চেয়ে ডাক তোমার বাঁদীর দল—সুরে ও সরাবে ভাসিয়ে দাও যত ভয় যত ক্ষোভ—

(এক দল লোক জুলফিকারের মৃতদেহ লইয়া জাহান্দারের সম্মুখে রাখিল)

এ কি! কে এল? কাকে নিয়ে এলে তোমরা?

(বাহকগণ শবের মুখাবরণ সরাইয়া দিল। জুলফিকারের শব দেখিয়া)

কে—কে—জুলফিকার খাঁ। কে তোমায় হত্যা করলে বন্ধু! মহম্মদ ইয়ার খাঁ—

ইয়ার খাঁ। জাহাঁপনা—

জাহান্দার। বন্দী কর—বন্দী কর—জুলফিকারের হত্যাকারীকে বন্দী ক'রে এখুনি আমার সম্মুখে উপস্থিত কর। রণক্ষেত্র থেকে পলায়নের অপরাধে আমি তাকে সাজা দেব বলেছিলুম—কিন্তু তাকে প্রাণদণ্ড দিইনি। নিয়ামৎ খাঁ—

নিয়ামৎ। জনাব—

জাহান্দার। আলিমুরাদ—আলিমুরাদ—কোকলতাস খাঁকে ডেকে নিয়ে এস। সে নিশ্চয়ই এই প্রাসাদেরই কোনো কক্ষে অভিমান ক'রে ব'সে আছে। তাকে চাই, তাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

লালকুঁয়ার। সম্রাট, সম্রাট—স্থির হন, বুঝতে পারছেন না।

জাহান্দার। বুঝতে পারছি না! (উচ্চ হাস্য)—খুব বুঝতে পারছি, এত বড় রাজত্ব চালাচ্ছি আর এইটুকু বুঝতে পারব না? তুমি মনে করেছ জুলফিকারকে হত্যা করেছে আলিমুরাদ। ভুল ভুল—আমি তাকে খুব জানি। সে বীর।

(কয়েক জন ঘাতক ও প্রহরীর সহিত আবদাল্লা খাঁর প্রবেশ)

কে! কি চাও তোমরা এখানে? কে তুমি?

আবদাল্লা। আমি আবদাল্লা খাঁ—

জাহান্দার। তুমি এলাহাবাদের সুবেদার আবদাল্লা খাঁ। তুমি বিদ্রোহী হ'য়ে ফরুখশায়ারের দলে যোগ দিয়েছিলে? এই—কে আছে—বন্দী কর—এই নিয়ামৎ—আলিমুরাদ—আলিমুরাদকে ডাক।

আবদাল্লা। আমি এসেছি বাদশা ফরুখশায়ারের—

জাহান্দার। চুপ রহো। আগে আমার কথার জবাব দাও। জুলফিকারকে কে হত্যা করেছে?

আবদাল্লা। সম্রাট ফরুখশায়ারের হুকুমে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

জাহান্দার। এবং তারই হুকুমে তার মৃতদেহ আমার কাছে পাঠিয় দেওয়া হয়েছে—কেমন?

আবদাল্লা। হাঁ।

জাহান্দার। বাঃ—বাঃ—বাঃ—ফরুখশায়ারের রসজ্ঞান আছে। আবদাল্লা খাঁ, তুমি ফরুখশায়ারকে বলবে যে তার এই রসিকতায় আমি বেশ প্রীত হয়েছি।

আবদাল্লা। সম্রাট আপনার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। আমরা সেই হুকুম তামিল করতে এসেছি—

জাহান্দার। আমায় দণ্ড! আমি যতক্ষণ সিংহাসনে আছি ততক্ষণ আমিই দণ্ডদাতা।

(ছুটে গিয়ে তক্ত্-এ-তাউসে বসল)

আবদাল্লা খাঁ, সাম্রাজ্যের এক জন পদস্থ কর্মচারী হ'য়ে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য আমি তোমাকে প্রাণদণ্ড দিলুম।

আবদাল্লা। (প্রহরীদের প্রতি)—এই—তোমরা দাঁড়িয়ে কি উন্মত্তের প্রলাপ শুনছ ? (লালকুঁয়ারকে দেখিয়ে)—যাও এই নারীকে আগে এখান থেকে নিয়ে যাও।

(প্রহরিগণ লালকুঁয়ারের দিকে অগ্রসর হ'ল)

লালকুঁয়ার। আমি যাব না—আমি এখানেই থাকব। তোমরা আগে আমাকেই বধ কর।

আবদাল্লা। যাও, নিয়ে যাও—জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাও।

(প্রহরিগণ ইতস্ততঃ করতে লাগল)

লালকুঁয়ার। যাও—আমি যাব না—আমি যাব না—

(দু'জন প্রহরী লালকুঁয়ারকে ধরল)

সম্রাট—

জাহান্দার। (তক্ত্ থেকে নেমে) খবরদার শয়তান—

লালকুঁয়ার। সম্রাট, সম্রাট—

(প্রহরীরা লালকুঁয়ারকে টানতে লাগল)

সম্রাট—সম্রাট—

জাহান্দার। (চাবুক নিয়ে আবদাল্লা খাঁকে মারতে উদ্যত হ'য়ে)—বেতমিজ! আমি তোকে চাবুক মেরে হত্যা করব—(ইতিমধ্যে কয়েক জন প্রহরী এসে জাহান্দারকে ধরলে ও তাদের সঙ্গে জাহান্দারের ধ্বস্তাধ্বস্তি। তাদের মধ্যে দু'জন জাহান্দারের গলা টিপে হত্যা করবার চেষ্টা করতে লাগল। জাহান্দার চীৎকার করতে লাগল—আলিমুরাদ—আলিমুরাদ! আওয়াজ ক্ষীণ হ'তে হ'তে বন্ধ হ'য়ে গেল। তার মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।)

প্রহরী। শেষ হ'য়ে গেছে হুজুর!

(ফরুখশায়ার, হুসেন খাঁ। তকব্বর খাঁ প্রভৃতির প্রবেশ)

আবদাল্লা। সম্রাট, আপনার সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক হয়েছে—যান—নির্ভয়ে তক্ত্-এ-তাউসে আরোহণ করুন।

ফরুকশায়ার। হুসেন আলি খাঁ, মৃতদেহ এখান থেকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা কর।

আবদাল্লা। মৃতদেহ দেখে ভয় পাবেন না সম্রাট—আপনার পূর্বপুরুষেরা প্রায় সকলেই মৃতদেহের পাহাড় অতিক্রম ক'রে তক্তে বসেছিলেন।

ফরুখশায়ার। তা হোক—তা হোক—এগুলো সরিয়ে দাও—

হুসেন। কোনো ভয় নেই—আসুন আমি সিংহাসনের সোপান অবধি আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।

(ফরুখশায়ারের হাত ধ'রে সিংহাসন অবধি পৌঁছে দিলে। ফরুখশায়ার তক্ত্-এ-তাউসে উঠে বসলেন)

হুসেন আলি। জয় সম্রাট ফরুখশায়ারের জয়!

সকলে। জয় সম্রাট ফরুখশায়ারের জয়!

(সকলের কুর্নিশ)।

তামামশুদ্

জগদীশচন্দ্র

শ্রীকরঙ্গাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

অতীতে ভারত ছিল জাগ্রত বিজ্ঞানে
বর্তমান যুগে যবে প্রতীচী বাখানে
বিজ্ঞানে ভারত আজি দাঁড়াইয়া কোথা
তখন জাগিল বঙ্গে প্রথম বারতা
বিজ্ঞান-জগৎ-মাঝে জগদীশচন্দ্র
দেশের মাঝারে গড়ি' বিজ্ঞানকেন্দ্র
বাঙালীর কীর্তি সে যে বেতার সূচনে
বিংশ শতাব্দী-প্রান্তে ভাস্বর যে জনে
তরুর ব্যথায় ব্যথী জাগে যে বিজ্ঞানী
প্রণাম সে আচার্যেরে সঁপিছে অজ্ঞানী।

শ্রীসুধীরকুমার চক্রবর্ত্তী

চা বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেশে সর্ব্বসাধারণ পানীয় হিসাবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পানীয় ব'লে আধুনিক সমাজে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু আপনারা বোধ হয় অবগত নন যে, বর্ত্তমান পৃথিবীর চা-শিল্পে চা-উৎপাদনকারীদের মধ্যে আমাদের এই ভারতই প্রধান। কেবল প্রধানই নয়, রূপে-গুণে, গন্ধে ও শ্রেষ্ঠত্বে পৃথিবীর রসাস্বাদনকারীদের কাছে আদরণীয়ও বটে। অথচ এই বিরাট ভারতীয় চা-উৎপাদন শিল্পের পাঁচ শত পঞ্চাশ কোটি পাউণ্ড উৎপাদনের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ কোটি পাউণ্ড ভারতবাসী তাঁদের নিজেদের জন্য ব্যবহার করেন না। কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শতকরা পঁচানব্বই ভাগ উৎপাদন বিদেশীরা ব্যবহার করেন ব'লেই এই বিরাট শিল্প আজ কোনও রকমে বেঁচে আছে। তা না হ'লে অচিরেই এই শিল্প ধ্বংস হ'য়ে যেতো। কিন্তু আজও যে এ শিল্প বেঁচে আছে তা শুধু বিদেশীর অনুগ্রহে নয়, তা শুধু কেবল তাঁদের নিজেদের স্বার্থের জন্য। শতকরা ৯৫ ভাগ চা-বাগান আজ বিদেশীর করতলগত। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আমাদের স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্ট সত্যিকারের কোন প্রচেষ্টা করেন নাই—সে জন্য আমাদের দেশের জনসাধারণের কাছে এই দেশীয় শিল্পের উৎপাদন, চাহিদার যথাযথ বণ্টন, প্রচার ও সরবরাহের কোন যথাযথ ব্যবস্থাই হয় নাই। ২১১টি প্রতিষ্ঠান যাহা আছে তাহা নাম মাত্র। সত্যিকারের কোন কার্য্যকরী পন্থা আজ পর্য্যন্ত অবলম্বন করা হয় নাই কেন, এ সম্বন্ধে আপনারা বিশদ ভাবে আলোচনা করবেন এ আশা পোষণ করি।

চায়ের উৎপাদন ও আমদানীর রহস্য

আমাদের দেশে এই চা কোথা থেকে কি ভাবে এলো। প্রায় শোনা যায়, খৃষ্ট-জন্মের প্রায় দুই হাজার সাত শত সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মহামান্য চীন-সম্রাট শেন নুং এই বস্তুটিকে আবিষ্কার করেন। তিনি নিজেই ছিলেন চীনা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের চরক সুশ্রুত। সম্ভবতঃ গাছ-গাছড়া হ'তে ঔষধ-পত্র বার ক'রতে গিয়ে তিনি এই বস্তুটি আবিষ্কার করেন। এ ছাড়া আরও অনেক জনশ্রুতি আছে, মহামান্য বোধিধর্ম্ম এক জন চীন-প্রবাসী ভারতীয় শ্রমণ। প্রায় কয়েক বৎসর ধ'রে বিনিদ্র ভাবে ভগবান শ্রীতথাগতের আরাধনা ক'রতে ইচ্ছা করেন। প্রথম ৩ বৎসর না কি তিনি চোখ খুলে রাখতে পেরেছিলেন, তার পর ঘুমের ঘোরে তাঁর চোখের পাতা আসে নেমে। এই সময় তিনি নিজকে ধিক্কৃত করে নিজের চোখের পাতা কেটে নিকটস্থ ঝোপের মধ্যে ফেলে দেন এবং পরে তাই থেকে এই নিদ্রাহরক বস্তুর উৎপত্তি হয়। তাই আজও প্রবাদ আছে, বোধিধর্ম্মের চোখের পাতা থেকে এই চা'এর জন্ম। সেই থেকে চীনদেশে এই চা'এর প্রথম প্রচলন হয়। তার পর অন্যান্য দেশে এই চা ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বৃটিশ-ভারতের গভর্ণর জেনারল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ভারতে চা উৎপাদন করার ব্যবস্থা করা যায় কি না দেখবার জন্য এক কমিশন বসান। এই সময় ডাক্তার ব্রুস নামে জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোকের প্রচেষ্টায় আসাম প্রদেশের অন্তর্গত সদিয়া ডিষ্ট্রিক্টে প্রথম চা'এর গোড়া-পত্তন করা হয়। সেই সময় চীন মহাদেশ হ'তে চা-গাছের বীজ ও অভিজ্ঞ শ্রমিক গোপনে ও নানা কৌশলে আমাদের এই ভারতবর্ষে আমদানী করা হয়েছিল।

সাধারণতঃ চীন দেশে এই বস্তুটিকে "ছা" বা "তে" নামে উচ্চারণ করা হয়। এক্ষণে উচ্চারণ-ভেদে বাঙ্গালা চা ও ইংরাজী টী শব্দ ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে।

উৎপাদন ক্ষেত্র

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের নানা স্থানে এই চা উৎপাদন হয়। সাধারণ ভাবে একে তিনটি এলেকায় বিভক্ত করা হয়; যথা—নর্থ ইণ্ডিয়া, সাউথ ইণ্ডিয়া ও কাংড়াভেলী। নর্থ ইণ্ডিয়ার মধ্যে দার্জ্জিলিং, আসাম, ডুয়ার্স (বাঙ্গালা ভাষায় জলপাইগুড়ি এলেকা), কাছাড় (সুরমাভেলী এলেকা), শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও কুচবিহার (পশ্চিমবঙ্গ)। সাউথ ইণ্ডিয়ার মধ্যে দক্ষিণ-ভারত ও নীলগিরি। কাংড়াভেলী পূর্ব্ব-পাঞ্জাব এলেকায় বলা হয়। এ ছাড়াও রাঁচির কয়েকটি জায়গায় এর উৎপাদন হয়। এবং এ ছাড়াও সংযুক্ত ভারতবর্ষের সময় চট্টগ্রামে উৎপাদন করা হত (বর্ত্তমানে পূর্ব্বপাকিস্থানে পড়েছে)।

চা গাছ

একটি গাছ লম্বায় ১৫।২০ ফুট পর্য্যন্ত হয়। সাধারণতঃ এই গাছের পাতা ক্যেমেলিয়া ফুলের পাতার চাইতে বড় হয়। সেই জন্য চা গাছের নামকরণ করা হয়েছিল Camellia Thea বা ক্যামেলিয়া থেয়ো। সাধারণতঃ বৎসরের শেযার্দ্ধে, ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্দ্ধে বা মাঝামাঝিতে জমিতে চারা রোপণ করা হয়। চারা রোপণ করবার প্রথমেই মাটী খনন করে গাছ বা মাটীর অবস্থা বুঝে মাটীর রাসায়নিক সবলতা ও দুর্ব্বলতা বিশ্লেষণ করে গাছের গোড়ায় সার (Fertiliser) প্রয়োগ করা হয়। এক বছর পরে গাছের মূল ডাল কেটে গুঁড়ির চতুর্দ্দিক হ'তে নূতন শাখা-প্রশাখার বিস্তার লাভের সুযোগ দেওয়া হয়। কোন কোন যায়গায় ২।৩ বৎসর এ কাজ করা হয়। এই ব্যবচ্ছেদ কার্য্যকে মধ্যমূল শাখা-ছেদন বলা হয়। এর দ্বারা গাছের ভবিষ্যৎ কাঠামো প্রস্তুত হয় এবং ৫।৬ বৎসর মধ্যেই গাছ ফলপ্রসূ হয়। সাধারণতঃ ডিসেম্বর মাসের শেষের দিক থেকে মার্চ্চের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত গাছ উৎপাদন ও বলিষ্ঠ করা হয়। এই সমস্ত ফলপ্রসূ গাছ প্রায় এক শত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত চয়নযোগ্য থাকে। এই গাছকে প্রতি বর্ষের প্রথমার্দ্ধে ছেঁটে দিয়ে ৩।৪৷ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা রাখা হয়। নচেৎ গাছ বেড়ে যায় এবং পাতা চয়ন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়। সাধারণতঃ মার্চ্চ হইতে সুরু করে নভেম্বর মাসের শেষ অবধি এই পাতা চয়ন-কার্য্য চলে। গাছ হ'তে ২।৩টি সবুজ কচি ডগা সমেত পাতা চয়ন করা হয়। সাধারণ ভাবে একে দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি বলা হয়। এই চয়ন-কার্য্য বিহারী, ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা ও স্থানীয় পাহাড়ী মেয়ে ও শিশু দ্বারা করান হয়। চলতি ভাষায় এদের চা-বাগানের কুলী বলা হয়। এই সমস্ত কুলী মেয়ে ও শিশুদের

দ্বারা মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি হ'তে গাছ থেকে পাতা চয়ন করা হয়। চয়নকালীন পাতা শক্ত থাকে।

পাতা হইতে চা তৈয়ারীর প্রক্রিয়া

চয়নের সময়ের শক্ত পাতাগুলিকে হাওয়ায় নরম ক'রতে ১৮।১৯ ঘণ্টা সময় লাগে। তার পর পাতাগুলি হাওয়ায় শুকাবার জন্য তারের জাল দ্বারা তৈয়ারী একটু চওড়া র‍্যাকের উপর পাতলা ক'রে বিছিয়ে রাখা হয়। এই ভাবে পাতাগুলি শুকিয়ে তৈরী হ'লে পর একটি ঘূর্ণায়মান ঘানী দ্বারা ২॥ ঘণ্টা পিষান হয়। এই পিষবার যন্ত্রকে rolling machine বলা হয়। পিষবার সময় জল নিংড়াবার মত পাতাগুলিতে নিংড়ান হয়। এবং পরে এই পাতাগুলিকে Farmenting Roomএ নিয়ে পাথর বা সিমেন্টের মেঝের উপরে ১"।১½" পুরু করে বিছিয়ে রাখা হয়। এই Farmenting Roomকে বাংলা ভাষায় তাপ-সঞ্চালন ঘর বলা হয়। এই ঘরের তাপ সাধারণতঃ ৭৫ হ'তে ৮৩ ডিক্রি পর্য্যন্ত রাখা হয়। পাতাগুলি নিংড়াবার সময় পাতাগুলির রং থাকে সাধারণ ফিকে ও সবুজ রঙের। ২।৩ ঘণ্টা পরে Farmenting Room হ'তে নিয়ে এলে পাতাগুলির রং হয় উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ। এই সময় এই সব পাতা হ'তে এক প্রকার সুমিষ্ট গন্ধ বার হয়। তার পর এই পাতাগুলি নিয়ে আসা হয় Drying machineএ। Drying machineকে বাংলা ভাষায় সাধারণতঃ শুকান যন্ত্র বলা হয়। এই মেসিনের দ্বারা ১৮০।২১১ ডিগ্রি তাপযুক্ত হাওয়ায় পাতাগুলিকে ১½।২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত শুকান হয়। পরে এই শুকান পাতাগুলিকে ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট নানা ছাঁচের পিত্তল বা লোহার তার দ্বারা Shorting machine ঘরে নানা রকম করে কেটে ছেঁটে Size ও Gradeএ প্রস্তুত করা হয়। সাধারণতঃ এই কাটাই পাতাগুলিকে অনেক রকম ভাবে ভাগ করা হয়। এর বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন নামে ভূষিত করা হয়। যথা—(১) ফ্লাওয়ারী অরেঞ্জ পিকো, (২) অরেঞ্জ পিকো, (৩) পিকো, (৪) ফ্লাওয়ারী ব্রোকেন অরেঞ্জ পিকো, (৫) ব্রোকেন পিকো, (৬) ব্রোকেন পিকো সুচং, (৭) পিকো সুচং, (৮) ফ্লাওয়ারী অরেঞ্জ ক্যানিং, (৯) অরেঞ্জ ক্যানিং, (১০) ব্রোকেন অরেঞ্জ ক্যানিং, (১১) পিকো ক্যানিং, (১২) ক্যানিং, (১৩) ডাষ্ট, (১৪) পিকো ডাষ্ট, (১৫) রেড ডাষ্ট, (১৬) ষ্টকি বা ডাঁটা, (১৭) সুইপিং বা ধুলা। এই ভাবে বিভিন্ন নাম দিয়ে তিন পিস্ কাঠে রাঙ্গতা ও ভিতরে কাগজ মোড়া ৮ বা ১২ টাইপের ব্যাটনের ১৬ × ১৬ × ১৮ বা ১৯ × ১৯ × ২৪ সাইজের দেশী বা বিলাতী বাক্সে চাগুলিকে বিভিন্ন প্রকার ভেদে ভূষিত করে পরে প্যাক করে বিক্রয়ার্থে চালান করা হয়।

"চা যে ভারতজাত উদ্ভিদ্, পূর্ব্বে য়ুরোপীয়েরা তাহা জানিতেন না। পরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জানিতে পারেন। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে সার জোসেফ ব্যাঙ্কস ওয়ারেন হেষ্টিংসের পরামর্শে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট এক দরখাস্ত করেন, তাহাতে চীনদেশ হইতে চা'র চারা আনাইয়া বেহার, রঙ্গপুর, কোচবিহার প্রভৃতি স্থানে চা'র চাষের অধিকার পাইবার কথা থাকে।" —বিশ্বকোষ।

যখন আমি স্কেচ করতাম

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
(অধ্যক্ষ, গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টস্ এণ্ড ক্র্যাফ্টস্)

প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী থেকে রেখাচিত্র আঁকা শিল্পীদের পক্ষে খুবই আনন্দদায়ক। যারা প্রকৃতির চক্ষু দিয়ে প্রকৃতিকে পর্য্যবেক্ষণ করতে ভালবাসে তাদের কাছেও এটা আনন্দের বিষয়। পর্য্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু চার দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। সহরে বা সহরের বাইরে সর্ব্বত্রই প্রত্যহ এই সব জিনিষ দেখা যায়। কিন্তু এ সব দেখে কে? এমন কি, শিল্পীদের মধ্যেও এমন লোক খুব কম আছেন, যাঁরা এ সব বিষয়বস্তু আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করে থাকেন। আর্টের ছাত্রদের অবশ্য ড্রয়িং ও পেণ্টিংএর মূল নীতি ও কৌশল শিক্ষার জন্য আর্ট-স্কুলে অথবা ষ্টুডিওয় শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু অহরহঃ অনুপ্রেরণা ও জীবনে আগ্রহের সম্প্রসারণের জন্য সদা-সর্ব্বদাই প্রকৃতির সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। আমাদের চার দিকে জীবন-নদীর যে ধারা বয়ে চলেছে তার বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য এটা করা দরকার। প্রথমে বহির্জ্জগতের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা একটু কঠিন। প্রকৃতি সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল এবং মাঝে মাঝে মনোমুগ্ধকর হলেও প্রকৃতির সঙ্গে কাজ আরম্ভ করার সময় তাকে নীরস ও একঘেয়ে বলে মনে হয়। প্রথমে প্রকৃতির মধ্যে মূল আকার বা রেখা, স্বর ও বর্ণের রহস্য উদ্ঘাটন করা কঠিন। অবিরাম প্রয়োগ দ্বারা প্রকৃতিকে তার গোপন কথা ও গুপ্ত সৌন্দর্য্য প্রকাশে বাধ্য করা যেতে পারে। আমার মনে পড়ে, যখন আমি আর্টের নবীন ছাত্র তখন আমার কাজের মান এত নীচু ছিল যে, আমার মনে বড় কষ্ট হত এবং এই মানের উন্নতি সাধনের কোন পথই খুঁজে পেতাম না। আমার মনের কল্পনাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতাম, কিন্তু কোন ফলই হত না। যে সব বিষয়বস্তু বা কল্পনা আমার মনে উদয় হত, সেগুলিকে যে ভাবে রূপ দিতে চাইতাম, ঠিক সেই ভাবে কিছুতেই ফুটিয়ে তুলতে পারতাম না। আমি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আর্ট-স্কুলে পড়াশুনা করতে লাগলাম, কিন্তু সৃষ্টিমূলক কাজের জন্য আমার অন্তরের কামনা সম্পূর্ণরূপে অপূর্ণ রয়ে গেল। এই বিরাট সহরের পার্কে পার্কে বাগানে বাগানে আমি ঘুরে বেড়াতাম, নদীর ধারে বসে নৌকা, ষ্টীমার ও জাহাজের যাতায়াত লক্ষ্য করতাম এবং সময় পেলেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে অস্তায়মান সূর্য্যের কিরণে মেঘের মধ্যে রঙের খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। নৌকার উপর জেলে ও মাঝিদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং এইরূপ আরও অনেক জিনিষ দেখে আমি মোহিত হতাম। এই বিষয়গুলি পেণ্টিং ও স্কেচিংএর বস্তু হলেও তাদের রূপ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মাঝে মাঝে আমি নোট নিতাম এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে যত দূর সম্ভব স্কেচ করবার চেষ্টা করতাম। এই কাজ খুব সহজ ছিল না। অনেক সময় নিজের কাজ দেখে আমার নিজেরই বিরক্তি মনে হত এবং যে দৃশ্য সামনে রেখে আঁকতে আরম্ভ করেছিলাম তার পরিবর্ত্তন হওয়ায় অঙ্কন অসমাপ্ত থেকে যেত। তখন আগ্রহও যেত কমে। নৈরাশ্য ও অসন্তোষ অনেক সময় মনকে আচ্ছন্ন করতো,

কিন্তু প্রকৃতির প্রতি নিবিড় প্রেম আবার আমাকে তার দিকে টেনে নিয়ে যেত।

শান্তিনিকেতন ও তার আবেষ্টনী আমার শিল্পিজীবন গড়ে তোলার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের কাজ করে। বস্তুতঃ, সেখানেই প্রকৃতির সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ স্থাপিত হয়। শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত আকাশ, দিক্‌চক্রবাল সবুজ তৃণক্ষেত্রে গিয়ে মিশেছে আর সেই তৃণক্ষেত্রের মাঝে মাঝে এক একখানি গ্রাম ও দু'-একটা তাল গাছ, দিক্‌চক্রবালের এক প্রান্তে সূর্য্যোদয় ও অপর প্রান্তে সূর্য্যাস্ত—এ সমস্ত চতুর্দ্দিকে ছড়ান অগাধ ঐশ্বর্য্যকে আমার কাছে এনে দিল। আমি দেখেছি বছরের পর বছর প্রত্যেক ঋতুতে শাল-বন, দেখেছি মাঠ আকাশ, লক্ষ্য করেছি সাঁওতালদের জীবন, দেখেছি প্রতি মুহূর্ত্তে বর্ণের পরিবর্ত্তন, লক্ষ্য করেছি ঝড়ের আগমন, উপভোগ করেছি বৃষ্টির সৌন্দর্য্য, রূপালী মেঘের ছটা ও পূর্ণিমার চাঁদ এবং শরতের কাশ ফুল। দিনের বেলা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এবং কোপাই নদীর ধারে ধারে চষা-মাঠে ঘুরে বেড়ান ছিল আমার মস্ত বড় নেশা। আর এরই ফাঁকে ফাঁকে চলত স্কেচিং আর নোট নেওয়া।

প্রত্যেক ছুটিতে আমি সমুদ্রতীরে অথবা পাহাড়ে কিম্বা প্রাচীন মন্দির ও গুহা পরিদর্শনে যেতাম—সঙ্গে থাকত স্কেচিংএর যাবতীয় উপকরণ। ছবি আঁকার বিষয়বস্তু আবিষ্কার করে খুবই আনন্দ পেতাম। যতই ভ্রমণ করতে লাগলাম, প্রকৃতি ও শিল্পকলার প্রতি আমার ভালবাসা বৃদ্ধি পেতে লাগল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বদেশ থেকে বহু দূরবর্ত্তী স্থানসমূহের প্রতি আমি একই প্রকার আকর্ষণ অনুভব করতাম এবং স্কেচিং করা চলতে থাকত। সেই সব দিনগুলি আমার হুবহু মনে পড়ে এবং স্কেচগুলি যখন একটার পর একটা দেখতে থাকি, তখন অনুভব করি যেন সেই সব ছবি আঁকার সময়কার পরিবেশ। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং ইংলণ্ডে অতিবাহিত দিনগুলি স্মৃতিপথে উদিত হয়। সেই সব দেশের লোকজন, বিভিন্ন ঘটনাবলী স্পষ্ট মনে পড়ে এবং এই সব দেশ ও তাদের অধিবাসীদের সঙ্গে যে পরিচিত হতে পেরেছি এবং স্কেচিংএর মধ্য দিয়ে তাদের জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ের অন্তর্নিহিত চিন্তাধারার মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছি, এ কথা ভাবতেও আনন্দ হয়। যত অপরিচিত স্থানই হ'ক না কেন, স্কেচিংএর অভ্যাস অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে বহু লোকের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছে। এমন কি ভাষাগত পার্থক্যের অসুবিধাও এই ভাবে দূর হয়েছে। তিরিশ বছরেরও অধিক কাল ধরে আমি সে সব স্কেচ করেছি, সেগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমার বহু ঘটনার কথাই মনে পড়ে। প্রবন্ধ শেষ করার আগে তারই কয়েকটি এখানে বলব। এক দিন সকালে হল্যাণ্ডে ট্রেণে হেগ থেকে আমষ্টারডাম যাচ্ছি। সেখানে মিউজিয়ম থেকে সন্ধ্যায় হেগে ফিরে আসার কথা। সকাল সকাল পৌছানর জন্য একটু সময় পাওয়া গেল বলে স্কেচিং করার উদ্দেশ্যে খালের ধারে বেড়াতে লাগলাম। পছন্দ মত একটি বিষয়বস্তু আবিষ্কৃত হওয়ার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আঁকতে আরম্ভ করলাম, কারণ বসবার জায়গা ছিল না। কিছুক্ষণ পরে দেখি, পিছনে এক ভদ্রলোক বসবার জায়গা দিলেন। আমি ধন্যবাদ দেওয়ার মত অস্পষ্ট ভাবে কিছু একটা বলে আবার আঁকতে সুরু করলাম। আমার আঁকা শেষ হলে জনৈক ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী এগিয়ে এসে অতিশয় সৌজন্য দেখিয়ে তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে কফি খাবার নিমন্ত্রণ করলেন। খালের ধারেই তাঁদের বাড়ী। গিয়ে দেখি, তাঁর ছেলেমেয়েরা সব জড় হয়েছে আমাকে সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্য আর কফি খাওয়ানোর নামে আয়োজন হয়েছে বিরাট ভোজের। আমি লক্ষ্য করলাম, তাঁদের সকলেই আমাকে খুসী করবার জন্য ব্যস্ত, কি দিয়ে আমাকে সন্তুষ্ট করবে ভেবে পাচ্ছেন না। আমি এক জন অপরিচিত আগন্তুক, এইরূপ অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনা দেখে বিস্মিত হলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের বন্ধুত্ব এত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো যে, কিছুক্ষণ আগে আমি যে তাঁদের কাছে অপরিচিত ছিলাম সে কথা আর মনে রইল না। তাঁরা সকলেই আমার ব্যাগ খুলে আঁকা স্কেচগুলি দেখে আনন্দ প্রকাশ করলেন। আত্মীয়তা এত বেড়ে গেল যে, আরও দু'দিন আমাকে সেখানে থেকে যেতে হল। তখন থেকে আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধন বজায় আছে পত্র-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে।

একবার আমি ফ্রান্সের দক্ষিণে আল্পসের একটি পাহাড়ের উপর থেকে নিসর্গ-চিত্র আঁকছিলাম। কয়েক জন চাষী আমাকে দেখতে পেয়ে ভাবল, এ লোকটা এখানে করছে কি? কিছুক্ষণ পরে দল বেঁধে কাছে এসে যখন দেখল যে, আমি তাদের ক্ষেত-খামার ও কুটীরের ছবি আঁকছি, তখন তাদের আনন্দের আর সীমা রইল না। তাদের স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েরাও একে একে কাছে আসতে লাগল। শীঘ্রই সেই অঞ্চলের সকল চাষী-পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ জমে উঠল। তারা প্রায়ই আমাকে তাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে খাদ্য ও পানীয় দিত।

আমার নিজের দেশেও অনুরূপ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। বাড়ীর বাইরে ছবি আঁকা সব সময়ে সুখের হয় না। এক এক সময় প্রখর রৌদ্রে শুধু-মাথায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ছবি আঁকার প্রতি মন নিবিষ্ট থাকায় প্রথমে কষ্ট অনুভব হয় না, কিন্তু ক্রমশঃ কষ্ট অনুভব না করে পারা যায় না। একবার গ্রীষ্মকালে সকাল বেলা একটি গ্রামের সন্নিকটে ছবি আঁকছিলাম। ছবি আঁকা শেষ হলে খুব ক্লান্ত হওয়ায় ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম। আমার তখন অত্যন্ত পিপাসা পেয়েছে। কাছে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে জড় হয়েছিল। তাদের বললাম, আমাকে একটু জল এনে দিতে পার? সঙ্গে সঙ্গে তারা গিয়ে কেবল জলই নয়, সঙ্গে বাড়ীতে তৈরী কিছু মিষ্টিও নিয়ে এল।

একবার উড়িষ্যার এক নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করেছিলাম। সেখানে বিশাল আকারের প্রস্তরখণ্ড ও গুহা দেখে স্কেচিং করার ইচ্ছা হল। স্থানটি বন্য জন্তুর আবাসভূমি। বাঘ-ভাল্লুক হয়ত সেই গুহার মধ্যেই আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমি যতক্ষণ ছবি আঁকলাম, ততক্ষণ স্থানীয় শক্তিশালী গোণ্ড তরুণ দল আমাকে পাহারা দিতে লাগল। আমাকে তারা এই ভাবে নিরাপদে রেখেছিল। সাধারণ লোকেদের চিত্রকলার প্রতি এই সব আন্তরিক প্রীতির কথা মনে করে আমি আনন্দ পাই এবং পণ্ডিতদের চেয়ে তাদের মতামতের মূল্য আমার কাছে অনেক বেশী।

স্বাধীনতা ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

ধর্মের বেশে মোহ এসে যারে ধরে
অন্ধ সে-জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।
বিধর্ম বলি মারে পরধর্মেরে
নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে,
পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে
আচার লইয়া বিচার নাহিক জানে
পূজাগৃহে তোলে রক্তমাখানো ধ্বজা
দেবতার নামে এ যে শয়তান ভজা।

* * *

হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
ধর্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি।
যে-পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো
অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

দেশে বিপদের আশঙ্কা দেখেই কবিতাটি লেখেন রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৩ সনের বৈশাখে রেলপথে,—দেশে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ তখন উগ্র হয়ে উঠেছে। মনে রাখতে হবে, প্রচলিত অর্থে রবীন্দ্রনাথ ধর্মপ্রাণ, কারণ তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী; তাছাড়া তিনি নৈতিক শৃঙ্খলারও একান্তই পক্ষপাতী। কিন্তু তিনি এখানে স্বর্গ চাননি, চাইছেন স্বর্গের বিকল্পে জ্ঞানের আলোক। এ যুগের বিদগ্ধ-সমাজের একজন যোগ্য প্রতিনিধিরূপেও তাঁকে ধরা যায়। সে ক্ষেত্রে তিনি বুদ্ধিজীবী বাস্তববাদীদের মতো ঈশ্বর ছেড়ে নাস্তিক হননি, তাঁর ঈশ্বর মানুষের জ্ঞানগত। বিশ্বের সকল-কিছুর মধ্যেই বিরাজিত, পার্থিব সকলের সমষ্টিরূপ ছাড়া তা অপার্থিব অলৌকিক কিছু নয়। মানুষের জ্ঞান দিয়েই তাঁকে বুঝতে হবে। মানুষের পৃথিবীর বাস্তবতা রবীন্দ্রনাথের কাছে এতই সত্য। প্রত্যেকটি মানুষ এবং তাকে কেন্দ্র ক'রে যে সংসার চলছে, সেই সংসারের মধ্যেই স্বর্গ ও দেবতার সমাবেশ রয়ে গেছে। জ্ঞানকে মুক্ত রেখে উপলব্ধি করতে হবে সেই সত্য; এই সত্যই চিরস্থায়ী 'সত্য,—আমাদের রাষ্ট্রের মুখ্য বাণী হচ্ছে সেই বাস্তবনিষ্ঠতারই জয়গাথা—"সত্যমেব জয়তে।" রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ ব'লে ঘোষিত হল হালে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আবাল্য দেশকে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে চলেছিলেন তাঁর নানা বাণীর বর্তিকা জ্বালিয়ে—

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

"আকাশের চাঁদ" ফেলে তিনি তার বদলে প্রতি দিবসের কাজে প্রতি দিবসেরে মধুর ক'রে দেখেছেন। আরো কত সুন্দর ক'রে মানুষের মুখে দেখিয়েছেন সে চাঁদকে তা শিশুরাও জানে। ক্ষণিক স্বর্গ হইতে বিদায় নিয়ে চিরস্বর্গ ফিরে পেয়েছেন "আমাদের বনচ্ছায়ে··· আমাদেরই কুটীরপ্রান্তে;" তাঁর পরশ-পাথর রয় এই সংসারেরই সিন্ধুতটে। খ্যাপা তাঁর সন্ন্যাসী ঠাকুর:

"চেয়ে দেখিত না নুড়ি দূরে ফেলে দিত ছুঁড়ি"

এই ক'রে সে "কখন ফেলেছে ছুঁড়ে পরশ-পাথর"—এই বিষয়ে সে সচেতন হল এক "গ্রামবাসী ছেলে"র কাছ থেকে। সংসারের ঘাটে-পথে পরশ-পাথরকে পেয়ে আমরাও এমনি ছুঁড়ে ফেলছি কি না অজ্ঞানতার দরুণ, তা ক'জনে ভাবছি। তার পরে দেখা যায় কবির দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছে এই সত্য যে,—দেবতা সেও দূরে সরে যায়, নেমে আসে পথে দীনের সঙ্গ ধরে,—স্বর্ণবেদীতে সে বদ্ধ থাকে না,—রাজার ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যের কীর্তি-দেউলে। দেবতাকেও স্বাধীনতা দিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ, তাঁকে আমাদের মধ্যে পেয়েও আমরা যেন অবহেলায় তাঁর বাণীর পরশ-পাথরগুলিকে না হারাই।

রবীন্দ্রনাথও স্বর্গ চেয়েছেন। সে স্বর্গ তাঁর কাছে অন্য কোথাও নেই, সেইখানেই মাত্র—

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি।"

নির্দয় আঘাত করে ভারতেরে বিচারের মুক্তপথে অখণ্ড সেই পৌরুষের স্বর্গে জাগরিত করবার জন্যই কবির একান্ত আকুতি। সকলেই জানেন, এ বাণীটি তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল, মনের একটি উন্মুখতা এর দিকে ছিল ব'লেই বাণীটিকে তিনি নিজের হাতে বিচিত্রিত ক'রে একটি কাগজে লিখে দেন ও তা ছাপানো হয়ে বিতরিত হয়। এই স্বর্গ ভৌগোলিক নয়, আত্মিক, সে আত্মলোক মানুষেরই মনের মধ্যে; নামরূপে তাই 'জ্ঞান' ব'লে পরিচিত। তার সীমা নাই দেশে কালে,—মানুষ সেখানেও বাঁধা প'ড়ে নেই, স্থূল তার সকল সৃষ্টির বন্ধন পেরিয়ে
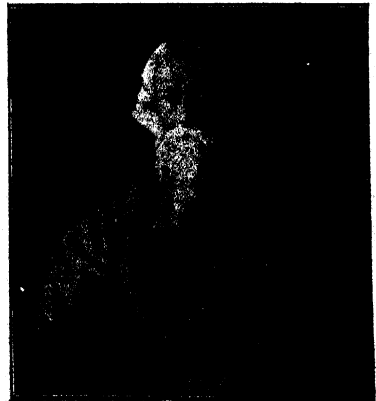
কবিগুরু

কেবলি চলেছে সে এই বাণী নিয়ে—"অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে"।

আর, আমরা প'ড়ে আছি কোথায়?—চিত্ত আমাদেরও ভয়শূন্যই বটে যখন দেখি তাকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের পর্বে,—বারদৌলী, মেদিনীপুরের সাধারণ চাষী-মজুর অবধি সসাগরা ধরণীর অপ্রতিহত অধীশ্বর দুর্দ্দান্ত বৃটিশের কামান-বন্দুককে ভয় না পেয়ে জয়ী করেছে তাদের স্বাধীনতার দাবী। শুনতে পাই, আজকেও আমরা না কি ভয়শূন্য;—যে ঘটনাগুলিতে তার ধারণা দেয়—সেগুলির বিষয় বুক ফুলিয়ে অমন গর্ব করে কেউ বলে না,—এই যা অসুবিধা। চোরাকারবারেও না কি লোকে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তবে, এ কাজকে শুধু একটানা দুষলে হবে না,—যখন এরূপই ঘটছে, মূলে তখন তার কিছু কারণ আছে নিশ্চয়ই। বিস্তারিত তার আলোচনার স্থল এ নয়। এটুকু স্পষ্ট দেখা গিয়ে থাকে, বাজারে জিনিষের ক্রেতা হয়ে যারা অপরের এ কাজকে নিন্দা করে, অপর ক্ষেত্রে নিজের চাকুরি বা ব্যবসাস্থলে হয়তো তারা নিজেরাই চালাচ্ছে চোরাকারবার। মাঝখান থেকে নিজেদের হাতে মারা পড়ছে নিজেরাই—এ রহস্যটুকু দেখেও দেখে না চৌদ্দ-আনা লোকে। এ কাজ করা পাপ কি পুণ্যের, এ নিয়েও হয়তো মতান্তরে নূতন বিবাদ বাধবে। এ ক্ষেত্রে নিজেদের বুদ্ধির বেড়াজালে নিজেদের ফাঁসের শিকার আমরা নিজেরাই। এই বন্ধন থেকে আমাদের স্বাধীনতা মিলে, আপাততঃ এমন উপায়টুকু বলে দেয় কে? উত্তর এখনি না পাই তবু বুদ্ধির কাছে মাথা খুঁড়ে আমাদের একথা জিজ্ঞেস করতে হবে। এখানে আপাততঃ এরূপ একটি বুদ্ধির কথা মনে আসছে:—সেটি এই যে, রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত বাণীর মধ্যে মুক্ত জ্ঞানের বাহক উদার ও বিচারশীল যে একটি চিত্তের কথা আছে, ভয়শূন্য হয়ে আমাদের উদার সেই চিত্ত যখন যে-কাজে এগোবে, সেই কাজই সত্যি-কাজ, মানুষের ধর্ম্মও সেইটিই। চোরাকারবার করতে গিয়ে সত্যি কি আমরা ও-রকম ভয়শূন্য হতে পারি? তার আগে আমাদের মনে যথেষ্ট কি জ্ঞানের সঞ্চয় থাকে, এবং আমরা উদার হয়ে বিচার ক'রে কি সেই কাজে অগ্রসর হই? মনের কোথাও কি দাগ পড়ে না?—এতগুলি প্রশ্ন নিজেদেরই প্রতি আমাদের প্রয়োগ করার আছে।

রবীন্দ্রনাথ যখন বালি দ্বীপে ভ্রমণে গিয়েছিলেন, তখন সেখানকার নানা কীর্ত্তি-কাহিনী, সমাজরীতি ও অভিনয়াদির মধ্য দিয়ে সে-দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুধাবন করেন,—ভারত-সংস্কৃতির সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত যোগ আবিষ্কার দ্বারা তিনি দুই দেশের সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করেন। কিন্তু একখানি পত্রে তিনি সে-দেশ সম্বন্ধে বলছেন—"আমরা যারা এখানে (বালি দ্বীপে) বাহির থেকে এসেছি, আমাদের একটা দুর্লভ সুবিধা ঘটেছে এই যে, আমরা অতীত কালকে বর্ত্তমান ভাবে দেখতে পাচ্ছি, সেই অতীত মহৎ, সেই অতীতের ছিল প্রতিভা, যাকে বলে নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি; তার প্রাণশক্তির বিপুল উদ্যম আপন শিল্পসৃষ্টির মধ্যে প্রচুর ভাবে আপন পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তবুও সে অতীত, তার উচিত ছিল বর্ত্তমানের পিছনে পড়া, সামনে এসে দাঁড়িয়ে বর্ত্তমানকে সে ঠেকিয়ে রাখল কেন? বর্ত্তমান সেই অতীতের বাহন মাত্র হয়ে বলেছে, 'আমি হার মানলুম'। সে দীনভাবে বলছে, 'এই অতীতকে প্রকাশ করে রাখাই আমার কাজ, নিজকে লুপ্ত করে দিয়ে।" নিজের 'পরে বিশ্বাস করবার সাহস নেই। এই হচ্ছে নিজের শক্তি সম্বন্ধে বৈরাগ্য, নিজের 'পরে দাবি যত দূর সম্ভব কমিয়ে দেওয়া। দাবি স্বীকার করায় দুঃখ আছে, বিপদ আছে, অতএব "বৈরাগ্যমেবাভয়ং, অর্থাৎ বৈনাশ্যমেবাভয়ং।" অন্য দেশ সম্বন্ধে এ কথা কবি বলে থাকলেও, নিজেদের দেশ সম্বন্ধে আমাদের এ থেকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে, অতীতের মহিমা কীর্ত্তনে আমাদের দিন না কাটে, বর্ত্তমানের পিছনে তাকে ফেলতে পারলেই তবে সে অতীতেরই তাতে খুলবে আরো মহত্ত্বের ছটা। নিজের 'পরে বিশ্বাস করবার সাহসই আমাদের বাড়ানো চাই,—দাবি স্বীকার করতে গিয়ে দুঃখ আসুক, বিপদ আসুক, দাবি মেটাব প্রধানত আমরাই,—আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা মতো। দরকার হলে সকলে মিলে বিচার ক'রে পরেরও কিছু সাহায্য নেব; তবু "খাদ্যহারা বস্ত্রহারা, আশ্রয়হারা হয়ে আপন বুদ্ধি ও বলের আশ্রয় ছেড়ে উদ্ধারের কাজে ডাকব না ভাগ্যকে বা ভগবানকে।

চোরাবাজার, শৈথিল্য,—এ সব নানা পাকেই আমাদের ঘোরাবে,—মরতেও আমরা কম মরব না,—কিন্তু মরতে মরতেই আমাদের ঢেউ পেরোতে হবে সকল বাধার উপর দিয়ে। বিধির দোহাই যদি দিতেই হয়, তবে এই বাধা পেরোবার চেষ্টাকেই যেন জানি, মানুষের নিগূঢ় স্বভাব বিধির শাশ্বত বিধান। কাজে সেটাকে যত বেশি দেরি করে মানব, ততই আমাদের ভোগান্তি। এত কথায় কাজ কী,—মনেই বা রাখবে কে?—গানের মধ্যে মহা-মুক্তির একটি যে চিত্র কবি এঁকে রেখেছেন,—সেইটি সকলে মনে গেঁথে রেখে জীবনের কাজগুলি করে যেতে পারলেই যথেষ্ট হতে পারে—এই ভেবে আজ স্বাধীনতার উৎসবে সেইটিই এখানে সবার সামনে রাখছি:—কবি লিখছেন তাঁর 'গীতালি' কাব্যে:—

এই কথাটা ধ'রে রাখিস্
মুক্তি তোরে পেতেই হবে।
যে পথ গেছে পারের পানে
সে পথে তোর যেতেই হবে।
অভয় মনে কণ্ঠ ছাড়ি'
গান গেয়ে তুই দিবি পাড়ি,
খুশি হয়ে ঝড়ের হাওয়ায়
ঢেউ-যে তোরে খেতেই হবে।
পাকের ঘোরে ঘোরায় যদি
ছুটি তোরে পেতেই হবে।
চলার পথে কাঁটা থাকে
দ'লে তোমায় যেতেই হবে।
সুখের আশা আঁকড়ে ল'য়ে
মরিস্ নে তুই ভয়ে ভয়ে,
জীবনকে তোর ভ'রে নিতে
মরণ-আঘাত খেতেই হবে।

এটি ১৩২১ সনের ২রা আশ্বিনে সুরুলে লেখা। তখন সেখানে কুঠি কেনা হয়েছে। শ্রীনিকেতনের এটি পত্তন-কাল। কবির জনগণের সঙ্গে যোগের কাজ এই পল্লীকেন্দ্র থেকেই ক্রমে ক্রমে বিশেষরূপে

প্রসারিত হয়ে চলে। এই মাসেই তিনি শান্তিনিকেতন থেকে বুদ্ধগয়ায় যাত্রা করেন। মনের পটভূমিটি রয়েছে—সেই জ্ঞান-সাধক মহাপরিত্রাতা পরম কারুণিক বুদ্ধের প্রভাবস্পর্শ-উন্মুখ,—যে বুদ্ধদেব মানবকে দাঁড়াতে বলেছেন মানবিক বিচারবুদ্ধি-চালিত জ্ঞানেরই পায়ে। সমস্ত বিশ্বকে মুক্তি না দিয়ে তিনি নিজের মুক্তি চাননি। বুদ্ধ ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসী আমরাও। এই বড়ো স্বাধীনতাকে বরাবরই সামনে রেখে চলবার দায়িত্ব রয়েছে আমাদেরও। সর্ব দিকে সকলের স্বাধীনতার মধ্যেই রয়েছে আমারো স্বাধীনতা।—এইটি আমাদের "মটো" হওয়া চাই।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন,—"একদিন বুদ্ধদেব বললেন, 'আমি সমস্ত মানবের দুঃখ দূর করব,' দুঃখ তিনি সবই দূর করতে পেরেছিলেন কি না সেটি বড়ো কথা নয়; বড়ো কথা হচ্ছে, তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন; সমস্ত জীবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন; ভারতবর্ষ ধনী হোক, প্রবল হোক, এ তাঁর তপস্যা ছিল না; সমস্ত মানুষের জন্য তিনি সাধনা করেছিলেন। আজ ভারতের মাটিতে আবার সেই সাধনা জেগে উঠুক, সেই ইচ্ছাকে ভারতবর্ষ থেকে কি দূর ক'রে দেওয়া চলে?"—(বিশ্বভারতী, পৃঃ ৯২, ১৭ ভাদ্র ১৩৩১)।

২

শত শত শতাব্দী পার হয়ে এসে রবীন্দ্রনাথের বাণীতে ভারতের ইচ্ছাটি লাভ করেছে উজ্জ্বল অভিব্যক্তি।—ভারতবর্ষ ধনী হোক, প্রবল হোক—এ নয়,—সমস্ত মানুষের মুক্তির সাধনাই হচ্ছে ভারতবর্ষের সুচির সাধনা। আর সেই সাধনায় সে জেগে উঠবে,—এ ইচ্ছাই আমাদের মনে সুস্পষ্ট করে তুলতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথের যা-কিছু প্রচেষ্টা রূপায়িত হয়েছে বাণীতে ও কর্মে।

স্বাধীন ভারতের লোকে দেখছে জনশক্তির অধিকার লাভটাই আজ রাষ্ট্রের প্রধান কথা। কিন্তু সে-শক্তি কী ক'রে সুস্থ বিকাশে সুসংহত হয়ে, স্বাধীন ভাবে দাঁড়াতে পারে, সেদিকে সমবেত লক্ষ্য ও চেষ্টা এখনো সম্ভব হয়নি। তার পরিবর্তে ঘাঁটি দখলের বিবিধ প্রক্রিয়ায় কেবলি চলছে বিচ্ছিন্নতা ঘটায়ে জাতীয় শক্তিক্ষরণ। ব্যাপক যে-জনশিক্ষা দ্বারা জনতার স্বাধীন চেতনা ও চেষ্টা দেখা দিত, বিপক্ষ দলের এই মত যে, প্রচলিত সেই শিক্ষার সরষেতেই ভূত ঢোকানো আছে। সুতরাং দেশের অজ্ঞানতা সরকারী দপ্তর থেকে ঘুচবার নয়, আরো তাতে বাড়বারই আশঙ্কা। জনসাধারণ কি তবে চিরকালই দলীয় অঙ্গুলি সঞ্চালনের মুখাপেক্ষী হয়ে চলবে? কবে তারা বুঝবে,—নিজেদের স্বার্থে শিক্ষার আবশ্যকতা? বুঝতে শুরু না করলে তাদেরি বিপদ। শিক্ষা দাবী করা চাই খাদ্য-বস্ত্রের মতো।—জরুরি বিষয় এই,—শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষার দাবিই তুলেছিলেন বহুপূর্ব থেকে। সে শিক্ষা স্বদেশী ভাষায় সর্ব-সাধারণের জন্য চাই, এই ছিল তাঁর নির্দেশ। ১২৯৯ সনে তিনি "শিক্ষার হের ফের" প্রবন্ধে বলছেন:—"আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও।" ১৩১৩ সনে "জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ইস্কুল বিভাগের একটি গঠন পত্রিকা তৈরি করবার জন্য" রবীন্দ্রনাথের উপরে ভার অর্পিত হয়। সেই উপলক্ষ্যে রচিত "শিক্ষা সংস্কার" প্রবন্ধের মধ্যে এক স্থলে তিনি বলেন, "আমাদের দেশের লোকের মনকে কোন্ আদর্শে বহুদিন মুগ্ধ করিয়াছে, আমাদের দেশের হৃদয়ে রসসঞ্চার হয় কিসে তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে।···অগ্নি বায়ু জলস্থল বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখা।" ১০ই কার্তিক (১৩১২) তিনি এক ছাত্রসম্মেলনে ঘোষণা করেন, "পূর্বে যখন দেশ ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখনো আমাদের সমাজ আপনাকে আপনি শিক্ষা দিয়াছে, আপনার ভিতরে আর প্রতিকূলতা জন্মায় নাই। আজ আমাদের অন্তঃকরণের সম্মুখে যে বৃহৎ প্রয়োজন জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে সার্থক করিতে হইলে যাহাতে আমরা নিজেদের শিক্ষাকে স্বাধীন করিতে পারি অধ্যবসায়ের সহিত, শান্তির সহিত, সাধনার সহিত, আমাদিগকে তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে।" তাঁর নিজের চেষ্টার এ ব্যবস্থার ফল "বিশ্বভারতী"। কিন্তু দেশের সাধারণের পক্ষ থেকে এই ব্যবস্থার পথ চিরকালই অনুসরণীয়; এ জন্য, স্বাধীন শিক্ষার কথাটি এই স্বাধীনতার উৎসব দিনে আজ বিশেষ ভাবেই স্মরণীয়। গবর্ণমেণ্টের দিক থেকে ব্যবস্থা হোক না হোক, নিজেদের প্রয়োজনের জিনিসের চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা নিজেদের হাতে সর্বক্ষণই চালু রাখতে হবে।

এবারকার নির্বাচনে জনসাধারণের শান্ত অথচ সুদৃঢ় উদ্যম এবং তার শৃঙ্খলানিষ্ঠা দেশ বিদেশের প্রশংসা লাভ করেছে। এবার অন্যান্য দিকে সংগঠনের কাজেও আশা করা যায় তারা আত্মকল্যাণ মুখ্য ক'রে আরো অদম্য অধ্যবসায় দেখাবে। সেই কল্যাণের পক্ষেই বড়ো লক্ষ্যের বাণীটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সেই "The human world is made one।"

ভুল-ভ্রান্তি সকলেরই থাকে, হিংসা-দ্বেষের অতীত নয় সাধারণ লোকে। কিন্তু সকলের চেয়ে বড়ো কথা, এ সব সত্ত্বেও আমরা প্রতিবেশী। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে আমাদের এই প্রতিবেশীত্বের সম্বন্ধ,—যে শিক্ষায় এই বড়ো সত্যকে যত দূর জানায় এবং যে-আচরণে এই শিক্ষাকে জীবনের অভ্যাসে প্রতিষ্ঠা দিতে সক্ষম হয়,—সে শিক্ষা এবং সেই আচরণই তত মহৎ। কেবল একা কেউ বড়ো হলে হবে না, সকলকে নিয়ে প্রত্যেকের বড়ো হওয়া চাই, এবং সেটা হওয়া চাই প্রত্যেকেরই স্বাধীন বিকাশ যত দূর সম্ভব অব্যাহত রেখে। একার বিকাশ যত সহজে সম্ভব, সকলের বিকাশ সম্ভব করা তত সহজ নয়। এ জন্য সকলের দিকে চেয়ে, ধনে মানে গুণে জ্ঞানে যে যত আপনাকে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারে, সকলের অধিকার সহানুভূতির সঙ্গে বিচার ক'রে দেখে সেই তত হয় বন্ধনমুক্ত, সেই তত হয় স্বাধীন; স্বদেশের আত্মকল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতাকে "One human world"-এর প্রতিবেশীত্বের এই বড়ো অর্থে গ্রহণ করতে পারলে, তবে হবে আমাদের অতীতের সাধনা সার্থক, ভাবী সাধনারও খুলবে অভাবিত নূতন সম্ভাবনা।

আকাশ থেকে কোনো দেবতার সাহায্য নয়, এই পৃথিবীর মানুষের সাধ্যের সীমাই তাতে আরো প্রসারিত হয়ে দেখা দেবে। স্থলে-জলে আকাশে-পাতালে, দৃশ্যে-অদৃশ্যেও মানুষের সেই সীমা-প্রসারণেরই সাধনা নিয়ে মনুষ্যত্ব বিচিত্র রূপ লাভ করে চলেছে—জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির বিবিধ পথে।

এর মধ্যে মানুষ যেখানে গিয়ে আপন সাধ্যের কূল পায় না, তার সেই সীমাটি কম-বেশি প্রশস্ত বা সংকীর্ণ হয়ে আছে নানা দেশে-দেশে দেশবাসীর অধ্যবসায়ের অনুপাতে। মানুষের চেষ্টাতেই যা সম্ভব,

আমাদের দেশে তার অনেকখানিই আমরা দেখে থাকি "দৈব" ব'লে।

সেই দৈব বিরাজ করে প্রত্যক্ষের ওপারে, নাম পায় সে ভাগ্য-বিধাতা। এই যে অদৃশ্য ইচ্ছার অধীনতা, একে আমরাই ইচ্ছা করে চাপিয়েছি আমাদের জীবন-বিধানে। একে যদি আমরা বিশ্বাস না করি, তবে সে-ও হয় এক রকমের স্বাধীনতা লাভেরই কাজ। সে হয় স্বাধীনতাকে নিগেটিভ দিকে পাওয়া।

পজিটিভ পাওয়াটা হচ্ছে এইরূপ :—প্রত্যেকের নিজ নিজ ব্যক্তিগত পরিবেশ এবং তা ছাড়াও মানব-সমাজের আরো সকল দিকের সামর্থ্যের পরিমাপ ক'রে যে লাভালাভ সম্ভব, ভাগ্য বা দৈব বলতে যদি আমরা সেই সম্ভাবনার সীমাটিই বুঝে চলি ;—তবেই হয় দৈব কথাটির ঠিক অর্থ গ্রহণ। তাহলে, ভালো-মন্দ যা-ই যখন যার ক্ষেত্রে ঘটুক, সে ক্ষেত্রে বাইরে থেকে কারো করুণা বা সাহায্যের কথা মনে আসবে না কারো। সব-কিছু ঘটনার জন্যেই পরিবেশ বা সাধ্যের সম্ভব অসম্ভব সীমা বিবেচনা ক'রে, সে নিজের সুখ-দুঃখকে অংশে অংশে সংশ্লিষ্ট আরো-সকলের অংশীভূত ক'রে দেখতে অভ্যস্ত হবে। সকলে মিলে দুঃখের পরিত্রাণ-চেষ্টা বা সুখের উপভোগ্যতা বিস্তৃত ক'রে গ্রহণ করলে, তার কোনোটাই মানুষকে মাত্রা-ছাড়া ভাবে বিচলিত করবে না।—প্রচলিত অর্থের 'দৈব'কে এ ভাবেই আমরা মানবায়িত করতে পারি। এতেই মানুষের স্বাধীনতা ও শক্তি বাড়বে। এই বৃহত্তর মুক্তির দিকেই রবীন্দ্রনাথের "নরদেবতা"র ইঙ্গিত প্রসারিত।

আমাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এই মানবায়িত স্বাধীনতা ও শক্তির বিকাশই তার মূল লক্ষ্য। ধর্ম বলতে এখানে সাম্প্রদায়িকতা ও দৈব-বিশ্বাসের প্রাধান্যই ধরা হয়েছে। কিন্তু সে-ধর্মকে বাইরে-বাইরে তাড়ালে হবে কী, মনের রাজ্যে যদি তার অধীনতাই কায়েম রেখে চলি ? ফলে, সেয়ানা হব না কোনো কালেই। ঈশ্বরেই যাঁদের বিশ্বাস,—যাঁরা তাঁকেই পরম পিতা বলে জেনে আসছেন,—তাঁদের পক্ষেও এটি বিচার করে দেখার বিষয়, যে, কোন্ পিতা সন্তানকে সেয়ানা না দেখতে চায়।—স্বাধীনতায় সন্তান যত দূর প্রতিষ্ঠা পায়, পিতৃত্ব তত দূরই হয় সার্থক। শাস্ত্রবাক্যে এমন কথাও ব'লে থাকে—"পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়েৎ।" সুতরাং ভগবান আছেন কি নেই,—সে প্রশ্ন না তুলেও এ কথা অক্লেশে বলা চলে—স্বাধীনতায় আমাদের জন্মগত অধিকার, এবং সে-অধিকার আমরা যত দূর বাড়াতে পারি, তত দূরই বাড়ানো আমাদের একমাত্র মানবধর্ম।—স্বাধীন ভারতে আর কিছু না মানি, ধর্মভীরু ভারতবাসী রবীন্দ্রনাথের মানবীয় এই ধর্মটুকু যেন পুরাপুরিই মেনে চলি।

"মানুষের ধর্ম" বইয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"মনুষ্যত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দেবতার উপলব্ধি মোহমুক্ত হতে থাকে, অন্তত হওয়া উচিত।"

সে গ্রন্থেই বৃহদারণ্যকের একটি বাণী উদ্ধার ক'রে তিনি দেখাচ্ছেন যে, সমাজে উচ্চস্তরের ঋষিরা বলছেন, "যে মানুষ অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, সেই দেবতা অন্য আর আমি অন্য এমন কথা ভাবে, সে তো দেবতাদের পশুর মতোই।" তেমনি আবার একালের কথা উদ্ধৃত করেও কবি বলছেন যে, "এই যেমন শোনা গেল উপনিষদে, আবার, সেই কথাই আপন ভাষায় বলছে নিরক্ষর অশাস্ত্রজ্ঞ বাউল। সে আপন দেবতাকে জানে আপনার মধ্যেই, তাকে বলে মনের মানুষ। "মনের মানুষ মনের মাঝে করো-অন্বেষণ।"

এই অন্বেষণের মধ্যেই মানুষের মুক্তি নিহিত। মুক্তির আহ্বান মানুষের নিজের মধ্যে অহরহঃ ধ্বনিত হচ্ছে, এইটি তার স্বভাবগত বড়ো আহ্বান।

"মানুষ অন্তরে বাহিরে অনুভব করে, সে আছে একটি নিখিলের মধ্যে। সেই নিখিলের সঙ্গে সচেতন সচেষ্ট যোগসাধনের দ্বারাই সে আপনাকে সত্য করে জানতে থাকে। বাহিরের যোগে তার সমৃদ্ধি, ভিতরের যোগে তার সার্থকতা।"

এই মুক্তির কাজে যে স্তরভেদ আছে, তাও আমাদের জানতে হবে। কবি বলছেন, "উপনিষদ বলেন, অসম্ভূতি ও সম্ভূতিকে এক করে জানলেই তবে সত্য জানা হয়। অসম্ভূতি যা অসীমে অব্যক্ত, সম্ভূতি যা দেশে কালে অভিব্যক্ত। এই সীমায় অসীমে মিলে মানুষের সত্য সম্পূর্ণ। মানুষের মধ্যে যিনি অসীম তাঁকে সীমার মধ্যে জীবনে সমাজে ব্যক্ত করে তুলতে হবে। অসীম সত্যকে বাস্তব সত্য করতে হবে। তা করতে গেলে কর্ম চাই। ঈশোপনিষদ তাই বলেন, "শত বৎসর তোমাকে বাঁচতে হবে, কর্ম তোমার না করলে নয়।" শত বৎসর বাঁচাকে সার্থক করো কর্মে, এমনতরো কর্মে যাতে প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রমাণের সঙ্গে বলতে পারা যায় সোঽহম্। এ নয় যে, চোখ উল্টিয়ে, নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকতে হবে মানুষের থেকে দূরে। অসীম উদ্‌বৃত্ত থেকে মানুষের মধ্যে যে-শ্রেষ্ঠতা সঞ্চারিত হচ্ছে সে কেবল সত্যং ঋতং নয়, তার সঙ্গে আছে রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ ভূতং ভবিষ্যৎ। এই যে-কর্ম, এই যে-শ্রম, যা জীবিকার জন্যে নয়, এর নিরন্তর উদ্যম কোন্ সত্যে? কিসের জোরে মানুষ প্রাণকে করছে তুচ্ছ, দুঃখকে করছে বরণ, অন্যায়ের দুর্দান্ত প্রতাপকে উপেক্ষা করছে বিনা উপকরণে, বুক পেতে নিচ্ছে অবিচারের দুঃসহ মৃত্যুশেল? তার কারণ, মানুষের মধ্যে শুধু কেবল তার প্রাণ নেই, আছে তার মহিমা। সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষেরই মাথা তুলে বলবার অধিকার আছে, সোঽহম্। সেই অধিকার জাতিবর্ণ নির্বিচারে সকল মানুষেরই।

এই অধিকারই আমাদের লাভ করতে হবে প্রত্যেকের জীবনে। ভিতরের সেই বড়ো মুক্তির কথা যেন আমরা কোনো বাহ্যাড়ম্বরে বিস্মৃত না হই। এ কথা যাঁরা আমাদের স্মরণ করিয়ে আসছেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই অন্যতম। ভারতের স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য দেখিয়েছেন তিনি জাতিবর্ণনির্বিচারে সকল মানুষেরই "সোঽহমে"র অর্থাৎ মানব-মহিমার শ্রেষ্ঠতম অধিকার লাভ করা।

মানুষের মধ্যে মানুষ

"আমি তাঁদের সমকক্ষ না হলেও জ্ঞানী-গুণীদের জানবার তিনটি উপায় জানি। ধার্মিক—যাঁর কোন ভাবনা-চিন্তা নেই ; জ্ঞানী—যাঁর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই এবং সাহসী—যাঁর কোন ভয় নেই।" —কনফুসিয়াস।

অবতরণিকার পরিচিতি থেকে এটুকু বুঝা যায় যে, ১৭৫১ কিম্বা ১৭৫২ শক হবে,—ঐ সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন যখন কলকাতায় আসেন তখন বাঙ্গালার সমাজে সঙ্গীতের 'আনন্দহাট' বেশ ভাল ভাবেই জমেছিল, কেন না, কৃষ্ণযাত্রা ও কবির লড়াই ছাড়াও বীণ, সেতার ও তলবার অনুশীলনের তখনো অভাব ছিল না।

ক্রমে এক ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তিনটি বিভাগের সৃষ্টি হ'ল, কিন্তু "ত্রিধাবিভক্ত ব্রাহ্মসমাজের তিন ভাগেই তখন মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, সাধু ও মহাত্মার অভাব ছিল না। * * উপনিষদের সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী ব্রহ্ম, একেশ্বরবাদ, ভগবানের স্নেহময় পিতৃরূপ, ক্ষমাশীল মাতৃরূপ, সর্বধর্মসমন্বয় সকলই এই সকল উপদেশের বিষয় ছিল।"৬ শ্রদ্ধেয় শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ পরমহংস' (৬ষ্ঠ আলোচনা) প্রবন্ধে পরমহংসদেবের সময়ে বাঙলা দেশে দেশীয় সমাজে বিভিন্ন কয়টি সংঘের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন: "পরমহংসদেব যখন বর্তমান ছিলেন, তখন দেশীয় সমাজে কয়েকটি দল প্রবল ছিল—ব্রাহ্মসমাজ, বৈষ্ণবসমাজ, সনাতন হিন্দু-সমাজ, ব্রাহ্ম বা খৃষ্টানপন্থী নব্য-হিন্দুসমাজ এবং সনাতনী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য-হিন্দুসমাজ। ব্রাহ্ম-সমাজ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, আদি-সমাজ বা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দল—দেবেন্দ্রনাথ জীবিত থাকা সত্ত্বেও মৃতকল্প শক্তিহীন। ভারতবর্ষীয়, পরে নববিধান সমাজে কেশবচন্দ্র প্রবল-প্রতাপান্বিত, কিন্তু কুচবিহার-বিবাহের ফলে উগ্র নব্যপন্থীদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও নিন্দিত। এই ভাঙা দলই সাধারণ সমাজ নামে খ্যাত। * * সনাতন হিন্দুসমাজকে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন এবং শশধর তর্কচূড়ামণি তখন ঢালিয়া সাজিতেছেন, ইঁহাদের প্রচারে শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ মুখর।"৭ সুতরাং বাঙ্গালা দেশে তখন ধর্মভাবেরও নবজাগরণ দেখা দিয়েছে।

সঙ্গীতজ্ঞ স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীত-মনীষার পরিচয় দিতে গিয়ে আমরা 'ধান ভানতে শিবের গীত' গাইছি—এ কথা যেন কেউ মনে না করেন। কেন না, আগেই বলেছি যে, সঙ্গীতজ্ঞ বিবেকানন্দকে সৃষ্টি করেছিল তিনটি সংস্কার বা কারণ: প্রথম—বংশ-সংস্কার; দ্বিতীয়—তাঁর সময়ে সামাজিক পরিবেশ ও তৃতীয়—ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত-প্রভাব। এদের মধ্যে প্রথমটি সহজাত ও প্রবল এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি সহকারিরূপে গণ্য হোলেও বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ, এ জন্যই স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক সামাজিক পরিবেশ ও তদানীন্তন কালে ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীতের রূপায়ণ ও বিকাশ সম্বন্ধে আমাদের সামান্য ভাবে আলোচনা করা উচিত।

ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীতের মহড়ার কথা আলোচনা করার আগে প্রসঙ্গক্রমে আমরা কলকাতায় প্রথম সঙ্গীত-সমাজের প্রতিষ্ঠা ও তার মাধ্যমে বাঙ্গালা দেশে উচ্চাঙ্গ ও বিশুদ্ধ সঙ্গীতের অনুশীলন কি ভাবে হোত সে-সম্বন্ধে একটি পরিচয় দেব। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন: "আমরা যে-সময়ের (১২৯১ সাল) কথা আলোচনা করিতেছি, তখন কলিকাতায় 'ভারতীয় সঙ্গীত-সমাজ' লইয়া খুবই মাতামাতি চলিতেছে। এত কাল বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কদর ও আদর ছিল ধনীর বৈঠকখানায়; আর লৌকিক সঙ্গীত আশ্রয় পাইয়াছিল বাউল-বৈষ্ণবের আখড়ায়। তাহারও নিচের স্তরে ছিল কবি, তরজা, খেউড়, লোটো, খেমটা, ঝুমুরের গান।৮ * * ইতিমধ্যে ব্রাহ্মসমাজ সংগীতকে ধনীর প্রমোদশালা হইতে বাহির করিয়া ও বাউল-বৈষ্ণব-কীর্তনীয়াদের আখড়া হইতে শোধন করিয়া আনিয়া সাধারণের সঙ্গে নির্বিচারে পরিবেশন করিতে শুরু করেন। বাংলাদেশে সঙ্গীতকে সর্বসাধারণের জন্য মুক্তিদান করিল ব্রাহ্মসমাজ।"৯ পুণায় থাকা কালে মহারাষ্ট্রদের 'গায়েন সমাজ' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে আনে প্রেরণা এবং সেই প্রেরণা বুকে নিয়েই কলকাতায় সঙ্গীত-সমাজের তিনি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ছিলেন সেই সমাজের প্রথম সম্পাদক ও পরে হয়েছিলেন সভাপতি নির্বাচিত। সেই সঙ্গীত-সমাজ ছিল 'বিলাতী ক্লাব ও বাবুদের বৈঠকখানার সংমিশ্রণ ফরাশ, তাকিয়া, জাজিম, গড়গড়া, তাস, পাশার সঙ্গে পিয়ানো, টেবিল অর্গান, বিলিয়ার্ড টেবিল প্রভৃতির সমাবেশে সমৃদ্ধ। বিদেশ তথা দিল্লী, আগরা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থান থেকে কণ্ঠ বা যন্ত্র-সঙ্গীতের ওস্তাদরা এলে তাঁদের সমাজে নিমন্ত্রণ করা হোত রাগ-রাগিণীর পরিবেশনের জন্য, সর্বসাধারণও সুযোগ পেত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে উপভোগ করার। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন সেই সঙ্গীত-সমাজের একরূপ হিতাকাঙ্ক্ষী ও পৃষ্ঠপোষক।১০

ব্রাহ্মসমাজে তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, চিরঞ্জীব শর্মা বা ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ও আরো অনেক গুণীদের রচিত নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম-বিষয়ক গানের ছড়াছড়ি ছিল, স্বামী বিবেকানন্দও সে-সব গান শিখেছিলেন ও গাইতেন। ক্রমে গানের জগতে বিবর্তন দেখা দিল এবং সে-বিবর্তনের খরস্রোতে শুধু ব্রাহ্মসমাজের নামকরা গায়কেরাই ভাসলেন না, নরেন্দ্রনাথও গা ভাসিয়েছিলেন। এখন এই আকস্মিক বিবর্তন বা পরিবর্তনের কারণ কি এবং কা'কে অবলম্বন অথবা কেন্দ্র ক'রে এই রূপায়ণ সাধিত হয়েছিল? ঐতিহাসিক বলবেন—দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থের পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণই ছিলেন এই বিবর্তন-যজ্ঞের হোতা; ব্রাহ্মসমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্মিলনই এই বিবর্তনের ধারাকে উন্মুক্ত করেছিল। কেন না, শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে ব্রহ্মের পিতৃভাবের পাশে মাতৃভাবের আরোপ সংঘটিত হয়েছিল, কালী ও কৃষ্ণের মধ্যে মিলন মৈত্রীর ভাব স্থাপিত হোয়ে ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীতের জগতে এক অভাবনীয় ভাবের সৃষ্টি করেছিল। আচার্য কেশবচন্দ্রের

৬। 'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ ১৩৫৮, পৃঃ ১১৩

৭। ঐ, কার্তিক ১৩৫৮, পৃঃ ১—৩

৮। অবশ্য এ-সকল আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

৯। 'রবীন্দ্রজীবনী' (২য় সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৫৩), পৃঃ ২৫১

১০। 'ভারতীয় সঙ্গীত-সমাজ' ছাড়াও ন্যাশানাল থিয়েটারের উদ্বোধন হয় ও তার মাধ্যমে নাটক-অভিনয়ের সঙ্গে নৃত্য-গীতেরও প্রসারতা বাড়ে। এছাড়া জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে যে অভিনয়ের মহড়া চলত তার সঙ্গে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত এবং তখন থেকে ২৫ বছর তিনি ছিলেন ঐ অভিনয় প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ বি-এ ক্লাশে পড়েন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বামিজীর হয় পরিচয়, কেন না, আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইংরেজী ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ থেকেই স্বামিজী ব্রাহ্মসমাজে বেশ মেলামেশা করেন; বয়স তখন তাঁর ১৬ বছর।

সময়ে তো কথাই নাই, যে কেশবচন্দ্র নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যানে নিজেকে অহরহ ডুবিয়ে রাখতেন, তিনিই আবার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সংস্পর্শে এসে মাতৃনামে ও হরিনামে অবিরল অশ্রু বিসর্জন করতেন, জ্ঞানী কেশবচন্দ্র প্রেমের অবতাররূপে পরিশেষে পরিচিত হয়েছিলেন।

"আচার্য কেশবচন্দ্র" গ্রন্থের লেখক ব্রাহ্মসমাজে নব-পরিবর্তনের প্রসঙ্গে এক স্থানে উল্লেখ করেছেন: "ব্রাহ্মসমাজে সঙ্কীর্তন ও খোলের আগমন এক নূতন ব্যাপার! কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে যখন ভক্তিভাব বৈষ্ণবভাব সঞ্চারিত হইল, তখন তাঁহার হৃদয় এই ভাবোপযোগী উপকরণের জন্য ব্যাকুল হইল; সঙ্কীর্তন ও খোলের প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। * * * পটলডাঙ্গার দ্বারকানাথ মল্লিকের লেনস্থ প্রচারকগণের আবাসে গোবিন্দ দাস নামা এক জন সঙ্কীর্তনীয়াকে আনা হইল। তিনি মৃদঙ্গযোগে প্রথমতঃ এই গানটি করিলেন—"প্রেমপরশমণি শ্রীশচীনন্দন"। এই গানে কেশবচন্দ্রের হৃদয় বিগলিত হইল, আর দুই একবার বৈষ্ণবমুখে গান শ্রবণ করিয়াই পূর্বোক্ত বন্ধুকে একটি মৃদঙ্গ ক্রয় করিয়া আনিতে বলিলেন। * * * মৃদঙ্গের শব্দ শুনিলে যাঁহাদের পূর্বে হাস্য উদ্রিক্ত হইত, এখন তাঁহারা পূর্বভাবের জন্য একান্ত লজ্জিত হইলেন। সকলে বলিতে লাগিলেন—কি আশ্চর্য, যে ত্রিতলগৃহে সেতার বীণা প্রভৃতির আদর ছিল, যেখানে কখন কোন কালে মৃদঙ্গ স্থান পায় নাই * * সেই মৃদঙ্গ আজ গৃহের উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়া বসিল। * * কেশবচন্দ্র নিজের ভাবানুরূপ কীর্তনে একান্ত প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার হৃদয়ে ভক্তির বন্যা ছুটিল। এই বন্যায় শীঘ্র ব্রাহ্মসমাজ প্লাবিত হইবেন, তাহার উপক্রম হইল।"১১

'আচার্য কেশবচন্দ্র' গ্রন্থের রচয়িতা কেশবচন্দ্রের মধ্যে মাতৃভাব ও হরিসঙ্কীর্তনের বন্যার উল্লেখ-প্রসঙ্গে এখানে 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের' কোন কথার অবতারণা করেননি বটে, কিন্তু অন্যত্র তিনি বাঙ্গালার দুই মহাপুরুষের মিলনের কথা উচ্ছ্বসিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন: (ক) "বেলা একটার সময়ে নৌকাযোগে সকলে দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করেন। এ-সম্বন্ধে 'ধর্মতত্ত্ব' লিখিয়াছেন—'* * দক্ষিণেশ্বরের বাঁধাঘাটে পঁহুছিলে পরমহংস মহাশয়ের ভাগিনেয় হৃদয় ঠাকুর বজ্রায় আসিয়া প্রমত্ত ভাবে 'জাহ্নবীতীরে হরি বলে কেরে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে * *' এই গানটি করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন; * * 'সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপানন্দঘন' সকলে এই সঙ্কীর্তনটি করিতে করিতে পরমহংসের সাধনভূমি হইয়া তাঁহার নিকটে চলিয়া আসিলেন। গানশ্রবণে ও ভক্তগণের সমাগমে পরমহংস মহাশয়ের মূর্ছা(?) হইল। সমাধি ভঙ্গ হইলে পরব্রহ্মস্বরূপ ও আমিত্ব নাশ-বিষয়ে তিনি কয়েকটি অতি চমৎকার কথা বলেন'"।১২ (খ) "১৪ই মাঘ মঙ্গলবার অপরাহ্নে ব্রাহ্মগণ বেলঘরিয়া-তপোবনে গমন করিয়া দীর্ঘিকাকূলস্থ বৃক্ষতলে ধ্যান-ধারণা করেন। সায়ংকালে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস আসিয়া মিলিত হন"।১৩ (গ) "অনেকেই জানেন, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহাকে (কেশবচন্দ্রকে) অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং শ্রদ্ধা করিতেন। একদিন আচার্যদেবের শরীর অত্যন্ত রুগ্ন ও যন্ত্রণাগ্রস্ত, সন্ধ্যার অনতিপূর্বে পরমহংস হঠাৎ কমল-কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। * * আচার্যদেব এই সময় বাহির হইলেন এবং পরমহংস মহাশয়কে প্রণাম করিলেন, উভয়ে উভয়ের হস্ত ধারণ করিলেন। * * প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া অনেক কথা কহিলেন * *। এ-সম্বন্ধে তিনি (রামকৃষ্ণ) এই মাত্র বলিলেন যে, * * তোমার সম্বন্ধে মা তাহাই করিতেছেন, * * মাকে পাকা রকম পাইতে গেলে শরীরে এক এক বার বিপদ হয় * *।"১৪ (ঘ) "এই সময়ে তপোবনে পরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকার হয়। * * প্রসঙ্গ হইতে হইতে প্রসঙ্গের ভাবোপযোগী একটি রামপ্রসাদী গান তিনি (রামকৃষ্ণ) ধরিয়া দেন। গাইতে গাইতে তাঁহার সমাধি হয়। * * পরমহংস ও কেশবচন্দ্রের মিলন এক শুভ সংযোগ। * * সুতরাং সময়ে সময়ে পরমহংসের বসতিস্থল দক্ষিণেশ্বরে বন্ধুগণসহ কেশবচন্দ্রের গমন এবং পরমহংসের তাঁহার নিকটে আগমন জীবনব্যাপী কার্য হইল।" ১৫

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের এই মিলন-প্রসঙ্গের অবতারণা করার উদ্দেশ্য এই যে, উভয়ের পুনঃপুনঃ মিলনই এনে দিয়েছিল সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে বিপুল পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল বিশেষ ভাবে সাধন ও ভাবের জগতে। পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'এর সাধকভাবের পরিশিষ্টেও (পৃঃ ৩৮৮—৩৯৬) শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রে অপূর্ব মিলনের কথা আলোচনা করেছেন। কেশবচন্দ্রের মধ্যে মাতৃভাব তথা শক্তিবাদের সঞ্চার কি ভাবে হয়েছিল তার অন্যতম কারণ দেখাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন: "ঠাকুর একদিন কেশবকে দক্ষিণেশ্বরে বুঝাইয়াছিলেন যে, ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মশক্তির অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হয় এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সর্বদা অভেদভাবে অবস্থিত। শ্রীযুক্ত কেশব ঠাকুরের ঐ কথা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।" কেশবচন্দ্র এজন্য ব্রাহ্মসমাজে মাতৃসঙ্গীতের পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও যখন যখন ব্রাহ্মসমাজে ও ব্রাহ্ম-উৎসবে যেতেন তখন মাতৃসঙ্গীত ও হরিসঙ্কীর্তনে মাতোয়ারা হতেন। নরেন্দ্রনাথও এই ভাব তাঁর আচার্যদেবের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। ইংরেজী ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ২৬শে নভেম্বরে ৮১ নং চিৎপুর রোড, সিঁদুরিয়াপটিতে মণিমোহন মল্লিকের বাড়ীতে ব্রাহ্মোৎসব, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেখানে উপস্থিত। স্বামী সারদানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, বলরাম বসু, বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল প্রভৃতিও সেখানে সেদিন ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, আচার্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুকণ্ঠ গায়ক চিরঞ্জীব শর্মাও উপস্থিত ছিলেন। চিরঞ্জীব শর্মা একতারা হাতে নিয়ে 'নাচ রে আনন্দময়ীর ছেলে, তোরা ঘুরে ফিরে' গানটি গেয়েছিলেন। আচার্য নগেন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন 'হরিরসমদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে' গানখানি। শ্রীরামকৃষ্ণও গেয়েছিলেন সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতির গান: (১) 'মজল আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ-নীলকমলে', (২) 'শ্যামাপদ

১১। 'আচার্য কেশবচন্দ্র' (মধ্যবিবরণ, প্রথম অংশ), কলিকাতা, ১৮১৪ শক, পৃঃ ১৬০-১৬২

১২। 'আচার্য কেশবচন্দ্র' (অন্ত্য-বিবরণ), পৃঃ ৪০—৪১

১৩। ঐ পৃঃ ১০৪

১৪। ঐ, পৃঃ ৫৮৬—৫৮৭

১৫। (ক) ঐ, মধ্যবিবরণ, পৃঃ ৭৭০—৭৭৩; (খ) *Indian Mirror*, **March 28, 1875.**

আকাশেতে মন-ঘুড়িখান উড়তেছিল', (৩) 'এ সব খ্যাপা মাগীর খেলা', (৪) 'মন বেচারীর কি দোষ আছে', (৫) 'আমি ঐ খেদে খেদ করি' প্রভৃতি।১৬ স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমময় স্পর্শ লাভ ক'রে দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীকে জগজ্জননী বোলে চিনেছিলেন, এ জন্য 'অনুপম-মহিমপূর্ণ ব্রহ্ম কর ধ্যান',১৭ 'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপতি'১৮, 'আরতি করে চন্দ্র তপন',১৯ প্রভৃতি গানের সাথে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতির শ্যামাসঙ্গীত ও বৈষ্ণবদের পদাবলী-কীর্তনেও আত্মহারা হতেন।

এবার নরেন্দ্রনাথ তথা স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীতানুশীলন নিয়েই আমরা আলোচনা করব। চোরবাগানের হরিদাস ও দাশরথি সান্ন্যাল নরেন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। পড়ার মাঝে মাঝে গানের মহড়া বসত, নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সকলের ওস্তাদ। বি-এ পাশ করার পর, অর্থাৎ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে নরেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ হয়। তখন বয়স তাঁর কুড়ি বছর। পিতার মৃত্যু-সংবাদ তিনি শোনেন বরাহনগরে। বরাহনগরে বন্ধুদের সঙ্গে তিনি সেদিন প্রায় রাত্রি ১১টা পর্যন্ত গান-বাজনা করেন; গান-বাজনার পর বিশ্রামের সময় কোন বন্ধু তাঁকে সংবাদ দিল তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছে হৃদ্‌রোগে। তখন থেকেই নরেন্দ্রনাথের ভাগ্যাকাশে দেখা দিল এক মহা বিপর্যয়। মা ভুবনেশ্বরী তাঁকে চাকরী করার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন, তিনিও উদ্‌ভ্রান্ত মনে কলকাতার এখানে-সেখানে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখেছেন: একদিন রোদে ঘুরতে ঘুরতে পায়ে তাঁর (নরেন্দ্রনাথের) ফোস্কা পড়ে গেছে; তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে মনুমেন্টের ছায়ায় বসে পড়লেন। হঠাৎ একজন বন্ধুর সঙ্গে তাঁর দেখা হোল, বন্ধু নরেন্দ্রনাথের অবস্থা দেখে সান্ত্বনা দেবার জন্য গান ধরলেন—"বহিছে কৃপাঘন নিঃশ্বাস পবনে"। নরেন্দ্রনাথ গানের সাধক, গান তাঁর জীবনের চিরসহচর, কিন্তু সেদিনের গান তাঁর ভাল লাগলো না, গান তাঁর চোখের ওপর এঁকে তুলল অতীতের সব বিষাদের ঘটনা, দুঃখের শত যোজন পাহাড় যেন ভেঙে পড়লো তাঁর মাথার ওপর। সেই সময়ে তিনি নাকি দিনকতক পুস্তক প্রণয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 'সঙ্গীত-রত্নাবলী' নাম দিয়ে গানের বই একটি তিনি লিখেছিলেন, ছাপা হয়েছিল তা বটতলা থেকে। কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' বইখানিরও তিনি বঙ্গানুবাদ করেছিলেন, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তা ছাপিয়েছিলেন প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ বটতলার ছাপাখানা থেকে। আরো কত অনুবাদ-সাহিত্য ও রচনা তাঁর লেখনী থেকে বোধ হয় আত্মপ্রকাশ করেছিল, কিন্তু দেশের অনাদর দৃষ্টিতে সে-সব হয়ে আছে এখনো অজ্ঞাত।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ তথা বিবেকানন্দের প্রথম মিলন ঘটে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি হয়। প্রায় এই পাঁচ বছর ধরে প্রেম ও ভালবাসার বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের অপার্থিব যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল বাঙ্গলার তথা ভারতের দুই অলৌকিক মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মধ্যে। এই কিঞ্চিৎ কম পাঁচ বছর ধরে কত গানের মন্দাকিনী-ধারা বয়ে গেছে দক্ষিণেশ্বরে, কলকাতায় ও কলকাতার আশেপাশে, অপূর্ব গুরু-শিষ্যের মধুর সাঙ্গীতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করেছে ভারতের শুধু কেন, সমগ্র বিশ্বের আধ্যাত্মিক সাধনক্ষেত্রকে, সরল ও রসসিঞ্চিত করেছে বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা, গরিমামণ্ডিত করেছে বাঙ্গালার মাটী ও স্মৃতিকে।

শ্রীকমলকৃষ্ণ মিত্র তাঁর "শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি" নামক পুস্তকে (২য় সংস্করণ, ১৩৫৫ সাল ১-৮৩ পৃষ্ঠা) ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের আষাঢ় মাস থেকে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় গানগুলি সহজ স্বরলিপি ক'রে প্রকাশ করেছেন এবং সে জন্য তিনি সর্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। অবশ্য শ্রীম-লিখিত 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ১-৫ম ভাগে আরো অনেক গানের উল্লেখ আছে যেগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, রামলাল দাদা, চিরঞ্জীব শর্মা প্রভৃতি গান করেছিলেন। আমরা আগামী বারে শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতকে অনুসরণ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীত-পরিবেশনের একটি নিদর্শন দেবার চেষ্টা করব। এছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির পর স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীত-প্রতিভার বিকাশ কি ভাবে হয়েছিল ও সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতবাদ কি ছিল সে-সম্বন্ধে আলোচনা করারও ইচ্ছা রইল।

[ক্রমশঃ।

১৬। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' (৫ম খণ্ড), পৃঃ ৩০
১৭। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত।
১৮। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রচিত।
১৯। ঐ।

দু'টি খনার বচন

"আষাঢ়ে কাড়ান নামকে।
শ্রাবণে কাড়ান ধানকে।
ভাদরে কাড়ান শীষকে।
আশ্বিনে কাড়ান কিসকে।

২

"আঘণে পৌটি।
পৌষে ছেউটি।
মাঘে নাড়া।
ফাল্গুনে ফাড়া।"
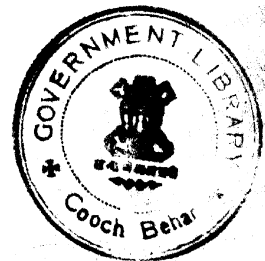
শেক্‌সপিয়রের ব্যর্থ প্রেম

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা হলেন শেক্‌সপিয়র। তাঁর একার রচনায় ইংরেজী সাহিত্য যতটা সমৃদ্ধ তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যান্যদের সমবেত চেষ্টাতেও বুঝি ততটা নয়। আজকের ইংরেজী ভাষাও বহুলাংশে তাঁর একক সৃষ্টি বলা চলে। বিশ্বসাহিত্যে বাল্মীকি, ব্যাস, হোমার, ভার্জিলের সগোত্র মহাকবি তিনি। তাঁর নাটক, নাটকে সৃষ্ট চরিত্র আজও মানুষের মন জয় ক'রে চিত্ত চঞ্চল ক'রে চলেছে। তাঁর ট্র্যাজেডির তুলনা নেই; তাঁর হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, কিং লিয়ার—এর যে-কোন একটি রচনাতেই বিশ্বসাহিত্যে তাঁর নাম চিরন্তন হয়ে থাকতে পারত।

শেক্‌সপিয়রের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডির খবর কিন্তু তাঁর অনেক পাঠকই জানেন না। হ্যামলেট, না, হ্যামলেটও তাঁর শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি নয়। বস্তুত: তাঁর কোনো রচনাই নয়। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি বুঝি শেক্‌সপিয়র নিজেই।

শেক্‌সপিয়রের মৃত্যুর আট বছর পরে তাঁর নাটকগুলি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং তাঁর যে-কোনো নাটকের সেই সংস্করণের একটি কপির মূল্য আজ দশ লক্ষ টাকা। অথচ জীবদ্দশায় তাঁর রচনার যৎসামান্যও মূল্য পাননি শেক্‌সপিয়র। এটা হয়ত ট্র্যাজেডি কিন্তু এ ট্র্যাজেডি কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের জীবনে চিরাচরিত ব্যাপার—এ ট্র্যাজেডিতে তাঁর কোনো বিশেষত্ব নেই। তা ছাড়া নাট্যকার-কবি হিসেবে তাঁর অর্থাগম না হলেও, অর্থের বিশেষ অভাব তাঁর কোনো দিন ছিল না। থিয়েটারের মালিকানা, জমি কেনা-বেচা ও তেজারতি কারবারে যথেষ্ট আয় ছিল তাঁর। 'ভেনিসের বণিক' নাটকের ঘৃণিত সুদখোর শাইলক-চরিত্রের স্রষ্টা শেক্‌সপিয়র যে জীবিকা-নির্বাহের জন্য স্বয়ং চড়া সুদের কারবার করতেন এটাও হয়ত ট্র্যাজেডি, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও কোনো বিশেষত্ব নেই তাঁর। নিজেদের কাব্য-উপন্যাসে পুষ্ট আদর্শের পরিপন্থী জীবন-যাপন ও জীবিকা-নির্বাহ করতে অনেক প্রতিভাধরকেই দেখা গিয়েছে শেক্‌সপিয়রের পর—এবং আগেও।

শেক্‌সপিয়রের বাপ ছিলেন নিরক্ষর চাষা, মাও নিরক্ষর; নিরক্ষর ছিলেন তাঁর স্ত্রী, কন্যা, দৌহিত্রী সকলেই। যুগান্তকারী স্রষ্টা, নাট্যকার ও কবির কাছে এর চেয়ে ট্র্যাজেডি আর কি হতে পারে? সারা জগতের জন্য অক্ষয় আনন্দের রসভাণ্ডার যিনি সৃষ্টি ক'রে গেলেন তাঁর আত্মীয়-স্বজন কণাটুকুর স্বাদ পেল না তার! বাপ-মায়ের নিরক্ষরতা হয়ত শেক্‌সপিয়রের দায়িত্বের বাইরে কিন্তু তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের অক্ষর-পরিচয় করালেন না কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর শেক্‌সপিয়রের জীবনের বৃহত্তর ট্র্যাজেডিতে।

হরিণ চুরি ক'রে ধরা পড়ে তার শাস্তি পেয়ে এবং তার পর শাস্তিদাতার নামে একটি নীতিদীর্ঘ উপাদেয় কবিতা লিখে তার দরজাতেই লটকে দিয়ে গ্রাম ছেড়ে শেক্‌সপিয়র লণ্ডনে পালিয়ে আসেন বলে রটনা আছে, কিন্তু তাঁর দেশত্যাগের সত্যিকার কাহিনী তা নয়। হরিণ চুরি হয়ত মিথ্যে নয়, শাস্তি পাওয়াও এবং কবিতা লেখাও, কিন্তু তাঁর দেশ-ত্যাগের কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তাঁর বয়স তখন উনিশ নয়। গরু দুয়ে, মাখন ফেটিয়ে, চামড়া শুকিয়ে আর ট্যান ক'রে গ্রামে তখন দিব্য সময় কাটছে তাঁর। মন আনন্দে ভরপুর—এ্যান্ হোয়েটলি বলে একটি মেয়ের সঙ্গে গভীর প্রেম চলেছে তাঁর; বিয়েও ঠিক, এমনকি লাইসেন্স পর্যন্ত নেওয়া সারা। দেশত্যাগের চিন্তা তখন তাঁর সুদূর কল্পনাতেও নেই। কিন্তু বিয়ের মাত্র ক'দিন আগে বিনামেঘে বজ্রপাত হ'ল। এ্যান হেথওয়ে নামে গ্রামের আর একটি মেয়ে গ্রামের মাতব্বরদের কাছে নালিশ জানালো।

শেক্‌সপিয়র নাকি তার সর্বনাশ করেছে। শুধু তাই নয়, অবিলম্বে শেক্‌সপিয়রের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়া প্রয়োজন, কারণ—

কারণ শুনে সারা গ্রামে ঢি-ঢি পড়ে গেল আর মাথা ঘুরে গেল শেক্‌সপিয়রের। চাঁদের আলোয় ক'দিন ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল হেথওয়ের সঙ্গে কিন্তু এ যে তাঁর কল্পনার বাইরে!

মাতব্বররা বললেন, "পুরুত না পুলিশ? হয় বিয়ে করো হেথওয়েকে নয় জেল খাটো। হোক না হেথওয়ে আট বছরের বড় তোমার চেয়ে, দেখাক না তাকে বয়সের তুলনায় আরো বুড়ি—"

নিরুপায় শেক্‌সপিয়র বিয়ে করলেন হেথওয়েকে, কিন্তু তার পরই তাকে ফেলে পালিয়ে এলেন লণ্ডনে। বহু বছর আর গাঁয়ের কেউ পাত্তা পেল না তাঁর।

লণ্ডনে পৌঁছে বছর পাঁচেকের মধ্যেই অভিনেতা হিসেবে অল্প-বিস্তর নাম কিনে ফেললেন শেক্‌সপিয়র। তার পর ক্রমশঃ দু'টো থিয়েটারের অংশীদার হয়ে, জমির ব্যবসা আর উচ্চ সুদে তেজারতি কারবার ক'রে রীতিমত ধনী হয়ে উঠলেন। বছরে তাঁর স্থায়ী রোজগার দাঁড়ালো গিয়ে—তখনকার সস্তা-গণ্ডার হিসেবে আজকের দিনের প্রায় লক্ষ টাকা।

কিন্তু মৃত্যুর আগে তাঁর উইলে একটি আধলা দিয়ে গেলেন না স্ত্রী হেথওয়েকে—তাকে শুধু দিয়ে গেলেন তাঁর দ্বিতীয় ভালো শোবার খাটখানা—তাও আসল উইল লেখা হওয়ার পরে লিখে দেওয়া। এই নিরেস খাটখানা দিয়েই হেথওয়ের প্রতি তাঁর মনোভাব পরিস্ফুট করে গেলেন তিনি। তাঁর ব্যর্থ দাম্পত্য-জীবনের উপর কটাক্ষ সব চেয়ে ভালো শোবার খাটখানা তিনি বেওয়ারিশ রেখে গেলেন।

হেথওয়েসের সঙ্গে শেক্‌সপিয়র কোনো দিন বাস করলেন না। অথচ আশ্চর্য, বিবাহ-বিচ্ছেদও করলেন না। হয়ত এ্যান হোয়েটলের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল কিম্বা এই কেলেঙ্কারীর পর তার সঙ্গে বিয়ে আর সম্ভব ছিল না।

"আমার বয়স যখন ৯, আমি ম্যাকবেথ তর্জমা করেছি।"

—রবীন্দ্রনাথ।

সত্যিকার গল্প

সাধিন ঘোষ

মণিপুরী হাতী মোহনের গল্প এখনও তোমাদের বলা হয়নি।

'সে আমার এত প্রিয় ছিল যে আমি তার মালিক না হলেও তাকে 'আমার' মোহন বলে ডাকতাম।

মোহন ছিল ভারী লাজুক। অনেক হাতী আছে বেহায়া নির্লজ্জ আর অসভ্য। কিন্তু মোহন ছিল অসম্ভব রকমের শান্ত আর সুশীল। তার সঙ্গে মিশলেই আনন্দ পাওয়া যেত।

জীবনে অনেক সময়ই একের ভুলের খেসারত দিতে হয় অপরকে। বেচারী মোহনের জীবনেও তাই ঘটেছিল। যদিও বিনয়, নম্রতা এবং সংস্বভাব ছিল তার সহজাত, তবুও ছেলেবেলায় বড় বেশী লাজুক ছিল বলে পাড়াপড়শীরা তার সঙ্গে বেশ রূঢ় ব্যবহার করতেন।

এই দেখ না, পুষ্করবামের সার্কাস পার্টির জীবজন্তুগুলো। পুষ্করবাম যে কে ছিলেন তা আজ আর মনে নেই। এই পুষ্করবামের সার্কাসের দলে ছিল গোটাকতক বেশ ধাড়ী-ধাড়ী হাতী। কিন্তু সব হাতীই কি আর ভদ্দরলোক হয়!

আমাদের পাড়ায় এসে তাঁবু গেড়ে বসবার পর দুই-এক দিনের মধ্যেই হাতীগুলো এক মদের দোকানে হানা দিয়ে মদের পচাই গিলতে আরম্ভ করল। গিলতে গিলতে একেবারে পাঁড় মাতাল। তারপর টলতে-টলতে হেলতে-দুলতে সার বেঁধে চলল তারা খালের দিকে। খালে তখন রোজকার মত মোষেরা মনের আনন্দে স্নান করছিল। তাদের সঙ্গে রাখাল ছিল না। মাতাল এক দল হাতীকে কাছে আসতে দেখে তারা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি খাল থেকে উঠে বাড়ীমুখো দৌড় লাগাবার চেষ্টা করল। পুষ্করবামের জানোয়ারগুলো ঠিক করল মোষগুলোকে খাল থেকে উঠতে দেবে না। কপাল ভাল, খালে বেশী জল ছিল না এবং মোষেরা তাদের বিরুদ্ধে জোর লড়াই চালালো।

ফলে সার্কাসী জানোয়ারগুলো তাদের কৌশল বদলে নিজেদের মধ্যেই লড়াই-ঝগড়া লাগিয়ে দিল। নিজেদের গায়ের জোর প্রমাণ করবার জন্য তারা কয়েকটা টেলিগ্রাফ তারের থাম উপড়ে ফেলল এবং একটা পায়ে চলার পুল ভেঙ্গে তছনছ করে দিল। তার পর ফুলের বাগানের মধ্যে দিয়ে গায়ের জোরে গোলাপের ঝাড়গুলোকে পায়ে দলতে-দলতে ছুট লাগালো। এত বড় একটা অপকর্ম যে তারা করল, তার জন্য তাদের মধ্যে একজনও যে একটু লজ্জিত হয়েছে—এমন বোধ হল না।

ক্ষতিপূরণ করবে কে? সমগ্র এলাকা—রাণী নীলমণির এষ্টেট আর আশেপাশের সমস্ত জমি ইজারা দেওয়া হয়েছিল সুতাসুতি এ্যাডভান্সমেণ্ট কোম্পানীকে। স্বভাবতই ব্যাপারটায় কোম্পানী কর্তৃপক্ষকে মাথা গলাতে হয়েছিল এবং যথাসময়ে একটি তদন্ত কমিশন বসল।

তারা আমাদের কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী মাদাম সুভেনস্কাকে সাক্ষী মেনেছিল। শুধু আমরা নয়, দূর-দূরান্তের লোকেরাও সুভেনস্কা দিদিমণিকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। তাঁর জীবনের 'মূলমন্ত্র ছিল 'দারিদ্র্য এবং সেবা'।

একদিন পিওন দাদা আমাদের বলেছিলেন: সুভেনস্কা দিদিমণির কাছে লেখাপড়া শিখছ—এ তোমাদের খুব সৌভাগ্য খোকনমনিরা। সত্যিই উনি সন্ন্যাসিনী। ছেলেপিলেদের খুব ভালবাসেন। সেদিন ওঁর জন্য কয়েকটা চিঠি এনেছিলাম, তাতে সব বিদেশী ডাক-টিকিট আটকানো ছিল। খুব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি আমি। বিশ্বাস করো, শুধু সুইডেন নয়, আমেরিকা, সুইজারল্যাণ্ড, বৃটেন, ফ্রান্স, ডেনমার্ক—সব দেশের ডাক-টিকিটই ছিল। ভাবলাম, সুভেনস্কা দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা করি চিঠিগুলো তাঁর জন্মদিনের শুভেচ্ছা বয়ে এনেছে কি না। তিনি বললেন, "না না, মেয়েদের আবার জন্মদিন কি? মেয়েদের জন্মদিন অথবা বয়স কারও কাছে প্রকাশ করা উচিত নয়। আমাকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষয়িত্রী হিসাবে কাজ করবার আমন্ত্রণ জানিয়ে ঐ সব চিঠিপত্র এসেছে। কিন্তু আমি ওসব আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারি না।" "কেন পারবেন না?"—প্রশ্ন করলাম আমি। উনি বললেন, "তাহলে এখানে আমার ছেলেপুলেদের দেখবে কে?" আমার বন্ধু দুলাল পোষ্ট অফিসে কাজ করে। সে বলেছে, পৃথিবীর দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য চিঠি আসে সুভেনস্কা দিদিমণির নামে। সকলেই তাঁকে মোটা মাইনে দিয়ে নিজের নিজের দেশে নিয়ে যেতে চায় কিন্তু উনি আমাদের এখানকার কাজ ছাড়বেন না। টাকা-কড়িতে একটুও লোভ নেই ওঁর। উনি ভালবাসেন কাজ। আমরা এটুকু বুঝেছিলাম যে সুতাসুতি এ্যাডভান্সমেণ্ট কোম্পানী সুভেনস্কা দিদিমণিকে ঘুষ দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চেয়েছিল। উনি তাদের হয়ে গোটাকতক মিথ্যা কথা বললে ওঁকে তারা তাদের ডায়মণ্ড-হারবারের "মডেল স্কুল ফর চিলড্রেনে" প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পদ দেবে বলে লোভ দেখিয়েছিল।

সুভেনস্কা দিদিমণি এ-সব ষড়যন্ত্র জানতে পেরেছিলেন। তাই সুতাসুতি এ্যাডভান্সমেণ্ট কোম্পানীর তদন্ত কমিশনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখলেন না। সাক্ষী হিসাবেও তিনি 'কমিশনে যেতে রাজি হলেন না।

তার পর তারা তাঁকে কমিশনের সদস্যা হবার আমন্ত্রণ জানালো। সে প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন, "যে কমিশনের খসড়া-রিপোর্ট ইতিমধ্যেই প্রচার করা হয়ে গেছে, সেই কমিশনের সদস্য হওয়া উচিত নয়। কমিশনের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই আর ডায়মণ্ডহারবারের চাকরীতেও আমি যাবো না।"

কোম্পানীর কর্তারা দেখল সুভেনস্কা দিদিমণি মনস্থির করে ফেলেছেন। তাঁর সঙ্কল্প বজ্রের মত দৃঢ়। পৃথিবীর কোন প্রলোভনেই তিনি মিথ্যা রিপোর্টে সই দেবেন না।

পরে কোম্পানীর লোকেরা তাদের একজন লোক মারফৎ আমাদের জন্য অনেক খেলনা পাঠালো, গরীব বাপ-মায়ের সন্তানদের বলা হল, তারা যদি কমিশনে হাজির হয় তাহলে এই খেলনাগুলো পাবে। তাদের কয়েকটি সরল প্রশ্ন করা হবে মাত্র।

হাতীরা মোষদের উস্কানী দিয়েছিল, না মোষেরা হাতীদের উস্কানী দিয়েছিল? ছেলেরা চীনে পটকার ভক্ত কি? তাদের মধ্যে কোন বুড়ো খোকা ভুল করে কোন হাতীর লেজে একটা পটকা বেঁধে দিয়েছিল কি? আমরা কি খালের ধারে খেলতে ভালবাসি? এবং এই ধরণের আরও কয়েকটি প্রশ্ন। সব কটা প্রশ্নই আমাদের কাছে হাস্যকর মনে হয়েছিল।

কোম্পানীর লোকটাকে সুভেনস্কা দিদিমণি বললেন, "আপনি কি খেলনা ঘুষ দিয়ে আমার ছেলেদের দলে টানবেন? আমার এই কিণ্ডারগার্টেনে ছেলেরা কি পাবে না পাবে তা ঠিক করি আমি

নিজেই। আপনার খেলনা নিয়ে কেটে পড়ুন আপনি। আমার ছেলেরা কমিশনে যাবে না।"

কোম্পানীর লোকটা বলল, "তাহলে খেলনাগুলো ছেলেদের বাপ-মাকে দিয়ে দিই।" এ কথার উত্তরে সৃভেনস্কা দিদিমণি বললেন, "সে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। সে হচ্ছে তাঁদের সঙ্গে আপনার বোঝা-পড়ার ব্যাপার। কিণ্ডারগার্টেনে ছেলেরা আমার। এখানে তাদের ভাল-মন্দ আমার হাতে। কিণ্ডারগার্টেনের বাইরে ছেলেরা থাকে তাদের বাপ-মায়ের তত্ত্বাবধানে। কাজেই সেখানে তাদের ভাল-মন্দও তাদের বাপ-মায়ের কাছে।"

কোম্পানীর লোকটা হঠাৎ রূঢ় স্বরে চিৎকার করে উঠল, "বেশ ভাল কথা, কোম্পানী মজাটা টের পাওয়াবে। আপনাকে বিনা ক্ষতিপূরণে রাণী নীলমনির এষ্টেট থেকে উচ্ছেদ করা হবে আর আপনার কিণ্ডারগার্টেন বন্ধ করে দেওয়া হবে।"

পরদিন মনোবল এ্যাস্যুওরেন্স এ্যাণ্ড বিল্ডিং অর্গ্যানাইজেসনের কয়েক জন কর্মকর্তা এলেন আমাদের স্কুলে।

তাঁদের মুখে হাসি লেগেই আছে। তাঁরা আমাদের আঁকা ছবি দেখে প্রশংসা করলেন আর সৃভেনস্কা দিদিমণিকে বললেন যে, তাঁর এই জনসেবা দেখে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁরা আমাদের বলছেন যে, পুষ্করবামের সার্কাস তাঁদের মনোবল এ্যাস্যুওরেন্স কোম্পানীতে ইন্সিওর করা ছিল। তার পর তারা বিনা পয়সায় আমাদের স্কুলটাকে ইন্সিওর করতে চাইলেন এবং ফিসফিসিয়ে সৃভেনস্কা দিদির সঙ্গে কি যেন আলাপ করলেন।

আমরা ইন্সিওরেন্সের মানেই জানতাম না এবং পুষ্করবামের জানোয়ারগুলো যে তাঁদের কোম্পানীর কি করেছে, তাও বুঝলাম না। কিন্তু আমরা আন্দাজ করলাম, এই লোকগুলি আমাদের কাউকে আদালতে দাঁড় করাতে চান। আমাদের সে অনুমান ভুল হয়নি।

তাঁরা আমাদের জন্য যে সমস্ত মিঠাই এনেছিলেন, সৃভেনস্কা দিদিমণি সেগুলো গ্রহণ করলেন না এবং সুতাসুতি কোম্পানীর লোকের মত তাঁদেরও বিদায় নিতে হল।

এই লোকগুলো যাবার সময় শাসিয়ে গেল যে, সৃভেনস্কা দিদিমণি তাদের পক্ষ না নিলে তাঁকে শেষ করে ছাড়বে।

সে রাতে আমাদের চোখ থেকে ঘুম পালিয়ে গেল। সৃভেনস্কা দিদিমণি একলা মানুষ আর এতগুলো লোক তাঁর বিরুদ্ধে! অদ্ভুত অদ্ভুত সব লোক যখন-তখন আমাদের মধ্যে এসে যে-রকম রূঢ় ভাবে সৃভেনস্কা দিদিমণির উপর হম্বিতম্বি করত তাতে আমরা মনে মনে খুব কষ্ট পেতাম। যখন তারা বুঝতে পারল, সৃভেনস্কা দিদিমণি তাদের কথা মত কাজ করতে মোটেই রাজি নন, তখন তারা রেগে গিয়ে তাকে বেয়াড়া বুড়ি বিশেষণে ভূষিত করল।

সৃভেনস্কা দিদিমণি সৎ এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন বলে তারা তাঁকে পছন্দ করত না এবং তারা বুঝতে পেরেছিল তিনি যত দিন সেখানে আছেন, তত দিন তাদের কুৎসিত ষড়যন্ত্র সফল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। সেই ষড়যন্ত্র যে কি, তা আমরা অনুমান করতে পারিনি।

সে তথ্যও ফাঁস হয়ে গেল কয়েক দিনের মধ্যেই। পিওন দাদা আমাদের বললেন যে, সুতাসুতি কোম্পানী আর মনোবল এ্যাস্যুওরেন্স কোম্পানীর মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে গেছে এবং বেসরকারী তদন্ত কমিশনের ব্যাপারটা নিছক ভাঁওতাবাজী। আসলে তারা হাতী আর মোষের লড়াইকে ছুতো করে ঐ অঞ্চলের সমস্ত গরীব লোকদের উচ্ছেদ করে ওখানে একটা ছোট সহর বানাতে চায়। তারা ওখানে অনেক বাড়ী বানাবে আর ওখানকার বাগ-বাগিচা অদৃশ্য হবে। আমাদের স্কুলের সামনে আর গরু চরবে না, মোষেরা খালের জল-কাদায় গড়াগড়ি দেবে না আর মতি দিদির হাঁস-মুরগীও মাঠে-ঘাটে ছুটে বেড়াবে না। সত্যি আমাদের পক্ষে এটা সংবাদই বটে।

পরে আরও খারাপ খবর পাওয়া গেল। মতি দিদি, বই বাঁধাইয়ের মিস্ত্রী, মুচি এবং অন্যান্য আরও অনেকের উপর হুকুম হয়েছে—এক সপ্তাহের মধ্যে বাড়ী ছেড়ে সরে পড়তে হবে। শেষ পর্যন্ত সৃভেনস্কা দিদিমণিও সুতাসুতি কোম্পানীর কাছ থেকে রেজিষ্ট্রী করা চিঠি পেলেন। শুনলাম, সৃভেনস্কা দিদিমণি তদন্ত কমিশনে আসতে রাজি না হওয়ায় সুতাসুতি কোম্পানী দুঃখ প্রকাশ করে বলেছে যে, কিণ্ডারগার্টেন স্কুলটা খালের বড্ড কাছাকাছি, কাজেই ওখানে স্কুল রাখা বিপজ্জনক। অর্থাৎ কি-না সৃভেনস্কা দিদিমণিকে প্রকারান্তরে স্কুল বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হল।

সেদিন বিকেলে শুধু আমরা নয়, বড়রাও কেঁদে ফেলেছিল। স্কুলের বারান্দায় দেখলাম, উচ্ছেদের নোটিশ-পাওয়া অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তারা সকলেই সৃভেনস্কা দিদিমণির সঙ্গে দেখা করবে বলে অপেক্ষা করছিল।

সৃভেনস্কা দিদিমণি বললেন, "ব্যাপার কি?"

হীরুর ঠাকুর্দা ছিলেন সকলের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। সকলের হয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, "সৃভেনস্কা বিবি, আমরা এখানে বলতে এসেছি, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আমরা গরীব মানুষ। বিনা অপরাধে আমাদের ভিটেমাটি উচ্ছেদ করা হচ্ছে। আপনি আমাদের অসম্মানের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, সে জন্য আপনার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আপনি আমাদের ছেলেদেরও লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। যারা এই জমির মালিক, তারা আপনাকে দিয়ে বলাতে চেয়েছিল যে, ছেলেরা হাতীর ল্যাজে চীনে পটকা বেঁধে দিয়েছিল এবং···"

"মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা, এ সব গল্প আপনাদের কাছে কে করেছে, বলুন আমায়।"—সৃভেনস্কা দিদিমণি বাধা দিলেন।

তাঁরা বললেন, "কিন্তু সৃভেনস্কা বিবি, ওরা আমাদের এ জায়গা ছেড়ে অন্যত্র সরে পড়তে বলেছেন। এটা তো আর গল্পকথা নয়?"

"তাতে হয়েছে কি? আমাকেও তো চলে যেতে বলেছে ওরা। আপনাদের চেয়েও আমার অবস্থা এমন কিছু ভাল নয়।"

"তা আমরা জানি সৃভেনস্কা বিবি, আমরা জানি। কিন্তু আপনাকে ছাড়া কোথায় যাব আমরা? আপনি আমাদের এবং আমাদের ছেলেপুলেদের মা-বাপ। আমরা আপনাকে ছাড়তে পারি না।"—বললেন জুতো তৈরীর মিস্ত্রী।

"আমাকে ছেড়ে যেতে বলেছে কে আপনাদের? আমি তো বলিনি। আমি যেখানে আছি, সেখানেই থাকব এবং আপনারাও যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন। কে আপনাদের তাড়িয়ে আমার ছেলেপুলেদের সরিয়ে নিয়ে যায় দেখব।"

হঠাৎ হীরুর ঠাকুর্দা তাঁর পিতলের হাতলওলা মোটা লাঠিটা

ঘোরাতে শুরু করলেন, যেন তিনি মৌমাছির ঝাঁক তাড়াচ্ছেন। তার পর চেঁচিয়ে বললেন—থ্রি চিয়াস ফর সৃভেনস্কা দিদিমণি!

সকলেই সেই উল্লাস-ধ্বনিতে যোগ দিল।

সুতাসুতি কোম্পানী ও মনোবস এ্যাসুওরেন্সের লোকেরা আমাদের স্কুলের সামনে জমির মাপজোপ করছিল। তারা তাকিয়ে দেখল কিন্তু উল্লাস-ধ্বনিতে যোগ দিল না। আমরা যখন শোভাযাত্রা করে বেরুলাম তখন তারা হাসতে লাগল।

হীরুর ঠাকুর্দা যখন তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময় তাদের মধ্যে এক জন অপর জনকে ঠোকা দিয়ে নির্লজ্জের মত বলল, "আমার মনে হয় পাগলীটাকে শীগ্‌গিরই উচ্ছেদ করা হবে। ও গরীব লোকগুলোর মাথা ঘোরাবার তালে আছে। ওর নিজের মাথাটা কি একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে?"

হীরুর ঠাকুর্দা বললেন, "দেবনিন্দা করিস না রে গাধা, দেবীর অপমান করিস না। দেবদেবীদের রক্ষা করেন দেবদূতেরা।"

পরদিন সকালে 'ওয়াচম্যান' এবং 'মর্ণিং ষ্টার' পত্রিকার চিঠিপত্র কলমে খিদিরপুরের সুইডিস মেডিকাল মিশনের প্রাক্তন সদস্যা মিষ্টার সৃভেনস্কা-স্বাক্ষরিত একটি পত্র প্রকাশিত হল। বে-সরকারী ভাবে গঠিত যে তদন্ত-কমিশনে কিণ্ডারগার্টেনের স্কুলের ছাত্রদের সাক্ষী মানা হয়, সেই কমিশন কার কাছ থেকে এই অধিকার পেয়েছে, চিঠিতে তাই জানতে চাওয়া হয়েছিল।

সেই দিন সন্ধ্যায় কলকাতা 'হরকরা' পত্রিকায় একনিষ্ঠ সর্বত্যাগী শিশু-মনস্তত্ত্ববিশেষজ্ঞা কর্মী সিষ্টার সৃভেনস্কার সম্মানার্থ একটা অর্থভাণ্ডার খোলবার আবেদন জানিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭ জন অধ্যাপক ও ৩১ জন লেকচারার একটি বিবৃতি প্রকাশ করলেন। সেই বিবৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রুশো, মন্তেসরি প্রভৃতি অদ্ভুত অদ্ভুত সব লোকের নাম ছিল।

পিওন দাদা আমাদের বলেছিলেন, "একজন অধ্যাপক সৃভেনস্কা দিদিমণির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তার সঙ্গে এসেছিলেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর সাহেব পিটার আর্ণট। আর্ণট সাহেব পুরাতন মানচিত্র সংগ্রহ করে বেড়াতেন। সৃভেনস্কা দিদিমণিকে তিনি কতকগুলো ফোটোগ্রাফ দিয়েছিলেন আর অধ্যাপক মশাই দিয়েছিলেন কয়েকটি পুরোনো কাগজপত্র। সে সব থেকে স্পষ্ট বোঝা গেছে যে, সৃভেনস্কা দিদিমণি, মতি দিদি অথবা অপর কাউকেই কেউ ঐ জায়গা থেকে ওঠাতে পারবে না। তাঁরা সৃভেনস্কা দিদিমণির জন্য বড় একটা টাকার থলিও এনেছিলেন কিন্তু সৃভেনস্কা দিদিমণি সে টাকা স্পর্শও করেননি। তিনি শুধু বলেছিলেন যে, যত দিন তিনি সন্ধ্যায় সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ করতে পারবেন, তত দিন তাঁর এবং তাঁর কিণ্ডারগার্টেন স্কুল চালাবার টাকার অভাব হবে না। তিনি বলেছিলেন, "কাজেই আমার আনন্দ। আমি সে আনন্দ হারাতে চাই না। ঐ টাকাটা অন্য কোথাও স্কুল খোলার কাজে ব্যয় করুন।" বিশ্বাস করো ছোট ছেলেরা, এই কথা শুনে অধ্যাপক এবং মেজর সাহেব তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে-বসে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন। সৃভেনস্কা দিদি তাঁদের ধন্যবাদ দিয়েবিদায় দেন।*

—অনুবাদক : সুনীল ঘোষ

* লেখাটি 'Mirror' পত্রিকা থেকে পেয়েছি।

ধূমকেতু

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য

'মাসিক ধূমকেতু' বলে কোন কাগজ আদৌ বেরিয়েছিল কি না বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস সে কথা লেখে না। অনেক বর্ষপঞ্জী আর পুরনো কাগজ ঘাঁটাঘাঁটি করেও আমরা এর কোন নজির বের করতে পারিনি। তবে মধ্য-কলিকাতায় বড় রাস্তা থেকে গলিপথে ঢুকেই ছু'-তিনখানা বাড়ী ছাড়ালে রকওয়ালা ছোট ঘরখানার দরজার পাশেই টিনের প্লেটে দেওয়ালে আঁটা 'মাসিক ধূমকেতু কার্যালয়' সকলেরই নজরে পড়ে থাকবে। সাদা চুণকামকরা দেওয়ালের গায়ে মেশা নীল টিনের প্লেটে সাদা হরফগুলো চোখে না পড়ে পারে না। উঁচু রকওয়ালা এই ছোট ঘরখানি রাস্তার উপরেই, দরজা-জানালা ছু'টি রাস্তার দিকে খোলা। পেছনের বিরাট তিনতলা বাড়ীর সঙ্গে এই একতলা ছোট ঘরখানার কোন যোগাযোগ নেই।

হয়তো বাড়ীর সামনে দারোয়ানের জন্য এ ঘরখানি তৈরি হয়েছিল, তার পর সে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে যখন 'মাসিক ধূমকেতু' সে-ঘর ভাড়া নেয়—সেটা কবেকার কথা আমাদের জানা নেই। ধূমকেতু, কার্যালয়-মার্কা দেওয়ালে-আঁটা এ টিনের প্লেটখানাকে অবান্তর মনে করে তুলে ফেলে দেবার প্রয়োজন কেউ মনে করেনি, দরজার পাশে সেখানাকে রেখেই চুণকাম হয়ে গেছে ছু'-চার বার, ফলে আজ তা দেওয়ালের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে এখানাকে পেয়েছি তিন-চার বছর, মানে তিন-চার বছর আগে আমরা যখন ঘরখানা ভাড়া নিলাম তখন থেকে।

রবিবারের সান্ধ্য-আসর জমাতে এ ঘর দশ টাকাতে পাঁচ বন্ধুতে মিলে ভাড়া নিয়েছি, আর তার পর থেকে প্রতি রবিবারে সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত দশটা এখানে আমাদের আড্ডা জমে আসছে। পেছনের প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ী ভাড়া খাটে, সেখানে চলে বিভিন্ন জীবনধারা যার সঙ্গে আমাদের পরিচয়ও নেই, পরিচিত হবার ইচ্ছেও নেই। মালিক থাকেন দূরদেশে, ভাড়া আদায় করা আর ঘর ভাড়া দেওয়ার জন্য রয়েছে এক হিন্দুস্থানী দারোয়ান নীচের তলায় সপরিবারে ছু'খানি ঘর জুড়ে—বাড়ী মেরামতি বা আর আর তদারকি তার কাজ। এক কথায় মালিকের অনুপস্থিতিতে প্রতিভূ-স্বরূপ দারোয়ানজিই এ বাড়ীর সর্বময় কর্তা। তারি কাছে মাসিক দশ টাকায় এ ঘরখানা আমরা ভাড়া নিয়েছি। প্রতিমাসে প্রথম রবিবার সন্ধ্যায় সে রসিদ দিয়ে ভাড়া নিয়ে যায়। নাম সহি করা রসিদগুলোতে ঘর বা ফ্লাটের নম্বর আর মাসের নাম বসিয়ে সে ভাড়া আদায় করে। বলতে গেলে আমরা এ পাড়ারই ছেলে, এ বাড়ীতে বছরে ছু'-এক বার যাতায়াতের প্রয়োজনও ঘটে থাকে কিন্তু আমাদের এ বাইশ-তেইশ বছর বয়সের ভেতর বাড়ীর মালিকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ-পরিচয়ের কোন সুযোগ ঘটে ওঠেনি।

আমরা পাঁচ বন্ধু—মানে আমি, হিমু, রবি, সুধা আর অটল। এক পাড়ার ছেলে, ছেলেবেলা থেকে পাশাপাশি বাড়ীতে এক-সঙ্গে বড় হয়েছি, আর সকলেই প্রায় সমান বয়সের। পাড়ার সবার ধারণা, আমরা পাঁচ বন্ধু ইচ্ছা করলে অসাধ্য সাধন করতে পারি, বিপদের দিনে আমাদের ডাক পড়ে আর বিপদের ঝুঁকি সমস্ত সম্ভাবনা সহ ঘাড় পেতে নিতে আমরাও ইতস্তত: করি না। এখানে আমরা কেউ কারুর চেয়ে ছোট হতে রাজী নই, ফলে প্রয়োজনের দিনে না ডাকতেও আমাদের মেলে। কেউ বা আমাদের ভাল বলে কেউ বা বলে খারাপ, আমরা নির্বিকার ভাবে তুটোই মেনে নিই—এ সম্বন্ধে কোন রকম তুর্বলতা আমাদের নেই। নিজেদের কথা অন্য সময় বলা যাবে, আপাতত: সেটা আমার বক্তব্য নয়।

সত্যি কথা বলছি, রবিবার সন্ধ্যায় আমরা এখানে জড় হই চা-সিগারেট খেতে আর আড্ডা দিতে—এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। খেলার নেশা আমাদের নেই, রাজনীতির নেশা নেই, শিল্প-সাহিত্যের নেশাও নেই। আসলে আমরা পাঁচ বন্ধুতে মিলে যা-খুশি আলাপ করে যেতাম, চাএর দোকানের বয় ছাড়া কোন ষষ্ঠ ব্যক্তির প্রবেশ ছিল এখানে একেবারেই নিষিদ্ধ। একদিন আমাদের ওখানে ষষ্ঠ ব্যক্তির আগমন হল আর শুধু আগমন হল নয়, সেদিন থেকে তিনিও হলেন আমাদের এ সান্ধ্য আড্ডার অতিরিক্ত একজন অংশী।

বছর খানেক আগের কথা। রবিবারের এক সন্ধ্যায় আমরা পাঁচ বন্ধুতে বসে বসে ঝিমুচ্ছি, আলাপ চলছে এটা-ওটা, এমন সময় এক সৌম্য সহাস মূর্তি বৃদ্ধ এসে ঘরে ঢুকলেন। অপ্রত্যাশিত বলেই আমরা কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে দেখলাম। একহারা লম্বা চেহারা, ক্ষীণ দেহ, মাথায় ছোট করে ছাঁটা সাদা চুল, বয়স যাট কিংবা তারো বেশী কিন্তু মুখে বয়সের ছাপ পড়েনি। গায়ের রঙ ফর্সা, ত্বক্ ভেদ করে রক্ত যেন বেরিয়ে আসতে চায়। দেহ শক্ত-সমর্থ না হলেও জরাগ্রস্ত বলা চলে না, গায়ের চামড়ায় এতোটুক খোঁচ কিংবা ভাঁজ নেই। নরম মসৃণ গাল আজো কোথাও এতোটুকু টোল খায়নি, স্বাস্থ্য আর রক্তের আভা স্পষ্ট চোখে পড়ে। ক্ষীণ বৃদ্ধ-দেহে এমন সৌন্দর্য না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। পোষাক-পরিচ্ছদে ভদ্র আর সৌখিন রুচির পরিচয় অতি স্পষ্ট অথচ তাতে বিন্দুমাত্র বাহুল্য নেই।

আমাদের এ ভাবে তাঁর দিকে তাকাতে দেখে হেসে বললেন—আমি লেখক নই আর তোমরাও কাগজওয়ালা নও আমি জানি। আর বয়স আমার যা দেখছো তা নয়, আসলে সেটাও প্রায় তোমাদেরই সমান। এটা বললাম এ জন্য যে তোমরা যা-খুশি আলাপ করে যেতে পার, আমাকে সঙ্কোচ করবার কিছু নেই। আমি হলুম তোমাদের ভোলাদা, আজ থেকে তোমাদের এ আড্ডার মেম্বার।

আমি বললাম—কিন্তু আমরা তো আর কাউকে এখানে নিই না!

—আরে দেখোই না একবার নিয়ে, যে-যে গুণ থাকা দরকার সব আমার আছে। এমন রত্ন তোমরা বিনা চেষ্টায় বিনা খরচায় পেয়ে যাচ্ছ এ নেহাৎ তোমাদের ভাগ্য।—বলে তিনি দামী সিগারেটের কৌটো বের করে আমাদের দিতে লাগলেন, আমরা ইতস্তত: করছি দেখে বললেন,—এ না হলে আড্ডা জমবে না, সঙ্কোচ করো না, ধরো!

বসে সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—তোমরা আমাকে না চিনলেও আমি তোমাদের চিনি।—তিনি একে একে আমাদের সকলের পরিচয় বলে যেতে লাগলেন। জেনে অবাক হলাম যে শুধু আমাদের নয় প্রত্যেক পরিবারের সকলকে তিনি চেনেন আর সব বিষয়ের খবর রাখেন। বললেন,—ভেবে অবাক হচ্ছ কি করে জানলাম, জ্যোতিষী না কি! সে আরেক দিন তোমাদের বলবো, আজ জানতে চেয়ো না।—একটু থেমে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আবার বলতে লাগলেন,—আচ্ছা, অতো লাল শাড়ী তোমরা আমদানি করলে কোথেকে হে? আমিও তো এ পাড়াতেই একদিন বড় হয়েছি, কই এমন দেখেছি বলে তো মনে হয় না? লালের জৌলুসে রাস্তায় চোখ ফেলাই দায় হয়ে উঠেছে। তোমাদের আমলে এসে এমনটা ঘটলো—হঠাৎ ছোট-বড় সব মেয়েই ভাবতে সুরু

অর্দ্ধেক রূপসী...

রূপ-চর্চ্চার রীতি-নীতি বদলায় যুগে যুগে···নূতন এসে করে পুরাতনের স্থান অধিকার। কিন্তু নারী—চিরন্তনী নারী—সে তার কেশসম্পদের নিরাপত্তা-রক্ষায় নিজের মধ্যে জেগে রয়েছে চিরদিন···কেশই যে তার অর্দ্ধেক রূপ। সে-রূপ সাধনায় এ-যুগের সর্ব্বগুণান্বিত আঙ্গিক **জবাকুসুম।**

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ **জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা**

করে দিলে লাল শাড়ীতেই তাদের মানায় ভালো? কি রুচি ভাই তোমাদের?

জিনিষটা আমরা সবাই লক্ষ্য করেছি। গত ছ'মাসের ভেতর পাড়ায় লাল শাড়ীর আমদানি হয়েছে অপর্যাপ্ত, বোধ হয় ইতিমধ্যে প্রত্যেক মেয়েই দু'একখানা লাল শাড়ী খরিদ করে নিয়েছে।

আমি বললাম,—এটা আমাদের না মেয়েদের রুচি ভোলাদা?

ভোলাদা হেসে বললেন,—মেয়েদের রুচিও যা তোমাদেরও তাই, কাকে কিসে মানাবে সে নিজেও জানে না, যে দেখে সেও জানে না।

রবি বললে,—মেয়েদের ধরণই এই, এক জন যা করবে দশ জন তারই নকল করে যাবে।

কোণ থেকে অটল বললে,—তোমরা বুঝতে পারছো না, এর পেছনে রয়েছে ব্যবসায়ীর কূটচাল আর বজ্জাতি বুদ্ধি!

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হেসে ভোলাদা বললেন,—এর থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, তোমাদের রুচি সম্বন্ধে আমি যা মন্তব্য করেছি সেটা মিথ্যা।

এমনি করে ভোলাদার সঙ্গে হল পরিচয়। তার পর প্রতি রবিবার সৌম্য সহাস ভোলাদা আমাদের আড্ডায় যোগ দিয়ে আসছেন আর দিনে দিনে হয়ে উঠেছেন এর প্রাণপুরুষ। সত্যি বলতে কি, আড্ডার আকর্ষণই হয়ে উঠেছে আজ আমাদের কাছে সব চেয়ে বড় জিনিষ। ভোলাদা জীবনটাকে এতো ভাবে দেখে নিয়েছেন যে তাঁর চোখ দিয়ে আজকাল আমরা জীবনটাকে বুঝতে শুরু করেছি। তাঁকে না হলে আজ আর আমাদের চলে না, আমরা আজ জানি, তিনি যেদিন থাকবেন না সেদিন এ আড্ডাও আর থাকবে না, সেদিন এটাকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা হবে অর্থহীন এক বিড়ম্বনা মাত্র, আমাদের পাঁচ বন্ধুর কেউই বোধ হয় সে নিষ্ফল চেষ্টা আর করতে যাবো না, করলে সেটা হবে অপপ্রয়াস। সপ্তাহে এই একটি দিনের জন্য অধীর আগ্রহে আমরা প্রতীক্ষা করে থাকি।

আজো ভোলাদার কোন পরিচয় আমরা জানি নে, যখনই জিজ্ঞাসা করে জানতে চেয়েছি, তিনি এ প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন।—আজ না, পরে একদিন বলবো। তাঁর নাম, ঠিকানা, পরিচয় কিছুই আমাদের জানা নেই। কৌতূহল রয়েছে, চেষ্টা করলে জেনে নিতেও যে না পারি তা নয়, কিন্তু একমাত্র সে পথে বাধা—ভোলাদা কি ভাববেন? নিজে এসে যে ধরা দিলেন, আপনার করে নিলেন,—তাঁকে খুঁজে বের করতে যাওয়ার লজ্জা আমাদের মানসিক আভিজাত্য-বোধকে পীড়িত করে তোলে। তার চেয়ে এমনি যতটুকু পাওয়া গেল সেই ভালো। ভোলাদাকে পথে-ঘাটে কোন দিন দেখিনি, বোধ হয় তিনি বেরোনই না।

ভোলাদা গল্প বলেন, আমরা শুনে যাই। গল্প বলতে তার জুড়ি নেই। সব সময় তাঁর গল্প যে বিশ্বাস করবার মতো হয় তা নয়, কিন্তু ভোলাদার মুখের দিকে চেয়ে তাঁর কথায় কেউ অবিশ্বাস করতে পারে এ কথা ভাবাই যায় না। শুনে যা মনে হয় অসম্ভব, বাস্তব দুনিয়ায় চিরদিন হয়তো সেটাই সম্ভব হয়ে আসছে। ভোলাদার সব চেয়ে বিশ্রী ব্যাপার হল এটা, যেখানে তিনি গল্প শেষ করতে চান সেখানে এলেই তাঁর নাক ডাকতে শুরু করে, হাজার চেষ্টায়ও তখন তাঁর ঘুম ভাঙে না, এর পর এ গল্পের বিবয় তাঁর কাছ থেকে আর কিছুই জানা যায় না। একটা জিনিষ তাঁর লক্ষ্য করবার মতো,—এতো দিন ধরে ভোলাদা গল্প বলে যাচ্ছেন কিন্তু কোন দিন কোন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করতে তাঁকে দেখিনি। এ তাঁর জীবনের ঘটনা নাই-বা যদি হয় তবু তাঁর জীবনের মর্মমূলে গল্পের এক প্রচণ্ড উৎস লুক্কায়িত রয়েছে, যা থেকে উৎসারিত হয়ে উঠছে প্রতিদিন নূতন, বিচিত্র আর আশ্চর্য রাশি-রাশি গল্প—তার পর কোন চিহ্ন না রেখে অনন্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

বর্ষণক্লান্ত এক শরৎ-সন্ধ্যায় বৃষ্টি-ধোয়া আকাশ ঘন নীল হয়ে উঠেছে, সেদিন আমরা একটু সকাল সকাল চলে এসেছি। আমরা বড় রাস্তা থেকে সোজা ঢুকে পড়ি, আর উলটো দিক্ থেকে আসেন ভোলাদা আমাদের ঠিক পরক্ষণে। যেন কখন আমরা আসবো সেটা তাঁর জানা, কিংবা কোথাও ওৎ পেতে আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। এটা দেখে আসছি এতো দিন।

প্রস্তাবটা সেদিন আমিই পেশ করলাম,—আজ ভোলাদা'র কাছে প্রেমের গল্প শুনতে হবে।

হিমু সাধারণতঃ খুব কম কথা বলে, সেদিন সেও সায় দিয়ে উঠলো,—আমিও এই কথাটাই ভাবছিলাম।

ঠিক এমন সময় হাসিমুখে এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন ভোলাদা। তাঁর চেহারায় আমরা আমাদের শোনা গল্পকেই দেখতে পাই। এ যেন ভোলাদা নয়, অসংখ্য গল্প রূপ ধরে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, অথবা ভোলাদাও গল্প। ভোলাদা আর তাঁর গল্প একের মাঝে ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে—একের মাঝেই দুটো হারিয়ে গেছে। হয় দুটোই সত্য, না হয় দুটোই মিথ্যা—কিন্তু দুই-ই অভিন্ন।

আমি বললাম,—আজ আমরা প্রেমের গল্প শুনবো ভোলাদা!

রবি বললে,—এ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে গেছে।

বসতে বসতে ভোলাদা বললেন,—প্রেমের গল্পের জন্য অতো উতলা হয়ো না ভাই, আজকাল তোমাদের ঠিকানায় প্রেমের দেবতার ঘন ঘন আনাগোনা চলছে। দু'দিন বাদে গল্প বলবে তোমরাই। অতর্কিত তার শরাঘাত আর সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে কাবু—সে যতো বড় বীরপুরুষই হও না কেন। কাবু হওয়াটা কোন ব্যাপারেই ভালো নয়, কিন্তু সত্যিকার প্রেমের মাধুর্যটুকু ঐ কাবু হওয়ার মাঝেই গোপন আছে। পাওয়ার চেয়ে অনেক বেশী দিয়ে এ পাওয়া, তাই প্রেমের দাম এতো বেশী।

আমি বললাম,—প্রেমের মহিমা আমরা শুনতে চাই নে ভোলাদা, সত্যিকার প্রেমের গল্প শুনতে চাই।

হেসে ভোলাদা বললেন,—তা বেশ, অবশ্যই শুনবে। প্রস্তাব যখন পাশ হয়ে গেছে ভোটের জোরে, তোমাদের এ দাবি না-মেনে আমি পারবো কেন? এ হল আজকের যুগের দাবি।

চাএর দোকানের বয় চা দিয়ে গেল। ভোলাদা পকেট থেকে সিগারেটের কৌটা বের করে একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। ধীরে ধীরে তিনি গম্ভীর আর অন্যমনস্ক হয়ে উঠছেন। এ হল তার গল্প আরম্ভ করবার পূর্বলক্ষণ।

—সে আজ থেকে বছর চল্লিশেক আগের কথা, আমার বয়স তখন বছর আঠারো হবে,—ভোলাদা আরম্ভ করে একটু থামলেন।

—তোমাদের আগে একটা কথা বলে নিই,—ভোলাদা আবার আরম্ভ করলেন,—বাংলা দেশের জল-হাওয়া, মাটি আর সামাজিক সংস্কারের গুণে এখানে যা একান্ত স্বাভাবিক, অন্য দেশের ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে সেটাকেই অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। তা ছাড়া বিশেষ ক্ষেত্রে যে বিশেষ ঘটনা ঘটে, ক্ষেত্রান্তরে সেটার সে রকম না ঘটবারই সম্ভাবনা বেশী, তাই বলে যা ঘটলো সেটা মিথ্যা হয়েও যায় না, আর সেটাকে অস্বাভাবিক বলে অবিশ্বাস করলে একদেশদর্শিতা দোষও ঘটে থাকে। যা বলছিলাম, তখন আমার বয়স আঠারো। আজো আমার নাম তোমাদের বলিনি, আমার নাম চন্দ্রচূড় চট্টোপাধ্যায়, সহজ করে চন্দ্রচূড়!

—চন্দ্রচূড়!—সমস্বরে আমরা বলে উঠলাম।

—কেন, চন্দ্রচূড় কি আমার নাম হতে পারে না? আমি ভেবে পাই নে কি আছে এতে অবাক হবার? অবাক হয়েছে সবাই, কেউ বলেছে নামটা সুন্দর, কেউ বলেছে একেবারে চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে রাখা। এ নামে আর আমার চেহারায় যে মিল কোথায়, সেটাও কিন্তু আরেক সমস্যা হয়ে রইল আমার কাছে। প্রথম যেদিন মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে দেখা—সে তার বড় বড় চোখ দু'টি আমার মুখের উপর রেখে, আরো বড় করে টেনে উপরের দিকে কপালে তুলে বিস্মিত প্রশ্ন করেছিল,—চন্দ্রচূড়! ভা—রি সুন্দর নাম তো? এমনটা আর শুনতে পাইনি কি না!—সঙ্গে সঙ্গে কৈফিয়ৎও দিয়েছিল।

না শুনবারই কথা, তবে তার এ কথা কয়টি আর দৃষ্টি আমার মর্মে সেদিন বিঁধেছিল। আজো আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে, আমি বোকার মতো হাঁ করে তার দিকে তাকিয়েছিলাম, যেন ঠিক সে দৃষ্টি আর কথাগুলোর অর্থ আমি উপলব্ধি করতে পারিনি। কথাটি একেবারে মিছে নয়। দু'জন হো-হো করে হেসে উঠতে তবে আমার খেয়াল হল, আমার হাঁ করে তাকিয়ে থাকার কি অর্থ ওরা করেছে বুঝতে পেরে লজ্জায় আমি রাঙা হয়ে উঠলাম। তারা যাই ভাবুক, তাদের ভাবনাটাকে কিছু নয় বলে আমি উড়িয়ে দিতে পারি নে। আমার বয়স তখন আঠারো, মঞ্জুশ্রী আর যতীনেরও এ রকমই হবে—দু'জনেই প্রায় আমার সমান বয়সী।

আমি আর যতীন পড়ি একই শ্রেণীতে, আমি কবি, যতীন শিল্পী—দু'জনে গভীর বন্ধুত্ব। জাতশিল্পী যতীন, তোমরা তার নামও জান না ছবিও দেখনি, একদিন তোমাদের তার ছবি দেখাবো। বাজারের শিল্পী সে নয়, সে নয় জনতার—সে শিল্পী অন্তরঙ্গ আপন জনের। তোমরা প্রশ্ন করবে কি সার্থকতা এমন শিল্পের, কিন্তু যে সৃষ্টি করলো তার কাছে এ প্রশ্নটা অবান্তর। কেন মানুষ কবি আর শিল্পী হয়,—আজ এতো বয়স হল এ সমস্যার কোন সমাধান খুঁজে পাইনি।

কলেজ কামাই করে দু'জন বেরিয়ে পড়লাম দুপুর বেলা,—মনে লেগেছে কবিতার হাওয়া, কাঁধে এসে ভর করেছেন ওমর খৈয়াম। কলুটোলায় গলির ভেতর তিনতলা ছোট বাড়ী যতীনদের। তিনতলার যতীনের ঘর, সিঁড়ি বেয়ে দু'জন সেখানে উঠে গেলাম। যতীনদের বাড়ীতে এই আমার প্রথম যাওয়া।

যতীনের ঘরে ঢুকলাম, মস্ত বড়ো ঘর। এক পাশে একটা বিছানা, অপর পাশে বড় টেবিল। টেবিলের সামনে চেয়ারে আমি বসে পড়লাম দরজার দিকে পেছন ফিরে, আমার সামনে যতীন বসলো দরজার মুখোমুখি। যতীনের ঠিক পেছনটায় দেওয়াল ঘেঁষে দুটো আলমারি, একটায় কাচের দরজা—বড় বড় বই ভর্তি। অপরটা আগাগোড়া কালো আবলুস কাঠের, মজবুত, গায়ে ফুলপাতা-কাটা সূক্ষ্ম কারুকাজ!

নিস্তব্ধ দুপুর, বাড়ীটা নির্জন। কোন সাড়াশব্দ নেই, বাড়ীতে জনপ্রাণী আছে বলে মনে হল না। অতো বড় বাড়ীটা যেন ফাঁকা, খাঁ-খাঁ করছে। যতীন পকেট থেকে চাবি বের করে কালো আলমারি খুলে একটা বোতল আর দুটো গ্লাস বের করে নিয়ে এলো। দেখেই বুঝলাম মদ। একটা গ্লাসে অনভ্যস্ত হাতে কিছুটা ঢেলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো—দেবো?

বুঝতে পারলাম যতীনের এ হাতে-খড়ি। আমিও এই প্রথম, তখনো সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারিনি। বললাম,—না ভাই, কাজ নেই, ভয় করে মাতাল-টাতাল হবো শেষটায়।

অবহেলার সঙ্গে যতীন বললো,—আরে দূর, মাতাল হবো কেন?

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকলো মঞ্জুশ্রী, দ্রুত যতীনের হাত থেকে গ্লাসটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তায়। আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মঞ্জুশ্রী জিজ্ঞাসা করলো,—এ চাবি তুমি কোথায় পেলে? কেন খুললে এ আলমারি—কেন?

চোখ রাঙিয়ে রূঢ় উত্তর দিল যতীন,—দেখো মঞ্জু, এ হল বাড়া-বাড়ি। আজ আর খাবো না, কিন্তু এই বলে রাখলাম মদ আমি একদিন খাবো। এ আমার প্রতি রক্তকণায় মিশে আছে... একদিন খাবোই।

বোতল আলমারিতে রেখে চাবি বন্ধ করে চাবিটা হাতের মুঠোয় নিয়ে মঞ্জুশ্রী পাশের একখানা চেয়ারে বসলো, তার পর বললো,—মদ তুমি কোন দিনই খাবে না, এই আমিও বলে রাখলাম। মদ খেয়ে আমাদের দু'জনেরই বাবা মরেছেন। সেদিন দাদা মরলেন—আমি জানি সেও মদ খেয়ে। তোমার রক্তে যদি মদ থাকে তো আমার রক্তেও প্রচুর মদ রয়েছে। তুমি আমাকে জানো, একটা সত্য কথা আজ তোমাকে বলে রাখি যতীন! যেদিন তুমি মদ খেতে আরম্ভ করবে ঠিক সেদিনই আমিও মদ ধরবো। আমার টাকা পরিমাণে তোমার দ্বিগুণেরও বেশী—কি পরিমাণ মদ খেতে পারবো হিসেব করে দেখো। মনে রেখো, এ ঠাট্টা নয়, ধরলে মরবার আগে পর্যন্ত আর ছাড়বো না!—শেষের দিকে তার কথাগুলো মনে হল গম্ভীর।

যতীন বললো,—তুমি মরবে তো আমার কি? আমি মদও খাবো, মরবোও না!—যতীন যে কিছুটা ভয় পেয়েছে তা তার মুখ দেখে বুঝতে পারলাম।

মৃদু হাসলো মঞ্জুশ্রী, বললো,—সে দেখা যাবে।

এবার বোঝা গেল মদ খেতে না পেয়ে যতীন চটেছে। আমাকে বললো,—তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই—বাবার এক বন্ধুর মেয়ে, নাম মঞ্জুশ্রী, আর মেজাজটা তো দেখতেই পেলে?

সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুশ্রী বললে,—আর এক বাড়ীতে একসঙ্গেই আমরা বড় হয়েছি।

যতীন বললে,—মানে, ওর মা মারা যাবার পর আমার মা ওকে মানুষ করেছেন।

মঞ্জুশ্রী বললে,—আর এই বাড়ীটার একাই ও অর্ধেকের মালিক।

—আর আমি বুঝি তা নই ?—ভ্রূ কুঁচকে যতীন মঞ্জুশ্রীর দিকে তাকালো।

—দাদা মারা যাবার পর থেকে তুমিও—উত্তর দিল মঞ্জুশ্রী।

যতীন এবার হঠাৎ নূতন সুর ধরলো,—দাদার ইচ্ছা ছিল ওকে বিয়ে করবেন, দাদা তো নেই, এবার আমার ইচ্ছে—

কথার মাঝখানে বাধা দিল মঞ্জুশ্রী—রাখো তোমার ফাজলামি, চাঁদ ধরতে হাত বাড়ালেই ধরা যায় না। দেশে ছেলের দুর্ভিক্ষ লেগেছে ? ওকে আমি বিয়ে করতে যাবো !

—মেয়েরও কিছু দুর্ভিক্ষ নেই, কিন্তু এ রকম করলে আমি তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই কি করে ?—যতীনের সুরে অসহায় ভাবটা ফুটে উঠলো।

মঞ্জুশ্রী বললো,—এক পক্ষে ঢের হয়েছে, এবার ও-পক্ষটা বলে ফেল।

আমি এতোক্ষণ অবাক হয়ে ওদের আলাপ শুনছিলাম, এবার ভালো হয়ে নড়ে-চড়ে বসলাম। এতোক্ষণ মঞ্জুশ্রী একবারও আমার দিকে চেয়ে দেখেনি।

যতীন বললো,—ও আমার কবি-বন্ধু—চন্দ্রচূড় চট্টোপাধ্যায় !

হাসিমুখে মঞ্জুশ্রী আমাকে নমস্কার করে বললে,—চন্দ্রচূড়, ভা-রি সুন্দর নাম তো !

আমি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম, ভুলে গেলাম প্রতি-নমস্কারের কথা। আমার এ বিমূঢ় ভাব দেখে দু'জনে হো-হো করে হেসে উঠলো। লজ্জায় আমি লাল হয়ে উঠলাম।

মঞ্জুশ্রী সত্যি সুন্দর, আমি ভাবতে পারি নে এতো রূপ দিয়ে বিধাতা কারুকে সৃষ্টি করতে পারেন। মনে হল, চারি দিকের আব-হাওয়ার মাঝে যেন সে মিশে আছে, এ হল দেহ ঘিরে অশরীরী রূপের আত্মপ্রকাশ ! সে যে কী সৌন্দর্য ভাষা দিয়ে তা বোঝাতে পারবো না। যেদিন তোমাদের মানসী বাস্তবে রূপ পেয়ে জেগে উঠবে সেদিনই শুধু বুঝতে পারবে এ কেমন !

মঞ্জুশ্রী বললো,—আপনারা বুঝি একসঙ্গে পড়েন ? তা এতো দিন আসেননি কেন ? যতীনটা একঘেয়ে হয়ে উঠেছে, এবার থেকে রোজ আসবেন—আলাপ করে বাঁচা যাবে। জানেনই তো, শিল্পীদের চেয়ে কবিদের প্রতি মেয়েদের পক্ষপাতিত্ব !—বলে অপাঙ্গে সে যতীনের দিকে চেয়ে দেখলো।

আমার মনে হল, ওদের এ আলাপ আর জীবনধারার সঙ্গে আমি একেবারেই অপরিচিত। তাদের বুঝতে চেষ্টা করলাম, বললাম, —আসবো, কিন্তু আপনাদের ঠিক আমি বুঝতে পারছি না যেন !

হেসে বললে মঞ্জুশ্রী,—ঠিক বুঝতে পারবেন। আমরা এ রকমই আলাপ করি। আলাপ করবার লোক পাবো কোথায় ? কেউ আমাদের এখানে আসেও না, আমরাও চাই নে যে-সে আসুক ! এবার আপনাকে পাওয়া গেছে, বোধ হচ্ছে কথা বলে বাঁচবো।

মনে হল তার কথাটাতে খোঁচা রয়েছে। বললাম,—আন্দাজ ঠিকই করেছেন, বলবার কথায় অভাব হবে না। বাঁচাতে পারবো কি না জানি নে, কিন্তু বাঁচবার চেষ্টা যে আগেই করতে হবে সেটুকু বুঝতে পারছি।

হো-হো করে যতীন হেসে উঠলো, বললো,—আরম্ভটা মন্দ হয়নি, এবার তোমরা থামো। চন্দ্রচূড়, ভাই, চেয়ে চলো, তোমার অপমৃত্যু দেখতে পাচ্ছি।

আমি তার কথাগুলো ঠিক বুঝবার আগেই চোখ পাকিয়ে মঞ্জুশ্রী বললো,—আমরা থামবো না, তোমার কি ? হিংসে হচ্ছে বুঝি ?

যতীন উত্তর দিল,—জেলাসি,—সাদা বাংলায় ঈর্ষা, হিংসে নয় হচ্ছে দুঃখ !

মঞ্জুশ্রী ধমক দিল—বাজে বকুনি থামাও ! আমার দিকে ফিরে বললো,—যতীন বলে সে নাকি আমার চেয়ে একদিনের বড়, সে আমি মানি নে। কাজেই তার বন্ধুকে আমি আপনি বলতে পারব না।

আমি বললাম,—তাই ভাল।

—তুমি ডাকবে আমাকে মঞ্জু বলে, আর আমি—মঞ্জুশ্রী দাঁতে ঠোঁট কেটে ভাবনার ভাণ করতে লাগলো আর অপাঙ্গে চেয়ে দেখতে লাগলো যতীনের মুখ। যতীন নির্বিকার বসে আছে।

আমি বললাম,—তুমি ডাকবে আমাকে কবি বলে—

—তাহলে বেশ হয় !—মন্তব্য করলো মঞ্জুশ্রী,—কিন্তু চন্দ্রচূড়, সেই বা মন্দ কি !

—বেচারি ওমর খৈয়াম, তোমার এ দশা হবে জানলে কে নিয়ে আসতো এই ভণ্ড ইডিয়টটাকে !—যতীনের কথায় খেদ আর ঝাঁজ !

সহজ হেসে মঞ্জুশ্রী বললো,—নিয়ে এসো তোমার ওমর খৈয়াম। মদের জন্য দুঃখ করো না, একাই দুটো পুষিয়ে দেবো।

—তাহলে তোমরা ওমর খৈয়ামকে ভাবতে চেষ্টা করো।—বললে যতীন। নিয়ে এলো চামড়ার বাঁধানো সোনালী ছাপা ওমর খৈয়ামের বিখ্যাত ইংরেজি অনুবাদ। পড়তে লাগলো যতীন, আমি আর মঞ্জুশ্রী অবাক হয়ে শুনতে লাগলাম :

Here with a loaf of bread beneath the bough,
A flask of wine, a book of verse—and thou
Beside me singing in the wilderness
And wilderness is paradise enow.

যতীন থামলো, আমার দিকে চেয়ে ব্যগ্র কণ্ঠে বললো—ভাই চন্দ্রচূড়, এখানটা রোবাইয়াতের ছন্দ ঠিক রেখে বাংলায় অনুবাদ করে দিতে পারিস, ?

বললাম,—কেন পারবো না—খুব পারি !

একখানা খাতা এগিয়ে দিল যতীন, কলম বের করে খাতার মাঝখানে একটা পাতায় আমি লিখে যেতে লাগলাম :

হেথায় সবুজ শাখার নীচে একটি রুটি নিয়ে,
সরাব বোতল, কাব্যগ্রন্থ—এবং তুমি প্রিয়ে
নির্জনে এই আমার পাশে তোমার গানের ধারা—
স্বর্গ হয়ে উঠলো সখি মরুভূমির হিয়ে।

আমার লেখা শেষ হওয়া মাত্র খাতাখানা টেনে নিল মঞ্জুশ্রী, বড় বড় করে পড়ে গেল। যতীন বলে উঠলো—সাবাস !

মঞ্জুশ্রী বললো,—সুন্দর !

তাদের সে দৃষ্টির সামনে আমার মনে হল আমার কবিতা লেখা সার্থক হয়ে উঠেছে। আমি কবিতা লিখি না, কোন দিন লিখতাম কিনা আজ ভুলে গেছি, কিন্তু আজো আমার মনে হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে আমিও একজন।

ঐতিহ্যময় ভারত

মিনাক্ষী মন্দির—মাদুরা

মাদুরার সুবিখ্যাত বিরাট মন্দিরের গোপুরমের চিত্রটি দক্ষিণে দেখানো হইয়াছে। মন্দিরের একাংশ শিবের নামে নিবেদিত এবং অপরাংশ শিব-কামিনী মীনাক্ষী দেবীর নামে উৎসর্গীকৃত।

এইখানে স্থানীয় চায়ের দোকানে যাত্রীরা এক কাপ ক্লান্তিহর চা লইয়া ক্ষণিক বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন। কিন্তু সত্যিকার তাজা ও সুগন্ধি চা পাইতে হইলে আপনাকে কেবলমাত্র ব্রুক বণ্ড চা-ই কিনিতে হইবে।

Darjeeling Brooke Bond Tea Blend

Brooke Bond Tea

তাজা জিনিষই ব্যবহার করুন
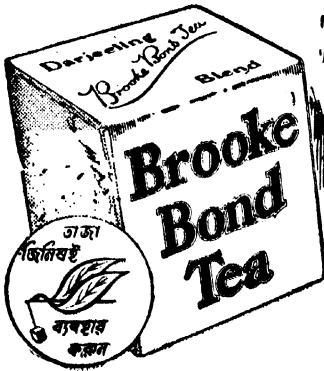
ব্রুক বণ্ড চা

চমৎকার দেশীয় প্যাকেটে সেরা ভারতীয় চা

আমি তাদের প্রশংসার উত্তরে বললাম,—সাবাস আর সুন্দর কোনটা, আমার লেখা না তোমার পড়া ঠিক বুঝতে পারছি নে!

তিন জনই এবার একসঙ্গে হেসে উঠলাম।

যতীন খাতাখানা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো, বললো,—চলো!

বারান্দা ঘুরে গিয়ে আমরা পাশের একখানা ঘরে ঢুকলাম। এক সদ্য-সমাপ্ত ছবির সামনে যতীন আমাদের নিয়ে দাঁড় করালো। কবিতার ভেতর যা প্রচ্ছন্ন রয়েছে, ছন্দ-সুর-ঝঙ্কারে যা আমি প্রকাশ করতে পারিনি, সেই অরূপকে রঙ-তুলির সাহায্যে রূপ দিয়েছে যতীন! যতীন শিল্পী জানতাম কিন্তু সে যে এতো বড় সে কথা জানতাম না। তিন জন ছবির দিকে চেয়ে রইলাম অবাক হয়ে। আমি বললাম,—অদ্ভুত!

সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুশ্রী বললো,—দাদার ক্যারিককেচার!

যতীন বললে,—দাদার কাছে তুলি ধরতে প্রথম শিখি, কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে তাকে আমি ছাড়িয়ে যাচ্ছি।

—ছাড়িয়ে যাচ্ছ না কচু!—অবজ্ঞার সহিত বললো মঞ্জুশ্রী।

—তুমি একদিন মরবে, আমি বলে রাখছি।—বললো যতীন।

মঞ্জুশ্রী বললো,—সবাই মরবে, আমিও বলে রাখলাম।

যতীনের দাদার আঁকা ছবিগুলো এক পাশে রয়েছে দেখলাম। সব ছবির নীচে রয়েছে 'অতীন'—নামই হবে। রঙের উপর রঙ ছড়ানো, সে যেন রঙের মায়াপুরী! উগ্র দুঃসাহসিক রেখাগুলো একটা দুরন্ত স্পর্ধা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দেখা মাত্র মনকে সজোরে ধাক্কা দেয়। তাতে রয়েছে একটা তীব্র উত্তেজনা আর প্রচণ্ড গতি—যা দর্শক মাত্রকে জাগ্রত সচেতন করে তোলে। দৃষ্টি পীড়িত হয়ে উঠে সত্য, কিন্তু মুহূর্তে মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে—উত্তেজনার আনন্দে অন্তর ভরে উঠে। যতীনের ছবিতে যে পেলব কমনীয়তা মনকে শান্তিতে ভরে তোলে সেখানে সে জিনিষটারই রয়েছে অভাব কিন্তু যে সবল স্পর্ধা অতীন-মার্কা ছবিগুলোতে রয়েছে তা মনকে এমন প্রবল নাড়া দেয় যে তাদের আর ভোলা যায় না।

সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম; মন তখন ভরে উঠেছে। যতীনদের ওখানে আর এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এখন বেরিয়ে পড়তে চাই, নিজেকে আমার এখন একবার একান্তে পাওয়া বড় বেশী দরকার।

বলতে রুখে দাঁড়ালো মঞ্জুশ্রী,—সে হবে না। তোমার সঙ্গে আমার কতো কথা ছিল সেগুলো না হয় কাল অবসর মতো হবে। মদও খেতে দিলাম না, কিছু না খেয়ে চলে যাবে, সে হবে না। তা ছাড়া কাকীমা'র সঙ্গে দেখা না করে গেলে তিনি অত্যন্ত দুঃখ পাবেন!

এর পর আর কিছু বলা চলে না। যতীনের মাকে দেখলাম, স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে, বছর খানেক আগে বড় ছেলে মারা যাবার পর থেকে কেমন এক রকম হয়ে গেছেন, সংসারের খবর আর বিশেষ রাখেন না। মঞ্জুশ্রী আর মা থাকেন দোতলায়, তিনতলায় থাকে যতীন আর একতলাটা ভাড়া খাটে। প্রণাম করতে গেলাম, বললেন,—না বাবা, থাক। তুমি আমার ছেলে যতীনের মতো কিন্তু তবুও তো ব্রাহ্মণ! হিন্দু-ঘরের খাঁটি বিধবা মা, কিন্তু কি করে মঞ্জুশ্রী আর যতীনকে তিনি একত্রে মানুষ করলেন পরে বহু ভেবেছি। আসলে মায়েদের কোন জাত নেই—এটাই সত্য।

যতীন এগিয়ে দিতে রাস্তা পর্যন্ত এলো।

মঞ্জুশ্রী ডেকে বললো,—কাল কলেজ-ফেরৎ এখানে খেয়ে যেয়ো।

যতীন বললো,—বড় আড়ম্বর করে নেমন্তন্ন করা হচ্ছে যে?

শুনলাম, মঞ্জুশ্রী বলছে,—ভয় নেই গো, তোমার পাতে ভাগ বসাতে দেবো না।

এক ঝলক বসন্তের হাওয়া বুকে পুরে সেদিন বাড়ী ফিরলাম।

পরদিন যতীন কলেজে এলো না, বিকেল বেলা আমি গেলাম তাদের ওখানে। গিয়ে দেখলাম মঞ্জুশ্রী আর যতীন আমার অপেক্ষায় বসে।

যতীন বললো,—নিশ্চয় আমার খোঁজে আসনি, এর আগের এমন নজির নেই।

বসতে বসতে বললাম,—নিমন্ত্রণটাই বা উপেক্ষা করি কি বলে? কারণ হয়তো দুটোই।

মঞ্জুশ্রী বললো,—তৃতীয় কোন কারণ নেই তো?

তার হাসিমুখের দিকে চেয়ে উত্তর দিলাম,—নাই বলে তোমাকে অসন্তুষ্ট করবো কেন? হয়তো সেটা ঠিকও হবে না, নিজের মনের খবর ক'জন জানে বলো?

মঞ্জুশ্রী মাথা নেড়ে বললো,—জানতে বেশী দেরি হবে না, যতীনের উপদেশটা মনে রেখো। বেচারা যতীন—যতীনের দিকে সে মুখ ফিরিয়ে চাইলো!

যতীন বললো,—থামলে কেন, বলে যাও। এখানে থামবার কথা তো নয়!—সে হাসছে।

আমি ঘেমে উঠেছি, বললাম,—যা গরম পড়েছে আজ!

মঞ্জুশ্রী বললে,—যেখানে মেয়েরা আছে সেখানে চিরবসন্ত!

যতীন শুধরে দিলে,—যেখানে তোমার মত মেয়ে আছে, সেখানে। মানে তোমার মতো যুবতী, সুন্দরী আর প্রগল্‌ভা!

মঞ্জুশ্রী হেসে বললো,—প্রশংসায় খাদ মেশানো। চন্দ্রচূড়, চুপ করে থেকো না, যে জিতবে বরমাল্য তার!

বেশ লাগছে এ আলাপ, কৌতুকে বললাম,—আমি যে জিতেই বসে আছি।

—তবু প্রশংসা করো। পুরুষের চোখ দিয়ে মেয়েরা নিজেদের দেখে। মনে হচ্ছে, তোমাদের চোখে নিজেকে দেখতে আমার ভালোই লাগবে।—মঞ্জুশ্রী বলে গেল অবহেলায়।

সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠেছি। বললাম,—ক্ষতি নেই, সেই সঙ্গে আমাদের দিকটাও একটু দেখবে বলো, তোমার স্তুতি গেয়ে নিজেকে ধন্য করি।

একসঙ্গে তিনজনেই হেসে উঠলাম।

খেয়ে-দেয়ে বেশ রাত করেই ফিরলাম সেদিন। মঞ্জুশ্রী আর যতীন আমাকে দুঃসাহসী করে তুলছে।

তার পর কিছু দিন ধরে দিনগুলো যেন এক স্বপ্নের ভেতর দিয়ে কাটতে লাগলো। আমি মঞ্জুশ্রীকে ভালোবাসলাম। সে দিনগুলোর কোন বাস্তব রূপ নেই কিন্তু সেগুলোকে অবাস্তব মিথ্যাই বা বলি কি করে? আমার এ ভালোবাসায় কি জানি কেন প্রথম থেকেই একটা ভয় মিশে ছিল। এক এক সময় দু'-চার দিন আমি যেতাম না, তখন ওরা আসতো আমার খোঁজে। আমরা ঐ পেছনের বাড়ীটাতে, মানে এই বাড়ীটাতেই থাকতাম। এ বাড়ী নিজেদের থাকবার জন্য

আরম্ভ হয়েছিল, পরে মত বদলে ভাড়া দেওয়ার জন্য তৈরি হয়। আমাদের ছিল কলকাতার বড় আর ধনী পরিবার। প্রথম দিন এসেই মঞ্জুশ্রী সকলের সঙ্গে পরিচয় করে নিলে। আমার মা তখন বেঁচে ছিলেন, তাঁকে বললো,—চন্দ্রচূড় যতীনের সঙ্গে পড়ে, মা তো তাকে ছেলের চেয়ে বেশী ভালোবাসেন। এ ক'দিন না দেখতে পেয়ে ভেবেছেন ছেলের নিশ্চয় কঠিন অসুখ করেছে আর ছেলে তো এদিকে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।—এমন ভাবে সে কথাগুলো বললো যে, মা পর্যন্ত না হেসে পারলেন না। এমনি অবলীলায় সকলের সঙ্গে আলাপ করে গেল, সে কে আর কি, এ প্রশ্ন কারুর মনেই উঠলো না।

আমাকে বললো,—উপকথার রাজকন্যা ঘুমিয়েছিল, রাজপুত্র তার প্রেমের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাকে জাগিয়ে তুললো, রাজকন্যা চোখ মেলে চেয়ে দেখে রাজপুত্র চলে গেছে,—এ কেমন ?

বললাম,—হঠাৎ এ কথা কেন ?

—তোমার মনের কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।—উত্তর দিলে মঞ্জুশ্রী।

—এ কখনো আমার মনের কথা হতে পারে না।—আমি বললাম।

মঞ্জুশ্রী হেসে বললো,—চলো।

একটা কথা এখানে বলে রাখি, মঞ্জুশ্রীর উচ্ছল কথাবার্তায় রয়েছে একটা তরল পরিহাস, কিন্তু নিছক পরিহাস বলে সেটাকে ফেলে দেওয়া যায় না। মনে হয়, তার ভেতর গভীর আরেকটা কিছু যেন প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

আমার দিনগুলো কেটে চললো একটানা এক উত্তেজনার ভেতর দিয়ে। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন যতীনের মা মারা গেলেন। একটু বিপর্যয়, তার পর আবার সব ঠিক হয়ে এলো। দিন কেটে চললো আগের মতোই। যতীন কলেজ ছেড়ে দিলে, আমি কলেজে যাই—নিজের অস্থির সত্তাটাকে চার দিক থেকে বেঁধে রাখি।

মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে রোজই দেখা হয়। যতীনের বড় একটা দেখা পাই নে আজ-কাল। সে যেন এক কঠোর তপস্যায় রত, একটা অসমাপ্ত ছবির সামনে বসে কাটিয়ে দিচ্ছে দিনের পর দিন। সেখান থেকে তাকে টেনে বাইরে নিয়ে আসি। যতীন কথাবার্তায় বড় একটা যোগ দেয় না, মাঝে মাঝে তার মুখে ফুটে ওঠে একটা কঠিন হাসি। তীক্ষ্ণ চোখে মঞ্জুশ্রী তা চেয়ে দেখে, তার পর আমার সঙ্গে আলাপ চালিয়ে যায় অবহেলায়।

সাধারণতঃ আমি যাই বিকেলের দিকে, সেদিন গেলাম সকাল বেলা। দোতলার বারান্দায় পাশাপাশি চেয়ারে বসে মঞ্জুশ্রী আর পাগড়ী-পরা ফর্সা চেহারার এক ভদ্রলোক। এমন গায়ের রঙ আর সুন্দর চেহারা কোন পুরুষের আমি এর আগে দেখিনি। বেশ-ভূষায় এমন আতিশয্য যে, নবাবী আমলের কোন নবাবজাদাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি মনে হল। তিনতলায় উঠবার সিঁড়ির গোড়ায় আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। দু'জন উর্দুতে আলাপ করছে, সে আমি বুঝি নে কিন্তু তাদের হাসি আর হাব-ভাব বুঝতে মোটেই কষ্ট হল না। বুকের ভিতরটা টন-টন করে উঠলো, আমি সেখানে আর না থেমে দ্রুত তিনতলায় যতীনের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়লাম। আমি যাকে ভালোবাসি সে যদি আরেক জনের সঙ্গে হেসে-হেসে কথা কয় তাহলে বুকে কোথায় কেমন বাজে যাদের জানা নেই, তাদের তা বোঝাতে পারবো না—বোঝাতে পারবো না সে কতো বড় আঘাত, কি রাক্ষুসে রূপ তার !

বেদনামুখর সে আঘাতের আকস্মিকতা সামলাতে বসে পড়ে দু'হাতে জোরে বুকটা চেপে ধরলাম। মনে হল, এই মুহূর্তে আমি নিষ্ঠুর হয়ে উঠছি—টুঁটি টিপে বিশ্ব-সংসারটাকে আমি হত্যা করতে পারি যেন !

কিছুক্ষণ পরে মঞ্জুশ্রী এসে সে ঘরে ঢুকে আমার সামনাসামনি বসলো।

মুহূর্তে মনস্থির করে ফেললাম। বললাম,—আকাশ থেকে এক কালো দৈত্য নেমে এসে রাজকন্যাকে নিয়ে যাচ্ছে, রাজপুত্র তা হতে দেবে না—ছিনিয়ে নিয়ে আসবে তার রাজকন্যাকে। রাজকন্যাকে তার পাওয়া চাই-ই, না হলে তার চলবে না।

মঞ্জুশ্রী আজ আর লঘু পরিহাসের দিকে গেল না। মুখখানাকে যতো দূর সম্ভব গম্ভীর করে সে বললো,—আমি জানতাম, এ প্রস্তাব তুমি একদিন করবে।

আমার আর সহ্য হল না, বললাম,—আর কি কি জানতে বলে ফেল।

দেখতে দেখতে মঞ্জুশ্রী কঠিন হয়ে উঠলো,—সারা দেহ যেন পাথরে গড়া, মুখে লেশমাত্র রক্ত নেই। বললো সে,—দেখো চন্দ্রচূড়, বাবার ছিল ফলের ব্যবসা, মা ছিলেন মুলতানী ফলওয়ালী।

বাবা তাকে বিয়ে করেন। আমি সেই ফলওয়ালীর মেয়ে। বাবার ছিল দুঃসাহস আর মা'র ভেতরে ছিল আগুন, আমার ভেতর উত্তরাধিকারসূত্রে দুটোই পুরোপুরি বিদ্যমান। তোমরা আমাতে বিদ্যুতের ঝলকই শুধু দেখতে পেয়েছো, দেখতে পাওনি তার দাহ যা তোমাদের পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। আমি জানি, আমাকে নিয়ে তোমরা কেউ সুখী হতে পারবে না—আমাকে নিয়ে বাঁচবে না—কোথায় তলিয়ে যাবে ভাবতে আমি নিজেই ভয় পাই। তোমাদের ভস্মস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে যদি নিজেকে সার্থক ভাবতে পারতাম, তা'হলে এ কথা বলতাম না জেনে রাখো, সেটা হবার নয় বলেই অনর্থক তোমাদের আমি মরতে দেবো না। তোমরা আমাকে ভালোবাস আর আমি তোমাদের ছোট ভাইএর মতো ভালোবাসি বলেই তোমাদের আমি বাঁচিয়ে রাখবো।

একটু থেমে আমার মুখে তার জলজ্বলে চোখের দৃষ্টি ঢেলে মঞ্জুশ্রী বললো,—চন্দ্রচূড়, আমার দিব্যি রইল, যতো দিন আমি এখানে থাকবো তুমি আর এখানে এসো না।

আমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না, রক্তে এক তীব্র জ্বালা অনুভব করছি! আমার কণ্ঠে শাণিত বিদ্রূপ ঝলকে উঠলো—তাতে তোমার কিছু সুবিধে হবে?

মঞ্জুশ্রী উঠে দাঁড়ালো, আমার দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনা মিশিয়ে বললো,—ছিঃ, ছোট হয়ো না। বাঁচতে পারবে কিনা জানি নে, অন্ততঃ বাঁচবার চেষ্টা করতে পারবে।—মঞ্জুশ্রী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘরের ভিতর থেকে আমি ডেকে বললাম,—তুমি আজ আমার যে ক্ষতি করলে, মানুষে মানুষের এমন ক্ষতি করে না মঞ্জুশ্রী!

মঞ্জুশ্রী এ কথার কোন জবাব দিল না। একটা রুদ্ধ আক্রোশ চেপে আমি সে-বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম, মঞ্জুশ্রীর আর কোন সাড়া পেলাম না।

এর পর আমার দিনগুলো একটা শূন্য হাহাকারের ভিতর দিয়ে কেটে চললো কিংবা কি ভাবে কাটতে লাগলো সে আমিই জানি না। এর ভেতর আশ্চর্য সংযমের সহিত নিজের মাথা ঠিক রাখলাম, আজো ভেবে পাই নে সেটা কি করে সম্ভব হল।

মাস দুই পরে যতীনের কাছ থেকে জরুরী তাগিদ এলো, আবার গেলাম সেখানে। দোতলায় উঠেই কি জানি কেন মনে হল, এ একটা ভূতুড়ে বাড়ী। যতীনের ঘরে গিয়ে দেখলাম, যতীন আমার অপেক্ষা করছে।

যতীন বললো,—চন্দ্রচূড়, কাল আমি বিলেত যাচ্ছি, সব ঠিক। দোতলা ভাড়া দিয়েছি, তিনতলা বন্ধ থাকবে। ঝি-চাকরদের ছাড়িয়ে দিয়েছি, কেবল বুড়ো অর্জুন এখানে থেকে সব দেখাশোনা আর আদায়পত্র করবে। তুমি মাঝে মাঝে খবর নিয়ো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—মঞ্জুশ্রী?

—কোথাকার এক নবাবজাদাকে নিয়ে চলে গেছে জাপান, বলেছে সেখানে গিয়ে তাকে বিয়ে করবে। জানি, বিয়ে সে ওকে করবে না, ওর কপালে দুর্দশা আছে দেখতে পাচ্ছি, তবু আশীর্বাদ করি মঞ্জুশ্রী যেন ওকে বিয়ে করে।

কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারলাম না, জিজ্ঞাসা করলাম,—এমন হঠাৎ চলে যাচ্ছ যে?

যতীন উত্তর দিলে,—সে কি ভেবেছিল জানি নে, নির্বিকার ভাবে সেদিন তাকে বিদেয় দিয়েছি। তার পর থেকে এ-বাড়ীটা যেন আমার দমবন্ধ করে আনছে। সত্যি কথাটা কি জানো? ও দাদাকে ভালোবেসেছিল। জানি আরেক দিন তাকে এখানে ফিরে আসতে হবে—সে এখানে ফিরে আসবে। সেদিন যেন আমাকে সে এখানে দেখতে না পায়!

একটু থেমে যতীন আবার বলতে লাগলো,—অনেক ভেবেছি, কেন সে এ করলো? আমাকে সে ভয় করেছে, বিশ্বাস করতে পারেনি—মা মারা যাবার পর থেকেই এ আমি লক্ষ্য করেছি। আমাকে সে এতো ছোট ভাবতে পারলো এই দুঃখ!—যতীনের এ কথাগুলোর ভেতর তার বুকের রুদ্ধ অভিমান দেখতে পেলাম, আমার চোখে অনেক কিছু এবার স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

এর পর তিন বছর চলে গেছে, শোভাবাজারের 'পুরান বাড়ী'তে তখন থাকি। এক শীতের সকাল বেলা রোদে পিঠ দিয়ে বারান্দায় বসে বই পড়ছি, বাড়ীর সামনে এসে একখানা ট্যাক্সি থামলো আর সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলো মঞ্জুশ্রী। গাড়ী সে নিজে চালিয়ে এসেছে, মঞ্জুশ্রী আজো ঠিক আগের মতোই আছে।

আমার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলো,—চিনতে পারো?

বললাম,—মনে হচ্ছে চিনতাম কিন্তু আজ চিনি নে।

অন্যমনস্ক ভাবে মঞ্জুশ্রী বললো,—চিনতে পারলে ভালো হত। যাক গে, যতীন কোথায়?

উত্তর দিলাম,—তুমি চলে যাওয়ার পরই সেও চলে গেছে বিলাত, এর বেশী জানি নে।

—বিলাত? যেতে দিলে কেন? আমি জানতাম এমনি কিছু ঘটবে!

মনে মনে বললাম,—তুমি নবাবজাদাকে নিয়ে স্ফূর্তি করে বেড়াও আর আমি তোমার ঘর-সংসার আগলাই, আবদার মন্দ নয়!—মুখে কিছুই বললাম না, চুপ করে রইলাম।

মঞ্জুশ্রী বললো,—তোমরা সবাই আমাকে ভুল বুঝেছো, যতীনও আমাকে ভুল বুঝলে শেষটায়! তাকে আমি খুঁজে বের করবো, যেখানেই থাক ধরে আনবো। ব্যাঙ্কে চললাম। বিদায়!—মঞ্জুশ্রী আর মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা না করে ফিরে চললো, তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও নেমে এলাম।

গাড়ীতে উঠতে যাবে, জিজ্ঞাসা করলাম,—নবাবজাদাকে কি করলে?

গাড়ীর ভেতর থেকে মঞ্জুশ্রী বললে,—ডুবে মরেছে! মহাসাগরের অতল জলে তলিয়ে গেল, আর উঠতে পারলো না।—একটা বিশ্রী শব্দ করে ট্যাক্সি ছুটে চললো।

মঞ্জুশ্রী হয়তো যতীনকে খুঁজে পেয়েছে, হয়তো আজো খুঁজছে!—এর পর আর জানি নে।

ভোলাদা'র নাক ডাকতে শুরু করলো। আমরা পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে দেখলাম।
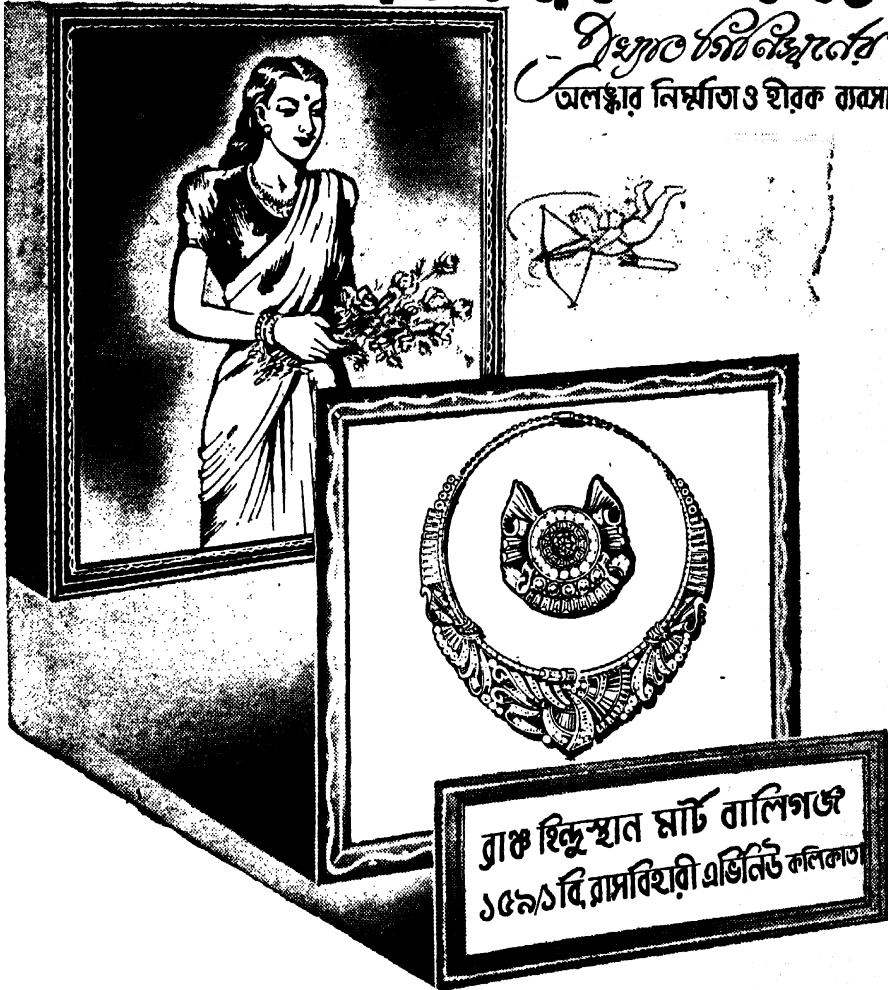
চিঠি

ছবি বসু

খাকী-পোষাকের পিওনকে দেখেই ভীষণ চাঞ্চল্য প'ড়ে গেল বাড়ীময়। মুসলমানদের কি একটা পরব উপলক্ষে আপিস-স্কুলের ছুটি। তাই পুরুষরা আজ বাড়ীতে বসে। মেয়েদেরও রান্নাবান্নার তাড়া নেই। চিঠিটা কার এল, কেউ কেউ প্রশ্ন করে।

—ও মা বীণা, তুই ভেবেছিস বুঝি তোরই বরের চিঠি? মা গো, কি বেহায়াই হয়ে উঠেছিস রে? মুখুজ্জেদের বড়বৌ ননদকে টিপ্পনি কাটে। বীণা এসেছে বাপের বাড়ী মাস তিনেক, বরের চিঠি না পেলে সত্যি সে কাতর হয়ে ওঠে, কিন্তু চিঠি এল শৈল হাজরার নামে—একটি নয়, আধটি নয়, তিন-তিনটি চিঠি। একই বাড়ীতে দশ ঘর ভাড়াটে, যার যার তার তার। কি দরকার বাপু অন্যের চিঠি হাতে নেওয়া? তার চেয়ে গভর্ণমেণ্টের নুণ খাচ্ছে যে লোক সে একটু খুঁজে দেখুক না বাছা, ক্ষতি কি? সদরের কাছে শ্রীনাথ মণ্ডলকে দেখে পিওন আবার জিজ্ঞেস করে—শৈল হাজরার ঘর কোন্‌টি দাদু?

—কে শৈল হাজরা, মেয়ে না পুরুষ? নিজের গুষ্টীর নাম মনে থাকে না ত কোথাকার কোন হাজরা? রামচন্দ্র!

—খেয়ে-দেয়ে আর কাজ পাওনি বাছা, জিজ্ঞেস করছ ঐ আফিঙখোর বুড়োকে? বলি হাজরা আছে ক'ঘর এ বাড়ীতে? আর প্রশান্ত হাজরার পরিবার শৈলীদিকে চেন না? শ্রীনাথ মণ্ডলের বিধবা বোন চারুশশী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। চিঠি তিনটে সে নিজেই নিয়ে পৌঁছিয়ে দিতে পারত, কিন্তু তা করে না। পিওনের চামড়ার ব্যাগের দিকে কেমন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চায়, তার পর গলার পর্দা আর পাঁচ ঘরের নাগালের উপযোগী করে বলে—তা বাছা, এত চিঠিই বা কেন শৈলীদির নামে? লেকাপড়াও করে না, আপিসেও যায় না। সোয়ামি অলজ্যান্ত রয়েছে, গেরস্থ ঘরের বউ-ঝির আবার এ সব কি? ছোকরা গোছের পিওনটি থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

শ্রীনাথ মণ্ডলের তের বছরের ছেলে সুর করে পাণিপথের যুদ্ধ পড়ছিল, তবে কান ছিল তার ইদিকে। পিওনটিকে সেই উদ্ধার করে। বই ছেড়ে লাফিয়ে বারান্দায় এসে বেশ মাতব্বরি সুরে বলে—কোথায় যাবেন স্যার, হাজরাদের বাড়ী? এই দরজার পাশ দিয়ে ডান দিকে হেলবেন। প্রথম দরজাটা জি, তার পর এইচ, উটি হাজরাদের।

সাবেক কালে এ বাড়ীটা ছিল মস্ত—এখন পাঁচিল উঠে ঘরগুলি হয়ে গেছে পায়রার খোপের মত; আলাদা আলাদা নম্বরে চৌখুপি ঘরে আলাদা আলাদা পরিবার। মেয়েদের মধ্যে ভেতরের দরজা দিয়ে এ-ঘর ও-ঘর যাওয়া-আসা হয়। যাদের সঙ্গে বনিবনা নেই তাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

গোপাল মিত্তিরের বৌ গৌরী এতক্ষণ শুনছিল ব্যাপারটা, এমন কি চারুশশীর মন্তব্য অবধি। পড়ি-মরি করে সেই প্রথম এসে সবিস্তারে খবরটা দিল শৈলকে।

—কি বল্লে চারু দিদি? মুখ টিপে হাসে শৈল। হাসলে ওকে বড় ছেলেমানুষ দেখায়, কিন্তু সংসারে খিঁচিয়ে-খিঁচিয়ে শৈলর মুখের টেপা হাসি চোখে পড়া প্রায় দুর্লভ হয়ে উঠেছে। গড়নটা ওর ছ্যাৎলাপানা, তাই একটু বেশী ঢ্যাঙা দেখায়। চুল উঠে গিয়ে কপাল চওড়া হয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টি নিস্তেজ, অবসন্ন কিন্তু চিঠির ব্যাপারটা শুনে ভারী মজা লাগে শৈলর।

—হাসালে বাপু, ভারী ত তিনটে চিঠি, তাতেই এই? কেন আমাদের কি আর নিজের লোক নেই? আত্মীয়-স্বজন রইলেই পাঁচ জনে খোঁজ-খবর নেয়। এতে চারু দিদির অত চোখটাটানি কেন?

—জামাই বাবুকে বুঝি কেউ লেখে না? আচমকা বলে বসে গৌরী। অবশ্য ওটা তার নেহাৎই কথার কথা, চারুশশীর মত শ্লেষ ছিল না তাতে। তার পর চোখ জোড়া রহস্যঘন করে ফিসফিসিয়ে বলে—অত দিস্তে দিস্তে চিঠি কেন দিদি, জামাই বাবুকে মনে ধরছে না বুঝি?

—আ মর মুখপুড়ি, তোর মত আমার রূপ-যৌবন না কি?

একটা ঠেলা দেয় শৈল গৌরীকে। গৌরীর ছেলেপুলে নেই, বিয়ে হয়েছে বছর তিনেক। ফর্সা রঙ, গোলগাল আতুরি আবদারে চেহারা, অভিমানের একটি সচল পিণ্ড, আবার কারণে-অকারণে হেসে গড়িয়ে পড়তে জানে। যে-কোন ব্যাপারে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে পরক্ষণে দু'চোখ তার ছলছলিয়ে ওঠে।

—যান ভাই চিঠি পড়তে, আমি আর আটকে রাখব না আপনাকে। কত আপন-জন আছে আপনার। আছে বলেই তারা তবু চিঠি-পত্তর দিয়ে খোঁজ-খবর নেয় আর আমার যা কপাল তিন কুলেই ঢুঁ-ঢুঁ। কি বাপের কুলে কি শ্বশুর-কুলে মুখ দেখবারও কেউ নেই। কথায় বলে না—

"একলা ঘরে একলা রাণী খেতে বড় সুখ
মারতে গেলে ধরতে নেই এই ত বড় দুখ"

ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ে গৌরী। এতক্ষণে চিঠির খবরটা তারস্বরে ঘোষণা করতে করতে ছুটে আসে শৈলর ছোট মেয়ে।

—মা গো মা, তোমার নামে দু'শ'-পাঁচশ' চিঠি এয়েছে। বাবা পড়ছে, দাদা পড়ছে। দিদি দুষ্টু মেয়ে পড়ার বই পড়ছে না, চিঠি পড়ছে। ছোট খুকু লক্ষ্মী মেয়ে, মায়ের চিঠি পড়ে না।

মায়েরা পরস্পরের মুখ চেয়ে হেসে ফেলে।

হাসির রেখা তখনও ঠোঁটের প্রান্তে লেগে রয়েছে, ঘরে ঢুকে মুখটা হাঁড়িপানা করে শৈল। সুর করে মায়ের চিঠি পড়বার ধুম পড়েছে ছেলেমেয়েদের। তাদের বাপের হাতেও বুঝি একটি চিঠি। কিছুক্ষণ থমকে থেকে এক জনকে শুনিয়ে শুনিয়ে অনুযোগ করে—ছেলে-মেয়ে-বাপে মিলে দেখি হাট বসিয়েছে। ধন্যি মানুষ যা হোক, যার চিঠি সেই বাদ পড়েছে শুধু।

—নাও নাও বিলক্ষণ, তোমারই ত পাওনা। আপন-জনেরা ঘটা করে নেমন্তন্ন করেছে। চিঠিটা প্রায় স্ত্রীর মুখের ওপর ছুঁড়ে দেয় প্রশান্ত।

—দিদির বিয়ে মা গো! বড় খুকু বলে।

—তোমার বোনের সাধ। প্রশান্ত বলে।

—ছোট পিসীর খোকার মুখে ভাত। খোকন বলে।

—ও মা গো, কত নেমন্তন্ন খাব!

ছোট খুকু সব শেষে বলে, তার পর ন্যাকড়ার পুতুলটা বগলে চেপে সারা ঘরময় নাচতে থাকে। চিঠিটা আলগোছে ধরে অপরাধীর মত স্বামীর মুখের দিকে চায় শৈল। তার পর শঙ্কিত গলায় বলে—কি হবে গো, কোনটাই ত ফ্যালনার সম্বন্ধ নয়।

কিন্তু যাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলা সে তখন নির্বিকার ভাবে ঘন ঘন চশমার কাচটি মুছতে ব্যস্ত, যেন সারা পৃথিবীতে ওর এর চেয়ে জরুরী কোন কাজ নেই।

—আমি কিন্তু বিচ্ছিরি জামা পরে বিয়েবাড়ী যাব না মা! বড় খুকী বাপ-মাকে শুনিয়ে কাঁদ-কাঁদ গলায় বলে।

—আর খালি পায়ে বেড়াই বলে সবাই আমাকে ঠাট্টা করে।

খোকন বলে। আন্দাজে ছোট খুকীও বোঝে ব্যাপারটা। নাচ থামিয়ে সে-ও চেঁচাতে থাকে—আমারও লাল জামা, জুতো চাই বাবা!

চশমাটা গুছিয়ে তুলে সার্ট গায়ে দিয়ে বেরুবার জন্য তৈরী হয় প্রশান্ত।

—এত বেলা কোথায় বেরুচ্ছ?

স্ত্রীর উৎকণ্ঠিত প্রশ্নে শান্ত ভাবেই জবাব দেয় প্রশান্ত—দেখি আর নতুন কি চিঠি-পত্তর এল।

রাগে-অপমানে ফেটে পড়ে শৈল—ঠাট্টা করছ, বাইরের লোকের সঙ্গে প্রেমপত্র লেখালেখি করি নাকি? নিজে ত আত্মীয়-স্বজনের ত্রিসীমানায় যাবে না। আমি ন' মাসে ছ'মাসে খোঁজ-খবর নিই বলে এত অপমান?

—খোঁজ-খবর নেবে বই কি, নইলে এত নেমন্তন্ন খাবে কোত্থেকে?

—হ্যাঁ, আমি ত রাক্ষস! ছেলেমেয়েরা অবুঝ, একটু হৈ-হৈ করছে তা প্রাণে সহ্য হচ্ছে না। বাপ ত ভাতের ওপর তরকারী যোগাতেই হিমসিম খেয়ে যায়। একটু ভাল-মন্দ খাবার নামে আনন্দ করবে বই কি।

বলতে বলতে থামে শৈল। যাকে উদ্দেশ করে বলা হঠাৎ চোখ পড়ে তার মুখের প্রতি। সারা মুখে এক ফোঁটা রক্তের চিহ্নও বুঝি নেই। শুধু একটু হেসে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে প্রশান্ত।

প্রথম চিঠিটা লিখেছেন শৈলর বড় জা হেমাঙ্গিনী। কোন ভূমিকা না করেই দিয়েছেন মেয়ের বিয়ের খবর। দিন ত আর সাত দিন বই নেই, এখন শৈল এসে ভার না নিলে কে নেবে? আর সেই সাথে মেয়ের আবদার কাকী বই কে তার পূরণ করবে? এই অজ পাড়াগাঁর সাড়ী পরে বিয়ে কোন মতেই হতে পারে না। ছোট কাকী কলকাতায় থাকে, ভাল ফ্যাশনের জামা-কাপড়ের খবর রাখে নিশ্চয়ই। বিয়ের সাড়ীটা তারই পছন্দ মত হবে। মেয়ের আবদার নিশ্চয়ই শৈল পূরণ করবে। সোনা-দানা যা পারে, সেই সাথে বিয়ের সাড়ীটা যেন বেশ দামী দেখে দেয়।

দ্বিতীয় চিঠিটা এসেছে খিদিরপুর থেকে। লিখেছে প্রশান্তর একটি মাত্র বোন প্রমীলা, তার ছেলের মুখে ভাতের নেমন্তন্ন জানিয়ে। মেয়ের পর এই প্রথম ছেলে প্রমীলার আর ভগবানের ইচ্ছায় তার স্বামীরও কারবারটা আজকাল মোটামুটি দাঁড়িয়ে উঠেছে। তাই অনেক অনুনয়-বিনয় ও হাজার হাজার মাথার দিব্যি জানিয়ে শৈলকে আসবার জন্য সাধ্য-সাধনা করে লিখেছে সে। প্রশান্তকে আসতেই হবে ভাগ্নের মুখে ভাত দেবার জন্য, সে কথা চিঠিতে পুনশ্চ করে লিখেছে প্রমীলা।

তৃতীয় চিঠিটা এসেছে বিডন ষ্ট্রীট থেকে। শৈলর ছোট বোন শর্মিষ্ঠার প্রথম সন্তান সম্ভাবনায় সাধ ভক্ষণ। আসছে কাল সেই উপলক্ষে তাদের সবার নেমন্তন্ন।

এতগুলো নেমন্তন্ন তাতে মোটা রকমের একটা খরচা আছে সত্যি কিন্তু এ জন্য ত আর শৈল দায়ী নয়? অথচ দেখ না, প্রশান্তর হাবে-ভাবে বোধ হয় যে শৈলই সাধ করে নেমন্তন্ন ডেকে এনেছে আর রোখটাও তাই যত তার প্রতি। নইলে খামকা কি আর শৈল তাকে অতগুলো কড়া কথা বলে? চিঠি-লেখার জন্য কতই না ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অথচ প্রশান্ত ভাল করেই জানে ঐ একটি মাত্র সখ শৈলর—চিঠি লিখতে ও ভারী ভালবাসে। একটা দোয়াত-কলম আর খান কয়েক বালি-কাগজ সযত্নে সে কুলুঙ্গির ওপর তুলে রেখেছে, ছেলেমেয়েরা কে কখন নিয়ে সব পাট চুকিয়ে দেবে! মেয়েদের চিঠি লেখার দরকার হলে তারা আসে শৈলর কাছে। চারুশশীর তাতে গায়ের জ্বালারও অন্ত নেই। শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—বিদ্যেধরী, ওঁর চিঠি নেকার মত আর কেউ নিকতে জানে না, কত গরব দেখ না!

কিন্তু সেও কালে-কস্মিনে। এ-বাড়ীতে মাঝে মাঝে এখন চিঠি আসে বীণার বরের আর তাই বীণার চিঠিটা তাকেই লিখে দিতে হয়।

বেলা গড়িয়ে আসে, ছেলেমেয়েদের খাইয়ে জানলার সামনে বার বার এসে দাঁড়ায় শৈল। গলির একটা বাঁকের মুখে ওদের ঘর ত'খানা। কে আসছে একটু আগে থেকে জানা যায় না, শুধু মানুষটা যখন দোরগোড়ায় কড়া নাড়বে তখনই টের পাবে। এত বেলায় মানুষটা শুধু শুধু না খেয়ে কোথায় বেরুল টাকার ধান্দায়? তাহলে প্রশান্ত বুঝেছে যে তিন-তিনটে নেমন্তন্ন খালি-হাতে রাখা চলে না। তবে নিশ্চয়ই ধারের বন্দোবস্ত করতে গেছে, ছুটীর দিন লোকেও বাড়ী আছে; কিন্তু খামকা কিছু না বলে অভুক্ত অবস্থায় বেরুন কেন বাপু? একটু ধীরে-সুস্থে কি আর বেরুন চলত না? নিজের মনে-মনেই বলে শৈল, তার পর গলিতে বেলাশেষের পড়ন্ত ছায়া দেখে ত'জনের ভাতে জল দিয়ে আসে।

শুধু শুধু একটা পুরোন টিনের তোরঙ্গ খুলে বসে শৈল। ইতিমধ্যে মেয়েরা আজ দল বেঁধে এ-বাড়ী আসতে সুরু করেছে। শৈলর স্তব্ধ মূর্তির দিকে চেয়ে গৌরী সগর্বে হেসে ওঠে।

তরল আলতা

বলতে বোঝায় সুপ্রসিদ্ধ পি, সি, দাসের "সুবাসিত তরল আলতা" অর্দ্ধ-শত বৎসর ধ'রে সুনাম অক্ষুন্ন রেখে সম-ভাবে চ'লে আসছে। মাত্র একবার ব্যবহারেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান হয় – কারন তারপর আর কোন আলতায় মেয়ে-দের মন ভরে না.......

আলতা-সিঁদুর-স্নো-ক্রীম সকল সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠানেই পাওয়া যায়।

—দেখুন দিকি পিসীমা, দিদির কাণ্ড! তিন-তিনটে নেমন্তন্ন পেয়ে দিদির আর তর সইছে না। এরই মধ্যে বাক্স গোছাতে লেগেছেন।

চারুশশী বলে—ভাগিস আমার সাথে গোষ্ঠ পিওনের দেখা হয়েছিল! শৈল হাজরার বাড়ীর হদিস না পেয়ে ত সে ফিরেই যাচ্ছিল!

এবার শৈলর ভাসুরঝির বিয়ে নিয়ে রকম রকম আলোচনা সুরু হয়, সেই প্রসঙ্গে ওঠে নিজেদের কথা। উৎসবের নেশা যেন সবাইকে পেয়ে বসেছে—বাব্বাঃ, তবু এক ঘরের চিঠিতে এল সুখবর, মা গো মা, কষ্টে কষ্টে ত আমরা মরেই আছি।

—দেখ দিকি বাছা, বাবুদের বৌয়েদের এমন কি কচি মুখগুলো অবধি শুকিয়ে আমসি, শুধু নাই-নাই খাই-খাই। ভাল খবর এলেই ভাল।

মুখুজ্যেদের বউ বলে—তা ভাই এমন খবর পেয়ে কি আর কেউ চুপিসাড়ে থাকতে পারে? ভাবলাম একটু আমোদ করে আসি, তা অমনি ছেলে দু'টো কাঁদতে সুরু করল কি ভাত খাবে।

—তা বাছা, রান্না করনি? আহা গো!

—করব না কেন পিসী? ছেলেগুলোর হাল এমনি। গভর্ণমেণ্ট চাল দিয়েছে কত যে হপ্তাভর ভাত গিলবে? রুটি গিলে চেঁচাবে হতভাগারা।

—আহা গো! বলে পিসী।

কিন্তু মুখুজ্যে-বউয়ের কথা চাপা পড়ে যায়। অত আর নাই-নাই ভাল লাগে না। আপাততঃ উৎসবের নেশা লেগেছে সারা বাড়ীটায়। এদের মধ্যে গৌরীরই উৎসাহ বেশী। উত্তেজনায় মেয়েটার ফর্সা মুখটি হয়ে উঠেছে আবিরের মত রাঙা।

—দিদির ভাগ্যি বটে! আপন-জন হলেও তিন-তিনটে নেমন্তন্ন একই সাথে, কত নতুন মানুষের মুখ দেখবে দিদি।

মনে মনে বেজায় বিরক্ত হয়ে শৈল বলে—বেশী বাড়াবাড়ি করিস নে গৌরী, অত সখ ত তুই ঘুরে আয় না, আমার যাবার ইচ্ছে নেই।

—ঢের হয়েছে আর ন্যাকামো কোর না।

এবারে দেওয়া-থোওয়ার প্রশ্ন ওঠে।

—বিয়ের সাড়ীটা কিন্তু আমি পছন্দ করব দিদি! গৌরী একনাগাড়ে আবদার করতে থাকে।—আমাকে ভাই বিয়ের সাড়ী আর কে দেবে? মামা ত লালপেড়ে সাড়ী আর শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে কাজ সারল। এবার কিন্তু সাড়ীটা আমি পছন্দ করে দেব, তোমার পায়ে পড়ি দিদি।

নতুন বিয়ে-হওয়া মেয়ে বীণা এখন মা-কাকীদের বয়সী মেয়েদের সাথে সমবয়সীর মত আলাপ করে। তিন-চার বছর আগে এই পাড়ার ছেলেদের সাথে বেণী দুলিয়ে ডাংগুলি খেলত মেয়েটা। সেও টুকটুক করে মন্তব্য করে—মেয়ের রঙ ত মাসীমা কাল, ঘোর রঙের সাড়ী বাপু বিশ্রী লাগবে।

—তুই আর পাকামো করিস না বীণা, বিয়ের সাড়ী একটু ঝকমকে না হলে মানাবে কেন?

সবাই সায় দেয় গৌরীর কথায় এবং সাথে সাথে মত দেয়—ঠিকই, পছন্দের ভার গৌরীর। সবাইকে ডিঙিয়ে সেই যা হোক বরের সাথে সহরের রাস্তা-বাট ঘুরেছে। দোকানপাট অন্ততঃ তবু তার জানা আছে।

শৈলর স্তব্ধতা উপেক্ষা করেই যে যার মত আলাপ জোড়ে। এ সব হলে তবু একটু প্রাণ বাঁচে গো; কিন্তু মরণ দেখ, এ-বাড়ীর তল্লাটেও কোথাও উৎসবের রেশ মাত্র নেই। থুবড়ো-থুবড়ো আইবুড়ো পুরুষগুলো প্যাঁচার মত মুখ করে বসে আছে। কারও কারবার ফেল, কেউ চাকরি ঘুচিয়েছে আর বয়স পেরিয়ে গেল যে কত মেয়ের। এই ধর না, পাশের দুই ঘরেই ত রয়েছে তবু বিয়ের নাম নেই।

পিসীমার আপশোষ সব চেয়ে বেশী।—উদিকে মরণ আছে ঘরে ঘরে। এই দেখ বাছা, টাইফয়েড জ্বরে দু'টো দুধের বাছা এ বছরে মরল আর আমার মত বুড়ী দুঃখু পাবার জন্য জলজ্যান্ত বেঁচে রইল! পিসীমার পিচুটি-পড়া চোখ দুটোয় জল টস-টস করে। চারুশশীর কিন্তু নেশা লেগেছে সব চেয়ে বেশী। আশেপাশে সবার দিকে চেয়ে চোখটা আধ-বোজা ভাবে সে আপন-মনেই বলে—আহা সে কি দিন ছিল আর বাপের মত বাপ ছিল গো আমার। গা ঝমঝমিয়ে গয়না দিল, সে ভারে আমি কি আর নড়তে পারি, তার ওপর সাড়ী দিল তিন তোরঙ্গ বোঝাই।

—সে সব ত তোমার বর কেড়েকুড়ে নিয়ে তোমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিল। সভার মধ্যে বেফাঁস বলে বসে গৌরী।

মুহূর্ত্তে চোখের নেশা কেটে গিয়ে তুবড়ির মত কথার পর কথা ফুটতে থাকে চারুশশীর, আর কথায় না পেরে কাঁদতে বসে গৌরী। সবাই একে একে রণে ভঙ্গ দেয় আর ক্রন্দনরতা গৌরীকে শান্ত করতে চেষ্টা করে শৈল—সাড়ীটা শুধু কেন, সব-কিছু কেনাকাটির ভারই গৌরীর ওপর। তার পর চিঠি তিনটে কুলুঙ্গির ওপর তুলে রাখে সে।

গ্রীষ্মের বেলা—দিনান্তের রেশ তখনও রাজপথের ঝাউ গাছের ফাঁকে ফাঁকে যাই-যাই করেও থমকে আছে, কিন্তু এই গলিতে উনুনের ধোঁয়ায় ধোঁয়ার আঁধার তখন জমাট বেঁধে উঠেছে। গোপাল মিস্ত্রিরের ঘরে গ্রামোফোন বাজছে আজ, হিন্দী বাংলা কত সব সিনেমার ভালবাসার গান। গৌরী বড় ভালবাসে সে সব শুনতে আর সিনেমা দেখতে। আশেপাশের পুরুষরা সব আজ সে ঘরে গান শুনছে, বিড়ি ফুঁকছে, কেউ বা তাল দিচ্ছে।

শৈলর কিন্তু কিছুই ভাল লাগে না, সব কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। অথচ ছেলেমেয়েগুলোর রকম-সকম দেখ, সারা দিন ওদের বাবা বাড়ী আসেনি কিন্তু কোন খেয়াল নেই। বড় খুকী অবধি ধিঙ্গিপনা করে গলিতে হুড়োহুড়ি করছে। টিনের বাক্সটার ডালা খুলে মেজেতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ে শৈল। শীত করছে, সাথে সাথে চোখটাও জ্বালা করছে। আশ্চর্য্য, মানুষটা নিজেও অভুক্ত রইল সেই সাথে দিন ভোর খাটছে যে বউ তাকেও উপোসী করে রাখল!

দরজার পাশে অনেকগুলো পায়ের ভারী আওয়াজ পাওয়া গেল যে—মনে হচ্ছে গ্রামোফোনটা আচমকা বন্ধ হোল। কে এল—কারা এল? শুয়ে-শুয়ে ঝিম মেরে শোনে শৈল আর ভাবে, কি বলছে সব একসাথে? গলিতে হুড়োহুড়ি কই শোনা যায় না ত? ও কি, তারই ছেলেমেয়েরা যেন কাঁদছে! ধরাধরি করে কারা সব ঘরে নিয়ে এল প্রশান্তকে; পায়ের আর মাথার ব্যাণ্ডেজ তখন রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে।

—চুপ চুপ, গোল কোর না সব ; ভয় পাবেন না বৌদি ; খুব বাঁচা বেঁচে গেছেন দাদা। ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়েছিলেন। ও চোট তেমন কিছু নয়, তবে খুব সামলেছেন। আর একটু হলে একেবারে চাকার নিচে পড়তেন।

—ডাক্তারও দেখেছেন। বলেছেন—শরীরটি বড়ই দুর্বল, তাই ভদ্রলোকের এমন ভাবে মাথা ঘুরে গেছল।—অপরিচিত ছোকরাটি আশ্বাস দেয়।

রাত হয়েছে, সারা ঘরটা নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। স্বামীর মাথার কাছে আধ-শোয়া ভাবে জেগে আছে শৈল—একেবারে অচেতনের মত পড়ে আছে প্রশান্ত, শুধু ওর হাতটি শৈলর মুঠোর মধ্যে বাঁধা।

পাশের ঘরে স্বামী, স্ত্রী এখনও আলোপ করছে। ওরা ঝগড়াঝাঁটি করে, কথাবার্তা বলে—লাগালাগি এই ঘরটি থেকে সব শুনতে পায় শৈল আর এ জন্য গৌরীকেও নাকাল কম হতে হয় না। কিন্তু আজ ওরা বলছে প্রশান্তর কথা। গৌরীটাও কাঁদছে সমানে—হায় গো হায়, একটু আমোদ-আহ্লাদ করবে, ঘুরবে-ফিরবে সাজ-পোষাক করবে, এ আর কারও বরাতে নেই, শুধু মুখ প্যাঁচা করে থাক, কাঁদ আর কাট।

পুরুষটি কি বলে শুনতে পায় না শৈল, কিন্তু গৌরীর প্রতি স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার তার অন্ত থাকে না।

তার পর আরও চাপা-গলায় ফিসফিসানি ; হঠাৎ গর্জে ওঠে অভিমানী মেয়েটা—কি নীচ লোক তুমি, একটা লোকের সর্বনাশ হল আর তুমি বলছ মানুষটা ইচ্ছে করেই ট্রামের নিচে পড়ছিল?

হাতের মুঠিটা মুহূর্তে খুলে যায়। স্প্রিংএর মত ছিটকে নেমে আসে শৈল, তার পর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রশান্তর মাথার কাছে। মনে হয়, গভীর প্রশান্তি নিয়ে ঘুমোচ্ছে প্রশান্ত। কি বললে, ইচ্ছে করে? তাকে জব্দ করতে, না নিরুপায় হয়ে?

ঘরে-বাইরে নিঃসীম অন্ধকার, তবু পা টিপে-টিপে কুলুঙ্গির কাছে এসে দোয়াতটা নামিয়ে নেয় শৈল। তার পর জানলার গরাদ ডিঙ্গিয়ে হাত বাড়িয়ে কালিটা ঢালতে থাকে। কি ঘর কি বাহির সবই আঁধারে আঁধার, তবু দোয়াতের ঘন কালি যে একেবারে নিংড়ে নিংড়ে শেষ হয়ে গেল তা বেশ অনুমান করতে পারে শৈল।

বিপর্য্যস্ত

শ্রীলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

যা দিনকাল পড়েছে? বিপর্য্যস্ত না হয়ে আজকালকার দিনে কোনও গৃহস্থ গৃহে টিকে থাকতে পারছে কি? এই দেখুন না, ভোরে উঠেই গৃহস্বামী নরেশ বাবুর চিরকালের অভ্যাস গঙ্গার ধারে একটু বেড়িয়ে এসে এক কাপ চা খেয়ে খবরের কাগুজে মন দেওয়া। কিন্তু ফিরে এসে দেখেন চা তো হয়নি, সবে নিচের কলতলায় বাসনের কাঁড়ি নিয়ে ঠিকে ঝি বসেছে। গৃহিণী সুধাময়ী উনুনের উপর কেটলিটা চড়িয়ে চায়ের কাপগুলো সাজিয়ে রাখছেন। নরেশ বাবুকে দেখেই সুধাময়ী বললেন, "এই যে, এর মধ্যেই বেড়ান হয়ে গেল? বেশী দূরে বুঝি আজ যাওনি? তা আসবার পথে অমনি বাজারটা তো করে আনতে পারতে?"

নরেশ বাবু মুখটা যত দূর সম্ভব ব্যাজার করে বললেন, "কেন? রামাটা যাবে না?"

"রামার জ্বর।"

"ছেলেরা?"

"ওরা কি কখন বাজার করেছে? বড়, তেতলার ছাতে মুগুর ভাঁজছে, মেজ লেকে সাঁতার কাটছে, আর ছোট রেডিওতে গান দেবে বলে সা, রে, গা, মা করে করে গলা সাধছে যে।"

কি আর করা যায়, নরেশ বাবু নিজের কোঁচাটা দিয়ে বারান্দার খানিকটা অংশ ঝেড়ে সেখানেই বসে পড়েন। দিনের মধ্যে বহু বারই তাঁকে এই ভাবে বসে পড়তে হয়। বললেন, "মেয়েরা গেল কোথায়? ওরা বুঝি সব বেড়াতে গেছে?"

"না গো, সেই কালকে ওদের "চ্যারিটী শো" ছিল না? তাই অনেক রাত হয়েছে শুতে, এখনও বাছারা ওঠেনি।"—সুধাময়ীর গলাটা কন্যা-গর্বে ভারাক্রান্ত হয়ে এল।

কাল ছিল চ্যারিটী শো। তাঁরও চারিটি কন্যা, দেখাবার মতনই বটে। তিনি চ্যারিটী শো, বিচিত্র অনুষ্ঠান, জলসাতে মেয়েদের আগে থাকতেই দান করে রেখেছেন। যা দিনকাল তাতে প্রথম থেকেই এই দলে না ভিড়োলে বিয়ের বাজারে নাজেহাল হতে হবে। কিন্তু ভিড়োলেই বা কি, আর না-ভিড়োলেই বা কি। বিয়ের বাজার আজকাল যা আক্রা হয়েছে তা তো তিনি জানেন! আর পাত্রই বা কোথায়? সবই যে ফুটো, ভাঙ্গা পাত্র! তা ছাড়া মেয়েদের বয়স হয়েছে, একটা কিছু তো করবে? চারটি কন্যার মধ্যে দুইটিকে আর শাড়ী ধরতে দেননি, তারা বড় বোনদের বয়সকে বাঁধ দেবার জন্য সমানে ফ্রক পরেই চলেছে, তা শোভন আর অশোভন হলেও।

চা খেয়ে বাজারের থলেটা নিয়ে নরেশ বাবু চললেন বাজারে। গিন্নীর ফরমাস খাটতে খাটতে তো এই হাড়-মাস আলাদা হতে বসেছে। এ যে কি কলে পড়েছেন তা যারা ভুক্তভোগী তারাই বুঝতে পারবে! স্বগতোক্তি করতে করতে তো আর রাস্তায় হাঁটা যায় না? কাজেই মনের রাগ মনেই চেপে তিনি হাঁটতে থাকেন। বাজার বেশী দূরে নয়, খানিকটা যাবার পর বাজারের প্রথম দরজাটা দেখা গেল। প্রথমেই মাছ কিনতে হবে। কারণ, বাঙ্গালী বাবুদের মাছ না হলে এক বেলাও চলবে না। রুই-কাতলা মাছের মালিকেরা বড় বড় বঁটি বাগিয়ে তার উপর সওয়ার হয়ে দর হাঁকলে—"সাড়ে তিন টাকা।"

"কিছু কমে হবে না?"

কোনও উত্তর পেলেন না। গেলেন ভেটকির কাছে, কিন্তু সেও কম যায় না। দূরে ইলিশের রূপের জৌলুস দেখে প্রলোভনে ভুলে তার কাছেই গেলেন।

"কত?" একটু অমায়িক হেসে নরেশ বাবু বললেন। দু'বার, তিন বার জিজ্ঞেস করবার পর, জবাব হল—"চার টাকা।"

"কমে হবে না ?"

মেজুনী শুধু মাথাটা এদিক-ওদিক করলে। এদিকে দেরী হয়ে যাচ্ছে, কাজেই সেই চার টাকা সের দরের রুপলী রূপসী ইলিশকে ছালাস্থ করে উদরস্থ করবার আশায় নরেশ বাবুর এতক্ষণকার বিরক্তি-ভরা মুখে একটু হাসি ঝিলিক খেলে উঠলো।

কি কি রান্না হতে পারে ? ভাজা, ঝাল, ঝোল, পাতাড়ী আবার ডিম থাকলে টক। গিন্নীর ছোট বেলা থেকেই বেশ রান্নার হাত আছে। আহা—ইলিশের পাতাড়ী, কত দিন খাইনি। মেয়েরা যেন দিন-দিন বিবি বনে যাচ্ছে। কিছুই শিখলো না। অবিশ্যি শিখলো না বলি কি করে, এই তো উদ্ধব সাহার কাছে বিনিটা নাচ শেখে। সেদিন কেমন পুজারিণী নৃত্যটা নাচলে! নাই বা শিখলো রান্না। কন্যা-গর্ব্বে পিতার বুকটা ফুলে ওঠে দশ হাত। কিন্তু গর্ব্বে বুক দশহাত হবারও আজকাল উপায় নেই, তাহলেই পুরান পুচপুচে পাঞ্জাবীর পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হতে হবে! সব দিকেই কনট্রোল! কিন্তু দশ হাত বুক তরকারীর বাজারে এসে দশ হাত বসে গেল। আলু, পটল, ঝিঙে, কুমড়ো সবাই যেন হাঁ করে আছে গৃহস্থদের কামড়াবার জন্য! দু'পয়সায় যে দু'মুঠো কাঁচা লঙ্কা পাওয়া যেত, তারাও আজকাল জাতে উঠে দু পয়সায় বারোটায় স্থান পেয়েছে!

কাঁচা লঙ্কার মতনই ঝালে গর-গর করতে করতে, করকরে দশ টাকার বাজার করে, গা কর কর করতে করতে কর্ত্তা নরেশ বাবু বাজারের থলেটা রান্না-ঘরের দরজার কাছে নামিয়ে দেন। দশ টাকার বাজার! ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগছে যেন। হাঁক দেন মেয়েদের, বিনি তখন পড়ার টেবিলে বসে ক্লাস-ফ্রেণ্ডকে প্রেমপত্র লিখছিল। রিনি ঘুঙুরের রিন্-রিন্ আওয়াজ তুলে নাচছিল। কিনি ছিল কাছে, তার হাতে একটা হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে বলে নরেশ বাবু তাঁর গায়ের এবং মনের গরম ঠাণ্ডা করতে প্রবৃত্ত হলেন।

সুধাময়ী বললেন, "চা খাবে না কি ? এক কাপ দিই ?"

নিরাসক্ত ভাবে নরেশ বাবু বললেন, "চা নয়, ঘোল দাও এক গেলাস, দেখি খেয়ে বিষে বিষক্ষয় হয় কিনা!"

গৃহিণী বললেন, "ঘোল আবার পাব কোথায় ? তোমার যত অদ্ভুত ফরমাস, চা করে দিচ্ছি খাবে তো বল ?"

"তাই তবে দাও"।—নরেশ বাবু বললেন।

গৃহিণী-প্রদত্ত চা খেয়ে কাপটা খটাস করে নামিয়ে রেখে নরেশ বাবু খবরের কাগজে মন দেন। ইস্! এবারও পরীক্ষায় পাশের হার শতকরা পঁচিশ ভাগ ? গত দুই বছর ধরে বড় ছেলেটি বি-এ এবং মেজ ছেলেটি আই-এ দিচ্ছে! মনটা তাঁর খারাপ হয়ে যায়। পরীক্ষায় পাশ করে কোনও একটা ভদ্র গোছের চাকরী করে তাঁকে যে একটু সাহায্য করবে, এ আশা তাঁর দুরাশা বলেই মনে হয়। প্রতি বছর দু'-একখানা বই যাচ্ছে পালটে, আবার নতুন বই হচ্ছে কেনা। আর পুরান বইগুলো সের দরে বিক্রি হচ্ছে সিনেমার টিকিটের জন্য। প্রায় সারা দিনই কোনও ছেলের চুলের টিকিটি পর্য্যন্ত তিনি দেখতে পান না। ছেলেরা যদি বা বড় হল কিন্তু মানুষ হল কৈ ? কিন্তু এক-এক জনের নিজস্ব পকেট-খরচ দিতে দিতে তাঁর নিজেরই পকেট প্রায় খালি হতে চলেছে। এদিকে তাঁর রিটায়ার করবার সময় হয়ে এসেছে। বিনিটারও বিয়ের বয়স অনেক দিন উত্তরে গেছে।

নরেশ বাবু আর ভাবতে পারেন না। বিছে কামড়াবার মতন ছটফট করতে করতে তিনি স্নানের ঘরে ঢুকে পড়েন অফিসের তাগিদে।

সুধাময়ী মুখখানা ভারী করে বলেন, "কি মাছই এনেছ! তাহা পচা! তোমায় না হলে ঠকাবে কাকে ? এত দাম দিয়ে এই মাছ নিয়ে এলে ? ছেলেমেয়েদের কি খেতে দেব ?"—গৃহিণীর আক্ষেপে সারা বাড়ী মুখরিত হতে লাগলো।

নরেশ বাবু বললেন "বেশ, আমি যখন এনেছি, আমাকেই না হয় পচা মাছ দাও।"

সুধাময়ী বললেন, "পচা মাছ খেয়ে অসুখ করে আর আমাকে 'সগ্যে' তুলতে হবে না। সে মাছ আমি পুঁটিকে দিয়ে দিয়েছি।"

"পুঁটিকে দিয়ে দিয়েছ ?" নরেশ বাবু কোঁচাটা দিয়ে বারান্দার খানিকটা অংশ ঝেড়ে নিয়ে আবার বসে পড়েন।

এদিকে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে ঝম-ঝম। ঘুঁটে ভিজে। কয়লা যা দেয় তার অর্দ্ধেক গুঁড়ো। দু'মণ কয়লা এর মধ্যেই শেষ! সুধাময়ী উনুনের পিঠে গুঁড়ো দিয়ে দু'-চারটে করে গুল দিয়ে রাখেন। রামার জ্বর যদিও কমে গেছে কিন্তু কাতরানি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। সময় বুঝে রান্নার লোকটিও করেছে কামাই।

এমনি করেই নাজেহাল হতে হতে আজকালকার গৃহস্থদের দিন কাটে হালভাঙ্গা নৌকোর মতন। এর উপর আছে চাকর-ঠাকুরের কামাই, না বলে চম্পট, শুধুই চম্পট নয় যাবার সময় দু'হাতে যা পাই সঙ্গে নেবারও রেওয়াজ।

বড় সংসার, রামাটার জ্বর, মেয়েরা যদি একটু কাজের হত! তাহলে হয়ত তাঁকে এত পরিশ্রম করতে হতো না। সুধাময়ী নিজের মনে কথাগুলো ভাবতে থাকেন। রবিবারে যদি বা মেয়েদের কলেজ বন্ধ, একটু ফরমাস খাটবার আশা করেন, কিন্তু তার তো উপায় নেই ? শনিবার বিকেলে নাচের স্কুল, রবিবার সকালে গানের স্কুল। এসো জন, বসো জন, সবই তাঁকে সামলাতে হয়। তার উপর আবার অনুষ্ঠানের রিহার্স্যালে যেতে উঠলে তো কথাই নেই। এত বড় সংসার, সবই কর্ত্রীর উপর নির্ভর করছে। একটু টেনে-টুনে কুলিয়ে-গুছিয়ে না করলে চলবেই বা কি করে ? সুধাময়ী আরও তাড়াতাড়ি গুল দিতে চেষ্টা করেন।

মেয়েদের তো আজ 'পাটলী' শাড়ী, কাল 'কেটসি' শাড়ী, পরশু চপ্পল কিনে দিতে না পারলে নাকি মান থাকে না। বিনিকে আবার পরশু দেখতে আসবে। কিন্তু কি যে মেয়ে হয়েছে, 'দেখতে আসার' নামেই মেয়ের মুখ ভার। তাঁদের সময় দেখতে আসবে শুনলেই, হঠাৎ লজ্জা পেয়ে মনটা রঙ্গীন হয়ে উঠতো, না দেখা লোকটিকে দেখবার জন্য মন উসখুস করে বেড়াত। বাপ-মা যার কাছে দেখাতেন, যার হাতে চির জীবনের জন্য তুলে দিতেন তাকেই বরণ করে নিতেন প্রসন্ন অন্তরে। এখন দশ বার চেনা-জানা হয়ে যাবার পর সব নিজেরাই বিয়ে করছে। এরা যেন লজ্জা পেতে ভুলে গেছে, বড্ড বেশী সপ্রতিভ। নিজের ভাল-মন্দ যেন নিজেই বোঝে। সবই যেন বেখাপ্পা! তাঁদের আর এখন এদের সঙ্গে খাপ খায় না।

"কই আমার বাদামের সরবৎ ?" মুগুর ভেঁজে, ক্লান্ত হয়ে বড় ছেলে এসে দাঁড়াল। সুধাময়ীর ভাবনায় বাধা পড়ল। ছেলের স্বাস্থ্যপূর্ণ চেহারার দিকে চেয়ে সুধাময়ীর গর্ব্ব হল বৈ কি! তাড়াতাড়ি

সরবতের গেলাসটা ছেলেকে ধরে দিলেন। সরবৎ খেয়ে দুম-দুম করে পা ফেলে পাড়ায় আড্ডা দিতে ছেলে গেল চলে। মেজ লেক থেকে সাঁতার কেটে লম্বা-লম্বা চুলগুলো ঠিক করতে করতে এসে উপস্থিত হল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। "মা আমার চা কই? শরীরটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।"

"এই যে দিই বাছা।"—ভাতটা নামিয়ে তাড়াতাড়ি কেটলী চড়ান উনুনে।

"মা, তুমি কেন এত সব কাজ কর? বিনি-রিণিকে শিখিয়ে দাও না।"—"মেজ ছেলে বিরক্তি-ভরা কণ্ঠে বলে।

"না, বাপু, আমার যত দিন সামর্থ্য আছে করে যাই। ওদের লেখাপড়া আছে, গান-বাজনা আছে, সময় পাবে কখন? এই তো আজ ওদের বন্ধুর জন্মদিনে 'নেমন্তন্ন, সেখান থেকে যাবে ছ'টার শো'তে সিনেমায়, তার পর বাড়ী ফিরবে। তখন কি আর কাজ শেখান যায়? এখন কোন শাড়ী পরবে, কি প্রেজেন্ট দেওয়া যায়, সেই ভাবনায় ওরা অস্থির! কাজ শেখার সময় তো পড়েই আছে।"

গরম চা খেতে খেতে মেজ ছেলে আরামের নিশ্বাস ফেলে বলে, "কিন্তু তোমার কাজের সাহায্য করেও তো নেমন্তন্নে যাওয়া যায়।"

এমন সময় লম্বা চুলের আধ-খোলা বিনুনিটা পিঠে ফেলে, হাতের নখে সুন্দর করে নেল-পলিশ লাগিয়ে, সিনেমার একটি লঘু সঙ্গীত গুন-গুন করতে করতে শ্লথগতিতে বিনি নিচে নেমে এল।

"মা, করবীর জন্মদিনে প্রেজেন্ট দেব, তুমি যে দশটা টাকা দেবে বলেছিলে, এখন দাও তো।"—বিনি আদুরে ভাবে বললে কথাগুলো।

"বেশ তো দেবো, কিন্তু তার আগে তরকারীটা কুটে দাও তো।" সুধাময়ী বললেন।

বিনি বললে, "বাঃ, এত সুন্দর করে নেল-পলিশ দিলুম, সব যে নষ্ট হয়ে যাবে! তুমি রিণিকে বলো।"

সুধাময়ী এবার চটে উঠলেন, "এত বড় মেয়ে, অমন বয়েসে আমরা সকলকার মন জুগিয়ে শ্বশুরবাড়ীতে কত কাজ করেছি। আর তোরা কি হচ্ছিস, এ্যাঁ?"—গালে হাত রেখে সুধাময়ী দাঁড়িয়ে রইলেন 'থ', হয়ে। মেয়ে মুখখানা ভার করে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কয়েকটা আলুর খোসা ছাড়িয়ে দেয় হাতের নখের পালিশ বাঁচিয়ে।

মা বিনির গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে বলেন, "একটু সাহায্য না করলে কি পেরে উঠি? কাকে একটু ফরমাস করি বল তো? যার এত বড়-বড় মেয়ে তার আবার কাজের ভাবনা?" সুধাময়ী ভাতের হাঁড়িটা উপুড় করে ফেলেন।

আলু কেটে বিনি বলে, "কই টাকা দাও, এই বেলা প্রেজেন্টটা কিনে আনি।"

আঁচল থেকে ঝনাৎ করে চাবির গোছাটা সামনে ফেলে দেন তিনি। আজ তাঁর যেন সব কাজেই বিরক্ত লাগছে। এই বর্ষার দিনে মেয়েরা কোথায় বাড়ীতে থাকবে, তা না, বাইরে না বেরুলে যেন আর চলে না। বারণ করলেই রাগ, স্বাধীনতা পেয়ে পেয়ে কেম- যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে দিন দিন। সুধাময়ী নিজের কাজ স- করতে ব্যস্ত হলেন।

বন্ধুর জন্য উপহার কিনে, যথাসময়ে সুসজ্জিতা হয়ে মে- বেরিয়ে গেল উৎসব-মুখরিত গৃহের উদ্দেশ্যে। এদিকে বৃষ্টির ছুতো ক- পুঁটি আর এল না, রান্নার কাতরানি সমানেই চললো। ছেলেরা যে-যার কাজে ব্যস্ত, নরেশ বাবু অফিসে। বৃষ্টির দিনে ফাঁকা বাড়ীতে সুধাময়ী জানলার ধারে একলা দাঁড়িয়ে থাকেন।

নরেশ বাবু যদিও বড় চাকরী করেন, সারা দিন অফিসের নানা রকম কাজের মধ্যে মনটাকে ডুবিয়ে রাখবার চেষ্টা করেও মনের উপর ভেসে উঠে মেয়েদের বিয়ের ভাবনা, অকৃতকার্য্য ছেলেদের ভবিষ্যতের ভাবনা, টাকার ভাবনা, ঝি-চাকর-সমস্যার ভাবনা। এতগুলি ছেলে-মেয়ের পিতা তিনি। কত কষ্টে মানুষ করে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন, কিন্তু তাঁর এ চলার যেন বিরাম নেই। কারুর উপর আশা আর তিনি করেন না। ছেলেরা যেন এক-একটি 'বাবু'! আর মেয়েরা? ওদের আর-কি বলব, দু'দিন পরেই তো পরের ঘরে চলে যাবে। চাকরের জ্বর, তার উপর এই বৃষ্টি, বাড়ী গিয়ে হয়ত তাঁকে কয়লা আনতে যেতে হবে। এত টাকা রোজগার করেন, এত পরিশ্রম করেন, কিন্তু কিছুতেই যেন সচ্ছলতা আসে না সংসারে। তাছাড়া, সুধাময়ী তো ছেলেমেয়েদের আদর দিয়ে দিয়ে একেবারে তাদের 'পরকালটা' নষ্ট করে দিচ্ছে। অথচ নিজে সারা-জীবন সংসারের ভালোর জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করে যাচ্ছে। নরেশ বাবু বেয়ারাকে এক কাপ চা দিতে বলেন। চায়ের ধোঁয়ার সঙ্গে নিজের ভাবনায় জাল বুনতে বুনতে অন্যমনস্ক ভাবে নরেশ বাবু কাপে চুমুক দিতে লাগলেন।

আলফোঁস দোঁদের গল্প

শ্রীতন্ময় বাগচী

দরজার মাথায় একটা পিজবোর্ডের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা—'বাড়ী বিক্রয় হইবে!' অনেক দিন ঝুলছে ঐ বোর্ডটা, প্রখর সূর্য-তাপে কখনও বা ঝলসে গেছে, প্রথম বর্ষণে কখনও বা ভিজে চুপসে গেছে, বসন্তের মৃদু-মন্দ বাতাসে আবার কখনও অল্প অল্প দুলেছে। কিন্তু সে-সব অত্যাচার সহ্য করেও বোর্ডটি আজো আছে ঠিক তেমনি শক্ত তেমনি অক্ষত।

শিং মাঠের মাঝে ভাঙ্গা বাড়ী সেটি। মেঠো রাস্তার ধূলো বাগানের শেষে সুরকির গুঁড়ার সাথে এক হয়ে মিশে যায়। সেই নির্জন রাস্তাটা দেখে মনে হয়, দুষ্ট অঙ্গের মত এটাকেও পরিত্যাগ করে বুকছে বাড়ীর মালিক। কিন্তু সেটা শুধু অনুমানই! দেয়ালের পাথরের ছোট্ট চিমনী থেকে নীল রঙের ধোঁয়া আকাশের দিকে ছুটে গিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে তারও মত আনন্দহীন আর এক জনের বাস আছে এই বাড়ীতে। প্রকৃতির সৌন্দর্যলীলার মধ্যে থেকেও যার মনে এতটুকু সুখ নেই।

পথ চলতে গিয়ে পথিকের দল হঠাৎ বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ততক্ষণে ভাঙ্গা দরজা দিয়ে তাদের চোখে পড়ে গেছে বাগানের মাঝখানের পুকুরের ধারে জল দেবার ঝাঁজরি, মাটি কোপাবার শাবল প্রভৃতি সাজানো রয়েছে। লাল সুরকির পথ সোজা চলে গেছে বারান্দা পর্যন্ত। রাস্তার ধারের এক নীচু জমির ওপর ঘরখানা। খোঁটা পুঁতে রাস্তার সমান একটা মাচার ওপর ঘরখানা তৈরী। দূর থেকে দেখায় ঠিক যেন লতা-পাতা ঢাকা এক উদ্ভিদ-গৃহ। গাছ পোঁতবার টবগুলো ওল্টানো। বাগানের মাঝে দু'-একটা শাখাবহুল প্ল্যাটান আর তার চার-পাশে স্ট্রবেরী, মটর প্রভৃতি ফলের গাছ।

প্রকৃতির এই সৌন্দর্যলীলার মাঝে খড়ের টুপী মাথায় দিয়ে বুড়ো একা-একাই ঘুরে বেড়ায়। গাছে জল দেয়, কখনও বা আগাছাগুলো পরিষ্কার করে।

এক রুটিওয়ালা ছাড়া আর কারো সাথে বুড়োর আলাপ নেই। ফলের ভারে নুইয়ে-পড়া গাছ দেখে রাস্তার কোন পথিক দু'-এক মুহূর্তের জন্যও থমকে দাঁড়ায়। তার পর দরজার ওপর বাড়ী বিক্রীর বোর্ড পড়ে হয়ত বা কেউ খোঁজ করে। প্রথম বারের কড়া নাড়ার শব্দে কোন উত্তর আসে না। দ্বিতীয় বার বাজতেই বাগানের ভেতর মস্‌-মস্‌ শব্দ হয়। তার পরই দরজার খিল খুলে বুড়ো প্রশ্ন করে—'কি দরকার?'

'এ বাড়ী কি বিক্রী হবে?'

'হ্যাঁ···কিন্তু দাম খুব বেশী!'—বুড়োর চোখ জলে ঝাপসা হয়ে ওঠে। তাই উত্তরের অপেক্ষা না করেই দরজা বন্ধ করে ফেলে। তার পরই দেখা যায়, বাগানের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারী করছে বুড়ো আর মণিহারা ফণীর মত বার বার দরজার দিকে তাকাচ্ছে।

পথিকের দল বুড়োর এই ব্যবহারে অবাক হয়ে বলে—'লোকটা পাগল নাকি? বাড়ী বিক্রীর বোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছে অথচ—'

বুড়োর এই ব্যবহারের আসল কারণ আমি জানতে পেরেছিলাম। এক দিন ঐ বাড়ীর সামনে দিয়ে হেঁটে চলেছি এমন সময় বাড়ীর ভেতরের চীৎকার কানে যেতেই আমার গতি রুদ্ধ হয়ে গেল।

'এ বাড়ী তোমাকে বিক্রী করতেই হবে বাবা। তুমি তো আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে···'

বুড়োর কম্পিত স্বর শোনা গেল—'তোদের অমতে কিছু তো করিনি। বাড়ী বিক্রী করব বলেই তো বাড়ীর দরজায়···'

ধীরে ধীরে জানলাম বুড়োর ছেলেদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। প্যারী সহরে চালু কারবার তাদের। তারাই এ বাড়ী বিক্রী করার জন্য বুড়োকে পীড়াপীড়ি করছে। কিন্তু বাড়ী বিক্রীর অযথা বিলম্ব দেখে প্রতি রবিবার এসে বুড়োকে তার প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিয়ে যায়। রবিবারের ছুটিটা পর্যন্ত উপভোগের অবসর নেই।

রবিবার ঐ রাস্তা দিয়ে হাঁটলেই শুনতে পেতাম বুড়োর ছেলেদের বাড়ী বিক্রীর আলোচনা। টাকাকড়ির কথা উঠলেই উচ্চহাস্যে বাগান মুখর হয়ে যায়। সন্ধ্যা হলেই ছেলেরা প্যারীতে ফিরে আসে। বুড়ো তাদের কিছু দূর এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে। তখন বুড়োর মুখের ওপর ফুটে ওঠে উপচে-পড়া হাসি। আবার সেই আগামী রবিবার—পুরো সাতটা দিন! এ ক'টা দিন তো শান্তিতে কাটবে!···

রবিবার ছাড়া অন্য সব দিন বুড়োর বাড়ী থাকে নিস্তব্ধ আর নিশ্চুপ। কেবল মাঝে মাঝে বুড়োর জুতোর শব্দ শোনা যায়।

বাড়ী বিক্রীর দেরী দেখে ছেলেরা বুড়োকে ক্রমাগত তাগাদা দিতে আরম্ভ করল। নাতি-নাতনীরা তাদের দাদুকে নিয়ে যাবার জন্য গলা জড়িয়ে ধরে বায়না করে—'তুমি আমাদের সাথে চল না? কেমন আনন্দ করব সবাই?' ছেলেরাও যোগ দেয় আর ছেলের বৌরা বাড়ী বিক্রীর টাকার হিসাব করতে বসে। বুড়োর মুখ দিয়ে একটা কথাও বের হয় না। শুধু নাতি-নাতনীদের আদর করে কাছে টেনে আনে।

এক দিন শুনলাম, বুড়োর এক ছেলের বৌ বলছে—'এটার দাম একশ' ফ্রাঙ্কও হবে না। সুতরাং একে ভেঙ্গে ফেলাই ভালো।' আর এক জন এমন ভাব দেখাল যেন বুড়ো অনেক কাল আগে মারা গেছে আর বাড়ীটাও ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। বুড়ো নিশ্চল পাথুরে মূর্তির মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনল শুধু। দু'চোখ বেয়ে নেমে আসে জলের ধারা। কিন্তু পরমুহূর্তেই চোখের জল মুছে বাগানের আগাছা পরিষ্কার করতে আরম্ভ করে দেয়।

বিরাট বট গাছের মত এখানেও বুড়ো আধিপত্যে একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে রইল। কেউ তাকে একচুলও নড়াতে পারল না। বুড়ো ছেলেদের নানা রকম স্তোকবাক্যে ভোলাতে থাকে। বসন্তের শেষে যখন ফল পাকতে সুরু হোল তখন বুড়ো তার ছেলেদের বোঝালো, এই সব ফল শেষ হলেই ঠিক বাড়ী বিক্রী করবে।

চেরী, আঙুর, পীচ একে একে পেকে যায়; মেডলার ফুলও ফুটে ঝরে গেল কিন্তু বুড়োর বাড়ী অবিক্রীতই থাকে।

শীত এলো। সে পথে লোক-চলাচল কমে আসে। ছেলেরাও বাড়ী আসা বন্ধ করে। এই তিন মাস বুড়োর বেশ নিরুপদ্রবে কাটে। এই সময়ে নতুন বীজ পোঁতে, গাছের বাড়তি ডালগুলো ছেঁটে ঠিক করে রাখে। জীর্ণ কাগজের বাড়ী বিক্রীর বোর্ডও শীতের বাতাসে অল্প অল্প দুলতে থাকে।

বুড়োর মতলব বুঝতে পেরে ছেলেরা বাড়ী বিক্রী করতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হোল। বুড়োর এক ছেলের বৌ এসে রইল সেখানে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সাজগোছ করে দরজার ধারে দাঁড়িয়ে পথিকদের বলে—'এ বাড়ী বিক্রী আছে। একবার দেখে যান!'

পুত্রবধূর আগমনে বুড়োর আর স্বস্তি নেই। মরণ-ভীত লোক মনের ভয় দূর করবার জন্য নিত্য-নতুন কল্পনা করে, তেমনি পুত্রবধূর অস্তিত্ব ভুলে থাকবার জন্য বুড়ো বাগানে নিত্য-নতুন বীজ লাগাতে সুরু করল। পুত্রবধূ প্রতিবাদ করে বলে—'আর বীজ পুঁতে লাভ কি বাবা? দু'দিন পরেই যখন বাড়ী বিক্রী হয়ে যাবে তখন কেন এত পরিশ্রম?'

উত্তর না দিয়ে বুড়ো একমনে কাজ করে যায়। বাড়ী ছেড়ে যাবার আগে কোথাও যেন এতটুকু ময়লা না লেগে থাকে। বাগানকে সব সময়ই ঝকঝকে—তকতকে।

তখন যুদ্ধ চলেছে। পুত্রবধূর মুখের হাসি আর সাজ-সজ্জায় কোন খরিদ্দার জুটল না। দিনের পর দিন এই একঘেয়ে একটানা কাজে বিরক্তি আসে তার। এই পাড়াগাঁয়ে বসে থাকলে চলবে না—দোকানের ক্ষতি হচ্ছে। তাই কোন অবলম্বন না পেয়ে বুড়োকেই বিরক্ত করতে আরম্ভ করল। অযথা তিরস্কার করতেও ছাড়ে না। বুড়ো নীরবে সহ্য করে। তার নব রোপিত বীজ থেকে অঙ্কুর দেখে আর দরজার মাথায় ঝুলন্ত বাড়ী বিক্রীর বোর্ড দেখে মনে মনে উল্লসিত হয়ে ওঠে।

* * * *

অনেক দিন পর সেই পাড়াগাঁয়ে বেড়াতে এসে আবার দেখলাম বুড়োর বাড়ীটা। কিন্তু দরজার মাথায় ঝুলন্ত বোর্ডটা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়েছে। সেই আধ-ভাঙ্গা দরজাও আর নেই—তার যায়গা নিয়েছে একটা সুন্দর খোদাই-করা দরজা। বাগানে সেই সুন্দর ফলের গাছও দেখলাম না; তার বদলে চোখে পড়ল ফোয়ারা, বেঞ্চি আর চেয়ার। বাগানে দেখলাম, পাশাপাশি দু'টি চেয়ারে বসে আছে এক তরুণ-তরুণী। পুরুষটি বেজায় মোটা—সঙ্গিনীও সেই রকম। বিকট হাসির সাথে শুনলাম স্ত্রীলোকটির কথা—'পনর ফ্রাঙ্ক খরচ করে এই চেয়ার কিনেছি।'

এত দিনে তাহলে বাড়ী বিক্রী হয়েছে। কুটীরের সেই সহজ অনাড়ম্বর সৌন্দর্য আর নেই। একটা নতুন বাড়ী উঠেছে সেই যায়গায়। ঘরের ভেতর থেকে এক যুবতীর পিয়ানোর সাথে কণ্ঠস্বরের যুদ্ধের আওয়াজ ভেসে আসছে। কেন জানি না, আমার মনের মধ্যে বুড়োর কথাই তোলপাড় করতে লাগল! এ যায়গায় সে-ও একদিন বাস করে গেছে। কিন্তু আজ······

হঠাৎ আমার মন চলে গেল প্যারীর রাজপথের ধারে বুড়োর ছেলেদের দোকানে। স্পষ্ট দেখতে লাগলাম—দোকানের এক কোণে একখানা ভাঙ্গা চেয়ারে হতাশ হয়ে বসে আছে বুড়ো। চোখ-মুখ অশ্রুভারাক্রান্ত! সুখ নেই, শান্তি নেই, স্ফূর্তি নেই—যেন নির্জীব, স্থবির বৃদ্ধত্বে ভরা প্রাণহীন! আর তার পুত্রবধূরা এক বড় খরিদ্দারকে ঠকিয়ে ঠন্-ঠন্ করে টাকাগুলো গুণছে······

বিখ্যাত স্বর্ণ শিল্পী :—
বি, সরকারের পৌত্র,
শ্রীনারায়ণ সরকারের
পরিচালনায়
আধুনিকতম অলঙ্কার শিল্প প্রতিষ্ঠান

বি, বি, সরকার কোং লিঃ
১৬০-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ফোন :—বি, বি, ১২৫৩

সা হি ত্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

বাকপতি—কবি। সম্ভবতঃ ৬৬০-৭২০ খৃঃ বর্তমান। কবি বাকপতিরাজ কান্যকুব্জের অধিপতি যশোবর্মাদেবের রাজসভার অন্যতম কবি। গ্রন্থ—গৌড়বহ (গৌড়বধকাব্য)।

বাগ্‌ভট—জৈন গ্রন্থকার। গুর্জরপতি জয়সিংহের সভাপণ্ডিত। গ্রন্থ—নেমিনির্বাণ (নেমিনাথের জীবনী), বাগ্‌ভটালঙ্কার।

বাগ্‌ভট—আয়ুর্বেদাচার্য। গ্রন্থ—অষ্টাঙ্গহৃদয়।

বাচস্পতি মিশ্র—অদ্বৈতবাদী দার্শনিক পণ্ডিত। জন্ম—৮ম-৯ম শতাব্দীতে মিথিলায়। গৌড়ের রাজা ধর্মপালের সমসাময়িক। ইনি ষড়্‌দর্শনের টীকা প্রণয়ন করেন। ইঁহার প্রতিভা সর্বতোমুখী ছিল। গ্রন্থ—ভামতী (বেদান্তের টীকা—পত্নী ভামতীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ইনি শারীরক ভাষ্যের নাম ভামতী রাখেন), ব্রহ্মতত্ত্বের সমীক্ষা (ব্রহ্মসিদ্ধির টীকা), তত্ত্বকৌমুদী (সাংখ্যটীকা), তত্ত্ববৈশারদী (পাতঞ্জল টীকা), ন্যায়বার্তিক তাৎপর্য্য (ন্যায়টীকা), ন্যায়সূচীনিবন্ধ (ঐ), তত্ত্ববিন্দু, ন্যায়কণিকা।

বাচস্পতি মিশ্র—স্মার্ত পণ্ডিত। জন্ম—১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে মিথিলায়। মিথিলাধিপতি হরিনারায়ণের আশ্রিত। বঙ্গদেশের বাচস্পতি মিশ্রের মত কিয়দংশে প্রচলিত ছিল। গ্রন্থ—বিবাদ-চিন্তামণি (স্মৃতিগ্রন্থ)।

বাঞ্ছানাথ—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। গ্রন্থ—ভাবদর্পণ।

বাণ—সংস্কৃতজ্ঞ কবি। জন্ম—১০ম শতকে। গ্রন্থ—চণ্ডীশতক।

বাণভট্ট—কবি। জন্ম—৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দী বিহার দেশে। পিতা—চিত্রভানু। ইনি হর্ষবর্ধনের সভাকবি। গ্রন্থ—পার্বতীপরিণয়, কাদম্বরী, শ্রীহর্ষচরিত, রত্নাবলী, চণ্ডিকাশতক।

বাণীকণ্ঠ—বঙ্গীয় কবি। গ্রন্থ—মোহমোচন (কাব্য)।

বাণী গুপ্ত—মহিলা গ্রন্থকর্ত্রী। শিশুদের ঐতিহাসিক গল্পলেখক। এম-এ, বি-টি। গ্রন্থ—পঞ্চপ্রদীপ, ছেলেদের জাহাঙ্গীর, ছেলেদের আওরঙ্গজেব, ছেলেদের বাবর, সিংহলকুমারী পাঞ্চালী।

বাণীরাম ঠাকুর—পাঁচালীকার। পাঁচালী গ্রন্থ—নিয়ত মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী।

বাণী রায়—মহিলা সাহিত্যিক। জন্ম—১৯২০ (?) ১৯এ কার্তিক পাবনা জেলার হাটুরিয়া গ্রামে। পিতা—পূর্ণচন্দ্র রায় এম, এ, বি, এল। মাতা—সুলেখিকা গিরিবালা দেবী, সরস্বতী। শিক্ষা—প্রবেশিকা (ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত) আই-এ (প্রথমে ডায়সিসন, পরে আশুতোষ কলেজ, ঐ), বি-এ (ঐ), এম-এ। কর্ম—এম-এ পাশ করিবার পর কিছুকাল বাংলা সরকারের প্রচার-বিভাগে। প্রথম রচনা কবিতা পুষ্পপাত্রে প্রকাশিত হয়। স্কুল ও কলেজ ম্যাগাজিনে সম্পাদনা। গ্রন্থ—জুপিটার (কাব্য ১৩৫০), পুনরাবৃত্তি (গল্প সং, ১৩৫১), প্রেম (উপন্যাস, ১৩৫২), শুক্রের অঙ্ক (গল্প, ১৩৫৪), রঞ্জন-রশ্মি (গল্প, ১৩৫৬), সপ্তসাগর (১৩৫৭), হাসি-কান্নার দিন (১৩৫৯)।

বাণী হালদার—মহিলা সাহিত্যিক। যুগ্ম-সম্পাদিকা—ছেলে-মেয়ে (মাসিক, ১৩৫৫)।

বাণেশ্বর—ঐতিহাসিক। জন্ম—শ্রীহট্ট জেলার ঢাকা দক্ষিণ পরগণার অন্তর্গত ঠাকুরবাড়ী গ্রামে। ত্রিপুরাধিপতি ধর্মমাণিক্যের (১৪৩১-১৪৬২) সভাপণ্ডিত। গ্রন্থ—রাজমালা।

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার—পণ্ডিত। জন্ম—হুগলী জেলার গুপ্তপল্লী গ্রামে। পিতা—রামদেব তর্কভূষণ। ইনি ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগের পণ্ডিত। নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত। কোন কারণে কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহার উপরে ক্রুদ্ধ হইলে ইনি বর্ধমানাধিপতি চিত্রসেনের সভায় যান। চিত্রসেনের মৃত্যুর পর কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আসেন এবং তৎপরে কলিকাতায় আসেন এবং দেওয়ানি আদালতের 'হিন্দু-আইন' সংকলয়িতার অন্যতম পণ্ডিত হন। গ্রন্থ—চিত্রচম্পূ (১৭৪৪ খৃঃ)।

বাতাসু সরকার—বঙ্গীয় মুসলমান কবি। জন্ম—বগুড়া জেলায়। গ্রন্থ—ছিলছত্র-বাজারজঙ্গ (১২৪৬)।

বাৎসায়ন—জ্যোতির্বিদ্। গ্রন্থ—বাদরায়ণ প্রশ্ন, মুহূর্তদীপিকা বা দর্পণ।

বাপুদেব শাস্ত্রী—গণিতজ্ঞ পণ্ডিত। জন্ম—১৮২১ খৃঃ পুণা-নগরে। মৃত্যু—১৮৯০ খৃঃ। পিতা—সীতারাম দেব। ১৬ বৎসর বয়সে নাগপুরে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন। কর্ম—অধ্যাপক, বেনারস সংস্কৃত কলেজ (১৮৪২)। সি. আই. ই উপাধি লাভ (১৮৭৮)। গ্রন্থ—বীজগণিত (হিন্দী), সূর্যসিদ্ধান্ত (ইং-অনুবাদ), ত্রিকোণমিতি, পাটীগণিত।

বামদেব দত্ত—সংবাদপত্রসেবী। জন্ম—হুগলী জেলার বৈঁচী গ্রামে। কর্ম—বঙ্গবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগে। সম্পাদক—প্রতিমা (মাসিক, ১২৯৭), দৈনিক (সংবাদপত্র), বঙ্গনিবাসী (ঐ)।

বামন—জ্যোতির্বিদ্। গ্রন্থ—জাতকতত্ত্ব বা সারোদ্ধার (১৫৫৭ খৃঃ)।

বামদ—বৈয়াকরণ। ৮ম শতাব্দী। কাশ্মীরের রাজা জয়াদিত্যের মন্ত্রী। গ্রন্থ—কাশিকাবৃত্তি (পাণিনির বৃত্তি), কাব্যালঙ্কার-সূত্র (ছন্দোশাস্ত্র)।

বামনদাস বসু, মেজর—চিকিৎসক। জন্ম—১৮৬৭ খৃঃ ২৪-এ আগষ্ট খুলনা জেলায় টেংরা-ভবানীপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৯৩০ খৃঃ ২৩-এ সেপ্টেম্বর এলাহাবাদে। পিতা—শ্যামাচরণ বসু (পঞ্জাব সরকারের শিক্ষাবিভাগে কর্ম)। শিক্ষা—প্রবেশিকা (১৮৮২), মেডিক্যাল কলেজ শেষ পরীক্ষা (১৮৮৭, অকৃতকার্য), বিলাতগমন (১৮৮৮), এল-এম-এস (লণ্ডন), এম-আর-সি-এস। কর্ম—মেডিকেল সার্ভিসে যোগদান (১৮৯১), কর্মে রত অবস্থায় চীন, আফ্রিকা প্রভৃতি ভ্রমণ। অবসর গ্রহণ (১৯০৭)। পাণিনি-কার্যালয় স্থাপনা (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র বসু সহ)। গ্রন্থ—**Rise of Christian Power in India, Story of Satara, History of Education in India under the Rule of East India Company, Ruin of Indian Trade & Industry, The Consolidation of Christian Power in India, My Sojourn in England, The Colonization of India by Europeans, Indian**

Medical Plants, Diabetis Mellibus & its Diabetis Treatments; অন্যতম সম্পাদক—**Sacred Books of Hindus.**

বামনদাস মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১২১০ বঙ্গ ১৩ই আষাঢ় নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলা-বীরনগর গ্রামে। মৃত্যু—১৮৮১ বঙ্গ ২৪-এ পৌষ। পিতা—দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (জমীদার)। গ্রন্থ—গোভিলোক্ত সামবেদীয় সন্ধ্যা (সবিচার গ্রন্থ)।

বামণ পণ্ডিত—মরাঠী পণ্ডিত। জন্ম—১৭শ শতাব্দীতে বোম্বাই প্রদেশে সাঁতারা জেলায়। মৃত্যু—১৬৭৩ খৃঃ (আনু)। ইনি বৈদান্তিক ছিলেন। গ্রন্থ—যথার্থদীপিকা, নিগমসার।

বামাচরণ দাস—শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার। জন্ম—মেদিনীপুর জেলায় কিশোরদহ। মৃত্যু—১৯৩১ খৃঃ। কর্ম—শিক্ষকতা। গ্রন্থ—কর্ণবধ-কাব্য (১৩১৬ বঙ্গ)।

বামাচরণ বসু—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। গ্রন্থ—আরণ্য-প্রসূন, স্বরো যে সন্ন্যাসী বা অষ্টাহে, বিজলী বা নারীভাগ্য, জয়চাদের চিঠি, ৪র্থ খণ্ড।

বামাসুন্দরী দেবী—গ্রন্থকর্ত্রী। নিবাস—পাবনা। গ্রন্থ—কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে? (১৮৬১)।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—অগ্নিযুগের নেতা। জন্ম—১৮৮০ খৃঃ ৫ই জানুয়ারি ইংলণ্ডের অন্তর্গত ক্রয়ডনে (সারে)। পিতা—ডাঃ কে. ডি. ঘোষ। ইনি শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পৈতৃক বাসস্থান—হুগলী জেলার কোন্নগর গ্রামে। শিক্ষা—ইংলণ্ড ও কলিকাতা। অগ্নি-যুগের বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতা (১৯০৫)। 'যুগান্তর' দলের অধিনায়ক, (১৯০৬)। মাণিকতলা বোমার মামলায় ধৃত ও দ্বীপান্তরে নির্বাসিত। স্বদেশী যুগের যুগান্তর (সাপ্তাহিক) পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক—বিজলী (সাপ্তাহিক), **Dawn of India** (সাপ্তাহিক), সন্ধ্যা (নবকলেবর), সহ-সম্পাদক—নারায়ণ (মাসিক), সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী। গ্রন্থ—দাপালি (গল্প), সোনার সিঁড়ি, মুক্তির দিশা, মিলনের পথে, দ্বীপান্তরের কথা, মানুষ গড়া, বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী, আমার আত্মকথা, দ্বীপান্তরের বাঁশী।

বালকাচার্য—আয়ুর্বেদবিদ্‌। গ্রন্থ—বালবোধ।

বালকৃষ্ণ—জ্যোতির্বিদ্‌। তাপ্তীনদীর তীরে বাস। গ্রন্থ—তান্ত্রিককৌস্তুভ।

বালকৃষ্ণ—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—যুক্তপ্রদেশ। শিক্ষা—এম্‌, এ। অধ্যাপক, গুরুকুল, কাঙ্গরী (হরিদ্বার)। হিন্দীগ্রন্থ—অর্থশাস্ত্র, বেদোক্তরাজ্য, ভারতবর্ষকা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, আর্য্যোঁ কী বৈজ্ঞানিক উন্নতি, অগ্নিহোত্র ব্যাখ্যা।

বালকৃষ্ণ ভট্ট—টীকাকার। জন্ম—১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বারানসী নগরে। পিতা—রঙ্গনাথ দীক্ষিত। টীকাগ্রন্থ—শক্তি-পদার্থদীপিকা।

বালগঙ্গাধর শাস্ত্রী—বহুভাষাবিদ্‌ মরাঠা পণ্ডিত। জন্ম—১৭৯৫ খৃঃ বোম্বাই প্রদেশ। মৃত্যু—১৮০০ খৃঃ ১৭ই মে। সম্পাদক—দিগ্‌দর্শন (মাসিক)।

বালচন্দ্র—জৈন আচার্য ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—করুণা বজ্রায়ুধ (নাটক)।

বাসন্তী চক্রবর্তী—মহিলা সাহিত্যিক। সম্পাদিকা—মুকুল (১৩৩৭-৩৮)।

বাসন্তী দেবী—মহিলা সাহিত্যিক ও দেশনেত্রী। স্বামী—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ইনি স্বামীর পার্শ্বে থাকিয়া দেশসেবা করেন ও বহুবার কারাবরণ করেন। সম্পাদিকা—বাঙ্গালার কথা (১৯২১ খৃঃ ২৩এ ডিসেম্বর)।

বাসুদেব—জ্যোতির্বিদ্‌। জন্ম—১৭শ শতাব্দী (১৬৫৫ খৃঃ বর্তমান)। গ্রন্থ—জাতকমুকুট।

বাসুদেব—টীকাকার। টীকাগ্রন্থ—মেঘমালা-মঞ্জরী।

বাসুদেব—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বাস্তপ্রদীপ।

বাসুদেব—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বীরপরাক্রম।

বাসুদেব ঘোষ—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। জন্ম—শ্রীহট্ট। কর্ম-মেদিনীপুর জেলার তমলুকে। ইনি শ্রীচৈতন্যের অনুচর ও অনুরক্ত ছিলেন। স্থাপনা—শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ (তমলুক)। গ্রন্থ—গৌরাঙ্গ-চরিত, নিমাইসন্ন্যাস পাটি।

বাসুদেব তর্কালঙ্কার—জ্যোতির্বিদ্‌। গ্রন্থ—কীর্ত্তিদীপিকা।

বাসুদেব রথ সোমযাজী—উৎকলবাসী কবি। গ্রন্থ—গঙ্গবংশানু-চরিতম্‌।

বাসুদেব সার্বভৌম—বিখ্যাত ন্যায়শাস্ত্রবিদ্‌ পণ্ডিত। জন্ম—১৪৪৫ খৃঃ নবদ্বীপে। পিতা—মহেশ্বর বিশারদ (বন্দ্যোপাধ্যায়) ভট্টাচার্য (মতান্তরে নরহরি বিশারদ)। যৌবনকাল পর্যন্ত ইনি লেখাপড়া শেখেন নাই। পিতৃরোষে গৃহত্যাগ করিয়া মিথিলায় ন্যায়শিক্ষা, ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া সার্বভৌম উপাধিলাভ, অতঃপর কাশীধামে বেদান্তপাঠ এবং নবদ্বীপে অধ্যাপনায় ব্রতী। এইরূপে ইনি সর্বপ্রথম মিথিলার বাহিরে ন্যায়দর্শনের টোল স্থাপনা করেন। গ্রন্থ—সার্বভৌম-নিরুক্ত, তত্ত্বচিন্তামণির ব্যাখ্যা।

বাসুদেব সার্বভৌম—টীকাকার। জন্ম—১৭শ শতাব্দী প্রথম ভাগে গঙ্গো-বংশে। ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক। টীকাগ্রন্থ—অদ্বৈত মকরন্দের (লক্ষ্মীধর-কৃত) টীকা (১৬২৯ খৃঃ)।

বাসুরি নারায়ণ—জ্যোতির্বিদ্‌। গ্রন্থ—সভাকৌমুদী।

বাহ্বট—আয়ুর্বেদবিদ্‌। গ্রন্থ—শতশ্লোকী।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য—শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৩১৩ বঙ্গ শ্রাবণ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বিবিগঞ্জে। পিতা—ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য। শিক্ষা—এম-এ-ডি, ফিল (১৯৪৯)। কর্ম—অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থ—প্রভাত-রবি, গান্ধীজীর জীবন-প্রভাত।

বিজনলতা দেবী—মহিলা গ্রন্থকর্ত্রী। জন্ম—ছোটনাগপুরের এক পার্বতীয় শহরে। বাল্যকাল হইতে সাহিত্যে ও কাব্যে অনুরাগ। প্রথম রচিত গল্প—প্রাণের দাবী (প্রবাসী, ১৩৩৭ শ্রাবণ, ছদ্মনামে—সান্ত্বনা দেবী।) ইহার পর বিভিন্ন সাময়িক পত্রে গল্প প্রকাশ। গ্রন্থ—ধূলার ধরণীতে (১৯৫০)।

বিজয়কিশোর আচার্য—গ্রন্থকার। জন্ম—মেদিনীপুর। পিতা—নবকৃষ্ণ আচার্য। শিক্ষা—বি-এ (১৮৯২), বার-এট-ল। কর্ম—আইন-ব্যবসায়, কলিকাতা হাইকোর্ট, আইন-অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১২)। গ্রন্থ—**Codification in British India.**

বিজয়কেশব বসু—সাহিত্যিক। যুগ্ম-সম্পাদক—জ্ঞানলহরী (মাসিক, ১২৭৬)।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—সন্ন্যাসী ও ধর্মোপদেষ্টা। জন্ম—১৮৪১ খৃঃ ১৯এ শ্রাবণ নদীয়া জেলার অন্তর্গত শিকারপুরের অদূরবর্তী দহকুল নামক গ্রামে (মাতুলালয়ে) অদ্বৈত বংশে। মৃত্যু—১৮২১ শক ২২এ জ্যৈষ্ঠ পুরীধামে। পিতা—আনন্দকিশোর গোস্বামী। মাতা—স্বর্ণময়ী দেবী। শিক্ষা—বাল্যে টোলে, সংস্কৃত কলেজ, মেডিকেল কলেজ। ছাত্রাবস্থায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ। পূর্ব-বাংলার ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদ গ্রহণ। ব্রাহ্মসমাজের সহিত মতানৈক্য হওয়ায় আচার্যপদ ত্যাগ (১৮০৯ শকে), ঢাকায় গণ্ডেরিয়া নামক স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা। বৃন্দাবন বাস। কুম্ভমেলায় গমন ও সেখানকার সাধুদিগের দ্বারা মহাপুরুষ বলিয়া প্রকাশ। গ্রন্থ—যোগসাধন, বক্তৃতা ও উপদেশ, আশাবতীর উপাখ্যান।

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত—সাহিত্যিক। সম্পাদক—আশ্রম (১৩৩৩-৩৪)।

বিজয়কৃষ্ণ ভট্ট—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অঙ্কসূত্র (১৮৭১)।

বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—উত্তরপাড়া-পাক্ষিক পত্রিকা (১৮৫৬)।

বিজয়কৃষ্ণ রায়—কবি। গ্রন্থ—সরল কবিতা (মুর্শিদাবাদ, ১৯০১)।

বিজয় গুপ্ত—কবি। জন্ম—১৪১৬ শকের কিছু পূর্বে বাখরগঞ্জ জেলায় গৌরনদী থানার অন্তর্গত ফুল্লশ্রী গ্রামে বৈদ্যবংশে। পিতা—সনাতন গুপ্ত। মাতা—রুক্মিণী। ইনি গৌড়ের বাদশা হুসেন শাহের (১৪৯৪—১৫২৫) সমসাময়িক। গ্রন্থ—পদ্মপুরাণ (১৪৮৪ খৃঃ গ্রন্থারম্ভ), মনসামঙ্গল।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার—প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষক। জন্ম—১৮৬১ খৃঃ ২৭এ অক্টোবর ফরিদপুর জেলার থানাকুল গ্রামে। মৃত্যু—১৯৪২ খৃঃ ৩০এ ডিসেম্বর। কর্ম—অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আইন-ব্যবসায়, সম্বলপুর, পরে কলিকাতা হাইকোর্ট। ইনি বহু ভাষাবিদ্ এবং সুকবি। চক্ষুরোগের চিকিৎসার জন্য বিলাতে গমন এবং পরে অন্ধ হন। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। বহু সাময়িক পত্রের প্রবন্ধলেখক। গ্রন্থ—যজ্ঞ ও তপস্যার ফল, থেরীগাথা, সচ্চিদানন্দ গ্রন্থাবলী, হেঁয়ালী, গীতগোবিন্দ, জীবনবাণী, কালিদাস, ছিটেফোঁটা, যজ্ঞভস্ম (কবিতা), পঙ্কজমালা (কাব্য), কথানিবন্ধ (উপ), খেলাধূলা, রুচিরা, **Elements of Social Anthropology, Aborigines of Central India, Orissa in the making, History of the Bengali Language.** সম্পাদক—বঙ্গবাণী (১৩২৮-৩৪), বাঙলা (১৩৩১, শারদীয়া), শিশুসাথী (বার্ষিক, ১৩৩৫)।

বিজয়চাঁদ মহতাব, মহারাজাধিরাজ, স্যর—কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৮১ খৃঃ বর্ধমানে। মৃত্যু—১৩৪৮ বঙ্গ। পিতা—রাজা বনবিহারী কাপুর। বর্ধমানের রাজা আফতাবচাঁদের দত্তক পুত্র। আফতাবচাঁদের মৃত্যুর পর বর্ধমানের সিংহাসনে আরোহণ। মহারাজাধিরাজ, নাইট উপাধি লাভ। বাল্যকালাবধি সাহিত্যে অনুরাগ। দুইবার ইউরোপ ভ্রমণ। বহু সাময়িক পত্রের লেখক। বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। গ্রন্থ—একাদশী ও ত্রয়োদশী (কাব্য), আবেগ, বিজয়-গীতিকা, ত্রি-চিত্র, বিজন-বিজনী, চন্দ্রাজিৎ, গায়ত্রী, কমলাকান্ত, কতিপয় পত্র, মানসলীলা, পঞ্চদশী, শুকদেব, **Studies.**

বিজয়ধর্ম সূরি—জৈনাচার্য। জন্ম—১৯২৪ সংবৎ গুর্জর প্রদেশে কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত মাহুবা গ্রামে বৈশ্যবংশে। পিতা—শেঠ রামচন্দ্র। মাতা—কমলা দেবী। দীক্ষার পূর্ব নাম—মূলবন্দ। প্রথম বয়সে ব্যবসায়ে লিপ্ত হন ও বিষয়কার্যে বিশেষ দক্ষতালাভ করেন। মাত্র পঞ্চদশ বয়সে সট্টা ও দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া পড়েন। বিংশ বয়ঃক্রম বয়সে ইঁহার চরিত্রের পরিবর্তন হয় এবং সংসার ত্যাগ করেন। দীক্ষাগ্রহণ (১৯৪৩ সংবত) এবং ধর্মবিজয় নাম গ্রহণ। এই সময় অতি অল্পকালের মধ্যেই সংস্কৃত, প্রাকৃত, ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রে অগাধ পারদর্শিতা লাভ করেন। অতঃপর ইনি বহু লুপ্তপ্রায় ও লুপ্ত জৈন তীর্থসমূহের উদ্ধার সাধন করেন। জৈনদিগের শিক্ষার নিমিত্ত বহু জৈন পাঠশালা স্থাপন করেন। 'শাস্ত্রবিশারদ জৈনাচার্য' উপাধিলাভ। "শ্রীযশোবিজয় জৈন গ্রন্থমালা'র প্রবর্তক। ইনি শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য। গ্রন্থ—জৈনতত্ত্ব-দিগ্‌দর্শন, আত্মোন্নতি দিগ্‌দর্শন, পুরুষার্থ দিগ্‌দর্শন, ইন্দ্রিয়পরাজয় দিগ্‌দর্শন; সম্পাদিত গ্রন্থ—যোগশাস্ত্র।

বিজয়ধ্বজ—মাধ্ব সম্প্রদায়ের আচার্য। গ্রন্থ—ভাগবত তাৎপর্য।

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গোল সমুরা (১২৯০), হাতেম তাই (১২৮৪)।

বিজয় পণ্ডিত—প্রাচীন কবি। জন্ম—১৫শ শতাব্দীতে সাগরদীয়ার বন্দ্যোবংশে। ইনি মহাভারতের অনুবাদক। গ্রন্থ—বিজয়পাণ্ডব কথা।

বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত—সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৯০০ খৃঃ বরিশাল জেলার অন্তর্গত মাহিলাড়া গ্রামে। এম-এ পাঠকালে (১৯২১) অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান এবং কারাবরণ। ছাত্রজীবন হইতেই সাহিত্যের প্রতি বিশেষ প্রীতি। অভ্যুদয় প্রেস প্রতিষ্ঠা (বরিশাল শহরে)। পরিচালনা—বরিশাল (সাপ্তাহিক), তরুণ (মাসিকপত্র)। কর্ম—'বঙ্গবাণী'র সম্পাদকীয় বিভাগে, প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুতে। গ্রন্থ—ছায়ালোকের নরনারী (১৯৩৪) ছায়াপথের তারকা (১৯৪৫), মহামানব মহাত্মা (১৯৪৮), বর্ষপঞ্জী (১৯৪৭)। সম্পাদক—বঙ্গবাণী (দৈনিক), বাঙ্গালার বাণী (সাপ্তাহিক, ১৯৩২), কেশরী (দৈনিক, কলিকাতা); প্রধান সম্পাদক—নবশক্তি (সাপ্তাহিক), সহ-সম্পাদক—যুগান্তর (দৈনিক, ১৯৩৭), বর্তমানে যুগ্ম-সম্পাদক—যুগান্তর।

বিজয়রত্ন মজুমদার—ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিক। ইনি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বহু রচনা প্রকাশ করেন। শিশুসাহিত্যেও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। গ্রন্থ—সাথী, স্বপ্নপরিণীতা, আলোকে আঁধারে, দিশেহারা, হাতের নোয়া, স্নেহাশীষ, সতীত্বের মূল্য, গৃহদেবী, সরীক, ছোড়দি, প্রণয়মিলন, হীরার কষ্টি, প্রীতির নিদর্শন, নূতন বধূ, কিশোরী, বধূ, চণ্ড, ধনুর্ভঙ্গ, হামির, ছেলেদের সত্যাগ্রহ, কর্মদেবী, রাণা কুম্ভ, বাপ্পাবীর, ছেলেদের গোপালভাঁড়, আজাদ হিন্দের অঙ্কুর, মহাতীর্থ; সম্পাদক—বাসন্তী (সাপ্তাহিক, ১৩২৯—৩২), সচিত্র শিশির (সাপ্তাহিক, ১৩৩০—৩১)।

বিজয়রত্ন সেন, কবিরঞ্জন,—আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক। জন্ম—

১৮৫৮ খৃঃ ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের কাঁচাদিয়া গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৮ বঙ্গ আশ্বিন কলিকাতা। পিতা—জগৎচন্দ্র সেন। মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ (১৯০৮)। চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, কলিকাতা কুমারটুলীতে ঔষধালয় স্থাপন। গ্রন্থ—অষ্টাঙ্গ-হৃদয় (অনুবাদ)।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়—কবি ও সাহিত্যিক। জন্ম—নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর। ইনি বহু সাময়িক পত্রের নিয়মিত লেখক। গ্রন্থ—রিয়ালিষ্ট রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লী-চিত্র, বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ, সাম্যবাদের গোড়ার কথা, সবহারাদের গান (কাব্য), মনের গভীরে, মনের খেলা, মানুষের অধিকার।

বিজয়সিংহ গণি—টীকাকার। টীকাগ্রন্থ—ন্যায়সার টীকা।

বিজয়সিংহ সূরি—জৈন আচার্য। গ্রন্থ—ভুবনসুন্দরী (১৩০৯ খৃঃ)।

বিজয় সূরি—জ্যোতির্বিদ্। গ্রন্থ—প্রশ্নরত্নসার।

বিজ্ঞানভিক্ষু—দার্শনিক হিন্দু সন্ন্যাসী। জন্ম—১৬শ শতাব্দীতে উত্তর-ভারতে। ইনি বিষ্ণুভক্ত সমন্বয়বাদী। গ্রন্থ—সাংখ্যসার, প্রবচনভাষ্য, যোগসার, যৌগবার্ত্তিক, ব্রহ্মসূত্রের বিজ্ঞানামৃতভাষ্য।

বিজ্ঞানানন্দ স্বামী—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী। পূর্বনাম—হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। মৃত্যু—১৩৪৫ বঙ্গ ১২ই বৈশাখ। কর্ম—পুণা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে পাশ করিয়া অযোধ্যা সরকারী পূর্ত বিভাগে কর্ম। পরমহংসদেবের সাক্ষাৎলাভ। এলাহাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা। বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ পদ লাভ। গ্রন্থ—সূর্য-সিদ্ধান্ত (অনুবাদ)।

বিজ্ঞানেশ্বর যোগী—টীকাকার। জন্ম—১১শ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের কল্যাণ নগরে। পিতা—পদ্মনাভ ভট্ট। দাক্ষিণাত্যের চৌলুক্যবংশীয় ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের (বিক্রমাঙ্কদেবের) আশ্রিত। গ্রন্থ—মিতাক্ষরা (টীকা)।

বিদেশ্বরী প্রসাদ—জ্যোতির্বিদ্। গ্রন্থ—স্ত্রীজাতক।

বিদ্দন দীক্ষিত—জ্যোতির্বিদ্। গ্রন্থ—মুহূর্ত্তকল্পদ্রুমমঞ্জরী (টীকা, ১৬২৭ খৃঃ)।

বিদ্যাকর—জ্যোতির্বিদ্। গ্রন্থ—গৃহবিদ্যাধর (১৬৩৮ খৃঃ)।

বিদ্যাদাসজী—দাদূপন্থী সাধক। গ্রন্থ—ভক্তবাণী।

বিদ্যাধর—গ্রন্থকার। ১৩-১৪শ শতাব্দী (কেহ কেহ ইহাকে উৎকলবাসী বলেন)। গ্রন্থ—একাবলী (অলঙ্কার শাস্ত্র, ১২৩৮—৬৪ মধ্যে রচিত)।

বিদ্যাধর কবিরাজ—জ্যোতির্বিদ্। গ্রন্থ—কেরলরহস্য।

বিদ্যাধর কবিরাজ—আয়ুর্বেদবিদ্। গ্রন্থ—কেলিরহস্য।

বিদ্যানন্দ—জৈন পণ্ডিত। ৮১০ খৃঃ বর্তমান। গ্রন্থ—অষ্ট সাহস্রী।

বিদ্যানাথ—কবি। ১৩-১৪ শতাব্দী দাক্ষিণাত্যে। অরুণ-কুণ্ড পত্তনে বা একশিলায় (ওয়ারাংগাল নগরে) রাজা প্রতাপরুদ্রের আশ্রিত। গ্রন্থ—প্রতাপরুদ্র-কল্যাণ (১৩০০ খৃঃ), প্রতাপরুদ্র-যশোভূষণ (আলঙ্কারিক গ্রন্থ)।

বিদ্যানাথ—জ্যোতির্বিদ্। গ্রন্থ—জ্যোৎপত্তি শিরোমণিসার।

বিদ্যানিবাস—পণ্ডিত। পূর্ণ নাম—কালীশ্বর বিদ্যানিবাস। জন্ম—১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপে বাসুদেব-সার্বভৌম-বংশে। পিতা—রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতি। গ্রন্থ—মুগ্ধবোধ-টীকা, দানকাণ্ডাখ্য (১৫৮৮ খৃঃ)।

বিদ্যাপতি—প্রাচীন মৈথিলী কবি। জন্ম—১৩৭৪ খৃঃ (আনু) মিথিলার অন্তর্গত সীতামারী মহকুমার বিস্ফী নামক গ্রামে। পিতা—গণপতি ঠাকুর। ইনি প্রায় মিথিলার দশ জন রাজা—রাজা কীর্তি-সিংহ, বীরসিংহ, দেবীসিংহ, মহারাজ শিবসিংহ, রাণী লছিমা দেবী, রাজা পদ্মসিংহ, রাণী বিশ্বাসদেবী, রাজা বীরসিংহ, ভৈরবসিংহ ও রামভদ্রের যথাক্রমে সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি বৈষ্ণব কবি। অনেকের মতে ইনি মিথিলা-প্রবাসী বাঙ্গালী কবি। ইঁহার পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য রত্ন। গ্রন্থ—কীর্তিলতা (সংস্কৃত গ্রন্থ—কীর্তিসিংহের সময়ে), পুরুষ-পরীক্ষা (মহারাজ শিবসিংহের আদেশে), লিখনাবলী (সংস্কৃত, পত্র লিখিবার পদ্ধতি), শৈবসর্বস্বসার (বিশ্বাস-দেবীর আজ্ঞায়), গঙ্গাবাক্যাবলী (ঐ), বিভাগসার (স্মৃতিগ্রন্থ, নরসিংহদেবের উৎসাহে), দানবাক্যাবলী (ঐ), গয়া-পত্তন (রাণী ধীরমতির আদেশে), দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী, কীর্তিপতাকা।

বিদ্যাপতি ঠাকুর—মৈথিলী কবি ও নাট্যকার। হিন্দী ভাষায় রচিত গ্রন্থ—পারিজাতহরণ (নাটক), রুক্মিণী-পরিণয় (ঐ—ইহাই বোধ হয় হিন্দী ভাষায় প্রথম নাটক)।

বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারী—গৌড়দেশবাসী অনুবাদক। গ্রন্থ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (পদ্যানুবাদ)।

বিদ্যাভরণ—দার্শনিক পণ্ডিত। গ্রন্থ—বিদ্যাভরণী (খণ্ডন-খণ্ডখণ্ডম্-এর টীকা)।

বিদ্যারণ্য—জ্যোতির্বিদ্। গ্রন্থ—ভাবনির্ণয় (১৮৩৮ খৃঃ)। কালজ্ঞান।

বিদ্যারণ্য মুনি—মাধবাচার্য দ্রষ্টব্য।

বিধুবদন গোস্বামী—সংবাদপত্রসেবী। সম্পাদক—ঢাকা রিভিয়ু ও সম্মেলন (১৩১৮-১৩২৯)।

বিধুভূষণ দত্ত—সাহিত্যিক। সম্পাদক—ভারতের সাধনা (১৩৩৪-৩৯)।

বিধুভূষণ বসু—গ্রন্থকার। ইনি বহু গল্প, উপন্যাস ও নাটক রচনা করেন। গ্রন্থ—উপন্যাস—লক্ষ্মীবৌ, লক্ষ্মীমা, লক্ষ্মী মেয়ে, বনমালা, স্বয়ম্বরা, দীপালির বাজী, নষ্টোদ্ধার, বিষের বাতাস, জ্যাঠাইমা, কুলের কালী, প্রখরা, অমৃত গরল, সতীলক্ষ্মী, চারুচন্দ্র, সুভদ্রা; নাটক—দাদা, ব্রহ্মচারিণী, গোধন। সম্পাদক—পল্লীচিত্র (১৩১৩)।

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রায়বাঘিনী, অভিরাম গোস্বামী, বঙ্গবীর রণজিত রায়।

বিধুভূষণ মিত্র—সাহিত্যিক। সম্পাদক—হিন্দু দর্শন (মাসিক, ১২৮৭)।

বিধুভূষণ রায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—শিলচর (পাক্ষিক, ১২৯৬)।

বিধুভূষণ সরকার—নাট্যকার ও সাহিত্যিক। জন্ম—কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলিয়াঘাটার সরকার-বংশে। নাট্যগ্রন্থ—মহারাষ্ট্র জাগরণ, কর্মরহস্য, রাজসিংহ, আসল-মেকি, কুরুপাণ্ডবের গুরুদক্ষিণা। সম্পাদক—বিশ্ববন্ধু (৪৩৩ গৌরাব্দ)।

বিধুশেখর শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায়—পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী। অধ্যাপক শান্তিনিকেতন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থ—মিলিন্দ

পন্থ (পালি ও বাংলা), শতপথ ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ, উপনিষদ্ সংগ্রহ, পালিপ্রকাশ, বিবাহমঙ্গল।

বিধু সেন—কবি। গ্রন্থ—দময়ন্তীর চৌতিশা।

বিনয়কুমার সরকার—অর্থনীতিবিদ্ ও শিক্ষাব্রতী। মৃত্যু—১৩৫৬ বঙ্গ অগ্রহায়ণ আমেরিকায়। শিক্ষা—এম. এ (১৯০৬), ডক্টরেট (তেহেরাণ)। অগ্নিময় যুগে ডন সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করিয়া বাংলার হিতসাধন ব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অক্লান্ত কর্মী। কর্ম—অধ্যাপক—জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ (১৯০৭), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠাতা—মালদহ, বিক্রমপুর, সেনহাটী, জাতীয় বিদ্যালয়। জাতীয় শিক্ষা প্রচারক। ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত ভাষাশিক্ষা দান—ইঁহার শিক্ষাবিধির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বিদ্যাবৈভব (কাশী) উপাধি লাভ। ইংরেজি, জর্মান, ইটালিয়ান, ফরাসী ভাষাবিদ্। ভারতের সভ্যতা ও সাধনার প্রচারকরূপে চীন, জাপান, ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রিয়া (১৯১৪—১৯২৫); ইটালী, সুইটজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইউরোপ ভ্রমণ (১৯২৯—৩১)। প্রতিষ্ঠা—বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ্ (১৯২৮), বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদ্ (১৯৩৭), আর্থিক উন্নতি (মাসিক, ১৯২৬); পরিচালক—গৃহস্থ (মাসিক, ১৯১১-১৪)। গ্রন্থ—বঙ্গে নবযুগের শিক্ষা (১৯০৭), শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা (১৯১০), প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা (১৯১০), ভাষাশিক্ষা (১৯১০), সংস্কৃত-শিক্ষা (১৯১২), ইংরেজি-শিক্ষা (ঐ), ঐতিহাসিক প্রবন্ধ (ঐ), শিক্ষা-সমালোচনা (ঐ), সাধনা (ঐ), বিশ্বশক্তি (১৯১৪), নিগ্রোজাতির কর্মবীর (ইং অনুবাদ—১৯১৪), পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র (জর্মান হইতে অনুবাদ, ১৯২৪), ধন-দৌলতের রূপান্তর (ফরাসী ভাষা হইতে অনুবাদ, ১৯২৮), স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি (জর্মান ভাষা হইতে অনুবাদ ১৯৩২), রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী (১৯১৪), বর্তমান জগৎ, ১৩ খণ্ড (১৯১৫—৩৫)—(১) কবরের দেশে দিন পনেরো (১৯১৬), (২) ইংরেজের জন্মভূমি (ঐ), (৩) বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র (১৯১৫), (৪) ইয়াঙ্কিস্থান বা অতিরঞ্জিত য়ুরোপ (১৯২৩), (৫) নবীন এশিয়ার জন্মদাতা জাপান (১৯২৭), (৬) বর্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য (১৯২৮), (৭) চীনা সভ্যতার অ আ ক খ (১৯২২), (৮) প্যারীসে দশ মাস (১৯৩২), (৯) পরাজিত জর্মানি (১৯৩৫), (১০) সুইটজারল্যাণ্ড (১৯৩০), (১১) ইটালীতে বার কয়েক (১৯৩২), (১২) দুনিয়ার আবহাওয়া (১৯২৫), (১৩) নবীন রাশিয়ার জীবনপ্রভাত (১৯২৪—রুশ ভাষা হইতে অনূদিত), হিন্দু রাষ্ট্রের গঠন (১৯২৬), একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র ১ম (১৯৩০), ২য় (১৯৩৫), বাংলার ধনবিজ্ঞান, ১ম (১৯৩৭), ২য় (১৯৩৯), নয়া বাংলার গোড়াপত্তন (১৯৩২), বাড়তির পথে বাঙালী (১৯৩৪), সমাজবিজ্ঞান, ১ম (১৯৩৮), **Futurism of young Asia** (বার্লিন, ১৯২২)। সম্পাদক—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকা (১৯১২), আর্থিক উন্নতি (১৩৩৩), সমাজ-বিজ্ঞান।

বিনয়কুমার সান্যাল—দেশহিতৈষী ও গ্রন্থকার। জন্ম—নদীয়া জেলায় শান্তিপুরে। শিক্ষা—বি. এ। স্থাপনা—শান্তিপুর স্বদেশী-ভাণ্ডার, জাতীয় বিদ্যালয়। গ্রন্থ—ভাগবতগীতিকা ১ম, গীত-প্রবেশিকা, বিদগ্ধমাধব (নাটক)।

বিনয়কুমারী (বসু) ধর—মহিলা কবি। জন্ম—১৮৭২ খৃঃ নভেম্বর। মৃত্যু—কলিকাতা। ইনি ব্যারিষ্টার মনোমোহন বসুর ভাগিনেয়ী। শিক্ষা—বেথুন কলেজ। প্রথম রচনা—জাগো (ভারতী, ১২৯৫)। গ্রন্থ—নবমুকুল (কাব্য, ১৮৮৭), নির্ঝর (কাব্য ১৮৯১)।

বিনয়কৃষ্ণ দেব, রাজাবাহাদুর—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৬৬ খৃঃ আগষ্ট শোভাবাজার রাজবংশে। মৃত্যু—১৯১২ খৃঃ ১লা ডিসেম্বর। পিতা—মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব। অল্প বয়সে সাহিত্য ও রাজনীতি-চর্চা। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের (১৮৯৪ খৃঃ), শোভাবাজার বেনা-ভোলেণ্ট সোসাইটীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বহু সদনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। রাজা উপাধি (১৮৯৫) লাভ। গ্রন্থ—পঞ্চপুষ্প, **Early History & Growth of Calcutta.**

বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। দেওয়ানী আদালত দর্পণ, সাবিত্রী।

বিনয়কৃষ্ণ সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—হিন্দু সংগঠন, অস্পৃশ্যের মুক্তি, বিপ্লবের আহুতি, সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা, ব্রহ্মচর্য, অনাসক্তি যোগ, দুর্নীতির পথে, স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতা।

বিনয় ঘোষ—গ্রন্থকার। জন্ম—১৩২৪ বঙ্গ ৩১এ জ্যৈষ্ঠ দক্ষিণ কলিকাতা মনোহরপুকুরে। পৈতৃক নিবাস—যশোহর জেলায় বনগ্রাম মহকুমার গোঁড়পাড়ায়। শিক্ষা—কলিকাতা। ছাত্রাবস্থা হইতেই মার্কসবাদী। কর্ম—ফরওয়ার্ড ব্লক, অরণি, দৈনিক বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগে। গ্রন্থ—শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ (১৯৩৯), নূতন সাহিত্য সমালোচনা, সোভিয়েট সভ্যতা ২ খণ্ড, ভারত ও সোভিয়েট মধ্য এশিয়া, শ্রীবৎসের নানা প্রসঙ্গ, বোধন, বাঙ্গালার নবজাগৃতি।

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য—শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার। জন্ম—২৪ পরগণার অন্তর্গত নৈহাটী গ্রামে। পিতা—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। শিক্ষা—এম. এ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক। পি, এইচ, ডি। রাজরত্ন, জ্ঞানরত্ন উপাধি লাভ। কর্ম—বরোদা রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগের অধিকর্তা, গ্রন্থাধ্যক্ষ, বরোদা রাজ্যের ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউট লাইব্রেরী। গ্রন্থ—**The Indian Buddhist Iconography** (১৯২৪), সম্পাদক—**Gaekwad's Oriental Series.**

বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত—গীতিকার। জন্ম—১৩১৪ বঙ্গ ৯ই ভাদ্র ঢাকা জেলার বেড়া-তেঘরিয় (মাতুলালয়ে)। পিতা—কালীপদ দাশগুপ্ত। পৈতৃক নিবাস—ঢাকা-বিক্রমপুর নয়নাগ্রাম। হুগলী জেলায় মনোহরপুরে স্থায়ী বাস। বাল্যকাল হইতেই কবিতা ও গান রচনা। গ্রামোফন রেকর্ডে ও বেতারে বহু গান রচনা। সঙ্গীতজ্ঞদের সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখক। গ্রন্থ—রাগসঙ্গীত (বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী সহ)। সহ-সম্পাদক—প্রবর্তক (মাসিক), সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা (মাসিক)।

[ক্রমশঃ।

তখন আমি জেলে

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

২১

কিন্তু, মহামান্ত বৃটিশরাজের কাছ থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করেছি আমরা যে, সন্ধিপত্র is nothing more than a scrap of paper অর্থাৎ তুচ্ছ এক টুকরো কাগজ মাত্র। সংগ্রাম যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে, তখন দিন কতক আলাপ-আলোচনার পর বিজেতা দলের ডিক্টেশন ও বিজিত দলের সাময়িক ভাবে নিরুপায় নতি-স্বীকারের ফলে কিছু কাল ও কিছু সময় অপব্যয় করে যে আপোষ-নামা প্রণীত হয়, গাল-ভরা ভাষায় তাকেই তখন বলা হয় সন্ধিপত্র। এই সন্ধিপত্রের মর্য্যাদা আজ অবধি দুনিয়ায় কেউ মেনে নেয়নি, মেনে চলেনি ; তাই তা দুনিয়ায় আজো হানাহানির নেই এতটুকু কমতি !

অবশ্য, ছাই চাপিয়ে আগুন ঢাকবার চেষ্টা হয়েছে বহু বার। যুক্তির শাণিত খড়্গে জমাট ভাবাবেগকে খান্‌খান্ করে কেটে ফেলে দিয়ে অথবা তোষামোদ করে, হাতে-পায়ে ধরে, বিনতি-মিনতির মরা-কান্না কেঁদে অসংখ্য বার চেষ্টা করা হয়েছে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার। কিন্তু হায়, ছিপি-খুলে-রাখা শিশির মধ্যে থেকে কর্পূর উড়ে যাওয়ার মতো সদিচ্ছা ও সহনশীলতা, আপোষ-রফা ও সন্ধির সাধুতা কখন্ এক সময় যে ছেড়ে চলে যায়, টের পাওয়া যায় তখন, যখন একেবারে শোনা যায় তূর্য্যধ্বনি, শুনতে পাওয়া যায় খাপখোলা তলওয়ারের ঝনৎকার, দিগ দিগন্ত যখন প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে যুধ্যমান সেনাদলের বিজয়-গর্জ্জনে। কাগজের টুকরোখানা তখন সমাধি লাভ করে ওয়েষ্ট পেপারের ঝুড়িতে !

অনশন-সংগ্রামে জয়লাভ করেছি আমরা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। একে কোন ক্রমেই জয় বলা যায় না। যে দাবীর তালিকা পেশ করতে গিয়ে একদিন উদাত্ত হয়ে উঠেছিল আমাদের কণ্ঠ মেঘ-গর্জ্জনের মতো, বিপর্য্যয় আসন্ন দেখে আর একদিন সেই কণ্ঠেরই স্বরগ্রাম আনলাম আমরা নামিয়ে, কমিয়ে আনলাম দাবীর সংখ্যা। তার পর এক দিন নিজেরাই গরজ করে, আগ্রহ দেখিয়ে উদ্ধত টবিনের আপোষের সর্ত্তগুলি এক-এক করে গলাধঃকরণ করতে হলো তিক্ত বটিকার মতো। মনে মনে অবশ্য খুশী হলো না এক জনও। ফলে, এর পর থেকেই কর্তৃপক্ষের সাথে কারণে-অকারণে হামেশাই আমাদের খিটিমিটি চলতে লাগলো।

রাত্রে ঘর বন্ধ করবার পূর্ব্বে ওরা যখন গুণতি করতে আসতো, প্রায়ই ভুল হতো ওদের। কারণ গুটানো বিছানার মধ্যে একটি লোক কি ভাবে ঘণ্টা খানেক লুকিয়ে থাকতে পারে, তা বোঝবার মতো বুদ্ধি গাড়োয়ালী মগজে ছিল না। তাই দরজায় তালা এঁটে ওরা সারা শিবির তন্ন-তন্ন করে তল্লাসী করে মরতো নিরুদ্দিষ্টের জন্য। তার পর ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে গলদঘর্ম্ম শরীরে যখন আবার গুণতি করতো, সবিস্ময়ে এবার খাতা খুলে দেখতো যে গুণতি মিলে গেছে।

কিন্তু বেশী দিন চললো না এই খেলা। দিবাকর নিজেই বা তার কোনো উৎসাহী সাকরেদ কোনো ছুতো করে অফিসে গিয়ে হয়তো শ্রীমান পবিত্রের কর্ণকুহরে ঢেলে দিয়ে এসেছে এই গুপ্ত ক্রীড়ার রহস্য। তাই দেখা গেল, এবার ওরা বাইরের মাঠ তল্লাসী করবার পূর্ব্বে ঘরের বিছানা উল্টে দেখে, খাটের নীচে ও পাইখানাতেও উঁকি মারে।

গাড়োয়ালী সিপাইদের সঙ্গে আমাদের পুরাতন দোস্তালীর কথাও বোধ হয় কী ভাবে টের পেয়ে গেছেন পবিত্র সরকার। তাই, অকস্মাৎ একদিন দেখা গেল, গাড়োয়ালী সেনাদল বদলি হয়ে গেছে, আর তাদের স্থানে এসেছে আনকোরা পাঠান সিপাই। এদের প্রত্যেকেই অন্ততঃ ছ'ফুট লম্বা, শরীরে মাংস ও মেদের চাইতে মোটা মোটা হাড়, খুব ষ্টাইল করে কামানো গোঁফ আর বব, করে ছাঁটা চুলে ঘাড়-কামানো। সারা মুখমণ্ডলে কেমন যেন একটা রুক্ষতার ছাপ, দু'-পাঁচ মিনিট কথা কইলেই তা আরও স্পষ্ট প্রকট হয়ে উঠতো। শিবিরে প্রবেশ করবার পূর্ব্বেই বোধ হয় এদের ফল্‌ ইন্ করিয়ে কমাণ্ডাণ্ট টবিন শিবিরে যে সব সরকার-বিরোধী ডাকাত ও নরঘাতকদের আটকে রাখা হয়েছে, প্রাঞ্জল ভাষায় তাদের কুকীর্ত্তিগুলো ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছে এবং বিনা পরিশ্রমে আমাদের মাসিক খাদ্য ও অন্যান্য ব্যয়-বাবদ মোটা টাকা বেরিয়ে যায় বলেই যে সিপাইদের তলব বৃদ্ধির সদিচ্ছা সদাশয় সরকারের মনে সর্ব্বক্ষণ কাঁটার মতো বিঁধলেও তাঁরা কার্য্যে তা পরিণত করতে পারছেন না—গবুচন্দ্র গিরিজাও নিশ্চয়ই ঝোপ বুঝে এই কোপটি মেরে দিয়েছেন !

গেটের বাইরে এদের রুক্ষ মেজাজে যে মনোবৃত্তি ইনজেক্ট করে দেয়া হয়েছে, শিবিরের অভ্যন্তরে ডিউটিতে এসে তারই তিক্ত অভিব্যক্তি পাওয়া যেতে লাগলো প্রতি পদে।

আমাদের চাকর-বাকর-রাঁধুনীদের গুণতি হতো দিনের মধ্যে দু'বার। গাড়োয়ালী সিপাইরা রসুই-ঘরে ঢুকে সর্দ্দার কয়েদীর কাছ থেকেই সব তথ্য নিয়ে চলে যেত, আমাদের দৈনন্দিন কাজে অনর্থক বাধা সৃষ্টি করতে চাইতো না। আর, পাঠানরা এসেই সর্ব্বপ্রথম আইন প্রয়োগ করলো এদেরই বেলায়। হুকুম হলো, বারোটা বাজলেই হাতের সহস্র কাজ ফেলে রেখে জেলের নিয়মের মতো এই সব সাধারণ কয়েদীকে ফাইল করে বসতে হবে ব্যারাকের বারান্দায়-বারান্দায়। এই কয়েদীর সংখ্যা প্রায় দু'শো। সিপাইরা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এক-এক করে এদের গুণতো—একবার নয়, একাধিক বার।

অর্থাৎ প্রায় একটি ঘণ্টা সময় নষ্ট হতো আমাদের। নয়া কিচেন-ম্যানেজার দিলীপ বাবুর সঙ্গে এই দুর্ব্যবস্থা নিয়েই প্রথম ওদের সেকসন-কমাণ্ডারের সঙ্গে বেশ বিতর্ক হয়। কমাণ্ডার নিয়মের বাঁধন এতটুকুও শিথিল করতে রাজী নয়, ফলে, অসুবিধে হতো সীমাহীন। অতগুলো লোকের কিচেনে রাবণের চুল্লীর ওপর সারি সারি বিরাটকায় ডেকচি ও কড়াইতে রান্না চলেছে, এমন সময় ঘণ্টা বেজে উঠলো—ব্যস্, সবাই চলে গেল কিচেন ছেড়ে। ম্যানেজার দিলীপ বাবুর তখন সঙ্গীন অবস্থা। কোনটা সামলাবেন তিনি,—কোন্ ডেকচিটা বা কোন্ কড়াইটা ?

এ নিয়ে অফিসে রিপোর্ট করেও কোন সুফল হয়নি। ওঁরা বলেন, নিয়মের ব্যতিক্রম তো ওরা কিছু করে না, শুধু একটু বেশী মেনে চলে। তা নিয়মভঙ্গের কথা আমরা উচ্চারণ করি কী ভাবে? ওদেরই একটু বলে-কয়ে নেবেন, আমরা বাধা দোব না।

কিন্তু বলা-কওয়া চলে তাদেরই সঙ্গে, যারা যুক্তি বোঝে ও মানে। এদের কাছে সে আশা বৃথা। মেসিনের মত এরা সর্ব্ব অবস্থায় ওপরওয়ালার হুকুম তামিল করে চলে অক্ষরে-অক্ষরে। নিজের কিছু বুদ্ধি থাকলেও তা খাটাবার মত মনোবৃত্তি বা সৎসাহস এদের নেই। তাই আমাদের সঙ্গে এদের ঠোকাঠুকি ক্রমে বেড়েই চললো।

একদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর একটু ঘুমের আয়োজন করছি, এমন সময় অকস্মাৎ বাইরে গোলমাল শোনা গেল। দ্রুতপদে কমেট এসে বললো: জলদি চলুন দ্বিজেন বাবু, ওদিকে সাংঘাতিক ব্যাপার লেগে গেছে।

ছুটে বেরিয়ে এলাম। কিচেনের কাছে গিয়ে দেখি একটি ছোটখাটো জন-সমাবেশ। জন কয়েক সিপাইকে ঘিরে এক দল রাজবন্দী চীৎকার করে বচসা সুরু করে দিয়েছেন এবং সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলাম, সেই দলের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের ঘরের মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। তার হাতে একখানা স্যাণ্ডেল। ছ'ফুট দীর্ঘ সিপাইয়ের মুখের কাছে স্যাণ্ডেল তুলে বলছে সাড়ে চার ফুট দীর্ঘ মনোরঞ্জন: চোপ রও উল্লুক, বেশী বাত বোলেগা তো এক জুতিসে দাঁত তোড় দেগা।

আমরা ক'জন গিয়ে পড়তেই ঝগড়াটা শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানী বচসাতেই শেষ হয়ে গেল বটে, কিন্তু বেশ অনুমান করলাম, কোনো দিন কোনো রকম সুযোগ পেলেই এই কাণ্ডজ্ঞানহীন হিংস্র সিপাইগুলো প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করবে না। আমাদের মধ্যেও সবাই এমন ধীর, স্থির ও যুক্তিবাদী ছিলেন না বা নিয়মানুগ ছিলেন না যে, সংঘর্ষ সর্ব্বদাই চলবেন এড়িয়ে আর যদিই বা অপ্রত্যাশিত ভাবে তা এসে পড়ে, তা হলে ন্যূনতম বিতর্কের মধ্যেই তা সমাধিস্থ করবার চেষ্টা করবেন অথবা দরখাস্ত ও প্রতিনিধিত্ব দ্বারা বিভাগীয় শাস্তির দাবী জানাবেন।

ক্রমে ক্রমে অবস্থা এমনি দাঁড়ালো যে, যে-কোনো অসতর্ক মুহূর্ত্তে সামান্য একটি দেশলাইয়ের কাঠি এসে পড়লেই এই বারুদখানা প্রচণ্ড নির্ঘোষে বিস্ফারিত হবে! সুতরাং আমরা সেই 'কিয়ামৎ রাত্রির' অপেক্ষা করতে লাগলাম রুদ্ধশ্বাসে। পুঞ্জীভূত মেঘের ভীম হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে, সর্পিল বিদ্যুতের আগ্নেয় ভ্রূকুটি তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে আকাশ চিরে চিরে ফেলছে। পাগলা হাওয়ার মাতাল গতিবেগ আসন্ন ঝটিকার আগমনী গাইছে···আর দেরী নেই। এখানেও হয়তো ঘটবে হিজলীর পুনরাবৃত্তি!······

এক দিন বিকেলে আমি আর খেলার মাঠে যাইনি, ইজিচেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে পড়ছিলাম হিটলারের আত্মজীবনী। ঘরে আর কেউ ছিল না, হরিমোহন আবার ঝাঁট দিচ্ছিলো ঘরখানা।

এমন সময় অকস্মাৎ মতি সিংহ ছুটতে ছুটতে এসে বললেন: জলদি যান দ্বিজেন বাবু, ওদিকে কমেট বাবুরা খেলার মাঠে এক দল সিপাইকে ঠেঙ্গিয়ে দিয়েছে হকি ষ্টীক দিয়ে।

ছুটে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে এসেই দেখলাম রীতিমত ছুটোছুটি পড়ে গেছে। দেখলাম, বীরেন ঘোষ মশারি টাঙ্গাবার লোহার সরু দু'খানা রড নিয়ে ছুটে চলেছে। ডাকতেই থামলো।

কী ব্যাপার? কোথায় চলেছেন?

এক নিশ্বাসে বলে গেল বীরেন ঘোষ: যাচ্ছি খেলার মাঠে। বিমল বাবু আর কমেট হকি ষ্টীক দিয়ে দুটো সিপাইয়ের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। এতক্ষণে ওরা এসে গেছে দল বেঁধে লাঠী নিয়ে, আমরা গ্রহণ করেছি ওদের চ্যালেঞ্জ। আজ খুনোখুনি একটা হবেই।— বলেই সে বিদ্যুৎবেগে ছুটে গেল।

এক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে রইলাম। এড়ানোর কথা এখন আর চিন্তা করা যায় না, ফলাফলের রক্তাক্ত অনিশ্চয়তা স্বীকার করেই এগিয়ে যেতে হবে। সূচনা করেছে কমেট অর্থাৎ বন্দীশিবির সেনাবাহিনীর অন্যতম সেক্সন-কমাণ্ডার অর্থাৎ বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের ভ্যানগার্ডের এক জন সৈনিক! অতএব জি-ও-সির আর মুহূর্ত্ত মাত্র দ্বিধা করবার কিছু নেই।

মাঠের প্রান্তে এসে দেখলাম, মাঠে লোকে লোকারণ্য। সবার হাতেই কোনো না কোনো হাতিয়ার। দুটো আহতকে কাঁধে করে নিয়ে যাবার সময় শাসিয়ে গেছে পাঠান সিপাই, আবার আসছে তারা তৈরী হয়ে। ডাকাতদের একবার দেখে নেবে! সেই দেখা দেবার সুযোগ দানের জন্যই প্রতীক্ষমান বন্দী-জনতা। চোখের কোণে কোণে দেখলাম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আবেগে ও উত্তেজনায় সবারই কণ্ঠ রুদ্ধ, আসন্ন সংঘর্ষের প্রতীক্ষায় সামান্যতম চাঞ্চল্যও কোথাও নেই!

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলাম সম্মুখে। কারুকে কিছু প্রশ্ন করবার সময় ছিল না। ভোলা বাবু নিঃশব্দে এসে আমার হাতে একখানা হকি ষ্টীক গুঁজে দিয়ে গেলেন।

কিন্তু, এমনি সময় অকস্মাৎ শিবির প্রকম্পিত করে পাগলা ঘণ্টি বেজে উঠলো। চতুর্দ্দিকে বিপদ-সংকেতসূচক বাঁশী শোনা যেতে লাগলো। বোঝা গেল, সম্মুখ সংগ্রামে এগিয়ে না এসে পাঠান সিপাই বেছে নিয়েছে আইনানুগ পথ। ঘণ্টি শুনে তৎক্ষণাৎ ঘরে ফিরে আসবার বশ্যতা স্বীকার করবো না আমরা, তা হলেই আমাদের ওপর নির্ব্বিচারে বলপ্রয়োগের নিয়মতান্ত্রিক শক্তি ও সমর্থন ওরা পেয়ে যাবে। কিন্তু ওদের এই ষ্ট্রাটেজি উপলব্ধি করতে আদৌ দেরী হলো না আমাদের। নিমেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো এবং দ্রুতপদে যে যার ঘরে যে শুধু ফিরে এলাম, তাই নয়, একেবারে নিরীহ সুবোধ বালকের মতো অন্য হাজারো কাজে ডুবে গেলাম। তাড়া-হুড়োতে দশ নম্বরের বিমল চক্রবর্ত্তী আর ডবলিউ-বি চোদ্দ নম্বরের কমেট আর ভোলা বাবু এসে ঢুকে পড়লো আমাদেরই ঘরে।

খট-খট করে প্রত্যেকটি ঘর তালা বন্ধ হয়ে গেল এবং গট-গট করে ডবল্ মার্চ্চ করে শিবিরের অভ্যন্তরে এসে প্রবেশ করলো সশস্ত্র পাঠানের বিরাট একটি দল। গুণতি সুরু হয়ে গেল।

সন্ধ্যে তখন সবে উৎরে গেছে। কমেট ও ভোলা বাবু তাঁদের রক্তমাখা জামা ও ধুতি বদলে নিয়ে নিবিষ্ট মনে দাবা খেলতে বসে গেছেন, সুধাংশু বাবু লিখছেন কোন্ জরুরী পত্র, সমরেন্দ্র পাল আর অমর খেলছে ক্যারম আর আমি আবার ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে তুলে নিয়েছি হিটলারের আত্মজীবনী। বিমল চক্রবর্ত্তীও তাঁর রক্তমাখা ধুতি ছেড়ে ফেলে পরেছেন ময়ূরকণ্ঠী রংয়ের একটি লুঙ্গি। খুলে বসেছেন একটি ভাঙা হারমোনিয়াম। কেউ শুনুক বা না শুনুক, গান একখানা তিনি গাইবেনই। এখন হারমোনিয়াম তা সইতে পারে ভাল, না-হয় যাক্, ভেঙে যাক্!

অভিনয় করছিলাম সবাই, তাই আমাদের কান ছিল অত্যন্ত সজাগ, মন ছিল অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। বার বারই মনে হচ্ছিলো, এবার তো প্রত্যেক ঘরে আমরা মাত্র চার জন বা ছয় জন। তালা খুলে একটি-একটি ঘরে যদি ওরা হানা দেয়, তা হলে? পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো অন্যান্য ঘরের সবাই শুধু গর্জ্জনই করবে নিস্ফল আক্রোশে, দংষ্ট্রাঘাতের সুবর্ণ সুযোগ আর পাবে না। আশঙ্কা হলো, নিশ্চয়ই ওরা এইবার খুঁজে বার করবে তাদের, এগিয়ে এসে যারা ষ্টীক চালিয়েছে বেপরোয়া ভাবে।

অকস্মাৎ চমক ভাঙ্গলো : হ্যাল্লো জি-ও-সি !

বারো জন পাঠানের একটি দল। এবার আমাদের ঘরে গুণতি হবে। বললাম : ইয়েস ?

আপনাকে না মাঠে দেখলাম হকি খেলতে ? ভারী ফার্ষ্ট ক্লাশ খেলেন তো আপনি !

বুঝলাম, ওরা সনাক্ত করতে পারছে না। বললাম : ঐ একটা খেলাই আমি পারি নে সুবাদার সাহেব ! আর শরীরটে আজ খারাপ, তাই এই বইখানাই পড়ছি দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর থেকে। A very good book—

যাঁরা আছেন, সবই কি এই ঘরের ?

সুধাংশু বাবু বললেন : না সুবাদার সাহেব। পাগলা ঘণ্টি পড়েছে তো, তাই যে যেখানে পেরেছে, ঢুকে পড়েছে। জন তিনেক বন্দী অন্য ঘরের।

বিমল বাবু এদের প্রতি দৃক্‌পাত না করে প্রাণপণে সুরের সঙ্গে স্বর মেলাবার কসরৎ করছেন। সুবাদারের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হলো।

আচ্ছা, উনি খুব ভাল গাইতে পারেন বুঝি ?

কমেট ফস্‌ করে হেসে জবাব দিল : ও ইয়েস। ধরা পড়বার আগে নিখিল ভারত মিউজিক কনফারেন্সে উনি বরাবর স্বর্ণপদক পেয়ে আসছিলেন। অনেক দিন চর্চ্চা না থাকাতে গলাটা একটু ধরে গেছে—I mean—

কূটবুদ্ধি নাজিব খাঁ এই পরিহাস বেশ বুঝতে পারলো। বলে উঠলো : I See—

তার পর সদলবলে বেরিয়ে গেল সে। ভাবলাম, এ যাত্রা ফাঁড়া কাটলো। কিন্তু আধ ঘণ্টা কেটে যেতেও দরজা খোলবার গরজ না দেখে আবার আশঙ্কা হতে লাগলো, সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয় এরা। আরও মিনিট পনেরো কেটে যেতেই পাশের কক্ষ থেকে নৃপেন পাল চেঁচিয়ে খাস কুমিল্লার ভাষায় জানিয়ে দিল সুধাংশু বাবুকে যে, এরা যাদের হাতে মার খেয়েছে, তাদের খুঁজছে। কুমিল্লার ভাষায় এ জন্য যে, বাংলা কিছু-কিছু সমঝাতে পারলেও বাঙ্গাল ভাষা ওদের কাছে গ্রীক্‌ !

সংগ্রামের জন তিনেক নায়কই তো আমাদের ঘরে ! কৌশলে এদের বাঁচিয়ে দিতে হবে। বিমল বাবু অবশ্য এতে সহজে রাজী হলেন না। খাপখোলা ছুরির মতো বিমল বাবু। যেখানেই চলেন, কেটে দিয়ে রক্তস্নান করে যান। Via media বলে কোনো শব্দ তাঁর অভিধানে নেই। যদি আরও শক্তিশালী ইস্পাতের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়, টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে যেতে চান তিনি। কিন্তু পাশ কাটিয়ে যাবেন না কোন মতেই। কোনো হিসেব, কোনো কৌশল, কোনো ষ্ট্রাটেজীর বালাই নেই তাঁর, বন্য শূকরের মতো দুর্নিবার তাঁর গতিবেগ !···

অনেক করে বুঝিয়ে শান্ত করা গেল বিমল বাবুকে।

ঋষি দাসের
ছোটদের নিউটন ১।০
ছোটদের আইনস্টাইন ১।০
ছোটদের মার্কনী ১।০
শ্রুতিনাথ চক্রবর্তীর
রাণী রাসমণি ১৲
যোগেশচন্দ্র বাগলের
ভারতের মুক্তি-সন্ধানী ২॥০
সংকল্প ও সাধনা ১॥০
রবীন্দ্রকুমার বসুর
মুক্তি-সংগ্রাম ৪৷৷০
রোলাঁর আলোকে গান্ধীজি ১॥০
সুবোধচন্দ্র রায়ের
স্বরাজ ও সাধনা ১॥০
প্রফুল্লরতন গঙ্গোপাধ্যায়ের
নবজীবনের পথে হায়দরাবাদ ১॥০
গিরীন চক্রবর্তীর
দেশ বিদেশের লেখা ৩৲

ছোটদের অন্যতম মাসিক পত্রিকা
চয়নিকা
বৈশাখ হইতে গ্রাহক হইতে হয়
নমুনার জন্য চারি আনার ডাক টিকিট লাগে
বার্ষিক ৩৲
বৈচিত্র্য ভরা রচনায় সমৃদ্ধ ও জ্ঞান বিজ্ঞানের রত্নখনি।

ভূতনাথ ভৌমিকের
ডোমিনিয়ন ভারতের পথরেখা ২৲
খগেন্দ্রনাথ মিত্রের
গোর্কীর ছেলেবেলা ১॥০
মাঙ্গোসেনের অ্যাডভেঞ্চার ৷৷০
নির্ম্মলকুমার বসুর
আরব্য উপন্যাস ২৲
কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য্যের
শ্রীমদ্ভগবতগীতা ২৲
সন্তোষকুমার ঘোষের
রূপকথার রাজ্য ১॥০
রবীন্দ্রলাল রায়ের
বলিত হাসব না ৷৷০
নলিনীকুমার ভদ্রের
আসামের অরণ্যচারী ১॥০
গদাধর নিয়োগীর
গল্প-বীথিকা ১৷৷০
H. Barik's
READY RECKONER ৩৲
PAY, WAGES INCOME TABLES ২৲

ভারতী বুক স্টল ঃঃ ৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

তিনি চুপ করে থাকবেন, কথা কইবো আমরা। বিশেষ করে সুধাংশু বাবু।

অনেকক্ষণ পর এবার বোধ হয় একেবারে নিশ্চিত হয়ে আবার এসে আমাদের ঘরে প্রবেশ করলো দুর্বৃত্ত নাজির খাঁ আর তার সঙ্গীরা। এসেই আদেশের সুরে অনুরোধ জানালো: বিমল বাবু, চলুন, আপনাকে আপনার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বোঝা গেল কিসের এত গরজ, কেন এতখানি ভদ্রতা! শিবিরের অন্যতম প্রতিনিধি যুক্তি-বিশারদ সুধাংশু বাবু এগিয়ে এলেন ধারালো যুক্তি নিয়ে। আমি এলাম নানা হালকা কথায় ওদের জিঘাংসার উত্তাপ খানিকটে কমিয়ে দিতে, সমরেন্দ্র পাল এলেন সামরিক কুচকাওয়াজের ঔৎসুক্যময় গল্প ফাঁদতে, কিন্তু দেখা গেল এবং দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম যে, ভবি ভোলবার নয়।

অগত্যা কমেট এগিয়ে এসে বললো: চলিয়ে, হাম ভি যায়েগা হামারা ডবলিউ-বি চৌদ নম্বরমে।

ভোলা বাবুও যেতে চাইলেন, কিন্তু নাজির খাঁ বলছে যে, সবার আগে সে বিমল বাবুকে তাঁর দশ নম্বরে পৌঁছে দেবে, তার পর—

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলাম নিমেষের জন্য। বিমল বাবুর হকি-ষ্টীকের আঘাতেই যে এক জনের মাথা ফেটে গেছে এবং জখম হয়েছে জন কতক, এতক্ষণে এরা তা বুঝতে পেরেছে এবং সন্দেহাতীত ভাবে বুঝতে পেরেছে। ওরা সংখ্যায় দশ বারো জন, এবং ওদের হাতে বিলিতি বেতের মোটা রেগুলেশন ষ্টীক আর আমাদের একেবারে খালি হাত। তথাপি বিমল বাবুর রণ-হুঙ্কার আর প্রচণ্ড ভাবে এলোপাথাড়ী ষ্টীক চালাবার বীভৎস দৃশ্য এখনো ওদের মনে ভাসছে। তাই বুঝি ওঁকে বারান্দায় একক করে নিয়ে···

বিমল বাবু কিন্তু তখনো পরম নিশ্চিন্তে হারমোনিয়ামের সঙ্গে কুস্তি করছেন আর মোটা কাচের আড়াল থেকে রহস্যময় চোখে সেদিকে চেয়ে অমর মৃদু-মৃদু হাসছে।

কী যে করবো এই নাছোড়বান্দা দস্যুদের সঙ্গে বুঝতে পারলাম না, এমন সময় বিমল বাবুই নেমে এলেন খাট থেকে: চলিয়ে সুবাদারজী, হামারা ঘরমেই চলিয়ে। বা কি বাত এহি হ্যায়, গুনতি তো মিল্ গিয়া, অভি তো লম্বর খোল দিয়া যায়গা।

কথা কইবার আর অবসর পেলাম না আমরা। বিমল বাবুকে নিয়ে ওরা বেরিয়ে গেল। আমাদের দরজায় তালা পড়লো।

কিন্তু মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড হবে। তার পরই অকস্মাৎ এমনি একটা তীব্র চীৎকার দেয়ালে-দেয়ালে আছাড় খেয়ে উঠলো যে, আমাদের অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠলো! সে চীৎকার বর্ণনা করবার ভাষা আজো তৈরী হয়নি। আর্ত্তনাদ তাকে বলতে পারি নে, বলতে পারি নে অসহায় মেষশাবকের করুণ ক্রন্দন। রাইখষ্ট্যাগে প্রবেশের প্রাক্কালে রক্তাক্ত লাল ফৌজ হের হিটলারের সাক্ষাৎ পাবার অধীর আগ্রহে যে উল্লাসধ্বনি করে উঠেছিল, নরপিশাচ নাজির খাঁ ও তার পাঠান অনুচরদের কণ্ঠে যেন শুনেছিলাম তারই প্রতিধ্বনি! কিন্তু দুর্বৃত্তদের সমবেত বুটের ঠোক্করে, বেল্টের ঘায়ে ও রেগুলেশন লাঠীর নৃশংস আঘাতে নিরস্ত্র, নিঃসঙ্গ, নিঃসহায় এক জন সহ-বন্দীর কণ্ঠ থেকে যে অদ্ভুত একটা শব্দ বার হয়েছিল, তাতে ঠিকরে পড়েছিল তাঁর সর্ব্ব অন্তরের ঘৃণা, ধিক্কার, ক্রোধ ও দুঃখ। খাঁচার ইঁদুরকে জলে ডুবিয়ে মারবার কাপুরুষতা ঐ সরকারী সেনাদলেরই শোভা পায়। বিমল চক্রবর্তী ছিলেন খাঁটি ইস্পাত, সাময়িক ভাবে হলেও দুমড়ে থাকবার রণনীতি তাঁর ধাতে সয় না।

তাই, একেবারে খালি গায়ে, খালি হাতে নেকড়ে বাঘের মত যুঝেছেন তিনি এই বারোটি ছ'ফুট দীর্ঘ পাঠানের সঙ্গে, তার পর এক সময় সংজ্ঞা হারিয়ে রক্তাক্ত কলেবরে লুটিয়ে পড়েছেন ব্যারাকের বারান্দায় উল্কা পতনের মতো, মহীরুহ পতনের মতো!

ইস্পাত ভেঙে গেছে!······

২২

সত্যিই, ভেঙে গেছে।

পরদিন ভোরে দরজা খুলে দিতেই ছুটে গেলাম দশ নম্বরে। শুভ্র শয্যায় প্রসারিত বিমল চক্রবর্তীর ইস্পাত দেহ, ব্যাণ্ডেজে একেবারে ঢাকা। মাথার কয়েকটি ক্ষত নাকি প্রায় তিন ইঞ্চি দীর্ঘ আর তেমনি গভীর।

বললাম: না বেরিয়ে এলেই পারতেন। গোলমাল যা-কিছু ঘরেই হতো, আমরা যোগ দিতে পারতাম।

ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিলেন বিমল বাবু: সেই জন্যেই তো বেরিয়ে এলাম। কমেট বাবুর দিকে বার বার চাইছিলো ওরা, যদি চিনে ফেলে? এতগুলো লোকের হাঙ্গামা বাড়িয়ে লাভ নেই। তবে, এতটা হবে ভাবিনি।

সমস্ত বন্দীর ওপর ওদের যে আক্রোশ, তাই মিটিয়ে নিয়েছে একা আপনার ওপর দিয়ে।—বললো অমর।

হাসতে চেষ্টা করলেন বিমল বাবু: তা হয়তো হবে।

এমনিই এরা। সকলের বিপদ, সকলের ঝুঁকি, সকলের সংকট বুক পেতে নেবার জন্যই যেন এদের জন্ম। ঘাড়ে জোয়ালের মত এসে পরের হাঙ্গামা চেপে বসে, না পারা যায় উপড়ে ফেলে দিতে, না পারা যায় শান্ত মনে সইতে; তার পর বাধ্য হয়েই কাঁধ লাগাতে হয়, একটু ঠেলাঠেলিও করতে হয়, শরীরের স্থানে স্থানে হয়তো ছড়ে যায়—এই অসহায় অবস্থার কথা জানি। আত্মীয়জনের জন্য আত্মনিগ্রহ, প্রেমিকের জন্য অস্তিত্ব-বিলোপ, পড়শীর জন্য জীবন বলিদান, এও জানি। কিন্তু এদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এরা, কোনও দিক দিয়ে এতটুকুও মিল নেই। জেলে এসে যাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়, জেলের বাইরে গিয়ে সারা জীবনে যাদের সঙ্গে দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের আদৌ সম্ভাবনা নেই, শুধু তাদেরই নয়, অচেনা, অজানা, অদেখা, যে যেখানে আছে তাদের সবার সবটুকু দুঃখ ও বেদনার পশরা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে মাথায় তুলে নেবার হিম্মৎ দেখেছি এমনি জন কতক বন্দীর। দুনিয়ার সবটুকু বিষ নিঃশেষে পান করবার মতো নীলকণ্ঠ এরাই!···

বেশী কথা কয় না, নেই হাঁক-ডাক, নেই আড়ম্বরের জৌলুস। একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে আচমকা এদের আবির্ভাব ঘটে, তার পর যীশুখৃষ্টের মতো চলে এদের তিলে-তিলে আত্মবলিদান। মৃত্যুর সঙ্গে এদেরই পাঞ্জা লড়াই চলছে নিশি-দিন, প্রাণ দেবার জন্য এরাই করে কাড়াকাড়ি। পরাধীন দেশের অনামী এই দধীচিকুল, তোমাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করি সর্ব্বান্তরিক প্রণতি!···

দিন পনেরোর মধ্যেই বিমল বাবু অনেকটা আরোগ্য লাভ করলেন বটে, কিন্তু শিবিরের কমবয়সীদের মধ্যে একটা চাপা ক্রোধের আগুন

ধূমায়িত হতে লাগলো। পাঠান সেনানায়ক সুবাদার নাজির খাঁকে একেবারে ধরাপৃষ্ঠ হতে সরিয়ে দেবার মারাত্মক পরিকল্পনাও কেউ কেউ আঁটতে লাগলেন গোপনে গোপনে। প্রতিনিধি দল অফিসে যাওয়া সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করলেন, রান্নাঘরের ব্যাপারেও দিলীপ বাবুর উৎসাহ একেবারে কমে গেল, খেলার মাঠে খেলোয়াড়ের অভাব দেখা যেতে লাগলো, বিভিন্ন দলীয় পত্রিকায় নাজির খাঁর এই নৃশংসতার প্রতিশোধ নেবার জন্য গরম গরম সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগলো, 'শৃঙ্খল' পত্রিকায়ও করা হলো এর তীব্র নিন্দাবাদ।

সরকারী ভাবে সংগ্রাম ঘোষণা না করলেও সংগ্রামী আবহাওয়ায় সারা বন্দীশিবির থমথম্ করতে লাগলো। টবিন এ সংবাদ নিশ্চয়ই পেয়ে গেছে এবং গিরিজা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দিয়েছে তাকে যে, এই নালিশবিহীন উদাসীনতা আসন্ন ঝটিকারই পূর্ব্বাভাস ; অতএব—

অতএব এক মাসের মধ্যেই পাঠান সেনাদল বদলী হয়ে গেল আর তাদের স্থানে এল বিহারী রেজিমেন্ট। আমি স্পষ্ট মনে করতে পারি আজও যে, এক দল বন্দী নাজির খাঁর কাপুরুষ আক্রমণের পশ্চাতে কমাণ্ডাণ্ট টবিনের পরোক্ষ সমর্থন উপলব্ধি করে বিপ্লবীদের কালো খাতায় মোটা হরফে তার নাম তুলে দিয়েছিলেন এবং যে করে হোক জন তিনেক শিবির থেকে পলায়নের ফন্দী আঁটছিলেন। তাঁদেরই দু'চার জন বন্ধু লোহার রড ও সাবল গোপনে সংগ্রহ করে সাগ্রহে টবিনের শিবির পরিদর্শনের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন।

অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ালো যে, এক আধটা নরহত্যা রোধ করবার শক্তি তখন আর কারুর ছিল না। কিন্তু, সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি 'ষ্টেটসমান' পত্রিকায় চট্টগ্রামের পাহাড়তলী রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটের ওপর "জঘন্য" আক্রমণ চালাবার যে ক্ষুদ্র বিবরণ প্রকাশিত হলো, তার ফলে আমাদের মনে এলো এক নতুন চেতনা, সমগ্র বন্দীশিবিরে এল এক অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা। পত্রিকায় যা পড়েছিলাম, হুবহু সবটুকু আজ আর মনে নেই। তবুও যেটুকু মনে পড়ে, তা এই—

১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর। রাত্রিকাল। পাহাড়তলী রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটের মোজাইক-করা মেঝের ওপর হাজারো আলোকের নিম্নে চলছে সাহেব-মেমদের যুগল নৃত্য। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পর প্রায় আড়াই বৎসর কেটে গেছে। সুতরাং নিশ্চিন্ত! একদা যারা আতঙ্কে সমুদ্রে জাহাজে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, তারাই আবার হাসিমুখে ফিরে এসেছে শহরে। বিপ্লবীদের কেউ কেউ সম্মুখ সংগ্রামে নিহত, আহত, আবার কেউ বা তখনো আত্মগোপন করে উধাও হয়েছেন। শহরে তাই স্ফূর্ত্তির বাজনা বেজে উঠেছে, চলছে আবেশময় নৃত্য!···

অকস্মাৎ প্রত্যেকটি জানালা ও দরজায় দেখা গেল আগ্নেয়াস্ত্রধারী আক্রমণকারী। কেউ কিছু বলবার পূর্ব্বেই তাদের হাতের রিভলভার ও বন্দুকগুলি একসঙ্গে গর্জ্জে উঠলো—গুম্ গুম্ গুম্! ছুটোছুটি ভড়োহুড়ি পড়ে গেল। বৈদ্যুতিক আলোকের ঝাড় চুরমার হয়ে ভেঙে পড়েছে, সুরার পাত্র মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, ভাঙা টেবিল-চেয়ারে নৃত্যবাসর একেবারে কণ্টকিত, নরনারীর আর্ত্ত চীৎকারে শুধু ইনষ্টিটিউট নয়, চারি দিকের পাহাড় পর্য্যন্ত মুখরিত।

অবিরাম গুলী ও বোমা-বর্ষণের ফলে নর্ত্তক ও নর্ত্তকীর দল কে কোথায় মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে, মরে গেছে, বিপ্লবীরা তার সংবাদ রাখে না। রেলিং-ঘেরা বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে এই অভিযান পরিচালনা করছিলেন মহীয়সী বিপ্লবী নারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

মাষ্টারদা'র নির্দ্দেশ: ধরা দেবে না, কাজ শেষ করে আত্মহত্যা করবে।

কাজ শেষ হয়ে গেছে। সবগুলো বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে, সব ক'টি বুলেট কাজে লাগানো হয়েছে। অন্ধকার নৃত্যশালায় শোনা যাচ্ছে শুধু সভয় চীৎকার, পলায়নপরা ইসাডোরা ডানকানদের করুণ ক্রন্দন, ফ্রেড এ্যাষ্টায়ারদের তীব্র আর্ত্তনাদ! ফলাফল সঠিক ভাবে কিছু জানা সম্ভব না হলেও বুঝিয়ে দেয়া গেছে এই সত্য যে, অস্ত্রাগার আক্রমণের পর নিশ্চিন্ত বিলাসের সময় আজো আসেনি, পলাতক হলেও আজও মাষ্টারদা' জীবিত!

মাষ্টারদা'র নির্দ্দেশ: ধরা দেবে না।

বোঝা গেল, এতক্ষণে শহরে সংবাদ পৌঁছে গেছে, এখনই হুড়মুড় করে এসে পড়বে লরী-লরী ভর্ত্তি বন্দুকধারী সৈনিক, আসবে মেসিন গান, ষ্টেন গান, লুইস গান···

মাষ্টারদা'র নির্দ্দেশ: ধরা দেবে না।

সামরিক জ্যাকেটের পকেট থেকে ক্ষুদ্র একটি প্যাকেট বার করে সাদা পাউডারটুকু মুখে ঢেলে দিলেন প্রীতিলতা।

মাষ্টারদা'র নির্দ্দেশ: ধরা দেবে না।

ধরা তো দিলাম না মাষ্টারদা'! তোমারই পায়ের তলায় বসে একদিন দীক্ষা নিয়েছিলাম যে অগ্নিমন্ত্রে, বুকের রক্ত দিয়ে তারই মর্য্যাদা রক্ষা করলাম। এগিয়ে যারা চলেছে, তাদের বলে দিও মাষ্টারদা যে, পথের ধারে পড়ে রইলো যে বোনটি, তার জন্য শোক করো না, চোখের জল ফেলো না, পরাধীন ভারত তাদের ডাকছে, আর্ত্তস্বরে ডাকছে···ইনক্লাব জিন্দাবাদ···

প্রীতিলতা ঢলে পড়লেন। নীল ঠোঁট দু'খানিতে তাঁর লেগে রইলো সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের যুধ্যমান বিপ্লবীদের রণহুঙ্কার: ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

পাহাড়তলী ইনষ্টিটিউট আক্রমণের রক্তরাঙা কাহিনী ভারতের বিপ্লবের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে রইলো।···

টবিন-গিরিজা-পবিত্র এ্যাণ্ড কোম্পানীর মাথায় একটা সত্য ঢোকেনি যে, আমরা সব বনবিহঙ্গ, জোর করে শিকল এঁটে খাঁচায় ভরে রাখা হয়েছে। নবাবী খানা, মূল্যবান আসবাবপত্র, অখণ্ড বিশ্রাম, একটানা নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের সুযোগ করে দিয়ে অবশ্য সেই খাঁচাকে সোনার খাঁচার রূপ দেবার চেষ্টা করে বন্দিত্বের মধ্যেই একটা বেলোয়ারী আকর্ষণ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বনবিহঙ্গ খাঁচাকে ভালবাসতে শেখে কি? সামান্যতম দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত পেলেই যে সে পালিয়ে যাবে ওরা তা ঠাওর করতে পারেনি। পবিত্র সরকার অবশ্য কোনো দিনই শিবিরের মধ্যে আসতো না। কিন্তু এখানে তো তার চর রয়েছে। একেবারে কিলবিল করছে বলতে পারি নে, তবুও দু'-চারটি আমাদের জানা ও দু'-চারটি অজানা সাকরেদ তো আছেই। তারাও কিন্তু একেবারেই ধারণা করতে পারেনি।

ওয়েষ্টার্ণ ব্যারাকের পনেরো নম্বর কক্ষের পশ্চিম দিকে যে গোটা তিনেক ক্ষুদ্র কুঠরী আছে, পূর্ব্বে তা ছিল না। অবশ্য পাগলা গারদকে রাজবন্দী শিবিরে পরিণত করবার পূর্ব্বেই ওগুলো তৈরী হয়েছে। কিন্তু ছিল না বলছি এ জন্য যে, তা না হলে পনেরো নম্বরের যে দু'টো বৃহদাকার ভেন্‌টিলেটার দুটি কুঠরীর মধ্যেকার দেয়ালে আজও রয়ে গেছে, সে দুটো রাখবার কোনো সার্থকতা নেই। যে দেয়ালে ভেনটিলেটার, সেই দেয়ালের বাইরেই ঘর তৈরী করবার পর এই ভেনটিলেটারের আর কি প্রয়োজন আছে?···

কর্ত্তৃপক্ষের এই মূঢ়তার সুযোগ আমরা পুরোপুরি নেবার সিদ্ধান্ত করলাম। ঐ কুঠরীগুলিতে নিরালায় নিবিষ্ট মনে পরীক্ষার পড়া পড়বার জন্য ক'জন পরীক্ষার্থী কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি সংগ্রহ করলো। একখানা টেবিল, একখানা বা দু'খানা চেয়ার ও বই-খাতায় ঘরগুলো ভরে উঠলো। টবিন মেজাজ দেখিয়ে বললেন: ঘরের তালা তোমরা কিনে নেবে, কিন্তু তার চাবী থাকবে অফিসে।

তথাস্তু!

কিন্তু একটি তালার যে দু'টো চাবী থাকে, এই সহজ সংবাদটি ওদের বোধ হয় খেয়াল হলো না। তাই দ্বিতীয় চাবিটি পড়ুয়াদের বাক্সের তলায় আশ্রয় গ্রহণ করলো। ভোরে ঘরগুলো খুলে দেবার সময় সিপাই এই কুঠরীগুলোও খুলে দিয়ে যেত।

ফ্রেমে আঁটা জালের ঢাকনী অবশ্য ভেনটিলেটারে ঝুলছে। কিন্তু তা খোলা যায় জালের দরজার মত। তালা লাগাবারও ব্যবস্থা আছে বটে পনেরো নম্বরের মধ্যে, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি সিপাইদের ওদিকে একেবারেই নজর পড়েনি। কেন, তা তাদেরই জিজ্ঞেস করতে হয়।···

শীতকাল। মাস ও সঠিক তারিখ মনে নেই। বহরমপুরের শীতও প্রচণ্ড, তাও রাত দশটা বাজবার অনেক পূর্ব্বেই বন্দীরা লেপের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। সিপাইরা যথাসময়ে এসে গুণতি করে যেত। মশারির নীচে লেপ মুড়ি দিয়ে নিদ্রিত বন্দীকে আর ডেকে তুলতো না বিহারী সুবাদার। শুধু উঁকি মেরে মুখখানা দেখেই চলে যেত। প্রত্যেক ঘরের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার প্রতিই ছিল তাদের কড়া নজর, অধিবাসীদের তারা চিনতে চাইতো না। বিশেষ করে পাঠান সিপাইদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর।

ফরিদপুরের সুধীন আর ময়মনসিংহের বারীন এক দিন পনেরো নম্বরের কান্তিবর্দ্ধন আর সুশীল সরকারের সঙ্গে সেই রাত্রির মতো সীট বদলে নিল অর্থাৎ ওরা দু'জন এল পনেরো নম্বরে আর এরা দু'জন গেল ঘুমোতে ওদের ঘরে। রাত দশটা বেজে পনেরো মিনিট হতেই সিপাইরা এসে যথারীতি গুণতি করে দরজায় তালা এঁটে দিয়ে নিশ্চিন্তে চলে গেল। সুবিধে হচ্ছে অতি দীর্ঘ ব্যারাকের প্রশস্ত বারান্দাটি মাত্র এক দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে। রাত্রের বন্দুকধারী সিপাই এই বারান্দা দিয়েই সারা রাত পায়চারী করে, নীচে ঘাসে নেমে সারা ব্যারাকটি ঘুরে দেখবার নিষ্প্রয়োজন ঔৎসুক্য বোধ করে না।

রাত দু'টো বাজতেই উঠে পড়লো সুধীন আর বারীন, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের অপর দুজনও। বারান্দার সিপাইয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখলো এক জন মশারির মধ্যে বসেই। ঘরে আলো নেই বটে, কিন্তু বৃহদাকার জানালা ও দরজাগুলো খোলা থাকায় কেমন একটা স্তিমিত দ্যুতি। এতে ওদের বেশ সুবিধেই হলো।

পনেরো নম্বরই ওয়েষ্টার্ণ ব্যারাকের এক দিকের শেষ ঘর। সিপাই খট্‌-খট্ করে বুট বাজিয়ে পনেরো পর্য্যন্ত এসে এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে, তার পর আবার এক-পা এক-পা করে চলে যায় এক নম্বরের দিকে। অর্থাৎ একবার চলে গেলে ফিরে আসতে অন্ততঃ আট মিনিট সময় লাগে। এই আট মিনিটের মধ্যেই কাজ হাঁসিল করতে হবে।

সুধীন ও বারীন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র একখানা এনভেলাপে পুরে নিয়েছে, গোপনে সংগ্রহ-করা কয়েক শো টাকাও নিয়েছে দু'জনে—ব্যস্, এবার রেডি!

মশারির মধ্যে সন্তর্পণে বসে যে সিপাইর ওপর লক্ষ্য রেখেছিল, সিপাই চলে যেতেই সে সংকেত জানালো, রেডি!

একটি ভেনটিলেটারের নীচে একটি টেবিল ও তার ওপর একখানা চেয়ার খাড়া করতেই 'নাগাল পাওয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়ালো ওরা। আলিঙ্গনের পালা শেষ হলো। ধীরেন বললো: Wish you safe journey······ওপারে একটি পাঠ-কক্ষের মধ্যে অবলীলাক্রমে পর-পর বারীন ও সুধীন নেমে গেল।

আবার চুপচাপ! আবার সিপাইকে একবার টহল দিয়ে যাবার সময় দিতে হবে। ইতিমধ্যে বারীন তালার দ্বিতীয় চাবি দিয়ে পাঠ-কক্ষের শিকের দরজা অর্গলমুক্ত করেছে।

সিপাই এসে ঘুরে চলে গেল। আবার সংকেত জানানো হলো, রেডি!

কক্ষের দরজা নিঃশব্দে খুলে বেরিয়ে এল দু'জনে একখানা টেবিল নিয়ে। ত্রিশ গজের মধ্যেই বাইরের দেয়াল, মাত্র দশ ফুট উঁচু। দেয়ালের পাশে টেবিল, টেবিলের ওপর একখানা চেয়ার—ব্যস্, নাগাল মিলে গেল।

পর-পর দুজনে দেয়াল টপকে বেরিয়ে গেল।

এদিকে বন্দুকধারী সিপাই তখনো পরম নিশ্চিন্তে পাহারা দিচ্ছে।

ভোরে দরজা খুলে দিতেই দু'জন বন্দী গিয়ে দেয়ালের পাশের সেই টেবিল ও চেয়ার নিয়ে এসে আবার পাঠ-কক্ষে যথাস্থানে রেখে দিল।

শীতের ভোর। দরজা খুলে দেবার সময়ও বেশ অন্ধকার থাকে। তাই এদের কেউ লক্ষ্য করলো না।

তার পরের দিন দিনের বেলাটা কাটলো বেশ নিশ্চিন্তে। বারীন ও সুধীন যে ততক্ষণে কলকাতাগামী ট্রেণে চেপে বসেছে, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হলাম, কারণ কর্ত্তৃপক্ষের বিন্দুমাত্রও চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

ছুতো করে দু'-চার জন মাঝে মাঝে অফিসে গেলেন ওদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে। সারা অফিস নিয়মিত কাজ করে চলেছে। বোঝা গেল, আমাদের কাজ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়েছে।

২৩

কিন্তু ফ্যাসাদ বাধলো সেদিন রাত্রে। প্রথমতঃ গুণতি মিললো না বার বার গুণেও। তার পর খাতা নিয়ে এসে সুবাদার মিলিয়ে মিলিয়ে বার করলো যে, ইসটার্ণের এগারো নম্বরের বারীন দাস আর সাদার্ণের চার নম্বরের সুধীন ভট্টাচার্য্য অনুপস্থিত।

ওদের ঘরের অন্যান্যদের প্রশ্ন করে জানতে পারলো যে, রাত্রে খাবার-ঘরেও না কি ও-দু'জনকে দেখা গেছে। দিলীপ বাবুও সায়

দিলেন। সুতরাং গোটা কয়েক পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ্চ নিয়ে সারা শিবির তন্ন-তন্ন করে অনুসন্ধান চললো। প্রত্যেকটি স্নানের ঘর, ব্যায়াম-ঘর, শিবিরের প্রত্যেকটি বৃক্ষ, টালী ব্যারাকের ছাদ, কিচেন, খাবার-ঘর, সরবৎ-ঘর, খেলার মাঠের ধারে মেহেদী গাছের বেড়ার পাশে, এমন কি, বড় ড্রেণটাতেও পরীক্ষা-কার্য্য শেষ করে প্রায় ত্রিশ জন সিপাইয়ের একটি দল একেবারে গলদঘর্ম্ম হয়ে এসে আমাদেরই ঘরের সম্মুখে বারান্দায় হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে পড়লো।

এবার কী করা যায়? কী করা যেতে পারে? টবিন না-হয় বাস করে বন্দীশিবির থেকে অনেক দূরে। কিন্তু গিরিজা দত্তের বাড়ী তো এই পাশেই। বুড়ো রাত্রের গুণতি মেলার ঘণ্টাটি না শুনে ঘরের আলো নেবান না, ঠায় বসে থাকেন। ক'জন জমাদার, সুবাদার ও সুবাদার-মেজরের মধ্যে সলা-পরামর্শ হলো অনেকক্ষণ। তার পর দেখলাম, দল বেঁধে ওরা চলে গেল এবং একটু পরই মধুক্ষরা ঠং শব্দ শোনা গেল। বুঝলাম, গিরিজা দত্ত রাত্রের মত চোখ বুজবেন, কিন্তু সকালের লোমহর্ষণকারী সংবাদ ওঁকে পাগল করে দেবে কি না কে জানে!

পরদিন সকালে আমাদের কর্ম্ম-চাঞ্চল্য যথারীতি সুরু হয়ে গেল। যেন কিছুই কোথাও ঘটেনি, যা ছিল একেবারে হুবহু তাই আছে। আদৌ চিন্তিত হলাম না এদের উদ্বেগ ও তৎপরতা দেখে, কারণ বারীন ও সুধীন ততক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে কলকাতা পৌঁছে গেছে। কাপড়-জামা ওরা কিছু নিয়ে যায়নি। প্রথমতঃ, নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া অসুবিধে, তার পর ট্রেণে সাধারণ পোষাকে উঠলে অন্যান্য হাজারো ডেইলি প্যাসেঞ্জারের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দেয়া সহজ। আবার ওদের ফেলে-যাওয়া জিনিষপত্র সবই যদি তেমনি সাজানো থাকে, তা হলে শেষ পর্য্যন্ত ওগুলো যাবে অফিসে, সেখান থেকে গুদামের নাম করে গুদাম-বাবুর বাড়ীতে। তাই, যাবার পূর্ব্বে ওরা দামী ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সবই বিলি করে দিয়ে গেছে বন্ধুদের মধ্যে।

বেলা নয়টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই এলো বিরাট তল্লাসী দল। শুধু বিহারী রেজিমেণ্ট নয়, বাইরের বি-পি মার্কা দারোগা, লাল পাগড়ী ও জন কতক আই-বি অফিসারও এসেছেন। কয়েক ঘণ্টা ধরে চললো তল্লাসী। বাক্সের জিনিষপত্র মেঝেতে নামিয়ে, বিছানা খুলে ও তুলে, জলের কলসী উলটো করে, ধোপা-বাড়ীর ধুতি ও জামার পাট খুলে, প্রত্যেকটি বই ও খাতার প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা—সে এক অভূতপূর্ব্ব তল্লাসী। বেলা সাড়ে বারোটায় যে-সব আপত্তিকর মালপত্র ওরা নিয়ে গেল, তার মধ্যে দেখলাম, কাচের ভাঙা গ্লাসের টুকরো, খালি তেলের বোতল, কতকগুলি ইট, প্যাকিং কেসের লোহার পাত কিছু, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিকেলের দিকে এলেন শহরের ও কলকাতা থেকে আমদানী-করা জন কতক আই-বি অফিসার। সাদা পোষাকে এসে তাঁরা একেবারে সাদা কথাই বললেন যে, বারীন দাস ও সুধীন ভট্টাচার্য্য যে করে হোক শিবির থেকে পলাতক। কী ভাবে সেটা বার করবার জন্য তাঁরা এসেছেন আমাদের কতকগুলো প্রশ্ন করতে।

অমনি প্রতিবাদ উঠলো উত্তাল হয়ে।

—আপনাদের কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে আমরা বাধ্য নই।

—বারীন ও সুধীন পালিয়ে গিয়ে থাকলে কি করে দেয়াল টপকে বা অন্য উপায়ে পালালো, তা বার করবার ডিউটি আপনাদের, আমাদের নয়।

—এ কি আপনাদের লর্ড সিংহ রোড পেয়েছেন?

—মণি বোসকেই কেয়ার করলাম না, বয়লার প্রুফ হয়ে বেরিয়ে চলে এলাম, তার আপনারা!

এমনি অজস্র প্রতিবাদ ও শ্লেষ। কিন্তু বাপ-মা তুলে গালি-গালাজ করলেও আই-বির লোকদের মেজাজ কখনো খারাপ হয় না এতটুকুও, আর তেমনি অটুট এদের ধৈর্য্য!

তথাপি প্রশ্ন: বেশ, আপনারা না বললেন। কিন্তু ওঁদের ব্যক্তিগত বন্ধু কারা বলুন, আমরা তাঁদের কাছে যাই। দেখি, তাঁরা কী বলেন!

ধমক দিল বিভূতি: সবাই আমরা ওঁদের বন্ধু। তাই বিশেষ করে উল্লেখ করবার মতো কেউ নেই। আমাদের কোনো প্রশ্ন করলে আমরা তার কোনো জবাব দোব না। সুতরাং—

হ্যাঁ, যাচ্ছি। তবে ওঁদের ঘর দু'খানা আমরা একবার দেখতে চাই। তা পারবো কি?

নিশ্চয়ই।—বলে এদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন যতীন বাবু। ওঁরা চারি দিক ভাল করে নিরীক্ষণ করে ওদের চেয়ারে একবার বসে ও পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে, খাট ও টেবিলের নীচেটা ভাল করে পরীক্ষা করে, অবশেষে আই-বি কুলকলঙ্কের মতো, অকাট মূর্খের মতো দরজা ও জানালার মোটা-মোটা শিকগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। তার পর এক সময় বিষণ্ণ মুখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে চলে গেলেন।

তার দু'দিন পর সুবাদার গোপনে আমায় বললো যে, বাঙালী লোক মন্ত্র জানে। তাই বিল্লি হয়ে ড্রেণসে পালিয়ে গেল। নইলে এত সান্ত্রী আছে, পালাবে কেমন করে? আই-বি লোগও তাই বলেন।

বিহারী রেজিমেণ্ট ও আই-বি কর্ত্তাদের ধারালো বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে সেদিন প্রাণ ভরে হেসেছিলাম মনে আছে। এবং আমার সঙ্গে অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন।

কিন্তু এদের তৎপরতা নিয়ে আদৌ ব্যস্ত ছিলাম না আমরা।

আই-বি অফিসার আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে প্রায়ই বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করে যেত: আপনাদের দলের বাতী জ্বালাতেও আর কাউকে বাইরে রাখবো না। The Revolutionary activities are completely checked by us—আমরা সব ঠাণ্ডা করে দিয়েছি।

কিন্তু আশ্চর্য্য, ওদের এই আত্মশ্লাঘাকে ধূলোয় লুটিয়ে দিয়ে ১৯৩২ সালেই এতগুলো বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করেছিল যে, বন্দীশিবিরে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করেও গোপনে এই সব সংবাদ পেয়ে আনন্দে ও গর্ব্বে আমরা অধীর হয়ে উঠতাম।

জানুয়ারী মাসে লাকসাম জংশনের কাছে শিকল টেনে ট্রেণ থামিয়ে ডাকের বগী থেকে রিভলবার দেখিয়ে ছয় জন যুবক ইনসিওর খামগুলো নিয়ে সরে পড়ে। চার জন যুবক ঢাকা শহরে পুলিশের জনৈক সার্জেণ্টের রিভলবার ছিনিয়ে নেয়। ফেব্রুয়ারী মাসে দু'টো ডাকাতি হয়। মার্চ্চ মাসে ঢাকা জেলার দু'টি স্থান থেকে বন্দুক ও রিভলবার চুরি হয়। বন্দুকের মালিক টের পেয়ে বাধা দিতে এসে রিভলবারের গুলীতে নিহত হন। ফরিদপুর জেলার চরমুগুরিয়া পোষ্ট অফিসে পাঁচ জন সশস্ত্র বিপ্লবী হানা দেয় ও অফিস লুঠ করে। এপ্রিল মাসে চারিটি স্থানে মেইল ডাকাতি হয়। রংপুরে একটি ট্রেণ ডাকাতি ও কলকাতায় একটি দোকানে ডাকাতি হয়। মে মাসে ঢাকা শহরের নিকট তেজগাঁওয়ে শিকল টেনে ট্রেণ থামানো হয় এবং জন কয়েক যুবক গার্ডকে রিভলভারের গুলীতে আহত করে জনৈক যাত্রীর কাছ থেকে ত্রিশ সহস্রাধিক টাকা নিয়ে একখানি ট্যাক্সিতে সরে পড়ে। ঢাকা শহরে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীর দেহরক্ষীকে আটক করে তার আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নেয়া হয়। জুন মাসে রংপুরে একটি জমিদার-গৃহ থেকে কতকগুলি বন্দুক ও রিভলভার অপহৃত হয়।

২৯শে জুলাই কুমিল্লায় সাইকেল-আরোহী জনৈক বিপ্লবীর রিভলভারের গুলীতে ত্রিপুরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ই. বি. ইলিসন মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পরে মারা যান। ৫ই আগষ্ট কলকাতায় 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার অফিসে প্রবেশ করবার সময়ে সম্পাদক স্যার এ্যালফ্রেড ওয়াটসনের প্রতি গুলী নিক্ষিপ্ত হয়। এই মাসেরই শেষ দিকে ঢাকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্র্যাসবিকে গুলী করা হয়। তার পর পাহাড়তলীর স্মরণীয় ঘটনা। ২৮শে সেপ্টেম্বর স্যার এ্যালেয়েডের গাড়ী থামিয়ে আবার তাঁর প্রতি গুলী নিক্ষিপ্ত হয়। ১৮ই নভেম্বর রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিনটেনডেণ্ট সি. এ. ডবলিউ লিউকের মোটর থামিয়ে তিন জন বিপ্লবী তাঁকে গুলী করে। তিনি মারাত্মকরূপে আহত হন।...

এই তালিকায় আরও অসংখ্য ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করা হয়নি। সে সব মিলিয়ে হিসেব করলে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, বাইরে তখনো যারা রয়ে গেছে, বিপ্লবের ঝাণ্ডা একটি মুহূর্ত্তের জন্যও তারা অবনমিত করেনি।

সুতরাং আই-বি কর্ত্তাদের সহর্ষ ঘোষণা যে একটা নিছক ধাপ্পা ব্যতীত আর কিছুই নয়, ওটা যে আমাদের উৎসাহের অনির্ব্বাণ শিখায় জলসিঞ্চনেরই অপপ্রয়াস মাত্র, তা মনে মনে বেশ উপলব্ধি করতে পারতাম। মুখে অবশ্য দুঃখ ও বেদনার মুখোস এঁটে ভয়ার্ত্ত কম্পিত কণ্ঠে নিবেদন করতাম: আপনাদেরই জয়জয়কার! এবার তা হলে......

[ক্রমশঃ।

মাতাপুত্র

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—"মা, তুমি ত শাস্ত্র-টাস্ত্র কিছু বুঝিবে না, আমি বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে এই বইখানি লিখিয়াছি, কিন্তু তোমার মত না পাইলে এই বই আমি ছাপাইতে পারি না, শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহের বিধি আছে।"

ভগবতী দেবী—"কিছুমাত্র আপত্তি নাই। লোকের চক্ষুঃশূল, মঙ্গল-কর্ম্মে অমঙ্গলের চিহ্ন ঘরের বালাই হইয়া নিরন্তর চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে যাহাদের দিন কাটিতেছে, তাহাদিগকে সংসারে সুখী করিবার উপায় করিলে, এতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে।"

আরো মসৃণ ও সুন্দর মুখশ্রী

মুখশ্রী আপনার আরো কমনীয় ও সুন্দর হবে, যদি দুটি পণ্ড্‌স ক্রীমের সাহায্যে সৌন্দর্য্য-সাধনার বিখ্যাত দুটি নিয়ম মেনে চলেন।

প্রত্যেকের জন্যই দুটি ক্রীমের দরকার—কারণ একটিতে ময়লা কাটে, অপরটি মুখশ্রী রক্ষা করে। রাত্রিতে চাই, সারাদিনের ধূলি ও ময়লা দূর করার জন্য উচ্চাঙ্গের একটি তৈলাক্ত ক্রীম — পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম। আর ভোরবেলা চাই, রঙ্‌-কালো-করা রোদের তাত থেকে মুখশ্রী বাঁচানোর জন্য হাল্‌কা, অদৃশ্য একটি ক্রীম—পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম।

সৌন্দর্য্য-সাধনার দুটি উপায়ঃ

রোজ রাত্রে পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম মুখে মেখে আস্তে আস্তে মালিশ করে বসিয়ে দিন। এর সুমিশ্রিত তেল লোমকূপের ভেতর থেকে সমস্ত ময়লা বার করে আনবে। তারপর মুছে ফেললেই দেখবেন, মুখখানি কেমন লাবণ্যে উজ্জ্বল!

রোজ ভোরে খুব পাত্‌লা ক'রে পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম মাখুন। এ হাল্‌কা, অথচ চট্‌চটে নয়। মাথার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায় এবং অদৃশ্য একটি সূক্ষ্ম স্তর সারাদিন মুখশ্রী অক্ষুণ্ণ ও কমনীয় রাখে।

POND'S COLD CREAM for Cleansing

POND'S VANISHING CREAM Protection and Powder Base

পণ্ড্‌স

একমাত্র কনসেশানেয়ার্স:
জিওফ্রে ম্যানার্স এণ্ড কোং লিঃ
বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ

বুদ্ধদেব

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মানুষ যে নিজেকে ভগবানের মত মহীয়ান ক'রে তুলতে পারে, পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথমে সেই প্রমাণ রেখে গিয়েছেন শাক্যবংশীয় মহাপুরুষ বুদ্ধদেব। একটি গল্প শোনা যায়। মান্ধাতার আমলের কাহিনী।

ইতিহাস-পূর্ব্ব যুগে উত্তর-ভারতে এক রাজা ছিলেন, তিনি বিবাহ করতে চান এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যাকে। কিন্তু রাজকন্যার এক অদ্ভুত খেয়াল, যে রাজা তাঁকে বিবাহ করবেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে না, হবে কনিষ্ঠ পুত্র। রাজা বললেন, "তাই সই।" তাঁদের বিবাহ হয়ে গেল এবং পরে পরে জন্মগ্রহণ করলে পঞ্চ পুত্র। ছোট ছেলেকে সিংহাসনের জন্যে রেখে রাজা নির্ব্বাসিত করলেন অন্য চার ছেলেকে।

চার রাজপুত্র দেশে দেশে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে হাজির হলেন। সেখানে ছিল কপিল মুনির আশ্রম। মুনিকে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে রাজপুত্ররা শুধোলেন, "মহর্ষিবর, আমরা বড়ই পথশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। বাস করবার জন্যে মনের মত ঠাঁই খুঁজে পাচ্ছি না।"

কপিল বললেন, "বৎসগণ, মনোরম জায়গায় আমার এই আশ্রম। তোমরা এইখানেই বাস কর।"

তাই হ'ল। রাজপুত্ররা সেইখানেই বসালেন এক নূতন নগর এবং কপিল মুনির নামানুসারে নগরের নাম রাখলেন, কপিলবাস্তু। তাঁদের বংশ পরিচিত হ'ল শাক্যবংশ নামে। এই বংশের অধস্তন পুরুষ রাজা শুদ্ধোদনই হচ্ছেন বুদ্ধদেবের জনক।

বুদ্ধদেবের সঠিক জন্ম-তারিখ জানা যায়নি। এইটুকুই নিশ্চিত ভাবে বলা চলে, পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাব হয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে।

রাজা শুদ্ধোদনের মহিষী মায়া দেবীর সন্তান-সম্ভাবনা হ'ল। গণৎকাররা বিচার ক'রে বললে, "মায়া দেবীর পুত্র হবে। সংসারে থাকলে তিনি হবেন দিগ্বিজয়ী। সংসার ত্যাগ করলে তিনি হবেন মহর্ষি।"

বুদ্ধদেবকে প্রসব করবার নয় দিন পরে মায়া দেবী স্বর্গারোহণ করেন এবং শিশুর [illegible] ভার গ্রহণ করেন মায়া দেবীর ভগিনী। রাজপুত্রের নাম রাখা হ'ল গৌতম।

গৌতমের মধ্যে ছিল রাজোচিত সমস্ত গুণ। ক্ষাত্র ধর্ম্মে অর্থাৎ অস্ত্রবিদ্যায় কেউ ছিল না তাঁর সমকক্ষ। কিন্তু গণৎকারদের কথা রাজা শুদ্ধোদন ভুলতে পারেননি। গৌতমের নাকি সংসার-ত্যাগের সম্ভাবনা আছে! অতএব পুত্রকে তিনি পালন করতে লাগলেন পরম সাবধানে। উনিশ বৎসর বয়সেই পুত্রের বিবাহ দিলেন যশোধরা দেবীর সঙ্গে। পাছে গৌতমের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, সেই ভয়ে তাঁকে তিনি ডুবিয়ে রাখলেন বিলাস-ব্যসনের মধ্যে।

কিন্তু পৃথিবীতে দুঃখ-শোক, জরা, রোগ ও মৃত্যু প্রভৃতি দেখে যৌবনেই গৌতমের মন হয়ে উঠল অশান্ত। অনিত্য জগৎ, নশ্বর দেহ, জীবনের পরম লক্ষ্য কি? রাজকীয় ভোগবিলাসের মধ্যেও এই প্রশ্নই জাগতে লাগল সর্ব্বদা।

সংসারত্যাগী, বন্ধনত্যাগী সন্ন্যাসীদের দেখে গৌতম ভাবতে লাগলেন, ওঁরা এমন কৃচ্ছ্রসাধন করছেন কোন্ পরম আদর্শের সন্ধানে? মন তাঁর কৌতূহলী হয়ে উঠল। ভালো লাগল এই বন্ধনহারা জীবন।

এমন সময়ে তিনি শুনলেন, তাঁর সহধর্ম্মিণী একটি পুত্র প্রসব করেছেন। গৌতম বললেন, "বন্ধনের উপরে এ আবার এক নূতন বন্ধন! এর পরেও বাঁধা পড়তে হবে আরো কত নূতন বন্ধনে!"

সব বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে গৌতম করলেন সংসার ত্যাগ। বয়স তখন তাঁর উনত্রিশ বৎসর।

পথচারী এক দীন পথিককে নিজের রাজবেশ খুলে দিয়ে চেয়ে নিলেন তার মলিন বস্ত্র এবং তাই প'রে গৌতম চললেন চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর খোঁজবার জন্যে।

দিনের পর দিন পথ চ'লে গৌতম অবশেষে উপস্থিত হলেন বিন্ধ্য পাহাড়ের এক সন্ন্যাসীদের আস্তানায়। সন্ন্যাসীদের উপদেশ অনুসারে তিনিও কিছুকাল ধ'রে কৃচ্ছ্রসাধনে নিযুক্ত হয়ে রইলেন। অবশেষে উপবাসে ও অনিদ্রায় প্রাণ তাঁর যায়-যায় হয়ে উঠল, তবু পাওয়া গেল না সত্যের সন্ধান। যখন তিনি বুঝলেন উপবাস ক'রে ও দেহকে যাতনা দিয়ে পরমার্থ লাভ হয় না, তখন আবার সাধারণ মানুষের মতই পানাহার করতে লাগলেন।

তার পর আবার দেশে দেশে অশান্ত মনে ঘুরতে ঘুরতে গৌতম যেখানে এসে হাজির হলেন, আজ তা বুদ্ধগয়া নামে বিখ্যাত। নির্জ্জন বনভূমির মধ্যে তৃণশয্যায় বিস্তৃত ছায়া ফেলে দাঁড়িয়েছিল প্রকাণ্ড একটি বট গাছ। তারই তলায় উপবেশন ক'রে গৌতম দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল একান্ত মনে তপস্যায় নিযুক্ত হয়ে রইলেন। এবং লাভ করলেন বুদ্ধত্ব।

এত দিন তপশ্চর্যার পর বুদ্ধদেব যে পরম সত্যকে লাভ করলেন, সর্ব্বমানবকে তার সন্ধান দেবার জন্যে সর্ব্বপ্রথমে যাত্রা করলেন কাশীধামের দিকে। সেখানে মৃগদাব কাননে (এখন সারনাথ নামে প্রসিদ্ধ) নিজের আশ্রম নির্ম্মাণ করলেন। প্রথম পাঁচ জন শিষ্যকে তিনি এই উপদেশ দিলেন: সৎ-দৃষ্টি, সৎ-সঙ্কল্প, সৎ-বাক্য, সৎ-ব্যবহার, সৎ-উপায়ে জীবিকার্জ্জন, সৎ-চেষ্টা, সৎ-স্মৃতি ও সম্পূর্ণ সমাধি—ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হবার জন্যে এই আটটি উপায় আছে।

বুদ্ধদেবের মত হচ্ছে, ব্যক্তিগত স্বার্থলাভের জন্যে সকল ইচ্ছা দমন করা উচিত। আত্মজ্ঞানের দ্বারা আত্মলোপ করতে পারলেই মানুষ চরম নির্ব্বাণ লাভ করতে পারে। সকল রকম হিংসাই ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

বুদ্ধদেব রাজগৃহে গিয়ে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন রাজা বিম্বিসারকে।

পরে কপিলবাস্তুতে প্রত্যাগমন ক'রে নিজের পুত্র ও সহধর্ম্মিণী প্রভৃতিকেও সন্ন্যাস মন্ত্র দান করেন।

পঁয়তাল্লিশ বৎসর কাল ধর্ম্মপ্রচার করবার পর অন্তিম শয্যায় শয়ন ক'রে বুদ্ধদেব শিষ্যদের এই শেষ উপদেশ দেন: "সকলে ধর্ম্ম ও নিয়মের অধীন থেকো। দেহকে ভঙ্গুর জেনে মুক্তিলাভের চেষ্টা কর।"

ডীন সুইফ্‌ট

শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বিখ্যাত লেখক। লেখকের বন্ধু-বান্ধবরা প্রায়ই নানা উপঢৌকন পাঠাত লেখককে চাকর মারফৎ। লেখক সাগ্রহে গ্রহণ করতেন বন্ধু-বান্ধবদের সেই প্রীতি-উপহার। কিন্তু চাকরদের যে কিছু দেওয়া উচিত, তা ভুলে যেতেন। কত খ্যাতিমান লেখক, কিন্তু ভদ্রতা কি জানে না? ভৃত্যের দল মনে মনে ভাবত।

এক বন্ধুর বাড়ি থেকে লেখকের প্রায়ই উপহার আসত। উপহার প্রায়ই নিয়ে আসত একটা চাকর—মনিবের বন্ধু উপহার পেয়ে যদি কিছু বক্‌শিস্ করে এই ভেবে। কিন্তু হ'ল বিপরীত।··· চাকরের সমস্ত শ্রদ্ধা উড়ে গেল লেখকের ওপর থেকে।···

এক দিন মনিব-বাড়ি থেকে একটা বড় মাছ নিয়ে সেই চাকরটা দাঁড়াল লেখকের পাঠাগারের দরজায়। কলিং-বেল টিপল।

—ভেতরে এসো।

ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল ভৃত্য।

—মনিব এই মাছটা আপনাকে দিয়েছেন।—চাকরটা বলল লেখককে। কথায় বিনয় নেই। রূঢ় কর্কশ কণ্ঠ।

চাকরের কথাবার্ত্তায় লেখক উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার থেকে। তার পর তার কাছে গিয়ে বললেন: যুবক, এখনো ভদ্রতা শেখোনি? দাঁড়াও, তোমায় কিছু ভদ্রতা শিখিয়ে দেই। আমার চেয়ারে তুমি বস। এখন মনে কর তুমি লেখক আর আমি তোমার মনিব-বাড়ির চাকর। ভবিষ্যতে কি রকম করে বলবে তাই দেখে নাও। এই বলে লেখক মাছটা নিয়ে দরজার বাইরে চলে এলেন। আর সেই চাকরটা চেয়ারের ওপর বসে পড়ল।

লেখক বিনীত ভাবে নমস্কার করে মাছটাকে হাতে নিয়ে টেবিলের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন।

—মহাশয়, আমার প্রভু আপনার কুশল কামনা করে আপনাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন। আর এই সামান্য প্রীতি-উপহারটুকু অনুগ্রহ করে গ্রহণ করতে বলেছেন। এখন যদি দয়া করে—

—তাই নাকি? চাকরটা তাঁর কথা কেড়ে নিয়ে গম্ভীর ভাবে বলল, তাঁকে আমার আন্তরিক ভালবাসা দিও।—আর তুমি নিজে এইটে নিও, কেমন? এই বলে তাঁর দিকে একটি অর্দ্ধ ক্রাউন এগিয়ে দিল।

লেখক রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন, ভৃত্যের এই ব্যবহারে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি হাসলেন।

—এই নাও তোমার স্ত্রীকে এই ক্রাউনটা দিয়ো। এই বলে লেখক চাকরটাকে খুশী করে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

কে এই লেখকটি, যিনি একটা চাকরকে শিষ্টাচার শেখাতে গিয়ে নিজেই উল্টে শিষ্টাচার শিখে গেলেন? তিনি হচ্ছেন আমাদের বিখ্যাত সাহিত্যিক ডীন সুইফ্‌ট (Dean Swift)

কাজী নজরুল ইসলাম

শ্রীমুরারি মুখোপাধ্যায়

দুরন্ত ফুটফুটে একটি ছেলে। গৃহের আবেষ্টনীর মধ্যে তাকে ধরে রাখা যায় না। প্রায়ই সে পালিয়ে আসে শিয়ালের গর্ত্তে ভরা, বনকলমী, ঘেঁটু গাছে সুসজ্জিত 'সিংহ রাজার গড়ে'। অসংখ্য যাযাবর পাখীর আবাস-স্থল, মজা, সুবিস্তৃত "পীরপুকুর" পার হ'য়ে কখনও সে "মাজার শরীফের" দোরগড়ায় এসে বসে।

চারি দিক নির্জ্জন। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে বালক কবর-ভূমির রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চেষ্টিত হয়। কখনও তাকে একমনে লাল মাটী খুঁড়তে দেখা যায়। এমনি ভাবে দিন যায়। বালকের দেহ-মন প্রকৃতির খোলা আলো-বাতাসে সুপুষ্ট হ'য়ে উঠে।

প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলা সত্ত্বেও বালকটি কম ডানপিটে ছিল না! গ্রামের মক্তবের সর্দ্দার পোড়ো হিসাবে সমস্ত ছেলেকেই সে হাতে পেয়েছিল। তাই এই বালক-সেনার ভয়ে ও দৌরাত্ম্যে সবাই অস্থির হ'য়ে উঠ্‌তো। কখন কার লিচু গাছে, আম গাছে বা ফলের বাগানে আক্রমণ-পর্ব্ব সুরু হবে তার হদিস কেউ পেয়ে উঠ্‌তো না।

এই ভাবে কয়েক বছর কাটার পর এক দিন তার পিতা ইহ জগৎ থেকে বিদায় নিলেন। দশ বৎসর বয়স্ক পিতৃহীন বালক রূঢ় বাস্তবের বীভৎস মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ ক'রে আঁতকে উঠ্‌লো। কিন্তু দম্‌লো না মোটেই। অল্প দিন পরেই তাকে "মক্তবের" শিক্ষকরূপে দেখা গেল।

বয়স যখন বারো কি তেরো তখন সে "মাজার শরীফের" "খাদেমদাগার" করে। বিস্ময়ে অভিভূত হ'তে হয়—বালকের স্কন্ধে এরূপ গুরু দায়িত্ব দেখে! বালক নিষ্ঠার সঙ্গে সব কাজ ক'রে চলে; কখনও বা কর্ম্মহীন নির্জ্জন মুহূর্ত্তে বসে কবিতাসুন্দরীর আরাধনা করে। ধীরে ধীরে আবার তার স্কুল-জীবন সুরু হলো। স্কুলের সমস্ত ছেলে যখন পড়ায় ব্যস্ত, তখন বালক কবি কবিতার পর কবিতা লিখে যায়। এর মধ্যে উচ্ছ্বাস ছাড়া ভাব, ছন্দের বালাই থাক্‌তো না।

কোন দিন দামাল কবি স্কুল পালিয়ে ছিপ নিয়ে বসে থাক্‌তো নির্জ্জন পুকুর-পাড়ে। 'চুড়ি' ডুবে যেত, বালক কবির সেদিকে লক্ষ্য থাক্‌তো না। সে একমনে তাকিয়ে থাক্‌তো শ্যামল তরুশ্রেণী, নলখাগড়ার বন, আর সদ্য-প্রস্ফুটিত সুন্দর 'শালুক' ফুলের দিকে।

খেয়ালী কবি কোন দিন বা বিশাল পাকুড় গাছের কোটর থেকে লুকান তামাক খাবার সরঞ্জাম বার ক'রে গাছের তলায় ব'সে দিব্য আরামে তামাক টান্‌তো, আর স্বভাবমিষ্ট কণ্ঠে গানের পর গান গেয়ে যেতো। নিস্তব্ধ প্রকৃতিই ছিল এই গানের একমাত্র শ্রোতা।

Formula ধ'রে অঙ্ক কষার মত, বাঁধাধরা নিয়ম-কানুনের মধ্যে তার উচ্ছল জীবনপ্রবাহ প্রবাহিত হলো না। স্কুল ছেড়ে সুকণ্ঠ তরুণ কবি গ্রামের 'লেটো' দলে প্রধান গায়ক হিসাবে যোগদান করলো। এই সময় লেটো দলের উপযোগী ক'রে দু'খানা নাটকও লিখ্‌লো সে। কবির এই অসাধারণ প্রতিভায় স্বল্পশিক্ষিত লেটো-সমাজ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। পাশের 'নিমশা' গাঁয়ের লেটোর দল তাকে সসম্মানে ওস্তাদের পদে বরণ করে নিল। তরুণ কবির পক্ষে এ এক অসাধারণ সম্মান বই কি?

লেটো দলের গান রচনা ছাড়া—গানের মধ্যে সুর সংযোগ করতে হতো কবিকে। আর লেটো-গান শুধু ছড়া নয়, এর মধ্যে যথেষ্ট কবিত্ব ও বুদ্ধির প্রয়োজন ছিল। তরুণ কবি একাই সমস্ত অভাব পূরণ করে যেতো।

জগতের বুকে যে কীর্ত্তিস্তম্ভ রচনা করবে—এ ভাবে লেটো দলে পড়ে থাকলে তার চলবে কেন ? বছর দুই এই ভাবে কাটিয়ে তাই এক দিন নিমশা দলের মায়া কাটিয়ে কবি পালিয়ে এলো আসানসোল।

এখানে এক রুটির দোকানে সে কাজ করতো। বজ্র-কঠিন হাতে ময়দা পিষ্‌তে পিষ্‌তে তার কবি-মন কল্পনার জাল বুনে যেতো। অনাগত শুভ মুহূর্ত্তের জন্য আকুল হ'য়ে উঠতো সে। পাঁচ টাকা মাইনের জন্য এরূপ প্রাণপাত পরিশ্রম করা কবির পোষাল না। এক দিন তাই কাজ ছেড়ে দিল সে।

১৩২০ সালে রাণীগঞ্জ সিয়াড়সোল হাই স্কুলে আবার তার ছাত্র-জীবন সুরু হলো। কয়লার খনির স্বেদলিপ্ত কঙ্কালকায় কঠোর পরিশ্রমরত শ্রমিকদের করুণ দৃষ্টি তার বিদ্রোহী মনকে নাড়া দিল। কুলী-মজুরদের এই দুঃখে আর এক জন দরদী, কবির বন্ধু শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দের হৃদয়ও ব্যথিত হ'য়ে উঠেছিল। এবার বুঝতে পেরেছো কি আমাদের দামাল, বলিষ্ঠ, নির্ভীক, খেয়ালী কবিটি কে ?—কাজী নজরুল ইসলাম।

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের ডঙ্কা বেজে উঠলো। এই যুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত ইংরাজের পক্ষে সৈন্যসংগ্রহে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। কবি তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র। কিন্তু এইটাই তার বলিষ্ঠ দেহ-মনের মাপকাঠি ছিল না। বেপরোয়া বিদ্রোহী কবি ৪৯ নং বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান ক'রে, শ্যামলী বাংলা মাকে প্রণাম জানিয়ে, ভীরু বাঙালীকে অপমানমুক্ত ক'রে মৃত্যুর মুখোমুখি হ'য়ে মধ্য-প্রাচ্য ও য়ুরোপের রণাঙ্গনের দিকে এগিয়ে চললেন।

এর পর কবির জীবনে আসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে তিনি যথেষ্ট গান ও কবিতা রচনা করেন। তাঁর বুকের মধ্যে যে ক্ষাত্রশক্তির লেলিহান শিখা রাবণের চিতার মত জ্বলছিল, তা কাগজের পৃষ্ঠায় জ্বালাময়ী ভাষার মাধ্যমে আগ্নেয়-গিরির লাভার মত জনসাধারণের নিকট পৌঁছাল। নিপীড়িত,—নির্য্যাতিত, আত্মবিস্মৃত জাতির হৃদয়ে হলো আশার সঞ্চার। বিদ্রোহী কবি অগ্নিবীণায় প্রলয় সুর বাজিয়ে অত্যাচারী শোষকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। তার সুরে সুর মিলিয়ে দুর্গম গিরি-কান্তার-মরু ভেদ করে ছুটলো নওজোয়ানের দল।

গল্প হলেও সত্যি

শ্রীমলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

একটি যুবক তখনকার এল-এ পরীক্ষা দেবেন। পরীক্ষার তখন সবে তিন মাসও বাকী নেই : নানা কাজের চাপে পড়াশুনাও ভাল হয়নি ; কিন্তু তবুও তাঁকে ঐ সময়ের মধ্যে ভাল ভাবে প্রস্তুত হতে হবে এ বিষয়ে মনে মনে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞও।

যুবকটির বর্ত্তমান অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়। তা'ছাড়া পরীক্ষা তো তাঁকে কলকাতাতেই দিতে হবে—তাই তিনি কলকাতার কোন এক পরিচিত সহৃদয় ভদ্রমহোদয়ের আশ্রয়ে একটি ঘর নিয়ে নিরিবিলিতে পড়াশুনা শুরু করে দিলেন। ঠিক মত খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, তবু পড়ার বিরাম নেই। একমাত্র স্নানাহারের জন্য দু'বেলা একটু বই ছেড়ে উঠতে হোত : তা'ও অল্প সময়ের জন্য! সময় তখন তাঁর কাছে খুবই মূল্যবান, সুতরাং নষ্ট করবার মত সময় আর তাঁর কোথায় ?

পরীক্ষার দিন ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। পরীক্ষার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চলতে থাকে তাঁর সাধনা। সেই পাঠ-সাধনার সূচীও যুবকটি তৈরী করেই তাঁর সাধনা শুরু করেন। দু'-এক ঘণ্টা নয়, মোট চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সতেরো-আঠারো ঘণ্টা চলতো তাঁর পাঠ-সাধনার বিভিন্ন পর্ব,—ইংরাজী, অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন পাঠ্যাংশ।

ঐ একই ভাবে একমনে পড়াশুনা করতে করতে যুবকটির এমন অবস্থা হয়েছিল যে, পরীক্ষা-গৃহ পর্য্যন্ত একা হেঁটে যাবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না ; কারণ গ্রন্থকীটের মত সব সময়ই বইএর উপর দৃষ্টি থাকাতে দেহ একেবারে অবশ হয়ে গিয়েছিল। কোন প্রকারে নিজেকে একটু ঠিক করে নিয়ে অপর এক জনের দেহের উপর ভর দিয়ে সমস্ত পরীক্ষাগুলিই তিনি ভাল ভাবে দিয়ে এলেন।

কিছু দিন বাদে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে তিনি দেখলেন যে তাঁর সাধনা ব্যর্থ হয়নি ; তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন অর্থাৎ তিনি প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পেয়ে অসামান্য সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হয়েছেন। যুবকটির শ্রমশক্তি ও একনিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে সত্যিই অবাক হতে হয়। সাধনার অসাধ্য কিছুই নেই—একনিষ্ঠ সাধনা ফলবতী হবেই। এই যে যুবকটি যাঁর কথা বললাম তিনি কে জানো ? তিনি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়।

রাজা লীয়ার

(উইলিয়ম সেক্সপীয়র)

৩

রাজা শুনে আর এক দফা অবাক হ'লেন—তাঁর লোক এসে জানাল, রিগান পথশ্রমে ক্লান্ত—এখন দেখা করতে নারাজ। আবার এর ওপরও দেখলেন তাঁর দূত কেন্টের অবস্থা। রাজা লীয়ারের দশা তখন মর্ম্মান্তিক। তাঁর প্রতাপ যে আজ ধূলায় লুণ্ঠিত। তিনি নিজে দেখা করতে উদ্যত হলেন।

রিগান যে তার ভগিনীর সমধাতু দিয়ে গড়া। রিগান বলল, "দেখ বাবা, দিদির মত রাজভক্ত কেউ নেই। কর্ত্তব্যবুদ্ধিই তাকে বাধ্য করেছে তোমার অনুচর সম্বন্ধে মন্তব্য করতে—তার সে কথায় তোমার রাগ ক'রে চলে আসা অন্যায় হ'য়েছে। তোমায় অনুরোধ করছি, তুমি দিদির কাছে ফিরে গিয়ে তোমার ত্রুটি স্বীকার কর।"

রাজা তো কাতর হ'য়ে পড়লেন। শেষে কি না রিগান পরামর্শ দিল তাঁকে—রাজা লীয়ারকে—মেয়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে ? বললেন, "দেখ মা, আমি বুড়ো মানুষ, আমি রাজা, আমি তার বাপ, আমি কি ক'রে তার কাছে ক্ষমা চাইব ?"

তার পর তিনি মেয়ের পায়ের তলায় ব'সে পড়ে বললেন, "আমি তোর কাছে ভিক্ষা চাইছি মা, তুই আমায় আশ্রয় দে, খেতে-পরতে দে।"

কিন্তু রিগানের এক কথা—সেই এক উপদেশ—"ভগিনীর কাছে

ক্ষমা চাও—তোমার একশ' পারিষদদের দূর কর" অর্থাৎ পরোক্ষে সে তার বাবাকে নির্দেশ করল বিদায়ের পথ। যে পথ তখন ঝঞ্ঝা আর বজ্রপাতে দুর্গম!

বাতাস গর্জ্জন করছে—ঝড়-জল সমান ভাবে বেড়ে চলেছে। প্রকৃতিতে মহাপ্রলয়ের ইঙ্গিত। বৃটেনের সম্রাট এই দুর্যোগে পথচারী। রাজা মাথার চুল টেনে ধরছেন মাঝে-মাঝে আর বলছেন —"এস এস বজ্র, আমার মাথায় নেমে এস—তোমরা আমার কথা শুনবে জানি। তোমরা আমার আপন। তোমরা তো আমার মেয়ে নও—তোমাদের তো আমি রাজ্য দিইনি।" এ দৃশ্য কে সহ্য করবে?

আগে থেকেই কেণ্টের সাথে হয়েছিল রাজার ছাড়াছাড়ি। রাজার সঙ্গে শুধু তাঁর সেই বয়স্য আছে—এই ঝড়ের রাতে সেও রাজার সঙ্গে মাথা পেতে দিয়েছে ক্রুদ্ধ প্রকৃতির নীচে। একটি ঝোপও চোখে পড়ছে না—একটা জীবও বাইরে নেই।

এমন সময় কেণ্ট হাজির হ'লেন সেখানে। এমনি রাতে ইংলণ্ডের অধীশ্বর আজ আশ্রয়হীন—মাথা বাঁচাবার ঠাঁইটুকু পর্য্যন্ত নেই দেখে কেণ্টের মন ক্রোধে-ক্ষোভে অস্থির হ'য়ে উঠল—যথাসম্ভব নিজেকে দমন ক'রে রাজাকে বললেন, "মহারাজ, নিকটেই দেখেছি একটা কুঁড়ে—চলুন, সেখানে গিয়ে বিশ্রাম করবেন।"

কিন্তু মহারাজের তখন মত্ত অবস্থা। বিকৃত হ'তে আরম্ভ করেছে আঘাত খাওয়া মস্তিষ্ক!

৪

রাজার অবস্থা যখন ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছিল, তখন কেণ্ট বয়স্যের সাহায্যে রাজাকে নিয়ে হাজির হ'লেন ডোভারে। ডোভারে আছে ফ্রান্সের রাজার শিবির। সেখানে আবার উপস্থিত রয়েছে ফ্রান্সের রাণী—রাজা লীয়ারের কন্যা কর্ডিলিয়া। কর্ডিলিয়া যখন জানল রাজার মর্ম্মান্তিক অবস্থার কথা আর যখন বুঝল এর জন্য দায়ী গনেরিল আর রিগান, তখন ক্রোধে সে ফুলতে লাগল—কিন্তু তার এখন কর্ত্তব্যের স্রোত অন্য দিকে। তাই খ্যাতনামা ডাক্তারদের নিয়ে সে ছুটল যেখানে পাগল রাজা ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভিখারীর মত—তাঁর মাথায় মুকুটের বদলে আজ আছে কাঁটার ঝোপ। আর সেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় বয়স্য তাঁকে কোন রকমে সামলে বেড়াচ্ছে।

চোখের জলে মিলন হ'ল পিতা-পুত্রীর। এর পর রাজার অবস্থা শান্ত হ'তে দেরী হ'ল না।······

গনেরিল আর রিগান জেনেছে—তাদের বিতাড়িত রাজা আজ তাঁর ছোট মেয়ের কাছে। হিংসা এসে জুড়ে বসল তাদের মনে। তার পর প্ররোচনা দিতে লাগল তাদের স্বামীদের এই বলে যে, ডোভারে ফ্রান্সের সৈন্য সব জড়ো হ'য়েছে—আক্রমণ করবে তাদের রাজ্য। তাদের প্ররোচনায় কর্ণওয়াল-আলবেনী সৈন্য সম্মিলিত ক'রে শিবির ফেললেন ডোভারের অনতিদূরেই। তার পর আরম্ভ হ'ল যুদ্ধ।

সংসারে সব সময় সত্যেরই যদি জয় হয় তাহ'লে এ যুদ্ধে কর্ডিলিয়ার জয়ী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বাস্তবিক মাটির পৃথিবীতে সত্যের পরাভব হ'তে দেখা গেছে বার বার, অবশ্য এই পরাজয়ের মূলে অদৃশ্য কোন লাভ আছে কিনা বলতে পারব না, কিন্তু এখানে দেখলাম, কর্ডিলিয়ার মুষ্টিমেয় সৈন্য হেরে গেল গনেরিল-রিগানের মিলিত শক্তির কাছে। আর ফল হ'ল বৃদ্ধ রাজা লীয়ার আর তাঁর প্রিয় কন্যা কর্ডিলিয়া বন্দী হ'লেন শত্রুর হাতে।

তথাপি মিথ্যাচারীরও মেয়াদ বুঝি ফুরিয়ে এসেছিল। এত দিন কর্ণওয়াল ও আলবানী কোন কথা না জেনে শুধু তাঁদের স্ত্রীদের পরামর্শ মত কাজ চালাচ্ছিলেন—ভেবে দেখেননি তাঁর স্ত্রীদের প্রকৃতি। ইতিমধ্যে কর্ণওয়াল অপঘাতে মারা গেছেন, আর আলবানী বুঝলেন তিনি ভুল করে এসেছেন আগাগোড়া। নির্দ্দোষ রাজাকে তাড়ানো তাঁদের অনুচিত হয়েছে। কেন না, গনেরিল আর রিগানের চরিত্র আজ তাঁর কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

আর তখন গনেরিল ও রিগানের মধ্যে স্বার্থ নিয়ে আরম্ভ হ'য়েছে দ্বন্দ্ব, সেই হিংসারই বশবর্ত্তী হ'য়ে রিগানকে বিষ খাইয়ে হত্যা করল গনেরিল আর ধরা পড়বার ভয়ে সেও করলো আত্মহত্যা। কিন্তু যাবার আগে সে মরণ-কামড় দিয়ে গেল রাজা লীয়ার আর কর্ডি-লীয়ার ফাঁসির আদেশ দিয়ে।

আলবেনী যখন জানতে পারলেন তাঁর স্ত্রীর এই ভয়ঙ্কর আদেশের কথা, নির্দ্দোষদের বাঁচাতে ছুটলেন—কিন্তু তখন কর্ডিলিয়ার মৃত-দেহ ফাঁসির দড়িতে লটকাচ্ছে—আর রক্ষা পেয়ে রাজা লীয়ার ছুটে গিয়ে তাঁর ভুলের ফল লক্ষ্য করছেন। তিনি যে বেঁচে গেলেন —তাঁর কি এ-জীবনে আর কোন প্রয়োজন আছে? আজ যে-সুশীলার শীতল দেহটাকে কোলে ক'রে রয়েছেন সে কি কোন দিন আর কথা কইবে? তাঁর অপরাধ কি সে ক্ষমা করবে না? যে অজানা আলোকের উদ্দেশ্যে ছুটে গেছে তার পবিত্র আত্মা—সেখানে কি তাঁর যাবার অধিকার আছে?

তবুও বুঝি রাজা শেষ চেষ্টা করলেন, কারণ ততক্ষণে তাঁর প্রাণ-হীন দেহ লুটিয়ে পড়েছে পৃথিবীর মাটিতে।···আর সদাশয় কেণ্টের আর্ল? মৃত্যুর আগে কেণ্ট নিজের পরিচয় জানাতে গিয়েছিলেন—কিন্তু রাজা বুঝতে চাননি। তবু যাবার বেলায় তাঁকে যেন ডাক দিয়ে গেছেন—তিনি 'না' বলবেন কি ক'রে—তাই তো তাঁকে এখন শুধু ঘুরে বেড়াতে হবে—অপেক্ষা করতে হবে সেই শেষ দিনের যাত্রার সম্মতি পাওয়ার আশায়।······

অনুবাদক—শ্রীতরুণকুমার দত্ত

বিদ্যাসাগরের পুত্রবধূ

"বিদ্যাসাগর মশায়ের ছেলে নারায়ণ বিদ্যারত্নের স্ত্রী সুতোকাটা শেখাতেন। আমার বড় মেয়ে, নাতনী যায় সুতো কাটতে। বলি—আটটার ভেতর ফিরবি, রাত করবি নে কিছুতেই, হাজার হলেও বয়সী মেয়ে সব। তবু ওরা দেরী করে। সুতো কাটতে কখনও এত দেরী হয়? তাই একদিন চললাম ওদের পিছু-পিছু। দেখি ওরা ঘরে ঘরে খদ্দর ফিরি ক'রে বেড়ায়। এক দিন আমিও ওদের দলে ভিড়ে পড়লাম।"

—মোহিনী দেবী।

পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ

অপর্ণা সরকার

শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেদিন মানুষের চৈতন্য প্রথম মুক্তিলাভ করল সেদিন থেকে সে চেষ্টা করে আসছে আপনাকে প্রকাশ করতে। সাহিত্য তার সেই আত্মপ্রকাশেরই ফল। যুগে যুগে হয়েছে তার মানস-পরিবর্ত্তন। তাই জগতের ইতিহাসের ধারার সঙ্গে সাহিত্যেরও হল পরিবর্তন। সেই পরিবর্ত্তনের স্রোতে বাংলা সাহিত্যেও এসেছে বৈচিত্র্য। যাঁদের অনন্যসাধারণ প্রতিভার যাদুস্পর্শে এসেছে এই বৈচিত্র্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। শুধু অন্যতম নয়—শ্রেষ্ঠতম। সে শ্রেষ্ঠতা তাঁর বিরাট রচনায়, তাঁর বহুমুখী প্রতিভায়। সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি একক, তাঁর জুড়ি নেই।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রবাহের মাঝে বিভিন্ন ধারা দেখা যায়। য়ুরোপ তাঁকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দেখিয়েছিল 'গীতাঞ্জলী'র কবি বলে, কিন্তু মূল ধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন কবি নিজে—

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—('জন্মদিনে')

সত্যই তাঁর বাঁশীর সুরে পৃথিবীর বিচিত্র রাগিণী ঝঙ্কৃত হয়েছে। ধরণীকে দেখেছিলেন তিনি পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে। তার মধ্যে ফাঁক ছিল না এতটুকু। 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি'—এ কথা কবির বিনয় মাত্র। তাঁর কাব্য পাঠে দেখা যায় 'সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসে সংকীর্ণ বাতায়ন' থেকে তিনি 'ওপাড়ার প্রাঙ্গণে'র সীমানাটুকুই দেখেননি, অখ্যাত অবজ্ঞাতদের জীবনকে উপলব্ধি করেছেন আপন গভীর সত্তায়। তাদের অনাবৃত দেহের অন্তরালে হৃদয়ের মর্য্যাদা দিয়েছেন তিনি। তাই বলতে হয়, হিরণ্যদ্যুতি সবিতার সহস্র রশ্মিচ্ছটায় যেমন বিশ্বচরাচরের তমিস্রার আবরণ যায় ঘুচে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের সহমর্মিতার উজ্জ্বল কিরণে জগতের সকল আঁধার-যবনিকা অপসারিত হয়েছে। আলোকোজ্জ্বল পৃথিবীকে কবি প্রকাশ করলেন বিচিত্র ভাবে। তাঁর হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য পেয়েছে পৃথিবী। তাঁর গতিশীল মন ভাবধারার দীর্ঘ পথ পরিক্রমণ করেও তুচ্ছ করতে পারেনি মাটির পৃথিবীকে। পৃথিবীর কবিরূপেই তিনি চেয়েছেন আপনাকে প্রকাশ করতে,—

দূর হতে আলোকের বরমাল্য এসে
খসিয়া পড়িল তব কেশে
স্পর্শে তারি কভু হাসি কভু অশ্রুজলে
উৎকণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষায় বক্ষতলে
ওঠে যে ক্রন্দন,
মোর ছন্দে চিরদিন দোলে যেন
তাহারি স্পন্দন।
স্বর্গ হতে মিলনের সুধা
মর্ত্ত্যের বিচ্ছেদ পাত্রে সঙ্গোপনে
রেখেছ বসুধা ;
তারি লাগি নিত্য ক্ষুধা
বিরহিণী অয়ি,
মোর সুরে হোক জ্বালাময়ী।
—('পূরবী')

রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীর মধ্যে মানুষ, প্রকৃতি ও বিশ্বদেবতার অনুভূতি বিধৃত রয়েছে। পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য্য, অসীম প্রীতি তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তাই পৃথিবী তাঁর কাছে মাটির পৃথিবী নয়, তা—

বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা
লক্ষ যুগের সঙ্গীত মাখা
সুন্দর ধরাতল।—('সোনার তরী')

সেই সুন্দর ধরাতলে বহু মানবের সাথে এক হয়ে কবি অনন্ত জীবন লাভ করতে চান। তাই তিনি বলেন—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'—('কড়ি ও কোমল')। মানুষকে তিনি আপন করেছেন তাঁর নিবিড় প্রেমে। উদার দৃষ্টিতে তিনি মানুষকে দেখলেন বিশাল বিশ্বের পটভূমিতে। সেখানে মানুষ কোন দেশ, কোন জাতি, কোন শ্রেণীর প্রতিনিধি নয়। ব্যক্তিগত চেতনায় সে সমৃদ্ধ। সমাজ-সংস্কারের গণ্ডীর বাইরে এই মানুষের মনটি কবিকে স্পর্শ করেছিল। এই মহামানবের প্রেমে পরিতৃপ্ত কবির মন বলে উঠেছে—

মানুষকে গণ্ডীর মধ্যে হারিয়েছি
মিলেছে তার দেখা
দেশবিদেশের সকল সীমানা পেরিয়ে।—('পত্রপুট')

খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের বিকাশই রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল কথা। প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব পরিবেশের মাঝে নিত্য দেখেছেন যে খণ্ড মানবকে, তাকেও উপেক্ষা করতে পারেননি। তাদের হাসি-কান্নার দোলায় দুলে উঠেছে কবির মন। আপাতদৃষ্টিতে যাকে সামান্য মনে হয়, বিশ্বের গতিচক্রে যার প্রয়োজন নেই বলে মনে হয়, কবির কাছে কিন্তু তা তুচ্ছ নয়। তাই এক দিকে যেমন নদীতীরে জননীর প্রতিনিধি ছোট্ট দিদির গাঢ়তম ভ্রাতৃস্নেহ অনুভব করেছেন অপার আনন্দে, তেমনি সদ্য কন্যাহারা ভৃত্যের পিতৃ-হৃদয়ের মর্ম্মভেদ হাহাকার উপলব্ধি করেছেন নিবিড় বেদনায়। মানুষের প্রতি তাঁর প্রেমের অন্ত নেই। তিনি নিজে বলেছেন—"প্রকৃতি তার রূপ-রস বর্ণ-গন্ধ লইয়া, মানুষ তার বুদ্ধি-মন-স্নেহ-প্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।"

সব কিছু সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ
অমৃতের অর্থ দেয় তারে,

মধুময় করে দেয় ধরণীর ধূলি,
সর্ব্বত্র বিছায়ে দেয় চিরমানবের সিংহাসন।—('আরোগ্য')

প্রেমের রস তাঁর হৃদয়-পাত্রটি পূর্ণ করে ছড়িয়ে পড়ল নিখিল বিশ্বে। কবি তাকালেন প্রকৃতির দিকে। প্রকৃতির নদ-নদী, ঋতুর লীলাবৈচিত্র্য, নানান্ ছোটখাট জিনিষের সৌন্দর্য্য তাঁকে মুগ্ধ করল। অজস্র লেখনের মাঝে হল তার প্রকাশ। শিল্পী রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক-একটি কথার আঁচড়ে প্রকৃতির সুন্দর ছবি আমাদের চোখের সামনে মূর্ত্ত করে তুললেন।—

······অর্দ্ধমগ্ন তরী 'পরে
মাছরাঙা বসি', তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্ত নেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি।—('চৈতালি')

লেখনীর মুখে ফুটে উঠেছে এ যেন একটি নিখুঁত আলোকচিত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত শিল্পীর মন কি শুধু আলোকচিত্রেই সন্তুষ্ট হয়? কবি তাঁর ছবির মধ্যে মিশিয়ে দিলেন আপন মনের কল্পনা, অনুভূতি। ফলে সে ছবি হয়ে উঠল আরও জীবন্ত। এমনি প্রাণবন্ত ছবি রবীন্দ্র-সাহিত্যে রয়েছে ছড়ান।—

ছায়ামূর্ত্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে।
কী ভীষণ অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ্ন-আকাশে
নিঃশব্দ প্রখর
ছায়ামূর্ত্তি তব অনুচর॥—('কল্পনা')

এখানে যা' দেখি তা' বৈশাখের রুক্ষ পাণ্ডুর মাঠের আলোকচিত্র নয়। ক্যামেরার লেন্সের সামনে তা' ধরা দেয়নি। ভুবনডাঙার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বৈশাখ তার সঙ্গি-সাথী নিয়ে একেবারে আমাদের চোখের সামনে তার প্রলয়নৃত্য সুরু করে দিয়েছে। ছবির সঙ্গে কবির মনের মিতালী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবির খুশিভরা মন তাকে রেখার টানে মূর্ত্ত করেই তৃপ্ত হল না। প্রকৃতির মনের গহনে গানের উৎসটির সন্ধান পেলেন কবি। লিরিকপন্থী কবি তাকে সুরের ধারায় সিক্ত করে তুললেন। ছবি ও গান এক হয়ে গেল।—

গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি'
গরজে গগনে গগনে।
ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা
কুলায় কাঁপিছে কাতর কপোতী
দাদুরী ডাকিছে সঘনে···('ক্ষণিকা')

তুলি ও সুরের একত্র সমাবেশের ফলেই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি বর্ণনা এত সুন্দর ও সার্থক হয়েছে। এই সার্থকতা সম্ভব হওয়ার কারণ প্রকৃতির অনন্ত সুধা, তার অফুরন্ত মাধুর্য্য কবির মন ভরে দিয়েছে। বিধাতার আশীর্ব্বাদে প্রকৃতি ধরা দিয়েছে তাঁর কাছে! আকাশ তার আলোর পাত্রখানি ঢেলে দিয়েছে কবির সামনে, বাতাস তার মধুর স্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছে, বনানী তার শ্যামল আস্তরণ দিয়ে ঘিরে ধরেছে কবিকে। কবির মনে লেগেছে খুশীর হাওয়া। বিশ্বের ইতিবৃত্তে হয়ত তার মূল্য নেই তবু সে ত মিথ্যা নয়? তাই তিনি বলেছেন—

জলস্থল আকাশের রসসত্রে
অশথের চঞ্চল পাতার সঙ্গে
ঝলমল করছে আমার যে অকারণ খুশি
বিশ্বের ইতিবৃত্তের মধ্যে রইল না তার রেখা.
তবু বিশ্বের প্রকাশের মধ্যে রইল তার শিল্প। ('পত্রপুট')

'এই রসনিমগ্ন মুহূর্ত্তগুলি'ই কবির 'চিরজীবনের খুশির মালা' গেঁথে চলেছে।

প্রকৃতি তাঁকে শুধু মুগ্ধই করেনি, ব্যাকুল করেছে। তার অতল রহস্য কবিকে শৈশব থেকেই হাতছানি দিয়ে ডাক দিয়েছে। শৈশবে তিনি ছিলেন 'ভৃত্যরাজতন্ত্রে'র গণ্ডীর মধ্যে। কিন্তু তাঁর মনকে কোন গণ্ডীর রেখাই বাঁধতে পারেনি। সে মন ছুটে চলেছিল অলস মধ্যাহ্নে পুকুর-পাড়ের বিরাট বটের ছায়ায়-ছায়ায়, স্নিগ্ধ অপরাহ্নে জোড়াসাঁকোর রাস্তায় বেলফুলওলার ডাকের পিছনে-পিছনে। সুদূরের বাঁশী বেজে উঠল। কবির চিত্ত-বিহঙ্গের ডানা হল চঞ্চল। পাষাণ-কারার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রভাতের সোনালী আলো তাঁকে ইসারা করলে বেরিয়ে পড়বার জন্য। অসীমের আগমনী সবে বেজে উঠেছে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় তখনও নিবিড় হয়নি। তার পর মাহেন্দ্রক্ষণে অনন্ত পাঠালেন তাঁর আলোকের দূত। সেদিন সদর-ষ্ট্রীটের বাসার ছোট বারান্দাটিতে দাঁড়িয়ে আবিষ্কার করলেন তিনি নূতন রূপ। নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ হল সীমায়িত গুহার মধ্যে। বিপুল আনন্দে কবি তাঁর চারি পাশের গণ্ডীকে মুছে ফেললেন—

আকাশ 'এসো এসো' ডাকিছ বুঝি ভাই
গেছি ত তোরি বুকে আমি ত হেথা নাই।—('প্রভাতসঙ্গীত')

সীমার মধ্যে পেলেন তিনি অসীমকে। সেই প্রাপ্তির আনন্দে বিহ্বল কবি বলে উঠেছিলেন—'ওরে প্রাণের বাসনা, প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।'

সেই আবেগ ব্যর্থ হয়নি কবির জীবনে। তার পর হতে কত নূতন নূতন রূপে, কত নিবিড় ভাবে উপভোগ করেছেন প্রকৃতিকে। একদিন প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা দেখে কবি বলেছিলেন—

নাই সুর, নাই ছন্দ, অর্থহীন নিরানন্দ
জড়ের নর্ত্তন।—('মানসী')

কিন্তু সে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হল। শত শত মানুষের আর্ত্ত হাহাকার যে জড়ের প্রাণে জাগাতে পারেনি এতটুকু মায়া, কবি তাঁর অনুভূতির সোনার কাঠির স্পর্শে সেই জড় মাটির বুকে জীবনের স্পন্দন জাগিয়ে তুললেন। তাঁর প্রকৃতি হল চেতনময়ী স্নেহময়ী। জীবের সুখ-দুঃখ, বেদনা-প্রীতিতে তার মনের তার একসুরে বাঁধা। তাই বিদায়ের ব্যথায় তাঁর মন গুমরিয়ে ওঠে। ব্যাকুল বাহুর বন্ধনে এই স্নেহময়ী মৃতবৎসা জননী তার সন্তানকে বুকে চেপে ধরে বলে—'যেতে নাহি দিব।' কিন্তু 'তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।' চেতনময়ী ধরণীর এই গভীর দুঃখটি অনুভব করে কবি বললেন—"এর মুখে ভারী একটা সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে—যেন এর মনে আছে—আমি দেবতার মেয়ে কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই, আমি ভালবাসি কিন্তু রক্ষা করতে পারি নে, আরম্ভ করি শেষ করতে পারিনে, জন্ম দেই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি নে।" পৃথিবীকে তিনি দেখলেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই সে শুধু স্নেহময়ী

জননী নয়। 'স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী, তুমি নিত্য নবীনা।' 'শুভে অশুভে তার পাদপীঠতলে' দাঁড়িয়ে কবি দেখলেন—

অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।
একদিকে অপক্ক ধান্যভার-নম্র তোমার শস্যক্ষেত্র—
* * *
অন্যদিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্ক পাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরীকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।
—('পত্রপুট')

এই ললিত-কঠোরে মিশ্রিত পৃথিবীর অন্তস্তলে যে বৈরাগ্য, যে ঔদাস্য নিহিত রয়েছে তার রূপ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তাই সেই উদাসীন পৃথিবীর নিশ্চল পদপ্রান্তে কবি রেখে গেছেন তাঁর ক্ষতচিহ্ন-লাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি।

একদিকে কবি যেমন নির্লিপ্ত ভাবে ধরণীর বিচিত্র রূপ ও লীলা দর্শন করেছেন, তেমনি তাকে উপভোগ করেছেন আপনার সমস্ত চেতনা দিয়ে। বিচিত্ররূপশালিনী ধরণীর স্তন্যরসপানে পুষ্ট হয়েছে কবির সত্তা। তিনি তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। তাই সাগরের কলতানের মাঝে তিনি শুনলেন তার ভাষা, আর তার সঙ্গে তাঁর মনে জেগে উঠল কত যুগ-যুগান্তরের অস্পষ্ট স্মৃতি।—

সেই জন্ম-পূর্ব্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী 'পরে সেই নিত্য জীবন স্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মত
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি। ('সোনার তরী')

সেখান থেকে ফিরে এসে দাঁড়ালেন কবি নীলাকাশের তলে মাটির বুকে। এই মাটি, পত্রপুষ্প, আকাশের অগণ্য নক্ষত্র—এ সবই যেন আপনার। যুগে-যুগে জন্মবিবর্তনের ধারার মাঝ দিয়ে তিনি যেন এই পৃথিবীর স্তন্যরস পান করেছেন—নাড়ীর যোগ রয়েছে তার সঙ্গে। তিনি বললেন—

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগ-যুগান্তর ধরি,······ ('সোনার তরী')

এই যুগ-যুগান্তরের স্মৃতির আলোড়ন—এই অভূতপূর্ব **Romance**—এ রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এই **Romantism**-এর কোন ইঙ্গিত নেই। রবীন্দ্রনাথের এই বিশিষ্ট অনুভূতির জন্য আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে **Romantism**-এর নতুন সংজ্ঞা রচনা করতে হয়। কবির সঙ্গে প্রকৃতির এই একাত্মানুভূতি সার্থক হল তখনই যখন তিনি উপলব্ধি করলেন—

ঐ চাঁদ ঐ তারা তমঃপুঞ্জ গাছগুলি
এক হ'ল, বিরাট হ'ল, সম্পূর্ণ হ'ল
আমার চেতনায়।

বিশ্ব আমাকে পেয়েছে,
আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে,
অলস কবির এই সার্থকতা।···('পত্রপুট')

সেই সার্থকতাতেই কবির পূর্ণতা। বিশাল বিশ্বের চারি দিক হতে প্রতি কণা কবির মনকে টানছে। সাধ্য কি তাঁর এ আকর্ষণ ঠেলে তিনি পরের মতন চলে যান! তাই স্বর্গবাসের প্রলোভনও তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। স্বর্গের সুখস্বপ্ন কবি কল্পনা করেও শান্তি পেলেন না। মর্ত্ত্যের দিকে চেয়ে দেখলেন। 'দুঃখ সুখের ঢেউ খেলানো এই সাগরের তীরে' ফিরে আসবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। স্বর্গের মাধুরিমা লুপ্ত হল। তাঁর চোখ জলে ভরে উঠল মাটির টানে—'মর্ত্ত্যভূমি স্বর্গ নহে, সে যে মাতৃভূমি···'—এই তাঁর মাতৃভূমি, এই পৃথিবীর আত্মজ তিনি।

খণ্ডের মাঝে অখণ্ড, সীমার মধ্যে অসীমের বিকাশই রবীন্দ্র-কাব্যের মূল তত্ত্ব। উপনিষদের ঋষি বিশ্বভুবনে যে অখণ্ড চৈতন্যের বিকাশ দেখে বলেছিলেন—

অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং
পৃথিবীহ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।

সেই বিরাট চৈতন্যময় পুরুষের সত্তাকেই কবি অনুভব করলেন বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে। তাই তাঁর নিসর্গচেতনা আপনার চেতনার সঙ্গে এক হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মাটির পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে—"from **synthesis to synthesis height to height till on absolutely universal consciousness is reached."**

এই বিশ্বানুভূতি তাঁর মনের আগল খুলে দিল। সেই মুক্তদ্বার পথে বিশ্বদেবতা নেমে এলেন সসীমের গণ্ডীর মাঝে, কবির বুকের আঙিনায়। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে কবি অনুভব করলেন তাঁকে, আস্বাদন করলেন প্রকৃতির সাথে অতীন্দ্রিয়ের লীলা অতি সহজ ভাবে। বিশ্বদেবতার রসের প্রসাদ পৃথিবীর পানপাত্রে ভরে আকণ্ঠ পান করে কবি বললেন—

এই বসুধার
মৃত্তিকায় পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। —(নৈবেদ্য)

পূর্ণ হল কবির মন। 'বিশ্বরূপের খেলাঘরে অপরূপকে দুটি নয়ন মেলে' দেখলেন কবি। অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মাটির আঙিনার কোণ হতে সেই অপরূপ অমূর্ত্তের সন্ধান পেয়ে পৃথিবীর পদতলে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি দিয়ে কবির মন বলে উঠল—

তবু জেনো অবজ্ঞা করিনি
তোমার মাটির দান, আমি সে মাটির কাছে ঋণী—
জানায়েছি বারম্বার, তাহারি বেড়ার প্রান্ত হতে
অমূর্ত্তের পেয়েছি সন্ধান। —('সেঁজুতি')

এই স্বীকৃতি কবির পৃথিবীকে অমূল্য করে রেখেছে। তাঁর আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে পৃথিবীর কবি জয়গান করে গেলেন এই ধূলা-মাটির জগতের। আনন্দের আবেশে মধুময় হয়ে উঠল ভূলোক, দ্যুলোক। অন্ত নেই সেই মাধুর্য্যের। তাই জীবনের শেষ লগ্নে মরণ-পথিক কবি খ্যাতির সিংহাসন থেকে নেমে এসে দাঁড়ালেন ধূলার ওপর। সত্যের সাধক, সুন্দরের পূজারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হল চির আনন্দের গান—

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
* * * *
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব, "তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে ;
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।"
সত্যের আনন্দ রূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি,
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি। —('আরোগ্য')

জলযাত্রা

শ্রীশান্তা দেবী

"জলরাজেন্দ্র", মে ১৯৫২।

১৫ বছর আগে জাহাজে চড়েছিলাম জাপান যাবার সময়। সে জাহাজ জাপানী N. Y, K, lineএর Anio Maru. আবার পনের বছর পরে জাহাজে চড়লাম ; এবার স্বদেশী জাহাজ ! সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর "জলরাজেন্দ্র" জাহাজ। স্বদেশী কোম্পানী ত বিশেষ নেই ; যাও বা আছে তাতে গেলে লোকে মনে করে দিশী জাহাজে চড়ে বুঝি মানহানি হল। আমার কিন্তু উল্টোই মনে হয়। একে ত আমরা ইউরোপ-আমেরিকাতে এমন মনোভাব নিয়ে যাই যে মনে হয় যে, ও-দেশের জল পেটে না পড়লে এবং ও-দেশের মাটিতে না হাঁটলে জাতেই উঠলাম না এ জন্মে। তার উপর যদি পি এণ্ড ওতে না চড়লে নিজেদের আভিজাত্য না প্রমাণ করা যায় তাহলে ত ময়ূরপুচ্ছ পরে ময়ূর হওয়ার চেয়ে দাঁড়কাক থাকাই ভাল। আমরা পড়তে যাই বিদেশে, রোগের চিকিৎসা করাতে যাই বিদেশে, টাকা ওড়াতে যাই বিদেশে, আবার জাহাজ-খরচা দেব তাও বিদেশকে ! তাই স্বদেশী জাহাজে বিদেশে যাচ্ছি বলে আমার বেশ ভালোই লাগল। যত দিন না বিলেতের মাটিতে পা দেব তত দিন আমাদের ভারতীয় চেহারাগুলি চার ধারে দেখলে মনে হবে দেশেই আছি।

সিন্ধিয়াদের অনেক জাহাজ। বেশীর ভাগই মাল-জাহাজ। কয়েকটা যাত্রী-জাহাজ আছে। বছর ১৫।২০ আগে যখন কোম্পানী নূতন ছিল তখন ভিজাগাপট্টমে সিন্ধিয়াদের কোন জাহাজের প্রথম ভাসান উপলক্ষে আমার পিতৃদেবকে এঁরা সেখানে পৌরোহিত্য করতে নিয়ে গিয়েছিলেন মনে পড়ছে। তখন ভাবিনি, নিজে এক দিন এঁদের জাহাজে সমুদ্রপারে যাব।

এই 'জলরাজেন্দ্র' মাল-জাহাজ। এতে ১২টি মাত্র যাত্রী নেয়। আর সব নিজেদের লোক। কলকাতা থেকে লিভারপুল পৌঁছুতে ৪০।৪২ দিন লাগে, তাই ভাড়া একটু বেশী। দিনে ৪।৫ বার যাত্রীদের আকণ্ঠ পানাহার করাতেই খরচ যথেষ্ট হয়। যাঁরা দীর্ঘকাল সমুদ্র-বাস করতে চান তাঁদের পক্ষে এই রকম জাহাজই ভাল। ছোট্ট জাহাজ, লোকের ভীড় বিশেষ নেই, যারা আছে তারা সবাই মোটের উপর বেশ মিশুক এবং ভদ্র।

এই জাহাজে যাত্রা যেদিন থেকে ঠিক হয় সেদিন থেকেই কোম্পানীর সকলে আমাদের সব বিষয়ে সাধ্যমত সাহায্য করছেন। মাস দুই আগেই বাড়ীর ২।১ জন গিয়ে জাহাজ দেখে কেবিন পছন্দ করে কাপ্তেনের সঙ্গে আলাপ করে এলেন। যতই যাবার দিন এগিয়ে আসতে লাগল ততই নানা রকম হাঙ্গাম বাড়তে লাগল। কত রকম যে আইন-কানুন আছে ঘরের বাইরে পা বাড়াবার, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। গত বৎসর একবার আমাদের বেরোবার কথা হয়। তাই পাশপোর্টগুলো গত বছরেই করে রাখা হয়েছিল। মনে করেছিলাম কাজ বুঝি হয়ে রইল। পরে দেখলাম, হায় রে, এই ত কলির আরম্ভ ! আগেও ত একবার সমুদ্রপারে গিয়েছি, কিন্তু এত বাঁধন ত তখন ছিল না ? বসন্ত-কলেরার নানা রকম টীকে নিতে হবে বুঝলাম। কিন্তু শুধু নিলেই হবে না। বিশেষ লোককে দিয়ে দিইয়ে এবং বিশেষ কাগজে বিশেষ লোককে দিয়ে সই করিয়ে পেশ করতে হবে। তার মানেই বিশেষ একটা ছুটোছুটি ও খরচ।

স্ত্রীলোকে চিরকালই গহনা পরে। আমার তিন মেয়ে আর আমি এই চার জন স্ত্রীলোক চলেছি, কাজেই সামান্য হলেও গহনা দু'-চারটা সঙ্গে থাকাই স্বাভাবিক। হঠাৎ অন্য কথার প্রসঙ্গে এক জন বন্ধু জানালেন, গভর্ণমেণ্টের অর্থাৎ Reserve Bankএর অনুমতি ছাড়া এক আনা সোনাও বাইরে নিয়ে যেতে দেবে না। যদি ভদ্র মহিলা গায়ে পড়ে খবরটা না দিতেন তাহলে হয়ত জাহাজ-ঘাটে গিয়ে হাতের চুড়ি-বালাগুলো খুলে জলে ফেলে দিতে হত। যাই হোক, ব্যাঙ্কে দৌড় করানো হল। চার জনের আলাদা আলাদা আটটি কাগজে অর্থাৎ দু'বার ফর্দ্দ করে দিতে হবে। কত দাম, কত ওজন, কিসের সঙ্গে কি দিয়ে তৈরী, কবে কোথায় পেয়েছি, কেন নিয়ে যাচ্ছি ইত্যাদি সহস্র রকম প্রশ্ন। কি করে পেলাম, কবে পেলাম, সব মনেও নেই ছাই। সন-তারিখ অগত্যা আন্দাজে তৈরী করতে হল, রাত জেগে নিক্তি নিয়ে গহনা ওজন করে সোনার দরে, বিজ্ঞাপন পড়ে দাম ঠিক করে আট বার লিখে সই করে যখন কাগজগুলো খাড়া করলাম, শুনলাম এ কাগজে হবে না, আবার অন্য কাগজে লিখতে হবে। কি আর করি ? কাঁদে যখন পা দিয়েছি, নিস্তার নেই। আবার আট প্রস্থ কাগজে নাম-দাম-ধাম এবং বিচিত্র প্রশ্নের জবাব লিখতে বসলাম। কিন্তু আমি শুধু লিখলেই ত হবে না, এক জন গহনার ব্যবসাদারকে দিয়ে আমার কথা যে সত্যি তা লিখিয়ে নিতে হবে। স্যাকরার দোকানে কত দৌড় করা যায় ! আগে যাঁকে দিয়ে সই করিয়েছিলাম, তাঁকে আবার চিঠি লিখে আনাবার সময় নেই। কাজেই টাইপ করে তাঁর নাম-ঠিকানা ছেপে দিয়ে কোন রকমে কাজ সারলাম। সাধারণতঃ মেয়েরা যা দু'তিনটা গহনা পরে তাই নিয়ে এত হয়রাণি ! কোন্ দেশে কখন কেমন শীত, কেমন গরম সেই বুঝে কাপড় তৈরী করাতে ত গলদ্ঘর্ম্ম। গরীবের পয়সা অকারণ যেন না যায় ! আবার শুধু শীত-গ্রীষ্ম বুঝলেই হবে না। আধুনিক হাল-চালও কিছু বোঝা চাই, বন্ধুরা বলতে লাগলেন। বললাম, "আমি বাপু বাঙালী মানুষ, যে চালে এতটা জীবন কাটালাম, তাইতেই চলে যাবে।" শোনে কে সে কথা ? না, ওটা ওদেশের নিয়ম নয়, সেটা ওখানে চলে না ইত্যাদি ইত্যাদি। যাক, মধ্যপন্থা ধরে কোন রকমে একটা ব্যবস্থা করলাম। পরে ভাগ্যে কি আছে অবশ্য জানি না। আমরা গরম দেশের লোক, শীতের ব্যাপার ভাল ত বুঝি না। পথ ত কম নয়। ইউরোপ হয়ে আবার

অন্য জাহাজে উঠে আমেরিকা যেতে হবে। সেই হল সব চেয়ে মুস্কিল। আমেরিকার ছাড়পত্রওয়ালারা বললেন, "ক'পয়সা সঙ্গে নেবার অনুমতি পেয়েছ আগে বল, তবে ত যেতে দেব?" তখন পর্য্যন্ত এক পয়সাও পাইনি। হতাশ হয়ে ১০৲ টাকা ট্যাক্সি খরচ করে বাড়ী ফিরে এলাম। গৃহকর্ত্তাকে কিছু পয়সা নিশ্চয় নিতে দেবে, কারণ তিনি ওদেশের নিমন্ত্রণে যাচ্ছেন, তাঁরা খরচ দেবেন। কিন্তু আমাদের কি হবে? তিন মেয়েকে সেখানেও এই সুযোগে কিছু একটা শেখাবার ইচ্ছা ছিল। আর 'বেড়াতে যাচ্ছি' বললে ভারত সরকার যেতেও দেবেন না। দেশের পয়সা নষ্ট করতে কেনই বা দেবে? কাজেই মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করবার অনুমতি চেয়ে বেতারে খবর দিতে অনুরোধ করলাম। দু'দিন পরেই জবাব পেলাম—তাদের ভর্ত্তি করা হবে। আমাকেও বাড়ীর কর্ত্তা খেতে-পরতে দেবেন তাঁকে লিখে দিতে হল। তার পর আরও আদা-জল খেয়ে অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে মেয়েদের জন্য এবং আমাদের জন্য অল্প-বিস্তর কিছু ডলার নেবার অনুমতি পেলাম। আমেরিকার নিন্দা-প্রশংসা অনেকগুলি। কিন্তু আমাদের যাবার পথ সহজ করবার জন্য সেণ্ট পলের (আমেরিকার) বিশ্ববিদ্যালয় যতটা তৎপরতার সঙ্গে সাহায্য করেছেন তাতে সত্যিই বিস্মিত হয়েছি।

এবার ছাড় পাব ভরসা হল। আবার গেলাম দল বেঁধে তখন তিনপুরুষের নামধাম নাড়ী-নক্ষত্র লিখে দশটা আঙুলের ছাপ নিয় প্রত্যেকের তিনটে করে ছবি দিয়ে ছাড় পাওয়া গেল। ওঁরা অবশ্য বললেন, "তোমাদের পাশপোর্ট যদি কেউ চুরি করে, কিম্বা নামও যদি কেউ জাল করে তাহলেও তোমাদের হাতের ছাপ ত নকল করতে পারবে না? এতে তোমরা নিরাপদ হলে।" আমার কিন্তু কি রকম মন-খারাপ হয়ে গেল। ঠিক যেন আমরা চুরির আসামী, তাই দশ আঙুলে কালী মেখে কাগজে ছাপ দিচ্ছি। সে কালী তুলতে আধখানা সাবান আর চার সের জল খরচ হয়ে গেল।

যত দেশে যেতে চাইব প্রত্যেককে তার জন্যে মাশুল দিতে হয়। কেউ বা কম নেয় কেউ বেশী। বিদেশে গিয়ে হয়রাণ হওয়ার চেয়ে এখান থেকেই সব করা ভাল ভেবে আমরা সেগুলো করিয়ে নিলাম। বিদেশ-যাত্রার খরচের হিসাব করবার সময় এই খরচগুলোরও হিসেব রাখা উচিত।

খুঁটিনাটি কত যে সব আইন আছে না জিজ্ঞাসা করলে আগে জানা যায় না। আমার কাছে কতকগুলি বিদেশী মুদ্রা ছিল। আমি এক ব্যাঙ্ককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এগুলো কি আমি নিয়ে যেতে পারি?' খুব সামান্যই খুচরা টাকা-পয়সা। তাঁরা বললেন, 'লুকিয়ে-চুরিয়ে নিয়ে যায় অনেকে, নিয়ম নেই নেবার।' বললাম, 'দরকার নেই বাপু, থাক্ বাড়ীতে পড়ে।' আইনে যা বলে তার যতটা জানা ছিল সেই মত পয়সা-কড়ি নিয়ে জাহাজ ধরতে বেরোলাম। সিন্ধিয়া কোম্পানীর মারাঠী কর্ম্মচারী মিঃ গুপ্তে আমাদের যত রকমে যাত্রা শুভ করা যায় তার চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। তাঁর সাহায্যে যথাস্থানে গিয়ে হাজির হলাম। পরীক্ষকরা প্রত্যেকের নাম করে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, "আপনার কাছে কত টাকা আছে?" বললাম, "ঠিক ত গুণে রাখিনি, আন্দাজে বলছি।" আন্দাজ মত যা দাঁড়াল তাকে চার ভাগ করে চার জনের নামে লিখে দিলেন। সঙ্গে গয়না ইত্যাদি কি সব আছে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন, কারণ ফরমগুলোতে অনেক জিনিষের কথা লেখা রয়েছে দেখলাম। আমাদের বন্ধু সে সব অপ্রয়োজনীয় বলে বাদ দিয়ে দিলেন।

শেষ পর্য্যন্ত জাহাজে চড়লাম। আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু দেখা করে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। মনটা বাড়ী ফিরে যাবার জন্যে ব্যাকুল হতে লাগল। কোন রকমে অন্য কাজে মন দিয়ে ঘরের কথা ভুললাম।

"জলরাজেন্দ্র" রাত ৯টা পর্য্যন্ত পাট আর এলুমিনিয়ম বোঝাই করতে থাকল। দু'টি মাত্র সাদা-মুখ আর সব আমাদের মতদের নিয়ে রাত ১০টায় যাত্রা করলাম। বাঙালী, মাদ্রাজী, পার্শী, সিন্ধি, শিখ, নেপালী, গোয়ানিজ সব আছে। তবে বোধ হয় বাঙালী সব চেয়ে কম, গোয়ানিজ সব চেয়ে বেশী।

[ক্রমশঃ।

গত যুগের জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী

৺কৈলাসবাসিনী দেবী

১২৫৯ এই শালে চইত্র মাসে আমার শাশুড়ি ঠাকুরানি এখানে আসেন। বাবুকে বল্লেন আমি বগড়ির কৃষ্টরায়ের দোল দেকিতে জাবো। বাবু বল্লেন আচ্ছা দোলের কদিন আছে। তাহাতে মাতা ঠাকুরাণির খুব আহ্লাদ হইল। তিনি বল্লেন জে তোমাকে জখন গর্ব্বে ধারণ করেছি তখন আমার সকল আশা পূর্ণ হবে তার আশ্চর্য্য কি। তোমাকে রেকে জেদিন মরিবো সেইদিন জিবোন সার্থক হবে। জাবার সব উয্যুক হতে নাগিল। আমাকে রাত্রে জিজ্ঞাসা কল্লেন, তুমি যাবে। তাহাতে আমি বলিলাম নে গেলে জাই। বল্লেন নে যাবো। সেখানে পাল্কি পাওয়া জায় না। আর দুইখানি পাল্কি আনালেন। আমাদের ঘরে একখানি ছেলো। বাবু একখানিতে, আমাতে কুমদে এক খানিতে, আর মাতে বামুন মাশিতে এক খানিতে। বামন মাশি প্রথমে আমার শঙ্গে রামপুর জান। তিনি অনেক দিন আমাদের বাটিতে আছেন। আর সব লোকজোন গেলেন। আমরা চন্দর কোনার ভিতর দে গেলুম। সেখানে অনেক বশতি আছে, পথঘাট পরিস্কার। ছতোরগঞ্জে একটি বাটি ভাড়া করে রাকিতে বলেছেলেন। ১৫ দিনের জন্যে আমরা শেই বাটিতে গেলুম। সে বাটি একতোলা কিন্তু খুব পরিস্কার। সেখানে শেই দিন রহিলাম। তার পরদিন আমরা গড়বেতা গেলুম। সেখানের ডিপটি বাবু শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র ঘোষ, তিনি আমাদের কুটুম্ব। তাঁর স্ত্রী সঙ্গে আছেন। সেইখানে আমরা রাত্রে পৌছাই। তাঁরা খুব আদর করিলেন। তাঁর বাটির কাছে একটি নিলকুটি আছে। জাহানাবাদের কর্ত্তে বসতি আছে। এর কিছুকাল আগে সেখানে মোগল পাঠানে জুদ্দ হয়। জাহানাবাদে একদল সেনা থাকে ডিল্লিশ্বরের, দারেকেশ্বর নদির ধারে। সে যা হক, গড়বেতা জাহানাবাদের কর্ত্তে উত্তম স্থান তার কোন সন্দ নাই। কিন্তু বাঘের ভয়। তাহা জাহানাবাদে নাই। সেই রাত্র আমরা সেখানে থাকি। তার পর দিন আমরা বগড়ি জাই। শেখানে আমরা দোল দেকি। ডিপটি বাবুর স্ত্রী যান আমাদের শঙ্গে। তাঁতে আমাতে দুইজনে ফাগ পাতাই সেইখানে। দুই জোন হাকিমের স্ত্রী গেছেন যেখানে, শেখানে মানের কথা কি বলিবো। বিধির বিধানে দেকা হলো, খাওয়া হল। আমার শাশুড়ি খুব বুদ্ধিমান,

তিনি পূজা দিলেন আর জাহা ২ কিনিলেন তাহা তাঁকে আমাকে সমান করে দিলেন। তাঁর একটি কন্যা, দুই মেয়েকে সমান করে দিলেন। তাহাতে ফাগ বল্লেন শাশুড়ি বটে, এমন নহিলে কি শাশুড়ির মান থাকে। তাহাতে সকলে হাস্য করিতে নাগিলেন। আমরা সকলে আবার ব্যেতায় এলুম। তাহাতে বড় আমোদ হতে নাগিল। আমাতে ফাগেতে অন্য ঘরে গেলুম। তাঁরা সেখানে রহিলেন সে সময় কি তাহা আমাদের মনে লাগিবে। কেন না আমাদের যেমন সময় তেমনি কথা ভাল লাগে। তখন আমরা শব্বদা আমোদে থাকিতে চাই। ঠাকুর দেকিতে যে গিএছিলুম তাহা আমোদের জন্যে ও ব্যাড়াবার জন্যে। একে আমাদের বয়েশ অল্প, তাতে স্বামিদের মান্য পদ। আবার তাঁদের ভালোবাশা খুব, মর্তে বল্লে মরেন, বাঁচিতে বল্লে বাঁচেন। অমন সব স্বামি পদানত যাদের, তাদের মনে কি অসুখ। শব্বোদা শরির আমোদে মেতে রহিয়াছে। তাহাতে তিনি একলা থাকেন, আমিও থাকি। সমান লোক পেয়ে মন আমাদের খুলে গেল। তংপর আমোদ হলো। সেখানে তিন দিন থেকে আমি আসিবার সময় তাঁকে নিমন্ত্রন্ন করে আসি। আবার সেই ছত্রগঞ্জে আসি। সেখানে বাবুর থানা। কাজে কাজে শেখানে চার পাঁচ দিন থাকিতে হল। তাঁর শেখানে অনেক কর্ম্ম ছেল, আমার তাতে কি ক্ষেতি। রাজার সঙ্গে অরণ্যে বাস। কিন্তু শেখানে অনেক বসতি আছে, একটি কুটি আছে, তাহাতে এক জোন শাএব আছেন। নিলকুটি হাকিমদের আড্ডা ঘর। বাবু শেইখানে কাছারি কত্তেন। রাত্রে শেইখানে খেত্তেন কিন্তু দিনে আমাদের কাছে খেত্তেন। রাত্রে এসে শোন আলাদা ঘরে। আমরা সকলে থাকি এক ঘরে। বাবুর মপঃশলের ছোটো খাট, একা শোন। আমি কুমুদ মা বামন মাশি আমরা সকলে এক বিছানায় থাকি। একদিন মা বল্লেন, যদি এখানে এত দিন থাকা হল তবে চন্দরকোনায় রাজার দেবালয় আছে দেকিলে হয়। বাবু বল্লেন, আচ্ছা দুই জোন পেদা আর শাণ্ডেল আর দুই জোন চাপরাশি জাবে। আর বামন মাশি জাবেন। আর কেউ জেন না যান। আমি ভাবিলাম যে এতোদূর এসেচি দেকিবো না! তাহাতে মাকে বলালুম। আমি এখন মার শঙ্গে কথা কইনে, কিন্তু এমন কই জে শুনিতে পান। আমি বলিলাম, আমাকে নে যাবেন না। কেমন করে বাছা না বলে নে যাবো। আমি বলিলাম, আপনি যদি নে যান তা হলে আর কে কি করিবে। না বাছা আমার সাধ্য নয়। কাযে কাযে চুপ করে রহিলাম। ন জন চাকরানি আমাদের শঙ্গে আছে। মা জিজ্ঞাসা কল্লেন ক জন তোমার কাছে থাকিবে। আমি বলিলাম কায কি। তিনি বলিলেন রাগ হল। আমি বলিলাম রাগ কি, আপনার উপর আমি রাগ করিবো। তবে যে ও কথা বল্লে। আমি বলিলাম তা নয়, কে যাবে কে থাকিবে। যে থাকিবে শেই মনে দুঃখ করিবে। আমি একা থাকিবো, কতোক্ষণ হবে। বাহিরে অতো নোক রহিয়াছে ভয় কি। তাহাতে তিনি বল্লেন আচ্ছা তোমরা যেও। এমন শময় দুইখানি পালকী এল। আমি ভাবিলাম জে বাবু বুজি বলেচেন তাই এসেচে। মাতে বামন মাশিতে এক
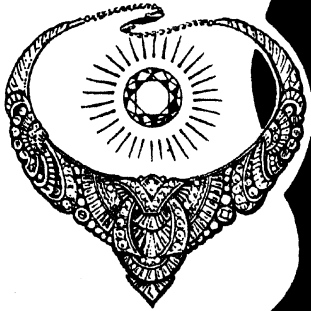
ফোন নং এভিনিউ ৪৮৮৬

গিনি স্বর্ণের ও জড়োয়া অলঙ্কার-শিল্পের বিশিষ্টতা ও মজুরী হ্রাস সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে আমাদের দোকানে সাদর অভ্যর্থনা জানাই।

খানিতে, আমাতে কুমুদে এক খানিতে যাচ্চি, এমন সময় শাণ্ডেলমশাই বল্লেন আমি কিসে জাবো। তথন বাবু শায়েবের কুটিতে। আমি জান্তে পারিলাম জে এ পালকী শাণ্ডেলের। তথন আর নাবি কি করে, বেয়রাদের কাঁধে। কাযে ২ যেতে হল। শাণ্ডেল সেখানে বসে রহিলেন, আমরা গেলুম। কিন্তু মনে বড় ভয় হল, জাওয়াতে কোন সুক হল না, বরন কেলেশ হলো। আমরা ঠাকুর দেকে জখন এলুম তখন রাত্র পেরায় ১টা। বাবু তখন আসেন নাই। কিন্তু আমি ভয়ে কিচ্ছু খেলেম না। বলিলাম আমার মাথা ধরেচে। জারা হামাশা বকুনি খায় তাদের কোন ভয় নাই। কিন্তু আমার বড় ভয়, যে কর্ম্ম বার বার মানা কল্লেন তাহা আমি করিলাম। আমিই অন্যায় করিয়াছি। আর এ ঠাকুর রাজার, রাজা শুনিবেন যে আমি গিয়েছিলেম। ভাবিতেছি এমন সময় বাবু এলেন। তার রাত্রের আসা, শাণ্ডেল দেকা কল্লে না। কাপড় ছেড়ে শুতে এলেন। এসে মাকে বল্লেন, মা ঠাকুর দেকেচ। তিনি বল্লেন হেঁ। কেমন দেকিলে। বেশ দেকেচি। শাণ্ডেল গেছেলেন, মা বল্লেন না। কেন। মা চুপ করে রহিলেন। কেন গেলেন না, দুই খানি পালকি এল। আমরা মনে করিলাম বুঝি আমাদের জন্য। তবে কুমুদ গেছেল। মা বল্লেন হেঁ। আর কিছু বল্লেন না। আমি মুকের দিকে চেয়ে আছি। আমার দিকে দুইবার জোরে চেয়ে দেকিলেন। একে বড় ২ চক্ষু, তাতে রাত্রে নাল হইয়াছে। ২ বার চাওয়াতে আমার দপা শেস হইয়াছে। বাবু গে শুলেন। আমি মার কাচে শুলুম, কিন্তু ঘুম হলো না। বাবু ভোরে উঠে ব্যাড়াতে গেলেন। শাণ্ডেলকে বল্লেন, তুমি কি মানুশ। তিনি বল্লেন, আমি কি করিবো, আমাকে সবার হুকুম রাকিতে হয়। বাবু আর প্রতি উত্তর কল্লেন না। বাড়ীর ভিতর এলেন, আমাকে সেই চক্ষে ডাকিলেন, ডেকে ছাতে গেলেন। মা আছেন নিচেতে, আমি ছাতে গেলুম, জা হয় হক। আমাকে দেকে বলেন, কেন গেলে, ছি ছি রাজা শুনিবে, তখন কি বলিবে! আমি বলিলাম জে, মেয়ে নোকেরা সবাই গেল, আমার বড় ভয় কত্তে লাগিল তাই গেলুম। আমি তো নিকটে ছিলাম, ডেকে পাটালে না কেন। আমি বল্লুম ওটা আমার স্মরণ হয় নাই। বলিতে হেসে আমার কাছে বশিলেন। বসে সকল গল্প করিতে নাগিলেন। ৭ দিন আমার সঙ্গে দেকা হয় নাই, মেলা কথা মনে ছেল। তোমার ফাগ কেমন লোক, দেখিতে কি রকম। আমি সব বলিলাম, ফাগ বেশ সুন্দর খুব সভ্য, আবার খুব আমুদে। জাহা জাহা কথা হইয়াছেল সকল বলিলাম। নানান কথা হতে নাগিল। এখন এক জোন ঝি এসে বল্লে, খাবার জায়গা হইয়াছে। তখন আমরা অবাক হইলাম জে এতো বেলা হইয়াছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলেম, কত বেলা হইয়াছে। সে বল্লে একটা বাজিয়াছে। তাহাতে আমাদের আশ্চয্য বোধ হল। নেবে এলুম, এসে মার কাছে গেলুম। তিনি একটু বেজার হলেন, বল্লেন এই চইত্র মাসের রদ্দুরে একেলা ছাতে বসে কি কচ্ছেলে, গাএ কি রদ্দুর লাগে নাই। আমি বুজিলাম জে আমার গায়ে রোদ লাগাতে যতো রাগ হয় নাই, আমার সঙ্গির গায়ে রোদ লাগাতে চটে গেচেন। আমি কিচু না বলে তাঁদের জাগা করালেম, ভাত আনালেম। তাঁদের খাওয়া হলো, আমি খেলেম। সেই রাত্রে জাহানাবাদে আসিলাম। বইশাক মাশে ৪ তারিকে মা কলিকাতা জান। তাহাতে দিন কতো আমার বড় কেলেশ হল। তার পরে সেরে গেল। একেলা থাকা আমার অভ্যাস আচে। জষ্টি মাসে আমার ফাগ এলেন। তাহাতে খুব আমোদ-আল্লাদ হলো। তিনি আমাকে পোলয়া কালিয়া খায়েছেলেন আমিও আমিও তাই খায়ালেম। দুই দিন থেকে তিনি জান। কাল আমাদের ঘাটাল জাবার কথা আছে, তাহা কি হয় বলিতে পারি নে। ইহাতে আমার বড় ইচ্ছা আচে। সেখানে আমার এক কাকা কর্ম্ম করেন, তাঁর স্ত্রী সঙ্গে আচেন। আমার কাকি আমার সমবইসি, তাঁতে আমাতে বড় ভাব। কিন্তু বাবুর শরদি হইয়াছে, জদি ভাল থাকেন তা হলে জাওয়া হবে। এ বংশর বরশা ভাল হচ্ছে না। আজ ভাদ্র মাসের ১৫ তারিখ। এর পরে কি হয় বলা যায় না। ১২৬০ এই শালে ভাদ্দর মাসের ১৬ তারিকে আমরা ঘাটালে যাই। ঘাটালের শায়েবের একখানি বোট এল, সেখানি চাকার বোট, ছোটো। আমি কখন চাকার বোটে উটি নাই। রামপুর ও নাটুরে জেতে ও মফঃসলে জেতে অনেক বোটে উটিছি। মার শঙ্গে কাশির বড় নৌকায় উটেছি। কিন্তু এ রকম চাকার বোটে কথন উটি নাই। আমরা ১৬ ভাদ্র ঘাটালে যাই। পথে যেতে অনেক ক্ষুদ্দর ২ গেরাম দেকে যাই। তাহাতে বড় আমোদ হইলো। শেখানে রাত্রে ৮ ঘন্টার শময় পৌচাই। আমার কাকার বাসা ঘাটের ধারে। তখনি পাল্কী আসিল। সেখানে গেলুম। তাঁরা খুব আদর করিলেন উটিতে। বাবু গেলেন, সেইখানে খাওয়া হলো। আমার কাকার বাসাতে শুলেন। কিন্তু তার পর দিন অসুখ হইল, তাহাতে বড় আমোদ হইল না। জে কদিন রহিলাম শেই কদিন অসুখ ছেল। তার পরে শেই বোটে করে জাহানাবাদে আসি। ঘাটাল বাবুর এলেকা। ১২৬২ শালে ফাগুন মাসে আমার শাশুড়ি ঠাকুরানি ও আমার বড় জা ও সেজো জা সকলে এসেন। তার পরে আমার সেজো ভাসুর এসেন। জাহানাবাদ গোলজার হয়ে গেল। সেই শালে আমার চার মাশ জ্বর হইয়াছেল। সেই ফাগুন মাসে ভাল হল। এই বচর এখানে ৩ দিনের জ্বর হইয়াছে। তিন দিন খুব জ্বর হয়, চার দিনের দিন ভাল হয়। অসুদ খান আর না খান আমার বয়েসে এই দুই বার দেখিলাম। যে বচর আমার বিবাহ হয় সেই বচর আর এই বচর। আমার বড় জা আগে গেলেন, তার কিছু দিন বাদে আমার সেজো জা মা সেজো বাবু সকলে গেলেন। আবার আমি একা রহিলাম। এই বচর আমি রাড়ির ভিতর একটি ছোটো পুকুর কাটাই, তাহা শানের ঘাট বাঁদাই। সেইখানে বসে চুল বাঁধি সেলাই করি। বাবু সেই ঘাটে এসে বসেন। এক দিন বলেন, তোমার বেশ পুকুর হইয়াছে। এতে কতকগুলি হাঁস হলে দেখিতে ভাল হয়। আমি বলিলাম হ্যাঁ। তাহাতে তিনি চারটি রাজহাঁস আর ছটি পাতি হাঁস আনায়ে দিলেন। আমি বড় খুশি হইলাম। সব জোড়া জোড়া, দশটি হাঁস, পাঁচটি নর পাঁচটি মেদি। তাহাতে আমি বলিলাম আরও গোটা কতো মেদি হলে ভাল হতো। তাহাতে বাবু আমার দিকে চেয়ে হাসিলেন। তাহাতে রেগে উঠিলাম। তাহাতে তিনি বল্লেন, তুমি রাগিলে কেন, তোমাকে কি বলিলাম। তাহাতে আমি কিছু বলিলাম না। তাহাতে তিনি বলিলেন, এ রকম করে রাগ কল্লে আমি কি করিতে পারি। আমি

কুমারেশ বয়স্ক ব্যক্তিদের পক্ষে উপকারী ; যৌবনোন্মেষ-কালে যখন বাড়ন্ত দেহের অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয়, যকৃৎ তাহা সরবরাহ করে থাকে—এবং **কুমারেশ** আপনার যকৃৎকে শক্তিশালী করিবে ও রক্ষা করিবে এবং অটুট স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিবে।

শিশির মাথায় নুতন রূপালী রেখাবিশিষ্ট অ্যালুমিনিয়াম ক্যাপস্যুল দেখিয়া লইবেন।

ও, আর, সি, এল, লিঃ
সালকিয়া • হাওড়া

তোমার সঙ্গে আদপে কথা কইলে এতে তুমি রাগ কল্লে। আমি কেমন করে জানিবো যে কি অপরাধ হল। তাহা আমি কিচুই জানিতে পারিলাম না, তবে কি সাধিবো তাহা যে ঠিক করতে পারিতেছি না। কোন কথা কইলে জানিতাম, যে এই কথাতে দোষ করিয়াছি, এই দোষ মার্জ্জনা করো বলে সাদিবো। কাজে কাজে চুপ করে থাকিতে হল। আমি বলিলাম যাও যাও, আর জেয়দা বোকোনা, তুমি কি হাস। তাহাতে তিনি হাসিতে লাগিলেন, এর নাম অন্যায় রাগ, এসো বাগানে বেড়াই। তাহাতে গেলুম। আসার হাঁসগুলির অনেক বাচ্চা কাচ্চা হলো। তাহাতে আমি খুসি হইতাম। ছোটো ছোটো বাচ্চা নিয়ে মায়ে ঝিয়ে আমোদ করিতাম। বাবুও সেইখানে থাকিতেম। আমার আর ৩টি খড়গোশ ছেল। এই নে রাত্রদিন আমোদ করিতাম। আর বাবুর কাচে ইংরাজি পড়িতাম। খানিক তাস খেলিতাম বাজি রেকে। প্রায় আমি জিতিতাম। বাবু হেসে অনেক কারণ দেখান। আমি বলি জে একটা কথা আছে, হাতে না পারি গোল করে সারি। ফিহাতে হারো আবার ঝাঁক করো। তাহাতে বাবু বলেন তোমাকে খুসি করিবার জন্যে আমি হারি। আমি বলি, তা আমি জানি, আর বলিতে হবে না। তুমি তো ফি গোলামের উপর চোদ্দ দিচ্ছ, টেক্কার উপর দওলা দিচ্ছ, তাই সাদ করে হার। বাবু বল্লেন, পড়তি হলে জিত হয়। আমি বলিলাম, আমি তবে শকুনি, আমি জা বলি আমার তাস তাই শোনে। বাবু হাসিতে নাগিলেন। এই বংশর বরোশা কম হইয়াছে কিন্তু ধান খুব হইয়াছে জাহানাবাদে। প্রভাকরে পড়িতেছি শকল জাএগায় খুব ধান হইয়াছে, নীলও ভাল হইয়াচে। কম জল হইয়াছে কিন্তু সময়ে সময়ে হইয়াছে, তাহাতে উপোকার হইয়াছে। এ বংশর পুজার সময় বাড়ি আসা হয় নাই। আমি এখন জাহানাবাদে আছি। আজ অষ্টমি পুজা। এখানে কোন গোল নাই। যে বচর হিন্দু ও মছলমানের পরব এক সময় তাহাতে হাট ও বাজার বড় গরম। কিন্তু আমরা কিচুই জাস্তে পারি নাই। কেবল ঘাশি মিয়াদের বাড়ির গৌরারা বাজানা কানে শুনিতে পাচ্ছি। এই দশমিতে ঠাকুর ভাশান হবে, গোমারা মাটি হবে, এই রকম তিন বচর হবে। আরো এক বৎশর হবে। আমরা তেরোদসির দিন বাড়ি আসিলাম। বাবু কার্তিক মাশে জাহানাবাদে গেলেন। আমার যাওয়া হল না। আমার কার্তিক পুজা কত্তে হবে। আমি অগ্রাণ মাসের ৪ তারিকে জাহানাবাদে আসি। পথে আমার বড় জ্বর হয়। বাবু আমাকে আনিতে গেচেলেন। তাঁরও পথে জ্বর হয়। এ জন্য পথ থেকে ফিরে আসেন। আমি শ্রীরামপুরে তাঁকে না দেকে বড় ভাবিত হইলাম। শুনিলাম পথ থেকে ফিরে গেচেন। তাহাতে আরো ভাবোনা হল। তার পরে জাহানাবাদে আসিলাম। দেকিলাম বড় জ্বর হইয়াছে। আমি বলিলাম, আমারও বড় জ্বর হইআছে। তাহাতে তিনি বলেন, তোমার জ্বর হয় নাই পথের কেলেশে অমন হইয়াছে। স্নান কল্লে সেরে জাবে। আমি তাই করিলাম। কিন্তু যেমনি মাথায় জল ঢেলেচি অমনি কম্প এল, আর মাতা মুচিতে পারিলাম না। শুলুম। তাহাতে ঝিয়ে টোয়ালে দে মুচায়ে দিলে। আমার আর কিচু ঠিক রহিল না। রাত্রে ভিমি জাই। বাবুর অশুক, আমার অশুক, তাহাতে বড় ক্লেশ হল। বাবু ৮ দিন বাদে ভাল হলেন, আমি বাঁচিলাম। আমি সেই অসুকে তিন মাশ ভুগি। তাহাতে আমার কোন কষ্ট ছেল না, বাবু জে শিঘ্র ভাল হলেন তাই ভাল। ঘাটালের ডাক্তার এসে আমাকে দেকিতো। এখানে একজোন নেটিব ডাক্তার আচেন। বেশি অসুক হলে ঘাটালের ডাক্তার এসেন। ঘাটালে ডাক্তার আগে ছেল না। বাবু সেইখানে ডাক্তারখানা করান চাঁদাতে। জাহানাবাদে ভদ্দর নোক নাই, কে চাঁদা দেবে। এই জন্যে হয় নাই। শরকারি নেটিব ডাক্তার আচে এক জোন। ব্যাতাতে (গড়বেতাতে) এক জোন নেটিব ডাক্তার আচেন। আমি ফাগুন মাশে ভাল হইলাম। আমার জখন অসুক হয়েছেল বাবু খুব সেবা করতেন। তাহাতে আমার অসুকের সুক হইয়াছেল।

[ক্রমশঃ।

করতোয়া

আর্য্যকন্যা লোপামুদ্রা

তোমার হাতটি যেন করতোয়া স্নিগ্ধ ঝিরিঝিরি,
হাত ছুঁয়ে অনুভব বেগবান স্রোতের প্রবাহ,
মনে হয়, এ নদীতে জল আছে, তল নেই কোন
শুধু প্রাণ ঢেলে দেওয়া, বিছানো কোমল কোমলতা :

পাঁচটি আঙুল তার কথা-কওয়া স্রোতেতে মুখর
আমার হৃদয়-মন, ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে কত বার,
আলো-ছলছল কোন শান্ত গৃহবধূটির
চুপি চুপি একখানি মুখের মতন :

করতোয়া খরতোয়া, বেগবান গতির জোয়ারে
পলির প্রশান্ত কোন প্রলেপের শান্ত স্নিগ্ধতায়,
ঢেকে দিয়ে হৃদয়ের দাহময় এপারের তট
ঝিরিঝিরি ঝরে পড়া উপল-ব্যাহত গতি তার ;

কতবার জোয়ারের জোলো হাওয়া উড়ে উড়ে এসে
ভিজে ভিজে স্নেহমাখা ঠাণ্ডা বাষ্পময় হাতে
দিয়ে গেছে গভীরতা, মধুরতা-জড়ানো মনন ;
হাতে হাত জড়াজড়ি নদ-নদী মিশে যাওয়া স্রোতে

এলোমেলো বালিহাঁস উড়ে চলা আকাশ-সীমায়—
দেখেছি চোখের ছায়া উদাস উদাস ইসারাতে
ডেকে নিয়ে গেছে মন সরোবর মানসের তীরে,
করতোয়া-স্নিগ্ধ করে ঝিরিঝিরি জলের ক্রন্দন।

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

মান—মর্য্যাদা, সম্ভ্রম, অভিমান।
মানত—মানন, ব্রত, নিয়ম, মানসিক, মাননী।
মাননীয়—মান্য, আদরণীয়, পাল্য।
মানস—ইচ্ছা, কামনা, বাসনা, অভিপ্রায়।
মানসিক—মনস্থ, মনোগত, আন্তরিক।
মানা—নিষেধ, নিবারণ, আটক, প্রতিষেধ।
মানী—সম্ভ্রান্ত, মর্য্যাদাসম্পন্ন।
মানুষ—মনুষ্য, মর্ত্ত্য, নর, মানব, মনুজ।
মাপ—পরিমাণ, তৌল, মাত্তি।
মাপন—পরিমাণ করণ, তৌল করণ।
মায়া—ছল, কুহক, মোহ, মমতা, স্নেহ।
মায়াজাল—ইন্দ্রজাল, ভ্রমজনক ব্যাপার।
মায়াবী—মায়াবিশিষ্ট, কপটী, কুহকী।
মায়াশূন্য—নির্দয়, নিষ্ঠুর, ইন্দ্রিয়ভ্রমহীন।
মায়িক—ভ্রামক, বঞ্চক, স্নেহযুক্ত, কুহকী।
মায়ু—পিত্ত।
মারক—ঘাতক, মড়ক, নাশক, হন্তা, মারী।
মারণ—ঘাতন, হনন, নাশন।
মারপেঁচ—ঝঞ্ঝাট, ফেরফার, দ্ব্যর্থ।
মারুত—বায়ু, অনিল, পবন, সমীরণ।
মার্গ—পথ, বর্ত্ম, ধারা, মত।
মার্ঘী—মহার্ঘ, দুর্মূল্য, বহুমূল্য।
মার্জন—পরিষ্কার করণ, লেপন, পুচন।
মার্জনা—ক্ষমা, পরিষ্কার, মোচন।
মার্জার—বিড়াল, আখুভুক্, ওতু।
মার্ত্তণ্ড—সূর্য্য, রবি, দিবাকর, ভানু।
মাল—মল্ল, বীর, শূর, বাহুযোদ্ধা।
মালঞ্চ—পুষ্পোদ্যান, উদ্যান।
মালা—মাল্য, হার, স্রক্, কণ্ঠী।
মালাকার—পুষ্পবৃত্তিজাতি, মালী, পুষ্পব্যবসায়ী।
মালিন্য—মলিনতা, অপরিষ্কার, ঘোরত্ব।
মালো—ধীবর, জালিয়া, মৎস্যজীবী।
মালসাট—আস্পর্দ্ধা, দম্ভ, বীরপণা।
মাস—দুই পক্ষ পরিমিত কাল, ত্রিশ দিন।
মাসবৃদ্ধি—মলমাস, অধিমাস, মলিম্লুচ।
মাসাল—মাংসযুক্ত, পীবর।
মাসিক—মাসে লব্ধ, প্রেতশ্রাদ্ধবিশেষ।
মাসী—মাতৃভগিনী, মাতৃস্বসা।
মাসুড়া—চক্ষুর ফুলী, ছানী, জালি।
মাসুড়া—প্রতিমাসীয়, মাসিক।
মাস্তুল—মাস্তর, নৌকার ডোল, গাস্তর।
মাহাত্ম্য—মহিমা, প্রভাব।
মাহুত—মাহুত, হস্তিচালক, হস্তিপক।
মিছা—মিথ্যা, অসত্য, অপ্রকৃত, বিতথ।
মিটন—থামন, নিবড়ন, নির্বহন।
মিটমিটিয়া—অল্পোজ্জ্বল, গুপ্তমনস্থ, মিটমিটে।
মিঠা—মিষ্ট, সুস্বাদু, মধুর, মৃদু।
মিঠাই—মিঠানি, মিষ্টান্ন।
মিত—পরিমিত, পরিমাণীকৃত, ক্রমিক।
মিতা—মিত্র, সুহৃৎ, সখা, বন্ধু।
মিতি—পরিমাণ, মাপ, মান, তৌল।
মিত্রতা—মিতালি, সৌহৃদ্য।
মিথুন—যুগ্ম, স্ত্রীপুরুষ, তৃতীয় রাশি।
মিনতি—বিনতি, অনুনয়, নম্রতা, বিনয়।
মিলন—সঙ্গম, মিশন, ঐক্য হওন।
মিলান—মিশান, একত্রী করণ, যোড়ান, মিশন।
মিলাপ—আলাপ, প্রেম, সংসর্গ।
মিলিত—মিশ্রিত, সংযুক্ত, সংশ্লিষ্ট, প্রাপ্ত।
মিশ্র—সংযোগ, মেল, উপাধিবিশেষ, মিশ্রণ।
মিসি—মাজন, মঞ্জন, দন্তপরিষ্কারক।
মীন—মৎস্য, মাছ, দ্বাদশ রাশি।
মীমাংসক—নিষ্পত্তিকারক, মধ্যস্থ।
মীমাংসা—দর্শনশাস্ত্রবিশেষ, নিষ্পত্তি।
মুকুট—কিরীট, মটুক, শিরোভূষণ।
মুকুর—দর্পণ, আর্শি, আদর্শ, আয়না।
মুকুল—কুঁড়ি, কড়িকা, কোড়ক, কলিকা।
মুক্ত—ত্যক্ত, উদ্ধৃত, মোক্ষপ্রাপ্ত।
মুক্তহস্ত—মহাদাতা, বদান্য, দানশীল।
মুক্তা—মুক্তাফল, মতি, রত্নবিশেষ।
মুক্তাগার—শুক্তি।
মুক্তাদাম—মুক্তামালা, মুক্তাহার।
মুক্তি—মোচন, মোক্ষ, কৈবল্য, ত্রাণ।
মুখ—বক্ত্র, বদন, আস্য, আনন, আদ্য।
মুখকটু—মুখর, দুর্মুখ, নিন্দক, কুভাষী।
মুখচোরা—লাজুক, লজ্জাশীল।
মুখবন্ধ—মুখরোধক দ্রব্য, প্রস্তাবিত বিষয়।
মুখর—কটুভাষী, অপ্রিয়বাদী, শঙ্খ।
মুখশুদ্ধি—মুখযন্ত্রণ, পাণ, মুখের পবিত্রতা।
মুখস—বাগ, বল্গা, কৃত্রিম মুখ, মুখোস, মুখাস।
মুখস্থ—কণ্ঠস্থ, অভ্যস্থ, মৌখিক।
মুখাগ্নি—শবমুখে দত্তানল, আলায়া।
মুখাপেক্ষী—অনুরোধ, পক্ষপাত।
মুখামুখি—দেখাদেখি, সম্মুখাসম্মুখী।
মুখামৃত—বদনামৃত।

মুখাসব—থুথু, নিষ্ঠীবন, লালা, মুখমদ।
মুখী—প্রবাল, অঙ্কুর, পল্লব।
মুখ্য—আদ্য, প্রধান, মহৎ।
মুগ—মুদগ, কলায়বিশেষ।
মুগুর—মুদ্গর, লৌহময় গদা, হাতড়ী।
মুগ্ধ—মোহিত, মায়াযুক্ত, মূর্চ্ছাপন্ন।
মুগ্ধা—ঋতুমতী, রজস্বলা, ঈষদ্‌যৌবনা স্ত্রী।
মুচী—চামার, চর্ম্মকার, ক্ষুদ্র নারিকেল।
মুচকি—ঈষদ্‌হাস্য, বিহাস, বিদ্রূপ।
মুচড়ন—গ্রন্থি ভগ্নকরণ।
মুঞ্জরী—স্তবক, পুষ্পগুচ্ছ, শিষ।
মুটরী—ক্ষুদ্র মোট, পুলিন্দা, বোচকা।
মুটী—গুঞ্জী, বাঁট, মুষ্টি, কীল, মুঠী।
মুড়—নেড়া, অঞ্চল, মাথা, সীমা।
মুড়ন—মুণ্ডন, কেশ কাটন, কামান।
মুড়ানিয়া—কামানিয়া, নাপিত, মুণ্ডক।
মুড়ী—ভাজা তণ্ডুল, ছিন্ন মস্তক।
মুণ্ড—মুণ্ডিত, কেশহীন, মস্তক, বৃক্ষ, রাহু।
মুদন—মুদ্রিত হওন, বুজন।
মুদিত—মুদ্রিত, বুজান, হর্ষিত।
মুদ্রা—টাকা, ছাপ।
মুদ্রাঙ্কিত—অঙ্কযুক্ত, ছাপা, মুদ্রিত।
মুনি—ঋষি, তপস্বী, যতী, সিদ্ধ।
মুমুক্ষা—মুক্তির ইচ্ছা।
মুমূর্ষা—মরণেচ্ছা, মরণাপেক্ষা।
মুমূর্ষু—মৃতপ্রায়, মরণোন্মুখ, মরণেচ্ছুক।
মুরলী—বংশী, বাঁশী, বেণু, বাঁশরী।
মুরজ—মুরজ, মৃদঙ্গ।
মুষল—ঢেঁকী, ঘোঁটনা, মুদ্গর।
মুহুঃ—মুহুর্মুহুঃ, বারম্বার।
মুহূর্ত্ত—ক্ষণিক কাল, দুই দণ্ড পরিমাণ।
মূক—বোবা, মৌন, মৎস্য, দীন।
মূঢ়—মূর্খ, অজ্ঞান, অবোধ, আনাড়ী, বিদ্যাহীন।
মূর্চ্ছাবায়ু—মূর্চ্ছাজনক রোগ, মৃগীরোগ।
মূর্ত্তি—আকার, আকৃতি, রূপ।
মূর্দ্ধন্য—মূর্দ্ধাসংস্থানোচ্চারিত, ট-বর্গাদি।
মূর্দ্ধা—মস্তক, মাথা, শিরঃ, উত্তমাঙ্গ।
মূল—আদি কারণ, গোড়া, হেতু, পুঁজী।
মূল্য—অর্ঘ্য, দাম, ক্রয়ণীয়।
মূষা—মূষিক, ইন্দুর, আখু, উন্দুর।
মৃগ—হরিণ, কুরঙ্গ, ঋষ্য, এণ, শারঙ্গ।
মৃগতৃষ্ণা—সূর্য্যকিরণে জলভ্রম, মরীচিকা।
মৃগধূর্ত্তক—শৃগাল, শেয়াল, শিবা, জম্বুক।
মৃগনাভি—মৃগমদ, কস্তুরী, কস্তুরিকা।
মৃগয়া—পশুবধ চেষ্টা, ব্যাধবৃত্তি।
মৃগয়ু—ব্যাধ, শৃগাল, ব্রহ্মা।
মৃগরাজ—মৃগপতি, মৃগেন্দ্র, সিংহ।
মৃগশিরা—পঞ্চম নক্ষত্র।
মৃগাঙ্ক—চন্দ্র, দ্বিজরাজ।
মৃগী—হরিণী, মূর্চ্ছাবায়ু, চিত্রিণী।
মৃণাল—পদ্মাদির ডাঁটা।
মৃণ্ময়—পার্থিব, মাটীয়া, মৃত্তিকাগঠিত।
মৃৎ—মৃত্তিকা, মাটী, ভূখণ্ড, ভূমি।
মৃত—শব, মরা।
মৃতকল্প—মৃতপ্রায়, মরণোন্মুখ।
মৃতদার—মৃতপত্নীক, যাহার স্ত্রী মৃত।
মৃৎসা—উত্তমা ভূমি, উর্ব্বরা ভূমি।
মৃদু—কোমল, অচঞ্চল, ধীর, শান্ত, মৃদুল।
মেইয়া—স্ত্রীলোক, কন্যা, বালিকা।
মেকী—কৃত্রিম, কল্পিত, নকল।
মেখলা—কাঞ্চী, স্ত্রীলোকের কটিভূষা।
মেঘ—জলধর, বারিদ, ঘন।
মেঘজ্যোতিঃ—মেঘদীপ, বিদ্যুৎ, তড়িত।
মেঘনাদ—মেঘের শব্দ, ইন্দ্রজিৎ।
মেঘমালা—কাদম্বিনী।
মেঘলা—মেঘযুক্ত, মেঘাচ্ছন্ন, দুর্দ্দিন।
মেজিয়া—মেজ্যা, ঘরের মধ্যভূমি, মেঝেয়।
মেটিয়া—মেট্যা, গিলা, কোষ্ঠা, জালা।
মেড়া—ভেড়া, মেঢ্যা, গড্ডলিকা, গাড়র, মেষ।
মেদ—মজ্জা, বসা।
মেদিনী—(বসুমতী দেখ)
মেধ—যাগ, নৈবেদ্য, বলিবিশেষ।
মেধা—ধারণাবতী বুদ্ধি, মতি, স্মারক।
মেধাবী—স্মারক, মেধাবিশিষ্ট, মতিমান।
মেধ্য—যজ্ঞীয়, বলিযোগ্য পূত।
মেরু—সুমেরু পর্ব্বত, হেমাদ্রি।
মেরুদণ্ড—পৃষ্ঠের মধ্যস্থিত অস্থি, কশেরু।
মেলক—আলাপী, ঐক্যকারক, যোটক।
মেলা—জনতা, লোকসমূহ।
মেষ—প্রথম রাশি।
মেস্‌য়া—মেসো, মাসীর পতি।
মৈত্র—মৈত্রেয়।
মৈত্রী—আত্মীয়, সৌহৃদ্য।
মৈথুন—সঙ্গম, শৃঙ্গার ব্যাপার।
মোক্ষ—মুক্তি, কৈবল্য।
মোক্ষন—অপবর্গ, ব্রহ্মপ্রাপ্তি, মৃত্যু।
মোঘ—নিষ্ফল, পুষ্পবিশেষ।
মোচ—ওষ্ঠের কেশ, অগ্রভাগ।
মোচা—কদলীবৃক্ষের প্রথম ফুল।

[ক্রমশঃ।

এই উপমহাদেশে বছরে ২০ লক্ষের বেশী লোক ম্যালেরিয়ায় মারা যায়

ভেবে দেখুন, শুধু ম্যালেরিয়াতে যারা মারা যায় তাদের সংখ্যাই এই, আর ম্যালেরিয়াতে ভুগে ভুগে শক্তিহীন হয়ে যারা অন্য রোগে মারা যায় তাদের কথা ধরলে এই ভয়ানক মৃত্যুসংখ্যার তাৎপর্য আরও কত বেশী হয়! ম্যালেরিয়া হওয়ার ভয় সব সময়েই আছে — সামান্য একটি মশার কামড়ই এই রোগ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। একে আপনার কিছুতেই অবহেলা করা উচিত নয়।

আজকাল ম্যালেরিয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারে 'প্যালুড্রিন'। একটি বড়ির দাম এক আনা —সপ্তাহে একদিন একটি বড়ি খেলে ম্যালেরিয়ার সাধ্য নেই যে আর কাছে ঘেঁষে। সপ্তাহে মাথাপিছু মাত্র এক আনা খরচ — আপনার উচিত এই সামান্য খরচে বাড়ীর সবাইকে ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা করা। সেবনবিধি নীচে দেওয়া হল।

অ্যানোফেলিস মশার কামড়ে ম্যালেরিয়ার জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে। বসা দেখেই এই মশাকে চিনতে পারবেন — হুলের ডগায় ভর ক'রে টেরছা হয়ে গায়ে বসে। এর হাত থেকে বাঁচতে হলে বাড়ীর আশেপাশে যাতে খানাডোবা না থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখুন কারণ এই সব যায়গাতেই মশা জন্মায়। ঘুমুবার সময়ে মশারি খাটিয়ে শুতে ভুলবেন না। আর মশা মারবার জন্য সারা বাড়ীতে কীট-নাশক 'গ্যামেক্সেন' ছড়িয়ে দিন।

ম্যালেরিয়ার লক্ষণ কি?

প্রথমে শীত করে ও কাঁপুনি আসে, তারপরে জ্বর আসে ও শেষে ঘাম দেখা দেয় — সারা গায়ে ব্যথা হয়। এ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। তিনিই আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন ম্যালেরিয়া হলে দু'চার দিনের মধ্যেই 'প্যালুড্রিন' কি ক'রে তা দূর করে এবং শুধু তাই নয়, তার ভবিষ্যৎ আক্রমণের হাত থেকেও রক্ষা করে।

আসল 'প্যালুড্রিন' স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে স্বচ্ছ কাগজের বন্ধ মোড়কে পাওয়া যায় — একটি বড়ির দাম মাত্র এক আনা।

'প্যালুড্রিন'

ম্যালেরিয়ার যম

সেবন বিধি

জ্বর অবস্থায়: পূর্ণ বয়স্কদের ও ১২ বছরের ওপর ছেলেমেয়েদের ১টি বড়ি, ৬ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত আধ বড়ি, ৬ বছরের নীচে সিকি বড়ি —যে পর্যন্ত না জ্বর বন্ধ হয় প্রত্যহ এই মাত্রায় খেতে হবে।

জ্বর প্রতিরোধের জন্য: উল্লিখিত মাত্রায় প্রতি সপ্তাহে একবার একটি নির্দিষ্ট দিনে খেতে হবে।

মনে রাখবেন, 'প্যালুড্রিন' খেতে হয় আহারের পর এবং 'প্যালুড্রিন' খাওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে জল (বা দুধ) খেতে হয়।

ICI

ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ

প্রতিভা বসু

১

অনসূয়ার বিয়ে, তার আবার আয়োজন। ঐ একফোঁটা উঠোনকেই ঝাঁট-পাট দিয়ে, আলপনা কেটে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হ'লো। ন'ড়ে-চ'ড়ে অনসূয়াকেই শেষ পর্যন্ত করতে হ'লো সব। অবিনাশ বাবু ইচ্ছে ক'রেই কাউকে ডাকেননি। মনের পরতে-পরতে তাঁর কালো মেঘের ভার। তাঁরও কি আজ কোনো কথা মনে পড়ছে না? মনে পড়ছে না এক অশ্রুমুখী তরুণীর মর্মান্তিক কান্না? মনে পড়ছে না নিজের কোনো অন্যায়, অবিচার? শুধু তাঁর জন্য, তাঁর জন্যেই তো আজ এই তেত্রিশ বছরের হতভাগ্য কলঙ্কিনী মেয়েটিকে এমন ক'রে ঠেলে ফেলে দিতে হচ্ছে পুরুষ জাতীয় কোনো এক মনুষ্যের হাতে, বিবাহ নামক কোনো এক অনুষ্ঠানের প্রবঞ্চনায়।

সকালবেলা একবারের জন্য বিকাশ এসে দাঁড়িয়েছিলো উঠোনে। অধিবাসের দিকে তাকিয়ে তার মুখ কঠিন হ'য়ে গেলো। আগের দিন হ'লে অবিনাশ বাবু লক্ষ্য করতেন না—কিন্তু আজ, আজকের দিনে তাঁর চোখে আর কিছুই এড়ায় না। তাঁর ভাই, প্রাণতুল্য প্রাণাধিক ভাই, এই ভাইয়ের জন্যই এক দিন দেশ-গাঁয়ের মমতা ছেড়ে চাকরী নিয়েছিলেন দূর দেশে, বোর্ডিংয়ের খরচ যোগাতে স্ত্রীর গয়না বিক্রী করেছিলেন অক্লেশে। বুকের রক্ত জল ক'রে পিতৃস্নেহে মানুষ করেছিলেন এই ভাইকে। এই বিকাশকে! মুখের শিথিল পেশীতে একটু কম্পন উঠলো। একটু হাসলেন বোধহয়। ছেঁড়া চটিতে পা গলিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন, ফুটপাতে।

আকাশ ভ'রে অন্ধকার নেমে এলো। নিষ্প্রভ চোখে তাকালেন উপর দিকে, হৃদয় মথিত ক'রে একটি নিশ্বাস পড়লো। আশ্চর্য! তবু এখনো, তাঁর কত স্নেহ সেই ভাইয়ের জন্য। দৌড়ে গিয়ে হাতে-পায়ে ধ'রে তবু আজ তিনি নেমন্তন্ন ক'রে এসেছেন তাকে। কী দরকার ছিলো? সে যে খুশি হবে না তা তো তিনি জানেন। কিন্তু কেন এই আক্রোশ? সাধ মেটাবার আর কী বাকি রেখেছে সে? অবিনাশ পথে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর স্ত্রী আধপেটা খেয়ে ধুঁকছেন, সন্তানেরা যে যার পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কুকুর-বেড়ালের মতো, আর অনসূয়া, হতভাগিনী অনসূয়া—তাঁর অতি আদরের অনু, অনাই, অনুকোটি—হায় রে—

২

'আমার একটা প্রার্থনা আছে।'

বিকেলে চা খেয়ে সবে এসে বসেছেন বকুলতলায়, অনসূয়া বসেছে তার মার পিঠ ঘেঁষে, আস্তে সে এসে বসলো কাছে। কে? কে সে? তাকে কি ভুলে গেছেন তিনি? ভুলতে পেরেছেন তাঁর মেয়ের সেই সুবেশ সুশ্রী পাণিপ্রার্থীটিকে? বিদ্যায় বুদ্ধিতে শালীনতায় শিক্ষায় যে মানুষটি একান্তভাবেই তাঁর কন্যার যোগ্য ছিলো?

'তোমার আবার কী প্রার্থনা?' প্রসন্ন অভ্যর্থনায় তিনি অধীর হ'য়ে উঠলেন।

'আমি অনসূয়াকে বিয়ে করতে চাই।'

পরিষ্কার স্পষ্ট গলা, এতটুকু সংকোচ নেই, দ্বিধা নেই। আঁৎকে উঠলেন অবিনাশ বাবু। 'বিয়ে!' আমার মেয়েকে? ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে কায়েতের ছেলের বিয়ে! সে একটা ভারি অনাচার! বিনয় কি পাগল? বোকা? সে কি জানে না সমাজের আইন-কানুন? পাঁচ জনের মতামত আছে না? আর পাঁচ জন দিয়ে করবেন কী। তিনি নিজেই কি এই চিরাচরিত নিয়মকে লঙ্ঘন করবেন এমন শক্তি রাখেন মনে-মনে? বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষে কার ঘরে এমন একটা বিয়ে হ'য়েছে! অসম্ভব! চারদিকে তাকিয়ে, আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব, লতা-পাতা যে যেখানে আছে প্রত্যেকের নাম মনে করলেন,—কই? কেউ তো নিজের কুল ত্যাগ ক'রে এমন একটা বিজাতীয় কর্ম করেনি তাদের সমাজে? তবে তিনি কেমন ক'রে করবেন? এই তো দুই পুরুষ আগেও তাঁরা গঙ্গাস্রোত

কুলীন ছিলেন, আর মাত্র দুই পুরুষ পরেই এতোখানি নীচে নেমে শূদ্রের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন ? গ্রামে বাস করবেন কেমন ক'রে ? কেমন ক'রে মুখ দেখাবেন সমাজে ? কেউ যে জলস্পর্শ করবে না তাহ'লে তাঁদের ঘরে। জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত হ'য়ে থাকতে হবে বাকী জীবন। সংস্কার ! সংস্কার ! কতো কালের কতো পুরুষের সংস্কারে ধাক্কা লেগেছিলো তাঁর ; তা নইলে অমন পাত্র কি কেউ মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দেয় ?

একবাক্যে মাথা নাড়লেন। অসম্ভব ! অসম্ভব ! এরকম একটা কাণ্ড হ'তেই পারে না এই দেশে এই সমাজে ব'সে।

বিনয় নির্বোধ। তবু সে বসেছিলো চুপ ক'রে, তবু সে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলো মানুষের হৃদয়ের কথা, শিক্ষার কথা, মানুষে মানুষে সম্পর্কের গভীরতার কথা। আর তাঁর মেয়ে, তাঁর অনসূয়া, অনেক রাত্রিতে ছোট্ট শিশুর মতো তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলো ! চোখের জলে ভিজিয়ে দিয়েছিলো বাবার কঠিন বুক। শেষে উপায়ান্তর না দেখে তিনি টেলিগ্রাম করেছিলেন ভাইকে সব জানিয়ে। তার মতামতের উপরই নির্ভর করেছিলেন। ভাই ! তাঁর পরম স্নেহাস্পদ ! পরম সুহৃৎ ! পরম বান্ধব ! সে কি তক্ষুনি ছুটে না এসে পারে ?

আশ্চর্য হ'য়ে ভাবলেন অবিনাশ বাবু, কোনো বিষয়েই তো কোনোদিন মনের মধ্যে তেমন কোনো জোরালো সংস্কার অনুভব করেননি তিনি, যার-তার বাড়িতে যার-তার হাতে খেয়ে এসে শৈশবে কতোদিন মা-ঠাকুমার কাছে কতো লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। কতোদিন কতো কারণে স্নান করতে হ'য়েছে অসময়ে ! জাতিভেদের এমন একটি কঠোর নিয়মকে হৃদয়ঙ্গমই করতে পারেননি জীবনে হঠাৎ ঐ বিয়ের ব্যাপারে তিনি কেন অমন থমকে গেলেন ? কেন কিছুতেই কোনোমতেই সায় দিতে পারলেন না মনে-মনে। ভয় ? লজ্জা ? সমাজ ? কী ? না কি বিকাশের প্রতি তাঁর অসামান্য মুগ্ধতাই তাঁর সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধিকে বোবা ক'রে দিয়েছিলো ? সমস্ত শক্তি কেড়ে নিয়েছিলো ? কী জন্য অমন বাঁদরনাচ নাচলেন, নিজের গালে নিজেই চুণকালি মাখলেন, সমস্ত পরিবারের মুখে থুতু ছিটোলেন। কেন ? আজকে আর ভেবে পান না। নিজের সন্তানের চেয়েও কি তবে তখন তিনি ভাইকেই মর্যাদা দিতেন বেশি ?

কী আশ্চর্য !

বিকাশ এসেছে, আর ভয় কী ! বিকাশ শাসন করছে, তার উপর আর কথা কী ! বি, এল পাশ উকিলবুদ্ধি মানুষ মাথা গলিয়েছে এতে, না, আর টুঁ শব্দটি না। তার বুদ্ধির কাছে কার বুদ্ধি এ বাড়িতে ? তার বিদ্যার কাছে কার বিদ্যা ? এ বাড়িতে এমন আর কে আছে, বিকাশের জন্য যাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে বর্জন করতে না পারেন ? অনসূয়া কেঁদে কেঁদে বললো, 'বাবা, আর তো পারিনে।'

তিনি বললেন, 'কাকাকে বলো। আমি এখানে কেউ না।'

'তুমি কেউ না ? তুমিই তো সব। তুমি আমাকে বাঁচাও। কাকার যন্ত্রণা আর আমি সইতে পারিনে।'

'সেটাই তোমার বাঁচবার রাস্তা।'

অনসূয়ার মা বললেন, 'বিকাশ বাড়াবাড়ি করছে, তুমি কেন কিছু বলো না ?'

'নাভানা'র বই

বাঙলা সাহিত্যের গর্ব

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
শ্রেষ্ঠ গল্প

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। রচনার উৎকর্ষে ও সজ্জা-সৌষ্ঠবে অতুলনীয়। দাম : পাঁচ টাকা।

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের
পলাশির যুদ্ধ

সরস ও সার্থক সাহিত্যের আস্বাদে জাতীয় ইতিহাস রচনায় নতুন দিকনির্দেশ। অসংখ্য দুর্লভ প্রামাণ্য চিত্রে সমৃদ্ধ।

*

বুদ্ধদেব বসুর
সব-পেয়েছির দেশে
নতুন শোভন সংস্করণ

*

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
শ্রেষ্ঠ কবিতা

*

বুদ্ধদেব বসুর
শ্রেষ্ঠ কবিতা

প্রতিভা বসুর নতুন উপন্যাস
মনের ময়ূর

নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

'বলবার মুখ রেখেছে তোমার মেয়ে? বাড়াবাড়ি তো সেও কিছু কম করছে না?'

'না, ও কিছু করছে না, কিছু বলছে না, ওকে থাকতে দাও ওর মনে ওর কাজ নিয়ে চুপচাপ। চুলের ঝুঁটি ধ'রে কার সঙ্গে তোমরা ওর বিয়ে দেবার চেষ্টা করছো? কেন তোমাদের এই নিষ্ঠুরতা! তুমি তো বাপ।'

বাপ! ভাইয়ের বুদ্ধিপরবশ হ'য়ে তখন তাঁর পিতৃত্বকে তিনি ভাসিয়ে দিয়েছিলেন আড়িয়ল নদীর স্রোতে। বাপ ছিলেন তিনি? শয়তান। শয়তান। শয়তানে চালাচ্ছিল তখন তাঁকে। তখন তাঁর জেদ চেপে গিয়েছিলো মাথায়। তিনি বুঝেছিলেন অনসূয়ার মত অসচ্চরিত্র, মিথ্যাবাদী, নষ্ট মেয়ে দু'জন জন্মায় না এই সংসারে। বিকাশ ধীরে ধীরে তিলে তিলে এই বিষবৃক্ষের বীজ বুনে দিয়েছিল তাঁর মনে। সেই বীজ অঙ্কুরিত হ'য়ে, মহীরুহ হ'লো। যে মেয়েকে বুক থেকে নামাতে কষ্ট হ'য়েছে সেই মেয়ের উপর ঘৃণায়, বিদ্বেষে, আক্রোশে বিদীর্ণ হ'য়ে গেছে হৃদয়। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! যে মেয়ে ধর্ম নিলো, মান নিলো, সম্ভ্রম নিলো, জাত নিলো তার উপরে প্রতিশোধ!

সেই ধর্ম, সেই জাত, সেই সম্ভ্রম খুব ভালো ভাবেই ফিরিয়ে দিলো বিকাশ। একেবারে ভিটেমাটি শুদ্ধু উপড়ে দিয়ে।

এই তো, আজকের আগেও তো এমন ক'রে ভাবেননি তিনি বিকাশকে, এমন বুকফাটা আর্তনাদ নিয়ে দেখেননি মেয়েকে। মেয়েকে তো শেষ পর্যন্তও তিনি ঘৃণা করেছেন, অবহেলা করেছেন, দুঃখ দিয়েছেন, মুখের দিকে তাকাতে পারেননি। আজ, আজ কতোকাল পরে পরিপূর্ণ চোখে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিলেন তাকে; ভাঙা গালের ছোট টোলে ঠোঁটের বাঁকায় ছলোছলো চোখের ঘন পল্লবে ঝিলিক দিয়ে উঠলো বিদ্যুৎ। স্মৃতির বিদ্যুৎ, বুকের সব পাঁজর যেন খসিয়ে দিলো। তবে এতোদিন এ-সব কোথায় ছিলো? কোথায় ছিলো? কে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলো এই দুরন্ত ভালোবাসা থেকে! আর যদি ঘুমই ছিলো, তবে—তবে এই বিসর্জনের মুহূর্তে কেন ভেঙে গেলো সেই ঘুম? কেন? কেন? বুকের উপর দুই হাত চেপে দরজার গোড়াতেই ফুটপাতের শানে ব'সে পড়লেন তিনি।

৩

একজন ঠাকুর আনা হয়েছে রান্নার জন্য। সকালবেলা অবিনাশ বাবুই নিয়ে এসেছেন খুঁজে-খুঁজে। যাই হোক দু'একজন প্রতিবেশী তো আছে, বরযাত্রী তো আসবে কয়েকজন? তাদের তো একটা ব্যবস্থা চাই? তা-ছাড়া অতগুলো যে জিনিষপত্র এলো সেগুলোও তো আর ফেলে দে'য়া যায় না? যথাযোগ্য বাসন-কোসন কিছু-কিছু ভাড়া করতে হয়েছে সে-জন্যে। অনসূয়ার দুঃখিনী মা, ক্ষণে-ক্ষণে কেঁপে উঠছে তাঁর বুক, বারে-বারে চোখ মুচছেন তিনি। রান্নাঘরের দাওয়ায় ব'সে তরকারি কুটতে কুটতে কতো কথা মনে হচ্ছে তাঁর। মা হ'য়ে তিনিই কি কম কষ্ট দিয়েছেন এই মেয়েকে? দিনের পর দিন মুখ ফিরিয়ে থেকেছেন, একটা কথা বলেননি, বলতে প্রবৃত্তি হয়নি। কিন্তু আজ? আজ বিদায়ের দিনে বুক ভেঙে যাচ্ছে না সে সব ভেবে?' কে জানে কেমন বিদায়! কে জানে ওর অদৃষ্ট ওকে আবার কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে!

অদৃষ্ট! অদৃষ্টের নামে দোষ দিয়েই কি সব সারতে পারবেন আজ? সেই অদৃষ্টের রচয়িতা কারা তা কি তিনি জানেন না? কাদের জন্য আজ ওর এই গতি? একটা পরবুদ্ধি, দুর্বল বাপ আর একটা অসহায় ভীরু কুসংস্কারের ঢিপি মা। কী চেয়েছিলো অনসূয়া? কতোটুকু তার দাবী ছিলো? 'শুধু বিয়েটা বন্ধ করো।' পায়ের উপর মুখ ঘ'ষে কেঁদে-কেঁদে এই তো একমাত্র মিনতি। আশ্চর্য! ঐটুকু হৃদয়বৃত্তিও কি তখন ছিলো না তাঁদের? কেন ছিলো না? ভাবতে গেলে, ওর অপরাধ ছিলো কী? নিজেদের বুদ্ধির দোষেই তো এমন হ'লো। বাপ না-হয় অন্যমনস্ক সাংসারিক বুদ্ধিহীন মানুষ, কিন্তু তিনি? মা হ'য়ে তিনি কেন আগে থেকেই শাসন করেননি, সংযত করেননি? কেন অমন অবাধে মেলামেশায় প্রশ্রয় দিয়েছেন? ভালোবাসা কি অন্যায়? ভালোবাসা কি পাপ? হৃদয় কি জাতের দোহাই মানে? জাত কি লেখা থাকে মানুষের আকৃতিতে? জাতের বিভিন্নতাই কি স্নেহপ্রেমের বিভিন্নতা আনতে পারে? তবে?

বিনয় যেদিন বলেছিলো সেই কথা, অনসূয়ার বাবা যতই চমকে উঠুন না কেন, তিনি নিজে এতটুকুও অবাক হননি। আগুন কি চাপা থাকে? অনসূয়ার পরীক্ষার সময় বিনয়ের ব্যাকুলতা কি অনেক কথাই ব'লে দেয়নি তাঁদের? বিনয়ের দিদি বলেছিলেন, নিজের পরীক্ষাতে তো এতো অস্থির হ'তে দেখিনি, এ যে নাওয়া-খাওয়াও চুকে গেছে। হেসেছিলেন। সে হাসি ছিল শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো। তিনি বুঝেছিলেন বিপদ আসছে। কতোদিন রাতের পর রাত মেয়েকে চুপচাপ জানালায় ব'সে কাটাতে দেখেছেন, দুই চোখে ধারা ব'য়ে গেছে, আয়নায় দেখেছেন তার প্রতিবিম্ব। বিনয়ের বিলেত যাবার তারিখ ঠিক হ'য়ে যাবার পরে অনসূয়া ভালো ক'রে ভাত খায়নি কোনোদিন। তবুও যদি সেই প্রস্তাব শুনে তিনি গালে হাত দেন তাকে আর ন্যাকামি ছাড়া কী বলে? অবিশ্যি অনসূয়ার কান্না দেখে এমন কথাও একদিন নিভৃতে বলেছিলেন অবিনাশ বাবু—থাকগে সমাজ, কী হবে আমার সমাজ দিয়ে? মেয়ে যাতে সুখী হবে তাই আমার সুখ। না-হয় বিয়ে দিয়ে আবার বিদেশে কোনো চাকরী-বাকরী নিয়ে চলে যাবো। তারপর সেই মানুষই একদিন কতো বড়ো শত্রু হ'য়ে দাঁড়ালো। কী করলো বিকাশ? কী মন্ত্র দিলো? কী পরামর্শ দিয়ে অমন ভালো মানুষটাকে একেবারে পিশাচেরও অধম ক'রে ফেললো চক্ষের পলকে। বাপ হ'য়ে সন্তানের প্রতি এমন অপরিসীম বিতৃষ্ণা কেমন ক'রে তিনি বহন করলেন হৃদয়ে?

এমনিই চৈত্রমাস ছিলো তখন। এমনিই নিবিড় হাওয়া, ঝরা পাতার রাশি বাগানে, আমের মুকুলে ভ'রে গেছে গাছের ডাল, কচি-কচি পাতা উঠেছে কোনো-কোনো গাছে,—বাতাবি ফুলের গন্ধে বাড়ি আকুল। তিনি ঘুরে-ঘুরে দেখছিলেন বাগান। অবিনাশ বাবু নদীর ধারে গেছেন জুতো কিনতে, অনসূয়া মন-খারাপ ক'রে ঘরের ভিতরে কী করছে কে জানে! বাচ্চারা এখানে-সেখানে খেলছে। হন্তদন্ত হ'য়ে একটা স্যুটকেস হাতে নিয়ে বিকাশ ঢুকলো ফটক খুলে। কলকাতা থেকে এসেছে সে টেলিগ্রাম পেয়ে। চোখোচোখি হ'তেই বোমা ফাটলো—কী! 'ব্যাপার কী আপনাদের? একটা মেয়ের জন্য কি শেষে বংশের নাম ডোবাবেন?' হকচকিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ মাথা নিচু ক'রে অপরাধীর মতো। 'কাকা কাকা' ব'লে ছুটে এলো বুলু আর মণ্টু। তাদের ঠেলে দিলো সে—'কোথায়? কোথায় আপনাদের

সেই আদরিণী বিদুষী কন্যা ? বাদামতলি ইষ্টিশন থেকে এটুকু রাস্তা আসতে-আসতে কত খ্যাতি শুনলাম তার, একবার দেখি তাকে।'

কী বিশ্রীই কেটেছিল সেদিনের সেই হাওয়া ভরা চৈত্রের সুন্দর সন্ধ্যা ! সেদিন সারারাত জেগে জেগে ভাইয়ের সঙ্গে কথা বললেন অবিনাশ বাবু। রাত ভোর হ'লে সারাদিন পরামর্শ করলেন। তার পর কতো সারাদিন আর কতো সারারাত যে মন্ত্রণা ক'রেই কাটলো দুই ভাইয়ে তার আর সংখ্যা নেই। তিনি তো তখন তৃতীয় ব্যক্তি।

অবশেষে বিনয়কে ডেকে এনে একদিন অপমান করলো বিকাশ, চাকর-বাকরের সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্রি গালাগাল দিলো। ছুটে এসেছিলো অনসূয়া, টুকটুকে লাল মুখ, বড়ো-বড়ো চোখ, বুকটা এতখানি উঠছে পড়ছে নিঃশ্বাসের ঢেউয়ে, দাঁড়ালো এসে মাঝখানে—'না। না। না। এ আমি হ'তে দেবো না। দেবো না! কেন? কিসের অধিকারে আপনি ভদ্রলোককে তাঁর বাড়ি থেকে ডেকে এনে অসম্মান করবেন ?' যেন থিয়েটারের একটা দৃশ্য।

মেয়েকে সেদিন আস্ত রাখেননি তিনি। চুলের মুঠি ধ'রে দেয়ালে ঠুকতে-ঠুকতে বলেছিলেন, 'তুই মর, তুই মর, তুই ম'রে যা। না-হয় যার জন্য তোর এত দরদ বেরিয়ে যা তার সঙ্গে।' কেন বলেছিলেন, কী এমন দুরন্ত অন্যায় সেদিন সে করেছিলো ও-কথা ব'লে? আজকে আর ভেবে উঠতে পারলেন না সে-সব।

আর বিনয়ের দিদি। ফর্সা ফুটফুটে ছোট্ট খাটো দুঃখী মানুষটি। তাঁর কথাও আজ মনে পড়লো তাঁর। কতো কষ্টই পেলেন ভদ্রমহিলা। অথচ তাঁর কী দোষ ছিলো। মিথ্যা মামলা সাজিয়ে তাঁকেও কতো নাকাল করলো বিকাশ। অত বড় ঘরের বৌকে পথে বার করলো তবে ছাড়লো।

আর আমরা ? আমাদের কী হ'লো ? যার পায়ে পা মিলিয়ে এতটা হাঁটলাম, গলায় গলা মিলিয়ে শেয়ালের ডাক ডাকলাম, অঙ্গুলি হেলনে উঠলাম আর বসলাম, আমাদের কী করলো সে ? বাড়ি থেকে ঘর থেকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ ক'রে এনে এই বস্তিতে বসালো—এই তো ? এদিকে নিজের দোতলা বাড়িতে ঘর বাড়াচ্ছে সে। দেশের জমিজমা সব চেটেপুটে খেয়ে সে বড়োলোক হচ্ছে। শুনলে অবিনাশ বাবু যতই খিঁচিয়ে উঠুন অনসূয়ার মা একথা ঠিকই জানেন তাঁদের অত সাধের বাড়িটির আর অস্তিত্ব রাখেনি বিকাশ। সে যে প্রত্যেক বছরই যায় সে খবর কি রাখেন না তিনি ? সেবার কালীঘাটে তিনুর মা কি বলেননি সেকথা ? পাষণ্ড কোথাকার ! বিশ্বাসঘাতক ! ঘন-ঘন নিঃশ্বাস ফেলে মনে-মনে ব্যাকুল কান্নায় তিনি উছলে উঠলেন—'বোকা ভালো মানুষ ভাই পেয়ে যত তুই ঠকালি, দুর্বল স্নেহের সুযোগে যত দুঃখ দিলি, সব দুঃখ এক দিন তোর বুকে জ্ব'লে উঠবে দ্বিগুণ হ'য়ে। এক দিন তুই জানবি দুঃখ কী ! দুঃখ কাকে বলে !'

দু'টো ছেলের একটা ছেলে এই বয়সেই কারখানায় ঢুকেছে মিস্ত্রীগিরি করতে, আরেকটি লেখাপড়ায় নেহাৎই ভালো ব'লে পড়া ছাড়তে দেয়নি অনসূয়া। অবিনাশ বাবু চটেছিলেন, স্ন্যাকামো ! লেখাপড়া শিখে তো সব লাট-বেলাট হবেন। সবাই সব হ'লেন আর এখন—' কী মানুষ কী হ'য়ে গেছেন। অভাবের তাড়নায়, দুঃখের তাড়নায় [আর আছে নাকি কিছু মনের মধ্যে মাথার মধ্যে। তা নইলে আজ এমন ক'রে বলি দিতে পারতেন মেয়েটাকে ! কেউ দেয় ? কোনো বাপ কি পারে ? বিষণ্ণ ব্যথিত ভাই দুটি দিদির আসন্ন বিচ্ছেদব্যথায় কাতর হ'য়ে ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে-ওখানে। তারা তাদের মাকে কতটুকু জানে ? কতটুকু পেয়েছে ? দিদিই তাদের সব। সেই দিদিকে আজ ছাড়তে হবে তাদের। ছোট্ট ছেলে লজ্জা ভেঙে সকাল থেকে চোখ মুছছে কেবল। তারা কি বোঝেনি, তারা কি জানেনি তাদের দিদিকে আমরা জলে ডুবিয়ে দিচ্ছি হাত-পা বেঁধে। মা হ'য়ে বাপ হ'য়ে কত বড়ো সর্বনাশই শেষে করলাম সন্তানের ! বুলু এলো না ! আসতে দিল না তার শাশুড়ি। অনসূয়া যে তার বৌর বোন এই লজ্জাই তিনি ঢাকতে পারেন না, আবার সমারোহ ক'রে বিয়েতে পাঠাবেন ! ছিঃ ! তা তো ঠিকই। অনসূয়া কি সম্পর্কের যোগ্য ? আর তাছাড়া আসবেই বা কে ? কে গিয়ে তাকে নিয়ে আসছে সমাদর ক'রে ? এলেই তো খরচ। যে-ক'টি মুখ আছে তাই ভরানো দায়, আবার বোঝার উপর শাকের আঁটি। অনসূয়া চ'লে গেলে কী ক'রে দিন চলবে সেটাই তো এখন মস্ত ভাবনা। অবিনাশ বাবু উদয়াস্ত খেটে অস্থিচর্মসার হ'য়ে মাত্র আটান্ন টাকা পান, আর বড়ো ছেলে ছত্রিশ। আর অনসূয়ার একারই তো উপার্জ্জন উননব্বুই টাকা।

হায় রে ! কত সাধের অনসূয়া তাঁর, আকাঙ্ক্ষার ধন। আজ তাঁর সেই মেয়ের বিয়ে। সেই অনাই সোনার। ফটকের দু'দিকে লাল শালুমোড়া উঁচু ঘরে নহবৎ বসবে সাতদিন আগে থেকে, আত্মীয়-কুটুম্বে থৈ-থৈ করবে বাড়ি। পুকুরের এতদিনের যত্নে লালিত বড়ো-বড়ো রুই-কাৎলা ধড়াস ধড়াস আছড়ে এনে ফেলবে উঠোনে, পান-খাওয়া লাল দাঁত বার ক'রে বকসিস্ চাইবে নবীন জেলের নাতি পরাণ কৈবর্ত। হৈ-হল্লা, গান-গল্প, আনন্দের স্রোত ব'য়ে যাবে কুসুমপুরের চৌধুরী-বাড়িতে। অবিনাশ বাবু ছুটে আসবেন ব্যস্ত হ'য়ে, 'কই, তুমি কোথায় ? ঢাকা থেকে অমৃতি এসেছে যে, নাটোরের কাঁচাগোল্লা, মানিকগঞ্জের চন্দনচূড় দই—' লালপাড় শাড়ির হলুদমাখা আঁচলে ঘাম মুছতে-মুছতে ছুটে আসবেন তিনি, 'ও মা, ভীমনাগের সন্দেশ আসেনি এখনো, আর আসবে কবে ?'

সন্ধ্যেবেলা ঝমঝমে বিলিতি বাজে ভ'রে যাবে বাড়ি। তারা এসেছে ঢাকা থেকে পানসি নৌকোয় চ'ড়ে। দশ দিন বাজিয়ে মোটা টাকা নিয়ে ফিরে যাবে আবার। শাদা শাদা এপ্রনের উপর লাল পটি বাঁধা কোমর, পেতলের তকমা আঁটা। চলন হবে এক মাইল জুড়ে, নদীর ঘাট থেকে জামাইকে তিনশো ঝাড়ের আলোয় বাজনাবাদ্যি আসাসোটা দিয়ে প্রোসেশন ক'রে আনবেন তাঁরা। চব্বিশ বছরের বলিষ্ঠ সুন্দর সুকুমার ছেলে।

আশ্চর্য ! অবাক হ'য়ে ভাবলেন অনসূয়ার মা, আজকের দিনেও এমন ক'রে সেই মানুষটিকেই মনে প'ড়ে গেল তাঁর ? তখনো—যখনি তিনি অনসূয়ার বিয়ের কথা ভেবেছেন, এই বিনয়কেই মনে-মনে দেখতে পেয়েছেন তিনি। তাই ব'লে আজ ? আজও সেই ছেলেই—তাঁর চোখের তলায় এসে দাঁড়ালো ? তরকারির জলভরা গামলায় টপটপ ক'রে কয়েক ফোঁটা জল ঝ'রে পড়লো তাঁর চোখ থেকে। বেলার দিকে তাকিয়ে, নিঃশ্বাস ফেলে সাতান্ন বছরের শির-ওঠা দুর্বল হাতে তাড়াতাড়ি আলুর খোসা ছাড়ানোতে মন দিলেন।

[ক্রমশঃ।

বিপ্লবী বাংলা

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

১৫

অগ্নিযুগে যে তিনটি পত্রিকা সমগ্র বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজের ধমনীতে অগ্নিপ্রবাহের সৃষ্টি করে, তাহার মধ্যে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' অগ্রজ। অপর দুইটি পত্রিকা—'যুগান্তর' ও অরবিন্দের ইংরাজী দৈনিক 'বন্দে মাতরম্'। এই পত্রিকা তিনটি সে যুগের বিপ্লব মন্ত্রের বাহন ও স্রষ্টা। তাহাদের পরিচয়ই জাগ্রত বাংলার প্রথম প্রাণস্পন্দনের পরিচয়।

১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট 'সন্ধ্যা' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। সেই সময় এই পত্রিকাটি নৈষ্ঠিক হিন্দুর ফিরিঙ্গী-বিদ্বেষী সামাজিক মুখপত্র মাত্র; খৃষ্টান পাদ্রী ব্রহ্মবান্ধব তখন প্রবল প্রতিক্রিয়াবশে গোঁড়া হিন্দুতে পরিণত হইয়াছেন, গো-ব্রাহ্মণ-দেবতায় অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রচুর ফৈরঙ্গী সভ্যতা-বিদ্বেষের সঙ্গে উদ্গিরণ করিতেছেন। ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে 'সন্ধ্যা'য় ছিলেন বলাই দেবশর্ম্মা, মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ শেঠ ও অণিমানন্দ নামে একজন সিন্ধি খৃষ্টান সাধু।

'সন্ধ্যা' যাঁহার মানসকন্যা—সেই 'সন্ধ্যা'কে বুঝিতে হইলে ব্রহ্মবান্ধবকে বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মবান্ধবও স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। সত্যের অনুসন্ধিৎসায় এই উল্কার মত মনস্বী পুরুষ বহু ধর্ম্ম ও পথের সন্ধান করিয়াছেন। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সন্ন্যাসী বেশে ধর্ম্মপ্রচারের ব্রত গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণান্তে ১৯০২ সালে বোলপুর ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ে শিক্ষাব্রতীর কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৯০২ সালে ৪ঠা জুলাই বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন। কলিকাতার পথে এই সংবাদ পাইয়া উন্মাদ সন্ন্যাসী চলিলেন বেলুড় মঠে এই যুগ-পুরুষের মৃত্যু-শয্যাপার্শ্বে। সেখানে তিনি অন্তরের প্রেরণা পাইলেন—স্বামী বিবেকানন্দের অসমাপ্ত ফিরিঙ্গী-জয়-ব্রত তাঁহাকেই শেষ করিতে হইবে।

সংকল্প মত মাত্র ২৭৲ টাকা সম্বল করিয়া ৫ই অক্টোবর ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং ৫ই নভেম্বর অক্সফোর্ডে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি 'হিন্দুধর্ম্মে ঐশ্বরবাদ', হিন্দুর নীতিশাস্ত্র ও 'হিন্দুর সমাজবিজ্ঞান' সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দেন। তৎপর কেম্‌ব্রিজে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-দর্শন সম্পর্কে আরও তিনটি বক্তৃতা দেওয়ার ফলে কেম্‌ব্রিজ বিদ্যালয়ে হিন্দু-দর্শনের অধ্যাপকের পদ প্রথম সৃষ্টি হয়। ১৯০৩ সালে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিলাত প্রবাসকালে তিনি 'বঙ্গবাসী'তে বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ, ছুঁৎমার্গ প্রভৃতি বিষয় সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ লিখিতেন। এই ব্রহ্মবান্ধবকে চিনিতে পারিলেই গোঁড়া নৈষ্ঠিক হিন্দুত্বের মুখপত্র 'সন্ধ্যা'কেও বুঝিতে পারা যাইবে।

দৈনিক 'সন্ধ্যা'র প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি এক প্রবন্ধে বলেন—"দুঃসময় পড়িলে লোকে বলে, এই ত কলির সন্ধ্যা অর্থাৎ কালরাত্রির কেবল মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। অন্ধকার ঘুচিয়া গিয়া সুপ্রভাত হইতে এখন অনেক বিলম্ব। কিন্তু কলির সন্ধ্যার একটি শাস্ত্রীয় অর্থ আছে। বার শত বৎসর ধরিয়া কলির একটি সন্ধ্যা। এইরূপ চারিটি সন্ধ্যা চলিয়া গিয়াছে। এখন পঞ্চম সন্ধ্যা।

"প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় সন্ধ্যায় বৌদ্ধবিভ্রাট ঘটিয়াছিল। তৃতীয় সন্ধ্যায় শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়। চতুর্থ সন্ধ্যায় ম্লেচ্ছাধিকার। এই-বার ভারতকে একেবারে পাড়িয়া ফেলিয়াছে। অনাচার ও অত্যাচারে দেশ বাঁচিয়া থাকিয়াও যেন মরিয়া গিয়াছে।

"পঞ্চম সন্ধ্যায় বোধ হয় সু-দশার পালা আসিতে পারে। কিন্তু পঞ্চমেরও দুই শত বৎসর চলিয়া গেল তবু কোন সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। এখন উপায় কি? পুরাতন কথা ভাবিয়া দেখিলে উপায় কি, তাহা বোধ হয়, বুঝা যাইতে পারে। আমরা একটা লম্বা রশিতে বাঁধা আছি, যত দূরই যাই না কেন, যতই ঘুরপাক খাই না কেন, খোঁটা ছাড়িবার যো নাই।…

"কলির পঞ্চম সন্ধ্যায় আমরা 'সন্ধ্যা' নামে যে এক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার মানস করিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে—কেবল এই একমাত্র উপায় ভাল করিয়া বুঝান। রাজা ম্লেচ্ছ। উপজীবিকার জন্য, মান-সম্ভ্রমের জন্য, ম্লেচ্ছ ভাষা, ম্লেচ্ছ বিদ্যা শিখিতে হইবে, ম্লেচ্ছ হাব-ভাব ধরিতে হইবে নহিলে উপায় নাই। এতে কি আর খাঁটি ধর্ম্ম থাকে? সমস্যা শক্ত বটে কিন্তু সিদ্ধান্তও আছে। রাজার সহিত সম্পর্ক রাখিতেই হইবে। রাজায় প্রজায় কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে রাজনৈতিক কথা 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় বিস্তর থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির কার্য্যকলাপ ও দেশ-বিদেশের বিবিধ সংবাদ লিখিত হইবে। বিদেশীয় কলাকৌশল শিখিয়া কিরূপে ধনধান্যের বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহারও মন্ত্রণা থাকিবে। কিন্তু সকল কথার মাঝে সহজ কথায় বাঙ্গালীর প্রাণের কথা আমরা সদাই বলিব। যাহা শুন—যাহা শিখ—যাহা কর—হিন্দু থাকিও—বাঙ্গালী থাকিও। সখের জন্য সাহেবী ঢং নকল করিলে আসল ভেস্তে যাবে। কিন্তু বিদেশী বিদ্যা শিখিলে বা পেটের দায়ে ধর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়া বহিরঙ্গ ব্যাপারের অল্প-স্বল্প বদল করিলে ক্ষতি নাই।"

'সন্ধ্যা' প্রকাশের অব্যবহিত পরেই বাংলা দেশ বিভক্ত হইল। লর্ড কার্জ্জনের নির্ম্মম আঘাতে বাংলার জাতীয় জীবনে যে বিপ্লবের হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন তাহার অন্যতম হোতা। শিক্ষিত জনগণকে জাগাইবার ভার বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ প্রভৃতির হস্তে রাখিয়া স্বয়ং আপামর জনসাধারণের নিকট হইতে সাড়া পাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। 'সন্ধ্যায়' গুরুগম্ভীর ভাষা পরিত্যাগ করিয়া সাধারণের হৃদয়গ্রাহী গ্রাম্যভাষা, রূপকথা, অপভাষা ও হেঁয়ালী প্রভৃতির দ্বারা এমন এক অদ্ভুত ভাষার সৃষ্টি করিলেন, যাহা বঙ্গভাষায় অপূর্ব্ব এবং অতুলনীয়।

স্বদেশবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দশায় ব্রহ্মবান্ধবের হৃদয় কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছিল তাহা 'সন্ধ্যায়' প্রকাশিত এক প্রবন্ধে সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি তাঁহার প্রবন্ধে বলেন, "আমাদের দশা কেন এমন হইল? কেন অহরহঃ ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে হা অন্ন হা অন্ন রোল উঠিতেছে? কেন মহামারী মহারোগের প্রপীড়নে লক্ষ লক্ষ নরনারী অকালে কালকবলে পতিত হইতেছে? কেন শাসনপদ্ধতির প্রতি

এত বিদ্বেষ? অতএব এমন অসামঞ্জস্যে সমাজ স্থায়ী থাকিতে পারে না,—হয় আমরা আবার জাগিয়া উঠিব—নয় একেবারেই মরিব।

"......কাঁদিবার মানুষ চাই—ব্যথায় ব্যথিত হইয়া উন্মাদ সাধক চাই—সর্বত্যাগী তপস্বী চাই—ভগবৎমণ্ডলী চাই—তবে ভগবানের শুভাগমন সম্ভব। যিনি যেমন তাঁহার যোগ্য আমন্ত্রণকারী না হইলে তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন কেন? কোথায় তিনি—যিনি আহ্বান করিবেন; কোথায় তিনি—যিনি হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া মায়ের চরণে রক্তজবার অঞ্জলি দিবেন; কোথায় তিনি—যিনি ভারতের দুঃখে উন্মত্ত হইয়া, নরনারীর পাপ রুচিতে জ্ঞানশূন্য হইয়া, ধর্ম্মের গ্লানি দেখিয়া, সর্বত্যাগী হইয়া দেবতার দেবতা—রক্ষাকর্ত্তা, ত্রাণকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, ভয়ত্রাতা, ভগবানকে ভক্তিভরে বাঁধিয়া আনিবেন? কে বুঝাইবে যে, পাপভরে ধরিত্রী চঞ্চলা হইয়াছেন—আর যন্ত্রণা সহ্য হইতেছে না? কে ঘন-ঘন ভূমিকম্পে, অনাবৃষ্টি, অতিপ্লাবনে, পর্ব্বতের অগ্ন্যুদ্গারে—মহামারীর পৈশাচ লীলায় দারিদ্র্যের অস্থিপেষণকারী বেদনায়, ঝঞ্ঝাবাতে ধরার চাঞ্চল্য বুঝিয়া ঊর্দ্ধমুখে করযোড়ে আর্ত্তস্বরে দয়াল প্রভুকে ডাকিবে? কে দ্বারে দ্বারে যাইয়া শুভ বার্ত্তার ঘোষণা করিবে?"

যে দু'টি লেখার জন্য উপাধ্যায় পুলিশের প্রকোপে পড়িয়া গ্রেপ্তার হন তাহার শিরোনামা ছিল "ফিরিঙ্গী আমার পরম দয়ালু। ফিরিঙ্গীর কৃপায় দাড়ি গড়ায়—শীতকালে খাই শাঁখ আলু।" এবং "ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে।"

'সন্ধ্যা' পত্রিকা উগ্র আনুষ্ঠানিক হিন্দু সমাজবাদ হইতে যুগান্তরী গরম রাজনীতিবাদে রূপান্তরিত হইবার অন্তর্নিহিত কারণ সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার বলেন যে, "একবার কি সূত্রে, তাঁর অবর্ত্তমানে 'সন্ধ্যা'র পরিচালনার ভার অস্থায়ী ভাবে পড়ে 'যুগান্তর' আফিসের উপর। আমরা প্রায় রাতারাতি এই অবসরে 'সন্ধ্যা'কে কালী মাঈর বোমার ওকালতিতে গরম আসরে নামিয়ে দিই।" ব্রহ্মবান্ধব ফিরে এসে খুসী হ'য়ে অবিনাশকে ব'ললেন, 'তা বেশ ক'রেছ, এখন 'সন্ধ্যা' গরম সিদিসনই চালাবে।' ব্রহ্মবান্ধব ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে কয়েকটি প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছিলেন যে, "প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শক্তিসম্পন্ন বোমা প্রস্তুত হইয়াছে এবং সকল দেশ-ভক্তেরই এই বোমা সংগ্রহ করিয়া ঘরে রাখা কর্ত্তব্য।"

কেবল মাত্র 'সন্ধ্যা' প্রকাশ ও পরিচালনাই এই কৃতী পুরুষের জীবন-কথা নয়, ব্রহ্মবান্ধব জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরিকল্পয়িতা ও স্রষ্টা এবং 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা।

'সন্ধ্যা'য় উগ্র লেখার জন্য গ্রেপ্তার হওয়ার পর যখন বিচার আরম্ভ হইল তখন ব্রহ্মবান্ধব বলিলেন—"ছিঃ! ফিরিঙ্গীর আদালতে গেরুয়া পরিয়া যাইব? আমাকে পৈতা গ্রন্থি করিয়া দাও, আমি যজ্ঞোপবীত পরিয়া শাদা কাপড়ে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়রূপে ফিরিঙ্গীর কাছে হাজির হইব।"

বিচারকের সম্মুখে 'সন্ধ্যা'র যাহা কিছু দায়িত্ব সকলই আপন স্কন্ধে লইয়া বিচারককে বলিলেন যে, "ভগবৎ-প্রেরণায় তিনি ভারতে স্বরাজ-সংস্থাপন কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। সে জন্য বিদেশীর নিকট কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিবেন না।"

এই মামলা বিচারকালীন ব্রহ্মবান্ধব গুরুতর পীড়িত হইয়া ক্যাম্বেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্ত্তি হন। হাসপাতালে যাইবার সপ্তাহকাল মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন অপরাহ্ণে উপাধ্যায় তাঁহার কোন এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন—"আমি ফিরিঙ্গীর জেলে যাইয়া কয়েদীর মত খাটিব না। আমি কখনও কাহারও ফরমাইস খাটি নাই—কাহারও হুকুমের তাঁবে থাকি নাই। চিরজীবনটা একভাবে কাটাইয়া শেষে প্রৌঢ়ের সীমায় আইনের দোহাই দিয়া আমাকে জেলে রাখিবে—আর আমি বেগার খাটিব? আমি ফিরিঙ্গীর জেলে যাইব না। আমার ডাক আসিয়াছে।" চিরকুমার সন্ন্যাসীর বাণী সত্যে পরিণত হইল। তিনি ইহলোকের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেলেন।

'সন্ধ্যা' পত্রিকার সমসাময়িক সময়েই 'যুগান্তর' পত্রিকার আবির্ভাব। এই সময় অনুশীলন সমিতির সভাপতি পি, মিত্রের সহিত তাঁহার সহকর্ম্মীদের মধ্যে দেশে বিপ্লব আন্দোলনের কর্ম্মপন্থা লইয়া মতবিরোধ দেখা দিল। মিত্র মহাশয় যখন বিপ্লব আন্দোলনের মূল সূত্র হিসাবে দেশের যুবকদের মধ্যে লাঠি, ফুটবল খেলা, বক্সিং, কুস্তী প্রভৃতি শরীরচর্চ্চার আন্দোলন যাহাতে বিস্তারলাভ করে তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিলেন তখন বারীন্দ্র, দেবব্রত, অন্নদা কবিরাজ, মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্ত্তী, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি কর্ম্মিগণ দেশকে সশস্ত্র অভিযানের মর্ম্মকথা উপলব্ধি করাইবার জন্য 'যুগান্তর' নাম দিয়া বিপ্লবতন্ত্রের কাগজ বাহির করিবার জন্য মনস্থ করেন। যাঁহারা প্রচারে বিশ্বাস করিতেন তাঁহারা একত্রিত হইলেন এবং ইঁহাদের সহিত "আত্মোন্নতি সমিতি" রাজনৈতিক কার্য্যে সহায়তা করিত। যুগান্তর দল পৃথক হওয়ার মূলে অন্য একটা কারণ ছিল, তাহা হইতেছে দলের নেতৃত্ব লইয়া মতবিরোধ। অনুশীলন দল প্রমথ মিত্রের অধিনায়কত্ব বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন, আর যুগান্তর দল অরবিন্দ ঘোষকে অধিনায়করূপে দেখিতে চাহেন। এই বিভেদের ফলে কলিকাতার অনুশীলন সমিতি, ঢাকার অনুশীলন সমিতি এবং ময়মনসিংহের সুহৃদ্ সমিতি ও তাহাদের শাখাসমূহ প্রমথ মিত্রের দলে থাকিয়া কার্য্য করিতে লাগিল। তাহা ছাড়া বঙ্গের যে-সব বৈপ্লবিক কেন্দ্র ছিল তাহারা সকলে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বাধীনে আসিল। যুগান্তর পৃথক্ ভাবে গড়িয়া উঠিলেও অনুশীলন, আত্মোন্নতি প্রভৃতির কয়েক জন প্রধান এই দলের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং শিথিল হইলেও এই যোগের দ্বারা পরস্পরের মধ্যে একটি সংযোগ-সূত্র বরাবরই ছিল। বিপ্লবীদের বাৎসরিক যে সম্মেলন হইত তাহার সভাপতিত্ব করিতেন প্রমথনাথ মিত্র।

পত্রিকার নামকরণ সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এক বিবৃতিতে বলেন যে, 'যুগান্তর' নাম আমার মনোনীত। দেবব্রত বসুর সঙ্গে অনেক আলোচনা করিয়া এই নাম নির্দ্ধারিত করিয়াছিলাম। এই নামটি ৺শিবনাথ শাস্ত্রীর "যুগান্তর" নামক সামাজিক উপন্যাস হইতে ধার লওয়া হয়। আমরা অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের ছায়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হই, সেই জন্য এই নামটি আমার বিশেষ পছন্দ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় যেমন সামাজিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইয়াছেন, আমরাও সেইরূপ রাজনৈতিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইব এবং বৈপ্লবিক মনোভাব দেশে আনিব ইহাই আমাদের ইচ্ছা ছিল। যুগান্তর-দলের কাগজ ছিল। টাকা সংগ্রহ, মতামত, ও প্রবন্ধ লেখা সমস্ত কর্ম্ম পার্টির অভিপ্রায় অনুসারেই হইত। কাগজ সম্বন্ধে আমাদের মাথার উপর ছিলেন—অরবিন্দ ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্কর এবং অবিনাশ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

রূপগাজীর মাঠ।

একটি প্রশস্ত একমুখো 'সম্মুখবন্ধ' গলিকে মাঠ বলা হয়। এই প্রশস্ত গলির তিন দিক ঘিরে রয়েছে দ্বিতল ও ত্রিতল অট্টালিকার সারি। টানা-টানা টেলিফোনের তার এই পাড়ার বৈশিষ্ট্য। দেওয়াল হতে দেওয়ালে, ছাদ হতে বারাণ্ডায় ঝোলানো তারগুলি এই পাড়ার আভিজাত্য এবং স্বচ্ছলতার পরিচয় দেয়। মামুলি এবং সাধারণ বেশ্যাপল্লী হতে এই পল্লীটি স্বতন্ত্র। এইখানকার প্রতিটি গৃহের প্রতিটি কক্ষের জানালা দুয়ার এবং সম্মুখের বারাণ্ডা পুরু চিক দিয়ে ঢাকা। এই সকল গৃহে বাস করে উচ্চশ্রেণীর বেশ্যা নারী; সাধারণ বেশ্যা নারীর এখানে স্থান নেই। মধ্যে মধ্যে অন্দর হতে হাসির রোল ও ঘুঙুরের শব্দ না এলে ভিতরে যে মানুষ আছে তা বোঝাই যায় না।

কিন্তু এই সদা আলোকসজ্জিত রূপায়িত বেশ্যাপল্লীর পূর্ব্বশ্রী আর নেই। কোলাহলমুখর সুবেশ যুবক দলের আনাগোনা বহু দিন হলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যন্ত্র-শকটের হুস-হুস শব্দও বহু দিন পর্য্যন্ত এ পাড়ায় শোনা যায় না। 'বোঁটা কাটা বেল ফুল' হেঁকে মালাকরগণও নির্ভয়ে বহু দিন মাঠের পথে হেঁটে যায়নি। সোডা-পানি ও চাটের আশু প্রয়োজন না হলে চাকর-বাকররাও রাতের বেলায় বাড়ীর বার হয় না। দু'-এক জন মাত্র সাহসী পথিক চারি দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সুটসাট করে এ-বাড়ি ও-বাড়ী ঢুকে পড়ছিল। পল্লীর চতুর্দ্দিক ঘিরে বিরাজ করছে একটা গুমট ও থমথমে ভাব। পল্লীর সকলেরই মনে ভয়, পুলিশের হাল্লা এসে কখন কাকে বিনাদোষে ধরে নিয়ে যাবে।

দয়াল মিত্রের লেন যেখানে রামবাগানের মাঠে এসে মিশেছে, তার বাম দিকের একটা বাড়ীর দেওয়ালে একটা পানের দোকান ছিল। কাঠের পাটাতনের উপর পান ও সোডা বিক্রয় হয়, কিন্তু পাটাতনের নিচে অকারণে রাখা আছে কাঠকুটো ও কয়লা। পানবিক্রেতা মুখিরাম মাঠের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে তার দোকানে বসেছিল, খরিদ্দারের বৃথা আশায়। এমন সময় ১৭ নম্বরের এক জন চাকর সাধুরাম পা টিপে-টিপে এগিয়ে এসে বললো, নাকিবিনার ঘরে দু'-জন কাপ্তেন বাবু এসেছে, চট করে দুই পাঁট মদ বার কর, রমী দিদিমণির জন্যে দু'পুরিয়া সাদা গুঁড়োও দরকার। একটু 'কিন্তু কিন্তু' করে মুখিরাম বললো, 'এতনামে ইহিপর হাল্লা আ' যাওত তব?' 'হাল্লা তো আয়েগাই, লেকেন ডরো মাৎ', উত্তরে সাধুরাম বললো, 'হাল্লা আনেকো আধা ঘণ্টা বাকী হ্যায়। ১৭ নম্বরমে থানেকো মুন্সীবাবু টেলিফোঁক কিয়া থা। এক জমাদার ভি ১২ নম্বর আকে সব কুছ বাতায় দেকে গিয়া।'

প্রয়োজন কখনও আইন মানে না, বিশেষ করে আত্মরক্ষার ব্যাপারে। বেঁচে থাকার বা টিকে থাকার অধিকার মানুষ মাত্রেরই আছে। এই পাড়ার লোকেরাও মানুষ, জীবন-যুদ্ধে তারাই বা পিছপাও হবে কেন? স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবেই সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এই পল্লীর লোকেদের ব্যবহারের জন্য গড়ে উঠেছিল। ভালো-মন্দ কর্ম্মচারী পৃথিবীর সকল দেশেই বর্ত্তমান আছে, স্থানীয় কোতোয়ালীতেও এইরূপ দুই-এক বর্ণচোরা ব্যক্তি বহাল ছিল। থানার এইরূপ দুই-এক জন অসাধু নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীর সঙ্গে ইতিমধ্যেই এরা সংযোগংস্থাপন করে ফেলেছে। থানার নূতন বড়বাবু এবং তাঁর সাকরেদ প্রণব বাবুর চলা-ফেরার প্রতিটি সংবাদ এ পাড়ার লোকেরা পূর্ব্বাহ্নেই পেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে। তাই এই পাড়ার লোকেদের জীবন-যাত্রা আজও পূর্ব্বের ন্যায়ই অব্যাহত আছে, তবে এখন উহা কিছুটা বাঁকা পথে প্রবাহিত হচ্ছে, মাত্র এই যা তফাৎ।'

পানবিক্রেতা মুখিরাম দোকানের পাটাতনের তলাকার কাঠ-কুটো ও বরফের বাক্স সরিয়ে দু'বোতল বিলাতী মদ ও একটা ভাঙ্গা টিনের বাক্স হতে দু'পুরিয়া কোকেন বার করে সাধুরামের হাতে তুলে দিয়ে বললো, 'জলদি ভেজ দিইয়ে বিশঠো রূপেয়া।'

সাধুরাম সওদা শেষ করে এইবার তাদের ১৭ নম্বরের বাড়ীতে ফিরে যাবে, কিন্তু তার আগে সে কোকেনের পুরিয়া দু'টো পকেটে রেখে মদের বোতল দু'টো একটা গামছায় জড়িয়ে নিচ্ছিল, এমন সময় দু'জন নবীন ছোকরা বাবুকে সঙ্গে নিয়ে সেইখানে উপস্থিত হলো বেশ্যাপল্লীর মেয়েমানুষের দালাল লক্ষ্মীকান্ত। ছোকরা বাবু দু'জনের লজ্জা-মিশ্রিত ভীতত্রস্ত ভাব দেখে সহজেই বুঝা যায় যে এ পথে তারা নতুন। সাধুরামকে উদ্দেশ করে লক্ষ্মীকান্ত জিজ্ঞেস করলো, 'কি রে এই! তোদের বাড়ীতে কাউর ঘর খালি আছে?'

রূপগাজীর বেশ্যাপল্লী ছিল একটা নামকরা বেশ্যাপল্লী। এইখানে তিন প্রকারের বেশ্যা বাস করে। এদের যথাক্রমে বলা হয়, বাঁধা, অর্থাৎ যারা মাত্র একজনের রক্ষিতা হয়ে স্বামি-স্ত্রীর মতন বাস করে। টাইমের, অর্থাৎ যাদের দু'জন, তিন জন বা ততোধিক উপপতি আছে। এদের এক জন হয়তো আসে সোম ও মঙ্গলবারে, অপর জন হয়তো আসে বুধ ও বৃহস্পতিবারে, এবং তৃতীয় জন এই নিয়মে আসে শুক্র ও শনিবারে, কিন্তু এরা যাকে-তাকে কখনও আপন ঘরে স্থান দেয় না। ছুটা বেশ্যা অর্থাৎ এদের মধ্যে যারা নির্ব্বিচারে যখন-তখন যাকে-তাকে আপন কক্ষে স্থান দেয়। এই তৃতীয় শ্রেণীর বেশ্যারা কেউ কেউ রাস্তায় বা গবাক্ষপথে দাঁড়িয়ে তাদের বাবুদের আশায় অপেক্ষা করে, কেউ কেউ আবার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বেশ্যাদের ন্যায় আপন আপন কক্ষে অপেক্ষা ক'রে দালালদের মারফৎ বাবু সংগ্রহ করে থাকে।

রূপগাজীর ১৭ নম্বরের বাড়ীর নামডাক ছিল। এই বাড়ীর

প্রত্যেক নারীরই বাঁধা বাবু আছে, তারা স্বামি-স্ত্রীর মতন বসবাস করে। লক্ষ্মীকান্তর প্রশ্নে বিরক্তি প্রকাশ করে সাধুরাম বললো, 'কি বাজে বাজে বকছিস্! তুই কি এখানে নূতন নাকি? আমাদের বাড়ীর দিদিমণিরা কি কেউ ছুটো নাকি? যা, ১২ নম্বরের বাড়ীতে খোঁজ কর গে যা।'

সাধুরামের নিকট হতে তাড়া খেয়ে লক্ষ্মীকান্ত রাস্তার দুই ধারের দোতলার ঘরগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলো। মাত্র চার-পাঁচটি কক্ষের বারাণ্ডায় নীল আলো জ্বলছিল, বাকি ঘরগুলিতে লাল আলো জ্বালোনো রয়েছে। এদের ঘরে বাবু থাকলে বারণ্ডায় লাল আলো জ্বলে, তা না হলে নীল আলো জ্বালানো থাকে। পূর্ব্বেকার দিন হলে লক্ষ্মীকান্ত ছুটোছুটি করে বার করতো কোন্ ঘরটি খালি আছে। কিন্তু আজকালকার এই ডামাডোলের বাজারে তার আর এ-বাড়ী ও বাড়ী করতে সাহস হচ্ছিল না। লক্ষ্মীকান্তকে হকচকিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে দেখে সাধুরাম বললো, 'কি এদিক-ওদিক দেখছিস্। দে না একটা বাড়ীতে ঢুকিয়ে। এদিকে যে হাল্লা এসে পড়লো বলে। দালালীটা আগেই নিয়ে নিস্, বুঝলি?'

সাধুরাম সওদা নিয়ে এবং লক্ষ্মীকান্ত তার খদ্দের নিয়ে স্থানত্যাগ করার পর পানবিক্রেতা মুখিরাম ভাবছিল, এইবার সে তার দোকনপাট বন্ধ করে উঠে পড়বে কি না। এমন সময় এই অঞ্চলের প্রখ্যাত গৃহস্থ-গুণ্ডা মুকুন্দরাম বাবু সেইখানে উপস্থিত হয়ে বললে, 'এই মুখিয়ারাম, এতো তাড়াতাড়ি পালাচ্ছিস কেন? আট বোতল মদ আমাদের এখুনি চাই, আর তোর দু'মাসের বাকি চাঁদা বাবদ বারোটা টাকাও।' তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে দোকান বন্ধ করবার টুকরো কাঠগুলো ওঠাতে ওঠাতে মুখিরাম উত্তর করলো, 'কিন্তু এখোন সময় কাঁহা? উনলোক্ এখুনি এসে পড়বে, বাবুসাহেব! খবর হো গ'য়া প্রণব বাবু খুদ আয়েঙ্গে, অভি।' দম্ভভরে মুকুন্দ বাবু মুখিরামের পিঠের উপর একটা চাপড় দিয়ে উত্তর করলে, 'আরে রহো রহো, ডরো মাৎ। পেরণব-বাবু জীবন লেকে আজ লোটেগা থোড়াই। খুদ বিহারী বাবুসে হুকুম মিল গ'য়া, বহুৎ রুপেয়া ভি। হারু গুণ্ডাকো দল ভি আ'যাতা, দেখিয়ে যা তামাসা। কেয়া মুখিরাম, ইস রায় মঞ্জুর তো। আচ্ছা! নিকালো শালা তব দশ রুপেয়া, অভি। হাম ভিখ মাঙতে নেহি ভাই, ই তো চাঁদা হ্যায়। পুলিশকো সামলানেকে বাস্তে জরুরত হোতা, তুম তো সব কুছ সমঝতা। মহল্লাকো সবকোই দে দিয়া, তুম ভি কুছ দে দেও, ভাই।'

থানেওয়ালা পুলিশ কর্ম্মচারীদের পানওয়ালা মুখিয়া কয়েকটি কারণে একটুও পছন্দ করতো না। নীচেওয়ালারা বরং দু'দশ টাকায় সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু বড়দের যেন খাঁইএর শেষ নেই। মদ ও কোকেনের চোরাকারবারী করে তার আয় হয় মাত্র পাঁচশো টাকা, তা থেকে যদি তিনশো টাকা কোতোয়ালিতেই দিতে হয় তো তার নিজের ভাগে থাকবে কি? এ ছাড়া আবগারীর লোকেরা আছে, গুণ্ডাদের উৎপাতও। এই সব সরকারী বিভাগে সাধু ব্যক্তির সংখ্যা অধিক হলেও, দু'-এক জন অসাধু ব্যক্তিও আছে। এবং এদের তাকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে বৈ কি? কিন্তু এ অঞ্চলে প্রণব বাবুদের রাত্রিকালীন টহল সুরু হওয়ার পর হতে তার আয় কমে এসে দু'শো টাকায় দাঁড়িয়েছে, কিন্তু এখন এই দুই শত টাকা তার নিজেরই থেকে যাচ্ছে, তাতে অন্য কেউ আর ভাগ বসায় না। ঘুষঘাষ এক্কেবারে বন্ধ। নীচেওয়ালা কর্ম্মচারী এবং পাড়ার গুণ্ডারা এ ক'দিন তার দোকানের ধারে-কাছে আসতেও সাহস করেনি। এই সকল কারণে পানওয়ালা মুখিরাম প্রণব বাবুর উপর মনে মনে বরং খুশীই ছিল। মুকুন্দরাম বাবুর কথা শুনে একটু চিন্তিত হয়ে মুখিরাম উত্তর করলো, 'লেকেন ইস রায়'মে মেরি দিল্ নেহি আতা। ইসমে হাল্লা উল্লা বহুত বাড় যায়েগা।'

এই পানের দোকানের মুখোমুখি উল্টো দিককার বাড়ীটা ছিল ২১ নম্বরের। সহসা দ্বিতলের একটা ঘর হতে একটা কোলাহল শোনা গেল, দু'-চারটে সোডার বোতল ও কাচের গেলাস ছোঁড়ার শব্দও। একটু পরে বাড়ীওয়ালীর চাকর হারাণ মাইতি বেরিয়ে এসে মুকুন্দ বাবুকে সম্মুখে দেখে বলল, 'এই যে বড়বাবু, আপনি এখানেই আছেন। বাড়ীওয়ালা মা আপনাকে বাড়ী থেকে ডেকে আনতে বললেন। মোক্ষদা দিদিমণির ঘরে দু'জন বাবু এসে বহুতক্ষণ উৎপাত করছে, তাদের কিছুতেই সামলাতে পারা যাচ্ছে না, বাবু।'

বেশ্যাপল্লী সমূহে রূপজীবিনীগণ বড়ো-বড়ো বাড়ীর একটি বা দুইটি ঘর নিয়ে বসবাস করে। এখানকার এক-একটি বাড়ী এক-এক জন বাড়ীওয়ালীর অধীন থাকে। এই সকল বেশ্যা নারী তাদের স্ব স্ব বাড়ীওয়ালীর কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করে এবং প্রায়শঃই তাদের নির্দ্দেশ মত তারা কায করে। বেশ্যাপল্লীর বাড়ীওয়ালীগণ স্ব স্ব বাড়ীর প্রাথমিক শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী থাকে। নিঃসহায় রূপজীবিনীদের দুর্দ্দান্ত মাতাল বা দুর্ব্বৃত্তদের হাত হতে রক্ষা করবার জন্য এই সব বাড়ীওয়ালীরা সব সময়ই প্রস্তুত থাকে, এই জন্য এরা এক শ্রেণীর গৃহস্থ-গুণ্ডাদের মাসিক মাহিনায় নিযুক্ত রাখে। এই সব গৃহস্থ গুণ্ডারা বেশ্যাপল্লীর সন্নিকটেই সপরিবারে বাস করে, প্রয়োজন মত বাড়ীওয়ালীরা চাকর পাঠিয়ে তাদের ডাকিয়ে এনে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের গৃহ হতে বার করে দেয়। মুকুন্দ বাবু ছিল এই শ্রেণীর এক জন গৃহস্থ-গুণ্ডা, এখানকার চার-পাঁচ জন বাড়ীওয়ালী একত্রে তাকে মাসিক মাহিনায় নিযুক্ত করে রেখেছিল।

চাকর হারাণ মাইতির নিকট সকল সংবাদ অবগত হয়ে মুকুন্দ বাবু বুঝলেন, ঘটনা আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে। পানওয়ালা মুখিরামের সঙ্গে বৃথা বাক্যালাপ না করে তিনি ২১ নম্বরের বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলছিলেন। এমন সময় দুই জন সুবেশ ভদ্রযুবক তাড়াতাড়ি ঐ বাড়ী হতে বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে উঠলো—এই ট্যাক্সী ট্যাক্সী! উপরের বারাণ্ডা হতে এক জন নারীকণ্ঠে চীৎকার করে বললো, 'ও—ও মুকুন্দদা! ধরো, শীঘ্রি ওদের ধরো।' তাড়াতাড়ি ছুটে এসে যুবক দুজনকে আটকে দিয়ে মুকুন্দরাম বললে, 'ভয় নেই দিদি, এসে গিয়েছি আমি।'

মুকুন্দ বাবুর এই দিদিটির নাম ছিল, মোক্ষদারাণী। ১৯ নম্বরের বাড়ীর কোণের ঘরটিতে সে পেশা করে। তার বাবুরা সকলেই 'টাইমের', ছুটা বেশ্যা সে নয়। এই পাড়ার সে ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর বেশ্যা, প্রথম শ্রেণীর বেশ্যা না হলেও এ পাড়ায় তার নামডাক আছে। এই সর্ব্বপ্রথম সে অধিক টাকার লোভে ছুটা করেছিল। কিন্তু যতো টাকা ঐ যুবক দু'জন তাকে দেবে বলেছিল, ততো টাকা তারা তাকে দেয়নি। অধিকন্তু তারা রাগারাগি করে বোতল ও গেলাস ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু মোক্ষদারাণীও হটবার পাত্রী ছিল না। যতোক্ষণ পারে সে তাদের আটকে রেখে

বাড়ীওয়ালীকে খবর পাঠিয়েছে। বাড়ী মাৎ করে চেঁচামেচি করতেও, কসুর করেনি। এইবার তাড়াতাড়ি সে নীচে নেমে এসে মুকুন্দ বাবুর কাছে নালিশ জানিয়ে বললে, মাত্র দু'ঘণ্টা থাকবে বলে কুড়ি টাকায় রাজী করিয়ে, পৌণে তিন ঘণ্টা বসে রইলো, এখন লোক দু'টো মাত্র পাঁচ টাকা ঠেকিয়ে দিয়ে সরে পড়ছে। আমি এক জনের হাত দু'টো চেপে ধরেছি! আর ঠাঁই করে একটা ঘুঁসি মারলে। আবার বলে কি না, ওরা গোয়াবাগানের গুণ্ডা; পয়সা দিতে আসেনি, নিতে এসেছে।

ঘুঁসি খেয়ে মোক্ষদারাণীর ঠোঁট কেটে রক্ত বার হচ্ছিল। তার মুখের দিকে চেয়ে আস্তিন হতে একটা ছুরি বার করে বাম হাতে এদের এক জনের ঘাড়টা মুচড়ে ধরে গুণ্ডাপ্রধান মুকুন্দ বাবু বললে 'বটে! তোমরা গুণ্ডা? এখন বাঁচতে চাও তো যার কাছে যা আছে চটপট বার করে দাও।'

যুবক দু'জন ছিল ভদ্র গৃহস্থ-সন্তান। অল্প বয়সে তারা ব'খে গিয়েছে, পেকেও। নিজ পল্লীতে তারা যে কিছুটা গুণ্ডামী করেনি তাও নয়। তবে এ সব পেশাদারী গুণ্ডাদের কাছে তারা ছিল ছুলিয়া মাত্র। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এদের এক জন তার কাছে যা কিছু ছিল মনিব্যাগ সমেত তা বার করে দিলে। অপর যুবকটির নিকট টাকাকড়ি কিছু ছিল না। বন্ধুর পয়সায় সে ফুর্ত্তি করতে এসেছে, তবে সাজগোজ তার ভালোই ছিল। মুকুন্দ বাবুর আরও একটা হুমকীর পর সে তার হাতের রিষ্টওয়াচ ও হাতের আঙটী খুলে মুকুন্দরামের হাতে তুলে দিলে।

ছোরাখানি তার আস্তিনের মধ্যে পুনরায় পুরে দিয়ে মুকুন্দ বাবু তাদের পকেট কয়টা চটপট তল্লাস করে দেখলে, তাদের নিকট অবশিষ্ট আর কিছুই নেই। অপহৃত মনিব্যাগের মধ্যে আটখানা দশ টাকার নোট মজুত ছিল। নোটগুলি হতে তিনখানা নোট মোক্ষদারাণীর হাতে তুলে দিয়ে মুকুন্দরাম বললে, 'এই নাও দিদিমণি, তোমার পাওনা টাকা। আরে তুমিও যেমন, একটুতেই ভয় পেয়ে যাও। ওরা হচ্ছে সব পোষাকী গুণ্ডা; সখের গুণ্ডা।' যুবক দু'জন তখনও পর্য্যন্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঠক্‌-ঠক করে কাঁপছিল। মদ তারা একটু খেয়েছিল বটে, কিন্তু ততক্ষণে তাদের যা কিছু নেশা তা ছুটে গিয়েছে। মুকুন্দ বাবু এইবার একটা দশ টাকার নোট এদের এক জনের হাতে গুঁজে দিয়ে, দু'জনেই মাথায় একটা করে চাঁটি কসিয়ে বললে, 'যাও, এখন ট্যাক্সি করে সরে পড়ো। এক্ষুনি পুলিশের হাল্লা এসে পড়বে, যাও!'

যুবক দু'জন দ্বিরুক্তি না করে সরে পড়ছিল, কিন্তু সরে পড়া তাদের সম্ভব হলো না। দূর হতে এক দল লোক চীৎকার করে উঠলো, 'ভাগো-ও ভাগো-ও! হাল্লা আ'গয়া। চতুর্দ্দিকে সহসা সোরগোল পড়ে গেল। যে যেদিকে পারে দৌড়ে পালাচ্ছে। খুটখাট্ শব্দ করে জানালা-দরজাগুলো বন্ধ হয়ে গেলো। এমন কি কয়েকটি কক্ষে যা বিজলী বাতী জ্বলছিল তা'ও একে-একে নিবে গেল। পান-বিড়ীর দোকানীরাও হৈ-হাল্লা করে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে আশ্রয়ের জন্য এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঢুকে পড়লো। মুকুন্দরাম বাবুও তার দলবল সহ ইতিমধ্যেই সরে পড়েছেন! কোলাহলমুখর বিস্তৃত পথে আর একটি মাত্রও মানুষ দেখা যায় না।

সকলে পলায়ন করলেও যুবকদ্বয় পালাতে পারলো না। কোন দিক দিয়ে এবং কেন তারা পালাবে তা তারা বুঝতে পারেনি। তারা তাড়াতাড়ি একটা গ্যাসপোষ্টের পিছনে লুকিয়ে পড়লো। এই যুবক দু'জনের মত একটি বৃদ্ধা বেশ্যা নারীও আটক পড়েছিল। দৌড়ে এসে সে দেখলো মেয়ের বাড়ীর দরজা বন্ধ। দরজার উপর ধাক্কা লেগে হুমড়ি খেয়ে রাস্তায় পড়ে সে অজ্ঞান হয়ে গেলো। বৃদ্ধার পালিতা কন্যা রাধারাণী মায়ের এই অবস্থা দেখে স্থির থাকতে পারলো না, বারাণ্ডার চিক একটু ফাঁক করে সে চীৎকার করে উঠলো, 'কে আছো! মা'কে একটু জল দাও গো। একটু জল!' কিন্তু কে দেবে কাকে জল? গোলমাল বুঝে অপর নারীরা তার মুখটা চেপে ধরে ভিতরে এনে বললে, 'চুপ করো বাপু, চুপ করো। ওরা আগে চলে যাক, তার পর দেখা যাবে।' কিন্তু রাধারাণী স্থির থাকতে পারলো না, সে পুনরায় বারাণ্ডায় এসে মায়ের অবস্থাটা একবার দেখে নিলে। বৃদ্ধা বেশ্যার অসহায়া কন্যা রাধারাণী, মায়ের মৃত্যু নিশ্চিত বুঝে এইবার বলে উঠলো, 'গঙ্গা গঙ্গা রাম রাম! বলো, হরি হরি! মা! ওমা, মা গো!'

যুবক দু'জন কিছুক্ষণ গ্যাসপোষ্টের আড়ালে লুকিয়ে থেকে এইবার বড় রাস্তার দিকে লক্ষ্য করে প্রাণপণে দৌড় দিলে। কিন্তু ততক্ষণে পুলিশের হাল্লা সম্মুখে এসে গিয়েছে। এক জন সিপাহী ছুটে এসে লাঠিটা তাদের পায়ের কাছে আছড়ে দিয়ে বললে, 'দো ছিনতাই ভাগ যাতা। জলদী পাকোড় লে'ও ভাই!' পিছন হতে দুজন সিপাহী উভয়কে চেপে ধরে একটা গামছা দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললে। এদিকে অপর ক'জন সিপাহী জন দশ-বারো লোককে হাতে হাতে বেঁধে সারিবন্দি করে সেইখানে এনে দাঁড় করিয়ে দিলে। এদের মধ্যে এক জন সিপাহী এক জন আসামীর কাপড়ের খুঁটের সঙ্গে অপর এক জন আসামীর হাতখানা বেঁধে দিচ্ছিল সব কয়জনকে এক সাথে থানায় নিয়ে যাবার সুবিধের জন্যে। সহসা চীৎকার করে সে বলে উঠলো, 'উধার আউর আদমী ভাগ যাতা হ্যায়।'

১৭ নম্বরের বাড়ী হতে এক জন চাকর ১২ নম্বরের বাড়ীতে দৌড়ে ঢুকে পড়ছিল। সিপাহী দলের এক জন ছুটে গিয়ে তাকে পাকড়াও করে বললে, 'কৌন হ্যায় রে তুম?' অপর এক সিপাহী গলির মুখ হতে এক জনকে পাকড়াও করে টেনে আনছিল, হঠাৎ ওপরের বারাণ্ডা হতে এক জন চেঁচিয়ে উঠলো, 'ও মা! মামাকে ধরে নিয়ে গেলো।' কিন্তু মামাকে উদ্ধার করবার জন্যে এক জনও বেরিয়ে এলো না। এর কিছুক্ষণ পরে আরও জন চার সিপাহী সঙ্গে প্রণব বাবু ঐস্থানে এসে দেখলেন, রামদীন জমাদারের তত্ত্বাবধানে প্রায় বিশ জন লোককে সিপাহীরা ধরে ফেলেছে।

এই দিন এই পাড়ায় বহু ব্যক্তি ধরা পড়লো পুলিশের ছাঁকা জালে। রাত্রি বারোটার পর পথে বার হওয়ার দায়ে কেবল মাত্র ধরা পড়লো না তারা—যারা স্থানীয় লোক বিধায় পুলিশের নির্দ্দেশ মত লম্ফ বা হ্যারিকেন নিয়ে রাত্রে পথে বার হয়েছে।

খুশী হয়ে প্রণব বাবু সিপাহীদের উদ্দেশ করে বললেন, 'ঠিক হ্যায়, বহুত খুশ হুয়া। এখন এদের থানায় পাঠিয়ে দিয়ে, চলো দয়াল মিত্রের লেনটা ঘেরোয়া করে ফেলা যাক।'

দশ জন সিপাহীর সঙ্গে ধৃত আসামীদের থানায় পাঠিয়ে দিয়ে, বাছা-বাছা জন বারো সিপাহী নিয়ে প্রণব বাবু এইবার ধীর-পদবিক্ষেপে দয়াল মিত্রের লেন ধরে এগিয়ে চললেন। থানা হতে বার হবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই স্থানটি সম্বন্ধে টেলিফোনের ওপারের মেয়েটা তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিল। [ক্রমশঃ।

ভল্গা থেকে গঙ্গা

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

[এই উপাখ্যানটি আর্য্যবংশের ১৮০ পুরুষ আগেকার। এই বংশের কিছু বংশধর এই সময়ে ভারতে প্রবেশের উদ্যোগ করছিল। এই যুগে তারা কৃষিকাজ এবং তামার ব্যবহার সুরু করেছিল। ইতিপূর্ব্বেই আর্য্যদের মধ্যে দাসপ্রথা প্রবেশ করেছিল, কিন্তু এই সময় তারা এটা ভুলবার চেষ্টা করছিল।]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পুরুহুত উপাখ্যান

স্থান—অক্সাস উপত্যকা—তাজিকস্তান : পাত্র—ইন্দো-ইরানিয়ান

কাল—খৃঃ পূঃ ২৫০০ বৎসর।

কলনাদিনী অক্সাস নদী বয়ে চলেছিল উপত্যকা বেয়ে। ডান পারে নদীর প্রান্ত থেকেই পাহাড়ের সারি উঠে গেছে, অন্য পারে জমি ঢালু হয়ে উঠেছিল খুব ধীরে ধীরে—ফলে উপত্যকাটা এপারেই ছিল প্রশস্ত। দূর থেকে দেখলে শুধু গাঢ় সবুজ প্রকাণ্ড পাইন গাছের ঘন বন দেখা যায়—আর নিকটে এলে দেখা যায় এই বৃক্ষরাজির শাখা-প্রশাখার সূক্ষাগ্র পত্রসম্ভার—কাণ্ডের কাছে শাখাগুলো অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং যত উপরে উঠেছে তত সেগুলো ছোট হয়ে এসেছে। এই বনস্পতিগুলোর নীচে জন্মেছে ক্ষুদ্রতর গাছপালা এবং নানা জাতের লতাপাতা। গ্রীষ্মের শেষভাগ তখন এবং বর্ষা তখনও সুরু হয়নি—এই মাসটাতেই উত্তর-ভারতের সমতল দেশের অধিবাসীরা ভীষণ কষ্ট পায় গরমে। কিন্তু এই ৭ হাজার ফুট উঁচুতে পাহাড়ী উপত্যকায় গরম হাওয়া প্রবেশের পথ নেই।

নির্ঝরিণীর বাম তীর ধরে একটি যুবক চলছিল। তার পরনে পশমী আঙরাখা, কোমরে তার কয়েক ভাঁজ কোমরবন্ধ এবং পশমী পাজামা এবং পায়ে পট্টী পাদুকা। মাথার টুপিটা খুলে পিছনে ঝোলানো থলির উপর সে রেখে দিয়েছে, ফলে তার লম্বা উজ্জ্বল চুলের গোছা অবিন্যস্ত ভাবে ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে, মৃদু বাতাসে চুলগুলোতে যেন ঢেউ খেলছিল। তার কোমরে ঝুলছিল একটা তামার তরবারি, চামড়ার খাপে বদ্ধ। তার পিছনে ঝোলানো থলিটির আকার চোঙ্গার মত, তার সাথেই ছিল একটা গুণ না দেওয়া ধনুক, এক তূণ তীর এবং অন্য অনেক জিনিস। তার হাতে ছিল একটা লাঠি, মাঝে-মাঝে সেটায় ভর দিয়ে জিরিয়ে বোঝার চাপ কমিয়ে নিচ্ছিল—কারণ ওপরে ওঠার পথ ক্রমেই দুর্গম হয়ে উঠছিল। তার আগে-আগে চলছিল ছ'টি পুষ্টকায় মেষ অশ্বলোমে তৈরী বড় থলিতে ভর্তি ভাজা চাল পিঠে নিয়ে। আর তার পিছনে-পিছনে আসছিল লালচে রংএর একটা লোমশ কুকুর। সারা পার্বত্যভূমি এই সময় মুখরিত হচ্ছিল পাখীর অস্পষ্ট কাকলীতে, যুবকেরও ইচ্ছা হল এই শব্দের অনুকরণ করতে, চলতে-চলতে সেও তাই শিষ দিতে সুরু করেছিল।

উঁচু পর্বতের মধ্য থেকে সফেন ঝর্ণাধারা নেমে আসছিল একটা রূপালী রেখার মত। ঝর্ণার পথ মুক্ত করে দেবার জন্য কে যেন খানিকটা পর্বতগাত্র কেটে দিয়েছিল, সেখানে একটা কাঠের পয়োনালীও কেউ তৈরী করে দিয়েছিল। পরিশ্রান্ত মেষপাল পাহাড়ের নীচে এই ঝর্ণা থেকে জলপান করতে সুরু করল, যুবক দেখতে পেল নিকটে বেয়ে ওঠা দ্রাক্ষালতাগুলি থেকে গুচ্ছ-গুচ্ছ আঙুর ঝুলছে, সে বসে মাটিতে কাঠের বোঝা নামিয়ে রেখে আঙুর-ফল তুলে খেতে আরম্ভ করল। ফলগুলো তখনও ছিল কটু এবং টক। এগুলো পেকে উঠতে তখনও প্রায় মাস খানেক বাকী ছিল—কিন্তু যুবক পথিকের এগুলোই ভাল লাগছিল, তাই সে একটা-একটা করে এগুলো চুষতে লাগল। বোধ হয় জলপানের আগে সে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল, কারণ সে খুবই পিপাসার্ত্ত হয়েছিল এবং এই অবস্থায় তক্ষুণি ঠাণ্ডা জল পান করা ক্ষতিকর হত। মেষগুলো তৃষ্ণা নিবারণ করে ঘুরে-ফিরে সবুজ কচি ঘাস খেতে আরম্ভ করল। লোমওয়ালা কুকুরটা গরম হাওয়ায় উত্যক্ত হয়ে তার প্রভু বা মেষপাল কারও দিকে না চেয়ে ঝর্ণার জলের মধ্যে গিয়ে বসে রইল। একটু পরে কুকুরটার পেট জলের থলির মত কেঁপে উঠল, তার খোলা মুখের মধ্য থেকে ঝুলে-পড়া রক্ত-রংএর জিহ্বাটা লকলক করছিল। যুবকটিও তখন ঝর্ণাধারায় মুখ পেতে এক চুমুকে তার তৃষ্ণা শান্তি করল এবং শুকনো চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে সামনেকার চুলগুলোর গোড়া পর্য্যন্ত ভিজিয়ে নিল। তার মুখে সবে হলুদ রংএর গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছিল, আর কিছু দিন পরেই তার কপিশ রংএর গালে ও লাল ঠোঁটের উপরভাগে রোমরাজি ছড়িয়ে পড়বে বোঝা যাচ্ছিল। তার মেষপাল মনের সুখে চরে বেড়াচ্ছে দেখে যুবকটি তার থলিগুলোর পাশে গিয়ে বসল। তার কুকুরটা তার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে কান খাড়া করে যে ভাবে তাকিয়েছিল, তার অর্থ বুঝতে পেরে সে থলিটার এক কোণ ঢুঁড়ে একখণ্ড শুকনো শূয়োরের মাংস খুঁজে বের করল এবং কোমরে ঝোলানো চামড়ার খাপ থেকে একটা তামার ছুরি বের করে সেটা টুকরো-টুকরো করে কেটে কুকুরটাকে দিল এবং নিজেও খেতে লাগল। এই সময়ে কাঠের ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল এবং সে দেখল, দূরে ঝোপের আড়াল থেকে একটা গাধা সেদিকে আসছে, পরে আরও একটা এবং তার পিছনে দেখল এক্টি ষোড়শী যুবতী সেদিকে আসছে। যুবতীর পরনে তারই মত পোষাক এবং তারও পিঠে অনুরূপ একটি থলি। সে মৃদু ভাবে শিষ দিল—কোন কিছু ভাববার সময় শিষ দেওয়াটা তার নিশ্বাস নেবার মতই অভ্যস্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শিষের শব্দটা নিশ্চয়ই যুবতীর কানে গিয়েছিল, সে তার দিকে একবার তাকালও। কিন্তু লতাপাতার আড়াল ছিল বলে তাকে দেখতে পেল না। মেয়েটি যুবকের থেকে প্রায় ৩০ ফুট দূরে থাকলেও তার মুখের সুন্দর ও মনোহর আকৃতি যুবকের খুবই ভালো লাগল। মেয়েটি কোন্ দিকে যাবে তা জানবার জন্য তাই সে অধীর ভাবে অপেক্ষা করতে লাগল। এখানে পাহাড়ের

উপরে কোন বসতি নেই তা সে জানত—তাই সে আন্দাজ করল যে মেয়েটিও বোধ হয় তারই মত পথিক। এই সুন্দরী আগন্তুককে দেখে কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করে উঠল—কিন্তু যুবক তাকে থামতে ইসারা করলে সে আবার নিঃশব্দে তার জায়গায় গিয়ে বসল। মেয়েটির সাথের গাধাগুলো মাথা গুঁজে জল খেতে সুরু করল, মেয়েটিও তার কাঁধের বোঝাটা খুলতে আরম্ভ করল। যুবক এগিয়ে গিয়ে তার শক্ত হাতে তাকে সাহায্য করল এবং বোঝাটা নামিয়ে রাখল। "ভয়ানক গরম" এই কথা বলবার সময় মেয়েটির মুখের হাসি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

"এমনিতে খুব গরম না, তবে নীচে থেকে উপরে ওঠার জন্যে তোমার বেশী গরম লাগছে। একটু জিরিয়ে নিলেই সব ঘাম মরে যাবে।"

"এখন দিনগুলো ভালই।"

"আর দশ-পনেরো দিন পর্য্যন্ত বৃষ্টি নামবার ভয় নেই।"

"বৃষ্টি আরম্ভ হলেই খুব ভয় হয়। জল আর পিছল কাদায় রাস্তা এত খারাপ হয়ে ওঠে!"

"গাধাগুলোর পক্ষে চলা আরও কঠিন হয়।"

"বাড়ীতে এখন কোন মেষ ছিল না, তাই আমাকে গাধা আনতে হয়েছে। আচ্ছা, বন্ধু, তুমি কোন্ দিকে যাবে?"

"দণ্ডতে। আমাদের ঘোড়া ও গরু-ভেড়া সব এখন সেখানেই আছে।"

"আমিও ত ওখানেই যাচ্ছি। আমি সেখানে ভাজা চাল, শস্য ও ফল নিয়ে যাচ্ছি।"

"ওখানে তোমাদের পশুপাল কে দেখে?

"আমার পিতার পিতামহ এবং আমার ভাই-বোনেরা।"

"কি, তোমার পিতার পিতামহ? তাহলে তিনি ত নিশ্চয়ই খুব বৃদ্ধ!"

"হ্যাঁ, তা ত নিশ্চয়ই। তুমি এ অঞ্চলে তাঁর মত বৃদ্ধ মানুষ আর পাবে না।"

"তাহলে তিনি তোমাদের পশুপাল কি করে দেখা-শোনা করেন?"

"তিনি এখনও বেশ শক্ত আছেন। তাঁর সব চুল, এমন কি চোখের ভ্রূ-পর্য্যন্ত শাদা হয়ে গেছে, কিন্তু দাঁতগুলো এখনও যেন নতুন রয়েছে। তাঁকে দেখলে তোমার মনে হবে না যে তাঁর বয়স ৫০।৫৫র বেশী হয়েছে।"

"তাহলে তাঁকে কি বাড়ীতে রাখাই ঠিক না?"

"কিন্তু তিনি তাতে কিছুতেই রাজী নন। আমার জন্মের আগের থেকেই তিনি একবারও গাঁয়ে যাননি।"

"এক বারও না?"

"না, তিনি যেতে চান না। গ্রামকে তিনি ঘৃণা করেন, তিনি বলেন যে মানুষ এক জায়গাতেই লেগে পড়ে থাকবার জন্য জন্মায়নি। তিনি আমাদের অনেক অতীত কালের সব কথা বলেন। সে ত হল—কিন্তু তোমার নামটা ত এখনও জানলাম না বন্ধু!"

"পুরুহুত—আমি পুরুবংশীয়, আমার মা ছিলেন মদ্রবংশের। তোমার নাম কি বোন?"

"রোচনা—আমি মদ্রবংশীয়া।"

"তাহলে তুমি ত বোন আমার মাতুল-বংশের মেয়ে—তোমরা কি উচ্চ-মদ্র না নিম্ন-মদ্র?"

"উচ্চ।"

পুরুদের গ্রামগুলো ছিল অক্ষাস নদীর বাম তীরে। এর নীচের দিকে প্রশস্ততর সমতল ক্ষেত্রে ছিল মদ্রদের বসতি—দক্ষিণ পারের উপরের দিকটাও ছিল মদ্রদের—নীচের দিকটা ছিল পরশুদের দখলে। লোকসংখ্যা এবং অধিকৃত অঞ্চলের দিক দিয়ে পুরুরা মদ্রদের থেকে কম ছিল না। যে মদ্ররা পুরুদের থেকে নীচের দিকে থাকত তাদেরই বলত নিম্ন মদ্র। মদ্রদের অন্য শাখার মেয়ে ছিল রোচনা এবং এই অঞ্চলেরই এক গাঁয়ে পুরুহুতের এক মাতুল বাস করত। উভয়ে উভয়ের নাম-ধাম জেনে নেবার পর উভয়ে আরও ঘনিষ্ঠতা বোধ করল এবং পুরু তখন আবার কথা সুরু করল—

"শোন রোচনা, আজ আমরা দণ্ড পর্য্যন্ত যেতে পারবো বলে আমার মনে হয় না। তুমি এ অবস্থায় একা বেরিয়ে পড়তে কি করে সাহস করলে?"

"আমি জানতাম যে, রাত্রে এই গাধাগুলোকে চিতাবাঘের মুখ থেকে রক্ষা করা খুব কঠিন—কিন্তু আমাদের বৃদ্ধ পিতামহের জন্য এ খাবার যে না আনলে চলতই না পুরুহুত! তুমি যদি জানতে পুরুহুত, তিনি আমার জন্য কত ভাবেন! তা ছাড়া রাস্তায় কারও না কারও সাথে আমার দেখা হবেই আমি আশা করেছিলাম, কারণ আজকাল অনেকেই দণ্ডের পথে যাতায়াত করে আমি জানতাম, আর রাতের সব থেকে খারাপ সময়টা আগুন জ্বালিয়ে রেখে আমি বিপদ পার হবো ভেবেছিলাম।"

"পথের মধ্যে তুমি কি করে জ্বালাতে? তোমার কাছে কি চকমকি পদার্থ কিছু আছে—রোচনা?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলেও চকমকি ঘষে অগ্নিদেবতাকে আত্মপ্রকাশ করানো মোটেই সহজ নয়। যা হোক, আমার কাছে একখণ্ড মন্ত্রপূত কাঠ আছে—আমাদের পরিবারে এটি আমার ঠাকুর্দার সময় থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই কাঠ থেকে আগুন ধরিয়ে বহু যজ্ঞ-হোম ইত্যাদি করা হয়েছে, অগ্নিপূজার মন্ত্রও আমার মুখস্থ আছে—সেই মন্ত্র পড়লে শীঘ্র অগ্নির আবির্ভাব হবেই।"

"তা ছাড়া আমরা এখন দু'জন আছি, তাই চিতাবাঘ আমাদের কাছে আসতে বোধ হয় সাহস করবে না।"

"এবং আমাদের ঝমরুও সাথে আছে।"

"ঝমরু?"

"হ্যাঁ, আমার এই লাল লোমওয়ালা শিকারী কুকুরটার কথা বলছি"—এই ব'লে পুরুহুত কুকুরটাকে ডাকল, সেটিও তক্ষুণি উঠে এসে প্রভুর হাত চাটতে লাগল। রোচনাও তার নাম ধরে ডাকলে, কুকুরটা তার পায়ের কাছে গিয়ে শুঁকতে লাগল, এবং তার পিঠ চাপড়াতে থাকলে কুকুরটা মাটিতে বসে লেজ নাড়তে লাগল।

পুরুহুত বলল—"বুঝলে রোচনা, ঝমরু আমার খুব বুদ্ধিমান কুকুর।"

"বেশ শক্তিশালীও বটে!"

"হ্যাঁ, নেকড়ে, চিতেবাঘ বা ভল্লুক, কোন কিছুতেই ও ভয় পায় না।"

ইতিমধ্যে ভেড়া ও গাধাগুলো পেট ভরে ঘাস খেয়ে নিয়েছিল, তরুণ পথিক দু'জনও শ্রান্তি দূর হওয়াতে আবার যাত্রা

সুরু করল—কুকুরটা চলল ওদের পিছনে-পিছনে। যদিও তাদের পায়ে-চলা পথ সোজা উপরে না উঠে এঁকে-বেঁকে এগিয়ে চলছিল—তবু রাস্তাটা ছিল বেশ দুর্গম, কাজেই খুব সাবধানে পা ফেলে-ফেলে ওদের উঠতে হচ্ছিল, মাঝে-মাঝে পুরুহুত মাটির কাছাকাছি ঝুলে-পড়া লাল ফল কিংবা করিণ্ডা ফল তুলে নিয়ে রোচনাকে দিল ও নিজেও খেতে লাগল। কিন্তু ফলগুলো তখনও পাকেনি বলে খেয়ে ওরা খুবই নিরাশ হল।

এই ভাবে গল্প করতে করতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ওরা হেঁটে চলল। সূর্য্য যখন ডুবুডুবু সেই সময় ওরা ছায়াঘেরা লতা-গুল্মের নীচে দিয়ে প্রবহমানা এক ঝর্ণার তীরে এসে পৌছুল। কাছাকাছি খানিকটা খোলা জায়গা ছিল—সেখানে পোড়া কাঠের ছাই এবং ঘোড়ার নাদ দেখতে পেল ওরা। পুরুহুত নীচু হয়ে ছাই উড়িয়ে দেখল যে কাঠে তখনও অল্প-অল্প আগুন আছে। সানন্দে সে বলল—"দেখ রোচনা, আজ রাত কাটাবার জন্য এর থেকে ভাল জায়গা আমরা পাব না। এখানে কাছে জল আছে, শুকনো কাঠ এবং ঘাসও আছে এখানে প্রচুর আর আজ সকালে যে পথিকেরা এখান থেকে রওনা হয়ে গেছে তারা ছাইয়ের নীচে আগুনও রেখে গেছে।"

"আমারও মনে হয় পুরুহুত, এর থেকে ভাল জায়গা আর পাওয়া যাবে না—আজ রাত আমরা এখানেই কাটাই। এর পরবর্তী ঝর্ণার কাছে পৌছুতে আমাদের অনেক আঁধার হয়ে যাবে।"

পুরুহুত হাঁটু গেড়ে বসে তাড়াতাড়ি তার কাঠের বোঝাটা নামিয়ে সেটা পাথরের গায় ঠেস দিয়ে রেখে রোচনার কাঠের ঝোলাটিও নামিয়ে দিল। দু'জনে মিলে তার পর গাধাগুলোর পিঠ থেকে বোঝা নামিয়ে তাদের কাঁধের জিন খুলে দিল। গাধাগুলো মাটিতে ২।৩ বার গড়াগড়ি দিয়ে ঘাস খেতে সুরু করল। ভেড়াগুলোর পিঠ থেকে বোঝাগুলো নামাতে কিছুটা দেরী হল—কারণ ধরে এনে জোর করে তার পর বোঝাগুলো নামাতে হল। রোচনা তার পর একটা চামড়ার মাশা নিয়ে ঝর্ণায় গেল জল ভরে আনতে।

পুরুহুত লতা-পাতা জড়ো করে আগুনটা জ্বালিয়ে তার উপর বড়-বড় কাঠের খণ্ড চাপিয়ে দিয়ে বেশ বড় একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরী করে ফেলল। জল আনা হলে সে সামনে একটা তামার পাত্র রেখে তাতে গোরুর পিঠের দিকের একখণ্ড মাংস কাটতে লেগে গেল। রোচনাকে লক্ষ্য করে সে বলল—"কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমরা পাহাড়ের মাথায় উঠতে পারব। তার পর তোমাদের চারণ-ভূমি সেখান থেকে বোধ হয় বেশী দূর হবে না?"

"দণ্ড থেকে সেখানটা ৬ মাইল পূব দিক হবে।"

"আমাদের আস্তানাটা ওখান থেকে মাইল বারো পূবে। তাহলে ত রোচনা, তোমাদের পশুপাল এবং তোমার প্রপিতামহের আস্তানা আমার পথে পড়বে?"

"হ্যাঁ তুমি তাঁকে দেখতে পাবে। তার সাথে তোমার সাক্ষাতের কথা ভাবতে আমার খুব মজা লাগছে।"

গোদরেজ সোপস্, লিমিটেড।

"আমাদের যখন আর মাত্র একদিন পথ চলতে হবে তখন একটা উরুর চার ভাগের এক ভাগ মাংসই যথেষ্ট হবে। এই মাংসটা বুঝলে রোচনা, একটা বাছুরের পিছনের পায়ের।"

"আমার কাছেও একটা বাচ্চা ঘোড়ার আধখানা পা আছে।"

"বছরের এই সময়টাতে মাংস বেশী দিন রাখলে গন্ধ হয়ে যায়—তাই না? আচ্ছা, নুণ দিয়ে এটা রান্না করলে কেমন হয়?"

"বেশ হবে। আর আমার কাছে গুড়ের মদও আছে পুরুহুত! আমরা মাংস আর গুড়ের মদ মিশিয়ে তার মধ্যে কিছু ভাজা চাল দিয়ে নিই—তাহলে বেশ ভাল ঝোল হবে—আমাদের ঘুমোবার আগে সেটা বেশ তৈরী হয়ে যাবে, কি বল?"

"আমি একা থাকলে অবশ্য ঝোল করতাম না—কারণ ওতে অনেক সময় লাগে। কিন্তু এখন আমরা গল্প করতে করতে এবং এই জানোয়ারগুলো বাঁধা-ছাঁদা করতে-করতে সময়টা কাটিয়ে দিতে পারব।"

"আমার প্রপিতামহ আমার রান্না করা ঝোল খেতে খুব ভালবাসেন। তোমার তামার পাত্রটি ত বড় সুন্দর!"

"হ্যাঁ, রোচনা। আর তামার দামও ত খুব। এই পাত্রটির দাম একটা ঘোড়ার সমান। তবে পথ চলতে এটা বেশ উপযোগী।"

"তোমাদের পরিবারের তাহলে মনে হচ্ছে অনেক পশু আছে?"

"হ্যাঁ, ফসলও অনেক আছে, তাই ত একটা ঘোড়ার দামের এই পাত্রটি আমি ব্যবহার করতে পারছি। এই নাও মাংসটা আমি কেটে ঠিক করে দিয়েছি, তুমি এগুলো জলের মধ্যে নুণ দিয়ে ততক্ষণ সিদ্ধ করো—আমি এর মধ্যে ওধারেও কিছু কাঠ জোগাড় করে আগুন জ্বেলে দিয়ে আসি। কিছু ঘাসও কেটে আনতে হবে, গাধা ও ঘোড়াগুলোকে এই জায়গার মধ্যেই বাঁধার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের কাছে গোবৎসের মাংস যেমন সুস্বাদু চিতাবাঘের কাছে গাধার মাংস তার চেয়েও সুস্বাদু—এটা বোধ হয় জানো। এই নে ঝমরু—তুই এটা ততক্ষণে খেয়ে নে"—এই কথা বলে পুরুহুত অল্প মাংস সমেত একখণ্ড হাড় কুকুরটার মুখে ছুঁড়ে দিল। কুকুরটা লেজ নাড়তে-নাড়তে হাড়টাকে দুই থাবার মধ্যে ধরে, দাঁত দিয়ে সেটাকে ভাঙবার চেষ্টা করতে লাগল।

পুরুহুত তার গাত্রাবরণ এবং কোমরবন্ধ খুলে ফেলল। হাত-কাটা জামার নীচে থেকে তার আয়ত বক্ষ এবং পেশল হাত দু'টো বেরিয়ে পড়াতে বিশ বছরের এই তরুণের দেহ-শক্তি প্রকট হয়ে উঠল। সে কাজে লেগে পড়লে তার হাতের লোমগুলো কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। সে তার ঝুলি থেকে একটা কাস্তে বের করে তাড়াতাড়ি একগাদা ঘাস কেটে এনে গাধাগুলোকে ধরে নিয়ে এসে মাটিতে পোঁতা একটা খোঁটার সাথে বেঁধে দিয়ে তাদের সামনে ঘাসগুলো ছড়িয়ে দিল—ভেড়াগুলো সম্পর্কেও সে একই ব্যবস্থা করল।

কাজ সেরে এসে সে আগুনের পাশে বসল—রোচনা তখন সিদ্ধ মাংসগুলো পাত্র থেকে তুলে একটা চামড়ার থালাতে রাখছিল। পুরুহুত তার ঝুলি থেকে একটা চামড়ার ঢাকনী খুলে তার মধ্য থেকে একটা সুন্দর কাঠের পেয়ালা এবং থলি থেকে মদ বের করল। এগুলোর সাথে একটা বাঁশীও মাটিতে পড়ে গেল। একটা ছোট্ট শিশু মাটিতে পড়ে গেলে তার মা তার আঘাত পাবার ভয়ে যে ভাবে চকিত হয়ে ওঠে—তেমনি করে পুরুহুত তাড়াতাড়ি মাটি থেকে বাঁশীটা কুড়িয়ে নিয়ে কাপড়ে মুছে নিল এবং আবার চামড়ার ঢাকনাটার মধ্যে রেখে দিল।

রোচনা এ সব লক্ষ্য করছিল—সে বাধা দিয়ে বলে উঠল—

"পুরুহুত, তুমি বাঁশী বাজাতে পার?"

"হ্যাঁ, রোচনা, এ বাঁশীটি আমার বড় প্রিয়। আমার প্রাণটাই যেন এর সাথে বাঁধা।"

"তোমার বাঁশী আমাকে শোনাও।"

"এখনই, না খেয়ে নিয়ে তার পর?"

"এখন একটুখানি শোনাও।"

"বেশ।"

পুরুহুত বাঁশীটি মুখে লাগিয়ে যখন তার আটটা আঙুল ছিদ্রগুলোর উপর ঘোরাতে লাগল—তখন সন্ধ্যার পরিব্যাপ্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে মধুর সুর আস্তে আস্তে চারি দিকে যেন এক মোহ ছড়িয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল, উঁচু গাছগুলোর ছায়া পেরিয়ে সে সুর যেন দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। মুগ্ধা রোচনা বসে বসে সেই সুরের লহরী পান করতে করতে যেন আত্মহারা হয়ে গেল। উর্বশী-পরিত্যক্ত বিরহী পুরুরবার একটা শোক-সঙ্গীত বাজাচ্ছিল পুরুহুত তার বাঁশীতে। বাঁশী থেমে গেলে রোচনার যেন মনে হল সে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে এসে পড়েছে।

আনন্দের অশ্রুভরা চোখ চেয়ে সে বলল—"পুরুহুত, তোমার বাঁশীর সুর বড় মধুর—ভারী সুন্দর! এমন বাঁশী আমি কখনও শুনিনি। কি সুন্দর সুর!"

"লোকে আমাকে অনেক সময়ই এ কথা বলে রোচনা! আমি নিজে কিন্তু বুঝতে পারি না—আমার মুখে এই বাঁশী তুলে নেবার পর আমি সব যেন ভুলে যাই। এই বাঁশী যতক্ষণ আমার সাথে থাকে—আমি পৃথিবীতে ততক্ষণ আর কিছুই চাই না।"

"যাক, এসো পুরু, খাবে এসো! তা না হলে মাংস জুড়িয়ে যাবে।"

"আচ্ছা, আর এই দেখো, আমি যখন আসি তখন আমার মা আমাকে এই দ্রাক্ষারস দিয়ে দিয়েছেন। অল্পই আছে আর কিন্তু মাংসের সাথে খেতে ভালই লাগবে।"

'তুমি কি মদ খেতে খুব ভালবাস?'

"খুব ভালবাসি, এ কথা বলতে পারি না। আর খুব ভালবাসলেও, এর বেশী তুমি খেতে পাবে না। যেটুকু খেলেই আমার চোখ একটু চকচক করে ওঠে—তার পর আর এক ঢোকও আমি খেতে পারি না।"

"আমারও তাই মনে হয় পুরু। কেউ মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়লে তাকে আমি খুব ঘৃণা করি।"—এই কথা বলে রোচনাও তার কাঠের পেয়ালাটা বের করে তার পাশে রাখল।

মাংসের তিন ভাগের এক ভাগ কুকুরটাকে দেওয়ার পর ওরা দু'জনে কিছুক্ষণের মধ্যেই পানাহার শেষ করল। চারি দিক তখন এক গভীর অন্ধকারের আবরণে ছেয়ে গেছে। জ্বলন্ত কাঠের লাল অগ্নিশিখা এবং তার চার পাশের সামান্য জায়গা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। শব্দ কিছু-কিছু শোনা যাচ্ছিল—তবে সেগুলো বোধ হয় মশা বা ঐ জাতীয় কীট-পতঙ্গের। তারা দু'জনে গল্প করতে থাকল—

আর মাঝে মাঝেই বাঁশীর মধুর সুর বেজে উঠছিল। কয়েক ঘণ্টা পরে চালভাজাটা ভিজে গেল এবং ঝোলটাও তৈরী হয়ে গেল। তারা পেয়ালাতে করে গরম গরম সেটা খেয়ে নিল। অনেক রাত্রি হয়ে গেলে তারা ঘুমোবার সিদ্ধান্ত করল। রোচনা তার চামড়ার শয্যা তৈরী করে তার পর পোষাক-পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করতে আরম্ভ করল। পুরুহুত ততক্ষণে আগুনে আরও কাঠ দিয়ে পশুগুলোকে কিছু ঘাস দিয়ে এসে তার পর বনদেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করে পোষাক ছেড়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন প্রত্যূষে জেগে উঠে তাদের মনে হল এক রাত্রে তারা যেন পরস্পরের সমগোত্রের ভাই-বোন হয়ে গেছে। রোচনা ঘুম থেকে উঠলে পুরুহুত না বলে যেন পারল না—"বোন, আমি তোমার মুখ চুম্বন করতে চাই।"

"আমিও তোমাকে চুমু খেতে চাই। আমরা এখানে আজ পরস্পরের ভাই-বোনকে খুঁজে পেয়েছি।"

পুরুহুত রোচনার অবিন্যস্ত চুলগুলো গুছিয়ে দিয়ে তার উভয় গণ্ডে চুমু খেল। উভয়ের দৃষ্টিতেই সুখের আভা দেখা গেল—যদিও উভয়ের চোখই ছিল জলে ভরা।

তারা হাত-মুখ ধুয়ে কিছু শুকনো মাংস ও ভাজা চাল খেয়ে নিয়ে পশুগুলোর পিঠে বোঝা চাপিয়ে যাত্রা সুরু করল। পথিমধ্যে বিশ্রামের জন্য তারা ২।৩ বার থামল—কিন্তু গল্প করতে-করতে তাদের সময় এত দ্রুত কেটে গেল যে তারা টেরই পেল না কখন তারা দগুতে পৌঁছে গেছে এবং কখন তারা সেই বৃদ্ধের আস্তানায় এসে গেছে। রোচনা তার বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিলে বৃদ্ধ তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন এবং পুরুদের পৌরুষের খুব গুণগান করলেন।

২

এখানে এই দগুতে একটা ছোট্ট মদ্রপল্লী ছিল—সেখানকার আবাসগুলো সবই হয় তাঁবু অথবা চালা-ঘর। এখান থেকে উৎরাইতে এবং পর্বতের সানুদেশে ঘন পাইন-বন ছাড়া কিছুই দেখা যায় না—কিন্তু আরও নীচের দিকে গাছপালা বিরল হয়ে এসেছিল এবং জমিও ছিল অনেকটা সমতল ও গালিচার মত ঘন সবুজ ঘাসের আস্তরণে আবৃত। এই সবুজ ঘাসের জমিতে এখানে-সেখানে ভেড়া, গরু ও ঘোড়ার পাল চরে বেড়াচ্ছিল এবং তার মধ্যে গোবৎস এবং অশ্বশাবকগুলো লাফালাফি ও দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াচ্ছিল। এই উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে তাকিয়েই সেই বৃদ্ধ বলতেন—"মানুষ কোন একটি জায়গায় আবদ্ধ থাকবার জন্যে জন্মায়নি।" এখানে ঘাস কমে এলে বৃদ্ধ কিছু দূরে অন্যত্র সরে যেতেন। এখানে দুধ, দই, মাখন, মাংস বহুল পরিমাণে পাওয়া যেত, তাঁবুতে খাদ্য-সংস্থানও ছিল প্রচুর। পনের বিশ দিন অন্তর গ্রাম থেকে কেউ একজন এসে মাখন ও মাংস নিয়ে যেত। শীতকালে যখন বরফ পড়ত তখনও বৃদ্ধ পারলে এখানেই থাকতেন। কিন্তু এই পশুগুলো যেহেতু বরফ খেয়ে বাঁচতে পারত না, তাই তিনি তখন আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে কিছুটা নীচে বনভূমিতে চলে যেতেন এবং পশুপাল চলে যেত গ্রামে। বৃদ্ধের কাছে কেউ যদি গ্রামে গিয়ে থাকার কথা কখনও বলত—তাহলে তিনি এ ভাবে তাকাতেন যে মনে হত তিনি ক্ষেপে গিয়ে তাকে হত্যা করবেন।

এই দুই পথিক যখন এই তাঁবুতে এসে পৌঁছুল তখনও বেলা ছিল—তারা জিনিসপত্রগুলো গাধা ও ভেড়ার পিঠ থেকে নামাবার পর বৃদ্ধ শ্রান্তিহরণের জন্য তাদের কাঠের পেয়ালায় করে ঘোড়ার দুধের দই খেতে দিলেন—৩।৪ পেয়ালা খাবার পর তাদের সব পথশ্রম যেন দূর হয়ে গেল। সন্ধ্যার সময় রোচনার ভাই-বোন এবং অন্যান্য তরুণ পশুপালকেরা গ্রাম থেকে তাদের গোবৎস ও অশ্বশাবকগুলো নিয়ে এসে পৌঁছুল। রোচনা পুরুহুতের বাঁশীর বাজনার প্রশংসা সুরু করলে বৃদ্ধ এত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন যে, পুরুহুতকে তিনি যেতে দিলেন না। তিনি এবং এই চারণ-ভূমির সব তরুণরা এই বাঁশী শুনে খুব খুসী হলেন। রাত্রে নাচের আসরে পুরুহুত তার বাঁশীর ইন্দ্রজাল আবার ছড়িয়ে দিল।

পরদিন সকালে সে যেতে চাইল কিন্তু বৃদ্ধ তাকে এত শীঘ্র যেতে দিতে চাইলেন না। দুপুরে খাবার পর তিনি কাহিনী বলতে সুরু করলেন—কথাটা সুরু হল পুরুহুতের থলিতে তামার পাত্রটি দেখে। তিনি বললেন—"এই তামার পাত্র কিংবা কর্ষিত জমি দেখলেই আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে—যখন থেকে অস্নাস-তীরে এই সবের আবির্ভাব হয়েছে তখন থেকেই অসততা এবং উচ্ছৃঙ্খলা চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, ঈশ্বরও কুপিত হয়ে উঠেছেন এবং তার ফলে মহামারী ও হত্যাকাণ্ড ব্যাপক হয়ে উঠেছে।"

পুরুহুত জিজ্ঞাসা করল—"আচ্ছা ঠাকুর্দা, এ সব কি তাহলে আগে ছিল না?"

"না বৎস, একেবারেই না। আমার ছেলেবেলাতেই সবে এ সবের সূত্রপাত হতে দেখেছি। আমার যিনি পিতামহ ছিলেন তিনি এ সবের নামই শোনেননি। সে সময়ে সব কিছু উপকরণই তৈরী হত হাড়, পাথর, শৃঙ্গ বা কাঠ থেকে।"

"তারা কাঠ কাটত কি দিয়ে ?"

"পাথরের কুঠার দিয়ে।"

"তাহলে ত কাঠ কাটতে অনেক সময় লাগত এবং কাটাও খুব ভাল হত না।"

"এই তাড়াহুড়ো করার খেয়ালই সব সর্বনাশের মূল। এখন একটা তামার কুড়ুল পাওয়ার জন্যে তুমি একটা ঘোড়াই দিয়ে দাও—যে ঘোড়া তোকে অর্ধেক জীবন বহন করতে পারে অথবা তোমার ছ'মাসের খোরাক হতে পারে। আর সেই কুড়ুল দিয়ে তুমি বনের পর বন কেটে মরুভূমি গড়ে তুলতে পারো কিংবা কোন গ্রাম আক্রমণ করে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারো। কিন্তু কোন গ্রাম আবার বনের গাছপালার মত অরক্ষিত নয়—তোমার মত সেখানকার লোকদেরও কুড়ুল আছে, এই তামার কুড়ুলের জন্য যুদ্ধও আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে। এর আঘাতে যে ক্ষত হয় তা বিষাক্ত হয়ে যায়। আগে তীরের ফলা তৈরী হত পাথর দিয়ে—এটা সত্যি যে তাতে ধার খুব বেশী হত না—কিন্তু ভাল তীরন্দাজ হলে সেগুলোই বেশী কার্য্যকরী হত। এখন এই তামার তীর দিয়ে শিশুরাও সব বাঘ শিকার করতে চায়। কাজেই এখন আর কেউ কৌশলী তীরন্দাজ হতে চাইবে কেন ?"

"হ্যাঁ পিতামহ, একটা ব্যাপারে আমি আপনার সাথে একমত যে, মানুষ কোন একটা বিশেষ জায়গায় সব সময়ের জন্য বদ্ধ থাকতে জন্মায়নি।"

"ভেবে দেখো বৎস, গতকালের আবর্জনার উপর আবার আজকের আবর্জনা চালানো কি রকম কুৎসিত ব্যাপার! তার থেকে ধরো আজ আমাদের তাঁবু এখানে আছে এবং আমাদের ও আমাদের পালিত পশুগুলির মলমূত্র এখানে স্তূপীকৃত হয়ে উঠবার আগেই আমরা এ জায়গা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলাম যেখানে প্রচুর ঘাস পাওয়া যাবে এবং যেখানকার মাটী, জল ও হাওয়া অনেক বেশী পরিষ্কার থাকবে।"

"হ্যাঁ, আমিও এই রকম জায়গাই পছন্দ করি। সেই রকম জায়গাতেই আমার বাঁশীর সুর আরও মধুর হয়ে ওঠে।"

"সেইটাই ত ঠিক। অতীতে আমরা এই রকম কতকগুলো তাঁবুকেই একত্রে বলতাম পল্লী—এবং তখন সেই পল্লীতে আমরা এক নাগাড়ে তিন মাসের বেশী থাকতাম না—এক বছর ত দূরের কথা। আর আজকাল পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে শত শত পুরুষ ধরে লোকে একই গ্রামে বাস করছে। তারা বাসস্থানের চার পাশে এ ভাবে মাটী, কাঠ, পাথরের প্রাচীর খাড়া করে যাতে করে শেষ পর্য্যন্ত সেখানে হাওয়া অবধি না ঢোকে, তারা আবাস-গৃহের উপরে পাথর, কাঠ ও খড়ের ছাউনী তুলে গৃহগুলোকে আবৃত করে দেয়—তার মধ্যে হাওয়া ঢুকবে কি করে? এখন লোকে মুখেই শুধু অগ্নি ও বায়ুদেবতার কথা বলে—মনে তাঁদের উপর আমাদের মত আর ভক্তি নেই, তার ফলে নিত্য নূতন রোগ দেখা দিচ্ছে। হে মিত্র! হে অগ্নিদেবতা! তোমরা মানুষের প্রতি রুষ্ট হয়ে উঠেছ এবং তোমাদের রোষ সঙ্গতই।"

"কিন্তু তাত, আমরা যদি তাম্র-কুঠার, তরবারি এবং বর্শা ব্যবহার ত্যাগ করি তাহলে আমরা আত্মরক্ষা করব কি করে? আমরা এগুলো ত্যাগ করলে আমাদের শত্রুরা এক দিনেই ত আমাদের ধ্বংস করে ফেলবে।"

"হ্যাঁ, বৎস, আমি জানি, লোকে ছ'মাসের খাদ্যের বদলে কিংবা একটা ঘোড়ার বদলে, যে ঘোড়া তাকে অর্দ্ধেক জীবন বহন করতে পারে—তাই দিয়েও একটা তামার তরবারি সংগ্রহ করতে পারেনি। নিম্ন-মদ্র এবং পরশু-বংশের লোকেরা আমাদের মাতা অক্সাস নদীকে অপবিত্র করেছে। অক্সাস নদী কত দূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে আমি জানি না—কেউই জানে না। যারা মিথ্যার বেসাতি করে তারা গল্প করে যে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যে অগাধ সমুদ্র আছে তাতে গিয়ে অক্সাস নদী পড়েছে। আমরা জানি যে মদ্র ও পরশুদের অঞ্চল পেরিয়ে এই নদী পর্বত ত্যাগ করে সমতল ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে—তার ওপারে যে দেশ আছে সেখানে বাস করে ঈশ্বরের শত্রুরা। শোনা যায় যে সেখানে এত বড়-বড় রকম সব প্রাণী বাস করে যাদের পা হচ্ছে ছোট ছোট এমন কি বৃহদাকার পাহাড়ের মত। হ্যাঁ বৎস, সেই প্রাণীদের যেন কি বলে? আজকাল আমার স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে।"

"তাত, তাদের বলে উট। কিন্তু সেগুলো ত পাহাড়ের মত বড় নয়। একবার দক্ষিণ-মদ্র থেকে একজন লোক এসেছিল একটা বাচ্চা-উট নিয়ে, সে বলেছিল যে সেটির বয়স তখন ছ'মাস—কিন্তু তখন সেটার আকার ছিল আমাদের ঘোড়ার মত।"

"ওঃ, বিদেশ থেকে এই যে সব ভবঘুরেরা আসে এরা মিথ্যা বলতে ওস্তাদ। তারা বলে যে কি যেন বলে ওগুলোকে?" উট?—হ্যাঁ, হ্যাঁ, উট। তারা বলে যে—উটের গলা এত লম্বা যে তারা অক্সাসের এক পারে দাঁড়িয়ে অন্য পারে গলা বাড়িয়ে ঘাস খেতে পারে। তাহলে সে কথাটাও মিথ্যা, কি বল বৎস?"

"নিশ্চয়ই! সেই বাচ্চা উটটার গলাটা নিঃসন্দেহে ঘোড়ার গলার থেকে লম্বা ছিল—কিন্তু এই সব 'ঘাস খাওয়া' প্রভৃতির গল্প হচ্ছে সব অর্থহীন!"

"এই সমস্ত মিথ্যাবাদী মদ্র এবং পরশুরাই এই সব তামার তলোয়ার এবং কুঠারের কুগ্রহ প্রচলন করেছে। পরশুরা আমাদের উপর অর্থাৎ উত্তর-মদ্রদের উপর এই হাতিয়ার নিয়ে আক্রমণ করেছিল। সে হচ্ছে আমার বাবার সময়কার ঘটনা। আমাদের লোকেদের তখন নিম্ন-মদ্রদের কাছ থেকে দু'টো ঘোড়ার বদলে একটি কুঠার—এই সর্তে তাম্রকুঠার সংগ্রহ করতে হয়েছিল।"

"তাম্রকুঠারের বিরুদ্ধে পাথরের কুঠার ত একেবারেই অকেজো হয়ে গিয়েছিল—তাই না?"

"অকেজো? তা বটে। তার ফলে আমরা দুর্বল হয়ে পড়লাম এবং আমাদের ধাতব অস্ত্র সংগ্রহ করতে হল। তার আগে পর্য্যন্ত মদ্র এবং পুরুদের মধ্যে কখনও সংঘর্ষ হয়নি। কিন্তু দক্ষিণ-মদ্র এবং পরশুরা সব সময়ই লুঠতরাজ করত এবং পুরানো রীতিনীতি ছেড়ে নিত্য-নূতন কাণ্ড করত। তাদের জন্যই আমাদের লোকেরা আত্মরক্ষার খাতিরে সেই সব পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হল। আমি জানি না—যত দিন না পরশু এবং দক্ষিণ-মদ্ররা ধাতব অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করে—তত'দিন উর্দ্ধদেশে আমাদের পক্ষে এই অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ

করাটা আত্মহত্যামূলক হবে। কিন্তু সর্বত্র এই তামার ব্যবহার প্রচলিত হওয়াটা সত্যিই খুব ক্ষতিকর হচ্ছে। আর এই দুই বংশেই এই দুর্বৃত্ততা ছড়িয়ে পড়ছে। তারা কোন দিনই ঈশ্বরের কৃপা লাভ করতে পারবে না, তারা অন্ধকার পাতালপুরীতে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেই। তাদেরই অনুকরণে এবং তাদের ভয়েই আমরা মাটী ও পাথরের তৈরী গ্রামগুলো গড়ে তুলেছি। অতীতে ছিল শুধু তাঁবুবাসীদের শিবির—এই আমাদের আজকের বা আগামী কালের মত—অক্কাস উপত্যকায়। কিন্তু ঐ মদ্র ও পরশুরা সে সব ভেঙ্গে দিয়েছে। মাতা ধরিত্রীর বক্ষ ধাতব অস্ত্র দিয়ে বিদীর্ণ করবার দুর্বুদ্ধি তাদের মাথায় কে দিয়েছিল? এমন দুর্বৃত্ততা এর আগে আর কখনও কেউ করেনি! আমরা এই ধরিত্রীকে আমাদের মা বলি—তাই নয় কি বৎস?"

"হ্যাঁ, তাত! আমরা ধরিত্রীকে মা বলি—আমরা তাঁকে দেবী বলি—আমরা তাঁর পূজা করি।"

"আর এই দুষ্কৃতিকারীরা তাদের নিজ হাতে আমাদের সেই মা'র বক্ষ বিদীর্ণ করেছে। তারা কি যেন করেছে—আমি ভুলে যাচ্ছি কথাটা, আমার স্মৃতিশক্তি আজকাল বড়ই দুর্বল হয়ে উঠেছে।—"

"কৃষিকার্য্য—ফসল উৎপাদন করা।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারা কৃষিকার্য্য সুরু করেছে। তারা গম, ধান এবং বার্লির বীজ বপন করছে—এর আগে এমন কথা কেউ কখনও শোনেওনি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কোন দিন ধরিত্রী মায়ের বুকে ক্ষত করেননি—তাঁরা এই দেবীর অসম্মান করেননি কোন দিন। পৃথিবী আমাদের পশুপালনের জন্য যথেষ্ট ঘাস জন্মাত—আর বনরাজি পূর্ণ থাকত নানা সুমিষ্ট ফলে। আমরা খাওয়ার জন্য তা কোন দিনই ফুরিয়ে যেত না। কিন্তু মদ্রদের পাপে এবং তাদের অনুকরণে আমরা যে পাপে মগ্ন হয়েছি—তার ফলে অতীতে মানুষের মাথা সমান উঁচু যে ঘাস জন্মাত তার অবস্থাটা আজ কি হয়েছে? সেকালের মত এত বড় গরু আজ কোথায় আছে, যে-গরু একটাই সমস্ত মদ্রবংশের লোকেদের একদিনের আহার জোগাতে পারত? সেকালে আমাদের যে ধরণের গরু, ঘোড়া ও মেষ ছিল আজ তার কিছুই নেই। এমন কি, বনের হরিণ আর ভল্লুকও আর আগের মত প্রকাণ্ড হয় না। মানুষের জীবনকালও আজ কমে গেছে। এই সবই হয়েছে ধরিত্রী দেবীর রোষে বৎস, অন্য কোন কারণে নয়।"

'আচ্ছা ঠাকুদ্দা, আপনি কতগুলো শীতঋতু দেখেছেন?"

"একশ'রও বেশী, অতীতে আমাদের বসতিস্থানে থাকত শুধু তাঁবু। আর আজ আমাদের গাঁয়ে মাটী ও পাথরের দেওয়াল দেওয়া শতাধিক গৃহ নির্মিত হয়েছে। অতীতে যখন আমাদের কোন কর্ষিত ভূমি ছিল না তখন আমাদের বসতিস্থান পরিবর্তিত হতে পারত স্বচ্ছন্দে। তখন আমাদের সমস্ত শিবিরটাও স্থান থেকে স্থানান্তরে নেওয়া চলত। কিন্তু যখন থেকে কৃষিকাজ সুরু হল তখন থেকেই হরিণ ও অন্যান্য পশুদের হাত থেকে আমাদের গম, ফসল রক্ষার ব্যবস্থা করতে হল। এই চষা জমিই এখন হয়েছে মানুষকে বন্দী করে রাখবার খুঁটা। কিন্তু বৎস, এমনি এক জায়গায় আবদ্ধ হয়ে থাকবার জন্যে মানুষের জন্ম হয়নি। মদ্র ও পরশুরা এমন সব ব্যাপার ঘটিয়েছে যা ঈশ্বরও কোন দিন মানুষের জন্য করাতে চাননি।"

"কিন্তু আজ যদি আমরা চাইও, আমরা কি কৃষিকাজ ত্যাগ করতে পারি? এখন শস্যই যে আমাদের অর্ধেক খাদ্য!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা আমি জানি। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষেরা কোন দিন শস্য খাননি। এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে এক জায়গায় গমের বন হয়ে আছে—সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই গম জন্মায়, নিজেই পেকে যায় এবং ঝরে যায়। গরুতে খায় সে সব—এবং তাতে তারা বেশী দুধ দেয়। ঘোড়াগুলো সে সব খেয়ে বৃহদাকার ও বলিষ্ঠ হয়। আমাদের এই পশুপাল প্রত্যেক বছর সেখানে যায়। মা বসুন্ধরা মানুষের খাওয়ার জন্য সে সব জন্মাননি—সে গমের যে দানা, তা আমাদের জমিতে জন্মানো দানা থেকে ছোট,—পশুদের খাদ্যের জন্যেই সেগুলো জন্মায়। আমার আশঙ্কা হয়, সেই সব বন্য গম এখন নষ্ট করা হচ্ছে। আমাদের খাদ্যের জন্য এই সব গরু, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগ রয়েছে এবং জঙ্গলে ভল্লুক, হরিণ, বন্যবরাহ প্রভৃতি শিকার রয়েছে এবং বনে রয়েছে অঙ্কুর এবং নানা ধরণের সুমিষ্ট ফল। মা বসুন্ধরা স্বেচ্ছায় আমাদের আহারের জন্য এগুলো জুগিয়েছেন—কিন্তু হতভাগ্য মদ্র ও পরশুরা অতীতের পথ ত্যাগ করে নতুন পথ ধরেছে এবং এই ভাবে মানুষের মাথায় দেবতার ক্রোধ ডেকে এনেছে। কাজেই বৎস, জানি না, এর পর অক্কাস উপত্যকার মানুষের ভাগ্যে কি আছে। আমি অবশ্য গত ২৫ বছরে, এক দণ্ড ভিন্ন, অন্য কোন গাঁয়ে একবারও যাইনি। শীতকালে আমি একটু নীচুতে একটা কুটীরে গিয়ে বাস করি। যে সব লোকেরা আমাদের পূর্বপুরুষদের

উকুনের নতুন ওষুধ
নিউট্রেল-লাইসাইড

"আমি আপনার ল্যাবরেটারীর উকুনের ঔষধের কথা আর বর্ণনা করিতে পারিলাম না। কী অমোঘ ঔষধ যে পাঁচ বছর ধরিয়া কোন ঔষধে কাজ হয় নাই অথচ আপনার ল্যাবরেটারীর ঔষধ একবার ব্যবহার করিয়া আমি এবং আরও ৫ জন মহিলা উপকৃতা হইয়াছেন। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।"

মিসেস বসু, কলিকাতা—২৬

প্রতি প্যাকেটের জন্য দুই আনার ডাকটিকেট পাঠাইবেন।

বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার কয়েকটি জেলায় এই **"লাইসাইড"** পরিবেশক প্রয়োজন। উচ্চহারে কমিশন দেবো।

Dept. M.B.

১৯, বণ্ডেল রোড; কলিকাতা-১৯

গড়ে তোলা রীতি-নীতি সব পরিত্যাগ করছে আমি তাদের মধ্যে কেন যাব? আমাদের পিতৃপুরুষেরা যে সব কথা বলে গেছেন তা আজ পর্য্যন্ত আমার মনের গভীরে আমি এমন ভাবে গেঁথে রেখেছি যে আজও যদি কারও সে সব কথা জানতে ইচ্ছা হয় তাহলে সে আমার কাছেই আসে, কিন্তু দিনের পর দিন সে সব অমান্য করবার লোকের সংখ্যাই বেড়ে যাচ্ছে। এখন ত মনে হয় যে মদ্র ও পরশুরা তাঁদের জমি থেকে সংগৃহীত ফসলেও তাদের উদরপূর্ত্তি করতে পারবে না। তারা ক্রমাগত এসে এসে এই নদীর দেশের লোকেদের বস্ত্র ও আহার- কোথায় নিয়ে চলেছে? আর তার বদলে আমরা কি পাচ্ছি? একটা ঘোড়ার পরিবর্তে আমরা যে তামার একটি পাত্র সংগ্রহ করি তার কথা ভেবে দেখ। যদি দুর্ভিক্ষ আসে তখন কি এই তামার পাত্রে আমাদের পেট ভরবে? পুরুদের ক্ষুধার অন্ন এবং গায়ের বস্ত্র কিছুই থাকবে না—তার পরিবর্তে তোমরা তাদের ঘর সাজিয়ে তুলছ তাম্রপাত্রে।"

"আমি আরও একটা কথা শুনেছি ঠাকুর্দ্দা—নিম্ন-মদ্রের স্ত্রীলোকেরা তাদের কানে ও গলায় সাদা ও হলুদ রংএর কি সব অলঙ্কার পরতে সুরু করেছে এবং একটি কানের অলঙ্কারের দাম হচ্ছে একটি ঘোড়ার সমান। এই সমস্ত অলঙ্কার তাদের মতে সোনার তৈরী, তামার নয়, এবং শাদাগুলোকে তারা বলে রূপা।"

"আর ঐ হতভাগাদের কেউ উপযুক্ত শিক্ষাও দেয় না। তারা সারা অম্লাস উপত্যকার মানুষের সর্বনাশ করে ছাড়বে, আমাদের ঘরে একদানা খাবার বা একখণ্ড বস্ত্র থাকতেও ওরা আমাদের রেহাই দেবে না। আমাদের মেয়েরাও ওদের মেয়েদের অনুকরণ করতে সুরু করবে এবং এক জোড়া ঘোড়ার বদলে এক জোড়া দুল কিনে তারা কানে পরতে সুরু করবে। হে দয়াময় অগ্নি! আমাকে আর বেশী দিন এই মর-জগতে রেখো না—আমার পিতৃলোকে তুমি আমাকে টেনে নাও।"

"ঠাকুর্দ্দা, আরও একটা বড় পাপের কাজ হচ্ছে। মদ্র এবং পরশুরা কোথা থেকে যেন সব বন্দীদের ধরে এনেছে এবং তাদের দিয়ে তামার তরবারি এবং কুঠার তৈরী করিয়ে নিচ্ছে। তারা (এই বন্দীরা) খুব কুশলী কারিগর, কিন্তু তাদের প্রভুরা তাদের সাথে পশুর মত ব্যবহার করে—যত দিন খুসী তাদের রাখে, তার পর তাদের বিক্রী করে দেয়। তারা এই বন্দীদের দিয়ে জমির কাজ, কম্বল বুননের কাজ বা অন্য নানা ধরণের কাজ করিয়ে নেয়—তারা এই বন্দীদের বলে দাস।"

"মানুষ কেনা-বেচা! আমরা এক সময়ে বস্ত্র কেনা-বেচাও খারাপ মনে করতাম—কিন্তু আমাদের পিতৃপুরুষেরা কোন দিন কল্পনাও করতে পারতেন না যে, মদ্ররা এতটা অধঃপাতে যাবে। একটা আঙুলে যদি পচন ধরে তাহলে একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে সেটা কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া, তা না হলে সারা শরীরটাই বিষিয়ে উঠবে। বুঝলে বৎস, মদ্র ও পরশুদের এই অম্লাস উপত্যকায় বাস করতে দেওয়াও পাপ। এই পাপ দৃশ্য দেখতে আমি আর বেশী দিন বাঁচতে চাই না।"

এই বৃদ্ধের কথাগুলো ছিল খুবই হৃদয়স্পর্শী, তা সত্ত্বেও পুরুহুত এ বিশ্বাস ত্যাগ করতে পারল না যে—এই নূতন ধরণের অস্ত্রপাতি ছাড়া মানুষ ও অন্য পশু শত্রুর বিরুদ্ধে টিকে থাকা বর্ত্তমানে আর সম্ভব না। তৃতীয় দিনে যখন সে বিদায় নিল তখন বৃদ্ধ তার কপাল ও চোখ ছুঁয়ে আশীর্বাদ করলেন, রোচনা তাকে এগিয়ে দেবার জন্য অনেক দূর পর্য্যন্ত এক সাথে গেল এবং যখন তাদের বিদায় নেবার সময় হল তখন চোখের জলে উভয়ের গণ্ডদ্বয়ই ভাসতে লাগল।

[ক্রমশঃ।

কবি মোহিতলালের প্রতি

শ্রীবিভাবতী আচার্য্য-চৌধুরী

স্বপনের দেশে আনাগোনা তব
"স্বপনপশারী" তুমি,
বাস্তব তবু পড়েছে লুটিয়া
ও দু'টি চরণ চুমি।
ভালবাসা নহে শুধু অমৃত
জানি তাতে আছে বিষ;
"স্মরগরলে"র গরল রেখেছো
কণ্ঠে অহর্নিশ।
বিস্মিত দিঠি অপলকে চেয়ে
"হেমন্ত-গোধূলি"তে,
কত রহস্য ফিরেছিল খুঁজি
তারকার সভাটিতে।

প্রশ্ন যেথায় উত্তর-হারা
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরে
দাঁড়ালে কি আসি আপনা ভুলি সে
"বিস্মরণী"র তীরে?
বজ্র-কঠোর কুসুম-কোমল
তোমার ভাবনাগুলি,
জীবনের সুখ-দুঃখের ছবি
আঁকিছে মৃত্যু ভুলি।
চন্দ্রের মত জ্যোতির্বলয়ে
তোমার জয়ের রথ
শুভ্র প্রভায় আলোকি তুলেছে
রবির অস্ত-পথ।

রূপ চর্চ্চার
আধুনিক প্রণালী
সকল দেশে ও সকল সময়ে রমণীরা নানা উপায়ে নিজেদের দেহশ্রী ও লাবণ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যচর্চ্চার বিভিন্ন অভিনব প্রণালীর সৃষ্টি হয়েছে। ক্যালকেমিকোর প্রসাধন সামগ্রী আজ রূপচর্চ্চার অন্যতম আধুনিক প্রণালী বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত।
মলয় চন্দন সাবান,
রেণুকা পাউডার
লাবণি স্নো ও ক্রীম
তুহিনা সৌন্দর্য্য ক্ষীর
ক্যাষ্টরল সুবাসিত ক্যাষ্টর তৈল
CASTOR OIL
La-bonny
কিনিবার সময়
আসল জিনিষ
দেখিয়া লইবেন
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

রাজা ফারুকের সিংহাসন ত্যাগ—

গত ২৩শে জুলাই হইতে ২৬শে জুলাই (১৯৫২) পর্য্যন্ত চারি দিনের মধ্যে ফিল্ড মার্শাল নাগিবের নেতৃত্বে মিশরে সামরিক অভ্যুত্থান এবং বাধ্য হইয়া রাজা ফারুকের সিংহাসন ত্যাগ যেন ছায়াচিত্রের ছবির মতই অতি দ্রুত সংঘটিত হইয়া গেল। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আকস্মিক বলিয়া মনে হইলেও উহা যে সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা অনুযায়ীই অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কত দিন পূর্ব্ব হইতে এই অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা গঠন করা হইয়াছিল তাহা কিছুই বুঝা না গেলেও প্রধান মন্ত্রী হোসেন শিরি পাশার পদত্যাগের পর হিলালী পাশা কর্ত্তৃক নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইবার অব্যবহিত পরেই জেনারেল নাগিবের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে, হিলালী পাশা প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করেন এবং আলী মাহের পাশা জেঃ নাগিব কর্ত্তৃক প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হন। সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে ২৩শে জুলাই এবং উহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে ২৬শে জুলাই (১৯৫২) রাজা ফারুক সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং তাঁহার সাত মাস বয়স্ক পুত্র যুবরাজ আহম্মদ ফুয়াদকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই সকল নাটকীয় ঘটনার অন্তরালে যে গোপন রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহার কতটুকু প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও বলা কঠিন। এ কথা অতি সত্য যে, মিশরের সৈন্যবাহিনীতে, বিশেষ করিয়া তরুণ অফিসার এবং সৈন্যদের মধ্যে একটা গভীর অসন্তোষ অনেক দিন হইতেই প্রধূমায়িত হইতেছিল। সৈন্যবাহিনীর প্রধান প্রধান পদে রাজা ফারুক তাঁহার অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিদিগকেই সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। তরুণ অফিসার এবং সৈন্যরা প্রগতিশীল ভাবধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাহাদের পক্ষে যোগ্যতা দ্বারা উচ্চতর পদে প্রমোশন পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাহাদের এই অসন্তোষ তীব্র হইয়া উঠিয়া বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে প্যালেষ্টাইন যুদ্ধে মিশরীয় বাহিনীর পরাজয়ের পরে। এই পরাজয়ের জন্য এক দিকে মিশরীয় সৈন্যবাহিনীর হাই কম্যাণ্ডের অযোগ্যতা এবং আর এক দিকে তাঁহাদের দুর্নীতিপরায়ণতার জন্য সৈন্যদিগকে অকেজো বন্দুক-কামান ও গোলাগুলী সরবরাহকে দায়ী করা হইয়াছে। প্রধান সেনাপতি মার্শাল হায়দর পাশা এবং চীফ অব ষ্টাফ জেঃ ওসমান এল মাহিদি পাশা প্যালেষ্টাইন যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র সংক্রান্ত কেলেঙ্কারীর ঘটনায় গভীর ভাবে জড়িত ছিলেন, ইহা একরূপ প্রকাশ্য গোপন ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল।

সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদগুলিতে অযোগ্যতা এবং দুর্নীতিপরায়ণতা অধিকাংশ অফিসারদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সকল অসন্তুষ্ট অফিসারদের নেতৃত্বস্থানীয় ছিলেন ফিল্ড মার্শাল নাগিব। তিনি কায়রোস্থিত সামরিক অফিসারদের ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং ক্লাবটিই ছিল অসন্তুষ্ট এবং রাজা ফারুকের বিরোধী অফিসারদের মিলন-কেন্দ্র। তাঁহারা উচ্চপদ হইতে অযোগ্যতা এবং দুর্নীতিপরায়ণতা দূর করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। রাজা ফারুকের ইচ্ছা এবং অনুগ্রহই যেখানে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার একমাত্র সহজ উপায়, সেখানে তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে ইহা খুব স্বাভাবিক। কয়েক মাস আগে কায়রোর অফিসার্স-ক্লাব যখন উচ্চপদগুলির অযোগ্যতা এবং দুর্নীতিপরায়ণতা দূর করার ব্যাপারে বেশ একটু মুখর হইয়া উঠিয়াছিল তখনই রাজা ফারুক এই ক্লাবটি বন্ধ করিয়া দেন।

মিশরের এই সামরিক অভ্যুত্থানের সহিত ওয়াফদ দলের কোন সংযোগ বা সংশ্রব ছিল কি না, তাহা বুঝিবার মত কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই। এই বিদ্রোহের সময় ওয়াফদ দলের নেতা নাহাশ পাশা এবং তাঁহার প্রধান সহযোগী শের এল-দীন পাশা ইউরোপে ছিলেন। রাজা ফারুকের সিংহাসন ত্যাগের পর প্রধান মন্ত্রী আলী মাহের পাশা ওয়াফদ দলের নেতৃবৃন্দকে মিশরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আহ্বান জানান। নাহাশ পাশা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই জেঃ নাগিবের হেড কোয়ার্টার্সে যান এবং জাতির মুক্তিদাতারূপে তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। গত ২৮শে জুন (১৯৫২) হিলালী পাশা যখন প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন, তখন তিনি এই অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, ওয়াফদ নেতারা কোন বিদেশী রাষ্ট্রদূতকে এই মর্ম্মে অনুরোধ করিয়াছেন যে, চাপ দিয়া হিলালী পাশাকে পদচ্যুত করিয়া ওয়াফদ দলকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিলে তাঁহারা মধ্য-প্রাচী রক্ষা-ব্যবস্থায় যোগদান করিবেন। এই অভিযোগের সমর্থনে যেমন কিছু পাওয়া যায় না, তেমনি এই অভিযোগ সত্য হইলেও উহার মধ্যে সামরিক অভ্যুত্থানের সহিত ওয়াফদ দলের সংস্রবের ইঙ্গিত পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু ওয়াফদ দল পুনরায় ক্ষমতা লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছে এবং মিশরে একটা বিপ্লব আসন্ন এইরূপ গুজব মিশরের বাহিরে রটনা করা হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। তখন ঐ আসন্ন বিপ্লবের কথা ভিত্তিহীন বলিয়াই অনেকে মনে করিয়াছিলেন। হিলালী পাশার প্রধান মন্ত্রিত্বের সময় ওয়াফদ দলের সমর্থক জনৈক পুঁজিপতি বৃটিশ কূটনৈতিক মহলে এইরূপ প্রচার-কার্য্য চালাইয়াছিলেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হিলালী পাশার সহিত খুব তাড়াতাড়ি কোন চুক্তি করা সঙ্গত হইবে না, কারণ আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে ওয়াফদ দলই জয়লাভ করিবে এবং এই চুক্তিকে বাতিল করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিবে না। ওয়াফদ দলের পক্ষ হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও প্রচারকার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ওয়াফদ দলের মুখপত্র 'আল-মিশরী'র প্রকাশক সিনেটর মহম্মদ আবুল ফতে কিছু দিন নিউ ইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে কাটাইয়া আসিয়াছেন। পত্রিকাখানির সুরেরও আকস্মিক ভাবে পরিবর্ত্তন দেখা যায়। 'আল-মিশরী' ছিল ভয়ানক মার্কিণবিরোধী, কিন্তু উহার সুর হঠাৎ পাল্টিয়া যায় এবং মার্কিণ-সমর্থক হইয়া উঠে। এই সংবাদপত্রের কথা এই যে, বৃটিশের প্রভাব-প্রতিপত্তি হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য মার্কিণ

যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা করা আবশ্যক। মিশরের বাহিরে ওয়াফদ দলের অনুকূলে প্রচারকার্য্য চলিবার সঙ্গে মিশরেও প্রবল গুজব রটিয়াছিল যে, হিলালী গবর্ণমেণ্টের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে, এবং হিলালী পাশার স্থলে হোসেন শিরি পাশা গবর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া ১৯৪৯ সালের মত ওয়াফদ দলকে নির্ব্বাচনে জয়ী করিয়া ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এই গুজবের একটা অংশ যেমন সত্যে পরিণত হইয়াছে, তেমনি বিপ্লবের গুজবটাও মিথ্যা হয় নাই।

গত ২৮শে জুন (১৯৫২) হিলালী পাশা প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করেন এবং ছত্রিশ ঘণ্টাব্যাপী মন্ত্রিত্ব সঙ্কটের পর ২৯শে জুন রাত্রে হোসেন শিরি পাশা প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিন সপ্তাহ পরে গত ২০শে জুলাই তারিখে তিনিও প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পদত্যাগের কারণও কিছুই প্রকাশ নাই। একটা Constitutional flare-upএর ফলে তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন, এ কথার কোন অর্থ হয় না। মিশরের কোন সংবাদ বাহিরে প্রেরণ করার পথে সেন্সরের এত কড়াকড়ি যে, প্রকৃত সংবাদ কিছুই বড় পাওয়া যায় না। শিরি পাশা প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পর নিম্নপদস্থ সামরিক অফিসারগণ তাঁহার নিকট প্রধান সেনাপতির পদচ্যুতি দাবী করেন এবং তাঁহারা নাকি ইহাও জানান যে, এই দাবী পূরণ করা না হইলে তাঁহারা বিদ্রোহ করিবেন। শিরি পাশা নাকি জেঃ নাগিবকে সামরিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা ফারুক দৃঢ়তার সহিত তাহাতে আপত্তি করেন। আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানসম্পন্ন শিরি পাশা এই অবস্থায় পদত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার পদত্যাগের পর হিলালী পাশা যখন আবার প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন, তখনই সেনাবাহিনী আঘাত হানিবার উপযুক্ত সময় বলিয়া মনে করিলেন। রাজা ফারুক নিজেই আঘাত হানিবার প্ররোচনা দিতে কসুর করেন নাই। হিলালী পাশা পুনরায় প্রধান মন্ত্রী হইয়া যে-মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন তাহাতে সামরিক দপ্তরের ভার দেওয়া হয় রাজা ফারুকের শ্যালক কর্ণেল ইসমাইল শেরিন বেকে এবং ইহাও প্রকাশ যে জেঃ নাগিবকে বরখাস্ত করিবার অথবা তাঁহাকে কোন নগণ্য পদ দিবার কথাও হইয়াছিল।

মিশরের সৈন্যবাহিনীকে রাজার সৈন্যবাহিনী বলিয়াই গণ্য করা হইয়া থাকে। সৈন্যবাহিনী মিশরের রাজার নিয়ন্ত্রণাধীনে। এই জন্যই রাজা যখন-তখন মিশরের রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ। ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত ২৬শে জানুয়ারী (১৯৫২) তারিখের কায়রোর ব্যাপক হাঙ্গামা। প্রধান মন্ত্রী নাহাশ পাশা এই হাঙ্গামা নিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই, এই অজুহাতেই রাজা ফারুক তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারণ করেন। হয়ত বৃটিশ-বিরোধী দিবস প্রতিপালনের জন্য নাহাশ পাশা মিশরবাসীর কাছে যে আবেদন জানাইয়াছিলেন, তাহাই ২৬শে জানুয়ারী তারিখের ব্যাপক হাঙ্গামারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। হয়ত হাঙ্গামার প্রথম দিকে ওয়াফদ গবর্ণমেণ্ট কতক পরিমাণে উহা সহ্য করিতেও রাজী ছিলেন। ২৬শে জানুয়ারীর আগের দিন ইসমাইলিয়ার বৃটিশ সৈন্য ৪৬ জন মিশরী পুলিশকে হত্যা করিয়াছিল। উহাকে উপলক্ষ করিয়া ওয়াফদ গবর্ণমেণ্ট বৃটেনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া এক ডিক্রী পাশ করিয়াছিলেন। উহাতে শুধু বাকী ছিল রাজার দস্তখত। হয়ত নাহাস পাশা মনে করিয়াছিলেন, এই হাঙ্গামার চাপ দিয়া রাজা ফারুককে দিয়া ঐ ডিক্রি দস্তখত করাইয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল, অক্সিলারী পুলিশ বাহিনী নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং নিয়মিত পুলিশ বাহিনীও হাঙ্গামাকারীদের উপর গুলীবর্ষণ করিতে অস্বীকৃত! এই অবস্থায় ওয়াফদ গবর্ণমেণ্ট হাঙ্গামা দমনের জন্য সেনাবাহিনীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রধান সেনাপতি জেঃ মহম্মদ হায়দার পাশা রাজা ফারুকের হুকুম না পাইলে হাঙ্গামা দমনে সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করিতে অস্বীকৃত হন। রাজা ফারুকও হুকুম দেন নাই। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, হাঙ্গামা দমনের জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগ না করিয়া রাজা ফারুকই হাঙ্গামার প্রসারে সহায়তা করিয়াছিলেন। অবশেষে মার্কিণ দূতাবাসের মারফৎ রাজা ফারুক যখন জানিতে পারিলেন যে, বিদেশী লোকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করিলে রাত্রের মধ্যেই বৃটিশ সৈন্য কায়রো দখল করিবে, তখনই শুধু রাজা ফারুক সৈন্যবাহিনীকে হাঙ্গামা দমনের জন্য নির্দ্দেশ দেন। যে-সৈন্যবাহিনী মিশরের রাজার সৈন্যবাহিনী, যে-সৈন্যবাহিনী রাজার নির্দ্দেশ ছাড়া কিছু করে না, যে-সৈন্যবাহিনী মিশর গবর্ণমেণ্টের অনুরোধও অগ্রাহ্য করিয়া থাকে, সেই সৈন্যবাহিনীই অবশেষে জেঃ নাগিবের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করিয়াছিল এবং সেই সেনাবাহিনীর দাবী অনুসারেই রাজা ফারুককে পর্য্যন্ত সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইল।

শিরি পাশা ২০শে জুলাই তারিখে প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করেন। হিলালী পাশার মন্ত্রিসভা ২২শে জুলাই তারিখে রাজা ফারুকের অনুমোদন লাভ করে। তাঁহার মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের নয় ঘণ্টা পার হইতে না হইতেই রাত্রি ৩টার সময় কায়রোতে সৈন্যবাহিনীর অভ্যুত্থান ঘটে। মিশরের প্রায় সমগ্র স্থলসৈন্য ও বিমানবাহিনীই এই অভ্যুত্থানে যোগ দিয়াছিল। এই সামরিক অভ্যুত্থানের সময় রাজা ফারুক আলেকজান্দ্রিয়ায় তাঁহার গ্রীষ্মাবাসে অবস্থান করিতেছিলেন। বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিবার স্থানও এখানে আমরা পাইব না। কিন্তু বিনা রক্তপাতেই এই বিদ্রোহের ফলে সৈন্যবাহিনী মিশরের ক্ষমতা দখল করিয়া বসে এবং জেঃ নাগিব নিজেকে সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক বলিয়া ঘোষণা করেন। সৈন্যবাহিনী যখন কায়রো দখল করে, আলেকজান্দ্রিয়ায় তখনও হিলালী মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব বজায় ছিল এবং এই মন্ত্রিসভা একটা মীমাংসারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ২৩শে জুলাই অপরাহ্ণে হিলালী পাশা পদত্যাগ করেন। সৈন্যবাহিনী কর্তৃক আলী মাহের পাশা প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

২৪শে জুলাই (১৯৫২) আলী মাহের পাশা নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং রাজা ফারুকও সৈন্যবাহিনীর সমস্ত দাবী মানিয়া লন। কিন্তু ২৬শে জুলাই রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই নাগিবের নেতৃত্বে এক ইউনিট সাঁজোয়া বাহিনী আলেকজান্দ্রিয়াস্থ রাজা ফারুকের গ্রীষ্মাবাস ঘিরিয়া ফেলে। এই অবস্থায় রাজা ফারুকের সিংহাসন ত্যাগ করা ছাড়া আর কোন উপায় রহিল না। দু'প্রহরের সময় তিনি সৈন্যবাহিনীর দাবী মানিয়া লইয়া সিংহাসন ত্যাগ করিতে এবং মিশর হইতে চলিয়া যাইতে রাজী হন। সন্ধ্যার সময়ই তাঁহাকে মিশর হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। তাঁহার সাত মাসের শিশুপুত্র রাজা মনোনীত হওয়ায় মিশরে রাজতন্ত্রের অবসান হইল না বটে, কিন্তু অতঃপর

রাজার ক্ষমতার যে বিশেষ সঙ্কোচ সাধিত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ফারুক মহম্মদ আলী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের দশম রাজা। মহম্মদ আলী ছিলেন আলবেনীয়ার এক জন ভাগ্যান্বেষী মুসলমান। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি মিশরে আসেন এবং মিশরে তাঁহার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি নামে মাত্র তুরস্কের সম্রাটের অধীন ছিলেন। একবার তিনি সিরিয়া পর্য্যন্ত অভিযান করিয়াছিলেন। বৃটেনের চেষ্টায় একটা মিটমাট হয়। কিন্তু তুরস্ক যখন সিরিয়া আক্রমণ করিল তখন মহম্মদ আলীও তুর্কী সৈন্যকে পরাভূত করেন। আবার বৃটেন এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে এবং তদানীন্তন বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব লর্ড পামারষ্টোনের চেষ্টায় ১৮৪০ সালের একটা চুক্তি হয়। কিন্তু শেষে এই চুক্তিকেও তিনি মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলে বৃটিশ এডমিরাল নাপিয়ার তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করেন। অতঃপর ১৮৪১ সালে দ্বিতীয় চুক্তি হয় এবং এই চুক্তি দ্বারা তুরস্কের অধীনে মিশরে তাঁহাকে বংশানুক্রমিক পাশালী প্রদান করা হয়। মহম্মদ আলীই সর্ব্বপ্রথম সুদান অধিকার করেন। কর্ণেল আর্‌বী পাশার বিদ্রোহের সময় বৃটেন আবার মিশরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় বৃটিশ সৈন্য অবতরণ করে। সেই হইতেই বৃটিশ সৈন্য মিশরে রহিয়া গিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তুরস্ক যখন জার্ম্মাণীর পক্ষে যোগদান করে, তখন বৃটিশ মিশরের জার্ম্মাণ-অনুরাগী খেদীব দ্বিতীয় আব্বাসকে পদচ্যুত করিয়া মহম্মদ আলী, বংশের জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ হোসেন কামিলকে সুলতান উপাধি দিয়া মিশরের সিংহাসনে বসায়। ১৯১৭ সালে সুলতান হোসেন কামিল পরলোক গমন করিলে তাঁহার ভ্রাতা ফুয়াদকে সুলতান করা হয়। ১৯২২ সালে রাজা ফুয়াদ এক ফরমান জারী করিয়া মিশরের রাজসিংহাসনে জ্যেষ্ঠ পুত্র অনুযায়ী মহম্মদ আলী বংশের বংশানুক্রমিক অধিকার ঘোষণা করেন। কোন নারী মিশরের সিংহাসনে বসিতে পারিবে না। রাজার কোন পুত্র না থাকিলে তাঁহার ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ পুত্রানুযায়ী বংশানুক্রমে, ভাই না থাকিলে জেঠা কিম্বা কাকা অনুরূপ ভাবে সিংহাসনের অধিকারী হইবেন। সুতরাং প্রত্যেক নূতন রাজাই একটি নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইবেন। দ্বিতীয় আব্বাসকে সুস্পষ্ট ভাবেই সিংহাসনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইলেও তাঁহার সন্তানাদিকে করা হয় নাই। যিনি মুসলমান নহেন, কিম্বা মুসলমান পিতামাতার সন্তান নহেন তিনি মিশরের সিংহাসনের অধিকারী হইবেন না।

১৯৩৫ সালে রাজা ফুয়াদের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র ফারুককে রাজা ঘোষণা করা হয়। তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয় ১৯৩৭ সালের ২৯শে জুলাই। ১৯৫২ সালের ২৬শে জুলাই তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। রাজা ফারুক সৈন্যবাহিনীর সমস্ত দাবী মানিয়া লইলেও তাঁহাকে কেন সিংহাসনচ্যুত করা হইল সে-সম্বন্ধে কোন সংবাদই প্রকাশ করা হয় নাই। মার্কিণ পত্রিকা 'নিউজ উইক' ৩০শে জুলাই (১৯৫২) তারিখের সংখ্যায় লিখিয়াছেন যে, বৃটিশ পররাষ্ট্র-দপ্তর জেঃ নাগিব কর্ত্তৃক ক্ষমতা দখলের আভাস পূর্ব্বাহ্নেই পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত আপোষ করিয়া ফেলিবার জন্য রাজা ফারুককে পরামর্শও দিয়াছিলেন। কিন্তু ফারুক সেই পরামর্শে তো কর্ণপাত করেনই নাই, অধিকন্তু বৃটিশকে তাহাদের সৈন্যবাহিনী দিয়া মিশরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে এবং কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, বৃটিশ এই প্রস্তাবে রাজী হয় নাই। এই ব্যাপারের পর রাজা ফারুকের পক্ষে মিশরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকা যে সম্ভব ছিল না ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

মিশরে যে রক্তপাতহীন বিপ্লব ঘটিয়া গেল তাহাকে এক রকমের প্রাসাদ-বিপ্লব বলিলেই ঠিক হয়। এই বিপ্লবের ফলে জনসাধারণের হাতে যেমন ক্ষমতা আসে নাই, তেমনি সুয়েজ ক্যানাল অঞ্চল হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণের সমস্যা, সুদান সমস্যা এবং মধ্য-প্রাচী রক্ষা-ব্যবস্থায় মিশরের যোগদান সমস্যার সমাধানের পথও পরিষ্কৃত হয় নাই। মিশরের রাজনীতিতে এক দিকে রাজা, আর এক দিকে জাতীয়তাবাদী ওয়াফদ দল এবং অন্য দিকে বৃটিশ এই তিন পক্ষের মধ্যে এক ত্রিকোণ সংগ্রাম চলিতেছিল। এই সংগ্রামে জনসাধারণের কোন স্থান না থাকিলেও এবং ওয়াফদ দল মিশরের পুঁজিপতিদের প্রতিষ্ঠান হইলেও ওয়াফদ দলই জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ওয়াফদ দলই মিশরের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং বৃটিশের নিপীড়ন-নীতিও এই ব্যাপারে সাহায্য বড় কম করে নাই। মিশরে জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থানের ইতিহাস আমরা অতি সামান্যই জানি। ১৮৮৫ হইতে ১৮৯৭ সাল পর্য্যন্ত মিশরে প্রকৃত পক্ষে লর্ড ক্রোমারেরই ছিল অপ্রতিহত আধিপত্য। তাঁহাকে বলা হইত 'আধুনিক মিশরের ফ্যারোয়া।' তিনি মিশর হইতে চলিয়া যাওয়ার পর বৃটিশ সামরিক অফিসারগণ যে নির্ম্মম অত্যাচার চালাইয়াছিল, তাহারই ফলে মিশরে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হইয়া উঠে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। এই জাতীয়তাবাদ এখন পর্য্যন্তও অর্থনৈতিক অসন্তোষে রূপায়িত ও সংহত হইয়া উঠিতে পারে নাই। ওয়াফদ দলও উহা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। মিশরের রাজারও তাহা অভিপ্রেত নয়। বৃটিশও উহা চায় না। এই অসন্তোষ বিপ্লবের আকার ধারণ করিলে রাজা, ওয়াফদ দল ও বৃটিশ নিজেদের সকল বিবাদ ভুলিয়া যে বিপ্লব দমনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হইবে তাহার পরিচয় ২৬শে জানুয়ারীর হাঙ্গামার মধ্যে কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। ঐ হাঙ্গামার ফলে জন কুড়ি বিদেশীর প্রাণহানি ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে বৃটিশের সংখ্যা ১৩ জনের বেশী নয়। কায়রোতে এক লক্ষ বিদেশীর বাস। তন্মধ্যে বৃটিশের সংখ্যা দশ হাজার। কিন্তু এই হাঙ্গামা শেষ পর্য্যন্ত অর্দ্ধ বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। নাহাশ পাশা পর্য্যন্ত বেতারে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, 'ইসমাইলিয়ায় বৃটিশ সৈন্য কর্ত্তৃক মিশরী পুলিশ হত্যায় আমি যত না ক্রুদ্ধ হইয়াছি, তাহা অপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়াছি কায়রোর এই হাঙ্গামায়।' হাঙ্গামাকারীরা বিদেশী লোককে হত্যা করা অপেক্ষা কায়েমী স্বার্থের প্রতীক বিদেশী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, নূতন মোটর কার এবং অন্যান্য বিলাস উপকরণ ধ্বংসের দিকেই ঝুঁকিয়াছিল।

মিশরের সমস্যা এবং এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশের সমস্যা প্রায় একরূপ। স্বদেশী কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণী জন-জাগরণকে ভয়ের চক্ষে দেখে। আবার বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সহিতও তাহাদের স্বার্থের সংঘর্ষ রহিয়াছে। এই পরস্পরবিরোধী অবস্থাই প্রত্যেক দেশের কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণী তথা শাসকশ্রেণীর নীতি ও কর্ম্মপন্থাকে

নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তাঁহারা কখনও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদকে হুমকী দিবার জন্য জনসাধারণের জাতীয়তাবোধের সাহায্য গ্রহণ করেন, আবার জনসাধারণের মধ্যে অর্থ নৈতিক অসন্তোষ দেখা দিলে সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যে তাহা দমন করিতে চান। আসলে তাঁহারা যাহা চান তাহা এই যে, স্বদেশী জনগণকে শোষণ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা তো তাঁহাদের থাকিবেই, বাহিরেও বৈদেশিক অধীনতার কোন লক্ষণ দেখা যাইতে পারিবে না।

ডাঃ মোসাদ্দিকের জয়—

ইরাণের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ডাঃ মোসাদ্দিকের জয়লাভের অব্যবহিত পরেই ইঙ্গ-ইরাণী তৈলবিরোধের ব্যাপারে আন্তর্জ্জাতিক আদালতের ইরাণের অনুকূলে রায় প্রকাশ বৃটিশের বিরুদ্ধে তাঁহার আর এক দফা জয় সূচনা করিতেছে। ইরাণের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী মিশরের ঘটনাবলীর প্রায় সমসাময়িক। উভয় দেশের ঘটনাবলীর তুলনামূলক আলোচনাও অনেকে করেন। এ কথা অবশ্যই ঠিক যে, উভয় দেশেই বিদেশী শক্তিকে যে-সকল সুবিধা দেওয়া হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে দেশের লোকের মনোভাব খুব তীব্র। কিন্তু বৃটিশ সৈন্য উপস্থিত না থাকায় ইরাণের যে সুবিধা আছে, বৃটিশ সৈন্যের উপস্থিতির জন্য মিশরের সে সুবিধা নাই। মিশরে সামরিক অভ্যুত্থান এবং রাজা ফারুকের বাধ্য হইয়া সিংহাসন ত্যাগের মূলে কোন বৈদেশিক শক্তির ইঙ্গিত আছে কি না তাহা কিছুই বুঝা যায় না। ইরাণে ডাঃ মোসাদ্দিকের প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ এবং মঃ গভাম এস্ সুলতানেকে শাহের প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করার মধ্যে বৃটিশ কূটনৈতিক হস্তক্ষেপ যেমন অনুমান করা যায়, তেমনি পুনরায় ডাঃ মোসাদ্দিকই প্রধান মন্ত্রী হওয়ায় বৃটিশ কূটনীতির পরাজয়ই সূচিত হইতেছে। বলা হইয়া থাকে যে, মিশরে ও ইরাণে যে-রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটিল তাহাতে মূল সমস্যা সমাধানের অর্থাৎ মিশরে ইঙ্গ-মিশর সমস্যা এবং ইরাণে ইঙ্গ-ইরাণী তৈলবিরোধের সমস্যা সমাধানের পথ একটুও সহজ হয় নাই। এখানেও উভয় দেশের পার্থক্যের কথা স্মরণ রাখা অবশ্যক। ডাঃ মোসাদ্দিকের পক্ষে ইঙ্গ-ইরাণীয় তৈল কোম্পানীর তৈলখনিগুলি দখল করা যতটা সহজ ছিল, সুয়েজ কেনাল অঞ্চল হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণ করা তত সহজ নয়। ইরাণ স্বেচ্ছায় রাজী না হইলে অথবা শান্তিপূর্ণ কোন উপায়ে ইরাণকে রাজী হইতে বাধ্য করাইতে না পারিলে, ইরাণ আক্রমণ করা ব্যতীত তৈলখনি দখলের আর কোন উপায় বৃটিশের নাই এবং বর্ত্তমান অবস্থায় উহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তেমনি সুয়েজ কেনাল অঞ্চল হইতে জোর করিয়া বৃটিশ সৈন্য অপসারণ করাও মিশরের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ইরাণের তৈলখনিগুলি অচল হইয়া পড়ায় যে অর্থ নৈতিক সমস্যা দেখা দিয়াছে, ডাঃ মোসাদ্দিকের কাছে উহার সমাধানই একমাত্র প্রধান বিষয়।

আন্তর্জ্জাতিক আদালতে ইরাণের পক্ষের বক্তব্য পেশ করিয়া ডাঃ মোসাদ্দিক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর গত ৫ই জুলাই (১৯৫২) শাহের নিকট পদত্যাগ-পত্র পেশ করেন। ইহার পরদিনই নবনির্ব্বাচিত মজলিস তাঁহাকেই প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত করেন। ইরাণের সিনেটে মৃদু আপত্তি উত্থাপিত হইলেও তাঁহাকেই মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। অতঃপর ১১ই জুলাই (১৯৫২) ইরাণের শাহ তাঁহাকে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের নির্দ্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হয় সমর-দপ্তরের ভারও তিনি নিজের হাতে রাখিবার দাবী করায়। এইরূপ ঘটনা পৃথিবীর গণতন্ত্রের ইতিহাসে একেবারেই নূতন, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইহা নিয়মতন্ত্রবিরোধীও নহে। জাতীয় জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে অনেক গণতান্ত্রিক দেশেও, এমন কি, বৃটেনেও এইরূপ ঘটিয়াছে। ইরাণের বর্ত্তমান অবস্থায় ডাঃ মোসাদ্দিক প্রধান মন্ত্রী হইয়াও সমর-দপ্তর নিজের হাতে রাখিতে চাহিবেন, ইহা খুবই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করিবার কোন কারণও দেখা যায় না। কিন্তু ইরাণের শাহ তাঁহার এই দাবী সরাসরি অগ্রাহ্য করেন, এমন কি, এ সম্পর্কে মজলিসের অভিপ্রায় কি তাহা জানিবার চেষ্টা করা পর্য্যন্ত তিনি প্রয়োজন মনে করেন নাই। ডাঃ মোসাদ্দিকের এই দাবী অগ্রাহ্য করার মূলে বৃটিশের কূটনৈতিক প্রভাব থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নয়। কারণ, সমর-দপ্তর তাঁহার হাতে দেওয়া না হইলে ডাঃ মোসাদ্দিক প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া জানাইয়া দেন। ডাঃ মোসাদ্দিক যে বৃটিশের চক্ষুশূল তাহা কাহারও অজানা নয়। শাহ তাঁহার দাবী অগ্রাহ্য করায় ডাঃ মোসাদ্দিক পদত্যাগ করেন এবং বৃটিশ কূটনীতিরই আপাততঃ জয় হয়। ডাঃ মোসাদ্দিক পদত্যাগ করিলে শাহ আর এক জন প্রধান মন্ত্রী স্থির করিবার জন্য মজলিসকে নির্দ্দেশ প্রদান করেন। ১৭ই জুলাই (১৯৫২) মজলিসের গোপন অধিবেশনে মঃ গভাম এস সুলতানেকে প্রধান মন্ত্রী মনোনীত করা হয়। কিন্তু নেশন্যাল ফ্রন্টের ডেপুটিগণ এই অধিবেশনে যোগদান করেন

অনন্যসাধারণ কেশবর্দ্ধক
সর্বত্র পাওয়া যায়
মূল্য ১।৵০
টস্ ফার্মাসিউটিক্যাল প্রডাক্টস্ (ইণ্ডিয়া)
হেড অফিস: ১, লোয়ার রডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—২০

নাই। অতঃপর তাঁহারা এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করেন যে, মঃ গভামের মনোয়ন নিয়মতন্ত্রবিরোধী হইয়াছে। কিন্তু মজলিস কর্ত্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার অব্যবহিত পরেই শাহ মঃ গভাম এস সুলতানেকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে নির্দ্দেশ প্রদান করেন। তিনি অবশ্য মঃ গভামকে ইহাও জানাইয়া দেন যে, তৈলবিরোধ সম্পর্কে প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মোসাদ্দিকের নীতিই অনুসরণ করিতে হইবে। ইহা যে ইরাণবাসীকে ধোঁকা দিবার চেষ্টা তাহা মঃ গভামের উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। মঃ গভাম ১৯শে জুলাই তারিখে সাংবাদিকদিগকে বলেন যে, "তৈলশিল্পকে এইরূপ অচল অবস্থায় রাখিতে পারা যায় না। গবর্ণমেণ্ট যাহাতে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করিতে পারেন তাহার জন্য যথাসম্ভব সত্বর তৈলশিল্পের কাজ আরম্ভ করিতে হইবে।" অতঃপর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি কি সোজাসুজি বৃটেনের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করিবেন, না, আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের মারফৎ? উত্তরে তিনি জানান যে, প্রশ্নটি তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। মঃ গভাম প্রধান মন্ত্রী হওয়ায় বৃটিশেরই যে কূটনৈতিক জয় হইয়াছিল তাহা বৃটিশ দূতাবাসের উক্তি হইতেও বুঝিতে পারা যায়। খুব সতর্ক ভাবেই তিনি মন্তব্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু মনের আনন্দ ভাষায়ও প্রকাশ না পাইয়া পারে নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, **"We are glad—as we have always been glad—at any thing that will help to solve the Persian crisis"** অর্থাৎ 'পারস্যের সঙ্কট সমাধানে সাহায্য করিতে পারে এরূপ যে-কোন কিছুতেই আমরা আনন্দিত, আমরা বরাবরই এইরূপ অবস্থায় আনন্দিত হইয়াছি।'

ডাঃ মোসাদ্দিকের নীতিকে ব্যর্থ করিয়া বৃটেনের সহিত একটা মীমাংসা করিবার জন্য ভিতরে ভিতরে যে একটা চক্রান্ত চলিতেছে এইরূপ আশঙ্কা বোধ হয় অমূলক নয়। ডাঃ মোসাদ্দিকের সমর্থক ডেপুটিগণ মজলিসে এমন একটি বিল উপস্থিত করিতে চাহিয়াছেন যাহা এইরূপ চক্রান্তের অস্তিত্বের ভিত্তিতেই রচিত বলিয়া মনে হয়। আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মারফৎই হউক আর সোজাসুজি আলোচনা দ্বারাই হউক যে-কোন প্রধান মন্ত্রী বা যে-কোন মন্ত্রী বৃটিশ টেক্‌নিশিয়ানদিগকে আবাদানে ফিরাইয়া আনিতে সম্মত হইবেন তাঁহাকে দশ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিবার বিধান এই বিলে প্রস্তাব করা হইয়াছে। কোন সঙ্গত কারণ না থাকিলে এইরূপ একটা অভূতপূর্ব্ব আইন রচনা করিবার চেষ্টা করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

মঃ গভাম প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পর ২০শে জুলাই (১৯৫২) তেহরাণে এমন এক ব্যাপক হাঙ্গামা হয় যে, উহার প্রবল বন্যায় মঃ গভামের প্রধান মন্ত্রিত্ব তৃণখণ্ডের মতই ভাসিয়া গেল। ২১শে জুলাই তারিখের সংবাদ প্রকাশ যে, মঃ গভাম প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং শাহও তাঁহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর ২২শে জুলাই তারিখে ডাঃ মোসাদ্দিকই প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। আন্তর্জ্জাতিক আদালতের রায়ও ঐ দিনই প্রকাশিত হয়। আন্তর্জ্জাতিক আদালতের বিচারপতিগণ সকলে একমত হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু নয় জন বিচারপতি একমত হইয়া ইহা সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, ইঙ্গ-ইরাণ তৈলবিরোধের মামলার বিচার করিবার এখ্‌তিয়ার তাঁহাদের নাই। পাঁচ জন বিচারপতি তাঁহাদের সহিত একমত হন নাই। এই রায় লইয়া আলোচনা করিবার স্থান আমরা এখানে পাইব না। এখানে শুধু এইটুকুই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিগণ ইহাই সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, যে-ঘোষণা দ্বারা ইরাণ আন্তর্জ্জাতিক আদালতের এখ্‌তিয়ার স্বীকার করিয়া লইয়াছে তাহার অর্থ শুধু ব্যাকরণ অনুযায়ী না করিয়া ঐ ঘোষণার সময় ইরাণের অভিপ্রায়ের কথা বিবেচনা করিয়া যাহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত অর্থ তাহাই গ্রহণ করা উচিত। এই ভাবে উক্ত ঘোষণার ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহারা সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, সে-সকল চুক্তি উল্লিখিত ঘোষণার পরবর্ত্তী, শুধু সেইগুলি সম্পর্কেই আন্তর্জ্জাতিক আদালতের এখ্‌তিয়ার আছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে এই নয় জন বিচারপতির মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক আদালতের প্রেসিডেণ্ট স্যার আরনল্ড ম্যাক্‌নেয়ার অন্যতম। তিনি এক জন ইংরাজ। তিনি এক সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ঠাকুর ল'-এর অধ্যাপক ছিলেন।

আন্তর্জ্জাতিক আদালতের রায় ইরাণের অনুকূল হইলেও সমস্যার সমাধান হয় নাই। তৈলবিরোধ সম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক আদালতের এখ্‌তিয়ার আছে কি না সে-সম্পর্কে উক্ত আদালতের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি মুলতুবী রাখা হইয়াছে। অতঃপর আবার নিরাপত্তা পরিষদে উহা উত্থিত হইলেও হইতে পারে, অথবা মীমাংসার জন্য বৃটেন অন্য পন্থাও গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু ইতিমধ্যে ইরাণের আর্থিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে পদানত করিবার জন্য বৃটেন পারস্য উপসাগর অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে। পার্শিয়ান নেশন্যাল অয়েল কোম্পানীর সহিত চুক্তি অনুযায়ী ইটালীর একটি 'ট্যাঙ্কার' গত মে মাসে তৈল লইয়া যাওয়ার সময় বৃটিশ উহাকে এডেনে আটক করিয়াছে। এই তৈল আটক করিবার আইন বা ন্যায়সঙ্গত কোন অধিকার না থাকিলেও কেবল শক্তিমান বলিয়াই যে বৃটেন উহা আটক রাখিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আন্তর্জ্জাতিক আদালতের রায়ের পরেই যে বৃটেন ইরাণকে তার তৈল বিক্রয় করিতে দিবে, ইহাও আশা করা অসম্ভব। বস্তুতঃ গত ২৩শে জুলাই (১৯৫২) মিঃ চার্চ্চিল কমন্স সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, তৃতীয় পক্ষের নিকট ইরাণ যাহাতে তৈল বিক্রয় করিতে না পারে তাহার জন্য সমস্ত রকম কার্য্যকরী ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হইবে। ডাঃ মোসাদ্দিক জয়লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তৈলসংক্রান্ত আসল সমস্যার সমাধান কিছুই হয় নাই। তাঁহার জয়লাভকে বৃটেন মোটেই ভাল চক্ষে দেখিবে না, ইহা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁহার জয়কে কম্যুনিষ্টদের ক্ষমতা লাভের সুযোগ বলিয়া বিলাতী সংবাদপত্রগুলি যেরূপ প্রচারকার্য্য চালাইতেছে তাহা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ।

নেপালের সঙ্কট—

নেপালে আবার সঙ্কট দেখা দিয়াছে। ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নেপালে গণতন্ত্রের সূচনা হওয়ার পর হইতে একের পর আর সঙ্কটের মধ্য দিয়াই নেপাল চলিয়াছে। কিন্তু নেপালের সাম্প্রতিক সঙ্কট সম্পূর্ণ অন্য রকমের। বর্ত্তমান নেপালের শাসকগোষ্ঠী নেপালী কংগ্রেসের ভিতরে এবং বাহিরে এই সঙ্কট সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার জন্য দায়িত্ব কাহার, সে-সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির যে-প্রয়াস

দেখা যায় তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক। নেপালী কংগ্রেসের ভিতরে যে-সঙ্কট সৃষ্ট হইয়াছে তাহা গ্রহণ করিয়াছে কৈরলা ভাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিরোধের রূপ। গত মে মাসের (১৯৫২) শেষ ভাগে নেপালী কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহার সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত মাতৃকাপ্রসাদ কৈরলা। ঐ অধিবেশনের সময় শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ কৈরলা নেপালী কংগ্রেসের সভাপতি হন। বিদ্রোহের পর ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তাহা ছিল রাণাবংশ এবং নেপালী কংগ্রেসের কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট। এই মন্ত্রিসভায় শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ কৈরলা ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। গত নবেম্বর মাসে (১৯৫১) ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণকে উপলক্ষ করিয়া উক্ত কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্টের অবসান হয় এবং রাণাবংশকে বাদ দিয়া গঠিত হয় নূতন গবর্ণমেণ্ট। এই গবর্ণমেণ্ট গঠনের পূর্ব্বে নেপালী কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন হয় তাহাতে তুমুল ঝগড়া-বিবাদ ঘটিয়াছিল। অবশেষে শ্রীযুক্ত মাতৃকাপ্রসাদ কৈরলা গবর্ণমেণ্ট গঠন করিবেন এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর তিনিই একসঙ্গে নেপালী কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট এবং নেপাল গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী—দুই পদেই অধিষ্ঠিত হন। মন্ত্রিসভায় শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ কৈরলার কোন স্থান হয় নাই। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ১৬ই নবেম্বর (১৯৫১) নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের ঘোষণায় রাজা ত্রিভুবন বিদায়ী প্রধান মন্ত্রী জেঃ মোহন সমশের জঙ্গ বাহাদুরের প্রশংসা করিলেও শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর-প্রসাদ কৈরলার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই।

বস্তুতঃ গত নবেম্বর মাস হইতেই নেপালী কংগ্রেসে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টিই শুধু হয় নাই, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে সংখ্যালঘুত্বে পরিণত করা হয়। জনকপুর অধিবেশনে এই অচল অবস্থার সাময়িক অবসান হইলেও কৈরলা ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধের সত্যিকার কোন মীমাংসা হয় নাই। সাত দিন ধরিয়া তীব্র এবং তিক্ত আলোচনার পর গত ১৯শে জুলাই (১৯৫২) নেপাল মন্ত্রিসভার সদস্য-সংখ্যা হ্রাস করিয়া ৭ জন করিবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মাতৃকাপ্রসাদ কৈরলাকে নির্দ্দেশ প্রদান করেন। প্রধান মন্ত্রী এই নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করায় ওয়ার্কিং কমিটি প্রধান মন্ত্রীকে তাঁহার নেপালী কংগ্রেস সহযোগীদের সহ মন্ত্রিপদ পরিত্যাগ করিতে নির্দ্দেশ প্রদান করেন। নেপালী কংগ্রেস দলভুক্ত তিন জন মন্ত্রী এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী পদত্যাগ করিলেও প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হন। অতঃপর গত ২৬শে জুলাই নেপালী কংগ্রেসের সদস্যপদ হইতে তাঁহাকে বহিস্কৃত করা হইয়াছে। এই নির্দ্দেশের নিয়মতান্ত্রিক পরিণতি যাহাই হউক, গত ৩০শে জুলাই নেপালী কংগ্রেসের আহূত জনসভায় এক দল ক্রুদ্ধ লোক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর-প্রসাদ কৈরলা এবং তাঁহার পত্নীকে গুরুতর ভাবে আহত করিয়াছে এবং পদত্যাগকারী মন্ত্রী তিন জনও আহত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সূর্য্যপ্রসাদ উপাধ্যায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, নেপালী কংগ্রেস-নেতাদের উপর এই আক্রমণ পূর্ব্ব-পরিকল্পিত। এইরূপ অভিযোগে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। এইরূপ সন্দেহও প্রকাশ করা হইয়াছে যে, এই আক্রমণের মূলে নেপাল গবর্ণমেণ্টের পরোক্ষ ইঙ্গিত ছিল। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, গত জানুয়ারী মাসে (১৯৫২) রক্ষাদলের বিদ্রোহের মূলে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ কৈরলারও হাত ছিল বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে।

নেপালী কংগ্রেসের মধ্যে এই বিরোধকে শুধু ক্ষমতার জন্য কাড়াকাড়ির ফল বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কঠিন। কৈরলা ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের কথাও এই সঙ্গে বিবেচনা করা আবশ্যক। এই সঙ্গে ইহাও মনে রক্ষা আবশ্যক যে, জনগণের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য কোন নীতি নেপাল গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া জনগণের মধ্যেও গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি সর্ব্বদলীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের যে দাবী করিয়াছেন, তাহা উপেক্ষিত হওয়ার পরিণামও উপেক্ষার বিষয় নয়। জন-নিরাপত্তা আইনের অপপ্রয়োগ জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছে। ৬৩ জন মনোনীত সদস্য লইয়া সালাহ্ কার সভা বা উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাতে নেপালী কংগ্রেসেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা। বিরোধী দলের তিন জন সদস্য উহার সদস্যপদ গ্রহণ করিতে রাজীই হন নাই। রাজার ভাষণ সম্পর্কে আলোচনা শেষ হওয়ার পরই উহার অধিবেশন মুলতুবী রাখা হইয়াছে। বিরোধী দল তাহাদের কোন কর্ম্মসূচীই উহাতে উত্থাপন করিবার সুযোগ পান নাই। নেপালের তরাই অঞ্চলে কৃষকরা বিদ্রোহ করিয়াছে। ফলে প্রায় পাঁচ শত জমিদার ভারতে পলাইয়া আসিয়াছেন। এক মাসের অধিক কাল ধরিয়াই এই বিদ্রোহ চলিতেছে। ইহার জন্য দায়ী করা হইয়াছে কম্যুনিষ্ট-প্রভাবিত কিষাণ-সঙ্ঘকে। গত ১৩ই জুলাই (১৯৫২) সালাহ্ কার সভায় তরাই অঞ্চলের অশান্তি সম্পর্কে আলোচনার জন্য এক মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু অবস্থা তেমন গুরুতর কিছু নয়—প্রধান মন্ত্রীর এই উক্তির উপর ভিত্তি করিয়া উক্ত মুলতুবী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হইলেও, তরাই অঞ্চলের বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিতে হইয়াছে। শুধু তরাই অঞ্চল বলিয়াই নয়—সমগ্র নেপালের সমস্যাটাই শুধু শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা নয়—সমস্যাটা আসলে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক। পররাষ্ট্র-নীতি লইয়াও নেপালী কংগ্রেসের মধ্যেও একটা মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। নেপালী কংগ্রেসের জনকপুর অধিবেশনে চীনের সহিত অবিলম্বে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য হইয়া যায়। প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মাতৃকাপ্রসাদ কৈরলা কম্যুনিষ্ট চীনের সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের পক্ষপাতী নহেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর কৈরলা এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত নহেন বলিয়াই মনে হয়। শ্রীযুক্ত উপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত গনেশমান সিং-এর বিবৃতি হইতে বুঝা যায়, তাঁহারা যত দিন মন্ত্রী ছিলেন তত দিন প্রত্যেক বিষয়েই প্রধান মন্ত্রীর সহিত তাঁহাদের মতভেদ হইয়াছে। তাঁহারা ভারতের মতই নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র-নীতির পক্ষপাতী। তাঁহাদের আশঙ্কা, পররাষ্ট্র-নীতির ব্যাপারে ভুল-ভ্রান্তি ঘটিলে নেপালের অবস্থা কোরিয়ার মত হইতে পারে। ইঁহারা দুই জনই বিশ্বেশ্বরপ্রসাদের সমর্থক।

আদর্শগত দিক হইতে কৈরলা ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে যে-পার্থক্য আছে তাহা বিশ্বেশ্বরপ্রসাদের বামপন্থী মনোভাবের জন্য, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তিনি বামপন্থী ইহাও মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। মাতৃকাপ্রসাদের মত বিশ্বেশ্বরপ্রসাদও সর্ব্বদলীয় গবর্ণমেণ্ট পছন্দ করেন না। সর্ব্বদলীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের

দাবী করিতেছেন বামপন্থীরা। কয়েক মাস পূর্ব্বে প্রজাপরিষদ দলের সভাপতি টঙ্কপ্রসাদের উদ্যোগে ১০টি বামপন্থী দল লইয়া একটি ইউনাইটেড ফ্রন্ট গঠিত হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট পার্টি এই ফ্রন্টের একটি প্রধান অংশীদার—যদিও কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, নেপালী কংগ্রেসের বামপন্থী উপদলকেও বে-আইনী করা হইয়াছে। সম্প্রতি নেপাল-তিব্বত সীমান্তবর্ত্তী নেপাল গবর্ণমেণ্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ হেড কোয়ার্টার্স দখলের জন্য কম্যুনিষ্টদের অভিযান চালাইবার এবং কম্যুনিষ্ট ও সরকারী বাহিনীর মধ্যে এক সংঘর্ষের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। চৌদ্দ জন কম্যুনিষ্ট নেতাকে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে এবং তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু মূল্যবান দলিলপত্রও নাকি পাওয়া গিয়াছে। তাহারা নাকি তিব্বত হইতে নেপালে ফিরিতেছিল। কিন্তু নেপালের অশান্তির জন্য শুধু কম্যুনিষ্টরাই দায়ী ইহা মনে করিলে ভুল হইবে। উহার আংশিক দায়িত্ব নেপাল গবর্ণমেণ্টকেও গ্রহণ করিতে হইবে। উত্তর-পূর্ব্ব নেপালের কিরাতদের মধ্যে অসন্তোষের কথাও আমরা শুনিয়াছি। এখানে কম্যুনিষ্টরা নাকি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রাণা-শাসনের আমলে কিরাতরা অনেক পরিমাণে স্বায়ত্ত-শাসন ভোগ করিত। তাহারা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রেরও দাবী করিয়াছে।

ইন্দোচীনের স্বাধীনতা-সংগ্রাম—

গত ছয় বৎসর ধরিয়া হো-চি-মিনের ভিয়েটমীন গবর্ণমেণ্টের সহিত ফ্রান্সের যে-সংগ্রাম চলিতেছে তাহার শেষ কত দূরবর্ত্তী এবং কি ভাবে শেষ হইবে তাহা এখনও কিছুই বুঝা যাইতেছে না। ইন্দোচীনের সংগ্রামের অবস্থার সংবাদ অতি সামান্যই প্রকাশিত হয়। যেটুকু প্রকাশিত হয় তাহা হইতে প্রকৃত অবস্থা কিছুই বুঝা যায় না। কিছু দিন ধরিয়া এই সংগ্রামকে একটা নূতন দিক হইতে দেখিবার চেষ্টা চলিতেছে। উহাকে কম্যুনিজম নিরোধের ব্যাপক সংগ্রামের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। গত জানুয়ারী মাসে (১৯৫২) প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এবং বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন ইন্দোচীন সম্পর্কে এক সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইন্দোচীনের ব্যাপারে কম্যুনিষ্ট চীন যদি হস্তক্ষেপ করে তবে উহা দ্বিতীয় কোরিয়ায় পরিণত হইবে। ইন্দোচীনে বর্ত্তমানে যে-সংগ্রাম চলিতেছে তাহা আরম্ভ হইয়াছে ১৯৪৬ সালের ১৯শে ডিসেম্বর হইতে। কম্যুনিষ্ট চীনের অস্তিত্বই তখন ছিল না। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কুয়োমিণ্টাং গবর্ণমেণ্ট চীনের মূল ভূখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ফরমোসায় আশ্রয় গ্রহণ করে। সুতরাং সমগ্র চীনে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই তিন বৎসর ধরিয়া ফ্রান্সের সহিত ভিয়েটনামের সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছিল। মার্শাল পরিকল্পনা অনুসারে ফ্রান্স যে অর্থ সাহায্য পাইয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই সে ব্যয় করিয়াছে হো-চি-মীনের সহিত যুদ্ধে। তাছাড়া গত দুই বৎসরে শুধু ইন্দোচীন বাবদই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এক বিলিয়ন ডলার সাহায্য দিয়াছে। কোন ফল হইয়াছে কি ?

—সাহিত্য-পরিচয়—

(প্রাপ্তি-স্বীকার)

বৃহৎ তন্ত্রসার—শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম দশ টাকা।

পালামৌ—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য এক টাকা।

নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার বি-এল, বিদ্যা-বিনোদ। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য দুই টাকা।

যীশুখৃষ্টের জীবনী—শ্রীঅমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুবাদক, রেভাঃ পি, ফালোঁ, এস, জে; ১৩২বি, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬। দাম দেড় টাকা।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়-চৌধুরী। ভারতী লাইব্রেরী, ১৪৫, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা চার আনা।

শ্রীশ্রীগীতামৃত—শ্রীসতীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, এম-এ। ইলামপুর শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, ইলামপুর; পোষ্ট পাড়্‌তল, জেলা বৰ্দ্ধমান। দাম ছয় টাকা।

সাধনা গীতি—শ্রীললিতানন্দ ব্রহ্মচারী। দামোদর আশ্রম, পোষ্ট পাঁচলা, হাওড়া। দাম দুই টাকা।

তন্ত্রোক্ত নিত্যপূজা পদ্ধতি—৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম সাড়ে চার টাকা।

ওপারের কথা—শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্র নাথ। প্রকাশক—শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২।১, কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব—শ্রীমনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রবর্ত্তক পাব্লিশার্স, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম সাড়ে ছ' টাকা।

জমজম, ঝমঝম—শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। দাসগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম চৌদ্দ আনা।

আগামী—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাব্লিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা চার আনা।

মর্ম্মর—শ্রীউষা দত্ত। বীণা লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার। দাম এক টাকা।

নুরজাহান—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার। পাঞ্চজন্য পাব্লিশার্স, ৩৬, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

সমুদ্রকন্যা—শ্রীমৃগাঙ্ক রায়। সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

সাইকেলে বল্কান ভ্রমণ—ভূ-পর্য্যটক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

শ্বেত কপোত—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ, ১১৯, ধৰ্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম আড়াই টাকা।

প্রেম—শ্রীমতী বাণী রায়। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১১৯, ধৰ্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

আত্মহত্যা—স্বপন বুড়ো। সাহিত্য চয়নিকা, ৫৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

রবীন্দ্র-মানস—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১১৯, ধৰ্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

মাটির মানুষ—শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য। ভারতী বুক ষ্টল, ৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম আড়াই টাকা।

চৈতন্যদেবের মহাদান—শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী। গ্রাম ও পোঃ-পিপলন, জেলা বৰ্দ্ধমান। সেবার্থে ভিক্ষা ছয় টাকা চার আনা।

ষ্টুডিয়ো-পরিচিতি

ভারতলক্ষ্মী-ষ্টুডিয়ো

১৯৩২ সালের কিছু দিন আগে-পরে জন্ম নেয় রাধা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া আর ভারতলক্ষ্মী। এক একখানা ছবির জন্যেই যে শেষের তিনটির মালিকদের ছায়াছবি নির্মাণের আগ্রহ, সে কথা শুনলুম সেদিন। বললেন শ্রীবাবুলাল চৌখানি। তিনিই ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিয়োর কর্ণধার। সুদীর্ঘ বিশ বছর হাল ধরে আছেন তিনি এই ষ্টুডিয়োটির। অন্য ব্যবসা ছেড়ে ছবির দিকে নজর পড়লো কেন—প্রশ্নের অপেক্ষায় আছি। শ্রীযুক্ত চৌখানি নিজে থেকেই বললেন সে কথা। বলতে গিয়ে তাঁর কণ্ঠস্বর কৃতজ্ঞতায় রুদ্ধ হ'য়ে এলো। ভারতের ছায়াছবির রাজ্যের মুকুটবিহীন রাজার উদ্দেশে শ্রদ্ধা-নিবেদন ক'রে ইনি বললেন যে, যুগে আজ যারা সেই স্মরণীয় মানুষটির ঋণ-স্বীকার করতে ভুলেছে, মনের কোণে কি তাদের তাই ব'লে কোনো চিহ্নই নেই ভাবেন? আগেকার তামাম মানুষই (চিত্রজগতের অবিশ্যি) সেই ম্যাডান সাহেবের কাছে হাতে-কলমে কাজ শিখেছে বা কাজ করেছে। তাঁর নিজের কথার উল্লেখ করে জানালেন, তিনিও মিঃ ম্যাডানের কাছ থেকেই এ ব্যবসায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন। ম্যাডানের কয়েকখানা নির্বাক্‌ ছবি তিনি প্রথম অবস্থায় কেনেন, তার মধ্যে বাংলা 'কৃষ্ণকান্তের উইল,' 'কলংকভঞ্জন'; আর হিন্দি 'পতিভক্তি,' 'স্বামীভক্তি,' 'দিল্‌ কি পিয়াস,' 'চত্রাবকায়লি' উল্লেখনীয়। শেষের ছবি 'চত্রাবকায়লি'-র কল্যাণেই আজ তাঁর এই ষ্টুডিয়ো। খানিক নীরব থেকে আবার তিনি বললেন, 'কিন্তু কি দুঃখের কথা, সেদিন ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল হোলো, কিন্তু কেউ-ই ম্যাডান সাহেবের সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করলো না। অথচ পাণ্ডাদের অনেকেই ম্যাডান সাহেবের হাতে-গড়া লোক!' আমি সে সম্বন্ধে এর আগের প্রবন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছি জানালুম, কিছুটা খুশি হলেন মনে হোলো তাঁকে।

কালীঘাট থেকে টালিগঞ্জে যেতে আগে পড়ে প্রিন্স আনোয়ার সা রোড; এই রাস্তায় প'ড়ে পূব-মুখে খানিক এগুলে ডান দিকে পড়বে ভারতলক্ষ্মীর ফটক। ভেতরে ঢুকে আবার দক্ষিণ দিকে যেতে হবে মিলিয়ে-আসা শুরকির লম্বা সরু পথ দিয়ে। গাছ আছে, আছে ডান দিকে নাতিক্ষুদ্র পুকুর, তার পর ষ্টুডিয়ো-অংগনের বহির্মুখ। ৩২ সালে ষ্টুডিয়োর উৎপত্তি—শুরুতেই সেকথা বলেছি। প্রথম ছবি মনসামংগল কাব্য অবলম্বনে 'চাঁদ-সদাগর' পরিচালক প্রফুল্ল রায়ের নেতৃত্বে গৃহীত হোলো বাঙলা ভাষায়। পণ্ডিত সুদর্শন ও প্রফুল্ল রায়ের যুগ্ম পরিচালনায় দ্বিতীয় ছবি উঠলো 'রামায়ণ' (হিন্দি)। বাঙলা-হিন্দি-তেলেগু-গুজরাটী-তামিল ভাষায় উঠলো নানান্‌ ছবি একে একে—'ভক্তকে ভগবান', 'ইন্‌সাফ কি তোপ', 'কুমারী বিধবা' (সব কটি হিন্দি); 'বাঙালী' (বাঙলা), 'সতী সুলোচনা' (তামিল), 'সমাজ পতন', 'ডাকুকা লেড়কী', 'দিলজানি' (হিন্দি), 'বেজার রগড়' (বাঙলা), 'সতী সাকুবাঈ', 'রুক্মিণীহরণ', 'মায়া অঞ্জনম্‌' (তেলেগু), 'আলিবাবা', 'মায়া-কাজল', 'অভিনয়', 'গরীব কি তোপ', 'পরশমণি', 'মাতোয়ালী মীরা' (হিন্দি ও পাঞ্জাবী), 'তগদীর কি তোপ', 'ঠিকাদার', 'জীবন-সংগিনী', 'গৃহলক্ষ্মী', 'সীতার বনবাস' (গুজরাটী), 'গাঁয়ের মেয়ে', 'পতি-পূজা'।

সাধনা বোস ও মধু বোস এখান থেকেই তাঁদের প্রস্তুতি-পর্ব সমাধা করেছিলেন। তার মাধ্যম হোলো 'আলিবাবা', 'অভিনয়', 'পরশমণি'। পরিচালক প্রফুল্ল রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এখানে একাধিক ছবি তুলেছেন। সুপ্রসিদ্ধ নট ৺দুর্গাদাস বহু দিন এখানে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। অহীন চৌধুরী, ৺ইন্দু মুখার্জি, সাধনা বোস, মধু বোসও স্থায়ী চুক্তিতে আবদ্ধ থেকে অনেক কাজ করেছেন।

শ্রীরমেন চৌধুরী

টেক্‌নিসিয়ানের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে তখনকার দিনের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ (শব্দযন্ত্রী ও আলোকচিত্রী) চার্লস্‌ ক্রীডের নাম। আজও নিশ্চয় এঁকে চিনতে অসুবিধে হবে না সাধারণের। ইনিই ভার নিয়েছিলেন সে সময় ভারতলক্ষ্মীর এই দু'টি বিভাগের। এ ছাড়া ক্যামেরায় ছিলেন বিভূতি দাস, ভি, ভি, দাঁতে, গীতা ঘোষ, পি চৌধুরী, জয়ন্তীভাই জানি; সাউণ্ডে—ভূপেন ঘোষ, গফুর সাহেব, মাল্লা লাডিয়া; ল্যাবরেটারীতে—জগৎ রায়-চৌধুরী, পূর্ণ চ্যাটার্জি; এডিটিংএ—শ্যাম দাস (অধুনা পরিচালক প্রযোজক), সুকুমার মুখার্জি ও সুধীন্দ্র পাল। ছায়া-ছবির জগতে ভারতলক্ষ্মীর দান অনস্বীকার্য। 'আলিবাবা', 'অভিনয়', 'পরশমণি' 'অবতার', 'জীবন-সংগিনী' 'গৃহলক্ষ্মী'র রূপ-লাবণ্য, নিশ্চয়ই দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে নিঃশেষে মুছে যায়নি চিত্রামোদীর চোখ থেকে। কীর্তির মাঝেই তো মানুষ বা প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকে।

কলা-কুশলী

সংগীত-শিল্পী অনিল বাগচী

সত্যিকারের গুণী সংগীত পরিচালক বাঙলায় খুব বেশি আছে ব'লে মনে করবেন না, এঁদের সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়। সুপ্রসিদ্ধ সংগীতশিল্পী অনিল বাগচী 'চিত্ররূপা'র 'সন্ধি' ছায়াছবির

যুগান্তর ছায়া প্রতিষ্ঠান লিঃ-র

যুগান্তকারী চিত্র-নিবেদন

চিত্রনাট্য : নরেশ মিত্র

পরিচালনা : চিত্ত বসু

চিত্রশিল্পী : রামানন্দ সেন

শব্দধর : সত্যেন চ্যাটার্জি

শিল্প-নির্দেশক : সুনীল সরকার

শ্রেষ্ঠাংশে

মলিনা দেবী, সন্ধ্যারাণী, রেণুকা রায়, রেবা দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যো, মনোরঞ্জন, ভানু, মাষ্টার সুখেন, মাষ্টার বিভু ও আরো অনেকে

একমাত্র পরিবেশক

কল্পনা মুভিজ লিমিটেড

৫৩, বেণ্টিংক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মাধ্যমে নতুন করে বাঙলার সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন—সেটা ১৯৪৪ সাল। উক্ত ছবি স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় ও সংগীতের জন্যে বছরের শ্রেষ্ঠ চিত্র বলে ঘোষিত হোলো। এর পর জনগণ-অভিনন্দিত এঁরি পরিচালিত 'কবি'র গান—'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে'? আরো আছে—'মানদণ্ড', 'দুর্গেশ-নন্দিনী'—বাঙলা গজল প্রভৃতি উচ্চাংগ গীতের অপূর্ব সংমিশ্রণ। অনায়াসে শ্রীযুক্ত বাগচী প্রথম শ্রেণীর সংগীত পরিচালকের সম্মানিত আসন অধিকার করেছেন।

ত্রিশ বছর আগেকার সেই সুন্দর কিশোরটি খাতা বগলে জোড়াসাঁকোর ধারে নিয়মিত যাতায়াত করে, দিনু ঠাকুর যেমন স্নেহ করেন গুরুদেবও তেমনি। স্বাভাবিক মিষ্টি গলার রবীন্দ্র-গীতি ভারি ভালো লাগে সবার। কিশোরটির সে কি অপরিসীম উৎসাহ সংগীত-সাধনায়! আবার কাজী সাহেবের গানের আসরেও একে দেখা যায়। কবি নজরুলও স্নেহ করেন, তাঁর ধারণা ছেলেটি ভবিষ্যতে প্রকৃত গায়ক হতে পারবে। সে দিনও বাগচী মশাইকে রবীন্দ্র-সংগীত ও নজরুল-গীতি গাইতে দেখা গেছে নিয়মিত—কি ঘরে কি বাইরে। এ ছাড়া উচ্চাংগ সংগীত শিক্ষা লাভ হোয়েছে কাশীর ওস্তাদ গণেশপ্রসাদ মিশ্র আর ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খানের ঘরে। এখনও মেহেদী হোসেন মাঝে মাঝে এসে এঁকে তালিম দিয়ে যান।

১৯২৭ সাল, রেডিয়োর প্রবর্তন হোলো কলকাতায়; তৎকালীন বেতারের সুযোগ্য পরিচালক যশস্বী ক্লারিওনেট-বাদক নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার মশাই অনিল বাবুকে টেনে নিয়ে গেলেন বেতারের আসরে। সৃষ্টিদিবস থেকে আজ পর্যন্ত বেতারের সংগে এঁর সম্পর্ক অটুট আছে।

দশ বছর পরের কথা। ৩৭ সালে নাট্যকার (অধুনা পরিচালক) বিধায়ক ভট্টাচার্য ও স্বর্গত প্রযোজক-নট প্রভাব সিংহের অনুরোধে ইনি এলেন রঙমহল রংগমঞ্চে। 'মাটির ঘর', 'বিশ বছর আগে', 'মাইকেল মধুসূদন' প্রভৃতি অসংখ্য নাটকের সুর-সংযোজনা করলেন। সাফল্য লাভ করলেন অনায়াসে, সে কথা নিশ্চয়ই আজকে বলতে হবে না নতুন করে। এ সময়ে শ্রীযুক্ত বাগচী মঞ্চের মায়ায় জড়িয়ে পড়েছিলেন বিশেষ ভাবে, তার প্রমাণ মেলে মিনার্ভা থিয়েটারের পর পর কয়েকখানি নাটকে। তার মধ্যে 'দেবদাস', 'কাঁটা ও কমল', 'চিরন্তনী' উল্লেখযোগ্য।

'বন্দী' চিত্রের বন্দনায় যখন শহরবাসী মুক্তকণ্ঠ, সেই সময় উক্ত ছবির প্রযোজক মাধব ঘোষাল 'সন্ধি' করতে মনস্থ করলেন। বাগচী মশাই নির্বাচিত হলেন সংগীত-পরিচালক। প্রথম প্রচেষ্টা তাঁর বিজয়-মুকুটে শোভিত হোলো। বি, এম, পি, এ-র বিচারে তিনি সে বছরের (১৯৪৪ সালের) সেরা সংগীত-পরিচালক ঘোষিত হোলেন। ক্রমান্বয়ে রূপালী পর্দায় এবার থেকে শ্রীযুক্ত বাগচীর নাম দৃষ্ট হ'তে থাকলো—'সুলহা' (হিন্দি), 'স্যার শংকরনাথ', 'মহাদান' 'উমার প্রেম', 'ঝড়ের পর', 'কবি', 'রাধারাণী', 'মানদণ্ড', 'দুর্গেশনন্দিনী' মুক্তি পেয়েছে। 'অনিবার্য', মানুষ' ও ৺বড়ুয়া সাহেবের 'মায়া-কানন' মুক্তি-প্রতীক্ষারত।

সুর-স্রষ্টা অনিল বাগচীর নিজস্ব একটি ধারা আছে; গতানুগতিকতার কণ্ঠরোধ করবার প্রচেষ্টা তাঁর জীবনের প্রথম দিন থেকে লক্ষ্য করেছি। 'মানদণ্ড' ও 'দুর্গেশনন্দিনী' চিত্রে বাঙলা উচ্চাংগ ও গজল গানের পরিবেশনে সেই কথাই ধ্বনিত হতে দেখা

গেছে। আধুনিক সংগীত-শিল্পীরা যাতে প্রকৃতই সংগীত-সেবক হয়ে ওঠেন, 'লারে লাপ্পা'র ফাঁদে না জড়ান, তার জন্যে প্রবন্ধাদি রচনাতেও ইনি ব্রতী হয়েছেন। সাময়িক পত্রের পাতায় ইতিমধ্যে তাঁর দু'-একটি আত্মপ্রকাশও করেছে।

দীর্ঘ এক যুগেরও পূর্বে এঁরি সুর-সৃষ্টি 'আঁধার রাতের পারে শুকতারা গো' শোনা গেছে ইতস্তত সর্বত্র—আজ বুঝছি বাগ্‌চী মশাই সত্যিই পথের দিশা পেয়েছেন, চিনেছেন তাঁর গন্তব্য পথ। তাঁর কাছ থেকে দুর্গম পথের পাথেয় লাভ করুক উৎসাহী শিক্ষার্থীরা।

সংগীত-শিল্পী কালোবরণ

সুরশিল্পী কালোবরণ বা কণ্ঠশিল্পী কালোবরণ দাশ একই ব্যক্তি। কখনো পদবীমুক্ত আবার কোনো সময় পদবীযুক্ত থাকায় অনেকে ভুল ধারণা করেন—বোধ হয় দু'জন ভিন্ন লোক। অবিশ্যি মানুষ কালোবরণ সুরলোকে বিচরণ কালে স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে থাকেন; তখন আর তাঁকে চেনা চায় না!

আলো-ঝলোমল প্রত্যূষ যেমন নির্মল দিনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না (স্মরণ করুন এবারকার বর্ষার দিনগুলিকে), তেম্‌নি সেদিনের মানুষগুলির ধারণাও সফল হ'তে পারেনি। একটি ডানপিটে কালোবরণের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ছেলে, দিন-রাত আম-জাম-কাঁটাল গাছে সদলে লাফালাফি করে, কখনো পুকুরে কিংবা চন্দননগরের গংগায় ঝাঁপাই ঝোড়ে শত অনুরোধ-উপরোধে কর্ণপাত না ক'রে; দীন-দুঃখীকে যেমন সমাদর করে তেমনি আত্মম্ভরি ধনীকে দেখায় অবহেলা—কাজেই সে ছেলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ছাড়া আর কি হতে পারে? কিন্তু যত দিন যেতে লাগল ততই সে সব শুভানুধ্যায়ীর (?) মুখের রঙ বদল হ'তে থাকলো—কালোর আলোয় ধীরে ধীরে দেশের লোকের চোখ জুড়োতে শুরু করলো। তার চরম এবং পরম লগ্ন দেখা দিলো ১৯৫১ সালে—প্রাগে (চেকোস্লোভাকিয়ায়) অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালে সুর-সংগতির জন্যে মর্যাদা লাভ করলো সেই ছেলেটি। 'ছিন্নমূল' (বাঙলা) ছবির আবহ-সংগীত অনবদ্য হয়েছে রায় দিলেন সেখানকার বিচারকেরা। এমন সম্মান ইতিপূর্বে ভারতীয়ের ভাগ্যে আর জোটেনি তো! সকলে অবাক-বিস্ময়ে চেয়ে দেখলেন বাঙলার এই শিল্পীটিকে। কিন্তু দলগত কলকাঠির ফলে আশানুরূপ সম্বর্ধনা লাভ করেননি ইনি। সে জন্যে বিন্দুমাত্র মনঃক্ষুণ্ণ এঁকে করতে পারেনি—বিশেষ করে তা লক্ষ্য করলুম সেদিন। প্রকৃত শিল্পীর এই-ই তো বিশেষত্ব!

রেডিয়ো এবং রেকর্ডের সংগে সম্পর্ক এঁর বহু দিনকার—শুধু নিজেই গেয়েছেন এমন নয়, অপর অনেক শিল্পীকেই train করেছেন অর্থাৎ যাকে বলে ইনি হচ্ছেন Trainer; আজকের দিনের সফলকাম বহু মেয়ে-পুরুষ কণ্ঠশিল্পী এঁর সুরকে গ্রহণ করে সাধারণ্যে স্বীকৃতি পেয়েছেন। রেকর্ডের বুকে সে-কথা Record করা আছে। প্রথম চিত্র-জগতে নামহীন অবস্থায় ইনি কাজ করেছেন, 'মুক্তিস্নান' ছবিতে। কিন্তু নাম দেখা গেল স্পষ্টাক্ষরে 'ঘরোয়া' বাণীচিত্রে—মনে আছে নিশ্চয় সে কথা চিত্রামোদীদের। ভালোই হোয়েছিলো প্রথম প্রয়াস—'এ যেন সেই রূপকথারি দেশ' কিংবা 'দোল দিলো কে মনে মনে' গানের সুরোচ্ছাস আজও শুনতে পাই এ-বাড়ি সে-বাড়ির ভেতর থেকে। 'সীমান্তিক' ও 'সংকেত'

রলিক্ পিক্‌চার্স লিমিটেড-এর

প্রথম ভক্তি-অর্ঘ্য

বিমলচন্দ্র মল্লিকের প্রযোজনায়

ভক্ত ধ্রুব

রচনা: কবি বিমল ঘোষ

পরিচালনা: চন্দ্রশেখর বসু

সুরশিল্পী: বীরেন রায়

চিত্রশিল্পী: বিভূতি চক্রবর্তী

রলিক্-এর দ্বিতীয় নিবেদন

সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবী'র

অনবদ্য উপন্যাস

মন্ত্রশক্তি

?

প রি বে শ ক

চিত্র-পরিবেশক লিমিটেড

পরবর্তী ছবি এঁর—বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এ ছবি দুটিতেও। ঠিক এই সময়ে বিভক্ত বাঙলার অধিবাসীর চোখের জলের কাহিনী তুললেন দেশা পিক্‌চার্স 'ছিন্নমূল'—কালোবরণ বাঙলার নিজস্ব সম্পদ যে সুরের সম্ভার (ভাটিয়ালী, কীর্তন ইত্যাদি) তার অপূর্ব সমন্বয় করলেন গোটা ছবিটির আবহ-সংগীতের মাঝে। গাঁয়ের যোগী নিজের গ্রামে আদর পায় না এ হোলো চিরকালের রীতি, তাই এখানে 'ছিন্নমূল' কিছুই সুবিধে করতে পারেনি। এমন মজা যে এখানকার Exhibitorরা দয়া করে এ ছবিটিকে Release করতেই চাননি। তার পর যেই তাঁদের কানে গেল রাশিয়া সর্বাগ্রে ছবিটি কিনেছেন, অমনি সুযোগ দিলেন এটিকে দেখাবার। সে যাই হোক, পশ্চিম থেকে এলো সম্বর্ধনা, গুণগ্রাহীরা স্বীকার করলেন বাঙলা দেশের একটি উদীয়মান তরুণ সুরশিল্পীকে 'সংগীতজ্ঞ' বলে। ওদেশের মানুষদের সবই আলাদা, আশ্চর্য্য! তেলা মাথায় ওরা তেল দেয় না!

কালোবরণ বাবুর কণ্ঠটি যেমন মধুর ততোধিক মিষ্টি তাঁর আচার-ব্যবহার। স্পষ্টবাদী বলে একটু অখ্যাতি আছে, যদিও তাকে খ্যাতির ভূষণে ভূষিত করা চলে। অতি শৈশব থেকে উচ্চাংগ সংগীতাদি শিক্ষা করেছেন ভারতের কয়েক জন ওস্তাদের কাছে, তার মধ্যে বাঙলার বরণীয় ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে উনি বিশেষ ভাবে ঋণী।

উপস্থিত মুক্তিপথে এঁর পরিচালনাধীনে 'স্বপ্ন ও স্মৃতি' ছবি; 'মৃণালিনী' নির্মাণরত এবং আরও একাধিক চিত্রের বরাত আছে অদূর ভবিষ্যতে। সাধকের সাধনা সফল হোক···প্রাচী ও প্রতীচীর জয়মাল্য লাভ করুন সংগীতের মাধ্যমে,—সুর-সরস্বতী সহায় হোন সেবকের।

টকির টুকিটাকি

ভক্ত ধ্রুব

রসিক পিক্‌চার্সের কর্ণধার বিমলচন্দ্র মল্লিক যে ভাবে 'ধ্রুব'কে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, তাতে এর শুভ মুক্তি অবিলম্বে আশা করা যায়। মাষ্টার বিভুকে ধ্রুবরূপে দেখতে পাওয়া যাবে, সেই সংগে দেখা দেবেন যমুনা সিংহ, বাণী গাঙ্গুলী, স্বাগতা, সুশীল রায়, গৌরীশংকর, অজিতপ্রকাশ। সংগীতাংশ পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে, আর হবে না কেন, সংগীত-সুধা দান করছেন যে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, উৎপলা সেন ও গায়ত্রী বসু। সব মিলিয়ে 'ধ্রুব' লোভনীয় হয়ে উঠছে বলেই মনে হয়।

শ্রীশ্রীমা

মুভিল্যাণ্ডের পক্ষ থেকে শচীন সেন-রায় ও শান্তি নন্দীর যুগ্ম-প্রচেষ্টা কিছু দিন আগে 'নীলদর্পণ'-এ প্রতিভাত হয়েছিলো। অধুনা 'শ্রীশ্রীমা'র চিত্ররূপের আয়োজন সম্পূর্ণপ্রায়। মায়ের করুণা এঁদের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত করুক—শুভেচ্ছা জানাই।

নদ ও নদী

'নদ ও নদী' আসলে হচ্ছে যশস্বী কথাশিল্পী প্রবোধকুমার সান্যালের একখানি নাম-করা উপন্যাস। কেশব দত্ত প্রোডাকশন এরি চিত্রায়নে উদ্যোগী হয়েছেন। প্রাথমিক করণীয় সমাধা হয়েছে, শিল্পী-নির্বাচনও সমাপ্তিমুখে। কল্পনা মুভিজ লিমিটেড পরিবেশন-স্বত্ব গ্রহণ করেছেন।

শরৎচন্দ্রের

পথ-নির্দেশ! শত মত আর পথ-পরিপূর্ণ এ দেশে মানুষ কোন্ মার্গ অবলম্বন করবে দিশা পাচ্ছে না। তাই না সবাই উন্মার্গগামী হয়ে উঠেছে। প্রমাণ তার ভূরি পরিমাণ মিলছে আমাদের কাজে-কর্মে। এমন অবস্থায় আসছে মনীষা দেবী—যমুনা দেবী—বীরেন চট্টোপাধ্যায়—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়—শিশির বটব্যাল অভিনীত 'পথ-নির্দেশ'!

চিত্রশিল্পী লিমিটেড

জানাচ্ছেন তাঁদের 'স্বপ্ন ও স্মৃতি' রূপালি পর্দায় এলো বলে। আজকের রূঢ় বাস্তবের গূঢ় ইংগিতে সবাই যখন কণ্ঠাগতপ্রাণ, তখন কিছুটা রঙিন স্বপ্ন দেখা আর অবশেষে তার স্মৃতি সম্বল করে বেরিয়ে আসার যদি সুযোগ মেলে—কে না তা চাইবে? সুর-সংগতি ভরা 'স্বপ্ন ও স্মৃতি'—সুরকার হচ্ছেন যশস্বী কালোবরণ!

আর্ট কর্পোরেশনের

'স্বপ্ন ও স্মৃতি' চিত্রে ধীরাজ ভট্টাচার্য! একই নামের প্রতি একাধিক প্রতিষ্ঠানের লোভ-দৃষ্টি! অর্থাৎ সাহিত্যের পীঠভূমি বাঙলা দেশে নামকরণে দৈন্য দশা! অদ্ভুত কাণ্ড! চিত্রশিল্পীর 'স্বপ্ন ও স্মৃতি' বৎসরাধিক কাল সেন্সার হয়ে গেছে, বহু দিন ধরে তার চলেছে প্রস্তুতি-পর্ব এবং তার জন্যে অশেষ ঢক্কানিনাদ। তার পরেও সেই নামে আর একটি নতুন ছবির কার্যারম্ভ—অশোভন তথা হতাশাব্যঞ্জক বটে!

মাকড়সার জাল

ফুটে উঠবে শহরের ছবিঘরে। তার জন্যে নীলকান্ত পিকচার্স-কর্তৃপক্ষ অকৃপণ হস্তে খরচ করে চলেছেন। ছবি-বিকাশ-জহর-অনুভা-শান্তি-অপর্ণা-রেবা-পশুপতি-আশু-নৃপতি সমন্বয়ে গঠিত 'মাকড়সার জাল' পশুপতি কুণ্ডু-পরিচালিত।

বিন্দুর ছেলে

'বিন্দুর ছেলে'-র স্যুটিং সারা হয়েছে, এডিটিং সমাপ্তিপ্রায় —বাকী শুধু রিলিজ। তারও দিন সমাগত সেপ্টেম্বরের মধ্যেই। খবর শুভ বলতে হবে।

এম, কে, প্রোডাকশন

তুলছেন 'বিল্বমংগল'। গৈরিক রচনা বহু দিন পর চিত্রায়িত হচ্ছে। দিলীপ মুখার্জি করছেন নেতৃত্ব। 'সাবিত্রী সত্যবান'-এর পরবর্তী প্রয়াস তাঁর এটি।

অভিশাপ

পরিচালক বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবতম প্রচেষ্টা—ইতিমধ্যে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। কাহিনী লিখেছেন শেফালী দত্ত। বিকাশ-পরেশ-গুরুদাস-মঞ্জু দে-গীতশ্রী'র দর্শন মিলবে, তারি আয়োজনে ব্যস্ত প্রযোজক শ্যামলকুমার দত্ত।

যাত্রার পরে

অরবিন্দ চলিয়া গেলেন, আমার উপর পুলিশের দৃষ্টি সমান ভাবে কয়েক বৎসর চলিতে লাগিল। যাহাতে গুপ্ত পুলিশ আমার বিরুদ্ধে কল্পিত বিবরণ পেশ না করে, তজ্জন্য আমি বাড়ীর বাহির হওয়া বন্ধ করিলাম। এই অবস্থায় এক দিন আমি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বৌবাজারে তাঁহার 'বেঙ্গলী' অফিসে যাই। গুপ্ত পুলিশ আমার সঙ্গ লইয়া 'বেঙ্গলী' অফিসের দরজা পর্য্যন্ত যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি সুরেন্দ্রনাথকে সমস্ত বিবরণ দিলে তিনি নীচে লোক পাঠাইয়া গুপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারীদের উপরে ডাকিয়া আনিলেন। কেন তাহারা আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতেছে এই কথা তিনি জানিতে চাহিলে তাহারা বলে যে, ইন্সপেক্টর নৃপেন ঘোষের আদেশে তাহারা এই কার্য্যে নিযুক্ত আছে। নৃপেন ঘোষকে রিভলভারের গুলী দ্বারা গ্রে ষ্ট্রীটে হত্যা করার অভিযোগে নির্ম্মল রায় অভিযুক্ত হন। তাঁহার পক্ষে ব্যারিষ্টার আর্ডলি নর্টন ছিলেন। দুইবার মামলা হয়, হাইকোর্টের ইহা এক চমকপ্রদ মামলা। মিঃ নর্টন ইঁহাকে কেবল সমর্থন করেন না, পরন্তু ইংলণ্ডে যাইয়া অধ্যয়নের ব্যয়ভারও গ্রহণ করেন।

সার হেনরী কটন

এই সময়ে হাবড়া ষড়যন্ত্র মামলা হয়। এই মামলায় বিখ্যাত যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন। আবার সঙ্গীত-শিক্ষক হেমচন্দ্র সেনের মতন নিরীহ লোকও হাজতবাস করিতে থাকে। রাজসাক্ষী অন্যান্যের সহিত ষড়যন্ত্রে সংশ্লিষ্ট বলিয়া আমার নামও স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ করে এবং একজন ম্যাজিষ্ট্রেট সমভিব্যাহারে ৬ নং কলেজ স্কোয়ারে বাড়ী দেখাইয়া দেয়। পুলিশ আমাকে কেন গ্রেপ্তার করে নাই বলিতে পারি না। এই রাজসাক্ষীকে আমি চিনিতাম না।

একাদিক্রমে তিন মাস বাড়ীর বাহির হই নাই। ডাঃ সুধীরকুমার বসু এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির অন্যতম সহকর্ম্মী ছিলেন। তিনি একদিন আমার নিকট আসিয়া এই কথা জানিতে পারিয়া স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে বলিলেন যে, এরূপ ভাবে গৃহের মধ্যে বন্ধ থাকিলে সুকুমারের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে। ভূপেন্দ্রনাথ বসু তাহার পরে ৬নং কলেজ স্কোয়ারে আসিয়া আমার নিকট সমস্ত বিবরণ জানিয়া আমার পিতাকে বলেন যে, তাঁহার সহিত ভারতের গুপ্ত পুলিশের অধিপতি সার চার্লস ক্লেভল্যাণ্ডের আলাপ আছে। ভূপেন্দ্র বাবু কয়েক দিন পরে এক চা-পার্টিতে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিবার প্রস্তাব করেন এবং তখন আমার কথা উত্থাপন করিবেন মনস্থ করেন। তিনি আমার পিতাকে ও আমাকে তথায় যাইতে বলিলেন। কয়েক দিন পরে আমরা তথায় যাইলে ভূপেন্দ্র বাবু আমাদের সহিত সার চার্লসের পরিচয় করাইয়া দেন। সার চার্লস প্রথমে কঠোর ভাবে আমাকে নানা কথা বলিতে থাকেন। আমি তাঁহার দুই-একটা প্রশ্নের উত্তর দেই। তাহার পরে তিনি আমাকে বলেন যে, তাঁহাকে আমি যেন একখানি পত্র দিয়া সাক্ষাতের জন্য
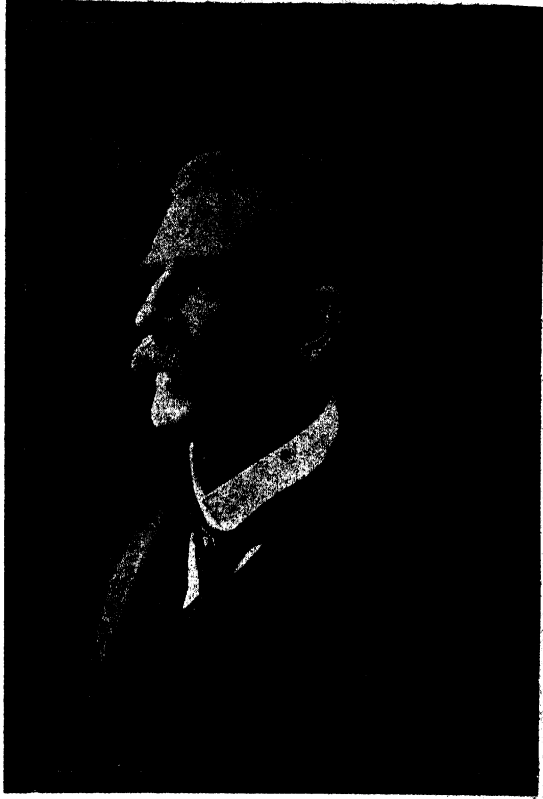
শ্রীসুকুমার মিত্র

দিন স্থির করিতে বলি, তদনুসারে তিনি দিন স্থির করিয়া আমার সহিত বিশদ্ ভাবে আলোচনা করিবেন।

আমি তাঁহাকে এক পত্র লিখি এবং তিনি তাহার উত্তরে একটি দিন স্থির করেন। সেদিন ইন্সপেক্টর শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র এক ট্যাক্সি লইয়া আসিয়া আমাকে তাঁহার সহিত যাইতে বলিলেন। গাড়ীতে উঠিবার সময় আমি চাহিয়া দেখিলাম যে, গোলদীঘিতে উপবিষ্ট গুপ্তচরগণ আমার সঙ্গে যাইবার কোন উপায় নাই দেখিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া আছে। বর্ত্তমানে যাহা গভর্ণরের বাড়ী তাহার পশ্চিম দিকে রাস্তার অপর পার্শ্বে তখন ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়েট ছিল। এখন তথায় ইনকাম ট্যাক্স অফিস ও একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের অফিস। এই বাড়ীর দ্বিতলে সার চার্লসের নিজস্ব অফিস ছিল। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি রূঢ় ভাবে বলেন, "দিন স্থির করিবার জন্য যে পত্র দিয়াছ তাহা নিজ হাতে না লিখিয়া টাইপ করিয়া দিয়াছ কেন?" বুঝিলাম, তিনি হস্তাক্ষর চাহিয়াছিলেন এবং তাহা না পাইয়া বিরক্ত হইয়াছেন। যাহাতে আমার হস্তাক্ষর তিনি না পান, সেই জন্যই আমি টাইপ করিয়া পত্র দিয়াছিলাম। আমি তাঁহার উদ্দেশ্য পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম।

অরবিন্দের ভ্রাতা বিনয়কুমার ঘোষ

সার চার্লস প্রশ্ন করেন, আমি কি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে (স্বর্গীয়া সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা, তখন বার্লিনে বাস করেন) জানি? আমি অস্বীকার করিলে তিনি জানিতে চান, পত্র দ্বারাও পরিচয় হইয়াছে কি না? ইহাতে আমি বিস্মিত হইয়া উল্টা প্রশ্ন করি, "এ রকম প্রশ্ন কেন?" সার চার্লস একখানি কাগজ আমাকে দেখান। তাহাতে কতকগুলি অঙ্ক লিখিত ছিল। তিনি বলিলেন, সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত এই চিঠি স্বর্গীয় বীরেন্দ্র তাঁহার ভগিনীকে (ডাক নাম 'গুনু') লিখিয়াছেন। এই পত্রে বীরেন্দ্র বাবু জানিতে চাহিয়াছেন, যে 'কৃষ্ণকুমার মিত্রের পুত্র সুকুমার চন্দননগর বা অপর কোন স্থানে তাঁহাদের (প্যারিসে অবস্থিত শ্যামজী কৃষ্ণ বর্ম্মা, ম্যাডাম কামা এবং পত্রলেখক স্বয়ং)* প্রেরিত যুদ্ধাস্ত্র সমূহ লুক্কায়িত স্থানে রাখিতে পারিবে কি না। এ সম্বন্ধে ব্যারিষ্টার বি, সি, চ্যাটার্জ্জির সহিতও তাঁহার ভগিনীকে যোগাযোগ স্থাপন করিতে বলেন।' তখন আমি বুঝিলাম, কেন একদিন রাত্রি একটায় এই তিনটি বাড়ীতেই যুগপৎ খানাতল্লাসী করা হইয়াছিল। সে বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

ক্রুদ্ধ হইয়া সার চার্লস আমাকে বলিলেন 'এ দেশ যদি রুশিয়া হইত, তাহা হইলে তোমাদের পরিবারের সমস্ত লোককে সাইবিরিয়ায় চালান করা হইত'; আবার পরক্ষণেই নরম হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি চন্দননগরে যাও?' ক্রমাগত অমূলক অভিযোগে আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 'আমি এক পত্র দিতেছি তাহা লইয়া কেহ আমার বাড়ী যাইয়া আমার ডায়েরীগুলি লইয়া আসুক। তাহাতে হয়ত দেখিবেন, আপনার গুপ্তচর যে তারিখে আমি চন্দননগর গিয়াছি বলিয়া বিবরণ দিয়াছে, ডায়েরীতে দেখা যাইবে যে সেদিন আমি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সহিত আলাপ করিতেছি।' সার চার্লস বলিলেন, 'তুমি অবাঞ্ছিত লোকের সহিত মিশ।' আমি বলিলাম, 'কে অবাঞ্ছিত জানি না। তাহাদের তালিকা দিন—আর মিশিব না।' কিরূপে সাঙ্কেতিক ভাষার লেখা পড়িতে হয় তাহা তিনি আমায় দেখাইয়া দিলেন। শেষ কালে আমি বলিলাম, 'বঙ্গব্যবচ্ছেদে আমাদের একটা অভিযোগ ছিল। তাহা মিটিয়া গিয়াছে তবুও আমার উপর গুপ্তচর কেন?' সার চার্লস বলিলেন, 'তোমার সহিত কথাবার্ত্তায় আমার মন অর্দ্ধেক তোমার পক্ষে ও অর্দ্ধেক তোমার বিরুদ্ধে আছে।' স্বর্গীয় ভুপেন্দ্রনাথ বসু যখন আমাকে সার চার্লসের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবেন বলেন, তখন বলিয়াছিলেন, লোকটা হোঁৎকা কিন্তু ভিতরটা ভাল। সে পরিচয় পাইলাম।

স্বর্গীয় সি, এফ, এণ্ড্রুজ একদিন পিতার নিকট আসিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, "লোকে আমাকে বৃটিশের গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করে।" ইহা শুনিয়া আমার পিতা বিশেষ লজ্জিত হইলেন; নানা ভাবে তাঁহাকে বুঝাইলেন ও সান্ত্বনা দিলেন। গুপ্ত পুলিশ সর্ব্বদা আমার পিছনে আছে কথায় কথায় এণ্ড্রুজ আমার পিতার নিকট শুনিয়া যখন তিনি সিমলায় গেলেন তখন বড়লাটের পত্নী লেডী হার্ডিংকে আমার প্রতি কিরূপ অত্যাচার হইতেছে ও আমার পিতা কিরূপ দেশমান্য ও ধার্ম্মিক লোক তাহা বলেন। সেই সঙ্গে লেডী হার্ডিংকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন তাঁহার প্রভাব দ্বারা আমার প্রতি এই ব্যবহার দূর করিবার ব্যবস্থা করেন। লেডী হার্ডিং আগ্রহের সহিত তাহা করিবেন বলেন। কয়েক মাস পরে স্বর্গীয় এণ্ড্রুজ আবার সিমলায় যান। এবং সেখানে এই সম্পর্কে তখন যাহা ঘটিয়াছিল তাহা তিনি আমার পিতার নিকট বিবৃত করেন। তাহা

* শ্যামজী কৃষ্ণ বর্ম্মা, ম্যাডাম কামা প্রভৃতি য়ুরোপে বাস করিয়া ভারতে বিপ্লব আনয়নের জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা প্যারিসে তৎকালে (১৯০৬) বঙ্গদেশে যে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় তাহা প্যারিসে উত্তোলন করেন। বার্লিনেও উত্তোলিত হইয়াছিল।

তাঁহার কথায় বলিতেছি—"অতি প্রত্যুষে উঠিয়া আমি লর্ড হার্ডিংএর প্রাসাদে গিয়া তাঁহাদের বসিবার কক্ষে যাইয়া দেখি, তাঁহারা স্বামি-স্ত্রী উভয়ে হাঁটু গাড়িয়া প্রার্থনা করিতেছেন। এক রন্ধ্র দিয়া সূর্য্য-রশ্মি লর্ড হার্ডিংএর মুখে পড়িয়াছে। তাঁহার মুখ উদ্ভাসিত। প্রার্থনান্তে তাঁহারা আমার সহিত কথা বলিলেন। লেডী হার্ডিং আমাকে অন্যত্র ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, আপনার অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য আমি নিজেই ভারতের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর (মিঃ ক্রেইগ) কাছে যাইয়া সুকুমারের উপর পুলিশের ব্যবহার ও ক্রমাগত তাহাদের গৃহতল্লাসী করা, হয়রান করা সম্বন্ধে বলিয়া তাঁহাকে ইহা বন্ধ করিতে বলি। তদুত্তরে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী কঠোর ভাবে আমাকে বলিলেন, শাসন-কার্য্যে আপনি হস্তক্ষেপ করিতে চাহিতেছেন কেন? এই কথা বলিতে বলিতে লেডী হার্ডিংএর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী এই ভাবে আমাকে অপমান করিলেন।" এই কথা মিঃ এণ্ড্রুজ যখন আমার পিতার নিকট বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখও বিষাদপূর্ণ ছিল।

পরলোকগত মিঃ গোখলে জানিতেন যে, আমার পিছনে বৎসরের পর বৎসর গুপ্ত পুলিশ লাগিয়া আছে। আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, আমার প্রতি পুলিশের দৃষ্টি আছে কিনা। একদিন তাঁহার বাড়ী যাইলে তিনি আমাকে বলেন, "তোমার পিছনে পুলিশ ঘুরে বলিয়া তুমি উৎকণ্ঠিত হও, আর ঐ দেখ, রাস্তার ঐ লোকটি আমার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছে। আমার উপরও পুলিশের দৃষ্টি আছে। আমারও রেহাই নাই।" এ বলিয়া আমায় প্রবোধ দিলেন।

অতঃপর পুলিশের এই সকল কার্য্যের বিবরণ দিয়া আমি ইংলণ্ডে মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড, সার হেনরী কটন প্রভৃতি কয়েক জনকে পত্র দেই। তাঁহারা তৎকালীন ভারত-সচিবের (লর্ড ক্রু) সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ভারত-সচিব যাহাতে আমার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন এবং পুলিশের এরূপ হয়রাণি করা বন্ধ হয় তজ্জন্য তাঁহারা অনুরোধ করেন। কিছুকাল গত হইলে এই সকল চেষ্টার ফল বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

১৯১৪ সালে মার্চ্চ মাসে সার হেনরী কটন ইলংণ্ড হইতে আমাকে এক পত্র দেন, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা হইল :

45, St. John's Wood Park
London N. W
7th March, 1914

Dear sir,

I have received with pleasure you letter of the 11th February which is an anniversary you justly commemorate in your family.

...."It must be no small satisfaction to your father who has done so much—and suffered—for the cause of patriotism in Bengal to be able to look back on the past and now regard the present condition of the country. A great and memorable advance has been made during the past decade which could never had been attained without suffering and trial on the part of those whose names will be always associated with the movement. You are fortunate now in the possession of such a sympathetic Governor as Lord Carmichael and Viceroy as Lord Hardinge and in the contemplation of re-united Bengal. The auguries for the future are now all as hopeful as they were depressing five or six years ago. This is indeed not only a great consideration but a sufficient reward to those who have laboured to achieve the result.

Your good friend Judge Mackarness is very well and so I am thankful to say am I after recovery from a long and dangerous illness. I think I am right in saying that your father's age is about the same as my own and we are therefore growing old together but it is the privilege of old age to live again in the lives of one's children and in the enjoyment of their happiness we both share...."

With my kindest wishes to you both.

I am yours sincerely,
(Sd) Henry Cotton.

To
Babu Sukumar Mitra.

সার হেনরী কটনের সহিত আমার মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর পরিচয় ছিল। সার হেনরী আই, সি, এস, হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে মত পোষণ করিতেন। অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি আসামের চীফ কমিশনার ছিলেন। তিনি রাজনারায়ণ বসুর কনিষ্ঠ পুত্রকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরী দিতে চাহিয়াছিলেন।

অরবিন্দ পণ্ডিচেরী চলিয়া যাইবার পরে মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট হইতে কর্ম্মী যুবকগণ কলিকাতা আসিয়া তাঁহার আদেশাদি আমাকে জানাইত। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। তখন সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পুলিশ ভারত-রক্ষা আইনে আটক রাখিতে আরম্ভ করিলে শ্রদ্ধেয় অমরেন্দ্র-নাথ চট্টোপাধ্যায় অন্তর্দ্ধান করেন। পুলিশ তল্লাস করিয়া তাঁহাকে পাইল না। বৎসরাধিক কাল পরে পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দের গৃহে এক জটাজুটধারী দীর্ঘশ্মশ্রু সন্ন্যাসী আসিলেন।

অরবিন্দ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। অমরেন্দ্র বাবু তাঁহার নাম বলিলে অরবিন্দ তাঁহাকে পাইয়া আনন্দিত হন।

আমার পিতা অরবিন্দকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সেজন্য তিনি চাহিতেন যে অরবিন্দ পণ্ডিচেরী হইতে আবার বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসেন। সেই জন্যই বাঙ্গালার গভর্ণরের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য হইলে তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন যে অরবিন্দ বাঙ্গালা দেশে ফিরিলে, গভর্ণমেণ্ট আর যেন তাঁহাকে নিগ্রহ না করেন। আশ্চর্য্যের কথা, ৫ই ডিসেম্বর আমার পিতার মৃত্যু হয়, আবার এই ৫ই ডিসেম্বরই অরবিন্দ পরলোক গমন করেন!

১৯০৮ সালে মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলাম। অধিবেশন শেষ হইলে সিংহল যাই, পথে পণ্ডিচেরী পড়ে। অত্যন্ত আগ্রহ থাকিলেও পণ্ডিচেরী যাইয়া অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। তখন ভারত-রক্ষা আইন চলিতেছে, পাছে হাঙ্গামায় পড়ি, সে জন্য যাইবার ইচ্ছা দমন করিতে হইল। পাশ দিয়া দক্ষিণে যাইলাম।

১৯০৯ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বারীন্দ্র দাদা প্রভৃতি সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় আন্দামান হইতে মুক্তি লাভ করেন। বারীন্দ্র দাদা তাহার পরে পণ্ডিচেরী গমন করেন।

অরবিন্দের সহিত আমার নানা বিষয়ে কথোপকথন হইত। একদিন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ভারতবাসীর মধ্যে কোন্ জাতি তুলনায় অধিকতর চরিত্রবান? তিনি উত্তর দিলেন, বাঙ্গালী। সেই সঙ্গে বলিলেন, আইরিশ জাতিও অন্যান্যের অপেক্ষা চরিত্রবান।

একদিন রুশিয়ার নিহিলিষ্টদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে পুস্তক পড়িবার কালে একজন নিহিলিষ্ট পথিপার্শ্বে অবস্থিত ক্ষুধায় কাতর ও দুর্ব্বল এক বিড়ালকে দেখিয়া কিরূপ সযত্নে তাহাকে তুলিয়া লইয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল, পুস্তকের সেই অংশ অরবিন্দকে পাঠ করিয়া শুনাইয়া প্রশ্ন করিলাম, কঠিন-হৃদয় নিহিলিষ্টের এ কি কার্য্য? অরবিন্দ বলিলেন, "তুমি ভুল সিদ্ধান্ত করিয়াছ, প্রাণীর দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিয়া নিহিলিষ্টদের প্রাণ গলিয়া যায়, সেই জন্য তুচ্ছ ঐ বিড়ালের কষ্ট তাহার সহ্য হইল না বলিয়া তাহার সেবা করিয়াছে। অপর দিকে অত্যাচারীর প্রতি তাহারা নির্ম্মম, যম সদৃশ।"

ইস্পাতের কাঠামোর বিরোধিতা

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বাতিল করিয়া নূতন ব্যবস্থায় বাঙ্গালার প্রথম গভর্ণর হইয়া আসিলেন—লর্ড কারমাইকেল। কোনও-ক্রমে তিনি আমার পিতার নাম অবগত হন এবং তাঁহার প্রতি দেশবাসীর মনোভাব জানিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উৎসুক হন। লর্ড কারমাইকেল তাঁহার সেক্রেটারী মিঃ গোর্লেকে এই কথা বলেন। মিঃ গোর্লে প্রফেসর সুবোধচন্দ্র মহলানবিশকে তাহা জানান। প্রফেসর মহলানবিশ আমার পিতার নিকট গভর্ণরের মনের কথা প্রকাশ করেন। আমার পিতার সহিত মিঃ গোর্লের সাক্ষাৎ হয়। তখন আমার পিতা তাঁহাকে বলিলেন, যেরূপ ভাবে সাজগোজ করিয়া গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয় তাহা তাঁহার নাই এবং তিনি তাহা করিতে পারিবেন না, সুতরাং সাক্ষাৎ করা সম্ভব হইবে না। ইহাতে লর্ড কারমাইকেল জানাইলেন যে, আমার পিতা যেরূপ পোষাক পরিতে অভ্যস্ত তাহাই পরিয়া আসিতে পারেন, কোনও বাধা হইবে না। আমার পিতার সহিত গভর্ণরের সাক্ষাৎ হইল। গভর্ণর সাদাসিদা লোক ছিলেন, উভয়ে পরে সৌহার্দ্দ্য হয়। মাঝে মাঝে গভর্ণর আমার পিতার সহিত আলাপ করিবার জন্য সংবাদ দিয়া ডাকিয়া পাঠাইতেন। অরবিন্দকে বাঙ্গালায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য আমার পিতা অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। এইরূপ একদিন সাক্ষাতের সময়ে অরবিন্দকে পণ্ডিচেরী হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য আমার পিতা গভর্ণরকে অনুরোধ করেন। তখন হাইকোর্টের বিচারে 'কর্ম্মযোগিনে'র মুদ্রাকর মনোমোহন ঘোষ বেকসুর খালাস পাইয়াছেন। গভর্ণর উৎসাহের সহিত বলেন যে, তিনি বিশেষ চেষ্টা করিবেন। বৎসরাধিক কাল অতিবাহিত হইলেও যখন কিছু হইল না, তখন একদিন আমার পিতা গভর্ণরকে বলিলেন, "কই, আপনি যে অরবিন্দকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টা করিবেন বলিয়াছিলেন, তাহার কি করিলেন?" গভর্ণর উত্তরে বলিলেন, "আমিও পারিলাম না for the simple three letters—I. C. S."

আমার পিতার সহিত তাঁহার স্নেহের অরবিন্দের আর সাক্ষাৎ হইল না।

শেষ

আগামী সংখ্যা থেকে

দুই নগরের গল্প

(চার্লস ডিকেন্স লিখিত 'এ টেল অব টু সিটিজ' গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ)

অনুবাদ করছেন শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্ত ভাদুড়ী

খোরপোশ-পার্বণ

অ, আ, ই

লক্ষ্মী-অন্নপূর্ণার দেশে জন্মেছে ব্রাহ্মণী। উদ্‌বৃত্তের দেশে।

গোলাভরা ধানের দেশ, শস্য-শ্যামলা বাঙলা দেশ। উনুনের আঁচে দগ্ধ হয়েও প্রস্তুত করেছে কত কি। কত আহার্য্য। হিঙের গন্ধ আর জাফরানের রঙে রন্ধন-ঘরের অন্য এক শোভা হয়েছে। দশভুজার মত দশ হাতে বুঝি পলকের মধ্যে তৈয়ারী করেছে এটা-ওটা-সেটা। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার, কুমুদিনীর মনের মত সাজানো ভাঁড়ার, যা চাইবে তাই মিলবে। অভাব নেই উপকরণের। একসঙ্গে কতগুলো উনুনে আগুন প'ড়েছে। কোনটায় ডেকচী আর কোনটায় কড়াই চেপেছে। গমগমে আঁচে ঘাম ঝরছে ব্রাহ্মণীর। এক মুহূর্ত্ত অপচয় করলে চলবে না। ধ'রে যাবে ডালের হাঁড়ী, পুড়ে যাবে শাকের তরকারী। চোখে-কানে যেন দেখতে পায় না ব্রাহ্মণী। শ্বাস ফেলে কি না ফেলে। পরিমাণ ভুল হয়ে যায় যদি। নুণ বেশী আর ঝাল কম হয় যদি। ভাজা মাছ যদি খ'রে যায়। ক'ষে যায় অম্বল। টক যদি না হয় চাটনি। হাতে-হাতে জোগান দেয় ক'জন দাসী। হাতের কাছে এগিয়ে দেয় বাটনা-মশলা। ফোড়নের উগ্র গন্ধে চোখে জল ঝরে ব্রাহ্মণীর। কখনও হাঁচে, কখনও কাশে। আঁখনির জল ঢালে গলদা চিংড়ীর পোলাওয়ে।

ক'বার তাড়া দিয়ে গিয়েছিল অনন্তরাম। বলেছিল,—বাজী ভোর করবে না কি তুমি বামুনদি? লোক-জনা চ'লে গেলে তখন খাইও কেনে কাকে খাওয়াবে! তোমার নড়তে-চড়তেই বেলা কাবার হয়ে গেল দেখছি।

ঘর্ম্মাক্ত কপাল ভিজে গামছায় মুছতে-মুছতে বলে ব্রাহ্মণী,—অনন্ত, তুমি কানের কাছে এমন আজে-বাজে বকনি বলছি! পুড়িয়ে মারতে চাও?

অনন্তরাম কথায় দুঃখ ফুটিয়ে বলে,—আগ কর কেনে, হুজুর যে তাড়া লাগিয়েছে উদিকে। ক্যাতক্ষণ লাগবে তুমিই বল' না?

তখন ইলিস মাছের দই-মাছ রাঁধছিল ব্রাহ্মণী। আদা-হলুদ ছাড়ছিল কড়াইয়ে। কাঁচা তেল ঢালছিল। বললে,—জায়গা করাওগে না তুমি। ডাকব'খন আমি।

অনন্তরাম বললে,—জায়গা হয়ে গেছে। পাতে দেওয়ার অপিক্ষা শুধু।

ব্রাহ্মণী বললে,—দু' দণ্ড দাঁড়াও। দই-মাছটা হ'লেই—

—এ যে বাবা আশীর্ব্বাদের খাওয়া!

খাওয়ার ঘরে ঢুকেই বললে হেমনলিনীর ছেলেরা। বিস্মিত হয়ে গেল যেন খাওয়ার জোগাড় দেখে। কতগুলো বাটিতে কত কি দেওয়া হয়েছে। বগি থালায় সাজানো কত ব্যঞ্জন। আমিরী পোলাও-কালিয়া থেকে ফকিরী শাকান্ন। গোবিন্দভোগ ভাতের চূড়ায় রূপোর বাটিতে গব্যঘৃত। বগি থালায় উচ্ছে-চচ্চড়ি থেকে আছে হয়তো তপসি মাছের ঘি-তপসি। নটে শাকের বাটি-চচ্চড়ি থেকে বেগুনের কলজি। আর বাটিতে সুপ-শুক্তো। ডাল, ঝোল, কালিয়া। চিংড়ীর বালুচাও। লাউ দিয়ে কাঁকড়া। কোর্ম্মা-কারি। মিটুলীর দোপেঁয়াজা। শাক দিয়ে মাংস।

ভোজনবিলাসী বাঙালী ব্রাহ্মণী। হাত-যশে ক'রে খাচ্ছে। প'ড়েছে না শুনেছে হয়তো কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত। কবিকঙ্কণের চণ্ডী। রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্ত্তন। শিখেছে কার কাছে কে জানে, বেশ পাকাপাকি আয়ত্ত করেছে রন্ধনশিল্প। ভুনিখিচুড়ী থেকে শামীকাবাব পর্য্যন্ত রাঁধতে জানে। মাছ-মাংস থেকে পুলিপিঠে পর্য্যন্ত।

—খালি পেটে খাওয়া যায় কখনও?

হেমনলিনীর ছেলেদের দলের মধ্যে থেকে মন্তব্য কাটল কে যেন।

জহর আর পান্না হাসলো একসঙ্গে। জহর বললে,—যথার্থ কথা! এক-আধ পেগ পেটে পড়লে দেখা যেতো খাওয়া কাকে বলে!

—কত্থুইয়ে কত্থুই ঠেকা মাইরী! হক্ কথা বললি বটে!

দলের মধ্যে থেকে কে যেন বললে।

হাসির রোল প'ড়ে গেল ঘরের মধ্যে। অট্টহাস্যরোল।

আপ্যায়িত করে কৃষ্ণকিশোর। বলে,—মা তো নেই, লজ্জা ক'রে খেও না যেন ভাই জহর পান্না।

জহর বললে,—তোকে বলতে হবে না! এমন খাবো যে পিঁপড়ে কেঁদে যাবে।

অন্দরের ঘর। এমনিতেই অন্ধকার থাকে। দেওয়ালে যেজন্য জ্বলছিল একটা দেওয়াল-গিরি। দিনের বেলাতেও। এক কোণে তাঁবেদার দাঁড়িয়ে রাম-পাখা চালাচ্ছিল। কৃষ্ণ-কিশোর বললে,—জোরে পাখা করছ না কেন? বাবুদের যে গরম লাগছে!

তাঁবেদারের পাখার গতি দ্রুত হয়ে ওঠে হঠাৎ। ঘরে যেন ঝড় বইতে থাকে। মাছির ঝাঁক উড়ে পালিয়ে যায়। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খানা চলতে থাকে। হাসি-মস্করা চলতে থাকে। উত্তম ব্যঞ্জনের তারিফ করে কেউ কেউ।

ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টা পড়তে থাকে। কলের ভোঁ বাজতে বাজতে কখন থেমে গেছে। পরিচ্ছন্ন আকাশে শরৎ-দিনের

ছিন্নভিন্ন শুভ্র রূপালী মেঘের ভিড় জমতে থাকে। অন্দরের ঘর, মধ্যদিনের সূর্য্যালোকেও বিন্দুমাত্র অন্ধকার ঘোচে না। পাখার হাওয়ায় দেওয়ালগিরির শিখা কাঁপছে ধিকি-ধিকি।

মাকে মনে প'ড়ে যায় কৃষ্ণকিশোরের। আশৈশব যার ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়েছে, যার স্নেহে আর যত্নে দিনে-দিনে গ'ড়ে উঠেছে, সেই কুমুদিনীকে। কুমুদিনীর শান্ত সৌম্য মুখাকৃতি ভেসে ওঠে চোখে; কুমুদিনীর মুখের পবিত্র মৃদু-হাসি। কেন কে জানে মনটা যেন অতিরিক্ত-চঞ্চল হয়ে উঠছে থেকে-থেকে। কোথায় এখন মা। কোথায় কুমু। কুমুদিনী ?

কাশীর ঢুণ্‌ঢীরাজ গণেশের পায়ে পুষ্পার্ঘ্য চাপিয়ে মুদিত-চক্ষে ও করজোড়ে দাঁড়িয়েছিল কে এক যোগিনী—মুখে যাঁর কষ্টভোগের মালিন্য। কোটরগত আঁখির নীচে প'ড়েছে যাঁর কালির লেপন। যাঁর শরীর কৃশ। রুক্ষকেশ। বাহুতে ঝুলছে পেতলের সাজি। সাজিতে ফুল-চন্দন।

—মাজী, বাবাকে দেখবেন না ? হাম লে যাবে, ভিড় বহুৎ আছে। বাবাকে দর্শন করবে, মাথা স্পর্শ করবে। চলিয়ে মাজী। কুছ্ ডর নেহি।

রুদ্র-তপস্বীর পেছনে কথা বলে মন্দিরের পাণ্ডা। চোখে লোভাতুর দৃষ্টি ফুটিয়ে কথা বলে। কাকুতি-মিনতি করে।

অগুরু ধূপের গন্ধ আসে কোথা থেকে। ফুল আর চন্দনের গন্ধ। কর্পূরের গন্ধ।

কত কথা ব'লে যায় ঐ যোগিনী। কত মন্ত্র আওড়ায়। অশ্রুসিক্ত লোচনে কত অনুরোধ জানায়। মন্দির-পথের কোলাহলে কোন বিরক্তি লাগে না। ধ্যানস্তিমিত চোখে পুত্তলিকার মত দাঁড়িয়ে থাকে পূজারিণী। বিড়-বিড় ব'কে যায়।

বলে,—হে গৌরীপুত্র, তুমি আমার সকল বিঘ্ন নাশ কর, তোমাকে আমি প্রণাম করি। হে মহাজ্ঞানী, আমার অজ্ঞান মোচন কর, তোমাকে আমি প্রণাম করি। হে অভয়, আমার ভয় দূর কর, তোমাকে আমি প্রণাম করি।

গণপতি গণেশের মুখে কথা ফোটে না। অপলক হস্তীচক্ষু।

মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হতে চলেছে। এখনও এক গণ্ডূষ জল পর্য্যন্ত খাওয়া হয়নি কুমুদিনীর। কখন হবে কে জানে! বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণাকে যে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়নি এখনও।

মন্ত্রোচ্চারণের ফাঁকে-ফাঁকে পুত্র আর পুত্রবধূকে মনে জাগে। বৌটা কেমন আছে কি জানি, ভাবেন কুমুদিনী। বুকের ভেতরে পাঁজরা ক'টা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। চোখ দু'টো জালা করে কেন। দীর্ঘশ্বাস পড়ে একটা। কুমুদিনী মন্দির-পথ ধ'রে ধীরে-ধীরে এগোতে থাকেন। পা দু'টো কাঁপতে থাকে বুঝি। সাজিটা বাহু থেকে প'ড়ে যাবে না তো।

বৌ তখন বঙ্কিম বাবুর 'কপালকুণ্ডলা' পড়তে-পড়তে বিভোর হয়ে গেছে। আত্মজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। পড়ছে তো পড়ছেই। রাজেশ্বরী পড়ছিল :

কাননতলে
"—Tender is the night,
And haply the Queen moon
is on the throne,
Clustered around by all her starry fays,
But here there is on light." —Keats.

বাঙলায় এত কথা থাকতে বঙ্কিম ইংরাজী কথা জুড়েছে কেন মরতে! রাজেশ্বরী পড়তে গিয়ে বিরক্ত হয়। বিদেশী ভাষা বুঝতে পারে না যে।

হঠাৎ কোথা থেকে আবির্ভাব হয় এলোকেশীর।

ঘরে ঢুকে পড়ে হঠাৎ ঝড়ের মত। এলোকেশীর হাতে কাচা কাপড়। রাজেশ্বরীর ছেড়ে-দেওয়া জামা, কাপড়, সায়া, কাঁচলী। শুকিয়ে গেছে, কোথা থেকে তুলে এনেছে এলোকেশী। ঘরের আলনায় তুলে রাখবে। এলোকেশী বললে,—ছ্যাখ্ রাজো, কে এয়েছে ছ্যাখ্।

—কে লা, কে এলো ?

'কপালকুণ্ডলা' রেখে উঠে পড়ে রাজেশ্বরী। পালঙ থেকে উঠে দাঁড়ায় মেঝেয়। গভীর-নীল রঙের একটা ছোট কার্পেট পাতা ছিল মেঝেয়। উঠে দাঁড়িয়ে ঘোমটা খোঁজে রাজেশ্বরী। বৌ মানুষ, কে না কে এসেছে। বলা নেই কওয়া নেই এসে পড়েছে খাস-কামরায়।

পায়ে তোড়া। ঝম-ঝম শব্দ বাজে কাছেই। চলনের শব্দ। কে আসছে।

তোড়া পায়ে কে আসে ? রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা ক'রে থাকে রাজেশ্বরী। কয়েক মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা, তোড়ার শব্দ ঘরে পৌঁছয়। তোড়া পায়ে একটি কিশোরী। ফুটফুটে মেয়ে একজন। কুমারী, কিশোরী।

অবাক-চোখে চেয়ে থাকলো রাজেশ্বরী।

ফুলের মত মেয়েটিও কাজল-কালো চোখ মেলে আছে। দেখছে না দেখাতে এসেছে। রাজেশ্বরী ভাবলো, না সত্যিই কখনও দেখা পাওয়া যায় না এমনটি। এ যে দুর্লভ! অদৃষ্টপূর্ব্ব!

—বৌদি! ব'লে ফেললে কথা, ঐ কিশোরী। আদো-আদো গলায়।

—বল' ভাই! কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেলো রাজেশ্বরী। অচেনা মেয়েটির একটি হাত ধ'রলো সস্নেহে।

লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে গেল মেয়েটি। কি যেন বলতে চায়, বলতে পারে না। আলতা-রাঙা ঠোঁটের ফাঁকে কথা উঁকি মারে। বলে,—বৌদি, জ্যাঠাইমা বললেন যে—বললেন যে, আজ রেতে তুমি আমাদের বাড়ীতে খাবে। আজ পুণ্যের দিন আমাদের। লোকজন খাবে। জ্যাঠাইমা ব'লে দিলেন যে—

মেয়েটির মুখে কথা যেন জোগায় না। কথা বলতে বলতে হাঁফিয়ে ওঠে। রাজেশ্বরী কিশোরীটির হাত ধ'রে বসালো কার্পেটে। বললে—তুমি কে? জ্যাঠাইমা কে? আমি তো চিনি না?

কি উত্তর দেবে এ কথার। মেয়েটি পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে। দেখে হয়তো রাজেশ্বরীকে।

পুণ্যাহের দিন বড়বাড়ীতে। লোকজন খাবে।

খাবে যত আত্মজন। দূর আর নিকট সম্পর্কের যত আত্মীয় খাবে এই উৎসবে। গমস্তা আর আমলাদেরও খাওয়ানো হবে। পাড়া-পড়শীদেরও কেউ কেউ খাবে। পুণ্যাহ—পুণ্যকর্ম্ম করতে হয় যেদিন, জমিদারীর খাতা-পত্তন করতে হয় যেদিন। এক বেলা ফলার আর আরেক বেলায় যত ভাল-মন্দ খাওয়া। সমস্ত দিন ধ'রে লোক খাবে বড়বাড়ীতে। ভিয়েন বসেছে ক'দিন আগে থেকে। মেঠাই, দরবেশ, বঁদে আর খাজা তৈরী হয়েছে।

মফঃস্বলের কাছারীতেও উৎসব হবে আজ। কাছারীর ফটকে ডাব-কলসী আর কলাগাছ বসেছে। দড়িতে ঝুলবে আম্র-পল্লব আর সোলার কদম ফুল। প্রজাদের খাওয়ানো হবে। রাধাবল্লভী আর আলুর দম। দই আর মিষ্টি। যে যত পারবে খাবে।

—তুমি বুঝি ঐ বড়বাড়ীর মেয়ে?

মুখে হাসি ফুটিয়ে রাজেশ্বরী শুধোয়।

মেয়েটি বললে,—হঁ্যা, আমি সেজো বাবুর মেয়ে। আমার নাম মাধবীলতা। জ্যাঠাইমা আমাকে পাঠালেন বলতে। জ্যাঠাইমা বলতে বলেছেন তুমি যেন বেশ ভাল গয়না-গাটি প'রে যেও। অনেক মেয়ে-বৌ আসবে ও-বেলায়।

—কার সঙ্গে যাবো? বললে রাজেশ্বরী। ফিস-ফিস বললে,—তোমার দাদা যাবে না?

মাধবীলতা বললে,—হঁ্যা যাবে। দাদাকে ব'লবে জ্যাঠাইমার ছেলে। সদরবাড়ীতে বলছে দাদাকে। তুমি যাবে তো বৌদি?

—হঁ্যা যাবো। জ্যাঠাইমা ব'লে পাঠিয়েছেন, যাবো না? বললে রাজেশ্বরী। বললে,—তুমি একটু বসবে? আমি এক্ষুনি আসছি।

মাধবীলতা বলে,—কোথায় যাচ্ছো? আমি এখন যাই। মা বলেছে যাবে আর আসবে। বাড়ীতে অনেক কাজ।

হেসে ফেললে রাজেশ্বরী। শব্দহীন হাসি। বললে,—আমিও যাবো আর আসবো। তুমি এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর।

ঘরে একা মাধবীলতা দেখে ইতিউতি। দেওয়ালের ছবি দেখে। ঘরের সাজসজ্জা দেখে। জানলার বাইরে আকাশ দেখে। আলমারীর আয়নায় দেখে নিজেকে। ঠোঁট উলটে-উলটে দেখে। ঠোঁটে আলতা আছে না নেই। টুকটুকে রাঙা ঠোঁট। কাচপোকার টিপ কপালে। সভঃস্নাত ঝাঁকড়া চুলে রেশমের ফিতা। লাল রঙের সিল্কের ফিতা, বো ক'রে বাঁধা। পাট-ভাঙা কাপড়, লাল রঙের। পাকা গিন্নীর মত দেখাচ্ছে কি মাধবীলতাকে? না অনাঘ্রাত ফুলের মত? কুমারী কিশোরী মাধবীলতা। শাড়ী, ফিতা আর আলতা, রক্তিম রঙে আরক্ত হয়ে ব'সে থাকে মাধবীলতা।

—দেখলে তো, আমি গেলাম আর এলাম? হাসি-মুখে বললে রাজেশ্বরী। ঘরে ঢুকে বললে,—তুমি ভাই বেশ! বেশ দেখতে তোমাকে।

কথা বলতে-বলতে কার্পেটে এসে ব'সলো। বললে,—তোমার নামটিও বেশ। তুমি ভাই কখনও কখনও বেড়াতে আসো না কেন এখানে?

—কার সঙ্গে আসবো? জ্যাঠাইমা যে আসতে দেবেন না। কোথাও যেতে দেন না। খুশী-খুশী কণ্ঠে কথা বলে মাধবীলতা। হয়তো-রূপপ্রশংসায় গর্ব্ব হয় মনে মনে।

কথা বলতে গিয়ে থেমে যায় রাজেশ্বরী।

কে জ্যাঠাইমা, কে মাধবীলতা, কে কার মা জানে না সে। চেনে না কাকেও। কার সঙ্গে কার কি পরিচয়। কি কথা বলতে কি বুঝবে মাধবীলতা কে জানে, চুপ ক'রে যায় রাজেশ্বরী।

বাইরে দাঁড়িয়েছিল এলোকেশী।

খোপায় আঙুল চালিয়ে উকুন মারছিল মাথার। রাজেশ্বরী কাছাকাছি গিয়ে চুপি-চুপি ব'লে এসেছে,—এক রেকাবী খাবার চাই এলো। বামুনদিকে বল, ভাঁড়ার থেকে দেবে সাজিয়ে। রূপোর ডিস-গেলাসে দিতে বলবি।

মাধবীলতা বললে,—জ্যাঠাইমা ব'লে দিয়েছেন পাল্কী পাঠিয়ে দেবেন। সকাল সকাল যেতে বলেছেন তোমাকে। বিকেলে পাল্কী আসবে।

—তুমি থাকবে তো? শুধোয় রাজেশ্বরী।

—হঁ্যা থাকবো। তোমার জন্যে, দাঁড়িয়ে থাকবো আমি। বললে মাধবীলতা।—এখন আমি যাই তবে?

এমন সময়ে ঘরে ঢুকলো এলোকেশী। রেকাবী আর জলপাত্র বসিয়ে দিলে কার্পেটে। রাজেশ্বরী বললে,—যাবে তো, মিষ্টি-মুখ ক'রে তবে তো যাবে? না খেলে আমি যে দুঃখ পাবো মনে।

মিটি-মিটি হাসে মাধবীলতা। মিষ্টি-মিষ্টি হাসি। টুকটুকে লাল ঠোঁটের ফাঁকে-ফাঁকে দেখা দেয় শুভ্র দন্তপাতি। মাধবীলতা গয়না পরেছে কয়েকটা। হাতে ক'গাছি চুড়ি, কণ্ঠহার, কর্ণভূষা। গয়নায় রঙীন রত্ন—চুণী পান্না মুক্তো। নাকে নোলক ঝুলছে, শিশিরবিন্দুর মত। মাধবীলতা বললে,—আমি তবে একটা মিষ্টি খাচ্ছি। তুমি মনে কষ্ট পাবে কেন, আমি বেশী খাবো না।

—বেশ তো, তুমি যা পারো খাও। কিন্তু না খেলে চলবে না ভাই! ছাড়বো না আমি। রাজেশ্বরী কথা বলে বয়স্কের গাম্ভীর্য্যে। বলে,—তুমি এখনই চলে যেতে চাও? থাকো না এখানে কিছুক্ষণ?

মিষ্টি মুখে দেয় মাধবীলতা। মতিচুর না মনোহরা খেতে

খেতে বলে,—কত কাজ বৌদি বাড়ীতে। থাকতে পারি আমি? কাজ করতে হবে না আমাকে?

হেসে ফেললে রাজেশ্বরী। কাজের কথা শুনে বিশ্বাস হয় না, মাধবীলতা কি কাজ করবে? বলতে হয় তাই বোধ হয় বলছে। সাজানো কথা বলছে। তৈরী কথা। খিল-খিল হাসতে-হাসতে রাজেশ্বরী বলে,—তুমি করবে কাজ? কি কাজ ভাই? পেটের ছেলেকে ঘুম পাড়াবে বুঝি?

লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে যায় যেন ননদিনীটি। বলে,—ধ্যেৎ, তাই বললাম আমি? তুমি যেন কি বৌদি! কত কাজ বলো তো আমার? পাতা মুছবো, পান সাজবো শ'য়ে-শ'য়ে, জ্যাঠাইমা কত ফাই-ফরমাশ করবে! ব'লবে যে মাধু, কুটো ভেঙ্গে দু'খানা করলি না? তখন?

নকল গম্ভীর হয় রাজেশ্বরী। চোখ দু'টোকে বড় ক'রে বলে,—তবে আর ভাই ধ'রে রাখবো না। তোমাকে যে হেঁশেল আগলাতে হবে কে জানতো বল'?

মাধবীলতা লজ্জায় কাতর হয়। যা নয় তাই বলছে বৌঠাকরুণ। জল খেয়ে কণ্ঠ ভিজিয়ে নেয়। বলে,—যাঃ, হেঁশেল আগলাবে তো সেজো কাকীমা। আমি শুধু পাতা মুছবো, পান সাজবো।

শাড়ীর আঁচল এগিয়ে দেয় রাজেশ্বরী। বলে,—মুখ মোছ', হাত মোছ'। জ্যাঠাইমাকে ব'ল, হুকুম যদি পাই নিশ্চিত যাবো।

—কে দেবে হুকুম? কুমু জ্যাঠাইমা তো কাশীবাসী হয়েছে। তবে? কথায় অজ্ঞতা ফুটিয়ে কথা বলে মাধবীলতা।

রাজেশ্বরীর মুখে সহসা আঁধার নামে বুঝি।

হাসি-খুশী মুখ ছিল, পলকের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল হাসি। কি দুর্ভাগ্য, শাশুড়ী থাকতেও রইলো না! চ'লে গেল ধরা-ছোঁওয়ার ঊর্দ্ধে। পুণ্য অর্জ্জন করতে গেল। এখানে ব'সে পুণ্যি হয় না, কাশী চ'লে যেতে হয় কচি বৌটাকে ফেলে? দয়া-মায়া নেই মনে? পেছন ফিরে দেখতে নেই?

—তবে আমি যাই? বলতে-বলতে উঠে প'ড়লো মাধবীলতা। বললে,—জ্যাঠাইমা ব'লে দিয়েছেন পাল্কী পাঠিয়ে দেবে, সকাল-সকাল যেও। ভাল-ভাল গয়না গায়ে দিয়ে যেও। কত মেয়ে আসবে, কত কে আসবে!

—যা এলো, পৌঁছে দিয়ে আয় মাধবীলতাকে। সদরে এগিয়ে দিয়ে আয়। বললে রাজেশ্বরী। কথা বলতে-বলতে সে-ও উঠে দাঁড়ালো। বিদায় দিলো হাসিমুখে।

বাইরের দালানে ছিল এলোকেশী। চুলে আঙুল চালিয়ে উকুন বাচছিল। মাধবীলতা তোড়া পায়ে ঝম-ঝম শব্দ তুলে চললো। নর্ত্তকীর মত চললো যেন নাচতে-নাচতে। আবীর-রাঙা শাড়ী মিলিয়ে গেল সিঁড়ির দরজায়। মৃদু থেকে মৃদুতর হ'ল তোড়ার ঝম-ঝম শব্দ। নর্ত্তকী যেন মঞ্চ থেকে চ'লে গেল নেপথ্যে।

একা-একা কিয়ৎক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে রাজেশ্বরী।

মন প'ড়ে আছে 'কপালকুণ্ডলা'য়। রাজেশ্বরী পুনরায় বই খুলে ব'সলো। কিন্তু মন ব'সলো না পাঠে। খাওয়া-দাওয়ার কত দূর কি হ'লো কে জানে! বামুনদি কি করলে? ঠিক-ঠিক হ'ল, না হ'ল না। কম পড়লো কিছু।

দেখতে-দেখতে বেলাও এগিও চ'লেছে। সূর্য্যের আলো ম্লান হয়ে আসছে। বুকটা যন শুকিয়ে গেছে রাজেশ্বরীর। ক্ষুধার তাড়নায়। তৃষ্ণা আর ক্ষুধা ছিল কত। সময়ে খাওয়া হ'ল না। মন বসছে না পড়ায়, তবুও উত্তেজনার বলে পড়তে থাকে রাজেশ্বরী।

"কপালকুণ্ডলা দৌড়িলেন। পশ্চাতে যে আসিতেছিল সেও যেন দৌড়িল, এমন শব্দ বোধ হইল। গৃহ দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই প্রচণ্ড ঝটিকাবৃষ্টি কপালকুণ্ডলার মস্তকের উপর দিয়া প্রধাবিত হইল। ঘন ঘন গম্ভীর মেঘশব্দ এবং অশনিসম্পাতশব্দ হইতে লাগিল। ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা কোনক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া গৃহে আসিলেন। প্রাঙ্গণভূমি পার হইয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে উঠিলেন। দ্বার তাঁহার জন্য খোলা ছিল। দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য প্রাঙ্গণের দিকে সম্মুখ ফিরিলেন। বোধ হইল যেন, প্রাঙ্গণভূমিতে এক দীর্ঘাকার পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। একবার বিদ্যুতেই তাহাকে চিনিলেন। সে সাগরতীরপ্রবাসী সেই কাপালিক!"

—হ্যাঁ গো বৌ, তুমি কি খাবে-দাবে না?

কথা শুনে চমকে উঠেছিল রাজেশ্বরী। তিমিরান্ধকারাবৃত গহন কাননমধ্যে ধাবমানা কপালকুণ্ডলার পিছু-পিছু রাজেশ্বরীর মনও যেন ছুটে চ'লেছিল। কানে শুনছিল গুরু-গুরু মেঘগর্জ্জন। চোখে দেখছিল বিদ্যুৎচকিত আকাশ। বৃষ্টির জলে রাজেশ্বরীর শরীরও কি সিক্ত হয়ে গিয়েছিল!

গ্রীবা বেঁকিয়ে দেখলো রাজেশ্বরী। বললে,—হ্যাঁ, ক্ষুধায় আমার শরীরটা যেন ভেঙ্গে প'ড়েছে বিনো। চল' খাইগে কিছু। যাঁদের খাওয়ার কথা তাঁদের খাওয়া কি শেষ হয়েছে?

বিনোদা বললে,—হ্যাঁ, এ্যাতক্ষণে এই খাওয়া চুকলো। তুমি এখানেই থাকো। স্বোয়ামী-স্ত্রীতে মিলে একসঙ্গে খাও। আমি তোমাদের খাবার পাঠিয়ে দিই এখানে। এলোকে বল' দু'টো জায়গা করুক এই ঘরে।

—তিনি কোথায় বিনো দিদি?

লজ্জার মাথা খেয়ে কথা বলে রাজেশ্বরী। বলে,—বেলা কত হয়ে গেছে! আর কত বেলা হবে?

বিনোদা বললে,—এ্যাতক্ষণে চান করতে গেছে। ব'লে ব'লে পাঠিয়েছি আমি। পিসীর ছেলেরাও বিদেয় হয়েছে। ওঃ, খেয়ে গেল না তো, যেন তাণ্ডব নেচে গেল দলবল সঙ্গে ক'রে! কেমন বাপের ছেলে দেখতে হবে তো!

—ইয়ার মোসায়েব, দু'টি চক্ষে দেখতে পারি না আমি।

বললে রাজেশ্বরী। মনের কথা ব'লে ফেললে।—পিশীমার ছেলেরা ভাল নয়, নয় বিনো দিদি?

—বলবনি বাবা, এ মুখ দিয়ে বলবো না। দেয়ালেরও কান আছে। কোথাকার কথা কোথায় যায় কেউ বলতে পারে? ছেলে দু'টি হতভাগা। মায়ের পোড়া-কপাল আর কি!

এলোকেশী ঘরে ঢোকে, মাধবীলতাকে পাল্কীতে তুলে দিয়ে আসে। বলে,—এ্যাই যে বিনো দিদি, তোমাকে খুঁজতেছি কত!

—কেন গা এলোকেশী? আমাকে আবার কেন? গুল ফুরিয়েছে বুঝি? বিনোদা কথা বলে সোহাগের সুরে।

এলোকেশী একমুখ হাসে। বলে,—ঠিক ধ'রেছো দিদি! গুল থাক্, দোক্তা আছে কাছে? গা-হাত কামড়াচ্ছে যেন। দাও, দু'টি দোক্তাই দাও।

'কপালকুণ্ডলা' আচ্ছন্ন করে রেখেছে রাজেশ্বরীকে। চোখে দেখতে পায় আকাশের লকলকে বিদ্যুৎশিখা। কানে শোনে বজ্রপাতের শব্দ। অঝোরে বারি ঝরে গভীর তমিস্রায়। কপালকুণ্ডলা ছুটছে গহন কাননে বিজলীর ক্ষণপ্রকাশ আলোয়।

—বিনো খাবার দিতে বল্। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

কে কথা বললো? মাথার ঘোমটা খোঁজে রাজেশ্বরী। না বলে-কয়ে ঘরে ঢুকে প'ড়েছে? তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়েছে। ভুলে গেছে কপালকুণ্ডলাকে।

দাসী দু'জন ঘর থেকে বেরিয়ে যায় তৎক্ষণাৎ।

বিনোদা আর এলোকেশী। কৃষ্ণকিশোর চিরুণীটা তুলে নেয়। অষ্ট্রেলিয়ার তৈরী চিরুণী। ক্রশটাও নেয়। এ্যালবার্ট ফ্যাশনের চুলের তদ্বির করতে থাকে। ভিজে চুলে ফুলেল তেলের গন্ধ। ঘরে তখনও আছে এলিজাবেথ আর্ডেনের গার্ডেনিয়ার মোহমাখা সুগন্ধ। ফুলেল তেল হয়তো হবে শিউলী বা চামেলী। উগ্র গন্ধে গার্ডেনিয়াকেও লজ্জা দেয়।

দেওয়ালে দেহ এলিয়ে দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে রাজেশ্বরী। ভাঙা-মনে চেয়ে থাকে জানলার বাইরে। আকাশে রূপালী রৌদ্রালোক, ছিন্নভিন্ন মেঘের কল্লোল। আকাশ নীল।

—মাধু এসেছিল, ব'লে গেছে তোমাকে? বললে কৃষ্ণকিশোর চুলে ক্রশ চালাতে চালাতে।

রাজেশ্বরী বললে শুষ্ক কণ্ঠে,—হ্যাঁ। নেমন্তন্ন ক'রে গেল। ব'লে গেল বিকেলে পাল্কী পাঠিয়ে দেবেন জ্যাঠাইমা।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—যেতে হবে তোমাকে আমাকে। নয়তো আমাদের পুণ্যের দিনে কেউ আসবে না। মাধুকে খাওয়ালে কিছু?

—মিষ্টি একটা খেয়েছে। খেতে চাইছিলো না কিছু। রাজেশ্বরী কথা বলে ধীরে ধীরে। ক্লান্ত সুরে। বলে,—খাওয়া হবে না? বেলা কত হয়ে গেল।

—হ্যাঁ, এই যে হয়ে গেছে। তুমি খেয়েছো?

ভ্রূদ্বয়ে ক্রশ চালায় কৃষ্ণকিশোর। সূক্ষ্ম গুম্ফরেখায়। বলে,—তুমি এমন মনমরা হয়ে আছো কেন বল তো? খুব ক্ষুধা পেয়েছে?

অভিমানের আবেগে কয়েক মুহূর্ত্ত কোন কথা বলতে পারে না রাজেশ্বরী। সত্যিই যে বুকের ভেতরটা যখন-তখন ধড়ফড় করছে। কষ্ট হচ্ছে মনের গহনে কোথায়। চোখের কোণে জল দেখা দিচ্ছে। কত কথা উদয় হচ্ছে মনে মনে। সিন্দুকের টাকা খাজনা দেওয়ার জন্য চাই জেনে ক্ষণেকের জন্য রাজেশ্বরীর মুখে হাসি ফুটেছিল। কিন্তু সে-হাসি ঐ ক্ষণেকের জন্যই। বর্ষাকালের সূর্য্যের মতই। হঠাৎ দেখা দিয়ে হঠাৎ মিলিয়ে গেছে।

রাজেশ্বরী বললে,—না শরীরটা ভাল নেই।

বিনোদা কখন আসন পেতে দিয়ে গেছে। বসিয়ে দিয়ে গেছে দু'পাত্র জল। ব্রাহ্মণী খাবারের থালা দিয়ে যাবে। দালানে জায়গা হয়েছে।

—কাছারীতে তুমি খোঁজ পাঠিয়েছিলে?

মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণকিশোর। বললে,—আমার কথা বিশ্বাস হ'ল না বুঝি?

লজ্জায় অধোবদন হয় রাজেশ্বরী। সত্যিই অন্যায় হয়ে গেছে। রাজেশ্বরী ভাবে, বিশ্বাস করতে হয় মানুষকে। অবিশ্বাস করলে ঠকতে হয়। বিশ্বাস হারাতে নেই। রাজেশ্বরী বললে,—আমাকে ক্ষমা কর'। ভুল ক'রেছি আমি। নানা রকম দেখে-শুনে—

আসল সত্য জানেন শুধু ঈশ্বর। কৃষ্ণকিশোর নকল হাসে। কৃত্রিম হাসির সঙ্গে বলে,—তুমি কি ভাবলে যে ঘড়ার টাকা আমি চিবিয়ে খাবো?

আরও লজ্জিত হয় রাজেশ্বরী। নতমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘামতে থাকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। ধরা-পড়া চোরের মত শুদ্ধবাক্ হয়ে থাকে।

ব্রাহ্মণী খাবারের থালা বসিয়ে দিয়ে গেছে দালানে। বিনোদা ঘরে ঢুকে বলে,—আমার মাথা খাও, দু'টি-দু'টি মুখে দিয়ে নাও। দোহাই তোমাদের। জমিদারী চাল-চলন দেখলে হাড় জ্বলে যায়!

হেড-নায়েবের প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানায় কৃষ্ণকিশোর। খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন তিনি। পুরস্কার দিতে হবে তাঁকে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। হাতে রাখতে হবে লোকটিকে। কৃষ্ণকিশোর বললে,—আমি কিন্তু খেয়ে-দেয়ে একঘুম দেবো। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে।

রাজেশ্বরী বললে,—বেশ তো, আমি জানলাগুলো বন্ধ করে দিই। ঘুমিও তুমি।

—না না, তুমি কেন দেবে? বল' না বিনোদাকে। বলে কৃষ্ণকিশোর।

ঘরে সুগন্ধ। মোহমাখানো বাসি গন্ধ এলিজাবেথ আর্ডেনের গার্ডেনিয়ার। চোখে ঘুম না থাকলেও ঘুমিয়ে

পড়তে ইচ্ছা হয়। চক্ষু মুদিত হয়ে আসে, আলস্য লাগে দেহে। সত্যিই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে কৃষ্ণকিশোরের। রাত্রে ঘুম ছিল না চোখে কতক্ষণ। জাগিয়ে রেখেছিল গহরজান। বিদায় কালে বলেছিল, চোখে মিনতি আর কথায় অনুরোধের আবেগ ফুটিয়ে ব'লেছিল, —ভুলো মাৎ। ভুলো মাৎ।

খেতে ব'সলো দু'জনে। মুখোমুখি ব'সলো।

কত রকমের ব্যঞ্জন আর আহার্য্য দিয়েছে ব্রাহ্মণী। ক্ষুধার তাড়না কেটে গেছে, মুখে কিছু তুলতে ইচ্ছা হয় না রাজেশ্বরীর। খায় কি না খায়। যেমনকার তেমনি পড়ে থাকে ভাত ডাল তরকারী। লজ্জা আর অপমানে কর্ণমূল রাঙা হয়ে ওঠে রাজেশ্বরীর। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হয়। বিশ্রী লাগে যেন এই পরিস্থিতি। রাজেশ্বরী মনে মনে ভাবে, যার যা খুশী করুক। সে বলতে যাবে না কোন কথা। জানতে চাইবে না কিছু। যেমন মানুষ তেমনি থাকবে।

—খাচ্ছো না তুমি? জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণকিশোর। রাজেশ্বরী মুখে কিছু তুলছে না দেখে বলে।

—হ্যাঁ খাচ্ছি তো। বললে রাজেশ্বরী, চাপা গলায় বললে। মিথ্যা কথা বললে। এখনও এক মুষ্টি ভাতও মুখে উঠলো না।

কৃষ্ণকিশোর ভাবছিল, ডালিমের বিয়ে বাবদ টাকাটা পেলে কি বলবে গহরজান। কত খুশী হবে। কত হাসবে।

—ফুল নিবি না মা?

গহরজানের ঘরের দরজার কড়া ন'ড়ে উঠেছিল তখন। ফুলওয়ালা এসেছিল। উড়িয়া ফুলওয়ালা। ঝুলিতে ফুল নিয়ে ঘরে-ঘরে ফুল দিয়ে যায়। যে যেমন চায়। যুঁই, রজনীগন্ধা, করবী আর চাঁপা। ফুলওয়ালার ঝুলিতে আছে ফুলের গয়না, তোড়া আর খুচরো ফুল। ফুল দিয়ে যায় যে যেমন চায়, মাসান্তে দাম নিয়ে যায়। নামমাত্র মূল্য।

দরজা খুলতেই বললে ফুলওয়ালা,—ফুল নিবি না মা?

—হ্যাঁ, জরুর নেবো। আচ্ছা ফুল দেবে আমাকে। বললে গহরজান।

—গয়না দেবো না তোড়া দেবো?

—তোড়া দাও। চাঁপা আর রজনীগন্ধা আর লাল করবী দাও।

—নে না মা কত তুই নিবি। যা চাইবি পাবি।

ফুল তুলে রাখে গহরজান। লুকিয়ে রাখে। জলে ভিজিয়ে রাখে। এখন প্রয়োজন নেই ফুল। রাত্রে ফুল চাই। খোঁপায় জড়াতে হবে রজনীগন্ধার মালা।

ফুলওয়ালা চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকবার দেখলো গহরজান। একটা ঘরের শেকল-তোলা দরজায় ফাঁক থেকে দেখলো। দেখলো ঘরের মধ্যে নিদ্রায় অচেতন মানুষটিকে। না, ঘুমোচ্ছে না তো। তক্তাপোষে ব'সে পড়ছে কি কাগজ। হয়তো চিঠি পড়ছে কিছু।

দরজায় টোকা মারতে থাকে গহরজান। বলে,—আসবো আমি? ঘুম ভেঙেছে?

ঘরের মানুষ তাড়াতাড়ি লুকিয়ে রাখে চিঠি। গেরুয়া আলখাল্লার ভেতর পূরে ফেলে। বলে,—হ্যাঁ, এসো। ঘুম ভেঙে গেছে।

ভয়ে ভয়ে কথা বলে যেন ধীরানন্দ। আর কেউ এলো না তো?

অন্য কোন কেউ। কোন পুলিশ, কিংবা পুলিশের কোন কেউ গোয়েন্দা। ধীরানন্দ অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকে। দরজা খুলে যায় ধীরে-ধীরে। ঘন নীল মেঘের ফাঁক থেকে চন্দ্রোদয় হয় কি! গহরজান, এই অসামান্যা রূপবতী রমণীকে প্রথম যেন চোখ মেলে দেখলো ধীরানন্দ। দেখে বিস্মিত হয়ে গেল। গহরজানের হাতে পুষ্পাঞ্জলি কেন? কাকে পূজা করবে? চাঁপা আর রজনীগন্ধা আর লাল করবী গহরজানের করপুটে। ঘরে ঢুকে বোধ করি খোঁজে কোন কিছু। দেরাজের মাথায় ছিল গোছা-গোছা বেলোয়ারী কাচের রেকাবী। নানা রঙের। একটা রেকাবীতে রাখলো হাতের ফুল। শাড়ীর আঁচলে মুখটা চেপে চেপে মুছলো। মুখে মদির হাসি ফুটিয়ে বললে,—রোটি ঔর কাবাব খাওয়া হবে তো?

ধীরানন্দ ঝুলি আর আলখাল্লা সামলায়। বলে,—জরুর খাওয়া হবে। আমার খাওয়ার সময় হয়েছে। দেরী হয়ে গেলে কাকে খাওয়াবে?

কানের ঝুমকো দুলিয়ে বললে গহরজান,—জানোয়ারটাকে ব'লে পাঠিয়েছি কখন! সবুর কর' বাবুজী। চ'লে গেলে দুখ্ পাবো আমি! প্রথম ক'রে যেও না বাবুজী। জানোয়ারটা আসলে চাবুক লাগাবো, দেখো তুমি। শুনবো না কোন ওজুহাত।

জানোয়ার যে কে বোঝে না ধীরানন্দ। কোন হিন্দু হোটেলের কোন খানসামা। ইচ্ছাকৃত কি না কে জানে, আবরু খসে যায় গহরজানের। শাড়ীর আঁচল বুক থেকে লুটিয়ে পড়ে মেঝেয়। হলুদ রঙের আলপাকার ময়লা কাঁচুলীটা দেখা যায়। বোতামের বালাই নেই, একটা সেফটিপিনে আঁটসাঁট বাঁধা।

—গহর আছিস ঘরে?

সৌদামিনী কথা বললে।

—হ্যাঁ মাসী, আছি।

—ধর্ তবে ধর্। বড্ড গরম, হাত পুড়ে যাচ্ছে।

গহরজান খুশীর হাসি হাসে। বলে,—দাও মাসী, দাও। উনি বলছেন, চ'লে যাবেন। দেরী হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, দেরী হয়ে গেছে অনেক।

গরাণহাটা থেকে এখন যেতে হবে হাওড়া ষ্টেশনে। দেখা করতে হবে এক অপরিচিতের সঙ্গে—যাকে ধীরানন্দ

দেখেনি কদাচ। চেনে না কস্মিন্ কালেও। হাওড়া ষ্টেশনের দু' নম্বর প্ল্যাটফর্ম্মে অপেক্ষা করছে লোকটি। ধীরানন্দ শুধু জানে লোকটির পোষাক কেমন। লোকটির গায়ে খাকির মিলিটারী সার্ট, মালকোঁচা দেওয়া কাপড়। ধীরানন্দকে লোকটির কাছে যেতে হবে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে,—বেল ফুল?

যদি বলে, 'হ্যাঁ বেল ফুল' তবেই বুঝতে হবে ঠিক লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছে। 'বেল ফুল' কথাটি শুনে ধীরানন্দকে দিতে হবে ঝুলিতে লুকানো মাল। একটা বাক্স। গোটা কয়েক রিভলভার আছে বাক্সে। দু' কুড়ি মানুষ-মারা কার্ত্তুজ আছে।

রুটি-মাংস খেয়ে ঘরের মানুষ গমনোদ্যত হ'লে গহরজান প্রণাম করে, পদধূলি নেয় মাথায়। কয়েক হাত পিছিয়ে ধীরানন্দ বললে,—কেন? এত ভক্তি কেন?

গহরজান বললে,—হ্যাঁ করতে হয়, পেন্নাম করতে হয় যে। দয়া ক'রে এসেছেন আমার ঘরে।

সত্যিই প্রণাম করে গহরজানের দল। জাত-কুল মানে না। বাচ-বিচার করে না। ঘরের লোককে বিদায় দেওয়ার সময় ভক্তিভরে প্রণাম করে। দেবতা জ্ঞান করে হয়তো আগন্তুকদের।

—গহর, তুই যাবি না কি? আমি তো যাবো ভাবছি।—

লোক চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে বললে সৌদামিনী।

—কোথায় মাসী? চুলে বিনুনী পাকাতে পাকাতে বললে গহরজান।

সৌদামিনী বললে,—আহিরীটোলার ঘাটে। ভাগবত পাঠ করবেন কথক ঠাকুর। যাবি না কি তুই? কাশী থেকে এয়েছে কথক ঠাকুর। ফসকালে আর কখনও শুনতে পাবি না।

গহরজানের মুখে বিরক্তির ছায়া ফুটে ওঠে। বলে,—না মাসী, আমি যাবো না। তুমি যাও।

—কেন রে গহর? আসবে বলেছে বুঝি? সৌদামিনী মৃদু হাসির সঙ্গে কথা বলে।

লজ্জা পায় যেন গহরজান। বলে,—কি জানি! বলেনি কিছু। আমি যাবো না, গা-হাত কেমন যেন কামড়াচ্ছে। চোখ দু'টো জ্বালা করছে।

—তবে থাক্, যেতে হবে না তোকে। আমিই ঘুরে আসি। কথা বলতে-বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সৌদামিনী।

আসবে কি আসবে না কে জানে।

শয্যায় শুয়ে ঘুম আসে না চোখে। কৃষ্ণকিশোর বলে,—দিনটাই মাটি হয়ে যাবে।

রাজেশ্বরী বলে,—কেন?

—যেতে হবেই নেমন্তন্ন, না গেলে বিচ্ছিরি দেখাবে। কথা উঠবে। কৃষ্ণকিশোর কথা বলে দু'চক্ষু মুদিত ক'রে। রাজেশ্বরীর একটা হাত মুঠোয় ধ'রে।

ঘর অন্ধকার; তবুও জানলার ছিদ্র দিয়ে আলো দেখা যায়। রাজেশ্বরীও শুয়ে আছে বাহুতে মাথা রেখে। এলো-কেশ এলিয়ে দিয়ে। কপালকুণ্ডলার কথা ভাবছে মধ্যে মধ্যে। গহন কাননাভ্যন্তরে ছুটছে কপালকুণ্ডলা। আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলছে। বৃষ্টি পড়ছে খরবেগে।

কৃষ্ণকিশোর ভাবছে দিনটাই নষ্ট হবে মিথ্যা মিথ্যা। যাওয়া হবে না গহরজানের কাছে। সুর্ম্মাটানা চোখ দু'টো গহরজানের, কি যাদু আছে ঐ চোখে।

ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টা পড়ে ঢং-ঢং। তিনটে বাজে।

রাজেশ্বরী ফিস-ফিস কথা বলে।—আমি উঠি। চুল বাঁধি। মাধবীলতা ব'লে গেল জ্যাঠাইমা বলেছেন অনেক গয়না-গাটি প'রে যেতে হবে। অনেক মেয়ে বৌ আসবে। বিকেলে পাল্কী পাঠিয়ে দেবে। আমি উঠি?

—হ্যাঁ ওঠ'। বেশ বুঝতে পারছি দিনটাই মাটি হয়ে যাবে। চক্ষু মুদিত ক'রেই কথা বলে কৃষ্ণকিশোর।

চিরুণী, কাঁটা, ফিতে খুঁজতে ওঠে রাজেশ্বরী। ধীরে ধীরে দরজাটা খোলে। ডাকতে হবে এলোকেশীকে। চালচিত্র খোপা বাঁধতে হবে। এলোকেশী ছাড়া কেউ সামলাতে পারবে না রাজেশ্বরীর চুলের বোঝা।

কোথায় এলোকেশী! কোথায় কে।

জন-মনুষ্য নেই যেন বাড়ীতে। রাজেশ্বরী দাসীদের এলাকায় চলে। ভাবতে ভাবতে যায়, কি পোষাকে যাবে। কি কি অলঙ্কারে। কিছু দূর এগিয়ে ধীর কণ্ঠে ডাকে রাজেশ্বরী,—এলো, এলো, ও এলোকেশী;

কারও সাড়া পাওয়া যায় না। ডাকের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। ভয়-ভয় করে রাজেশ্বরীর। তবুও দ্রুত পদক্ষেপে এগোয় দাসীদের এলাকায়। টম কুকুর ছিল কোথায়। রাজেশ্বরীর পিছু-পিছু চলে। টমের গলায় বকলশে আছে ঘণ্টি। ঝুন-ঝুন শব্দ হয়। রাজেশ্বরীর ভয়-ভয় করে কাকেও কোথাও দেখতে না পেয়ে। দাসী-মহল নিদ্রামগ্ন যে!

শুধু পুকুর থেকে শব্দ আসে। পোলাওয়ের ডেকচীতে কে এক দাসী ঝামা ঘষছে হয়তো। পোড়া দাগ ওঠাচ্ছে কর্কশ শব্দে।

[ক্রমশঃ।

জনান্তিক

[৫১২ পৃষ্ঠার পর]

আলোক সম্পাতের, দৃশ্যসজ্জার, নৃত্য পরিকল্পনার, সঙ্গীতের সব কিছুরই তম-প্রত্যয়ান্ত সাধুবাদ। বিশেষ করে অভিনয়ের যুগ্মপ্রয়োগকর্ত্রী মিসেস মলী সেনের অভিনয় সম্পর্কে প্রায় পুরা তিন প্যারাগ্রাফ। তৃতীয় অঙ্কে মঞ্জুশ্রীর রাজগৃহ ত্যাগের দৃশ্যে তাঁর স্বাভাবিক ও মর্ম্মস্পর্শী অভিনয়ে প্রেক্ষাগৃহে অনেকেই যে অশ্রু সংবরণ করতে পারেনি,—সে কথারও উল্লেখ আছে।

"চমৎকার!" বলে মলী সেন প্রুফগুলি ফিরিয়ে দিলেন সুরেন লাহিড়ীর হাতে।

"কাল সকালে এটা পড়ে, যারা আজ টিকিট কেনেনি তারা বুঝতে পারবে যে কী জিনিষ মিস্ করেছে। দেখবেন, আমি বলে রাখছি, রিপিট পারফরমেন্সের জন্য চিঠি আসবে অনেক।" বলে বীরদর্পে প্রস্থান করলেন উৎফুল্ল প্রচারসচিব।

পরক্ষণেই ডলি এসে উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলল, "মলী দি, বীরেশ্বর বাবু বাড়ী চলে গেলেন এই মাত্র। ষ্টেজ সাজাবার ভার দিয়ে গেলেন আমার উপরে, আমার তো বড্ড ভয় হচ্ছে।"

কথাটা উদ্বেগেরই বটে।

"বাড়ি চলে গেলেন? কেন?" জিজ্ঞাসা করলেন মলী সেন।

"বললেন, বাড়িতে কি বিশেষ দরকার; এক্ষুনি না গেলেই নয়।" উত্তর করল ডলি।

মলী সেনের স্মরণ হলো, স্ত্রীকে অভিনয় দেখতে নিয়ে আসার জন্য বাড়ি যেতে চেয়েছিলেন বটে বীরেশ্বর। মলী সেন নিবৃত্ত করেছিলেন। তাই এবার তাঁকে না বলেই বীরেশ্বর চলে গেছেন মনে করে মলী সেন ক্ষুব্ধ হলেন। ভীরু কোথাকার! সাহস হয়নি মুখোমুখি তাঁর ইচ্ছার বিরোধিতা করতে। যাক। পশ্চাদপসরণের দ্বারা আত্মরক্ষা করে যারা, তারা মলী সেনের মনোযোগের অযোগ্য।

ডলি মলী সেনের মনোভাবটা অনুমান করেছে কি না তা সে-ই জানে। সে বলল, "আমি তোমাকে বলে যাওয়ার কথা বলেছিলেম। তিনি বললেন, 'সময় নেই'।"

বটে! সময় নেই!! মলী সেনের জন্য আজ কি সবারই সময়ের অভাব? অথচ এতকাল তাঁর একটু সখ্য, একটু প্রশ্রয়, একটু সান্নিধ্যের জন্য অকাতরে সময় বিসর্জ্জন দিয়ে সময় সার্থক মনে করেছে কতজন। আজও অপরাহ্নে তাঁর একটি সামান্য ইঙ্গিত, একটি ক্ষুদ্র আহ্বানের অপেক্ষা করেছে কত উৎকর্ণ শ্রবণ, কত উদ্বেল হৃদয়। এই ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে কোথায় ঘটেছে বিপ্লব? কোনখানে নেমেছে আঁধার? নির্দ্দিষ্ট দিনশেষে চিত্রাঙ্গদার অপসৃত রূপের মতো তাঁর আকর্ষণ কি নিঃশেষ হয়েছে আজ সন্ধ্যায়? চক্ষে কি নাই বিদ্যুৎ, হাস্যে কী নাই সম্মোহন, কণ্ঠে কি নেই মদিরতা?

সেক্ষণে হাজির হলেন অমলা। মেয়েদের ড্রেস করার ভার তাঁর উপরে। বললেন, "মলী ভাই, সহচরীর পার্টে ছোট মেয়েদের চুলে ওয়েভ দিয়ে দিলে খাশা দেখাতো। কিন্তু কার্লিং ক্লিপ দেখছিনে ড্রেসিংরুমে। তোমার কাছে—"

কথা শেষ হওয়ার আগেই ক্রোধ ও বিরক্তি-জড়িত কণ্ঠে মলী সেন বললেন, "সবই কি আমাকে করতে হবে? কোনো কিছুই কি তোমরা দেখে শুনে নিজেরা করতে পার না? কী কুক্ষণেই যে এই অভিনয়ে হাত দিয়েছিলেম! বিরক্তি ধরেছে আমার!"

অমলা ও ডলি দু'জনেই মলী সেনের এই আকস্মিক বিক্ষোভে বিস্মিত বোধ করলেন। অভিনয়ের আয়োজনে মলী সেনের পরিশ্রম ও উদ্বেগের কথা অমলার অজানা ছিল না। তিনি অনুমান করলেন, ক্লান্তিজনিত অবসাদেই চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে তাঁর।

তাঁরা চলে গেলেও মলী সেনের চিত্ত শান্ত হলো না। কিসের এক দুর্জ্জয় অভিমান যেন তাঁর হৃদয়কে দলিত, মথিত ও পীড়িত করতে লাগল সর্ব্বক্ষণ। সমস্ত পরিচিত নরনারী, সমুদয় প্রচলিত রীতিনীতি ও সর্ব্ববিধ সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক দুর্দ্দমনীয় বিদ্রোহের তাড়নায় উত্তেজিত হলো তাঁর মন। তাঁর চক্ষে এই বিশ্ব চরাচরের জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে কোথাও কোনখানে আর লেশমাত্র আনন্দের চিহ্ন রইল না।

নিজেকে আর কখনও এমন নিঃসঙ্গ নিরালম্ব মনে হয়নি। বৃহৎ পৃথিবীটা যেন একটা বিরাট

অতলস্পর্শী গহ্বর; তার সীমাহীন শূন্যতার মধ্যে একা দাঁড়িয়ে আছেন নীরজা।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল সুধাংশুকে। তাঁর বঞ্চিত বিড়ম্বিত জীবনের একমাত্র অথচ ক্ষণস্থায়ী আনন্দ। অন্তহীন দুঃখ-রজনীর মেঘাবৃত আকাশে স্বল্পায়ু চন্দ্রালোক।

নিজের মনে মনে তাঁকে তিনি বারংবার আহ্বান করে বলতে লাগলেন, "সুধা, তুমি দূরে চলে গেলে কেন? কেন এমন চিরকালের মতো পর হয়ে গেলে তুমি?"

তাঁর অনুক্ত কণ্ঠের সেই অনুচ্চারিত কাতরতা নির্জ্জন সজ্জা-কক্ষটিকে যেন এক গভীর শোকাচ্ছন্ন নিস্তব্ধতায় পূর্ণ করে দিল।

দ্রুতপদে সত্যসিন্ধু প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাঁকে কিছু বলার কিছুমাত্র সুযোগ না দিয়ে বিরস কণ্ঠে মলী সেন বললেন, "যদি আবার কোন উপদেশ দিতে এসে থাক সিন্ধু, তবে ক্ষান্ত হও। উচিত-অনুচিতের তালিকায় আমার আর রুচি নেই।"

সত্য বললেন, "তাতে অবাক হইনি। মরণ-কালে সুপথ্যে অরুচি ঘটে, একথা আয়ুর্ব্বেদে আছে। কিন্তু ভয় করো না, আমি লাইফ ইনসিওরেন্সের এজেন্ট নই; অনিচ্ছুক লোককে কর্ত্তব্য বোঝানো আমার পেশা নয়।"

মলী সেন ঈষৎ হেসে বললেন, "শুনে আশ্বস্ত হলেম। অনেক ডাক্তারই ভুলে যান যে, অষুধ এবং উপদেশ কোনটাই বিনামূল্যে দিতে নেই। তাতে কারো আস্থা থাকে না।"

"বোধ হয় তাই। কিন্তু এ আলোচনা বর্ত্তমানে নিষ্প্রয়োজন। আমি একটি জরুরী সংবাদ দিতে এলেম। শচীনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।"

"গ্রেপ্তার করেছে! কখন?" ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন মলী সেন।

"হ্যাঁ, আজ বিকেলে। ডি. সি., হেড কোয়ার্টার্স আমার বিশেষ বন্ধু। স্কুলে সাত বছর আমরা এক-সঙ্গে পড়েছি। এইমাত্র টেলিফোনে আমায় খবর দিলেন। আমি এক্ষুনি লালবাজারে যাচ্ছি।"

"গ্রেপ্তার কিসের জন্য? শচীন কি নতুন কোন—"

"বোধ হয় না। টেলিফোনে যতটুকু জানা গেল তা এই যে, সে নিজে পুলিশের কাছে গিয়ে যেচে সমস্ত কনফেশান করেছে। পুরানো কোন্ কোন্ রাজনৈতিক ডাকাতিতে তার যোগাযোগ ছিল তাও বলেছে। আমি জামিনের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। ওঃ আর একটা কথা। আমার বন্ধু বলছিলেন, শচীনের বাড়ি তল্লাসীর সময়ে কোন এক মহিলার নামে লেখা একখানা চিঠি পাওয়া গেছে। প্রেমপত্র জিনিষটা ভালো। যিনি লেখেন তিনি নিশ্চয়ই আনন্দ পান। যাঁকে লেখা হয়, অনুমান করি, তাঁরও মন্দ লাগে না। কিন্তু সেটা প্রকাশ্য আদালতে বহুজন সমক্ষে পঠিত হলে কতখানি রুচিকর হবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কাগজপত্র এখানেও যদি কিছু থাকে তবে সেগুলি এই বেলা অবিলম্বে সরিয়ে ফেল।" এক মুহূর্ত্ত থেমে পুনরায় বললেন, "রোগী-বিশেষে অষুধটা আমি বিনিপয়সায়ই দিয়ে থাকি। মানুষ-বিশেষে উপদেশটাও বিনামূল্যেই দিলেম। আস্থা থাকা না-থাকাটা অবশ্য আমার হাতে নয়।"

আকস্মিক এই দুঃসংবাদের আঘাতে প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেলেন মলী সেন। গভীর উদ্বেগ ও শঙ্কায় আচ্ছন্ন হলো তাঁর শরীর ও মন। সুসম্বন্ধ চিন্তার ক্ষমতা পেল লোপ। বাকস্ফুর্ত্তি হলো না রসনায়। চলৎ-শক্তিহীন প্রস্তর-মূর্ত্তির মতো বসে রইলেন নিজের আসনে।

কিন্তু সে মিনিট কয়েক মাত্র। ছুটে এলেন সিদ্ধনাথ। "মিসেস সেন, আপনি এখনও বসে আছেন? ড্রপসিন উঠবে এই মুহূর্ত্তে। ডোবাবেন দেখছি। চলুন, চলুন, আর এক সেকেণ্ড দেরী নয়।" বলে এক রকম হাত ধরেই টেনে নিয়ে গেলেন মলী সেনকে। দমকা হাওয়ায় উড়িয়ে-নিয়ে-যাওয়া তৃণখণ্ডের মতো মলী সেনকে সজ্জাকক্ষ থেকে যেন তাঁর নিজের অজ্ঞাতেই সিদ্ধনাথ নিয়ে এলেন ষ্টেজে। যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো মলী সেন কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে বসলেন অভিনয়ের সেটে।

ষ্টেজ-ম্যানেজার শেষবারের মতো পাত্রপাত্রীদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সব ঠিক আছে কি না। তারপর দ্রুতপদে উইংসের আড়ালে গিয়ে বললেন, "রেডী? ওয়ান, টু, থ্রি।"

হুইসিল।

প্রেক্ষাগৃহের অবশিষ্ট আলোগুলি একসঙ্গে নিবে গেল। ইলেকট্রীক সুইচের প্রক্রিয়ায় মঞ্চের সম্মুখ

থেকে কালো ভেলভেটের মোটা যবনিকা নিমেষে হলো অপসৃত। উৎসুক দর্শকদের চক্ষের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হলো রঙ্গস্থল। 'স্বপন কুহেলী' গীতিনাট্যের প্রথম দৃশ্য।

সমগ্র মঞ্চটি ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। নিস্তব্ধ। শুধু বহু দূর হতে বাতাসে-ভেসে-আসা বীণা-ধ্বনির ঈষৎ একটুখানি আভাস আসে যেন। রজনীর শেষ প্রহরে পূর্ব্বাকাশের মতো ধীরে ধীরে অন্ধকার দূর হয়ে রঙ্গস্থলে দেখা দিল আলোর রেখা। যেন তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বীণার সুর হলো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর।

রঙ্গস্থল পূর্ণালোকিত হলে দেখা গেল,—নদীবক্ষে ভাসমান সুদৃশ্য এক প্রমোদ-তরণী। ময়ূরপংখী গড়ন। শ্বেত পংখের কাজ করা ছাদের উপরে বীণা বাজাচ্ছেন সুন্দরী রাজকন্যা মঞ্জুশ্রী। তাঁর প্রায় কোলের কাছ ঘেঁসে বাহুতে ভর দিয়ে অর্দ্ধশায়িত সৌম্যদর্শন ইন্দ্রজিৎ। নীচে দ্বাররক্ষিকার ভূমিকায় দাঁড়িয়ে সুবেশা দু'টি তরুণী; রাজকন্যার প্রিয় সহচরীদ্বয়। দূরে অপর তীরে আকাশ নীচু হয়ে যেখানে গাছের সারির সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে, সেখানে উঠেছে আধখানা চাঁদ। তার আলো দুলছে নদীর বুকে। বীরেশ্বরের সুনিপুণ তুলির রেখা ও নিখিলের আলোকসম্পাতের কৌশল 'স্বপন কুহেলীর' দৃশ্য-বিন্যাসে স্বপ্ন সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নেই।

প্রেক্ষাগৃহের মুগ্ধ নরনারী করতালি দ্বারা সংবর্দ্ধনা জানাল নয়নমুগ্ধকর মঞ্চসজ্জার এই অপূর্ব্ব কলা-কৌশলকে।

সমীর স্তব্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে ছিল ষ্টেজের দিকে। ধীরার কানের কাছে মুখ এনে বলল, "তোমার মলী মামীকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু।"

সত্য কথা। মলী সেনের স্বাভাবিক দেহলাবণ্য যে কোন নারীর পক্ষেই ঈর্ষ্যার বস্তু। এক্ষণে সযত্ন প্রসাধন, বর্ণাঢ্য বসন ভূষণ, আলোকোজ্জ্বল পরিবেশের সহযোগে সেই পর্য্যাপ্ত রূপ হয়েছে অপরূপ। কিন্তু সত্য কথাও শুনে যে মন অপ্রসন্ন হতে পারে, তা কি ধীরা ইতিপূর্ব্বে কোনদিন কল্পনা করেছে?

উত্তেজিত সমীর দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মলী সেনের প্রশংসায় নিজের উচ্ছ্বাসের থলি উজাড় করে দিতে লাগল। বলল, "দেখেছো, বীণার তারে হাতের আঙ্গুলগুলি খেলছে কেমন গ্রেসফুল্!"

"সায়লেন্স প্লিস।"—পিছন থেকে অন্য দর্শকের কাছ থেকে তাড়া খেল সমীর। তার ডান পাশের ভদ্রলোকটিও বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করলেন। বাধ্য হয়ে সমীরের মন্তব্য বন্ধ হল। কিন্তু তার পার্শ্ব-বর্ত্তিনীটি অহেতুক মনোবেদনায় অনর্থক পীড়িত হতে লাগল নিঃশব্দে। মলী সেনের রূপ নিয়ে এতকাল সব চেয়ে গর্ব্বিত ছিল ধীরা স্বয়ং। আজও সমীর কিছু না বললে সম্ভবতঃ সে নিজেই প্রশংসা করতো। হায়, যে কথা নিজের মুখে সবাইকে বলে বেড়াতে পারা যায় মনের আনন্দে, সে কথা পরের মুখে শুনলে বুকে ব্যথা বাজে কেন, এ রহস্য ধীরা কিছুতেই বুঝে ওঠে না।

অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীরা ষ্টেজের ভিতরে উইংসের পাশ থেকে অভিনয় দেখছিল। যদিও নীরজা দাঁড়িয়ে ছিলেন দূরে এক প্রান্তে, সেখান থেকেও অভিনয়রত নায়ক নায়িকাকে স্পষ্ট দেখা যায়।

অভিনয়ের সঙ্গে বাস্তবের যোগ থাকে না, এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি নীরজার আছে। থিয়েটারের প্রণয়, দ্বন্দ্ব, সখ্য, বৈরিতা, পাত্রপাত্রীরা মুখের গ্রিজ-পেইণ্টের মতোই অভিনয়-শেষে ধুয়ে মুছে ফেলে রেখে যায় পাদপ্রদীপের ছায়াতে, একথা তাঁরও অজানা নেই। তবুও প্রেমমুগ্ধ ক্রৌঞ্চমিথুনের মতো মঞ্জুশ্রী ও ইন্দ্রজিতের এই ভাবাবেগে ঘন-সন্নিবদ্ধ অবস্থিতিটুকুকে নীরজা কিছুতেই যেন প্রসন্ন মনে দেখতে পারলেন না। নিজের মনকে বারংবার বোঝাতে চেষ্টা করলেন,—এ তো শুধু অভিনয়। কিন্তু মানবমনে বিচার বুদ্ধির গণ্ডি অতিক্রম করেও আছে যে যুক্তিতর্কের অতীত এক অনুভূতির ক্ষেত্র, সেখানে নীরজার কেবলই ছুঁচ ফুটতে থাকে।

মঞ্জুশ্রীর বীণাবাদন সাঙ্গ হলো। সন্তর্পণে বীণাটিকে একপাশে সরিয়ে রাখলেন। ইন্দ্রজিত তাকিয়ে ছিলেন তাঁর মুখের পানে। সে তন্ময় দৃষ্টিতে প্রণয়বিহ্বল পুরুষের পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। সে দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলতেই দৃষ্টি নত করলেন মঞ্জুশ্রী।

এই অংশটুকু নিখুঁত ভাবে আয়ত্ত করতে নিখিল ও মলী সেনকে রিহার্সেলে যে অনেক দিন ধরে অনেক চেষ্টা করতে হয়েছে, সে তো নীরজা স্বচক্ষেই দেখেছেন। অথচ সে কথা এখন তাঁর মনেই পড়ল

না। ঈর্ষ্যাকাতর হৃদয়ের পীড়িত তন্ত্রীগুলি শুধুই ব্যথায় আলোড়িত হতে লাগল।

সমগ্র প্রেক্ষাগৃহটি নীরব। বোধ হয় একটা আলপিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। দর্শক জনের বিস্ময়বিমুগ্ধ চক্ষুগুলি ষ্টেজের উপরে নিবদ্ধ। সমীর ধীরার কানের কাছে কী বলার উপক্রম করছিল। পাশের ভদ্রলোকটি নিজের ওষ্ঠাধরে তর্জ্জনী স্থাপন করে বললেন, "হাশ্‌শ—।"

বেচারা সমীরকে অগত্যা উৎসাহ সংবরণ করতে হলো।

দর্শক জনের উৎসুক দৃষ্টির বাইরে ইন্দ্রজিতের মহার্ঘ রাজসজ্জার অন্তরালে যে রক্তমাংসের সাধারণ মানুষ নিখিলচন্দ্র রায়টি আছেন, তাঁর চিত্তও শান্ত ছিল না। মান্নামাসির কটু ভাষণের আঘাতে নিখিলের স্বপ্ন গেছে ভেঙ্গে, মন হয়েছে বিষাক্ত। মোহভঙ্গের পরিণাম তো মোহমুক্তি নয়, মোহভেদ। এক ভ্রম থেকে অপর ভ্রান্তি। ফলে প্রথমে যতখানি ছিল অনুরাগ, পরিণামে তার বেশী জমেছে বিদ্বেষ। যতখানি ছিল আকর্ষণ, তার বেশী দেখা দিয়েছে বিতৃষ্ণা।

কিন্তু নিজ দায়িত্ব পালনে কোনদিন কোন ত্রুটি ঘটেনি নিখিলের। আজ সন্ধ্যায় এই অভিনয়েও আপন কর্ত্তব্যে এতটুকু স্খলন হবে না, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দ্বারা মন থেকে বার বার সরিয়ে দিলেন ব্যক্তিগত দুঃখ-ক্ষোভের ভার। নিষ্ঠার সঙ্গে করতে লাগলেন আপন অংশটুকুর অভিনয়।

আহত নিখিলের সমস্ত বেদনা চাপা রইল ইন্দ্রজিতের আড়ালে; মুখে ফুটিয়ে তুললেন প্রফুল্লতা, দৃষ্টিতে আনলেন বিহ্বলতা, কণ্ঠে জাগালেন ভাবগম্ভীর স্বর। জড়তাহীন উচ্চারণে সুরু করলেন নিজ পার্ট—"সুলক্ষণে, ধন্য মানি আপনারে তোমার প্রসাদে। প্রেমে তব মোর অভিষেক।"

নীরজার দুই কানে কে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপ করল। কিন্তু আত্মসংবরণে ব্যর্থ হলে তো লজ্জা রাখার জায়গা থাকবে না কোথাও। তাই নিজেকে সংযত করার চেষ্টায় মনে মনে বলতে লাগলেন, "না, ঈর্ষ্যা করব না। দুঃখকে জয় করব আমি।"

নিখিলের কণ্ঠ কানে এল—"হে কল্যাণী, ভিক্ষা এক আছে তব পাশে। বিমুখ করো না যেন—"

নীরজা দুই হাত দিয়ে সজোরে নিজের কান দুটি চেপে ধরলেন। স্মরণ করলেন সত্যসিন্ধুর উপদেশ, —যা রইবে না জানি, তাকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে পারলেই তাকে আর ক্ষতি মনে হয় না। ঠিক কথা। ত্যাগ করবেন তিনি। শুধু স্বেচ্ছায় নয়, সচ্ছন্দচিত্তেও। মন্ত্রের মতো পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করতে লাগলেন নীরজা, "আমি দিলেম, নিঃশেষে দিলেম।"

চেয়ে দেখলেন, নিখিল আবেগভরে তাঁর দুই হাতের মধ্যে মলী সেনের ডান হাতখানি গ্রহণ করেছেন। বলছেন—কী বলছেন, তার এক বর্ণও আর নীরজার বোধগম্য হলো না। দুই চক্ষে তাঁর জ্বালা ধরল। ছিঃ ছিঃ। এ দৃশ্য কি লুপ্ত করা যায় না দৃষ্টির সম্মুখ থেকে? ঢেকে দেওয়া যায় না সূচীভেদ্য আঁধারে? আকাশে অমাবস্যার কালিমা কি নেই? আলো কি মুছে দেওয়া যায় না? রঙ্গমঞ্চ থেকে? সমস্ত পৃথিবী থেকে? উত্তেজনায় কম্পিত পদে দ্রুত ছুটে গেলেন বৈদ্যুতিক কলা-কৌশল ও আলোক নিয়ন্ত্রণের সুইচ বোর্ডটার দিকে।

নিখিলের মনেও ঝড় বইছিল প্রচণ্ড। এতদিন মলী সেনের ক্ষণিক উপস্থিতিকে তিনি জ্ঞান করতেন সৌভাগ্য, তাঁর সঙ্গকে মনে করতেন পুরস্কার। আজও অপরাহ্ণ বেলায় ইলেকট্রিক সুইচ বোর্ডটার কাছে মলী সেনের অঙ্গুলির অতর্কিত ছোঁয়াটুকু নিখিলের সর্ব্বাঙ্গে পুলকের প্রবাহ সৃষ্টি করেছে। সেই নৈকট্যই এখন বিরক্তি উৎপাদন করে। সেই আকাংখিত স্পর্শ মনে হয় অশুচি। আশ্চর্য্য!

এতক্ষণ যে মনোবলের দ্বারা নিখিল পরিপূর্ণ নিষ্ঠায় অভিনয় করে যাচ্ছিলেন, মলী সেনের হাতে হাত রাখা মাত্রই যেন ছিটকে-পড়া কাচের বাসনের মতো তা ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেল। স্থান কাল পাত্র সম্পর্কে বুঝি তাঁর আর জ্ঞান রইল না। ভুলে গেলেন, তিনি মগধের যুবরাজ ইন্দ্রজিতের ভূমিকায় অবতীর্ণ। আপনাকে দেখতে পেলেন এক ছলনাময়ী নারীর অপ্রীতিকর অতিনিকট পরিবেষ্টনে। প্রবল ঘৃণা ভরে তাঁর কলুষিত হস্তের অবাঞ্ছিত স্পর্শ থেকে তড়িদ্বেগে সরিয়ে নিলেন নিজের হাত। সজোরে হাত টেনে নিলেন, না, কি হাত দিয়ে ধাক্কা দিলেন? কে জানে?

মলী সেনের মনের উপর দিয়ে যেন এক প্রবল ঝড় বয়ে গেল।

সিদ্ধনাথ তাঁকে গ্রিণরুম থেকে প্রায় একটি জড় পদার্থের মতো টেনে ষ্টেজে বসিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু আপনার বোধশক্তিকে পুরোপুরি বজায় রাখা তাঁর পক্ষে কঠিন হলো। তিনি প্রাণপণে যতই মনোনিবেশের প্রয়াস করেন অভিনয়ে, তাঁর সমস্ত চৈতন্য কেবলি হারিয়ে যেতে চায় অতীত স্মৃতিতে। মনে পড়ে একটি সুকুমার তরুণ মুখ,—সারল্যে নির্ম্মল ও বীরত্বে নির্ভীক। স্মরণে আসে দুটি স্বচ্ছ চপল চক্ষের দৃষ্টি,—সাংসারিক অভিজ্ঞতায় পরিপক নয়; ভাবপ্রবণতায় উদ্দীপ্ত। নিজের অজ্ঞাতে মলী সেন উন্মনা হয়ে যান।

এ কী বিপত্তি! ইন্দ্রজিৎ চেয়ে আছে মঞ্জুশ্রীর মুখের পানে। অধীর আগ্রহে প্রত্যাশা করছে উত্তর; প্রেমময়ী রাজকন্যার সলজ্জ সম্মতি। কিন্তু, কোথায়? সে যে বাক্যহীনা! এক বর্ণও মনে আসছে না। তাঁর পার্ট! উপায়? লজ্জা ও উৎকণ্ঠায় মলী সেনের সর্ব্বাঙ্গ হিম হয়ে এল। যাক, ঐ যে উইংসের পিছন থেকে পার্টের খেই ধরিয়ে দিচ্ছে স্মারক। মলী সেন শুনতে পেলেন,—"আমি চাই তোমাকে বিয়ে করতে, চাই দু'জনে ঘর বাঁধতে।" সর্ব্বনাশ! এ তো নাট্যকারের রচনা নয়, এ যে শচীনের উক্তি। এ কী বিভ্রম, না ইন্দ্রজাল? মলী সেন কী জেগে স্বপ্ন দেখছেন?

প্রম্‌টার বেচারা বার বার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল—"হে অতিথি, কিছু নাহি অদেয় তোমায়—বলুন মিসেস সেন, হে অতিথি—" বৃথা। মলী সেনের মস্তিষ্কে যেন একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পের আন্দোলন চলছে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো তাঁর রসনা হলো ভাষাহীন, অঙ্গ হলো বিবশ। মনে হলো, পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে আশ্রয়। সম্মুখে চেয়ে দেখলেন,—এ কী, প্রেক্ষাগৃহটা রথের মেলার নাগরদোলার মতো ঘুরছে যেন! রঙ্গমঞ্চের আলোগুলি যাচ্ছে নিবে! এ কী, চারদিকে এত অন্ধকার কেন?

অন্ধকার! হাঁ, অন্ধকার চান নীরজা। ঘন, কালো, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। যে অন্ধকারে লুপ্ত হবে সহস্র কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে নির্লজ্জ প্রণয়লীলার এই প্রগলভ প্রকাশ। লুপ্ত হবে নিখিল, মলী সেন, উৎসব আয়োজনের সমস্ত সমারোহ। রুদ্ধশ্বাসে নীরজা সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন সুইচবোর্ডের ক্ষুদ্র মঞ্চটির উপরে। ঠিক যেখানে ঘণ্টা দুই আগে নিখিল মলী সেনকে সযত্নে দেখিয়েছেন আলোক নিয়ন্ত্রণ ও বৈদ্যুতিক কৌশলগুলির নিয়ন্ত্রণ-সঙ্কেত। সারিবন্দী অসংখ্য সুইচগুলির মধ্যে যেটা প্রথম হাতের নাগালে পেলেন নীরজা সেটাই টিপে দিলেন সজোরে।

দুম্! দাম্!! দড়াম্!!!

বিকট শব্দে কেঁপে উঠল রঙ্গস্থল। বিপুলবেগে প্রমোদ-তরণীটি হলো আন্দোলিত। ছাদের উপর থেকে মলী সেন সবলে শূন্যে নিক্ষিপ্ত হলেন। পড়ে গেলেন ষ্টেজের নীচে যেখানে নানা যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের ভীড়।

চক্ষের পলকে ঘটল দুর্ঘটনা।

সভয় আর্ত্তনাদ উঠল ষ্টেজের ভিতরে। কেউ চীৎকার করছেন, "ষ্ট্রেচার"। কেউ চেঁচাচ্ছেন, "এ্যাম্বুলেন্স"। কেউ বা হাঁক দিচ্ছেন, "ফায়ার-ব্রিগেড"। কী করবেন ভেবে না পেয়ে অর্থহীনভাবে ছুটোছুটি করছেন শঙ্কিত মুখে কর্ম্মকর্ত্তার দল। ষ্টেজ ম্যানেজার তাড়াতাড়ি কালো পর্দ্দাটা ফেলে দিলেন। প্রেক্ষাগৃহেও দর্শকেরা ভীত, সচকিত। চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলা ও কোলাহল।

সমীর আসন ছেড়ে ছুটে গেল ষ্টেজের উপর। নিমেষে লাফিয়ে পড়ল মঞ্চের তলদেশে। জীমনাষ্টিক-করা শরীর তার। মলী সেনের সংজ্ঞাহীন লঘুভার দেহ দুই হাতে অনায়াসে বহন করে উপরে নিয়ে এল ড্রেসিং রুমে টেবিলের উপর শুইয়ে দিল। কৌতূহলী বন্ধুবান্ধবীরা চার দিকে ঘিরে দাঁড়ালেন। মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ খুঁজতে লাগলেন স্মেলিং সল্ট, ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ ছুটলেন বরফের সন্ধানে। বর্ষীয়সীরা "ডাক্তার, শীগগীর একজন ডাক্তার" বলে ব্যাকুলভাবে ডাকাতে লাগলেন আশে পাশে।

এই হিতাকাঙ্ক্ষী অথচ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নরনারীর ভীড় ঠেলে যিনি সামনে এগিয়ে এলেন, তিনি শচীনের মা। হতবুদ্ধি সমীরকে বললেন, "আমি ওকে দেখছি বাবা। তুমি চট করে একটু ঠাণ্ডা জল আনো দিকিন।" মলী সেনের মাথাটি তুলে নিলেন নিজের কোলে। বুকের কাঁচুলির শক্ত বাঁধনটা শিথিল করে দিলেন। পাখার অভাবে একটা

প্রোগ্রামের বই দিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন সযত্নে।

ঘণ্টা দুই কেটে গেছে। প্রেক্ষাগৃহ জনশূন্য। ষ্টেজের উপরেও ভীড় নেই। বেশীর ভাগ অভিনেতা ও অভিনেত্রীই চলে গেছেন। শুধু ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন তখনও অপেক্ষা করছেন। ক্রিং ক্রিং শব্দে টেলীফোন বাজছে মুহুর্মুহুঃ। নানা জায়গা থেকে আসছে পরিচিত ও অপরিচিতদের কণ্ঠে ঘন ঘন উৎকণ্ঠিত অনুসন্ধান।

একাধিক সম্ভবপর স্থানে খোঁজ করে শিবনাথকেও ধরা গেছে। সৌভাগ্যক্রমে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে দেরী হওয়ায় আসানসোল যাত্রায় বিলম্ব ঘটেছিল। তিনিও রোগীর কক্ষের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন।

অবশেষে ডাক্তার বেরিয়ে এসে বললেন, "জ্ঞান হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই। ইনজুরি তেমন বিশেষ কিছু নয়। পায়ে ও পিঠে কয়েকটা সামান্য ব্রুইসেস, ছড়ে যাওয়ার মতো। খুব আশ্চর্য্য রকমভাবে বেঁচে গেছেন বলতে হবে। ওঁর ঘরে আজ রাত্তিরে কেউ যাবেন না যেন।"

প্রাণের আশঙ্কা নেই। আঘাত সামান্য। শুনে খুশি হওয়া উচিত। কিন্তু শিবনাথের মনে যেন আশ্বাসের সৃষ্টি হলো না। কেন? শিবনাথ কি সহজে উতলা হন? বেশী উদ্বিগ্ন বোধ করেন? না কি—তিনি—হঠাৎ শিবনাথের কাছে নিজের হৃদয়ের গোপন কুঠরীর দ্বার উদ্ঘাটিত হলো। শিবনাথ সভয়ে আবিষ্কার করলেন, এ তো উদ্বেগ নয়, এ হতাশা। মলী সেনের দুর্ঘটনার সংবাদ শুনে তিনি অবশ্যই অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তিত হয়েছিলেন। কিন্তু সেই দুঃখ ও দুর্ভাবনার সঙ্গে তাঁর অবচেতন মনের নিভৃততম স্তরে সমান্তরালভাবে বইছিল একটি অতি সূক্ষ্ম প্রত্যাশার ধারা। অনাকাঙ্ক্ষিত দাম্পত্য বন্ধন থেকে মুক্তির ইঙ্গিত। নিরন্তর কৃত্রিম জীবনযাপনের শ্বাসরুদ্ধকর বিড়ম্বনা থেকে নিষ্কৃতির আশা। ডাক্তারের আশ্বাসে তাই যেন এই নিরাশার ভাব জাগল। শিক্ষা ও শুভবুদ্ধির প্রভাবে শিবনাথ সভয়ে দুই হাত দিয়ে সজোরে যেন প্রতিরোধ করতে চাইলেন এই হীন মনোভাব। কিন্তু নিজের কাছে নিজের সততায় কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেন না তার অস্তিত্ব। ফলে নিজের উপরেই ক্রুদ্ধ হন।

স্ত্রীর জ্ঞান হওয়া মাত্রই তাঁর কাছে যেতে না পারার দুঃখেই যে স্বামীর মুখ ম্লান হয়ে আছে, সে সম্পর্কে ডাক্তারের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। তিনি শিবনাথকে বোঝালেন, "শারীরিক আঘাত বেশী না হলেও একটা শক লেগেছে তো। এখন প্রিয়জনকে দেখলে একটা ইমোশন্যাল একসাইটমেণ্ট হতে পারে। তাতে ব্রেইনে ব্লাড রাশ করার আশঙ্কা।"

আপন সুপ্ত মানসের গুপ্ত তথ্য জানতে পেরে নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মিল শিবনাথের। হৃদয়হীন পাষণ্ড বলে নিজেকেই নিজে ভর্ৎসনা করলেন তিনি। স্ত্রীর চিকিৎসা ও পরিচর্য্যায় যাতে কিছুমাত্র ত্রুটি না ঘটে সেদিকে অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে উঠলেন। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন, "একবার কর্ণেল এমার্সনকে ডাকলে হয় না?"

"না, না, এ সামান্য ব্যাপারে তাঁকে কেন? পেশেণ্টের দরকার শুধু এখন রেষ্টফুল সিপ। ভালো করে ঘুমোতে পারলেই হয়। আমি একটা মিকশ্চার দিয়ে গেলেম। তাই যথেষ্ট।"

শিবনাথ বললেন, "একজন বিলাতী নার্স—"

ডাক্তার বললেন, যে মহিলা ওঁর কাছে রয়েছেন তিনি বোধ হয় মিসেস সেনের মা? তাঁর চাইতে ভালো শুশ্রূষা নার্স এসে করতে পারবে না। তবে, আপনি যদি টাকা খরচ করতে চান, আমার আপত্তি কী?"

শিবনাথ নিবৃত্ত হলেন।

আত্মনিগ্রহের পালায় আরও একজনের অংশ ছিল। সে ধীরা। মলী সেনের ঘরের বাইরে অন্ধকার এক কোণে থামে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল নিঃশব্দে। ভয়ে, দুঃখে ও অনুশোচনায় প্রায় বিবর্ণ চেহারা। মলী সেনের প্রতি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে বিরূপ হয়েছিল, একথা মনে করে ধীরার অনুতাপের আর সীমা রইল না। নিজের দুই গালে নিজ হাতে চড় কষিয়ে দিতে ইচ্ছা হলো। মলী মামীর আর জ্ঞান ফিরে আসবে কি? তিনি সম্পূর্ণ সেরে উঠবেন তো? তিনি যদি না বাঁচেন? না, না, সে কি কখনও হয়? মনে মনে সমস্ত ঠাকুর দেবতাকে স্মরণ করে সে প্রার্থনা করল, "ঈশ্বর, কালী, দুর্গা, তোমরা মলী মামীকে ভালো করে দাও, সুস্থ করে দাও।"

পাশে কার যেন উপস্থিতি অনুভব করল ধীরা।

মুখ তুলে দেখল, সমীর। সে চুপি চুপি বলল, "ডাক্তার বলেছে বেশী লাগেনি। কোন ভয় নেই।"

ধীরা সমীরের দেহলগ্ন হয়ে তার কাঁধে আপন অশ্রুপ্লাবিত মুখটি স্থাপন করল। সমীর ডান হাত দিয়ে তাকে বেষ্টন করে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলল, "কেঁদ না ধীরা, মণী মামী ভালো হয়ে উঠবেন।"

অভিমানের দ্বারা যে দুটি হৃদয় দূরে সরে যাচ্ছিল ঘণ্টা কয়েক আগে, চোখের জলের মধ্য দিয়ে তারা এখন নিকটতর হলো। নতুন করে যুক্ত হলো সুদৃঢ় প্রেম-বন্ধনে।

নিখিল বসেছিলেন এতক্ষণ একান্তে। ঘড়ির পানে তাকিয়ে দেখলেন, রাত কম হয়নি। গৃহে ফিরবার উদ্যোগ করলেন। মনে হলো ষ্টেজের বাইরে সিঁড়ির উপরে কে যেন বসে আছে। অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না। কাছে এগিয়ে গেলেন।

"এ কী, নীরজা! তুমি বাড়ি যাওনি এখনও?" সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন নিখিল।

নীরজা উঠে দাঁড়াতেই নিখিল লক্ষ্য করলেন তার মুখ ছাই-এর মতো পাংশু। বুঝলেন, তাঁরও আঘাত লেগেছে মনে। বললেন, "চল আমি পৌঁছে দিচ্ছি তোমাকে।"

গাড়িতে বসে দুজনের কারুর মুখেই কথা ছিল না। ক্লান্তিতে অবসন্ন বোধ করলেন নিখিল। ক্লান্তি শুধু দেহের নয়, মনেরও। চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করলেন আজ অপরাহ্ন থেকে দ্রুত পরিবর্ত্তিত সমুদয় ঘটনা প্রবাহ। অসীম এক শূন্যতায় যেন ছেয়ে গেল মন। যেন খুঁজতে লাগলেন কোনো একটা নির্ভর, হাত বাড়িয়ে পেতে চাইলেন কোনো একটা অবলম্বন। হাতের সামনে যা ছিল, নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি তা শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন।

নীরজাও অন্যমনস্ক ছিলেন তেমনি। কখন যে তাঁর ডান হাতখানি পার্শ্ববর্ত্তী নিখিলের হাতের মধ্যে আশ্রয় লাভ করেছে তা জানতেও পারেননি। হঠাৎ খেয়াল হলো। সর্ব্বাঙ্গে জাগল কম্পন। সুখে কী দুঃখে, সে কথা বোঝার সাধ্য রইল না। গ্যাসের আলোয় আলোকিত রাজপথ দিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ি। বাইরের আকাশের পানে চেয়ে নীরজা মনে মনে কা'কে যে প্রণাম করলেন, কেন যে প্রণাম করলেন, সে শুধু তাঁর অন্তর্য্যামীই জানেন।

বন্ধুজন ও পরিচিতের দল একে একে সবাই প্রস্থান করল। শিবনাথ একাকী বসে গবাক্ষ পথে ঊর্দ্ধে তাকিয়ে রইলেন অপলক দৃষ্টিতে। সেখানে রাত্রির আকাশে তারার অক্ষরে লেখা বুঝি মহাকালের স্বাক্ষর। তাতে কী আছে মুক্তির নিশানা? আছে পরিত্রাণের সঙ্কেত?

"এই যে শিবনাথ বাবু, আপনি এখানে—"

চমকিত শিবনাথ তাকিয়ে দেখলেন, সুরেন লাহিড়ী।

পূর্ণিমার নিদ্রা নেই। নিদ্রা নেই সাগরের। আর নিদ্রা নেই বোধ হয় প্রচার-সচিবের চক্ষে। বললেন, "কী দুর্ভাগ্য! অভিনয়ের রিভিয়্যুটা বিশ্ববার্ত্তায় পেজ মেক আপ হয়ে গিয়েছিল। বন্ধ করে দিতে হলো। যাক গে, গতস্য শোচনা নাস্তি। তার জায়গায় এই রিপোর্টটা ছাপার জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি। বড্ড তাড়াহুড়া করে লিখতে হলো। একটু শুনুন দিকিন, কেমন হয়েছে। এক্ষুনি পৌঁছে দিতে হবে নিউজ এডিটরের ডেস্কে। নইলে ডাক এডিশানটা ধরা যাবে না।"

শিবনাথের সম্মতির অপেক্ষা মাত্র না করে লাহিড়ী পড়তে সুরু করলেন। এমন একটি উপভোগ্য অভিনয় সুরুতেই পণ্ড হওয়ার ফলে দর্শকগণের হতাশা, আর্টের ক্ষতি, প্রধানা অভিনেত্রীর আঘাত ইত্যাদির মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনা। শেষ কয় ছত্রে আছে শিবনাথের উল্লেখ ;—

"এই অপ্রত্যাশিত শোচনীয় দুর্ঘটনায় অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা মিষ্টার সেন স্বভাবতঃই অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। বস্তুতঃ পত্নীপ্রাণ স্বামীর শোকাচ্ছন্ন ও উদ্বেগকাতর চেহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণের গভীর সহানুভূতি উদ্রেগ করিয়াছে। যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি বাড়িতে আসিয়া বা টেলীফোনযোগে মিষ্টার সেনকে তাঁহার এই বিপদে সমবেদনা জানাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি উল্লেখযোগ্য, স্যার ও লেডী প্রফুল্লনাথ রায় ; জাষ্টিস এস, পি, সেন ; কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র, শেরীফ রামসুখন ভাণ্ডারী, মিষ্টার ডি, কে, বোস, আই, সি, এস ও তাঁহার স্ত্রী।"

(আগামী বারে সমাপ্য)

—যাহা পাই তাহা চাই না

"কাশ্মীরের অর্দ্ধেকটা তো পাকিস্তানের দখলেই রহিয়াছে, বাকী অর্দ্ধেকটাও শেখ আবদুল্লার নীতির প্রসাদে পাকা আমটির মত বোঁটা খসিয়া টুপ করিয়া পড়িয়া যাইবে। কাশ্মীর সম্বন্ধে নেহরুজীর অহেতুক উদারতাই ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া গণ্য হইবে। কংগ্রেসী শাসনের আমলে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন কোন দিন সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। অন্ন-বস্ত্রের সমস্যাও তাঁহারা কোন দিন সমাধান করিতে পারিবেন, সে ভরসাও দেখা যায় না। কংগ্রেসী শাসকবর্গ আমাদের স্বাধীনতাকে কন্‌ট্রোল, লাইসেন্স, পারমিট, দুর্নীতি, চোরাকারবারের শাসনে রূপান্তরিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ইহাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা যে, আমরা বৃটিশের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়াছি। কিন্তু শুধু এই সান্ত্বনায় দেশবাসীর অন্তর শান্ত হইতে পারিবে কি? স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম এখনও আমাদের বাকী রহিয়াছে। আজ নিয়মতান্ত্রিক পন্থাতেই জনগণের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়া সম্ভব। ইহাই স্বাধীন ভারতে আমাদের একমাত্র ভরসার স্থল। যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাহিয়া গিয়াছেন, সম্মুখ সমরে প্রাণদান করিয়াছেন, পুলিশের গুলীতে প্রাণ দিয়াছেন, দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতি আমাদের এই নূতন ধরণের স্বাধীনতা-সংগ্রামে শক্তি যোগাইবে। তাঁহাদের অম্লান অমর স্মৃতির উদ্দেশে আজিকার এই স্বাধীনতা দিবসে আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছি। তাঁহারা যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন, আমরা যেন সেই স্বাধীনতাকে অর্জন করিতে পারি। বন্দে মাতরম্! জয় হিন্দ্!!"

—দৈনিক বসুমতী।

কালবিলম্ব না করিয়া—

"শিয়ালদহ ষ্টেশনে উদ্বাস্তুর ভীড়ে এক গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। গত বুধবার রাত্রির হিসাবে দেখা যায়, ষ্টেশনে তখন ৪৬৯৪ জন উদ্বাস্তু রহিয়াছে। একটা রেল-ষ্টেশনে ৪৬৯৪ জন উদ্বাস্তু নরনারীর অবস্থান এক ভয়াবহ ব্যাপার! ইহার উপরে দেখা দিয়াছে ষ্টেশনে যক্ষ্মারোগী। উদ্বাস্তুর ভীড় বৃদ্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যক্ষ্মারোগীর কথাও শোনা যাইতেছে। একটা রেল-ষ্টেশনে কয়েক সহস্র উদ্বাস্তুর গাদাগাদি করিয়া অবস্থানই এক বিপজ্জনক ব্যাপার! সুস্থ লোকও এইরূপ অবস্থানের ফলে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহার উপর যদি যক্ষ্মারোগী পড়িয়া থাকে তাহা হইলে সর্বনাশের আর বাকি থাকিবে কি? ইতঃপূর্বে ২১ জন যক্ষ্মারোগীকে স্থানান্তরে প্রেরণ করার সংবাদ জানা গিয়াছে। আমাদের ষ্টাফ রিপোর্টারের প্রদত্ত সংবাদে প্রকাশ, ষ্টেশনে এখন ছয় জন ক্ষয়রোগী রহিয়াছে। ইহাও প্রকাশ, গত দেড় মাস যাবৎ ইহারা সেখানে উপেক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। কলিকাতার জনাকীর্ণ শিয়ালদহ ষ্টেশনে ছয় জন যক্ষ্মারোগী পড়িয়া আছে—ইহা না দেখিলে কে বিশ্বাস করিত? অথচ তাহাই আছে। আশ্রয়শিবিরে স্থানাভাব বশতঃ সাধারণ উদ্বাস্তুকে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয় নাই, সংখ্যা ৪ হাজারের উপর উঠিয়াছে—ইহা না হয় বুঝি; কিন্তু যক্ষ্মারোগীকে স্থানান্তরিত না করার বা না করিতে পারার কোন কৈফিয়ৎই থাকিতে পারে না। আমরা আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কালবিলম্ব না করিয়া যক্ষ্মা-রোগীদের যথাস্থানে প্রেরণ করিবেন।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

অভিনন্দনের যোগ্য

"পরাধীন ভারতে বিদেশী শাসকগণ এ দেশের প্রাচীন শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির রক্ষণ এবং পোষণের জন্য আগ্রহ দেখাইতেন। কিন্তু আধুনিক কালের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁহাদের সংস্রব ছিল না—এ সবের জন্য তাঁহারা কোন গরজও বোধ করিতেন না। তথাপি সাহিত্যিক, শিল্পী ও সংস্কৃতিসাধকদের নিজস্ব উদ্যমে এবং দেশের বিদ্যোৎসাহী সম্পন্ন ব্যক্তিদের সহায়তায় আধুনিক ভারত এতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছে—জ্ঞানে-বিজ্ঞানে তাহার সাহিত্য-শিল্প এমন সমৃদ্ধিও অর্জন করিয়াছে! কিন্তু সে দিন বদলাইয়াছে—আজ আর দেশে বিদ্যানুরাগী ও সাহিত্য-শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ধনীদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। জীবন ধারণের সুকঠিন সংগ্রামে বিপর্যস্ত সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি সেবকদের স্বকীয় উদ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়াও আজ দুঃসাধ্য হইয়াছে। এমন দিনে দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের স্থিতি এবং উন্নতির জন্য সরকারী আনুকূল্য একান্ত প্রয়োজন। আর জাতীয় সরকার জাতীয় সংস্কৃতির রক্ষণ ও পোষণের দায়িত্ব লইবেন, ইহাই ত স্বাভাবিক। কোন জাতির সত্যকার পরিচয় যেমন তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, দীক্ষা, রাজনীতি ও সমাজ-জীবনের উন্নতাবস্থার মধ্য দিয়া প্রকাশমান হয়, তেমনি হয় তাহার সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, ভাস্কর্য ও অন্যান্য কলা-বিদ্যার উৎকর্ষের মধ্য দিয়া। এই শেষোক্ত বিষয়গুলির জন্য জাতীয় সরকারকে আমরা যথোচিত কর্তব্য করিতে অনুরোধ করিতেছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বৎসরের সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার দিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, বা মাদ্রাজ সরকার দেশের প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যব্রতীদের সম্মানিত করার যে রীতি প্রবর্তিত করিয়াছেন,

তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। কিন্তু পূর্বে যে সমস্যাগুলির উল্লেখ করিয়াছি, সেগুলির প্রতিও গভর্ণমেণ্টের অবহিত হওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সাহায্যদানের ঘটনাটি সেদিককার একটি প্রাথমিক চেষ্টা হিসাবেই প্রশংসা ও অভিনন্দনের যোগ্য।" —যুগান্তর।

পাকা চোর

"শাসকদের এই কমিউনিষ্টবিরোধী অভিযান যে আসলে এ দেশের শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তের বিরুদ্ধে হামলা, প্রত্যেক গণতন্ত্রী দল ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ তাহা সর্ব্বজনবিদিত। এমন কি, হালেও গোয়ালিয়র সহরে ছাত্র এবং মাদ্রাজের চা-বাগানের শ্রমিক কংগ্রেসী শাসকদের গুলীর শিকার হইয়াছেন—কলিকাতা ও পশ্চিম-বঙ্গে শান্তিপূর্ণ আইন অমান্য আন্দোলনকারীদের মাথার খুলি ও বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়াছে এই কাটজুদেরই পুলিশের গুলী ও লাঠির ঘায়ে। কাজেই, গণতন্ত্রী ভারত, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের সমর্থক নাগরিক কাটজুদের এই পাকা চোরের কৌশল বুঝিতে ভুল করিবেন না। ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে কাটজুদের এই আক্রমণনীতিকে পরাস্ত করিতেই হইবে। আইনের খাতা হইতে বিনাবিচারে আটক করার এই বেআইনী আইনকে মিটাইয়া না দিতে পারিলে আগামী দিনে ভারতবাসীর রুটি-রুজিও যেমন বিপন্ন হইবে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র যেমন জাহান্নামে যাইবে তেমনি এ দেশকে যুদ্ধভূমিতে পরিণত করিবার জন্য বৃটিশ-মার্কিণ যুদ্ধদানবেরা যে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছে তাহার সামনেও এদেশবাসী অসহায় বলিতে পরিণত হইবেন।" —স্বাধীনতা।

হাসির খোরাক

"খবরের কাগজওয়ালারা দেশের বিখ্যাত পদস্থ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে কত ব্যঙ্গাত্মক চিত্র (cartoon) প্রকাশ করিয়া পাঠকসাধারণের হাসির খোরাক যোগাইয়া থাকেন। সময় সময় পদস্থ ব্যক্তির ব্যঙ্গ-চিত্র তিনি স্বয়ং দেখিয়া তাঁহার কৃত কর্মের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার প্রতীকারার্থে নিজেই তৎপর হইয়া থাকেন। রসিক ব্যক্তি নিজের ব্যঙ্গ-চিত্র দেখিয়াও স্বয়ং রসভোগ করেন। অতি প্রাচীন কালে যখন সংবাদপত্রের চলন হয় নাই, তখন এতদ্দেশে ভট্ট মহারাজেরা (ভাট ব্রাহ্মণ) তদানীন্তন রাজা মহারাজাদের যেমন স্তুতিগান করিতেন, তেমনি তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ছন্দোবদ্ধ ভাষায় সে সমস্ত বর্ণনা করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। বড় বড় রাজষ্টেট হইতে এই জন্য ইঁহাদের বৃত্তি ও ব্রহ্মোত্তর ভূসম্পত্তি প্রদান করা হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহাদের একটি রচনা উদ্‌ধৃত হইল। যখন মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার রাজধানী ভদ্রপুরে (চলতি গ্রাম্য ভাষায় ভাদোর) লক্ষ ব্রাহ্মণের সমন্বয় করেন, সকলকে সমান সম্বর্দ্ধনা করা হয় নাই বলিয়া ভট্ট মহারাজেরা কবিতায় মন্তব্য করেন—

ভাদোরের নন্দকুমার
লক্ষ বামুন কল্লে শুমার
কেউ খেলে রুহির মুড়ো
কেউ খেলে কদ্দুকের ছড়ো।
কেউ খেলে লুচি পুরি
কেউ খেলে ঠ্যাং হেঁচড়ি।" —জঙ্গিপুর সংবাদ।

ম্যাসাজ হোমে ব্যভিচার

"যেদিন ছাত্রী-নিবাস হইতে বার্থ কন্ট্রোল এ্যাপারেটাস বাহির হইয়াছিল, সেইদিন দাঁড়াও বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম! কোথা যাও! কোন্ সর্ব্বনাশের মুখ-গহ্বরে ছুটিয়া চল! সেই বিশ বছর পূর্ব্বে হইতে প্রগতির সর্ব্বনাশা স্রোতে বাধা দিতে কত চেষ্টা করিয়াছি। সুখের কথা, সহযোগী "যুগবাণী" ম্যাসেজ হোমের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া আমাদের ভাবধারার কতকটা আনুকূল্য করিয়াছেন! বাঙলার যাবতীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারাও প্রতিবুদ্ধ হউন এই সর্ব্বনাশ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে। সিনেমা পাশের বাড়ীর মেয়েকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে, ম্যাসাজ হোম তাহাকে ব্যভিচারের পঙ্কে ডুবাইতেছে, কবি মন্ত্র দিতেছেন: বাসর-শয্যা রচিব না মোরা প্রিয়ে, রাষ্ট্র বিবাহের সাত পাককে শিথিল করিয়া দিতেছে, সাহিত্যিক বলিতেছেন, বিয়ের চেয়েও বড় আছে। এই প্রধূমিতা প্রজ্বলিতা প্রবাহিতা রক্ত-স্রোতস্বতী ভৈরবী, ব্যভিচারক্লিন্না, শকুনি-গৃধিনী-অধ্যুষিতা, লাম্পট্য-দুষ্ট বর্ত্তমান বাঙলা। চাণক্য……!" —আর্য্য।

মিলনাত্মক আত্মহত্যা

"সম্প্রতি দাঁতন থানার ১১নং ইউনিয়নের খণ্ডরোই গ্রামে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে কালীকৃষ্ণ দাস নামক জনৈক ধনীর একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধূ পার্শ্ববর্ত্তী এক আম-গাছে দড়ি বাঁধিয়া তাহারই ফাঁসে দু'জনে বিবাহের সাজে সজ্জিত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। পরদিন প্রত্যুষে চারি দিকে উহাদের আত্মহত্যার সংবাদ ছড়াইয়া পড়িলে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং ঐ আমগাছে একটি সিঁড়ি লাগান দেখিতে পায় ও মৃত ব্যক্তিদের সর্ব্বাঙ্গ সার্চ করিয়া স্ত্রীলোকটির বক্ষঃস্থলে ব্লাউজের ভিতরে আলপিনে আঁটা একটি চিঠি হইতে জানা যায়—উহারা কোন এক শপথে বদ্ধ ছিল এবং সেই শপথ ভঙ্গ হইলে দু'জনে একই সঙ্গে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হয়। তাহারা পত্রে এক স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখিয়াছে—তাহাদের মৃত্যুর জন্য বাড়ীর বা অন্য কেহ দায়ী নহে। পিতাকে এক স্থানে লিখিয়াছে—তাঁহার শেষ জীবনে যেন তিনি সকল সম্পত্তি রামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠানে উৎসর্গ করিয়া যান, তাহা হইলেই তাহারা সুখী হইবে। ঘটনায় আরও জানা যায় যে, আত্মহত্যা করিবার পূর্ব্বদিন তাহারা গ্রামের লোকজনদের খাওয়াইয়াছে ও গ্রামের প্রত্যেক ঠাকুরকে পূজা দিয়াছে। স্ত্রীলোকটি ৪ মাস গর্ভাবস্থায় ছিল। উহাদের বয়স যথাক্রমে ২৪ ও ১৮ বৎসর হইয়াছিল।"

—হিজলী-হিতৈষী।

জমিদারী প্রথা বিলোপ করিয়া

"বর্ত্তমান কৃষি-ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া সমবায়ী প্রথায় বর্ত্তমান ভূমি-ব্যবস্থার সহিত জড়িত সমস্ত স্বার্থকে লইয়া সরকারী সাহায্যে নূতন কৃষি-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা, এবং এই সব ছোট ছোট এলাকাভুক্ত গ্রাম্য সমবায় সমিতিগুলিতে জমির মালিক করিয়া—ইহাদেরই সর্বমুখী আদর্শ গ্রাম্য পঞ্চায়েত হিসাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা—প্রাক্তন মন্ত্রিসভায় এই ধরণের একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা জনৈক মন্ত্রী মহোদয় পেশ করিয়াছিলেন। সরকার যদি

জমিদারী প্রথা বিলোপ করিয়া নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে আগ্রহশীল হন, তাহা হইলে সরকারের উচিত সেই বা নূতন সুচিন্তিত কোন পরিকল্পনা জনসাধারণের সমক্ষে ইতিমধ্যেই পেশ করিয়া জনসাধারণের নিকট মতামত ও সংশোধনী প্রস্তাব আমন্ত্রণ করা।"

—ডাক।

প্রকৃত গলদ কোথায় ?

"প্রকৃত গলদ যে কোথায় তাহা ধরিতে বা দূর করিতে কেহই চাহে না। কেতাদোরস্ত করিয়া নথিপত্রের দ্বারা ইংরাজ আমলের ঢঙ বজায় রাখিতে ব্যস্ত। টেবিল-চেয়ারে বসিয়া দেয়ালে কলা, মূলা ফলান যত সহজ, লাঙ্গল দিয়া মাটি চষিয়া ফসল ফলান তত সহজ নয়। কর্তব্য-কর্ম্মে অবহেলাই আমাদের জাতীয় জীবনের অবনতির প্রথম ও প্রধান কারণ। কর্তব্য কর্ম্মে অবহেলা যেন উপহাসের বস্তুতে দাঁড়াইয়াছে। এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। উলুবেড়িয়ার মিলিটারী ব্রীজ যাহা নির্ম্মাণের পর হইতে কোনও রূপ মেরামত হয় নাই এবং পরে ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল এমন কি একটি নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল, সেই সংবাদে আমরা গত বৎসর মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম এবং তিনিও যথাশীঘ্র কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, মেরামতের ২।৩ মাসের মধ্যে সেই মিলিটারী ব্রীজটি পুনরায় মেরামত করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে! যে পরিদর্শকের উপর এই সংস্কার-কার্য্যের ভার ছিল তিনি কিরূপ ভাবে নিজ কর্তব্য পালন করিয়া সরকারী অর্থের অপচয় ঘটাইয়াছেন তাহা সহজেই অনুমেয়। এইরূপ কর্তব্যপরায়ণতাই অনর্থক অর্থব্যয়ের দ্বারা রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবন আজ বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত।"

—উলুবেড়িয়া সংবাদ।

আলো, আরো আলো!

"রামপুরহাট রেলওয়ে পল্লী পূর্ব্বে যেমন আলোকময় হইয়া থাকিত—বর্ত্তমানে ঠিক তেমনই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। স্বকপোলকল্পিত যুক্তিতে রেল-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের বিভিন্ন রাস্তার আলোর সংখ্যার হ্রাস করিতেছেন। কিন্তু যাত্রী ও রেলকর্ম্মচারীদের যাতায়াতের সুবিধার কথাও কি তাঁহাদের বিচার-বিবেচনার বহির্ভূত হইয়া যাইবে? প্রাক্তন ইউরোপীয়ান ইন্‌ষ্টিটিউটের সন্নিকটস্থ মোড়ের আলোটি অপসারিত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যাত্রীদের উপর অবিচার করিয়াছেন। ষ্টেশনে যাইবার পথে ঐ স্থানটি ২।৩টি শাখা-পথের সন্ধিস্থল বলিয়া উহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আশা করি, কর্ত্তাগণ অন্ততঃ নিরীহ যাত্রীদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া যথাযথ আলোর ব্যবস্থা করিবেন।"

—রাঢ় দীপিকা।

ভাষাগত প্রদেশ চাই

"বর্ত্তমান লোক-গণনার ফলে জানা গিয়াছে, বিভক্ত পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা ছাড়া পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে বাস্তুহারার আগমন হ্রাস পায় নাই। কাজেই পশ্চিম-বঙ্গের আয়তন বৃদ্ধির দাবী অযৌক্তিক নহে, চরম স্থান-সংকটে পড়িয়া বাঙালীকে বাধ্য হইয়া এই দাবী জানাইতে হইতেছে। তাহা ছাড়া মাত্র ভাষাগত প্রদেশ গঠনের দাবীই পশ্চিম-বঙ্গের একমাত্র দাবী নয়। সীমান্ত রাজ্য পশ্চিম-বাংলাকে আত্ম-নির্ভরশীল করিবার জন্যও বাংলার বিস্তৃতি সাধনের প্রয়োজন আছে। চার বৎসর পূর্ব্বে তৎকালীন পশ্চিম-বঙ্গের অর্থ-সচিব শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার বাংলার আয়তন বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করিয়া ভারত সরকারকে যে স্মারকলিপি প্রেরণ করেন তাহাতে তিনি রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলি ভাল ভাবেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার এ যাবৎ কোনও যুক্তিই গ্রহণ করেন নাই। বিভক্ত বাংলার ভৌগোলিক আয়তন বৃদ্ধির দাবী প্রাদেশিকতা-বিষাক্ত নহে, এই সম্প্রসারণ পশ্চিম-বঙ্গের সংকট-ত্রাণ হিসাবেই প্রয়োজন। কাজেই ভাষাগত ভাবে প্রদেশ গঠনের দাবী পশ্চিম-বঙ্গকে জানাইতেই হইবে। নানা সংকটে বিপন্ন বাঙালীর পক্ষে বাঁচিবার মত স্থান সঙ্কুলানের দাবী না করা ছাড়া কোনও উপায় নাই।"

—মুর্শিদাবাদ সমাচার।

শিক্ষায় সঙ্কট

"আজ দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূরীকরণকল্পে যেখানে শিক্ষার প্রসারতার একান্ত প্রয়োজন—আর এ শিক্ষা প্রসারণের জন্য যেখানে নতুন নতুন স্কুল, কলেজ গ'ড়ে তোলা দরকার—এবং তার জন্যে সরকারী বাজেটের একটা বৃহত্তর অংশের ব্যয় বরাদ্দ প্রয়োজন—সেখানে তার পরিবর্ত্তে চলেছে ঢালাই ভাবে স্কুল, কলেজ উঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা, শিক্ষককে অভুক্ত রাখার ব্যবস্থা, ব্যাপক ফেলের মাধ্যমে ছাত্রসমাজের এক বিরাট অংশকে শিক্ষাজীবন থেকে পৃথক্ করার ব্যবস্থা—সাথে সাথে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে পুলিশ-গোয়েন্দা থানায় পরিণত করার চক্রান্ত—এমনই কোরে কুখ্যাত বৃটিশ শিক্ষানীতিকে পুরোপুরি ভাবে দেশে চালু রেখে শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও সংকুচিত করার জঘন্যতম নির্লজ্জ প্রয়াস বর্ত্তমান সরকার গ্রহণ করছেন। তাই আজ কি ছাত্র, কি শিক্ষক, কি অভিভাবক, কি জনসাধারণ—সকলেরই দেশের এই নিদারুণ শিক্ষাসঙ্কটের কালে ঐক্যবদ্ধ বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে তুলে সরকারী শিক্ষা সংকোচন নীতিকে পরাস্ত করার দায়িত্ব আর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে—নতুবা এক দিকে যেমন দেশের বৃহত্তম যুবশক্তির প্রকৃত শিক্ষার সুযোগাভাবে ধ্বংস সুনিশ্চিত তেমনই অন্য দিকে সূচিত হবে সামগ্রিক ভাবে দেশের শিক্ষার সাথে জড়িত সংস্কৃতি, কৃষ্টিরও অনিবার্য্য অধঃপতন!"

—বীরভূম বার্ত্তা।

কৃষিঋণ চাই

"কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাদেশিক সরকার পর্য্যন্ত "Grow more food"-এর নামে—অফিস, কর্ম্মচারী, প্রচারপত্র, Publicity ইত্যাদির নামে হাজার হাজার টাকা খরচ ক'রছেন। কিন্তু তাতে আশানুরূপ খাদ্যের অভাব মিটছে না বরং সেই 'Food'-এর অভাবে চারি দিকে আজ ক্ষুধিত জনতার হাহাকারধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আমাদের মনে হয়, অফিসে বা অফিসের দেওয়ালে খরচ করে পোষ্টার এঁটে যথার্থ শস্য উৎপাদন করা যায় না। তবে Publicityর ভেতর দিয়ে আদর্শ প্রচার হয় সত্য, সর্ব্বহারা চাষীর প্রাণে প্রেরণাও যোগায় বটে, কিন্তু যথার্থ অভাব মেটে না। তাই বলি, বাংলার শত শত নিঃস্ব চাষীদের মধ্যে সময় থাকতে ব্যাপক সাহায্য করা দরকার। বর্ত্তমানে অতি সত্বর কৃষকদের মধ্যে কৃষি-ঋণ দেওয়া প্রয়োজন। চাষীরা যাতে দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় সে জন্য গভর্ণমেন্টের মজুতে ধানগুলি বাঁধা দরে বিক্রী করার ব্যবস্থা

সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। শুনা যায়, অনেক জায়গায় বলদ কেনার ঋণ এমন দেওয়া হয় যাতে বলদ তো দূরের কথা তাতে ছাগলও কেনা যায় না।" —নীহার।

নদ ও নদী

"এক সময়ে কৃষির উপর নির্ভর করিয়াই জেলার প্রায় সমস্ত অধিবাসী জীবিকার্জ্জনের সুযোগ পাইত। বর্দ্ধমান জেলার উপর দিয়া প্রবাহিত দামোদর ও অজয় নদ এবং তাহার সহিত খড়ি, বাঁকা, কুনুর, বেহুলা, ভল্লুকা প্রভৃতি ছোট ছোট নদীগুলি এক সময়ে জেলার সর্ব্বত্র কৃষিকার্য্যে জলসেচের সাহায্য করিত। জমির উপর দিয়া পলি-মিশ্রিত প্রবাহিত জলও উৎপাদন বৃদ্ধির সাহায্য করিত। বর্ত্তমানে নদীগুলির কোনটিতে রেল-লাইন রক্ষার জন্য অথবা সহর রক্ষার জন্য বাঁধ নির্ম্মাণের দ্বারা নদীর স্বাভাবিক গতিপথ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, কোনটির গতিপথ সংস্কার অভাবে সংকীর্ণতর হইয়াছে এবং সর্ব্বোপরি জেলাব্যাপী জল-সংরক্ষণের চিরাচরিত ব্যবস্থা উপেক্ষিত হইয়া মজিয়া যাওয়ার ফলে উদ্‌বৃত্ত জলের আধিক্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, জল নিষ্কাশন ক্ষীণতর হইয়াছে। ফলে কোথাও বা জলের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় আবার কোথাও বা জলাভাবে জেলার কৃষিউৎপাদন ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতেছে।"

—বৰ্দ্ধমানের কথা।

অপ্রকাশিত তদন্ত

"কুচবিহারেও বুভুক্ষু শোভাযাত্রীদের উপর গুলী করিয়া কয়েক জনকে হত্যা করা হইয়াছিল। "হত্যা" বলিতেছি এই জন্য যে, মহা সমারোহে সরকারী তদন্ত সুরু করিয়া জলের মত অর্থ ব্যয় করা হইল, কিন্তু তদন্তের রিপোর্টখানি প্রকাশ করা হইল না। মানুষ এ সম্বন্ধে কি ধারণা করিবে?" —ত্রিস্রোতা।

জ্বলবে না আলো?

"আসানসোল 'ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর' বিদ্যুৎ সরবরাহের অবস্থা দেখিয়া ক্রমশঃই বিরক্তি আসিতেছে। যে সময়ে আলো বা পাখার বেশী প্রয়োজন বোধ হইল, সে ঘনান্ধকার বাদল দিনে অথবা রাত্রে—কিম্বা যখন খুসী দেখা গেল বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে সময়ে সময়ে কাজের অনেক ক্ষতি হয়, তদুপরি এক শত ওয়াট পাওয়ারের বাতি জ্বালিয়াও লাল আলো (অর্থাৎ ১০০ পাওয়ারের উপযুক্ত আলো নহে, তদপেক্ষা কম) পাওয়া যায়। কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষ আশা করি এইরূপ অসুবিধার নিরসন করিয়া জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইবেন।" —আসানসোল হিতৈষী।

পথ দেখো

"তমলুক মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত জেলা বোর্ডের দুইটি রাস্তা সরকার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইলেও রাস্তা দুইটি চরম দুরবস্থায় উপনীত হইয়াছে—বিশেষ এই বৃষ্টিতে দুর্গম হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রধান রাস্তাটির পিচমাড়াই হইবার কথা গত বৎসর হইতেই শুনিতেছি। সরকারের জিনিষপত্র বা কর্ম্মচারীর এখানে অভাব নাই, তথাপি পিচ দেওয়া দূরে থাক, যদি জনসাধারণের অতি প্রয়োজনীয় এই রাস্তায় সময়মত গাড়ী ও মানুষ চলাচলোপযোগী মেরামতটুকুও না হয় তবে সরকারী কর্ম্মতৎপরতাই বা কি আর এই সব অফিসাদি থাকার সার্থকতাই বা কোথায়? মহিষাদল যাইবার পথেও এই রকম দেখি যে, নন্দকুমারের নিকট খানিকটা এবং মহিষাদল প্রবেশ-পথের কিছুটা রাস্তায় গভীর গর্ত্তের জন্য যাত্রীদের মোটর হইতে নামিয়া হাঁটিয়া যাইতে হইতেছে। ইহা খেয়ার কড়ি দিয়া ডুবিয়া পার হওয়ার সমতুল্য নহে কি?" —প্রদীপ।

অর্থ অপব্যয়

"করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস কমিটির অন্যতম যুক্ত-সম্পাদকের পত্নী সরকার হইতে চরাকুড়ি সুতাকাটা কেন্দ্রের সংগঠক হিসাবে আড়াই হাজার টাকা সাহায্য পাইয়াছেন। আমরা অবগত হইলাম, এই টাকা দেওয়ার জন্য Self help Advisory Board বা বোর্ডের সভাপতি অথবা সম্পাদক কোনরূপ সুপারিশ করেন নাই। আসাম বিধান সভার গত অধিবেশনে এক প্রশ্নের উত্তরে গবর্ণমেণ্ট বলেন যে, উক্ত কংগ্রেস-সম্পাদকের বিরুদ্ধে চোরাকারবারের মামলা ঝুলিতেছে। এই সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও গবর্ণমেণ্ট কি ভাবে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে না জানাইয়াই আবার আড়াই হাজার টাকা তাহারই হাতে তুলিয়া দিলেন তাহা আমরা বুঝিতেছি না। ইহা কি সরকারী অর্থের অপব্যয় নহে?" —যুগশক্তি।

অবিমৃষ্যকারিতা

"ইংরাজী আমলের জিদ্ বজায় রাখায় এখন আর বাহাদুরী নাই। জনসাধারণের ব্যথায় সাড়া দেওয়ার মধ্যেই এখন জনপ্রিয়তার গৌরব নিহিত রহিয়াছে। ডাঃ রায় যখন বিরোধী পক্ষের উক্তি-যুক্তি সমস্তই মানিয়া লইয়াছিলেন, তখন অবিলম্বে কিদোয়াই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে নিষ্ঠুর ভাবে কলিকাতাকে কর্ডন করিয়া ফেলুন। কলিকাতার শিল্পাঞ্চলকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কেন্দ্রকে বাধ্য হইয়া প্রয়োজন হইলে বিমানযোগে খাদ্য আনিয়াও যোগান দিতে হইবে, ডাঃ রায়কে এ বিষয়ে আমরা নির্ভয়ে ভরসা দান করিতেছি। তিনি মফঃস্বলকে বাঁচান—ইহারাই আজ মরিতে বসিয়াছে। আর বাণী, বিবৃতি, কথা কাটাকাটি না করিয়া সত্বর জনসাধারণের দাবী মানিয়া লউন। কলিকাতাকে অছিদ্র অবধারণে ঘিরিয়া ফেলুন—মানুষগুলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচুক। অবিমৃষ্যকারিতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইতে বুভুক্ষিতের বিক্ষোভ বিদূরিত করিবার পূর্ণ দায়িত্ব আজ বাংলার মন্ত্রিসভাকে গ্রহণ করিতেই হইবে।" —পল্লীবাসী।

প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

"বর্দ্ধমানে বে-আইনী মদ্য বিক্রয় যেরূপ বাড়িয়া চলিতেছে তাহাতে মনে হয় যে, খুব শীঘ্রই বর্দ্ধমান ফরাসী চন্দননগরে পরিণত হইবে। প্রকাশ যে, প্রায় প্রতিটি রেষ্টুরেণ্ট ও চায়ের দোকানেই বে-আইনী ভাবে মদ্য বিক্রয় হয় এবং প্রায় প্রতিটি পল্লীতেই সন্ধ্যার পর এবং কখনও কখনও দিবাভাগেও মাতালেরা প্রকাশ্য ভাবে রাস্তায় মাতলামি করিয়া থাকে। সুখের বিষয়, এই দিকে গোয়েন্দা বিভাগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে ও তাঁহারা কয়েক জন বে-আইনী মদ্য-বিক্রেতাকে অভিযুক্ত করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের এই প্রচেষ্টার প্রশংসা করি। এই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষকে বলিতে চাই, যেন এক দিনেই আরব্ধ কার্য্যের সমাপ্তি না ঘটে। কিছু দিন ধরিয়া এইরূপ সতর্কতা অবলম্বিত না হইলে আদৌ কোন ফল পাওয়া যাইবে না।" —দৃষ্টি।

কুটীরশিল্পকে বাঁচাও

"দেশবাসীকে শুধু এ কথা স্মরণ করিতে হইবে যে, দেড় শত বৎসরের পরবশতার ফলে যে কুটীরশিল্প ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে আজ তাহাকে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য যে আয়োজন চলিতেছে তাহা যাদু-দণ্ডের স্পর্শের ন্যায় মুহূর্ত্তে দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিতে সক্ষম হইবে না। নানা প্রতিকূল ভাব ও চিন্তায় বিচলিত মনকে সংযত করিতে হইবে—সরকারের এই মহতী উদ্দেশ্যে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করিয়া কুটীরশিল্পের পুনরুদ্ধার ও প্রসারের পথকে পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। তবেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে উদ্দেশ্য সার্থক হইবে—দেশ সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হইবে। পশ্চিম-বাংলায় বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন স্থান কুটীরশিল্পের জন্য এককালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী, কাটোয়া, মেমারী প্রভৃতি অঞ্চল তাঁত, মাদুর, শোলা ও বাসনশিল্পের জন্য এককালে বিখ্যাত হইয়াছিল। জেলাবাসীকেও আজ একযোগে দেশের অর্থ নৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিবার জন্য এই মহতী প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিতে হইবে—জেলার বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলের ক্ষীয়মান শিল্পকে উদ্ধার করিয়া দেশবাসীর জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করিতে হইবে—ইহাই আমাদের আন্তরিক আবেদন।" —বৰ্দ্ধমান।

মা-বোনের অবমাননা

"শ্রীত্রিবেদী সমগ্র মা-বোনের জাতির অবমাননা করিয়া এক জন চরিত্রহীনাকে শিক্ষয়িত্রী পদে অধিষ্ঠিত রাখিতে ব্যক্তিগত ক্ষমতার জঘন্য অপব্যবহার করিয়াছেন। এই ব্যক্তিকে কোন দেশের সামান্য ভদ্রতা বা শালীনতাসম্পন্ন স্বাধীন সরকার কিরূপে উচ্চ দায়িত্ব ও ক্ষমতাপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। সমাজে পুরুষদের একনায়কত্বের বর্ত্তমান যুগে নারীর জীবিকার বিনিময়ে পুরুষ নারীর সতীত্ব হরণ করিয়াছে ও করিতেছে। এমতাবস্থায় উন্নতি বা চাকুরী রক্ষার জন্য যে কোন শিক্ষয়িত্রীর পক্ষে পুরুষের কবলগত হওয়া আশ্চর্য্যের নয়। কিন্তু তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা না করিয়া প্রশ্রয়ের পথে চরিত্রহীনতাকে অনুমোদন দেওয়া জঘন্যতম অপরাধ। সুকুমারমতি ছাত্রীদের নৈতিক জীবনে শিক্ষয়িত্রীর প্রভাব অনস্বীকার্য্য। ব্যাভিচারী শিক্ষয়িত্রীর তুলনায় দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত লোকের পক্ষে সেই চরিত্রহানির সাফাই গাওয়া আরও গুরুতর অপরাধ। প্রকাশ্য বেসরকারী তদন্ত দ্বারা উপযুক্ত বিচারের দ্বারাই ইহার প্রতীকার করিতে হইবে।" —বীরভূমের ডাক।

সে দিনের আর কত দেরী ?

"বিলেতের 'টাইমস্' সংবাদপত্রের আমেরিকার সংবাদদাতার এক সংবাদে প্রকাশ যে, রেডিও ও টেলিভিসন প্রচারের মাত্র একটি কেন্দ্র এক সপ্তাহে সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৯টা পর্য্যন্ত যে প্রোগ্রাম প্রচার করে তাতে ছিল ৯টি খুন, ৭টি গাড়িতে ডাকাতি এবং আরো অজস্র অন্য জাতের অপরাধের কথা। মুনাফাখোরদের দ্বারা একটা জাতির নৈতিক চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বসিয়ে দেওয়ার ব্যাপক ষড়যন্ত্রের কিছুটা নমুনা এতে পাওয়া যাচ্ছে। এই সব অপপ্রচারের প্রতি নজর রাখার জন্য যে কমিটি আছে তাদের অভিযোগ যে, তাদের প্রতিটি নির্দ্দেশকে কংগ্রেস থেকে কটূক্তি করে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। আমেরিকা থেকে বিশেষজ্ঞ যখন সব ব্যাপারেই এ দেশে আমদানী হচ্ছে তখন বেতার প্রচারের জন্যও হয়তো কিছু আমদানী হবে এক দিন, সে শুভ দিনটির জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছি। আহা, কবে সেদিন আসবে? যেদিন থেকে রেডিও খুললেই হত্যা, গুম খুন, ডাকাতি, স্ত্রীহরণ প্রভৃতি কত রকমেরই না রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতে পাওয়া যাবে এবং শুনে আমাদের এই পানসে জাতীয় জীবন প্রাণপ্রাচুর্য্যে উথলে উঠবে!" —জনসাধারণ।

ট্রাইব্যুনাল বিল

"ডাক্তার রাধাকৃষ্ণ পাল সত্যই বলিয়াছেন, যে ট্রাইব্যুনাল বিল পাশ হইল—তাহা কি যাহারা জাল-জুয়াচুরি করিয়া সূতা বিক্রয় করিয়াছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে? অথবা কয়লার চোরা-কারবার করিয়া যাহারা অর্থ লুটিয়াছেন, আলু বিদেশে রপ্তানি করিয়া প্রচুর অর্থ সিন্দুকে তুলিয়াছেন, এই ট্রাইব্যুনাল বিল কি তাহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হইবে? আমরা কংগ্রেসী রাষ্ট্রশক্তিকে দেশের এই চোরাকারবারীদের দমন করিতে বলিব। কিন্তু এই ৪ বৎসরে দেশে যে সকল রাহাজানী হইয়াছে, বোমার আঘাতে লোক হত্যা করা হইয়াছে, দলবদ্ধ ভাবে ধানের মরাই, ব্যাঙ্কের টাকা লুঠ করা হইয়াছে, ব্যবসায়ী প্রভৃতির প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে, তাহারও প্রতীকার প্রয়োজন। দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেই হইবে। ইহা না হইলে দেশের প্রজাসাধারণ যে পদে পদে বিপন্ন হইবে, সে বিষয়ে বলার আর কি আছে? বিরোধী পক্ষ আরও সংহতিবদ্ধ হইয়া কংগ্রেসের হস্ত হইতে রাষ্ট্রশক্তি গ্রহণ করুন অথবা কংগ্রেস পক্ষ অধিকতর শক্তিশালী হইয়া বিরোধী পক্ষকে অধিক মাত্রায় পর্যুদস্ত করুন, তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই; কিন্তু আমাদের কথা, দেশে যে লুঠতরাজ অবাধে চলিবে, এই নিত্য অশান্তি আমরা আর সহিতে রাজী নহি।" —নবসজ্ঞ।

শোক-সংবাদ

বিগত ১০ই শ্রাবণ শনিবার রাত্রি ৯॥০টায় প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে বাঙলার বিখ্যাত কবি ও শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য-সমালোচক শ্রীমোহিতলাল মজুমদার পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৪ বৎসর। শ্রীযুক্ত মজুমদার ১৫ দিন ধরিয়া করোনারী থ্রমবোসিস রোগে ভুগিতেছিলেন। রবিবার তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তিনি পূর্ব্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন এবং সম্প্রতি কলিকাতায় বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা করিতেছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত "বঙ্গদর্শন" পত্রিকা তৃতীয় পর্য্যায়ে প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। তাঁহার স্বপনপসারী, স্মরগরল, প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পর্কে কয়েকখানি সমালোচনা পুস্তক আছে।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কাঁচড়াপাড়ায় মাতুলালয়ে কবি মোহিতলাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈত্রিক নিবাস ছিল হুগলী জেলার অন্তর্গত বলাগড় গ্রামে।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মহাযোগী—ত্রিলোকের মহাতান্ত্রিক—সাধকশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের শ্রীমুখনিঃসৃত—কলির মানবের মুক্তির ও অলৌকিক সিদ্ধি-লাভের একমাত্র সুগম পন্থা—অসংখ্য তন্ত্রশাস্ত্র-সমুদ্র আলোড়িত করিয়া সারাৎসার সঙ্কলনে—প্রত্যক্ষ সত্য—সদ্যফলপ্রদ সাধনার অপূর্ব্ব সমন্বয়

তন্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ আগমবাগীশ শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দের

বৃহৎ তন্ত্রসার

—সুবিস্তৃত বঙ্গানুবাদসহ বৃহৎ সংস্করণ—

দেবাদিদেব মহাদেব স্বীয় শ্রীমুখে বলিয়াছেন—কলিতে একমাত্র তন্ত্রশাস্ত্র জাগ্রত—সদ্য ফলপ্রদ—জীবের মুক্তিদাতা—অন্য শাস্ত্র নিদ্রিত—তাহার সাধনা নিষ্ফল। শ্মশানে সাধনামগ্ন মহাদেব পঞ্চমুখে কলিযুগে তন্ত্রশাস্ত্রের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিয়া—সংখ্যাতীত তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া—সাধনা, মুক্তি ও সিদ্ধির পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সীমাতীত তন্ত্রসমুদ্র মথিত করিয়া, মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ সরল সহজ বোধগম্যভাবে সাধক-সম্প্রদায়ের শক্তি-বীজ-নিহিত অমূল্যরত্ন এই বৃহৎ তন্ত্রসার আজীবন কঠোরতর সাধনায়—জীবনান্তকর পরিশ্রমে সংগ্রহ—সঙ্কলন সারাৎসার সমাবেশ করিয়া—

মানবের মঙ্গলবিধান করিয়া গিয়াছেন

তন্ত্র-তত্ত্ব ও তন্ত্র-রহস্য পঞ্চমকার সাধনা কিরূপ? গুপ্তসাধন কাহার নাম? অষ্টসিদ্ধির সকল প্রকারের সাধনা—তান্ত্রিক সাধনায় শাক্তভক্তগণের সকল সিদ্ধিই তন্ত্রসারে সন্নিবেশিত।

সরল প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ—নূতন নূতন যন্ত্রচিত্রে—সুশোভিত—অনুষ্ঠানপদ্ধতি সম্বলিত।

বহু সাধকের আকাঙ্ক্ষায়—বহুব্যয়ে—আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক পণ্ডিতমহাশয়গণের সহায়তায়—কাশী হইতে পুঁথি আনাইয়া বসুমতী সাহিত্য মন্দির পরিশোধিত পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করে। পূজা, পুরশ্চরণ, হোম, যাগযজ্ঞ, [illegible], সিদ্ধি, মন্ত্র, জপ, তপ, তন্ত্রসারে কি নাই? হাইকোর্টের [illegible] বিচারপতি [illegible] আইনগ্রন্থ-প্রণেতা উডরফ সাহেবের তন্ত্রানুশীলন—মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অনুবাদ প্রণয়ন ও প্রকাশ কালাবধি তন্ত্রগ্রন্থের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের [illegible] হইয়াছে; তাঁহারা দেখিবেন কি অলৌকিক সাধনার সিদ্ধি—অতীন্দ্রিয় অনুষ্ঠান সমাবেশ—সর্ব্বতন্ত্রের অপূর্ব্ব [illegible]নন্দের তন্ত্রসারে যত মন্ত্র আছে সকলেরই [illegible] হইয়াছে।

মূল্য [illegible] টাকা

সদ্য প্রকাশিত : ছাত্রদের অপরিহার্য্য

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

পালামৌ

ইহাতে আছে

ঋষি বঙ্কিম রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী—সঞ্জীবনী-সুধা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'পালামৌ-সমালোচনা' এবং সমালোচকশ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর সঞ্জীব-সাহিত্য সমালোচনা। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্ত্তৃক দ্রুত-পঠন-গ্রন্থরূপে নির্ব্বাচিত।

মূল্য এক টাকা

আবার পাওয়া যাচ্ছে—

সেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

ওথেলো

দেবেন্দ্রনাথ বসু অনূদিত

ভেনিসের বনিক্

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় অনূদিত

রাজা লীয়ার

যতীন্দ্রমোহন ঘোষ অনূদিত

দ্বাদশ রজনী

পশুপতি ভট্টাচার্য্য অনূদিত

রীতিমত

সিম্বোলিন

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় অনূদিত

মূল্য ২৸৹ টাকা

মহিষাসুরমর্দ্দিনী

ডাঃ ষ্টেলা ক্রেম্‌রিশ কর্ত্তৃক কলিকাতা আশুতোষ মিউজিয়ামে প্রদত্ত এই চিত্রটির আসল মূর্ত্তিটি আছে লণ্ডন ওয়ারব্যুই ইনষ্টিটিউটে। উড়িষ্যাদেশীয় এই মূর্ত্তির চিত্রটি আশুতোষ মিউজিয়ামের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

প্রথম খণ্ড]   [পঞ্চম সংখ্যা

ভাদ্র

১৩৫৯

৩১শ বর্ষ

সৎ কথা

ঠাকুর বলতেন,—তোতাপুরী সমস্ত রাত ধ্যান করতেন। দিনে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে প'ড়ে থাকতেন। লোকে ভাবত, ঘুমিয়ে আছে। বাস্তবিক কিন্তু ধ্যান করতেন।

—

কারুর খুব রাগ হ'লে ঠাকুর বল্‌তেন,—ওকে ছুঁসনি, চণ্ডালে স্পর্শ করেছে। চণ্ডালে ছুঁলে যেমন অস্পৃশ্য হয়, ক্রোধের বশীভূত হ'লে মানুষ সেরূপ হয়।

—

তিনি (ঠাকুর) বলেছেন,—কিছু খেয়ে-দেয়ে পূজা করলে কোন দোষ নেই। তা না হ'লে পেট চুঁই-চুঁই করবে, পূজো কেমন ক'রে করবে? কেবল খাবার দিকে মন থাকবে। কিছু খেয়ে তার পর পূজোয় বসলে মনটা স্থির হয়, আর খাই-খাই ভাব থাকে না।

—

তিনি (ঠাকুর) বল্‌তেন,—জগৎ দেখে ভুলো না, জগৎকর্ত্তাকে জানবার চেষ্টা কর।

—

তিনি (ঠাকুর) বলতেন,—সাধু না থাকলে ধ্বংস হবার লক্ষণ। সাধু থাকলে খুব জোর—অসৎ লোক প্রবল হয় না।

ঠাকুর বলেছেন,—ওরে সাধুরা চার ধাম ঘুরায়ে তবে চেলাকে কৃপা করেন। এখানে চার ধাম ঘুরতে হয় না, কোথায় যাবি! এখানে প্রসাদ পাচ্ছিস। তখন আমার একটু ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা হয়েছিল।

—

তিনি (ঠাকুর) বলতেন,—সৎকাজে খুব বাধা।

—

তিনি (ঠাকুর) বলতেন,—'তৈরী খানা মৎ ছোড়ো', অর্থাৎ তৈরী খাবার ছেড়ো না। তৈরী খানা ছাড়লে অকল্যাণ হয় এবং হয়তো সেদিন আর খাওয়া হ'ল না।

—

স্বামিজী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিল,—'মশায়, ঈশ্বরকে কি দেখা যায়?' ঠাকুর বলেছিলেন,—'হাঁ, আমি তোমার সঙ্গে যে ভাবে কথাবার্ত্তা কইছি, ঠিক এমনি তাঁকে দেখা যায়—স্পর্শ করা যায়, আর তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া যায়।'

—স্বামী অদ্ভুতানন্দ (লাটু মহারাজ) লিখিত সৎকথা থেকে।

মাষ্টার মহাশয়ের তারকেশ্বর ভ্রমণ

(মহেন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত ডায়েরী অবলম্বনে)

শ্রীঅনিল গুপ্ত (মহেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র)

আজ মঙ্গলবার ১১শে জানুয়ারী ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। মাষ্টার কাশীপুর উদ্যান-বাটিতে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া মেঝেতে বসিলেন ; দেখিলেন নরেন্দ্র, লাটু, ও নিরঞ্জন ঘরে উপস্থিত আছেন ও ঠাকুরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর মাষ্টারকে দেখিয়া সস্নেহে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি দেখেছ স্বয়ম্ভু ?···

মাষ্টার। না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। Surprised স্বয়ম্ভু লিঙ্গ ফুঁড়ে বেরিয়েছে—তুমি যাবে, রবিবারে।

মাষ্টার। এই রবিবারে ? আচ্ছা তা গেলেই হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর একবার ছোঁবে—পূজারীদের (Repeatedly) ।• আনা পয়সা দিবে—আর ফুলচন্দন দিয়ে আপনি পুজা করিবে, তার পর তোমরা খিচুড়ী-ফিচুড়ী কোরে খেও। ইত্যাদি।

রবিবার ২৪শে জানুয়ারী মাষ্টার স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রের পরিচারিকাকে (ঝি) সঙ্গে করিয়া তাঁর আদেশে তারকেশ্বর যাত্রা করিলেন ও পরদিন প্রভাতে আসিয়া দেখিলেন ঠাকুর সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরে মশারীর ভিতর আছেন। মাষ্টার ঠাকুরের জন্য তারকেশ্বরের প্রসাদ আনিয়াছেন। মাষ্টার ঠাকুরকে প্রণাম করিতে ঠাকুর বলিলেন—

মহেন্দ্রনাথের ডায়েরীর পৃষ্ঠা মহেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক ধৃত

শ্রীরামকৃষ্ণ। কে ?

শশী। মাষ্টার মশাই তারকেশ্বর গিয়েছিলেন।

মাষ্টার। প্রসাদ রেখেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা···তুমি কবে গেলে ? রবিবারে, কাল ?

একজন ভক্ত। উনি ছুঁয়ে পূজা করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কিছু দিসলে ?

মাষ্টার। হ্যাঁ, বললুম আমায় খুব ভাল করে পুজা করিয়ে দাও, ।• আনা দক্ষিণা দেবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বেশ কোরেছ।

মাষ্টার। আর বললুম এই টাকাটি তাঁর মাথায় দিয়ে জপ করব, তা আমায় আগে এক পাশে দাঁড় করিয়ে দিলে আর গলায় দুই বেল পাতের মালা দিলে, বললে এরা সব যাক।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাস্য।

মাষ্টার। তার পর ডেক তুলে, আমি বললুম জপ করব, তা যতক্ষণ ইচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এত দিনে তোমার হাত শুদ্ধ, হাত শুদ্ধ হল, তার পর কি খেলে ইত্যাদি।

মাষ্টার। খাওয়া কিছু জোগাড় হল, যারা গিসলু তারা বড় গা করলে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কে ? তোমার পরিবার, সে ছুঁয়েছিল ?

মাষ্টার। ডেক ছুঁয়ে পূজা করেছিল, ওদের সব পূজা হয়ে গেলে তার পর আমি করলুম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হোক···

মাষ্টার। দু'-এক পয়সা জল-টল খেয়েছিলুম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। লুচি-টুচি পাওয়া যায় না ?

বাবুরাম। হ্যাঁ।

মাষ্টার। হ্যাঁ, কিন্তু ঘি-টি খারাপ, আর শৃঙ্গার বেশ হবে বলে স্নান করাবার সময় চরণামৃত ফেলতে লাগল, আমি আঁজলা (হাত ?) পেতে খেতে লাগলুম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ধন্য, তুমি ধন্য।

মাষ্টার। তাতেই পেট ভরে গিসলু।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেমন তোমার কি বোধ হল, সত্য কি না ?

মাষ্টার। খুব প্রকাশ দেখলুম আর যেতে গা ছমছম্ আর ভাবতে লাগলুম ইনি তিনবার ছুঁয়ে গেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেমন তিনি সব হয়েছেন না ? নরেন্দ্র (দত্ত) এখন সব মানছে। এখন টাকা আছে একবার জগন্নাথ যাবে, পায়ে হাত দিয়ে পুজা করবে—কেমন ?

মাষ্টার। আচ্ছা।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বিরাশি

রঙ্গন আর জুঁই ফুল দিয়ে মালা গেঁথেছে সারদা। সাত-লহর গোড়ে মালা। বিকেল বেলা গেঁথে পাথরের বাটিতে জল দিয়ে রাখতেই কুঁড়িগুলি ফুটে উঠেছে।

মন্দিরে পাঠিয়ে দিল। জগদম্বার গলার গয়না খুলে রেখে পরানো হল ফুলের মালা।

রামকৃষ্ণ দেখতে এসেছে ভবতারিণীকে। আহা এ কি রূপ! একদিকে নিকষের মতো কালো আকাশ, তার গায়ে সূর্যোদয়ের ছিটে-লাগা শাদা সমুদ্রের ঢেউ। ভাবে একেবারে বিভোর রামকৃষ্ণ।

সেই যে ছ-বছর বয়সে প্রথমে দেখেছিল সরু আল-পথ দিয়ে মাঠে যেতে-যেতে। কাজল কালো আকাশের কোলে সিতপক্ষ বকের বলাকা।

'আহা, কালো রঙে কী সুন্দরই মানিয়েছে!'

যেন জীবন-মৃত্যুর কোলাকুলি। মাঝখানে ঈশ্বরানুরাগের রক্তিমা।

'কে গেঁথেছে রে এমন মালা?' চারদিকে তাকালো রামকৃষ্ণ।

'আর কে!' পাশেই ছিল বৃন্দে-ঝি, টিপ্পনি কাটল।

রামকৃষ্ণের বুঝতে আর বাকি নেই, কে! সে ছাড়া আর কার এমন শুভ্রতা, কার এমন চিকণ-গাঁথন। ভক্তির সুগন্ধে গদগদ হয়ে আছে সারল্যের হাসিটি।

'আহা, তাকে একবার ডেকে নিয়ে এস।' স্নেহের আনন্দে উছলে উঠল রামকৃষ্ণ। 'মালা পরে মায়ের কি রূপ খুলেছে একবার দেখে যাক।'

বৃন্দে-ঝি ডাকতে গেল সারদাকে।

লজ্জায় জড়িপটী খেয়ে গেল। মন্দিরে কেউ আর নেই তো এ সময়? নেই। তা ছাড়া ঠাকুর যখন ডেকেছেন—

কিন্তু মন্দিরের কাছে আসতেই দেখল সুরেন মিত্তির, বলরাম বোস, আরো কে কে, আসছে এদিকে। হয়েছে! এখন তবে কোথায় যাই। কোথায় লুকোই।

বৃন্দের আঁচল টেনে ধরে তাড়াতাড়ি নিজেকে ঢাকা দিল সারদা। কোনো রকমে একটা আড়াল রচনা করে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেল।

আশ্চর্য, ঠিক নজর রেখেছে রামকৃষ্ণ। বলে উঠল, 'ওগো ওদিক দিয়ে উঠো না। সেদিন এক মেছুনি উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মরেছে। সামনের দিক দিয়েই এস।'

বলরাম বাবুরা সরে দাঁড়ালো। সারদা উঠে দাঁড়ালো। ভাবে-প্রেমে গান ধরল রামকৃষ্ণ।

সেবার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে সত্যি-সত্যিই কিন্তু পড়ে গিয়েছিলেন শ্রীমা।

দুধের বাটি নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন—বাটিতে আড়াই সের দুধ। ঠাকুরের তখন অসুখ, আছেন কাশীপুরের বাড়িতে। হঠাৎ কি হল, মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন শ্রীমা। দুধ তো গেলই, পায়ের গোড়ালির হাড় সরে গেল।

নরেন আর বাবুরাম কাছে পিঠে কোথাও ছিল, ছুটে এসে ধরলে মাকে।

ঠাকুর শুনতে পেলেন। ডাকিয়ে আনলেন বাবুরামকে। বললেন, 'তাই তো—এখন তবে আমার খাওয়ার কি উপায় হবে?'

ঠাকুর তখন মণ্ড খান। সে-মণ্ড তৈরি করে দেন শ্রীমা। রোজ উপরের ঘরে গিয়ে খাইয়ে আসেন ঠাকুরকে।

'এখন তবে কে আমার মণ্ড রাঁধবে? কে খাইয়ে দেবে?'

শ্রীমার পা বিষম ফুলে উঠেছে, নিদারুণ যন্ত্রণা।

ওঠা-চলা সম্ভবের বাইরে। গোলাপ-মা রেঁধে দিচ্ছে মণ্ড। নরেন খাইয়ে দিচ্ছে নিজের হাতে।

একদিন বাবুরামকে নিজের কাছটিতে ডেকে আনলেন ঠাকুর। নিজের নাকের কাছে হাত ঘুরিয়ে ঠারে-ঠোরে বললেন, ওকে একবারটি এখানে নিয়ে আসতে পারিস?'

বাবুরাম তো অবাক। পা ফেলতে পারেন না মাটিতে, সিঁড়ি বেয়ে আসবেন কি করে উপরে?

ঠাকুর পরিহাস করে বললেন, 'একটা ঝুড়ির মধ্যে ওকে বসিয়ে দিব্যি মাথায় করে তুলে নিয়ে আসবি।'

নরেন আর বাবুরাম উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

ব্যথাটা একটু কম পড়তেই উঠে দাঁড়ালেন শ্রীমা। নরেন-বাবুরামকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমাকে তোমরা ধরে-ধরে নিয়ে যাও উপরে। হ্যাঁ, খুব পারব আমি। ওঁকে নিজের হাতে খাইয়ে আসি।'

বাবুরাম আর নরেন মাকে নিয়ে চলল ধরে-ধরে।

কিন্তু সেবার যখন ঠাকুরের হাত ভেঙেছিল তখন কী হয়েছিল?

জগন্নাথকে মধুর ভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়েই ঠাকুর পড়ে গেলেন। ভেঙে গেল বাঁ-হাত। এর দু' একদিন আগেই সারদামণি ফিরেছে দেশ থেকে। দক্ষিণেশ্বরে ফিরতে না ফিরতেই এই অঘটন।

'কবে রওনা হয়েছিলে?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'বেস্পতিবার।'

'বেলা তখন কত?'

হিসেব করে দেখা গেল, বারবেলা।

আর কথা নেই। ঠাকুর বললেন দৃঢ়স্বরে, 'বিষুৎবারের বারবেলায় রওনা হয়ে এসেছ বলেই আমার হাত ভেঙেছে। যাও, যাত্রা বদলে এস।

আর কথাটি নেই। সারদা ফিরে চলল দেশে। যাত্রা বদলে আসতে।

তুমি যেমন বলো তেমনি চলি। তোমার যাতে আরাম তাতেই আমার আনন্দ। বৃক্ষ হয়ে যদি বসতে বলো, বসি। আকাশ হয়ে যদি বলো ওড়ো, উড়ে বেড়াই। বৃক্ষ আর আকাশ, দুইই আমার আশ্রয়।

মথুর বাবুর দেওয়া পিঁড়িতে রামকৃষ্ণ বসে আর সারদা তার গায়ে তেল মাখিয়ে দেয়। সারদা তন্ময় হয়ে দেখে, গা থেকে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে। আর কী রঙ! যেন হরিতালের মত! বাহুতে সোনার ইষ্টকবচ, তার সঙ্গে গায়ের রঙ যেন মিশে গেছে।

ঠাকুর তখন দেহ রেখেছেন, ঠাকুরের ইষ্টকবচ তখন শ্রীমার হাতে। ট্রেনে বৃন্দাবন যাচ্ছেন শ্রীমা, দেখতে পেলেন জানলার বাইরে ঠাকুর দাঁড়িয়ে। শুধু দাঁড়িয়ে নয়, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছেন ভিতরে। বলছেন, 'কবচটি যে সঙ্গে-সঙ্গে রেখেছ, দেখো যেন না হারায়।'

মার যে হাতখানিতে কবচ ছিল তা বোধ হয় জানলার উপরে অনাবৃত ছিল। দেখতে পেয়ে ঠাকুর তাই সাবধান করে দিলেন।

আগে একবার সত্যিই গিয়েছিল হারিয়ে। সেই কবচ পূজো করতেন শ্রীমা। একবার ঠাকুরের এক তিথিপূজার দিন ফুল-বেলপাতার সঙ্গে তাকেও ফেলে দিয়েছিল গঙ্গায়। কারুর খেয়াল ছিল না। কিন্তু যাঁর কবচ তাঁর খেয়াল আছে। ভাঁটায় জল যখন কমে গেল, তখন গঙ্গার পারে খেলতে গেল ঋষি, রাম দত্তের ছেলে। দিব্যি পেয়ে গেল ইষ্টকবচ।

যা হারাবার নয় তা কে হরণ করে। নিশীথ রাত্রে নিজের হাতে যদি ঘরের আলো নিবিয়েও ফেলি, বাইরে চেয়ে দেখি ধ্রুবতারার জ্যোতিটি তুমি ঠিক জ্বেলে রেখেছ!

পরনে ছোট তেল-ধুতি, থস-থস করে গঙ্গায় নাইতে যায় রামকৃষ্ণ। কাচের উপর রোদ লেগে যেমন ঠিকরে পড়ে তেমনি তার গা থেকে একটা আভা ছিটকে পড়ছে চারদিকে। যে দেখে তারই আর পলক পড়ে না।

রামকৃষ্ণের জন্যে রাঁধে সারদা। যদিও পরিহাস করে বলে, শ্রীনাথ হাতুড়ে, তবু সারদার রান্নাটিতেই রামকৃষ্ণের অন্তরের রুচি। সজনে খাড়া বা পলতা শাক যেটি যখন রাঁধে সারদা, সেটিই একান্ত মনের মতন হয়ে ওঠে। স্বাদ আর পুষ্টির স্বাভাবিক মিতালি। রাত্রে দু-একখানি লুচি আর একটু সুজির পায়েস।

কাশীপুরে তুলোর মতন নরম করে মাংসও রেঁধে দিয়েছেন শ্রীমা।

'আমি যখন ঠাকুরের জন্যে রাঁধতুম কাশীপুরে, কাঁচা জলে মাংস দিতুম। কখানা তেজপাতা আর অল্প খানিকটা মশলা। তুলোর মতন সেদ্ধ হলে নামিয়ে নিতুম।'

থালার উপর টিপে-টিপে ভাত বেড়ে দেয় সারদা। যাতে একটু কম দেখায়। বেশি ভাত দেখলে আঁৎকে ওঠে রামকৃষ্ণ। তাই সরুটি করে দেয় টিপে-টিপে। দুধের বেলায়ও তাই। আধ সের করে রোজ-বাঁধা। কখনো-সখনো একটু বেশি দিয়ে যায় গয়লা। সেটাকে ফুটিয়ে ঘন করে রাখে। সর করে। সর ভালোবাসে রামকৃষ্ণ।

এমনি করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে খাওয়ায় সেই সদানন্দ শিশুকে। কিন্তু কিছুতেই লোভ নেই সেই শিশুর।

এক দিন একটা সন্দেশ মুখে পুরে দিতে গিয়েছিল সারদা, রামকৃষ্ণ বললে, 'ওতে আর কি আছে? সন্দেশও যা মাটিও তা।'

শুধু নারকেলের নাড়ু আর জিলিপির উপর একটু পক্ষপাত।

'ঠাকুর নারকেলের নাড়ু ভালবাসতেন।' এক স্ত্রী-ভক্তকে বললেন এক দিন শ্রীমা: 'দেশে গিয়ে তাই করে তাঁকে ভোগ দেবে।'

আর জিলিপি?

কেশব সেনের বাড়িতে খেতে বসেছেন ঠাকুর। খাওয়া হয়ে গিয়েছে—হাত তুলে বসেছেন পাত থেকে। আর খাবেন না, শত সাধাসাধি করলেও না। এমন সময় জিলিপি এসে উপস্থিত।

আর যায় কোথা! ঠাকুর তুলে নিলেন জিলিপি।

এ হচ্ছে বড়লাটের গাড়ি। ঠাকুর প্রসন্ন চোখে হাসলেন। বড়লাটের গাড়ী দেখলে রাস্তা যেমন ফাঁকা হয়ে যায় তেমনি জিলিপি দেখে ভরা পেট হালকা হয়ে যাচ্ছে। জিলিপির সঙ্গে কার কথা! জিলিপি হচ্ছে অমৃতের লিপি! সেই শিশুকালের অকৃত্রিম সুস্বাদের সংবাদ। সেই কামারপুকুরের সত্য-ময়রার দোকান।

খাবার জায়গা হয়েছে রামকৃষ্ণের। নহবৎ থেকে থালা হাতে নিয়ে আসছে সারদা। ভক্তরা সব এখন সরে যাও।

সিঁড়ি থেকে বারান্দায় পা দিয়েছে, কোত্থেকে এক মেয়ে-ভক্ত হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল। 'দাও মা আমাকে দাও।' বলে প্রায় জোর করেই সারদার হাত থেকে টেনে নিল থালা। রামকৃষ্ণের আসনের কাছে ধরে দিয়ে সরে গেল।

সারদা বসল এক পাশে। রোজ এমনিই এসে বসে। রামকৃষ্ণের খাওয়া দেখে।

খেয়ে যে স্বাদ রামকৃষ্ণ পায় তারও চেয়ে সারদা অধিকতর পায় না-খেয়ে।

'তুমি এ কি করলে?' আসনে বসেই বললে রামকৃষ্ণ, 'আমার খাবার নিজে না নিয়ে ওর হাতে দিলে কেন? তুমি কি ওকে জানো না?'

একটা কলঙ্ক ছিল মেয়েটির। সারদা বললে, 'জানি।'

'জানো তো, দিলে কেন? এখন আমি খাই কি করে?'

মেয়েটির হাতের সেই আকুলতাটি বুঝি মনে পড়ল সারদার। বললে, 'আজকে খাও।'

'তবে বলো, আর কোনো দিন আর কারু হাতে দেবে না আমার খাবার?'

সারদা জোড় হাত করল। বললে, 'ওটি আমি পারব না। যে কেউ চাইলেই আমি ছেড়ে দেব ভাতের থালা।'

করুণাময়ীর এ আরেক অমৃত-পরিবেশন। আমার ভালোবাসার সঙ্গে আর যদি কেউ তার ভক্তির স্বাদটি মিশিয়ে দিতে চায় তা আমি বারণ করি কি করে?

'তবে চেষ্টা করব খুব।' সারদা বললে গাঢ়স্বরে, 'যাতে আমিই বরাবর নিজের হাতে নিয়ে আসতে পারি।'

খুশি মনে খেতে লাগল রামকৃষ্ণ।

কাশীপুরে ঠাকুরের জন্যে শামুকের ঝোল ব্যবস্থা হল। ঠাকুরের ইচ্ছে শ্রীমাই তা রান্না করুক।

শ্রীমা বললেন, 'ও আমি পারব না।'

'কেন কি হল?'

'ওগুলো জীয়ন্ত প্রাণী, চলে বেড়ায়। ওদের মাথা আমি ইঁট দিয়ে ছেঁচতে পারব না।'

'সে কি! আমি খাব, আমার জন্যে করবে!'

তখন, কি আর করা, রোক করে করতে লাগলেন শ্রীমা।

'মা, ঠাকুরকে অন্ন ভোগ দেব কি?' জিগগেস করলেন এক স্ত্রী-ভক্ত।

'হ্যাঁ, দেবে বৈ কি। তিনি শুকতো খেতে ভালোবাসতেন। গাঁদাল, ডুমুর, কাঁচকলা—'

'মাছ ভোগ দেব কি?' কুণ্ঠা-ভরা জিজ্ঞাসা মেয়েটির।

হ্যাঁ, তাও দেবে। তিনি সেদ্ধ চালের ভাত

খেতেন, মাছও খেতেন। অন্তত শনি-মঙ্গলবারে মাছ ভোগ দেবে। আর যেমন করে হোক তিন তরকারি ছাড়া ভোগ দেবে না—'

তারপরে পান সাজে সারদা। রামকৃষ্ণের মশলা এলাচ লাগে না। সাদাসিধে সাজা পানেই অন্তরঙ্গ স্বাদ।

পান সাজছে নহবতে বসে। কতগুলো বেশ ভালো করে এলাচ-মশলা দিয়ে, কতগুলো শুধু শুপুরি-চুন দিয়েই।

যোগেন বসে ছিল পাশে। জিগগেস করলে, 'কই এগুলোতে মশলা-এলাচ দিলে না ?, ওগুলো বা কার, এগুলোই বা কার ?'

সারদা বললে, 'যেগুলো ভালো, এলাচ-দেওয়া, সেগুলো ভক্তদের। ওদেরকে আপনার করে নিতে হবে, তাই একটু আদর-যত্নের ছিটেফোঁটা ওগুলোতে। আর এলাচ-মশলা ছাড়া এগুলো—এগুলো ওঁর জন্যে। উনি তো আপনার আছেনই।'

তোমাকে ভালো ভাষায় ভোলাব না, তোমাকে ভালোবাসায় ভোলাব। তোমার জন্যে আমার কোন সাজ-সজ্জা নেই, আমার এই সারল্যটুকুই আমার একমাত্র ভূষণ। আমার তো ঘোষণা নয়, আমার আহ্বান। অকপট না হলে তোমার কপাটপাটন হবে না যে।

আহারান্তে রামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে এসে বসে। তামাক খায়। সারদা এসে পা টেপে।

শেষকালে, সারদার চলে যাবার আগে সারদাকে আবার প্রণাম করে রামকৃষ্ণ।

সন্ন্যাসী-স্বামীর একটি পরিত্যক্তা স্ত্রী এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। একটু সাজগোজ করতে চায় বলে তার উপর তার শাশুড়ির বড় কড়া শাসন। শ্রীমা তাই বলছেন দুঃখ করে: 'আহা, ছেলেমানুষ বৌ, তার একটু পরতে-খেতে ইচ্ছে হয় না ? একটু আলতা পরেছে তা আর কি হয়েছে ? আহা, ওরা তো স্বামীকে চোখেই দেখতে পায় না—স্বামী সন্ন্যাস নিয়েছে। আমি তো তবু চোখে দেখেছি, সেবা-যত্ন করেছি, রেঁধে খাওয়াতে পেরেছি, যখন বলেছেন যেতে পেয়েছি কাছে, যখন বলেন নি, দু মাস পর্যন্ত নামিই নি নবত থেকে। দূর থেকে দেখে পেন্নাম করেছি—'

সাজতে সারদাও ভালোবাসে।

'কেন বাসবে না ? ওরে, ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী। তাই তো ভালোবাসে সাজতে।' বললে রামকৃষ্ণ।

নিজে টাকা-কড়ি ছুঁতে পারে না, তাই ডাকালো হৃদয়কে।

'ছাখ তো, তোর সিন্দুকে কত টাকা আছে। ওকে ভালো করে দু ছড়া তাবিজ গড়িয়ে দে।'

সিন্দুক থেকে তিনশো টাকা বেরুলো। তাই দিয়ে তাবিজ হল সারদার।

রামকৃষ্ণের মাইনে নিয়ে হিসেবে কি গোল করেছিল খাজাঞ্চি। কম দিয়েছিল। তাই নিয়ে এক দিন বললে সারদা, 'খাজাঞ্চিকে গিয়ে বলো না—'

রামকৃষ্ণ বললে, 'ছি ছি হিসেব করব ?'

হিসেব পচে যায়।

এদিকে সর্বস্ব ত্যাগী, অথচ সারদার জন্যে ভাবনা। এক দিন তাকে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ, 'তোমার ক টাকা হলে হাতখরচ চলে ?'

মুখ নামালো সারদা। বললে, 'পাঁচ-ছ টাকা হলেই চলে।'

তারপর, হঠাৎ আরেক অদ্ভুত জিজ্ঞাসা: 'বিকেলে কখানা রুটি খাও ?'

এবার লজ্জায় আর বাঁচে না সারদা। কি করে বলি ! এ কি একটা বলবার মত কথা !

কিন্তু রামকৃষ্ণ ছাড়ে না। জিগগেস করে বারে-বারে।

মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে সারদা বললে, 'এই পাঁচ-ছখানা খাই।'

তারপর আরো একটু অন্তরঙ্গ হয় রামকৃষ্ণ। বলে, 'বুনো পাখি খাঁচায় রাতদিন থাকলে বেতে যায়। মাঝে মাঝে পাড়ায় বেড়াতে যাবে।'

এক দিন কটা পাট এনে দিলে সারদাকে। বললে, 'এগুলি দিয়ে আমাকে শিকে পাকিয়ে দাও। আমি সন্দেশ রাখব লুচি রাখব ছেলেদের জন্যে।'

সারদা শিকে পাকিয়ে দিল। ফেঁসোগুলো দিয়ে থান ফেলে বালিশ করলে।

কোনো জিনিস অপচয় হতে দেয় না সারদা ! যত সামান্য জিনিস হোক, যত্ন করে রেখে দেয়, কাজে লাগায়। বলে সেই অপূর্ব্ব কথা: 'যাকে রাখো সেই রাখে।'

পটপটে মাদুর পেতে ফেঁসোর বালিশে মাথা রেখে সারদা শোয়। দিব্যি ঘুম আসে।

পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, সারদার জন্যে বড় ভাবনা রামকৃষ্ণের। কোথায় না জানি শৌচে যাবে, নিন্দে করবে লোকে, তখন ভারি লজ্জা পাবে বেচারী!

কিন্তু আশ্চর্য, কখন যে কি করে, কাকপক্ষীও টের পায় না।

'বাইরে যেতে আমিও কখনো দেখলুম না।' বলে ফেলল রামকৃষ্ণ।

কথাটা সারদার কানে যেতেই মুখ শুকিয়ে গেল। ওমা, এখন কী হবে! ঠাকুর যা মনে-মনে চান তাইই মা ওঁকে দেখিয়ে দেন। এখন তো তবে এক দিন তাঁর চোখে ঠিক ধরা পড়ে যাব! এখন উপায়?

আকুল হয়ে ভবতারিণীকে ডাকতে লাগল সারদা। 'হে মা, আমার লজ্জা রক্ষা করো।'

এমন মা, বিপন্না মেয়ের দায় মোচন করলে। দুই পাখা দিয়ে ঢেকে রাখল মেয়েকে।

কত বছর ধরে আছে সারদা, এক দিনও কারু সামনে পড়ল না।

রাত তিনটের সময় উঠে জপে বসে। জপে বসে আর কোন হুঁস থাকে না। সেদিন জ্যোৎস্না রাত, নবতে সিঁড়ির পাশে বসে জপ করছে সারদা। চার-দিকে রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধতা। ধ্যান খুব জমে গিয়েছে। ঠাকুর কখন বটতলায় গেছেন টেরও পায়নি। অন্য দিন জুতোর শব্দে টের পায়, আজ তাও নয়। লালপেড়ে শাড়ির আঁচল খসে বাতাসে উড়ে-উড়ে পড়ছে, খেয়াল নেই। তন্ময়তার প্রতিমূর্তি।

যখন ধ্যান ভাঙল তাকাল চাঁদের দিকে। হাত জোড় করলে। বললে, 'তোমার ঐ জ্যোৎস্নার মত আমার অন্তর নির্মল করে দাও।'

তিরাশি

'আজ নরেন এখানে খাবে।' ঠাকুর বললেন এসে নবতে। 'বেশ ভালো করে রাঁধো।'

মুগের ডাল আর রুটি করল সারদা।

তাই খেল নরেন এক পেট। খাবার পর ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'ওরে কেমন খেলি?'

'বেশ খেলুম। যেন রুগীর পথ্য।'

ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। নবতের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললেন, 'ওকে ওসব কি রেঁধে দিয়েছ? ওর জন্যে ছোলার ডাল আর মোটা-মোটা রুটি করে দেবে।'

তাই আবার করে দিল সারদা। তাই আবার খেল নরেন।

'নরেনের হচ্ছে ব্যাটাছেলের ভাব। নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা। ও হচ্ছে পুরুষ-পায়রা। পুরুষ-পায়রার ঠোঁট ধরলে ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে নেয়।'

কিন্তু মেয়ে-ভাব প্রকৃতি-ভাব কার? বাবুরামের। ওর হচ্ছে প্রেমের ঘর।

কিন্তু নরেন আর আসে না কেন? কেন দেখা দিয়ে আবার লুকিয়ে থাকে?

নরেন আসেনি কিন্তু সেদিন বাবুরাম এসে উপস্থিত।

যখন পাঁচ বছর বয়েস তখন যদি কেউ বলত, 'তোর এমন বাবুর মত চেহারা, তোকে একটি টুকটুকে সুন্দরী বউ এনে দেব', অমনি কচি-কচি দুটি হাত নেড়ে অসম্মতি জানাত, 'ও কথা বোলো না—ম'য়ে যাব, ম'য়ে যাব।' সেই বাবুরাম।

বড় বোন কৃষ্ণভাবিনী। শ্যামবাজারের বলরাম বোসের স্ত্রী। ঠাকুরের রসদদার বলরাম বোস।

'যখন আসবে এখানকার জন্যে কিছু নিয়ে এস। শুধু হাতে আসতে নেই।' এ কথা এক দিন বলেছিলেন বলরামকে। আর যায় কোথা! প্রতি মাসে ডালা পাঠায় বলরাম।

কেশবও যখন আসে হাতে করে কিছু নিয়ে আসে। অন্তত একটি ফুল।

শ্যামবাজারে যদু পণ্ডিতের 'বঙ্গ বিদ্যালয়ে' ভর্তি হয়েছে বাবুরাম। থাকে খুড়োর বাড়িতে। পাঠশালায় সহপাঠী তার কালীপ্রসাদ। স্বামী অভেদানন্দ।

সেইখান থেকে চলে এসেছে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে। মাষ্টার মশায়ের ইস্কুলে। ঠিক অঙ্কুরটি উড়ে এসে পড়েছে ঠিক মাঠটিতে।

গঙ্গাপারে সাধুসন্নেসী খুঁজে বেড়ায় বাবুরাম। কতই দেখে কিন্তু মনের মতনটিকে দেখে না। যাকে দেখে আর জিগগেস করতে হয় না, এ কে,—সেই জিজ্ঞাসাতীতকে।

ঘৃণাক্ষরেও জানে না তেমন একজনকে দেখেছে তার ভগ্নিপতি। দেখেছে তার মা। এমন কি তার দাদা তুলসীরাম।

'কোথায় অমন সাধু খুঁজে বেড়াচ্ছিস?' এক দিন

তাকে বললে তুলসীরাম। 'যদি সত্যিকার সাধু দেখতে চাস তবে দক্ষিণেশ্বরে যা! দেখে আয় রামকৃষ্ণ-দেবকে।'

রামকৃষ্ণের কথা শুনেছে বাবুরাম। পড়েছে খবরের কাগজে। জোড়াসাঁকোর এক হরিসভায় এক দিন বুঝি তাঁকে দেখেওছিল দূর থেকে। কিন্তু তাঁর কাছে যাই কেমন করে? কে নিয়ে যায়!

শুধু একবার মনে করো, যাবে, তিনিই ব্যবস্থা করে দেবেন।

ছেলে যদি বাপের কাছে যেতে চায়, বাপ টাকা পাঠিয়ে দেয়, লোক পাঠিয়ে দেয়। তোমার কাছে যাব—একবার শুধু একটি খবর পাঠিয়ে দাও তাঁকে। আর দেখতে হবে না। তিনি পাঠিয়ে দেবেন যান-বাহন লোক-লস্কর টাকা-পয়সা।

রাখালকে চিনত, তাকে বললে খুলে মনের কথা।

'আমি তো যাই প্রায়ই দক্ষিণেশ্বর।'

'আমাকে নিয়ে যাবে?' রাখালের হাত চেপে ধরল বাবুরাম।

কিন্তু যাবে কি করে? পায়ে হেঁটে না নৌকোয়? যাবে তো ফিরবে কি করে? যদি ফিরতে না পাও, খাবে কি? শোবে কোথায়?

কোনো প্রশ্ন নিয়েই আর মাথা ঘামায় না বাবুরাম। ঠিকানা জানা হয়ে গেছে। ঠাকুর পাঠিয়ে দিয়েছেন দিশারী।

শনিবার ইস্কুল ছুটি হলে দুই বন্ধু চলে এল হাটখোলার ঘাটে। রামদয়াল চক্রবর্তীও এসেছে দেখছি। হোরমিলার কোম্পানীতে চাকরি করে রামদয়াল, থাকে বলরামের বাড়িতে। সেও দক্ষিণেশ্বরের যাত্রী।

পৌঁছুতে সেই সন্ধে। ঠাকুর ঘরে নেই।

রাখাল কখন চলে গেছে মন্দিরের দিকে। বাবুরামকে বসে থাকতে বলে গেছে, তাই বসে আছে বাবুরাম। বসে আছে প্রার্থনার মত। প্রসাদের জন্যে যে প্রতীক্ষা তাই প্রার্থনা।

কতক্ষণ পরে রাখালের কাঁধে হাত রেখে ভাবাবিষ্ট ঠাকুর ঘরে ঢুকছেন। টলছেন মাতালের মত। হতবাকের মত তাকিয়ে রইল বাবুরাম। চোখের সামনে এ কে নয়নভুলানো!

ছোট খাটটিতে বসলেন ঠাকুর। রামদয়াল পরিচয় করিয়ে দিল।

'বাবুরামের আত্মীয়? তা হলে তো আমাদেরও আত্মীয়।' হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ডাকলেন বাবুরামকে। 'এসো তো, আলোয় এসো তো একটিবার, তোমার মুখখানি দেখি।'

ঘরের কোণে মিটমিটে একটি দীপ জ্বলছে। সেইখানে বাবুরামকে টেনে আনলেন ঠাকুর। বাবুরামের ভক্তিনম্র কিশোর মুখখানি দেখলেন একদৃষ্টে। বললেন, 'বাঃ, বেশ ছেলেটি তো!' পরে তার হাতখানি টেনে নিলেন তাঁর হাতের মধ্যে। ওজন নিলেন। বললেন, 'বেশ।'

বাবুরামকে দেখলাম—দেবীমূর্ত্তি। গলায় হার। সখী সঙ্গে। ওর দেহ শুদ্ধ—ওর হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ। একটা কিছু করলেই ওর হয়ে যাবে।

পরে এক দিন বলেছিলেন ঠাকুর, 'দেহরক্ষার বড় অসুবিধে হচ্ছে। বাবুরাম এসে থাকলে ভালো হয়। নেটো তো চড়েই রয়েছে। ক্রমে লীন হবার যো। আর রাখাল? রাখালের এমন স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আমাকেই তাকে জল দিতে হয়। আমার সেবা বড় সে আর করতে পারে না। তবে টানাটানি করে আসতে বলি না, বাড়িতে হাঙ্গামা হতে পারে। আমি যখন বলি চলে আয় না, তখন বেশ বলে, আপনি করে নিন না। রাখালকে দেখে কাঁদে, বলে, বেশ আছে।'

তাই এক দিন যখন মাকে নিয়ে বাবুরাম গিয়েছে দক্ষিণেশ্বর, ঠাকুর বললেন মাতঙ্গিনী দেবীকে, 'তোমার এই ছেলেটি আমাকে দেবে?'

মাতঙ্গিনী দেবী নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন। বললেন, 'এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।'

বাবুরামের দেহ-লক্ষণ পরীক্ষা করে ঠাকুর আবার বসলেন ছোট খাটে। হঠাৎ রামদয়ালকে লক্ষ্য করে বললেন স্নেহাকুল কণ্ঠে; 'ওগো নরেনের খবর জানো? সে কেমন আছে?'

'ভালো আছে।' বললে রামদয়াল।

'এখানে অনেক দিন আসে না। তাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে। কেন আসে না—এক দিন আসতে বোলো।'

কানু ছাড়া গীত নেই, ঈশ্বর ছাড়া কথা নেই। কথায় কথায় রাত দশটা বেজে গেল।

অমৃতময়ী কথা।

নারদকে রাম বললেন, তুমি আমার কাছে কিছু বর নাও। নারদ বললেন, রাম, আমার আর কি

বাকি আছে? কি বর নেব? তবে যদি একান্তই দেবে, এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকে, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। রাম বললেন, নারদ, আর কিছু বর নাও। নারদ আবার বললেন, রাম, আর কিছু চাই না, যেন তোমার পাদপদ্মে শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকে এই করো।

যেখানে ভক্তি সেখানেই ভগবান।

লক্ষ্মণ রামকে জিগগেস করলেন, রাম, তুমি কত ভাবে কত রূপে থাকো, কিরূপে তোমায় চিনতে পারব? রাম বললেন, ভাই, একটা কথা জেনে রাখো। যেখানে উর্জিতা ভক্তি, সেখানে নিশ্চয়ই আমি আছি। উর্জিতা ভক্তিতে হাসে কাঁদে নাচে গায়। যদি কারু এরূপ ভক্তি হয় নিশ্চয় জেনো সেখানে ভগবানের আবির্ভাব।

ঠাকুরের তো সেই অবস্থা। প্রেমে হাসে কাঁদে নাচে গায়। তবে কি এইখানেই ঈশ্বরসাক্ষাৎ? বাবুরামকে ঠাকুর যখন আত্মীয় বললেন তখন তার মানে কি বাবুরাম ঠাকুরের ভক্ত? অন্তরঙ্গদের একজন?

রাত দশটা বেজে গেছে। ঠাকুর বললেন, এবার খেয়ে নাও সকলে।

রামদয়াল আর বাবুরাম বারান্দায় শুলো। রাখাল ঠাকুরের সঙ্গে এক ঘরে।

শয়ন যেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম এই শুধু মনে হতে লাগল বাবুরামের। যেন বা মাতৃঅঙ্কে মাথা রেখে শিশুর মতো ঘুমিয়ে আছে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে নিগূঢ় শান্তি। যেন কোন গভীরের দেশে এসে সহজ বিশ্রাম পেয়েছে আজ।

'ওগো ঘুমুলে?'

অতন্দ্র মধ্যরাত্রিই হঠাৎ করুণ স্বরে কেঁদে উঠল নাকি?

বাবুরাম চোখ চাইল, দেখল ঠাকুর। বালকের মত পরনের কাপড়খানি বগলের নিচে ধরা। রামদয়ালের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে ডাকছেন।

দুজনে ঘুম ফেলে উঠে বসল। বললে, 'আজ্ঞে না, ঘুমুইনি।'

'ওগো আমার ঘুম আসছে না। নরেনের জন্যে আমার প্রাণের ভেতরটা মোচড় দিচ্ছে! যেন জোরে কে গামছা নিংড়োচ্ছে বুকের মধ্যে। তাকে একবার নিয়ে আসতে পারো?'

'আজ্ঞে, ভোর হোক। ভোর হলেই তাকে আমি সংবাদ দেবো।' বললে রামদয়াল।

'তাই কোরো। শুধু একবারটি একটু চোখের দেখা। তাকে মাঝে-মাঝে না দেখলে থাকতে পারি না।'

এই বুঝি ভগবানের কান্না। বাবুরাম দেখতে লাগল, শুনতে লাগল। ভক্তই শুধু ভগবানের জন্যে কাঁদে না, ভগবানও বিনিদ্র রাত্রি জেগে ভক্তের জন্যে অশ্রুবর্ষণ করে। ভক্ত না থাকলে ভগবানও অনর্থক। যিনি কবি তাঁর একটি রসিক পাঠক চাই। এই রসিকটি না থাকলে সমস্ত রসসমুদ্রই শুষ্ক। সমস্ত কবিতাই মাটি।

শুধু ভগবান নন ভক্তও কঠোর হতে জানে। আর সেই ভক্তকে দ্রবীভূত করবার জন্যে ভগবানের এই বিগলিত কান্না।

বাবুরাম ভাবতে লাগল, কী নিষ্ঠুর না-জানি এই নরেন্দ্রনাথ!

শুধু কি এক দিন না এক রাত্রি? ভালোবাসার কি দিন-রাত্রি আছে? কান্নার কি শান্তি আছে কোনো কালে?

এক দিন শেষে মার মন্দিরে গিয়ে ধন্না দিলেন। মা গো, তাকে এনে দে। তাকে না দেখে যে থাকতে পাচ্ছি না।

ঠাকুরের কান্নার রোল ঘরের মধ্যে বসে শুনতে পাচ্ছে ভক্তেরা। পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। একটা পরের ছেলের জন্যে এমন করে কাঁদতে পারে কেউ?

মা গো, এক কালে তোর জন্যে কেঁদেছিলাম, এখন নরেনের জন্যে কাঁদছি। তুই দেখা দিলি আর নরেন দেখা দেবে না? আমার এই কান্নার ডাকটি তার কানে পৌঁছে দে মা। তুই পাষাণ হয়ে শুনতে পেলি আর ও রক্তমাংসের মানুষ হয়ে শুনতে পাবে না?

আবার ভক্তদের মধ্যে এসে বসেন ঠাকুর। বলেন, এত কাঁদলাম কিন্তু নরেন্দ্র তো এলো না! সে এত বোঝে আর আমার প্রাণের টানটাই সে বোঝে না!'

আবার ঘরের বাইরে গিয়ে কান পাতেন! ঐ বুঝি শোনা যাচ্ছে তার পায়ের শব্দ। তার দরাজ গলার কলস্বর।

কোথাও কিছু নেই। তখন নিজেকেই নিজে

উপহাস করেন ঠাকুর। 'বুড়ো মিনসে. পরের একটা ছেলের জন্যে এমনি কাঁদছি, লোকে দেখলে কী বলবে বলো দেখি? তোমরা আপনার লোক, তোমাদের কাছে না-হয় লজ্জা নেই, কিন্তু অন্যে কী বলবে? অন্যে কী বলবে ভেবেও তো সামলাতে পাচ্ছি না।'

সেবার ঠাকুরের জন্মোৎসব করছে ভক্তরা। নতুন সাজে সাজিয়েছে ঠাকুরকে। চন্দনচর্চিত পুষ্পমালা ঝুলিয়ে দিয়েছে গলায়। আনন্দের হাটবাজার বসে গিয়েছে চারদিকে। রাম দত্ত প্রসাদ বিলোচ্ছে। গোষ্ঠমিলন গান সুরু হবে এবার।

কিন্তু ঠাকুর মাঝে-মাঝে একটা বিষণ্ণতার রেখা টানছেন। 'তাই তো. নরেন্দ্র এখনো এলো না।'

নরোত্তম কীর্তন গাইছে। যার কীর্তন তিনি মাঝে-মাঝে আঁখর দিচ্ছেন। মাঝে-মাঝে আবার তা কান্নার আঁখর। 'কই, নরেন্দ্র কই?'

নরেন্দ্র ছাড়া সমস্ত ব্যঞ্জন আলুনি। সমস্ত ব্যঞ্জনা বিস্বাদ।

উন্মনা ভাবে কখন একটু তন্ময় হয়ে ছিলেন ঠাকুর, নরেন হঠাৎ এসে তাঁকে প্রণাম করলে। ঠাকুর লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর আনন্দ তখন আর দেখে কে! একেবারে নরেনের কাঁধে চেপে বসলেন, বসেই গভীর ভাবাবেশ।

আর নরেন? প্রেমময়ের স্পর্শে বেদান্তবাদীর কাঠিন্য গলে যেতে লাগল। দুটি পরিপূর্ণ চোখ আচ্ছন্ন হয়ে এল অশ্রুতে।

চারদিকে আনন্দের ঢেউ বইতে লাগল। বইতে লাগল সেবার স্রোতস্বিনী।

ঠাকুর খাচ্ছেন, প্রসাদ-লোভে ভক্তরা তাঁকে বেষ্টন করে আছে। হঠাৎ দু চার গ্রাস খেয়েই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'নরেনের গান শুনব। গান শুনতে-শুনতে খাব। তাঁর গুণগান শোনাবার জন্যে মহামায়া নরেনকে অখণ্ডের ঘর থেকে নিয়ে এসেছেন। ওর গান শুনলে আমার ভিতরে কী হয় জানিস? আমার ভিতরে যিনি, তিনি ফোঁস করে ওঠেন।'

নরেন গান ধরল:

'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥
অভয় চরণ তলে প্রেমের বিজলী খেলে
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি॥'

গান শুনেই ঠাকুর সমাধিস্থ। অন্নরস ছেড়ে চলে গেছেন অন্য রসে। আনন্দরসে।

কিন্তু ঠাকুরের পরিহাসরসও অফুরন্ত।

বেলা দুটোর সময় ভক্তরা বসেছে পঙক্তি-ভোজনে। চিঁড়ে দই আর চিনি পরিবেশন হচ্ছে।

'রামের কি ছোট নজর!' বললেন ঠাকুর, আমার জন্মোৎসবে কিনা চিড়ের ব্যবস্থা করল! এই শীতের দিনে চিঁড়ে-দই! তার বদলে—'

ঠাকুর গান ধরলেন: 'মোণ্ডা খাজা খুরমা গজা মোদক-বিপণি-শোভনম্।'

ভক্তবৃন্দ উল্লাসের হিল্লোল তুলল।

গান জমাবার জন্যে 'আরে আরে' বলে ঠাকুর আঁখর দিচ্ছেন, এমন সময় এক ভক্ত 'হরি হরি' বলে উঠল।

সব রস মাটি। ঠাকুর হেসে উঠলেন। 'শালা এমন বেরসিক, রসগোল্লা না বলে হরি-হরি বললে।'

এমন সময় ফের দই নিয়ে এল। দই দেখে ঠাকুর হাত তুলে গাইতে লাগলেন: 'দে দই দে দই পাতে, ওরে ব্যাটা হাঁড়ি-হাতে। ওরা কি তোর বাবা খুড়ি, ওদের পাতে হাঁড়ি-হাঁড়ি—'

একটা হুল্লোড় পড়ে গেল।

আর তারই মধ্যে সেই অরসিক ভক্ত 'রসগোল্লা' বলে 'জয়' দিলে। [ক্রমশঃ।

দুর্গা, দুর্গা

(ক) এক ঝাড়ের বাঁশ,—কোনটিতে দুর্গার কাঠামো, কোনটিতে হাড়ির ঝুড়ি।
(খ) ওয়াপানের জন্যে দুর্গোৎসব বাকি থাকে না।
(গ) হিঁদুদের দুর্গাপুজো, উপরে চিকণ-চাকন ভিতরে খড়ের বুজো।
(ঘ) দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়।
(ঙ) দুর্গাপূজায় শাঁখ বাজে না, ষষ্ঠীপূজায় ঢোল।

—ডা: শ্রীসুশীলকুমার দে সংগৃহীত প্রচলিত বাঙলা প্রবাদ থেকে

শ্রীসজনীকান্ত দাস

নবম তরঙ্গ

বোলপুর

["আমার রবীন্দ্রনাথ"কে যে অতঃপর একটানা সকলের গোচরে আনিবার মতলব করিয়াছিলাম তাহা বজায় রাখিতে পারিলাম না। কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু আমার কাহিনীর কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া চলিবার পরামর্শ দিলেন। তাঁহাদের মতে, আমার "আত্ম-স্মৃতি"তে পথ-চলাটাই প্রধান অবলম্বন হওয়া বাঞ্ছনীয়, পথের ধারে বৃহৎ বা মহৎ যে বস্তুই চোখে পড়ুক তাহাকে লইয়া স্থাণু হইয়া থাকা অথবা কালের গতিকে লাফ দিয়া দিয়া ডিঙাইয়া চলা কোনটাই সমীচীন নয়। পণ্ডিত মহাশয়—ভুবনমোহন করের ক্ষেত্রে এইরূপ করিতে গিয়া একটা ভুলও করিয়া বসিয়াছি। তাঁহার সহিত আমার সম্পর্কের কাল ১৯১৪ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ বি-এস-সি পড়িতে আমার কলিকাতা আসার আরম্ভকাল পর্যন্ত। তিনি ১৯২০ খৃষ্টাব্দের শেষার্ধে দেহরক্ষা করেন। আমি ভুলক্রমে, আমার 'প্রবাসী' অফিসে চাকুরির কাল পর্যন্ত তিনি বর্তমান ছিলেন এইরূপ বলিয়াছি। গত সংখ্যার আর দুইটি ভুলও এই সঙ্গে উল্লেখ করি; কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসে সেপ্টেম্বর (১৯২০) মাসের গোড়ায়, ডিসেম্বর মাসের শেষে কংগ্রেসের মূল অধিবেশন হয় নাগপুরে, এইখানেই মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব পাকাপাকি রকমে গৃহীত হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতেই অসহযোগের বন্যা কলিকাতায় বিস্তার লাভ করে, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ এই তিন মাস আমরা প্রবলভাবে ইহাতে যোগদান করি। কবি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাটির নাম "কোনো ধর্মধ্বজের প্রতি"—উহা ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে বাহির হয়।]

অসহযোগ-মন্দাকিনীর প্রথম বন্যা যেমন প্রবল তোড়ে কলিকাতার ছাত্রসমাজকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল ঠিক তেমনই প্রবল তোড়ে তাহা নামিয়াও গেল; ঐরাবতরা একে একে আত্মস্থ হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-যূথও। নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ-বিরোধী সি. আর. দাশ মহাত্মা গান্ধীকে সমর্থন ও মাসিক অর্ধ লক্ষ টাকা আয়ের ব্যারিষ্টারি বিসর্জন করিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হইয়া বাংলাদেশে, বিশেষ করিয়া কলিকাতায় যে বিপর্যয় আনিয়াছিলেন, জাতীয় শিক্ষালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নেতৃবৃন্দ তথোপযুক্ত তৎপর হইতে না পারিয়া অসহযোগী ছাত্রদের সহযোগিতা হারাইলেন। কলিকাতায় সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং সুদূর আমেরিকা-ইউরোপের প্রবাস-বাস হইতে রবীন্দ্রনাথ বারংবার সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিতে লাগিলেন,—শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরোধিতা আত্মঘাততুল্য; হে ছাত্রগণ, বাহির বিশ্বের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কূপমণ্ডূক হইও না; আগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠুক তবে তোমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বর্জন করিও, ইত্যাদি। চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পূর্বপ্রান্তে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন পার্কে ও স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত সভায় চিত্তরঞ্জন-বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি নেতারা বেকার ছাত্রদের দ্বারা বারংবার আক্রান্ত হইয়া উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। আমরা কয়েকজন একদিন চিত্তরঞ্জনের গৃহে তাঁহাকে গিয়া ধরিলাম, নূতন শিক্ষাব্যবস্থা চাই। সেখানে সেদিন বিপিনচন্দ্র ও সি. এফ. আণ্ড্রুজ উপস্থিত ছিলেন। চিত্তরঞ্জন স্পষ্ট রূঢ় ভাষে বলিলেন, শিক্ষা অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু স্বরাজ পারে না। তিনি নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিলেন, আমি কাল কি খাইব জানি না, তবু বৃত্তি ছাড়িতে দ্বিধা করি নাই; তোমরাও বৈদেশিক শিক্ষা সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া বৎসর খানেক ধীর ও স্থির থাকিলে স্বরাজ অবশ্যম্ভাবী, এবং তখন স্বদেশী শিক্ষাপদ্ধতির চমৎকার ব্যবস্থা হইবেই। অধিকাংশ ছাত্রই এই ফাঁকা কথায় স্থির থাকিতে পারিল না, প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার মুখেই নিরুৎসাহ ও হতোদ্যম হইয়া প্রায় অধিকাংশই একে একে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করিল। আমিও করিলাম। যে কয়েকজন দৃঢ়চিত্ত যুবক মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-মন্ত্রকে গুরু-মন্ত্রের মত গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা আর ফিরিল না। সংখ্যায় তাহারা কম নয়।

১৯২১ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাৎ সার্ আশুতোষের এই সাময়িক দুঃস্বপ্ন কাটিয়া গেল; প্রত্যাবর্তনের পালা শেষ হইল; নিয়মিত স্কুল কলেজ চলিতে লাগিল। ক্লাস প্রমোশনের জন্য এপ্রিল মাসেই আমাদের একটা বার্ষিক পরীক্ষা হইল; অধ্যক্ষ ওয়াট বিদ্রোহী আমাকে স্মরণ রাখিয়াছিলেন। তিনি কিছুতেই আমাকে পরীক্ষায় বসিতে দিবেন না। শেষ পর্যন্ত আমাদের হস্টেল-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জে. সি. কিড ও কেমিস্ট্রির অধ্যাপক আমার এখন-পর্যন্ত ভক্তিভাজন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বিপদ উত্তীর্ণ হইলাম। আসলে ওয়াট সাহেব নিজেও অত্যন্ত ভালমানুষ ছিলেন, কাহারও ক্ষতি করিতে চাহিতেন না।

গ্রীষ্মাবকাশ আসিল। অসহযোগ পরিত্যাগের গ্লানি কাটাইবার জন্য হষ্টেলের সকলেই মফস্বলে স্থান পরিবর্তনে গেলাম। বস্তুত, অসহযোগকে একটা পবিত্র মহদ্ধর্মরূপে ছাত্রসমাজ প্রথমে গ্রহণ করিয়াছিল, সুতরাং ধর্মত্যাগের গ্লানি প্রত্যেকের অন্তরেই ছিল। জুলাই মাসে কলেজ খুলিতে আবার সকলে যখন সমবেত হইলাম, গ্লানিহীন নিরাবিল আনন্দে অকস্মাৎ বাধা পড়িল—দার্জিলিঙে মিসেস কিডের অকালমৃত্যু-সংবাদে। পত্নীহারা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কিড্ অত্যন্ত অভিভূত ও বিচলিত, তিনি আর বিদেশে থাকিতে চাহিলেন না, ২০এ আগষ্ট (১৯২১) আমরা তাঁহাকে একটা গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানের মধ্যে চিরবিদায় দিলাম। আমাদের স্নেহশীল বিদেশী অভিভাবক অশ্রুভারাক্রান্ত চিত্তে স্কটল্যাণ্ডে চলিয়া গেলেন। তাঁহার স্থলে আমাদের অভিভাবক হইলেন তরুণ মিঃ ডি. টি. এইচ. ম্যাকলেলান। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধ ফেরত, মহাপণ্ডিত ব্যক্তি, সাহিত্য ব্যাপারে অতিশয় উৎসাহী, তাঁহারই উদ্দীপনায় সুধানলিনীকান্ত দে, গোপাল হালদার, বিমলাকান্ত সরকার, সুধেন্দুমোহন ঘোষ, প্রবোধচন্দ্র মজুমদার, শৈলেশ কর, যতীন্দ্রনাথ দত্ত (বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী গম্ভীরানন্দ) ও আমি উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম। অগিলভি হষ্টেল ম্যাগাজিন দীর্ঘকাল বাহির হয় নাই, ষষ্ঠ খণ্ড পর্যন্ত কয়েকটি সংখ্যার প্রকাশ পুরাতন ইতিহাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা সপ্তম খণ্ডের (১৯২১) প্রথম সংখ্যা প্রকাশের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলাদেশে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহাতে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতে এবং বাংলা-সাহিত্যে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হইল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে অতিশয় শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পুত্র ও পুত্রবধূ সহ ইয়োরোপ যাত্রা করেন। অমৃতসর-জালিয়ানওয়ালাবাগের হাঙ্গামা তখন থিতাইয়া আসিয়াছে, নাইটহুড ত্যাগ করিয়া সম্রাটকে যে অপমান করিয়াছিলেন (১৯১৯) তাহার জের ইংলণ্ডে একটু আধটু থাকিলেও এ দেশে আর নাই। কিন্তু কবির বিদেশে অবস্থানকালেই ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের গোড়া হইতেই মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-তত্ত্ব সারা ভারতবর্ষে তোলপাড় তুলিল, ঢেউ গিয়া সারা বিশ্বের সহযোগকামী, শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে বিশ্বের বিবুধমণ্ডলীর আমন্ত্রণবাহী রবীন্দ্রনাথকে আঘাত করিল। বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠারূপ সুমহৎ কার্যের প্রাক্কালেই এই জাতিগত বাধার আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হইলেন। ইতিমধ্যে নাগপুরে অসহযোগকে কার্যকরী করার প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং নূতন বৎসরের প্রারম্ভেই তাহা উত্তাল হইয়া সমগ্র দেশকে গ্রাস করিল। সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজ ও বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের নেতৃত্বে এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদলাভে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাভূমি শান্তিনিকেতনেই অসহযোগ প্রবল আকারে দেখা দিল। দূর হইতে প্রেরিত সত্য মিথ্যা নানা খবরে বিচলিত, বিরক্ত ও অস্থিরচিত্ত রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিরোধ পূর্বে ও পশ্চিমে ঘনাইয়া উঠিতেছে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহারই প্রতিবাদ-স্বরূপ তিনি আশ্রমে ফিরিয়াই "শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধ রচনা করিয়া ১১ই আগষ্ট কলিকাতায় আসিলেন।

তখন পর্যন্ত, আমার জীবনে কাব্য ও সাহিত্য অনুভূতির উদ্বোধক, আমার শৈশব-কৈশোরের পরম বিস্ময় "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" ও 'কথা ও কাহিনী'র কবি, আমার যৌবন-প্রারম্ভের ধ্যান ও জ্ঞান রবীন্দ্রনাথের দর্শনলাভ ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। সেই শুভদিন অকস্মাৎ সমাগত ভাবিয়া পুলকিত হইয়া উঠিলাম। ১৫ই আগষ্ট ৩০-এ শ্রাবণ কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি স্বয়ং "শিক্ষার মিলন" পাঠ করিবেন—এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইল। কিন্তু আমার আন্তরিক চেষ্টা ও প্রভূত কায়িক উদ্যম সত্ত্বেও যাহা হইবার নয় তাহা ঘটিল না, নিদারুণ ভিড়ের চাপে বিপর্যস্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথের দর্শন না পাইয়াই হষ্টেলে ফিরিয়া আসিলাম।

আমার জন্ম ভাদ্র মাসে। আমি বরাবরই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি, আমার জীবনের গণনীয় ও স্মরণীয় যাবতীয় ব্যাপার এই ভাদ্র মাসেই ঘটিয়া থাকে। পরে 'শনিবারের চিঠি'র সহিত আমার সংযোগ এই মাসেই

ঘটিয়াছিল। সুতরাং অদম্য ইচ্ছা লইয়াও রবীন্দ্র-সন্দর্শনের জন্য সেই ভাদ্র মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। সুযোগ ঘটিতে বিলম্ব হইল না। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও মহাত্মা গান্ধীর সহিত বিরোধিতা লইয়া তখন কলিকাতার ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ, হষ্টেলে মেসে সর্বত্রই দুই দল। অগিলভি হষ্টেলে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র শিবদাস রায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীতের কল্যাণে আমরা অসহযোগের পলাতক ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও অন্তরে অন্তরে রাবীন্দ্রিক ছিলাম। বিদেশ হইতে সদ্যপ্রত্যাবৃত্ত রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎকামী আমাদের কয়েকজনের আগ্রহাতিশয্যে শিবদাস অচিরাৎ সে ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল; শান্তিনিকেতন আশ্রম দলের সহিত অগিলভি হষ্টেল দলের ফুটবল খেলা প্রতিযোগিতার দিন ধার্য হইয়া গেল, ভাদ্র মাসে শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতন আমার পৈতৃক নিবাস রাইপুরের সন্নিকট, রাইপুরেরই ভুবনমোহন সিংহের নামাঙ্কিত ভুবনডাঙার উপর অবস্থিত, সুতরাং আমার স্বদেশেই বিশ্বের মহাকবির সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার আমার অসীম সৌভাগ্যেরই পরিচায়ক।

আমি কোনকালেই খেলায় দড় ছিলাম না, তবু বারীন ঘোষেদের মানিকতলার বোমার আড্ডার পাশেই অবস্থিত স্কটিশ চার্চ কলেজের মাঠে হষ্টেলের দলে ভিড়িয়া ফুটবল ও হকি খেলিতাম। এইটুকুই মূলধন, কিন্তু আসলে ইহা আমাদের খেলার অভিযান ছিল না, সাহিত্যতীর্থযাত্রাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল। ১৯২১, সেপ্টেম্বরের শেষে প্রকাশিত হষ্টেল ম্যাগাজিনে গোপাল হালদার লিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিপিবদ্ধ আছে:

"We went to Santiniketan Bolpur on a 'literary excursion'; never probably in the history of the hostel had there been such a pilgrimage."

বন্ধুমহলে আমার কবিখ্যাতি ছিল, গোলকীপারের পদের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া আমিও তীর্থযাত্রার অধিকার লাভ করিলাম। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মালদহ হইতে বাবার সহিত স্বদেশযাত্রার ঠিক দশ বৎসর পরে আবার সেই পুরাতন বোলপুরে বহু বন্ধু-সমাবৃত হইয়া উপস্থিত হইলাম। খেলায় দুই গোলে হারিয়া ফিরিলাম বটে, কিন্তু জীবনের খেলায় সেই প্রথম গুরুদর্শনের দিন হইতেই যে জিত হইল আজিও তাহার ফলভোগ করিতেছি।

বোলপুর। শরতের প্রসন্ন প্রভাত, স্বর্ণ-রৌদ্রোজ্জ্বল। আকাশের হালকা মেঘ আর প্রান্তরের কাশফুল একই শ্বেতবরণী দেবীর মন্দিরে চামর ব্যজনরত। সেদিন বোলপুরের এই রূপ মাত্র দেখিয়াছিলাম। পরে আরও নিবিড় করিয়া আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখা বোলপুরের রূপ আমার 'পঁচিশে বৈশাখ' কাব্যে এইভাবে ধরিয়াছি :—

"রেল-লাইনের ধারে ধারে দেখি সারি-সারি ধান-কল
চোঙার আকারে আকাশে তুলেছে মাথা
কয়লা খাইয়া মিশকালো ধোঁয়া উদ্গারে অবিরল,
ধূম্র-মলিন সবুজ গাছের পাতা।
পথের দু ধারে সেই পাতাদের দেখি গৈরিক শোভা
কখনো সবুজ ছিল তা হয় না মনে,
ধুলো আর ধোঁয়া ডাঙা ও খোয়াই খ'ড়ো ঘর আর ডোবা
এ বোলপুরের পরিচয় মোর সনে।
দূর হতে দেখি, পথ চলিতেছে গেঁয়ো লোক দলে দলে
ভিন গাঁ হইতে আসে হেথাকার হাটে,
লাঠির আগায় বোঁচকা বাঁধিয়া যত সাঁওতাল চলে
যেতে হবে দূর সূর্য নামিছে পাটে।
কৌপীন-পরা পুরুষ এবং মেয়েরা গামছা-পরা
যত চলে পথ তত বেশী কয় কথা;
কলের কবলে প্রকৃতি মানুষ এখনো পড়ে নি ধরা,
ধূলি ধোঁয়া ঠেলে জাগে প্রাণ-ব্যাকুলতা।
ভারমন্থর গরুর গাড়ির চাকার কান্না শোনো—
ধূলি-বালি কেটে চলে ঘস্ ঘস্ করি।
দূর-দিগন্তে পথ চলিয়াছে নাই তার শেষ কোনো
নিশিদিন চলে গো-গাড়ির খেয়াতরী।
কখনো দেখি যে মোটরের ছই, কভু টায়ারের চাকা,
পুরাতন আর নূতনেতে মেশামেশি
এই বোলপুর—নূতন ধোঁয়া ও পুরাতন ধুলা ঢাকা;
নূতনো হতেছে পুরাতন ঘেঁষাঘেঁষি।
ডাঙায় ডাঙায় ছাড়াছাড়ি হয়ে তাল-খেজুরের মেলা—
তারি মাঝ দিয়ে চলিয়াছে রাঙা পথ,
তৈলবিহীন চাকার ভাষণে মুখরিত দুই বেলা,
চলে অবিরাম জগন্নাথের রথ।
পাশ দিয়ে গেছে রেলের লাইন, প্রহরে প্রহরে চলে
মাল ও মানুষে বোঝাই বাষ্পগাড়ি,
ঘরের ছন্দ কেটে কেটে যায় বাহিরের কোলাহলে,
অটুট তবুও রয়েছে বনেদী বাড়ি!
উত্তরে যাবে? উত্তরায়ণ—সেখানে ঠাকুর রবি······"

"উত্তরায়ণ" নয়, তাহারও উত্তরে "কোনারক" সদ্যনির্মিত, প্রস্তরশোভিত খর্বায়তন সৌধ। বাতায়ন

ও দ্বারের অবকাশ-পথ দিয়া পশ্চিমে উত্তরে দিগন্ত-বিস্তার প্রান্তর—সেই তরুণ প্রভাতেও রুক্ষ নিষ্করুণ। শালপ্রাংশু মহাভুজ কবি সেই খাটো ঘরে দক্ষিণাস্ত হইয়া বসিয়া ছিলেন, প্রসন্ন হাস্যে আমাদের সম্ভাষণ জানাইলেন। দীর্ঘ প্রবাসান্তে ইয়োরোপ হইতে সদ্য ফিরিয়াছেন, গায়ের রঙ টক্ টক্ করিতেছে। বিস্ময়বিমূঢ় আমরা প্রথমটা প্রণাম করিতেও বিস্মৃত হইলাম। কবির সুধাবর্ষী কণ্ঠনিঃসৃত কৌতুক-প্রশ্নে আমাদের চমক ভাঙিল—

—তোমরাই বুঝি অগিল্‌ভি হষ্টেলের দল। শুনলাম ডাঙার মাঝখানে বেকায়দায় পেয়ে তোমাদের এঁরা হারিয়ে দিয়েছেন !

মন বলিতে চাহিল—হারি নাই, আমাদের জিত হইয়াছে ; কিন্তু বলিতে পারিলাম না। বিশ্বমৈত্রীর পুরোহিত কবির চিত্ত তখন অতিথি-বিমুখ অসহযোগী ভারতবর্ষের দুর্ব্যবহার-চিন্তায় কাতর, "শিক্ষার মিলন" ও "সত্যের আহ্বান"এর ছাপাখানার কালি তখনও শুকায় নাই। স্বতঃই প্রসঙ্গ প্রাচীন ভারতের উদারতা ও আধুনিক ভারতের সঙ্কীর্ণতা-ক্ষুদ্রতার প্রতি নিবদ্ধ হইল। সেদিন তাঁহার মুখে যে সুগভীর বেদনা এবং ভবিষ্যতের আশঙ্কাজনিত উত্তেজনার প্রকাশ দেখিয়াছিলাম তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই অভিভূত হইয়াছিলাম। প্রায় বত্রিশ বৎসর পূর্বেকার ঘটনা, সব কথা পূর্বাপর মনেও নাই। শুধু এইটুকু মনে আছে, সেই কথাগুলিই তাঁহার তৎকালীন ভাষণ-গুলিতে বিস্তৃততরভাবে স্থান পাইয়াছিল। যাহা স্থান পায় নাই তাহা আমার অন্তরে আজও স্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান আছে। আমাদের বর্তমান জাতিগত চরিত্রহীনতা ও ক্ষুদ্রতার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়া-ছিলেন :

"আমরা যে কোথায় নেমে গেছি তা বোঝাতে আমি আমাদের দেশের বহুপ্রচলিত একটা গুজবের কথা বলব। দেশে কোথাও ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হ'লেই শুনতে পাই, এত জন আহত মুমূর্ষুকে মেরে মাল-গাড়িবন্দী ক'রে কর্তৃপক্ষ জলে ফেলে দিয়েছে। আমরা সহজেই বিশ্বাস করি এবং উত্তেজিত হই। একবার ভেবে দেখি না, এই কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনেক দেশী লোক আছেন, ঘাতকরা তো নিশ্চয়ই দেশী। বছরে বছরে এভাবে দেশের এতগুলো নিরীহ লোককে খুন ক'রে জলে ফেলা হচ্ছে অথচ এদের মধ্যে আজ পর্যন্ত একজনও কি দাঁড়াল না এই নির্মম নৃশংসতার প্রতিবাদ করতে ? মেরে ফেলাটা যদি সত্যি হয় তাহ'লে আমরা জাত হিসেবে কত ছোট ভেবে দেখ। আর সবটাই যদি মিথ্যে গুজব হয়, তাহলে মানুষের সততা ও মহত্ত্বকে এমনভাবে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস ও সন্দেহ করবার প্রবৃত্তি আমাদের হ'ল কি ক'রে ? আসলে আমরা সর্বদাই অক্ষম দুর্বল হীনের যা ধর্ম তাই অবলম্বন করি, সব বড়কেই সব মহৎকেই টেনে ধূলোয় নামিয়ে ধূলোসাৎ করলেই আমাদের আনন্দ, সবাইকে অবিশ্বাস্য ও হেয় প্রমাণ করতে পারলেই আমাদের উল্লাস। এই দুর্ভাগা দেশে কোনো দিক দিয়ে বড় যাঁরা হয়েছেন যেমন ক'রে হোক তাঁদের ছোট প্রমাণ করতে না পারলে আমাদের স্বস্তি নেই। এযুগের ছেলেরা অর্থাৎ তোমাদের ওপর আমার অটুট বিশ্বাস আছে। তোমরা এই হীন কলঙ্ক থেকে জাতিকে মুক্ত ক'রো।"

ইয়োরোপ ও ইংলণ্ডের প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি বলিলেন : "একটা বিরাট ফাঁকির ওপর গ'ড়ে উঠেছে আজ সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডের অভিমান। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা বলতে যা বোঝায় ওরা মোটে তার এক-টুকরোর মালিক, এতেই ওদের বাহাদুরী কত, গর্ব কত! ফ্রান্সে যাও জার্মানীতে যাও, তবেই যথার্থ ইয়োরোপীয় সভ্যতা কি বুঝতে পারবে। এদেশের অনেকে ভাবেন ওয়েষ্টার্ন সিভিলিজেশনের গোড়ার সুরটা তাঁরা ধরতে পেরেছেন, কিন্তু তাঁরা ভুলে যান, সুর জিনিসটা সূক্ষ্ম, মোটা মোটেই নয়, চট্ ক'রে তা ধরা যায় না, নিখুঁত হ্যাট কোট টাই পরলেও না ; তার জন্যে দেখা চাই এবং দেখার দৃষ্টি চাই। যাঁরা সত্যের ওপর জীবন গ'ড়ে তুলেছেন তাঁরাই মিথ্যেটাকে স্পষ্ট দেখতে পান। পুলিসে চোর ধরে কিন্তু চৌর্য বস্তুটার ভয়ানকত্ব বুঝতে পারেন কেবল সাধুরাই। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সমাজের ব্যাধি তাঁরাই পুরোপুরি ধরতে পারেন যাঁরা ব্যাধিমুক্ত। খেলোয়াড়ের চাইতে খেলার দোষগুণ মাঠের বাইরে যারা থাকে তারাই ভাল দেখতে পায়। লেখা অনেক লেখা হয়, বেরও হয় কিন্তু অধিকাংশ লেখাতেই শুধু কথা থাকে, বাণী থাকে না। লেখক হয়তো অনেক ভেবে লিখেছেন কিন্তু পাঠককে ভাবিয়ে তোলার মশলা সে লেখায় নেই। এসব লেখা অসার্থক, ইয়োরোপে আজকাল যেসব লেখক পাঠককে ভাবিয়ে তুলতে

পারেন তাঁদের মধ্যে রোমা রলাঁ্যা প্রধান, বার্নার্ড শ'য়ের প্রভাবও কম নয়।"

"স্বদেশী" ও "জাতীয়"—প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "আমরা নামে ন্যাশনাল ফ্যাক্টরি খুলি, স্বদেশী আন্দোলন করি, জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্ গড়ি, ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়ান ব'লে চেঁচিয়েই মরি কিন্তু কাজে কি করি ইণ্ডিয়ান আর্টের হাল দেখলেই বুঝবে। কত কষ্টে কত চেষ্টায় একে বাঁচিয়ে তোলা হ'ল কিন্তু সারা দেশের লোক চোখ ফিরিয়ে তাকালেও না, পশ্চিম একে একে সব লুট ক'রে নিয়ে গেল, আমরা হাত তুলে বারণ পর্যন্ত করলাম না। দেশের জিনিস তো যাচ্ছেই, পশ্চিম থেকে যদি কেউ কিছু আহরণ ক'রেও নিয়ে আসে তখন জাত যাওয়ার কথা ওঠে, যেমন উঠেছে আজ।"

অসহযোগের অতিথি-বিমুখতার কথা রবীন্দ্রনাথ ভুলিতে পারিতেছিলেন না। আমরা মুগ্ধ অথচ বেদনা-হত চিত্ত লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু এমনই আমাদের সৌভাগ্য যে বোলপুরও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় আসিল, অর্থাৎ কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে "সত্যের আহ্বান" পাঠ ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্রথম "বর্ষামঙ্গল" উৎসব করিতে রবীন্দ্রনাথ স্বদলবলে কলিকাতায় আসিলেন। রবীন্দ্রনাথকে পুনঃ পুনঃ দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিতে লাগিল। "শিক্ষার মিলনে"র অভিজ্ঞতায় "সত্যের আহ্বান" আর শুনিতে যাই নাই, কিন্তু "বর্ষামঙ্গলে"র অপূর্ব স্বপ্নময় পরিবেশে রবীন্দ্রনাথকে দেখিলাম। ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৯ ভাদ্র, ১৩২৮) আবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে অনুষ্ঠিত কবির ষষ্টিতম বার্ষিক সম্বর্ধনায় যোগ দিবার সুযোগও লাভ করিলাম। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বহু সাহিত্যিকই সমবেত হইয়াছিলেন; কিন্তু এক ছাড়া দ্বিতীয় দেখিতে পাইলাম না; সেই রাত্রেই একটি কবিতায় কবিকে বন্দনা করিলাম:

রবীন্দ্রনাথ

ওগো আঁধারের রবি,
ওগো মরতের কবি,
স্বরগে মরতে ঘটালে মিলন
দেবতার কৃপা-লভি।

আকাশে মাটিতে তৃণে ফুলেফলে
প্রতি গৃহকোণে প্রতি হৃদিতলে
চিরবিচিত্র যে সুর উথলে
আঁকিছ তাহারি ছবি।
তুমি সন্ধানী, কবি।

আনন্দ দিয়ে দুখশোক করি জয়,
অসীমের পানে চলেছ ছুটিয়া
নিশঙ্ক নির্ভয়।

মূক প্রকৃতিরে তুমি দিলে ভাষা,
ক্ষুদ্রে জাগালে বৃহতের আশা,
যেথা সুন্দর যেথা ভালবাসা—
সেখানে সত্য সবি
তুমিই দেখালে, কবি।

মঙ্গলগানে অশুভে করিয়া ক্ষয়,
আঁধারবিনাশী আলোক আনিলে
হে চিরজ্যোতির্ময়।

নিরাশ পরাণে তুমি দাও আনি
আশা-আনন্দ-আশ্বাস-বাণী;
আছে দেবতার বরাভয়-পাণি
নিত্য তা অনুভবি
তব আশ্বাসে, কবি।

তুমি আনো সুর অসুর ভুবনময়
নব নব গানে দাও প্রাণে প্রাণে
অধরার পরিচয়।
তোমারে প্রণাম কবি,
তুমি আঁধারের রবি,
মোদের মাঝারে তোমারে পেয়েছি,
দেবতার কৃপা লভি। [ঈষৎ পরিবর্তিত]

এই কবিতা, সঙ্গে সঙ্গে আমারই হস্তাক্ষরে হষ্টেল-ম্যাগাজিন-ভুক্ত হইল। পরবর্তী ৭ই পৌষের উৎসবে একেলাই শান্তিনিকেতন গেলাম কবিতাটির নকল পকেটে লইয়া। প্রত্যূষে কাচ-মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের উপাসনা শুনিলাম। পরদিন ৮ই পৌষ ২৩এ ডিসেম্বর শুক্রবার রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কুড়ি বৎসরের লালিত সাধের বিশ্বভারতীকে একটি মনোরম অনুষ্ঠানের মধ্যে দেশবাসীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জ আশ্রম-বালিকাদের দ্বারা আলিম্পনে ও ফুলসজ্জায় সজ্জিত হইল। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন; সভাপতিকে বরণ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন। এবার তমোহন্তা এক-চন্দ্রকেই শুধু দেখিলাম না; চোখ মেলিয়া নক্ষত্রমণ্ডলীকেও দেখিবার অবকাশ পাইলাম; তন্মধ্যে আচার্য সিলভ্যাঁ লেভি, মাদাম

লেভি, সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজ, উইলিয়াম পিয়ার্সন, এল. কে. এলম্‌হার্ষ্ট, বিধুশেখর শাস্ত্রী, নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এক ফাঁকে নামো-বাংলোয় গিয়া ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথকেও শ্রদ্ধানিবেদন করিয়া আসিলাম। তিনি তখন রকম-বেরকমের কাগজের বাক্স বানাইতে ব্যস্ত এবং ভৃত্য মুনীশ্বর প্রসাদাৎ কোনও রকমে লজ্জানিবারণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু এবারকার একক তীর্থযাত্রায় রবির যে গ্রহটি সর্বাপেক্ষা আমার চিত্ত আকর্ষণ করিলেন, তিনি হইতেছেন প্রমথনাথ বিশী। দেখিতে বালকের মতো, বেঁটেখাটো কিন্তু তখনই খ্যাতিমান, অন্তত আমার প্রভূত হিংসার উদ্রেক করিবার মতো তাঁহার খ্যাতি। কাব্যে গল্পে প্রবন্ধে, ভ্রমণকাহিনীতে, বিশ্বসাহিত্য-সমালোচনায় তখনই তিনি সার্থক সাহিত্যিক, তদুপরি রবীন্দ্রনাট্য. সংস্কৃত নাট্য ও যাত্রাগান অভিনয়েও যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলেন। বয়স তখন তাঁহার কতই হইবে? উনিশ-কুড়ি। রবীন্দ্রনাথের পরে তিনিই বাংলা দেশের দ্বিতীয় নামকরা সাহিত্যিক যাঁহার সহিত পাঠ্যাবস্থাতেই আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটে। অবশ্য একটা অভিসন্ধি লইয়া প্রমথনাথের শরণ লইয়াছিলাম, তিনি যদি দয়া করিয়া আমার রবীন্দ্র-বন্দনাখানি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে হাজির করিয়া দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লজ্জায় মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না, কবিতাটি পকেটে লইয়াই ফিরিয়া আসিলাম।

আজ প্রমথনাথ বিশী আমার প্রীতিভাজন, এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর একজন। তিনি হয়তো আজ আমার এই কাহিনী পড়িয়া হাসিবেন, কিন্তু সেদিন সত্য সত্যই তাঁহাকে দেখিয়া আমি মজিয়াছিলাম। আজিও সেই সুবাদে তাঁহার প্রতি আমার প্রীতি কিঞ্চিৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধা মিশ্রিত হইয়া আছে। তাঁহার প্রসঙ্গ পরে আসিবে। আপাতত, অমন পরমার্থিক কবিতাটির গতি কি হয় সেই দুর্ভাবনা লইয়াই কলিকাতায় হষ্টেলে ফিরিয়া আসিলাম। ডাকযোগে পাঠাইব? কিন্তু অকারণে একটা কবিতা পাঠাইলে তিনি কি মনে করিবেন? কারণেই বা কি লেখা যায়? ভাবিতে ভাবিতে মনে পড়িল, স্কুল-জীবনের রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' বইখানি সম্পূর্ণ নকল করিবার কালে একটা বৈজ্ঞানিক ভুল আমার নজরে পড়িয়াছিল। মুদ্রাকর-প্রমাদ নয়, রবীন্দ্রনাথ সময়ের হিসাব না রাখিয়াই লিখিয়াছিলেন। 'গোরা'র ৬ অধ্যায়ের বিষয়। বর্ণনাটি এইরূপ ছিল :

"ক্ষণকালের জন্য রমাপতি চাহিয়া দেখিল, গোরার সুদীর্ঘ দেহ একটা দীর্ঘতর ছায়া ফেলিয়া মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে জনশূন্য তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়া একাকী ফিরিয়া চলিয়াছে।"

"মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে" ছায়া "দীর্ঘতর" হইতে পারে না—একটি সুচিন্তিত পত্রে সবিনয়ে ইহাই নিবেদন করিলাম এবং কবিতাটি ফাউস্বরূপ পত্রে পুরিয়া গোপনে তাহা পোষ্ট করিলাম। লজ্জায় কাহাকেও জানাইতে পারিলাম না। দুই দিন পরে আমার চিরস্মরণীয় ৫ই মার্চ (৯৩২) তারিখে চমৎকার হস্তাক্ষরে অগিল্‌ভি হষ্টেলের ঠিকানায় ও আমার নামে একখানি লেফাপা আসিল ; পোষ্টমার্ক—"শান্তিনিকেতন, ৪ঠা মার্চ"। দেখিয়াই বুঝিলাম, দেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন। এই আমার তাঁহার সহিত সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত যোগাযোগ। প্রথম স্বামী-পত্রপ্রাপ্ত নববধূর মত উর্ধ্বশ্বাসে ঘরে গিয়া খিল দিয়া চিঠিটি পড়িলাম :

"ওঁ

কল্যাণীয়েষু

গোরার কোন্ জায়গা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছ মনে পড়িতেছে না, বইখানিও হাতের কাছে নাই। যদি মধ্যাহ্ন কালের বর্ণনা হয় তবে ছায়ার দীর্ঘতা অসম্ভব বটে, যদি মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইয়া থাকে তবে ছায়া দীর্ঘ হওয়ার বাধা নাই বিশেষত ঋতুবিশেষে।

তোমার কবিতাটি পড়িয়া আনন্দিত হইলাম।

ইতি ২০ ফাল্গুন ১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

মনে হইল গলা ফাটাইয়া চেঁচাইয়া কথাটা রাষ্ট্র করি। লজ্জায় বাধিল। একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। আমার এই পত্র বিফলে যায় নাই। 'গোরা'র পরবর্তী সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ "দীর্ঘতর" কাটিয়া "খর্ব" করিয়াছেন। আমি ধন্য হইয়াছি।

এই "দীর্ঘতর"কে "খর্ব" করা—ইহাই বাংলা-সাহিত্যে আমার সর্বপ্রথম কীর্তি, আধুনিক ভাষায় "অবদান"ও বলিতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার জীবনে দীর্ঘতরকে খর্ব করার ইহাই শেষ নয়।

দশকুমার চরিত

দণ্ডী বিরচিত

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

পূর্ব্বপীঠিকা

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

একদা বামদেব মহারাজ রাজহংসের সভায় প্রবেশ করে দেখলেন—মহারাজকে ঘিরে বসে রয়েছেন কুমারমণ্ডলী। তাঁরা যেন শ্রীমদনের সহোদর, তাঁদের সাহস যেন উপহাস করছে কার্ত্তিকেয়কে। হাতে তাঁদের জয়ধ্বজ ছত্র এবং বজ্রাঙ্কুশ। বামদেবকে দেখেই মহারাজ রাজহংস আনত করলেন নিজের মূর্দ্ধা। এবং কুমারেরা তাঁর পাদপদ্মে প্রণত করল নিজেদের শির। প্রণামের সময়টিতে সুন্দর দেখতে হল কুমারদের। তাদের কাকপক্ষ কেশরাশি মধুকরের ধারার মত ঢলে পড়ল পাদপদ্মের মন্দিরে।

বামদেব কুমারদের গাঢ় আলিঙ্গন দিয়ে মিত এবং সত্যবাক্যে আশীর্ব্বাদ করে রাজহংসকে বললেন "ভূবল্লভ, তোমার মনের পুষ্পফলের মতই তারুণ্যের লাবণ্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তোমার পুত্র রাজবাহন। এঁর মিত্রেরাও প্রশংসার্হ। এখন দিগ্বিজয়ের সময় এসেছে। রাজবাহনও অক্লেশে সে ক্লেশ সহ্য করতে পারবে। সহচরদের সঙ্গে দিয়ে রাজবাহনের দিগ্বিজয় যাত্রার ব্যবস্থা করা বিধেয়।"

মুনিবাক্যে অভিনন্দিত হয়ে, মারের মত অভিরাম, কুমারেরা—রাম প্রভৃতি মহাবীরদের মত তাঁদের পৌরুষ—রোষেই যেন ভস্ম করে দিতে লাগল শত্রুদের; বাতাসকে উপহাস করল তাঁদের চঞ্চল গতিবেগ, গতিবেগেই প্রকাশ পেল রণাভিযানের সংশয়হীন জয়। মহারাজ আশ্বস্ত হলেন। তিনি স্বপ্ন দেখলেন—অভ্যুদয়! দিগ্বিজয়ে প্রেরণ করলেন রাজবাহনকে। অন্য কুমারদের দিলেন সাচিব্য। যথাযোগ্য উপদেশ ও আশীর্ব্বাদসহ তখন শুভমুহূর্ত্তে ব্যবস্থা করে দিলেন জয়যাত্রা।

চতুর্দ্দিকের মঙ্গলসূচক শুভলক্ষণে সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে রাজবাহন মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে, একদা প্রবেশ করলেন বিন্ধ্যাটবীর গহনতায়।

সেই অরণ্যে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে গেল এক অদ্ভুত মনুষ্যের। মনুষ্যটির অঙ্গে তখনও লেগে ছিল যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন। দেহখানি কালায়সের মত কর্কশ, স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত, বিপ্র-বিপ্র-ভাব, কিন্তু দেহের সমগ্রতায় কিরাতের প্রৌঢ় প্রভাব। চোখ দেখলে বুক কাঁপে।

সেই মনুষ্যটি এগিয়ে এসে রাজবাহনকে পূজা করল। অদ্ভুত মনুষ্যের এই অদ্ভুত ব্যবহার দেখে রাজবাহন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে, মানব, এই ঘোর-প্রচার কান্তারে তুমি একলাই দেখছি বসবাস কর। অথচ এখানে বসতি দেখছিঁ না, এমন কি পশুপক্ষীও না। তোমার কাঁধের ঐ যজ্ঞোপবীতখানি বলছে তুমি ব্রাহ্মণ, অথচ আমার মন বলছে তুমি কিরাত। বিস্মিত বোধ করছি।"

অদ্ভুত মানুষটি কিন্তু রাজবাহনকে একটি তেজোময় পুরুষ বলেই বিবেচনা করে নিয়েছিল; প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে পৌরুষ আছে, তার চেয়েও যেন অধিক পৌরুষ দেখতে পেয়েছিল সে রাজবাহনের মধ্যে। বয়স্যদের কাছ থেকে তাই রাজবাহনের নাম এবং গোত্রের সংবাদ জেনে নিয়ে সে বললে—

"রাজনন্দন, এই অরণ্যে একদল মনুষ্য বাস করে, নামেই তারা ব্রাহ্মণ। বেদপাঠ বিদ্যাভ্যাস তাদের নেই, দূর করে দিয়েছে কুলাচার, পরিত্যাগ করেছে সত্য-শৌচাদি ধর্ম্মব্রত। ঘুরে বেড়ায়, অনিষ্ট করে, পাপকর্ম্ম আচরণে দ্বিধা করে না। পুলিন্দদের পুরোগম, ওদের সঙ্গে মাথামাখি, তাদের অন্নভোগী—এমনিধারা তারা ব্রাহ্মণ। তাদেরি কারও আমি পুত্র—'মাতঙ্গ' আমার নাম। আমার চরিত্র বিষয়ে সর্ব্বত্রই শুনতে পাবেন নিন্দা। আমি কিরাত-সৈন্য সঙ্গে নিয়ে জনপদে প্রবেশ করতুম, দয়া মায়া করতুম না, গ্রামে গ্রামে আক্রমণ করতুম ধনীদের, তাদের স্ত্রী পুত্রদের বেঁধে এনে সর্ব্বস্বান্ত করতুম; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাদের ছেড়ে দিতুম।

সেদিন হল কি, হঠাৎ দেখি আমার দলবলের লোকেরা বনের মধ্যে একটি খাঁটি ব্রাহ্মণকে ধরেছে;—তাকে হত্যা করতে যাবে এমন সময় তাদের বাধা দিয়ে বলি, "আরে, করছ কি। ব্রহ্মহত্যা কোরো না। মহাপাপ লাগবে।" তারা আমার কথা শুনে ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এল। তাদের পরুষ

ভাষায় অসহিষ্ণু হয়ে আমি ব্রাহ্মণকে রক্ষা করতে যাই কিন্তু পারলুম না। তাদের আক্রমণে প্রাণ হারাই।

প্রাণ হারিয়ে দেখি প্রেতপুরীতে এসেছি। সভার মধ্যে এক রত্নখচিত সিংহাসন—তাতে সমাসীন সাক্ষাৎ শমনদেব—তাঁর চারিদিকে অসংখ্য দেহধারী প্রেতপুরুষ। তাঁকে দেখে দণ্ড-প্রণাম করলুম। তিনি আমাকে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করলেন। তার পরে অমাত্য চিত্রগুপ্তকে আহ্বান করে বললেন, "দেখ, অমাত্য, এর ত এখনও মৃত্যু-সময় উপস্থিত হয় নি। দোষ এ অনেক করেছে, সত্য, কিন্তু একটি ব্রাহ্মণকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। দেখবে এর পর থেকে ওর মন পাপপথে আর যাবে না, পুণ্যকর্ম্মে ওর রুচি হবে। পাপিষ্ঠকে একবার দেখিয়ে দাও এখানকার যন্ত্রণাভোগ। তার পরে ও ফিরে পাবে ওর পূর্ব্বশরীর।"

চিত্রগুপ্ত তখন আমাকে নরক যন্ত্রণা দেখালেন। উঃ সে কী ভীষণ! একদল পাপী দেখি—লোহার থামে বাঁধা—আগুনের তাতে থামের রং হয়ে গেছে লাল। আর এক দলকে দেখি—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কটাক্ষে তপ্ত তৈলে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে, তার পরে লগুড় দিয়ে পীড়ন। আর এক দল দেখি,—দাঁড়িয়ে রয়েছে,—ধারালো কুড়ুল দিয়ে তাদের মাংস ছুলে ছুলে কাটা হচ্ছে।

কী যে দেখলুম, কত যে দেখলুম, বীভৎসতার চরম, তার ইয়ত্তা নেই। শেষে আমাকে মুক্তি দেওয়া হল। সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলুম কিছু পুণ্যবুদ্ধি।

আমার পূর্ব্বের দেহখানি প্রাণ ফিরে পায়। জেগে দেখি—সেই ব্রাহ্মণ—যাকে রক্ষা করতে গিয়ে আমার প্রাণহানি ঘটেছিল—সেই ব্রাহ্মণ—ঘোর অরণ্যের মধ্যে তখনও আমার দেহটিকে আগলে বসে আছেন, শীতল উপচার দিয়ে সেবা করছেন, পরীক্ষা করছেন। ক্রমে আমার বেঁচে ওঠার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। সহসা বন্ধুরা এসে ব্রণশুদ্ধি করে আমাকে মন্দিরে নিয়ে চলে গেল।

ব্রাহ্মণ কিন্তু কৃতজ্ঞ রইলেন। আমাকে সুস্থ করে অক্ষর-শিক্ষা দিলেন, বিবিধ আগমতন্ত্রের ব্যাখ্যা করে, পাপক্ষয়ী সদাচারে আমার মনটিকে ব্রতী করে দিলেন। শেষে এক দিন চন্দ্রমৌলি মহাদেবের পূজাবিধানে আমাকে দীক্ষা দিয়ে আমার কাছ থেকে পূজা অঙ্গীকার করে কোথায় যেন চলে গেলেন। সেই থেকে আমি সমস্ত সংসর্গ ত্যাগ করেছি, কিরাতদেরই বলুন, কি বন্ধুদেরই বলুন। এই কাননে বাস করি, দিবারাত্র এখন আমার হৃদয়ে নিবাস করছেন কলঙ্কমোচন জগদ্গুরু চন্দ্রশেখর। কিন্তু রাজনন্দন, নিভৃতে আপনাকে কিছু বলবার রয়েছে আমার। একান্তে আসুন।"

রাজবাহন বয়স্যদের প্রেরণ করলেন অন্যত্র। মাতঙ্গ তখন পুনর্বার বলতে লাগল—"গতকাল, রাত্রি তখন শেষ হয়ে আসছে, হঠাৎ স্বপ্নের মধ্যে আমি দেখতে পাই—গৌরীপতি আমার চোখ থেকে যেন নিদ্রাটিকে সরিয়ে নিয়ে আমাকে জাগিয়ে দিলেন।—জাগ্রত স্বপ্নে দেখি,—প্রসন্নবদনকান্তি গৌরীপতি সম্মুখে শোভমান। প্রশ্রয়নত আমাকে বললেন—"মাতঙ্গ, দণ্ডকারণ্যের অন্তরাল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে যে তটিনী তার তীরভূমিতে একটি স্ফাটিক-লিঙ্গ রয়েছে; সিদ্ধ এবং সাধ্যেরা সেটিকে আরাধনা করে। সেই স্ফাটিক-লিঙ্গের পশ্চাদ্ভাগে পার্ব্বতীর চরণচিহ্ন-অঙ্কিত যে বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড রয়েছে, তার নিকটেই দেখতে পাবে একটি গহ্বর—বিধির আননের মত পবিত্রসুন্দর। তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত রয়েছে একখানি তাম্রশাসন। বিধাতার শাসন বলেই সেটিকে বিবেচনা কোরো। সেটিকে গ্রহণ কোরো। দেখো তার উপরে কি লিখন লেখা আছে। সেই লিখনটিকে তোমার সৌভাগ্যবিজয় বলে জেনো। তাম্রশাসনের নির্দেশ পালন করলে তুমি অনাগতকালে ঈশ্বরত্বলাভ করবে পাতালের। তোমাকে সাহায্যদানের জন্য আজ বা কাল এখানে সমুপস্থিত হবেন জনৈক রাজকুমার। তাঁর আদেশ অনুসারে কর্ত্তব্য পালন কোরো। তোমার সাধনায় আমি তুষ্ট হয়েছি।"

রাজবাহন সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে দৈবাদেশ শিরোধার্য করে বললেন, "বেশ তাই হবে।"

মাতঙ্গকে বিদায় দিলেন। মস্তক আনত করে চলে গেল মাতঙ্গ। তার পর রাত্রি যখন দ্বিতীয় প্রহর, মিত্রগণ গভীর নিদ্রায় মগ্ন, রাজবাহন ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করে অলক্ষিতে প্রস্থান করলেন, চলে গেলেন বনান্তরে।

পরের দিন প্রভাত হতেই অনুচরেরা দেখতে পেল রাজবাহন নেই। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল সকলে। অরণ্যের চতুর্দ্দিকে তারা বেরিয়ে পড়ল, আঁতিপাঁতি করে খুঁজল, কিন্তু রাজবাহনকে পাওয়া গেল না কোথাও। রাজবাহনের নয়টি সুহৃৎ তখন সম্মিলিত হয়ে স্থির করলেন—দেশদেশান্তরে সর্বত্র তাঁকে অন্বেষণ করতে হবে, তখুনি তাঁদের যাত্রা করতে হবে, বিলম্ব অসহনীয়।

পুনর্মিলনের সঙ্কেতস্থান নির্দ্ধারণ করে তাঁরা পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে—বেরিয়ে পড়লেন।

এদিকে শ্রেষ্ঠ বীর রাজবাহনের রক্ষণাবেক্ষণে রোমাঞ্চিত-চিত্ত হয়ে মাতঙ্গ তখন পৌঁছে গেছে গহ্বরদ্বারে, গৌরীপতির নির্দ্দেশ অনুসরণ করে। নিঃশঙ্ক-প্রবেশ। তাম্রশাসনখানি পেল এবং সেই গহ্বরপথেই উপনীত হল রসাতলে। পৌঁছে দেখে, তাঁরা রসাতলের একটি পত্তনের অদূরে এসে নেমেছেন। কাছেই ক্রীড়াকানন, কাননের মধ্যে সরোবর। পশুপক্ষীর নামগন্ধও সেখানে নেই। তাম্রশাসনের অনুশাসন মত আনীত ঘৃত ও সমিধের সম্ভার দিয়ে মাতঙ্গ প্রজ্বলিত করল হোমানল। রাজবাহন স্তব্ধবিস্ময়ে দেখতে লাগলেন মাতঙ্গের কীর্ত্তি। জ্বলজ্বল্ করে জ্বলে উঠল হোমানলের শিখা—ক্ষালন করে প্রত্যূহ। তার পরে দ্বিধাহীনচিত্তে মন্ত্রোচ্চারণ-পুরঃসর আহুতি দান করতে করতে প্রবেশ করল হোমানলে; বিসর্জ্জন দিল আত্মার পুণ্যগেহ এই দেহ। কিন্তু আশ্চর্য্য! পরমুহূর্ত্তেই হোমানল থেকে বেরিয়ে এল মাতঙ্গ। পূর্ব্বের কদর্য্য আকৃতি আর নেই, এখন একেবারে দিব্যতনু—বিদ্যুতের মত চোখঝলসানো তার রূপ।

মাতঙ্গের দিব্যদেহ ধারণের সঙ্গে সঙ্গে রাজবাহন অকস্মাৎ শুনতে পেলেন নূপুরনিক্কণ। চোখের বিস্ময় মিটিতে না মিটতেই দেখতে পেলেন কলহংসের মত মৃদু-দোদুল গতিতে সেই হোমানলের নিকটে উপস্থিত হল একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা। তার সারা অঙ্গে মণিময় অলঙ্কার। হ্যাঁ সুন্দরী বটে, ললনাকুলের যেন সীঁথিমৌড়। বিনয়াবনতা অনেকগুলি সখী পিছনে পিছনে এল। কন্যাটি এসে দিব্যতনু মাতঙ্গের সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাকে উপহার

দিলে—একটি উজ্জ্বলকান্তি মণি। "তুমি কে?"—প্রশ্ন করল মাতঙ্গ।

কলকণ্ঠে উৎকণ্ঠার ধ্বনি তুলে কন্যাটি বললে, "ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, আমি অসুররাজনন্দিনী 'কালিন্দী'। এই রসাতলের শাসিতা ছিলেন আমার পিতা। দেবাসুর-সংগ্রামে অমরদের দূর করে দেওয়ার ফলে, বিষ্ণু অসহিষ্ণু হয়ে আমার পিতাকে হত্যা করে অতিথি করিয়েছেন যমনগরের। আমি তার পর অত্যন্ত শোকার্ত্ত হয়ে পড়ি। তখন জনৈক কারুণিক সিদ্ধতাপস আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, "বৎসে, তুমি চিন্তা কোরো না। দিব্যদেহধারী এক মানব তোমায় পত্নীত্বে বরণ করে রসাতলের পালনকর্ত্তা হবে।" সেই থেকে আমি উন্মুখী হয়ে বসে আছি,—যেমন থাকে নবীন বর্ষণ-দিনের প্রতীক্ষায় আষাঢ়ের ঘনোন্মুখী চাতকী। আজ আপনি এসেছেন। আমার মনে হল এতদিনে সফল হতে চলেছে বুঝি আমার মনস্কামনা। মন্ত্রীরা এতদিন আমার রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের অনুমতি নিয়ে আমি এখানে এসেছি। আমার মনোরথের সারথিত্ব করেছেন শ্রীমদন। এই রসাতলের রাজলক্ষ্মীকে অঙ্গীকার করে আমাকে দান করুন তাঁর সপত্নী-পদ; এই আমার ঐকান্তিক বাসনা।"

এর পরে যা স্বাভাবিক তাই হল। রাজবাহনের অনুমতি নিয়ে তরুণীকে বিবাহ করল মাতঙ্গ এবং দিব্যাঙ্গনালাভ করে, হর্ষের নির্ভরতায় আয়ত্তাধীন রসাতল-রাজত্বে বাস করতে লাগল,—পরমানন্দে। বয়স্যদের বঞ্চিত করে চলে এসেছিলেন রাজবাহন; তাই পাতালরাজ্যের নবতম আনন্দের মধ্যে থেকেও তাঁর মন পৃথিবীর উন্মুক্ত বাতাসের জন্যে, মিত্রদের সঙ্গে বিহারবিচরণ করবার জন্যে, ছটফট করে উঠত। শেষে তিনি মাতঙ্গ ও কালিন্দীকে জানালেন 'বিদায় নিতে হবে'।

তাঁর প্রয়াণকালে কালিন্দী ও মাতঙ্গ তাঁকে উপহার দিলেন—ক্ষুৎপিপাসাদি-ক্লেশনাশন একটি অদ্ভুত মণি। কৃত-সাহায্যের জন্যে এ বুঝি তাঁদের কৃতজ্ঞতার দাক্ষিণ্য! গহ্বর পর্য্যন্ত মাতঙ্গ রাজবাহনকে পৌঁছিয়ে দিয়ে বিদায় নিলে।

গহ্বরপথে পুনর্বার পৃথিবীতে ফিরে এলেন রাজবাহন। কিন্তু কোথায় গেছে তাঁর বন্ধুরা? সন্ধান করতে লাগলেন, ঘুরে বেড়াতে লাগলেন দেশে দেশান্তরে।

ঘুরতে ঘুরতে একদা এসে পৌঁছলেন বিশালার গ্রামপ্রান্তে। একটি বিজন আক্রীড়ে বিশ্রাম করবেন ভাবছেন, এমন সময় দেখতে পেলেন জনৈক নাগরিক আন্দোলিকায় আরোহণ করে, একটি রমণী ও সখীপরিজন সঙ্গে নিয়ে সেই উদ্যানে এসে প্রবেশ করল। নিকটে আসতেই সেই আন্দোলিকার আরোহীটির কেমন যেন প্রকাশ পেল ভাবান্তর। মনে হল, তার হৃদয়ে বুঝি নতুন পাতা গজাচ্ছে, মুখে ফুটছে আনন্দের পদ্ম। আরোহীটি হঠাৎ চীৎকার করে উঠল

"একি, আমার প্রভু যে! সোমকুলের অবতংস, বিশুদ্ধ যশোনিধি আমার প্রভু, রাজবাহন যে! মহাসৌভাগ্যে দর্শন পেয়েছি। আশ্চর্য্য, হঠাৎ পদমূলে এসে স্থান পেয়েছি। একি আমি চক্ষু দিয়ে দেখছি, না, এ আমার নয়নের উৎসব?"

আন্দোলিকা থেকে সসম্ভ্রমে তিনি নেমে এলেন। দ্রুতচরণের বিন্যাস যেন উল্লসিত হর্ষের সঙ্গীত।

রাজবাহনের চরণপদ্মে মাথা ঠেকিয়ে তিনি প্রণাম করলেন। আমোদী মল্লিকাফুলের শেখর-বলয়খানি খসে পড়ে গেল রাজবাহনের চরণ-পীঠিকায়।

রাজবাহনের নয়নেও উচ্ছল হয়ে উঠল বন্যার মত আনন্দ। রোমাঞ্চিত অঙ্গে ঢেউ দিয়ে গেল আলিঙ্গন! শুধু মুখ ফুটে তিনি বলতে পারলেন "সোমদত্ত, তুমি!"

রাজচম্পক বৃক্ষের শীতল ছায়ায় উপবেশন করে কত যে কথা হতে লাগল দুটি বন্ধুর। ফুরোতে আর চায় না। রাজবাহন শেষে বললেন—"সখা, আমার জীবনে একের পর একটি করে ঘটেই চলেছে যাদুকরী ব্যাপার। তা, এতদিন তুমিই বা ছিলে কোথায়? কোন্ সে দেশ? ছিলেই বা কেমন করে? চলেছই বা কোথায়? আবার সঙ্গে দেখছি—একটি তরুণী। তরুণী আর সখীরা। এরা এলই বা কোথা থেকে?"

এতদিন বাদে, বন্ধুর দর্শন পেয়ে সোমদত্তেরও যেন ছেড়ে গিয়েছিল চিন্তাজ্বর। করপদ্মখানি মুকুলের মত বন্ধ করে উৎসাহভরে রাজবাহনকে সে তখন শোনাতে লাগল আত্মীয়প্রচার এবং তার প্রকার।

ইতি দশকুমারচরিতে দ্বিজোপকৃতির্নাম দ্বিতীয়ঃ উচ্ছ্বাসঃ॥

তৃতীয় উচ্ছ্বাস

সোমদত্তের আত্ম-কথা

"হে দেব, আপনার চরণপদ্মের সেবা করব—যে কোরেই হোক আপনাকে খুঁজে বার করবই—এই কথাটি হৃদয়ে গেঁথে নিয়ে দেশ-দেশান্তরে আমি ঘুরতে লেগে যাই। একদিন হয়েছে কি, ঘুরতে ঘুরতে এক বনের মধ্যে এসে পড়ি। তৃষ্ণায় তখন প্রাণ বুঝি যায় যায়। এমন সময় চোখে পড়ল একটি শীর্ণনদ; কী শীতল তার জল, নদের দুটি তীর ঘনলতায় আচ্ছন্ন। প্রাণের আশ মিটিয়ে অঞ্জলিভরে জল পান করছি, এমন সময় দেখি অগভীর জলের তলদেশে কী একটা পদার্থ ঝক্‌ঝক্ করছে। তুলে নিলুম। দেখি অমূল্য একটি মণি। হাতের মুঠোর মধ্যে মণিটিকে নিয়ে ভাল করে দেখতে দেখতে অগ্রসর হতে লাগলুম, কিন্তু অম্বরমণির তখন এত তীব্র জ্বালা যে চলা হল দায়। বনের মধ্যে দেবায়তন ছিল—সেইখানেই প্রবেশ করলুম, বিশ্রামের আশায়। কিন্তু নির্জ্জন ছিল না দেবায়তন। একটি দীনহীন ব্রাহ্মণ সেখানে ম্লানমুখে বসেছিলেন। সঙ্গে অনেকগুলি সন্তানসন্ততি। তাদের দেখে কেমন যেন দয়া হোলো। জিজ্ঞাসা করলুম, "কুশল ত?"

ব্রাহ্মণ বললেন "মহাভাগ, মাতৃহারাদের কোনো রকমে শুধু প্রাণে বাঁচিয়ে রেখেছি। এই দেশটি দুর্দশাগ্রস্ত। বলতে পারেন কু-দেশ। ভিক্ষা করে এদের মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দিই আর এই শিবালয়ে থাকি।"

আমি তখন তাঁকে প্রশ্ন করলুম, "ব্রাহ্মণ, নিকটেই দেখতে পেলুম একটি স্কন্ধাবার স্থাপিত রয়েছে। বলতে পারেন এ দেশের রাজা কে, তাঁর নামই বা কি? আর আপনিই বা এখানে এসেছেন কেন?"

উত্তরে ব্রাহ্মণ বললেন—

"সৌম্য, লাটেশ্বর 'মত্তকাল' এই দেশের রাজা 'বীরকেতু'র কন্যা 'বামলোচনার' অনিন্দ্যসুন্দর রূপলাবণ্যের মহিমা শুনে অধীর হয়ে কিছুদিন পূর্ব্বে বিবাহপ্রস্তাব করে পাঠান। কিন্তু বীরকেতু প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। মত্তকাল তখন অবরোধ করেন বীরকেতুর রাজধানী "পাটলী"। শেষে ভীত হয়ে কন্যাটিকে উপঢৌকনস্বরূপে মত্তকালের নিকটে পাঠাতে বাধ্য হন বীরকেতু। তরুণীটিকে লাভ করে আনন্দিত মনে লাটেশ্বর এখন নিজের রাজধানীতে ফিরে চলেছেন এবং তাঁর অভিলাষ—দেশে ফিরে গিয়ে নিজের পুরীতেই বিবাহবিধি সম্পন্ন করেন। কিন্তু মৃগয়ায় তাঁর অত্যন্ত প্রীতি। তাই এই অরণ্যে সৈন্যাবাস করেছেন কল্পনা। বীরকেতুর কন্যার সঙ্গে চলেছেন মন্ত্রী মানপাল। তিনিও ধনমান এবং চতুরঙ্গবল নিয়ে এখানেই শিবির রচনা করে রয়েছেন। প্রভুর অপমানে তাঁর মন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ এবং কী উপায়ে অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া যায় সেই চিন্তাতেই তিনি সদা মগ্ন।"

ব্রাহ্মণের অনেকগুলি সন্তান, ব্রাহ্মণ বিদ্বান অথচ নির্ধন, বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন,—কিছু দান করা যাক্—এই মনে করে, দয়া করে, ব্রাহ্মণটিকে দান করে দিলুম সেই মণি। গভীর আনন্দে অনেক আশীর্ব্বাদ করে ব্রাহ্মণ বিদায় নিয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন। আমিও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম। গভীর নিদ্রা অতি শীঘ্রই আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

হঠাৎ একটা তীব্র নাড়া পেয়ে আমার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম চোখেই দেখি, সেই ব্রাহ্মণ যেন চীৎকার করে আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বলছে, "দস্যু, এই সেই দস্যু।" ঘুম ছুটে গেল। দেখলুম ব্রাহ্মণের হাত পা শিকল দিয়ে বাঁধা, সারা গায়ে কশাঘাতের লাঞ্ছনা, খড়্গ নিয়ে কতকগুলি রাজপুরুষ তার পিছনে দাঁড়িয়ে এবং ব্রাহ্মণ চীৎকার করছে—এই সেই দস্যু, দস্যু।

রাজপুরুষেরা তখন ব্রাহ্মণকে ছেড়ে দিয়ে একগাছি মোটা দড়ি দিয়ে আমাকে নির্দ্দয়ভাবে বাঁধল। কোথায় কেমন করে রত্নটি আমি কুড়িয়ে পেয়েছি সে কথা বলতে গেলুম, কিন্তু তারা কালা হয়ে রইল, শুনলেও না, টানতে টানতে আমাকে নিয়ে গেল; কারাগারের কবাট খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে আমাকে তা'র মধ্যে; বললে "এবার, সখাদের নিয়ে থাক।" এই বলে দেখিয়ে দিলে আমার কারা-সঙ্গীদের। তাদেরও হাত-পা শিকল দিয়ে বাঁধা।

মূঢ়ের মত নিজেকে বোধ হতে লাগল। কি যে করব ভেবেই পেলুম না। নৈরাশ্যের মধ্যে ডুবে গেলুম। সঙ্গীদের দিকে চেয়ে ক্ষণপরে বললুম, "ভাই-গণ, তোমাদের দেখে ত নির্বীর্য্য বলে মনে হচ্ছে না। তবে এই কারাগারে কেন তোমাদের এ যন্ত্রণা ভোগ? এরা বলে গেল তোমরা আমার বয়স্য—এর অর্থ টাই বা কি?"

চৌরবীরেরা আমার কাছে তখন লাটেশ্বর মত্তকালের—সেই ব্রাহ্মণ বর্ণিত—বৃত্তান্তটি জ্ঞাপন করে পুনর্ব্বার বললে—

"মহাভাগ, আমরা বীরকেতুর মন্ত্রী মানপালের বিশ্বস্ত কিঙ্কর। তাঁরই আদেশমত লাটেশ্বরকে বধ করবার জন্যে শয়নকক্ষ পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ খনন করি। সুড়ঙ্গদ্বার দিয়ে কক্ষে প্রবেশও করেছিলুম কিন্তু মত্তকাল সেখানে ছিলেন না, তাঁকে হত্যা করতে পারিনি। শয়নকক্ষে যা মণিমাণিক্য ধনরাশি পাই সেগুলিকে হস্তগত করে মহারণ্যে প্রবেশ করি। এই সেদিন আমাদের পদান্বেষণ করে রাজা মত্তকালের অনুচরেরা লুণ্ঠন-সামগ্রী-সমেত আমাদের ধরে ফেলে, বেঁধে এখানে নিয়ে আসে। মণিমাণিক্য গণনা করে মিল করবার সময় দেখা যায়—একটি মণি পাওয়া যাচ্ছে না। সেইটিই নাকি অমূল্য মণি। সেটিকে না পাওয়া গেলে আমাদের প্রাণ হারাতে হবে, ঘাতকের হাতে। যতদিন না পাওয়া যায় ততদিন এই শৃঙ্খলিত ব্যবস্থা।"

বৃত্তান্ত শুনে বুঝতে পারলুম ব্যাপারটি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কারাগার-বয়স্যদের কাছে প্রাণ খুলে বলে গেলুম—এ ব্যাপারের সঙ্গে আমার কতখানি সংশ্রব, আমার নাম, ধাম, পরিচয়,—আপনাকে খোঁজবার জন্য আমার পর্য্যটনের কাহিনী। সময়োচিত সংলাপে বিশেষ মিত্রতা পাতিয়ে ফেললুম তাদের সঙ্গে। তার পরে অর্দ্ধরাত্রে, কারাগৃহ যখন সুপ্ত, আমি আমার ও বয়স্যদের ভেঙে ফেলে দিলুম শৃঙ্খলের বন্ধন। শৃঙ্খলমুক্ত গুপ্তচরেরা আমার অনুসরণ করল। প্রহরীরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাদের অস্ত্রগুলি হস্তগত করে কারাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসি। পুররক্ষীরা আমাদের আক্রমণ করেছিল, কিন্তু চাতুর্য্য এবং পরাক্রমের সহায়তায় আমরা অবলীলাক্রমে তাদের দমন করি। প্রবেশ করি মানপালের শিবিরে, রক্ষা পাই। মানপাল নিজ কিঙ্করদের নিকট থেকে আমার কুলাভিমান বৃত্তান্ত ও তৎকালীন বিক্রমের কাহিনী শ্রবণ করে আমাকে প্রচুর আদরযত্ন করেন।

তার পরের দিন মত্তকালের শিবির থেকে কয়েকজন রাজপুরুষ এল এবং মানপালের নিকটে নিবেদন করল মত্তকালের ক্রূরতর বাক্যগুলি "মন্ত্রিন্, আমাদের রাজমন্দিরে সুড়ঙ্গ খনন করে ঐশ্বর্য্য অপহরণ করেছে চৌরবীরেরা। তারা আশ্রয় পেয়েছে আপনার শিবিরে। আমার হস্তে তাদের সমর্পণ করুন। নচেৎ মহান্ অনর্থ ঘটবে।"

মন্ত্রী মানপালের নেত্র দুটি ক্ষোভে ও অপমানে অরুণ হয়ে উঠল। তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, "লাটেশ্বর আবার কে? তাঁর সঙ্গে আবার মৈত্রী। মূর্খের সেবায় কি কোনো লাভ থাকে?"

ভর্ৎসিত হয়ে মত্তপালের অনুচরেরা ফিরে যায় এবং মত্তপালকে নিবেদন করে মানপালের বিপ্রলাপ। লাটেশ্বর ক্রোধে অন্ধ হয়ে বাহুবীর্য্যের গর্ব্বে অল্পসংখ্যক সৈনিক নিয়েই মানপালের শিবিরের দিকে ধাবমান হন।

খণ্ডযুদ্ধ হয়। মানী মন্ত্রী মানপাল কিন্তু পূর্ব্ব হতেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আমিও মন্ত্রীদত্ত রথে আরোহণ করে যুদ্ধে নামলুম। অশ্ববাহিত রথ, চতুর সারথি, দৃঢ়তর কবচ, অনুরূপ ধনুঃ, বিবিধবাণপূর্ণ দুটি তূণীর, আয়ুধের সংগ্রহ—কাজেই নিজের বাহুবলে বিশ্বাস না থেকে যায় না; মত্তকালের বিরুদ্ধে অভিযান চলল। বাণের বর্ষণে মত্তকালকে শ্রান্ত করে দিলুম, তার পরে বেগবান্ অশ্ববাহিত রথে উভয়সৈন্যকে অতিক্রম করে মত্তকালের রথের উপরে লাফিয়ে পড়লুম। দেরী হল না; ক্ষণিকের মধ্যেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল শত্রুর দ্বিখণ্ডিত শির। মত্তকালের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই হতাবশিষ্ট সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাল। নানাবিধ হস্তী অশ্ব ধন সামগ্রী সংগ্রহ করে রণক্ষেত্র থেকে ফিরে আসি, এবং মন্ত্রী মানপালের নিকটেও

লাভ করি প্রভূত সম্মান এবং সেবা। বীরকেতুর নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল সংবাদ। আমার বীরত্বে বিস্মিত হয়ে বীরকেতু আমাকে অভ্যর্থনা করেন এবং বান্ধব ও অমাত্যদের অনুমতি নিয়ে শুভদিনে মহোৎসবের মধ্য দিয়ে আমাকে সম্প্রদান করেন তাঁর কন্যা,—বামলোচনা।

তিনি আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছেন। কিন্তু এত সুখ এত আনন্দ, মহারাজের এত প্রসন্নতা, বামলোচনার এত সঙ্গসৌখ্যের মধ্যেও, আপনার বিরহ শল্যের মত বিঁধছিল, বিকল করে রেখেছিল আমার হৃদয়।

মাত্র সেদিন এক সিদ্ধ পুরুষ আমাকে আদেশ দেন, "সুহৃদের মুখাবলোকন-ফল যদি পেতে চাও, মহাকালনিবাসী পরমেশ্বরের আরাধনা কর, আজই যাও, পত্নীকে সঙ্গে নিও যেও।" মহেশ্বরের আস্থানে চলেছিলুম কিন্তু ভক্তবৎসল গৌরীপতি অপার করুণায় আমাকে লাভ করিয়ে দিয়েছেন আপনার চরণ-পদ্ম-দর্শনের আনন্দ-পরাকাষ্ঠা।"

সোমদত্তের আত্ম-কথা শুনে রাজবাহন অভিনন্দন করলেন তাঁর পরাক্রমের। দৈবকে ধিক্কার দিলেন।—নিরপরাধীকে দণ্ড দেওয়া কি দৈবের সাজে! নিজের আত্মবৃত্তান্ত সোমদত্তকে বলছেন এমন সময় রাজবাহন দেখতে পেলেন—একি, সামনে এ যে পুষ্পোদ্ভব! তার পরে মুহূর্তের মধ্যে সমাপ্ত হল প্রণাম, গাঢ় আলিঙ্গন, আনন্দাশ্রু-পতনের পূর্ণ সমারোহ। এই দেখ, কে এল, এখানে কে এল। সোমদত্ত, দেখ, পুষ্পোদ্ভব এসেছে।

তার পরে তাঁরা সকলে রাজচম্পক-বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করলেন। রাজবাহন বললেন, "বয়স্য পুষ্পোদ্ভব,—ব্রাহ্মণের কিছু উপকার করতে হবে, অথচ বন্ধুদের জানালে তারা যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায়—এই চিন্তা করে নিদ্রিতাবস্থায় তোমাদের ফেলে রেখে আমি তো সেই রাত্রে চলে গিয়েছিলুম। তার পর তোমরা জেগে উঠে আমার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলে। এবার বল, একলা কোথায় তুমি গিয়েছিলে, আর কোথা থেকেই বা আজ ফিরে এলে?"

ললাটতটে অঞ্জলির চুম্বন দিয়ে ধীরে ধীরে বলতে লাগল পুষ্পোদ্ভব—

ইতি দশকুমারচরিতে সোমদত্তচরিতং নাম তৃতীয়: উচ্ছ্বাস: [ক্রমশ:।

লঘুমেঘে

শ্রীবিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছায়া ছায়া ছিল, কিছু কিছু ছিল ছবি,
চাপা কল্লোল অধরে নয়নে কিছু···
মেঘলা রাতের আড়ালে অস্ত-রবি,
ছুটে ছুটে চলে উদয়-রবির পিছু,
লঘুমেঘমোহে বারে বারে চেয়েছিনু,
থেমে থেমে চাওয়া, নয়ন করিয়া নিচু···

বিজন ঘরের আকুল মর্মকথা
গভীর অতলে ভিজে নয়নের জলে,
একেলা প্রদীপ, কাঁদে যেথা অমরতা—
ফুলে চন্দনে যেখানে আগুন জ্বলে,
যেখানেতে হেলা শূন্য আসন পরে,
যেখানে চরণ বাজে অঙ্গনতলে।

অঙ্গনে এলো দূর সাগরের পাড়ি,
রক্ত অধরে কুয়াসাটুকু যে ঐ,
মনে হয় কোথা ভিজে যেন ভারী ভারী,
যেন ভয়ে ভয়ে ফিস্ ফিস্ করে কই;
তুলির টানেতে কোথা যেন ঘন রং
কোথায় অথই, দিকে দিকে থই থই···

লঘুমেঘমায়া আকাশে ভাসিয়া যায়,
কালো এলো চুলে কি যেন লুকায়ে রাখা,
তৃষ্ণাকমল কে জানে ফোটে কোথায়,
দূরে বহুদূরে জাগে ভ্রমরের পাখা···
তৃষ্ণা পেয়েছে তুমি জানো আমি জানি,
কাছের পাথরে দূর কাতরতা মাখা।

ছবি ছবি ছিল কিছু কিছু ছিল ছায়া—
একটু ভ্রূকুটী, চাপা-হাসি রঙ-ধরা,
পাতার আড়ালে ফুলের সুরভি-মায়া,
তপ্ত সাহারা দূর্বা-কাঁচলি পরা···
আমি বারে বারে ফিরে ফিরে চেয়েছিনু,
তোমার নয়ন দূরের চাহনি-ঝরা···

মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে লেখা শ্রীশ্রীসারদামণির পত্র

ওঁ রাম

তাং ১৫ই কার্ত্তিক

চিরজীবেষু,

পরে বাবাজীবন ইতিমধ্যে একখানি পুস্তক পাঠাইয়াছিলে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, আর বাবাজীবন পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন—তাহা, অভয় আমাকে পড়িয়া শ্রবণ করাইতেছে, আমি বড় আহ্লাদিত হইয়াছি। ও ইহার মধ্যে গানও আছে শুনিলাম। আর অভয় বর্ত্তমান মাসের ৬ই তারিখে যাইতেছিল আমি কেবল আটক করিয়া রাখিয়াছি, কারণ আমার পায়ে বড় বাতজনিত বেদনা হইয়াছিল, এক্ষণে শারীরিক কিছু সুস্থ আছি, আর এখানে পোষ্টকার্ড বড় অভাব আপনাকে পত্র দিতে দেরী হইল। তাহার জন্য কিছু মনে করিবেন না। আর অভয় ৺পূজার পর দশমী নাগাত যাত্রা করিবে। ইতি—উপস্থিত কুশল, আপনাদের কুশল সমাচার লিখিবে।

তোমাদের মাতাঠাকুরাণী।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে লেখা গিরিশচন্দ্র ঘোষের পত্র

Minerva Theatre
6, Beadon St. Cal.

Dated......189

My dear Brother,

I hear that a theatrical engagement at Azimgunje is at the disposal of our Rajani Babu. I would very much like to avail myself of it. Will you please see to it? How do you do.

Your affy.
Girish Chandra Ghose

মিনার্ভা থিয়েটার
৬, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তারিখ............১৮৯

প্রিয় ভ্রাতা,

শুনিলাম আজিমগঞ্জে এক থিয়েটারের আয়োজন হইতেছে, ব্যবস্থার ভার আমাদের রজনী বাবুর উপর। ইহার সুযোগ লইতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি কি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ বিষয়ে অবহিত হইবেন? কেমন আছেন?

আপনার স্নেহাস্পদ
গিরিশচন্দ্র ঘোষ

মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে লেখা অশ্বিনীকুমার দত্তের পত্র

শ্রীহরি

গোবিন্দপুর (মানভূম)
২৩ কার্ত্তিক, ১৩১৭

ভাই শ্রীমঃ,

তোমার ইংরাজী ও বাংলা দুই পত্রই পাইয়াছি। ঠাকুর সম্বন্ধে আমি যাহা তোমায় লিখিয়াছি, তাহা স্থানে স্থানে তোমার মনোমত সংশোধন করিয়া ছাপাইতে আমার আপত্তি নাই। তবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ঠাকুরের যে উক্তি আছে, তাহা মুদ্রিত হইলে ব্রাহ্মগণ কিঞ্চিৎ আমার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন। তাই ও জায়গায় নাম না দিয়া একটি dash দিয়া রাখিলে হয় না?

আর এক কথা মনে পড়ে গেল—যেখানে লিখেছি "যেমন কাঁঠাল খেতে হ'লে হাতে তেল মেখে নিতে হয় etc." তারই নীচে লিখো— "আর ধ্যান করবে—মনে, কোণে, আর বনে।"

আমার কাছে Modern Review নাই তাই শাস্ত্রী মহাশয়ের ঠাকুর সম্বন্ধে প্রবন্ধ দেখতে পারলাম না।

বলি, তোমার স্কুল চলছে কেমন? আর তোমার সপরিবার কুশল ত? সপ্রীতি প্রণতি গ্রহণ কর।

তোমার শ্রীঅঃ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের চরিত্র-প্রশংসা-পত্র

Calcutta 26th June, 1882s

I have known Babu Mahendra Nath Gupta since his appointment as Head master & Superintendent of Shampukur Branch of the Metropolitan Institution in January, 1880. He has good..........by diligent & attentive discharge of the duties entrusted to him. He is proficient in the art of teaching & is a remarkably intelligent & well-informed gentleman of amiable disposition & unexceptionable character.

Iswar Chandra Sarma.

কলিকাতা, ২৬শে জুন, ১৮৮২

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মেট্রোপোলিটান ইন্‌ষ্টিটুশনের শ্যামপুকুর শাখা বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার ও সুপারিণ্টেনডেণ্ট নিযুক্ত হন। তৎকাল হইতে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় আছে তাঁহার উৎকৃষ্ট ......তাঁহার উপর সে সকল কর্ত্তব্য ভার ন্যস্ত হয় সুমনোযোগে ও সুনিষ্ঠায় তাহা পালন দ্বারা.........তিনি শিক্ষা দান কলায় বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি দুর্লভ চরিত্রের অমায়িক প্রকৃতির, সর্ব্বব্যাপারে বিশেষ ওয়াকিবহাল ও বিশেষ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ভদ্রলোক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

Calcutta 26th June 1882

I have known Babu Mahendranath Gupta since his appointment as Head master & Superintendent of the Shampukur Branch of the Metropolitan Institution in January 1880. He has good [illegible] diligent & attentive discharge of the duties [illegible]. He is proficient in the art of teaching & is a remarkably intelligent & well-informed gentleman of amiable disposition & unexceptionable character.

Iswar Chandra Sarma

বিদ্যাসাগরের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি

মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে লেখা স্বামী ব্রহ্মানন্দের পত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

The Math
21st, Oct. '97.

My Dear Master Mohasaya,

স্বামীজী এক পত্র আমাকে লিখেন তাহার ভিতর আপনাকে এক পত্র লিখেন, আমি আপনাকে পাঠাইলাম। অদ্য S. Turianandaকে যে P. c. লিখিয়াছেন তাহাতে Bhai Protapর opinion দেখিয়া সুখী হইলাম। তাঁহার sincerity সম্বন্ধে বড়ই সন্দেহ হয়। আপনি স্বামীজীকে উক্ত Protapর opinion লিখিয়া

পাঠাইবেন। তাহার ঠিকানা C/o. Lala Hansaraj, Pleader, Rawalpindi (Punjab) Bhurna Hillতে Swamijeeকে এক address দেয়। তিনি তাহার প্রত্যুত্তর দেন তাহাতে সেখানকার লোকেরা খুব সুখী হইয়াছে। গতবারে Calcutta Meetingতে Girish বাবু অতি সুন্দর "হরিনাম মাহাত্ম্য" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, সেটি শীঘ্র ছাপাইবার ইচ্ছা আছে। এ রবিবারে হরি মহারাজ পাঠ এবং ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন করিবেন তৎপরে কীর্ত্তন হইবে। এবার হইতে ৫॥টার সময়ে আরম্ভ হইবে। আপনি এই রবিবারের পর রবিবারে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় বলিবেন। অনেক দিন আপনি বলেন নাই। এই রবিবারে আমরা announce করিয়া দিব। সুধীর (?) এবং হরিপ্রসন্ন Umballaয় পৌছিয়াছে। মঠস্থ একপ্রকার মঙ্গল আপনার কুশল লিখিয়া সুখী করিবেন। ইতি—

With love & namasker. Your affy.
Brahmananda.

মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে লেখা স্বামী প্রেমানন্দের পত্র

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

পুরী—শনিবার

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মাষ্টার মহাশয়,

আপনার প্রেরিত সকল চিঠি, টাকা ও শ্রীশ্রীকথামৃত আমরা পাইয়াছি। ঘরের কথা বলে এতদিন বড় মন দিই নাই, কিন্তু এখন আর হাতছাড়া করতে পাচ্ছি না। কত কথাই মনে হচ্ছে। ধন্য আপনি।

মহারাজ মন্দ নাই তবে সে খুতখুতেমি ছেড়ে দিন। কাল থেকে এখানে খুব বৃষ্টি নেমেছে।·········গণেশের ঠিকানা লিখিবেন। সেই বিবাহের ভিড়ে পড়ে গিছলাম, মধ্যে রাম ও নিতাই এসেছিল। পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী কেমন আছেন?

হাঁ গোপালের মার প্রাপ্তির সংবাদ পাইয়াছি। সে আনন্দের কথা। বেশী বাঁচা যন্ত্রণা ভোগ। ধন্য নিবেদিতা, কি সেবা করলে! আমায় মা বলেন ইংরাজের মেয়ের কি ভক্তি বিশ্বাস, তাই ইংরাজ আমাদের রাজা। কালী ভায়ার অভ্যর্থনার জন্য আয়োজন হচ্ছে। আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানবেন। চারু নটীকে ভালবাসা জানাবেন।

ইতি—

দাস বাবুরাম।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে লেখা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্র

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ভরসা

Triplicane

My dear Master Mohasaya

আপনার অভিপ্রায়ানুসারে এবারকার ব্রহ্মবাদিনে শ্রীশ্রীগুরু-মহারাজের জীবনপুস্তকের যে রমণীয় যে পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই মুদ্রিত হইয়াছে। যেমন মধুর মনোরঞ্জন খাদ্য অল্প খাইয়া কাহারও তৃপ্তি হয় না বরং উত্তরোত্তর ভোজন বাসনা আরও বলবতী হয় আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। কবে পুনরায় আপনার পরপ্রেমপ্রসূত ভক্তিনদীর নির্ম্মল, সুশীতল, মনমুগ্ধকর, সৌরভাকুলিত, নবজীবনবর্ষী, পবিত্র মন্দপবনহিল্লোল স্বরূপ মধুর ভাব—শ্রীগুরুদেবজীবনীর দ্বিতীয় হিল্লোল আমাদের মনপ্রাণ শীতল করিবে সেই আশা উদ্‌গ্রীবের ন্যায় আমরা সকলে করিয়া রহিয়াছি। আপনি এ বিষয়ে কৃপণতা করিবেন না। যে সরল বালকটির কথা প্রথম পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে সে কি আমাদের নিরঞ্জন? মঠের পত্রে আপনাকে ৺বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ, কোলাকুলি, প্রণাম ইত্যাদি নিবেদন করিয়াছি। এক্ষণে পুনরায় অত্র পত্রে নিবেদন করিতেছি গ্রহণ করিয়া সুখী করিবেন। নটী ও চারুকে আমার কোলাকুলি, ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। আপনি আমাদের অর্থাৎ খোকার, তুলসীর, আর সকলের ও আমার ভালবাসা প্রভৃতি জানিবেন। আমি বোধ হয় মাস খানেকের মধ্যে এখানকার classগুলি বন্ধ রাখিয়া তুলসী ও খোকার সঙ্গে ৺রামেশ্বর দর্শনে গমন করিতেছি। যাইবার কালীন মঠে পত্র লিখিব। আপনার মধুর ও নিত্য অভিনব মহামূল্য গুপ্তধনের অংশলাভ প্রত্যাশায় চাহিয়া রহিলাম।

ইতি—

দাস শশী।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে লেখা স্বামী যোগানন্দের পত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজয়তি

বাগবাজার
5 April, '97

মাষ্টার মহাশয়,

আপনার পত্রে সমস্ত অবগত হইলাম। শ্রীশ্রীমার আরোগ্য সংবাদে পরম সুখী হইলাম। তাঁহার যখন একান্ত ইচ্ছা নয় এক্ষণে কলিকাতায় আসিতে তখন তাঁহাকে বেশী আর পেড়াপিড়ি করা আমাদের উচিৎ নয়। আমি······ তাঁহাকে পেড়াপিড়ি করিয়া আনিতে······কিন্তু তিনি দুইখানি পত্রের উত্তরে আমাকে বাড়ী ভাড়া করিতে নিষেধ করেন। অদ্য আবার আপনার পত্রে বাড়ী ভাড়া করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার এত অনিচ্ছা তখন যাহাতে ও যখন যেখানে থাকিলে ভাল থাকেন তাহা আমাদের করা কর্ত্তব্য। অদ্য ১৲ টাকা পাইলাম রজনী বাবুর ৫৲টাকা পাইয়াছি। শ্রীশ্রীমার জন্য জায়গা কল্য দেখিতে যাইব আগোড়পাড়ায়। বেলা তিনটা চারটার সময় যাইব। আপনি যদি যান তাহা হইলে পত্রপাঠ কোন লোক দ্বারায় সংবাদ পাঠাইবেন। কখন এখানে আসিতে পারিবেন। আমি ততক্ষণ আপনার জন্য অপেক্ষা করিব। দাস যোগেন।

কুমুদিনী বসুকে লেখা রাজনারায়ণ বসুর পত্র

ওঁ

দেওঘর
১৬ই পৌষ, ১৩০৪

প্রাণাধিকা দিদি রতন,

তোমার পীড়ার সময় যে আমি কি পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম তাহা বলিতে পারি না। কখন জীবন-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, কখন নির্ব্বাণপ্রায় হইতেছে, এরূপ সংশয় স্থলে আমার মন যে কিরূপ অসুখের দোলায় দোলায়মান হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কে তোমায় রক্ষা করিল? সাক্ষাৎ ভগবান, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ।

তোমার জন্মাবধি আমি তোমাকে ভগবানের হস্তে অর্পণ করিয়াছি। তুমি তাঁহারই প্রিয় কন্যা। তাঁহাতে নির্ভর কর—তাহা হইলে তুমি যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছ তাহা পূর্ণ হইবে।

অধিক আর কি লিখিব—আমি বড় ক্ষীণ।

একান্ত স্নেহশীল তোমার দাদা
(স্বাঃ) শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

পরম কল্যাণীয়া কুমারী রত্ন,

ঈশ্বরানুগ্রহে তুমি এক্ষণে নব স্বাস্থ্যে নব বলে বলবতী হইতেছ; আজ তোমার জন্মদিনে প্রার্থনা করি সেই সঙ্গে তোমার চরিত্র নব বলে নব সৌন্দর্য্যে উত্তরোত্তর সুশোভিত হইতে থাকুক; যেন বঙ্গনারীগণের নিকট তাহা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হইয়া থাকে।

২রা শ্রাবণ, ১৩০৬ (স্বাঃ) শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

কুমুদিনী বসুকে লেখা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পত্র

ওঁ

কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু,

তোমাদের ওখানে একদিন যাইব স্থির করিয়াছিলাম —কিন্তু আমি বহরমপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া অসুস্থ হইয়া আছি। ইতিমধ্যে একদিন আমার সঙ্গে দেখা করিতে পার? পরামর্শের বিষয় আছে এবং আমার মেয়েদের সঙ্গে তোমাদের আলাপ করাইয়া দিতে আমি ইচ্ছা করি। ইতি ২৭শে কার্ত্তিক, ১৩১৪

শুভানুধ্যায়ী
(স্বাঃ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বোলপুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

আমার ছোট কবিতাটি তোমার ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া খুসি হইলাম। ইহার নাম দিতে পার—দুঃখাভিসার। এই কবিতা সুরে বসাইয়াছি—যদি ইচ্ছা কর দিনেন্দ্রকে দিয়া স্বরলিপি করাইয়া তাহা তোমাদিগকে পাঠাইয়া দিতে পারি। তোমার মাতামহের সহিত আমাদের পরিবারের যে সম্বন্ধ ছিল তাহাতে তোমার দিদিমাকে আমরা যাহা দিতেছি তাহাকে "সাহায্য" নাম দিতে পার না। যখন সুবিধা দেখিব তাঁহার উপকার করিতে আরো একটু চেষ্টা করিব!

আমার বর্ত্তমান সময়ের ছবি তোলানো হয় নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে যে ছবি আমার প্রকাশকেরা তোলাইয়াছিলেন তাহা নানাস্থানে বাহির হইয়া গিয়াছে। বারম্বার নানা উপলক্ষ্যে আমার ছবি প্রকাশ হইলে তাহা সঙ্কোচের বিষয় হইয়া উঠে। ইতি ২১শে আষাঢ় ১৩১৬

আশীর্ব্বাদক
(স্বাঃ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কোম্পানীর মুন্সী মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পত্র

শোভাবাজার, রাজবাটী
১২ই আশ্বিন, ১৭...০...সাল

প্রিয় জয়রাম,

তোমার সহিত আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে। পার যদি একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় লর্ড ক্লাইভের আদেশ অনুযায়ী আমি তোমায় এই পত্র লিখিতেছি। বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ামের পুনরুদ্ধারকল্পে তোমার বাসস্থানের বিশেষ প্রয়োজন। অতএব তোমায় ইহার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান পাথুরিয়া ঘাটে বিরাট ভূমিখণ্ড কোম্পানী তোমায় দিতে স্বীকৃত হইয়াছে, অবশ্য ইহাতে লাভ হইবে ক্ষতি বিশেষ হইবে না পার যদি একবার লর্ড ক্লাইভের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। আমি কোম্পানীর বিশেষ প্রয়োজন থাকায় মুর্শিদাবাদ কুঠিতে যাইতেছি। এবার ৺পূজার সময় লর্ড ক্লাইভ আমার বাটিতে অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রতিমা দর্শন করিতে আসিবেন। তাঁহার সহিত কোম্পানীর বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিবেন। তোমার আসা চাই এবং সেই প্রসঙ্গে তোমার কথাও তাঁহার সহিত আলোচনা করিব। আশা করি ভাল আছ। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও।

ইতি
তোমারই নবকৃষ্ণ।

শ্রীঅরবিন্দের পিতা কে, ডি, ঘোষের পত্র

খুলনা, ১২ই আষাঢ়

পূজনীয় পিতা মহাশয়,

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এখানকার স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। এখন পীড়িত হইয়া কিছু দিন দেওঘরে থাকিবেন। আপনার দ্বারা ইঁহার যদি কোন উপকার হয় তাহা হইলে আমি বড় আপ্যায়িত হইব। ইনি এক জন বিশেষ শিক্ষিত ও বুদ্ধিবান ব্যক্তি।

আপনার পুত্র
কৃষ্ণধন ঘোষ।

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

মোছন—পুঁছন, মার্জ্জন, ঘর্ষণ।
মোট—ভার, গাঁঠরী, গড়, একুন।
মোটা—স্থূল, হৃষ্টপুষ্ট, পীন।
মোড়ক—পুঁটলী, মোট, ঔষধের মাত্রা।
মোড়ান—দুমড়ান, ফিরান, জড়ান, বেষ্টন।
মোদক—ময়রা, পুষ্টিক ঔষধবিশেষ।
মোদা—রুদ্ধ, বুজা, মুদ্রিত।
মোষ—চোর, দস্যু, তস্কর।
মোহ—মায়া, ভেল্কী, মূর্চ্ছা, অজ্ঞানতা।
মোহিত—মোহপ্রাপ্ত, মুগ্ধ, মুগ্ধিক।
মোহিনী—মনোহারিণী, মনোরমা, কান্তা।
মৌ—মহু, মধু, পুষ্পমধু, মাধ্বীক।
মৌক্তিক—মুক্তা, মতি, রত্নবিশেষ।
মৌখর্য্য—মুখরতা, প্রাগল্‌ভ্য, ব্যাপকতা।
মৌখিক—মুখস্থ, কাল্পনিক, বাহ্য।
মৌচাক—মধুমক্ষিকা-রচিত বাসা।
মৌন—অবাক, তুষ্ণীং, শীলতা।
মৌমাছী—মধুমক্ষিকা, ভ্রমর, ষট্‌পদ।
মৌর্ব্বী—ধনুকের ছিলা, জ্যা, গুণ।
মৌল—মূলজ, সদ্‌বংশজাত।
মৌলি—মস্তক, মাথা, কিরীট, চূড়া।
মৌহূর্ত্তিক—দৈবজ্ঞ, গণক, জ্যোতির্বেত্তা।
ম্রিয়মাণ—মরণোন্মুত, বিষণ্ণ, খেদান্বিত।
ম্লান—শুষ্ক, বিষণ্ণ, খেদযুক্ত।
ম্লেচ্ছ—বেদাচারহীন, নীচ জাতিবিশেষ।
যক—যক্ষ, কুবেরের ধনরক্ষক।
যকৃৎ—কালখণ্ড, রোগবিশেষ।
যক্ষধুপ—বৃক, ধূনা, কুন্দুরু।
যক্ষ্মা—শোষরোগ, ক্ষয়কাসি।
যখন—যে সময়ে, যৎকালে, যদা।
যজন—যাগকরণ, পূজাকরণ, অর্চ্চন।
যজমান—যাগকরণ, যাগাদির অনুষ্ঠাপক।
যজুঃ—যজুর্ব্বেদ, দ্বিতীয় বেদ।
যজ্ঞ—যাগ, মখ, ইজ্যা, মেধ, ক্রতু।
যজ্ঞসূত্র—যজ্ঞোপবীত, উপনয়ন, পৈতা।
যড়—একত্রীকৃত, অবশেন্দ্রিয়।
যড়ান—কুড়ান, গুটান, কোঁকড়ান।
যড়িত—বেষ্টিত, সংশ্লিষ্ট, সংলগ্ন।
যত—যাবৎ, যতেক, যৎসংখ্যক।
যতি—যতী, জিতেন্দ্রিয়, সন্ন্যাসী, থাক।
যত্ন—প্রয়াস, উদ্যোগ, আয়াস, চেষ্টা।
যত্নবান—সচেষ্ট, উদ্যুক্ত, পরিশ্রমী।
যথা—যেমন, যেরূপ।
যথাকাম—যেমন ইচ্ছা, যথাভিলাষ।
যথাকাল—বিহিত কাল, দিনের শেষভাগ।
যথাক্রম—আনুপূর্ব্বিক, ক্রমশঃ, ক্রমে ক্রমে।
যথাযোগ্য—যথোচিত, উপযুক্তমতা।
যথাসাধ্য—যথাশক্তি, সাধ্যানুযায়ী।
যথাশাস্ত্র—শাস্ত্রসম্মত, শাস্ত্রানুযায়ী।
যথেষ্ট—প্রচুর, অনেক, বিস্তর।
যথোচিত—যথোপযুক্ত, যেমন ন্যায্য।
যদবধি—যে কাল হইতে, যে কাল পর্য্যন্ত।
যদা—যখন, যে কালে, যে ক্ষণে।
যদৃচ্ছা—অনায়াস, ইচ্ছানুযায়ী।
যন্ত্র—কল, শিল্পকর্ম্মার্থ কল্পিত বস্তু।
যন্ত্রণা—ক্লেশ, দুঃখ, বেদনা, কষ্ট, কৃচ্ছ্র।
যব—শস্য, পরিমাণবিশেষ।
যবক্ষার—লবণবিশেষ, সোরা।
যবস্থব—যবথব, যেমন ছিল, পূর্ব্ববৎ, যবুথবু।
যবান্ন—পক্ক যব, ছাতু।
যবে—যে কালে, যখন, যে সময়ে।
যম—অন্তক, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, যুগ্ম।
যমক—যমজ, মিথুন, সহজাত, যোট।
যমধার—ছোরা, কটার, কাটার।
যশঃ—সুখ্যাতি, কীর্ত্তি, স্তব, গুণানুবাদ।
যষ্টা—যাজক, যজমান, পূজারী।
যষ্টি—লগুড়, লাঠী, দণ্ড, ছড়ি, যাটি।
যাওন—যাওয়া, চলা, গমন করা।
যাঁতা—পেষণীয় প্রস্তর, চাকী, ভস্ত্রা।
যাঁতি—সযোনী, গুবাক-ছেদনাস্ত্র।
যাগ—(যজ্ঞ দেখ)
যাচক—প্রার্থক, ভিক্ষুক, যাচ্ঞাকারী।
যাচন—মাঙ্গন, চাহন, প্রার্থনা করা।
যাচ্ঞা—যাচনা, প্রার্থনা, ভিক্ষা।
যাজক—পূজারী, ঋত্বিক্‌, পুরোহিত।
যাজন—যাজকের কাজ, পৌরোহিত্য।
যাজ্য—যজমান, যজ্ঞোপার্জ্জিত বস্তু।
যাতনা—(যন্ত্রণা দেখ)
যাতায়াত—গমনাগমন, গতায়াত, যাওয়া-আসা।
যাত্রা—গমন, চলন, গায়ক দল।
যাত্রিক—যাত্রোপযুক্ত, পথিক, তীর্থগামী।
যাত্রী—যাত্রাকারী, তীর্থপর্য্যটক।
যাথার্থিক—বাস্তবিক, সত্য, সাধু, প্রকৃত।
যাথার্থ্য—স্বরূপতা, তথ্য।

[ক্রমশঃ]

ঘাট —কুমারী গীতা গোস্বামী

জলা —অজিতকুমার মিশ্র
(প্রথম পুরস্কার)

ঘাট
—গীতারাণী সিংহ-রায়

—অর্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক
(তৃতীয় পুরস্কার)

দীঘি

পুকুর-তীরে —পুলক ভট্টাচার্য্য

Cooch Behar

প্রতিযোগিতা

বিষয়

চিড়িয়াখানা

প্রথম পুরস্কার ১৫৲ দ্বিতীয় পুরস্কার ১০৲
তৃতীয় পুরস্কার ৫৲

[ছবি পাঠানোর শেষ দিন ২৩শে আশ্বিন]

পদ্মপুকুর —তপন ঘোষ

গাগরী-ভরণে

—শি. সু. বসু
(দ্বিতীয় পুরস্কার)

যাযাবর

উত্তর শ্রাবণ
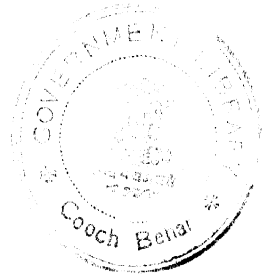
আমার কথাটি ফুরালো।

কিন্তু নটে গাছটি মুড়োবার আগেই বিস্মিত বন্ধুজনেরা প্রশ্ন করেন, "সে কী কথা? এই কি শেষ?"

জবাবে চুপি চুপি বলি, শেষ কিছুরই হয় না। উপসংহারের অন্তে থাকে পরিশিষ্ট, পঞ্চম অঙ্কের অবসানে আসে এপিলোগ, পরিশেষের পরে পুনশ্চ। তাই প্যারাডাইজ লষ্টের পরে আবার প্যারাডাইজ রিগেইন্‌ড্‌ হয়, বঙ্কিমের হাতে মরা উদাসিনী বন্য বালিকা দামোদরের হাতে বেঁচে উঠে নম্র বধূরূপে স্বামী পুত্র নিয়ে করে ঘর। পর্ব্বের পর পর্ব্ব যোজনায় পাটনার পিয়ারী বাঈজীর ধারা বয়ে পৌঁছয় মুরারিপুরের দ্বারকাদাস বাবাজীর আশ্রমে বৈষ্ণবী কমললতায়। টানলে বাড়ে শুধু দ্রৌপদীর বস্ত্র নয়, উপন্যাসের ভল্যুমও। যথা,—আপটন সিনক্লেয়ার।

অবশ্য জগতে বস্তু এবং প্রাণী দুই-এরই আয়ুষ্কাল বাঁধা আছে মহাকালের খাতায়। সেই নির্দ্দিষ্ট সীমা-রেখা অতিক্রম মাত্রই তাদের অস্তিত্ব যায় ঘুচে। কিন্তু জীবনসাঙ্গের মধ্য দিয়েই যে জীবনের উজ্জীবন ঘটে তার প্রমাণ আছে যুগে যুগে জগতের একাধিক মহামানবের ধর্ম্মপূত জীবনে। ক্রুশদণ্ডে যিশুর যে জীবনাবসান, সে খৃষ্টের সত্যিকার মৃত্যু, না, জন্ম? ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী নাথুরাম গডসে গান্ধিজীকে প্রকৃতপক্ষে মেরেছে, না, বাঁচিয়েছে?

মরণ নিয়ে কবিদের নানা জল্পনা-কল্পনার কথা সুপরিজ্ঞাত। তাকে কেউ বলেছেন মধুর, কেউ বলেছেন ভয়াল, কেউ বলেছেন শান্তির পারাবার। কেউ বা তাকে মনে করেছেন শ্যাম সমান। মৃত্যুর রূপ সম্পর্কে তাঁদের যতই মতভেদ থাক, তাকে চরম সমাধান বলে' তাঁরা কখনও ভুল করেন নি। 'কবিদের সাংসারিক জ্ঞানের পরিমাণ নিয়ে যতই কেন না কৌতুক প্রচলিত থাক, তাঁদের কাণ্ডজ্ঞানের অভাব নেই। মরণেই যদি সমস্ত নিঃশেষ, তবে কোন্‌ পরিতৃপ্তি নিয়ে মরবে নায়ক? কোন্‌ প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাঁচবে নায়িকা? না, একমাত্র বাংলা সিনেমার পরিচালক ছাড়া এ যুগে মৃত্যুকে আর কেউ সমাপ্তির অবধারিত উপায় মনে করে না।

পদার্থবিদ্যায় বলে,—বস্তুর বিলোপ নেই; আছে পরিবর্তন। আধ্যাত্মিকতায় কহে, প্রাণের বিনাশ নেই, আছে বিবর্ত্তন। সাদা কথায়, তথ্যজ্ঞানীরা মানে রূপান্তর। তত্ত্বজ্ঞানীরা মানে জন্মান্তর। এ দুই-এর কোনটাই যারা নয়, সেই সাধারণ মানুষেরও দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আছে অনুরূপ উদাহরণ। ধূপ দগ্ধ হলেই তো মেলে সুরভি, প্রদীপের তেল ক্ষয় হয়েই দেয় আলো। বসন্তে চেরীর শাখায় পাতা খসে গেলে ফোটে ফুল। ফুল ঝরে গিয়ে ধরে ফল। ফল থেকে বেরোয় বীজ। সে কি তরুর সারা, না, সুরু? শ্রাবণ আকাশের শ্যামল মেঘমালা কি জলের আদি, না, অন্ত? জপের মালায় কোন্‌ রুদ্রাক্ষটি শেষের? স্তবের ভাষায় কোন্‌ মন্ত্রটি সমাপ্তির?

বস্তুতঃ, জগতে বিরাম নেই, আছে বিশ্রাম। যাত্রাশেষ নেই, আছে যাত্রাভঙ্গ। সে থামাটা শুধু পুনরারম্ভেরই পূর্ব্বাভাষ;—গানের যেমন সম, কবিতার যেমন চরণ। সেগুলি তো ইতি নয়,—যতি। এক মাত্র দাম্পত্য কলহে স্ত্রীর উক্তি ছাড়া জগতে 'শেষ কথা' বলে কিছুই নেই।

শুনে বন্ধুরা নিরস্ত হন। কিন্তু বান্ধবীরা তাঁদের খোপাশুদ্ধ মাথা নেড়ে কানের দুলে দোলা দিয়ে বলেন, "বাঃ রে, তা বলে তোমার গল্পের কি পূর্ণচ্ছেদ থাকবে না? প্লটের থাকবে না কনক্লুশন?"

সেই সাহিত্যানুরাগিণীদের আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে, গল্পের বায়না নিয়ে আমি বসি নি।

গল্প এ যুগে হয় না। গল্প রচনার জন্য চাই যে রহস্যময় পরিবেশ এবং কল্পনাপ্রবণ মনোভাব তার কোনটাই বর্ত্তমানে আর সম্ভব নয়। অপরিচয়ের যে দূরত্ব ও কৌতূহল শ্রোতার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত ও মনকে মোহাবিষ্ট করে, আজিকার ভূগোল-ইতিহাস-ব্যাখ্যাত বিজ্ঞান-বিশ্লেষিত দিনে তার অস্তিত্ব নেই।

পৃথিবীর সকল দেশের সর্ব্বাপেক্ষা আদি ও অকৃত্রিম গল্প হলো রূপকথা। তার পাত্র-পাত্রীরা

সাধারণ নরনারীর প্রাত্যহিক পরিচিতির বাইরে। তার ঘটনাবিন্যাস সাংসারিক অভিজ্ঞতার উর্দ্ধে। সেই অজ্ঞাত, অভাবিত রহস্য তাই শ্রোতার মনে এক অনির্ব্বচনীয় মোহ বিস্তার করে। রূপকথার রাজ্য পুরোপুরি স্বপ্নের রাজ্য। সে গল্প-লোক আসলে হলো কল্প-লোক। তাই তার আবেদন এত সর্ব্বজনীন, এত দেশ-কাল-নিরপেক্ষ।

কিন্তু আধুনিক জগতে মানুষের বিস্ময়ের পরিধি সঙ্কীর্ণ, বিশ্বাসের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। যন্ত্র এবং বিজ্ঞান মিলে অচেনা অজানার ক্ষেত্রকে করেছে অপরিসর, অসম্ভবের তালিকাকে করেছে সংক্ষিপ্ত। এরোপ্লেনে যখন হামেশাই তিল, তিসি, মায় হাতির বাচ্চা চালান হচ্ছে, তখন পুষ্পকরথের নামে কারো মন উত্তেজিত হয় না। প্রত্যহ খবরের কাগজে যখন থাকে হাইড্রোজেন বোমার রোমহর্ষক বিবরণ, তখন অগ্নি বা বরুণ বাণের কথা শুনে কারো দুই চোখ কপালে উঠবে এমন সম্ভাবনা নেই। যে দিনে প্রমাণ ছাড়া কিছুই প্রত্যয় হয় না, সে দিনে 'এ হ্যাণ্ড বুক অব্ বটানি'র পাতায় উল্লেখ না থাকলে সাত ভাই চম্পার পারুল বোনটিকেও কারো মনে ধরে না এবং প্রাণী-তত্ত্ববিদের ছাড়পত্র না পেলে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীদেরই বা সাধ্য কি যে শ্রোতাদের অবিশ্বাসের বেড়া ডিঙ্গোয়!

এক যে ছিল রাজা! সুদূর অতীতে কোন্ এক বিস্মৃত দিবসের কর্ম্মহীন সন্ধ্যায় মৃদু দীপালোকিত গৃহকোণে বৃদ্ধা পিতামহী সর্ব্বপ্রথম এই বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন, তা শুধু পণ্ডিতেরাই জানেন। কিন্তু যুগ-যুগান্ত ধরে এই সহজ ও সামান্য সূচনাটি নিঃসংশয় শিশুচিত্তে যে কী মোহিনী মায়া বিস্তার করে আসছে, সে কথা কারুরই অজানা নেই। ভাষার কারুকার্য্য নয়, ভাবের গাম্ভীর্য্য নয়, আড়ম্বরহীন নিরলঙ্কার চারটি মাত্র শব্দ,—এক যে ছিল রাজা! সে তো কথা নয়, সে ইন্দ্রজাল।

মুস্কিল এই যে, এ যুগে রাজা নেই। আছে রাজ্যপাল। নৃপতির বদলে রাষ্ট্রপতি। তাঁদের ভ্রূকুটিতে কারো শিরশ্ছেদ হয় না, তাঁদের তুষ্টিতে হয় না অর্দ্ধেক রাজত্বসহ রাজকন্যা লাভ। প্রজা পালন বা দুষ্টদলন কোনটাই তাঁদের এক্তিয়ারে নয়। ত্রিষ্টুপ অনষ্টুপ ছন্দে গেঁথে কোন সভাকবি করে না তাঁদের স্তুতিপাঠ। চাঁদির রেকাবে হাজার আশরফি সাজিয়ে কোন আমীর ওমরাহ দেয় না নজরানা। অনাথ আশ্রমের দ্বারোদ্‌ঘাটন বা বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কারবিতরণী সভার সভাপতিত্ব ছাড়া তাঁদের আর কোন সার্থকতা নেই। ফুঃ; তাঁদের গল্প লিখতে বসবে কে?

একালের রাজকন্যারাও পাঁচ-মহলা রাজপুরীর অন্তঃপুরে সোনার কাঠি ছোঁয়ার অপেক্ষায় নিদ্রামগ্ন থাকে না। সোনার গয়না গড়াতে স্যাকরার দোকানে ভীড় বাড়ায়। কেশবতীদের কেশদাম মেঘবরণ হওয়ার আগেই বংড্ হয়ে যায়। কঙ্কাবতীর অশ্রুতে মুক্তা ঝরে না, বরং গালের মেক-আপ ধুয়ে যায়। তাদের গল্প শুনতে বসবে কে? ডেমোক্রেসীতে ফেরার ট্রায়েল হয় তো হতে পারে, কিন্তু ফেয়ারী টেলস্ কদাচ নয়। হায়, গণতন্ত্রে ছেলেদের মত গঠন করে মন্ত্রীমণ্ডলী, মেয়েদের রুচি নিয়ন্ত্রণ করে সিনেমা প্রযোজক এবং শিশুদের চিত্ত বিনোদন করে ডিটেকটিভ বইর প্রকাশক।

রূপকথার পরবর্ত্তীকালে উপকথা রচিত হয়েছে যাঁদের নিয়ে, তাঁদের সঙ্গেও আধুনিক নরনারীর সাদৃশ্য সামান্য। ক্রোধ, করুণা, প্রেম, প্রতিহিংসা প্রভৃতি মৌলিক প্রবৃত্তিগুলির তীব্র অনুভূতি ও প্রচণ্ড প্রকাশ সে যুগের অধিকাংশ নরনারীর আচরণে দিয়েছে অভিনবত্ব, চরিত্রকে করেছে রহস্যময়। পাপে, পুণ্যে, ক্রূরতায়, ঔদার্য্যে, লোভে, বৈরাগ্যে, মহত্ত্বে ও দুষ্কৃতিতে তাঁরা অসাধারণ। তাই তাঁদের সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল ও কল্পনার কিছুমাত্র অভাব ছিল না।

আধুনিক মানুষের জীবনে বিস্তার নেই। বিক্রমও না। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মতো তার না আছে রং, না আছে ঝাঁজ। নিতান্তই নিরীহ। স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হলে আধুনিক ভেনিসের মুর শয্যাগৃহে সুন্দরী ভার্য্যাকে গলা টিপে মারে না, বড় জোর বিবাহবিচ্ছেদের পরামর্শ নিতে উকীলের বাড়ি ছোটে। ওসমান এবং জগৎসিংহ এখন আর তরোয়াল নিয়ে তেড়ে আসে না। একে অন্যকে সিগারেট-কেস বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "হ্যাভ এ স্মোক।" প্রণয়িনীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে এ যুগে প্রেমিক আত্মহত্যা করে না; বরং মাসিক পত্রিকায় দুর্ব্বোধ্য গদ্য কবিতা লিখে পাঠকের মনেই হত্যা-প্রবৃত্তি জাগায়!

এ যুগে মানুষের ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র দুঃখ, ক্ষুদ্র কল্পনা। উচ্চাভিলাষ রাজসিংহাসন নয়, খুব বেশী হলে একটা প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব। তার জন্যে গুপ্তহত্যার প্রয়োজন হয় না, খদ্দরের টুপিই যথেষ্ট। বর্ত্তমানে কলহের উত্তেজনায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধযাত্রা করে না, থানায় ডায়েরী লিখিয়ে আসে। এখন জয়ের লক্ষ্য নির্ব্বাচন, দানের দৌড় ফ্ল্যাগ-ডে এবং প্রতিহিংসার মাত্রা বেনামী চিঠি। একালে বাসের জন্য উদ্ভব হয়েছে ফ্ল্যাট, আহারের জন্য ক্যাফেটেরিয়া এবং পড়ার জন্য 'ডাইজেষ্ট' অথবা দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরীয় অংশ। কোনোখানে আর বিশালতা বা নাটকীয়ত্বের অস্তিত্ব নেই। তাই এ যুগে ড্রামা হয় না, হয় প্লে। সেক্সপিয়ার হয় না, হয় নোয়েল কাওয়ার্ড। এখন জীবনে টেম্পেষ্ট নেই; আছে কেবলই ব্রিফ এনকাউণ্টার।

বাস্তবিক গল্প উপন্যাসকে যে ইংরেজীতে ফিকশান বলে সেটা একেবারে নিরর্থক নয়। কী কঠিন সঙ্কটে পড়েই যে আধুনিক সাহিত্যিকেরা চাষী মজুরদের গল্প রচনায় বসেন সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। যেন রেশনের দিনে বাঙ্গালী মেয়েদের রুটি খাওয়ার দায়। অবশ্য অপরিচয় এবং ব্যবধান নিরঙ্কুশ কল্পনার অনুকূল, সন্দেহ নেই। কিন্তু অবকাশ, অপব্যয় ও অজস্রতার মাটি না পেলে কল্পনাধর্ম্মী রচনার অঙ্কুরোদ্‌গম হয় না। তাই আইন সভায় স্বতন্ত্রদল যেমন প্রচ্ছন্ন সুবিধাবাদী, রাষ্ট্রনীতিতে নিউ ডেমোক্রেসী যেমন বেনামী কমিউনিজম, রচনাশাস্ত্রে আধুনিক গণ-উপন্যাসও তেমনি ছদ্মবেশী প্রবন্ধ। 'মেহনতি'তে আর যাই হোক, সাহিত্য হয় না। সাহিত্যিকেরই কথা ধার করে' বলতে পারি, মানুষেব মনোহরণ করে বংশীধর। সেটা হলধরের সাধ্যে নেই।

এ যুগের সার্থক সাহিত্যসেবীদের কাছে সমাজ ও জীবনের এই সঙ্কীর্ণ পরিধির কথা অজ্ঞাত নেই। তাঁরা জানেন, নলেন গুড়ের মরশুম ফুরালে নলেনতর গুড়ের আশায় বসে কালহরণে লাভ নেই, তখন বাজার থেকে চিনি কিনে সন্দেশের পাক দিতে হয়। তাই তাঁরা এখন গল্প না লিখে লেখেন প্রসঙ্গ। ঘটনা-বিন্যাসের চেষ্টা ছেড়ে মন দেন চরিত্র সৃষ্টিতে। জীবনের গতি অপেক্ষা মনের ধারা তাঁদের রচনার উপজীব্য। তাতে বিবরণ অপেক্ষা বিশ্লেষণ বেশী। মানসিক একটি বিশেষ অবস্থা, আচরণের একটি বিশেষ ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলতে পারলেই তাঁদের রচনা সফল।

পুরানো দিনের রচনায় পাত্র-পাত্রীদের মাতৃ-জঠরবাস থেকে শ্মশানযাত্রা পর্য্যন্ত সমগ্র জীবনের কাহিনী থাকত। এখনকার লেখায় থাকে তাদের জীবিতকালের কোনো একটি অংশ, কোনো একটি দিন, এমন কি কোনো দু-একটি ঘণ্টার কথামাত্র। সেগুলি কথাসাহিত্যের ভোজনশালায় ডিনার নয়,—আলাকার্ট। কাহিনী-সমুদ্রের তরঙ্গ নয়,—বুদ্‌বুদ। শেকভই এ যুগের গল্প-লেখকদের আদর্শ। কবিযশঃ-প্রার্থীদের সামনে যেমন টি. এস. এলিয়ট। জগতে রোমান্টিক কাব্য আর হয় না। সত্যিকার গল্পও আর হবে না। যেমন আর ফিরে আসবে না সামন্ত-তন্ত্র বা পালের জাহাজ, কিম্বা চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডা।

তবুও সংশয় নিরসন হয় না। বান্ধবীরা সহৃদয়া। তাঁরা হৃষ্ট চিত্তে বইর মলাট মুড়ে রেখে তাঁদের কমলকরপল্লবে চা-র পেয়ালা এগিয়ে ধরেন। কিন্তু দেখ বৎস সম্মুখেতে প্রসারিত তব সমালোচকের জিজ্ঞাসু নেত্র। বাগবিস্তার দ্বারা ভোটদাতাদের ভোলানো যায়, সমালোচকদের নয়। তাঁরা ঊর্দ্ধে ও অধে মৃদু শির সঞ্চালনপূর্ব্বক সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র, ইংরেজী কাব্য-জিজ্ঞাসা ও রাশিয়ান সাহিত্য-বিচার উদ্‌ধৃত করে' শব্দবহুল ও কটাক্ষ-কুটিল যে সব মন্তব্য প্রকাশ করেন তার সহজ সারাংশ এই যে, "আচ্ছা, না হয় মেনেই নিলেম এটা মলী সেনের গল্প নয়। কিন্তু বাপু হে, তাঁর জীবনের কি পরিণতি নেই?"

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন করি, "না, নেই।"

শুধু মিসেস মলী সেনের নয়, সংসারে কারো জীবনেরই পরিণতি থাকে না। থাকে পরিণাম। জিভে ক্যানসার ক্ষতকে কি গণ্য করব ঠাকুর রামকৃষ্ণের দিব্য জীবনের পরিণতি? অতীতের কারাবরণকারী বহুনির্য্যাতিত দেশহিতব্রতীদের জীবনের পরিণতি কি বর্ত্তমান পারমিটলোলুপতা?

পরিণতি কথাটার মধ্যে যে সুসমঞ্জস সমাধানের ইঙ্গিত আছে জীবনের প্রকৃতিই তার বিরুদ্ধে। বাস্তব জীবন হচ্ছে কতগুলি আকস্মিকতার সমষ্টি। সুপরিকল্পিত ধারা বা যুক্তিসম্মত ধাপ বেয়ে তা চলে না। তার আরম্ভ, তার স্থিতি এবং তার অবসান

সমস্তই পুরোপুরি কার্য্যকারণবিরহিত, খামখেয়ালীভরা, —ইংরেজীতে যাকে বলে আরবিট্রেরী। তার মধ্যে ঔচিত্যানুগ বিকাশ বা সঙ্গতিপূর্ণ সমাপ্তি খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম।

কাল পূর্ণ হলে মলী সেনের জীবনেরও নিশ্চয় একটা পরিণাম ঘটবে। কিন্তু সে তো আমার জানা নেই। এটা খণ্ডিত জীবনচিত্র মাত্র। পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত নয়। আমি মলী সেনের বসওয়েল নই।

প্রকৃত তথ্য হচ্ছে এই যে, দুর্ঘটনার পরে মলী সেনের সঙ্গে আমার আর যোগাযোগ ঘটেনি। কর্ত্তার ইচ্ছায় শুধু কর্ম্ম নয়, কর্ম্মস্থানও বটে। আমার কর্ম্মদাতাদের আদেশে অভিনয় রাত্রির পরদিনই আমাকে দীর্ঘকালের জন্য স্থানান্তরে যেতে হয়। মাঝে এই প্রাসাদপুরীতে কখনও আসি নি, এমন নয়। কিন্তু মলী সেনের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করি নি। সেটা ইচ্ছাকৃত। যাঁকে ভালো লাগে, তাঁর সঙ্গে পরিচয় পরিমিত রাখা ভালো। যে গানের রেকর্ডটি পছন্দ, সেটি বেশী বাজাতে নেই।

অবশ্য পছন্দ হলে কৌতূহলটাও একেবারে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তারও একটা সীমা থাকা প্রয়োজন। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে মলী সেন পুনরায় অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন কি না, সে সংবাদ আমার পক্ষে অনাবশ্যক। একমাত্র সাহায্য-রজনীর টিকেটের যাঁরা মূল্য ফেরৎ আশা করেন, তাঁরা ছাড়া আর কারুরই তাতে ঔৎসুক্য নেই। উপর থেকে নীচে ছিটকে পড়া সত্ত্বেও মলী সেনের আঘাত কেন গুরুতর হয়নি তার কারণ নিয়ে মাথা ঘামাবেন ডাক্তারেরা। হঠাৎ মানসিক উত্তেজনা বা অবসাদে সংজ্ঞা লোপ হয় কি না তার সঠিক উত্তর দিতে পারবেন মনস্তত্ত্ববিদ। প্রমোদ-তরণীর ছাদ থেকে পতনের সঠিক কারণ কি, সেটা নির্ণয়ের কাজ সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের। আমি আর যাই কেন না হই, রবার্ট ব্লেক নই।

মলী সেনকে কেন্দ্র করে' আমার পরিচিতির পরিধিতে প্রবেশ করেছিল যে ক'টি বিশিষ্ট নরনারী, তাদের সম্পর্কেও আর অধিক জানার আগ্রহ নেই। সচ্ছলতা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাস্পৃহাই যাঁর জীবনের জীবনীশক্তি, সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার নিঃশেষ সমাধি অন্তে সেই মাল্লামাসির জীবনে আর বাকী থাকে কী? দুর্জ্জয় অভিমানে দুরতিক্রমণীয় দূরত্ব রচনাই ছিল যাঁর দাম্পত্যজীবনের অটল প্রতিজ্ঞা, স্বামীর কাছ থেকে চরম অপসৃতির পরে সেই সুবালার আর করণীয় আছে কী? অহেতুক আশঙ্কার যে যুক্তিহীন বেদনায় ধীরার চিত্ত বিকল হয়েছিল, তা অপগত। নীরজার ঈর্ষ্যাদগ্ধ হৃদয়ের আকুলতা হয়েছে শান্ত। মায়ামরীচিকার পশ্চাদ্ধাবনের নিষ্ফলতা থেকে নিখিল পেয়েছেন মুক্তি। নির্ব্বোধ হঠকারিতায় নিজের জীবন বিড়ম্বিত এবং স্ত্রীর জীবন অভিশপ্ত করেছে যে মূঢ়, সেই পল্লীপ্রেমবিমুখ অপদার্থ শিবনাথ নতুন করে জেনেছে অনিবার্য্য দণ্ডভোগের প্রায় অন্তহীন সীমানা। অতঃপর এদের জীবন করকোষ্ঠিকারকের গণনার এবং মৃত্যু করোনার আদালতে তদন্তের লক্ষ্য হলেও হতে পারে। সাংবাদিকের অনুসন্ধিৎসার বিষয় নয়।

মলী সেন সম্পর্কে আমার কৌতূহল নেই। কিন্তু মনোযোগ আছে। বিদেশে আমার এক আত্মীয়াকে মলী সেনের কাহিনী বলেছিলেম। শুনে নিরতিশয় ঘৃণাভরে নাসিকা কুঞ্চিত করে' তিনি ধিক্কার দিলেন, "অমন মেয়ের মুখে আগুন।" মহিলা পাঁচটি মেয়ে ও চারটি ছেলে, একুনে এই নয়টি জীবিত সন্তানের জননী। বয়স চল্লিশের উপরে। এখনও স্বামীর নামীয় খামের চিঠি গোপনে খুলে পড়েন এবং তাঁর বাড়ি ফিরতে দেরী হলে আপিসের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ষ্টেনোগ্রাফার মেয়েদের চেহারা সম্পর্কে চাপরাশীকে জেরা করেন। তাঁর উষ্ণতার কারণ বুঝি।

মলী সেনের সগোত্রদের মধ্যে অনেক মেয়েই এখন স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে মুখে সধূম অগ্নি বহন করেন। সমাজের উপরতলার অতি আধুনিকাদের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা অবশ্যই জানেন যে, ঠোঁটে রং মাখাটাই এখন আর যথেষ্ট প্রগতিশীলতার চিহ্ন নয়। সুতরাং আমার আত্মীয়ার ভর্ৎসনা কানে গেলে মলী সেন বিচলিত হবেন এমন সম্ভাবনা নেই।

এদেশে সুনীতি সংঘের চাঁদা-না-দেওয়া সদস্য আছেন সর্ব্বত্র। আপামর সাধারণের নৈতিক চরিত্রের স্বয়ংনিযুক্ত অভিভাবকের সংখ্যাও অগুণতি। যদিও তাঁরা জেনে আতঙ্কে প্রায় শিউরে উঠবেন, তবুও স্বীকার করতে লজ্জা নেই, মলী সেনের সম্পর্কে আমার দুর্ব্বলতা আছে। অন্ততঃ সাধুভাষায় পাপীয়সী বলে তাঁকে গাল দিতে আমার মন

সরে না। স্ত্রী অনন্যমতি নয় একথা শুনে স্বামী-সম্প্রদায় আনন্দে একেবারে গদগদ হয়ে উঠবেন এমন প্রত্যাশা অবশ্য করিনে। কিন্তু বিবাহিতা নারীর জীবনেও যে দুরূহ সংকট দেখা দিতে পারে সে কথা উপলব্ধির প্রয়োজন আছে। ব্যাড পার্ট—অপকৃষ্ট ভূমিকা—শুধু যে প্রবঞ্চিত স্বামীর তা নয়, অবহেলিত স্ত্রীরও। সম্মানের অভিনয় করা সমানই কষ্টসাধ্য। একথা ঋষি টলষ্টয়ের হয়তো জানা ছিল না। কিন্তু কারাবাস যাদের ঘটেছে, কারাযন্ত্রণার খবর তাদের কাছে অন্ততঃ অজ্ঞাত নয়।

পুরাকালে বিবাহের লক্ষ্য ছিল বংশরক্ষা। নিজের অবর্ত্তমানে ভূসম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য ছিল সন্তান-সন্ততির আবশ্যকতা। শ্রমশিল্পের যুগে সে প্রয়োজন অন্তর্হিত। যৌথ কোম্পানীর উদ্ভব হওয়াতে সম্পত্তির পারিবারিক তদারক আর অপরিহার্য্য নয়। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তিই যদি না থাকে, তবে তার জন্যে ব্যক্তিগত দুশ্চিন্তাও অনাবশ্যক। পরলোকে পিণ্ডপ্রাপ্তির তাগিদে দার-পরিগ্রহ যে দেশের সনাতন রীতি সেই ভারতবর্ষেও এখন বেশীর ভাগ লোক ইহলোকের পিণ্ড সংস্থানেই হিমশিম। পরিবারের আকার বৃদ্ধিতে একালে আনন্দ হয় না; আতঙ্ক ঘটে। পুরোহিতের কথা অগ্রাহ্য করে' আধুনিক হিন্দু যেমন বিলাতি হোটেলে খানা খায়, তেমনি পোপের অনুজ্ঞা উপেক্ষা করে' আধুনিক রোম্যান ক্যাথলিক পর্য্যন্ত গোপনে জন্মশাসন করে। মেরী মাতার চাইতে মেরী ষ্টোপসের প্রতি তাদের এখন বিশ্বাস বেশী। শুধু প্রজনার্থং-ই মহাভাগাঃ হতে এযুগের নারীর আপত্তি আছে। ভার্য্যা এখন আর পুত্রার্থে নয়, প্রীত্যর্থে। ঘরকন্না দেখার জন্য স্ত্রী ঘরে আনার যুক্তিও আজ আর তেমন গ্রাহ্য নয়। বিলাতে তো গৃহস্থালির পারিশ্রমিক হিসাবে স্বামীর কাছে নির্দ্দিষ্ট বেতন আদায়ের যুক্তি দেখিয়ে এরই মধ্যে নারী-আন্দোলন সুরু হয়েছে।

প্রশ্ন ওঠে, প্রীতি আগে পরে বিবাহ; না, আগে বিবাহ পরে প্রীতি? এ তর্ক প্রায় তৈলাধার পাত্র এর মতোই পুরাতন ও ক্ষান্তিহীন। সুতরাং নিরর্থক। কিন্তু বিনা প্রেমসে যে না চলে দাম্পত্য জীবন, সে বিষয়ে একালে মতদ্বৈধ নেই। মীরা দে, দত্ত, দাস বা দেবী সবাই সেকথা মানেন। আগে স্বামীরা সেবায় নিষ্ঠা এবং স্ত্রীরা শয্যার ভাগ পেয়েই খুশি থাকতেন। এখন দুপক্ষেরই মন না পেলে মন ওঠে না। তাই সমুদ্রের ওপারে শুধু ভাই ভাই-এরাই ঠাঁই ঠাঁই নয়, মনের অমিলে স্বামী স্ত্রীতেও পার্টিশান সুট হয় যার সহজবোধ্য নাম ডাইভোর্স।

আমাদের সমাজে মেয়েদের পক্ষে বাসরঘরগুলি অভিমন্যুর চক্রব্যূহ। তাতে প্রবেশের পথ আছে, নির্গমনের উপায় নেই। পতিপ্রেমবঞ্চিতা নারীকে এদেশে গৃহকর্ম্মে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করে' হতে হয় দাসী। নয়তো দানধর্ম্মে মন ব্যাপৃত করে' হ'তে হয় দেবী। সাধারণ মানবী হয়ে জীবনধারণের কোন সুযোগ নেই তার সামনে। এদেশে বিবাহ স্থির হয় স্বর্গে, সুতরাং স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে তার পরিত্রাণ কোথায়? তার তো হোলি ওয়েডলক্ নয়, হোলি ডেডলক্।

দুঃখে অচঞ্চল সুখে চ বিগতস্পৃহ যে নারী, তিনি নমস্যা। তাঁকে নিয়ে তো প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু হৃদিস্থিত হৃষীকেশের দোহাইতে যার হৃদয় সান্ত্বনা না পায়, সমাজের আর পাঁচজন নারীর মতো যে প্রত্যাশা করে সখ্য, প্রীতি ও অনুরাগ সেই কাদা-মাটিতে গড়া সাধারণ মেয়ে স্বামীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকবে কী নিয়ে? মলী সেনের শৈশবের শিক্ষা, কৈশোরের আবেষ্টন ও যৌবনের সমাজ কোনটাই ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের অনুকূল নয়। কৃচ্ছ্রসাধনের সঙ্গে ভগবদ্ভক্তির সম্বন্ধ ঠিক কোন্‌খানে সে আমার জানা নেই। কিন্তু সোনার বোতাম আঁটা সিল্কের পাঞ্জাবী গায়ে যে ব্রহ্মচিন্তা চলে না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

সমাজে অধিকাংশ আধুনিকাদেরই উভয় সঙ্কট। পূর্ব্বজন্ম বা কর্ম্মফলের উপর যে নির্ভরতায় প্রাচীনারা আপন দুর্ভাগ্যকে অনিবার্য্যরূপে গ্রহণ ও বহন করতেন, সে তাঁরা বর্জ্জন করেছেন। অথচ যে দুঃসাহসের দ্বারা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা যায় তাও তাঁরা অর্জ্জন করেননি। তাঁদের না আছে অন্ধ বিশ্বাসের প্রশান্তি, না আছে যুক্তিপরায়ণতার প্রত্যয়। যে পাখীর মনে আকাশে উড়ে বেড়াবার বাসনা আছে অথচ ডানায় যথেষ্ট জোর নেই, তার মতো দুঃখী নেই ত্রিজগতে। পাখা-ঝটপটানিতে কেবলই ক্ষত-বিক্ষত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না তার।

মলী সেন তো ছায়া নন। তাঁর হৃদয় আছে, আশা আছে, আসক্তি আছে এবং সৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে সম্পদ সেই ভালোবাসা আছে। ভালোবাসায় তিনি আপন স্বামীকে জয় করতে পারেন নি। অন্যকে আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু হায়, যে প্রেম নরনারীর পরিপূর্ণ মিলনের মধ্যে সুসম্মানে প্রতিষ্ঠিত নয়, যে অনুরাগ নিত্যকার সাংসারিক জীবনযাত্রায় অপ্রতিফলিত, স্বজন বন্ধুগণের দ্বারা অস্বীকৃত এবং সমাজের মৌলিক-কল্যাণ ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতিহীন, সে ঝঞ্ঝার মতো বেগবান হলেও ঝঞ্ঝার মতোই অস্থায়ী। বন্ধনহীন প্রেম বৃন্তহীন পুষ্পের মতো আপনাতে আপনি বিকশি' মনোহরণ করতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকাল বাঁচতে পারে না। প্রেমস্ফুলিঙ্গ। বাস্তব জীবনের দীপশিখায় আশ্রয় না পেলে সে দীপ্তিময় হয়েও স্বল্পায়ু। এ সত্য মলী সেনের জানা ছিল না। তাই ব্যর্থমনোরথ হয়ে তিনি ক্ষোভে বিদ্রোহে ও ভ্রান্তিতে বারংবার কেবলি মাথা খুঁড়েছেন চারদিকের দেয়ালে। তাতে দেয়ালে চিড় ধরে নি। তাঁর নিজেরই আহত ললাট থেকে ঝরেছে শোণিত।

অসামান্য রূপ ও অসাধারণ বুদ্ধি নিয়ে অতুল ঐশ্বর্য্যে এবং অসংখ্য ভক্ত জনগণের মধ্যে মলী সেন রিক্ত, নিঃসঙ্গ ও বুভুক্ষু। চিরাচরিত রীতিতে যেখানে তাঁর স্থান, সেখানে তিনি অনাহূত। স্বাভাবিক নিয়মে যাঁর কাছে তাঁর মান, তাঁর কাছে তিনি অনাদৃত। তিনি যা চেয়েছেন তা রয়েছে তাঁর পাওয়ার অতীত। তাঁর কাছে যা চাওয়া হয়েছে, তা ছিল তাঁর দেওয়ার অতীত।

এই হলো তাঁর ট্র্যাজেডি।
এই হবে তাঁর এপিটাপ।

সমাপ্ত।

হে শিল্পী

শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বহিছে কালের স্রোত—বর্ষ হল গত
শুকাল না তবু হায়, হৃদয়ের ক্ষত।
আজিও নয়নধারা পড়িছে ঝরিয়া,
শূন্য সিংহাসনতলে তোমারে স্মরিয়া ;
আজিও জাগিছে মনে সেদিনের কথা,
আজিও হৃদয়ে বাজে সেদিনের ব্যথা
সেদিন মোদের ছাড়ি' চলে গেলে তুমি
অন্ধকার হয়ে গেল তব জন্মভূমি।
হায় শিল্পী, গেল থেমে তুলিকা তোমার
কেমনে থামাব সেই অশ্রু বেদনার ?
সে কথা জাগিয়া উঠে, থাকিয়া থাকিয়া,
কাঁদিয়া উঠিছে হিয়া তোমার লাগিয়া।
জিজ্ঞাসা করিছে চিত্ত, 'তুলিকা তোমার
সত্য কি নীরব হল ?'—করে না স্বীকার
আমার হৃদয় তাহা ;—তুলিকার টান
আজিও বর্ণের ছন্দে তুলিছে, যে, গান।
তোমার অমর রেখা চাহি' মোর পানে
আসিয়া প্রাণের মাঝে, বলে কানে কানে—
"কেন মিছে ব্যথা পাও ? কেন কাঁদ মিছে ?
শিল্পীর মরণ কোথা ?—চেয়ে দেখ পিছে
জীবন্ত বরণ রাজি কহে তাঁর কথা
সহস্র রূপের ছন্দে ; ভুলে যাও ব্যথা।
চিরজীব শিল্পী তিনি—নাহি মৃত্যু ভয় ;
নমস্কার কর তাঁরে—গাহ তাঁর জয়।"

* * * *

শুনিনু আশার বাণী, ঘুচিল বেদনা—
গেল হৃদয়ের গ্লানি, মিলিল সান্ত্বনা।
নীরব হওনি তুমি—তুলির ঝঙ্কার
আজিও শুনিতে পাব—হৃদয়ের তার
তোমার তুলির তানে বাজাবে পরাণে—
অমর সঙ্গীত-ধ্বনি, তুলিকার টানে
রূপবর্ণে পরিপূর্ণ রেখাচ্ছন্দে গান
আজিও শুনিতে পাব—ধন্য তব দান।
তব তুলিচিত্রে বাজে বীণা অমরার—
হে শিল্পী, তোমারে তাই করি নমস্কার।

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

[প্রকাশক 'আকাশ-পাতাল' পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়ে বিজ্ঞাপনে যখন আমার নামটাই প্রকাশ ক'রে দিলেন, তখন আর ছদ্মনামে লেখা উচিত বোধ করলাম না। 'আকাশ-পাতাল' দু' খণ্ডে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হচ্ছে, যদিও প্রতি খণ্ড একেকটি সম্পূর্ণ উপন্যাসরূপে পড়তে অসুবিধা হবে না। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, উপন্যাসের কাহিনী কাল্পনিক, পটভূমি বাস্তব, পাত্র ও পাত্রীগণ কল্পনায় চিত্রিত। 'আকাশ-পাতালে'র প্রশংসাকারীদের জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।—লেখক।]

দেখতে দেখতে বেলা অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

ফুলের পাপড়ি খ'সে পড়ে। বর্ষামুখর দিন; নাতিশীতোষ্ণ হাওয়ায় পাপড়ি ওড়ে এলোমেলো। যেন প্রজাপতি উড়ছে। শরৎ-দিনের আকাশে শুভ্র মেঘের ঢেউ, নিরেট রূপো যেন গ'লে যাচ্ছে অবিরাম। মধ্যে মধ্যে হাওয়া থেমে যায়, গুমোট আবহাওয়ায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে মানুষ। দম আটকে যাওয়ার উপক্রম হয়। বৃক্ষশাখে কাকের ঝাঁক কা-কা করে। ঘাড়-গলা খোঁচাখুঁচি করে তীক্ষ্ণ চঞ্চুতে। বেলা শেষে ফেরীওলার ডাক শোনা যায় পথের মোড়ে। সাড়ে বত্রিশ ভাজা, জলকচুরী আর কাটা-কাপড়ওলার চিৎকার গগন-বিদারক। পুজোর মরসুম, ক্রেতা আর বিক্রেতাদের হাঁক-ডাক আর দরাদরির ভাসা-ভাসা কথা। দোকানগুলো সেজেছে যেন কনে বৌয়ের মত। শিমুল তুলোর অক্ষরে নীলামের নোটীশলেখা লাল শালু লটকানো হয়েছে দোকানের মাথায় মাথায়। লেখা হয়েছে,—সেল! সেল!! সেল!!! অর্থাৎ হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যে বিক্রয় হওয়ার লিখিত ঘোষণা। ষ্টক ফতুর ক'রে দেওয়ার জন্য নামমাত্র মূল্যে। গোলাপজল, কেওড়া আর আতরওলাদের আবির্ভাবে হাওয়ায় থেকে থেকে সুগন্ধের আমেজ। যাত্রা, পাঁচালী, পুতুলনাচ, অপেরা আর বাইজীদের দালালরা বাবুদের মজলিস থেকে কেউ বেরোচ্ছে আর কেউ ঢুকছে। হলুদ আর আসমানী রঙের জরিদার পাগড়ীধারী শেঠেরা বকেয়া টাকা আদায়ের উদ্দেশে দ্রুতপদক্ষেপে চলা-ফেরা করছে। লোকের বাড়ীর দালানে দালানে প্রতিমার গায়ে খড়িগোলা রঙ চাপানো হচ্ছে, কুমোরদের বারেক তামাক খাওয়ার ফুরসৎ পর্য্যন্ত নেই। বেণের দোকানে পুজোর উপকরণ বিক্রী হচ্ছে। মধুপর্কের বাটি আর গালার বালা স্তূপীকৃত করা হয়েছে। চাঁদমালা আর শোলার কদমফুলের দর-কষাকষি হচ্ছে।

দেরাজের টানায় ছিল সোনার কাঁটা আর পাশ-চিরুণী।

ঘরের রুদ্ধ জানলা। আলো থেকে অন্ধকারে পৌঁছে চোখে যেন কিছু দেখতে পায় না রাজেশ্বরী। জানলার পাখী খুলে দেখে বেলা কত হ'ল। দেখে পথ লোকে লোকারণ্য; পুজোর মরসুম লেগেছে দিকে দিকে। জানলার পাখী খুলতে যতটুকু আলো হয় ততটুকু আলোতেই দেরাজের টানা খুলে হাতড়ে হাতড়ে কাঁটা আর পাশ-চিরুণী বের করে। চুল বাঁধতে বাঁধতে উঠে এসেছে রাজেশ্বরী। বাইরের দালানে ফিতে হাতে ব'সে আছে এলোকেশী। ভাবছে; কোন্ ধরণে বাঁধবে রাজেশ্বরীর চুলের বোঝা। কোন্ ধরণের খোঁপা বেঁধে দেবে। দিনে দিনে কত রকমফের হচ্ছে।

রাজেশ্বরী ঘর থেকে বেরোতেই বললে এলোকেশী,—কেমন ক'রে যে চুল বেঁধে দিই সেই ভেবে-ভেবেই মরছি আমি।

ঘরে ঘুমন্ত স্বামী। দিবানিদ্রা দিচ্ছে কৃষ্ণকিশোর।

ফিস-ফিস কথা বলে রাজেশ্বরী। বলে,—মেয়ে-বৌ অনেক আসবে। ভাল ক'রে সেজেগুজে যেতে অর্ডার হয়েছে। বুঝেসুঝে চুল বেঁধে দাও এলো।

বড়বাড়ীতে পুণ্যাহের খাওয়া-দাওয়া।

দিনভোর লোক খাচ্ছে সকাল থেকে। রাত্রে মেয়েদের নিমন্ত্রণ। পাড়া-পড়শী আত্মীয় অনাত্মীয়াদের ভিড় হবে। সাড়ী আর গয়না দেখানোর প্রতিযোগিতা চলবে। রূপ দেখানোর হিড়িক লাগবে। কার কত রূপ, দেখাবে কত কে।

—তবে আয় ফিরিঙ্গী-খোঁপা বেঁধে দিই রাজো।

অনেক ভেবে-ভেবে বললে এলোকেশী। বললে,—তোর যা মুখ, মানাবে চমৎকার।

—অত-শত জানি না আমি। যা ভাল বোঝ' দাও চটপট। পাল্কী পাঠাবে ওরা বিকেল হ'তে না হ'তে।

এলোকেশীর দিকে পেছন ফিরে বসতে বসতে বললে রাজেশ্বরী। কাঁটা আর পাশ-চিরুণী রাখলে মেঝেয়; কথা বললে ধীর চাপা কণ্ঠে।

কথা বলতে বলতে ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টা পড়তে লাগলো; ঢঙঢঙিয়ে বাজলো চারটে।

চুলে চিরুণী চালাতে চালাতে চুপি-চুপি শুধোলে এলোকেশী,—জামা-কাপড় বের করা হয়েছে? চুল বাঁধতে কতক্ষণ আর লাগবে! তোর গা ধুতেই যা সময় লাগবে। গয়নাগাটি বের করেছিস?

—না, না, না। বললে রাজেশ্বরী।—বক-বক না ক'রে দাও, চটপট তুই চুলটা বেঁধে দে।

—হুট বলতেই হয়? চুল বাঁধা কি চাট্টিখানি কথা।

এলোকেশী কথা বলে কিছু বা বিরক্ত হয়ে। বলে,—আমি কি কুসমন্তরে এই চু-লের বোঝা বেঁধে দেবো? মনে যদি না ধরে তখন? কথার ঠেলা কে সামলাবে?

হেসে ফেললে রাজেশ্বরী। শব্দহীন ক্ষীণ হাসি। বললে,—হ্যাঁ রে এলো, আমি তোকে কবে কথা শোনালুম যে বলছিস?

—যাই বল্ তাই বল্, আগলে তোর জ্ঞান থাকে না রাজো! আমার তো ভয় করে তোর মুখটা ভার দেখলে। এলোকেশীর কথায় সত্যিকার আন্তরিকতা ফুটে ওঠে। বেশ গম্ভীর হয়ে কথা বলে সে।

—আচ্ছা এলো, কে কোথায় গুলী ছুঁড়ছে বল্ তো?

কথার মাঝে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো রাজেশ্বরী। কথা শুনে বিস্মিত হয়ে গেল বুড়ী। ভাবলো তারই হয়তো শুনতে ভুল হচ্ছে। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, কানে তালা লেগে গেছে হয়তো। খানিক কান খাড়া করে থাকলো এলোকেশী। বললে,—আমি তো বাছা গুলীর আওয়াজ কানে পাচ্ছিনে! কে জানে বাবা, হয়তো হবে। পাখী শিকার করছে না তো কেউ?

—ঐ শোন ন', গুম-গুম শব্দ হচ্ছে। থাকুগে, দে তুই হাত চালিয়ে দে তাড়াতাড়ি। বললে রাজেশ্বরী। গুলী ছোঁড়ার শব্দের উৎস জানতে না পেয়ে বললে হতাশ হয়ে।

—হাত কি চালালেই চলে রাজো? বাহারী খোঁপা চাই ইদিকে, অথচ দু'দণ্ড তর সইবে না তোর?

চুলের গোড়ায় ফিতে বাঁধতে বাঁধতে কথা বলে এলোকেশী। বলে,—ধর্, ফিতে দু'টো কষে ধর্ দাঁতে চেপে। আমি জটটা ছাড়িয়ে দিই।

বিনোদা এলো কোত্থেকে। হাতে জল-খাবারের রেকাবী। বেলা শেষ হয়ে গেছে, জল-খাবার এনেছে তাই। রেকাবীতে মিষ্টি আর ফল। রূপোর ফুলকাটা রেকাবী। আর এক ঘটি জল। বললে,—কিচ্ছু ফেলবে না বৌ, ফেললে রক্ষে রাখবো না আমি।

—এত খাওয়া যায় বিনোদিদি?

দাঁতে ফিতে ধ'রেই বললে রাজেশ্বরী। দাঁতে দাঁত চেপে বললে। বললে—অবেলায় খেয়ে মোটে ক্ষিদে হয়নি বিনোদিদি। দোহাই তোমার। ব'ল না আমাকে।

—ত্যাখো বৌ, ভাবছো যে আমি কিছু দেখতে পাই না? যা খেয়েছো আমি দেখেছি! বসেছো আর উঠেছো। যা খেয়েছো ও তোমার না-খাওয়ারই সামিল। আমি কি আর জানি না, খাওয়ায় কি মন আছে তোমার?

সত্যি কথা ব'লেছে বিনোদা।

ভেবে-ভেবে আর সময়ে না খেয়ে খেয়ে কেমন যেন আধমরা হয়ে গেছে রাজেশ্বরী। রঙটা যেন পুড়ে গেছে, সিঁটিয়ে গেছে দেহবল্লরী। চোখের দৃষ্টিতে আর নেই তেমন আগের মত জাজ্জ্বল্য। হাসিতে জৌলুস। চলতে-ফিরতে মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ করে, পায়ে পায়ে জড়িয়ে যায়। বললে উঠতে ইচ্ছা হয় না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে গেছে বুঝি। ক্ষুধামান্দ্য হয়েছে। সামান্য ফল খেলেও বুক জ্বালা করতে থাকে। পেট আইঢাই করে।

কথা বলতে বলতে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় বিনোদা। রাজেশ্বরী ভাবে, যথার্থ কথাই বলে গেল বিনোদা। একটা মিষ্টি হাতে তুলে রেকাবীটা ঠেলে দিয়ে বললে রাজেশ্বরী,—দু'টি পায়ে পড়ি তোর এলো, বিনো যেন না জানতে পারে, খাবারগুলো খেয়ে ফেলিস ভাই।

—আমার তো পেটে ডাইনী ঢোকেনি! ন্যাকরা করছিস কেন বল্ তো রাজো। যা পারিস্ খা দেখি তুই। ঠিক কথা ব'লেছে বিনোদিদি! খাওয়া তোর আছে আর? লুচির ফোস্কা ছিঁড়ে খাওয়া কি খাওয়া?

এলোকেশীর কথার কোন জবাব দেয় না রাজেশ্বরী। আকাশে চোখ তোলে। শরতের মেঘ আকাশে। বীতস্পৃহ সন্ন্যাসীর মত শুভ্র মেঘের দল ইতস্ততঃ বিচরণ করছে। কাক-চিল উড়ছে। খেয়ালী হাওয়া। কখনও গুমোট হয়ে থাকে। এলোমেলো হাওয়া বয় কখনও। 'কপালকুণ্ডলা' তখনও রাজেশ্বরীর মনটা অধিকার ক'রে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত কপালকুণ্ডলার পরিণাম যে কি হবে সেই কথাই ভাবে। ভাবে যে, কপালকুণ্ডলা শিবিকারোহণে যেতে যেতে সামান্য ভিক্ষুকের কাতর প্রার্থনায় অঙ্গের অলঙ্কার দিয়ে দিতে পারে? রাজেশ্বরীর মনে পড়ে বঙ্কিমের বর্ণনা ভাষা এবং লিখিত কথোপকথন।

> কপালকুণ্ডলা শিবিকার দ্বার খুলিয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন; এক জন ভিক্ষুক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ভিক্ষা চাহিতে চাহিতে পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।
>
> কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "আমার ত কিছুই নাই, তোমাকে কি দিব?"
>
> ভিক্ষুক কপালকুণ্ডলার অঙ্গে যে দুই-একখানা অলঙ্কার ছিল, তৎপ্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "সে কি মা! তোমার গায়ে হীরা-মুক্তা—তোমার কিছুই নাই?"
>
> কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গহনা পাইলে তুমি সন্তুষ্ট হও?"
>
> ভিক্ষুক কিছু বিস্মিত হইল না। ভিক্ষুকের আশা অপরিমিত। ক্ষণমাত্র পরে কহিল, "হই বৈ কি।"
>
> কপালকুণ্ডলা অকপটহৃদয়ে কৌটা সমেত সকল গহনাগুলি ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন। অঙ্গের অলঙ্কারগুলিও খুলিয়া দিলেন—

কি আশ্চর্য্য! কপালকুণ্ডলা তবে কি আর মানুষ নেই? জ্ঞানগম্যি হারিয়েছে? মতিবিবি গহনা রাখতে যে রৌপ্য-জড়িত হস্তিদন্তের কৌটা পাঠিয়েছিলেন, সেই কৌটাসমেত সকল গয়না ভিক্ষুককে দিয়ে দিলো কপালকুণ্ডলা! পরিচ্ছেদের প্রথমেই বঙ্কিম বাবু বলেছেন,—

শিবিকারোহণে
"—খুলিনু সত্বরে,
কঙ্কন, বলয়, হার, সীঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী।"
মেঘনাদ বধ।

ভাবতে ভাবতে বিহ্বল হয়ে যায় রাজেশ্বরী। কপালকুণ্ডলা হীরা-মুক্তাখচিত অলঙ্কারসমূহ মুহূর্ত্ত মধ্যে ভিক্ষুককে অর্পণ করতে পারে, আর সে, রাজেশ্বরী একটা টায়রা হারানোয় কত আফশোস ক'রেছে। কিন্তু ভিক্ষা দেওয়া আর হারিয়ে যাওয়া বা চুরি যাওয়ায় তফাৎ যে অনেক! রাজেশ্বরী ভাবে, কিন্তু কে চুরি করলো! কেমন ক'রে হারালো ঘর থেকে! সোনা যে হারাতে নেই। সোনা হারালে যে পাপ হয়, অমঙ্গল হয়।

এলোকেশী বললে,—দে কাঁটাগুলো এগিয়ে দে। দ্যাখ, গিয়ে আয়নায় খোঁপা ঠিক হয়েছে কি না।

—যা হয়েছে তা হয়েছে। বললে রাজেশ্বরী।—তুই ভাই ফল-মিষ্টিগুলো খেয়ে ফেলিস্। বিনো যেন দেখতে না পায়।

দিবানিদ্রা ভেঙ্গে যেতে রাজেশ্বরীকে পাশে দেখতে না পেয়ে খানিক বিস্মিত হয় কৃষ্ণকিশোর। শুয়ে থাকে চুপচাপ।

এলোকেশী বললে,—আলতাটা পরিয়ে দিই?

রাজেশ্বরী বললে,—না, আগে গা ধুয়ে আসি। গা ধুয়ে এলে আলতা পরিয়ে দিস্।

এলোকেশী বলে,—বেশ, তাই হবে। মিষ্টিটা হাতে ধ'রেই থাকব? খাবি না?

রাজেশ্বরী অসহায়ের মত কথা বলে। বলে,—কি পরি বল্‌তো এলো?

কথা শুনে হেসে ফেলে এলোকেশী। বলে,—ভালো লোককে শুধোলি বটে তুই! মোরা গরীব-গরবা, মোরা কি জানি সাজ-পোষাকের? সে যুগ কি আছে? এখন ক্যাত ধরণ-করণ হয়েছে।

—ন্যাকরা করিস কেন? বল্ না! বললে রাজেশ্বরী মুখে মিষ্টি তুলে। বললে,—ব'লে পাঠিয়েছে গা-ভর্ত্তি গয়না-গাটি প'রে যেতে। আমি তো কিচ্ছু ভেবে পাচ্ছি না।

এলোকেশী উঠে পড়লো রাজেশ্বরীর পেছন থেকে। বললে,—অভাব তো কিছুর নেই। যা ভাল বুঝিস গায়ে চাপা না।

হঠাৎ যেন দিনের আলো ম্লান হয়ে গেল।

মেঘে ঢাকা পড়লো হয়তো সূর্য্য। রৌদ্র যেন মুছে দিলো কে।

হাওয়া বইলো হঠাৎ ঝিরঝিরে। ঘেমে উঠেছিল রাজেশ্বরী, মন্দ-মধুর হাওয়ায় কপালটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল ক্ষণিকের মধ্যে। এলোকেশী বললে,—যাবি তো ওঠা মেয়ে সোয়ামীকে। ঘুম থেকে উঠতে বল্। অবেলায় ঘুমোয় না, যা যা ডেকে তোল্ যেয়ে। বেলা কি আর আছে?

রাজেশ্বরী ঘরে ঢুকতেই কথা বললে কৃষ্ণকিশোর। বললে,—যাবে না তুমি? কখন যাবে?

রাজেশ্বরী বললে, যখন হুকুম করবে। যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। পাল্কী এলেই যেতে হবে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—পাল্কী ফেরৎ দেওয়া হবে। আমাদের গাড়ী আছে, পৌঁছে দেবে তোমাকে।

—তুমি যাবে না? শুধোয় রাজেশ্বরী। বলে,—তোমাকেও তো যেতে ব'লেছে।

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপচাপ থাকে কৃষ্ণকিশোর। ভাবে বুঝি কিছু। বলে,—হ্যাঁ, আমিও যাবো। খাওয়ার সময় গিয়ে খেয়ে আসবো শুধু। ব'লে গেছে, না গেলে ভাল দেখায় না। প্রতি বছরেই তো যাই।

কথা বলতে বলতে পালঙ থেকে উঠে পড়লো কৃষ্ণকিশোর।

রাজেশ্বরী বললে,—এখন কোথায় চললে তুমি? কি যে পরি, ভেবে পাচ্ছি না।

হেসে ফেললো কৃষ্ণকিশোর। বললে—হাসিও না তুমি। আলমারী-ভর্ত্তি শাড়ী-জামা, বাক্স-ভর্ত্তি গয়না, ভেবে পাচ্ছো না তুমি? আমি যাচ্ছি কাছারীতে, নায়েব মশাইকে ডাকতে।

—কেন? রাজেশ্বরীর কৌতূহলপূর্ণ কথায় যেন অজ্ঞতা ফুটে ওঠে। কেমন যেন ভয়ার্ত্ত কণ্ঠ।

কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তিত থেকে বললে কৃষ্ণকিশোর,—ডাকতে হবে নায়েবকে। ঘড়ার টাকাটা গুণে ফেলতে হবে যে। যদি বেশী হয়ে যায় তখন? ঘড়াটা তো আর তুলে দিতে পারি না নায়েবের হাতে! গুণে না দিলে—

কথাগুলো শুনে খুশী হয় রাজেশ্বরী। অন্যায় কথা বলেনি, ঠিক কথাই বলেছে কৃষ্ণকিশোর। হিসাবী মানুষের কথা। বিজ্ঞ এবং বিবেচকের কথা। বুদ্ধিমানের কথা। রাজেশ্বরী খুশী হয়ে বলে,—ঠিক কথাই তো। তোমার টাকা, তুমি বুঝে-সুঝে না চললে কে দেখবে? এখন কিছু খাবে? জল-খাবার খেয়ে কাছারীতে যাও না?

—নাঃ। অবেলায় খেয়েছি। ক্ষিধে হয়নি। কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর। দালানে পৌঁছে কেন কে জানে ক্ষীণ হাসি হাসে। লোককে ঠকিয়ে লোকে যেমন হাসে। কার টাকা কে অপব্যয় করছে। হয়তো বিধাতাও হাসলেন অলক্ষ্যে। শুধু হয়তো হাসলেন না কৃষ্ণকিশোরের পূর্ব্বপুরুষ—পিতা, পিতামহ, আর প্রপিতামহ, যাঁদের বুদ্ধি এবং কষ্টার্জ্জিত টাকা, সেই মৃত জনের দল।

স্বামীর বিবেচনা হয়েছে দেখে বেশ খুশী হয়ে ওঠে রাজেশ্বরীর অন্তর।

মুহূর্ত্তের মধ্যে মুখে হাসি দেখা দেয়। তৃপ্তির স্মিতহাস্য ওঠে ফুটিয়ে ডাকে,—এলো, অ এলোকেশী! গেঞ্জি কোথায়?

—যাবো আর কোথায় বল? বলতে বলতে দালান থেকে ঘরের ভেতরে সেঁধোয় দাসী। বলে,—যেতে পারলে তো বাঁচি। মিত্যু কি আর হবে?

—আঁ গেল! কথায় কৃত্রিম ক্রোধ রাজেশ্বরীর। বলে,—কথা দেখ পোড়ামুখীর! নে নে জানলা ক'টা খুলে দে আগে। জানলা খুলে দেখে আয় চানের ঘরে জল আছে না নেই। না থাকে তো ভারীকে ডেকে বল্ গে এক কলসী জল দিয়ে যাবে। গা ধুতে হবে।

জবুথবু বয়োবৃদ্ধা কথা শুনে থতমত খেয়ে যায়। জানলা খুলতে খুলতে বলে,—বুড়ী হয়ে বিধবা হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে পাপ কিছু আছে? এখন মরণ হ'লেই বাঁচি। যত জালা জুড়োয়।

রাজেশ্বরী উন্মুক্ত জানলার আলোয় তখন ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে খোঁপা দেখছিল মাথার। আলমারীর আয়নায় এলোকেশীর বেঁধে দেওয়া খোঁপা দেখছিল। ফিরিঙ্গী-খোঁপা। কাঁটা আর পাশ-চিরুণীতে মাথাটা যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এলোকেশী চুলটা আজ বেঁধেছে খুব ভাল। আয়নায় কবরী-শিল্প দেখতে দেখতে বললে রাজেশ্বরী,—এক্ষুনি তুই ম'রতে যাবি কেন? দাঁড়া, আমি আগে যাই। আমি আগে মরি। তুই না থাকলে কে আমাকে আলতা পরিয়ে দেবে পায়ে?

—বালাই ষাট! বললে এলোকেশী।—বলতে আছে এমন কথা! ছিঃ! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?

এলোকেশীর কথা শুনে খিল-খিল হেসে উঠলো রাজেশ্বরী। অনেক, অনেক দিন বাদে বুঝি সত্যিকার হাসলো রাজেশ্বরী। তরঙ্গায়িত হয়ে উঠলো দেহ। পরিপূর্ণ-যৌবনা রাজেশ্বরীর রূপশ্রী হঠাৎ যেন চোখে পড়লো এলোকেশীর। দেখলো কয়েক মুহূর্তের জন্য, দেখলো কেমন চমৎকার মানিয়েছে মেয়েটাকে। এলোকেশীর চোখের কনীনিকা স্থির হয়ে আছে। বিমুগ্ধ হয়ে গেছে সে। খোলা জানলা থেকে তেজহীন মিষ্টি আলোর ঝলক ঢুকেছে ঘরে। সেই আলোয় মেয়েটাকে দেখাচ্ছে যেন অপ্সরীর মত।

—হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা বললুম শোন, যা গিয়ে ভারীকে ডাকা। বললে রাজেশ্বরী খোঁপা চাপড়াতে চাপড়াতে।

এলোকেশী যেন চমকে ওঠে কথা শুনে। সম্বিৎ ফিরে পায়। বলে,—চানের ঘরে জল আছে। দেখে এয়েছি আমি। তুই যা না, গা ধুয়ে আয় না।

—বলতে হয় এতক্ষণ! বললে রাজেশ্বরী। বলতে বলতে বেরিয়ে গেল রাজেশ্বরী। ঘর থেকে বেরিয়ে বললে,—এলো, অপেক্ষা কর্ তুই। আমি এলাম ব'লে।

কথা বলতে বলতে মুখ তুলতেই দেখলো অনন্তরাম আসছে। মাথায় ঘোমটা তুললো রাজেশ্বরী। অনন্তরাম বললে,—ঘোমটায় মুখ ঢাকতে যেয়ে আছাড় খেয়ে মরবে কি বৌদিদি? তুমি তো আমার মেয়ের সামিল। আমাকে অত লজ্জা করবে কেন?

কুঁকড়ে-মুকড়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছিল রাজেশ্বরী। মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলো,—কিছু বলছিলে তুমি?

অনন্তরাম বললে,—হ্যাঁ, বলছিলাম। বলছিলাম যে হুজুর চাবি চাইছে ঐ ঘরের। বললে যে, তোমার কাছেই আছে চাবি।

—কোথাকার চাবি বল তো অনন্ত? কিছু বা বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে রাজেশ্বরী। বলে,—কোথাকার চাবি শুধোলে না তুমি?

—হাঁ গো হাঁ। বললে অনন্তরাম।—সিন্দুকের ঘরের চাবি।

তৎক্ষণাৎ অপ্রতিভ হয়ে পড়ে রাজেশ্বরী। লজ্জিত হয়ে বলে,—হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে বটে। দিয়েছিলো রাখতে আমাকে। পালঙের মাথার দিকের তোষকের তলায় আছে। নে যাও তুমি। তাড়া আছে আমার, আমি যাচ্ছি চানের ঘরে।

—এই তো মুস্কিল করলে। ফাঁকা ঘরে যে ঢুকতে চাইনে আমি। বললে অনন্তরাম ক্ষোভের সঙ্গে। বললে—যদি কিছু চুরি যায় আমাকেই তো দুষবে?

স্মিত হাস্যরেখা দেখা দেয় রাজেশ্বরীর বিম্বাধরে। বললে,—তুমি আর হাসিও না অনন্ত? ঘরে এলোকেশীও আছে। কথা বলতে বলতে চ'লে যায় রাজেশ্বরী। খোঁপা থাপড়াতে থাপড়াতে যায় গাত্র ধৌত করতে।

দিনের আলো যেন ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যায়। সূর্য্য অস্তাচলে নামে।

পশ্চিমাকাশ কখন লালে লাল হয়েছে অস্তরবির রক্তিমালোকে। শরতের আকাশে ছিন্ন মেঘের জটলা। রাশি রাশি পেঁজা তুলো ছড়িয়েছে কে যেন অদৃশ্য থেকে। স্নানের ঘরের জানলা থেকে আকাশ দেখে রাজেশ্বরী।

গায়ে জল ঢালতে ঢালতে গুন্ গুন্ গান গায় রাজেশ্বরী। রবি বাবুর কি একটা গানের কলি।

চাবিটা পেয়েই বললে কৃষ্ণকিশোর,—চল' অনন্তদা, টাকাগুলো গুণে ফেলা যাক্। কালকেই খাজনা পাঠাতে হবে। সূর্য্যাস্ত আইন, খাজনা না দিলে কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে।

অনন্তরাম বললে,—বেশ তো, চল'। কিন্তু একটা কথা কখন থেকে বলি-বলি করেও বলা হচ্ছে না। বলছি যে, কাছারীতে এমন টাকা নেই যে এক সালের খাজনা দিতে পারে? জমানো টাকায় হাত প'ড়লো শেষে? কে জানে বাবা! আমরা অবিশ্যি আদার ব্যাপারী।

কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে যেন কৃষ্ণকিশোর। কি বলবে ভেবে পায় না। বিমূঢ়ের মত বলে শেষে,—হুগলীর প্রজাদের

[৮০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে আধুনিক সাহিত্য

শ্রীকালিদাস রায়

ইউরোপে বৈশ্যমানবিকতার যুগ শেষ হয়ে বৈশ্যমানবিকতার যুগ চলছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"রাষ্ট্রতন্ত্রে একদিন আমরা ইউরোপকে জনসাধারণের মুক্তি-সাধনার তপোভূমি ব'লেই জানতুম—অকস্মাৎ দেখছি সমস্ত যাচ্ছে বিপর্য্যস্ত হ'য়ে। বৈশ্যযুগের ভীরুতা মানুষের আভিজাত্য নষ্ট ক'রে দিচ্ছে—তার ইতরতার লক্ষণ নির্লজ্জ ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। পণ্যহাটের তীর্থযাত্রী অর্থলুব্ধ ইউরোপ এই যে আপন মনুষ্যত্বের খর্ব্বতা মাথা হেঁট ক'রে স্বীকার করছে, আত্মরক্ষার উপায় করছে আপন কারাগার, এর প্রভাব কি ক্রমে ক্রমে তার সাহিত্যকে অধিকার করছে না?"

প্রকৃতপক্ষে এই বৈশ্যযুগের একাধারে বাহন ও উপাস্য বিজ্ঞান। সাহিত্য তার সাধনার বস্তু নয়। আজ পর্য্যন্ত সাহিত্য যে সকল মহান্ আদর্শকে মানবচিত্তে প্রতিষ্ঠিত ক'রে এসেছে—সে সকল আদর্শ বৈশ্যবুদ্ধির প্রতিকূল। বৈশ্যযুগের প্রধান সম্বল বিজ্ঞানও চিরন্তন সাহিত্যের আশ্রয়গুলিকে অসত্য ব'লে প্রতিপাদন করছে। তবু এই বৈশ্যযুগেরও একটা সাহিত্য আছে—সাহিত্যের রীতি ও গতিপ্রকৃতি বদলিয়েছে কিন্তু সাহিত্য-ধারাটা বিলুপ্ত হয়নি। সাহিত্যের চিরন্তন বিষয়বস্তুগুলিকে বিজ্ঞান অসত্য ব'লে গণ্য করায় বিজ্ঞানসম্মত বিষয়বস্তুই সে সাহিত্যের উপজীব্য বা আশ্রয় হয়েছে। আদর্শও তার বদলে গেছে—বৈশ্যমনোবৃত্তির সঙ্গে যে সকল ভাবের সামঞ্জস্য হয় না—সে সকল ভাব ও আদর্শ সাহিত্য হ'তে বর্জ্জিত হচ্ছে। সাহিত্য বর্ত্তমান যুগের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মতবাদগুলিকেই আশ্রয় করেছে। কেবল তাই নয়, সাহিত্যের চিরন্তন ভাব ও আদর্শগুলির প্রতি একটা উদ্ধত বিদ্বেষও তার মধ্যে প্রকট হ'য়ে উঠছে। আজ জাতির নিজস্ব রাষ্ট্রীয়, অর্থনীতিক ও সামাজিক মতবাদের অনুগত হ'য়ে প্রত্যেক জাতির সাহিত্য রচিত হচ্ছে—যে স্বাভাবিক দাক্ষিণ্য থাকলে দূর নিকটের সকল অতিথিই উপভোগের ক্ষেত্রে আসন পেতে পারে—সে স্বাভাবিক দাক্ষিণ্য তার নষ্ট হয়েছে,—ভুলে যাচ্ছে "সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা-ভিত্তি সর্ব্বমানবের চিত্তক্ষেত্রে," কোন জাতিবিশেষের মতবাদের উপর নয়।

এ সাহিত্যের যত গুণই থাকুক, এ সাহিত্য সার্ব্বজনীন বা সার্বভৌম নয়। কবি তাই বলেছেন—

"এর কঠোরতা আমার কাছে অন্ধকার ঠেকে। বিদ্রূপপরায়ণ বিশ্বাসহীনতার কঠিন জমিতে এর উৎপত্তি। এর মধ্যে এমন উদ্বৃত্ত কিছু দেখা যাচ্ছে না, ঘরের বাহিরে যার অকৃপণ আহ্বান। এ সাহিত্য বিশ্ব থেকে আপন হৃদয় প্রত্যাহরণ ক'রে নিয়েছে—এর কাছে এমন বাণী পাইনে যা শুনে মনে করতে পারি যেন আমারই বাণী পাওয়া গেল চিরকালীন দৈববাণীরূপে।"

প্রাক্তন সাহিত্যের বিষয়বস্তু আজ বিজ্ঞানের পরীক্ষাক্ষেত্রে অসত্য ব'লে প্রতিপন্ন হ'তে পারে, কিছু যে মিলন-বিরহ, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, রাগ-বৈরাগ্য, প্রেমাকাঙ্ক্ষা, উদারতা, মনুষ্যত্ব, সৌন্দর্য্য, সেবাধর্ম্ম, আত্মত্যাগ ইত্যাদি অবলম্বনে প্রাক্তন সাহিত্য রচিত হয়েছে—সেগুলি ত মিথ্যা নয়, সেগুলি ত সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বজাতির মধ্যে আজও সত্য। যুগে যুগে সাহিত্য ভাষায় ভূষায় যে রূপ-বৈচিত্র্য লাভ ক'রে এসেছে—তা আজ অচল হতে পারে, কিন্তু তার প্রাণধর্ম্ম ত অসত্য নয়—তা ত মানবজীবনের ঐতিহাসিক সত্য। সাহিত্যের সার্ব্বজনীন আবেদন ত বিষয়বস্তুতে নেই। বিষয়বস্তুকে 'পরমার্থতয়া' না নিয়ে Symbol-স্বরূপ গ্রহণ করলেই ত চলে। আজ বিষয়বস্তু অসত্য হ'লে, তার আশ্রিত ভাব, অনুভূতি ও রূপ-বৈচিত্র্যকেও অসত্য বলে মনে করলে সাহিত্যের সার্ব্বভৌমতা নষ্ট হতে বাধ্য। বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য এই সমস্তকেই অস্বীকার করতে চলেছে, সর্ব্ব বিষয়ে প্রাক্তন সাহিত্যের শুধু Antithesis নয়, Negation হতে চলেছে। এ সাহিত্য তার ভিত্তি-ভূমি পর্য্যন্ত বদলিয়ে ফেলেছে। ফলে সাহিত্যের চিরন্তন বিচারে এ সাহিত্য অবিমিশ্র সাহিত্য নয়, চিরন্তন ভাব ও অনুভূতির বাহন নয়—বিজ্ঞানেরই উপসৃষ্টি, নব নব মতবাদেরই বাহন।

পুরাতন মাত্রই বর্জ্জনীয়, নূতন মাত্রই বরণীয় নয়। নূতন মাত্রই এক হিসাবে বিদ্রোহ। সাহিত্যক্ষেত্রে এই বিদ্রোহ হয়েছে সাহিত্যের বাণীরূপের বিরুদ্ধে—কখনও কখনও ভাবাদর্শেরও বিরুদ্ধে, কিন্তু রসাদর্শের বিরুদ্ধে নতুন কখনও বিদ্রোহ করেনি। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে সাহিত্যের নতুন বিদ্রোহ সাহিত্যের রসাদর্শেরই বিরুদ্ধেও দেখা যাচ্ছে। নতুনের বিদ্রোহ কখনও কখনও সঙ্গত কিন্তু কবির কথায়—"নূতনের বিদ্রোহ অনেক সময় একটা স্পর্দ্ধা মাত্র।" যে সাহিত্য আজ বিজ্ঞানবলে ও রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের সাহায্যে পুরাতন সাহিত্যের ভিত্তি-ভূমি পর্য্যন্ত ধ্বংস করতে প্রস্তুত, তাকে নতুন ভিত্তি-ভূমিও গড়তে হবে। নতুন ভিত্তিভূমি যদি গড়তে পারে তবে বলব—হোমার হতে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইউরোপে, বাল্মীকি হতে রবীন্দ্রশিষ্যগণ পর্য্যন্ত এ দেশে সাহিত্যের যে ধারা চলে আসছিল তার অবসান হ'ল এবং নতুন ধারার সূত্রপাত হ'ল। তা যদি না হয়—তবে বর্ত্তমান যুগের অভিনব সাহিত্য-চেষ্টাকে বলব বালুকা-প্রান্তরের ব্যবধান মাত্র, ফল্গুধারা তলে তলে চলেছে, এ ব্যবধান ক্ষণিক, এই বালুকা-প্রান্তর অতিক্রম করার পরেই আবার প্রাক্তন সাহিত্যধারার পুনরভ্যুদয় হবে। কবিগুরু এই কথাই নানা প্রবন্ধে বলেছেন।

ভাঙন

"আজ জাতিতে জাতিতে একত্র হচ্ছে অথচ মিলছে না। এরই বিষম বেদনায় সমস্ত পৃথিবী পীড়িত। এত দুঃখের প্রতিকার হয় না কেন? তার কারণ এই যে, গণ্ডীর ভিতরে যারা এক হতে শিখেছিল, গণ্ডীর বাহিরে তারা এক হতে শেখেনি।"

—রবীন্দ্রনাথ।

হা উ ই

পুলকেশ দে সরকার

ফাঁকা ময়দান থেকে মৃৎস্তরের ওপরে, আরও ওপরে, আরও আরও ওপরে শূন্যাকাশ ভেদ ক'রে উজ্জ্বল ধোঁয়ারেখার হাউই এক মুহূর্তে উঠে গেল। ত্রিদিক্ স্থান আর একদিক কাল জোড়া আকাশের শূন্যময় কণা কণা গা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে শূন্যে উঠে গেল নীলাভ উজ্জ্বল ধোঁয়ারেখার হাউই।

খোদার মাধ্যাকর্ষণে খোদকারি করেছে মানুষ, প্রবল বিকর্ষণে বারে বারে স্বর্গচ্যুতি হবে তাই তো দেবতার অভিশাপ। কিন্তু মানুষ মুহূর্তের জন্যও এই মাধ্যাকর্ষণকে মিথ্যে ক'রে শূন্যময় স্থানের ওপরে, আরও ওপরে, আরও আরও ওপরে ঠেলে তুলছে নীলাভ ধোঁয়ারেখার স্পর্দ্ধিত হাউই—আতসবাজী! হাউই উঠ্ছে, উঠ্ছে, উঠ্ছে। মাটী থেকে বারে বারে, অন্ধকারে ডোবানো মাটী থেকে, ওপরে আরও ওপরের স্তরে অন্ধকার চিরে-চিরে হাউই উঠ্ছে, উঠ্ছে।

পনেরোই আগষ্টের স্বাধীনতা দিবস। সন্ধ্যার আবছায়া যখন গাঢ় গাঢ়তর হ'য়ে আস্তে লাগল তখন এক সীমারেখাহীন লোক-ছায়ারণ্যের বিস্ফারিত দৃষ্টি ঘেঁষে নির্নিমেষে উঠ্ছে, উঠ্ছে, বুদ্‌বুদের মতো, অবিরাম অবিশ্রাম, নীলাভ ধোঁয়ারেখা বেয়ে বিচিত্র বিকাশের, বিচিত্র পরিণতির হাউই। বিস্ফারিতদৃষ্টি লোকারণ্য গাঢ় তমসা ঠেলে পদনখে ভর দিয়ে দাঁড়ায় ক্ষণে ক্ষণে, আকাশ-বিচরণেচ্ছু উৎকণ্ঠিত অস্থির মানুষের বনানী। স্বাধীনতার অবাধগতি ঊর্ধ্বগামী ধোঁয়ার হাউই।

কালো ক্রাইস্‌লার ঘুরিয়ে ড্রাইভার তীব্র হেড্‌লাইটের পথ কাট্‌ল বহু দূর, তমসাচ্ছন্ন হাজার আশী ভ্রূকুটিকুটিল নয়নতারার ওপর থেকে থেকে চওড়া সাপের মতো সাদা আলোর রেখাপথ তক্ষুণি সরে গেল। মোটর ঘুরল। মোটরের চাকার ছন্দে এল বেগ; মোটর ছুটল।

ড্রাইভারের পেছনকার বিস্তৃত আসনে দুই পুরুষ, শ্রী বি এল বোস্ এণ্ড সন্ (সন্স নয়, ক্রাইসলার যাঁরা চড়েন তাঁদের সন্স হয় না) শ্রীটি এল বোস্ ওরফে তরুণ বোস্, ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটে লেখা তরুণ-লাল বোস্, গত বছরে পাওয়া গেছে ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট, কিন্তু সমাজে কেউ ডাকে তরুণ বোস্, তারাই ডাকে যারা জানে ছোট বোস্ এতেই খুসী হয়, সঙ্গীরা "বোস্" ডাক্‌লে সে আরও খুসী হয়, বিশেষ এক শ্রেণীর লোক মিঃ বোস্ বললে আরও আরও খুসী হয় এবং সব চাইতে বেশী খুসী হয় মিঃ ও দেশ স্বাধীন হবার পর শ্রীটি এল বোস্ ব'লে উল্লেখ করলে। তরুণ হচ্ছে সেই জাতের মানুষের বাচ্চা যারা স্বনামখ্যাত হ'তে চান কিন্তু বাপ-মার সোজা নামে পরিচিত হ'তে চান না।

চলমান মিশমিশে কালো ক্রাইস্‌লার মোটরের পেছনকার আসনে টি এল বোস্, সংক্ষেপে টি এলের চিত্তে অস্বস্তি। বাঁ পাশে নিরুদ্বিগ্ন জন্মদাতাকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌ল, হাউই। শুনেছি রকেট আরও অনেক ওপরে যায়।

বাঁ পাশের কোণা থেকে ছোট্ট জবাব এল, চাঁদে যায়।

যায়?

যাবে, যাবে। অনেকে টিকিটও কিনে ফেলেছে।

টি এল ফস্ ক'রে ব'লে বস্‌ল, আমি যাব।

বাঁ কোণের পিতা বি এল আড়চোখে টি এলের দিকে তাকিয়ে হাস্‌লেন। ড্রাইভারের দিকে এগিয়ে পড়ে কি বললেন।

টি এল জান্‌তে চাইল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

চাঁদের দেশে।

টি এল জবাব দিল না, সংশয়ে ভরা চিত্ত, বাঁ কোণে বি এল বোসের মুখে কোন বিকৃতি নেই।

কালো মিশ্‌মিশে ক্রাইস্‌লার এক বড় গেটের ভেতরে ঢুক্‌ল, চাকার তলায় তলায় আলগা ক্ষুদ্র মসৃণ উপলখণ্ডে ঘুম-পাড়ানিয়া ছরছরে শব্দ। গাড়ী থাম্‌ল।

লিফ্‌ট উঠতে লাগল। উঠছেই, উঠছেই। লিফ্‌ট উঠছে। হাউইয়ের মতো উঠছে।

আমরা কোথায় যাচ্ছি এই রাত্তিরে?

চাঁদের দেশে।

অকস্মাৎ অনেকখানি স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না লিফ্‌টে ঝাঁপিয়ে পড়ল, লিফ্‌ট থাম্‌ল। আশ্চর্য আলোর প্রাচুর্য, চোখ-ধাঁধানো তীব্র নয়, সিমেন্টের দেয়ালে বা বালুচরের গা-পোড়া ঝাঁঝালো সূর্যালোক নয়, চাঁদের আলো। বোস্ এণ্ড সন্ মস্ত একটা হল-ঘরে প্রবেশ করলেন।

হল-ঘরে তখন অভিনব নৃত্যোৎসব; অনেকটা সাঁওতালী নাচের মতো, কিন্তু তাও নয়। এক বিরাট্ ডিম্বাকৃতি, অন্ততঃ ১০ জন নরনারী বিচিত্র বেশে ইলিপ্‌টিকাল ঘূর্ণিনাচ নাচছে। আবহ-সঙ্গীতে সেই পুরানো জাজ্। প্রত্যেকের বাঁ হাত আর ডান হাত, পাশের সাথীর ডান হাত বা বাঁ হাতে বাঁধা, রুমালের গেরো। একবার পিছোচ্ছে, একবার এগোচ্ছে। মাথাগুলো কুর্ণিশের ভঙ্গিতে এগোবার সময় নামাচ্ছে, পেছোবার সময় উদ্ধত ভঙ্গিতে তুলছে। জসোবা মার্কা ব্রতচারীর মালাই খাওয়া মানের বালাই নিয়ে মাথা কোটাকুটি নয়। নয়া নৃত্য।

হল-ঘরের রক্ষাকর্তা ছুটে এসে বোস্ এণ্ড সনকে সম্বর্দ্ধনা জানালেন। বোস্ অনেক দিনকার প্রবীণ পৃষ্ঠপোষক—এই ক্যাঙ্কার্স মুন্‌সাইন ক্লাবের, দশতলা বাড়ীর শেষতলা ফ্ল্যাটের গহ্বরে যে ক্যাঙ্কার্স মুন্‌সাইন ক্লাব বিরাজমান। মসৃণ আর্ট পেপারে ক্লাবের নিজস্ব মুদ্রাযন্ত্রে নিখুঁত ছাপানো একখানা কার্ড তুলে দিলেন প্রবীণ বোসের হাতে। বাবু চণ্ডুরাম বেনামী এক নূতন নাচের পরিকল্পনা করেছেন, নামকরণ করেছেন "গোল্ডেন চেন" বা স্বর্ণশৃঙ্খল অথবা জবরদস্তি রাষ্ট্রভাষায় "সোনেকা শিক্‌লি"। যাঁরা নাচবেন তাঁদের প্রত্যেকের হাত দুটো দুই পাশে দুজনকার হাতে স্বর্ণবলয়ে জোড়া থাকবে, এই করে সারা হলে হবে নৃত্যদোদুল মানুষের এক ডিম্বাকৃতি শৃঙ্খল, কোথাও ফাঁক বা শৈথিল্য থাকবে না, ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে যে যেখানে থাকবেন যাঁর যাঁর পাশে দাঁড়িয়ে যাবেন, নরনারীনির্বিশেষে। হল-ঘরের রক্ষাকর্তা বেয়ারাদের হাতে স্বর্ণবলয় দেবেন, তারা দেবে পরিয়ে জোড়া জোড়া হাতে। তার পর হবে এগোনো-পিছোনো নাচ একটু একটু ডান দিকে সরে সরে। স্বর্ণবলয়ের বন্ধনে সৃষ্ট হবে মানুষের ঘনিষ্ঠ শৃঙ্খল। আজ স্বর্ণবলয়গুলো তৈরী হ'য়ে আসেনি, আজ তাই রুমাল বেঁধে মহড়া হচ্ছে। বোস্ যদি···

প্রবীণ বোস্ রক্ষাকর্তাকে ইসারায় নিরস্ত করলেন। দেয়ালের সোফায় বস্‌লেন তরুণকে নিয়ে। স্কুলে থাকতে টি এল একবার

স্বদেশীর পাল্লায় পড়েছিল, বি এল তখন চেষ্টে পাঠিয়ে সন্তুকে নিবৃত্ত করেছিলেন ; কিন্তু এই ভেবে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, তখন অব্যর্থ ফলপ্রদ এই পরিবেশটির কথা মনে হয়নি ; বনেদী ঘরের ছেলের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা রক্ষায় এমন এক অনুকূল আবহাওয়ার কথা একবারও সেদিন মনে জাগেনি, আশ্চর্য তো !

মহড়ার অনেকে আছেন, অনেকে মানে, সমাজের যাঁরা মাথায় চড়ে আছেন, যাঁরা অনুমধ্যাৎ ক্ষীর অথবা ঠিক ঠিক অর্থে কর্ণধার, তাঁরা সব আছেন। পাকা সরকারী হিসাবে চুয়াত্তর হাজারখানা বিক্রী হয় এমন দৈনিক 'ভাস্করজ্যোতি'র মালিক, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও প্রধান সম্পাদক বি এল বোস্ এই নৃত্যস্তি মানবাঃর ডিম্বাকৃতি আগু্টিট নিরীক্ষণ করলেন। অপরিচিত খুব কমই আছেন এই রুনালের গাঁটছড়ায়। চুয়াত্তর হাজারখানা বিক্রী হয় যে ভাস্করজ্যোতি, ছত্রিশ বছর ধরে চল্‌ছে যে দৈনিক ভাস্কর-জ্যোতি, তিনশ' পঁয়ষট্টি গুণ ছত্রিশ, কত লোক এসেছে, গিয়েছে, জন্মেছে, মরেছে, শ্রী বি এল বোসের ছাঁকুনি তলিয়ে আজও যাঁরা পরিচয়ের মুড়িতে আছেন, এঁরা তাঁরা।

লর্ড কর্ণওয়ালিশের আমল থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রথম পঙ্‌ক্তির জমিদার-বংশোদ্ভূত এবং বংশানুক্রমে স্যার সি বি চ্যাটার্জি (ওরফে-চটুলবিহারী চাটুজ্যে), আমদানী ব্যবসায়ে অন্যতম অগ্রণী রায় বাহাদুর শিউরাম বেনামী, ভড় ইঞ্জিনিয়ারিং কন্‌সার্ণের দ্বিতীয় পুরুষের মালিক স্যার এ কে ভড় ও তাঁর স্ত্রী লেডী বিমি ভড়, সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত মেজর পি মাইতি, নিখিল ভারত নারী আন্দোলনের সভানেত্রী লেডী কর্মকার, সারা বাংলায় দশখানা সিনেমা-ভবনের অধিকারী রায়সাহেব পরশুরাম খান্না, উদীয়মান চিত্রসূর্য শ্রীতিলক রায় ও চিত্রতারকা লক্ষ্মীবাঈ, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযোগেন সেন, বিলাতী পানীয়ের বাঘা আমদানীকার মিঃ টি জোন্স, কংগ্রেস পরিষদ দলের সেক্রেটারী শ্রীসতীশ মণ্ডল, সহর কোতোয়াল শ্রীভূধর মুখার্জি, এম এল এ শ্রীঅতুল দত্ত, সরকারী স্থপতিকার মিঃ জি এস সুলতান, আবগারী মন্ত্রী শ্রীপ্রদোষ রায়, বনস্পতি ঘৃত কারবারের অবিসম্বাদী সম্রাট মাংতুরাম জাগানিয়া, কাপড়ের কল সমিতির উপর্যুপরি তিনবার নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট স্যার কেশোরাম ঢনঢনিয়া, একেবারে আধুনিক নক্সার গ্যারিক গাড়ীর একমাত্র পরিবেশক স্যার জে জে গ্রিম, সহরে নানা বেনামে ৩০খানি বাসের মালিক খান বাহাদুর মহম্মদ সোলেমান, খ দ্যবিভাগের ঝানু ডিপুটী শ্রীপি এন মোদক আই সি এস, দুই মিনিটে একশ' চৌষট্টি টাকা প্রণামীর এবং শতমারী এলোপ্যাথিক বৈদ্য ডাঃ কেতকী (পুং) বসু, সমাজকল্যাণ সেবিকার অধ্যক্ষা লেডী বিমলা গাঙ্গুলী, এঁরা অনেকেই, প্রায় সবাই আছেন এই স্বর্ণাঙ্গুরীয়তে।

শ্রীমান্ তরুণকে সকলকার পরিচয় দিতে দিতেই ঢং করে একটা ঘণ্টা পড়ল, আর কোথা থেকে যেন ছোট একটা বাক্স এম্প্লিফায়ারে ইংরাজীতে শব্দিত হ'ল, ১৫ মিনিট বিশ্রাম।

জড়ো পানাদলে খোঁচা মারলে যেমন হয়, এঁরা ছড়িয়ে পড়লেন তেমনি অসংখ্য সোফায়। সোনার শেকলে লেখা অশেষ কথার কলরব। শুকনো গলায় পানীয়ের স্পর্শ গড়ায়।

সে হামি করিয়ে দেব, কুছ ভাববেন না। লেকিন, হামলোক বব্‌সায়ী আছি, কুছ লেনদেন তো করুন।

কি লেনদেন হবে বলুন ?

সোভি হামাকে বলিয়ে দিতে হবে ? যবে মানবেন না তো আপনাকে খলুমখোল্লা বলি ; দেখুন, যুগেনবাবু, 'জিন্দাগীভর রূপেয়া বহুৎ কামায়া, মিট্টিকাতর,, আভি কুছু সমাজসেবাকা তো মৌকা দিজিয়ে……

নিশ্চয় নিশ্চয়—

তো, উতো আপ্‌কো হাথ্‌পর হায়। আপ্‌নি কুছু কর্‌তে পারেন।

কি কর্‌ব ?

সোভি বল্‌তে হবে ? হাঁ, তো কহেনে দিজিয়ে। বহুৎ আদ্‌মিকো তা আপ্ নোমিনেশান দে চুকা, একটো হাম্‌কো ভি মিল্ যায়।

নমিনেশান ? কিন্তু আমিও তবে খলুমখোল্লা বলি, আপনার নামে একটা চোরাকারবারের……

মামলা ? উ তো মিট্ গিয়া। কই পর্‌মাণ নেহি মিলা।

মোকামটা লিখে-পড়ে দেবেন তো ?

জরুর।

কথায় ছেদ পড়ল। পাশের সোফায় উত্তেজিত কথা শুনে তাকালেন শ্রীসেন আর স্যার ঢনঢনিয়া।

…কিন্তু কর্ণওয়ালিশের আমল থেকে যে ব্যবস্থা…

সে ব্যবস্থা চল্‌তে পারে না। এম এল এ অতুল দত্ত বল্‌ছেন গভীর আবেগে।

কেন ?

ওটা ইংরেজ আমলের।

কিন্তু ইংরেজ আমলের অনেক কিছুই তো রেখেছেন।

না, জমিদারী ওভাবে আর রাখা যাচ্ছে না। জনসাধারণ চাইছে না।

জনসাধারণ ? ছাদ ফাটিয়ে উঁচু পর্দায় হেসে উঠলেন স্যার সি বি চ্যাটার্জি (ওরফে চটুলবিহারী চ্যাটার্জি)।

অপরের হাসির লহরীতে একটু আহত হ'য়েও কথার খেই হারালেন না শিউরাম বেনামী।

আমদানী ব্যবসায়ে এ রকম কড়াক্কড়ি জনকল্যাণ-বিরোধী।

রপ্তানীর ক্ষেত্রেও। কেন না, আমাদের ডলার চাই।

কিন্তু দেশের শিল্পও বাঁচাতে হবে। সুতরাং, অবাধ আমদানী…

তবে রপ্তানী করতে দিন অবাধ…

কিন্তু দেশের লোকের অভাব মিটোনোও তো দরকার ?

দেশের কল্যাণেই তো এই স্বার্থত্যাগ, যত রপ্তানী তত টাকা।

ওদিকে গ্লাসটা সুমুখের টিপয়ে রেখে বল্‌ছেন রায় সাহেব খান্না।

ঐ কন্‌ট্রোলটা তুলে দিন।

হাঁ, তার পর হাউইয়ের মতো উঠতে থাকুক দাম।

স্বাভাবিক বাণিজ্যের গলা টিপে রাখবেন কত কাল ?

অন্তত সিনেমা-বাড়ী তোলার কন্‌ট্রোল প্রত্যাহার করুন।

কথার উত্তাপে অত্যন্ত আশ্চর্য হ'য়ে ঝুঁকে পড়ে বল্‌ছেন শ্রীজাগানিয়া।

কেয়া বল্‌তে হেঁ। বনস্পতি খিউ ? মেরা পাছ এক হাজ্‌জার একশো ডাগদারকে সার্টিফিট আছে। উস্‌মে কই হানি নেহি হোতা

পরন্তু উস্‌মে এইছা এক ভারী চিজ্‌ নিকালতা যিস্‌কো কহা যাতা হায় ভাইটামিন। হাঁ পুছিয়ে বি এল বোস্‌কো, কা বোস্ সাহাব, কোয়ার্টার পেজ ঘিউ কা এডভার্টাজ মিল্‌তা তো? বোস্ সাহাব, মেরা কহনা হায়, ইস্‌কো খেলাপমে কই তক্‌রির ছাপানা আপ কো উচিৎ নেই হোগা।

সমস্যাটা জল ক'রে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন শ্রীমোদক।

ব্যাপারটা কি জানেন, বীরভূম বাঁকুড়া কাঁকরের দেশ, তাই তো চালে এত কাঁকর।

সবই বীরভূম বাঁকুড়ার চাল বুঝি? সারা বাংলায় আর কোথায় চাল নেই, নয়?

বেশী ঘাঁটবেন না ওঁদের। এখনই অংক-কাঁকরের এমন ঘূর্ণি উঠবে যে, আপনি অস্থির হয়ে বলবেন, দোহাই আপনার, দিন আরও দু'টো বেশী করে কাঁকর।

প্রৌঢ় বয়সের কাজল-দেয়া চোখ বাঁয়ে-ডাইনে আঁকাবাঁকা ক'রে ছ'বছরের জ্যান্ত পুতুলের মতো আদুরে গলায় বলছেন লেডী কর্মকার।

এবার আমাদের যে বাৎসরিক সম্মেলন হবে তাতে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটক করব আমরা।

শুধু মেয়েরা?

হ্যাঁ।

আর দর্শক?

আপনারা। কিন্তু নানা কারণে এবার দর্শনীটা একটু বেশীই ধরা হয়েছে।

কি রকম?

২০৲ ৫০৲ ১০০৲ ১৫০৲ আর ২৫০৲।

মাত্র!

পাশেই কার উচ্চরবে কথায় ছেদ পড়ল। উদ্বেগের কথা।

কি ভয়ানক চিকিৎসা-সঙ্কট মশাই!

এখনও চলছে?

না। তিনি তো গতা হয়েছেন।

কি হয়েছিল?

ডায়াগ্নোক্রাইসিস, আর তার সঙ্গে স্পুরিওড্রাগস···

নূতন রোগ বুঝি?

মোটেও না। সকল রোগের মূল রোগ তো ঐ। প্রথম ৩২৲ টাকার জগবন্ধুকে আনালাম। ও বললে, রোগ শক্ত মনে হচ্ছে, সম্ভবত ক্যান্সার। এই ওষুধটা দিচ্ছি। দেখবেন বাজারে নকল ওষুধের ছড়াছড়ি, যদি না কমে···। তার পর আনালাম ৬৪৲ টাকার শরৎকে। তিনি বললেন, স্রেফ আমাশয়, খুব কষে খাওয়ান দেখি, আর এই ওষুধটা, দেখবেন বাজারের নকল ওষুধের ছড়াছড়ি। আনালাম ১০৮৲ টাকার মহিমকে। বললেন, সিরোসিস, ভাববেন না, এই ওষুধটা···সাবধান বাজারে নকল ওষুধ গিস্‌গিস্ করছে। আনালাম ১৬৪৲ টাকার···

ওঁকে বুঝি?

হ্যাঁ।

কি বললেন?

বললেন, টিউমার; পেট কাটতে হবে।

তার পর?

তার পর পেট কাটা হ'ল। মা আর উঠলেন না।

পেটে কি পাওয়া গেল?

···ঢং করে ঘণ্টা বাজল। শ্রীবি এল বোস্ বললেন, আমি চলি। তাহ'লে ঐ কথা রইল যোগেন বাবু। শাস্ত্রে আমাদের বয়সে প্রব্রজ্যা নেবার কথা, মুনি-ঋষিরা ভাল নিয়মই করেছিলেন, প্রবীণ যাবে তরুণ আসবে। না, না, যোগেন বাবু, নিজের ব'লে বলছি না, ছেলের বিয়ে আছে, মানে···

বলতে হবে না, মুনি-ঋষিরা এও বলেছেন, দীয়তাং ভুজ্যতাং, মানে দাও খাও।

বাঃ, সুন্দর সংস্কৃত জানেন তো আপনি! আচ্ছা···

লিফটে ঢুকে তরুণ জিগগেস করল, এবার কোথায়?

মর্তে্য; চাঁদে আনাগোনার পরিবহন ব্যবস্থাটা ঠিক রইল।

'ভাস্করজ্যোতি'র চুয়াত্তর হাজার আর পৌনে চার লক্ষ পাঠক পড়ে এবং শুনে অবধি সবিস্ময়ে 'ভাস্করজ্যোতি'র সম্পাদককে শাপ-শাপান্ত করতে লাগল। এত বড় একটি মহৎ প্রাণের কোন খোঁজই তাঁরা রাখতেন না, আর কোন প্রচারই তাঁরা করেননি এত দিন! বিরল প্রতিভার অধিকারী, ভারতীয় ত্যাগপূত ঐতিহ্যের পরিবাহক শ্রীটি এল বোস্। এত অল্প বয়সে বিষয়ের প্রতি এমন বীতরাগ কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র গৌতমের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সে ইতিহাস; এ যে একেবারে প্রত্যক্ষ, একেবারে আধুনিক শ্রী টি এল বোস্। কি সেই মহা আকর্ষণ যা এই অতুল বৈভবের অবিসম্বাদী উত্তরাধিকারী তরুণ প্রাণকে অনিবার্য দুঃখ-দারিদ্র্য গঞ্জনার মধ্যে সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ উদ্‌বুদ্ধ করল? শ্রীটি এল বোস্। সকলের মনে এই এক জিজ্ঞাসা। কাজলকালি গ্রামে পুরন্দরের ছোট মুদীখানায় লালিগুড় মেখে নিজেদের তৈরী তামাক পোড়া-কল্কেয় সাজিয়ে নিয়ে সুখটানের নিস্পৃহ ভঙ্গিতে অপরের হাতে থেলো হুঁকো সমর্পণ করতে করতে বলল বিষ্ণুচরণ: যদা যদা হি ধর্মস্য, গীতা পড়নি? তো পড়েছ কি কচু? এ সেই। অধর্ম অধর্ম, চার দিকে অধর্ম, তিনি জন্মাবেন না? তিনি জন্মালেন। নইলে বল, পুরন্দরের হুঁকোয় যাঁর চেয়ে তামাক খেতে হয় না, মস্ত ফরাসে ভুঁড়ি খুলে ওপরে আশে-পাশে বিজলী পাখা ছেড়ে যিনি আলবোলায় অম্বুরি তামাক খেতে পারেন, খোসবাই যার মহল্লাকে মহল্লা মাৎ ক'রে রাখতে পারে, স্রেফ, দেখ মেধো, স্রেফ, চোখ বুজে আর নল টেনে যাঁর দিন কাটালে ইস্ত্রী মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে আসবে না, তিনি আসবেন কেন দেশ-সেবায়—দুঃখ-কষ্টের কাদায় পড়তে! না মধু, তিনি এসেছেন রে!

মধু বলে, তোর কথা শুনে চোখে জল আসে। রামপ্রসাদের মতো তুই মুই করে বলতে ইচ্ছে করে, এলি যদি, তবে এত দেরী করে এলি কেন সর্বনাশী!

মুদি পুরন্দর খদ্দের বিদেয় করে বাটখারা গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলল, একটু বাংলা করে বল দেখি বিষ্ণুচরণ বেয়াপারটা কি হইয়েছে?

নলকূপ গো নলকূপ। এই অঞ্চলে ১৩০টা নলকূপ বসাবেন ব'লে আসছেন তিনি সংসারধর্ম ছেড়ে, তিনি সন্ন্যাস নিয়েছেন।

কিনি?

'ভাস্করজ্যোতি' পড়নি? লক্ষ লোক পড়ে পুরোনো হ'য়ে

গেল, আর তুমি এখনো শোননি? বলছি কি এতক্ষণ? শোনোনি শ্রীটি এল বোসের কথা? শোনোনি? শোনোনি বলছ? এ তল্লাটে সবাই শুনেছে তুমি শোনোনি বলতে চাও? বল শোনোনি।

কি বইললে টি এল বোস, নামটা যেন চেনা-চেনা বোধ হচ্ছে।

চিনতেই হবে। চেন না বললেই হবে? তিনি আসছেন, দেখবে, দেখেই চিনবে।

কয়েক হাজার বেশী ছাপা হয়েছে 'ভাস্করজ্যোতি' এবারকার—এমনিতেই চুয়াত্তর হাজার ছাপা হয় যে 'ভাস্করজ্যোতি'। প্রাচীন বনেদী দৈনিক 'ভাস্করজ্যোতি'র ওজন-করা কথা, পাকা কংক্রীট গাঁথুনির মত নিরেট, অভঙ্গুর। শ্রীটি এল বোসের স্বার্থত্যাগের সচিত্র সংবাদ এমনি শব্দের ওজনে ভারী।

"কাজলকালি এলাকার লক্ষাধিক অধিবাসীর জলকষ্টের কথা শুনিয়া আজন্ম দেশহিতব্রতে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ শ্রীটি এল বোস ১৩০টি নলকূপের সরঞ্জাম লইয়া ঐ অঞ্চল অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন। কাজলকালির বর্তমান দুর্গতির নিরাকরণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি ঐ এলাকায়ই একটি পর্ণকুটীরে অবস্থান করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি বন্ধু-বান্ধবের কাছে নাকি এই কথা প্রকাশ করিয়াছেন যে, লোকের জলকষ্ট হইতেছে এই কথা শুনিলে তাঁহারই কণ্ঠ বিশুষ্ক বিকল্পে অশ্রুজলে সরস হইয়া উঠে। কাহারও জলকষ্টের কথা তিনি ভাবিতেও পারেন না। 'ভাস্করজ্যোতি'র ষ্টাফ রিপোর্টার সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি এই সংবাদ প্রকাশের প্রস্তাবে অত্যন্ত বিরক্তির ভাব ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, দেশের ভাল কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারা সৌভাগ্যের লক্ষণ, এ কথা প্রকাশের জন্য ব্যস্ততা হইবে কেন? তিনি যে সেখানে যাইতেছেন তাহার কারণ ইহা নহে যে, তিনি কাজলকালি এলাকার অধিবাসীদের জলতৃষ্ণা দূর করিতে যাইতেছেন, তাঁহার মধ্যে যে সেবার পিপাসা আছে তাহা মিটাইতেই তিনি সেখানে যাইতেছেন। সুতরাং, এই সংবাদ যেন প্রকাশ না পায়। বরং ওখানকার জলকষ্টের সচিত্র সংবাদ ছাপুন।"

'ভাস্করজ্যোতি'র সম্পাদকীয়তে এই বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই। সেদিনকার প্রথম প্রবন্ধে আরও একদিনকার সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলা হয়েছে: "আমরা ইতিপূর্বে আরও একদিন সংগঠনের কথা বলিয়াছিলাম। বিষয়টি এতই জরুরী যে, কেবল আজ নহে, পুনঃ পুনঃ ইহার আলোচনায় আমরা বিন্দুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করি না। বরং দেশবাসীর এ বিষয়ে চৈতন্যোদয়ের জন্য আমাদের ইহার প্রতি প্রত্যেক চিন্তানায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে। আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, আমাদের সকল দুঃখ, অভাব ও লাঞ্ছনার মূলে সংগঠনের অভাব, অনৈক্য ও ভেদবুদ্ধি। আমাদের দেশে যে অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, জলাভাব, শিক্ষাভাব অথবা চিকিৎসাভাব তাহা কোন্ দলকে, কোন্ সম্প্রদায়কে বা কোন্ স্বার্থকে না স্পর্শ করে! অথচ দেশের এই মূল সর্বাত্মক অভাবের ক্ষেত্রেও আমরা এক হইতে পারিলাম না। আমরা ভাবিয়া পাই না এত দলাদলি কিসের, কি প্রয়োজনে, কাহার স্বার্থের খাতিরে এত দল? এক দিন ইংরাজ ছিল, তাহাদের স্বার্থ ছিল এ দেশকে শত বিচ্ছিন্ন রাখা; উহারা মুসলমানকে, হিন্দুকে, খৃষ্টানকে, আদিবাসীকে একে অপরের নিকট হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিত, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব সঞ্চার করিত। স্পষ্টতঃই এই ভেদবুদ্ধির প্রেরণাস্থল ছিল বিদেশী স্বার্থ। কিন্তু আজ? আজ তো বিদেশী নাই। আজ কেন তবে এই দলাদলির কোন্দল? তবে কি বিদেশী-স্বার্থ চলিয়া গেলেও তাহাদের চর-চামুণ্ডারা এখানে রহিয়া গিয়াছে? মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে আমরা ইংরাজকে তাড়াইয়া স্বরাজ লাভ করিয়াছি। যে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতা আনিতে পারে তাহা সংরক্ষণও করিতে পারে। তথাপি লোকে ইহার শক্তি দৃঢ়তর না করিয়া ইহাকে দুর্বলতর করিবার চেষ্টায় ভিন্ন দল গঠন করিতেছে কেন? আমরা জানি, খবরও রাখি যে, কম্যুনিষ্ট পার্টি বিদেশী রুশ-রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার একটি এজেন্সী মাত্র। ইহার সহিত দেশের স্বার্থের কোন সংশ্রব নাই। ইহারা দেশীয় নেতৃবৃন্দকে শ্রদ্ধা করে না, দেশীয় ঐতিহ্যকে স্বীকার করে না, উপরন্তু ভারতীয় সভ্যতাকে উপহাস করে। ইহাদের দেশ রুশিয়া, ইহাদের শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ রুশিয়ার; ইহাদের ঐতিহ্য সর্বথা বিদেশী। রিভলিউসানারী কম্যুনিষ্ট পার্টি বলিয়া আর একটি ক্ষুদ্র দল দেখা দিয়াছে; ইহারা স্পষ্টতঃই হিংসপন্থী ও ইহাদের এক দল নানা হিংসাত্মক ও অপরাধমূলক কাজে জড়াইয়া আছে বলিয়া আদালতে অভিযোগ উঠিয়াছে। সোস্যালিষ্ট পার্টির লক্ষ্যের সহিত কংগ্রেসের পার্থক্য কোথায় আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও তাহা আবিষ্কার করিতে পারি নাই। ভেদবুদ্ধি ছাড়া অথবা নেতৃত্বের লোভ ছাড়া ইহাদের পৃথক্ অস্তিত্বের জিদ্ আমাদের বুদ্ধির অগম্য। দ্বিধা-ত্রিধাবিভক্ত ফরোয়ার্ড ব্লক দেখিয়া মনে হয়, দেশের কল্যাণ অপেক্ষা গোষ্ঠীগত অভিমানই ইহাদের মধ্যে প্রাধান্য পাইয়াছে। আর কত দলের নাম করিব? কি প্রয়োজনে করিব? আজ একমাত্র প্রয়োজন সংগঠনের; একটি মাত্র দৃঢ় সবল সংগঠনের; যে সংগঠন কেবল বহু কষ্টলব্ধ স্বাধীনতাকে রক্ষাই করিবে তাহা নহে, দেশকে সমৃদ্ধির পথে আগাইয়া লইয়া বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসনেও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। আমাদের নিঃসংশয় বিশ্বাস, মহাত্মা গান্ধীর আশীর্বাদপূত জাতীয় প্রতিষ্ঠানই একমাত্র সেই নির্ভরযোগ্য সংগঠন। বুদ্ধিমান সচেতন দেশপ্রেমিক নাগরিক মাত্রেই ইহাকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করিয়া তুলিতে যত্নবান্ হইবেন।"

কমসেকম পৌনে চার লক্ষ পাঠক এই সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ ক'রে জিভ, ঠোঁট চাটল। মাথা ঝিমঝিম্ করতে লাগল এমন সুগভীর ভাবময় অভিব্যক্তিতে। 'ভাস্করজ্যোতি'! ছত্রিশ বছর ধরে সত্তর হাজার কপি দৈনিক ছাপা হয় যে "ভাস্করজ্যোতি'। পৌনে চার লক্ষ পাঠক পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ভাবতে লাগল; ভাবনা জাগায় বটে, খুঁচিয়ে জাগায় 'ভাস্করজ্যোতি' প্রবন্ধে। কংগ্রেস-বিরোধী ভাবের বহু পোকা আবহাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে, নাকে-মুখে যাচ্ছে, গায়ে বসছে, কিন্তু 'ভাস্করজ্যোতির' ভাবনার পথে নির্দেশের গাড়ী ঠিক চালিয়ে যাচ্ছে। পাতা ওল্টাতে থাকে ভাব-গম্ভীর পাঠক, শেষের পাতা পর্যন্ত যেখানে আদ্ধেক পাতা ধরে' জুড়ে রয়েছে একটা বিরাট্ বনস্পতির টিন, আর নামজাদা দু'জন ডাক্তারের হাতে-লেখা সার্টিফিকেটের ফ্যাক্‌সিমিলি। "বনস্পতি কেবল যে পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি করে অথবা যকৃতের কাজে সহায়তা করে, তাহা নহে, ইহাতে দুষ্প্রাপ্য একজাতীয় খাদ্যপ্রাণও আছে যাহাতে দৃষ্টির ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়।" 'কিন্তু নকলের হাত হইতে সাবধান, খাঁটি ত্র্যাণ্ড দেখিয়া লইবেন।'

এদিকে চাঁদের দেশ থেকে চাঁদেরা এবার হাট মিলিয়েছেন শ্রীযোগেন সেনের বৈঠকে। প্রকাশ্য আলাপের পরও ঘন ঘন ওঁকে যেতে হ'চ্ছে একজন বা দু'জনকে নিয়ে পাশের পর্দাঘেরা কক্ষিকা বা ক্ষুদ্র কক্ষে। সকলের সামনে রাজনীতির সাধারণ আলোচনার পরও কিছু কথা বাকী থেকে যায় এবং সে কথা শুধু প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেন্টকেই বলা চলে, রাজনীতির জটিল পাকটা যেখানে-সেখানে সবাইকে জড়াতে নেই। বিশেষ, দেশসেবার একটা মস্ত সুযোগ সফেন প্লাবনের মতো যখন ধেয়ে আসছে।

পারিবারিক কথাই বেশী ওঠে প্রকাশ্য আলোচনায়। স্বল্পভাষী বি এল বোস বলেন, ছেলেটা সব কিছুই ছেড়েছুড়ে দিয়ে গেল।

সব কিছু ?

কার ছেলে ?

কি ছাড়ল ?

বিষয়-আশয়।

ভাল করিয়েছে। মিট্টিকাতর্। মঁয়ভি তো বুরো মার্গ লিয়া। কামানা হায় তো কামায়া, আভি দেশকা সেওয়া।

এই জন্মই যোগেন বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন বুঝি ?

আচ্ছা আদ্‌মিসে দোস্তি রাখলে পুন্ হোয় জানেন তো ?

তা আপনি কেন এই ভীড়ে বিশকরম্‌বাবু, বয়স তো হয়েছে, গতবার এম-এল-এও ছিলেন।

রাম রাম! গান্ধীজী গান্ধীজী! বার্ধক্যের কাঁপানো গলায় জবাব দিলেন বিশকরম্ বর্মা। কোন্ হোনে মাতা এম-এল-এ, কি বুলছেন আপুনি। আ যাও নওজোয়ান, লো হাম্‌সে জিম্মাদারী, খুসীসে, লেকিন কাঁহা ঐসা নওজোয়ান, একঠোভি দেখ্‌লাও।

বিশকরম্‌বাবু বলেছেন এক রকম ঠিকই। অসহযোগ আন্দোলন থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত জেলে আর আশ্রমে কাটল, পুলিশের মারের চোটে হাড় ভেঙে রয়েছে কনুইয়ের, কিন্তু সত্যি কথা বলব, দেশসেবকের প্রতি দেশের লোকের সে শ্রদ্ধা-ভক্তি আর নেই। ওখানকার লোকে বললে, দেশসেবার রীতি বা পথ বদ্‌লেছে। আপনার মতো ত্যাগী লোকেই আসন্ন নির্বাচনে……

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বুঝি ?

ছি! আশ্রম তো রয়েইছে। তবে লোকে বল্‌লে। জানেন তো, জনমতই আমাদের রাজা।

আর আপনি বা আপনারা জনমতের প্রতিধ্বনি। জনমতের জন্য আপনারা দক্ষিণ থেকে একেবারে বামেও হেলে পড়তে পারেন।

হ্যাঁ, জনমত !……

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি যোগেন সেনের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল সকলেরই একে একে। সোজা চেয়ারে বসতে পারেন না যোগেন সেন, সোজা চেয়ারে বসাতেও পারেন না যোগেন সেন অতিথিদের। তাঁর নিজের হেলান দেয়া আরাম-কেদারা, আর নরম সোফা অতিথিদের। বাল্‌বের আলো সইতে পারেন না বলে লাবা রঙের কাঁপানো আলো-বিকারী নিয়নের সাদা নল আংটায় ঝুলিয়েছেন ঘরে। রক্তের চাপাধিক্যের জন্য মাথায় আশে-পাশে পেছনে জোরালো পাখার আয়োজন। চোখাচোখি করতে লজ্জা পান বলে উইলসনি গাঢ় কালো রঙের চশমা চোখে রাখেন। কেননা, অনেককে ওঁকে দাক্ষিণ্য বিতরণে নিরাশ করতে হয়, ভালবাসতেও হয়। নতুন নতুন রাজা তৈরীর বিশ্বকর্মা তিনি। শুধু ওঁর একটি বাঘের সম্মতি। টাকা-পয়সা হাত দিয়ে ছোঁন না, ভাগ্যে আছে। বিয়ে করেননি, বিয়ে করার রুচিও নেই, মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ আছে কি, না, নেই, মেয়েরাও বলতে পারে না। বরাবর স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে মানুষ, ছোট ছেলেদেরই ভালবাসেন। আদরে কোলে টেনে বলেন, ওরাই ভবিষ্যৎ।

ভবিষ্যৎ ওরাই। তাই কাজলকালি এলাকায় ওস্তাদ ঠিকাদারের তদারকে তৈরী পাকা গাঁথুনির ওপর খড়ের ছাউনি দেয়া পর্ণকুটীরে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করতে এলো শ্রীবি এল বোসের পুত্র শ্রীটি এল বোস। স্বপাকে আহার করবে এই ছিল সঙ্কল্প, রওনাও হয়েছিল, কিন্তু 'পুরাতন ভৃত্য' কেষ্টর ভাই বলরাম রামের বনবাস-গমনকালে লক্ষ্মণের মতো বলল, তুমি কায়া, আমি ছায়া। পার তো আমায় মেরে রেখে যাও। কোলে কাঁধে করে তোমায় বড় করলাম পাড়াগাঁয়ে ম্যালোয়ারীর হাতে সঁপে দেয়ার জন্য ? আমি যাবোই।

শ্রীটি এল বোস্ রাগ ক'রে ওর টিকিট কাটেনি; কিন্তু বলরাম কি ক'রে হাজির তো হয়েইছে, কাঁধে লাঙ্গলের মতো একটা রসুয়ে বামুনকেও নিয়ে এসেছে। এর পর রাগে শ্রীটি এল বোসের মুখে কথা যোয়ায়নি, মুখ বুজে সব সয়েছে।

কাজলকালি এলাকায় ১৩০টি নলকূপ স্থাপন করা হবে; এক একটি ক'রে ১৩০টি। প্রথম নলকূপ প্রতিষ্ঠার আয়োজন সাত দিন ধ'রে চলল। ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সচেতন করা হ'ল এই চৌহদ্দির লোককে, যত রকম উপায়ে জানান্ দেয়া সম্ভব তা হতে লাগল, মুখে-মুখে কথা রটল। পর্ণকুটীরের সামনেটা ঘাস তুলে ফেলে ঘন গোবর দিয়ে লেপে দেয়া হল; শান্তিনিকেতনের সঙ্গে কি সূত্রে সম্বন্ধ ছিল এমন একটি বাব্‌রিওলা ঘোলাটে চোখ তরুণ শিল্পী চাউল-বাটা দিয়ে ধ্যাবড়া-ধ্যাবড়া দুর্বোধ্য আলপনা দিল ঐ ঘন গোবর দিয়ে নিকোনো উঠোনে। যথারীতি সিঁদুর-মাখা মঙ্গলঘট ও আম্রপল্লব শোভা পেল কেন্দ্রস্থলে, অতিথিদের বসবার জন্য বিরাট এক সতরঞ্চি ভূতে জোগালো, সামান্য দু'-এক জায়গায় হুঁকো-জলে খয়েরী রংএর দাগ-ধরানো সাদা চাদরও তার ওপর পড়ল, লোকের পায়ে-হাঁটা পথের ভেজা-ধূলোয় চাপটা-চাপটা পায়ের আলপনা আঁকার দরাজ ক্যান্‌ভাস। প্রাঙ্গণের এক কোণে যেখানে প্রথম নলকূপটি বসানো হবে সেখানে রয়েছে লম্বা নল গোটা দুই, আর হাতীর শুঁড়ের মতো ঝোলানো হাতল-দেয়া নলকূপের আবক্ষ মুণ্ড। ত্রিদণ্ডে পুলি-দড়ি-দড়া লাগিয়ে মিস্ত্রীরা প্রস্তুত, সন্ন্যাসী শ্রীটিল এল বোসের একটু স্পর্শের অপেক্ষা মাত্র। কেপ্পেকে 'ভাস্করজ্যোতি'র এবং আরও দু'-একটি কাগজের ষ্টাফ রিপোর্টাররাও এসে গেলেন। অদ্ভুত সাফল্যমণ্ডিত হ'ল অনুষ্ঠানটি। অভিভূত হ'ল লোকে সন্ন্যাসী শ্রীটি এল বোসের সংক্ষিপ্ত কথায়: কাজলকালি এলাকার মাটী রসসিক্তিত হোক্, রসসিক্তিত হোক্ কাজলকালির মাটীর মানুষের কণ্ঠ। আমার পিপাসার্ত চিত্ত তৃপ্ত হোক্। ভগবানের করুণা-ধারা নলকূপ বেয়ে উঠে আসুক অবিরাম।

১৩০টি নলকূপ প্রতিষ্ঠা হবে। হ'ল প্রতিষ্ঠা প্রথমটির পর্ণকুটী-প্রাঙ্গণে। দ্বিতীয়টি হবে শীগগিরই। শিগগিরই হবে। যত দিন গড়ায়, লোকে তত আশান্বিত হ'য়ে ওঠে। এবার হবে, এই হ'ল ব'লে। দ্বিতীয়টি হবে, তৃতীয়টি হবে, ১৩০টি হবে। শীগগির হবে। হবেই।

প্রথমটি হয়েছে, দ্বিতীয়টি হবে। সরঞ্জাম এসে গেছে দেখেছে কালীচরণ। দেখেছে বিষ্ণুচরণ। দেখেছে শ্রীচরণ। কোথায় হবে তাও মোটামুটি ঠিক হয়েছে। পাকাপাকি হবার পথে একমাত্র বাধা দেখা দিয়েছে অসংখ্য দাবীদার। কোথায় দ্বিতীয়টি প্রতিষ্ঠা হবে। সন্ন্যাসী ভাবছে। সকল এলাকার মোড়লদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছে। আলোচনা করছে। ভাবছে। সবাইকে একসঙ্গে অসন্তুষ্ট করা যাবে না। তাই ভাবছে। দিন গড়ায়; কিন্তু দ্বিতীয়টি, তৃতীয়টি, ১৩০টি নলকূপ যে প্রতিষ্ঠা হবে এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই কাজলকালি এলাকার অধিবাসীদের। শ্রীবি এল বোসের সন্ন্যাসী পুত্র শ্রীটি এল বোসের দৃঢ় সঙ্কল্প। কাজলকালি এলাকার জলকষ্ট দূর হবে—১৩০টি নলকূপে।

এমন সময় দামামা বাজিয়ে এল নির্বাচন। ওরে বাস্ রে, এ যেন ভগীরথের শঙ্খ বাজিয়ে গঙ্গার উচ্ছ্বিত জলধারাকে গড়িয়ে আনা—জহ্নু মুনির হাঁটুফাটা পাগলা গঙ্গা। গ্রামের কথা যে সহরের লোকে ভাবে নির্বাচনী-প্রপাতের তোড়ে তা জানা গেল। এই প্রপাতে নৌকা ছেড়ে দিয়ে একের পর এক অপরিচিত কাণ্ডারীরা মাইক্রোফোনে ফুকার দিতে লাগলেন। লোক-কল্যাণের জন্য কি অসহ্য বেদনা এঁদের! আকাশে-বাতাসে এক অপ্রাকৃতিক নাদ উত্থিত হল, ভোটভোটভোটভোট···সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। লেখাপড়া জানা-অজানা লোকের ঘরে ঘরে হাতে হাতে নানা যুক্তির কণিকা সাহিত্য। গাছে গাছে, পুরন্দরের মুদি দোকানের ঝাঁপে ঝাঁপে লাল কালিতে ছাপা আত্মপ্রশস্তি ও ভদ্রভিক্ষা। অচেনা লোকেদের নাম মুখস্থ হ'য়ে আসে গ্রামবাসীদের! কিন্তু সব চাইতে বেশী মুখস্থ হ'য়ে গেছে শ্রীটি এল বোসের নাম। খুশী হয়ে লোকে বলে, এ ভালই হয়েছে আপনি কংগ্রেস থেকে দাঁড়িয়েছেন; শ্রীটি এল বলে, আমি তো কিছুই জানি নে। আমি তো বরাবর এইখেনেই আছি। কাজলকালির সেবা ছাড়া আমি তো কিছু জানি নে।

না জানুন, সবাই বললে, কাজলকালির কথা কেউ যদি বলতে পারে তো সে আপনি। কাজলকালির অন্তরাত্মা টি এল।

দ্বিতীয় নলকূপটি ন'পাড়ায় ব'সে গেল। তৃতীয়টির সরঞ্জামও এসেছে পর্ণকুটীরে। দেখেছে কালীচরণ। দেখেছে বিষ্ণুচরণ। দেখেছে শ্রীচরণ। তৃতীয়টি হবেই। তৃতয়টি হবে, চতুর্থটি হবে, ১৩০টি হবে। শীগগিরই হবে। শ্রীটি এল তেষ্টা আর সইতে পারছে না। হবে, শীগগিরই হবে, হবেই। ১৩০টি নলকূপ হবে কাজলকালি এলাকায় পর্ণকুটীরবাসী সন্ন্যাসীর এই সঙ্কল্প।

শ্রীটি এলের মনোনয়ন পত্র পেশ হয়েছে, মনোনয়ন পত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়েছে, এবার ভোট দেবার দিন। দিনও আগত ঐ। এল ব'লে। কাজলকালিতে সহস্র লোকের আনাগোনা, বিস্তর সভা ফাঁকা মাঠে মাইক্রোফোনের কানে কানে। দেশে দেশপ্রেমিকের অবধি নেই এবং এদের অধিকাংশই ছিল ইংরাজের খাস দরবারে।

তৃতীয় নলকূপ বসল কালীতলায়। চতুর্থটির সরঞ্জামও এসেছে পর্ণকুটীরে। দেখেছে কালীচরণ। দেখেছে বিষ্ণুচরণ। দেখেছে শ্রীচরণ। চতুর্থটি বসবে, পঞ্চমটি বসবে, ১৩০টি বসবে। বসবেই। শীগগিরই বসবে। প্রথমটি বসেছে, দ্বিতীয়টি বসেছে, তৃতীয়টি বসবে, চতুর্থটি তো বসবেই, পঞ্চমটি বসবে, এক একটি ক'রে ১৩০টি বসবে।

ভোটের দিনেই চতুর্থটি ব'সে গেল ময়নাডাঙ্গে। দ্বিতীয়টি চুরি গেল। ইতিমধ্যে পর্ণকুটীরে ভৃত্যের সংখ্যাও বেড়েছে। বেশ করিৎকর্মা, চটপটে। দ্বিতীয় নলকূপের শূন্য স্থানে তারা হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল, গাল-মন্দ করল, এমন করলে শিবতুল্য বাবুরও ধ্যানভঙ্গ হবে এবং তখন সর্বনাশ হবে। কিন্তু পঞ্চম নলকূপ প্রতিষ্ঠার সরঞ্জামও এসে গেছে। দেখেছে বিষ্ণুচরণ, দেখেছে শ্রীচরণ, কালীচরণও। ওটাও বসবেই, বসবে ষষ্ঠটি—এ নিশ্চিত আশ্বাসও পাওয়া গেছে ঐ ভৃত্যদের কাছ থেকেই! ষষ্ঠটি বসবে, একটি একটি করে ১৩০টি বসবে। দিন গড়িয়ে যায় যাক, বসবেই। সুতরাং, পঞ্চম নলকূপের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে লোকে নিঃসংশয়, যেমন নিঃসংশয় তারা ভোটযুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে। পঞ্চম নলকূপের প্রতিষ্ঠা হবেই, শ্রীটি এলও লোক-প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেনই। হলেনও। যেদিন হ'লেন সেদিনই ভূশণ্ডীর মাঠে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেল পঞ্চম নলকূপটি। আর তৃতীয় নলকূপটি চুরি হয়ে গেল। রাতারাতি। যেমন রাতারাতি চুরি হয়েছিল দ্বিতীয়টি। আর যেমন সকাল সকাল সবার আগে সন্ন্যাসী-কুটীরের ভৃত্যকুল দাপাদাপি করেছিল এবারও করল। শাসালো। হুঙ্কার ছাড়ল, শিবতুল্য বাবুর কথা বলল, শেষে রাগে রাগেই আশ্বাস দিল যে, নিতান্ত এই বাবু বলেই ষষ্ঠ নলকূপটির প্রতিষ্ঠা হবে, হবেই, সরঞ্জামও এসে গেছে পর্ণকুটীরে, আয়োজন সম্পূর্ণ···

কিন্তু···

তিন দিন পরে পর্ণকুটীর অকস্মাৎ জতুগৃহে পরিণত হল। তবে ভাগ্যগুণে সকল পাণ্ডবই বেঁচে গেছে। তারা সকলেই কোন-না-কোন কাজে পর্ণকুটীরের বাইরে ছিল। সন্ন্যাসী স-সঙ্গী ষষ্ঠ নলকূপ প্রতিষ্ঠার স্থান নির্বাচনে গেছলেন। এমন সময় দিবালোকে এই অগ্নিকাণ্ড। পর্ণকুটীর ভস্মসাৎ! পর্ণকুটীরের অনেকটা বাইরে উৎসুক জনতাকে ঠেকিয়ে রাখল ভৃত্যকুল। আর ভিতরে ভস্মস্তূপ নিরীক্ষণ করতে করতে সন্ন্যাসীর সংযমের বাঁধ ভাঙল, সর্বদেহ এক উগ্র শিখায় পরিণত হ'ল, জ্বলন্ত শব্দানল উদ্গীর্ণ ক'রে বলতে লাগলেন, কাজলকালির শুষ্ক মাটী সরস করবেন এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা, কৃতঘ্নেরা জবাব দিয়েছে ভালই, নলকূপগুলিও ভেঙে চুরি করতে সুরু করেছে লোকেরা তাও তিনি শুনেছেন, কাজলকালির কল্যাণ ভগবানও করতে পারবেন না।

লোকেরা কান্নাকাটি করতে লাগল। কিন্তু সন্ন্যাসী সঙ্কল্পে অটল। এবার প্রত্যাবর্তন। তিনি ফিরে যাবেনই। এবং আজই। মিস্ত্রীরা এরই মধ্যে প্রাঙ্গণের নলকূপ তুলে ফেলেছে, চক্ষের নিমেষে; এই মিস্ত্রীরা বরাবর এই কুটীর-প্রাঙ্গণে তাঁবু খাটিয়ে আছে। ওস্তাদ মিস্ত্রী। নিমেষে নলকূপ তুলে নিল। সন্ন্যাসীর জন্য দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ী। একেবারে আধুনিক নূতন গাড়ী কলকাতা থেকে অনায়াসে ছুটে এসেছে, কখন্ কার নির্দেশে কেউ জানে না, এসেছে এবং এসেছে বিমানের গতিতে। সন্ন্যাসী যাবেনই। গেলেনও। পর্ণকুটীরের ভস্মরাশি পেছনে রেখে সন্ন্যাসীকে নিয়ে বোস্ কোম্পানীর নূতন কেনা আধুনিক গাড়ী ৪৬ মাইল বেগে ছুটল। কাজলকালি এলাকার লোকের 'ভাস্করজ্যোতি' ছাড়া আর কোন সম্বল রইল না।

'ভাস্করজ্যোতি'র সর্বশেষ সংখ্যায় মারাত্মক সংবাদ বেরিয়ে গেল গুহ্যদাহের। "সৎকর্মবলে শ্রীটি এল বোসকে অগ্নিস্পর্শ করিতে পারে

নাই ; তিনি তথনও তাহাদেরই কল্যাণ-কামনায় আত্মনিমগ্ন ছিলেন যাহারা বা যাহাদের প্ররোচনায় অথবা যাহাদের পরিবেশের মধ্যে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে। কাহারা এই অপকর্ম করিয়াছে শ্রীটি এল বোস সে সম্বন্ধে নি:সংশয় ; কিন্তু তিনি বলিতে চাহেন না। তিনি শুধু বলিয়াছেন, কাহাদের কল্যাণ করিব, যাহারা কল্যাণ চাহে না তাহাদের ?"

পুরন্দরের মুদিখানায় বিষ্ণুচরণ কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, কাগজের নিকুচি করি।

পুরন্দর বললে, কিন্তু তাতে তো গ্রামের অন্যায় কাটে না।

কিসের অন্যায় ?

ঘর-পোড়ানো, নলকূপ তোলা।

ও-কাজ সন্ন্যাসীর নন্দীভৃঙ্গির। না না পুরন্দর, ও কাগজ আর রেখো না।

না না বিষ্ণুচরণ, সাত দিন পর পুরন্দর 'ভাস্করজ্যোতি' খুলে, বললে-এই দেখ পড়ে ; না হে না, কাগজ খুব জোরালো কাগজ।

সত্যিই 'ভাস্করজ্যোতি' এক নব রূপে দেখা দিতে সুরু করেছে। প্রতিদিনের কাগজে ভয়ঙ্কর লাভা-প্রবাহ কাজলকালিকেও তপ্ত ক'রে তুলল। বৃহত্তর লোক-সমাজের কল্যাণের জন্য কোন অপ্রিয় কথা বলতেই 'ভাস্করজ্যোতি' ভয় পায় না। বিস্ময়কর দুঃসাহস !

"আমরা বার বার সংহতির কথা তুলিয়াছি। কিন্তু ইহাই কি সংহতি ? আমরা বার বার একটি সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠানের কথা বলিয়াছি। কিন্তু ইহাই কি সেই প্রতিষ্ঠান ? আমরা বার বার কংগ্রেসকেই সেই প্রতিষ্ঠানরূপে দেখিতে চাহিয়াছি। ইহাই কি সেই কংগ্রেস ? দুর্নীতিদুষ্ট, ব্যভিচারপরিপুষ্ট, স্বজনবাৎসল্যে বিকৃত, অর্থলালসায় হীনমন এই কংগ্রেস আমাদের কাম্য ও মনঃপুত হইতে পারে না। আমরা চাহিয়াছি, এই বিরাট জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হইবেন এমন এক ব্যক্তি যাঁহার চারিত্রিক পবিত্রতায় লেশমাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই, যিনি জাগতিক বিষয় সম্বন্ধে উদাসীন, যাঁহাকে বৈভবের মোহ পঙ্কলিপ্ত করিতে পারে না। পক্ষান্তরে আমরা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছি, কংগ্রেসের বর্তমান কর্মকর্তাগণ কংগ্রেসের সম্মান মর্যাদা প্রতিষ্ঠা অনায়াসে ধূলায় লুটাইয়া দিয়া কুবেরের আধুনিক বংশধর ইহুদীদের ভারতীয় সগোত্র বেনিয়াদের গদীতে বিবেক বাঁধা রাখিয়াছেন এবং ঐ গদীর টানে টানে রজ্জুলগ্ন পুত্তলিকার মতো হস্তপদ আন্দোলন করিতেছেন ও গ্রামোফোনে চাবি দেয়া প্রভুকণ্ঠের প্রতিধ্বনি করিতেছেন। আমরা কেবল এই ভাবিয়া চিন্তান্বিত হইতেছি যে, এই গভীর কূপে পতিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে উদ্ধার করিবে কে, কাহারা ? আমরা ইহাও বেদনার সহিত লক্ষ্য করিয়াছি যে, বিগত নির্বাচনের মনোনয়ন কালে অবাঞ্ছিত পথে ও উপায়ে অগাধ ঐশ্বর্য আনাগোনা করিয়াছে, সৎপথে যাঁহার নিজস্ব গাড়ী চড়িবার সম্ভাবনা নাই, তাঁহার ময়দানের মতো বিস্তৃত বিপুলাকৃতি গাড়ী হইয়াছে, জলধারার মতো পেট্রোল জুটিতেছে, বেনামে রেশন সপ, কাপড়ের দোকান, ছাপাখানা, এমন কি অট্টালিকা পর্যন্ত হইয়াছে এবং ইহারই পরিণামস্বরূপ চরিত্রহীন, অর্থগৃধ্নু, লোকশত্রু, কংগ্রেস-বিরোধী, আজীবন ইংরাজপদলেহী স্বদেশদ্রোহীরা কংগ্রেসের মনোনয়ন লাভ করিয়াছে, অর্থের পাহাড় ডিঙ্গাইয়া দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা এম এল এ হইয়াছেন, এমন কি, সর্বাধিক পরিতাপের বিষয়, বর্তমান কর্মকর্তাগণের সুপারিশে মন্ত্রী হইতে যাইতেছেন। তাই আমাদের অন্তরাত্মা হইতে একটি মাত্র চীৎকার উত্থিত হইতেছে, দেশকে, জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে এই দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ করিবে কে ? কই সে নায়ক যিনি জাতির ভবিষ্যৎ-ভার দৃঢ়হস্তে গ্রহণ করিয়া জাতিকে সর্বব্যাধি হইতে মুক্ত করিবেন ? কোথায় তিনি ? তাঁহাকে আমরা সর্বান্তঃকরণে আহ্বান করিতেছি।"

দিনের পর দিন কংগ্রেসের নানা কুৎসা-কাহিনীর এক পাগলা-ঝোরা 'ভাস্করজ্যোতি'র অফিস থেকে উত্তাল গতিতে বেরিয়ে এসে পাঠক অপাঠক সকলকে অভিভূত করে তুলল। কাজলকালির ঘটনার ওপর আমসত্ত্বের মতো প্রলেপের পর প্রলেপ পড়ে, পাঠকদের মনে ক্রমশঃ এই বিশ্বাস ঘনীভূত হ'ল যে, সকল অনর্থের মূল বর্তমান কংগ্রেস-কর্মকর্তাগণ, এঁদের অপসারণেই দেশের সকল দুর্নীতির অপসারণ, গত নির্বাচনের মনোনয়নে অর্থ বিনিয়োগ যথেষ্ট হয়েছে, এবার তা নিবারণের একমাত্র উপায় সাধু নির্লোভ প্রগতিশীল তরুণ ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন। কাজলকালি এলাকার লোকেরাও এ কথা বুঝতে পারল যে, তাদের দুর্গতির মূলে ঐ দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাগণ। কে জানে শ্রীটি এলের পর্ণকুটীর দাহের বা নলকূপ চুরির পেছনে ঐ সব দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের অনুপ্রেরণা নেই ? ওরা তো ভাল লোকদের দেখতে পারে না ?

ক্রমশঃ তাপের সৃষ্টি হ'ল, ঝড়ো হাওয়া উঠল, তার পর এল ঝড় ; 'ভাস্করজ্যোতি' পাঠক-চিত্ত আন্দোলিত হ'ল, ভীষণ ঘূর্ণিপাকে পড়ে কাজলকালির লোকেরা প্রশান্তি কামনায় হতবুদ্ধি হ'য়ে গেল। 'ভাস্করজ্যোতি' পুরন্দরের মুদিখানায় তুফান ডেকে আনে রোজ, কড়া তামাক খেলো হুঁকোয় ভুড়ুক ভুড়ুক টানতে টানতে বিষ্ণুচরণ গবেষণার ঝটিকায় মত্ত হ'য়ে ওঠে।

তার পর দুঃস্বপ্নের তমসান্ধ দুরন্ত প্রকৃতি শান্ত হয়। কাজল-কালির শেষ নলকূপটি নিশ্চিহ্ন হওয়ার সাড়ে চার মাস পর এক অপ্রত্যাশিত প্রত্যূষে 'ভাস্করজ্যোতি'র প্রথম পৃষ্ঠায় আটটি স্তম্ভ জুড়ে নূতন নূতন মন্ত্রিমণ্ডলীর নাম প্রকাশিত হল। তার মধ্যে শ্রীটি এল বোসের নাম পঞ্চম ; শ্রীটি এল বোস—গ্রামোন্নয়ন-মন্ত্রী।

চার মাস পর ধরণী শান্ত হ'ল—কাজলকালিতে পর্ণকুটীরের ভগ্নস্তূপ ফুঁড়ে কচি ঘাসের মাথা জেগেছে অনেক। হাউয়ের মতো ঊর্ধ্বমুখী।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ

"একটি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যৎদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার আদেশ ছিল, যেন তাঁহার মৃত্যুর পর দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনী অপ্রকাশিত থাকে।" —ললিতচন্দ্র মিত্র

উনবিংশ শতাব্দীর নাট্য-সাহিত্যের প্রাচীন পটভূমি

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

নানা দিক হইতে বিচার করিয়া গিরিশচন্দ্রকে আমরা আমাদের বাঙলা-সাহিত্যের উনবিংশ শতাব্দীর নাট্যকারগণের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। আজ-কাল আমরা সাহিত্যের সাধারণ মানদণ্ড অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্রের নাটক যখন বিচার করিতে বসি, তখন নিরপেক্ষ বিচারে গিরিশচন্দ্রকে হয়ত আমরা এক জন বড় নাট্যকার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রকে যে উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়া থাকে তাহার ঐতিহাসিক যৌক্তিকতা রহিয়াছে। সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নূতন বিদেশাগত ভাবাদর্শ বা রূপাদর্শ তখনই সার্থক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে যখন তাহা দেশী ভিত্তিভূমির উপরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নতুবা স্রোতের জলে ভাসিয়া আসা পানার মত স্রোতের জলেই সে আবার ভাসিয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের নিকট হইতে যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব লাভ করিলাম, বাঙলা দেশের নাট্য-সম্বন্ধীয় ঐতিহ্যের সহিত তাহাকে অতি সহজভাবে মিলাইয়া লইবার একান্ত প্রয়োজন ছিল; সেই প্রয়োজনটি সিদ্ধ হইয়াছিল গিরিশচন্দ্রের নাট্য-সাধনায়। নাটক সম্বন্ধে এই পাশ্চাত্য প্রভাবকে সহজভাবে খাঁটি দেশীয় নাট্য-প্রাণের সহিত মিলাইয়া লওয়া জিনিসটি খুব সহজ ছিল না; সহজ ছিল না বলিয়াই গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা এতখানি শ্রদ্ধার দাবী করে।

পাশ্চাত্যের আদর্শে গঠিত রঙ্গমঞ্চে পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শ ও রূপাদর্শের সহিত আমাদের বাঙলা নাটকের ঐতিহ্যকে গিরিশচন্দ্র এমন সহজভাবে মিলাইয়া লইয়াছিলেন কোন্ কৌশলে? নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্রের বিচার করিতে গিয়া অনেককেই আজ-কাল কিঞ্চিৎ অবজ্ঞাভরে বলিতে শোনা যায়, গিরিশচন্দ্র ঠিক নাট্যকার ছিলেন না, তিনি ছিলেন যাত্রাওয়ালা। আসলে কিন্তু এইখানেই গিরিশচন্দ্রের সাফল্যের মূল রহস্য। তাঁহার উনবিংশ শতাব্দীর নাট্য-প্রতিভাকে ঘিরিয়া একটি খাঁটি যাত্রাওয়ালার পরিমণ্ডল একান্ত সত্য হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার নাট্য-প্রতিভা বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল। গিরিশ ঘোষের প্রতিভা না হইলে নব আদর্শে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চ এবং নাট্যাদর্শ তৎকালীন বিশিষ্ট একটি দর্শকগোষ্ঠীর ভিতরে হয়ত কিছু কিছু জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারিত, কিন্তু তাহা সমগ্র বাঙালী জাতির নিকটে গ্রাহ্য হইয়া উঠিতে পারিত না। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেকার বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের প্রাণধর্মের সহিত গিরিশচন্দ্রের গভীর পরিচয় ছিল; নাট্য-সাহিত্যের নবাগত ধর্মকে তিনি সেই বহু শতাব্দীর ভিতর দিয়া আবর্তিত প্রাণধর্মের সহিত যুক্ত করিয়া দিলেন। ফলে নব আদর্শে এবং প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ উনবিংশ শতাব্দীর নাট্য-সাহিত্য আমাদের পূর্বেকার নাট্য-সাহিত্যের আবর্তন হইতে একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারিল না,—আমাদের নাট্য সাহিত্যের আবর্তন তাহার অখণ্ডতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিল। নূতনের প্রতিষ্ঠা কখনও পুরাতনের অস্বীকৃতিতে নয়, পুরাতনের সার্থক গ্রহণে।

কিন্তু এ-স্থলে অনেকেই প্রশ্ন করিবেন, এই যে এত সাড়ম্বরে আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেকার নাট্য-সাহিত্যের কথা বলা হইতেছে, ইহা কি? সেই ত ঘুরিয়া-ফিরিয়া পাঁচালী, কবি, তর্জা, হাফ-আখড়াই—আর যাত্রা? এই যাত্রাগান সম্বন্ধে আমাদের আধুনিক শিক্ষিত মহলে একটা উন্নাসিক অবজ্ঞার ভাব অতি স্পষ্ট। যাত্রাগান বলিতে অনেকেরই ধারণা, ইহা অষ্টাদশ শতকের প্রাকৃতগণ-মনোরঞ্জনের জন্য তৈয়ারী একটি সস্তাদরের খিচুড়ি; ইহা বাঙলা সাহিত্যের প্রাণধর্মের কোনও গভীর পরিচয় বহন করে না; বাঙলা সাহিত্যের অতীত ইতিহাসের ভিতরে ইহার তেমন কোনও সুদূর-প্রসারী মূলেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। এই জন্যই ইঁহারা মনে করেন, আমাদের নাট্য-সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস মুখ্যতঃ উনবিংশ শতাব্দীর ভিতরেই সীমাবদ্ধ, বিংশ শতাব্দীতে তাহার বিস্তার।

আমাদের বিচারে বাঙলা নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে এই জাতীয় একটি মনোভাব ভ্রমাত্মক এবং এই ভ্রমের জন্যই মনে হয়, রুশবাসী লেবেডেফের বাঙালীর অদৃষ্ট-গগনে সহসা আবির্ভাবের ঘটনাটিকে আমরা আমাদের নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে একটু অতিমাত্রায় বড় করিয়া দেখিয়াছি। হাজার বৎসর প্রাচীন কাল হইতে আমরা যেমন বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের সন্ধান পাই, সেই হাজার বৎসর প্রাচীন কাল হইতেই আমরা বাঙলা নাট্য-সাহিত্যেরও ইতিহাসের উপকরণ পাইয়া থাকি। আমাদের বিশ্বাস, এই হাজার বৎসর ধরিয়া আমাদের নাট্য-সাহিত্যেরও একটা অবিচ্ছিন্ন ইতিহাসের ধারা চলিয়া আসিয়াছে। এই হাজার বছরের ইতিহাসের ধারার সহিত আমরা প্রথমে একটা সাধারণ পরিচয় না করিয়া লইলে, আমাদের প্রাচীন নাট্য-সাহিত্যের যথার্থ প্রাণধর্ম কি এবং গিরিশচন্দ্র কি ভাবে কতখানি তাহাকে তাঁহার নাট্য-রচনায় গ্রহণ করিয়া পূর্ববর্তী ধারার সহিত পরবর্তী কালের ধারার অবিচ্ছিন্নতা সম্পাদন করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিব না। প্রথমে তাই আমরা আমাদের পূর্ববর্তী নাট্য-ধারারই একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব।

ভারতীয় নাটকের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া অনেকেই অনেক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; এই আলোচনার ভিতরে অনেকে নাটক জিনিসটিকে নৃত্যের সহিত গভীর ভাবে যুক্ত করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন; এমন কি 'নাটক' শব্দটিকেও নৃৎ ধাতুর সহিত যুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নৃৎ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'নৃত্ত' এবং 'নৃত্য' কথা দুইটির অর্থের পার্থক্যও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মোটামুটিভাবে 'নৃত্ত' শব্দের অর্থ তাললয়াদি সহযোগে বিভিন্ন অঙ্গবিক্ষেপ; আর নৃত্য শব্দের অর্থ হাবভাবযুক্ত বিবিধ অঙ্গবিন্যাসের সাহায্যে মূক অভিনয়; অর্থাৎ বিবিধ অঙ্গ-বিন্যাসের সাহায্যে কোনও একটি বিশেষ ভাব বা ঘটনাকে আভাসিত করিয়া তোলা। মহাদেব হইতে আমাদের নাটকের উৎপত্তি, এইরূপ বিশ্বাসও ভারতীয়গণের মধ্যে প্রচলিত আছে। মহাদেবের তাণ্ডব-নৃত্য এবং গৌরীর লাস্য-নৃত্য এই নাট্যকলার সহিত যুক্ত হইয়া আছে। সংস্কৃত নাটকের প্রাথমিক যুগেই যে নাটক নৃত্যাশ্রিত ছিল তাহা নহে, সংস্কৃত নাটকের সমৃদ্ধযুগেও আমরা নৃত্যগীতাশ্রিত নাটকের কথা দেখিতে পাইতেছি। কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' ত বিশেষ বিশেষ নৃত্য ও সঙ্গীত-বৈচিত্র্যের দ্বারাই অভিনীত নাটক। ইহা ব্যতীত কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র ভিতরে নাটক-অভিনয়ে এই নৃত্যগীতের যে কতখানি স্থান ছিল তাহার একটি পরিচয় পাও-

করি। গণদাস এবং হরদত্ত উভয়েই প্রসিদ্ধ নাট্যাচার্যরূপে রাজসভায় সম্মানিত ছিলেন। উভয়ের ভিতরে শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহারা তাঁহাদের উভয়ের শিষ্যাগণের অভিনয়-কৌশল প্রদর্শনের দ্বারা নিজেদের কৃতিত্বের পরীক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন। এই নাট্যাচার্যদ্বয়ের শিষ্যাদ্বয় কিরূপে তাঁহাদের অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করাইয়াছিলেন? নৃত্যগীতের সাহায্যে। আমাদের মনে হয়, ইহা আমাদের নাট্য-সাহিত্যের ভিতরকার ছলিকাদি নৃত্যগীতবহুল নাটকাদির নাট্যধর্ম সম্বন্ধেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, ইহা আমাদের নাট্যধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধেই সাধারণ তথ্য দান করিতেছে।

বাঙলা সাহিত্যে আমরা প্রথম সাহিত্য পাইতেছি খৃষ্টীয় দশম হইতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের ভিতরে রচিত চর্যাপদগুলি। এগুলি সাধন-সঙ্গীত হইলেও সাধনার গুহ্য রহস্য বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে তৎকালীন নাট্য-ব্যবস্থা সম্বন্ধেও কিছু কিছু তথ্য লাভ করিতে পারি। বীণাপাদের একটি পদে দেখিতে পাইতেছি, সিদ্ধাচার্য এখানে সূর্যকে লাউ করিয়াছেন, আর চন্দ্রকে তন্ত্রী করিয়াছেন, তারপরে অনাহত দণ্ডে এই লাউ এবং তন্ত্রী যুক্ত করিয়া একটি চমৎকার বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র তৈয়ারী করিয়া লইয়াছেন; এই বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে বজ্রগুরু নিজে নাচিতেছেন, আর দেবী গান করিতেছেন, এইরূপে বিষম ভাবে বুদ্ধ-নাটক সম্পন্ন হইতেছে। পদটির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যাহাই হোক, বাহিরের দিকে আমরা দেখিতে পাইতেছি, এখানে বুদ্ধ-নাটক অভিনীত হইতেছে; অভিনয়ের পন্থা হইতেছে বজ্রগুরু এবং দেবীর নৃত্যগীত; এই নৃত্যগীতের জন্য একটি লাউয়ের খোল, একটি দণ্ড ও তন্ত্রী সহযোগে যে বাদ্যযন্ত্রটি প্রস্তুত হইয়াছে বাঙলা দেশের আনাচে-কানাচে আজও নৃত্যগীতের সহিত এই জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্রটির আমরা সাক্ষাৎ পাইয়া থাকি। এখানে দেখিতেছি, দেবী গাহিতেছেন, আর বজ্রগুরু নাচিতেছেন; কিন্তু তখনকার দিনেও ইহা প্রথা ছিল না; প্রথা ছিল, পুরুষ-সঙ্গী গান করিত আর নারী নাচিত; এই জন্য এখানে বলা হইয়াছে যে বুদ্ধ-নাটক বিষমভাবে (বিপরীতভাবে) অভিনীত হইতেছে। ইহা হইতে মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, দশম হইতে দ্বাদশ শতকে যখন বাঙলা দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রভাব বর্তমান ছিল তখন বুদ্ধদেবের চরিত্রের বিশেষ দিক্ বা তাঁহার ভাবকে এইভাবে নারী-পুরুষে মিলিয়া নৃত্যগীত সহযোগে অভিনীত করিত। ইহাকেই আমরা তৎকালে প্রচলিত বাঙলা নাটকের একটি গ্রাম্য জনপ্রিয় রূপ বলিতে পারি। আর একটি চর্যাপদেও সমজাতীয় তথ্যের আভাস পাই। সেখানে প্রথমে পাই একটি ডোমরমণীর বিবরণ; সে অভিজাত সমাজে অস্পৃশ্যা হইলেও অদ্ভুত নৃত্যকুশলা। তাহার লঘু পদক্ষেপে সে একটি পদ্মের চৌষট্টি পাপড়ির উপরেই নাচিয়া বেড়াইতে পারে।—

এক সো পদুমা চৌষট্ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী॥

এই ডোম্বীকে সম্বোধন করিয়া যোগী বলিতেছেন,—

তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়পেড়া॥

তোমার জন্য ছাড়িয়া দিতেছি আমি 'নটপেটিকা'। যোগের অর্থ বাদ দিয়া বাহিরের অর্থ বিচার করিলে এই পংক্তিটির তাৎপর্য্য কি? নটপেটিকা অর্থ হইল একটি ছোট পেটিকা বা পেটারা—যাহার ভিতরে নট-নটীর সকল সাজপোষাক রাখা হইত। তখনকার দিনের নিম্নজাতীয়গণের মধ্যে নৃত্যগীতকুশল পুরুষ ও রমণী দেশে দেশে ঘুরিয়া নৃত্যগীতের সাহায্যেই নানারূপ নাট্যাভিনয় করিয়া বেড়াইত, পদটির ভিতরে তাহারই আভাস ছড়াইয়া আছে। এই সকল হইতে মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, বাঙলা সহিত্যের প্রথম যুগে নৃত্যগীতের দ্বারা এইরূপ নাট্যাভিনয়ের প্রথা অন্ততঃ জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

ইহার পরে আমরা পাইতেছি দ্বাদশ শতাব্দীর জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ'। সংস্কৃতে লিখিত হইলেও বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের সহিত গ্রন্থখানি নিগূঢ় ভাবে যুক্ত। কাব্য বলিয়াই 'গীত-গোবিন্দের' প্রসিদ্ধি; কিন্তু গ্রন্থখানির ভিতরে প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রার একটি বিশেষ রূপ পাওয়া যাইতেছে। প্রথমেই আমরা স্মরণ করিতে পারি, জয়দেব কবি ছিলেন, 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী'। অনেকে মনে করেন, জয়দেবের প্রিয়া পদ্মাবতী ছিলেন নৃত্যকুশলা নটী; সেই পদ্মাবতীর নৃত্যের সহিত তিনি তাঁহার সঙ্গীত যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। গীত-গোবিন্দ কাব্যখানি মূলতঃ এইরূপ নৃত্যগীতের ভিতর দিয়া কৃষ্ণলীলা অভিনয়ের জন্যই রচিত হইয়াছিল কি? গীত-গোবিন্দের বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণের 'বসন্তরাস'। রাসও নৃত্য। গীত-গোবিন্দের প্রত্যেক পদই সঙ্গীত, বিশেষ বিশেষ সুর-তালে তাহারা গেয়। গীত-গোবিন্দের ভিতরে যে সকল সুর-তালের নির্দেশ রহিয়াছে তাহাদের সহিত নৃত্যের সহজ যোগ আছে। বিষয়বস্তুটি যেমন বর্ণনার ভিতর দিয়াও ফুটিয়াছে, তেমনই সঙ্গীতের মধ্য দিয়া উক্তি-প্রত্যুক্তির ভিতর দিয়াও প্রকাশ পাইয়াছে। কৃষ্ণলীলাকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন প্রকারের কৃষ্ণযাত্রা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে আমরা কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ পাই। এখানে কৃষ্ণের কংসবধ এবং বিষ্ণুর বলিকে পাতালে বদ্ধ করিবার উপাখ্যানের উল্লেখ পাই। এই অভিনয় যে ঠিক কিরূপ ছিল তাহা এখন নিশ্চিন্ত করিয়া বলা যায় না; কেহ বলেন যে ইহা মূকাভিনয় ছিল, কেহ বলেন বিভিন্ন চরিত্রের অংশ লইয়া ইহা নাট্যাভিনয়েরই একটি স্থূল রূপ ছিল। আমরা জয়দেবের গীত-গোবিন্দের মধ্যে এই কৃষ্ণযাত্রারই একটি পরিণতি দেখিতে পাই।

জয়দেবের পরে বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনের ভিতরে পাওয়া যায় সেই কৃষ্ণযাত্রারই ক্রম-পরিণতি। এখানে কৃষ্ণলীলাকে বহু 'খণ্ডে' বিভক্ত করা হইয়াছে; প্রত্যেকটি 'খণ্ড' স্বয়ং-সম্পূর্ণ। পরবর্তী কালের নাট্যাভিনয়ের ভাষায় ইহার প্রত্যেকটি খণ্ডকে বলা যাইতে পারে এক একটি 'পালা'। প্রত্যেক খণ্ডের প্রত্যেকটি পদই সুর-তালাদির সহিত গেয়। কৃষ্ণকীর্তনের বৈশিষ্ট্য এই, এখানে যে কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে কতগুলি আখ্যানই রহিয়াছে তাহা নহে; এই আখ্যানের ভিতরে কবির বর্ণনা অপেক্ষা বর্ণিত চরিত্রগুলির উক্তি-প্রত্যুক্তির ভিতর দিয়াই ঘটনাটি আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে অধিক। নায়ক কৃষ্ণ, নায়িকা রাধা এবং মধ্যবর্তিনী বড়াই বুড়ীর সংলাপই বিষয়বস্তুকে অগ্রগতি দান করিয়াছে। স্থানে স্থানে রাধা-কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি স্পষ্ট ভাবেই নাট্যধর্মকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। একটি নমুনা লওয়া যাক্। 'যমুনাখণ্ডে'র ভিতরে দেখিতে পাই, রাধা একাকিনী যমুনায় জল আনিতে গিয়াছে; সুযোগ বুঝিয়া জলের ঘাটে কৃষ্ণ দাঁড়াইয়া তাহার প্রেম-নিবেদনের চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এ রাধা একেবারে 'অবলা অখলা' নয়—

মুখের উপরে যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পারে। কৃষ্ণ ও রাধার এই উক্তি-প্রত্যুক্তি কিরূপ নাটকীয় সংলাপের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে নিম্নের উদ্ধৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।—

কাহার বহু তোঁ কাহার রাণী। কেহ্নে যমুনাত তোলসি পাণী ॥
বড়ার বহু মো বড়ার ঝী। আহ্মে পাণি তুলি তোহ্মাত কী ॥
কাখের কলস নাম্বাঅ তোহ্মে। কথা চারি পাঁচ কহিব আহ্মে ॥
যার কান্ধ বসে দোষর মাথা। সেসি আহ্মা সমে কহিবে কথা।
তাম্বুলে নেহ আইহনের রাণী। তোর বচনে জীএ চক্রপাণী ॥
তাম্বুল দিয়া মোরে বোলসী। খুদ বড়সিএঁ রুহী বান্ধসী ॥
এহা যমুনাত মো অধিকারী। আহ্মার বচন সুণ সুন্দরী ॥
তোর মোর আর বচন নাহীঁ বুঝিল তোহ্মার মতী কাহ্নাঞিঁ ॥
সুদ্ধ সুবন্নের মোর কিঙ্কিণী। এহা নেহ মোর ধরহ বাণী ॥
গোআলিনী আহ্মে নহোঁ নাচুনী। মোর কাজ নাহিঁ তোর কিঙ্কিণী ॥
তের ষোল হাথ মোর পাটোল। এহা নেহ মোর ধরহ বোল।
সুদ্ধ সুবন্নের মোহোর বাঁশী। এহা নেহ রাধা পাসত বসী ॥
তোর বাঁশী মোঞেঁ ঘসি না ঘাটো। তাক হাথে করী দুধ না আউটোঁ ॥
তোর পাটলের সুণ কথা। সে মোহোর ঘৃত ভাণ্ডের নাথা ॥

কৃষ্ণ—কাহার তুমি বউ, কাহার রাণী,—কেন তুলিতেছ যমুনায় জল ?
রাধা—বড়র বধূ আমি, বড়র ঝি; আমি জল তুলি, তাহাতে তোমার কি ?
কৃষ্ণ—তুমি কাঁখের কলস নামাও, তোমার সঙ্গে চারি-পাঁচটি কথা বলিব।
রাধা—যাহার কাঁধে বসে দু'টি মাথা, সেই আমার সঙ্গে কথা বলিবে।
কৃষ্ণ—তাম্বুল নাও ওগো আয়ানের রাণী, তোমার মুখের কথায় বাঁচে চক্রপাণি।
রাধা—তাম্বুল দিয়া আমার সহিত সম্ভাষণ করিতে চাও! তুমি খুঁদে বড়সি দ্বারা বড় রুই বাঁধিতে চাও ?
কৃষ্ণ—এখানে এই যমুনায় আমিই অধিকারী, হে সুন্দরি তুমি আমার কথা শোন।
রাধা—তোমাতে আমাতে নাই আর কোন কথা, তোমার মতি (অভিসন্ধি) আমি বুঝিয়াছি, হে কানাই!
কৃষ্ণ—খাঁটি সোনার এই আমার কিঙ্কিণী, আমার কথা ধর, ইহা নাও।
রাধা—গোয়ালিনী আমি, নাচুনী (নর্তকী) নই; তোমার কিঙ্কিণীতে নাই আমার কোনও কাজ।
কৃষ্ণ—এই দেখ, ষোল হাত আমার রেশমী বস্ত্র; ইহা নাও, ধর আমার কথা। আর খাঁটি সোনার এই আমার বাঁশী, ইহা নাও রাধা আমার পাশে বসিয়া।
রাধা—তোমার বাঁশী দিয়া আমি ঘসিও ঘাঁটি না, তাহা হাতে করিয়া দুধও আউটাই না: তোমার রেশমী বস্ত্রের শোন কথা,—উহা হইল আমার ঘৃতভাণ্ডের (ঘৃতভাণ্ড মুছিবার) নাতা!

উপরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করিবার উদ্দেশ্য হইল নৃত্যগীতের ভিতর দিয়া প্রাচীন যুগে যে কৃষ্ণলীলা অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল তাহার সঙ্গীতাংশের ভিতরে নাটকীয় সংলাপ যে কতখানি চমৎকারিত্ব লাভ করিয়াছিল তাহারই একটা নমুনা দেওয়া।

আমাদের মধ্যযুগের নাট্যতথ্যরূপে আমরা বিভিন্ন চরিতগ্রন্থে বর্ণিত মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কর্তৃক সপার্ষদ কৃষ্ণলীলা অভিনয়ের কথাই নানাভাবে উল্লেখ করিয়া থাকি। কিন্তু প্রায় পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী জাতির নাট্য-পিপাসা কিসে মিটাইয়াছিল ? আমার বিশ্বাস, আমাদের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যগুলি এবং আমাদের রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতিই নানাভাবে আমাদের এই নাট্য-পিপাসা মিটাইয়াছিল। এইগুলির ভিতর দিয়া আমাদের নাট্য-পিপাসা নানাভাবে চরিতার্থ হইতেছিল বলিয়াই হয়ত আমরা আর পৃথক্‌ভাবে নাট্যাভিনয়ের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করি নাই। এই সমস্ত সাহিত্য আমাদের নাট্য-পিপাসাকে কি ভাবে মিটাইতে সমর্থ হইয়াছিল সেই কথাটিকেই একটু ভালভাবে বুঝিয়া লওয়া দরকার।

প্রথমতঃ, সাহিত্যের দিক্ হইতে বিচার করিলে দেখিতে পাই, আমাদের বিভিন্ন জাতীয় মঙ্গলকাব্যগুলি কাব্য হইলেও ইহাদের সাহিত্য-প্রকৃতির মধ্যে আমাদের আধুনিক যুগের উপন্যাস এবং নাটক পরস্পরের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে। সাহিত্য-প্রকৃতির দিক হইতে বিচার করিলে উপন্যাস ও নাটকে মৌলিক পার্থক্য কি ? উপন্যাসে গল্পাংশ সম্পূর্ণভাবে না হইলেও মুখ্যতঃ বর্ণিত, আর নাটকে গল্পাংশ সবটাই অভিনীত। আমরা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলির ভিতরে এই উভয় উপাদানের একটা চমৎকার মিশ্রণ রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য (কালকেতু উপাখ্যান এবং ধনপতি শ্রীমন্ত উপাখ্যান উভয়ই) উল্লেখযোগ্য। মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্য মধ্যে খানিকটা একটু নিজের মুখে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার পরই যেন তিনি পিছনে সরিয়া গিয়াছেন,—আমাদের সামনে আনিয়া ধরিয়া দিয়াছেন তাঁহার জীবন্ত চরিত্রগুলি। সেই চরিত্রগুলি নিজেরা তাহাদের স্পষ্ট ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে যেমন নাটকীয় সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তেমনই আবার তাহাদের সংলাপ এবং কার্যাবলী দ্বারা নিজেরাই যেন গল্পাংশকে অগ্রগতি দান করিয়াছে। মুকুন্দরামের কাব্যের মধ্যে এই জাতীয় দৃষ্টান্তস্থল খুঁজিয়া-পাতিয়া বাহির করিতে হয় না; খানিকটা নিজে বর্ণনা করা এবং তাহার পরেই খানিকটা আবার চরিত্রগুলিকে আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠিতে দেওয়া—ইহাই যেন মুকুন্দরামের কাব্য-কলা-কৌশলের বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য সকল মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও এই নাটকীয় গুণ ন্যূনাধিকভাবে ছড়াইয়া আছে।

কিন্তু মঙ্গলকাব্যাদির গঠনকৌশলের ভিতরকার এই যে নাটকীয় উপাদান ইহা আজ আমাদের চোখে যেরূপ ভাবে দেখা দেয় মধ্যযুগের সাহিত্য-সমাজের পক্ষে তাহা এরূপ ভাবে সহজগ্রাহ্য ছিল না; কারণ আজকার দিনে অভিনয় ব্যতীত শুধু পঠনের ভিতর দিয়াও আমরা নাটকীয় উপাদানকে যে ভাবে আস্বাদ করিতে অভ্যস্ত, মঙ্গলকাব্যাদির যুগের জনসাধারণ নিশ্চয়ই সেরূপ ভাবে অভ্যস্ত ছিল না। তাহা হইলে এই জাতীয় সাহিত্যের নাট্য-ধর্ম তৎকালীন সাহিত্য-সমাজকে আনন্দ দান করিতে পারিয়াছিল কি ভাবে ?

অন্য সব জাতীয় সাহিত্য হইতে নাটকের বৈশিষ্ট্য হইল এইখানে যে সর্বদেশে সর্বকালে নাটকের ভিতরে একটি পরিবেশনের প্রশ্ন আছে। আজিকার দিনেও নাটক লিখিয়া ছাপিয়া দিলেই সে তাহার সার্থকতা লাভ করিতে পারে না, রঙ্গমঞ্চ বা পর্দার ভিতর দিয়া তাহাকে পরিবেশন করিতে হয়। আগেকার দিনে নাটকের জন্য এই রূপালি পর্দা বা রঙ্গমঞ্চের পরিবর্তে যে জিনিসটি আমাদের বাঙলা দেশে ছিল তাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে 'আসর'। মঙ্গলকাব্যাদি

পড়িয়া শুনিবার সাহিত্য ছিল না ; গ্রাম্য আসরে-আসরে ইহাকে পরিবেশন করিয়া সার্থক করিয়া তুলিতে হইত। শুধু মঙ্গলকাব্য কেন ? আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের অধিকাংশই এইরূপ নৃত্যগীত-সহকারে পরিবেশিত সাহিত্য। আমাদের রামায়ণও এইরূপ আসরে গীত হইত ; আমাদের নাট্য-সাহিত্য অনেকটাই এই পল্লীর সঙ্গীতাসর হইতে সংগৃহীত জিনিস। আমাদের গীতিকাগুলি (পূর্ববঙ্গগীতিকা) সম্পূর্ণরূপেই এইরূপ আসরের সামগ্রী। আমাদের বৈষ্ণবকবিতাও তাই।

আমাদের প্রাচীন কাব্যাদিতে এই আসরের যে বর্ণনা পাই তাহারই পরিণতি দেখিতে পাই অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকের যাত্রার 'আসরে'। আজ পর্যন্তও আমাদের যাত্রাগানের যে রঙ্গভূমি তাহা 'আসর' নামেই খ্যাত। এই আসরে বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের ব্যবস্থা থাকিত, একাধিক 'বায়েনে'র অধিষ্ঠান থাকিত ; একজন যেমন মূল 'গায়েন' ছিলেন, তেমনই তাহার চারিপার্শ্বে বহু 'দোহার'ও উপস্থিত থাকিতেন। এই সকল একত্রিত হইয়া যে পরিবেশ সৃষ্ট হইত তাহার ভিতরে জনসাধারণ নাট্য-পরিবেশকে অনেক-খানি লাভ করিতে পারিত। এই সকল আসরে গায়কগণ শুধু সঙ্গীতের সাহায্যে সমস্ত উপাখ্যানটিকে উপস্থিত শ্রোতার সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেন না ; শ্রোতৃগণ শুধু শ্রোতা ছিলেন না, তাঁহারা দর্শকও ছিলেন ; সুতরাং সঙ্গীতের সহিত নৃত্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত ; শুধু তাললয়াদির সহিত পদবিক্ষেপের ভিতরেই এই নৃত্য সীমাবদ্ধ ছিল না ; করুণরস, বীররস, রৌদ্ররস প্রভৃতিকে গায়কগণের বিবিধ অঙ্গভঙ্গি বা বিন্যাসের সাহায্যে যতটা সম্ভব দর্শকগণের নিকটে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইত। এই কাজে মূল গায়ক তাঁহাদের সঙ্গে একাধিক সঙ্গীতকুশলা নর্তকীর সাহায্য লাভ করিতেন। মূল গায়কই ছিলেন তখনকার দিনের 'নট' ; এই গায়িকা এবং নর্তকীরা প্রসিদ্ধা ছিলেন 'নটী'রূপে ; মঙ্গলকাব্যের কবিগণ তাঁহাদের সঙ্গীত-কাব্যকে অনেক সময় 'নাট' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ; আর যে স্থানে বসিয়া এই সমস্ত সাহিত্যরসের পরিবেশন হইত তাহার নাম ছিল 'নাট'-মন্দির। এই 'নাট' কথাটির সহিত স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় যুক্ত হইয়াই 'নাটক' শব্দটি সাধিত হইয়াছিল কি ?

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আবার নূতন করিয়া নূতন বৈশিষ্ট্য লইয়া যাত্রাগান গড়িয়া উঠিতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই এই যাত্রাগানকে আমরা ঠিক প্রাচীন যাত্রারীতিরই অবিচ্ছিন্ন ধারা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না ; ইহা তৎকালীন জনসাধারণের ভিতরকার সাহিত্য-সামাজিকগণের চাহিদার ফলে জনসাধারণের ভিতরকার প্রতিভা অবলম্বনে অভিব্যক্ত নাট্যকৃতি। মানুষের মনের যে মৌলিক চাহিদায় নাটকের উৎপত্তি সেই মৌলিক চাহিদাকে অবলম্বন করিয়াই আমাদের অষ্টাদশ শতকের শেষভাগের যাত্রার উৎপত্তি। মানুষের মধ্যে কাব্যের অতিরিক্ত আবার নাটক গড়িয়া উঠিয়াছে কেন ? নিছক সাহিত্য হিসাবে বিচার করিলেও দেখিতে পাই, একটি ঘটনাকে বর্ণনার ভিতর দিয়া যে ফলশ্রুতি হয় তাহা অপেক্ষা ঘটনাগুলিকে কতগুলি পৃথক্ পৃথক্ চরিত্রের কার্য ও সংলাপের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিলে ফলশ্রুতির অনেকখানি তফাৎ হয় ; ফলশ্রুতির এই পার্থক্যই নাট্যোৎপত্তির কারণ। এইজন্য মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, বৈষ্ণব-কবিতাদি ভাঙিয়া-ভাঙিয়াই নূতন নূতন যাত্রা গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই যে কাব্য ভাঙিয়া নূতন নূতন যাত্রা গড়িয়া উঠিবার প্রক্রিয়া ইহা বিংশ শতাব্দীতেও চলিয়াছে, আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই ইহার তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। একদিন গ্রাম্য-আসরে রামায়ণ গান শুনিতেছি,—রাবণ-বধ পালা। অধিকারী, অর্থাৎ মূল গায়েন দুই হাতে দুই চামর ঝুলাইয়া রাবণের ভাবে পরিভাবিত হইয়া বেশ বীর-রস এবং রৌদ্র-রসের সৃষ্টি করিয়াছেন। রাবণ আজ রণ-উন্মমে উন্মাদ, আজ রাম-লক্ষ্মণকে হত্যা না করিয়া আর গৃহে ফিরিবে না ; পৃথিবী আজ হয় অ-রাম অথবা অ-রাবণ হইবে, এই কথাই অধিকারী তাঁহার সঙ্গীত, দ্রুত এবং উত্তেজিত নৃত্য এবং অঙ্গ-ভঙ্গি সহকারে যখন বার-বার ঘোষণা করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ দেখা গেল বেহালাদার তাহার হাত হইতে বেহালাটি আসরে রাখিয়া একান্ত নাটকীয় ভাবে আসিয়া রাবণের সম্মুখে যেন পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, এবং রমণীজনোচিত মিহি কণ্ঠে বলিল,—"মহারাজ, ক্ষান্ত হোন, ক্ষান্ত হোন,—আজ যুদ্ধে যাইবেন না।" অধিকারী রাবণের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বলিল,—"কেন প্রিয়ে ?" মিহি কণ্ঠে বেহালাদার মন্দোদরীর ভূমিকায় বলিলেন,—"মহারাজ, আমি আজ দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি।" উত্তরে অধিকারী রাবণ-রূপেই পুনরায় অধিকতর উত্তেজিতভাবে নৃত্যগীত আরম্ভ করিলেন—তাহার ভিতর দিয়া তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ পাইল এই যে, আজ আর তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না ; আজ হয় পৃথিবী অ-রাম, না হয় অ-রাবণ হইবে।

মাঝখানের এই নাটকীয় আয়োজন কিসের জন্য ? রামায়ণ গানের অধিকারীর ভিতরেও একটি স্বভাব-নাট্যকার বাস করে ; সে বুঝিতে পারিয়াছে, এ ক্ষেত্রে সে এক অধিকারীই রাবণ ও মন্দোদরী-রূপে বিষয়টি সঙ্গীতাকারে বর্ণনা করিলে শ্রোতা এবং দর্শকগণের মধ্যে যে ফলশ্রুতি দেখা দিত তাহা অপেক্ষা উপরোক্ত নাটকীয় পন্থায় ফলশ্রুতির অনেক তীব্রতা এবং বৈচিত্র্য সাধিত হয়। এই সহজাত নাট্য-বোধ হইতেই সকল রাম-যাত্রা, কৃষ্ণ-যাত্রা, বিদ্যাসুন্দর সঙ্গীতাভিনয় প্রভৃতির উদ্ভব। আর একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কীর্তন বাঙলার প্রায় সকল অঞ্চলেই প্রসিদ্ধ ছিল। প্রথমে একজন কীর্তনিয়াকে দেখিলাম ঢপ গানের ভঙ্গিতে 'রাই-উন্মাদিনী' কৃষ্ণলীলা গান করিতেছেন ; তাঁহার সঙ্গে খোল-করতাল ব্যতীত আর কোনও সাজ-সরঞ্জাম নাই। দেখিলাম, তিনি নাচিয়া নাচিয়া কৃষ্ণদর্শনে পাগলিনী রাধিকাকে পথে বার বার যেন বাধা দিতেছেন—এই ভঙ্গিতে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর প্রসিদ্ধ গান গাহিতেছেন—

> ধীরে ধীরে চল গজগামিনী।
> তুই অমনি ক'রে যাস্ নে যাস্ নে গো ধনী।
> তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পাবি,
> না জানি কোন্ গহনবনে প্রাণ হারাবি—ইত্যাদি।

কয়েক বৎসর পরে দ্বিতীয় বার আবার যখন সেই একই অধিকারীর গান শুনিলাম, দেখিলাম, আর সবই পূর্বের ন্যায় আছে, শুধু ছোট একটি ছেলেকে রাধা সাজাইয়া লইয়াছেন, তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া বাধা দিবার ভঙ্গিতে গান করিতেছেন। তৃতীয় বারে আবার দেখিলাম, রাধার সঙ্গে দুই-একটি সখীও জুটিয়াছে, অধিকারী নিজেও গান গাহিতেছেন, রাধা ও সখীরাও কিছু কিছু গান গাহিতেছে। মাঝে মাঝে সামান্য কিছু কিছু সংলাপও দেখা দিয়াছে। কয়েক

বৎসর পরেই জানিলাম, উপরি-উক্ত অধিকারী বড় কৃষ্ণযাত্রার দল করিয়াছেন।

দৃষ্টান্তগুলির একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিবার তাৎপর্য এই, ইহার ভিতর দিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে আমাদের যাত্রাভিনয়ের ধারাটি কি ভাবে আবর্তিত হইয়াছে তাহারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আমাদের দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর গীতাভিনয়কে আমরা মোটামুটি ভাবে এক যাত্রা নামে অভিহিত করিয়া থাকি। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এই যাত্রাগানের আমাদের কোনও একটা সুস্পষ্ট আদর্শ বা কাঠামো আমাদের কখনও গড়িয়া ওঠে নাই; জনসাধারণের ভিতর হইতে সহজাত নাটকীয়-বোধের দ্বারা যত রকমের অভিনয়-পদ্ধতি দেখা দিয়াছে অনেক সময় তাহাদের সকলের জন্য আমরা শিথিলভাবে যাত্রা কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আমাদের যাত্রাভিনয়ের যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, সেগুলির রচনা-পদ্ধতি এবং প্রয়োগ-কৌশল বিশ্লেষণ করিলেও আমরা দেখিতে পাই, নাট্য-সাহিত্য হিসাবে তাহার রচনা ও প্রয়োগ-কৌশলের যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য তাহা কোনও একটি সুস্পষ্ট এবং দৃঢ় আদর্শকে অনুসরণ করিয়া গড়িয়া ওঠে নাই; এ জাতীয় সাহিত্য জনগণের এবং সেই কারণে জনমনের এমন ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে সর্বদা বর্ধিত হইয়াছে যে বাঙালী জাতির অন্তর্নিহিত নাট্য-চাহিদা সর্বদাই এগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। যাত্রার পৌরাণিক কাহিনী বা কিংবদন্তীর বিষয়বস্তু, তাহার নৃত্যগীত-প্রাধান্য, তাহার চরিত্রের বলিষ্ঠতা এবং স্থূলতা, থাকিয়া থাকিয়া পাগল, পাগলিনী, বিবেক, নিয়তি প্রভৃতির আকস্মিক আবির্ভাব ও তিরোভাব, স্থানে অস্থানে সংলগ্ন এবং অসংলগ্নভাবে বিশিষ্ট প্রথায় হাস্যরসের আয়োজন—ইহার সকলের সহিতই নাট্য-পিপাসু বৃহত্তর জনমনের একটা নিগূঢ় যোগ রহিয়াছে; এক কথায় বলিতে গেলে, যাত্রা এবং অনুরূপ গীতাভিনয়ের ভিতর দিয়া আমরা বাঙালী মনোধর্মেরই একটা পরিচয় দেখিতে পাই। ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে ইউরোপীয় আদর্শে যে আমাদের নাট্য-প্রচেষ্টা উহা সীমাবদ্ধ ছিল তৎকালীন বাঙালী-জীবনের একটি অতিশয় ক্ষুদ্রাংশের ভিতরে, বৃহত্তর জাতীয় নাট্য-প্রতিভার বিকাশ এবং নাট্য-পিপাসার পরিতোষ এই দেশীয় নাট্য-প্রথাকে অবলম্বন করিয়া।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বিদেশাগত কোনও শিল্পাদর্শ একটি জাতীয় জীবনে তখনই গ্রহণীয় হইয়া ওঠে যখন তাহা দেশীয় জল-মাটি, আলো-হাওয়ার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়া বর্ধিত হয়। আমাদের বাঙলা সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইল ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সমাজ—সব দিক্ হইতেই একটা প্রবল পাশ্চাত্য প্রভাবের যুগ। সাহিত্যেরও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠা কি ভাবে ঘটিয়াছিল? একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, স্বদেশের ভাবাদর্শ এবং রূপায়ণ-প্রথাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করিয়া কেহই পাশ্চাত্য ভাবাদর্শ বা রূপায়ণ-প্রথাকে সার্থক ভাবে চালু করিতে পারেন নাই। কাব্যের দিক হইতে মধুসূদনকে তৎকালীন বাঙালীর জাতীয় জীবনের উপরেই 'মেঘনাদ-বধ-কাব্য'কে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছে। মিত্রাক্ষরের বন্ধন ভুলিয়া দিয়া আবার দেশীয় প্রথায়ই অনুপ্রাস-যমকের দ্বারা নানা ভাবে তাঁহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছে। বর্ণনার স্থানে স্থানে হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো, মিল্টন প্রভৃতির প্রভাব যেমন স্বীকার করা হইয়াছে তেমনি বাল্মীকি, ভবভূতি প্রভৃতির প্রভাবকেও গ্রহণ করা হইয়াছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের চলিয়াছিল সমজাতীয় সার্থক সাধনা। নাটকের ক্ষেত্রে এই বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র। নবাগত পাশ্চাত্যের নাট্য-ভাবাদর্শ, রঙ্গমঞ্চ এবং অভিনয়-কৌশল প্রভৃতিকে জাতির বৃহত্তর মনোভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইবার মস্ত বড় প্রয়োজন ছিল, সেই প্রয়োজন সাধনেই গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব।

আমরা পূর্বে পাশ্চাত্য-প্রভাবান্বিত বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের সুদীর্ঘ পটভূমিকার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা মোটামুটি ভাবে বিশ্লেষণ করিলে বাঙলা নাট্য-শিল্পের কতগুলি বিশেষ ধর্মের সহিত পরিচিত হই। ইহার ভিতরে সর্বপ্রধান হইল বাঙালী জাতির নৃত্যগীত-প্রিয়তা। অন্যান্য দেশের নাট্য-ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, নৃত্যগীত সেখানে প্রাথমিক যুগেই নাট্য-শিল্পের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিল; কিন্তু আমাদের দেশে 'আদাবন্তে চ মধ্যে চ'। শুধু নাট্য-সাহিত্য কেন, প্রাক্-আধুনিক যুগের আমাদের প্রায় সমস্ত সাহিত্যই হইল সঙ্গীত। নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, আজ পর্যন্ত আমাদের এই নৃত্যগীতপ্রবণতা; আজ পর্যন্ত সিনেমা-ঘরে গিয়া দেখিতে পাই, যতই আধুনিক লেখক হোন, এবং যতই আধুনিক বিষয়বস্তু হোক্ না কেন, স্থানে-অস্থানে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কিঞ্চিৎ নৃত্যগীতের ব্যবস্থা সাধারণতঃ থাকিবেই; কারণ, মুষ্টিমেয় পাশ্চাত্য রুচিতে অনুশীলিত মন ব্যতীত বাদবাকি দর্শকের আন্তরিক চাহিদা যে এখনও ঐরূপ। আমাদের নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল খানিকটা একটু বীরাচারী ছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার এই বীরাচারের সঙ্গেও আমাদের সঙ্গীতাচারকে যতটা পারেন মিলাইয়া লইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি নাটকেরও বৈশিষ্ট্য নৃত্যগীতে। ইহাও কি সূক্ষ্মবেশে আমাদের জাতীয় নাট্য-ধর্মেরই যুগোচিত পরিণতি?

পূর্বেই বলিয়াছি, সাহিত্যের ভিতরে নাট্য-সাহিত্যের জনগণের সহিত যোগ সর্বাপেক্ষা অধিক। অন্য ক্ষেত্রে লেখক তাঁহার পাঠক বা শ্রোতা সম্বন্ধে যদি বা উদাসীন থাকিবার চেষ্টা করেন, ভাল নাট্যকারের তাঁহার দর্শকসমাজ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবার জো নাই। আমাদের উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নাটকের যে দর্শকসমাজ, তাঁহাদের মনের সকল রসের উপরে আধিপত্য করিতেছিল আমাদের সনাতন ধর্মরস; তাই নাট্য-শিল্পের ক্ষেত্রেও এই ধর্মরসের প্রভাব একরূপ অমোঘ ছিল।

নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ছিল এইখানে, তিনি পাশ্চাত্যের আলোক অনেকখানি পাইয়াছিলেন, অন্য দিকে আবার তাঁহার নাট্য-প্রতিভা তৎকালীন নাট্যরসের পিপাসু গণমনেরই প্রতিনিধিস্বরূপ ছিল। ফলে একদিকে তিনি যেমন পাশ্চাত্য আদর্শে নাটক গড়িবার বিরোধী ছিলেন না, অপর দিকে আমাদের বহু দিনের আবর্তিত নাট্য-ধারার সকল বৈশিষ্ট্যকেই তিনি সুযোগ্য অধিকারীর ন্যায় একরূপ উত্তরাধিকারসূত্রেই লাভ করিয়াছিলেন। এই উভয়ের বিরল মিশ্রণে আমাদের নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী হইয়া আছে।

ভক্ত রঘুনাথ দাস

শ্রীশুভেন্দু ঘোষ

[ভগিনী নিবেদিতা কর্তৃক লিখিত My Master As I Saw Him গ্রন্থ থেকে তথ্য পাওয়া গেছে।—লেখক]

"বোলো জয়! রামচন্দ্র কী জয়!"

পশ্চিমের একটা ছোট সহর। সহরটার একাংশ জুড়ে সেনানিবাস। গোরা সৈন্য; দেশী সৈন্য···

তখন বেশ রাত্রি হয়েছে। সেনা-পল্লীতে দীপনির্বাণ হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ।

সে রাত্রে রঘুনাথ দাসের উপর পড়েছে প্রহরার ভার।

চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। রঘুনাথ সেনা-বারিকের বাইরে পায়চারি করছে। একক, নিঃসঙ্গ। পায়ের ফৌজী জুতো আওয়াজ দিচ্ছে মচ্ মচ মচ্।

দূর হতে ভেসে আসছে রামনাম কীর্ত্তনের একটা পদ:

"বোলো জয়! রামচন্দ্র কী জয়!"

সান্ত্রী রঘুনাথের কান খাড়া হয়। কী মিষ্টি লাগছে ঐ কীর্ত্তন-গান—হোক্ না একই পদের বারম্বার আবৃত্তি:

"বোলা জয়! রামচন্দ্র কী জয়!"—রঘুনাথ শোনে, একেবারে তন্ময় হয়ে শোনে। কীর্ত্তনের তালে তালে তার পা ওঠে, নামে; তার দেহের প্রতি ধমনীতে তাল বাজে। তার প্রাণ-মন-দেহ সবই যেন গলা ছেড়ে গাইতে থাকে: "বোলো জয়! বোলো রামচন্দ্র কী জয়!"

"বোলো জয়! বোলো রামচন্দ্র কী জয়!"—এই পদটির মধ্যে রঘুনাথের বহিশ্চেতনা ধীরে ধীরে লীন হয়ে যায়।

তার পর? তার পর কী হয়, কে জানে?

* * * *

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন। রাত্রি গভীর হতেই দূর হতে ভেসে আসে কীর্ত্তনের সুর: "বোলো জয়! রামচন্দ্র কী জয়!" সুর যেন ক্রমে এগিয়ে আসে। রঘুনাথের চিত্ত মিলিয়ে যায় ঐ কীর্ত্তনের ধ্বনিতে।

সিপাহীরা কি-সব ফিস্-ফিস্ করে। কর্ণেল সাহেবের কানে যায়: সান্ত্রী রঘুনাথ দাস নাকি রাত্রে প্রহরা ছেড়ে রাম-কীর্ত্তনের দলে গিয়ে মেশে।

কর্ণেল সাহেবের বিশ্বাস হয় না। রঘুনাথ দাসকে তিনি জানেন; সে বুদ্ধিমান, সংযত; প্রখর তার কর্ত্তব্য-বোধ। সে কি···

ডাক পড়ে রঘুনাথ দাসের। সে গোপন করে না কিছুই। পুরাতন সিপাহী সে; ফৌজী আইন-কানুন তার অজানা নয়, সান্ত্রীর কর্ত্তব্যে অবহেলা যে কত বড় অপরাধ, তার শাস্তি যে মৃত্যুদণ্ড—তাও তার অবিদিত নয়। তবু সে গোপন করে না কিছুই। বাঁচতে যেন সে চায় না।

কর্ণেল সাহেব কি করবেন ভেবে পান না। এখনো কথাটা বিশেষ জানাজানি হয়নি, এ যাত্রা মাফ করা গেল। ভবিষ্যতে যেন আর এ-অপরাধ না করে।

* * * *

কিছু দিন পরে।

আবার রাত্রি আসে। সে-রাত্রেও রঘুনাথের সান্ত্রী ডিউটা পড়ে।

রাত্রি গভীর হয়। রঘুনাথ পায়চারি করে, তার কান খাড়া হয়ে থাকে; সে মনে-মনে বলে, আর না, আর কিছুতেই সে কর্ত্তব্য-লঙ্ঘন করবে না।

"বোলো জয়! রামচন্দ্র জী জয়!"—দূর হতে ভেসে আসে কীর্ত্তনের সুর। রঘুনাথ নিজেকে বোঝাতে চায়, এ তার মনের ভুল। তবু, ধীরে ধীরে তার দেহ-মনের প্রতিটি অণুতে ধ্বনিত হতে থাকে! "বোলো রামচন্দ্র কী জয়!"

এদিকে কর্ণেল সাহেবের চোখে ঘুম নাই: কে জানে এবারও যদি রঘুনাথ কর্ত্তব্যে অবহেলা করে! পুরাতন বিশ্বাসী সিপাহী সে, কিন্তু ইদানীং কেমন যেন হয়ে পড়েছে। পা টিপে-টিপে তিনি দেখতে বার হন।

···এই তো রঘুনাথ যথারীতি পাহারা দিচ্ছে। এই তো তিনি কাছে আসতেই তাঁকে চ্যালেঞ্জ করল। সাড়া পেয়ে স্যালুট দিল।

* * * *

পরের দিন সকাল বেলা। রঘুনাথ দাস কর্ণেল সাহেবের কাছে গিয়ে বলল, "আবার আমি বিশ্বাসভঙ্গ করেছি। আমায় শাস্তি দেন।"

কর্ণেল সাহেব অবাক্। সিপাইটার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে নিশ্চয়! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "বিশ্বাসভঙ্গ করলে কি করে? কাল রাত্রে তো তুমি ঠিক মতই ডিউটী দিয়েছ; আমি নিজে যাচাই করে এসেছি।"

রঘুনাথ দাস স্তম্ভিত! সাহেব এ কি বলছেন? গত রাত্রেও তো সে রাম-কীর্ত্তনে যোগ দিয়েছে। তার বেশ মনে আছে, গভীর রাত্রে তার কানে এল কীর্ত্তনের সেই পদটি: 'বোলো জয়! বোলো রামচন্দ্র কী জয়!' আর···

অকস্মাৎ তার মনের মধ্যে বিদ্যুতের চমক খেলে গেল, তার সমস্ত দেহ শিউরে উঠল: ভুল নাই, কোনো ভুল নাই! এ রামজী নিজে···তার হয়ে সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, স্যালুট করেছেন। তার মত তুচ্ছ একটা কীটের জন্যে!! রামজী নিজে!!!

রঘুনাথ দাস পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে। এ কী হল! প্রভু এ কী করলেন?

* * *

সেই দিনই রঘুনাথ দাস সাহেবের কাছে আবেদন জানাল: তাকে ফৌজ থেকে মুক্তি দেওয়া হোক্; নিজের উপর তার আর দখল নাই।

কর্ণেল সাহেব ভাবলেন: লোকটা সত্যিই প্রকৃতিস্থ নয়। রঘুনাথ দাসের আর্জি মঞ্জুর হল।

রঘুনাথ দাস ঘরে ফিরল না। রামজী তাকে যে কিনে নিয়েছেন—শুধু তার জীবনই নয়, সব। এত দিনে খোদ্ মালিকের কাজে নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করার অবকাশ মিলেছে তার।

ফেলে আসা দিন

জসীমউদ্দীন

পদ্মা নদীর তীরে আমাদের বাড়ী। সেই নদীর তীরে বসিয়া নানা রকমের কবিতা লিখিতাম, গান লিখিতাম, গল্প লিখিতাম। বন্ধুরা কেহ সে সব শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, কেউ বা সামান্য তারিফ করিতেন। মনে মনে ভাবিতাম, একবার যদি কলিকাতায় যাইতে পারি, তবে সেখানকার রসিক-সমাজ আমার আদর করিবেনই। কত দিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছি, কলিকাতার মোটা মোটা সাহিত্যিকদের সামনে আমি কবিতা পড়িতেছি। তাঁহারা খুসি হইয়া আমার গলায় মালা পরাইয়া দিতেছেন। ঘুম হইতে জাগিয়া ভাবিতাম, একবার কলিকাতা যাইতে পারিলেই হয়। সেখানে গেলেই শত শত লোক আমার কবিতার তারিফ করিবে। কিন্তু কি করিয়া কলিকাতা যাই? আমার পিতা বহু কাল স্কুলের মাষ্টারী করিতেন। ছেলেরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে এইরূপ আকাশকুসুম চিন্তা করে, তাহা তিনি জানিতেন। কিছুতেই তাঁহাকে বুঝান গেল না, আমি কলিকাতা যাইয়া একটা বিশেষ সাহিত্যিক খ্যাতি লাভ করিতে পারিব। আর বলিতে গেলে প্রথম প্রথম তিনি আমার কবিতা লেখার উপরে চটাই ছিলেন। কারণ পড়াশুনার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতাম না। কবিতা লিখিয়াই সময় কাটাইতাম, তাতে পরীক্ষার ফল সব সময়ে ভাল হইত না।

কলিকাতায় বোনের বাড়ী

তখন আমি প্রবেশিকার নবম শ্রেণীতে কেবল মাত্র উঠিয়াছি! চারি দিকে অসহযোগ আন্দোলনের ধুম। ছেলেরা ইস্কুল-কলেজ ছাড়িয়া স্বাধীনতার আন্দোলনে নামিয়া পড়িতেছে। আমিও ইস্কুল ছাড়িয়া বহু কষ্ট করিয়া কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার দূর-সম্পর্কের এক বোন কলিকাতায় থাকিতেন। তাঁর স্বামী কোন অফিসে দপ্তরীর চাকুরী করিয়া মাসে কুড়ি টাকা বেতন পাইতেন। সেই টাকা দিয়া তিনি অতি কষ্টে সংসার চালাইতেন। আমার এই বোনটিকে আমি কোন দিন দেখি নাই। কিন্তু অতি আদরের সঙ্গেই হাসিয়া তিনি আমাকে গ্রহণ করিলেন। দেখিয়াই মনে হইল, যেন কত কালের স্নেহ-আদর জমা হইয়া আছে আমার জন্য তাঁহার হৃদয়ে। বৈঠকখানা রোডের বস্তিতে খোলার ঘরের সামান্য স্থান লইয়া তাঁহাদের বাসা। ঘরের মধ্যে সঙ্কীর্ণ জায়গা, তার মধ্যে তাঁহাদের দুই জনের আন্দাজ চৌকিখানারই শুধু স্থান হইয়াছে। বারান্দায় দুই হাত পরিমিত একটি স্থান, সেই দুই হাত জায়গাই আমার বোনের রান্না-ঘর। এমন সারি সারি ৭।৮ ঘর লোক পাশাপাশি থাকিত। সকাল-সন্ধ্যায় প্রত্যেক ঘরে কয়লার চুলা হইতে যে ধূম বাহির হইত তাহাতে ওই সব ঘরের অধিবাসীরা যে দম আটকাইয়া মরিয়া যাইত না এই বড় আশ্চর্য মনে হইত। পুরুষেরা অবশ্য তখন বাহিরে খোলা বাতাসে যাইয়া দম লইত, কিন্তু ওই সব ঘরে মেয়েরা, ছোট ছোট বাচ্চা শিশুরা ওই ধূঁয়ার মধ্যেই থাকিত। সমস্তগুলি ঘর লইয়া একটি পানির কল। সেই কলের পানিও স্বল্প-পরিমিত ছিল। সময় মত কেহ স্নান না করিলে সেই গরমের দিনেও তাহাকে অস্নাত থাকিতে হইত। রাত্রে এ-ঘরে ও-ঘরে কাহারও ঘুম হইত না। কারণ আলো-বাতাস বঞ্চিত ঘরগুলির মধ্যে যে বিছানা-বালিস থাকিত, তাহা রৌদ্রে দেওয়ার কোনই সুযোগ ছিল না। সেই অজুহাতে সেই বিছানার আড়ালে রাজ্যের যত ছারপোকা অনায়াসে যাইয়া রাজত্ব করিত। রাত্রে একে তো গরম, তার উপর ছারপোকার উপদ্রব। এ-ঘরে ও-ঘরে কোন ঘরেই কেহ ঘুমাইতে পারিত না। প্রত্যেক ঘর হইতে পাখার শব্দ আসিত আর মাঝে মাঝে ছারপোকা মারার আয়োজন চলিত। তাছাড়া প্রত্যেক ঘরের মেয়েরা অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে পরদা মানিয়া চলিত, অর্থাৎ পুরুষেরাই যার-যার ঘরে আসিয়া পর্দায় আবদ্ধ হইত। প্রত্যেক বারান্দায় একটি করিয়া চটের আবরণী ছিল। পুরুষ লোক ঘরে আসিলেই সেই আবরণী টানাইয়া দেওয়া হইত। দুপুর বেলায় যখন পুরুষেরা অফিসের কাজে যাইত, তখন এ-ঘরের ও-ঘরের মেয়েরা একত্র হইয়া গাল-গল্প করিত, হাসি-তামাসা করিত, কেহ বা সিকা বুনাইত, কেহ কাঁথা সিলাই করিত। তাহাদের সবারই হাতে রঙ-বেরঙের সুতাগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নক্সায় পরিণত হইত। পাশের ঘরের সুন্দর বউটি হাসিয়া হাসিয়া তখন বিবাহের গান করিত, বিনাইয়া বিনাইয়া মধুমালার কাহিনী বলিত। মনে হইত, আল্লার আসমান হইতে বুঝি এক ঝলক কবিতা ভুল করিয়া এখানে ঝরিয়া পড়িয়াছে।

এ হেন স্থানে আমি অতিথি হইয়া আসিয়া জুটিলাম। আমার ভগ্নীপতিটি আবার ছিলেন খাঁটি খোন্দকার বংশের। পোলাও-কোর্মা না খাইলে তাঁহার চলিত না। সুতরাং মাসের কুড়ি টাকা বেতন পাইয়া তিনি পাঁচ টাকা ঘরভাড়া দিতেন। তার পর তিন-চার দিন ভাল গোস্ত ঘি কিনিয়া পোলাও মাংস খাইতেন; পরে অবশিষ্ট মাস কোন দিন খাইতেন, কোন দিন বা অনাহারেই থাকিতেন।

মাসের প্রথম দিকেই আমি আসিয়াছিলাম। ৪।৫ দিন পরে যখন পোলাও গোস্ত খাওয়ার পর্ব শেষ হইল, আমার বোন অতি আদরের সঙ্গে আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "সোনাভাই আমাদের সংসারের খবর তো তুই জানিস্ না। এখন হ'তে আমরা থকোন দিন খাব, কোন দিন বা অনাহারে াকব। আমাদের সঙ্গে থেকে তুই এত কষ্ট করবি কেন? তুই বাড়ী যা।"

আমি যে সঙ্কল্প লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছি তাহা এখনও সফল হয় নাই। কলিকাতার সাহিত্যিকদের সঙ্গে এখনও আমি পরিচিত হইতে পারি নাই। বোনকে বলিলাম, "বুবুজান, আমার জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না। কাল হতে আমি উপার্জন করতে আরম্ভ করব।" বুবু জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ভাবে উপার্জন করবি রে?" আমি উত্তরে করিলাম, "এখন তাহা আপনাকে বলব না। পরে জানাব।"

খবরের কাগজের হকার

পরদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া খবরের কাগজের অফিসে ছুটিলাম। তখনকার দিনে বসুমতী কাগজের চাহিদা ছিল সব চাইতে বেশী। কয়েক দিন আগে টাকা জমা না দিলে হকারেরা কাগজ পাইত না। নায়ক কাগজের তত চাহিদা ছিল না। বসুমতীর অফিসে চার-পাঁচ দিন আগে টাকা জমা দেওয়ার সঙ্গতি আমার ছিল না। সুতরাং ২৫খানা নায়ক কিনিয়া বেচিতে বাহির হইলাম।

রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া 'নায়ক, নায়ক' বলিয়া চিৎকার করিয়া ফিরিতে লাগিলাম। সারাদিন ঘুরিয়া ২৫খানা নায়ক বিক্রয় করিয়া যখন বাসায় ফিরিলাম, তখন শ্রান্তিতে আমার শরীর অবশ হইয়া আসিয়াছে। ২৫খানা কাগজ বিক্রয় করিয়া আমার চোদ্দ পয়সা লাভ হইল। আমার পরিশ্রান্ত-দেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে আমার বোন সস্নেহে আমাকে বলিলেন, "তুই বাড়ী যা। এখানে এত কষ্ট ক'রে উপার্জন করার কি প্রয়োজন? বাড়ী গিয়ে পড়াশুনা কর।"

কিন্তু এ সব উপদেশ আমার কানেও প্রবেশ করিল না। এই ভাবে প্রতিদিন সকালে উঠিয়া খবরের কাগজ বিক্রয় করিতে ছুটিতাম। রাস্তায় দাঁড়াইয়া কাগজে বর্ণিত খবরগুলি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতাম। মাঝে মাঝে কাগজের প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা দিতাম। কলিকাতা সহরে কৌতূহলী লোকের অভাব নাই। তাহারা ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আমার বক্তৃতা শুনিত। কিন্তু কাগজ কিনিত না।

কার্তিকদা

কাগজ বিক্রয় করিতে করিতে আমার কার্তিকদা'র সঙ্গে পরিচয় হইল। বিক্রমপুরের কোন গ্রামে তাঁহার বাড়ী। তিনিও খবরের কাগজ বিক্রয় করিতেন। কি ভাবে তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইল আজ সবটা মনে নাই। তবে এইটুকু মনে আছে আমার অবিক্রীত কাগজগুলি কার্তিকদাদা বিক্রয় করিয়া দিতেন। আমারই মত অনেক হকারের এটা-ওটা কাজ তিনি করিয়া দিতেন। সেই জন্য আমরা সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতাম।

আপার সার্কুলার রোডের একটি বাড়ীতে কার্তিকদাদা থাকিতেন। আমার বোনের বাড়ীতে থাকার অসুবিধার কথা শুনিয়া কার্তিকদাদা আমাকে তাঁহার বাসায় উঠিয়া আসিতে বলিলেন। আমি আট আনা খরচ করিয়া একটি মাদুর কিনিয়া কার্তিকদাদার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম; একটি ভাঙা বাড়ীর দ্বিতল কক্ষ কার্তিকদাদা ভাড়া লইয়াছিলেন। কক্ষটির সামনে প্রকাণ্ড খোলা ছাদ ছিল। সেই ছাদেই আমরা অধিকাংশ সময় যাপন করিতাম। বৃষ্টি হইলে সকলে ছাদ হইতে মাদুর গুটাইয়া আনিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইতাম। অর্থাৎ শরীর বিস্তার করিয়া কোন রকমে নিজ নিজ গুটান মাদুরগুলি ছাদ-চোঁয়ান পানি হইতে রক্ষা করিতাম।

সকাল হইলে যার যার মত খবরের কাগজ লইয়া বিক্রয় করিতে বাহির হইতাম। দেড়টা বাজিলে সকলে বাসায় ফিরিয়া আসিতাম। তার পর দুইটা আড়াইটার মধ্যে রান্না ও খাওয়া শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া যাইতাম খবরের কাগজের আফিসে। তখনকার দিনে বাংলা কাগজগুলি বিকালে বাহির হইত। রাত প্রায় আটটা নয়টা পর্যন্ত কাগজ বিক্রয় করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিতাম। তার পর রান্না-খাওয়াটা কোন রকমে সারিয়া ছাদের উপর মাদুর বিছাইয়া তাহার উপর-শ্রান্ত ক্লান্ত দেহটা ঢালিয়া দিতাম। আকাশে তারাগুলি মিটিমিটি করিয়া জ্বলিত। তাহাদের দিকে চাহিতে চাহিতে আমরা ঘুমাইয়া পড়িতাম। আকাশের তারাগুলি আমাদের দিকে চাহিয়া দেখিত কি না কে জানে?

কোন কোন রাত্রে মোমবাতি জ্বালাইয়া কার্তিকদাদা আমার কবিতাগুলি সকলকে পড়িয়া শুনাইতেন। আমার সেই বয়সের কবিতার কতটা মাধুর্য ছিল আজ বলিতে পারিব না। কারণ সেই খাতাখানা হারাইয়া গিয়াছে। আর আমার শ্রোতারা সেই সব কবিতার রস কতটা উপলব্ধি করিত তাহাও আমার ভাল করিয়া মনে নাই। কিন্তু তাহাদেরই মত একজন হকার—যে সব কাগজ তাহারা বিক্রয় করে সেই সব কাগজের লেখার মত করিয়াই সে লিখিতে পারিয়াছে, ইহা মনে করিয়া তাহারা গর্ব অনুভব করিত। কার্তিকদাদা আই, এ, পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। ননকোঅপারেশন করিয়া কলিকাতায় আসিয়া খবরের কাগজ বিক্রয় করার পেশা লইয়াছেন। তিনি নুটহামসন, ম্যাক্সিম গোর্কীর জীবনী পড়িয়াছিলেন। আমাকে লইয়া তাঁহার গর্বের অন্ত ছিল না। কোন শিক্ষিত লোকের সঙ্গে দেখা হইলেই সগর্বে আমাকে কবি বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিতেন।

আমাদের সংসার ছিল দিন আনিয়া, দিন খাওয়া। কেহই বেশী উপার্জন করিতে পারিত না। ননকোঅপারেশন করিয়া আমাদের মতই বহু ভদ্রঘরের ছেলে খবরের কাগজ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং কাগজ বিক্রয় করার লোকের সংখ্যা ছিল অত্যধিক। সারা দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াও আমাদের কেহ চার-পাঁচ আনার বেশী উপার্জন করিতে পারিত না। আমি চৌদ্দ পয়সার বেশী কোন দিনই উপার্জন করিতে পারি নাই। মাঝে মাঝে শরীর খারাপ থাকিলে বেশী ঘুরিতে পারিতাম না, সুতরাং উপার্জনও হইত না। সেই দিনটার খরচ কার্তিকদা চালাইয়া দিতেন। পরে তাঁহার ধার শোধ করিতাম। কোন কোন দিন আমার সেই বোনের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইতাম।

একদিনের কথা মনে পড়ে। কাগজ বিক্রয় করিয়া মাত্র এক আনা পয়সা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। দুই পয়সার চিড়া আর দুই পয়সার চিনি কিনিয়া ভাবিলাম, কোথায় বসিয়া খাইব? দুপুর বেলা আমার সেই বোনের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইলাম। বোন আমার শুষ্ক মুখ দেখিয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি আমার হাত হইতে সেই চিড়া আর চিনির ঠোঙ্গা ফেলিয়া দিয়া আমাকে আদর করিয়া বসাইয়া ভাত বাড়িয়া দিলেন। আমি বলিলাম, "বুবু, আপনি তো খান নাই। আপনার ভাত আমি খাব না।" বুবু বলিলেন, "আমার আজ পেট ব্যথা করছে। আমি খাব না। তুই এসে ভাল করলি। ভাতগুলি নষ্ট হবে না।" আমি সরল মনে তাহাই বিশ্বাস করিয়া ভাতগুলি খাইয়া ফেলিলাম। তখন অল্প বয়সে তাঁহার এ স্নেহের ফাঁকি (প্রতারণা) ধরিতে পারি নাই। এখন সেই সব কথা মনে করিয়া চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসে। হায় রে মিথ্যা? তবু যদি তাঁহার মায়ের পেটের ভাই হইতাম! সাতজন্মে যাহাকে কোন দিন চোখে দেখেন নাই, কত দূরের সম্পর্কের ভাই আমি, তবু কোথা হইতে তাঁহার অন্তরে আমার জন্য এত মমতা সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, আজও তাহা ভাবিয়া পাই না। এইরূপ মমতা বুঝি বাংলা দেশের সকল মেয়েদের অন্তরেই স্বতঃ প্রবাহিত হয়। বাপের বাড়ীর কোন আত্মীয়কে এ দেশের মেয়েরা অযত্ন করিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত ক্বচিৎ মেলে।

কার্তিকদাদার আড্ডায় দিনগুলি বেশ কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু আমাকে খবরের কাগজ বিক্রয় করিলেই চলিবে না। কলিকাতায় আসিয়া আমাকে লেখাপড়া করিতে হইবে। নেতাদের সাহায্যে গোলামখানা ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। এখানকার জাতীয় বিদ্যালয়ে আমাকে পড়াশুনা করিতে হইবে। আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে একদিন

জাতীয় বিদ্যালয় দেখিয়া আসিলাম। ক্লাসে যাইয়াও যোগ দিলাম। ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক সবই ইংরেজীতে পড়ান হয়। মাষ্টার একজনও বাংলায় কথা বলেন না। কারণ ক্লাসে হিন্দীভাষী ও উর্দ্দুভাষী ছাত্র আছে। বাংলায় পড়াইলে তাহারা বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু নবম শ্রেণীর ছাত্রদের কাছে ইংরেজীতে বক্তৃতা দিলে কতটাই বা তাহারা বুঝিতে পারিবে ? তাহাদের ইংরেজী বিদ্যার পুঁজি তো আমার চাইতে বেশী নয়। সুতরাং জাতীয় বিদ্যালয়ের মোহ আমার মন হইতে মুছিয়া গেল। নেতাদের মুখে কত গরম গরম বক্তৃতা শুনিয়াছি। ইংরেজ-আমলের বিদ্যালয়গুলি গোলাম তৈরি করার জন্যই তৈরি হইয়াছিল। একবার গোলামখানা ছাড়িয়া বাহিরে আইস। এখানে বসন্তের মধুর হাওয়া বহিতেছে। আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ে আসিয়া দেখ, বিদ্যার সূর্য তার সাত ঘোড়া হাঁকাইয়া কিরূপ বেগে চলিতেছে। কিন্তু গোলামখানা ছাড়িয়া তো কত দিন আসিয়াছি। বসন্তের হাওয়া তো বহিতে দেখিলাম না। জাতীয় বিদ্যালয়ের সেই সাত ঘোড়ার গতিও তো অনুভব করিতে পারিলাম না।

জাতীয় বিদ্যালয়ের এই সব মাষ্টারের চাইতে আমাদের ফরিদপুরের স্কুলের দক্ষিণা বাবু কত সুন্দর পড়ান, যোগেন বাবু পণ্ডিত মহাশয় কত ভাল পড়ান। আমার মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। সারা দিন খবরের কাগজ বেচিয়া যখন রাত্রে ছাদের উপর শুইয়া পড়িতাম, এ-পাশের ও-পাশের সহকর্মীরা ঘুমাইয়া পড়িত, কিন্তু আমার ঘুম আসিত না। মায়ের কথা ভাবিতাম, পিতার কথা ভাবিতাম। তাঁহারা যেন আমার জন্য কত চিন্তা করিতেছেন। চোখের পানিতে বালিশ ভিজিয়া যাইত। এ আমি কি করিতেছি ? এই ভাবে খবরের কাগজ বিক্রয় করিয়া জীবন কাটাইয়া দিব ? আমি লেখাপড়া শিখিব না ? মূর্খ হইয়া থাকিব ? কে যেন অদৃশ্য স্থান হইতে আমার পিঠে সপাং-সপাং করিয়া বেত্রাঘাত করিতেছে। নাঃ, আমি আর সময় নষ্ট করিব না। দেশে ফিরিয়া যাইব। দেশে ফিরিয়া যাইয়া ভালমত লেখাপড়া করিয়া মানুষ হইব। আমি সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিলাম।

দেশে ফিরিবার পূর্বে আমি কলিকাতার সাহিত্যিকদের কাছে পরিচিত হইয়া যাইব। ছেলেবেলা হইতেই আমি পরলোকগত সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরাগী ছিলাম। তাঁহার সওগাত নামক গল্প-গ্রন্থখানিতে মুসলমানদের জীবন লইয়া কয়েকটি গল্প লেখা ছিল। তাহা ছাড়া চারুবাবুর লেখায় যে সহজ কবিত্ব মিশ্রিত ছিল, তাহাই আমাকে তাঁহার প্রতি অনুরাগী করিয়া তুলিয়াছিল। আমি ভাবিলাম, তাঁহার কাছে গেলে তিনি আমাকে উৎসাহ দিবেন; এমন কি আমার একটি লেখা প্রবাসীতেও ছাপাইয়া দিতে পারেন। তিনি তখন প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

অনেক কষ্টে প্রবাসী অফিসের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া একদিন সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তখনকার দিনে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ব্রাহ্ম-সমাজের নিকটে এক বাড়ী হইতে প্রবাসী বাহির হইত। প্রবাসী অফিসের দারোয়ানের কাছে চারু বাবুর সন্ধান করিতেই দারোয়ান মোটা একটি কালো লোককে দেখাইয়া আমাকে বলিল, উনিই চারু বাবু। সুতরাং সেই ভদ্রলোকের সামনে যাইয়া সালাম করিয়া দাঁড়াইলাম। "কি চাই ?" বলিয়া তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন। আমি বলিলাম, "আমি কিছু কবিতা লিখেছি। আপনি যদি অনুগ্রহ করে পড়ে দেখেন বড়ই সুখী হব।" ভদ্রলোক বলিলেন, "আমার তো সময় নেই।" অতি বিনয়ের সঙ্গে বলিলাম, "বহু কাল হতে আপনার লেখা পড়ে আমি আপনার অনুরাগী হয়েছি, আপনি সামান্য একটু যদি সময়ের অপব্যয় করেন",—এই বলিয়া আমি বগলের তলা হইতে আমার কবিতার খাতাখানা তাঁর সামনে টানিয়া ধরিতে উদ্যত হইলাম। ভদ্রলোক যেন ছুঁৎমার্গগ্রস্ত কোন হিন্দু বিধবার মত অনেকটা দূরে সরিয়া গিয়া আমাকে বলিলেন, "আজ আমার মোটেই সময় নেই।" কিন্তু সাঁতারে পড়া লোকের মত এই তৃণখণ্ডকে আমি কিছুতেই ছাড়িতে পারিতেছিলাম না। কাকুতি-মিনতি করিয়া তাঁহাকে বলিলাম, "এক দিন যদি সামান্য কয়েক মিনিটের জন্যও সময় করেন।" ভদ্রলোকের দয়া হইল। তিনি আমাকে ছয়-সাত দিন পরে একটা নির্দিষ্ট সময়ে আসিতে বলিলেন। তখন আমার প্রবাসের নৌকার নঙর ছিঁড়িয়াছে। দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য আমার মন আকুলি-বিকুলি করিতেছে। তবুও আমি সেই কয় দিন কলিকাতায় রহিয়া গেলাম। আমার মনে স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, একবার যদি তাঁহাকে দিয়া আমার একটি কবিতা পড়াইতে পারি তবে তিনি আমাকে অতটা অবহেলা করিবেন না। নিশ্চয়ই তিনি আমার কবিতা পছন্দ করিবেন।

আবার সেই খবরের কাগজ বিক্রয় করিতে যাই। পথে পথে 'নায়ক নায়ক' বলিয়া চিৎকার করি। কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে আমার গৃহগত মনের আবেগে সিক্ত হইয়া উঠে। দলে দলে ছেলেরা বই পুস্তক লইয়া ইস্কুলে যায়। দেখিয়া আমার মন উতলা হইয়া উঠে। আমিও পড়িব। দেশে যাইয়া ওদের মত বই পুস্তক লইয়া আমিও ইস্কুলে যাইব। এত যে পয়সার অনটন, নিজের আহারের উপযোগী পয়সাই সংগ্রহ করিতে পারি না, তবুও মাঝে এক পয়সা দিয়া একটা গোলাপ ফুল কিনিতাম। দেশে হইলে কারও গাছ হইতে বলিয়া বা না বলিয়া ছিঁড়িয়া লওয়া চলিত। এখানে ফুল পয়সা দিয়া কিনিতে হয়। আমার এক হাতে খবরের কাগজের বাণ্ডিল আর এক হাতে সেই গোলাপ ফুল। সঙ্গী-সাথীরা ইহা লইয়া আমাকে ঠাট্টা করিত।

আজও আবছা-আবছা মনে পড়িতেছে—তের-চৌদ্দ বৎসরের সেই ছোট বালকটি আমি, মোটা খদ্দরের জামা পরিয়া দুপুরের রৌদ্রে কলিকাতার গলিতে গলিতে ঘুরিয়া 'চাই নায়ক, চাই নায়ক,' 'চাই বিজলী' করিয়া চিৎকার করিয়া ফিরিতেছি। গলির দুই পাশে ঘরে ঘরে কত মায়া, কত মমতা, কত শিশু মুখের কলকাকলি। গল্পে তো কত পড়িয়াছি, এমনি এক ছোট্ট ছেলে পথে পথে ঘুরিতেছিল; এক সহৃদয়া রমণী তাহাকে ডাকিয়া ঘরে তুলিয়া লইলেন। আমার জীবনে এমন ঘটনা কি ঘটিতে পারে না ? রবীন্দ্রনাথের "আপদ" অথবা "অতিথি" গল্পের সহৃদয়া মা দু'টি তো এই কলিকাতা শহরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মনে মনে কত কল্পনাই করিয়াছি। কিন্তু মনের কল্পনার মত ঘটনা আমার জীবনে কখনও ঘটিল না। আমার নিকট সুবিস্তৃত কলিকাতা শুধু ইট-পাটখেলের শুষ্কতা লইয়াই বিরাজ করিল।

একদিন খবরের কাগজ লইয়া গলিপথ দিয়া চলিয়াছি। ত্রিতল হইতে এক ভদ্রলোক হাত ইশারা করিয়া আমাকে ডাকিলেন। উপরে যাইয়া দেখি তাঁহার সমস্ত গায়ে বসন্তের

গুটি উঠিয়াছে। কোন রকমে তাঁহাকে কাগজখানা দিয়া পয়সা লইয়া আসিলাম। সেদিন রাত্রে শুধু সেই বসন্ত রোগগ্রস্ত লোকটিকেই মনে হইতে লাগিল। আর মাঝে মাঝে ভয় হইতে লাগিল, আমাকেও বুঝি বসন্ত রোগে ধরিবে।

আস্তে আস্তে চারু বাবুর সঙ্গে দেখা করার সেই নির্দিষ্ট দিনটি নিকটে আসিল। বহু কষ্টের উপার্জিত দুইটি পয়সা খরচ করিয়া একটি বাঙলা সাবান কিনিয়া ধূলিমলিন খদ্দরের জামাটি পরিষ্কার করিয়া কাচিলাম। দপ্তরীপাড়ার কোন দপ্তরীর সঙ্গে খাতির জমাইয়া কবিতার খাতাখানিতে রঙিন মলাট পরাইলাম। তার পর সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত নির্দিষ্ট সময়টিতে প্রবাসী অফিসের দরজায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। অল্পক্ষণ পরেই আমার সেই পূর্বপরিচিত চারু বাবুকে আমার সামনে দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিলাম। তিনি আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। আমি তাড়াতাড়ি সামনে যাইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহার সামনে দাঁড়াইলাম। তিনি পূর্ব দিনের মত করিয়াই আমাকে প্রশ্ন করিলেন, "তা কি মনে করে?" আমি তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলাম, "আপনি আমাকে আজ এই সময় আসতে বলেছিলেন। আপনি যদি আমার দু'একটি কবিতা দেখে দিতেন"...

তিনি নাক সিঁটকাইয়া বলিলেন, "দেখুন কবিতা লিখে কোনই কাজ হয় না। আপনি গদ্য লিখুন"। আমি আমার পদ্য লেখা খাতাখানা সামনে ধরিয়া বলিলাম, "আমি তো গদ্যও কিছু লিখেছি।" ভদ্রলোক দাঁত খিঁচাইয়া ধমকের সঙ্গে বলিলেন, "মশায়, আপনি কি ভেবেছেন আপনার ঐ আজে-বাজে লেখা পড়ার সময় আমার আছে?" এই বলিয়া ভদ্রলোক আগাইয়া চলিলেন। কিছুতেই আমার বিশ্বাস হইতেছিল না, আমার ধ্যানলোকের সেই সাহিত্যিক চারু বাবু ইনিই হইতে পারেন। ভদ্রলোকের চাকর মাছের খালুই হাতে করিয়া তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতেছিল। আমি যাইয়া তাহাকে ভদ্রলোকের নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। চাকর কি একটা নাম যেন বলিল। তাহাতে বুঝিতে পারিলাম, তিনি চারু বাবু নহেন।

আবার রামানন্দ বাবুর বাড়ীতে যাইয়া কড়া নাড়িতেই এক নারী-কণ্ঠের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তাহার নিকট হইতে চারুবাবুর ঠিকানা লইয়া শিবনারায়ণ দাস লেনে তাঁহার বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। খবর পাঠাইতেই আমাকে দ্বিতলে যাইবার আহ্বান আসিল। অর্ধশায়িত অবস্থায় সেই আগের লোকটির মতই তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, "কি চাই?" ঘরে বোধ হয় আরও দু'-এক জন ভদ্রলোক ছিলেন। একে ত পূর্বের লোকটির কাছ হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া আসিয়াছি, তার চিহ্ন বোধ হয় মুখে-চোখে বর্তমান ছিল। তার উপরে একতলা হইতে দ্বিতলে উঠিয়া শ্রান্তিতে দীর্ঘ নিশ্বাস লইতেছিলাম, কোনরকমে বলিলাম, " আমার কিছু কবিতা আপনাকে দেখাতে এসেছি।" ভদ্রলোক অতি কর্কশ ভাবে আমাকে বলিলেন, "তা আমার বাড়ীতে এসেছেন কবিতা দেখাতে?" আমার কল্পলোকের সেই চারুবাবুর কাছে আমি এই জবাব প্রত্যাশা করি নাই। আমি শুধু বলিলাম, "আমার ভুল হয়েছে, আমাকে মাফ করবেন।"

এই বলিয়া রাস্তায় নামিয়া আসিলাম। তখন সমস্ত আকাশ-বাতাস আমার কাছে বিষে বিষায়িত বলিয়া মনে হইতেছিল। ইচ্ছা হইতেছিল, কবিতার খাতাখানা ছিঁড়িয়া টুকরা-টুকরা করিয়া আকাশে উড়াইয়া দেই। নিজের কার্যশক্তির উপর এত অবিশ্বাস আমার কোন দিনই হয় নাই। আজ এই সব লোককে কত কৃপার পাত্র বলিয়া মনে করিতেছি। কি এমন হইত, গ্রামবাসী এই ছেলেটিকে যদি তিনি মিষ্টি কথা বলিয়াই বিদায় দিতেন? যদি একটা কবিতাই পড়িয়া দেখিতেন, কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হইত?

আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলার অধ্যাপক, চারুবাবু তখন জগন্নাথ কলেজে পড়ান। একবার আলাপ-আলোচনায় এই গল্প তাঁহাকে কিছুটা মৃদু করিয়া শুনাইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, "আমার জীবনে এই ঘটনা ঘটেছে, এটা সবই অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে।" বস্তুতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে চারু বাবু বহু অখ্যাত সাহিত্যিককে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

কবি মোজাম্মেল হকের সহিত

আমার কলিকাতা আসার সকল মোহ কাটিয়া গিয়াছে, একবার বাড়ী যাইতে পারিলেই হয়। কিন্তু আমার সঙ্গে যে টাকা আছে তাহাতে রেল-ভাড়া কুলাইয়া উঠিবে না। ফরিদপুরের তরুণ উকিল অধুনা পাকিস্তান গণ-পরিষদের সভাপতি মৌলবী তমিজউদ্দিন সাহেব তখন ওকালতি ছাড়িয়া কলিকাতা জাতীয় কলেজে অধ্যাপনা করিতেছেন। তিনি ছোটকাল হইতেই আমার সাহিত্য-প্রচেষ্টায় উৎসাহ দিতেন। তাঁহার নিকটে গেলাম বাড়ী যাইবার খরচের টাকা ধার করিতে। তিনি হাসিমুখেই আমাকে একটি টাকা ধার দিলেন আর বলিলেন, "দেখ, ভোলার কবি মোজাম্মেল হক সাহেবের সঙ্গে আমি তোমার বিষয়ে আলাপ করেছি। তুমি যদি তাঁর সঙ্গে দেখা কর, তিনি তোমাকে উৎসাহ দেবেন, এমন কি তোমার দু'-একটি লেখা ছাপিয়েও দিতে পারেন।"

মোজাম্মেল হক্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার আমার বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু তমিজউদ্দিন সাহেব আমাকে বার বার করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি অবশ্য অবশ্য মোজাম্মেল হক্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে যেও!" সুতরাং সাধারণ কৌতূহলের বশেই মোজাম্মেল হক্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি তখন কারমাইকেল হোষ্টেলে থাকিতেন। মোজাম্মেল হক্ সাহেব আমার কয়েকটি কবিতা পড়িয়া খুবই প্রশংসা করিলেন এবং আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "বৎসরের প্রথম মাসে আমার পত্রিকায় কোন নূতন লেখকের লেখা ছাপি না। কিন্তু আপনার লেখা আমি বৎসরে প্রথম সংখ্যাতেই ছা'পব।"

আমি মুসলমান হইয়া কেন মাথায় টুপী পরি নাই এই বলিয়া তিনি আমাকে অনুযোগ করিলেন। আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। আমি বাড়ী হইতে টুপী লইয়া আসি নাই, আর এখানে টুপী কেনার যে আমার পয়সা নাই সে কথা বলিতে পারিলাম না। সে আজ তিরিশ বৎসরেরও আগের কথা। তখনকার দিনে মুসলমানের অধিকাংশই ধুতি পরিতেন, আর মাথায় টুপী পরিতেন। বড়রা সকলেই দাড়ি রাখিতেন। আজ নতুন ইস্‌লামী জোস্ লইয়া মুসলমান-সমাজ হইতে টুপী ও দাড়ি প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

মোজাম্মেল হক্ সাহেব আমাকে আরও বলিয়াছিলেন, "আপনি অবশ্য অবশ্য হাবিলদার কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি আপনার লেখার আদর করবেন। আপনার লেখার সঙ্গে তাঁহার লেখার সাদৃশ্য আছে।"

দুই নগরের গল্প

চার্লস ডিকেন্স

প্রথম পর্যায়

১

সে এক আশ্চর্য ক্রান্তিকাল। সময়ের আলো-আঁধারিতে ইতিহাসের গোধূলি। আশ্বাসে-নৈরাশ্যে খণ্ডিত। জ্ঞানের সঙ্গে সংঘর্ষ ছিল অবিদ্যার। বিশ্বাসের সঙ্গে দ্বিধার। মনে হোত, ভবিতব্য উপহার সাজিয়ে বসে আছে মানব-যাত্রীদের জন্য। যেন ভবিষ্যতের তিমিরান্ধকার সূচীভেদ্য। স্বর্গ-নরকের কিনারা নেই। অথচ সেকালে-একালে পার্থক্য ছিল না কণা মাত্র। কেবল যুগধর্মী সমালোচকেরা সে যুগের আতিশয্যকে বোঝাতে বিশেষণ জুড়তেন সবিস্তারে।

তখন ইংলণ্ডের মসনদে এক চওড়া চোয়াল রাজা আর তাঁর সাদামাটা রাণী। ফ্রান্সের সিংহাসনেও তেমনি এক চওড়া চোয়াল রাজা। তাঁর রাণী পরমাসুন্দরী। দুই দেশেই সমাজের বড়বাবুরা নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাতেন। কোন ভাবনা নেই। সব ঠিক হ্যায়।

সতেরোশ' পঁচাত্তর সালের কথা। তখনো ইংলণ্ডের লোকের বিশ্বাস ছিল দৈববাণীতে। বিশ্বাস ছিল ভূত প্রেত দৈত্য দানোতে। তারা মানত অপদেবতার ভর। ক্রীশ্চান পুরোহিতেরা বুজরুকি আর ভেলকি দেখিয়ে লোককে ইহলোকের না হোক পরলোকের খবর দিত। পৃথিবীর খবরের মধ্যে একটি ছিল সামান্য জরুরী। আমেরিকায় বসতি করা ইংরেজ প্রজাদের খবর। অথচ আশ্চর্য যে অপদেবতা আর ভেল্কি ছাপিয়ে সেই নগণ্য সংবাদটুকু শুধু সপারিষদ রাজা নয় আপামর প্রজাদেরও দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল।

ফরাসীরা ধর্মাধর্ম নিয়ে তত মাথা ঘামাত না। রাজা কাগজের নোট ছাপিয়ে দরাজ হাতে ছড়িয়ে দিতেন। আর প্রজারা মহানন্দে উচ্ছন্নে যাবার রাস্তা দেখত। এখানেও লোকের আত্মার মঙ্গলের ভার ছিল পুরোহিতদের উপর। একশ' হাত দূর দিয়ে যাওয়া এক পুরোহিতের মিছিল দেখেও বৃষ্টির মধ্যে জানু পেতে বসেনি—এই অপরাধের শাস্তি হোত হাত কেটে জিব টেনে উপড়ে নেওয়া। গীর্জার এই শাস্তি লোকে নির্বিবাদে মেনেও নিত। জীবন্ত পুড়িয়ে মারা ছিল পুরোহিতদের অসম্মানের সাজা। হয়ত বা এই সব অনাচার-অত্যাচারের প্রতিবাদে কখন অলক্ষ্যে ইতিহাসের ভাগ্যবিধাতা কাঠুরিয়া ফ্রান্স নরওয়ের অরণ্যে বৃহৎ বনস্পতিদের কঙ্কালে গড়ে তুলেছিল এমন এক ভবিতব্যের কাঠামো যা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। হয়ত বা সুন্দরী প্যারিসের গা-লাগা কোন চাষার জমিতে মুরগী-শূয়োরের খামারের ধারে রোদে-জলে পোড়া একখানা দু'চাকা গাড়ীকে কিষাণ মৃত্যু এক মহা দুর্দিনের জন্য জিইয়ে রাখছিল। কিন্তু সেই কাঠুরিয়া ও চাষার নিঃশব্দ অবিরাম কাজের হদিস রাখেনি কেউ। সে মহা বিপ্লবের পদধ্বনিতে যারা জেগে সচকিত হচ্ছিল তারা কেউ সাড়া দিত না। যে সাড়া দেবে সে ত পাষণ্ড ধর্মদ্রোহী বেইমান।

এমন আইন-শৃঙ্খলার বালাই ছিল না ইংলণ্ডে যা নিয়ে লোকে দম্ভ করতে পারে। খাস রাজধানীতে সশস্ত্র গুণ্ডার দল প্রতি রাত্রে রাহাজানি করত। পথে লুঠপাটের বিরাম ছিল না। বাড়ীতে আসবাবপত্র রেখে বাইরে যাবার উপায় ছিল না। সব-কিছু দোকানে জমা রেখে তবে নিশ্চিন্তে লোকে বাড়ী খালি করে বিদেশ যেত। দিনে যিনি সহরের এক জন গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বন্ধু, রাতের আঁধারে তিনি এক কুখ্যাত গুণ্ডা। তাঁর এক পরিচিত ব্যবসায়ীই তাঁকে গা-আঁধারী আলোয় চিনে ফেলার অপরাধে তাকে গুলী করে উধাও হয়ে গেল। সাত জনে এক জেলের প্রহরীকে ঘিরে ফেলায়, প্রহরী তিন জনকে গুলী করে মারে। তার পর বারুদ ফুরিয়ে যাওয়ায় বাকি চার জনে প্রহরীকে হত্যা করে নিশ্চিন্তে মেল-ব্যাগ লুঠ করে নিয়ে পালায়। জেলের ভিতর কয়েদীদের সঙ্গে প্রহরীদের নিত্য খুনোখুনি লেগে থাকে। বড়ো বড়ো অভিজাত আসরে লোকের গলা থেকে হীরা মুক্তা টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যায় বাটপাড়দের দল। গীর্জার শান্ত-পবিত্র আবহাওয়ায় লুঠের মালের বখরা নিয়ে বচসা শেষে খুনে শেষ হয়। পুলিশ গুলী করে ডাকাতদের। তারা পালটা জবাব দেয়। এমনি চলে দিনের পর দিন। এই সব নোংরা জঘন্যতা নিয়ে কেউ-ই মাথা ঘামায় না। শুধু এক জনের কাজের বিরাম থাকে না। সে জল্লাদ। লম্বা সারিতে ফাঁসীর দড়ি সাজিয়ে সে নানা শ্রেণীর অপরাধীকে পরলোকের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। মঙ্গলবারে ধরা পড়া সিঁদেল চোরের ফাঁসী হয় শনিবারে। নিউ গেটের মুখে মানুষ পোড়ে। ওয়েস্টমিনিষ্টার হলের বাইরে—পোড়ে নানা পুস্তিকা ইস্তাহার। আজ যেখানে এক সাংঘাতিক খুনীর ফাঁসী হোল, কাল সেখানে ফাঁসীতে মরল এক সিঁধেল চোর।

এ সব সতেরোশ' পঁচাত্তর সালের শেষাশেষি ঘটনা। আর এই পরিস্থিতির মধ্যে ইতিহাসের কারিগর অস্ত্রে শাণ দিয়ে কাঠামো তৈরী করে। বিপ্লবী মৃত্যু করে সর্বনাশের উদ্যোগপর্ব। আর দুই দেশের দুই চওড়া চোয়াল রাজা আর তাদের পত্নীরা নিজেদের খেয়াল চরিতার্থ করে যায় বিধিদত্ত ক্ষমতার আত্মপ্রবঞ্চনায়। এমনি করে বৃহৎ-ক্ষুদ্র মিলিয়ে এক বিরাট মানব-পরিবার অমোঘ নিয়তির টানে এগিয়ে চলে ইতিহাসের ক্রান্তিকালে।

২

শেষ নভেম্বরের এক শুক্রবার রাত্রে যে লোকটি ডোভার রোড ধরে পদব্রজে পাহাড়ের চড়াই পার হচ্ছিলেন, তাঁর সঙ্গে এই ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সম্মুখে ডোভার ডাকগাড়ী ধীর-গতিতে পাহাড়ের পথ বেয়ে উপরে উঠছিল। অন্য দু'জন যাত্রীর

সঙ্গে তিনিও যে কর্দমাক্ত পার্বত্যপথে পদব্রজে যাচ্ছিলেন, সে ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করার জন্য নয়। এই পার্বত্য চড়াই পথ, এই কর্দম এবং ডাকগাড়ীর গুরুভারে অশ্বেরা ইতিপূর্বে তিন বার বিদ্রোহী হয়ে গতি বন্ধ করেছিল। একবার যাত্রাস্থলে ফেরার জন্য রুখে উঠেছিল। কিন্তু বলগা আর চাবুকে তারা আবার কর্তব্যনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। নিকৃষ্ট প্রাণীদের মধ্যেও যে যুক্তিবোধ আছে এই ঘটনায় তা আর একবার প্রমাণিত হোল।

ভারী কর্দম ঠেলে ডাকগাড়ী এগোচ্ছে শম্বুকগতিতে। অশ্বের দল মাথা নামিয়ে লেজ ঝাপটে গভীর কর্দম ভাঙছে কঠিন পরিশ্রমে। এক একবার যখন হোঁচট লাগছে, বোধ হচ্ছে যেন তাদের হাড় গুঁড়ো হয়ে গেল। যত বার গাড়োয়ান রাশ টেনে গাড়ী থামাচ্ছে ঘোড়াদের বিশ্রাম দেবার জন্য, তারা মাথা ঝাঁকিয়ে এমন উচ্চ শব্দ তুলছে যে যাত্রীরা সচকিত হয়ে উঠছে আশঙ্কায়। অশ্বেরা যেন সশব্দে ঘোষণা করছে যে, এই দুর্গম পথে আমরা আর ভারী ডাকগাড়ী বইতে পারব না।

পর্বত-কন্দরে সঞ্চিত উষ্ণ বাষ্প গিরি-অরণ্যপথ আবৃত করে উপরে উঠে আসছে। যেন কোন নিঃসঙ্গ প্রেতসত্তা কাউকে আশ্রয় করে বিশ্রাম নেবার আশায় ঘুরে মরছে ব্যর্থ-মনোরথে। রাতের হিমেল কুয়াশা ছোট ছোট তরঙ্গে আবর্তিত হয়ে চারি দিক ব্যাপ্ত করে লুপ্ত করে এগিয়ে আসছে। যেন কোন অমঙ্গলের সমুদ্রজলে মগ্ন হচ্ছে দিগ্‌দিগন্তর। সেই কুয়াশায় ডাকগাড়ীর আলো নিষ্প্রভ। আশে-পাশে সম্মুখে পশ্চাতে শুধু রাশি রাশি অন্ধকার। পরিশ্রান্ত অশ্বদের নাসা থেকে নির্গত প্রশ্বাস উষ্ণ বাষ্পাকারে উপরে উঠছে।

তিন জন যাত্রীরই সর্বাঙ্গ ভারী পোষাকে ঢাকা। আর দেহই শুধু নয়, মনও তাদের সম্পূর্ণ আড়াল করা। কেউ কারুর পরিচয় জানে না। এর কারণ, সেকালে পথচারীদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হোত। পথের যে কোন সহযাত্রী আচম্বিতে দস্যু বা দস্যুর সাগরেদ-রূপে আত্মপ্রকাশ করলে বিস্মিত হবার কিছু ছিল না। অস্ত্রের পেটিকার উপর কড়া নজর রেখে ডাকগাড়ীর পাহারাদারও সেদিন এই কথাই ভাবছিল।

ডাকগাড়ীর যা রীতি এখানেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। প্রহরীর সন্দেহ যাত্রীদের। যাত্রীর আতঙ্ক সহযাত্রী ও প্রহরী। আপনাকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করে না এরা। শুধু অশ্বগুলিকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত নয় গাড়োয়ান।

'ও: হো'—গাড়োয়ানের চীৎকার শোনা যায়—'আর একটা দৌড় বাপধনরা, তাহলেই পাহাড়ের টঙে উঠে পড়ব আমরা। কী যন্ত্রণায় যে পৌঁছে দিচ্ছি সে আমিই জানি।'

'কে হে?' পাহারাদারের গলা।

'ক'টার ঘড়িতে যা দিল?'

'এগারোটা বেজে গেছে।'

'হা কপাল! আর আমরা চড়াই শেষ করতে পারলাম না। এঃ এঃ। চ বাবারা চ চ!'

ডাকগাড়ী আবার সেই পার্বত্য পথ ভেঙে কাদা ঠেলে এগোতে লাগল। যাত্রীরা এতক্ষণ বিশ্রাম নিচ্ছিল, এবার গাড়ীর পাশে পাশে চলতে লাগল।

শেষ দৌড়ে ডাকগাড়ী গিয়ে পৌঁছল মাথায়। অশ্বেরা আবার বিশ্রাম পেলে। পাহারাদার নেমে উৎরাইএর জন্য গাড়ীর চাকাগুলি সাফ করে দিলে। যাত্রীরা বসবেন বলে গাড়ীর দরজা খুলে দিলে।

'হুঁসিয়ার হো!' এমন সময় গাড়োয়ান সামনে থেকে চেঁচিয়ে ওঠে।

'কী হোল?'

'এই পথে ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে।'

'ঘোড়ার খুরের আওয়াজই বটে।' উঠে দাঁড়িয়ে পাহারাদার যাত্রীদের সতর্ক করে দেয়। তার পর বন্দুক বাগিয়ে নিয়ে বিপদের জন্য তৈরী থাকে।

আমাদের পরিচিত লোকটি সেই মাত্র পাদানীতে পা দিয়ে গাড়ীর ভিতর ঢুকছিল। বাকী দু'জন তাঁর পিছনে। সেই অবস্থায় তিন জনেই স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রহরী গাড়োয়ান যাত্রী সবাই উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল সেই অশ্বখুরধ্বনি।

সেই পার্বত্য পথে এতক্ষণ অবধি কেবল ডাকগাড়ীর ঘরঘড়ানি নৈশ বাতাসকে প্রকম্পিত করছিল। এখন সেই কুয়াশা-ঢাকা রাত্রি যেন মৌন উৎকণ্ঠায় রোমাঞ্চিত হল। অজানিত আশঙ্কায় যাত্রীদের হৃদ্‌স্পন্দন যেন শব্দময় হয়ে উঠেছে। কণ্টকিত নিস্তব্ধতা, সেই হিমেল রাত্রির রহস্য আর শ্রান্ত যাত্রীদের উদ্বিগ্নতা, সব মিলে যেন শঙ্কা মূর্তিমান হয়ে উঠল।

পাহাড়ের ঊর্দ্ধমুখী পথে বেগে ধাবমান অশ্বখুরধ্বনি মুহূর্তে মুহূর্তে নিকটবর্তী হচ্ছে।

'রো—খো' বুক ফাটিয়ে চীৎকার করল প্রহরী। 'রো-খো। নয় তো আমি গুলী করব।'

চকিতে সেই ধ্বনি থামল। তার পর ঘন কুয়াশার অন্তরাল থেকে প্রশ্ন এল—'ডোভারের ডাকগাড়ী নাকি?'

'কে তুমি?'

'এ কি ডোভারের ডাকগাড়ী?'

'কি তোমার দরকার?'

'এক জন যাত্রীর খবর চাইছি?'

'কি নাম?'

'মিঃ জার্ভিস লরি।'

আমাদের পরিচিত যাত্রীটির আচরণে সবাই তাঁর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি হানলে।

'যেখানে আছ সেখান থেকে নড়বে না।' প্রহরী অদৃশ্য অতিথিকে উদ্দেশ করে বললে—'একবার ভুল হলে সারা জীবনে তা আর শুধরে নেওয়া চলবে না। মিঃ লরি, আপনি সাড়া দিন।'

ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে লরি বললেন—'কি দরকার? জেরির গলা মনে হচ্ছে।'

'আপনার জন্যে টি এ্যাণ্ড কোম্পানি থেকে খবর এনেছি। আমি জেরি।'

'লোকটি আমার পরিচিত' বলে লরি পাদানী থেকে পথে নামলেন। বাকী দু'জন রূঢ় হাতে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে গাড়ীর ভিতর গিয়ে বসল। দরজা বন্ধ করে জানলা তুলে তারা নিশ্চিন্ত হল। 'কাছে আসতেও পারে। সাবধানের বিনাশ নেই।'

'পা ফেলে ফেলে এগিয়ে এসো' ভারী গলায় বললে পাহারাদার—

'হাতে যদি কিছু থাকে, হাত মাথার ওপর তুলে এগোবে। নইলে এই সীসের গুলীতে ঝাঁঝরা করে দোবো।'

সেই তরঙ্গময় কুয়াশা-সমুদ্রের অভ্যন্তর হতে অশ্বারোহী এগিয়ে এসে ডাকগাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে লরির হাতে একখানি কাগজ দিলে। বিদ্যুৎবেগে ছুটে আসার চিহ্ন অশ্বটির স্বেদসিক্ত দেহে। ঘোড়ার খুর থেকে অশ্বারোহীর টুপির প্রান্ত অবধি পদোৎক্ষিপ্ত কর্দম।

শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে লরি বললেন—'প্রহরী!'

সতর্ক প্রহরীর দুই হাত বন্দুক বারুদে উন্মুখ। সে কাটা জবাব দিলে, 'বলুন স্যার!'

'ভয়ের কিছু নেই। টেলসন ব্যাঙ্কে কাজ করি আমি। লণ্ডনের টেলসন ব্যাঙ্ক নিশ্চয়ই জানো তুমি। এখন প্যারিস যাচ্ছি ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে। এই নাও তোমার জলখাবার। 'চিঠিটা পড়ে নি?'

'চটপট সেরে নেবেন কিন্তু।'

গাড়ীর বাতির কাছে গিয়ে কাগজটি খুলে ফেললেন তিনি। প্রথমে মনে-মনে পড়ে নিয়ে তার পর সরবে পড়লেন—'শ্রীমতীর জন্য অপেক্ষা করবে ডোভারে! দেখলে ত ভাই, মোটেই দেরী হোল না। আচ্ছা জেরি, তুমি গিয়ে আমার এই জবাবে জানাবে—বেঁচে উঠেছি।'

ঘোড়ার পিঠের উপর নড়ে বসল জেরি। "এ কি অদ্ভুত জবাব!'

'যা বললাম তাই গিয়ে জানাবে। তাহলেই তারা জানবে যে আমি ঠিক ঠিক পেয়েছিলাম পত্র। সাবধানে যাবে। আচ্ছা, গুড নাইট।'

লরি এই কথা বলে ডাকগাড়ীর ভিতর গিয়ে আসন নিলেন। বাকী দু'জন আরোহী ইতিমধ্যে তাদের দামী ঘড়ি, আঙটি ও টাকার থলে ভারী বুটের মধ্যে গোপন করে ফেলেছিল। এখন তারা নিদ্রার ভাণ করে পড়ে রইল।

এতক্ষণে গাড়ী উৎরাই-পথে নামতে লাগল। কুয়াসা আরও ভারী হয়ে জড়িয়ে ধরছে ডাকগাড়ীটিকে। প্রহরী এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে তার বন্দুক বারুদ রাখলে যথাস্থানে। পরীক্ষা করে দেখলে তার জরুরী কাজের মালগুলি যথাস্থানে আছে কি না।

তার পর মৃদু স্বরে গাড়োয়ান ডাকলে, 'টম'।

'হ্যালো—জো।'

'জবাবটা শুনেছিলে?'

'শুনলাম বৈ কি?'

'কিছু বুঝলে?'

'মোটেই না।'

'কি আশ্চর্য! আমিও মাথা-মুণ্ডু কিছু বুঝতে পারিনি।'

সেই জমাৎজোড়া কুয়াশা আর অন্ধকারের মধ্যে জেরি ততক্ষণে নিশ্চিন্ত মনে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়েছে। ক্লান্ত অশ্বকে হাঁফ ছাড়তে দিয়ে সে নিজের মুখ, জামা-কাপড় যথাসাধ্য পরিষ্কার করে নিলে। সেইখানে দাঁড়িয়ে সে শুনতে লাগল তীব্রবেগে গড়িয়ে যাওয়া ডাকগাড়ীর চক্রধ্বনি। এক সময় সে শব্দও মন্দীভূত হয়ে এল। তখন নির্জন নিস্তব্ধ পার্বত্য-পথে জেরি অশ্ব-সঙ্গী নিয়ে ধীর পায়ে নামতে লাগল।

বেঁচে উঠেছি। আচ্ছা জবাব ত! কিন্তু তুমি জানো না জেরি, এ মামুলী উত্তর নয়। যদি কোন দিন এমনি বেঁচে ওঠা ঘন ঘন ঘটতে থাকে তবে পরিস্থিতি ঘোরালো সাংঘাতিক হয়ে উঠবে। কিন্তু তাতে তোমার বিপদ কমবে না।

৩

দুনিয়ার প্রত্যেকটি লোক আপন খোলসের মধ্যে কি গভীর গোপন,—কি গূঢ় রহস্যময়, ভাবলে আশ্চর্য লাগে। রাতের অন্ধকারে নগরীর ভীড় করা প্রতিটি গৃহের ছায়াবৃত গোপনীয়তা কত গভীর! শুধু গৃহ কেন, প্রতিটি কক্ষের নিজের রহস্য। প্রতিটি স্পন্দিত হৃদয়ের গভীরে কত অন্তর্মূল গোপন কামনা-বাসনা। হয়ত বা ভয়, হয়ত বা সে বিভীষিকা মৃত্যুর। এ প্রিয় গ্রন্থের পৃষ্ঠা আর ওলটাতে পাই না। কোন দিন এ গ্রন্থের বস্তু-সম্ভার সব জানব, সে আশাও সুদূরপরাহত মনে হয়। একদা ক্বচিৎ আলোকপাতে যে অতল জলরাশি মধ্যে দেখেছিলাম গুপ্ত কত রত্নরাজি, কত উপাদান সামগ্রী, চিরকালের মত সে সকল আমার নয়নের অগোচর হয়ে গেছে। একটি পৃষ্ঠা পাঠের পর এক বসন্ত দিনে সে গ্রন্থ চিররুদ্ধ হয়ে যাবে এই বুঝি ছিল নিয়তির নির্দেশ। আলোকিত জলাভ্যন্তরে যে রহস্য আমি নিরীক্ষণ করেছিলাম, সহসা কার ইঙ্গিতে তা অগাধ তুষারে রূপান্তরিত হ'ল! নির্বোধের মত আমি সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার বন্ধু নিয়েছে, প্রতিবেশী নিয়েছে, প্রাণপ্রিয় যে ভালবাসার ধন তাও ছিনিয়ে নিয়েছে মৃত্যু। আমার সত্তার যে নিগূঢ় গোপনীয়তা তার ভার আমি বইব সারা জীবন।

ঢিলে পদক্ষেপে চলেছিল অশ্বারোহী জেরি। পানশালায় যত বার সে থামল, ইচ্ছা করে নির্বাক্ হয়ে রইল। মাথার টুপিটি সযত্নে যথাস্থানে রক্ষা করতে লাগল।

'না—না' আপন মনে বিড়-বিড় করলে সে—'এ সব তোমার পোষাবে না বাপু। তুমি ভাল মানুষ। ব্যবসায় করে তোমার চলে। তোমার কি এ সব পোষায়। বেঁচে উঠেছি। লোকটা নিশ্চয়ই মাতাল অবস্থায় জবাব দিয়েছে।'

যত বার উত্তরটা মনে পড়ল পত্রবাহক কিছুতেই তার অর্থ করতে পারলে না। বুদ্ধি যেন ঘুলিয়ে যেতে লাগল।

টেলসন ব্যাঙ্কের প্রহরীকে সে জানাবে এই জবাব। প্রহরী জানাবে বড়কর্ত্তাদের। ততক্ষণ অবধি রাত্রি গভীরতম হবে। নগরীর পথে নৈশ ছায়াদের রহস্যের চেয়ে অনেক বেশী রহস্যময় এই জবাব।

রাত্রির প্রহর এগিয়ে চলে। তিন জন যাত্রী নিয়ে পুরানো ডাকগাড়ী সশব্দে দুলে দুলে এগিয়ে চলে। আর আরোহীদের আধ-জাগ্রত চক্ষের সমক্ষে রাত্রি নানা রহস্যমূর্তি নিয়ে ধরা দিতে লাগল।

ডাকগাড়ীতে ব্যাঙ্কের বিভ্রম ঘটল। ঝোলান চামড়ার মধ্যে হাত আটকে আমাদের পরিচিত যাত্রীটি তন্দ্রাতুর চোখে বসেছিলেন। গাড়ীর ঝাঁকুনিতে শরীর হেলে পড়ছে বার বার। ছোট জানলাটি আর বাতির টিমটিমে আলোয় মনে হচ্ছে যেন সামনের ঐ দুটি মনুষ্য মূর্তি মোটা টাকাভরা থলি। বগ্‌গার ঝনঝনানি যেন টাকার ঝঙ্কার। বিরাট টাকার লেনদেন হচ্ছে বিজড়িত চোখের সমুখে। একটু পরেই সেই ভূগর্ভস্থ ট্রংরুমের দৃশ্য উদ্ঘাটিত হল মনশ্চক্ষে। মস্ত এক চাবী আর একটি বাতি নিয়ে তিনি সেই ঘরে প্রবেশ

করলেন। বহু দিন পূর্বেকার পরিচিত সেই সব বস্তু-ভার ঠিক তেমনি রয়েছে। একটুকু বদল হয়নি।

রাত্রির কুয়াশা আর তিমিরান্ধকার মনে যেন আফিমের নেশা লাগিয়েছে। ব্যাঙ্কের স্বপ্নের সঙ্গে আর একটি ধারণা সারা রাত্রি ধরে মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। যেন কবর খুঁড়ে কা'কে বার করতে যাচ্ছেন।

রাত্রির পটভূমিকায় সেই অগণিত ছায়ামূর্তির মধ্যে কোন্‌টির সাদৃশ্য আছে সেই মৃত মুখটির সঙ্গে তার হদিস মেলে না। সব ক'টি মুখেই সেই পঁয়তাল্লিশ বছরের ছাপ। পার্থক্য শুধু ব্যঞ্জনায়, আর তার গলিত বীভৎসতায়। কিন্তু মুখ সব একই। সবগুলিই বিবর্ণ শ্বেত। সেই প্রেতায়িত ছায়ামূর্তিকে শত বার করে প্রশ্ন করলেন তন্দ্রাচ্ছন্ন যাত্রী।

'কত দিন রয়েছ কবরে ?'

প্রত্যেকটি ছায়া-মুখ সেই একই উত্তর দিলে—'হোল বৈ কি ষোলো বছর।'

'কবর থেকে আর উদ্ধারের আশা ছিল কি ?'

'সে আশা বহু দিন ত্যাগ করেছি।'

'তুমি আবার বেঁচে উঠবে ?'

'তাই ত শুনছি।'

'বাঁচার ইচ্ছা হয় ?'

'তা বলতে পারি কই ?'

'সে মেয়েটিকে ইচ্ছে করে দেখতে ? আসবে তাকে দেখতে ?'

এ কথার কত রকম উত্তর পেলেন তিনি। একবার ভাঙা গলায় জবাব পেলেন—তাড়াতাড়ি কোরো না। তাকে হঠাৎ দেখলে আমি মরে যাবো।' একবার কান্না-ঝরা মুখে শুনলেন মিনতি—'আমায় নিয়ে চল তার কাছে।' কখনো বা সে মুখে অগাধ বিভ্রান্তি। নিষ্পলক দৃষ্টি তুলে বললে—'কে সে? আমি তাকে চিনি না। বুঝতে পারছি না তোমার কথা।'

একটি উত্তর শোনেন আর তাঁর স্বপ্ন-প্রমত্ত মন মৃত্তিকা খুঁড়তে থাকে। কখনো শাবল দিয়ে—কখনো সেই মস্ত চাবিটা দিয়ে, কখনো বা খালি হাতে। এক সময় সেই বীভৎস গলিত শবটাকে কবর থেকে তোলেন। শবের মুখে-কেশে মাটি। কিন্তু হঠাৎ যেন সেই মৃতদেহ ধ্বসে গুঁড়িয়ে পড়ে মাটিতে। চমকে ওঠেন তিনি। ডাকগাড়ীর জানালা নামিয়ে বাইরের কুয়াসা আর বৃষ্টির স্পর্শ নেন গালে মুখে। বাস্তবের স্পর্শে স্বপ্নের ঘোর কাটে।

আবার কখন সব একাকার হয়ে যায়। রাত্রির বাস্তব ঘটনার সঙ্গে স্বপ্নের আচ্ছন্নতা মিলে-মিশে যায়। সব যেন আবছায়া অস্পষ্ট হয়ে আসে। শুধু আচ্ছন্নতার মধ্যে সেই প্রেতমূর্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে আবার।

'কত দিন রয়েছ কবরে ?'

'তা হোল বৈ কি, প্রায় আঠার বছর।'

'বাঁচতে ইচ্ছা করে ?"

'কি জানি।'

আবার সেই মাটি খোঁড়া। মাটি খুঁড়তে গিয়ে কখন সমুখের যাত্রীদের গায়ে আঘাত দেন। তারা আপত্তি করে। তখন চেতনা ফেরে। কিন্তু সে কতক্ষণ। আবার সেই ঘোর লাগে। আবার। আবার।

এক সময় জানলা নামিয়ে দেখেন কুয়াশা কেটে গেছে। পার হয়েছে রাত্রি। দিন আসন্ন দিগন্তে। সূর্য উঠছে পাহাড়ের পাশ দিয়ে। মাটি বন পর্বত এখনও হিম। নির্মল স্বচ্ছ আকাশে দিনদেবের উষ্ণতা।

সেই নবোদিত সূর্যের দিকে তাকিয়ে আপন মনে বললেন তিনি—'আঠারো বছর! হা ভগবান, আঠারো বছর জীবন্ত কবরে পাঠানো! আঠারো বছর!'

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীশিশির সেনগুপ্ত ও শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী।

দুর্গার বিয়ে

আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ি সংসার কাঁদিয়ে॥
মা কাঁদেন মা কাঁদেন ধূলায় লুটায়ে।
সেই যে-মা পলাকাটি দিয়েছেন গলা সাজায়ে॥
বাপ কাঁদেন বাপ কাঁদেন দরবারে বসিয়ে।
সেই যে-বাপ টাকা দিয়েছেন সিন্দুক সাজায়ে॥
মাসি কাঁদেন মাসি কাঁদেন হেঁশেলে বসিয়ে।
সেই যে-মাসি ভাত দিয়েছেন পাথর সাজিয়ে॥
পিসি কাঁদেন পিসি কাঁদেন গোয়ালে বসিয়ে।
সেই যে-পিসি দুধ দিয়েছেন বাটি সাজিয়ে॥
ভাই কাঁদেন ভাই কাঁদেন আঁচল ধরিয়ে।
সেই যে-ভাই কাপড় দিয়েছেন আলনা সাজিয়ে॥
বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধ'রে।
সেই যে-বোন—

—গ্রাম্য বাঙলা ছড়া

সা হি ত্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

বিনায়ক পণ্ডিত—গ্রন্থকার। নামান্তর—নন্দপণ্ডিত। জন্ম—১৬শ শতাব্দী। পিতা—রামপণ্ডিত ধর্মাধিকারী (কাশী)। গ্রন্থ—কেশববৈজয়ন্তী, কাশীপ্রকাশতত্ত্ব, মুক্তাবলী, শ্রাদ্ধমীমাংসা, হরিবংশবিলাস, দত্তকমীমাংসা।

বিনীত দেব—টীকাকার ও দার্শনিক পণ্ডিত। ৭ম শতাব্দী। টীকাগ্রন্থ—ন্যায়বিন্দুটীকা, হেতুবিন্দুটীকা, বাদান্যায়ব্যাখ্যা, সম্বন্ধ-পরীক্ষা টীকা, সন্তানান্তরসিদ্ধি।

বিনোদরাম সেন—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। জন্ম—বীরভূম জেলার কড়িধা গ্রামে। পিতা—ধর্মদাস সেন। গ্রন্থ—শ্রীকৃষ্ণের শতনাম ও অষ্টপদী,স্তোত্র, বৈষ্ণববন্দনা, বৈষ্ণব-পদাবলী।

বিনোদ দাস—কবি। গ্রন্থ—সিউড়ি চরিত্র।

বিনোদ দ্বিজ—পাঁচালীকার। গ্রন্থ—শনির পাঁচালী।

বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৭৭ বঙ্গ ৬ই জ্যৈষ্ঠ বিহার-অন্তর্গত জামালপুরে। মৃত্যু—১৩৫১ বঙ্গ ১৮ই বৈশাখ কাশীধামে। পিতা—প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষা—এম-এ. এম-ডি. সম্মানাত্মক (Hony) পি. এইচ. ডি এল, এল. ডি, প্রথম বাঙালী এফ. আর. আই. পি. এইচ ; প্রথম বাঙালী কনসাল ; ৮টি দেশের কনসাল ও ২টি দেশের কনসাল-জেনারেল। গ্রন্থ—আশ্রমাবলী, শান্তি ও সমৃদ্ধি, Moral Philosophy, Treatment of the diseases of heart & lungs, Treatment of Intermittent Fever, Outline of the Dominion Constitution for India, Peace, Way to Peace, Royal Road to Peace & Prosperity for all Nations of the World.

বিনোদলাল দাশগুপ্ত—চিকিৎসক। সম্পাদক—চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান (১৩১৯-১৩২১)।

বিনোদবিহারী চক্রবর্তী—অনুবাদক। অনুবাদ-গ্রন্থ—রামায়ণ (১৮৭২-৭৫)। সম্পাদক—পূর্ণশশী (সাময়িক পত্র, ১৮৭৫)।

বিপিনচন্দ্র পাল—রাজনীতিবিদ্ ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৬৪ বঙ্গ কার্তিক শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমায় পৈল গ্রামে। মৃত্যু—১৩৩৯ বঙ্গ, জ্যৈষ্ঠ। পিতা—রামচন্দ্র পাল। শিক্ষা—শ্রীহট্ট, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ। শিক্ষার্থী অবস্থায় কেশব সেনের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ। ইনি স্বদেশী যুগের অন্যতম নেতা, রাজনৈতিক বাগ্মী, সাংবাদিক, অক্লান্ত কর্মী ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা। রাজনীতিক্ষেত্রে বহু আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন এবং কারাবরণ করেন (১৯০৭, ১৯১১)। অধিকাংশ সময় সংবাদপত্রসেবা। বিলাত গমন। গ্রন্থ—শোভনা (উপ, ১৮৮৪), ভারত-সীমান্তে রুশ (১৮৮৫), মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবন-বৃত্তান্ত (১৮৮৯), জেলের খাতা (১৯০৮), চরিত-চিত্র (১৯১৬), সত্যমিথ্যা (গল্প, ১৯১৬), ভক্তিসাধনা, প্রমদাচরণ সেনের জীবনী, Indian Nationalism (লণ্ডন, ১৯০৯), The New Spirit (১৯০৮), Introduction to the Study of Hinduism (ঐ), The Soul of India (১৯১২), Nationality & the Empire (১৯১৬), Annie Besant, a Psychological Study (১৯১৭), Indian Nationalism, its Principles & Personalities (১৯১৮), Sir Asutosh Mukherjee (১৯১৯), Srikrishna, The World Situation, Non-Co-operation, Swaraj, The Goal & the Way, Bengal Vaishnavism, Responsible Government, The New Economic Menace to India, The Basis of Social Reform, Swaraj the present Situation, Swaraj what it is & how to attain it, The People of India. সম্পাদিত গ্রন্থ—রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলী। সম্পাদক—বন্দে মাতরম্ (১৯০৬), Swaraj (১৯০৯, লণ্ডন হইতে), Independant (১৯২০), Bengalee, পরিদর্শক (শ্রীহট্ট সাপ্তাহিক, ১৮৮০), সোনার বাংলা (১৩৩২-৩৪) সহ-সম্পাদক—Bengal Public Opinion, Calcutta (১৮৮৩-৮৪), Tribune (লাহোর, ১৮৮৭-৮৮)।

বিপিনচন্দ্র রায়—কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৮৫ বঙ্গ ২৫এ আষাঢ় ময়মনসিংহ জেলার ধিতপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৩৪৫ বঙ্গ ৬ই পৌষ। শিক্ষা—এনট্রান্স (মৈমনসিং জেলা স্কুল, প্রথম স্থান), এফ-এ, (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৮৯৭, প্রথম স্থান), বি, এ, (ঢাকা সংস্কৃত কলেজ, ১৮৯৯, প্রথম স্থান), এম, এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ), বি, এল (১৯১০), বহু পদক ও বৃত্তিলাভ। কর্ম—অধ্যাপক, মৈমনসিংহ সিটি কলেজ (বর্তমান আনন্দমোহন কলেজ), আইন-ব্যবসায়, মৈমনসিংহ। গ্রন্থ—মুকুলাঞ্জলি, মৃত্যুঞ্জয়স্তোত্রম্, সারস্বত-কবিতা।

বিপিনবিহারী গুপ্ত—সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৮৭৫ খৃঃ কলিকাতা। মৃত্যু—১৯৩৬ খৃঃ। পিতা—কেদারনাথ গুপ্ত। শিক্ষা—মণিরামপুর ; বি, এ (রিপন কলেজ, ১৮৯৫), এম, এ (১৮৯৯)। কর্ম—অধ্যাপক, মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন, রিপন কলেজ (১৯০৬), অধ্যক্ষ, মুরারিচাঁদ কলেজ (১৮৯৯—১৯০৬)। গ্রন্থ—পুরাতন প্রসঙ্গ, বিবিধ প্রসঙ্গ।

বিপিনবিহারী গোস্বামী—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। জন্ম—বর্ধমান জেলায় বাঘনাপাড়া। মৃত্যু—১৩২৬ বঙ্গ ১৮ই শ্রাবণ। ইনি বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক ছিলেন। গ্রন্থ—শ্রীহরিভক্তিতরঙ্গিণী, শ্রীশ্রীরসামৃত-সিন্ধু, দশমূলরস (বৈষ্ণব জীবনী), মধুর মিলন।

বিপিনবিহারী চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৫২ খৃঃ। মৃত্যু—১৮৯৯ খৃঃ। পিতা—পণ্ডিত ভগবান বিদ্যালঙ্কার (খাটুরা বৈয়াকরণ)। গ্রন্থ—অদ্ভুত দিগ্বিজয়, সৈনিক সীমন্তিনী, কুশদ্বীপ-কাহিনী, ঘাটুহার-ইতিবৃত্ত। অনুবাদ-গ্রন্থ—মিষ্ট্রিজ অফ কোর্ট অফ লণ্ডন।

বিপিনবিহারী চক্রবর্তী—কবি। জন্ম—১২৭১ বঙ্গ ১ই শ্রাবণ বিক্রমপুরের বাহেরক গ্রামে। মৃত্যু—১৯২২ খৃঃ ২৩এ ডিসেম্বর রাঁচীর অন্তর্গত রাজগ্রাম গ্রামে। পিতা—অভয়চরণ চক্রবর্তী। শিক্ষা—প্রবেশিকা (১৮৮৫), এফ, এ (ঢাকা)। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ। শিক্ষকতা, ফরিদপুর জমীদারীর ম্যানেজারী, গিরিডি, হাজারীবাগ প্রভৃতি স্থানে জরীপের কার্য (১৯১৬)। কাব্যগ্রন্থ—বুদ্বুদ!

বিপিনবিহারী দাস—গ্রন্থকার। জন্ম—শ্রীহট্ট করিমগঞ্জ জেলায় মর্যাদাকান্দী গ্রামে বৈষ্ণ-সাহু বংশে। মৃত্যু—১৮৮৫ খৃঃ। শিক্ষা—এনট্রান্স, এফ-এ (প্রাইভেট), এম-এ, বি-এল। কর্ম—প্রধান শিক্ষক, গৌহাটী নর্মাল স্কুল, আইন-ব্যবসায়, পণ্ডিতা রমাবাঈকে বিবাহ। গ্রন্থ—রসায়নের উপক্রমণিকা (১২৮৪ বঙ্গ)।

বিপিনবিহারী নন্দী—কবি। জন্ম—চট্টলা। কাব্যগ্রন্থ—অর্ঘ্য (১৩১০), চন্দ্রধর (১৩১২), শিখ (১৩১৬), সপ্তকাণ্ড রাজস্থান (১৩১৮), চন্দ (১৩২১), নারী (ক্ষুদ্র কাব্য)।

বিপিনবিহারী সরকার—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—সৌদামিনী (দ্বিসাপ্তাহিক, ১৮৫৯)।

বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শিববৃত্তান্ত (১৮৫৭), সত্যগুরু।

বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তী—গ্রন্থকার। খৃষ্টধর্মাবলম্বী। গ্রন্থ—টম খুড়ো (অনুবাদ), জ্ঞানবৃক্ষ, জ্ঞানশাখা।

বিপ্রদাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভাস্বততত্ত্বপ্রকাশিকাতত্ত্ব (করণগ্রন্থ)।

বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। জন্ম—১২৪৯ বঙ্গ যশোহর জেলায় (পূর্বে নদীয়ায়) হালদা মহেশপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৩২১ বঙ্গ ১৩ই অগ্রহায়ণ। কর্ম—উড়িষ্যায় এক রাজপরিবারের গার্জেন টিউটর, পরে শিক্ষকতা, মেদিনীপুর স্কুল, ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন, পশ্চিমে কিছুকাল অবস্থান—পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে শিক্ষকতা। গ্রন্থ—পাকপ্রণালী, মিষ্টান্নপাক, রন্ধনশিক্ষা, জননীজীবন, যুবতী-জীবন, দেদার মজা, শুভবিবাহতত্ত্ব, সহচর (১২৮০), সচিত্র পারস্য কুসুম (১২৯০); সম্পাদক—দ্রব্যগুণতত্ত্ব (মাসিক, ১২৯০), পঞ্চপ্রণামী (ঐ), গৃহস্থালী (মাসিক, ১২৯১-৯৪), কৃষিতত্ত্ব (মাসিক, ১২৮৮-৯০)।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়—সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও কবি। জন্ম—১৯০৪ খৃঃ। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সমরনীতির বিশেষ খ্যাতিমান লেখক। কর্ম—সম্পাদকীয় বিভাগে, আনন্দবাজার (১৯২৫), যুগান্তর (১৯৩৭)। ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী-সঙ্ঘের সভাপতি (১৯৫০-৫২)। কাব্য-সাহিত্যে ইঁহার গ্রন্থ পাঠকসমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। গ্রন্থ—জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী (১৯৪৩), রুশ-জর্মান সংগ্রাম (১৯৪৭), সোভিয়েট-মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতি (১৯৫১); কাব্যগ্রন্থ—শতাব্দীর সঙ্গীত (তৎকালীন বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত), বিপ্লবী নায়িকা, জীবন-মৃত্যু। সম্পাদক—যুগান্তর (দৈনিক)।

বিবেকানন্দ, স্বামী—ধর্মনেতা ও দেশসেবক। পূর্ব নাম—নরেন্দ্রনাথ দত্ত। জন্ম—১২৬৮ বঙ্গ ২৯এ পৌষ কলিকাতা শিমুলিয়া অঞ্চলে। মৃত্যু—১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই। পিতা—বিশ্বনাথ দত্ত (আইন-ব্যবসায়ী)। মাতা—ভুবনেশ্বরী। শিক্ষা—মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউসন, এফ, এ, (প্রেসিডেন্সী কলেজ ও পরে জেনারেল এ্যাসেমব্লী), বি, এ। ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও কেশবচন্দ্রের অনুরাগী। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত সাক্ষাৎ—এই সাক্ষাতে ইঁহার জীবনের এক মহাপরিবর্তন ঘটে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ লাভ। সন্ন্যাসগ্রহণ ও বুদ্ধগয়ায় গমন। পাওহারী বাবার দর্শন লাভ। দক্ষিণেশ্বরে নির্বিকল্প সমাধি। বরাহনগরে মঠ স্থাপন, পরিব্রাজক বেশে বহু তীর্থ ভ্রমণ, কাশীতে শ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামীর ও শ্রীভাস্করানন্দ স্বামীর সাক্ষাৎ লাভ। ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ। চিকাগো শহরে ধর্মসভায় যোগদান (১৮৯৩, ৩১ মে), বক্তৃতায় আমেরিকাবাসীদের মনে এক ধর্মবিপ্লব আনয়ন ও অধিবেশন শেষে আমেরিকার বহু স্থানে বক্তৃতা ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের সান্নিধ্যলাভ। ইংলণ্ড গমন (১৮৯৪, মে), Miss Noble-এর (Sister Nivedita) সহিত সাক্ষাৎ। আমেরিকায় দ্বিতীয় বার গমন (১৮৯৬), পরে সুইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, ইটালী, সিংহলে আগমন (১৮৯৭ খৃঃ ১৫ই জানুয়ারী) প্রত্যাবর্তন, রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা (১৮৯৭ খৃঃ ১লা মে), বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা, মায়াবতী আশ্রম প্রতিষ্ঠা, পুনরায় আমেরিকায় যাত্রা (১৮৯৯)। গ্রন্থ—বর্তমান ভারত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, পরিব্রাজক, ভাববার কথা, বীরবাণী, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, চিকাগো-বক্তৃতা, মদীয় আচার্যদেব, ধর্মবিজ্ঞান, ভক্তিরহস্য, পওহারীবাবা, পত্রাবলী ৫ খণ্ড, সন্ন্যাসীর গীতি, দেববাণী, মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ, ঈশদূত যিশুখৃষ্ট, হিন্দুধর্মের নবজাগরণ, বিবেকবাণী, ভারতীয় নারী, স্বামিজীর কথা, Religion of love, The Science & Philosophy of Religion, Realisation & its methods, Thoughts on Vedanta, A study of Religion, Christ, the Messenger.

বিভাবতী সেন—মহিলা সাহিত্যিক। সম্পাদিকা—পাপিয়া (ঢাকা, ত্রৈমাসিক, ১৩৩৪, মাসিক, ১৩৩৫)।

বিভুবালা সরকার (বক্সী)—গ্রন্থকর্ত্রী। জন্ম—মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরে। পিতা—হরিপ্রসাদ সরকার। শিক্ষা—বি, এ (১৯১৪)। শিক্ষয়িত্রী। গ্রন্থ—বাংলার বাঘ।

বিভূতিভূষণ ভট্ট—সাহিত্যিক। মুর্শিদাবাদ। ইঁহারই ভগ্নী সুলেখিকা নিরুপমা দেবী। গ্রন্থ—সহজিয়া, স্বেচ্ছাচারী সপ্তপদী।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৩০১ বঙ্গ ২৮এ ভাদ্র, ২৪ পরগনার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়ার সন্নিকটে মুরারিপুর নামক স্থানে। মৃত্যু—১৩৫৭ বঙ্গ কার্ত্তিক ঘাটশীলায়। পিতা—মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শাস্ত্রী (প্রসিদ্ধ কথক)। শিক্ষা—হুগলী সাগঞ্জ কেওটা গ্রামে, ব্যারাকপুর পাঠশালা, বনগ্রাম হাইস্কুল, প্রবেশিকা, আই, এ (রিপন কলেজ), বি-এ (ঐ), পরে কিছুদিন এম-এ ও আইন পাঠ। কর্ম—শিক্ষকতা, হুগলীর জঙ্গীপাড়া হাইস্কুল (১৯২১), হরিনাভী হাইস্কুল (১৯২২), ইহার পরে কেশোরাম পোদ্দারের কাউ প্রটেকসনের সেক্রেটারী, পূর্ববঙ্গ, আসাম ও বর্মা ভ্রমণ, এক বৎসর পরে সিদ্ধেশ্বর ঘোষের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও ভাগলপুরের জমীদারীতে কার্য। ইনি কথা-সাহিত্যের বহু পুস্তক রচনা করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন। প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' (প্রবাসী)। গ্রন্থ—মেঘমল্লার (১৯৩০), পথের পাঁচালী (১৯৩১), মৌরীফুল, অপরাজিত ২ খণ্ড, আরণ্যক, অনুবর্তন, দৃষ্টিপ্রদীপ, নবাগত, তৃণাঙ্কুর, দেবযান, উর্মিমুখর, অভিযাত্রিক যাত্রাবদল, কিন্নরদল, আদর্শ হিন্দু হোটেল, বিপিনের সংসার, জন্ম ও মৃত্যু, বেণীগির, অসাধারণ, স্মৃতিরেখা, দুই বাড়ী, হীরামাণিক জ্বলে, চাঁদের পাহাড়, বিচিত্র জগৎ, উপলখণ্ড, ইছামতী, উৎকর্ণ, ক্ষণভঙ্গুর, মুখোস ও মুখশ্রী, জ্যোতিরিঙ্গণ, হে অরণ্য কথা কও, অথৈ জল, আচার্য কৃপালনী কলোনী, কোশার রাজা, বিধুমাষ্টার।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—কথাসাহিত্যিক। জন্ম—১৮৯৬ খৃঃ আষাঢ় মাসে মিথিলার দ্বারভাঙ্গা জেলার পাণ্ডুল গ্রামে। পিতা—বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়। মাতা—গিরিবালা দেবী। পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার চাতরা গ্রামে। পিতামহ মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের নীলকুঠিতে চাকুরী ব্যপদেশে মিথিলায় বসবাস। শিক্ষা—প্রবেশিকা (দ্বারভাঙ্গা রাজ স্কুল, ১৯১২), আই, এ, (রিপণ কলেজ), বি, এ (পাটনা কলেজ)। ১৯ বৎসর বয়স হইতে সাহিত্যচর্চা। প্রথম লেখা প্রবাসীতে (১৯১৫)। ইনি গল্প লেখায় বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। গ্রন্থ—রাণুর প্রথম ভাগ, রাণুর দ্বিতীয় ভাগ, রাণুর তৃতীয় ভাগ, কথামালা, বর্ষায়, বসন্তে, শারদীয়া, চৈতালী, তালনবমী, হৈমন্তী, অতঃকিম্, কায়কল্প, লঘুপাক, আগামী প্রভাত, ক্ষণঅন্তঃপুরিকা, অষ্টক, কথাচিত্র, বরযাত্রী, বাসর, রূপান্তর, স্বর্গাদপি গরীয়সী, নীলাঙ্গুরীয়, তোমারই ভরসা, দুয়ার হতে অদূরে, গণশার বিয়ে, বিশেষ রজনী, দৈনন্দিন, হাতেখড়ি, কলিকাতা নোয়াখালি বিহার, নবসন্ন্যাস, উত্তরায়ণ।

বিভূতিশেখর মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—অভিষেক (মাসিক)।

বিমলকুমার ঘোষ—শিশু সাহিত্যিক। ছদ্মনাম—মৌমাছি। জন্ম—১৩১৩ বঙ্গ কলিকাতা মাণিকতলা অঞ্চলে। পিতা—অনাদিপ্রসন্ন ঘোষ। আদি নিবাস—বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় গ্রামে। শিক্ষা—নারিকেলডাঙ্গা হাইস্কুল, গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুল। কর্ম—পূর্বে এ্যাডভান্সের বিজ্ঞাপন বিভাগে, পরে আনন্দবাজার পত্রিকা (১৩৩১), আনন্দমেলার প্রবর্তন (১৯৪০, এপ্রিল); ১৯৩৮ খৃঃ হইতে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে লেখা আরম্ভ। গ্রন্থ—জীবজন্তুর ঘরকন্না, মনীষীদের ছেলেবেলা, জ্ঞানবিজ্ঞানের মধুভাণ্ড, ৩ খণ্ড, শিশু রবি (নাটিকা), দেশবিদেশের রূপকথা, যে গল্পের শেষ নেই, রাষ্ট্রজ্ঞানের মধুভাণ্ড, নাচগানহল্লা, কাজ খেয়াল খেলা, হাসিখুসি মজা, পুতুলের দেশ, যারা মানুষ নয়, নয়াযুগের রূপকথা, টুনটুনি ঝুনঝুনি।

বিমলচন্দ্র ঘোষ—প্রগতিশীল কবি। জন্ম—১৩১৭ বঙ্গ ২৬এ অগ্রহায়ণ কলিকাতা ভবানীপুরে। পিতা—নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ইঁহাদের পূর্বপুরুষের হাওড়া জেলার বালী হইতে কলিকাতায় বসবাস। ১৯২৬ খৃঃ হইতে ইঁহার বহু কবিতা বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৩ বৎসর বয়সে ইনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ঈশকেনকঠোপনিষদ্, কবীরের দোঁহা প্রভৃতি পদ্যানুবাদ করেন। ইনি বামপন্থী কবি হিসাবে সাম্যবাদী শিবিরের জনপ্রিয় কবি। কাব্যগ্রন্থ—জীবন ও রাত্রি, দক্ষিণায়ন, উলুখড়, দ্বিপ্রহর, ফতোয়া ১৮৪৮—৪৯, নানকিং, সাবিত্রী, সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, বিশ্বশান্তি, ভুখা-ভারত।

বিমলচন্দ্র সিংহ—সাহিত্যিক। জন্ম—১৯১৭ খৃঃ ১লা ডিসেম্বর কলিকাতার উপকণ্ঠে পাইকপাড়া-রাজবংশে। পিতা—মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ। শিক্ষা—প্রবেশিকা (মণীন্দ্র মেমোরিয়াল হাইস্কুল, ১৯৩৩) বি. এ. (প্রেসিডেন্সী কলেজ ১৯৩৭), এম. এ (১৯৩৯)। বাঙলা দেশের ভূতপূর্ব মন্ত্রী। বহু সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। গ্রন্থ—বাংলার চাষী (১৯৩৬), সমাজ ও সাহিত্য (১৩৫০), ইতিহাসের শিক্ষা ও ভারতের রাজনৈতিক কর্মসূচী (১৩৫৩), আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (১৩৫১), দেশের কথা (১৩৫১), খাতার পাতা (১৯৫১), ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস (অনুবাদ, ১৩৫১), Debt Legislation in Bengal (১৯৩৮), The New Constitution of India (১৯৩৮), A changing world of other Essays (১৯৪১); সম্পাদিত গ্রন্থ—বঙ্কিম-প্রতিভা, বঙ্কিম-কণিকা।

বিমলচন্দ্র সূরি—জৈন পণ্ডিত। গ্রন্থ—প্রশ্নোত্তর-রত্নমালা।

বিমল মিত্র—কথাসাহিত্যিক। জন্ম—১৯১২ খৃঃ ১৮ই মার্চ কলিকাতা। শিক্ষা—এম. এ। প্রথম প্রকাশিত রচনা (বসুমতী ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ)। গ্রন্থ—দিনের পর দিন (গল্প) ছাই (উপন্যাস), কেস নম্বর ৪৯ (শিশুপাঠ্য)।

বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—হুগলী জেলার চুঁচুড়া। পিতা—নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক, চুঁচুড়া বার্তাবহ)। গ্রন্থ—মধুক্রম (কবিতা), স্কুলবয় (নাটিকা), স্বরশ্রী (স্বরলিপি)।

বিমলাচরণ রায়চৌধুরী—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—মোহিনী (মাসিক, ১৩০২)।

বিমলাচরণ লাহা—বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৯১ খৃঃ ২৬এ অক্টোবর কলিকাতার বিখ্যাত লাহা-বংশে। পিতা—অম্বিকাচরণ লাহা। শিক্ষা—বি. এ. (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৯১৪), এম. এ. (১৯১৬), বি. এল., পি. এইচ. ডি. (১৯২৪), আশুতোষ মুখার্জি স্বর্ণপদক লাভ, ডি. লিট্., ব্যানার্জি গবেষণা পুরস্কার (লক্ষ্ণৌ), গ্রিফিথ পুরস্কার (কলিকাতা)। 'বুদ্ধাগম শিরোমণি' (সিংহল)। কর্ম—জমীদার, কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রাণকৃষ্ণ লাহা এণ্ড কোং-এর অংশীদার, প্রাচীন সংস্কৃতি ও বৌদ্ধশাস্ত্রে বহু গ্রন্থ রচনা। বহু শিক্ষা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। জনহিতকর বহু অনুষ্ঠানে বহু লক্ষ টাকা দান করেন। বহু সাময়িক পত্রের গবেষণামূলক লেখক। গ্রন্থ—বুদ্ধচরিত, বৌদ্ধযুগের ভূগোল, গৌতম বুদ্ধ, লিচ্ছবিজাতি, প্রেততত্ত্ব, বৌদ্ধরমণী, জৈনগুরু মহাবীর, ভারতের পুণ্যতীর্থ, Ksatriya Clans in Buddhist India, Some Ksatriya Tribes in Ancient India, Ancient Mid-Indian Ksatriya Tribes, Ancient Indian Tribes ২ খণ্ড, Tribes in Ancient India, India as described in early Texts of Buddhism & Jainism, The Magadha in Ancient India, Geography of Early Buddhism, Geographical Essays, Holy Places of India, Mountains of India, Rivers of India, Mahavira, His life & Teachings, History of Pali Litt. ২ খণ্ড, The life & work of Buddhaghosa, Historical Gleanings, Heaven & Hell in Buddhist Perspective, The Buddhists Conception of Spirits, Women in Buddhist Literature, Concepts of Buddhism, Manual of Buddhist Historical Traditions, Designation of Human Types, The minor Anthologies of the Pali Canon, A Study of the Mahavastu &

Supplement, The Law Gift in British India; অনুবাদগ্রন্থ—সৌন্দরানন্দকাব্য (অশ্বঘোষ কৃত—বাংলা), দাঠাবংশ (ইংরেজি), চরিয়া পিটক (ইংরেজি),। অন্যতম সম্পাদক—Indian Culture, Bengal, Past & Present (কিছুদিন), Annual Bibliography of Indian Archaeology (হল্যাণ্ড)।

বিমলা দাশগুপ্তা—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—মালবিকাগ্নিমিত্র, উত্তর-রামচরিত, নরওয়ে ভ্রমণ।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—কবি ও গ্রন্থকার। ইনি নানা সাময়িক পত্রের লেখক। গ্রন্থ—পঞ্চমী (গল্প), সংক্রান্তি (কাব্য), চন্দ্রকলা (ঐ), সঞ্চয়ী (ঐ), ভারতের ঐতিহ্য (প্র), ব্যক্তিগত (ঐ), আমার চোখে গান্ধীজী, সেকেণ্ড হ্যাণ্ড (গ), শয়তান (অনুবাদ), নিমন্ত্রণ (প্র, ১৩৫৯)।

বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী—গ্রন্থকার। জন্ম—নদীয়া জেলার মায়াপুরে। গ্রন্থ—বঙ্গে সামাজিকতা।

বিমানবিহারী মজুমদার—শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার। জন্ম—নবদ্বীপে। পিতা—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (নবদ্বীপ-নিবাসী)। শিক্ষা—প্রবেশিকা (নবদ্বীপ হিন্দুস্কুল, ১৯১৭), এম, এ, (ইতিহাসে ১৯২৩), এম, এ (অর্থনীতিতে ১৯২৯), প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি (১৯৩২), মোয়াট স্বর্ণপদক (১৯৩৫), গ্রিফিথ পুরস্কার (১৩৩৫), ভাগবতরত্ন উপাধি (নবদ্বীপ), পি, এইচ, ডি (১৯৩৭)। কর্ম—হেতমপুর কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনার পর পাটনা বি, এন কলেজে অধ্যাপনা। বাল্যকাল হইতেই ইনি অধ্যবসায়ী ও বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৯৩৬)। গ্রন্থ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপাদান, History of Political Thought from Ramananda to Dayananda.

বিরজানন্দ, স্বামী—সন্ন্যাসী। জন্ম—১৮৭৩ খৃঃ কলিকাতা মৃত্যু—১৯৫১ খৃঃ ৩০এ মে। পূর্বনাম—কালীকৃষ্ণ বসু। শিক্ষা—রিপন কলেজ। সংসার ত্যাগ (১৮৯১)। স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হইয়া বিরজানন্দ নাম গ্রহণ (১৮৯৭)। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক, (১৯৩৪—৩৮) ও অধ্যক্ষ (১৯৩৮—১৯৫১)। গ্রন্থ—স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী। সম্পাদক—প্রবুদ্ধ ভারত (ইংরেজি)।

বিরাজমোহিনী দেবী—মহিলা কবি। কাব্যগ্রন্থ—কবিতাহার (১৮৮৩ খৃঃ)।

বিরাজমোহিনী রায়—সাহিত্যিকা। সম্পাদক—অন্তঃপুর (১৩২২)।

বিরিঞ্চি দাস—অনুবাদক। গ্রন্থ—রাগময়ী কণা (অনুবাদ, ১২১১ ত্রিপুরাব্দ)।

বিরূপ—বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য। গ্রন্থ—বজ্রযান ও কালচক্রযান, ছিন্নমস্তাসাধন, রক্তযমারিসাধন, বিরূপগীতিকা, বিরূপপদচতুরশীতি, কর্মচণ্ডালিকা, দোহাকোষগীতি, বিরূপবজ্রকোষগীতিকা।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর—অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী। জন্ম—দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণানদীর তীরে কোন স্থানে। যৌবনে প্রণয়িনী বারাঙ্গনা কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে ইনি সোমগিরি নামক এক সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি শঙ্করাচার্যের পরবর্তী। গ্রন্থ—কৃষ্ণকর্ণামৃত, বিল্বমঙ্গল।

বিশাখ দত্ত—গ্রন্থকার। জন্ম—৯ম শতাব্দীর শেষার্ধে মগধে (কেহ বা বলেন কৃষ্ণানদীর নিকটে চন্দ্রগুপ্ত নগরে)। পিতা—পৃথু দত্ত বা ভাস্কর দত্ত। মৌখরিরাজ অবন্তিবর্মার সমসাময়িক। গ্রন্থ—মুদ্রারাক্ষস।

বিশু মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক, সমালোচক ও সাংবাদিক। জন্ম—১৯০৮ খৃঃ জানুয়ারি হাওড়া জেলায় চন্দ্রভাগ গ্রামে। শিক্ষা—জুনিয়ার কেম্‌ব্রিজ পাশ (১৯২৪), স্কটিশচার্চ কলেজ ও বিহারের জী, বী, বী, কলেজ। অনুবাদ-সাহিত্যে ও শিশু-সাহিত্যে বিশেষ খ্যাতিবান্। শিল্পী ও সিনেমা-শিল্পের বিশেষ অনুরাগী। ফিল্ম সম্পর্কে বাংলা ও ইংরেজিতে বহু প্রবন্ধের লেখক। গ্রন্থ—সাফো (আলফোঁস দোদের অনুবাদ), সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায় (অনুবাদ), ওল্ড কিউরিসিটি শপ (ঐ), মিথ্যার সাথে মিতালি (ঐ), অ্যাডভেঞ্চার অফ মার্কোপোলো, নানা দেশের নানা গল্প, লোবেনগুলার গুপ্তধন, নাগওয়ার অভিশাপ, বিখ্যাত বিচারকাহিনী, আধমণী ঘন্টেশ্বর, রামপড়ুয়ার পাততাড়ি। সংকলিত গ্রন্থ—শরতের ফুল, রোশনাই, ভ্যাবাচ্যাকা সিরিজ; সম্পাদকীয়—জিন্নাতে সাহানা, রবিবার, জলছবি, মৌচাক। বর্তমানে মৌচাকের অন্যতম সম্পাদক।

বিশ্বনাথ—জ্যোতির্বিদ্। পিতা—দিবাকর। গ্রন্থ—উদাহরণ-গ্রন্থ (সৌরপঞ্চগণিত, ১৬২৩ খৃঃ), মকরন্দের উদাহৃতি, (১৬২২), গ্রহলাঘবের উদাহৃতি (১৬১২), শ্রীজাতক উদাহৃতি, সিদ্ধান্তশিরোমণির উদাহরণ, নীলকণ্ঠিজাতকের উদাহরণ।

বিশ্বনাথ—জ্যোতির্বিদ্। পিতা—শ্রীনিবাস। গ্রন্থ—গ্রহচক্রসার (১২১৮ খৃঃ)।

বিশ্বনাথ—জ্যোতির্বিদ্। পিতা—রাম। গ্রন্থ—সিংহোদয় বা হোরাস্কন্দনিরূপণ (জাতকগ্রন্থ, ১৫শ শতাব্দী)।

বিশ্বনাথ—পাঁচালীকার। গ্রন্থ—পদ্মপুরাণ বা পদ্মা পাঁচালী।

বিশ্বনাথ কবিরাজ—অলঙ্কার-শাস্ত্রবিদ্। জন্ম—১৩শ শতাব্দীতে উৎকলদেশীয় মধ্যম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-বংশে। পিতা—চন্দ্রশেখর। কবিত্বশক্তির জন্য উৎকলরাজের নিকট কবিরাজ উপাধিলাভ। গ্রন্থ—সাহিত্যদর্পণ (অলঙ্কার গ্রন্থ, ১৩শ শতাব্দী)।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী—দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। জন্ম—১৬৬৪ খৃঃ নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামে। মুর্শিদাবাদ জেলায় সৈয়াবাদ-নিবাসী কৃপারাম চক্রবর্তীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া পিতা মাতা স্ত্রী ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে কৃষ্ণদাস কবিরাজের কুটীরে বাস। ইনি নিম্বার্কমতাবলম্বী। বৃন্দাবনে গোকুলানন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। গ্রন্থ—সারার্থদর্শনী (ভাগবতের টীকা, ১৭০৪ খৃঃ), ভগবদ্গীতার টীকা, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত (মহাকাব্য, ১৬০০ শক,) মাধুর্যকাদম্বিনী, রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, গুণামৃতলহরী, প্রেমসম্পুট, স্বপ্নবিলাসামৃত (কাব্য), অনুরাগবল্লী, রূপচিন্তামণি, সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, সুরথকথামৃত, গৌরগণোচন্দ্রিকা, চমৎকারচন্দ্রিকা, ব্রহ্মসংহিতার টীকা, গোপালতাপনীর টীকা, চৈতন্যচরিতামৃত টীকা, বিদগ্ধমাধবের টীকা, সারার্থবর্ষিণী (টীকা), সুবোধিনী (অলঙ্কারকৌস্তভের টীকা), সুখবর্তিনী (আনন্দবৃন্দাবন চম্পূর টীকা), ঐশ্বর্যকাদম্বিনী, স্তবামৃতলহরী, গৌরাঙ্গলীলামৃত, আনন্দচন্দ্রিকাটীকা, উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু, ভাগবতামৃতকণা, সাধ্যসাধনাকৌমুদী, স্মরণ-ক্রমমালা, হংসদূতের টীকা, ক্ষণদাগীতচিন্তামণি (সংকলন)।

বিশ্বনাথ তর্কালঙ্কার—কবি। গ্রন্থ— কৃষ্ণকেলিকল্পলতা (১২৭৫ বঙ্গ)।

বিশ্বনাথ ন্যায়-(সিদ্ধান্ত) পঞ্চানন—দার্শনিক পণ্ডিত। জন্ম—১৭শ শতাব্দী নবদ্বীপে। পিতা—বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য। শেষ বয়সে বৃন্দাবনে বাস। গ্রন্থ—ভাষাপরিচ্ছেদ (১৬৩৪), সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীটীকা, ন্যায়সূত্রবৃত্তি, গৌতমসূত্রের টীকা (১৬৫৪), ন্যায়তন্ত্রবোধিনী, পদার্থতত্ত্বাবলোক, পিঙ্গলপ্রকাশিকা (টীকা)। সুবর্ণতত্ত্বাবলোক, পঞ্চপদটীকা।

বিশ্বনাথ ভট্ট—জ্যোতির্বিদ্। গ্রন্থ—রত্নমঞ্জরী।

বিশ্বনাথ মাল—যাত্রাপালা-রচয়িতা। জন্ম—১২১৭ বঙ্গ (আনু) হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল-কৃষ্ণনগরের জঙ্গীপাড়া গ্রামে। মৃত্যু—১২৯৭ বঙ্গ। জাতিতে সাপুড়ে হইলেও গীতানুরাগী ও ভগবৎ প্রেমিক। 'মালের যাত্রার দল' নামে যাত্রার দল গঠন। এই যাত্রা দক্ষিণ বর্ধমানে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। যাত্রার পালা—শ্রীরাধিকার মান, কলঙ্কভঞ্জন, মান, মাথুর, প্রভাস।

বিশ্বনাথ মিশ্র—টীকাকার। জন্ম—১৭শ শতাব্দী। পিতা—বলভদ্র। মাতা—বিজয়শ্রী। গ্রন্থ—মেঘদূতকাব্যের মুক্তাবলী টীকা।

বিশ্বনাথ শর্ম্মা—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সারসংগ্রহ (Principles of Hindu Astronomy—১৮৭৫)।

বিশ্বনাথ শিরোমণি—টীকাকার। গ্রন্থ—ন্যায়সূত্রবৃত্তি।

বিশ্বপতি চৌধুরী—শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৩০২ বঙ্গ আষাঢ়। পিতা—অমৃতলাল চৌধুরী। মাতা—সুখদা দেবী। শিক্ষা—এম এ,। কর্ম—অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যচর্চা। গল্প-রচনায় নিপুণ। ইঁহার প্রথম গল্প কোলআঁধারী। গ্রন্থ—ঘরের ডাক, ঘূর্ণি, সেতু, কাব্যে রবীন্দ্রনাথ, কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ। গল্পগ্রন্থ—বৃন্তচ্যুত, স্বপ্নশেষ, বহুরূপী।

বিশ্বম্ভর কর—সাহিত্যিক। সম্পাদক—সম্বাদকৌস্তুভ (সাপ্তাহিক, ১৮৪৮ খৃঃ)।

বিশ্বম্ভর ঘোষ—সংবাদপত্রসেবী। সম্পাদক—জ্ঞানরত্নাকর (সংবাদপত্র)।

বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব—জ্যোতির্বিদ্। জন্ম—১৮৫৭ খৃঃ ৯ই নভেম্বর ফরিদপুরের অন্তর্গত থানাকুলা গ্রামে। মৃত্যু—১৯১২ খৃঃ ১লা সেপ্টেম্বর। পিতা—পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ (নবদ্বীপ)। নবদ্বীপের প্রধান জ্যোতির্বিদ্। পরে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান পঞ্জিকাকার। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা গণনা ও সম্পাদনা। সম্পাদিত গ্রন্থ—রবিসিদ্ধান্ত মঞ্জরী, দিনকৌমুদী, বিদগ্ধতোষিণী।

বিশ্বম্বর দাস—গ্রন্থকার। জন্ম—কৃষ্ণনগর (নদীয়া) পিতা—কানাইচরণ দাস। মাতা—রত্নমণি। গ্রন্থ—জগন্নাথ-মঙ্গল, রজনীকান্ত (উপ, ১৮৭০)।

বিশ্বম্ভর পাইন—পণ্ডিত ও ভক্তকবি। জন্ম—খানাকুল-কৃষ্ণনগর হাটবাসী গ্রামে। গ্রন্থ—সঙ্গীতমাধব, ভক্তরত্নমালা, কন্দর্পচৌধুরী, বৃন্দাবন-প্রাপ্ত্যুপায়, জগন্নাথ-মঙ্গল, প্রেমসম্পুট।

বিশ্বেশ্বর ঘোষ—নাট্যকার। গ্রন্থ—প্রেম-উপদেশ নাটক।

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী—কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৭৭৩ শকে বর্ধমান জেলায় কালনা মহকুমার মোয়াইল গ্রামে। মৃত্যু—১৩২৫ বঙ্গ ১০ই অগ্রহায়ণ কলিকাতায়। শিক্ষা—এফ, এ (কৃষ্ণনগর কলেজ), বি, এ, (প্রাইভেট)। কর্ম—শিক্ষকতা, মহেশগঞ্জ হাইস্কুল; প্রধান শিক্ষক, জাহানাবাদ স্কুল, নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল। গ্রন্থ—উপাসক (কবিতা), আনন্দগীতি (ঐ), গীতাভাস (ঐ), ছাত্র-শিক্ষা, বালিকারঞ্জন, শব্দশিক্ষা, Junior Text Book of Translation, Manual of Translation.

বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার—গ্রন্থকার। জন্ম—বর্ধমান। গ্রন্থ—পাক-রাজেশ্বর (১৮৫৮)।

বিশ্বেশ্বর দত্ত—অনুবাদক। অনুবাদগ্রন্থ—শাহনামা (১৮৪৭ খৃঃ)।

বিশ্বেশ্বর দ্বিজ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সত্যনারায়ণ ব্রতকথা বা গোবিন্দবিজয়।

বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদপত্রসেবী। সম্পাদক—সংবাদ বর্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী (বর্ধমান, ১৮৪৯ খৃঃ সাপ্তাহিক)।

বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যসেবী। জন্ম—যশোহর। সম্পাদক—কল্যাণী (যশোহর, ১৯০১)

বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৬০ বঙ্গ (আনু) বর্ধমান জেলায় গঙ্গাতীরবর্তী মাজিদা গ্রামে। পিতা—রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য (রত্নাবলী-সম্পাদক)। শিক্ষা—নদীয়ায় নাকাশিপাড়া, কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, কাকিনা। কর্ম—এলাহাবাদ একাউন্টেন্ট অফিস (১৮৬৭ খৃঃ), রেলওয়ে অফিস। আইন-পরীক্ষা (১৮৭৪)। আজমগড় মেলার প্রবর্তক (১৮৭৬), আইন-ব্যবসায় (এলাহাবাদ, ১৮৮৭)। গ্রন্থ—অপচয় ও অর্থনীতি (১৮৯০ খৃঃ)।

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিবাহকল্যাণ, বুদ্ধবাণী, শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথা।

বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—পূর্ণিমা (১৩১০-১৩১৬)।

বিষ্ণুপুরি—বৈষ্ণব কবি। গ্রন্থ—বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী।

বিষ্ণুপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জীবনপথে ৩ খণ্ড (বৃহৎ গার্হস্থ্য উপন্যাস)।

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়—কবি। জন্ম—১২৩৯ বঙ্গ ২৯এ চৈত্র নদীয়া জেলার মাটিয়ারি গ্রামে। মৃত্যু—১৩০৮ বঙ্গ ২৪এ ফাল্গুন। বাল্যাবস্থা হইতেই কবিতা রচনা। গ্রন্থ—রামবাল্য-লীলামৃত, গীতমালা, কুলীনকন্যার দ্বিরাগমন, পদ্মমঞ্জরী (১৮৬৮)।

বিষ্ণুরাম তর্কসিদ্ধান্ত—গ্রন্থকার। শিক্ষা—ফ্রি চার্চ ইনষ্টিটিউসন। গ্রন্থ—বিষ্ণুসার ব্যাকরণ।

বিষ্ণুরাম নন্দী—গ্রন্থকার। ময়মনসিংহ। গ্রন্থ—উদ্ধব গীতা।

বিষ্ণু সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দময়ন্তীর চৌতিসা (চট্টগ্রামে প্রচলিত)।

বিহারীলাল গোস্বামী—সাহিত্যিক। সম্পাদক—সরোজিনী (মাসিক, শান্তিপুর গোস্বামীপাড়া হইতে প্রকাশিত, ১২৮১)।

[ক্রমশঃ।

স্ত্রী পুত্র সকলি বৃথা কেহ কারো নয়।
পথিকে পথিকে যেন পথে পরিচয়॥

—কৃত্তিবাস

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

১৯৩৩ সাল পড়তেই অকস্মাৎ নতুন করে মনে পড়লো আমি একজন পরীক্ষার্থী এবং আর মাস দেড়েক পরই সুরু হবে সেই আই, এ, পরীক্ষা। ১৯২৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ করবার সাত বৎসর পর এই বাইশ বৎসর বয়সেও আমি আই, এ, পরীক্ষা দোব। দোব বললে ভুল বলা হবে, দিতে হবে। বই কিন্তু নিজের একখানাও নেই, পাঠ্য বই কিনে টাকার অপব্যয়ও করতে রাজী নই আর তার পর শিবিরের হাজারো কাজে ও অকাজে ব্যাপৃত থাকার দরুণ নিবিষ্ট মনে পড়বার সময়ই বা কোথায় আমার? তা হোক্। তথাপি···! এই তথাপির গোঁ কিছুতেই ছাড়লেন না বরিশালীয় দাদা। বললেন, পরীক্ষা দেবার জন্ম আমার প্রয়োজন কালি, কলম ও খাতা, বইয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। তার পর বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁর কাল্পনিক স্ত্রীর ভ্রাতার সম্মানিত আসনে বসিয়ে আমার লেখার ওপর তাদের আঁচাড় কাটবার অক্ষমতার কথা যে কণ্ঠে, যে উৎপ্রেক্ষা দিয়ে, যে ভাষায়, যে নাদ-পদ্ধতিতে, যে ভাবে বর্ণনা করলেন, আমি নিশ্চিত বলতে পারি সিনেট হাউসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ধীরেনদা' যদি এমনি একটি অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা দেন, তাহলে সম্মুখে কলেজ স্কোয়ারের পুকুরে নিশ্চয়ই বন্যা দেখা দেবে এবং সিনেট হাউসের ঐ মোটা-মোটা থামগুলি চৌচির হয়ে ফেটে পড়বে। এমনি জ্বালাময়ী ভাষা!

একেই বলে বরিশালীয় ভাষা। বাংলা দেশে কেন, সমগ্র ভারতে, এমন কি, বোধ হয় সমগ্র বিশ্বে এই একটি মাত্র জেলা আছে, যেখানে নব-পরিণীত স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে curtain lecture বলে কিছুও বস্তু নেই। কারণ ফিস্-ফিস্ করে কথা বললে বোধ হয় সে দেশে কেউ শুনতে পায় না আর যে বলে তাকে সমাজচ্যুত করা হয়, তার ধোপা-নাপিত বন্ধ করা হয় এবং হয়তো তাকে জেলা থেকে বার করে দেয়া হয়। বরিশালের সবিনয় অনুরোধ অন্য দেশে কমাণ্ডার-ইন-চীফের আদেশ। আর বরিশালের আদেশ অন্য দেশে ফাঁসীর হুকুম! এই একটি মাত্র জেলা—যেখানকার কথায় মোলায়েম শব্দ একটিও নেই, নরম স্বর নেই, উচ্চারণে আদৌ নেই সংকোচ! সদ্য-ছড়ানো ঝামার খোয়ার ওপর দিয়ে ষ্টীম রোলার যেমন প্রচুর শব্দ করে ও ধাক্কা দিয়ে-দিয়ে এগিয়ে যায় এবং চেপে, দুমড়ে, ভেঙে সব-কিছু একেবারে পালিশ করে দিয়ে যায়, ঠিক তেমনি বরিশালের বিশ্রম্ভালাপ শুনলে মনে হবে বুঝি বচসা হচ্ছে আর তর্ক শুনলে মনে হবে বুঝি হাতাহাতি সুরু হয়ে গেছে! কিন্তু বরিশালে হাতাহাতি বলে কোনো শব্দ নেই। ছোরা-ছুরি, লাঠালাঠি, আর তার চাইতে নরম কিছু মানেই ঘুসোঘুসি। কালি-কলমের ব্যাপার সেখানে নেই কিছু। আপোষ-রফার সুযোগ নেই। রক্তপাত ব্যতীত কোনো ঝগড়া মিটতে পারে বলে বরিশালবাসী বিশ্বাস করেন না।

কিন্তু দেখেছি এবং দেখে বিস্মিত হয়েছি, বরিশালের প্রত্যেকটি বন্দী শিশুর মতো সরল। সামান্যতম কূটনীতিজ্ঞানও নেই তাঁদের। রেখে-ঢেকে কথা তাঁরা বলতে জানেন না। শালীনতার অনুশাসনগুলি অক্ষরে অক্ষরে মেনে স্থান, কাল, পাত্রের গুরুত্ব ওজন করে, হিসেব করে, বিচার করে বক্তব্য পেশ করবার রীতি তাঁদের রপ্ত নয়। খাপ-খোলা তলওয়ারের মতোই তাঁরা স্পষ্ট ও সত্য। এক কথায় বলতে গেলে সে যুগে বরিশালের বন্দীরাই ছিল বাংলা দেশের হাইল্যাণ্ডার্স, জার্মাণীর ষ্টীল হেলমেট্স্, রাশিয়ার কসাকস্!···'

সুতরাং ধীরেনদা'র নির্দেশ অনুযায়ী সহবন্দীদের বই ধার করে পাতা ওল্টাতে সুরু করলাম। পরীক্ষা এসেছে দ্বারে।

সঙ্গে সঙ্গে নাটকও। অতি উৎসাহী উষা পাল আর ধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সাফল্যমণ্ডিত নাটক মন্ত্রশক্তি ও সীতার পুনরাভিনয়। অগণিত দর্শকগণের তাগিদে মাত্র দুই রাত্রির জন্ম! মৃগাঙ্ক ও লবের পার্ট আমার মুখস্থ আছে। তাহলেও কো-এ্যাক্টর? সুতরাং উষা ও ধীরঞ্জনের তাগিদে নিয়মিত ভাবে না হলেও প্রায়ই মহলায় যোগদান করতে হয়। ধীরেনদা'র কঠোর নিয়মানুবর্তিতার ভ্রূকুটি এ ক্ষেত্রে কিন্তু একেবারে শান্ত। কেউ চরের মত এই মারাত্মক সংবাদ তাঁর কানে পৌছে দিলে তিনি নস্যি দিয়ে দন্তধাবন করতে করতে বিশ্ববিদ্যালয়কে আর-একবার তাঁর কাল্পনিক স্ত্রীর ছোট ভ্রাতার আসনে বসিয়ে দিয়ে বলতেন: নে, হইছে। হেইয়া লইয়া তর মাথাডা না ঘামাইলেও চলবে হ্যানে, বোঝছো মনু?

তৎক্ষণাৎ মনু হনুর মতো এক লম্ফে পগার পার হয়ে আত্মরক্ষা করতো! স্থির হলো, পরীক্ষার্থীদের অসুবিধার সৃষ্টি না করে পরীক্ষার ফাঁকে ফাঁকে নাটক দু'খানি হবে দু'-দু'বার করে।

তথাস্তু।

কিন্তু এই ১৯৩৩ সালের এই ফেব্রুয়ারী মাসেই দূর চট্টগ্রামের অখ্যাত গৈরালা গ্রামে যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সংবাদ প্রথমে ক্ষুদ্রাকারে 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকা মারফৎ এবং পরে বিস্তৃত ভাবে অন্যান্য গুপ্তপথে বহরমপুর বন্দীশিবিরে এসে পৌছোল, আমার স্পষ্ট মনে পড়ে তার ফলে সমগ্র শিবিরের শৃঙ্খলা ও সহজতা অন্ততঃ সাময়িক ভাবে খান-খান হয়ে ভেঙে পড়লো।

মারাত্মকতম সংবাদ, মাষ্টারদা' ধরা পড়েছেন!···

গৈরালা গ্রামের দূরত্ব ধলঘাট থেকে মাত্র তিন মাইল। অস্ত্রাগার আক্রমণের পর ও বিশেষ করে ধলঘাট যুদ্ধের পর এদিকটায় তখন গ্রামে গ্রামে সামরিক বাহিনীর তাঁবু পড়েছে। সারা দিন ও সারা রাত তারা প্রকাশ্য ভাবে গ্রামের পথে-পথে ঘোরাঘুরি করে, সন্দেহ হলেই কোনো গ্রামবাসী বা পথিককে নানা রকম প্রশ্ন করে, সদুত্তর দিতে না পারলে তার আর লাঞ্ছনার অবধি থাকে না।

ঠিক এই সময় গৈরালা গ্রামের বিশ্বাসদের বাড়ীতে বিপ্লবীদের গুপ্ত আড্ডা। সেদিন সেখানে এসে জমায়েৎ হয়েছেন কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্ত্তী, মণি দত্ত ও সুশীল দাশগুপ্ত। পলাতকদের এই গুপ্ত আশ্রয়-স্থলের তদারকের ভার ন্যস্ত আছে এই গ্রামেরই অধিবাসী নেত্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিপ্লবী দলের সভ্য ব্রজেন সেনের ওপর।

প্রথমটা নেত্র কিছুই জানতো না, সন্দেহও হয়নি একটুও। কিন্তু লক্ষ্য করতো সে, ব্রজেন দু'বেলাই তার বৌদিকে দিয়ে খাবার প্রস্তুত করিয়ে নিয়ে যায় পাশেই এক বাড়ীতে, বিশ্বাসদের বাড়ীতে। কেন? কারা ওখানে আছেন? আমার বাড়ীতে এসে বসে খেতে তাঁদের অসুবিধে কীসের?···অনুসন্ধিৎসা শনৈঃ শনৈঃ বেড়ে গেল নেত্র সেনের। স্ত্রীকে মিঠে কথায় ভুলিয়ে সেদিন তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতে বেগ পেতে হলো না তাঁর যে, ওরা সবাই পলাতক,

GOVERNMENT LIBRARY Cooch Behar

অস্ত্রাগার আক্রমণের দলীয় লোক আর ওদের মধ্যেই এসে আছেন পরম পূজনীয় সূর্য্য সেন।

সূর্য্য সেন?—চমকে উঠলো নেত্র। একেবারে সূর্য্য সেন? সেধে এসে অতিথি হয়েছেন?···মানসনেত্রে দেখতে পেলো নেত্র সেন, যথাস্থানে সংবাদটি সে পরম যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে পৌঁছে দিয়েছে আর কর্ত্তৃপক্ষ খুশী-মনে গুণে গুণে তার হাতে তুলে দিচ্ছে দশ হাজার টাকার কারেন্সী নোট!···লোভী ও পানাসক্ত মন তার একেবার লক্-লক্ করে উঠলো।

সম্মানিত অতিথিদের আরও যত্ন করে খাওয়াবার জন্য সে সরলা স্ত্রীর কাছে দাবী জানালো এবং প্রস্তাব করলো, সে সেদিনই শহরের হাটে গিয়ে কিনে আনবে নানা রকম তরি-তরকারী ও মাছ। স্ত্রীর মন আনন্দে ও স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে উঠলো।

কনিষ্ঠ ব্রজেনও বুঝতে পারলো না দাদার এই শহরযাত্রার গূঢ় উদ্দেশ্য কি! আর ততটা তলিয়ে দেখতে চেষ্টাও করলো না সে, কারণ স্থির হয়ে আছে, সেদিনই গভীর রাত্রে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে সবাই চলে যাবেন আর একটি গুপ্ত আশ্রয়স্থলে।

রাত প্রায় এগারোটায় অনভিজ্ঞা বৌদি ও একনিষ্ঠ কর্ম্মী ব্রজেন যখন সম্মানিত অতিথিদের চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় নানাবিধ ব্যঞ্জন সাজিয়ে খাওয়াতে বসালেন, তখন ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলেন না তাঁরা গ্রামের পায়ে-চলা মেঠো পথ এড়িয়ে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অন্ধকারে ভল্লুকের মতো নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে গৈরালা গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছেন ক্যাপ্টেন ওয়াম্‌স্‌লি চল্লিশ জন রাইফেলধারী গুরখা সৈনিক ও অফিসার নিয়ে।······

আহার শেষ হতেই অকস্মাৎ বমি করে ফেললেন মাষ্টারদা'। কল্পনা দাদাকে ঠাট্টা করলো, কিন্তু ব্রজেন হয়ে উঠলো ব্যস্ত। ওষুধের ব্যবস্থা করা উচিত। এই রাতেই যে সরে যেতে হবে অন্যত্র!

ছুটে এল সে নিজেদের বাড়ীতে। দাদা কোথায়? দাদা?··· কিন্তু এ কি!! সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলো ব্রজেন, নেত্র সেন একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন শূন্যে তুলে ট্রেণের গার্ডদের সিগন্যাল দেবার মতো করে আন্দোলিত করছে! কেন? কেন?

চট্ করে সমস্ত রক্ত তার মাথায় উঠে এল! ছুটে এল সে সূর্য্য সেনের কাছে এই সংবাদ দিতে এবং পরামর্শ দিতে যে, আর একটি মুহূর্ত্তও নষ্ট না করে এখনই স্থান ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

তৎক্ষণাৎ সবাই প্রস্তুত হয়ে নিলেন।

But it was too late···দেরী হয়ে গেছে! দেরী হয়ে গেছে!

অকস্মাৎ কয়েকটি রকেট বোমা ফেটে পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার গ্রাম আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। লক্ষ্যবস্তু ও নিশানা ঠিক করে নিয়ে চল্লিশটি রাইফেল একসঙ্গে গর্জ্জে উঠে সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেললো।

চ্যালেঞ্জ, এসেছে চ্যালেঞ্জ! ধলঘাট, জালালাবাদ, পাহাড়তলীর চ্যালেঞ্জ! কিন্তু কৌশলী সূর্য্য সেন সম্মুখীন হবার সহজ সাহস না দেখিয়ে এবার আশ্রয় নিলেন ষ্ট্রাটেজীর! শত্রুকে বিভ্রান্ত করে বোকা বানিয়ে এবার বার করতে হবে নিঃশব্দে পলায়নের পথ।

সবাই প্রস্তাব করলো, তারা যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখবে সেনাদলকে। সেই অবসরে সরে পড়বেন মাষ্টারদা'। মাষ্টারদা' বললেন, না, তা হয় না। তিনি যাবেন সবার শেষে।

বাঁশের বেড়া ডিঙ্গিয়ে পাশেই যে ঝোপ-জঙ্গল, তাতে গা-ঢাকা দিতে হবে, তার পর বিশ্রি ময়লাপূর্ণ গড়টি হামাগুড়ি দিয়ে পার হয়ে একবার ওপারে যেতে পারলেই আর কে পারবে দেখতে আমাদের?

সুশীল দাশ-গুপ্ত এগিয়ে এল। কল্পনাকে পার করে দিল পাঁজা-কোল করে, তার পর আর-একজন, তার পর আর-একজন, এবার মাষ্টারদা'র পালা। তুলে নিল সে তাঁকে অবলীলাক্রমে। কিন্তু যেই বেড়া পার করে দেবে, এমন সময় অকস্মাৎ অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত একটা গুলী এসে লাগলো তার হাতে। পারলো না বেচারা!

মাষ্টারদা' হামাগুড়ি দিয়ে সরে এলেন একটু দূরে। একটা প্রকাণ্ড গাছ, বেয়ে উঠে ওপারে পড়তে পারলে আর শব্দ হবার আশঙ্কা নেই। নিঃশব্দে বেয়ে উঠলেন, নিঃশব্দে ওপারে নামলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হুমড়ি খেয়ে পড়লেন একজন রাইফেলধারী সৈনিকেরই গায়ে। প্রাণপণ শক্তিতে তাঁকে চেপে ধরে চীৎকার করে সাহায্য প্রার্থনা করলো সে। আবার ফাটলো গোটা কয়েক রকেট বোমা, আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো বনভূমি। মাষ্টারদা' ধরা পড়লেন, সঙ্গে ধরা পড়লো ব্রজেন সেন।···

কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলাম সবাই। হাসি ও খুশী কে যেন কেড়ে নিয়ে গেছে! কী যে ভাবি সারা দিন, নেই তার মাথা, নেই মুণ্ডু! খেলতে ভালো লাগে না, নাটকের মহলাও বন্ধ হয়ে গেল লোকাভাবে। পড়ার বই খুলে বসলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। চট্টগ্রামের বন্দীরা তো জলস্পর্শ [illegible]লেন না দিন কয়েক। বাধা দিলাম না আমরা। যুক্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি করে গেলাম না বোঝাতে যে, শোক ত্যাগ ক[illegible] নাও, তূর্য্যনিনাদে আহ্বান জানাও বাংলার সমস্ত বিপ্লবীদের, মাষ্টারদা'র গ্রেপ্তারের মূল্য আদায় কর কড়ায়-গণ্ডায়!···নীরবে দূর থেকে শ্রদ্ধা জানালাম এই অশ্রুকে! জানি, এই অশ্রু একদিন উত্তপ্ত হয়ে উঠে টগবগ করে ফুটতে থাকবে, রূপায়িত হবে তাজা লাল রক্তে আর সেই রক্তেরই আলতা পরিয়ে দিতে হবে আমার দেশজননীকে। আজিকার এই অশ্রু সেই অনাগত সুদিনেরই পূর্ব্বাভাস! তাই ঝরুক না বিন্দু বিন্দু!···

সেদিনকার সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে 'ষ্টেটসম্যান্' যা লিখেছিল তার কতকটা আজও মনে পড়ে।···লোকটির আকৃতি এত সাধারণ, প্রকৃতি এমনি বৈশিষ্ট্যহীন আর তার চলা-ফেরা এমনি গেঁয়ো যে, গোয়েন্দা বিভাগ দীর্ঘ তিন বৎসর আপ্রাণ চেষ্টা করেও তাকে খুঁজে বার করতে পারেনি। অথচ সংবাদ পেয়েছে তারা এবং নির্ভুল সংবাদই পেয়েছে যে, সূর্য্য সেন চট্টগ্রামের বাইরে যায়নি। কখনো কুলির বেশে, কখনো কৃষকের বেশে, কখনো-বা ঝাঁকামুটের বেশে এই লোকটি চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাম্পানওয়ালার ছদ্মবেশে সূর্য্য সেন পার্ব্বত্য নদীতে-নদীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে সংগঠনের কাছে, এই সংবাদ পেয়েও গোয়েন্দা বিভাগ একে চিনতে পারেনি, ধরতে পারেনি। আজ সেই মাষ্টারদা' ধরা পড়েছেন! মনে হলো, আমাদেরও গলায় পড়েছে ফাঁসীর রজ্জু!···

কী যেন হারিয়েছি আমরা। কী এক অমূল্য বস্তু! শুধু পরম আত্মীয় নয়, পরম পূজ্য! মনে হলো হারিয়েছি যেন নিজেরই হস্ত,

নিজেরই চক্ষু, নিজেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে যেন গৈরালা গ্রামের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত ক্যাপ্টেন ওয়ামস্লির বিভঙ্গভাবের বুলেট !···

নেত্র সেন নিশ্চয়ই পেয়েছে দশ হাজার টাকা। কিন্তু টাকায় যার মূল্য নির্দ্ধারণ করতে পারা যায় না, এমনি কী এক অমূল্য বস্তু সে হারালো, জানতে পারলো না সে। সমগ্র বিপ্লবী জাতির পৃষ্ঠে অতর্কিতে কী করে যে সে ছুরিকাঘাত করলো, মূর্খ বোধ হয় তা বুঝতেই পারলো না।

বৃটিশ গভর্ণমেন্টের খানাপিনা ও আনন্দ-উৎসবের ফেনিল স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে নেত্র সেন কল্পনাই করতে পারবে না যে, শৃঙ্খলিতা দেশজননীর চক্ষু দু'টির কোণে তখন তপ্ত রক্তাশ্রু চক-চক করে উঠছে অন্ধকারে সাপের মাথার মণির মতো !···

২৫

কিন্তু, কালের ব্যবধানে মানুষ নিকটতম আত্মীয়ের তীব্রতম বিয়োগ-ব্যথাও ভুলে যায় !···

তাই, ধীরে ধীরে আবার কর্ম্মচাঞ্চল্য দেখা দিল বন্দীশিবিরে। পরীক্ষা দিলাম আমি এবং সঙ্গে সঙ্গে নাটকও হলো। নাটকে যথাপূর্ব্বং প্রশংসা অর্জ্জন করলাম বটে। কিন্তু প্রশ্নপত্রের জবাব কী রকম দিলাম, পরীক্ষকদের কতখানি মনোরঞ্জন তা করতে পারবে, তখনই তা জানবার পথ কোথায় ? প্রত্যেক দিন প্রশ্নপত্র পেয়েই তৎক্ষণাৎ লেখা সুরু করতাম আমি, তার পর যখন দেখতাম পুরো নম্বরের জবাব দেয়া হয়ে গেছে, তখন ফাউনটেন পেন পকেটে গুঁজে উঠে দাঁড়াতাম, একটি বার রিভাইজ করবারও ধৈর্য্য থাকতো না। এমনিই ছিল আমার স্বভাব !

পাশে বসে অনিল সেন প্রমাদ গুণতো। কারণ তাকে সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করতে হতো আমারই লেখার ওপর। আড়চোখে চেয়ে-চেয়ে যতখানি পারতো সে নকল করে নিত পরম নিষ্ঠার সঙ্গে, তার পর শেষের পঁয়তাল্লিশ মিনিট আমার অনুপস্থিতি কালে সে বেচারা হয় ছবি আঁকতো, নয় তো প্রাণপণ চেষ্টা করতো এক-আধটা প্রশ্নের জবাবে অন্ততঃ এক-আধ লাইন লিখবার জন্য। আশ্চর্য্য, এই অনিল সেনও কিন্তু পাস করেছিল আই· এ পরীক্ষায় তার তেরছা দৃষ্টির দৌলতে।

পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ায় অন্ততঃ ধীরেনদা'র চোখ-রাঙানি থেকে রক্ষা পেলাম এবং সে জন্যই স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলাম !···

এর পরই সাহিত্য-সভার পক্ষ থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের যে নকল অধিবেশন আহ্বান করা হয়, আজও তা স্পষ্ট মনে পড়ে।

ইষ্টার্ণ এ্যানেক্সি অর্থাৎ টালি ব্যারাকের সম্মুখে খোলা ময়দানে চতুর্দ্দিকে বিচিত্র রংয়ের সুজনী টাঙ্গিয়ে পরিষদ-কক্ষ তৈরী করা হলো। তক্তপোষের ওপর টেবিল-চেয়ার পেতে স্পীকারের আসন তৈরী হলো। তার নীচেই আসন নির্দ্দিষ্ট হলো পরিষদ-সেক্রেটারীর। তার পর অর্দ্ধবৃত্তাকারে স্থান নির্দ্দিষ্ট হলো বিভিন্ন দলের, যথা—মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, অনুন্নত সম্প্রদায়, স্বতন্ত্র দল, জাতীয়তাবাদী মুসলিম, হিন্দু-মহাসভা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং ট্রেজারী বেঞ্চ আলোকিত করে

বসলেন হোম মেম্বার, ডেপুটি হোম মেম্বার, সেক্রেটারী, মন্ত্রিগণ ইত্যাদি। সন্ত্রাসবাদীরা ভগৎ সিং-এর মতো পরিষদে বোমা নিক্ষেপ করতে পারে আশঙ্কায় সদস্যগণের নিরাপত্তার ভার দেওয়া হলো পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্টের ওপর। শুধু তাই নয়, সাদা পোষাকে আই-বি ও এস-বির কর্তারাও সন্ত্রাসবাদীদের তল্লাসে তৎপর হয়ে উঠলেন। দর্শকদের প্রবেশ করতে দেয়া হবে, কিন্তু দেহ-তল্লাসীর পর।

১৯৩৩ সালের ১৭ই মার্চ্চ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন সুরু হলো বেলা দু'টোয়।

স্পীকার হিমাংশু আইন-পরিষদ কক্ষে প্রবেশের প্রাক্কালে সেক্রেটারী পুষ্প চ্যাটার্জ্জী গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন: Gentlemen, Mr. President.

সদস্যেরা উঠে দাঁড়ালেন। স্পীকার আসন গ্রহণ করবার পর তাঁরা উপবেশন করলেন। স্পীকারের আদেশে এবার সুরু হলো interpellations অর্থাৎ প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্নগুলি যথারীতি বিভিন্ন দলের নেতা সাহিত্য-সভার কাছে পূর্ব্বেই পৌঁছে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন দল ও সরকারী দল মনোনীত হবার পর প্রশ্নগুলো হোম মেম্বার রাখাল ঘোষের হাতে দেয়া হয়েছিল।

প্রথমেই প্রশ্ন করবেন মুসলিম লীগের নেতা মতি সিং। যেমনি বার্ণিশহীন আবলুসের মতো কালো, তেমনি অস্থিচর্ম্মসার দেহ। এরই ওপর তিনি বারো আনা দামের লুঙ্গি পরেছেন ও মাথায় জিন্না টুপী ও গালে কৃত্রিম দাড়ী এঁটেছেন।

বিচিত্র সুরে কোরআণের একটা বয়াৎ উচ্চারণ করে তিনি প্রশ্ন করলেন: হোম মেম্বার মহোদয় দয়া করিয়া জানাইবেন কি সেক্রেটারীয়েটে গেজেটেড অফিসারের পদে শতকরা কত জন মুসলমান নিযুক্ত আছেন?

রাখাল ঘোষ জবাব দিলেন: শতকরা ৮ জন।

—গভর্ণমেণ্ট এই সংখ্যাবৃদ্ধির কথা চিন্তা করিয়াছেন কি?

—উপযুক্ত প্রার্থী পাইলেই চিন্তা করা হইবে।

চীফ হুইপ ধীরেন সোম অতিরিক্ত প্রশ্ন করলেন: উপযুক্ত প্রার্থীর জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় কি?

হোম মেম্বার এ প্রশ্নের জবাব দিলেন না। দেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন না।

এর পর দাঁড়ালেন অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা নিবারণ দত্ত। উসকো-খুসকো চুল, ছেঁড়া খদ্দরের পাঞ্জাবী গায়ে, সারা মুখে বসন্তের দাগ, চোখে পুরু কাচের চসমা। Depressed ও oppressed classএর মুখপাত্র বার কয়েক কেসে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে প্রশ্ন করলেন মাদ্রাজী উচ্চারণে ইংরেজী ভাষায়: Will the Hon'ble member in charge of Home (Police) Department please state the reason why all scheduled caste inhabitants of the village of Keshiary in the district of Midnapur had to leave the village leaving behind their belongings?

মন্ত্রী সুধীন সরকার তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন: Only a few have left for personal reasons.

—Is it not a fact that a caste Hindu Zamindar persecuted them mercilessly?

—No.

—Oh, the depressed and oppressed class!—বলে অনুন্নত দলের দরদী নেতা একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বসে পড়লেন।

এবারে প্রশ্ন করবেন কংগ্রেসী দল অর্থাৎ পরিষদে শক্তিশালী বিরোধী দল। দলের মুখপাত্র কমরেড কৃশা গান্ধী-ক্যাপ মাথায় দিয়ে এসেছেন। হাঁটু অবধি মোটা খদ্দর, খালি পা, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, গায়ে জামা নেই, শুধু চাদর আর গলায় মোটা যজ্ঞোপবীত।

প্রশ্ন: গভর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া বলিবেন কি বর্ত্তমানে বাংলায় কত জন বিনা বিচারে আটক বন্দী আছেন?

জবাব: ৩২৫৮ জন।

প্রশ্ন: গ্রামে ও গৃহে অন্তরীণদেরও কি ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে?

জবাব: আজ্ঞে হ্যাঁ।

—অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ইহাদের আটক রাখিবার কারণ কি?

—কারণ, প্রাপ্ত কাগজপত্র হইতে গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস করিবার সঙ্গত কারণ দেখা দিয়াছে যে, ইহারা এমন সব প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সদস্য, যাহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে হিংসামূলক পন্থায় আইন ও শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত এই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ সাধন করা।

বিরোধী পক্ষ থেকে শেম শেম ধ্বনি শোনা গেল।

কমরেড কৃশা প্রশ্ন করলেন: কি কি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, গভর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া তাহা জানাইবেন কি?

জবাব দিলেন হোম মেম্বার: না। জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য তাহা প্রকাশ করা হইবে না।

আবার হল্লা সুরু হলো। সরকারী দল হিয়ার হিয়ার করে উঠতেই বিরোধী দল খ্যাঁকশিয়ালের ডাক ডাকলো। দর্শকদের মধ্যেও গণ্ডগোল সুরু হলো। স্পীকার হিমাংশু আইন-হাতুড়ী পিটলেন: অর্ডার! অর্ডার!

হিন্দু মহাসভার একজন সদস্য নাক ডাকিয়ে নিদ্রাসুখ উপভোগ করছিলেন। বৈধতার প্রশ্ন তুলে মুসলিম লীগের ডেপুটি লীডার অনন্ত সরকার স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। স্পীকার এই প্রশ্ন বাতিল করে দিয়ে বললেন: সংবিধানে নিদ্রা সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই। সুতরাং পরিষদ-গৃহে অধিবেশন চলতে থাকা কালে নিদ্রা আইনবিরুদ্ধ বলা যায় না।

আবার প্রশ্ন করলেন কংগ্রেসী দলের নেতা কমরেড কৃশা: ইহারা ডাকাতি, নরহত্যা, বোমা প্রস্তুত প্রভৃতি অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন বলিয়া গভর্ণমেণ্ট মনে করেন কি?

হোম মেম্বার জবাব দিলেন: তাহা প্রকাশিতব্য নয়।

প্রশ্ন: গভর্ণমেণ্ট কোন্ কোন্ সূত্রে এই সব সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন? তাহার মধ্যে সবগুলিই কি বিশ্বাসযোগ্য?

জবাব: জনসাধারণের নিরাপত্তায় জন্য এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারি না।

আবার হিয়ার হিয়ার, শেম শেম, হল্লা, চীৎকার ও স্পীকারের হাতুড়ীর ঘা।

ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন যখন এই ভাবে পূর্ণোদ্যমে চলছে, বাংলা দেশের বিপ্লবীরা তখন কিন্তু নীরব ছিল না। গোপনে তারা বোমা ও রিভলভার প্রস্তুতে রত। মাণিকতলায় নয়, কিচেনের কাছে আমতলায় ছুঁচ তৈরী করে রিভলভার তৈরী করছেন টিটু নাগ। এস-বি দারোগা মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এই সংবাদ এনে পৌঁছে দিলেন পুলিশ কমিশনার দ্বিজেন গাঙ্গুলীর অফিসে। ব্যস, অমনি চললো এক দল সশস্ত্র সিপাই, তল্লাসী হলো, কিন্তু আপত্তিকর পাওয়া গেল না কিছুই। পরিষদ-কক্ষে তবুও প্রবেশের ব্যাপারে কড়াকড়ি বাড়িয়ে দেয়া হলো। দু'জন সার্জেণ্ট পাঠিয়ে দেয়া হলো স্পীকারের দেহরক্ষী হিসেবে আর প্রবেশ-দরজায় দাঁড়ালো চার জন।

বৃটিশ রাজত্বে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকতে পারে কি?···

এবার স্পীকার আহ্বান জানালেন ডেপুটি হোম মেম্বার প্রভাত নাগকে তাঁর প্রস্তাব পরিষদে পেশ করবার জন্য।

প্রভাত নাগ দাঁড়ালেন। সুন্দর চেহারা, চসমা চোখে, তার ওপর সাহেবী পোষাক। স্বভাবতঃই তিনি সুরু করলেন ইংরেজীতে: I am Just coming for my home at London. When I had been there I met Mr. Ramsey Macdonald···অর্থাৎ লণ্ডনে থাকা কালে ম্যাকডোনাল্ডের মেয়ের বিয়েতে একটি ভোজসভার আমি নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে যখন তাকে Communal Award সম্বন্ধে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, জানাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম, তখন সে স্পষ্টই আমায় বলেছিল, ভারতে অসংখ্য সম্প্রদায়, সংখ্যাতীত তাদের ভাষা, একেবারে পরস্পরবিরোধী তাদের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার। সেখানে এক সম্প্রদায়ের লোক অপর সম্প্রদায়ের লোকের হুঁকোতে তামাক খায় না। সুতরাং সম্প্রদায়গত অধিকারের কথা ভারতে অবশ্যই বিবেচ্য। ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর কল্যাণ সাধনের যে পবিত্র দায়িত্ব বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেছেন, তা পালন করতে হলে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের। ···এমনি ভাবে প্রাঞ্জল ইংরেজী ভাষায় মাঝে মাঝে হাস্যরসের সৃষ্টি করে ডেপুটি হোম মেম্বার প্রভাত নাগ চমৎকার একটি বক্তৃতা দিয়ে শেষ দিকে গদগদ ভাষায় বললেন: এই জন্যই এসেছে এই সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ। ভারতীয় সম্প্রদায়গুলি নিজেরা আলাপ আলোচনা করে যখন কোনও মীমাংসায় আসতে পারলো না, তখন অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে, নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেই ম্যাকডোনাল্ডকে এই শুষ্ক ও নীরস কর্ত্তব্য পালন করতে হয়েছে। ভারতবাসীর জন্য তার দরদ সীমাহীন!

Oppressed ও Depressed classএর নায়ক নিবারণ দত্ত তাঁকে সমর্থন করবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। বরিশালীয় বাংলা ও মাদ্রাজী ইংরেজী মিলিয়ে তিনি বার বারই অনুন্নত সম্প্রদায়ের ওপর বর্ণহিন্দুদের অসংখ্য অত্যাচারের কথা বর্ণনা করলেন এবং একমাত্র এই Communal Awardই যে সেই অত্যাচার রোধ করতে পারে, তাও ব্যক্ত করতে ভুললেন না।

এমনি ভাবে প্রত্যেক দলই নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করবার পর যখন হিন্দু মহাসভার নেতা গোপাল গুপ্ত সপুষ্প শিখা দুলিয়ে, পৈতা দেখিয়ে, বৃত্তাকার গীতা আন্দোলন করে, হাত-পা ছুঁড়ে একেবারে খাস ফরিদপুরী গ্রাম্য ভাষায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট, মুসলিম লীগ, অনুন্নত সম্প্রদায়, এমন কি স্পীকারকেও ম্লেচ্ছ নামে আখ্যাত করে গালিগালাজ সুরু করলেন, অধিবেশন তখন শুধু যে জমেই উঠলো, তাই নয়, অতি দ্রুত তা এগিয়ে চললো ক্লাইমেক্সের পানে!

বাধা এলো চতুর্দ্দিক থেকে, বৈধতার প্রশ্ন, অধিকারের প্রশ্ন, অবমাননার প্রশ্ন উঠলো বহু বার। কেউ টেবিল চাপড়াতে লাগলেন, কেউ বেড়ালের ডাক ডাকতে লাগলেন, কেউ শুধু চীৎকারই করতে লাগলেন, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন অগ্রাহ্য করে, বেদ ও পুরাণের কথা তুলে, চণ্ডী ও গীতার শ্লোক উচ্চারণ করে, যাজ্ঞবল্ক্য, অষ্টাবক্র, ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি মুনিদের অমর জীবনীর পর্য্যালোচনা করে হিন্দু মহাসভার যোগ্যতম নেতা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপাল গুপ্ত, তর্কচূড়ামণি, স্মৃতিতীর্থ, সার্ব্বভৌম, বিদ্যাবাগীশ ও ন্যায়রত্ন মহাশয় অগ্নিক্ষরা ভাষায় যে বক্তৃতা দিলেন—

এমন সময় অকস্মাৎ এক অঘটন ঘটে গেল। পুলিশ কমিশনারের সতর্ক প্রহরা-ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে কী ভাবে এক জন বিপ্লবী গোপনে রিভলভার নিয়ে প্রবেশ করে ভালো মানুষটির মতো দর্শকের আসনে বসে সুযোগের অপেক্ষা করছিল। গোপাল গুপ্তকে থামিয়ে দেবার জন্য বেই হোম মেম্বার রাখাল ঘোষ উঠে দাঁড়িয়ে পার্লিয়ামেণ্ট-বিরোধী ভাষায় shut up বলে চীৎকার করে উঠলেন,

অমনি সম্মুখে লাফিয়ে পড়ে সেই বিপ্লবী ফস্ করে রিভলভার বার করে পর-পর তিন বার গুলীবর্ষণ করলো। আমতলায় তৈরী রিভলভারের ট্রিগার এখানে বিপ্লবীর আঙুলে টানলেও শব্দ হলো তার পাশের টালি ব্যারাকে। চাবির মধ্যে দেশলাইয়ের বারুদ পুরে টিটু নাহা যথাসময়ে আওয়াজ করে দিলেন। কিন্তু তাহলে কী হবে? রাখাল ঘোষকে যে মরতেই হবে, নইলে অমল মজুমদার শহীদ হবে কি করে? অতএব হোম মেম্বার Oh my God! Oh my Virgin Mary! বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। মুসলিম লীগের নেতা মতি সিং ইয়া আল্লাহ্ বলে দাড়ি ফেলে রেখেই পলায়ন করলেন। Depressed ও Oppressed classএর নেতা নিবারণ দত্ত টেবিলের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। গোপাল বিদ্যাভূষণ মশায় উন্মুক্ত কাছা কিছুতেই আর খুঁজে পেলেন না। হৈ-চৈ, চীৎকার ও ছুটোছুটির মাঝে বিপ্লবী পকেট থেকে পটাসিয়াম সায়নেডএর প্যাকেট বার করে মুখে ঢেলে দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো শহীদ হয়ে এবং সেই সময় অকস্মাৎ বিউগল ধ্বনির মাঝে সশস্ত্র সিপাই দল নিয়ে গট্-গট্ করে প্রবেশ করলেন মার্চ্চ করে স্বয়ং পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্ট অর্থাৎ দ্বিজেন গাঙুলী খোলা রিভলভার হাতে নিয়ে।

হুকুম হলো: Hands up everybody or I will shoot.
সকলেই গৌরাঙ্গের পোজ-এ দাঁড়িয়ে পড়লেন।

২৬

এমনি ভাবে বন্দী-জীবনে মাঝে মাঝেই ক্লাইমেক্স সৃষ্টি করা হতো এই একঘেয়েমি দূর করবার জন্য। এই একঘেয়েমিটা একটা দুরারোগ্য ব্যাধির মতো। নানাবিধ সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দিলেও গভর্ণমেণ্ট সঙ্গে সঙ্গে বপন করতেন একঘেয়েমির বীজ। হয়তো তা রাজসিক একঘেয়েমি। চার বেলা নবাবী খানা আর দায়িত্বহীন অফুরন্ত অবসর, প্রতিদিন একই লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, একই শয্যায় শয়ন—এই যে অনড় একঘেয়েমী, এর কটু প্রভাব প্রথমে আচ্ছন্ন করে সারা মন, মনকে পাণ্ডুর করে দিয়ে নেমে আসে সারা দেহে, প্রতি শিরা-উপশিরায়, প্রতি রক্তকণিকায়, অস্থিমজ্জায়!—ব্যস, তাহলেই সিদ্ধ হলো গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য! মরফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে অকেজো করে দিল তাজা ঘোড়াকে!…

এই অভীষ্ট সাধনে গভর্ণমেণ্ট যে একেবারে ব্যর্থকাম হয়নি, তার প্রমাণ রবী লাহিড়ী। এক দিন দুপুরে খেতে যাবো এমন সময় শুনলাম, সাদার্ণ ব্যারাকে রবী লাহিড়ী নাকি খেতে যাবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেছে।

খেতে আর যাওয়া হলো না। এসে দেখলাম, দেবেশ ও বিমল বাবু মাথায় হাওয়া করছেন কপালে জলপটি দিয়ে।

রবী লাহিড়ী শিবিরের সুন্দর স্বাস্থ্যবান দেহধারীদের অন্যতম। অনেক বার সে পেশী নিয়ন্ত্রণ দেখিয়েছে শিবিরে এবং বাইরে রংপুর শহরে। বন্ধুরা সম্প্রতি কোনো অসুখের কথাও জানেন না বললেন। ভালো হয়ে রবী লাহিড়ী বললো যে, ক'দিন থেকে কেমন যেন দাঁড়ালেই হঠাৎ সে চোখে অন্ধকার দেখে আর মাথাটা ঘুরে যায়!

কিন্তু কেন? কেন এমনি হলো?…কোনো সদুত্তর সে দিতে পারলো না, আমরাও কিছুই অনুমান করতে পারলাম না।

এমনি করে ফরিদপুরের পরেশ রায় এক দিন পড়ে গেলেন। আর-এক দিন সত্য ব্যানার্জ্জীর দুই হাঁটুতেই বাতের ব্যথা দেখা দিল। এবং সর্ব্বশেষ এক দিন রবী হালদারের গলা দিয়ে ঝলকে ঝলকে উঠতে লাগলো রক্ত!

ছুটে গেলাম। দেখলাম, শয্যায় লম্বমান তার বলিষ্ঠ দেহ। কিন্তু এখন আর দেহ নেই মনে হলো, যেন দেহের একটা বিরাট খাঁচা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

থুথু ফেলার পাত্রে রক্ত, হু'কসেও তার শুষ্ক চিহ্ন দেখা গেল। ডাক্তার এলেন, দেখলেন, পরীক্ষা করলেন, বললেন, টি-বি at galloping stage!

বুঝতে পারলাম, রবীর আর জীবনের আশা নেই। তথাপি টবিনেরর সঙ্গে পরামর্শ করে সেদিনই পাঠানো হলো তাকে শিউড়ি জেলে চিকিৎসা ও আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য। মুখে আশার কথা গালভরা ভাষায় প্রকাশ করলেও মনে মনে দারুণ উৎকণ্ঠায় একেবারে বিচলিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু সৌভাগ্য রবীর, ওষুধে সে সেখানে অনেকটা ভালো হয়ে উঠছে বলে মাস খানেক পরে সে নিজেই পত্র লিখেছে দেখলাম।

কোনো নির্দ্দিষ্ট অসুখই আমার ধরেনি সত্য, তথাপি কী জানি কেন, ওজন আমার নিয়মিত ভাবে কমে যাচ্ছিল। একঘেয়েমি রোগ আমায় ধরতে পারেনি জানি। খেলা-ধূলায়, ব্যায়ামে, সর্ব্ব-প্রকার সভা-সমিতিতে সর্ব্বত্রই আমি যোগদান করতাম এবং আমার অংশটি খুব অকিঞ্চিৎকর ছিল না কখনো। তথাপি, কী জানি কেন, ওজন আমার কমে যেতে লাগলো। শ্লো পয়জনের কথা কোনো কোনো বন্ধু বললেন বটে, কিন্তু তরি-তরকারী ও অন্যান্য খাদ্যবস্তু ঠিকাদার এনে অফিসে পৌঁছে দেবার পরই তো আমাদের ম্যানেজার সে সব ওজন করে ভেতরে নিয়ে আসেন, ওতে বিষ মেশাবার সুযোগ ওরা পাবে কোথা থেকে? আর বিষ মেশালে তার প্রক্রিয়া কি শুধু বাছা-বাছা জন কতকের মধ্যেই দেখা যাবে?

অবশ্য এ জন্য চিন্তিত হইনি আদৌ। কারণ জন-কতক বন্ধুর যে যুক্তিহীন ও দুঃখজনক পরিণতি দেখলাম, তার সঙ্গে তুলনায় আমার কোন কিছুই হয়েছে বলে স্বীকার করা যায় না। এক দিন ডাঃ সরকারকে নিভৃতে পেয়ে সাধারণ ভাবে রাজবন্দীদের স্বাস্থ্যহানির কথা তাঁকে বললাম এবং টবিন চাচা নিজে বা কোনো এজেণ্ট মারফৎ আমাদের খাদ্যে যে বিষও মিশিয়ে দিতে পারে, এমনি একটা অভিমত ঝপ করে ছেড়ে দিয়ে ডাঃ সরকারের ভাবগতি লক্ষ্য করতে লাগলাম তীক্ষ্নদৃষ্টিতে। না, দেখলাম, আমার আশঙ্কা অমূলক। বেচারা কিছুই জানে না এবং এমনি নৃশংসতা যে হতে পারে, তা কল্পনাও করতে পারে না।

তবে ডাঃ সরকার রবী লাহিড়ী, পরেশ রায় প্রভৃতির এমনি আকস্মিক দুর্ব্বলতা ও সাধারণ ভাবে সবার ওজন হ্রাস এবং কারুর কারুর এই বয়সেই বাত-ব্যাধি আক্রমণের কথা উল্লেখ করে এর পশ্চাতে একটি কারণের কথা ব্যক্ত করলেন এবং নানা ভাবে যুক্তি দিয়ে তা সমর্থন করতে লাগলেন। সেদিন অবশ্য তাঁর যুক্তি শুনে খুব হেসেছিলাম।

কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের বিরুদ্ধে ডাঃ সরকার সেদিন কঠোরতম অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। প্রকৃতির বিরুদ্ধে এই যে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা,

বোর্ন-ভিটা যে কতো ভালো খেয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন!

ক্যাডবেরির বোর্ন-ভিটা পান-করুন

আপনার শক্তি বাড়বে...শরীরেরও পুষ্টি হবে

পুষ্টিকর পানীয় বোর্ন-ভিটার পেয়ালা হাতে নিয়ে খেতে গেলে প্রথমেই মল্ট ও চকোলেটের গন্ধে মনটা ভরে উঠবে... তারপর পেয়ালায় চুমুক দিয়েই বুঝতে পারবেন জিনিসটা কতো ভালো ও সুস্বাদু। স্বাদ ও গন্ধের কথা ছেড়ে দিলেও বোর্ন-ভিটা অত্যন্ত পুষ্টিকর কারণ বোর্ন-ভিটা একাধারে পরিপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত সুষম একটি খাদ্য ও পানীয়। বোর্ন-ভিটা ছোটোবড়ো সকলেরই স্বাস্থ্য, শক্তি ও প্রাণ-প্রাচুর্যকে জাগিয়ে তোলে। এই জন্য ১৪,০০০-এরও বেশি চিকিৎসকের প্রত্যেকেই "ক্যাডবেরির বোর্ন-ভিটা পান করুন" বলে থাকেন। বোর্ন-ভিটায় আপনার শক্তি বাড়বে... শরীরের পুষ্টিও হবে।

CFY-11 BEN

প্রতিদিন ক্যাডবেরির বোর্ন-ভিটা পান করে আপনার স্বাস্থ্য গড়ে তুলুন!

ক্যাডবেরি-ফ্রাই (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড বোম্বাই — কলিকাতা — মাদ্রাজ

তার উল্লেখ করে তিনি বললেন : ভগবান আছেন কি নেই, সে প্রশ্ন নয় দ্বিজেন বাবু ! এটা স্বতঃসিদ্ধের মতো সত্য যে, প্রকৃতি একটি বাঁধা-ধরা নিয়মে চলেন, একটি ছক-কাটা পথেই তাঁর আনাগোনা। এই প্রকৃতিই নরের পাশে এনে দিয়েছেন নারী এবং নারীর পাশে নর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাতে কোনো দিনই না দেউলে হয়ে যায়, শ্মশান হয়ে যায়, সে জন্য এই নর-নারীর মিলনে যেমন আঁতুড়-ঘর হেসে ওঠে, তেমনি এক দিন ফুল ঝরার মতো তাদেরকে ঝরে পড়তে হয় শ্মশানে। এই যে নিয়ম, আপনারা এই নিয়মের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন অহর্নিশি। কিন্তু দ্বিজেন বাবু, প্রকৃতির বিরোধিতা করলেই তো জয়লাভ অবধারিত বলে মেনে নেয়া যায় না। তাই কঠিন ব্রহ্মচর্য্য যাঁরা পালন করেন, অর্থাৎ আপনারা, তাঁদের অমনি সব যুক্তিহীন ব্যাধিতে কষ্ট পেতে হয়। Biological factকে অস্বীকার করলে ভূগর্ভের উত্তাপে জল পড়লে যা হয়, তাই হবে। সেই বাষ্প এক দিন উত্তাল হয়ে উঠে কোথা-না-কোথা দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে পড়বেই। এক দিন কায়রোতে—

বলেই ডাঃ সরকার আবার তাঁর সেই মধ্য-প্রাচ্যের অফুরন্ত ও থিলিং অভিজ্ঞতার ইতিহাস খুলে বসলেন এবং আগামী যুদ্ধ কবে ও কার কার সঙ্গে বাধতে পারে, এবং তাহলে জয়লাভের সম্ভাবনা কার বেশী, সে সম্বন্ধে নানা তথ্য ও গবেষণামূলক এক দীর্ঘ বক্তৃতা সুরু করলেন। আমি বাধ্য হয়ে একটা ছুতো করে রণে ভঙ্গ দিলাম। ঘরে এসে হাসলাম প্রাণ ভরে। নরের পাশে যে নারী রেখেছেন প্রকৃতি দেবী, তা তো জানি ; রেণু, লতিকা, বীণা ও অশোকার মধ্য দিয়ে তা মর্ম্মে মর্ম্মে জেনেছি ; কিন্তু ওদিকে ভালো করে দৃষ্টিক্ষেপ করবার অবসর কোথায় আমাদের ?

আমাদের পথ চলেছে যেদিকে, সেদিকে শুধু ময়না কাঁটার ঝাড় আর বাবলা গাছের সারি। পথে ছড়ানো মরুভূমির বালি, উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে সেই তপ্ত বালুকারাশি এলোপাথাড়ি উড়তে থাকে। পথের ধারে নেই কোনো কাজলা-দীঘি, নেই মানস সরোবর ! সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখতে পাই—বালির সমুদ্র অতি দূরে গিয়ে দিকচক্রবালের সঙ্গে মিশে গেছে। সেই পথে আমাদের যাত্রা ! কখনো আকাশে শুনতে পাই কালবৈশাখীর রণ-হুঙ্কার, কখনো শীতের শুষ্ক রুক্ষ ঝটিকা তুলে ধরে অনতিক্রম্য বাধা, কখনো নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার চতুর্দ্দিক থেকে এসে গ্রাস করে পাইথনের মতো। …তবুও আমরা চলেছি সেই পথে নিশিদিন, দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন। কী আমাদের লক্ষ্য, কোথায় আমাদের গন্তব্য স্থান, করে শেষ হবে আমাদের এই অবিশ্রাম চলা, আদৌ জানি নে তা। কিন্তু এই চলার পথে যাত্রা করে ভুলে গেছি আমরা কোথায় ফোটে শিউলি ফুল, কোথায় শোনা যায় ভ্রমরার গুনগুনানি, কোন্ কালো চোখের কোণে খেলে বিদ্যুৎ, কোন্ কোমল হৃদয়ে ডাকে ভাবাবেগের বন্যা !…

নারীকে আমরা করে চলেছি সম্পূর্ণ অস্বীকার !

অকস্মাৎ এক দিন হুকুম এল যতীশ গুহকে সমস্ত জিনিষপত্র নিয়ে যেতে হবে অফিসে। বুঝলাম তাঁকে এবার নিয়ে যাচ্ছে হয় হিজলীতে, না হয় বক্সা দুর্গে। বলতে গেলে এই প্রথম বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সন্তানের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের আঘাত।

কিন্তু বিস্মিত হলাম তাঁকে দল বেঁধে বিদায় দিতে গিয়ে। গভর্ণমেণ্ট তাঁকে একেবারে বিনাসর্ত্তে মুক্তির আদেশ দিয়েছেন। দূরে দাঁড়িয়ে কিছুতেই বিশ্বাস হলো না আমাদের। কিন্তু যতীশ বাবু হাসিমুখে একখানা দশ টাকার নোট আন্দোলিত করে দেখালেন। এবার আর অবিশ্বাস করবার কিছু রইলো না। কারণ, স্থানান্তরে যেতে হলে ওদের নিয়ম অনুসারে সঙ্গে যাবে আই-বি অফিসার এক জন ও জন দুই সশস্ত্র দেহরক্ষী। টাকা-পয়সা সব ঐ অফিসারের হাতেই থাকবে। যতীশ বাবুর হাতে টাকা দিয়েছে মানেই হচ্ছে তাঁর যাবতীয় ভাড়া তাঁকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন তিনি মুক্ত !

মুক্ত ! কথাটা কেমন যেন নতুন শোনাতে লাগলো। আর খানিকটে বেসুরোও বটে ! আর কেউ নয়, স্বয়ং যতীশ গুহ। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের কতকগুলি Actionএর পরিকল্পনাই যে শুধু তাঁর ছিল, তা নয়, কয়েকটাতে তিনি সক্রিয় অংশও গ্রহণ করেন। আমার এই আখ্যায়িকাতেই পরে আবার এই যতীশ গুহের উল্লেখ করতে হবে। তখনই জানা যাবে, গভর্ণমেণ্ট এই লোকটিকে অকস্মাৎ ঐ ভাবে মুক্তি দিয়ে কী মহাভ্রমই না করেছিলেন এবং সেই ভুলের কী মর্ম্মান্তিক পরিণামই না তাঁদের হজম করতে হয়েছিল নীরবে !…

এই ধরণের অদ্ভুত মুক্তির পশ্চাতে গোয়েন্দা বিভাগের কী গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তা স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারতাম আমরা। মিহি জালে ছেঁকে ধরবার মতো প্রথমতঃ গোয়েন্দা বিভাগ দলে দলে গ্রেপ্তার করতো। স্বভাবতঃই তখন এই বিশেষ এলাকায় বিপ্লবীদের তৎপরতা ব্যাহত হতো। নিশ্চয়ই দু'-এক জন, যারা জাল থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে, তারা ভাঙ্গা আসর আবার জমিয়ে তোলবার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। তাই কিছু দিন অতিবাহিত হলে নেতৃস্থানীয় এক জনকে অকস্মাৎ একেবারে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দিয়ে অত্যন্ত কঠোর ভাবে তার ওপর নজর রাখা হতো গোপনে—তিনি কোথায় কোথায় যান, কে কে আসেন তাঁর ওখানে, কি কি কথা হয়, এ সব দেখবার ও জানবার চেষ্টা করা হতো। ফলে, হয়তো সন্ধান পাওয়া যেত আরও কিছু বিপ্লবীর। তখন আবার জাল ফেলা হতো।

কিন্তু আমরা এ সব তথ্য বেশ জানতাম বলেই সমঝে ও সামলে চলতাম সর্ব্বদাই। যতীশ গুহ আবার সেই সমঝে ও সামলে চলবার দলের মুখপাত্র। সুতরাং খুশী হলাম মনে মনে গভর্ণমেণ্টের এই নির্বুদ্ধিতায়। আমরা কেউ দীর্ঘকাল বাইরে যেতে না পারলেও একা যতীশ গুহই যে বিপর্য্যয় সৃষ্টি করতে পারবে, সে বিশ্বাস আমার আছে।

যতীশ গুহ বিদায় নেবার পরই চললো নানা গবেষণা ও বিতর্ক। গভর্ণমেণ্ট নাকি ধীরে ধীরে মুক্তি দেবার নীতি গ্রহণ করেছেন। ব্যারাকে ব্যারাকে এই বিষয়ে চললো ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা। কিন্তু 'হায়, শিকে ছিঁড়লো বোধ হয় ঐ একটি বিড়ালেরই ভাগ্যে !

টবিন-গিরিজা এ্যাণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে তেমন আর ঠোকাঠুকি নেই। মোটের ওপর এক ভাবে কেটে যাচ্ছে বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি। বোধ হয়, শান্ত আবহাওয়াকে কোনো কূটনৈতিক কারণে আরও

আনন্দময় করে তোলবার-উদ্দেশ্যেই এক দিন বিকেলে অকস্মাৎ দেখলাম এসেছে শিবিরের মধ্যে বেড়াতে চাকর সঙ্গে করে দু'টি ৬।৭ বছরের ফুটফুটে মেয়ে। শুনলাম, দু'টি মেয়েই গিরিজার।

কিন্তু অনেকক্ষণ পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম ওদের পানে। অনেক কাল পর যেন নতুন জিনিষ দেখতে পেলাম। দুনিয়ায় যে শুধু আমরা নেই, এরাও আছে, সেদিন যেন আবার নতুন করে অনুভব করতে শিখলাম। সৌন্দর্য্যের স্কেল দিয়ে মেপে দেখলে হয়তো মেয়ে দু'টির নাক-মুখ-চোখে অনেক গলদ আছে, রূপবতীর সংজ্ঞার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলাতে গেলে কিংবা এদের প্রতিটি অবয়ব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চুলচেরা বিচার করে দেখতে গেলে হয়তো এরা যে আদৌ সুন্দরী নয়, তাই প্রমাণিত হবে। কিন্তু বাস্তব পরীক্ষার কথা বাদ দিয়ে আমাদের নীরস শুষ্ক মনে অকস্মাৎ গোলাপ ফুলের মতো দলের পর দল মেলে ফুটে উঠে এই ছোট মেয়ে দু'টি যে আনন্দের শিহরণ এনে দিল, সত্যিই তা অনির্ব্বচনীয়!

আমাদের জগতে যেন নতুন জিনিষের অকস্মাৎ আমদানী হয়েছে, যা আমাদের অপরিচিত ও অবজ্ঞাত!···দু'-চারটে কথা বলাবলির মধ্য দিয়ে সহজেই আমরা ওদের দু'জনকে আপন করে নিলাম এবং তার পর সবাই মিলে সমবেত ভাবে এমনি আদর সুরু করে দিলাম যে, প্রায় এক ঘণ্টা পর সুধাংশু বাবু ও নৃপেন পাল মেয়ে দু'টিকে আমাদের কবল থেকে এক রকম উদ্ধার করে নিয়ে চাকরকে দিয়ে একেবারে শিবিরের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন এবং বারণ করে দিলেন, যেন আর কোনো দিন এদের না নিয়ে আসে।

সত্যিই, একেবারেই যেন ভুলে গেছি বাইরের কথা, বাড়ীর কথা। প্রায় দেড় বছর হলো রেণুর বিয়ে হয়ে গেছে। যতই সে আমার জন্য ভাবুক, জানি শ্বশুরবাড়ী গিয়ে সেখানকার পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে আদৌ দেরী হয় না মেয়েদের। তাই মনের দরদ এখন স্থানান্তরিত হয়েছে চিঠির ভাষায়। মাঝে মাঝে এখনো আসে বটে, তবে হয়তো এর পর আর আসবে না।

ছোট বোন হেনার বিয়ে হয়ে গেছে। এখান থেকেই খানকতক বই অবশ্য পাঠিয়েছি উপহারস্বরূপ, কিন্তু বই দিয়ে যেতে-না-পারার দুঃখ কি আর ভোলা যায়? পাড়ার ছেলেদের কথাও মনে পড়লো। সর্ব্ব কার্য্যে যারা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতো আমারই ওপর এবং নির্ভর করে পরম নিশ্চিন্তে যারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতো সাফল্য একেবারে নিশ্চিত জেনে, আজ তারা না-জানি কত অসহায় হয়ে পড়েছে!

এমনি করে গ্রামের প্রত্যেকটি লোকের কথা আমার মনে ভেসে উঠলো। মনে হলো বহু দিন নয়, বহু কাল এদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। কে জানে, কবে, কত কাল পরে আবার তাদের সুখ-দুঃখের মধ্যে ফিরে যেতে পারবো?

কিন্তু বহরমপুর বন্দীশিবিরে যতীশ গুহ চলে যাবার পর দ্বিতীয় যুগান্তকারী সংবাদ এল, বরিশালের আরও দু'জন বন্দী সহ আমার প্রতি স্বগৃহে অন্তরীণের আদেশ।

স্বগৃহে বা গ্রামে অন্তরীণের আদেশকে কোনো দিনই আমরা ভালো চোখে দেখতাম না। কারণ, ঐ অর্দ্ধ স্বাধীনতাকে নানাবিধ বিধি-নিষেধ দিয়ে এমনি করে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয় যে, যে-কোনো সময়ে একেবারে অনিচ্ছায়, এমন কি অজ্ঞাতেও তার কোনোটা ভঙ্গ হয়ে যাবার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। তার পর বন্দীশিবিরে দু'-এক জন দিবাকর সেনগুপ্ত বন্দীর ছদ্মবেশে এসে আমাদের গোপন সংবাদ গোপনে কর্তৃপক্ষের কর্ণে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করতে পারে বটে, কিন্তু গ্রামে বা স্বগৃহে চৌকিদার, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট থেকে সুরু করে গ্রামের প্রত্যেকটি লোকই সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অনায়াসে বিবেক বিক্রয় করে দিতে পারে।

তবে এ সত্যও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, জেলের মধ্যে যে কর্ম্মতৎপরতা একেবারে থাকে স্থগিত, বাইরে গিয়ে বুদ্ধির সঙ্গে, সতর্কতার সঙ্গে তা চালু করা যেতে পারে। বুদ্ধির লড়াইতে পুলিশ চিরকালই পরাজয় স্বীকার করেছে আমার কাছে। তাদের কাছে চিরদিনই আমার চ্যালেঞ্জ ছিল, কোনো ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতে পার যদি, কর; ঐ অর্ডিন্যান্স, বিনা বিচারে রাজবন্দী করে রাখা, ও তো তোমাদের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। নির্দ্দিষ্ট কোনো অভিযোগ আদালতের সমক্ষে আনতে না পেরে কাল্পনিক সন্দেহবশে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটক করে রাখা।

দীর্ঘ সাত বৎসরের বন্দি-জীবনে আমার এই চ্যালেঞ্জ যে অটুট ভাবে আমি রক্ষা করে চলেছি, এই কাহিনীতেই তার কতকটা আভাস পাওয়া যাবে। সঙ্গে সঙ্গে জানা যাবে, যে কোনো মামলায়

জড়িয়ে দেবার জন্য পুলিশ ও আই-বি কর্তারাও কী পরিশ্রম ও ষড়যন্ত্রই না করেছিলেন !···

আমার বিদায়ের একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। সর্ব্বপ্রথম আমি বহরমপুর বন্দীশিবির সেনাবাহিনীর জি-ও-সি, তার পর সাহিত্য-সভার সম্পাদক, তার পর নাটক, খেলা-ধূলা, ব্যায়াম ও সর্ব্ব ব্যাপারেই আমার বিশেষ যোগাযোগ ছিল। তাই সংবাদ পাবার দশ মিনিটের মধ্যেই এমনি অনেকগুলো সংক্ষিপ্ত বিদায়-সভার অনুষ্ঠান হলো। অবশেষে খেলার মাঠে গেলাম। সেনাবাহিনী সেখানে ফল্ ইন করে আমারই জন্য অপেক্ষা করছিল। মিলিটারী বোর্ডের চেয়ারম্যান পরেশ সান্ন্যাল আমায় নিয়ে গেলেন। আমি গার্ড অব অনার পরিদর্শন করলাম ও প্রত্যেকটি সৈনিকের সঙ্গে করমর্দ্দন করে বিদায় গ্রহণ করলাম।···

বহরমপুর ষ্টেশনে এসে জানা গেল ট্রেণের একটু দেরী আছে। তাই বিশ্রামাগারে নয়, বাইরে প্লাটফরমে মালপত্রের ওপর বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। নানা বয়সের ও নানা চেহারার অসংখ্য নরনারী চলা-ফেরা করছে। ষ্টেশনের কর্ম্মতৎপরতা দেখলাম। সবই যেন নতুন মনে হলো। শুধু ষ্টেশন কেন, বাইরের আকাশ, গাছপালা, কর্ম্মমুখর জগতের প্রত্যেকটি নর ও নারীকে একেবারে অভিনব ও অপরূপ মনে হতে লাগলো !

এক দল মহিলা কেন জানি নে বার বারই আমাদের লক্ষ্য করছেন। ওঁরাও যে বহরমপুর শহরের লোক নন, তা সহজেই অনুমান করলাম, নিশ্চয়ই কোনো বন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। উঠলাম কিন্তু আমরা একই ইণ্টার ক্লাশ বগিতে, তথাপি দৃষ্টিক্ষেপে তাঁদের আমার সঙ্গে কথা কইবার প্রবল আগ্রহ দেখা গেলেও বোধ হয় সঙ্গী আই-বি দারোগা ও সশস্ত্র সিপাইদের দেখে তাঁরা ইতস্ততঃ করছিলেন।

কিন্তু গোয়ালন্দে এসে যখন ষ্টীমারেও আমরা একই ইণ্টার ক্লাশ কামরায় উঠলাম, তখন ওদের মধ্যে বর্ষীয়সী যিনি, তিনি এগিয়ে এলেন।

তুমি কি বহরমপুর থেকে আসছো বাবা ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমরাও ওখানে গিয়েছিলাম আমার ছেলেদের সঙ্গে দেখা করতে। প্রভাস গুপ্ত—প্রভাত গুপ্ত আমার ছেলে।

পদধূলি গ্রহণ করলাম। বললাম: আমি তাঁদের খুব চিনি।

তার পর তাঁরা সবাই আমায় ঘিরে বসলেন এবং খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ওখানকার খাওয়া-থাকা, সুবিধে-অসুবিধে সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। স্বগৃহে অন্তরীণের আদেশ পেয়ে যাচ্ছি শুনে মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: কী যে করেছ তোমরা, তা আমরা জানি নে, টেরও পাই নে। এমনি কাজ কেনই বা করতে যাও বাবা ? পারবে কি তোমরা ইংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে ?

বললাম: সারা অন্তর দিয়ে আমরা কিন্তু মা তাই বিশ্বাস করি।

মা বললেন: বিশ্বাস করতে পার এবং বিশ্বাস রাখা ভাল। কিন্তু তোমরা তো জান না, তোমাদের এমনি ভাবে জেলে নিয়ে গেলে মা-বাবার মন কতখানি ভেঙে পড়ে ? সারা রাত আমাদের ঘুম হয় না। ভাবি, সেখানে কি জানি তোমাদের খেতে দিচ্ছে কি না, শোবার জায়গা দিচ্ছে কি না, কি জানি সেখানে তোমাদের ওপর নির্য্যাতন করছে কি না। এই সব ভাবনাতেই আমাদের আয়ু যায় কমে আর বেঁচে থাকতেও সাধ হয় না।

মায়ের গলার স্বর ভারি হয়ে এল। জবাব আমি দিতে পারতাম, যুক্তি দেখাতে পারতাম প্রচুর, কিন্তু কিছুই করলাম না, কিছুই বললাম না। নীরবে বাংলা দেশের অসংখ্য মায়ের ভর্ৎসনা যেন শুনতে লাগলাম পরম শ্রদ্ধাভরে !······

গৃহে ফিরে গেলে জানি, আমারও মা এমনি ভাবে তিরস্কার করবেন আমায়, কত দুঃখ জানাবেন, এই সর্ব্বনাশা পথ ত্যাগের জন্য কত অনুরোধ জানাবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সারা অন্তর দিয়ে এ বিশ্বাসও রাখি, এই বাংলা দেশের মায়েরাই দামাল ছেলেদের রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়েছেন নিজেদের হাতে সাজিয়ে,—মাথায় পরিয়ে দিয়েছেন উষ্ণীষ, কোমরে দুলিয়ে দিয়েছেন তীক্ষ্ণধার তরবারি, বক্ষে এঁটে দিয়েছেন বর্ম্ম আর ললাটে এঁকে দিয়েছেন রক্তাক্ত তিলক, তার পর আশীষ চুম্বন দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন রণক্ষেত্রে। বাংলার বিপ্লবীদের অসামান্য সাফল্যের পশ্চাতে রয়েছে মায়েদেরই নীরব আশীর্ব্বাদ !···

এসে নামলাম সেই লৌহজংএ। তার পর নৌকোযোগে এলাম সেই শ্রীনগর থানায়, সেখানে একটু বিশ্রাম করে সেই পুঁটিমারা খাল দিয়ে এলাম আবার আমাদের গ্রামের সন্নিকটে। মাঝির মাথায় বাক্স-বিছানা চাপিয়ে রওনা হলাম গ্রামের দিকে।

গ্রামে প্রবেশের প্রাক্কালে, সর্ব্বাগ্রে দেখা হয়ে গেল আমার পুরাতন মাঝি বছিরদ্দি শেখের সঙ্গে। ব্যাটা বিরাট একটি ঘাসের বোঝা মাথায় করে যাচ্ছিল, দূর থেকে ক্ষেতের আইল ধরে এক জন ভদ্রলোককে মালপত্র নিয়ে আসতে দেখে থমকে দাঁড়ালো। তার পর যেই চিনতে পারলো, অমনি বোঝা ফেলে দিয়ে পাগলের মত ছুটে এল কাছে। মাটিতে একেবারে সটান শুয়ে পড়ে দুই হাতে পদধূলি গ্রহণ করতে লাগলো। বাধা দিলাম, শুনলো না। বলতে লাগলো: আইছেন—আইছেন কর্ত্তা ? হঃ, কদ্দিন ভাবছি কত্তা কবে আইবো। গেরাম এক্কেবারে খালি হইয়া গেছে। ভালোই লাগে না আর কোনো কিছু।—হেই মাঝি, দে ব্যাটা দে, বাক্স-বিছানা আমার মাথায় তুইলা দে।

বলে সে মাঝিকে আর কোনো কথা বলতে না দিয়ে বাক্স ও বিছানা এক রকম কেড়ে মাথায় তুলে নিয়ে অবলীলাক্রমে ছুটে চলে গেল গ্রামে ও আমাদের বাড়ীতে সুসংবাদটা পৌছে দিতে।

ধোপাবাড়ী ডাইনে রেখে প্রবেশ করলাম পাড়ায়। তার পর বাঁ দিকে পড়লো গিরিশ কাকার বাড়ী, তার পর হেরম্বদা'র বাড়ী, তার পরই বিলাস কাকার সেই বৈঠকখানা, গ্রেপ্তারের প্রাক্কালে যেখানে ছোট-খাটো একটা সভা হয়েছিল। ডান দিকে ঘুরে একটু দূরেই দেখা যাচ্ছে আমাদের বাড়ী। দেখলাম, আমার অভ্যর্থনা জানাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন মা, বাবা, বৌদি'রা, ছোট ভাই রঙ্গলাল।

বছিরদ্দি শেখ অনর্গল ভাষায় তখনো বক্তৃতা ক'রে কি তাঁদের বোঝাচ্ছে।

সেই দিন থেকে সুরু হলো স্বগৃহে অন্তরীণের জীবন।···

[ক্রমশঃ।
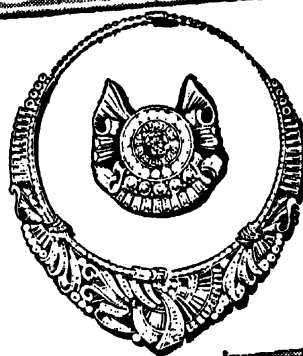
এম.বি.সরকার এণ্ড সন্স
অলঙ্কার নির্ম্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী
ব্রাঞ্চ হিন্দুস্থান মার্ট বালিগঞ্জ
১৫৯/১ বি, রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা
১৬৭ সি, ১৬৭ সি/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও বহুবাজার ষ্ট্রীটের সংযোগস্থল)
আমাদের পুরাতন শোরুমের বিপরীতদিকে ফোন- এভিন্যু ১৭৬১ গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস,
ব্রাঞ্চ—হিন্দুস্থান মার্ট, বালিগঞ্জ ফোন—পি. কে. ৪৪৬৬

জলযাত্রা

শ্রীশান্তা দেবী

২

কলকাতা থেকে জাহাজে বেরিয়ে বোম্বাই-এডেন হয়ে লিভারপুলে যাব জানতাম। বোম্বাই এসে শুনলাম, জাহাজ কোম্পানী অনেক মাল পেয়েছেন পোর্ট স্নদান থেকে নিয়ে যাবার জন্য। তাই এঁদের বেশ কয়েক দিন পোর্ট স্নদানে থাকতে হবে। ১৫ই জুন ভোর বেলা জাহাজ বন্দরে ঢুক্‌ল। যারা বিলেত যায় তারা সচরাচর এ বন্দরে আসে না; নূতন একটা দেশ দেখব তাই সবাই তাড়াতাড়ি কেবিন ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। এডেনের মত জলের ধার থেকেই খোঁচা-খোঁচা রুক্ষ পাহাড় নয়। অতখানি পাথর-সর্ব্বস্ব দেশও নয়। সমুদ্রটা যদি না থাকত মনে হত ছোটনাগপুর অঞ্চলে কোথাও এসেছি। অনেকখানি সমতল জমির পর ঘর-বাড়ী, তার পিছনে বোধ হয় জংলা গাছপালা, তারও পিছনে ঘাটশিলা অঞ্চলের পাহাড়ের মত সুদীর্ঘ এক সারি পাহাড়। জাহাজ থেকেই দেখা যাচ্ছে একটা বাড়ীতে বড় বড় অক্ষরে Hotel লেখা রয়েছে, পরে নেমে দেখেছি তার নাম Hotel Red Sea। সমুদ্রে জলের অভাব নেই, তবু তার পাশেই হোটেল-ওয়ালারা একটা সাঁতার দেবার চৌবাচ্চা করে রেখেছে। তার গায়ে বড় বড় অক্ষরে Swimming লেখা। যারা আদত সমুদ্রে নামতে চায় না বা সাহস করে না, তাদের জন্যেই এ ব্যবস্থা।

সারা দিন জাহাজ থেকেই ডাঙ্গার দিকে তৃষিত নেত্রে চেয়ে রইলাম। একে ত ডাঙ্গা, তায় আবার আফ্রিকা, বিশ্বাস যদিও হচ্ছিল না যে আফ্রিকায় আবার আমি আসতে পারি। যাই হোক, লম্বা সাদা আলখাল্লা-পরা লোকেরা ছোট-ছোট ডিঙ্গি নৌকায় ক্রমাগত যাওয়া-আসা করছে; তাদের দেখে বিশ্বাস করতেই হল। মানুষের চেহারা ভাল কি মন্দ বলাটা আজকার দিনে উচিত নয়। একটু—চেহারাগত সমালোচনা করলাম।

এদেশের লোকরা সোমালিল্যাণ্ডের লোকদের মত দেখতে অত খারাপ নয়; এখানের একটা জাতের লোকদের এ রকমই ছোট এবং উপর দিকে উঁচু মাথা, তবে সোমালিদের মত দাঁড় করানো সাপের মত নয়।

অনেক লোকই দেখি, সমুদ্রে সকাল-বিকেল নৌকো করে বেড়ায়। তারা বেশীর ভাগই সাহেব-মেম বা ভারতবর্ষীয়। এদেশীদের মধ্যে যারা নৌকায় চলেছে দেখলাম, তারা নৌকা-বোঝাই কুলি—জাহাজে-জাহাজে মাল-ওঠা-নামানোর কাজ করতে চলেছে। সন্ধ্যা বেলাও এ রকম নৌকা পারাপার। আমাদের কাপ্তেন সাহেবের সঙ্গে দুটি মহিলা-যাত্রী সন্ধ্যায় এখানকার আর এক মৃত কাপ্তেনের সমাধি দেখতে চলে গেলেন। ওঁরা সেজে-গুজে ডাঙ্গায় নামলেন, আমরা জাহাজে বসে রইলাম বলে একটু দুঃখ হচ্ছিল। জাহাজের কর্ম্মীরাও অনেকে নৌকায় করে বেড়িয়ে এলেন সন্ধ্যার পর।

পরদিন ১৬ই সকালে ব্রেকফাষ্ট খেয়েই দেখি জাহাজের Purser একটা নৌকায় করে পারে যাচ্ছেন। ওঁদের জাহাজের ব্যবহারের জন্য একটা ডিঙ্গি আছে। আমরা তাড়াতাড়ি দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে সেই নৌকায় নেমে পড়লাম। ঘাটে ত জাহাজ বাঁধা নেই যে ইচ্ছা করলেই ডাঙ্গায় নেমে পড়ব? এ পারণীর আশায় ব্যাকুল হয়ে বসে থাকার ব্যবস্থা। "সুরের রসিক নেয়েদের গান গেয়ে ভুলিয়েও" যে যখন-তখন খেয়া পার হতে পারব তাও নয়। একে ত কণ্ঠে গান নেই, তাও আবার খেয়ামাঝি তার নিজের গান ছাড়া অন্য গান বুঝবে না। দাঁড় টেনে গান গায় সেও।

বেলে-জমির মাঝখান দিয়ে concreteএর রাস্তা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমাদের রাস্তায় পা দিতে দেখেই সব ট্যাক্সিওয়ালারা পেছনে তেড়ে আসতে লাগল। দাড়িওয়ালা শিখ নয়, পশ্চিমী মুসলমানও নয়, হিন্দীও বলছে না অথচ ট্যাক্সি চালাচ্ছে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কি একটা হিসেবে ভুল হয়ে গিয়েছে। আমরা হেঁটেই চল্‌লাম, সুন্দর একটা বাগানের মধ্যে দিয়ে। গাছগুলো সব আমাদের দেশের গাছ; রাধাচূড়া, বলরামচূড়া, বাবলা, ক্যানা, বিলাতি নিম। তাছাড়া পথের দু'ধারে খেজুর গাছ থোপা-থোপা কাঁচা খেজুর নিয়ে দাঁড়িয়ে। বাগানটা যেন শিবপুরের বাগানের একটা ক্ষুদে সংস্করণ। রাত্রে ভিজে মাটির গন্ধ আর ফুলের গন্ধে শান্তিনিকেতনের কথা মনে হয়।

গাছতলায় গাছতলায় লোকের ভীড়, ছায়াসুখ উপভোগ করছে। কিছু রোগগ্রস্ত ভিখারীও আছে। পথে আমার মেয়েরা আলখাল্লা-পরা পাগড়ী মাথায় একটা লোকের ছবি তুলে নিতেই সে পয়সা চাইতে লাগল। তাদের চন্দ্রবদনের এতই দাম যে বিনা পয়সায় ছবিও তুলতে দেবে না। যাই হোক, তোলা হয়ে গিয়েছিল, কাজেই লোকটা বেশী জেদ করল না।

বাগানে একটা ছোট্ট সাহেববাচ্চা বসেছিল তার আয়ার সঙ্গে। আয়াটি এদেশী, এই প্রথম এদেশের মেয়ে দেখলাম। কালো ঝাঁকড়া চুল তেল দিয়ে পালিশ করেছে, মুখে বেশ সলজ্জ মিষ্টি হাসি। পরনের লম্বা ফ্রকটাকে এমন করে সাদা লেসের মত ওড়নার দ্বারা

বেষ্টন করেছে যে, দেখলে মনে হয় শাড়ী পরেছে। তার একটা ছবি তোলবার লোভে মেয়েরা যেন বাচ্চাটার ছবি তুলছে ঐ ভাবে বাচ্চাটাকে অনেক সেধে দাঁড় করাল। ছেলেটা কিছুতেই দাঁড়াতে চায় না, আমরা বাঙালী মেয়ের মত তাকে অনেক আদর করে বোঝাচ্ছে। শেষে অনেক সাধ্য-সাধনায় সাহেব-খোকা রাজি হলেন, ছবি উঠল।

Post Officeএ গেলাম, সেখানে খুব লোকের ভীড়। কি আশ্চর্য্য! আফ্রিকায় এসেছি, কিন্তু মানুষগুলো কাফ্রি নয় মোটেই। ভূগোল অনেক দিন পড়িনি, ভাবলাম এ রকম কেন হল? লোকগুলো দেখতে ত বেশ ভালই। কাফ্রিদের চেয়ে অনেক হাল্কা রং, নাক বেশ খাড়া আর ঠোঁট পাতলা পাতলা। মুখের কাটও চাঁছাছোলা, খালি চুল অসম্ভব কোঁকড়া। মাথায় একটা জরির টুপির উপর বিরাট সাদা পাগড়ী বেঁধেছে।

অনেক মানুষ বেশ ফর্সা, বোধ হয় আরব, একটু ভারী মুখ আর কারুর কারুর পাদ্রীর মত ধরণ-ধারণ। অল্প দাড়ী আর আলখাল্লাটা ত অনেকটা পাদ্রীদেরই পোষাক।

দু' জন-একজন খাঁটি কাফ্রি দেখলাম, তারা কিন্তু খাকি shorts পরেছে সাহেবদের মত। রাস্তায় অনেক পুরুষ মানুষ চলাচল করছে। বাগানের বাইরে স্ত্রীলোক প্রায় দেখলাম না। পুরুষগুলো মোটের উপর দেখতে পুরুষোচিত, কিন্তু শতকরা আশী জনের দুই গালে বাঁদরে আঁচড়ানোর মত দাগ। এগুলো না কি ওদের উল্কি। সবাইকার আঁচড় কিন্তু এক রকম নয়। বেশীর ভাগের লম্বা-লম্বা দু'টো-দু'টো করে দু'গালে চারটা দাগ, কারুর বা ক্রশের মত।

আমরা জিনিষপত্রের দোকান দেখতে গেলাম। সিন্ধী-গুজরাটীরা এখানেও দোকানপাট খুলে বসে আছে। তাছাড়া গ্রীক আর ইটালিয়ান। অনেক সিন্ধীর সঙ্গে সুদানীদের চেহারায় বেশ সাদৃশ্য। খালি সুদানীদের মুখের নীচে থুতনিটা একটু বেশী সরু আর ছোট। পিরামিডের যুগের আফ্রিকায় যে সব ছবি ইতিহাসের পাতায় বা চামড়ার শিল্পে দেখতে পাই, সেই রকম চেহারা অনেক ঘুরে বেড়াচ্ছে চার দিকে। তবে ওদের মত বস্ত্রহীন নয়।

বন্দরের সহর, কাজেই ব্যবসাদাররা পয়সা করতে ব্যস্ত। বড় বড় দোকান ত আছেই, ছোটখাট ফিরিওয়ালাও প্রচুর, তারা অনেকে মালা বিক্রী করছে। একটা কাচের মালা ৬ শিলিং দিলেই দেবে বলতে চায়। কাপ্তেন বললেন, পেনিতে দাও ত নেব।

বিদেশী লোক দেখে একটা সুদানী দৌড়ে ভাব করতে এল। নাগ মশাইকে বললে, "তোমার সুটটা দেখে মনে হচ্ছে, ঠিক ঐ রকম একটা সুট আমার ছিল ১৯৪৩ সালে। আমি তখন জাহাজে কাজ নিয়ে নানা বন্দরে ঘুরে বেড়াতাম। অনেক দেশ দেখেছি।"

নাগ মশাই বললেন, "আমার সুটটা আরও একটু বেশী দিন আগে কেনা, কারণ আমি আরও অনেক আগে থেকেই বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়াই।"

এক ইটালীয়ানের হোটেলে আমরা সরবৎ খেতে বসলাম। যে লোকটা খেতে দিচ্ছে সে বললে, "আমি ছোট্ট বেলা থেকে এখানে আছি। আগে এ সব গাছপালা কিছু ছিল না। তার পর অনেক চেষ্টা করে মরুভূমিতে বাগান হয়েছে।" লোকটা ভীষণ মোটা কিন্তু খুসী মেজাজ। আমাদের দেশের সাহেবদের মত সাজ-পোষাক নেই, কাঁধে ময়লা ঝাড়ন নিয়ে ঘুরছে, সুদানীরা তার গায়ে ধাক্কা মেরে-মেরে কথা বলছে। কলকাত্তাই-সাহেবরা যদি ফিরিঙ্গিও হয়, দিশি ফিরিওয়ালারা তাদের গায়ে ধাক্কা দিয়ে কথা বলতে সাহস করে না।

ফিরিওয়ালারা বড় বড় সামুদ্রিক কাঁকড়া ঝুড়ি করে বিক্রী করতে এনেছিল। Purser দর করছিলেন, বড় দাম বেশী—এক-একটা দু'শিলিং চায়। হোটেলের খাবার টেবিলে গোছা-গোছা সিঙ্গাপুরী কলা আর বড়-বড় ফুটি সাজানো।

ফুটপাথগুলো চওড়া-চওড়া। দোকানের ঠিক সামনের ফুটপাথ বাঁধানো আর ঢাকা দেওয়া, কিন্তু তার থেকে নেমে বেলে মাটির আরও খানিকটা করে ফুটপাথ, সেখানে সন্ধ্যা বেলা খাবারের দোকান আর পানীয়ের দোকানের খদ্দেররা টেবিল-চেয়ার পেতে খেতে বসে। আমাদের মেয়েরা বিকালে একবার গিয়েছিল, তখন সব গ্রীকদের খাদ্যপানরত দেখে এসেছে। আমরা পরদিন রাত্রে গেলাম, তখন অন্যান্য দোকান বেশীর ভাগই বন্ধ, দুই-একটা দরজির দোকান বা ঘড়ি কি সার্ট ইত্যাদির দোকান খোলা। কিন্তু খাদ্য-পানীয় খুব চলছে। বেশীর ভাগই গ্রীক, ইটালিয়ান, ইংরেজ, এ্যাংলো প্রভৃতি খেতে বসেছে দল করে, মাঝে মাঝে পাগড়ি ও আলখাল্লা-শোভিত আরব কিম্বা সুদানীজদেরও দেখা যায়। মেয়েদের মুখ প্রায় নেই, ২।৩টি যা দেখলাম খাঁটি মেমসাহেব। যে সব সুদানীজ লোক খেতে বসেছে তারা দেখতে অনেকে খুব বুদ্ধিমান লোকের মত। আমাদের পাশেই একজন ফরসা চশমা-পরা স্বজাতীয় পোষাকে বসেছিল, বোধ হয় আরব। মনে হচ্ছিল কেউ একবার অনুরোধ করলেই হয়, তা হলেই উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবে।

জাহাজে মাল তুলতে যারা এসেছে তারা যে এক জাতের সবাই নয় তা দেখলেই বোঝা যায়। অবশ্য আমি ত নৃতত্ত্ববিদ্ নই, তাছাড়া এদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও পড়িনি। তবে দেখে বুঝলাম, এক দল একেবারে আদিমবাসী, তাদের চুল ভীষণ কোঁকড়া ঝাঁকড়া আর উঁচু, চেহারাগুলো কাফ্রির মত চাপা-চাপা নয়, মোটের উপর চোখা তবে একটু রুক্ষ। আর এক দল ন্যাড়া-মাথা, কিঞ্চিৎ নিগ্রো-ভাব, তবে তারাও নিগ্রোদের চেয়ে রঙে হাল্কা এবং লম্বায় বোধ হয় বড়। আর এক দল বেশ ভাল দেখতে কিন্তু শ্যামবর্ণ বাঙালীদের মত রং, তাদের কথা আগেই বলেছি।

ঝাঁকড়া চুলওয়ালাদের এক জনের ছবি তুলতে মেয়েরা চাইল, সে হয় পালিয়ে যেতে লাগল, নয় জামা দিয়ে ঘোমটা দিতে লাগল। শেষে অনেক সাধ্য-সাধনা ও পয়সার লোভে রাজি হল। তাও আবার রসিক আছে, মেয়েদের ছবি নিতে দেবে কিন্তু ছেলেদের কাছে মুখে ঘোমটা দিচ্ছে। শুনেছি এই ঝাঁকা চুলওয়ালারা খুব যোদ্ধা এবং ইংরেজদের সঙ্গে খুব লড়েছে।

দেশটা পুরাপুরি ইংরেজের নয় বলে সব জাহাজ এলেই দু'টো flag টাঙায়; একটা British, অন্যটা সুদানীজ চাঁদ মার্কা। এবং এই জন্যেই বোধ হয় জাতিভেদ এখানে কম। হোটেলের Swimming poolএ সাহেব-মেম আরব সুদানীজ সবাই একত্রে ঝাঁপ দিচ্ছে ও সাঁতার কাটছে, কেউ কাউকে নাক সিঁটকাচ্ছে না। আমাদের ভারতীয়রাও বাদ যাচ্ছেন না।

এর কাছেই এসে দাঁড়িয়েছিল একটা বিরাট বিলিতী জাহাজ। তাতে South Africa থেকে সাহেব-মেমরা সপরিবারে দেশে ফিরছে। সে দেশে ত কালা আদমীদের অপাংক্তেয় করে রেখেছে।

এই সব জাহাজেও সহজে উঠতে দেয় না। এক চৌবাচ্চায় স্নান করা ত দূরে থাক্।

আফ্রিকার একটা কোণের একটুখানি মাটির উপর পা দিয়ে যা চোখে দেখলাম, লিখলাম; এটা ভূতত্ত্ব বা নৃতত্ত্ববিদের লেখা নয়, বলাই বাহুল্য। [ক্রমশঃ।

গত যুগের জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী

৺কৈলাসবাসিনী দেবী

১২৬১ এই সালে আমার চতুখো ভাশুরের বড় কন্যার বিবাহতে আমাকে নিতে নোক আসিল। জাহানাবাদে। তাহাতে বাবু কি করিবেন, পাঠাতে হবে। অন্য ভায়ের হলে পাঠাতেন না। কিন্তু যে ভাই মর্তে বল্লে মরেন, ভাইও তেমনি ভালবাশে, দুই ভাইতে কখন মনান্তর দেকি নাই। আর শুনিছি জখন ছেলেবেলা তখনও আমার ভাশুর ভাল বাশিতেন। বলিতেন মা খোকাকে মাই দেয় আমি দেখি। পিটোপিটিতে এমন ভাব কেউ কখন দেকে নাই। কি করিবেন, কাযে ২ পাঠাতে হবে। ২২ তারিকে পাঠাবেন ঠিক হইল। কিন্তু কাছে থেকে পাঠাতে বড় কষ্টবোধ হল। আর সেখানে একলা থাকেন আমার কষ্টবোধ হল। কি করি বেহারা এল। বল্লেন, খাওয়ার পরে জাওয়া হবে। দুইজোন বামুন থাকিতো বরাবর মপঃশলে জাবার জন্যে। একজোনকে বল্লেন, তুমি এখন জাও ছিরামপুরের বাংলায়। কাল খুব সকালে রেঁধে রেকো। পাল্কি পৌচানমাত্রে ভাত দেবে, জেন দেরি হয় না। তাহাতে বামন চালডাল নিলেন। আমি তাঁর কাছে গে বলিলাম, তুমি সেখানে রেঁধোনা। তারকনাথের মন্দিরের কাচে সদা ময়রার দোকান আচে সেইখানে রাঁধিবে। আমি শেইখানে খাবো। তাহাতে বামন বল্লে জে আজ্ঞা। আমি এসে বাবুর কাচে বসিলাম। খাওয়া দাওয়া হলো বল্লেন ঘুমোও, এখন বড় রদ্দুর। ঘুমুলুম। তার পরে বলেন রাত্রে জাবো। রাত্র হল, বল্লেন খাও দাও তার পরে জেও। খাওয়া হল, শোও এর পরে জেও। শুইলাম। রাত্র ১১টা বেজে গেল, চাপড়াশিরে মশাল জ্বেলে ঠিক কল্লে আবার নিবুলে। এই রকম তিনবার জ্বাল্লে আর নিবুলে। তার পরে আপনি গে আমাকে পাল্কিতে তুলে দিলেন। জত খন দেকা গেল তত খন দাঁড়ায়ে রহিলেন। বেলা ১১ টার সময়ে আমি তারোকনাথে আসিলাম। ২৩শে শুক্কুর বার। সেখানে দেকা হল, পাওয়া হল। বামনকে বারণ করে দিলুম বলিতে। সকল নোককে বারণ করিলাম। আমার জাবার আগে সবাই জাবে কিনা এই জন্যে বারণ করিলাম। বেলা ৩ টের সময় সেখান থেকে ছাড়িলাম। ২৪ তারিকে বেলা ১১ ঘণ্টার সময় বাড়ি আসিলাম। আমাদের বাড়িতে সকলে বড় ভাবিত হইয়াছেন, যে মানুষ ২৩শে আসিবে সে এখন কেন এল না। আমি পাল্কি থেকে নাবিতে আমার ন জা এসে আমার হাত ধরে নে গেলেন। আর বল্লেন, তোর ভাশুর ভাই সারা রাত্র ঘুমায় নি, বল্লেন আমি না হয় খানিক জাই পথে কোন বিপদ হইয়াচে না কি। আমিও ভাবিতে নাগিলাম। সে জা হক, এখন বাচিলাম ভাই, তুমি ভালয় ২ এলে। তোর ভাশুর তোকে বড় ভালবাশেন, কাল জেন ছট ফট করেছেন সারা রাত্র। আমি হাসিলাম। হেসে বলিলাম, আমার সকালে ছাড়িবার কথা ছেল, কিন্তু রাত্র ১ টার সময় ছাড়া হইয়াছেল। আবার ভাই তারোকনাথ দেকে আসিয়াছি। তাই এতো দেরি হইয়াছে। তার পরে ম্যার কাচে যাই, আর দুই জার কাচে জাই। খাওয়া দাওয়া হল, খুব আমোদ আল্লাদ হল। কিন্তু আমার মনটি জাহানাবাদে পড়ে রহিল। সেই যে পাল্কির দিকে চেয়ে ছেলেন তাহাই মনে হইতে নাগিল। তার পর বিবাহের ধুমধাম হইতে নাগিল। ২৮ তারিকে বুধবারে বিবাহ হয়। বাগবাজারে শ্রীযুত বাবু অভয়চরণ মল্লিক, তার প্রথম পুত্রের সহিত। তাঁরা বড় সৎ নোক। আমার বিবাহ দেকা হয়ে গেলো, কবে শেখানে জাবো ভাবিতে নাগিলাম। কিন্তু বাবু কলিকাতায় কর্ম্মের জন্যে দরখাস্ত করেছেন, তাহা কি হয় বলা যায় না। বাবু আমাকে চিটি নিকিলেন, এখন কোন খপর পাই নাই, কিন্তু এখানে আমার বড় কেলেশ হচ্ছে, আর আমি একা থাকিতে পারি না। নোক পাঠাতেছি তুমি শিঘ্র আসিবে, তিলমাত্র দেরি করিবে না, আমি তোমার জন্যে শ্রীরামপুরের বাঙ্গালায় জাচ্ছি, সেইখানে দেকা হবে। আর ভাইকে নিকিলেন, নোক পাঠাতেছি, কুমুদকে পাঠাবেন। তাহাতে আর কি আপত্তি আছে। কাযে যাওয়া হল। জষ্টি মাশের ১৮ তারিকে কলিকাতা ছাড়ি বেলা ১১টার সময় খাওয়া দাওয়া করে। সন্দের সময় শেয়াখেলায় আসি। দেকি সেখানে জতো রাহাদানিরে রান্না খাওয়া কচ্ছে, চতুর্দিকে আলো জ্বলিতেছে ও উনুন জ্বলিতেছে। তাহা দেকে আমার বড় আমোদ হলো আমি বলিলাম এই খানে একখানি দোকানে থাকা জাক ব্যারারা সকলে জল খাক। তারা বললে আচ্ছা। এমন সময় দুই জোন চাপরাশি এল। এসে বললে এখানে দেরি করা হবে না, বাবু বাঙ্গলায় আচেন। সেইখানে জেতে হবে। তাহাতে তাই হল, সেই খানে জাবো কিন্তু একবার নাবাতে বলিলাম। নাবালে কুমুদকে খাওয়াইলাম, আমিও কিছু খাইলাম। সকলে অল্প ২ খেলে। তার পরে রাত্র যখন ১১টা তখন সেই খানে পৌছিলাম বাবু তখন খান নাই। আমি জাবামাত্র সেখানে আসিলেন, পাল্কি থেকে আপনি তুলিলেন। আমরা ঘরে আসিলাম এসে দেকি, জায়গা করা, খাবার রহিয়াছে। খাবার জল, আঁচাবার জল, পান সাজা কাপড় কোঁচান, সব তয়ের। আমি বলিলাম এখন খাওয়া দাওয়া থাক, আমি খানিক শুই, জষ্টি মাসের রোদে মরে গিচি। তাহাতে তিনি কুমুদকে নে চাকোরদের কাচে দিলেন। আর পাকা টানতে বলে এলেন। তখন ঝিরে কেউ পৌচুতে পারে নাই। চাকোরদের সামনে আমি বাহির হই না। কাজে ২ সব তিনি কত্তে নাগিলেন খাওয়ান আঁচাবার জল দেওয়া। একথা শুনে নোকে বলিবেন জে তুমি কি একদিন কিচু কত্তে পাল্লে না। তার কারণ কোথায় কি তাহা আমি কিচুই জানিনে। কাযে ২ আমার সঙ্গে যেতে হল। আর হাত জোড়া জল দিতে হল। তাই আমি কি করিবো আমি বরপ ও বোম্বাই আব তার জন্যে নিয়ে গিয়েছিলুম। তাহা তিনি খেলেন। সেই রাত্র আর তার পর দিন সেইখানে থাকি ২০ তারিকে সকালে জাহানাবাদে আসি। ৪ আশাড় আজ— আমরা দুই জোনে বসে আচি বাড়ির ভিতরের বাগানে। এমন সময় কুমুদ একখানি কাগজ এনে দিলে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কি।

বাবু বলেন জাহা তুমি নিত্য প্রার্থনা করো তাই। বলে খুব আল্লাদিত হইলেন। আমিও পরম আল্লাদিত হইলাম। জগদিশ্বরকে কোটি কোটি ধন্যবাদ দিলুম। তাহাতে সেদিন আমার বড় আমোদে গেল। আসিবার সব উয্যুক হতে নাগিল। কলিকাতা আসিব, বোধ হয় আর কোথায় জাইতে হবে না ; বড় আল্লাদ। এখন আমার স্বামি জুনিয়ারি মাজিষ্টর হইলেন, ৮০০৲শো টাকা হল—এই পদ এখন আর কোন বাঙ্গালির হয় নাই, কেবল প্রথমে বাবু হরোচন্দ্রর ঘোষের হয়, তিনি জজ হন। বাবু সেই কর্ম্ম পান। আমরা কলিকাতায় আসিলাম। কলিকাতার বাটিতে। সেখানে দিন পোনর থাকি। তার পরে বাবু চিৎপুরে একটি বাড়ী ভাড়া করেন, সেটি গঙ্গার ধারে। ইশটোয়াটার শাহেবের বাটি, ৯০ই টাকা ভাড়া। আশাড় মাসের ১৮ তারিকে এই বাটিতে আসি, এসে খুব আরামে আচি। আমাদের বাড়ি নিকটে। এই শালে ১২৬১ শ্রাবোন মাশের ১৪ তারিকে আমার শেজো জার দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ হয় বারিপুরে। আমি জাই ১৩ তারিকে, আসি ১৫ তারিকে। সেই দিন খিদিরপুরে জাই বিনয়ের বিবাহতে। সে বিবাহ হয় যোড়াশাঁকোর সিংহদের বাটি। সেখানে গে খুব আমোদ হইল, শকলের শঙ্গে দেকা হইল। ১৭ তারিকে চিৎপুর আসি। এখন ভাল আচি। আশ্বিন মাসে পুজার সময় বাবু ও নবাবু ও সেজোবাবু সকলে শ্রীরামপুরে যান। ৪ দিন থেকে এসেন। আমি ত সেই ৪দিন কলিকাতার বাটিতে থাকি। দশমির দিন আসি। তার পরে কার্ত্তিক মাশের সংক্রান্তির দিন আমার স্বামি মাকে কথা দেওয়ান। তাতে খরচ হয় ১৫০০৲ টাকা। এই দেড় হাজার টাকাতে কথা হয়, বামন খাওয়ান হয় বেশ ভালরূপে, তাতে খুব শুখ্যেতি হয়েছেল। আমি আলাদা বাড়িতে ছিলাম, তবু রোজ কথা শুনিতে জাইতাম। বাবু বলেন এতো খরচ হচ্ছে জখন তখন তোমার জাওয়াতে কতো খরচ হবে। তাতাতে আমি পেরায় জাইতাম। জে দিন আমার কি বাবুর কি কুমুদের অসুক হইতো সেই দিন জাওয়া হতো না। এই কথা পোষ মাশের ১৮ তারিকে রবিবারে দশমির দিন ওঠে। তাহাতে খাওয়ান দাওয়ান খুব হলো। আমার স্বামির বাই এখানে আর থাকিবো না। আমি বলিলাম এখানে কি হইল। বাবু বললেন, বড় কাঠ টানার গোল, মতিশিলের সতের নম্বর কুটিতে জাবো। আমি বড় বিরক্ত হইলাম। আমি বলিলাম তোমাকে এক জায়গাতে জগদিশ্বর থাকিতে দেন নাই। বাগান কিনিবো বলিতেচ তাই হলে একাবারে ওটা জাবে। তিনি বললেন, না মাই ডিয়ার সে বড় চমৎকার জায়গা। আচ্ছা চল। ৩ মাঘ সোমবার এখানে আসা হলো। এ বাটির ভাড়া ১০০৲ টাকা। ফাগুণ মাশের ১৯ তারিকে শুক্করবারে এক জোন বিবি রাকেন। তাঁর নাম মিশ টুগোড। তাঁর মাহিনা বাবু দেন ২৫ টাকা। নবাবু দেন আর ভবায় মল্লিক দুই জোনে ২৫ টাকা। একদিন তাঁদের দুই বাড়িতে পড়ান, আর একদিন আমাদের পড়ান। তাতে একদিন অন্তর পড়া হয়, আর শেলাই শেখা হয়। আর ঘরের গুরুর কাছে পড়া হয়। তাহাতে শেখা এক রকম হতে লাগিল। বৈশাখ মাসে আমার

বিখ্যাত স্বর্ণ শিল্পী ঃ—

বি, সরকারের পৌত্র,

শ্রীনারায়ণ সরকারের

পরিচালনায়

আধুনিকতম অলঙ্কার শিল্প প্রতিষ্ঠান

বি, বি, সরকার কোং লিঃ

১৬০-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

ফোন :—বি, বি, ১২৫৩

জ্যাঠতুতো ভায়ের বিবাহতে জাই ১৭ তারিকে। ১৮ তারিকে বিবাহ হয়, ১৯ তারিখে আশি। এই সালে ১২৬২ বিবাহ হয়।

কলিকাতা এসে আমার স্বামি এতদিন ভাল ছেলেন। এখন কলিকাতার বাতাশ গায়ে নাগিতেছে, এখন আরেক রকম চালে জাচ্চেন। কতোগুলি ভদ্ররে অভদ্ররে জুটিলেন, তাঁদের নাম করিবো না, এঁরা ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভার সভ্য। সভ্য ভব্য বাবুরা এঁরা আসিতে নাগিলেন, আর সব্বোদা শেখাতে নাগিলেন, তাহাতে আমি ক্রেমে জানিতে পারিলাম। কিন্তু আমি আগে বলিয়াচি আমার স্বামি বড় ভদ্র ও বিদ্বান। তাঁকে ধরা সহজ কথা নয়। আমি জদি কিচু বলিতাম তাহলে অগ্রাহ্য করে হেসে উড়ায়ে দেন। বলেন, মাই ডিয়ার তুমি কি আজ মাতাল হইয়াচ নাকি? কি বলিতেছে তাহা আমি কিচু বুজিতে পারিনে ও কাকে বলিতেচে। আমি বড় খুশি হইলাম তোমার মাতলামি দেকে। আমি জেদিন বেসি খাই, তুমি শেই দিন মাতাল হও, এলমেল বক। আহা কি আশচর্য্য, আমি খাই তুমি মাতাল হও, তোমাকে খেতে হয় না। আমি বলি জাও ২ তোমাকে দেকিলে আমার গা জ্বালা করে, আর কথা কয়ো না। বাবু বলেন, তোমার জদি আমাকে দেকিতে কষ্ট হয় তবে আমাকে দেকো না। আমি তোমাকে দেকি। আমি বলি, তুমি এখন বড় নোক হইয়াছ, এখন বড় ২ কথা। বাবু বলেন আমি জদি বড় হইয়াছি তুমি কোনো ছোটো হইয়াছ তুমিও তো বড় হইয়াছ। জানেন আমি খুশি, এতে চড়া হইয়া অন্যাই জত পারে বোকুক, একলা কতো বকিবে। খিদিরপুর থেকে ১৯ তারিকে আসি। সেইখানে রাম গোপাল বাবুর মা আমাকে নিমন্তন্ন করেন। আমি বলিলাম আচ্ছা। সেদিন আমার অল্প জ্বরোভাব হইয়াছেল। তবু আমি বাবুর জন্ন রাঁধিলাম, আমার রান্না বড় ভালবাসেন। অশুক হলে আমি রেঁদে দিই, বাবু খেয়ে পুলিশে জান। এমন সময় উক্ত বাবুর মা আর তাঁর বোন একখানি পানসি করে এলেন আমাকে নিতে। তাহাতে তাঁদের সঙ্গে আমি জাই। তাঁরা আবার বালির খালে গেলেন রামতনু* বাবুর স্ত্রীকে আনিতে। তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলেন, আর তাঁর কন্যা পুত্র সব এলেন। তাঁর স্বামি পইতা ফেলে দেছেন। তাঁর কাওরা বাবুর্চিতে রাঁধে, সকলে খান। আর মছলমান চাকোর চাকরাণি। কিন্তু পরেন শাড়ি কাপড়। তাঁর স্বামি বড় সৎ নোক, আমার স্বামির সহিত বড় ভাব আমাকেও তিনি চেনেন আমিও তাঁকে চিনি। কিন্তু এর আগে কখন দেকা হয় নাই। জানা নোকের সহিত জ্যেমন কথা হয় তাই হল। কথা কহিতে কহিতে রামগোপাল বাবুর বাগানের ঘাটে পানশি আসিলো। তখন আমরা নাবিলাম। তাঁরা ভাত খেলেন আমি শাগু খাইলাম। তার পরে গল্পশল্প হতে নাগিল। সন্দে বেলা আসিলাম। বাবুর সঙ্গে রামতনু বাবুর স্ত্রীর কথা বলিলাম। বাবু বললেন তিনি কোথা খেলেন। আমি বলিলাম কেন সবার সঙ্গে, আমি বা কি আর তিনি বা কি, আর তাঁরা বা কি। বাবু বলেন তাহা তো সত্য। তবে বাঙ্গালিদের মিছেমিছি হেঙ্গাম, আমি হাশিলাম। আমি হিন্দুয়ানি মানিনে, কিন্তু বরাবর খুব হিন্দুআনি করি। তার কারণ আমি জদি একটু আলগা দিই তাহলে আমার স্বামি আর হিন্দুয়ানি রাকিবেন না। হিন্দুরা হলেন আমার পরম আত্মীয়। তাঁদের কোন মতে ছাড়িতে পারিবো না, ইহা ভেবে আমি খুব হিন্দুয়ানি করি। আমার বড় ভয় পাছে আমার হাতে কেউ না খান। তাহলে কি ঘৃণার কথা, তার কর্তে মরণ ভাল। একে তো আমার স্বামি প্রকাশ্যে খান, এতে জদি আমি কিছু করি তা হলে একাবারে চুড়ান্ত। ঐ রামতনু বাবুর স্ত্রী জখন বাটি জান, ওঁকে রান্নাঘরে ভাত দেয় না, খাবার জল ছুঁতে দেয় না। ননদ জদি ছেলেকে ভাত খাইয়ে দেন, দে স্নান করেন। কিন্তু আমার কন্যা সবার পাতে খায়। আমি হিন্দুআনি করি বলে আর কোন গোল নাই। আমার স্বামি জা ইচ্ছা তাই করুণ তাতে কোন কথা নাই। বাঙ্গালিদের এই ধর্ম্ম, এইজন্য জাদের বুদ্ধি আছে তারা বাঙ্গালি ধর্ম্ম মানে না। আমি তো মানিনে। কিন্তু এ কথা আমার স্বামিকে কখন বলিনে। বাবু জদি এই কথা আমার মুখে শুনিতেন তা হলে কতো সুকি হনে তাহা আমি বলিতে পারিনে। কিন্তু আমি তাঁকে এ সুখি করিনে। তা হলে তিনি আর বামুন রাকিবেন না। অমনিতে বলেন তুমি যদি খাও তা হলে ডবোল খরচ হয় না। আমি বলি খেতে পারি তাতে আমার কোন দ্বিধা নাই। যদি আমার ৪টি কি ৫টি ছেলে হতো আর তোমার মতন বিদ্বান হতো, তা হলে হতো। কেন আমি কি মরে জাবো তাই। না না তা কেন ভাবিব, তা হলে তোমার কেনা ব্যেচার মধ্যে হতে হয়, আর কোথায় জাবার যো থাকে না। নিতান্ত তোমাকে ধরে থাকিতে হয়। তবে এখন কাকে ধরে আছ, তাহা আমি জানিনে। তোমাকেই, আর অন্য জায়গায় জাবার পথ আচে। তুমি এতো বুঝে চল তাহা আমি জানিনে, আজ জানিলাম। আমাকে বাল্যকাল অবদি পাখি পড়াচ্ছ তাহাতে আমার অন্য মত হতে পারে না তোমার মতে আমার মত। কিন্তু আমি হিন্দুয়ানি ছাড়িব না, তাহার কারণ তোমাকে বলিলাম। আমাকে তোমার এত অবিশ্বাস। তাহা কখন নয়, তোমার জিবনকে অবিশ্বাস। বাবু বুজিলেন আর কিছু বলিলেন না। আমি এখন মতিশিলের কুটিতে আছি। আমার একটি বাগান কিনিবার কথা হতেছে, কবে কেনা হয় তাহা বলিতে পারি নে। এক দিন বাবুতে আমাতে বসে আছি গঙ্গার ধারে রাত্রে, সেথানে দিনমানে বসিবার জো নাই সন্দেব্যেলা বসিতাম। বসে বসে শকল কথা হতেছে। আমি বলিলাম জে, বাগান কেনা হবে শিঘ্র, কিন্তু গঙ্গার সকল তামশা দেকিলাম, বান ডাকা, স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা। কেবল নউকা কেমন করে ডুবে তাহা দেকিতে পাইলাম না। বাবু হাশিলেন আর বলিলেন, তোমার য়ে সাধ বড় অন্যায়। আমি বলিলাম, আমি কি ডুবিতে বলিতেছি, বলি এইটি দেকা বাকি রহিল। তার পরে আমরা ঘরে আসিলাম কিন্তু জষ্টিমাশ বড় গরমি, এখানে আমরা দালানে শুইলাম। তার পরদিন বাবু আপিশ থেকে এসে কুমদকে নে ব্যাড়াতে বেরুলেন। এমন সময় জেমনি জল তেমনি ঝড়। তাহাতে আমার বড় ভয় হইল। আমি চুপ করে বসে আছি, এমন সময় পাচ নম্বরের কুটির সামনে একখানি নউকা ডুবিল। তখন আমার আরো ভয় হইল যে আমার মনে এমন কুমতলোব কাল কেন হইআছেল, এখন আমার কপালে কি হয়, বাবু ও কুমদ এলে বাঁচি। সেখানি হাড়ি ও কলসির নউকা,

* রামতনু লাহিড়ী।

"সংক্রামক রোগ থেকে বাড়ীর লোকদের নিরাপত্তার জন্যে আমি কি ব্যবস্থা করে থাকি।"

"আমি আগে তেমন গ্রাহ্য করতাম না, কিন্তু ডাক্তারবাবু একদিন বললেন যে খালি-চোখে দেখা যায় না এমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবাণু নাকি সব জায়গায়ই ছড়িয়ে আছে, এমন কি যা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মনে হয় তাতেও — সেই থেকে আমি হুঁশিয়ার হয়ে গেছি। তিনি আমায় একথাও বলেছেন যে, শরীরের কোথাও যদি ক্ষুদ্র একটু ক্ষতও থাকে তবে আগে থাকতে সতর্ক না হ'লে সেই নগণ্য কাটা বা ছেঁড়া চামড়ার মধ্য দিয়ে দুষ্ট জীবাণু শরীরে ঢুকতে পারে ও সাংঘাতিক সব রোগ জন্মাতে পারে। এই সংক্রমণের আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকার জন্য ডাক্তাররা উৎকৃষ্ট কোনো জীবাণুনাশক ওষুধ, যেমন 'ডেটল' ব্যবহার করতে বলেন"।

জীবাণুনাশক 'ডেটল' প্রসবের সময় প্রসূতিকে নিরাপদ রাখে। প্রসবপথের ভিতরে কিংবা মুখে অতি সামান্য ক্ষত থাকলেও তা থেকে সূতিকাজর কি অন্য কোনো সাংঘাতিক অসুখ দেখা দিতে পারে — এমন কি চিরতরে বন্ধ্যা হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়, কাজেই সময় থাকতেই জীবাণুনাশক ওষুধ ব্যবহার করা উচিত।

কেটেকুটে যাওয়া কিংবা আঁচড় খাওয়া তো ছেলেদের লেগেই থাকে। তৎক্ষণাৎ 'ডেটল' লাগিয়ে জীবাণু সংক্রমণের আশঙ্কা দূর করবেন। 'ডেটল' সম্পূর্ণ নির্দোষ — শিশুদের জন্য নির্ভয়ে ব্যবহার করা যায়।

'ডেটল' বিষাক্ত নয়, এতে কোন বিষক্রিয়া হয় না বা দাগও লাগে না। স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায় — জ্বালা বা যন্ত্রণা হয় না। আজই জীবাণুনাশক 'ডেটল' কিনুন।

'ডেটল' স্নিগ্ধ ··· মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষার আদর্শ উপকরণ। এ সম্পর্কে লিখিত "মডার্ন হাইজিন ফর উইমেন" (মহিলাদের আধুনিক স্বাস্থ্যরক্ষা) পুস্তিকাটি বিনামূল্যে দেওয়া হয় — চিঠি লিখুন।

গলা ব্যথা হ'লে মনে করবেন, সম্ভবতঃ মুখ ও গলার আর্দ্র ত্বকে ভয়ঙ্কর রোগ-জীবাণুরা বাসা বেঁধেছে। জীবাণুনাশক 'ডেটল' অল্পমাত্রায় জলে মিশিয়ে নিয়মিত কুলকুচো করবেন। নিজের অথবা ঘরের অন্যান্য জিনিস ধোয়ার সময়ও 'ডেটল' ব্যবহার করবেন।

'DETTOL'

Regd

আধুনিক জীবাণুনাশক

অ্যা ট লা ন্টি স (ঈস্ট) লিঃ

পোঃ বক্স ৬৬৪, কলিকাতা ১

DBI-1

তাতে ঢের কলশি ছেল। শিলেদের বাবুরা সেদিন সেই বাগানে ছেলেন, তাঁয়া বড় শতোতা কল্লেন, তারা সেই কলশি ধরে ধরে ভাসায়ে দিলেন। তাহাতে তারা সকলে প্রাণ পাইলেন, সবাই উঠিলেন। কিন্তু উলঙ্গ। তাঁরা ব্যাড়াতে আসিয়াছেলেন বেশি কাপড় কোথা পাবেন। আমার কাছে নোক পাঠায়ে দিলেন আমি কাপড় ও কতোগুলো কাঠ পাটায়ে দিলাম॥ তার খানিক বাদে বাবু ও কুমদ এলেন আমি বাঁচিলাম, জগদিশ্বরকে কোটি কোটি প্রণাম কবিলাম॥ তার পরে আমার বাগান কেনা হলো। *

[ক্রমশঃ।

বাংলায় মেয়ে-সাংবাদিক

অঞ্জলি বসু

বাঙলার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার দায়িত্ব কি বাঙালী কি বাঙলা-বহির্ভূত ভারতীয় কেউ-ই গ্রহণ করতে রাজী নন, কিন্তু দুর্দ্দশা অস্বীকার করার মত দুঃসাহসও কারো নেই। তবু একটা জিনিষ লক্ষ্য না করে পারা যায় না যে, একটা সূত্র যেন বাঙলার সব ক'টা দুর্ঘটনা, দুর্বিপাককে একসঙ্গে গেঁথে রেখেছে—অবাঙালীর বিপরীত আচরণ সত্বেও যাকে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না, সেটা হোলো বাঙলার মেয়েদের অগ্রগতি। মনুষ্যকৃত বিপর্য্যয়ের এক-একটা ধাক্কায় মেয়েরা নিজেদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে এক-এক ধাপ সচেতন হচ্ছে।

স্বদেশী আন্দোলন মেয়েদের শেখালো মুক্ত প্রাঙ্গণে পুরুষের পাশে হাতিয়ার হাতে দাঁড়াতে। দুর্ভিক্ষ শেখালো পুরুষের অপেক্ষা না রেখে নিজের এবং সন্তানের ক্ষুন্নিবৃত্তির ভার নিজের হাতে নিতে। আর যুদ্ধ-দাঙ্গা দেশ-ব্যবচ্ছেদ শেখালো যে, সুযোগ গ্রহণ করার মত সাহস এবং আত্মবিশ্বাস থাকলে পুরুষকে তার একচেটিয়া অধিকার থেকে হঠিয়ে নিজের জন্য একটু জায়গা করে নেওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

এই বিভিন্ন প্রকার ঠেকে-শেখা জ্ঞানোন্মেষের ফলে বাঙালীর জীবনযাত্রার এবং জীবিকানির্ব্বাহের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই মেয়েরা দরজা ঠেলে ঢুকতে আরম্ভ করেছে। তার ফলস্বরূপ পুরুষ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু বাঙলা দেশটা মোটের উপর যে লাভবান হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, আগে শুধু পুরুষের সাহায্যের আশায় বসে থাকতে হোতো যেখানে এখন সেখান মেয়েরাও সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসাতে সমাজের এক-চোখ-কানা ভাবটা কেটে আসছে।

তাই মন্ত্রিমণ্ডলী, আইন পরিষদ, পুলিশবাহিনী থেকে সুরু করে কেরাণী, ক্যানভাসার পর্য্যন্ত সব জায়গাতেই মেয়েদের যোগ্যতা স্বীকার করে নিতে হয়েছে। কিন্তু এখনও দু'-চারটে ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে পুরুষরা তাদের আসন ছেড়ে নড়ে বসতে কিছুতেই রাজী নন—তার একটি হোলো সাংবাদিকতার জগৎ। আমাদের দেশের মেয়েরা বক্তা, লেখিকা, সম্পাদিকা এমন কি সমালোচক পর্য্যন্ত হতে পারেন, কিন্তু পুরোপুরি সাংবাদিকতাটা যেন একান্ত ভাবে তাঁদের এলাকা-বহির্ভূত।

পাশ্চাত্যের দৃষ্টান্ত আমাদের অনেক বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা বা অমূলক ভয় ঘুচিয়ে দিতে সাহায্য করেছে। মেয়েদের পুরুষের সমকক্ষতা বা পুরুষ-নিরপেক্ষতা সেই নির্ভয় এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যতম প্রকাশ। এই যৌক্তিক বুদ্ধির বলেই আজ এ দেশের মেয়েরা বুঝতে পারছে যে, 'ও কাজ পুরুষের—আমাদের করতে নেই'—বলে কোনো শ্রেণী-বিভাগ আঁকড়িয়ে থেকে কারো লাভ নেই। যে কাজ যে করতে সক্ষম, তারই সে কাজ করবার অধিকার আছে।

এই সাধারণ যুক্তির উপরেও মেয়ে-সাংবাদিক হবার অভিলাষী যারা, তাদের আর একটা বিশিষ্ট যুক্তি আছে—পাশ্চাত্যের মেয়েরা এবং পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত অনেক অগ্রসর দেশের মেয়েরা পুরুষের সম-সংখ্যায় না হলেও যথেষ্ট সংখ্যায় সাংবাদকতার কাজে যোগদান করেছেন। 'নিউ-ইয়র্ক টাইমসে'র এ্যান ও'হারা ম্যাক-করমিক বা ডরোথি টমসন বা ইসবেল রসের নাম সাংবাদিক জগতে সুপরিচিত। 'নিউজ ক্রনিকলে'র লুইস্ মরগ্যান রিপোর্টার হিসাবে দীর্ঘকাল জড়িত ছিলেন পত্রিকার সঙ্গে। বছর কয়েক আগে ইংল্যাণ্ডের 'সোসাইটি অব উইমেন জার্ণালিষ্টস'-এর স্বর্ণ-জুবিলী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এর থেকেই বোঝা যায়, সাংবাদিকতায় সে দেশের মেয়েরা কতটা প্রাচীন এবং কঠিন শিকড় গেঁড়েছেন। তাছাড়া, মেয়েদের পত্রিকা বা মেয়েদের এবং শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ বিভাগ-গুলি তো মেয়েরাই পরিচালনা করে থাকেন এবং তার সংখ্যাও অগুণতি বললেই হয়। তাহলেও অজস্র প্রতিবন্ধকতা কাটিয়েই তাদের বর্ত্তমান অবস্থায় এসে পৌছতে হয়েছে। কাজেই আমাদের দেশের মেয়েদের সামনে যে প্রতিকূলতা আজ দেখা যাচ্ছে সাংবাদিক হবার চেষ্টায়, সেটাই বড় কথা নয়—শেষে যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আছে সেটাকে সামনে রেখে এগিয়ে যাওয়াই এখন করণীয় কাজ।

এগোতে গেলে প্রথমে পায়ের নীচে শক্ত মাটি দরকার—তার পরে দরকার একটার পর একটা ক্রমোন্নত ধাপ। এর কতকগুলি আপাততঃ আমরা দেখতে পাচ্ছি তার একটা হিসাব নিলে মন্দ হয় না।

প্রথম ভর দিয়ে দাঁড়াবার জন্য যে ভিত্তি প্রয়োজন তা তৈরী হয়ে আছে। শুধু মেয়ে বলে এই এলাকা থেকে অক্ষমতার দোহাই দিয়ে যে আমাদের বাইরে ঠেকিয়ে রাখবেন পুরুষ প্রকাশক, সম্পাদক এবং স্বত্বাধিকারীরা—সে যুগ পেরিয়ে এসেছি। আইনতঃ ঢোকবার অনুমতি পেয়ে গেছি—চাবিকাঠিটি জোগাড় করতে পারলেই হয়।

প্রথম দিকে যে ক'টা ধাপ পেরিয়ে আমাদের যেতেই হবে—তাতেও খানিকটা অগ্রসর আমরা হয়েছি বৈ কি! পত্রিকাদিতে মেয়ে লেখিকার সংখ্যা—তা সে কাঁচা কি পাকাই হোক, ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। মেয়েদের পরিচালিত ও সম্পাদিত পত্রিকারও বেশ একটা ছোটো-খাটো ফর্দ্দ করা যায়। অবশ্য সর্ব্বৈব সত্যের আশ্রয় নিতে গেলে এর অনেকগুলোর পিছনে যে প্রকৃতপক্ষে পুরুষকর্ম্মীরা রয়েছেন তা অস্বীকার করা চলে না—যেমন বাংলা পত্রিকার প্রথম যুগে ছিল। কিন্তু তাহলেও মেয়েদের নামে চালিত সব পত্রিকাতেই মেয়েদের সাহায্য যে নেওয়া হয় সেটা অবিসম্বাদিত। পুরুষের কর্তৃত্ব ছাড়া সম্পূর্ণ ভাবে মেয়েদের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত পত্রিকাও দেশে যথেষ্ট সম্মান এবং সমাদর লাভ করছে।

দৈনিক সংবাদপত্রসমূহের সাপ্তাহিকী অংশে নিয়মিত মেয়েদের লেখা নানা ধরণের শিক্ষামূলক প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে থাকে।

* সিঁথি-সাতপুকুর ১ নং দমদম রোড।

আপনার
অনিন্দ্য মুখরাগ
অম্লান রাখতে

এই দু'ভাবে
যত্ন নেবেন

মুখখানি ফরসা ও মসৃণ রাখতে হলে **দুটি** ক্রীম আপনার চাই-ই—একটিতে ময়লা কাটবে, অপরটি মুখশ্রী নিখুঁত রাখবে। রাত্রিতে মাখবেন ত্বক্ নির্ম্মল রাখার জন্য সুমিশ্রিত তৈলাক্ত ক্রীম—পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম। আর দিনের বেলায় **রঙ্-কালো-করা** সূর্য্যালোক থেকে মুখশ্রী বাঁচানোর জন্যে মাখবেন সুশীতল হাল্কা একটি ক্রীম—পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম।

আপনার 'রূপচর্য্যায়' এই নিয়ম মেনে চলুন:

রোজ রাত্রে
ত্বক্ নির্ম্মল করার জন্য সারা মুখে পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম মেখে মালিশ ক'রে বসিয়ে দিন। তাতে লোমকূপের সমস্ত ময়লা বেরিয়ে আসবে। তারপর মুছে ফেললেই দেখবেন, মুখখানি কেমন উজ্জ্বল ও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।
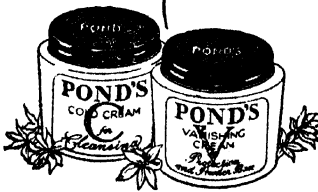
রোজ ভোরে
হাল্কা ভাবে পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম মেখে মুখশ্রী নিখুঁত রাখুন। এ মাখবার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যাবে কিন্তু অদৃশ্য একটি সূক্ষ্ম স্তর দিনভোর রঙ-কালো-করা সূর্য্যালোক থেকে মুখশ্রী অম্লান রেখে দেবে।

পণ্ড্‌স

একমাত্র কনসেশানেয়ার্স
জেফ্রি ম্যানার্স এণ্ড কোং লিঃ
বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ।

তাছাড়া প্রায় প্রত্যেক বাংলা সংবাদপত্রের রবিবাসরীয় সংখ্যায় এবং 'মাসিক বসুমতী' জাতীয় মাসিক পত্রিকায় এক বা একাধিক পৃষ্ঠা মেয়েদের জন্য নির্দ্ধারিত থাকে। কোথাও সেটা মেয়েদের পরিচালিত —কোথাও সাধারণ রবিবাসরীয় সম্পাদকের পরিচালিত হলেও যাঁদের লেখায় সে বিভাগটি গড়ে ওঠে, তারা সকলেই মহিলা। এর বাইরে কয়েকটা এমন বিষয় আছে যে, যে পত্রিকাতেই তার জন্য বিশিষ্ট স্থান নির্দ্ধারিত আছে সেখানেই সেগুলো মেয়েদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়েছে—যেমন, রান্না সেলাই ঘরকন্নার খুঁটিনাটি ইত্যাদি।

এর থেকে এইটা বোঝা যায় যে, আমাদের দেশের পত্রিকাগুলির বিস্তার যত হবে সংখ্যার দিক দিয়ে এবং মানের দিক দিয়ে—তত অধিক সংখ্যায় মেয়েরা এ কাজে যোগ দিতে পারবেন। কারণ সুযোগ পেলে উৎসাহ এবং যোগ্যতা দুই-ই বাড়ে। বিলিতি বা মার্কিণ পত্রিকার পৃষ্ঠা উল্টোলে এর সত্যতা বোঝা যায়। সেখানে মেয়েদের জীবন নিয়ে, তার বহুবিধ সমস্যা এবং প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে, আরও হাজারো রকমের কার্য্যকলাপ নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই এবং সে বিষয়ে মেয়েরা যতটা জানতে ও জানাতে পারে, পুরুষের পক্ষে ততটা সম্ভব নয়—হয়ত অনেক ক্ষেত্রে শোভনও নয়। কাজেই সে সব দেশে যা হয়েছে, আমাদের দেশে তা না হবার কারণ নেই। কিন্তু তা করতে গেলে আগে আমাদের পত্রিকার মান অনেকখানি উঁচু করা দরকার। শুধু খোসগল্প আর দু'টো কবিতায় ভরা পত্রিকা যত দিন পাঠকের কাছে পরিবেশন করা হবে, তত দিন গভীর তত্ত্বমূলক বা বৈজ্ঞানিক তথ্যমূলক আলোচনার অবতরণিকা করাটাই পণ্ডশ্রম বলে ধরে নিতে হবে। কাজেই উঁচু দরের ফিচার রাইটার বা করেসপণ্ডেণ্ট বা কলামিষ্ট, এমন কি, প্রথম শ্রেণীর মেয়ে রিপোর্টারেরই বা চলতি পত্র-পত্রিকার জায়গা কোথায় ?

সুতরাং ইচ্ছা এবং শক্তি থাকলেও শিক্ষিতা মেয়েরা পত্রিকা-জগতে যতটা তা দিতে পারেন তা দেওয়া হয়ে ওঠে না। তদুপরি কর্ত্তৃপক্ষের গোঁড়ামি এবং ভীতি তো রয়েছেই, মেয়েদের বেশী প্রাধান্য দিলে যদি তাঁদের কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগে। সে আশঙ্কা তাঁরা সব সময়ই অন্তরে পোষণ করেন। সবার উপরে আমাদের দেশে শিক্ষার যে হার, তাতে শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা গুণতে বেশী সময় লাগে না, যাঁরা শিক্ষিতা তাঁরাও সকলে লেখার ভিতর দিয়ে জনশিক্ষা বিতরণের যোগ্যতা রাখেন না—সকলের শেষে। যেটুকু বা পারেন তা' গ্রহণ করবার লোক নেই।

তবে আশা করা যায়, দেশে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পত্র-পত্রিকার উন্নতি আমরা ক্রমশঃ দেখতে পাব এবং সে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের সুযোগও বাড়তে থাকবে। বিশেষতঃ পত্রিকার কদর বাড়াতে গেলে, একান্ত মেয়েদের ব্যাপার যেগুলো—শিশুপালন, গৃহসজ্জা, সাজসজ্জা ইত্যাদি—সেগুলোর ভার মেয়েদের হাতে তুলে দিতেই হবে।

কিন্তু পত্রিকা ইত্যাদির বিভাগীয় পরিচালনা সাংবাদিকতার একটি অংশ মাত্র। সংবাদপত্র বা খবরের কাগজের পরিচালনায় লেখার ভিতর দিয়ে কোনো রকম অংশ গ্রহণ করাকেই খাঁটি সাংবাদিকতা বলে গণ্য করা হয়। পাশ্চাত্য দেশীয় বহু সংবাদপত্রে copy bearer থেকে সুরু করে সম্পাদকীয় বিভাগের শিখরে পর্য্যন্ত মেয়েদের দেখা যায়। রক্ষণশীল বৃটেনের চেয়ে প্রগতিশীল যুক্তরাষ্ট্রে মেয়েদের প্রাদুর্ভাব অবশ্যই বেশী। বিজ্ঞাপনের ভার তো মেয়েদের উপরে দিয়েই সকলে নিশ্চিন্ত হন। রিপোর্টিংএর কাজে, বিশেষ করে মেয়েদের সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে অথবা Intervewতে মেয়েরা নিজেদের সহজাত বুদ্ধির দরুণ অনেক সময়ই অদ্ভুত দক্ষতা এবং নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন—যুদ্ধক্ষেত্রে পর্য্যন্ত তাঁদের আবির্ভাবকে ঠেকিয়ে রাখা যায়নি।

যে সাহস, যে আত্মপ্রত্যয় এবং যে একনিষ্ঠতা নিয়ে তাঁরা এ কাজে যোগদান করে থাকেন, আমাদের ভিতরেও যে তার উৎস নেই, এ কথা বলা যায় না। ভয় অনেকেই অনেক রকম দেখিয়ে থাকেন—বড্ড পরিশ্রম, মেয়েরা পারবে না—টাকার দিক দিয়ে এ লাইনে বিশেষ লাভ নেই—যাবার কি দরকার—সব জায়গাতেই তো মেয়েরা পুরুষদের ঠেলে ভিতরে ঢুকছে, এটা না হয় ছেড়েই দিল—এতে অনেক রকম বিপজ্জনক বা নোংরা ব্যাপারের সম্মুখীন হতে হয়, কেন মেয়েরা সেধে তার মধ্যে যেতে চায়···ইত্যাদি।

কিন্তু এর প্রতিটি যুক্তি মেয়েরা নিজেদের কাজ দিয়েই বারে বারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে খণ্ডন করেছে, কাজেই এর বেলাতেও বিচার খাটিবে না। পরিশ্রম না করে মেয়েরা কোন কাজ করে ? যথেষ্ট টাকা কোন্ কাজেই বা পাওয়া যায় ? পুরুষরা যদি অর্থের দিকে না চেয়ে সাংবাদিক হতে পারে, মেয়েরা কেন পারবে না ? সব জায়গায়ই যদি মেয়েরা প্রবেশের অধিকার পেয়েছে—এখানেই বা হঠাৎ পুরুষদের করুণা প্রদর্শন করতে যাবে কেন ? বিপদ বা নোংরামির সম্মুখীন তো জীবনের অনেক অবস্থাতেই হতে হয়।

তবে ? এ তবের উত্তর এই যে, বাধা আসবেই এবং এগোতে হবে সে বাধা ঠেলেই। সাব-এডিটিং, নিউস-এডিটিং, প্রুফ রিডিং, রিপোর্টিং, এডিটোরিয়াল রাইটিং—ইত্যাদি কাজের যোগ্যতা মেয়েদের আছে কি নেই—তা নিয়ে তর্কাতর্কি করে লাভ কি ? সেই সেই কাজের ভার মেয়ে সাংবাদিকদের উপর ছেড়ে দিলেই হয়—দায়িত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করতে তারা পারবে কি না পারবে, হাতে-কলমেই তার পরিচয় মিলে যাবে।

মেয়েদের এ কাজের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলে যে আর দূরে সরিয়ে রাখা যাবে না, তার একটা প্রমাণ আমরা পাই এইখানে যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি যে সাংবাদিকতা শিক্ষার বিভাগ খুলেছেন, তাতে মেয়েদের গ্রহণ করতে অস্বীকার করেননি, এবং মেয়েরাও তাতে যোগদান করছেন যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে।

অবশ্য এঁদের ভবিষ্যৎ কি, তার স্পষ্ট ধারণা এখনও করা যাচ্ছে না। তবু এটুকু জোর করে বলা যেতে পারে যে, পুরুষ-অধ্যুষিত সাংবাদিক-জগতে একটা আক্রমণ তাদের কাছ থেকে আসবেই। এবং আজ হোক, কাল হোক, এত দিনের বন্ধ দরজা সে ধাক্কায় খুলবেই।

সংবাদপত্রের উন্নতির সঙ্গে যেমন মেয়ে সাংবাদিকদের সুযোগ এবং ভাগ্য জড়িত হয়ে আছে, মেয়েদের সহযোগিতার উপরেও যে পত্রিকা-জগতের ক্রমবিস্তার এবং ক্রমোন্নতি নির্ভর করছে, সে কথা অদূর ভবিষ্যতেই সংবাদপত্র অধিনায়কদের স্বীকার করে নিতে হবে।
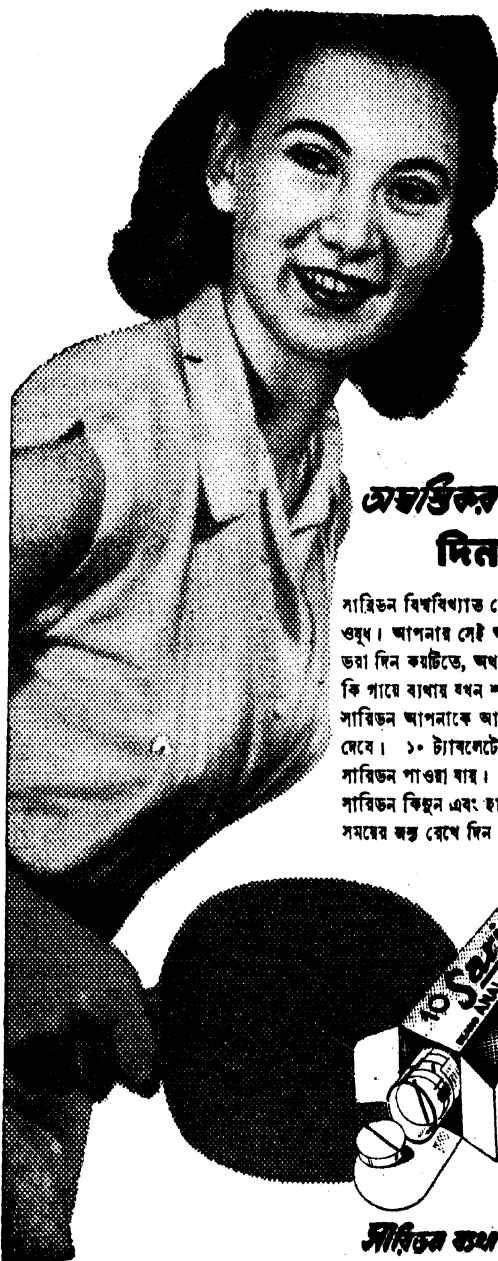
অস্বস্তিকর
দিনগুলি...
সারিডন বিশ্ববিখ্যাত বেদনানাশক
ওষুধ। আপনার সেই অস্বস্তি ও যন্ত্রণা-
ভরা দিন কয়টিতে, অথবা মাথাধরা
কি গায়ে ব্যথায় যখন শান্তি পেতে চান,
সারিডন আপনাকে আশ্চর্য আরাম
দেবে। ১০ ট্যাবলেটের ছোট্ট টিউবে
সারিডন পাওয়া যায়। আজই
সারিডন কিনুন এবং হাত ব্যাগে সব
সময়ের জন্য রেখে দিন।
10 Saridon
ANALGESIC TABLETS
সারিডন ব্যথা দূর করে

অভিনয়

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

১
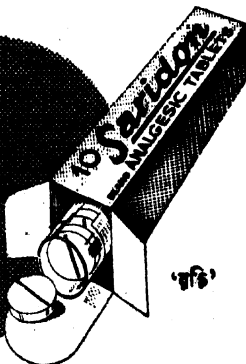
শীতের অন্নায় দিবস সন্ধ্যার দিকে অগ্রসর হইতেছে—আকাশে অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ বর্ণের সমারোহ সৃষ্টি করিতেছে। পরলোকগত চিকিৎসক পরিমল দত্তের গৃহে বিধবা শান্তিলতা মৃত্যুশয্যায়। শয্যাপার্শ্বে একমাত্র পুত্র কনককান্তি—সে-ও ডাক্তার, আর পুত্রবধূ কল্পনা। পৌত্রী বিনীতা বালিকাসুলভ কৌতূহলবশে এক এক বার কক্ষের দ্বারে আসিতেছে, কিন্তু পিতা তাহাকে পিতামহীকে বিরক্ত করিতে নিষেধ করিয়া ঘরে আসিতে বারণ করায় ঘরে প্রবেশ করিতেছে না। তাহার ইচ্ছা কোনরূপে পিতামহীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করে; কারণ, তাহার বিশ্বাস, সে আসিয়াছে জানিতে পারিলেই তাহার দিদি তাহাকে ডাকিবেন, তাহাকে নিকটে পাইতে ব্যাকুল হইবেন।

শান্তিলতা ঘরের পশ্চিম দিকের বন্ধ জানালার কবাট খুলিয়া দিতে বলিলেন—পুত্রবধূ তাহাই করিলেন—ঘরে দিনান্তের আলোক প্রবেশ করিল—কে যেন পিচকারী হইতে আলোক দিল।

শান্তিলতার স্বভাবতঃ গৌর বর্ণ রক্তহীনতায় আরও শ্বেত দেখাইতেছে—বেশ ও শয্যা শুভ্র—কেশও তাহাই। তাঁহার মনে হইল, যেন কাহার মৃদু পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?"

কনককান্তি বলিল, "বিনীতা।"

শান্তিলতার যে চক্ষুতে মৃত্যুর যবনিকাপাত হইতেছিল, তাহা—দীপ নিবিবার পূর্ব্বে যেমন উজ্জ্বল হয় তেমনই—উজ্জ্বল হইল। তিনি স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে ডাকিলেন, "দিদি!"

তিনি পুত্রকে বলিলেন, "সারা দিন আসিতে পায় নাই!"

বিনীতা ঘরে প্রবেশ করিয়া পিতামাতার দিকে চাহিল—দিদির কাছে যাইবে কি?

কল্পনা বলিলেন, "এস।"

বিনীতা পিতামহীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

শান্তিলতা বলিলেন, "দিদি!" তিনি তাহার মস্তকে করতল রক্ষা করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—তাঁহার মনে হইল—তিনি আর বিনীতা—মৃত্যু আর জীবন।

দিদি যে আর তাহার সহিত খেলা করিতে পারিতেছেন না, তাহাতে বিনীতার চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে কাঁদিলে পাছে শান্তিলতা ব্যস্ত হইয়া পড়েন সেই আশঙ্কায় কনককান্তি কন্যাকে বলিলেন, "পুরাণচাঁদের সঙ্গে খেলা কর গিয়ে।" দ্বিরুক্তি না করিয়া—কিন্তু একান্ত অনিচ্ছায়—বালিকা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। শান্তিলতার দৃষ্টি তাহার অনু[illegible] করিল। পুরাণচাঁদ গৃহের পুরাতন ভৃত্য; দাসদাসীরা প্রায় সকলেই পুরাতন—যে একবার নিযুক্ত হইয়াছে, সে, অপরাধ না করিলে, বিতাড়িত হয় নাই—পরিমল দত্তের ও শান্তিলতার—গৃহকর্ত্তার ও গৃহিণীর স্নেহমধুর ব্যবহার তাহাদিগকে আপনার করিয়াছে। তাহারা বলিত—"বাবুজী" আর "মাইজী"—মানুষ নহেন, তাঁহারা "দেবতা।"

বিনীতা চলিয়া যাইবার পরে শান্তিলতা পুত্রকে বলিলেন, "কনক, তোমাকে একটি কথা বলবার আছে।"

কনককান্তি বলিল, "আজ দু'দিন হ'তে আমি লক্ষ্য করছি, কি যেন তোমাকে সুস্থ হ'তে দিচ্ছে না—বোধ হয়, তুমি কিছু বলতে চাইছ।"

"তা'-ই বটে।"

"একটু সবল হয়ে বল্‌লে হয় না।"

শান্তিলতা ম্লান হাসি হাসিলেন, "তুমি ডাক্তার—তুমি ত জান, হয়ত আর বলবার সময় হ'বে না।"

কনককান্তি জানিত—ম'র আশঙ্কাই সত্য।

শান্তিলতা বলিলেন, "সত্য অনেক সময় উপন্যাস অপেক্ষাও বিস্ময়কর। আমার জীবনে তা'ই প্রমাণ হয়েছে। আমাদের—আমার আর যাঁ'কে তুমি তোমার পিতা ব'লে জান তাঁর জীবন—লোক যা'কে অভিনয় বলে তা'-ই। যদি তোমাকে জানান প্রয়োজন মনে হয়, সেই জন্যও বটে, আর পাছে তুমি আমাদের উপর রুষ্ট হও সেই ভয়েও বটে, আর সকল কথা বলতে সঙ্কোচের জন্যও বটে—সব কথা তোমাকে বলব কি না, আমরা বহুবার তা'র আলোচনা করেছি। কিছু স্থির করতে পারি নাই; একবার মনে হয়েছে—তোমাকে না জানালে ত কা'রও কোন ক্ষতি নাই; আবার মনে হয়েছে—সত্য তোমার কাছেও অজ্ঞাত থাকবে? স্থির করতে পারি নাই বলেই আমাদের জীবনের ইতিহাস আমি লিখে রেখেছি। সে ইতিহাস তোমাকে কেন্দ্র ক'রেই হয়েছে। মনুর কথা—স্ত্রীলোকের "পিতা রক্ষতি কৌমারে" দেখবে আমার ভাগ্যে তা'-ও হয় নাই; তা'র পরে "ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে"—সে ক্ষেত্রে রক্ষকই ভীতির কারণ; কেবল "রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রাঃ"—তা'-ই সার্থক হয়েছে। যদি তা'-ও ব্যর্থ হয়, সেই আশঙ্কাই ছিল। আজ আর তা'র অবসর নাই। সেই জন্য মনে হচ্ছে, সত্যকে গোপন ক'রে—তোমার কাছেও গোপন ক'রে—সংশয় নিয়ে যাব' না।"

তিনি শ্রান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। পুত্রের কাছে, সবই রহস্যাচ্ছন্ন মনে হইতেছিল, তবুও সে বলিল, "না-ই বা বল্‌লে, মা। চুপ কর—শান্ত হও।"

শান্তিলতা পুত্রবধূকে আলমারী হইতে তাঁহার ছোট বাক্সটি আনিতে বলিলেন—আলমারীর চাবি তিনি শয্যা লইয়াই কল্পনাকে দিয়াছিলেন। কল্পনা বাক্সটি আনিলে তিনি তাহা খুলিতে বলিলেন—খুলা হইলে তাহাতে একখানি খাতা দেখা গেল। তিনি তাহাই পুত্রকে পড়িতে বলিলেন; কল্পনাকে বলিলেন, "তুমিও পড়, মা। তোমার কাছেও কিছু গোপন করব না।"

বাহিরে তখনও দিনের আলোক নির্ব্বাপিত হয় নাই; কিন্তু ঘরে তাহা মলিন হইয়া আসিয়াছিল। কনককান্তি ও কল্পনা শান্তিলতার শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া যাইয়া ঘরের এক কোণে যে দীপদান—দীর্ঘ দণ্ডের উপর আচ্ছাদনতলে ছিল, তাহাই জ্বালাইয়া—দুইখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া—বসিয়া খাতার লিখিত বিবরণ পাঠ করিতে লাগিল। শান্তিলতার হস্তাক্ষর সুন্দর ও সুস্পষ্ট।

শান্তিলতা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

তাহারা পড়িতে লাগিল:—

২

প্রপিতামহী আমার নাম রাখিয়াছিলেন—বিদ্যুল্লতা। কলিকাতার দক্ষিণে যে প্রসিদ্ধ গ্রামে আমার পিতৃপুরুষের বাস ছিল, তথায় আমার পিতার পূর্ব্বপুরুষরা সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন—প্রপিতামহ নীলকুঠী

করিয়া সেকালের হিসাবে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং "বার মাসে তের পার্ব্বণে" ব্যয়ও করিতেন। প্রপিতামহী অসামান্ত সুন্দরী ছিলেন; লোক বলিত, সে পরিবারে তেমন সুন্দরী বধূ তাঁহার পূর্ব্বে কেহ আসেন নাই। আপনার একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিয়া সুন্দরী বধূ আনিবেন—ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই; কারণ, প্রপিতামহ রূপ অপেক্ষা "কুলের" অধিক আদর করিতেন এবং সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া—পুত্রের বিবাহে—"কুলের"ই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। পিতামহের দুই পুত্র—আমার পিতা কনিষ্ঠ। পুত্রের বিবাহে যে কারণে প্রপিতামহীর ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই, সেই কারণেই জ্যেষ্ঠ পৌত্রের বিবাহেও তাহা পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই। সেই জন্য তিনি কনিষ্ঠ পৌত্রের বিবাহে সে বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন—আপনি দেখিয়া—অনেক পাত্রী দেখিয়া মা'র সহিত বাবার বিবাহ দিয়াছিলেন। আর সেই কারণে মা'র প্রতি তাঁহার স্নেহও অসাধারণ হইয়াছিল। কিন্তু সেই স্নেহই মা'র পক্ষে সম্পদ না হইয়া বিপদ হইয়াছিল। কারণ, সেই স্নেহ পিতামহীর আনন্দপ্রদ হয় নাই এবং পিতার বিবাহের অল্প দিন পরেই কনিষ্ঠা পুত্রবধূর উপর তাঁহার শাশুড়ীর মনোভাব অপ্রীতিতে আত্মপ্রকাশ করে এবং তাঁহার প্রশ্রয়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর মনোভাব বিদ্বেষে পরিণতি লাভ করে। ব্যবসা-ব্যপদেশে পিতামহ কলিকাতাতে একখানি বাড়ী কিনিয়াছিলেন; পিতামহের মৃত্যু প্রপিতামহীর মৃত্যুর অল্প দিন পরেই হয় এবং তখন "সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল" মনে করিয়া বাবা মা'কে লইয়া কলিকাতার বাড়ীতেই আসিয়া ওকালতী করিতে থাকেন। আমার মাতুলালয়ও কলিকাতায় ছিল। তথায় আমার জন্ম হয়। প্রপিতামহী আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং দেখিয়া আমার নামকরণ করেন। আমার শৈশবেই তাঁহার ও তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হয়।

বাবা স্বস্তির আশায় কলিকাতায় আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অধিক দিন স্বস্তি সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। আমার জন্মের পর চতুর্থ বৎসরে দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের পূর্ব্বেই মা রক্তাল্পতায় দুর্ব্বল হইয়াছিলেন এবং রোগ সকল চিকিৎসা ব্যর্থ করিয়া প্রসবের পরেই প্রসূত ও প্রসূতি উভয়কেই মৃত্যুর রাজ্যে লইয়া যায়।

পিতামহী ও মাতামহী—কে আমার পালনভার লইবেন, পিতা মাতামহীকে ভার দিয়া সে সমস্যার যে সমাধান করেন, তাহাতে তাঁহার মাতার সহিত তাঁহার মনোমালিন্য বর্দ্ধিত হয়।

বিপত্নীক হইয়া পিতা তাঁহার ব্যবসায়ে—যে মনোযোগ ব্যতীত সাফল্য লাভ করা যায় না তাহা দিতে পারিলেন না এবং ধর্ম্মচর্চ্চায় অশান্ত হৃদয় শান্ত করিতে প্রয়াস করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি ধর্ম্মচর্চ্চাতেই অখণ্ড মনোযোগ দিতে ও নানা স্থানে—বিশেষ নানা তীর্থস্থানে যাইতে লাগিলেন। মাতামহী তাঁহাকে কন্যার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতেন—তাহার অর্থ এই যে, 'যিনি বককে ধবল, কাককে কৃষ্ণবর্ণ ও ময়ূরকে চিত্রিত করিয়াছেন—তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন, তাহাই হইবে।' শেষে মাতামহী যখন তাঁহার ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আমার যাহা হইবার হইয়াছে—তুমি কেন ভাসিয়া যাইবে? আমি তোমার আবার বিবাহ দিব।"—তখন এক দিন পিতা তাঁহার সম্পত্তি আমার নামে যথারীতি লিখিয়া দিয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন এবং কয় দিন পরে তাঁহার পত্র আসিল—তিনি সংসারাশ্রমে বিরক্তিহেতু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন—আর ফিরিবেন না। তখন আমার বয়স দশ বৎসর।

বাবার কার্য্যে নূতন ও জটিল অবস্থার উদ্ভব হইল—জ্যেষ্ঠতাত সম্পত্তির অর্দ্ধেক আয় আমাকে দেওয়া বন্ধ করিলেন—তিনি পিতার দানপত্র প্রকৃত নহে বলিলেন।

আমার অভিভাবক হইয়া মাতামহ মামলা করিলেন। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর শুনানী, মুলতুবী, আপীল প্রভৃতির পরে যখন মামলার রঙ্গমঞ্চে শেষ অঙ্কে যবনিকাপাত হইল, তখন দুই পক্ষের ব্যয় সঙ্কুলান করিতেই কেবল কলিকাতার বাড়ী নহে, গ্রামের বাড়ী ও অধিকাংশ সম্পত্তিই হস্তান্তরিত হইয়া গেল—যাহা থাকিল তাহার এক-তৃতীয়াংশ আমি পাইলাম, অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ—পিতামহী ও জ্যেষ্ঠতাত পাইলেন। তাঁহারা গ্রাম ত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। পিতামহী বলিয়াছিলেন—আমিই সম্পত্তিনাশের জন্য দায়ী।

এত দিন মাতামহী আমার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেও ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে পারেন নাই; মামলা শেষ হইলে সে জন্য ব্যস্ত হইলেন। ব্যস্ত হইবার কারণও ছিল। মামলায় জয়ের সংবাদ যখন পাওয়া যায়, তখন মাতামহ মৃত্যুশয্যায়—মামারা ছয় ভাই—ছয় প্রকারের বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বড়মামার পাটোয়ারী বুদ্ধি প্রবল—তিনি অন্যান্য ভ্রাতাকে বঞ্চিত করিয়া পিতার সব সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন; মধ্যম, ঘোড়দৌড় হইতে নানা প্রকার জুয়ায় রাতারাতি ধনী হইবার স্বপ্ন দেখেন; তৃতীয়, মাতামহ যে "হৌসে" চাকরী করিতেন, তাহাতেই চাকরী করেন—মনে করেন "যেমন তেমন চাকরী—ঘী ভাত"; চতুর্থ ডাক্তার হইতেছেন; পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিদ্যালয়ে গতায়াত করেন—পাঠে বিশেষ মনোযোগ নাই। তখন চা'র মামার বিবাহ হইয়াছে—বধূদিগের পরস্পারে যে বিশেষ সদ্ভাব আছে, তাহা বলা যায় না।

৩

মাতুলদিগের মধ্যে যিনি চতুর্থ তাঁহার এক জন সহপাঠী প্রায়ই তাঁহার নিকট আসিতেন—তাঁহার সহিত অধ্যয়নসূত্রে চারি বৎসরের পরিচয়। তাঁহার নাম—পরিমল দত্ত। তাঁহারা দুই ভাই—পিতৃ-মাতৃহীন। তাঁহার পঠদ্দশাতেই তাঁহার অগ্রজ য়ুরোপে গিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি একা। তিনি কলেজের ছাত্রাবাসে থাকিতেন—মেধাবী ছাত্র বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। চারি বৎসরে তাঁহার ব্যবহারে ও গাম্ভীর্য্যে আমার যেমন তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা বর্দ্ধিতই হইয়াছিল, বোধ হয়, তিনি স্বয়ং পিতৃমাতৃহীন বলিয়া, মাতৃহীনা পিতৃপরিত্যক্তা আমার প্রতি তাঁহার তেমনই স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল—তাহা সহানুভূতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। অনেক সময় ন'মামার যাহা বুঝিতে বিলম্ব হইত, দেখিতাম তিনি তাহা অনায়াসে বুঝাইয়া দিতেন। তিনি সময় সময় আমার পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন—আমি যাহা বলিতে পারিতাম না, তাহা বুঝাইয়া দিতেন। সেই অবস্থায়—মাতামহীর আগ্রহে—যখন মামারা আমার বিবাহ দিতে চেষ্টায় রত হইলেন, তখন ন'মামা তাঁহার সেই বন্ধুর সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

শুনিলাম, তিনি প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন ; বলিয়াছেন—"আমারও কেহ নাই, বিদ্যুতেরও তাহাই—এ যে যোগ্যে যোগ্য !" মাতামহী সন্তুষ্ট হইলেন ; মামলার পরে আমার অংশে যে টাকা পাওয়া গিয়াছিল, তিনি তাহা হইতে আমার অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে ও বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে বলিলেন।

সহসা বড়মামা দৃঢ়তা সহকারে প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন ; বলিলেন, "যাহার তিনকুলে কেহ নাই—তাহাকে কন্যাদান কন্যাকে জলে ফেলিয়া দেওয়া—হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিয়া দেওয়া।" মেজমামাকে তিনি স্বমতে আনিলেন। সেজমামা নির্ব্বিরোধী লোক, তিনি কিছুই বলিলেন না। ন'মামার কথা বহুমতে ভাসিয়া গেল। এক দিন শুনিতে পাইলাম, ন'মামা তাঁহার স্ত্রীকে বলিতেছেন, "দাদার কিছু উদ্দেশ্য আছে। নহিলে এমন সম্বন্ধে আপত্তি হয় ?" ন'মামীমা বলিলেন, "তুমি যাহা করিবার করিয়াছ ; আর আপত্তি করিও না।"

বড়মামার উদ্দেশ্য বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। দিদিমা অলঙ্কারাদির কথা বলিলে এক দিন তিনি বিরক্ত হইয়া মাতাকে বলিলেন, "অত ব্যস্ত কেন ? তুমি হাত খালি করিয়াছ বলিয়া কি সিন্দুকও খালি করিতে চাহ ?" দিদিমা বলিলেন, "টাকা ত ওরই।" বড়মামা বলিলেন, "হইলই বা। টাকা কি কামড়াইতেছে ? আমি এমন সম্বন্ধ দিব যে, এক পয়সাও দিতে হইবে না। তাহাদিগের পয়সায় ছাতা ধরিতেছে।"

বড়মামা একটি সম্বন্ধের কথা বলিলেন—পাত্রের বাড়ী, গাড়ী, দাসদাসী কিছুরই অভাব নাই।

দিদিমা সম্মতি দিলেন। বড়মামীমা মেজমামীমাকে বলিলেন, "বাঁচা গেল ! এইবার ঘাড় হইতে বোঝা নামিবে। পরের আপদ—কে কত দিন বহিতে পারে ?" মেজমামা স্ত্রীকে বলিলেন, "বড়বাবুর উদ্দেশ্য যে কি, তাহা বুঝিতে পারি না। উনি চীৎকার করিয়াই জিতিতে চাহেন। আমার জিনিষটা ভাল মনে হইতেছে না।"

শুনিয়া আতঙ্কিতা হইলাম ; কিন্তু কিছু বলিতে পারিলাম না—লজ্জায়ও বটে, ভয়েও বটে। বিবাহের দিন ন'মামার একটি কথায় ভয় আরও বাড়িল। তাহার পূর্ব্বদিন তাঁহাদিগের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছিল—ন'মামা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ; পরিমল বাবু সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। ন'মামা তাঁহার স্ত্রীকে বলিতেছিলেন, "যাহাকে বলে হাতের লক্ষ্মী পায় ঠেলা—তাহাই হইল ! পরিমল স্থির করিয়াছিল, বিবাহ করিয়া—বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য বিদেশে যাইবে। সে প্রথম হইল ; তাহার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল। আমার আর ভাল লাগে না। বড়বাবু যে সম্বন্ধ করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। আমি কোন কলেজের হাসপাতালে চাকরীর চেষ্টা করিব—বাড়ীতে থাকিতে ইচ্ছা নাই। মা-মরা মেয়ে—কি জানি অদৃষ্টে কি আছে ?"

ভয় বাড়িল ; কিন্তু কোন উপায় পাইলাম না।

৪

বিবাহ হইয়া গেল। বুঝিতে বিলম্ব হইল না, আমার রূপের ও যৌবনের রজ্জুর দ্বারা তাঁহার পুত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা বাঁধিয়া অসংযতকে সংযত করিবার জন্যই মাতা আদর দেখাইয়া আমাকে বধূত্বে বরণ করিয়াছিলেন। হিন্দুর ঘরে কেবলই শুনিয়া আসিয়াছিলাম—অদৃষ্টের বাহিরে পথ নাই। অদৃষ্ট কি রাক্ষসী বিমাতা হইতে পারে ? নহিলে সে আমাকে শৈশবেই মাতৃহীন করিয়াছে কেন ? নহিলে সে আমাকে বাল্যে পিতার রক্ষায় বঞ্চিত করিয়াছে কেন ? আর নহিলে সে আমাকে যৌবনে এই দুর্দ্দশায় আনিবে কেন ? এক এক বার মনে হইত, এই অদৃষ্টের বিরুদ্ধে কি বিদ্রোহ করা যায় না ? এই অদৃষ্টের সহিত কি মানুষ সংগ্রাম করিতে পারে না ? কিন্তু যাহা মনে হইত, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় কোথায় ?

দীর্ঘ ছয় মাস অতিবাহিত হইল। জীবন দিন দিন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতে লাগিল। বোধ হয়, আমার অবস্থা, আমি প্রকাশ না করিলেও, আমার মাতুলপরিবারে অনুমিত হইয়াছিল। কারণ, ন'মামা সত্য সত্যই গৃহ ত্যাগ করিয়া চাকরী লইয়া গিয়াছিলেন এবং স্ত্রীকে তাঁহার পিত্রালয়ে রাখিয়াছিলেন ; আর দিদিমা কেবলই আমাকে সান্ত্বনা দানের ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন—পতি ব্যতীত সতীর গতি নাই—পতি নারীর দেবতা। মনে হইত, এই কি দেবতার স্বরূপ ? দেবতার দেবত্বে আর পশুর প্রকৃতিতে কি কোন প্রভেদ নাই ? বুঝিতে পারিতাম না।

বিবাহিত জীবন যখন প্রায় এক বৎসর পূর্ণ হইল, তখন মনে হইতে লাগিল, আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। নরকের যে বর্ণনা কবিকল্পনা দিয়াছে, তাহা মানুষের অনুভূতির সহিত অনুমান মিশাইয়া রচিত। সেই নরকের যন্ত্রণা যাহাকে দিবারাত্রি ভোগ করিতে হয়, তাহার দুঃখে কি কোন সান্ত্বনা থাকিতে পারে ? তাহার দুঃখ কয় জন বুঝিতে পারে ? সেই জন্যই কবি বলিয়াছেন—

> "কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
> কভু আশীবিষে দংশেনি যা'রে ?"

কয় জন সত্যই সে যন্ত্রণা ভোগ করে ? ভোগ করে না বলিয়াই অপরের সে যন্ত্রণায় উপহাস করিতে পারে—"He jests at scars, that never felt a wound."

তাহার পরে অবস্থা চরমে উপনীত হইল। যে রজ্জুতে তাঁহার পুত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা বদ্ধ করা সম্ভব হইল না, পুত্রের মাতা আশায় হতাশ—শেষে নিরাশ হইয়া সেই রূপ-যৌবনের রজ্জুতে আর এক জনের উচ্ছৃঙ্খলতা বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি—তাঁহার জামাতা—উচ্ছৃঙ্খলতায় তাঁহার পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেই সঙ্গত হয়। পুত্রের মাতা মনে করিয়াছিলেন, যে রজ্জু পশুকে বদ্ধ করিবার উপযুক্ত হয় নাই, যদি তাহাতে দুর্ব্বৃত্ত মানুষকে বদ্ধ করা যায়। দিন কয়েক আমার প্রতি কেন যে দুর্ব্ব্যবহার নিবৃত্ত হইল, কেন যে কপট সহানুভূতিতে আমাকে সান্ত্বনা-দানের চেষ্টা হইতে লাগিল, তাহা আমি প্রথমে বুঝিতে পারিলাম না। যখন বুঝিতে পারিলাম, তখন ঘৃণায় আমার সমস্ত মন তিক্ত হইয়া উঠিল—আমি সেই পাপ চেষ্টায় পদাঘাত করিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিলাম। আহত সর্প যেমন উগ্র হয় সেই পুত্রের মাতা—জামাতার শাশুড়ী তেমনই উগ্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু আমার মনের তখন যে অবস্থা তাহাতে আমি তাহাতে যে বিপদ ঘটিতে পারে, সে দিক বিবেচনা করিতে পারিলাম না—বিবেচনা করিতে পারিলেই বা কি হইত ? মাতা ও পুত্রী পরামর্শ করিতে লাগিলেন—যেন বিবরে সর্প গরলোদ্গিরণ করিতে লাগিল। সে বিষ কি ভাবে প্রযুক্ত

হইয়াছিল, তাহা আমি জানি না। তবে সে বিষের ক্রিয়া আমাকে কয় ঘণ্টার মধ্যেই অনুভব করিতে হইল।

সন্ধ্যায় যখন পুত্র গৃহে ফিরিলেন, তখন মাতা তাঁহাকে কি বলিলেন এবং কন্যাও তাঁহার সহকর্মী হইলেন। স্ফটিকস্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া যেমন অর্দ্ধ-সিংহ, অর্দ্ধনরাকার নরসিংহের আবির্ভাব হইয়াছিল, তেমনই সভ্যতার এ শিষ্টাচারের আবরণ ভেদ করিয়া—যাঁহাকে দেবতা মনে করিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলাম তাঁহার দানব মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। তখন আমি ভাবিতেছিলাম—কি করিব? সে অবস্থায় বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরের তরুণী প্রথমে ও শেষে মৃত্যুর কথাই চিন্তা করে। মরিতে পারিতাম। কিন্তু ভাবিতেছিলাম—যদি বা আমার আপনার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত করিবার অধিকার আমার থাকে, তথাপি যে জীবন আমার জীবন হইতে উদ্ভূত হইতেছিল—যাহার উদ্ভবের অনুভূতি আমি আমার দেহেও অনুভব করিতেছিলাম, তাহাকে নষ্ট করিবার অধিকার আমার আছে কি? কেবল সহজাত সংস্কারই নহে—পুরুষপরম্পরাগত সংস্কার তাহাতে সংযুক্ত হইয়া আমাকে সে বিষয়ে দ্বিধায় বিচলিত করিতেছিল—ঝড় উঠিলে জলে পদ্মফুল যেমন দোলাচল হয় মন তেমনই হইতেছিল!

পথ কি ও কোথায়?

কিন্তু পথের সন্ধান আমাকে পাইতে হইল। কারণ, অযথা অপবাদ দিয়া আমাকে গৃহ হইতে পথে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। পথও, বোধ হয়, সে গৃহের তুলনায় ভাল।

৫

যে গৃহে প্রবেশাবধি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলাম, সে গৃহের দ্বার বন্ধ হইল।

পথে আসিয়া আমাকে ভাবিতে হইল—এখন কর্ত্তব্য কি? কোথা হইতে মনে বল পাইলাম, জানি না; কিন্তু অনুভব করিলাম, বল পাইয়াছি। প্রথমেই মাতুলালয়ের কথা মনে পড়িল। পথে অল্প দূর অগ্রসর হইয়াই একখানি ভাড়াগাড়ী যাইতে দেখিয়া তাহাকে মাতুলালয়ের রাস্তায় যাইতে বলিলাম। চালক বলিল, এক টাকা লইবে। উঠিয়া বসিয়া বলিলাম—"চল।" মনে হইল, চালক যদি বুঝিতে পারে, আমি অসহায়, তবে আমার বিপদ ঘটিতে পারে। সেই জন্য স্থিরভাবে তাহাকে কোন্ পথে যাইতে হইবে, সে বিষয়ে নির্দ্দেশ দিলাম।

গাড়ী মামার বাড়ীর দ্বারে দাঁড় করাইয়া অবতরণ করিয়া ভৃত্যকে ভাড়া দিতে বলিলাম—সঙ্গে টাকা ছিল না।

আমাকে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। বড়মামীমা বলিলেন, "কি গো—অসময়ে?" উত্তর না দিয়া মাতামহীর নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন একাই ছিলেন। তাঁহাকে বলিলাম, "আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে।" তিনি স্তম্ভিত হইলেন; কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই, যেন প্রকৃতিস্থ হইয়া, বলিলেন, যেন সে কথা আমি তখন কাহাকেও না বলি। তাঁহার ভয় ছিল—মামীমারা হয়ত অপ্রিয় আলোচনা করিবেন; আর আশা ছিল—

ঋষি দাসের ছোটদের নিউটন ১।০ ছোটদের আইনস্টাইন ১।০ ছোটদের মার্কনী ১।০ শ্রুতিনাথ চক্রবর্তীর রাণী রাসমণি ১৲ যোগেশচন্দ্র বাগলের ভারতের মুক্তি-সন্ধানী ২॥০ সংকল্প ও সাধনা ১॥০ রবীন্দ্রকুমার বসুর মুক্তি-সংগ্রাম ৪৷৷০ রোলাঁর আলোকে গান্ধীজি ১॥০ সুবোধচন্দ্র রায়ের স্বরাজ ও সাধনা ১॥০ প্রফুল্লরতন গঙ্গোপাধ্যায়ের নবজীবনের পথে হায়দরাবাদ ১॥০ গিরীন চক্রবর্তীর দেশ বিদেশের লেখা ৩৲	ছোটদের অন্যতম মাসিক পত্রিকা চয়নিকা বৈশাখ হইতে গ্রাহক হইতে হয় নমুনার জন্য চারি আনার ডাক টিকিট লাগে বার্ষিক ৩৲ বৈচিত্র্য ভরা রচনায় সমৃদ্ধ ও জ্ঞান বিজ্ঞানের রত্নখনি।	ভূতনাথ ভৌমিকের ডোমিনিয়ন ভারতের পথরেখা ২৲ খগেন্দ্রনাথ মিত্রের পোকার ছেলেবেলা ১॥০ মাঙ্কুসেনের অ্যাডভেঞ্চার ৸০ নির্ম্মলকুমার বসুর আরব্য উপন্যাস ২৲ কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য্যের শ্রীমদ্ভগবতগীতা ২৲ সন্তোষকুমার ঘোষের রূপকথার রাজ্য ১॥০ রবীন্দ্রলাল রায়ের বলিত হাসব না ৸০ নলিনীকুমার ভদ্রের আসামের অরণ্যচারী ১॥০ গদাধর নিয়োগীর গল্প-বীথিকা ১৷৷০ H. Barik's READY RECKONER ৩৲ PAY, WAGES INCOME TABLES ২৲

ভারতী বুক স্টল :: ৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

হয়ত আমাকে আবার সেই বিতাড়ন-স্থানে পাঠাইয়া দিতে পারিবেন।

রাত্রিতে দিদিমা আমাকে ঘটনার বিবরণ বিবৃত করিতে বলিলেন। আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা ব্যক্ত করিলাম। শেষ কথা শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এরা মানুষ!" কিন্তু তাহার পরেই যেন আপনা-আপনি বলিলেন, "এখন উপায়?" তিনি যখন বলিলেন, আমি চলিয়া আসিলাম! তখন আমাকে বলিতে হইল, আমি চলিয়া আসি নাই—আমাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

দিদিমা যেন আপনার মনে বলিলেন, ন'মামার প্রস্তাব না শুনিয়া কি ভুলই করিয়াছেন! বড়মামা কি সর্ব্বনাশই করিলেন!

তবুও পরদিন প্রাতঃকালে—বড়মামা একটু বেলায় শয্যা ত্যাগ করিলে দিদিমা তাঁহাকেই ডাকিয়া "একটা ব্যবস্থা" করিতে বলিলেন। কারণ, বড়মামাই উৎপীড়ক পক্ষকে জানিতেন এবং তিনিই বিবাহ-সম্বন্ধ আনিয়া ন'মামার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তিনি কাতরভাবে বড়মামাকে বলিলেন—তিনি একবার সে বাড়ীতে যাইয়া যে কোন প্রকারে তথায় আমাকে দিয়া আসিবার ব্যবস্থা করুন—নহিলে আর উপায় নাই। বহু সাধ্যসাধনায় বড়মামা তথায় যাইতে সম্মত হইলেন।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, আমি কি প্রাণহীন জড়বস্তু যে, আমার কোন মত, কোন অনুভূতি, কোন অধিকার নাই?

প্রায় এক ঘণ্টা পরে বড়মামা যখন অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন ঘটনাটি আর কাহারও অজ্ঞাত রহিল না—তাহা সকলেরই আলোচনার বিষয় হইল। বড়মামা দিদিমা'কে বলিলেন—আমার জন্য তাঁহাকে অকথ্য অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে। তিনি কেন তাহা সহ্য করিবেন?

বড়মামা যখন উচ্চকণ্ঠে সেই কথা বলিতেছিলেন এবং মামীমা'রা কেহ কেহ তাহা উপভোগ করিতেছিলেন, সেই সময় ন'মামা আসিয়া উপস্থিত হইলেন—সঙ্গে তাঁহার বন্ধু পরিমল বাবু। পরিমল বাবু যুক্তপ্রদেশে কোন নগরে হাসপাতালে চাকরী পাইয়াছিলেন—হাসপাতালে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া বিদেশে যাইয়া বিশেষজ্ঞ হইয়া আসিবেন মনে করিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন—সেই দিনই যাত্রা করিবেন। তিনি বন্ধুর মাতা—দিদিমা'কে প্রণাম করিতে আসিয়াছিলেন।

বড়মামার চীৎকারে ন'মামা কি হইয়াছে জানিতে চাহিলে দিদিমা তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইলেন এবং তাঁহার ঘরে লইয়া যাইয়া সকল কথা বলিলেন! ন'মামা যখন দিদিমা'র ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, তখন তাঁহার মুখ কালবৈশাখীর আকাশের মত। তিনি তাঁহার অভ্যস্ত ধৈর্য্য হারাইয়া বড়মামাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া ফেলিলেন—"ইহার জন্য তুমিই ত দায়ী!"

বড়মামা আরও উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "কেন?—'যত দোষ—নন্দ ঘোষ'?"

দুই জনে কথা কাটাকাটি অপ্রীতিকর হইতেছে দেখিয়া পরিমল বাবু ন'মামাকে নিবৃত্ত হইতে বলিয়া পার্শ্বের কক্ষে লইয়া যাইলেন। বড়মামা পূর্ব্ববৎ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ন'মামা আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার কি মনে হয়, আমার আর আমার বিতাড়নের স্থানে যাইবার উপায় নাই?

আমি বলিলাম—"না।"

পরিমল বাবু ন'মামাকে বলিলেন,—"এখন উপায়?"

ন'মামা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

পরিমল বাবু আমার দিকে চাহিলেন। তাঁহার স্নেহস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে অসীম করুণা। তিনি ন'মামাকে বলিলেন, তিনি সেই দিনই চলিয়া যাইতেছেন—কিন্তু মনে অশান্তি লইয়া যাইবেন; ন'মামা কি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ও ন'মামীমাকে পিত্রালয় হইতে আনিয়া আমাকে অন্ততঃ সহানুভূতি দিয়া রক্ষা করিতে পারেন না?

ন'মামা বলিলেন—তিনি তাহাই করিবেন।

তাঁহারা উভয়ে চলিয়া যাইলেন।

বড়মামার চীৎকার তখনও নিবৃত্ত হয় নাই—পরের জন্য তাঁহাকে অপমান সহ্য করিতে হইল! কেন তিনি ন'মামার কথা সহ্য করিবেন?—ইত্যাদি।

দিদিমা বড়মামাকে শান্ত করিবার চেষ্টাই করিতে লাগিলেন।

৬

শেষে বড়মামা ব্যবস্থা করিলেন, আমাকে যাইয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া সেই নরকে ফিরিবার চেষ্টা করিতে হইবে; কারণ, আমার আর কোন স্থান নাই। তিনি বলিলেন, আমাকে একাই যাইয়া তাঁহাদিগের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাদিগের দয়া উদ্রিক্ত করিতে হইবে।

তিনি গাড়ী ডাকাইতে পাঠাইলেন।

গাড়ী আসিলে যে ভৃত্য আমাকে গাড়ীতে দিয়া আসিল—সে'ও যেন আমাকে দয়ার দৃষ্টিতে দেখিতেছিল।

সেই নরকের রুদ্ধ দ্বারে যাইয়া আত্মসমর্পণের প্রার্থনা লইয়া তাহা মুক্ত করিতে বলিবার প্রবৃত্তি আমার ছিল না। কিন্তু কোথায় যাইব?

পরিমল বাবুর স্নেহস্নিগ্ধ দৃষ্টির কথা আমি ভুলিতে পারিতেছিলাম না। আমার মনে পড়িল, ন'মামা যখন তাঁহাকে তাঁহার যাত্রার আয়োজনে সাহায্য করিতে যাইবেন কি না, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন—প্রয়োজন নাই—তাঁহাকে সাহায্য করিবার লোক ত কেহই নাই। তাহার পরে তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার জিনিষ সবই পূর্ব্বদিন পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং যে "মেসে" থাকিতেন, তাহা ছাড়িয়া পূর্ব্বদিন হইতে "স্বরাজ হোটেলে" সাত নম্বর ঘরে আছেন—হোটেলটি কোথায়, তাহাও তিনি বলিয়াছিলেন। তাঁহার—তাঁহাকে সাহায্য করিবার ত কেহই নাই, কথায় তাঁহার হাসির অন্তরালে যেন বেদনার সন্ধান পাইয়াছিলাম। তাহা কি আমার কল্পনা?

যে ডুবিতেছে সে যেমন স্রোতে ভাসমান তৃণখণ্ড দেখিতে পাইলে তাহাই ধরিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করে, আমি তেমনই মনে করিলাম, তিনি কি কোন উপায় করিতে পারেন? হয়ত তাহা বাতুলের কল্পনা—স্বপ্ন। কিন্তু আমি যানচালককে সেই হোটেলে যাইতেই নির্দ্দেশ দিলাম।

বড়মামা আমাকে যে স্থানে যাইতে বলিয়াছিলেন, তথায়

চুলের খুস্কি কি
এতই অনিষ্ট কর?

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড এন্‌সাই ক্লোপিডিয়া অনুযায়ী ইহা মাথার ত্বকের এক "দুরারোগ্য ছোঁয়াচে রোগ যা টাকে পরিণত হতে পারে"।

Godrej রেজিষ্টার্ড

গোদরেজ হেয়ার টনিক

নিয়মিত ব্যবহারে ইহা
নিবারণ করা সম্ভব
কারণ ইহাতে আছে
বিখ্যাত জীবাণু নাশক জি-১১
যাহা চুলের গোড়ার কোন অনিষ্ট করে না বলে ইউরোপ ও আমেরিকাতে ইহা খুবই সমাদৃত হয়েছে

ঠাণ্ডা ও তৃপ্তিকর

গ্রীষ্ম প্রধান দেশের একান্ত উপযোগী।

ভারতে
এই জাতীয় এক মাত্র
হেয়ার টনিক।

গোদরেজ সোপস্, লিঃ

অধিবাসীরা যে আমার গাড়ীভাড়াও দিবেন না তাহা বুঝিয়া দিদিমা আমাকে কিছু অর্থ দিয়া দিয়াছিলেন। গাড়ীর ভাড়া দিয়া আমি হোটেলে প্রবেশ করিলাম এবং দ্বারবানের জিজ্ঞাসায় ঘরের নম্বর বলিলে সে আমাকে সেই ঘরে লইয়া যাইবার জন্য এক জন ভৃত্যকে বলিল।

আমি ভৃত্যের অনুগামী হইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলে পরিমল বাবু অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিদ্যুল্লতা—তুমি!"

আমি নিবেদন করিলাম, আমি অসহায়—কি করিব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; আমার কোন আশ্রয় নাই। তিনি কি আমাকে আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোনরূপ সাহায্য করিবেন?

তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম।

প্রায় দশ মিনিট ভাবিয়া তিনি আমার দিকে চাহিয়া আমাকে বসিতে বলিলেন এবং আমি বসিলে বলিলেন, ন'মামার কাছে সব শুনিয়া অবধি আমার জন্য দুশ্চিন্তা হইতে তিনি কিছুতেই আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছিলেন না। এখন একটি উপায় তাঁহার মনে পড়িতেছে—কিন্তু সে উপায় ত্যাগবুদ্ধি-প্রদর্শিত, কি স্বার্থ-প্রণোদিত তাহা তিনি নিজেই স্থির করিতে পারিতেছেন না বলিয়া তাহা উল্লেখ করিতে কুণ্ঠানুভব করিতেছেন।

আমি যেন অকূলে কূল পাইবার সম্ভাবনায় বলিলাম, সে উপায় কি?

তিনি গম্ভীরভাবে আমাকে বলিলেন—তাঁহাকে আর তিন ঘণ্টার মধ্যেই নূতন কর্ম্মস্থানে যাইতে হইবে। আমি কি তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারিব?

স্বাভাবিক অবস্থায় এ প্রস্তাবে চমকিয়া উঠিবার কথা—সুস্থ মনে ইহাতে সম্মত হইতে দ্বিধা অনিবার্য্য। কিন্তু আমার অবস্থা অস্বাভাবিক এবং আমার মনও বিচার-বিবেচনা করিবার মত সুস্থ নহে। আমি—কেন জানি না—বলিলাম, "পারিব।"

তিনি আরও গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "ভাবিয়া দেখ,—তুমি বিবাহিতা—সন্তানসম্ভবা। তোমাকে সর্ত্ত বিবেচনা করিতে হইবে—আমি তোমাকে আমার অন্য কোন আশ্রয়হীনা ভগিনী বলিয়া বিবেচনা করিব; তুমি আমাকে তোমার অন্য স্বজনহীন ভ্রাতা বলিয়া বিবেচনা করিবে। কিন্তু সমাজ তাহাতে কি মনে করিবে—অকারণ কৌতূহলবশে কি করিবে, বলিতে পারি না। তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের এক উপায়—আমরা স্বামি-স্ত্রী পরিচয়ে পরিচিত হইব। তাহা অভিনয়; কিন্তু সেই অভিনয়ই করিতে হইবে। কি বল?"

আমি সম্মতি জানাইলাম।

তিনি বলিলেন, "আরও একটি কথা আছে—যদি কখন আপনার দৌর্ব্বল্য অনুভব কর, তবে স্মরণ করিও—তুমি সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সংসারত্যাগী—আর তুমি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কন্যা। আর যদি কখন আমার কোনরূপ দৌর্ব্বল্য অনুমান কর, তবে আমাকে সতর্ক করিয়া দিবে। কি বল, পারিবে?"

আমি বলিলাম, "পারিব। যদি না পারি, তবে মৃত্যুবরণ করিব।"

আমি একবস্ত্রে আসিয়াছিলাম। আমার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি আমার জন্য বস্ত্রাদি কিনিতে বাহির হইয়া যাইলেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই সে সব লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

তিনি স্বয়ং আহার করিয়া লইলেন।

আমরা রেল-ষ্টেশনে যাত্রা করিলাম।

আমার ভয় হইল না—মনে হইল, যেন বুকের উপর হইতে দুশ্চিন্তার গুরুভার প্রস্তর অপসারিত হইয়াছে।

৭

যে অভিনয়ের কথা পরিমল বাবু বলিয়াছিলেন, হোটেলেই তাহার সূচনা হইয়াছিল কি না, বলিতে পারি না: কিন্তু রেল-ষ্টেশনে তাহার আরম্ভ লক্ষ্য করিতে পারিলাম। ট্রেণের কামরায় ডক্টর পরিমল দত্তের জন্য বেঞ্চ রাত্রিতে ব্যবহারার্থ নির্দ্দিষ্ট করা ছিল। কামরায় অপর সব স্থানেও যাত্রী ছিলেন। তিনি আমার জন্য এক-খানি বেঞ্চ নির্দ্দিষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন—বলিলেন, দত্ত-গৃহিণীর শরীর অসুস্থ, সেই জন্য তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইতেছে—একই কামরায় তাঁহার স্থান হইলে সুবিধা হয়। সে চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইল, তখন তিনি তাঁহারই বেঞ্চে তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে বলিলেন। বিদ্যুল্লতার স্থান ডক্টর পরিমল দত্তের পত্নী শান্তিলতা গ্রহণ করিল এবং তাঁহার নির্দ্দেশে আমাকে তাঁহার সম্বন্ধে "আপনি" ব্যবহার বন্ধ করিয়া "তুমি" ব্যবহার করিতে হইল।

রাত্রিতে আহারের পরে তিনি বেঞ্চে শয্যা পাতিয়া আমাকে শয়ন করিতে বলিলেন। তিনি কি করিবেন, জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, সে ব্যবস্থা তিনি করিবেন। দুই দিন উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার পরে ক্লান্ত স্নায়ু সহজেই নিদ্রায় শিথিল হইয়া পড়িল—আমি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। পথে একটি বড় ষ্টেশনে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকির গোলমালে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম, তিনি আমার মাথার কাছে—গাড়ীর গদীতে ঠেসান দিয়া জাগিয়া বসিয়া আছেন। প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিলে তিনি বলিলেন, আমার শরীর দুর্ব্বল—আমার নিদ্রার প্রয়োজন—তাঁহার নহে। অভ্যাসবশে আমি "আপনি" বলিয়া ফেলিলে তিনি সতর্ক করিয়া দিলেন।

ট্রেণে আমার সম্বন্ধে তাঁহার যত্নের মাত্রায় কোন কোন সহযাত্রী ব্যঙ্গের হাসি হাসিলেন—যেন বড় "বাড়াবাড়ি" হইতেছে। হয়ত অভিনয়ে তাহাই হয়। কিন্তু তাহার পরে ত্রিশ বৎসরের অধিক কালে যে সেই সস্নেহ যত্ন এক দিনের জন্যও শিথিল হয় নাই, তাহাতে বহুবার মনে হইয়াছে, তাহা কি সত্যই অভিনয় বা অভিনয় অভ্যাসে—স্বভাবে পরিণত হইয়াছে—না তাহার উৎস হৃদয়ের সযত্নসংরক্ষিত কোন ভাব হইতে উদ্গত? তাহার পাবনী ধারা আমাকে ধন্য করিয়াছে।

নূতন স্থানে আসিয়া "সংসার পাতিতে" হইল। তিনি নূতন কাজে বড় হাসপাতালের সহকারী ডাক্তার হইয়া আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কার্য্যে যোগদানের পরদিনই কোন দুর্ঘটনায় প্রধান চিকিৎসকের অনিবার্য্য অনুপস্থিতিতে তাঁহাকেই সকল ভার গ্রহণ করিতে হইল। "সংসার পাতাইবার" সব ভার আমাকে গ্রহণ করিতে হইল। তাহাতেও তিনি আমাকে অধিক কায়িক শ্রম করিতে নিষেধ করিলেন—পাছে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়ি।

সেই সময়ের মধ্যেই আমার ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করা

হইল এবং বাঙ্গালার অনুশীলন জন্য বহু পুস্তক ক্রীত হইতে লাগিল। হিন্দী তথায় সাধারণ প্রচলিত ভাষা—তাহা শিখিতেই হইল।

চারি মাস পরে আমার সন্তান—পুত্র প্রসূত হইল। তাহারই জন্য আমি আপনার জীবন নষ্ট করিতে পারি নাই।

কিন্তু তাহার আগমনে পরিমল বাবুর যে আনন্দ তাহা লক্ষ্য করিয়া আমি অধিক আনন্দ লাভ করিলাম। তিনি তাহার জন্মের পরে আমাকে বলিলেন, তিনি যে আমার বাঙ্গালা, ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার প্রথম কারণ, আমিই ছেলেকে শিক্ষা দিব; আর দ্বিতীয় কারণ, চিত্তের প্রসার ও মনের শান্তি। কারণ, পুস্তকের মত আদরের সঙ্গী আর নাই। বাঙ্গালা শিক্ষার অর্থাৎ বাঙ্গালা শিক্ষার অনুশীলনের বিশেষ কারণ এই যে, বাঙ্গালা আমার সন্তানের মাতৃভাষা—হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষাভাষী স্থানে লালিত পালিত হইয়া সে যেন তাহার মাতৃভাষার যথোচিত আদর ও ব্যবহারে বাধা না পায়। তিনি তাহার নাম রাখিলেন—কনককান্তি। সরকারের নিয়মে তাহার জন্ম লিপিবদ্ধ করিবার সময় তিনি আমাকে বলিলেন, তিনি তাহার পরিচয়ে লিখাইবেন—পরিমল দত্তের পুত্র। সকলেই তাহাই জানিল।

বাঙ্গালীর পরিচয়ে কবি লিখিয়াছেন—

"একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়;
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়।"

সেকালের কথা। একালেও বাঙ্গালী কি ভাবে সমগ্র ভারতে আপনাকে ব্যাপ্ত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে বাঙ্গালার বাহিরে যাইতে হয়। যে নগরে আমরা ছিলাম, তথায়ও বাঙ্গালীর একান্ত অভাব ছিল না। যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা হাসপাতালে বাঙ্গালী ডাক্তার আসিয়াছেন জানিয়া সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন—অনেকেই তাহার পরে সস্ত্রীক আসিলেন। কিন্তু প্রসবের চারি মাস পূর্ব্বে ও দুই মাস পরে আমার তাঁহাদিগের গৃহে বা সম্মিলনে যাওয়া হইল না—শরীর দুর্ব্বল।

তত দিনে আমার অভিনয়-শিক্ষাও সম্পূর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং আমার তাঁহাদিগের সহিত মিশা চলিতে লাগিল। ডাক্তার বাবুর "পরিবারের" আদর হইল।

এ দিকে চিকিৎসানৈপুণ্যে পরিমল বাবুর ব্যবসা বিস্তার লাভ করিতে লাগিল—প্রচুর অর্থাগমও হইতে লাগিল। তিনি প্রথমেই আমার নামে ও কনককান্তির নামে জীবনবীমা করিলেন—যদি প্রয়োজন হয়, আমরা যেন কোন অসুবিধায় পতিত না হই—কনককান্তির শিক্ষায় যেন কোন বাধা অনুভূত না হয়।

বাঙ্গালীদিগের নিকট হইতে তিনি চিকিৎসার জন্য অর্থ গ্রহণ করিতে চাহিতেন না। কিন্তু যাঁহারা দরিদ্র নহেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই প্রকারান্তরে ঋণ শোধ করিতেন। দরিদ্র রোগীর নিকট হইতে তিনি অর্থ গ্রহণ করিতেন না।

এইরূপে দশ বৎসর কাটিয়া গেল। সেই সময়ের মধ্যে প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায় স্থানীয় ডাক্তারী বিদ্যালয়টির বিশেষ উন্নতি সাধিত ও তাহা পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত হইল। তিনি হাসপাতালের কায ছাড়িয়া দিলেন—ব্যবসা বৃদ্ধিহেতু সময়ের অভাব অনুভূত হইতে লাগিল।

দীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে আমরা এক দিনের জন্যও তাঁহার কর্ম্মস্থান ত্যাগ করিলাম না। এক দিন কথাপ্রসঙ্গে তাহার কারণ, তিনি ব্যক্ত করিলেন—পাছে কোথাও কোন পূর্ব্বপরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ হয়; যাহাকে তিনি অভিনয় বলিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বিপদ ঘটে—বিপদ আমাকে লইয়া ঘটিতে পারে এবং বিপদ—যদি কনককান্তি প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিয়া বিব্রত হয়—তাঁহার ও আমার অভিনয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া আমাদিগের সম্বন্ধে অবাঞ্ছিত ধারণা পোষণ করে।

শুনিয়া আমার সম্বন্ধে তাঁহার ত্যাগের স্বরূপ যেন আরও সুস্পষ্টরূপ বুঝিলাম। আমার প্রতি ও আমার পুত্রের প্রতি তাঁহার স্নেহের গভীরতা ও পবিত্রতা উপলব্ধি করিয়া মনে করিলাম—তাঁহার চরিত্র কি মানুষে সম্ভব? আর তাঁহার ব্যবহারের সহিত যখন আমার পূর্ব্বপরিচিতদিগের ব্যবহারের তুলনা করিলাম, তখন শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে আমার হৃদয়ে আর কোন ভাবের স্থান রহিল না।

পরিমল বাবুর ইচ্ছা ছিল, বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য বিদেশে যাইবেন। তাহা হইল না—কারণ, তিনি আমাদিগকে রাখিয়া যাইতে পারিলেন না; হয়ত তাহার প্রয়োজনও হইল না—কারণ, তিনি আপনার চেষ্টায় যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন, তাহা বিদেশে শিক্ষায় লাভ করা সম্ভব কি না, সন্দেহ।

৮

কনককান্তির বয়স যখন পঞ্চদশ বর্ষ তখন সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিল। তখন সে এক দিন দুই একটি স্থান দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। পরিমল বাবু তাহার ইচ্ছায় বাধা দিলেন না। তিনি আমাদিগকে লইয়া আগ্রা ও দিল্লী হইয়া হরিদ্বারে গমন করিলেন।

হরিদ্বারে এক দিন আমরা যখন একটি ঘাটে গমন করিলাম, তখন এক সন্ন্যাসী তথায় গীতার উপদেশ বিতরণ করিতেছিলেন। তিনি হিন্দীতে যাহা বলিতেছিলেন, তাহাতে যেন বিস্ময়কর আকর্ষণী শক্তির পরিচয় পাইতেছিলাম; ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, কর্ম্ম ও ভক্তি—এ সকলের সমন্বয় সুস্পষ্ট হইতেছিল।

তিনি যখন ধর্ম্মোপদেশ দিতেছিলেন, সেই সময়—আমাদিগেরই মত বেড়াইতে বেড়াইতে—এক জন য়ুরোপীয় বেশধারী বিহারী উপস্থিত হইলেন। তিনি সন্ন্যাসীকে কয়টি প্রশ্ন করিলেন এবং গীতা সম্বন্ধে অশ্রদ্ধ উক্তি করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে—তিনি কোন ধর্ম্মাবলম্বী জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিলেন, তিনি খৃষ্টান, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বাইবেল পাঠ করিয়াছেন?" তিনি যে ভাবে বলিলেন, তিনি তাহা পাঠ করিয়াছেন, তাহাকে মনে হইল, তিনি সত্য কথা বলিলেন না বা অর্দ্ধেক সত্য বলিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে "বুক অব জব" পাঠ করিয়া পরদিন তাঁহার নিকট আসিতে বলিলেন। তাহার পরে সন্ন্যাসী আবার উপদেশ দিতে থাকিলেন।

কতক কৌতূহলবশে, কতক সন্ন্যাসীর উপদেশের আকর্ষণে পরদিন আমরা আবার সেই ঘাটে আসিলাম। বিহারীকে সন্ন্যাসী গীতার শ্লোকের পর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শেষে গম্ভীরভাবে বলিলেন, তিনি কি এখন বুঝিলেন, গীতায় তিনি পাইবেন—

Rendering of the problem of the Book of Job, a scripture for all time, a revelation of the secret of life and death which is told to each of us as we sigh "for the touch of a vanished hand, and the sound of a voice that is still."

বিহারী আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

সন্ন্যাসী সন্ধ্যাগমের পূর্ব্বে উপদেশদান শেষ করিয়া আমার দিকে চাহিলেন—কেন জানি না, আমাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার কি কিছু জিজ্ঞাস্য আছে? যে জিজ্ঞাসা আমার মনের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা কি তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন? আমি যখন বলিলাম, "হাঁ,", তখন তিনি তাহা জানিতে চাহিলেন; বলিলেন, যথাশক্তি তাহার প্রকৃত উত্তর দিবার চেষ্টা করিবেন। আমি জিজ্ঞাসা করিতে ইতস্তত করিতেছি লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, আমি যেন পরদিন মধ্যাহ্নের পরে তাঁহার আবাসে গমন করি। তিনি যে গৃহে "আসন করিয়াছিলেন" তাহার সন্ধান দিলেন।

গৃহে ফিরিলে পরিমল বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি সন্ন্যাসীকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিব? আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমরা যে "অভিনয়" করিয়া আসিয়াছি, আমাদিগের অবস্থায় তাহাই কর্ত্তব্য কি না, জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। তিনি বলিলেন, "সে বিষয়ে কি তোমার এখনও কোনরূপ সন্দেহ আছে?" আমি দৃঢ়ভাবেই বলিলাম, "না।" তিনি বলিলেন, "তবে জিজ্ঞাসা কি কেবল কৌতূহল নিবৃত্তি?" আমার যাহা মনে হইল, তাহাই বলিলাম, "বোধ হয় তাহাই।"

মধ্যাহ্নের পরেই তিনি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি কি সন্ন্যাসীর কাছে যাইব না?—তখন আমি বলিলাম, "ভাবিতেছি।" কারণ জিজ্ঞাসায় আমি বলিলাম, ভয় হইতেছে পাছে "কেঁচো খুঁড়িতে সাপ" বাহির হয়। তিনি হাসিয়া বলিলেন, তাঁহার বিশ্বাস—সেরূপ ভয়ের কোন কারণ নাই।

তাঁহার কথায় দ্বিধাভাব যেন প্রশমিত হইল। তাঁহার বিশ্বাস এত দিন আমার বিশ্বাস যেমন দৃঢ় করিয়া আসিয়াছে, তেমনই দৃঢ় করিল।

তিনি বলিলেন, যখন তাঁহাকে বলা হইয়াছে, আমরা যাইব, তখন যাওয়াই সঙ্গত—কিছু জিজ্ঞাসা করা না করা সম্বন্ধে আমি অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিলেই হইবে।

তাহাই হইল।

সন্ন্যাসী তাঁহার লোককে বারান্দায়—গঙ্গার উপরেই বারান্দা—পরিমল বাবুর ও কনককান্তির জন্য আসন দিতে বলিয়া আমাকে তাঁহার উপবেশনকক্ষে প্রবেশ করিতে বলিলেন। আর সকলে বাহির হইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর বসিয়া ছিলেন না—সাধারণ একখানি গালিচায় বসিয়া ছিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন—স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন—আমার জিজ্ঞাস্য কি?

মনে যে দ্বিধার ভাব ও সঙ্কোচ ছিল, তাহা তাঁহার কথায় দূর হইয়া গেল। আমি আমার সকল কথা অকপটে বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আমি যাহা করিয়াছি ও করিতেছি, তাহা কি অপরাধ?

সন্ন্যাসী প্রায় পাঁচ মিনিট কাল কিছু বলিলেন না, তাহার পরে সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি ত বাঙ্গালী?"—আমার উত্তর শুনিয়া তিনি বলিলেন, পরদিন আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পাইব।

আমি প্রণাম করিয়া উঠিলাম। মনে হইল, সন্ন্যাসীর নয়নে অশ্রু! তিনি হিন্দীতেই জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার সঙ্গে কাহারা আসিয়াছেন? আমি যখন বলিলাম, সঙ্গে আসিয়াছেন—পরিমল বাবু আর আমার পুত্র, তখন তিনি হিন্দীতেই বলিলেন—"চল, তোমার পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসি।"

সন্ন্যাসী উঠিয়া আসিয়া বারান্দায় আমার পুত্রের মস্তকে করতল স্থাপিত করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, সে যেন তাহার পিতা "ডাক্তার সাহেবের" উপযুক্ত পুত্র হয়, মাতার উপযুক্ত পুত্র হয়।

আমাদিগকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া সন্ন্যাসী ত্রস্তপদে কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

পরদিন আমার প্রশ্নের উত্তরের জন্য যাইয়া জানিলাম, সন্ন্যাসী মানস-সরোবরের জন্য যাত্রা করিয়াছেন—আমার জন্য একখানি পত্র রাখিয়া গিয়াছেন। ঔৎসুক্য সহকারে পত্রখানি লইয়া পরিমল বাবু ও আমি পাঠ করিলাম। পত্র বাঙ্গালায় লিখিত:—

মা,

মনে কোনরূপ দ্বিধাকে স্থান দিও না।

পাপকৌরব-সভায় যিনি বস্ত্ররূপে লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই তোমার জীবনে রক্ষকরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। পূর্ব্বাশ্রমে সন্ন্যাসীর মানস-সরোবরে যে পদ্ম বিকশিত হইয়াছে, তাহা দেবতার চরণে উৎসর্গ করিবার উপযুক্ত। আমি মানস-সরোবর যাত্রা করিলাম। আর ফিরিবার ইচ্ছা নাই।

তোমাদিগের তিন জনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছি—কল্যাণ হউক! কল্যাণ হউক—কল্যাণ হউক!

৯

পিতার সহিত সাক্ষাৎ যেমন অতর্কিত তেমনই অপ্রত্যাশিত—"Like angel visits short and far between." তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমরা দুই জন যে কত বল পাইলাম, তাহা বলা যায় না।

কনককান্তি সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। যথাসময়ে সে কি করিতে ইচ্ছা করে জিজ্ঞাসায় সে বলিল, "বাবার ব্যবসা করিব—তাহাতে লোকের উপকার করা যায়।"

সে স্থানীয় চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল এবং তথা হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা-ব্যবসা আরম্ভ করিল। সে কয় বৎসর ব্যবসা করিয়া—হাসপাতালে ও ব্যক্তিগত ভাবে রোগীর চিকিৎসায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পরে পরিমল বাবু প্রস্তাব করিলেন, সে একবার য়ুরোপে ও আমেরিকায় যাইয়া সে সব দেশে হাসপাতালে ও অন্যত্র চিকিৎসা-ব্যবস্থা অধ্যয়ন করিয়া আসিলে ভাল হয়। আমি কোন আপত্তি প্রকাশ করিলাম না বটে, কিন্তু পরিমল বাবু নিশ্চয়ই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন—দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরে তিনি আমার প্রকৃতি ভাল করিয়াই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহারও ত যাওয়া হয় নাই—তিনিও ঘুরিয়া আসিবেন, মনে করিতেছেন। আমার জন্যই যে তাঁহার যাইবার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই,

তাহা আমি জানিতাম। আমি কিরূপে তাহাতে আপত্তি করিতে পারি? তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন, শম্বুক যখন যে স্থানেই যায়, তাহার গৃহটি লইয়া যায়—তেমনই তাঁহারও সংসার ব্যতীত যাইবার উপায় নাই, সুতরাং আমাকেও যাইতে হইবে।

তাহাই হইল—সাত হইতে আট মাসের জন্য আমরা বিদেশ-যাত্রা করিলাম। যাইবার পূর্ব্বদিন স্থানীয় বাঙ্গালী সমাজের উদ্যোগে স্থানীয় বহু লোক আমাদিগকে বিদায়-সম্বর্দ্ধনায় সম্বর্দ্ধিত করিলেন—সভাপতি বলিলেন, সাত আট মাস পরেই তাঁহারা আমাদিগকে স্বাগত-সম্বর্দ্ধনা করিবেন।

আমরা কোথায় কয় দিন থাকিব, স্থির করিয়া গিয়াছিলাম। ছয় মাসে দেখা শেষ করিয়া পরিমল বাবু ফিরিবার আয়োজন করিলেন: কারণ—

"স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি'
রেখ রেখ হৃদে এ ধ্রুবজ্ঞান;
যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে
অনিলে মলয় সদা-বহমান।"

স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁহার সেই মনোভাবই ছিল এবং তিনি আমাকে ও কনককান্তিকে সেই ভাবের অনুশীলনেই অভ্যস্ত করিয়াছিলেন।

বিদেশে—রোমে—একটি বাঙ্গালী পরিবারের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হইল। আমরা রোমের বিরাট ভগ্নাবশেষ কলোশিয়ম দেখিতে গিয়াছিলাম। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা ছিল—যতদিন কলোশিয়ম থাকিবে ততদিন রোমের স্থিতি; কলোশিয়ম ভাঙ্গিয়া পড়িলে রোম ধ্বংস হইবে—আর রোমের ধ্বংসে পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য্য। ইহাতে পঞ্চাশ হাজার দর্শকের উপবিষ্ট হইয়া ক্রীড়া দেখিবার স্থান ছিল। ইহাকে প্রাচীন রোমের প্রেতাত্মা বলা যায়। আমরা যখন তাহাতে প্রবেশ করি, তখন পরিণতবয়স্ক ব্যারিষ্টার রাজকৃষ্ণ মিত্র সপরিবারে তাহা দেখিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পত্নী, দুই পুত্র ও কন্যা—কল্পনা। পরিচয় হইল—বিদেশে স্বদেশীকে দেখিলে আনন্দ হয়। মিত্র মহাশয় সেই দিন সন্ধ্যায় আমাদিগকে তাঁহার হোটেলে তাঁহার আতিথ্য স্বীকারে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমরা সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।

হোটেলে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা মিত্র মহাশয়ের হোটেলে গমন করিলাম। কিন্তু—কি অবস্থা! তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র চারুব্রত সহসা অসুস্থ পড়িয়া পড়িয়াছে—হোটেলের চিকিৎসক রোগের নিদান নির্ণয় করিতে পারেন নাই, তাহাকে হাসপাতালে লওয়া হইয়াছে। মিত্র মহাশয়, তাঁহার পত্নী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র সঙ্গে গিয়াছেন; কন্যা কল্পনা আমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সে আমাদিগকে দেখিয়া কাঁদিয়া অবস্থা জানাইল। বিলম্ব না করিয়া আমরা তাহাকে লইয়া হাসপাতালে গমন করিলাম। পরিমল বাবু ও কনককান্তি উভয়ের মধ্যে তখন চিকিৎসক আবির্ভূত।

রোগনির্ণয় করিতে পরিমল বাবুর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব হইল না—তাহা প্রাচ্য দেশের রোগ, য়ুরোপের চিকিৎসকদিগের অভিজ্ঞতার সীমাবহির্ভূত—তাহার নাম "ব্ল্যাকওয়াটার ফিভার"। চারুব্রত মিত্র মহাশয়ের হিমালয়ের পাদদেশে যে চা-বাগানে ছিল, তথা হইতে আসিয়া পিতামাতার সহিত য়ুরোপে আসিয়াছিল—শরীরে ব্যাধির যে বিষ লইয়া আসিয়াছিল, তাহাই প্রবল হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

পরিমল বাবু ও কনককান্তি তাহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন। তাহা না হইলে অথবা বিলম্ব হইলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য ছিল।

দ্বিতীয় দিনেই চারুব্রত বিপন্মুক্ত হইল বটে, কিন্তু মিত্রগৃহিণী আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—আমরা তাঁহার পুত্র হাসপাতাল হইতে যাইবার পূর্ব্বে কিছুতেই রোম ত্যাগ করিতে পারিব না; আর কল্পনা যেরূপ কাতর ভাবে অনুরোধ করিতে লাগিল, তাহাতে আমাদিগকে সব ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া রোমে আরও তিন দিন থাকিতে হইল। রোগীর সেবাসূত্রে সেই পরিবারের সহিত আমাদিগের ঘনিষ্ঠতা ঘটিল—বিপদে যে ঘনিষ্ঠতা হয়—সম্পদে তাহা হয় না।

১০

আমেরিকা হইতে ফিরিয়া লণ্ডনে আসিয়া ভারত যাত্রা করিব—ব্যবস্থা ছিল। তদনুসারে লণ্ডনে ফিরিয়া পরিমল বাবু যখন যাত্রা-ব্যবস্থাকারীর প্রতিনিধির সহিত জাহাজ কোম্পানীর কার্য্যালয়ে উপনীত হইলেন, তখন—তথায়—তিনি জানিতে পারিলেন, আমাদিগের সহিত একই জাহাজে আর একটি বাঙ্গালী পরিবার যাইবেন—আর, কে, মিত্রের নামে পাঁচ জনের জন্য টিকিট লওয়া হইয়াছে। আমাদিগের মনে হইল—যে পরিবারের সহিত রোমে পরিচয় হইয়াছিল, এ সেই পরিবার।

জাহাজে আসিয়া দেখিলাম, আমাদিগের অনুমানই সত্য—তাঁহারাই আমাদিগের সহযাত্রী। মিত্রগৃহিণী যেমন আমিও তেমনই বলিলাম—ভালই হইল।

কাহারও কাহারও ধাতুতে সমুদ্রযাত্রায় প্রথম কয়দিন উৎকট বিবমিষায় কাতর হইতে হয়। আমার তাহাই—আসিবার সময়েও হইয়াছিল, যাইবার সময়ও হইল। সেই অবস্থায় কল্পনা যে ভাবে আমার সেবা করিল, তাহাতে আমি লজ্জানুভব না করিয়া পারিলাম না। সে আর কাহাকেও আমার সেবাভারের অংশ দিতে সম্মত হইল না। সে যেমন কন্যার মতই সেবা করিল, তেমনই কন্যার মতই আমাকে "মা" বলিতে আরম্ভ করিল—কন্যার স্থান অধিকার করিল। সে রোগে সেবা-শুশ্রূষাই ঔষধ—কল্পনা আমাকে তাহার অভাব অনুভব করিতে দিল না।

কয় দিনে আমার রোগের উপশম হইল বটে কিন্তু কল্পনার সেবা-শুশ্রূষার উপশম হইল না। আমি শয্যাত্যাগ করিতে পারিলেই সে কনককান্তির সাহায্যে আমাকে লইয়া যাইয়া জাহাজে মুক্ত স্থানে চেয়ারে বসাইয়া দিত—আমার বালিশ প্রভৃতি যথাস্থানে দিয়া আমার কি প্রয়োজন হয় না হয়, সেই জন্য আমার কাছে বসিয়া থাকিত।

দেখিয়া পরিমল বাবু হাসিতেন; বলিতেন, আমার সৌভাগ্য যে আমি রোগগ্রস্ত হইয়াছি; কারণ, সেবা লাভ সৌভাগ্য ব্যতীত হয় না।

যাত্রা শেষ হইয়া আসিল। জাহাজ যেদিন ভারতের বন্দরে ভিড়িবে তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রিতে যখন আমরা জাহাজের মুক্ত স্থানে বসিয়া ছিলাম, তখন মিত্রগৃহিণী আমাকে বলিলেন, তাঁহার একটি

কথা আছে—আমাকে তাহা রক্ষা করিতে হইবে। কি কথা?—জিজ্ঞাসায় তিনি বলিলেন, আমরা না থাকিলে তাঁহার পুত্রের জীবন-রক্ষা হইত না—আমরা তাহার জীবন দিয়াছি; তাঁহারা প্রতিদানে কিছুই দিতে পারেন নাই—দিবেন, সে স্পর্দ্ধাও তাঁহাদিগের নাই। কিন্তু তাঁহারা একটি উপহার দিবেন, তাহা আমাকে লইতেই হইবে। আমি বলিলাম—আমরা যাহা করিয়াছি, তাহা না করিলে অপরাধ হইত। কিন্তু তাঁহারা প্রতিদানের জন্য ব্যস্ত কেন? পরিমল বাবু হাসিয়া বলিলেন, না হয় ঋণ থাকুক।

মিত্রগৃহিণী বলিলেন, "আমার কন্যাকে আমি আপনাদিগকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইব।"

কল্পনা উঠিয়া গেল—জাহাজের উজ্জ্বল আলোকে আমি লক্ষ্য করিলাম, তাহার মুখে লজ্জার রক্তাভা—কর্ণমূল রক্তবর্ণ হইয়াছে।

আমি বলিলাম, কনককান্তি ও কল্পনা উভয়েই প্রাপ্তবয়স্ক, তাহাদিগের মত জানা ত প্রয়োজন। মিত্রগৃহিণী বলিলেন, আমি কল্পনাকে লক্ষ্য করিয়াছি—সে পিতামাতার কথা অবহেলা করিবে না। তিনি আমাকে কনককান্তির মত করিতে বলিলেন।

সেই রাত্রিতেই আমাকে সে কথা কনককান্তিকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল। কারণ, পরদিন মিত্রপরিবার কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিবেন; আমরা আমাদিগের কর্ম্মস্থলে যাইব।

কনককান্তি বলিল, তাহার পিতামাতার ইচ্ছাই তাহার নিকট আদেশ। আমরা যাহা বলিব, সে তাহাই করিবে।

আমি ভাবিতে লাগিলাম—পরিমল বাবুর সহিত পরামর্শ করিলাম। পুত্র সংসারী হয় এ ইচ্ছা—আমাদিগের অভিজ্ঞতায় বিস্ময়কর হইলেও—স্বাভাবিক নিয়মে আমাদিগের ছিল। কিন্তু আমি যে এত দিন সে কথা উত্থাপিত করে নাই সে ভয়ে—অভিজ্ঞতা-জনিত ভয়ে, আর পাছে পরিচয়ের ব্যাপারে বিব্রত হইতে হয় সেই ভয়ে।

এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভয়ের কারণ থাকিল না; প্রথম ভয় সম্বন্ধে মনে হইল, কনককান্তি ত আপনি ইচ্ছা করিয়াই বিবাহ করিবে।

পরদিন জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া যে যাহার গন্তব্য স্থানে যাইতে হইবে।

"নানা পক্ষী এক বৃক্ষে নিশিতে নিবসে সুখে,
প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন।"

বন্দরে নামিয়া মিত্রগৃহিণীকে আমাদিগের সম্মতি জানাইলাম। কেবল বলিলাম, আমরা কলিকাতায় যাইব না—বিবাহ আমাদিগের কর্ম্মস্থলে অথবা অন্য কোন স্থানে হইবে।

যাত্রাকালে কল্পনা যখন পরিমল বাবুকে ও আমাকে প্রণাম করিল, তখন পরিমল বাবু আমাকে বলিলেন, "যদি বল, তবে 'আশীর্ব্বাদই' করি; তুমিও কর।"

১১

কয় মাস পরে কল্পনা পুত্রবধূ হইয়া আমার কাছে আসিল। সংসার নূতন রূপ ধারণ করিল।

তিন বৎসর সুখেই কাটিল। তাহার পর পৌত্রী বিনীতা জন্মগ্রহণ করিল। কতদিন পূর্ব্বে এই পরিবারে প্রথম সন্তানের আবির্ভাব হইয়াছিল! যে দিন কনককান্তি আসিয়াছিল—সে দিন আর এ দিন—কত প্রভেদ!

আরও এক বৎসর অতিবাহিত হইল। গড়া আর ভাঙ্গা সংসারের নিয়ম। গঠন শেষ হইয়াছিল—তাই বুঝি ভাঙ্গন আরম্ভ হইল।

একদিন অপরাহ্নে সহসা আলোকের মধ্যে ছায়াপাত হইল—পরিমল বাবু রক্তের ক্রিয়া বন্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কথা বন্ধ হইল—আর ফুটিল না। জীবনে তিনি কখন সেবা গ্রহণ করেন নাই; আজ তাঁহার সেবার প্রয়োজন হইল। দেখিতে দেখিতে মৃত্যুর অন্ধকার ঘনীভূত হইল। আমরা শয্যাপার্শ্বে ছিলাম। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত আমার হস্তের উপর পড়িল—বোধ হয়, মৃত্যু-যন্ত্রণায় তিনি তাহা চাপিয়া ধরিলেন—যখন সে হস্ত শিথিল হইল, তখন সব শেষ হইয়াছে। জীবনে তাহাই তাঁহার প্রথম ও শেষ স্পর্শ—সে স্পর্শে কি তিনি কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন? তাহার কি কোন বিশেষ তাৎপর্য্য ছিল?

বহু লোক মৃতদেহ কুসুমাবৃত করিয়া শ্মশানে লইয়া গেল—বহু দরিদ্র অশ্রুপাত করিল!

আমার মনে স্মৃতিই আলোড়িত হইতে লাগিল।

তাহার পরে আমার কথা। বুঝিতে পারিতেছি, জীবনের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় শেষ হইয়াছে—যবনিকাপাতের অপেক্ষা।

পিতার অভিমত—আপনার বিশ্বাস—যিনি বিপদে রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহার দৃঢ় মত—এ সকল ভুলি নাই; ভুলিতে পারি না। তবুও আজ মনে হইতেছে, যে অভিনয় করিয়াছি, তাহা আমার পুত্র-পুত্রবধূ অপরাধ মনে করিবে না ত? হায় মানবজন্ম!

* * * *

শান্তিলতা পুত্র-পুত্রবধূকে লক্ষ্য করিতেছিলেন—পুত্র বার বার ও পুত্রবধূ বার বার চক্ষু মুছিতেছিল।

পাঠ শেষ হইলে কনককান্তি ও কল্পনা ব্যস্ত হইয়া শান্তিলতার কাছে আসিল। কনককান্তি বলিল, "মা, বাবা আর তুমি অভিনয় কর নাই; মানুষের মধ্যে যে দেবতা থাকিতে পারেন, তোমরা তাহারই পরিচয় দিয়াছ।"

কল্পনা শান্তিলতার চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিল; বলিল, "মা, আপনি আপনার বিনীতাকে আশীর্ব্বাদ করুন, সে যেন আপনাদের উপযুক্ত পৌত্রী হয়।"

কল্পনা ঘর হইতে যাইয়া কন্যাকে আনিল।

শান্তিলতা তাহার মস্তকে করতল অর্পণের চেষ্টা করিলেন—পারিলেন না। তাঁহার দুর্ব্বল হস্ত কম্পিত হইতেছিল। কল্পনা সে হস্ত কন্যার মস্তকে স্থাপন করিল।

মনে হইল, মরণাহতার ওষ্ঠাধর কম্পিত হইল—তিনি যেন বলিতে চাহিলেন—"দিদি!" তাঁহার কণ্ঠে সামান্য ঘর্ঘর শব্দ শ্রুত হইল।

বিনীতা ডাকিল—"দিদি!—দিদিভাই!"

সে কথা কি শান্তিলতার কর্ণে প্রবেশ করিল?

বছরের পর বছর... এদেশের হাজারো মায়ের
মুখে একই কথা: ছেলেদের কাশি হলেই
চাই 'সিরোলিন'!
SIROLIN
'ROCHE'
ছেলেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সজাগ ও
অভিজ্ঞ জননীরা কফকাশির জন্য
দাম বেশী হওয়া সত্ত্বেও সিরোলিন
খাওয়ান, তার কারণ—
সিরোলিন শীঘ্র কাশির ধমক কমিয়ে দেয়
সিরোলিন খুব অল্প সময়ে কাশি নির্মূল করে
সিরোলিন খেতে সুস্বাদু
সিরোলিন শিশুদেরও নির্ভয়ে খাওয়ানো যায়
—কোনো অনিষ্টকর উপাদান এতে নেই।
'সিরোলিন' কাশির যম

গোলাবী

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

১

আশ্বিন মাস, একটু একটু শীতের আমেজ আসে শেষ রাতের দিকে, আর তখনই শুনতে পাই মেয়েলী গলায় অজস্র কলরব। কৌতূহলী হয়ে উঠে দেখলাম দলে দলে গ্রাম্য-নারীরা, প্রায় সব বয়সেরই, হাতে খুরপী আর মাথায় একটা করে টুক্‌রী, গল্প করতে করতে চলেছে। উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে আমাদের বাংলা-বাড়ী। বাংলাটি উচ্চ মালভূমির উপর, চারদিকে যত দূর চক্ষু যায় শ্যামল প্রান্তর। দূরে গাঢ় সবুজ পাতাঘেরা গাছের সারি আকাশ আর জমির মধ্যে সীমা এঁকে দিয়েছে, উপরের অনন্ত নীলাকাশ এসে সবুজ ঘন গাছের রেখায় মিলিয়ে গেছে। দূরে কৃষ্ণচূড়ায় অজস্র লাল ফুল সবুজ ঘাসে বিছানো, যেন সবুজ মখমলে লাল রেশমের বুটি। সাতপুরা পাহাড়ের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে সোনালী সূর্য্য উঁকি দিতে লাগল। মেঘমুক্ত নীল আকাশ, আধো-আলো আধো-আঁধারে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্যের মধ্যে, দূরে পায়ে-চলা পথে, রং-বেরং-এর ঘাঘরা-পরিহিতা খুরপী হাতে নারীদলের বিচিত্র গতি, অদ্ভুত নিমাড়ী ভাষায় কলরব যেন এক রহস্যের সৃষ্টি করে তুলল।

খবর নিয়ে জানলাম, এই নারীবাহিনীর অভিযান চলেছে মুংফলী মানে চীনেবাদামের সুবিস্তৃত ক্ষেতের পানে। এই সময়টা নাকি ক্ষেত থেকে চীনেবাদাম তুলবার সময়। সারা দিন এরা মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে চিনেবাদাম তুলবে, বাছবে; দিনান্তে পাবে এক টুকরী মুংফলী, আর একটি টাকা। এক আঁজলা কাঁচা চীনেবাদামের আর এক পোয়া মাংসের নাকি একই পুষ্টিকর শক্তি—বড় বড় অভিজ্ঞ ডাক্তারদের এক মত। দুপুর বারোটা থেকে একটা পর্য্যন্ত খানা খাবার ছুটি, তখন এই নারীদল বিচিত্র কলরব করতে করতে যে-যার টুকরী নিয়ে বসে যায় খেতে। মোটা-মোটা জোয়ারের রুটি, যে-আর "আম্বরী ভাজি", খুব লঙ্কা-পেঁয়াজ দিয়ে শুকনো করে রান্না, একটু ঝাল আমের আচার, ঐ তাদের প্রধান খাদ্য। পরম তৃপ্তির সঙ্গে এরা খেয়ে একটু বিশ্রাম করে আবার কাজে লেগে যায়। সন্ধ্যেয় সেই মুংফলী-গাঁটরী পায়ে-চলা ফেরবার পথে পথিকদের কাছে বিক্রী করে বেশ দু'পয়সা লাভ করতে করতে যায়।

এই নারীদের পোষাকও বড় বিচিত্র, ওদের অধিকাংশের পরনেই ফুলতোলা রঙীন কাঁচুলি শরীরে আঁট করে বাঁধা, কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত ঘন চুনটকেরা গাঢ় লাল রংএর ঘাঘরা, তার নীচে আবার কালো কুচকুচে কাপড়ের বর্ডার উপরে গায়ে-মাথায় একখানা ওড়না জড়ানো। চলার তালে তালে তাদের ভারী চুনট-করা ঘাঘরা ভাঁজে-ভাঁজে দুলতে থাকে, আর পায়ের ভারী মল ঝমঝম আওয়াজ করে ওঠে।

আমাদের বাংলায় গম-চাল ঝাড়বার-বাছবার লোক পাচ্ছিলাম না, সেদিন চাকরটা নিয়ে এল একটা নিমাড়ী মেয়েলোক সেই বাহিনী থেকে। মেয়েলোকটি প্রৌঢ়া, আধ-পাকা আধ-কাঁচা চুল মাথার পেছনে টেনে বাঁধা, কপালে হাতে বড় বড় উল্কী, পরনে ঐ রকম ভারী লাল ঘাঘরা, গলায় দু-তিন রকমের গোল গোল টাকা বসানো আর চৌকা পাত বসানো রূপার হার, মোটা হাঁসুলী, কানে ২বড় ঝুমকো, কানের ছেঁদা দুটো ঝুমকোর ভারে প্রায় ছিঁড়ে এসেছে। হাতে মোটা-মোটা রূপার বালা, পায়ে ভারী মল। আমি বেশ কৌতূহলের সঙ্গে তার বিচিত্র বেশভূষা দেখতেছিলাম। তার নাম কি জিজ্ঞেস করায় বললে সরস্বতী, তবে লোকে ডাকে "গোলাবীর মা।"

সে থাকে আমাদের বাংলার অনতিদূরে এক শেঠের বাড়ীর প্রাচীর-সংলগ্ন বস্তিতে। আমাদের বাংলার পেছনে দাঁড়ালে দেখা যায় শেঠের বিরাট অট্টালিকা আর পাশে গরীবদের এক সার কুঠুরি। গোলাবীর মা নিমাড়ী ভাষায় অদ্ভুত সুরে নিজের কথা বলছিল, তবে তার অর্দ্ধেক কথাই বুঝতে পারছিলাম না।

২

গোলাবীর মা কাজে লেগে গেল, তখন থেকে সেই আমার গম-চাল বাছে। এটা-সেটা করে দেয়। আমি মাঝে-মাঝে তার কাছে বসে তার ভাষায় গল্প শুনি, অর্দ্ধেক বুঝি অর্দ্ধেক বুঝিনে। একদিন সে একটি মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে এল, মেয়েটির বয়স চৌদ্দ-পনেরোর বেশী হবে না। আমি বললুম, এই বুঝি তোর গোলাবী? সে মাথা নেড়ে বললে, হ্যাঁ। কিন্তু এই মায়ের এমন মেয়ে কেউ বিশ্বাস করবে না। মায়ের রং কালো, মুখ বলী-রেখাঙ্কিত, উল্কি-কাটা, মাথায় কালো-পাকা চুল, পরনে ঘাঘরা। মেয়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চোখ দুটি বড়-বড় ঠোঁট দুটিও পাতলা, সে মায়ের মত চুনট-করা ঘাঘরা পরেনি, পরেছে একখানা নীল পাড়ের মোটা শাড়ী! গায়ে একটা রঙীন ফুলতোলা ব্লাউজ, হাতে শুধু কয়েক গাছা কাচের চুড়ি। গোলাবীও মায়ের সঙ্গে কাজে লেগে গেল, মায়ে-ঝিয়ে চাল বাচছে আর গুন-গুন সুরে গান গাইছে।

পয়সা নেবার সময় গোলাবী বড় গোলমাল সুরু করলে। গোলাবীর মা পয়সা হাতে নিয়ে হাসিমুখে চলতে শুরু করলে। কিন্তু গোলাবী তাকে ধমকে বললে, পয়সা হিসেব মত পেলে কি না না দেখেই চলে যাচ্ছ? ছালাতে কত মণ গম ছিল কে জানে? এই বলে সে নিজেই মেপে দেখতে বসে গেল।

সে বসে বসে একবারের জায়গায় দু'বার গম মাপলে, পয়সাগুলো ভাল করে গুণে নিলে, উল্টে-পাল্টে বাজিয়ে দেখলে সব ঠিক আছে কিনা। তার রকম-সকম দেখে আমার রাগ ধরে গেল, আমি বললাম, তোর যদি এতই অবিশ্বাস থাকে, তুই আর আসিসনে। বুড়ী গোলাবীকে ধমকে দিলে, কিন্তু আমার দিকে ফিরে বললে, ছোকরী বহুৎ হুঁসিয়ার। আমি বললাম, তা হুঁসিয়ার হোক গে, কিন্তু ওরকম করে হিসেব-করা আমি মোটেই পছন্দ করিনে। গোলাবী কিন্তু দমবার পাত্রী নয়, সে আসবে, কাজ করবে, তেমনি হটিপনা করবে, একগাল হাসবে, গান গাইবে, বাগান থেকে ফুল তুলে খোঁপায় পরবে, বেশ দিব্যি যেন কিছু না।

গোলাবীর মা চাল বাছতে বসে গেছে, আমি ওর কাছে বসে ওর দেশের কথা, ওর ঘর-সংসারের সুখ-দুঃখের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। সে খুশীর সঙ্গে সুর করে তার কাহিনী বলতে সুরু করলে, আমি বহু কষ্টে তার মর্ম্মোদ্ধার করলাম।

সে বলতে লাগল,—"বাঈ, আমি বহু বৎসর হল বিধবা হয়েছি, যখন আমার ছোট ছেলেটা দু'মাসের তখন আমার স্বামী মারা যায়। প্রথমে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু ছেলেদের মুখ দেখে সামলে নিলাম। সবাই বললে, পাট বিয়ে লাগাও, আমি সে কথা শুনলাম না। আমরা বিধবা হলেও এত নিরাশ্রয় হই না, কারণ আমরা কাজ করে খাই, কাজেই অতি অল্প সময়েই সামলে গেলুম, দ্বিগুণ কাজ করে ছেলেদের মানুষ

করতে লাগলাম। আমার মেয়ে একটিও নেই, তিনটি ছেলে। এত কষ্টের ছেলেগুলো ভগবানের দয়ায় বড় হল, মানুষ হল, বড় ছেলেটা শেঠের বাড়ীর মালী, দু'পয়সা রোজগার করে, বিয়ে-থাওয়া দিয়েছি, একটা ছোট বাচ্ছাও হয়েছে। মেজোটা—আমাদের গাঁয়ে এক টুকরো জমি আছে—তাই দেখাশোনা করতো আর এটা-সেটা করে তার খরচ চালিয়ে নিত। একদিন সে ক্ষেতে কাজ করতে গেছে, সঙ্গে রুটি আর চাটনী করে দিয়েছি খেতে। একদিন বলছিল, মা শুকনো মাছ খুব ঝাল করে রান্না করো অনেক দিন খাইনি। তা বাছা আমার আর খেতে পেল না, দুপুরে খবর এল তাকে নাকি নাগবাবা (সাপ) কেটেছে। দৌড়তে দৌড়তে পাগলের মত ক্ষেতে ছুটলাম, হায় হায় আমার এমন জোয়ান ছেলেটা বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে, মুখে ফেনা বেরুচ্ছে, গোঁ-গোঁ করছে। গাঁয়ের লোক বড় ওঝা নিয়ে এল, ওঝা কত ঝাড়ফুঁক করল, কত মন্ত্র-তন্ত্র পড়ল, নাগবাবার মাথায় কড়ি চাপাবার চেষ্টা করল, নাগবাবা এল না। ও আসল নাগবাবা ছিল, আমার ছেলের আর হুঁস হল না।—বলে বুড়ী ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে লাগল। বললে,—"আমি আমার ছেলের মুখটা ভুলতে পারি না। ছেলেটার বিয়ে দেব বলে সব ঠিকঠাক করেছিলাম, তা ভগবান আমার ছেলেকে কেড়ে নিলেন। তখন থেকে, বাঈ, আমার মাথা কেমন গরম হয়ে গেছে। আমার আর ঘুম পায় না, রাত তিনটে থেকে আমি বিছানায় গড়াগড়ি করি, তার পর উঠে বসে ভজন গাইতে থাকি। রাত আর ফুরোয় না, প্রভাত হলেই উঠে পড়ি। কাজে লেগে যাই, সব ভুলে থাকি।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, আচ্ছা, তুই বললি তোর মেয়ে নেই, তবে গোলাবী কি তোর মেয়ে নয়?

সরস্বতী বললে, ও ত আমার মেয়ে নয়। গোলাবী এক মা-বাপ মরা মেয়ে। সেবার গাঁয়ে মাতার (বসন্তের) খুব কোপ হল। গোলাবীর মা-বাবা দুই-ই উপর-উপরি মাতার কোপে মারা গেল। আমি, গোলাবী তখন দু'বছরের, তাকে আমার কাছে নিয়ে এলাম, এরা আমাদেরই স্বজাত। সেই দুবছরের মেয়েকে যত্ন করে বড় করেছি, এখন আর একটু বড় হলেই বিয়ে দেব আমার ছোট ছেলের সঙ্গে। আমার ছেলে রেলওয়েতে কাজ করে। গোলাবী আমার মেয়েকে মেয়ে, বউকে বউ দুই-ই হবে, আমি তাকে ঘরের কাজকর্ম সবই শিখিয়েছি। ও ভাল হিসেব করতে ভাল ভজন গান গাইতে পারে।" —এই বলে সস্নেহ দৃষ্টিতে গোলাবীর দিকে চাইলে। মুখে একটু অহঙ্কারের ভাব, আমি কেমন মেয়ে তৈরী করেছি দেখ।

৩

গোলাবীর মায়ের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে এদের জীবনযাত্রা জানবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হত। আমি প্রায়ই পেছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ্য করতাম তাদের বাস্তব জীবনের চলচ্চিত্র। প্রেক্ষাগৃহের চলচ্চিত্রের চেয়ে কোন-কিছু কম নয়। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থই এক-একটি কোঠা ভাড়া নিয়েছে, প্রত্যেক কোঠার সামনে ঘরে ঢুকবার সিঁড়ি, আর প্রায় সব দরজার সামনেই এক-এক গৃহকর্ত্তার এক-একটা খাটিয়া পাতা থাকে। ভোরে উঠে যে-যার দোরগোড়ায় মুখ ধোয়, বউ-ঝিরা বাসনগুলো ঝকঝকে করে মেজে নেয়, তার পর কলসী নিয়ে চলে সরকারী কলতলায় জল আনতে। সেখানে মাঝে-মাঝে নারীদের মধ্যে কে আগে জল ভরবে এই নিয়ে একচোট ঝগড়া হয়ে যায়। দুপুরে দেখতে পাওয়া যায়, মেয়েরা-বউরা বসে থাকে দোরগোড়ায়, নানা রকম মুখরোচক আলাপ করে, কখনও বা তুচ্ছ কথা নিয়ে লেগে যায় কোন্দল। সন্ধ্যায় বিশেষতঃ গরমের দিনে বাইরে বসে বউরা একটানা সুরে ভজন গাইতে সুরু করে।

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রায়ই শাশুড়ী ও ভাবী পুত্রবধূর আসা-যাওয়া লক্ষ্য করতাম। গোলাবীর মা'র সঙ্গে গোলাবীকে প্রায়ই দেখতে পেতাম বাসন মাজছে, জল ভরছে, আবার কলতলায় অন্য মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়াও করছে। বুড়ীর আদর পেয়ে গোলাবী বেশ একটু উদ্ধত প্রকৃতির হয়ে গিয়েছিল। বুড়ী আগে বুঝতে পারেনি, গোলাবী বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উদ্ধত স্বভাব ও চাল-চলন কথা-বার্ত্তায় প্রকাশ পাচ্ছে, আর তাতেই বুড়ীর রাগ বেড়ে যাচ্ছে। গোলাবী যায় সব তাতেই সর্দ্দারী করতে, বুড়ীকে শাশুড়ী হিসেবে মান্য-মানতা করতে চায় না, মুস্কিল বাধল ওখানেই।

অনেক দিন হল গোলাবীর মা আসেনি। একদিন এল বড় বিরস বদনে। বললে, বাঈ, আমি আমার ভঁইসের জন্যে তোমার উঠোনের ঘাস কেটে নিয়ে যাচ্ছি। আমি বললুম, আচ্ছা নিয়ে যা,

রোজই ঘাস চাই ত এসে নিয়ে-যাস। গোলাবীর মা বললে, কি আর আসব মা, আমার কাজে মন বসে না, আমার অদৃষ্টই মন্দ। আমি বললাম, আবার তোর কি হল? গোলাবীর মা বললে, দেখ বাঈ, মেয়েটাকে গু-মূত কেচে ছোট থেকে কত যত্ন করে মানুষ করলাম, কত কাজ শেখালাম, তা মেয়েটা যত বয়স বাড়ছে না বদমায়েস হয়ে যাচ্ছে, কথা শোনে না, রোজ কত মারছি তা বেসরমীর কোন গ্রাহ্য নেই, আরও চোপা করে।

একদিন গোলাবীর মা গোলাবীকে সঙ্গে নিয়ে এল বাগান থেকে ঘাস কাটতে। দেখলুম, গোলাবীর চুলগুলো উস্কুখুস্কু, চোখ ফুলো-ফুলো। আমি বললুম, কি হয়েছে রে গোলাবী, তোর এর কম চেহারা কেন? গোলাবী কোন উত্তর না দিয়ে ঘাস কাটতে লাগল। গোলাবীর মা বললে, আর বলো না বাঈ, আজ ওকে খুব মেরেছি,—বলে গোলাবীর হাত টেনে দেখাল—ওই দেখ কাঠ দিয়ে মেরেছি, হাতের সবগুলি কাচের চুড়ি ভেঙ্গে গেছে। লোকসান কার হল বল, আমারই ত, আবার আমাকে চুড়ি কিনতে গাঁটের পয়সা খরচ করতে হবে কিনা? গোলাবী হাত মোচড় দিয়ে টেনে নিয়ে বলল, আমি চাইনে কিছু। আমাকে নীচু-গলার গোলাবীর মা বললে, আমি একে ছোট থেকে যত্ন করে মানুষ করেছি, নয় ত তাড়িয়ে দিতুম। আমার কথাবার্তা একেবারে শোনে না। আমি যদি বলি এটা করিসনে, তা ও সেটা করবেই। ওই যে আমাদের বস্তির এক কোণার ঘরটা, সেখানে কালী দাই নামে সেই বুড়ীটা থাকে, যে বুড়ীটার একটা জোয়ান ছেলে আছে। সেই ছেলেটা আবার বাহানা ধরেছে সুন্দরী নইলে বিয়ে করবে না। আমার গোলাবীর উপর বড় লোভ, আমি বললাম, সে কি রকম? গোলাবীর মা উত্তেজিত হয়ে হাত-মুখ নেড়ে বলতে লাগল, "দেখ বাঈ, দু'বছর থেকে গু-মূত কেচে মেয়েটাকে মানুষ করেছি, কালী বুড়ীর হয়েছে এখন আমার বাড়া-ভাতে ঠোকর মারা। কেমন সুর করে বলে, ও গোলাবীর মা, তোর গোলাবীকে দিয়ে দে, আমার ফুলচাঁদের সঙ্গে বিয়ে দি, তোর ছেলে এখনও ছেলেমানুষ, ওর সঙ্গে মানাবে না। রাগ ধরে কিনা, ওই বুড়ীই ত আরো ঝগড়া লাগাবার শনি, ছুতোনাতা করে মেয়েটাকে উস্কে দেয়।

আমি অবাক হয়ে গোলাবীর মা, আর তাদের স্তরের জীবনযাত্রা শুনছিলাম।

গোলাবীর মা কাজের ফাঁকে ফাঁকে ফুরসৎ পেলেই আমাদের বাড়ীর আশে-পাশের ঘাস কেটে নিয়ে যেত তার মোষের জন্য আর মাঝে-মাঝে তার নানা সুখ-দুঃখের কাহিনী বলে। সেদিন আমি জিজ্ঞেস করলুম, আচ্ছা গোলাবীর মা, তোর ছেলের কখন বিয়ে দিবি? সে উত্তর দিলে, মা, আমাদের জাতের বিয়ে ত সোজা নয়! জ্ঞাতি-ভাইদের ভোজ দেওয়া হচ্ছে সব চেয়ে বড় কাজ, ভাল ভোজ না দিলে আমাকে সমাজ থেকে নামিয়ে দেবে, তখন আবার ভোজ দিয়ে, দু'-দশ টাকা দণ্ড দিয়ে সমাজে উঠতে হবে। আমি গরীব মানুষ, মায়ে-পোয়ে মিলে পয়সা রোজগার করছি আর জমাচ্ছি। এই ত বিয়ের মাস এসে পড়ল বলে, তুলসী ঠাকুরুণের বিয়ে হলেই আমাদের জাতে বিয়ের ধুম লেগে যায়। আমি বললুম, তুলসী ঠাকরুণের বিয়ে কি করে হয়?

সে বললে, দেখ, বাঈসাহেব, কার্ত্তিক মাস হল এই ব্রতের সময়, আমাদের দেশে সব মেয়ে-বউরা কার্ত্তিক মাসে একবেলা খাবে তা সে রাতেই হোক বা দিনেই হোক। হয় ভাত, নয় রুটি। শুধু একটা তরকারী দিয়ে খাবে, তারপর রোজ রাত চারটে-পাঁচটার সময় উঠে সবাই তলাও থাকলে তলাও, নদী থাকলে নদীতে স্নান করে। যাদের নদী-তলাও থাকে না তারা কলতলায় স্নান করে নেয়। স্নান সেরে সবাই মিলে ভজন গান করি। এ ভাবে পুরো এক মাস ভজন-উপোস করার পর যে কার্ত্তিক পূর্ণিমা আসবে, সেদিন হবে তুলসী দেবীর বিয়ে। পূজারী ব্রাহ্মণ আসে, বিষ্ণু ঠাকুরের সঙ্গে তুলসী দেবীর বিয়ে দেয়, কথকতা করে, আমরাও যে যেমন পারি শাড়ী কাপড় বাসন এ সব পূজারীকে দেই, আমাদের ব্রত সমাপ্ত হয়, আমরা তখন ছেলে-মেয়েদের বিয়ের উদ্‌যোগ করি। কালী দাই বলছে, এই অগ্রহায়ণেই নাকি তার ছেলে ফুলচাঁদের বিয়ে দেবে, পাত্রী খুঁজছে। আমার ত পয়সা জমানোও হল না, ছেলের বিয়েও যে এই অগ্রহায়ণে দিতে পারব মনে হয় না। বুড়ীর বলীরেখাঙ্কিত মুখে একটা হতাশার ভাব ফুটে উঠল।

৪

গোলাবী এখন রোজ ভোরে খুরপী হাতে চীনেবাদাম তুলতে যাচ্ছে, রোজ এক গাঁটরী চীনেবাদাম আর একটা করে টাকা নিয়ে আসছে। বুড়ী খুব খুশী। বুড়ী বলে, এ টাকাটা খরচ করব না, এ দিয়ে গোলাবীর বিয়ের জন্য গলার হাঁসুলী, আর হাতের মোটা বালা গড়িয়ে দেব।

সেদিন গোলাবীর মা'র শরীরটা ছিল খারাপ, তাই রোববারের বাজারে গোলাবী চলল বাজার করতে, আর ওই বাজারই হল কাল। গোলাবী খুশীমনে মাথায় টুকরী নিয়ে বাজারে চলল। সে এক চৌকী জোয়ার কিনলে, এক সের অড়হর ডাল কিনলে, আর কিনলে লাল টক্‌টকে লঙ্কা, এক সের ছোট ছোট বেগুন আর পেঁয়াজ। তারপর ঘুরতে ঘুরতে এল কাপড়ের দোকানের সামনে। রং-বেরঙ্গী ফুলতোলা চমকানো শাড়ীগুলো দেখে গোলাবী আর লোভ সামলাতে পারল না, নিজের রোজগারের কয়েকটা টাকা লুকিয়ে সঙ্গে নিয়েছিল, তাই দিয়ে কিনলে খুব সুন্দর ফুলতোলা নকল রেশমী শাড়ী আর ব্লাউসপিস। দোকানী কাগজ দিয়ে শাড়ী-ব্লাউস সযত্নে মুড়ে দিল। গোলাবী হাসিমুখে মন্থর গতিতে বাড়ী ফিরে চলল জোয়ারের টুকরী মাথায় চাপিয়ে। মা'র ভয়ে, বুক দুরু-দুরু আবার খানিক আনন্দও নতুন শাড়ী পরবার লোভে। গোলাবীর মা খাটিয়াতে বসেছিল, দুদিন ধরে জ্বরে ভুগছে, শুধু চায়ের পানি খেয়ে আছে, তাই মেজাজটাও তিরিক্ষে হয়ে আছে। গোলাবীকে দেখেই চেঁচিয়ে বললে, এত দেরী করলি কেন, দেখি কি এনেছিস? গোলাবী ধীরে ধীরে টুকরী নামিয়ে বাজার দেখালে। জোয়ার দেখে, আর দাম-দর শুনে গোলাবীর মা খুশীই হল, না, গোলাবী ভালই বাজার করতে জানে। খানিক পর গোলাবীর হাতে কাগজের একটা বাণ্ডিল দেখে বললে, এটা কি? গোলাবী ভয়ে ভয়ে কাগজ ছিঁড়ে শাড়ী আর ব্লাউস পিসটা বের করলে। গোলাবীর মা বললে, এটা কি, কি জন্যে এনেছিস? গোলাবী বললে, আমার শাড়ী। দুরন্ত বিস্ময়ে গোলাবীর মা অবাক হয়ে বললে, শাড়ী? কই তুই ত আমাকে বলিসনি শাড়ী কিনবি?

কত দাম হয়েছে? দুটো মিলে বারো টাকা। বারো টাকা! বলে গোলাবীর মা চেঁচিয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, হতভাগী, পেটে নেই দানা, বারো টাকার রেশমী শাড়ী! রেশমী শাড়ীটা তার গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, বল্, টাকা কোথায় পেয়েছিস? গোলাবী তার অত সাধের শাড়ী ধূলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে দেখে স্তব্ধ হয়ে রইল। গোলাবীর মা তার হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললে, বল্ শীগ্‌গির টাকা কোথায় পেলি? গোলাবী বলে, কেন তোমার পেটরা থেকে। হারামজাদী, চোর, তুই এখন চুরি করতে শিখেছিস? গোলমাল শুনে আশে-পাশের কুঠরী থেকে লোকগুলো জড়ো হতে লাগল, একটা মুখরোচক বিষম ঝগড়ার সূত্রপাত হচ্ছে দেখে তারা বেশ একটু খুশী হয়েই রণাঙ্গনে এসে দাঁড়াল।

গোলাবী এবার বেঁকে দাঁড়াল। তার ফর্সা ঘর্মাক্ত মুখটা লাল হয়ে উঠল। সে বললে, আমাকে চোর বলে গালি দিও না। আমার রোজগারের টাকা আমি নিয়েছি, আমাকে তুমি চোর বলবার কে? গোলাবীর মা আর নিজেকে সামলাতে পারলে না। কাছেই একটা পোড়া কাঠ পড়েছিল, ওটা তুলে নিয়ে গোলাবীর মাথায় দিলে এক ঘা!—হারামজাদী, গু-মূত কেচে মানুষ করেছিলাম তোকে মুখে-মুখে চোপা করবার জন্যে, আর চুরি করবার জন্যে? সঙ্গে সঙ্গে গোলাবী আর্ত্তনাদ করে দু'হাতে মাথা টিপে বসে পড়ল। বুড়ীর উত্তেজিত হাতের আঘাতটা কচি মাথায় বেশ জোরেই লেগেছিল, বাঁ দিকের কপালের কোণটা কেটে দর-দর করে রক্ত পড়তে লাগল, আর গোলাবী তার যত দূর শক্তি আছে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল। ধূলোয় লোটানো রেশমী শাড়ীটার লাল টকটকে ফুলগুলো গোলাবীর দিকে চেয়ে যেন হাসতে লাগল। উত্তেজিত জনতার হৈ-চৈ সুরু হয়ে গেল। কেউ বলে, হাসপাতালে নিয়ে যাও। কেউ বলে, "গোলাবীর মা এ কি করলি, কচি বাচ্চাটাকে এমন করে মারলি, রক্তগঙ্গা বইয়ে দিলি?" দু'-চারটে কর্কশস্বভাবা বুড়ী গোলাবীর মা'র পক্ষ সমর্থন করে বললে, "মারবে না ত কি করবে? ঘরের বউ, আজ বাদে কাল বিয়ে হবে। এখনই শাশুড়ীর কথা অগ্রাহ্যি, বাক্স থেকে টাকা ভাঙ্গবে! ও মা, এ কেমন ভাল বউ হবে, মান্যি-মানতা নেই! ওকে শাশুড়ী সায়েস্তা করবে না ত কে করবে?"

গোলাবী মাটীতে লুটিয়ে অবিশ্রান্ত চীৎকার করে নিমাড়ী ভাষায় বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল,—"ও মাগো তুই কোথায় গেলি গো, এরা আমায় মেরে ফেললে, আমি আর এখানে থাকব না গো ও ও ও।..."

হৈ-চৈ শুনে কালী দাইও এল, সে গোলাবীকে তুলে তার রক্ত মুছে দিয়ে জল দিয়ে ধুইয়ে কপালে পটি বেঁধে সরস্বতীকে বললে,—ও আবাগী, এ রকম করেই পরের মেয়েকে মারতে হয়? গোলাবীর মা তেড়ে উঠে বললে,—শয়তানী তুই আমাকে গালি দেবার কে? গোলাবীকে কে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করলে, তুই না আমি? এখন এসেছিস সাহুকারী করতে? দেখতে দেখতে দু'দলে ভীষণ ঝগড়া-চেঁচামেচি সুরু হয়ে সারা মহল্লা তোলপাড় হতে লাগল। বুদ্ধি করে দু'জন বুড়ো গোলাবীকে টাঙ্গায় বসিয়ে নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেল। আঘাতটা বেশ গুরুতরই হয়েছিল। ঘণ্টা দুই পর মহল্লা শান্ত হল। এ সব মহল্লাতে মাঝে-মাঝে এমনতর ঝগড়া প্রায়ই হয়, এ নতুন নয়। গোলাবী মাথায় পটি বেঁধে ফিরে বসে বিছানায় শুয়ে রইল। উঠল না, খেল না, কারো সঙ্গে কথা বলল না।

৫

এই মারামারির ব্যাপারের পর গোলাবীর মা আর আমাদের বাড়ীতে আসে না। বোধ হয় লজ্জাটা এত গুরুতর, তার মুখ দেখাতে সাহস হয় না। ভাবী শাশুড়ী আর পুত্রবধূতে কথাবার্ত্তা বন্ধ। দু'-চার দিন সরস্বতী কাজে বেরুলো না।

কয়েক দিন পর একদিন সরস্বতী কাজে গেল। গোলাবী এই সুযোগে বাড়ী থেকে পালালো, সঙ্গে তার সেই সাধের লাল শাড়ীটা নিতে ভুললো না। অনির্দ্দিষ্ট ভাবে চলছে, কোথায় যাবে তাও সে জানে না, তিন কূলে তার কেউ নেই, বড় হয়ে অবধি গোলাবী বুড়ীকেই মা বলে জানে। সেই বুড়ী সামান্য কারণে তাকে নিষ্ঠুরের মত মারলে! দুঃখে-অভিমানে আবার তার দু'চোখ দিয়ে দর-দর করে জল পড়তে লাগল, এক হাতে কাপড়ের পুঁটলী ধরে আর এক হাতে চোখের জল মুছতে মুছতে গোলাবী বাজারের দিকে রাস্তা ধরলে। হঠাৎ তাকে পেছন থেকে কে যেন 'গোলাবী গোলাবী' করে ডাকছে। পেছন ফিরে দেখে ছোট্ট একটা বঙ্গীল গাড়ী থেকে তাদের পড়শী জানকীর মা তাকে ডাকছে। গোলাবী কাছে ছুটে গেল। বুড়ী গাড়ী থামিয়ে জিজ্ঞেস করলে,—গোলাবী, কোথায় যাচ্ছিস? গোলাবী রাগ করে বললে,—যমের বাড়ী। আমার কে আছে কোথায় যাব? বুড়ী বললে,—দু'চার দিন পর পূর্ণিমা, আমরা ওঙ্কার মান্ধাতায় যাচ্ছি, তুই যাবি? গোলাবী যেন অকূলে কূল পেল, এক লাফে গাড়ীতে উঠে বসল। প্রৌঢ় ছেদীলাল নিজেই গাড়ী চালাচ্ছিল, ভেতরে তার মা আর স্ত্রী, আর ছোট দুটি ছেলে। সেদিন গাড়ী চলে সন্ধ্যের সময় মোরটক্কা গাঁয়ে থামলো। ছেদীলাল একটা বড় গাছ-তলায় গাড়ী থামালো। বঙ্গীল দুটো খুলে দিলে। কূয়োর কাছে নিয়ে বঙ্গীল দুটোকে খুব জল খাওয়ালে, তার পর ও দুটোকে একটা বড় গাছে বেঁধে রেখে নিজে গাছতলায় শতরঞ্চি বিছিয়ে সারা দিনের পথশ্রান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিলে। ছেদীলালের স্ত্রী আর মা গাছতলায় দুটো পাথর বসিয়ে খড়-কুটো দিয়ে আগুন ধরাল রাতের রান্নার জন্য। গোলাবীও খুশী মনে তাদের সঙ্গে কাজে যোগ দিলে। গোলাবীর অভিমানী মনটি খুশী হয়ে উঠল এই নতুন ধরণের অভিযানে। সারা রাত বিশ্রামের পর ভোরে আবার ছেদীলাল গাড়ী চালাতে সুরু করলে, বিকেল পর্য্যন্ত ওরা গিয়ে পৌঁছলে ওঙ্কার মান্ধাতায়। ওঙ্কারেশ্বরের মন্দির আর নদী দেখে গোলাবী আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠল, তার মনের যত দুঃখ-গ্লানি সব ভুলে ছোট ছেলে দুটোর হাত ধরে নদীর তীরে নাচানাচি করতে লাগল। গোলাবী বুড়ী কাকীও ভাবীর সঙ্গে থাকে, নদীতে স্নান করে, মন্দিরে মহাদেবকে পূজো দেয় আর বলে,—ঠাকুর আমি আর বুড়ীর কাছে যাব না।

৬

এদিকে গোলাবীর মা সন্ধ্যেয় বাড়ী ফিরে দেখে, তার ঘর-দোর খোলা, গোলাবীর কোন পাত্তা নেই। শূন্য ঘর, অবিন্যস্ত কাপড়-চোপড়, রাত্রির এঁটো বাসন সব এধার-ওধার পড়ে আছে। শূন্য ঘরটা যেন খাঁ-খাঁ করছে। সরস্বতীর বুকটা কেঁপে উঠল! চার দিন পর সে গোলাবীর নাম ধরে ডেকে উঠল,—গোলাবী! গোলাবী! তার প্রতিধ্বনি শূন্য ঘরে আছড়ে পড়তে লাগল—'গোলাবী! গোলাবী!'

পাড়া-পড়শী কেউ বলতে পারল না গোলাবী কোথায়। দু'-তিন দিন ধরে গোলাবীর মা এধার-ওধার প্রাণপণে খুঁজতে লাগল

গোলাবীকে,' কিন্তু কোথায় গোলাবী ? বুড়ী দমে গেল, তার বুকটা ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ করে উঠতে লাগল। শূন্য ঘরে বসে থাকলেই বুড়ীর চোখে ভেসে ওঠে গোলাবী। বুড়ীর মনটা হু-হু করে, আর দু'চোখ বেয়ে জল ঝরতে থাকে। না হয় সে রাগের মাথায় একটু বেশীই মেরেছে, তাতে কি হল ? আর সে যে মা-বাপ মরা এতটুকুন মেয়েটাকে খেয়ে-না-খেয়ে কত কষ্টে মানুষ করলে সেটা কিছু নয় ? নিজের পেটের মেয়ে হলে কি আর ছেড়ে চলে যেত ?

৭

ছ'সাত দিন কেটে গেল মান্ধাতায় ছেদীলাল আর তার পরিবারের। এই কয় দিন সবাই খুব আনন্দ পেলে নর্ম্মদা নদীতে স্নান করে, মহাদেবের পুজো দিয়ে, নর্ম্মদা-তীরের সস্তা ফল-পশারী খেয়ে। এবার দেশে ফিরবার পালা, ছেদীলালের মা পোঁটলা-পুঁটলী বাঁধা-ছাঁদা করে ফিরবার উদ্যোগ করতে লাগল। গোলাবী কেঁদে বললে,—কাকী, আমার কি গতি হবে ? আমি আবার ফিরে গেলে বুড়ী আর আমায় আস্ত রাখবে না, আমি যাব না। বুড়ী কাকী অনেক বোঝালে, কিন্তু গোলাবী অবুঝ, সে কিছুতে ফিরবে না। বুড়ী পরের মেয়েকে নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না, এমনি সময় অকূলে কূল পেলে হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে ফুলচাঁদ আর তার মা বুড়ী কালী দাইয়ের দেখা পেয়ে। কালী দাই ত গোলাবীকে দেখে অবাক্! বললে—ও গোলাবী, তুই এখানে! আর ওদিকে তোর মা খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। গোলাবী মুখ তুলে চাইতেই ফুলচাঁদের চোখে চোখ মিলে গেল, সে নিঃশব্দে মুখ ফিরিয়ে নিল। ছেদীলালের মা সখী কালী দাইকে সঙ্গে করে ধর্ম্মশালায় নিজের ঘরে নিয়ে এল। নানা কথাবার্ত্তা বলতে বলতে সে বললে—গোলাবীকে নিয়ে আমি কি করি বল ? পরের মেয়ে গলায় বেঁধে আমি ডুবব ?

কালী দাই দু'-চার মিনিট চুপ করে রইল, তার পরে হঠাৎ খুশীতে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে সখীর গলা ধরে কানে কানে কি বললে। ছেদীলালের মা গোলাবীকে নদী থেকে এক ঘড়া জল আনতে পাঠিয়ে দিল। ইত্যবসরে দুই বুড়ীতে বসে অনেক সলা-পরামর্শ হয়ে গেল। পরদিন দুজনে মান্ধাতার বাজারে গিয়ে কয়েকটা নারকেল, কয়েক জোড়া সবুজ কাচের চুড়ি, সিঁদুর আর টুকটাক জিনিষপত্র কিনে নিয়ে এল। তার পর সব জিনিষ মন্দিরের পুজারী ব্রাহ্মণের কাছে রেখে এল।

পরের দিন বিকেলে ছেদীলালের মা গোলাবীকে বললে—চ, নদীতে চান করে আসি। গোলাবীকে নিয়ে স্নান করে এসে বুড়ী গোলাবীর চুল সুন্দর করে বেঁধে দিল, তার পর বললে,—তোর সেই সুন্দর শাড়ীখানা বের করে পর। গোলাবী অবাক হয়ে বললে,—এখন সন্ধ্যের সময় শাড়ী পরে কি হবে কাকী ? বুড়ী কাকী বললে,—চল, মন্দিরে পুজো দিয়ে আসি। গোলাবী সুন্দর করে লাল শাড়ীখানা ঘুরিয়ে পড়ল, ছেদীলালের বউর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে চোখে কাজল লাগাল, তার পর কপালে কুমকুমের ছোট টিপ পড়ল। সদ্যস্নাত কিশোরীর মুখখানা প্রসাধনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বুড়ী মুখখানা তুলে বললে,—এমন মেয়েটাকে কিনা বুড়ী সরস্বতী খুঁৎ করে দিচ্ছিল। গোলাবী লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিল।

ছেদীলালের মা গোলাবীকে নিয়ে মহাদেবের মন্দির-সংলগ্ন পুজারীর বাড়ী চলল। যাবার আগে দু'জনে মহাদেবের পুজো দিয়ে নিল। পুজারীর বাড়ীতে পৌঁছেই গোলাবী শুনতে পেল সানাই বাজছে, আর দেখতে পেল ছোট উঠানে বিয়ের সব আয়োজন। ফুলচাঁদ বরবেশে টোপর পরে বসে আছে। গোলাবী আসতেই ফুলচাঁদের মা গোলাবীকে নিয়ে ফুলচাঁদের পাশে বসিয়ে দিয়ে মাথায় টোপর পরিয়ে দিল, আর হাতে পরাল গাঢ় সবুজ রংএর কাচের চুড়ি। গোলাবী হতভম্ব, ভারি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। কিছু বলতে পারল না। ব্রাহ্মণ মন্ত্র বলে দু'জনের হাত এক করে দিল। সস্মিত ফুলচাঁদ বিস্ময়বিমূঢ়া গোলাবীর চোখে চোখ মিলাল, শুভদৃষ্টি হল, ফুলচাঁদ বউয়ের গলায় কাল মঙ্গলসূত্র বেঁধে দিয়ে তার অধিকার কায়েমী করে নিলে। সানাই বাজতে লাগল পোঁ-পোঁ।

পরের দিন ফুলচাঁদের মা ছেদীলাল আর তার মাকে পাঠিয়ে দিলে গাঁয়ে, বউ-বরণের ব্যবস্থা আর জ্ঞাতি-ভোজের আয়োজন করতে। ছেদীলালের মা আর ছেদীলাল ফিরে এল গাঁয়ে, এসেই তারা ফুলচাঁদের বাড়ীর সামনে মণ্ডপ বাঁধতে লাগল আর মহল্লার সবাইকে নিমন্ত্রণ করল পরের দিন সন্ধ্যেয় এসে ফুলচাঁদের বৌ দেখতে। বুড়ী রাষ্ট্র করলে—ওঙ্কার নাইতে গিয়ে মহাদেবের কৃপায় ফুলচাঁদের খুব সুন্দরী বউ জুটেছে। মা ছেলের বিয়ে দিয়ে কাল বেটা-বৌ নিয়ে ফিরবে।

একটা ভোজ হবে, মহল্লার সবাই খুব খুশী। ফুলচাঁদের কেমন বউ জুটেছে তারই আলোচনায় সবাই ব্যস্ত। বউ-ঝিরা বেলা পড়তে না পড়তেই ফুলচাঁদের ঘরে এসে জমা হল। সবাই নতুন সুন্দর শাড়ী-কাপড় পরে সেজে-গুঁজে এসেছে, নতুন বউ আসবার অপেক্ষায় বসে আছে। সব মেয়েলোকরা ঘরে গোল হয়ে বসেছে, মাঝখানে দু'জন বুড়ী ছোট ঢোলক নিয়ে ডুম ডুমা ডুম, ডুম ডুমা ডুম করে বাজাচ্ছে আর অন্য মেয়েরা হাততালি দিয়ে তাল রেখে রেখে গান গাইছে, আর চেয়ে দেখছে বর-বউ আসছে কিনা। একটি অল্পবয়সী বউ তার বিয়ের জমকালো ঘাঘরা পরে ঢোলের তালে-তালে নাচছে, নানা রকম হাসির গান চলছে, মেয়ে-মজলিশ খুব জমে উঠেছে। গোলাবীর মা-ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে এসে এই মজলিশে বসেছে আর বিরস মুখে ভাবছে, হায় সেই, হতভাগী যদি না পালাত তবে ত আমিও এমনি করে ছেলের বিয়ে দিয়ে আসছে বছর উৎসব করতাম। আমারই মন্দ অদৃষ্ট। কোথায় কালী দাই ছেলের বউ পাচ্ছিল না, ওঙ্কারে গিয়ে সুন্দর মেয়ে জুটিয়ে ছেলের বিয়ে দিয়ে আনছে।

এমনি সময় হঠাৎ ব্যাণ্ডের আওয়াজ কানে আসতেই সব বউ-ঝি-বুড়ী গান-বাজনা ফেলে হৈ-চৈ করে উঠে পড়ল বউ দেখতে। ফুলচাঁদ আর বউ আসছে ঘোড়ায় চড়ে। বর-বধূ দু'জনের মুখ মুকুটের শোলার ফুল দিয়ে ঢাকা। ছেদীলাল বর-বউকে ঘোড়া থেকে নামাল। কালী দাই তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গাঁটছড়া-বাঁধা ছেলে-বউকে দোরগোড়ায় দাঁড় করালে। এক ঘটি জল নিয়ে বর-বধূর চার দিকে জল ছিটালে। বর-বধূর পায়ে সবটা জল ঢেলে দিলে, আরতির থালা থেকে সিঁদুর-মাখা চাল তুলে বর-বধূর উপর ছিটিয়ে দিলে। তার পর ছেলে-বউকে নিয়ে ঘরে বসালে। সব মেয়েরা বউকে উপহার দিয়ে মুখ দেখবার জন্য উঠে দাঁড়াল। ছেদীলালের মা বুড়ী কাকী একখানা থালাতে একটা শাড়ী আর নারকেল নিয়ে এসে বউর সামনে দাঁড়াল। বউর হাতে শাড়ী আর নারকেল দিয়ে টোপরের ফুলের মালা সরিয়ে বউর মুখখানা তুলে ধরল। সবাই চমকে চেয়ে দেখে সিঁদুর পরে বিয়ের সজ্জে হাসিমুখে—গোলাবী। গোলাবীর মা গোলাবীর সুন্দর হাসি-হাসি মুখখানার দিকে চেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। গোলাবীর পরনের শাড়ীর লাল ফুলগুলো যেন সরস্বতীর দিকে চেয়ে হাসতে লাগল।

পনের বছরের কমবয়সী ছেলেমেয়েদেরই সব চেয়ে বেশী ম্যালেরিয়া হয়

জাতির পক্ষে ম্যালেরিয়া যে কী নিদারুণ বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা এই মর্মান্তিক তথ্য থেকেই বোঝা যায়।

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের যে বয়সটি ঠিক তাদের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য ও মনোবৃত্তি গড়ে তোলবার সময় ঠিক তখনই তাদের দেহ ও মন ভেঙ্গে দেয় এই ম্যালেরিয়া।

ম্যালেরিয়া থেকে শিশুদের বাঁচাবার চেষ্টা না করা মানে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক পরিবার, এমন কি সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎকে চরম ঔদাসীন্যে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া। এ শুধু অবহেলা নয়, ভয়ানক অপরাধ।

এই জন্যই বিশেষভাবে বলছি, 'প্যালুড্রিন'এর সাহায্যে ম্যালেরিয়ার হাত থেকে শিশুদের বাঁচান, আর নিজেও বাঁচুন। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে — এমন কি আসন্ন প্রসবারাও নির্ভয়ে নিয়মিতভাবে 'প্যালুড্রিন' খেতে পারে — কোন অনিষ্টের ভয় নেই। সেবনবিধি নীচে দেওয়া হল।

অ্যানোফেলিস মশার কামড়ে ম্যালেরিয়ার জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে। বসা দেখেই এই মশাকে চিনতে পারবেন — হুলের ডগায় ভর ক'রে টেরছা হয়ে গায়ে বসে। এর হাত থেকে বাঁচতে হলে বাড়ীর

আশেপাশে যাতে খানাডোবা না থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখুন কারণ এই সব যায়গাতেই মশা জন্মায়। ঘুমুবার সময়ে মশারি খাটিয়ে শুতে ভুলবেন না। আর মশা মারবার জন্য সারা বাড়ীতে কীট-নাশক 'গ্যামেক্সেন' ছড়িয়ে দিন।

ম্যালেরিয়ার লক্ষণ কি ?

প্রথমে শীত করে ও কাঁপুনি আসে, তারপরে জ্বর আসে ও শেষে ঘাম দেখা দেয় — সারা গায়ে ব্যথা হয়। এ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। তিনিই আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন ম্যালেরিয়া হলে দু'চার দিনের মধ্যেই 'প্যালুড্রিন' কি ক'রে তা দূর করে এবং শুধু তাই নয়, তার ভবিষ্যৎ আক্রমণের হাত থেকেও রক্ষা করে।

আসল 'প্যালুড্রিন' স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে স্বচ্ছ কাগজের বন্ধ মোড়কে পাওয়া যায় — একটি বড়ির দাম মাত্র এক আনা।

'প্যালুড্রিন'

ম্যালেরিয়ার যম

সেবন বিধি

জ্বর অবস্থায় : পূর্ণ বয়স্কদের ও ১২ বছরের ওপর ছেলেমেয়েদের ১টি বড়ি, ৬ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত আধ বড়ি, ৬ বছরের নীচে সিকি বড়ি — যে পর্যন্ত না জ্বর বন্ধ হয় প্রত্যহ এই মাত্রায় খেতে হবে।

জ্বর প্রতিরোধের জন্য : উল্লিখিত মাত্রায় প্রতি সপ্তাহে একবার একটি নির্দিষ্ট দিনে খেতে হবে।

মনে রাখবেন, 'প্যালুড্রিন' খেতে হয় আহারের পর এবং 'প্যালুড্রিন' খাওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে জল (বা দুধ) খেতে হয়।

ICI

ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ

ICP 77

অশ্রুজল

শ্রীমতী কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়

মিলি সৌখীন মেয়ে, আধুনিকা সে, তার উপর আছে পিতৃবংশের খ্যাতি, চেহারায় আছে বৈশিষ্ট্য। কাজেই তরুণ মহলে সে এনেছিলো চাঞ্চল্য,—তার সাজ-পোষাক ছিল সৌখীন, বাক্যবিন্যাস মার্জিত, ব্যবহার মধুর।

সোসাইটির আকর্ষণীয়া এই মেয়েটি হাল্কা প্রজাপতির মত ঘুরে বেড়াতো চারি ধারে। গানের আসর থেকে চায়ের পার্টিতে ছিল তার অবারিত গতি। এই মিলিকে জানে না কে? মিলির কৃপা-কটাক্ষ পেলে তরুণেরা ধন্য হোত, মৃদু হাসিতে সে নিতো তাদের হৃদয় জয় করে।

এই মিলির জীবনে বৈচিত্র্য এনে দিলে বসন্তের একটি মধুর সন্ধ্যা। দক্ষিণের বাতাসে মিলিরও বিয়ের ফুল ফুটলো। যদিও সে ফুলের বর্ণচ্ছটা সাধারণ জীবনযাত্রার পথে বেমানান হয়, তবুও ফুল ফুটলো।

কোথায় মিলিয়ে গেল মিলির কল্পনার সৌধ! তার মত মেয়ের বিয়ে সাধারণ মেয়েদের মত গতানুগতিক প্রথায় হয়ে গেল। দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটলো না। এতে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবেরা হয়ত আশ্চর্য্য হয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই—ধনীর পুত্র সন্দীপের অর্থ আকর্ষণই মিলিকে কাছে টানলে। তার স্তাবকদের পরাজিত করে মিলিকে সে জয় করে নিলে।

আমি সাধারণ অধ্যাপক, মিলিকে পাবার কল্পনাও আমার নিশীথের স্বপ্নের মতই অলীক তা জানতাম। তন্দ্রার ঘোরে আজও ভেসে আসে সেই মুখ মধ্যে মধ্যে। তার পর অস্পষ্ট কুয়াশা-জালে সব ঢেকে যায়। আমার দৃষ্টি আর মিলিকে খুঁজে পায় না। আজও কেন চোখে জল আসে? না—না! এত দুর্বল মন হলে চলবে না! যাক্ গে সে সব কথা।

ধনীর দুলাল সন্দীপ এসে নিয়ে গেল মিলিকে। তার প্রকাণ্ড ক্যাডিল্যাক্ গাড়ী সামনে এসে গেলে—আমাকেই ছেড়ে দিতে হোল পথ।

মিলি সুরূপা কি রূপহীনা তা ভাববার প্রয়োজন নেই,—সত্যই সে অপরূপা! কিন্তু তার বন্ধুরা এখন বলে মিলি সাধারণ—খুব সাধারণ মেয়ে। সে যাই হোক, যখন দেখলাম তাকে বিবাহ-বাসরে —লাল শাড়ী জড়ানো মূর্ত্তি—চেয়ে রইলাম নির্নিমেষে। মিলি,—মিলি তার উজ্জ্বল চোখ দুটো তুলে আমার পানে চেয়ে মৃদু হেসেছিল, তাঁর মুখের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও সরলতা দেখে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন।

যখন মিলিকে বেষ্টন করে শোনা যেতো মধুপের গুঞ্জরণ তার কৃপাদৃষ্টি লাভের আশায়, আমিও তাদের মধ্যে এক জন ছিলাম। আমার দাম কতটুকু তা জানি। বিদ্যাদান করতে হয় প্রয়োজনের তাগাদায়, জীবন চলেছে একঘেয়ে ছন্দে, রুটিনের মধ্যে দিয়ে বেষ্টন করে আছে আমার জীবন—ভরে আছে নিঃসঙ্গ হৃদয়ে গভীর ক্লান্তি।

মিলি, ধনীর কন্যা, বালিগঞ্জের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় সে বাস করে। তার বাবা ষ্টিভেডর, বেশীর ভাগ সময়ই বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় তাঁকে।

মিলির মা মধ্যযুগের মেয়ে, এ যুগের অত্যধিক প্রগতি তাঁর পছন্দ নয়। তবে একমাত্র মেয়ে মিলিকে বিশেষ কিছু বলেন না। সে ইচ্ছামতই চলে। অবশ্য বিবাহের ব্যাপারে মা'র মন্তব্য সুদৃঢ় তা মিলি বেশ জানে। মিলিরও আভিজাত্য-গর্ব্ব যথেষ্ট আছে, তাই সে সাধারণ এই অধ্যাপককে স্থান দিতে পারেনি তার জীবনে। আমি ভুল করেছিলাম, প্রথম দর্শনেই মিলির সাথে আমার মনের বন্ধন অচ্ছেদ্য বলেই ভেবেছিলাম উপন্যাস-বর্ণিত নায়ক-নায়িকার মতই। আমি ভেবেছিলাম, আমার জীবনের সুখ-শান্তি নির্ভর করছে মিলির হাতেই। সে যাই হোক, কিন্তু মিলি! সে যা চেয়েছিলো—প্রতিষ্ঠা, সম্পদ, সম্মান, সবই সে পেয়েছে। তার কি এখন মনে আছে এই সামান্য অধ্যাপকের কথা?

মিলি বেশ আছে ধনী-গৃহের স্বাচ্ছন্দ্য বিলাসের আরামে। তাই হোক, মিলি সুখেই থাকুক। সে খুঁজে পেয়েছে তার জীবনের স্বপ্নকে। ধনীর গৃহিণী হয়ে সে আপনাকে ধন্য মনে করেছে। আর—আমার জীবনে কি পেলাম? শুধু স্মৃতি। সেই স্মৃতিই থাকুক অক্ষয় হয়ে। বেষ্টন করে থাকুক আমার জীবন।

মিলি দূরে চলে গেলেও আমার কাছে সে হারায়নি। সে আছে আমার সবটুকু অন্তর জুড়ে, বাইরে তাকে নাই বা পেলাম।

বিষাদমাখা একঘেয়ে জীবন এমনই কেটে যাবে। কিছুই পাব না তা জানি। কিন্তু কি পেতে চাই আমি? তাও তো বুঝি না? কোথায় যেন ব্যথা লাগে—সত্য। তবুও জানি, মিলির জীবন গতানুগতিক রুক্ষ বন্ধনের চাপে বিনষ্ট হয়ে যায়নি। তাই থেকে সে রক্ষা পেয়েছে। পেয়েছে সুখ, আমার হয়েছে পরাজয়—তাতে ভয় কি? দেখা যাক, এ জীবনের শেষ কোথায়।

* * * *

পাঁচটা বছর কেটে গেল কোথা দিয়ে। সেই দীর্ঘ দিনের সকল ঘটনা জানাতে হোলে সময় অনেক নষ্ট হবে। কাজেই আমি সংক্ষেপেই বলি। জীবনযাত্রার বিচ্ছিন্ন সূত্র কোথা থেকে আবার জোড়া দেবো তাই ভাবছি।

সাধারণ মানুষ আমি, আমার জীবনযাত্রা বৈচিত্র্যহীন,—কি আর বলবো! পয়সা-কড়ির খুব সচ্ছলতা না থাকলেও চলে যাচ্ছিল কোনও রকমে। সারা দিনটা কাটিয়ে দিতাম কাজের মধ্য দিয়ে, কিন্তু রাত্রি? কোন রকমে কাটিয়ে দিতে পারলেই ত সব কষ্ট লাঘব হতে পারতো, কিন্তু তা হয় না। সেই নিস্তব্ধ নিশীথেই আমার সব যেতো কেমন হয়ে। কোথা থেকে এলোমেলো চিন্তা এসে জুটতো। জীবনে বঞ্চিত হয়েছে যারা তারাই সঙ্কোচের বর্ম্মে নিজেকে ঢেকে রাখতে চায়। কিন্তু এইটুকু অক্ষত রাখতে গিয়েই জীবনের সুখ-শান্তি বিনষ্ট হয়ে যায়।

কত বিনিদ্র রাত্রি কেটেছে, আমার জীবনের প্রতিটি ঘটনা সামনে দিয়ে ভেসে চলে গেছে সেই নিস্তব্ধ নিশীথে। সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, আবেগ, উদ্বেগ সব-কিছুরই স্পর্শ মিলেছে এই শুভক্ষণে। ভেবেছিলাম, জীবনের বাকি কয়টা দিন এ ভাবেই কাটিয়ে দেবো।

মা এসে মধ্যে মধ্যে আমার বিয়ের জন্য তাগাদা দিতেন। আত্মীয়-স্বজনেরা ত আমার বিয়ের আশা পরিত্যাগই করেছিলেন। বোধ করি তাঁরা ভেবেছিলেন বিয়ের দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা আমার নেই।

আমার সঙ্কল্প ছিল অন্য রূপ। আজীবন বিয়ে-থা না করে দেশের কাজেই জীবন উৎসর্গ করবো,—এই ছিল আমার ভবিষ্যতের কল্পনা। কিন্তু আমার মত প্রতিভাহীন লোক শুধু কল্পনা করেই থাকে।

কঠিন বাস্তবের তাড়না যখন প্রবল হয়ে পড়ে দেহ-মন পিষ্ট হয়ে যায়, কোথায় চলে যায় জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য। প্রবল অসুখের মধ্য দিয়ে প্রমাণ পেলাম জ্ঞানের চর্চ্চা ও মহান্ সঙ্কল্প নিয়ে থাকলে আর চলবে না। দুর্ব্বল শরীরে এসে জোটে নানা দুশ্চিন্তা, ডাক্তারের পরামর্শে কিছু দিনের জন্য বেরিয়ে পড়লাম ঘর ছেড়ে।

আমার সঙ্গী ছিল বন্ধু রবীন। সে কলকাতার কলেজে পড়ে, শেয়ালদায় একটা মেসে থাকে। মানুষ বেশ আমুদে। নানা রকমের গল্প-গুজব করে সময় কাটিয়ে দেয়। তার বই পড়ার খুব সখ। রবীন হাসি-গল্পের মধ্যে দিয়ে আমার মনকে হাল্কা করতে চায় তা বেশ বুঝতাম।

আমাদের জীবনে বেজেছিল সংঘাতের সুর সংসারের কঠিন চলার পথে। জীবনের বাস্তব রূপকে দেখতে পেলাম বেদনার মধ্য দিয়ে। আনন্দের মধ্যেও নয়, জ্ঞানের মধ্যেও নয়। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে কিছু দিন বেশ ভালই লেগেছিলো,—মনটা অনেক হাল্কা বোধ করলাম। তবে মধ্যে মধ্যে এই নির্জ্জন অবকাশ মনটাকে কেমন এলোমেলো করে দিত।

এ ভাবে আর কত দিন কাটবে! নানা চিন্তায় শরীর-মন ভেঙ্গে পড়েছিলো। ভাবলাম এবার ত সময় এলো কলকাতায় যাবার, কিন্তু ফিরে গিয়ে করবো কি? সেই দশটা থেকে পাঁচটা কাজ করেও ত আমার অর্থের সঙ্কুলান হয় না। আমার অসুখে অনেক টাকা ব্যয় হয়ে গেছে, কাজেই আয়ের সংখ্যা বাড়ানো দরকার।

দুই বন্ধুতে পরামর্শ চললো। প্রত্যেক দিন চায়ের পর্ব্ব শেষ করেই খবরের কাগজ নিয়ে বসতাম। বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করে যেতাম প্রত্যেক দিন। বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা দেখে একটা চিঠিও লিখে দিলাম। মাইনে যদিও খুব বেশী নয়, একটি ছোট ছেলেকে পড়াতে হবে।

কলকাতায় ফিরে এসে রোজ চিঠির অপেক্ষায় থাকতাম। এক দিন সত্যই চিঠি এলো। দেখলাম আমার সেই চিঠির উত্তর। দেখা করবার সময় দেওয়া ছিল পাঁচটায়, কিন্তু বেরিয়ে পড়লাম নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই। বাইরের পানে তাকিয়ে দেখলাম আকাশটা ম্লান, তাই মনে হচ্ছিল বুঝি অনেক দেরি হয়ে গেল। হাতঘড়িটা দেখে নিলাম। না,—সময় এখন অনেক বাকি। আমার সময়-জ্ঞান নেই—তা তারা ভাববে না। পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে একবার দেখে নিলাম ঠিকানাটা। এগিয়ে চললাম নির্দ্দিষ্ট পথে।

* * * *

বাড়ীটা খুঁজে নিতে বেশী সময় লাগল না। প্রকাণ্ড লোহার গেট পার হয়ে প্রবেশ করলাম মেহেদির বেড়া-দেওয়া লাল সুরকির পথ ধরে। বারান্দার দু'ধারে ফুটে আছে অজস্র গন্ধরাজ আর চাঁপা ফুল, তারি মিষ্টি গন্ধে চারি দিক সুরভিত হয়ে আছে। শিকলে বাঁধা প্রকাণ্ড গ্রেট ডেন চক্ষু মুদিত করে বিশ্রামসুখ উপভোগ করছিল, আমার পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে উঠে চাঁড়িয়ে তার সুমিষ্ট স্বরে জানালো সম্বর্দ্ধনা। তারই শব্দে ঘর থেকে পরিচারক বেরিয়ে এলো।

আমার এখানে আসবার কারণটা তাকে জানালাম। সে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল বারান্দার এক প্রান্তে একটি অপরিসর ঘরে। বোধ করি এই ঘরখানি সদর ও অন্দরের সংযোগ-স্থল। ঘরটি ছোট হলেও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মেঝেতে সুদৃশ্য কার্পেট মোড়া, মধ্যিখানে পালিশের টেবিল, খান কয়েক চেয়ার ও এক কোণাতে একটি রাইটিং টেবিল। পাশে একটি সোফা, ফুলদানিতে সাজানো আছে এক-গোছা সদ্য ফোটা গন্ধরাজ, চারি দিকে সৌখিন পর্দ্দা আঁটা। একখানা চেয়ার অধিকার করে বসলাম।

বেয়ারা গেল ভেতরে খবর দিতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধ দরজাটা গেল খুলে—বুকটা কেঁপে উঠলো, ঘরে এসে ঢুকলো—মিলি। চমকে উঠলাম তাকে দেখে। হঠাৎ এ ভাবে দেখবো মিলিকে তা কল্পনা করিনি। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিলাম, কিন্তু সেই চঞ্চলা হরিণীর মত মেয়েটিকে আজকার মিলির মধ্যে খুঁজে পেলাম না। যাই হোক, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম—একটি কথাও বলতে পারলাম না। কি কথা আজ বলবো তাই ঠিক করতে পারছিলাম না। মিলিও ভাবেনি এই ভাবে আমাকে দেখবে এখানে। সে নিজের অজ্ঞাতসারেই বলে উঠলো—ওঃ, আপনি! কেন এলেন এখানে?

তার সেই নিবিড় কালো চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। নির্ব্বাক্ চেয়ে রইলাম পরস্পরের পানে। মিলি কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলো কোন কথা না বলে। মাটির পানে তাকিয়ে ছিলাম আমি, সঙ্কোচ হচ্ছিল কথা বলতে, শেষে বললাম—ক্ষমা কর আমাকে মিলি, আমি জানতাম না এটা তোমার বাড়ী, এখুনি চলে যাচ্ছি।

এগিয়ে গেলাম দরজার কাছে।

সঙ্কুচিত ভাবে মিলি বললে—আমার রঞ্জুর ভার আপনার। এ আমার অনুরোধ, এ শুধু আপনিই পারবেন।

আমার যেন কেমন সব গুলিয়ে যেতে লাগলো। মিলি তার ছেলেটিকে বললে—রঞ্জু, প্রণাম কর মাষ্টার মশাইকে। উনি তোমাকে কত সুন্দর সব গল্প শোনাবেন, তোমায় সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে যাবেন। তুমি এগিয়ে যাও, ওঁকে ধরে রাখ রঞ্জু, যেতে দিও না।

ছেলেটি এগিয়ে এলো। ভারি সুন্দর শিশুটি, তার বড় বড় চোখ দুটো মেলে ধরলো আমার মুখের পানে নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো।

বললাম—ক্ষমা কর মিলি আমাকে। তোমার কথা রাখতে পারলাম না। তোমার কৃপা এই সামান্য অধ্যাপককে বারে বারেই আঘাত করবে, সে হয় না। মিলি, ভেবে দেখলাম এ হতেই পারে না। আর বেশী কিছু বলবার ক্ষমতা আমার নেই। তোমার সুখের সংসারে আমার স্থান কোথায়? তোমার বুদ্ধি তোমার রুচি আমার অনেক উপরে। মিনতি করছি মিলি, এখানে আমাকে ডেকো না। তোমার জীবনের সহজ সূত্রটিতে জট পাকিয়ে গেলে আরও জড়িয়ে পড়বে, সে গ্রন্থি খুলতে পারবে না। আমার জীবনে যা পেয়েছি তাই যথেষ্ট, এতেই চলে যাবে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত। এর বেশী আশা আমার নেই। কিন্তু তুমি নিজে ভুল কোর না। আমি তোমাকে বেশী জানি। তোমার মত মানুষ সংসার করবার জন্য নয় মিলি, রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্যই তুমি ফিরেছিলে। ধনী জমিদারের গৃহিণী, বিরাট ঐশ্বর্য্যের গদিতে বসে নিশ্চিন্ত মনে সে তৃষ্ণা মেটাচ্ছো। যা তুমি খুঁজেছিলে তাই পেয়েছো। আজ তুমি সুখী। তাই দেখে আমি পেলাম আনন্দ। এখন যাবার অনুমতি দাও।

বুঝলাম, সঙ্কুচিতা মিলি কিছু বলতে চায় আমাকে কিন্তু লজ্জায় বাধে। তার মুখের পানে তাকালাম, কোথায় যেন বেদনা বোধ করলাম। মুখে নেই সে জৌলুস, চোখে নেই সে মদিরতা, সেই লাস্যময়ী মিলির এ কি আমূল পরিবর্ত্তন ! দেখে যেন আশ্চর্য্য বোধ করলাম।

শেষে ভাবলাম,, জমিদার-গৃহিণীর বুঝি এই কায়দা হবে। চওড়া-পাড় শাড়ী, সোনার গহনার ঝলমলানি, ঢুআনি মার্কা সিঁদূরের টিপ, কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য, এ সকল বুঝি ওদেরই নিজস্ব রূপ। এই চাকচিক্যের অন্তরালে আসল মানুষটি গেছে হারিয়ে। এ ভাবে ত আমি দেখতে চাইনি মিলিকে ? পাঁচ বছর আগের সেই নিরুপমা মূর্তিটি আজও আমার অন্তর জুড়ে আছে।

বললাম মিলিকে—তুমি যেমন আছো তেমনই থাকো। আমার প্রতি তোমার করুণা থাকে—তাই থাকুক। তুমি আমার দায়িত্ব নিও-না।

সে কোনও কথা বললে না। ধীরে ধীরে শিশুটিকে টেনে নিলে তার বুকের মাঝে। পরম নিশ্চিন্তে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে চেয়ে রইল শিশুটি আমারই পানে। এ যেন আর একটি অপূর্ব্ব রূপ দেখলাম মিলির,—চেয়ে রইলাম কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে, তার পর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম খোলা দরজার পানে।

হঠাৎ শুনতে পেলাম বিকৃত কণ্ঠের চিৎকার। চমকে উঠলাম—ব্যাপার কি ?

মিলির পানে তাকালাম। মিলি স্তব্ধ হয়ে গেছে। কোন কথা ছিল না তার মুখে ; গোলমালে খোকার মনেও ভয় হোল, সে কেঁদে উঠলো মা'র মুখের পানে তাকিয়ে। বুঝলাম, অদূরে বৈঠকখানা ঘর থেকেই ভেসে আসছে সেই বিকৃত কণ্ঠস্বর।

সেই কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলাম—ব্যাপার কি ? কিসের এত গণ্ডগোল ? মাঝপথে দেখা হোল এক জন বেয়ারার সঙ্গে। তার কাছ থেকেই শুনলাম ব্যাপারটা কিছুই নয়, তার বাবু, অর্থাৎ মিলির স্বামীর সন্ধ্যার মজলিস সুরু হয়েছে বন্ধু-বান্ধবের সহযোগে। এ তার সামান্য নমুনা, এমন ত রোজই হয়ে থাকে।

ঘৃণায় অন্তর ভরে উঠলো, অন্ধকার বারান্দায় কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম নিস্ফল আক্রোশে। ছিঃ ছিঃ, এই কাণ্ডজ্ঞানহীন মত্তপ স্বামী মিলির ! বুঝলাম মিলির জীবন সুখের নয়।

শূন্যমনে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। প্রকাণ্ড বাড়ীটার সব ঘরে তখনও আলো জ্বলেনি। সেই অন্ধকারে প্রত্যেক ঘরগুলো যেন তীব্র বেদনায় কেঁদে উঠছে। এ সকল ঐশ্বর্য্য আমার কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ ও অর্থহীন বলে মনে হোল। চোখের সামনে ভেসে উঠলো মিলির স্তব্ধ মুখ। ফিরে গেলাম ঘরের মধ্যে।

ছু'হাতে মুখ ঢেকে মিলি কাঁদছে। কাছে এসে দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ। বুঝলাম ওর মন পীড়িত, তাই ব্যথার বোঝা নিয়ে সে বসে আছে একা।

ডাকলাম—মিলি !

সে আমার পানে চাইলে অশ্রুভেজা চোখে। বললাম—অতীতের অন্ধকার পথ খুঁজে কি হবে আর, ভবিষ্যতের পানে দৃষ্টি দিতে হবে। এই ক্ষুদ্র শিশুটি তোমার জীবনের আঁধার পথ আলো করবে মিলি ! তোমার রঞ্জুর শিক্ষার ভার আমি নিলাম। মানুষকে মানুষ করে তোলাই আমার আদর্শ। পারিবারিক ঐতিহ্য বা দীনতার মধ্য দিয়েই ত মানুষের পরিচয় নয়। এই মিথ্যা অহঙ্কার ছেড়ে দিয়ে সহজ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পথে চলতে অভ্যস্ত হতে হবে ওকে।

মিলি চাইলে আমার পানে। তার কাল চোখ ছুটিতে সজল স্নিগ্ধতা ঘনিয়ে এলো সেই মেঘাচ্ছন্ন নীরব সন্ধ্যায়। ছু'ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়েছিল, কিন্তু তার মুখে ফুটে উঠেছিল পরম পরিতৃপ্তি।

সেই দিন খুঁজে পেলাম আমার জীবনের হারানো পথ। চির-জীবনের সব-হারানোর শূন্যতা পূর্ণ হোল এক ফোঁটা চোখের জলে।

ইজ্জৎ

রমাপতি বসু

সহর যেখানে শেষ হ'য়েছে ঠিক তারই পরে একটি মাঠ। যুদ্ধের সময় এখানে ভারতীয় সৈনিকদের জন্য একটি অস্থায়ী শিবির তৈরী হ'য়েছিল। যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেছে। পরিত্যক্ত শিবিরে এত দিন কোনো মানুষের সন্ধান মেলেনি। বুনো গাছ শিবিরের চারি দিকে গজিয়ে উঠেছে। হঠাৎ দেখি, সেদিন সকাল বেলা কয়েক জন দিন-মজুর কোদাল আর ঝুড়ি নিয়ে পরিষ্কার করতে সুরু করে দিয়েছে। দেখতে দেখতে পরিষ্কার হ'য়ে গেল। পরের দিন সকালে সেখানে অনেক লোক এসে গেছে। বেশ একটা কোলাহল শোনা যায়। এত দিন যেখানে কোনো মানুষ ছিল না, হঠাৎ মানুষের কণ্ঠস্বরে মুখরিত হ'য়ে উঠলো সহরতলীর এই পরিত্যক্ত শিবিরটি।

যারা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে—তাদের দেখে বেশ বোঝা যায় এরা উদ্বাস্তু। কয়েকটি ছোট ছোট পরিবার এক-একটি করে কামরা জুড়ে পেতে ফেলেছে এদের সংসার। সংসারের কোনো পরিপাটি নেই। টিনের কৌটো, মাটির থালা হাঁড়ি, কুঁজো—গোলাপ ফুল আঁকা টিনের সুটকেশ এদের নতুন সংসারের সরঞ্জাম।

এই মানুষগুলো যেন কি রকম ! কচিকাচা, বুড়ো, পঙ্গু—জোয়ান মেয়ে-পুরুষ দেখা যায়। বহু দিনের পথক্লেশ এদের চেহারায় এনে দিয়েছে বিবর্ণ, নিস্তেজ চাহনি। এদের ইতিহাস বিরাট। দারিদ্র্য ও অসহায় জীবনকে সম্বল করে এরা চলে এসেছে কোলকাতায়। শুধু বাঁচার জন্য। শুধু ইজ্জৎ নিয়ে বেঁচে থাকার লোভে।

কিন্তু পরিহাস—এদের বাঁচার কোনো উপায় নেই। তবু এরা বাঁচার জন্য মৃত্যুর সঙ্গে যুঝে চলেছে। জীবনের যা-কিছু সম্বল এরা সব ফেলে চলে এসেছে। যারা এদের এই ছিন্নমূল জীবনের জন্য প্রত্যক্ষ দায়ী—তারা সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে নৈতিক দায়িত্ব থেকে নিজেদের কোনো 'ক্রমে এড়িয়ে, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির নেশায় বুঁদ হ'য়ে আছে।

এরা মানুষ—তাই বাঁচার জন্য এদের এই ব্যাকুলতা। শুধু পেটের জন্য ভাত আর মাথা গুঁজে থাকার জন্য একটু আশ্রয় ভিক্ষে করে চলেছে। ভাগ্যের কি পরিহাস—সে জন্য এরা ভোগ করছে লাঞ্ছনা আর ভাগ্যবান মানুষের কাছ থেকে ব্যঙ্গ! এরা হয়তো আসতো না এদের জন্মভিটে ছেড়ে অপরের করুণায় বাঁচার জন্য, কিন্তু গ্রামের যারা বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার, যারা বিত্তশালী, ধনী—তারা সকলেই পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলে এসেছে হিন্দুস্থানে।

এত দিন এরা থেকেছে এই আশায় যে, হয়তো বা ইজ্জৎ নিয়ে জন্মভিটের মাটি আঁকড়ে বেঁচে থাকা যাবে, কিন্তু যখন তা সম্ভব নয় বলে জেনেছে—তখনই দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। এদের অপরাধ এরা পাকিস্থানের হিন্দু।

এদের মধ্যে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কৃষক-সম্প্রদায়ই বেশী। নানা রকমের, নানা মতবাদে বিশ্বাসী লোক এই শিবিরটিতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কোলাহল ও কলহ লেগেই আছে। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি এরা সহ্য করতে পারে না। সবেতেই এরা ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে।

—'কান্না—কান্না আর কান্না! চুপ কর হারাণ।'—বলে নরহরি মাষ্টার তার আধপোড়া বিড়িটা ধরিয়ে টান দেয়।

হারাণ চুপ করে থাকে। কোনো জবাব দেয় না।

নরহরি মাষ্টারকে এই আশ্রয়-শিবিরের মানুষগুলো মান্য করে চলে। নরহরি এদের ফেলে-আসা গ্রামেরই কোনো এক স্কুলের মাষ্টার ছিল। তাই লেখাপড়া জানা লোক বলে হারাণ, দাশু খুড়ো, বিজয় মণ্ডল নরহরি মাষ্টারকে জিগেস না করে কোনো কাজই করে না।

জন্মভিটে ছেড়ে আসার সময় হারাণের বুকের মধ্যে কি রকম যেন মোচড় দিয়েছিল। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত তার চোখে জল দেখা যায়। হারাণের চোখের জল বুঝি শুকিয়ে গেছে, তাই তার কান্না শুনে ধমক দিয়ে ওঠে নরহরি মাষ্টার।

নরহরি বলে, দুঃখ কি হারাণ? আমি যত দিন আছি তত দিন তোমাদের আমি মরতে দেবো না।

হারাণ এবার মুখ খোলে। বলে, ভাবনা আমার ঐ সোমোত্ত মেয়ে দুটোর জন্য। ওদের যদি কোনো ব্যবস্থা করতে পারতাম তো সুখেই মরতাম।

নরহরি মাষ্টার বিড়িতে সুখটান মেরে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে: কমলা অমলার জন্য ভেবো না। আমি ওদের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

হারাণ নরহরি মাষ্টারের পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলে: মাষ্টার, তোমার আমি চিরদিন গোলাম হ'য়ে থাকবো।

নরহরি হারাণের হাত দুটো চেপে ধরে বলে: পাগল হ'য়ে গেলে নাকি?

হারাণের কান্না আর থামে না।

নরহরি মাষ্টার বলে: চলো হারাণ একটু ঘুরে আসি।

হারাণ জিজ্ঞেস করে: কোথায়?

—চলো না, কোলকাতা বিরাট সহর—বলে নরহরি।

হারাণ রাজি হয় বেরুতে। উঠে দাঁড়ায় বেরুবে বলে।

কমলা আর অমলা হারাণের মেয়ে। কমলাকে ডেকে হারাণ বলে, কোথাও যাস না। আমি এখুনি আসছি মাষ্টারের সঙ্গে একটু ঘুরে।

কমলা বলে: আচ্ছা।

নরহরি মাষ্টার আর হারাণ বেরিয়ে পড়ে সহরের দিকে। এত আলো ও ট্রাম-বাসের চলাচল দেখে হারাণ থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

নরহরি বহু বার কোলকাতায় এসেছে। তাই সহরের সব কিছুই তার জানা-শোনা। হারাণকে বলে: চলো হারাণ, ট্রামে করে যাই।

হারাণের আর আপত্তি কোথায়? মনটাকে ভালো করার জন্যই তো বেড়াতে বেরিয়েছে। দেশে চাষ করে খেত হারাণ। জন্মাবধি ক্ষেত-খামারই সে দেখে এসেছে। সহরের এই জমজমাট তার জানা নেই। হারাণ শুনেছে কালীঘাট তীর্থস্থান। তাই মুখ ফুটে বলে, মাষ্টার, কালীঘাট এখান থেকে কত দূর?

নরহরি বুঝতে পারে হারাণ কি বলতে চায়। সে বলে, বেশী দূর নয়।

—চলো না যাই। মাকে একটু দর্শন করে আসি।

—চলো, বলে নরহরি থেমে দাঁড়িয়ে যায়।

হারাণ বুঝতে পারে না জিগেস করে, থামলে কেন?

—দাঁড়াও, ট্রামে চড়ে যাবো।

হারাণ আর কোনো কথা বলে না। ট্রাম আসতে দু'জনে উঠে বসে। হারাণের ভালই লাগে। কিন্তু পিছনের গাড়ীটাতে চড়লো কেন নরহরি—তা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। জিগেস করে, আচ্ছা মাষ্টার, আগের গাড়ীতে উঠলে না কেন?

নরহরি একটু হাসে, তার পর বলে, ওটা ফার্ষ্ট ক্লাস। বেশী পয়সা ভাড়া।

—ও! হারাণ কারণটা বুঝতে পারে। কিন্তু তার কাছে যে পয়সা নেই। হঠাৎ তার মুখ শুকিয়ে যায়।

হারাণ বলে: আমার কাছে যে একটাও পয়সা নেই।

নরহরি একটু ধমকের সুরে বলে: তোমার কেন ভাবনা? আমি তোমায় নিয়ে যাবো।

কালীঘাট ট্রাম-ডিপোর কাছে এসে গাড়ী থামে। নরহরি ও হারাণ নেমে পড়ে।

মা কালীর মন্দিরে ভক্তের ভীড়। নতুন যাত্রী দেখে পাণ্ডারা ছেঁকে ধরে নরহরি ও হারাণকে। নরহরি নতুন লোক নয়, তাই পাণ্ডাদের ও ভিখিরিদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে মন্দিরের ভেতর গিয়ে ঢোকে। মানুষে মানুষে ঠেলাঠেলি। মায়ের কাছে ভক্তরা তাদের মনবাসনা ব্যক্ত করছে। মা স্থির, নিশ্চল। ভক্তদের পুষ্পার্ঘ্য শুধুই গ্রহণ করছেন।

হারাণের চোখে জল। নরহরি ভক্তিভরে মাকে প্রণাম জানায়। নরহরি লক্ষ্য করে, হারাণের গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে। সে কিছুই বলে না হারাণকে।

মন্দিরের বাইরে এসে হারাণ বলে: জীবন আমার সার্থক হলো মাষ্টার!

নরহরি কোনো জবাব দেয় না। হারাণও চুপ করে যায়। ট্রাম-রাস্তা পর্যন্ত কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলে না। ট্রামে উঠে হারাণ বলে: কোলকাতায় এত লোক মাষ্টার?

—হ্যাঁ—কেন? তাতে কি হ'য়েছে? নরহরি হারাণের উত্তরের জন্য চেয়ে থাকে তার দিকে।

হারাণ বলে: এরা কত সুখী মাষ্টার! আমাদের মত কাঙ্গাল নয়। আচ্ছা মাষ্টার, আমাদের তো আজ এক মাস ঘুম নেই? এরা কিন্তু বেশ রাত্রে ঘুমোয়—না?

নরহরি হারাণের কথার সুর বেশ ভাল করেই উপলব্ধি করে। তাই বলে; এরা কি উদ্বাস্তু?

—না—তা হবে কেন? তবু বলছি। হারাণ এমনি কথার পিঠে বলে যায়।

—তবে আর এদের কি ভাবনা বলো? তোমার ঘা হ'য়েছে, তুমি নিজে চিকিৎসা করাবে। তোমার জন্য অন্য লোকে কেন ভুগতে যাবে বলো?

—না, এমনি বললাম, বলে হারাণ পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে মাষ্টারের হাতে দেয়। নিজেও একটা বিড়ি নিয়ে ধরায়।

হারাণ ও নরহরি মাষ্টার যখন আশ্রয়-শিবিরে এসে পৌঁছোয় তখন রাত্রি প্রায় ন'টা হবে। চারি দিকে অন্ধকার। শিবিরের কুক্ষিতে দু'-একটি লণ্ঠন জ্বলছে।

হারাণ বলে: বড়ো দেরী হ'য়ে গেল মাষ্টার!

—না, দেরী আর কি? বলে নরহরি জোরে পা চালায়। হারাণ নিজে এগিয়ে যায় আগে। নরহরি আস্তে আস্তে চলে।

—এই যে নরহরি মাষ্টার, নমস্কার। অস্পষ্ট অন্ধকারে একটি লোক দাঁড়িয়ে যায়।

নরহরি চিনতে পেরেছে। প্রতি-নমস্কার করে বলে: শিবনাথ বাবু বুঝি? কি খবর?

—বড়ো বিপদে পড়েছি মাষ্টার!—বলে শিবনাথ অপেক্ষা করে।

নরহরি জিগ্যেস করে, কি বিপদ?

—এদিকে আসুন,— বলে শিবনাথ নরহরি মাষ্টারকে নিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়।

অন্ধকারে দু'জনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে। তার পর শিবনাথ প্রায় শ'খানেক টাকা নরহরির হাতে গুঁজে দিয়ে দেয়। বলে: কাল আমাকে আপনার উদ্ধার করতেই হবে।

নরহরি মাষ্টার রাজী হ'য়ে যায়। অন্ধকারে নোটগুলো গুণে নিয়ে ফতুয়ার পকেটে ঢুকিয়ে রাখে।

পরের দিন সকালে উঠতে শোনা যায়, নরহরি মাষ্টার বিজয় মণ্ডল, হারাণ, কার্তিক হাতী, পাঁচু বড়াকে ডেকে বলছে:—দেখ ভাই, আজ মনুমেণ্টের নীচে ময়দানে বিরাট জনসভা হবে। আমরা মিছিল করে যাবো। এই ভাবে আমরা আর কিছুতেই থাকবো না। সরকারী অব্যবস্থার প্রতিবাদ জানাবো। সুবিচার চাই। আমরা এই শিবিরে যত লোক আছি সব প্রতিবাদ-সভায় মিছিল করে যাবো।

পাঁচু এদের মধ্যে কম কথা বলে। সে বললে: মাষ্টার কচি কচি ছেলে-মেয়ে, বিন্দীর মত বুড়োরা কি অত দূর হেঁটে যেতে পারবে?

—পারবে, পারবে। যদি না পারে তো লরীতে করে যাবে। নরহরি মাষ্টার জোর-গলায় বলে ওঠে, আমরা তো মরেই আছি। ভয় আবার কিসে?

মিছিলে এই শিবিরের লোকেরা যোগ দেয় নরহরি মাষ্টারের নির্দেশে। এমনি করে দিনের পর দিন চলে।

আশা নেই, লক্ষ্য নেই—মানুষগুলো যেন পিঁজরাপোলের অথর্ব

পঙ্গু জানোয়ার। শিবিরের আশে-পাশে স্বার্থপর মানুষগুলো ঘোরা-ফেরা করে। চক্রান্ত করে বিপর্যস্ত প্রাণীগুলোকে আরো বিচ্ছিন্ন করার জন্য। নরহরি মাষ্টারের বেশ প্রতিপত্তি আছে এই শিবিরে। তাই যার যা-কিছু দরকার সব নরহরিকে জানায়।

এই উদ্বাস্তুরা হ'চ্ছে রাজনৈতিক খেলার সামগ্রী। যখন যে ভাবে ইচ্ছে সেই ভাবে এদের ব্যবহার করা হয় নরহরি মাষ্টারের সহায়তায়।

কার্তিক হাতীর বৌটা শুধছে। শিবিরের শেষ প্রান্তে তাকে রেখে দেওয়া হ'য়েছে। রোগটা ভীষণ। বাঁচানোর কোনো উপায়ই নেই। তবু নরহরি মাষ্টারের সহায়তায় দু'-এক জন কোলকাতার বড়ো ডাক্তার দেখে গেছে। রোগ যক্ষ্মা।

পূর্ণিমা বিজয় মণ্ডলের ছেলের বৌ। বিয়ে হ'য়েছে এই আশ্বিনে তিন বছর। আহা, বেচারীর স্বামী মারা গেছে বিয়ের এক মাস যেতে-না-যেতে। বিধবা পুত্রবধূ ছাড়া বিজয় মণ্ডলের জীবিত কোনো আত্মীয় নেই। সেদিন নরহরি মাষ্টারের সঙ্গে বেরিয়েছিল সহর দেখতে, তার পর আর তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে সহরে এসে যে নতুন নতুন হারিয়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

নরহরি মাষ্টার একা শিবিরে এসে বিজয় মণ্ডলকে বলে, কি গো মণ্ডল, পুর্ণিমে ফিরেছে নাকি?

বিজয় অবাক হ'য়ে বলে, সে কি মাষ্টার? তোমার সঙ্গে যে সে গিয়েছে!

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার সঙ্গেই গিয়েছিল। পথে কোথায় যে চলে গেল তার কোনো পাত্তা পেলাম না। তোমরা বাপু আমাকে পাগল করে ছাড়বে। নরহরির মুখে-চোখে বিরক্তির ভাব।

বিজয় মণ্ডল আর থাকতে পারে না। বলে, মাষ্টার তুমি খারাপ লোক। আমার পুর্ণিমেকে তো হারিয়ে দিলে, এ ছাড়া তোমাদের এইখান থেকে তেরটা সোমোত্ত মেয়ে নিখোঁজ হ'য়েছে। তুমি আমাদের মধ্যে লেখাপড়া জানা মাতব্বর। তোমার ভরসায় আমরা কোলকাতায় এসেছি। এখন তোমার চোখের সামনে দিয়ে এতগুলো সোমোত্ত মেয়ে নিখোঁজ হবে? না—না মাষ্টার, এ যেন কি সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে।

—চুপ কর বে-আদপ!—নরহরি মাষ্টার গর্জে ওঠে। খুব একটা অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করতে বিজয় চুপ করে যায়।

এই হলো সংঘর্ষের সূত্রপাত। বিজয় মোড়লের ছেলে। অবস্থার বিপাকে পড়ে না হয় আজ এই অবস্থা। উদ্বাস্ত-শিবিরে ছোট ছোট দল গড়ে ওঠে। তিন মাসের মধ্যে কত পরিবর্তন হয়ে যায়। খগেনের বৌটা ওলাউঠায় মারা গেছে। খগেন এক বছরের ছেলেটাকে নিয়ে পথে-পথে ঘুরে বেড়ায়, রাত্রি হ'লে ফিরে আসে শিবিরে। কার্তিক হাতীর গায়ে কি হ'য়েছে। হাম বা বসন্ত নয়। চর্মরোগ, তবে সংক্রামক। অসহ্য যন্ত্রণা হয় কার্তিকের।

কমলাকে নিয়ে নরহরি মাষ্টার প্রায়ই সন্ধ্যার পর বেরিয়ে যায় কোথায়। অমলাও যায়। হারাণ নরহরি মাষ্টারকে বিশ্বাস করে। নরহরি হারাণের উপকার না করলেও অপকার যে করবে না—তা হারাণ বিশ্বাস করে। মাঝে মাঝে নেশার জন্যে দু'একটা টাকা দেয় নরহরি হারাণকে। বিজয় মণ্ডল কিন্তু এ সব ভাল চোখে দেখে না। আড়ালে এক দিন হারাণকে ডেকে বলে দিয়েছে: হারাণ, কেউটে সাপ নিয়ে খেলা করছো।

হারাণ সে কথা বলে দেয় নরহরি মাষ্টারকে। বিজয়ের এই কথা বলার জন্য নরহরির সঙ্গে বেশ হাতাহাতি হবার যোগাড় হ'য়ে যায়। যদিও সেদিন হাতাহাতি হয়নি—তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিজয় ও নরহরির সঙ্গে ঝগড়াটা আরো দানা বেঁধে উঠেছিলো।

এই শিবিরে কোনো শৃঙ্খলা নেই। গণেশ কোলকাতায় এসে চুরি করেই দিন ভালো করে কাটায়। দিনের বেলা সে পাগলা সেজে ভিক্ষে করে কলকাতার পাড়ায় পাড়ায়। সন্ধ্যের সময় সে সুরু করে তার পুরোনো ব্যবসা।

গণেশকে লোকে ক্ষ্যাপা বলেই ডাকে। বলাই মণ্ডল নরহরিকে জব্দ করার জন্য গণেশের কাছে সাহায্য চায়। গণেশ এত সব যে ঘটে গেছে তা মোটেই জানতো না। সারা দিন-রাত্রি সে ফিকিরে ঘুরে বেড়াতো। গভীর রাত্রে এসে সে ঢুকে পড়তো শিবিরে। বিজয়ের কাছ থেকে জেনে গণেশ বলল: তুমি কিছু বোল না মোড়লের পো। ভগবান ওকে সাজা দেবে।

বিজয় বলে: তুই ক্ষ্যাপা তো ক্ষ্যাপাই। মানুষ যদি শাস্তি না দেয় তবে নরহরি মাষ্টার সিধে হবে না।

গণেশ বলে: তোমরা তো তাকে পীর করে দিয়েছো। এখন আমি কি করতে পারি?

বিজয় তবু বলে: গণেশ, তুই ছাড়া এর কেউ বিহিত করতে পারবে না।

গণেশ চুপ করে থাকে। কোনো উত্তর দেয় না বিজয় মণ্ডলের কথায়। কি যেন একটা ভেবে নিয়ে বলে: আচ্ছা দেখি, কি করা যায়!

কয়েক দিন হ'লো গণেশ রাত্রে আর সিঁদ কাটতে বেরোয় না। চুপচাপ পড়ে থাকে তার সতরঞ্চি পেতে। বাঁ দিকের পাঁজরায় তার কদিন হ'লো একটা ব্যথা ধরেছে। সতরঞ্চির ওপর পড়ে পড়ে কাতরায়।

কমলাকে দেখতে পেয়ে গণেশ বলে: কি রে কমলি, তুই তো আর চিনতে পারিস না।

কমলা গণেশকে দাদা বলেই ডাকে। একটু মুচকি হেসে বলে: তোমার কি আমাদের কথা মনে আছে? কোলকাতায় এসে তুমি একেবারে বদলে গেছ।

গণেশ বলে: পাঁজরার কাছে একটা ব্যথা ধরেছে। ক'দিন হ'লো উঠতেই পারছি না।

নরহরি মাষ্টারকে আসতে দেখে কমলা বলে: রাত্রে আসবো গণেশদা, এখন একটু কাজ আছে। গণেশের কোনো কথা বলার আগেই কমলা সরে পড়েছে।

কমলার এই ভাবে চলে যাওয়াটা গণেশের মনে কি রকম যেন একটা খটকা লাগে। ভাবে, কমলা তার সঙ্গে কথা বলতে আজ কেন এই ভয় পেল? নরহরি মাষ্টারকে ভয় করে চলার কি আছে!

সামনে একটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুড়ি খাচ্ছে। গণেশ তাকে ডেকে বলে: হারাণকে ডেকে আন্ তো। ছেলেটা হারাণকে ডাকতে যায়।

অনেকক্ষণ হ'য়ে গেছে হারাণ আর আসে না। গণেশ বেশ অস্থির হ'য়ে উঠে। কমলা চলে গেল—হারাণকে ডাকতেও হারাণ এলো না। ব্যাপার কি? এরা কি সহরে এসে বদলে গেল নাকি একেবারে? গণেশ নিজেই যাবে হারাণের কাছে। গণেশ পাঁজরাটা ডান হাতের তালু দিয়ে চেপে ধরে হারাণের ডেরার দিকে এগিয়ে যায়। হারাণের যেখানে আস্তানা সেখানে পৌঁছেই টাল সামলাতে না পেরে গণেশ ছিটকে পড়ে মাটিতে। কমলা বসেছিল—উঠে এসে ধরে গণেশকে।

গণেশের কোনো জ্ঞান নেই। অজ্ঞান, অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকে মাটিতে।

কমলা কি করবে ঠিক করতে পারে না। ধরাধরি করে শুইয়ে দেয় গণেশকে পাটির ওপর। মুখে জল ছিটিয়ে বাতাস করতে করতে জ্ঞান ফিরে আসে গণেশের। হারাণ ছিল না।

হারাণ এসে গণেশের এই রকম অবস্থা দেখে জিগ্যেস করে, কি হয়েছে কমলা?

কমলা বলে: জানি না। তোমাকে ডাকতে এসে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে যায়।

হারাণ বলে, সে কি! জ্ঞান হ'য়েছে?

—হ্যাঁ, এই একটু আগে জল খেয়েছে। খালি ফেলফেলিয়ে চেয়ে থাকে। একটা কথাও বলে না।

হারাণ ভাল করে একবার তাকায় গণেশের দিকে, তার পর বলে: অমলার বিষয় ও জানে?

ও কি করে জানবে? কমলা বলে।

হারাণ হি-হি করে হাসে। চার দিক তাকিয়ে বলে: আমি রাতে যাবো বাবুদের বাড়ী। অমলাকে বাবু বিয়ে করবে বলেছে। কাল সকালে পাঁচশো টাকা দেবে আমাকে। নরহরি মাষ্টার নেবে তিনশো। আমি দেবো না নরহরিকে। আমার মেয়ে অমলা। আমি কেন টাকা দেবো মাষ্টারকে। অমলার যা চেহারা—তাতে অনেকেই ওকে বিয়ে করতে চাইবে।

কমলা বলে, ও যে কাঁদছিল বাবা!

—চুপ কর। বলে হারাণ, বাবুরা লোক ভালো। মেয়ের ন্যাকাপনা আছে।

কমলা হারাণের মুখের ওপর কোনো কথাই বলে না।

নরহরির চক্রান্তে পড়ে হারাণের মতিভ্রম হ'য়েছে। তাই নিজের মেয়েটাকে টাকার লোভে কাদের কাছে দিয়ে এলো।

কমলা ভাবে—এর চেয়ে উপোস করে মরে যাওয়া ঢের ভালো। কমলা আর থাকতে পারে না। হারাণকে ডেকে বলে: অমলাকে তুমি ফিরিয়ে নিয়ে এসো।

—না, আর তা হয় না। হারাণ পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হ'য়ে উত্তর দিল।

কমলা বলে: তুমি তাকে এখুনি ফিরিয়ে আনো। না হ'লে আমি লোক ডেকে জড়ো করবো।

হারাণ চটে যায়। খুব চটে গিয়ে বলে, তোকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলবো। তোর যে খুব আস্পর্ধা বেড়ে গেছে?

কমলা হাজার হোক নারী। নারীত্বের হৃদয়বৃত্তি তার আছে বলেই সে আজ প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু অর্থের জন্য হারাণ যে এমনি একটা অমানুষ হ'য়ে উঠবে, এ কথা কে-ই বা বিশ্বাস করবে? হারাণের মমতা বোধ একেবারে লোপ পেয়ে গেছে।

কমলা বলে, এখুনি যদি না তুমি তাকে ফিরিয়ে আনো, আমি তোমাদের সব কথা ফাঁস করে দেবো। যদি নিজে বাঁচতে চাও তো অমলাকে ফিরিয়ে আনো।

হারাণ রাগে গর-গর করে। কমলার গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে একেবারে রাস্তায়।

কমলা অবাক হ'য়ে যায় হারাণের ব্যবহারে। চুপ করে বসে থাকে গণেশের পাশে। কি যেন সে ভেবে যায়। কোনো কিছুরই সে থেই খুঁজে পায় না।

বহু দূর থেকে রাত্রি দশটা বাজার ঘণ্টা শোনা যায়। নরহরি ব্যস্ত হ'য়ে এসে চটের দরজায় টোকা মারে আর ডাকে, কমলা··· কমলা।

কমলা খুব ধীরে ধীরে উঠে এগিয়ে যায় দরজার কাছে।

নরহরি কি যে ফিস্-ফিস্ করে বলে তা কিছুই বুঝতে পারা যায় না।

শুধু কমলা দৃঢ়স্বরে বলে, না। হবে না।

নরহরি অনুনয় করে বলে, শুধু আজকের মত আমার কথা রাখ। আর কোনো দিন আমি বলবো না।

কমলা তবু বলে, না। আমার শরীর খারাপ, আমি যাবো না।

নরহরি বলে, তোর পায়ে পড়ি কমলা। শুধু আজকের মত আমার কথা রাখ। তুই শুধু গাড়ী করে একটু ঘুরে আসবি। আমি তোর এখানে চৌকী দেবো। কোনো ভয় নেই। এক ঘণ্টার মধ্যেই তোকে ওঁরা পৌঁছে দেবেন। মস্ত ধনী। কথার খেলাপ হ'লে আমাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে।

—কিন্তু এক সর্তে।

নরহরি মাষ্টার জিগ্যেস করে, কি?

—অমলাকে আর বাবাকে তুমি এখুনি ফিরিয়ে আনবে?

নরহরি বলে, আনবো। তুই আমার ইজ্জতটা বাঁচা।

অন্ধকারে মিটমিটে কুপির আলোতে দেখা যায়—কমলা দড়ি থেকে তার সিল্কের কাপড়টা পরে বেরিয়ে যায় নরহরির সঙ্গে।

হারাণ, কমলা ও নরহরির সব কথাই শুনেছে গণেশ। শুধু মটকা মেরে শুয়েছিল। কমলা নরহরির সঙ্গে চলে যেতে গণেশের মনটা ভারী হ'য়ে উঠলো। কিছুতেই সে ভেবে উঠতে পারে না—হারাণ ও নরহরি আসলে কি? গণেশ ভাবে হারাণ তো এ রকম মানুষ নয়! তবে কেন সে আজ নিজের সন্তানকে অর্থের জন্য ধনীর শয্যাসঙ্গিনী হ'তে বাধ্য করলো? দারিদ্র্য আজ হারাণকে অমানুষ করে তুলেছে। এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী নরহরি মাষ্টার।

গণেশের পাঁজরার ব্যাথাটা যেন একটু বেড়েছে। গণেশ ছটফট করে পাটির ওপর শুয়ে। দূরে কোথা থেকে একটা বুক-ফাটা কান্নার শব্দ শোনা গেল। গণেশ কান পেতে শোনে। নিশ্চয় খগেনের বৌ কাঁদছে। খগেন বোধ হয় মারা গেছে। আহা, বেচারী খগেনের বৌ-এর আর পৃথিবীতে কেউই রইলো না!

নরহরি মাষ্টার শিবিরে ফিরে এলো। কার সঙ্গে দাঁড়িয়ে সে খগেনের বিষয় কথা বলছিল। অনেক দিন ধরেই খগেন গ্রহণী রোগে ভুগছে। হ্যাঁ, সত্যি আজ সে মরেছে।

নরহরি মাষ্টারের কথাবার্তায় গণেশের আর কোনো সন্দেহই রইলো না। ও কান্না যে খগনের বৌ-এর সে-বিষয়ে সে এখন সুনিশ্চিত।

নরহরি চুপি-চুপি এসে ঢুকে পড়ে হারাণের ডেরায়। অন্ধকার রাত্রি, কেউ কোথাও নেই। একটা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ে নরহরি। তার পর আস্তে আস্তে কাপড়ের খুঁট থেকে এক গোছা নোট বার করে সে কুপির আলোতে দেখে দেখে গুণে রাখে।

নরহরি গণেশকে এখানে শুয়ে থাকতে দেখে অবাক হ'য়ে যায়। সন্দেহ হয় নরহরির। গণেশ একটা সিঁদেল চোর। তাকে এখানে ঢোকালো কে? নরহরি কুপির আলোটা নিয়ে গণেশের মুখটা ভাল করে দেখে নেয়। তার পর ডাকে: এই গণেশ, গণেশ!

গণেশ কোনো উত্তর দেয় না। নরহরি গণেশকে ধাক্কা দিয়ে ডাকে।

গণেশ এতক্ষণ ঘুমোনোর ভাণ করেছিল। আচমকা যেন ঘুম ভেঙ্গে গেছে—এমনি একটা ভাব দেখিয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। নরহরি জিগ্যেস করে, তুই এখানে শুয়ে কেন রে?

গণেশ বলে: আমি কোথায়?

—তুমি কোথায় জানো না? হারাণের ডেরায়। নরহরির গলায় বেশ একটু ঝাঁজ আছে।

গণেশ বলে: আমি হারাণকে ডাকতে এসেছিলাম। তার পর কি করে যেন মাথাটা ঘুরে গেল। আর কিছু মনে নেই।

নরহরি বলে: ন্যাকরা করতে হবে না। নিজের ডেরায় চলে যাও।

গণেশ জিগেস করে, হারাণ, কমলা সব কোথায়?

—কি করে জানবো কোথায় গেল? তাদের কি আমি জমীন্দার নাকি?

গণেশ নরহরির স্বরে যে টাকার ঝাঁক আছে তা ভাল করেই উপলব্ধি করে: বলে; আচ্ছা, যাচ্ছি।

নরহরি বলে, হ্যাঁ—সরে পড়ো।

গণেশের ব্যথাটা একটু কম আছে। গণেশ আস্তে আস্তে উঠে আসে।

নরহরি কুপিটা নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে।

গণেশ একেবারে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। চারি দিকে অন্ধকার। কিছু আগে এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। প্যাচ-প্যাচ করছে সারা রাস্তাটা। খানিকটা দূরে দেখা যায় কাফিখানার উনুনে আগুন গন্‌গন্ করছে। দু'-একটা কুকুর কাফিখানার ঝাঁপে হেলান দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে।

গণেশ এগিয়ে আসে কাফিখানার দিকে। হারাণ, কমলা, নরহরি মাষ্টারের কথাগুলো ভেবে মাথাটা ঘুরে যায়। বসে পড়ে কাফিখানার উনুনের পাশের টিপিটার ওপর। এত রাত্রি হ'য়ে গেছে, এখনও কমলা ফেরেনি! কমলা যে সহজে ফিরতে পারবে না—তা গণেশ বুঝেছিল।

গণেশ নিজের মনে মনে বলে ওঠে, 'ছিঃ ছিঃ, তার খুব অন্যায় হ'য়ে গেছে। তার উচিত ছিল উঠে পড়ে নরহরির গলাটা চেপে ধরা। এত অন্যায়, এত শয়তানী কিছুতেই সহ্য করা উচিত নয়।'

গণেশ নিজের মনে কি যেন ভাবে। তার পর চারি দিক একবার দেখে কাফিখানা থেকে কাবাবের একটা শিক্ নিয়ে ছুটতে থাকে শিবিরের দিকে। সে সটান গিয়ে হাজির হয় হারাণের ডেরায়—যেখানে নরহরি মাষ্টার নোটের বাণ্ডিলটা বুকে চেপে স্বস্তিতে ঘুমোচ্ছে।

গণেশ সজোরে গিয়ে আঘাত করে ঘুমন্ত নরহরির রগে।

শুধু একটা অস্ফুট আর্তনাদ শোনা যায় নরহরির। গণেশ পর পর আরো দু'বার আঘাত করে—তার পর ছুটে বেরিয়ে যায় শিবিরের বাইরে। নিস্তব্ধ নিশুতি রাতে খগেনের বৌ-এর বুকফাটা কান্না বহু দূর থেকেও শোনা যায়। কেন জানি না, গণেশের খালি ভুল হয়—এ বুঝি কমলার কান্না!"

প্রেমের কবিতা

অমরেন্দ্র ঘোষ

লোকটা উন্মাদ নাকি? বৈশাখের খর দ্বিপ্রহরে এমন করে কি কারুর মেঠো পথ চিরে ছুটে আসা সম্ভব? স্থানে স্থানে মাটি শুকিয়ে চৌচির হয়ে আছে। ফাটলে পা পড়লে আর রক্ষা নেই। এখানে-ওখানে দু'-একটা মরা শামুকের খোলা, নয় তো ঝিনুকভাঙা ছুরির মত শাণান রয়েছে। একটু রক্তের ছোঁয়াচ পেলেই হয়! মানুষটা হোঁচট খেল বলে।

প্রিয়নাথ শংকিত ও দুঃখিত হয়। কেনই বা ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কে যায়? ব্রজদাস নাকি?'

মেঠো পথ ধরে সদাসর্বদা যাতায়াত করে প্রিয়নাথ। সকাল, সন্ধ্যা ও রাত্রে, কত লোকের সংগেই তো সাক্ষাৎ হয়। কেউ পরিচিত, কেউ বা অপরিচিত। কেউ দেশী কেউ বা বিদেশী। কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করা মাত্রই তো এমন করে কেউ ছুটে আসে না! লোকটা নিশ্চয়ই পাগল হয়েছে।

কিন্তু ব্রজদাস তো পাগল ছিল না? তার যৌবনের স্মৃতি উদয় হয় প্রিয়নাথের মনে। দীর্ঘ দেহ, উন্নত নাসা, বলিষ্ঠ বাহু। কি না ছিল ব্রজদাসের? রূপ? তামার তাওয়ায় যেন নীল আগুন গন-গন করত! একটা হাটের ভিতরও তাকে খুঁজে বের করতে কষ্ট হত না। ব্রজদাসকে দেখলেই প্রিয়নাথের কাশীরাম দাসের কয়েকটি পংক্তি মনে পড়ত—

অনুপম দেহ শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরেরও তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল।

প্রিয়নাথ একটু কবি-প্রকৃতির মানুষ। তাই তার ভাবনাটাও অপরের তুলনায় ভিন্নরূপ। সে মানুষকে শুধু বাইরের চোখ দিয়েই দেখে না, দেখে অন্তরের চোখ দিয়ে। তার কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের

ডিগ্রি লাভের সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু বহু কষ্টে ও যত্নে অধ্যয়ন করেছে অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ। আধুনিক সমাজ এবং রাজনীতি সম্বন্ধেও তাকে কতকটা সচেতন হতে হয়েছে, কারণ পেশা তার কবিয়ালী। আজ পর্যন্ত সে সুবিধা করতে পারেনি অর্থ আহরণে, কিন্তু নেশা ত্যাগ করতে পারেনি। বরঞ্চ ঘোর না কেটে আরও দিন দিন বেড়েই চলেছে। গাঁয়ের লোকেরা অবাক হয়ে যায় তার নিজের হাতে লেখা ছোটখাট নাটকের অভিনয় দেখে।

এই নিদারুণ কাঠ-ফাটা রোদে প্রিয়নাথ একটি গাইয়ে ছেলের খোঁজে বেরিয়েছিল। ছেলেটি না কি দেখতে অপূর্ব, গলাখানা আরও অপূর্ব!

সময় অল্প, দূর অনেক। নিজের পায়েই সে কুড়ুল মারল ব্রজদাসকে ডেকে। উগ্র রোদে এখনও সঠিক চেনা যাচ্ছে না। আর সন্দেহ করে মনকে চোখ-ঠারা দেওয়ারও উপায় রইল না। ব্রজদাস হাঁপাতে হাঁপাতে তার সুমুখে এসে থামল। এই রে মাটি করে ছাড়বে—বলতে আরম্ভ করলে কথা আর ফুরাবে না। যে উদ্দেশ্যে প্রিয়নাথ বেরিয়েছে, তা এবারের মত পণ্ড হল!

'কবি তুমি ডাকছ? তা ডাকবে বই কি, মনে-প্রাণে আমিও যে তোমাকে স্মরণ করছিলাম। ভক্ত ডাকলে কি ভগবান সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে?'

কবি! অতি মধুর সশ্রদ্ধ সম্বোধন। তার পর যা নিবেদন জানাল দাস তা আরও মধুর। বৈষ্ণবের চরিত্রই আলাদা। প্রিয়নাথ জল হয়ে গেল। এত সাধের মধুক্ষরা কণ্ঠ বালকের কথা সে ভুলে গেল তখনকার মত।

'কেমন আছ দাস?'

'ভালো!' হঠাৎ দাসের চোখ দুটো সজল হয়ে উঠল।

ঐ সামান্য দুটি অক্ষরের মধ্যে এমন কি তাৎপর্য নিহিত থাকতে পারে যে উচ্চারণ করা মাত্র চোখ ভরে এলো? কিছু কাল পর্যন্ত ব্রজদাসের সংগে সাক্ষাৎ নেই। সে তো এত কাল নয় যে, দাস বুড়ো হয়ে যেতে পারে! যৌবনে পা দিয়ে তার দাড়ি-গোঁফ সবিক্রমে বেড়েছে। প্রৌঢ়ে হয়েছে তামাটে—এর মধ্যে পাকা তো অসম্ভব। প্রিয়নাথ ভিন্ন গ্রামের লোক হলেও তো তার অনুমান মিথ্যা হতে পারে না।

'কোথায় চলেছ দাস?'

'চলেছি তিলের ভুঁইয়ে কৃষাণ খাটাতে। নবীন মামার তিল হয়েছে বিস্তর। তুলতে হবে, কৃষাণ চাই। তা মজুরী খুবই কম। কিন্তু খাটুনী ভাই বেদম। ঐ ক্ষেতের বেড়াও আমি বেঁধেছি, তল্লা বাঁশের তেরছি বেড়া। তাতে লাভ হয়েছে কি? সুন্দর হয়েছে, শক্ত হয়েছে, আর তিলের ক্ষেতে গরু ঢুকতে পারেনি—তা বলে তো আমার প্রাপ্য বাড়েনি। লোকটা একদম ঠগ। সেই জন্যই তোমায় স্মরণ করলাম···'

প্রিয়নাথের মন যেটুকু নরম হক না কেন, এবার ত্রাহি মধুসূদন করতে লাগল। লোকটা আগে তো এমন ছিল না। প্রিয়নাথ কথা ঘুরিয়ে দিল। 'তুমি কি সোনারপুরের লক্ষ্মী হালদারের নাতিকে চেন? মিষ্টি গলা, সুন্দর গান গায়।'

'তার চেয়েও মিষ্টি গলা ছিল পরেশের বৌর। তার গলা তো তুমি শোননি কবি! শুনলে একটা রাজ্যও দান করে দেওয়া যায়। আমার তো ছার তিন বিঘে ভুঁই!'

'তোমার জমির সংগে পরেশের স্ত্রীর সম্পর্ক?'

'কিছু বুঝি জান না, থাকো দেখি পাশের গাঁয়ে। পরেশের বৌ ছিল অতিশয় রূপবতী—নাম ছিল তার যশোদা।'

'যশোদা না তোমার স্ত্রীর নাম, আবার বলছ পরেশের বৌ। তোমার কি সত্যই মাথা বিগড়ে গেছে। বল তো ব্যাপার কি?'

'মাথাটা এখনও ঠিকই আছে, তবে সময় সময় বিগড়ে যায় মগজ, যখন খুন ঠেলে ওঠে ওপর দিকে। কবি তুমি লিখতে জানো কিন্তু ভুগে তো দেখনি এ জ্বালা। লক্ষ্মী হালদারের নাতিকে কেন চিনব না—আগে শুনে নাও লক্ষ্মীর সংগে কি ভাবে পরিচয় হল তার কাহিনীটা। তুমি একটা নাটক লিখবে, আমি জুগিয়ে দেব মসলা?'

শ্রান্ত হয়ে পড়ল প্রিয়নাথ। একে রৌদ্রের অসহ্য তেজ, তাতে এই পাগলামী। সে চুপ করে রইল। যা বলার তা ব্রজদাস বলে যাক। শত উত্তেজনা ও অসংগতি থাকলেও, সে আর বাধা দেবে না। সোনারপুরের কাজ তো আজ তার নষ্টই হয়েছে। আহা, দেরী হলে অমন একটা ছেলে কি পাওয়া যাবে?

'তুমি কি রাগ হয়েছ কবি, একটু বেশী কথা বলি বলে? উঁহু-তুমি তো রাগ হওয়ার মানুষ নও। কত অবাক্য-কুবাক্য শোনো আসরে উঠে বিপক্ষের। রাগই হচ্ছে বিষম রিপু যার জন্য আজ আমার এই দশা।'

প্রিয়নাথের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল ব্রজদাস একটা বটগাছের দিকে। 'বসবে চল, বলছি আগে যশোদার কথা।' কিন্তু সে সুরু করে লক্ষ্মী হালদারের ছেলে থেকে। 'লক্ষ্মীর ছেলে যখন বিয়ে করে তখন আমার পূরাদস্তুর বয়সের কাল। এক টানে ধান তুলতে পারি এক কাহন। এক লপ্তে আমার জমি ছিল তিন কুড়া···'

'দাস তোমার যশোদা? আবার যে খেই হারিয়ে ফেলছ।' প্রিয়নাথ একটু পূর্বের প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে বাধা না দিয়ে থাকতে পারে না। 'যশোদাকে কি তুমি ভুলে গেলে?'

'এই তো তুমি কবি হয়ে অকবির মত একটা কথা বললে! একালে তো বুক চিরে দেখান সম্ভব নয়, তুমি একটু ভিতরের দিকে চেয়ে দেখ—রূপবতী রসবতী কে রয়েছে দাঁড়িয়ে পাটকাঠির বেড়াটি ধরে। সন্ধ্যে কি হয়েছে, তবু কত আশংকা। ঝড়ো কোণে কালিন্দী মেঘও তো নেই, তবু কত ভয়। ধীরে-সুস্থে বলি, একটু ধৈর্য ধরে শোন, তা হলেই সব বুঝবে।'

প্রিয়নাথ মুগ্ধ হয়ে বালকের মত যেন এক গল্পদাদুর সুমুখে বসল। কি যেন বলবে বৃদ্ধ, কি যেন পক্ক জীবনের এক অবিস্মরণীয় কথা। অনেকের কাছে সামান্য কিন্তু কবিপ্রাণ প্রিয়নাথের কাছে অসামান্য বলে বোধ হয়।

'এখন কৃষাণ খাটি, তখন কৃষাণ ডাকতাম—জমি তিন কুড়া ছিল বাঁশ বাগানের নীচে। নাম করা কৃষাণ ছদন এল, বলাই এল, আর এল লক্ষ্মী হালদার। সব্বাই পান্তা খেয়ে নেমেছে বীজ তুলতে, আমি আর থাকতে পারলাম না। কী যে বীজের চেহারা কবি—আমি নামলাম না খেয়ে। ঘড়ি খানেক বীজ তুললাম পাল্লা দিয়ে।

গুণে দেখা গেল, আমি তুলেছি ওদের এক-এক জনার প্রায় দুনো। সবাই বলল দৈত্য। কথাটা কিন্তু সত্যি নয়।'

'কেন, না খেয়ে তুমি বীজ তুললে সবাইকে টেক্কা দিয়ে—একেবারে দুনো আঁটি, সে কি যেমন-তেমন মানুষের কর্ম? দৈত্যি নয় তো বলবে কি?'

'জমির জোরে জোর, যেমন স্বামীর জোরে এয়োতি। কবি হয়ে তুমি এটুকু বুঝলে না—তোমায় আর বলব কি প্রিয়?' দুঃখ রংগ ব্যংগ কত কি যেন একই সময় ব্রজদাসের মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অবাক হয়ে প্রিয়নাথ চেয়ে থাকে। দাসের প্রতিটি বলি-রেখার কত রূপ, প্রতিটি কুঞ্চনে কত প্রতিভা! এ বয়সেরই শুধু দান নয়, অভিজ্ঞতার চরম উৎকর্ষ।

'দাস, তোমার সে জমি কি হল?'

'আগেই তো বলেছি, পরেশের স্ত্রী খুব সুন্দরী ছিল।'

'সে তো শুনেছি—তার পর?'

'সত্য কথা সব খুলে বলব—কেবল একটু সবুর করে'। তামাক খেয়ে সুস্থ হয়ে নি। কাজে দেরী হয়ে যাবে, তা যাক গে। তুমি শুনলে জগৎ শুনবে, হয় তো অনেকের উপকার হবে।' ব্রজ একটা নাড়ার বিনুনী টিপে কল্‌কিতে আগুন ধরাল, প্রতিটানে ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। 'খাবে নাকি?'

'না।'

প্রিয়নাথ তামাক খাবে কি, সে চেয়ে দেখে চমৎকার এক নিরালা পরিবেশ। সুনিবিড় বটের ছায়ায় রৌদ্রের লেশমাত্র রুদ্রতাও নেই। তার সুমুখে এক বহুদর্শী বসে আছে, আর সে রয়েছে যেন প্রিয়তম শিষ্যের মত একান্ত আগ্রহে চেয়ে। কি দর্শন কি শাস্ত্র যে সে আজ ব্যাখ্যা করবে প্রিয়নাথ জানে না। তাই তার ব্যাকুলতা চরম হয়ে ওঠে। কে বলে ঐ বৃদ্ধ উন্মাদ? এ কথা ততক্ষণই মনে হয়, যতক্ষণ না ওকে তলিয়ে বোঝার লগ্ন আসে। সেই মহা লগ্ন সমুপস্থিত।

'দু' সন ধান পেলাম, গোলা-ভরা। বয়স অল্প ছিল—তখন শীতের শেষ, ফাগুন কেবল আসছে। বুড়ো শকুনটা রোদে বসে থাকত পাখনা মেলে দিয়ে। তখনও বেঁচেছিল দুটো ছোট ছোট ঘোলাটে চোখ নিয়ে—মরণের ঠিক আগদশা।'

'শকুনটা কে ব্রজ?'

'যার নজর ভাগাড়ের দিকে। যুবতী স্ত্রীলোক দেখে আমার মাথাটা টনটন করে উঠল। শুধু যুবতী নয়, আগেই বলেছি অতিশয় রূপবতী ছিল পরেশের স্ত্রী।'

'কি করে জানলে?'

'আগুন যেমন চাপা থাকে না, রূপের কথাও লোকের মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ে। সুন্দরীর সাধ সবাইর, পায় ক'জনে? একদিন সত্যি সত্যি বলছি চুপি-চুপি গেলাম। সাধ মিটিয়ে দেখলাম।' ব্রজদাস থামল, তামাক টানল, তার পর আবার বলতে লাগল ধীরে ধীরে। 'মহাভারত তো কুরু-পাণ্ডবের কাহিনী, রামায়ণে আছে রঘুবংশের জীবনী। লিখে গেছে ব্যাস ও বাল্মীকি। তুমি আমার গল্পটা লিখবে? তুমি তো কবি।'

নির্জনতা ও সারল্যের দরুণ সমস্ত কথাগুলি প্রিয়নাথকে স্পর্শ করল। কি জন্য সে এসেছিল, কতদূর পথ তাকে যেতে হবে—সকল ভুলে সে বলল, 'আমাকে দিয়ে কি সম্ভব হবে? আমি কত নগণ্য!'

'ঠিক হবে, ঠিক হবে প্রিয়নাথ। তোমাকে নগণ্য যে মনে করে সেই নগণ্য। তুমি তোমার গলা দিয়ে ধন্য করেছ দেশটা। তুমি ধীরে ধীরে লিখবে, আমি বার বার বলব। এক বার দু'বার দশ বার। আচ্ছা, বলতে বলতে কি পাপক্ষয় হয়, যেমন ঘষতে ঘষতে পাথর?'

'হয় বই কি! কিন্তু কি পাপ তুমি করলে?'

'পাপ, অতি লোভ। পরের জিনিসে লিপ্সা। কিন্তু এক কালে তো দোষের ছিল না। অর্জ্জুনও তো সুভদ্রাকে হরণ করে এনেছিল। কৃষ্ণ বের করে এনেছিল আয়ান ঘোষের স্ত্রীকে।'

'সেখানে যে প্রেম ছিল, তাই বন্ধন মুক্ত করা সহজ হয়েছে।'

'কবি, তোমাকে শত কোটি প্রণাম। তুমি আমার মনের জ্বালা নিবিয়ে দিলে। বড় কষ্ট পাচ্ছিলাম এত দিন। তার পর শোনো, বুড়ো শকুনের পরামর্শ নিলাম। সে বলল, ছোট জাতে দোষ নেই, ফুসলিয়ে আন। সামাজিক ভাল মন্দর ঝুঁকি রইল আমার ঘাড়ে। আমি না দেশের কত্তা, তোর ভয় কি? কোনও বেটা আমায় সেলাম না দিয়ে পারে?'

ব্রজদাস বলে চলে—'বুঝলে প্রিয়নাথ, ভেবে দেখলাম সত্যাই, বুড়ো শকুনটার বাধ্য সবাই—থানার পুলিশ পর্য্যন্ত। যশোদাকে ফুসলাতে গিয়ে ভালবেসে ফেললাম। যশোদাও পাগল, আমিও পাগল। কখনও দেখা হয় মেঠো পথে তপ্ত রোদে—যখন যশোদা গরুর দড়ি বদলাতে যায়। কখনও বা দেখা হয় গাঁয়ের পথে সন্ধ্যার ছায়ায়,—যখন যশোদা বেসাতি আনতে দোকানে যায়। প্রথম প্রথম কথা হয় কি হয় না, যশোদা ফিরে তাকায় কি তাকায় না। তার পর একটু একটু হাসে। চলে হরিণীর মত তরিৎ পায়। আবার ইচ্ছা হলে থামে। ডাইনে-বাঁয়ে কেউকে না দেখলে হাসে খিল-খিল করে।'

'কি চাই দাসের পো?'

বুক টিপ-টিপ করে এত বড় যোয়ানেরও, আমি মিথ্যা কথা বলি ভয়ে ভয়ে। 'কিচ্ছু না?'

'তবে পিছন পিছন ঘোরো কেন?'

'এমনি।'

প্রতি-উত্তরে মুখ মচকে ব্যংগ করে যশোদা, 'এমনি!'

আবার একদিন দেখা হয় সন্ধ্যার ঠিক পরে করবী গাছটার আবডালে। চমকে ওঠে যশোদা—ভুত নাকি?

'আজ যে বড় মন-মরা?'

'উপোস করে আর ক'দিন মন তাজা রাখা যায়? আজ তো চালই জুটল না একপো। বাড়ী ফিরে কিল খেতে হবে গোঁয়ারটার। বল তো মন তাজা থাকে কি করে?'

যশোদাকে আমি আমার বাড়ী ডেকে নিয়ে গেলাম। দেখালাম আমার ছোট্ট ধান-বোঝাই গোলাটা। উপোসী যশোদার আঁচলে ক'সের চাল দিলাম, আর মুখে দিলাম একটা চুমো।'

'যশোদা কিছু বলল না?'

ব্রজদাস একটু ঝলকে উঠে বলতে লাগল, 'নিজের বাড়ী ফিরে এসে মার খেল যশোদা, চাল পেল কোথায় সে? ফাঁসাদ মন্দ নয়। শাঁখের করাত সোয়ামী। আসতে-যেতে কুরিয়ে-কুরিয়ে কাটে।

জীবনের ওপর ধিক্কার জন্মে যশোদার। সে একদিন পরেশের সংগে সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে আমার কাছে চলে এল, আমি বুকে টেনে নিলাম। পরদিন বুড়ো শকুনটার কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, দাদা ঠাকুর, এখন? বুড়ো শকুনটা হাসে। কণ্ঠী বদল কর। বৈরাগী হ। দেখি তোদের কে কি করে? শেষ পর্যন্ত তাই করলাম প্রিয়নাথ। এখন দেখি যে পরেশও হাঁটাহাঁটি করেছে বুড়ো শকুনের কাছে। বোধ হয় পরামর্শ নেয়। এ তো বড় তাজ্জব! দু'ধারওয়ালা ছুরি! কয়েক দিন বাদে পুলিশ এল। এসেই, তারা ফিরে গেল। গ্রামের পাঁচ জনেও আমাদের কিছু বলল না। বুড়ো শকুনটা জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছিস ব্রজ? দেখলি তো মজা, কেউ কি তোদের একটি কেশও স্পর্শ করতে পারল? হাভাতের ঘর থেকে তোর ঘরে এসে যশোদা ভাল আছে, না? এক দিন পায়ের ধুলো দিলেই হয়—যশোদা নিত্য বলে। শকুনটা তেমনি হাসে। তার পর একদিন কোর্টের পরওয়ানা আসে। দো-তরফা মামলা চলে ভয়ংকর। দেখতে দেখতে আমার তিন কুড়া আর পরেশের এক কুড়া বুড়ো শকুনের পেটে ঢোকে। আমরা জেরবার হই—আর শকুনে পিটপিটিয়ে চেয়ে দেখে।

প্রিয়নাথ আশ্চর্য হয়ে মন্তব্য করে, 'বল কি?'

'কি আর বলব! যার জন্ম এত মারামারি সেই এক দিন গেল বিনা চিকিৎসায় মরে।'

'যশোদা?'

'হ্যাঁ। কাল এসেছিল পেটে, অকালে ভূমিষ্ঠ হল। তখন আমার হাত একেবারে শূন্য। জমি-জায়গাও কবলা দেওয়া সারা। সে সময় তুমি যদি কবি যশোদার চোখ জোড়া দেখতে! সন্ধ্যে তারার মত আজও আমার বুকে জ্বলছে! সে কি মরতে চায়! তুমি ভেবে চিন্তে একটা নাটক লেখ। ব্যাস বাল্মীকির মত তোমার নাম থাকবে পাঁচ গাঁয়ে। হ্যাঁ, একটি কথা—নাটকটা হবে কিন্তু কড়া, অথচ প্রেমের ভিয়ান থাকবে। তুমি কখন দেখনি ফল্গু নদীর ধারা?'

ব্রজর বুকের তলায় যে ধারাটি বইছে, তাই পৃথিবীর বৃহত্তম অভিজ্ঞান। প্রিয়নাথ শপথ করে, 'দাস, নিশ্চয়ই লিখব তোমার জীবনী।'

সেদিন গাইয়ে ছেলের কথা ঐখানেই চাপা পড়ে।

ওপরে রৌদ্র-স্নাত নির্মেঘ আকাশ, নীচে শ্যামশ্রী মাটির পৃথিবী। মাঝখানে কুশীলব ব্রজদাস, যশোদা, পরেশ। আর একটু গভীরে নেমে ভেবে দেখলে আরও অনামা-অচেনা অপাংক্তেয় অনেকে। কেউ হয়তো নির্বাক, কেউ হয়তো নেপথ্যচারী। শোনা যায় মৃত্তিকার রংগমঞ্চে জনতার হাসি-কান্না, হাহাকার, সুদীর্ঘ বিলাপ। আসে প্রেম, চলে চুপেচুপে অভিসার—এই তো চিরন্তনী মহানাট্য। ব্রজদাস এই নাটকই লিখতে বলেছে। সেই নাটকই প্রিয়নাথ লিখবে। এবার আর দম্ভ ও বৈরাট্যের ইতিকথা নয়, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের শুধু ভনিতা নয়—উন্মোচিত করতে হবে যুগধর্মে তৈরী স্বার্থশিকারী দৈত্যবংশের স্বরূপ। বুঝিয়ে দিতে হবে—ব্রজদাস, তুমি পাপ করনি, যশোদাও পাপ করেনি, কিন্তু তোমরাই পচে মরছ কংসের কৌশলে দারিদ্রের কারাগারে। তোমরাই আসামী, তোমরাই দাগী, তোমাদেরই নাম লেখা থাকে পুরুষ-পরম্পরায় বিংশ শতকের থানার ভিলেজ ক্রাইম নোট বুকে!...

গভীর রাত্রি। নিদ্রাচ্ছন্ন সমস্ত গ্রামখানা। কেবল প্রিয়নাথ একা জেগে। সে প্রস্তুত হচ্ছে ব্রজদাসের জীবননাট্য রূপায়িত করবে বলে। প্রদীপ উজ্জ্বল করে দিয়ে সে খাতা-কলম নিয়ে বসল।

কিন্তু একটি কথা, নাটক শেষ হবে কোথায়? শেষ না ভেবে সুরু করা বাতুলতা। প্রিয়নাথ উঠে দাঁড়াল। সে পায়চারী করতে লাগল। যদি একটা ইংগিতও দিত ব্রজদাস! যশোদার মৃত্যুতে মহিমান্বিত হবে, না দাসের বিয়োগবিধুর শোকাশ্রুপাতে? ব্যথায় যে নাটক সমাপ্তি লাভ করে, সেই তো মহৎ নাটক। কিন্তু তবু জিজ্ঞাসা করা উচিত। এখানে কল্পনার অবকাশ নেই মোটেই। একেবারে নিছক সত্য কাহিনী।

প্রিয়নাথ কোনও রকমে রাতটা কাটাল। ভোর হতে না হতে সে ছুটল ব্রজদাসের সন্ধানে। সে মনে মনে হাসল নিজের পরিবর্তন দেখে। কোথায় গেল তার গাইয়ে ছেলেটির জন্য ব্যাকুলতা? এখন যে তার সমস্ত স্মৃতি জুড়ে ব্রজদাস ও যশোদা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেদিন সে দাসের দেখা পেল না। বিফল হয়ে সে কি করে যে দিনটা বাড়ীতে কাটাল! কোনও কাজেই মন বসতে চাইছে না।

প্রিয়নাথ সন্ধ্যার পর আবার গেল দাসের খোঁজে। কিন্তু এবারও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। পরদিন ভোর বেলাও তাই। পাগলটা গেল কোথায়?

সে দারুণ বিরক্ত হল। তার সমস্ত কবিত্বের মোহ গেল ঘুচে। সে এ কি করছে? মিছেমিছিই একটা উন্মাদের পিছে ঘুরে মরছে। নিজের যে সমস্ত কাজ মাটি হতে চলল!

সে খেয়ে-দেয়ে একটা ছাতি মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়ল সেই গাইয়ে ছেলেটির সন্ধানে। দল চালাতে না পারলে ব্রজদাসের জীবনী লিখে আর পেট ভরবে না।

ব্রজদাসের বাড়ীর একটু দূর দিয়ে সোজা পথটা। সেইটা ধরে এগিয়ে আসছে প্রিয়নাথ। যাবে মুখ ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি চলে।

আশ্চর্য, কে যেন ডাকছে পিছন থেকে। প্রিয়নাথ দ্রুত পা চালিয়ে দিল।

'কবি, ও কবি—একটু দাঁড়াও না ভাই। তুমি কি সেদিনের কথা সব ভুলে গেলে?' ব্রজদাস এগিয়ে এল। প্রিয়নাথের হাতখানা ধরে বলল, 'যশোদা তোমায় ডাকছে—রূপবতী এক নারী!'

'বল কি দাস!' প্রিয়নাথ থামল। ব্রজদাসের সংগে তার বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল।

'যুবতী স্ত্রীলোকের কথা না শুনলে, তুমি কি থামতে? সাধে লোকে কবিদের সন্দেহ করে!' ব্রজদাস একটু হাসার প্রয়াস পেল।

প্রিয়নাথ বিষম রুষ্ট হয়ে হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। আরম্ভ করলে আর শেষ হবে না কথা! আজকার দিনটাও তার বৃথাই কাটবে।

আহা, কেন সে রুষ্ট হচ্ছে? দাসের কথা তো ফুরাবার নয়। প্রেমের কথা কি শেষ হয় কখনও? দাস শুধু প্রেমে নয়, জীবন-সংগ্রামেও বঞ্চিত, শঠের পরামর্শে একেবারে দেউলিয়া। এমনি অবস্থায়ই মানুষ বিবাগী হয়, ঠকে ঠকে টিকিট কেনে কাশীর। কিন্তু সে পথ তো দাস আজ পর্য্যন্ত ধরেনি। সে এখনও কৃষাণ খাটে পরের ভুঁইতে কপালের ঘাম পায়ে ফেলে। আশ্চর্য ঐ মানুষটি! ও একটা গড্ডালিকা প্রবাহে উদ্ধত ব্যতিক্রমের পাহাড়!

'আজ আর কবি তোমায় বেশী বিরক্ত করব না। কেবল একটু আমার ঘরখানা দেখে যাও। কথা আছে মাত্র একটি। ঐ তো আমার বাড়ী। ঐ তো তুলসীমঞ্চ যশোদার। ঐ তার শ্মশান। অনেক দূরে রাখিনি—তা হলে কথা বলব কার সাথে?

'সে তো মৃত। সে তো গত, দাস?'

মাথা নাড়ায় ব্রজ। 'না, না—যাত্রা গানের পালা শোননি? জবাব দেয় আবডাল থেকে।'

নেপথ্যচারিণী! বিশ্বাস করে না প্রিয়নাথ। কিন্তু এই মূঢ়ের বিশ্বাস তখন তখনই ভাঙতেও মন সরে না তার।

সত্যই বৈষ্ণবের বাড়ী বটে!

পথের দু'পাশের ফুল যেন নানা বর্ণের পাখা মেলে রয়েছে! উড়লেই উড়ে যেতে পারে স্বর্গে। এত চোখ-ধাঁধাঁনো রঙের কবিতা বোধ হয় ময়ূরের পেখমেও নেই। প্রিয়নাথ চেয়ে থাকে এক-মনে।

'যশোদা রুয়েছিল গাছ, আমি জিইয়ে রেখেছি, জল ঢেলে সার দিয়ে। তখন ছিল পাতলা-পাতলা এখন হয়েছে ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া। বড় সৌখীন ছিল যশোদা। কত রাজ্যের যে ফুল গাছ সংগ্রহ করে এনেছিল!'

ব্রজদাস একে একে তার যশোদার স্মৃতিগুলো দেখাতে লাগল প্রিয়নাথকে। কেবল ফুল গাছ—এ যেন ফুলের পৃথিবী! শ্বেত, রক্তিম, হরিদ্রাভ, ঈষৎ নীল। বাতাসে এমন একটা মিহি সুবাস ভেসে বেড়াচ্ছে যা বোধ হয় ফুলের নয়—জীয়ন্ত যশোদারই দেহ-সৌরভ।

'এই লতা-ফুলগুলোর নাম জানি নে কবি কিন্তু বার মাস ফোটে। রাত্তির বেলা এস তুমি, ঠিক রাত্তিরে যশোদাও আসে।' প্রিয়নাথের কানের কাছে এগিয়ে আসে দাস।

'পাগল!'

'নইলে বেঁচে আছি কি করে?'

রোদে-পোড়া ব্রজদাসের কুঞ্চিত মুখমণ্ডলের দিকে বারেক তাকায় প্রিয়নাথ। কোনও মন্তব্য করেই আর আঘাত দিতে পারে না! ভুল যদি বেঁচে থাকারই মূলধন হয়, সে ভুল না ভাঙাই ভাল। একটা আধ-পাগলা গ্রাম্য কৃষাণ, সে এতও ভালবাসতে জানে! ব্রজ তো শুধু কৃষাণ নয়, সে যে বাঙলা দেশের বৈষ্ণব। তার বৈশিষ্টের তুলনা মেলা ভার এ পৃথিবীতে! পরকীয়া প্রেম-সাধনায় সে যে স্বকীয়তার স্বর্গে চলে গেছে! বেঁচে যে আছে, সে ব্রজদাস নয়, তার ছায়া। জল নয়, মৃগতৃষ্ণিকা!

যদি বুড়ো শকুনের দৃষ্টিপথে ওরা না পড়ত, তবে হয়তো আজও বেঁচে থাকত যশোদা। প্রসব করত বলিষ্ঠ সন্তান। জীবন-মধ্যাহ্নে এমন সান্ধ্য পুরবী নিশ্চয় শোনা যেত না। কিন্তু সে কথা এখানে একান্তই অবান্তর! প্রিয়নাথ একটা নিশ্বাস ছাড়ে। এমনি ফলে মুকুলে কত সমৃদ্ধি যে ওরা যুগে যুগে ছিঁড়ে উপড়ে ফেলেছে! ওরা দৈত্য নয়, দানব নয়—মানুষ। কিন্তু শিকারী জিঘাংসু মানুষ, ছদ্মবেশী বিভীষণ!

পুষ্পকুঞ্জ, তুলসীমঞ্চ অনেক কিছুই দেখাল ব্রজ।

'কবি, দেখে রাখো, নাটক যখন লিখবে তখন এগুলো তোমার কাজে লাগবে। সন্ধ্যে বেলা যশোদা চুল এলিয়ে ওখানটিতে বসত ঐ রক্তকরবী গাছটার গোড়ায়। বর্ষাকালে তার পায়ের ছাপ পড়ত এই উঠানখানার সারা বুকে। এসো, এসো দেখে যাও, সে চিহ্ন এখনও দু'-একটি আছে। তুমি আমার কাহিনীটা তো সত্যি লিখবে?'

'তাতে আর সন্দেহ কি দাস—বড্ড দেরী হয়ে গেছে, আজ তবে আসি।'

'না, না, তুমি যাবে কি করে? যে কথাটা বলব বলে ডেকেছি তাই তো এখনও বলা হয়নি। ঘরের ভিতর এসো, একটু বসো, বলছি।'

যশোদা কবে মরে গেছে, তার স্পর্শ এখনও যেন সর্বত্র বর্তমান। এই তো ছিল, কোথায় যেন একটু কাজকর্মের তাড়ায় দৃষ্টির বাইরে গেছে—এমনি ছোঁয়াই যেন দেখা যায় ঘরের প্রতিটি বস্তুতে। সলতে, প্রদীপ, খড়ম, আসন—সবই তো ঠিক-ঠাক গোছ-গাছ। মাথা আঁচড়াবার কাঁকইও রয়েছে একখানা চালের বাতায়।

'কি বলবে, দাস?'

'শেষ অংকের বয়ান—নইলে নাটক শেষ করবে কি করে?' হঠাৎ ব্রজদাসের মুখে রক্ত ঝলকে ওঠে। সে ত্বরায় ঘরে ঢুকে একখানা তীক্ষ্ণ হাতিয়ার নিয়ে আসে। মুক্ত বারান্দায় ঝলমল করে ওঠে অস্ত্রখানা।

প্রিয়নাথ হতবুদ্ধি হয়ে যায়। 'তুমি কি খুন করবে?' উত্তরের অপেক্ষা না করে সে গিয়ে মাঠের পথ ধরে। উন্মাদকে তো বিশ্বাস নেই। কিসে কি করে!

আর ব্রজদাসের সংগে দেখা হল না সপ্তাহ খানেকের মধ্যে। হঠাৎ এক দিন রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল প্রিয়নাথের গ্রামের বড় বাড়ীর হৈ-চৈতে। এক জন ডাকাত নাকি ধরা পড়েছে। খুন করতে চেষ্টা করেছিল বুড়ো চক্রবর্তীকে।

প্রিয়নাথ গিয়ে দেখল যে, একটা বলিষ্ঠ মানুষ চৌকিদারের পাগড়ি দিয়ে বাঁধা। সে স্থির হয়ে বসে আছে। স্থির মানে নিস্তব্ধ। অগ্নি উদ্‌গিরণের পরের অবস্থা নিশ্চয়।

বৈষ্ণবের এ কি মনোভাব? এ কি তার সংগ্রামী রূপ? কিছুই বুঝতে পারল না প্রিয়নাথ। সে ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেল।

এ যে ব্রজদাস! আজ তার অনর্গল কথা কোথায়? কোথায়ই বা তার জীবন-নাট্য লেখার জন্য সবিনয় অনুনয়? একেবারে ধ্যান-গম্ভীর। তাকে ফাঁসিকাঠে লটকাবার জন্য কত পরামর্শ হচ্ছে—কিন্তু সে উদাসীন। সে মোহমুক্ত—স্থির।

এত যে কথা বলত তার এ গাম্ভীর্যও অসহনীয়।

প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করল, 'দাস, উন্মাদের মত এ কাজ করতে গেলে কেন?'

ব্রজদাস ধীরে ধীরে জবাব দিল, যেন তার ধ্যান ভাঙল প্রিয়নাথের প্রশ্নে। 'নইলে তুমি লিখতে কি? এই তো আমার শেষ অংকের বয়ান।'

ভীড় ভেঙে গেছে অনেকক্ষণ। ব্রজদাসকে থানায় চালান দেওয়া হয়েছে তারও আগে। কবিমনা প্রিয়নাথ দাঁড়িয়ে আছে ঠায়। এ তো পাগলের পাগলামী নয়, ভণ্ডের ভণিতাও নয়। রক্ত-মাংসের মানুষের জীবন-নাট্যের যবনিকাপাত। কিন্তু কী মহা সংকেত দিয়ে গেল দাস! কী মহা ইংগিত!

ব্যথায় বিস্ময়ে প্রিয়নাথ অভিভূত হয়ে থাকে।

ছোটদের আসর

শান্তিনিকেতনের "আনন্দ-বাজার"

শ্রীসুব্রত কর

"আনন্দ-বাজার।" মেলা নয়। শুধু আনন্দ করা। আশ্বিন মাস। পুজার সাজ-সাজ রব চার দিকে। ছেলেদের মন ছুটেছে বাড়ির দিকে। এমনি সময় প্রতি-বছর জ'মে ওঠে আমাদের "আনন্দ-বাজার"। আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের দোকান, বাইরের কেউ থাকে না। ক্রেতা হয় সকলেই। এর লাভের টাকা আশ্রমের দরিদ্র-ভাণ্ডারে যাবে। আসল টাকাটা রেখে বাকিটা গরীবদের জন্য দিয়েই ছাত্রছাত্রীরা খুসী। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে চাঁদা চেয়ে কতই-বা টাকা ওঠানো যায়। এ ভাবে মেলা জমিয়ে টাকাও তোলা হয়, সকলে মিলে একসঙ্গে আনন্দ করা যায়, আর, নিজেদের আপন-হাতে অনেক কিছু করবার সুযোগ মেলে। মাছ মাংস বা বাজারের খাবার বেচা এখানে নিষেধ। সাধারণ দামের চেয়ে বেশি দাম। তবু সবাই হাসিমুখে এসে জিনিস কেনে।

আগের রাত্রি থেকে আমাদের চোখে আর ঘুম নেই। অনেক রাত্রে মা-ঠাকুরমার ধমকানি খেয়ে শুয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে জেগে উঠছি, নানা রকম স্বপ্ন দেখছি, আবার কখন্ ঘুমিয়ে পড়লাম। কখন্ ভোর হয়ে গেল, সানাইয়ের সুর উঠল। লাফিয়ে উঠে পড়লাম। আজ যে "আনন্দ-বাজার," কতদিন থেকে অপেক্ষা করে আছি এ-দিনটির!

উঠে ভাবলাম নিশ্চয় সবার আগে উঠেছি, এখনো কেমন আবছা রয়েছে। সঙ্গীদের ডাকতে চললাম। গিয়ে দেখি সঙ্গীরা সব কত আগে উঠে গেছে, ফুল তুলছে। অপ্রস্তুত হয়েও কাজে লেগে গেলাম। সবাই ভাবছি 'এবার নিশ্চয় আমাদের দোকানেই বেশি লাভ হবে'। ফুল তুলে বোনদের দিয়ে গেলাম মালা গাঁথতে, দোকান সাজাবো। তারপরে বেরিয়ে পড়লাম বাঁশের খুঁটির খোঁজে। যারই সঙ্গে দেখা হয়, এই কথা—কিসের দোকান দিচ্ছিস রে? খাবারের? মনিহারী? আমরা দেব ফুল আর পুতুলের।

বাঁশ আর পেলাম না। কত দল আগের ভাগে এসে চেয়ে নিয়ে গেছে কর্তৃপক্ষের থেকে। আমরা এখন করি কী? একটা ছিল আধখানা তৈরি বাড়ি। বাঁশ খুঁটি বাখারি মেলা প'ড়ে। টেনে নিয়ে এলাম তাই। দড়ি দিয়ে ঘেরাও ক'রে, কাপড় টাঙিয়ে ঝখন মালা দিয়ে সাজালাম—বাঃ দিব্যি। বড়ো বড়ো দোকানগুলি তখনো সাজাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা ক্লান্ত, তবু অস্থির। দৌড়চ্ছে, মাটি খুঁড়ছে, এক ভাবে কাপড় টাঙাচ্ছে, আবার খুলছে, মনোমত হচ্ছে না। দেখে দেখে একটু হেসে আবার ছুটলাম নিজেদের কাজে—পদ্মফুল আনতে।

আশে-পাশের গাঁয়ে পুকুরে এ সময় মেলা পদ্মফুল। ফুল আর কুঁড়িগুলি দেখতে এমন সুন্দর, খুব বিক্রী হয়। কিন্তু পুকুরে নাবাই মুস্কিল। অনেকেই গেল, বেশির ভাগই মুখ শুকিয়ে ফিরে এলো। পদ্মফুল আনবে কী ক'রে, কেউ জানে না সাঁতার, কারু বা জোঁকের ভয়। মুখের সামনে থেকে রসগোল্লা যেন কেড়ে নিয়ে যাওয়া হল; যারা পেল না তাদের এমনি মনের কষ্ট। আমরা অনেক চেষ্টায় কিছু পদ্ম আর কুঁড়ি জোগাড় করলাম। আমাদের সঙ্গীরা তো আমাদের ঘিরে নাচতে লাগল। পাশের দোকানের সবারই দেখি মুখ কালো। তারা পদ্ম জোগাড় করতে পারেনি। আমরা কয়েকটা দিলাম; আর, তারা নতুন উদ্যমে আশ্রমের সমস্ত ফুল নিয়ে ফুলের তোড়া, মালা, হাতের মাথার গয়না ক'রে নিয়ে এলো। তাদের আরেক সান্ত্বনা তাদের মা তাদের খাবার তৈরি করে দিয়েছেন—কুড়মুড়-ভাজা। বাদামের সন্দেশ,—আরো কত কী।

বেলা বারোটার মধ্যেই দোকানগুলি প্রায় সাজানো হয়ে গেল। ছোটরা বড়-বড় দোকানগুলির দিকে তাকিয়ে অবাক—কেমন ক'রে এমন সুন্দর করে তুলল!

লাইব্রেরী আর 'সিংহসদনে'র সামনের মাঠটা চেনা যায় না। লাল নীল কাপড় উড়ছে, ফুলের মালা দুলছে, সানাই ঢোল বেজে চলেছে। তিনটের সময় ঘণ্টা পড়তে লাগল। দোকান খুলল। প্রত্যেক দোকানে চেয়ার টেবিল সাজানো। সুন্দর সুন্দর ঢাকনায় ঢাকা। একটি ক'রে ফুলদানি। বেলা পড়তে লাগল, আলো জ্বলল, আর মেলা জমে উঠল।

সবাই আসছে আনন্দমেলা দেখতে। কী খুসী। আমরাও মেতে উঠলাম। অনবরত চেঁচাচ্ছি—এই যে আসুন, এখানে পদ্মফুল, বাঘ, সিংহ। এই যে এখানে পান; আসুন আসুন হাতে-আঁকা ছবি, হাতে-তৈরি আসন। খাবার চাই তো এখানে; এখানে পাবেন লস্যি, হিং-টিং-ছট্, আবার খাবো, খান্ না, জীবনে খাননি এমন চা, জীবনে ভুলবেন না এমন সরবৎ—ফুরিয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল।

রাত্রে 'সিংহসদনে' টিকিট কেটে জলসা। ঘর ভরতি। গিয়ে দেখবার ফুরসৎ পেলাম না। মেলাটা তবু খানিক ঘুরে দেখে এলাম, একটু খেলামও। আর নিজেদের দোকানে বসে বসে বিক্রী করলাম। রাত আটটা বাজতে না বাজতে মেলা প্রায় ভেঙে এল, ছোট-ছোট দোকানে সব জিনিস ফুরিয়ে গেছে; দোকান গুটিয়ে নিতে ব্যস্ত, বড় দোকানগুলি কিছুটা চলছে, ন'টা বাজতেই সব শেষ।

টাকা হিসেব করতে করতে পাশের দোকানে মণ্টু বললে,—দেখলি তো, পুরো ষোলটি টাকা উঠালাম। বলেছিলাম কী, যদি একটি ঘুষ নিদানাও মুখে দি',—আমার নাম মণ্টু নয়! মা বলেছিলেন,—কখনই পারবি নে, নিজেরাই সব খেয়ে দোকান ফেল পড়িয়ে দিবি! হুঁ, দেখলি?

শিবু ব'লে উঠল—সত্যি রে, বড়রা অমনি সব বলেন, নয় তো আমরা কী-না পারি!

কুমারেশ বয়স্ক ব্যক্তিদের পক্ষেও উপকারী; যৌবনোন্মেষকালে যখন বাড়ন্ত দেহের অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয়, যকৃৎ তাহা সরবরাহ করে থাকে—এবং **কুমারেশ** আপনার যকৃৎকে শক্তিশালী করিবে ও রক্ষা করিবে এবং অটুট স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিবে।

শিশির মাথায় নূতন রূপালী রেখাবিশিষ্ট অ্যালুমিনিয়াম ক্যাপস্যুল দেখিয়া লইবেন।

কুমারেশ

ও, আর, সি, এল, লিঃ
সালকিয়া • হাওড়া

সাবিত্রী বাই

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

দিল্লীর তখ্‌ৎ-ই-তাউসের উপরে ব'সে সম্রাট ঔরংজীব তখন শুনতে পাচ্ছেন, সুদূর দক্ষিণ থেকে ভেসে ভেসে আসছে ছত্রপতি শিবাজীর ঘন ঘন সিংহনাদ!

ঔরংজীবের মতে, শিবাজী হচ্ছেন পার্ব্বত্য মূষিক। কিন্তু মূষিক যে বীর্য্যের মন্ত্র পাঠ ক'রে পশুরাজে পরিণত হয়ে সিংহনাদ ক'রে মোগল সাম্রাজ্যের সিংহাসন পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে তুলবে, ঔরংজীব কোনদিন এতটা কল্পনা করতে পারেননি।

সমগ্র দক্ষিণাপথে তখন শিবাজীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। তিনি মোগলদের ও বীজাপুরীদের সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত ক'রে দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে উঠেছেন। দক্ষিণ ভারতে নেই তাঁর আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী।

কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হ'লেও স্বাধীন রাজারূপে শিবাজী তখনও অভিষিক্ত হননি। মোগল সম্রাট তাঁকে তুচ্ছ জমীদার ব'লে মনে করতেন। বীজাপুরের আদিল শাহের কাছে তিনি ছিলেন অধীনস্থ এক জায়গীরদারের বিদ্রোহী পুত্রের মত।

কিন্তু তিনি সফল করেছেন হিন্দু স্বরাজের স্বপ্ন। কেবল অধীনতা-শৃঙ্খলেই হিন্দুদের চিত্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়েনি, তার উপরে ছিল মোগলদের ধর্ম্মদ্বেষিতার অত্যাচার। বহু গ্লানি, অপমান ও হাহাকারের মধ্য থেকে শিবাজী স্বজাতিকে উদ্ধার ক'রে গৈরিক পতাকার তলায় এনে আশ্রয় দিয়েছেন এবং সকলকে শুনিয়েছেন মুক্ত আত্মার গৌরবময় সঙ্গীত। তাই সমগ্র হিন্দুজাতি তাঁকে দেখতে চায় আজ স্বাধীন ছত্রপতিরূপে।

অবশেষে হিন্দুদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'ল ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে। মহাসমারোহে শিবাজীর অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হ'ল। তিনি হলেন ছত্রপতি। রাজকোষ থেকে ব্যয় করা হ'ল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। আজকের দিনে সেই অর্থ হবে কয়েক কোটি টাকার সামিল!

তারপর শিবাজীর অভিযান সুরু হ'ল মাদ্রাজের দিকে। দিকে দিকে বিজয়পতাকা তুলে মহীশূর পার হয়ে শিবাজী নিজের রাজ্যের দিকে প্রত্যাগমন করলেন (১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে)। তখন তিনি দুই লক্ষ সৈন্য, দুই শত কামান, এক হাজার দুই শত বাট হস্তী, তিন হাজার উষ্ট্র ও বত্রিশ হাজার অশ্বের অধিকারী। কিন্তু ভারত-সম্রাটের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছত্রপতি শিবাজীর সমগ্র সৈন্যবল, অস্ত্রবল ও অর্থবলের বিরুদ্ধেও সগর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়ালেন এক দুর্ব্বলা গ্রাম্য মহিলা।

ফেরবার মুখে শিবাজীর সৈন্যরা লুঠতরাজ করতে করতে আসছিল গ্রামে গ্রামে। এই নৃশংস যুদ্ধরীতি কেবল সে যুগেই ছিল না, আজও আছে। এই জন্যেই কথায় বলে—রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়।

বাঁকাপুর লুণ্ঠন করে শিবাজী গিয়ে পড়লেন বেলভেদী নামে একটি ছোট গ্রামে। সেখানকার প্যাটেল বা সর্দ্দার তখন পরলোকগত, তাঁর বিধবা সহধর্ম্মিণী সাবিত্রী তাই করছেন স্বামীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

সাবিত্রী বাইয়ের অধীনে ছিল কয়েক শত সেপাই আর একটিমাত্র মাটির কেল্লা। এই যৎসামান্যের উপরে নির্ভর ক'রেই অসামান্য শক্তিশালী ছত্রপতি শিবাজীকে বাধা দিতে যাওয়া পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু সেই পাগলামিই ক'রে বসলেন সাবিত্রী বাই। কেবল তাই নয়, মারাঠীরা আক্রমণ করবার আগেই তিনি করলেন মারাঠীদের আক্রমণ!

ভেড়া যে বাঘকে ঢুঁ মারতে আসবে, এটা কেউ আন্দাজ করতে পারেনি। অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে মারাঠী সৈন্যরা প্রথমটা দস্তুরমত হতভম্ব হয়ে গেল। সেই সুযোগে তাদের মালপত্তর লুঠ ক'রে সাবিত্রী বাই নিজের মাটির কেল্লার ভেতর গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

এই অভাবিত অপমান হজম ক'রে দেশে ফিরে গেলে শিবাজীর নামে সবাই দেবে ধিক্কার। তুচ্ছ এক সর্দ্দারণী, তার এত বড় স্পর্দ্ধা! দিল্লীশ্বরের বড় বড় সেনাপতি যাঁর কাছে বার বার পরাজিত হয়েছেন, তাঁকে বাধা দিতে চায় অজানা গ্রামের এক অনামা মেয়ে!

তৎক্ষণাৎ আদেশ এল, সাবিত্রী বাইকে বন্দী কর!

এমন আদেশ যে আসবে, সাবিত্রী বাইয়েরও তা অজানা ছিল না, কিন্তু তিনিও অপ্রস্তুত নন। আত্মরক্ষার তোড়জোড় করতে ভোলেননি। ছত্রপতি শিবাজী যত বড় যোদ্ধাই হোন, দেহে একবিন্দু শক্তি থাকলেও তাঁর কাছে তিনি নত করবেন না মাথা।

কিন্তু এ যেন মৃগ বনাম কেশরীর যুদ্ধ! সকলেই বুঝলে, বিপুল মারাঠী বাহিনীর প্রথম আক্রমণেই সাবিত্রী বাইয়ের মাটির কেল্লা হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়বে তাসের ঘরের মত। মারাঠীদের কামানের গোলা মস্ত মস্ত পাথরের দুর্গপ্রাচীরও চুরমার ক'রে দিয়েছে, নড়বড়ে মাটির কেল্লার ভিতরে ব'সে তাদের ফাঁকি দেওয়া চলে না।

কিন্তু মাটির কেল্লা ভেঙে পড়ল না। মারাঠীদের কামানের গর্ভ থেকে নির্গত হয়ে উত্তপ্ত গোলাগুলো ছুটে এসে পাঁচিলের নরম মাটির ভিতরে ব'সে যেতে লাগল, অটুট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুর্গপ্রাকার। বহুকাল পরে বিখ্যাত ভরতপুর দুর্গেরও মাটির প্রাচীর এই ভাবেই ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিল ইংরেজদের কামানের গোলাবৃষ্টি।

মারাঠী সৈন্যরা চারিধার থেকে হৈ-হৈ রবে দুর্গ আক্রমণ করলে এবং দুর্গরক্ষীরাও তাদের উপহার দিতে লাগল গরম গরম গুলীগোলা। শত্রুদের কেউ হ'ল আহত, কেউ হ'ল নিহত। এই অসহনীয় উপহার ধাতস্থ করতে না পেরে মারাঠীরা তাড়াতাড়ি আবার পিছিয়ে পড়ল।

বার বার অগ্রসর হয়ে আক্রমণ এবং বার বার গুলী খেয়ে নিরাপদ ব্যবধানে প্রত্যাবর্ত্তন। বার বার এই দৃশ্যের পুনরভিনয়।

রাণী দুর্গাবতী, রাণী লক্ষ্মীবাই ও সুলতানা চাঁদবিবি প্রভৃতি বীরনারীরা কি ভাবে নিজের নিজের সেনাদের চিত্তকে উদ্দীপিত করেছিলেন, ইতিহাসে তা পাঠ করা যায়। কিন্তু সাবিত্রী বাই রাণী-মহারাণী নন, তিনি এক ক্ষুদ্র গ্রামের সর্দ্দারণী মাত্র, তাঁর কথা জানবার বা বলবার জন্যে ইতিহাস বেশী আগ্রহ প্রকাশ করেনি।

তবে এটুকু আমরা অনায়াসেই অনুমান ক'রে নিতে পারি যে, অবজ্ঞাত এক গ্রাম্য নারী হ'লেও সাবিত্রী বাই ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী এবং তাঁর মৌখিক ভাষায় ছিল এমন সঞ্জীবনমন্ত্র, কাপুরুষেরও চিত্তে সঞ্চারিত হয়ে যেত বীর্য্যের প্রেরণা। অমোঘ ছিল তাঁর আদেশবাণী, নইলে এক দল মুষ্টিমেয় লোক কিছুতেই দিগ্বিজয়ী শিবাজীর দুর্দ্ধর্ষ ও অসংখ্য সৈন্যদলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করত

না অটল ভাবে। সামনে মৃত্যুকে দেখেও তারা সাবিত্রী বাইয়ের আদেশ পালন করেছিল মৃত্যুঞ্জয়ীর মত।

মারাঠী সৈন্যদের অধিনায়ক ছিলেন শাখুজী গাইকওয়াড়। দুর্গ দখল করতে গিয়ে বারংবার বিফল হয়ে তিনি বুঝলেন, পা দিয়েছেন বড় শক্ত মাটিতে, এখানে বেশী জারিজুরি ক'রে লাভ নেই। তিনি অন্য উপায় অবলম্বন করলেন।

মারাঠীরা কেল্লার চারিদিক ঘিরে ব'সে রইল। বাইরের জগতের সঙ্গে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদের সমস্ত আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে গেল।

দিনে দিনে কেটে যায় এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ। দুর্গের দ্বারও খোলে না, মারাঠীরাও নড়ে না।

মারাঠী সৈন্যসাগরের প্রত্যেক তরঙ্গ ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে সামান্য একটা মাটির কেল্লার কাছ থেকে। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল এই অবিশ্বাস্য সংবাদ! একটা মাটির গড়, একটি গ্রাম্য মেয়ে, আর তার জন কয় অনুচর। মারাঠীদের সৈন্যসাগর তাদের স্পর্শ করতেও পারছে না! বুঝি ম্লান হয়ে যায় ছত্রপতির ভারতব্যাপী গৌরব!

কিন্তু অসম্ভবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন সাবিত্রী বাই।

ছোট গড়, ভাণ্ডারও বিস্তৃত নয়। রসদ গেল ফুরিয়ে, বারুদ ও গোলাগুলীরও অনটন। বিনা খাদ্যে বিনা অস্ত্রে শত্রুদের বাধা দেওয়া সম্ভবপর নয়। উপবাসে বলীও অক্ষম হয়। সশস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র মহাবীরও দাঁড়াতে পারে না।

এই ভাবে আরো পাঁচ দিন কেটে গেল।

সাতাশ দিনের দিন সাবিত্রী বাই তাঁর অনুচরদের সম্বোধন ক'রে বললেন, "বাছারা, শেষ যা খোরাক আছে খেয়ে নাও, বাকি যা অস্ত্রশস্ত্র আছে কুড়িয়ে নাও। শত্রুরা আমাদের অবস্থা জানে না, নিশ্চয়ই তারা অসাবধান হয়ে আছে। এখন দুর্গের ভিতরে থাকলে মৃত্যু আমাদের নিশ্চিত। চল, আমরা হঠাৎ বেরিয়ে প'ড়ে শত্রুদের আক্রমণ করি।"

আবার সেই অতর্কিতে আক্রমণ, যার জন্যে মারাঠীরা এবারেও প্রস্তুত ছিল না। তাদের হতভম্ব ভাব কাটবার আগেই দুর্গরক্ষীরা ক্ষিপ্রহস্তে অস্ত্রচালনা ক'রে মাটির উপরে পেড়ে ফেললে কয়েক জন মারাঠীকে।

তারপর কাতারে কাতারে শত্রুসৈন্য ভেঙে পড়ল দুর্গরক্ষীদের উপরে।

বার্ধ্যবতী সাবিত্রী বাই! অগণ্য মারাঠীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও তিনি নতি স্বীকার করলেন না, তাঁর জ্বলন্ত উৎসাহবাণী উদ্দীপ্ত ক'রে তুললে প্রত্যেক দুর্গরক্ষীর চিত্তকে, তা'রা মরিয়া হয়ে লড়তে লাগল মারাঠীদের সঙ্গে—রক্তপিচ্ছল যুদ্ধক্ষেত্র, অস্ত্রে অস্ত্রে ঝঞ্ঝনা, আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জ্জন, যোদ্ধাদের হুঙ্কার, আহতদের আর্ত্তনাদ, ধুলো আর ধোঁয়ায় চারিদিক সমাচ্ছন্ন।

কিন্তু কেবল বীরত্ব দিয়ে যুদ্ধজয় হয় না। নদী যত বেগবতীই হোক্, সমুদ্র তাকে গ্রাস করবেই।

তবু আরো একটা দিন মারাঠীদের প্রাণপণে ঠেকিয়ে রেখে, অবশেষে হাল ছেড়ে সাবিত্রী বাই রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হ'লেন।

তিনি কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করতে পারলেন না। মারাঠীদের হাতে তাঁকে বন্দী হ'তে হ'ল।

সেনানায়ক শাখুজী গাইকওয়াড় এই মহিমময়ী বীর নারীকে যোগ্য অভিনন্দন দান ক'রে নিজের মহত্ত্ব দেখাতে পারলেন না। তাঁর কবলে প'ড়ে সাবিত্রী বাইকে হ'তে হ'ল লাঞ্ছিত, অপমানিত, অত্যাচারিত।

এই অসম যুদ্ধজয়ের সংবাদ শুনে ছত্রপতি শিবাজী গৌরব অনুভব করেছিলেন কি না জানি না; কিন্তু সাবিত্রী বাইএর নির্য্যাতন কাহিনী শুনে দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে উগ্র কণ্ঠে ব'লে উঠেছিলেন, "কি, আমার রাজত্বে নারী-নিগ্রহ? এখনি বন্দী কর দুরাচার শাখুজী গাইকওয়াড়কে। নারীত্বের উপরে অত্যাচার আমি সহ্য করব না! উপড়ে ফ্যালো শাখুজীর দুই চক্ষু—নিক্ষেপ কর তাকে কারাগারে!"

শিবাজীর আদেশ পালিত হয়েছিল অক্ষরে অক্ষরে।

রাজাপুরের ইংরেজ বণিকদের পত্রে জানা যায়, এক দুর্ব্বল গ্রাম্য নারীর কাছে প্রবল মারাঠী সৈন্যদের এই অভাবিত দুর্দ্দশার জন্যে যথেষ্ট আহত হয়েছিল শিবাজীর নামের মর্য্যাদা।

চাঁদ

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত

আকাশে যে সব গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র আমরা দেখতে পাই তাদের ভেতর চাঁদই পৃথিবীর সব চাইতে কাছে। তা'বলে খুব কাছে এ রকমও মনে করো না। ধর, পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্য্যন্ত একটা রেল লাইন পাতা হ'ল এবং একটা ট্রেণ ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে চলতে আরম্ভ করল। ট্রেণটা যদি দিনে-রাতে এক মুহূর্ত্ত না থেমে চলে তাহলে চাঁদে পৌঁছুতে কত সময় লাগবে জান? ছুশো চল্লিশ দিন অর্থাৎ প্রায় আট মাস। আজ যদি তুমি চাঁদের দেশে রওনা হও, তাহলে যখন পৌঁছুবে তখন তোমার বয়স প্রায় এক বছর বেড়ে গেছে! তাহলে বুঝছ, চাঁদ আমাদের সব চাইতে নিকটে হয়েও কত দূরে?

পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব এত বেশী বলে চাঁদকে আমরা একটা ফুটবলের মত দেখি। আসলে কিন্তু চাঁদের আকার ওর চাইতে বহু গুণ বড়। কোন গোলকের ব্যাস যদি দু'হাজার মাইল হয় তাহলে কি সেটা ছোট হ'ল? তুমি এমন একটা ফুটবল কল্পনা কর যার ব্যাস হ'ল কলকাতা থেকে দিল্লী যত দূর তার দ্বিগুণের কিছু বেশী। তাহলে খানিকটা আন্দাজ করতে পারবে চাঁদ কত বড়! দূরবীক্ষণ যন্ত্রের নাম তোমরা শুনেছ। এই যন্ত্র দিয়ে বহু দূরের জিনিষকে বড় করে দেখা যায়। আমেরিকার মাউণ্ট উইলসন গবেষণাগারের দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে চাঁদকে পৃথিবী থেকে এত স্পষ্ট দেখা যায় যে, চাঁদে কোন বড় সহর বা বড় বাড়ী কিংবা গড়ের মাঠের মনুমেণ্টের মত উঁচু স্তম্ভ থাকলে তা পরিষ্কার দেখা যেত। কিন্তু চাঁদে ত সে রকম কিছু নেই—কাজেই জ্যোতির্ব্বিদদের বহু বছর ধরে চেষ্টার ফলেও চাঁদে মানুষের কোন কাজকর্ম্মের চিহ্ন দেখা যায়নি।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চাঁদকে দেখলে সেখানে জলের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। চাঁদের দেশে বড় নদী বা পাহাড়ের গায়ে ঝরণা থাকলে নিশ্চয়ই দূরবীক্ষণ যন্ত্রে তা ধরা পড়ত। বড় নদী বা কোন জলস্রোতের দ্বারা পাহাড়ের গায়ে যে বিরাট গহ্বর সৃষ্টি হয়, চাঁদের দেশের পাহাড়ে সে রকম গহ্বরও দেখা যায় না। এমন কি, চাঁদের

রাজ্যে কখনও মেঘের সৃষ্টি পর্য্যন্ত হয় না। কাজেই সেখানে জলের কোন চিহ্ন নেই। শুধু তাই নয়, জ্যোতির্ব্বিদগণ বলেছেন, চাঁদের দেশে কোন হাওয়াও নেই। যেখানে হাওয়া নেই, জল নেই সেখানে কোন মানুষ, জীবজন্তু বা গাছপালা কি জন্মাতে পারে? তাছাড়া, চাঁদ এত ঠাণ্ডা যে সেখানে কোন মানুষ গেলে জমে বরফ হয়ে যাবে। চাঁদের চার পাশে কোন আবহাওয়া না থাকার দরুণ সূর্য্য থেকে পাওয়া তাপ চাঁদ ধরে রাখতে পারে না। তাই বিজ্ঞানীরা চাঁদকে মনে করেন ঠাণ্ডা, নিরেট, জমে যাওয়া বরফের একটা স্তূপ।

তোমরা জান যে আমাদের পৃথিবীর চার দিক ঘিরে এক হাওয়ার সমুদ্র আছে যাকে আমরা বলি আবহাওয়া। এই আবহাওয়া আছে বলেই আমরা নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছি। শুধু তাই নয়, আবহাওয়া পৃথিবীর কম্বলের কায করছে; সূর্য্য থেকে যে তাপ আসছে এই কম্বল তা ধরে রাখছে সময় মত কাযে লাগাবার জন্যে। আবার খুব বেশী তাপ পৃথিবীর গায়ে এসে না পড়ে তারও ব্যবস্থা এ করছে। যেহেতু, চাঁদের কোন আবহাওয়া নেই, কাজেই চাঁদের দেশের লম্বা রাতের সময় সেখানে কি রকম ঠাণ্ডা পড়ে সহজেই বুঝতে পার। ঐ সময় চাঁদে তাপমাত্রা শূন্য দাগের ২৫০° ডিগ্রী নীচে নেমে যায়। পৃথিবীতে এর কম ঠাণ্ডা পড়লে হাওয়া তরল পদার্থে পরিণত হত। আবার চাঁদের দেশে লম্বা দিনের বেলাতে সূর্য্য থেকে সোজাসুজি তাপ পেয়ে কি সাংঘাতিক গরম হয়ে ওঠে তাও বোধ হয় অনুমান করতে পার। হিসাব করে দেখা গেছে যে, পৃথিবী থেকে চাঁদে পাঁচ গুণ বেশী তাপ পৌঁছয়। কাজেই জুন মাসে যখন কোলকাতার তাপমাত্রা ১০৪° ডিগ্রী হয় তোমরা তখনই হাঁসফাঁস সুরু কর, কেউ বা দার্জ্জিলিং, সিমলা ছোট—আর চাঁদে তার পাঁচ গুণ বেশী তাপে কি অবস্থা হয় নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছ? কাজেই এ রকম পরিবেশে কোন জীবন্ত প্রাণী চাঁদের দেশে থাকতে পারে না সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ অধ্যাপক পিকারিং বলেন যে, তিনি চাঁদের দেশে সামান্য জীবনের চিহ্ন পেয়েছেন এবং তিনি এ-ও বলেন যে, সেখানে পাতলা একটা আবহাওয়ার স্তর আছে ও মাঝে মাঝে তুষারপাতও হয়। কিন্তু এ বিষয়ে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ বিপক্ষে। তাঁরা জোর করেই বলেন যে, চাঁদে কোন হাওয়া বা জল নেই—কাযেই কোন জীবন্ত প্রাণীও নেই।

চাঁদ সম্পর্কে একটা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, আমরা পৃথিবী থেকে শুধু চাঁদের একটা দিকই দেখতে পাই, কারণ, চাঁদ পৃথিবীর দিকে কেবল তার একটা দিক ফিরিয়ে রাখে। অন্য দিকে কি আছে, তার চেহারাটা কেমন বা সেখানে কি ঘটছে তা আমরা জানি না বা কোন দিন জানতেও পারব না। চাঁদ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে একবার ঘুরে আসার ভেতর নিজের মেরুরেখার চার দিকেও একবার ঘুরে আসে এবং এতে তার সময় লাগে প্রায় আটাশ দিন। প্রথম চোদ্দ দিন চাঁদের দেশে ক্রমাগত রাত্রি; আবার পরের চোদ্দ দিন ক্রমাগত দিন। এত দিন ধরে ক্রমাগত রাত ও দিন হবার ফলে চাঁদের রাজ্যে তাপমাত্রার এত পার্থক্য দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, চাঁদ যখন গরম হয় তখন তার তাপমাত্রা এত বেড়ে যায় যে, তাতে জল বাষ্পে পরিণত হয়।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে জ্যোতির্ব্বিদগণ দেখেছেন যে, চাঁদের পিঠে অসংখ্য বিরাট ও গভীর গর্ত্ত আছে। কেউ কেউ বলেন যে, কোন জ্যোতিষ্ক আকাশপথ থেকে ছিটকে গিয়ে চাঁদের ওপর পড়াতে এই গর্ত্তগুলি সৃষ্টি হয়েছে। আবার অনেকে বলেন যে, প্রথম অবস্থায় চাঁদের উপরিভাগ তরল ছিল এবং সূর্য্যের তাপ পেয়ে ঐ তরল পদার্থের ভেতর মস্ত বড় বড় বুদ্বুদ্ সৃষ্টি হয়েছিল। কালক্রমে যখন চাঁদ জমাট ও কঠিন হয়ে উঠল তখন ঐ বুদ্বুদগুলি ফেটে গিয়ে বিরাট গর্ত্তের সৃষ্টি করেছিল। আবার অনেকের মত এই যে চাঁদের পিঠে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি ছিল এবং কালক্রমে আগ্নেয়গিরি নিস্তেজ হওয়ায় ঐ গর্ত্তের উৎপত্তি হয়েছে। তোমরা চাঁদের দেশের পাহাড়ের কথা শুনেছ। খালি চোখে চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখলে যে ছবিটা দেখা যায়—যাকে তোমরা 'চাঁদের মা বুড়ী চরকা কাটছে' বলে জান—সেগুলি কিন্তু আসলে পাহাড়ের'ছবি। বাস্তবিক চাঁদে বহু পাহাড় আছে এবং চাঁদের পাহাড়গুলি অত্যন্ত উঁচু ও দুর্গম। পৃথিবীতে যে পাহাড়গুলি আছে সেগুলি অনবরত ঝড়, ঝঞ্ঝা, তুষারপাত, জলস্রোত প্রভৃতি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কিন্তু চাঁদে কোন আবহাওয়া না থাকায় সেখানে ঐ সব উৎপাতও নেই। ফলে পাহাড়গুলি কোন রকম ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে চিরদিন একই ভাবে আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবেও। পৃথিবীতে আমরা যেমন ঋতু-পরিবর্ত্তন, হাওয়ার গতি-পরিবর্ত্তন ও আরো অন্যান্য নানা রকম পরিবর্ত্তন দেখি, চাঁদে কিন্তু সে সব কিছু নেই। সেখানে সব সময়ই একটা নিশ্চল, নীরব, স্তব্ধ ভাব। এ ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখলে ভারী অবাক লাগে। পৃথিবীর ওপর পড়ে থাকা একটা পাথরের টুকরো বাতাস, বৃষ্টি, ঝড়, জল প্রভৃতি সহ্য করে ক্রমাগত ক্ষয়ে যায়। কিন্তু চাঁদের দেশের পাথরের টুকরোর কোন ক্ষয়ক্ষতি নেই। সেই যে সৃষ্টির প্রথম থেকে এক জায়গায় পড়ে আছে, চিরদিন ঠিক সেই জায়গায় সেই ভাবেই থাকবে। সূর্য্য যখন ক্রমাগত তার প্রখর কিরণ পাথরটির ওপর ফেলবে তখন সে উত্তপ্ত হয়ে উঠবে—আর সূর্য্য অস্ত গেলে দীর্ঘ রাত তাকে আবার সুশীতল করে দেবে। একমাত্র তাপের এই পরিবর্ত্তন ছাড়া চাঁদের দেশে আর কোন পরিবর্ত্তন নেই।

চাঁদের আলো খুব মিষ্টি এ কথা তোমাদের বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। এই চাঁদের আলো নিয়ে কত কবিতা, গান, ছড়া এ পর্য্যন্ত লেখা হয়েছে তারও কোন সীমা-সংখ্যা নেই। কিন্তু শুনলে অবাক হবে, যে-চাঁদের আলোর এত সুখ্যাতি সেই চাঁদেরই নিজের কোন আলো নেই। চাঁদ ত নিরেট, ঠাণ্ডা, জমা-বরফের পিণ্ড। তার আবার আলো আসবে কোত্থেকে? তবে চাঁদের আলো কি মিথ্যে? না মিথ্যে নয়—তবে চাঁদ সূর্য্য থেকে যে আলো পায় সেইটেই পৃথিবীর দিকে প্রতিফলিত করে দেয়। তাকেই আমরা বলি চাঁদের কিরণ। যদি অমাবস্যার দু'-এক দিন পরে চাঁদের দিকে লক্ষ্য কর তাহ'লে কাস্তের মত সরু একফালি উজ্জ্বল চাঁদের অংশ দেখতে পাবে। তাছাড়া, সম্পূর্ণ গোলকটির একটি আবছা বহিঃরেখাও দেখতে পাবে। উজ্জ্বল অংশটি হচ্ছে সেইটুকু— যেটুকুর ওপর সূর্য্যের আলো এসে পড়ছে এবং আবছা বহিঃরেখা দেখা যায়, কারণ পৃথিবীর আলো গিয়ে চাঁদের ওপর পড়ছে। মনে রাখবে চাঁদের কাছে আমাদের পৃথিবীও একটি চাঁদ; এবং যেহেতু পৃথিবীর আকার চাঁদের চাইতে অনেক বড়, সেহেতু পৃথিবীর কিরণ চাঁদের কিরণের চাইতে প্রায় চোদ্দ গুণ উজ্জ্বল।

মনে কর, আমরা কয়েক জন চাঁদের রাজ্যে বেড়াতে গিয়েছি।

সেখান থেকে এই পৃথিবীকে কেমন দেখাবে বল ত ? এই পৃথিবী হবে তখন আমাদের চাঁদ কিন্তু অনেক গুণ বড় চাঁদ। এ চাঁদ কখন উঠবে না বা অস্ত যাবে না, কারণ চাঁদ তার একটা দিককেই পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে রাখে। আমরা যদি চাঁদের অপর পার্শ্বে গিয়ে হাজির হই তাহলে সেখান থেকে কোন দিনই পৃথিবীকে দেখতে পাব না। আগেই বলেছি, চাঁদের দেশে জল হাওয়া বরফ কিছু নেই। কাজেই চাঁদের দেশে গেলে ঐ সবগুলো যাতে না লাগে সে রকম ভাবে তৈরী হয়ে নিতে হবে। সেখানে কোন ঝড়-বাতাস নেই, মাথার ওপর দিয়ে মেঘও ভেসে যাবে না। সেখানে পরস্পরের সঙ্গে কথা কইলে কথাও শোনা যাবে না। কারণ শব্দের চলাচলের জন্য চাই হাওয়া। কাযেই চাঁদের দেশে হাজির হ'লে কথা কইতে হবে আকারে-ইঙ্গিতে। পারবে এ রকম করে দিন কাটাতে ?

চাঁদে গিয়ে আকাশের দিকে তাকালে দেখবে আকাশের রং কয়লার মত কালো। পৃথিবী থেকে যেমন সুনীল আকাশ দেখা যায় তেমনটি নয়। এর কারণ একটু বুঝিয়ে বলি। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে লাল, হলুদ ও নীল রং উপযুক্ত পরিমাণ মেশালে কালো রং সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর বাইরেকার যে আবহাওয়া—সেই আবহাওয়ার ভেতর দিয়ে যখন সূর্য্যের সাদা আলো পৃথিবীতে এসে পড়ে তখন সূর্য্যরশ্মির নীল রং বাদ দিয়ে আর সব কটা রং আবহাওয়ার ভেতর ডুবে যায়। ফলে পৃথিবী থেকে আকাশকে দেখায় নীল। কিন্তু চাঁদের চার পাশে কোন আবহাওয়া না থাকায় ঐ তিনটি রংই উপস্থিত থাকে। সে জন্যে চাঁদ থেকে আকাশের রং দেখাবে সম্পূর্ণ কালো।

এবার একটু চন্দ্রগ্রহণের কথা বলি। তোমরা জান যে পৃথিবী সূর্য্যের চার দিকে আপন কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে এবং চাঁদ করে পৃথিবীর চার দিকে প্রদক্ষিণ। এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে যখন পৃথিবী ঠিক সূর্য্য ও চাঁদের মাঝখানে এসে পড়বে তখন সূর্য্যের আলো আর চাঁদে গিয়ে পৌঁছবে না ; কারণ মাঝপথে পৃথিবী সে আলোকে আটকে দেবে। সূর্য্যের আলো চাঁদে না পৌঁছলে ত আমরা পৃথিবী থেকে চাঁদকে দেখতে পাব না। কাযেই তখন আমরা বলি চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হয়েছে। এই গ্রহণ খুব অল্প সময় থাকে কারণ পৃথিবী ও চাঁদ দু'জনেই দ্রুতবেগে ঘুরছে। ফলে, শীগ্‌গিরই চাঁদ সরে গিয়ে এমন জায়গায় আসবে যেখানে সূর্য্যের আলো গিয়ে তার ওপর পড়বে। ঠিক একই ভাবে সূর্য্যগ্রহণ হয় যখন চাঁদ পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝখানে গিয়ে পড়ে। পূর্ণগ্রহণ—সে চন্দ্রের কি বা সূর্য্যের কি—পৃথিবীর সব জায়গা থেকে একসঙ্গে দেখা যায় না। তাই গ্রহণের সময়—বিশেষ করে সূর্য্যগ্রহণের সময় বিজ্ঞানীদের ভেতর হুলুস্থুল পড়ে যায়। দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও অন্যান্য আরো অনেক রকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে তাঁরা ছোটেন সেই যায়গায় যেখান থেকে পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের খুব তাড়াতাড়ি পরীক্ষা-কার্য্য চালাতে হয়, কারণ পূর্ণগ্রহণ থাকে মাত্র তিন কি চার মিনিট, অনেক সময় দেখা যায় যে তাঁদের এত পরিশ্রম, এত অর্থ-ব্যয় সব বিফল হয়ে গেল, কারণ ঐ সময় আকাশে মেঘ থাকার ফলে কিছু দেখা গেল না। তোমাদের বোধ হয় মনে আছে যে, কিছু দিন আগে যখন সূর্য্যগ্রহণ হয়েছিল তখন পূর্ণগ্রাস দেখবার জন্য দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা ছুটেছিলেন দক্ষিণ-আফ্রিকায়। কারণ সেখান থেকেই পূর্ণগ্রহণ দেখা গিয়েছিল।

এই চাঁদের দেশে যাবার কথা নিয়ে বিজ্ঞানী-মহলে গভীর আলোচনা সুরু হয়েছে। তোমরা বোধ হয় শুনেছ যে, পদার্থের পরমাণুর ভেতর যে অভাবনীয় শক্তি লুকানো আছে, বিজ্ঞানীরা সেই শক্তিকে কাযে লাগিয়েছেন বোমার আকারে। এই বোমাকে বলা হয় এটম্ বোমা। তাঁরা এখন বলছেন যে, এই পরমাণু শক্তিকে কাযে লাগিয়ে এমন একটা রকেট তৈরী করা যাবে যাতে করে খুব দ্রুত চাঁদের দেশে গিয়ে হাজির হওয়া যাবে। তোমরা শুনে অবাক হবে যে, হুজুগের দেশ আমেরিকায় ইতিমধ্যে চাঁদের দেশে যাবার জন্যে টিকিট বিক্রীও সুরু হয়েছে !

গল্প হলেও মিথ্যে নয়

কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক বছর আগের কথা। ধরা যাক, পঞ্চাশ থেকে ষাট বছরের মধ্যে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের আই-এ (এখনকার আই-এস-সি) ক্লাসের বহু ছাত্রের মধ্যে কেবল এক জন ছাত্রের বিষয়েই তোমাদের কিছু বলব। তিনি খুব ধনী ছিলেন না, স্কুলের ছাত্রদের পড়িয়ে তাঁর নিজের পড়ার খরচ যোগাড় করতে হ'ত। এখন তাঁর ফাইন্যাল পরীক্ষার আগের দিনের ঘটনা ! একটি কাজে তিনি এমন তন্ময় ছিলেন যে সেদিন সমস্ত দিন তাঁর আর পরীক্ষার জন্যে পড়তে বসা হ'ল না। বিকেলে খেয়াল হ'ল অথচ সন্ধ্যা বেলাতেই আবার ছেলেরা আসবে। ছেলেরা আসতেই বাধ্য হয়ে তিনি তাদের বললেন, "ছাখো, কাল আমার পরীক্ষা সেই জন্যে আমি এখন একটু পড়ব, তোমরা বরং কাল সকালে এসো, আমি তোমাদের যাকে যা বোঝাবার বুঝিয়ে দেব।" ছাত্ররা বিদায় নিলে তিনি দরজা বন্ধ করে আলো জ্বেলে মোটা মোটা সব বিজ্ঞানের বই নিয়ে পড়তে বসলেন।

তারপর অনেকক্ষণ খুব মনোযোগ সহকারে পড়ছেন হঠাৎ বুঝতে পারলেন দরজা খুলে কারা যেন ঘরে প্রবেশ করল। ফিরে দেখলেন তাঁরই ছাত্ররা। একটু রেগে গিয়ে বললেন, "তোমাদের যে আমি একটু আগেই বললুম, কাল সকালে এসো, তাহ'লে আজ আবার কি করতে এলে ?" ছাত্রেরা বিস্মিত হয়ে যায়—পরস্পর মুখ-চাওয়াচায়ি করে, শেষে এক জন ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়, "আপনি তো স্যার গতকাল বলেছিলেন যে কাল সকালে এসো, তা আমরা তো সেই জন্যে আজ সকালে এলুম।" এইবার আস্তে আস্তে পরীক্ষার্থী গুরুটি বোধ হয় আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন, তাড়াতাড়ি উঠেই ঘরের দরজাটা খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক রোদ ঘরের মাটি স্পর্শ করল।

ব্যাপারটা কি হ'ল তোমরা কেউ বুঝতে পারলে ? সেই যে বিকেলে এই ছাত্রদের শিক্ষকটি পড়তে বসলেন তারপর পড়ার মধ্যে এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন—সারা রাত যে কেটে গেল তাতে তাঁর খেয়ালই নেই। সকালে যদি ঐ ছাত্রেরা তাঁকে না ডাকত তাহ'লে তিনি যে আরও কতক্ষণ পড়তেন তা কে জানে ?

এখন তোমাদের সকলের নিশ্চয়ই এই অদ্ভুতকর্মা লোকটির নাম জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, না ? ইনিই হচ্ছেন কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র।

ভল্গা থেকে গঙ্গা

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

(পূর্বানুবৃত্তি)

(পুরুহূত উপাখ্যানের শেষাংশ)

বৃদ্ধের কথাই সত্য হল—কিন্তু ২৫ বছর পরে। নিম্ন-মদ্র ও পরশুর লোকেরা ক্রমেই নির্মম ভাবে পুরু ও উচ্চ-মদ্রের লোকেদের শোষণ করতে থাকল। পুরু ও উচ্চ মদ্রদের মধ্যে যারা কাপড় ও কম্বল বুনত তারা যদিও স্বাধীন ছিল তবু তাদের আহার ও আভরণের জন্য প্রচুর খরচ হওয়ার ফলে তারা যে সব জিনিস তৈরী করত তা সুন্দর হলেও খুব বেশী দামে তাদের বিক্রয় করতে হত; অপর পক্ষে নিম্ন-দেশের লোকেদের অধীনে ক্রীতদাসেরা থাকার ফলে তাদের জিনিসপত্র ভাল না হলেও তারা সস্তায় দিতে পারত। তাই যখন এখানকার বণিকেরা উট বা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে ক্রীতদাসদের তৈরী এই সব জিনিস নিকটবর্তী অঞ্চলে বিক্রয় করতে আনত তখন তাদের মালপত্র খুবই বিক্রয় হত। ইতিমধ্যে তামার জিনিসপত্র উচ্চ-দেশের লোকদের কাছেও ক্রমে বেশী অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছিল। তার একটা কারণ ছিল যে বছরে বছরে এগুলো ক্রমেই সস্তা হয়ে উঠছিল এবং দ্বিতীয়ত মাটী বা কাঠের পাত্রের তুলনায় এগুলো টিকতও বেশী দিন। ২৫ বছর আগে যেমন খুব অল্প বাড়ীতেই তামার পাত্রাদি দেখা যেত, তেমনি এই সময় খুব কমই বাড়ী ছিল যেখানে এই পাত্রাদি ছিল না। সোনা ও রূপার ব্যবহারও অনুরূপ ভাবেই বাড়ছিল, আর এই সব দ্রব্যের পরিবর্তে তাদের দিতে হত খাদ্য, কম্বল, চামড়া, ঘোড়া ও গরু প্রভৃতি প্রাণী, ফলে তাদের এই সম্পদ দিনের পর দিন কমে আসছিল। উত্তর দেশের লোকেরা কয়েক জন নিজেরাই বণিক হবার চেষ্টা করল, কারণ তাদের সন্দেহের সূত্রপাত হয়েছিল যে দক্ষিণ দেশের লোকেরা তাদের প্রতারিত করছে। কিন্তু অম্লাস নদী দিয়ে দক্ষিণ দিকের পথ গেছে ওদেরই দেশের মধ্যে দিয়ে এধং তারা এই পথ বন্ধ রাখতে কৃতসঙ্কল্প ছিল। মাঝে মাঝে এই নিয়ে তুমুল যুদ্ধ হত। উত্তর-মদ্র এবং পুরুদেশের লোকেরা বাইরের দেশে যাবার অন্য পথ বের করবার বহু চেষ্টা করেছিল কিন্তু একবারও সফল হয়নি।

এই সব সংঘর্ষে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল এই যে, দক্ষিণ দেশের লোকেরা কোন সময় নিজেদের মধ্যে একত্র সংঘবদ্ধ হতে পারত না—অপর পক্ষে উত্তরের লোকেরা ছিল সবাই একজোট, তাই তারা যে-কোন সময়েই আক্রমণ বা প্রতি-আক্রমণে প্রস্তুত ছিল। এই সমস্ত সংঘর্ষে পুরুহূত তার বীরত্ব ও চাতুর্য্যের জন্য তার গোষ্ঠীর লোকদের শ্রদ্ধা অর্জন করে এবং মাত্র ৩০ বছরের তরুণ বয়সে সে গোষ্ঠীপতি নির্বাচিত হয়।

পুরুহূতের মনে এ ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, যদি মদ্রদের অসৎ ব্যবসায়-পদ্ধতি বন্ধ না করা যায় তাহলে তার গোষ্ঠীর লোকদের আর কল্যাণ নেই। তামার ব্যবহার কমা ত দূরের কথা, ক্রমেই বেড়ে চলেছিল এবং তাও শুধু অস্ত্রপাতি, তৈজসপত্র বা গহনা তৈরীর জন্য নয়—এই সময়ে সাধারণ লেন-দেনের ব্যাপারেও লোকে মাংস বা বস্ত্র প্রভৃতির পরিবর্তে তাম্র তরবারি বা ছুরিকা নিতে বেশী পছন্দ করত।

পুরুহূত তাদের বংশের সমস্ত লোককে সমবেত করে তাদের কাছে এই কথা উপস্থিত করল যে, তাদের সমস্ত ক্ষতির মূলে রয়েছে নিম্ন-দেশের বণিকেরা এবং তাদের লোভ। সকলেই এতে একমত হল যে, যদি না তারা তাদের পথ থেকে মদ্রদের সরিয়ে ফেলতে পারে তাহলে তাদের সকলকেই মদ্রদের তাঁবেদারে পরিণত হতে হবে—এমন দিনও আসতে পারে, যখন বস্তুত তাদের সবাইকে মদ্রদের ক্রীতদাসে পরিণত হতে হবে। এই অভিমত পুরু এবং মদ্র-বংশের প্রধানদের সম্মেলনেও স্থিরীকৃত হল। উভয় বংশের দ্বারাই পুরুহূত মিলিত সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক নির্বাচিত হল এবং তাকে 'রাজা' উপাধি দেওয়া হল। এই ভাবে ইতিহাসে প্রথম রাজা হল পুরুহূত।

বিপুল উদ্যম নিয়ে সে তার বাহিনীকে প্রস্তুত করতে সুরু করল। নূতন পদাধিকারের সাথে সাথেই সে অস্ত্র উৎপাদনের জন্য দু'জন ধাতুশিল্পী ক্রীতদাসকে তার রক্ষণাধীনে নিয়ে এল। উত্তর দেশের লোকেরা এই দু'জন কারিগরকে বিশেষ হৃদ্যতার সাথেই অভ্যর্থনা করল এবং তাদের সাহায্যে এরা তাম্র ব্যবহারের বেশ ভালো মত কৌশলই আয়ত্ত করল। এই ভাবে তাদের মধ্যে অনেক জন কারিগর শিক্ষিত হল। প্রতিবেশীরা (অর্থাৎ নিম্ন-দেশের লোকেরা) তাদের ক্রীতদাস দু'জনকে ফিরে পাবার জন্য বলপ্রয়োগ এবং পরামর্শ উভয়ই করতে প্রস্তুত হল। তাদের বাণিজ্য বিস্তারের সাথে সাথেই কিন্তু তাদের অস্ত্রকৌশলও কমে এসেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হয়ে তাই তারা শত্রুদের কাছে তামা বিক্রী বন্ধ করে দিল, কিন্তু খুব শীঘ্রই তারা বুঝতে পারল যে এতে করে সর্বনাশ হবে তাদের নিজেদের বাণিজ্যেরই। উত্তর-মদ্র বা কুরুকুলের লোকেরা আগে তামার তৈরী যে সব হাঁড়িকুড়ি কিনেছিল তাই ভাঙ্গিয়ে হাতিয়ার তৈরী করে তারা একপুরুষ কাটিয়ে দিতে পারত।

রাজা পুরুহূত এবং তার পক্ষের উভয় বংশের লোকেরা শত্রুদের ধ্বংস করতে প্রতিজ্ঞা নিল। পুরুহূত নিজেই ধাতুবিদ্যা শিখেছিল এবং তার পরামর্শ মতই তাম্র তরবারি, বর্শা এবং তীরাগ্র তৈরীর উন্নত পদ্ধতির প্রস্তাব গৃহীত হল। সে কতকগুলো তামার বর্ম তৈরী করালো—সেইগুলো ব্যবহার করে যাতে তার দলের সব থেকে বেশী সাহসী ও কৌশলী যোদ্ধাকে আঘাতের হাত থেকে বাঁচান যায়।

সে এক-এক বারে এক-এক দল শত্রুকে শায়েস্তা করার পরিকল্পনা নিল এবং তার প্রথম শিকার হল পরশুরা। তখন শীতকাল—পরশুদের অধিকাংশই তখন বাণিজ্য-ব্যপদেশে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং রাজা (পুরুহূত) দেখল—এই সুযোগ। সে তার সৈন্যদের খুব চতুরতার সাথে লড়াই করতে শিখিয়েছিল। যদিও এই দুই বংশের মধ্যেকার বিরোধ ছিল দীর্ঘ দিনের তবু নিম্ন-দেশের লোকেরা

প্রসাধনে মাধুর্য এনে দেয়....

মার্গোসোপ

নিমের সুগন্ধি টয়লেট সাবান। দেহের মালিন্য মুক্ত করে। বর্ণ উজ্জ্বল করে।

ভৃঙ্গল...

সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল। কেশ ভ্রমর কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত হয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখে।

লাবণি স্নো ও ক্রীম

মুখশ্রীর সৌন্দর্য ও লালিত্য বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। দিনের প্রসাধনে স্নো ও রাত্রে ক্রীম ব্যবহার্য।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

কলিকাতা - ২৯

এমন ধারণাও করেনি যে তাদের শত্রুরা (পুরুরা) এমন প্রচণ্ড এবং অতর্কিত আক্রমণ করবে—যে আক্রমণে অস্নাস উপত্যকা থেকে তাদের নামের নিশানাই মিটে যাবে।

রাজা তার নিজের নেতৃত্বে বাছাই-করা কয়েক জন যোদ্ধাকে নিয়ে নিজেই আক্রমণ সুরু করল। পরশুদের অবশ্য এই আক্রমণের অর্থ বুঝতে বেশী সময় লাগল না এবং কি ঘটছে এটা বুঝতে পারার সাথে সাথেই এবং যখন তারা দেখল যে তাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন তখন তারা মরিয়া হয়ে লড়াই সুরু করল। কিন্তু আক্রমণটা এত দ্রুত হচ্ছিল যে, তারা বিভিন্ন পল্লী থেকে তাদের যোদ্ধাদের সমবেত করার সময়ই পেল না। শত্রুরা একটার পর একটা পল্লী দখল করতে লাগল এবং হাজারে হাজারে অধিবাসীদের হত্যা করতে লাগল, কাউকেই তারা বন্দী করল না। এই বিপর্য্যয়ের সংবাদ যখন অন্য পারে দক্ষিণ-মদ্রদের দেশে গিয়ে পৌঁছুল তখন তাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করবার আর সময় ছিল না। অবশেষে মাত্র কয়েকটি গ্রাম আর অবশিষ্ট রইল এবং সেগুলো দখল করবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যা সৈন্য রেখে রাজা পুরুহুত কুরু এলেকাতে প্রবেশ করল। দক্ষিণ-মদ্রেরা প্রতি-আক্রমণ করল, কিন্তু তারাও পরশুদের মত একই প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হল। এই দুই বংশের একজন পুরুষও—সে বালক, বৃদ্ধ বা যুবা যাই হোক না কেন—কেউই জীবিত রইল না, আর মেয়েরা বিজেতাদের অন্দরমহলে নীত হল। যে ক্রীতদাসদের বন্দী করা হয়েছিল তাদের মধ্যে যে স্বদেশে ফিরে যেতে চাইল তাদের ফিরে যেতে দেওয়া হল। পরাজিত গোষ্ঠীদ্বয়ের কয়েক জন স্ত্রী-পুরুষ জীবন নিয়ে পালিয়ে গেল এবং অস্নাস উপত্যকা ত্যাগ করে তারা পশ্চিম দিকে চলে গেল। এদেরই বংশধররা পরবর্তী কালে পারস্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল—তখন এদের নাম হয়েছিল 'মেদি' (মদ্র) এবং পারশিয়ান (পরশু)। রাজা পুরুহুতের নেতৃত্বে পূর্বপুরুষদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার হয়েছিল সে কথা তারা কোন দিনই ভুলতে পারেনি। এই জন্যই ইরাণীরা ইন্দ্রকে (বর্ষা—দেবতা অথবা রাজা) তাদের নির্মম শত্রু বলে মনে করত। সমগ্র অস্নাস উপত্যকা উত্তর-মদ্র এবং পুরুদের অধীনে এসেছিল এবং নদীর উভয় তীর তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল।

এই উপত্যকা অধিবাসীরা নূতন জীবনধারা পরিত্যাগ করে পুরাতন রীতিনীতি প্রচলনের জন্য দৃঢ় প্রচেষ্টা করেছিল। কিন্তু তামা পরিত্যাগ করে পাথরের যন্ত্রপাতি পুনঃপ্রচলন করা সম্ভব হল না—তাই তামা পাওয়ার জন্য তাদের এই পার্বত্য উপত্যকার বাইরের জগতের সাথে বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করতেই হল।

দাসপ্রথাকে অবশ্য তারা কোন দিন স্বীকার করল না এবং তারা বাইরের কাউকেই তাদের উপত্যকার স্থায়ী বাসিন্দা হতেও দিল না। অনেক শতাব্দী পরে যখন লোকেরা পুরুহুতের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল কিংবা তাকে দেবতা বানিয়ে নিয়েছিল—তখন এই বংশ এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল যে তাদের পক্ষে এই উপত্যকায় জীবিকা-সংস্থান আর সম্ভবপর রইল না এবং তখন তাই অনেকে দক্ষিণ দিকে বসতিস্থাপনের জন্য অগ্রসর হল।

এক সময়ে প্রত্যেকটি গোষ্ঠীই ছিল স্বপ্রধান এবং যখন গোষ্ঠী-পতিরা একেশ্বর হয়ে উঠেছিল তখনও তাদের জন-সমর্থনের উপর নির্ভর করতে হত। কিন্তু অস্নাস নদীতীরের এই গত যুদ্ধেই একাধিক গোষ্ঠীর উপর একজন অধিনায়ক বা রাজার সৃষ্টি হল।

পঞ্চম উপাখ্যান

পুরুধন আখ্যায়িকা

স্থান—উত্তর সুবাত, পাত্র—আর্য্যভারতীয়, কাল—খৃঃ পূঃ ২০০০

[প্রায় ১৭০ পুরুষ আগেকার এক সংঘর্ষের উপাখ্যান এটি। আর্য্যদের সে সময়কার পার্বত্য-জীবনে দাসপ্রথা তখনও প্রচলিত হয়নি। তাম্র ও পিতলের ব্যবহার এবং বাণিজ্যের বিস্তৃতি তখন বাড়তির দিকে।]

নদীর বাম তীরে সুবাস্তু অঞ্চল—সবুজ পাহাড়ে ঘেরা, খরস্রোতা ঝর্ণাধারায় ধোয়া এবং বহুদূর বিস্তৃত আন্দোলিত শস্যক্ষেত্রে ভরা এই অঞ্চল দেখলে যেন মনে হত সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু যে জিনিসের আর্য্যরা সব থেকে বেশী গর্ব করত তা ছিল তাদের গৃহগুলো—দেওয়ালগুলো তাদের সব পাথরের, পাইন শাখায় তৈরী তাদের গৃহচূড়া। এই জন্যেই এই জনপদের নাম তারা দিয়েছিল 'সুবাস্তু' (সুবাত—সুগৃহের দেশ)। অস্নাস তীরভূমি ত্যাগ করে আর্য্যরা পামীর ও দুরধিগম্য হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে দুর্গম পথ ধরে এগিয়ে এসেছিল কুনার ও পাঞ্জকোরার মত নদী পার হয়ে। এই দীর্ঘ-পথের স্মৃতি আর্য্যদের বংশধারায় বহু দিন ধরেই বেঁচেছিল—আজও মঙ্গলপুরে (মাঙ্গালোরে) ইন্দ্র উৎসবের এত যে ব্যাপক রেওয়াজ রয়েছে তারও কারণ বোধ হয় ইন্দ্রের (রাজার) প্রতি সেই দুর্গম পার্বত্যপথে তাদের নিরাপদে পরিচালনার জন্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

মঙ্গলপুরে পুরুরা তাদের সুন্দর গৃহগুলি পাইন শাখায় ও নানা রংএর পতাকায় সাজিয়েছিল। পুরুধন একটি বিশেষ ধরণের লোহিত পতাকায় তার গৃহটি সাজিয়েছিল। সেগুলো দেখে তার প্রতিবেশী সুমেধ একটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল—

"সখ' পুরু, তোমার এই পতাকাগুলো ত খুব সুন্দর, বড় মোলায়েম। আমরা ত এ ধরণের কাপড় এখানে তৈরী করি না। নিশ্চয়ই কোন নতুন ধরণের ভেড়ার পশমে এ কাপড় তৈরী।"

"না সুমেধ, কোন ভেড়ার পশমে এ কাপড় তৈরী নয়।"

"তাহলে?"

"এই পশম হয় গাছে। আমরা সাধারণত যে পশম ব্যবহার করি তা ভেড়ার গায়ে হয়, আর এই পশম ঠিক একই রকমে গাছে জন্মায়।"

"এই রকম শুনেছি বটে, কিন্তু এ ধরণের গাছ কখনও দেখিনি।" সুমেধ একটা লাটাইতে একদলা নতুন পশম জড়িয়ে সেটা উরুতে ঘঁষে ঘুরিয়ে দিল এবং বলল—"আঃ, যাদের গাছে এমনি পশম জন্মায়, না জানি তারা কত ভাগ্যবান! আচ্ছা, সে গাছের চারা আমাদের এখানে লাগানো যায় না?"

"ঠিক বলতে পারি না। কতটা শীতাতপ সে গাছ সহ্য করতে পারে তাও জানি না। আর ঐ লোকেদের ভাগ্য সম্পর্কে তুমি যা বলছিলে সুমেধ, তাদের আহার্য্য যে মাংস তা ত আর গাছে হতে পারে না, কি বল?"

"এক দেশে যখন পশম গাছে জন্মায় তখন মাংসও গাছে জন্মায় এমন দেশও হয়ত থাকতে পারে? আচ্ছা এই কাপড়ের দাম কি রকম?

"পশমী কাপড়ের তুলনায় অনেক সস্তা—তবে বেশী দিন টেকে না।"

"তুমি এগুলো কোত্থেকে কিনেছিলে ?"

"অসুর জাতির কাছ থেকে। তাদের দেশ এখান থেকে মাত্র ৫০ মাইল দূরে, তারা পরিধানের জন্য এগুলোই ব্যবহার করে।"

"যদি এই কাপড় এতই সস্তা তাহলে আমরাও কেন এ জিনিস ব্যবহার করি না ?"

"শীতকালে এ কাপড় কোন কাজে আসবে না।"

"তাহলে অসুররা কি করে এ কাপড় ব্যবহার করে ?"

"তাদের দেশে শীত এত প্রবল নয়। সেখানে কখনও বরফ পড়ে না।"

"আচ্ছা, বাণিজ্যের জন্য তুমি শুধু দক্ষিণ দেশেই কেন যাও ? পুব, পশ্চিম বা উত্তর দিকে যাও না কেন ?"

"দক্ষিণ দিকে বাণিজ্যে লাভও বেশী—বিভিন্ন ধরণের মালও সেদিকে বেশী। একটা অবশ্য খুবই অসুবিধা, ওদিকে গরমটা বড় বেশী—এক ঢোক ঠাণ্ডা ভাল জলের জন্যে যেন দম ফুরিয়ে আসে।"

'সেখানকার অধিবাসীরা কি ধরণের মানুষ ?"

"খুব বেঁটে, তামার মত গায়ের রং, মুখাকৃতি কুৎসিত, নাকগুলো তাদের এতই চাপা ও চ্যাপ্টা যে দেখলে মনে হয় যেন ওদের নাকই নেই। আর তাদের দেশে একটা বড় খারাপ রীতি আছে—তা হচ্ছে মানুষ কেনা-বেচা করা।"

"কি বললে ?"

"ওরা এই ব্যবসায়কে বলে দাস-ব্যবসায়।"

"আচ্ছা, দাস এবং তাদের প্রভুদের মধ্যে কি মুখ বা আকৃতিতে কোন পার্থক্য আছে ?

"না। দাসেরা যেন তাদের প্রভুদের অস্থাবর সম্পত্তি—দেহে-মনে তারা তাদের প্রভুদের অধীন।"

"ইন্দ্রদেব আমাকে রক্ষা করুন, এমন মানুষদের যেন আমায় দেখতে না হয়।"

"ভাই সুমেধ, তোমার লাটাই ত এখনও ঘুরছে, কিন্তু যজ্ঞে যাবার সময় কি এখনও হয়নি ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। ইন্দ্রের দয়াতেই ত আমরা সবল পশুপাল এবং ভাল সোমরস পাচ্ছি। এমন কোন্ হতভাগা আছে বল যে, ইন্দ্রের যজ্ঞে অংশ নেবে না ?"

"তোমার ভাগ্যবতী স্ত্রীর কি সংবাদ ? তাকে ত আজকাল সভাস্থলে একনজরও কেউ দেখতে পায় না !"

"তোমার কাছে সেটা খুবই অপ্রীতিকর, তাই না ?"

"অপ্রীতিকর ! না, সে কথা হচ্ছে না। এ কথা ত ঠিক সুমেধ যে, তোমার বৃদ্ধ বয়সে এক তরুণীর সাথে প্রেম করাটা জিদ ছাড়া কিছু নয় !"

"পঞ্চাশ বছরে আর লোকে এমন কিছু বৃদ্ধ হয় না !"

"তাহলেও, পঞ্চাশ আর বিশে অনেক তফাৎ আছে।"

"সে তখন প্রত্যাখ্যান করলেই পারত।"

"সে সময়ে তুমি তোমার দাড়ি-গোঁফ চুমরিয়ে এমন একটা চেহারা করেছিলে যে তোমার বয়স যেন ১৮ বছর। তাছাড়া উঁধার বাবা-মার নজর ছিল তোমার পশুপালের

কুরুবকের পরত চূড়া
কালো কেশের মাঝে,
লীলা কমল রইত হাতে
কিজানি কোন্ কাজে।
অলক সাজত কুন্দ ফুলে,
শিরীষ পরত কর্ণ মূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিত
নব নীপের মালা।
ধারা যন্ত্রে স্নানের শেষে
ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে,
লোধ্র ফুলের শুভ্র রেণু
মাখত মুখে বালা
কালাগুরুর গুরু গন্ধ
লেগে থাকত সাজে,
কুরুবকের পরত মালা
কালো কেশের মাঝে।"

— রবীন্দ্রনাথ

সেকালে
তরুণীর রূপ চর্চ্চার উপাদান যোগাত প্রকৃতি
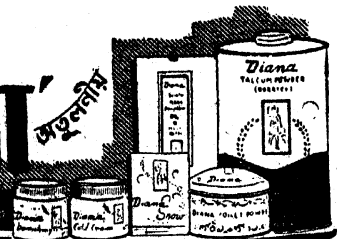
উপর, তোমার পঞ্চাশ বছর বয়সের দিকে তাদের খেয়াল ছিল না।"

"এই ধরণের কথাবার্তা আর কখনও বলবে না পুরু। তোমরা ছেলে-ছোকরারা সব সময়…"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আর আমি বলব না। ঐ শোন বাজনা সুরু হয়ে গেছে—উৎসব এবার আরম্ভ হবে।

"তুমি ইচ্ছা করেই ত আমায় দেরী করিয়ে দিলে—আমায় এখন খানিকটা গালাগাল খেতে হবে।"

"চলো তাহলে, উষাকেও সংগে নিয়ে চলো।"

"সে কি এতক্ষণ বাড়ীতে বসে আছে তুমি ভেবেছ?"

"যাক, এই পশম আর লাটাইটা রেখে তাহলে চলো এখন।"

"আরে এগুলো সঙ্গে থাকলেও উৎসবের কিছু অঙ্গহানি হবে না।"

"ও, এই সবের জন্তই ত উষা তোমাকে পছন্দ করতে পারে না।"

"সে ঠিক আমাকে পছন্দ করতে পারে—এক যদি মঙ্গলপুরের যুবক তোমরা তাকে তা করতে দাও।"

কথা বলতে বলতে দুই সঙ্গী সহরের সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে পৌছুল বলিদানের জন্য তৈরী বেদীটার নিকটে। রাস্তায় যে কোন যুবক বা যুবতীর সাথে পুরুধনের দেখা হল, সেই তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো—পুরুধনও মাথা হেলিয়ে চোখ ঠেরে তার জবাব দিল। এক জন যুবক যখন এরকম করছিল তখন সুমেধের দৃষ্টি পড়ে গেল সেই দিকে এবং সে রাগে গর্জাতে গর্জাতে বলল—"এই যুবকগুলোই মঙ্গলপুরের কলঙ্ক!"

"কি ব্যাপার সখা?"

"সখা! যত সব বাজে! আমাকে দেখেই ওরা হাসছে।"

"ওটা একটা বদমাস, সে ত তুমি জানো বন্ধু! ওর কাজে তুমি গুরুত্ব দাও কেন?"

"না, সারা মঙ্গলপুরে এখন আর একটাও ভাল লোক দেখি না?"

বেদীটার চার পাশে বিস্তৃত একটা সমান জায়গা ছিল—সেখানে মঞ্চের উপর এদিক-সেদিকে সব পাইন পাতায় ঢাকা বালিশ আর উৎসবের ফুলমালা প্রভৃতি ছড়ানো ছিল। বেদীটার নিকটে নগরের নরনারীরা সব ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল—কিন্তু আসল বৃহৎ সমাবেশটা অবশ্য হওয়ার কথা সন্ধ্যায়, তখন পুরু-বংশের প্রত্যেকটি নরনারী এই উৎসবে এসে যোগ দেবে, সুবত নদীর ওপার থেকে মদ্ররাও আসবে।

উষা ঐ দুটি সঙ্গীকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি তাদের কাছে গিয়ে সুমেধের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে ঠিক তরুণী প্রেমিকার মত ভঙ্গী করে বলল—"প্রিয় সুমেধ! সারা সকাল থেকে তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমি সারা হয়ে গেছি, তবু তোমার দেখা পাইনি!"

"কেন, ব্যাপার কি? আমি কি কোথাও গিয়ে মারা পড়েছিলাম না কি?"

"এমন কথা বোলো না সুমেধ! তুমি চলে গিয়ে আমাকে জীবিত অবস্থায় বিধবা করে যেও না প্রিয়।"

"পুরু-বংশে বিধবাদের কি আর তরুণ বান্ধবের অভাব আছে?"

পুরুধন জিজ্ঞাসা করল—"তাহলে তুমি কি বলতে চাও যে, যত দিন স্বামী জীবিত থাকে তত দিনই মাত্র স্ত্রী স্বামীর আত্মীয়দের অপছন্দ করে?"

সুমেধ জোর দিয়ে বলল—"তাই ত কথা। দেখ না, উষা আমাকে যেন বোকা বানাতে চায়। সে ভোর বেলায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে, জানি না এর মধ্যে সে ক'টা বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেয়েছে, আবার রাত্রে হয়ত একজন এসে বলবে ওকে—'আমার সাথে নাচো'; অন্য একজন হয়ত বলবে—'না, আমার সাথে নাচো।' এই নিয়ে বেধে যাবে ঝগড়া, রক্তারক্তি, আর বউএর জ্বালায় গালমন্দ খাবে বেচারী সুমেধ।"

উষা তার হাত ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত স্বর ও চাউনি নিয়ে চীৎকার করে বলল—"তুমি কি আমাকে বাক্সে বন্ধ করে রাখতে চাও নাকি? যাও না, নিজের উনুনের পাশে গিয়ে বসে রাগ ঝাড়ো না। আমি আমার পথ দেখছি!"

উষা পুরুধনের দিকে চেয়ে একটু মুচকি হাসল—সে হাসি দেখতে পেল না আর কেউ, তার পরই সে ঘুরে বেদীর কাছে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল।

এই দিনটা ছিল বছরের মধ্যে একটি দিন—যখন অতীতের অক্ষাসের তীরের দিনের মত বংশের সবার পশুপালের মধ্য থেকে বেছে সব থেকে বড় ঘোড়াটা ইন্দ্রের পূজায় বলি দেওয়া হত। এখানে এখন যদিও ঘোড়ার মাংস খাওয়া হত না, তবু এই বলির সমস্ত অংশটাই ভাগ করে দেওয়া হত এবং সবাই শ্রদ্ধার সাথে তা নিত। সব গোষ্ঠীপ্রধানেরাই—বর্তমানে যাদের বলা হত কুলপতি—তারা তার গোষ্ঠীর সকলকে নিয়ে এই অশ্বমেধ যজ্ঞে যোগ দিত। এই বলিদানের সব অনুষ্ঠানের পদ্ধতিই এদের প্রত্যেকেরই জানা ছিল এবং অক্ষাস উপত্যকার অধিবাসীরা যে মন্ত্র পড়ে ইন্দ্রের কাছে উৎসর্গ দিত তা তাদের সবটাই মুখস্থ ছিল। বাদ্য ও মন্ত্রের সহযোগে অশ্ব বলিদান সমাপ্ত হল—শান্তিবারি ছিটানো থেকে সুরু করে বলিদান সবটাই হল। তার পর ঘোড়াটির চামড়া ছাড়িয়ে তার দেহটা খণ্ড-খণ্ড করে কাটা হল—পরে কয়েক খণ্ড মাংস ঐ অবস্থাতেই বা মসলা মেখে আহুতি হিসাবে আগুনের মধ্যে দেওয়া হল।

বলির প্রসাদ বাটতে বাটতে সন্ধ্যা হয়ে এল। ইতিমধ্যে যজ্ঞস্থল জনাকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং এদিনে সবাই এসেছিল তাদের শ্রেষ্ঠ পোষাক পরে। মেয়েরা পরেছিল নরম রঙ্গীন শাল—কোমরের কাছে তা জড়ানো ছিল নানা রংএর কোমরবন্ধে এবং তার নীচেয় ছিল সুন্দর বস্ত্রাভরণ। প্রায় প্রত্যেকের কানেই ছিল সোনার কুণ্ডল। বসন্ত শেষ হয়ে আসছিল—আজকের সারা উপত্যকা ছিল ফুটন্ত ফুলে ভরা, নারী-পুরুষেরা সমভাবেই তাদের লম্বা চুল সাজিয়েছিল ফুল দিয়ে, কারণ এই উৎসবের দিনে কামনা জাগাবার উপযোগী সব কিছু করার অধিকারই তাদের ছিল। রাত্রে যখন উৎসবের সজ্জায় সুসজ্জিতা উষা পুরুধনের হাতে হাত মিলিয়ে ঘুরছিল—সুমেধের দৃষ্টি পড়ল তখন একবার তাদের উপর, সে তার মুখ ফিরিয়ে নিল। বেচারা আর কি-ই বা করতে পারত? ইন্দ্রের উৎসবের দিনে তার রাগ করবার অধিকার পর্য্যন্ত ছিল না—মাত্র গত বছরেই এই জন্তে সে কুলপতির রোষভাজন হয়েছিল।

আজকের রাতে সোমরস আর মইয়ের ছড়াছড়ি পড়ে গিয়েছিল। সুস্বাদু অশ্বমাংস, গোমাংস এবং সোমরস—নানা গ্রামের দেওয়া ভোগে জমে স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছিল। সর্বত্রই নতুন প্রেমের

উত্তেজনায় মত্ত যুবজনের সম্ভাষণ শোনা যাচ্ছিল। একখণ্ড মাংস মুখে পুরে একপাত্র সোমরস পান করে তারা নাচের বাজনার তালে তালে—বাজনাটা সব সময়ই বাজছিল কিংবা বাজাবার জন্য তৈরীই ছিল—খানিকটা নেচে অন্য গাঁয়ের লোকেদের অভ্যর্থনার জায়গায় গিয়ে হাজির হচ্ছিল। সারা বংশের লোকেদের উদ্যোগে উৎসবের আয়োজনও হয়েছিল বিরাট আকারে—আর নাচের জন্য আসরও ছিল বিরাট বিস্তৃত।

ইন্দ্র উৎসব ছিল যুবজনের মহোৎসব। এদিন সারা দিন-রাত তাদের কোন-কিছু করতেই বাধা-নিষেধ ছিল না।

২

উত্তর-সুবতের এই অঞ্চল পশু ও শস্যসম্ভারে পূর্ণ ছিল—এখানকার অধিবাসীরাও তাই ধনী ও সুখী ছিল। আর অন্য যে সব জিনিস তারা ব্যবহার করত—তার মধ্যে প্রধান ছিল তামা এবং বিলাস দ্রব্যের মধ্যে ছিল সোনা, রূপা এবং কয়েক ধরণের মণিমাণিক্য এবং এগুলোর চাহিদা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছিল। এই সব সরবরাহ করার জন্য প্রত্যেক বছরেই সুবত ও কাবুল নদীর সঙ্গমস্থলে অস্থায়ী তাঁবু ও উপনিবেশ গড়ে উঠত।

মনে হয়, আর্য্যরা এই অসুর ঘাঁটীর নাম দিয়েছিল পরে পুস্কলাবতী (চারসাদা) এবং আজও আমরা সেই নামই ব্যবহার করি। শীতের মাঝামাঝি সময়ে সুবত, পাঁজকোরা এবং অন্যান্য পার্বত্য উপত্যকায় যে সমস্ত জাতি বাস করত—যেমন কুরু, পুরু, গান্ধার, মদ্র, মল্ল, শিবি, উশীনর প্রভৃতি—তারা তাদের ঘোড়া, কম্বল এবং অন্যান্য মুদ্রা নিয়ে এসে পুস্কলাবতীর বাইরে সমতলভূমিতে তাদের তাঁবু খাটাত। অসুর বণিকেরাও তাদের জিনিসপত্র নিয়ে এসে বিনিময়ের জন্য উপস্থিত করত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই প্রথা বিকাশ লাভ করছিল।

এ বছরে পুস্কলাবতীতে পুরুদের যে বণিক দল এসেছিল পুরুধন ছিল তাদের প্রধান। গত কয়েক বছর ধরেই পর্বতবাসীদের মধ্যে এই অভিযোগ শোনা যাচ্ছিল যে, অসুররা তাদের ভীষণ ভাবে ঠকাচ্ছে। নগরবাসী হিসাবে অসুররা পর্বতবাসীদের থেকে অনেক বেশী চতুর ছিল। তারা এই পর্বতবাসীদের মনে করত অসভ্য বর্বর এবং তাদের এই ধারণাতে কিছুটা সত্যতাও ছিল। কিন্তু এই পীতকেশী, নীলনয়ন আর্য্য অশ্বারোহীরা কোনক্রমেই নিজেদের অসুর নাগরিকদের থেকে নীচু বলে স্বীকার করতে রাজী ছিল না। ক্রমে যখন পুরুরা অনেকে—যেমন পুরুধন একজন—অসুরদের সমাজের সাথে মিশতে এবং তাদের কথার অর্থ কিছুটা বুঝতে আরম্ভ করল, তখন তারা দেখতে পেল যে, অসুররা তাদের পশু ছাড়া অন্য কিছু মনে করে না। এই ভাবেই দুই জাতির মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হল।

অসুরদের নগরগুলো ছিল খুব সুন্দর। পোড়া ইটের ইমারত তৈরী করত তারা—তাছাড়া জলনালী, স্নানাগার, রাস্তা, কূপ প্রভৃতিও ছিল। এমন কি আর্য্যরাও পুস্কলাবতীর সৌন্দর্য্যের কথা অস্বীকার করত না। তারা কোন কোন অসুর-রমণীকে সুন্দরী বলতেও রাজী ছিল—যদিও তাদের নাক, চুল এবং দেহাকৃতির তারা সমালোচনা করত; কিন্তু পাইন-বনে আচ্ছাদিত পাহাড়ে-ঘেরা নানা রংএর কাঠের অলিন্দে সাজানো পরিচ্ছন্ন আবাসগৃহের সারিতে
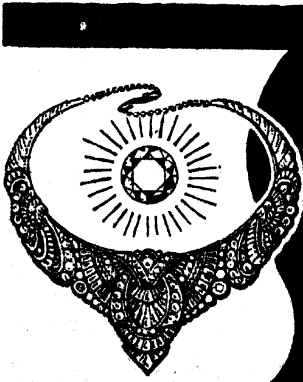
গিনি স্বর্ণের ও জড়োয়া অলঙ্কার-শিল্পের বিশিষ্টতা ও মজুরী হ্রাস সম্বন্ধে পরীক্ষা প্রার্থনীয়। গ্রহ-রত্নাদি নির্ব্বাচনে একমাত্র নির্ভর-যোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ভরা তাদের মঙ্গলপুর যে কোন অংশে পুস্কলাবতী থেকে খারাপ এ কথা স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত ছিল না। পুস্কলাবতীতে একটানা এক মাসও তারা টিকতে পারত না—তাদের মন অনবরত টানত তাদের জন্মস্থানের দিকে। পুস্কলাবতীর নীচে দিয়েও একই সুবত নদী বইত—কিন্তু এখানে যেন একই নদীর জলের স্বাদ পৃথক্ রকম হয়ে যেত। তারা বলত অসুরদের স্পর্শই এই পবিত্র জলধারাকে অপবিত্র করে দিয়েছে। যা হোক, আর্য্যরা অসুরদের নিজেদের সমকক্ষ বলতেও প্রস্তুত ছিল না—বিশেষ করে যখন তারা দেখত যে অসুররা দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ ক্রীতদাস রাখে এবং তাদের নগরের গৃহের সমতল ছাদের উপরে বসে বসে স্বৈরিণী নারীরা দেহ-বিক্রয়ের ব্যবসা করে।

বেসরকারী ভাবে অবশ্য এই দুই জাতির অনেক লোকের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। অসুরদের রাজা পুস্কলাবতী থেকে অনেক দূরে সিন্ধুনদের তীরে এক নগরে বাস করত—পুরুধন তাই তাকে কোন দিন দেখেনি, তবে রাজার স্থানীয় প্রতিনিধিকে সে দেখেছিল—বেঁটে, মোটা, আলসে একটি লোক—মদের নেশায় চোখ দুটো তার সব সময়ই ঢুলু-ঢুলু করত আর তার সর্বাঙ্গে সব সময়ই উজ্জল উজ্জল সোনা-রূপার গহনা পরা থাকত। তার কানের নীচেটা ছিল ছিদ্র করা এবং তা তার কাঁধ পর্য্যন্ত ঝুলে পড়েছিল। পুরুধনের চোখে এই রাজপ্রতিনিধিটি ছিল কদর্য্যতা এবং নির্বুদ্ধিতার প্রতিমূর্তি এবং যে রাজার প্রতিনিধি ছিল এই রকম সেই রাজা সম্পর্কেও কোন উচ্চ ধারণা পুরুধনেরা পোষণ করত না। পুরুধন শুনেছিল যে, এই রাজপ্রতিনিধিটি হচ্ছে রাজার শ্যালক এবং সে এই পদে শুধু ঐ গুণের অধিকারেই নিযুক্ত হয়েছে।

কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে অসুরদের মধ্যে বাস করার সুযোগে পুরুধনের কাছে অসুর জাতির নানা দুর্বলতা ধরা পড়েছিল। অসুরদের মধ্যে উচ্চবর্ণের লোকেরা হয়ত বুদ্ধিমান ছিল—কিন্তু তাদের অনেকে ক্রমেই কাপুরুষ হয়ে উঠছিল, তারা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কাজে সশস্ত্র ক্রীতদাসদের উপরেই নির্ভর করত। অবশ্য এতে করে কোন দুর্বল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইতে তাদের সুবিধাই হত, কিন্তু এই ধরণের বাহিনী দিয়ে প্রবল শত্রুকে প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। অসুরদের শাসনকর্তারা—রাজা এবং তার প্রতিনিধিরা—আরাম উপভোগকেই তাদের জীবনের একমাত্র ব্রত করে নিয়েছিল। প্রত্যেক শাসনকর্তারই শত শত উপপত্নী ও দাসী থাকত, বস্তুত তাদের পরিবারের সব স্ত্রীলোকই ক্রীতদাসী বলে বিবেচিত হত। বর্তমান রাজার অন্তঃপুরে বলপ্রয়োগে অপহৃতা হয়ে কয়েক জন আর্য্য-রমণীও নীত হয়েছিল এবং এদের এই দুর্ভাগ্য আর্য্যদের মনে প্রচুর উত্তেজনাও সৃষ্টি করেছিল। ভাগ্যক্রমে অসুরদের রাজধানী ছিল অনেক দূরে এবং কোন আর্য্য তখনও সেখানে যায়নি, ফলে আর্য্যরা এই আর্য্যরমণীদের দুর্ভাগ্যের কথা কিংবদন্তী হিসাবেই গ্রহণ করত।

পুস্কলাবতীর জিনিসগুলি থেকে নানা ধরণের অলঙ্কার, সুতীবস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য জিনিসপত্র শুধু সুবাত অঞ্চলে নয়, কুনারের উত্তর পার্বত্য অঞ্চলের যাযাবরদের বসতিস্থানেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সুবাতের স্বর্ণকেশী বিলাসিনী রমণীরা অসুরশিল্পীদের হাতে তৈরী রত্নভূষণের জন্যে সবাই যেন উন্মাদিনী হয়ে উঠেছিল—তাই প্রত্যেক বছরেই ক্রমে বেশী সংখ্যায় এরা পুস্কলাবতীগামী বণিকদের সঙ্গে আসতে আরম্ভ করেছিল।

ইতিমধ্যে হতভাগ্য সুমেধ সত্যিই উষাকে বিধবা রেখে গত হয়েছিল এবং উষা তখন তার স্বামীর জ্ঞাতিভ্রাতা পুরুধনের স্ত্রী হয়েছিল। এ বছরে সেও পুস্কলাবতীতে এসেছিল। অসুর-রাজপ্রতিনিধির লোকেরা দেখল যে আগন্তুকদের শিবিরে অনেক সুন্দরীর আগমন হয়েছে এবং তাদের প্রভু এই সংবাদ পেয়ে সিদ্ধান্ত করল যে যাত্রী দল যখন ঘরে ফিরবার পথে গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করবে সে সময়ে তাদের আক্রমণ করে সুন্দরীদের হরণ করতে হবে। এই পরিকল্পনাটা হল অত্যন্ত নির্বুদ্ধির মত—কারণ পর্বতবাসীরা যে কি পরিমাণ যুদ্ধপ্রিয় তা তার অজানা ছিল না—কিন্তু এই শাসনকর্তাটির মগজে বুদ্ধি ছিল না একটুও।

সহরের ধনী বণিকেরাও নানা কারণে এই রাজপ্রতিনিধিটিকে ঘৃণা করত। ইদানীং সে আবার একজন বণিকের একটি সুন্দরী কন্যাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল এবং এই বণিকটি আবার ছিল পুরুধনের বন্ধু—বণিকটি রাজপ্রতিনিধির চরম শত্রু হয়ে উঠেছিল। উষা কয়েক বার এই বণিকটির বাড়ীতে অতিথি হয়েছিল—সে নিজে যদিও এই বণিক-পত্নীর কথা কিছুই বুঝত না, তবু পুরুধনের ভাষ্যের সাহায্যে এবং বণিক-পত্নীর সৌজন্যে উষা ও বণিক-পত্নীর মধ্যে সখ্য গড়ে উঠেছিল।

আর্য্যদের রওনা হয়ে যাবার দু'দিন আগে এই অসুর-বণিকটি—পুরুধন তার একজন মালদার ক্রেতা হিসাবে তার সম্মানার্থে এক ভোজের আয়োজন করেছিল। যখন এই উৎসব চলছিল সেই সময় এই বণিকটি পুরুধনের কানে কানে রাজপ্রতিনিধির কুমতলবের কথাটি ফাঁস করে দেয়। সেই রাত্রেই পুরুধন তার দলের নেতৃস্থানীয় লোকেদের ডেকে একটা ফন্দী এঁটে ফেলল। যাদের ভাল অস্ত্রের অভাব ছিল—ঠিক হল তারা সব ভাল অস্ত্রশস্ত্র কিনে ফেলবে। তারা বিক্রীর জন্য যে সব ঘোড়া এবং ভারী ভারী জিনিসের বোঝা নিয়ে এসেছিল সে সব তাদের বিক্রী হয়ে গিয়েছিল, তাদের হাতে তখন ছিল মাত্র তাদের নিজেদের ব্যবহারের ঘোড়া এবং তারা অন্যান্য যে সব জিনিসপত্র খরিদ করেছে অর্থাৎ গহনা এবং অন্যান্য ধাতব তৈজসপত্র। কাজেই এদিক দিয়ে তাদের দুর্ভাবনা খুব ছিল না। আর তাদের দলের মেয়েদের সম্পর্কে—যদিও সুবাতএর মেয়েরা ক্রমেই বিলাস-ব্যসনপ্রিয় হয়ে উঠছিল, তবু অস্ত্র ব্যবহার—নৃত্য-গীতের মত আজও তাদের শিক্ষার অঙ্গ হয়েছিল। তাই তারাও যখন শুনল এই চক্রান্তের কথা, তখন তারাও তাদের ঢাল-তলোয়ার সব গুছিয়ে নিল। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

মিছা দারাসুত লয়ে, মিছা সুখে সুখী হয়ে,
যে রহে আপনা কহে সে মজে বিষাদে। —ভারতচন্দ্র

পশ্চিম বাংলার দূরদূরান্তরে ছোট বড় নগরে এবং পল্লীতে পল্লীতে সর্বত্রই সুসজ্জিত পূজা-মণ্ডপগুলির প্রতি যে লক্ষ লক্ষ নর-নারী আকৃষ্ট হয়েছেন তাঁদের সকলে অবশ্যই ব্রুক বণ্ড চা পান করেন যেহেতু এই চা তাজা, সুরভিসম্পৃক্ত এবং বেশ সঞ্জীবনী।

ব্রুক বণ্ড
চা

ভারতের সেরা

প্রতিভা বসু
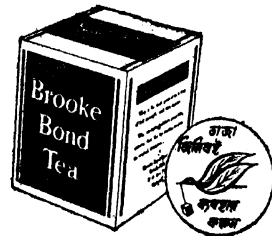
উপসংহার

১

বেলা গেল। সন্ধ্যার ছাই রং ছড়িয়ে পড়বার আগেই ঘরে-ঘরে পনেরো পাওয়ারের বদলে পঁচিশ পাওয়ারের আলো জ্ব'লে উঠলো উৎসব-বাড়িতে। উঠোনে পয়েন্ট নেই, কোথা থেকে মণ্টু একটা গ্যাস জোগাড় ক'রে নিয়ে এলো। পাশের ঘরের হিরণমাসিমা এসে অনসূয়াকে ধ'রে-ধ'রে নিয়ে গেলেন স্নান করাতে, আরো দু'জন এয়ো এলো সাত পাক সুতো আম্রপল্লবছোঁয়া জল মাথায় ঢালতে। কলকল ক'রে সাত ঝাঁক উলু দিলো তারা। জলভরা চোখে তাকিয়ে রইলেন মা।

অবিনাশ বাবু এলেন চটির শব্দ করতে-করতে, পাশ কাটিয়ে একবার ঢুকলেন গিয়ে নিজের ঘরে, কী করলেন না করলেন আবার বেরিয়ে গেলেন উঠোন পার হ'য়ে। হাতাখুন্তির শব্দে, মাছমাংসের গন্ধে দশখানা টিনের ঘরের অগুনতি বাচ্চাকাচ্চার ভিড়ে, [illegible] পড়শি মহিলাদের সহৃদয়তায় হঠাৎ যেন বাড়িটা গমগমে হ'য়ে উঠলো। স্নান ক'রে সাদা নতুন চিকনপাটিতে এসে বসলো অনসূয়া, হিরণমাসিমাই বসিয়ে দিলেন। চিরুণি দিয়ে আস্তে-আস্তে আঁচড়ে দিলেন চুল, ঘন কালো মেঘ না হ'লেও এখনো চুল আছে অনসূয়ার। রঙের ঔজ্জ্বল্য নেই, কিন্তু ফ্যাকাসে হ'য়ে আরো ফর্সা দেখায়। রোগা হ'য়ে গিয়েও হাতের গড়ন ভাঙেনি, মোমের মতো গোল, আর মোমের মতই রক্তহীন মসৃণ। প্রসাধনের অভাব কী? অধিবাসের ট্রে থেকে একে-একে সব তিনি টেনে নিলেন। সাজাতে সাজাতে হাসিমুখে বললেন, 'কপাল করেছিলি বটে, টাকা না কড়ি না, দেখলো আর রাজার মতো মানুষটা উড়াল দিয়ে নিতে এলো। ঈস্ কী দেয়াটাই দিয়েছে!' কথার শেষে দীর্ঘনিঃশ্বাসও পড়লো একটি। একদিন না, দু'দিন না, পাশাপাশি ঘরের ভাড়াটে হ'য়ে একই সুখদুঃখে কত বছর একসঙ্গে তো কাটলো, বিদায়ের দিনে মন কেমন করে বই কি। নিজের মেয়েটা ভুগে-ভুগে এই তো বছর দুই আগে চারটা বাচ্চা রেখে মারা গেল। বড়ো ছেলেটা বিয়ে ক'রে শ্বশুর-বাড়িতেই ঘর নিয়েছে, ছোটোটা তবু পদে আছে, তা কদিন কে জানে? অভাবে কি আর মানুষকে মানুষ থাকতে দেয়? অনসূয়া তার কন্যার বয়সী না হ'লেও তবু তিনি তাকে ভালো বাসেন, সর্বাণীকে যেমন বাসতেন ঠিক তেমনিই বোধ হয়।

চাটালো বেণীতে জরি জড়িয়ে রুপোর কাঁটা দিয়ে প্রকাণ্ড মাথা জোড়া চালি খোঁপা বাঁধলেন, তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দামী স্নো লাগালেন গালে, ঘন ক'রে পাউডার বুলোলেন মুখে, বুকে, গলায়, হাতে। লবঙ্গ দিয়ে ছোটো-ছোটো ফুল এঁকে দিলেন তেত্রিশ বছরের লাঞ্ছিত বঞ্চিত কপালে। যাই-যাই ক'রেও যে লাবণ্য এতোদিন আত্মগোপন করেছিলো ভাঙা গালের খাঁজে-খাঁজে, ডোবানো চোখের তারায়—সব উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো একটুখানি যত্নে। কম্পোজিটর বাবুর মেজ মেয়ে ছুটকি পাতলা পায়ে আলতা পরিয়ে দিল। ছোপ-ছোপ লাগলো পাটিতে, বুড়ো নখের মতো ছোট্ট নীল শিশির পাগল-করা গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো ঘরের আনাচে-কানাচে। চুলের কাঁটায়, ফিতের লালে, ছড়ানো ছিটোনো ব্লাউজে শাড়িতে রঙিন কুলোর সরা-ঢাকা প্রদীপে সব মিলিয়ে তারও বাইশ বছরের অবিবাহিত মন কেমন যেন আকুল হ'য়ে উঠলো। হেলানো আয়নায় চুপে-চুপে মুখ দেখলো বার-বার।

এতক্ষণে মা এলেন অবসর হ'য়ে, হাতে একগ্লাস সরবৎ নিয়ে এলেন মেয়ের জন্য। আহা, সারাটা দিন গেছে, এক-ফোঁটা জল মুখে দিলো না মেয়ে। 'একটু খা—' মুখের কাছে ধরলেন গ্লাসটা। অনসূয়ার বুক ঠেলে কান্না জমে এলো। তিনি নিজেই কি সারা দিন মুখে দিতে পেয়েছেন কিছু? বমি-বমিতো তাঁরও করছে।

বড়োছেলে বাবলু প্রস্তুত হ'তে এলো জামাই আনতে যাবার জন্য।

ঘরের কোণে আল্‌না থেকে কাচা কাপড় আর ডুরে-কাটা ইস্তিরি-করা সার্ট গায়ে দিলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে। অনসূয়াই কেচে দিয়েছে কাল। বিয়ে-বাড়িতে কি ওরা ময়লা ছেঁড়া পরে বেড়াবে! বাবলুর চোখে জল এলো আড়চোখে দিদির দিকে তাকিয়ে। কাল এমন সময় দিদি আর এখানে থাকবে না ভাবতেই নিশ্বাস যেন বন্ধ হ'য়ে এলো।

সোনা-দানা কী-ইবা আর আছে, তবু যা অবশিষ্ট ছিলো কাঁপা-কাঁপা হাতে সেই সব খুলে একে-একে পরিয়ে দিলেন মা। তারপর কন্যার স্তম্ভিত মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদে উঠলেন হু-হু ক'রে। অবিনাশ বাবু কী বলতে দরজা পর্যন্ত এসে ফিরে গেলেন। হিরণমাসিমা লালপাড় শাড়ি ছাড়িয়ে ক্রেপের লাল বেনারসি পরিয়ে দিলেন। লগ্ন তো প্রথম রাত্তিরেই। এখান থেকে এখানে—জামাই তো এলো ব'লে গাড়ি চ'ড়ে।

অনসূয়া ব'সে রইলো স্থির, নিস্পন্দ। যেন পাথর হ'য়ে গেছে। কিছুই ভাবছে না সে, কিছুই দেখছে না। কিছুতেই যেন আর কিছু এসে যায় না তার। তার বিকার নেই, দুঃখ নেই, আসক্তিও নেই, ভয়ও নেই। যা হবার হোক, যা হয় হোক।

* * * *

হ্যাঁ, সুন্দর হয়েছে বাড়ি। চমৎকার। কর্মচারীদের ধন্যবাদ দিলেন মিঃ রায়। পশ্চিমে গড়ের মাঠ, মস্ত জানালা দিয়ে পরিষ্কার দেখা যায়। ভাড়া বড় বেশী? তা হোক। একদিন কেন, এক বেলার জন্যে উঠলেও অসুবিধে ক'রে থাকা যায় না। তারপর আত্মীয় পরিজন না থাকুক (অবিশ্যি আজকের দিনে ইচ্ছে করলে বহু আত্মীয়কেই তিনি একটি তুড়ির আঘাতে নিয়ে আসতে পারেন এখানে, কিন্তু আত্মীয়তার মোহ আর তাঁর নেই জীবনে।) আপিসের কিছু পদস্থ কর্মচারী এবং জন কয়েক বন্ধু তো আছেন সঙ্গে?

সন্ধের আগে একটু ঘুরে নিলেন সহরটা। মার্কেটে এসে দু'চোখে যা দেখলেন পাগলের মতো কিনলেন। উটরাম ঘাটে এসে চা খেলেন বন্ধুদের নিয়ে। গঙ্গার জলের গন্ধে মন কেমন করলো। কত কাল, কত কাল পরে আবার কলকাতা। আবার কলকাতা? আবার তিনি কলকাতা এসেছেন। সত্যি! এই গঙ্গার বুক বেয়েই তো একদিন ছেড়ে গিয়েছিলেন এই মাটি। তখন কি ভেবেছিলেন আবার এসে পা রাখবেন সেই মাটিতে?

এলোমেলো এলেন সেন্টপল্‌স্‌ ক্যাথিড্রেলের কাছে, গেলেন কার্জন পার্কে, রেড রোড দিয়ে হু-হু ট্যাকসি চললো খানিকক্ষণ। তারপর ফিরে এলেন ঘরে। সময় হয়েছে। একজন বৃদ্ধ কর্মচারী নিয়ে এলেন তাঁর স্ত্রীকে। মেয়ে না হ'লে কি চলে? নিয়ম কানুন আছে তো? কে ব'লে দেবে সব? মিঃ রায় হাসলেন। নিয়ম! তাই তো বটে। দিদির বয়সী ভদ্রমহিলা, তেমনিই ছোট-খাটো, কিন্তু শ্যামাঙ্গী। ভালো লাগলো মিঃ রায়ের। সত্যিই তো, মেয়ে না হ'লে চলে? তিনি এসেই জিভ কাটলেন, চওড়া লাল লতাপাড় শান্তিপুরী শাড়ির আঁচল কপাল পর্যন্ত টেনে দিয়ে বললেন, 'না বাবা আজকের দিনে ঐ বিজাতীয় পোষাক আপনি পরতে পাবেন না। যাবার সময়ে কপালে ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করবো সেই কুলো কই? কুটুম্বরা নিতে আসবে, মিষ্টি কই তাদের জন্য, পান-তামাক কই?'

আছে, আছে, সব আছে। টাকা থাকলে কী না আছে কলকাতা সহরে? টানা-টানা পুরোনো হাতের লেখায় তৈরী হ'লো অমুকোটি চৌষট্টি ফর্দ—তিন গাড়ি তিন দিকে ছুটলো। তারপর ময়দা-গোলা দিয়ে ঘরের লাল মেঝেতে সাদা পদ্ম আঁকলেন তিনি। যাবার আগে এইখানে দাঁড়িয়ে কপালে কুলো ছুঁইয়ে, মাথায় ধান-দূর্বো নিয়ে কাজললতা হাতে ক'রে তবে তো যাবেন বিয়ে করতে?
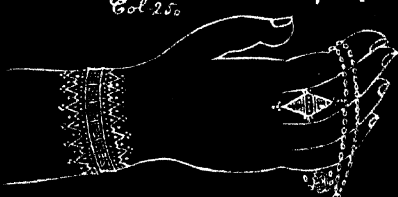
বাথরুমে গিয়ে ঝর্ণার তলে একঘণ্টা স্নান করলেন মিঃ রায়। বেরিয়ে এসে বাহান্ন ইঞ্চি বহরের কুঁচোনো শান্তিপুরী পরলেন পরিপাটি ক'রে, গরদের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে একেবারে ফিটফাট পুরো বাবু! আয়নায় দাঁড়িয়ে চিনতে পারলেন না নিজেকে। কোমরে কত কাল পরে ধুতি জড়ালেন তার হিসেব কষলেন মনে-মনে। ভদ্রমহিলা একটু চন্দন কপালে না দিয়ে ছাড়লেন না। তা কি হয়? নিয়ম আছে না শুভ কাজে? অনুষ্ঠান আছে না? টোপর হাতে নিয়ে মিঃ রায় আবার হাসলেন।

* * * *

না, বিকাশ এলো শেষ পর্যন্ত সপরিবারে। মক্কেলদের সেদিনের মতো বিদায় দিয়ে এসে ভুরু কুঁচকে স্ত্রীকে বললো, 'যাওয়াই স্থির করলাম, বুঝলে?'

স্ত্রী বললেন, 'হুঁ।'

'তারা যেমনই হোক, যা-ই করুক, আমার তো একটা কর্তব্য আছে।'

'তাই তো।'

স্ত্রীর মুখের কাছে এসে ঠোঁট বাঁকিয়ে এবার হাসলো সে—'তখন আমাকে কত অপমান করা হ'লো, গালি-গালাজ ক'রে স্বামি-স্ত্রীতে বার ক'রে দিলো বাড়ি থেকে, আর এখন? এখন কী?'

'কী এখন?'

'কী এখন?' হাতের ভঙ্গি ক'রে স্ত্রীকে ভ্যাংচালো বিকাশ, 'বললাম না সকালবেলা এসে? আসলে মৎলবখানা তো এই ছিলো আগাগোড়া, অর্থাৎ একলা খাবে, ভাগ দিতে কি পরাণে সয়?'

ভালোমানুষ স্ত্রী ব্যথিত হলেন স্বামীর কথায়, বললেন, 'মৎলব পুষবার মতো তো মাথা নয় ভাসুরঠাকুরের, দিদিও—'

'চুপ করো, চুপ করো। চিনতে আর আমার বাকী নেই কাউকে। আচ্ছা চলো না, দেখবেই তো সব। হাতে-হাতে আমি আজ প্রমাণ দেবো, চাক্ষুষ প্রমাণ না-হ'লে তো আর বিশ্বাস করবে না তোমরা?' স্ত্রী চুপ ক'রে রইলো, কিন্তু বিকাশ গজ্ গজ্ করতে লাগলো, 'ঈস! কত তেজ দেখানো হ'লো তখন। মেয়ে বিক্রী। মেয়ে বিক্রী করবো না! এখন? বিয়ে! আবার নাম দেয়া হ'য়েছে, বিয়ে! বৌদিকে বললাম, পাত্রের দেশ কোথায়? বলেন, "জানিনে"। নাম কী? "পুরো নাম শুনিনি।" কী? না—মিঃ রায়। মস্ত ধনী, ব্যবসায়ী, বম্বেতে সবাই চেনে। আহা রে, কী সুন্দর পরিচয়! ঈশ্বর তো আছেন। সেই অপমানেরই প্রতিশোধ হবে আজ বিয়ের আসরে। প্রতিশোধ!' রোগা হাতের মোটা শির ফুলিয়ে স্ত্রীর মুখের কাছেই মুঠি শক্ত করলো। চশমাটা খুলে পড়লো নাকের কাছে।

* * * *

লগ্ন হ'য়ে এলো, বরের দেখা নেই। বাড়িশুদ্ধ লোক উচ্চকিত হ'য়ে উঠলো, অবিনাশ বাবু ঘর-বা'র করতে লাগলেন, এগিয়ে গিয়ে বটতলার মাথা ঘুরে এলেন, যানবাহনের স্রোত ব'য়ে চলেছে বড়ো রাস্তা দিয়ে—কেবল প্রত্যাশিত গাড়িটিরই দেখা নেই। বাবলুই বা করছে কী! বোকা ছেলে! এত বড় হলো তবু যদি বুদ্ধি হ'লো কিছু। ঠিকানা মিলিয়ে যেতে পারলো তো? না কি ভুল ঠিকানা দিয়ে গেছে? না-না, তা দেবে কেন? তাতে তো ওদেরই ক্ষতি! তবে? তবে কী? ঘরে এসে ঘড়ি দেখলেন, বুকের মধ্যে যেন কেমন করতে লাগলো। হে ঈশ্বর! আর কত? আর কত?

মা-ও ছট্ফট্ করলেন বই কি। কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা আরামও বোধ করলেন মনে-মনে। না-ই যদি আসে, তাহ'লে নাই-বা এলো। এতোগুলো বছরই যদি এমনি কেটে যেতে পারলো তাহ'লে কাটুক না বাকি জীবন। কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে এমন তো কত অবিবাহিত মেয়ে চিরকাল বাপের ঘরে থেকে বুড়ি হ'য়ে যায়। কত মেয়ে তো বিধবা হ'য়ে জীবন কাটায়। তবে অনসূয়ার বিয়ের জন্যেই বা কেন তাঁরা অমন ব্যাকুল হ'য়ে গিয়েছিলেন? কী সংগত কারণ ছিলো তার? অনসূয়া এ সংসারের হাল ধ'রে আছে, অনসূয়ার শরীর-মনের সমস্ত নির্যাস টেনে-টেনে বেঁচে আছে এই সংসার, তাকে বিদায় দিয়ে কী এমন সুখ বাড়বে, শান্তি বাড়বে? সে চ'লে গেলে কি শুধু ভাতের খিদেতেই টান পড়বে, সব খিদেই মিলিয়ে যাবে জীবন থেকে। খিদের কি অন্ত আছে? এইটুকু বাড়িকে যে সে পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখে আর তার তিলতম ত্রুটি ঘটলেই যে তোলপাড় করেন অবিনাশ-বাবু সেটাও কি একটা খিদে নয়? ছেঁড়া জুতো ঝকঝক করছে পালিশে, পুরোনো শাড়ি ধবধব করছে সাবানে, জানলার পর্দা, বালিশের ওয়াড়, রান্নাঘরের বাসন, চায়ের কাপ, ভাইয়েদের বই, কোথায় হাত নেই অনসূয়ার? এটা চাই, ওটা চাই, কেন ঠিক মতো পাইনে, রান্না কেন ভালো হ'লো না, ডাল কেন কম, চাল কেন বাড়ন্ত—সব, সবটাতেই অনসূয়া। অনসূয়ার মুখের দিকে তাকিয়েই এ-বাড়ির ঘড়ির কাঁটা চলছে, মনের কাঁটা চলছে। তবে সে মানুষটাকে বিদায় দিয়ে তাঁরা থাকবেন কেমন ক'রে?

একটি শব্দ নেই মুখে, একটু বিরক্তির রেখা নেই কোথাও, রাগ নেই, দুঃখ নেই, হাসি নেই, মলিনতা নেই, একটা কলের মতো চালিয়ে গেল জীবনের এতোগুলো বছর। তবু তাঁরা খুঁতখুঁত করেছেন, তবু তাঁদের তৃপ্তি ছিলো না। ও যে অনসূয়া। মা হ'য়ে তাঁর মনও কি এই ভাব থেকে মুক্ত ছিলো? অথচ এমন আশ্চর্য—

'দিদি, ঠাকুরমশাই বলছেন লগ্ন যে ব'য়ে যায়—'

অনসূয়ার কাকিমা।

অনসূয়ার মা অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকালেন ছোটো জায়ের মুখের দিকে। অনেক দিন পরে দেখলেন। দেখলেই ভালো লাগে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'তাই তো!'

'বাবলু তো অনেকক্ষণ গেছে। আসা উচিত ছিলো।'

বাড়ি থেকে একবার ঘুরে এলেন হিরণমাসিমা। চোখ কুঁচকে বললেন, 'বাবলু তো এসেছে দেখলাম দরজায়, ওর কাকার সঙ্গে বাবার সঙ্গে কী-সব বলছে। বর নাকি পরে আসছে।'

অনসূয়া সেই থেকে ব'সে আছে স্তব্ধ হ'য়ে, একবার চোখ তুলে নামিয়ে নিল।

হন্তদন্ত হ'য়ে বিকাশ এসে ফেটে পড়লো 'কী কাণ্ড বলো দেখি, কোথাকার কে সব—' কথা শেষ না-ক'রে আবার বেগে চ'লে গেল বাইরে। এ-কথা কে না জানে যে লগ্নের জন্য তারা পরোয়া করে না। আবার পিটুলির লতা দিয়ে পাড়াপড়শি ডেকে পুরুৎ এনে ঘটা ক'রে বিয়ে দে'য়া হচ্ছে। কেন রে বাপু ওসব ভড়ং। মস্ত গাড়ি নিয়ে চুপচাপ আসবে, দরকষাকষি সেরে চুপচাপ চ'লে যাবে মেয়ে নিয়ে। তা নয়, মিছিমিছি লোক ডেকে কেলেঙ্কারী। সাপের মতো চিক-চিকিয়ে উঠলো চোখ। গণ্ডগোল তো বাধলো ব'লে। ফুটপাতে, যেখানে বকুল গাছের গায়ে শিথিল শরীর এলিয়ে দিয়ে, জোরে-জোরে নিঃশ্বাস টেনে গলির মুখে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন অবিনাশ, সেইখানে এসে দাঁড়ালো সে। চোখ তীক্ষ্ণ ক'রে, কান খাড়া ক'রে। আসবে, তারা নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু কী ভাবে আসবে, কখন আসবে, সেটাই সে দেখতে চায় শেষ পর্যন্ত। সম্বর্দ্ধনা তো করতে হবে? দাদা-বৌদির সঙ্গে চোখোচোখির পালা আছে তো একটি? শুভদৃষ্টি?

* * * *

আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'লো বিকাশের। বর এলো। কিন্তু লগ্ন পেরিয়ে নয়, বিয়ের অল্প একটু আগে সাত-আটখানা মোটর নিঃশব্দে এসে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে থামলো তাদের দরজায়। গলিটা ভ'রে গেল। একটা সৌখিন গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো বাতাসে।

এসেছে। এসেছে। একটা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। দরজায় ভিড় করলো বাচ্চারা, অবিনাশ বাবু এগিয়ে এলেন ঊর্দ্ধশ্বাসে। তবে এলো ?

একে-একে নামলো সব সম্ভ্রান্ত চেহারার অতিথিরা। তিনি মুখ থেকে মুখে চোখ সরালেন। কে ? কে ? কোনজন ? বুকের মধ্যে তাঁর হাতুড়ি পিটতে লাগলো।

শান্তিপুরী ধুতির লম্বা কোঁচা সামলে সবশেষে নামতে-নামতে হাত থেকে সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল বিনয়। চল্লিশ বছর বয়সেও তার চেহারার এমন কিছু তফাৎ হয়নি যাতে তাকে চেনা যাবে না। একটু মোটা হয়েছে, ঘন চুল খানিকটা পাতলা, রং সামান্য লালচে। হাতের টোপর আর গায়ের চাদরের দিকে তাকিয়ে এবার তাড়াতাড়ি কাছে এলেন অবিনাশ বাবু, নিস্পৃহ, নিষ্প্রভ বৃদ্ধ-চোখে ভালো ক'রে তাকালেন তিনি ভাবী জামায়ের মুখের দিকে, তারপরেই পিছিয়ে গেলেন দুই পা। প'ড়ে যেতে-যেতে টাল সামলালেন গাড়ির চাকায় হাত রেখে, নিঃশ্বাসের ঘনতায় পুরোনো ফতুয়ার উপর পাঁজরার ওঠানামা দেখা যেতে লাগলো স্পষ্ট। নিচু হ'য়ে বিনীত হাস্যে তাঁকে প্রণাম করলো বিনয়। 'ভালো আছেন।' তারপরই তাকালো সে বিকাশের দিকে। তার কাচের মতো ঠাণ্ডা নিষ্প্রাণ আক্রোশে স্থির, নিস্তব্ধ চোখের উপর চোখ মিলিয়ে রাখলো একটু, একটু বিদ্যুত চিড়িক ক'রে উঠলো বোধহয়, কিন্তু নিবিয়ে দিল তৎক্ষণাৎ হেসে ফেলে বললো—'এই যে আপনি। আপনি কেমন আছেন ?' দাঁতে দাঁত আটকে গেল বিকাশের, মাথার চুল যেন খাড়া হ'য়ে উঠলো কিন্তু পরমুহূর্তেই সপ্রতিভ অভ্যর্থনায় অস্থির হ'য়ে হাঁকে-ডাকে সরগরম করলো বাড়ি। 'আরে, তোরা সব কোথায় গেলি ? এই ভানু, শাঁখ বাজাতে বল না মাকে। মন্টু, বাবলু কই ? দাঁড়িয়ে আছিস কী হাঁ ক'রে, এঁদের ঘরে নিয়ে বসা না !' হাত বাড়িয়ে দিলেন বিনয়ের পিঠে, 'এসো বাবা এসো, গরীবের ঘর—' বিনয় হাসবে কি রাগ করবে ভেবে পেল না।

পাশের ঘরের ভাড়াটেরা একখানা ঘর ছেড়ে দিয়েছিলো বরযাত্রীদের জন্য। বরযাত্রীরা বসলো গিয়ে সেখানে, বিনয় একেবারে বিয়ের পিঁড়িতেই চ'লে এলো। পুরুৎ বললেন, 'আর একমিনিটও সময় নেই দেরী করবার।' অনসূয়ার মাকে ঠেলে ঠুলে অনসূয়ার কাকিমাই নিয়ে এলেন জামাইবরণ করাতে। এটা তাঁদের প্রাদেশিক নিয়ম। চোখ মুছে কবেকার পোকায় কাটা লালপাড় গরদের শাড়ি প'রে ধীরে ধীরে এলেন তিনি। রোগা মুখ থেকে দু'টি নিবন্ত নিরুৎসুক চোখ মেলে সামনে এসে তাকালেন জামায়ের মুখে, তাকিয়েই রইলেন, আস্তে সজল হ'য়ে এলো সেই দৃষ্টি—গাল বেয়ে সেই জল গড়িয়ে পড়লো বুকের আঁচলে।

বিনয় অবাক হ'য়ে গেল। এই সেই দীর্ঘাঙ্গী, গৌরাঙ্গী, সুস্মিতশ্রী অনসূয়ার মা ? এই হ'য়ে গেছেন তিনি ? এই তাঁর চেহারা ! পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো সে। অতি কষ্টে একখানা থরো থরো হাত তিনি তুলে দিলেন বিনয়ের মাথায়, অস্ফুটে ডাকলেন, 'বাবা !'

* * * *

অনসূয়াকে নিয়ে এলো তার ছোটো ভাই - মন্টু। শাড়ির আঁচলে আপাদমস্তক নিজেকে জড়িয়ে কলে-চলা পুতুলের মতো ভারি-ভারি পা ফেলে বিয়ের পিঁড়িতে মুখোমুখি এসে বসলো সে। পুরুৎ মন্ত্র পড়লেন, বিড়-বিড় ক'রে পুনরুচ্চারণ করলো বিনয়—তার সাগ্রহে প্রসারিত হাতের পাতায় অবিনাশ বাবু তুলে দিলেন মেয়ের নিষ্কম্প্র, শীর্ণ, হাড়ের মত সাদা একখানা অবিচলিত হাত। স্বস্তি-বাচন পাঠ হ'লো।

হিমের মতো ঠাণ্ডা হাত। মানুষটার দেহে কি প্রাণ আছে ? সন্দেহ হয় বিনয়ের। নাক পর্যন্ত ঘোমটায় ঢাকা, চোখের দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ, থুতনি বুকের সঙ্গে ঠেকানো। যতক্ষণ ধ'রে বিয়ে হ'লো এই ভঙ্গির একতিল বদল হ'লো না, একবারের জন্য একটু নড়লো না, একটা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের স্পন্দন পর্যন্ত বোঝা গেলো না বাইরে থেকে। শুভদৃষ্টির সময় ভাইয়েরা ঘোমটা তুলে দিল, গ্যাসের উজ্জ্বল নীলচে আলোয় দু'টি মুদ্রিত চোখ নত, চন্দন আঁকা ক্লান্ত করুণ মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে ব্যথায় ভ'রে উঠলো বিনয়ের মন।

২

বিয়েকে বিলম্বিত করবার মতো কেউ ছিলো না সেখানে। অত্যন্ত সংক্ষেপে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অনুষ্ঠানের সমস্ত পাট চুকিয়ে ঘরে এলো বর-বধূ। একটু পরেই নির্জন হ'লো ঘর। বিনয় উঠে গিয়ে আলো নিবিয়ে দিলো, দরজা বন্ধ ক'রে দাঁড়ালো এসে সেই ছোট্ট সরু শিক দেয়া জানালার কাছে। পাখিরা পাখা ঝাপটালো

উকুনের নতুন ওষুধ

নিউট্রেল-লাইসাইড

"আমি আপনার ল্যাবরেটারীর উকুনের ঔষধের কথা আর বর্ণনা করিতে পারিলাম না। কী অত্যাচার ঔষধ যে পাঁচ বছর ধরিয়া কোন ঔষধে কাজ হয় নাই অথচ আপনার ল্যাবরেটারীর ঔষধ একবার ব্যবহার করিয়া আমি এবং আরও ৫ জন মহিলা উপকৃতা হইয়াছেন। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।"

মিসেস বসু, কলিকাতা—২৬

প্রতি প্যাকেটের জন্য দুই আনার ডাকটিকেট পাঠাইবেন।

বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার কয়েকটি জেলায় এই "লাইসাইড" পরিবেশক প্রয়োজন। উচ্চহারে কমিশন দেবো।

Dept. M.B.

১৯, বণ্ডেল রোড ; কলিকাতা-১৯

বকুলগাছের পাতা ঝরিয়ে, কিচিরমিচির উঠলো, রাত্রির প্রহর প্রহর ঘোষণা ক'রে চুপ হ'লো তারা। এককোণে কুলোর উপর জ্বলতে লাগলো রঙিণ সরাঢাকা মঙ্গলপ্রদীপ, তার ছায়া ফেলা-ফেলা কাঁপা-কাঁপা আলোর চক্র ঘরের আবহাওয়াকে অদ্ভুত থমথমানিতে রূপান্তরিত করলো। এই একফোঁটা টিনের চালার নিচে অসম্ভব গরম লাগছিলো তার। চুপচাপ আকাশের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটার পর একটা সিগারেট ধরালো, একটার পর একটা ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তায়।

এ রাস্তায় ট্রাম নেই, বাস নেই, মোটর নেই, মাঝে-মাঝে শুধু রিকসার টুং টুং। রাত্রি স্তব্ধ হ'লো এই গলিতে। একটু সময় ব'সে রইলো অনসূয়া, তারপর কী ভেবে পা মুড়ে, বিছানার একটুকু কোণ জুড়ে, আঁচলে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়লো। বিনয় এলো অনেক পরে। হাত থেকে ঘড়িটা খুলে কোথায় রাখবে ভাবতে না পেরে কুলোর উপরই রেখে দিলো, খস্‌খসে সিল্কের পাঞ্জাবিটা লটকে দিলো দেয়ালের ব্র্যাকেটে। অনসূয়ার মাথার কাছে এসে দাঁড়ালো একটু। খানিকক্ষণ যেন নিঃশ্বাস পড়লো না তার। একটু সময়ের জন্য অন্য কোনো একদিনের এমনিই আবছা আলো ফেলা ঘরের এই-রকমই একটি যুগল শয্যার স্মৃতি, ঠিক এই-রকমই একটা মৃদুমধুর সৌরভ যেন তাকে আচ্ছন্ন করলো। স্পষ্ট অনুভব করলো—এই রাতটিই আবার সে ফিরে পেতে চেয়েছিলো জীবনে, এই রাতটির সাধনাতেই—এতোদিনেও সে অকৃতদার। সহসা সেই চব্বিশ বছরের হৃৎপিণ্ডটা চল্লিশ বছরের প্রৌঢ় বুকের মধ্যে ধ্বকধ্বক ক'রে উঠলো; অত্যন্ত আস্তে, অতি সন্তর্পণে একখানা হাত সে অনসূয়ার ঘোমটা-ঢাকা মাথায় ছুঁইয়ে মৃদুগলায় বললো, 'ঘুমিয়েছো ?'

সচকিত হ'য়ে উঠে বসলো অনসূয়া, যেন ভয় পেয়েছে, যেন না-জেনে সাপের মাথায় পা দিয়ে ফেলেছে। মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই সংযত হ'য়ে মাথায় কাপড় টেনে মুখ ফিরিয়ে সাদা দেয়ালের উপর তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় বললো, 'না।'

লালে-সোনালিতে মেশানো জালের মতো পাতলা শস্তা ক্রেপ বেনারসির আবরণ থেকে তার শ্বেত পাথরের মতো শক্ত শাদা আধখানা ফেরানো মুখের উপর চোখ রেখে বিনয় বললো, 'আমার উপর কি রাগ ক'রে আছো তুমি ?'

'রাগ! ছি।'

'তবে ?'

'আপনার কত দয়া।' কৃতজ্ঞচিত্ত অনুগত-জনের গলা ফুটলো অনসূয়ার।

'দয়া। দয়া বলছো কেন ? আমি কি দয়া করতে এসেছি তোমাকে ?'

'তা নয় তো কী। আমি কি দয়ার পাত্র ছাড়া আর কিছু ?'

'অনসূয়া,' প্রায় ফিসফিসিয়ে ডেকে উঠলো বিনয়, 'দয়া নয়, দয়া নয়। তাকিয়ে ছাখো তুমি, আমার মুখে কেবল দয়াই আছে কিনা।'

অনসূয়া থমকে গেলো। বুকের মধ্যে যেন ঝড় ব'য়ে গেল ডাক শুনে। সব পুরুষের গলাই কি এক-রকম ? না কি তারই মনের বিকার ? নয় তো সুদীর্ঘ ষোলো বছরের বোবা শ্রবণ হঠাৎ কেন আজ এমন অধীর হ'লো ? আজকের দিনেই—যেদিন তা জীবনের এমন একটা চরম শুভদিন—এই শুভদিনটিতে আবার আবার কেন মন অবাধ্য হ'য়ে ওঠে বারে-বারে ? দাঁত দিয়ে রক্ত জমালো ঠোঁটে।

বিনয় বললো, 'আমাকে তুমি আপনি বলছো কেন ?'

'আপনি আমার গুরুজন।'

'গুরুজন! পতি পরম গুরু ?'

জবাব দিলো না অনসূয়া।

'শোনো।'

'বলুন।'

'তুমি বোধ হয় শুনেছ আমি কালকেই আবার এখান থেকে ফিরে যাবো।' বিনয়ের গলা গম্ভীর।

'শুনেছি।'

'তুমি কী করবে ?'

'আমি ? আমি কী করবো ?'

'বোধহয় যাবে না।'

'অনুমতি করলে যাবো।'

'আর না-করলে ?

'এখানেই থাকবো।'

'কোথায় থাকবে ?

'এখানেই, এ-বাড়িতেই—'

'এ বাড়িতেই ?' হাসলো বিনয়—'এ-বাড়িতে যে আর তোমার জায়গা হচ্ছে না তা কি তুমি বোঝোনি ? তা নইলে নাম জানে না, ধাম জানে না এমন একটা প্রবাসীর হাতে কেউ কন্যা সমর্পণ করে ?'

ঠিকই তো। এর আর জবাব কী।

'তবে অবিশ্যি একটা কাজ করতে পারো।'—বিনয়ের গলায় ঈষৎ রাগের আভাস; বালিসটা টেনে একটু এলিয়ে বসলো, 'এখানে আমি যে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছি সেটা রেখে যেতে পারি তোমার জন্য। তুমি থাকবে, ইচ্ছে করলে তোমার মা-বাবাও থাকতে পারেন তোমার সঙ্গে। আর না-থাকলে অন্য লোকজন রেখে সব ব্যবস্থা ক'রে যাবো।' অনসূয়া ভেবে উঠতে পারলো না স্বামীকে তার কী জবাব দেয়া উচিত। মানুষটি ভদ্র, আরো ভদ্র তার কণ্ঠস্বর আর কথা বলবার বিশেষ ভঙ্গিটি। অনসূয়ার কেবল ভুল হয়, কেবল মন-কেমন করে। অস্থির হ'য়ে উঠলো সে, তার বুক-পিঠ বেয়ে ঘাম নামলো পিঁপড়ের সারের মতো, বিন্দু-বিন্দু-ঘামে কপালের চন্দন মুছে গেল।

সে কী চেয়েছিলো ? এই তো। শুধু তো এই। যে-কোনো, যে-কোনো একজন মানুষকে অবলম্বন ক'রে এ জীবন থেকে মুক্তি পেতে। শুধু কি চেয়েছিলো ? এই তো ছিলো তার দিনরাত্রির প্রার্থনা। কিন্তু ঈশ্বর যেদিন পূর্ণ করলেন তার সেই প্রার্থনা, সেদিন কেন এমন হ'লো মন ? কেন এমন হ'লো ? শক্তি দাও, প্রভু, মনে শক্তি দাও।

'আমি আপনার সঙ্গেই যাবো।' হঠাৎ যেন সে মৃত্যুর পরপার থেকে কথা ব'লে উঠলো।

'এত দয়া নাই বা করলে ?' বিদ্রূপ ছুঁড়ে মারলো বিনয়, 'দয়াময়ী!'

বুক কেঁপে উঠলো অনসূয়ার, 'আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনার রাগের যোগ্য নই।'

'অনু, অনসূয়া' কেমন ব্যথিত, আর্ত গলায় ডেকে উঠলো বিনয়—'তুমি এখনো এত নিষ্ঠুর!'

এও কি ভুল? আর থাকতে পারলো না অনসূয়া।

হঠাৎ ঘুরে বসে বিনয়ের মুখের দিকে তাকালো। চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলো বিনয়। একটু হাসলো, ভারি গলায় বললো, 'আবার আমার ভুল হ'লো, অনসূয়া। আমি জানতাম না এতদিনে কতটা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে গেছি তোমার হৃদয় থেকে।

অনসূয়া স্তব্ধ।

'অস্বাভাবিক নয়। কালের প্রভাব কোনো মানুষই এড়াতে পারে না, তুমিই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন?'

অনসূয়া চুপ।

একটা গুমোট নামলো ঘরে। উঠে ব'সে একটা সিগারেট ধরালো বিনয়। 'আমার ইচ্ছে করছে কি জান, এই মুহূর্তে এইখান থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজের লজ্জা ঢাকি। কত অপমান, কত অসম্মানই তো জীবন ভ'রে ভোগ করতে হ'য়েছে, কিন্তু এ আমার সব চেয়ে বড়ো পরাজয় হ'লো।' প্যাঁচা ডাকলো বাইরে। একখানা পাতলা টিনের ব্যবধানে পাশের ঘরের কাশি শোনা গেল স্পষ্ট। অনসূয়া তেমনি স্থির তেমনি নিষ্পলক।

'কী দেখছো? চিনতে পারোনি?'

চুপ।

'কথা বলছো না কেন? কী হয়েছে?'

'বলো, বলো, একটা কিছু বল অনসূয়া'—অধীর আবেগে অস্থির হ'য়ে অনসূয়ার হাত ধ'রে সজোরে নাড়া দিল বিনয়।

আর নাড়া খেয়েই কেঁপে উঠলো চোখের পাতা, কাঁপলো রংহীন ঠোঁট, চৈতন্য ফিরে এলো শরীরে। শীতের শুকনো গাছ থেকে টপটপ ক'রে শিশির ঝ'রে পড়লো অজস্র ধারায়। ভাগ্যের এই অবিশ্রান্ত পরিহাসে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটলো মুখে, দুঃখদারিদ্র্য-নিপীড়িত কুণ্ঠিত ফুসফুস থেকে মস্ত একটি নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো সশব্দে, তারপর শান্ত গলায় অনসূয়া বললো,—'তুমি!'

'হ্যাঁ গো, আমি! আমি শ্রীবিনয়কুমার রায়। নারীহরণ মামলার সেই দাগী আসামী। চিনতে পেরেছো এতক্ষণে?'

'আমি তো এতোক্ষণ দেখিনি!'

'ছাখোনি?'

'না।'

'ও' একটু চুপ ক'রে থেকে, 'আমার গলাও কি শোনোনি?'

'গলা! তোমার গলা!'

'ভুলে গেছ? সব ভুলে গেছ?'

'ভুলে গেছি?'

'অনু, অনু,' আকুল বিনয় কাঙালের মতো একটি হাত মেলে দিল কোলের উপর। 'অনেক কষ্টই আমি দিয়েছি তোমাকে, কিন্তু কত কষ্ট যে আমি পেয়েছি তা তো তুমি জান না?'

'জানি।'

'এবার তুমি আমাকে নাও, আমার ভার নাও তুমি। আমি আর পারিনে।'

'নাভানা'র বই

প্রকাশিত হ'ল

প্রতিভা বসুর নতুন উপন্যাস

মনের ময়ূর

অনসূয়া আর বিনয়। সংবাদপত্রের আইন-আদালতের স্তম্ভে একদা ঝিলিকিয়ে উঠেছিলো সতেরো আর চব্বিশ বছরের দুই বিদ্রোহী যৌবন। তারপর কে কোথায় তলিয়ে গেল সংস্কারজীর্ণ সমাজের ফাটলে হতাশার হিমালয় বুকে নিয়ে। জীবন-বিধাতার বিদ্রূপ কিনা কে জানে— বয়স-বদলানো সেই অনসূয়া ও বিনয়ের ভাঙা মনের দর্পণে অস্পষ্ট ইন্দ্রধনুর ছায়া যেন এক নতুন জিজ্ঞাসা: 'মেঘের ডাকে তোমার মনের ময়ূরকে নাচাও কি?' বর্ণাঢ্য অনুভূতির উজ্জ্বল অভিব্যক্তিতে, রুচি ও রচনার উৎকর্ষে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখিকা উপন্যাসের কাব্যমণ্ডিত কাহিনীটিকে এমন জায়গায় পৌঁছে দিলেন যেখানে 'মনের ময়ূর' নামটি স্বতঃই সার্থক॥

মুদ্রণ-পারিপাট্য ও প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনায় অভিনব

॥ তিন টাকা ॥

বাঙলা সাহিত্যের গর্ব

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে

॥ সুনির্বাচিত গল্প সমূহের মনোজ্ঞ সংকলন ॥

॥ পাঁচ টাকা ॥

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

একসঙ্গে সমস্ত অতীত উতরোল হ'য়ে উঠলো অনসূয়ার বুকের মধ্যে। আশ্চর্য্য! এখনো বিনয় তাকে ভালোবাসে, এতদিন পরে, এতো কিছুর পরেও?

এখনো সে তেমনি ক'রেই সর্বস্ব নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে অঞ্জলি পেতে? কিন্তু কার দরজায়? সেই সতেরো বছরের পরিপূর্ণ-যৌবনা নির্ভরযোগ্য, বিশ্বাস-যোগ্য অনসূয়ার? সে তো কবে মরে গেছে! এতো তার কঙ্কাল! ভুল ভুল। বিনয়, ভুল ক'রেছ তুমি! তুমি কি চিরদিন বোকা হ'য়েই থাকবে? ত্যাখো, ত্যাখো, তাকিয়ে ত্যাখো। তেত্রিশ বছরের এই বিগতযৌবনা জীর্ণ শরীরটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখো তুমি, তারপর কথা বলো। তোমাকে অনেক ঠকিয়েছি, অনেক দুঃখ দিয়েছি,—তোমার সব কষ্ট,—সব দুঃখ, এই, এই মানুষটার থেকেই এক দিন জন্ম নিয়েছিলো, কিন্তু আর না, আর আমি পারি না ঋণী হ'তে। পারি না। পারি না। ঘরের চারদিকে বড়ো-বড়ো উদ্‌ভ্রান্ত চোখে তাকালো অনসূয়া, তাকালো বিনয়ের মুখের উপর। সত্যি! সত্যিই আবার সেই বিনয়। সেই নিভৃত নির্জন ঘরে আবার তাদের যুগল জীবনের ভূমিকা! সুস্থ, সবল, আরো সুন্দর, আরো পরিণত বিনয়! আরো ভদ্র, আরো মার্জিত, ভালোবাসার ভারে আরো অবনত বিনয়। কিন্তু এই মানুষকে দেবার মতো কী সম্বল আর আজ আছে তার? গুরুজনদের আকাশছোঁয়ায় ঋণ শোধ করতে করতে তো সব ফুরিয়ে গেছে। সে ঠাণ্ডা, সে মৃত। চাঁদের অতল শীতলতা ছাড়া কই, আর তো কিছুই সে অনুভব করেনি এই ষোলো বছর ধ'রে! একটা নিরন্ধ্র অন্ধকারে কেবল হাবু-ডুবু খাওয়া, দু'হাতে কেবল প্রাণপণে লগি ঠেলা এই দীর্ঘায়ুর সীমাহীন দম-আটকানো কঠিন রাস্তা পার হবার জন্য। কই? আশা কই? আলো কই? এই দীর্ঘ পথ হাঁটতে হাঁটতে সব ফুল ঝ'রে গেলো সব গন্ধ বিলীন হ'লো, ক্ষণিক জীবনের ক্ষণিকতম বসন্ত উজাড় হ'য়ে গেল এই মৃত্যুর মতো কঠিন হিমশীতল অন্ধকারের পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে-দিয়ে। তারপর আর বাকি রইলো কী? কী রইলো আর আশা করবার, আকাঙ্ক্ষা করবার, উদ্দাম আগ্রহে কুড়িয়ে নেবার?

বুকের ভেতর ব্যথা ক'রে উঠলো। ষোলো বছর ধরে একদিনের জন্যেও যাকে ভুলে থাকতে পারেনি, যার কথা ভেবে নিজেকে সে ছিঁড়েছে, খুঁড়েছে, টুকরো-টুকরো ক'রে কেটেছে, যার স্মৃতিকে হৃদয় থেকে এতটুকু ফিকে হ'তে দেয়নি পাছে সেই ভুলের রাস্তা বেয়ে আবার কোনো সুখ, কোনো মধুরতা ফিরে আসে তার জীবনে, সেই মানুষ যখন সত্যি আবার জ্যোতির্ময় হ'য়ে এসে দাঁড়ালো তার জীর্ণ পাতার কুটিরে রাজার ঐশ্বর্য্য নিয়ে, তখন কেন এমন হায়-হায় ক'রে উঠলো হৃদয়? কত কষ্ট সে পেয়েছে জীবন ভ'রে কিন্তু আজ মনে হ'লো এই কষ্টের তুলনায় সেটা ছিলো মাত্র ভূমিকা। আসল গল্পের যবনিকা উঠলো এই মাত্র।

'অনসূয়া! অনু!' নিবিড় হ'য়ে কাছে এলো বিনয়, অনসূয়ার নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মতো প্রসারিত স্থির চোখের পাতায়, মুখে, কপালে আস্তে হাত বুলোলো—

'আজ আমার ঠিক তেমনি লাগছে, তেমনিই মনে হচ্ছে সব মাঝখানকার সময়টা যেন একটা দুঃস্বপ্নের মতো কী দেখেছি। আবার আমি তোমাকে নিয়ে যাবো আমার কাছে আমার ঘরে, আবার আমাদের নতুন জীবন, নতুন সুখ, আবার তোমার আর আমার ছোট্ট সংসার—'

'আবার!' প্রায় আর্তনাদের মতো প্রতিধ্বনি করলো অনসূয়া। আবার তুমি আর আমি? আবার অনসূয়া সংসার পাতবে নতুন ক'রে? আবার কচিপাতায় ছেয়ে যাবে মরা ডাল, আসবে কুঁড়ি, ফুটবে ফুল? আবার সব হবে? হবে? তেমনি? সহসা সতেরো বছর ঘুমোনো বসন্ত সতেরোটি ফাল্গুন নিয়ে শিরশির ক'রে উঠলো সারা শরীরে—এ-গৌরব সে আজ রাখবে কোথায়? এই জয়, এই অহংকার! নিথর সমাধি থেকে ভাপসা গন্ধ ঠেলে সতেরো বছরের যৌবন লাফ দিয়ে জেগে উঠলো বুকের মধ্যে।

আছে, আছে, সব আছে। সব। সব! তিল তিল ক'রে সবটুকু এতদিন সঞ্চয় ক'রে রেখেছে অনসূয়া! এইতো, এই জন্যেই তো!

'ক্ষমা করো। ক্ষমা করো। আমাকে ক্ষমা করো তুমি।'

উত্তাল হ'য়ে সে কুড়িয়ে নিল বিনয়ের হাতটি, সেই বলিষ্ঠ হাতের পাতায় মুখ ঢেকে, সেই উত্তপ্ত প্রেমের স্রোতে গলিয়ে দিল তার এতোদিনের পুঞ্জীভূত দুঃখবেদনার শক্ত পাষাণ।

পাথর যেন ফেটে চৌচির হ'য়ে গেল। নিজেকে সে পিষে ফেললো, মিশিয়ে দিতে চাইলো বুকভাঙা মর্মান্তিক কান্নায় বিনয়ের বুকের উপর ভেঙে পড়ে। বিনয় ব্যাকুল হাতের আলিঙ্গনে জড়িয়ে নিলো তাকে, তার স্ত্রীকে। কান্না-কাঁপা, ভাঙা-খোঁপা, কোমল নরম আনত পিঠের রেখার দিকে তাকিয়ে এইমাত্র সে উপলব্ধি করলো যে যৌবনের চেয়ে এই বয়সের মূল্য অনেক অনেক বেশি। সতেরো বছরের কাঁচা অনসূয়ার চাইতে আজকের এই রোগা ছোট্ট তেত্রিশ বছরের দুঃখী অনসূয়া অনেক বেশী নিটোল, অনেক সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণতম। পরম সুন্দর।

শেষ

—আগামী সংখ্যা হইতে—

পর্য্যটক বার্ণিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

যে-বৃত্তান্ত সমগ্র পৃথিবীতে আলোড়ন তুলেছিল, সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এত দিনে বাঙলায় সাবলীল ভাষায় অনূদিত হইতেছে। প্রাচীন যুগে যেমন হিউয়েন চোয়াঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ভারতবর্ষের প্রামাণ্য ইতিহাসরূপে গণ্য হইয়াছে, আধুনিক যুগে সেইরূপ বার্ণিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইয়াছে।

অনুবাদক—বিনয় ঘোষ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

সদলবলে প্রণব বাবু দয়াল মিত্র লেনের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় তাঁর বিশ্বস্ত জমাদার রামদীন লাঠি উঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, "জলদী হট যাইয়ে, বাবু সাব।" কিন্তু প্রণব বাবু পিছিয়ে আসবার সময় পেলেন না। সহসা এক ব্যক্তি একটা ভাঙা পাঁচিলের উপর হতে একটা ছোরা হাতে প্রণব বাবুর পিছনে লাফিয়ে পড়লো। ব্যাপারটা প্রণব বাবুর বোধগম্য হবার পূর্ব্বেই লোকটা ধারালো ছোরাখানা মুঠি করে তাঁর মাথার উপর উঁচিয়ে ধরেছিল। সামান্য একটু সময় পেলে হয়তো লোকটা ওখানা প্রণব বাবুর মস্তকে আমূল বসিয়ে দিতো, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে জমাদার রামদীনের সতর্ক দৃষ্টি তাকে এ যাত্রা বাঁচিয়ে দিলে। দোধারা ছোরাখানা প্রণব বাবুর মস্তক স্পর্শ করবার পূর্ব্বে রামদীনের উদ্যত লাঠি লোকটার হাতের উপর আছড়ে পড়লো। লাঠির ঘায়ে ছোরা সমেত তার হাতখানা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল। ইত্যবসরে প্রণব বাবু প্রকৃতিস্থ হয়ে আততায়ীর উদরে সজোরে একটা লাথি বসিয়ে দিলেন। লোকটা হুমড়ী খেয়ে গলির পথে গড়িয়ে পড়লো, কিন্তু আহত হয়েও সে ছোরাখানা হাত-ছাড়া করলো না। প্রণব বাবু এইবার হেঁট হয়ে লোকটার হাত হতে ছোরাখানা কেড়ে নিচ্ছিলেন, এমন সময় একজন সিপাহী চেঁচিয়ে উঠলো, "হুজুর, হুসিয়ার!"

প্রণব বাবু লোকটার হাত হতে ছোরাখানা কেড়ে নিয়ে পা দিয়ে তাকে সজোরে চেপে ধরে মস্তক উত্তোলন করে দেখলেন, বিশ গজের মধ্যে এক স্থানে জন দশ-বারো গুণ্ডা-প্রকৃতির লোক কখোন এসে জমায়েত হয়েছে। এদের এক জনের হাতে একগোছা চকচকে ধারোলো ছোরা ছিল। হঠাৎ এক জন ছোরার গোছা হতে একখানি ছোরা তুলে প্রণব বাবুর দিকে ছুঁড়ে মারলো। ছোরাখানি সবেগে ছুটে এসে একটি বাড়ীর দেওয়ালে এসে গেঁথে গেলো। লোকটা কিন্তু এইখানে ক্ষান্ত দিলে না, সে বিদ্যুৎগতিতে একটি করে ছোরা ছুঁড়তে থাকে, এবং অপর লোকটা ছোরার পর ছোরা তাকে জুগিয়ে যায়। সোঁ-সোঁ করে ছোরাগুলি ছুটে এসে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ছিল। প্রণব বাবু বুঝলেন যে তাঁরা সুশিক্ষিত ও বেপরোয়া এক গুণ্ডাদলের সম্মুখীন হয়েছেন। প্রণব বাবু পকেট হতে পিস্তল বার করবার পূর্ব্বেই একখানি ছোরা ছুটে এসে এক জন সিপাহীর হাতের চেটোর মধ্যে গেঁথে গেলো। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সিপাহী আর্ত্তনাদ করে উঠলো, "বাবু মর গ'য়া"। প্রণব বাবু আর কালক্ষেপ না করে গুলী ছুঁড়লেন দুড়ুম, দুম! পিস্তলের আওয়াজ থামবার পর-মুহূর্ত্তে কিন্তু গুণ্ডাদের জমায়েতের আর চিহ্ন মাত্র দেখা গেল না। কখোন যে কে কোন্ দিকে পলায়ন করলো তা কেউ বুঝতেও পারেনি। ধৃত গুণ্ডাকে এক জন সিপাহীর জিম্মায় রেখে সদলে এগিয়ে এসে প্রণব বাবু দেখলেন, ঐ স্থানে চাপ-চাপ তাজা রক্ত পড়ে রয়েছে, কিন্তু গুণ্ডাদলের এক জনও সেখানে উপস্থিত নেই। বেশ বুঝা গেল, গুণ্ডাদলের অন্ততঃ দুজন সাংঘাতিকরূপে আহত হয়ে পলায়ন করেছে। কিন্তু এদিকে প্রণব বাবুর দলের এক জন সিপাহীও সাংঘাতিকরূপে আহত। সে তার বাম হাত দিয়ে ডান হাতখানা চেপে ধরে তখনও পর্য্যন্ত ঐ স্থানে বসে আর্ত্তনাদ করছিল। গুণ্ডাদের জন্য বৃথা খোঁজাখুঁজি না করে প্রণব বাবু একটা রুমাল দিয়ে আহত সিপাহীর হাতখানা সযত্নে বেঁধে দিয়ে রামদীনকে বললেন, "ট্যাক্সি বোলায়কে ইনকো হাঁসপাতালমে লে' যাও, আভি।"

জমাদার রামদীন একটা ট্যাক্সি করে আহত সিপাহীকে নিয়ে হাসপাতালে চলে গেলে, প্রণব বাবু এক জন সিপাহীর সাহায্যে আততায়িগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ছোরাগুলি সংগ্রহ করে নিলেন। তার পর তাঁর দলের দু'জন সিপাহীকে হুকুম করলেন, "ইস্ গুণ্ডাকো লেকে থানেমে লোট যাও।"

"নেহি নেহি"—মাথা নেড়ে এক জন সিপাহী উত্তর দিলে, "আপভি চলিয়ে। ইঁহা রহনে ঠিক নেহি।" "কাহে ডরতা তুম?" উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "জলদী থানেমে লোট যাও। পাঁচ সিপাহী মেরি সাথ রহেগী। এতনা ডরনেসে পুলিশকো কাম হোতি?"

ধমক খেয়ে আসামীকে নিয়ে সিপাহীদ্বয় চলে গেলে প্রণব বাবু স্থিরদৃষ্টিতে একবার চতুর্দ্দিক দেখে নিলেন। কোথায়ও কোন জনপ্রাণীও দেখা যায় না। চতুর্দ্দিক ঘিরে বিরাজ করছিল শুধু নিঃসাড় নিস্তব্ধতা। এতো বড়ো একটা ঘটনা ঘটে গেলো, কিন্তু সাক্ষীস্বরূপ এক জনও অকুস্থলে উপস্থিত নেই। গলির দু'ধারের বাড়ীগুলি নির্ব্বাক্ দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে, ভিতরে যে কোনও প্রাণী আছে তা প্রতীতি হয় না। নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হতে অব্যাহতি পেয়ে প্রণব বাবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছিলেন, সহসা তার মনে পড়ে গেলো টেলিফোনের ওপারের সেই মেয়েটিকে। বস্তুতঃপক্ষে ততোগুলো সিপাহী তো দূরের কথা, আগ্নেয়াস্ত্র পর্য্যন্ত নিয়ে এই দিন তাঁর রোঁদে বার হবার কথা নয়। যে মেয়েটি তাঁকে পূর্ব্বাহ্ণে সতর্ক করে দিয়েছিল, বারে বারে তাকে প্রণব বাবুর মনে পড়ছিল। প্রত্যুত্তরে তাকে ধন্যবাদ না দিয়ে প্রণব বাবু অকারণে কটু বাক্য প্রয়োগ করেছিলেন। আজ সর্ব্বপ্রথম প্রণব বাবু উপলব্ধি করলেন, রূপজীবিনীরাও মানুষ, তাদের মধ্যেও প্রাণ আছে ঠিক আর পাঁচ জনের মতোই। প্রণব বাবুর মন ঐ মেয়েটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছিল, তাঁর ইচ্ছা হচ্ছিল, এক্ষুণি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আসবেন রূপজীবিনীদের বিরুদ্ধে তাঁর সকল সংস্কার দূর করে

দিয়ে। কিন্তু তার ঠিকানা, বা নাম এবং টেলিফোন নম্বর তো তিনি টুকে রাখেননি। ব্যথা-ভারাক্রান্ত মনে প্রণব বাবু রামবাগানের মাঠের উপর এসে দাঁড়ালেন। এই অঞ্চলে যাদের বাড়ী টেলিফোন আছে তাদের প্রায় সকলেই মাঠরূপে পরিচিত খোলা জায়গার চারি দিককার বাড়ীগুলিতে বাস করে।

প্রণব বাবু ক্ষুণ্ণ মনে চতুর্দ্দিকের বাড়ীগুলি একে একে দেখতে সুরু করলেন। প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখে একটি করে বারাণ্ডা এবং প্রতি বারাণ্ডা চিক দিয়ে ঢাকা। নীচে বা উপরে কোথায়ও জন-প্রাণীর সাড়া-শব্দ নেই। সদা কোলাহলমুখর স্বপনপুরীকে কে যেন রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রণব বাবুর মনে ধ্রুব বিশ্বাস যে তাঁর জীবনদাত্রী মেয়েটি নিশ্চয়ই পর্দ্দার আড়ালে লুকিয়ে তাকে নিরীক্ষণ করছে। প্রণব বাবুর সন্ধানী চক্ষু পর্দ্দার ফাঁকে-ফাঁকে বৃথা অন্বেষণ করে মাটির উপর ফিরে এলো তাঁর মনকে অনুশোচনায় বিদগ্ধ করে।

প্রণব বাবু স্থির করলেন, এইবার থানায় ফিরে সকল সমাচার নরেন বাবুকে জানিয়ে দেবেন। এতো বড়ো একটা ঘটনা ঘটে গেল, এই সম্পর্কে অবশ্য তদন্তেরও প্রয়োজন আছে। প্রণব বাবু ধীর পদবিক্ষেপে মাঠ হতে বার হয়ে আসছিলেন এমন সময় সহসা তাঁর লক্ষ্য পড়লো দু'জন বালকের প্রতি। বালক দু'জন প্রণব বাবু পিছন ফিরবা মাত্র একটা বাড়ী হতে বার হয়ে সান্ত্রিদলের অলক্ষ্যে সরে পড়ছিল। তাদের প্রতি নজর পড়া মাত্র প্রণব বাবু ছুটে গিয়ে দু'জনকে ধরে ফেলে বললেন, "কারা তোমরা, এ্যাঁ? এইটুকু ছেলে এইখানে! কোথায় থাকো তোমরা?"

কেঁদে ফেলে বালকদ্বয় বললো, "আমাদের ভুল বুঝবেন না। যাঁর কাছে এসেছিলাম, তাঁকে আমরা দিদি বলি।"

বালকদ্বয়ের ঘাড়ে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে প্রণব বাবু বললেন, "ফের মিথ্যে কথা? চলো তবে থানায়।"

থানার নাম শুনে বালকদ্বয় আঁতকে উঠে বললো, "জিজ্ঞেস করুন দিদিকে। উনি মাসে মাসে আমাদের স্কুলের মাইনে দেন। ওঁর কাছে টাকা নিতে এসেছিলাম, এর মধ্যে পুলিশের হাল্লা এসে পড়লো, এই জন্যে এতোক্ষণ বেরুতে পারিনি। আমরা ঐ পিছনের বাড়ীটাতে থাকি। আমাদের ছেড়ে দিন ও দিদি-ই! মা-আ, বাবা!"

বালকদ্বয়ের কান দুটো আরও একবার নেড়ে দিয়ে প্রণব বাবু বললেন, "চালাকীর জায়গা পাওনি, কোথায় তোমাদের দিদি, দেখাও দিকি!"

এর পর আর অধিক কথা না বলে প্রণব বাবু বোধ হয় খেলাচ্ছলে হাতের টর্চ্চলাইট এধার-ওধার ঘুরিয়ে বারাণ্ডায় ঝুলানো চিকের ওপর নিক্ষেপ করলেন। টর্চ্চের আলো চিকের উপর পড়া মাত্র সেখানে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো একটি জ্বলজ্বলে মুখ। এতো রূপ এই পল্লীর কোনও মেয়ের থাকতে পারে তা প্রণব বাবুর কল্পনারও বাহিরে ছিল।

প্রণব বাবু তাড়াতাড়ি বৈদ্যুতিক টর্চ্চটি নামিয়ে নিলেন। অস্ফুট স্বরে তার মুখ হতে বার হয়ে এলো, কে এ মেয়েটি! সে নয় তো? পর্দ্দার ওপার হতে মেয়েটি অনুরোধ করলো, "ওরা মিথ্যে বলেনি। দয়া করে ছেড়ে দেবেন ওদের। যাদের আপনারা মন্দ বলেন ওরা সে গোত্রের নয়!" 'বাঃ, গলার স্বরও তো চমৎকার!' প্রণব বাবু ভেবে নিলেন, ভাষাও সাহিত্যিকার ন্যায়। এর পর তাঁর সন্দেহ রইলো না যে মেয়েটি কে? এইরূপ দরদী মেয়ে এই অঞ্চলে দু'জন থাকা অসম্ভব। কিন্তু সিপাহীদের সম্মুখে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করা তাঁর উচিত মনে হলো না। তারা যদি তাঁর সম্বন্ধে মন্দ কিছু ভেবে বসে তা'হলে? সকলের সম্মুখে অস্বাভাবিক আচরণ না করাই ভালো। কিন্তু প্রণবকে এই দিন যেন ভূতে পেয়ে বসেছিল, তিনি যাই-যাই করেও কিছুতেই এই স্থান পরিত্যাগ করতে পারছিলেন না। পরন্তু কি ভেবে প্রণব বাবু টর্চ্চের আলো পুনরায় চিকের ফাঁকে ফেলে বসলেন। মেয়েটি তখন পর্য্যন্ত চিকের ওপারে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সে প্রণব বাবুর এই ছেলেমানুষিতে হেসে ফেটে পড়লো না বরং দরদী বন্ধুর মত ইংরাজীতে চাপা-গলায় উত্তর দিলে, "ডোণ্ট বি সিলি-ই! পিপল মে থিং আদারওয়াইজ।"

এতক্ষণে প্রণব বাবু নিশ্চিতরূপে বুঝে নিতে পারলেন যে ঐ মেয়েটিই তাঁর জীবনদাত্রী। তাঁর প্রগলভতার জন্য তিনি লজ্জিতও হয়ে পড়েছিলেন। প্রণব বাবু অবাক হয়ে ভাবলেন, 'বাঃ, মেয়েটা তাহ'লে ইংরাজীও বলতে পারে!' কিন্তু সকল কৌতূহল আপাততঃ তাঁর দমন করা ভিন্ন উপায় ছিল না। তাড়াতাড়ি টর্চ্চের আলো এইবার নিবিয়ে ফেলে তিনি সিপাহীদের বললেন, "আউর কেয়া? চলো আভি থানেমে লোটকে।" এর পর একটু মাত্রও কালক্ষেপ না করে প্রণব বাবু সান্ত্রিদল সহ ঐ স্থান হতে বার হয়ে গেলেন কোনও দিকে আর ফিরে না চেয়ে।

প্রণব বাবু তাঁর সান্ত্রিদল সহ থানায় ফিরে দেখলেন অফিস-ঘরে

টসের
ম্যাকেসার কেশতৈল
অনন্যসাধারণ কেশবর্দ্ধক
সর্বত্র পাওয়া যায়
মূল্য ১৷৴০
টস্ ফার্ম্মাসিউটিক্যাল
প্রডাক্টস্ (ইণ্ডিয়া)
হেড অফিস: ১, লোয়ার রডন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—২০

হুলুস্থূল পড়ে গিয়েছে। সুধীর বাবু, রহমন সাহেব প্রভৃতি অফসররা সেইখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, এমন কি খোদ বড়বাবু পর্য্যন্ত অফিস-ঘরে উপস্থিত। ততক্ষণে জমাদার রামদীনও আহত সিপাহীকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করে দিয়ে থানায় ফিরে এসেছে। হেপাজতী গুণ্ডা আসামী সহ অপর দুই জন সিপাহীও বহুক্ষণ থানায় পৌঁছিয়ে গিয়েছে, কেবলমাত্র প্রণব বাবুই তথনও পর্য্যন্ত থানায় ফিরে আসেননি।

প্রণব বাবু অফিস-ঘরে ঢুকা মাত্র, সকলে সমস্বরে বলে উঠলো, "এই যে এসে গিয়েছেন!" বড়ো বাবু নরেন বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "কোথায় ছিলেন এতোক্ষণ? আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে বসে রয়েছি। 'আর একটু দেরী হলে আপনাকে খুঁজতে বেরুতাম। কম ভাবনা হচ্ছিল, বাপস্!' খুউব বেশী লাগেনি তো?" উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "না, স্যার, আঘাত লাগেনি। তবে নার্ভ আমার এক্কেবারে সেটার্ড হয়ে গিয়েছে। যারা মৃত্যুর মুখ হতে ফিরে আসে, একমাত্র তারা বলতে পারবে স্নায়ুর আঘাত কি।"

নরেন বাবু হাতে ধরে প্রণব বাবুকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন, "সব শুনেছি প্রণব বাবু! এখোন একটু জিরিয়ে নাও। বিহারী বাবু যে এতো বড়ো একটা দলের সর্দ্দার তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। তবে মুস্কিল এই যে, উপযুক্ত প্রমাণ না পেলে ওপরওয়ালাদের প্রকৃত বিষয় বুঝানো যাবে না। কিন্তু আমাদের ধৈর্য্য হারালে চলবে না, বিহারী বাবুর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ এই সবে মাত্র সুরু হলো। মনে রাখবেন, আমরা এমন এক অবস্থায় পৌঁছিয়েছি যে আমরা তাঁকে ছাড়লেও তিনি আমাদের ছাড়বেন না। এখোন মূল কাণ্ডটি আপাততঃ বাদ রেখে তার শাখাগুলি একে একে কাটতে হবে আমাদের, অর্থাৎ তার দলের প্রতিটি লোককে একে একে জেলে পাঠাতে হবে। এখোন হতে আমরা ওদের সম্পর্কে একটা সুযোগও উপেক্ষা করবো না। শুনলাম, কে একটা মেয়ে নাকি তোমাকে বেরুবার আগে সাবধান করে দিয়েছিল? আমার মনে হয়, মেয়েটা আরও অনেক খবর দিতে পারবে। খুঁজে বার করতে পারবে তাকে?"

এতক্ষণে অজ্ঞাতনামা রূপজীবিনী প্রণব বাবুর এক জন উপকারী আত্মীয়-বন্ধুর পর্য্যায় এসে পৌঁছিয়েছিল। উপকারী বান্ধবীকে ও জীবনদাত্রীকে বৃথা পুলিশের ঝামালায় জড়াতে তাঁর মন চাইছিল না। প্রণব বাবু কিছুক্ষণ চুপ করে ইতিকর্ত্তব্য ঠিক করে নিলেন এবং তার পর একটুও ইতস্ততঃ না করে উত্তর দিলেন, "চেষ্টা করেছিলাম, স্যার, কিন্তু খুঁজে পেলাম না। এই জন্যই তো আমার দেরী হচ্ছিলো।"

"তাকে খুঁজে পেলে ভালো হতো"—নরেন বাবু বললেন, "আচ্ছা, থাক সে কথা। এখোন আনো দেখি ধরা-পড়া গুণ্ডাটাকে। ওর কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে।" "এখুনি কি কিছু বলবে ও?" উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "লোকটা পাকা লোক, স্যার! সহজে ও কিছু বলবে না।"

নরেন বাবুর হুকুম পেয়ে দুই জন সিপাহী সাবধানে পাশের ঘর হতে দুর্দ্দান্ত গুণ্ডাটাকে পাকড়াও করে তাঁর সম্মুখে এনে উপস্থিত করলো। নরেন বাবু গুণ্ডা লোকটার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ-ই! তোমারা নাম কেয়া? বাপকো নামভি ঠিকসে বাতাও।" গুণ্ডা লোকটা বুক চিতিয়ে মাথা উঁচু করে উত্তর দিলে, "লিখ লিইয়ে, মেরি নাম মতিরাম বাম। লেকেন মেরি বাপ বদমায়েস নেহি থে। উন বহু সরিফ আদমী থে, উনকো নাম মে নেহি বাতায়গে।"

আসামী মতিরাম বাম গুণ্ডা হলেও, সে তার পিতা ও নিজের গুণাগুণ এবং ওদের প্রভেদ সম্বন্ধে সচেতন ছিল। বাপজানের উপর ভক্তিও ছিল তার অচলা। এই কারণে স্বর্গগত পিতাকে তার অকায-কুকাযের মধ্যে সে আনতে চায়নি। বড় বাবু নরেন বাবু কিন্তু তাঁকে ভুল বুঝেছিলেন। এক জন গুণ্ডার এই ধৃষ্টতায় নরেন বাবু হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "চোপরাও কমবখত, উল্লুকো পাঁঠা। তুমি গুণ্ডা হ্যায়, হামলোক গুণ্ডা নেহী? তোমসে হামি আউর বড়ি গুণ্ডা হ্যায়। বদমায়েস কাঁহাকো।" কিন্তু আসামী মতিরাম গুণ্ডাও হটবার পাত্র ছিল না। সে পূর্ব্বেকার মতই তার বুকটা চিতিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, "খবরদার বাবু সাহেব! গলি মাত দিইয়ে। হামকো জুতাসে মাত মরিয়ে, আউর গালি মাত দিইয়ে। লেকেন আপকো মর্জ্জি হোয় তো লাঠি আউর ডাণ্ডাসে মেরি ছাতি পর মারনে শেখতে।"

নরেন বাবু কিন্তু এইবার ধীর ভাবে মতিরাম গুণ্ডার উত্তর শুনলেন, কিন্তু তার এই ঔদ্ধত্যের জন্য সামান্য মাত্রও ক্রোধান্বিত হলেন না। নরেন বাবু ছিলেন পুলিশের এক জন পুরাতন অভিজ্ঞ অফিসার। এতক্ষণে তিনি মতিরাম গুণ্ডার প্রকৃত স্বরূপ বুঝে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু অপরাধী এবং অপরাধ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এক জন কর্ম্মচারী বড় বাবুকে এইভাবে অপমানিত হতে দেখে ক্ষেপে উঠে বললো, হুকুম দীজিয়ে হুজুর, ইস বদমাসকো হাম লোক দেখলেঙ্গে।" নূতন পুলিশ সাব-ইনিসপেক্টার সুধীর বাবুও এই সব গুণ্ডাদের মনোবিজ্ঞান বা মতি-গতি সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবহিত ছিলেন না। সুধীর বাবুও অপরাধীর এই ধৃষ্টতায় ক্রোধান্ধ হয়ে উঠে নরেন বাবুকে বললেন, "ওকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে বেশ করে ধোলাই করে নিয়ে আসি। ও মনে করেছে, ও একাই গুণ্ডা। আমরা যেন গুণ্ডা নই।" [ক্রমশঃ।

জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা,
সুখের সময় সবাই তারা
বিপদ কালে কেউ কোথা নাই
ঘর বাড়ী ওড় গাঁয়ের ডাঙ্গা।
—কমলাকান্ত।

রমেন চৌধুরী

ষ্টুডিয়ো-পরিচিতি

রূপশ্রী লিমিটেড

ছায়া-ঘেরা অঞ্চল এই ঝাউতলা ! কেমন নির্জন শান্ত পরিবেশ। ভোরের অনুভূতি এখানে আরো মনোরম। কয়েকটি ছবির স্যুটিংএর কল্যাণে সে মধুর অভিজ্ঞতা আমার আছে। সারা রাত কেটে গেছে বর্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ের সংগঠনায়—অবিশ্যি ব্যবসাদার হিসাবে নয়,—আকাশে শুরু হোলো রঙের খেলা, ধীরে ধীরে খ'সে যেতে থাকলো রাত্রির কালো ঘোমটাখানি। ফ্লোর ছেড়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়াই ছোট্ট পুকুরটির সামনে, চার ধারের গাছে গাছে তখন নহবৎ আরম্ভ হয়ে গেছে বিহগকুলের ! শিশির-ভেজা ঘাসের বুক থেকে আমার প্রিয় বকুল দলকে কুড়িয়ে নিই—নাঃ, কলকাতা এখনো রমণীয় আছে ! চতুর্গুণ লোকের ঠেলায় সর্ববিষয়ে কোণ-ঠাসা হ'লে কি হবে, ছ'-একটা জায়গায় এখনো আছে প্রকৃতির কবিতা লেখা।

এই ঝাউতলা রোডে রূপশ্রী লিমিটেড ষ্টুডিয়োটি উপস্থিত রুদ্ধদ্বার পড়ে আছে মুক্তির পথ চেয়ে। প্রতীক্ষা বিফল হয় না বলেই তো আমার মনে হয়। শ্রীযুক্ত কেশব দত্ত মশায়ের মুখে আমার ধারণার প্রতিধ্বনি শুনলুম—যে কোনো মুহূর্তেই ষ্টুডিয়োর পুনরায় পথ-চলা শুরু হবে। যন্ত্রপাতি প্রস্তুত আছে, দেরি শুধু শুভ মুহূর্তটির !

রূপশ্রী লিমিটেড নামটি আমরা জনসাধারণ প্রথম দেখতে পেয়েছি পর্দায় 'সহধর্মিণী' চিত্রের কল্যাণে '৪২ কি '৪৩ সালে। পরিচালক নীরেন লাহিড়ীর নেতৃত্বে এটি সংগঠিত হয়েছিলো। পরবর্তী প্রয়াস এঁদের 'দম্পতি'—পূর্বোক্ত পরিচালকেরই পরিচালনাধীনে যথারীতি মুক্তি পায়। আশানুরূপ সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে কর্তৃপক্ষ পর পর ছবি তুললেন 'নন্দিতা', 'মৌচাকে ঢিল', 'শাঁখা সিঁদুর' ও 'রূপান্তর'। 'মৌচাকে ঢিল' ছবিটি রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র—যশস্বী ছায়াছবি-সমালোচক মন্মথেন্দ্র ভঞ্জ নিয়েছিলেন এর পরিচালন-দায়িত্ব। তৎকালীন রাজনীতিজ্ঞেরা বিশেষ ভাবে প্রশংসা করেছিলেন প্রযোজক তথা সংগঠককে।

ষ্টুডিয়োর কাজ প্রথমে বাইরেই সারা হয়েছে রূপশ্রীর, কিন্তু কয়েকখানি ছবি তোলার পর ষ্টুডিয়ো নির্মাণে যত্ন নিলেন কর্তৃপক্ষ। এঁদের কর্ণধার ডাঃ এস, এন, সিন্‌হা ও শ্রীযুক্ত কেশব দত্ত অক্লান্ত পরিশ্রমে ঝাউতলায় ষ্টুডিয়ো-বাড়ির ভিত্তি স্থাপনা করলেন ১৯৪৫ সালে। বেশ এগুচ্ছিলো গৃহ-নির্মাণ, সহসা জ্বলে উঠলো আগুন সারা কলকাতায় 'ডাইরেক্ট অ্যাক্‌সান' উপলক্ষে। পার্ক সার্কাসের সীমানায় প্রবেশ নিষেধ হ'য়ে গেল ভিন্নধর্মাবলম্বীদের, কাজেই বেশ কিছু দিনের মত প্রস্তুতি-পর্বে বিরতি দেখা গেল। '৪৮ সালের নভেম্বর মাসে দ্বারোদ্‌ঘাটন হোলো রূপশ্রী চিত্রনির্মাণশালার—নিজেদের ছবির সংগে ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানেরও ছবি উঠতে শুরু করলো একক সেটের অভ্যন্তরে। টালীগঞ্জের ছোঁয়াচ এড়িয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন অঞ্চলের এই ষ্টুডিয়োটিকে শিল্পী, প্রযোজকেরা পছন্দ করেছিলেন নিশ্চয়ই, তার প্রমাণ 'সীমান্তিক', 'সংকেত', 'দিগ্‌ভ্রান্ত', 'সম্পদ', 'কৃষাণ', 'ইন্দিরা', প্রভৃতি ছায়াছবি গৃহীত হোলো এই ষ্টুডিয়োয়। নাতিদীর্ঘ বাগানবাড়ি-স্বরূপ ষ্টুডিয়ো-গৃহটি পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

এগিয়ে চলছিলো কাজ, সফলতা ক্রমশই ধরা দিচ্ছিলো কর্তৃপক্ষের তৎপরতায়, কিন্তু সম্পূর্ণ অভাবিত ভাবে নেমে এলো তীব্র আঘাত ! '৫১ সালের ১৪ই মে রাত্রি বেলায় বহু আয়াসে গড়ে-ওঠা ষ্টুডিয়োটি অগ্নিদেবের দৃষ্টিপাতে দগ্ধ হোলো। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা একটি মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। অতো কর্মব্যস্ততা নিমেষের মাঝে মন্থর হোলো। কতো চেষ্টাই না হয়েছিলো হুতাশনের শাসনের, কিন্তু কিছুই ফলপ্রসূ হয়নি।

আজও রুদ্ধ হয়ে আছে দ্বার, রুদ্ধ আছে সকল কাজকর্ম। তবে যে কোনো সময়ে যবনিকা উত্তোলিত হবে রূপশ্রীর—কর্তৃপক্ষ বাধার গ্রন্থি ছিন্ন করবেনই। তাই হোক, এঁরা নব প্রচেষ্টায় সফলকাম হোন।

কলা-কুশলী

চিত্রশিল্পী বিভূতি লাহা
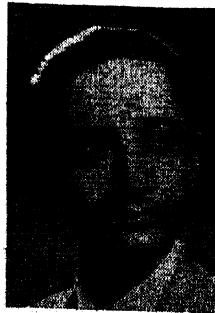
চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত বিভূতি লাহা আজ কুড়ি বছর ধরে আছেন চিত্রশিল্পের কাজ নিয়ে। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা দানা বেঁধে উঠেছে আর তারি কল্যাণে ইনি চিত্র-পরিচালকদের পর্যায়ে উন্নীত। পরিচালক অগ্রদূত-গোষ্ঠীর নাম বাঙলা তথা সারা ভারতে সুপরিজ্ঞাত—সেই অগ্রদূতের ইনি একজন।

১৯৩২ সালে বিভূতি বাবু বহু দিনকার ইচ্ছা Still photography

শেখবার সুযোগ পেয়ে গেলেন। সে সময় বৌবাজারে Arts Institute of Film Technique নামে যে স্কুলটি ছিল তাতে ইনি ভর্তি হয়ে গেলেন মাসিক কুড়ি টাকা দক্ষিণায়, কিন্তু সেটা অর্থদণ্ড-স্বরূপ হোলো বলা চলে। পুঁথিগত শিক্ষার কোনোই ব্যবস্থা সেখানে ছিলো না, কিন্তু ক্যামেরা প্রভৃতি থাকায় নিজ ব্যয়ে তাই নিয়ে চললো পরীক্ষা। কিছু দিন পরে প্রতিষ্ঠানটি উঠে গেল, তত দিনে শ্রীযুক্ত লাহা স্থিরচিত্র গ্রহণে দক্ষ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু ক্ষেত্র কই—কোথায় দেখবেন ও দেখাবেন নব অর্জিত জ্ঞানের পরিচয়? সর্বত্র চেনা-মুখের জয়জয়কার! পৃষ্ঠপোষক কেউ না থাকলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা ছাড়া গতি নেই! এমনই যখন অবস্থা তখন বড়ুয়া সাহেবের সংগে হঠাৎ যোগাযোগ হয়ে গেল, স্থির হোলো, লাহা মশাই তাঁ'র কাছে তাঁর প্রতিষ্ঠানে কাজ করবেন। কিন্তু নানা কারণে তা আর সম্ভব হয়নি। এই সময় প্রিয়নাথ গাঙুলী মশাই ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রিজ (পরে কালী ফিল্মস্) খোলেন, সেখানে সহকারী ক্যামেরাম্যানরূপে যোগ দিলেন বিভূতি বাবু। এ যোগাযোগের ফলে উক্ত কোম্পানীর প্রথম ছবি 'বিল্বমংগলে' এঁরও প্রথম হাতে-কলমে কাজ করা হোলো। উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালের মাঝামাঝি তখন।

পরের বছরেই এলো স্বাধীন কর্মদক্ষতা প্রদর্শনের অভাবিত সুযোগ। রাঁচির গবর্মেন্ট Lac-Research Inst-এর ডকুমেন্টারী ছবি তুলবেন কালী ফিল্ম সরকারী বরাত অনুযায়ী—এ কাজের ভার যাঁর ওপর ছিলো তিনি (চিত্রশিল্পী সুরেশ দাশ) পারিবারিক কারণে অনুপস্থিত থাকায় শ্রীযুক্ত লাহা গেলেন ক্যামেরা নিয়ে। প্রশংসা লাভ হোলো সকলের কাছেই। পর-পর আরও কয়েকটি ডকুমেণ্টারী ছবির চিত্রগ্রহণ যোগ্যতার সংগে ক'রে বিভূতি বাবু হাত ও পসার জমিয়ে ফেললেন। Drama-তে এঁকে সর্বপ্রথম দেখা গেল কালী ফিল্মসের 'কচি সংসদে'। দার্জিলিঙের কতকগুলি বহির্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ প্রভৃতি এই ছবিটির অর্ধেক কাজ ছিল এঁর করা। হাজরা পিক্‌চার্সের 'দেবী ফুল্লরা' পুরোপুরি এঁরি সাহায্যে চিত্রায়িত হোলো। এই সংগে কালী ফিল্মসের বাঁধন ছিন্ন হোলো লাহা মশায়ের।

হাজরা পিক্‌চার্স ষ্টুডিয়ো করলেন বি, টি, রোডের ধারে সিঁথির কাছে। বিভূতি লাহা প্রভৃতিকে সেখানে দেখা গেল। হাজরা পিক্‌চার্সের আয়ু ছিলো খুবই অল্প, মাস তিনেকের মধ্যে জীবন-দীপ নিবে গেল। হাজরা পিক্‌চার্স বিদায় নিলে সেইখানে আত্মপ্রকাশ করলো ফিল্ম প্রোডিউসার্স। বিভূতি বাবু রয়ে গেলেন নব জাতকের সহায়তা করতে। 'স্বামি-স্ত্রী' ও 'রাজকুমারের নির্বাসন' ব্যবস্থা পাকা হোলো এঁরি চিত্রগ্রহণের ফলে। 'এপার-ওপারে'র কাজ অসমাপ্ত রেখেই ইনি ফিল্ম কর্পোরেশনে যোগ দিতে বাধ্য হলেন। তার পর তুলতে থাকলেন 'অপরাধ' চিত্রটি। কিন্তু ফিল্ম কর্পোরেশন দ্বার বন্ধ করে বসলো অকালেই। আরব্ধ কাজ সারা করলেন এঁরা কালী ফিল্মসে। আবার কালী ফিল্মস! পুরাতনী পুনরায় মায়া বিস্তার করলো, লাহা মশাই ফেরাতে পারলেন না সে আহ্বান, যোগ দিলেন। 'অপরাধ' শেষ করে এঁকে যাত্রা করতে হোলো এই সময় বোম্বাই। সেখানে লক্ষ্মী প্রোডাক্‌সন্সের 'তমন্না' ও 'মেরা গাঁও' ছবি দুটির চিত্রগ্রহণ সেরে ঘরে ফিরে এলেন বছরের

বিমলচন্দ্র মল্লিকের প্রযোজনায়

রূপলিক্ পিক্‌চার্স-এর নিবেদন

ধ্রুব : মাষ্টার বিভু
উর্বশী : মিস ইণ্ডিয়া

●

অন্যান্য চরিত্রে—যমুনা সিংহ, বাণী গাঙুলী, স্বাগতা চক্রবর্তী, অজিতপ্রকাশ গৌরীশংকর, সুশীল রায়

●

পরিচালনা : চন্দ্রশেখর বসু
রচনা : কবি বিমল ঘোষ

সুরশিল্পী : বীরেন রায়
চিত্র-নির্দেশক : বিভূতি চক্রবর্তী
শিল্প-নির্দেশক : সত্যেন রায়চৌধুরী
শব্দযন্ত্রী : নৃপেন পাল
সম্পাদনা : নানা বসু

●

পরিবেশক

চিত্র-পরিবেশক

ছেলে। বোম্বায়ের যান্ত্রিক জীবনধারণ পদ্ধতি এঁর ভালো লাগেনি মোটেই।

সেই কালী ফিল্মসের আওতায় আবার চললো বিভূতি বাবুর কর্মব্যস্ত দিনগুলি কেটে···'পরিণীতা', 'শেষ রক্ষা', 'অভিনয় নয়', 'বিদেশিনী', 'নন্দিতা', 'পথ বেঁধে দিল', 'রাজলক্ষ্মী' (হিন্দি), 'সাত নম্বর বাড়ি', 'তুমি আর আমি', 'তুম্ আউর ম্যয়' উঠলো এই সময়। 'তুমি আর আমি'র চিত্রগ্রহণের পর এলো নব-জীবনের শুভ আমন্ত্রণ—পরিচালনায় আত্মপ্রকাশের অবকাশ। শব্দযন্ত্রী যতীন দত্ত, বিমল ঘোষ, শৈলেন ঘোষাল ও এঁর সম্মিলিত প্রয়াসে যে গোষ্ঠী গড়ে উঠলো তাকে আবির্ভাবের সংগে সংগেই জনসাধারণ আপনার করে নিতে ভুললেন না। সে আবির্ভাব সূচিত হোলো 'স্বপ্ন ও সাধনা'য়। অগ্রদূত-গোষ্ঠীর যাত্রা শুরু একে নিয়েই। দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হিন্দি পথের দাবী 'সব্যসাচী'। তার পর 'সমাপিকা'। অবিশ্যি এই সময় অগ্রদূত-গোষ্ঠী বৃদ্ধি পেয়ে পাঁচ জনে দাঁড়ায়—এই অতিরিক্ত মানুষটি হলেন শ্রীসন্তোষ গাঙ্গুলী, চিত্র-সম্পাদক।

এই সময় ইনি পাকাপাকি ভাবে কালী ফিল্ম ছেড়ে দিলেন। অগ্রদূত-গোষ্ঠী থেকে দু'জন বিদায় নিয়ে গেলেন—শৈলেন ঘোষাল ও সন্তোষ গাঙ্গুলী। এম, পি-র সংগে চুক্তি হোলো, এঁরা (কর্মী তিন জন) প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হলেন। লিমিটেড হোলো এম, পি, প্রোডাক্শন, কিন্তু সম্ভাবনা রইলো Unlimited! এলো 'সংকল্প', উঠলো 'সহযাত্রী', তার পর 'বাবলা'! সকলের প্রত্যাশা সার্থক হোলো। অভিনন্দনের স্রক্-চন্দনে চর্চিত হলেন এঁরা। যশের সৌরভ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো···আজকের বাঙলা ছবির সংকটের সময় এই সাফল্য শুধু প্রতিষ্ঠান-বিশেষেরই নয়, গোটা ব্যবসায়ী সমাজের তাতে অংশ আছে। আরো সুখের কথা, অল্প কিছু দিন হোলো জানা গেছে, চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে 'বাবলা' আহরণ করে এনেছে সম্মানের হীরক-মুকুট! গত বছরেও এমনি ধারা সম্ভ্রম সংগ্রহ করেছিলো আমাদের বাঙলা দেশের আর একখানি ছবি—দেশা পিক্চার্সের 'ছিন্নমূল'। পর-পর দু'বছর একই জায়গা থেকে স্বীকৃতি পাওয়া বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়।

অধুনা মুক্তি-পাওয়া ছবি 'কার পাপে', এবং পূর্ববর্তী 'বিদ্যাসাগর' এঁদেরি তত্ত্বাবধানে গৃহীত হয়েছে। এখানে বলা দরকার—'সংকল্প', 'সহযাত্রী', 'বাবলা' আর ওপরের দুটি ছবির চিত্রগ্রহণ বিভূতি বাবুরই করা। এ ছাড়া এই পরিচালক-জীবনে 'অনির্বাণ', 'বিদুষী ভার্য্যা', 'আভিজাত্য', 'মেঘমুক্তি' প্রভৃতির ক্যামেরার কাজ ইনি সফলতার সংগে করেছেন।

১৯৩২ আর ১৯৫২—ব্যবধান শুধু বিশ বছরের। এই কুড়িটা বসন্তের বিনিময়ে বিভূতি লাহা মশাই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন যথেষ্ট। অর্থ ও সম্মান কিন্তু এঁর স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন করে ফেলেনি—তার পরিচয় পাওয়া যায় মেলা-মেশায়, কথা-বার্তায়। জ্ঞানানুশীলনের স্পৃহা ও সে বিষয়ে প্রচেষ্টা দুই-ই আমায় মুগ্ধ করেছে। এর পর আসছে এঁদের 'আঁধি'। তারপর?

টকির টুকিটাকি

প্রশ্ন

লেখনী-মুখে ফুটিয়ে তুলেছেন মহিলা সাহিত্যিক শান্তি দাশগুপ্তা, তাকে চিত্রায়িত করার দায়িত্ব নিয়েছেন বর্তমান বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক সুশীল মজুমদার। সুর-তাল-লয়ে নাটকের পরিবেশ সৃজন করবেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংগীত-পরিচালক কালোবরণ। ভারত-চিত্রম-কর্ণধার বিমল দে'র প্রয়াস জয়যুক্ত হোক।

মানসী ফিল্মস

যোগেশচন্দ্র বাগচীর প্রযোজনায় এবার কর্মমুখর হ'য়ে উঠেছে কর্ম-সচিব নরেন দত্ত মশাই গল্প নির্বাচনের জন্যে সবিশেষ ব্যস্ত। সময়ের সংগে সংগতি রক্ষা করে যেন কর্মপদ্ধতি স্থিরীকৃত হয়—আগে থেকে আমরা সে কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

পথিক

'কবি', 'রত্নদীপ', খ্যাত চিত্রমায়ার নব উদ্যোগ জনসাধারণ আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করবেন। বিশিষ্ট প্রয়োগশিল্পী দেবকীকুমার বসু বহুরূপীর 'পথিক'কে নতুন রূপ দেবার অংগীকারে আবদ্ধ। মঞ্চের (সৌখিন) পথিক এত দিনে চির-আয়ুষ্মান্ হবার বরাত লাভ করলো।

স্বর্গের উর্বশীর

ভূমিকায় মর্তের উর্বশী মিস্ ইণ্ডিয়া! সংবাদপত্রে ক'দিন ধরে বিজ্ঞাপিত। সকলের মাঝে উৎসাহের সাড়া পড়ে গেছে, উর্বশীকে দেখতে পাওয়া দাবে চিত্রের মাধ্যমে। ভারত-সুন্দরীর রূপ-লাবণ্যের কথা কার না শোনা আছে? এ-হেন যোগাযোগ করেছেন রলিক্ পিকচার্স তাঁদের ভক্তিমূলক কথাচিত্র 'ভক্ত ধ্রুব'র মাঝে। এ ছাড়া ধ্রুবরূপী মাষ্টার বিভুর অনবদ্য অভিনয় আছে এ ছবিতে। সুষ্ঠু চিত্রের প্রয়োজন হয়েছে আজ—সামাজিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক—যে ছবি হোক ক্ষতি নেই। অর্থ, প্রচেষ্টা, সেই সংগে ব্যবসায়গত নিষ্ঠা রক্ষিত হলে সকলেরই লাভ। 'ধ্রুব'র রূপায়ণ সার্থক হোক।

পদ্মা নদীর মাঝি

সুসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু-প্রশংসিত উপন্যাস। প্রযোজক সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদার আবার চিত্রজগতে অবতীর্ণ হয়েছেন আর ঐ অতি-খ্যাত কাহিনীটিকে নিয়েই চলেছে তাঁর প্রচেষ্টা। ইতিমধ্যে চিত্রস্বত্ব ক্রয় হয়ে গেছে, চিত্রনাট্য রচনা সমাপ্ত প্রায়, অবিলম্বে শুরু হবে চিত্রগ্রহণ। আই• পি• টি• এ• রূপশিল্পীগণ সুখের বিষয়, এই ছবিটি সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত করবেন।

আগামী ১৯শে

সেপ্টেম্বর শরৎচন্দ্রের বিন্দুর ছেলে মুক্তিলাভ করবে শহর ও শহরতলীর রূপালি পর্দায়। 'বিন্দুর ছেলে' মঞ্চের মায়া কাটিয়ে সত্যিই তাহলে পর্দায় দেখা দিচ্ছে। যুগান্তর ছায়া-প্রতিষ্ঠান-কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ!

মাকড়সার জাল

নীলকান্ত পিকচার্সের। পরিচালক পশুপতি কুণ্ডু। রচনাকার যোগেশ চৌধুরী। উপস্থিত আছে সম্পাদনাগারে। রূপায়ণে আছেন বিকাশ রায়, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, অনুভা গুপ্তা, শান্তি সান্যাল, অপর্ণা—অর্থাৎ সমগ্র তারকা-খচিত বাণীচিত্র!

বিমল মল্লিক-এর

দ্বিতীয় প্রচেষ্টা 'মন্ত্রশক্তি' আরো কিছুটা প্রস্তুতির পথে অগ্রসর হয়েছে। 'ধ্রুব' মুক্তিলাভ করলেই এঁরা নতুন ছবির স্যুটিং শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন। এটিও রলিক পিক্চার্সের পতাকায় গৃহীত হবে।

আকাশ-পাতাল

[৭০০ পৃষ্ঠার পর]

সঙ্গে মামলা চালাতে চালাতেই ফতুর হয়ে গেছি যে অনন্তদা! হাকিমকে হাত করেছে প্রজাদের দল, ম্যাজিষ্ট্রেটকে ভেট পাঠিয়ে পাঠিয়ে বশ ক'রেছে। আমাদের পক্ষ থেকে কোন তদ্বির হচ্ছে না। উকিলই শুধু টাকা খেয়ে যাচ্ছে।

কথায় কথায় বুঝি মনে পড়ে যায় অনন্তরামের। বলে,—তোমার মনোহরপুরের প্রজাদের ভারী ইচ্ছে যে আমি ওদের দেখাই-শোনাই কলকাতার যা-কিছু দেখাবার আছে। বলছে যে আসছে কাল রোববার আছে, ছুটির দিন, চল' আমাদের নে চল'। যতই হোক গেঁয়ো মানুষ, দেখতে বেরিয়ে যদি হাইরে-টাইরে যায়!

কৃষ্ণকিশোর বললে,—ঠিক কথা। তা তুমি যেও না কাল ওদের সঙ্গে ক'রে। কোথায় কোথায় যাবে?

—মরা সোসাইটি, আলিপুরের চিড়িয়াখানা, কালিঘাটের কালীমন্দির, মনুমেণ্ট, হাইকোর্ট, ইডেন গার্ডেন, খিদিরপুরের ডক, শিবপুরের কোম্পানীর বাগান ইত্যাদি যা-যা দেখাবার আছে।

কথার শেষে অনন্তরাম দম নেয়। কথা বলতে বলতে হাঁফিয়ে ওঠে হয়তো। বলে,—চল' তবে, যাই, টাকা গুণতে গুণতে যেন রাত্তিভোর হয়ে যাবে। দু'-চার টাকা হ'লে ন' হয় কথা ছিল, এক ঘড়া টাকা যে।

কৃষ্ণকিশোর গমনোদ্যত হয়ে বলে, —চল' না দু'জনে গুণে শেষ করে ফেলবো।

অনন্তরাম বললে,—পাল্কী আবার কাদের আসছে?

সত্যিই ফটক পেরিয়ে ঢুকছিলো তখন একটা ঘেরাটোপে ঢাকা পাল্কী। বাহকের দল সোৎসাহে ছড়া কাটতে কাটতে আসছিল। কৃষ্ণকায় ঘর্মাক্ত শরীরের পেশী নাচিয়ে নাচিয়ে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—বটঠাকুমা পাঠিয়েছে পাল্কী। বড়বাড়ীতে পুণ্যে খাওয়া-দাওয়ার নেমন্তন্ন আজ। বৌ যাবে নেমন্তন্ন খেতে। অনন্তদা, পাল্কী ফেরৎ পাঠাও। বলে দাও, 'আমাদের গাড়ী যাবে বৌকে পৌঁছতে।

—তুমিও তো যাবে? না বৌ একলা যাবে? শুধোয় অনন্তরাম।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—একলা কেন? সঙ্গে বিনো যাবে'খন। আমি যাবো সেই খাওয়ার সময়, রাত্তিরে। তুমি পাল্কী ফেরৎ পাঠাও। আমি সিন্দুকের ঘরে যাচ্ছি।

অনন্তরাম ইতস্ততঃ করে যেন। অনিচ্ছায় বলে,—তুমি যখন হুকুম করছো, ব'লে আসছি আমি। কিন্তু, পাল্কীটা ফেরৎ দিলে কি ঠিক হবে? ভাববে না তো অপমান করলে? ভেবে-চিন্তে দেখো এখনও।

কোন কিছু না ভেবেই বললে কৃষ্ণকিশোর,—না, না, কিচ্ছু ভাববে না। যেতে বল তুমি বেয়ারাদের। আমাদের গাড়ী না থাকলে বলতুম না। গাড়ী যখন আছে—। যাও, যাও বলগে তুমি। আমি যাচ্ছি ঘর খুলতে।

অন্দরে যেতে যেতে হঠাৎ লক্ষ্যে পড়লো অদূরের বাতায়ন-পথ।

হাস্যময়ী কে একজন। বিনা কারণে মুখে হাসি ফুটেছে কেন? পান-রাঙা ঠোঁটের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে না শুভ্র দন্ত? বৈকালী সূর্য্যের রক্তিমে এমন দেখাচ্ছে, না, সত্যিই আরও অনেক ফর্সা হয়েছে আইভিলতা। মুখে যেন ফুটেছে গার্হস্থ্য গাম্ভীর্য্য। তবুও সেই জন্মগত হাসির অভ্যাস যাবে কোথায়। সেই পুরানো হাসি। জাফরাণ রঙের শাড়ীতে আইভিলতাকে মানিয়েছে কি অদ্ভুত! হাসি-খুশী মুখে জানলার গরাদে ঊর্দ্ধাঙ্গ চেপে ধ'রে দেখছে আর হাসছে।

তখন অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিজাল ছড়িয়ে পড়েছে গৃহশীর্ষে, বৃক্ষচূড়ায়। মুঠো মুঠো আবীর ছড়ালো কে? পশ্চিম দিগন্তে লাল রঙের বন্যা ছুটলো কখন!

এখন কিন্তু অপেক্ষা করবার ফুরসৎ নেই। আইভিলতাকে দাঁড়িয়ে দেখবার। ঘড়ার টাকা গুণে শেষ করতেই হবে। টাকা গুণলে তবে রূপোর টাকাকে কাছারীতে পাঠিয়ে কাগজের টাকায় পরিণত করাতে হবে। কে বইবে অত রূপোর টাকা!

সিন্দুকের ঘরে যেন সোঁদা-সোঁদা গন্ধ।

ঘর খুলতেই ভ্যাপসা গন্ধ পাওয়া যায়। রুদ্ধদ্বার বন্ধ-ঘরের

তরল আলতা

বলতে বোঝায় সুপ্রসিদ্ধ পি, সি, দাসের "সুবাসিত তরল আলতা" যে-শত বৎসর ধ'রে সুনাম অক্ষুন্ন রেখে সমভাবে চ'লে আসছে। মাত্র একবার ব্যবহারেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান হয় – কারন তারপর আর কোন আলতায় মেয়েদের মন ভরে না........

আলতা-সিঁদুর-স্নো-ক্রীম সকলে সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠানেই পাওয়া যায়।

দম-আটকানো আবহাওয়া। দরজা খুলতেই 'কড়িকাঠে চামচিকাগুলো বোধ করি ন'ড়ে-চ'ড়ে ওঠে। বোঝে হয়তো ঘরে আলো ঢুকলো। আরশুলার ঝাঁক পালায় যত্র-তত্র।

অনন্তরাম ফিরে আসতেই বললে কৃষ্ণকিশোর,—দেয়াল-গিরিটা জ্বালাও। তাঁবেদারদের ডাকো না কাউকে। জ্বেলে দিয়ে যাক্।

—ওফ্, কদ্দিন বাদে ঘরটায় ঢুকেছি কে জানে। কথা বলতে বলতে ইতিউতি দেখে অনন্তরাম। দেখে, ঘরে ঝুল হয়েছে, চামচিকা ও আরশুলায় ঘর নোংরা করেছে। বললে, —দেয়াল-গিরি জ্বালো বললেই জ্বলবে? সাফ নেই, তেল নেই, জ্বালতে ঢের দেরী হবে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—তবে লণ্ঠন-টণ্ঠন যা হয় দিয়ে যেতে বল'। দেরী করলে চলবে না। দাঁড়িয়ে থেকো না অনন্ত, যাও চটপট। বলছি, শুনছো না কেন?

—যাচ্ছি হে যাচ্ছি। বলে অনন্তরাম। বলে,—তোমার যে দেখছি উঠলো বাই তো কটক যাই। দেখছি ঘরটা, কদ্দিন বাদে ঘরটায়— কথা বলতে বলতে অনন্তরাম চ'লে যায় তড়িৎগড়িতে।

অন্দরের একতলায় যেতেই দেখতে পায় অনন্তরাম, উঠোনের ধারে উবু হয়ে ব'সে লণ্ঠনের ভুষো পরিষ্কার করছিল দু'জন তাঁবেদার। তাদের তোয়াক্কা না ক'রে না ব'লে-ক'য়ে ঝট করে একটা লণ্ঠন তুলে নেয় অনন্তরাম। বলে,—জ্বেলে দে দেখি। আমি ততক্ষণ গাঁজার কলকেয় দু'টো টান মেরে আসি। লণ্ঠনটা রেখে মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় অনন্তরাম।

বিনোদা কাছাকাছি ছিল কোথায়।

খ্যাক করে উঠলো যেন। বললে,—রাখো রাখো। আগে বৌমার ঘরে আলো দিতে হবে। সাজতে-গুজতে হবে তাকে। ব'সে আছে সে আলোর জন্যে।

তাঁবেদার দু'জন হাসাহাসি করে। চকমকি ঘষে দু'টো লণ্ঠনের শিখা জ্বালাতে উদ্যোগী হয় দু'জনেই।

সূর্য্য কি ডুবে গেল তবে?

আঁধার নেমেছে দিকে দিকে। মশা উড়ছে ঝাঁকে-ঝাঁকে। আকাশ কালো হয়ে যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। গৃহলগ্ন প্রাঙ্গণের গাছে গাছে কূজন করছে কাক আর চড়াই।

আলোর জন্যে সত্যিই কতক্ষণ ব'সেছিল রাজেশ্বরী।

বিনোদা লণ্ঠনটা ঠক ক'রে বসিয়ে দেয় ঘরের মেঝেয়। বলে,—নাও বৌ নাও, ব'লে পাঠিয়েছিল সকাল সকাল যেতে। তাড়াতাড়ি নাও।

রাজেশ্বরীও ভাবছিল তো সেই কথাই। ভাবছিল কত দেরী হয়ে গেল। এখনও পায়ে পাইজোর এঁটে দেয় এলোকেশী আর রাজেশ্বরী ক্যাশবাক্সে ঝুঁকে প'ড়ে খোঁজে অন্যান্য অলঙ্কার। আরও আছে পদালঙ্কার; আছে গোল মল, আজট, চরণ-পদ্ম; পাওড়া আছে, ঝাঁকমলও আছে। কিন্তু পা তো আছে দু'টো। হঠাৎ চোখে পড়তেই অঙ্গুরীয়ক কয়েকটা তুলে নেয় রাজেশ্বরী। তিন আঙুলে তিনটে আঙটি দেয়। হলদে পোখরাজ, লাল মুক্তা আর বৈদূর্য্য।

বিনোদা অনেকক্ষণ দেখে-শুনে বললে,—আয়নাটা সামনে দিই বৌ?

রাজেশ্বরী বলে,—হ্যাঁ দাও। কম আলোয় দেরাজের আয়নায় দেখা যায় না কিছু। কথা বলতে বলতে মুকুটের কালো ভেলভেটের বাক্সটা খুলে ফেলে রাজেশ্বরী। হেসে ওঠে যেন ঘরটা। লণ্ঠনের আলো-আঁধারি আর মুকুটের রত্নময় শোভা। মাথায় মুকুট চাপায় রাজেশ্বরী। বিনোদার বসিয়ে দেওয়া আয়নায় দেখতে দেখতে মাথায় মুকুট পরে। মুকুটের দু' পাশে কাঙরা ওঠানো, মধ্যস্থলে উচ্চ চূড়া। চূড়াতে পাখীর সুদৃশ্য পালক। রাজেশ্বরীকে দেখায় ঠিক রাজমহিষীর মত। হীরা আর মুক্তাখচিত মুকুটটা পাওয়া গেছে শ্বশুরালয় থেকে। রাজেশ্বরীর দিদিশাশুড়ীর মুকুট, কুমুদিনীর শাশুড়ীর। গ্রীবা বাঁকিয়ে একেক কানে পরে কুণ্ডল—যার ধাপে-ধাপে হীরকপংক্তি, আটটা নেমী। দু' কানে কুণ্ডল ঝুলিয়ে আয়নায় দেখে রাজেশ্বরী। দোদুল্যমান কুণ্ডল, যার অন্য নাম কর্ণবেষ্টন?

—গলায় কিছু দিলে না বৌ? দেখতে দেখতে হঠাৎ কথা বললে বিনোদা।

—হ্যাঁ। ভাবছি গলায় কি পরি? বললে রাজেশ্বরী।

—ঐটি তো বেশ। দে না গলায়। বলে এলোকেশী।

রাজেশ্বরী বললে,—আমিও ভেবেছি নক্ষত্রমালার কথা। কালো রঙের শাড়ীতে খু—ব মানাবে।

নক্ষত্রমালাটা গলায় বাঁধে রাজেশ্বরী। সাতাশটি মুক্তায় গ্রথিত একাবলী কণ্ঠভূষণের নাম নক্ষত্রমালা? যার মধ্যে থাকে পদক? চৌদ্দ রতির পান্না দেওয়া পদকটা কালো শাড়ীতে দেখায় ঠিক কালো দীঘির জলে সবুজ পদ্মপত্র। আর গলায় ঠিক এঁটে থাকবে ব'লে গলায় জড়ায় সরিকা। মুক্তার সরিকা। বাহুতে পরে কেয়ূর। সিংহমুখাকৃতি ও বিবিধ রত্নখচিত কেয়ূর যার নামান্তর বাহুবট না অঙ্গদ?

এলোকেশী পরিয়ে দেয় কেয়ূর। রাজেশ্বরী আয়নায় দেখে বাহুযুগল। মুহূর্ত্ত কয়েক দেখে বলয় তুলে নেয়। বলয় দু'টি ব্যাঘ্রমুখাকৃতি। হাতের কব্জায় এঁটে দেয় এলোকেশী। বলয় না বালা? নানা রঙের মিনার কাজ বালা দু'টিতে। মধ্যে মধ্যে পলকি হীরা। রাজেশ্বরীর অজ্ঞাতে রেকাবীতে চুড়ির রাশি দেখে হাত দু'টো টেনে কখন চুড়িগুলি পরিয়ে দিয়েছে বিনোদা। কুঁচো হীরের চুড়ি। আট দু'য়ে ষোলটি চুড়ি। নাকে নোলকটা ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়ায় রাজেশ্বরী। বলে,—এলো, হয়েছে হয়েছে। বাক্সগুলো তুলে রাখ্, দেরাজে। বিনোদিদি তোল' না ভাই। আমি কপালে টিপটা—

কপালে সিঁদুর-টিপ দিলেই শাঁখা-নোয়ায় সিঁদুর দিতে

হয়। সিঁদুর-কৌটটা রাখতে রাখতে বললে রাজেশ্বরী,—তুমি তো সঙ্গে যাবে বিনোদিদি ! ব'লে পাঠাও আমি তৈরী হয়েছি। এলো, ভাল ক'রে ছ্যাখ কিছু যেন না প'ড়ে থাকে। গালচেটা তুলে নেড়ে-চেড়ে ছ্যাখ,।

—কিচ্ছু প'ড়ে নেই। খু—ব ভাল ক'রে দেখেছি আমি। বললে এলোকেশী।

বিনোদা দরজার কাছাকাছি এগোতেই দেখলো অনন্তরামকে। বললে,—বৌ তো তৈরী।

অনন্তরাম বললে,—গাড়ীও তো তৈরী। গাড়ীতে যেয়ে উঠলেই হয়।

রাজেশ্বরী বললে চুপি-চুপি,—এলো, তুই রইলি। দেরাজে চাবি দে। চাবি ঠিক থাকবে না ফেলে-ছড়িয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়বি তুই ?

—না গো না। আমি কি দিন নেই রাত্তির নেই ঘুমোচ্ছি ? এলোকেশী বেশ কুপিত হয়ে কথা বলে।

—চল' তবে বৌ। বললে বিনোদা।

রাজেশ্বরীও চললো অলঙ্কার ও পোষাকে ভারাক্রান্ত দেহে। কাব্যের রূপমাত্রে কোন মূল্য নেই, কেবল বাক্য শুনে কর্ণতৃপ্তি হয় না, যেজন্য কাব্যকে অলঙ্কারে সুশোভিত করে কোবিদের দল। শুধু রূপে নারীদেহও হয়তো অনুরূপ বিকশিত হয় না, যেজন্য সেই আদিম যুগ থেকে বোধ করি অলঙ্কারের চল।

ঘর-কালো আকাশে চন্দ্রোদয় হয়েছিল। হঠাৎ সেই চাঁদ মেঘের ফাঁকে লুকিয়ে পড়লো। অলঙ্কারবিভূষিতা রাজেশ্বরী চলে যাওয়ায় চাঁদহীন কালো আকাশের রূপ ধারণ করলো যেন ঘরটি।

রাজেশ্বরী যেতে যেতে শুনলো টাকা বেজে চলেছে অবিরাম। টাকা গোণা হচ্ছে সিন্দুকের ঘরে।

কৃষ্ণকিশোর তখন বলছিল,—কত হ'ল অনন্তদা !

—সাড়ে আট হাজার হ'ল গিয়ে তোমার। বলছিল অনন্তরাম। বলছিল—আর গিনি তিনশো তেত্রিশ। মোহর দুশো আট।

টাকা বেজে যায় অবিরাম। যেতে যেতে শোনে রাজেশ্বরী।

বড়বাড়ীতে জনাগম হয়েছে প্রচুর।

বেললণ্ঠন জ্বালা হয়েছে; আলোর ঝাড়েও আলো। ভিয়েনে চুল্লী জ্বলছে কতগুলো। লোকজন খাচ্ছে ছাদে। পংক্তিভোজন হচ্ছে। পাড়া-পড়শী আর আত্মজনেরা খাচ্ছে। সদর আর মফঃস্বলের প্রজাদের ভিড় হয়েছে। পুণ্যাহের শুভদিনের ভূরিভোজ হচ্ছে। অন্দরে মেয়ে-মহলে সাড়া পড়ে গেছে। কথা, ডাকাডাকি আর চিৎকারে কান পাতা দায় হয়ে উঠেছে।

খিড়কিতে গিয়ে ভিড়লো জুড়ী।

বিনোদা বললে,—নাবো বৌ গাড়ী থেকে। গিয়ে সকলকে প্রণাম করবে। বুঝে-সুঝে কথা বলবে।

কোথায় ছিল মাধবীলতা। এলো ছুটতে ছুটতে। রূপকথার রাজকন্যার মত এলো যেন পাখা মেলে, উড়তে উড়তে। হাসতে হাসতে বললে,—কত দেরী করলে বল তো ? ঠায় দাঁড়িয়ে আছি আমি তোমার জন্যে। আমি দূর থেকে ভাবলাম বুঝি কোথাকার বেগম-টেগম এলো। কি চমৎকার দেখাচ্ছে বৌদি তোমাকে ! চল'—মা, জ্যাঠাইমা, কাকীমাদের কাছে চল'।

রাজেশ্বরী চললো মাধবীলতার হাত ধ'রে। যেন আত্মজ্ঞান হারিয়ে। অন্দরে যেতেই কেউ কেউ দেখলো। কেউ কেউ ফিরেও তাকালো না। চলে গেল মুখ ঘুরিয়ে।

মাধবীলতা চিৎকার করে বললে,—দেখ' মা, কে এয়েছে !

রাজেশ্বরী নতদৃষ্টি তুলে দেখলো। একজন স্থূলাকৃতি মহিলা। তাঁতের শুভ্রবাস। জামা নেই গায়ে। হাতে গোছা-গোছা জলতরঙ্গ চুড়ি, বাহুতে অনন্ত। গলায় মটরমালা। প্রতিমা'র মত ঢলঢলে মুখ। তাম্বূলরাগরক্ত অধর। সীঁথিতে টকটকে লাল সিঁদুর। সহাস্যে বললেন,—এসো মা এসো। কত দেরী করলে বল'তো ! সকাল সকাল আসতে হয়। যাও, বটঠাকুমার সঙ্গে দেখা করগে যাও। যা, নে যা মাধবীলতা।

অন্য একজন বৌ কাছাকাছি কোথায় ছিলেন। ছিমছাম দেহের গঠন। লম্বাটে আকৃতি। যুক্ত ভ্রূযুগল কুঁচকে বললেন ঠোঁট বেকিয়ে,—ঠাট-ঠমক তো দেখছি খুব বৌয়ের ! সিন্দুক উজাড় ক'রে গয়না গায়ে দেওয়া হয়েছে ! স্বোয়ামী তো ওদিকে এক মুসলমান বাইজীকে বাঁধা রেখেছে ! ফিরেও তাকায় না।

অনেক উঁচু থেকে কে বুঝি আচমকা ঠেলা মেরে ফেলে দিলো রাজেশ্বরীকে। বুকে কে বুঝি হাতুড়ীর ঘা মারলো। চোখের সমুখে বুঝি কাঁপতে লাগলো পৃথিবী। রাজেশ্বরীকে ধরলে বোধ করি ভাল হয়। রাজেশ্বরী হয়তো জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে যাবে। কুল-কুল ক'রে ঘামতে লাগলো রাজেশ্বরী। মুখ তুলে তাকালো শুধু কাজল-কালো চোখ মেলে। মনে মনে হয়তো ভাবলো,—হে ধরণি, দ্বিধা হও।

[ক্রমশঃ।

ভাই বন্ধু দারাসুত, কেবলমাত্র মায়ার গোড়া
ম'লে, সঙ্গে দিবে মেটে কলসী, কড়ি দিবে আটকড়া।
—রামপ্রসাদ

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

বলশেভিক পার্টির কংগ্রেস—

সম্প্রতি আন্তর্জ্জাতিক মধুচক্রে যে তিনটি লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হওয়ায় জল্পনা-কল্পনার ব্যাপক গুঞ্জরণ সুরু হইয়াছে তন্মধ্যে আগামী ৫ই অক্টোবর (১৯৫২) সোভিয়েট ইউনিয়ন কম্যুনিষ্ট পার্টির কংগ্রেস আহূত হওয়ার সিদ্ধান্তকে প্রধানতম বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। সোভিয়েট রাশিয়ার বিভিন্ন পত্রিকায় ২০শে আগষ্ট (১৯৫২) তারিখে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। ইহার তিন দিন পূর্ব্বে ১৭ই আগষ্ট তারিখে চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাইয়ের নেতৃত্ব একটি চীনা প্রতিনিধি দল মস্কো যাইয়া পৌছেন। এই দুইটি সংবাদই আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট তোলপাড় সৃষ্টি করিতে সমর্থ। ইহার উপর আছে পিকিং-এ এসিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির শান্তি-সম্মেলন। এই শান্তি-সম্মেলনের কথা অবশ্য অনেক পূর্ব্বেই ঘোষিত হইয়াছে। গত জুন মাসের (১৯৫২) ৩রা হইতে ৬ই পর্য্যন্ত পিকিং-এর এই শান্তি-সম্মেলনের জন্য একটি প্রস্তুতি সম্মেলনের অধিবেশন হয় এবং শান্তি-সম্মেলনের অধিবেশন হওয়ার দিন ধার্য্য হইয়াছে ২৫শে সেপ্টেম্বর। এই তিনটি ব্যাপার ছাড়া আরও দুইটি ঘটনার কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তন্মধ্যে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতদের অদল-বদল অন্যতম। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব পরিমাপ করা হয়ত সহজ নয়। উহা সোভিয়েট পররাষ্ট্র-নীতিতে কি পরিবর্ত্তন সূচনা করিতেছে তাহাও অনুমান করা কঠিন। কিন্তু পূর্ব্ব-ইউরোপের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিকে যে ভাবে কতক পরিমাণে ঢালিয়া সাজা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য অনুমান করা কঠিন নয়। উল্লিখিত ঘটনাবলীর মধ্যে সময়ের ব্যবধান যেমন খুব কম, তেমনি পরস্পর-নিকটবর্ত্তী এই সকল ঘটনার সমষ্টিভূত প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে অনেক রকম সন্দেহ ও আশঙ্কা সৃষ্টি করিবে, ইহাও খুব স্বাভাবিক।

আমরা উপরে যে পাঁচ দফা ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছি সেগুলির মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন কম্যুনিষ্ট পার্টির কংগ্রেসের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন কম্যুনিষ্ট পার্টির ইহা উনবিংশতম কংগ্রেস। ১৯৩৯ সালের পর গত ১৩ বৎসরের মধ্যে আর উহার অধিবেশন হয় নাই। শুধু দীর্ঘকাল পরে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির অধিবেশন হইতেছে বলিয়াই নয়—উহার কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত দুইটি বিষয়ের জন্য উহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথমতঃ, এই কংগ্রেসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে নূতন কলেবর দেওয়া হইবে এবং কমিটির গঠনতন্ত্রেরও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এই কংগ্রেস রাশিয়ার পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১—৫৫) সম্পর্কেও বিবেচনা করিবেন। পশ্চিমী শক্তিবর্গ রাশিয়ার অতি নগণ্য কার্য্যকলাপকেও সুতীক্ষ্ণ সন্দেহের দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়া থাকেন। কাজেই রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির গঠনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন এবং পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে রাশিয়ার বড় রকম কোন মতলবের সন্ধান করা হইবে ইহা অসম্ভব কিছুই নয়। কম্যুনিজম নিরোধের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে বিপুল আয়োজন করিয়াছে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির পরিবর্ত্তনকে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া উহার মধ্যে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগোষ্ঠীর শক্তিবৃদ্ধির প্রয়াসের সন্ধান করা হইলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টিই শুধু নয়, সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের দিক হইতেই কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পার্টির কর্ম্মসূচীর পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন এই কংগ্রেসেই হইয়া থাকে। কংগ্রেসই পার্টির মূলনীতি নির্দ্ধারণ এবং কেন্দ্রীয় কমিটি নিয়োগ করিয়া থাকে। নূতন নীতি নির্দ্ধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় কমিটিই কংগ্রেসের নির্দ্ধারিত নীতি অনুযায়ী কার্য্যতঃ সোভিয়েট ইউনিয়নের রাজনীতি ও অর্থনীতি পরিচালন করিয়া থাকেন। কি নূতন নীতি নির্দ্ধারিত হইবে, তাহা অবশ্য কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বে অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির গঠনতন্ত্রে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে তাহার কথাই শুধু এখানে আলোচনা করা সম্ভব।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টির যে সকল পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে, তন্মধ্যে পার্টির ভিত্তিকে বৃহত্তর করার প্রস্তাব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এখন পর্য্যন্ত রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশিত আছে তাহাতে এই কম্যুনিষ্ট পার্টি হইল "The foremost organized detachment of the working class" অর্থাৎ শ্রমজীবীদের সংগঠিত অগ্রগামী স্বতন্ত্র দল। বর্ত্তমানে রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির সংজ্ঞার যে পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাতে কৃষকরা ও বুদ্ধিজীবীরাও অর্থাৎ যাঁহারা তাঁহাদের মস্তিষ্কের শক্তি বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন তাঁহারও কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হইতে পারিবেন। সোজা কথায়, কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হওয়ার অধিকার সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির গঠনতন্ত্র পরিবর্ত্তনের খসড়ার প্রস্তাবে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে 'A voluntary militant union of Communists drawn from the peasantry, working class and intellectuals,' অর্থাৎ কৃষক, শ্রমিকশ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবী কম্যুনিষ্টদের স্বেচ্ছামূলক সংগ্রামশীল ইউনিয়ন বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রস্তাবিত দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন পলিট ব্যুরো এবং অর্গ ব্যুরোকে সম্মিলিত করিয়া একটি পরিষদ বা প্রেসিডিয়াম (Presidium) গঠন করা। এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে পলিট ব্যুরো এবং অর্গ ব্যুরোর কোন অস্তিত্ব আর থাকিবে না। কম্যুনিষ্ট পার্টির বিভিন্ন সংগঠন অঙ্গের মধ্যে পলিট ব্যুরোই বোধ হয় ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর প্রথম সৃষ্ট হয়। কম্যুনিষ্ট পার্টির বিভিন্ন 'অর্গানে'র মধ্যে পলিট-ব্যুরোই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী। পলিট ব্যুরোই কার্য্যতঃ নীতি নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। পার্টি পরিচালনের দায়িত্ব, অর্গ ব্যুরোর

উপর। অনেকে মনে করেন, এই প্রেসিডিয়ামের চেয়ারম্যান হইবেন ষ্ট্যালিন। অনেকে ইহাও মনে করেন যে, অতঃপর মঃ জর্জ্জি মালেনকোফ রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল বা সাধারণ সম্পাদক হইবেন। ইহার কারণ এই যে, কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পাঁচ জন সেক্রেটারীর মধ্যে মঃ মালেনকোফকেই কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট কংগ্রেসে পেশ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে ষ্ট্যালিনের পরে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত কে হইবেন তাহা লইয়াও জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে। বিশেষতঃ ষ্ট্যালিনের বয়স এখন ৭২ বৎসর। তাঁহার হৃদযন্ত্রের অবস্থাও নাকি ভাল নয়। অবশ্য চিকিৎসকগণ বলিয়াছেন যে, ষ্ট্যালিন দেড় শত বৎসরও বাঁচিতে পারেন। তিনি যত দিনই জীবিত থাকুন, তাঁহার উত্তরাধিকারী কে হইবেন, তাহা লইয়া আলোচনা করিবার স্থান আমরা পাইব না। যিনিই সেক্রেটারী জেনারেল হইবেন, তিনিই ষ্ট্যালিনের উত্তরাধিকারী না-ও হইতে পারেন।

ষ্ট্যালিন যদি কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল না থাকেন এবং তিনি যদি প্রেসিডিয়ামের চেয়ারম্যান হন, তাহা হইলে রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের সংগঠন অনেকটা চীনের অনুরূপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মাও সে তুং কোন সময়েই চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন না। তিনি চীনের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। এই কাউন্সিলের ৫৬ জন সদস্যের মধ্যে অধিকাংশই চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। এই কাউন্সিলই চীন রাষ্ট্রের উচ্চস্তরের সমস্ত নীতি নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। এই কাউন্সিলের অধীনে আছে ১৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত 'ষ্টেট্ এডমিনিষ্ট্রেশন' বা রাষ্ট্র-পরিচালক পরিষদ। ইহাই সর্ব্বোচ্চ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি এবং প্রধান মন্ত্রী উহার প্রধান কর্ত্তা। এই কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি সমস্ত মন্ত্রিদপ্তর এবং সরকারী কমিটিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। রাশিয়ায় ষ্ট্যালিন কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল এবং কাউন্সিল অব পিপলস্ কমিশারের চেয়ারম্যান।

কম্যুনিষ্ট পার্টির গঠনতন্ত্রে যে সকল পরিবর্ত্তন সাধনের প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য যে, পার্টির ভিতরে নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থাকে অধিকতর সুদৃঢ় করা, তাহা মনে করিলে বোধ হয় খুব বেশী ভুল হইবে না। তাছাড়া, উহার যে আরও উদ্দেশ্য আছে তাহাও বুঝিতে পারা যায়। কম্যুনিষ্ট পার্টিই সোভিয়েট রাশিয়ার শাসকশ্রেণী, এ কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। শাসন-ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক মনোভাব এবং দুর্নীতির প্রবেশ অনেক স্থলে ধরা পড়িয়াছে। এইগুলিকে সমূলে উচ্ছেদ করাও গঠনতন্ত্রের প্রস্তাবিত সংস্কারের উদ্দেশ্য। ইহা ব্যতীত পারিবারিক জীবনে মার্কস্‌বাদী নৈতিক নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য আয়োজন করাও উহার আর একটি উদ্দেশ্য। কিন্তু পার্টির গঠনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন ছাড়াও রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির উনবিংশতিতম কংগ্রেসের আর একটি বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে, এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে না। উহার পরিচয় পাওয়া যায় পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে।

রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদা' পত্রিকার ২১শে আগষ্ট (১৯৫২) তারিখের সংখ্যায় নূতন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণই শুধু দেওয়া হয় নাই, সম্পাদকীয় মন্তব্যে পার্টির উনবিংশতিতম কংগ্রেস যে রাশিয়ার সোশ্যালিজম হইতে কম্যুনিজমে রূপান্তরিত হওয়ার সূচনা করিবে তাহারও ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। উক্ত পত্রিকা তাহার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "The cheif task of the Bolshevik Party now is to build up a Communist society developing socialism into communisn, educating the members in internationalism, the establishment of fraternal relationship with workers of all countries and strengthening in all possible ways of active defence of Soviet homeland against enemy agression." অর্থাৎ সোশ্যালিজমকে কম্যুনিজমে উন্নীত করিয়া কম্যুনিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করা, সদস্যদিগকে আন্তর্জ্জাতিক মনোভাবে দীক্ষিত করা, সকল দেশের শ্রমিকদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, এবং শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েট মাতৃভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার সম্ভাব্য সক্রিয় রক্ষা-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করাই বর্ত্তমানে বলশেভিক পার্টির প্রধান কর্ত্তব্য।', 'প্রাভদা'র উল্লিখিত মন্তব্য হইতে ইহা অনুমান করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না যে, নূতন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইলে সোভিয়েট রাশিয়াকে সমাজতন্ত্রের স্তর হইতে কম্যুনিজমের স্তরে উন্নীত করা সম্ভব বলিয়া উক্ত পত্রিকা মনে করেন। এই প্রসঙ্গে 'সমাজতন্ত্র কি, কম্যুনিজম বলিতেই বা কি বুঝায় এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, এই সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করিবার স্থান পাইব না। এখানে শুধু এইটুকু মাত্র বলাই সম্ভব যে, ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার জঠর হইতে কম্যুনিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থা যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন উহা পূর্ণ বিকশিত কম্যুনিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থারূপে ভূমিষ্ঠ হয় না, হওয়াও অসম্ভব। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পুরাপুরি কম্যুনিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থা গঠিত হওয়া পর্য্যন্ত কালকে বলা হয় phase of transition বা পরিবর্ত্তনের যুগ। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা বিলোপ করিবার পর পূর্ণ কম্যুনিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থা গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত কম্যুনিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থা গঠনের প্রয়াসের যুগের যে সামাজিক ব্যবস্থা তাহাকেই কার্ল মার্কসের মতবাদ অনুসারে সোশ্যালিজম বা সমাজতন্ত্র বলা হইয়া থাকে। এই সময় সকলেরই সমান অধিকার থাকার ব্যাপারটা বুর্জ্জোয়া অধিকারের মতই শুধু নীতিগতই থাকে। কার্য্যক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ সম্ভব হয় না। কারণ, ব্যবহার্য্য পণ্যের বণ্টন উহার উৎপাদনের অবস্থার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এই জন্যই সমাজতন্ত্রের স্তরে প্রত্যেকে যে পরিমাণ শ্রম করে, সেই শ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী তাহাকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। এই পরিবর্ত্তনের যুগে 'from each according to his ability to each according to his needs', এই নীতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু সমগ্র সামাজিক প্রচেষ্টার লক্ষ্য থাকে উহাই। এই প্রচেষ্টার ফলে উৎপাদনের প্রাচুর্য্য যখন এরূপ হয় যে, প্রত্যেককেই তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার্য্য পণ্য দেওয়া সম্ভব, তখনই শুধু উল্লিখিত নীতি প্রয়োগের সময় উপস্থিত হয়।

'প্রাভদা' পত্রিকার মন্তব্য শুনিয়া এ কথা মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক যে, নূতন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে প্রত্যেকের

নিকট হইতে তাহার সাধ্যানুযায়ী এবং প্রত্যেকে তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী' এই নীতি প্রয়োগ করা সম্ভব হইবে। যদি সত্যই তাহা সম্ভব হয় তবে বুঝিতে হইবে, রাশিয়ার বিপ্লব সত্যই সাফল্যের পথে এক বৃহৎ পাদক্ষেপ করিয়াছে! এই নূতন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উৎপাদনের পরিমাণের যে লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে তাহা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমান উৎপাদন অপেক্ষা অনেক কম, এ কথা আমরা শুনিয়াছি। ইহা লইয়া আলোচনা করিতে হইলে যে স্থান প্রয়োজন তাহা আমাদের নাই। রুশ-বিপ্লবের পর হইতে রাশিয়া যে সকল বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া বিপ্লবকে সফল করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহা ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। দেশের ভিতরে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রতিবিপ্লব, চারি দিক হইতে বৈদেশিক সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ১৯২১ সালের শেষ পর্য্যন্ত বলশেভিকদিগকে ঘরে-বাহিরে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। যুদ্ধের ফলে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। বাঁচিয়া থাকিবার মত প্রয়োজনীয় পণ্যের পর্য্যন্ত অভাব, দুর্ভিক্ষের প্রবল প্রকোপ, উৎপাদনের পথে প্রচণ্ড বাধা, অথচ দুয়ারে শত্রু! এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে যে ভাবে লেনিন রাশিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালন করিয়াছেন তাহাকে অনেকে ঠাট্টা করিয়া ওয়ার কম্যুনিজম নামে অভিহিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই সঙ্কটের মধ্যেই ১৯২০ সালে লেনিন সর্ব্বপ্রথম রাশিয়াতে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রসারের জন্য পরিকল্পনা গঠন করেন। গস্প্ল্যান বা রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের ভিত্তিও স্থাপিত হয় ১৯২১ সালেই। কিন্তু ১৯২১ সালেই তিনি বাধ্য হইয়া নিউ ইকনমিক পলিসি বা নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন। এই সময়েই রাশিয়ায় আবার ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া চারি দিকে রব উঠিয়াছিল। কিন্তু আসলে উহা ছিল শুধু আপদ্‌-কালীন ব্যবস্থা মাত্র। বলশেভিকরা যখন একটু নিশ্বাস ফেলিবার সুযোগ পাইলেন, তখনই প্রবর্ত্তন করা হইল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯২৮—১৯৩৩) লক্ষ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে রাশিয়ায় শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করা। পাঁচ বৎসর পূর্ণ হওয়ার নয় মাস পূর্ব্বেই অর্থাৎ সোয়া চারি বৎসরেই এই পরিকল্পনার লক্ষ্যে উপনীত হওয়াই শুধু সম্ভব হয় নাই, রাশিয়া কৃষিপ্রধান দেশ হইতে শিল্পপ্রধান দেশেও পরিণত হয়। এই সাফল্যের ভিত্তিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৩৩—১৯৩৭) গঠিত হয়। টেক্‌নিক্যাল দিক হইতে দেশকে অধিকতর উন্নত করাই ছিল এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য। এই পরিকল্পনার লক্ষ্যে উপনীত হইতেও সোয়া চারি বৎসরের বেশী লাগে নাই। অতঃপর যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৩৮—১৯৪২) গঠিত হয় তাহার লক্ষ্য ছিল উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৩৭ সালের উৎপাদনের শতকরা ৮৮ ভাগ বৃদ্ধি করা। এই পরিকল্পনার কাজ শেষ হওয়ায় ১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেন। কাজেই এই পরিকল্পনার অবশিষ্ট অংশের বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তন সাধন করা হয় এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রাশিয়ার সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যুদ্ধের প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া তোলা হইয়াছিল।

এ কথা অবশ্য সত্য যে, উল্লিখিত তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যবহার্য্য পণ্য অপেক্ষা কলযন্ত্র ইত্যাদি তৈয়ার করার দিকেই বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছিল। ফলে সোভিয়েট রাশিয়ার অধিবাসী-দিগকে অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরই অভাব অনুভব করিতে হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম কলযন্ত্র ইত্যাদি তৈয়ার করিবার উপর জোর দেওয়ার সার্থকতা নির্ভুল ভাবে প্রমাণিত করিয়াছে। রাশিয়া যদি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদনেই বিশেষ জোর দিত, তাহা হইলে হিটলারের প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে সোভিয়েট রাশিয়ার অস্তিত্বই থাকিত না। রাশিয়ার পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা দ্বারা সমাজতন্ত্রকে কম্যুনিজমে উন্নীত করিবার পথে পরিচালিত করা কতটুকু সম্ভব হইবে তাহা বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। তৎপূর্ব্বে যুদ্ধোত্তর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বা চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বা যুদ্ধোত্তর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসেই শেষ হয়। অনেকে মনে করিয়াছিলেন, উহাই সর্ব্বশেষ রুশ পরিকল্পনা এবং ১৯২৭ সাল হইতে শতাব্দীর একপাদ ব্যাপিয়া রাশিয়ায় যে জরুরী অবস্থা চলিতেছিল অতঃপর তাহার অবসান হইবে। বস্তুতঃ, ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরের পর গত ২০শে আগষ্টের ঘোষণা পর্য্যন্ত পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা কিছুই শোনা যায় নাই। প্রকৃত পক্ষে এই পরিকল্পনার কাজ ১৯৫১ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং উহা শেষ হইবে ১৯৫৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। এই পাঁচ বৎসরে শিল্পোৎপাদন বাড়িবে শতকরা ৭০ ভাগ। কিন্তু জলজ বিদ্যুৎ উৎপাদন-ষ্টেশন, শিল্পায়তন, জলসেচের ব্যবস্থা, গৃহ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি মূল নির্ম্মাণকার্য্যের পরিমাণ শতকরা ৯০ ভাগ বাড়িবে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হইবে। ইহার উদ্দেশ্য, শিল্প ও কৃষির জন্য কলকব্‌জা ও যন্ত্রপাতির যাহাতে কোন অভাব না থাকে তাহার ব্যবস্থা করা। এই পাঁচ বৎসরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে এবং যৌথ কৃষি-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে যন্ত্রীকরণ করা হইবে। সহর ও শিল্পাঞ্চলে বাসস্থান নির্ম্মিত হইবে ২০ কোটি ৫০ লক্ষ বর্গমিটার। এই পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও একটি সংক্ষিপ্তসার মনে করিলে ভুল হইবে না। এখানে ঐ সারাংশের পূর্ণ বিবরণ দেওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু এই পরিকল্পনা যে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির এক বিরাট কর্ম্মসূচী তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি এই উন্নতি সাধিত হওয়ার পরও রাশিয়ার উৎপাদন যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক কম থাকিবে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে এ-কথাও সত্য যে, রাশিয়ায় ব্যক্তিগত লাভের কোন স্থান নাই। উৎপাদিত সমস্ত সম্পদই সমাজের সম্পত্তি। এই সম্পদ সকলেরই প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী হইবে কি না তাহাতে অবশ্যই সন্দেহ থাকিতে পারে। তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামের বাধা যদি উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে উন্নতির সর্ব্বাত্মক গতি অব্যাহত থাকিয়া রাশিয়া কম্যুনিষ্ট সমাজ-গঠনের পক্ষে চালিত হইতে পারিবে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামের আশঙ্কা যত দিন থাকিবে তত দিন ব্যবহার্য্য পণ্য অপেক্ষা দেশরক্ষার প্রয়োজনের প্রতিই বেশী জোর দিতে হইবে, এ কথাও অস্বীকার করা যায় না।

চীন ও রাশিয়া—

রুশ গবর্ণমেণ্ট এবং চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত চীনা প্রতিনিধিমণ্ডলীর মধ্যে আলোচনার ফলে নূতন চুক্তি সম্পাদনের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে কি না, তাহা এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্য্যন্ত ঠিক বুঝা না গেলেও পোর্ট আর্থার বন্দর সম্পর্কে যে চীন-সোভিয়েট চুক্তির এবং চ্যাংচুং রেলপথ চীন গবর্ণমেণ্টের নিকট হস্তান্তরিত করিতে রাশিয়ার যে সিদ্ধান্তের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ চুক্তির বিবরণ সম্পর্কে পশ্চিমী শক্তিবর্গের মনে যে বিশেষ ঔৎসুক্য এবং চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯৫০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী রাশিয়া এবং চীনের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাহাতে রাশিয়া পোর্ট আর্থার হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে এবং জাপানের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পর চীনের হাতে ঐ বন্দর সমর্পণ করিতে সম্মত হয়। ঐ চুক্তিতে ১৯৫২ সালের মধ্যেই চ্যাংচুং রেলপথের কর্ত্তৃত্বও চীনের হস্তে সমর্পণ করিবার সর্ত্ত ছিল। দারিয়েন বন্দর সম্পর্কে এই চুক্তি হইয়াছিল যে, জাপানের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি হওয়ার পর এ-সম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে। মস্কো হইতে সোভিয়েট সংবাদ পরিবেশন প্রতিষ্ঠান 'টাস'র ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, পোর্ট আর্থার বন্দর রাশিয়া ও চীনের যৌথ নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা সম্পর্কে রাশিয়া এবং কম্যুনিষ্ট চীনের মধ্যে মতৈক্য হইয়াছে। এই চুক্তিটি যে পশ্চিমী শক্তিবর্গের কাছে ভাল লাগিবে না, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। যদিও চীন গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রীর পত্রে লিখিত অভিপ্রায়-অনুযায়ীই এই চুক্তি হইয়াছে, তথাপি রাশিয়া তাহার সাম্রাজ্যবাদী অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য চাপ দিয়া চীনকে এইরূপ চুক্তিতে রাজী করাইয়াছে, এইরূপ মন্তব্য করিয়া তাঁহারা যদি চীনের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করেন, তাহা হইলেও বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। কিন্তু চীনের পক্ষে বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া থাকা সম্ভব নয়। চীন যদি ইচ্ছা করিয়া আক্রমণ ডাকিয়া না আনে, তাহা হইলে চীনের আক্রান্ত হওয়ার কোন ভয় নাই, বাস্তব অবস্থা যে পশ্চিমী শক্তিবর্গের এই আশ্বাস-বাণীতে আস্থা স্থাপন করিবার মত নয়, কম্যুনিষ্ট চীন তাহা ভাল করিয়াই জানে। বস্তুতঃ এই আশ্বাস-বাণীর মধ্যেই একটা প্রবল হুমকী যে লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহাও বুঝিতে কষ্ট হয় না।

কম্যুনিষ্ট চীনের দিক হইতে বাস্তব অবস্থা কি? মার্কিণ ও বৃটিশ নৌবহর কর্ত্তৃক চীনের উপকূল ভাগ কার্য্যতঃ অবরুদ্ধ। চীনের পূর্ব্ব দিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ঘাঁটির এক বিরাট শক্তিশালী লহর গড়িয়া তুলিয়াছে। মূল চীন আক্রমণের জন্য ফরমোসায় চিয়াং কাইশেকের বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া তোলা হইতেছে। ব্রহ্মদেশে যে কুয়োমিংটাং বাহিনী রহিয়াছে তাহাদিগকে সাহায্য করা হইতেছে। রাশিয়া ও কম্যুনিষ্ট চীনের সহিত জাপানের শান্তি-চুক্তি হয় নাই। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে চিয়াং কাইশেকের উদ্বাস্তু গবর্ণমেণ্টের সহিত এক চুক্তি করিতে বাধ্য করিয়াছে। এই চুক্তিতে জাপান স্বীকার করিয়াছে যে, ফরমোসা গবর্ণমেণ্টই প্রকৃতপক্ষে মূল চীনের গবর্ণমেণ্ট। জাপান কার্য্যতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশে পরিণত হইয়াছে এবং জাপানে রহিয়াছে মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি। ইয়ালু নদীতীরস্থ বৈদ্যুতিক কেন্দ্রগুলিতে বোমাবর্ষণ করা হইয়াছে। চীনের কতগুলি অঞ্চলে চালানো হইয়াছে বীজাণু-যুদ্ধ। কোরিয়ায় এখনও যুদ্ধবিরতি হয় নাই। ইহাতেও চীন যদি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা না করে তবে আর কি হইলে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা চীন করিবে? এই পরিপ্রেক্ষিতেই পোর্ট আর্থার বন্দর সংক্রান্ত চুক্তি বিবেচনা করা আবশ্যক। পোর্ট আর্থার পশ্চিম-কোরিয়া হইতে দুই শত মাইল দূরে অবস্থিত। মালয়ে কম্যুনিষ্ট গেরিলাদের কর্ম্মতৎপরতা যদি বৃটিশের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিয়া থাকে, ইন্দোচীনে হো-চি-মিনের গবর্ণমেণ্ট যদি ফ্রান্সের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হয়, কোরিয়ায় চীনা সৈন্যের উপস্থিতি যদি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে চীনের নিরাপত্তা যে কিরূপ ভয়ানকরূপে বিপন্ন হইয়াছে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। এই অবস্থায় নিজের নিরাপত্তার জন্যই চীন পোর্ট আর্থার হইতে সোভিয়েট সৈন্যের অপসারণ দাবী করিতে পারে না। জাপান যে পর্য্যন্ত রাশিয়া ও চীনের মিত্ররাজ্যে পরিণত না হইতেছে সে পর্য্যন্ত পোর্ট আর্থার সোভিয়েট-চীনের যৌথ নিয়ন্ত্রণে থাকাই চীন পছন্দ করিবে, ইহাই কি স্বাভাবিক নয়?

চ্যাংচুং রেলপথের মালিকানা ১৯৫২ সালের মধ্যেই চীনের নিকট হস্তান্তর করিতে সোভিয়েট রাশিয়া রাজী হইয়াছে, 'টাস' এজেন্সীর সংবাদে ইহাও প্রকাশ। ইহার জন্য রাশিয়া চীনের নিকট হইতে কোন মূল্য দাবী করিবে না। এই রেলপথটি এক হাজার মাইলেরও অধিক দীর্ঘ এবং কোন কোন স্থানে মাঞ্চুরিয়া-কোরিয়া সীমান্তের এক শত মাইলের মধ্য দিয়া গিয়াছে। হস্তান্তর-কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য একটি যুক্ত সোভিয়েট-চীন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 'টাস' এজেন্সীর প্রেরিত সংবাদে আরও প্রকাশ যে, চীন-সোভিয়েট আলোচনায় পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং মৈত্রীর ভাব লইয়া গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্ন বিবেচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনার ফলে এই দুই দেশের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতা ঘনিষ্ঠতর ও দৃঢ়তর করিবার এবং শান্তি ও আন্তর্জ্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিবার সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে। ইহার জন্য কি কি বাস্তব পন্থা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা কিছুই প্রকাশ করা হয় নাই। প্রকাশ করা না হইলেও বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। এই আলোচনা উপলক্ষে মোঙ্গলীয় পিপলস্ রিপাবলিকের প্রধান মন্ত্রীও আমন্ত্রিত হইয়া মস্কো গিয়াছেন। ইহা লইয়া অনেক জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে মনে করেন, সিংকিয়াংও এই আলোচনার বিষয় বস্তু। কিন্তু এ-সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। তাছাড়া, চীন তাহার সৈন্য বাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিবার জন্য রাশিয়ার নিকট সমরোপকরণ দাবী করিয়াছে কি না এবং দাবী করিয়া থাকিলে রাশিয়া রাজী হইয়াছে কি না, চীন আক্রান্ত হইলে রাশিয়া সাহায্য করিবে কি না, এ সব বিষয়ে কোন সংবাদই এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। পশ্চিমী শক্তিবর্গ এই সকল সংবাদের জন্য যে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিবে, ইহা খুব স্বাভাবিক, কিন্তু চীনের আভ্যন্তরীণ উন্নতি এবং রক্ষা-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করাই যে চীন গবর্ণমেণ্টের প্রধান লক্ষ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। এই লক্ষ্যের দিক হইতে দীর্ঘস্থায়ী শান্তিই যে তাহার প্রয়োজন তাহাও বুঝিতে কষ্ট হয় না। ইহার জন্য রাশিয়ার সহযোগিতা ও সাহায্য

যেমন প্রয়োজন তেমনি নিবিড় রুশ-চীন মৈত্রী ও সহযোগিতা হইতে প্রবল শক্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ইঙ্গ-মার্কিণ গোষ্ঠীকে যে চিন্তাকুল করিয়া তুলিবে, তাহা মনে করিলেও ভুল হইবে না। কিন্তু রুশ-চীন মৈত্রী তাহাদিগকে যতটুকু চিন্তাকুল করিবে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কম্যুনিজমের নিরোধের পরিকল্পনা তাহা অপেক্ষা বহু গুণে চিন্তাকুল করিবে রাশিয়া এবং রুশ-মিত্রগোষ্ঠীকে।

কম্যুনিজম ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—

গত আগষ্ট মাসের (১৯৫২) প্রথম ভাগে হনোলুলুতে প্যাসিফিক প্যাক্ট কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশনে প্যাসিফিক ডিফেন্স কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে এবং উহাকে পরামর্শ দিবার জন্য একটি সামরিক দল গঠনেরও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সানফ্রান্সিস্কোতে জাপ-সন্ধি-চুক্তির প্রাক্কালে অষ্ট্রেলিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়, তদনুসারে গঠিত হয় প্যাসিফিক প্যাক্ট কাউন্সিল। উহাকে 'এনজাস' (ANZUS) কাউন্সিল নামেও অভিহিত করা হয়। ইহাকে কতটা উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তির অনুরূপ বা প্রাচ্য সংস্করণ বলিয়া মনে করিলে খুব বেশী ভুল হইবে না। উদ্দেশ্যের দিক হইতেই উভয়কেই সমান মনে করা যাইতে পারে। 'এনজাস' ছাড়া আছে ফিলিপাইনের সহিত রক্ষা-চুক্তি। জাপানের সহিত চুক্তির কথাও স্মরণ রাখা আবশ্যক। চিয়াং কাইশেককে ও ইন্দোচীনে ফ্রান্সকে সাহায্য করার কথাও একই সঙ্গে বিবেচনা করা আবশ্যক। এই সকল চুক্তির উদ্দেশ্য কম্যুনিজমকে নিরোধ করা, রাশিয়া ও চীনকে আক্রমণ করা নয়, এ কথাও আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু রাশিয়া ও চীনের আশঙ্কা যে মিথ্যা নয় তাহা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ কম্যুনিজম নিরোধের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া কম্যুনিজমকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিবার কথাই বর্ত্তমানে চিন্তা করিতেছেন।

মিঃ জন ফষ্টার ডুলেস গত ২৭শে আগষ্ট (১৯৫২) নিউ ইয়র্কে পলিটিক্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "সোভিয়েট কম্যুনিজমের সাম্রাজ্যকে ভিতর হইতেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে। ইতিমধ্যেই এই সাম্রাজ্য ৮০ কোটি লোকের অধ্যুষিত অঞ্চল ব্যাপিয়া বিস্তৃত হইয়াছে এবং এই সকল লোক ১৯টি নেশানে বিভক্ত। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এবং অসহযোগিতা দ্বারা এই সাম্রাজ্যে ফাটল ধরান যাইতে পারে। সুতরাং কম্যুনিজম নিরোধের নীতি আমাদের পরিত্যাগ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। "মিঃ ডুলেস বিশ্বাস করেন না যে, ধনতন্ত্রবাদ ও কম্যুনিজম পাশাপাশি অবস্থান করিতে পারে। কম্যুনিজম নিরোধের নীতিও তিনি পছন্দ করেন না। কম্যুনিজম নিরোধের নীতির অর্থ যদি ইহাই হয় যে, রাশিয়া ও তাহার মিত্রগোষ্ঠীর বাহিরে কম্যুনিজমের প্রসার নিরোধ করা, তাহা হইলে উহা মিঃ ডুলেসের যে পছন্দ হইবে না তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার উল্লিখিত উক্তির অর্থ ইহাই যে, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও অসহযোগ নীতি দ্বারা রাশিয়ার মিত্রবর্গকে রাশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। কম্যুনিজমকে দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পূর্ব্ববর্ত্তী সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে হইবে, ইহাও তাঁহার উক্তির লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। উক্ত বক্তৃতার আগের দিন (২৬শে আগষ্ট, ১৯৫২) তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে এই অর্থই পরিস্ফুট হয়। ২৬শে আগষ্ট তারিখে মিঃ ডুলেস বলিয়াছেন, "পূর্ব্ব-ইউরোপের বন্দী অধিবাসীদিগকে মুক্ত করিয়া স্বাধীন জনগণের সমাজভুক্ত না করা পর্য্যন্ত আমেরিকার বিবেক শান্তিলাভ করিতে পারিবে না।" কিন্তু ইহার জন্য ঐ দেশগুলির অধিবাসীদের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এবং অসহযোগ আন্দোলনের উপরেই কি তিনি শুধু নির্ভর করিতে চান? আর কোন উপায় গ্রহণের অভিপ্রায় কি তাহার নাই? তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এত বিরাট সামরিক আয়োজনই বা কেন, আর উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তিই বা কেন? তিনি হয়ত বলিতে পারেন যে, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারী ও অসহযোগ আন্দোলনকারীদিগকে সাহায্য করিবার জন্যই এই আয়োজন। তাহা হইলেও রাশিয়াকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদের নাই, এ কথা স্বীকার করা সম্ভব নয়। আমেরিকার এই অভিপ্রায়ের সমর্থন মিঃ আইসেনহাওয়ারের উক্তি হইতে পাওয়া যায়। গত ২৫শে আগষ্ট (১৯৫২) তিনি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "Our Government once and for all with cold finality must tell the Kremlin that we shall never recognize the slightest permanence of Russia's position in Eastern Europe and Asia." অর্থাৎ 'মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েট ইউনিয়নকে চূড়ান্ত ভাবে ইহা জানাইয়া দেওয়া উচিত যে, পূর্ব্ব-ইউরোপে এবং এশিয়ায় রাশিয়ার অবস্থার সামান্যতম স্থায়িত্বও আছে এ কথা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিব না।' মিঃ আইসেনহাওয়ার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন নির্ব্বাচনে রিপাবলিকান দলের পক্ষে প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী। ইতিপূর্ব্বে তিনি ইউরোপীয় রক্ষা-ব্যবস্থার সর্ব্বাধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার উক্তিকে নিছক নির্ব্বাচনী প্রচার-কার্য্য বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। তাঁহার এই উক্তিতে পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলিতেও যথেষ্ট উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হইয়াছে। শুধু মার্কিণ রিপাবলিকান দলের নেতারাই এইরূপ উক্তি করিয়াছেন তাহা নয়। গত ২২শে আগষ্ট (১৯৫২) ফিল্ড মার্শাল স্যার উইলিয়ম স্লিম উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি প্রতিষ্ঠানের ২০০ ষ্টাফ অফিসারের এক সভায় বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে কম্যুনিজম বিলোপের জন্য চেষ্টা করা পশ্চিমী শক্তিবর্গের উচিত নয়। তাঁহাদের শুধু কম্যুনিষ্ট অঞ্চলগুলিকে মস্কোর নিয়ন্ত্রণ হইতে বিচ্ছিন্ন করা কর্ত্তব্য। তিনি যুগোস্লাভিয়ার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকার কম্যুনিজম নিরোধের প্রয়াস কি ভাবে চালিত হইতে পারে, তাহারই ইঙ্গিত এই সকল উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়। ধরিয়া লওয়া যাউক যে, রাশিয়াকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদের নাই—তাঁহারা কূটনীতি প্রয়োগ করিয়া পঞ্চম বাহিনীর সাহায্যে অথবা সামরিক শক্তি দ্বারা পূর্ব্ব-ইউরোপের দেশগুলি ও কম্যুনিষ্ট চীনকে স্বাধীন রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করিতে চান। কিন্তু আমেরিকা স্বাধীন পৃথিবী বলিতে কি বুঝে?—এশিয়া ও পূর্ব্ব-ইউরোপের জনগণ এই প্রশ্নকে উপেক্ষা করিতে পারিবে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে মালয়, ইন্দোচীনে বাওদাই গবর্ণমেণ্ট এবং দক্ষিণ-কোরিয়ায় সিংম্যান রী গবর্ণমেণ্টও স্বাধীন রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই সকল দেশের অবস্থা চীনের ও পূর্ব্ব-ইউরোপের জনগণের মনে স্বাধীন পৃথিবীর প্রতি লোভ জাগাইবে, ইহা আশা

করা সত্যই কঠিন। শুধু পঞ্চম বাহিনী দ্বারা এই সকল দেশকে রাশিয়ার মৈত্রী হইতে বিচ্ছিন্ন করা চলিবে না। যদি বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়ও, তাহা হইলে আবার যাহাতে বিপ্লব না হয় তাহার জন্য মার্কিণ সৈন্যবাহিনীকে ঐ সকল দেশে স্থায়িভাবে রাখিতে হইবে। কত দিন যে রাখিতে হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কম্যুনিজম যদি শুধু রাশিয়াতেই আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলেও উহা অন্য দেশকে প্রভাবিত করিবে এবং ঐ সকল দেশে একটা অশান্তি স্থায়িভাবে লাগিয়াই থাকিবে। উহা দমনের জন্যই ঐ সকল দেশে মার্কিণ বাহিনীর স্থায়ি ভাবে থাকা প্রয়োজন বলিয়া আমেরিকা মনে করিবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে স্বাধীন পৃথিবীর এই রূপ এশিয়ার সাধারণ মানুষের কাছে লোভনীয় বলিয়া মনে হইবার কোন কারণ নাই। কোরিয়াকে এই স্বাধীন পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্যই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নামে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছে।

২ বৎসর ৩ মাস হইতে চলিল কোরিয়ায় যুদ্ধ চলিতেছে। এক বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া চলিতেছে যুদ্ধবিরতির আলোচনা। যেমন সংগ্রামক্ষেত্রে, তেমনি যুদ্ধবিরতির বৈঠকে চলিতেছে অচল অবস্থা। উত্তর-কোরিয়ার সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জীবাণু যুদ্ধ চালাইতেও দ্বিধা করে নাই। আমেরিকা জীবাণু যুদ্ধ চালাইবার অভিযোগ অস্বীকার করিলেও উহার বহু প্রমাণ এ পর্যন্ত উপস্থিত করা হইয়াছে। সম্প্রতি হংকং হইতে প্রচারিত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, পিকিং হইতে নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান জানাইয়াছেন, একটি আন্তর্জ্জাতিক বৈজ্ঞানিক কমিশন কোরিয়া ও উত্তর-পূর্ব্ব চীনে মার্কিণ বাহিনীর জীবাণু যুদ্ধ চালাইবার অভিযোগ সত্য বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। দুই মাসব্যাপী ব্যাপক তদন্তের পর তাঁহারা তিন লক্ষ শব্দ-সমন্বিত যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেই এই অভিযোগ সত্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। সংগ্রামক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চালাইতেছে ব্যাপক বিমানহানা। ইয়ালু নদী-তীরস্থ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে ব্যাপক বিমানহানার পর চারি দিকেই উহার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন সুরু হইয়াছিল। কিন্তু উহার পরেও যে ব্যাপক বিমানহানা চলিতেছে সেগুলির সংবাদ প্রকাশিত হইলেও উহা লইয়া আর কোন আলোচনা শোনা যায় না। সম্প্রতি ব্যাপক ও বৃহৎ বিমানহানা চলিয়াছে তিন বার। তাছাড়া, ছোট-খাটো বিমানহানা তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া উঠিয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে যুদ্ধ আবার তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। অতঃপর যুদ্ধের সংবাদ খুব কমই পাওয়া যাইতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার প্রবল সামরিক শক্তি লইয়া কোজে বন্দীশিবিরের কম্যুনিষ্ট বন্দীদিগকে শায়েস্তা করিবার চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু এখনও মাঝে-মাঝে কোজে বন্দী-শিবির হইতে মার্কিণ অত্যাচারের কাহিনী কিছু কিছু প্রকাশ পাইতেছে। কোরিয়াকে স্বাধীন বিশ্বে টানিয়া আনিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ এতই উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার ফলে কোরিয়া একেবারেই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে।

মালয়ে পাইকারী নির্য্যাতন—

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীন-বিশ্বে আর একটি দেশ মালয়। জেনারেল টেম্পলার মালয়বাসীদিগকে স্বাধীনতার যে আস্বাদ দিতেছেন, তাহাতে এই স্বাধীনতার প্রতি এশিয়াবাসীর লোভ বাড়িয়া যাইবে বলিয়াই বোধ হয় ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিগোষ্ঠীর ধারণা। কম্যুনিষ্ট গেরিলাদিগকে ধ্বংস করার অজুহাতে গ্রামকে গ্রাম জ্বালাইয়া দেওয়া বা ধ্বংস করা জেঃ টেম্পলারের স্বল্প শাসন কালের মধ্যে নূতন ঘটনা নয়। তানজন মালিন ও সুনগেই পেলাকের কথা এখনও আমাদের মনে পড়িতেছে। গত ২১শে আগষ্ট (১৯৫২) মালয়ের বৃটিশ হাই কমিশনার স্যার জেরাল্ড টেম্পলার উত্তর-মালয়ের পেরমাতাং তিঙ্ঘি গ্রামের সমস্ত অধিবাসীকে তাহাদের নিজ নিজ গৃহে আটক রাখিবার আদেশ দেন। গত ১৫ই আগষ্ট শুক্রবার একজন চীনা সহকারী পুনর্ব্বাসন অফিসারের হত্যা সম্পর্কে সংবাদ জানিতে চাহিয়া তিনি এই আদেশ জারী করেন। ২৫শে আগষ্ট সোমবারের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংবাদ পাওয়া না গেলে তিনি আরও কঠোর শাস্তি দিবার হুমকী দেন। কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হয় নাই। গ্রাম-বাসীরা কোন সংবাদ দিতে অস্বীকার করে। অতঃপর সৈন্য ও পুলিশ মিলিয়া গ্রামবাসীদিগকে বন্দীশিবিরে লইয়া যায়। তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইহার পর সমগ্র গ্রামকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হইয়াছে। এই গ্রামে ১৯টি পরিবার বাস করিত। মোট জনসংখ্যা ছিল ৭১ জন।

জেঃ টেম্পলার কম্যুনিষ্ট গেরিলাদিগকে অনাহারে মারিবার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সমস্ত ধাক্কা যাইয়া পড়িতেছে মালয়ের নিরীহ অধিবাসীদের উপর। নেগরি সেমবিলান রাজ্যের রাজধানী সেরেমবান সহরকে গত ৩১শে আগষ্ট কার্য্যতঃ অবরোধ করা হইয়াছে। সরকারী লাইসেন্স ছাড়া কাহারও খাদ্যদ্রব্য লইয়া এই সহর হইতে বাহির হইবার উপায় নাই। শুধু খাদ্যদ্রব্যই নয়, ঔষধ, কাগজ এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সহরের লোকসংখ্যা ৩০ হাজার। জেঃ টেম্পলার যেরূপ নির্ম্মম নির্য্যাতন চালাইতেছেন, তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যে, নির্য্যাতনকারী বৃটিশ শাসক অপেক্ষা কম্যুনিষ্ট গেরিলাদের প্রতিই মালয়ের অধিবাসীদের সহানুভূতি অনেক বেশি। নিষ্ঠুর নির্য্যাতন চালাইয়া মালয়ের অধিবাসীদিগকে বৃটিশ-অনুরাগী করিয়া তুলিতে পারিবেন বলিয়া তিনি যদি মনে করেন, তাহা হইলে ইহার মত ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না।

মিশর ও ইরাণ—

মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলিতে বিশেষ করিয়া মিশর ও ইরাণে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর গহন-গতির তাৎপর্য্য সহজে বুঝিয়া উঠা কঠিন। মিশরে জেনারেল নাগিবের বিদ্রোহ সাফল্যমণ্ডিত হইলেও উহার উদ্দেশ্য ক্রমেই দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিতেছে। সফল বিদ্রোহের দেড় মাস যাইতে না যাইতেই জেঃ নাগিব মিশরের সমস্ত ক্ষমতা দখল করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার ভূমিব্যবস্থা সংস্কারের একটা পরিকল্পনা আছে। কিন্তু আলী মাহের পাশা খুব তাড়াতাড়ি এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে অস্বীকার করিয়া প্রধান মন্ত্রীর

পদ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার পদত্যাগের কারণ কি না এ-সম্বন্ধে সন্দেহ জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। গত ৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৫২) আলী মাহের পাশা প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিবার পর যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তাহার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন স্বয়ং জে: নাগিব। মিশর কতকটা সিরিয়ার পথে চলিয়াছে বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। জে: নাগিবই একাধারে প্রধান মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতি। কার্য্যত: মিশরে সামরিক শাসনই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি বহুসংখ্যক রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার করায় মিশরে রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে। এমন কি, জে: নাগিবের এই বিদ্রোহ ও ক্ষমতা দখলের মূলে বৃটিশের কোন কূটনৈতিক চাল আছে কি না এইরূপ সন্দেহ জাগ্রত হওয়া খুব স্বাভাবিক। জে: নাগিবের প্রতি বৃটিশ-মনোভাব অনেকটা উদার বলিয়াই মনে হয়। জে: নাগিব বৃটিশের অভিপ্রায় অনুযায়ী সুয়েজ খাল ও সুদান সমস্যার সমাধানে রাজী হন কি না তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

জে: নাগিব ক্ষমতা লাভ করায় মিশরে বৃটেনের কোন সুবিধা হইতেও পারে বলিয়া যদি মনে করা যায়, তাহা হইলেও ইরাণে তৈল সমস্যার সমাধান এখনও বহু দূরবর্ত্তী। তৈলসমস্যা সমাধানের জন্য ৩০শে আগষ্ট (১৯৫২) মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এবং বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মি: চার্চ্চিল ব্যক্তিগত ও যুক্তভাবে এক প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইরাণের প্রধান মন্ত্রী ডা: মোসাদ্দেক এই প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই যুক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন বিচার করিবার ভার আন্তর্জ্জাতিক আদালতের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে এবং তৈল বিক্রয়ের জন্য ইরাণ গবর্ণমেণ্টকে ইঙ্গ-মার্কিণ তৈল কোম্পানীর সহিত একটা বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তৈল সংক্রান্ত এই প্রস্তাবের সহিত ইহাও বলা হয় যে, বৃটেন ইরাণের পাওনা ষ্টার্লিং বাজেয়াপ্ত করিবে না এবং আমেরিকা ইরাণকে জরুরী প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ১ কোটি ডলার সাহায্য করিবে! ডা: মোসাদ্দেক এই প্রস্তাব শুধু প্রত্যাখ্যানই করেন নাই, পাল্টা প্রস্তাবও উত্থাপন করিয়াছেন। ইঙ্গ-মার্কিণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান এবং পাল্টা প্রস্তাবের বিবরণ মজলিসে প্রদান করিয়া তিনি আস্থাজ্ঞাপক ভোট দাবী করিয়াছেন এবং এইরূপ ইঙ্গিতও দিয়াছেন যে, পারস্যের অধিকার রক্ষার জন্য তিনি বৃটেনের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিতেও রাজী আছেন। ডা: মোসাদ্দেকের পাল্টা প্রস্তাবের মূল কথা হইল এই যে, ইরাণ কয়েকটি সর্ত্তে ক্ষতি-পূরণের প্রশ্ন মীমাংসার জন্য আন্তর্জ্জাতিক আদালতে যাইতে রাজী আছে। এই সর্ত্তগুলির মধ্যে একটি হইল এই যে, ক্ষতিপূরণ শুধু আবাদানের কারখানার জন্যই দেওয়া হইবে, রাষ্ট্রায়ত্ত করণের পরবর্ত্তী কালের জন্য এ্যাংলো-ইরাণীয় তৈল কোম্পানী কোন দাবী করিতে পারিবে না। আর একটি সর্ত্ত হইল এই যে, ইরাণের প্রাপ্য ৪৯ মিলিয়ন পাউণ্ড অবিলম্বে ইরাণকে এ্যাংলো-ইরাণীয় তৈল কোম্পানীর দিতে হইবে।

তৈল বিক্রয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া ইরাণের উপর যে চাপ দেওয়া হইতেছে তাহা সত্ত্বেও ইরাণ ইঙ্গ-মার্কিণ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার দৃঢ়তা ও সৎসাহস প্রদর্শন করিয়াছে। কিন্তু বৃটেন যে ইরাণের পাল্টা প্রস্তাব গ্রহণ করিতে রাজী হইবে, তাহা মনে হয় না।

—সাহিত্য-পরিচয়—

(প্রাপ্তি-স্বীকার)

স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্ত্তমান ভারত—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম্মচক্র, বেলুড়, হাওড়া। দাম এক টাকা।

বাংলা প্রবাদ—শ্রীসুশীলকুমার দে সম্পাদিত। এ, মুখাৰ্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা। দাম কুড়ি টাকা।

লয়লা মজনু—শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। গুলজার পাবলিশিং হাউস, ১০, শিকদারপাড়া লেন। দাম আড়াই টাকা।

এঁরাই মানুষ—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা। দাম এক টাকা চার আনা।

তদবধি—শ্রীমানিক ভট্টাচার্য্য। সাম্য গ্রন্থাগার, কদমকুয়াঁ, পাটনা। দাম এক টাকা।

বহুদিন পরে—শ্রীরিক্ত। কদমকুয়াঁ, পাটনা। দাম এক টাকা চার আনা।

তখত-ই-তাউস—শ্রীঅজয় দাসগুপ্ত। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম এক টাকা আট আনা।

অন্তর্দর্শন (১ম খণ্ড)—শ্রীগিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কৈলাস কুটীর, পঞ্চাননতলা লেন, শ্রীরামপুর। দাম দেড় টাকা।

বাঁশী ও অশ্রু—রামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ি। দাম আড়াই টাকা।

মীরাবাঈ—শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার। সঙ্গীত প্রচারণী, ৬১, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ। দাম আড়াই টাকা।

ভারতীয় সমাজ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ভদ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৪, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। দাম আড়াই টাকা।

নাগপাশ—শ্রীমণীন্দ্র মজুমদার। ৪৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

বিজ্ঞানের রকমারী—শ্রীহরপ্রসাদ ঘোষ। ঘোষ পাব্লিশার্স, ১৩২বি, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম চৌদ্দ আনা।

বার্ষিক শিশুসাথী—বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিমিটেড। ৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম চার টাকা।

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। সাহিত্য চয়নিকা, ৫৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম দু টাকা।

আমেরিকার নিগ্রো—ভূ-পর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস। ইণ্ডিয়ানা, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম দু টাকা।

আসল সমস্যা

"কৃষকদের অবস্থা জানিবার জন্য যে সর্ব্বভারতীয় তদন্তের কাজ চলিতেছে, তাহারই অঙ্গস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কেও তদন্ত করা হইয়াছে। এই তদন্তের ফলাফল সম্পর্কে যেটুক জানা গিয়াছে তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিহীন কৃষকদের শোচনীয় অবস্থাই প্রকাশ পাইয়াছে। এই তদন্তের জন্য ৫১টি গ্রামকে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছিল। ভূমিহীন কৃষকদের গড়পড়তা মাসিক আয় মাত্র ২২৲ টাকা। তাহাদের বার্ষিক বেতন এক শত টাকা. তাহারা দুই বেলা খাইতে পায় এবং তাহাদিগকে বৎসরে দুইখানা কাপড় দিবারও নিয়ম আছে। এই সব ধরিয়া হিসাব করিয়া তাহাদের গড়পড়তা মাসিক আয় ২২৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহারা নিজেরা চাকুরীস্থলে দুই বেলা খাইতে পাইলেও স্ত্রী-পুত্র-কন্যার অন্নসংস্থান করিতে হয় বৎসরে যে এক শত টাকা পাওয়া যায় তাহা দ্বারাই। সুতরাং স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভরণপোষণের জন্য তাহাদের মাসিক আয় দাঁড়ায় মাত্র ৮।/৪ পাই। পরিবারে লোকসংখ্যা যদি চারি জন হয়, তাহা হইলে জনপ্রতি খাওয়া-পরার জন্য মাত্র দুই টাকা পাওয়া যায়। দুই টাকায় এক জন লোকের এক মাস খাওয়া কিরূপে চলিতে পারে, তাহা কল্পনাশক্তিকে উদ্দাম করিয়া ছাড়িয়া দিলেও বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। ভূমিহীন কৃষকদের সমস্যার সমাধান করিতে হইলে তাহাদের আয় বৃদ্ধি করা আবশ্যক। মজুরী বৃদ্ধি করিলে যাহারা তাহাদিগকে নিয়োগ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ঐ মজুরী দেওয়া সম্ভব কিনা, তাহাও বিবেচনা না করিলে চলিবে না। আসলে সমস্যাটা দাঁড়াইতেছে ভূমি-সংস্কারের।" —দৈনিক বসুমতী।

প্রতিকার নেই ?

"পশ্চিমবঙ্গে চাষী মজুর হিসাবে যাঁহারা জীবিকার্জন করেন, তাঁহাদের আর্থিক অবস্থার এক শোচনীয় চিত্র কেন্দ্রীয় তদন্তে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে এই রাজ্যকে মোটামুটি আটটি অঞ্চলে ভাগ করিয়া এই তদন্ত চলিয়াছে। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, জমি চাষের কাজে নিযুক্ত মজুরগণ প্রায় সকলেই ঋণগ্রস্ত। অনেক মজুর নগদ টাকায় কোন পারিশ্রমিক পান না, নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির ফসল তাঁহাদিগকে দেওয়া হয়। কোন কোন মজুর তাঁহাদের পারিশ্রমিক বাবদে কর্ষিত জমিতে উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হন। যাঁহারা পারিশ্রমিক বাবদে নগদ টাকা পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের বার্ষিক প্রাপ্য গড়ে ১০০৲ টাকার অধিক হয় না। অবশ্য এই নগদ টাকার অতিরিক্ত দুই বেলা আহার এবং দুই-চারিখানা কাপড়-জামা তাঁহাদিগকে দেওয়া হয়। সমস্ত হিসাব করিলে এক-এক জন চাষী মজুরের মাসিক বেতন দাঁড়ায় গড়ে ২২৲ টাকা মাত্র। বলা বাহুল্য যে, এই সামান্য কয়টি টাকায় বর্তমান আক্রার দিনে পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহ করা কোন চাষী মজুরের পক্ষেই সম্ভব হয় না। ফলে তাঁহারা ধার করিয়া পরিবার পোষণে বাধ্য হইয়া দেনার দায়ে জর্জ্জরিত হন। অবস্থাটা নিঃসন্দেহে একান্ত শোচনীয় ও অবাঞ্ছনীয়। ইহার প্রতিকারে সচেষ্ট হইতেই হইবে। কিন্তু প্রতিকারের সরাসরি উপায় কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না। চাষী মজুর যাঁহারা নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের উপর অধিক পরিমাণে মজুরী প্রদানের দায় চাপাইয়া দেওয়ার পূর্বে দেখিতে হইবে, জমি চাষ করাইয়া এই শ্রেণীর লোকেরা যাহা আয় করেন, তাহা হইতে অধিক মজুরী দেওয়া সম্ভবপর কিনা। পূর্বাহ্নে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হইয়া কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে কোন লাভ হইবে না—এক সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া অপর সমস্যা ডাকিয়া আনা হইবে মাত্র।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

রবীন্দ্র-স্মৃতি তহবিল

"পত্রান্তরে রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা তহবিল সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সকলেই চমৎকৃত হইবেন। রবীন্দ্র-বিয়োগের পর তাঁহার "স্মৃতিরক্ষার" পবিত্র কর্তব্য লইয়া একটি নিখিল ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার প্রথম পরিচালক সভা তিন বৎসর ধরিয়া সাত হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া সরিয়া যান। তারপর ১৯৪৫ সালে যোগ্যহস্তে নূতন পরিচালক সভার ভার অর্পিত হওয়ার পর প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া পরিচালকবর্গ নীরব হইলেন। হঠাৎ একদিন অন্তরালে আবার স্মৃতি-কমিটির নামেরও পরিবর্তন হইয়া গেল। সাড়ে সাত বৎসর ইতিমধ্যে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন শুনা যাইতেছে যে, স্মৃতি-ভাণ্ডারের ১৪ লক্ষ টাকার মাত্র দেড় লক্ষ টাকা অবশিষ্ট রহিয়াছে। এদিকে রবীন্দ্রনাথের চার পুরুষের ভদ্রাসন নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের চিতাভূমিতে নির্বিবাদে গরু চরিতেছে। রবীন্দ্রনাথের যোগ্যপুত্র শ্রীরথীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে কোনও কথা উচ্চারণ না করিলেও জনসাধারণ অবাক্ হইয়া ভাবিতেছে—স্মৃতিরক্ষার এই পরিণতি ঘটা কেমন করিয়া সম্ভব ?" —সত্যযুগ।

শ্ল্যাভ শব্দের অর্থ

"শ্ল্যাভ" শব্দ আজ ষ্টালিনের মাহাত্ম্যে নূতন করিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। এই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ "সবাক জাতি" (the

articulate people)। তারা অন্যান্ত অসভ্য জাতি (barbarians) হইতে পৃথক্‌। এই জাতিগত, বর্ণগত অহমিকার উদাহরণ ইতিহাসের পাতায়-পাতায় পড়া যায়। কম্যুনিষ্ট শাসকবর্গের পূর্ব্বজ জার (Tsar) রাজা-রাণীগণ এই জাতিবাচক অহমিকাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। কত বার যে তাঁরা য়িহুদী-ধর্ম্মাবলম্বীদের নিঃশেষ করিবার জন্য জনগণকে ক্ষেপাইয়াছিলেন, তার সংখ্যা অগণিত এবং ষ্টালিনের নেতৃত্বে সেইরূপ "সবাক" রুশগণ অরুশীয় জাতিসমূহকে পদানত করিতেছে।" এই শ্লাভ আদর্শের প্রবর্ত্তক কিন্তু কোন রুশ-জাতিসম্ভূত ব্যক্তি নন। চেকোশ্লাভিয়া দেশবাসী জোসেফ সেফারিস্ (Josef Sefaris) সর্ব্বপ্রথমে বিজ্ঞানসম্মত শ্লাভ ভাষাসমূহের ব্যাকরণ সঙ্কলন করেন। আর এক জন চেকোশ্লাভিয়াবাসী জ্যান কলার (Jan Kollar) চেকোশ্লাভ ভাষায় প্রথম স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেন। তার শিরোনামা— শ্লাভ দুহিতা (The Daughter of the Slavs)। প্রাগ নগরীতে ১৮৪৮ খৃঃ নিখিল শ্লাভ সম্মেলন সংগঠিত হয়। তাহার সভাপতি ছিলেন প্যালেকি ড্রন (Palacky Drawn)। সকল শ্লাভ দেশের প্রতিনিধি তাহাতে সমবেত হন। আর এক কথা, এক জন জার্ম্মাণ এই জাগরণের পরিপোষক ছিলেন। তাঁহার নাম জোহান গটফ্রেড হার্ডার। শ্লাভ কৃষকের সহজ জীবনযাত্রার প্রশংসা করিয়া তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই তত্ত্বের একটা প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। তাহা এই যে, টিউটন ও ল্যাটিন জাতিসমূহই ক্ষয়িষ্ণু হইয়া পড়িতেছে। শ্লাভ-রক্ত প্রবাহিত করাইয়া তাহাদের পুনরায় সতেজ করা যাইতে পারে। নৃতত্ত্ববিদের এই চেষ্টা সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত। তাহার সঙ্গে যখন ভাষাবিদ্ যোগদান করেন তখন সোনায় সোহাগা মেশানো হয়। ইতিহাসের এই বিবরণ বর্ত্তমান যুগের রাজনৈতিক সমস্যাবলী বুঝিবার পক্ষে সাহায্য করে বলিয়া দিলাম।"

—প্রবাসী।

শিক্ষায় বাধা

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার একটা শেষ তারিখ স্থির করিয়া দিয়া থাকেন। এবার প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তির শেষ দিন ছিল ২১শে জুলাই। মাসের শেষে ভর্ত্তি হওয়ার এতগুলি টাকা একসঙ্গে জোগাড় করা বহু অভিভাবকের পক্ষে কষ্টসাধ্য। এই সামান্য কথাটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ চিন্তা করেন নাই। তা ছাড়া ভর্ত্তির সময় এত কম দেওয়া হইয়াছে যে আসামের বহু ছাত্র আসিয়া পৌছিতে পারে নাই। মাসের প্রথম সপ্তাহে তারিখ দিতে কি বাধা ছিল তাহা আমরা বুঝিলাম না। যাহারা বিশেষ বাধায় নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ভর্ত্তি হইতে পারিত না তাহাদিগকে পরে ভর্ত্তি হওয়ার বিশেষ অনুমতি দেওয়া হইত। এবার প্রায় হাজার খানেক ছাত্র ভর্ত্তির দরখাস্ত করিলে তাহা প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। প্রত্যাখ্যানের প্রধান কারণ, দেরীতে ভর্ত্তি হইলে ছাত্রেরা কোর্স শেষ করিতে এবং পাশ করিতে পারিবে না। আজ-কাল ছাত্রেরা সব বিষয়ে শতকরা ৭০।৮০ জন পাশ করিতেছে, ফেল করিতেছে কেবল ইংরেজিতে। এ বৎসর এখনও পর্য্যন্ত ইংরেজির দুইখানি বই-ই পাওয়া যাইতেছে না। একটি বই বিলাত হইতে আসিয়া পৌছাইতেছে না;" অপরটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বই, ছাপা নাই। এটিতে ২৬ পৃষ্ঠা মাত্র পড়া হইবে। কিন্তু তার জন্য ৮৬ পৃষ্ঠার বই দেড় টাকায় গছানো হইতেছে। ২৬ পৃষ্ঠার পাঠ্যটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাপাখানার এক সপ্তাহও লাগা উচিত নহে, অথচ দুই মাস অতীত হইয়াছে এখনও উহা পাওয়া গেল না। বিলাতের বই সময় মত পৌছাইবার ব্যবস্থা না করিয়া কেন পাঠ্য করা হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয় তার কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। এই এক হাজার ছাত্রকে অবিলম্বে ভর্ত্তি হওয়ার অনুমতি দেওয়া কর্ত্তব্য।"

—যুগবাণী।

রাষ্ট্রভাষা

"১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের স্মরণীয় ৭ই আগষ্ট তারিখে রাষ্ট্রভাষা-ব্যবস্থা-পরিষদের নয়াদিল্লী অধিবেশনে আমরা আহূত হইয়া নিবেদন করিয়াছিলাম: 'ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা বা সর্বভারতীয় ভাষা রাজধানী দিল্লীকে কেন্দ্র করিয়াই অতঃপর ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিবে, এবং সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের ক্ষমতাও তাহা সাহিত্যিকদের চেষ্টায় লাভ করিবে। এই ভাষা স্বভাবতই হিন্দী-হিন্দুস্থানীর সামান্য পরিবর্তনে গঠিত হইবে। এই রাজধানীর ভাষাকে আমাদের স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। কিন্তু হিন্দীকে কেন্দ্র করিয়া সকল প্রদেশের সক্ষম 'মথিত একটি ভাষা' গড়িয়া না-উঠা পর্যন্ত এ ভাষা সকল কাজের উপযোগী হইতে পারিবে না। প্রদেশগুলিতে এই ভাষা আয়ত্ত করিবার পর্যাপ্ত সময় দিতে হইবে। যত দিন এই যোগাযোগ সম্পূর্ণ না হইতেছে, তত দিন সকল প্রদেশের আইনঘটিত ও অন্যান্য মামলার সুবিধার জন্য ইতিমধ্যে-আয়ত্ত ইংরেজী ভাষা সম্পূর্ণ বহাল রাখিতে হইবে, ইংরেজীর পাশাপাশি কেন্দ্রে হিন্দীও চলিতে থাকিবে। প্রদেশে প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের উপর কেন্দ্র হইতে কোনও প্রকার চাপ দেওয়া হইবে না। এই চাপ-দেওয়া হিন্দী-উৎসাহীদের অত্যধিক অহমিকাবশত ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বাংলা দেশে এই চাপ একটু বেশি করিয়াই অনুভূত হইতেছে। অনেকে ভাষার এই সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেছেন। ইংরেজের রাষ্ট্রনৈতিক কূটচালে বিহারের অন্তর্ভুক্ত বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলগুলি হইতে মূল বাংলাভাষা উচ্ছেদ করিয়া ধীরে ধীরে হিন্দী প্রবর্তনের যে চক্রান্ত স্বয়ং বিহার-সরকার চালাইতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিয়াও প্রতিকার হয় নাই; সরকারী-কেন্দ্র এবং কংগ্রেস-কেন্দ্র এই চক্রান্তে যোগ দিয়াছেন বলিয়াই সন্দেহ হইতেছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের বহু ষ্টেশনের পরিচয়জ্ঞাপক ফলকগুলি হইতে বাংলা নাম তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আরও অনেক ছোটখাট অসুবিধার সৃষ্টি করা হইয়াছে ও হইতেছে। সামান্য সৌজন্য ও সুবুদ্ধি থাকিলে এই ভাবে বাঙালীকে উত্যক্ত করিবার চেষ্টা হইতে হিন্দী-উৎসাহীরা বিরত থাকিতেন। বাঙালী প্রেমের বশে হিন্দীর জন্য পূর্বে অনেক কিছু করিয়াছে, গোড়ায় হিন্দীতে বহু সাময়িক-পত্র প্রকাশ করিয়াছে, বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছে, বহু পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছে। তাহাকে খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া বিরোধী করিয়া না তুলিলে তাহার কাছ হইতে আরও অনেক সুবিধা পাওয়া যাইত। আমাদের বক্তব্য ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তেও প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর ঠিক তিন বৎসর অতীত হইয়াছে; আমরা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছি, হিন্দী-সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণ-ভারতে ঘোরতর বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছে। মানভূম অঞ্চলে এই অত্যাচার

বিন্দুমাত্র প্রশমিত না হইয়া কি পর্যায়ে উঠিয়াছে, গত ১২ই জুলাই কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য শ্রীভজহরি মাহাতো কর্তৃক লোকসভায় প্রদত্ত (৪ঠা আগষ্টের কলিকাতা 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে' উদ্ধৃত) বক্তৃতা হইতে তাহা প্রকট হইবে।"

—শনিবারের চিঠি।

পূর্ত্তকর্ম্মের ধূর্ত্ততা

"রঘুনাথগঞ্জ মিত্রপুর রোডের রঘুনাথগঞ্জ হইতে রেল-লাইন পর্যন্ত পথে তীক্ষ্ণ ছুঁচালো পাথর বিছাইয়া তাহার উপর মাটি চাপাইয়া রোলার টানিয়া দিয়া জেলা বোর্ডের পূর্ত্ত বিভাগ কর্ত্তব্য সমাপন করিয়াছেন। বর্ষাকালে মুষলধারে বৃষ্টিপাতের ফলে মাটি ধুইয়া তীক্ষ্ণাগ্র প্রস্তরখণ্ডগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দেখিলে মনে হয়—উপকথার বিশালদেহ রাক্ষস তাহার বিরাট বদন ব্যাদান পূর্ব্বক দন্ত বিকাশ করিয়া নগ্নপদ পথিকগণের প্রতি-পদবিক্ষেপে রক্তপিপাসা জ্ঞাপন করতঃ ভীতির সঞ্চার করিতেছে। এই রাস্তা দিয়া প্রত্যহ দিবারাত্রি বহু পাদুকাবিহীন গরীব পথচারী যাতায়াত করে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দুঃখ নিবেদন ব্যয়-সাপেক্ষ। তাহা অনেকেরই সাধ্যাতীত। আমরা জেলা বোর্ডের অন্যতম সদস্য জঙ্গিপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব লুৎফল হক এম, এল, এ, সাহেবকে সানুনয়ে নিবেদন করি—তিনি যেন স্বচক্ষে এই রাস্তার অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া, ইহা পূর্ত্তকর্ম্মের ধূর্ত্ততার মূর্ত্ত বিকাশ কিনা, তাহা ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের গোচরে আনয়ন করেন।"

—জঙ্গিপুর সংবাদ।

শিক্ষাক্ষেত্রে দলাদলি

"দেশের আজ বড়ই দুর্দ্দিন। নিত্য-নূতন সমস্যা দ্বারা বাংলা কণ্টকিত। শুধু সরকারের উপর দোষ চাপাইয়া এবং সরকারী অবহেলার নিন্দাবাদ করিয়া বা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়া এ সমস্যার সমাধান করা যাইবে না। দেশের জননায়কগণের এক্ষণে দলাদলির উর্দ্ধে উঠিয়া এমন এক কর্ম্মপন্থা বাছিয়া লইতে হইবে যাহা সত্যিই বর্ত্তমান কালে বাস্তব এবং কার্য্যকরী। দেশের এবং জনসাধারণের তথা সরকারের নিকট সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা দিতে হইবে। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে সমস্যাগুলি দেখিতে হইবে। তাই আমরা বাংলার জননায়কগণকে, শিক্ষাব্রতিগণকে এবং দেশহিতৈষিগণকে অনুরোধ জানাই, যেন তাঁহারা দেশের বিভিন্ন মতাবলম্বী বিভিন্ন দলের মধ্যে মতের সমাধান করিয়া এক সুষ্ঠু, বলিষ্ঠ জনমত গঠন করেন। বহুধা বিভক্ত দুর্গত বাংলায় সত্য সত্যই জনমতের সহজ, সরল বিকাশের অবকাশ মিলিতেছে না। কেবল দ্বিধা, কেবল সন্দেহ, তদুপরি অপরিমেয় ভুল বোঝা, আমাদের জাতীয় সংহতি বিনষ্ট করিতেছে। আজ শুধুই আমাদের মনে হইতেছে—"স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা!"

—রাঢ় দীপিকা।

ভারতীয় চা-শিল্পের বিপর্যয়

"ভারতীয় চা-শিল্প ধ্বংস হইলে ইন্দোনেশিয়া, চীন, জাভা, জাপান, সিংহল, দক্ষিণ-আফ্রিকার চা-শিল্পের কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না, বরং ইহাদের উৎপন্ন চায়ের চাহিদা সমগ্র বিশ্বে আরও বাড়িয়া যাইবে। পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং জেলায় চা উৎপন্ন হয় এবং এই চা কলিকাতা হইতে যুক্তরাজ্যের মাধ্যমে সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যায়। বর্ত্তমানে জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং জেলায় চা-শিল্প যে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় চা-বোর্ড বিস্তারিত অবগত আছেন বলিয়াই আমরা মনে করি। তাঁহারা বিশেষ ভাবে তৎপর হইয়া সত্বর যদি এ সম্পর্কে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন তবে শিল্পের পরিণতি অবশেষে কি দাঁড়াইবে তা বলা কঠিন নয়। আশা করি, কেন্দ্রীয় চা-বোর্ড ও ভারত সরকার অবিলম্বে এ বিষয়ে দৃষ্টি দিবেন।"

—ত্রিস্রোতা।

দুই বিঘা জমি

"বাংলা যাহা চাহিতেছে—ভাষা, কৃষ্টি, ইতিহাস ও ভূগোলের দিক হইতে তাহা তাহার নিজস্ব বস্তু এবং চাহিতেছে বাঁচিয়া থাকিবার একান্ত তাগিদে, কাহারও বাস্তভিটা সমভূমি করিয়া কলম বাগান রচনা করিবার সৌখীন খেয়ালের বশে নয়। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কর্ত্তৃক যে দাবী উত্থাপিত হইয়াছে, কংগ্রেসের পক্ষ হইতে উত্থাপিত তাহা ন্যূনতম দাবী মাত্র। বাংলার নিজস্ব দাবী তাহা হইতে বহু গুণ বিস্তৃততর এবং সে দাবী স্পর্শ করে সমগ্র মানভূম, ধলভূম, পূর্ণিয়া ও সাঁওতাল পরগণাকে। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তাহা দাবী, যাচ্ঞা নয়। বাংলার সে দাবী কংগ্রেসের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় নাই। তবু বাংলা প্রাদেশিক মনোভাবাপন্ন, তবু বাংলা সঙ্কীর্ণমনা। 'দুই বিঘা জমির' মালিকের কথার পুনরুক্তি করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়: তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আমি আজ চোর বটে!"

—স্বাধীন ভারত।

কোঁদল

"বাংলা ও বিহার কংগ্রেস বেশ কোন্দল শুরু করিয়া দিয়াছেন। অথচ উভয় প্রদেশেই এবং কেন্দ্রে কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বই কায়েম আছে। তবে তাঁহারা উপর হইতেই ফয়সলা না করিয়া রণং দেহি রবে মল্লভূমে অবতীর্ণ হইয়া উত্তেজনার তথা তিক্ততার সৃষ্টি করিতেছেন কেন? কোন সাধু উদ্দেশ্য ইহার পশ্চাতে নাই বলিয়া যদি নিন্দা করা হয়, জনমতকে পক্ষে আনিবার জন্য ও বিভ্রান্ত করিবার জন্য ইহা একটা সাজান নাটক বলিয়া সন্দেহ করা হয়, তাহা হইলে কি অতিশয়োক্তি হইবে? তাঁহারা জানেন, ইহার বিষময় ফল কি। সুতরাং ইহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া অবিলম্বে সরকারী ভাবে প্রতিশ্রুতি পালনে তাঁহারা অগ্রসর হউন, ইহাই আমাদের নিবেদন। আমাদের বিশ্বাস, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের অভিমত লইলে এই দ্বন্দ্বের অনেকটাই অবসান হইবে।"

—এশিয়া।

কমিউনিজমে কমিউনিজমে

"রঘুনাথপুর থানার মধুতটী, বিলতোরা, বেড়ো অঞ্চলে কাজের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টি সাধারণ মানুষের ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। গত নির্বাচনের সময় বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টি এই এলাকায় নির্বাচনবিরোধী প্রচার চালাতে থাকে, তখন একদিন কংগ্রেস টিকিটে ভোট-প্রার্থিনী শ্রীমতী বিজলীপ্রভা দত্ত বিলতোরা গ্রামে নির্বাচনী সভা করার জন্য দলবল নিয়ে হাজির হন। কিন্তু স্থানীয় বিপ্লবী কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড সাধন মজুমদারের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে, জাগ্রত জনসাধারণ কর্তৃক ধিক্কৃত হয়ে সভা না করেই শ্রীমতী বিজলীপ্রভা চম্পট দিতে বাধ্য হন এবং সেই দিন থেকেই কংগ্রেসী সরকারের বিষনজর পড়ে বিপ্লবী কমিউনিষ্টদের উপর।

সরকার সুযোগ খুঁজতে থাকে বিপ্লবী কমিউনিষ্টদের উপর আঘাত হানবার। বেড়োর অত্যাচারী জমিদার বহু দিন থেকেই তাদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত-মজুর ও ভূমিহীন চাষীদের বে-আইনী বেগার দিতে ও অল্প মজুরীতে কাজ করাতে বাধ্য করত। বিপ্লবী কমিউনিষ্টরা এই অঞ্চলের ক্ষেত-মজুর, ভাগচাষীদের সংগঠিত করে জমিদারদের বিরুদ্ধে, বে-আইনী জুলুম ও বেগারী প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন সুরু করেন। এর ফলে ক্ষেত-মজুরেরা বেগারী দিতে ও মুখ বুজে অত্যাচার সইতে অস্বীকার করে। জমিদারও ক্ষেত-মজুরদের ভয় দেখাতে সুরু করে এবং অপর দিকে তাদের নেতা বিপ্লবী কমিউনিষ্টদিগকে মিথ্যা মামলায় জড়াবার জন্য পুলিশের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে।"

—জনসাধারণ।

হাতি-ঘোড়া গেল তল

"ভারতের শ্রম-মন্ত্রী ভি ভি গিরি সম্প্রতি কোলকাতায় এসেছেন এক "মহৎ" উদ্দেশ্য নিয়ে। তাঁর উদ্দেশ্যটা হোল "কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে" পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে পশ্চিম-বাংলার অন্যান্য সকল ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে নিয়ে একটি মিলিত জোট বাঁধার চেষ্টা করা। শ্রমিক সংহতি ভাঙ্গতে সংগ্রামী সংগঠনের বিরুদ্ধে এই ধরণের প্রতিক্রিয়াশীল প্রচেষ্টা এদেশে অনেক বার দেখে দেখে আমাদের একঘেয়ে হয়ে গেছে। শ্রমিক সংহতি ও সংগ্রামী ঐক্য কাচের গ্লাস নয়—যে শ্রম-মন্ত্রীর ধাক্কায় তা ভেঙ্গে চুরমার হবে। সর্দার প্যাটেল তো শ্রীভি ভি গিরিরও সর্দার—স্বয়ং সেই সর্দারের চেষ্টাই ধোপে টেকেনি—গিরি মশাই ত কোন্ ছার!"—জনসাধারণ।

বিহারী মন্ত্রীর হুমকি

"পশ্চিম-বাংলার বাঁচার দাবীতেই গান্ধীবাদী বিহার ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। বিহারের জনৈক মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় হুমকি দিয়াছেন—বাংলার দাবীতে বিহার প্রবাসী বাঙালীদের অবস্থা আরও খারাপ হইবে। কিন্তু বিহারী মন্ত্রী মহাশয় ঐখানেই পূর্ণচ্ছেদ দিয়াছেন। দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা কম থাকিলে বেশী দূর দেখিবার শক্তি থাকে না, তা যদি থাকিত তাহা হইলে সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ প্রবাসী বিহারীদের কথাও চিন্তা করিতেন। সাম্প্রতিক হাঙ্গামার পরে পশ্চিম-বাংলা আবার প্রমাণ দিয়াছে, বাঙালী আঘাত পাইলে সেই আঘাত নিঃশব্দে সহ্য করে না। বিহারের মন্ত্রী হইতে অতি সাধারণ পর্য্যন্ত সকলেই এই সহজ কথাটা স্মরণ রাখিলে সকলেরই কল্যাণ হইবে।"

—নির্ভীক।

আত্মহত্যার হিড়িক

"গত ৫ই শ্রাবণ সোমবার বেলা প্রায় দেড়টার সময় কাঁথি সরস্বতীতলার নিকটবর্ত্তী এক গৃহে রাইমোহন গাঙ্গুলী মহাশয়ের ১৫।১৬ বছরের কন্যা গলায় ফাঁসি লাগাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। কারণ প্রকাশ পায় নাই। এ বছর কাঁথিতে আত্মহত্যার যেন একটি হিড়িক চলিয়াছে। গত কয়েক মাসে আমরা কয়েকটি আত্মহত্যার সংবাদ পরিবেশন করিয়াছি। নারী পুরুষ সকলেই আজ স্বাধীন বলিয়া গর্ব্ব করি, কেহ কাহারও অধীন নহি। সকলে নির্বিঘ্নে নিজেদের মহৎ উদ্দেশ্যে আগাইয়া যাইতে পারি, তাই বলিয়া কি গলায় দড়িই সব-কিছু উদ্দেশ্যের সর্ব্বোচ্চ মাপকাঠি? আজকাল তরুণ-তরুণীরা মনে করে জীবনটা কিছুই নয়। তাহারা জীবনে কি শিক্ষা লাভ করিতেছে? এ সমস্তই অন্তরের দুর্ব্বলতার চিহ্ন। জগতে এই ভাবে মরিয়া যাওয়া বাহাদুরী নয়—বাঁচিয়া থাকিয়া প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া সংগ্রাম করাই বাহাদুরী।" —নীহার।

পায়ের তোড়া?

"'লোক-সেবক' সংবাদ দিতেছে পশ্চিম-বাংলার কংগ্রেস-প্রধান অতুল্য বাবুকে তাঁহার জন্মদিনে এক লক্ষ টাকার তোড়া দিবার জন্য বড়বাজারে হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে। আনন্দীলাল পোদ্দার, দয়ারাম বেরী এবং সত্যনারায়ণ মিশ্রও নাকি টাকা তুলিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যে সত্তর হাজার টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছে। অতুল্য বাবু লক্ষ টাকা পাইবেন ইহা বাঙালীর সৌভাগ্য। 'জন-সেবক' শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিলে বাঙালী বাঁচিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে জুজুর জটিল জাল কি ভাবে কাহাকে কখন জড়াইয়া ধরে কে বলিতে পারে? 'জন-সেবক' বাঁচিলেও অতুল্য বাবুর ভাষায় মানভূম না পাইলে বাঙালী বাঁচিবে না। জুজু প্রয়োজনে চকলেট-লজেন্সও দেয়। আমরা বুঝিতে পারি না, তাহাকে জুজু হিসাবেই দেখি। অভ্যস্ত চোখে মাঠের সবুজকেও অফিসের লাল ফিতা বলিয়া মনে হয়। শ্রীনেহরুর ভর্ৎসনা, আনন্দীলালের আদা-জল খাইয়া অর্থ-সংগ্রহ এবং মানভূম আন্দোলন বন্ধ কার্য্যে আত্মনিয়োগ এই তিন একই জুজুর বিচিত্র লীলা কিনা চোখে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিলেও আমরা তাহা বুঝিতে পারিব না। অতুল্য বাবুর অতুল বিজ্ঞাপনবাহী 'জন-সেবক' রহিয়াছে। অজ্ঞ জনকে একটু আলো দান করিবেন কি?"

—ডাক।

শোক সংবাদ

শ্রীমনোমোহন কাঞ্জিলাল গত ২১শে আগষ্ট শুক্রবার প্রাতর্ভ্রমণের সময় সহসা ট্রেণ চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৮৮৭ সালে নোয়াখালী জেলার রসিদপুরের বিখ্যাত দেওয়ান-পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ ও বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছু দিন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যাপনা করিয়া নোয়াখালী বারে যোগ দেন। ১৯২১ সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হন। তিনি বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৯৩১ সালে নোয়াখালীর বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীমতী স্নেহরাণী কাঞ্জিলালের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত বিধবা স্ত্রী এবং আত্মীয়-স্বজনকে সহানুভূতি জানাইতেছি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত,

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

প্রথম খণ্ড]　　　[ষষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন

১৩৫৯

৩১শ বর্ষ

কথামৃত

ঠাকুর বলছেন, "শুধু দর্শন নয়, আমার সঙ্গে কথা কয়েছে।"

ঠাকুর বলতেন, "যাঁরা আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে তাদের এখানে (দক্ষিণেশ্বরে) আসতেই হবে!"

ঠাকুর ছোকরাদের ডেকে বলতেন, "দেখ, বিয়ে করিস নে। এঁর (মহেন্দ্র গুপ্তর) এই বিপদ তোদের শিক্ষার জন্য।"

ঠাকুর বলতেন, "সব চৈতন্যময় দেখছি—মাটি, হাড়, মাংস।"

ঠাকুর আমাদের বললেন, "রোক চাই। ভ্যাদভেদে হলে চলবে না।"

মা ঠাকরুণ দেশে যাবেন। সমাধিবান পুরুষ (ঠাকুর) সব বলে দিলেন। বললেন, "পাড়ার লোকদের সঙ্গে ভাব রাখবে। কারু অসুখ করলে কাউকে দিয়ে খবর নেবে।"

ঠাকুর এক ভক্তের বাড়ী গিয়েছেন। বাড়ীর মেয়েরা তাঁকে প্রণাম করবার পর ঠাকুর ভক্তকে বললেন, "দেখ গৃহস্থের যেমন বার-বাড়ী ও অন্দর-মহল থাকে তেমনি থাকবে; আমায় দেখছ ইন্দ্রিয় জয় করেছি, তা'বলে কি সকলে তা করেছে? ইন্দ্রিয় জয় করা কি আমার সাধ্য? মা টেনে রেখেছেন তাই?"

একদিন (ঠাকুর) বললেন, "কর্ম্ম ত্যাগ করবার জো নেই। নিশ্বাস ফেলাও কর্ম্ম।"

তিনি (ঠাকুর) বললেন, "বিচার কি করব? আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি।"

তিনি (ঠাকুর) বললেন, "মানুষের ভুল ভ্রান্তি আছে। তাঁকে আন্তরিক ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সব ধর্ম্মে তাঁকে পাওয়া যায়, যদি আন্তরিক হয়।"

তিনি (ঠাকুর) একজনকে বলেছিলেন, "একটি মাটির ঘর রইল, সেখানে ব'সে ঈশ্বর চিন্তা করবে। এক বেলা শাকান্ন, আর এক বেলা বাতাসা ভিজিয়ে খেলেই হ'ল।"

ঠাকুর একবার একজন ভক্তকে দেখে বিষ্ণুভাবের উদ্দীপন হওয়ায় বলেছিলেন, "দেখ, আমার পুজো করতে ইচ্ছে হচ্ছে। ফুল থাকলে পুজো করতাম।" তার পরেই আবার বললেন, "মানস পুজোও হয়?"

ঠাকুর বলতেন, "ভগবানকে দর্শন করলে কায় চলে যায়।"

ঠাকুর বলতেন, "পরমহংস বালক, তার মা চাই।"

ঠাকুর কেশব সেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বল দেখি আমার ক'আনা জ্ঞান হয়েছে?" কেশব সেন বললেন, "আমি আর আপনার সম্বন্ধে কি বলব?" ঠাকুর তবু "বল না" এইরূপ জেদ করায় কেশব বাবু বললেন, "আপনার ষোল আনা জ্ঞান হয়েছে।" ঠাকুর শুনে বললেন, না, "তোমার কথা বিশ্বাস হ'ল না, নারদ শুকদেব এঁরা যদি বলতেন, তা হ'লে বিশ্বাস হ'ত।"

ঠাকুর জগন্মাতাকে ব'লেছিলেন, "আমাকে নিয়ে চল'। ঐহিকদের সঙ্গে থাকতে পারব না।" মা তাতে বললেন, "বাবা, দিন কতক থাক লোক-কল্যাণের জন্য। অনেক শুদ্ধ ভক্ত আসবে, তাদের নিয়ে আনন্দে থাকবে।" —'শ্রীম কথা' থেকে সঙ্কলিত

মাষ্টার মহাশয়ের ৺কামারপুকুর ভ্রমণ

(মহেন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত ডায়েরী অবলম্বনে)

শ্রীঅনিল গুপ্ত (মাষ্টার মহাশয়ের পৌত্র)

আজ বৃহস্পতিবার ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। নিকুঞ্জ দেবী (মাষ্টারের স্ত্রী) দ্বিজর সহিত কাশীপুরে আসিয়াছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার জন্য। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া নীচে মায়ের কাছে আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। শ্রীশ্রীমা মাষ্টার শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছেন শুনিয়া নিকুঞ্জ দেবীকে বলিলেন—

শ্রীশ্রীমা—বৌমা, তোমায় দেশে নিয়ে যাব ও পরে তুমি আমার সঙ্গে তীর্থে যেও।

এই কথাগুলি বলিয়া শ্রীশ্রীমা মনে মনে মাষ্টার শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছেন ও কত কষ্ট করিয়া যাইতেছেন ভাবিতেছিলেন এমন সময় লাটু আসিয়া বলিলেন—"দোর খুলুন, মাষ্টার মহাশয় এসেছেন কামারপুর থেকে।"

মাষ্টার ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ খৃঃ ৺কামারপুকুর যাত্রা ও ১১ই সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরে তিনি কাশীপুরে আসিয়া ঠাকুরের অসুখ বৃদ্ধির কথা গুরু-ভ্রাতাদের নিকট হইতে শুনিয়া হৃদয়ে তীব্র ব্যথা অনুভব করিলেন। শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া বিষণ্ণ বদনে উপরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া ঘরে বসিলেন। লাটু যোগীন প্রভৃতি উপস্থিত।

লাটু (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—মাষ্টার মহাশয় কামারপুকুর গিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি রঞ্জিত রায়ের দীঘি দেখ নাই? তুমি কি হেঁটে গেলে···

লাটু—মাষ্টার মহাশয় খুব ভাগ্যবান, কেমন সব বেশ দেখে এলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কামারপুকুরের লোক কেমন দেখলে? ওখানকার হাট দেখেছো?

মাষ্টার—মেহেরবানপুরের গুরুদাস গোস্বামী আপনাকে নমস্কার জানিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ হাত জোড় করিয়া গুরুদাস গোস্বামীর উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাইলেন।

মাষ্টার—তারা সব আপনার ব্যারামের কথা জানেন। গড় মান্দারণ ও পথের ধারে বৃহৎ দীঘিগুলি দেখিয়াছি। সেখানে কুমীর ও···

এই কথাগুলি মাষ্টার বলিতেই শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিয়া উঠিলেন।

লাটু—(মাষ্টারের প্রতি)—রাখালরা পূজা করে কোথায় দেখেছেন?

মাষ্টার—হাঁ, বিশালাক্ষী।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, ঠিক।

মাষ্টার—শ্যামবাজারে * গিয়েছিলাম। বকুলতলা, গুঁয়েদের বাড়ী ও নটবর গোস্বামীর * বাড়ী দেখেছি। গত কাল গুঁয়েদের বাড়ীতে আউল ও বাউল সম্প্রদায়ের অনেক গান হলো, আঁখর পড়ল ও সব হলো, তবু কিছু বুঝাতে পারলো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা···

মাষ্টার—হাজরা মহাশয়ের, ভিক্ষামায়ের † ও শ্রীনিবাস শাঁখারীর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। হালদারপুকুর, ভূতীর খাল ও গোচারণের স্থান, লাহাদের বাড়ী, চণ্ডীমণ্ডপ ও পাঠশালা ‡ দেখে এসেছি। ওখানকার লোকেরা খুব আদর-যত্ন করলো। আপনার কথা বলায় তারা বললে, "উনি আমাদের খুব ভক্তি করেন?"

[অশিক্ষিত, তাই ভক্তি ও ভালবাসার পার্থক্য না বুঝিয়া এইরূপ বলিয়াছিল। তারা ভাবিয়াছিল ইহাতে খুব বেশী ভালবাসা বুঝাইবে।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)—ইনি তোমার বাড়ীতে গিয়েছিলেন।

হাজরা—শুনেছি আর শিবুর চিঠিতে সব জানতে পারলাম যে উনি ওখানকার সব স্থান দর্শন ও নমস্কার করে এসেছেন। আর ওঁর শক্তি সঞ্চার এখান থেকেই হয়ে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(উৎসাহের সহিত)—কেউ বলেনি, নিজে থেকেই!

[এই কথাগুলি বলিতে বলিতে ঠাকুর আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন]

হাজরা—আমাদেরই যেতে ভয় হয়। (ডাকাতের উৎপাত)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ মাটি আনা ভক্তি-বিশ্বাস। যেমন বিভীষণ ও শ্রীচৈতন্যের হয়েছিল। বিভীষণের রাম নামে ছিল অগাধ ভক্তি-বিশ্বাস। একটি পাতায় রাম নাম লিখে, পাতাটি একটি লোকের কাপড়ের খোঁটে বেঁধে দিছিল—সে লোকটি সমুদ্রের পারে যাবে। বিভীষণ তাকে বলে দিছিল তোমার কোন ভয় নাই, তুমি বিশ্বাস করে

---

* ১৮৮০ খৃঃ ঠাকুর যখন হৃদয়ের বাড়ীতে ছিলেন সেই সময় তাঁহাকে শ্যামবাজারে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে ৭ দিন ও কি পাঁচিলে ও গাছে লোক। এখানে ঠাকুরের মুহুর্মুহু ভাব-সমাধি হয়। এই সময় ঠাকুর নটবর গোস্বামীর বাড়ীতে অবস্থান করেন। সেখানেও লোকের ভীষণ ভীড় হওয়ায় তিনি এক তাঁতীর বাড়ীতে সকালে পলায়ন করিতেন। লোকে সন্ধান পাইয়া এখানে ক্রমে খোল করতাল লইয়া "তাকুটী তাকুটী" ভীড় করিতেন। চারি ধারে রব উঠিয়া গেল "সাত বার মরে সাত বার বাঁচে" এমন লোক আসিয়াছে।

* নটবর গোস্বামীর বাড়ীতে কীর্ত্তন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণকে দর্শন করিয়া সমাধিস্থ হন। তাঁর সূক্ষ্ম শরীর শ্রীকৃষ্ণের পায়ে পায়ে বেড়াইতেছে অনুভব করেন।

† ইনিই কামারকন্যা ধনী, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের সময় ইনি ধাত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন ও উপনয়নের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ ইহার নিকট হইতে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া মাতৃ সম্বোধনে ইহাকে কৃতার্থ করেন।

‡ জমিদার লাহা বাবুদের নাট্যমণ্ডপে একটি পাঠশালা ছিল। এইখানে শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যারম্ভ হয়।

জলের উপরে দিয়ে চলে যাও, কিন্তু দেখো, অবিশ্বাস করো না করলেই ডুবে যাবে। লোকটিও বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় তার ভারি ইচ্ছা হলো কি লেখা আছে একবার ত্যাখে। খুলে দেখলে কেবল রাম নাম লেখা! দেখে ভাবলে, শুধু রাম নাম লেখা! যা-ই অবিশ্বাস অমনি ডুবে গেল। আর শ্রীচৈতন্য যখন মেরগাঁ দিয়ে যাচ্ছিলেন, শুনলেন এই গাঁয়ের মাটিতে শ্রীখোল তৈয়ার হয়। যা-ই শোনা অমনি ভাবাবিষ্ট হলেন।

এই ভক্তি বিশ্বাসের কথা বলিতে বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট ও সমাধিস্থ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন।

মাষ্টার—রঘুবীরের আরতি দর্শন, রঘুবীর ও শীতলামা দর্শন ও প্রণাম, সব করে এসেছি। এখানকার জন্য প্রসাদ এনেছি। সঙ্গে কামারপুকুরের মাটিও এনেছি।

রঘুবীরের প্রসাদ (ফুল ও মিঠাই) শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে ঘ্রাণ ও পরে চক্ষে, বুকে ও মাথায় স্পর্শ করিলেন। এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন লাটু ঐ মাটি খাবার উদ্যোগ করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার হস্ত ধারণ করিয়া লাটুকে বলিলেন, "আগে প্রসাদ খা।" কিন্তু লাটু এতই বিভোর যে তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা কিছুই শুনিতে পাইলেন না।

যোগীন—মাষ্টার মহাশয় ভিতর থেকে কখন যে কি করেন কেউ জানতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাষ্টারের হাস্য।

যোগীন—(শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) আমরা আপনি ভাল হলে যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কপালে হাত দিয়া) আর কি ভাল হবে! (মাষ্টারের প্রতি) দেখ না হাতটা কত রোগা হয়ে গেছে।

মাষ্টার—আর মোগলমাড়ীতে গুপের দোকান, সরস্বতী পূজা ও বাজার হাট সব দেখলাম।

এই কথা বলিতে বলিতে মাষ্টার লক্ষ্য করিলেন, ঠাকুর নিস্তব্ধ হইয়া ফ্যাল-ফ্যাল ও দৃষ্টিহীন ভাবে চাহিয়া আছেন। এ কি! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি ভাবচক্ষে কামারপুকুরের স্মৃতির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন ও বাল্যস্মৃতি স্মরণ করিতে করিতে তাহাতে লীন হইলেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ একটু প্রকৃতিস্থ হইলে সকলে একে একে ঘর পরিত্যাগ করিলে ঠাকুর মাষ্টারকে পদসেবা করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

মাষ্টার (সেবা করিতে করিতে)—জগন্নাথ যাব মনে করেছি কিছু দিনের ছুটি নিয়ে। মহাপ্রভু দুপুর বেলা তপ্ত ভূমির উপর দিয়ে সার্ব্বভৌমের কাছে বেদান্ত পাঠ করিতে যাচ্ছেন স্মরণ করে বড় কান্না পেলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বলরাম ও আর যারা ওখানে গিয়েছে তাদের জিজ্ঞাসা করে যাবে।

মাষ্টার—যাব ভেবেছি কিন্তু কেউ না জানতে পারে। আর বাড়ীতে বলবো শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে তাই দু'দিন বাহিরে যাব হাওয়া পরিবর্ত্তনে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখন, কি দোলে। টাকা অনেক নেবে। বলরামকে একবার জিজ্ঞাসা করবে।

মাষ্টার—তিনি কি এসেছেন? তাঁর বাড়ীতে গিসলুম. ও ওড়িয়াদের জিজ্ঞাসা করে এসেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, হাঁ, বেশ।

মাষ্টার—জাহাজের খবর পেয়েছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর যাবে। আর সব জায়গায় যাবে। যারা ওখানে গিয়েছে তাদের জিজ্ঞাসা করবে। জগন্নাথের পা ছুঁয়ে পূজা করবে।

মাষ্টার—মহাপ্রভু যে রাস্তা দিয়ে গিসলেন সেই রাস্তা দিয়ে যাব মনে করেছি। যাবার সময় যদি না হয়ত, দেখি যদি আসবার সময় হয়। শুনেছি গোপীনাথ মিশ্রের বাড়ী যেখানে মহাপ্রভু ছিলেন, সে বাড়ী এখনও আছে।

এইরূপ কথা হইতেছে এমন সময় লাটু ও কালী আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে জানাইলেন সুরেশ বাবু বাড়ী যাইবেন, আপনাকে প্রণাম করিবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণ সরিয়ে নিলেন ও মাষ্টারকে বিদায় দিলেন। মাষ্টারও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য চাই

বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানে এক্ষণে পৃথক্, পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব্ব থাকিবে যে, তাঁহারা ভিন্নদেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দ্দু-ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেন না, জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা। —বঙ্কিমচন্দ্র

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

চুরাশি

যদু মল্লিকের বাগানে গিয়ে আবার কাঁদে রামকৃষ্ণ।

ভোলানাথ, মোটা বামুন, হাত জোড় করে বলে, 'মশায়, ওর সামান্য পড়াশুনো, ওর জন্য আপনি কেন এত অধীর হন?'

সামান্য পড়াশুনো? নরেনের জুড়ি আর একটাও ছেলে আছে? ঝলসে ওঠে রামকৃষ্ণ। 'যেমন গাইতে-বাজাতে, তেমনি বলতে-কইতে, তেমনি আবার লেখাপড়ায়। রাত-ভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে-করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁস থাকে না। সে কি যে-সে? তার ভেতর এতটুকু মেকি নেই—বাজিয়ে দেখ গিয়ে, টং-টং করছে। আর সব ছেলেদের দেখি—দেড়টা-দুটো পাশ করেছে হয়তো, ব্যস, ঐ পর্যন্তই। চোখ-কান টিপে কোনো রকমে পাশ করতেই যেন সব শক্তি বেরিয়ে গেছে। আমার নরেনের সে রকম নয়, সে হেসে-খেলে পাশ করে যায়। ব্রাহ্মসমাজে ভজন গায় সে—আর-আরদের মতন নয়, সে সত্যিকারের ব্রহ্মজ্ঞানী। বুঝলে, ধ্যান করতে বসে সে জ্যোতি দেখে। সাধে কি আর নরেনকে এত ভালোবাসি?'

কিন্তু যাকে এত ভালোবাসেন সে তাঁকে মানতে রাজি নয়। সে তাঁকে কাঁদায়।

এক দিন সরাসরি বললে মুখের উপর, 'তুমি ঈশ্বরের রূপ-টুপ যা দেখ তা তোমার মনের ভুল।'

আহতের মত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'বলিস কি রে! কথা কয় যে।'

'কথা কয় না কচু!' কথাটা হেসে উড়িয়ে দিল নরেন্দ্র। 'সব আপনার মাথার খেয়াল।'

বলে কি চোঁড়া। মাথার খেয়াল?

'বলিস কি রে। মা স্পষ্ট চোখের সামনে দাঁড়ান, হাঁটেন-চলেন, কথা কন—'

'বাজে কথা! মাটির প্রতিমা নড়বে-চড়বে কি। কথা কইবে কি!'

'বাঃ, নিজের চোখ-কানকে অবিশ্বাস করব?'

'মাথার গরমে ছায়া দেখেন আপনি, হয় তো বা অপচ্ছায়া!' নরেন নিষ্ঠুরের মত বললে, 'হাওয়ায় হয়তো বা কি শব্দ হয়, ভাবেন ছায়া বুঝি কথা কইছে।'

'তুই বললেই হল?' নরেনকে উড়িয়ে দিতে চাইলেন রামকৃষ্ণ।

'আপনি বললেই বা হবে কেন?' প্রত্যাখ্যানে দৃঢ় নরেন্দ্রনাথ: 'পশ্চিমের বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, অনেক জায়গায় চোখ-কান এমনি করে প্রতারণা করে। আপনিও যে প্রতারিত হচ্ছেন না তার প্রমাণ কি? কে বলবে সমস্তই আপনার চোখ-কানের ভুল নয়?'

'সমস্তই আমার চোখ-কানের ভুল?' অসহায়ের মত তাকিয়ে রইলেন রামকৃষ্ণ।

'নিশ্চয়। নইলে যা সত্যি অদৃশ্য তাকে দেখা যাবে কি করে? যা অচল সে কি করে নড়ে-চড়ে?'

এর মধ্যে আবার হাজরা আছে টিপ্পনি ঝাড়তে। বলছে, 'ঈশ্বর অনন্ত, তাঁর ঐশ্বর্য অনন্ত—সব বুঝি। তাই বলে তিনি কি আর সন্দেশ-কলা খাবেন? না, গান শুনবেন? ও সব ধোঁকা, ধাপ্পাবাজি।'

'তা ছাড়া আবার কি।' তার কথায় দাগ বুলোলো নরেন।

বড় মন-মরা হয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ। নরেন তো মিথ্যে বলবার ছেলে নয়। তবে এত দিন তিনি যা সব দেখে এসেছেন, বিশ্বাস করে এসেছেন, সব ভুয়ো? সব কাল্পনিক?

ভবতারিণীর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লেন রামকৃষ্ণ

'মা, এ কী হল? এ সব কি মিছে? নরেন্দ্র এমন কথা বললে! তুই শুধু পাথরের মূর্তি? তুই অচল, অনড়? তুই বোবা, বধির?'

মা কথা কয়ে উঠলেন। বললেন, 'ওর কথা শুনিস কেন? কিছু দিন পরে ও-ই নিজে দেখতে পাবে ঈশ্বরীয় রূপ, সব কথা সত্য বলে মানবে। কিছু ভাবিসনে। যদি মিথ্যে হবে, সব কথা তবে অবিকল মিলল কি করে?'

শুধু তাই নয়, দেখিয়ে দিলেন ভবতারিণী। দেখিয়ে দিলেন, সর্বত্র চৈতন্য, অখণ্ড চৈতন্য—চৈতন্যময় রূপ।

তেড়ে ছুটে গেলেন রামকৃষ্ণ। পাকড়াও করলেন নরেনকে। বললেন, 'শালা, তুই আমায় অবিশ্বাস করে দিয়েছিলি! চলে যা, তুই আর এখানে আসিস নে।'

যার জন্যে এত কান্না, তাকেই কিনা বাড়ির বার করে দেওয়া।

মুখের কথায় নরেন নড়ে না, কেননা সে জানে অন্তরের কথাটি। তাই সে আস্তে-আস্তে বারান্দায় সরে গিয়ে বসে তামাক সাজতে। নীরবে হুঁকোটা বাড়িয়ে দেয় হাজরার দিকে। হাজরাও চুপ।

সেই যে সেদিন চলে গেল নরেন, রামকৃষ্ণের ভয় হল, আর বুঝি সে আসবে না রাগ করে। কিন্তু, না, আবার এসেছে আরেক দিন। সেদিন আনন্দ কত রামকৃষ্ণের! মনে-মনে বলছেন, ও যে আমার আপনার লোক, তাই ওকে বকলেও ও আসবে। যে আপনার লোক তাকে বকলেও সে রাগে না।

তাই তো ঈশ্বর মুখের কথার ধার ধারেন না। অন্তরের বচনহীন ভাষাটি শোনবার জন্যে নিরন্তর কান পেতে থাকেন।

'নরেন্দ্রর কথা আর লই না।'

সেদিন আবার আরেক তর্ক।

রামকৃষ্ণ বললেন, চাতক আকাশের জল ছাড়া আর কিছু খায় না।

নরেন তা মানতে রাজি নয়। বললে, 'বাজে কথা। এমনি জলও চাতক খায়।'

মহা ভাবনা ধরল রামকৃষ্ণের। আবার ছুটলেন ভবতারিণীর মন্দিরে। মা, এ সব কি মিথ্যে হয়ে গেল? যা এত দিন সব দেখেছি-জেনেছি সব গাঁজাখুরি?

সেদিন কি মনে করে নরেন্দ্র এসে হাজির।

ঘরের ভিতর কতগুলো কী পাখি উড়ছে ফরফর করে। নরেন্দ্র বলে উঠল, 'ঐ, ঐ—'

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন রামকৃষ্ণ, 'কি?'

'ঐ চাতক। ঐ চাতক!' উল্লাস করে উঠল নরেন।

কতগুলো চামচিকে।

হেসে উঠলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'সেই থেকে নরেন্দ্রর কথা আর লই না।'

কিন্তু সব সময়ে ভয়, নরেন্দ্র এই বুঝি আর কারু হয়ে গেল। আমার বুঝি হল না! তাই তার সঙ্গে কথা কইতেও ভয়, না কইতেও ভয়।

স্নেহকরুণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন রামকৃষ্ণ। ভাববিহ্বল হয়ে গান ধরেন:

'কথা বলতে ডরাই না-বললেও ডরাই।

মনে সন্দ হয় পাছে তোমাধনে হারাই-হারাই॥'

গান শুনে অশ্রু-ভরোভরো চোখে তাকিয়ে থাকে নরেন। ভাবে ভালোবাসায় পাহাড় বুঝি দ্রবময়ী নির্ঝরিণী হয়ে যাবে।

কিন্তু ঐ বুঝি আবার হারিয়ে গেল। কত দিন আবার দেখা নেই নরেনের।

কাঁহাতক আর বসে থাকবেন পথ চেয়ে! সেদিন নিজেই রওনা হলেন কলকাতার দিকে।

কিন্তু, হঠাৎ খেয়াল হল, আজ তো রবিবার, যদি তার বাড়িতে গিয়ে দেখা না পাই! যদি কোথাও কারু সঙ্গে আড্ডা দিতে বেরিয়ে গিয়ে থাকে! কোথায় আর যাবে! আজ যখন রবিবার, নিশ্চয়ই ব্রাহ্মসমাজে ভজন গাইবার ডাক পড়েছে সন্ধের সময়। সেখানে গেলেই নির্ঘাৎ তাকে দেখতে পাব। আমার তো আর কিছুই বাসনা নেই, শুধু তাকে একটু দেখব কাছে থেকে।

যেমন ভাবনা তেমন কাজ। সরাসরি সমাজে গিয়ে উপস্থিত হলেন রামকৃষ্ণ।

মুহূর্তে একটা প্রলয়-কাণ্ড ঘটে গেল। বেদিতে বসে আচার্য ভাষণ দিচ্ছেন, জনতার সেদিকে লক্ষ্য নেই। সেই 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' সহসা যেন মূর্তি ধরে আবির্ভূত হয়েছেন সভাস্থলে, এমনি মনে হল জনতার। তাঁকে একবারটি একটু চোখের দেখা দেখবার জন্যে চারদিকে রব পড়ে গেল। সুরু হয়ে গেল বাঁধভাঙা বিশৃঙ্খলা। বেঞ্চির উপর

উঠে দাঁড়াল এক দল, অন্য দল ঘিরে ধরতে চাইল রামকৃষ্ণকে।

স্তম্ভিতের মত বসে রইল আচার্য। মাথায় একবার এল না ঠাকুরকে যোগ্য সমাদরে সংবর্ধনা করে নিই। বসাই এনে বেদির উপরে।

আচার্যের কথা ছেড়ে দি, সমাজের কর্তৃপক্ষের কেউই একটা সাধারণ শিষ্টাচার পর্যন্ত দেখাল না। মনে-মনে রামকৃষ্ণের উপর তারা চটা ছিল। তাদের সমাজের দু-দুটো মাথা—কেশব আর বিজয়কে রামকৃষ্ণ বশ করেছে! টেনে নিয়েছে নিজের মতে।

কিন্তু তাই বলে তিনি এমনি ভাবে অপমানিত হবেন? বেদির উপর বসে ছিল নরেন্দ্রনাথ, নিচে লাফিয়ে পড়ল! এগিয়ে গেল ঠাকুরের দিকে।

তাকে দেখতে পেয়ে ভাবে মাতোয়ারা হলেন রামকৃষ্ণ। তার দিকে ধাবমান হতে-না-হতেই সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

তখন আবার সমাধি-অবস্থায় রামকৃষ্ণকে দেখবার জন্যে জনতা আলোড়িত হয়ে উঠল। এমন সময় কারা ঘরের গ্যাস দিল নিবিয়ে। ঘনান্ধকারে ভরে গেল চার দিক।

তুমুল গোলমাল। দিগ্‌ভ্রান্ত দ্বারভ্রান্ত জনতা। এদিক-ওদিক ছুটতে লাগল বিপর্যস্তের মত।

এখন রামকৃষ্ণকে কি করে রক্ষা করবে নরেন্দ্র! কি করে অন্ধকার থেকে নিয়ে আসবে বাইরে। নরেন একাই একশো। একাই আবৃত করে রাখবে। বলিষ্ঠবাহু পুত্র যেমন পিতাকে বেষ্টন করে রাখে। কারু সাধ্য নেই রামকৃষ্ণের ছায়া মাড়ায়।

রামকৃষ্ণের সমাধি ভাঙল। চার পাশে তাকালেন অন্ধকারে। কই, তুই আছিস? আয়, আমাকে ধর। তোকে দেখতে চলে এসেছি কতদূর!

হাত ধরে রামকৃষ্ণকে বাইরে নিয়ে এল নরেন। পিছনের দরজা দিয়ে। অন্ধকার ঠেলে-ঠেলে।

একটা গাড়ি ডাকালো। চলো দক্ষিণেশ্বর।

পথে ঠাকুরকে বকতে লাগলো নরেন। 'কেন আপনি এসেছিলেন এখানে?'

তুই জানিস না কেন এসেছিলাম? সুখস্মিতমুখে তাকিয়ে রইলেন ঠাকুর।

'সেজন্যে এখানে আপনি আসবেন, এই ব্রাহ্ম-সমাজে? এখানে ওরা আপনাকে সম্মান দেখাল, না, অভ্যর্থনা করল? ঘর অন্ধকার করে পালিয়ে গেল সকলে। আমার জন্যে আপনি কেন এ অপমান নিতে এলেন? আপনার অপমানে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে—'

অপমান! ঠাকুরের মুখপদ্মের প্রসন্নাভা এতটুকু ম্লান হল না।

'অপমান ছাড়া আবার কি। ওরা আপনাকে বোঝে না, বোঝবার ওদের সাধ্যও নেই—ওদের এখানে আসবার আপনার কী দরকার! আমাকে ভালবাসেন বলে আপনার সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান খোয়াতে হবে?'

যা খুশি তাই বল। তোর কথায় কে কান দেয় তোর কথা আর লই না। তোর দেখা পেয়েছি তুই আমাকে গাড়ি করে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিস এই আমার ঢের। নইলে কে কোথায় কী অনাদর বা উপেক্ষা করল তাতে আমার বয়ে গেল।

'ভালবাসেন বাসুন, কিন্তু নিজের দিকে খেয়াল রাখেন না কেন?'

ওরে ভালবাসায় কি নিজের দিকে খেয়াল থাকে? ভালবাসা যে আত্মনাশী।

'কিন্তু এই ভালবাসার পরিণতি কি? শেষে ভরত রাজার মতন আপনার না দশা হয়! ভরত রাজা হরিণ ভাবতে-ভাবতে হরিণ হয়ে জন্মেছিল, আপনারো না শেষ পর্যন্ত—'

ঠাকুরের মুখে হঠাৎ চিন্তার ঘোর লাগল। বললেন, 'তুই একেকটা এমন কথা বলিস যে বিষম ভাবনা ধরে যায়।'

'আমি ঠিকই বলি।'

'তাই তো রে, তাহলে কী হবে! আমি যে তোকে না দেখে থাকতে পারি না। আমায় তবে উপায় বলে দে।'

তবু ভালবাসায় মাত্রা টানতে পারবেন না ঠাকুর। মন্দা পড়তে দেবেন না জোয়ারে।

শেষকালে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে মা'র দুয়ারে এসে হাজির হলেন। নরেনকে কেন এত ভালোবাসি? কেন ওকে দেখবার জন্যে চোখ দুটো ক্ষয় হয়ে যায়? ও আমার কে?

হাসতে-হাসতে ফিরে এলেন মন্দির থেকে। বললেন, 'যা শালা, তোর কথা আর লই না। মা সব বলে দিলেন, বুঝিয়ে দিলেন—'

'কী বলে দিলেন?'

'বলে দিলেন তুই ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস, তাই অত ভালোবাসিস। যেদিন ওর মধ্যে নারায়ণকে দেখতে পাবিনে সেদিন ওর মুখদর্শন তোর অসহ্য হবে।' প্রসন্ন আস্ত প্রেমে তরল হয়ে এল। 'আমার ভরত রাজার মত দশা হবে বলতে চাস? নারায়ণ ভেবে নারায়ণকে ভালোবেসে যে পাড়ি জমাতে পারে তার আর পারাবারের ভয় কি।'

সেই ভালোবাসার কাছে নরেন দাঁড়িয়ে রইল অসহায়ের মত। আত্মবিস্মৃতের মত।

'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কিনা জানি না, বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে', শিবানন্দকে বিবেকানন্দ চিঠি লিখছেন আমেরিকা থেকে: 'রামকৃষ্ণ পরমহংস the latest and the most perfect—জ্ঞান প্রেম বৈরাগ্য লোকহিতচিকীর্ষা উদারতায় জমাট—কারু সঙ্গে কি তাঁর তুলনা হয়? তাঁকে যে বুঝতে পারে না তার জন্ম বৃথা। আমি তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য, তাঁর একটা কথা বেদবেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়। তস্য দাস-দাস-দাসোঽহং। তবে একঘেয়ে গোঁড়ামি দ্বারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয়—এই জন্য চটি। বরং তাঁর নাম ডুবে যাক—তাঁর উপদেশ ফলবান হোক। তিনি কি নামের দাস?...'

পঁচাশি

জুড়িগাড়ি করে কারা আসছে দক্ষিণেশ্বরে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল রাখাল। সহজেই চিনতে পারল। কলকাতার এক নামজাদা বড়লোক।

রামকৃষ্ণেরও চোখ পড়েছে। যেমনি দেখা অমনি জড়সড় হয়ে পালিয়ে গেলেন ঘরের মধ্যে। অচেনা আগন্তুক দেখে শিশু যেমন ভয়ে পালায়।

এ কি হল? রাখালও পিছু-পিছু ঘরে ঢুকল।

'যা, যা, শিগগির যা। ওরা এখানে আসতে চাইলে বলিস এখন দেখা হবে না।'

এমনতরো তো কোনো দিন হয় না। অর্থী তো কোনো দিন ফিরে যায় না ব্যর্থ হয়ে।

অবাক মানল রাখাল। বাইরে এসে জিগগেস করল অভ্যাগতদের: কি চাই?

'এখানে একজন সাধু আছেন না? তাঁকে চাই।'

'কি দরকার?'

'আমার আত্মীয়ের থাক-যাক অসুখ। কিছুতেই সুরাহা হচ্ছে না। উনি দয়া করে যদি কোনো ওষুধ-টোষুধ দেন—'

এতক্ষণে বুঝল রাখাল। কিন্তু অন্তরের ভাবটি কি করে বোঝেন ঠিক অন্তর্যামী তা কে বলবে!

'উনি ওষুধ দেন না। আপনারা ভুল শুনছেন—'

এক দিন আরেক জন বড়লোক এসেছিল। আমায় বলে, মশায়, এই মোকদ্দমাটি কিসে জিত হয় আপনার করে দিতে হবে। আপনার নাম শুনে এসেছি। আমি বললুম, বাপু, সে আমি নই—তোমার ভুল হয়েছে।

বলছেন রামকৃষ্ণ: 'যার ঠিক-ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি হয়েছে, সে শরীর, টাকা—এ সব গ্রাহ্য করে না। সে ভাবে, দেহসুখের জন্যে কি লোকমান্যের জন্যে কি টাকার জন্যে আবার জপ-তপ কি! জপ-তপ ঈশ্বরের জন্যে।'

বলে, দুদিক রাখব! দু আনা মদ খেলে মানুষ দু দিক রাখতে চায়। কিন্তু খুব মদ খেলে রাখা যায় দু দিক?

তেমনি ঈশ্বরের আনন্দ পেলে আর কিছুই ভালো লাগে না। কামকাঞ্চনের কথা যেন বুকে বাজে। শাল পেলে আর বনাত ভালো লাগে না। রামকৃষ্ণ কীর্তনের সুরে গান গেয়ে উঠলেন। 'আন লোকের আন কথা ভালো তো লাগে না—'তখন ঈশ্বরের জন্যই মাতোয়ারা। আর সব আলুনি, পানসে।

ত্রৈলোক্য বললে, 'সংসারে থাকতে গেলে টাকাও তো চাই, সঞ্চয়ও চাই। পাঁচটা দানধ্যান—'

'আগে টাকা সঞ্চয় করে নিয়ে তবে ঈশ্বর?' রামকৃষ্ণ ঝলসে উঠলেন: 'আর, দানধ্যানই বা কত! নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার-হাজার টাকা খরচ, আর পাশের বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না। তাদের দুটি চাল দিতে কষ্ট হয়। দিতে-থুতে হিসেব কত! ও শালারা মরুক আর বাঁচুক—আমি আর আমার বাড়ির সকলে ভালো থাকলেই হলো। মুখে বলে সর্বজীবে দয়া!'

জীবে দয়া! জীবে দয়া! দূর শালা! কীটানুকীট—তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? তোর স্পর্ধা কিসের? তুই কিসে এত আত্মম্ভরী?

সেদিন ঠাকুর তাই ধমকে উঠেছিলেন নরেন্দ্রকে। বল, জীবে দয়া নয়, জীবে শ্রদ্ধা, জীবে প্রেম, জীবে সেবা। শিবজ্ঞানে জীবের বন্দনা।

দয়ার মধ্যে একটা উঁচু-নিচুর ভাব আছে। আমি দয়ালু, আমি উপরে দাঁড়িয়ে; তুমি দয়ার ভিখারী, তুমি নিম্নাসীন। এ অসাম্য সহ্য হল না রামকৃষ্ণের। তিনি সর্বত্র নরায়িত নারায়ণ দেখলেন। দেখলেন আশ্চর্য সৌষাম্য। সব এক, সব সমান, সব বিভক্ত হয়েও অবিচ্ছিন্ন। প্রত্যেককে দাঁড় করিয়ে দিলেন একটি শ্যামল সমভূমিতে—যার পোষাকী নামটি ভূমা, আর চলতি নামটি ভালোবাসা।

এই রামকৃষ্ণের সাম্যবাদ। সকলে আমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ, আনন্দময়ীর ছেলে, রামপ্রসাদের ভাষায়, ব্রহ্মময়ীর বেটা। এক বাপের সমাংশভাক্ বংশধর। অধিকারের স্তরভেদ নেই. আমাদের মধ্যে শুধু প্রেমের সমানস্রোত।

বনের বেদান্তকে ঘরে নিয়ে এলেন রামকৃষ্ণ। একেই বললেন, 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে কাজ করা।' একেই বললেন, নিরাকার থেকে আবার সাকারে চলে আসা। এবার সত্যিকারের সাকার। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে স্বীকার করা, আবিষ্কার করা, অভ্যর্থনা করা।

নরেনের তৃতীয় নয়ন আবার উদ্দীপ্ত হল। দেখল সর্বত্র অভেদ। পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলে একই পরমপ্রকাশের খণ্ড মূর্তি। প্রত্যহের তুচ্ছতার মধ্যে সে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তাকে মুক্ত করে যুক্ত করে দিতে হবে সে সর্বভাসকের সঙ্গে। দিতে হবে তাকে তার সুমহান অধিকারের সংবাদ। তার অন্তরের নিভৃত গুহা থেকে জাগাতে হবে সে প্রসুপ্ত কেশরী। তার অনুভবের মধ্যে আনতে হবে তার অস্তিত্বের পরমার্থের আস্বাদ।

শুধু নিজে দেখলে চলবে না, দেখাতে হবে। শুধু নিজে চিনলে চলবে না, চেনাতে হবে। আমি যদি একা জেগে উঠে দেখি আর-সবাই তখনো ঘুমিয়ে রয়েছে, তখন আমার আকাশ-ভরা প্রভাত-আলোর আনন্দ কই?

ছিন্ন কথার খেই ধরল ত্রৈলোক্য। বললে, 'সংসারে তো ভালো লোকও আছে। চৈতন্যদেবের ভক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, তিনি তো সংসারে ছিলেন—'

'তার গলা পর্যন্ত মদ খাওয়া ছিল।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'যদি আর একটু খেত, সংসার করতে পারত না।'

'তা হলে সংসারে কি ধর্ম হবে না?'

'হবে। যদি ভগবানকে লাভ করে থাকতে পারো। তখন কলঙ্ক-সাগরে ভাসো, কলঙ্ক না লাগে গায়। তখন পাঁকাল মাছের মতো থাকো। ঈশ্বর-লাভের পর যে সংসার সে বিদ্যার সংসার। তাতে কামিনীকাঞ্চন নেই, শুধু ভক্ত আর ভগবান। এই আমার দিকেই দেখ না। আমারও মাগ আছে, ঘরে-ঘরে ঘটি-বাটিও আছে—হরে প্যালাদের খাইয়েও দিই, আবার যখন হাবীর মা এরা আসে এদের জন্যেও ভাবি।'

চৈতন্যলাভের পর সংসারে গিয়ে থাকো। যদি অনেক পরিশ্রমের পর কেউ সোনা পায়, তা বাক্সের মধ্যেই রাখো বা মাটির নিচেই রাখো, সোনার কিছুই হয় না। কাঁচা মনকে সংসারে রাখতে গেলেই মন মলিন হয়ে যায়। দুধে-জলে একসঙ্গে রাখলেই যায় সব একাকার হয়ে। দুধকে মন্থন করে মাখন তুলে জলের উপর রাখলে আর গোল থাকে না, ভাসে।

কাগজে তেল লাগলে তাতে আর লেখা চলে না। তবে যদি বেশ করে খড়ি দিয়ে ঘসে নিস, লেখা ফুটবে। তেমনি কামকাঞ্চনের দাগ-ধরা জীবনে সাধন করতে হলে ত্যাগের খড়ি ঘর্ষণ করো।

শশধর পণ্ডিতকে দেখতে যাবেন রামকৃষ্ণ। অত বড় পণ্ডিত, অথচ এক বিন্দু ভয় নেই কাছে ঘেঁসতে। আমার কি! আমার তো বাজনার বোল মুখস্ত বলা নয়, হাতে বাজানো। ওরা শুধু জল তোলপাড় করে, আর আমি অতলতলে ডুব দিই।

ওরে নরেন, তুই সঙ্গে চল। মন্দ কি, পণ্ডিতদের সঙ্গে দর্শনচর্চা করে আসবি।

কিন্তু, দেখা হলে শশধর পণ্ডিত কী বললে? বললে, 'দর্শনচর্চা করে হৃদয় শুকিয়ে গিয়েছে। দয়া করে আমায় এক বিন্দু ভক্তি দিন—'

জ্ঞানের খররৌদ্রে দগ্ধ হয়ে গেলাম, দাও এবার একটু ভক্তির বিষাদ-মেঘ, ভালোবাসার অশ্রুবিন্দু। তোমার জন্যে শুধু সেজে-গুজে সুখ নেই, তোমার জন্যে কেঁদে আনন্দ। আমি তোমার রাজরাণী হতে চাই না, আমি তোমার কাঙালিনী হব।

রামকৃষ্ণ শশধরের বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন। তৃষ্ণা মিটল শশধরের। দীপ্ত চোখ অশ্রুতে ছলছল করে উঠল।

রামকৃষ্ণেরও পিপাসা পেল হঠাৎ। বললেন, জল খাব।

গৃহস্থ যদি নিজের থেকে কিছু না-ও দেয়, তবু সাধু-সন্ন্যেসী চেয়ে নিয়ে কিছু খেয়ে আসবে। আর কিছু না হোক, অন্তত এক গ্লাশ জল। নইলে অকল্যাণ হয় গৃহস্থের।

আর সকলের হোক বা না হোক, রামকৃষ্ণের ভুল হয় না।

তিলক-কণ্ঠীধারী এক ভক্ত শুদ্ধ ভাবে জল নিয়ে এল। কিন্তু মুখের কাছে গ্লাশ তুলে ধরতেই, এ কী হল হঠাৎ? রামকৃষ্ণ গ্লাশ নামিয়ে রাখলেন। তাঁর কণ্ঠনালী আড়ষ্ট, বিশুষ্ক হয়ে গিয়েছে। এক ফোঁটা জল গলবে না ভিতরে।

গ্লাশের জলে কুটোকাটা পড়েছে বোধ হয়। তাই বোধ হয় আপত্তি করলেন খেতে। গ্লাশের জল ফেলে দিল নরেন। আরেক গ্লাশ জল এনে দিল আরেক জন। এবার সে জল স্বচ্ছন্দে পান করলেন রামকৃষ্ণ। সন্দেহ নেই, আগের গ্লাশে ময়লা ছিল বলেই সেটা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

কিন্তু নরেনের মন মানতে চাইল না কিছুতেই। নিশ্চয়ই গভীর আর কোনো রহস্য আছে। ঠাকুরকে একাই পাঠিয়ে দিলে গাড়িতে করে। বললে, আমার বিশেষ কাজ আছে। পরে যাব।

বিশেষ কাজ নয় তো কি। সব দিক থেকে যাচিয়ে-বাজিয়ে নিতে হবে ঠাকুরকে। সব কিছুর জানতে হবে হাট-হদ্দ। কেন উনি ঐ ভক্তের হাতের জল খেলেন না?

তিলক-কণ্ঠীধারীকে প্রশ্ন করা যায় না সরাসরি। তার ছোট ভাইকে পাকড়াও করলে। ভাগ্যক্রমে তার সঙ্গে আগে থেকে আলাপ ছিল নরেনের। জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি হে তোমার দাদাটির? বলি, স্বভাবচরিত্র কেমন?

মাথা চুলকোলো ছোট ভাই। বললে, দাদার কথা কি করে বলি ছোট হয়ে?

নিমেষে বুঝে নিল নরেন। কিন্তু ঠাকুর বুঝলেন কি করে? তিনি কি অন্তর্যামী অন্তরজ্ঞ?

আবার গেরুয়া কেন? একটা কি পরলেই হল? রামকৃষ্ণ রসিকতা করলেন, 'একজন বলেছিল চণ্ডী ছেড়ে হলুম ঢাকী। আগে চণ্ডীর গান গাইতো, এখন ঢাক বাজায়।'

সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া পরেছে—সে বৈরাগ্য বেশি দিন টেঁকে না। হয়তো কাজ নেই, গেরুয়া পরে কাশী চলে গেল। তিন মাস পরে ঘরে চিঠি এল, আমার একটি কাজ হয়েছে, কিছু দিন পরেই বাড়ি ফিরব, ভেবো না আমার জন্যে। আবার সব আছে, কোনো অভাব নেই, কিন্তু কিছুই ভালো লাগে না। ভগবানের জন্যে একা-একা কাঁদে। সে বৈরাগ্যই আসল বৈরাগ্য।

মন যদি ভেকের মত না হয়, ক্রমে সর্বনাশ হয়। তার চেয়ে শাদা কাপড় ভালো। মনে আসক্তি, আর বাইরে গেরুয়া! কী ভয়ঙ্কর!

ভগবতী ঝি এসে দূর থেকে প্রণাম করল ঠাকুরকে।

অনেক দিনের ঝি। বাবুদের বাড়িতে কাজ করে। ঠাকুরের জানাশোনা।

প্রথম বয়সে স্বভাব ভালো ছিল না। কিন্তু তাই বলে ঠাকুর তাঁর করুণার সুগন্ধ বারির ধারাটি শুকিয়ে ফেলেন নি। দিচ্ছেন তাকে তাঁর অমিয় বচনের আশীর্বাদ।

বললেন, 'কি রে, এখন তো ঢের বয়েস হয়েছে। টাকা যা রোজগার করলি, সাধুবৈষ্ণবদের খাওয়াচ্ছিস তো?'

'তা আর কি করে বলব?' অল্প একটু হাসল ভগবতী।

'কাশী-বৃন্দাবন—এ সব হয়েছে?'

'তা আর কি করে বলব?' কুণ্ঠিত হবার ভান করল ভগবতী। 'একটা ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছি। তাতে পাথরে আমার নাম লেখা আছে।'

'বলিস কি রে?'

'হ্যাঁ, নাম লেখা আছে শ্রীমতী ভগবতী দাসী।'

আনন্দে হাসলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'বেশ, বেশ।'

কি মনে ভাবল ভগবতী, হঠাৎ ঠাকুরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে।

যেন একটা বিছে কামড়েছে, যন্ত্রণায় এমনি অস্থির হয়ে পড়লেন ঠাকুর। ছোট খাটটিতে বসে ছিলেন, ঝটকা মেরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মুখে শুধু 'গোবিন্দ', 'গোবিন্দ'। কী যেন একটা অঘটন ঘটে গেল মুহূর্তে। অসহন আর্তির দৃশ্য। শিশু-অঙ্গে কে যেন তপ্ত অঙ্গার ছুঁড়ে মেরেছে।

ঘরের যে কোণে গঙ্গাজলের জালা, সেদিকে হাঁপাতে-হাঁপাতে ছুটলেন ঠাকুর। পায়ের যেখানে ভগবতী ছুঁয়েছিল সেখানে ঢালতে লাগলেন গঙ্গাজল।

জীবন্মৃতার মত বসে আছে ভগবতী। সাড় নেই স্পন্দ নেই, দহনের পর দেহের ভস্মরেখা। জীবনে অনেক সে পাপ করেছে, কিন্তু এ পাপের বোধ হয় তুলনা নেই।

যত তোমার পাপ করবার ক্ষমতা, তার চেয়ে ভগবানের বেশি ক্ষমতা ক্ষমা করবার। পতিতপাবন করুণাসিন্ধু তাই আবার অমৃতবচন বিতরণ করলেন। বললেন, 'বেশ তো গোড়ায় দূর থেকে প্রণাম করেছিলি। কেন মিছিমিছি পা ছুঁতে যাস?'

যাক গে। তাই বলে মন-খারাপ করিস নে। গা-হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে এতক্ষণে। শোন. একটু গান শোন। গান শুনলে তুইও ঠাণ্ডা হবি।

ঠাকুর গান ধরলেন।

দুর্গাপূজার দিন মঠে বহু লোক সেবার প্রণাম করছে শ্রীমাকে। প্রণামের পর বারে-বারে গঙ্গাজলে পা ধুচ্ছেন শ্রীমা। যোগেন-মা বললেন, 'মা, ও কি হচ্ছে? সর্দি করে বসবে যে।'

'যোগেন, কি বলব! এক-একজন প্রণাম করে যেন গা জুড়োয়, আবার এক-একজন প্রণাম করে যেন গায়ে আগুন ঢেলে দেয়। গঙ্গাজলে না ধুলে বাঁচিনে।'

তোমার পা ছোঁবার সুযোগ দাওনি। তাই দূর থেকেই তোমাকে প্রণাম করছি। তাতেও যদি পাপস্পর্শের জ্বালা লাগে, গঙ্গাজল কোথায় পাব মা, অশ্রুজলে ধুয়ে নিয়ো পাদপদ্ম।

ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়ে ভাবাবস্থায় কথা বলছেন ঠাকুর, 'করছিস কি? এত লোকের ভিড় কি আনতে হয়? নাইবার-খাবার সময় নেই। গলা তো ভাঙা ঢাক। এত করে বাজালে কোন দিন ফুটো হয়ে যাবে যে। তখন কী করবি?'

তবু ভিড়ের কমতি নেই। ভক্তের দল যেমন আসছে তেমনি আসছে আবার ভণ্ডের দল।

'অমন সব আদাড়ে লোকদের এখানে আনিস কেন?' এক দিন সরাসরি জগদম্বার সঙ্গে ঝগড়া করছেন রামকৃষ্ণ। 'আমি অতশত পারব না। এক সের দুধে পাঁচ সের জল—জ্বাল ঠেলতে-ঠেলতে ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে গেল। তোর ইচ্ছে হয় তুই দিগে যা। আমি অত জ্বাল ঠেলতে পারব না। অমন সব লোকদের আর আনিসনি।'

সাধুর মধ্যেও ভণ্ডের ছড়াছড়ি।

'যে সাধু ওষুধ দেয়, ঝাড়ফুঁক করে, টাকা নেয়, বিভূতি-তিলকের আড়ম্বর করে, খড়ম পায়ে দিয়ে যেন সাইনবোর্ট মেরে নিজেকে জাহির করে বেড়ায়, তার থেকে কিছু নিবিনে।'

শুধু ভক্তি খুঁজে বেড়াবি। অহেতুক ভক্তি। নারদীয় ভক্তি। ভক্তির আমি-র অহঙ্কার নেই। এ আমি আমির মধ্যেই নয়। যেমন হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়। অন্য শাকে অসুখ করে, হিঞ্চে শাকে পিত্ত যায়। মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। অন্য মিষ্টিতে অপকার, মিছরি খেলে অম্বল নাশ হয়। ভক্তি অজ্ঞান করে না, বরং ঈশ্বর লাভ করিয়ে দেয়।

আমার শক্তি নেই, আসক্তিও নেই। শুধু ভক্তি নিয়ে বসে আছি এক কোণে।

মধুস্নিগ্ধ পদ্ম যদি ফোটে, শুনতে পাব সে ভৃঙ্গের গুঞ্জরণ।

[ক্রমশঃ।

আগামী সংখ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ

(স্মৃতিকথা)

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

বিনয় ঘোষ

ভূমিকা

"ইতিহাস" বলতে আমরা আজকাল যা বুঝি, একশ' বছর আগেও সেরকম ইতিহাস লেখা হ'ত না। ইতিহাসের লক্ষ্য কি, ইতিহাস রচনার পদ্ধতি কি, এসব সম্বন্ধে সেকালের পণ্ডিতদের কোন স্পষ্ট ধারণাও ছিল না। সেইজন্য "মধ্যযুগ" ও "প্রাচীনযুগের" কোন লিখিত ইতিহাস বিশেষ নেই, অন্তত: "ইতিহাস" বলতে আমরা যা বুঝি এখন, তার কোন নিদর্শন নেই। সেদিন পর্যন্ত ইতিহাস বলতে ঘটনাপঞ্জী, তারিখের ফিরিস্তি, বংশপরিচয়, রাজা-বাদ্‌শাহের রোমাঞ্চকর কাহিনী ইত্যাদি বোঝাত। ঘটনা ও তারিখ কোনটাই অবশ্য ঐতিহাসিকের কাছে উপেক্ষণীয় নয়। ঘটনার 'ক্রম'-ই ইতিহাস, এবং কালক্রম ও কালের পটভূমি ছাড়া ঘটনা অর্থহীন, সঙ্গতিহীন। সুতরাং ঘটনা ও তারিখ ঐতিহাসিকের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু তাহ'লেও ইতিহাস শুধু ঘটনাক্রম বা তারিখের ফিরিস্তি নয়—যুগের কথা, যুগের চলার গতি, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, বিধিব্যবস্থার কথা, যুগ থেকে যুগান্তরে যাত্রার উত্থান-পতনের কথা, এই হ'ল ইতিহাস। ইতিহাস সম্বন্ধে আগেকার দৃষ্টিভঙ্গী বদলাচ্ছে এবং এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাস-রচনা সবেমাত্র শুরু হয়েছে বলা চলে। দৃষ্টিকোণ ও রচনাপদ্ধতি নিয়ে ঐতিহাসিকের মধ্যে আজও মতভেদ থাকলেও, ইতিহাস যে শুধু ঘটনাক্রম, রাজাবাদ্‌শাহের বংশচরিত বা জীবনচরিত নয়, একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। দেশের কথা, দেশের লোকের কথা, সর্বশ্রেণীর ও সর্বস্তরের লোকের জীবনযাত্রা ও ধ্যানধারণার কথা নিয়েই ইতিহাস। কিন্তু এ হ'ল ইতিহাস-দর্শনের কথা, এখানে এ-বিষয় আলোচ্য নয়।

ইতিহাস-রচনার উপাদান কি এবং কোথায় তার সন্ধান পাওয়া যাবে? দেশের মধ্যে আজও যেসব "অসভ্য" আদিমজাতির বাস আছে, তাদের জীবনযাত্রা, সমাজব্যবস্থা, ধর্মকর্ম, ভাষা, ব্যবহার্য হাতিয়ার, জিনিসপত্র ইত্যাদি নিয়ে অনুসন্ধান ক'রে নৃতত্ত্ববিদরা (Anthropologists) আদিমযুগের ইতিহাস রচনা করেছেন। শিলালেখ, প্রাচীন মুদ্রা, আসবাবপত্র, শিল্পকলা স্থাপত্য ভাস্কর্য ইত্যাদি উপাদানের সাহায্যে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা (Archaeologists) প্রাচীনযুগের ইতিহাসের কাঠামো তৈরী করেছেন। প্রাচীন সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণকথা, লোককাহিনী ইত্যাদির সাহায্যে ঐতিহাসিকরা তার উপর চূণ বালি রঙের প্রলেপ দিয়েছেন। এই একই উপাদান নিয়ে মধ্যযুগের ইতিহাসও রচিত হয়েছে। এছাড়া মধ্যযুগের ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল "রাজবংশ পরিচয়", "জীবনচরিত" ও "স্মৃতিকথা"। পর্যটকদের "ভ্রমণকাহিনী" বোধ হয় তার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান। বর্তমান যুগে ইতিহাস রচনার পথও প্রশস্ত, উপাদানও পর্যাপ্ত। বর্তমান যুগ বলতে ছাপাখানার যুগকেই বোঝায়। ছাপাখানার দৌলতে যাবতীয় বিষয় ও ঘটনার বিবরণ মুদ্রিত থাকে—নানাবিধ রিপোর্টে, গ্রন্থ ও পত্রিকাদিতে। সুতরাং ঐতিহাসিক মালমশলার কোন অভাব নেই, এবং সেই সব মালমশলা সংগ্রহ করারও কোন অসুবিধা নেই। ছাপাখানার আগের যুগে তা ছিল না, অর্থাৎ আমাদের দেশে দুশ' বছর আগে, ইওরোপে পাঁচশ' বছর আগে। ইতিহাসের উপাদান তখন নানাজায়গা থেকে সংগ্রহ করতে হ'ত, তার মধ্যে পর্যটকদের "ভ্রমণকাহিনী" অন্যতম। মনে রাখতে হবে, তিন চারশ' বছর আগেও সেই সব "ভ্রমণকাহিনী" ছাপা সম্ভব ছিল না, "পাণ্ডুলিপির" আকারেই থাকত, এমন কি ইওরোপেও। যেমন বার্নিয়েরের কথাই বলি। ১৬৫৮ সাল থেকে ১৬৬৭ সাল পর্যন্ত বার্নিয়ের ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন। ফ্রান্সে, অর্থাৎ স্বদেশে ফিরে গিয়ে ১৬৭০ সালে তিনি ফরাসী সম্রাট ত্রয়োদশ লুইর কাছ থেকে তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ছেপে প্রকাশ করার অনুমতিপত্র পান।

ভারতীয় ইতিহাসে বিদেশী পর্যটকদের দান

ভারতীয় ইতিহাসে বিদেশী পর্যটকদের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন দেশে এত পর্যটকও আসেননি, এবং দেশ দেখে মুগ্ধ হয়ে এত ভ্রমণ-বৃত্তান্তও লিপিবদ্ধ ক'রে যাননি। ভারতের রাজা-বাদ্‌শাহ, ভারতের বৌদ্ধধর্ম, ভারতের ঐশ্বর্য, ভারতের শিল্পকলা, ভারতের শাস্ত্রচর্চা, ভারতের অফুরন্ত প্রাকৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পদ, যুগে যুগে বিদেশীদের আকর্ষণ ক'রে টেনে এনেছে—রাজসিংহাসনের লোভে, অর্থের লোভে, জ্ঞানবিদ্যার লোভে। তাঁদের মধ্যে পর্যটকও এসেছেন অনেকে, পূব থেকে, পশ্চিম থেকে। গ্রীক, চীনা, মুসলিম, ইওরোপীয়—সকল জাতের, সকল দেশের পর্যটক এসেছেন ভারতবর্ষে। কেউ মনে করেছেন এ-দেশকে জ্ঞানবিদ্যা ও ধর্মসাধনার মহাতীর্থ, কেউ বা মনে করেছেন ধনরত্নসম্ভার লুণ্ঠনের স্বর্গরাজ্য। প্রাচীনযুগে চীনা পর্যটকরা এসেছিলেন প্রধানত: ভারতের মহান ধর্ম ও সংস্কৃতির মহিমায় মুগ্ধ হয়ে, কিন্তু মধ্যযুগে ইওরোপীয় পর্যটকরা এসেছিলেন ধনরত্নের লোভে। তার আগে গ্রীক ও রোমান পর্যটকরা এসেছিলেন ধর্ম ও অর্থ, সংস্কৃতি ও সম্পদ, দুয়েরই লোভে নাবিকের বেশে, বণিকের বেশে, রাজদরবারে দূতের বেশে। তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে। সকলেই জানেন, গ্রীকদূত মেগাস্থিনীসের (Megasthenes) ভারত-বিবরণ না থাকলে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনা করা কত কঠিন হ'ত।

তাও তো মেগাস্থিনীসের আসল পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গিয়েছিল, পরবর্তী লেখকদের বিস্তৃত উদ্ধৃতি থেকেই তার পরিচয় পেয়েছি আমরা। বিশেষ ক'রে রোমান ভৌগোলিক ষ্ট্রাবোর (Strabo) কাছে এর জন্ত আমরা ঋণী। মেগাস্থিনীসের আগে আলেকজাণ্ডারের নৌ-সেনাপতি নিয়ার্কাসও (Nearchus) ভারতের কথা কিছু কিছু লিপিবদ্ধ ক'রে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাও আমরা উদ্ধৃতি-আকারে পেয়েছি। এখন J. W. McCrindle-এর "Ancient India as described by Megasthenes and Arrian" (১৮৭৭ খৃঃ অঃ) গ্রন্থ থেকে মেগাস্থিনীসের ভারত-বিবরণ পরিষ্কার জানতে পারা যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জনৈক আলেকজাণ্ড্রিয়ান নাবিক (হিপ্পলাস) ভারতীয় উপকূল ঘুরে (উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল) "Periplus Maris Erythrœi" নামে যে guide-book লিখে গেছেন, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান হিসেবে তারও মূল্য অনেক। এ বিষয়ে Schoff-এর "The Periplus of the Erythrean Sea" পঠিতব্য। এই সব গ্রীক ও রোমান নাবিক, দূত, সেনাপতি ও পর্যটকদের পর চীনা পরিব্রাজকদের ভারতবৃত্তান্তের কথা উল্লেখ করতে হয়। খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী থেকে প্রায় নবম শতাব্দী পর্যন্ত একাধিক চীনা পরিব্রাজক ভারতে এসেছেন—

ফা হিয়েন (Fa Hian) : ৩৯৯ খৃঃ—৪১৪ খৃঃ অঃ
ইউয়ান চোয়াং (Yuan Chawang) : ৬২৯ খৃঃ—৬৪৫ খৃঃ অঃ
আই সিং (I-tsing) : ৬৭৩ খৃঃ অঃ
সুঙ উন্ (Sung-Yun),
হুয়ি সেঙ (Hwi Seng),
ও কুঙ (O Kung) প্রভৃতি } : ৬০০ খৃঃ—৮০০ খৃঃ অঃ

এই চীনা পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অপরিহার্য উপাদান। বিশেষ ক'রে ফা হিয়েন ও ইউয়ান চোয়াঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত না থাকলে সেযুগের ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস উদ্ধার করা যে কত কষ্টসাধ্য হ'ত তা কল্পনা করা যায় না। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত যাঁরা বিস্তৃতভাবে জানতে চান তাঁরা ফা হিয়েনের "Travels" ও Watter এর "Yuan Chwang" গ্রন্থ পাঠ করতে পারেন। ভারতীয় ইতিহাসের এই মৌলিক উপাদানগ্রন্থের অনুবাদ কোন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে কি না আমি জানি না, তবে বাংলায় ইউয়ান চোয়াঙের যে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয় বলে আমার মনে হয়। একাজ যদি কেউ ধৈর্য ধ'রে করেন তাহলে বাংলা সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ হ'তে পারে। এদিক দিয়ে আমাদের বাংলা সাহিত্যের দারিদ্র্য অনেকটা কলঙ্কের মতন হয়ে রয়েছে।

প্রাচীন হিন্দুযুগ পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসে বিদেশী পর্যটকদের অবদান সম্বন্ধে মোটামুটি এই হ'ল সংক্ষিপ্ত পরিচয়। মুসলমানযুগে ইওরোপীয় ও মুস্লিম পর্যটক অনেকে আসেন ভারতবর্ষে। মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ইবন বতুতা (Ibn Batuta)—"the traveller of Islam." ইবন বতুতা (১৩৪২—১৩৪৭ খৃঃ অঃ) ভারতে আসেন মহম্মদ বিন্ তুঘলকের রাজত্বকালে। তুঘলক-যুগের ভারত সম্বন্ধে বতুতার বিবরণের মধ্যে অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায়। বাংলাদেশ সম্বন্ধেও অনেক কথা বতুতা লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। পরলোকগত পণ্ডিত হরিনাথ দে মূলগ্রন্থ থেকে তা ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন (Description of Bengal: Ibn Batuta: Translated by Harinath De)। ইওরোপীয় পর্যটকদের মধ্যে মার্কো পোলোর (Marco Polo) কথা সকলেই জানেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে (১২৯৩ খৃঃ অঃ) মার্কো পোলো চীন থেকে ফেরার পথে দক্ষিণ ভারতের করোম্যাণ্ডেল ও মালাবার উপকূল ঘুরে গিয়েছিলেন। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ইওরোপে বাণিজ্যযুগের সূচনা হয় বলা চলে। বণিকসুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে ধনরত্নের লোভে সেই সময় থেকে এসিয়ায় যেসব ইওরোপীয় বণিক দুঃসাহসিক অভিযান করেন, তাঁদের মধ্যে ইতালীয় মার্কো পোলো অন্যতম। এসিয়া সম্বন্ধে ইওরোপীয় বণিকদের এই ধারণা ও মনোবৃত্তি, মার্কো পোলোকে কেন্দ্র ক'রে, বিখ্যাত মার্কিণ নাট্যকার Eugene O'Neill তাঁর "Marco Millions" নাটকে চমৎকার-ভাবে ব্যক্ত করেছেন। কৌতূহলী পাঠকদের নাটকখানি পড়তে অনুরোধ করছি। মার্কো পোলো ও ইবন বতুতার পর রুশ পর্যটক নিকিটিনের (Athanasius Nikitin) নাম করতে হয়। বহমনী সুলতান তৃতীয় মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৪৬৩—১৪৮২ খৃঃ) নিকিটিন দক্ষিণাপথে আসেন (১৪৭০ থেকে ১৪৭৪ খৃঃ মধ্যে)। নিকিটিনের ভ্রমণবৃত্তান্ত, "India in the Fifteenth Century" গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে (H. R. Major সম্পাদিত, Hakluyt Society থেকে ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত)। ষোড়শ শতাব্দীর ভারতের ইতিহাসের জন্য, আবুল ফজলের বিখ্যাত "আকবরনামা" থাকতে কোন বিদেশীর ভ্রমণকাহিনীর শরণাপন্ন হবার প্রয়োজন হয় না। সপ্তদশ শতাব্দীতে জাহাঙ্গীর থেকে আওরঙ্গজীবের রাজত্বকালের মধ্যে একাধিক ইওরোপীয় পর্যটক ও দূত ভারতবর্ষে আসেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন :

উইলিয়াম হকিন্স (William Hawkins) : ১৬০৯—১৬১২ খৃঃ
টমাস রো (Sir Thomas Roe) : ১৬১৫—১৬১৯ খৃঃ
ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ের (Francois Bernier) : ১৬৫৯—১৬৬৬ খৃঃ
তাভার্নিয়ের (Tavernier) : ১৬৪০—১৬৬৭ খৃঃ
ডাঃ ফ্রায়ার (Dr. Fryer) : ১৬৭২—১৬৮১ খৃঃ
ওভিঙটন্ (Ovington) : ১৬৮৯—১৬৯২ খৃঃ
জেমেল্লি ক্যারেরী (Gamelli Careri) : ১৬৯৫ খৃঃ
নিক্কোলাও মনুচ্চি (Niccolao Manucci) : ১৭০৪ খৃঃ

ইংরেজ ক্যাপটেন উইলিয়াম হকিন্স নূতন "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর" প্রতিনিধিরূপে আগ্রায় জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন ১৬০৯ সালে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সুরাটে ইংরেজদের একটি বাণিজ্য-কুঠি প্রতিষ্ঠার অনুমতি নেওয়া। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি জাহাঙ্গীরের অন্তরঙ্গ দোস্ত হয়ে ওঠেন এবং বাদশাহের সঙ্গে একত্রে মগুপানাদিও করতে থাকেন। জাহাঙ্গীরের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে হকিন্স যে চিত্র এঁকে গেছেন তা এইজন্যই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মতন অত্যন্ত জীবন্ত হয়েছে। তাঁর এই বিবরণ ফষ্টারের (W. Foster) "Early Travellers in India" গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যাবে। হকিন্সের প্রতি জাহাঙ্গীর ক্রমে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং ১৬১২ সালে স্বদেশে ফিরবার পথে হকিন্সের মৃত্যু হয়।

১৬১৫ সালে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স জাহাঙ্গীরের দরবারে স্যার টমাস রোকে রাষ্ট্রদূতরূপে পাঠান। রো সাহেব তাঁর দৌত্যজীবনের যে দিনপঞ্জী লিপিবদ্ধ করে গেছেন, ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে তা অমূল্য সম্পদ বলা চলে। তাঁর চ্যাপলিন এডওয়ার্ড টেরীও (Edward Terry) যেসব মজার কাহিনী লিখে গেছেন তার তুলনা হয় না। টেরীর কাহিনী ফষ্টারের পূর্বোক্ত গ্রন্থে পাওয়া যাবে এবং রো সাহেবের দিনপঞ্জীও ফষ্টারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে (Roe's "Embassy" : Edited by Sir W. Foster, Hakluyt Society, 1899)।

ফরাসী চিকিৎসক ও পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের ভারতীয় ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে ভারতভ্রমণে আসেন। ১৬৫৮ সালের শেষে তিনি সুরাটে পৌঁছান এবং কিছুদিন দারা শিকোর সঙ্গীরূপে কাটান। সম্রাট শাহজাহান তখন মারাত্মক পীড়ায় আক্রান্ত এবং সেই সুযোগে তাঁর পুত্র সুজা, ঔরঙ্গজীব ও মুরাদ সিংহাসনলোভে বিদ্রোহী। জ্যেষ্ঠ দারা শিকোর বিরুদ্ধে তাঁদের চক্রান্ত। গৃহযুদ্ধের আগুনে মোগল সাম্রাজ্য ভস্মস্তূপে পরিণত হবার সম্ভাবনা। এই সময় বার্নিয়ের ভারতবর্ষে আসেন, এবং প্রথমে দারা শিকো ও পরে ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে দিল্লী, লাহোর ও কাশ্মীরে থাকেন। এই সময় আরও একজন ফরাসী পর্যটকের সঙ্গে বার্নিয়েরের দেখা হয়, তাঁর নাম তাভার্নিয়ের। বার্নিয়ের ও তাভার্নিয়ের একসঙ্গে বাংলাদেশে আসেন এবং রাজমহল থেকে তাঁরা দুজন দুদিকে চ'লে যান। বার্নিয়ের যান কাশিমবাজারের পথে এবং পরে বাংলাদেশ ঘুরে মসলিপত্তম ও গোলকুণ্ডায় উপস্থিত হন। গোলকুণ্ডায় থাকার সময়, ১৬৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে, তিনি সম্রাট শাহজাহানের মৃত্যুসংবাদ পান। ১৬৬৭ সালে তিনি সুরাট থেকে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময় সম্ভবত সুরাটেই তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক মঁশিয়ে শার্দাঁর (M. Chardin) সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাভার্নিয়ের ও শার্দাঁ দুজনেই জহুরী (Jeweller) ছিলেন, বার্নিয়ের ছিলেন সুশিক্ষিত চিকিৎসক ও দার্শনিক।

বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্তের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে যেসব বিদেশী পর্যটক ভারতবর্ষে আসেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ডা: ফ্রায়ার, ওভিংটন, ইতালীয় জেমেল্লি ক্যারেরী এবং বিখ্যাত ভেনিসীয় পর্যটক নিক্কোলাও মনুচ্চি। ডা: ফ্রায়ারের "New Account of India" গ্রন্থের মধ্যে শিবাজীর সময় মারাঠা জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়, সাধারণভাবে ভারতের কথা কিছু জানা যায় না বিশেষ। তার কারণ ফ্রায়ার সুরাট ছাড়িয়ে বেশীদূর অগ্রসর হননি। ফ্রায়ারের মতন ওভিংটনও (১৬৮৯-১৬৯২) মোগল দরবারের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেননি এবং বোম্বাই ও সুরাটের ইংরেজ বণিকদের মুখে তিনি যা শুনেছেন তাই লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন তাঁর "Voyage to Suratt" গ্রন্থের মধ্যে। জেমেল্লি ক্যারেরী ১৬৯৫ সালে সম্রাট ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পান এবং এই সময় এই সুযোগ পাওয়ার ফলে তাঁর প্রত্যক্ষ বিবরণও অনেকদিক থেকে মূল্যবান হয়েছে। মানুচ্চিও দারা শিকোর অধীনে কিছুদিন গোলন্দাজের কাজ করেন, তারপর রাজা জয়সিংহের অধীনে কাজে বহাল হন। বোম্বাই ও গোয়ার কাছে কিছুদিন থেকে তিনি শেষে মাদ্রাজ গিয়ে বসবাস করেন এবং ১৭১৭ সালে মাদ্রাজেই মারা যান। তাঁর বিখ্যাত "Storia do Mogar" আর্ভিন সাহেব (W. Irvine) ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। অনূদিত গ্রন্থ "A Pepys of Mogul India" (London, 1908) নামে প্রকাশিত হয়েছে।

এই সব প্রত্যক্ষ ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে মানুচ্চির ছাড়া বার্নিয়ের ও ও তাভার্নিয়েরের কাহিনীর মূল্যই সবচেয়ে বেশী। প্রথমতঃ সময়ের মূল্য, দ্বিতীয়তঃ অভিজ্ঞতার মূল্য। বার্নিয়ের ও তাভার্নিয়ের যে সময় এসেছিলেন, সেটা ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্কটকাল বলা চলে। মোগল সাম্রাজ্যের সূর্য তখন নিশ্চিত অস্তাচলের পথে। মোগলযুগের সমাজ ও সংস্কৃতির যা চূড়ান্ত বিকাশ হবার তা হয়ে গেছে এবং অবনতির সূচনা হয়েছে। এই সময় বার্নিয়ের ও তাভার্নিয়েরের আগমন। তার মধ্যে ব্যক্তি হিসেবে বার্নিয়ের ও তাভার্নিয়েরের মধ্যে পার্থক্য আছে এবং এই পার্থক্যের জন্য তাঁদের পর্যবেক্ষণের মধ্যেও পার্থক্য থাকতে বাধ্য। আছেও তাই। "মধ্যযুগের ভারত" সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ষ্ট্যান্‌লে লেন্‌-পুল তাঁর "ঔরঙ্গজীব" গ্রন্থে ভূমিকায় এ-সম্বন্ধে চমৎকার কথা বলেছেন :

"Bernier writes as a philosopher and man of the world: his contemporary Tavernier (1640-1667) views India with the professional eye of a jeweller; nevertheless his Travels... contain many valuable pictures of Mughal life and Character." (Aurangzib : S. Lane-Poole : Rulers of India Series, 1893—Note on Authorities).

বার্নিয়ের তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখেছেন দার্শনিকের মতন, সত্যদ্রষ্টার মতন। কিন্তু তাঁর সমকালীন তাভার্নিয়ের ভারতবর্ষকে দেখেছেন জহুরী ব্যবসায়ী দৃষ্টি দিয়ে। তাহ'লেও তাভার্নিয়েরের ভ্রমণ-কাহিনী মূল্যবান, কারণ মোগলযুগের জীবনযাত্রার ছবি তিনি কয়েকদিক দিয়ে ভালই এঁকেছেন। বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের এদিক দিয়ে তুলনা হয় না। যেমন তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তি, তেমনি তাঁর যথাযথ বর্ণনার ক্ষমতা। কোন সংস্কার বা স্বার্থের দিক থেকে তিনি কোন ঘটনার, কোন বিষয়ের বিচার করেননি। যা দেখেছেন, উত্তরভারত থেকে দক্ষিণভারত, দক্ষিণভারত থেকে পূর্বভারত পর্যন্ত, তা নিরপেক্ষ ভাবে বুঝবার চেষ্টা করেছেন, বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে। কেবল জহরত বা মণিমাণিক্যের সন্ধানে তিনি আসেননি। মোগল দরবারের ঐশ্বর্য ও সম্পদ দেখে তিনি মোহমুগ্ধ হননি। তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি রাজদরবার থেকে বাইরের বাজারঘাট পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। সম্রাট, আমীর-ওম্‌রাহ থেকে ভারতের সকল শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রা তিনি লক্ষ্য করেছেন এবং তাদের কথা সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের মতন বর্ণনা ক'রে গেছেন। হীরা জহরত, মণিমুক্তা ছাড়াও তাই তাঁর দৃষ্টি ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হয়েছে। এমন কি "সতীদাহ" পর্যন্ত তিনি লক্ষ্য ক'রে বর্ণনা ক'রে গেছেন। মোগলদের রাজস্ব-ব্যবস্থা, দেশের সাধারণ আর্থনীতিক অবস্থা, জনসাধারণের অবস্থা, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর

লোক ও তাদের জীবনযাত্রা, ক্রীড়াকৌতুক, বিলাসব্যসন, আমোদ-প্রমোদ, ধ্যানধারণা, ধর্মকর্ম, চিত্রকর ও শিল্পকলার অবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। কোনটাই তাঁর পরের মুখে শোনা কথা নয়, নিজের চোখে দেখা, নিজের বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে বোঝা।

এই জন্যই বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্তকে মোগলযুগের, বিশেষ ক'রে সপ্তদশ শতাব্দীর অর্থাৎ ঠিক বৃটিশপূর্ব যুগের, ভারতের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিশেষ মূল্যবান মৌলিক উপাদানগ্রন্থ বলা যায়।

বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বাংলায় অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তাও এইজন্য অস্বীকার করা যায় না।

বাংলা অনুবাদ সম্বন্ধে দু'চার কথা

বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত কনষ্টেবলের (Archibald Constable) সংস্করণ অনুসরণ ক'রে করা হবে। আর্ভিং ব্লকের (Irving Block) ইংরেজী অনুবাদের যে সংশোধিত সংস্করণ কনষ্টেবল প্রকাশ করেছিলেন (১৮৯১ সালে মুদ্রিত), আমার মনে হয় অন্যান্য সংস্করণের তুলনায় সেটি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসের দিক থেকে মূল্যবান বা জ্ঞাতব্য কোন তথ্য বাদ দেওয়া বা অকারণে সংক্ষেপ করা হবে না অনুবাদের মধ্যে। মূল গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে যতদূর সম্ভব যথাযথ অনুবাদ করাই হবে আমার লক্ষ্য, অবশ্য বাংলা-ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির নিজস্ব স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা বজায় রেখে! মূল গ্রন্থে স্থান, ব্যক্তি বা দ্রব্যাদির নাম যেমন আছে সেটি বাংলা কথার পাশে বন্ধনীর মধ্যে ঠিক তেমনি ভাবেই দিয়ে দেব ঠিক করেছি। তাতে সুবিধা হবে এই যে যদি কেউ কোনদিন মূল গ্রন্থ (ইংরেজী অনুবাদ অবশ্য—পুরাতন ও সঠিক পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী অনুবাদ) পড়তে চান তাহ'লে কোন অসুবিধা হবে না। নমুনা হিসেবে কিছুটা উল্লেখ করছি এখানে :

(Aguacy-die)	:	অর্থাৎ আকাশ-দিয়া বা আকাশপ্রদীপ
(Bechen)	:	বা বিষ্ণু
(Beths)	:	বা Vedas, বেদ
(Delale)	:	বা Dalal, দালাল বাবু
(Gavani)	:	Bavani, বা ভবানী-দেবী
(Genich)	:	Ganesh বা গণেশ
(Gosel-Kane)	:	গোসলখানা
(Franguistan)	:	ফিরিঙ্গিস্থান বা ইওরোপ
(Gusarate)	:	গুজরাট
(Hasmer)	:	Ajmere, আজমীর
(Jessomseingue)	:	যশোবন্ত সিং
(Kane-saman)	:	Khansaman, খানসামা
(Kar-kanays)	:	Karkhana, কারখানা
(Kichery)	:	খিচুড়ী
(Mangues)	:	Mangoes, আম
(Maperle)	:	Mahapralay, মহাপ্রলয়
(Mehadeu)	:	Mahadeo, মহাদেব
(Ogouli)	:	Hoogly, হুগলী—ইত্যাদি।

প্রথমে বাংলা নাম, পরে ইংরেজী নামগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হবে। কোন বিবরণ (নেহাৎ অপ্রয়োজনীয় হ'লে) কোন স্থানে যদি সংক্ষেপ করতে হয় বা বাদ দিতে হয়, পাদটীকায় তার কারণ উল্লেখ করা হবে। ঠিক করেছি, মধ্যে মধ্যে একই বিষয়ে সমসাময়িক অন্যান্য পর্যটকদের বিবরণও উল্লেখ ক'রে দেব, অবশ্য পাদটীকায়, কারণ তাতে বিষয়বস্তু আরও উপভোগ্য হবে।

এই হ'ল মোটামুটি আমার অনুবাদের পরিকল্পনা ও পদ্ধতি।

[ক্রমশঃ।

বর্গী কর্তৃক বর্দ্ধমান লুঠ

"আপনারা বর্দ্ধমানের দুরবস্থার কথা অবিদিত নহেন। তাহা হইলেও, আমি প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে আপনাদের টাকা শোধ করিতে পারিব, এইরূপ আশা করি। আমার বড়ই দুর্ভাগ্য যে, দুর্দ্দান্ত বর্গীগণ আমার দেশ জ্বালাইয়া ছারখার করিয়াছে। প্রজাদের যাহা কিছু ছিল সকলই তাহারা লুঠ করিয়াছে। এই সমস্ত কারণেই কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা বাকী পড়িয়াছে। আমার রাজ্যে পুনরায় সুখসৌভাগ্যময় অবস্থা ফিরাইতে আমাকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইবে। দেশের দুরবস্থাই এখন আমার বিশেষ চিন্তার কারণ।"

—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতি বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তিলকচাঁদের পত্রাংশ।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

দশম তরঙ্গ

দুই নৌকা

দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য বলিতে পারি না, জীবনে আমাকে প্রায় বরাবরই দুই নৌকায় পা দিয়া চলিতে হইয়াছে। বিজ্ঞানের ছাত্র হইয়া আর্টের অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথে চিত্তসমর্পণ করিয়া শিক্ষাজীবনে যে মানসিক দ্বন্দ্বের কবলে পড়িয়াছিলাম তাহার জের সম্পূর্ণ মিটিতে আরও পূরা তিন বৎসর সময় লাগিয়াছিল। সে কথা যথাসময়ে বলিতেছি। কিন্তু ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়া হইতে ধীরে ধীরে আরও যে একটি আকর্ষণের কবলায়িত হইতেছিলাম তাহাও আমাকে কম দোটানায় ফেলে নাই। তাহা ঠিক পলিটিক্স নয়। কৈশোরে দিনাজপুরে থাকিতে মনেপ্রাণে বিপ্লববাদী ছিলাম, মার-কাট ছাড়া যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারে না সেই বিশ্বাসই মনে মনে পোষণ করিতাম। হঠাৎ ১৯২০ সালের শেষে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আদর্শ আমার বিশ্বাসকে টলাইয়া দিল। মহাত্মা গান্ধীকে লইয়া সেই ১৯২০ সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৮ ৩০ জানুয়ারি তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত পলিটিক্স অনেক হইয়াছে, আমি তাহার কোনটিই কখনও অবলম্বন করিতে পারি নাই। তাঁহাতে ভারতীয় ঋষিদের সর্বশেষ আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া আমি তখন হইতেই তাঁহার প্রতি এক নৈতিক ও আত্মিক আকর্ষণ অনুভব করিতাম। বহুকাল পরে 'শনিবারের চিঠি'র গান্ধীভক্তি দেখিয়া বহু সাহিত্যিক বন্ধু আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন এবং অনেকের ধারণা গান্ধীজীর নোয়াখালি-সচিব অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর প্রভাবই ইহার কারণ। কিন্তু আসলে এই ভক্তি যে সুদীর্ঘ বত্রিশ বৎসরের পুরাতন তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সেই সময়ে রচিত আমার সর্বপ্রথম গান্ধীবন্দনাটি নিম্নে মুদ্রিত করিতেছি, ইহার রচনাকাল ১৯২০ সেপ্টেম্বর ; ১৯২১ সেপ্টেম্বরে 'অগিলভি হস্টেল ম্যাগাজিনে' আমার স্বহস্তাক্ষরে ইহা বিবৃত হইয়াছিল :

মহাত্মা গান্ধী

ঘুচালে অন্ধকার।
ধন্য তুমি হে মহাত্মা, ধন্য শেষ ঋষি
তোমায় নমস্কার।
তব সুকঠিন অহিংসা-ব্রতে
দিতেছ চেতনা তন্দ্রা-আহতে

নিত্য স্বাধীন শাশ্বত যাহা
মানুষের অধিকার—
তাহারি লাগিয়া জাগালে ভারতে,
তোমায় নমস্কার।

তোমার সত্য-আগ্রহ-বেগে
মহাস্পন্দন উঠিয়াছে জেগে ;
"মিথ্যার সাথে ছাড় সহযোগ"
তীক্ষ্ণ বাণী তোমার
মোহ করে দূর মুগ্ধ মনের,
তোমায় নমস্কার।

স্বদেশের লাগি ভিক্ষার ঝুলি
নিজের স্কন্ধে নিলে তুমি তুলি,
ধূলির মাঝারে হইতেছ ধূলি
প্রতিদিন শতবার,
সেই ধূলিমাঝে পেতেছ দীপ্তি—
তোমায় নমস্কার।

খৃষ্টের সম মানুষের লাগি
হে দধীচি, তুমি রহিয়াছ জাগি,
আপন বুকের রক্তে মানুষে
দেখাও মুক্তিদ্বার ;
সত্যে ও শুভে ঘটাও মিলন—
তোমায় নমস্কার।

[ঈষৎ পরিবর্তিত]

আমাদের কলেজজীবনে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতায় গান্ধীভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আমাদের হৃদয় হরণ করিয়াছিলেন ; হেদুয়ার দক্ষিণে তিনি নিবাত-নিষ্কম্প শিখার মত চোখে ঠুলি বাঁধিয়া বসিয়া থাকিতেন, আমি মাঝে মাঝে তাঁহার আশেপাশে ঘুরঘুর করিতাম। উত্তেজনার মুখে তাঁহার সমীপবর্তী হইয়া একদিন তাঁহাকেও উত্তেজিত করিয়াছিলাম, সে কথা বলিয়াছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা সভায় তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার আরও

ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভের বাসনা জাগিয়াছিল। কিন্তু তখন রবির প্রদীপ্ত তেজ আমার চোখ দুটিকে এমনই ধাঁধিয়া দিয়াছিল যে সামলাইয়া আশেপাশে সহজ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে খানিকটা সময় গেল। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিঠি পাওয়ার প্রায় দেড় মাস পূর্বে ১৩২৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের 'প্রবাসী'র "কষ্টিপাথর" বিভাগে ওই সালের কার্তিক মাসের 'মোস্‌লেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হাবিলদার কাজী নজরুল ইস্‌লামের "বিদ্রোহী" কবিতা পাঠে মনে ছন্দের দোলা ও ভাবের দ্বন্দ্ব জাগিয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথকে ছন্দের রাজা বলিয়া তখনই চিনিয়াছিলাম। গান্ধী-বন্দনা কবিতাটি পকেটে এবং নজরুলের "বিদ্রোহী" কবিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা মনে লইয়া একদিন বৈকালে মফঃস্বলীয় মূঢ়তাসহ সত্যেন্দ্রনাথের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। স্বল্পভাষী সত্যেন্দ্রনাথ রূঢ় দৃষ্টি (চক্ষুপীড়ায় অস্বচ্ছ) আমার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ভয়ে এবং সঙ্কোচে মরীয়া হইয়া শেষ পর্যন্ত "বিদ্রোহী" সম্বন্ধে আমার বিদ্রোহ ঘোষণা করিলাম। বলিলাম, ছন্দের দোলা মনকে নাড়া দেয় বটে কিন্তু "আমি"র এলোমেলো প্রশংসা-তালিকার মধ্যে ভাবের কোনও সামঞ্জস্য না পাইয়া মন পীড়িত হয়। এ বিষয়ে আপনার মত কি? প্রশ্ন শুনিয়া প্রথমটা বোধ হয় সত্যেন্দ্রনাথ একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন। পরে একটা মৃদু হাসি তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বুঝি বিজ্ঞানের ছাত্র? বলিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, বি. এস-সি. পরীক্ষা দিতেছি। বস্তুতঃ তখন পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে এবং প্র্যাক্‌টিকাল ফিজিক্স ও কেমিষ্ট্রি পরীক্ষা দেওয়াও হইয়া গিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ আমার প্রশ্নের জবাবে সেদিন মোদ্দা কথাটা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমি কোনদিনই ভুলিতে পারি নাই। তিনি বলিলেন, 'কবিতার ছন্দের দোলা যদি পাঠকের মনকে নাড়া দিয়া কোনও ভাবের একটা ইঙ্গিত দেয় তাহা হইলেই কবিতা সার্থক। "বিদ্রোহী" কবিতা কোনও ভাবের ইঙ্গিত দেয় কি না, তুমিই তাহা বলিতে পারিবে।' বৎসর দেড়েক পরে সেই কথাই বলিতে গিয়া আমার "কামস্কাট্‌কীয় ছন্দে"র অন্তর্ভুক্ত করিয়া "বিদ্রোহী"র একটা মারাত্মক প্যারডি লিখিয়াছিলাম যাহার আরম্ভটা ছিল এইরূপ:

"আমি ব্যাঙ,
লম্বা আমার ঠ্যাং
ভৈরব রভসে বরষা আসিলে ডাকি যে গ্যাঙোর গ্যাঙ।
আমি ব্যাং···
দুইটা মাত্র ঠ্যাং।···" ইত্যাদি।

এই কবিতাই সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র একাদশ বা পূজা-সংখ্যায় (১৯২৪, ৪ঠা অক্টোবর) প্রকাশিত হইয়া বিবিধ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। স্বয়ং নজরুল ইসলাম ইহা তাঁহার গুরুকল্প মোহিতলাল মজুমদারের রচনা অনুমান করিয়া পরবর্তী সংখ্যা 'কল্লোলে' তাঁহাকে একটি কবিতায় ভীষণ আক্রমণ করেন এবং 'শনিবারের চিঠি'র সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন মোহিতলাল 'চিঠি'র পরবর্তী সংখ্যায় (২৫ অক্টোবর, ১৯২৪) "দ্রোণ-গুরু" শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশ করিয়া 'শনিবারের চিঠি'র সহিত যুক্ত হইয়া পড়েন। আমি আরও কিছুকাল পরে বিচিত্র ছন্দে ভাবলেশহীন কয়েকটি কবিতা লিখিয়া ও 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথের কথার সমর্থন করি। আমার বিশ্বাস, পরীক্ষামূলক সেই সকল কবিতার দ্বারা আমার ধারণা আমি প্রমাণ করিতে পারিয়াছিলাম।

যাহা হউক, "বিদ্রোহী"-প্রসঙ্গশেষে পকেট হইতে আমার ব্যাঙের আধুলিটি অর্থাৎ গান্ধী-বন্দনা বাহির করিলাম। গান্ধীজীকে মাত্র পক্ষকাল পূর্বে (১০ই মার্চ) কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের চিত্ত বেদনাকাতর। পরিবেশও ছিল আমার সহায়। হেদুয়ায় গ্যাসের বাতি তখন জ্বলিয়াছে এবং মৃদুতরঙ্গায়িত সরোবরে তাহাদের প্রতিবিম্ব আন্দোলিত হইয়া জনবহুল কলিকাতার সন্ধ্যাকেও স্বপ্নময় করিয়া তুলিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ মন দিয়া শুনিয়া বলিলেন, "এ বিজ্ঞানও নয়, কবিতাও নয়, এ দেখছি তোমার তিন নম্বর নৌকো; এত সামলাতে পারবে কি?"

সত্যই সামলাইতে পারি নাই। আমার পলিটিক্সের নৌকা কোনও কালেই চলে নাই এবং মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে উপজীবিকার অবলম্বন বিজ্ঞানের নৌকাও বানচাল হইয়াছিল।

পরীক্ষা দিয়া দিনাজপুরে অবকাশ যাপনের জন্য আসিলাম। সেখানেও ধরপাকড় চলিতেছে। একরূপ নির্লিপ্ত অজ্ঞাতবাসে সেখানে থাকিতে থাকিতেই মে মাসের মাঝামাঝি সংবাদ পাইলাম, পাস

করিয়াছি। মেডিকাল কলেজে ভর্তি হইবার জন্য কলিকাতায় আসিলাম। প্রবেশাধিকার পাইয়াও মামাতো ভাইয়ের পক্ষে সে অধিকার ত্যাগ করিলাম। কি করিব, কোন্ পথে চলিব—ভাবিতে ভাবিতে কলিকাতার পথে নিঃসঙ্গ ভ্রমণ করিতেছি, সহসা ২৬শে জুনের (১৯২২) সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় মর্মঘাতী আঘাত পাইলাম, ১০ই আষাঢ় শনিবার রাত্রি আড়াইটায় (ইংরেজী মতে ১৫শে জুন প্রত্যূষ আড়াইটা) কবি সত্যেন্দ্রনাথ অকস্মাৎ মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে (জন্ম ১৮৮১, ১০ই ফেব্রুয়ারি) বঙ্গবাণীর মন্দিরে স্বীয় আসন শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ১৩২৯ শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সত্যেন্দ্র-পরিচয়ে" কবিতা বিষয়ে আমার সহিত সত্যেন্দ্রনাথের আলাপ বিষয়ে আরও স্পষ্টতর ইঙ্গিত পাইলাম। অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য, এলোমেলো, ছন্দোবদ্ধ কথাকে তিনি কবিতা বলিতেন না, বলিতেন, "হেঁয়ালি"। কবিতার ক্ষেত্র হইতে স্পষ্ট ও সত্য ভাষণ তাঁহার সঙ্গেই বিদায় গ্রহণ করিল। বঙ্গভারতীর মন্দির-প্রাঙ্গণে নাম-লেখানো ভক্তের দলের একজন না হইয়াও সত্যেন্দ্র-বিয়োগ-ব্যথায় মুহ্যমান হইলাম।

বিজ্ঞানের নৌকাই শেষ পর্যন্ত আমাকে জীবন-সমুদ্রে তরাইতে পারে কি না—সে বিষয়ে শেষ চেষ্টা করিবার জন্য কলিকাতা ছাড়িয়া কাশী যাত্রা করিলাম। সত্যেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু ছাড়াও হৃদয়-ঘটিত অন্য কারণ ছিল যাহা নিষিদ্ধ পর্যায়ভুক্ত। দাদা এবং রতন দুজনে আমাকে খু উৎসাহ দিয়া বিদায় দিল। কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য-স্থাপিত ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে তড়িৎ-ইঞ্জিনীয়ারিংএর ছাত্ররূপে পরদিন দর্শন দিলাম। মা সরস্বতীর সিংহাসন নিশ্চয়ই একবার টলিয়া উঠিল। কয়েকটি বিরহ-ব্যঞ্জক এবং যৌবন প্রবৃত্ত কবিতা রচনা ছাড়া কাশীর তিন মাস প্রবাস-বাসে আর যাহা করিয়া-ছিলাম তাহা মোটেই বিদ্যা-বিষয়ক নয়। সে পথে সহৃদয় অধ্যক্ষ কিং সাহেবের উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রবল থাকিলেও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরম কর্তৃপক্ষের বঙ্গবিরোধী খুঁটিনাটি বাধাই শেষ পর্যন্ত পর্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিল। সেই সকল বাধা অপসারণে দল বাঁধিতে ও ঘোঁট পাকাইতেই সময় গেল। মৎস্য-মাংস-ডিম্ব নিষেধক হুকুমগুলি কৌশলে অমান্য করিবার ফিকিরে সর্বদা ফিরিতে হইত বলিয়া হষ্টেলগুলির বাঙালী ছাত্রদের লেখাপড়া করিবার অবসর মিলিত না। তিন মাসে ছুতারমিস্ত্রীর কাজে হাত পাকাইয়া একটি চেয়ারের তিনখানি পায়া নিখুঁতভাবে নির্মাণ করিয়া একদিন সেগুলি ফেলিয়াই বি. এন. ডব্লু. আর. পথে দিনাজপুরে উপস্থিত হইলাম।

কাশীতে থাকিতে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম যাহার নাম দিয়াছিলাম "যৌবন"; নজরুল ইসলামের "বিদ্রোহী"র প্রভাব স্পষ্ট কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের নির্দেশ-মত নানা অসম্বদ্ধ উপমার মধ্যে একটা ভাবের ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা ইহাতে আছে। এই কবিতাটিই "বিদ্রোহী"র বিরুদ্ধে আমার প্রথম বিদ্রোহ হিসাবে শুধু নয়, আমার তখনকার উদ্দাম মনের পরিচয় হিসাবেও উদ্ধারের যোগ্য। কবিতাটি এই :

আমি আলেয়ার আলো
    আপন খেয়ালে চলি
ঝঞ্ঝা মানি না, মানি না বাত্যা ভয়,
আমি উল্কার মতো
    আপন বেগেতে জ্বলি ;
পথহারা, নাহি কারো সাথে পরিচয়।
আমি পর্বত হ'তে
    দুর্জয় বেগে নামি,
বাধাবন্ধন দুধারে ঠেলিয়া যাই,
কভু নহি কো কাতর
    হ'তেও নিম্নগামী
নিম্নে যদি বা সাগরের খোঁজ পাই।
আমি বৈশাখী ঝড়,
    বিপুল রুদ্র তেজে
আঁধারি জগৎ উড়াই ধূলার রাশি,
ঘন শ্রাবণের মেঘে—
    ভীষণ সাজেতে সেজে
ডুবাতে ধরণী বড় আমি ভালবাসি।
আমি বিদ্যুৎ-শিখা
    চঞ্চল তির্যক বেগে
অট্টহাস্তে আকাশের বুক চিরি।
আমি মহা মহামারী
    জনপদ মাঝে জেগে
মৃত্যুরে মোর সাথে সাথে লয়ে ফিরি।
আমি জ্যৈষ্ঠের রোদ
    আগুনের মত জ্বলি
পরশে আমার ওঠে মাটি ফেটে ফেটে—
আমি সমর ভীষণ
    মূর্খ মানবে ছলি,
রয়ে দলে দলে নিজেরে নিজেরা কেটে। ০ ০ ০

কিন্তু কবিতায় বন্দিত এই নিত্যজয় দুর্মদ যৌবন আমার কর্মহীন মনকে এতটুকু আশ্বাস দিতে পারে নাই। বুঝিতেছিলাম বিজ্ঞানলক্ষ্মী আমাকে দূরের ইঙ্গিত দিবেন না, নিরুদ্দেশ-যাত্রায় ডাকিবেন না। সাহিত্য-লক্ষ্মীও যে বিশেষ ভরসা দিতেছিলেন তাহাও নয়। তথাপি, সর্বাধ্যক্ষ মালবীয়জীর সঙ্গে একদিন বাসা বাঁধাইয়া বারাণসীধাম পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম। দিনাজপুর হইতেই দরখাস্ত করিয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটির সায়েন্স কলেজে ফিজিক্সের "হীট" বিভাগে ভর্তি হইলাম এবং পূজার ছুটি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া ক্লাসে যোগদান করিলাম। আশ্রয় লাভ করিলাম ৬ নং বাদুড়বাগান লেনে—সায়ান্স কলেজের মেসে।

যে দোটানার মধ্যে পড়িয়াছিলাম তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য এইটিই শেষ চেষ্টা। নিজের ভবিষ্যৎ যদিচ গণৎকার ছাড়া আর সকলের নিকটই অন্ধকারসমাচ্ছন্ন থাকে, তবু এই চেষ্টার মধ্যে কে যেন আমাকে কানে কানে বলিত—তোমার বিজ্ঞানের নৌকা বেশিদূর অগ্রসর হইবে না, নামিয়া পড়, নামিয়া পড়। মেসের সহপাঠী বন্ধুরা যখন নিষ্ঠার সহিত পাঠাভ্যাস করিতেন আমি তখন অশান্ত চিত্তে সে সময়ের ফ্যাশন কন্টিনেন্টাল সাহিত্য-সমুদ্রে পাড়ি দিতাম। বন্ধুবর অজিতনারায়ণ চৌধুরী (ফলিত রসায়নের ছাত্র) দাশরথি সান্যালের সুবিখ্যাত ব্যক্তিগত লাইব্রেরি হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিতেন। নরওয়েজিয়ান, স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান, আইসল্যাণ্ডিক, ডেনিশ, পোলিশ ভাষার বহু গল্প উপন্যাস তখন ইংরেজী অনুবাদে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, আমি একে একে সেগুলি গলাধঃকরণ করিয়া যাইতেছি। ইহার সঙ্গে ফ্রেঞ্চ, জার্মান ও রুশীয় ভাষার বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনা যে ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। আমার অবস্থা শিশুপাঠ্য বইয়ের সেই হতভাগ্য বালকটির মত হইল, যে বিদ্যালয় পলাইয়া পথে পথে পশু-পক্ষী-পতঙ্গের সহিত খেলা যাচিয়া বেড়াইত। কলের পুতুলের মত বই বগলে সি. ভি. রমন, মেঘনাদ সাহা, ডি. এম. বোস, সুশীল আচার্য, বিধুভূষণ রায় ও ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ক্লাস করিতাম, প্রেসিডেন্সী কলেজে গিয়া যে যে দিন প্রশান্ত মহলানবীশ ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকট যথাক্রমে রিলেটিভিটি ও রেডিও অ্যাক্টিভিটি পড়িতে যাইতাম সেদিন পথে একটু মুখবদলের নূতনত্ব থাকিত। প্র্যাকটিকাল ক্লাসে কি যে মাথামুণ্ড করিতাম—একটা এক্সপেরিমেন্টও যে শেষ করিতে পারিয়াছিলাম তাহা মনে হয় না। ক্লাসে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন শ্রীঅমূল্য সেন, তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতেই আমার সহপাঠী ছিলেন। তাঁহার কৃপায় নিঃসঙ্গ কলিকাতাতেও একটা মধুর সামাজিক জীবনের আস্বাদ পাইয়াছিলাম। যে হতাশা ও রুক্ষতা আমার মনকে ধীরে ধীরে অধিকার করিতেছিল, চমৎকার পারিবারিক পরিবেশে তাহা ধীরে ধীরে কাটিয়া গিয়া আশ্বাস ও স্নিগ্ধতায় চিত্ত ভরিয়া উঠিতেছিল।

আমাদের মেসের ঠিক উত্তরে বাদুড়বাগান লেন এবং তারও উত্তরে একটি চতুষ্কোণ পার্ক। এই বাড়িটিরই দক্ষিণ অর্ধাংশে থাকিতেন দেশকর্মী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। নিষিদ্ধ বাতায়নপথে এই প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নিরীক্ষণ করা আমার একটা ব্যসন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেখিতাম, সংসারে ইনি ঠিক বিগ্রহের মতই পূজিত ও সেবিত হইতেন; সভাসমিতি নিত্য লাগিয়াই থাকিত, ফুলের মালা আসিত, তোড়া আসিত—চক্রবর্তী-গৃহিণী সেগুলি ধবধবে বিছানার চারিপাশে পরিপাটি করিয়া সাজাইতেন। চক্রবর্তী মহাশয়ের পান হইতে চুণ খসিবার জো ছিল না। খসিলেই কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। দেখিয়া দেখিয়া মনে রাজনৈতিক নেতা হইবার লোভ জাগিত।

উত্তরে আমার ঘরের বাতায়নপথে প্রত্যহ সকাল বিকাল আর একটি মানুষকে দেখিতে পাইতাম, দেহ ঈষৎ স্থূল, কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু মনোরম মুখশ্রী। ছাতা হাতে বেলা দশটা নাগাদ সম্মুখের পথ দিয়া কোথায় যাইতেন আবার বৈকালে ফিরিতেন। কে একজন বলিয়া দিল, ইনিই কবি মোহিতলাল মজুমদার, কাছাকাছি কোনও মেসে থাকেন। 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ-কবিতার শেষে নামটি দেখিতাম বটে, কিন্তু তাঁহার কোনও লেখার সহিত পরিচিত ছিলাম না। প্রত্যহ দেখিতে দেখিতে এই বঙ্গকবির প্রতি মনে মনে স্বতঃই শ্রদ্ধাশীল হইতেছিলাম, তিনি আমাদেরই নিকট প্রতিবেশী জানিয়া মনে মনে গর্বও অনুভব করিতে লাগিলাম। পরিচিত হইবার খুবই বাসনা হইতেছিল, কিন্তু সুযোগ মিলিতেছিল না।

আর দেখিতাম শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে। রোজ এগারোটায় আমার ক্লাস। আহারান্তে পান চিবাইতে চিবাইতে (তখন পর্যন্ত সিগারেট স্পর্শ করি নাই) বইখাতা হাতে সঙ্কীর্ণ গলিপথ পার হইয়া যেমনই আপার সার্কুলার রোডের প্রশস্ত পরিসরে আসিয়া পা দিতাম, দেখিতে পাইতাম রিক্সারোহণে শ্বেতশ্মশ্রু প্রশস্তললাট রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী' আপিসে চলিয়াছেন, সায়ান্স কলেজেরই ঠিক দক্ষিণে ৯১ নং আপার সার্কুলার রোডে। তিনি তখন থাকিতেন ৮নং রামমোহন রায় রোডে। আমি জানিতাম তিনি আমার বড় ও মেজমামা নন্দলাল ও কানাইলাল দত্তের ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু। সেই পরিচয়ে আলাপ করিবার ইচ্ছা হইত কিন্তু সাহসে কুলাইত না। ঘড়ির কাঁটা মিলাইয়া লওয়া যায়—এমনই নিয়মিত তাঁহার গতায়াত ছিল।

এই যে সামান্য সামান্য ঘটনা, বিজ্ঞান পড়িতে পড়িতে সাহিত্যিক সন্দর্শন, এবং কাচপোকা-তেলাপোকার চিরন্তন কাহিনী অনুযায়ী ধীরে ধীরে তেলাপোকা-আমির মানসিক রূপান্তর গ্রহণ—আমার স্বভাবতপলাতক মনকে আরও দ্বিধাগ্রস্ত, আরও বৈরাগী করিয়া তুলিতেছিল। পাঠে সম্পূর্ণ অসহযোগ ও নিত্য হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যেও শান্তি পাইতেছিলাম না। ঠিক এই সঙ্কটকালে অপ্রত্যাশিত ভাবে এবং অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসিয়া আমাকে আরও বিচলিত করিয়া দিল। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়া হইয়া গিয়াছিল সুতরাং বিবাহিত জীবনের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে একটু বেশি অবহিত ছিলাম—পিতামাতার আশ্রয় সত্ত্বেও। বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আর পাঁচজনের মত উচ্চতম ডিগ্রি-লাভ ও চিরাচরিত প্রথায় সরকারী বেসরকারী ভাল-মন্দ-মাঝারি চাকুরিতে প্রবেশলাভ আমার ভাগ্যে নাই। দিনাজপুরের পার্টিশন ডেপুটি কলেক্টর পিতার বাসনা ছিল ডেপুটিগিরির আশ্রয়ে নিরাপদ জীবন-যাত্রায় আমাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন। আমার তাহা মনঃপূত হয় নাই, অমান্য করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইয়াছিলাম। ভাগ্যে যাহাই থাকুক, সাহিত্য-সাধনাকেই উপজীবিকা-স্বরূপ গ্রহণ করিবার বাসনা অবচেতন মনে তখন হইতেই ছিল। বিবাহ করিলে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইবে এবং মনের বাসনা ফলবতী হইবে না, ইহা জানিতাম। প্রথমেই প্রবল অসম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। কিন্তু অচিরকাল মধ্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং প্রায়-বালিকা আমার ভাবী পত্নীকে শ্যামবাজারের এক সঙ্কীর্ণ গলির শেষপ্রান্তে দূর হইতে একদিন প্রত্যক্ষ করিয়া এমন একটা অলৌকিক আবেশ আমার মনের মধ্যে সঞ্চারিত হইল, অত্যন্ত যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও যাহার প্রভাব এড়াইতে পারিলাম না। এই ঘটনার কথা আমার সেকালের বন্ধুরা সকলেই জানেন, তাই তাহার উল্লেখ করিতে সাহসী হইতেছি, সাধারণ পাঠকের নিকট আজগুবি ঠেকিবে বলিয়া তাহার বিস্তারে নিরস্ত হইলাম। যাহা হউক, আমি প্রত্যাদেশ-প্রাপ্ত ব্যক্তির মত বিবাহে রাজী হইলাম। মনের দ্বন্দ্ব তবু সম্পূর্ণ ঘুচিল না। ঠিক এই সময়ে লেখা "হতাশা" নামক কবিতায় তখনকার মনের ভাব কিছু প্রকাশ পাইয়াছে। বিবাহিত এবং অবিবাহিত জীবনের দ্বন্দ্বই শুধু নয়—বিজ্ঞান না সাহিত্য, সেই দ্বন্দ্বের আভাসও ইহাতে আছে। কবিতাটি অংশত এই :

"আমার মনের গভীর আঁধার মাঝে
উঁকি-ঝুঁকি কচিৎ আসে আলো,
আশার বাণী হঠাৎ কানে বাজে
ঘনায় যখন মনের আঁধার কালো।
চেয়ে চেয়ে দেখি সমুখ পানে
পথের আভাস কিছুই নাহি পাই,
তবু চলি কোন্ অজানার টানে,
ভয়ে ভয়ে পিছন পানে চাই।
ডুবেছে মন গভীর হতাশায়
বুঝতে নারি চলব যে কোন্ পথে,
বিজ্ঞানেতে বন্দী হয়ে হায়,
ভাবি—জীবন কাটাই কোনো মতে। * * *

আশা-হতাশার দোলায় আরও বাউণ্ডুলে হইয়া উঠিলাম; সঙ্কটত্রাণ বা অন্যান্য ব্যাপারে ভলান্টিয়ারি করিবার সুযোগ পাইলেই হইল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে কলেজে দুই বেলা দেখিতাম। তিনিই হইলেন আদর্শ। তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার স্নেহভাজন হইয়া উঠিতেও বিলম্ব হইল না। সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমায় (১৩২৯) পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ, সন্ধ্যার দিকেই গ্রাস আরম্ভ। চন্দ্রগ্রহণের সময় শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন। সায়ান্স কলেজের একটা দল এই কাজে আহিরীটোলা ঘাটের ভার পাইল। মেসের বন্ধুরা প্রায় সকলেই ছিলাম। দল বাঁধিয়া

সন্ধ্যার একটু আগেই আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ধরিয়া ঘাটের দিকে যাইতেছি; সুকিয়া ষ্ট্রীট জংশন পার হইয়াই ডান দিকের একটা বাড়ির ফুটপাতে অনেকজনসমাগম দেখিলাম। চেয়ারে বেঞ্চে টুলে বসিয়া এবং দাঁড়াইয়া অনেক লোক। ঠিক রাস্তার পাশের একটা ঘরে প্রবল উৎসাহে গানবাজনা চলিতেছিল। উদাত্ত বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে কানে বাজিল—

"বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ
নবযুগ ওই এল ওই
এল ওই রক্ত যুগান্তর রে—"

পুলকে বিস্ময়াভূত হইয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, একজন ঝাঁকড়াচুল বৃষস্কন্ধ সুদর্শন যুবক কোলের উপর হারমোনিয়াম তুলিয়া বাজাইতে বাজাইতে গান গাহিতেছেন এবং তাঁহার ঠিক সম্মুখে আমাদের পথের নিত্যদৃষ্ট পথিক কবি মোহিতলাল মজুমদার আসর জাঁকাইয়া বসিয়া বেশ একটা সাফল্যগর্বের ভঙ্গিতে এদিকে ওদিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতেছেন। ভাবটা—দেখ, এটি আমারই কীর্তি। আশেপাশের অস্ফুট গুঞ্জনেই সঙ্গীতরত যুবকটির পরিচয় মিলিল—কাজী নজরুল ইসলাম। গৃহস্বামী মোহিতলালের গুণমুগ্ধ বন্ধু সাহিত্যরসিক কবিরাজ জীবনকালী রায় আমাদিগকেও আপ্যায়িত করিলেন। কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। চন্দ্রে গ্রহণ লাগিল বলিয়া। আমরা শকুন্তলা-সমাগমান্তে রাজধানীপ্রত্যাগমনবাধ্য রাজা দুষ্মন্তের মত বিশেষ অনিচ্ছার সঙ্গে আহিরীটোলা ঘাটের দিকে অগ্রসর হইলাম। গান চলিতে লাগিল।

অনেক রাত্রে নয়নমনোহারী বিবিধ পুরস্কারাকীর্ণ কর্তব্য সমাপন করিয়া যখন মেসের দিকে ফিরিলাম তখন বাসন্তী নিশীথে সদ্য রাহুগ্রাসমুক্ত পূর্ণচন্দ্র প্রসন্ন হাস্য বিকিরণ করিতেছেন। আমরাও আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে লঘু মেঘের মত পক্ষ বিস্তার করিয়া আসিতেছিলাম। ভাঙা মানিকতলা হইতে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ঢুকিতেই সেই সুরালঙ্কৃত বজ্রনির্ঘোষ কানে আসিল—

"নবনবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান—"

জলসা তখনও শেষ হয় নাই জানিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিলাম। পথের জনতা তখন বিরল হইয়া আসিয়াছে। মোহিতলাল বাহিরের একটা চেয়ারে আসিয়া বসিয়াছেন; তাঁহার পাশে একজন নগ্নগাত্র স্বর্ণবর্ণ পুরুষ, গামছা কাঁধে বসিয়া হাস্য-পরিহাসে অবশিষ্ট কয়েকজনকে মাতাইয়া রাখিয়াছেন। ভিতরে গান চলিতেছে। নজরুল ইসলামের বোতামখোলা পিরহান ঘামে এবং পানের পীচে বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু তাঁহার কলকণ্ঠের বিরাম নাই। "বিদ্রোহী"র প্রলাপ পড়িয়া যে মানুষটির কল্পনা করিয়াছিলাম ইঁহার সহিত তাঁহার মিল নাই। বর্তমানের মানুষটিকে ভালবাসা যায়, সমালোচনা করা যায় না। এটনা-বিসুভিয়াসের মত সঙ্গীত-গর্ভ এই পুরুষ, ইঁহার ক্রেটার-মুখে গানের লাভাস্রোত অবিশ্রান্ত নির্গত হইতেছে।

গান থামিতেই আমরা সরিয়া পড়িলাম, কিন্তু তৎপূর্বে সেই বিদূষক ব্রাহ্মণটির পরিচয় সংগ্রহ করিলাম। তিনি স্বনামখ্যাত শরৎ পণ্ডিত দাঠাকুর—পরে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সৌভাগ্য হইয়াছে। এইদিনকার গানের আসরে আরও দুইজন সাহিত্যিককে দেখিয়াছিলাম যাঁহারাও পরে আমার বন্ধু হইয়াছেন—শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ও শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। আমার যাত্রাপথে বিজ্ঞানের নৌকাকে বানচাল করিবার শৈবালদাম এইভাবে সঞ্চিত হইতে লাগিল।

গ্রীষ্মাবকাশে দিনাজপুরে আসিলাম। কনিষ্ঠ ভগিনীর বিবাহ বৈশাখে (১৩৩০), আমার বিবাহ ৪ঠা আষাঢ়। দিনাজপুরে গিয়াই নিদারুণ অর্শরোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলাম। বহু কষ্টে সামলাইয়া লইয়া মাত্র পাঁচ-ছয় জন আত্মীয় ও বন্ধুসহ কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলাম। ১৯শে জুন (১৯২৩) মঙ্গলবার প্রায় গোধূলিলগ্নে শ্যামবাজারে শ্যামস্কোয়ারের পূর্বদিকসংলগ্ন একটি বৃহৎ বাড়িতে (রামলাল দত্তের) অগিলভি হষ্টেল ও সায়ান্স কলেজ মেসের বন্ধুদের আনন্দহুলাহুলির মধ্যে শ্রীমতী সুধারাণী চৌধুরীর সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল। সেই দিন সেই শুভলগ্নেই আমার নিরুদ্দেশযাত্রার পরিবহন বিভাগের একটি ছাড়া আর সব কয়টি নৌকাই ভাঙিয়া খান খান হইয়া গেল। আমার যান ও পথ নির্দিষ্ট হইল। আমি অনেক অশান্তি হইতে বাঁচিয়া গেলাম। বঙ্গবাণী সেই ১লা আষাঢ়ে আমার মুখ দিয়া বলাইলেন—

গুরু গুরু গুরুধ্বনি আমার বুকের মাঝে,
সে কি তুমি আসছ ব'লে, সে কি তোমার চরণ বাজে,
আমার রক্তের মাঝে ? [illegible]

ফোটোগ্রাফী

মৃগ-মিথুন
(দ্বিতীয় পুরস্কার)
—শশীকান্ত চক্রবর্তী

জিরাফ
—দেবকুমার বসু
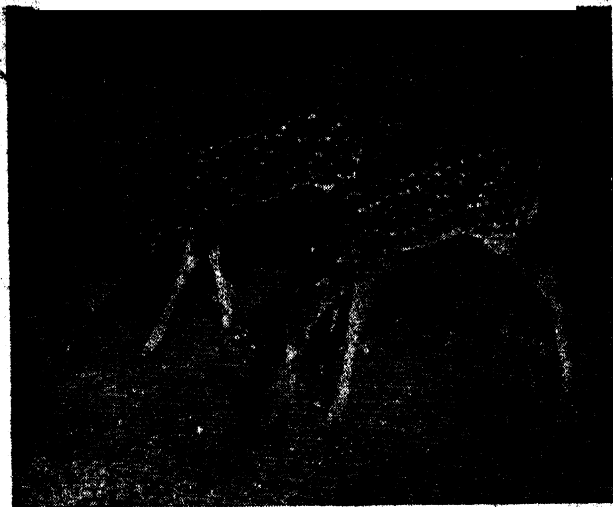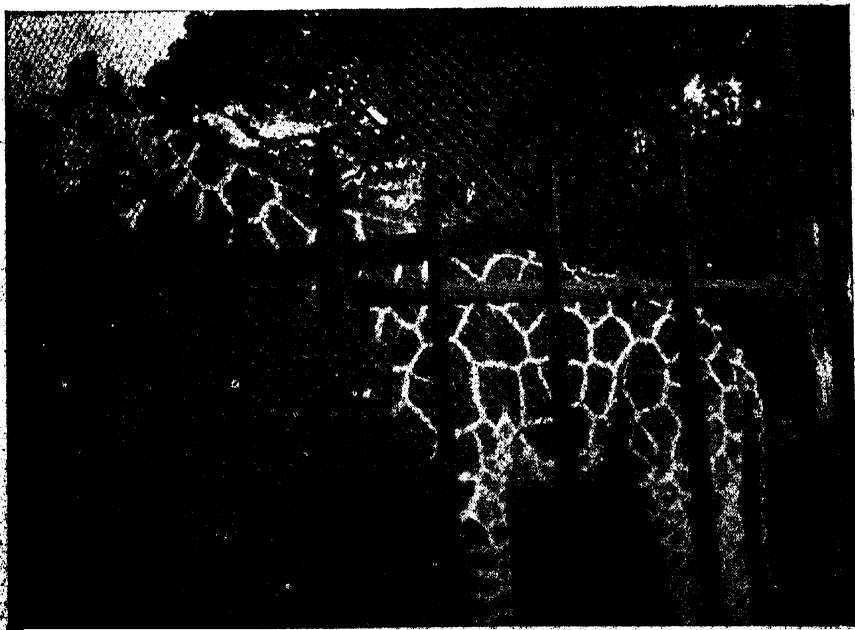
রাজহংস
—কেশব দত্ত
(প্রথম পুরস্কার)

জলচর
—কমলা বসু

শিখী

—কানু ঘোষ

প্রতিযোগিতা

বিষয়

বৃক্ষ
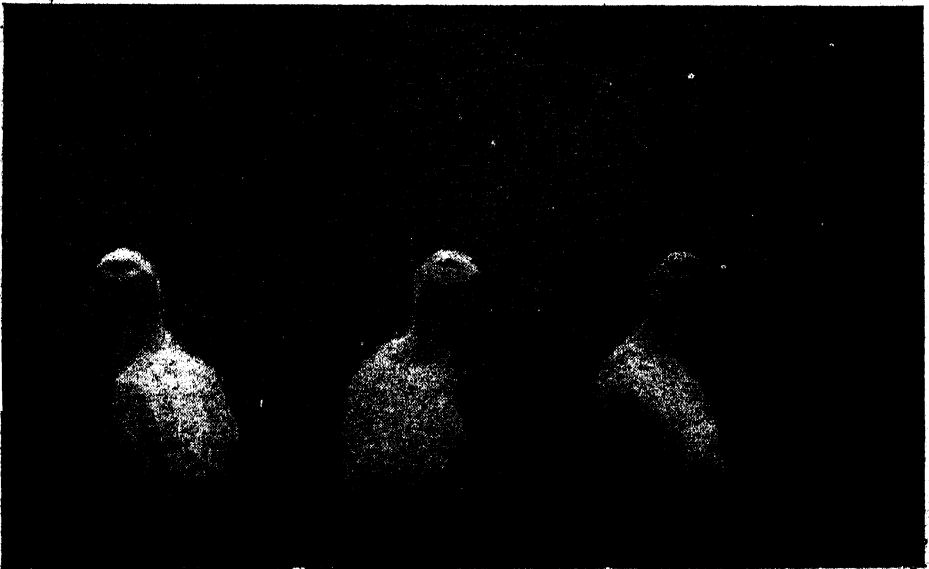
প্রথম পুরস্কার ১৫৲ দ্বিতীয় পুরস্কার ১০৲

তৃতীয় পুরস্কার ৫৲

[ছবি পাঠানোর শেষ দিন ২২শে কার্ত্তিক]

জিরাফ —দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিখী-নৃত্য —অনিল ঘোষ (তৃতীয় পুরস্কার)
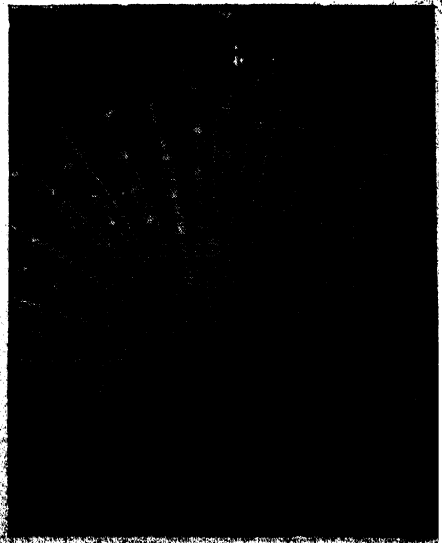
জলহস্তী

—মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

—নির্ম্মলকুমার দত্ত

রামমোহন রায়ের বিষয়ে তথ্যপূর্ণ পত্র

[দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা খ্যাতনামা এটর্ণী মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় আমেরিকা প্রবাস-কালে কোন আত্মীয়কে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে রামমোহন রায়ের বিষয়ে অবিদিত কতকগুলি কথা আছে। পাঠকগণের প্রীতিকর হবে বলে সম্পূর্ণ চিঠিটি প্রকাশিত হচ্ছে।]

ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় অবস্থিতি কালে রামমোহন রায়কে যাঁহারা পাশ্চাত্য প্রবাসে চিনিতেন তাঁহাদের নিকট মৃত মহাত্মার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি তাহাতে বিস্মিত ও প্রীত হইয়াছি। যাহা শুনিয়াছি ভাবিয়া দেখিলে তাহা হইতে বড় সুন্দররূপে একটি শিক্ষা লাভ করা যায়। মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃভাবস্থাপনা কিছুকাল হইতে উন্নতপ্রকৃতির মানুষের মধ্যে একটি আদর্শ কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর শেষ সহস্রাধিক বৎসরের ইতিহাস পাঠ করিলে ও এই সময়ের মহৎ ব্যক্তিগণের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, "মানুষ মানুষের ভাই" এই ভাবটি যেন মহৎ প্রকৃতিকে আপনা হইতে নমিত করিয়া ীভূত করিয়াছে। এই ভাবটির ধারণাই যেন মহত্ত্বের লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু খাঁটি সোনায় যেমন গহনাপত্র গড়া হয় না বা সাধারণ্যে প্রচলিত রাজমুদ্রাও হয় না—কতকটা খাদ দিবার আবশ্যক হয়, তেমনই নিছক বিশুদ্ধ ভাবও পৃথিবীতে চলে না—আপনা হইতেই যেন কিছু খাদ আসিয়া পড়ে। মানুষের জাতিব্যাপী ভ্রাতৃভাবও এই সাধারণ নিয়ম অতিক্রম করিতে পারে নাই। লোকে বলে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃভাব স্থাপন কর। ভ্রাতৃভাব কি মানুষের ইচ্ছাধীন—ইহা যে আমাদের প্রকৃতিগত সত্য। পরমেশ্বর মানুষকে মানুষের ভাই করিয়া গড়িয়াছেন এবং অবিভাজ্য ঈশ্বর প্রত্যেকের হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ প্রতাপে রহিয়াছেন। ঈশ্বরকে চিনিলেই মানুষের ভ্রাতৃভাব অনুভব করা যায়। তাই আমাদের পক্ষে "ভ্রাতৃভাব স্থাপন কর" ইহা বিধি না হইয়া, বিধি হওয়া উচিত যে, "ঈশ্বর দত্ত ভ্রাতৃভাব উপভোগ কর।" ভ্রাতৃভাবের জন্য মানুষকে কুঁদাইয়া লইতে হইবে না—কেবল ঈশ্বরে সকল মানুষের একত্ব অনুভব করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ-সন্তান রামমোহন রায়ের ইহুদি ও খৃষ্টানের মধ্যে সস্নেহ সম্মান দেখিয়া ইহার একটি দৃষ্টান্ত পাইয়াছি।

লণ্ডনে মিসেস্ প্রে—র বাড়ীতে আহারান্তে সন্ধ্যা যাপনের জন্য একদিন আমার নিমন্ত্রণ হয়। গৃহস্বামিনী একজন খ্যাতনামা লেখিকা। সেখানে যথারীতিতে একজন সম্ভ্রান্ত ইহুদি ভদ্রলোক মিষ্টার লে—র সহিত পরিচিত হই। তিনি আমাকে পূর্ব্বদেশী লোক দেখিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনার একজন স্বদেশীয় লোক আমার পিতার পরম বন্ধু ছিলেন। আমিও তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি একজন অসাধারণ আশ্চর্য্য লোক ছিলেন।"

নাম জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম, তাঁহার পিতার বন্ধু ছিলেন রামমোহন রায়। তাঁহার পিতা ও অপরাপর বন্ধুগণ রামমোহন রায়ের ইহুদি ধর্ম্মের জ্ঞান ও গভীর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। কথা শেষ করিবার সময় ভদ্রলোকটি বলিলেন, "মহাশয়, রামমোহনকে আমার পিতা কেবল পূজা করিতে বাকী রাখিয়াছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর পরও আমার পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার নাম করিতেন। রাজা একজন অসাধারণ লোক ছিলেন। সে রকম লোক আমি আর কখনও দেখি নাই।"

মিসেস রো—সে—নাম্নী একজন ইংরেজ মহিলার সহিত লণ্ডনে আমার পরিচয় হয়। এদেশে বয়স গণনার রীতি অনুসারে তিনি এখন বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র। প্রচলিত পদ্ধতিমত ইনি একজন খ্যাতিপন্ন রমণী, লণ্ডনের কএকখানি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার নিয়মিত লেখকশ্রেণীভুক্ত। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে পিতৃভবনে ইনি রামমোহন রায়কে দেখিয়াছিলেন। রাজা অনেকবার ইঁহার পিতার নিমন্ত্রণে ডিনারে উপস্থিত থাকিতেন।

এই কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাজা কি ডিনারের সময় আহারে যোগ দিতেন?"

তিনি উত্তর করিলেন, "না, আহারে ঠিক যোগ দিতেন না। তবে আহারের সময় টেবিলে আসিয়া বসিতেন। এবং ঈশ্বরের নামে রুটি নিবেদন করিয়া ভাঙ্গিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিতেন।"

রামমোহন রায়ের সহিত ইঁহার পিতৃ-পরিবারের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। কখনও কখনও রাজা বন্ধুর বাড়ী আসিয়া কৌচের উপর শয়ন করিতেন এবং এই মহিলাকে ডাকিয়া গান গাহিতে বলিতেন। ইনি তখন দশ বৎসরের বালিকা মাত্র। আর এই বালিকার ছাই-ভস্ম গান শুনিতে শুনিতে রাজা নিদ্রা সেবা করিতেন।

অপরাপর ছোট ছোট কথার কণা সংগ্রহ করিবার আবশ্যক নাই। ফলকথাটা আমার মনের উপর দাঁড়াইয়াছে এই যে, লোকে জাতি ও ধর্ম্মসম্প্রদায়নিরপেক্ষ হইয়া রামমোহন রায়কে স্নেহ ও সম্মান করিত। আমার বোধ হয় এরূপ স্নেহ ও সম্মান-আকর্ষণী শক্তি রাজার বিদ্যা-বুদ্ধিজনিত নহে, ইহার উৎপত্তি-স্থান রামমোহনের সত্যনিষ্ঠতা। খৃষ্টের কথা ঠিক যে, সত্যই মানুষের সান্ত্বনাদাতা।

তবে আর একটা কথা বলিতে হইবে। কবি রোড্‌ন্ নোয়েল আমাকে বলিয়াছেন যে, তাঁহার স্বর্গীয়া মাতা কাউন্টেস্ অফ্ গেন্‌সবরা রামমোহন রায়ের একটি সুন্দর মার্ব্বেল মূর্ত্তি তৈয়ার করাইয়াছিলেন। উহা এখন তাঁহার কোন বংশীয়ানের নিকট আছে। আমি এটা দেখি নাই। মৃত্যুর পর রামমোহন রায়ের মাথার একটা ছাঁচ তোলা হয়, তাহা এখন নিউইয়র্কে আছে—ইহা আমি দেখিয়াছি।

বষ্টনে আসিয়া দেখিলাম, একেশ্বরবাদী খৃষ্টানদের মধ্যে

রামমোহন রায়ের নাম সুপরিচিত। এক বংশ পূর্ব্বে এই সম্প্রদায়ের মুখ্য নেতৃবর্গ রামমোহন রায়ের প্রশংসাশীল বন্ধু ছিলেন। চ্যানিং, ওয়েস, টাকারমান প্রভৃতির সহিত রাজার প্রত্যক্ষভাবে বা অপরের মধ্যবর্ত্তিতা অবলম্বন করিয়া চিঠিপত্র চলিত। একটি প্রকাণ্ড ভোজে মিঃ হেল (ইনি বষ্টনের একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার) রামমোহন রায়ের আরও কয়েক জন বন্ধুর নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেগুলি আমার মনে নাই।

টাকারমান রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ইংলণ্ডে যান—মনে রাখিতে হইবে, যে কালের কথা হইতেছে, তখন কলের জাহাজের সৃষ্টি হয় নাই। এবং রামমোহন রায়ের সহিত দেখা করিয়া বলেন যে, "ঈশ্বর ধন্য, তিনি এই মানুষের সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইলেন।"

রামমোহন রায়ের রচিত "Precepts of Jesus" এবং "Appeals to the Christian Public"—এই গ্রন্থগুলির এক সংস্করণ বষ্টন নগরে ছাপা হইয়াছে দেখিয়াছি।

এ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক ও প্রীতিকর একটি ঘটনা সম্প্রতি ঘটিয়াছে, তাহা এখনও বলি নাই। মিসনারী এডামের নাম আমাদের দেশে অনেকেই শুনিয়াছেন। তিনি প্রথমে শ্রীরামপুরের মিসনারীসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, পরে রামমোহন রায়ের সঙ্গ পাইয়া খৃষ্টীয় ত্র্যাত্মক ঈশ্বরবাদ পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বর খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এ জন্য সহযোগী পাদ্রীরা তাঁহাকে Second Father Adam উপাধি দেন। ইয়ুরোপে আসিবার পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, মাননীয় ৺রাখালদাস হালদার মহাশয় এডামের একটি বক্তৃতা পুস্তিকা আকারে ছাপাইয়াছিলেন।

এডামের বিধবা পত্নী এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার বয়স ৮৮ বৎসরের অধিক কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি এখনও অক্ষুণ্ণ। বৃদ্ধা দুইটি কন্যা লইয়া বষ্টনের সন্নিকটে জেমেকা প্লেন নামক একটি পল্লীতে বাস করেন। বষ্টন হইতে ইঁহাদের বাড়ী রেলে ১৫ মিনিটের পথ।

আমার পরিচিত পাদ্রী ড—য়ের নিকট আমার সম্বাদ পাইয়া বৃদ্ধা আমাকে দেখা করিতে আমন্ত্রণ করেন। আমি বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত তাঁহার আদেশ রক্ষা করিলাম।

মিসেস্ এডামের দুইটি কন্যাই ভারতবর্ষে জন্মিয়াছিলেন। ইঁহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে মনে হইতে লাগিল যেন কালের চক্র বিপরীত গতিতে চলিতেছে। বৃদ্ধা অবশ্য রাজা রামমোহনকে চিনিতেন। এডাম সপরিবারে শ্রীরামপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া সারকুলার রোডের দক্ষিণ অংশে বাস করেন। এই রাস্তার অন্য দিকে রাজা নিজের বাগানবাটীতে থাকিতেন। এই বাগানবাটীতে সুকীস্ ষ্ট্রীটের থানা ছিল দেখিয়া আসিয়াছি। আমার বিবেচনায় এই বাটী ক্রয় করিয়া একটি সাধারণ মন্দির করা উচিত। মিসেস্ এডামের কাছে শুনিলাম, কি অবস্থায় রাজা একটি বালককে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাহার রাজারাম রায় নামকরণ করেন। মিষ্টার ডিগবি নামক একজন সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী এই অনাথ বালকটিকে মানুষ করিতেন। একদিন রাজা ডিগবির সহিত বন্ধুভাবে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া শুনেন যে, তিনি পদত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিতেছেন, কিন্তু এ অনাথ বালকটিকে লইয়া কি করিবেন ভাবিয়া ব্যাকুল। দুই বন্ধুতে কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় বালক ঘরে ঢুকিয়া দুই-একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া সস্নেহে রাজার ক্রোড়ে উঠিয়া বসিল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বালককে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

মিষ্টার এডাম রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র ৺রাধাপ্রসাদ রায়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধার সহিত রাধাপ্রসাদের বিশেষ কথাবার্ত্তা হয় নাই কিন্তু প্রতিদিন পড়িতে আসিবার ও পড়া শেষ করিয়া যাইবার সময় ইঁহার সহিত তাঁহার দেখা হইত। একদিন রাজা আসিয়া এডাম ও তাঁহার পত্নীকে বলিলেন, "রাধাপ্রসাদের মাতার মৃত্যু হইয়াছে—কিন্তু রমাপ্রসাদের মাতা এখনও জীবিত।" কথাটা ইঁহাদের নিকট একটা হেঁয়ালির মত বোধ হওয়ায় ইঁহারা রাজাকে সমস্যা পূরণ করিতে অনুরোধ করেন। প্রত্যুত্তরে বুঝিলেন যে, রাজাকে শৈশবে তাঁহার পিতা তিনটি বিবাহ দেন। রামমোহন রায়ের তৃতীয় স্ত্রীর কথা তাঁহার বংশীয়ানদিগের বাহিরে যে কেহ জানে—এই আমি প্রথম শুনিলাম। তবে রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ সহোদর ভাই। কিন্তু ইঁহাদের মাতা ভিন্ন এ কথার অর্থ বোধ হয় এই যে, রাজার কনিষ্ঠা স্ত্রীকেই রমাপ্রসাদ মা বলিয়া জানিতেন—তাঁহার গর্ভধারিণীকে চিনিতেন না। তাঁহার মৃত্যুর, বহুকাল পরে রমাপ্রসাদ অবগত হন যে তাঁহার যথার্থ গর্ভধারিণী কে। এ কথা বাটীতে শুনিয়াছিলাম।

মিসেস্ এডাম বলেন, তাঁহার স্বামী ও রামমোহন রায় উভয়ে মিলিয়া গ্রীক ভাষা হইতে খৃষ্টীয়ানদিগের নূতন ধর্ম্মপুস্তক বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বে উভয়েরই জীবন শেষ হইয়াছিল।

রাজা বিলাতে আসিবার সময় ইঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে আমরণ তিনি আর দেশে ফিরিবেন না এবং ইংলণ্ড হইতে আমেরিকা যাইবারও অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। মিসেস্ এডামের প্রত্যাশা ছিল যে এ দেশে রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে কিন্তু অনতিবিলম্বে রাজার মৃত্যু হওয়ায় সে প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নাই।

রামমোহন রায় খৃষ্টীয়ান কি না জানিবার জন্য বিখ্যাত ডাক্তার উইলিয়ম এলরিয়্যানিং এডামকে পুনঃ পুনঃ চিঠি লেখেন। অবশেষে এডাম রাজাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এ প্রশ্নের কি উত্তর করিবেন। রাজা ইহাতে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অতীব সুন্দর, "আপনি আমার আধ্যাত্মিক বিশ্বাস কিরূপ তাহা জানেন এবং জীবনে কিরূপ ব্যবহার কার্য্য করি তাহাও জানেন—ইহাতে যদি আমি খৃষ্টীয়ান হই তবে আমি খৃষ্টীয়ান।"

মিসেস্ এডামের পিতা পাদ্রী গ্রাণ্ট শ্রীরামপুরে কেরি মার্শমান প্রভৃতির সহযোগী ছিলেন। ইনি পিতা-মাতার সহিত অতি অল্প বয়সে ভারতবর্ষে যান। শ্রীরামপুরে প্রথম বাঙ্গালীর খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা তাঁহার পরিষ্কাররূপ স্মরণ হয়। তাঁহার নাম কৃষ্ণ, সে জাতিতে তাঁতী।

একটি সতীদাহও মিসেস্ এডাম চাক্ষুষ করিয়াছিলেন। সে সময় ইংরেজরাজ্যে এই নৃশংস প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল তাই এ কুসংস্কার রাক্ষসের নিকট বলি দিবার জন্য দিনেমার রাজ্য শ্রীরামপুরে যাইতে হইত। মিসেস্ এডাম ও তাঁহার মাতা গঙ্গাতীরে উপস্থিত। অপর পার হইতে একখানি নৌকা করিয়া বাদ্য-বাজানা লইয়া কতকগুলি লোক আসিতেছিল। দেখিয়া মনে হয় কোন উৎসব উপলক্ষে যাত্রী আসিতেছে। নৌকা কূলে লাগিল। কিন্তু আরোহীদিগের মুখে

উৎসবোচিত হর্ষ নাই—সকলই বিষণ্ণ, সকলই মলিন। সর্ব্বশেষে নৌকা হইতে একটি ক্ষীণা তরুণী নামিল। তাহার পর? তাহার পর ও হরি হরি! কোথায় উৎসব—আর কোথায় চিতা সজ্জা। তরুণী গঙ্গায় স্নান করিয়া মৃত পতির সহিত চিতারোহণ করিল। গ্রান্টপত্নী এই লোমহর্ষণ ব্যাপারে অভিভূত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। দুর্ঘটনা আশঙ্কা করিয়া আমি তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িলাম। একটু পরে মিসেস্ এডাম বেগম সমরুর দরবারের কথা তুলিলেন। বেগমের সহিত একদিন তিনি হাজিরা খাইতে গিয়া দেখেন যে ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারীরা দুয়ারের বাহিরে জুতা রাখিয়া টুপী মাথায় দিয়া বেগম সাহেবের নিকট হাজির হইলেন। এ কথা এখন কেহ বিশ্বাস করা সুকঠিন।

বলা বাহুল্য, বৃদ্ধা ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরকে চিনিতেন। বেলগাছিয়া বাগানে তাঁহারা অনেকবার নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সে বিষয়ে অনেক কথা শুনিলাম। তাঁহায় জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজা বৈদ্যনাথের বাগানে চিড়িয়াখানা দেখিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা করিলেন।

বৃদ্ধা বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া গিয়াছেন কি না প্রসঙ্গক্রমে এ কথা উঠিলে তিনি আমাদের চিরপরিচিত

"মশায়, মশায় তোমার প'ড়ো হাজির।
এক দণ্ড ছেড়ে দাও জল খেয়ে আসি॥"

ইত্যাদি আওড়াইলেন। ইঁহার বাঙ্গালা উচ্চারণ বিশুদ্ধ, কথার অতি যৎসামান্য টান। বাঙ্গালা এ পরিবারের সকলেই জানিতেন কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দীর অনভ্যাসে এখন কথা কহিতে অক্ষম। হাঁসের ছবিওয়ালা একটা আমাদের দেশীয় কাগজচাপা দেখাইয়া বৃদ্ধা বলিলেন,

"হাঁসগুলা বালির উপর দৌড়ে দৌড়ে যায়।"

আর একটা কথা ভুলিয়া যাইতেছিলাম। ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহিতও এই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি ইঁহাদের সহিত অনেকবার আহারাদি করিয়াছিলেন আরও অনেক কথা শুনিয়াছিলাম, সকলেরই এক সুর—যাহা ছিল তাহা নাই।

কাল কৃষক। আমরা শালী ফসল। পূর্ব্ব কৃতীগণকে কাল গত বৎসরের ফসলের ন্যায় কাটিয়া যে গোলায় জমা করিয়াছে, সেখানে মানুষের চক্ষু যায় না।

সন্ধ্যারম্ভে আমি ভাবিতে ভাবিতে রেলের ষ্টেশনে ফিরিলাম,

All flesh is as grass
And all the glory of man
as the flower of grass
The grass withereth, and the
flower thereof falleth away
But the word of the Lord
endureth for ever.

আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং, প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ।
লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গবিদ্যুচ্চলং জীবনং
তস্মান্ মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা॥

সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথায়।
দারা সুত ধন জন সঙ্গে নাহি যায়॥

বষ্টন, ম্যাসাচুসেট্‌স্, আমেরিকা,
১৫ মার্চ্চ, ১৮৮৭ সাল।

রোমাঁ রোলাঁর পত্র

(বাংলা অনুবাদ)

ভিলেন্যুভ (ভঁ‍াদ) ভিল্লা অলগা
২রা অক্টোবর, ১৩৩৩

প্রিয় ভবদেব ভট্টাচার্য,

তোমাদের দীর্ঘ পত্রটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে। আমি তোমার চিঠির মধ্যে টাটকা সবুজ প্রাণের স্পন্দন পেয়ে খুসী হয়েছি।

তুমি জ্যঁা ক্রিস্তফের সমস্ত পর্ব্বগুলি শেষ না করেই আমার কাছে লিখেছ। আমার ভয় হয়, পরের পর্ব্বগুলি পড়তে তোমার অনুভূতি আরো কঠিন আঘাতের সম্মুখীন হবে। আমার আশঙ্কা, এই অনুভূতি দুঃখের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত নয়।

হে প্রিয় তরুণ! তুমি আমাকে নিষ্ঠুর আখ্যা দিয়েছ যেহেতু আমি জ্যঁা ক্রিস্তফের সহিত মারি আঁন্তোয়ানেতের মিলন ঘটাইনি। আমি তো নিষ্ঠুর নই। জীবনই নিষ্ঠুর। আমি লিখে যাই যেমনটি দেখতে পাই ও যেমনটি শুনি। আমি সেই কবিদের দলে নেই—যাঁরা বাস্তবের উপর কল্পনার তুলি বুলিয়ে সত্যকে লুকিয়ে রাখতে চান। তোমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মহামায়ার কল্পনা করেছ, আমিও সেই দৃষ্টিতেই জীবনের সত্যকে দেখতে শিখেছি। তোমার কি স্বামী বিবেকানন্দের কথাগুলি মনে পড়ে?

"মাকে দেখতে শেখো। সুখ ও আনন্দের মধ্যেই শুধু যে তাঁর স্থান তা নয়, তিনি অসৎ, ভয়ঙ্কর, দুঃখ ও শূন্যতার মধ্যে অবস্থান করেন। মা! দুর্বল যে তোমাকে মালা পরিয়ে দেয়, তারপর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে করুণাময়ী! মরণকে ধ্যান করো, ভয়ঙ্করকে উপাসনা করো। ভয়ঙ্করকে ভজনা করেই কেবল ভয়ঙ্করকে জয় করা যায়। অমরত্ব লাভ শুধু তখনি সম্ভব।"

জ্যঁা ক্রিস্তফের ও আমার "বিমুগ্ধা আত্মার" (আমে এনচ্যাণ্টি) আঁনেতের জীবনসত্য মহামায়ার দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে থাকা নয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অমরত্বে পৌঁছানো পর্যন্ত মা চলেছেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি পদক্ষেপে।

এ ছাড়াও হে প্রিয় যুবক বন্ধু! তুমি কি শেষ পরিণতির কথা ভেবে দেখছ? বোধ হয় ভালই হয়েছে কোমল স্বভাবের আঁন্তোয়ানেৎকে জ্যঁা ক্রিস্তফের স্ত্রীরূপে অঙ্কন না করে। বেঠোভেনের সঙ্গেও তাঁর অমর প্রিয়ার মিলন হয়নি। অন্তর্জীবনের অদ্ভুত রহস্যময় শক্তি উদ্ভাসিত হয় আত্মার কাছে—জীবনের নিঃসঙ্গতা ও দুঃখের মধ্য দিয়েই। আঁন্তোয়ানেতের মতন বিনম্রা, স্নেহময়ী নারীও আত্মবলিদানের পথে এই উদ্ভাসিত চৈতন্যশক্তির প্রভাবে ধন্য হয়েছে।

সত্যই মহাদ্বন্দ্বের ও সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের বাস করতে হচ্ছে। যা আমি এতদিন ধরে লিখে এসেছি এবং অন্যের মনে যে ভাব-সত্য আমি জাগাতে চেষ্টা করে এসেছি তার মূলকথা হ'ল জীবনের মর্মান্তিক বাস্তবতার সম্মুখে দাঁড়িয়েও সাহস অবলম্বন কর, হৃদয়ের ও আত্মার বলিষ্ঠতাকে হারিয়ে ফেলো না। প্রশান্তি আসবে পরে। জয় হবে—জয়লাভের আনন্দও পাওয়া যাবে। কিন্তু বর্ত্তমানকে অবহেলা করো না, ঘুমিয়ে থেকো না। অবাস্তব স্বপ্নের পিছনে দিন কাটিয়ে দিও না। কাজ করে যাও, প্রেমিক ও শিল্পীর জীবনেও চাই মহৎ গুণের একাগ্র সাধনা। তবেই সার্থকতা আসে। মহান শক্তির উদ্বোধন কর।

প্রিয় ভট্টাচার্য, তোমাকে আমি পিতার আশীর্ব্বাদ পাঠাচ্ছি।

(স্বাঃ) রঁম্যা রোঁল্যা।

এই সঙ্গে তোমাদের মহাত্মা গান্ধীর সহিত আমার সাক্ষাতের ক্ষুদ্র স্মারকচিহ্ন পাঠিয়ে দিলাম।

উত্তরপাড়ার রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি-এস-আই, এম-এ, বি-এল, এফ-সি-ইউকে লিখিত স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রাবলী

দি বেঙ্গলী ১০, কলুটোলা ষ্ট্রীট
প্রতিষ্ঠিত ১৮৫৯ কলিকাতা, ২৪।৪।১৯০৬

প্রিয় মহাশয়,

বরিশালের কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য আগামী শুক্রবার সম্ভবতঃ বাবু পশুপতিনাথ বসুর গৃহপ্রাঙ্গণে এক জনসভা হইবে।

আমাদের সকলের ইচ্ছা, আপনি এই সভার সভাপতিত্ব করেন। আমি এই সঙ্গে খসড়া প্রস্তাবসমূহের অনুলিপি পাঠাইলাম। সত্বর উত্তরপ্রাপ্তির আশায় রহিলাম।

ভবদীয়
(স্বাঃ) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী

সিমুলতলা, ই, আই, রেলওয়ে
২৮।৯।১৯০৬

প্রিয় মহাশয়,

১৬ই অক্টোবর বঙ্গবিভাগের স্মৃতিবার্ষিকী। প্রদেশের সর্ব্বত্র ইহা যথোচিত গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদার সহিত পালিত হইবে। ১৬ই তারিখে কলিকাতায় এক বিরাট বিক্ষোভ হইবে এবং আমাদের সকলের আন্তরিক অনুরোধ, আপনি এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবেন। ইহা পুরাতন ও নূতন প্রদেশে বাঙ্গালীদের অবিভাজ্য ঐক্যের প্রতীকস্বরূপ একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠান এবং রাখীবন্ধন ইহার সূচী। আমি আশা করি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সম্মত হইবেন। আমি একটু বিশ্রাম ও ছুটি উপভোগের জন্য এখানে আসিয়াছি। বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিবেন।

ভবদীয়
(স্বাঃ) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী।

দি বেঙ্গলী ১০, কলুটোলা ষ্ট্রীট,
প্রতিষ্ঠিত ১৮৫৯ কলিকাতা, ৮-৫-১৯০৭

প্রিয় মহাশয়,

পূর্ব্ববঙ্গে বেপরোয়া হিংসানীতির কবলিত বিপন্ন ব্যক্তিদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, নূতন শিক্ষাসংক্রান্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং পঞ্জাবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য আমরা আগামী শনিবার অথবা রবিবার একটি জনসভা অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করিতেছি।

আমাদের আন্তরিক অনুরোধ, আপনি এই সভার সভাপতিত্ব করেন। আমি আশা করি আপনি রাজী হইবেন।

ভবদীয়
(স্বাঃ) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী।

দি বেঙ্গলী ১০, কলুটোলা ষ্ট্রীট
প্রতিষ্ঠিত ১৮৫৯ কলিকাতা, ৬-১২-১৯০৭

প্রিয় মহাশয়,

জাতীয় ভাণ্ডার সম্বন্ধে আপনি যে প্রস্তাবের নোটীশ দিয়াছেন সে সম্বন্ধে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা ইহার বিশেষ বিরোধী এবং বিষয়টি বিশেষ যত্ন সহকারে বিবেচনা করা দরকার। আমি উপস্থিত থাকিতে পারিলে খুব ভাল হইত, কিন্তু মেদিনীপুর জেলা সম্মেলনে যোগদানের জন্য আজ আমাকে কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইবে এবং রবিবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিতে পারিব না। এমতাবস্থায় আমি বিষয়টির আলোচনা আগামী সপ্তাহে শনিবার ১৪ই পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখিবার অনুরোধ জানাইতেছি।

ভবদীয়
(স্বাঃ) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী।

দি বেঙ্গলী ১০, কলুটোলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা, ১৭।২।১৯০৮

প্রিয় মহাশয়,

সকলের মধ্যে এই মনোভাব প্রবল হইয়াছে যে, প্রস্তাবিত হাইকোর্ট বিভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য টাউন হলে একটি জনসভা হউক। এই সভায় প্রদেশ বিভাগের বিরুদ্ধেও আমরা নূতন করিয়া প্রতিবাদ জানাইতে পারিব। এ বিষয়ে আপনি ও বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন কি নেতৃত্ব করিবেন? আমি আশা করি, আপনি ইহাতে রাজী হইবেন।

ভবদীয়
(স্বাঃ) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী।

দি বেঙ্গলী ১০, কলুটোলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১।১২।১৯০৮

প্রিয় মহাশয়,

আমি নিশ্চিত জানি যে, সার এডোয়ার্ড বেকারের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ আপনার হইবে। বর্ত্তমান আইন কলেজ সমূহের বিরুদ্ধে যে জেহাদ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা যে কত দূর অন্যায় ও অবিজ্ঞ-জনোচিত, তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছি। ভাইস চ্যান্সেলর সুনির্দ্দিষ্টরূপে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কলেজগুলিকে কতকগুলি সর্ত্ত পালন করিতে বলা হইবে এবং তাহা পালন না করিলে উহাদের অনুমোদন বাতিল করা হইবে। সিণ্ডিকেট কিন্তু কোন প্রকার সর্ত্ত আরোপ না করিয়াই মেদিনীপুর কলেজ, ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজ এবং বিহার ন্যাশনাল কলেজ সংলগ্ন ক্লাসগুলির অনুমোদন বাতিলের সুপারিশ করিয়াছেন।

আমি ঐকান্তিক ভাবে আশা করি, আপনি উক্ত কলেজগুলিকে সাহায্য করিবেন।

ভবদীয়
(স্বাঃ) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী।

যাদৃক্—যাদৃশ, যেরূপ।
যাদৃচ্ছিক—অবাধ্য, ইচ্ছাবান, স্বতন্ত্র।
যান—বাহন, রথাদি, শকট, গাড়ী।
যানবাহক—শকটাদি চালক, অশ্বাদি।
যাপন—চলান, কাটান, লুকান।
যাপিত—গত, লুক্কায়িত, গুপ্ত।
যাপ্য—সমতাপ্রাপ্ত, গুপ্ত।
যাবক—অর্দ্ধপক্ক যব, বোর ধান, লা।
যাবজ্জীবন—মরণ পর্য্যন্ত, আজীবন।
যাবৎ—যত দিন, যে পর্য্যন্ত, যত, সমুদায়।
যাবতীয়—সমগ্র, সকল, সমুদায়।
যাম—অষ্ট দণ্ড পরিমিত কাল।
যামাতা—যামাই, কন্যার স্বামী।
যামিনী—রাত্রি, নিশীথিনী।
যিনি—যে লোক, যে ব্যক্তি, যে জন।
যুক—তুলা, নিক্তি, পরিমাণ-দণ্ড।
যুকৎ—কৌশল, চাতুর্য্য, দাঁড়া, ক্ষমতা।
যুক্ত—মিলিত, সম্লিষ্ট, বিশিষ্ট।
যুক্তি—তর্ক, মন্ত্রণা, উপায়।
যুগধর্ম্ম—যুগমাহাত্ম্য, যুগের ব্যবহার।
যুগপৎ—যুগপদ, এককালে।
যুগল—যুগ্ম, যুড়ি, যোড়া, মিথুন, দ্বন্দ্ব, দুই।
যুগান্ত—যুগের শেষ, কল্পান্ত।
যুত—(যুক্ত দেখ)
যুদ্ধ—আহব, সমর, রণ।
যুবক—যুবা, যুবন, যৌবনান্বিত, তরুণ, প্রাপ্তবয়স্ক।
যুবতা—যুবত্ব, যৌবনাবস্থা, যৌবন কাল।
যুবতী—তরুণী, যৌবনান্বিতা, যুনী।
যুবরাজ—রাজ্যপ্রাপ্ত, রাজপুত্র।
যূক—উকুন, ডেঙ্গর, উৎকুন, কেশকীট।
যূথ—ঝাঁক, সমূহ, ঝুণ্ড, রাশি।
যূষ—ঝোল, মণ্ডবিশেষ, ব্যঞ্জনাদি।
যে—বিশেষ্য ব্যক্তি বা বস্তু, যাহা।
যেথা—যেদিকে, যত্র, যেখানে।
যেন—যাহাতে, যেরূপে।
যেমত—যেরূপ, যেমন, যাদৃক্, যথা।
যেহেতুক—যে কারণ, যে জন্য।
যোঁয়ালি—যোয়াল।
যোক্তা—যোটানিয়া, যোগকর্ত্তা।
যোক্ত্র—যোত, যোয়ালবন্ধন রজ্জু।
যোগ—চিত্তের একাগ্রতা, যুক্ত করা।
যোগবল—তপস্যাবল, সমাধিশক্তি।
যোগাড়—আনুকূল্য, সহায়তা।
যোগাড়িয়া—যোগাল, সহকারী।
যোগান—কুলান, চালান।
যোগিনিদ্রা—লঘুনিদ্রা, কাকতন্দ্রা।

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

যোগী—যোগকর্ত্তা, ভক্ত সন্ন্যাসী, তাঁতী।
যোগে—সময়ে, দ্বারা, করণক, সঙ্গে।
যোগ্য—উপযুক্ত, নিপুণ, দক্ষ, কৃতী।
যোগ্যতা—উপযুক্ততা, ক্ষমতা, পারগতা।
যোঙড়া—শম্বুক, শামুক, শুক্তি, ঝিনুকাদি।
যোজক—যোড়ানিয়া, ঘটক।
যোজন—যোড়ান, চারি ক্রোশ।
যোড়—যোট, দ্বিপদ শ্লোক।
যোত্র—সম্পত্তি, আয়, প্রতুল।
যোদ্ধা—যোধ, রণকর্ত্তা।
যোনি—স্ত্রীচিহ্ন, উৎপত্তিস্থান।
যোষিৎ—স্ত্রী, মেইয়া, মেয়ে, অবলা, নারী।
যৌ—যাবক, লাক্ষা, গালা, অলক্তক।
যৌক্তিক—তার্কিক, নৈয়ায়িক, যুক্তিসিদ্ধ।
যৌগিক—ব্যুৎপন্ন, ব্যুৎপত্তি।
যৌতুক—বিবাহে লব্ধ অর্থাদি।
যৌবন—যুবত্ব, তারুণ্য, বয়ঃপ্রাপ্তি।
রক্ত—শোণিত, রুধির, লোহিত।
রক্তচন্দন—রক্তবর্ণ গন্ধকাষ্ঠবিশেষ।
রক্তপা—জলৌকা, জলিকা, জোঁক।
রক্তপাত—রক্তপতন, রক্তক্ষরণ।
রক্তবটী—বসন্ত রোগ, গুটি, মাতা।
রক্তবর্ণ—লাল রঙ, রক্তিমাকার বর্ণ, রক্তিমা, লোহিত বর্ণ।
রক্তময়—রক্তযুক্ত, রক্তাক্ত, রুধিরময়।
রক্ষক—পালক, ত্রাণকর্ত্তা, উদ্ধারকর্ত্তা, প্রহরী।
রক্ষণ—রক্ষাকরণ, উদ্ধারণ।
রক্ষস—রাক্ষস, ক্রব্যাদ, নিশাচর।
রক্ষা—প্রতিপালন, ত্রাণ, আশ্রয়, উদ্ধার।
রক্ষিতা—রক্ষক, ত্রাণকর্ত্তা, প্রতিপালক।
রগড়ন—কচলন, ঘর্ষণ, মর্দ্দন।
রগড়ান—কচলান, অঙ্গমর্দ্দন, শস্য ডলন।
রঙ্গ—রঞ্জক, দ্রব্য, ক্রীড়া, রাং।
রঙ্গভঙ্গ—কৌতুক, বিহার, হাবভাব।
রঙ্গভূমি—রণভূমি, আখড়া, যুদ্ধস্থল।
রঙ্গশালা—নাচঘর, নাট্যালয়, নেপথ্য।
রঙ্গানিয়া—রঞ্জকর, রঞ্জক, বর্ণকারী।
রঙ্গাবতারী—নর্ত্তক, ভণ্ড, বেশধারী।
রঙ্গীন—বর্ণীকৃত, ভাবক।
রচক—রচনাকারী, গ্রন্থকর্ত্তা, লেখক।

[ক্রমশঃ

অরবিন্দ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বর্ত্তমান যুগে জগতে ভারতের শাশ্বত সাধনার ও সংস্কৃতির রাষ্ট্রদূত চারি জন—রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অরবিন্দ। ভবিষ্যতের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু বর্ত্তমানে যাঁহারা ভারতের বৈশিষ্ট্য প্রচার করিয়া জড়বাদজর্জ্জরিত—ইহকাল-সর্ব্বস্ব সভ্য জগৎকে মৃত্যু হইতে অমৃতের সন্ধানে পথিপ্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা এই চারি জন। রামমোহন প্রচারক, বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী, রবীন্দ্রনাথ কবি, অরবিন্দ দার্শনিক। সকলেই ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হইয়া তাহার সমৃদ্ধিসাধন করিয়া গিয়াছেন। সকলেই বাঙ্গালী। সকলেই স্রষ্টা।

অরবিন্দকে আমরা কয় রূপে দেখিতে পাই—সাহিত্যিক, দেশপ্রেমিক, দার্শনিক ও অধ্যাত্মবাদ-প্রচারক। অরবিন্দের কার্য্যে এই চারিটির অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল—একের সহিত অপরের সংযোগ কোথাও বিচ্ছিন্ন হয় নাই। সাহিত্যের মধ্য দিয়া তিনি দেশসেবা, দার্শনিক তত্ত্বপ্রচার ও অধ্যাত্মবাদের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেশসেবা ভারতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণকল্পে। তাঁহার দার্শনিক তত্ত্বপ্রচার দেশের ও বিদেশের কল্যাণসাধন জন্য। তাঁহার অধ্যাত্মবাদ-প্রচার স্বদেশে ও বিদেশে নূতন যুগ প্রবর্ত্তনের জন্য।

অরবিন্দের সাহিত্য অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি স্বদেশের ও বিদেশের নানা ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন—তাঁহার রচনা ইংরেজীতে ও বাঙ্গালায়—প্রধানতঃ ইংরেজীতে; তাহার কারণ তিনি তাঁহার বক্তব্য কেবল স্বীয় প্রদেশে বা দেশে নিবদ্ধ রাখেন নাই; তাহা মানব জাতির জন্য।

প্রচলিত বিশ্বাস, তিনি যখন বরদা রাজ্যে ছিলেন, তখন দীনেন্দ্রকুমার রায়কে শিক্ষক রাখিয়া বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন। সে বিশ্বাসের বুদ্বুদ ফুৎকারে বিলীন করিবার জন্য তাঁহার বরদায় অবস্থানকালে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধীয়—ইংরেজীতে লিখিত—প্রবন্ধ কয়টি। সেইগুলিতে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য সপ্রকাশ। বরদায় বাঙ্গালায় আলোচনার সুবিধা ছিল না বলিয়াই তিনি বাঙ্গালী "শিক্ষক" নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় তাঁহার অধিকারের প্রমাণ—তাঁহার বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের' অসমাপ্ত অনুবাদ। আর একটি প্রমাণ আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে দিতেছি। আলীপুরের মামলায় মুক্তিলাভ করিয়া আসিয়া তিনি ইংরেজীতে সাপ্তাহিক পত্র 'কর্ম্মযোগিন্' প্রচার করেন। কিছু দিন পরে প্রকাশক গিরিজা-সুন্দর চক্রবর্ত্তী (শ্যামসুন্দরের অনুজ) যখন আসিয়া আমাকে বলেন, অরবিন্দ বাঙ্গালায় একখানি সাপ্তাহিক পত্র—'ধর্ম্ম' প্রচার করিবেন, স্থির করিয়াছেন, তখন আমি বিস্ময়ানুভব করিলাম। অরবিন্দকে সে বিষয় জানাইলে তিনি হাসিয়া বলিলেন—"আপনি দেখিয়া দিবেন।" আমি "দেখিয়া" দিয়াছিলাম; কিন্তু সে কেবল ৩।৪ সপ্তাহের জন্য। আমি ভাষায় কোন পরিবর্ত্তন করিলে, তিনি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন। কয় সপ্তাহের পরে আর ভাষারও কোন পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইত না। ভাবের সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন যে কখন প্রয়োজন হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য।

অরবিন্দের দেশসেবার কারণ, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—দেশ স্বাধীন না হইলে দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে পারে না—জাতির আত্মোপলব্ধি সম্ভব হয় না। দেশসেবার মন্ত্র তিনি গীতায় পাইয়াছিলেন। সে বিষয়ে আর দুই জন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী—বঙ্কিমচন্দ্র ও বালগঙ্গাধর তিলক। অবশ্য এই সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের নাম করিতে হয়। তিনি তাঁহার মত গীতার শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—তাঁহার উপদেশ ও নির্দ্দেশ গীতা হইতে লব্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র, তিলক, অরবিন্দ ও বিবেকানন্দ গীতা শেষে সঞ্জয়ের উক্তিরই সমর্থক ছিলেন :—

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতি ধ্রুবা নীতি মতির্মম।"

যে স্থানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ (আধ্যাত্মিক শক্তি) ও ধনুর্দ্ধর পার্থ (বাহুবল) সেই স্থানেই শ্রী, বিজয়, উন্নতি ও নীতি বাস করে। কেবল বাহুবলে যেমন কেবল আধ্যাত্মিক শক্তিতেও তেমনই শ্রী, বিজয় প্রভৃতি লাভ করা যায় না।

যিনি গীতামুখে মানুষকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিয়াছেন অরবিন্দের মতে তিনি জ্ঞানগোচর ভগবান নহেন—তিনি আমাদিগের কর্মজগৎ পরিচালিত করেন, মানব তাঁহারই জন্য বিদ্যমান—তাঁহারই জন্য কাজ করে এবং তাঁহারই উদ্দেশে মনুষ্য-জীবন প্রবাহিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি—

(১) "অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্ম প্রয়োজন ব্যতীত যে হিংসা, তাহা হইতে নিবৃত্তিই পরম ধর্ম্ম। নচেৎ হিংসাকারীর নিবারণ জন্য হিংসা অধর্ম্ম নহে, বরং পরম ধর্ম্ম।"

(২) "আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম্ম, আত্মরক্ষার্থ বা পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা পরম অধর্ম্ম; আমরা বাঙ্গালী জাতি, আজি শত শত বৎসর সেই অধর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছি।"

বিবেকানন্দের উক্তি—

"অহিংসা ঠিক, নির্বৈর বড় কথা, কথা ত বেশ, তবে শাস্ত্র বলছেন, তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি ফিরিয়ে না দাও, তুমি পাপ করবে।··· অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে।"

অরবিন্দ বলিয়াছেন—

(১) "রাজনীতি ক্ষত্রিয়ের কার্য। ক্ষাত্র্য শক্তি ব্যতীত রাজনৈতিক সংগ্রাম ব্যর্থ হইবেই।"

(২) "যাঁহারা যুদ্ধকে পাপ ও আক্রমণকে নৈতিক অবনতি বলেন, গীতায় তাঁহারা সে কথার উত্তর পাইবেন।"

যাঁহারা বলেন, অরবিন্দ কখন সন্ত্রাসবাদের প্রবর্ত্তক ও সমর্থক ছিলেন না, তাঁহারা অসত্যের দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠার বৃথা চেষ্টা করেন। তবে অহিংসায় অবিচলিত থাকিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা যেমন অনেকেরই থাকে না—সন্ত্রাসবাদে অবিচলিত থাকিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তাহাও তেমনই অনেকেরই থাকে না। অরবিন্দ যাঁহাদিগকে সে বিষয়ে দীক্ষা দিয়াছিলেন, তাহারা আজ "অগ্নিযুগের" নায়ক বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেও তাঁহাদিগের অনেকেই বলিতে পারেন নাই—

"যথা অগ্নিহোত্র দ্বিজ দীপ্ত রাখে অগ্নি নিজ
চির দীপ্ত র'বে হুতাশন।"

যাঁহারা শক্তিশালী তাঁহারা ব্যর্থতায়—জাপানে বীররা যেমন "হারি-কিরি" করিয়া আত্মহত্যা করিতেন, এ দেশে তেমনই সন্ন্যাসী হইয়াছেন। আর যাঁহারা সেরূপ বীর ছিলেন না, তাঁহাদিগের দৌর্ব্বল্য শেষে—নানারূপ দণ্ডভোগের পরেও তাঁহাদিগকে বিদেশী সরকারের তুষ্টিসাধনে প্ররোচিত করিয়াছে। তাঁহারাই "আহত মৃগ" পুস্তিকা লিখিয়া ও বিদেশী শাসকজাতির মুখপত্রে প্রবন্ধে সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করিয়াছেন। তদপেক্ষা যে আত্মহত্যা ভাল ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। অরবিন্দ কখন তাঁহার রাজনৈতিক মত ভুল বলেন নাই—তাহা বর্জ্জনীয় এমন কথা বলেন নাই।

বলিয়াছি, অরবিন্দের দেশপ্রেম দর্শনের ও অধ্যাত্মবাদের সহিত সংযুক্ত ছিল। সেই জন্যই রাজনৈতিক অরবিন্দকে কবি রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ-আত্মার বাণী বলিয়া নমস্কার জানাইয়াছিলেন—"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার"। আর সেই জন্যই যিনি বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া আলীপুরের মোকর্দ্দমায় অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিয়া যশ ও জয় অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই চিত্তরঞ্জন মোকর্দ্দমায় বলিয়াছিলেন—ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন :—

মোকর্দ্দমার চাঞ্চল্য দূর হইবার দীর্ঘকাল পরে, আন্দোলন শেষ হইবার দীর্ঘকাল পরে, অরবিন্দের মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে লোক তাঁহাকে দেশপ্রেমের কবি বলিয়া দেশে ও বিদেশে মনে করিবে। তিনি জাতীয়তার বাণীদানকারী ও মানবজাতির বন্ধু বলিয়া বিবেচিত হইবেন। তাঁহার উক্তি সর্ব্বত্র ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হইবে।

চিত্তরঞ্জনের এই উক্তিতে সামান্য ভুল ছিল। অরবিন্দের তিরোভাব পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় নাই; তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার বাণী স্বদেশে ও বিদেশে ব্যাপ্ত ও শ্রদ্ধাসহকারে গৃহীত হইয়াছিল। য়ুরোপ ও আমেরিকা তাঁহার উপদেশামৃতে তাহাদিগের জড়বাদস্পৃষ্ট তৃষ্ণায় পীড়িত কণ্ঠ সরস করিয়া—সেই উপদেশামৃতের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল।

অরবিন্দ একদিন বিবেকানন্দের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, আজ আমরা তাঁহার সম্বন্ধে তাহাই বলিতেছি—আমরা চারি দিকে তাঁহার প্রভাব লক্ষ্য করিতেছি; তিনি কি ভাবে তাঁহার প্রভাব-দ্বারা কার্য্য পরিচালন করিতেছেন, তাহা আমরা সম্যক বুঝিতে পারি না বটে, কিন্তু সে প্রভাব আমরা অনুভব করিতেছি; তাই আমরা আজ বলিতেছি—অরবিন্দ মৃত নহেন—জীবিত; তিনি জনগণের মনে ও জগজ্জননীর অঙ্কে রহিয়াছেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

ভগবানের বিধানে আজ ভারতের হিন্দুরা বিশেষ দায়িত্ব লাভ করিয়াছেন। প্রতীচীর জাতিসমূহ আধ্যাত্মিক সাহায্যের জন্য ভারতের দ্বারস্থ হইতেছে। ভারতীয়দিগকে সেই কার্যের জন্য যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে।

সেই যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া অরবিন্দ প্রতীচীকে তাঁহার উপলব্ধির কমণ্ডলু হইতে উপদেশের অমৃত দিয়াছিলেন। তিনিও বলিয়াছিলেন, আজ যখন পৃথিবীর সর্ব্ব দেশের লোক আধ্যাত্মিক সাহায্যের জন্য ভারতের দ্বারস্থ হইতেছে, তখন যদি ভারতীয়গণ তাহাদিগের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ত্যাগ করে, তবে তাহা একান্তই পরিতাপের বিষয় হইবে।

সে সম্পদ অমূল্য ও অক্ষয়। সেই সম্পদের জন্যই ভারত অমর হইয়া আছে। যে রোমের সৈনিকপদভরে এক দিন পৃথিবী কম্পিত হইত, সে রোম আজ নামশেষ—তাহার পুনরুজ্জীবন মুসোলিনীর মত সাধারণ মানবের পক্ষে হাস্যোদ্দীপক চেষ্টা। যে গ্রীস য়ুরোপীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির প্রসূতি, সে গ্রীস আজ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত—সে নিদ্রার জাগরণ নাই। যে মিশর এক দিন নূতন সভ্যতায় সমুজ্জ্বল হইয়াছিল, সে মিশর আজ তাহার মরুকান্তারে পিরামিডের ও স্ফীঙ্কসের নিম্নে শবাকারে রক্ষিত। কিন্তু ভারতবর্ষ আজও জীবিত। তাহার আধ্যাত্মিকতাই তাহার অমরতার কারণ। নানা জাতির বিজয়-বাত্যা ও নানা দেশের আক্রমণের বন্যা ভারতের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে—বিলয়ভূয়িষ্ঠ-বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের মত করকাপাত ও বজ্রপাতে আপনাকে নিঃশেষ করিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষের ধ্বংস সাধিত হয় নাই।

সেই জন্যই যাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে মুগ্ধ হইয়া মনে করিয়াছিলেন—প্রতীচী ভারতবর্ষের উদ্ধার সাধন করিবে, তাঁহাদিগকে স্বামী বিবেকানন্দ কম্বুনাদে বলিয়াছিলেন—প্রতীচীর ধর্মগুরুরা এ দেশে আসেনও নাই, আসিবেনও না—"তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার সময় নাই।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি "নববলমধুপানমত্ত, হিতাহিতবোধহীন হিংস্রপশু-প্রায় ভয়ানক, * * জড়বাদী, জড়সহায়, ছলে বলে কৌশলে পরদেশ, পরধনাপহরণপরায়ণ, পরলোকে বিশ্বাসহীন, দেহাত্মবাদী, দেহ-পোষণৈকজীবন" প্রতীচীকে বলিয়াছিলেন,—"আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।"

সেই দিবার দ্রব্য—আধ্যাত্মিকতা। তাহাতেই ভারতের জগৎ-জয়ের স্বপ্ন বিবেকানন্দ দেখিয়াছিলেন। আর সেই জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ—বঙ্কিমচন্দ্রের মা'র ধ্যানে মগ্ন হইয়া বিশ্বাসবশে গাহিয়াছিলেন !—

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।"

তাঁহারা কালের গতি অবজ্ঞা করেন নাই; জানিতেন, আবার শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুযুধান কৌরব ও পাণ্ডবচমূর মধ্যে অর্জ্জুনের জয়রথে সমাসীন হইবেন না; কিন্তু গীতার উপদেশ আমাদিগের সমুন্নতির জয়যাত্রায় তূর্যনাদ করিবে।

অরবিন্দ—দার্শনিক বুদ্ধিবলে—বুঝিয়াছিলেন, হিন্দুর বর্ণবিভাগের বিশেষ সার্থকতা আছে—তাহা মানব-চরিত্র-সম্মত। সাধুর জন্য যে আদর্শ তাহার সহিত যদি যোদ্ধার—কর্মীর আদর্শ এক করা হয় আর বৈশ্যের আদর্শ ও দাসের আদর্শ মিশ্রিত হয়, তবে বর্ণ-সঙ্করের উদ্ভব হয়—জাতির সর্ব্বনাশ হয়। যখন তমঃ জাতিকে জাড্যবিহ্বল করে, তখন তাহার চেতনা ফিরাইয়া আনিবার জন্য রজঃ প্রয়োজন হয়। রজঃ হইতে ঘৃণারও উদ্ভব হয়। আর রজঃ হইতে মানুষ সত্বে উপনীত হইতে পারে।

হিন্দু দর্শনের এই সত্য অরবিন্দ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মানুষ

আধ্যাত্মিকতার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারে। কর্ম্মযোগ তাহাকে সেই পূর্ণ পরিণতির জন্য প্রস্তুত করে। কর্ম্মযোগের দ্বারা মানুষ ভগবানের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে পারে এবং আপনার নরদেহ ভগবানের কার্য্যের জন্য উৎসর্গ করে। অরবিন্দ বলিয়াছিলেন :—

ধ্বংসের ক্ষেত্রে অর্জ্জুনসারথির রথচালন কর্ম্মযোগ। কারণ, এই দেহই রথ—প্রবৃত্তি সে রথের অশ্ব। জগতের রক্তসিক্ত কর্দমাক্ত পথে শ্রীকৃষ্ণ মানবের আত্মাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যায়েন।

যে জীবিত হইয়াও জীবন্মুক্ত হয়, সেই দিব্য জীবনের সন্ধান পায়; এবং সেই জীবনে প্রবেশ করিতে পারে। প্রবৃত্তি স্বাভাবিক —নিবৃত্তিতে নীত হইবার পথ প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া প্রসারিত।

অরবিন্দ আপনার সাধনার দ্বারা দিব্য জীবনের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন এবং মানবের কল্যাণকল্পে সেই সন্ধানের সুযোগ মানুষ-মাত্রেরই অধিগম্য করিয়া গিয়াছেন। তাহাই অরবিন্দের বৈশিষ্ট্য।

অরবিন্দের জীবন বিস্ময়করের সমাবেশে সমুজ্জ্বল। তাঁহার মাতামহ রাজনারায়ণ বসু সেকালের হিন্দু কলেজের যশস্বী ছাত্র—ইংরেজীতে সুশিক্ষিত। সেই জন্য তিনি হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিলেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"বেকন পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত।" যে সময় ইংরেজীশিক্ষিত বাঙ্গালীরা দেশের সকল সংস্কার কুসংস্কার মনে করিতেন—যে সময় হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের আকাঙ্ক্ষা ছিল—ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখিবেন, সেই সময়ের রাজনারায়ণ এ দেশে "জাতীয়তার পিতামহ।" কিন্তু অরবিন্দের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ সর্ব্বতোভাবে ইংরেজের অনুকরণকারী ছিলেন এবং পুত্রদিগকে ইংরেজী প্রভাবে লালন-পালনের ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে বিদেশে বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত অরবিন্দ কিন্তু সর্ব্বতোভাবে ভারতীয় ছিলেন। তিনি যে অশ্বারোহণের পরীক্ষা না দেওয়ায় ইংরেজের চাকরী লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার ইচ্ছাকৃত কি না, তাহাও বলা যায় না।

স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি ভারতীয় ভাবের অনুশীলন করিতে আরম্ভ করেন; যোগাভ্যাস করিতে থাকেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে তিনি প্রথমে বরদা সামন্তরাজ্যে কয় বৎসর অতিবাহিত করেন; কিন্তু বাঙ্গালাতেই কার্য্যক্ষেত্র বাছিয়া বাঙ্গালায় আগমন করেন। কারণ, বাঙ্গালায় প্রথম রাজনীতিক মুক্তির আগ্রহ দেখা দিয়াছিল; জাতীয় উন্নতির স্বপ্ন রাজনারায়ণ দেখিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ দেশে জাতীয়তার জনক। মাতৃমন্ত্র জাতিকে বঙ্কিমচন্দ্র দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালায় আসিয়া অরবিন্দ যে গঠনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন, তাহার লক্ষ্য—স্বাধীনতা লাভ। বিদেশী শাসনে ও শোষণে দেশ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, তাহাতে জাতির পক্ষে আত্মোপলব্ধি দুঃসাধ্য—আত্মোপলব্ধি ব্যতীত পূর্ণ পরিণতি অসম্ভব; কারণ, অনুকরণ সে পরিণতির প্রধান অন্তরায়।

স্বাধীনতা লাভের জন্য অরবিন্দ যে গঠনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। স্বাধীনতা যখন প্রথম প্রসূত হয়, তখন তাহাকে স্তন্য দিতে হয়; সে যদি দুগ্ধের পরিবর্ত্তে রক্ত চাহে—তবে, তাহাকে তাহাই দিতে হয়—তাহা অনিবার্য। হিংসা যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃতিগত নহে—ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। সেই জন্যই তিনি বলিতেন—যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের কার্য্য এবং যুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের নীতিই ব্যবহার্য। তিনি বলিয়াছেন, বিশ্বাসঘাতককে দণ্ড না দিলে—কর্ম্মহানি অবশ্যম্ভাবী।

অরবিন্দ যখন রাজনীতিক্ষেত্রে কার্য্যারম্ভ করেন, তখন তিনি যোগাভ্যাস করেন—তখন তিনি গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন। এই গুরুকে আমরা এক বার কলিকাতায় দেখিয়াছিলাম।

যখন অরবিন্দ পূর্ণোদ্যমে রাজনীতিক কার্য্য পরিচালিত করিতেছিলেন, সেই সময় ইংরেজ শাসকরা তাঁহাকে দণ্ড দিবার আয়োজন করেন। এক বার আদালতে অভিযুক্ত হইয়া মুক্তিলাভের পরে অরবিন্দকে কলিকাতার উপকণ্ঠে মানিকতলায় (মুরারিপুকুর) বাগানে বোমার কারখানা সম্বন্ধীয় মামলায় জড়াইয়া অভিযুক্ত করা হয়।

অরবিন্দ বলিয়াছেন, সেই সময় কারাগারে তাঁহার ভগবদ্দর্শন হয়। অরবিন্দ বলিয়াছেন, যিনি খণ্ড ভারতকে অনাচার ও অত্যাচার হইতে মুক্ত করিয়া মহাভারতে পরিণত করিবার জন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন এবং ত্রিতাপতপ্ত মানবকে চিরদিনের জন্য কর্ত্তব্য পথের সন্ধান দিয়াছিলেন, সেই কংসকারাগারে শৃঙ্খলিতা জননী কর্ত্তৃক প্রসূত শ্রীকৃষ্ণ কারাকক্ষে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। ফলে—রাজনীতি ও ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন হইয়া যায়।

কিন্তু পরাধীন ভারতে অরবিন্দের মতপ্রচার অসম্ভব বুঝিয়া তিনি ইংরেজ-শাসিত ভারত ত্যাগ করিয়া যাইয়া স্বদেশের মুক্তির জন্য শক্তি প্রযুক্ত করেন। এই বিষয়ে ইটালীর মুক্তিদাতারা তাঁহার পূর্ব্বগামী এবং সুভাষচন্দ্র তাঁহার পরবর্ত্তী। ইঁহারা সকলেই—অরবিন্দের মত—বাধ্য হইয়া স্বদেশের জন্য স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশ হইতে স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রাম পরিচালিত করিয়াছিলেন।

অরবিন্দ আর তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। সুভাষচন্দ্র আজ কোথায় কে বলিবে?

অরবিন্দ কখন তাঁহার রাজনীতিক মত পরিবর্ত্তিত করেন নাই। যখন দেশ ভারত ও পাকিস্তানে বিভক্ত করিয়া স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত করা হয়, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—এ কি হইল? এ ত পূর্ণ স্বাধীনতা নহে। দেশ আবার সংযুক্ত ও এক হইবে।

আজ দেশবিভাগের ফলে নানারূপ দুর্দ্দশায় পীড়িত জনগণ বলিতেছে—তাহাই হউক।

অরবিন্দ বাঙ্গালায় (কলিকাতায়) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালাকেই তিনি প্রথমে তাঁহার সাধনার ক্ষেত্র করিয়াছিলেন। সেই সাধনার সিদ্ধি গঙ্গার কূলে হইতে পারে নাই—অনন্ত সমুদ্রের তরঙ্গতাড়িত বেলাভূমিতে—পণ্ডিচেরীতে—হইয়াছিল।

অরবিন্দ সেই সিদ্ধির ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া আসেন নাই। তথায় তিনি যে আশ্রম রচনা করিয়াছিলেন, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা তাঁহার সাধনায় সঞ্জীবিত। দেশ-বিদেশ হইতে বহু ভক্ত তথায়—তীর্থক্ষেত্রে গমন করিয়া থাকেন।

তথায় অরবিন্দের নরদেহ সমাধিস্থ হইয়াছে। হয়ত কালে সেই স্থানই অরবিন্দের অসংখ্য ভক্তের তীর্থস্থানরূপে বিরাজ করিবে।

অরবিন্দ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের সমন্বয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি আধ্যাত্মিকতার উৎসসন্ধান দিয়াছেন। আজ তিনি আর নরদেহে আমাদিগের মধ্যে নাই; কিন্তু তাঁহার সাধনার সিদ্ধিফল মানবজাতির অমূল্য সম্পদ। সেই সম্পদ মানুষকে আকৃষ্ট করিতেছে ও করিবে। যদি তাহা শ্রদ্ধাসহকারে যথাযথভাবে গৃহীত হয়, তবে জগতের অসীম কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

রোদেনষ্টিন একবার বড় দুঃখেই বলেছিলেন, সেক্সপীয়ার ও গ্যেটের পর রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় পৃথিবীর শেষ কবি। কথাটা অবশ্যই তাৎপর্য্যপূর্ণ। কিন্তু পৃথিবীর কথা বাদ দিয়ে এবং মহাকবির গুণাবলীর প্রশ্ন না তুলেও, এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, সমসাময়িক রবীন্দ্রোত্তর যুগে মোহিতলাল ছিলেন বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা, এবং বর্ত্তমান কালের কবিকুলের অগ্রজ শেষ কবি।

দান্তে কাব্য-রচনা সম্পর্কে যে তিনটি প্রকৃষ্ট বিষয় উল্লেখ করেছিলেন, সেই শৌর্য্য, বীর্য্য আর প্রেম, (Salus, Virtus and Amore) প্রধানতঃ এই তিনটি ভাব-বিভাবের মধ্যেই মোহিতলালের কাব্য-সাধনার সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ দেখা যায়। বর্ত্তমান এই সংশয়-বাদের যুগেও একটা সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে রূপ-রস-গন্ধকে তিনি আস্বাদন করেছেন,—প্রকট করেছেন তাকে রসোত্তীর্ণ কাব্যরূপ দিয়ে। প্রথম জীবনে দেহাতীত, অতীন্দ্রিয় ও অলৌকিকের উপর আস্থা ছিল তাঁর অল্পই, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে নিঃশ্রেয়সের সন্ধানে তিনি হাত বাড়ান—attitude বদলান। 'Poetry is the criticism of life' বলতে যা বোঝায়, ম্যাথ্ আর্ণল্ডের সেই অমোঘ বাণী জীবনশিল্পী মোহিতলাল পালন করে গেছেন অক্ষরে অক্ষরে—পৃথিবীর সমূহ নয়নানন্দ রূপৈশ্বর্য্য, শ্রবণানন্দ কাব্যরসের মাধ্যমে লীলায়িত মুখর হয়ে উঠেছে তাঁর সুনিপুণ লেখনীস্পর্শে।

কেবলমাত্র কাব্যের মধ্যেই নয়, সাহিত্যেও, বিশেষভাবে সমালোচনা-সাহিত্যে তাঁর স্বকীয় চিন্তাধারার স্বাক্ষর চিরকাল বঙ্গ-সাহিত্যে আলোচনার বিষয় হয়ে থাকবে। মোহিতলালের দৃষ্টিভঙ্গীর স্বকীয়তার মধ্যে বিশেষ অনুধাবন করার বিষয় হ'ল তাঁর স্বধর্ম্মনিষ্ঠা। জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তিনি স্থান দিয়েছেন সবার ঊর্দ্ধে। ভাষার ক্ষেত্রে পূর্ব্বাচার্য্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেও, সুধীন্দ্রনাথ দত্তপ্রমুখ কয়েকজন প্রবন্ধকারের নীরসতম গাম্ভীর্য্যকে তিনি অতিক্রম করেছেন অনপেক্ষ স্পষ্টতায়। তাঁর গদ্যরচনায় রীতিবৈচিত্র্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক কথায় গৌড়ী রীতি ও বৈদর্ভী রীতির সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন মোহিতলাল তাঁর সাহিত্য ও সমালোচনা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ভাবের দিক থেকে কাব্য-জগতে প্রথম আমরা তাঁর দেখা পাই রোমাণ্টিক কবি হিসাবে—সংস্কারমুক্ত নতুনত্ব নিয়ে। এই নতুন সঙ্গীতের ঝঙ্কার তৎকালীন নবীন কাব্যরসপিপাসুদের মধ্যে এক চমকপ্রদ আলোড়ন সৃষ্টি করে। কিন্তু তা'হলেও, সংস্কৃত শাস্ত্র-সংস্কৃতি,—শব্দের ব্যুৎপত্তি, পদসাধনের পদ্ধতি, পদান্বয়ের প্রক্রিয়া ও ভাষার নিয়ম থেকে কোথাও তিনি বিচ্যুত হননি।

মোহিতলালের প্রথম কাব্য-গ্রন্থ 'স্বপনপসারী' প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালে। 'স্বপনপসারী'র কাব্যসমূহ তৎকালীন তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সাগ্রহে আবৃত্ত হতে থাকে। প্রাণের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও জৈব-জীবনের যা কিছু প্রয়োজন—অতীন্দ্রিয়ে আস্থাহীন, ইন্দ্রিয়সুখবাদী মোহিতলাল 'স্বপনপসারী'র মধ্যে তুলে ধরেন অসঙ্কোচে। 'স্বপনপসারী'র পর আমরা কবিকে পাই তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিস্মরণী'র মধ্যে। এই দুই গ্রন্থের প্রকাশ-ব্যবধান যেমন দীর্ঘ, তেমনি 'স্বপনপসারী'র কবির সঙ্গে 'বিস্মরণী'র কবির পার্থক্যও দেখা যায় বহুল পরিমাণে। রবীন্দ্র-প্রভাবের মধ্যে দিয়েই কাব্যলক্ষ্মীকে তিনি নব রম্যপথে পরিচালিত করেন 'বিস্মরণী'র মধ্যে। সমূহ আবর্জ্জনা দূর করে খাঁটি রস-সৌন্দর্য্যের (Pure aesthetic) দিক থেকে এখানে সমস্ত কাব্যকে রূপায়িত করেছেন তিনি। খাঁটি কবি তিনি এখানে। সমাজ-সমস্যার সঙ্গে এখানে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই, রসজ্ঞানে নেই কোন সঙ্কীর্ণতা। প্রকৃত ভারতীয় আলঙ্কারিকদের রূপ ফুটে উঠেছে তাঁর 'বিস্মরণী'র পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে। পুলকপ্রাচুর্য্যে ইতিহাসের পাতা থেকে, জীবনের খাতা থেকে, নাম না জানা

কত গাথা, কত কথা শৌর্য্যে-বীর্য্যে-প্রেমে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে তাঁর হৃদয়-মুকুরে—প্রতিফলিত হয়েছে সুমধুর কাব্যে।

'বিস্মরণী' প্রকাশিত হয়, 'স্বপনপসারী'র পাঁচ বৎসর পরে। কবি ১৩১৬ সাল থেকে যে সাহিত্য-সাধনা সুরু করেছিলেন 'মানসী', 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে, তার সার্থক প্রকাশ দেখা দেয় এই দু'খানি কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে। ক্রোচের কথায়, 'আবেগের যন্ত্রণা থেকে ধ্যানের স্থৈর্য্যমুখে অভিযান' কবির এখান থেকেই।

'স্মরগরল'কে পাই আমরা এরও অনেক পরে। ১৩৮৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 'স্মরগরল' প্রকাশিত হয়। 'বিস্মরণী'র পান্থ 'যম ও নচিকেতা' কবিতায় যে সুর ধ্বনিত হয়েছিল, তা এসে পরিণতি লাভ করে 'দিন-শেষে', 'বুদ্ধ'-তে। 'স্বপনপসারী'র কবি এখানে শান্ত, সমাহিত। একটা জিজ্ঞাসা, বিস্ময় জেগেছে তাঁর মনে। 'নিশি-ভোর' হয়ে আসছে, 'দিন-শেষ' হয়ে যাচ্ছে, 'শেষ-শিক্ষা' গ্রহণ করতে হবে, এখন আর ধরণীর পেয়ালায় মোহের মদিরা পান করার সময় নয়, ধরণীর স্তনযুগ ক্ষত ক'রে দেবার সময় নয়, (এই কথাগুলি সবই যে কবির কবিতার নাম ও পঙক্তি ভেঙে বলা হয়েছে, আশা করি রসিক পাঠক তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন) এখন কেবল জড়দেহের পূজারী নন তিনি, এখন তাঁর ধ্যানলোকে অন্য জগৎ, অনন্যতন্ত্রে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এখানে তিনি আর্য্যঋষির সন্তান, সনাতনধর্ম্মী শক্তিমান, প্রতিষ্ঠ দার্শনিক। তাঁর স্বপনপসারী, বিস্মরণী ও স্মরগরল এই ত্রয়ী কাব্যগ্রন্থের মধ্যে প্রধানতঃ দ্বিবিধ ভাবই প্রকট দেখা যায়, এবং তার জন্যে 'রূপ-মোহ', 'নারীস্তোত্র', 'বসন্ত বিদায়', 'অঘোরপন্থী', 'মোহমুদ্গর' ও 'স্বপ্নসঙ্গিনী' প্রভৃতিগুলি নির্দ্দেশ করে একটি ভাবতরঙ্গের, এবং 'প্রেম ও জীবন', 'নিশিভোর', 'রুদ্রবোধন', 'নির্ব্বাণ', 'অগ্নি-বৈশ্বানর', 'মৃত্যু ও নচিকেতা', 'আহ্বান', 'কালাপাহাড়' ইঙ্গিত করে অন্য মন্ত্র-সম্পদের।

মোটের উপর মোহিতলালের সমগ্র কাব্য-রচনার মধ্যে ক্ল্যাসিসিজম ও রোমান্টিসিজিমের অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখা যায়। এবং মূলতঃ এই সমন্বয়ের মধ্যেই প্রতিভাত হয়েছে শৌর্য্য, বীর্য্য ও প্রেমের প্রকাশ—ভাব, ভাষা ও ছন্দের উজ্জ্বল স্বকীয়তা।

গদ্যে-পদ্যে উভয় স্থলেই সাহিত্য-সাধক মোহিতলালের ভাবগর্ভ রচনা, প্রাঞ্জল ভাষার ছটা ও বিচারবুদ্ধিশীল বিশ্লেষণী মন বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। 'বাংলা কবিতার ছন্দ', 'সাহিত্য-বিতান', 'জীবন-জিজ্ঞাসা', 'রবি-প্রদক্ষিণ', 'কবি শ্রীমধুসূদন', 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস', 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ রচনা ও কাব্যগ্রন্থ যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই তাঁর স্বাতন্ত্রিক চিন্তাবিন্যাস, অবজেকটিভ দৃষ্টি ও কাব্যাদর্শের গভীরতা দেখে মুগ্ধ হবেন। তাঁর প্রবন্ধকার ও সমালোচকের জীবন আরম্ভ হয় প্রকৃতপক্ষে 'শনিবারের চিঠি' মাসিক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ১৩৩১ সাল থেকে। অবশ্য ইতঃপূর্ব্বে 'প্রবাসী' বা অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ একেবারে প্রকাশলাভ যে করেনি তা বলছি না, কিন্তু ধারাবাহিকভাবে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীই তাঁকে বিশেষভাবে প্রবন্ধকার ও সমালোচক হিসাবে খ্যাত করে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপর ও সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেন উক্ত পত্রিকায়। এবং ক্রমশঃ তিনি উক্ত 'শনিচক্রে'র নেতা হিসাবে পরিগণিত হন। তাঁর প্রবন্ধের ভাষা ভাবের অপূর্ব্ব অনুগামী এবং একটা নিজস্ব ষ্টাইলে প্রাণবন্ত। প্রবন্ধ-সাহিত্যের যে সার্থকতা নির্ভর করে বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ, যুক্তির সুসঙ্গতি ও সমস্যার সমাধানে, তার মনোজ্ঞ সৌকর্য্য দেখা যায় মোহিতলালের রচনার মধ্যে। 'আর্ট অব ক্রিটিসিজিম' বিদ্যার সূক্ষ্মতত্ত্ব ছিল তাঁর করায়ত্ত। প্রয়োজনীয় বাক্যবিন্যাস ব্যতীত প্রবন্ধের মধ্যে ভাবাবেগ বা উচ্ছাস কোথাও তাঁর বক্তব্যকে দুর্ব্বল হতে দেয়নি। এই প্রবন্ধ বা সমালোচনা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর নৈরপেক্ষ্য নীতি তিনি পালন করেছেন সর্ব্বত্র। এখানে তাঁর গর্বিত-চিত্ত কোন কারণে উৎখাত বা দীর্ণ হলেও, নত হয়নি—কোন সহযোগিতার ভাব দেখায়নি কোন কারণে। Dumount Wildon-এর মতই এখানে তিনি কঠোর সমালোচক—বকধার্ম্মিক বা মিষ্টিক নন।

মোহিতলাল তাঁর সাহিত্য-সাধনায় এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও প্রেরণা লাভ করেন তাঁর পিতৃপুরুষের কাছ থেকে বংশানুক্রমে। কবি ঈশ্বরগুপ্ত ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে তিনি আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। এছাড়া মোহিতলালের পিতারও ছিল ফার্সী ও ইংরেজী কাব্যে প্রগাঢ় অনুরাগ। মোহিতলালের পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার বলাগড় গ্রামে হলেও, তিনি জন্মগ্রহণ করেন নদীয়া জেলার কাঁচরাপাড়ায় তাঁর মাতুলালয়ে, ১২৯৫ সালের ১১ই কার্ত্তিক (ইং ১৮৮৮)। কিন্তু তিনি এন্ট্রাস পরীক্ষা দেন বলাগড় ইংরেজী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে, (১৯০৪ সালে) এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্ত্তি হন। ইংরেজী ১৯০৮ সালে তিনি সসম্মানে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কাব্যপাঠে অনুরাগ মোহিতলালের অল্পবয়স থেকেই দেখা দেয়। স্কুলে অধ্যয়নরত অবস্থাতেই তিনি প্রচুর সাহিত্য-গ্রন্থ ও রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। কলেজ-জীবনে তাঁর সাহিত্যানুরাগ আরও ব্যাপকভাবে প্রকাশলাভ করে। ইংরেজী-কাব্যের ভাব-সমুদ্রে তিনি অবগাহন করেন। দেশীয় কবিসমূহের মধ্যে মাইকেল, নবীন সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল, গোবিন্দদাস ও রবীন্দ্রনাথের রচনা তাঁকে মুগ্ধ করে। এবং তাঁদেরই রচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নিজে নিভৃতে কাব্যচর্চ্চা করতে আরম্ভ করেন। উক্ত সময় কিয়ৎকাল তাঁকে সাংসারিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়ে দারুণ আর্থিক দুরবস্থা ভোগ করতে হয়। ১৯১৪ সালে অবস্থাগতিকে অস্থায়িভাবে তিনি একটি সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন, কিন্তু পরে উক্ত কাজে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় শিক্ষকতার কার্য্যে যোগ দেন। কলকাতায় অবস্থান তাঁর সাহিত্যচর্চ্চার পক্ষে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। এই সময়ই তিনি 'ভারতী' গোষ্ঠী, ও তৎকালীন বিভিন্ন পত্রিকা ও সাহিত্য-দলের সঙ্গে পরিচিত হন, এবং নানা পত্রিকায় নিয়মিত কবিতাদি লিখতে থাকেন। ইতোমধ্যে তাঁর 'স্বপনপসারী' ও 'বিস্মরণী' নামক দু'খানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় খ্যাতির ক্ষেত্রও যথেষ্ট প্রসারলাভ করে।

১৩৩৫ সালে মোহিতলাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা-সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এইরূপ জনশ্রুতি যে, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার

যে এই ব্যাপারে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৩৪৩ সালে ঢাকায় অবস্থান কালে তাঁর প্রথম সাহিত্য-পুস্তক 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' প্রকাশলাভ করে। দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাদান করার পর তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু এই শিক্ষকতা জীবনের মধ্যেও সাহিত্যচর্চ্চা একদিনের জন্যও তাঁর স্থগিত থাকেনি। সত্যিকার তাঁর আনন্দ ছিল, উৎসাহ ছিল এই সাহিত্যচর্চ্চার মধ্যে। সাহিত্যের কথা উঠলে দশজনের মধ্যে তিনি একাই মুখর হয়ে উঠতেন—একটা উত্তেজনা বোধ করতেন। সাহিত্যিকদের যদিও মনে-প্রাণে তিনি শ্রদ্ধা করতেন বটে, কিন্তু সাহিত্যাদর্শে যাঁদের নিষ্ঠা নেই, যাঁরা ফাঁকি দিয়ে সাহিত্যে নাম-কেনার পক্ষপাতি, তাঁদের তেমনি তিনি ঘৃণা করতেন অন্তরের সঙ্গে! নিজ মতবাদে তিনি এমনই বলিষ্ঠ ছিলেন যে, কখনো কোন অবস্থাতেই একটি মত পোষণ করে তা থেকে বিচ্যুত হতেন না—সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যেও অবিচলিত থাকতেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁর পরিচিত কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে এইভাবে মতদ্বৈধ ঘটায় তিনি তাঁদের সংসর্গ একেবারে ত্যাগ করে একপ্রকার নির্জ্জনবাসই শ্রেয়: মনে করেছিলেন।

তাঁর সাহিত্যানুরাগের অন্যতম প্রকাশ হিসাবে শেষদিকে কিছুকাল তাঁকে আমরা দেখি 'বঙ্গদর্শন' ও 'বঙ্গভারতী' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদকরূপে। উক্ত পত্রিকা দুটির মধ্যে তিনি তাঁর বহু গবেষণা-মূলক রচনা প্রকাশ করেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত প্রাচীন 'বঙ্গদর্শনের' কৌলীন্য রক্ষা করার চেষ্টা করেন।

এখানে তাঁর চরিত্রের আর একটি বিশেষ দিক আলোচনা করা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এটিও হচ্ছে তার চরিত্রের শৌর্য্য-বীর্য্যের দিক। অভাবের সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছে, বিরুদ্ধ শক্তির সামনাসামনি তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছে, কিন্তু এ যুদ্ধে কখনো তিনি পরাঙ্মুখ হননি—নতি স্বীকার করেননি কখনো। এই বিশেষ বলবীর্য্যের দিকে প্রবণতাই তাঁকে নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল করেছিল, এবং ভারতের রাজনৈতিক জগতের অন্যান্য ব্যক্তিগণ অপেক্ষা নেতাজীর স্থান ছিল তাঁর কাছে সবার উপরে। সে কারণ নেতাজীর জীবনের উপর তিনি বৃহৎ একখানি গ্রন্থও রচনা করে গিয়েছেন। আসলে, বাঙালী ও বাংলার ভগ্নোন্মুখ সাংস্কৃতিক অবস্থাকে উন্নত করার জন্য কাব্যে-সাহিত্যে এমন সার্থক সবল প্রচেষ্টা ইদানীন্তন কালের মধ্যে খুব কদাচিৎ দেখা যায়। বাংলা গদ্য, পদ্য ও সমালোচনা-সাহিত্যের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার যে বিশুদ্ধ চিন্তার খোরাক দিয়ে গেছেন, আশা করি ভবিষ্যতে বিদগ্ধরসিক জন তার তত্ত্ব আরও গভীরভাবে ও সহানুভূতির সঙ্গে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস

রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় একদিন আদিসমাজ দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিন জন উপাসনা করিতেছিলেন। পরমহংস উপাসনার পর বলিলেন, "এই তিন জনের ভিতর এক জনকে দেখে বুঝিতে পারিলাম ইঁহারই হইয়াছে।" তারপর তিনি কেশবের সঙ্গে ভাব করেন। তার পর থেকে আমাদের বাড়ীতে আসিতেন, ঐ তেতলার ঘরে প্রথম আমি তাঁহাকে দেখি। কেশবের কাছে এসে তিনি কেশবের হাতে ধরে নাচিতেন ও গান গাহিতেন। আর একদিন কমলকুটীরে মাঘোৎসবের সময় বরণের দিন, সংকীর্ত্তনের পর আমি বলিলাম, "আপনি কিছু খান।" তিনি খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "হাঁ, মা বলিয়া দিয়াছিলেন, কেশবের বাড়ী থেকে একখানি জিলিপী খেয়ে আসিস্।" আমি একখানি জিলিপি দিলাম, তিনি হাত কাত করিয়া লইয়া খাইলেন (তিনি হাত সোজা করিতে পারিতেন না)। তারপর যখন চলিয়া যান, কেশবকে বলিলেন, "দেখ কেশব, আমি যখন আসি, মা বলিয়াছিলেন 'কেশবের বাড়ীতে যাইতেছ, একটি কুল্‌পী বরফ খেয়ে এসো'।" তখন সেখানে কুল্‌পিওয়ালা ছিল না, কেশব কুল্‌পী কোথায় পান ভাবিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ একজন কুল্‌পিওয়ালা আসিল; একটি কুল্‌পী কেশব দিলেন, তিনি খুব আহ্লাদ করিয়া খাইলেন। সেই বরণের দিন সংকীর্ত্তনের সময় কেশব ও পরমহংস অনেকক্ষণ হাত ধরাধরি করিয়া নাচিলেন। কীর্ত্তন শেষ হইয়া গেলে তিনি আমায় বলিলেন, "ত্যাখ মা, তোর যত নাড়িভুঁড়ি নিয়ে পৃথিবীর লোকে এর পরে নাচবে। তোর ঐ ভাণ্ড থেকে এই ছেলে বেরিয়েছে।"

তাঁহাকে আমার বড় ভাল লাগিত। আমি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যাইতাম। তিনি কত যে ভাল ভাল কথা বলিতেন তাহা এখন আমার সব মনে নাই। একবার বলিয়াছিলেন, "দেখ মা, ভায়ে ভায়ে দড়ি ধরে মাপে, আর বলে, এই দিক্‌টা তোর আর ঐ দিক্‌টা আমার। কিন্তু কার যায়গা মাপ্‌ছে আর কেই বা নেয়, সেটা কিছু ঠিক্ করে না।" আর একদিন দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আমি ও কেশব যাই, তিনি অনেক কথার পর আমায় বলিলেন, "ত্যাখ্ মা, আমি অনেক কষ্টে মাকে ধরেছি, কিন্তু কেশবের সঙ্গে মিশে সেটুকু যায় বুঝি আমি শেষে এসে নিরাকারে পড়ি।" এই রকম যে কত কথা হইত তার শেষ নাই। কিন্তু এখন সব মনে আসিতেছে না।

—(কেশবচন্দ্রের মাতৃদেবী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মজীবনী হইতে)

কবি অতুলপ্রসাদ

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

অনেক গ্রীক দার্শনিক বলিয়াছেন—একই নদীতে দুই বার অবগাহন করিতে পার না। এক বার অবগাহন করিবা মাত্র সেই স্রোতস্বতী নদীর জল বহু দূর চলিয়া গিয়াছে; তাহাকে ডাকিলে ফিরানো যায় না। যেদিন চলিয়া গিয়াছে, রায় রামানন্দ বলিয়াছেন, যদি সেদিন আবার পাওয়া যাইত তাহা হইলে হীরকে বাঁধিয়া তাহাকে রাখিয়া দিতাম।

আমার এই ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা হয়তো কাহারও কাহারও মনে আনন্দ দিতে পারে। অন্ততঃ আমি যে ছবিগুলি আঁকিবার প্রয়াস করিতেছি তাহার বর্ণচ্ছটা কোনও লোকের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে। আমি সেই জন্য, অতুলপ্রসাদের বিশেষ কৃতিত্বের কথা বলিব না, কেবল আমার জীবনের সঙ্গে তাঁহার যেখানে যেখানে যোগ হইয়াছিল তাহার কথা আমি বলিতে চাহিতেছি। প্রথম যখন তাঁহার সঙ্গে দেখা হয়, তখন আমি পঠদ্দশা অতিক্রম করিতে পারি নাই। দেখা হইয়াছিল ওভারটুন হলে—এক সভায়। অতুলপ্রসাদ তখন যুবক; সভাস্থ সকলের মধ্যে আমার কেন জানি না অতুলপ্রসাদের মুখখানি বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল। তার পর অনেক বার তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছে। দিলীপ রায়ের সঙ্গে তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম মধুপুরে। অনেক বার তাঁহার গান শুনিয়াছি। এমন কোমল কণ্ঠস্বর দরদে ভরা অথচ মিষ্টত্বে অতুলনীয়—এমন কণ্ঠস্বর আমি আর শুনি নাই। তিনি অপেক্ষাকৃত নীচু স্বরে গান করিতেন, কিন্তু তাহার সুরগুলি অনেক সময়ে নিজের ভাব ও ব্যঞ্জনার অকস্মাৎ সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে মধুর হইয়া উঠিত। আমার ১০ নং ডোভার লেনের বাড়ীতে তিনি গান করিয়াছেন। দিলীপ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং নাটোরের বর্ত্তমান মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গত করিয়াছিলেন। যেমন গান অপূর্ব্ব, তেমনই সঙ্গত সুন্দর। উভয়ে মাখামাখি হইয়া যে মধুর পরিবেশের সৃষ্টি করিল—তাহার রেশটি এখনও আমার কানে লাগিয়া আছে। আমার বোধ হয় অতুলপ্রসাদ বহু দিন লক্ষ্ণৌ থাকায় হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণী ও তান-লয়ের উপর তাঁহার বেশ আধিপত্য জন্মিয়াছিল। এই জন্যই কি তাঁহার সুর এত লাবণ্যপূর্ণ ও মধুর হইত?

অতুলপ্রসাদ আমাকে একবার ৬ নং চেষ্টার রোডে অর্থাৎ সার কে, জি, গুপ্তের বাড়ীতে গান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। আমি সেখানে গিয়া দেখিলাম—ঘর-ভরা মহিলা ও অল্প কয়েক জন পুরুষ। আমার কেমনই ইচ্ছা হইল, আমি সেখানে ৺ব্রজবাসীর সঙ্গতের সঙ্গে রাসলীলা গান ধরিয়া দিলাম। ইহার এক কারণ এই যে, রাস গানের সুরগুলি সহজবোধ্য ও মধুর। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, রাসলীলা নাম শুনিতেই অনেকের নাসিকাগ্র ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। কিন্তু রাস গানে এরূপ কোনও ভাব নাই। তাহাই দেখাইবার জন্য আমি রাস গান করিয়াছিলাম। গায়ক ইচ্ছা করিলেই অবশ্য তরল রস মিশাইতে পারেন। কিন্তু ভগবল্লীলা হিসাবে গান করিলে ইহার মতো শুদ্ধ ও পবিত্র আর কিছু হইতে পারে কি? আর একটি নিগূঢ় কারণ ছিল, কীর্ত্তনে সাধারণতঃ মান মাথুর অর্থাৎ কলহান্তরিতা ও বিরহ, দান ও নৌকাবিলাস শুনিতে পাওয়া যায়। রাসলীলা প্রায়ই শোনা যায় না। অন্ততঃ আমি কীর্ত্তন গান অভ্যাস করিবার পূর্ব্বে এ গান কাহাকেও করিতে শুনি নাই। ব্রজবাসী ছিলেন রাস গানে সিদ্ধ। যেমন বাজনা, তেমনি গান। এরূপ গানের প্রণালী পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। যাহা হউক অতুলপ্রসাদকে শ্রোতারূপে পাইয়া মনের আনন্দে আমরা গান করিলাম। এমন কবিত্ব প্রায় গানেই দেখা যায় না। কাজেই আমরা সেই "বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখি পাতে" বা "আর কত কাল রইব বসে দুয়ার খুলে বন্ধু আমার" প্রভৃতি গানের অমর কবিকে পাইয়া মনের সাধ মিটাইয়া রাস গান করিলাম,

শরদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূঁথী
মত্ত মধুকর ভোরনী

—এ গান গাহিতে হয়, তবে কবির কাছেই গাওয়া উচিত।

আর একবার পুরীর কথা মনে পড়ে। প্রায় ২৫ বছর আগে আমি সমুদ্রতটে বাস করিতেছিলাম। সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামিজী সন্ধান পাইয়া আমার সহিত দেখা করিলেন এবং একদিন গান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু খোলবাদক না হইলে ত গান গাওয়া হয় না। মিশনের মহারাজ বলিলেন যে, রাধাকান্ত মঠে একজন বৈষ্ণব আসিয়াছেন। শুনিয়াছি তিনি বেশ ভাল বাজাইতে পারেন। আমি বলিলাম, "তাহা হইলেই হইল।" অতঃপর দিনস্থির করিয়া তিনি বিদায় লইলেন।

যেদিন সন্ধ্যার গান হইবার কথা, সেদিন আমি এবং বিখ্যাত গায়ক ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী—আমি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম—দেখিলাম রামকৃষ্ণ আশ্রমের তালাবন্ধ। ভাবিলাম তারিখ ভুল করি নাই ত? ছুটির সময় বিদেশে থাকিলে বার এবং তারিখ সব সময়ে ঠিক থাকে না। হয়ত এ ক্ষেত্রে বা তাহা হইয়াছে। আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া একজন ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, "আপনারা কাহাকে খুঁজছেন?" আমি বললাম "আজ এখানে গান হবার কথা নয়?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "খুব ভিড় হয়েছে কিনা, সে জন্য আশ্রমে গান না হয়ে ক্লাব-বাড়ীতে গানের ব্যবস্থা হয়েছে। আপনারা সেখানে চলুন"। পুরী কীর্ত্তনের যায়গা বটে, নীলাচলের অনেক লোকই কীর্ত্তনে অনুরাগী। ৺মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ৪০০।৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই নীলাচলেই অবস্থিতি করিয়াছেন। সেই হইতে ইহার আকাশ, বাতাস এমন কি সমুদ্র-তরঙ্গ পর্য্যন্ত কীর্ত্তনরসে ভরপুর। ক্লাব-বাড়ীতে গিয়া দেখিলাম যে, আটচালা ঘরে আর তিল ধারণের যায়গা নাই। ধার নামক একটি করদ রাজ্যের রাজা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। কিন্তু সেদিকে আমার মন ছিল না। আমি দেখিলাম বারান্দার এক প্রান্তে একজন অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিবা মাত্রই আমি অতুলপ্রসাদকে চিনিলাম। তাঁর কাছে গিয়া বলিলাম—"এই যে আপনি এসেছেন!" "পুরীতে কত দিন

অতুলপ্রসাদ বলিলেন, "আমি বিশ্রামের জন্য এখানে এসেছি। বোধ হয় এই সপ্তাহটা থাকব।" তখন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম এবং দেখিলাম যে, আমার গানের সবই বন্দোবস্ত আছে কিন্তু আসল যেটি সেটি নাই অর্থাৎ খোলও নাই এবং খোলবাদকও নাই। কিঞ্চিৎ বিমূঢ় ভাবে স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন, "কেন, আপনারই তো বাদক আনিবার কথা?" আমি বুঝিলাম, কোথাও কিছু গোলযোগ হইয়াছে। স্বামিজী তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া দিলেন রাধাকান্ত মঠে। যাহা হউক, শ্রোতাদের এখন কি দিয়া বোঝাই? অতুলপ্রসাদকে বলিলাম, "আপনি গান করুন।" তিনি বলিলেন, "বাঃ, আমি এলাম আপনার গান শোনবার জন্যে, আমি গান করতে এখানে আসিনি।" বাস্তবিক তাঁহাকে গান করিতে বলা আমার অন্যায় হইয়াছিল কারণ তিনি বিশ্রামের জন্য সমুদ্রতীরে আসিয়াছেন। তিনি একটু লাজুক ছিলেন। কিন্তু কে শুনে কাহার কথা! অতুলপ্রসাদের নাম করিতেই ঘন ঘন করতালি হইতে লাগিল।

কাজেই তাঁহাকে একখানা গান করিতে হইল। তাহার পর আবার ফরমাস। আবারও তিনি গান করিলেন। তাঁহার গানে যেরূপ হয়—সভাশুদ্ধ নিস্তব্ধ; আর তার পরেই প্রশংসার গীতিগুঞ্জন। আমি আর তাঁহাকে কষ্ট দিতে পারিলাম না। সঙ্গে ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী ছিলেন; তিনি অতঃপর আসর রক্ষা করিলেন। ব্রজেন্দ্র বাবুর গানও সেদিন খুব সুন্দর হইয়াছিল। আমার গান করিবার কথা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একখানা খোল আসিল—বাদক আসিল না। তাহা হইলেও আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া ছোট ছোট তানের ২।১খানা পদ শুনাইলাম। বাজাইলেন মোহনচাঁদ গোস্বামী। ইনি একবার খুব ছোট ছোট ছেলে লইয়া কলিকাতায় গান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে তেমন জমিল না। যাহা হউক, সেদিনকার আসর প্রকৃত পক্ষে রক্ষা করিলেন অতুলপ্রসাদ। তাঁহার আবির্ভাব যেমন সহসা—তেমনই তাঁহার গানও পুরীর সেই ক্লাব-বাড়ীতে অত্যন্ত আকস্মিক। আমি বুঝিলাম যে আমারই জন্য কষ্ট করিয়া অতুলপ্রসাদ আসিয়াছিলেন এবং আমাকে অসুবিধার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। আমি জানিতাম না যে, তিনি পুরীতে অবস্থান করিতেছেন।

অবশ্য অন্যান্য আসরে তাঁহার গান বহু বার শুনিয়াছি। কিন্তু যত বার শুনিয়াছি আমার আশা মেটে নাই। এমনই সুন্দর তাঁহার কণ্ঠ এবং এমন লালিত্যপূর্ণ পদ। প্রায় আসরেই দিলীপকুমার তাঁহার সঙ্গী থাকিতেন। এই প্রসঙ্গে দিলীপের গান সম্বন্ধে কিছু না বলিলে তাঁহার প্রতি অনাদর প্রদর্শন করা হয়। প্রথম যখন তাঁহার গান শুনিয়াছি তখনও তিনি ভারতবিখ্যাত হন নাই। পরে তিনি গানের দ্বারা সারা ভারতকে মুগ্ধ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। সুতরাং আমার এই প্রসঙ্গে তাঁহার গান সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও তাহাতে এমন কেহ বুঝিবেন না যে তাঁহার প্রতি উপেক্ষা দেখানো হইতেছে। এখানে অতুলপ্রসাদের গানই আমার বলিবার বিষয়। সেই জন্য তখনও এবং এখনও আমরা অতুলপ্রসাদের গানকেই উপভোগ্য বিষয় বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি।

অতুলপ্রসাদের সঙ্গে আমার দেখা শেষ বার এলাহাবাদে। আমি সেবার হাইকোর্টের জজ সার লালমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলাম। এমন সময়ে অতুলপ্রসাদ এলাহাবাদ ষ্টেশনে আসিয়া শুনিলেন যে আমি সেখানে আছি সুতরাং সেই ধূলাবিমণ্ডিত মূর্ত্তিতে তিনি লালগোপাল বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। আমাকে বলিলেন, "মধুপুরে গিয়া আপনার খোঁজ পেলাম না। এখানে এসে শুনলাম আপনি এলাহাবাদে এসেছেন। তাই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এখানে উপস্থিত হলাম।" আমার আনন্দের সীমা নাই। লালগোপাল বাবুও তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আমি বলিলাম, "আপনি গাড়ী হতে আসছেন। আমি আবার সন্ধ্যার পরেই রওনা হব। সুতরাং এই দু'-তিন ঘণ্টা সময় যাতে ব্যর্থ না যায় আমার আপনার কাছে সেই প্রার্থনা।" তখন অতুলপ্রসাদ বলিলেন, "আমি শীঘ্রই হাত-মুখ ধুইয়া আসছি। আপনাকে গান শোনাবো।" তখনও বেলা বোধ হয় ঘণ্টা তিনেক ছিল। তিনি আসিবা মাত্র চা পান করিয়া তাঁহার কয়েকটি নূতন গান আমাকে শুনাইলেন। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরেই আমার রওনা হইবার সময় হইল। লালগোপাল বাবু আর অতুলপ্রসাদ আমাকে ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণে তুলিয়া দিলেন। সেই আমার শেষ দেখা এবং শেষ শোনা। এখনও কানে তাঁহার সুর লাগিয়া আছে। আমি যেন মাঝে মাঝে তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর তাঁহার গীতিগুঞ্জ পড়িতে পড়িতে এখনও শুনিতে পাই।

কার পুত্র কোন জন কেবা কার পিতা।
কে কার জননী কেবা কাহার বনিতা॥
কত জন্ম মরণ নির্ণয় নাহি জানি।
জননী রমণী হয় রমণী জননী॥
পুত্র হয়ে পিতা হয় পিতা হয়ে পুত্র।
অদ্ভুত ঈশ্বর লীলা কর্ম্মমাত্র সূত্র॥
পথিক সহিত যেন পরিচয় পথে।
সেই মত দিন কত থাকে এক সাথে॥

—কাশীদাস।

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

১৬

১৯০৭-৮ সালে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে বহু বিচিত্র ব্যাপার দেখা দেয়। কংগ্রেসী নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের প্রতিকূলতা এবং উদ্যত-খড়্গ বৈদেশিক রক্তচক্ষু এড়াইয়া অগ্নি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যে ভাবে কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন, তাহা এক দিকে যেমন তাহাদের সংগঠন দক্ষতার পরিচায়ক, অন্য দিকে তেমনই উহা আমাদের অন্তরে গভীর বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বিপ্লবীদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা নির্য্যাতনের দ্বারা ব্যাহত করিবার জন্য সরকার এই সময় অতিমাত্রায় সক্রিয় হইয়া উঠেন। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের নেতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, অশ্বিনী-কুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজা সুবোধ মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, পুলিনবিহারী দাস ও ভূপেন্দ্রচন্দ্র নাগ ১৮১৮ সালের ৩ আইন অনুসারে বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত হইলেন।

এদিকে বারীন্দ্রকুমার ১৯০৭ সালের আগষ্ট মাস হইতে 'যুগান্তর' পত্রিকা পরিচালনা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ ভাবে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। ঐ বৎসরের প্রথমে জানুয়ারী মাসে অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে সর্ব্বপ্রথম সংঘবদ্ধ ভাবে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা আরম্ভ হয়। এই স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র ছিল শিবনারায়ণ দাসের লেনস্থ 'সন্ধ্যা' পত্রিকার অফিস। সেবাকার্য্যে যোগদানেচ্ছু যুবকের দল দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক দলে নাম লিখাইতে আসিত। এই নাম গ্রহণ-কার্য্যের ভার প্রভাসচন্দ্র দেব, অমরেন্দ্রনাথ বসু ও প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর ন্যস্ত ছিল। স্বেচ্ছাসেবকগণের মধ্যে যাঁহাদের কর্ম্মতৎপরতা ও শৃঙ্খলানুবর্ত্তিতার পরিচয় পাওয়া যাইত, তাঁহাদের মধ্যে বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি জাগাইবার প্রয়াস পাইতেন—প্রভাসচন্দ্র, হিকিনবথাম মামলার সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত আসামী কার্ত্তিক-চন্দ্র ধর ও পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী। ইহারা যে সমস্ত তরুণকে বিপ্লবী দলে ভিড়াইতে সমর্থ হন তাহাদের মধ্যে যেমন কয়েকটি তরুণ পরবর্ত্তী কালে বিপ্লবী দলের রত্ন হইয়াছিল, তেমনই দলবৃদ্ধির আগ্রহে বিশেষ সুপরীক্ষিত যুবক না গ্রহণ করার ফলে কয়েকটি আগাছাও আসিয়া জোটে। ইহার ফল পরে অত্যন্ত খারাপ হয়। এই সকল সংগৃহীত তরুণদের মধ্যে দুই জন পরে রাজসাক্ষী হয়।

প্রকৃত পক্ষে মানিকতলার বাগানের সমিতির উদ্বোধন হয় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে। উক্ত বাগানবাড়ী বারীন্দ্রের পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষের সম্পত্তি ছিল। উপযুক্ত দলীল সম্পাদন করিয়া বারীন্দ্র এই স্থানটিই সমিতির জন্য নির্দ্ধারিত করেন। স্থির হয় এখানে শরীরচর্চ্চা, ধর্ম্মচর্চ্চা এবং রাজনৈতিক শিক্ষাদান করা হইবে। বৈপ্লবিক কার্য্যের জন্য যাহারা এই সমিতিতে যোগদান করিতেন তাঁহাদিগকে দুইটি বিভাগে ভাগ করা হইত। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী তাঁহারা একটি বিভাগে এবং যাহারা ধর্ম্ম বিশেষ পছন্দ করিতেন না, অথচ বৈপ্লবিক কর্ম্মে নিষ্ঠাসম্পন্ন, তাঁহাদিগকে একটি দলে রাখা হইত। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাঁহারা এই বাগানে থাকিতেন এবং উপেন্দ্রনাথের নিকট রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি শিক্ষা করিতেন। ইহারাই প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী বলিয়া বিবেচিত হইতেন।

উপেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বাগানের মধ্যেই বিপ্লবীরা থাকিতেন। উক্ত বাগানের বর্ণনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ বলেন, "মানিকতলার বাগানে যখন আশ্রমের সূত্রপাত হইল, তখন সেখানে চার-পাঁচ জনের অধিক ছেলে ছিল না। হাতে একটিও পয়সা নাই, ছেলেরা সকলেই বাড়ীঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে, সুতরাং তাহাদের মা-বাপদের কাছ হইতেও কিছু পাইবার সম্ভাবনা নাই। অথচ ছেলেদের আর কিছু জুটুক আর নাই জুটুক, দু'বেলা দু'মুঠো ভাত ত চাই। দু'-এক জন বন্ধু মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, আর স্থির হইল যে, বাগানে শাকসব্জীর ক্ষেত করিয়া বাকি খরচটা উঠাইয়া লওয়া হইবে। বাগানে আম, জাম, কাঁঠালের গাছও যথেষ্ট ছিল। সেগুলো জমা দিয়াও কোন্ না দু'-দশ টাকা পাওয়া যাইবে? আর আমাদের খাইতেও বেশী খরচ নয়—ভাতের উপর ডাল, আর একটা তরকারী। অধিকাংশ দিনই আবার ডালের মধ্যেই দুই-চারিটা আলু ফেলিয়া দিয়া তরকারীর অভাব পুরাইয়া লওয়া হইত। সময়াভাব হইলে খিচুড়ীর ব্যবস্থা। একটা মস্ত সুবিধা হইল এই যে, বারীন তখন ঘোর ব্রহ্মচারী। মাছের আঁশ বা পেঁয়াজের খোসাটি পর্য্যন্ত বাগানে ঢুকিবার হুকুম নাই; তেল, লঙ্কা একেবারেই নিষিদ্ধ। সুতরাং বাগানের খরচ কতকটা কমিয়া গেল।"

সেই সময় উদ্যোগপর্ব্বের অঙ্গ হিসাবে প্রকাশ্যে বিপ্লবমন্ত্র প্রচার বিপ্লবীদের কর্ম্মসূচীর অন্তর্গত হয়। 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ সংকলন করিয়া "মুক্তি কোন্ পথে" এবং "বর্ত্তমান রণনীতি" প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক দুইটি যুবকদের মধ্যে সেই সময় বিপ্লবপ্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করে। ইহা ছাড়া প্রায়ই বৈপ্লবিক ইস্তাহারও ছাপা হইয়া প্রকাশ্য ভাবে বিতরিত হয়।

"বন্দে মাতরম্" মামলায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করার জন্য বিপিন-চন্দ্র পালের যে ছয় মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হয় সেই কারাবাস ভোগ করিয়া যেদিন বিপিনচন্দ্র কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন সেদিন কলিকাতাবাসী তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জানায়। জনাকীর্ণ হাওড়া ব্রীজে সেদিন বৈপ্লবিক ইস্তাহার "Now or Never" প্রকাশ্যে বিতরিত হয়। এই ক্ষুদ্র ইস্তাহারটি গোপনে সুমতি প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত হয়। ইহার মুদ্রণ ও বিতরণে নিখিলেশ্বর রায় মৌলিকের সহায়তা করিয়াছিলেন প্রভাসচন্দ্র দেব এবং তিনিই ইহার বিতরণের ভার গ্রহণ করেন।

বিপ্লব মন্ত্রের এই প্রকাশ্য প্রচারে তরুণের দল 'যুগান্তর' পত্রিকা অফিসে আসিয়া খোঁজ লইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে লোক সংগ্রহ চলিতে লাগিল। বারীন্দ্রকুমার যখন এইভাবে দশ-পনেরটি যুবক সংগ্রহ করিয়াছেন তখন উল্লাসকর দত্তের সহিত তাঁহার সংযোগ ঘটে। উল্লাস একাকী নিজ গৃহে একটি পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়া বোমা প্রস্তুত ও বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুতে দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। উল্লাসের এই নিজস্ব প্রচেষ্টা প্রমাণ করে যে চাপেকার সংঘ নিরপেক্ষ ভাবেই তিনি বৈপ্লবিক সাধনায়

নিয়োজিত হইয়াছিলেন। উল্লাসকরের সন্ধানের পূর্ব্বে বারীন্দ্রের দল বোম্বাই অঞ্চলের যোশী ও কুলকর্নী নামে দুই জন যুবকের সহায়তায় বোম্বাই হইতে বোমা আনিতে চেষ্টা করেন। এই দুই জন যুবকই বাক্‌সর্ব্বস্ব ছিল। বোমা আনিবার জন্য কিছু টাকা লইয়া যোশী নিরুদ্দেশ হয়। কুলকর্নী নিজেকে তিলকের ভাগিনেয় এই মিথ্যা পরিচয়ে আসর জমাইয়াছে টের পাওয়াতে কুলকর্নীর প্রতি যুগান্তর দল বিশ্বাস হারায়।

উল্লাসকর ছিলেন শিবপুর কলেজের অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়ের পুত্র। বরাবর তাঁহার বেপরোয়া ভাব। ১৯০৪ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিতে গিয়া দেখিতে পান পুলিশ ভিড় সরাইবার জন্য বেপরোয়া লাঠি চালাইতেছে। পুলিশের এই আচরণ অসহ্য হওয়ায় তিনি প্রতিবাদ করেন। ফলে উল্লাসকরের পিঠে ছড়ি ও ঘুষি বর্ষিত হইল এবং পুলিশ তাঁহাকে থানায় ধরিয়া লইয়া যায়। সেখানে ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস জামিন দিয়া তাঁহাকে বাড়ী লইয়া আসেন এবং ঔষধ দিয়া প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। এই ঘটনার কিছু দিন পরে তিনি বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিলনীতে যোগদান করেন। তথায় পুলিশের যে নির্ম্মম অত্যাচার চলে তাহাতে তাঁহার তরুণমন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। প্রবলের এই অত্যাচারের ফলে উল্লাসকরের জীবনের ঘটনার স্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত হয়। এই ঘটনার পর বোমা ও রিভলবারের প্রতি তাঁহার আগ্রহ বাড়িয়া যায়। ফ্রান্স হইতে হেমচন্দ্র ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই উল্লাসকর নিজ জীবন তুচ্ছ করিয়া বিস্ফোরক দ্রব্য লইয়া পরীক্ষাকার্য্য চালাইলেন। যেহেতু তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার সহপাঠী রাসবিহারী বসুও তখন ঐ কলেজে পড়িতেন, সেই হেতু প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নাগার হইতে অনেক সাহায্য পাইলেন। এইরূপে পরীক্ষা করিতে করিতে তিনি বোমা আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন।

ভারতে প্রথম "বোমা" তৈয়ারী করা সম্পর্কে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন যে, "একটি বি, এস-সি পাশ যুবকই বাংলায় আমাদের অনুরোধে প্রথমে "বোমা" তৈয়ারী করেন। ইঁহার নাম বিভূতি চক্রবর্ত্তী এবং নদীয়া জেলায় বাস। ইনি আত্মোন্নতি সমিতির নিবারণ ভট্টাচার্য্যের নিকট বিস্ফোরণ রসায়ন শিক্ষা করিতেন। 'যুগান্তর' অফিসে 'তাঁহাকে বারীন্দ্র ও আমি এক দিন বলি—বোমা প্রস্তুত করিবার জন্য টাকা মজুদ আছে কিন্তু বোমা প্রস্তুতকারকের অভাবে তাহা সফল হইতেছে না। এই কথাটা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছিল, কারণ তিনি ছিলেন একজন কেমিষ্ট। পরদিন তিনি বারীন্দ্রকে আসিয়া বলেন, 'আমি বোমা প্রস্তুত করিতে রাজী আছি, কিন্তু ভূপেন প্রভৃতি কেহই যেন ইহা না জানিতে পারে।' খরচার জন্য প্রথমে ভবানীপুরের যোগেশচন্দ্র ঘোষ ১০০৲ টাকা দান করেন। বারীন্দ্র যখন তাঁহাকে এক দিন বলেন, "টাকার অভাবে বোমা নির্ম্মাণের কার্য্য হইতেছে না, তখন তিনি বলেন, আমার হাতে এক শত টাকা আছে, অনুগ্রহ করিয়া নিবেন কি? এ কথা এখানে উল্লেখ করা হইল, কারণ কর্ম্মীদের মনে তৎকালে কর্ম্মে কি প্রকারের আগ্রহ ও নিষ্ঠা ছিল, তাহা এই সব দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হয়।

"বোমাটি দক্ষিণ কলিকাতায় যোগেশ বাবুর ভ্রাতার ডাক্তারখানায় প্রস্তুত হয় এবং আবরণটি যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য—এক জন সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির ঝামাপুকুরের কলাইয়ের কারখানায় তৈয়ার হয়। অনেকগুলি আবরণ (shell) প্রস্তুত হইয়াছিল। ···এই বোমা লইয়াই বারীন্দ্র, পরে হেমচন্দ্র দাস লাট ফুলারের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। বোমা নির্ম্মাণের বাকী আবরণগুলি 'যুগান্তর' অফিসে কিছু দিন থাকে। অবশেষে আমি স্বগৃহে আনি। আমার জেল হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে নদীয়াবাসী এক সভ্য দ্বারা তাহা স্থানান্তরিত করি। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, এক পুকুরে এইগুলি ডুবাইয়া রাখিবেন।

"এক্ষণে, আসল বোমাটি কোথায় গেল? পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, হেম দাস ও প্রফুল্ল আমার বাড়ী আসিয়া বলিয়া গেলেন, 'দাদা পালিয়েছে' (অর্থাৎ ফুলারের নাগাল পাওয়া গেল না)। বোমাটি তাঁহারা সঙ্গে করিয়াই কলিকাতায় আনিয়াছিলেন। আমার ধারণা ছিল, উক্ত দ্রব্যটিও নদীয়া জেলায় আমি পাঠাইয়া দিই। কিন্তু হেমচন্দ্র বলিতেছেন উক্ত বোমা মেদিনীপুরে নীত হয় এবং পরে তথাকার একটি পুকুরে নিমজ্জিত করা হয়। ইহাই হইতেছে বাংলার বোমা আবির্ভাবের আসল সত্য তথ্য।"

উল্লাসকর বিপ্লব সমিতিতে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করিলে মানিকতলা বাগানবাড়ীতে একটি ছোটখাট বোমা প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয় এবং উল্লাসকরের সহকারী হিসাবে বারীন্দ্র, ইন্দুভূষণ রায়, বিভূতি সরকার ও প্রফুল্ল চাকী যোগদান করেন।

উল্লাসকরের বোমা পরীক্ষার জন্য বারীন্দ্রকুমার বিভূতি সরকার, উল্লাসকর ও রংপুর বিপ্লব-কেন্দ্রের প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীকে লইয়া দেওঘরে রোহিণী পাহাড়ে গমন করেন। সেখানে প্রফুল্ল বোমাটি নিক্ষেপ করার ভার গ্রহণ করিলেন এবং তাহার নিকটে রহিলেন উল্লাসকর। বোমাটি দড়ির সাহায্যে পাহাড়ের নীচের দিকে অনেক দূরে নিক্ষেপ করা হইল, কিন্তু ফাটিয়া সেখানকার পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া প্রবল বেগে উর্দ্ধ দিকে উৎক্ষিপ্ত হইল এবং প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া তাহার উপর আসিয়া পড়িল, ফলে ঘটনাস্থলেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। উল্লাসকরও বিশেষ ভাবে আহত হন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। কাজেই ইহারা প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীর শবদেহ সেখানে রাখিয়া উল্লাসকরের শুশ্রূষা করিবার জন্য তাঁহাকে কাঁধে করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসেন। উল্লাসকর অল্প দিনের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিলেন। ইহার পর তাঁহার উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পাইল। এখন তিনি অধিক পরিমাণে বোমা প্রস্তুত করিতে মনোনিবেশ করিলেন। বোমার উপাদান দেশবিদেশ হইতে সংগৃহীত হইতে লাগিল। এই উপাদান সংগ্রহ করা যুবকদের প্রধান কার্য্যে পরিণত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর দাদা জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু এই বিষয়ে সকলকে উৎসাহিত করিতেন।

প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীর পিতা ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে পূর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনায় তাঁহার পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ জানাইলে তিনি পুত্রশোকে বিচলিত না হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার একমাত্র পুত্র মণিকেও (সুরেশচন্দ্রের ডাক নাম) মায়ের কাজের জন্য দিলেন। এই সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, "রংপুরে আমাদের সমিতির একটি ঘাঁটি ছিল। সেখানকার নেতার ঈশান চক্রবর্ত্তী

মহাশয় আমাদের একজন বড় সমর্থক ছিলেন। তিনি বলিতেন, 'আমি একে একে দেশের জন্য আমার সবগুলি ছেলে দেব, মাতৃপূজায় তোমরা বলি দিও।' প্রফুল্লর মৃত্যু-সংবাদ ঈশানচন্দ্রকে জানান হইলে তিনি লিখিলেন—'বেশ, এবার আমার আর একটি ছেলেকে পাঠালাম, মাতৃপূজায় উৎসর্গ করো।' এল সুরেশ চক্রবর্ত্তী—মণি। সুরেশ চক্রবর্ত্তী পরে পণ্ডিচেরী অরবিন্দ আশ্রমে যোগদান করেন।

সমিতির অন্যতম স্তম্ভ হেমচন্দ্র দাস কানুনগো স্বেচ্ছায় নিজের বিষয় বিক্রয় করিয়া প্যারীতে গিয়া বিস্ফোরক বিদ্যা শিক্ষা করিতে যান। এই বিষয়ে বর্ম্মা নামক একজন পাঞ্জাববাসী ও ব্যারিষ্টার রাণা তাঁহাকে সাহায্য প্রদান করেন। তথায় শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মার সাহায্যে হেমচন্দ্র বোমা প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা করিতে থাকেন। এই কার্য্যে মির্জ্জা আব্বাস (হায়দরাবাদ) ও টি, এম, বাপাত (বম্বে) তাঁহার সহকর্ম্মিরূপে কৃষ্ণবর্ম্মা দ্বারা নিযুক্ত হন। এই তিন জনের গোপন স্থানে থাকা, ল্যাবরেটারী চালান ইত্যাদির খরচার জন্য ক্রমে কৃষ্ণবর্ম্মা তিন হাজার ফ্রাঙ্ক দেন। ইলেক্‌ট্রিক ড্রাই সেল যোগে কি প্রকারে ট্রেন ধ্বংস করা যাইতে পারে হেমচন্দ্র তাহাও শিক্ষা করেন।

হেমচন্দ্র ফ্রান্স হইতে ফিরিলে মানিকতলা বাগান ভিন্ন ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেন, ৩৮-৪ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, ১৩৪ নং হ্যারিসন রোড, দেওঘরের শীলস্ লজ ও বানিয়াচঙ্গের সুশীল সেনেদের বাড়ীতে বোমা প্রস্তুত হইত।

মহারাষ্ট্রীয় যুবক বাপাত ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই দলের সহিত যুক্ত হন। চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, প্রভাসচন্দ্র দেব ও ইন্দ্রনাথ নন্দীও বোমা প্রস্তুত শিখিয়াছিলেন। বোমার মামলায় চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তীর বোমা প্রস্তুত-প্রণালীর বিশদ বিবরণ সম্বলিত একটি সাইক্লোষ্টাইল পুস্তক ও বিস্ফোরক নিস্ফারণের নানা রকম ফরমুলা আবিষ্কৃত হয় এবং চন্দ্রকান্ত ফেরার হন। পরে তিনি ইউরোপে ও মার্কিণ মুলুকে বিপ্লবীরূপে নানা কীর্ত্তি করার পর আবার দলের লোকের নিন্দাভাজন হন। বিপ্লব ইতিহাসের সে এক অন্য অধ্যায়।

সহসা বোমা বিস্ফোরণে ইন্দ্রনাথের একটি হাতের কব্জি উড়িয়া যায় এবং প্রভাসচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ বিশেষতঃ মুখ ও হাত ভীষণ ভাবে দগ্ধ হয়। এই দুর্ঘটনায় প্রভাস পড়েন ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে, কেন না, বানিয়াচঙ্গে সুশীলের বাড়ীতে প্রভাসচন্দ্রকে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারীতে লিখিত একটি পোষ্টকার্ড আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে প্রভাসের মুখের ক্ষত শুকাইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা ছিল এবং ১লা ফেব্রুয়ারী সুশীলকে কলিকাতার ঠিকানায় এক পত্র লিখিয়া হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, প্রভাসের অঙ্গ দগ্ধ হইল কিরূপে?

ইঁহারা ব্যতীত সুশীল ও বীরেন্দ্রও বোমা প্রস্তুতে দগ্ধ হইয়াছিলেন এবং এ সম্পর্কে তাঁহারা তাঁহাদের মাতুল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক মহেন্দ্র দের নিকট যথেষ্ট সাহায্য লাভ করেন। মহেন্দ্র বাবু পরে অরুণাচল আশ্রমে পুলিশ প্রবেশে বাধা দিবার সময় পুলিশের গুলীতে নিহত হন।

বোমা প্রস্তুত পূর্ণোদ্যমেই চলিতে লাগিল। ইহা ছাড়া অস্ত্র সংগ্রহে বারীন্দ্র মনোনিবেশ করেন এবং তাঁহার স্বীকারোক্তি অনুসারে এগারটি রিভলবার, চারিটি রাইফেল এবং একটি বন্দুক তাঁহারা সংগ্রহ করেন। কলিকাতায় চীনা নাবিকদের নিকট হইতেও রিভলবার কেনা চলে এবং ইন্দ্রনাথ নন্দীও কিছু আগ্নেয়াস্ত্র যোগাড় করিয়া দেন।

ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগরে সেই সময় কোন প্রকার অস্ত্র আইন ছিল না, সেই জন্য বারীন্দ্র ও অবিনাশ চন্দননগরনিবাসী বনবিহারী মণ্ডলের সহায়তায় কিশোরীমোহন সাঁপুই নামক উকিলের এক মুহুরির মারফৎ ফ্রান্স হইতে রিভলবার আমদানীর ব্যবস্থা করেন। রাউলাট কমিটির এক রিপোর্টে প্রকাশ যে, "১৯০৭ সালে ফরাসী সরকারী অস্ত্রের কারখানা হইতে ৩৪টি রেজিষ্টার্ড পার্শ্বেল চন্দননগরে পাঠান হয়। ইহার মধ্যে ২২টি পার্শ্বেল কিশোরীমোহনের নামে আসে। এই ২২টি পার্শ্বেলের মধ্যে তিনি মাত্র ১৬টি খালাস করেন এবং ৬টি প্যাকেট কেহ খালাস করে নাই। পরবর্ত্তী মেলে ইহা প্রেরকের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। চন্দননগরে অস্ত্র আইন প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনাই উক্ত পার্শ্বেল ফেরত পাঠাইবার একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হয়। কিশোরীমোহনের নিকট পরেও এইপ্রকার পার্শ্বেল আসে। এই সম্পর্কে নিয়োজিত বিশেষ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক অনুসন্ধান কালে দেখা যায়, উক্ত ৩৪টি পার্শ্বেলের' ১৯টির মধ্যে রিভালবার ছিল। চন্দননগরের শাসনকর্ত্তা কিশোরীমোহনকে ডাকাইয়া এই সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি অস্ত্রের বিষয় সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া বলেন, ঐ সকল প্যাকেটে ঘড়ি ছিল। কিন্তু পরে তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, ঐ সকল প্যাকেট অস্ত্রপূর্ণ ছিল এবং সেগুলি বন্ধু-বান্ধবকে দিয়াছেন। কিন্তু প্রাপকের নাম দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু পরে জানা যায়, ঐ সকল অস্ত্রের মধ্যে চারিটি রিভালবার বারীন ঘোষ এবং অবিনাশ ভট্টাচার্য্যের নিকট বিক্রয় করা হয়। ইহাদের সেই সময় চন্দননগরে প্রায়ই যাতায়াত ছিল।"

'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ ও জেলায় জেলায় 'ছাত্রভাণ্ডার' নামে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের অন্তরালে বিপ্লবীদের ঘাঁটি স্থাপন করার প্রয়াস আরম্ভ হয় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট তারিখের 'যুগান্তর' পত্রিকায় সর্ব্বপ্রথম জেলায় জেলায় গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইবার জন্য সংঘবদ্ধ ভাবে প্রয়াস আরম্ভ করিতে তরুণ দলকে প্রকাশ্য ভাবে আহ্বান করা হইল। সৃষ্টির মধ্যেই যে সংগ্রামের বীজ নিহিত আছে, জীবনের ধর্ম্মই যে যুদ্ধ—এরূপ তত্ত্ব সকল সংখ্যার পর সংখ্যায় জোর করিয়া প্রচার চলিতে থাকে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ তারিখে বিপ্লবের সাহায্যের জন্য অর্থসংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিতে গিয়া রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ডাকাতি করাও যুক্তিসিদ্ধ এই তত্ত্ব 'যুগান্তর' প্রচার করেন। এই সময়ে স্বদেশী আন্দোলনে যে সমস্ত ধনী যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট গুপ্ত সমিতির সংবাদ প্রদান করিয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চলে। ময়মনসিংহের আচার্য্য-পরিবার, গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর, রাজা সুবোধ মল্লিক, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেক ধনী ইহাদের গোপনে অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন।

মানিকতলার দল ক্রমেই প্রসার লাভ করিতে থাকে। মেদিনীপুর ভিন্ন চন্দননগর, কৃষ্ণনগর, দেওঘর, শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ্গ, রংপুর, বগুড়া, কটক প্রভৃতি অঞ্চলেও শাখা স্থাপিত হয়। [ক্রমশঃ।

স্বর্গীয় কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভঞ্জ

সম্প্রতি দৈনিক বসুমতীর রবিবারের সাহিত্য-সভায় "বাংলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিক" পর্য্যায়ে স্বর্গীয়া শরৎকুমারী চৌধুরাণীর সাহিত্য-সেবার আলোচনা হইতে দেখিয়া এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে তাঁহার "রচনাবলী" প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া যুগপৎ প্রীতি ও আনন্দ অনুভব করিলাম। কিন্তু যাঁহার সাহিত্য-প্রতিভায় শরৎকুমারীর সুপ্ত সাহিত্য-সেবার শক্তি প্রভাবান্বিত হইয়াছিল অর্থাৎ তাঁর স্বামী ৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর বিষয়ে অদ্যাবধি বিশেষ কোনও আলোচনা না দেখিয়া দুঃখের কারণ বোধ করি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমসাময়িক অক্ষয়চন্দ্র কবি ও গান রচয়িতা ছিলেন ও জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের সহিত আজীবন অন্তরঙ্গ ভাবেই কাটাইয়াছিলেন। এই চৌধুরী-পরিবারের সহিত আমাদের পরিবার প্রায় অভিন্ন ছিলেন এবং অক্ষয়চন্দ্র ও শরৎকুমারীর সহিত মদীয় পিতা ৺দেবেন্দ্রনাথ ভঞ্জ ও আমার মাতাঠাকুরাণীর এরূপ প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল যে, আমরা বাল্যাবধি শরৎকুমারীকে "ছোটমা" সম্বোধন করিতাম। তিনিও আমাদের নিজ সন্তান জ্ঞান করিতেন। এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটা কথা বলিতে চাই যে, যে সময় ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় মহাভারত অনুবাদ করান তৎকালে আমার স্বর্গীয় পিতামহ দ্বারকানাথ ভঞ্জ পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয়কে (যাঁহার নাম এখনকার লোকের নিকট লুপ্ত) বাল্মীকি রামায়ণের বঙ্গানুবাদ করিতে বলেন ও সেই উপলক্ষে তিনি "বাল্মীকি প্রেস" নামক ছাপাখানা স্থাপন করেন। পণ্ডিত হেমচন্দ্র সে সময় জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারে আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। হেমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্রের মাধ্যমে আমাদের সহিত ঠাকুর-পরিবারের ঘনিষ্ঠতা জন্মে ও সেই সময়ে ঠাকুরবাড়ীর ও রবীন্দ্রনাথের "রুদ্রচণ্ড" "ভগ্নহৃদয়" প্রভৃতি পুস্তকের প্রথম সংস্করণ বাল্মীকি প্রেসে ছাপা হয়। তাহার নিদর্শন এখনও কিছু কিছু আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "পুরুবিক্রম নাটক", "অশ্রুমতী নাটক" প্রভৃতি ও স্বর্ণকুমারী দেবীর "গাথা", "বসন্ত-উৎসব" প্রভৃতির প্রথম সংস্করণ বাল্মীকি প্রেসে ছাপা হয়। ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "স্বপ্নপ্রয়াণ' পুস্তকখানি এখানে মুদ্রিত হইয়া বাহির হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রনাথ হঠাৎ একদিন আসিয়া পুস্তকগুলি দেখিতে চাহেন ও ছাপাখানায় গিয়া বলেন যে, পুস্তকের বহু স্থান পরিবর্ত্তিত করিবার আবশ্যক বিধায় ঐ বহিগুলি নষ্ট করিয়া দিতে চাহি, যাহাতে এক কপিও প্রকাশ না হয়। এই বলিয়া সমস্ত পুস্তকগুলি একত্র করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া পুড়াইয়া ফেলেন। পরে তাঁহার সংশোধিত সংস্করণ ছাপাইয়া বাহির করেন। তখনকার দিনে ঋষি রাজনারায়ণ বসু, চন্দ্রনাথ বসু, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বহু মনীষী ও বাগ্মীর রচনাবলী ও বক্তৃতা এই প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, অক্ষয়চন্দ্রের নিজের লেখার প্রতি মমতা না থাকায় এবং কোনও দিন সাধারণের নিকট কবিযশঃপ্রার্থীর চিন্তা না করায় তাঁহার লেখা কবিতা, গান বা প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি তাঁহার নিজ বাটীতে কিছুই রাখেন নাই। ভট্টাচার্য্য ও ঠাকুরবাড়ীর লোকমুখে প্রচারিত সংবাদে জানা যায় যে, অক্ষয়চন্দ্র কাগজ ও পেন্সিল পাইলেই কবিতা বা গান লিখিতেন এবং সেই সকল লেখা কাগজ ঠাকুরবাড়ীর উঠানে বা চত্বরে ছড়াইয়া থাকিত। তাঁহার রচিত অনেক গান রবীন্দ্রনাথের বহু প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিশ্বকবির রচিত বলিয়া লোকে ধরিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "জীবন-স্মৃতি"তে অক্ষয়চন্দ্রের গান ও খণ্ডকাব্য রচনা বিষয়ে বলিয়াছেন, "এ কার্য্যে অক্ষয়চন্দ্রের ক্ষিপ্রতা অসামান্য ছিল অথচ নিজের এ সকল রচনা সম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র মমত্ব ছিল না। রচনা সম্বন্ধে ক্ষমতার যেমন প্রাচুর্য্য তেমনি ঔদাসীন্য ছিল। ইঁহার অনেক গান লোককে গাহিতে শুনিয়াছি, কে তাহার রচয়িতা তাহা কেহ জানেও না।" রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "প্রভাত সঙ্গীত" পুস্তকে যে "অভিমানিনী নির্ঝরিণী" নামক কবিতাটি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অক্ষয়চন্দ্রের রচনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পুস্তকে বিজ্ঞাপনে কোন এক বন্ধু রচনা করেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অক্ষয়চন্দ্রের রচিত অনেক গান বিশ্বকবির রচনা বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "জ্যোতিরিন্দ্রনাথের (ঠাকুর) জীবন-স্মৃতি" পুস্তকে জ্যোতি বাবুর নিজের কথায় অক্ষয়চন্দ্রের বিবরণ দিতে বলিয়াছেন, অক্ষয় এম-এ, বি-এল পাস করিয়া এটর্ণী হইয়াছিলেন। তিনি Shakespeareএর বড় ভক্ত ছিলেন এবং বাটীর কয়েকটি ছেলেকে তিনি Shakespcare পড়াইতেন। কোনও কল্পনা যদি কখনও তাঁহার মাথায় একবার ঢুকিত তবে সেটা শীঘ্র বাহির হইতে চাহিত না। প্রথম বৎসরের 'ভারতী'তে রবি ও অক্ষয়ের লেখা বেশী প্রকাশিত হইয়াছিল। অক্ষয়চন্দ্র প্রেমের গানই বেশী রচনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করিতাম। আমার দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি সুর রচনা করিলাম, অমনি ইঁহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। সেই সময়ে অক্ষয়চন্দ্র চক্ষু মুদিয়া বর্ম্মা সিগার টানিতে টানিতে, মনে মনে কথার চিন্তা করিতেন। পরে যখন তাঁহার নাক-মুখ দিয়া অজস্র ভাবে ধূম-প্রবাহ বহিত, তখনই বুঝা যাইত যে এইবার তাঁহার মস্তিষ্কের ইঞ্জিন চলিবার উপক্রম করিয়াছে। তিনি অমনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া চুরুটের টুকরাটি, সম্মুখে যাহা পাইতেন, এমন কি পিয়ানোর উপরেই তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া "হয়েচে হয়েচে" বলিতে বলিতে আনন্দদীপ্ত মুখে লিখিতে সুরু করিয়া দিতেন। রবি কিন্তু বরাবর শান্ত ভাবেই ভাবাবেশে রচনা করিতেন। চাঞ্চল্য ক্বচিৎ লক্ষিত হইত। অক্ষয়ের যত শীঘ্র হইত, রবির রচনা তত শীঘ্র হইত না।

অক্ষয়চন্দ্রের গান গাহিবার গলা না থাকিলেও গাহিবার ইচ্ছা প্রবল ছিল। রবীন্দ্রনাথের কথায় "তাহা বৈধ, অবৈধ, সুরে, বেসুরে"

যাহাই হউক গাহিতেন। শ্রোতাদের ভাল না লাগিলেও তাঁহাকে থামান দায় হইত এবং বাদ্যযন্ত্র না থাকিলেও যাহা সম্মুখে পাইতেন তাহাই চাপড়াইয়া সঙ্গত করিতেন। এই প্রসঙ্গে ইহার বিপরীত ঘটনার কথা মনে পড়ে। সুরজ্ঞ ও সুগায়ক নরেন্দ্রনাথ দত্ত (যিনি পরে জগৎবিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ) মহাশয়কে স্মরণে আসে। তিনি আমার খুল্লতাত ৺উপেন্দ্রনাথ ভক্তের সহপাঠী ছিলেন। কলেজের ফেরত আমাদের বাটীতে আসিয়া বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া দেবদুর্লভ কণ্ঠে গান গাহিতেন এবং বৈঠকখানায় কোনও বাদ্যযন্ত্র না থাকায় দুই ভলুম "Webster's Dictionary" চাপড়াইয়া সঙ্গত করিতেন। তাঁহার বন্ধুরা সকলে তন্ময় হইয়া তাঁহার ধর্ম্মসঙ্গীত শুনিতেন। স্বামিজী যখন আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উৎসবে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে বক্তৃতাদি করেন, আমাদের খুল্লতাত মহাশয় আমাকে, আমার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র ক্ষেত্রনাথ প্রভৃতিকে লইয়া দক্ষিণেশ্বর যান। আমরা গিয়া দেখি স্বামিজী তখন মঞ্চোপরি উঠিয়া বক্তৃতা করিতেছেন। আমরা মঞ্চের নিকটে এক স্থানে দাঁড়াইয়া সেই মহাপুরুষকে একদৃষ্টে দেখিতেছিলাম। বক্তৃতা শেষে মঞ্চ হইতে নামিয়া সেজ কাকার সম্মুখে আসিয়া "উপীন যে, সব ভাল আছ তো" বলিয়া দাঁড়াইলেন। আমাদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বহু দিন পরে প্রত্যেকের নাম ধরিয়া ডাকিলেন ও মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সে মহাদিন আজও স্মরণ করিয়া নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। সে যেন দেবতার আশীর্ব্বাদ!

অক্ষয়চন্দ্র কখনও নামের কাঙ্গাল ছিলেন না। বন্ধুবর্গের বিশেষ অনুরোধে আমাদের প্রেসে অনামীতে তাঁহার কবিতা-পুস্তক—"উদাসিনী" ও "সাগর-সঙ্গমে" আমার পিতা ঠাকুরের দ্বারা

অক্ষয়চন্দ্র

প্রকাশিত হয়। বোধ হয় বহু লোকেই এই দুইখানি পুস্তকের আজ নামও জানেন না। অক্ষয়চন্দ্রের লিখিত "ভারতগাথা" অর্থাৎ পদ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস এক অভিনব জিনিষ। আমি নিজে সাহিত্যিক নহি কিন্তু আমার ধারণা যে, জগতে পদ্যে কোনও দেশের ইতিহাস কেহ লেখেন নাই। আমার এই ৭৫ বৎসর বয়সে কাহারও নিকটেও শুনি নাই। স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর তাঁহার "সুরধুনী কাব্যে" গঙ্গাবতরণ বর্ণনায় ভাগীরথীর গতিপথের দুই তীরের অনেক প্রদেশ, নগর, প্রসিদ্ধ স্থান প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু সর্ব্বভারতের ইতিহাস কাহারও নাই। অবশ্য ইতিহাসের কোনও বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ করিয়া অনেক কবি তাহার বিবৃতি রচনা করিয়াছেন, যেমন—কবি নবীনচন্দ্র সেনের রচিত "পলাশীর যুদ্ধ", "কুরুক্ষেত্র" ইত্যাদি। তখনকার দিনে "হেয়ার প্রেসে" বই ছাপা না হইলে পাঠ্যপুস্তক হইত না এবং অক্ষয়চন্দ্রের জীবদ্দশায় "ভারতগাথা" কোনও স্কুলের পাঠ্যপুস্তক হয় নাই। অক্ষয়চন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল যে, বাল্যকালে ছেলেরা কবিতা হিসাবে কণ্ঠস্থ করিলে বড় হইয়া ঘটনাগুলি নিজ ভাষায় সহজে লিখিতে বা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের উত্তর দিতে পারিবে। এরূপ ধারণা তাঁহার অসাধারণত্বেরই পরিচয়।

অক্ষয়চন্দ্র আমাদের বাড়ীর খুব নিকটেই থাকিতেন এবং সেইখান হইতেই আমার পিতার সহিত তাঁহার পত্রবিনিময় হইত। তাঁহার পত্র লেখার ধরণ ছিল চিরকুট কাগজে যাহা জানাইবার তাহা কবিতায় লেখা। এখন মনে হয়, যদি ঐ সকল চিরকুট কাগজ সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম। সে বয়সে ঐ সকল কাগজের মর্ম্ম বুঝি নাই। চিরকুটে পত্র লেখার একদিনের ঘটনা আমার বিশেষ মনে আছে। আমার পিতা ঠাকুরকে অক্ষয়চন্দ্র বার বার লোক পাঠাইয়া দেখা করিবার জন্য বলিয়া পাঠান এবং আমার পিতা ঠাকুর পরে যাইব বলিয়া দেন। সে সময় তিনি অন্য এক জনের সহিত কথাবার্ত্তা করিতেছিলেন ও আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। পুনরায় অক্ষয় বাবুর লোক এক চিরকুট কাগজে লেখা পত্র আনিল। পিতা ঠাকুর তাহা পড়িয়া হাসিয়া বলিলেন যে, এখনই যাইতেছেন। পরে ভদ্রলোকটিকে বিদায় দিয়া জামা গায়ে বাহির হইয়া পড়িলেন। আমি অক্ষয় বাবু কি লিখিয়াছেন জানিবার জন্য সেই পত্রখানির অনুসন্ধান করিয়া দেখি, লেখা রহিয়াছে—

"রাজা, *

শুনেও অসুখ মোর, তবুও গরজে তোর
ডাকিতেছি আয়, আয়, আয়।
বিশেষ জরুরী আছে, তা না হলে তোর কাছে
কাজ কি এ সাধ্যি সাধনায়।

ইতি

অঃ।"

আর একটি মজার ঘটনা এখানে উল্লেখ করিব। অক্ষয় বাবুর ঠাট্টা ও রসিকতার উৎস প্রচুর ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "বিবিধ

* আমাদের বাটীতে আমার পিতাকে বয়োবৃদ্ধ সকলে "রাজা" বলিয়া ডাকিতেন। যে জন্য অক্ষয় বাবু ডাকিয়া পাঠাইতেছিলেন তাহা পিতা ঠাকুরেরই গরজের সংবাদ দিবার মানসে।

প্রবন্ধ" পুস্তক এক কপি আমার পিতৃদেবকে নামের শেষে "সুহৃদ্বরেষু" লিখিয়া অক্ষয়চন্দ্রের মারফৎ উপহার দেন। অক্ষয়চন্দ্র পুস্তকখানিতে "সুহৃদ্বরেষু" কথার নিচে পেন্সিল দিয়া মন্তব্য লেখেন যে, "সুহৃদ্বরেষু অর্থাৎ সুহৃদ্বরকে Shoe" ও বইখানিতে "রাজাবাবু—ছোঁড়া" লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। পিতৃদেবের সহিত কিরূপ অন্তরঙ্গতা ছিল ইহা তাহারই প্রমাণ।

অক্ষয়চন্দ্রের বাটীতে আমার পিতামাতারও সর্ব্বদা যাতায়াত থাকায় এবং ঠাকুরবাড়ীর বিশেষতঃ স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর ওখানে আসা-যাওয়ায় আমার মাতা ঠাকুরাণীর সহিত স্বর্ণকুমারী সখীত্ব স্থাপন করেন ও তাঁহার সেই সময়কার লেখা অনেক পুস্তক মাতা ঠাকুরাণীকে উপহার দেন। অনেক পুস্তক এক্ষণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে বটে, তত্রাচ তাঁহার লেখা প্রথম সংস্করণ কিছু বই এখনও আমাদের ভাণ্ডারে আছে।

অক্ষয়চন্দ্র অলস থাকিতে পারিতেন না। তিনি ব্যবসায়ে এটর্ণী হইলেও তাঁহার আফিসে বসিয়া কাজ না থাকিলে খেয়াল বশতঃ ব্রিফের উপরেই কবিতা বা ছড়া অনেক সময় লিখিয়া রাখিতেন। আমার জ্যেষ্ঠতাত ৺কালিদাস ভঞ্জ সমব্যবসায়ী থাকায় এবং উভয়ের আফিস ৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোডে থাকায় একত্রে কাছারী যাতায়াত করিতেন এবং আফিস-ফিরতি যখন আমার জ্যেঠামহাশয়কে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া অক্ষয়চন্দ্র নিজ ভবনে যাইতেন, সে সময় বহু দিন আমরা তাঁহার সঙ্গ লইতাম ও দেখিতাম যে, আদালতের কাগজের উপর তাঁহার কবিতা লেখা। অক্ষয়চন্দ্রের লেখা কবিতা বা গান তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত সেই সময়কার 'ভারতী' পত্রের পৃষ্ঠায় অনুসন্ধান করিলে এখনও পাওয়া যায়। স্বর্ণকুমারী দেবী জোর করিয়া তাঁর পত্রে প্রকাশ জন্য অক্ষয়চন্দ্রের লেখা লইলেও অক্ষয়চন্দ্র "অনামী" থাকিতেই চাহিতেন। সাহিত্যিক নাম জাহির করিবার তাঁহার বিন্দুমাত্রও স্পৃহা ছিল না। তিনি ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন। তখন তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে ছোট সহোদর মনে করিতেন। রবীন্দ্রনাথের উল্লেখে অক্ষয়চন্দ্রকে কখনও "রবি" ভিন্ন বলিতে শুনি নাই। বিশ্বকবিকে অক্ষয়চন্দ্রের বাড়ীর চৌবাচ্চায় অপরাহ্ণে গলা অবধি ডুবাইয়া বসিয়া থাকার দৃশ্য আমি নিজ চক্ষে দেখিয়াছি। সে সময় অক্ষয়চন্দ্র আমাদের বাড়ীর নিকটে নন্দকুমার চৌধুরীর লেনে (অধুনা ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট) বাস করিতেন। অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার মৃত্যুকালে আপার সারকুলার রোডে বাস করিতেন। অক্ষয়চন্দ্র যেদিন দেহত্যাগ করেন অর্থাৎ ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮১৮ সালে দ্বিপ্রহরে, "ছোটমা" শরৎকুমারী সে সংবাদ আমাদের বাড়ীতে জানাইলে আমি, আমার জ্যেষ্ঠতাতভ্রাতা ৺ক্ষেত্রনাথ ভঞ্জ, (৺কালিদাস ভঞ্জ এটর্ণী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র) ও আমার ছোট কাকা ৺হেমচন্দ্র ভঞ্জ সহ তৎক্ষণাৎ সারকুলার রোড ভবনে যাই। গিয়া দেখি, কে হিন্দু সৎকার সমিতিকে সংবাদ দিয়া সমিতির লোকদিগকে শববাহক হিসাবে আনাইয়াছে। আমরা তাহাদিগের সহিত শববাহকরূপে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করি।

হিন্দু-সৎকার সমিতির লোকদিগকে ২॥১ টাকা দিয়া বিদায় করিয়া যাহা হউক, আমরা দুই ভ্রাতা, অক্ষয়চন্দ্রের এক ভ্রাতুষ্পুত্র (নাম এক্ষণে স্মরণ নাই) ও এলাহাবাদ-নিবাসী ৺চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের দুই পুত্র ফণীন্দ্র ও মণীন্দ্র শবদেহ নিমতলা ঘাটে দাহকার্য্য জন্য বহন করিয়া লইয়া যাই। এখনকার দিনে সাধারণ লোকের জন্য যেরূপ উৎসব ও শোভাযাত্রা করিয়া শব বহন করা হয়, অক্ষয়চন্দ্রের তাহা হয় নাই বা সেদিন সে সময় কোন সাহিত্যিক বা গণ্যমান্য নাম-করা কাহাকেও তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত থাকিতে দেখি নাই। তাই মনে হয়, অক্ষয়চন্দ্র যেমন নামের বা যশের কাঙ্গাল ছিলেন না তাঁহার অন্তিম সময়েও যেন তিনি কাহাকেও না জানাইয়া মহাপ্রস্থান করেন। তিনি একমাত্র কন্যা উমারাণীকে রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পরে উমার বিবাহ শিল্পী যতীন্দ্রনাথ বসুর সহিত হয়। এক্ষণে উমারাণী ও যতীন্দ্রনাথ উভয়েই স্বর্গতঃ। উমারাণীর বিবাহের কিছু পরে শরৎকুমারী কন্যা ও জামাতাকে লইয়া ত্রিপুরার আগরতলায় থাকেন। শরৎকুমারী স্বামীর বিয়োগ-ব্যথায় কিরূপ মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেছিলেন তাহা আগরতলা হইতে আমার পিতা ঠাকুরকে লিখিত তাঁহার নিম্নের পত্রখানি হইতেই সাধারণে অনুভব করিতে পারিবেন। সে সময়ে তিনি যেন আর জীবন বহন করিতে পারিতেছিলেন না।

"শনিবার।

কাল তোমার চিঠি পাইয়া সকলে ভাল আছে শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। তুমি এবার আমরা আসার পর দু'-একখানি মাত্র চিঠি লিখিয়া পরে একেবারে পত্র বন্ধ করাতে আমরা বড় ফাঁপরে পড়িয়াছিলাম। মনে যে কত রকম অমঙ্গলের ঝড় বহিয়া গিয়াছে তাহা লেখা বা বলা যায় না (কিন্তু ঘটিলে সহা যায়) আমি তোমাকে লিখিয়াও যখন উত্তর পাইতে বিলম্ব হইল—তখন বুকুকে লিখিলাম যেন তোমাদের বাড়ী যাইয়া সকলকে

শরৎকুমারী

দেখিয়া আসিয়া আমাকে সংবাদ জানায়। বোধ হয় সে এত দিনে তোমাদের বাড়ী গিয়া থাকিবে।

আমার "মরণ বাঁচন সমান" নয় কি? আমার উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে তাহাতে কি আমাকে "জীবন্মৃত" করিয়া রাখে নাই? আর কেন বাঁচিয়া আছি? আমার দ্বারা ইহসংসারে কাহারও কোন কায হওয়ার আশা নাই, তবে এ মাংসপিণ্ড ভগবান কেন যে রক্ষা করিতেছেন বুঝিতে পারি না। তাঁহার সঙ্গে আমার সমস্ত সুখ গিয়াছিল—ভাল হইয়াছিল—ভগবানের মনে আরও কি আছে জানি না—কেন যে পুত্রাধিক জামাতা যতী হেন ধনকে দিয়াছেন—জানি না—এত সুখ কি চিরদিন থাকে? যতীকে পাইয়া যে পরিমাণে সুখী হইয়াছি—সেই পরিমাণে দুঃখ ভোগ করিতেও হইবে ত? সংসার সুখ-দুঃখময়—এখন চক্ষু ফুটিয়াছে—সুখের মোহে ত দুঃখের দিন ভুলিতে পারি না।

আমার প্রিয়তম যাহারা তাহারা চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু যাহারা আছে তাহারাও কি প্রিয়তর নহে? পাছে তাহাদের অমঙ্গল হয়, পাছে ঈশ্বরের নিকট অকৃতজ্ঞতা অপরাধে অপরাধী হই তাই ইহাদের লইয়া হাসিয়া-খেলিয়া বেড়াই। ভিতরে যে অন্ধকার এমনি করিয়া আলোয় আঁধারে সংশয়ে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করিতেছি—শান্তি কোথায়? ঈশ্বরে বিশ্বাস জন্মিয়াছে কিন্তু তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে যে আজও পারিলাম না—এ জন্য যে তাঁহার নিকট পদে পদে অপরাধী হইতেছি। তোমার মতন ২।১টি বন্ধু যদি না থাকিতেন তবে নিশ্চয় একটা মহাপাপ করিয়া ফেলিতাম—জীবন ধারণ করা ভার হইত। "বন্ধু" বলিলাম বলিয়া যেন কিছু মনে করিয়ো না—বন্ধুত্বের সম্বন্ধ আমি সংসারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ বলিয়া বিবেচনা করি।

কয়েক মাস হইল আমার একখানা বই বাহির হইয়াছে—নাম "শুভ-বিবাহ"। মজুমদার লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত শৈলেশ মজুমদারের কাছে চাহিলে পাইবে। শৈলেশকে আজ লিখিলাম যেন তোমাকে পাঠাইয়া দেয়। পড়িয়ো। * * * *

অবিলম্বে পত্র লিখিবে। শঃ।"

Posted	Received
Agartala	21 May 06.
19. May. 06.	

উমারাণীও একমাত্র কন্যা দেবযানীকে রাখিয়া স্বর্গলাভ করেন। দেবযানী এক্ষণে শিল্পী অতুলচন্দ্র বসুর সহধর্ম্মিণী।

অক্ষয়চন্দ্রের পরিবারের সহিত আমাদের এতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল যে, ৺শরৎকুমারী তাঁহার মৃত্যুর অত্যল্প কাল পূর্ব্বে তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া আমাদের ১০ নং রঘুনাথ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীটস্থ বাড়ীতে সকলের সহিত শেষ দেখা করিতে আসেন। তখন তিনি কন্যা-জামাতাকে লইয়া বালিগঞ্জের দিকে থাকিতেন। তাঁহার সে সময়ে সিঁড়ি উঠিতে কষ্ট হয় বলিয়া আমাদের বাহির বাড়ীর উঠানে আসিয়া বসিয়া পড়েন। আমরা সকলে তাঁহার ঐরূপ অসুস্থ অবস্থায় এতদূর আসায় মৃদু ভর্ৎসনা করিলে বলেন যে, "তোমাদের দেখবার জন্য প্রাণটা বড়ই হু-হু করছিল তাই থাকতে পারলুম না।" যতক্ষণ ছিলেন আমার মাতা ঠাকুরাণীকে পার্শ্বে রাখিয়া গলা ধরিয়া বসিয়াছিলেন—যেন আর দেখা হইবে না। সত্যই ঐ শেষ দেখা।

কালীঘাটের পট

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

কিছুদিন হল শিল্পের জগতে কালীঘাটের পটের খুব নামডাক হয়েছে। বাংলা দেশের চলিত শিল্প বলতে হাঁড়ি সরা কাঁথা মাদুরই আসর জাঁকিয়ে ছিল বাউল, কেত্তন, জাড়ি ঝুমুরের মত। হঠাৎ টপ্পা গানের ভঙ্গীতে কালীঘাটের পট এসে আসর মাত করে দিল। কালীঘাটের পটে এমন একটা কিছু ছিল যার আকর্ষণ দেখা মাত্রই মনকে ভিজিয়ে ফেলত; এর ঘরোয়ানা ঢং, এর মাত্রাবদ্ধ প্রকাশ-ভঙ্গী, গতিশীল রেখা যতটা নিকট, যতটা আবেগপ্রবণ এবং যে পরিমাণে স্বচ্ছ, সেই পরিমাণেই এর আবেদন রসলিপ্সু মনকে আকৃষ্ট করেছিল। অনেকে এই রেখাভূয়িষ্ঠ পটচিত্রের সঙ্গে ফরাসী চিত্রকলা আধুনিকতাবাদী কোন কোন শিল্পীর কাজের নিকট যোগ দেখে চমৎকৃত হয়ে কালীঘাটের পোটোদের মধ্যে মনীষার খোঁজ করেছেন। কেউ কেউ এমন ইঙ্গিতও করেছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় গোড়ায় কালীঘাটের অনেক পট লেনদেনের তল্পীজাত হয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে ইয়োরোপের বাজারে গিয়ে হাজির হয়েছিল। কথাটার মধ্যে কিছু সত্য থাকা অসম্ভব নয়। মনে আর সেজান, গ্যগাঁ আর পিকাসোর অনেক ছবিতে কালীঘাটের পটের খুব আদল যে নাই তা নয়। আর এই আদলের মূলে অমনি একটা কিছু সংঘটন আশ্চর্য নয়।

কালীঘাটের পটের মধ্যে রচনা বা শিল্পকৌশলের দিক থেকে রেখার বৈশিষ্ট্যই বিস্তৃত স্বীকৃতি লাভ করে থাকলেও এর আবেদন শুধু এই রেখাতেই সীমায়িত নয়। বৃহত্তর সংবেদনশীলতা, দৃষ্টি-ভঙ্গীর স্বচ্ছ সাবলীলতা, এবং বর্ণিত বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠায় কালীঘাটের পটশিল্পে যে স্তরের রস-পরিবেশনের পরিচয় পাওয়া যায়—ভারতশিল্পের গতানুগতিক প্রবাহে তার তুলনা খুব বেশী নেই। এই দিক থেকে কালীঘাটের পটের একটা বিশেষ স্থান নিশ্চয়ই স্বীকৃত হবে। রচনা-পদ্ধতির দিক থেকে পোটোদের উপজীব্য খুবই সীমায়িত; মাল-মসলার বালাইও তাদের ছিল খুব কম। ভারতে প্রচলিত রঙ এবং রেখাবিন্যাসকে মূলধন করেই পোটোরা পট আঁকায় প্রবৃত্ত হয়েছিল; এই দিক থেকে খুব মৌলিকত্ব তারা দাবী করতে পারে না। অনেকে অজন্তার চিত্রকলার সঙ্গে পটুয়াদের রেখা-বিন্যাসের নৈকট্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন; কেউ বা এদের কেরামতি কিছু ছিল না এটা ধরে ফেলে সবাইকে চমৎকৃত করেছেন। কিন্তু এ কথা কেউ ভাবেননি যে, এরা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই শিল্পের প্রবহমান ধারা থেকেই প্রেরণা এবং উপকরণ সংগ্রহ করেছিল এবং এই অনন্যসাধারণ (?) কাজের জন্য তারা কারু কাছে বাহবার প্রত্যাশা করেনি। শিল্প এবং মনন কল্পনায় গতানুগতিকতা মরেও কেমন অজরামর থেকে যায় তার পরিচয় অহরহ পাওয়া না গেলেও খুব বিরল কিছু নয়। একাধিক মাথাওয়ালা জন্তুর কল্পনা মহেঞ্জোদরোর শীলমোহরে আছে; অজন্তার দুই মাথাওয়ালা মৃগের সঙ্গে পরিচয় শিল্পরসিকদের খুবই ঘনিষ্ঠ; বাংলার কোন কোন মধ্যযুগীয় প্রতিমায় একাধিক মাথাওয়ালা জন্তুর সমাবেশ দেখা

অমল মিত্রের সৌজন্যে

দেড়শো বছরের পুরানো কালীঘাটের পট

যায়। (আশুতোষ চিত্রশালার চণ্ডীমূর্তি) আর উড়িষ্যার পটে আঁকা বা কাগজের মণ্ডের মায়ামৃগে এখন দুইটি মাথা লাগাবার রেওয়াজ রয়েছে। কোন অবচেতন অবস্থা থেকে কালীঘাটের পটুয়া তার রেখাবিন্যাসের কৌশল অধিগত করেছিল তা জানা না গেলেও সে যে গতানুগতিকতার শিল্পস্রোত থেকেই আপনার উপজীব্য গ্রহণ করে তার সৃষ্টিকে রসোজ্জল করেছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কৃতী শিল্পীর হাতে এই রেখা নির্ভুল, নিষ্কম্প, লীলায়িত এবং দৃঢ়তা-সম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। এই প্রত্যেকটি গুণই কঠিন অধ্যবসায় এবং সাধনা দ্বারা অধিগত করতে হয়েছিল এবং এইখানেই কালীঘাটের শিল্পীর কৃতিত্ব। বিবৃত বিষয়বস্তুকে বাস্তবনিষ্ঠ করতে গিয়ে পটুয়াকে পশুপক্ষী এবং মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছিল; এই পর্যবেক্ষণ শুধু আকৃতিগত নয়; গতি এবং প্রকৃতির অবয়ব, হাবভাব পোষাক পরিচ্ছদের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটিকে পটুয়ারা এমন ভাবে আয়ত্ত করেছিল যে, অনায়াস রেখার টানে দেহের ভঙ্গী, মুখের ভাব, চোখের আর ঠোঁটের একটু ভঙ্গী, এবং আঙুলের একটু মুদ্রা কখনও সামান্যও ভুল হয়নি; যেমনটি তারা চেয়েছে ঠিক সেই ভাবেই তা রূপায়িত হয়েছে। রচনা-পদ্ধতির দিক থেকে এইখানেই পটুয়ার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব, এইখানেই সে ওস্তাদ ছকদার বা draftsman. কালীঘাটের পটুয়া কিন্তু শুধু ছকদার বা ড্রাফট্সম্যান নয় তার কৃতিত্ব আরও অনেক বিস্তৃত। শিল্পের শাস্ত্র-নির্দ্ধারিত কাঠামোকে ছাপিয়ে শিল্পকে ব্যবহারিক দিকে প্রত্যক্ষ ভাবে জনসাধারণের অধিগম্য করে তোলার মধ্যে যে দুঃসাহসিকতা, যে বিধিভঙ্গের (convention) উন্মাদনা, যে বিদ্রোহপ্রবণতা দেখা যায়, কালীঘাটের পটুয়ার অনন্যসাধারণতা সেইখানে। এইখানে চিরদিনের শিল্পী মনে বিধি-নির্দ্ধারিত পথের সঙ্গে আপন সত্তার নির্দেশিত পথের যে দ্বন্দ্ব তারই পরিচয় দেখা যায়। এই দ্বন্দ্বই যুগে যুগে শিল্পকে এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে, এক স্তর থেকে অন্য পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে—; এইখানেই শিল্পীর গতি-প্রকৃতির চিরন্তন দ্বন্দ্ব। কাজের সুবিধার জন্য মানুষ নিজেই বিধি রচনা করে; চলাচলের সুবিধার জন্য পথ। চির প্রগতিশীল মানুষ কিন্তু চিরদিন একই বিধির অধিগত থাকতে চায় না, চলতে চায় না একই পথে। নিজের তৈরী বিধিতে যেদিন মানুষ জড়িয়ে পড়ে সেইখানে হয় তার মৃত্যু। আবার বিধিকে অতিক্রম করতে গিয়ে ভুল পথে চলতে অনেক সময় আসে বিপর্যয়। যাঁরা নূতন বিধি গড়ে দাঁড়াতে পারে, রচনা করতে পারে নূতন পথ, গোড়াতে তাদের ললাটে জোটে লাঞ্ছনা; কিন্তু এরাই হয়ে দাঁড়ায় পরে দ্রষ্টা। নূতনের সন্ধান এনে এরাই পুরাতনকে সঞ্জীবিত করে; সমাজকে নূতন গড়নে রূপায়িত করে এরা মানুষের প্রগতির পথ রচনা করে।

কালীঘাটের পটুয়ারাও পটের জগতে এই নূতন পথের প্রবর্তন করেছিল। দেবদেবী এবং দৈবী ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষ ছাড়া শিল্পে রূপ লাভ করবার অধিকার ভারতের শাস্ত্রকারেরা দেয়নি। সমাজের প্রত্যেকটি স্তরের মত শিল্পের ক্ষেত্রেও এদের কড়া শাসন চিরকালই উদ্যত খড়্গের মত শিল্পীর ঘাড়ের ওপর ঝুলোনো থাকতো, নির্ধারিত বিধি-নিষেধের এক তিল এদিক-ওদিক যাওয়ার স্বাধীনতা শিল্পীর ছিল না। যে দেবদেবী এই শাস্ত্রনির্দেশকদের ছিল একচেটে সম্পত্তি, তাদের রূপ প্রকৃতি বেঁধে দিয়ে তারই মাধ্যমে চলত এদের সমাজ-শাসন। কালীঘাটের পটুয়া এই বিধিনির্দেশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজের মনোগত দেবদেবী রচনা করে প্রথম দুঃসাহসের পত্তন করল। কালীঘাটের পটুয়াদের কালী লোল-জিহ্ব ভয়ঙ্করী রূপ ত্যাগ করে করুণাময়ীরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। কালীমন্দিরের দরজায় বসে এই দুঃসাহসের তুলনা পাওয়া যায় না। এর পর তাদের হাত দিয়ে আর যে সব দেবদেবী রচিত হল তাঁরাও হলেন বাঙ্গালী গৃহস্থ-ঘরে অতি নিকটের অতি পরিচিত দেবতা; পরিবারের নিকট-আত্মীয়। দেবী হলেন উমা, শিব হলেন সাধারণ ভোলা গৃহস্থ, কৃষ্ণ তাঁর বাঁশের বাঁশী নিয়ে সীমান্তের মাঠে নেমে এলেন, দিনান্তের গৃহপ্রত্যাবর্তনশীল গ্রামধেনুর সঙ্গে। এমনি করে দেবতাদের নিজের করে নেওয়ার পরিচয় কিছুটা বাংলার মঙ্গলকাব্যের মধ্যে থাকলেও তার পরিপ্রেক্ষিত পৌরাণিক খোলস ছেড়ে খুব বেশী দূর এগুতে পারেনি। কিন্তু পটের এই দেবদেবী গল্পের পৌর্বাপর্য ত্যাগ করে সোজাসুজি মানুষের মনে এসে নিজের স্থান করে নেয়। এরা নিতান্তই বাংলার মাঠ-ঘাটের বিচরণশীল গ্রামেরই মানুষ, আমাদের আপনার লোক।

এমনি করে দেবতাদের ঘরোয়া করে নিয়ে পটুয়ারা নিছক শিল্প-রচনার চেষ্টায় বিষয়বস্তুর খোঁজে সমাজের নানা স্তরে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। সমাজ এ সময় যে অবস্থায় এসে পড়েছিল তাতে পটুয়াদের রস-সমৃদ্ধ বিষয় রচনায় কখনও অপ্রতুলতা ঘটে নাই। মহৎ এবং উল্লেখনীয় বিষয় অপেক্ষা নীচ স্তরের প্রমোদ-বিলাসে সমাজ তখন পূর্ণ। কালীঘাটের পটুয়ারা সমাজের এই গ্লানিকর অবস্থাগুলি ফুটিয়ে তুলতে যে কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গেছে, ভারতশিল্পে তার তুলনা খুব বেশী নেই। সমাজের গ্লানি যাদের খুব বেশী করে স্পর্শ করেছিল কলকাতার সেই বাবু সমাজই ছিল পটুয়াদের এই চিত্রণ ব্যাপারের উপজীব্য। এই সমাজের নরনারীর দেহ গঠনের বৈশিষ্ট্য, বেশভূষা, আকৃতি-প্রকৃতির যে বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় এই ছবিতে পাওয়া যায়, সাহিত্যের জগতে সমসাময়িক শক্তিশালী লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নক্সায়ই তার কিছুটা আদর্শ আছে। কিন্তু হুতোমের ব্যঙ্গ-বিশ্লেষণের মধ্যে যে তীক্ষ্ণতা কালীঘাটের পটে তা নেই। বরং এর মধ্যে একটা সহজাত দরদ এমন ভাবে ফুটে উঠেছে দেখা যায় যাতে করে মনে হয়, হুতোমের ব্যঙ্গের কশাঘাত অপেক্ষাও কালীঘাটের পটুয়াদের দরদ-সংপৃক্ত ইঙ্গিত সমাজের এই সব বিপথগামী নরনারীকে সুপথে আনতে অধিকতর সহায়তা করেছিল। সমাজ-সচেতন পটুয়ারা সে যুগে শিল্পের মাধ্যমে যে কৃতিত্ব, সৎসাহস এবং শিল্পের সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠার যে সমন্বয় ঘটিয়েছিল, বর্তমানের শিল্পীদের তা অনুধাবন করবার উপদেশ দেবার ধৃষ্টতা আমার নেই। কালীঘাটের পটুয়ারা জগতের বহু পথসন্ধানী বিদ্রোহীদের মতই নূতন জগতের সাধনায় আত্মবিলোপ করে গিয়েছে। চির-দারিদ্র্য তাদের সন্তোষ কখনও নষ্ট করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত কালীঘাটের পট তাই রসোত্তীর্ণ এবং বাংলার বাঙ্গালী চিরদিনই এই পটুয়াদের দরদের সঙ্গে মনে রাখবে।

শ্রীমতী লিজেল্ রেমঁ

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ছেলেবেলায়

১৮২৫ সনের কাছাকাছি। আয়র্ল্যাণ্ড তখন নির্মম গেরিলা যুদ্ধের কবলে। মানুষে-মানুষে ঘরে-ঘরে দলে-উপদলে সে কী রেষারেষি আর হানাহানি! এক দিকে ক্যাথলিক আর প্রোটেষ্টাণ্টরা যুঝছে,—ধর্মবিশ্বাসের চৌহদ্দি নিয়ে তাদের টানাটানি; আর এক দিকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বান ভয়াল উচ্ছ্বাসে ফুঁসে উঠেছে। মুক্তিপিপাসু আয়র্ল্যাণ্ডের আর্ত প্রার্থনা দেবতার দুয়ারে আছড়ে মরছে সেদিন।

আইন জারি হল, রাজদ্রোহীদের সব-কিছুই বে-আইনী, তারা জমি কিনতে পাবে না, ব্যবসা করতে পাবে না, আদালতে জুরির কাজ বা স্কুলে মাষ্টারি করতে পাবে না, হাতিয়ার নিয়ে চলা বা ঘোড়ায় চড়া তাদের বারণ; এমন কি মরলে পর গোরস্থানের মাটিতে তাদের কবর দেওয়াও চলবে না।···প্রতিদিন সান্ধ্যোপাসনার পর দেশ ভক্তেরা এই কুখ্যাত হুকুমনামার ধারাগুলো একবার করে আউড়ে যেতেন—বুকের আগুন জ্বালিয়ে রাখবার জন্যে।

এই সময় সারা দেশে একটি লোকের খ্যাতি রূপকথার মত ছড়িয়ে পড়েছিল। জন নোবল্ তাঁর নাম। উত্তর-আয়র্ল্যাণ্ডের ছোট্ট এক শহর রষ্ট্রেভর; চৌদ্দ শতকের শেষাশেষি তাঁর পূর্ব-পুরুষেরা স্কটল্যাণ্ড ছেড়ে ওখানে বসবাস করতে আসেন। জন নোবল্ ছিলেন উত্তর-আয়র্ল্যাণ্ডের ওয়েস্লিয়ান চার্চের ধর্মযাজক। ও-অঞ্চলে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির একেবারে গাঁটছড়া বাঁধা। জন তাই তিন বছরে একবার করে তাঁর এলাকা বদলাতেন। এমনি করে যাজক হিসাবে সারা দেশ ঘুরে বেড়ানোর ফলে দেশের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর ছিল তাঁর নখদর্পণে—দূর-দূরান্তের খামার-বাড়ি থেকে শহরের ভদ্রাভদ্র কারুরও বাড়ির কোনও কথাই তাঁর অজানা ছিল না। তাঁর পূর্বপুরুষেরা কঠোর নির্যাতন করেছেন রোমান ক্যাথলিকদের; জন নোবল্ আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা কিন্তু এঁদের হয়েই ইংল্যাণ্ডের অনুরাগী চার্চ অফ আয়র্ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে লড়তে লাগলেন। কখনও বা একটা বোমা ফাটল, কিংবা দেশপ্রেমিকদের একটা-দুটো সম্মেলন ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হল। এমনি সব অত্যাচারের প্রতিবাদ করা হত মৌন বিরুদ্ধতায়; হয়তো জন কয়েকের ফাঁসি হল, অমনি অন্য নেতারা এসে দাঁড়ালেন তাঁদের জায়গায়। ওদিকে জন তাঁর নিজস্ব ধরণে লড়ে চলেছেন অতন্দ্র উৎসাহে। তাঁর দেবতা আর যুদ্ধদীর্ণ স্বদেশ, দুয়ের সেবাই করতেন তিনি। দুজনেই যে তাঁর আরাধ্য!

১৮২৮ সন,—তাঁর বয়স তখন হবে চল্লিশ। এক বন্ধুর বাড়িতে মার্গারেট এলিজাবেথ নীলাস্ নামে এক অষ্টাদশী তরুণীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। এলিজাবেথ বৈবাহিক সূত্রে জনের দূর-সম্পর্কের বোন। তাঁদের মিলন হল যেন মণিকাঞ্চন যোগ। এ বিয়েতে কন্যাপক্ষের মত ছিল না, তারা ঘরছাড়ার হুমকি দিয়ে বিয়ে ভেঙে দিতে চাইলেন। কিন্তু সব-কিছু অগ্রাহ্য করে মার্গারেট দৃপ্ত মহিমায় জন নোবলের পাশে এসে দাঁড়ালেন, ভাগ নিলেন তাঁর যত-কিছু দায়-দায়িত্বের। দাম্পত্য-জীবন তাঁদের সুখেরই হয়েছিল। কিন্তু ছোট-ছোট ছেলেপুলে নিয়ে পঁয়ত্রিশ বছরে মার্গারেট বিধবা হলেন। জীবনে নেমে এল কঠিন দুঃখের অভিশাপ, বড় ছেলে জন তখন মোটে ষোল বছরের; আর পাঁচটি ভাই-বোনকে মানুষ করে তোলবার জন্য মাকে কতটুকু সাহায্যই বা সে করতে পারে! অথচ দুঃখিনী মায়ের দশা বোঝবার মত বয়স অন্যদের তখনও হয়নি,—সব-ক'টিই নেহাৎ শিশু।

স্যামুয়েল মার্গারেটের চতুর্থ সন্তান। আমাদের নিবেদিতা এসেছিলেন তাঁরই ঘরে। রোজগারের বয়স হলে স্যামুয়েল এলেন কাকার কাছে কাজ শিখতে।. কাকা ছিলেন নামজাদা কাপড়ের ব্যাপারী। ব্যবসা-বাণিজ্যে স্যামুয়েলের যে খুব ঝোঁক ছিল তা নয়; কিন্তু উদ্যম আছে বুদ্ধি আছে যে ছেলের, সে যাতে হাত দেবে তাতেই যে সোনা ফলাবে। স্যামুয়েল কাজ করতেন মায়ের মুখ চেয়ে। ব্যবসা-বাণিজ্য মানেই যে 'দিনে ডাকাতি' এমনিতর একটা দ্বিধ নিয়ে একবার কাকার কাছ থেকে তিনি পালিয়ে আসেন। মাকে তখন ছেলের বিবেক-দংশনের জ্বালা ঘোচাতে হয় তাঁর স্বচ্ছ ও স্থিরবুদ্ধির প্রলেপ দিয়ে।···তার পর থেকে আর কোনও গোল হয়নি। মায়ের হাতে আপন উপার্জনের সবটুকু তুলে দিতে পারার আনন্দেই স্যামুয়েল কাজ করে যেতে লাগলেন।

বাড়িতে এলে স্যামুয়েল প্রায়ই দেখতেন, একটি পড়শীর মেয়ে মায়ের কাছে বসে হয়তো কিছু পড়ে শোনাচ্ছে। উনি ঘরে ঢুকলেই সে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়, আর স্যামুয়েলের কেমন যেন অস্বস্তিবোধ হতে থাকে। নিজেদের অগোচরে দুজনেই তাঁরা দুজনকে ভালবেসেছিলেন। তার পর একদিন সকালে দুজনের বিয়েতে মত দিয়ে মা প্রাণভরে তাঁদের আশীর্ব্বাদ করলেন,—তাঁর এই ছেলেটির জন্য মেরী হ্যামিল্টনের মত একটি বৌ-ই যে তিনি চেয়েছিলেন। মেরীও উত্তরকালে প্রায়ই বলতেন, মার্গারেটকে জগতের মধ্যে সব চাইতে শ্রদ্ধা করতেন তিনি,—তাঁর ঘরে বৌ হয়ে যাবেন এই কল্পনাতেই তাঁর মন বেশী ঝুঁকত স্যামুয়েলের পানে।

উত্তর-আয়র্ল্যাণ্ডের টাইরন—ঝোপে-ঝাড়ে ভরা জংলা মেঠো দেশ; ওরই মাঝে ডাংগানন শহরের ছোট্ট বসতি। এইখানে তরুণ দম্পতী তাদের গৃহস্থালী পাতলেন। স্যামুয়েলের জীবন-স্বপ্ন যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল নব বধূর সৌম্য-মধুর স্বভাবের ছোঁয়ায়; এই প্রথম তাঁর মনে হল পিতার জীবনাদর্শ আপন জীবনে ফুটিয়ে তোলবার কথা। নিজের ভরা-ভরতি দোকানে বসে কল্পনায় দেখতেন—কর্মক্ষেত্রে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বীরের মত। স্বদেশকে তিনি এনে দেবেন মুক্তি, পথহারা মানুষকে দেখাবেন পরম তীর্থের পথ।

কিন্তু তখনও এ শুধু কল্পনাই। আয়র্ল্যাণ্ডে বিদ্রোহের তরঙ্গ তখন নেতিয়ে পড়েছে; এদিকে তাঁদের পরিবারে একটা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব। তুয়ের পীড়নে তাঁর প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠত—মনে হত, কোন্ গারদে বন্দী তিনি! এ গণ্ডি ভাঙতে হবে—যেতে হবে আর কোথাও। জীবনের এই অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য এ তো তিনি চাননি। ক্ষোভ হয় তাঁর। তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শুনতে-শুনতে মার্গারেটের মুখে ফুটে ওঠে এক টুকরো সার্থকতার হাসি। তিনিও যে এই-ই চান! সন্তান-সম্ভাবনা হয়েছে তখন। আসন্ন মাতৃত্বের স্নেহাতুর প্রতীক্ষা নিয়ে মার্গারেট অনুভব করতেন, ভবিষ্যতের সকল দারিদ্র্য সকল ক্লেশ বরণ করে নিতে তিনি প্রস্তুত। স্বামীর সহধর্মিণী, অর্ধাঙ্গিনী যে তিনি।

২৮শে অক্টোবর, ১৮৬৭ সন। শরতের এক সোনার ভোরে মায়ের বুকে এল তাঁর প্রথম সন্তান। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে প্রসূতি আকুল কণ্ঠে দেবতাকে নিবেদন করলেন, 'ঠাকুর, আমার সন্তানকে আমি তোমার পায়ে সঁপে দিলাম।' মায়ের মনে কত না আশঙ্কা! বড়-বড় নীল চোখ, একটু-বা রোগা; ঘুমন্ত মেয়েকে দোলনায় ভাল করে প্রথম দেখে আনন্দে আর দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মায়ের চোখে জল আসে: 'ওরে খুকু, কী আছে তোর ভাগ্যে, কে জানে! সত্যি কি তাঁর পায়ে সঁপে দিতে পেরেছি তোকে?' ঠাকুরমার নামে নাম মিলিয়ে মেয়ের নাম রাখা হল মার্গারেট এলিজাবেথ।

এই উপলক্ষে সমগ্র নোবল্-পরিবার একত্র হলেন। সবারই মনে পড়ছিল পূর্বপুরুষদের বীরকীর্তির কথা। তাদের মাঝে ছিলেন কঠোর ব্রতী ধর্মযাজক, একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক আর তেমনি সব মহীয়সী বীরাঙ্গনা। এই নবজাতক পেয়েছে তাঁদের উদ্দীপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার উত্তরাধিকার। উৎসবের গোলমাল, তাই পাড়ার এক দাসীকে রাখা হয়েছিল বাচ্চাটিকে দেখাশোনা করবার জন্য। ওর গোঁড়ামির কথা কেউ জানত না; চুপি-চুপি এমনি একটা সুযোগই ও খুঁজছিল। অতিথিরা সবাই যখন ভোজের ঘরে, ও তখন বাচ্চা মার্গারেটকে কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে গেছে পাড়ারই এক ক্যাথলিক চার্চে, সেখানে ওকে ব্যাপটাইজ করে এনেছে। প্রতিবেশীদের কাছে নিজের বাহাদুরি ফলাতে গিয়ে কথাটা জানাজানি হয়ে গেল। নইলে কেউ জানতেই পারত না ব্যাপারটা।

মেয়ে যখন এক বছরের, স্বামি-স্ত্রী নতুন জীবন আরম্ভ করবেন স্থির করলেন। আসবাবপত্র বেচে ফেলে, দোকান তুলে দিয়ে মেয়েকে ওঁরা পাঠিয়ে দিলেন তার ঠাকুরমার কাছে। কেবল জ্বলন্ত বিশ্বাস সম্বল করে মেরী আর স্যামুয়েল পাড়ি দিলেন ইংল্যাণ্ডে। সম্পন্ন বণিক বরণ করে নিলেন স্বাধ্যায়রত ছাত্রের জীবন।

ম্যাঞ্চেষ্টারে এসে তিনটি বছর বীরের মত যুঝছিলেন তাঁরা। প্রশান্ত চিত্তে এবার ঈশ্বরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন স্যামুয়েল, আর তাঁর মনে কোনও দ্বিধা নাই। মরিয়া হয়ে কাজ করে যেতেন তিনি; অবসর সময়ে খুঁজে-খুঁজে জড়ো করতেন তাঁদের দেশের যে-সব লোক ওখানে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে এসেছে, তাদের। সপ্তাহে একটা সন্ধ্যায় তারা একত্র হত তাঁর ঘরে। একটা তেলের বাতি জ্বলছে, তার চার পাশ ঘিরে ওরা বসে, শুরু হয় দেশের কথা। নানান সমস্যা, আর ভবিষ্যতে কেমন করে তার সমাধান হবে, তারই আলোচনা।

স্যামুয়েলের কথায় যেন যাদু ছিল; এ তাঁর বাপের কাছ থেকে পাওয়া সম্পদ। এত দিন পরে জীবনকে এমনি করে কর্মের উন্মাদনায় ভাসিয়ে দিয়ে তিনি যেন আত্মহারা হয়ে গেলেন। তাই তিলে-তিলে দারিদ্র্যের ছায়া যে ছড়িয়ে পড়ছে সংসারের 'পরে, এ দেখবার সময় তাঁর ছিল না। শেষ পর্যন্ত সংসার অচল হয়ে উঠল। যেমন করে হোক, এবার কিছু উপার্জন করতে হয়।

সহজেই কাজ জুটে গেল। নিজের 'থেসিস্' তৈরী করতে-করতে উনি যে ক'টা 'সার্মন' দিয়েছিলেন সেগুলো খুব উৎরে গেল। তার পর, যে-সব যাজকেরা অসুস্থ বা ছুটিছাটায় থাকতেন, তাঁদের বদলে ভাষণ দেওয়ার কাজটা নিয়মিত ওঁর 'পরেই পড়ল। কাজটা পছন্দসই, কিন্তু বড় খাটুনি। ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এসেও বিশ্রাম নাই,—বহুক্ষণ ধরে পড়াশোনা করতে হয়। মেরী তাঁর অতন্দ্রিত পার্শ্বচারিণী। বই থেকে দরকারী কথা টুকে দেওয়া বা মিলিয়ে দেখা ওঁরই হাতে। এমনি করে তুজনে একান্ত নিজস্ব একটি জগৎ গড়ে তুললেন অক্লান্ত চেষ্টায়। তুজনেরই পড়াশোনায় খুব ঝোঁক, কাজেই বাইরের দিকে তাকানোর অবসর বড় মিলত না। কী দীর্ঘ আর কঠিন এ সাধনা!······স্যামুয়েল যখন ধর্মযাজকের পদ পেয়ে ওল্ডহ্যামে এলেন, তখন তাঁর তুটি ফুস্ফুসই জখম হয়ে গেছে।

ওদিকে মার্গারেট এত দিনে বড় হয়ে উঠেছে। ঠাকুরমার বাগান-ঘেরা বাড়িটিতে খেয়াল-খুশিতে বড় আনন্দেই দিনগুলো তরতরিয়ে বয়ে চলে···যে-সব পরীর গল্প সত্যি মনে করে শোনে ও, তাদেরই আনাগোনা ওর দিনে-রাতে। এই ফুল-বিছানো বাড়িখানাই ওর রংমহলের এলাকা, তুয়ারে তার সূর্যমুখীর প্রহরা। ও ঘুরে-ঘুরে দেখে, বিকাল বেলায় গাছে-গাছে ব্লু-বেলগুলি কেমন দোল খায়, লিলির পাপড়ি খোলে ধীরে-ধীরে, প্রজাপতিরা তার 'পরে উড়ে বসে মধুর লোভে। প্রতিটি পাখির সঙ্গেই ওর চেনা-পরিচয়; কোন্ শরবনের আড়ালে রূপালী পরীর বাসা, তা-ও ওর জানা।

এ ছাড়া আছেন জর্জ কাকা, সবাই তাঁকে মানে-গণে। ও-অঞ্চলে তিনি 'ডাক্তার' বলেই পরিচিত,—জড়িবুটি দিয়ে রোগ আরাম করেন বলে। ও-বিদ্যে তাঁর শেখা নয়, সহজাত। বনে-বনেই দিন কাটান, মার্গারেটকে প্রায়ই সঙ্গে নিয়ে যান; বিকালে বাড়ি ফিরে ওকে ঘুম পাড়ান কোলের উপর। ও কিন্তু যতক্ষণ পারে জেগে থাকে।······তেপান্তরের উপর দিয়ে কুয়াশা ঘনিয়ে আসছে; ওর চার পাশে যা-কিছু তখন ঘটছে, তাতেই যেন একটা রহস্যের আমেজ লাগছে ওর শিশু-মনে। সারা দিন বাড়ি তো ছিল নিঝুম, এবার যেন সে চনমনিয়ে বেঁচে উঠেছে। লোকজন আসছে, বসছে, বক্‌বক্ করছে ঠাকুরমার সঙ্গে। আগুনের ধারটিতে বসেছেন ঠাকুরমা··· সাদা চুলের 'পরে কালো একটা লেসের ওড়না জড়িয়ে। ওঁকে সবাই বলত "নিষ্ঠাবতী", আর খুব সমীহ করে চলত। কাকার কোলে পাখির ছানার মত মুখ গুঁজে ও শুয়ে আছে।······ভারী গলার কথা, কাচের গেলাসের ঠুংঠাং, তার পর হঠাৎ খানিকটা নিস্তব্ধতা······সব মিলিয়ে কী মজাই যে লাগে! তামাকের ধোঁয়ায় ওর চোখ তুটো জ্বালা করে। কখনও বা শিরালো হাতে ওর মাথার চুলে একক'র

হাত বুলিয়ে দিলেন কেউ। ও সবার নজর এড়াবার জন্য ঘুমের ভাণ করেই পড়ে থাকে কিন্তু।

মার্গারেট তার ঠাকুরমাকে দেবীর মত ভালবাসত; সে-ও ছিল যেন তাঁর চক্ষের মণি। মায়ের বেলায় ঠিক এমনটি হয়নি কিন্তু; মমতা ছিল, কিন্তু এমনতর অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ ছিল না। কী যে গভীর ছিল দুজনের ভালবাসা! ওদের পরস্পরের বিচ্ছেদের সম্ভাবনাতেই যে বেদনাবিধুর দৃশ্যের অবতারণা হবে তা' জল্পনা করতেও স্যামুয়েল আর মেরীর কষ্ট হত। মার্গারেট ঠাকুরমাকে কক্ষনো চোখের আড়াল হতে দিত না, সব সময়ে তাঁর পায়ে-পায়ে ঘুরত। বাড়ির রংচঙে বাইবেলটি হতে বর্ণ-পরিচয় হল ওর ঠাকুরমার কাছে,—তাঁর মনোমত ভজনগুলো তাঁর সঙ্গে আওড়ানোতে ওর ক্লান্তি ছিল না।

যখন চার বছরেরটি, বাপ এলেন মার্গারেটকে নিয়ে যেতে। ও একেবারে যেন মুষড়ে পড়ল। ওল্ডহ্যামে গিয়ে মা আর তিন বছরের বোনটিকে ও এই প্রথম দেখল। মাকে তো এ পর্য্যন্ত দেখেনি; তিনি ওর কাছে অচেনা, আর বোনটি খালি কাঁদে আর কাঁদে। নিজের ঘরে মার্গারেট যেন পরবাসী। রাগে ঈর্ষায় জ্বলে-পুড়ে শেষে ও ভাব জমাল বাড়ীর আইরিশ চাকরটার সঙ্গে। সে বেচারা নেহাৎ গেঁয়ো হলেও অনেক মজার-মজার ভূতের গল্প জানে। ওর মনটা একটু ঠাণ্ডা হয় তাতে।

দুটি শিশু বড় হয়ে ওঠে নেহাৎই ঘরোয়া পরিবেশে। ওদের খাসমহল হল শোবার ঘরখানা।···জানলা দিয়ে এক টুকরো পড়ো জমি দেখা যায়; সামনেই প্রকাণ্ড রান্নাঘরটা,—ওখানে সন্ধ্যায় আগুনের সামনে দু'বোনে খেলা করে। আর ইস্কুলে গেলে সেখানে আছে এক ফালি ফুলের বাগান। এই নিয়ে ওদের রাজত্ব। দু'বোন এক বিছানায় শোয়। সকাল বেলা সেখানকার তাঁতিরা চেঁচামেচি করতে-করতে কাজে যায়, শার্সির গায়ে বৃষ্টির ছাঁটে একঘেয়ে শব্দ হতে থাকে; ওরা ঠেসাঠেসি করে গা ঘেঁষে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে,—ঘুমটি যেন ওসব আওয়াজে পাতলা না হয়। ইস্কুলে যাবার পথে শহরটা একবার চক্কর দিয়ে নেয় দুজন। রাস্তাগুলো অন্ধকার ঝুপসি, একটিও গাছপালা নাই, বাড়িগুলো একই ছাঁদের—দেখবার কিছুই নাই, তবুও। সব চাইতে অদ্ভুত লাগত ইস্কুলটা। তিনটি আইবুড়ো ভদ্রমহিলা সেখানে ওদের লেখা-পড়া শেখান, আর, যাতে দুষ্টুমি না করে তার জন্য খেলার সময়টা ওদের ধরে-ধরে সেণ্ট জনের 'সুসমাচার' মুখস্থ করান। ইস্কুলে ওদের নাম হয়েছিল 'সুয্যি' আর 'বাদলা'। বিকাল নাগাদ বাড়ি ফেরে ওরা, তখন প্রায়ই এক দল বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে আসে 'কানামাছি' খেলবে বলে। রান্নাঘরটি ওদের খেলার জায়গা। কেমন গরম সেখানে, কেটলি শোঁ-শোঁ করছে, প্লেটে রুটি-মাখন সাজান। মা অগ্নিকুণ্ডের ধারে পা রেখে সেলাই করছেন। সারা দিনের মধ্যে এই সময়টায় সব চাইতে খুশি লাগে যেন।

সাত বছর বয়সে ঠাকুরমাকে হারাল মার্গারেট। তাঁর শেষ সময়ে স্যামুয়েল কাছে ছিলেন। ফিরে এসে একদিন সন্ধ্যোপাসনার পর ওদের কাছে বর্ণনা করলেন তাঁর চলে যাওয়ার দৃশ্যটি।···'কোলের উপর বাইবেলটি খোলা। একশ' তিনের ভজনটি তাঁর প্রিয় ছিল, ঐটি একবার আবৃত্তি করে পুবমুখী ফিরে বসলেন। ক্রমে চোখ দুটি বুজে এল, আর খুলল না। এই অবস্থাতেই তিনি চলে গেলেন। বুঝি অন্তরে-অন্তরে ঠাকুরের সঙ্গে মুখোমুখী হল, তাই আর বাইরে তাকানোর অবকাশ রইল না।'···মার্গারেট এক ফোঁটা চোখের জল ফেলল না, কিন্তু বুকের ভিতরটা ওর যেন পাথরের মত ভারী হয়ে রইল।···তার সুখের নীড় এ কোন্ ঝড়ে ভেঙে গেল!

ওল্ডহ্যামে এ কয় বছর স্যামুয়েলের শান্তিতে অথচ সার্থক কর্মেই কেটেছে। তিনি এখানকার ধর্মযাজক আর জনসাধারণের নেতা দুই-ই। কিন্তু শরীর তাঁর ক্রমেই ভেঙে পড়ছিল। চার বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর কর্মক্ষেত্র বেছে নিতে হল তাঁকে শহরে নয়,—ডেভনের গ্রেট টরেণ্টন গাঁয়ে।

মেয়েদের মনে হল, ওরা যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে। ওল্ডহ্যামের কাটখোট্টা বাড়িটা কোন্ কুহকে এমন মনভুলান পল্লী-আবাস হয়ে গেল?···চার পাশে মধুমালতীর ঝাড়, আধা-পড়ো বাগানে নানা ধরণের শৈবাল আর 'সুপর্ণী'র মেলা। যা দেখে তাই-ই চমৎকার! নিম ফুলের মরসুম শুরু হল যখন, তখন ওদের আরেকটি বোন জন্মাল। ঝোপে-ঝোপে পাখির বাসা, ঘাসের ফাঁকে-ফাঁকে কত-না ঝিঁঝিঁ আর প্রজাপতি, নদীর বুকে কোন গোপন প্রাণের ফোয়ারা উছলে চলেছে। যখন ঝিকমিকিয়ে রোদ ওঠে ওরা পাথরের উপর টিকটিকির মত শুয়ে-শুয়ে রেদে পোয়ায়, যখন বৃষ্টি পড়ে রিমঝিম্···রিমঝিম্, ওরা বাগানের পথে ছপছপিয়ে ঘুরে বেড়ায়। উপাসনা-ঘরে পাঁচটি ঘণ্টার রিনিঠিনি—তার পাশের কামরাটা ওদের পড়ার ঘর।

ভগিনী নিবেদিতা (অপ্রকাশিত চিত্র)

··· ···

মফস্বলের খোলা হাওয়ায় স্যামুয়েল কিছুটা সামর্থ্য ফিরে পেয়েই তাঁর নতুন কার্যক্ষেত্র গড়ে তুলতে লেগে গেলেন। দেখলেন, ওখানকার সাধারণ গ্রামবাসীদের সব-তাতেই কেমন একটা উদাস ভাব, আর ভদ্র সমাজের আগ্রহটা রুশ-তুর্কী লড়ায়ের প্রতি যতখানি, আধ্যাত্মিকতার প্রতি ততখানি মোটেই নয়। যে-সম্প্রদায়েরই হোন, স্যামুয়েল গোঁড়া ছিলেন না ; সরাসরি যাতে পল্লীসমাজে তাঁর ভাব ছড়িয়ে পড়ে, তার জন্য স্থানীয় পাদ্রীদের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করতে শুরু করলেন। প্রথম বছর পার হতে-না-হতেই ধর্মাচার্যকে কেন্দ্র করে একটা সত্যিকার বিদ্যাপীঠ গড়ে উঠল। সেখানে তিনি সবাইকে ধর্মের বাঁধি গৎগুলোই শুধু শেখাতেন না, অর্থনীতি ও ইতিহাসের প্রাথমিক সূত্রগুলোও ধরিয়ে দিতেন। আর দিতেন সেই সব শাশ্বত ধর্মের পাঠ, মানুষের জীবনে যা অপরিহার্য। স্যামুয়েলের ভাবধারা ধীরে-ধীরে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল।

পারিবারিক জীবনে তাঁর আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন। ধর্ম ছিল তাঁর জীবনসাধনার অঙ্গ, তাই তাঁর প্রতি কাজে তা রূপ ধরত চারিত্রিক মর্যাদায়। রবিবারে চার বার ভাষণ দিতেন তিনি ; স্ত্রী-কন্যা আর দাসী-চাকরেরাও সেদিন পুণ্যগ্রন্থ বাইবেলের সামনে একত্র হতেন। বাইবেল ধর্মপ্রাণ খৃষ্টানের জীবন-দিশারী, ওরই মাধ্যমে দেবতার সঙ্গে সবাইর সাক্ষাৎ বোঝাপড়া। শিশুর মনে এ-শিক্ষায় গভীর ছাপ পড়ে যায়। তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হয়,—'কিয়ামতে'র দিনে তাদের বিবেকই জাগ্রত হয়ে প্রকাশ করে দেবে সঙ্গোপনে ঢেকে-রাখা প্রতিদিনের ছোটখাট যত ত্রুটি-বিচ্যুতি। তবে কেন আর নিজেকে বঞ্চনা করা, কেন পালানো আপন মনের সন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়ে ? নিজেকে যে গড়ে তুলবে নিটোল পবিত্রতায়, বিশ্বতশ্চক্ষুর ন্যায়দণ্ড হতে রেহাই পাবে শুধু সেই-ই।

এই কঠিন শাসনের সঙ্গে স্বপ্নবিলাস বা কল্পবিহারের বিরোধ ছিল না কিন্তু। বরং বাইবেলই যে ওদের ছেলেখেলার রসদ যোগাতে পারে, স্যামুয়েল তা জানতেন। রবিবারের বিকালে বাইবেল নিয়েই ওদের খেলা। মেরী তখন ওদের দেখাশোনা করেন,—ওদিকে স্যামুয়েল মন্দিরে হয়তো দিনের উপাসনা শেষ করছেন।···সে কী মজা ! মায়ের কোলে মাথা গুঁজে কখনও ওরা আকুল প্রাণে প্রার্থনা করছে, কখনও বা মুগ্ধ আগ্রহে শুনছে বাইবেলের কোনও কাহিনী। মেরী এমন অলঙ্কার দিয়ে গল্প বলেন যে অতীতের পুণ্যকথা যেন ওদের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে।' দাদু হ্যামিল্টন এককালে পর্তুগীজদের সঙ্গে কারবার করতেন ; তাঁর আমলের তাল পাতার পাখা, পালকের টুপি আর কড়ির মালা নিয়ে ওরা সেই সেকালের ইহুদী রাজা বা নবী সেজে বসে। ছবির পর ছবি ভেসে চলে মনের পটে ! কত বীরচরিতে 'যতো ধর্মস্ততো জয়:' নীতি সার্থক হয়েছে··· ডেভিড বাজিয়ে চলেছেন সোনার বীণ···মূর্ধাভিষিক্ত বালক সলোমন চলেছেন খচ্চরে চড়ে, চারিদিকে বাজনা-বাদ্যির সঙ্গে থেকে থেকে রব উঠছে—'ইজরাইল রাজকী জয় !'

সন্তানদের সঙ্গে নিবিড় বাঁধনে বাঁধা পড়েছিলেন স্যামুয়েল। ওলডহ্যামে পর পর তিনটি ছেলে হয়ে আঁতুড়েই মারা গেল। একটি পুত্রসন্তানের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা ছিল তাঁর মনে। কিন্তু সে-ছেলে জন্মাল মরণের কালো ছায়ার মাঝে। তার জন্মের সঙ্গে-সঙ্গে শিশু অ্যানিকে মৃত্যু ছিনিয়ে নিয়ে গেল। স্যামুয়েলের মনে হল, এ যেন তাঁরই মৃত্যুর ইশারা। কিন্তু বুদের ব্যথা বুকে চেপে জীবনকেই তিনি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরলেন। রোগের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে দিন-দিন তিনি যেন নিজেকে গুটিয়ে আনছিলেন নিজের মাঝে। শুধু মার্গারেট জানত তাঁর মনের খবর।···সে তখন তাঁর সব চাইতে অন্তরঙ্গ সহচরী হয়ে উঠেছে।

মাত্র দশ বছরের মেয়ে হলে কি হয়, মাগারেট বুঝেছিল বাবার তাকে কত দরকার। বাইরে বেড়ানো বা খেলাধূলো ছেড়ে মেয়ে বাপের সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে উঠল। যখনই স্যামুয়েল ভাষণ দিতে যান, ও যায় সঙ্গে। নিজের জায়গাটিতে চুপচাপ বসে থাকে, উপস্থিত জনতাকে চেয়ে-চেয়ে দেখে···মুচি, ঘোড়ার ব্যাপারী, ছেলে-কোলে উকীলের বৌ···সবাইকে ও চেনে। বাপের উপাসনায় ওর মনটা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। নির্জনে তাঁর কথার ঢংটা পর্যন্ত ও নকল করতে চায়। কথায় জোর দেবার জন্য অল্প একটু মাথায় ঝাঁকি দিতেন স্যামুয়েল, সেটা ওর রপ্ত হয়ে গেল। তাঁর সহজ নেতৃত্বের ভাবটা নকল করে সেটা ও খাটাতে চায় বোনটি আর স্কুলের সঙ্গীদের 'পরে। যদিও নেহাৎ শিশু, তবুও স্বভাবটি ওর একটু অহঙ্কারী আর একরোখা। আর এমন-সব অদ্ভুত কল্পনা ওর মাথায় আসে যে সঙ্গীদের শুনে চমক লাগে। একা থাকতেও ওর ভালো লাগে ; তখন মনে-মনে গল্প বানায়, সে-সব গল্পের নায়িকা ও নিজে।

ওর বাবা যখন অভ্যাগতদের সঙ্গে দেখা করেন, সে সময়টা ওর খুব ভালো লাগে। একদিন ভারত-ফেরৎ এক ধর্মযাজক ওর প্রদীপ্ত মুখভাবে বড় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যাবার আগে ওকে একটুখানি আদর করে আশীর্বাদ করে গেলেন 'ভারতবর্ষ অতন্দ্র হয়ে তার দেবতাকে খুঁজছে।···যেমন করে আমায় সে ডাক দিয়েছিল, তেমনি তোমাকেও হয়তো ডাক দেবে। সেদিনের জন্য তৈরী থেকো।' অধীর ভাবাবেগে মার্গারেটের দেহ-মন থর-থর করে কেঁপে উঠল। বাপের কাছ থেকে মানচিত্রে ভারত কোথায় দেখে নিয়ে তার চার পাশে ও একবার আঙুল বুলিয়ে গেল। বাপ মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কিসের তৃষ্ণায় ওর দু'চোখে তখন আগুন জ্বলছে। সেদিন রাতে আতপ্ত আবেগে আত্মনিবেদনের মন্ত্র জপতে-জপতে ও শুতে গেল।

মাত্র ৩৪ বছর বয়সে স্যামুয়েল পৃথিবী হতে বিদায় নিলেন। স্ত্রীকে শেষ সম্ভাষণ করতে গিয়ে তাঁর মুখে এল মার্গারেটের নাম :—'ভগবান যেদিন ওকে ডাক দেবেন, সেদিন বাধা দিও না যেন··· ও পাখা মেলবে দূরের আকাশে, আমি জানি···ও এসেছে একটা বড়-কিছু করবার জন্য।' যেন দুহিতার দীপ্ত ভবিষ্যতের ছবি দেখতে-দেখতে হাসিমুখে স্যামুয়েল ঘুমিয়ে পড়লেন।

মার্গারেট কাঁদল। শুধু পিতা নয়, তিনি যে ওর বন্ধুও ছিলেন। ক'দিন পরে এক ঘরোয়া বৈঠকে দাদু হ্যামিল্টন ঠিক করলেন, কংগ্রিগেশনালিষ্ট চার্চের অধীনে যে হ্যালিফ্যাক্স কলেজ, সেখানে মেয়ে দুটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

মার্গারেট আর মে-র নতুন জীবন শুরু হল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদ্যালয়ে

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে দুই বোন হ্যালিফ্যাক্সের স্কুলে পড়তে এল। জানে, এবার কড়া শাসনে দিন কাটবে। শাসন মেনে চলতে ওদের

অনিচ্ছা নাই। তাই কিছুই ওদের নতুন লাগল না।···বন্দিশালার মত স্কুলের অজস্র জানালা-দেওয়া বিরাট বাড়ি, মেয়েদের সাদা পাড়ের নীল ইউনিফর্ম—সবই ওরা মেনে নিল। তাছাড়া শিগগিরই ওরা আবিষ্কার করল, বেশীর ভাগ ছাত্রীই ওদের মত ধর্মযাজকের মেয়ে। কাজ কি খেলা যাই হোক না কেন, স্কুলের ঘণ্টার তালেই সব-কিছু ওখানে পা ফেলে চলে; তাতেও ওদের খারাপ লাগে না কিছু। স্কুলের ঘরগুলোতে প্রচুর আলো-হাওয়া, দেয়ালে বড়-বড় ছবি, খেলার মাঠ প্রকাণ্ড—অনেকখানি জায়গা কাঁটা গাছের বেড়ায় ঘেরা। কাছেই এক পাহাড়, তার তলা অবধি স্কুল-কম্পাউণ্ডের সীমানা।

মেয়েরা দশটায় শোবার ঘরে ঘুমোতে যায়। সারি-সারি বিছানা। প্রত্যেকের বিছানার ধারে একটি করে নিজস্ব ওয়ার্ডরোব —তাতে কাপড়-চোপড় স্কুলের পোষাক-আশাক যত না থাকবার কথা তার চাইতে বেশী আছে শখের জিনিস! এক টুকরো নীল ফিতে, একটা শুকনো ফুল, একটা ফটো, চকচকে একটা নুড়ি— এ-হেন টুকিটাকি ওদের কাছে খুব দামী। বুধবার বিকালে যখন মনের খুশীতে মাঠে খেলার ছুটি পাওয়া যায় তখন, কিংবা অবসর-মত এগুলি বার করে নাড়া-চাড়া করা যায়। এর মধ্যে ওতে কেউ হাত দেবে, এ ভয় নাই। ঐ বুধবার দিন দুজন করে সার বেঁধে ওরা উঠে যায় সামনের পাহাড়টার উঁচু চূড়ায়। হু-হু হাওয়া সেখানে। মার্গারেট ওর বন্ধুদের ওখানে গল্পের বই পড়ে শোনায়, গল্পের নায়িকা সেজে অভিনয় দেখায়।

স্কুলের এলাকায় কঠিন নিয়ম কিন্তু। প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিস ল্যারেট নিজেকেও রেয়াৎ করেন না নিয়ম-কানুন মেনে চলার বিষয়ে, পরকে তো নয়-ই। বুদ্ধিতে শান দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে নীতিশিক্ষাও যাতে হয় মেয়েদের, সেদিকে তাঁর কড়া নজর। নিজের শিক্ষা-দীক্ষা হয়েছে ধর্মযাজকদের ধরনে, তাই তাঁর প্রভাবে সমস্ত স্কুলে একটা বিশুদ্ধ ধর্মপ্রাণতার হাওয়া বইত যেন। আত্মত্যাগ আর অন্যায়ের জন্য অনুতাপ করার ভাবটি যাতে জোরালো হয়ে ওঠে সবার মনে, এই ছিল তাঁর চেষ্টা। মেয়েরা তাঁর শিক্ষায় অন্যায় ইচ্ছা আর দোষ-ত্রুটি শোধরাবার জন্য নানা রকম সংযম অভ্যাস করত। অনেকে স্বেচ্ছায় সঙ্কল্প করত,—তারা ব্রহ্মচারিণী হবে, ভগবানের কাজে জীবন দেবে, আমোদ-প্রমোদ বা মাদক বর্জ্জন করবে ইত্যাদি। পরের জন্য স্বার্থত্যাগ করাটা সাধারণ শিক্ষা-সূচীর মধ্যে ছিল, ওটা অভ্যাস করতে হত সবাইকে।

মার্গারেটের মনে মিস ল্যারেটের প্রভাব খুবই পড়েছিল—যত ভয় করত তাঁকে, তার চাইতে বেশী করত শ্রদ্ধা। অন্য মেয়েদের চেয়ে পড়াশোনায় অনেক এগিয়ে ছিল বলে মার্গারেটের পক্ষে আদর্শ ছাত্রী হওয়া মোটেই শক্ত ছিল না। কিন্তু ওর মুক্ত মন আর দৃপ্ত স্বভাবের জন্য ওকে অনেক হাঙ্গামা পোয়াতে হত। দেখতে ভারী সুশ্রী ছিল ও; এক রাশ সোনালী চুলে ঘেরা ফুটফুটে মুখখানির চার পাশ দিয়ে যেন স্বর্ণচ্ছটা ঠিকরে পড়ছে। সে জন্য খানিকটা গর্ব ছিল বই কি ওর মনে! মিস ল্যারেট সেটা বুঝতে পেরে ওর চুল কেটে দিয়ে বললেন 'এক বছরের আগে আর এ চুল রাখতে পাচ্ছ না।' এমনি শাসন তাঁর! প্রতিদিন বিকালে ছাত্রীরা একসাথে মুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা করে নতজানু হয়ে। সেই সময় মিস ল্যারেট একে-একে তাদের যত-কিছু দোষ-ত্রুটির কথা সবার সামনে বলে যেতেন। যারা দোষী, তাদের মন গভীর দৈন্যে নুয়ে পড়ে। মার্গারেটকে প্রায়ই শাস্তি পেতে হত। নতজানু হয়ে বসে থাকে ও, চোখের জলে বুক ভেসে যায়। ওর না হয় রাগ, না জাগে বিদ্রোহ, নিজেকে নির্ম্মল করবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা শুধু হৃদয়ে জ্বলতে থাকে। নিজেকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, বোনকে শাস্তিস্বরূপ যে কাজগুলো দেওয়া হয় তার হয়ে ও সেগুলো করে দেয়, নিজের হাতখরচা ওকে দিয়ে দেয়, এমন কি, রবিবারে পাওয়া নিজের মিষ্টির ভাগটাও বিলিয়ে দেয় বোনটিকে।

এমনি কড়া শাসনে দিন কাটিয়েও মার্গারেটের স্বপ্ন দেখার অভ্যাস ঘোচে না। থেকে-থেকে ওর মন ছুটে যায় সেই অবন্ধন কল্পলোকে: সেখানে গুরুজনরা নাই, নাই অবাঞ্ছিত আর কেউ। রাতের শেষ ঘণ্টা বাজে যখন, তখন ওর ঘরে মেয়েদের নিয়ে ও পাড়ি দেয় সেই স্বপ্নরাজ্যের উদ্দেশে।···ওরা চলে যায়, পথের ধারে জেকব যেখানে ঘুমিয়ে পড়েছেন পাথরের উপর মাথা রেখে। জল খাওয়ানোর পর ভেড়ার পাল আশেপাশে চরে বেড়াচ্ছে—কেউ শাদা, কেউ কালো, কেউ রঙ-বেরঙের। হঠাৎ মেঘের বুক চিরে আকাশ হতে নিঃশব্দে সোনার সিঁড়ি নেমে এল। সেপথে দেবদূতদের আনাগোনা,—জ্যোৎস্নালোকে লঘু পায়ে তাঁদের চলাফেরা, শুভ্র বসন ঢেউ খেলছে হাওয়ায়-হাওয়ায়।···অমনি হা-হা করে হেসে উঠে বিছানার চাদর উড়িয়ে মেয়েরা বলে, 'দেখ ভাই, আমরা যেন সেই দেবদূতদের পাখার হাওয়া!' আরেকটা গল্প ছিল মার্গারেটের খুব প্রিয়। নানা রকমে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গল্পটা ও বলে: 'একদিন একটা মাতাল এক গর্তে পড়ে গিয়েছে। গর্তটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে যখন উঠে আসছে, মস্ত একটা মদের পিপেয় মাথা ঠুকে ও আবার বলের মত গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। ছোট ছোট পিপেগুলো অন্ধকারে এই সব না দেখে হেসেই কুটিকুটি। হাসে, আর বলে, 'আরো গড়াও, আরো গড়াও।' তখন বড় পিপেটা বার কয়েক দুলে নিয়ে ঝুল দিতে-দিতে ঠিক মাতালটার উপরেই গড়িয়ে পড়ল। লোকটা যা মুখে আসে তাই বলে খেঁকিয়ে উঠল···শেষে খোঁৎ-খোঁৎ করতে-করতে আরেকটা উল্টান দিয়ে ভাঙা পায়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে দৌড়!' মেয়েরা সঙ্গে-সঙ্গে হাততালি দিয়ে ওঠে মহানন্দে, আর ঐ রকম কুমড়ো-গড়ান গড়াতে-গড়াতে বেদম হয়ে পড়ে।

গল্প-বলিয়ের কল্পনা যে কত দূর গড়াবে বা শেষটা যে কি দাঁড়াবে, শ্রোতারা তা কিছুতেই ধরতে পারত না।···একদিন শয়তানের সঙ্গে দেবদূতের লড়াই চলছে, মার্গারেট নিয়েছে শয়তানের পাঠ। দেবদূত শয়তানকে কাবু করে ফেলেছেন দেখাতে গিয়ে ও নিজের একগোছা চুলই ছিঁড়ে ফেলল! মেয়েরা তো দেখে অবাক!

দুটি বছর স্কুলে কাটল।···মিস ল্যারেট স্কুল ছেড়ে গেলেন। নতুন প্রধান শিক্ষয়িত্রী যিনি এলেন, তিনি আলাদা ধরনের মানুষ। ভদ্রমহিলা খুব মেধাবী। রুচি তাঁর সাহিত্যে, অথচ পড়ান উদ্ভিদ-বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা আর বলবিদ্যার প্রথম পাঠ। তাঁর সংস্পর্শে এসেই মার্গারেটের মনে নতুন নতুন প্রশ্ন জাগল। 'মরণেই কি জীবনের শেষ? সব-কিছুরই যদি বিনাশ না হয়ে কেবল রূপান্তরই ঘটে, তাহলে প্রাণ ধাতুর কি পরিণতি ঘটে মৃত্যুতে?' সমস্তটা স্কুলে যে

চিরকেলে গোঁড়ামির রাজত্ব, মার্গারেট তার মধ্যে নিতান্তই খাপছাড়া। এই তেরো বছরের মেয়ের চিন্তাশক্তি দেখে আশ্চর্য লাগত মিস কলিন্সের। একান্তে ওকে ডেকে এনে নানা রকম প্রশ্ন করেন তিনি। মার্গারেটকে নিজের হেপাজতে রেখে তিনি ওকে শেখাতে লাগলেন, কেমন করে মনকে বশে আনতে হয়, স্বাধীন চিন্তায় নিজস্ব মতামত কেমন করে গড়ে তুলতে হয়। সাহস পেয়ে মার্গারেট একদিন বলে বসল, "ভগবান আছেন বিশ্বাস করি, কিন্তু আমি তাঁকে জানতে চাই, বুঝতে চাই।" ওর মুখে সেই আদিম প্রশ্ন, 'বলে দাও, "কেন প্রাণ: প্রথম: প্রৈতিযুক্ত:"?' বাইবেল খুলে আবেগভরে খানিকটা পড়ে যায়; তার পর নির্ভীক হৃদয়ের স্পর্ধিত জিজ্ঞাসা নিয়ে বাইবেল ঠেলে রেখে ও খুলে বসে বিজ্ঞানের বই···অপরাধ হল না কি? ভয়ে ওর বুক কেঁপে ওঠে। কিন্তু অপরাধের সাজা ও মাথা পেতে নেবে।···এমনি দুরন্ত ওর তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা। অধ্যাত্ম-জীবনের আদিপর্বে আছে যে সংশয় আর উৎকণ্ঠা, তারই ঘাত-প্রতিঘাতে ওর অন্তর্জীবন বিকশিত হয়ে উঠছিল। কিন্তু ভাগ্যবশে সে তিক্ত অভিজ্ঞতা হওয়ার আগেই মিস কলিন্সের কল্যাণে কলা আর সঙ্গীতে আধ্যাত্মিকতার যে রসোত্তীর্ণ প্রকাশ, তার সন্ধান ও পেয়ে গিয়েছিল। কয়েকখানা সুনির্বাচিত বই আর ছবি নেড়ে-চেড়েই রং ও রেখার নিটোল আদর্শটি ওর মনে বসে গেল। ভাল ছবির সুষম ছন্দে ওর যে কী গভীর আনন্দ! এ ছাড়া গথিক স্থাপত্যের প্রাণ যে ভক্তি-বিশ্বাস, ওর স্বভাব-মরমীয়া চিত্ত সহজেই সেটা ধরতে পারল। খৃষ্টের আননে যে দিব্য প্রেমের বিভা, প্রার্থনা-সঙ্গীতের সুরে যে সর্বব্যাপ্ত করুণার আশ্বাস,—এগুলো ও অনায়াসে বোঝে। ভজনালয়ে ওর সঙ্গের মেয়েরা যখন চড়া-গলায় গান ধরে, মার্গারেট তখন সেদিকে কান না দিয়ে তলিয়ে যায় মনের গহনে: সেখানে অজানা ডমরুর ছন্দে উথলে উঠছে গম্ভীর অনাহত নাদ, জাগছে নব-নব প্রার্থনার আকূতি।···চিত্ত কানায়-কানায় ভরে ওঠে কী এক কোমল মাধুর্যে।

মিস কলিন্সের প্রভাবে মার্গারেট দ্রুত বদলে গেল। ওর ছড়ানো মন গুটিয়ে এল নিজের গভীরে। বুঝতে পারল রসায়ন আর পদার্থ-বিদ্যার চাইতে ধর্ম অনেক বড় দরের বিজ্ঞান। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে আপন অন্তরে সমস্ত অধ্যাত্ম সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে হবে, বাইরে খুঁজলে তা মিলবে না।

বড়দিনে আর জুলাই-এর মাঝামাঝি, বছরে দু'বার স্কুল-জীবনে হঠাৎ একটা ছেদ পড়ে, মার্গারেট আর মে-ও তক্ষুনি রওনা হয় আয়র্ল্যাণ্ডে। যখন ওরা নেহাৎ ছোটটি, তখনও ওদের দোসর থাকত না কেউ। এক জন শিক্ষয়িত্রী হ্লিট্‌উড ষ্টেশনে ওদের ট্রেণে তুলে দিতেন, ট্রেণ থেকে ওরা জাহাজে করে সটান পাড়ি জমাত। কখন আইরিশ তটরেখা দেখা যাবে এই উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে বেশীর ভাগ রাতটা জেগেই কাটত ওদের। মার্গারেটের বয়স যখন বারো, ওর মা লণ্ডনে কাজ করতেন তখন। সেবার হ্লিট্‌উডে এলেন ওদের সঙ্গে দেখা করতে, তিন বছরের ভাইটিকে মার্গারেটের হাতে তুলে দিলেন সঙ্গে করে বেলফাষ্ট নিয়ে যাবার জন্য। কনকনে ঠাণ্ডায় বন্দরটা মুষড়ে পড়েছে যেন। তার মধ্যে মা-মেয়ের এই বিদায়ের পালাটা মনে হল আরও করুণ। বিধবার বেদনাময় জীবনে নতুন একটা বিয়োগ-ব্যথা জমা হল। প্রবাসে শেষ সন্তানটিকেও আয়র্ল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর বুকটা যেন একেবারে খালি হয়ে গেল।

বেলফাষ্ট বন্দরে দাদু হ্যামিল্টন ফি-বারই ওদের নিতে আসেন। ব্যাকুল স্নেহে ওদের বুকে জড়িয়ে ধরেন···তাঁর খসখসে মেরজাই-এ ওদের কচি মুখ ছড়ে যায় আর কি! তার পর ঘোড়ার গাড়িতে মাল চাপিয়ে হনহন করে দেশের পথে চলা। সারা ছুটিটা মেয়েরা তাদের খুশি মত ঘর-গেরস্থালী চালায়। দাদুও তাতে খুশি, ওদের স্বাতন্ত্র্যের আনন্দটা তিনিও মনে-প্রাণে উপভোগ করেন।

খুব ভোরে দাদু বেরিয়ে যান। সারাটা দিন কচিৎ তাঁকে দেখা যায়। কর্ক-ব্যবসায়ী ছিলেন এককালে,—সে-কাজ ছেড়ে দিলেও, ফুরফুৎ নাই তাঁর। আছেন রাজনীতি নিয়ে। খুব কর্মী, জীবন-ভোর হোমরুল আন্দোলন চালিয়ে এসেছেন; 'তরুণ-আয়র্ল্যাণ্ড' সঙ্ঘের অবিসংবাদিত নেতা এখন। চাষীদের ফিরে-পাওয়া জমি বিলির ব্যাপারে যারা উদ্যোগী তাদেরও উনি নেতৃস্থানীয়। গ্ল্যাডষ্টোন প্রবর্তিত এই 'সংস্কার আইন'কে চালু রাখাই তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সে জন্য বার দশেকের বেশি মৃত্যু বা কারাদণ্ডের ঝুঁকি নিয়েছেন। স্ত্রী খুব অল্প বয়েসেই মারা যান। স্বামীর সমস্ত কর্ম-প্রচেষ্টায় তাঁর অন্তরের সায় ছিল। তাঁর কথা উঠলে হ্যামিল্টন বলতেন, 'সে ছিল বনেদী মারডক-বংশের মেয়ে—ওদের ধারাই হচ্ছে "চরৈবেতি"।

দাদু যখন বুট পরে পাইপটি জ্বালিয়ে বেরোবার জন্য তৈরী হন, মার্গারেট মনে-মনে ভাবে, আমি যদি ওঁর সঙ্গে যেতে পেতাম! বেশ জানে, ওঁর ঝোলা-ভর্তি র'য়েছে 'দি নেশন' নামে একটা নিষিদ্ধ পত্রিকা—ওগুলো বিলি করতে চলেছেন উনি। দাদুর গর্বে ওর বুক ভরে ওঠে। বৃদ্ধ ধীরে-ধীরে নাতনীর কাছে মনের কবাট খুলে দিলেন। হাত ধরে তাঁর সঙ্গে ও-ও বাইরে বেরুতে শুরু করল। দাদু বুঝেছিলেন, মার্গারেটের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ, তাঁর বিশ্বাস আর উদ্দীপনার আগুন ও-মেয়ের মাঝেও জ্বলছে। দুজনের মনের গড়ন একই রকম। মার্গারেট তাঁর গর্বের ধন, তাঁর সর্বস্ব। দেশকে ওরা দুজনেই প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন, তাই যত দিন যায় দাদু-নাতনীর অন্তরঙ্গতা বেড়েই চলে। শেষ পর্যন্ত দাদুর সঙ্গে সব জায়গায় ও যেতে আরম্ভ করল। বন্ধুদের কাছে নাতনীর পরিচয় দিতে গিয়ে শুধু বলেন, 'টাইরনের নোবল্-বংশের মেয়ে ও, আমার আর জন নোবলের নাতনী।' একজন আইরিশের কাছে ওর এই পরিচয়ই যথেষ্ট। বুঝতে পেরে গৌরব-গর্বে মার্গারেটের মুখ লাল হয়ে ওঠে। উত্তর কালে নিবেদিতা প্রায়ই বলতেন, 'স্বদেশ যে কী বস্তু তা প্রথম শিখেছি আমার দাদু আর ঠাকুরমার কাছে।'

ছুটি ফুরিয়ে গেলেও এ-উদ্দীপনায় ভাটা ধরে না। কারণ, ফেরবার সময় মার্গারেট বাক্স ভরে সাজিয়ে নেয় দাদুর বেছে-দেওয়া সব বই—মিল্টন আর সেক্সপিয়ার, আয়র্ল্যাণ্ডের জন্য যিনি প্রাণ দিয়েছিলেন সেই রবার্ট এলস্‌মারের জীবনী, আয়র্ল্যাণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে রাজনৈতিক যোগাযোগ নিয়ে নানা প্রবন্ধ, বড়-বড় বিদ্রোহীদের কাহিনী আর স্মৃতিকথা। এগুলি ওর রবিবাসরের চিত্তবিনোদনের জন্য।···আবার ভয়, মিস কলিন্স দেখতে পেয়ে যদি ও-সব পড়তে নিষেধ করেন! কিন্তু মিস কলিন্স ওর মন বুঝেছিলেন। যদিও কোনও কিছুই তাঁর নজর এড়াত না তবু শাসনের ছদ্ম আবরণে ওকে অবাধ স্বাধীনতাই দিতেন তিনি।

এমন ভাবে ওকে প্রশ্রয় না দিলে স্কুলে শেষ দু'বছর কাটানো

ওর শক্ত হত, দুঃখের হত। সতীর্থদের সঙ্গে ওর যোগসূত্র একেবারেই ছিঁড়ে গিয়েছিল। তাদের মত হওয়ার জন্যে ও চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। ও স্বাতন্ত্র্যবাদী, ও আদর্শবিলাসী; বেশ বোঝে, ওকে কেউ ভালবাসে না! ছাত্রসমিতির পাণ্ডা হিসাবে ওকে মানে সবাই, অন্যদের পড়াশোনায় ও সাহায্য করে সে জন্যও সবাই শ্রদ্ধা করে, কিন্তু সেই সঙ্গে ওকে ওরা একটু মেজাজী একটু অমিশুক ঠাওরায়। অথচ স্নেহ-প্রীতির সামান্য আভাসেও ওর চোখে জল আসে, এমনি নরম ওর মন। আসলে, ঐ বয়সেই মার্গারেট জীবনের নানা সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে, আর ওর সঙ্গিনীরা তার তুলনায় তখনও নেহাৎ বালিকা। নিজেকে নিজে ভাল করে বুঝে ওঠবার আগেই পরীক্ষার কঠিন পর্বের জন্য তৈরী হওয়ার গুরুত্বটা সব সময় ওকে পীড়া দিত। যাতে ভেঙ্গে না পড়ে তার জন্য ও মরিয়া হয়ে উঠল, এক দুর্ধর্ষ সঙ্কল্প নিয়ে দ্বিগুণ খাটুনির মধ্যে ও ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অবসর সময়টাতেও সঙ্গিনীদের নিয়ে খেলা না করে ঘরে বসে ও লেখে। এই ওর প্রথম প্রবন্ধ লেখা; তার কতগুলি স্কুলের পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল। প্যালেষ্টাইন বা মিশর নিয়ে যে-সব প্রবন্ধ, মিস কলিন্স সেগুলো শুধু পড়তে পেতেন, সমালোচনাও করতেন। ওতে থাকত খৃষ্টের সাধনার কথা, তাঁর অনুভবে বিশ্বরহস্যের নিদান কথা। তাছাড়া যে-গুলোতে আত্মোৎসর্গ আর স্বাধীনতা সম্বন্ধে উচ্ছাস প্রকাশ পেত, সেগুলো যেত দাদুর কাছে। তার সঙ্গে আবেগ ভরা চিঠিও থাকত।

মার্গারেটের মা তখন বেলফাষ্টে, বিদেশীদের জন্য একটা স্কুল খুলেছেন। মায়ের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা গত দু'বছরে বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে। তাঁর জীবন কেমন যেন একঘেয়ে নিরানন্দ হয়ে গেছে। শেষ যে ছুটিটা মার্গারেট তাঁর কাছে ছিল, সে দিনগুলো ভালো কাটেনি। মেয়েকে অত গম্ভীর আর অত স্বাধীনচেতা দেখে মেরী যেন দমে গিয়েছিলেন। নানা কষ্টে মায়ের স্বভাব এমন খিট্‌খিটে হয়ে গেছে দেখে মেয়েও মনে দুঃখ পেয়েছে। যে মেরী নোবল্ ছিলেন ভাববিলাসী, আজ তিনি হয়ে উঠেছেন বদমেজাজী সব কিছুই বাড়িয়ে দেখা অভ্যাস হয়ে গেছে তাঁর। সে-তুলনায় মার্গারেটের মাত্রাজ্ঞান একটু বেশীই মনে হয়। ছেলেমেয়েদের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়ার অবসর পাননি বলে মায়ের মনে একটা আফশোস আছে। তার শোধ তুলতে এখন নিজের ধর্মভাবনার ছাঁচে তাদের ঢেলে সাজতে চান তিনি, —মায়ের নির্দেশে ওদের ধর্মজীবনটা অন্তত গড়ে উঠুক, এই তাঁর সাধ। কিন্তু মার্গারেট তো মাকে ধরা দেয় না। ক্ষুণ্ণ মনে মা অস্ফুটে বলেন, 'বড়টা অমন ধারা হল কী করে, আমার সঙ্গে ওর যে মোটে মেলে না দেখছি!' এদিকে মার্গারেট ভাবে, 'মায়ের ধর্মনিষ্ঠা অমন নিরেট বর্বরতা হয়ে উঠল কেন?'

স্কুলে শেষ ক'টা মাস মার্গারেটের কাটে একটা উন্মাদনায়। খাটুনির চাপ যতই বাড়ে, দিন ঘনিয়ে আসে মুক্তির সম্ভাবনার, ততই ও অধীর হয়ে ওঠে। সৌজন্য ও সুশীলতার কড়া নিয়মে বাঁধা অনুত্তাল ছাত্রজীবন বৃহত্তর কর্মের স্বাচ্ছন্দ্যে ছড়িয়ে পড়তে চলেছে। 'কেমন হবে সে জীবন' মনে-মনে প্রশ্ন করে। অজানা একটা উদ্বেল বিশ্বাসে ওর মন কোথায় ভেসে যায়।···সব চেয়ে কঠিন পরীক্ষা কেমন করে উত্তীর্ণ হতে হবে, সেই শিক্ষার পিপাসা ওর মনে। যেন জানে, বিজয়িনী ও হবেই।

শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার দিন এসে গেল।···সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ও সঙ্গে-সঙ্গে স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে এল। বাইরে প্রকাশ না থাকলেও, অন্তরে একটা শুধু গভীর দুঃখ, মিস কলিন্সকে ছেড়ে যেতে হল। গুটির বাঁধন কেটে প্রজাপতি যেমন উড়ে যায়, তেমনি করে ও যেন পাখা মেলল দিনমধ্যের ভাস্বর আলোয়। কোন রহস্যভরা জীবনের দুরতিক্রম্য আকর্ষণে ওর চিত্ত সেদিন আনন্দে বিভোর।

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীন জীবন

নিজেকে ভারিক্কী করে তোলবার কোন চেষ্টা না করে মুক্তির আনন্দে স্বচ্ছন্দে ভেসে চলল মার্গারেট। শিশুর মত প্রাণখোলা ওর হাসি। গলার সুরটি ঝরঝরে, জড়তা নাই একটুও। বাড়ির সবাইকে আর বন্ধুদের প্রথমেই হেসে জানিয়ে দিল, 'এবার নিজেরটা নিজেই রোজগার করব।' যে হঠাৎ ওর কাছে 'খুকু' অভিধান পেল, ভাই হল 'খোকা'। মাকে দেখে আর ভাবে, 'যত শিগ্‌গির পারি মাকে কাজ থেকে ছুটি দেব। তাহলেই গ্রেট-টরেণ্টনে মাকে যেমনটি দেখেছিলাম, মা আবার তেমনি হয়ে উঠবে।'

উপার্জনের রাস্তা বেছে নেওয়া তো খুব সোজা। মার্গারেট হবে শিক্ষয়িত্রী। নিজের পাঠ্যাবস্থায় যা-কিছু সঞ্চয় করেছে, তা ও তুলে দেবে ওর ছাত্রীদের হাতে। মিস কলিন্সকে ও যেমন পেয়েছিল, ওর ছাত্রীরাও ওকে তেমনি করে পাবে। 'চার্চ নিউজ' পত্রিকায় একরাশ দরখাস্ত ছেড়ে দিয়ে তার উত্তর আসবার আগেই ও জিনিষপত্র গোছাতে লেগে গেল। একটা শিক্ষয়িত্রীর পদ যে পাবেই এতে ওর সন্দেহ নাই। একে-একে ওর পোষাকগুলো সাজিয়ে তোলে একটা আখরোট রঙের চীর কাঠের বাক্সে। রোজকার জন্য খুব উঁচু-কলারওয়ালা একটা পোষাক। একটা মিহি সুতোর কালো সার্জের পোষাক, বুটি তোলা ঘন কুচি দেওয়া তাতে। মনোহরণের আকাঙ্ক্ষাটা যে নিতান্ত প্রচ্ছন্ন নয়, তার প্রমাণস্বরূপ দামী স্কচ শিল্পের বডিস্—তার লতানো কলার আর ফোলা হাতে দিব্যি লেসের ঝালর।

১৮৮৪ সনের গ্রীষ্মকাল।···কেসউইক থেকে একটা চিঠি এল। তখনকার এইটেই প্রধান ঘটনা,—পাশার দান পড়েছে তো! মার্গারেট একটা নামজাদা প্রাইভেট স্কুলে চাকরী পেয়েছে। ওকে নিয়ে আত্মীয়দের গর্বের অন্ত নাই।···ওকে অভিনন্দন জানিয়ে কেউ দিলেন কাজ-করা পিন-কুশন, কেউ একটা রূপার কলমদানি, কেউ-বা ব্লটার। সবই ওর কাজের জিনিষ। ওর মন দুলে ওঠে।···কাজে নামবার আর তর সইছে না ওর। ও তখন মোটে আঠার বছরের মেয়ে।

কেসউইকের বোর্ডিং স্কুল।···এইখানে দুটি বছর কাটবে মার্গারেটের। সেকেলে ধরনের মস্ত-বড় দালানে একটা বিহ্বল পরিবেশ। এককালে সাদে আর কোলরিজ ছিলেন এখানে। পাহাড় আর হ্রদের পটভূমিতে শতাব্দীর সাক্ষী সব প্রাচীন গাছে ঘেরা জায়গা। কর্ম আর সুষমা যেন একত্রে মিলেছে এখানে।

কিন্তু কতগুলো অপ্রত্যাশিত সমস্যা মার্গারেটের অপেক্ষায় ছিল যেন; কাজ শুরু করাটা বড় সহজ হল না। বড় বেশী উৎসাহ নিয়ে কাজে নেমেছিল বলেই বাধা পেয়ে প্রথমটা ও থমকে গেল। নইলে বুঝতে পারত, ভাগ্যদেবতা ওকে ঠিক পরিবেশটিই জুটিয়ে দিয়েছেন।··· পেশাদার শিক্ষয়িত্রীসুলভ যে-আবরণটা গায়ে জড়িয়ে ও ভাবছে 'ঠিক আছি' সেটা ছাড়তে হবে, যা কিছু ওর স্বভাবে রুক্ষ আর নীরস সেগুলো ঝরে যাবে, এই ওর নিয়তি যে! এটা গোড়ায় ও বুঝতে পারেনি। তাই যখন শুনল, চোদ্দ থেকে ষোল বছরের মেয়েদের সাহিত্য আর ইতিহাস পড়াতে হবে, তাদের কাছে হতে হবে প্রাণোচ্ছল, মার্গারেট ঘাবড়ে গেল। বাধার সামনে এলেই উলটে একটা স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি জাগে ওর মনে, তাই রক্ষা—নইলে বিপদ হত। নিজের মুক্ত মনের প্রবেগ ছাত্রীদের মাঝে ও সঞ্চারিত করল বেশ সহজ ভাবেই। একটা নতুন দিক যেন খুলে গেল ওর। আগে থেকেই কিছু না ভেবে শুধু সহজ সংস্কারবশে ওর শিক্ষা দেওয়ার ধরণটা হল, ছাত্রীদের মনোভাব লক্ষ্য করে শিক্ষার বিষয়টিকে তাদের সহজবোধ্য করে তোলা—নির্বিচারে ধরা-বাঁধা একটা কিছু সবার 'পরে চাপিয়ে দেওয়া নয়। ও যেন নিজেই নিজের ছাত্রী বনে গেল।··· মেয়েদের যা বলে, সেটা ওর নিজের মাঝে জীবন্ত হয়ে উঠে সত্তার সঙ্গে যেন মিশে যায়। ওর চার পাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সব রকমে ওকে সাহায্য করতে লাগলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী যিনি, তিনি রুচিতে কলারসিক, স্বভাবে স্বাধীনচেতা।···গ্রামের ধর্মযাজক ছিলেন রাস্কিন আর ওআর্ডসওআর্থের অন্তরঙ্গ। এঁরা দুজনেই মুগ্ধ-বিস্ময়ে ওর কাজকর্ম দেখতেন। কিন্তু শুধু যে পরিবেশটি উর্বর তা নয়, গাছটিও যে সতেজ।

এখানে এসে সব চাইতে বদলে গেল ওর আধ্যাত্মিক ধারণাগুলো। একটা সরল নিষ্ঠার সঙ্গে ওদের পরিবারের বৈধ ধর্মকে ও আঁকড়ে ধরেছিল। কেসউইকের অনুকূল আধ্যাত্মিক আবহাওয়ায় সেইটি ওর হয়ে উঠল খাঁটি ধর্মানুরাগের পিপাসা। ফুলের সমারোহ আর ধূপ-দীপের আলো-গন্ধে ভরা বেদীর কাছে উপাসনায় বসে ও যেন সমগ্র প্রকৃতির সঙ্গে একটা একাত্মতা অনুভব করে। প্রার্থনার সময় অপরূপ সঙ্গীতে ভজনালয় মুখর যখন, ওর মনে হয় জানালার কাচের চিত্রকলাপ হতে সাধুসন্তরা এসে দাঁড়িয়েছেন ওর কাছে, তার কাছে চাইছেন প্রেমের অকুণ্ঠ আত্মনিবেদন। তাঁদের সান্নিধ্য ওর কাছে এত স্পষ্ট যে, বেদীর কাছ থেকে উঠে বাইরে আসতেই ওর চিত্ত যেন এক গভীর বৈচিত্ত্য-বেদনায় মথিত থাকে। এই সময় ও কোনও ক্যাথলিক মঠে যোগ দিবে কি না ভাবত···

বাড়ির চাইতে কেসউইকে মার্গারেট থাকে ভাল। ওর ধর্মবিষয়ক মনোভাবের বিরুদ্ধে বাড়িতে একটা অনুচ্চারিত বিরোধ··· দেখা-সাক্ষাৎ হলেই সেটা বাড়ে, একটা মন-কষাকষির সৃষ্টি হয়! সে তখন হ্যালিফক্স ছেড়ে বাড়িতে এসেছে; তার মন বোঝা দায়। মায়ের সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করে দেখেছে, সে-ও বৃথা। তাঁর মেয়ে পারিবারিক গণ্ডির বাইরে থেকে ধর্মবিষয়ে নতুন রকম শিক্ষা-দীক্ষা পাবে এ ভাবতেও মেরী নোবলের খারাপ লাগে। জীবন কাটানোর মত যথেষ্ট ধর্মশিক্ষা কি ও পায়নি না কি? ধর্ম সম্বন্ধে মেয়ের মনে একটা ভাবব্যাকুল রহস্য-তন্ময়তার ঝোঁক দেখে মায়ের কেবলই মনে হত, শিশু মার্গারেটকে যে ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছিল, এ তারই ফল। তাছাড়া, ও যখন তিন বছরেরটি, তখন Virgin's Respone আওড়ানো ওর একটা খেলা ছিল যে!···অবশ্য এ-সবের প্রভাব যে কিছু ছিল না, তা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু সেটা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর। মার্গারেট ইদানীং চুপ করে থাকতে শিখেছে। যে-সব প্রশ্ন ওর কাছে এত গুরুতর, তা নিয়ে কথা-কাটাকাটি করতে ও চায় না। কিন্তু কত রাত্রে ঘুম ভেঙে মনে হয়েছে, প্রিয় পরিজনের মাঝে থেকেও ও যেন বন্দী, প্রাণটা যেন ওর পালাই-পালাই করে। স্কুলেও ঠিক এমনি মনে হত এককালে। কিন্তু নিজেকে তখনই সামলিয়ে নেয় ও। কুলধর্মের প্রতি মায়ের এ-নিষ্ঠাকে ও মন্দ বলতে পারে না···তবে ও যে নিজে এদের থেকে ছিটকে পড়েছে, এটাও ঠিক। ওকে আর খাপ খায় না এদের মাঝে। এ ওর নিজেরই দোষ।··· কেসউইক ওকে শিখিয়েছে, অন্তর যতই বিকশিত হবে, মাধুরীতে যতই ভরে উঠবে, ততই তার অনন্তের পিপাসা হবে অতর্পণ।··· ওর আর ঘরে ফেরবার উপায় নাই।

১৮৮৭ সনে হঠাৎ মার্গারেট কেসউইক ছেড়ে গেল একটা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করে দেখবে, ওর আত্মত্যাগ আর বৈরাগ্যের জোর কতটুকু। তাই রাগ্‌বির অনাথাশ্রমে ও কাজ নিল। সাধারণের দয়ার দানে ওখানে জন কুড়ি মেয়েকে মানুষ করা হয়, ভবিষ্যতে যাতে ওরা গেরস্থ-ঘরের ভাল চাকরাণী হতে পারে। মার্গারেট একটি বছর সেখানে কাটাল। যেমন তাদের শেখায়, তেমনি তাদের সঙ্গে সমানে সব কাজ করে। ওদের মধ্যে যারা বড়, বছর ষোল বয়স যাদের, তারা শিগ্‌গিরই রোজগারে যাবে; তাদের দিকেই ওর বিশেষ নজর। তাদের ও বোঝাত পরের সেবায় কেমন ক'রে আত্মবিকাশ হয়, আর তাতে কী আনন্দ। যথার্থ খৃষ্টানের আদর্শই হল সেবা। সে-আদর্শকে যদি ওরা জীবনে রূপ দিতে পারে, তবে বুঝবে, মানুষের মুক্তি শুধু এই সেবাব্রতে। এই প্রায়-অকিঞ্চন বালিকাদের মনে একটা আশ্বাস সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছে বোঝা মাত্র ও রাগবি ছাড়ল।···ওর কাজ হয়ে গেছে। মনে হল, ওর সবখানি হৃদয় দিয়ে ও এবার তাঁর কাজ করতে পারবে। সে যোগ্যতা ওর হয়েছে।

রেক্সহ্যামের সেকেণ্ডারী স্কুলে মার্গারেট যখন শিক্ষয়িত্রীর পদ পেল, তখন তার বয়স মোটে একুশ। জায়গাটা খনি অঞ্চলের মধ্যে। এমনি জায়গাতেই একটা চাকরি চেয়েছিল ও। এখানে জনকল্যাণের কাজে ওর অভিজ্ঞতা হবে, ওর মনোমত জীবনাদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে পারবে এখানে। বিরাট কর্মক্ষেত্র সামনে পড়ে। স্কুলে পড়াতে দিনের অর্ধেকটা সময় যায় মোটে। বাকী সময়টা ও দেবে নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে। ওর ছাত্রী আর তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্যে ও একেবারে শ্রমিক-জীবনের মর্মস্থলটিকে স্পর্শ করল, তাদের হতশ্রী কুটিরে ঘুরে-ঘুরে ঘনিষ্ঠ হল তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে।

রেক্সহাম সহরটার কোন ছিরিছাঁদ নাই। শিল্পোন্নতির ফলে তাড়াহুড়োর মধ্যে শহরটার পত্তন। বাড়িগুলো একটার গায়ে আরেকটা ঠেসাঠেসি, খনির চার পাশে যত পারে লোক ধরাতে পারলেই হল। অযত্ন কুড়ে ঘরের সঙ্গে তাল রেখে কয়লার ধুলো উড়ছে,

কোথাও নোংরা এক চিল্‌তে বাগানের মধ্যে যত ছেঁড়া ন্যাতার রাশ ঝুলছে দড়িতে, গলিগুলো কাদায় প্যাচপ্যাচে। জঞ্জালের স্তূপের আড়ালে দিগন্ত ঢাকা পড়েছে, চিমনীর ধোঁয়ায় আকাশ ধোঁয়াটে। দিনগুলো ওখানে হয় ধোঁয়ায় ধূসর নয়, আঁধারে কালো—তা যে বছরের যে-ঋতুই হোক না কেন!

খনি অঞ্চলের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সেন্ট মার্কস্ চার্চ। অনেকখানি জুড়ে তার এলাকা।···মার্গারেট ওখানকার চার্চ কর্মী হিসাবে নাম লেখালো। জনমঙ্গল কাজের তদারকি, বস্তিতে ঘুরে-ফিরে দেখা, ফ্যাক্টরির আসন্নপ্রসবা মেয়েদের খুঁজে বার করা, অনাথ-আতুরদের খোঁজ-খবর করা, এই সব ওর কাজ। ধর্ম-যাজকদের কাছে রিপোর্ট হাতে নিয়ে এমনি নম্র দৃঢ়তার সঙ্গে ও প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্য দরবার করে যে তাঁরা হাঁ হয়ে যান,—এতখানি দরদ তো সচরাচর চোখে পড়ে না! অবশ্য দু'দিনেই তাঁদের বুঝতে বাকী রইল না যে সাহায্য দেওয়ার বেলা ওর বাছবিচার নাই···গরীব হলেই হল, তা সে কখনও গির্জায় যাক বা না যাক, কি অন্য সম্প্রদায়ভুক্তই হোক। চার্চের বিধান কিন্তু তা নয়; সুতরাং প্রধান কর্তা আর কর্মীদের মধ্যে এই নিয়ে মনোমালিন্য শুরু হল, ওর কাজকর্ম নষ্ট হওয়ার যোগাড়! গির্জার ভিতর এ-রকম মন-কষাকষি ঘটুক, ও তা চায় না। সুতরাং মার্গারেট স্বেচ্ছায় এ কাজ ছেড়ে দিল। এমনটা ও আশঙ্কা করেনি। মনে অশান্তির আগুন ধোঁয়াতে-ধোঁয়াতে হঠাৎ একদিন দপ্ করে জ্বলে উঠল···গির্জার ভিতরকার সব কথা ফাঁস করে দিয়ে ও একখানা খোলা চিঠি লিখে বসল 'নর্থ ওয়েলস্ গার্ডিয়ানে'।

এমনি করে নিবন্ধকারের সৃষ্টি হল। অল্প দিনেই মার্গারেট বুঝতে পারল, শুধু সমাজসেবায় ও যা না করতে পারে, তার চাইতে বেশী করতে পারে কলমের জোরে, যদি ঠিক দরদ দিয়ে লেখে। অসহায় নিপীড়িতদের সেবার এ শক্তি নিয়োগ করতে ওর দেরি হল না। নানা ছদ্মনামে রেক্সহামের দরিদ্রদের মুখপাত্র হল মার্গারেট। এমনি লেখালেখির ফলে টাকাও উঠল; তাই দিয়ে একটা লঙ্গরখানা, একটা ডাক্তারখানা আর একটা চলন্ত লাইব্রেরির পত্তন হল। শিক্ষা-বিভাগের নথিপত্র ঘেঁটে ওখানে সংস্কৃতি-উন্নয়ন-কেন্দ্র আর খেলার ষ্টেডিয়াম স্থাপনার যে পরিকল্পনাটা এত দিন ধামা-চাপা রয়েছে, সেটা চালু করবার জন্যে ও লেখালেখি শুরু করল। সামাজিক বিষয় নিয়ে কাগজে লেখা ওর তখন একটা সত্যিকারের নেশা হয়ে উঠেছে। রকমারি ছদ্মনামে ও লিখত তখন, কখনও পুরুষের নাম···'ডবলিউ নীলাস', কখনও বা 'জনৈকা জননী', 'অন্ত্যজ' ইত্যাদি নামে। বেশীর ভাগই লিখত সামাজিক প্রবন্ধ, কদাচিৎ রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও।

ওখানকার খোদ অফিস অঞ্চল থেকে যখন চাঁদা আদায় করছে মার্গারেট, তখন তেইশ বছরের এক তরুণ ওয়েলস্‌বাসীর সঙ্গে ওর আলাপ। ভদ্রলোক ইঞ্জিনিয়ার, এক কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন। তাঁর সঙ্গে ক্রমে ওর বন্ধুত্ব হল। একদিন গির্জায় দেখা, সেই সুযোগে ভদ্রলোক তাঁর মায়ের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলেন। বৃদ্ধা হাসিমুখে মার্গারেটকে তাঁদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন, চায়ের নিমন্ত্রণ।···তার পর থেকে স্কুলের ছুটি হলে মার্গারেটকে প্রায়ই দেখা যেত ওদের উপরতলায় ফ্ল্যাটে। টুকটুক করে কড়া নেড়ে আস্তে-আস্তে ও ঘরে ঢোকে, বন্ধু হয়তো ওরই প্রতীক্ষা করছেন পাইপ টানতে-টানতে, আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে। মা চা নিয়ে আসেন। ছিমছাম নির্জন ঘরটি কাজ করার পক্ষে দিব্যি। মার্গারেট আগুনের সামনে বসে, আখরোট পুড়িয়ে খায়, এই প্রীতি-ভরা ঘরোয়া পরিবেশটি দস্তুর মত উপভোগ করে। ওদের রুচি, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই যেন এক রকমের। দুজনের মনে একই সঙ্গে জাগল অনুরাগ, কিন্তু কেউ কাউকে কিছু বলল না।

দিনের কাজ শেষ হলে বন্ধু ওর আনা খবরের কাগজের পাতা উল্টিয়ে ওর লেখা খোঁজেন, দুজনে তা নিয়ে আলোচনা হবে। ওরা একসঙ্গে পড়ে এমার্সন, রাস্কিন, থরো,—একই আদর্শের স্বপ্ন ওদের মনে, একই উৎসর্গের আকুতি। কখনও-বা রবিবারে ওরা বেড়াতে যায় গ্রামের দিকে, খোলা হাওয়ায় বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে ফিরে আসে আনন্দে বিভোর হয়ে। গ্রীষ্মের ছুটিতে দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়। সে-বিচ্ছেদে মিলনের আগ্রহ বাড়ে, পরস্পারের হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার যৌবন-স্বপ্ন আরো রঙিন হয়ে ওঠে। ওরা পরস্পরে বাগ্‌দত্ত হবে, এমন সময় যে-রোগে স্যামুয়েলকে শেষ করে দিয়েছিল, সেই রোগে ধরল বন্ধুকে।···তার পর হপ্তা কয়েকের মধ্যে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। প্রশান্ত চিত্তে মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালেন বন্ধু, নিজের জীবন দেবতার পায়ে ডালি দিয়ে নীরবে সরে গেলেন মার্গারেটের জীবন থেকে।···তাঁর জীবনের বিনিময়ে দ্বিগুণ উজ্জ্বল হোক ওর জীবন। পরম নির্ভরতায় তাঁর দুটি চোখে ঘুম জড়িয়ে এল।

বদলির জন্য আবেদন করে কয়েক সপ্তাহ পরে মার্গারেট চলে এল চেষ্টারে। [ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী।

কাব্যরূপ

কাব্য-ক্রিয়া-ব্যাপারে—

উত্তর-দেশীয়েরা শ্লেষপ্রায়
পশ্চিমীরা অর্থমাত্রক
দক্ষিণীরা উৎপ্রেক্ষাবহুল
এবং গৌড়ীয়েরা অক্ষর-ডম্বর।

কাব্যে থাকবে—

নূতন নূতন অর্থ
অগ্রাম্যতা, স্বভাবোক্তি
সুস্পষ্ট বিন্যাস।

—বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিতের ভূমিকা
—অনুবাদক শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

দুই নগরের গল্প

চার্লস ডিকেন্স

৪

দ্বিপ্রহরের পূর্বেই ডাকগাড়ী পৌঁছল ডোভারে। রয়েল জর্জ হোটেলের প্রহরী সাড়ম্বরে এসে গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়াল বিনীত ভঙ্গিমায়। এই দুরন্ত শীতের রাত্রে যে যাত্রী ডাকগাড়ী করে লণ্ডন থেকে ডোভারে এলেন, তাকে অভ্যর্থনা জানান সৌজন্য।

একটি মাত্র আরোহী ভিতর থেকে নামলেন। বাকী দু'জন ইতিমধ্যে পথের ধারে নেমে পড়েছে।

লরি পথে নেমেই প্রশ্ন করলেন—'আগামী কাল চ্যালের নৌকা পাওয়া যাবে?'

'হ্যাঁ স্যার। আবহাওয়া যদি ভাল থাকে আর বাতাস ওঠে, তবে বেলা দুটো নাগাদ নৌকা ছাড়বে। বিছানা দরকার হবে ত স্যার?'

'রাতের আগে বিছানা চাই না। এখন একটা থাকার ঘর দাও ত ব্যবস্থা করে। আর একজন নাপিত।'

'আসুন স্যার। এখুনি সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। এই যে স্যার এই দিকে। কোন অসুবিধা হবে না।'

একটু পরে লরি যখন খাবার-ঘরে এসে উপস্থিত হলেন, দেখলেন তিনি ভিন্ন আর একটি মাত্র লোক প্রাতরাশ সামনে নিয়ে বসে আছেন। ঘরে আর তৃতীয় প্রাণী নেই। মানুষটির সর্বাঙ্গ দামী পোষাকে ঢাকা। আর সেই পোষাক সুগঠিত দেহের সঙ্গে চমৎকার মানানো। চোখ দুটিতে সিক্ত উজ্জ্বল দীপ্তি। মুখে একটা সমাহিত গাম্ভীর্য যা দীর্ঘদিন ব্যাঙ্কের গুরু দায়িত্বের সঙ্গে বর্ষে বর্ষে গভীরতর হয়েছে। নিটোল কপোলে স্বাস্থ্যের লক্ষণ। আজো অবধি দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েনি মুখে, যদিও বয়সের রেখা কয়টি স্পষ্ট চোখে পড়ে। টেলসন ব্যাঙ্কের অন্যান্য কর্মচারীদের মত এঁরও কাজ হোল পরের ঝঞ্ঝাট পোয়ানো। আর পরের ঝঞ্ঝাট পরের সজ্জার মত অনায়াসেই ঝেড়ে ফেলা সম্ভব শরীর-মন থেকে। মানুষটি এমন নিথর হয়ে বসে আছেন যেন কোন শিল্পীর সামনে মডেল হয়েছেন।

লরিও তেমনি ভাবে আসন নিলেন। অবিলম্বেই গভীর ঘুম জড়িয়ে এল দুটি চক্ষু ভরে। বেয়ারা যখন খাবার দিতে এল, সেই শব্দে তিনি জেগে উঠলেন। তার পর চেয়ারটি টেবিলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন—'একটি অল্পবয়সী মেয়ে সারা দিনের মধ্যে এক সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তার থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। এসে হয়ত বলবে মিঃ লরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই অথবা বলতে পারে টেলসন ব্যাঙ্কের ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করব। তুমি তাকে আমার কাছে পৌঁছে দেবে, কেমন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। টেলসন ব্যাঙ্কের খদ্দের আমাদের প্রচুর। লণ্ডন আর প্যারিস যাতায়াত করেন ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা হরদম। তা হুজুরকে ত এর আগে কখনো দেখিনি?'

'অনেক দিন আসিনি কি না। আমরা এসেছিলাম—মানে আমি এসেছিলাম ফ্রান্স থেকে সে প্রায় বছর পনেরো হোল।'

'তখন আমি ছিলাম না এখানে। তখন এ হোটেল অন্য লোকের হাতে ছিল।'

লরি তখন আহারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। আর কথা না কয়ে বেয়ারা নিঃশব্দ প্রস্তুতিতে দাঁড়িয়ে রইল সমুখে। অপেক্ষা করে রইল অতিথির আদেশের।

আহারান্তে তিনি ডোভার সমুদ্রের বালুতটে বেড়াতে গেলেন। সঙ্কীর্ণ সহরটি যেন জলক্রোড় থেকে এলোপাথাড়ি পালিয়ে উটপাখীর মত পর্বতের কানাচে মাথা গুঁজে রেখেছে। ডোভারের সমুদ্র-সৈকত যেন বালুমরু। আর সেই মরুপ্রান্তরে পাথরের নুড়ি নিয়ে সমুদ্রজলের নিরবধি ধ্বংসলীলা! রাত্রিদিন জল আক্রোশে গর্জায় উন্মত্তের মত। সহরকে ভয় দেখায়, পাহাড়কে ভয় দেখায় আর পাড় ধ্বসায়। সহরে নিশি-দিবস ঝড়ের ঝাপটা লাগে, আর সেই প্রবল বায়ুতে লোণা জলের গন্ধ পাওয়া যায়। কেবল যখন জোয়ার আসে, সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কিছু লোক বালুতটে বেড়ায়—নয় ত ডোভারের উপকূল প্রায় নির্জন থাকে।

এক সময় শীতের অপরাহ্ণ গড়িয়ে এল। আজ সারা দিনের মধ্যে অনেক বার আবহাওয়া পরিষ্কার হয়েছিল। এপার থেকে দৃশ্যমান হয়েছিল ওপারে ফ্রান্সের তটভাগ। এখন পড়ন্ত আলোকে আবার কুয়াশার ভার নেমে এল দিগন্ত অন্তরাল করে আর সেই কুয়াশা আচ্ছন্ন করল লরির চেতনালোক। সন্ধ্যার অন্ধকারে জলন্ত গনগনে আগুনের সামনে সান্ধ্য আহারের অপেক্ষায় বসে তার মন গত রাত্রের মত আবার তন্দ্রাঘোরে কবর খুঁড়তে লাগল। এবার আর মাটি নয় রক্তরাঙা জলন্ত কয়লার কবর।

আহারপর্ব সমাধা করে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে মদ্যপান করছেন এমন সময় গলিপথে গাড়ীর ঘটাং-ঘটাং শব্দ তার কানে পৌঁছল।

'ঐ সে!' মনে মনে আবৃত্তি করলেন লরি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেয়ারা এসে খবর দিল যে লণ্ডন থেকে মিস্ মেনেট এসেছেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

'এখুনি।'

হ্যাঁ, মেয়েটি ভারী উতলা হয়েছে লরির সঙ্গে দেখা করার জন্য। যদি তার কোন অসুবিধা না হয় তাহলে—

মদের গেলাস নামিয়ে রেখে শরীর-মনের শ্লথ আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে নিয়ে লরি বেয়ারার অনুসরণে একটি কক্ষে এসে উপস্থিত হলেন। ঘন পালিশ-করা প্রাচীন ভারী-ভারী কালো রঙের আসবাব-পত্র। দুটি বাতি জ্বলছে। ঘরের আবছা আলোয় লরির মনে হোল, মেয়েটি হয়ত অন্য কোন ঘরে অপেক্ষা করছে।

কিন্তু ঘরের মাঝামাঝি এসে দেখলেন যে, দুটি টেবিলের মাঝে আগুনের চুল্লীর দিকে পিছন করে একটি বছর সতেরোর সুকুমারী মেয়ে তার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। সোনালী চুল আর তার সমুদ্রনীল চোখ দেখে এক ঝলক স্মৃতি লরির মনের আকাশে বিদ্যুদ্বেগে উড়ে গেল। এমনি এক শীতের দিনে বিরামহীন তুষার-ঝটিকায় যখন সমুদ্র অস্থির উদ্বেল, তখন একটি স্বর্ণকেশী নীলনয়না শিশু-কন্যাকে বুকে করে তিনি চ্যানেল পার হয়েছিলেন। মুহূর্তের জন্য সেই স্মৃতির পরিবেশে তিনি বেঁচে উঠলেন। কিন্তু সে ক্ষণিকের বুদ্বুদ যেমন আচম্বিতে উঠেছিল তেমনি হঠাৎ মিলিয়ে গেল।

'বসুন'। মেয়েটির জিহ্বার ঈষৎ বিদেশী টান কানে বাজল।

পুরানো রীতিতে সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন লরি—'বোসো তুমি।'

'গত কাল ব্যাঙ্ক থেকে খবর পেলাম—কি যেন একটা আশ্চর্য সংবাদ মানে অভিনব আবিষ্কারই—

'বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন—একান্তই অবান্তর।'

'আমার পিতা—স্বর্গতঃ পিতা যাঁকে জীবনে দেখিনি আমি, তাঁর সামান্য সম্পত্তির ব্যাপারে যখন প্যারিসে গিয়ে ব্যাঙ্কের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করার প্রয়োজনের সংবাদ পেলাম, তখন এই দূর পথের একজন অভিভাবক সঙ্গীর জন্য আমি ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষকে জানাই। ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই লণ্ডন ত্যাগ করেছিলেন, সেই কারণে তাঁকে ডোভারে অপেক্ষা করার জন্য ব্যাঙ্ক খবর পাঠিয়েছিল।'

মিঃ লরি বললেন—'তোমার ভার নিতে পেরে আমি অত্যন্ত খুসী হয়েছি।'

'আমার কৃতজ্ঞতা জানবেন আপনি' বললে মেয়েটি—'ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষ আমায় জানিয়েছেন যে, আপনার মুখে পরম বিস্ময়কর কোন সংবাদ শোনার জন্য আমি যেন প্রস্তুত হয়ে থাকি। আপনি আমায় বলুন,—আমি অত্যন্ত উদ্গ্রীব হয়ে কালযাপন করছি।'

'তাই ভাবছি। কি বলে সুরু করব ভেবে ঠিক করতে পারছি না।'

'আপনি কি আমার সম্পূর্ণ অচেনা?'

'তাই নয় কি?' বললেন লরি তার্কিকের মত দুটি করতল অঞ্জলির আকারে প্রসারিত করে।

মেয়েটির মুখের অতি চিকণ চিন্তাসূত্রগুলি ললাটে রেখায়িত হয়ে উঠছে দেখলেন তিনি। এক সময় সে চোখ তুলতেই তিনি বললেন—'বিদেশে তোমায় যদি ইংরেজ তরুণী বলে পরিচয় দিই, যদি মিস্ মেনেট বলে সম্ভাষণ করি, ভালোই হবে, কি বল?'

'আপনার ইচ্ছায় আমি বাধা দেবো না।'

'মিস মেনেট! তোমার কাছে আমাদের ব্যাঙ্কের একজন [খ]রিদ্দারের কাহিনী বলব। ব্যবসায়ী মানুষ আমরা। ব্যবসা ছাড়া কথা বলতে পারি না।'

'কাহিনী বলবেন?'

'হ্যাঁ, ব্যাঙ্কের লোক কি না। মানুষের চেয়ে খরিদ্দার বলাই আমাদের অভ্যাস। তিনি ছিলেন ফরাসী। পরম পণ্ডিত একজন ডাক্তার।'

'বোভের লোক নয় ত?'

'হ্যাঁ, বোভেরই ত। তোমার পিতার মত তিনিও ছিলেন প্যারিসের এক বিখ্যাত লোক। আর মানুষটির সঙ্গে আমার জানা-শোনা ছিল—ব্যবসা সংক্রান্ত গোপনীয় জানা-শোনা। সে প্রায় বিশ বছর আগে।'

'সে কত দিনের কথা?'

'বললুম ত। বিশ বছর হয়ে গেল। তিনি বিয়ে করেছিলেন এক ইংরেজ মহিলাকে। আমি ছিলাম তার সম্পত্তির একজন রক্ষক। ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কাজেই তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। কোন বন্ধুত্ব নয়। কোন বিশেষ আকর্ষণ বা মনের কোন ব্যাপার নয়। রোজ যেমন ব্যাঙ্কের খরিদ্দারের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে আলাপ-পরিচয় হয় তেমনি ধারা আর কি। আমরা ব্যবসায়ী মানুষ ত আসলে। মনের কারবারী ত নই।'

মেয়েটির কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠছে দেখলেন লরি। 'আপনি আমার বাবার কথা বলছেন। বাবা মারা যাওয়ার দু'বছরের মধ্যে আমার মা-ও মারা যান। তখন আপনিই আমাকে ইংলণ্ডে নিয়ে আসেন। নিশ্চয়ই আপনি নিয়ে আসেন।'

'হ্যাঁ মা! আমিই নিয়ে আসি। কিন্তু আমরা ব্যবসায়ী লোক। আমাদের হৃদয় বলে কিছু নেই। থাকত যদি—এত বৎসরে একবারও কি তোমায় দেখতে যেতাম না? কিন্তু তুমি ত আমার কেউ নও? তুমি আমার ব্যাঙ্কের খরিদ্দার। আরো হাজার খরিদ্দারের একজন মাত্র। হৃদয়, অনুভূতি ও-সব আমাদের কিছু নেই—করবার সময়ও নেই। কিন্তু এই অবধি তোমার পিতার কাহিনী! এর পর সব গরমিল। অথচ যে সময় তিনি মারা গেলেন, ঠিক সেই সময়টিতে যদি মারা না যেতেন—তুমি ভয় পেয়ো না মা, অমন করে চমকে উঠছ কেন?'

চমকিত হয়ে উঠে মেয়েটি লরির কবজি দুই করতলে চেপে ধরল।

কোমল সান্ত্বনার সুরে বললেন মেরি—'উতলা হয়ো না। শোনো। যদি তোমার বাবা মারা না যেতেন। যদি, মনে কর, একদিন হঠাৎ নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে যেতেন এমন কোন ভয়াবহ স্থানে যেথান থেকে তাঁকে সন্ধান করে বার করা অসম্ভব হত। যদি তাঁর কোন সমধর্মী শত্রুই এমন থাকত যে এমন কিছু করত যার উচ্চারণ অবধি করতে সাহস করত না সেকালে কোন সাহসী লোকও সমুদ্রের ওপার ঐ দেশে। এই যেমন ধর, কোন জেলখানায় দীর্ঘদিন কাটানোর জন্য কারুর হয়ে রাজী হত, যদি ধর, তাঁর স্ত্রী রাজা রাণী গীর্জা আদালত সর্বত্র আবেদন করেও তাঁর কোন সংবাদ না পেতেন, সে ক্ষেত্রে আমার ফরাসী ডাক্তারের কাহিনীর সঙ্গে তোমার পিতার কাহিনীর আর কোন অসামঞ্জস্য থাকত না।'

'আপনাকে মিনতি করছি, আপনি সব কথা আমায় খুলে বলুন।'

'বলব বৈ কি মা! কিন্তু তুমি অত উতলা হলে বলি কি করে? আমরা কারবারী লোক, মাথা ঘুলিয়ে গেলে কাজও গোলমাল হয়ে যায়। হ্যাঁ, শোন। সেই ভদ্রলোকের স্ত্রী এই ব্যাপারে মনে এমন গভীর আঘাত পেলেন যে, ভাবলেন, তার গর্ভস্থ শিশুকে তিনি এ-সব কিছুই জানতে দেবেন না। সে যেন জানে যে তার বাবা—তুমি জানু পেতে বসলে কেন মা—কি হল তোমার?'

লরি সযত্নে মেয়েটিকে তুলে নিলেন। তার পর স্নেহসিক্ত কণ্ঠে

বললেন—'সাহস অবলম্বন করো মা। ভেঙে পড়ছ কেন অমন করে? তোমার মা যখন ভগ্নমনোরথ হয়ে দেহত্যাগ করলেন, তখন তোমার বয়স দু'বছর। সেই শিশু আজ পরমা সুন্দরী তরুণী হয়ে উঠেছে। এই ক'বছরে একদিনও এ কালো মেঘ তার মনের আকাশকে আঁধার করেনি যে—কারাগারের অন্তরালে তার পিতা এই দীর্ঘ দিন ধরে কি ভাবে নিজের চিত্তের নিপীড়িত হাহাকারে কালযাপন করেছেন।'

মেয়েটির নরম সোনালী কেশরাশির দিকে একবার তাকালেন তিনি, তার পর বললেন—'পিতামাতার কোন গুপ্ত দৌলতের সন্ধান তোমায় দিতে পারব না। তোমায় জানাচ্ছি মা, তাঁকে আমরা খুঁজে পেয়েছি। তোমার পিতাকে পেয়েছি আমরা। কিন্তু আজ তিনি পুরানো মানুষটির কঙ্কাল মাত্র। তবু তাঁকে যে পাওয়া গেছে এই কি যথেষ্ট নয় মা! তাঁকে একজন পুরাতন পরিচিতের বাড়ী নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি যাচ্ছি সেখানে, সম্ভব হলে তাঁকে সনাক্ত করতে। তুমি তাঁকে বাঁচিয়ে তুলবে। স্নেহে কর্তব্যে বিশ্রামে স্বাচ্ছন্দ্যে আবার পরিপূর্ণ মানুষ করে তুলবে।'

লরি দেখলেন, মেয়েটির সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন একটা মৃদু কম্পন প্রবাহিত হল। যেন প্রেত-কণ্ঠে বললে সে—'আমি কি দেখতে যাচ্ছি মিঃ লরি তাঁকে না তাঁর প্রেতকে?'

মেয়েটির মনে গভীর দাগ কাটবার অভিপ্রায় নিয়ে লরি বললেন—'কিন্তু পুরানো মানুষটিকে পাওয়া গেলেও, তাঁকে পুরানো নামে পাওয়া যায়নি মা! আজ আর তা নিয়ে মাথা ঘামানো বৃথা। সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা বা উল্লেখ করাও যুক্তিসঙ্গত হবে না। এখন প্রথম প্রয়োজন তাঁকে ফ্রান্স থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা। আর সেই গুপ্ত উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা যাত্রা করেছি। তার একটি মাত্র সঙ্কেত হল—'বেঁচে উঠেছি' এই দুটি কথায়। তুমি কি কিছুই শুনলে না মা?'

লরি দেখলেন, মেয়েটির সর্বাঙ্গ নিথর নিঃসাড় হয়ে গেছে। নিশ্বাস পড়ছে অতি মৃদু। এই অতি আকস্মিকতার আঘাতে মেয়েটি বিহ্বল বিবশ হয়ে পড়েছে ভেবে তিনি তার সঙ্গিনীকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন।

যাত্রা করার আগে অন্ততঃ সুস্থ হয়ে ওঠা ত প্রয়োজন।

৫

মদের দোকানের দরজায় ঠেলা-গাড়ী থেকে নামাতে গিয়ে একটা মদের পিপে মাটিতে বাদামের মত ফেটে পড়েছে। পথের উপরেই দুর্ঘটনা।

কাছাকাছির যত লোক কাজ-কারবার ফেলে ছুটে এসেছে সেই মদ গেলবার লোভে। পথের এলোপাথাড়ি পাথরের টুকরোর ফাঁকে-ফাঁকে সেই মদের ছোট ছোট কুণ্ডের পাশে পাশে বিক্ষিপ্ত জনতার ভীড়। পথের কাদা-ধূলোর সঙ্গে মিশে-যাওয়া সেই রুদ্ধ বা প্রবাহিত মদ্যস্রোতকে নিঃশেষে শুষে নেওয়ার প্রতিযোগিতায় মুহূর্তে সেই পথ কলরব-মুখর হয়ে উঠল।

হাসি উল্লাস গালাগালি আর হৈ-চৈ শেষ হল তেমনি হঠাৎ, যেমন আচম্বিতে শুরু হয়েছিল কিছু পূর্বে। যে লোকটি করাত দিয়ে কাঠ চিরছিল সে আবার কাজে ফিরে গেল। যে মেয়েটি গরম উনুনের ছায়ে অনাহারী দেহের কৃশ হাত-পায়ের আঙুলগুলি সেঁকছিল সে আবার ফিরে গিয়ে বসল দরদবজায় নিজের জায়গাটিতে। অন্ধকার গহ্বর থেকে যে লোকগুলো হঠাৎ পথের উপর উঠে এসেছিল, তাদের কদাকার মুখগুলো আবার অন্ধকারে হারিয়ে গেল। রৌদ্র-ঝলকিত পথে আবার একটা বিষণ্ণ নৈঃশব্দ নেমে এল।

প্যারিসের এক সঙ্কীর্ণ গলিপথে সেদিন মাটি-পাথর ভিজেছিল লাল মদে। সেই রঙ লেগেছিল নানা বয়সের নারী শিশু বৃদ্ধের সর্বাঙ্গে। কারুর মুখে, কারুর হাতে, কারুর কপালে, কারুর সারা গায়ে। একজনের ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে গড়িয়ে-পড়া মদের রক্ত-ধারায় মানুষটাকে দেখাচ্ছিল যেন রক্তলোভী পিশাচ! একজন পথের পাগল সেই মদের ধারা দিয়ে দেওয়ালে রক্তাক্ষরে লিখেছিল—রক্ত!

এ পথের পাথর রক্তস্রোতে একদিন লাল হয়ে উঠবে—লাল হয়ে যাবে মানুষের শরীর, তারও বুঝি আর দেরী নেই।

চকিতের ঔজ্জ্বল্যে যে-পথ ঝলকিত হয়ে উঠেছিল, আবার পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার সেখানে বাসা বাঁধল। সে যেমন জমাট তেমনি ভারী। সেই তিমির-রাজ্যের পাঁচ জন দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রভু। শীত, আবর্জনা, ব্যাধি, অশিক্ষা আর অভাব। এই পঞ্চরথীর সভায় অভাব হোল মহারথী। বিলাস-নগরী প্যারিসের সহরতলীতে এই পথের আশে-পাশে সেই রাজ্যের এক মূর্ত্তি প্রজা দেখতে পাবে তুমি। দেখতে পাবে সেই অভাবের চেহারা এখানকার প্রত্যেকটি দরজায় জানলায়—দেখতে পাবে পথের কোণে-কোণে। পঙ্ক শোষণে এখানকার শিশুর অকাল বার্ধক্য। শিশু যুবা বৃদ্ধ সকলের মুখেই একটি মাত্র ছাপ—সে ছাপ ক্ষুধার। ক্ষুধার রাজ্যই যেন। বড়-বড় অট্টালিকা থেকে নির্বাসিত হয়ে ক্ষুধা যেন এই সব পথের আশে-পাশে হিংস্র লোভে ঘোরে। এখানকার বাসার বাইরে যে নোংরা কাপড় আর চট ঝোলে—পথের আবর্জনা-স্তূপে যে ময়লা জমে, সে সব যেন ক্ষুধারই রূপ। সস্তা রুটির দোকানে, নোংরা মাংসের দোকানে, পচা তেলে-ভাজা খাবারের দোকানে, এ পল্লীর আনাচে-কানাচে, অণু-পরমাণুতে দারিদ্র্য আর ক্ষুধা যেন নিত্য প্রহরী।

আর যেমন দেবতা তেমনি তার পীঠস্থান! একটা সরু নোংরা গলিপথ থেকে বেরিয়েছে আরো সরু ঘোরানো গলি সব। পচা দুর্গন্ধে তাদের বাতাস ভারী হয়ে আছে সব সময়। সে পথে যারা বাস করে তাদের গায়েও যেমন দুর্গন্ধ পরনেও তেমনি। মুখে দিন-রাত্রি হাজার ভাবনার বাসা। চোখের দৃষ্টি বিষণ্ণ উদাস।

কিন্তু মরবার আগে পশু যেমন একবার মরীয়া হয়ে শিকারীর দিকে ফেরে, তেমনি এই সব চিন্তাক্লিষ্ট পরাজিত চোখের দৃষ্টিতে কখনো কখনো সেই মরীয়া ভাব চোখে পড়ে। চোখে পড়ে অনাহারী সাদা ঠোঁটের নিরুদ্ধ আক্রোশ। কপালের বলীরেখায় যেন ফাঁসীর পাকানো দড়ির সাদৃশ্য।

দোকানের বিজ্ঞাপনীতেও সেই অভাবের স্বাক্ষর। এখানে সবই যেন নেই-নেই—সর্বত্র যেন নিত্য লক্ষ্মীছাড়া ভাব। কেবল যন্ত্রপাতি আর অস্ত্রশস্ত্রের দোকানে ভাণ্ডার পর্যাপ্ত। ছুরি আর কাস্তে এখানে যেমন শাণিত তেমনি উজ্জ্বল। হাতুড়িগুলির একটিও অজড়ায় নয়। বন্দুকের দোকানে যেন বিপ্লবের ভাণ্ডার। এ-পথে পথচারীদের জন্ত ফুটপাত নেই। জল-কাদা ভরা এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা একেবারে

"লাক্স্ টয়লেট্ সাবান
আমার ত্বক্‌কে কমনীয় ক'রে রাখে"

রেনুকা রায়
বলেন

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 237-X30 BG

বাড়ীর দরজার ধারে উপস্থিত। বৃষ্টি-বাদলে পথের নোংরা জল গিয়ে দাঁড়ায় উঠোনে বা ঘরে। দীর্ঘ গলির মাঝে-মাঝে দড়ি পুলি দিয়ে টাঙানো এক-একটি গ্যাস। সন্ধ্যায় যখন বাতিওয়ালা সেই গ্যাস জ্বালিয়ে দিয়ে যায়, অল্প-অল্প হাওয়ায় সেই টিমটিমে আলোর বাতি শূন্যে দোল খায়, মনে হয় যেন আঁধার সমুদ্রে ঝড়ের ঝাপটে উঠছে-নামছে জাহাজ। বস্তুতঃ এরা সমুদ্রযাত্রীই, ঝড়ের তাড়নায় ও ঢেউয়ের ঝাপটে এরা বিপর্যস্ত নৌকাবাহী।

আর এমন দিনও আসতে বিলম্ব নেই যেদিন ঐ বাতিওয়ালার মত টিমটিমে গ্যাসের বাতি নামিয়ে লোকে ঐ পুলি আর দড়ি দিয়ে টেনে তুলবে মানুষকে। ঐ বাতির মতই সারি-বাঁধা মানুষ ফাঁসীতে লটকে দোল খাবে। সারা ফ্রান্স জুড়ে সেই হাওয়া উঠতে আরো বুঝি কিছু বিলম্ব আছে।

পথের কোণের এই মদের দোকানটি এখানকার মধ্যে সম্রান্ত। এতক্ষণ ধরে দোকানের মালিক দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছিল। মানুষটি রুক্ষ প্রকৃতির। বছর তিরিশ বয়স, পৃষ্ঠ ভারী গড়ন। ছোট-ছোট কোঁকড়ান কালো চুলে সারা মাথাটি ভরা। মুখটিতে শিল্পীর হাতের ছাপ আছে। প্রথম দর্শনেই বোঝা যায় যে মানুষটি জেদী একরোখা প্রকৃতির।

পাগলের কীর্তি দেখে মালিক চেঁচিয়ে বললে—'কী ব্যাপার? একেবারে পাগলা-গারদের ক্ষ্যাপা! কী যা-তা লেখা হচ্ছে?'

রাস্তা পার হয়ে গিয়ে কাদা লেপে মালিক রক্তলেখাটি মুছে দিলে নিজের হাতে। 'রাস্তায় এ-সব লেখো কেন? আর কোথাও জায়গা পাও না লেখবার?'

যখন দোকানে ফিরে এলো দেখল স্ত্রী কাউণ্টারের পিছনে তেমনি বসে আছে। মাদাম দ্য ফর্জের বয়স স্বামীরই সমান। চোখের দৃষ্টি ভারী সজাগ। কিন্তু লোকে দেখে, মেয়েটি কদাচিৎ চোখ তুলে তাকায়। মুখের ভাবে শান্ত দৃঢ়তা। এ মেয়েকে দেখলেই বোঝা যায় যে বুদ্ধিতে তার কুয়াশা নেই, জীবনে ভুল করেনি মোটেই। সহজে ঠাণ্ডা লেগে যায় বলে মেয়েটি গলায় গলাবন্ধ জড়িয়ে হাতের সেলাই পাশে রেখে একটা ছোট কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটছিল বসে-বসে।

স্বামী ঘরে ঢুকতেই ছোট্ট একটু কাসলে সে। বাক্যহীন এই সঙ্কেতেই স্বামী বুঝলে যে, স্ত্রীর ইচ্ছা দোকানের ওপাশে নতুন কোন খরিদ্দারের তদারক করে সে, এই চায় তার মাদাম। মেয়েটি যখন কাসে ভুরু দুটি ঈষৎ উন্নত হয় কপালে, সেটি প্রথমেই চোখে পড়ে।

মালিক এতক্ষণে দোকানের চারি পাশে তাকিয়ে দেখলে। ঘরের এক কোণে দুটি চেয়ারে নিরিবিলি এসে বসেছেন একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক আর একটি কমবয়সী মেয়ে। অন্য খরিদ্দারদের পাশ দিয়ে এগিয়ে যখন সে নিকটবর্তী হোল আগন্তুকদের, শুধু চোখের ভাষায় ভদ্রলোকটি সঙ্গিনীকে জানালেন যে, এই সেই লোক। একেই খুঁজছি আমরা।

মনে মনে বললে দ্য ফর্জ—'এখানে কোণ ঘেঁসে বসে কি করছেন আপনারা? আপনাদের চিনিই না আমি।'

অন্য চেনা খরিদ্দারদের সঙ্গে আজকের ব্যাপার নিয়ে গল্প জুড়েছে এমন সময় মাদামের পোষাকের খসখসানি আওয়াজে চকিত হল দ্য ফর্জ। দেখলে দাঁত খোঁটা বন্ধ রেখে স্ত্রী আবার গভীর অভিনিবেশে সেলাইতে মন দিয়েছে।

অন্য খদ্দেররা দাম দিয়ে বিদায় নেওয়া মাত্রই প্রৌঢ় লোকটি এগিয়ে এলেন। স্ত্রীর সেলায়ের দিকে নজর ছিল মালিকের, তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন তিনি—'একটু কথা বলতে চাই।'

'স্বচ্ছন্দে।' দ্য ফর্জ আগন্তুকের সঙ্গে নিঃশব্দে দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াল।

ভদ্রলোকটির প্রথম বাক্যস্ফূর্তিতেই মালিক দ্য ফর্জ যেন চমকে উঠল। তার পর দু'জনে মিনিট খানেক গূঢ় আলাপ হল। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সে বাইরে যেতেই ভদ্রলোকটি সঙ্গিনী মেয়েটিকে ডাকলেন। তার পর তারাও বাইরে গেলেন। মাদাম নিবিষ্ট মনে সেলাই করছিল, এ সকলই তার দৃষ্টির অগোচর রইল।

দরজা থেকে বেরিয়ে লরি ও মিস্ মেনেট দোকানের মালিকের পিছু-পিছু এগোলেন। ছোট উঠোনের চারি পাশেই মস্ত মস্ত পিঁজরাপোলের মত বাসা। তারই একখানির অন্ধকার টালি বাঁধানো সিঁড়ির কাছ বরাবর এসে দ্য ফর্জ নীচু হয়ে পুরানো কর্তার মেয়েকে প্রণাম জানালে। ভাবটুকু কোমল কিন্তু ভঙ্গীটি মোটেই মনোহর বোধ হোল না লরির। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে লোকটির যেন গভীর পরিবর্তন ঘটে গেছে। মুখে বিন্দু মাত্র স্নিগ্ধতা অবশিষ্ট নেই, ব্যবহারে নেই শিষ্টতা। আচম্বিতে যেন গূঢ় ক্রুদ্ধ ভয়ঙ্কর জীব হয়ে উঠেছে মনে হোল।

সিঁড়ি ভাঙা সুরু করেই কঠিন কণ্ঠে জানালে সে—'অনেক উঁচু। পথও দুর্গম। ধীর পায়ে চলুন।'

'একলা আছেন?'

'একলা? একলা ছাড়া তাঁর সঙ্গে থাকবে কে?'

'একলাই থাকেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'একলা থাকার ইচ্ছে বুঝি ওঁর?'

'ইচ্ছেতে নয়। দরকারে। ওরা যখন প্রথম আমায় খুঁজে পেয়ে দাবী করে যে ওকে আমি রাখব কি না—এমন কি নিজের ঝুঁকিতে—সেই তখন যেমন দেখেছিলাম এখনও ঠিক তেমনি আছেন।'

'অনেক বদলে গেছেন—না?'

'বদলে?' দেওয়ালে ঘুঁসি মেরে দোকানের মালিক কি-যেন একটা গালিবর্ষণ করলে আপন মনে।

যত উঠছেন উপরে বুকে হাঁফ ধরছে লরির।

প্যারিসের ঘিঞ্জি রাস্তায় এই ধরণের বাড়ীর সিঁড়ি ভাঙা যেন পাহাড়ে ওঠা। শুধু অন্ধকার নয়, নোংরা। দু'পাশের ভাড়াটেরা সিঁড়ির ধারেই নোংরা ফেলে রাখে দিন-রাত্তির। একটা পচা ভ্যাপ্‌সা দুর্গন্ধ যেন বাতাসের টুঁটি চেপে আছে সব সময়। লরি দু'বার থেমে হাঁফ ছাড়লেন। মাঝে-মাঝে পথের দৃশ্য চোখে পড়ে জানলা দিয়ে। চারি পাশেই সেই নোংরামি আর লক্ষ্মীছাড়া রূপ। শুধু অনেক উঁচুতে উঠে একবার চোখে পড়ল নোতরদম গীর্জার দুটি উন্নত শীর্ষ। এই বুক-চাপা হীনতা ছোটত্বের মধ্যে গীর্জার ঐ দুটি চূড়া যেন মহৎ জীবনের স্বপ্ন-স্বর্গ!

অবশেষে শেষ সিঁড়ি ভাঙা সুরু হল। কোটের পকেট থেকে চাবী বার করতে দেখে লরি তাকে প্রশ্ন করলেন—'দরজায় তালা দেওয়া কেন?'

দ্য ফর্জ রুক্ষ গলায় শুধু হুঁ বলে সাড়া দিলে।

'দরজা বন্ধ রাখ কেন ?'

'কেন ? এত কাল বন্ধ দরজার অন্তরালে কাল কাটিয়েছেন। এখন সব খোলা পেলে জানি না কি সর্বনাশ করে বসবেন। হয়ত নিজেকেই টুকরো করে ফেলবেন আক্রোশে।'

'তাও কি-সম্ভব ?'

'সম্ভব ? সম্ভব কেন নয় শুনি ? এ পৃথিবীতে কী সম্ভব নয় ? কি হচ্ছে না দুনিয়ায় ? শয়তানের পৃথিবী—হয় না আবার কি ?'

পুরুষ দু'জনের নিম্ন কণ্ঠের আলাপ কানে না পৌঁছলেও, আপন মনের গভীর ভাব-সংঘাতে মিস্ মেনেটের মুখ এতক্ষণে ভাবলেশহীন হয়ে উঠেছিল। একটা আতঙ্কের ধাক্কায় মুখের সব রক্ত সরে গিয়ে গোলাপী গাল পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে দেখে লরি তার গায়ে হাত দিয়ে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন—'সাহসী হও মা! এখুনি দেখো না সব চিরকালের মত মিটে যাবে। একবার তাকে দেখলেই সব ভয় ঘুচে যাবে তোমার। তখন তোমার কত কাজ পড়বে। তাকে ভালো করে তুলবে তুমি—স্নেহ দেবে, যত্ন দেবে—তাকে সুখী করবে—তিনি তোমার—'

শেষ ধাপে যখন পৌঁছলেন, লরি দেখলেন তিন জন লোক গভীর মনোযোগ দিয়ে ঘরের ভিতর দেখছে। কেউ দরজার ফুটো দিয়ে, কেউ দেওয়ালের ফাটা দিয়ে।

'এরা কারা ?'

'তাড়াতাড়িতে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আচ্ছা, তোমরা এসো ভাই। আমাদের একটু কাজ আছে।'

তিন জন নেমে যেতেই লরি রাগত কণ্ঠে দোকানের মালিককে বললেন—'এরা কারা ? তুমি কি ওঁকে চিড়িয়াখানার জন্তু পেয়েছ ?'

'না—দু'-এক জন চেনা লোককে মাত্র দেখাই। যেমন এই আপনারা এসেছেন।'

'এ অন্যায়।'

ততক্ষণে দরজায় চাবী ঘুরিয়েছে সে। দুম-দুম করে ধাক্কা দিয়ে ভিতরের মানুষটির সাড়া জাগিয়েছে। তার পর দরজার এক পাল্লা ঈষৎ উন্মুক্ত করে কি যেন বললে। অস্ফুট এক বর্ণ একটা প্রত্যুত্তর কানে এল অন্ধকার থেকে!

তাদের হাত নেড়ে আহ্বান করতেই লরি মেয়েটিকে সবলে বাহু দিয়ে জড়িয়ে নিলেন। দেখলেন, সে যেন সংজ্ঞা হারাবার প্রাক্-মুহূর্তে এসে পৌঁছেচে।

চোখ থেকে ঝরে লরির গালে কি যেন চক-চক করতে লাগল। তিনি স্নিগ্ধ সিক্ত কণ্ঠে বললেন—'এসো মা—এসো।'

'বড়ো ভয় করছে আমার!'

'ভয় ? কিসের ভয় ? কার ভয় মা ?'

লরি মেয়েটিকে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে নিলেন। তার পর যেন কোলে করেই ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন।

এ ঘরটি বহু কালের কাঠ-কাঠরার গুদোম। দরজা একটি। জানলা একটি পথের দিকে। সেই জানলায় চাকা লাগান দড়ি। সোজা পথ থেকে এই উঁচু অবধি মাল তোলার ব্যবস্থা। এত অন্ধকার যে প্রথমে কিছুই ঠাহর হল না লরির। তার পর চোখ একটু অভ্যস্ত হতে তিনি মেয়েটিকে নিয়ে পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলেন।

এক সময় দেখলেন, জানলার দিকে মুখ করে একটি পক্ককেশ বৃদ্ধ একখানি বেঞ্চির উপর ঝুঁকে আপন মনে কি নিয়ে পরম ব্যস্ত। লরি নত হয়ে দেখলেন, বৃদ্ধ যা তৈরী করছেন তা এক পাটি মেয়েদের জুতো।

৬

'কেমন আছেন ?'

দ্য ফর্জের উত্তরে সেই নত শির একবার ঈষৎ আন্দোলিত হল। দূরাগত ধ্বনির মত শোনা গেল—'ভাল।'

'এখনও কাজ করছেন ?'

কতক্ষণ পরে সেই মুখ দেখতে পেলেন লরি। দেখলেন, দুটি নিষ্প্রভ জ্যোতিহারা চোখ। 'কাজ করছি।' এই দুটি মাত্র কথায় যে দুর্বলতা প্রকাশ পেল তাতে লরির হৃদয় গভীর দুঃখে ভরে উঠল। দীর্ঘ দিন বন্দিজীবন যাপন করার ফলে যে দুর্বলতা শরীরে বাসা বেঁধেছে এ তারই ফল বুঝলেন তিনি। কত দিন কারুর সঙ্গে কথা বলেন নি। কাল কাটিয়েছেন নিঃসঙ্গ নির্জন বোবা। যেন কত কাল পূর্বের একটি ধ্বনির মৃদুতম প্রতিধ্বনি। মনুষ্য-কণ্ঠের সজীবতা ও ব্যঞ্জনার লেশ মাত্র সেই ধ্বনিতে। লরির মনে হোল, যেন মানুষটি কত কাল ধরে একাকী দিশাহারা হয়ে ফিরেছেন বনে-বনান্তরে, এত দিনে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে বন্ধু-পরিজনের কাছে শেষ বিদায় নিয়ে গভীর মৃত্যু ঘুমে অচেতন হবেন।

কতক্ষণ মৌন কাল কাটল। তার পর সেই দুটি দীপ্তিহীন চোখের দৃষ্টি তুলে আবার তাকালেন বৃদ্ধ।

দ্য ফর্জ তাকে বললে—'আর একটু আলো বাড়লে কষ্ট হবে কি ?'

একবার এদিকে একবার ওদিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি দিয়ে বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বললেন—'কি যেন বলছিলে তুমি ?'

'আর একটু আলো বাড়লে কষ্ট হবে ?'

'আলো এলে সহ্য করতেই ত হবে।'

আধ-ভেজান দরজাটি খুলে দিলে দ্য ফর্জ। আলো এসে পড়ল বৃদ্ধের সর্বাঙ্গে। লরি দেখলেন মানুষটিকে। কোলের উপর আধা তৈরী একটি জুতা। শ্বেত শ্মশ্রুতে ভরা মুখখানি। গাল দুটি বসা। দীর্ঘ চিকণ মুখের মধ্যে চোখ দুটি কেবল বড়ো-বড়ো। আলো লেগে সে দুটি যেন ঝক-ঝক করতে লাগল এতক্ষণে। গায়ে একটি হলুদ রঙের ছিন্ন সার্ট। খোলা বুকটি দেখা যাচ্ছে যেন শীতের পাতার মত শুষ্ক বিবর্ণ।

আলোর জন্য করতল দিয়ে চোখ ঢেকেছিলেন। সেই হাতের দিকে তাকিয়ে লরির মনে হোল যেন হাড় অবধি স্বচ্ছ হয়ে গেছে। মানুষটি যখনই কথার উত্তর দিচ্ছেন বিপর্যস্ত ভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন, যেন শব্দের সঙ্গে স্থানের মিল করতে পারছেন না দীর্ঘ অনভ্যাসের ফলে।

লরি মেয়েটিকে দ্বারপ্রান্তে রেখে এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ালেন।

নতশির বৃদ্ধের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্য ফর্জ বললে—'জানেন, একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

'কি বলছ ?'

'একজন ভদ্রলোক আপনাকে দেখতে এসেছেন। কী জুতো তৈরী করছেন এঁকে দেখান ত। আর কারিগরের নামটিও বলুন।'

মানুষটি অনেকক্ষণ ধরে এক হাতের আঙুল আর এক হাতে

গুঁজে বসে রইলেন। তার পর তার বিপরীত করলেন। তার পর আবার আগের মত। মাঝে-মাঝে চিবুকে হাত বুলাতে লাগলেন। এমনি ধারা করলেন কত বার। যেন বার বার শূন্যতার মধ্যে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে সজাগ করা যেন কোন সংজ্ঞাহীন লোককে ডেকে সাড়া নেওয়ার মত।

'কি যেন বলছিলে?'

'আপনার নাম বলুন।'

'আমার? একশ' পাঁচ।'

'বাস্। আর কিছু নয়।'

'হ্যাঁ—একশ' পাঁচ।'

'আপনি ত আর মুচি নয় পেশায়?'

সেই ছুটি জ্যোতিহীন চোখ পলকের জন্য স্ত ফর্জে'র মুখের উপর ন্যস্ত হল। তার পর ধীর কণ্ঠে বললেন তিনি—'মুচি নই আমি। কোন কালে ছিলামও না। তবে শিখেছি—শিখে নিয়েছি নিজে-নিজে।'

লরির হাত থেকে সেই সৌখীন মেয়েলি জুতাটি নেবার জন্য ঈষৎ কম্পিত হাত প্রসারিত করলেন তিনি। সেই অবসরে দু'জনে দৃষ্টিবিনিময় হল। লরি প্রশ্ন করলেন তাঁকে—'মসিয়ে মেনেট, আমায় মনে পড়ে?'

হাত থেকে স্খলিত হয়ে জুতাটি পড়ল মাটিতে। প্রশ্নকারীর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধ।

'মসিয়ে মেনেট' স্ত ফর্জে'র বাহুতে হাত রেখে লরি বললেন বৃদ্ধকে—'দেখুন ত ভালো করে এই লোকটির দিকে। আমার দিকে তাকান। কিছুই কি মনে পড়ে না আপনার? কোন পুরানো ব্যাঙ্কার, পুরানো ব্যবসা, পুরানো চাকর-বাকর, কোন কিছু পুরানো কি মনের ভিতর জাগে না? দেখুন না চেয়ে। ভাবুন না একটু মসিয়ে মেনেট।'

এই ছুটি লোকের দিকে একাগ্র দৃষ্টি রাখতে লাগলেন বৃদ্ধ পালটে-পালটে। ধীরে-ধীরে তাঁর কপালে একটি কুঞ্চন-রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল। মনে হোল বুঝি চৈতন্যোদয় ঘটেছে। কিন্তু ক্ষণিকের সেই চেতন মানস আবার এক সময় কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেল। আবার সেই বিস্মৃতির সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হলেন বৃদ্ধ। স্মৃতি বিস্মৃতির বিপরীত তরঙ্গভঙ্গে ক্লান্ত হলেন। আবার নেমে এল অন্ধকার দু'চোখ ভরে। তখন মৃত্তিকার দিকে মুখ করে বৃদ্ধ আবার জুতা সেলায়ে মন দিলেন।

'চিনতে পেরেছেন?'

স্ত ফর্জে'র প্রশ্নের উত্তরে লরি বললেন—'পলকের জন্য চিনেছি। ভেবেছিলাম বুঝি হবে না। কিন্তু একটি মুহূর্তের জন্য ঐ মুখে আমি বহু দিনের বিস্মৃত পরিচয় স্পষ্ট দেখেছি। চুপ। এসো আমরা সরে দাঁড়াই।'

দ্বারপ্রান্ত থেকে মেয়েটি এগিয়ে এসে বৃদ্ধের পাশে দাঁড়িয়েছে কখন। কোন সাড়া নয়, শব্দ নয়, যেন একটি বিদেহী আত্মার মত বৃদ্ধের নত মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েটি।

কখন বুঝি হাতের যন্ত্র বদলাতে গিয়ে মেয়েটির জামার প্রান্ত চোখে পড়ল বৃদ্ধের। চকিতে মুখ তুলে দেখলেন মেয়েটিকে।

একটা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ভরে উঠল বৃদ্ধের ছুটি চোখ। একটু পরে ছুটি ঠোঁট কাঁপতে-কাঁপতে যেন কি বাক্য রচনা করতে লাগল নিঃশব্দে। অনেকক্ষণ পরে সেই শব্দ ক'টি হৃৎপিণ্ডের গতির সঙ্গে মৃদু কণ্ঠে উচ্চারিত হল—'এ কি?'

কান্নায় ভেঙে পড়েছিল মেয়েটি। সেই অবস্থায় সে বৃদ্ধের ছুটি হাত নিয়ে একবার অধরে ছুঁইয়ে বুকের উপর চেপে ধরল। লরি ভাবলেন বুঝি বা বৃদ্ধ পিতার ধ্বংসস্তূপই কন্যা বুকে আঁকিড়ে নিল।

'তুমি জেলারের মেয়ে নও?'

'না।'

'তবে কে তুমি?'

তাঁর পাশে বসল মেয়েটি বেঞ্চের উপর। বৃদ্ধ ঝাঁকিয়ে সরিয়ে নিলেন নিজেকে। তখন পিতার হাতে হাত দিল সে। একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গে শিহরিত হল বৃদ্ধের দেহ। হাতের তীক্ষ্ণ ছুরিকাটি রেখে বৃদ্ধ এই অজানা মেয়েটির মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

এক রাশ সোনালী চুল কাঁধের উপর ভেঙে পড়েছে। সেই চুলের কয়েক গাছা নিয়ে একটুক্ষণ খেললেন তিনি। তার পর আবার সেই অন্ধকার।

একটু পরে নিজের গলা থেকে একটা দড়ি ছিঁড়ে ফেললেন বৃদ্ধ। নোংরা কাপড়ের একটা টুকরো খুলে ভিতর থেকে দু'-তিনটি সোনালী চুল বার করলেন। কত বার করে মিলিয়ে দেখলেন। বিড়-বিড় করে বললেন বৃদ্ধ—'এ-ও কি হয়? কি করে হয়? এ সব কি?'

চেতনার সূর্যালোক এল। 'সে রাত্রে আমার কাঁধে মাথা রেখেছিল আমার সোনা। বুঝি ভয় পেয়েছিল যে আমি চলে যাবো। কিন্তু ভয় ত ছিল না কিছু। তবু ওরা যখন আমায় নিয়ে গেল জেলখানায় এই ক'টি চুল আমার জামার হাতায় জড়িয়ে ছিল। আমি বলেছিলাম জেলারকে, ঐ ক'টি আমায় রাখতে দিন। ওরা আমার দেহকে মুক্ত করতে পারবে না—কিন্তু আমার মনকে মুক্তি দেবে। মনে পড়ছে—সব মনে পড়ছে আমার।'

এতগুলি কথা-কল্লোল মানস সরোবরে উঠল-পড়ল। কিন্তু মুখে বললেন তিনি—'এ-ও কি হয়? তুমিই কি আমার সেই?'

মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলতে লাগলেন বৃদ্ধ। সেই সোনালী চুল ক'টি কত বার করে বুকে চেপে ধরে অসহায় আর্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন—'না—না। তুমি এত ছোট—এত সুন্দর। তুমি কি করে হবে? এই আমি। জেলখানার কয়েদী। এই হাত তুমি ত কখনো দেখনি। এই মুখ তুমি ত চিনবে না। এই গলা কখনো শোনোনি। না, না। সে ছিল আমার একদিন। আমি ছিলাম তার—কিন্তু সে কত যুগ হয়ে গেল জেলের জীবন—কত যুগ—তোমার নামটি কি লক্ষ্মী মেয়ে?'

তাঁর কণ্ঠের স্নিগ্ধতায় অধীর হয়ে মেনেট পিতার চরণতলে বসল। বুকের উপর হাত ছুটি জড়ো করে বললে—'আমার কি নাম। মা কে, বাবা কে, সব আমি বলব আপনাকে। কিন্তু সে এখন নয়। সব বলব আপনাকে। সব বলব। শুধু আমায় আপনি আশীর্বাদ করুন। আমায় একবার বুকে জড়িয়ে নিন—শুধু একটি বার।'

নীচু হয়ে বৃদ্ধ মেয়েটির সোনালী চুলে মুখ রাখলেন।

'যদি চিনেই থাক মা আমার, একবার এই বৃদ্ধের কথা ভেবে
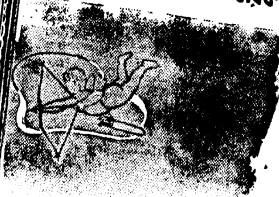
দু'ফোঁটা চোখের জল ফেল মা ! কত আশা, কত স্বপ্ন, কত সাধ, কত স্মৃতি ! সব চোখের জলে ভিজিয়ে দাও।'

বৃদ্ধের শুষ্ক বিবর্ণ মুখখানি বুকের মধ্যে নিয়ে মেয়েটি তাঁকে যেন শিশুর মত ভোলাতে লাগল।

'যত কান্না আছে সব কেঁদে নাও। কান্নার শেষ করে দাও। আমি এসেছি তোমায় নিয়ে যেতে। এইবার তোমায় নিয়ে আমি চলে যাবো ইংল্যাণ্ডে। পিছনে পড়ে থাকবে এই পুরানো পতিত জমি—নতুন সুখের নীড় বাঁধব আমি তোমায় নিয়ে সযত্নে। মাকে ত হারিয়েছি চিরদিনের জন্য—তিনি ত কেঁদে-কেঁদে চলে গেছেন। তোমায় ফিরে পেয়েছি এ আমার কত সৌভাগ্য ! তোমার এই অভাগ্য ভাগ্যবতী মেয়ের দিকে একবার তাকাও।'

মেয়ের বুকে মুখ গুঁজে বৃদ্ধ শরীর এলিয়ে দিয়েছিলেন। কী অপরিসীম যন্ত্রণা ও অন্যায় ভোগ করে এত ক্লান্ত হয়েছেন ভেবে বাকী দু'জনের চোখ ফেটে জল এল।

লরি এগিয়ে এসে পিতা-পুত্রীকে পরম স্নেহে তুলে ধরলেন। ঝড়ের শেষে এখন সব শান্ত হয়ে এসেছে। জীবনের ঝটিকা অবসানে এখন বিরতি অখণ্ড শান্তিতে বিরাজ করছে।

'এখনি এঁকে নিয়ে যেতে হবে প্যারিস হতে ?'

'কিন্তু ওঁর পক্ষে এই কষ্ট কি সহ্য হবে ?

'এ বীভৎস রাজ্য থেকে পালাতে পারলে উনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন।' বললে মেয়ে জিদ করে।'

লরি বললে—'তবে তাই হোক মা ! আমি নিজে ওঁর যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

পিতা-পুত্রীকে সেই আধা-অন্ধকার চিলে কোঠায় তেমনি ভাবে রেখে লরি ও দ্য ফর্জ দু'জনে যাত্রার আয়োজন করতে গেলেন।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল প্যারিসের এই সহরতলীতে। অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল কখন নিঃশব্দ পায়ে। তারও কতক্ষণ পরে দু'জনে ফিরে এলেন। যাত্রা ও খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে।

শূন্য বিহ্বল বিস্মিত দৃষ্টির অন্তরালে সেই বন্দীর মনে কি ভাবতরঙ্গ উঠছিল তা এরা কেউ-ই ধারণা করতে পারলে না। কি যে ঘটল তার গভীর মর্মার্থ কি তিনি বুঝলেন ? আপন মুক্ত জীবনের অনুভূতি কি হৃদয়তন্ত্রীতে নব জীবনের রাগিণী বাজালে ? মানুষটির গূঢ় বিহ্বলতায় এক-এক বার ছেদ পড়ছে তখন—যখন কন্যার কণ্ঠধ্বনিতে সচকিত হয়ে উন্মনা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন তার মুখখানির দিকে।

আহারপর্ব সমাপ্ত হল মন্থর গতিতে। পোষাক-পরিচ্ছদ বদল হল। তার পর চার জনে অবতরণ করতে লাগলেন সেই দীর্ঘোন্নত বন্ধুর সিঁড়ি বেয়ে।

'কিছু মনে পড়ে তোমার ?'

'কিছু না। কত দিন হয়ে গেল।'

উঠোনে নেমে বৃদ্ধ যেন একটি পরিচিত টানা'পোলের আশায় তাকালেন। কিন্তু না দেখে যেন নিরাশ হলেন।

পথ নির্জন। কোন বাতায়নে কৌতূহলী দর্শক নেই। সেই জনহীন পথে কেবল নিশ্ছিদ্র নৈঃশব্দ এদের সাক্ষী হয়ে রইল। আর মদের দোকানের দ্বারে হেলান দিয়ে মালিকের স্ত্রী গভীর মনোযোগে সেলাই করতে লাগল। তার দৃষ্টিও যেন পড়ল না এদিকে।

বৃদ্ধের পিছনে-পিছনে কন্যাও গাড়ীতে উঠল।

লরি উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বৃদ্ধ তাকে মিনতি করলেন তার যন্ত্রপাতি আর অর্দ্ধসমাপ্ত জুতাটি নিয়ে আসার জন্য। মাদাম দ্য ফর্জ সে কথা শুনে নিজে নিয়ে এলো সেগুলি ! তার পর আবার দরজায় হেলান দিয়ে তেমনি ভাবে আপন মনে সেলাই করতে লাগল। যেন কিছু দেখেওনি।

গাড়োয়ানের চাবুক খেয়ে ঘোড়ারা ছুটতে লাগল। আধ স্তিমিত পথের আলোয় গাড়ীর লণ্ঠনগুলির দোলায়মান আলো কত ছায়া-রূপ সৃষ্টি করতে-করতে চলল।

তারা-ভরা আকাশের নীচে কম্পিত এই আলোক-দ্যুতি। কত নক্ষত্র, যাদের আলোক আজও এসে পৌঁছায়নি এই ধরিত্রীর বুকে। যারা আজো জানে না এই অপার অসীম বিশ্বভুবনে একটি মৃত্তিকা-কণা এই পৃথিবী। সেই পৃথিবীতে কত ন্যায় অন্যায়, কত স্নেহ নিষ্ঠুরতা।

রাত্রির অন্ধকারের কী দুর্ভেদ্য গূঢ়তা ! কী অগোচর ব্যাপ্তি ! মনকে আচ্ছন্ন করে। শীতল রাত্রি, ঘোড়ার লাগামের ঝনঝন, সম্মুখে বসা একটি নিথর ঘুমন্ত বৃদ্ধ আবার সেই স্বপ্নকে প্রত্যাবৃত্ত করল মনে।

এই মাত্র তাকে উদ্ধার করেছেন। মৃত্তিকার অভ্যন্তর থেকে মুক্ত বাতাসে তুলে এনেছেন।

'বেঁচে উঠতে ভালো লাগছে ?'

কানে সেই পরিচিত উত্তরটি এল।

'ঠিক বলতে পারি না। কী জানি !'

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী।

পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

বহু সাধনার বন্ধন পথে সিদ্ধি লভিল যে মহাজন
বাঙলা যাঁহার গৌরবে জাগে, সবারে করিল যেবা আপন।
সমন্বয়ের দীপ্য মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ নাম যাঁহার,
বিশ্বজগতে ভারতের নাম প্রকট হইল কৃপায় তাঁর।
শ্রদ্ধা-প্রণতি সঁপিনু আজি সে পরমহংস চরণে
তাঁরি মাধ্যমে আজিও বাঙলা জাগিছে বিশ্ব-স্মরণে।

কঠোপনিষদ

চিত্রিতা দেবী

শান্তিপাঠ

ওঁ সহনাববতু সহ নৌ ভুনক্তু,
সহ বীর্য্যং করবাবহৈ,
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ,
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

গুরু ও শিষ্য আমাদের দোঁহে,
একসাথে রাখো প্রভু,
বিদ্যার ফল যেন ভোগ করি দুজনে।
সমান শক্তি দাও যেন মোরা
শিখিতে শিখাতে পারি,
অধীত বিদ্যা হোক তেজস্বী
আনুক চিত্তে বল,
বিদ্বেষ ভরে, দোঁহারে দুজনে,
কখনো না যেন দেখি।
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

প্রথম অধ্যায়

প্রথম বল্লী

ওঁ উশন হবৈ বাজশ্রবসঃ
সর্ববেদসং দদৌ
তস্য হ নচিকেতা নাম
পুত্র আস ॥ ১

বাজশ্রবের মহান্ পুত্র দান করলেন সর্বস্ব—
যজ্ঞফলের আশায়।
নচিকেতা তার পুত্র ॥ ১

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু
নীয়মানাসু
শ্রদ্ধাবিবেশ, সোঽমন্যত ॥ ২

দক্ষিণার জন্যে আনা হোল যাদের,
তাদের দেখলেন সেই কুমার,
শ্রদ্ধা এল চিত্তে,
ভাবলেন,—॥ ২

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা
নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্
স গচ্ছতি তা দদৎ ॥ ৩

—এই যে সব গাভী,
যাদের শেস হয়েছে তৃণাহার,
যারা পান করেছে জল,
দুগ্ধ যাদের হয়ে গেছে নিঃশেষ,
নিরিন্দ্রিয় এই গাভীদের,
দান করেন যিনি,
নিরানন্দ লোকে তাঁর গতি ॥৩

স হোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মাং
দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হোবাচ
মৃত্যবে ত্বা দদামীতি ॥৪

তিনি প্রশ্ন করলেন পিতাকে,
—"আমাকে দিলে তুমি কার হাতে"?
বার বার, তিনি করলেন এই জিজ্ঞাসা।
—"দিলাম তোমায় মৃত্যুকে",
বললেন পিতা ॥৪

বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি
মধ্যমঃ
কিং স্বিদ যমস্য কর্তব্যং
যন্ময়াঽদ্য করিষ্যতি ॥৫

অনেকের মাঝে কভু মধ্যম,
কভু বা প্রথম আমি।
(নামি না তো তার নীচে,)
জানি না আমার কি রয়েছে কাজ,
আজিকে যমের কাছে ॥৫
(যদি অনুশোচনা আসে পরে,
তাই তিনি আশ্বাস দিলেন পিতাকে—)

অনুপশ্য যথা পূর্বে প্রতিপশ্য
তথাঽপরে,
শস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে,
শস্যমিবাজায়তে পুনঃ ॥৬

পূর্বপুরুষ কোন পথে গেছে
ভেবে দেখ পিতা একবার,
কোন পথে চলে আজিকার সাধু,
তাও ভাব তুমি আর বার,
দুঃখ কোর না, মানব কেবল,
শস্যের মত, জন্মায় আর মরে ॥৬

বৈশ্বানর প্রবিশত্যতিথি-
বাঁহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি,
হর বৈবস্বতোদকম্ ॥৭

আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাং
চেষ্টাপূর্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্বান্।
এতদ্‌বৃঙক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো,
যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে ॥৮

তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মেঽ-
নশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ।
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু,
তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব ॥৯

শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনা যথাস্যাদ্
বীতমন্যুর্গৌতমো মাঽভিমৃত্যো।
ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাঽভিবদেৎ প্রতীত,
এতৎ ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে ॥১০

যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত,
ঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ
সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যু-
স্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্ ॥১১

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাঽশনায়াপিপাসে,
শোকাতিগো, মোদতে স্বর্গলোকে ॥১২

স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো
প্রব্রূহি ত্বং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত
এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ ॥১৩

প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ,
স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং
বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্ ॥১৪

(যমালয়ে যাবার তিন দিন পরে, প্রবাসী যম
যখন ফিরে এলেন ঘরে, হিতার্থীরা তাঁকে বললেন—)
ব্রাহ্মণ অতিথি ঘরে আসেন,
যেন অগ্নিরূপী দেবতা
হে সূর্যপুত্র, পাদ্য-অর্ঘ্য আন তুমি
তার জন্য
জল দিয়ে যথা অগ্নিরে তোষ,
তথা অতিথিরে কর শান্ত ॥৭
আশা, প্রতীক্ষা, সাধুসঙ্গের ফল,
মধুর বাক্য, দানের পুণ্য যত,
সকলি তাহার ধূলায় নষ্ট হয়,
যার ঘরে আসি নিরাহারে রয় অতিথি ॥৮
(যম বললেন—)
—নমস্য তুমি অতিথি আমার,
ত্রিরাত্রি অনাহারী,
ক্ষমা কর যেন মঙ্গল হয় মম,
প্রতিরাত্রির লাগি এক একটি বর,
কর তুমি প্রার্থনা ॥৯
নচিকেতা :—
পিতা যেন মোর প্রতি বীতমন্যু হয়ে,
শান্তমনে নিরুদ্বেগে রন!
তোমা হতে মুক্ত হয়ে ঘরে ফিরে গেলে,
সাদরে সম্ভাষি যেন ডেকে মোরে লন,
ত্রি বরের মাঝে এ মোর প্রথম প্রার্থনা ॥১০
আমার আদেশে আগের মতই তোমারে চিনিয়া,
স্নেহময় হবে আরুণি,
মৃত্যু হইতে মুক্ত তোমারে, হেরিয়া নয়নে,
সুখেই যাপিবে নিশি ॥১১
তুমি নেই তাই স্বর্গে নেইকো ভয়,
তোমা ছাড়া জরা আনে নাকো সংশয়।
ক্ষুধা ও তৃষ্ণা উভয়কে হয়ে পার
শোকাতীত সেই সুখের স্বরগে,
আনন্দ করে ভোগ ॥১২
যে অগ্নি হতে, অমৃতপিয়াসী,
স্বর্গ করেন লাভ,
কহ সে বহ্নিরূপ,
শ্রদ্ধায় আমি এসেছি,
হে প্রভু (বিফল কোর না মোরে),
এ মোর দ্বিতীয় প্রার্থনা ॥১৩
(যম—)
শোন, নচিকেতা, নিবোধ চিত্তে,
আমি সে অগ্নি জানি,
অমরলোকের সেই তো সোপান,
সেই জগতের আশ্রয়,
নিহিত রয়েছে মনে বুদ্ধিতে,
তাহারে কহিব আমি ॥১৪

লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ
যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা,
স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্ যথোক্ত-
মথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ ।১৫

তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা
বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতাঽয়মগ্নিঃ
সৃঙ্কাং* চেমামনেকরূপাং গৃহাণ ।১৬

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং
ত্রিকর্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যু
ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি। ১৭

ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্ বিদিত্বা
য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে। ১৮

এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো
যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ
এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাস-
স্তৃতীয়ং বরং নচিকেতা বৃণীষ। ১৯

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ।২০

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা,
ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্মঃ,
অন্যং বরং নচিকেতা বৃণীষ
মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্। ২১

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল
ত্বং চ মৃত্যো যন্ন সুজ্ঞেয়মাত্থ।
বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো
নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ ।২২

* সৃঙ্কা অর্থ মালা। শঙ্করের মতে—ফললাভের উপায়স্বরূপ, পরম্পরাক্রমে শৃঙ্খলাকারে গ্রথিত কর্মসিদ্ধি।

আদিম শক্তি অগ্নির বাণী,
যম তাঁকে ডেকে শোনালেন,
ইট গেঁথে তাহা আহরিতে হয়,
কি করে, তাহাও বললেন,
নচিকেতা তাহা শিখলেন,
প্রীত হয়ে যম আরবার তাকে
বললেন ।১৫
প্রীতিভরে আমি আর একটি বর,
আবার তোমায় দিচ্ছি,
তোমার নামেই হোক অগ্নির নাম,
মালার মতন বহুফলরূপা,
কর্ম, তোমায় দিনু ।১৬
ত্রিগুরুর সাথে, একসাথে মিলে,
যে করে আগুন আহরণ,
ত্রিকর্ম দ্বারা পার হয় সে যে,
জন্ম-মৃত্যু-রাশি।
জ্ঞানতপস্যা হৃদয়ে ধারণ করে,
লভে চিরস্থির, অবিশেষ সেই শান্তি। ১৭
তিন বার যেবা অগ্নিরে সেবা করে,
যে জানে কি করে অগ্নি সেবিতে হয়,
অগ্নিরে যেবা তেজোরূপে জানে প্রাণে,
এই জীবনেই, শোকাতীত হয়ে,
সে করে স্বর্গভোগ। ১৮,
অগ্নির তরে যে বর চেয়েছ,
তাই দিনু আমি তোমারে,
আরো বর দিনু, তোমার নামেই,
লোকে নাম দিবে ইহারে,
কি তব তৃতীয় প্রার্থনা। ১৯
(নচিকেতা—) মৃত্যুর পরে কেউ বলে 'আছে',
কেউ বলে 'নেই' তাকে,
বলে সংশয়ভরে।
দাও উপদেশ, সত্য জানব,
থাকে কি না থাকে 'সে'—
এ মোর তৃতীয় প্রার্থনা। ২০
(যম—) দেবতারও ছিল এই সংশয়,
শোন নচিকেতা তুমি,
সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব বোঝান
সহজসাধ্য নয়,
এ তুমি চেও না,
আর কোন বর, কর মোর কাছে,
প্রার্থনা। ২১
দেবতারও ছিল সন্দেহ যাতে,
সে তো সুজ্ঞেয় নয়,
তোমার তুল্য বক্তা কোথায় পাব?
এর মত আর কি প্রশ্ন আছে,
কোথায় জগৎ-মাঝে ।২২

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব,
বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব
স্বয়ং চ জীব শরদো—
যাবদিচ্ছসি ॥২৩

(যম—) বর চাও তুমি শতকালজীবি,
পুত্র পৌত্র সব।
যত পশুদল, হাতী ঘোড়া আর সেনা,
সুবিশাল ভূমি, বর লও তুমি,
বাঁচ যত দিন খুসী,
শুধু চেও না এমন বর ॥২৩

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ্ব
বিত্তং চিরজীবিকাং চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি কামানাং
ত্বা কামভাজং করোমি ॥২৪

এই বর ছাড়া, আর যাহা চাও,
সব দিব আমি তোমারে,
আরো দেব বহু ধন,
হও চিরজীবি, হও মহারাজ,
ভোগ কর তুমি বসুধা,
শুধু চেও না এমন বর ॥২৪

যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে
সর্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সতূর্য্যাঃ সরথাঃ
ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব।
নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ ॥২৫

কামনার ধন, যাহা কিছু আছে,
যত দুর্লভ হোক্,
আমি এনে দেব তোমারে।
তূর্য্যবাদিকা, রথ-সমারূঢ়া,
দিব্য শোভনা রমণী—
এই যে দেখিছ, সামনে,
নহে মানুষের লভ্যা।
তবু ইহাদের দিলাম তোমায়,
কোর না মৃত্যুজিজ্ঞাসা ॥২৫

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ;
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব
তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥২৬

(নচিকেতা)—হায় যমরাজ, তোমার এ দান,
কাল রবে, কিনা কে জানে।
কতটুকু আয়ু মানুষের?
ভোগে ইন্দ্রিয় কেবলি জীর্ণ হয়,
রথ আদি সব গীত ও নৃত্য
তোমার তরেই থাক ॥২৬

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্বা,
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসিত্বং
বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥২৭

ধনে মানুষের আত্মা তৃপ্ত নয়,
তোমাকে দেখেছি, সেই পুণ্যেই,
হয়ত বিত্ত পাব,
হয়ত বাঁচব, ততদিন,
তুমি রবে যতদিন প্রভু।
যা চেয়েছি আগে,
সেই মোর চির প্রার্থনা ॥২৭

অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্য্যন্ মর্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদান্
অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥২৮

ইন্দ্রিয়-সুখ ক্ষণিক জেনেও,
হেন মূঢ় কেউ আছে কী,
যে চায় কেবলি জীবন করিতে ভোগ।
অমর জনের কাছে এসে, করে,
ক্ষণসুখতরে প্রার্থনা ॥২৮

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যোঃ
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ,
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো

আছে কি না আছে, মৃত্যুর পরে,
সংশয় করি ভেদ,
মহান্ সে বাণী চিত্তে আমার
পূর্ণ করিয়া দাও।
মর্মকেন্দ্রে গহনে গোপনে,
যে সত্য আছে স্থির,
তারে ছাড়া, আর নচিকেতা
কিছু চায় না ॥২৯

সি. কে. সেনের আর একটি
অনবদ্য সৃষ্টি
পুষ্পগন্ধে সুরভিত
ক্যাস্টর অয়েল
বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দণ্ডী বিরচিত

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

পূর্ব্বপীঠিকা

চতুর্থ উচ্ছ্বাস

ব্রাহ্মণের উপকার করবার জন্তেই নিশ্চয় আপনি চলে গেছেন—সকলে মিলে এই সিদ্ধান্তেই আমরা পৌছেছিলুম। কিন্তু কোথায় যে আপনি যেতে পারেন, কোনো জানা দেশে, বা অজানা দেশে, সেইটি নির্ণয় করতে আমরা পারলুম না। তখন সকলের পরামর্শ মত এক-এক জন এক-এক দিকে আপনাকে খুঁজতে বেরই।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন, মাটি ফাটছে সূর্য্যের তেজে,—অসহ্য গরম—বিশ্রাম করতে ইচ্ছা হল। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ছিল প্রকাণ্ড একটি ছায়াঘন গাছ। তারই তলদেশে বসে পড়লুম। বসে আছি,—এমন সময় আমার সামনে মাটির উপর একটা ছায়ার ছবি পড়ল। কূর্ম্মাকৃতি একটি মনুষ্যছায়া;—সারা অঙ্গ যেন সিঁটিয়ে কুঁচকিয়ে আছে—সেই রকমের একটা ছায়ার ছবি। আকাশের দিকে চেয়ে দেখি,—তাই ত, পাহাড়ের চুড়ো থেকে একটা মানুষ খসে পড়ে যাচ্ছে—ভয়ানক বেগে সেটি নেমে আসছে মাটির দিকে;—ভৃগুপতন! হঠাৎ মনটা কেমনধারা হয়ে গেল—বোধ হয় জাগল দয়া। পড়ন্ত মানুষটিকে কোন রকমে ধরে ফেলি। সংজ্ঞা লোপ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। শীতল উপচারের ব্যবস্থায় তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনি। এ রকম ভৃগুপতনের কারণ কি, জিজ্ঞাসা করাতে চোখের জল মুছে তিনি বললেন,—

"সৌম্য, আমার নাম রত্নোদ্ভব;—মগধরাজ্যের মন্ত্রী পদ্মোদ্ভবের আমি পুত্র। বাণিজ্যব্যপদেশে 'কালযবন দ্বীপে' যাই। সেখানকার একটি বণিক্-কন্যাকে বিবাহ করে ফিরে আসছিলুম—সমুদ্রে পোতখানি ভেঙে গিয়ে মগ্ন হয়। তীরের কাছেই ডুবেছিল। দৈবগতিকে রক্ষা পেলুম বটে আমি, কিন্তু কোথায় যে গেলেন আমার পত্নী তার কোনো খোঁজই করতে পারলুম না। এক লবণসমুদ্র থেকে পড়লুম আর এক লবণসমুদ্রে অশ্রুর। পরে একটি সিদ্ধ তাপসের সঙ্গে দেখা হয়, তিনিই আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন—বলেছিলেন—'ষোলটা বছর কোনো রকমে কাটিয়ে দে—সব ফিরে পাবি—তোর দুঃখের হবে অবসান।' ষোল বছর কেটে গেল কিন্তু দুঃখের অবসান ত হল না। তাই পাহাড়ের চূড়ো থেকে এই ভৃগুপতনের আশ্রয় নিয়েছিলুম।"

এমন সময়ে হঠাৎ একটা চীৎকার ভেসে উঠল সেই অরণ্যে। নারীকণ্ঠেরই ত চীৎকার! চমকে উঠলুম। কে যেন চীৎকার করে বলছে "সিদ্ধ পুরুষের কথায় আর বিশ্বাস নেই, স্বামী ছেলে—কেউ ত ফিরে এল না, আগুনই আমার একমাত্র ভরসা।"

রাজকুমার, ততক্ষণে আমার সমস্ত মন দিয়ে আমি জানতে পেরেছি যে এঁরাই আমার জনক আর জননী। দৈবের রহস্য কোথা হ'তে কোথায়, কাকে যে টেনে নিয়ে আসে তারি অপূর্ব্ব এক নিরঞ্জন সমাধান! আমি বললুম "তাত, আপনাকে বলবার অনেক কিছু রয়েছে আমার। কিন্তু এখন থাক। পরে সমস্ত বলব। আমাকে ঐ স্ত্রী-কণ্ঠের আর্ত্তধ্বনির দিকে এখনি ছুটতে হবে। উপেক্ষা করতে পারছি না। আপনি বরং এইখানেই কিছুকাল বিশ্রাম করুন।"

কিন্তু তিনি সেখানে রইলেন না। আমরা দু'জনে ছুটলুম সেই দিকে, যেখান থেকে ভেসে এসেছিল আর্ত্ত চীৎকার। গিয়ে দেখি—সামনেই জ্বলছে প্রচণ্ড এক শিখাশালী আগুন, আর তাতে অবগাহন করবার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন একটি সাহসিকা—স্থির বদ্ধাঞ্জলি। কোনো কথা না বলে তাঁকে আগুনের নাগালের বাইরে করে দিলুম, নিয়ে এলুম পিতৃদেব যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আগুনের নিকটেই একটি বৃদ্ধা স্থবিরা ছিল—সেই-ই চীৎকার করে উঠেছিল। তাকেও টেনে নিয়ে এলুম। "এই হেন ঘন বনের মধ্যে এ কি কাণ্ড তাঁরা আরম্ভ করেছেন?"—এই প্রশ্ন করাতে সেই স্থবিরাটি ধরা-গলায় থেমে থেমে বলতে লাগল, "বাছা, কালযবন দ্বীপের কালগুপ্ত বণিকের মেয়ে এই 'সুবৃত্তা'। স্বামী রত্নোদ্ভবের সঙ্গে আসতে আসতে ভরাডুবী হয়। আমি ওর ধাত্রী। কাঠের একটা ফালি ধরে আমরা বেঁচে যাই। তার উপর ওঁর ছিল সন্তান-সম্ভাবনা। তীরে এক বনের মধ্যে ছেলেটি কোলে এলো। কিন্তু আমাদের কপাল এত মন্দ—বুনো হাতী ছেলেটিকে শুঁড়ে জড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। তার পরে ষোল

বছর কেটে গেছে। সিদ্ধ পুরুষের বাক্য ফলল না। চোখের সামনে আমাকে দেখতে হচ্ছে সুবৃত্তার অগ্নিপ্রবেশ। এত দিন আমরা সেই সিদ্ধ পুরুষের পুণ্যাশ্রমেই আশ্রয় পেয়েছিলুম।"

ব্যাপার কি, বুঝতে বাকি রইল না। জননীকে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করলুম। সব বৃত্তান্ত খুলে বললুম, এবং সর্ব্বশেষে আমার পিতৃদেবকে ধরে দিলুম মায়ের সামনে। ষোলো বছর পার হয়ে গেছে—তবু এক মুহূর্ত লাগল না তাঁদের চিনে নিতে নিজেদের। আনন্দাশ্রুর আশীর্ব্বাদী দিয়ে আমাকে আশীর্ব্বাদ করবার সে কি ধুম! কী সুখে যে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে, আঘ্রাণ করলেন মস্তক! গাছের ছায়ায় বসে নিশ্চিন্ত মনে আমাকে শুধালেন "পুষ্পোদ্ভব, মহারাজ রাজহংস কেমন আছেন?"

তাঁদের প্রথম কথা পরিচয়ের!

জানালুম সব,—মহারাজ রাজহংসের কেমন করে রাজ্য গেল, তার পরে আপনি জন্মালেন, দশটি কুমার আমরা কেমন করে সম্মিলিত হলুম, তার পরে আমাদের দিগ্বিজয়ে প্রয়াণ ইত্যাদি।

তার পরে আমরা আশ্রয় নিলুম একটি মুনির আশ্রমে।

এ তো গেল আমার জনক-জননী-লাভ। কিন্তু কুমার, তখনও আমি, চেষ্টা সত্ত্বেও আপনার কোনো খবর পাইনি। নবীন উৎসাহে আবার আরম্ভ করলুম অন্বেষণ। হঠাৎ মনে হল—অর্থ না থাকলে কিছু হয় না। সফলতার বেদী হচ্ছে অর্থ। রাজবংশের অনাবিল অনুগ্রহে এবং আচার্য্যদের পরামর্শে আমি অনেক কিছু লাভ করেছিলুম বিদ্যা। সাধনগুলি আমাকে সাধক করে তুলেছিল। তাই, আমি শিষ্য-সৃষ্টি করলুম, যারা আমার কার্য্যে আমাকে সাহায্য করতে পারবে এমন শিষ্য। সমৃদ্ধশিষ্য-সমভিব্যাহারে বিন্ধ্যারণ্যের অনেক প্রদেশে, যেখানে যেখানে পুরাতন পত্তন ছিল, সেখানে সেখানে পৃথ্বীচর্ম্মের নিম্নে, মহীরুহের তলদেশে, কমলার উল্লসিত শিবির অনুসন্ধানে নিয়োজিত করে দিলুম নিজেকে। ফল ভাল হল। সিদ্ধাঞ্জনের আনুকূল্যে খননে পেলুম সাফল্য। রক্ষীদের চোখের উপর দিয়েই সংগ্রহ করতে লেগে গেলুম কলসী কলসী অর্থবিত্ত, রাশি-রাশি দীনার। নিকটেই বণিকদের কটক ছিল, সেখান থেকে খরিদ করলুম বলীবর্দ্দ। গোনীর (ডবল থলের) ভিতরে ভরে ভরে গাড়ী বোঝাই করে মাল নিয়ে যেতুম। কী যে নিয়ে ফিরছি, তা কেউ বুঝতে পারত না। লোক-চক্ষুকে এড়িয়ে নগরে নিয়ে আসতে লাগলুম রত্ন। 'চন্দ্রপাল'—বণিকের সে ছেলে, সেই কটকের অধিকারী—আমার মহদ্বন্ধু হল;—তাকে সঙ্গে নিয়ে এই বিশাল উজ্জয়িনীতে আমার প্রবেশ হল, অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যে মহীয়ান্ হয়ে। জনক-জননীকেও নিয়ে এলুম উজ্জয়িনীতে। চন্দ্রপালের জনক 'বন্ধুপাল' গুণী লোক। উজ্জয়িনীতে এসে আমার জনক-জননীর সঙ্গেও তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা হল। মালবরাজের সঙ্গে তিনিই ঘটিয়ে দেন আমার দর্শন ও পরিচয়, এবং রাজার অনুমতি নিয়েই আমরা উজ্জয়িনীতে গূঢ় বসতি করতে থাকি।

এর মধ্যেও আপনার অন্বেষণ চলেছিল। আমার দুশ্চিন্তা দেখে একদিন শকুনবিদ্যাবিশারদ বন্ধুপাল বললেন "দেখ, পৃথিবী-ঘোরা সহজ কথা নয়। মন থেকে গ্লানি দূর করে দিয়ে কিছুদিন চুপ করে থাকো। যখন রাজপুত্র রাজবাহনের সঙ্গে তোমার দেখা হবার সময় হবে তখন আমিই তোমাকে জানাব।"

কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলুম তাঁর বচনামৃতে। সেই থেকে তাঁর কাছে কাছেই ফিরি। কখন কোন্ পাখীর মুখ থেকে কী খবর যে তিনি পান!

এই রকম চলেছে, হঠাৎ একদিন দেখতে পাই 'বালচন্দ্রিকাকে'। আহা, তার জ্যোৎস্না-ফোটা চোখ! তরুণীরত্নকে দেখাও যা, পুষ্প-ধনুর বাণ খাওয়াও তা। বণিক-মন্দিরের মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী দেবী—দেহ লাবণ্যের ঢেউয়ে যেন ভাসিয়ে দিয়ে গেল আমার প্রাণের তীরভূমিকে।

ক্ষণপরেই বুঝতে পারলুম বালচন্দ্রিকাও আমাকে লক্ষ্য করেছে। কটাক্ষ ত নয়—যেন শ্রীমদনের ধনু। দেখলুম সেও কাঁপছে, যেমন করে মোহনলতা কাঁপে—মন্দমারুতের আন্দোলনে। হঠাৎ তার চোখের কোণটি কুঁচকে গেল, চোখের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল অনুরাগ আর লজ্জা, মনের কথাটি যেন সেই চাহনির রাজপথ ধরে আমার কাছে পৌঁছে গেল। গূঢ়-চতুর চেষ্টায় তার মনের অনুরাগখানি ভাল করে বুঝে নিলুম, আর সেই সঙ্গে ঘনিয়ে উঠল চিন্তা, কেমন করে হবে আমাদের সুখ-মিলন।

তার পর একদিন আমি এবং বন্ধুপাল পাখীদের কাছ থেকে আপনার গতিবিধি জানবার বাসনায় উজ্জয়িনীর উপান্তে একটি বিহার বনে এসেছি, হঠাৎ একটি গাছের কাছে এসেই বন্ধুপাল দাঁড়ালেন। কী যেন কি শুনতে লাগলেন মন দিয়ে। আমি আর কি করি, মনের উৎকণ্ঠা মনেই রেখে বনান্তে পরিভ্রমণ করতে করতে উপস্থিত হলুম এক সরোবরের সুন্দর তীরে। চেয়ে দেখি,—বালচন্দ্রিকা! বসে রয়েছে। চিন্তায় আক্রান্তচিত্ত, মুখে অদ্ভুত দীনতা। কিন্তু, আমি যেন অনুভব করলুম প্রেম-লজ্জা-কৌতুক-মনোরম একটি সুখ। মনে হল ওর পদ্মমুখে ঐ যে দেখা যাচ্ছে একটি বিষণ্ণতা—ওটির জন্ম বোধ হয় ভালবাসার বেদনা থেকেই। কাছে এগিয়ে গেলুম—জিজ্ঞাসা করে ফেললুম "সুন্দরি, তোমার মুখখানিতে ছায়া কেন বিষাদের?"

তখন কেউ ছিল না সরোবরের তীরে, এবং আমার উপর বোধ হয় অকারণ বিশ্বাস ছিল বলেই, লজ্জা ভয় পরিত্যাগ করে বালচন্দ্রিকা ধীরে ধীরে বললে,—

"সৌম্য, মালবপতি মানসার অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়েছেন। দর্পসারকে অভিষিক্ত করেছেন উজ্জয়িনীর সিংহাসনে। সাত সাগর পৃথিবী—শাসন করতে করতে একদা তাঁর বৈরাগ্য আসে। নিজ পিতৃষসার উদ্দণ্ডকর্ম্মা দুটি পুত্র 'চণ্ডবর্ম্মা' আর 'দারুবর্ম্মা'র হাতে রাজ্য-রক্ষার ভার সমর্পণ কোরে তপস্যার জন্যে 'রাজরাজগিরি'তে (কৈলাসে) প্রস্থান করেন দর্পসার। চণ্ডবর্ম্মা সত্যই রাজ্য শাসন করছেন, কিন্তু দারুবর্ম্মা পাষণ্ডবিশেষ। সে চণ্ডবর্ম্মাকে অগ্রাহ্য করে, পরস্ত্রী লুণ্ঠন, পরদ্রব্য অপহরণ—কিছুই বাদ দেয় না। আপনার সঙ্গে দেখা হবার পরে দারুবর্ম্মা কোথায় না জানি আমাকে দেখেছে। কন্যা-দূষণ-দোষ যে কত বড় অপরাধ সে ভুলে গেছে। জোর করে আমাকে তার রতিমন্দিরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেও দ্বিধা করেনি। তাই চিন্তা করছি কি করব।"

বালচন্দ্রিকার কথা শুনে, কথার ভঙ্গিতে ভালবাসার নৈবেদ্যলাভ করে ভাবতে লাগলুম—"আমার মনোরথ সিদ্ধির অন্তরায় ঐ দারুবর্ম্মাটিকে ইহলোক থেকে কি করে সরাই?" বালচন্দ্রিকাকে আশ্বাস দিয়ে অনেক বিচার করে শেষে বললুম—

"তরুণি, পাষণ্ড দারুবর্ম্মাকে নিধন করবার জন্তে একটি মৃদু উপায় ঠিক করেছি। তোমার লোকজনদের কাছে গিয়ে বলো, তারা যেন এই খবরটা সহরময় রাষ্ট্র করে দেয়। তারা বলুক—'বালচন্দ্রিকাকে অধিকার করে রয়েছে এক যক্ষ। তাঁকে ভালবাসে, বা সম্পদের আশায় তাঁকে বিবাহ করতে চায় এমন যদি কোন সম্বন্ধ-যোগ্য সাহসিক থাকে—তার পক্ষে তাঁকে লাভ করতে পারার একটি মাত্র উপায় রয়েছে। জেনে রেখো এটি সিদ্ধাদেশ। একটি মাত্র সখী সঙ্গে নিয়ে মৃগনয়না বালচন্দ্রিকা রতিমন্দিরে প্রবেশ করবেন। সেখানে যক্ষকে বধ ক'রে, সংলাপের অমৃতে তাঁর হৃদয় যে জয় করতে পারবে তারই সঙ্গে বিবাহ ঘটবে রূপসীর।' এই রটনার পরে দারুবর্ম্মা যদি যক্ষের ভয়ে চুপচাপ থেকে যায় তা'হলে সব চেয়ে ভাল। কিন্তু যদি দৌর্জন্যের আশ্রয় নিয়ে তোমাকে কামাধীন করতে চায় তাহলে তাকে এই কথা বোলো, 'দেখুন, আপনি পৃথ্বীপতি দর্পসারের অমাত্য। আমার নিবাসে এসে এই হেন দুঃসাহসের কাজ করা আপনার শোভা পায় না। পৌরজনদের সাক্ষী করে আপনার মন্দিরে আমাকে নিয়ে চলুন। সেখানে যদি সিদ্ধাদেশ অনুযায়ী আচার-ব্যবহার করে আপনি আয়ুষ্মান্ হন তাহলে আমাকে বিবাহ করে মনোরথ পালন করবেন। দেখো, দারুবর্ম্মা এ কথা মেনে নেবে, স্বীকার করবে। সখীবেশধারী আমাকে নিয়ে তুমি তখন তার মন্দিরে যাবে। আমিও সেই একান্ত নিকেতনে মুষ্টি, জানু ও পদাঘাতে তাকে কৃতান্তপুরে পাঠিয়ে দিয়ে, তোমার সখীর ছলে আবার তোমার সঙ্গেই নিঃশঙ্কে বেরিয়ে আসব। পরেরটুকু সুন্দরি তোমার কাজ। কিন্তু সব খুলে বলতে হবে তোমায় তোমার জনক-জননীর সকাশে। আমাদের ভালবাসার ফুল যাতে পরিণয় ফলে পৌঁছয়, তার ব্যবস্থা নির্ভর করছে তোমার অনুনয়ের সফলতায়। তাঁরা নিশ্চয়ই তোমাকে আমার হাতে তুলে দেবেন। বংশের সম্পৎ লাবণ্য বাড়বে বই কমবে না। তাঁদের কাছে দারুবর্ম্মার এই মারণোপায়টি বোলো। জানিও, তাঁরা কি বলেন।'

আমার কথা শুনে যেন দল মেলল বালচন্দ্রিকার পদ্মমুখ। সে বললে "এক—আপনার সৌভাগ্য যদি আমাকে ঐ পাষণ্ড দারুবর্ম্মার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে—ত পারবে। সে যদি মরে তবেই আমাদের মনোরথ সফল হবে। আপনি যা বললেন, সেই মতই আমি কাজ করব?" এই কথা বলে বালচন্দ্রিকা ধীরে ধীরে চলে গেল। যাবার বেলা সেই ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে চেয়ে দেখায় কী সুন্দরীপনা!

বুদ্ধি বার করলুম বটে কিন্তু অন্ত কোথায় চিন্তার! ধীরে ধীরে ভাবতে ভাবতে বন্ধুপালের কাছে ফিরে গেলুম। গভীর আনন্দের সঙ্গে শুনলুম, বন্ধুপাল পাখীদের কাছ থেকে খবর পেয়েছেন আপনার গতিবিধির। বন্ধুপাল বললেন—"ত্রিশটি দিন কাটলেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে।" অধীর আনন্দে বাড়ী ফিরে এলুম বন্ধুপাল আর আমি। ভাবতে লাগলুম।

শেষে বালচন্দ্রিকার কাছ থেকে দূতিকা এল। বলে গেল "দারুবর্ম্মা ফাঁদে পা দিয়েছেন। তাঁর রতিমন্দিরে তিনি বালচন্দ্রিকাকে বিহারের জন্তে আহ্বান করেছেন এবং বালচন্দ্রিকাও জানিয়েছেন—যাবেন।"

আমি তখন বেরুলুম। কিন্তু পুরুষবেশে নয় স্ত্রীবেশে। পায়ে পরলুম মণিনূপুর, কোমরে দিলুম মেখলা; হাতে বাঁধলুম কটক আর কঙ্কণ, কাণে পরলুম তাড়ঙ্ক; গলায় হার, ক্ষৌমবাস, নয়নেতে কজ্জল—। যখন বেরুলুম তখন একেবারে চেনা যায় না আমাকে। আমি সখী হয়ে গেছি। বালচন্দ্রিকার সঙ্গে দারুবর্ম্মার মন্দিরে এসে পৌঁছলুম। দ্বারদেশে সাদর অভ্যর্থনা; আহ্বান করে আমাদের নেওয়া হল ভিতরে; দ্বারোপান্তে নিবারিত হল অশেষ পরিবার। সঙ্কেতাগারে এসে পৌঁছলুম।

সারা নগরে তখন রাষ্ট্র হয়ে গেছে যক্ষ-বৃত্তান্ত। যক্ষ-কথা পরীক্ষা করবার জন্তে অনেক নাগরিক কুতূহলী হয়ে জড় হয়েছে দারুবর্ম্মার প্রতীহার ভূমিতে।

দারুবর্ম্মা প্রবেশ করলেন রতিমন্দিরে। ঘরের আড়ালে—সেখানে অন্ধকারখানি গাঢ়—সেখানে আমি সরে দাঁড়ালুম। আমি যে পুরুষ, দারুবর্ম্মা তা বুঝতে পারলেন না। তাঁর তখন মস্তিষ্কে বিবেক বলে কিছু ছিল না। অনুরাগের আতিশয্যে যেন স্ফীত হয়ে উঠছিলেন। রত্নখচিত সোনার পালঙ্ক, তার উপর হংসতালগর্ভ শয়ন, তরুণী বালচন্দ্রিকা সেখানে আসীনা। তরুণীর এবং আমার হাতে ধীরে ধীরে দারুবর্ম্মা একে একে তুলে দিতে লাগলেন—মণিমুক্তা বসানো সোনার অলঙ্কার, সূক্ষ্ম চিত্র বসন, কস্তুরিকা দেওয়া হরিচন্দন, কর্পূর মেশান তাম্বুল এবং সুরভি পুষ্প! তুলে দিয়ে দারুবর্ম্মা হেসে হেসে একটু কথা কইলেন। মাত্র দু'-এক মুহূর্ত্ত। তার পরেই কামান্ধের মত যৌবনপুষ্প চয়ন করতে হঠাৎ উদ্যত হয়ে উঠলেন বালচন্দ্রিকার।

আমিও আর বিলম্ব করলুম না। রোষে আমার সর্ব্বশরীর লাল হয়ে উঠেছে। নিঃশঙ্কে পর্য্যঙ্ক থেকে দারুবর্ম্মাকে মাটিতে ঠেলে ফেললুম, ফেলে দিয়ে মুষ্টি এবং পদাঘাতে তাকে প্রহার করতে লাগলুম—জর্জ্জর প্রহার। দারুবর্ম্মাকে আর চোখ মেলতে হল না। এই সম্পর্কে যে অলঙ্কারগুলি 'স্থানভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল সেগুলিকে যথাযথ স্থানে আরোপণ করে নতাঙ্গী বালচন্দ্রিকাকে ধীরে ধীরে ক্ষণকাল সেবা করলুম। ভয়ে সে থর-থর করে কাঁপছিল। তার পরে স্ত্রীবেশে মন্দিরের অঙ্গনে বেরিয়ে এসে স্ত্রী-কণ্ঠে চীৎকার দিলুম "হায় রে, হায় রে! সেই ভয়ানক যক্ষটা, যে বালচন্দ্রিকাকে ভর করেছিল, দেখসে সে খুন করেছে দারুবর্ম্মাকে। বাঁচাও, দৌড়ে এস, বাঁচাও, হায় হায় কি হল!"

পৌরজন যারা দ্বারোপান্তে জড় হয়েছিল তারা আকাশ ফাটিয়ে চতুর্দ্দিক বধির করে প্রথমে হা-হা ধ্বনি করে উঠল। কিন্তু ভয়ে কেউ এগোল না।

শেষ পর্য্যন্ত তারা বলাবলি করতে লাগল "গায়ের জোর ফলাতে গিয়েছিল যক্ষের সঙ্গে!—জানতুম নিজের কর্ম্মে নিজেই মরবে—কে বলেছিল তাকে এমন করে মদান্ধ হয়ে মরণকে নেমন্তন্ন করতে?—এর জন্ত আবার শোক করা কেন?" অনেক পরে পৌরজনেরা দারুবর্ম্মার রতিমন্দিরে প্রবেশ করল। আমিও তখন সেই হট্টগোলের

তাকে তাঁকে চটুলনয়নাকে সঙ্গে নিয়ে নিপুণ ভাবে সহসা সেখান থেকে বেরিয়ে এলুম। সোজা গৃহে আসি।

তার পরে কয়েক দিন কেটে গেল। পৌরজন সমক্ষে সিদ্ধাদেশ অনুসারে আমার বিবাহ হয় বালচন্দ্রিকার সঙ্গে। বহু দিন ধরে যে সব ভালবাসার ও মিলনের ছবি এঁকেছিলুম মনের মধ্যে, সেগুলিকে সাজানোর সুবিধা হল বালচন্দ্রিকার দেহ-মন্দিরে। আজ আমি নগরের বাইরে এসেছি—বন্ধুপালের কাকবিষ্ঠার নির্দ্দেশে। এসেই আপনাকে দেখতে পেলুম—নয়নের যেন উৎসব!

পুষ্পোদ্ভবের বৃত্তান্ত শুনে অম্লানমানস রাজবাহন তাঁকে জানালেন নিজের এবং সোমদত্তের বৃত্তান্ত। তার পরে সোমদত্তকে আদেশ দিলেন "মহাকালেশ্বরের আরাধনা সমাপন করে নিজ কটকে তোমার পত্নী-পরিবারবর্গকে পৌঁছিয়ে দিয়ে ফিরে এস।" সোমদত্ত বিদায় নিল। পুষ্পোদ্ভবের সেবা-চাতুর্য্যে আনন্দিত হয়ে রাজবাহন তখন ভূস্বর্গায়মান অবন্তিকাপুরে প্রবেশ করলেন।

সেখানে বন্ধুপাল প্রভৃতি বান্ধবদের নিকটে পুষ্পোদ্ভব,—"ইনি আমার স্বামিকুমার"—বলে পরিচয় দিল রাজবাহনের,, এবং অবন্তিকাপুরে রটিয়ে দিল—"ইনি একজন সকল কলাকুশল ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ।"

পুষ্পোদ্ভবের মন্দিরেই স্নানাহারাদির সুখ উপভোগ করতে করতে আস্থান নিলেন রাজবাহন।

ইতি দশকুমারচরিতে পুষ্পোদ্ভবচরিতং নাম চতুর্থঃ উচ্ছাসঃ

পঞ্চম উচ্ছ্বাস

তার পরে একদা অবন্তিকাপুরে আবির্ভূত হলেন ঋতু বসন্ত, সঙ্গে তার মীনধ্বজের সেনানায়ক দক্ষিণ সমীর। এ সেনানায়কটিকে দেখা যায় না।—সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্মতর এঁর শরীর। মলয় পর্ব্বতের বৃক্ষতলবাসী ভুজঙ্গেরা এঁকে যেন পান করে করেই সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম করে তবে ছেড়েছে। তবুও কী সুন্দর এঁর মৃদু-দোলন গতি!—অঙ্গ থেকে উড়ে যাচ্ছে ঐ যে হরিচন্দনের পরিমল—সেই গন্ধভারেই যেন ঈষৎ তুলে বইল ঐ দক্ষিণ সমীর।

ঋতু বসন্ত এলেন—বিরহীদের হৃদয়ে হৃদয়ে উজ্জ্বল জ্বলে উঠল—
মন্মথের অনল; আম্রমঞ্জরীর মধুপান করে
রক্তকণ্ঠ হল ভ্রমর, তাদের গুঞ্জনে যেন বাচাল
হয়ে উঠল দিক্‌চক্র; এবং মানিনীদের মনের মধ্যে ফুটে
উঠল আধ-ফোটা একটি সুখের বেদনা।

ঋতু বসন্ত এলেন—মাকন্দ, সিন্ধুবার, রক্তাশোকে,—কিংশুকে এবং
তিলকের শাখায় শাখায় ফুটিয়ে দিয়ে পুষ্পের ঐশ্বর্য্য,
উল্লসিত করে দিয়ে রসিকজনের হৃদয় মদন মহোৎসবের
অনবদ্য মাধুর্য্যে।

বলতেই হবে সময়টি বড় রমণীয়। নগরের উপান্তে একটি রম্যোদ্যান। হঠাৎ সেখানে দেখা গেল বিহার করতে এসেছেন মানসার-নন্দিনী "অবন্তিসুন্দরী",—সঙ্গে তাঁর প্রিয় বয়স্যা 'বালচন্দ্রিকা'। তাঁরা শুধু দুজনাই নন্—সঙ্গে আরও ছিলেন অনেকে—অনেক পৌরসুন্দরী। শিশু আম্রের একটি সুন্দর গাছ,—তারি ছায়াশীতল তলদেশে, সরোবরের সৈকতে, সকলে মিলে মনোভবের অর্চ্চনা, করতে লেগে গেলেন—গন্ধফুল, হরিদ্রাক্ত, চীনাম্বর, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি মনোহরণ উপচারে।

এমন সময় রাজবাহন পুষ্পোদ্ভবের সঙ্গে সেই উদ্যানে এসে প্রবেশ করলেন। সাক্ষাৎ কামদেব যেন বসন্তদেবকে সহায় করে নিয়ে দেখতে এলেন মূর্ত্তিমতী রতিদেবীকে। একটু লুকিয়ে, চোখের দেখা একটিবার দেখে নেব—এই মনে করে রাজবাহন ধীরে ধীরে এগোতে লাগলেন সেইখানে—যেখানে সহকারের শাখা দক্ষিণে বাতাসের নিরন্তর আন্দোলনে কাঁপছিল, যেখানে শাখার মাঝে মাঝে গজিয়ে উঠেছিল নূতন পাতা এবং যেখানে পাতার মাথায় মাথায় উল্লাসের মত ফুটে উঠেছিল সহকারের মঞ্জরী। ধীরে ধীরে তিনি এগোতে লাগলেন,—কানে এসে বাজতে লাগল কোকিলের কুহু, পাখীদের কূজন, ভ্রমরের গুঞ্জন,—এবং ঘন আনন্দের মধ্যে দিয়ে তিনি নয়ন ভরে দেখতে পেলেন—একটি জলভরা স্বচ্ছ সরোবর, কলধ্বনি করে তাতে খেলে বেড়াচ্ছে কলহংস, সারস, কারণ্ডব, চক্রবাক চক্রবাল,—ফুটে রয়েছে নীলপদ্ম, কহ্লার, কৈরব,—আর তারি কাছে সেই হৃদয়চঞ্চলা ললনা। তাঁদের দেখতে পেয়ে হাতছানি দিয়ে বালচন্দ্রিকা তাঁদের আহ্বান করলেন—যেন বললে "শঙ্কা নেই, এস।"

আনন্দে স্ফীত হয়ে উঠলেন রাজবাহন। মনুষ্যরাজ রাজবাহন তেজের দীপ্তিতে যেন দেবরাজ ইন্দ্রের চেয়েও আজ বড়!

কী কৃশ অবন্তিসুন্দরীর কোমরখানি! কাছে এগিয়ে ভাবলেন রাজবাহন। রাজবাহনের মনে হল নিশ্চয় শ্রীমদন রতিদেবীর শালভঞ্জিকা গড়তে গিয়ে হঠাৎ এই নারীবিশেষটিকে রচনা করে ফেলেছেন!—এবং গড়েছেন,—

ক্রীড়া-সরোবরের আশ্বিনের ফোটা পদ্মের সৌন্দর্য্য দিয়ে—তার চরণ দুখানি।

নিজের উপবন-দীর্ঘিকার মত্ত মরালিকার গতি-রীতি দিয়ে—অলস লীলায় তার ঐ চলে যাওয়াটি,

তূণীরের লাবণ্য দিয়ে—দুখানি জঙ্ঘা,
জৈত্ররথের চক্রচাতুর্য্য দিয়ে—ঘন জঘন,
সৌধারোহণের পারিপাট্য দিয়ে—ত্রিবলী,
আর মৌর্বী-মধুকর-পংক্তির নীলিমা দিয়ে—রোমাবলী।

রূপ দেখতে গিয়ে প্রতি অঙ্গ থেকে চোখ যেন আর নড়ে না। সর্ব্বত্রই কি শ্রীমদনের জয়টীকা!

তাই বুঝি অবন্তিসুন্দরীর কণ্ঠে মদনের জয়শঙ্খের বাহার,
কুচদ্বন্দ্বে—স্বর্ণ-কলসের পূর্ণ শোভা,
শুভ্র হাসিতে—বাণায়মান পুষ্পের লাবণ্য,
নিঃশ্বাসে—সেনানায়ক মলয় মারুতের সুরভি,
নয়ন দুটিতে—জয়ধ্বজের মীনদর্প,
এবং কেশপাশে—লীলাময়ূরের কপালভঙ্গি?

ঐশ্বর্য্যের এত সম্ভার দিয়েও যেন স্বস্তি পাননি শ্রীমদন। তিনি তার উপর যেন সেই মূর্ত্তিখানিকে ধুয়েছেন মকরন্দ আর কস্তুরিকা মেশানো চন্দনের রস দিয়ে, মেজে দিয়েছেন কর্পূরের পরাগ দিয়ে।

গোপন-চর এই রাজবাহনকে এতক্ষণ দেখতে পাননি লক্ষ্মী-স্বরূপিণী মালবেন্দ্র-কন্যকা অবন্তিসুন্দরী। হঠাৎ তিনি তাঁকে দেখে ফেললেন। পূজা করছিলেন যে মনোভবকে, সেই মনোভবই কি 'তথাস্তু' বলবার জন্যে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন? দেখতে দেখতে তাঁর সমস্ত শরীর কেমন যেন কেঁপে উঠলো মদনের আবেশে, দক্ষিণ বাতাসের দোলা-লাগা লতিকার মত কেমন যেন নুয়ে গেল। তার পরে খেলায় হল ভুল, পূজায় হল ভুল, বিশ্রামে হল ভুল। মুখখানির উপর ভাবের ইন্দ্রধনু এঁকে মিলিয়ে গেল সুন্দরী একটি লজ্জা।

আর রাজবাহনের মন তখন সবিস্ময়ে ভাবছে,—"ললনা সৃষ্টি করতে গিয়ে নিশ্চয়ই বিধাতা এখানে অনুসরণ করেছেন ঘুণাক্ষর-ন্যায়। এমন সুন্দর গড়তেই যদি তিনি পারেন তবে কেন তাঁর হাত থেকে বেরল না এমন ধারা আর একটি সৃষ্টি?"

অমন চোখের চাউনির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না অবন্তিসুন্দরী। লজ্জা তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল সখীজনদের অন্তরালে। সেই সুন্দর অন্তরালখানিকে আশ্রয় করে রাজবাহনকে তিনি দেখতে লাগলেন। তাঁরো চোখে খেলতে লাগল সেই একটু কোঁচকানো, একটু ভুরুবাঁকানো, একটু কোণে-ঠেলা চাউনি। নিজের হৃদয়খানিকে মনে হল কুরঙ্গ, আর রাজবাহনের লাবণ্য যেন সেই কুরঙ্গ-ধরা ফাঁদ।

অবন্তিসুন্দরীর উপচারে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে গায়ের জোর বাড়ল মদনের।

সেই দেখে কেবল বলতে লাগলো রাজবাহনের মন, "এবার আমি পুষ্পধন্বার শর হব, বুঝি শরব্যস্ত হব।"

অবন্তিসুন্দরীর মন ভাবতে লাগল, "জানি না কোন্‌দেশী এই অসামান্য সৌন্দর্য্য, কোন ভাগ্যবতীর তরুণ নয়নের ইনি উৎসব! এমন পুত্ররত্ন গর্ভে ধারণ করে, না জানি কোন সীমন্তিনী ললাটে তুলিয়েছিলেন তাঁর সীমন্ত-মৌক্তিক। এঁর মা না জানি কেমন! এখানে ইনি এসেছেনই বা কেন? এই লাবণ্যশালীকে আমি দেখছি—আর মন্মথ যেন অসূয়ার পরাধীন হয়ে মন্থন করছেন আমার মনখানিকে—বোধ হয় নিজের "মন্মথ" নামের সঙ্গে অন্বয় ঘটাবার উদ্দেশ্যে। কি করি! কি করে এঁকে জানা যায়?"

কিন্তু চতুরিকা বালচন্দ্রিকা নিজের ভাববিবেক দিয়ে বুঝতে পেরেছিল এঁদের দুজনকার অন্তরঙ্গ কাহিনী। কিন্তু মেয়েদের সমাজে সমীচীন হবে কি রাজকুমারের সঠিক পরিচয়টি নিবেদন করা? সেই ভেবে সাধারণ ভাষায় বলে উঠল, "ভর্ত্তৃদারিকে, এই নবীন ব্রাহ্মণকুমার কিন্তু কলাবিদ্যায় প্রবীণ, দেবতাদের আহ্বান করে নিয়ে আসতে পারেন, যুদ্ধবিশারদ, আবার মন্ত্রৌষধি বিষয়ে এঁর জ্ঞানও অসীম। ইনি সেবা-যোগ্য। আপনি এঁকে অর্চ্চনা করতে পারেন।"

মৃদু বাতাসে যেমন ছোট ছোট প্রীতির ঢেউ ওঠে, তেমনি ঢেউ জাগিয়ে এল বালচন্দ্রিকার বাক্যগুলি অবন্তিসুন্দরীর অন্তরে। সমুচিত আসনে জিতমার কুমারকে বসিয়ে, সখীদের হাত দিয়ে গন্ধকুসুম অক্ষত ঘনসার তাম্বুলাদি নানাবিধ দ্রব্যের অর্ঘ্য দান করে তিনি পূজা করলেন ব্রাহ্মণকুমারকে।

অকস্মাৎ নবস্রোতে প্রবাহিত হল রাজবাহনের চিন্তা।—"নিশ্চয়ই এই কন্যাই ছিলেন আমার পূর্ব্ব জন্মের জায়া 'যজ্ঞবতী'। তা না হলে আমার মনে এমন অনুরাগের জন্ম হয় কেমন করে? তপোনিধির যখন অবসান হল অভিশাপ, তখন আমাদের দুজনের সমানই ছিল জাতিস্মরত্ব। তবু অনেক দিন অতীত হয়ে গেছে। অভিজ্ঞান-সূচক বাক্য বলে দেখি—যদি ওঁর জ্ঞান ফিরে আসে।" এই রকমের জল্পনার মধ্যপথে রাজবাহন দেখতে পেলেন,—একটি নধর রাজহংস হেলতে হেলতে দুলতে দুলতে অবন্তিসুন্দরীর কাছে এগিয়ে এল। চঞ্চল হয়ে উঠলেন রাজকন্যা। আদেশ পেয়ে যেই বালচন্দ্রিকা সেই মরালটিকে ধরতে যাবে ঠিক সেই অবসরে সম্ভাষণ-নিপুণ রাজবাহন নিঃসঙ্কোচে বলে ফেললেন—

"সখি, পুরাকালে একদিন মহারাজ শাম্ব তাঁর প্রেয়সী যজ্ঞবতীর সঙ্গে বিহার করতে করতে একটি পদ্মদীঘির ধারে এসে দেখেন—রাঙা রাঙা পদ্মফুলের মধ্যে ঘুমোব ঘুমোব করছে একটি রাজহংস। রাজহংসটিকে ধরে মৃণালের সুতো দিয়ে তার হলুদবরণ চরণ দুটি বাঁধতে বাঁধতে, প্রেয়সীর মুখের দিকে অনুরাগের দৃষ্টি ফেলে ধীরে ধীরে হাসতে হাসতে বলেন, 'ইন্দুমুখি, মরালটিকে বেঁধেছি, দেখেছ, একেবারে ঠিক মুনিটির মত শান্ত হয়ে বসে আছে, নাও, একে নিয়ে যা মনে চায় করো।' রাজহংসটি তখন অভিশাপ দিয়েছিলেন সেই রাজাকে। বলেছিলেন—'মহীপাল, আমি এই অম্বুজখণ্ডের ধারে পরমানন্দে ধ্যান করছিলুম; রাজ্যগর্ব্বে অন্ধ হয়ে নিষ্ঠাবান আমাকে তুমি অকারণে অপমান করলে। তোমাকে অভিশাপ দিলুম,—তোমাকে ভোগ করতে হবে রমণীর বিরহ সন্তাপ।"

শাম্বর মুখ শুকিয়ে যায়। অসম্ভব হবে প্রেয়সীর বিরহ—তাই সসম্ভ্রমে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলেন, "মহাভাগ, না জেনে যা করে ফেলেছি তার কি আর ক্ষমা নেই?" তাপসের হৃদয় করুণায় গলে যায়, শেষে বলেন, "রাজন্, এই জন্মে এ অভিশাপ তোমাদের লাগবে না। কিন্তু পরজন্মে এই কমলনয়নার সঙ্গে যখন তোমার অনুরাগ হবে এবং মিলন হবে, তখন সেই মিলন মুহূর্ত্তে—আমার চরণ যেমন মুহূর্ত্তদ্বয়ে বেঁধেছিলে তেমনি তোমার চরণও দুটি মাসের জন্যে শৃঙ্খলিত হয়ে যাবে এবং শৃঙ্খলিত অবস্থায় তোমায় ভোগ করতে হবে রমণী-বিয়োগের বিষাদ; তার পরে তোমাদের মধ্যে আসবে রাজ্যসুখ এবং অখণ্ড প্রেম।" শাম্ব এবং যজ্ঞবতীকে তার পরে তাপস দান করেছিলেন জাতিস্মরত্ব। তাই বলছিলুম—দেবি, ঐ রাজহংসটিকে বাঁধবেন না।

শাম্বরাজের আখ্যান শুনে অবন্তিসুন্দরী চমকে উঠলেন। চমকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ে গেল পূর্ব্বজন্মের কাহিনী।—মন জেগে উঠল, যেন পাতা বেরুল। হাসি খেলে গেল মৃদুমন্দ,—মুখের উপর। হ্যাঁ এই ত সেই আমার রাজা, আমার প্রিয়। কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি বললেন, "সৌম্য, পুরাকালে শাম্বরাজা যে রাজহংসের চরণ দুটি বেঁধে দিয়েছিলেন সেও কেবল যজ্ঞবতীর কথা রাখতে গিয়ে। জানেন ত—এই পৃথিবীতে, যা করবার নয় তাও করে বসেন পণ্ডিতেরা—দাক্ষিণ্যের আশ্রয়ে মুগ্ধ হয়ে।" এই বলে অবন্তিসুন্দরী স্তব্ধ হলেন। কিন্তু দুজনে তখন দুজনাকে চিনে ফেলেছেন, যেন বিলীন হয়ে গেছে

অপরিচয়ের বাধা, যেন হঠাৎ তাঁদের মধ্যে এসে গেছে প্রণয়ের পূর্ণতা।

ইত্যবসরে মালবেন্দ্র-মহিষী প্রবেশ করলেন উদ্যানে। তাঁর চারিদিকে অসংখ্য পরিজন। তাঁর মেয়ে কেমন করে খেলছে তাই দেখতে তিনি এসেছেন। দূর থেকেই মহারাণীকে দেখতে পেয়েই বালচন্দ্রিকা লাফিয়ে উঠল ; পাছে রহস্য ভেদ হয়ে সব জানাজানি হয়ে যায় সেই ভয়ে হাত দিয়ে ইসারা করে পুষ্পোদ্ভবকে জানিয়ে দিলে—'সরে পড়।' পুষ্পোদ্ভবও সসম্ভ্রমে রাজবাহনকে নিয়ে গা-ঢাকা দিলে বৃক্ষবাটিকার অন্তরালে। উদ্যানে কিছুকাল অতিবাহিত করে, মেয়ের সঙ্গসুখ লাভ করে সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে মানসার-মহিষী আদেশ দিলেন—'সকলে মিলে এবার ঘরে ফিরে চল।' অবন্তিসুন্দরীও উঠলেন। মাতার পিছনে পিছনে চলতে চলতে অবন্তিসুন্দরী বলে উঠলেন—

"ওরে আমার রাজহংসের কুলতিলক, আমার কাছে এসেছিলে খেলা করবে বলে, হঠাৎ তোমায় ছেড়ে দিয়ে এবার আমায় চলে যেতে হল মায়ের সঙ্গে। এই যাওয়াটিই আমার উচিত। কিন্তু দেখো, তোমার মনের অনুরাগটি যেন আমায় না ছেড়ে যায়।" মরাল ছলে কুমারকে এই কথাটুকু জানিয়ে চোখ ফিরিয়ে দেখতে দেখতে রাজপুরীতে চলে গেলেন অবন্তিসুন্দরী।

কিন্তু রাজপ্রাসাদের রহস্যমন্দিরে প্রবেশ করে শান্তি হারালেন অবন্তিসুন্দরী। পাশে বালচন্দ্রিকা, মুখে কেবল তরুণ রাজকুমারের কথা। আগ্রহের আতিশয্যে রাজবাহনের পরিচয় নাম ধাম ততক্ষণে সব জানিয়ে ফেলেছে বালচন্দ্রিকা। কে জানতো মন্মথের বাণে হৃদয় এমন ব্যাকুল হয়? কে জানতো বিরহে এত ব্যথা! কে জানতো এই নির্জ্জন বিরহখানি কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদের মত শরীরখানিকে খইয়ে দেবে, ভুলিয়ে দেবে জলপান, আহার, রহস্যমন্দিরে বিছিয়ে দেবে চন্দনের রসে ধোয়া পর্ণকুসুমের বিছানা!

গত কালও ত এই শরীর সাধারণ ছিল, আজ সে এমন পোড়ে কেন?

অবন্তিসুন্দরীর অবস্থা দেখে বয়স্যারাও ব্যাকুল হয়ে উঠল। তারা কেউ সোনার ঘড়ায় করে চন্দন, উশীর আর ঘনসার মিশিয়ে স্নানের জল নিয়ে আসে, কেউ নিয়ে আসে মৃণালের সূত্র দিয়ে বোনা পরিধেয় বসন, কেউ নিয়ে আসে পদ্মের পাপড়ি দিয়ে মোড়া তালবৃন্ত। কত রকমের যে শীতল উপচার তারা আনতে লাগল তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তপ্ত তৈলে জল পড়লে, জলও যেমন আগুন হয়ে যায়, কুমারীর শরীরের স্পর্শ পেয়ে তেমনি হল শীতল উপচারগুলির দশা। বালচন্দ্রিকা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হয়ে গেল।

শেষে একদিন বালচন্দ্রিকাকে কাছে ডাকলেন অবন্তিসুন্দরী। চোখ যেন তাঁর খুলতে আর চায় না ; চোখের জলেই ঢাকা পড়ে গেছে চোখ ; উষ্ণ নিঃশ্বাসে ম্লান হয়ে গেছে বন্ধুজীব ফুলের মত অধর ; নুয়ে পড়েছে অঙ্গ। ধীরে ধীরে ধরা-গলায় বললেন—

"প্রিয় সখি, লোকে বলে কামদেবের হাতে থাকে ফুলের ধনুক আর পাঁচটি বাণ। এর চেয়ে মিথ্যা কথা বুঝি আর জগতে নেই। এই ত আমি রয়েছি—আমার গায়ে ত ফুলের বাণ লাগছে না ;—লক্ষ লক্ষ লোহার বাণ যেন বিঁধছে? সখি, চাঁদকে তোরা শীতল বলিস,—মিথ্যা কথা। আমি জানি, ও বাড়বহ্নির চেয়েও তপ্ত। ভিতরে প্রবেশ করলে সাগর দেয় শুকিয়ে, বেরিয়ে এলে সেই আবার বাড়তে থাকে দুরন্ত। জান না ও কি কম দুষ্টু? নিজের সহোদরা কমলার ঘরেতেও পদ্মগুলিকে হত্যা করে ফেলে রেখে আসে? ওর দুষ্কর্মের কি অন্ত আছে?

"বিরহানলের সন্তাপে উষ্ণ হয়ে, ঐ দেখ সখি, আবার স্বল্প হয়ে বইছে দক্ষিণে বাতাস! আমি সহ্য করতে পারছি না নব পল্লবের এই শয্যা,—অসহ্য—এ যেন শ্রীমদনের অগ্নিশিখা! ও ত হরিচন্দন নয়—ও যেন সাপের ওগরানো উল্বণ গরল। কেন মিছে তোমরা নিয়ে আসছ এই সব শীতল উপচার? এই কামনার, এই বিকারের চরম নিদানী হচ্ছেন তোমাদের ঐ লাবণ্যজিতমার রাজকুমার। তাঁকে পাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। বল, কি করি!"

বালচন্দ্রিকা দেখতে পেল—ব্যাপার গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রেমের ব্যাধি পরাকাষ্ঠায় পৌঁছতে আর কতক্ষণ? রাজবাহনের লাবণ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে কোমলাঙ্গী ; তাঁর আর শরণ্য কেউ নেই। ভাবতে বসে গেল বালচন্দ্রিকা,—

"একমাত্র উপায় কুমারকে সত্বর নিয়ে আসা, আনতেই হবে। নয় ত শ্রীমদন স্মরণীয় গতি লাভ করিয়ে ছাড়বেন অবন্তিসুন্দরীকে। তবে বোধ হয়, আমাকে বেশী কষ্ট ওঠাতে হবে না। সেদিন উদ্যানে কুমারের অবস্থাও যে রকম শোচনীয় দেখেছিলুম তাতে মনে হয় শ্রীমদন পক্ষপাতিত্ব করেননি—দুজনের উপরেই সমান বেগে মুক্ত করেছেন তাঁর ফুলের শর।"

বালচন্দ্রিকা তখন অবন্তিসুন্দরীর কাছে সেবা-চতুর সখীদের রেখে তাদের যথাসময়ে কি কি করতে হবে বলে দিয়ে চলে গেল সেইখানে,—যেখানে রুদ্ধদ্বার মন্দিরের মধ্যে সন্তাপম্লান নবপল্লবের শয়নে অধিষ্ঠিত রয়েছেন রাজবাহন,—পুষ্পোদ্ভবের সঙ্গে কথা কইছেন তাঁর হৃদয়চোরণীর কথা,—আর বলছেন—কেন নিজের মনখানি আজ পুষ্পবাণের বাণ আর তূণীর হতে চায়।

প্রিয় বয়স্যা বালচন্দ্রিকাকে আসতে দেখে খুসীতে ভরে উঠল তাঁর মন। "এস এস, এইখানে বস"—বলে আসন পেতে দিয়ে তাঁকে করলেন অভ্যর্থনা। করপল্লবটিকে ললাটে ছুঁইয়ে বালচন্দ্রিকা রাজবাহনের সামনে বিনয় ভরে ধরে দিলে—অবন্তিসুন্দরীর প্রেরিত সকর্পূর তাম্বুল। "রাজনন্দিনীর কুশল ত?" এই প্রশ্নের উত্তরে সে বললে, "দেব, আর কথাটি বলবেন না। আপনার মতই দেখছি—ফুলের শয়ন তাঁরও হয়েছে অসহ্য। মদনের অন্ধতা তাঁকে আর কিছুই দেখতে দিচ্ছে না ; এখন কেবল স্বপ্ন দেখেন,—একটি বুকে আরেকটি বুকের আলিঙ্গন-সৌখ্য! যাক, এখনি এই পত্রিকাখানি লিখে আমার হাতে সঁপে দিলেন,—বললেন, যাও তাঁকে দিয়ে এস। তাই এলুম।"

পত্রিকাখানি হাতে নিয়ে পাঠ করলেন রাজবাহন—

"ওগো ভাগ্যবান, ফুলের মত সুকুমার—জগতের অনবদ্য তোমার রূপ। সেই রূপ আমার মনখানিকে চায় ; আর আমার

মন বলে—সুকুমার রূপের মতই মনখানি যদি মৃদুল হোতো, সুকুমার হোতো!"

পড়ে রাজবাহন সাদরে বললেন,

"সখি, ছায়ার মত পুষ্পোদ্ভব আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে। তুমি তার প্রেয়সী; এবং সেই তুমিই আবার মৃগনয়নার বহিশ্চর প্রাণ। তোমার চাতুর্য্যই এখন এই ক্রিয়া-লতার আলবাল হোক। যা করণীয় আমি সব করব। হায় রে, নতাঙ্গী আমাকে দুষেছেন—বলেছেন আমার হৃদয় বড় কঠিন। কিন্তু সখি, ক্রীড়াকানন থেকে চলে যাবার সময় তিনিই ত আমার হৃদয়খানিকে অপহরণ করে নিয়ে চলে গেলেন নিজের প্রাসাদে। অপহৃত সেই চিত্তখানি কঠিন কি মধুর—তা কেবল তিনিই জানেন। কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করা দুষ্কর। যাই হোক, তোমার সখিকে বোলো—কালই হোক বা পরশু—উপায় বার করে তাঁর সঙ্গে আমি মিলব। শিরীষ ফুলের মত সুকুমার তাঁর শরীর—একটু দেখো, যেন ইতিমধ্যে ভেঙে না পড়ে।"

রাজবাহনের প্রেম-গর্ভিত বাক্যের আশ্বাস নিয়ে বালচন্দ্রিকা তখন কন্যাপুরের দিকে চালিয়ে দিল তার দুখানি সুখী চরণ।

কিন্তু ঘরের মধ্যে থাকতে পারলেন না রাজবাহন। তাঁকে বেরতেই হল। পুষ্পোদ্ভবকে সঙ্গে নিয়ে বিরহ বিনোদনের জন্যে চলে এলেন সেই উদ্যানে, যেখানে অবন্তিসুন্দরীর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল তাঁর। দেখতে লাগলেন—বৃক্ষগুলিকে, তাদের পল্লবগুলিকে, শাখার যে যে স্থান থেকে পল্লব চয়ন করেছিল চকোরনয়না, সেই সেই স্থানগুলিকে। যেন দেখতে পেলেন, বসে রয়েছেন নতাঙ্গী, আরাধনা করছেন মন্মথের। কী সুন্দর সেই বরাসন! তার মধ্যে আশ্বিনের চাঁদের মত একখানি পূজারত মুখ; শীতল সৈকততলে চঞ্চল চরণের চিহ্ন; দশনদষ্ট কুসুমের অবশেষ, মাধবীলতার শ্রীমণ্ডপে নবপল্লবের শয্যা। এরা যেন প্রিয়তমার তিলক-চিহ্ন। এই চিহ্নগুলিই বারংবার মনে পড়িয়ে দিতে লাগল—প্রথম সম্ভাষণ, বিদায় বেলার ইঙ্গিত। নবাম্রমঞ্জরী কাঁপছে—প্রেমাগ্নিশিখার মত; কোকিল আর ভ্রমরদের কুহু-কূজন নিয়ে আসছে কানে-কানে-বলা মদনের মন্ত্র!

উদ্যানের চারিদিকে বিকারগ্রস্তের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন রাজবাহন। কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়ানো যেন আজ অসহ্য!

পাগলের মত যখন এই রকম ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন সেই উদ্যানে প্রবেশ করল একটি ব্রাহ্মণ। সূক্ষ্ম চিত্রনিবসন তাঁর অঙ্গে, দুটি কর্ণে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে মণিময় দুটি কুণ্ডল, মনোরম চতুর বেশ, সঙ্গে মুণ্ডিতমস্তক একটি মানব। ব্রাহ্মণটি নিজের খুসীমত উদ্যানে প্রবেশ করে সামনেই দেখতে পেলেন তেজোজ্জ্বল রাজবাহনকে। আশীর্ব্বাদ করতে করতে এগিয়ে এলেন ব্রাহ্মণ। পরিচয় এবং বৃত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে রাজবাহনকে ব্রাহ্মণ জানালেন—বিদ্যেশ্বর তাঁর নাম, তিনি একজন ঐন্দ্রজালিক, রাজাদের মনোরঞ্জন করে বিবিধ দেশে তিনি ভ্রমণ করেন—সম্প্রতি এসেছেন উজ্জয়িনীতে। তার পরে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাব ধারণ করে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা জাগিয়ে ঐন্দ্রজালিক ব্রাহ্মণ রাজবাহনকে প্রশ্ন করলেন, "এটি ত দেখছি লীলাকানন; এবং দেখছি মুখের জ্যোতিঃ হারিয়ে আপনি এখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন; অভিপ্রায়টি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

নিজেদের কার্য্য এবং করণ প্রথমে চিন্তা করল পুষ্পোদ্ভব। বিচার শেষে সাদরে বললে "বাণীর বিনিময়ের আগেই অনেক সময় সখ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে যায় শিষ্টজনদের মধ্যে। তার উপরে আপনার রুচির ভাষণ আমাদের মুগ্ধ করেছে এবং আপনি হয়ে দাঁড়িয়েছেন প্রিয় বয়স্য। সুহৃদদের মধ্যে অ-বলা কিছুই থাকে না। কী আর বলব আপনাকে! আমাদের এই রাজকুমার ভালবেসে ফেলেছেন। মালবেন্দ্র-কন্যা এই কেলিবনে এসেছিলেন, মদনোৎসব করতে বসন্ত ঋতুতে—দুজনের দেখা দুজনের সঙ্গে,—এখন অনুরাগ পৌঁছিয়ে গেছে অতিরেকে। কী করে যে মিলন ঘটবে,—সেই চিন্তাতেই আমার এই রাজনন্দনের এমন জ্যোতিঃ হারানো ভাব।"

লাজনম্র রাজবাহনের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে ঐন্দ্রজালিক বললেন—"আমি যেখানে আপনার অনুচর, দেব, সেখানে এমন কি কাজ থাকতে পারে যা দুঃসাধ্যতার তিলক পাবে? আমি ঐন্দ্রজালিক, এই আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, মালবেন্দ্রকে মোহগ্রস্ত করে, সমস্ত পৌরজনদের চোখের উপর দিয়ে তাঁর কন্যার সঙ্গে আপনার পরিণয় ঘটিয়ে দেব, ঘটিয়ে আপনাকে পাঠাব তাঁর কন্যান্তঃপুরে। পাঠিয়ে দিন আপনি এই সংবাদ সখীমুখে রাজকন্যার কাছে।"

অকারণ বান্ধব লাভ করে রাজবাহনের উথলে উঠল আনন্দ। ঐন্দ্রজালিক তখন খেলা দেখালেন, কৃত্রিম কত রকমের খেলা, তার চোখ-ভোলান অসামান্য পটুতা। তাঁর সঙ্গে কথা বলে রাজবাহন বুঝতে পারলেন—একদা ঐ ঐন্দ্রজালিকও ভালবেসেছিল, সেও ভোগ করেছে বিপ্রলম্ভ, সেও জানে অকৃত্রিম ভালবাসা, সেও জানে সহজ সৌহার্দ্য। তার পর ঐন্দ্রজালিক বিদায় নিলেন।

বিদ্যেশ্বরের ঐন্দ্রজাল-নৈপুণ্য দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন রাজবাহন। নিশ্চয় ফল ফলাবে এবার মনস্কামনা! পুষ্পোদ্ভবের সঙ্গে ফিরে এলেন নিজের মন্দিরে। বালচন্দ্রিকাকে আহ্বান করে তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাতে হোলো, তার মুখেই বিদ্যেশ্বরের কথিত-মত মিলনপ্রণালী পাঠিয়ে দিলেন অবন্তিসুন্দরীর কাছে। এই করতেই দিন কাটল। এল রাত্রি। রাত্রি কাটতে আর চায় না। হৃদয়টিকে তখন সম্মোহিত করছে এক অপূর্ব্ব কৌতুকের আকর্ষণ। ঘুম হল না।

পরের দিন সকাল হতেই খবর এল,—ঐন্দ্রজালিক পৌঁছে গেছে রাজপুরীতে।

ঐন্দ্রজালিক বিদ্যেশ্বর পরের দিন প্রভাতে রাজভবনের দ্বার-প্রান্তে উপস্থিত হয়ে গেলেন অসংখ্য পরিজন সঙ্গে নিয়ে। বিদ্যেশ্বর কি সহজ মানুষ? আদৌ নয়। রসে, ভাবে, রীতিতে, গীতিতে এমন যার অদ্ভুত চাতুর্য্য, সে মানুষ কি কখনো সহজ হয়? দৌবারিক মুগ্ধ হয়ে গেল, উদ্ভ্রান্ত হয়ে গেল। হঠাৎ সে দৌড়ল মহারাজের কক্ষের দিকে। প্রণাম করবার অবসর যেন তার নেই। কোন রকমে প্রণাম করে বললে, "মহারাজ, এক ঐন্দ্রজালিক এসেছেন, অদ্ভুত, দ্বারে রয়েছেন দাঁড়িয়ে।"

ঐন্দ্রজালিকের সংবাদ শুনে দর্শন-কুতূহলী হয়ে উঠলেন মালবেন্দ্র;

অন্তঃপুরের ললনারাও কোলাহল করে ঔৎসুক্য জানাল। সমাহূত হয়ে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যেশ্বর প্রবেশ করলেন, রাজকক্ষে নয়, রাজসভায়। মালবেন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করে তাঁর অনুজ্ঞা লাভ করে ঐন্দ্রজালিক দেখাতে আরম্ভ করে দিলেন তাঁর বিদ্যার কোবিদত্ব।

আর ঐন্দ্রজালিকের পরিজনেরা বাদ্যযন্ত্রগুলিতে ধনধন্ করে ধ্বনি তুর্লল আনন্দের। গায়কীতে খেলে যেতে লাগল সুরের নাদ। যন্ত্রে যন্ত্রে উঠল ঝঙ্কার—মাতাল কোকিলের মুখে যেন মঞ্জুপঞ্চম।

তার পরে ঐন্দ্রজালিক ঘোরাতে লাগলেন পিচ্ছিকাগুলি। তখন সভাসীন সামাজিকদের মন আনন্দের উল্লাসে বিভোর হয়ে গেল। ইন্দ্রজাল বিদ্যার আবেশে দর্শকমণ্ডলীর হৃদয়গুলিকে পরিবৃঢ় ভাবে ঘুরিয়ে দিয়ে হঠাৎ ঐন্দ্রজালিক বিদ্যেশ্বর নিজের চোখ দুটিকে বন্ধ করে ফেললেন। পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল।

তার পরেই সেই রাজসভায়—সমস্ত লোকের দেহগুলোকে আঁৎকিয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল,—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজগোখরো। তাদের ফণার কি অদ্ভুত বাহার! মণি জ্বলছে। মণির আলোয় চিক্‌চিকিয়ে উঠছে রাজমন্দিরের শেষ ধাপ। তারা বিষ ঢালতে লাগল—গরম বিষ—আগুন রংএর বিষ। তার পর হঠাৎ কোথা থেকে রাজসভায় ছুটতে ছুটতে এল রাজ-শকুনি গরুড়ের দল। ইয়া তাদের লম্বা লম্বা চঞ্চু!—তারা এক একটা রাজগোখরোকে ধরে আর আকাশের বাতাসে বাতাসে বেড়িয়ে বেড়ায় উড়ে উড়ে।

তার পরে সেই ব্রাহ্মণ ঐন্দ্রজালিক অভিনয় করে দেখালেন,—দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপুকে কেমন করে বিদারণ করেছিলেন নৃসিংহ।

মালবেন্দ্রের মুখ দিয়ে তখন বাক্যস্ফূর্ত্তি হচ্ছিল না। আশ্চর্য্য! হাঁ একেই বলে বিদ্যা।

মালবেন্দ্রের যখন এই রকমের এক বিস্ময়মূঢ় অবস্থা তখন ঐন্দ্রজালিক বিদ্যেশ্বর নিবেদন করলেন—"রাজন্, আমার খেলা শেষ হয়ে আসছে। এবার বিদায় নেব। তবে বিদায় বেলায় আমার কর্ত্তব্য, আপনাকে কল্যাণবহ শুভসূচক কিছু খেলা দেখানো। কাজেই আমি আপনার অনুমতি নিয়ে এখন প্রযোজনা করব—রাজবংশের কল্যাণ-পরম্পরার উদ্দেশ্যে আপনার আত্মজা অবন্তিসুন্দরীর সঙ্গে নিখিল কলাগুণান্বিত একটি রাজনন্দনের শুভ বিবাহ। এইটিই হবে আমার শেষ খেলা দেখানো। যদি অনুমতি করেন তাহলে আমার বিদ্যার প্রভাবে সেটি ঘটাই।"

কুতূহলী হয়ে উঠলেন মহারাজ। আশ্চর্য্য হয়ে গেল সভাতল। বিদ্যুতের মত এল রাজাদেশ—"বেশ ঘটাও।"

অর্থসিদ্ধিটিকে মুঠোর মধ্যে আয়ত্ত করে, বাদ্যযন্ত্র ভৈরবের মধ্যে ঐন্দ্রজালিক ব্রাহ্মণ বিদ্যেশ্বর সভাস্থ সমস্ত জনতার চোখের উপর ছড়িয়ে দিলেন 'মোহাঞ্জন'। তার পরে চারিদিক একবার ভাল করে দেখে নিলেন। সভাস্থ সকলে যখন ভাবছে—ঐন্দ্রজালিকের এই কীর্ত্তিটি অদ্ভুত, তখন ঠিক সেই সময়ে—প্রেমপল্লবিতহৃদয় রাজবাহন প্রবেশ করলেন সভাতলে, এবং তাঁর সঙ্গে এলেন পূর্ব্ব-সঙ্কেত-সমাগতা বৈবাহিকী অলঙ্কারে বিভূষিতা অবন্তিসুন্দরী। বিলম্ব হল না। অগ্নি সাক্ষী করে তন্ত্রমন্ত্রের সমুচ্চারণ করতে করতে ব্রাহ্মণ বিদ্যেশ্বর বর এবং বধূর মধ্যে ঘটিয়ে দিলেন বৈবাহিক সংযোজনা। যথারীতি সমাপ্ত হয়ে গেল শুভবিবাহ।

ক্রিয়াবসানে ঐন্দ্রজালিক চীৎকার করে উঠলেন—"হে আমার সৃষ্ট মানবের সংহতি, লুপ্ত হও, ক্ষান্ত হোক্ ইন্দ্রজাল।" উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়ে গেল মায়ামানবের সামগ্র্য।

ঐন্দ্রজালিকের মায়ামানবদের মত রাজবাহনও অবন্তিসুন্দরীকে নিয়ে উধাও হয়ে গেলেন, প্রবেশ করলেন কন্যান্তঃপুরে। চাতুর্য্য কি গূঢ়!

কিন্তু মালবেন্দ্র কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি মনে করলেন তাঁর সামনে যা ঘটে গেল তা অপূর্ব্ব, তা অদ্ভুত! কী যে তিনি ভাববেন তা স্থির করতে না পেরে কোষাগার থেকে ধনরত্ন আনিয়ে আহ্লাদিত চিত্তে দান করলেন ঐন্দ্রজালিককে। "বিদ্যেশ্বর, তুমি ধন্য, তুমি আমার প্রীতি গ্রহণ কর"—এই বলে তাঁকে বিত্তসাৎ করে চলে গেলেন নিজের কক্ষে।

এদিকে অবন্তিসুন্দরী তখন প্রবেশ করছেন সুন্দরী-মন্দিরে, সঙ্গে তাঁর স্নিগ্ধপ্রিয়সহচরী পরিবার এবং এক অতিস্নিগ্ধ প্রেমিক বল্লভ।

দৈবও এখানে প্রবল, মানুষও এখানে প্রবল।

রাজবাহনের বলবার কিছুই রইল না। কিন্তু বাকী রইল অনেক কিছু না-বলা।

ধীরে ধীরে সুন্দরী-মন্দিরে, সরস মাধুর্য্যের দক্ষিণা বাতাসে,—হরিণাক্ষী অবন্তিসুন্দরীর লজ্জা ভাঙল, অনুরাগের শেষ চেষ্টা সফল হল—গোপন বিশ্রাম, কেউ-শোনে-না-এমন-কথা, সুরতির গূঢ় ভাষণ!

আহা, সেই ভাষণের অমৃত!

রাজবাহন শোনালেন তাঁর প্রিয়বধূকে অমৃত বাণী—তারপরে অমৃত-লোল বিচিত্র-চিত্র বৃত্তান্ত—চতুর্দ্দশ ভুবনের হৃদয়মোহী বৃত্তান্ত।

ইতি দশকুমারচরিতে অবন্তিসুন্দরী-পরিণয়ো নাম পঞ্চমঃ উচ্ছ্বাসঃ।

পূর্ব্বপীঠিকেয়ং সম্পূর্ণা।

[ক্রমশঃ।

আগামী সংখ্যা হইতে

মানুষ রামেন্দ্রসুন্দর

অজয়েন্দুনারায়ণ রায়

তিমির তীর্থ

আশু চট্টোপাধ্যায়

যে অস্থিরতা পূব বাতাসে নারিকেল গাছের মাথায়, তাই আজ রূপেন্দ্রের সর্ব্ব দেহ-মনে আশ্রয় করেছে। অতসী আজ তাকে যে মুক্তি দিয়ে গেছে তা অবারিত প্রান্তরের, অবাধ শূন্যতায় খাঁ-খাঁ করে। সন্ধ্যা বেলায় অতসীর চিতা নিবিয়ে ওরা চার ভায়ে এই একটু আগে ফিরেছে।

হাঁ, এটা মুক্তিই—রূপেন্দ্র শীর্ণ হাসল। তার জীবনে অতসীর বিশেষ কোনো স্থানই ছিল না। একহারা একরত্তি মেয়েটি শশিকলার মত ক্ষীণ, নিজ অধিকারে দাবীর তীব্রতা একদিনও প্রকাশ করেনি। কি ভাবে যে ওর জীবন কাটছে সে খবর রাখবার প্রয়োজন একদিনও রূপেন্দ্র অনুভব করেনি।

শরীরটা ক্লান্ত লাগল, জলো বাতাস দিচ্ছে, এখনই হয়ত আবার বৃষ্টি নামবে। রূপেন্দ্র চাদরটা টেনে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। এই বিছানার এক পাশেই রোজ অতসী শুয়ে থাকত, এখন থেকে সেই স্থানটা শূন্য থাকবে। ঘরটি হবে রূপেন্দ্রের একেবারে নিজস্ব। রাত্রে যখন খুসী ফেরাতে আর বাধা নেই, এমন কি মত্ত অবস্থাতেও।

শ্মশান থেকে ফিরে সে জানিয়ে দিয়েছে রাত্রে কিছু খাবে না, সুতরাং ঘুমিয়ে পড়াই ভাল, জেগে থাকলেই কতকগুলো বিদ্‌ঘুটে চিন্তা মগজের মধ্যে ঘূরপাক খায়। বিশেষ করে, শুয়ে-বসে আকাশ-পাতাল চিন্তা করাটা রূপেন্দ্রের ধাতে পোষায় না। সে কাজের লোক, ব্যবসায়-জগতে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে, কিন্তু তার বেশীর ভাগ ব্যয় হয় নিজের ভোগ-বিলাসে, অনর্থক অপব্যয়ে। কিন্তু রূপেন্দ্র তাকে অপব্যয় মনে করে না। এই যে অক্লান্ত পরিশ্রম করি তা কিসের জন্য? সে পাশ ফিরে শুয়ে ভাবল, একটু সুখে থাকব বলেই ত। কিন্তু বৃদ্ধা মা আর তিন ভাই তার উপর থাবা বসাতে এলে ত নাচার। তারা একেবারে বেকার হলে অবশ্য কথা ছিল। হোক মাইনে কম, তবু দু'ভাই যা-হোক চাকরি করে। ছোট ভাই উপেন্দ্রের কলেজের মাইনে রূপেন্দ্র দিয়ে দেয়। তার উপর সে নাকি আবার ছেলে পড়ায়। তবে সংসারের অভাব কোথায়? রূপেন্দ্রও ত প্রতি মাসে যা-হোক একটা অঙ্ক দেয়।

না, ঘুমের আশা বৃথা, এই সব তুচ্ছ জানা-কথারা ভীড় করছে মনের চার-পাশে। বরং উঠে জেগে থাকবার চেষ্টা করলেই হয়ত সুফল পাওয়া যাবে। তৃষ্ণা পেয়ে গেছে, সে উঠে জল গড়িয়ে খেল। অতসী নেই যে তাকে হুকুম করবে। বাইরে চেপে বৃষ্টি নেমেছে। জানলার বাইরে জগতটা ঝাপসা। একটু বৃষ্টি কমলে বন্ধুদের আড্ডায় ঘুরে এলে হত, কিন্তু আজকের সন্ধ্যায় সেটা বিসদৃশ দেখাবে।

রূপেন্দ্র ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। সব জায়গায় অতসীর ছোঁয়াচ লেগে আছে। এর আগে এটা এমন করে কোনো দিন চোখে পড়েনি, আজ অতসী মারা গিয়ে বেশী উপস্থিত। তাছাড়া, এমন সন্ধ্যা রাত্রিতে রূপেন্দ্রই বা এ ঘরে এর আগে কবে হাজির ছিল। আলনায় অতসীর শাড়ী সেমিজ ব্লাউস ঝুলছে, আয়নার সামনে টেবলে প্রসাধনের সামগ্রী, চুল-বাঁধার কত খুঁটিনাটি।

[illegible] অতসীর জীবন কাটত কে জানে। রূপেন্দ্র বিমনা হয়ে গেল। তার বাইরের জীবনের প্রাত্যহিক সমারোহের পাশে ঐ নারীটি ছিল যেন তার সংকুচিত ছায়া। চুলের কাঁটা আর ফিতে, কিছু স্নো আর পাউডার, কয়েকটা শাড়ী ব্লাউস এই সম্পত্তি নিয়েই সে জীবনটা কাটিয়ে গেল। আর কাজের মধ্যে ঘর-দোর পরিষ্কার করা, রান্না করা আর সকলকে খাওয়ানো, হয়ত বাসন মাজাও। রূপেন্দ্রের আজ প্রথম লজ্জা করতে লাগল। তার মা তাকে অনেক বার একটা ঝিয়ের কথা বলেছিলেন, কিন্তু সে গ্রাহ্য করেনি, সংসারে খরচ বেশী হলে তার ভোগের অংশে যে টান পড়ে এবং সারা দিন হাড়-ভাঙা খাটুনি আর মস্তিষ্ক চালনার পর একটু ফুর্ত্তি না হলে চলে না। ঝি-চাকর রেখে বিলাসিতা করতে হয়, ভায়েরা করুক। তার ধারণা ছিল বাড়িতে বন্দী মেয়েরা একটু-আধটু না খাটলে তাদের শরীর ভাল থাকে না।

অবশ্য অতসীর শরীর নিয়ে রূপেন্দ্র কোনো দিনই মাথা ঘামায়নি, কামনার পথে তার কারবার অন্যত্র, যেখানে মূল্য দিয়ে লীলা, রূপ আর রস একসঙ্গে পাওয়া যায়। কিন্তু যে মেয়েটির সঙ্গে দিনে বা রাত্রে তার একবার দেখা প্রত্যহ হতই সেই অতসীর উপর একবারও তার নজর পড়ল না এই ভেবে রূপেন্দ্র নিজেই বিস্মিত হল। না হয় বিয়েতে রূপেন্দ্রের আপত্তিই ছিল, কারণ প্রজাপতি-জীবন সে ছাড়তে রাজি ছিল না, কিন্তু যে যৌবন-ময়ীকে সে তার শয্যার একাংশের অধিকার দিয়েছিল আজ তিমির-পথে যাত্রায় সে কি পাথেয় নিয়ে গেল? দাম্পত্য রসের এক কণা মাত্রও ত সে পায়নি!

অস্থির ভাবে রূপেন্দ্র বারান্দায় বের হয়ে দাঁড়িয়ে দেখল প্রবল বৃষ্টিপাত হচ্ছে, রাস্তা জনশূন্য। মনে হল রাত গভীর হয়েছে। সে বুঝল রাত্রি অনিদ্রায় কাটবে। এই রকম কত বর্ষণ-মুখর রাত অতসীর অনিদ্রায় কেটেছে কে জানে! আগামী কাল দিবালোকে রূপেন্দ্রের বাইরের জীবন আছে, মনের হাত থেকে পরিত্রাণ আছে, কিন্তু একঘেয়েমির শৃঙ্খল-মোচনের সুযোগ অতসীর একেবারেই ছিল না।

উচ্ছল বাতাসে আর অজস্র বর্ষণে রূপেন্দ্রের মন উদ্বেল হয়ে উঠল, সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ফিরে এসে অনুভব করল যেন একটা চাপা কান্নায় চার পাশ থম্‌থম্ করছে। আলো নিবিয়ে দিয়ে যে শুয়ে পড়ে চোখ বুজলে এবং কিছুক্ষণ পরেই আবার চোখ মেলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার স্পষ্ট মনে হল, পাশের বিছানায় অতসী যেন শুয়ে আছে এবং তার মৃদু নিশ্বাস শোনা যাচ্ছে। রাস্তায় যে ক্ষীণ আলো ঘরে ঢুকছে তাতে দেখা গেল গভীর নিদ্রায় অতসীর বুক উঠছে, নামছে।

আতঙ্কে লাফিয়ে উঠে রূপেন্দ্র আলো জ্বালল এবং নিজের নির্বুদ্ধিতায় লজ্জিত হল। তার পর বিছানার যে অংশে অতসী শুতো তার ধারে এসে দেখল উপাধানটি অতসীর মাথার ভারে এখনও নত হয়ে রয়েছে এবং তার ধারে বিছানা যেন চোখের জলে ভিজে।

খুব সম্ভব কেন, নিশ্চয়ই বাইরে থেকে বৃষ্টির ছাট এসে বিছানা ভিজেছে। রূপেন্দ্র জানলাটি বন্ধ করে দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে আয়নার সামনে চেয়ারে গিয়ে বসল; বাকী রাতটা একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করে কাটিয়ে দেবে-এই সঙ্কল্প নিয়ে।

ড্রেসিং টেবলের এক পাশে কতকগুলো বই দেখতে পেল অলস হাতে উপরের একটা তুলে দেখল একটি বাজলা উপন্যাস মলাট উল্টাতেই দেখল লেখা রয়েছে—'বৌদিকে'—জন্মদিনে

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সান্‌লাইট্‌
সাবানের
দৌলতে
SUNLIGHT
SOAP
না আছড়ে কাচলেও কাপড়চোপড় সাদা ও ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!

S. 186-50 BG

প্রীতি-উপহার—উপেন্দ্র'। অতসীর জীবনেও যে একটা দিন ছিল এবং সেটিকে স্মরণীয় করার দিকে তার একটি ভাই-এরও যে দৃষ্টি ছিল এ কথা ভেবে রূপেন্দ্রর মন কোমল হয়ে এল। অথচ এই ভায়েরা তার কাছ থেকে কোনো দিন প্রশ্রয় পায়নি, বরং তার মেজাজের ভয়ে বরাবর দূরে-দূরে থেকেছে। যাই হোক, তাদের একজনের কাছ থেকেও যে একাকিনী অতসী মনোযোগ ও প্রীতি পেয়েছে এই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় বইটি তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতেই তার মধ্যে থেকে কয়েকটি সিনেমার টিকিটের অংশ পড়ে গেল। আশ্চর্য্য, এই তুচ্ছ জিনিষও অতসী সযত্নে তুলে রেখেছে। কিন্তু হয়ত, রূপেন্দ্র ভাবল, হয়ত এগুলি তার কাছে তুচ্ছ ছিল না। হয়ত ওরা কয়েক ভাই মিলে আর এক জন্মদিনে ওদের বৌদিকে নিয়ে সিনেমা দেখাতে গিয়েছিল। অথচ এই সব ভাইদের সঙ্গে সে কত দুর্ব্যবহার না করেছে! রূপেন্দ্র নিশ্বাস ফেলে ভাবল।

তার জীবনকে কেন্দ্র করে যে-কয়টি প্রাণীর জীবন আবর্ত্তিত হচ্ছিল তাদের কোনো খবরই সে রাখেনি। সে শুধু নিজের আমোদ নিয়েই উন্মত্ত হয়ে ছিল, প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার তট-রেখার মধ্য দিয়ে যে কত সুধার স্রোত বয়ে গেছে তার সন্ধান রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি। সে তার একান্ত আপনার লোকগুলির কাছ থেকে ছিল বিচ্ছিন্ন।

হঠাৎ সে নিজেকে অত্যন্ত একলা বোধ করল। তার মনে হল, তার জীবন একেবারে নিঃসঙ্গ। সে অনুভব করল, তার চার পাশে নিশুতি রাত্রি খাঁ-খাঁ করছে। তার গা ছম-ছম করতে লাগল। ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা ডাকে যেন একটা অমোঘ ভবিতব্যতার বিভীষিকা! ক্লান্ত-বর্ষণ নিশীথ পৃথিবী যেন নিশ্বাস বন্ধ করে তার গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

তার মনে হল, কে যেন ঘরের মধ্যে মৃদু, অস্পষ্ট অথচ ঘন-ঘন নিশ্বাস গ্রহণ করছে—একজন লোক উত্তেজিত হলে যা হয়। সেটা তার নিজেরই নিশ্বাস কিনা তা বোঝবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না। তার চার দিকে যেন একটা প্রেতায়িত উপস্থিতি! আর কিছুক্ষণ এ ঘরে থাকলে বোধ হয় সে পাগল হয়ে যাবে। সে এক প্রকার ছুটে বাইরে বের- হয়ে গিয়ে তার মায়ের দরজায় ধাক্কা দিল।

* * * *

পরদিন সকালে যোগমায়া চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে একলা বসেছিলেন। একে একে তিন ছেলে বিমর্ষ মুখে এসে বসল। তার পরই সকলেই সচকিত হয়ে দেখল রূপেন্দ্র এই প্রথম এসে চায়ের আসরে তাদের সঙ্গে যোগ দিল।

তাদের বিচলিত ভাব দেখে রূপেন্দ্র স্নিগ্ধ হেসে বলল, "কি উপেন, বৌদির জন্য খুব মুষড়ে পড়েছিস নাকি! পরীক্ষার ত দেরী আছে, যা মাকে নিয়ে দিন কতক হরিদ্বারে ঘুরে আয়, সব খরচ আমি দেব। ভূপেন্দ্র, তোমার ত যাবার উপায় নেই, অফিস রয়েছে। ও-অফিসে কি বা মাইনে দেয়, শুধু হাড়ভাঙা খাটুনি। তার চেয়ে আজই দুপুরে আমার সঙ্গে চল, রবার্টসনের ওখানে তোমাকে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। আমাকে বেশ খাতির করে, বসে-বসে মোটা দু'পয়সা কামাতে পারবে। আর একজনের জন্য কথা বলে রেখেছিলাম। মা, দিন কতক হরিদ্বারে ঘুরে এস, বুঝলে? তার পর তুমি ফিরে এলে, এবার থেকে দু'বেলা তোমার কাছেই খাব, বাইরে হোটেলে খেয়ে-খেয়ে শরীরটা মোটেই ভাল থাকছে না। এইবার, মা, দেখে-শুনে গুণেন্দ্রের বিয়েটা দিয়ে বউ ঘরে আন। কিন্তু আমার চা কই? গলাটা যে বকে-বকে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল!"

আয়না

ভবানী মুখোপাধ্যায়

উর্মিলার মনে পড়ল প্রেমের সব চেয়ে বড় ট্রাজেডি এই যে এক পক্ষের চেয়ে অপর পক্ষের ভালোবাসাটাই অধিকতর গভীর মনে হয়।

রেশম-কোমল চুলগুলির ওপর কঠিন ব্রাস ঘসছিলো উর্মিলা, সাতাশ, আটাশ, উনত্রিশ—প্রতিদিন গুণে একশো বার চুলের ওপর ব্রাস চালানো উচিত, বিলাতী মাসিকের পাতায় এই রকম একটা কথা পড়েছিল। ব্রাসের চাপে চুল সায়েস্তা রাখা যায়, কিন্তু স্বামী? স্বামীকে সে কি দিয়ে বাঁধবে? মৃণাল ভূজের বাঁধনই কি যথেষ্ট! পুরুষকে কখনও স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিতে নেই, বিশেষতঃ স্বামীকে। রাশ একটু আলগা পেলেই অপরার কণ্ঠলগ্ন হয়ে মাকড়সার জালে বাঁধা পড়তে কতক্ষণ! সাতচল্লিশ···আটচল্লিশ···উনপঞ্চাশ··· চতুর্দিকেই মেয়ে আর মেয়ে—

ড্রেসিং টেবিলের ওপর পড়ে আছে সেই রঙীন খামখানা, মেয়েলী ছাঁদে মোটা-মোটা অক্ষরে জয়দেব চৌধুরীর নাম লেখা। এই খামখানাই সারা সন্ধ্যাটা বিষিয়ে দিয়েছে, গভীর মর্মবেদনার কারণ হয়েছে। এমন সুরভিসিক্ত খামে কোন নারীর মায়া-ভরা আকুলতা মিশিয়ে আছে কে জানে, কি প্রয়োজন তার জয়দেব চৌধুরীকে?

মন বলে ওঠে এতটা ঈর্ষা ভালো নয় উর্মিলা, যা রাখতে চাও তা যে নিজেই হারাতে বসেছ। তিন বছরের বিবাহিত জীবনের পর এই মনোভাব সত্যই অহেতুক। কিন্তু জয়দেবের ঐ বরতনুর দিকে তাকালে কোনো কিছুই অহেতুক মনে হয় না। রমণীর চোখের ভাষা রমণী বলেই উর্মিলা অতি সহজে বুঝে নেয়, এমন কি একদিন জয়দেবের চোখেও কেমন যেন রসগ্রাহীর মোহিত দৃষ্টি লক্ষ্য করেছে।

যা আমাদের আছে তা হারাবার ভয়ই হল ঈর্ষা, জয়দেব একদিন কথাটা বলেছিল। কথাটা সত্য বটে। এই কথাটা মনে পড়ার সঙ্গেই আবার মনে হল, প্রেমের সব চেয়ে মর্মান্তিক ট্রাজেডি এক পক্ষ অন্যকে বেশী করে ভালোবাসে। কিন্তু যার ভালোবাসা অগভীর তার কিছু হারাবার ভয় নেই, তাই অত-শত চিন্তাও নেই। জয়দেব একাধিক বার বলেছে তার মনে কখনও এতটুকু ঈর্ষা নেই, কে জানে তার কি মানে? উর্মিলাকে হারালেও হয়ত তার কিছুই এসে যায় না।

বাইরে পদধ্বনি ও সেই সঙ্গে দরজা খোলার আওয়াজ পাওয়া

গেল। হাত থেকে ব্রাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে উর্মিলা পিছন ফিরে তাকাল। জয়দেব এতক্ষণে ফিরল—

উর্মিলা বলে উঠল—"এত দেরী যে? সেই কখন থেকে বসে ভাবছি, খাবারও সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল বোধ হয়, যা শীত পড়েছে আজ—"

এ সব কথার জবাব না দিয়ে ড্রেসিং টেবিল থেকে খামখানা তুলে নিয়ে সাগ্রহে প্রশ্ন করে জয়দেব—"এ আবার কখন এল?"

উর্মিলা শুকনো গলায় বলে—'বিকালের ডাক।" সংক্ষিপ্ত জবাব।

জয়দেব তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়ে চিঠিখানা পড়ে পকেটেই রাখল। আর্শীর ভিতর দিয়ে পিছনের এই দৃশ্য সচেতন উর্মিলার নজর এড়ালো না।

একটু পরে জয়দেব বলল—"খাবার যদি তোমার ঠাণ্ডা হয়েই থাকে, আমি না হয় তাড়াতাড়ি কাপড়-জামা ছেড়ে আসি।"

সেদিন রাতের খাওয়ার ব্যবস্থাটা ভালোই হয়েছিল আর জয়দেবের মেজাজও ছিল আশ্চর্য রকম ভালো। সারা দিনের কাজের হিসাব, কার সংগে কি কথা হল, এমন কি সামনের ছুটিতে ক'দিনের জন্য ওয়ালটেয়ার বা গোপালপুর যাওয়া যায়—এই জাতীয় বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা হল; কিন্তু সকল কথার ফাঁকে উর্মিলার মন পড়ে আছে পকেটের সেই নীল খামটিতে। কে জানে এ আবার কোন্ মেয়ে জয়দেবকে চিঠি লিখল?

বাকী সময়টুকু নিরিবিলিতে চুপচাপ কাটলো, জয়দেব সকালের সংবাদপত্র আর উর্মিলা অর্ধসমাপ্ত সোয়েটারে মনোনিবেশ করল। সেদিনের কাগজে তেমন চাঞ্চল্যকর কিছু ছিল না, তাই জয়দেব কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠে শুতে চলে গেল, উর্মিলার সোয়েটারটা তাড়াতাড়ি শেষ করা প্রয়োজন, তাই সে বসে রইল।

অনেকক্ষণ পরে উর্মিলা সেলাই ছেড়ে উঠল, ঘরের আলো নিবানো,—বাইরের দালানটায় সবুজ আলোটা জ্বলছে, সারা বাড়ি নিঝুম। উর্মিলা এদিক-ওদিক তাকিয়ে আলনার ওপর 'হ্যাঙ্গারে' টাঙানো জয়দেবের কোটটি সন্তর্পণে তুলে নিয়ে পকেট থেকে সেই নীল খামটা বার করল। তার হাত থরথর করে কাঁপছে, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা, (কারণ উর্মিলা এটুকু জানে যে কাজটা গর্হিত, স্বামীর চিঠিপত্র স্ত্রীর পড়া উচিত নয়, আর কেউ এ কাজ করলে উর্মিলা কি বলত তাকে)—সামনের ঘরেই শুয়ে রয়েছে জয়দেব? বেশ জোরে যেন তার নাক ডাকছে। এই নিরাপদ অবসরে খামখানি খুলে ফেলল উর্মিলা, কাগজটা বেশ বড় কিন্তু লেখা আছে মাত্র তিন ছত্র:

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আগামী শনিবার 'ভারতশ্রী'তে আমাদের চ্যারিটি সো, সন্ধ্যা ৬টার পর। আপনাকে মনে করিয়ে দিলুম, গভর্ণর ছ'টা বাজতে পাঁচের মধ্যেই আসবেন, কিন্তু আপনি একটু আগে আসবেন, রিসিভ করবেন আপনি।

নমস্কার—ইতি

গায়ত্রী দত্ত"

বিখ্যাত স্বর্ণ শিল্পী:—

৺বি, সরকারের পৌত্র,
শ্রীনারায়ণ সরকারের
পরিচালনায়

আধুনিকতম অলঙ্কার শিল্প প্রতিষ্ঠান

★

বি, বি, সরকার কোং লিঃ

১৬০-১, বহুবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা

ফোন:—এভিনিউ ১২৫৩

অতি সাধারণ, রসকষহীন শাদা চিঠি, হয়ত জয়দেবকে ধরেছে, ঐ ত' মানুষ, একটু ভালো করে ধরতে পারলেই হল। উর্মিলার সারা শরীরে একটা স্বস্তির হিল্লোল খেলে গেল। ধীরে ধীরে সে খামখানি পকেটেই রেখে দিল।

—"একেবারে যে রবার্ট ব্লেক হয়ে উঠলে দেখছি, রীতিমত গোয়েন্দাগিরি!"

চমকে পিছন ফিরে উর্মিলা দেখল দরজার চৌকাঠে হাত রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে জয়দেব।

কি বলবে উর্মিলা, কি আর বলতে পারে, ধরা গলায় বললে—"এই ত' নাক ডাকছিলো তোমার—"

বিষয়টি লঘু করাই তার উদ্দেশ্য।

—"অর্থাৎ বেশ নিশ্চিন্ত হয়েই গোয়েন্দাগিরি করতে চেয়েছিলে"—জয়দেব বাঘের মত সজোরে এসে ধরল উর্মিলাকে।

উর্মিলা কেঁদে উঠল, ফুঁপিয়ে কান্না—অনেক কষ্টে শুধু বলল—"আমারই দোষ।"

জয়দেবের বাহুবন্ধন শিথিল হয়ে এল, বেশ কোমল গলায় বলল—"দোষ সকলেরই হয়, তবে রোগে না দাঁড়ায়। এসো, শোবে এস—, মাথাটা ঠাণ্ডা হয়েছে?"

বিছানায় শুয়ে হাই তুলতে তুলতে জয়দেব বলল, "ভাগ্যিস্ আমার অতশত নেই—"

—"তার মানে?"

—"আজ কার সংগে দেখা হল জানো, তোমাদের সেই মতি সেন?"

—"সে ফিরেছে নাকি?"

—"ফিরেছে বৈ কি, কি একটা বিজনেস্ সুরু করবে। পৃথিবীটা বড্ড ছোট, না উর্মি?"

—"কিন্তু তোমার অত মাথাব্যথা কিসের? আমার সঙ্গে তার এখন কিসের সম্পর্ক?"

জয়দেব ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার আর সাড়া নেই। দুটি হাতের ওপর মাথা রেখে উর্মিলা আকাশপাতাল ভাবে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের পানে তাকিয়ে ভয় পায়, জয়দেবকে হারাবার ভয়। এবারও কিন্তু ভয়টা নিছক অকারণ, আরো কত বার এমনই অকারণ ভয় পেয়েছে।

না, ছায়া দেখে আর ভয় পাওয়া উচিত নয়—

কত মেয়ের কথা মনে পড়ে, জয়দেবের জানাশোনা মেয়ের দল। রীতিমত এক পাল মেয়ে, তাদের হাত থেকে ওকে ছিনিয়ে নিয়েছে সে, এ কি তার কম কৃতিত্ব! কিন্তু সম্পত্তি আহরণ করার চাইতে রক্ষা করাটাই বড় কঠিন দায়িত্ব। পেয়ে হারানোর জ্বালা বড় জ্বালা, তাই সহজেই তার মনের শান্তি টুকরো হয়ে ভাঙে,—কোথায় কার হাসি, কার ছুটো লঘু রসিকতা, কারো বা দু'লাইন চিঠি,—সব মেঘেই যেন আগুনের রঙ।

কত বার উর্মিলা মনে করেছে শান্ত হবে, সন্দেহের হাত থেকে মুক্তি নেবে, সব ঝোপেই বাঘ দেখার আশংকা করবে না, তবু হার মানতে হয়। এই সব ছোটখাটো ঘটনাতেই ত' জয়দেবের মন ভাঙতে পারে, আজ কি কেলেঙ্কারীটাই না হল।

উর্মিলাও অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন সন্ধ্যায় জয়দেব বাড়ি ফিরল একগুচ্ছ রজনীগন্ধা হাতে করে। উর্মিলা সানন্দে ফুলগুলি সাজাতে বসে। এমন সময় পিছন থেকে এসে হাত বাড়িয়ে জয়দেব একটি ছোট ভেলভেট কেস এগিয়ে দেয়।

বাক্সটি খুলে উর্মিলা অভিভূত হয়ে পড়ল—বলল, "হঠাৎ যে, এ সব কি কাণ্ড?"

—"মনে নেই, আজ কি দিন বলো ত'? ১১ই মাঘ, এই দিনেই তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, মাঘোৎসবের দিন।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি অরুন্ধতীর সংগে এসেছিলে, বাড়ি ফিরেছিলে কিন্তু আমার সংগেই—"

—"হ্যাঁ, সেদিন তোমাকে ভারী চমৎকার দেখাচ্ছিল কিন্তু!"

—"আর এখন?"

জয়দেব গম্ভীর গলায় বলে—"কালের হাতে ত' কারো নিষ্কৃতি নেই, বয়সের সঙ্গে আমাদের সবই বদলায়। শুধু রূপ আর রঙ নয়, মনও বদলায়। কিন্তু তোমার সংগে সেদিন কে ছিল মনে আছে, না ভুলে গেছ?"

—"কেন মনে থাকবে না, মতিদা—মতি সেন।"

—"তা হলে মনে আছে দেখছি!"

—"খুব কি বিচিত্র ঠেকছে? তবে মতিদা আর অরুন্ধতী এক বস্তু নয়। অরুন্ধতী তোমার এ ভাবে চলে যাওয়ায় একেবারে ক্ষেপে গিয়েছিল।"

—"সে আর এমন বিচিত্র কি, মেয়েরা চিরদিনই আমাকে নিয়ে ক্ষেপে আছে।"—বেশ নাটকীয় ভংগীতে বলে জয়দেব।

উর্মিলা আবেগ ভরে বলে ওঠে—"সে আর আমি জানি না!"

অনেক দিন পরে এই প্রথম উভয়ের মধ্যে অরুন্ধতীর কথা উঠল। একদা এই অরুন্ধতীর ওপর উর্মিলার ঈর্ষার আর অন্ত ছিল না, কিন্তু সে সব অনেক দিন ধুয়েমুছে গেছে, কিন্তু তার পরদিনই হঠাৎ তার সংগে উর্মিলার দেখা হয়ে গেল। সে এক বিচিত্র সংঘটন।

গারষ্টিন প্লেসে রেডিয়ো অফিসের কর্তৃপক্ষের আহ্বানে গিয়েছিল উর্মিলা। কথাবার্তায় অনেক দেরী হয়ে গেল। ফেরার পথে উর্মিলা ভাবল, অফিস-পাড়াতেই যখন এসেছে তখন হেস্টিংস স্ট্রীটে গিয়ে জয়দেবের অফিসে ওঠা যাক্। প্রায় একটা বাজে, একসংগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাবে, কিন্তু অফিসে যেতেই জয়দেবের ক্লার্ক হালদার বাবু বললেন—জয়দেব একটু আগেই বেরিয়েছে।

বিরাট বাড়ি, প্রায় পাঁচশো অফিস আছে এই একটি বাড়িতেই, প্রতি ঘরেই একটি করে অফিস, সলিসিটর জয়দেব চৌধুরীর অফিসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে উর্মিলা কিছুক্ষণ ভাবলো কি করা যায়।

জয়দেব প্রতিদিনই গভর্ণমেন্ট হাউসের কাছে একটা মাঝারি ধরণের হোটেলে লাঞ্চে যায়, সেখানে সচরাচর বেশী ভিড় থাকে না, তাই জয়দেব এই হোটেলটি পছন্দ করে। উর্মিলা সেখানে চললো, জয়দেব নিশ্চয়ই সেখানে গেছে। মানুষ অদ্ভুত জীব—একই স্থান, কাল ও পাত্র তাদের প্রিয়।

জয়দেব ওই হোটেলেই এসেছে। কোণের দিকে টেবিলে

সেই ব্যক্তিটিই ত' বসে আছে, সামনে একটি মেয়ে, তার মুখ কিন্তু এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। বেশ দেখা যাচ্ছে জয়দেব আনন্দে আছে, কারণ হাসির বেগে তার মাথাটা চেয়ারের পিছন দিকে গড়িয়ে পড়ল। ঠিক সেই মুহূর্তেই জয়দেবের দৃষ্টি পড়ল উর্মিলার দিকে, আর উর্মিলা দেখতে পেল জয়দেবের সামনের মেয়েটিকে। মেয়েটি আর কেউ নয়, সেই অরুন্ধতী! উর্মিলার মনে হল যেন অতীতের এক দুঃস্বপ্ন তার গলা টিপে ধরেছে, পায়ের তলায় মাটি যেন আর নেই।

অরুন্ধতী টেবল ম্যানার্স ভুলে গিয়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল—"এসো উর্মি,—আজ কি কপাল, একসঙ্গে জয়দেব আর উর্মিলা, দু'জনের সঙ্গেই দেখা। এক ঢিলে দুই পাখি।"

উর্মিলা অনেক কষ্টে মুখে হাসি টেনে এনে বলল—"অবাক কাণ্ড, ভেবেছিলাম ওঁর ঘাড় ভেঙে দুপুরের খাওয়াটা সেরে নেব, কিন্তু—"

—"কিন্তু আমাকে দেখেই চমকে উঠেছ? কেমন? তাই নয়?"

জয়দেব চেয়ারটা একটু সরিয়ে নিয়ে উর্মিলার বসবার ব্যবস্থা করে দিল। বসতে বসতে উর্মিলা বলল—"দিল্লী আর কলকাতা যদিও আজকাল উড়ো জাহাজের কল্যাণে দূর নয়, তবু কে জানত তুমি এখন কলকাতায় এবং উপস্থিত এই হোটেলে?"

—"কাল সন্ধ্যাতেই এসেছি, মামলায় জড়িয়ে পড়েছি ভাই, তাই ভাবলুম জয়দেব যখন রয়েছে, ভালো-মন্দ যা-হয় পরামর্শ ওর কাছেই মিলবে।"

—"তোমার আবার মামলা কিসের? সুজিৎ বাবু কোথায়?" বিস্মিত উর্মিলা প্রশ্ন করে।

—"সুজিৎ বাবুর সংগে অরুন্ধতীর বিচ্ছেদ ঘটেছে, একেবারে যাকে বলে জুডিসিয়াল সেপারেশন।" জয়দেব নীরস গলায় এতক্ষণে অরুন্ধতীর হয়ে জবাব দেয়।

উর্মিলা কি যে কথা বলবে ভেবে পায় না, তার পর অতি কষ্টে বলে: "তাই নাকি? আহা—"

—"অত-শত তোকে ভাবতে হবে না,—যা হবার তা হয়েছে"—এই বলে জয়দেবের দিকে একটা বিশেষ ভংগীতে তাকাল। কেমন যেন একটা অন্তরঙ্গ ভাব। তার পর যেন উর্মিলাকেই সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলে, "যা হল তার মধ্যে তেমন 'টক্‌-ঝাল' নেই, বেশ সহমাজাই ঘটল—"

জয়দেব সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীর গলায় বলে—"না, তা ঠিক বলা যায় না, এ সব ব্যাপারে একটু মন-কষাকষি থাকবে বৈ কি—"

উর্মিলা বাড়ি ফিরল। মনের ভিতর আবার ঝড় বইছে। যেটুকু শান্তি এসেছিল আজ দুপুরের এই ব্যাপারে তা ভেঙে-চুরে ছারখার হয়ে গেল। সমস্ত বিকেলটা দুপুরের এই ঘটনার কথা মনে পড়েছে। এই কথাগুলি একই গ্রামোফোন রেকর্ড বার বার বাজানোর মত, কেবল মনে পড়েছে। রাতে খাওয়ার সময় উর্মিলা প্রায় মরিয়া হয়েই জয়দেবকে বলে—"অরুন্ধতীকে আজ চমৎকার দেখাচ্ছিল না?"

একবার ওর মুখের পানে তাকিয়ে জয়দেব জবাব দেয়, "চমৎকার! কিন্তু ঐ পর্যন্তই, ওর বেশী আর যেও না—তোমার আবার যে রকম উদ্ভট কল্পনাশক্তি!"—"হঠাৎ একথা তোমার মনে হল যে, আমি কি কিছু বলেছি?"

—"কিছু না, তবে তোমার যেমন কাণ্ড! সব কিছুতেই ত' তোমার ভয়,—এমন একটা অহেতুক ঈর্ষায় তোমার মন ছেয়ে আছে যে, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ নেই।"

উর্মিলা হেসে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, বলে—"তুমিও কি মহাদেব নাকি? আমি কারো সংগে হেসে কথা কইলে তোমার 'জেলাসি' হয় না?"

একটু ভেবে বলে জয়দেব—"হয়-কি না-হয় কে জানে? মনে ত' পড়ে না। ও-সব প্যানপ্যানানি আমার সয় না।"

—"কি জানি, কিছু না হওয়াই ভালো, ওর চেয়ে দাঁতকন-কনানির যন্ত্রণা ঢের ভালো।"

জয়দেবের খাওয়া শেষ হয়েছিল। সে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—"জানো, এ সব কাণ্ড মানুষকে পাগল করে দেয়!"

"উর্মিলা সরল ভাবে বলে—আমি ত' সইতে পারি না, যত বার ভাবি, কিছু আর ভাবব না, তবু আমার মনটাকে যেন পেয়ে বসে—"

জয়দেব বলে—"ওটা একটা ম্যানিয়া। ডাঃ গিরীন্দ্রশেখরের কাছে যাও, তিনি তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন—"

—"ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর কেন, আমিই কি বুঝি না কিছু, জানি সবটাই নিছক বোকামি। জানো, মাঝে-মাঝে ভাবি, এমন যদি স্বামী হত কেউ তার দিকে তাকাতে পারত না তা হলে হয়ত ভালো হত।"

জয়দেব করুণার ভংগীতে হাসল বলল,—"অন্ততঃ একটা কথা আমাকে দিন-রাত মনে করিয়ে দাও তুমি যে আমি একজন সুপুরুষ। বুড়ো বয়সে অন্ততঃ এই ভেবে আনন্দ পাব।"

এর পর আর কিছু দিন এ নিয়ে কোনো কথাই উঠল না, তবে অরুন্ধতী দিন-রাতই উর্মিলার মনের আকাশ ছেয়ে রইল। জয়দেবও অরুন্ধতী-প্রসঙ্গ সযত্নে এড়িয়ে চলত আর উর্মিলাও কিছু কথা তুলতো না।

একদিন কথা-প্রসঙ্গে কথাটা তুললো উর্মিলা, হঠাৎ বলে উঠল—"অরুন্ধতীদের খবর কি? তার মামলার কি হল?"

—"খবর ভালোই, কাল দুপুরে লাঞ্চে এসেছিল। কেন?"

—"না, এমনই জিগগেস করছিলুম, তুমি ত' কিছুই বলোনি!"

—"মনেই ছিল না, একেবারে ভুলে গিছলাম।"

তার পরের সপ্তাহে রাতে খাওয়ার সময় ফিরল না জয়দেব, টেলিফোনে জানালো বাইরে খেয়ে নেবে, কাজ আছে, ফিরতে দেরী হবে। আগেও অনেক বার এমন ঘটেছে, উর্মিলা তাই বিষয়টিতে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু মাঝে-মাঝে প্রায়ই এমন ঘটতে লাগল। একদিন বাড়ি ফিরল জয়দেব তখন বারোটা বেজে গেছে।

বসে বসে মশার কামড়ে ক্লান্ত হয়ে উর্মিলা বিছানায় প্রবেশ করলেও ঘুমাতে যায়নি, চুপ করে পড়েছিল। জয়দেব ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বালতেই উর্মিলা আচমকা জেগে ওঠার ভাণ করে ধড়মড় করে উঠে বসল।

মশারির দরজা খুলে উঁকি মেরে জয়দেব বললে—"আলোটা চোখে পড়তে বুঝি ঘুম ভেঙে গেল, আহা—!"

হাই তুলে উর্মিলা বলে—"অনেক রাত হয়েছে না, ক'টা বাজল ?"

জয়দেব শুধু মাথা নেড়ে জানাল রাত হয়েছে, কিন্তু কোনো কথা বলল না। আর উর্মিলা প্রায় সারা রাত ছটফট করে কাটাল, কেবল মনে হল সেই অরুন্ধতীর জালে বোধ হয় জয়দেব ক্রমশঃই জড়িয়ে পড়ছে।

জয়দেবের ব্যাপারটি ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, দিন-দিন যেন ব্যস্ততা বেড়েই চলেছে, যদিচ অমনোযোগের তেমন লক্ষণ দেখা যায় না, তবু যেন মনে হয় তার মন পড়ে আছে অন্যত্র। বুধবার, বৃহস্পতিবার, পর-পর দু'দিনই ফিরতে রাত হল জয়দেবের, আর শুক্রবার যখন সন্ধ্যার পর আবার টেলিফোন বেজে উঠল, তখন যন্ত্রণায় আকুল হয়ে উঠেছে উর্মিলা। । কি যে সংবাদ পাবে তা সে আগেই জানে—কেমন একটা হতাশা ভরা বেদনা যেন তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলছে।

—"উর্মি, একটা দুঃসংবাদ দিচ্ছি।"

—"বুঝেছি, ফিরতে দেরী হবে ত' ?"

—"হ্যাঁ, জানি তোমার কষ্ট হবে, কিন্তু বিশেষ কাজে আটকে পড়েছি।"

—"জানি !"

লাইন কেটে যাবার অনেক পরেও টেলিফোনের রিসিভারটা জোরে হাতে চেপে রেখেছে উর্মিলা, ফলে হাতটা অবশ হয়ে গেছে। উর্মিলা আজ একটা কাণ্ড করবে।

ঠিক আটটার পর সাড়িটা বদলিয়ে বেরিয়ে পড়ল উর্মিলা, পথে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে বলল, "পার্ক সার্কাস।"

পার্ক সার্কাসের ঝাউতলা রোডেই একটা ফ্লাট-বাড়িতে অরুন্ধতীরা থাকে, সেইখানে আজ উর্মিলার নৈশ অভিযান।

ট্যাক্সি যখন আধুনিক ঢঙে তৈরী সিমেণ্ট আর বালি জমানো ফ্লাট-বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, তখন আর নামতে পারে না উর্মিলা, সারা শরীর এমন ভারী হয়ে উঠেছে যে তাকে টেনে তোলার শক্তি তার নেই। অনেক পরে ধীরে ধীরে ট্যাক্সি থেকে নেমে ড্রাইভারকে টাকা দিয়ে পেভমেণ্টের ওপর কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এই ইট-পাথর আর কাচ দিয়ে ঘেরা বাড়িটায় কি রহস্য ভরা আছে যেন তার সন্ধানে উর্মিলার আকুল চোখ সেটা খুঁজে পেতে চায়। এই শেষ—যা তার স্বপ্ন, যা তার আশা আর আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তিল-তিল করে তৈরী হয়েছে আজ তার শেষ দেখবে সে—

তিন তলার ফ্লাটে অরুন্ধতীরা থাকে, সিঁড়িও অনেক। সিঁড়িতে দড়ির ম্যাটিং করা, কিন্তু ফ্লাট-বাড়ির ভাগের মা গঙ্গা পায় না, নোঙরা, কাগজের টুকরো, সিগারেটের খালি বাক্স চার পাশে ছড়ানো রয়েছে, —গা ঘিন্-ঘিন্ করে। অথচ ওপাশে কাদের ফ্লাটে একটি মেয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত অনুশীলন করছে—

"শেষ নাহি যে
শেষ কথা কে বলবে ?"

গাইছে ভালো। তেতলায় উঠে সিঁড়ির সামনেই অরুন্ধতীর ফ্লাট। কলিং বেলে চাপ দিতেই যে সামনে এসে দাঁড়াল সে অরুন্ধতী স্বয়ং, উর্মিলাকে দেখে অবাক, বললে, "কি রে উর্মি, তুই এত রাত্তিরে ? এই বৃষ্টিতে ? ভিজে গেছিস যে ? আয় ভেতরে আয়।"

উর্মিলা বলে—"এদিকে এসেছিলাম, ভাবলাম তোমাদের একবার দেখে যাই—"

—"বেশ করেছিস্, আয় ভেতরে আয়।"

—"ভাবলুম রিং করবো তা আর হয়ে উঠল না—"

—"ন্যাকামি করিসনি, রিং-ফিং আবার কি ? সত্যি তোকে আশাই করিনি, ভালোই হল, আমাদের এক বন্ধু রয়েছেন, আয় আলাপ করিয়ে দিই।"

এখান থেকে অরুন্ধতীর বন্ধুর ঘাড়টা দেখা যাচ্ছে, দরজার দিকে পিছন করে বসে আছেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে জয়দেব।

প্রায় কাঁপতে কাঁপতে উর্মিলা ঘরের ভেতরে এসে ঢুকলো, চমৎকার সাজান ঘর, পাথরের বুদ্ধমূর্তি থেকে মির্জাপুরী কারপেট—কোনো কিছুর অভাব নেই। লোকটি এতক্ষণে এদিকে মুখ ফেরাল।

অরুন্ধতী বলে উঠল—"ছবি—ছবি ধর, নিশ্চয়ই নাম শুনেছিস, সম্প্রতি 'কালো মেঘ' ডিরেক্ট করেছেন, খুব সাক্সেস হয়েছে, এবার বম্বে যাচ্ছেন, 'আঁখ্কা কিড়কিড়ি' ছবি তোলা হবে।"

—"সে আবার কি ?"

—"হরি বল—রাষ্ট্রভাষায় জ্ঞান তোর কত কম, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', হিন্দীতে ঐ বলে।"

পাজামা এবং পাঞ্জাবী-সজ্জিত সিনেমার ছবি ধর বেশ কায়দা করে নমস্কার জানালেন উর্মিলাকে।

উর্মিলা নেহাৎ পোষাকী ভদ্রতা হিসাবে পাণ্টা জবাব দিল, একে তার মন খারাপ; তাছাড়া এই লম্বা জুলপিওলা লোকটিকে তেমন ভালো লাগছিল না।

অরুন্ধতী বলল—"ইনি আমার বন্ধু উর্মিলা চৌধুরী, অর্থাৎ আমার সলিসিটর জয়দেব চৌধুরীর মিসেস্।"

লোকটি বলে উঠল—"ও, আই সী। জানেন মিসেস্ চৌধুরী, কেস্টা শেষ হলেই অরুন্ধতী আমার ফিল্মের হিরোইন হচ্ছেন।"

উর্মিলার বিস্ময়ের আর শেষ নেই, শেষটায় অরুন্ধতীর মত একটা আদি ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে ফিল্মে নামবে! শুধু বললে—"সত্যি! এটা একটা সারপ্রাইজ!"

বসল উর্মিলা, সে অতি দুর্বল হয়ে পড়েছে, এই অরুন্ধতী, সিনেমায় নামতে চলেছে, আর উর্মিলা সন্দেহের উৎকট দংশনে এর জন্যই মাথা খারাপ করে বসেছে। সহসা তার মনে একটা স্বস্তি ও সান্ত্বনার ভাব জাগল। সে বলল—"আমি কিন্তু বেশীক্ষণ থাকবো না, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।"

—"বস্। একটু কিছু খা, কফি খাবি ?"

—"নাঃ, কিছু না, খাওয়ার সময় হয়ে গেছে, এইবার ফিরি আর একদিন সময় করে আসব।"

তার মন থেকে সব হিংসা, দ্বেষ ধুয়ে-মুছে গেছে।

অরুন্ধতী বিশেষ আপত্তি করল না, আবার সিঁড়ি পর্য্যন্ত নেমে এল উর্মিলাকে এগিয়ে দিতে।

নীচে নেমে শুধু বলল, "এসেছিস সত্যি ভালো করেছিস্, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন বুঝলাম না—"

ঐতিহ্যময় ভারত

স্বর্ণ মন্দির—অমৃতসহর

এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে রণজিৎ সিং নির্মিত স্বর্ণ-মন্দিরই অমৃতসরের সর্বপ্রধান আকর্ষণ। কারুশিল্পের নিদর্শন ও শিখ ধর্মের প্রাণকেন্দ্ররূপে এই মন্দিরের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য দ্বিবিধ। শিখদের প্রিয় আর একটি শিল্পের নিদর্শন—মনোহারী, প্রাণ মাতান—ব্রুক বণ্ড চা।

তাজা জিনিষই ব্যবহার করুন

Darjeeling Brooke Bond Tea Blend
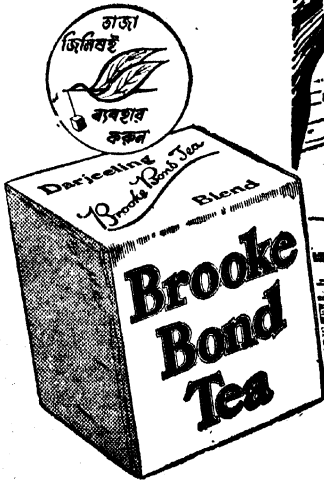
Brooke Bond Tea

ব্রুক বণ্ড চা

চমৎকার দেশীয় প্যাকেটে সেরা ভারতীয় চা

—"তাড়াতাড়ি কোথায় ? ন'টা বেজে গেছে, আর একদিন ত আসছি।"

—"সেই ভালো।"

পথে নেমে দেখা গেল তখনও ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। শীতের রাত্রি তায় বৃষ্টি, পথ-ঘাট নিঝুম, কাছাকাছি ট্যাক্সিও নেই, সেই পার্ক সার্কাস ট্রাম-ডিপোর কাছে ট্যাক্সি-ষ্ট্যাণ্ড।

ভিজতে ভিজতেই চলেছে উর্মিলা—আজ তার মন অনেক হাল্‌কা, পথ চলা আজ আর তার কাছে কঠিন নয়।

পিছন থেকে তীব্র হেডলাইট জ্বালিয়ে এক প্রকাণ্ড গাড়ি এগিয়ে আসছে, মুখ ফিরে তাকিয়ে দেখে উর্মিলা—ট্যাক্সি না প্রাইভেট গাড়ি।

গাড়িটি উর্মিলার গা ঘেঁসে এসে সজোরে ব্রেক কষল, ড্রাইভারের এই অভব্যতায় বিরক্ত হয়ে উর্মিলা পেভমেণ্টে ওঠার উদ্যোগ করছে, গাড়ির দরজা খুলে গেল, ভিতর থেকে কে বলে উঠল,—"উর্মি, ভেতরে চলে এস, এ রকম ভিজছ কেন ?"

বিস্মিত উর্মিলা কণ্ঠস্বর চিনল,—"কে—মতিদা ? তুমি এখানে ?"

—"ফলো করিনি নিশ্চয়ই, পিছন থেকে ঠিক ধরেছি।"

গাড়িতে উঠতে উঠতে উর্মিলা বলে—"শুনেছি তুমি কলকাতায় ফিরেছ, কিন্তু দেখা করোনি কেন, বিশেষ তেমন বদলাওনি ত ?"

—"কত দিন তোমাকে দেখিনি বলো ত ?"

—"বিয়ের পর থেকেই। তার পনের দিন পরেই ত তুমি সেল করেছিলে—"

—"মনে আছে দেখছি, বলো কোথায় নিয়ে যাব ?"

—"সোজা বাড়ি, আমাদের বাড়ি ত' জানো, সেই সনাতন শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট !"

উর্মিলার জীবনে জয়দেবের আবির্ভাবের আগে এই মতি সেনের সংগেই তার বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে গিছল, সবাই জানত ওদের বিয়ে হতে আর দেরী নেই। তার পর জয়দেবের নাটকীয় আবির্ভাব ও তার পনের দিন পরেই বিবাহ।

আজ এই মুহূর্তে মতি সেনকে হাতের কাছে পেয়ে একটা মধুর অতীতের কথা মনে পড়ল। তখন পুরুষরা উর্মিলাকে নিয়ে একটা ঈর্ষা বোধ করত আর উর্মিলা নিজের রূপ ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করত। আজ অবস্থা তার বিপরীত। আজ ওর পাশে বসে কেমন যেন একটা অন্তরঙ্গ আকুলতা এসে উর্মিলার মন আচ্ছন্ন করে দেয়। এই উষ্ণ সান্নিধ্য আজ যেন পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে। নারী জাতির এই ত' চিরন্তন কামনা, পুরুষ তাকে আদর করুক, তার পূজা করুক, তার জন্য জ্বলে-পুড়ে মরুক।

বাড়ি এসে গেল—মতি সেন গাড়ির দরজাটা খুলে হাত ধরে নামাল উর্মিলাকে। বলল,—"আশ্চর্য, এমন ভাবে তোমার সংগে দেখা হয়ে যাবে ভাবিনি, অথচ আজ ক'দিন ধরে তোমার কথাই কেবল মনে মনে ভেবেছি, তাই বোধ হয় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তুমি কিন্তু এই ক'বছরে একটুও বদলাওনি, একটু হয়ত মোটা হয়েছ—না ?"

—"বাঃ, ওয়েট ত ঠিকই আছে !"

দোর-গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আবার গাড়িতে এসে বসল মতি সেন। উর্মিলা তখন বলছে, "একদিন ঠিক এসো কিন্তু—"

ওপরে উঠে গেল উর্মিলা, তখনও জয়দেব বাড়ি ফেরেনি। রেন-কোটটা চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে ফেলল উর্মিলা, তার পর ড্রেসিং টেবলের সামনে ব্রাস নিয়ে মাথা আঁচড়াতে সুরু করল, অনেক দিন এই নিত্যকর্মটিতে অবহেলা হয়েছে, আজ কিন্তু মন অনেক হাল্‌কা।

পিছন থেকে সহসা হাত চেপে ধরল জয়দেব। সে নিঃশব্দে কখন এসেছে। উর্মিলা চমকে উঠে বলল—"তুমি ? কখন এলে ?"

—"বড় আশ্চর্য লাগছে, না ? কোথায় গিয়েছিলে হঠাৎ ?"

উর্মিলার মুখ দিয়ে সত্য কথা বেরোল না, বলল—"পিসিমার বাড়ি গিছলাম, অনেকদিন ও-পাড়ায় যাইনি।"—কথাগুলো কিন্তু সহজ সুরে বেরোল না।

চেয়ারে বসে জুতা ছাড়তে ছাড়তে জয়দেব গম্ভীর গলায় বলে—"আজকাল কি পুরানো বন্ধুদের নিয়ে মাসীমা-পিসিমাদের বাড়ি ঘুরে বেড়াও ?"

—"ওঃ, এই কথা, মতিদার সঙ্গে হঠাৎ দেখা, ট্যাক্সি খুঁজছিলাম, ও পিছন থেকে এসে লিফট্ দিল, কিন্তু তাতে কি ?"

জয়দেব সহসা উঠে এসে আবার উর্মিলার হাত চেপে ধরল—"আমাকে তুমি কচি খোকা পেয়েছ, না,—ওসব আমি ঢের জানি !"

—"কি করছ, ছাড়, আমার হাতটা ভেঙে দেবে নাকি ?"

—"তার আগে জবাব দাও, কত দিন এ লীলা-অভিসার চলছে ?"

—"ছিঃ তুমি কি, আমার কথায় তোমার বিশ্বাস নেই ?"

—"হ্যাঁ, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়, আমি নিজের চোখে দেখেছি মতি সেন তোমার হাত ধরে আছে—"

—"হাত ধরে আছে ত কি হয়েছে ?"

জয়দেব সহসা উর্মিলার খোঁপা ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললে…"কি হয়েছে তার মানে কি তুমি জানো না ?

—"ছিঃ, তোমার মন এত ছোট হয়ে গেছে ?"—কান্নায় ভেঙে পড়ল উর্মিলা।

জয়দেব তবু আঘাত দিয়ে বললে, "ন্যাকামি ভরা কান্না রাখো, ঐ তোমাদের শেষ অস্ত্র।"

উর্মিলা কাঁদছে, অতি করুণ তার কান্না, তারপর সহসা সে উন্মত্তের মত হেসে উঠল—অট্টহাস্য !

চমকে উঠল জয়দেব, "উর্মিলা কি পাগল হয়ে গেল নাকি ?"

উর্মিলা বলল—"ডাঃ গিরীন্দ্রশেখরের কাছে এবার তুমি যাও। অকারণ ঈর্ষা মানুষকে কত নোংরা, কত ছোট করে দেখলে ?"

তৎক্ষণাৎ জয়দেব তার পাশে উঠে গিয়ে কাঁধে হাত রাখল, সান্ত্বনার ভংগীতে বলল…"উর্মি, হঠাৎ আমার কেমন যেন মনে হল, —তুমি কিছু মনে কোরো না।"

উর্মিলা তখনও কাঁদছে।

রাতে বিছানায় শুয়ে প্রথমটা ঘুম আসে না উর্মিলার। আবার সেই দীর্ঘনিশ্বাস, আবার সেই চিন্তার স্রোত। কিন্তু পাশে নিদ্রিত জয়দেবের গায়ে হাত দিয়ে সকল জ্বালা যেন ইন্দ্রজালে দূর হয়ে গেল। জয়দেবও শেষ কালে সন্দেহ ও ঈর্ষার ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারল না, তারও মনে বিষাক্ত বিষ।

কিন্তু আর যাই হোক, আজকের রাতে অরুন্ধতীর কোনো স্থান নেই,—আর কেউ কোথাও নেই, আছে শুধু ও আর জয়দেব। জয়দেব তাহলে ওকেই ভালোবাসে।

হিমালয় বুকে
টয়লেট্ ও ট্যাল্কাম্ পাউডারের
স্নিগ্ধ সুগন্ধ
আপনার সত্যই ভাল লাগবে
Himalaya Bouquet
Himalaya Bouquet
TOILET POWDER
দুটি সুষ্ঠু
ইরাস্‌মিক্
সৃষ্টি
HBP. 6-X30 BG
ইরাস্‌মিক্ কোং, লিঃ, লণ্ডনের তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত।

নীল আলো

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

দীর্ঘ এক মাস ধরে খনন-কার্য চলেছে। শতাব্দীর লুপ্ত চিহ্ন সব একটি-দু'টি করে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে খননকারীর দল বের করছে। এও এক ধরণের উল্লাস। ডাঃ সরকারের নেতৃত্বেই চলেছে খনন-কার্য। সকাল থেকেই সেদিন আকাশটা ছিল মেঘাচ্ছন্ন। গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টিও ঝরছিল সারাটা দিন ধরে এবং সমস্ত দিন ধরে মাটি খুঁড়ে খুঁড়েও বিশেষ কিছুই পাওয়া যায়নি। ডাঃ সরকার তাঁর তাঁবুতে বসে একটা শিলালিপি উদ্ধারের চেষ্টায় যেন বুঁদ হয়ে আছেন, হঠাৎ একটা গোলমাল চেঁচামেচির শব্দে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হলো। প্রান্তরের দক্ষিণ দিকে গত তিন দিন ধরে খনন চলেছে, গোলমালটা সেই দিক থেকেই আসছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন ডাঃ সরকার। হঠাৎ ভাঙা মেঘের ফাঁকে দিনশেষের সূর্য ঝকমকিয়ে উঠলো এবং সেই সঙ্গে অদ্ভুত একটা আলোর ঝরণা যেন শূন্য থেকে জলে-ভেজা প্রকৃতির উপরে ঝরে পড়ল।

এগিয়ে গেলেন কৌতূহলী ডাঃ সরকার খনন-কার্য যেদিকে চলেছে সেই দিকে। আট-দশ জন মাটি-কোপান ওড়াং কুলী, ডাঃ সরকারের সহকারী তরুণ ইনজিনীয়ার অমিয় সব এক জায়গায় গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। একটা চাপা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। সকলের দৃষ্টি একই দিকে নিবদ্ধ।

'অমিয়—'

ডাঃ সরকারের ডাকে অমিয় ফিরে দাঁড়াল।

'ব্যাপার কি! কি হয়েছে!—'

'দেখুন স্যার কি আশ্চর্য ব্যাপার!'—অমিয় সামনের দিকে অংগুলি নির্দেশ করে ডাঃ সরকারের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করল।

ডাঃ সরকার আর একটু এগিয়ে গিয়ে সামনের দিকে তাকালেন! সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন যেন ডাঃ সরকার। আশ্চর্য দৃশ্যই বটে!

নির্দিষ্ট স্থানটিতে বোধ হয় হাত পাঁচেকের বেশী খোঁড়া হয়নি, একটা সমচতুষ্কোণ গর্তের মত। সেই গর্তের মধ্যে প্রকাণ্ড একটি গোখরো সাপ দেহের নিম্নার্দ্ধ কুণ্ডলী পাকিয়ে বাকী অর্দ্ধেক একেবারে সোজা ভাবে খাড়া করে ফণা বিস্তার করে আছে; আর দেহের কুণ্ডলীর ঠিক মধ্যস্থলে একটি অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত হাতলওয়ালা ধাতুনির্মিত প্রদীপ। সর্পরাজ যেন তার দেহ দিয়ে প্রদীপটিকে আঁকড়ে ধরে আছে। রক্তপ্রবালের মত জ্বলছে সাপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার চক্ষু দু'টি যেন।

'আশ্চর্য স্যার! গর্তটার মুখে একটা পাথর ছিল। শাবল দিয়ে চাড় দিয়ে পাথরটা তুলতেই—ঐ সাপটা ফোঁস্ করে গর্জে উঠেছে!—ওরা সাপটাকে মারতে চেয়েছিল কিন্তু আমি মারতে দিইনি—'

'না। না মেরো না ওটাকে!'—কতকটা যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতই ডাঃ সরকার কথাগুলো বললেন।

'কিন্তু সাপের কুণ্ডলীর মধ্যে ঐ প্রদীপটা দেখেছেন স্যার? ওটা উদ্ধার করতে পারলে আজকের সমস্ত দিনের কোন কিছু খুঁজে না পাওয়ার পরিশ্রমটা সার্থক হতো। কি অদ্ভুত কারুকার্য প্রদীপটার! আরো একটা জিনিষ লক্ষ্য করুন স্যার, এত দিন মাটির নীচে থাকলেও প্রদীপটা যেন এতটুকুও মলিন হয়নি।'

'হয়ত কোন বিশেষ ধাতু দিয়ে তৈরী প্রদীপটা, মাটি ওটার ক্ষতি করতে পারেনি।'—মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন ডাঃ সরকার।

'কিন্তু সাপটাকে না মারতে পারলে বা তাড়াতে পারলে ত প্রদীপটা উদ্ধার করা যাবে না স্যার!'

'এক কাজ করো, লাঠিসোটা দিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করলে হয়ত সাপটা যাবে না। সাপটাকে মারতেও আমার মন চাইছে না—চার পাশে কিছু খড়-কুটো এনে আগুন জ্বেলে দাও। আগুন দেখে ভয় পেয়ে হয়ত সরে যেতে পারে, একান্তই যদি না যায় তখন না হয় দেখা যাবে।—'

সেই ব্যবস্থাই করা হলো ডাঃ সরকারের নির্দেশক্রমে। কুলীরা চার পাশে খড়-কুটো এনে জ্বেলে তাতে কিছু কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিল।

ডাঃ সরকারের অনুমানটা মিথ্যা নয়, সত্যি-সত্যিই চার পাশে আগুন বেশ ভাল ভাবে জ্বলে উঠতেই দেখা গেল—সাপটা হঠাৎ ফণা নামিয়ে একটু এগিয়ে সামনেই একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে মাটির তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাপটাকে অদৃশ্য হতে দেখেই অমিয় যাচ্ছিল প্রদীপটা তুলে আনতে কিন্তু ডাঃ সরকার বাধা দিলেন: 'একটু অপেক্ষা করো অমিয়, দেখা যাক, সাপটা আবার ফিরে আসে কি না?'

দশ-বার মিনিটের মধ্যেও সাপটা যখন ফিরে এলো না, ডাঃ সরকার নিজেই এগিয়ে গিয়ে মাটি থেকে প্রদীপটা তুলে আনলেন।

ওজনে বেশ ভারী প্রদীপটা! সেরখানেক ওজন ত হবেই।

সামান্য কাদা-মাটি প্রদীপটার গায়ে লেগে আছে বটে, তাও বিশেষ এমন কিছু নয়।

পকেট হতে একটা রুমাল বের করে প্রদীপটা বার-দুই ভাল করে ঘষা-মাজা করতেই ঘনায়মান সন্ধ্যার ম্রিয়মাণ আলোতেও প্রদীপটা যেন ঝকমক করতে লাগল।

কি ধাতু দিয়ে গড়া প্রদীপটা কে জানে? স্বর্ণও নয়, রৌপ্যও নয়, তাম্রও নয়, পিতলও নয়। কোন মিশ্রিত ধাতু দিয়ে নির্মিত বলেই মনে হয়। আর প্রদীপের গায়ে কি অপূর্ব শিল্প-চাতুর্য! ময়ূর, নগ্ন তরুণী, পদ্মের মৃণাল ও কুঁড়ির অপূর্ব শিল্পিপ্রতিভা যেন প্রদীপটির গায়ে সজীব বলেই মনে হয়।

সেদিনকার মত কাজ বন্ধ করে ডাঃ সরকার অমিয়কে সঙ্গে নিয়ে প্রদীপটি হাতে তাঁবুতে ফিরে এলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার কালো পক্ষ বিস্তার করে প্রকৃতির বুকে ঘন হয়ে নেমেছে।

সম্মুখে-পশ্চাতে দক্ষিণে-বামে ধূধূ প্রান্তর—প্রান্তর-লক্ষ্মীর শান্ত সৌন্দর্যকে বিদীর্ণ করেছে অনুসন্ধানী প্রত্নতাত্ত্বিকের ইস্পাতের নিষ্ঠুর তীক্ষ্ণ ফলা। ক্ষত-বিক্ষত করেছে অনুসন্ধানীর তীক্ষ্ণ বাঁকানো নখর, যেন বহুযুগ শান্ত-শীতল ঘুমন্ত মাটিকে তার কুক্ষিতলে সংগুপ্ত বিলুপ্ত অতীতকে উদ্ঘাটিত করবার জন্য। খনন করা স্থানগুলো জায়গায় জায়গায় যেন কুৎসিত ক্ষতের মতই ঘনায়মান অন্ধকারে ক্ষুধিত লালসায় দানবের মতই মুখব্যাদান করে আছে। ভূতপ্রেত মহাবীর

. হ্যারিকেনটা জেলে নিয়ে এসে তাঁবুর মধ্যে ঢুকতেই ডাঃ সরকার তাঁবুর ঠিক সামনে বাইরের অন্ধকারে একটা ক্যাম্বিশের চেয়ার পেতে তাঁবুর ঠিক দরজার মুখেই আড় হয়ে শুয়েছিলেন, মহাবীরকে সম্বোধন করে বললেন, 'মহাবীর, হ্যারিকেনের আলোটা আজ থাক। রান্নার জন্য সরষের তেল আছে না ?'

'জি।'

'যা, সেই তেলের বোতলটা নিয়ে আয়—আর খানিকটা ন্যাকড়া নিয়ে আয়।—'

মহাবীরের বাড়ী ছাপরা জিলাতে হলেও দীর্ঘ পনের বৎসর কাল আজ ডাঃ সরকারের সঙ্গে থেকে চমৎকার বাঙ্গলা বলতে পারে। প্রভুর অদ্ভুত আদেশ শুনে সে বেশ একটু বিস্মিতই হয়। জিজ্ঞাসা করে, 'তেলের বোতল দিয়ে কি হবে বাবু ?'

'যা না। যা বলছি তাই শোন। হাঁ, আর দেখ, অমিয় বাবুকে একবার ডেকে দিয়ে যা।'

একটু পরে প্রায় একই সময়ে মহাবীর তেলের বোতল ও ন্যাকড়ার একটা টুকরো হাতে এবং অমিয় সামনে এসে দাঁড়াল।

'আমাকে ডাকছিলেন স্যার ?'

'কে অমিয়, এসো ! সলতে পাকাতে জান ?'

'সলতে ?—' বিস্মিত অমিয় ডাঃ সরকারের মুখের দিকে তাকায়।

'হাঁ, সলতে—প্রদীপের সলতে। আজ আর তাঁবুতে আমার হ্যারিকেনের আলো রাখবো না। তোমার সেই মাটির তলা থেকে খুঁড়ে পাওয়া প্রদীপটিই জ্বালাবো। কেমন হবে বল ত ?'

ডাঃ সরকারের বয়স হলেও তাঁর মধ্যে যে একটা কৌতুক ও রহস্যপ্রিয় শিশু-প্রকৃতি আছে, মাস ছয় তাঁর সঙ্গে কাজ করে অমিয়র সেটা অবিদিত ছিল না।

'বেশ ত। মন্দ হবে না স্যার !'—অমিয় ডাঃ সরকারের প্রস্তাবে রাজীই হয়। মধ্যে মধ্যে ডাঃ সরকারের এমনই অদ্ভুত সব খেয়াল মনে জাগে।

অপটু হস্তে অনেকক্ষণ ধরে অমিয় ও ডাঃ সরকার মোটা মোটা করে কয়েকটা সলতে পাকালেন ছেঁড়া ন্যাকড়াটার সাহায্যে।

প্রদীপটায় তেল ঢালা হলো—সলতে সেই তেলে ডুবিয়ে সলতের ডগায় আগুন দেওয়া হলো। পিট্-পিট্ কিছুক্ষণ শব্দ করে অবশেষে প্রদীপ জ্বলে উঠলো।

মৃদু ঈষৎ নীলাভ একটা আলোয় তাঁবুর ভিতরটা কেমন যেন স্নিগ্ধ করুণ হয়ে উঠেছে। মৃদু মৃদু কাঁপছে প্রদীপের ভীরু শিখাটি। মন্ত্রমুগ্ধের মতই তাকিয়ে থাকেন প্রজ্বলিত প্রদীপ-শিখাটির দিকে ডাঃ সরকার।

বাইরের বৃষ্টি অনেকক্ষণ থেমে গিয়েছে, তাঁবুর খোলা দরজা-পথে প্রান্তরবাহিত শীতল বায়ুপ্রবাহ ক্ষণে ক্ষণে ভিতরে এসে প্রবেশ করছে।

'তুমি ত একজন সাহিত্যিক অমিয় !'

'আজ্ঞে—' ডাঃ সরকারের সম্বোধনে হঠাৎ যেন অমিয় চমকিয়েই ওঁর মুখের দিকে তাকায়।

'তুমি ত একজন সাহিত্যিক। প্রদীপটা জ্বলতে দেখে তোমার কিছু মনে হচ্ছে না ?'

ইতিমধ্যে দু'জনেই পাশাপাশি দু'টো চেয়ারে উপবেশন করেছিলেন। অমিয় পার্শ্বে উপবিষ্ট ডাঃ সরকারের মুখের দিকে তাকাল। ডাঃ সরকারের দক্ষিণ গণ্ডের খানিকটা প্রদীপের আলোয় দেখা যাচ্ছে, বাকী অংশটুকু মুখের কেমন যেন অস্পষ্ট, যেন আলো-ছায়ার একটা লুকোচুরি।

মহাবীর ডাঃ সরকারের সামনে একটা ছোট্ট টুল বসিয়ে তার উপরে হুইস্কীর বোতল, একটা কাচের গ্লাস ও সোডা সাইফনটা নামিয়ে রেখে গেল।

ডাঃ সরকার গ্লাসে হুইস্কী ঢেলে সোডা সাইফন থেকে খানিকটা সোডা মিশিয়ে নিয়ে অমিয়র দিকে তাকিয়ে বললেন: 'কি হে অমিয়নাথ, like to have a peg ?'

'না স্যার, ধন্যবাদ।'

একটা মৃদু চুমুক দিয়ে গ্লাসটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলেন ডাঃ সরকার। আবার অদূরে টেবিলের ওপর রক্ষিত প্রজ্বলিত প্রদীপটির দিকে তাকালেন।

'আজ দুপুরে একটা শিলালিপির পাঠ উদ্ধার করছিলাম। প্রায় হাজার বছর আগেকার কথা। যত দূর মনে হচ্ছে, এখানে বোধ হয় একটা বৌদ্ধ-বিহার ছিল। আচ্ছা, এমনও ত হতে পারে, আমরা যে প্রদীপটি আজ মাটি থেকে খুঁড়ে উদ্ধার করেছি একদা ঐ প্রদীপটিই সন্ধ্যায় জ্বালিয়ে ভগবান তথাগতের সন্ধ্যারতি করা হতো। সারাটা রাত ধরে জ্বলত প্রদীপ-শিখাটি।'

অমিয় ছেলেটি সাহিত্যিক হলেও অত্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক। মৃদু হেসে বললে: 'আশ্চর্য্য কি, হতেও পারে।'

ডাঃ সরকার আবার কিছুক্ষণ চুপ করেই রইলেন কম্পিত প্রদীপ-শিখাটির দিকে অন্যমনা হয়ে তাকিয়ে। তাঁবুর মধ্যে একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা যেন থম্‌থম্ করছে। বাইরের প্রান্তরে অন্ধকার রাত একটু একটু করে বাড়ছে। তাঁবুর কোণে টেবিলের ওপর রক্ষিত রেডিয়াম ডায়েল দেওয়া ক্লকটা টিক্‌টিক্ শব্দ করে চলেছে একঘেয়ে। সময়-সমুদ্রের হৃদ্‌স্পন্দন যেন ওটা।

হঠাৎ আবার ডাঃ সরকার বলে উঠলেন, 'লক্ষ্য করে দেখো অমিয়, একটা কেমন অদ্ভুত নীলাভ আলো প্রদীপের শিখাটা থেকে বের হচ্ছে।'

'কোথায় স্যার?'

'দেখতে পাচ্ছ না, আশ্চর্য্য! ভাল করে চেয়ে দেখো।'—ডাঃ সরকার আবার বললেন।

অমিয় একবার আড়-চোখে ডাঃ সরকারের সম্মুখস্থিত টেবিলে রক্ষিত পেগ গ্ল্যাসটার দিকে তাকাল। প্রথম পেগটা নিঃশেষিত হবার পর ডাক্তারের দ্বিতীয় পেগ চলছে।

'দেখ ভাল করে চেয়ে, দেখো অদ্ভুত একটা চাপা নীল আলোয় সমস্ত তাঁবুটা কেমন ভরে গিয়েছে।'

মহাবীর এসে জানাল রাত্রির আহার্য প্রস্তুত।

দুই

আজকে রাত্রে চোখে বোধ হয় আর ঘুম আসবে না।

এমনি অনেক রাত ডাঃ সরকারের নিদ্রাহীন কেটে যায়। কখনো তাঁবুর মধ্যে সারা রাত আলোর সামনে বসে কোন বই পড়ে কাটিয়ে দেন, কখনো বা তাঁবুর বাইরে পায়চারী করে-করেই রাত কেটে যায়। রাত ক'টা হলো? চেয়ে দেখলেন রাত প্রায় সাড়ে বারটা।

গ্লাসে খানিকটা হুইস্‌কী ঢেলে নিয়ে তা থেকে এক সীপ খেয়ে আরাম-কেদারাটার উপর গা এলিয়ে দিলেন ডাঃ সরকার। কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই চোখের দৃষ্টিটা গিয়ে যেন প্রদীপ-শিখাটার উপরে পড়ল।

প্রদীপটা এখনো জ্বলছে।

কি আশ্চর্য! প্রদীপের আলোটা ত নীলই; অমিয় দেখতে পেল না কেন? দোষ নেই অমিয়র। চোখ নেই ওদের তা দেখবে কি!

ক্লান্তিতে চোখের পাতা দু'টো বুজিয়ে মনের মধ্যে ডুব দিলেন ডাঃ সরকার। কত বয়স হলো তাঁর। প্রায় পঞ্চান্ন। দীর্ঘ এই পঞ্চান্নটা বছরের মধ্যে শেষের একুশটা বৎসর কি গুরু পরিশ্রমই না করেছেন তিনি! বাইরে থেকে অবশ্য তাঁর কর্মঠ রুক্ষ চেহারাটা দেখলে সকলেই ভাবে তাঁর বর্তমান জীবনধারাই যেন তাঁর জীবনের রস ও গন্ধটুকু নিংড়ে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়েছে। গম্ভীর। খুব কম কথা বলেন। ডিপার্টমেণ্টে এমন লোক নেই তাঁকে শ্রদ্ধা বা সমীহ করে না। তাঁর বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্য অভিজ্ঞতার প্রতি কি শ্রদ্ধাই না সকলের! বাইরেটাই লোকে তাঁর দেখে, তাঁর মনের মধ্যে যে একটা পিপাসার্ত ক্লিষ্ট পরিশ্রান্ত...

সহসা যেন চম্‌কে চোখ মেলে তাকালেন ডাঃ সরকার। কে যেন অত্যন্ত ভীরু লঘু পা ফেলে-ফেলে এইমাত্র তাঁর পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। কিন্তু কই? কোথায়ও ত কেউ নেই। তাঁবুর মধ্যে একাকী তিনিই আরাম-কেদারাটার উপরে শুয়ে আছেন। আশ্চর্য! স্পষ্ট শুনেছেন তিনি অত্যন্ত লঘু হলেও পদশব্দ; তাঁবুর দরজাটা ত ভেজানই আছে। কেদারাটা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ইতস্তত অনুসন্ধানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন: না। কেউ না।

অথচ লঘু হলেও স্পষ্ট কারো পদশব্দ তিনি শুনেছেন। কি জানি, আবার মনে হয়, হয়ত মনেরই ভুল।

আরাম-কেদারাটার উপরে উপবেশন করলেন ডাঃ সরকার।

পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র যখন—প্রতিমার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয় অধ্যাপক ডাঃ বোসেরই বাড়ীতে এক সন্ধ্যায়। ডাঃ বোসেরই জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিমা। কালো দেখতে হলে কি হবে, অদ্ভুত একটা দেহশ্রী ছিল প্রতিমার। প্রদীপের ঐ নীল আলোটির মতই স্নিগ্ধ, ভারী মিষ্টি। মনে পড়ছে, কি দুর্জ্জয় অভিমান ছিল প্রতিমার! শেষ দেখা প্রতিমার সঙ্গে—পাশ করবার বছর দুই পরে ডাঃ বোসেরই চেষ্টায় ও সুপারিশে চাকরী পেয়ে দিল্লীতে যাচ্ছেন। যাত্রার আগের দিন ডাঃ বোসের বাড়ীর এক নিভৃত কক্ষে প্রতিমার সঙ্গে দেখা হলো। প্রতিমার ইচ্ছা ছিল, ঐ মুখেই বিবাহের ব্যাপারটা চুকিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সে দিল্লীতে যায়। কিন্তু তিনি বলেছিলেন মাস পাঁচেক বাদে ছুটি নিয়ে এসে মাঘ মাসে কি ফাল্গুনে তিনি বিবাহ করবেন।

প্রতিমা বলেছিল, 'বেশ যাও। আর ফিরে এসে প্রতিমাকে তুমি খুঁজে পাবে না।'

জবাবে তিনি বলেছিলেন: 'ওগো মানিনি! পাঁচটা মাস অপেক্ষা করো অধীন আবার এসে হাজির হবে ঐ চরণতলে।'

কিন্তু পাঁচ মাসও কাটেনি। তিন মাসের মাথাতেই সহসা একদিনের জ্বর-বিকারে প্রতিমা ইহজগৎ থেকে চিরবিদায় নিয়েছিল অকস্মাৎ।

অনেকগুলো চিঠিই লিখেছিল প্রতিমা তাঁকে, কিন্তু কি দুর্জ্জয় অভিমান! একখানা চিঠিতে ভুলেও সে তাকে আসবার কথা লেখেনি।

এ অপেক্ষার কি শেষ হবে না কোন দিন? একে একে একুশটা বছর পার হয়ে গেল। আর কত কাল অপেক্ষা করতে হবে প্রতিমা!

'আমি এসেছি!—' ভীরু একটি কণ্ঠস্বর যেন ঠিক পাশেই শোনা গেল। আর সেই সঙ্গে ক্ষীণ লঘু পদসঞ্চার।

স্পষ্ট! হাঁ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে ভীরু সতর্ক পদবিক্ষেপে কে যেন তাঁরই আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চোখ দু'টো বুজিয়েই রাখেন ডাঃ সরকার, এসেছে কেউ নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে তাঁর তাঁবুর মধ্যে। চোখ খুললেই যদি আগের মত আবার পালিয়ে যায়!

তিন

'সত্যিই কি তুমি এসেছো—?'

'কেন, টের পাওনি যে আমি এসেছি?'

'পেয়েছি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না যে!'

'কেন বল ত? কেন বিশ্বাস করতে পারছো না?'

'সত্যিই যদি এসেছো, কই আমাকে স্পর্শ কর ত? আমার কপালে তোমার আঙুলটা একটি বার ছুঁইয়ে যাও।'

'স্পর্শ করলেও ত তুমি টের পাবে না আজ আর—' কথাটা কেমন যেন একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের মতই শোনায়।

'কেন! কেন টের পাবো না?'

'কেন? যে স্পর্শের ভিতর দিয়ে একদিন তুমি আমায় অনুভব করতে, তোমার মনের কামনাকে জাগিয়ে তুলতে, সে আগুন ত আজ আর আমার মধ্যে নেই—'

কিছুক্ষণ আবার স্তব্ধতা।

'তুমি কি চলে গেলে?'

'না।'

সত্যি তুমি কে বলবে?'

'চেয়েই দেখো না আমি কে?—'

'চোখ খুললেই যদি তুমি হঠাৎ আবার পালিয়ে যাও?'

প্রত্যুত্তরে সুমিষ্ট একটা হাসির ঝর্ণা যেন ছলছলিয়ে উঠলো। সেতারের তারে কে যেন মৃদু করাঙ্গুলীতে ঝঙ্কার জাগাল।

'এত ভয়?'

'না, ভয় নয় ত?'

'তবে? কই চোখ খুলে চাও!—'

একেবারে পাশ ঘেঁষে এসে যেন সে দাঁড়াল,—মৃদু কাপড়ের একটা খস্‌খসানি, সেই সঙ্গে মৃদু একটা সৌরভ।

'তুমি কি প্রতিমা?'

'প্রতিমা পারুল প্রিয়া প্রিয়তমা যে নামে ডেকে তুমি খুসী হও আমি সেই।—'

'সত্যি। সত্যি তুমি সেই! সত্যি তুমি এসেছো?—'

'এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না? চেয়েই দেখো না।—'তার পর একটু থেমে যেন আবার বলে,—'আসবো না? তুমি যে আমাকে এতক্ষণ মনে মনে ডাকছিলে, তুমি ডাকলে আমি কি না এসে থাকতে পারি? যখনই তোমরা ডাক তখনই যে আমরা আসি। সর্বক্ষণ যে তোমাদের সাথে সাথে পাশে পাশেই আছি,—চিরদিন তোমাদের পাশে পাশেই থাকি। সেই তুমি সেই আমি।—'

আবার স্তব্ধতা কিছুক্ষণ। বাইরের প্রান্তরে রাত্রি আরো গভীর হয়।

'শুনছো—?'

'কি?'

'আমার প্রদীপটা এবারে ফিরিয়ে দাও!'

'প্রদীপটা! ওঃ, প্রদীপটা বুঝি তোমার?'

'হাঁ। তাড়াতাড়ি দাও, আমি চলে যাই। সে অপেক্ষা করছে বাইরে—'

'কে? কে অপেক্ষা করছে বাইরে?'

'কালভৈরব।'

'কালভৈরব কে সে?'

'কালভৈরব কে, চেন না? তোমার কাছ থেকে সেই ত আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সেই ত তোমার কাছে আর আমাকে আসতে দেয় না! 'আর দেরী করো না, প্রদীপটা দাও।'

'প্রদীপ দিয়ে তুমি কি করবে?'

'এর মধ্যেই সব ভুলে গেলে রঞ্জন? মনে পড়ে না তোমার, নাচের সভার এক পাশে বসে তুমি তোমার বীণাটি বাজাতে, আসরের এক কোণে প্রদীপাধারের উপর জ্বলত ঐ প্রদীপটা, প্রদীপের আলোয় আমি নাচতাম! রঞ্জন! মনে পড়ছে?'

বহু দূর থেকে কে যেন ডাকছে, রঞ্জন! রঞ্জন! রঞ্জন!

কত যুগ! কত যুগ আগে।

রাজা ইন্দ্রজিতের নৃত্যশালা।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। এইবারে শুরু হবে চন্দনার নৃত্য। নৃত্যশালার বড় বড় ঝাড়বাতিগুলো একে একে নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে সুদৃশ্য কারুকার্যময় রৌপ্য-নির্মিত প্রদীপদানের উপর বিশেষ প্রদীপটি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে সুগন্ধ তৈলে। সোনার কাজ-করা পুরু মখমলের গদির উপরে রাজাধিরাজ ইন্দ্রজিত অর্ধশায়িত ভাবে দেহের ভার রেখেছেন সম্মুখের একটি রেশমী ঝালর-দেওয়া তাকিয়ার ওপর। রাজাধিরাজের সর্বাঙ্গে বহু মূল্যবান সব অলঙ্কার, গলায় মুক্তাহার, কর্ণে কর্ণভূষণ, মণিবন্ধে প্রবাল ও হীরাখচিত সুবর্ণ-বলয়। সম্মুখে রৌপ্যথালিতে সুরাপাত্র। অন্য একটি থালিতে সুগন্ধি পুষ্প। ধূপাধার হতে চন্দন-ধূপের গন্ধ কক্ষের বায়ুতরঙ্গে আতর ও পুষ্পগন্ধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে।

পার্শ্বে উপবিষ্ট সখা সুমন্তকে সম্বোধন করে ইন্দ্রজিত মদালস কণ্ঠে বললেন, 'এখনো চন্দনা এসো না কেন সুমন্ত? রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, এখনো কি নৃত্যশালায় তার আসবার সময় হলো না?'

অদূরে বসে রাজাধিরাজের প্রিয় বীণবাদক রঞ্জন বীণখানি সম্মুখে রেখে মধ্যে মধ্যে তারের গায়ে মৃদু করাঙ্গুলীঘাত করছিল। তরুণ যুবক রঞ্জন। বয়ঃক্রম চতুর্বিংশর বেশী হবে না।

অপূর্ব লাবণ্যময় দেহশ্রী রঞ্জনের। খড়্গের ন্যায় উন্নত নাসা, প্রশস্ত কপাল, টানা-টানা দু'টি ভাবালস চক্ষু। ধনুকের ন্যায় বাঁকানো যুগ্ম ভ্রূ। সর্বাপেক্ষা সুন্দর তার মৃণালের মত নিটোল দু'টি বাহু ও লম্বা বাঁকান অংগুলিগুলি। নৃত্যশালায় চন্দনার আবির্ভাব ঘটে মাত্র সপ্তাহে দু'টি রাত্রি। বুধ ও শনি। অন্যান্য রাত্রিতে রঞ্জন রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরের আগেই তার বীণখানি হাতে করে নৃত্যশালা ত্যাগ করে চলে যায়, কেবল যে রাত্রে চন্দনা নৃত্য করে সেই দু'টি রাত্রে যতক্ষণ সে নৃত্য করে রঞ্জন বিভোর হয়ে বীণ বাজায় চন্দনার নৃত্যের তালে-তালে। মধ্যে মধ্যে নৃত্যরতা চন্দনা যখন বিলোল কটাক্ষে রঞ্জনের দিকে দৃষ্টিপাত করে, রঞ্জনের অংগুলিগুলি তারের উপর কেমন যেন অবশ হয়ে আসে। ব্যাপারটা অত্যন্ত ক্ষণিকের হলেও এবং অন্য কারো দৃষ্টিপথে না পড়লেও সঙ্গীত-বিলাসী রাজা ইন্দ্রজিতের চক্ষু ও কর্ণকে কিন্তু এড়ায়নি। তাই মধ্যে মধ্যে তিনি রঞ্জনকে পরিহাস-কৌতুকে লজ্জা দেন। আজও তেমনি কৌতুকমিশ্রিত কণ্ঠে রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রঞ্জন, চন্দনার আসতে বিলম্ব হচ্ছে, বীণ বাজিয়ে তাকে আহ্বান করো—'

সহসা এমন সময় নূপুরের ঝুনুঝুনু শব্দ কক্ষের বাইরে অলিন্দে শোনা গেল।

মৃদু হেসে রঞ্জন বললে, 'মহারাজ, আর আহ্বান জানাতে হবে না, ঐ শুনুন তার নূপুরের আওয়াজ।'

সত্যি। পরমুহূর্তেই চন্দনার আবির্ভাব ঘটলো কক্ষে।

নৃত্যপটীয়সী চন্দনা। সর্বাঙ্গ একখানা সূক্ষ্ম নীলবর্ণের রেশমী ওড়নায় ঢেকে এসেছে। সূক্ষ্ম রেশমী ওড়নার অন্তরাল হতে যেন চন্দনার অপূর্ব দেহবল্লরী কামনার অগ্নি-হিল্লোল তুলছে।

মদালস চরণক্ষেপে ঝুনুঝুনু নূপুরের শব্দ জাগিয়ে চন্দনা এগিয়ে গিয়ে লীলায়িত ভঙ্গীতে ঈষৎ হেসে ইন্দ্রজিতকে প্রণাম জানাল। তারপর কেশের মধ্যে গোঁজা একটি রূপার কাঠি টেনে খুলে নিয়ে এগিয়ে গেল প্রদীপাধারটির দিকে। ঈষৎ উসকে দিল শিখাটি। একবার বাঁকানো দৃষ্টিতে তাকাল রঞ্জনের দিকে। সকলেরই মুগ্ধ দৃষ্টি চন্দনার উপরে, কেবল রঞ্জন যেন কিছু অন্যমনস্ক। অন্যমনে সে সম্মুখে রক্ষিত বীণের তারে মৃদু ভাবে অংগুলির স্পর্শে সুর সৃষ্টি করছে।

নৃত্য হলো শুরু। সেই সঙ্গে রঞ্জনের বীণও ঝঙ্কার তোলে।

নূপুরের মিঠা আওয়াজ, বীণের সুরতরঙ্গে যেন চন্দনার নৃত্যরতা লীলায়িত দেহের প্রতিটি ভঙ্গী আগুনের শিখার মতই জ্বলতে থাকে।

প্রথম নৃত্যটি সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অকস্মাৎ রঞ্জন তার বীণটি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। সকলেরই বিস্মিত নির্বাক্ দৃষ্টি একই সঙ্গে গিয়ে দণ্ডায়মান রঞ্জনের উপরে পতিত হলো।

প্রশ্ন করলেন রাজা ইন্দ্রজিত: 'এ কি রঞ্জন, উঠলে যে?'

'আমাকে আজ ক্ষমা করুন মহারাজ। শরীরটা সহসা কেমন যেন আমার অসুস্থ বোধ হচ্ছে।'

'অসুস্থ!—'

সপ্রশ্ন নির্বাক্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চন্দনা রঞ্জনের দিকে। কিন্তু রঞ্জনের সে দিকে দৃষ্টি নেই।

'মহারাজ, আমাকে আজকের রাতের মত ছুটি দিন।'

'অসুস্থ যখন, যাও তুমি রঞ্জন!'

একমাত্র রঞ্জনের বীণের সঙ্গতের অভাবেই চন্দনার দ্বিতীয় নৃত্য সে রাত্রে আর যেন জম্‌লো না। দ্বিতীয় বার নৃত্য করতে গিয়ে দু'-তিন বার তার তাল কেটে গেল।

মহারাজ ইন্দ্রজিত মধুর কৌতুক হাস্যের সঙ্গে বললেন, 'চন্দনা, তুমি পারবে না আজ আর নাচতে। আজ তোমাকেও আমি ছুটি দিলাম—যাও।'

উদ্যানের মধ্যবর্তী পথ।

উদ্যান-দ্বারের বহির্দেশে কালভৈরব তার অপেক্ষায় আছে দাঁড়িয়ে। নিঃশব্দে অন্যমনস্ক ভাবে এগিয়ে চলছিল চন্দনা উদ্যান-পথ ধরে। রাত্রি তৃতীয় প্রহরও উত্তীর্ণ-প্রায়। আকাশের পশ্চিম প্রান্তে অস্তগমনোন্মুখী রাতের চাঁদ। চারি পাশের গাছপালার উপরে স্তিমিত চাঁদের আলো যেন বিবশার মত এলায়িতা।

'চন্দনা!'

সহসা ডাক শুনে চম্‌কে দাঁড়ায় চন্দনা।

পার্শ্ববর্তী মল্লিকা-ঝোপের অন্তরাল হতে বীণ হাতে বের হয়ে এলো রঞ্জন।

'রঞ্জন! তুমি এখনো গৃহে যাওনি?'

'না চন্দনা। তোমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি—'

চন্দনা চুপ করেই দাঁড়িয়ে থাকে।

রঞ্জন আবার ডাকে: 'চন্দনা!'

'বল?'

'এমনি করে আর কত দিন আমাকে প্রতীক্ষা করতে হবে চন্দনা? একটি বার তুমি অনুমতি দাও, মহারাজ ইন্দ্রজিতকে আমি বলি, তোমাকে—চন্দনাকে আমি বিবাহ করতে চাই—'

'না, না—রঞ্জন! কালভৈরব জানতে পারলে আমাদের দু'জনকেই একসঙ্গে হত্যা করবে।'

'কালভৈরব! কালভৈরব! কেন এত ভয় তোমার চন্দনা কালভৈরবকে?'

'তুমি ত জান, এ রাজ্যের মহাকালের মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সে। অসম্ভব তার ক্ষমতা! অমিত তার পরাক্রম। বলতে গেলে এ রাজ্যের সেই ত সর্বেসর্বা! তার বিরুদ্ধে কথা বলে স্বয়ং মহারাজ ইন্দ্রজিতেরও সাধ্য নেই।'

'কিন্তু তুমি! তুমি যদি রাজী থাকো তাহলে আমি কালভৈরবের—'

'চুপ! চুপ! ও কথা উচ্চারণও করো না রঞ্জন! হাওয়ায় ভেসে যায় কালভৈরবের কানে কথা।—গোখরো সাপের চাইতেও সাংঘাতিক নিষ্ঠুর!—ঘূণাক্ষরেও ও যদি জানতে পারে তাহলে আমাদের এই দেখা-সাক্ষাৎটুকুও ও বন্ধ করে দেবে।'

ভিটামিন্‌সমূহ

আপনার হৃদ্‌পিণ্ড, রক্ত, হাড় মাংস প্রভৃতি সব ক'টিরই দরকার করে রকমারি খাদ্যউপাদান, অর্থাৎ কী না এদের প্রয়োজন **সমন্বয়যুক্ত খাদ্যের** যাতে প্রতিদিন এই পাঁচটি খাদ্য উপাদান থাকা চাই-ই:- (১) **ভিটামিন্‌সমূহ,** সুস্থ রক্ত ও রোগ এড়াবার জন্যে; (২) **আমিষজাতীয়খাদ্য,** স্নায়ু পুণর্গঠনের জন্যে; (৩) **খনিজপদার্থসমূহ,** হাড়, দাঁত এবং শরীর বৃদ্ধির জন্যে; (৪) **শর্করাজাতীয়খাদ্য,** দেহের আশু ইন্ধনের জন্যে; (৫) **স্নেহপদার্থ,** স্থিতিশীল দৈনিক শক্তির জন্যে। সর্বোৎকৃষ্ট স্নেহ-উপাদান গুলির মধ্যে ডাল্‌ডা অন্যতম। যে কোনও রকম রান্নায় সর্বোত্তম, ডাল্‌ডা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যদায়ী আর শীলকরা টিনে নির্ম্মল ও নিরাপদ অবস্থায় আপনার ঘরে আসে।

সন্তানসম্ভবা স্ত্রীদের কি কোন বিশেষ পথ্যের দরকার হয়?

বিনামূল্যে উপদেশের জন্যে লিখুন-আজই কিম্বা অন্য যে কোনো দিন:-

দি ডাল্‌ডা এ্যাড্‌ভিসারি সারভিস্‌

পো: আ: বক্স্‌ নং ৩৫৩, বোম্বাই ১

সমন্বয়যুক্ত খাদ্যে আপনার প্রয়োজনীয় স্নেহপদার্থ যোগায়

HVM. 177-50 BG

'আজ বুঝতে পারছি চন্দনা, ঐ কালভৈরবই তোমার মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করে রেখেছে—তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না। একটুও না—'

'এত দিন পরে তোমার এই ধারণা হলো রঞ্জন?—তুমি কি জান না, মন্দিরের দেবদাসী আমি, কাউকে আমার ভালবাসাও পাপ, তা সত্ত্বেও তোমাকে আমি মন-প্রাণ সব দিয়েছি?'

'তাই যদি হবে, তবে কেন—কেন আমার প্রস্তাবে তুমি রাজী হচ্ছো না?'

'উপায় নেই চন্দনা—উপায় নেই। সেবাদাসীর ঘর বাঁধা নিয়মবিরুদ্ধ তুমি জান। চিরটা কাল এমনি করেই আমাকে কাটাতে হবে। এই আমার ভাগ্যলিপি। আমার আগেও প্রত্যেক সেবাদাসীকেই ঐ ভাগ্যলিপিই অনুসরণ করতে হয়েছে।'

'নিয়মের কি ব্যতিক্রম নেই?'

'না। সেবাদাসীর জীবনে দ্বিতীয় আর কোন পথই নেই।'

'তবু—তবু আমি প্রতীক্ষা করবো চন্দনা! তোমাকে আমার পেতেই হবে।'

'আমি ত তোমারই আছি রঞ্জন!'

'না, না—অমনি করে পাওয়া নয়। একান্ত সর্ব্বতোভাবে আমারই নিজস্ব করে তোমাকে আমি পেতে চাই চন্দনা! প্রতি মুহূর্তে প্রতি পলে সর্বক্ষণ পাশে-পাশে তোমাকে আমি পেতে চাই। তোমার আমার মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মত এমনি করে ঐ কালভৈরব দাঁড়িয়ে থাকবে না।'

সহসা এমন সময় দু'জনেই চমকে ওঠে। ইতিমধ্যে কখন এক সময় নিঃশব্দে ছায়ার মতই কালভৈরব ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বিরক্তিমিশ্রিত রুক্ষ গলায় কালভৈরব ডাকে: 'চন্দনা!'

চন্দনা যেন বোবা পাথর হয়ে গিয়েছে।

'হুঁ! এতক্ষণে উপলব্ধি করছি নৃত্যশালা হতে ফিরতে প্রতিবার তোর এত বিলম্ব হয় কেন?'—এবং পরক্ষণেই রঞ্জনের দিকে রোষকষায়িত লোচনে তাকিয়ে প্রশ্ন করে: 'কে তুই?'

'আমি রঞ্জন। নৃত্যশালার বীণবাদক।'

'হুঁ! কিন্তু এ দুঃসাহস কেন তোর? দেবভোগ্যা নারীর প্রতি দৃষ্টি দেবার দুঃসাহস কেন হলো তোর?—কি ধৃষ্টতা! মৃত্যুর ভয় নেই তোর? দূর হ এখুনি আমার সম্মুখ হতে। পুনরায় যদি কোন দিন তোকে চন্দনার প্রতি দৃষ্টি দিতে দেখি, মৃত্তিকা-তলে অন্ধকূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখে দেবো। অনাহারে অন্ধকারে তিল-তিল করে মৃত্যুকে বরণ করতে হবে।'

অতঃপর লৌহ-মুষ্টিতে চন্দনার একখানা হাত ধরে সবলে আকর্ষণ করে এক প্রকার টানতে টানতেই কালভৈরব নিয়ে গেল তাকে। প্রস্তর-মূর্ত্তির মতই নিঃশব্দ নিষ্প্রাণ দাঁড়িয়ে থাকে রঞ্জন। নিরুপায় ক্রোধ ও দুর্জ্জয় আক্রোশ-বহ্নিতে সমস্ত অন্তর তার জ্বলতে থাকে। নিষ্ঠুর দানবীয় একটা জিঘাংসায় ছুটে গিয়ে শয়তানটার গলা টিপে এখুনি হত্যা করতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু কেন যেন এক পাও নড়তে পারে না রঞ্জন। চরণের সমস্ত গতিশক্তিই যেন তার কে হরণ করে নিয়েছে।

চার

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

সেই সন্ধ্যা হতেই সমস্ত আকাশটা মেঘে-মেঘে একেবারে কালো হয়ে আছে। সূচীভেদ্য অন্ধকারে দৃষ্টি যেন অন্ধ হয়ে যায়। নগরের প্রান্তে নদীতীরবর্তী ছোট একখানা চালা ঘর: চণ্ডের কামারশালা। হাপরের সাহায্যে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে একটি লৌহখণ্ডকে লোহার একটা চিমটার অগ্রভাগ দিয়ে চেপে ধরে উত্তপ্ত করছিল চণ্ড। বিশাল দৈত্যের মত চেহারা চণ্ডের। প্রশস্ত কপাল, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া একমাথা চুল, চাপদাড়ি, গোলাকার রক্তবর্ণ দু'টি অক্ষিগোলক। রোমশ পেশল বাহু। রক্তবর্ণ উত্তপ্ত লৌহখণ্ডটা একটা লোহার দণ্ডের উপরে রেখে বড় একটা লোহার হাতুড়ির সাহায্যে ঠংঠং শব্দে পিটতে শুরু করল চণ্ড।

এ রাজ্যে চণ্ডের মত অস্ত্র তৈয়ারী করতে কেউ পারে না। তার মত সুদক্ষ অস্ত্রশিল্পী বড় একটা দেখা যায় না। অস্ত্রনির্মাণ ছাড়াও আর একটি গুণ ছিল চণ্ডের: ভেষজ বিষজ্ঞানও তার অদ্ভুত।

বাইরে কার চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেল: 'চণ্ড! চণ্ড!'

প্রথমটায় চণ্ড শুনতে পায় না। তিন-চার বার ডাকবার পর ডাকটা তার কানে গেল: 'কে?'

'আমি রঞ্জন।'

'আরে রঞ্জন বীণবাদক, এসো এসো!'

চণ্ডের সঙ্গে রঞ্জনের পূর্ব হতেই যথেষ্ট পরিচয় ছিল। বীণবাদক তরুণ যুবকটিকে চণ্ড বড় স্নেহ করত। চণ্ডের আহ্বানে রঞ্জন কামারশালায় এসে প্রবেশ করল।

'রঞ্জন যে এত রাত্রে! কি সংবাদ?'

'আমাকে একটা ভাল দেখে ছোরা বানিয়ে দিতে পার চণ্ড!—'

'ছোরা! ছোরা দিয়ে কি হবে রঞ্জন? বীণ-বাজিয়ে তুমি, সংগীতের কারবারী—অস্ত্র দিয়ে কি করবে?'

'প্রয়োজন আছে। খুব পাতলা হবে ছোরাটা, কিন্তু ফলাটা হবে তার তীক্ষ্ণ সূচ্যগ্র একেবারে অব্যর্থ!'

'কিন্তু প্রয়োজনটা কিসের রঞ্জন?'

'তা শুনে তোমার প্রয়োজনটা কি? দেবে কিনা তৈরী করে তাই বল?—' চণ্ডকে চুপ করে থাকতে দেখে রঞ্জন আবার বলে: 'আর—আরো একটা কথা আছে—' রঞ্জন ইতস্তত করতে থাকে।

'কি—?'

'ছোরার ফলাটা শুধু তীক্ষ্ণ ধারালো করলেই হবে না, ভয়ঙ্কর কোন তীব্র বিষ মাখিয়ে দিতে হবে ছোরাটার ফলায়—'

'যাতে করে আক্রান্ত শত্রুর মুহূর্তে প্রাণনাশ ঘটে, তাই না?'—কথাটা শেষ করল চণ্ড রঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে।

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তোমার আবার কেউ শত্রু আছে নাকি? আমার ত ধারণা ছিল তুমি অজাতশত্রু!'

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে রঞ্জন বলে, 'কবে পাবো তাহলে ছোরাটা?'

'এক পক্ষ কাল পরে—'

'এত দেরী হবে?'

'ছোরাটা তৈরী করতে ত দেরী হবে না কিন্তু তুমি যে বিবের কথা বলছো সেটা আগামী অমাবস্যার রাত্রে ছাড়া মেলে না।'

'বেশ, তাহলে তাই, এক পক্ষ কাল পরেই আমি আসবো।'

'এসো!'

রঞ্জনের কি হয়েছে কে জানে! গৃহ থেকে সে বড় আজকাল একটা বেরই হয় না। এমন কি রাজার নৃত্যশালাতেও সে অনুপস্থিত। সাধের বীণখানি সে কয়দিন ধরে স্পর্শও করেনি।

ইন্দ্রজিত প্রিয় সখা সুমন্তকে জিজ্ঞাসা করেন, 'রঞ্জনের অসুখ কি খুব বেশী সুমন্ত?—নৃত্যশালাতে সে ত ইতিপূর্বে কখনো অনুপস্থিত থাকেনি?—আগামী কাল চন্দনার নৃত্য আছে, রঞ্জন না বীণ বাজালে চন্দনার নৃত্যই ত জমবে না।'

'পূর্বাহ্ণেই আমি সংবাদ নিয়েছিলাম মহারাজ! সে বলেছে কালকের নৃত্যসভাতেও সে আসতে পারবে না।'

'তাই ত! গত দু'-তিন রাত্রি দেখলে ত চন্দনার নৃত্যের মধ্যে কোথায়ও যেন এতটুকু প্রাণের সাড়াও পাওয়া গেল না। রঞ্জনের বীণ সঙ্গে না থাকলে ও নৃত্য করতেই যেন পারে না। তুমি বরং এক কাজ করো সুমন্ত—'

'বলুন মহারাজ?'

'চন্দনাকে জানিয়ে দিও, রঞ্জন পুনরায় সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তারও ছুটি।'

'বেশ, তাই হবে।'

সংবাদটা পেয়ে চন্দনাও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

সত্যি, রঞ্জন নৃত্যশালায় উপস্থিত ছিল না দু'টো রাত্রি, প্রতি পদবিক্ষেপে তার নৃত্যরতা চরণ দু'টি জড়িয়ে গিয়েছে। পায়ে পায়ে তার যে অপূর্ব নৃত্যছন্দ জেগে ওঠে তা সে চেষ্টা করেও জাগাতে পারেনি।

কিন্তু কি হোলো রঞ্জনের? সেই রাত্রির পর আর তার সঙ্গে দেখাও হয়নি। সত্যিই কি রঞ্জন অসুস্থ! কেমন করেই বা রঞ্জনের সংবাদ সে পাবে?

আগামী ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রিতে রাজনৃত্যশালায় বিশেষ উৎসব। তারই আয়োজন চলেছে। নৃত্যের বিশেষ উৎসব এবং বিশেষ আকর্ষণ চন্দনার নৃত্য! এবং রাজ্যের বহু মান্যগণ্য অতিথির সে উৎসবে সমাগম হবে। প্রধান পুরোহিত কালভৈরবও সে নৃত্যের আসরে উপস্থিত থাকবে। চন্দনা পূর্বাহ্ণেই সংবাদ পেয়েছে উৎসবে রঞ্জনও উপস্থিত থাকবে। চন্দনার সমগ্র হৃদয় আনন্দে যেন উদ্বেল হয়ে উঠছিল, বহু দিন পরে আবার রঞ্জনের সাক্ষাৎ মিলবে। একটি মাস রঞ্জনকে না দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটি যুগ! এক যুগ যেন সে রঞ্জনকে দেখেনি। অবশ্য রঞ্জনকে সে ঐ রাত্রে চোখের দেখাই দেখবে মাত্র, তার সঙ্গে কথা বলবার কোন সুযোগই সে পাবে না, কারণ স্বয়ং কালভৈরব সেখানে উপস্থিত থাকবে এবং কালভৈরবের চক্ষের কোন দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া কারোরই সাধ্য নয়। বিশেষ করে আবার সেই রাত্রের [illegible] পর থেকে চন্দনার উপরে কালভৈরবের সদা সতর্ক দৃষ্টি যেন [illegible] প্রহরা দিচ্ছে। যেখানেই সে যাক না কেন, কালভৈরবের গোলাকার রক্তবর্ণ দু'টি চক্ষের দৃষ্টি যেন ছায়ার মতই তাকে সর্বদা অনুসরণ করে ফেরে। কালভৈরবের নাগপাশকে ছিন্ন করবার তার কোন সাধ্যই নেই। জন্মগত অধিকারে যে মুহূর্তে সে তার দরিদ্র পিতামাতা কর্তৃক মহাকালের চরণে উৎসর্গিতা হয়েছে সেই মুহূর্ত হতেই তার জীবন-মরণের ওপরে অধিকার বর্তেছে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত কালভৈরবের। তার বিনিময়ে আজ তার দরিদ্র পিতামাতার আর অন্ন-বস্ত্রের অভাব নেই। মন্দির হতেই তারা যথাযোগ্য সাহায্য পায়। কিন্তু আজ সে সত্যিই যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। সে মুক্তি চায়। মন্দিরের সোনার শিকল আজ সে তার পা থেকে খুলে ফেলতে চায়। সংসারের আর দশ জন নারীর মতই সে চায় নিরালা একটি গৃহকোণ। প্রাচুর্য সে চায় না। চায় শান্তি। চায় সে স্বামী। চায় সন্তান। আপন হস্তে গৃহখানি সে সাজাবে, নিজ হস্তে রন্ধন করে পরিবেশন করবে সে তার স্বামীকে, সন্তানকে।

কিন্তু হায় রে দুরাশা!

মহাকালের চরণতলে লুটিয়ে পড়ে রাত্রির অন্ধকারে সে গোপনে কাঁদে: মুক্তি দাও প্রভু! মুক্তি দাও।

নৃত্যশালা।

নৃত্যশালায় রাজার যত নর্তকী ছিল একে একে তাদের নৃত্য শেষ হয়েছে, এইবারে চন্দনার নৃত্য।

বিশেষ প্রদীপটি জ্বেলে দেওয়া হলো। নৃত্যশালার অন্যান্য বাতিগুলো নির্বাপিত করা হলো। চন্দনা এসে নৃত্যশালায় প্রবেশ করল। সেই নীল বর্ণের রেশমী ওড়না সর্বাঙ্গে তার। সর্পের ন্যায় দু'টি বেণী বক্ষের দু'পাশে লম্বমান। পরিধানেও আজ তার নীল বর্ণের রেশমী সাড়ী। চন্দনাকে মনে হচ্ছিল যেন একটি নীল প্রজাপতির মতই।

রঞ্জন তার আসনে বসে। বীণাটি তার সম্মুখেই রক্ষিত।

রাজা ইন্দ্রজিতের বাম দিকে মাত্র হাত দুয়েকের ব্যবধানে একটি আসনের উপরে বসে প্রধান পুরোহিত কালভৈরব।

চন্দনার নৃত্য শুরু হলো কিন্তু রঞ্জন তখনও তার বীণে সুরঝঙ্কার তোলেনি। নিশ্চিন্ত আলস্যে তার একখানা হাত কেবল বীণের উপরে রক্ষিত।

রাজা ইন্দ্রজিত একবার অদূরে উপবিষ্ট রঞ্জনের দিকে তাকালেন। কিন্তু রঞ্জন নিশ্চুপ।

নৃত্যরতা চন্দনাও তাকাল একবার রঞ্জনের দিকে কিন্তু রঞ্জনের দৃষ্টি যেন কোথায় কোন্ সুদূরে নিবদ্ধ।

ধীরে ধীরে এক সময় রঞ্জন বীণের তারে মৃদু অংগুলি সঞ্চালন করল।

তারের মৃদুমন্দ সুরতরঙ্গ যেন সহসা মূর্চ্ছাভঙ্গে চক্ষুরুন্মীলন করলে।

চন্দনা। অপূর্ব্ব রসে যেন লীলায়িত হয় ওঠে তার দেহভঙ্গিমা। লাস্যে ও [illegible]তে যেন কল-কল্লোলিনী সুরধুনীর মতই মর্মরিত হয়ে ওঠে।

[illegible] মধ্যে উপস্থিত সকলের দৃষ্টিই নিবদ্ধ হয় নৃত্যরতা চন্দনার [illegible]লায়িত দেহের উপর।

এমনি সময় সহসা একটা অর্ধস্ফুট কাতর শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় রাজার অদূরে উপবিষ্ট প্রধান পুরোহিত কালভৈরবের দেহ সম্মুখের দিকে ঢলে পড়ল।

রঞ্জনের বীণখানি মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধ হয়েছিল, সহসা আবার ঝনঝন শব্দে যেন জেগে ওঠে।

ভূপতিত কালভৈরব পার্শ্বে উপবিষ্ট সকলের দৃষ্টিই আকর্ষণ করে: কি হলো? কি হলো?

বিস্মিতা চন্দনার নৃত্যও থেমে গিয়েছে।

সকলেই দেখলে ভূলুণ্ঠিত কালভৈরবের বক্ষে বিঁধে আছে একখানা তীক্ষ্ণধার ছোরা।

যন্ত্রণায় কালভৈরবের দেহ তখনও বারংবার আক্ষেপ করছে। সমস্ত মুখখানা তার নীল হয়ে গিয়েছে।

রাজা ইন্দ্রজিত তার পাশে এসে দাঁড়ালেন: 'কালভৈরব!'

'মহারাজ, গুপ্ত শত্রু আমায়···'

বাকী কথাগুলো আর বলবার অবকাশ পায় না কালভৈরব।

সহসা এমন সময় আর একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। আহত কালভৈরবের দিকে এগিয়ে আসতে গিয়ে চন্দনার রেশমী ওড়নায় আগুন ধরে গেল প্রদীপের আলোটা অসতর্কে তার গায়ের উপরে উল্টে পড়ে গিয়ে, এবং নিমেষে যেন দাউ-দাউ করে ওড়নাটা জ্বলে উঠলো। চন্দনা ভীতা হয়ে গা হতে ওড়নাটা না ফেলে দিয়েই এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে গিয়ে, ওড়না থেকে লাগলো আগুন তার পরিধেয় বস্ত্রে।

সভাস্থ সকলেই ঘটনার আকস্মিকতায় নির্বাক্ বিমূঢ়। হতচেতন যেন।

রঞ্জনও হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তারই চক্ষের সামনে চন্দনার সর্বদেহ যখন নিষ্ঠুর অগ্নি গ্রাস করতে উদ্যত, ছুটে গেল সে দু'বাহু প্রসারিত করে: 'চন্দনা চন্দনা!'

সেই মুহূর্তে সভাস্থ অন্যান্য সকলেও যেন সম্বিৎ ফিরে পেল।

চন্দনার দেহের অগ্নি নির্বাপিত করা হলো কিন্তু নিদারুণ ভাবে দগ্ধ হয়েছে যেন চন্দনা। প্রাণের আশা তার আর তখন নেই। মৃত্যুর করাল ছায়া নেমে এসেছে তার সর্বদেহে।

দগ্ধ বীভৎস চন্দনার দেহের দিকে তাকিয়ে রঞ্জন চীৎকার করে বলে ওঠে: 'মহারাজ, আমায় শাস্তি দিন! আমায় শাস্তি দিন। চন্দনাকে পাবার আশায় আমিই বিষাক্ত ছোরা নিক্ষেপ করে কালভৈরবকে হত্যা করেছি। আমিই কালভৈরবের হত্যাকারী।'

* * * * *

রঞ্জন পাগল হয়ে গেল।

নগরের পথে পথে সে ঘুরে বেড়ায় সেই প্রদীপটি বুকে নিয়ে। চন্দনার স্মৃতি তার বুকে।

চন্দনা! চন্দনা! কোথায় তুমি ফিরে এসো। আজিও কি এ প্রতীক্ষার আমার শেষ হলো না?

তারপর আরো অনেক দিন পরে নগরকর্মী দেখলো মন্দিরের চাতালে রঞ্জনের মৃতদেহ পড়ে আছে—সর্পবিষে জর্জরিত। এবং পাশেই পড়ে আছে সেই প্রদীপটি এবং প্রদীপটিকে কুণ্ডলাকৃতি হয়ে আঁকড়ে আছে ভয়ংকর বিষধর এক গোখরো সাপ!

* * * * *

পরের দিন প্রত্যূষে ভৃত্য মহাবীরের ডাকাডাকিতে অমিয়র নিদ্রাভঙ্গ হলো: 'বাবু শিগ্‌গির আসুন। বাবু! আমার বাবু—' বাকীটা এবার সে বলতে পারে না—কেঁদে ফেলে।

পাশের ঘরে এসে দেখলে অমিয় ডাঃ সরকারের মৃতদেহটা মেঝেতে পড়ে আছে। তাঁর হাতের মুষ্টির মধ্যে তখনও ধরা রয়েছে গতকালের সেই প্রদীপটি!

অমিয়র বুঝতে কষ্ট হয় না সর্পাঘাতেই ডাঃ সরকারের মৃত্যু হয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য, মৃতের মুখে কোথাও যন্ত্রণার যেন কোন চিহ্নমাত্রও নেই। পরিতৃপ্তির একটি ক্ষীণ হাসির রেখা তখনও ওষ্ঠপ্রান্তে যেন লেগে আছে।

মাটীর পৃথিবী

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

চামেলি আর চঞ্চলের মধ্যে প্রথম দেখা হয় গ্রামে। চামেলি তখন স্কুলের পড়া শেষ কোরে সবে কলেজে ঢুকেছে আর চঞ্চলের কলেজের পড়া সারা হোয়ে বেকারীতে নাম লেখান হোয়েছে।

চামেলির দিদির শ্বশুরবাড়ী পাড়াগাঁয়ে। প্রায় একবয়সী চামেলি ও শ্যামলী। খুব জোর বছর খানেকের বড় হবে শ্যামলী। আর পাঁচটা মেয়ের মত বিয়ে হোয়ে শ্বশুরবাড়ী আসার পর বাপের বাড়ী প্রায় যাওয়া হয় না। মা অভিযোগ করেন তার চেয়ে অভিযোগ বেশী চামেলির। দিদি কি তার একবার এসে তাদের দেখে যেতে পারে না। যদি বিয়ে না হোতো তবে কি হোতো?

—দিদি কেমন পালটে গিয়েছে দেখো তো দাদা! চামেলি সুদর্শনকে বলে।

—কেন রে, কি হোলো শ্যামলীর?

—একখানা পত্র দিয়েও খোঁজ নেয় না আমাদের!

—ওই যা, ভুলেই গিয়েছিলাম। শ্যামলী তোকে একখানা পত্র দিয়েছে। লিখেছে, ছুটিতে যদি চামেলি ওর শ্বশুরবাড়ীর গাঁয়ে বেড়াতে যায়।

—দায় পড়েছে আমার! পাড়াগাঁয়ে কে যাবে মরতে?

—না রে, শ্যামলীর শ্বশুরবাড়ী সে রকম পাড়াগাঁয়ে নয়। তুই যাসনি তাই তোর ধারণা নেই।

—কই, দেখি পত্রখানা! আমার পত্র তুমি পড়লে যে বড়—

—পোষ্টকার্ডে লেখা, আমি কেন, পিওনে পর্য্যন্ত পড়ে জানতে পেরেছে যে তোর পাড়াগাঁয়ে বেড়াতে যাবার নেমন্তন্ন!

প্রথম দিকটায় চামেলির পাড়াগাঁয়ে যাওয়ার আপত্তি থাকলেও শেষ পর্য্যন্ত পাড়াগাঁয়েতে সে আগ্রহের সঙ্গেই গেল। সিনেমার গ্রাম

সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান তাতে আকর্ষণের কিছু না থাকলেও বেশ রোমাঞ্চময় এক অনুভূতিতে পরিবেশটা চিন্তা করতে ভালই লাগে। চলে যাও নির্জনে নদীর ধারে বেড়াতে। কেউ কোথাও তোমার গতিকে বাধা দেবে না। তুমি নদীর ধারে একা-একা বসে ঢেউ গুণে যাও কিংবা দূরের দিক্‌চক্রবালের দিকে তাকিয়ে যদি কবি হও কবিত্ব কোরে সূর্য্যাস্ত দেখতেও পারো। নয় তো দেখ সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকার নামতে নামতেই ওপারের জীর্ণ-শীর্ণ মন্দিরে আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠলো, সারা দিনের কাজের শেষে ক্লান্ত পদে কৃষকবধূ গা ধুয়ে জল নিয়ে ঘরে ফিরে গেল।

—কে? চামেলি, আয় আয়—শ্যামলী ছুটে এসে চামেলিকে জড়িয়ে ধরলো। আর কে এসেছে রে তোর সঙ্গে? দাদা—

—হাঁ, তুই কত রোগা হোয়ে গিয়েছিস রে দিদি!

—ও কথা থাক; হাঁ রে, মা কেমন আছে রে? সামু পামু ওরা সব ভাল আছে তো? ওদের নিয়ে এলি নে কেন?

—এত রাস্তা কখনও ওরা আসতে পারে?

—কত রাস্তা! ছেলেমানুষ ওদের নিয়ে এলেই পারতিস্। তোর আসবার সময় ওরা কাঁদলো না আসার জন্য?

—হাঁ, অনেক ভুলিয়ে রেখে এলাম।

—দাদা, তুমিও তো আনতে পারতে?

—দূর, এ কি সহজ পথ!

বাড়ীর কুশল-প্রশ্নের পর ভাই-বোনে ছাড়াছাড়ি হোয়ে গেল। বাড়ীর অন্যান্য গুরুজনেরা এসে কুশল-প্রশ্ন শুধালেন। সহরের মেয়ে কিন্তু পাড়া-গাঁয়ের বৌ। শ্বশুর-শাশুড়ীর সামনে নিঃসঙ্কোচে সহজ ভাবে কথা বলায় বাধো-বাধো মনে হয়। মনে হয় যেন সহজ স্বাভাবিক ফেলে-আসা জীবন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। বোন, দাদা—এদের সঙ্গে সকলের সামনে গল্প কর, নিন্দে হবে। উদার উন্মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়েও সঙ্কীর্ণতা মানুষের ঘোচে না। এক দিকে সহরের দুকূলপ্লাবী সভ্যতার নিঃসঙ্কোচ পদক্ষেপ, অন্য দিকে গ্রামের গণ্ডীর মধ্যে ধরা-বাঁধা জীবন। নূতনত্ব নেই, গতি নেই।

বিকালে সুদর্শন আর চামেলি বেড়াতে বার হোলো। গ্রামের কাছেই নদী। ছোট্ট নদী কিন্তু বর্ষায় তার দুকূলপ্লাবী বন্যার জের এখনও যায়নি। পূর্ণ নদী, কানে-কানে ভরা জল। আর মাঝে মোচার খোলার মত ছোট ছোট নৌকা।

—দেখিছিস দাদা, কেমন সুন্দর সিনারি! সত্যি, এর জন্য পাড়াগাঁকে বড় ভাল লাগে।

—এখন ভাল লাগে কেন—তখন তো আসতেই চাওনি।

—অবশ্য অসুবিধে অনেক, না পাওয়া যায় একখানা কাগজ, না পাওয়া যায় বই।

—সবই পাওয়া যায়! ঐ দেখ, এক ভদ্রলোক আসছেন, মনে হচ্ছে ওঁর হাতেই কাগজ রয়েছে।

—ডাকো না ভদ্রলোককে দাদা?

—দূর! উনি নিজেই আসছেন এদিক দিয়ে—

আপনার হাতে কি আজকের কাগজ? চামেলিই শুধোয় ভদ্রলোককে।

—হাঁ, আপনার দরকার?

—পেলে ভাল হোতো।

—বেশ তো, নিন না।

—কোথায় আবার ফেরৎ দেব?

—ফেরৎ দেবার জন্য ভাবতে হবে না। আপনি পড়ুন। ভদ্রলোক চলে যায়।

—দেখলে দাদা, কেমন ভদ্রলোক!

—তুই দেখ, তোর পাঁড়াগা ভাল লাগে না! পাড়াগাঁয়েও যে সব পাওয়া যায় এবং সব রকম লোক থাকেন সেটা তুই নিজে বোঝ।

বাড়ী ফিরে এসে সুদর্শন আর চামেলি দেখে সেই খবরের কাগজ দেওয়া ভদ্রলোককে। পাশের বাড়ীতেই বাড়ী। দিদির শ্বশুরদের এক রকমের আত্মীয় ও বাড়ীর গায়েই বাড়ী। নাম চঞ্চল রায়। প্রচুর পড়াশোনা করা লোক এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি করেন এটাও তাঁর একটা মস্ত পরিচয়। সখের রাজনীতি নয়। রীতিমত নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম ও আদর্শ সুমুখে রেখে চলেন ওঁদের দল। রাজনীতিকে পেশা ও নেশায় প্রায় পরিণত করার মত অবস্থা চঞ্চল বাবুর।

পরের দিন নদীর ধারে আবার চঞ্চল বাবুর সঙ্গে চামেলিদের দেখা। সেদিনও হাতে তাঁর কাগজ।

আপনি কি কাগজ হাতে নিয়েই ঘোরেন ?

—প্রায় তাই। আপনার চাই তো !

—চাই বই কি। কিন্তু শুধু কাগজই চাই নয়, কাগজের মালিকের সঙ্গে ভাল ভাবে আলাপ করতে চাই।

—বেশ তো। এ আর বেশী কথা কি ?

—আপনার কি এখন কোন কাজ আছে ?

—কাজ করলেই আছে।

—মানুষ কিন্তু মেশিন নয় মনে রাখবেন।

—কিন্তু মেশিন তৈরী করা উচিত এই পরিস্থিতিতে। আপনার দাদাকে দেখছি নে যে ?

—তিনি আসেননি। কাল চলে যাবেন বোলে এখন থেকে প্রস্তুত হচ্ছেন।

—আপনি যাবেন না ?

—না, দু'দিন থেকে যাবার ইচ্ছা আছে—

—বেশ তো। পাড়াগাঁয়ে এসেছেন, দেখে যান ভাল কোরে মানুষ কি ভাবে আছে এখানে! কি ভাবে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করছে।

—সংগ্রাম ?

—হাঁ, লাঠিসোটা নিয়ে সংগ্রাম নয়। জীবন-সংগ্রাম !

—ওঃ, তাই বলুন।

—বাড়ী ফিরবেন নাকি ?

—সঙ্গী যখন পেয়েছি তখন ফেরাই ভাল।

চামেলি আর চঞ্চল পাশাপাশি গল্প করতে করতে চলেছে। দু'জনের মধ্যে অপরিচয়ের কোন ব্যবধানই নেই এমনি ভাবে আলাপ-আলোচনা করতে করতে ওরা চলেছে। নদীর ধারে-ধারে পথ। দুরন্ত হাওয়া মধ্যে মধ্যে হুহু শব্দ কোরে বয়ে যাচ্ছে। পরিশ্রান্ত শরীরের স্বেদবিন্দুগুলো হাওয়ায় মিলিয়ে আসে চঞ্চলের। চামেলির ওড়না ওড়ে হাওয়ায়। মনটাও যেন লঘুপক্ষ পাখীর মত কোথায় উধাও হোয়ে যেতে চায়। নদীর অথৈ জল। গভীরতা বোঝা কষ্টকর। ঠিক একই অবস্থা দু'জনের।

কথা বলতে বলতে প্রায় দু'জনেই বাড়ীর কাছাকাছি এসে পৌঁছায়। এবারে যে-যার বাড়ী যাবে। চামেলির বাড়ী গিয়ে সময় প্রায় কাটে না। দিদির সঙ্গে গল্প বলারও ফুরসৎ নেই। দিদি যেন কেমন হয়ে গিয়েছে এখানকার মানুষের পাল্লায় পড়ে। যেন একটা যন্ত্র। ঠিক চঞ্চল বাবুর মতই। মন বা অনুভূতি আছে কিনা সন্দেহ।

—দিদি, আজও নদীর ধার থেকে বেড়িয়ে এলাম।

—বেশ তো। ভাল লাগছে ?

—তা তো লাগছে। কিন্তু তোর অবস্থা দেখে কান্না পায় রে ! এ যেন "ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি, পরখ করে সবে করে না স্নেহ।"

—যাক্, তোর ভাল লাগছে তো ? আজ কার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এলি ?

—চঞ্চল বাবু গো—তোমাদের চঞ্চল বাবু !

—রোজই বুঝি দেখা হয় তোর সঙ্গে ?

—নদীর ধারে বিকালে গেলেই দেখা হবে।

—সময়টাও মুখস্থ কোরে ফেলেছিস দেখছি !

—যাঃ, বড় বাজে বকিস তুই।

—খুব শক্ত লোক, চামেলি !—দিদি মুচকে হাসে একটু।

পরের দিনও যথানিয়মে নদীর ধারে দু'জনে দেখা। কিন্তু বাড়ী ফেরার তাগিদ নেই চঞ্চল বাবুর। সকালে উঠে পাড়ায় বেরিয়ে যায় আর ফিরে আসে যখন সন্ধ্যা হোতে বাকী থাকে না। মাসের প্রায় ত্রিশ দিনই ঐ একই রকম। কোন ব্যতিক্রম নেই, ছেদ নেই। অসুখ-বিসুখ না হোলে এ চাকরীর কামাই নেই।

—আজ সকাল সকাল ফিরলেন যে ? চামেলি শুধায় চঞ্চলকে।

—হ্যাঁ, একটু কাজ আছে পাড়ায়।

—একটু বসবেন না এখানে ?

—না, পাড়ায় যেতে হবে এখুনই। চলুন না ? যাবেন ?

—কোথায় ? কত দূরে ?

—এই তো কাছেই, দেখে আসবেন মানুষ কি ভাবে বেঁচে আছে। কি অবস্থায় মানুষ মানুষকে এনে ফেলেছে।

—বেশ তো, চলুন না।

ওরা এসে পৌঁছায় একটা মজুরদের পাড়ায়। চালে খড় নেই, দেয়ালে মাটী নেই—এমনই দুরবস্থা ঘরগুলোর। ঝোড়ো কাকের মত ন্যাড়া মনে হয় ঘরগুলোকে আর মানুষদের। ছোট ছোট চালা-ঘর চালে চাল লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চঞ্চল আর চামেলি যেতেই তারা বসায় একটা ঘরের বাইরের দিকের চালায়। আগে থেকেই সেখানে সতরঞ্চি একখানা আর কয়েকটা ছেঁড়া মাদুর পাতা আছে। একে একে মানুষ আসে। কঙ্কালসার এক-একটা মানুষ। পাঁজরার হাড়গুলো প্রত্যেকটা আলাদা কোরে গোণা যায়।

—কি ! কত লোক এসেছে কানাই ? চঞ্চল বাবু শুধাল।

—আজ্ঞে, এই তো জন কুড়ি।

—খয়রাতি সাহায্য তো এদের সবাইকেই দিতে হবে ?

—হ্যাঁ, কারও দু'বেলা ভাত হয় না।

—দু'বেলা কি, কাল থেকে উপোষ করছি বাবু ! ছেলেডাকে পাটপাতা সেদ্ধ খাইয়ে রেখেছি। ওই খেয়ে কি থাকতে পারে, ছেলেমানুষ ?—সত্তর বছরের বুড়ী বলে।

—আজ সকালে এক সের মুসুরি কিনে এনে তাই দু'জনে সেদ্ধ কোরে খেয়েছি এক-গাল এক-গাল। আর যে এ বেলা কিছুই জোটাতে পারলাম না !

—আমাদের কাজ দিলে আমরা খেটে খাই ! কত দিন আর না খেয়ে থাকি, বাবু !

—আপনারা ইচ্ছা করলে বাঁচাতে পারেন আমাদের।

—আমার কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে আটটা লোক। একজন পাঁচ সিকে উপায় কোরে নিয়ে এসেছে এ বেলা। চোদ্দ আনা চালের সের, কি হবে পাঁচ পোয়া চালে আট জনের ?

—কাল রাত্তির থেকে কিছুই পেটে পড়েনি বাবু !—লাঠিতে ভর দিয়ে রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ বলে।

—বল, একে একে তোমাদের নাম বল ? আর ক'জন কোরে পোষ্য এবং ক'জন উপায়ক্ষম।

—আমি বিধবা। আমার কেউ নেই দুটো নাবালক ছেলে ছাড়া।

আরো মসৃণ ও সুন্দর মুখশ্রী

মুখশ্রী আপনার আরো কমনীয় ও সুন্দর হবে, যদি দুটি পণ্ড্‌স ক্রীমের সাহায্যে সৌন্দর্য্য-সাধনার বিখ্যাত দুটি নিয়ম মেনে চলেন।

প্রত্যেকের জন্যই দুটি ক্রীমের দরকার—কারণ একটিতে ময়লা কাটে, অপরটি মুখশ্রী রক্ষা করে। রাত্রিতে চাই, সারাদিনের ধুলি ও ময়লা দূর করার জন্য উচ্চাঙ্গের একটি তৈলাক্ত ক্রীম—পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম। আর ভোরবেলা চাই, রঙ্‌-কালো-করা রোদের তাত থেকে মুখশ্রী বাঁচানোর জন্য হাল্‌কা, অদৃশ্য একটি ক্রীম—পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম।

সৌন্দর্য্য-সাধনার দুটি উপায়ঃ

রোজ রাত্রে পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম মুখে মেখে আস্তে আস্তে মালিশ করে বসিয়ে দিন। এর সুমিশ্রিত তেল লোমকূপের ভেতর থেকে সমস্ত ময়লা বার করে আনবে। তারপর মুছে ফেললেই দেখবেন, মুখখানি কেমন লাবণ্যে উজ্জ্বল!

রোজ ভোরে খুব পাত্‌লা ক'রে পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম মাখুন। এ হাল্‌কা, অথচ চট্‌চটে নয়। মাখার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায় এবং অদৃশ্য একটি সূক্ষ্ম স্তর সারাদিন মুখশ্রী অক্ষুণ্ণ ও কমনীয় রাখে।

POND'S COLD CREAM for Cleansing

POND'S VANISHING CREAM Protection and Powder Base

পণ্ড্‌স

একমাত্র কনসেশানেয়ার্স ঃ

জেফ্রি ম্যানার্স এণ্ড কোং লিঃ

বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ।

—আমি অন্ধ বাবা ; ওই নাতিটা লাঠি ধরে আমায় নিয়ে আসে। ওর মা ছাড়া আর কেউ নেই। কাল্ থেকে দু'খানা বেশমের বড়া খেয়ে আছে।

একে একে বুভুক্ষুরা তাদের নাম-ধাম বোলে যায় আর চঞ্চল বাবু সে সব লিখে যান। লেখা শেষ হোলে উঠে আসবার সময় একবার কলরব ওঠে—এ যেন এক ঝাঁক বুভুক্ষু পায়রার মধ্যে এক মুঠো মুড়ি ছিটিয়ে দেওয়ার মত। সামান্য একটু সহানুভূতি দেখালেই, ওদের জন্যে একটু চেষ্টা করলেই ওরা ভাবে এ আমাদের দেওয়াই হোলো। এত সরল আর ভালো মানুষ এই নিরন্ন চাষী-মজুরের দল। না-খাওয়া অবস্থায় অভিযোগের অন্ত নেই। কে কারটা আগে বলবে তাই নিয়ে ঠেলাঠেলি। যেন দুঃখের কাহিনী বলতে পারলেই সব দুঃখু ঘুচে যাবে!

—দেখলেন চামেলি দেবী, এই আমার দেশ!

—হুঁ—দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে চামেলির।

—আপনাদের সহরের সভ্যতা আর বৈদ্যুতিক আলো কিন্তু এরাই জ্বালিয়ে রাখে।

—এদের এ অবস্থা কেন?

—এই অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়েছে। চোখ থাকতেও ওরা অন্ধ—এই গ্রামটার বাইরের কোন ধারণাই ওদের নেই। আপনারা বৈদ্যুতিক আলোর নীচে বসে সিনেমা দেখেন আর ওরা সারা দিনের পর সন্ধ্যায় এক-এক মুঠো মুশুরি-সেদ্ধ খেয়ে বুভুক্ষু ছেলেমেয়েকে জোর কোরে ঘুম পাড়ায়!

—সত্যি মানুষকে মানুষ, এই রাষ্ট্র এই অবস্থায় রাখে আর সেই লোকেরাই বড়াই করে সভ্যতার!

—তাই তো হয়, যাঁরা দেশ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার তাঁরা পুকুর চুরি করেন অথচ তাঁদের চোর বলাটা আনপার্লামেণ্টারী!

চামেলিকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে চঞ্চল বাড়ী চলে যায়। সারা দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর দেহ যেন এলিয়ে পড়ে। মেশিনই বটে! গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে বেড়ান। এক সূত্রে মালার মত গেঁথে তোলা গ্রামের পর গ্রাম—এ কি সহজ কাজ! অথচ যদি চেতনা না আসে, চেতনা না আনতে পারা যায় তবে তো কাজ এগোয় না।

পরের দিনেও ওরা নদীর ধারেই বসলো। মৃদু হাওয়া কুঞ্চিত চুলের মধ্যে কম্পনের সৃষ্টি করে। সমস্ত দেহ যেন স্নিগ্ধতায় ভরে যায়। মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক বক চলে যায়। দূরে একখানা নৌকা পাল তুলে মোচার খোলার মত ভেসে যায়। বড় ভাল লাগে চঞ্চলের। চঞ্চল দেহকে এই স্তব্ধতার মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। পাশেই তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা, সামনে কুলু-কুলু শব্দে প্রবাহিত নদী, মাথার উপর দিগন্তবিস্তৃত উদার আকাশ—সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর একটু বিশ্রাম!

—কি ভাবছেন চঞ্চলদা?

—ভাবছি এই সময়টার কথা!

—আমার তো যাবার সময় হয়ে এলো।

—তাই নাকি! যাই হোক, এসেছিলে তাই গ্রাম দেখে গেলে!

—শুধু গ্রামই দেখিনি। মানুষও দেখিছি! মেশিনও দেখিছি!

—যা বলেছো চামেলি! মেশিনই বটে! কোন অনুভূতি নেই, কোন সূক্ষ্ম রসবোধও বোধ হয় হারিয়ে ফেলেছি।

—কেন? কেন এমন কোরে সব থেকে বঞ্চিত হওয়া—আবেগ আর উত্তেজনায় চামেলি চঞ্চলের হাতটাকে জোরে আঁকড়ে ধরে। চঞ্চল একটু থেমে চামেলির দিকে তাকিয়ে বলে—মাটীর মানুষ; মাটীর ওপরের জগতের কথা ভাববার সময় কোথায় চামেলি?

চামেলি শক্ খাওয়া মানুষের মত নিস্পন্দ হোয়ে বসে থাকে।

—প্রচ্ছদপট—

"আমি যদি পৃথিবীর সকল ভাষা না শিখিয়া মরি, তাহা হইলে আমার জন্য কেহ যেন অশ্রুপাত না করে!" উল্লিখিত কথাটি ঘোষণা করেছিলেন কলিকাতাস্থিত এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যর উইলিয়াম জোন্স, যিনি ইংরাজী ভাষায় প্রথম মহাভারত, রামায়ণ, বেদ, পাণিনির ব্যাকরণ, হিন্দু নাট্যকলা ও জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতির তর্জ্জমা এবং ৩২টি শব্দসংগ্রহ গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত সংস্কৃত ভাষাভিধান রচনা করেছিলেন। শাসক ইংরাজকে ভারতবাসী প্রচুর গালিবর্ষণ করলেও ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক কয়েক জন ইংরাজের নাম অন্ততঃ বাঙালী যেন কখনও না বিস্মৃত হয়। স্যর উইলিয়াম জোন্স এই সকল ইংরাজগণের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তিনি সংস্কৃত ভাষায় ১৪খানি, আরবী ৪খানি, পারসী ৪খানি, চীন ২খানি এবং তাতার ও অন্যান্য ভাষা থেকে আরও কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। মনুসংহিতা, শকুন্তলা, গীতগোবিন্দ এবং হিতোপদেশ প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থের তর্জ্জমা ক'রে জোন্স খ্যাত হন। ইংরাজদের মধ্যে জোন্সই প্রথমে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। ইং ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হন। তিনি হিন্দু এবং মুসলমান আইন-বিষয়ক গ্রন্থ ইংরাজীতে রচনা করেন।

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে সেই মহা পণ্ডিতের চিত্র মুদ্রিত করা হয়েছে এজন্য যে তিনি প্রায় এই সময়েই অর্থাৎ ইং ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। অধুনা আমাদের দেশে রাম ও শ্যাম প্রভৃতিদের জন্মতিথি উৎসব পালিত হ'তে দেখা যায়। কিন্তু এই মহা পণ্ডিতের জন্মতিথি পালন করা যে বাঙালীর একান্ত কর্ত্তব্য, এরূপ আমরা মনে করি। জোন্স হ্যারোতে প্রথম শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। অতঃপর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং এম-এ উপাধি পাওয়ার পূর্ব্বেই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হন। প্রাচ্যদেশীয় ভাষ্য এবং সংস্কৃতি বিষয়ের গবেষণায় তিনি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। অত্যধিক পরিশ্রম হেতু শরীর ভগ্নপ্রাপ্ত হওয়ায় জোন্স মাত্র ৪৮ বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কলিকাতায় গার্ডেনরিচস্থিত উদ্যান-বাটিকাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। কলিকাতাবাসী সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এবং বিচারক মিঃ হাইড ও স্যর উইলিয়াম উইলকিনের তত্ত্বাবধানে এই মহা পণ্ডিতের শবদেহ শোভাযাত্রা সহকারে পার্ক ষ্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে পৌঁছায় এবং তথায় জোন্সকে সমাধি দেওয়া হয়। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ থেকে শোকসূচক তোপধ্বনি করা হয়। প্রচ্ছদে মুদ্রিত চিত্রটি বিখ্যাত শিল্পী স্যর জোসুয়া রেনল্ড অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি এ যাবৎ কোন্ বাঙলা কাগজে প্রকাশিত হয়নি।

সা হি ত্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

বিহারীলাল গোস্বামী—কবি। জন্ম—১৮৭১ খৃঃ পাবনা জেলায় সাতবাড়িয়া গ্রামে। মৃত্যু—১৩৩৮ বঙ্গ জ্যৈষ্ঠ। পিতা—দেবনাথ গোস্বামী। শিক্ষা—প্রবেশিকা (১৮৮৭), বি, এ (সিটি কলেজে পাঠ) প্রাইভেটে পরীক্ষা দান। কর্ম—প্রধান শিক্ষক, পাবনা জেলার পোতাজিয়া হাইস্কুল (১৯০৫)। বাল্যাবস্থা হইতেই কবিতা রচনায় বিশেষ ঝোঁক ছিল। ছন্দে ইহার আশ্চর্য রকম অধিকার ছিল। শিক্ষকতার সময়ে 'মেঘদূত' ও 'কুমারসম্ভবে'র পদ্যানুবাদ 'বঙ্গদর্শন' (রবীন্দ্র-সম্পাদিত) পত্রে অনেকাংশ প্রকাশিত হয়। ইনি পারসীক ভাষায় সুপণ্ডিত ও চিত্রাঙ্কনেও বিশেষ পটু ছিলেন। গ্রন্থ—গীতা-বিন্দু (গীতার অনুবাদ, ১৯১৩), সেখ সাদীর বান্দ নামা (পদ্যানুবাদ, ১৩৩২)।

বিহারীলাল ঘোষ—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—কারিগর-দর্পণ (মাসিক, ১২৯০), বিশ্বকর্মা বা বিজ্ঞান-রহস্য (মাসিক, ১২৯৩)।

বিহারীলাল চক্রবর্তী—কবি। জন্ম—১২৪২ বঙ্গ ৮ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা নিমতলাস্থিত অক্ষয় দত্ত লেনে (বর্তমান এই বাটী ২নং বিহারীলাল চক্রবর্তী ষ্ট্রীট)। মৃত্যু—১৩০১ বঙ্গ ১১ই জ্যৈষ্ঠ। পিতা—দীননাথ চক্রবর্তী (বংশগত উপাধি—চট্টোপাধ্যায়)। পূর্ব-নিবাস—হুগলী। শিক্ষা—জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ (৬ বৎসর), সংস্কৃত কলেজ (৪ বৎসর)। বাল্যাবস্থা হইতেই কবিতা রচনা। রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনায় এঁর প্রভাব বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। ইনি সঙ্গীতপ্রিয় ও যাত্রাপালা-রচয়িতা। প্রতিষ্ঠাতা—পূর্ণিমা (মাসিক, ১২৬৫), সাহিত্য-সংক্রান্তি (মাসিক, ১৮৬৩), অবোধসিন্ধু (ঐ)। কাব্যগ্রন্থ—স্বপ্নদর্শন (১৮৫৮), সঙ্গীত-শতক (১২৬৯), বঙ্গসুন্দরী (১২৭৬), নিসর্গসন্দর্শন (১২৭৬), বন্ধুবিয়োগ (১২৭৭), প্রেমপ্রবাহিনী (১২৭৭), সারদামঙ্গল (১২৮৬)। সম্পাদক—পূর্ণিমা (মাসিক, ১৮৫৯)।

বিহারীলাল চক্রবর্তী—সাময়িকপত্রসেবী। কলিকাতা আর্টিষ্ট প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। সম্পাদক—শিল্পপুষ্পাঞ্জলি (শিল্পসম্বন্ধীয় মাসিক, ১২৯২)।

বিহারীলাল চক্রবর্তী—সাহিত্যিক। সম্পাদক—প্রদীপ (১৩০৮-১২)।

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়—নাট্যকার ও অভিনেতা। জন্ম—১২৪৭ বঙ্গ ২৫এ বৈশাখ কলিকাতা তারক চ্যাটার্জির গলিতে। মৃত্যু—১৩০৮ বঙ্গ ৭ই বৈশাখ। শিক্ষা—জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ। শৈশবে পিতৃ ও পিতামহ-বিয়োগ হইলে—মাতামহ গৃহে আশ্রয়লাভ। কর্ম—গ্লাডষ্টোন ওয়াইলির অফিসে চিঠিনবীশ, ই, আই, আর ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ারের অফিসের সহ-কোষাধ্যক্ষ, মালগুদামের ইন্সপেক্টার, তৎপরে চাকুরী ত্যাগ করিয়া নটজীবন আরম্ভ। প্রথম অভিনয় 'কুলীনকুলসর্বস্ব'এ স্ত্রী ভূমিকায় (১২৬৩ বঙ্গ), বহু স্থানে অভিনয়ের পর—'বেঙ্গল থিয়েটারের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজার। গ্রন্থ—দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ, পাণ্ডব-নির্বাসন, দুর্যোধন-বধ, রাবণ-বধ, নন্দবিদায়, প্রভাস-মিলন, অক্রুর-সংবাদ, সুভদ্রাহরণ, কুমারসম্ভব, বাণযুদ্ধ, পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, হরি-অন্বেষণ, জন্মাষ্টমী, সীতা-স্বয়ম্বর, রাজসূয়-যজ্ঞ, যমের ভুল, মোহশেল; নাট্যকৃত গ্রন্থ—দুর্গেশনন্দিনী।

বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি। গ্রন্থ—শক্তিসম্ভব কাব্য (১৮৭২?)

বিহারীলাল ভাদুড়ী—চিকিৎসক। ইনি এল, এম, এস পাস করিয়া হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করেন। গ্রন্থ—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান (১৮৭৩)। সম্পাদক—The Indian Homœopathy Review (মাসিক, ১৮৮২, দ্বিভাষিক পত্র)।

বিহারীলাল মণ্ডল—নাট্যকার। ইনি বিধবা-বিবাহ সমর্থক ছিলেন। গ্রন্থ—বিধবা-পরিণয় (নাটক, ১৮৪৬)।

বিহারীলাল মিত্র—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৫৭ খৃঃ বাগবাজারের মিত্র-বংশে। মৃত্যু—১৯৩৩ খৃঃ ৭ই ফেব্রুয়ারী। পিতা—রসিকলাল মিত্র। শিক্ষা—ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, বাগবাজার একেডেমী। 'রায়-বাহাদুর' উপাধি লাভ (১৯১২), ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি, জর্মানী ভ্রমণ। ইনি সমাজের উন্নতিকল্পে বহু অর্থ দান করেন। গ্রন্থ—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (ইংরেজি অনুবাদ), মিত্ররহস্য, চিন্তারহস্য, প্রেমরহস্য, কথোপকথনরহস্য, সংসাররহস্য, নিয়মরহস্য, ভ্রমণরহস্য, বিদেশীরহস্য, প্রকৃতিরহস্য, শাস্তিরহস্য, সঙ্গরহস্য, নূতন জন্মরহস্য, ভাবুক ও সভ্যতারহস্য, ত্যাগরহস্য, Sedition or Progress, Obstruction or Progress.

বিহারীলাল রায়—সাময়িক পত্রসেবী। কলুটোলা আর্টিসৃট প্রেসের স্বত্বাধিকারী। সম্পাদক—চিত্রদর্শন (মাসিক, ১২৯৭)।

বিহারীলাল রায়—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—বিজ্ঞান-চক্রবান্ধব (১২৭৮)।

বিহারীলাল সরকার—সাংবাদিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৬২ বঙ্গ ২রা কার্ত্তিক হাওড়া জেলার আন্দুলমৌরি গ্রামে। মৃত্যু—১৩২৮ বঙ্গ ৯ই ফাল্গুন কাশীধামে। পিতা—উমাচরণ সরকার। শিক্ষা—ছাত্রবৃত্তি (কলিকাতা বহুবাজার স্কুল), প্রবেশিকা (জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ)। কর্ম—কলিকাতা প্রেসের প্রেস-পরিদর্শক (১৮৭৮), বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্য (১৮৮০)। পরিচালক—প্রভাতী (প্রাত্যহিক পত্রিকা, ১৮৮০)। ইনি সুগায়ক। রায় সাহেব উপাধিলাভ (১৯১৫)। গ্রন্থ—শকুন্তলা-তত্ত্ব, তিতুমীর, বিদ্যাসাগর (জীবনী), ইংরাজের জয়, বঙ্গে বর্গী, ভরতপুর যুদ্ধ, মহারাণী স্বর্ণময়ী, গান; সম্পাদিত গ্রন্থ—শ্রীশ্রীভাগবত, সিদ্ধান্তসার সাংখ্যকারিকা।

বিহারীলাল সিংহ—খৃসৃটান পাদরী। গ্রন্থ—খৃসৃটান-তারা (১৮৫২ খৃঃ)।

বিহ্লন বিদ্যাপতি—কাশ্মীর দেশীয় পণ্ডিত। ১০-১১ শতাব্দী। চৌলুক্যরাজ ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত। পিতা—জ্যেষ্ঠ কলস। মাতা—নাগদেবী। গ্রন্থ—বিক্রমাঙ্কদেব।

বিসৃবরৈ—(বিশ্বরায়)—অনুবাদক। পিতা—হরিগরব দাস। গ্রন্থ—সিংহাসন বত্রীসী (ফার্সী অনুবাদ—সম্রাট জহাঙ্গীরের সময়)।

বীণা গুহ—মহিলা সাহিত্যিক। শিক্ষা—এম, এ। সম্পাদিকা—মহিলা (১৩৫৪)।

বীণাপাণি রায়—মহিলা সাহিত্যিক। শিক্ষা—এম, এ। সম্পাদিকা—জয়শ্রী (মাসিক, ঢাকা, ১৩৪০)।

বীণাপাদ—দোঁহা রচয়িতা। ইনি বীণাপাদ বিরূপের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রন্থ—বজ্রডাকিনী গুহ্যপূজা।

বীরচন্দ্র গুপ্ত—কবি। গ্রন্থ—কাব্যকুসুম (১৮৭১)।

বীরনারায়ণ, মহারাজ—কুচবিহারের রাজা। গ্রন্থ—কিরাত পর্ব।

বীরভদ্র গোস্বামী—অনুবাদক। জন্ম—বীরভূম জেলায় গোপালগ্রামে গঙ্গাবংশজাত। গ্রন্থ—শ্রীমদ্ভাগবতলহরী বা শ্রীমদ্ভাগবত ভাবতরঙ্গিণী (অনুবাদ, ১২৬৫—১২৬৮ বঙ্গ), বৃহৎপাষণ্ডদলন (সংকলন)।

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—সঙ্গীতজ্ঞ ও বীণকার। জন্ম—১৩১০ বঙ্গ আষাঢ় মাসে। পিতা—ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (গৌরীপুরের জমীদার)। শিক্ষা—বি, এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ)। ইনি বহু সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। গ্রন্থ—হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের দান, প্রবেশিকা-সঙ্গীত, রাগসঙ্গীত (বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত সহ), Hindustani Music of India (মাদ্রাজ); সম্পাদক—সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা (মাসিক), স্বরশ্রী (মাসিক)।

বীরেন্দ্রকুমার দত্ত—গ্রন্থকার। বাল্যকাল হইতেই গল্প ও উপন্যাস রচনা। গ্রন্থ—জঞ্জাল, জীবন, প্রহেলিকা, যুগমানব, উলট-পালট, সন্ধান, সনাতনী।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র—সাহিত্যসেবী ও নাট্য-পরিচালক। জন্ম—১৯০৫ খৃঃ জুন কলিকাতা আহিরীটোলা। পিতা—রায় সাহেব কালীকৃষ্ণ ভদ্র (ছোট আদালতের দোভাষী)। পৈতৃক নিবাস—২৪ পরগণা দত্তপুকুর। শিক্ষা—স্কটিশ চার্চ ও বিদ্যাসাগর কলেজ, বি-এ। কর্ম—ই. আই. আর (১৯২৭)। এই সময়ে নিয়মিত ভাবে ভারতবর্ষে বেতার-বার্ত্তা চালাইবার কোম্পানী গঠিত হয়, উহাতে অন্যতম সহকারী প্রোগ্রাম-পরিচালকরূপে যোগদান। ১৬ বৎসর বেতারে কর্মের পর পদত্যাগ। নিয়মিত শিল্পী হিসাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট। 'বিষ্ণু-শর্মা' ছদ্মনামে মহিলা মজলিস্ পরিচালনা। বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চের পরিচালক (১৯৩০-৩১)। সিনেমা-জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে রস-রচনার লেখক। গ্রন্থ—ঝঞ্ঝা, ব্ল্যাক-আউট, বিরূপাক্ষের বঞ্চাট, বিরূপাক্ষের অযাচিত উপদেশ, বিরূপাক্ষের বিষম বিপদ, বিরূপাক্ষের নিদারুণ অভিজ্ঞতা। নাট্যকৃত গ্রন্থ—অর্জুন-বিজয়, সীতারাম, চন্দ্রনাথ, স্বুবর্ণগোলক।

বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—মায়ের প্রসাদ, মহাশ্বেতা, সাধে বাদ।

বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন—সাহিত্যসেবী। জন্ম—চন্দননগর। সম্পাদক—তরুণ ভারত।

বীরেন্দ্রনাথ দে—সাহিত্যিক। সম্পাদক—পথ (১৩১৭—১৮)।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল—সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ্‌। জন্ম—১৮৮১ খৃঃ ২৪এ অক্টোবর মেদিনীপুর জেলার কাঁথি থানার চণ্ডীভেটী গ্রামে। মৃত্যু—১৯৪১ খৃঃ ২৪এ নভেম্বর। শিক্ষা—বার-এট্-ল। আইন-ব্যবসায়ী ও নির্ভীক দেশসেবক। 'দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ' নামে জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত। গ্রন্থ—স্রোতের তৃণ (১৯২২), Midnapore Partition (১৯৩১)।

বীরেশ্বর চক্রবর্তী—শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৪১ খৃঃ ১১ই মার্চ চন্দননগরে বুড়ো শিবতলায় বিদ্যাভূষণ ডাঙ্গায়। মৃত্যু—১৯০৩ খৃঃ (আনু)। পিতা—আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী। মাতা—আদ্যাশক্তি দেবী। শিক্ষা—চতুষ্পাঠী, চুঁচুড়া ফ্রি স্কুল, হুগলী কলেজ (১৮৫৯)। শিক্ষকতা—উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় (বড়াগ্রাম, হুগলী), ব্যারাকপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুল, পরে গোপীনাথপুর, বালেশ্বর, মেদিনীপুর স্কুল। ছোটনাগপুর স্কুল ইনেস্পেক্টর (১৮৬৭), ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদ পাইয়া তাহা ত্যাগ। অবসর গ্রহণ (১৮৯৬ খৃঃ)। ইনি দেশীয় অনেকগুলি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। রায় বাহাদুর উপাধি লাভ। গ্রন্থ—ভারতবর্ষীয় ভক্ত কবি, কোলকাহিনী, স্বাস্থ্যসাধন, সাহিত্যসংগ্রহ, মানবপ্রকৃতি (অপ্র), Gita in Rhyme (গীতার অনুবাদ—মৃত্যুর পরে প্রকাশিত, ১৯০৬)।

বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন—স্মার্ত পণ্ডিত। জন্ম—নবদ্বীপ, ভট্টাচার্য-বংশে। মৃত্যু—১৮০১ খৃঃ ২৯এ অক্টোবর। ইনি ইংরেজদিগকে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়া গভর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক বৃত্তি পাইতেন। ইনি 'বিবাদার্ণবসেতু' নামক গ্রন্থের সংকলয়িতৃগণের ১১ জন পণ্ডিতের অন্যতম। ইনি গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের আদেশ মতে 'হিন্দু ল' (Hindu Law) সংকলন আরম্ভ করেন (১৭৭৫)।

বীরেশ্বর পাঁড়ে—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৪৯ বঙ্গ ২১এ চৈত্র যশোহর জেলার কামরা গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৮ বঙ্গ ২৮এ ফাল্গুন কাশীধামে। পিতা—মৃত্যুঞ্জয় পাঁড়ে। ইঁহার পূর্বপুরুষ আকবরের সময় কান্যকুব্জ হইতে বাংলায় আগমন করেন। শিক্ষা—কৃষ্ণনগর কলেজ, পরে মোহনচন্দ্র চূড়ামণির নিকট ব্যাকরণ শাস্ত্র পাঠ। কর্ম—কাপড় প্রভৃতি নানাবিধ ব্যবসায়। প্রতিষ্ঠাতা—কৃষ্ণনগর বঙ্গ বিদ্যালয়। গ্রন্থ—মানবতত্ত্ব, ধর্মবিজ্ঞান, অদ্ভুত স্বপ্ন বা স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব, উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত, ধর্মশাস্ত্রতত্ত্ব ও কর্তব্যবিচার, আর্যচরিত, আর্যপাঠ, আর্যশিক্ষা, নীতিকথামালা, কবিতা (৩ খণ্ড), উপক্রমণিকা, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, শিশুশিক্ষা, বাঙ্গালা শিক্ষা, ২ খণ্ড, লীলাবতী, বিজ্ঞানসার উপক্রমণিকা (১৮৭৫), শিশুবিজ্ঞান (১৮৭৫)। সম্পাদক—সহচরী (১২৯০-২), জাহ্নবী (১২৯১-২), সচিত্র বিজ্ঞানদর্পণ (ঐ)।

বুদ্ধদেব বসু—কবি ও কথা-সাহিত্যিক। জন্ম—১৯০৮ খৃঃ কুমিল্লা শহরে। শিক্ষা—নোয়াখালি, ঢাকা। এম,এ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)। কর্ম—অধ্যাপক, রিপন কলেজ (১৯৩১)। ইনি বাল্যকাল হইতেই কবিতা ও গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন। পরিচালনা—কবিতা-ভবন ও 'কবিতা' পত্রিকা। গ্রন্থ—সাড়া (প্রথম প্রকাশিত বই), বন্দীর বন্দনা (ক), অসূর্যম্পশ্যা, যেদিন ফুটলো কমল, বাসরঘর, লাল মেঘ, পরিক্রমা, রেখাচিত্র, অসামান্য মেয়ে, মিসেস গুপ্ত, হঠাৎ আলোর ঝলকানি, আমি চঞ্চল হে, সমুদ্রতীর, কঙ্কাবতী, পৃথিবীর পথে, দময়ন্তী, অভিনয় নয়, মন দেয়া নেয়া, এরা আর ওরা, An Acre of Green Grass। সম্পাদক—প্রগতি (অজিত দত্ত সহ, ১৯২৭ খৃঃ), কবিতা (ত্রৈমাসিক পত্র)।

"সময়ে সামান্য সতর্ক হলে সহজেই সংক্রমণ রোধ করা যায়"

রোগবাহী জীবাণুই রোগ-সংক্রমণের কারণ। জীবাণু এত ছোটো যে খালি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু এরা ছড়িয়ে আছে সব জায়গায়। যে-বাতাস আপনি শ্বাসের সঙ্গে টেনে নেন, যে কোনো জিনিসে আপনি হাত দেন, এমন কি আপনার গায়ের ত্বকেও লক্ষ লক্ষ জীবাণু রয়েছে।

শরীরের কোথাও কেটে বা চামড়া উঠে গেলে সেই মুহূর্তেই ঝাঁকে ঝাঁকে জীবাণু আপনার শরীরে প্রবেশ করতে পারে। সামান্য একটু পিনের খোঁচাকেও তুচ্ছ করবেন না, তা থেকেই সারা শরীর বিষাক্ত হতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত অঙ্গহানি কি প্রাণহানিও ঘটতে পারে।

সুতরাং জীবাণুর হাত থেকে নিজে ও বাড়ীর সবাই নিরাপদে থাকতে চান তো 'ডেটল' ব্যবহার করুন — 'ডেটল' আধুনিক জীবাণুনাশক।

প্রসবপথের মুখে বা ভেতরে সামান্য একটু ক্ষত থাকলেও প্রসূতিজ্বর দেখা দিতে পারে, যা থেকে চিরতরে অকর্মণ্য বা বন্ধ্যা হয়ে থাকাও বিচিত্র নয়। ডাক্তারেরা তাই জীবাণু-সংক্রমণের ভয় দূর করবার জন্য প্রসবের সময় প্রসূতিকে জীবাণুনাশক 'ডেটল' ব্যবহার করতে বলেন।

ক্ষতস্থান যত ছোটোই হোক তা যেন বিষাক্ত হতে না পারে। কেটেকুটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে 'ডেটল' লাগাবেন। ডেটল জীবাণু নাশ করে, বিষাক্ত সংক্রমণের পথ রুদ্ধ করে এবং ক্ষত শুকোতে সাহায্য করে।

ডাক্তারদের মতো আপনিও 'ডেটল' ব্যবহার করুন—'ডেটল' স্নিগ্ধ, এতে জ্বালা-যন্ত্রণা হয় না। 'ডেটল' লাগালে কাপড়ে বা গায়ে দাগ হয় না। শিশুরা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারে। খরচ খুব কম, একটুতেই অনেকটা কাজ হয়। মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে আদর্শ জীবাণুনাশক উপকরণ এই 'ডেটল'। "মডার্ণ হাইজিন ফর উইমেন" (মহিলাদের আধুনিক স্বাস্থ্যরক্ষা) পুস্তিকাটি বিনামূল্যে দেওয়া হয়—চিঠি লিখুন।

দাড়ি কামানোর জলে কয়েক ফোঁটা 'ডেটল' মিশিয়ে নেবেন, তাতে ছোট-খাটো কাটাকুটি বা আঁচড় আর বিষিয়ে ওঠার ভয় থাকবে না। বেশী জলে অল্প 'ডেটল' মিশিয়ে কুলকুচো করলে গলায় আরাম ও উপকার পাবেন।

'DETTOL'

আধুনিক জীবাণুনাশক

অ্যাটলান্টিস (ইষ্ট) লিঃ,

পোঃ বক্স ৬৬৪, কলিকাতা ১

DBI-2

বুধুই দাস—কবি। জন্ম—বীরভূম জেলার অন্তর্গত মোহনপুর গ্রাম। গ্রন্থ—কলির মাহাত্ম্য কথা (১২৪৭ বঙ্গ)।

বৃন্দাবনচন্দ্র চক্রবর্তী—পাঁচালীকার। গ্রন্থ—সত্যনারায়ণের পাঁচালী (ঢাকা, ১৮৬৫ খৃঃ)।

বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—নাট্যকার। গ্রন্থ—স্বর্ণশৃঙ্খল (নাটক, ঢাকা, ১৮৬৩ খৃঃ)।

বৃন্দাবন দাস—বৈষ্ণব কবি। জন্ম—১৫০৭ খৃঃ (আনু) নবদ্বীপে। মৃত্যু—১৫৮৯ খৃঃ (আনু)। ইঁহার মাতা নারায়ণী দেবী শ্রীনিবাস আচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্রী। শৈশবে জননীর সহিত মাতুলালয়ে মামগাছির ঠাকুরবাড়ীতে বাস এবং চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি লাভ। আজীবন ব্রহ্মচারী। নিত্যানন্দের নিকট মন্ত্রলাভ। বর্ধমান জেলায় মন্তেশ্বর থানার অধীন দেনুড় মন্দিরে বিগ্রহ স্থাপন ও তথায় বাস। গ্রন্থ—চৈতন্যভাগবত (১৫৩৫ খৃঃ), শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার, দেহতত্ত্ব, পদাবলী।

বৃন্দাবন দাস—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কৃষ্ণনারদ সংবাদ (১২২১ বঙ্গ)।

বৃন্দাবন দাস—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। গ্রন্থ—তত্ত্বমঞ্জরী, আনন্দলহরী, নারদ উপাসনা-তত্ত্ব।

বৃন্দাবন দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জ্ঞানহীন কৌমুদী (১৮৫৩ খৃঃ)।

বৃন্দাবন সরকার—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—সুধাকর (মাসিক, ১২৮২)।

বেঙ্কট বেদান্ত দেশিক—কবি ও দার্শনিক। জন্ম—১৩-১৪ শতাব্দীতে কাঞ্চীনগরের উপকণ্ঠে। পিতা—অনন্ত সুরি। মাতা—তোতারম্বা। ইনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। গ্রন্থ—পাদুকাসহস্র (কাব্য), সঙ্কল্পসূর্যোদয় (নাটক), অধিকরণসারাবলী শতদূষণী।

বেঙ্গার, জন রেভারেন্ড (John Rev. Bengar)—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮১১ খৃঃ। মৃত্যু—১৮৮০ খৃঃ। ইনি ইয়েটস্ সাহেবের সহকর্মী ও কিছুকাল বাঙলা সরকারের অনুবাদকের কর্ম করেন। ইনি বাঙলা ও সংস্কৃত পুস্তকের তালিকা প্রণয়ন (১৮৬৫) ও সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (১৮৫০)। গ্রন্থ—বাঙ্গলা ব্যাকরণ, বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত, সার্বত্রিক পুরাবৃত্তসার, উপদেশ পাঠ-সংগ্রহ। সম্পাদক—উপদেশক (মাসিক), প্রচার-পত্রিকা—ঐতিহাসিক তত্ত্বাবধারণ, খৃষ্টান মণ্ডলীর চরিত্র।

বেচারাম চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ধর্মদীক্ষা (১৮৬৪ খৃঃ)।

বেচারাম লাহিড়ী—গ্রন্থকার। জন্ম—শান্তিপুর। গ্রন্থ—সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ।

বেণীমাধব আচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—উপদেশকল্পলতা (১৮৫৫)।

বেণীমাধব কর—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—বিশ্ববাণী (১৩৩৪-৩৭)।

বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কুঞ্জবিলাস (১৮৫৫)

বেণীমাধব ডাক্তিৎ—কবি ও গীতিকার। জন্ম—১২৪০ খৃঃ বর্ধমান জেলায় মন্তেশ্বর থানার অধীন বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট দেনুড় গ্রামে মধুমোদক বংশে; মৃত্যু—১৩০৯ বঙ্গ ১৫ই অগ্রহায়ণ। পিতা—গৌরহরি ডাক্তিৎ। মাতা—ব্রজসুন্দরী। অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় ব্যবসায় আরম্ভ। গৃহে সংস্কৃত, গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ। ইনি বহু কবিতা ও যাত্রার পালা রচনা করেন। যাত্রার পালা—রাবণ বধ, মানভঞ্জন।

বেণীমাধব দত্ত—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—প্রতিভা (১২৯৯)।

বেণীমাধব দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কবিতা-কুসুমমালা (১৮৬০), শব্দার্থমুক্তাবলী (১৮৬৪), বর্ণবোধ।

বেণীমাধব দে—সংবাদপত্রসেবী। সম্পাদক—সারসংগ্রহ (পত্রিকা, ১৮৩১ খৃঃ), সংবাদসংগ্রহ (পত্রিকা, ১৮৩৫)।

বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়—সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক—শুভাকাঙ্ক্ষী (১৮৭৫)।

বেণীমাধব বড়ুয়া—শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার। জন্ম—চট্টগ্রাম পাহাড়তলী। মৃত্যু—১৩৫৫ বঙ্গ ৬ই চৈত্র কলিকাতা। শিক্ষা—এম. এ (১৯১৩), সরকারী বৃত্তিলাভ করিয়া বিলাত গমন (১৯১৪—১৭)। কর্ম—অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৮), পালি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক (১৯২৪), ডক্টর, ডি-লিট্ উপাধি লাভ (লণ্ডন)। ইনি বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। গ্রন্থ—Barhut Inscriptions, ৩ খণ্ড। Gaya and Buddha-Gaya (১৯৩৪), A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy, Old Brahmi Inscriptions. অন্যতম সম্পাদক—Indian Culture, বৌদ্ধ কোষ, বঙ্গীয় মহাকোষ।

বেণীমাধব ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পদ্যাবলী (১৮৭৪)।

বেতাল ভট্ট—রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম। গ্রন্থ—বেতালপঞ্চবিংশতি, নীতিপ্রদীপ।

বেলা দেবী (ঘোষ)—মহিলা সাহিত্যিক। সম্পাদিকা—রূপশ্রী (মাসিক, ১৩৪১)।

বেলা ভট্টাচার্য—মহিলা সাহিত্যিক। যুগ্ম সম্পাদিকা—ছেলেমেয়ে (১৩৫৫)।

বেলী, এইচ, ভি (H. V. Bayley)—ইংরেজ সাংবাদিক ও গ্রন্থকার। ভারতহিতৈষী সিভিলিয়ান। কর্ম—মেদিনীপুর জেলার কালেক্টর ও সেটেলমেন্ট অফিসার (১৮৪৩—১৮৫২ খৃঃ)। গ্রন্থ—Settlement Report of Majnamtha (১৮৪৪), Settlement Report of Jallamutha (১৮৪৪), Memoranda of Midnapore (১৮৫২)। সম্পাদক—Midnapore & Hijli Guardian (মেদিনীপুর ও হিজলী অঞ্চলের অধ্যক্ষ—ইহা মেদিনীপুর জেলার সর্বপ্রথম মাসিকপত্র, ইংরেজি ও বাংলা দ্বিভাষিক পত্র, ১৮৫১ খৃঃ)।

বৈকুণ্ঠচন্দ্র দাস—শিক্ষাব্রতী ও সংবাদপত্রসেবী। জন্ম—ঢাকা। মৃত্যু—১৩২৯ বঙ্গ। শিক্ষকতা। ঢাকা রিপন লাইব্রেরীর (পুস্তকালয়) প্রতিষ্ঠাতা। সহ-সম্পাদক—ঢাকা-প্রকাশ।

বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত—আইনজ্ঞ ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—Indian Penal Code, ১ম-৩য় (১৮৫৫-৬৩), Criminal Penal Code (১৮৫৫-৬৩)।

বৈকুণ্ঠনাথ দাস—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—সখী (মাসিক, ১১০১)।

বৈকুণ্ঠনাথ দে—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—তামাক এক প্রকার বিষ (১৯০১), আগামী রাজ্য (১৯০১)।

বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি। গ্রন্থ—ভগবদ্গীতা (পদ্যানুবাদ —১৮৯৯)।

বৈকুণ্ঠনাথ বসু—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৬০ বঙ্গ ভাদ্র কলিকাতা। মৃত্যু—১৯২১ খৃঃ। পিতা—শ্রীনাথ বসু (জমীদার)। আদি নিবাস—২৪ পরগনার অন্তর্গত বহড়ু গ্রামে। শিক্ষা—এনট্রান্স (১৮৬৬), এফ, এ, (প্রেসিডেন্সী কলেজ)। কর্ম—টাকশালের নায়েব দেওয়ান (১৮৭০), অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট (শিয়ালদহ ১৮৮০, কলিকাতা ১৮৮২), কারেন্সী অফিসের ডেপুটি ট্রেজারার (১৮৮২), টাকশালের দেওয়ান বা বুলিয়ন কীপার (১৮৮৩), অবসর গ্রহণ (১৯০৫), রায় বাহাদুর উপাধি লাভ (১৮৯৪)। ইনি বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্ত হন ও নানাবিধ বাদ্য ও সঙ্গীত শিক্ষা করেন। কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয়বিধ সঙ্গীতে ইনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ইঁহার রচিত নাটক ও প্রহসনগুলি তদানীন্তন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া দর্শকগণের মনোরঞ্জন করে। নাট্যগ্রন্থ ও প্রহসন—রামপ্রসাদ, বসন্তসেনা, কৃষ্ণাষ্টমী, মান, নাট্যবিকার, ঠকলে কে? যুগের হুজুগ, পৌরাণিক পঞ্চরং, বারবাহার, গোবর গণেশ, ষোল কড়াই কাণা, নাট্যসংহার, অদল বদল, লছমী পানা।

বৈকুণ্ঠনাথ সেন—আইনজ্ঞ ও সংবাদপত্রসেবী। জন্ম—১৮৪৬ খৃঃ বর্ধমান জেলায় আলমপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৯২২ খৃঃ। পিতা—হরিমোহন সেন। আইন ব্যবসায় অবলম্বন ও পরে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট (বহরমপুর, ১৮৭৩-১৮৯৯)। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। সম্পাদক—মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী (খাগড়া, সয়দাবাদ, সাপ্তাহিক, ১৩০৩)।

বৈজয়ন্তী দেবী—মহিলা কবি। জন্ম—১৬শ শতাব্দীতে ধামুকা গ্রামের কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র ময়ূরভট্টের বংশে। বাল্যে পিতার নিকট টোলে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা। সংস্কৃত কবিতা রচনায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ। স্বামী—কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম (কবি ও পণ্ডিত)। বিবাহের পর স্বামীর নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন ও সংস্কৃত কবিতার পত্র-বিনিময়। কাব্যগ্রন্থ—আনন্দ-লতিকাচম্পূকাব্য (স্বামীসহ—১৫৭৪ খৃঃ)।

বৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বাঁচিবার উপায়, নিরক্ষরা, ঘরে পরে, ব্যথার সুখ, ভুল, মূর্খ কে?

বৈদ্যনাথ দ্বিজ—অনুবাদক। গ্রন্থ—শিবপুরাণের অনুবাদ (১৮৩১-৪৭)।

বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডে—টীকাকার। জন্ম—১৮শ শতাব্দী দাক্ষিণাত্য। পিতা—মহাদেব। মাতা—বেণীদেবী। ইনি দার্শনিক পণ্ডিত নাগেশের শিষ্য। গ্রন্থ—ছায়া (প্রদীপোদ্দ্যোতের টীকা), পরিভাষেন্দুশেখরসংগ্রহ, রমা (টীকা)।

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থ। ইনি খাজনাখানায় কর্ম করিতেন। অবসর সময়ে সাহিত্যচর্চা করিতেন। গ্রন্থ—ভারতবর্ষীয় ইতিহাস, ২ খণ্ড (১৮৪৮ খৃঃ)।

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—২৪ পরগনার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া। গ্রন্থ—আচারদর্পণ (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে), অজ্ঞানতিমিরনাশক (ঐ)।

বৈষ্ণবচরণ বসাক—সাহিত্যিক। সম্পাদক—আর্যপ্রতিভা (মাসিক, ১২৯৫ বঙ্গ)।

বৈষ্ণব দাস—পদকর্তা। ইনি বৈষ্ণব ছিলেন, পূর্ব নাম গোকুলানন্দ সেন। গ্রন্থ—গুরুকুলপঞ্জিকা, পদকল্প তরু (সংকলিতা)।

বৈষ্ণব দাস—পাঁচালীকার। পাঁচালী গ্রন্থ—বাবাহর পাঁচালী।

বোগেরাতি, মৌলবী—শিক্ষাব্রতী মুসলমান সাহিত্যিক। সম্পাদক—জগতদীপ (ইহা পারস্য, হিন্দী, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত—১৮৪৬)।

বোপদেব—বৈয়াকরণ ও গ্রন্থকার। ১৩শ শতাব্দী। পিতা—ভিষক্ কেশব (বগুড়া জেলার মহাস্থানের অধিবাসী, মতান্তরে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, মতান্তরে দৌলতাবাদে)। ইনি যাদবরাজ মহাদেবের সভাপণ্ডিত। গ্রন্থ—মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, বোপদেবশতক, সিদ্ধমন্ত্রপ্রকাশ, কাব্যকামধেনু, হরিলীলা, শ্রাদ্ধকাণ্ডদীপিকা, কবিকল্পদ্রুম, মুক্তাফল, রামব্যাকরণ, শতশ্লোক-চন্দ্রিকা পরমহংসপ্রিয়া।

ব্যাড়ি—কোষকার। ইনি বিন্ধ্যাচলে বাস করিতেন এবং গুণাঢ্যের সমসাময়িক। ইনি নন্দিনীপুত্র বলিয়া উল্লিখিত। গ্রন্থ—সংস্কৃত অভিধান।

ব্যাসরাজ স্বামী—দার্শনিক পণ্ডিত। ১৬শ শতাব্দী। ব্রাহ্মণী-তীর্থের শিষ্য। গ্রন্থ—ন্যায়ামৃত (টীকা), পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনের টীকা।

ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—কথা-সাহিত্যিক। নিবাস—মুর্শিদাবাদ। উপন্যাস রচনায় ইনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। গ্রন্থ—সোনালী, লক্ষ্মীপ্রতিমা, শিথিল কবরী, বিয়ের রাত, স্বর্ণমন্দির, জীবনের সাধ, রূপসী, চোখের কাজল, দুনিয়ার দান, সোহাগী, কাজলা রাতের বাঁশী, কিশোরী, আলোর কমল, নিখিলের শান্তি, কায়া ও ছায়া, বাদলধারা, বিশ্বনাথের দরবারে, দানের বোঝা, স্বেচ্ছাসেবিকা, পদ্মমধু।

ব্যোমকেশ মুস্তফী—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৬৮ খৃঃ। মৃত্যু—১৯১৬ খৃঃ ১লা এপ্রিল। পিতা—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী (প্রসিদ্ধ অভিনেতা)। কিশোর বয়স হইতেই বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অক্লান্ত কর্মী এবং সহকারী সম্পাদক (১৩০৬-১৩২২)। কর্ম—কলিকাতা হাইকোর্টের কর্মচারী। সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা, মানসী, বাণী প্রভৃতি বহু সাময়িক পত্রের ও বিশ্বকোষ গ্রন্থের চিন্তাশীল লেখক। প্রকাশক—তপস্বিনী (নন্দলাল বসু ও নগেন্দ্রনাথ বসু সহ—১২৮৯), ভারত (পত্রিকা ১২৯১), বিশ্বকোষ সংকলনে ইনি নগেন্দ্র বাবুকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। গ্রন্থ—ললাট লিখন (গল্প)। সম্পাদক—সাহিত্য-কল্পদ্রুম (মাসিক ১২৯৮), বঙ্গনিবাসী (সাপ্তাহিক), মালা (মাসিক, ১৩০৪)।

ব্যোমচাঁদ বাঙ্গাল—গ্রন্থকার। জন্ম—ঢাকা জেলায়। গ্রন্থ—ঘর থাকতে বাবুই ভিজে (ক্ষুদ্র পুস্তিকা মদ্যপানের বিরুদ্ধে রচিত—১৮৫৭ খৃঃ)।

ব্রজকিশোর গুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বাঙ্গালা ব্যাকরণ (ইহা সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে রচিত—১৮৫১)।

ব্রজগোপাল ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দায়ভাগ (Hindu Law of Inheritance)। [ক্রমশঃ।

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

যাঁরা সঠিক সংবাদ রাখেন না, স্বগৃহে অন্তরীণের কথা শুনেই হয়তো তাঁরা উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন। এই ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন যে, যাক্ গে, তবুও তো জেল নয়, স্বগৃহ অর্থাৎ বাবা, মা, ভাই, বোন, আত্মীয়জন ও প্রতিবেশীর সান্নিধ্য-সমৃদ্ধ শান্তিময় আবেষ্টনী! নেই এখানে দোর্দণ্ডপ্রতাপ বৃটিশ ক্রাউনের প্রতিনিধি হবুচন্দ্র রাজা উদ্ধত টবিন আর তাঁর যোগ্য দোসর ও মন্ত্রী গবুচন্দ্র গিরিজা। নেই পাঠান সিপাইয়ের দুর্বিনীত অসহ আচরণ, তল্লাসীর নামে নেই আই-বি অফিসারদের অবমাননাকর ব্যবহার, নেই গুণতি আর লক্-আপের দৈনন্দিন ঝামেলা। স্বগৃহে নেই দেয়ালের অনতিক্রম্য বাধা, নেই পদে-পদে শত-সহস্র আইন ও নিয়মের ভ্রূকুটি আর আশেপাশে নেই দিবাকর সেনগুপ্তের শ্যেন-চক্ষু!

রান্নাঘরে বসে এখানে বৌদিদের সঙ্গে খোসগল্প করেই কাটিয়ে দেয়া যাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, জ্যোৎস্না রাতে আমাদের ছাদে জমানো যাবে আবার সেই পারিবারিক অফুরন্ত আড্ডা, সারাটি দিন পুকুরের পশ্চিম পাড়ে হিজল গাছের কোণে ছোট ছিপ নিয়ে বসে বেশ দিব্যি তোলা যাবে প্রায় প্রতি টানেই পুঁটি, ট্যাংরা, বেলে অথবা টাকি। স্বভাবতই তাঁরা ভাববেন, স্বগৃহে অন্তরীণের সঙ্গে মুক্তির পার্থক্য একেবারেই অকিঞ্চিৎকর!

অপরে যাই ভাবুন, বন্দীশিবিরের সঙ্গে তুলনায় স্বগৃহে অন্তরীণাবস্থাকে আদৌ প্রীতির চক্ষে দেখতাম না আমরা। সর্বক্ষেত্রেই যে সর্তহীন মুক্তিদানের পূর্বেই শুধু স্বগৃহে এনে কিছু দিন আটক রাখা হতো, তা একেবারেই সত্যি নয়। আমার নিজের ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম দেখা গেছে। বরং অসময়ে মুক্তির পশ্চাতে পুলিশের যে নীতি আছে, স্বগৃহে অন্তরীণ করবার বেলাতেও তাই। অর্থাৎ, বিশেষ কোনো এলাকা থেকে গুপ্ত সমিতির আরও কিছু সদস্যকে মাটির তলা থেকে লোভ দেখিয়ে বাইরে এনে হাতকড়া লাগানোই এর উদ্দেশ্য। অনেকটা খাঁচার মধ্যে ছাগল পুরে হিংস্র ব্যাঘ্র ফাঁদে আটকাবার চেষ্টা! আর এমনই ফাঁদ, চক্রব্যূহের মতো অভ্যর্থনার বেলায় যে সীমাহীন উদার, কিন্তু বিদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত কৃপণ!······

সরকারী অফিসারদের স্বাক্ষরযুক্ত যে হুকুমনামা হাতে দিয়ে স্বগৃহে অন্তরীণের আদেশ জারী করা হয়, তার দুটি সর্ত এমনি:

এক: স্বগ্রামের সীমানার মধ্যে থাকতে হবে চব্বিশটি ঘণ্টা আর সন্ধ্যে ছ'টা থেকে ভোর ছ'টা পর্যন্ত থাকতে হবে একেবারে স্বগৃহের চারখানি দেয়ালের মধ্যে।

দুই: কোনো ছাত্র, শিক্ষক অথবা ভিন্ন গ্রামের কারুর সঙ্গে কথা কওয়া নিষেধ।

আমার বেলায় কর্তারা খেললেন আর একটি বিশেষ রকমের চাল। দিনের বেলা আমার চলাফেরার সীমানা নির্দিষ্ট হলো শুধু আমাদের কেয়টখালী গ্রাম নয়, আশেপাশের দু'-চারখানা গ্রামও নয়—একেবারে গোটা বিক্রমপুর বলা চলে। পুবের সীমানা হলো তালতলা, পশ্চিমে নির্দিষ্ট হলো আড়িয়ল বিল, দক্ষিণে লৌহজং এবং উত্তরের সীমানা হলো ধলেশ্বরী নদী। এই বিস্তীর্ণ এলাকার পরিধি অন্যূন ১৬৮ বর্গমাইল।

যাঁরা ভেতরের সংবাদ রাখেন না, তাঁরা তো খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠবেন এ কথা শুনে। কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে—একটি 'বিরাট এলাকায় ঘোরাফেরা করবার' সুযোগ দিয়ে অসংখ্য চর লাগিয়ে আমার গতিবিধির রিপোর্ট সংগ্রহ এবং সুযোগ বুঝে এক-একটি করে কর্মীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করা।

এটা সহজেই ধরতে পেরেছিলাম আমি। দিনের বেলায় বিরাট এলাকায় অবাধে ঘোরাফেরার স্বাধীনতা দিয়ে আবার ভিন্ গাঁয়ের কারুর সাথে কথা কইতে বারণ করে দেবার পশ্চাতে যে গূঢ় অভিসন্ধি আছে, সহজ লজিকেই তা ধরা পড়ে। কিন্তু ধরা পড়বার এই সহজ সত্যটাই ঐ "বুদ্ধি শাখা"-র অশেষ বুদ্ধিশালীদের মগজে একটু বিলম্বে ঘা দেয়। ট্র্যাজেডি ঐখানেই।

বাড়ীতে এসে আমি বেশ বুঝতে পারলাম ওরা গভীর জলের আরো গোটা কতক মৎস্য শিকারের উদ্দেশ্যে সুগন্ধ 'চার' করে লোভনীয় 'টোপ' ফেলতে চায়। ফলে, এবার সুরু হলো আমার সঙ্গে ওদের বুদ্ধির লড়াই!

প্রথম দিনেই মনে-মনে সংকল্প করলাম যে, আমার ও অন্যান্য বন্ধুদের অবর্তমানে যে যোগাযোগ-গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, শুধু তাই জুড়ে দেয়া নয়, স্বগৃহে ফিরে আসার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে এমন একটা কিছু করতে হবে, যাতে মূর্খ Intelligence Branch অর্থাৎ আই-বি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে ওদের মারাত্মক ভুল কোথায়। বুদ্ধির লড়াইতে ওদের ধরাশায়ী করাই আমার ব্রত হয়ে দাঁড়ালো।

আমাদের বাড়ীতে একখানা একতলা দালান আছে। খুব বড়-বড় কোঠা। তার দক্ষিণের কোঠাটি আমি দখল করলাম। আমাদের বাড়ীতে প্রবেশের সদর এদিকে। তাই মা আপত্তি করলেন না।

অন্যান্য দশ জন শুভানুধ্যায়ীর মতোই বাবা সরকারী হুকুমনামা পাঠ করে আশান্বিত হয়ে উঠলেন, এবার ওরা ছেড়ে দেবে শুধু একটুখানি চুপ করে থাকলেই। কিন্তু মা আমায় জানতেন একটু বেশী নিবিড় ভাবে। তাই নিজে আশার আলোকরেখা দেখতে পেলেও আমার কাছে এলেন যাচাই করতে।

কি রকম দিলি আই-এ পরীক্ষা?

হেসে জবাব দিলাম: পাশ করে যাবো।

শুধু পাশ!—মা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন: প্রশ্ন বুঝি খুব শক্ত এসেছিল আর জেলের মধ্যেও বোধ হয় স্বদেশীর পোকা তোমায় কামড়ানো ছাড়েনি?
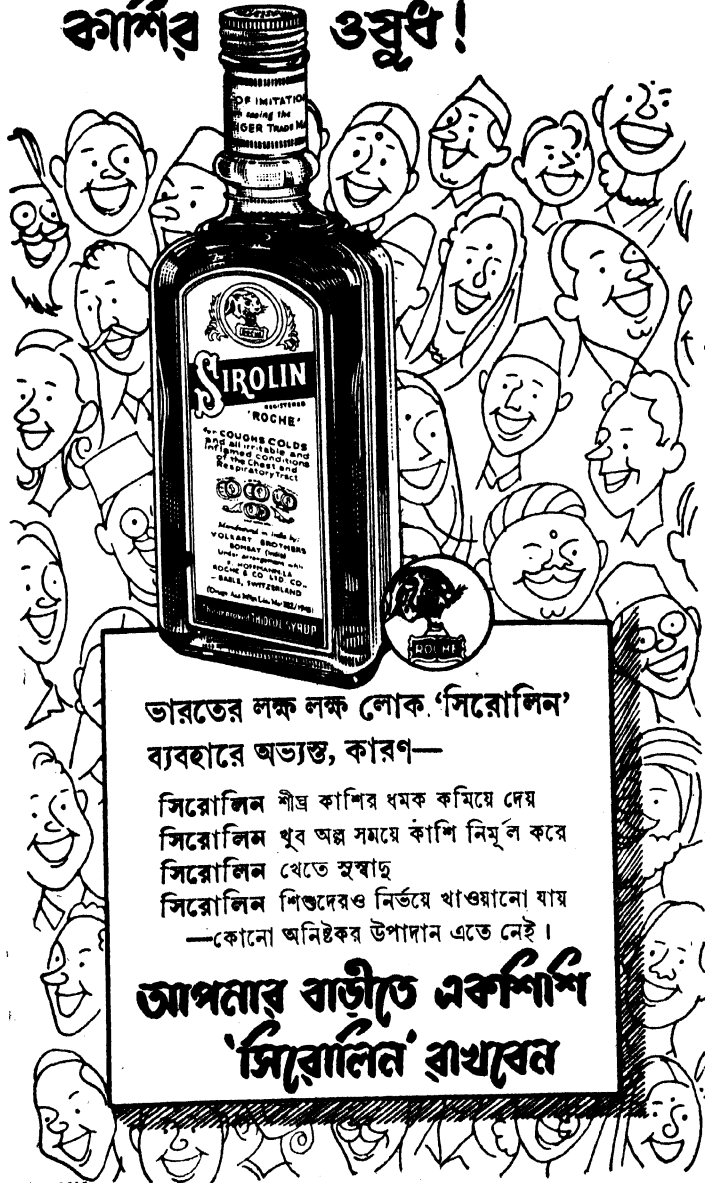
কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করলাম: না, না, পোকা নয়। আসল কথা, বই যে একখানাও কিনিনি। পরের বই ধার করে পড়ে শুধু পাশই করা চলে মা, ষ্ট্যাণ্ড করা যায় না।

পাশেই প্রকাণ্ড কাচের আলমারী ভর্তি নতুন বইয়ের সারি দেখিয়ে মা জিজ্ঞেস করলেন: এই বাইরের বইগুলো কিনতে পারলি আর পাঠ্য বইগুলো—

বাধা না দিয়ে পারলাম না: শুধু কি তাই, বহরমপুরে রাজবন্দীদের প্রত্যেকটি কাজেই যে আমায় যেতে হতো—

মা গম্ভীর হলেন: কেন, ঐ তিনশো বন্দীর মধ্যে কি তুমি একাই ছিলে মাতব্বর?

ভারতের ঘরে ঘরে সমাদৃত
কাশির ওষুধ!
SIROLIN
'ROCHE'
For COUGHS COLDS and all irritable and inflamed conditions of the Chest and Respiratory Tract
ROCHE
ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক 'সিরোলিন' ব্যবহারে অভ্যস্ত, কারণ—
সিরোলিন শীঘ্র কাশির ধমক কমিয়ে দেয়
সিরোলিম খুব অল্প সময়ে কাশি নির্মূল করে
সিরোলিন খেতে সুস্বাদু
সিরোলিন শিশুদেরও নির্ভয়ে খাওয়ানো যায়
—কোনো অনিষ্টকর উপাদান এতে নেই।
আপনার বাড়ীতে একশিশি 'সিরোলিন' রাখবেন
VB 6614

কী জবাব দোব ? চুপ করে থাকলাম। মা রেগেছেন, এবার বকবেন।

কিন্তু না, তা নয়। মাথার বালিশের পাশে ঝপ্ করে বসে পড়ে আমার চুলের মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন : সে কথা যাক্। আমার একটা কথা রাখবি বল্ ?

কি কথা ?

আগে রাখবি বল্ ? কথা দে—

কি কথা, বল না !

না। আগে কথা দিতে হবে।

ইতস্ততঃ করে বললাম : দিতে পারি, শুধু একটি কথা বাদে। আর সেটা যে কী কথা, তা তো তুমি জানোই মা !

হাত থেমে গেল। গাঢ় গলায় মা বললেন : তা জানি, তুমি কথা দেবে না। কত আশা ছিল তোমার বাবার, তুমি বিলেত যাবে, ব্যারিষ্টার হবে, বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। এখন দেখছি, তোমায় জেলের বাইরে রাখাই মুশকিল !

আবহাওয়া হালকা করবার জন্ত বলে উঠলাম : কেন, এই তো জেলের বাইরে এসেছি। তোমার কোলে মাথা রেখেছি। গল্প করছি—

মা হেসে ফেললেন। বললেন : কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে যারা চুপিচুপি এসে এই ঘরে ঢোকে, অন্ধকারেই বসে ফিস্‌ফিস্ করে কথা কয়, আবার এক সময় চোরের মত পা টিপেটিপে যারা বেরিয়ে যায়, তারা যে বেশীদিন তোমায় বাইরে থাকতে দেবে না, তা আমি জানি।

বললাম : ওদের কী দোষ ?

মা বললেন : দোষ ওদের নয়, দোষ তোর নিজের।

কিন্তু পুলিশ টের পাবে না। দেখো তুমি মা, কাজ আমাদের চলবেই আর ওরা ভাববে আমি শুড বয়ের মতো খাই আর ঘুমই।

মা বুঝলেন হুকুমনামা দেখে বাবা উল্লসিত হয়ে উঠলেও তাঁর সে ভুল করবার দুর্দ্দিন এখনো আসেনি। মা আমায় চেনেন।

সত্যিই, কালক্ষেপ না করে কাজ সুরু হয়ে গেল। গোপনে বৈঠক হলো অনেকগুলো। একসঙ্গে বসে বিতর্ক-সভা নয়—পৃথক-ভাবে। এলো সুবোধ চক্রবর্ত্তী, এলো মধু ভট্টাচার্য্য, ইন্দু সরকার ; এলো শচীন চ্যাটার্জ্জী, এলো সুবোধ গুহ, বঙ্কিম নাগ ও পবিত্র দাস ; এলো কানাই ব্যানার্জ্জী বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী ও পরাণ চ্যাটার্জ্জী। আর আমাদের গ্রামেই তৈরী হয়ে উঠলো বিপদভঞ্জন চ্যাটার্জ্জী, খগেন চক্রবর্ত্তী, অনাথ চক্রবর্ত্তী ও মণি চ্যাটার্জ্জী।

স্থির হলো সর্ব্বাগ্রে সংগঠন, তার পর ট্রেনিং, তার পর পরিকল্পনানুযায়ী এ্যাক্‌শন ! বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিশালী বিভাগের সঙ্গে সুরু হলো বুদ্ধির লড়াই। দুনিয়ার যে-কোনো কামানের লড়াইয়ের মতোই এটা মারাত্মক ও ভয়াবহ। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় রেখেছি সজাগ কান-খাড়া বুলডগের মতো। শত্রুর অনুপ্রবেশের প্রত্যেকটি পথে অহর্নিশি রয়েছে অতন্দ্র পাহারা। অবিশ্বাস করছি দেয়ালকে, সন্দেহ করছি সন্দেহাতীত সুহৃদকে। নিজের ছায়াকে বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস নেই নিজের হাতকে। ক্ষুরধার বুদ্ধির কাঁটাগুলো উঁচিয়ে রেখেছি সজারুর মতো। সাপের মতো বুকে হেঁটে-হেঁটে এগিয়ে যেতে হবে শত্রু-সীমানায়। সন্তর্পণ অনুসন্ধানে বার করতে হবে লখীন্দরের লৌহ-গৃহের অসতর্ক ছিদ্র !···কামানের লড়াইয়ে তবু আছে বিরামের আশা, সন্ধির আশ্বাস, ভার্সাইয়ের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু বুদ্ধির লড়াই চলে অবিশ্রাম একটানা ভাবে। সুরু আছে এর, শেষ নেই ! মজঃফরপুরে হয়েছে এর সূত্রপাত, পরিণতি লাভ করেছে ইস্কুল পাহাড়ের চূড়ায়, শেষ কবে হবে কে জানে !···

২৮

বাড়ীতে এসে সংবাদ নিলাম, রেণু এখানে নেই, শ্বশুরবাড়ীতে। আসবার কথা আছে শীগগিরই। তার খোকা হয়েছে একটি।

কিন্তু কিছুতেই পারছিলাম না রেণুর মা'র সঙ্গে দেখা করতে তাঁদের বাড়ী গিয়ে। কারণ শুধু একটি এবং সে কারণটি এমনি মর্ম্মস্পর্শী যে, তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

রেণুর দাদা ত্রিলোকেশ ওরফে মাণিক আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক কাজে সে-ই তখন ছিল আমার দক্ষিণ হস্ত। অনেকটা হীরা সিংয়ের মত। কথা বেশী কয় না, বেশী লোক-জনের সান্নিধ্যও সর্ব্বদাই এড়িয়ে চলে। যখন যেখানে যে অবস্থায় যেতে বলা হবে, যা করতে বলা হবে, সে যাবেই এবং তা করবেই। কোনো কারচুপি, ষ্ট্র্যাটেজি বা কৌশলের ধার ধারে না মাণিক। এগিয়ে যেতে-যেতে এক পা পেছিয়ে আসবার কূটনীতি তার অন্তর স্পর্শ করে না। কাজের শেষে সে যদি ফিরে না আসে, তাহলে বুঝতে হবে হয় কাজ শেষ হয়েছে, নইলে সে নিজে শেষ হয়ে গেছে ! এর মধ্যে কোনো রফার অবকাশ নেই। Light Brigade-এর সৈনিকের মতো—

Their's not to reason why,
Their's but to do or die·····,

স্বেচ্ছায় সে নিয়েছিল আমার দেহরক্ষীর কাজ। সর্ব্বত্রই সে ছায়ার মতো নিঃশব্দে আমার পাশে-পাশে থাকতো। সর্ব্বদাই পকেটে বা বেল্টে থাকতো তার একটি রিভলবার। গুলী-ভরা ছ'ঘরা রিভলবার। চালাতে হয়নি তাকে কোথাও আমার দেহরক্ষার জন্ত, তা সত্যি। কিন্তু চালাবার ক্ষীণতম প্রয়োজন দেখা দিলেই যে নেকড়ে বাঘের মতো মাণিক লাফিয়ে পড়তো সম্মুখে, তা সর্ব্ব অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি আমি।

দু'বছর পূর্ব্বে আমি গ্রেপ্তার হবার কিছু দিন পর সে-ও গ্রেপ্তার হয় এবং রাজবন্দী করে তাকে বহরমপুরেই আমাদের পুরোনো বন্দীশিবিরের পাশেই একটি নতুন বন্দীশিবিরে অন্যান্যের সঙ্গে আনা হয়। কিছু দিন পরই পাঠানো হয় তাকে যশোহরের কোনো গণ্ড-গ্রামে থানায় অন্তরীণ করে। বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে সেখানে সে প্রাণত্যাগ করে বিনা চিকিৎসায় ও বিনা শুশ্রূষায় !

বাড়ীর বড় ছেলে। তাও আবার যার-তার নয়, স্বয়ং বিলাস কাকার ছেলে। বৃদ্ধ কাকার হাত থেকে সংসারের সমস্ত ভার মাণিকই স্কন্ধে তুলে নেবে, এই ছিল তাঁদের কামনা। দেলভোগের সাউদের বলেও রেখেছিলেন কাকা যে, এবার মুক্তি পেয়ে এলেই তাকে বসিয়ে দেবেন কাছারিতে, নায়েবের কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খ শিখিয়ে দেবেন। কাকা আর ক'দিন ? কাকীমাও সিংপাড়ার কোন্ এক ব্রাহ্মণ-কন্যার পিতাকে কথাই দিয়ে রেখেছিলেন যে, মাণিক এবার

ফিরে এলেই হয়…আর কি মিশতে দেবেন গাঙ্গুলী বাড়ীর ঐ দ্বিজেন গাঙ্গুলীর সাথে ?…

কিন্তু হায়, দ্বিজেন গাঙ্গুলী ফিরে এল বাড়ীতে, মাণিক আর এলো না। কী করে যাই কাকীমাকে প্রণাম করতে ? কী বলে সান্ত্বনা দোব তাঁকে ? মৃত্যু যে অবধারিত নির্মম সত্য, তা জানি, কিন্তু এমনি করে অজানা অচেনা দেশে নিজের ঘরে একা-একা ধুঁকতে ধুঁকতে মরা, এর ধাক্কা কী করে সামলাবেন কাকীমা ?

তবু গেলাম, অপরাধীর মতো নীরবে মাথা নীচু করে তীব্র ভর্ৎসনা গ্রহণ করবার জন্যই গেলাম। কাকীমা রান্নাঘরে রাঁধছিলেন। আমি হাঁক দিতেই ত্রস্তপদে বেরিয়ে এলেন। আমি পায়ের ধুলো নেবার জন্য নীচু হতেই শুধু একটি প্রশ্নই শুনলাম কানে : তুই তো, ফিরে এলি, কিন্তু আমার মাণিককে কোথায় রেখে এলি রে ?…

সংজ্ঞাহীন দেহ তাঁর মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। জ্ঞান ফিরে আসা পর্য্যন্ত আর অপেক্ষা করলাম না আমি। কারণ এমনি একটি প্রশ্ন কাকীমা উচ্চারণ করবার পূর্ব্বেই আমারও মনের কোণে দেখা দিচ্ছিল বিজলী চমকের মতো। মাণিক কোথায় ? কোথায় আমার দেহরক্ষী ? কোথায় আমার দক্ষিণ হস্ত ?…নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই পাইনি খুঁজে। তাই পালিয়ে এলাম।

মনে পড়ে কয়েক বছর পূর্ব্বেকার কথা। কলকাতা মিডল্ রোডে থাকতো সে সহানুভূতিহীন কাকার বাসায়। বাবা পাঠিয়েছিলেন চাকরির চেষ্টা করবার জন্য। পাড়ার সুশীল চক্রবর্ত্তী কলকাতাতেই ভালো একটা চাকরি করতো। কাকার বাসায় মাণিকের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার অবধি ছিল না। সময় মত বাড়ীতে না ফিরে গেলে প্রায়-দিনই হয় তার জন্য খাবার থাকতো না বা কম থাকতো অথবা হয়তো একখানা থালায় সব ঢেলে দিয়ে এমনি অসাবধানতার সঙ্গে ফেলে রাখা হয়েছিল যে, বেড়ালে সব খেয়ে গেছে। কিন্তু কাজের নেশায় এমনি মশগুল ছিল সে যে এ সব অসুবিধাকে ভ্রূক্ষেপই করতো না। বহু জেরা করে-করে সুশীল হয়তো একদিন জানতে পারতো যে গত ক'দিন মাণিকের খাওয়াই হয়নি। এই অর্দ্ধাশন ও অনশন থেকে বাঁচাবার জন্য সুশীল বিশেষ ভাবে চেষ্টিত হয়ে উঠলো।

জুটলোও একটা চাকরি কলকাতার বাইরে খুলনাতে। কিন্তু মাণিক যেতে রাজী নয়। এদিকে সুশীল আমার গোপন সমর্থন পেয়ে মাণিকের বাড়ীতে সংবাদ পাঠিয়ে, নিজে ওর জামা-কাপড় ও খাঁকি হাফ প্যাণ্ট কিনে দিয়ে এই ব্যাপারে এমনি অগ্রসর হয়ে পড়লো যে, মাণিকের আর প্রত্যাখ্যান করবার উপায় রইলো না। খুলনা যাবার দিন স্থির হয়ে গেল। কোন্ একটি মোটর সারাই কারখানায় চাকরি। প্রারম্ভে লোভনীয় কিছু না পেলেও কামড়ে পড়ে থাকতে পারলে ভবিষ্যতে আশা আছে।

মাণিকের কলকাতা ত্যাগের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে দলের কাজে অকস্মাৎ আমারও একবার বিক্রমপুরে যাবার প্রয়োজন দেখা দিল। ঢাকায় লোম্যান ও হডসন সাহেবকে গুলী করে বিনয় তখন পলাতক। নির্দ্দেশ এসেছে, একটি রিভলবার নিয়ে বিক্রমপুরে গিয়ে সেটা বিনয়ের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। কী করে রিভলবার সঙ্গে করে কলকাতা থেকে কেয়টখালী পৌঁছাই ? একটু ভাবনায় পড়লাম।…অসীম সাহসে ভর করে এক দিন ট্রেণে গোয়ালন্দে শ্রীপদের কোয়ার্টার ষ্টীমারের "আমীর" ফ্ল্যাটে পৌঁছলাম। সেখানে দু'-এক দিন অপেক্ষা করে সুযোগ বুঝে অকস্মাৎ এক দিন নারায়ণগঞ্জ মেল ষ্টীমারে পাড়ি দোব স্থির করলাম।

কিন্তু পরদিন অকস্মাৎ কলকাতা থেকে মাণিক গোয়ালন্দে এসে হাজির ! ক্ষুণ্ণ মনে প্রশ্ন করাতে সে তার স্পষ্ট জবাব দিল : আমার একটা চাকরি গেলে আবার চাকরি পাবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বিনয় বোস বাংলা দেশে এক জনই আছে। এই মহা সত্যটি ভুলো না, বুঝলে ?

মাণিক রিভলবারটি নিয়ে কোমরের বেল্টে এঁটে নিল এবং ষ্টীমারে চড়ে বসলো। চাঁদপুর মেল ষ্টীমারে গেলাম আমরা রাত্তে কেয়টখালীতে অনেক রাতে পৌঁছোই। অর্থাৎ অসময়ে।

কাদিরপুর থেকে হাঁটা-পথে যখন আমরা কেয়টখালী পৌঁছলাম, তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। আমাদের বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। গ্রামও নিস্তব্ধ। মাণিক চাকরিতে না গিয়ে বাড়ী চলে এসেছে আমার সঙ্গে, বিলাস কাকা এটা কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না জেনে মাণিককে আর ওদের বাড়ী যেতে দিলাম না।

মাকে ডেকে তুললাম, সোনা বৌদিও উঠলেন। বললাম, এক জন অতিথি আছেন দক্ষিণের ঘরের অন্ধকারে বসে। তিনি খাবেন, আমিও খাবো।

মা জিজ্ঞেস করলেন : অন্ধকারে বসে ? সে কেমন অতিথি রে ?

গম্ভীর মুখে বললাম : তা জেনে তোমার কী প্রয়োজন মা ?

উকুনের নতুন ওষুধ
নিউট্রেল-লাইসাইড

"আমি আপনার ল্যাবরেটারীর উকুনের ঔষধের কথা আর বর্ণনা করিতে পারিলাম না। কী অমোঘ ঔষধ যে পাঁচ বছর ধরিয়া কোন ঔষধে কাজ হয় নাই অথচ আপনার ল্যাবরেটারীর ঔষধ একবার ব্যবহার করিয়া আমি এবং আরও ৫ জন মহিলা উপকৃতা হইয়াছেন। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।"

মিসেস বসু, কলিকাতা—২৬

প্রতি প্যাকেটের জন্য দুই আনার ডাকটিকেট পাঠাইবেন।

বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার কয়েকটি জেলায় এই **"লাইসাইড"** পরিবেশক প্রয়োজন। উচ্চহারে কমিশন দেবো।

Dept. M.B.

১৯, বণ্ডেল রোড ; কলিকাতা-১৯

এখন আলু আর ডিম সেদ্ধ দিয়ে ভাত দাও চড়িয়ে। ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে!

সোনা বৌদি হেসে বললেন : তোমার অতিথিরা বেশ ঠাকুরপো! আসেন রাত বারোটায়, থাকেন অন্ধকারে বসে, খাবেনও নিশ্চয়ই অন্ধকারে এবং তার পর ভোর হবার পূর্ব্বেই বোধ হয় সম্মানিত অতিথি বিদায় নেবেন?

বললাম : ঠিকই বা বলেছ! এবার দয়া করে যদি—

রান্না হলো। বৌদি বড় এক থালা ভাত ডিম ও আলু সেদ্ধ দিয়ে মেখে দিয়ে গেলেন দক্ষিণের ঘরের অন্ধকারে টেবিলের ওপর। খেলাম মাণিক ও আমি।

মা আবার জিজ্ঞেস করলেন ঘরের বাইরে থেকে : এই, অন্ধকারে খাচ্ছিস কেন, আলো জ্বালিয়ে নে না। অন্ধকারে খেতে নেই।

বললাম : তা পারলে তো অতিথির সঙ্গে তোমাদের পরিচয়ই করিয়ে দিতাম মা!

মাণিক নয় তো?—অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের মতো প্রশ্ন করলেন মা।

অবলীলাক্রমে সত্যের মত করে বলে গেলাম : পাগল হয়েছ তুমি মা? মাণিক চাকরি পেয়েছে খুলনায়। কবে চলে গেছে সেখানে। আর চাকরি ফেলে কি ওকে আর এখানে আনা যায় কখনো? না আনা উচিত?

মা আর প্রশ্ন করলেন না। কিন্তু বিস্মিত হলাম মার শারলক্ হোমীয় বিচার-বুদ্ধি দেখে!…

সেই রাত্রেই পুব পাড়া থেকে অনাথকে ডেকে তুলে তাকে সঙ্গে করে পাঠিয়ে দিলাম মাণিককে তিন মাইল দূরে কোলা গ্রামের বিষ্ণু চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে।

মাণিক সম্বন্ধে এমনি অনেক কথা সেদিনও যেমন মনে পড়েছিল, আজও তেমনি পড়ে। আমার জীবন-মন্দারকে ঘিরে রয়েছে মাণিকের স্মৃতি-সৌরভ! মাণিক সত্যিই ছিল মাণিক। হীরা, চুণি বা পান্না নয়, মাণিক ছিল সাপের মাথার মাণিক! নিবিড় অন্ধকারে তার স্তিমিত দ্যুতি আলোকরেখা বিকিরণ করতো চলার পথে।

সেই মাণিক হারিয়ে গেছে, সেই হীরা সিংএর মৃত্যু হয়েছে!…

শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ শুরু হয়ে গেল। সংগঠনের কাজ। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে আমাদের সংগঠকরা হানা দিতে লাগলো স্থূচ হয়ে এবং অতি দ্রুত অথচ সীমাহীন সতর্কতার সঙ্গে একটি-একটি করে ছেলে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলো আমার সাথে। ওদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হতো প্রায়ই বিরাট মাঠের মাঝখানে হয়তো কোনো গাছের ছায়ায় ঝোপের আড়ালে। এতে দারুণ সুবিধে ছিল একটা। চারি দিকে শোনবার মতো দেয়াল নেই, দরজা-জানালার আড়ালে লুকিয়ে লক্ষ্য করবার সুবিধে নেই। চারি দিকে বিরাট মাঠের কোথাও নেমে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেই বা আমাদের লক্ষ্য করলেই ধরা পড়বার নিশ্চয়তা আছে। অর্থাৎ, গুপ্তচরেরা আমার কোনো সংবাদই সংগ্রহ করতে পারতো না।

সে যুগে বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে অসংখ্য দিবাকর সেন চোখ ও কান সজাগ রেখে ঘোরাফেরা করতো হায়েনার মতো। এদের মধ্যে এক দল ছিল, যারা সোজাসুজি ঢাকা আই-বি অফিসের চাকুরে। এক দল এদেরই নিয়োজিত চর, কমিশনে কাজ করতো। আর একদল ছিল, যারা এদের প্রায় সবাইকেই জানতো ও চিনতো এবং পাছে এদের বিরাগভাজন হলে হাতে হাতকড়া পরতে হয়, তাই তারা যুধিষ্ঠিরের মতো সত্য সংবাদগুলি এদের প্রশ্নের জবাবে অসঙ্কোচে বিবৃত করে যেতো। এ ছাড়াও কিছু লোক অদ্ভুত সত্যবাদিতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে পুলিশের কাছে বা গুপ্তচরদের কাছে অযাচিত ভাবে স্বদেশীদের সম্বন্ধে যত সত্য কথা সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে প্রকাশ করতো ফলাফলের কথা আদৌ চিন্তা না করেই।

অর্থাৎ নিয়োজিত, কমিশনপ্রাপ্ত, স্বেচ্ছাব্রত অথবা অসাধারণ সত্যবাদী অজস্র লোক বিক্রমপুরের প্রত্যেক গ্রামে কিলবিল করতো এবং তার ফলে কোন্ গণ্ডগ্রামের কোন্ অন্ধকার ঘরে কখন্ নিঃশব্দে একটি সূচ পড়েছিল, তার গ্রাফিক সংবাদ যথাসময়ে গিয়ে পৌঁছতো ঢাকা শহরে গ্র্যাসবি সাহেবের দপ্তরে। বিশ্বাস করবার ঝুঁকি ছিল ভয়ানক, আস্থা স্থাপনের বিপদ ছিল সীমাহীন। কিন্তু এই সব বাধা-বিপত্তি ও আশঙ্কার মধ্যেই চললো আমাদের সুনিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাময় গুপ্ত অভিযান। গভর্ণমেণ্ট যেমন চালাকি করে দিনের বেলায় ঘুরে বেড়াবার জন্ম দিয়েছিল আমায় প্রায় গোটা বিক্রমপুর, আমিও তেমনি ওদের চালাকির পুর্ণ সুযোগ নিয়ে সারাটা দিন ঘুরে বেড়াতাম গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। কিন্তু সন্ধ্যে হতেই পাখীরা যেমন কুলায়ে ফিরে যায়, আমিও তেমনি ফিরে আসতাম কেয়টখালীতে আমাদের বাড়ীতে আমার দক্ষিণের কোঠায়।

কিন্তু তাই বলে সারা রাত কি গুড বয়ের মতো বিশ্রাম নিতাম আমি? লোক-দেখানো সাধুতা ছিল বটে, কিন্তু তার পরই, রাত একটু বেশী হলে গ্রামের কর্ম্মচাঞ্চল্য কমে এলে, পথঘাট নির্জ্জন হলে, শোবার ঘরের আলোগুলো নিবে গেলে হয়তো ম্যান্দারবাড়ী শ্মশানঘাটের ওপারে বট গাছটার নীচে একটি টর্চ্চ জ্বলে উঠলো। ক্ষুদ্র টর্চ্চ, ফোকাস-করা প্রদীপের আলোর মতো। টর্চ্চধারীর সংকেত বোঝা গেল, তাই খুলে গেল দক্ষিণের কোঠার দরজা নিঃশব্দে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বেরিয়ে এলাম। কোথায় গেলাম, কার কার সঙ্গে কথা বললাম এবং কখন আবার ভোর হবার পূর্ব্বেই ফিরে এসে নিজের জন্ম সংরক্ষিত খাটখানায় দেহ প্রসারিত করে দিয়ে লক্ষ্মী ছেলেটির মতো শুয়ে পড়লাম, টিকটিকিরা আদৌ হদিসই করতে পারতো না তার।

প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে যাই থানায় হাজিরা দিতে। শ্রীনগর থানা আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় চার মাইল দূরে। যেতে হয় ষোলঘর গ্রামের মধ্য দিয়ে, স্কুলের পাশ দিয়ে, তার পর দেলভোগ গ্রামের সাউদের কাছারিবাড়ীর পুব দিকের সড়ক দিয়ে, তার পর থানার পাশেই খালের ওপরকার পোল পার হয়ে। এ যাওয়া-আসাও ব্যর্থ হতে দিই না। ষোলঘরে আমাদের শক্তিশালী একটা ঘাঁটি স্থাপিত হয়েছে। ষোলঘর বাজারের বিলাস সাহার বিরাট চালের দোকানের বৃহৎ বাঁশের মাচার ওপর বসে-বসে অতুল লক্ষ্য রাখতো পথের পানে। গোয়ালবাড়ীর নীচে দিয়ে বাজার এড়িয়েও যাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্ব ব্যবস্থা মত আমি ওপথে যাই না। চালের দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় অতুলের সঙ্গে আমার হয় দৃষ্টি-বিনিময়, অনুচ্চারিত ভাষায়

১৪,০০০-এরও বেশি চিকিৎসক বলেন

ক্যাডবেরির বোর্ন-ভিটা পান করুন

আপনার শক্তি বাড়বে...শরীরেরও পুষ্টি হবে

ক্যাডবেরির বোর্ন-ভিটা একাধারে পরিপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত সুষম একটি খাদ্য ও পানীয়। শরীরের ক্ষয়প্রাপ্ত কোষগুলির পুনর্গঠনের জন্য এবং আপনার হৃতস্বাস্থ্য, শক্তি ও প্রাণ-প্রাচুর্যকে জাগিয়ে তুলতে যে পুষ্টির প্রয়োজন তা এই স্বাস্থ্যপ্রদ পানীয় বোর্ন-ভিটার প্রতি পেয়ালা থেকেই পাবেন। ছোটোবড়ো সকলের জন্যই ক্যাডবেরির বোর্ন-ভিটাকে একাধারে একটি অতি-প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয় বলা চলে — এবং এ যে সত্যি কতো ভালো তা আপনি খেলেই বুঝতে পারবেন।

সেইজন্যই তো চিকিৎসকেরা বলে থাকেন সুস্বাদু বোর্ন-ভিটা পান করুন। বোর্ন-ভিটা খেলে আপনার শক্তি বাড়বে — শরীরেরও পুষ্টি হবে।

প্রতি পেয়ালায়

শ্বেতসার দুগ্ধজ স্নেহ পদার্থ ডায়াস্টেজ	শরীরের বৃদ্ধি ও শক্তি যোগানোর জন্য
প্রোটিন কোকো বাটার	শরীর গঠনের জন্য
খনিজ লবণ	অস্থি গঠনের জন্য
ভিটামিন এ ও ডি	রোগ প্রতি-রোধের জন্য

বোর্ন-ভিটা
একাধারে সংরক্ষণশীল খাদ্য ও পানীয়

প্রতিদিন বোর্ন-ভিটা

পান করে আপনার স্বাস্থ্য গড়ে তুলুন।

ক্যাডবেরি-ফ্রাই (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
বোম্বাই — কলিকাতা — মাদ্রাজ

CFY-9 BEN

হয়ে যায় আমাদের আলাপ। তার পর থানা থেকে ফেরবার পথে আমি বাজারের কাছাকাছি এসে ধরি চন্দ্রমাধব ঘোষের বাড়ী যাবার রাস্তা। তাঁর বাড়ী ছাড়িয়ে একটু উত্তরে গেলেই একটি বৃহৎ দীঘি। সেই দীঘির পারে অনেকগুলো আম ও চালতে গাছ। অযত্নে তার নীচে জঙ্গল জন্মে গেছে। সেই আম ও চালতে বনে হয়তো ইতিমধ্যেই বসে গেছে জরুরী একটি বৈঠক। আমার যোগদানে তা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

এক দিন এমনি ভাবে থানায় যাবার পথে মাঠের মধ্যে ঘোলঘর হাই স্কুলটাকে দেখেই মনে হলো, এই স্কুলটাকে দখল করতে হবে। ঘোলঘরে আমাদের ছেলেদের মধ্যে স্কুলের ছাত্র কেউ ছিল না, সুতরাং নিজেকেই পথ বার করতে হবে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সঙ্গে নিলাম বিপদভঞ্জনকে। তারই বয়েস একটু কম, স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে চট্ করে হয়তো পারবে মিশতে। তখন বেলা প্রায় বারোটা। পুরো দমে স্কুল সুরু হয়ে গেছে। ক্লাশ এইটের যে কোনো এক জনকে সুযোগ বুঝে ডেকে আনবার নির্দ্দেশ দিলাম বিপদভঞ্জনকে। অপেক্ষা করতে লাগলাম অনতিদূরে একটা কাঁটাল গাছের ছায়ায়।

একটু পর একটি পিরিয়ড শেষ হবার ঘণ্টা বাজতেই দেখি, বিপদভঞ্জন একটি ছেলেকে সঙ্গে করে এগিয়ে আসছে। বুদ্ধিতে ও স্বাস্থ্যে দীপ্ত ছেলেটির চেহারা।···বোঝা গেল, বিপদভঞ্জনের পছন্দ আছে।

কাছে এসে সে বিস্মিত নেত্রে আমার পানে চাইতেই বললাম: ভাই, কিছু মনে করো না। তুমি ক্লাস এইটে পড় তো? তোমাদের ক্লাশে সমীর বিশ্বাস নামে কোনো ছাত্র আছে কি?

সমীর!—ছেলেটি মনে করবার চেষ্টা করলো: না, মনে পড়ছে না তো! সমীর—সমীর—ও হ্যাঁ, এক জন আছে, কিন্তু সে তো বিশ্বাস নয়, কুণ্ডু।

কুণ্ডু? নাঃ, আমি চাই সমীর বিশ্বাসকে।—আচ্ছা, কী রকম দেখতে বল তো?

ছেলেটি বিবরণ দিল: এই লম্বা-চওড়া চেহারা, খুব ভালো ফুটবল খেলে। পড়াশুনায় কিন্তু একেবারে গোল্লা।

বললাম নিরাশার সুরে: নাঃ, সে ছেলেটি দেখতে ছোটখাটো, অনেকটা তোমার মতো।—তোমার নাম কি ভাই?

বিজনকুমার বসু।

কিন্তু ভারী মুশকিলে পড়লাম তো ভাই! সমীর আমাদের লাইব্রেরী থেকে একখানা বই পড়তে নিয়ে এসেছে সে আজ প্রায় এক মাস হবে। বলে এসেছিল ক্লাশ এইটে সে পড়ে।

কোথায় আপনাদের লাইব্রেরী?

ঐ তো বাঁড়ুয্যে পাড়ায়। চেন তুমি বাঁড়ুয্যে পাড়া? তোমার বাড়ী কোন্ দিকে?

বিজন জবাব দিল: আমার বাড়ী ঘোলোঘরে নয়, হরপাড়ায়।

বাঁচলাম!···বললাম: যেও না তুমি এক দিন লাইব্রেরীতে, অনেক ভালো ভালো বই আছে, পড়তে পারবে।—এই তো লাইব্রেরীর সহকারী লাইব্রেরীয়ান। এর নাম রবীন সরকার।

বিপদভঞ্জনকে জিজ্ঞেস করলো বিজন: কখন্ আপনার লাইব্রেরী খোলা থাকে, রবীন বাবু?

বিকেলে ৪টে থেকে রাত ৭টা পর্য্যন্ত। আমি না থাকলেও তোমার অসুবিধে হবে না। যাকে ওখানে পাবে, তাকেই বলবে সেই তোমায় বই দেবে পড়তে।—বলে রবীন নামধারী বিপদভঞ্জন বিজনের কাঁধে একখানা হাত রেখে সস্নেহে বললো: তোমাদের ক্লাশে মাষ্টার গেছেন। এবার যাও। কাল ছুটির পর এসো পাঁচটার—আমি থাকবো। কেমন! আসবে তো?

আচ্ছা।

বিজন চলে গেল।

এমনি করে ঘোলঘর স্কুলে প্রবেশ করা গেল বিজনের হাত দিয়ে এবং এমনি করেই কৌশলে আমরা গ্রামের পর গ্রামে সংগঠনের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম। যে-কোনো ছুতোয়, যে-কোনো গুজব দেখিয়ে আমরা যে-কোনো একজনের সঙ্গে আলাপ করতাম ও অন্তরঙ্গতা করে ফেলতাম। তার পর একটি একটি করে টেনে-টেনে এনে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দিতাম।···

২৭

হঠাৎ এক দিন শুনতে পেলাম রেণু এসেছে।

বর্ষা কাল। ওদের পাড়া ও আমাদের বাড়ীর মধ্যেকার পথ বর্ষার জলে একেবারে ডুবে গেছে। নৌকো ব্যতীত তখন এক পা-ও কোথাও যাওয়া যায় না।

খোঁজ নিলাম। চাকর মহাদেব বেরিয়ে গেছে নৌকো নিয়ে কিছু গাব ফল পেড়ে আনতে। ভাবলাম, থাক গে, এত তাড়া কিসের? রেণুই তো আসবে জেল-ফেরৎ আমার সঙ্গে দেখা করে আমায় অভিনন্দন জানাতে! সবে তো এসেছে সে। নিশ্চয়ই একটু পরেই সে গুরুদাসকে সঙ্গে করে এসে হাজির হবে আমার ঘরে।

আবার 'আনন্দবাজার' পত্রিকাখানি তুলে নিলাম। কিন্তু পড়বো কি? ইংরেজী ভাষায় প্রাপ্ত সংবাদগুলির এমনি কটমট বাংলা তর্জ্জমা করেছে পত্রিকার বার্ত্তা-বিভাগের কর্ত্তারা যে, একেবারে পড়তেই ইচ্ছে করে না।···বিরক্তির আর অবধি রইলো না। কাগজখানা ফেলে দিয়ে দক্ষিণের বড় লেবু গাছে লেবু আরও হচ্ছে কি না দেখতে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে জানি নে কখন এসে পড়েছি একেবারে দোতলার পশ্চিমের ঝুল-বারান্দায়।··· ঐ যে বেণুদের ঘাটে বাঁধা রয়েছে সেই ছই-ওয়ালা নৌকোখানা। ছইয়ের মধ্যে এখনো বিছানাটা পড়ে আছে। একটা ছোট বালিশ ও দুটো ক্ষুদ্রাকার পাশ-বালিশ। রেণুর ছেলের বিছানা। কী নাম ওর? কেউ জানে না আমাদের বাড়ীতে?···থাক গে, না জানলো। রেণু তো আসছেই একটু পরে, তখনই জানা যাবে।··· প্রায় দেড় বছর পর এসেছি জেল থেকে। আসবে না রেণু দেখা করতে? তারই আসা উচিত নয় কি?

একটা লোক এসে ছোট বিছানাটা গুটিয়ে নিয়ে গেল। মরণি পিসিমা এক পাঁজা বাসন নিয়ে এসে ঘাটে বসলেন কথার যন্ত্র খুলে। শ্রোতা থাক্ বা নাই থাক, তারা কেউ উৎসাহ বা আগ্রহ বোধ করুক বা নাই করুক, মরণি পিসিমা বকে যাচ্ছেন অনর্গল! শ্রান্তি নেই, এমন কি বিরামেরও প্রয়োজন হয় না।···কিন্তু রেণু তো এটাও ভেবে বসতে পারে যে, আমিই ছুটে যাবো তার কাছে? মেয়েরা বড্ড অভিমানী হয়, বলা যায় না।

কিছুই স্থির করতে পারছিলাম না, কার যাওয়া উচিত, রেণুর, না আমার? আমার, না রেণুর!…এমন সময় ফুল বৌদি নীচে থেকে হাঁক দিল: ভাত দেওয়া হয়েছে।

চমক ভাঙলো। নীচে নেমে এলাম। দেখা গেল রেণু যতই দেরী করছে, ততই আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে পড়বার উপক্রম হচ্ছে। আমি যে ফিরে এসেছি, তা কি এখনো জানতে পারেনি সে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কি এমন কেউ নেই যে, এই সুসংবাদটা রেণুকে জানিয়ে দেয়? সে যে কত খুশী হবে, তা তো আমি সারা মর্ম্ম দিয়ে জানি।…

অবশেষে রেণু এল, কিন্তু সেদিন নয়, পরদিন। ময়দা গুলে একটি কলা পাতার টুকরো দিয়ে তা মুড়ে উনুনে পুড়িয়ে নিয়ে সবে মাছ ধরতে যাবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় রেণুকে নামিয়ে দিয়ে গেল ওদের চাকর। বর্ষা কাল। মাছ আর তেমন ওঠে না। তবু সেদিনটা ছিল একেবারেই ফাঁকা, কোনো এনগেজমেণ্ট ছিল না। তাই সময় কাটাবার জন্য নৌকো করে জলে-ডোবা ধানক্ষেতের পাশে গিয়ে ইচ্ছে ছিল ছিপ ফেলে বসে থাকবো। যদি খায়।

রেণু বলে উঠলো: নিশ্চয়ই রাগ করেছ কাল আসিনি বলে, তাই না? কিন্তু সময় করে আসা যে কী মুশকিল, তা তো আর জান না তুমি?

বললাম: রাগ তো করিনি আমি। আর আমি রাগ করলে কার কী যায়-আসে?

মুচকি হেসে রেণু বললো: নিশ্চয়ই যায়-আসে।—এসো তো এই ঘরে। ওসব ছিপ-টিপ রাখো। এই মহাদেব, তোর বাবু এখন আর যাবেন না মাছ ধরতে।—বলে আমার হাত থেকে ছিপ কেড়ে নিয়ে আমার হাত ধরে একেবারে দক্ষিণের ঘরে এসে প্রবেশ করলো।

বসলাম খাটে পাশাপাশি। অনেক কথা হলো। হাল্কা কথা, মান-অভিমানের কথা। তার কতগুলো পত্রের জবাব দিইনি আমি, পরিষ্কার হিসেব দিল রেণু। আমিও পাল্টা হিসেবে কতগুলো পত্রে সে মাত্র দু'-চার লাইনে দায় উদ্ধার করেছে, তার বিবরণ দিলাম। কথা-কাটাকাটি সুরু হয়ে গেল।

রেণু বললো: তা তো বলবেই। শ্বশুরবাড়ীর হাজারো কাজের মধ্যে সময় করে নিয়ে তোমায় লিখলাম, আর তুমি বলছো ওকে পত্রই বলে না? সংক্ষেপে ষোলো পৃষ্ঠা পত্র যিনি লিখতে পারবেন বিনিয়ে বিনিয়ে, তিনি আগে আসুন। তার পর দিন-রাত শুধু প্রেমিকার পত্র নিয়ে—

ওর লম্বা বেণী ধরে হ্যাঁচকা একটা টান দিতেই রেণু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল একেবারে আমার গায়ে। তৎক্ষণাৎ গায়ের কাপড় সামলে উঠে বসলো বটে, কিন্তু আমার গায়ে তার শরীর রীতিমত ঘা খেয়ে গেল। আজকের মন সেদিন ছিল না বলেই এই আঘাতে আদৌ চাঞ্চল্য বোধ করিনি। কিন্তু আজকের মন নিয়ে সেদিনের সেই দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করলে সত্যিই বিচলিত হয়ে উঠি। কুড়ি বছরে রেণু বুড়ী হয়নি, হয়েছে যৌবনভারাবনতা। পদ্মপত্রের ওপর জলবিন্দুর মতো টলটল করছে তার স্বচ্ছ যৌবন। উনিশটি বসন্তের মোহময় স্পর্শে যে দেহ-মন্দার প্রাণরসে হয়ে উঠেছিল ভরপুর, খোকা এসে প্রস্ফুটিত হয়েছে তাতে পারিজাত হয়ে। তাই রূপ-ঐশ্বর্য্য যেন উপচে পড়েছে। এই উপচে-পড়া রূপকে যক্ষোবাসে বন্দী করে রাখতে গিয়ে একেবারে অপরূপ করে তোলা হয়েছে। সেই পূর্ণবক্ষ বুকের জ্বলন্ত স্পর্শ আমার শিরার মধ্যে দিয়ে বইয়ে দিল হিমানী প্রবাহ।…

এরপর অনেক কথা হলো দু'জনে। বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেই রেণু যেন পাগল হয়ে উঠলো: সে কথা আর জিজ্ঞেস করো না দাদা! এমনি ভোলা লোকের পাল্লায় পড়েছি! রোজই একটা-না-একটা নিয়ে কল্-এ যেতে সে ভুলে যাবেই। ষ্টেথেসকোপ নেবে তো ভুলে যাবে থারমোমিটার, আবার থারমোমিটার নিলে ভুলে যাবে ষ্টেথেসকোপ। কোনো কোনো সময় দুটোই ভুলে গিয়ে শুধু ওষুধের বাক্সটা নিয়ে গিয়ে রোগীর বাড়ীতে হাজির হলেন ডাঃ চক্রবর্ত্তী।…আর রাত্রে কিছুতেই সে কল্-এ যাবে না। বলে, গ্রামের পথে চলতে ভয় করে।

ঠাট্টা করলাম: তা এমনি রূপসী গৃহিণী ঘরে ফেলে যাওয়া কি সহজ কথা?

মৃদু করাঘাত করে রেণু বলে উঠলো: যাও! সে জন্য নয়। আসল কথা সত্যিই ওর ভয় করে। জান না, রাত্তিরে বাইরে যেতে হলে আমাকে দাঁড়াতে হয় ওর সঙ্গে।

বলে হি-হি করে হেসে উঠলো রেণু। আরও কী বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ফুল বৌদি এলো মুড়ি নিয়ে। সমুখের টেবিলের ওপর বাটিটা রেখে বললো: তোমাদের দু'জনের।

বৌদি বেরিয়ে যেতেই রেণু আবার সুরু করলো: আর এমনি ভীতু যে যত বড়ই রোগ হোক না কেন, হাজার টাকা দিলেও তিনি কোথাও রাত কাটাবেন না। যত রাতই হোক, ঠিক ফিরে আসবেনই—

আর মিষ্টি স্থানটি দখল করে বসবেনই, এই তো?—বলে রেণুর পিঠে সস্নেহে একটা কিল বসিয়ে দিলাম।

একই বাটি থেকে দু'জনে মুড়ি খেতে ভারী ভালো লাগছিল। ফাঁকে-ফাঁকে মুখরোচক পরিহাস কাজ করছিল নুণ ও ঝালের। বেলা কখন যে একেবারে শেষ হয়ে এসেছে, টেরই পাইনি তা।

অকস্মাৎ এক সময় ওদের চাকর এসে হাজির। সংবাদ: রেণুর খোকা কাঁদছে।

বিশ্রি বাধা পেলাম। আপ্রাণ চেষ্টা করলাম রেণুকে আটকে রেখে ওর খোকাকে আনাতে। কিন্তু সে বললো: না দাদা, তা হয় না। নৌকো করে ওরা আনতেই পারবে না। সে আমার ভারী ভয় করে! আজ যাই, কাল আবার আসবো, কেমন?

শেষ চেষ্টা করলাম: জানিয়ে রাখছি, আমি দুঃখ পাবো তুমি এখনই চলে গেলে। প্রায় দু'বছর পর দেখা। কত কথা আছে, যা এখনো বলিনি তোমায়। এর পরও যদি—

ঘরের বাইরে গলা বাড়িয়ে রেণু দেখলো চাকরটা নৌকোয় চলে গেছে কিনা। নিশ্চিন্ত হয়ে কাছে এসে একেবারে আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আমার স্কন্ধে একখানা হাত রেখে বললো: ভারী মুশকিলে ফেল তুমি দাদা! বল, যাই?

চুপ করে রইলাম বসে মুখ ফিরিয়ে। একটু অপেক্ষা করে জোর করে আমার মুখ দু'হাতে ঘুরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলো রেণু: বল, অনুমতি দাও!

কথা কইলাম না। সুযোগ যখন এসেছে, আজ একটা পরীক্ষাই

হয়ে যাক, কে তার কাছে প্রিয়তর, খোকা, না আমি? মাত্র এক বছর হলো যে এসেছে তাঁর জীবনে, সেই কি প্রিয়তর হবে সারা জীবনের বন্ধুর চাইতে?···

কিন্তু মেয়েদের বেলায় বোধ হয় তাই। খোকার বাবার কথা বলছি না, খোকার চাইতে মিষ্টি বোধ হয় ওদের কাছে আর কিছুই নেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে!—তাই দেখলাম, খুব গম্ভীর হয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাবার পূর্ব্বে রেণু আমার একখানা হাত টেনে নিয়ে শুধু তার গালে একবারটি চেপে ধরলো।

ঘাট থেকে নৌকো ছেড়ে যেতেই সমস্ত শরীর আমার অবসন্ন হয়ে এল। অবশিষ্ট মুড়িগুলো মনে হতে লাগলো পাথরের কুচি!···

দেখা গেল, ছেলেদের আকর্ষণ করবার দুটি সহজ পন্থা আছে —খেলাধুলো আর নাটক। দুটোতেই ছিলাম সিদ্ধহস্ত। সুতরাং ঢাকা থেকে কুড়ি টাকা ব্যয় করে চমৎকার একটি ক্যারম বোর্ড আনা হলো আর বর্ষার শেষে শীত পড়তেই থিয়েটার হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো!

ক্যারম খেলার মাধ্যমে নিত্য নতুন ছাত্র আসতে লাগলো স্কুলের ছুটির পর। আশ্বাস দিলাম শীগগিরই প্রতিযোগিতা সুরু হবে। দক্ষিণের কোঠায় পুরো দমে যখন খেলা সুরু হয়ে যায়, তখনই হয়তো খগেন একটি ছেলেকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। তার পর নৌকোয় উঠে সমুখের পুকুরটাতেই ঘুরে বেড়ায় কিছুক্ষণ। খেলার কথার মধ্য দিয়ে এসে পড়ে সিরিয়াস কথায়···এই আমাদের দেশ! এই দেশের ওপর গত দু'শো বছর ধরে অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে শয়তান বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট। সুতরাং দেশের সুসন্তান যারা, তারা এই গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ সাধনের ব্রত গ্রহণ করবেই। কংগ্রেস যে পথে চেষ্টা করছে, সেটা আবেদন-নিবেদনের পথ, কাকুতি-মিনতির পথ। কিন্তু সর্ব্বদেশের ইতিহাসে এর সমর্থন মেলে না। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হয়। ঢিল মারবার জবাবে চিরকালই এসেছে পাটকেল। তাই কংগ্রেসের শান-বাঁধানো রাস্তায় না এগিয়ে যাঁরা পদক্ষেপ করতেন বিপ্লবের বন্ধুর পথে, কুশাঙ্কুর ও কাল ফণির প্রাণান্তকর ঝুঁকি নিয়ে যাঁরা শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলেছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে, তাঁদেরই উদাত্ত আহ্বান এসেছে তোমার দ্বারে··· এমনি করে বোঝানো হয় তাকে। এক দিন, দু'দিন। তার পরই তাকে এক দিন পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় আমার সঙ্গে।···

গ্রামের চৌকিদার তমিজদ্দী যখন-তখন এসে হাজির হয় আমাদের বাড়ীতে। আমায় না পেলে মা'র কাছে জিজ্ঞেস করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে-কোথায় গেছি আমি, কার সঙ্গে গেছি, কখন্ ফিরবো ইত্যাদি। আর আমার সঙ্গে দেখা হলেই অকস্মাৎ বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে আমার স্বাস্থ্যের কথা, জেলের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের কথা এবং বাজে প্রসঙ্গে খানিকটে সময় কাটিয়ে যায়। রাত্রে পাহারাতে বেরিয়ে সে দক্ষিণ দিকে এসে হাঁক দিয়ে আমায় একবার জাগাবেই এবং যথারীতি জানিয়ে যাবে: হুঁসিয়ার থাইকেন।

চালাকী বুঝতে দেরী হলো না। দারোগা বা আই-বির নির্দ্দেশ অনুসারেই যে ব্যাটা এমনি প্রকাশ্য ভাবে চরগিরি সুরু করেছে, তা বুঝলাম। উপেক্ষা করে-করে যখন দেখলাম ব্যাটার তড়পানি একেবারে সীমা ছাড়িয়ে উঠেছে, তখন বাধা দেয়াই সিদ্ধান্ত করা হলো। চৌকিদার গ্রামেরই অধিবাসী। বহু পুরুষ ধরে ওরা এখানে বাস করছে। আর আমাদের গ্রামের শতকরা আশী জনই মুসলমান।

কিন্তু এই সবের জন্য অপরে যা করে বা করতে পারে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঝাণ্ডা উচ্চে তুলে ধরে শান্ত মনে তারা যা ভাবে, আমি ভাবি ও করি তার বিপরীত। গ্রামের শয়তানদের সায়েস্তা করতে হলে আমি মনে করি, প্রয়োজন ভীতি সৃষ্টির। আতঙ্ক সৃষ্টি করতে না পারলে এই বিভীষণদের ঠাণ্ডা রাখা যাবে না। ঠাণ্ডা লজিক নয়, ক্রুদ্ধ চোখ-রাঙানিই এদের দাওয়াই। মুগুর হাতে না নিলে এই কুকুরদের ঘেঁৎকানি থামবে না। অতএব—

এক দিন বিকেলে ছেলেদের ক্যারম খেলা যখন পূরো দমে চলছে দক্ষিণের কোঠায় আর আমি পুব দিকের পরিত্যক্ত বাড়ীর ছাদনাতলায় ইজিচেয়ারে বসে খবরের কাগজখানার পাতা ওলটাচ্ছি, এমন সময় যেই ধূমকেতুর মতো চৌকিদার তমিজদ্দী এসে হাজির, অমনি অনাথ এসে সেই সংবাদটি জানিয়ে দিল আমায়।

তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠালাম তমিজদ্দীকে।

কোনো ভূমিকা নয়, কোনো ভদ্রতা নয়, ভাষার মোলায়েমত্ব সৃষ্টির জন্য কোনো চেষ্টা নয়, একেবারে সহজ শাণিত ভাবে জানিয়ে দিলাম আমার আদেশ: তোমার মতলব বুঝতে আমার দেরী হয়নি। তাই বলে দিচ্ছি, সাবধান, আমাদের বাড়ীর ত্রিসীমানায় এসো না কখনও। আর এই গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের পেছনেও যদি লাগ, তাহলে কিন্তু তোমার জীবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি আর নিতে পারবো না, তমিজদ্দী!

থতমত খেয়ে গেছে ব্যাটা। জিজ্ঞেস করলো: কী কইলেন কর্ত্তা?

আবার বললাম যা বলেছি। জলের মত করে বুঝিয়ে দিলাম যে, ছুরি-ছোরা বা গোলা-গুলীর ভয় থাকলে এ পথ যেন সে ত্যাগ করে। সত্যিই যেন গোটা কয়েক ছুরির ঘা খেল তমিজদ্দী। কিছুই বললো না। বৈঠা হাতে নীরবে গিয়ে তার নৌকোয় উঠলো। বিপদভঞ্জন ঠিক তখনই আর একখানা নৌকো থেকে নামছিল।

জিজ্ঞেস করলো: কি চৌকিদার, গাঙুলী বাড়ীতে কি নেমন্তন্ন থাকে নাকি তোমার?

কেন?

এই যে প্রায়ই দেখি তোমায় আসতে। বলি, বকশিশ-ফকশিশ ঠিক মত পাও তো, না, সেখানেও শালা আই-বি ফাকির কারবার চালায়?

তমিজদ্দীর মাথায় খুন চেপে গেল। আমার আঘাতই তার রক্ত ঝরিয়ে দিচ্ছে, তার ওপর আবার বিপদভঞ্জনের ছুরি একেবারে হাড়ে গিয়ে ঠেকলো!

সে ফস্ করে অবমাননাকর কী একটা কথা উচ্চারণ করেই দ্রুত নৌকো ভাসিয়ে দিল। বিপদভঞ্জনও সোজা এসে নালিশ করলো আমার কাছে। চৌকিদার বাপ্ তুলে গাল দিয়েছে!

এমনি সাহস? জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গেই শত্রুতা? আন্দাজ করতে পারেনি চৌকিদার আমাদের ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা! আমাদের বেহিসাবী পদক্ষেপের পরিচয় যখন সে পায়নি, তখন টের পাইয়ে দেয়া যাক্ এর ভয়াবহতা! হুকুম হলো: আজ রাত্রেই—

দিন শেষ হয়ে এলো সন্ধ্যা, সন্ধ্যার পর রাত, তার পর এলো মধ্য-রাত্রি। স্তিমিত জ্যোৎস্না রাত। মৃদু হাওয়ায় ধান গাছগুলি দোল খাচ্ছে। গ্রাম একেবারে নিস্তব্ধ। পশ্চিম দিকের সদর জল-পথে দু'-একখানা বৃহদাকার নৌকো চলেছে আর তার মাঝির কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে ভাটিয়ালী গানের এক-আধটা কলি।

ধীরে ধীরে একখানা নৌকো এসে লাগলো তমিজদ্দী চৌকিদারের বাড়ীর পেছন দিকে অর্দ্ধনিমগ্ন কুল গাছটার পাশে। ছায়ার মত নিঃশব্দে ক'জন নেমে এল নৌকো থেকে। জ্যোৎস্না রাতে পাহারা দিতে হয় না, সুতরাং নিশ্চয়ই চৌকিদার আজ আরামে নিদ্রামগ্ন।

অনেকগুলো ন্যাকড়া কেরোসিন তেল ঢেলে ভিজিয়ে তমিজদ্দীর ঘরখানার চারি দিকে বেড়ায় গুঁজে দেয়া হলো। তার পর ফস্ করে একটা মশাল জ্বালিয়ে সেটা চারি দিকে ছুঁইয়ে দেয়া মাত্রই দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন। জ্বলে উঠলো তমিজদ্দীর ঘরখানা। আগুনের শিখা গাছের মাথায় গিয়ে ঠেকলো।

নিঃশব্দে যে নৌকোখানা এসেছিল, দ্রুতবেগে অথচ নিঃশব্দেই তা সোজা ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বেড়া আগুনে পড়েও কিন্তু মরলো না তমিজদ্দী, কারণ অন্যান্য ঘরের লোকেরা সময় মত জেগে গিয়ে ছুটোছুটি করে বেরিয়ে এসে বালতী-বালতী জল ঢেলে আগুন নিবিয়ে ফেলে। কিন্তু এতেই কাজ হলো। পরদিনই সকাল বেলা এলো তমিজদ্দী আমার বাড়ীতে।

অভ্যর্থনা জানিয়ে বললাম: এসো, এসো চৌকিদার! ওখানে কলকে আর তামাক আছে, খাও সেজে। তোমায় একটু প্রয়োজনও ছিল আমার। থানায় কাল আর যেতে পারবো না মনে হচ্ছে। শরীরটা ভাল নেই। রসিক কবিরাজ দেখছে, ওষুধ দিয়েছে। কিন্তু হাজির না দিলেও তো চলে না। তাই ভাবছি একখানা চিঠি তোমায় দিয়ে থানায় দোব পাঠিয়ে। তুমিও অবশ্য বলো আমার অসুখের কথা, বুঝলে?—ও কি, বসো না টুলটায়, উঠছো কেন?

তমিজদ্দী একেবারে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়লো: আমারে মাপ করেন কর্ত্তা!

মাপ? কিসের জন্য?—একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম।

তমিজদ্দী কেঁদে ফেলার মতো সুরে বললো: এই কানমলা খাই কর্ত্তা, আর আমি আপনাগোর পিছনে লাগুম না।

প্রশ্ন করলাম: কেন, কী হয়েছে?

সে কোনও কথা বললো না আর। দু'হাতে আমার পা জড়িয়ে ধরে একেবারে কেঁদে ফেললো তমিজদ্দী। গ্রামের চৌকিদার হলেও সে সরকারী প্রতিনিধি!

মর্ম্মে মর্ম্মে টের পেয়েছে চৌকিদার যে, সরকারী চাকরির অপেক্ষা নিজের জীবন, ছেলেমেয়ের জীবন অনেক বেশী মূল্যবান! চাকরি গেলে আবার মিলতে পারে, কিন্তু জীবন?......

[ক্রমশঃ।

দুটি বিলাতী কবিতা

অমিয় ভট্টাচার্য্য

নর্ত্তকী

(টার্ণার)

যৌবন-উন্মনা, নটিনী নাচে
উন্মুখী, সকরুণ বেদনা-রাঙা
(নতমুখী কুন্দের বাসর ভাঙ্গা!)

যন্ত্রের ঝঞ্ঝনা বাজে সুকঠোর,
ঠোকাঠুকি হাড়ে কাঠে; ছন্দ-মশাল
জ্বেলে দিয়ে ক্ষণগুলি, মেলে মায়াজাল!

নর্ত্তকী নেচে চলে, দৃষ্টি করুণ,
কালো আঁখি ব'য়ে চলে সুদূরের রেশ,
মনে হয়, রাত্রির মুখের 'পরে
দিবসের উজ্জ্বল ধ্বংসাবশেষ ॥

বিলাতী শীত

(হিউয়েস্)

আকাশে কঠিন সূর্য্য প্রহরী, আলোক-চোর।
নীচে হিমকণা বায়ুর চাবুকে হ'ল বরফ!
নদীনালা ক্রমে জমে জমে হ'ল জরতী মোম
—মাটির কেতাবে শাদা হরফ!
শুকনো শাখায় রিক্ত দোয়েল।
শিলীভূত গান কণ্ঠের অভিশাপ!
হার-জির -জিরে তিত্তির অস্থির,
নরম পালকে বৃথা খুঁজে মরে তাপ।
আয়ত-চক্ষু হায় রে, শশক!—হারালো পথ।
তুষারের বুকে হিংস্র বিভ্রমণ!
বাসি-মরা ঘাস খুঁজে খুঁজে ফেরে
কুয়াসা-দষ্ট নখের আস্ফালন।
বৃদ্ধ পথিক নির্জ্জন পথে চলে,
জরা-ভরা বোঝা কুব্জ পিঠের সাজ।
বাঁকানো আঙ্গুলে বায়ু ছেঁকে তোলে নাকে,
ঠাণ্ডা-কাটারি কেটে কেটে দেয় ঝাঁঝে!
চোখ চমকালো। এ কী জমকালো শীত!
রুটির দিওয়ানা মুসাফির খোঁজে কাকে?
তাপ দাও প্রভু!—হাতড়ায় শুধু
ছেঁড়া কামিজ আর শূন্য পেটের ফাঁকে ॥

এলিজাবেথ ফ্রাই

কেয়া দেবী

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মে মাসে ইংলণ্ডের নরউইচ প্রদেশের আর্ল্‌হ্যাম হলে এলিজাবেথ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জন গার্ণে এক ধনী ব্যাঙ্কার। বেশ সচ্ছল অবস্থা! অনেক ছেলে-মেয়ে। তার মধ্যে এলিজাবেথও একজন। বাপ অতি ভাল মানুষ। ধর্ম্মপ্রাণ কিন্তু গোঁড়ামি নেই। কোয়েকার। ছেলেমেয়েদের খুব ভাল বাসতেন। অবাধ স্বাধীনতা তাদের, হাসছে খেলছে, নাচছে। এই ভাবেই তারা বড় হল।

একদিন এক পাদ্রীর বক্তৃতা শুনে এলিজাবেথের জীবনের মোড় ঘুরে গেল। বিলাসিতা একেবারে ত্যাগ করে দিলেন। দরিদ্রের জন্য কিছু করা উচিত মনে করলেন। তাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য পাঠশালা খুললেন। অসুখে বিপদে নিজে গিয়ে তাদের শুশ্রূষা সাহায্য করতে লাগলেন।

বছর কুড়ি বয়সে যোজেফ ফ্রাই নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে এলিজাবেথের বিয়ে হয়। লোকটি বেরসিক, পাথরের মত ঠাণ্ডা। লণ্ডনে গিয়ে তাঁরা বসবাস করেন। বড় সংসার। নিজের ছেলে-মেয়ে। পাকা গিন্নী ছিলেন এলিজাবেথ। সকলকে খুশী রেখে সুন্দর ভাবে সংসার চালাতেন। ধর্ম্মপ্রাণা তো বিয়ের পূর্ব্ব থেকেই ছিলেন। বিয়ের পর জনসেবায় আরও মেতে উঠলেন। সেবা, সাহায্য ও বক্তৃতা দিয়ে গরীবদের জীবনকে উন্নত করতে লাগলেন।

একবার তিনি লণ্ডনের নিউগেট জেল দেখতে যান। জেলের অব্যবস্থা এবং জেলবাসীদের দুর্দ্দশা দেখে তাঁর মন কেঁদে ওঠে। মাত্র দু'টো ছোট ঘরে তিনশ' নারী ও শিশুরা চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে দিন কাটাচ্ছে। যেন খাঁচার মধ্যে বন্য জন্তুদের পুরে রাখা হয়েছে। শোবার ব্যবস্থা নেই, খাওয়া প্রায় না খাওয়ারই সামিল। ছেঁড়া ময়লা কাপড়-জামা। দুর্গন্ধে বমি হয়ে যায়। অনেকে পুরানো বদমায়েস। যেমন অশ্লীল ব্যবহার, তেমনই অশ্লীল কথাবার্ত্তা। তাদেরই সঙ্গে একই ঘরে আবদ্ধ রয়েছে অনেক কচি মেয়ে। জীবনে তাদের এই প্রথম অপরাধ, ভয়ে এক কোণ ঘেঁষে বসে আছে। সঙ্গ-দোষে এরাও পরে হয়ে উঠবে ঘাগী। আবার সেই সঙ্গে অনেক বাচ্চাও রয়েছে আবদ্ধ। মা কি কোন অপরাধের জন্য অভিযুক্তা। বাচ্চাদের দেখবার আর কেউ নেই। তাই তারাও এসে পড়েছে বন্দি-শালায়। শিখছে গালমন্দ, অশ্লীলতা, নোংরামী।

তখনকার দিনে বন্দীদের ঘরে অত্যন্ত সাহসী লোক ছাড়া কেউ ঢুকত না। এমন কি, জেলখানার অধ্যক্ষও ঢোকবার সময় প্রহরী সঙ্গে নিতেন। কিন্তু এলিজাবেথের কোন রকম ক্ষতি হয়নি। তাঁর কথা বন্দিনীরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনেছে। তাদের মনে হয়েছে যেন কানে অমৃত বর্ষিত হচ্ছে। এলিজাবেথ সেই দিনই ঠিক করে ফেললেন, যেমন করে হোক ওদের মানুষের মত বাঁচবার সুযোগ দিতে হবে। পশুর মত ব্যবহার করলে অপরাধীরা পশুই হয়ে যাবে। শুধরোতে গেলে তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হবে, ভাল শিক্ষা দিতে হবে। তাদের মনে মনুষ্যত্ববোধ জাগাতে হবে।

প্রথমেই তিনি তাদের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দিলেন। অন্ন-বস্ত্রের অভাব দূর করবার ব্যবস্থা করলেন। তার পর তাদের মান-সিক উন্নতির চেষ্টা করতে লাগলেন। ভালো কথা, গল্প, পরামর্শ দিয়ে তাদের মনের মোড় ফেরাবার চেষ্টা করলেন। জেলখানার মধ্যেই তিনি এক পাঠশালা স্থাপন করলেন। ছোট ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য। একটা ওয়ার্কশপ খুললেন। বড়রা হাতের কাজ শিখবে। কাজে আটকে থাকলে মন্দ কাজ বা মন্দ চিন্তার অবসর পাবে না। মনে সদিচ্ছা জাগবে, আশা জাগবে। ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ শুনিয়ে ও গল্প বলে তাদের মনে ধর্ম্মভাব জাগালেন।

এলিজাবেথের পিতৃকুল এবং শ্বশ্রুকুল তখনকার দিনের উচ্চ সমাজের কর্ণধারবিশেষ ছিলেন। শীঘ্রই তাঁর কীর্তিকলাপ জনসাধারণের কর্ণগোচর হ'ল। মার্কিণ রাষ্ট্রদূত বলেছিলেন, লণ্ডনে যে কয়টি দর্শনীয় বস্তু আছে তার মধ্যে এলিজাবেথের জেলবন্দীদের উন্নত করার প্রচেষ্টাই মহত্তম। তদানীন্তন বিখ্যাত লেখক সিডনি স্মিথ লিখেছেন যে, এলিজাবেথ যখন বন্দিনীদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তখন মনে হয় যেন কোন দেবদূতী মনুষ্যদের কল্যাণের জন্য স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন। বন্দিনীদের মুখে কলঙ্কের ছাপ কোথায় যেন মিলিয়ে গিয়ে স্বর্গের সুষমা ফুটে ওঠে।

কেবল জেলে নয়, পথেও তিনি দেখেছেন, উলঙ্গ অনাহারে মুমূর্ষু পীড়িতদের। শীতের প্রকোপে, ক্ষুধার জ্বালায়, চিকিৎসার অভাবে কত লোক মরেছে, মরছে। বিভিন্ন সহরে বিভিন্ন জেলখানায় ঘুরে সর্ব্বত্র দেখেন একই দুরবস্থা। একা কত দিক সামলাবেন। তখন তিনি এক সমিতি গড়ে তুললেন তাঁর কাজের জন্য। আর সরকার, কর্ত্তৃপক্ষ ও উচ্চ সমাজকে ধরলেন এর একটা সুব্যবস্থা করে দেবার জন্য। আশানুরূপ না হলেও অনেকটা সুফল পেলেন।

সেই সময় আর একটা জঘন্য প্রথা ছিল। সামান্য সামান্য অপরাধের জন্য অপরাধীদের নির্ব্বাসন দণ্ড দেওয়া হত। গরু-ঘোড়ার মত এক জাহাজে পুরে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হত
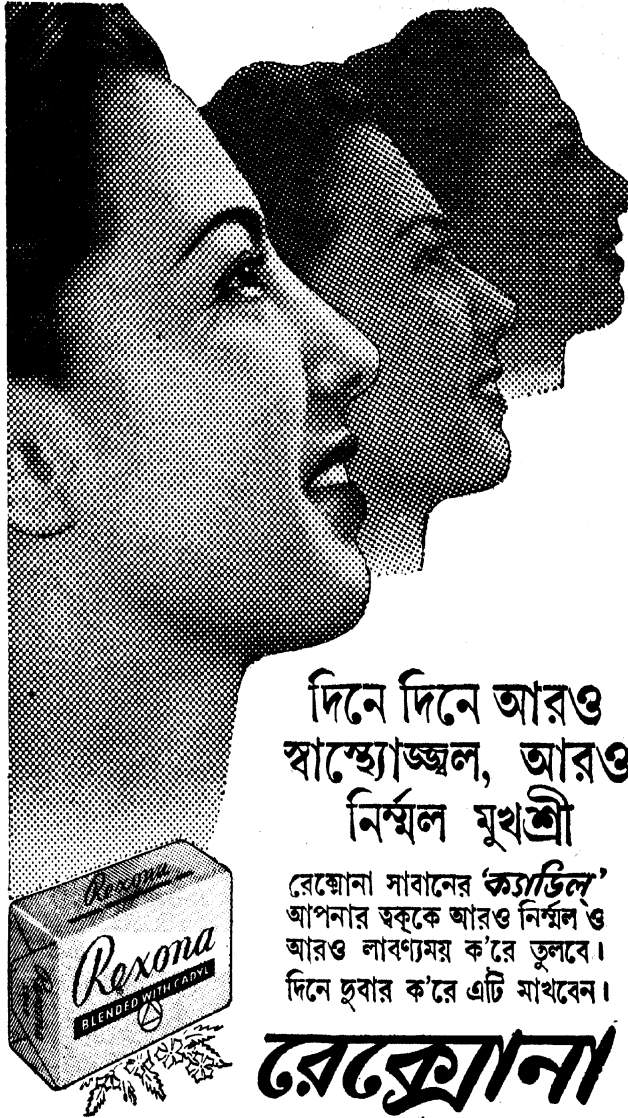
দিনে দিনে আরও
স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, আরও
নির্ম্মল মুখশ্রী
রেক্সোনা সাবানের 'ক্যাডিল'
আপনার ত্বককে আরও নির্ম্মল ও
আরও লাবণ্যময় ক'রে তুলবে।
দিনে দুবার ক'রে এটি মাখবেন।
Rexona
BLENDED WITH CADYL
রেক্সোনা
একমাত্র 'ক্যাডিল্*'-বিশিষ্ট সাবান
* চর্ম্ম-কোমলকারী কতকগুলি তৈলের বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম।
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটরিস্ লিমিটেডের তরফ হইতে ভারতে প্রস্তুত
R.P. 86-50 BG

দূর দেশে। আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি স্থানে। সেখানকার শাসকদের হাতে বন্দীদের তুলে দেওয়া হত। বিনা পয়সায় কুলীবৃত্তি করাবার জন্য। উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশ গঠন করা। সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সুবিধার জন্য মানুষদের পশুতে রূপান্তরিত করা হত। দেশের প্রতি বা সমাজের প্রতি তাদের মনে থাকত কেবল বিদ্বেষ ভাব। যে কেউ জীবন্ত অবস্থায় দেশে ফিরত সেই হয়ে উঠত দুর্দ্ধর্ষ দস্যু। এলিজাবেথ এই প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। প্রথাটা বন্ধ করতে পারেননি, কারণ সরকার স্বয়ং তাতে বাধা দিয়েছেন। তবে বন্দীদের প্রতি ব্যবহার অনেকটা ভালো করতে পেরেছিলেন।

এ সবের ওপর আবার নিজের সংসার। এগারটি ছেলে-মেয়ে। তার ওপর ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর স্বামী দেউলিয়া হয়ে যান। ফলে অর্থের অনটন দেখা দেয় সংসারে। অন্য মেয়ে হলে ভেঙ্গে পড়ত। কিন্তু এলিজাবেথ ভাগ্যের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নিজেকে সুন্দররূপে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। এর পর থেকে তিনি দরিদ্রদের আর্থিক সাহায্য তেমন করতে পারেননি, কিন্তু অধিকতর সেবা দিয়ে সেই অভাব পূর্ণ করবার চেষ্টা করেছিলেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে র‍্যামসগেটে তিনি মারা যান। যতটা তিনি করতে চেয়েছিলেন, সবটা পারেননি বটে। কিন্তু যতটা পেরেছিলেন তারই ফলে আধুনিক জেলের এই উন্নত অবস্থা।

শিল্পবোধ

শ্রীসুলেখা দাশগুপ্তা

সত্যি কি আর্ট একজিবিসনে যাবার হুজুক অর্থাৎ ফ্যাশন আমাদের দেশে আছে? একমাত্র সিনেমা হুজুক ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় সর্বজনীন হুজুক এদেশে ছিল না বললেই চলে। বর্তমানে মাত্র সামান্য কিছু দিন হল এসে যোগ হয়েছে খেলার মাঠটি। আর সাধারণের চাইতে নিজেকে উচ্চস্তরে ভাববার মত কিছু বন্দোবস্তও এর ভেতর যারা করে ফেলতে পেরেছেন—সাধারণের রূপ, রস, সৌন্দর্য্য উপলব্ধির ক্ষমতার উপর তাঁদের অবজ্ঞা ও অবহেলা তো দস্তুর মত অশিষ্ট। উন্নাসিকতার দম্ভে লিখে ছাপিয়ে তাঁরা সর্বসাধারণের গায় কাদা ছিটোন। বলেন, ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থান, নানা কলাবিত্তা বা চিত্রপ্রদর্শনী দেখবার চাইতে—কুস্তি মল্লযুদ্ধ দেখাটাই নাকি জনগণের প্রকৃষ্টতম চিত্তবিনোদনের উপায়। অথবা পাথরের হাতী, ঘোড়া, বাঘ, বানর! কিন্তু জনসাধারণ এত অবজ্ঞেয় নয়। তারা সাদরে যে বস্তু গ্রহণ করে, কালের বিচারে তা কোন দিনই বড় একেবারে বাতিল হয়ে যেতে দেখা যায় না। তার পর এই সাধারণ অসাধারণে দাগ টানা—এও খুব সহজসাধ্য নয়। দু'দিন আগে জনতার ভেতর দাঁড়ানো নিতান্ত সাধারণ একজন কেউ হঠাৎ একদিন অসাধারণ হয়ে আত্মপ্রকাশ করে সামনে এসে দাঁড়ান। অসাফল্যের অভ্যুদান হয়ে থাকেও এমনি করে সাধারণের ভেতর হতেই। তাই সাধারণের প্রতি উপেক্ষার দৃষ্টিপাতের চাইতে, বিজ্ঞজনোচিত কাজ—বিস্মিত চোখে মুহূর্ত গোণা, কে জানে কোন প্রতিভার বীজ কার ভেতর শুধু আত্মপ্রকাশের শুভ সময়ের প্রতীক্ষা বা পূর্ণতাপ্রাপ্তির অপেক্ষায় সুপ্ত হয়ে আছে!

ছবি সম্বন্ধে সাধারণের নিজেদের আত্মবিশ্বাসের অভাব নয় ত অবহেলা আর বিদগ্ধ জনের অবজ্ঞা-উপেক্ষা সর্বসাধারণকে শিল্পকলার জগৎ হতে দূরে ঠেলে রেখেছে। আর্ট সম্বন্ধে কিছু বোঝা বা বলাটা তাঁরা ভাবেন, ছোটমুখে বড় কথা! কিন্তু মুখ-বিস্তৃতির পরিধি মেপেই যদি গোটা বস্তুর রস আস্বাদন করতে হতো, তবে পৃথিবী-ছড়ানো ভোগ্য বস্তুসম্ভারের নিরানব্বই ভাগ জিনিসের ভোগসুখের আনন্দ হতে আমাদের বঞ্চিত থাকতে হতো। সম্ভবপর অনুসারে কেটে-ছেঁটে ফেলে-রেখে গ্রহণের উপায় আছে বলেই না জিহ্বার তৃপ্তি—শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা।

মনের বেলাও ঠিক তাই। পুরোপুরি রস গ্রহণের প্রশ্ন, গোটা বস্তু মুখে পুরে দেওয়ার মতই অবান্তর। সম্ভাব্য উপায়ে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষাটাই আসল কথা। যাঁদের আস্ত হজমের ক্ষমতা (সে ক্ষমতা অবশ্যি স্বল্পেই সীমাবদ্ধ) তাঁরা আবার সামান্যর ভেতরও অসামান্যতার পূর্ণ স্বাদ পেয়ে থাকেন। নেই যাদের তাদেরই খাঁই বেশী, পেটরোগা মানুষের খাবার দিশের মত। তেমন অসুস্থ ব্যক্তিদের কাছ হতে সভয়ে ও সসম্মানে দূরে সরে, পুরোর জন্য নিজেকে একেবারে উপবাসী না রেখে—কথা হলো, যখন যেখানে যেটুকু সম্ভব উপভোগ করে নেওয়া।

যে কোন বিষয়েই হোক, একটা স্তরে পৌঁছে বোঝবার জন্য রীতিমত শিক্ষার ভেতর দিয়ে সূক্ষ্মানুভূতি অর্জন করতে হয়। ছবি বোঝবার জন্যও চোখের সে শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেই শিক্ষার গোড়ার কথাই হলো দৈনন্দিন অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা।

ক্রিকেট-মাঠে অগণিত নর-নারীর ভীড়। বেতার তরঙ্গ-বার্তার ধারা-বিবরণী শুনতে শুনতে, মাঠ-বঞ্চিতদের রেডিও সেটের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মাথাটি পর্য্যন্ত গরম করে তোলা—সামান্য কিছুদিন আগেও না ধ্যান-ধারণার বাইরে ছিল। খেলাটির নামই বা জানত ক'টি লোকে? এমন একটা সর্বজনীন উৎসব পর্বের মত হৈ-হৈ কাণ্ড বেধে ওঠা কল্পনায়ও আসতো না। যে কারণে ক্রিকেট জগতের বনেদি দেখিয়েরা বর্তমান ভিড়ের প্রতি তেরছা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঠোঁট বাঁকান আর ঘরে কচি ছেলে-মেয়েগুলোর মুখে পর্য্যন্ত, গুগলি বল, কট্ আউট, এল্, বি, ডাব্লিউর আলোচনার উত্তেজনায় স্তম্ভিত হয়ে যান মা—'সব শিখে গেছে ওরা!' কিন্তু আগে শিখে পরে ক্রিকেট-মাঠে যাবার হলে জীবনেও আর তা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। আগ্রহ আর অভ্যাস পরম সুহৃদের মত মানুষকে সঙ্গে করে সব শিখিয়ে-বুঝিয়ে নিয়ে চলে। তাই প্রথমে চাই নিত্য আচরণের রুচি ও অনুরাগের পরিবেশ তৈরী করে মনের উৎসাহ জাগান। আর তবেই সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হবে শিক্ষা অর্জন।

জিহ্বার তৃপ্তি যেমন অভ্যাসের বাইরে কিছু গ্রহণ করতে গুটিয়ে আসে—আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রতিটি ইন্দ্রিয় তেমনি। অভ্যাসের রেওয়াজ না থাকলে ভালো-মন্দ বোঝবার জন্য চোখ-কান না তুলেই থাকে মুখ ঘুরিয়ে। ছবি সম্বন্ধে শুধু মাত্র এই কারণেই মন আমাদের বিমুখ। কিন্তু এ মনোভাব ঝেড়ে ফেলে যদি একবার ঐকান্তিক ঔৎসুক্য নিয়ে এগোনো যায় তবেই বোঝা যায়, ছবি এমন কিছু আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরের বিষয়বস্তু নয়।

কোন এক সন্ধ্যায় দেখলেন স্তব্ধ হয়ে, আকাশে শীতের কুয়াশা-ঢাকা চাঁদ, শুভ্র মেঘের উড়ে চলার দৃশ্য, রাজপথের কৃষ্ণচূড়া

গাছের সারি। অথবা চোখে পড়ল কোন এক ঝড়ের রাতে গাছের মাতামাতি, অন্ধকার-চেরা বিদ্যুৎ-ঝলক—অবিশ্রান্ত ঝর-ঝর ধারা-বৃষ্টি। জানালা বন্ধ করতে এসে সে কথা গেল বেমালুম ভুল হয়ে। জলো হাওয়া ও জলে ভিজে হিম হয়ে উঠলো মুখটি, তবু ইচ্ছে করলো না চলে আসতে বা জানালা বন্ধ করতে। সমুদ্রতীরে বেড়াতে গেলেন, দেখলেন সমুদ্র-ঝড়ের তাণ্ডব লীলা, শান্ত শান্তি। দেখলেন, রাতের সমুদ্রে কালো ঢেউএর চূড়ায় শুভ্র ফেনপুঞ্জের খেলা, জ্যোৎস্নার অপরূপ সৌন্দর্য্য! ঘড়িতে এলার্ম বাজিয়ে শেষ রাতে ছুটলেন সূর্য্যোদয় দেখতে, সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্ত।

গেলেন পাহাড়ে। দেখলেন কাঞ্চনজঙ্ঘার সাদা বরফের উপর রবি-রশ্মির সপ্ত রংএর মন-ভোলানো দৃশ্য। পাহাড়ের গা-ঝরা রূপালী ঝর্ণা; হরিণের ভীত-চকিত জলপান। পাহাড়ী নারী-পুরুষের বোঝা বওয়া। মুগ্ধ হলেন। কণ্ঠ দিয়ে আনন্দধ্বনি বেরিয়ে এলো,—'বাঃ, কি চমৎকার সব দৃশ্য! যেন সাজানো ছবি।'

এ মুগ্ধ হওয়ার আগে নিশ্চয়ই আপনাকে কোন শিল্পবিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হয়নি বা বিদগ্ধ জনের কোন জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করে নিতেও হয়নি।

ছবি দেখতে গিয়েও যদি মুগ্ধ মন এমনি বলে ওঠে—'বাঃ, এ যেন সব জীবন্ত সত্য!' তবেই তো বোঝা হয়ে গেল। রং ও তুলির টানে বিশ্বপ্রকৃতির মূক অভিব্যক্তিকে ফুটিয়ে তোলার নামই তো ছবি। রং-বিন্যাস আর তুলির টানের ভুল-ত্রুটির হের-ফের না-ই বা বুঝল আমাদের চোখ। রইল সে সব বিশেষজ্ঞদের বিশেষ ভাবে বোঝবার জন্য।

'পৃথিবীতে দু'রকমের জানা আছে। এক—ব্যবসায়ীর জানা, আর এক—অব্যবসায়ীর জানা। ব্যবসায়ী জানে যেটা জানা সহজ নয়, অর্থাৎ নাড়ীনক্ষত্র। আর অব্যবসায়ী জানে যেটা জানা নিতান্তই সহজ অর্থাৎ হাব-ভাব চাল-চলন।

এই নাড়ী-নক্ষত্র জানাটাই প্রকৃত জানা, এমন একটা অন্ধ সংস্কার সংসারে চলিত আছে। তাই সরলহৃদয় আনাড়িদের মনে সর্বদাই একটা ভয় থাকে, ঐ নাড়ী-নক্ষত্র পদার্থটা না জানি কি? আর ব্যবসায়ীরাও ঐ নাড়ী-নক্ষত্রের দোহাই দিয়ে অব্যবসায়ীদের মুখ চাপা দিয়ে রাখেন। অথচ জগতে ওস্তাদ কয় জন মাত্র; অধিকাংশই আনাড়ি। সব সেয়ানে, এক মত কেন না, তাদের বাঁধা রাস্তা। যারা সেয়ানা নয় তাদের নানা মত, কেন না, তাদের রাস্তাই নেই।—(রবীন্দ্রনাথ)'

আর ঐ বাঁধা রাস্তায় চল্‌তে না জানার জন্য আমরা সমস্ত শিল্প-কলার জগৎ হতে দূরে সরে আছি। বর্তমান যুগ শ্রী-সৌন্দর্য্য, শিল্প-সাহিত্য—মানুষের সর্ব মনোরম মনোবৃত্তি চর্চা ও আনন্দ-প্রসাদ উপভোগের একমাত্র স্থান নির্বাচন করে নিয়েছে—সিনেমা-গৃহ!

জলযাত্রা

শ্রীশান্তা দেবী

আমরা যখন বিদেশে যাই তখন কি কি নূতন জিনিষ দেখলাম তার একটা ফর্দ্দ করি। মানুষের চেহারায় ব্যবহারে রীতি-নীতিতে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের কি প্রভেদ সেটাও একটা লক্ষ্য করবার এবং আলোচনা করবার জিনিষ। কিন্তু দেশে দেশে মানুষে মানুষে কতটা মিল সেটা আমরা সচরাচর বলি না।

এবার বিদেশে এসে এই কথাটাই আমার বেশী করে মনে হচ্ছে। আমরা আমাদের গরীব দেশের লোকেদের শত ত্রুটি দেখি আর বড়-বড় রাজৈশ্বর্য্যওয়ালা দেশের গুণগান করি। সত্যি, ত্রুটি আমাদের দেশের আছে বটে এবং গুণ এদের অনেক আছে স্বীকার করি। কিন্তু আসলে মানুষ সর্ব্বত্রই অনেক দিকে একই রকম এবং সেই একতাটা এত বেশী যে, কলকাতা থেকে লণ্ডনে এসে খুব যে একটা অন্য লোকে অন্য আবেষ্টনে এসেছি তা মনে হয় না। পথে যখন চলি সেই আমাদের কলকাতার মতই দেখি, দলে দলে লোক ব্যাগ হাতে করে আপিসে চলেছে ব্যস্ত ভাবে। প্রভেদের মধ্যে এদের সকলেরই রং সাদা এবং আপিসের বাবুর চেয়ে বিবির সংখ্যা অনেক বেশী। আমাদের আবার পাড়াটা এমন যে, এখানে দশটা লোক দেখলে তার মধ্যে একটা অন্ততঃ ভারতীয় বা কাফ্রি বা জাপানী না হয় Siamese হবেই। এটা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাড়া, তায় আবার African & Oriental Studiesএর একটা কলেজ আছে, সুতরাং বিদেশীদের মধ্যে ভারতীয় এবং কাফ্রিরা খুব চোখে পড়ে। আমাদের দেশে এত কাফ্রি আমরা কখন দেখি না, কালে-ভদ্রে হয়ত দুই-একটা পুরুষ চোখে পড়ে, স্ত্রীলোক দেখেছি কি না মনে পড়ে না। এখানে পুরুষ ত অনেক দলে দলেই দেখি, মেয়েরাও খুব বেশীই আছে। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই সাজ ইউরোপীয়দের মত, হাঁটা-চলা ধরণ-ধারণ ওদের মতই চট্‌পটে, অনেকে ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুর মতই গল্প করতে করতে চলেছে। একদিন দেখলাম, একটি ইউরোপীয় সাহেব গাড়ী হাঁকিয়ে চলেছে, তার পাশে বসে আছে একটি কালো কাফ্রি মেয়ে। মেয়েটির কোলে ছোট্ট একটি শিশু। শিশুটির রং ফরসা, কিন্তু মাথার চুল কাফ্রিদের মত। সম্ভবতঃ এরা ইউরোপীয়ানের স্ত্রী ও পুত্র। মানুষে মানুষে যদি আসল জায়গায় মিল না থাকত তাহলে এ রকম বিবাহ ও সংসার সম্ভব হত না। কাফ্রি ছাড়া আফ্রিকার অন্যান্য দেশের অর্থাৎ ইথিয়োপিয়া, সুদান প্রভৃতির লোকও এখানে আইন ডাক্তারী প্রভৃতি পড়ছে, অনেকের সঙ্গে ইংরেজ মেয়েরা ঘুরছে দেখেছি। তবে ভারতীয় ছেলেদের সঙ্গে ইংরেজ মেয়েদের যতটা ভাব লক্ষ্য করেছি, এদের সঙ্গে সে রকম গভীর ভাব চোখে পড়েনি। ভারতীয় ছেলে কেউ-কেউ সপরিবারে অর্থাৎ ইউরোপীয় স্ত্রী এবং বাচ্চা নিয়ে ঘুরছে দেখেছি এবং প্রিয় সখী সমভিব্যাহারে ত অনেককেই দেখি। মানুষে মানুষে বিভিন্ন জাতে প্রভেদটা খুব বড় হলে এটা হত না। অবশ্য এই রকম পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলন আমার বাঞ্ছনীয় মোটেই মনে হয় না। তার কারণ আজ আলোচনা করব না।

আমরা যে হোটেলে থাকি সেখানে একটি মেয়ে ঘর-দোর পরিষ্কার করার কাজ করে। বয়স অল্পই, দেখলে মনে হয় বিয়ে হয়নি, কিন্তু তার বিয়ে হয়েছে শুধু নয়, ছেলেও একটি আছে। তার কথাবার্ত্তা বেশ আমাদের দেশের মেয়ের মত। সে আমাকে বলছিল, "তোমার তিনটিই মেয়ে, একটিও ছেলে নেই?" আমি বললাম, "না, আমার ত নেই-ই, আমার ভাই-বোনেদেরও ছেলে নেই।" সে বললে, "ও মা! কি আশ্চর্য্য! তোমার ইচ্ছা করে না একটি ছেলে পেতে?" আমি বললাম, "কোথায় পাব?" তার স্বামী মা বোন ননদ সকলের গল্প

সে করে। একটি মাত্র ছেলে তার। তাকে বললাম, "তোমার আর বাচ্চা নেই?" সে বললে, "কি খাওয়াব আর বাচ্চা হলে?" এটা অবশ্য আমাদের দেশের মেয়ে বল্‌ত না, কিন্তু তার বন্ধুর মত বলার ধরণটা আমাদেরই মত।

ট্রেণে যখন যাই, দেখি মায়েরা ছেলে কোলে করে গাড়ীতে উঠছে, বাচ্চারা মায়ের কোলের অল্প জায়গায় ঘুমোচ্ছে ঠিক আমাদের শিশুদেরই মত। কেউ বা ক্রমাগত খেতে চাইছে আর অজস্র আদায় করছে। গাদা খানিক জিনিষ তাদের সঙ্গে, আমাদের দেশের লোক পুঁটলি বেঁধে নেয়, এরা অবশ্য ব্যাগে করে বয়।

গাড়ীতে এক এক জায়গায় ভীষণ লোকের ভীড়। কিন্তু কেউ-ই প্রায় মেয়েদের জন্তে উঠে দাঁড়ায় না, যে যার নিজের জায়গায় বসে থাকে। আমাদের কলকাতার ছেলেরা এটা এখনও করে না। কিন্তু করলে বোধ হয় ভাল হত, কারণ মেয়েদের সিট ছেড়ে দিয়ে গজ-গজ করা আর বিরক্তি দেখানোর চেয়ে না ছেড়ে দেওয়াই ঢের শোভন। আমার বয়স হয়েছে, তার উপর বিদেশী স্ত্রীলোক, তাই আমাকে কিন্তু ২।৩ দিন সাহেবরা জায়গা ছেড়ে দিয়েছে।

এ দেশের লোকে মদ বোধ হয় সবাই খায়। কিন্তু আগে যেমন মনে করতাম, পথে-ঘাটে সর্ব্বত্র মাতাল দেখব, তেমন কিছু দেখলাম না। শুধু একদিন শনিবার রাত্রে এক আত্মীয়ের বাড়ী থেকে ফিরতে রাত প্রায় ১২টা হয়ে গিয়েছিল। ১২টা পর্য্যন্তই ট্রেণ চলে। একটা ইলেকট্রিক ট্রেণে ওঠবার কিছু পরেই দেখি, একটা লোক ট্রেণে উঠেই বক-বক করতে লাগল, তার-পর নিজের কোটটা নিয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নাচল এবং পরিশেষে জানলা দরজা হাতলের সঙ্গে boxing লড়তে সুরু করল। আমাদের দেশ হলে যাত্রীরা বিশেষত যাত্রিনীরা একটু ভয় পেত বোধ হয়। কিন্তু এরা সবাই তাকে দেখে হাসতে লাগল। ওরা আমাদের চেয়ে এ সব দেখতে বেশী অভ্যস্ত নিশ্চয়ই।

এখানে ছোট ছোট ছেলেরা রাস্তায় খেলা করতে কিছুই ত্রুটি করে না। সকালে ঘুম ভাঙলেই তাদের কলরব শোনা যায়। বেরোলেই দেখি, এক দল ট্রাইসাইকেল নিয়ে ঝগড়া করছে, কেউ বা মোটরের পিছন বেয়ে চড়তে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। অমনি ভ্যাঁ করে কান্না! এক দল ছেলে রাস্তা জুড়ে ক্রিকেট খেলছে। পথচারীদের গায়ে বল লাগল কি না তাও দেখছে না। আমাদের ছেলেরা হয়ত আর একটু সতর্ক হত। অবশ্য ঠিক বলতে পারি না। খেলার বাতিকটা সমানই।

দোকানে বাজারে এখানে প্রতি দিন ফল তরকারীর গায়ে সেদিনের বাজার-দর লেখা থাকে বটে এবং তারা বোধ হয় ওজনে বা দামে ঠকায় না, কিন্তু অন্য দিকে ব্যবসাদারেরা আমাদের দেশের মতই শুষে টাকা আদায় করে। আমরা যে বাড়ীতে থাকি, তাকে হোটেল বলা যেতে পারে। ছোট একটা চার তলা বাড়ী, প্রতি তলায় তিনটা করে ১২´×১৮´ আন্দাজ মাপের ঘর আর সরু একফালি করে বারাণ্ডা। সবশুদ্ধ চারটে তলায় ২৪।২৫ জন লোক বোধ হয় থাকে, বেশীও হতে পারে ঠিক জানি না। অন্যদের ঘরে ঢুকিনি, নিজেদের ঘরের বর্ণনা দিলে হয়ত সারা বাড়ীটার বর্ণনায় ভুল হবে না। এই রকম দু'খানি ঘরে আমরা পাঁচ জন মানুষ থাকি। পাঁচটি ছোট ছোট খাট ও বিছানা, তিনটি গদীওয়ালা এবং দুটি বেন্টউড চেয়ার, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, বৈদ্যুতিক আলো, ঠাণ্ডা জল, গরম জল আছে। কিন্তু বিছানার চাদর ও বালিশের ওয়াড় সব তালি দেওয়া, বেড-কভার পাঁচটির মধ্যে চারটি ছেঁড়া এবং বে-মেরামতী, আলোর বাল্‌বগুলি যেমন-তেমন করে টাঙান, মাঝে মাঝে ঝুলে নেমে আসে। মেঝে যদিও vaccum cleaner দিয়ে পরিষ্কার করা হয় মাঝে মাঝে তবু যথেষ্ট পরিষ্কার হয় না, সরু বারাণ্ডায় কোনো দিন ঝাঁট পড়ে না এবং এগার দিনেও আমাদের বিছানার চাদর বদলে দেয়নি। সর্ব্বোপরি এতগুলো মানুষের জন্য স্নানের ঘর একটা এবং পায়খানা দু'টো। তার ভিতর একটার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ হয় না। ঘরগুলিতে ঢুকতে হলে অনেক বার সিঁড়ি ওঠা-নামা করতে হয় এবং তাও সর্ব্বদা পাওয়া যায় না। এই রকম বাড়ীতে সকালে cornflakes, রুটি মাখন চা এবং কোনো দিন একটা ডিম, কোনো দিন বা একটু ফল একবার মাত্র ৯টার সময় খেতে পাওয়া যায়। হাত মুছবার ন্যাপকিন কেউ দেয় না, চামচও একটু কম। পাড়াটা অবশ্য ভাল, চুপচাপ রাস্তা, গৃহস্থরা থাকে এবং কিছু কিছু হোটেলে ছাত্র ও টুরিষ্টরা থাকে। রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সিগারেটের টুকরো, দেশলাইএর কাঠি, চকোলেটের খোসা ছাড়া আর কিছু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায় না। রোদ উঠলে ঘরে রোদ আসে, জানলাও একটা বড় রকম আছে। কিন্তু যাই হোক, একবার মাত্র চা রুটি ইত্যাদি খেয়ে এই রকম ঘরে বাসের জন্য আমাদের সপ্তাহে ১৯৩/০ দিতে হয়, মাস-হিসাবে ৮২৫৲ টাকার চেয়ে বেশী। যদি কোনো কোনো দিন না খাই এক পয়সাও বাদ যাবে না মনে হচ্ছে, কারণ, না খেয়ে দেখছি বিলটা ঠিক একই। এর উপর বাকি খাওয়ার জন্য অন্যত্র বার-দুই অন্ততঃ ব্যবস্থা করতে হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ব্যবসাদারেরা এখানেও ছেঁড়া চাদর এবং ভাঙা আলো দিয়ে যথাসম্ভব টাকা আদায় করে, তা তুমি খাও বা না খাও। সপরিবারে না থেকে একলা থাকলে বিল আরও বেশী। একটু ভাল বাড়ীতে দৈনিক ১৬½ শিলিংও নিচ্ছে, অর্থাৎ দিন ১২৲ টাকা মাথা-পিছু। এগুলো কোনোটাই নাম-করা হোটেল নয়, ছোটখাট বাড়ী নিয়ে মেয়েরা লোককে ঘর ভাড়া দেয়।

ভাল দিকেও দেখি, মানুষের মন এক ভাবেই চলে। আমাদের দেশে ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অপূর্ব্ব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ শ্রদ্ধায় নতমস্তক হয়ে থাকতে হয়, দেবতার কাছে মানুষ কেমন করে তার ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ অঞ্জলি ধরে দিয়েছে দেখে মুগ্ধ হতে হয়। এ দেশেও দেখলাম ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবির অপূর্ব্ব স্থাপত্য তেমনি বিস্ময় জাগায় মানুষের মনে। আমরা ভারতবাসী বলে কিনা জানি না, আমাদের অবশ্য মনে হয়, ভুবনেশ্বরের সৌন্দর্য্যের মত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি এরা করতে পারেনি। কিন্তু মাপকাঠি দিয়ে মাপার কথা আজ বলছি না এবং শিল্পজ্ঞরাও হয়ত আমাদের দেশের মহিমান্বিত স্থাপত্য-শিল্পকেই বড় বলবেন। আমি বলছি মানুষের মনের একমুখী গতির কথা। দেবতার নিকট এরাও যেমন তাদের শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা দিয়েছে আমরাও তেমনি দিয়েছি। তবে আজকের দিনে এরা তাকে যেমন করে সযত্নে সশ্রদ্ধায় বুক দিয়ে আগলে রেখেছে, আমরা তা মোটেই রাখিনি! আমাদের ভুবনেশ্বরের মন্দির পায়রা বাঁদর আর পাণ্ডার উৎপাতে কণ্টকিত। সেখানে যাওয়া আসার অসুবিধার অন্ত নেই, অথচ এদের এখানে এক এক দিনে ২০০।৩০০ হয়ত বা তারও বেশী লোক এই সব মন্দির দেখে বেড়াচ্ছে। আমরা স্বাধীনতা

পেয়েছি, এখন যদি আমাদের সৌন্দর্য্যের পীঠস্থানগুলিকে সহজলভ্য শুচিশ্রীমণ্ডিত করে রাখতে পারি, তাহলে বহু ক্ষেত্রে ভারতীয় স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও শিল্প-সৌষ্ঠব জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সমাদর পেতে পারে।

একটা দেশ থেকে আর এক দেশে যেতে হলে মনে হয়, না জানি কি অভূতপূর্ব্ব জিনিষ সেখানে দেখব! কিন্তু যদি সব দেশেই একটু চোখ মেলে ঘরের কোণ ছেড়ে ঘোরা যায় তবে দেখা যাবে, পৃথিবীর মানুষ যত না এক রকম হোক, পৃথিবীর মাটি সর্বত্রই এক ধরণের। এ দেশে এসে এদের বনভূমির সবুজ শ্রী, উঁচু-নীচু জমি, গড়িয়ে-পড়া ঢালু পথের ধারে সবুজ ঘাস, পাহাড়ের কুক্ষিতে ছোট নদী আর তার পাশে ঘন বন দেখে মনটা খুব খুসী হয় বটে, কিন্তু মনে হয় না সম্পূর্ণ নূতন কিছু দেখছি। এমনি সবুজ বনভূমি, এমনি উর্দ্ধমুখী শিখার মত গাছ, এমনি নতমুখী উইলো, ঘন পত্রবহুল চেনার বৃক্ষের মত বৃক্ষ কাশ্মীরে দেখেছি কত দিন; তার সৌন্দর্য-মহিমা আরও বেশী, সেখানে ফুলের ছড়াছড়ি, জলের অসংখ্য কলস্রোত, হ্রদের টল-টল জল, গাছের অতি বিশাল গুঁড়ি, পাহাড়ের গায়ে শস্যক্ষেত্র আরও বিস্ময় জাগায়। মানুষের রং এমনি উজ্জ্বল, ফল-ফুল অজস্র। কিন্তু নাই এই যত্ন, এই মাজাঘস', এই সহজলভ্য পথ, এই হৃষ্ট-পুষ্ট সুসজ্জিত মানুষ। এই রকম ঢালু পথ টাটানগরে, রাঁচিতে কত আছে, এমনি পাহাড়ের কুক্ষিতে নদী চলেছে দার্জ্জিলিঙে; কিন্তু দার্জ্জিলিঙ যেন রাজাধিরাজ, প্রকৃতি তাকে যেমন ঐশ্বর্যের বাহুল্য ঢেলে দিয়েছেন তেমন ঐখানে দিতে পারেননি।

আমাদের দেশের মেয়েরা কাজের মেয়ে বলে পরিচিত এবং কোন মেয়ে কাজকর্ম্ম না করলে তাকে আমরা মেমসাহেব বলে ঠাট্টা করি। তার কারণ, দেশে আমরা যে সব 'বড়া সাহেবে'র মেমদের দেখেছি তারা সস্তায় চাকর পেয়ে প্রচুর চাকর রাখে আর হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকে বা নেচে-গেয়ে বেড়িয়ে দিন কাটায়। কিন্তু এখানের মেমরা তো একেবারেই সে রকম নয়। এই যে Boarding house বা হোটেল জাতীয় বাড়ীতে থাকি তার দুটোতে থাকার অভিজ্ঞতা হয়েছে, দুটোতেই বেশ লোক। প্রথম বাড়িটাতে যিনি কর্ত্রী, তাঁর ঝি ব'লে কেউ নেই। জন পঁচিশ লোক বাস করে, তাদের ঘর পরিষ্কার করা, বিছানা পাল্টা, নূতন লোক এলে চাদর বদলে দেওয়া, বাড়ী ঝাঁট দেওয়া, সকালে সকলকে Breakfast দেওয়া, খাবার সময় বা সপ্তাহে সপ্তাহে বিল করা, বাজার করা, রান্না করা—সব মহিলাটি নিজেই করেন! বিছানার চাদর যখন কাচানো হয় তখন হয়ত laundryতে যায়, কারণ একটা laundryর গাড়ী প্রায় আসে দেখি। এত কাজ কলকাতায় কোন মেয়েকে আমরা সচরাচর করতে দেখি না। অবশ্য এরা শুধু যে কাজের মেয়ে বলে এত কাজ করে তা নয়, এখানে দিনে ৬ ঘণ্টা আন্দাজ লোক রাখতে হলে তাকে মাসে প্রায় ১৫০৲ টাকা দিতে হয় এবং এখানে gas-এ রান্না, গুঁড়ো সাবানে বাসন ধোওয়া, vaccum cleanerএ ঘর পরিষ্কার ইত্যাদি করবার ব্যবস্থা ঘরে-ঘরেই আছে। তবু অবশ্য দেখি, রোজ সকালে ফুটপাথে হাঁটু গেড়ে বসে মেয়েরা বালতি আর ন্যাকড়া দিয়ে বাড়ীর সিঁড়ি মুচছে। তাদের মধ্যে কে যে ঝি আর কে যে গৃহিণী জানি না, তবে এটা জানি যে অনেকের বাড়ীতেই ঝি থাকে না। ঝিএর মাইনে বাঁচিয়ে সেই পয়সায় তারা অনেক কাজ ও আনন্দ করে নেয়। মুটেভাড়াও অনেক মেয়েই দেয় না, দু'হাতে দুটো আধমণী ব্যাগ নিয়ে ছুটে গাড়ী ধরতে যেতে অনেক মেয়েকেই দেখা যায়। তাছাড়া, electric train প্রভৃতি local গাড়ীর stationএ বোধ হয় মুটেসাহেবরা থাকে না। ঘরে-ঘরে সব মেয়েরাই রান্নাবান্না কাপড় কাচা ইস্ত্রী করা বাজার করা করছে। তদুপরি Bank হাসপাতাল দোকান বাজারে চাকরী করে পুরুষের চেয়ে মেয়ে বেশী।

আর একটা বিষয়ে দেশে-দেশে মিল হচ্ছে বকশিশের। তবে আমাদের দেশের চেয়ে এখানে এটা অনেক বেশী। আমাদের গরীব বেচারীরা বকশিশ চাইলে আমরা অনেক সময় তাদের তাড়া দিয়ে বিদায় করে দি। আর এরা যদিও চায় না তবু যে যা করে তার জন্যে বকশিশ না দিলেই নিন্দে। সত্যি নিন্দা কতটা হয়, বলা আমার পক্ষে শক্ত। তবে এসে অবধি সর্ব্বত্র দিয়ে যাচ্ছি, কারণ শুনছি এটাই নাকি নিয়ম। মাঝে-মাঝে বোকার মত কাজের চেয়ে এবং দামের চেয়ে বকশিশ বেশী দিয়ে বসি কেউ-কেউ। সেটাই যদি নিয়ম হয় তাহলে মারাত্মক বলতে হবে! [ক্রমশঃ।

গত যুগের জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী

৺কৈলাসবাসিনী দেবী

১২৬২ এই শালে। আশাড় মাশের ৪ তারিকে বাগানে আসি। আমি জে তারিকে কলিকাতা আসি তার ফিরে বচর সেই সেই তারিকে বাগানে আসি। ৪ আশাড়ে আমার নতুন বাগানে আসিলাম। বাড়ি দেকে বড় আহ্লাদিত হইলাম। জগৎপিতাকে কোটি কোটি ধন্যবাদ দিতেছি এই বার বুঝি আমার তলপি বাঁধা শেষ হল। তাহা এখন বলিতে পারি না, আমার কপালে কতো ঘোরা আছে। ছেরাবোন মাশের ১ তারিকে আমি কালিঘাটে জাই। সেখান থেকে বাপের বাড়ি জাই। সেই রাত্র আমার কুমদের বড় জ্বর হয়, আর কান পাকে, আর পায়ে একখানি ঘা ছেল সেখানি সেই দিন বাড়ে। তাহাতে সারা রাত্র আমি জে কি কষ্টে কাটাই তাহা বলিতে পারিনে। জার মেয়ে তার কাচে থাকিলে আমার কোন ভয় থাকিতো না। তিনিও আমার শঙ্গে বসে থাকিতেন। একবার পথে আসিতে এমনি জ্বর হয়। তখন নাটুর ছাড়া হইআছে, আর কৃষ্টনগর দুই দিনে পথ আছে এমন জায়গাতে। কুমদের এমনি জ্বর হইয়াছেল, তাহাতে বাবু সঙ্গে ছেলেন আমাকে কিছু ভাবিতে হয় নাই। বাবু মাজিদের বলেন, জদি আজ কৃষ্টনগরে নে যেতে পারো তা হলে আমি তোমাদের ১০৲ টাকা বকশিষ দিবো। তারা তাহাই কল্লে। মরে পিটে ভোরে কৃষ্টনগরে আনিলে সেখানে ৩ দিন থাকি। ডাক্তার শায়েব দেকেন। বাবুকে এমনি সকলে ভালবাসে, সে সাহেবের সঙ্গে কখন আলাপ ছেল না, তবু একটি ফি নিলে না। রোজ ৩ বার করে দেকিতো। তাঁর ঘাটে বোট বাঁদা ছেল, ঘাটে থেকে কুটি দেকা জেতো। আর বাবুকে একদিন খাওয়ান। আর রোজ চা খেতেন, কাগচ পড়িতেন। সেইখানে টাকা নে কতো সাদাসাদি কল্লেন তাহাতে কোন মতো নিলেন না। বল্লেন, আমি শকালে বৈকালে ব্যাড়াবার সময় তোমার কন্যাকে দেকি, তার ফি নেবো কোন আর।

আমি তোমাদের দেকিবার জন্তে তো মাহিনা পাই। আমি বড় সুকি হইলাম জে তোমার কন্তা ভাল হইল। আমি ভাবিতেছি জে কতখনে রাত্র প্রভাত হইবে, আমি সেখানে গেলে বাঁচি। সকাল হল আমি বাঁচিলাম। আমি বলিলাম আজ এখনি আমি জাবো। তাহাতে আমার জ্যাঠা মহাশয় বলেন, কুমদের অসুক হইআছে, তুমি কেমন করে জাবে, পাল্কিতে আরো অসুক বাড়িবে। আর তাঁরা কি বলিবেন জে এমন অশুক শুদ্ধো পাঠায়ে দেছেন। আমি বলিলাম, এ মেয়ে তাদের বড় আদরের। আর তাদের সবার ভালবালা এমনি এখন সবাই আশিবেন, আর আমারে বকিবেন। তাহাতে তিনি বল্লেন, তবে জেন রদ্দুর ওঠেনা। আমি বাগানে আসিলাম, তখন ব্যেলা ৯টা। বাবু চুপ করে বসে আচেন। আমি আসিতে এল্লেন, বল্লেন কুমদ কোথা। আমি বলিলাম, তার বড় অসুক হইয়াছে তাহাতে বাবুর মুকখানি একাবারে জেন নীল হয়ে গেলো। আমি ভাবিলাম এমন কেন হল। আমাকে বল্লেন, উপরে চল। আমি আসিলাম। বাবু বল্লেন কাল আমি বড় খারাপ স্বপ্ন দেকেছি, জেন আমার কোলে থেকে কে কেড়ে নেবে আমি টানাটানি কচ্ছি, আমি বলচি দেবনা শে বলিতেছে আমি কখন ছাড়িবোনা। সারা রাত্র আমার এই কষ্ট হইয়াছে। শুনে আমার বড় ভয় হল। আমি খানিক খোন চুপ করে রহিলাম। তার পরে বল্লেম, আমি সারা রাত্র তোমাকে ভেবেছি, আর তোমার মেয়ে তোমাকে ডেকেচে, তাইতে তোমার অতো কষ্ট হইয়াছে। তাহা বাবু শুনলেন না, খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করে বসে রহিলেন। বল্লেন, আমি টানাটানি করি আর কোথাও জানাবো। আমারো বড় ভয় হল। দুই দিকে দুইজোনে বসে সব্বোদা মুখপানে চেয়ে, আর অশুদ খাওয়ান, আর জাতে ভাল থাকে তাই করা। কতো খেলনা কতো পুতুল দেওয়া, আর ছবি দেকান, কুমদ বড় ছবি দেকিতে ভালবাসে, আর হা জগদিশ্বর কি কল্লে। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে বসে থাকি। আর দুইজোনের সমান ভালবাশা, বাবু আমার দিকে চান, আর দুই চক্ষু দে জল পড়ে, আর আমি তাঁর দিকে চাই দুই চক্ষু দে জল পড়ে। ৪ দিন এই করে কাটাই, ৫ দিনের দিন একটু ভাল হল, ৮ দিনে একাবারে ভাল হল। বাঁচিলাম। আহা জগদিশ্বর সন্তানের উপর কি স্নেহ করে দেছেন তাহা বলা যায় না। এই সালে ১২৬৩ ছেরাবোন মাশে বাবুর বড় অশুক হয়। পেটে লিবর হয়। তাহাতে অমনি করে রাত্র দিন কাটাই। সুকের দিন কোথা দে যায় জানা জায় না। কিন্তু দুঃখের দিন জে কি কেলেশ দানি তাহা সকলে জানেন। এই রকমে আমার দিন জাচ্চে। তার উপরে এখন এক ভয়ানক ব্যাপার। এখন জিনি লাড শায়েব নাম কেনিং, ইনি এক নতুন হুকুম জারি করেন জে শিপায়েরা দাঁতে টোটা কাটিবে। তাহাতে চরবি আছে গরু ও শোয়ারের। তা হতে জতো শিপাই খেপে উঠিল কি হিন্দু কি মুছলমান।* প্রথমে চানকের সিপাই খেপে। এখন ভয়ানক কাণ্ড কচ্চে, সকল জাগায় শিপাই খেপে উটিয়াছে, এখন সামাল ২ পড়েছে। ২৮ তারিকে এখানে এমনি ভয় হইয়াছে জে কি ইংরাজ কি বাঙ্গালি সকলে ভয় পাইয়াছেন। রাত্রে কেউ ঘুময়নি। এর সঙ্গে কতোগুলি দিশি দস্যু মাতিয়াছেন। তাহাতে এখন শহর তোলপাড় হতেছে। কতো পাহারা শরগরম। অবতার পথে ঘাটে সকল জায়গাতে। গউর অবতার, তাঁদের এখন কিছু বলিবার যো নাই, তাঁরা ভারতে রক্ষা কচ্ছেন। এই গোলে আমরা কলিকাতা যাই, শেখানে ৫ দিন থাকি। একটু গোল থামিলে এখানে আসি।

ভাদ্রমাশে আমার বড় জ্বর হয়। ভাদ্র আশ্বিন দুই মাস জ্বর, কিছুতে ভাল হইল না। কার্তিক মাশে আমার কন্তার বিবাহ হইবার কথা হইতে নাগিল। আমার ভাশুর বলেন, কন্তে ১১ বৎসরে পড়িল, অগ্রাণ মাশে বিবাহ দিতে হবে, আর দেরি করা হবে না। বাবু তখন কিছু বলেন না। আমার সেজো জাকে বল্লেম, দেকো ভাই এখন কেমন করে বিবাহ হইতে পারে? আমার একটি মাত্র কন্তা. আমি ভাল করে বিবাহ দেবো, আমার মনে আছে। কিন্তু ইনি ভাল না হলে আমি দেবো না। আমি কি কেঁদে ২ দেবো, এতো কন্তাভারে আমি পড়ি নাই। তুমি ভাই বড় দাদাকে বল। আমার ঐ জা আমাদের বড় ভাল বসেন, আর তিনি বাবুর মনের মতন মানুষ। তিনি বল্লেন, আমি এখনি বলচি, সত্যি তো মেয়ের মা সেই পড়ে রহিল, এখন বিবাহতে কার সুক হবে আমাদের কি সুক হবে। তিনি বল্লেন কেমন করে বাবু ফি শনিবার পাত্র দেকিতে হুগিলি কলেজ ও কৃষ্টনগর কলেজে যাবেন। ও হিন্দু কলেজ দেকিতেন। এখন আর সে কৃষ্টনগর নাই, এখন রেল হইয়াছে। বেচে ২ একটি ছেলে বার কল্লেন সেটি হলো মল্লিকের ছেলে। তাহাতে আমার ভাশুর বল্লেন, কেমন করে হবে। আবার যদি পুত্র হয় তা হলে তার কুল নষ্ট হবে। বাবু বল্লেন এখন ১১ বচরের পরে জদি পুত্র হয় তা হলে অন্তায় হবে, আপনি তাকে দান করিবেন। আমি কুলের জন্তে একটি মুখ্য এনে কন্তে দিতে পারিবো না। তিনি আর কি বলিবেন। কিন্তু আমার জ্বর সারিল না। বাবু বড় দুঃখিত হলেন, আর ডাকতারদের বল্লেন বোধ হয় ভাল হবে না। তাঁরা বল্লেন, কেন ভাল হবে না, ভাল হবে, দুই দিন দেরি হবে। বাবু আমাকে বল্লেন একদিন জদি তুমি ভাল হও তা হলে বাঙ্গালির সহিত বিবাহ দেবো। তা না হলে আমার কন্তা নিয়ে বিলাতে জাবো। আমি বলিলাম তাই ভাল মেয়েকে একটি শায়েব দিও আর তুমি একটি মেম করো, তা হলে আর কোন গোল থাকিবে না। বাবু বল্লেন এতো নিদয় ভেবো না, আমার এ মনে এ জিবনে আর কেউ স্থান পাবে না। আমি বলিলাম ঠিক বলেচেন, বলে হাশিলাম। বাবু বল্লেন ঠিক কি গরঠিক তাহা তুমি ভেবে দেকো। তোমাকে বলিতে হল খুলে, তুমি বিশ্বাস করো আর না করো। আমি এক ২ দিন কোথাও জাই বটে কিন্তু সে আমোদের জন্তে, নাচ দেকিতে গায়োনা শুনিতে। কখন তোমাকে অনাদর করেছি, কি কখন রাত্র প্রভাত করেছি, তাহা তোমাকে যথার্থ বলতে হবে। আমি বলিলাম যথার্থ বলিবো, অনাদর কখন করো নাই বটে, কিন্তু আমিও অনাদরের কর্ম্ম কখন করি নাই। বাল্যকাল অবধি যাহা বল তাই করি সাধ্য অনুসারে। ইহাতে কি করে অনাদর করিবে। দোষ দেকে তবে তো বকিবে তাচ্ছল্য করিবে, না শুদ্ধ ২ বকিবে। মাই ডিয়ার, আমি বলিতে পারি, কিন্তু তুমি রাগ করিবে। বল না আমি কেন রাগ করিবো। তবে বলি আমাকে শুদ্ধ ২ কতো বকো, আমি কিছু বলিনে, চুপ করে থাকি, অন্ত লোক হলে কতো রাগারাগি হত্তো।

---

* শিপাহী বিদ্রোহ।

কুমারেশ যুবা বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই সমান উপকারী। বৃদ্ধ বয়সে যকৃৎ স্বভাবতঃই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং এই কারণে ইহার বহুবিধ কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত শক্তি; **কুমারেশ** সেই মূল্যবান শক্তি যোগায়।

কুমারেশ শুধু লিভার পীড়ার অমোঘ ঔষধমাত্র নহে, ইহা লিভার টনিকও বটে।

ও, আর, সি, এল, লিঃ
সালকিয়া • হাওড়া

আমি বলিলাম, ঠিক কথা বলেচ, তুমি হচ্চ বিদ্বান, আমি হচি মুখ্যু, কাযে ২ তোমাকে বকি, তোমার তো কোন দোষ নাই। সে যা হক, এখন তোমার জ্বরের জ্বালায় প্রাণ গেল। জগদ্ধাত্রী পুজার আর কার্তিক পুজায় ছুটি আচে, আর এক হপ্তার ছুটি নে তোমাকে নে একবার ব্যেড়াতে জাই। তাহলে জ্বর ভাল হবে। এই বই আর উপায় পাই নে। আমি বলিলাম, ওটি তোমার রোগের কর্ম্ম আর আমার কপালের দুঃখ। আমি তো বলে থাকি এক ঠাঁই দুই মাস থাকিলে তোমাকে পিঁপড়া ধরে। তাহা তুমি কখন থাকিতে পারো না তাহা আনি। এখানে তো মপশলে জাওয়া নাই, কন্যার বর দেকা শেষ হইয়াছে। এই বারে আর কি করিবে আমাকে নে ভাসো, আমার বোটে বসে ২ পা জাবে, আর মরিবো। না না তা হলে আর জ্বর হবে না, তুমি দেকো জলে থাকিলে কখন জ্বর হবে না। আমি বলিলাম, এমন করে কতো বার নে গেছ, কিন্তু একবারও ভাল হই নাই। বরং হিম লেগে আর অসুক বাড়ে। চল, তোমার সঙ্গে থেকে থেকে আমারও ওই রোগ হইয়াছে, আমাকেও পিঁপড়া ছাড়ে না, তবে জাওয়া জাক, আর কেন শুভ কর্ম্মে বিনয়ে কিছু প্রয়োজন নাই। বাবু বল্লেন, তুমি রাগ কল্লে। আমি বল্লাম, তুমি আমার অশুকের জন্যে যাচ্ছ, আমি রাগ কেন করিবো। কিন্তু আমার সঙ্গে বোটে বসে থাকিতে হবে উঠিতে পারিবে না। বাবু বল্লেন আচ্চা থাকিবো। তবে জাবো। তার পরে আমরা হাওয়া থেতে জাই বাঁশবেড়েতে। সেখানে শ্রীকৃষ্ট সিংহের একটি বাড়ি আছে, তাহাতে থাকা জাবে। গে দেকি তিনি সেইখানে আছেন। বাবুর খুব আল্লাদ হল। সেখানে কুমুদকে নে গেলেন। আমাকে সেই ঘাটে রাকিলেন। আমি বলিলাম, এখন কি হল, আমি একা থাকি, তুমি আমোদ কর, আর আমার মেয়েটি শুদ্দ নিলে। তাহাতে বাবু হাসিতে লাগিলেন। বল্লেন তুমি না বলিলে কেন জাবো। তুমি জদি বল তা হলে যাবো। তা না হলে এইখানে খাবো নাবে। যা তোমাব হুকুম হবে তাই করিবো। আমি বলিলাম যাও, খাও দাও গে, আমি তামাশা করে বলিলাম। সত্যি ২ বলিনে। যাও। বাবু হাসিতে লাগিলেন, বল্লেন, সকল কার্তিক এই ঘাটে ফেলিতে বলিছি তুমি দেকিবে বলে। সেদিন ভাসান দেকিলাম। তার পরদিন বলিলাম আজ কি হবে। তোমার খাওয়া হলে তিরবেনি (ত্রিবেণী) দেকায়ে আনিবো। আমি বলিলাম আচ্ছা। জে কদিন সেখানে ছিলুম সেই কদিন খাওয়ার পরে বোট খুলে দিয়ে ব্যেড়ান হতো। আর রাত্রে ঐ ঘাটে বাঁধিতো। তাহাতে আমার কোন কষ্ট হতো না। তিরবোনির ঘাটে গে বসে থাকিতাম। বৈকালে সব জল নিতে আসিতো, তাদের সঙ্গে এমনি ভাব হল, তাদের জল থাকিলেও শেই সময় জল নিতে আসিতো। জে কদিন জলে ছিলুম সেই কদিন জ্বর হয় নাই।

তার পরে বাগানে আসি। এসে আবার জ্বর হয়। তিন চার জোন ডাক্তার দেকে। পোষমাসে ভাল হই। ১২৬৪ এই সালে আমার কন্যার শুভো বিবাহ হয় মাঘ মাশে। ২৩ তারিকে মাচ হয়, ২৪ তারিকে জগ,গি হয়, ২৫ তারিকে বুধবারে শুভো বিবাহ হয়। তাহাতে খুব ঘটা হয়, সমাজিক দেওয়া হয়। বিবাহর দিন নাচ হয়। আর ইংরাজ বাঙ্গালি সকলে এক ঠাঁই খান। কেউ কোন কথা কয়নি। আমি আগে বলেছি বাঙ্গালিতে মান্য লোকের কিছু কর্তে পারে না। রামগোপাল বাবু * বললেন, তুমি ভাই বাগে গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ালে। তাঁর কন্যার বিবাহতে যাঁরা গেছেলেন তাঁরা একঘরে হন কি না, আর বড় গোল হইয়াছেল। তিনিও বড় লোক, তার হাতে বিচার ছেল না এই জন্যে সকলে ভয় করেন নাই। সে যা হক, আমার জামাতা বড় ভাল ছেলে। তাহাতে আমি জগদিশ্বরকে কোটি ২ ধন্যবাদ দিতেছি। এরা দির্ঘজিবি হয়ে সুখে থাকুন এই আমার প্রার্থনা। সব চাকরদের ও দরয়ানদের বালা দেন আর জিদের তশর কাপড় আর অঙ্গুরি দেন। সইষ ও কচউনয়নদের পোষাক দেন। দারোয়ানদেরও পোশাক দেন। আর সব রঙ করা কাপড় দেন। মালি মেতর দুই বাগানের মালি, তালুকের মালি, রাঁদুনি বামন, ৮ জোনকে অঙ্গুরি আর তশরের যোড়, বামুন মাশিকে গরদ অঙ্গুরি। এ বাটি ও বাটির লোকদের সমান দেন। বাড়ির মেয়েদের গরদ। আমার বাপের বাড়ি তাঁদেরও গরদ, সধবাদের ধুপছায়া, শরকায়দের স্ত্রীদেরও ধুপছায়া। আর খাওয়া দাওয়া দেওয়া খুব হল। ১০ দিন থাকিতে নহবত বসে।

[ক্রমশঃ।

* রামগোপাল ঘোষ।

আগামী সংখ্যা থেকে

(ষ্টালিন পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত গ্রন্থ)

দি ক্রেন

ভেরা প্যানোভা লিখিত

অনুবাদ করছেন শান্তা বসু

ভলগা থেকে গঙ্গা

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

(পূর্বানুবৃত্তি)

[পুরুধন উপাখ্যানের শেষাংশ]

পুরুধন সংবাদ পেয়েছিল—অসুরদের পরিকল্পনা হচ্ছে যে তারা পুরুধনদের সামনে যাবার পথ আটক করে সীমান্তের খাড়া পর্বতের গিরিবর্ত্মে আক্রমণ করবে এবং সেই সময়ে পিছন দিক দিয়েও একটা প্রবল বাহিনী এসে তাদের ঘিরে ফেলবে। এই আশঙ্কার প্রতিবিধানের জন্য পূর্ব-সংবাদ অনুযায়ী সে সমস্ত সতর্কতাই অবলম্বন করল। অন্য সময়ে পাঁজকোরা, সুবাত বা কুনারের আগন্তুকেরা অন্যদের গতিবিধির কথা খেয়াল না করে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবেই রওনা হয়ে যেত—কিন্তু এই ঘটনার পর তারা যুক্তভাবেই সব ব্যবস্থা করল। শত্রুর মনে যাতে কোন সন্দেহের উদ্রেক না হয় তার জন্যে তারা পুষ্কলাবতী থেকে এক-দুই দিনের ব্যবধানে রওনা হয়ে গেল, কিন্তু সিদ্ধান্ত রইল যে সব দলই গিরিবর্ত্মের মুখে সম সময়েই গিয়ে পৌঁছুবে।

গিরিবর্ত্মের ৩১৪ মাইলের মধ্যে এসে পুরুধন ২৫ জনের এক অশ্বারোহী দলকে আগেই পাঠিয়ে দিল। যে মুহূর্তে এই অশ্বারোহীরা গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করে উপরের দিকে উঠতে লাগল, তখনই অসুর-সৈন্যরা তাদের উপর শরজাল বর্ষণ সুরু করল। এর থেকেই বোঝা গেল যে সত্যিই তারা আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে। অশ্বারোহীরা তখন পিছু হটে এসে তাদের নায়কের কাছে সংবাদ দিল। পশ্চাৎ দিক থেকে যে শত্রুবাহিনী আক্রমণ করতে আসবে আগে তাদের ধ্বংস করার কথাই পুরুধন স্থির করল। এটা তার সৈন্যদলের পক্ষে কঠিনও হ'ল না, কারণ অসুররা যদিও প্রতি বছর আর্য্যদের কাছ থেকে হাজার হাজার ঘোড়া খরিদ করত, তবু তখন পর্য্যন্ত ঘোড়সওয়ারী যুদ্ধ তারা ভাল ভাবে আয়ত্ত করতে পারেনি।

ঘোড়সওয়ারীদের থামিয়ে এক দল যোদ্ধাকে রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য রেখে দিয়ে অন্যদের সাথে নিয়ে পুরুধন রওনা হয়ে গেল। অসুর-সৈন্যরা এমনি হঠাৎ আক্রান্ত হবার কোন আশঙ্কাই করছিল না। তারা দীর্ঘ বর্শা ও তরবারি-সজ্জিত আর্য্য-বাহিনীর আক্রমণের মুখে বেশীক্ষণ টিকতে পারল না—অসুরদের শুধু পরাজিত করে ছেড়ে দেবার ইচ্ছা ছিল না আর্য্যদের, তারা চ্যাপ্টা নাকওয়ালা, কৃষ্ণবর্ণ অসুরদের এ কথা সমঝে দিতে চেয়েছিল যে, আর্য্য-রমণীদের উপর নজর দেওয়াটা খুবই বিপজ্জনক কাজ। যখন পুরুধন দেখল যে শত্রুরা পলায়ন করছে তখন সে রক্ষীবাহিনীর কাছে সংবাদ পাঠিয়ে দিয়ে তার নিজের অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে পুষ্কলাবতীর দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হ'ল। তার সৈন্যবাহিনীর মত অসুর রাজপ্রতিনিধিও অতর্কিতে আক্রান্ত হ'ল। অসুররা তাদের সমস্ত শক্তি যুদ্ধে নিয়োগ করবার সময়ই পেল না এবং রাজপ্রতিনিধি সহ এই রাজধানী সহজেই আর্য্যদের হাতে এসে গেল।

অসুরদের বিশ্বাসঘাতকতায় আর্য্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা নির্বিচারে সমস্ত বন্দী পুরুষদের হত্যা করল। রাজপ্রতিনিধিকে প্রকাশ্য চৌমাথা রাস্তায় টেনে নিয়ে এসে তাকে তার প্রজাদের সামনে খণ্ড-খণ্ড করে কেটে ফেলল। স্ত্রীলোক, শিশু এবং বণিকদের তারা রেহাই দিল। আর্য্যরা যদি দাস-ব্যবসায়ে লিপ্ত হতে সে সময়ে ইচ্ছুক থাকত তাহ'লে এত লোক সেদিন এ ভাবে নিহত হত না। নগরের কতকগুলি অঞ্চল আগুনে ভস্মীভূত হ'ল। এই ভাবে সর্বপ্রথম অসুরদের একটি শক্তিকেন্দ্র বিজিত হল এবং আর্য্যদের পুরাণ-কাহিনীতে এই ঘটনা দেবাসুর যুদ্ধ বলে প্রচলিত হয়ে গেছে।

পুরুধন এর পর স্বদেশের দিকে রওনা হবার মুখে গিরিবর্ত্মে তখন পর্য্যন্ত যে সমস্ত অসুর-সৈন্য ঘাঁটী নিয়ে ছিল তাদের ধ্বংস করে ফেলল এবং বিভিন্ন দল তাদের নিজেদের অঞ্চলাভিমুখে রওনা হয়ে গেল।

এর পর কয়েক বছর পুষ্কলাবতীর বাণিজ্য স্থগিত রইল। পর্বতবাসীরা অসুরদের কাছ থেকে কোন জিনিষ খরিদ করতে অস্বীকার করল। কিন্তু খুব বেশী দিনের জন্য তারা তামা এবং পিতলের ব্যবহার থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখতে পারল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অঙ্গিরা উপাখ্যান

স্থান—গান্ধার তক্ষশিলা ; পাত্র—ইন্দো-এরিয়ান (ভারতীয় আর্য্য)
কাল—খৃষ্টপূর্ব ১৮০০

[প্রায় ১৫২ পুরুষ আগেকার এই উপাখ্যানে উত্তর-পশ্চিম ভারতের তদানীন্তন অধিবাসী অসুরদের সাথে আর্য্যদের প্রথম সংঘর্ষের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে]

যুবকটি তার পরিধানের ভিজা জামাটি খুলে ফেলে কাঁধের উপর একটি কম্বল জড়িয়ে নিতে নিতে বলল—"এই সুতী কাপড়গুলো একেবারেই বাজে, শীত এতে আটকায় না, বর্ষা থেকেও এতে আত্মরক্ষা করা যায় না।"

দ্বিতীয় যুবকটি তার নিজের গায়ের জামাটি খড়খড়ির উপর মেলে দিতে দিতে বলল—"কিন্তু গরম কালের পক্ষে ত এগুলো ভালো।" সন্ধ্যা হতে তখনও দেরী ছিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই পান্থনিবাসে অগ্নি-কুণ্ডের পাশে কিছু লোক এসে জমেছিল। যুবক দু'জন ধোঁয়াভরা অগ্নিকুণ্ডের পাশে না বসে জানালার কাছে গিয়ে বসল। ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য কম্বল দুটো তারা গায়ে জড়িয়ে নিল।

প্রথম জন মন্তব্য করল—"আমরা আগামী কাল প্রত্যুষের আগে আরও আট মাইল পথ চলে গান্ধার নগর (তক্ষশিলায়) গিয়ে পৌঁছুতে পারি, কিন্তু এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পথ চলা বড় কঠিন।"

"মেঘলা আকাশে সব জিনিষই যেন খারাপ হয়ে যায়, এদিকে আবার মেঘ না হলে আমাদের কৃষকেরা বৃষ্টির প্রার্থনায় চোটে ত

ইন্দ্রদেবের কানে তাঁলা ধরিয়ে দেয়, আর পশুপালকেরা ত আরও বেশী বিক্ষুব্ধ হয়।"

"সে কথা ভাই ঠিক। এক আমরা এই পথচারীরাই শুধু বর্ষা-বাদলা পছন্দ করি না, তা ছাড়া সারাক্ষণ ধরে কেউ ত আর পথ চলে না।" এই সময়ে সঙ্গীটির কাঁধের কাছে একটা ক্ষতচিহ্ন দেখে অন্য জন প্রশ্ন করল—"তোমার নাম কি ভাই?"

"মদ্র বংশের পাল। তোমার নাম?"

"সৌবীর বংশের বরুণ। তুমি তাহ'লে পূব দিক থেকেই আসছ?"

"হ্যাঁ, মদ্রদেশ থেকে—আর তুমি আসছ দক্ষিণ দিক থেকে—তাই না?"

"আচ্ছা, আমরা যে শুনছি দক্ষিণে অসুররা এখনও দেবতাদের সাথে লড়াই করছে, এ কথা কি সত্য?"

"একমাত্র সমুদ্রতীরে তারা লড়ছে—সেখানে এখনও তাদের হাতে একটা সহর রয়েছে। তুমি বোধ হয় জানো, বন্ধু, আমাদের যুবরাজ মাধব কি ভাবে তাদের সুরক্ষিত সহর ধ্বংস করেছেন?"

"শুনতে পাই, অসুরদের সে দুর্গগুলো নাকি তামার তৈরী ছিল।"

"অসুরদের অনেক তামা আছে বটে, তাই বলে এত তামা নেই যে তা দিয়ে তারা দুর্গ তৈরী করতে পারে। এই রটনাটা কি ভাবে চালু হ'ল জানি না। বড় আকারের জোড়া ইটে তাদের বাড়ী-ঘরগুলো তৈরী, সহরের চার পাশের দেওয়ালটাও তাই দিয়ে তৈরী; ইটগুলো হচ্ছে লালচে রংএর কিন্তু ইট আর তামাতে তফাৎ অনেক, ইটকে তামা বলে ভুল করা ত বেয়াকুফি।"

"তা সত্ত্বেও কিন্তু ভাই বরুণ, অসুরদের এবং তাদের ধাতু-নির্মিত দুর্গের সম্বন্ধে রটনা কিন্তু আমরা শুনছিই।"

"তার কারণ বোধ হয় যে আমাদের রাজপুত্রকে এই দুর্গগুলো ধ্বংস করতে যে কঠিন প্রচেষ্টা করতে হয়েছিল তাতে করে মনে হয়েছিল যে ধাতুদুর্গের মতই সেগুলো সুদৃঢ়।"

"তার পর, সম্বরের প্রচণ্ড বীরত্ব, কি করে সমুদ্রের মধ্যে তার গৃহ দাঁড়িয়ে রয়েছে, আকাশপথে তার রথ কি করে উড়ে যায় এ সব সম্বন্ধে কাহিনী ত আমরা প্রতিদিনই শুনছি।"

"তার রথ সম্পর্কে এই কাহিনী একেবারেই আজগুবি, যুদ্ধের যে দিকটাতে অসুররা সব থেকে দুর্বল তা হচ্ছে অশ্বারোহী বাহিনীর যুদ্ধ। এখনও, এমন কি তাদের উৎসবাদিতেও, অসুররা অশ্বচালিত রথের পরিবর্তে গোশকটই ব্যবহার করে। আমার ত ধারণা, পাল, যে, আমরা অসুরদের পরাজিত করতে পেরেছি অশ্বের জোরেই। অশ্বযূথ ছাড়া তাদের সহরগুলো দখল আমরা কোন দিনই করতে পারতাম না। সম্বর গত হয়েছে প্রায় দুই শতাব্দী আগে। আমার ত ধারণা, আকাশপথে উড়ে যাওয়া ত দূরের কথা তার একটা অশ্বচালিত রথও ছিল না।

"আচ্ছা, সম্বর যদি এত সাধারণ এক জন শূদ্রই হবে, তাহ'লে তাকে পরাজিত করে আমাদের যুবরাজ এত সুনাম অর্জন করলেন কি করে?"

"তার কারণ সম্বর ছিল খুব বড় এক জন বীর। সৌবীর নগরে আমি তার স্বর্ণখচিত তাম্রনির্মিত বর্ম দেখেছি—সেটা যেমন অসম্ভব শক্ত, তেমনি প্রচণ্ড ভারী। অসুররা সাধারণত বেঁটে, কিন্তু সম্বর ছিল বিরাটকায় মানুষ, দীর্ঘ, বিপুল এবং মেদবহুল ছিল তার দেহ। অপর পক্ষে আমাদের মাধব ছিলেন কৃশকায় ক্ষিপ্রগতির মানুষ। তুমি এখনও সিন্ধুনদের তীরে পুরাতন অসুর-নগরীগুলো দেখতে পাবে। সেই দুর্গের মধ্যে বসে শতখানেক তীরন্দাজ হাজার জন আক্রমণকারীর মহড়া নিতে পারত। বস্তুত ঐ দুর্গগুলো ছিল দুর্ভেদ্য—আর এইগুলো ধ্বংস করতে আমাদের রাজকুমার মাধবকে—যাঁকে আমাদের আর্য্য রণনেতা বলে অভিহিত করা চলে—তাঁকে যথেষ্ট দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দিতে হয়েছিল।"

"আচ্ছা বরুণ, দক্ষিণ দেশে অসুরদের কি এখনও কিছু শক্তি আছে?"

তোমাকে কি বলিনি যে, সমুদ্রতীরে তাদের শেষ দুর্গ কয়েক দিন আগে বিজিত হয়েছে? আমি নিজেই ত সেই যুদ্ধে গিয়েছিলাম।"—এই কথা বলতে বলতে বরুণের রৌদ্রতপ্ত মুখমণ্ডল ঝলমল করে উঠল, সে তার হরিদ্রাভ লম্বা চুলের গোছাটা হাত দিয়ে পিছনের দিকে সরিয়ে দিল—"অসুরদের শেষ দুর্গটিও বিজিত হয়েছে।"

"এই যুদ্ধে আমাদের রাজা কে ছিলেন?"

"আমরা রাজ-পদবীর বিলোপসাধন করেছি।"

"বিলোপসাধন করেছ?"

"হাঁ, আমরা—দক্ষিণ দেশের আর্য্যরা—এ সম্পর্কে আশঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম।"

"কেন?"

"রাজাদের কাজ হচ্ছে যুদ্ধে নেতৃত্ব করা, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"আর্য্যরা তাদের সেনাপতিদের স্বয়ংপ্রধান মনে করে না। যুদ্ধের সময় আমরা তাদের নির্দেশ মানি বটে, কিন্তু আর্য্যরা তাদের লোক-সভাকেই সর্বপ্রধান মনে করে, প্রতি জন আর্য্যের সেই সভাতে স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের পূর্ণ অধিকার আছে।"

"নিশ্চয়ই।"

"কিন্তু অসুরদের মধ্যে প্রথা অন্য রকম, সেখানে এক জন রাজাই হচ্ছে সর্বেসর্বা। তার নিজের ক্ষমতার থেকে উচ্চতর ক্ষমতাসম্পন্ন কোন সভাকে তিনি স্বীকার করেন না। তিনি যা বলেন, মরবার ইচ্ছা না থাকলে, সকলেই তা বাধ্য হয়ে পালন করে।"

"না, এ ধরণের রাজাকে আমরা কখনও স্বীকার করতে পারি না।"

"কিন্তু অসুররা এই ধরণের রাজাকেই সব সময় মেনে নেয়। তারা তাদের রাজাকে মানুষ নয়, দেবতা বলে মনে করে। রাজা জীবিত থাকতেই তাকে যে ভাবে তারা পূজা করে তা শুনলে তুমি বিশ্বাস করতেই পারবে না।"

"ঠিক বলেছ, আমি নিজেই দেখেছি অসুর পুরোহিতেরা কি ভাবে তাদের জনসাধারণকে ধোঁকা দেয়।"

"তারা জনসাধারণকে যেন গাধার থেকেও ইতর জীব মনে করে। তুমি বোধ হয় শুনেছ তারা লিঙ্গপূজা করে? শরীরের এই প্রত্যঙ্গটি নরনারীর সুখবিধান করে এবং বংশরক্ষার ব্যবস্থা করে, একথা সত্যি। কিন্তু তাকে পূজা করা, লিঙ্গ বা লিঙ্গের প্রস্তর বা মাটির প্রতিমূর্তি পূজা করা কি আহাম্মুকি বল ত?"

"নিশ্চয়ই।"
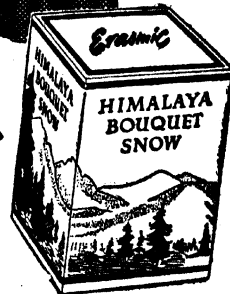
গরমে...
বা ঠাণ্ডায়...
HIMALAYA BOUQUET SNOW
HIMALAYA
BOUQUET
SNOW
আপনি যেখানেই থাকুন...
হিমালয় বুকে স্নো
ব্যবহার করুন
কারণ বিশেষ ক'রে ভারতীয় জলবায়ুর জন্যই
এটি তৈরী করা হ'য়েছে
আবহাওয়া যেমনই হোক না কেন—ভারতবর্ষের যে কোনও জায়গাতেই আপনি থাকুন, হিমালয় বুকে স্নো আপনার ত্বককে আরও মোলায়েম ও সুন্দর ক'রে রাখবে। এর মিষ্টি গন্ধ আপনাকে মোহিত ক'রবে।
আর একটি সুন্দর ইর্যাসমিক সৃষ্টি
HBS. 6A-X30 BG

"আর অসুর রাজারা এই ধরণের পূজায় বিশেষ আসক্ত। আমার কিন্তু মনে হয়, এই সবের মধ্যে যথেষ্ট কপট মতলব আছে। রাজারা এবং তাদের যাজকেরা নিশ্চয়ই বোকা ছিল না। তারা আমাদের থেকে (অর্থাৎ আর্য্যদের থেকে) অনেক বেশী চতুর। তাদের মত সহর তৈরী করতে গেলে আমাদের তাদের থেকে অনেক কিছু শিখতে হবে। তাদের দোকানপাট, পদ্মফুলে ভরা তাদের পুষ্করিণী, তাদের বৃহদাকার প্রাসাদশ্রেণী, তাদের রাজপথ,—এ সব জিনিষ আমাদের আদিম আর্য্যভূমিতে তুমি কখনও দেখতে পেতে না। আমি উত্তর-সৌবীরের পরিত্যক্ত অসুর-নগরী এবং অধুনা-বিজিত অসুর-নগরীটি দেখেছি। আমরা আর্য্যরা তাদের পুরাতন নগরীগুলো সংস্কার করতে বা তাদের হৃত অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতেও সক্ষম হইনি। বিশেষ করে বর্তমানের এই নগরীটি—যেটি সম্বর নিজে প্রতিষ্ঠা করেছিল বলে প্রবাদ আছে এটি ত দেবপুরীর মত।"

"বলো কি ?"

"সত্যি বলছি। পৃথিবীতে এমন কোন স্থান ত দেখি না, যার সাথে সে নগরীর তুলনা চলে। উদাহরণস্বরূপ সেখানকার একটি পরিবারের বাসোপযোগী একটি গৃহের কথাই ধরা যাক। তাতে থাকবে—একটি বা দুটি সুসজ্জিত বৈঠকখানা, চুল্লী সমেত একটি রান্নাঘর, চত্বরে একটি বাঁধানো কূপ, একটি স্নানাগার, একটি শয়নগৃহ এবং একটি গোলাঘর। সাধারণ লোকের বাড়ীও আমি দু'তলা তিনতলা হতে দেখেছি। সেই নগরীর বর্ণনা দেওয়াও দুরূহ—সুরপুরী ভিন্ন অন্য কিছুর সাথে তার তুলনা করতে পারি না।"

"পূর্ব দেশেও অসুরনগরী আছে, কিন্তু সেগুলো আমাদের মদ্রদেশ থেকে (বর্তমান শিয়ালকোট) অনেক দূরে।"

"আমি সে সবও দেখেছি বন্ধু। এটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, যারা এই সব সহর তৈরী করেছিল তারা আমাদের থেকে কৌশলী। আচ্ছা, তুমি সমুদ্রের কথা শুনেছ কখনও ?"

"নাম শুনেছি মাত্র।"

"নাম শুনে বা বর্ণনা শুনে তুমি সমুদ্র সম্পর্কে কোন ধারণাই করতে পারবে না। সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে তার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিতে পারলেই তবে তুমি সমুদ্র সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে, তুমি দেখতে পাবে তোমার সম্মুখে নীল জলরাশি আকাশ পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।"

"আকাশ পর্য্যন্ত কি করে তা পৌঁছুতে পারে বরুণ ?"

"তা হয়। যত দূর তোমার দৃষ্টি যায় তুমি শুধু দেখতে পাবে অফুরন্ত জলরাশি, ক্রমেই মনে হবে তাল-তাল পরিমাণ হয়ে গিয়ে যেন তা আকাশ ছুঁয়েছে। উভয়ের বর্ণও এক, কারণ, সমুদ্রের জল আমাদের এখানকার জল থেকে বেশী নীল। আর এই অসীম সমুদ্রের বক্ষে অসুররা তাদের বিশাল তরীসমূহ নির্ভয়ে ভাসিয়ে দিত—মাস বা বর্ষ ধরে তারা সমুদ্র ভ্রমণ করত আর এই সমুদ্রপার থেকে তারা নানা রত্নসম্ভার সংগ্রহ করে আনত। অসুরদের শৌর্য্য ও কুশলতার এটিও একটি নজীর। এছাড়া, আর একটি ব্যাপার আছে, যা তুমি বন্ধু কোন দিন শোনওনি। অসুররা তাদের মুখ ব্যবহার না করেও কথা কইতে পারে।"

"সে কি রকম ? কথা না বলেও ?"

"হ্যাঁ, কথা না বলেও। মাটি, পাথর এবং চামড়া পেলে তা দিয়ে অসুররা এমন কতকগুলো সঙ্কেত তৈরী করবে—যার অর্থ অন্য এক জন অসুর স্বচ্ছন্দে বুঝতে পারবে। আমরা যা দু'ঘণ্টা কথা বলে বোঝাতে পারব না—তা তারা পাঁচ-দশটা সঙ্কেতের দ্বারা বুঝিয়ে দেবে। আর্য্যরা এ বিদ্যা জানত না। এখন তারা এই সব সঙ্কেত বুঝতে চেষ্টা করছে। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে চেষ্টা করেও তারা ত সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারবে না।"

"তাহ'লে এটা নিঃসন্দেহ যে অসুররা আমাদের থেকে বেশী বুদ্ধিমান ছিল ?"

"হ্যাঁ। আমরা সর্বত্রই তাদের কারিগর, মৃৎশিল্পী, রথপ্রস্তুতকারী, অস্ত্রনির্মাতা, কর্মকার এবং তন্তুবায়দের কাজ দেখছি। আমাদের থেকে তাদের এ সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বে কি করে সন্দেহ থাকতে পারে ?"

"তাছাড়া, তুমি বলছ যে বীরত্বেও তারা পারদর্শী।"

"বীর, হ্যাঁ, তা বটে, তবে তার সংখ্যা খুব কমই। তাদের সন্তানেরা আমাদের সন্তানদের মত মানুষ হয় না ; কারণ, আমাদের সন্তানেরা ত মায়ের কোল ছেড়েই তরবারি নিয়ে খেলা সুরু করে। তাদের সৈন্যবাহিনীর লোকেরা আলাদা একটা শ্রেণী—যেমন আছে কারিগর, বণিক এবং দাসেরা। এই যোদ্ধৃশ্রেণীর বাইরে আর কেউ অস্ত্রবিদ্যা শেখে না। যোদ্ধারা অন্যান্য সবাইকে ঘৃণার চোখে দেখে। আর দাসেরা—স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে পশুর থেকেও দুর্দশায় থাকে। তাদের প্রভুরা শুধু যে তাদের কেনা-বেচা করে তাই নয়। তাদের দেহ এবং জীবনের উপরেও প্রভুদের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে।"

"তাদের কত সৈন্য আছে ?"

"শতকরা এক জনও হয়ত তাদের সৈনিক নয়। কিন্তু একশ' জনের মধ্যে চল্লিশ জনই দাস এবং আরও প্রায় চল্লিশ জন অর্দ্ধদাস অবস্থায় দিন যাপন করে ; কারণ, তাদের কারিগর এবং কৃষকরাও অর্দ্ধদাস। শতকরা দশ জন হবে ব্যবসায়ী এবং বাকীরা হচ্ছে অন্য বৃত্তিধারী।"

"এই জন্তেই বোধ হয় তারা আর্য্যদের দ্বারা পরাজিত হয়েছে !"

"হ্যাঁ, এটি তাদের পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ বটে। অন্য একটি প্রধান কারণ হচ্ছে—তাদের রাজাকে দেবতা বলে মানা, তাকে জনসাধারণ থেকে বহু উচ্চে স্থান দেওয়া।"

"আমরা, আর্য্যরা, তা কখনও করতে পারি না।"

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়

"ব্রাহ্মণদের দেহে ও মনে, মস্তিষ্কে ও আত্মায় সকল সাত্ত্বিকতার প্রভাব দেখা যায়।"

—ফরাসী পণ্ডিত মুসো জেক লিয়ং।

বেদনালাঘবে অব্যর্থ

সারিডন

সুইজারল্যাণ্ড-এর বেসল্-এ স্থিত বিশ্ববিখ্যাত 'রচি' ল্যাবরেটরীর আবিষ্কৃত **সারিডন** দ্রুত বেদনা উপশমে অব্যর্থ। মাথাধরা, দাঁতব্যথা, কোমরব্যথা, সায়েটিকা, স্নায়ুশূল ও জ্বরে আশু ফলদায়ক হিসাবে সারিডন সুপরিচিত। এতে অ্যাস্পিরিন বা কোনো মাদকদ্রব্য নেই। সারিডন খাওয়ার পর অস্বস্তিকর কোনো উপদ্রবের সৃষ্টি হয় না।

ব্যথায়

সারিডন চট্ ক'রে কাজ দেয় এবং মাথাধরা, দাঁতব্যথা, মেয়েদের মাসিকের যন্ত্রণা, পেশী ও স্নায়ুশূল প্রভৃতি কমিয়ে দেয়।

জ্বরে

সারিডন জ্বরের উত্তাপ কমায়, জ্বরভাব ও ব্যথাবেদনা দূর করে। স্বস্তি পাওয়া যায় ও অবসাদ দূর হয়, কিন্তু শরীরে ঘাম বা হজমের গণ্ডগোল দেখা দেয় না।

মৃদু উত্তেজক

সারিডন মৃদু উত্তেজক; অনিদ্রা ও বেদনাজনিত শারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদ এতে অতি অল্প সময়ে দূরীভূত হয়।

VB 6608

পিরামিডে কি আছে

সুনীল ঘোষ

বিশ্বের সাতটি আশ্চর্য্যজনক বস্তুর মধ্যে একমাত্র মিশরের পিরামিড ছাড়া আর সব ক'টাই মহাকালের নির্মম পদক্ষেপে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে গেছে। মহাকালের কুটিল ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা পিরামিড অতি আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারদের কাছ থেকেও গভীর শ্রদ্ধা আদায় করে ছাড়ে।

পিরামিড তৈরী ২০৬ থাক ঘুটিং পাথর দিয়ে। পাথরগুলো গড়পড়তা ৫৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ২৬ ইঞ্চি চওড়া এবং প্রতিটি পাথরের ওজন আড়াই টন করে। পিরামিডে এমনি আড়াইটনী পাথর আছে ২৩,০০,০০০ (২৩ লক্ষ) খানা।

পাথরগুলো থাকে থাকে সাজানো বলে খুব কাছে থেকে দেখলে পিরামিডের গা' বেয়ে সিঁড়ি উঠেছে বলে মনে হয়। প্রাচীন কালে অর্থাৎ প্রায় ৫০০ বছর আগে পিরামিডের ধারগুলো ছিল ঢালু এবং মসৃণ। দুই থাকের মাঝের ফাঁকগুলো ভরাট করা ছিল ২ থেকে ১৬ টনী খণ্ড-পাথর দিয়ে। আগে পিরামিড মোড়া ছিল দুগ্ধফেননিভ ঘুটিং পাথরের আস্তরণ দিয়ে কিন্তু ঘরবাড়ী তৈরীর কাজে লাগাবার জন্ত লোকেরা সেগুলো কেটে কেটে নিয়ে গেছে। প্রাচীন কায়রোর বহু ঘরবাড়ী এবং মসজিদ তৈরী হয়েছে পিরামিড কাটা মালমসলা দিয়ে। পিরামিডকে বিকৃত করার ব্যাপারে দস্যুতস্করের হাতও আছে। পিরামিডের তলায় অসংখ্য ধনদৌলত পোঁতা আছে বলে যে গুজব চালু ছিল, সেই গুজবে বিশ্বাস করে অনেক ধান্ধাবাজ পিরামিডকে ভেঙ্গে চুরে যাচ্ছেতাই কাণ্ড করেছে। ৮১৮ সালে খলিফা ম্যামাউনের মত একজন বিখ্যাত লোকও পিরামিডের ভিত্তিমূলে একটি সুড়ঙ্গ-পথ কেটেছিলেন। পিরামিডের উপর এই দস্যুবৃত্তির ফলে তার আয়তন হ্রাস পেয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। গোড়ায় এক একটা দিকের দৈর্ঘ ছিল ৭১৫ ফুট, উচ্চতা ছিল ৪৮১ ফুট ৪ ইঞ্চি। এখন এক একটা দিকের দৈর্ঘ দাঁড়িয়েছে ৭৭৫ ফুট পৌনে ৯ ইঞ্চি। যে সমস্ত পাথর দিয়ে পিরামিডের চুড়ো তৈরী হয়েছিল, সেই পাথরগুলো খোয়া গেছে। তাই তার চূড়া আজ আর সূচালো নয়, চ্যাপ্টা। এখন এর উচ্চতা ৪৫১ ফুট।

পিরামিডের ওজন ৭০,০০,০০০ টন। এতে প্রায় ৮,৫০,০০,০০০ ঘন-ফুট পাথর আছে আর মালমসলা আছে প্রায় ৪০,০০,০০০ ঘন-ফুট। মোট সাড়ে ১৩ একর জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে পিরামিড। এমন নিখুঁতভাবে তৈরী এর কাঠামো যে এক ইঞ্চির বেশী এবড়ো খেবড়ো নেই কোথাও।

মিশরের প্রধান পিরামিডটাই বিশ্বের মধ্যে সব চেয়ে প্রসিদ্ধ হলেও ঠিক এর পাশেই আরও যে দুটো পিরামিড আছে, সে দুটোও মোটেই তুচ্ছ করবার মত নয়। দ্বিতীয় পিরামিডের প্রতিষ্ঠাতা খাপরা; এটা প্রায় প্রধান পিরামিডের মতই বড়—পাশগুলো ৭০৬ ফুট ৩ ইঞ্চি করে এবং উচ্চতা ৪৭২ ফুট। এতে আছে ৬,০০০,০০০ ঘন-ফুট পাথর। এর চুড়োটা আজও গর্বভরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তৃতীয় পিরামিডটা মেনকাউরার। এটা একেবারেই ছোট—৩৪৬ ফুট ২ ইঞ্চি (পাশ) এবং ২১৫ ফিট উঁচু।

এই সমাধিস্তম্ভগুলির ইতিহাস ভারী রোমাঞ্চকর! প্রত্যেকটি পিরামিডই এক একটি কবর। এর তলায় আছে একটি করে মৃতদেহ। প্রাচীন ও আধুনিক বহু ধর্মের মত প্রাচীন মিশরের ধর্মও ছিল পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাসী। ৬ হাজার বছর আগের মিশরীরা বিশ্বাস করত যে পরলোকের জীবন পেতে হলে দেহটিকে মজুত করে রাখতে হয়। তখন মৃতদেহকে পচনের হাত থেকে বাঁচানোর উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চলতে লাগল এবং এইভাবে গড়ে উঠল বিজ্ঞানের একটি শাখা, আবিষ্কার হল নানা প্রকার আরকের। রাজা-রাণী প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের আরক-জারিত মৃতদেহগুলো মজুত রাখা হত পিরামিডের মধ্যে ছোট্ট একটা কামরায়। পরলোকে গিয়ে সংসার পাততে যে সব তৈজসপত্র লাগতে পারে, সেগুলোও ভরে রাখা হত মৃতদেহের সঙ্গে। যখন থেকে মিশর ঐক্যবদ্ধ হয়ে একই রাজার অধীনে শাসিত হতে সুরু করল, তখন থেকে আরম্ভ হয় পিরামিডের যুগ। খৃষ্টপূর্ব ত্রিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ৫০০ বছর যাবৎ মিশরের প্রত্যেক রাজাকেই তাঁর নিজস্ব পিরামিডে কবর দেওয়া হয়। রাজারা শাসনভার পাওয়া মাত্রই নিজের সমাধি রচনা করতে আরম্ভ করে দিতেন।

নীল নদের কাছে পূর্ব মরুভূমিতে পরিত্যক্ত কবরখানার মত পড়ে আছে বিরাট পিরামিড ময়দান—উত্তরে আবু রোয়স এবং দক্ষিণে মেডাম জুড়ে ৬০ মাইলব্যাপী বিরাট প্রান্তর!

মিশরের প্রধান পিরামিডটা সম্ভবত পিরামিড-শিল্পের শ্রেষ্ঠতম অবদান। কি করে এটা তৈরী হল, তার এক চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রীসের মহান ঐতিহাসিক (ইতিহাসের জনক নামে পরিচিত) হোরাডোটাসের বিবরণ থেকে। তিনি বলেছেন, এক লক্ষ শ্রমিক এবং কারিগর ২০ বছর পরিশ্রম করে গড়ে তুলেছে এই পিরামিড। সুসংগঠিত দাস-শ্রমিকদের সাহায্যে এটা তৈরী করা হয়েছিল বলে সকলে মনে করে। তবে অনেকে বলেন যে ওটা নাকি সত্যি কথা নয়। আসলে ওরা ক্রীতদাস ছিল না মোটেই, ছিল বেতনভুক শ্রমিক। বছরের তিন মাস নীল নদে কূলপ্লাবী বন্যা হত। ফলে দু'পাশের চাষবাসের জমি সব যেত ভেসে। বেকার চাষী আর ক্ষেতমজুররা দারুণ দুর্দশায় পড়ত। রাজা তাদের নিয়োগ করতেন সমাধিস্তম্ভ নির্মাণের কাজে। রাজার পয়সায় শ্রমিকরা খেত, পরত এবং সংসার চালাত।

যতটুকু জানা গেছে, তাতে মনে হয় এই সব শ্রমিকদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারই করা হত। হোরাডোটাস লিখে গেছেন যে, পিরামিডের গায়ে খোদাই-করা লেখা থেকে সে যুগের খাদ্যদ্রব্যের দর জানতে

পাওয়া যায়। পেঁয়াজ রসুন আর মূলো সে যুগের প্রধান খাদ্য ছিল বলে মনে হয়। শ্রমিকদের খাদ্যের জন্য মোট ১৬০০ রৌপ্য-মুদ্রা (প্রায় ৬ লক্ষ টাকা) খরচ হয়েছিল।

প্রধান পিরামিডটা যদিও বেশীর ভাগই আড়াই টন ওজনের টুকরো পাথর দিয়ে তৈরী কিন্তু এর মধ্যে বেশী ওজনের পাথরও আছে। দ্বারপথের প্রধান ছিপিটার ওজনই ৬০ টন। এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর কি করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় আনা হল আর কি করেই বা নির্দিষ্ট স্থানে থাপে থাপে বসিয়ে দেওয়া হল, সে প্রশ্ন মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক।

পিরামিড তৈরীর জন্য যে সমস্ত মালমসলা ব্যবহৃত হয়েছে, তার মধ্যে আসাউনের লাল স্ফটিক পাথর ছাড়া আর সমস্তই কেটে আনা হয়েছে নীল নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত প্রাচীন মাসাবার প্রস্তরখনি থেকে। একথা বললে মোটেই ভুল করা হবে না যে, পিরামিড তৈরীর মালমসলা এক কালে প্রাণবান পদার্থ ছিল। সমুদ্রের এক রকমের প্রাণীর খোল জমতে জমতে যে পাহাড়ের সৃষ্টি হয়েছিল সেই পাহাড়ের চূর্ণ দিয়ে রাজমিস্ত্রীর কাজ করা হয়েছে। এই প্রাণীগুলো এক ইঞ্চির বেশী বড় হত না। যে সমস্ত অজ্ঞাত প্রাচীন সমুদ্র তৎকালে পৃথিবীর অধিকাংশ গ্রাস করে রেখেছিল, সেই সমুদ্রে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়াতো এই প্রাণীগুলো। এই প্রাণীগুলো মারা পড়ত অসংখ্য কোটিতে কোটিতে। তাদের খোলগুলো জমতো এসে সমুদ্র-তীরে। সেখানে কাদা, মাটি এবং খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণে সেগুলোর মধ্যে নূতন গুণের সঞ্চার হত। সেই খোলের সমষ্টি থেকে গড়ে উঠত পাহাড় এবং সেই পাহাড় থেকে পর্বতমালা।

আজও যদি আপনি প্রধান পিরামিডের তলা দিয়ে চলাফেরা করেন তাহলে পিরামিডের গা বেয়ে পড়া এমনি অসংখ্য খোল আপনার পায়ে বিঁধবে।

মাসাবার প্রস্তরখনিতে এই পাথরগুলোকে নির্দিষ্ট মাপে কাটছাঁট করা হত। এমন অনেক চিহ্ন দেখা যায় যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, পাথর কাটাইয়ের কাজে ব্রঞ্জের উপর হীরক লাগানো করাত এবং পাথরে গর্ত করবার জন্য হীরকের তুরপুন ব্যবহৃত হত। পাথরগুলো সাইজ মত কেটে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী পথের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে নিয়ে যাওয়া হত নদীর তীরে। তার পর কাঠের ভেলা অথবা নৌকায় করে নদী পার করে নিয়ে যাওয়া হত।

হোরাডোটাসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, নদীতীর থেকে পাথরের টুকরোগুলোকে পিরামিড পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ-ভাবে একটি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছিল। পিরামিডের অবস্থান হচ্ছে প্রাচীন কায়রো থেকে ৭ মাইল দূরে ১০০ ফুট উঁচু একটা মালভূমির উপর। নদীতীর থেকে পিরামিড পর্যন্ত যে রাস্তাটা তৈরী করা হয়েছিল, সেও এক বিরাট ব্যাপার! পিরামিডের চেয়েও কম নয় তার মাহাত্ম্য। হোরাডোটাস বলেছেন যে পিরামিড তৈরী করতে যে সময় ব্যয় হয়েছিল, এই রাস্তাটা তৈরী করতেও তত সময় লেগেছিল। ৩০৫১ ফুট লম্বা এবং ৬০ ফুট চওড়া এই রাস্তাটা তৈরী করা হয়েছিল নিখুঁত ভাবে কাটাই-করা পাথরের টুকরো দিয়ে।

একটা পাহাড় কেটে পিরামিড তৈরী হয়েছে বলে অনেকের মধ্যে যে ধারণা ছিল, সে ধারণা ভুল। অন্তত হোরাডোটাসের বিবরণে সেই কাহিনী মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে।

পাথরগুলো ক্রমশঃ উপরে তোলা হয়েছে কপিকলের সাহায্যে। থাকে থাকে কপিকল বসিয়ে একখানা একখানা করে পাথর তুলে নির্দিষ্ট স্থানে বসানো হয়েছে সেগুলোকে। শত শত লোক টানাটানি করেছে সেই কপিকলের দড়িদড়া।

সম্ভবত এক একটা পাশের জন্য একসঙ্গে ছুটো-করে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। কপিকলের বিভিন্ন অংশ জোড়া এবং খোলা যেত বলেই মনে হয়। প্রথমে এক থাকের সব পাথর সাজিয়ে কপিকল খুলে আবার দ্বিতীয় উচ্চতর থাকে বসানো হত—এমনিভাবেই চলেছে কাজ। সিঁড়ি গেঁথে গেঁথে উপরে ওঠা হয়েছিল। চূড়া নির্মাণের পর ধীরে ধীরে নীচের দিকে বানাতে বানাতে নেমেছে মিস্ত্রীরা।

কেউ কেউ বলেন, দোলনার সাহায্যে এই সমস্ত পাথর ওঠানো নামানো হয়েছে।

হাজার হাজার বছরের পুরানো এই সমাধিস্তম্ভের বিভিন্ন কক্ষ, পথ, গবাক্ষ ইত্যাদি কারিগরি বিদ্যার চরম পরাকাষ্ঠার প্রমাণ দেয়। প্রত্যেকটি পাথর বসাবার আগে তার মাপজোক জ্যামিতির হিসাব নিকাশ কষতে হয়েছে। প্রাচীন বিশ্বের এই গগনচুম্বী স্থাপত্যের সঙ্গে এ যুগে কিসের তুলনা হতে পারে বলুন তো?

বিরাটত্ব এবং ঘনত্বের দিক দিয়ে এ যুগে প্রধান পিরামিডের সঙ্গে তুলনীয় একমাত্র কয়েকটি বৃহৎ বৃহৎ বাঁধের প্রাচীর। লোকে বলে সানফ্রানসিস্কো-ওকল্যাণ্ড যে ব্রিজের প্রধান থামটা নাকি ঘনত্বের দিক দিয়ে প্রধান পিরামিডকে ছাড়িয়ে গেছে। বৌল্ডের বাঁধের দৈর্ঘ ১১৮০ ফুট, উচ্চতা ৭২৭ ফুট, ভিতের বেড় ৬৬০ ফুট। এই বাঁধে ৩২,৫০,৩৩০ ঘন-গজ মালমসলা আছে। আর বর্ত্তমানে পিরামিডে মালমসলা আছে ৩১,৫০,০০০ ঘন-গজ, ক্যালিফোর্ণিয়ার সাস্তা বাঁধে মালমসলা আছে ৫৪,০০,০০০ ঘন-গজ।, গ্র্যাণ্ড কাউলি-বাঁধের মালমসলার পরিমাণ ১,০২,০০,০০০ ঘন-গজ অর্থাৎ পিরামিডের তিনগুণ। এই বাঁধের দৈর্ঘ ৪৩০০ ফুট, উচ্চতা ৫৫০ ফুট এবং ভিতের বেড় ৫০০ ফুট।

এ ছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি মাটিকাটা বাঁধ আছে, সেগুলো পিরামিডের চেয়েও অনেক অনেক বড়। এর মধ্যে সব চেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে মোণ্টানার কোর্ট পিক বাঁধ। এই বাঁধটা ২৫০ ফিট উঁচু এবং ৪ মাইল দীর্ঘ। এতে আছে ১০,৯০,০০,০০০ ঘন-গজ মালমসলা।

চিত্রকর রাজা রবিবর্ম্মা

শ্রীদুলাল গঙ্গোপাধ্যায়

রাজা রবিবর্ম্মার নাম অনেকেরই কাছে সুপরিচিত। আজ রবিবর্ম্মা আমাদের মধ্যে আর নাই; অপর দশ জন সাধারণ লোকের মতই তাঁর নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু যে পথ তিনি আমাদের দেখিয়ে গেছেন তা' কোন দিন নিবে যাবার নয়। কারণ তা শুধু আগুনের ফুলকি নয়, সূর্য্যের মতই তা নিত্য ও তেজোময়। ভারতের জাতীয় চিত্রবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত হোলে রাজা রবিবর্ম্মাই তাঁর পিতা বলে পরিগণিত হবেন।

রাজা রবিবর্ম্মা ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলস্থ অর্দ্ধস্বাধীন

ত্রিবাঙ্কোর রাজ্যে কিলিমানুর নামক গ্রামে ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন। ত্রিবাঙ্কোর রাজবংশের সঙ্গে রবিবর্ম্মার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই রাজবংশটি এক দিকে যেমন ধনে আবার অপর দিকে তেমনি উন্নত প্রতিভাতে সমুজ্জ্বল। রবিবর্ম্মার মাতা অম্বা বাই এক জন প্রতিভাশালিনী রমণী ছিলেন। তাঁর রচিত কবিতা এখনও ত্রিবাঙ্কোর রাজ্যের শিক্ষিত মহলে সমাদৃত। রবিবর্ম্মার মাতুল রাজবর্ম্মা এক জন প্রতিষ্ঠাশালী চিত্রকর ছিলেন। এই মাতুলই রবিবর্ম্মাকে চিত্রশিল্পে উৎসাহিত করেন। সকলেই চিত্র অঙ্কিত করার জন্য তিরস্কার করতেন কিন্তু রাজবর্ম্মা কখনও রবিবর্ম্মাকে তিরস্কার করেন নাই। কথায় বলে না—'জহুরীই জহর চেনে'। সত্যিই তিনি রবিবর্ম্মাকে চিনতে পেরেছিলেন যে, এই ছেলে এক দিন জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলে পরিচিত হবে। আর একটা কথা যে, 'প্রতিভা এমনই জিনিষ—যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকেই সজীব করিয়া তোলে'। রবিবর্ম্মা ভারতবর্ষের কলাবিদ্যাকে সজীব করে তুললেন।

স্থানীয় প্রথানুসারে রবিবর্ম্মাকে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হোল, কিন্তু রবিবর্ম্মার লেখাপড়া অপেক্ষা কলাবিদ্যায় বেশী ঝোঁক চাপল। সুতরাং লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে মাতুল রাজবর্ম্মার সংস্পর্শে এসে কলাবিদ্যা সাধনায় মগ্ন হোলেন। রবিবর্ম্মার প্রথম চিত্র সম্মানিত হয় মাদ্রাজে। এই প্রদর্শনীতে রবিবর্ম্মার চিত্র শ্রেষ্ঠ বলে সম্মান লাভ করে। এর পর হতে রবিবর্ম্মার প্রতিভা-গৌরব দেশময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। তার পর পুনরায় ১৮৭৩ সালে মাদ্রাজের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা লর্ড হোবার্টের প্রযত্নে একটি শিল্প-প্রদর্শনী হয়। রবিবর্ম্মা এই প্রদর্শনীতে দু'খানি চিত্র পাঠান। সে দু'খানি চিত্র খুব প্রশংসা অর্জ্জন করে এবং উহার জন্য রবিবর্ম্মা একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইহার পর তিনি নানা স্থানের শিল্পপ্রদর্শনীতে অনেক চিত্র প্রেরণ করেন। সর্ব্বত্রই তাঁর চিত্র যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। তাঁর প্রতিভা কেবল ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ চিত্রকর-গণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি বার বার সম্মানিত হয়েছিলেন। যদি তিনি পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় ভাল কলাবিদ্যা শিক্ষা পেতেন, তাহোলে নিশ্চয়ই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলে পরিচিত হতেন। কিন্তু তিনি আপন প্রতিভায় উদ্ভাসিত হয়েছিলেন জগতের সামনে এবং জগতের সামনে চিত্রবিদ্যার নবযুগ এনে দিয়ে গেছেন। রবিবর্ম্মার চিত্রের পরিচয় ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁর চিত্রের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করতে গেলে দেখা ভিন্ন উপায় নাই। রবিবর্ম্মার চিত্র দুই শ্রেণীর। প্রথম—ভারতের পৌরাণিক দৃশ্য, দ্বিতীয় হচ্ছে—তাঁর মানস-কল্পনা। আজ ভারতের ঘরে ঘরে তাঁর ছবির প্রতিলিপি দেখা যায়।

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪

সংকেতময় সেই দুটি বস্তু বা প্রতীক—দেশবাসীর চোখে অপূর্ব কিছু নয়, সকলেরই পরিচিত; আজ হয়তো তাদের পরি-চিতি অনেকের কাছে হাসির বিষয় বলে মনে হবে। কিন্তু সেদিন হাসির বস্তু হয়ে তারা আসেনি—সত্য-পীরের শিরণীর মত সে-যুগের হিন্দু ও মুসলমানকে সমান ভাবে শ্রদ্ধায় অভিভূত করত। সেই বস্তু দুটির প্রথমটি হচ্ছে—চাপাটি, দ্বিতীয়টি—লাল পদ্ম।

এদের কোনটি সেদিন যাঁর হাতে এসে পৌঁছাত, তিনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতেন। হাতে আসবা মাত্রই তার আসার তাৎপর্য বুঝতে পারতেন—এর পিছনে ছিল এমন এক অভিসন্ধিমূলক পটভূমিকা,······বছরের পর বছর ধরে সেটি প্রস্তুত হয়েছিল।

আটার তৈরী—ছোট একখানি থালার মত আয়তনে এক ইঞ্চি পুরু সরু রুটি বা চাপাটি। সাধারণতঃ গ্রামের যিনি মোড়ল—তাঁরই হাতে এসে পড়ে এই চাপাটি, বহন করে আনেন পাশের গাঁয়ের যিনি মোড়ল—তিনি। চাপাটি আসবা মাত্রই মোড়ল বুঝতে পারতেন যে, আসন্ন ঝড়ের এক পরম সংকেত বহন করে এনেছে এই পবিত্র বস্তুটি। এখন তাঁর কর্ত্তব্য হচ্ছে, সমস্ত উত্তেজনাকে চেপে রেখে প্রাপ্ত চাপাটির মান রাখা।

চাপাটি আসার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার মাতব্বর লোকজন সব ছুটে আসেন মোড়লের আলয়ে। মোড়লের পরিবর্তে সময়বিশেষে ভিন্ন গ্রামের চৌকিদারও চাপাটি বহন করে আনেন—এই গ্রামের মোড়লকে দেবার উদ্দেশ্যে। মোড়ল তখন সেই চাপাটি ভেঙে টুকরো-টুকরো করে সমবেত সকলকে বিতরণ করেন—দেবপ্রসাদ বা পীরের শিরণীর মত পবিত্র ভেবে সকলেই তার অংশ গ্রহণ করে ধন্য হন। এর পর সেখানেই মোড়লের উদ্যোগে অনুরূপ আর এক চাপাটি প্রস্তুত করে পাশের গ্রামের যিনি মোড়ল, তাঁর হাতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হয়ে যায়। হয় মোড়ল নিজেই নূতন চাপাটি নিয়ে যান, নতুবা গ্রামের চৌকিদারের উপর এ ভার অর্পিত হয়। সঙ্গে কোন বাণী নেই, চিঠি নেই, চাপাটি এমন একটা গাম্ভীর্যময় নীরব ভঙ্গিতে যায় যে, বক্তব্য বিষয় অনেক আগে থেকেই জানানো হয়ে আছে। চাপাটি পাবা মাত্র প্রাপক বুঝতে পারেন যে, কি উদ্দেশ্যে প্রেরক এই পবিত্র বস্তুটি পাঠিয়েছেন তাঁরই কাছে, আর এখন তাঁকে কি করতে হবে।

এই ভাবে বছরের পর বছর ধরে এই অদ্ভুত চাপাটি ঘুরে বেড়াতে থাকে গ্রামের পর গ্রাম, পরগণার পর পরগণা, জেলার পর জেলা, প্রদেশের পর প্রদেশ অতিক্রম করে, এবং এর উদ্দেশ্য এমন ভাবে সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, কেউ সন্দেহ করে না, জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজনও মনে করে না, স্ব স্ব কর্ত্তব্য ভেবেই বাঁধা-ধরা নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করে যান। এই চাপাটি হাতে আসবা মাত্র তাঁরা বোঝেন এর সংকেত এবং এর স্রষ্টাদের আদেশ। কাজেই, কোন গ্রামে চাপাটি আসবা মাত্র সারা অঞ্চল যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে—সেই সঙ্গে বিস্ময়জনক তৎপরতার সঙ্গে চাপাটি আসার কথা দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

এখন দ্বিতীয় প্রতীকটি লাল পদ্মের কথায় আসা যাক। চাপাটি যেমন গণ-আন্দোলনের প্রতীকরূপে গ্রামের মোড়লের হাতে এসে ক্রমে-ক্রমে জনসাধারণের কাছেও বিশেষ পরিচিত হয়ে ওঠে—দেশের লোক এই দ্রব্যটি দেখেই বুঝতে পারে তার উদ্দেশ্যে—নেতাদের সংকেত ও নির্দ্দেশ;—পক্ষান্তরে তেমনি এই লাল পদ্ম ফুলটিও ইংরেজের সেনানিবাসে দেশীয় সিপাহী-মহলে উত্তেজনাময় এক চাঞ্চল্য জাগিয়ে তোলে।

চাপাটি যেমন কোন বিশ্বস্ত দূত বা বাহক মারফত প্রথমে গ্রামের মোড়লের হাতে আসে এবং এই আসার মধ্যে থাকে শুধু একটি সংকেত,

লাল পদ্মটিও এই ভাবে সেনানিবাসে ভারতীয় রেজিমেণ্টের প্রধান দেশীয় অধ্যক্ষের হাতে এসে পড়ে। এর বাহক এমন দক্ষ ও চতুর ব্যক্তি যে, ঠিক স্থান ও উপযুক্ত সময় বুঝেই সেনাধ্যক্ষের হাতে ফুলটি গুঁজে দেন; আর এমনি এই ফুলের প্রভাব ও সম্মোহনী শক্তি যে, যত বড় পদস্থ ও মানী অফিসার তিনি হোন না কেন—তখনি দেবতার নির্মাল্যের মতন ভক্তির সঙ্গে ফুলটি মাথায় ঠেকিয়ে তিনি কর্তব্যে অবহিত না হয়ে পারেন না। তাঁর দেহ-মন যেন ফুলের পরশে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে; সেই সঙ্গে দেশাত্মবোধের প্রেরণা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। এর পর তিনিও এমনি সন্তর্পণে এই রক্তপদ্মটি তাঁর ঠিক অধস্তন কর্মচারীর হাতে অর্পণ করতে বাধ্য হন। তিনিও আবার অনুরূপ শ্রদ্ধায় তাঁর পরবর্তী কর্মচারী বা সৈনিকের হাতে গুঁজে দেন এই রহস্যময় লাল রঙের ফুলটি। এখানেও এই প্রকার আদান-প্রদানে কোন কথা নেই, প্রশ্ন ওঠে না, কেউ বিস্ময় বোধও করে না—সত্যই যেন ব্যাপারটি আগে থেকে জেনে রেখেছে। এর পর এই ভাবে একে একে এই লাল পদ্ম দেশীয় রেজিমেণ্টের প্রত্যেক অফিসার ও সিপাহীর হাতে-হাতে ঘুরে আবার যথাস্থানে—সেই প্রধান অফিসার বা অধ্যক্ষের হাতে ফিরে আসে।

আশ্চর্য এই যে, যাঁরই হাতে গিয়ে ওঠে লাল পদ্ম, তাঁরই দেহের শিরায়-শিরায় রক্তে যেন দোলা লাগে; তাঁরা প্রত্যেকই যেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে আকুল আগ্রহে করছিলেন যেন এই লাল পদ্মটির পরম প্রতীক্ষা। এই পদ্ম যেন তাঁদের কানে-কানে জানিয়ে দিচ্ছে—দিন আগত ঐ···তৈরী হও! একটি মাত্র লাল পদ্ম, পাপড়ির নিচে পাপড়ি, রক্তের মত টুকটুকে লাল রঙ তার; কিন্তু কি তেজোময় এর প্রভাব, কি প্রোজ্জ্বল এর আভা,—এই পদ্ম যেন একসঙ্গে শুদ্ধি, বিজয় ও মুক্তির প্রতীক। এই লাল বস্তুটি যেন প্রাণবস্তু হয়ে রেজিমেণ্টের সমগ্র সিপাহীকে একদেহ একমন একপ্রাণ হতে প্রেরণা দিচ্ছে; যেন উপনিষদের ভাষায় বলছে—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্,

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।

তোমরা মিলিত হও, এক কথা বল, এক মত হও। মন্ত্র সমান, সমিতি সমান, চিত্ত ও মন সমান—এই সত্য তোমাদের উপলব্ধি হোক। এই লাল ফুলটি ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক সেনাবারিকের বীর সিপাহীদের অন্তরে যেন প্রেরণা দিতে লাগল—সব লাল হয়ে যাবে শীগগির···সেদিন এলো বলে!

প্রায় একশো বছর আগেকার কথা। এখনকার মতন তখনো দেশের চার দিকে যাওয়া-আসার সুযোগ-সুবিধা হয় নাই, কলকাতার মত সহরেও ট্রাম-বাস-মোটর-ট্যাক্সীর কল্পনাও কেউ করেন নাই; রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত সবে মাত্র রেল-লাইন খোলা হয়েছে, নির্দিষ্ট সংখ্যক দু'-চারখানি গাড়ী সেই নতুন রেলপথে যাতায়াত করে। মালপত্র আমদানী-রপ্তানী হয় জলপথে—নৌকায়, বড় বড় মহাজনী কিস্তীতে; স্থলপথে—উটের পিঠে, গরু-মোষের গাড়ীতে। দেশবাসীর দেহ তখন সবল, প্রায় প্রত্যেকেই শ্রম-সহিষ্ণু। ধনী ব্যক্তিদের কথা অবশ্য আলাদা—তাঁরা যানবাহনে যাতায়াত করতেন, কিন্তু মধ্যবিত্ত ঘরের লোকজন

দশ-বিশ ক্রোশ পথ হেঁটেই পাড়ি দিতেন। দেশের এমন অবস্থায় তখন নানা সাহেবের মত দেশনায়কের মাথা থেকে নীরবে এহেন দেশব্যাপী আন্দোলন চালাবার কি অদ্ভুত ফন্দীই বেরিয়েছিল! সভা নেই, বক্তৃতা নেই, হৈ-চৈ নেই,—ঘরে তৈরী করা একখানা চাপাটি, আর জলাশয় থেকে তোলা একটি ফুলের সাহায্যে বাঙলা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ বিশাল দেশের সাধারণ অধিবাসী এবং ইংরেজের সুরক্ষিত সেনানিবাসে রেজিমেন্টের মধ্যে অদ্ভুত উপায়ে সকলের সহজে বোধগম্য সংকেত দ্বারা রটিয়ে দেওয়া হলো: ভাই সব, বিদেশী ইংরেজ কোম্পানীর অত্যাচার চরমে উঠেছে; ওদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করবার দিনও এসে পড়েছে, তোমরা তৈরী হয়ে থাকো—চরম আঘাত হানবার দিন ও ক্ষণটির প্রতীক্ষা কর!

এমনি এক অদ্ভুত মানুষ ছিলেন নানা ধুন্ধুপন্থ—যিনি মনের কথা মুখে প্রকাশ করতে অভ্যস্ত নন, মনের মধ্যেই সুকঠোর সঙ্কল্প চেপে রেখে তারই প্রেরণায় ইংরেজ কোম্পানীর ভারতজোড়া সাম্রাজ্যে একই সঙ্গে আগুন জ্বালাবার ইন্ধন প্রস্তুত করতে থাকেন বছরের পর বছর ধরে। সেই পরিকল্পনার যুগল ফল এই—চাপাটি ও লাল পদ্ম। অপূর্ব এই দুটি ইন্ধন বীর সাধক নানা সাহেবের দীর্ঘ সাধনাপ্রসূত পরিকল্পনার অদ্ভুত অবদান! আর, যাঁরা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিষ্ঠার সঙ্গে এই ইন্ধন অবলম্বন করে কার্যে ব্রতী হলেন—প্রত্যেকেই তাঁরা কর্মযোগী, দেশের মুক্তির জন্য আত্মত্যাগী বীর, অসাধারণ কৌশলী।

নূতন কোন অঞ্চলে এই চাপাটি ও লাল পদ্ম আসবার আগেই এঁদের মধ্য থেকে এমন সব কৃতী ব্যক্তির শুভাগমন হয়, যাঁরা ঐ দুটি বস্তুর সঙ্কেত-রহস্য প্রচারে অভিজ্ঞ এবং দেশমাতার পায়ে জীবন উৎসর্গ করেই এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেছেন। স্থানীয় অধিবাসীদের মন বুঝে নানা ভাবে রূপসজ্জা করে তাঁরা জনসাধারণের সঙ্গে মিশে যান। কেউ হন জ্যোতিষী, কেউ সাজেন বাউল, কেউ আসেন কথক হয়ে। কিন্তু সবার লক্ষ্য থাকে—কথার কৌশলে ইংরেজ কোম্পানীর দেশব্যাপী অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়ে দিয়ে শেষে এই বলে আশ্বাস দেওয়া যে, ওদের পাপের ভরা পূর্ণ হয়ে এসেছে। ১৭৫৭ সালে ইংরেজ রাজত্বের পত্তন হয়েছিল, ১৮৫৭ সালে হবে তার পতন। বড়-বড় জ্যোতিষীরা গণনা করে বলেছেন—ইংরেজ কোম্পানীর রাজত্বের পরমায়ু একশো বছর মাত্র; ১৮৫৮ সালেই শত বর্ষ হবে পূর্ণ। সারা দেশ চাইছে ইংরেজ রাজত্ব ধ্বংস হোক। এরই ধুয়া তুলে দেশের দিকে-দিকে চাপাটি চলেছে। চাপাটি কথা বলে না, কথা শুনতেও চায় না; কিন্তু সে এলে আর তাকে দেখলেই বুঝতে হবে—ইংরেজ কোম্পানীর উচ্ছেদের পরোয়ানা নিয়েই সে হাজির হয়েছে—অমনি সকলেই মনে মনে কামনা করবে—কোম্পানীর পাপের রাজ্য ধ্বংস হোক; কিন্তু হুঁসিয়ার, মুখের কথায় কেউ কিছু বলবে না। মনে মনে সবাই তৈরী হবে—এক হবে মনে-প্রাণে। চাপাটির কণিকা মাত্র গ্রহণ করলেই মনের মধ্যে অদ্ভুত রকমের বল পাবে।

এমন কথা শুনে কেউ কি আর স্থির থাকতে পারে? ইংরেজ কোম্পানীর অত্যাচার-কাহিনী দিনে দিনে শুনে শুনে তারা অধীর হয়ে উঠেছে। ঝাঁসীর রাণী, অযোধ্যার বেগম, নানা সাহেবের প্রতি এই কোম্পানীর অকথ্য অত্যাচারের অতিরঞ্জিত আখ্যান শুনে সব প্রদেশের অধিবাসীদের অন্তরে তখন ইংরেজ-বিদ্বেষবহ্নি প্রধূমিত হচ্ছে। এমনি সময় চাপাটির প্রসঙ্গ উঠতেই আনন্দে উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে প্রত্যেক অঞ্চলের বাসিন্দারা, উল্লাসের সুরে আকুতিপূর্ণ আহ্বান জানাতে থাকে অদেখা এই চাপাটির উদ্দেশে। সুতরাং এ থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, এর পর চাপাটি এলে কেন যে সে অঞ্চলের প্রায় সকলেই মুখ বুজিয়ে নীরবে তার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি জানায়, আর তাদের মনের তলে-তলে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত ইংরেজবিদ্বেষ ও দেশাত্মবোধের প্রবাহ প্রচণ্ড বেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে। নিখিল ভারতের প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলেই এমনি করে প্রেরণার সঞ্চার করছিলেন নানা সাহেবের সিদ্ধ হস্তে তৈরী এক-একটি নির্ভীক বাক্‌পটু বিচক্ষণ কর্মযোগী। চাপাটির আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই এই ভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন তাঁরা; কিন্তু চাপাটি যখন এলো তাঁদের কাজ শেষ হয়ে গেছে; তখন আর কথা নেই, প্রচারের প্রচেষ্টা নেই, তার পিছনে আন্দোলন নেই, চাপাটি নিজেই তার কাজ করে চলেছে।

বিঠুরের ব্রহ্মাবর্ত প্রাসাদে এখন প্রত্যহ নানা সাহেবের বৈঠক বসে। দিল্লীর মসনদচ্যুত বাদশাহ বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ থেকে আরম্ভ করে তান্তিয়া তোপী, আরার বৃদ্ধ রাজা কুমার সিংহ, রয়ার খণ্ড রাজা নৃপৎ সিংহ, শঙ্করপুরের রাণা বেণী সাধু, রোহিলখণ্ডের নবাব বাহাদুর খাঁ, ফয়জাবাদের বাগ্মী আলেম আহম্মদ শা-প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে নানা সাহেব সংগোপনে সংযোগ স্থাপিত করে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। নানা সাহেবের বিশ্বস্ত দূতরূপে আজিমউল্লা প্রত্যেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এমন ভাবে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন যে, বিঠুরের প্রধান কেন্দ্র ব্রহ্মাবর্ত প্রাসাদ থেকে সর্বত্র—দূরবর্তী প্রত্যেক নেতা একই সময়ে সংকেত বাক্যে বৈঠকের কার্যক্রম জ্ঞাত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনে সমর্থ হন। বছরের পর বছর ধরে এক বিরাট বৈপ্লবিক আন্দোলনের এরূপ অনাড়ম্বর প্রস্তুতি সত্যই বিস্ময়াবহ ঘটনা!

এই সময় ইউরোপে রাশিয়ার সঙ্গে বৃটেনের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় এবং প্রায় একই সময় চীনেও সংঘর্ষের সম্ভাবনা ঘটায়, ভারতে বেশী ইংরেজ সৈন্য রাখা সম্ভবপর ছিল না; ভারতীয় ইংরেজ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিও ইউরোপে নিবদ্ধ থাকে। বিপ্লবী নেতৃবর্গ তৎপরতার সঙ্গে এই সুযোগটুকু গ্রহণ করলেন। তাঁরা বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারলেন যে, সে সময় ভারতে ইউরোপীয় সৈন্য-সংখ্যা চল্লিশ হাজার মাত্র; কিন্তু ভারতীয় সিপাহী সেনা-সংখ্যায় প্রায় সওয়া দুই লক্ষ। বিপ্লবী নেতৃবর্গ ভারতের সেনানিবাসগুলিতে লাল পদ্মের সাহায্যে প্রস্তুতির সংকেত দিয়ে এই সেনাবাহিনীকে আয়ত্ত করতে বদ্ধপরিকর হলেন। একই দিনে একই সময়ে বঙ্গদেশ থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত সমস্ত সেনাবাহিকে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত করবার এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা নানা সাহেব প্রস্তুত করে ফেললেন।

স্থির হলো—১৮৫৭ অব্দের ২৩শে জুন বেলা ঠিক বারোটার সময় একসঙ্গে ইংরেজের সমস্ত সেনানিবাস থেকে দেশীয় সিপাহীরা বিপ্লবীরূপে আক্রমণ আরম্ভ করবে এবং সরকারী মালখানা, কালেক্টরী, কেল্লা, বুরুজ প্রভৃতি দখল করে নেবে।

কিন্তু নিয়তির এমনই পরিহাস—তার তিন মাস আগেই বাঙলা দেশের বুকেই ইংরেজের ব্যারাকের মাঠে সেই বহ্নি হঠাৎ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। সেদিন—২৯শে মার্চের আর এক স্মরণীয় দিন। [ক্রমশঃ।

আমাদের

পূর্ব্বতন অবদান

চন্দ্রলেখা...

নিশান...

মঙ্গলা...

ও

সংসার...

এবারের উপহার

"মিঃ সম্পত"...

এটী জেমিনির পরবর্ত্তী আকর্ষণ

শ্রীরমেন চৌধুরী

ষ্টুডিয়ো-পরিচিতি

ইষ্টার্ণ টকিজ লিমিটেড

দিকটা উত্তর বটে, কিন্তু জায়গার নাম দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণেশ্বরী মায়ের রাজ্য এটা। বর্তমান জগতের মহাবিস্ময় পরমপুরুষ পরমহংসদেবের সাধনায় জাগ্রত মহামায়ার লীলা-নিকেতন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি। শ্যামবাজার মোড় থেকে ৩২ কিংবা ৩২বি বাস ধরলে আপনাকে নামিয়ে দেবে মায়ের বাড়ি-যাওয়া পথের সামনেতে। এখান থেকে যে রাস্তা এঁড়েদহ অভিমুখে পশ্চিমমুখো চ'লে গেছে সেদিকে হেঁটে গেলে লাগবে ৫।৭ মিনিট। ষ্টেট বাসে—(যেটা ৩২সি বলে খ্যাত) গেলে হাঁটুনি বেঁচে যায় বেশ খানিকটা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে রাণওয়ে তৈরী হয়েছিলো এখানে (এখন অবিশ্যি তা আর নেই, সেটাকে কোণাকুণি ভাবে পেরিয়ে কাঁচা পথ ধরে এগিয়ে পাবেন ইষ্টার্ণ টকিজ ষ্টুডিয়ো। ইষ্টার্ণ টকিজ ষ্টুডিয়োর কাজ শুরু হয় ১৯৪৬ সনে। কিন্তু কোম্পানীর পতাকায় ছবি তোলা আরম্ভ হয়েছে '৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে। যশস্বী ঔপন্যাসিক বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'নীলাংগুরীয়' এঁদের প্রথম ছবি; '৪৩-এর জুলাই মাসে রূপবাণীতে দেখা দেয় দর্শকসাধারণকে। এই বছরের শেষে কোম্পানীর জয়যাত্রার কাড়া-নাকাড়া বেজে উঠলো 'শহর থেকে দূরে'র কল্যাণে। শৈলজানন্দ পরিচালিত অনবদ্য মুখর-চিত্র 'শহর থেকে দূরে'···জহর গাজুলী—ফণি রায়—রেণুকা রায় প্রভৃতির অসাধারণ অভিনয়-ধন্য 'শহর থেকে দূরে' তাবৎ বাঙলা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতাকে কি আনন্দই না সেদিন দান করেছে! এ-হেন বিখ্যাত ছবির নির্মাতা হিসাবে ইষ্টার্ণ টকিজ বাঙলার অভিজাত সংস্থাগুলির পুরোভাগে স্থান পেয়ে গেল। এই সাফল্যের মূলে কর্ণধার সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার মহাশয়ের নিরলস প্রচেষ্টা বিদ্যমান। তাঁরি ঐকান্তিকতায় ছোট গাছটি ক্রমে শাখা-প্রশাখায় দীর্ঘ কাণ্ড হ'য়ে বহু কর্মীর আজ আশ্রয়-স্থল হ'য়ে উঠতে পেরেছে। 'শহর থেকে দূরে'র পর কিছু দিন নীরবতা নেমে আসে, তার পর ১৯৪৬-এর মাঝামাঝি দেখা দিলো এঁদের 'নতুন বউ'। এই বছরেই ষ্টুডিয়ো-গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটিত হয়। টালিগঞ্জের মায়ামুক্ত হ'য়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে স্থান নির্বাচন করলেন কর্তৃপক্ষ। যাতায়াতে অসুবিধা যে হয়নি তা নয়, কিন্তু যত দিন যেতে থাকলো অভ্যাস হ'য়ে এলো সকলের। দিক-পরিবর্তন এখন ভালোই লাগে সবার। বি, টি, রোডের ধারে দুটি এবং দক্ষিণেশ্বরে একটি—মোট তিনটি ষ্টুডিয়োর আশ্রয়-স্থল হয়েছে এই উত্তরাঞ্চল। অবিশ্যি এর মধ্যে একটির দোরে কিছু দিন হলো তালা-চাবি পড়ে গেছে দুর্ভাগ্যবশতঃ।

আটচল্লিশের আগষ্ট মাসে এঁদের আর একখানি ছবি মুক্তি পায়—'নন্দরাণীর সংসার'। স্বর্গত নট-নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীর রচনা এটি। পরিচালনা করেন 'বন্দী', 'শহর থেকে দূরে'-খ্যাত রূপশিল্পী পশুপতি কুণ্ডু। 'পরশ পাথর'-এর দর্শন মিলেছে '৪৯ সনে। 'সাহসিকা' ছবিখানির স্যুটিং সারা হয়েছে বেশ কিছু দিন—এখন মুক্তির দিন গুণছে বলা চলতে পারে। এটির রচনা ও পরিচালনা প্রেমেন্দ্র মিত্রের। উপস্থিত এঁরা ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, নিজস্ব প্রচেষ্টা আছে সাময়িক ভাবে বন্ধ। বাইরের ছবি যা উঠছে তার মধ্যে 'গোপাল ভাঁড়', 'হিন্দী ছবি', 'মাকড়সার জাল', 'মাণিক-জোড়', 'মীরকাশিম', 'যাযাবর', 'প্রাচীর', কাল-রাত্রি', 'কলংকিনী', 'ভগিনী নিবেদিতা', 'আদেশ' প্রভৃতির নাম করা যায়। এঁদের অনেকগুলির চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েও গেছে, বাকি শুধু রূপালি পর্দায় প্রতিফলিত হওয়া।

ষ্টুডিয়োর যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সব-কিছুই এখানকার আধুনিক উন্নত ধরণের—আর, সি, এ, রেকর্ডার, মিচেল ক্যামেরা, আইমো ক্যামেরা, ভিনটেন পাথ ফাইণ্ডার প্রভৃতি। ল্যাবরেটরীতেও সেই আধুনিক ব্যবস্থা দেখতে-পাওয়া যায়। শ্রীপরিতোষ বসু ও শ্রীসত্য ব্যানার্জি শব্দযন্ত্রে এবং ক্যামেরায় আছেন শ্রীদিব্যেন্দু ঘোষ ও শ্রীশচীন্দ্র দাশগুপ্ত। ল্যাবরেটরী ইন-চার্জ শ্রীজগবন্ধু বসু, চীফ ইলেক্‌ট্রিসিয়ান শ্রীবিমল দাস ও শিল্প-নির্দেশক শ্রীহীরেন লাহিড়ীর নাম কর্মী হিসাবে উল্লেখ্য।

কলা-কুশলী

পরিচালক সুশীল মজুমদার

সুশীল মজুমদার

দরজার বাইরে থেকে আমার সাড়া পেয়ে প্রসন্ন হাস্যে আহ্বান জানালেন চিত্রজগতের নিরলস কর্মী জ্ঞান-কেন্দ্রিক পরিচালক সুশীল মজুমদার মশাই। বর্তমান বাঙলার আঙুলে-গোণা প্রথম শ্রেণীর পরিচালকদের অন্যতম মানুষটি কাজ ফেলে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন, প্রার্থী এবং দর্শনার্থীরা আজ সকালের মত তাঁকে আর পাবে না।

সে কথা আর একবার মজুমদার মশাই বেয়ারাকে জানিয়ে দিলেন আমার সামনে।

মুখ তুলতেই সপ্রশ্ন দৃষ্টি চোখে পড়লো : অর্থাৎ কি আমার জিজ্ঞাস্য? কাল সেই কথাই হয়েছিলো।—জানালুম, ও-সব পয়েণ্টের ঝামেলা আর রাখিনি, সোজাসুজি জীবনের গল্প বলুন, সংক্ষেপে সেটা ধরে নিই আমার পত্রপুটে।

'সেটা ১৯২৭ সাল—আজ থেকে পঁচিশ বছর আগের কথা। হ্যাঁ, জুবিলি ইয়ার বলতে পারা যায় এ বছরকে। অবনীমোহন ঠাকুর (শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ নন) করলেন 'টেগোর ফিল্ম'। জনৈক সাহিত্যিকের একটি গল্প—বোধ হয় 'সোনার কাঠি' তার নাম—তুলবার ব্যবস্থা করেন কর্ত্তৃপক্ষ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজ আর এগোয়নি। এই ছবিতেই আমি দ্বিতীয় নায়ক নির্বাচিত হই। প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হোলো। নিরুৎসাহ হলুম না। তার ফল ফললো দু'বছর পর। বেংগল মুভিজ এণ্ড টকিজ গড়ে উঠলো কুমিল্লায়, 'ডন অফ লাইফ' (জীবনপ্রভাত) তোলা শুরু হোলো কলকাতায়! এখানে আমি জেনারেল য্যাসিস্‌ট্যাণ্ট হয়ে ঢুকে পড়লুম। ছবিটি যথাসময়ে মুক্তি পেল। ১৯২৯ সালের ঘটনা এটা।'

বড়ুয়া পিকচার্স করলেন স্বর্গত নট-পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া—তাঁর কোম্পানীতে যোগ দিলেন সুশীল বাবু ১৯৩০ সালে। এখানেও সাধারণ সহকারী—অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে কাজ করতে ব্রতী হলেন তিনি। দেবকী বসু 'অপরাধী'র পরিচালক নির্বাচিত হলেন। তাঁকে সাহায্য করলেন শ্রীযুক্ত মজুমদার। 'অপরাধী' মুক্তি পেল। তোড়জোড় চললো 'নিশির ডাক'-এর। কিন্তু 'নিশির ডাক' শোনা শেষ পর্যন্ত কারুর ভাগ্যে ঘটলো না, এরি ফাঁকে 'একদা' নামে দু'রীলের একটি হাসির ছবি সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে তুলে ফেললেন পরিচালক মজুমদার। এটাই ওঁর জীবনের প্রথম ছবি। শুধু তাই নয়, Short reeler-এর ইতিহাসে এর স্থান একেবারে শুরুতে। এই 'একদা'য় নায়ক ছিলেন নীরেন লাহিড়ী (বর্ত্তমানে পরিচালক), গল্প লিখেছিলেন বড়ুয়া।

যে ছবি দিয়ে 'রূপবাণী' চিত্রগৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়েছিল সেই 'বেংগল ইন ১৯৮৩'র ডিরেক্টারের প্যানেলে ছিলেন শ্রীযুক্ত মজুমদার, অবিশ্যি পুরোধায় বড়ুয়া সাহেব ছিলেন। ফ্লোর ডিরেকশান পুরোপুরি সুশীল বাবুকেই দিতে হয়, কারণ—কুমার প্রমথেশ চরিত্র-চিত্রণে ব্যাপৃত থাকতেন। বলা বাহুল্য, এ ছবিটি বড়ুয়া পিকচার্সের পতাকায় গৃহীত হয়েছিল।

পাইয়োনিয়ার ফিল্ম-এর 'তরুবালা'র দেখা মিললো ১৯৩৪ সালে—সুশীল বাবুকে আমরা এত দিনে পেলুম পূর্ণ পরিচালকরূপে। সিনারিও প্রভৃতি পরিচালক মশাই করলেন, দর্শকসাধারণ প্রথম দর্শনেই হৃষ্ট হলেন, বলা চলে। কালী ফিল্মসের 'মুক্তিস্নান' হোলো এঁর পরবর্ত্তী প্রয়াস। এগিয়ে চললো রথ যাত্রাপথে নব উৎসাহে।

এলো ১৯৩৯ সাল•••ফিল্ম কর্পোরেশন তুলে ধরলেন 'রিক্তা'-কে। আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো পরিচালকের

সাড়া পড়ে গেছে দেশময়•••সাংবাদিকরাও প্রশংসায় পঞ্চমুখ ঃ

আনন্দবাজার •
প্রত্যেকটি চরিত্রকেই এমন আন্তরিকতার সঙ্গে সকলে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন যে, মনে হয় শরৎচন্দ্র এঁদেরই দেখে কাহিনীটি রচনা করেছিলেন।

N.K.G of Amritabazar
So far giving us a completely winsome and sparkingly true pulse of Sarat Chandra as contained in this warm story, let us congratulate Jugantar Chhaya Pratisthan and its makers unreservedly.

• যুগান্তর
•••কাজেই 'বিন্দুর ছেলে' হয়ে উঠেছে এমন একখানি ছবি যা দেখে দর্শক বলে যায়, 'এই তো খাঁটি ভারতীয় ছবি, এই তো বাঙালীর ছবি, এই ছবিই তো সবাই দেখতে চায়।'

• Screen
In no story perhaps is this truer than in "Bindur Chheley" and in none perhaps, if only with the exception of Barua's "Devadas" was there ever shown a greater reverence for the master.

একযোগে
শ্রী
২-৩০, ৫-৪৫, ৯
পূর্ণ
২-৩০, ৫-৪৫, ৯
প্রাচী
২-৪৫, ৫-৪৫, ৮-৪৫
অজন্তা
(বেহালা)
শ্যামাশ্রী
(হাওড়া)

এবং শহরতলীর ১১টি চিত্রগৃহে

চিত্রনাট্য
নরেশ মিত্র
পরিচালনা
চিত্ত বসু
শ্রেষ্ঠাংশে
মলিনা দেবী • সন্ধ্যারাণী
পাহাড়ী • অজিত
মাষ্টার বিভু • মাষ্টার সুখেন
পরিবেশনা
● কল্পনা মুভিজ ●

জয়-গানে! দেশের মানুষের মনে বাঞ্ছিত আসন লাভ করলেন সুশীল মজুমদার! 'রিক্তার' প্রযোজক প্রভৃত অর্থ আহরণ করলেন এই ছবিটির কল্যাণে। ফিল্ম কর্পোরেশনের হয়ে আর দু'খানা ছবি তুললেন সুশীল বাবু—'তটিনীর বিচার', 'প্রতিশোধ'।

ডি ল্যুক্স ফিল্ম আহ্বান জানালেন বিয়ের পৌরোহিত্য করতে—হ্যাঁ, 'অভয়ের বিয়ে'র। সুশীল বাবু সাগ্রহে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। কর্ম-সন্ধানী সাধক, কাজের আরাধনায় প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করতেই উন্মুখ। এই কারণে শ্রীযুক্ত মজুমদারকে অলস আড্ডায় প্রায়শই অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়। 'অভয়ের বিয়ে' সার্থক হয়েছিল—আজ তা নিঃসংশয়ে চলা চলতে পারে। ছায়া দেবী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, রেখা মিত্রের রূপায়ণ প্রাণবন্ত হয়েছিলো বৈ কি! এম, পি'র 'যোগাযোগ' ও 'হস্‌পিট্যাল' (হিন্দি 'যোগাযোগ') মজুমদার মশায়ের পরবর্তী সফল চিত্র।

বোম্বায়ের ডাক এলো এই সময়, সাড়া দিতে হোলো এঁকে। 'চার-আঁখে' তুললেন সেখানে। এখানা Propaganda Picture—যুদ্ধের বাজারে তখন এমনি ধারা প্রচার-ছবি অনেক উঠেছে কলকাতায় বোম্বায়ে। এই 'চার আঁখে' ছবিতে বোম্বায়ের স্বনামধন্য নট-প্রযোজক পরিচালক রাজকাপুর সুশীল বাবুর তৃতীয় সহকারী ছিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, আজকের বাঙলার অনেক নতুন ও পুরোনো পরিচালক একদা শ্রীযুক্ত মজুমদারের সহকারী ছিলেন। এমনও দেখা গেছে যে, অল্প সময়ের ব্যবধানে ইনি নতুন নতুন সহকারী গ্রহণ করছেন। কারণ? কারণ সহকারী তখন স্বাধীন ভাবে কাজ শুরু করে দিয়েছে। এঁর সহকারীর মধ্যে পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।...

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলুম—বোম্বায়ে থাকা কালীন তাজমহল ফিল্মসের হ'য়ে আর একটি প্রশংসা-ধন্য ছবি করলেন মজুমদার মশাই—'বেগম'। কাশ্মীরের পটভূমিকায় এটির কাহিনী রচিত হয়। 'বরসাত' ছবি এই 'বেগম' থেকেই প্রেরণা পেয়েছিল বেশ কিছু দিন পরে।

কলকাতায় ফিরে এসে বাসন্তিকার 'অভিযোগ' প্রস্তুত করে নিজের প্রতিষ্ঠানের (মজুমদার-স্বামী প্রোডাক্‌সন) ছবি করলেন 'সর্বহারা'। পূর্ববংগের ভাষায় গৃহীত কাহিনীটি অনবদ্য হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম-বাঙলার দর্শককে আশানুরূপ খুশি করতে পারেনি। আই, এন, এ, সৈন্যবাহিনী অভিনীত চিত্র 'সিপাহী-কা-স্বপ্ন' এই সময়েই নির্মিত হয়েছিলো। তার পর উঠলো 'দিগ্‌ভ্রান্ত' এবং কিছু দিন আগেকার অজস্র দর্শক, সমালোচক প্রভৃতির অকুণ্ঠিত উচ্ছ্বাস-নন্দিত 'রাত্রির তপস্যা'। উপস্থিত ভারত চিত্রমের 'প্রশ্নে'র প্রস্তুতিতে ইনি আত্ম-সমাহিত।

আমরা সুশীল বাবুকে নিরবচ্ছিন্ন পরিচালকরূপেই পাইনি। ওঁর প্রতিভা বহুমুখী জীবনের প্রথম দিনে যে প্রচেষ্টারত দেখেছি, আবার তার দেখা পেয়েছি, অর্থাৎ রূপ-শিল্পী হিসাবে এঁকে রূপ নিতে দেখেছি 'রিক্তা', 'যোগাযোগ', 'সর্বহারা' ও 'দিগ্‌ভ্রান্তে'। 'দিগ্‌ভ্রান্তের' ভ্রষ্ট-আদর্শ বৈজ্ঞানিককে কি আপনারা ভুলতে পেরেছেন?

আসন্ন মুক্তি প্রতীক্ষায়

শ্রীদুর্গা পিক্‌চার্সের নিবেদন

শকুন্তলা দেবীর প্রযোজনায়

"পথভ্রষ্ট"

একটি বিশিষ্ট ভূমিকায়

নবাগতা ইন্দ্রাণী দেবী, এম, এ,

পরিবেশনায়

মুক্তি ডিষ্ট্রিবিউটারস্

৫৪, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টকির টুকিটাকি

দীপালী পিক্‌চার্স

গড়ে উঠেছে কতিপয় শিল্পীর সহযোগিতায় দক্ষিণ-কলকাতায়। এঁদের প্রথম প্রচেষ্টা কোনো একটি সুরশিল্পীর জীবন-কথা অবলম্বনে রচিত হচ্ছে বলে প্রকাশ। গুরুদাস ব্যানার্জি, শিবশংকর, দীপ্তি রায় প্রমুখ রূপশিল্পীরা এই চিত্তাকর্ষক কাহিনীটিকে রূপায়িত করবেন। সংগীত-পরিচালক কালোবরণ সুর-সংগতির ভার নিয়েছেন।

আঁধি

এলো বলে! বাঙলা দেশে বালুঝড় (আঁধি)—শুনতে যেন কেমন লাগে! কিন্তু মা ভৈঃ! এ হোলো একটি বাঙলা ছবি, যশস্বী অগ্রদূত-গোষ্ঠীর পরিচালনায় এম, পি প্রডাকশনের পতাকায় দ্রুত সমাপ্তিমুখে। চরিত্র-চিত্রণে রয়েছেন দীপ্তি রায়, রাধামোহন আর শ্রীমান বিন্তু।

এম, পি প্রডাকশনের

আর একখানি ছবি 'সাড়ে চুয়াত্তর'! বিজন ভট্টাচার্যের রচনা, পরিচালনা নির্মল দে'র! হাস্যাভিনেতারা প্রায় সকলেই দেখা দেবেন এই চিত্রটিতে।

পতিতার সিদ্ধি

সুপ্রভাত ফিল্মসের দ্বিতীয় চিত্র পরিচালক মধু বোসের নেতৃত্বে নির্মাণরত। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের প্রখ্যাত গল্প হচ্ছে এই 'পতিতার সিদ্ধি'। চিত্রে কার্যসিদ্ধি হোলে, বাঙলা ছবির রাজ্যেরই মংগল। ভাবি দুর্দিন চলেছে কিনা।

ভারতীয় কৃষ্টি মন্দির

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক স্মরণীয় অধ্যায়ের প্রতিচ্ছবি 'অগ্নিযুগ' চলচ্চিত্রে গ্রহণ করতে অগ্রণী হয়েছেন। অগ্নিযুগের বিখ্যাত নেতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ইতিহাস চিত্র-কাহিনীরূপে রচনা করে দিয়েছেন কর্তৃপক্ষদের। পরিচালনা করবেন অমলেন্দু বসু।

তারাশংকরের

নাম-করা উপন্যাস 'রাইকমল' এবার চিত্র-রূপ পাবার পথে হাজির হোলো। অল্প দিন হোলো (recently) রিসেণ্ট ফিল্মস ক্রয় করেছেন এর চিত্রস্বত্ব! সংবাদ ক্রম-প্রকাশ্য।

বনহংসী

পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় দ্রুত নির্মীয়মান নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিয়োয়। প্রবোধ সান্যালের আর একখানি নবতম কাহিনী সুধী দর্শকসাধারণের সম্মুখীন হবে অনতিবিলম্বে। পরিবেশন করবেন 'পণ্ডিত মশাই', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'বিন্দুর ছেলে'র পরিবেশক কল্পনা মুভিজ।

যে-ই করুন

মুস্কিল-আসান হোলেই হোলো। বাঙলা ছবি ধোপে টিকছে না কিছুতেই, সে অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়াই হোলো প্রধান কথা। তাই অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন 'মুস্কিল-আসান' করছেন বলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী তস্য তনয় সৌমেন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।

অমর প্রেম

মহেন্দ্র গুপ্তের পরিচালনায় পর্দায় ফুটে ওঠবার অবস্থায় এসে পৌচেছে। মহেন্দ্র বাবু এত দিন মঞ্চ নিয়েই ছিলেন, এবার তাঁকে ছায়াছবির মায়ায় আবদ্ধ হতে দেখা যাচ্ছে। 'অমর প্রেমে' সন্ধ্যারাণী, প্রণতি ঘোষ, ধীরাজ ভট্টাচার্য, কমল মিত্র, পরিচালক স্বয়ং এবং অপরাপর ছোট-বড় রূপশিল্পীকে দেখা যাবে।

—সাহিত্য-পরিচয়—

(প্রাপ্তি-স্বীকার)

সাঙ্খ্যদর্শন (৫ম সংস্করণ)—মহর্ষি কপিল, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য এক টাকা।

পবনবিজয়-স্বরোদয়ঃ (ষষ্ঠ সংস্করণ)—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য এক টাকা।

হঠযোগ-প্রদীপিকা (পঞ্চম সংস্করণ)—শ্রীমৎ স্বাত্মারাম-যোগীন্দ্র। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা-১২। মূল্য এক টাকা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা)। (অষ্টম সংস্করণ)—শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য চারি টাকা।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী—মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

দশ-মহাবিদ্যা—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য বার আনা।

হর্ষচরিত—বাণভট্ট বিরচিত, শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর অনূদিত। প্রাপ্তিস্থান—রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, টালা, কলিকাতা। মূল্য দশ টাকা।

শ্রীচৈতন্য-রসায়ন (আদি খণ্ড)—শ্রীমন্মথনাথ নাগ সঙ্কলিত। মেদিনীপুর হিতৈষী প্রেস, মেদিনীপুর। মূল্য তিন টাকা।

আপনি কি হারাইতেছেন, আপনি জানেন না—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

হাসিকান্নার দিন—শ্রীমতী বাণী রায়। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীঅবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম চার টাকা।

নিত্যপূজা পদ্ধতি—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। এম, সি, আঢ্য এণ্ড কোং লিঃ, ১২, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা বারো আনা।

সেকালের কথা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বুক ষ্টোর, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম বারো আনা।

ব্রহ্মর্ষি রজনীকান্ত—ত্রিদণ্ডিস্বামী, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বনমহারাজ। জ্ঞানপীঠ লিমিটেড, পাটনা। দাম সাড়ে দশ টাকা।

মুক্তিপথের গান—শ্রীঅমরকুমার দত্ত। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম দেড় টাকা।

মডার্ণ কম্পারেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা—ডাঃ জে, এম, মিত্র। মডার্ণ হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ, ২১৩, বহুবাজার ষ্ট্রীট। দাম ছ টাকা।

দেবমতি—স্বামী উত্তমানন্দ। উত্তমাশ্রম, গাঙ্গিনগর, পোঃ ডুমুরদহ, হুগলী। দাম তিন টাকা।

সব শেষের কবিতা—শ্রীকানুরঞ্জন ঘোষ ও অমিত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৪২সি বলদিয়া পাড়া রোড, কলিকাতা-৬। দাম চার আনা।

মেসমেরিজম বা সম্মোহন বিদ্যা—প্রোফেসার জে, চৌধুরী। ৬০।১এ, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম আড়াই টাকা।

বহুদিন পরে—শ্রীরিক্ত। মায়া গ্রন্থাগার, কদমকুঁয়া, পাটনা। দাম পাঁচ সিকা।

তদবধি—শ্রীমানিক ভট্টাচার্য্য। মায়া গ্রন্থাগার, কদমকুঁয়া, পাটনা। দাম এক টাকা।

বিংশ শতাব্দীর শেষ ডিটেকটিভ উপন্যাস—শ্রীপ্রবোধ-চন্দ্র বসু। বেঙ্গল পাব্লিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

আত্মশিক্ষা—শ্রীরাসবিহারী বসু। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

কার পাপে—শ্রীকালিপ্রসাদ ঘোষ, বি-এস-সি। শিশির পাবলিশিং হাউস, ২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম দু টাকা এক আনা।

স্মৃতির ব্যথা বা ছোট দি—ডাঃ পাঁচু নন্দী। ৫০, কালিকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭। দাম আড়াই টাকা।

ছোটদের গণতন্ত্র—গসলিন। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, কলিকাতা-১২। দাম ছ আনা।

পথে প্রান্তরে—বেদুইন। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

এক ফালি বারাণ্ডা—শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী। ইষ্টার্ণ পাব্লিশার্স, ২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দু টাকা।

বিপ্রতীক—শ্রীঅবিনাশ রায় ও আরেকজন প্রকাশক। এ, সি, দাশগুপ্ত কোং, ৩২।৪, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম এক টাকা চার আনা।

একটি মেয়েকে—বায়রণ বোস। সীমান্তিক প্রকাশনী, ৭৮এ, দিলখুসা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৭। দাম আট আনা।

আকাশ-পাতাল

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

ঘন-কালো আকাশে হঠাৎ বুঝি চাঁদ দেখা দেয়।

দেখতে দেখতে মেঘের ফাঁকে লুকিয়ে পড়ে হঠাৎ। বেললণ্ঠনের আলো-আঁধারিতে রাজেশ্বরীকে ঠিক ঐ চাঁদ ব'লেই ভ্রম হয়। মনে হয় চিত্রপটে যেন চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। অল্প গুণ্ঠনে আবৃত, মুকুট পরিহিত রাজেশ্বরীর চূর্ণ অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে দেখা যায় না। তবুও মেঘবিচ্ছেদে মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত চন্দ্ররশ্মির মত অপূর্ব্ব সুন্দর মুখবিম্বের দ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। বিশাল লোচনে কটাক্ষ—অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর অথচ জ্যোতির্ম্ময়। কালো মসলিনের শাড়ীর বেষ্টন থেকে মুক্ত হয় শুভ্র বাহুযুগল, আবার আবৃত হয়ে যায়। মাধবীলতার পেছু পেছু যন্ত্র-চালিতের মত চলে রাজেশ্বরী। বটঠাকুমার সঙ্গে দেখা করতে যায়। দেখা দিতে যায়। তপ্তকাঞ্চনের একটি মূর্ত্তি যেন, লজ্জানত হয়ে এগিয়ে চ'লেছে ধীর পদক্ষেপে। তপ্তকাঞ্চনের মতই রঙ যে রাজেশ্বরীর। মধ্যে মধ্যে ফিরে তাকায় মাধবীলতা। দেখে রাজেশ্বরীর চোখে কেমন যেন মর্ম্মভেদী দৃষ্টি! ঘোরারক্ত ওষ্ঠাধর কি কাঁপছে! বর্ষার ভরা নদীর মত বৌটির রূপরাশি টলটল করছে, উছলে পড়ছে। দেখতে দেখতে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে যায় মাধবীলতা। সুবর্ণমুক্তা ও হীরকাদি শোভিত কারুকার্য্যযুক্ত বেশভূষা রাজেশ্বরীর। কুন্তলে, কবরীতে, কপালে, কর্ণে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, বাহুযুগে, সর্ব্বত্র সুবর্ণমধ্য থেকে হীরকাদি রত্ন ঝলসে উঠছে বেললণ্ঠনের আলোয়। রাজেশ্বরীর মত মোহনমূর্ত্তি পূর্ব্বে কখনও দেখেছে কি মাধবীলতা!

বড়বাড়ীর কোথাও লণ্ঠন জ্বলছে, কোথাও দুর্ভেদ্য তমসা। নেহাৎ পুণ্যাহের উৎসব, অন্য দিন হ'লে দ্বিগুণ অন্ধকারে ঢেকে থাকে ঘর-দোর। বড়বাড়ীর অন্দরে ঢুকলে যে-কোন অপরিচিত জন অবশ্যই বিভ্রান্ত হবে। গোলকধাঁধার মতই জটিল বড়বাড়ী। কোথায় সিঁড়ি, কোথায় ঘর, কোথায় দালান, কোথায় উঠোন আর কোথায় যে ছাদ সহজে ধরা যায় না। তদুপরি এখনও দিনের আলো নেই, রাত্রির অন্ধকার। পুণ্যাহের জন্য আলো জ্বালানো হয়েছে কতগুলো। দালান আর উঠোনে। ঘরে আর পরিখায়। নানা রঙের নানা ঢঙের বেলোয়ারী কাচের লণ্ঠন। কোথাও লাল, কোথাও হলুদ আর কোথাও জাম রঙের আভা ঠিকরোচ্ছে। আজকে দালানের কবুতরের দল হৈ-হল্লা আর চিৎকারে যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ঘুম নেই চোখে, পাখা ঝাপটাচ্ছে থেকে থেকে। পালখ ওড়াচ্ছে হাওয়ায়।

যেতে যেতে একটি ঘরের দ্বারমুখে থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়লো মাধবীলতা। বললে,—ঠাকুমা, কে এয়েছে দেখো। মা বললে, তোমার সঙ্গে দেখা করাতে।

বৃদ্ধার ক্ষীণ কণ্ঠ শ্রুত হয় ঘরের ভেতর থেকে।—কে রে মাধু? কে আবার এলো?

—দেখ্‌তেই পাচ্ছ না তুমি। দেখো চিনতে পারো কি না। বললে মাধবীলতা। রাজেশ্বরীর দিকে গ্রীবা বেঁকিয়ে বললে,—যাও বৌদি, ঘরের ভেতরে যাও তুমি।

বটঠাকুমা ব'সেছিলেন ঘরের ভেতর।

মেদিনীপুরের নক্সা-তোলা একটা মাদুরে উবু হয়ে ব'সে গুড়ুক টানছিলেন। হুঁকোটা ঘরের কোণে ঠেকা দিয়ে রেখে বললেন গলা কাঁপিয়ে,—কে বল্‌তো মাধু? চিনতে পারছি না তো!

রাজেশ্বরী প্রণাম করলে ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে। চিবুক স্পর্শ করলেন বটঠাকুমা। বললেন,—আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবি হও। কে মা তুমি? কি নাম? কাদের বাড়ীর বৌ?

রাজেশ্বরী হতবাক হয়ে থাকে। নতমুখী হয়ে বসে বটঠাকুমার সমুখে। মাধবীলতা হাসতে হাসতে বলে,—ব'লবো না আমি। আমি ব'লবো না, কিছুতেই ব'লবো না।

বটঠাকুমার বয়োবৃদ্ধির জন্য দৃষ্টিশক্তি তেমন আর নেই। তবুও ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে দেখেন। কিয়ৎক্ষণ দেখে বলেন,—মুখটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কে বল্‌তো মাধু? আরও কয়েক মুহূর্ত্ত দেখে বললেন,—চিনেছি। তুমি কুমুদিনীর ব্যাটার বৌ না?

মাধবীলতা খিল খিল হাসে। বলে,—ঠিক ধ'রেছো ঠাকুমা। কে বলে যে তোমার চোখ গেছে! কি চমৎকার দেখতে বল'তো!

—তুই-ই বল্ মাধু! বললেন বটঠাকুমা। ফুলকুমারী। বললেন,—তুই-ই বল্ মাধু। এক দিন দেখেছি বৈ তো নয়? বৌ ক'রেছে বটে কুমু। আহা, যেন লক্ষ্মীপিতিমে!

হাসি থামিয়ে বললে মাধবীলতা,—গয়নাগুলো দেখো ভাল ক'রে। আমার কিন্তু ঐ মটুক একটা করিয়ে দিতে হবে ঠাকুমা! বাবাকে বলতে হবে তোমাকে।

মটুক কি মুকুটের অপভ্রংশ! হয়তো তাই। মাধবীলতা নাবালিকা হলে কি হবে, অলঙ্কারের তৃষা যে নারীর বয়স মানে না। ঈশ্বর না করুন, সিঁথির সিঁদুর না মুছলে কোন নারী দেহ থেকে শুধু নয়, মন থেকেও ত্যাগ করতে পারে না অলঙ্কারপ্রীতি।

মাদুরের একধারে টিম টিম জ্বলছিল একটা পিলীভি

লণ্ঠন। পলতোলা কাচের ষট্‌কোণাকৃতি লণ্ঠন। হয়তো তেল ফুরিয়েছিল। জ্বলন্ত শিখায় তেজ ছিল না তেমন। আর আর কি যেন ছিল ঘরে। থান আর গরদের ধুতি ঝুলছিল আলনায়। দেওয়ালের হুকে ছিল ১০৮ রুদ্রাক্ষর মালা। একটা ষ্টীলের তোরঙ্গ ছিল, তাতে ছিল, পুরানো শাড়ী ও গামছা। বৃন্দাবনী চাদর আর কিছু নগদ টাকা ছিল একটা পুঁটলীতে। আরেকটা পুঁটলীতে ছিল কামাখ্যার রক্তিমাকার ন্যাকড়া, পুরীর মন্দিরের চাল, বৃন্দাবনের ধূলো, বৈদ্যনাথধামের ফুল আর বিল্বপত্র, কাশীর বিশ্বনাথের অঙ্গের শুষ্ক চন্দনচূর্ণ আর কালীঘাটের কালীর পায়ে ছোঁয়ানো শুষ্ক অপরাজিতা আর জবা। মামলার জন্য আদালতে গেলে কিংবা কেউ কোন শুভ কাজে গেলে ফুলকুমারী ঐ সকল মহামূল্য দ্রব্য সঙ্গে দিয়ে দেন। আর আছে কালীঘাটের কালীর হাতে আঁকা পট; রামেশ্বরের মূর্ত্তির পেতলে-খোদা প্রতিলিপি, বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরের ছবি, কাশীর বিশ্বনাথের ছবি, দক্ষিণেশ্বরের দক্ষিণ কালীর ছবি। আর ছিল গঙ্গাজলের কলসী। একটা সাজি। ফুলকুমারী ধার্ম্মিকপ্রকৃতির বর্ষীয়সী নারী, ফুরসৎ পেলেই জপাহ্নিক করেন। উপবাস করেন। শুভদিনে উপবাস করেন। আর থেকে থেকে এখনও কেন জীবিত আছেন সেজন্য ভাগ্যকে দোষেন। দেবদেবীদের গালমন্দ করেন। ফুলকুমারীও স্বামি-বিয়োগ হওয়ায় সহমৃতা হ'তে চেয়েছিলেন। আত্মীয় ও অনাত্মীয়দের কত কাকুতি মিনতি ক'রেছিলেন, কিন্তু ঐ পুত্রকন্যা থাকার দরুণ ফুলকুমারীর ইচ্ছায় বাধা প'ড়েছিল। অশাস্ত্রীয় কোন কিছু তো করা উচিত নয়।

মাধবীলতা মুকুট চাইছে শুনে ফুলকুমারী বললেন,—পাবি লা পাবি। ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? তোর ভাতার তোকে দেবে, ভাবছিস্ কেন?

—ধ্যেৎ, কি অসভ্য তুমি ঠাকুমা? কথাগুলি বলেই তৎক্ষণাৎ ছুটে পালিয়ে যায় মাধবীলতা। ডানা-মেলা পরীর মত উড়ে পালিয়ে যায় যেন।

ফুলকুমারী ফিস ফিস বললেন,—শাউড়ীকে ফেরাতে পারলে না ভাই? কাশীতে গিয়ে ব'সে আছে? ছেলে না হয় অন্যায় ক'রেছে, তাই বলে ঘর-দোর ছেড়ে সন্ন্যাসী হ'তে হবে?

'ছেলে অন্যায় করেছে' কথা ক'টি শুনে রাজেশ্বরীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জ্বলতে থাকে যেন। তীরের মত গায়ে বিঁধেছে কথা, জ্বলতে থাকে দেহ। লজ্জানত মুখে ব'সে থাকে চুপচাপ। পাষাণমূর্ত্তির মত ব'সে থাকে।

ফুলকুমারী বলে যান,—অন্যায় করে না কে? পুরুষ-মানুষের মধ্যে দেখাও তো ভাই ক'টা লোক সাঁচ্চা আছে? আছে, থাকবে না কেন, সাধু ফকিরও আছে। তাই বলে ঘর-দোর ছেড়ে চ'লে যেতে হয়? আমি ভাই কুমুকেই দোষ দিই।

শুধু কথা নয়, অলঙ্কারগুলিও যে বিদ্ধ করছে দেহকে। কাঁটার মতই বিঁধছে থেকে থেকে। খুলে ফেলতে মন চাইছে বহুমূল্য জড়োয়া অলঙ্কারের রাশি। মাথাটা ধ'রে গেছে, কপালের দুই ভীর দপদপ করছে। হাতের কাছে ছোরা কিংবা ভোজালী থাকলে আত্মহত্যা করতো রাজেশ্বরী। কিংবা একটু বিষ থাকলে, খেয়ে সকল জ্বালা জুড়াতো। রাজেশ্বরী ভাবলো, ঠাগমা কি অন্যায় ক'রেছেন! না জেনেশুনে তুলে দিয়েছেন একটা অপোগণ্ডের হাতে। একটা কুলাঙ্গারের সঙ্গে যে দিয়ে দিয়েছেন বাইরের চাকচিক্য আর নামডাক দেখে। হ'লেই বা বাপের একমাত্র ছেলে, থাকলেই বা সম্পত্তি আর নগদ টাকা। কিন্তু মানুষ যদি বদ হয়, যদি হয় দুশ্চরিত্র; মাতাল, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন, অশিক্ষিত? রাজেশ্বরীর অন্তর থেকে ইচ্ছা হয় পিতামহী অর্থাৎ ঠাগমাকে বুকে জড়িয়ে খুব খানিকটা কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে জানায় বুকের ব্যথা। বিনা যৌতুকে রাজেশ্বরীর বিয়ে হয়নি, খোঁজাখুঁজি করলে কি সুপাত্র মিলতো না? শিক্ষিত, মার্জ্জিত, ভদ্র ও সচ্চরিত্র পাত্র কি নেই আর বাঙলা দেশে? রাজেশ্বরী ভাবে, কিছু যখন র'টেছে কিছুটা নিশ্চয়ই সত্যি। কিন্তু মুসলমান বাইজীটি কে?

মুসলমান বাইজী!

হঠাৎ হঠাৎ বুকের মধ্যিখানটা ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে ওঠে রাজেশ্বরীর। যতবার মনে পড়ে ততবার। অতগুলো কথা শুনলে, সেই অত কথার ভিড়ে 'মুসলমান বাইজী' কথা দু'টোই শুধু মধ্যে মধ্যে রাজেশ্বরীর বুকের মধ্যিখানে তুলছে অসহ্য আলোড়ন। রূপ, অলঙ্কার, মিশ-কালো মসলিনের জঙ্‌লা শাড়ী—বৃথাই অঙ্গে চাপিয়েছে রাজেশ্বরী। মিথ্যে মিথ্যে সেজেছে আয়না সামনে রেখে। সাজগোজ ক'রে ক'বার দেখেছিল না দেরাজের আয়নায়? ক্ষণেকের জন্যে দেখেছিল সালঙ্কারা প্রতিমূর্ত্তি। হয়তো মুহূর্ত্তের জন্যে অতি-সামান্য গর্ব্বও বোধ ক'রেছিল মনে মনে। ফুলকুমারী ব'লে চলেছেন আর ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকে বৌ হ'লে কি হবে ঐ রাজেশ্বরীই। কি হ'ল রূপের ডালিতে? কি শুনলো কানে? মুসলমান বাইজীটি কে? ভাবলো রাজেশ্বরী।

—আমি ভাই আছি তবুও। পারতেম বৈ কি ঘর-দোর ছেড়ে চ'লে যেতে যে দিকে দু'চোখ যায়। কথার পৃষ্ঠে বললেন ফুলকুমারী। আত্ম-কথার ঝিলিক ফুটলো ফুলকুমারীর মুখভঙ্গীতে। হাঁফ ছেড়ে বললেন,—আমিও ভাই দেখেছি যে! চোখের সমুখে দেখেছি নাতিদের কুকীর্ত্তি। বৌগুলোকে ধ'রে ধ'রে মারে মদ টেনে ফিরে? বল' কি ভাই তুমি! রক্তগঙ্গা ক'রে ছাড়ে। চাবুক মারে।

শেষের কথা ক'টি ফিস ফিস ক'রে বললেন ফুলকুমারী। যেন ভয়ে ভয়ে বললেন।

লণ্ঠনের অল্প আলো। তবুও চোখ তুলে দেখেছিল রাজেশ্বরী। দেখেছিল দেওয়ালে কালীঘাটের পট। সাদা-কালো ছবি।

ফুলকুমারীর পৌত্রদের গুণকীর্তি শুনে মনে সান্ত্বনা পায় না রাজেশ্বরী। ভুলতে পারে না যেন ক্ষণেকের জন্যেও সেই মুসলমান বাইজীকে। হঠাৎ হঠাৎ বুকের মধ্যিখানটা ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে ওঠে। চোখ ফেটে অশ্রুর চাকচিক্য দেখা যায়। লণ্ঠনের অল্প আলোয় দেখতে পান না ফুলকুমারী।

—শুধু গল্প ক'রেই কি চ'লে যাবে? খেতে তো হবে! রাতও কম হ'ল না!

হঠাৎ কথা শুনে চমকে উঠেছিল রাজেশ্বরী। চোখ ফিরিয়ে দেখলো যে নারীটিকে তাঁরই মুখে শুনেছিল না ঐ দু'টো শব্দ।

হ্যাঁ, যাকে দেখেছিল সেই! যজ্ঞি সামলানোর ঝক্কিতে কিছু যেন ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত। হয়তো বা পরিশ্রম-হেতু কিছুটা রাগত।

রাজেশ্বরী তবুও মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে,—আমি উঠি?

ফুলকুমারী বেশ যেন অপ্রস্তুত হয়ে প'ড়ে বললেন,—হ্যাঁ ভাই ওঠ'। যাও, খাওগে। কুমু ব্যাটার বৌ ক'রেছে দেখো নাতবৌ। একেবারে যাকে বলে তোমার লক্ষ্মীপিতিমে?

মুখরা বৌটি বললেন তৎক্ষণাৎ,—তা হ'লে বটঠাকুমা আমার ভেয়ের বৌকে দেখলে তো ভিরমি খাবেন! যাকে বলে পটে-আঁকা বিবি। মেমেদের রঙও হার মেনে যায়। মোমের মত গা। কি চোখ কান পর্য্যন্ত!

স্মিত হেসে বললেন ফুলকুমারী,—তবে ভাই নাতবৌ দেখিও না যেন কখনও তোমার ভেয়ের বৌকে! ভিরমি খাই যদি!

মুখরা বৌটির মুখে কথা ফুটে উঠলো। বললেন,—অযথা দাঁড়িয়ে থাকবার মত সময় আমার নেই। যাবে তো চলো। প্রণাম করা তো আর পালাচ্ছে না! অনেক কাজ আমার। এখনও বাড়ীর ঝি চাকরদের দাঁড়িয়ে খাওয়াতে হবে আমাকে। ভাঁড়ারে চাবি দিতে হবে।

—যাও ভাই যাও। খাওগে যাও ভাই। বললেন ফুলকুমারী রাজেশ্বরীর চিবুক ধ'রে। ফুলকুমারীর পাদস্পর্শ ক'রে প্রণাম করতেই বৌটি বলে গেলেন কথাগুলি। যেন তপ্ত কড়াইয়ে খৈ ফুটতে লাগলো।

ঝমাঝম বাজলো পাইজোর। বৌটির সঙ্গে সঙ্গে চ'ললো রাজেশ্বরী। কত ঘরের ভেতর দিয়ে ক'টা দালান পেরিয়ে চ'লেছে তো চ'লেছেই। নতদৃষ্টি তুলে কখনও বা দেখছিল রাজেশ্বরী। কোন ঘরে ঘুমিয়ে আছে হয়তো কারও শিশু। কোন ঘরে জটলা পাকিয়েছে হয়তো সমবয়সী মেয়ের দল। কোন ঘরে দেখা যাচ্ছে দুগ্ধফেননিভ শয্যা। কোন দালানে প'ড়ে আছে কয়েকটা এঁটো পাতা আর শূন্য ভাঁড়। কোন দালানে শুয়ে ঘুমিয়ে প'ড়েছে হয়তো কোন দাসী কিংবা কোন দূর-সম্পর্কীয়া দরিদ্র আত্মীয়া।

রাজেশ্বরী ভাবছিল যে আর খাওয়া-দাওয়ার নেই প্রয়োজন। চ'লে যেতে পারলেই বাঁচে। ক্ষুধাতৃষ্ণা কি চিরদিনের মত মিটে গেছে রাজেশ্বরীর! বিনোদা সঙ্গে এলো দেহরক্ষীর মত। ডুব মারলো কোথায়! বিনোদাও যদি কাছে থাকতো! কিংবা থাকতো যদি সঙ্গে ঐ মাধবীলতা নামে মেয়েটি? ভয় ভয় করছিল রাজেশ্বরী। অস্বস্তি বোধ করছিল।

—সিঁড়িতে বড্ড পেছল। দেখো, আছাড় খেও না যেন নামতে নামতে! একটা সিঁড়ির মুখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললেন বৌটি।

শুধু কি পিচ্ছিল! কত যে অন্ধকার কে বলবে। বৌটির না হয় অভ্যাস আছে। ধীরে ধীরে দেওয়াল ধ'রে নামতে থাকে রাজেশ্বরী। ভয়ে সিঁটিয়ে। ক'বার পিছলে প'ড়ে যেতে যেতে বেঁচে যায়। মনে মনে গাল পাড়ে বিনোদাকে। গেল কোথায় আহাম্মুখী?

সিঁড়ি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেললণ্ঠনের আলোকরেখা চোখে পড়ে। স্বস্তির শ্বাস ফেলে রাজেশ্বরী।

বৌটি বললেন,—চল' বৌ, ব'সগে যাও খেতে ঐ ঘরে।

রাজেশ্বরী দেখলো সমুখেই একটি ঘর। ঘরের দু'কোণে জ্বলছে দু'টো সেঁজুতি। পাশাপাশি পঙ্‌ক্তি ভোজনে ব'সেছে কারা। কয়েকজন সধবা আর কয়েকটি কুমারী। খাচ্ছে না, শুধু ব'সেছে মাত্র। হয়তো অপেক্ষা করছে আরও যদি কেউ কেউ আসে। গোটা কয়েক পাতা খালি দেখা যাচ্ছে।

যজ্ঞির কোলাহলে কানে আঙুল দিলেই বুঝি ভাল হয়।

ক্ষুধাতৃষ্ণা নেই, পাতে ব'সে কি হবে, ভাবে রাজেশ্বরী। পালাতে পারলে যেন বাঁচে। কিন্তু বিনোদা দাসী গেল কোথায়? দাসীদের দলে ভিড়ে গিয়ে হয়তো আড্ডা মারছে কোথায় কোন্ ঘুপচিতে ব'সে!

পঙ্‌ক্তিতে যারা বসেছিল তাদের কেউ কেউ ঘোরতর বিস্ময়ে চেয়ে আছে। রাজেশ্বরীকেই দেখেছে, বেশ বুঝতে পারছে রাজেশ্বরী। জোড়া জোড়া চোখ, কেমন আদেখলার মত চেয়ে আছে। দেখছে রাজেশ্বরীর রূপ আর অলঙ্কার! বেশভূষা?

রাজেশ্বরীও ব'সলো পঙ্‌ক্তিতে। ক্ষুধাতৃষ্ণা নেই, তবুও ব'সলো। বারেকের জন্যে মনে উদিত হয়, মুসলমান বাইজীর কথা তো মিথ্যাও হ'তে পারে। দাদেইজীদের রটনাও তো হ'তে পারে। মন ভাঙ্গাতে বলেছে স্বামীর নামে। কিন্তু স্বামী যে বলেছিল, আসবে? আসলো কি না কে জানে! হতভাগী বিনোদাই বা গেল কোথায়? আহার্য্যের পরিবর্ত্তে সামান্য বিষ পাওয়া যায় না? খেয়ে জ্বালা জুড়োয় রাজেশ্বরী। স্বামী থাকুক মুসলমান বাইজীর সঙ্গে। বিশ্রী লাগে রাজেশ্বরীর আশ-পাশের জোড়া জোড়া চোখ। সেঁজুতির ক্ষীণ আলোয় দেখায় যেন জোড়া জোড়া আগুনের ভাঁটার মতই। রূপ আর অলঙ্কার কখনও দেখেনি যেন। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখছে। মধ্যে মধ্যে চোখ তুলে তাকায় রাজেশ্বরী, আয়ত আঁখিদ্বয়ে দেখে নেয় হয়তো সকলকে। কিন্তু স্বামী আসলো না তো?

এই উপ-মহাদেশে প্রতি চারজনের মধ্যে একজন ম্যালেরিয়ায় ভোগে

একটু ভেবে দেখুন — এর মানে এই যে প্রতি বছর আমাদের দেশে প্রায় দশ কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় ভোগে।

ভুলে যাবেন না যে ম্যালেরিয়া একটি শক্তিনাশক মারাত্মক ব্যাধি। ম্যালেরিয়ায় স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে, শক্তি ক্ষয় হয় এবং উৎসাহ-উদ্যম ও বুদ্ধি-বিবেচনা ম্লান হয়ে যায়।

এই জন্যই বলি — আজ, এখনি — ম্যালেরিয়ার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য 'প্যালুড্রিন' খেতে আরম্ভ করুন। ওষুধের মত ওষুধ এই 'প্যালুড্রিন' — নিরাপদ, নির্ঝঞ্ঝাট এবং সস্তা। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করতে হলে সপ্তাহে মাত্র এক আনা খরচ ক'রে একটি মাত্র 'প্যালুড্রিন' খেলেই যথেষ্ট। সেবন বিধি নীচে দেওয়া হল।

অ্যানোফেলিস মশার কামড়ে ম্যালেরিয়ার জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে। বসা দেখেই এই মশাকে চিনতে পারবেন — হুলের ডগায় ভর ক'রে টেরছা হয়ে গায়ে বসে। এর হাত থেকে বাঁচতে হলে বাড়ীর

আশেপাশে যাতে খানাডোবা না থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখুন কারণ এই সব যায়গাতেই মশা জন্মায়। ঘুমুবার সময়ে মশারি খাটিয়ে শুতে ভুলবেন না। আর মশা মারবার জন্য সারা বাড়ীতে কীট-নাশক 'গ্যামেক্সেন' ছড়িয়ে দিন।

ম্যালেরিয়ার লক্ষণ কি?

প্রথমে শীত করে ও কাঁপুনি আসে, তারপরে জ্বর আসে ও শেষে ঘাম দেখা দেয় — সারা গায়ে ব্যথা হয়। এ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। তিনিই আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন ম্যালেরিয়া হলে দু'চার দিনের মধ্যেই 'প্যালুড্রিন' কি ক'রে তা দূর করে এবং শুধু তাই নয়, তার ভবিষ্যৎ আক্রমণের হাত থেকেও রক্ষা করে।

আসল 'প্যালুড্রিন' স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে স্বচ্ছ কাগজের বন্ধ মোড়কে পাওয়া যায় — একটি বড়ির দাম মাত্র এক আনা।

'প্যালুড্রিন'

ম্যালেরিয়ার যম

সেবন বিধি

জ্বর অবস্থায়: পূর্ণ বয়স্কদের ও ১২ বছরের ওপর ছেলেমেয়েদের ১টি বড়ি, ৬ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত আধ বড়ি, ৬ বছরের নীচে সিকি বড়ি —যে পর্যন্ত না জ্বর বন্ধ হয় প্রত্যহ এই মাত্রায় খেতে হবে।

জ্বর প্রতিরোধের জন্য: উল্লিখিত মাত্রায় প্রতি সপ্তাহে একবার একটি নির্দিষ্ট দিনে খেতে হবে।

মনে রাখবেন, 'প্যালুড্রিন' খেতে হয় আহারের পর এবং 'প্যালুড্রিন' খাওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে জল (বা দুধ) খেতে হয়।

ICI

ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

ICP 73

সদর আর অন্দর পাশাপাশি হ'লে জানতে কিংবা দেখতে পাওয়া যেতো।

কিন্তু ব্যবধান যে অনেকটা। যেন এ পাড়া আর ও পাড়া। প্রতি বছরে আসে, যেজন্য কৃষ্ণকিশোর আসতে বাধ্য হয়েছিল। গরদের চুড়িদার বেনিয়ান, রূপালী ধাক্কা-দেওয়া জরিপাড় কোঁচানো দেশী ধুতি আর মাথায় মুর্শিদাবাদী রেশমের কল্কা-তোলা উষ্ণীষ। গলায় মুক্তোর মালা। আঙুলে হীরকাঙ্গুরীয়। লাল ভেলভেটের জরিদার নাগরা পায়ে। কৃষ্ণকিশোরকে দেখে বড়বাড়ীর কর্ত্তাদের কেউ কেউ মৌখিক অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। বাড়ীতে উৎসব, এই কারণে মদ্যপায়ীদের মধ্যে তখনও কেউ বোতলের মুখ দেখেননি। লোকজন চ'লে গেলে ধীরে সুস্থে ভিক্টোর আর পেগ বেরুবে। আর অন্যান্য পুরুষদের মধ্যে যাঁরা সৎ, কীর্ত্তিমান, উদ্যমশীল এবং গবেষক তাঁরা এই কাজের বাড়ীতেও যে যাঁর ডেরা ছাড়েননি। কেউ সংহিতা পড়ছেন, কেউ মূল সংস্কৃতে রামায়ণের ব্যাখ্যা পড়ছেন, আবার কেউ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রিকা এশিয়াটিক রিশার্চে'শের কোন খণ্ড খুলে পড়ছেন এবং নোট-বইয়ে নোট লিখছেন। খেয়ালই নেই, বাড়ীতে যজ্ঞি চ'লেছে। নিমন্ত্রিত অতিথিদের ভিড়ে পরিপূর্ণ হয়ে আছে বৈঠকখানা আর হল-ঘরগুলো। সদরের ঘরে ঘরে ঢালোয়া ফরাস বিছানো হয়েছে। তাকিয়া প'ড়েছে কতগুলো। আলবোলা দেওয়া হয়েছে। আর রূপোর ট্রেতে দেওয়া হয়েছে পান। ঘরে ঘরে বেলোয়ারী কাচের ঝাড়-লণ্ঠনে আলো জ্বালানো হয়েছে। হৈ-হল্লায় কারও কথাই কারও শ্রুতিপথে পৌঁছুচ্ছে না।

হল-ঘরে অতিথিদের মধ্যেই ব'সেছিল কৃষ্ণকিশোর।

কর্ত্তাদের একজন গোঁফে পাক দিতে দিতে একেবারে কানের কাছে মুখ এনে বললেন,—মা হঠাৎ কাশীবাসী হ'ল কেন?

কৃষ্ণকিশোর থতমত খেয়ে বললে,—কি বলছেন?

গোঁফে পাক দেওয়ায় থামা দিয়ে বক্তা বললেন,—কুমু'কাকী হঠাৎ কাশীবাসী হ'লেন কেন?

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বক্তার মুখে কিঞ্চিৎ হাসির ঝিলিক মারলো।

কৃষ্ণকিশোর কয়েক মুহূর্ত্ত ভেবে বললে,—পুণ্যি অর্জ্জন করতে গেছেন। বুঝতেই তো পারছেন, বাকী দিনগুলো কাশীতেই কাটাতে চান আর কি।

গুম্ফধারী কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য মুখে ফুটিয়ে বললেন,—বুঝতে আর পাচ্ছিনে? খুব বুঝতে পাচ্ছি। ধম্মকম্ম করবার সাধ হয়েছে আর কি!

কৃষ্ণকিশোর বললে,—আজ্ঞে হ্যাঁ, যা বলেছেন।

কিঞ্চিৎ হেসে বললেন বক্তা, গোঁফে পাক দিতে দিতেই বললেন,—আমরা শুনেছিলাম যে—শুনেছিলাম যে ছেলের জন্যেই কুমু'কাকী নাকি দুঃখে কাশী চ'লে গেছে। সত্যি কথা?

ক্ষণেকের জন্ত হতভম্ব হয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর। বলে,—শোনা কথায় কান দেন কেন? কত লোক তো কত কথা বলে!

বক্তার কানে ছিল আতরের তুলো। কান থেকে তুলোটা নিয়ে শুঁকতে শুঁকতে বললেন,—আমরা শুনেছি খুব বিশ্বেসী লোকের মুখ থেকে। শুনে তো থ' হয়ে গিয়েছিলাম! কত কথাই শুনেছিলাম!

—শোনা কথায় কান দেন কেন? বলতে বলতে উঠে প'ড়লো কৃষ্ণকিশোর। বললে,—আমি যাচ্ছি এখন।

—খেয়ে যেতে হবে যে! সে কি কথা? বক্তার কথায় ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়। কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়েন। হয়তো ভাবেন কথাগুলো উত্থাপিত না করলেই চ'লতো। কৃষ্ণকিশোর ক্ষুণ্নকণ্ঠে বলে,—না, খাওয়া চ'লবে না। ক'দিন ক্ষুধামান্দ্যে ভুগছি। যা খাই অম্বল হয়। আমি এখন যাচ্ছি। বলে দেবেন অন্যান্য দাদাদের।

বক্তাকে কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই হল-ঘর থেকে বেরিয়ে প'ড়লো কৃষ্ণকিশোর। হন হন ক'রে চ'ললো। পথে যেতেই কিছু দূরে দেখলো আবদুলের জুড়ী দাঁড়িয়ে আছে। জুড়ীর কাছাকাছি গিয়ে বললো,—চল' আবদুল, পৌঁছে দাও আমাকে।

আবদুল বললে,—বৌদি যাবে যে!

কৃষ্ণকিশোরের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে আছে। বললে,—ফের আসবে তুমি আমাকে পৌঁছে।

—ঠিক বাত আছে। চলিয়ে। বললে আবদুল।—উঠিয়ে।

যিনি এত কথা বললেন তাঁরই নাম পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ। বড়-বাড়ীর ভ্রাতাদের মধ্যে অগ্রজতম। ইচ্ছা ক'রেই হয়তো শুনিয়েছিলেন বা শুধিয়েছিলেন কৃষ্ণকিশোরকে। ঘোরতম বিদ্বেষী হ'লেও নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে কথাগুলি বলায় এবং কৃষ্ণকিশোর না খেয়ে চ'লে যাওয়ায় হয়তো মনে মনে তাঁর মত জঘন্য চরিত্রের লোকও কিছুটা অনুতপ্ত হন। কৃষ্ণকিশোর চ'লে গেলে ক্ষুব্ধচিত্তে। সদরের দালানে পায়চারী ক'রতে থাকেন। কিছুকাল যাবৎ মদ্যপানে বিরত থাকলেও ভৃত্যকে ডেকে বলেন কানে কানে,—কাছারী থেকে টাকা নিয়ে যা। এক বোতল হ্যাট কিনে নে আয়। ছুটে যাবি আর দৌড়ে ফিরবি। বুঝলি?

ভৃত্য ভয়ে ভয়ে বলে,—হ্যাঁ হুজুর।

পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ বললেন,—কেউ যদি জানতে পায়, তোকে গোটা খেয়ে ফেলবো! বুঝলি?

ভৃত্য ভয়ে ভয়ে বলে,—হ্যাঁ হুজুর।

পুণ্যাহের উৎসবে দিল খুশ থাকার দরুণ না কতকগুলো অপ্রিয় কথা বলার জন্য অনুতপ্ত হয়ে কে জানে, পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণর সত্যিই জোর নেশা চাগে হঠাৎ। অথচ অতিরিক্ত মদ্যপানে পেটে ব্যামো হওয়ায় মদ্য স্পর্শ ক'রতে পর্য্যন্ত তাঁকে নিষেধ ক'রেছে চিকিৎসক-বৈদ্য। পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ পায়চারী ক'রেন ভৃত্যের প্রতীক্ষায়।

রাত্রি গড়াতে থাকে ধীর মন্থর গতিতে। জনাগমও ক'মতে থাকে। যে যার খেয়ে চ'লে যায়। হৈ-হল্লা আর কোলাহলেও ভাঁটা প'ড়তে থাকে।

শুধু ঝাড় আর দেওলণ্ঠনগুলো ছুটি পায় না। স্তিমিত প্রভায় জলতে থাকে ধিকি ধিকি। কোনটায় হয়তো তেল ফুরিয়ে গেছে। নিবু-নিবু হয়েছে কোনটা।

ভিয়েনে উনুন আর চুল্লীগুলো কিছুক্ষণ আগে ছুটি পেয়েছে। এখনও গমগমে আঁচ। চালুইকর বামুনের দল কাজের শেষে নিশ্চিন্ত হয়ে দোক্তা খাচ্ছে জটলা পাকিয়ে।

বাড়ীতে গাড়ী পৌছতে কৃষ্ণকিশোর গাড়ী থেকে নেমে বললে আবদুলকে,—বৌদিকে বলে পাঠাবে চটপট চ'লে আসতে।

—যো হুকুম। বললে আবদুল। বলতে বলতে মোড় ঘুরিয়ে জুড়ী ছোট'লো তড়িৎ গতিতে। রাত্রি ঘন হয়েছে। পথ জনহীন। জুড়ী ছুটলো বিদ্যুতের মত। খটাখট শব্দ উঠলো। উত্তরোত্তর মেজাজটা রুক্ষ হয়ে উঠেছিল। পূর্ণেন্দুকৃষ্ণর মুখে মাতৃদেবী কুমুদিনীর গৃহত্যাগের মুখ্য উদ্দেশ্য শুনে অত্যধিক বিরক্ত হয়েছিল কৃষ্ণকিশোর। জুড়ী ফটকের ভেতরে যায়নি, যেজন্য ফটক থেকে সদরের দালানের সিঁড়ি পর্য্যন্ত হেঁটেই যেতে হয়। একশো আটটা সিঁড়িও টপকাতে হয়। দালানে পৌছে বেতের আরাম-কেদারায় ব'সে পড়ে। চক্ষু মুদিত ক'রে এলিয়ে পড়ে। ভাল লাগে না যেন রাত্রির তামসিকতা। দিনের আলো ফুটতে কত দেরী আর? মেজাজ শুধু রুক্ষ আর বিরক্ত হ'লে ক্ষতি ছিল না, লোকনিন্দার জন্য কেন কে জানে কিঞ্চিৎ ভীত হয়ে ওঠে কৃষ্ণকিশোর। অপবাদের ভয়, দোষের ভাগী হওয়ার ভয়। কৃষ্ণকিশোর ভাবে যে, বিষয়টা তা হ'লে আর অজানা নেই কারও। কুমুদিনীর অভাবে আকর্ষণ জন্মায় না মনে, মার প্রতি বোধ করি ঘোরতম বিতৃষ্ণা আর বিদ্বেষ জেগে ওঠে মনের গহনে।

টম্ কুকুরের গলা-বন্ধনীর ঘন্টির শব্দ পাওয়া যায় দূরে। ঐ তো টম। দালানের অন্য প্রান্তে লাফালাফি করছে। কি করছে কি টম্ লম্ফ দিয়ে দিয়ে! কয়েকটা আরশুলাকে ধরতে উদ্যোগী হয়েছে হয়তো। নখর এবং থাবার সাহায্যে আক্রমণ চালিয়েছে। বাগ মানাতে পারছে না। আরশুলার দল উড়ে পালাচ্ছে এখান থেকে সেখানে।

—বৌ এলো না, তুই যে ফিরলি?

পাশ থেকে হঠাৎ কথা বললে অনন্তরাম।

চোখ খুলে চাইলে কৃষ্ণকিশোর। ঠেস দিয়ে ব'সেছিল, উঠে ব'সলো। বললে,—গাড়ী পাঠিয়েছি আমি ফিরে। সঙ্গে তো খিনো' আছে, আসছে তারই সঙ্গে। কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে, বললে,—অনন্তদা, বামুনদিকে বলে আর, আমি খাবো।

—নেমন্তন্ন গেছলি, খাবো মানে? শুধোয় অনন্তরাম; কথায় কৌতূহল ফুটিয়ে। বলে,—অপমান টপমা'ন করলে বুঝি কেউ?

ঘনান্ধকার আকাশে চোখ মেলে চুপচাপ ব'সে থাকে কৃষ্ণকিশোর। সকালের দিকে কখন বৃষ্টি হয়েছিল, দিনটাই আজ কেমন থমথমে গেছে। এখনও আকাশটা ঘোলাটে রূপ ধারণ ক'রে আছে। কিছুক্ষণ আগে থেকে মধ্যে মধ্যে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া চ'লেছে। কেমন উত্তরের হাওয়া যেন।

কৃষ্ণকিশোর চেপে গেল বিষয়টা। বললে,—না, দুপুরে অত খাওয়া-দাওয়া হয়েছে। ভাল লাগলো না ওখানে খেতে। হাজিরা দিয়ে চ'লে এলাম।

—ভাল করলে কি? না খেয়ে চ'লে আসাটা ভাল কাজ হয় নাই। বললে অনন্তরাম। বললে শুভাকাঙ্ক্ষীর মতই।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—তোমাকে যা বলছি তুমি শোন' না। বল' গে যাও না বামুনদিকে।

গমনোদ্যত হয়ে বললে অনন্তরাম,—আমার কি। আমি গিয়ে বলছি। বলতে বলেছো, বলছি।

অনন্তরাম চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে প'ড়লো কৃষ্ণকিশোর। চ'ললো অন্দরে। চ'ললো হয়তো খাস-কামরায়, যেখানে শ্বেতশুভ্র শয্যা বিছানো আছে পালঙ্কে। টাকা গুণতে গুণতে উঠে গিয়েছিল সিন্দুকের ঘর থেকে। ঘড়ার অর্দ্ধেক টাকা, মোহর আর গিনিও বোধ হয় গোণা হয়নি। নিমন্ত্রণ রক্ষার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় উঠে প'ড়েছিল। সাজাগোজা ক'রতেও সময় লেগেছিল কিয়ৎক্ষণ। যাওয়ার সময় সিন্দুকের ঘরের চাবিটা দিয়ে গিয়েছিল কাছারীতে। হেড-নায়েবের কাছে।

ঘড়া, টাকা, মোহর আর গিনি যেমনকার তেমনি প'ড়েছিল মাটিতে।

অন্দরের মুখে পৌছতেই থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়লো কৃষ্ণকিশোর। দৃষ্টি-বিভ্রম হয়নি তো? ভুল দেখছে না? কৃষ্ণকিশোর প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বললে,—কে? কে দাঁড়িয়ে আছে?

কৃষ্ণকিশোর অকস্মাৎ অন্দরমধ্যে এইরূপ দৈবী মূর্ত্তির মত কাকে দেখে নিস্পন্দশরীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্দরের মুখে কোন লণ্ঠন নেই। কিছু দূরে দালানের কড়িকাঠে ঝুলছে একটা আলো—একটা বিলাতি লণ্ঠন অসলার কোম্পানীর। যদিও রেড়ির তেলেই জলে। জলছিল ক্ষীণপ্রভ হয়ে। সেই আলোরই আভায় দেখতে পেয়েছিল কৃষ্ণকিশোর। দেখে যেন বাকশক্তি রোধ হয়ে গিয়েছিল, শুদ্ধদৃষ্টিতে চেয়েছিল। দেবী মূর্ত্তিটি কোন রমণীর বলেই বোধ হয়। সত্যিই এক অসামান্যা রূপবতী নারী, বিশাল চক্ষুর স্থিরদৃষ্টি কৃষ্ণকিশোরের প্রতি ন্যস্ত ক'রে পাষাণ-মূর্ত্তির মত দণ্ডায়মানা থাকে। উভয়মধ্যে প্রভেদ এই যে কৃষ্ণকিশোরের দৃষ্টি চমকিত লোকের মত, নারীটির দৃষ্টিতে সেই লক্ষণ কিছুমাত্র নেই, কিন্তু চক্ষুদ্বয়ে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশিত হয়ে আছে।

কৃষ্ণকিশোর নারীটিকে নিরুত্তর দেখে বিস্মিত হয়ে বললে,—কে দাঁড়িয়ে? কথা বলছো না কেন?

বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হ'লে নারীটি মৃদুকণ্ঠে বললেন,—আমি। আমার নাম পূর্ণশশী।

—আপনি! এখানে আপনি এমন দাঁড়িয়ে আছেন কেন? উত্তর শুনে আশ্বস্ত হয়ে বললে কৃষ্ণকিশোর। পূর্ণশশীর কাছাকাছি গিয়ে বললে, চলুন, ভেতরে চলুন। এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

কথা বলতে বলতে লক্ষ্য ক'রলো কৃষ্ণকিশোর। পূর্ণশশী অর্থাৎ শশীবৌদির চোখ দু'টিতে অশ্রু টলমল ক'রছে। মুখাবয়ব ঈষৎ বিষণ্ণ। যতই হোক পূর্ণশশী অপরূপ রূপের অধিকারিণী, কোন কারণে অত্যন্ত দুঃখিতা হ'লেও রূপপ্রভা যাবে কোথায়! হয়তো সুদর্শনার রূপ সুখে কিংবা দুঃখে বিনষ্ট হয় না।

পূর্ণশশী বললেন,—বৌমাটির জন্যে অপেক্ষা করছি। বিশেষ প্রয়োজন আছে। শুনলাম সে গেছে বড়বাড়ীতে। পুণ্যের নিমন্ত্রণ রাখতে। ফিরবে তো শীঘ্র। তাই দাঁড়িয়ে আছি এখানে।

—আপনার চোখে জল কেন? জিজ্ঞেস করলো কৃষ্ণকিশোর।

কয়েক মুহূর্ত্ত অনিমেষ লোচনে তাকিয়ে থেকে বললেন পূর্ণশশী,—পুরোহিত মশাই কোন কথা জানিয়েছেন কি তোমাদের? আমি তো জানিয়েছি সকল কথা।

—জানি না তো আমি! বললে কৃষ্ণকিশোর।—কিছুতো বলেন না তিনি!

স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন পূর্ণশশী। চোখের কোণে জলের জৌলুশ দেখা যায়। বললেন,—আমার কপাল! কথার শেষে অঞ্চলে চোখ দু'টি মুছলেন।

—ভেতরে চলুন আপনি। দাঁড়িয়ে থাকবেন এখানে?

পূর্ণশশী বললেন,—হ্যাঁ, এখানে বেশ আছি। বৌ আসুক। তাকে জানাই। জানিয়ে ঘরে ফিরে যাবো আমি।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—বিষয়টা গুরুতর বলেই মনে হচ্ছে। আমি জানতে পাই না?

পূর্ণশশী তৎক্ষণাৎ বললেন,—হ্যাঁ, পাবে জানতে। বৌ তোমাকে বলবে। তোমাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা করি, বলেই তো যত বিপদ আমার! তোমার মার জন্যে, তোমাদের জন্যে, বিশেষতঃ ঐ কচি বৌটির জন্যে থেকে থেকে বুকটা হু-হু করে ওঠে। থাকতে পারি না। চ'লে আসি, তাতেই যত কাল হয়েছে আমার।

বিস্মিত হয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর।

কোন কিছু অনুমান করতে পারে না। স্তব্ধবিস্ময়ে শুনে যায় শুধু। আর দেখে পূর্ণশশীর রূপমাধুর্য্য। ঐ উগ্র রূপ দেখতে দেখতে রূপানলে দৃষ্টি বুঝি দগ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আলেয়া দেখলে মানুষ কি চক্ষু মুদিত ক'রে থাকতে পারে? দেখে কৃষ্ণকিশোর। অপলক দৃষ্টিতেই দেখে।

কম্পমান কণ্ঠে বললেন পূর্ণশশী,—তুমি যাও, কোথায় যাচ্ছিলে। আমি বৌ না আসা অবধি এখানেই অপেক্ষা ক'রবো।

—একটা ঘোড়া কিংবা কেদারা দিতে বলি? বললে কৃষ্ণকিশোর। আপ্যায়িত ক'রলো হয়তো।

পূর্ণশশী বললেন,—না, কিছু দরকার নেই। তুমি শুনেছো তো উনি বিলাতে যাচ্ছেন?

কৃষ্ণকিশোর বিস্মিত হ'লেও খুশীর হাসি মুখে ফুটিয়ে বললে,—কালীকিঙ্করদাদা বিলাত যাচ্ছেন বুঝি? খুব ভাল কথা। শুনে আমি গর্ব্ব বোধ করছি। কিন্তু কেন যাচ্ছেন?

আঁচলে মুখমণ্ডল মুছতে মুছতে বললেন পূর্ণশশী,—ইংলণ্ডে যাবেন প্রথমে। ইংলণ্ড থেকে আরও কোথায় কোথায় যাবেন। গবেষণা করেন তো উনি, সেই কাজেই ডাক প'ড়েছে বৃটিশ মিউজিয়াম থেকে। পাথেয় খরচ পাচ্ছেন, থাকা খাওয়ার জায়গা পাচ্ছেন, লেকচার দেওয়া, কাগজে আর্টিকেল লেখার জন্যেও প্রচুর টাকা পাচ্ছেন। একটা উপাধিও পাচ্ছেন। উপাধির সঙ্গে পাচ্ছেন সোনার মেডেল আর কিছু নগদ টাকা।

পূর্ণশশীর প্রত্নতাত্ত্বিক স্বামী কালীকিঙ্কর অনেক কাল থেকেই ডাক পেয়েছেন।

কিন্তু সময়াভাবের জন্য কলকাতা ত্যাগ করতে পারেননি। ডাক প'ড়েছে বৃটিশ মিউজিয়াম থেকে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও তলব প'ড়েছে। ওরিয়েণ্টাল আর্কিওলজির বিষয়ে তিন মাসে তিন ছ'য়ে আঠারোটি বক্তৃতা দিতে হবে। ইংলণ্ড থেকে যাত্রা করবেন মেক্সিকোয় তিন মাস অতিবাহিত হ'লে। মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে দেওয়া হবে উপাধি এবং মানপত্র। সোনার মেডেল আর নগদ টাকা। পথে যেতে যেতে আরও কোন কোন শিক্ষাকেন্দ্রে বক্তৃতা দিতে হবে, যার বিনিময়ে উপার্জ্জন করবেন হাজারে হাজারে টাকা।

পূর্ণশশীর তো ভাগ্যোদয় হয়েছে, তবে কেন, তবে কেন তিনি রোরুদ্যমানা! কেন বিমর্ষ, কেন বিষণ্ণ? শশীবৌদির মুখে পুরোহিতের নামোল্লেখ শুনে কৃষ্ণকিশোরের মনোমধ্যে প্রবল ইচ্ছা হয় অবিলম্বে পুরোহিত মশাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, কথা বলে। পূর্ণশশীর বক্তব্যটা এই মুহূর্ত্তে জেনে নেয়। কৃষ্ণকিশোর বললে,—তবে আপনি অপেক্ষা করুন। আমি আসছি কাছারী থেকে।

—হ্যাঁ, আমি আছি এখানে। বললেন পূর্ণশশী।—আমাকে কিন্তু বিপদ থেকে উদ্ধার করতে হবে। দোহাই!

—শুনলাম না কিছু। কি বলবো আমি?

বলতে বলতে সদরের দিকে এগোয় কৃষ্ণকিশোর। কাছারীতে যায় না, যায় নাটমন্দিরের দিকে।

রাত্রি কত হয়েছে কে জানে! ঘোলাটে আকাশে কয়েকটা নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে। ইতস্তত ছড়িয়ে আছে অনেক দূরে দূরে। জলছে দপ্ দপ্। কখনও বা চলন্ত মেঘের তরঙ্গাঘাতে লুকিয়ে পড়ছে। দিনভোর থেকে থেকে থেমে থেমে বৃষ্টি পড়ছে। উত্তরে হাওয়ায় হিম-শীতলতা। শীত শীত করছে। হিম পড়ছে কি? না গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে! [illegible]

নাটমন্দিরেই ছিলেন পুরোহিত মশাই।

চোখে চশমা। পুঁথিপাঠ করছিলেন। হস্তলিখিত পুঁথি হলুদ রঙের তুলট কাগজের। কোন্ শাস্ত্র বিষয়ক পুঁথি? শিবায়ন না মহাতন্ত্র? গীতা না চণ্ডী কে জানে?

চশমা কপালে তুলে দেখলেন পুরোহিত মশাই। কে আসছে? পুঁথি পাশে রেখে বললেন,—কি হুকুম শুনতে পাই?

পুরোহিত মশাইয়ের সম্মুখে ব'সে প'ড়লো কৃষ্ণকিশোর। ইতিউতি দেখে ফিস ফিস বললে,—শশীবৌদি ডাকিয়েছিলেন আপনাকে, কি বক্তব্য তাঁর বলুন তো?

চোখের চশমার সুতো খুলতে খুলতে বললেন মৃদুহাস্যে,—মিথ্যা কথা নয়। সত্যই ডাকিয়েছিলেন আমাকে। ডাকিয়ে অনেক কথা বললেন।

—যথা? শুধোলে কৃষ্ণকিশোর।

কয়েক মুহূর্ত্ত মৃদু মৃদু হাসলেন পুরোহিত মশাই। কি ভাবলেন কি জানি হাসতে হাসতেই বললেন,—কয়কোষ্ঠী দেখালেন। বললেন কতকগুলি কথা। দেখেশুনে বুঝলাম বধূটির মঙ্গল আর শনি ভাল যাচ্ছে না। তথাপি বৃহস্পতির শুভফলের জন্য ক্ষতি হবে না কিছু। অর্থাগম হবে, স্বামীর যথেষ্ট শুভ হবে। মানমর্য্যাদা বর্দ্ধিত হবে। বধূটির স্বামী শীঘ্র য়ুরোপ যাত্রা করছেন। কিন্তু তোমাদের প্রতিবেশী, তোমাদেরই আত্মীয় অর্থাৎ ঐ বড়বাড়ীর স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই বধূটির ক্ষতি ক'রতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। দুষ্ট ব্যক্তিদের উৎকোচ দিয়ে ঐ পরিবারটির পিছনে লাগিয়েছে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ কথার মধ্যপথে পুরোহিত বাক্ রোধ ক'রলেন। হয়তো কোন মন্ত্র জপ ক'রছেন মনে মনে। নয়তো ঐ শশীবৌদির মুখে বিবৃত বক্তব্যটা স্মৃতিপটে মন্থন ক'রছেন।

পুষ্প, চন্দন আর ধূপের মিশ্রিত সুগন্ধ নাটমন্দিরে।

উত্তরের হাওয়ায় কখনও জোরালো হয়, কখনও স্তিমিত হয় ঐ মিশ্রগন্ধ। আতপ তণ্ডুলের গন্ধ পাওয়া যায়। পুরোহিত মশাই কথা বলতে বলতে থামলে কি হবে, উগ্র কৌতূহলে কৃষ্ণকিশোরের শ্বাস রোধ হওয়ার উপক্রম হয়। নেহাৎ প্রণম্য ব্যক্তি পুরোহিত মশাই, অন্য কেউ হ'লে হয়তো কেন নিশ্চয়ই ধমক দিতো।

হঠাৎ কথা ধ'রলেন ব্রাহ্মণ,—বধূটির তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার নিমিত্ত তোমাদের ঐ বড়বাড়ীর আত্মজন বধূটির প্রতি অত্যন্ত বিরূপ। তদুপরি বধূটি সত্যই রূপবতী। কথা বলতে বলতে ব্রাহ্মণের কপালের শিরাগুলি ফুলে ওঠে। চোখে-মুখে দৃঢ়তা দেখা দেয়। বলেন,—তুমি আমার পুত্রতুল্য, তোমাকে বলতেও আমি লজ্জিত হাচ্ছি। ওঁরা ঐ পরিবারটির পিছনে দুষ্টব্যক্তিদের লাগিয়ে ক্ষান্ত নেই। বড়বাড়ীর বাবুদের কারও কারও ইচ্ছা বল-প্রয়োগে বধূটিকে হরণ ক'রে—

কথাটি শেষ ক'রলেন না পুরোহিত মশাই। হয়তো কথা বলতে লজ্জানুভব ক'রছেন।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—আশ্চর্য্য মানুষ!

ব্রাহ্মণ মৃদুহাস্যে বললেন,—এখনও কত আশ্চর্য্য মানুষ দেখবে এই দুনিয়ার চিড়িয়াখানায়! তুমি কি জ্ঞাত আছো যে বধূটির স্বামী ম্লেচ্ছদেশে যাত্রা করছেন?

—এইমাত্র শুনেছি শশীবৌদির কাছে। বললে কৃষ্ণকিশোর।

—হ্যাঁ। বধূটির স্বামী অশেষগুণসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি। গবেষণায় দিবারাত্র মগ্ন থাকেন। দৃক্‌পাত নেই পার্থিব বিষয়ে। আত্মসমাহিত। বধূটি বলছেন যে, ম্লেচ্ছদেশে যাওয়ার পূর্ব্বে প্রায়শ্চিত্ত করাতে ইচ্ছুক। বলছেন, আমাকেই ক'রতে হবে। কি কি করণীয় জানাতে বলেছেন। যাত্রার সময় সমুপস্থিত। শীঘ্রই যাচ্ছেন।

কালীকিঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা যেন নত হয়ে যায় কৃষ্ণকিশোরের। বলে,—শশীবৌদিকে এই অবস্থায় একা রেখে যাবেন?

ব্রাহ্মণ বললেন কটির কষি আঁটতে আঁটতে,—ঐটি তো সমস্যা! স্বামীর অনুপস্থিতিতে কিংকর্ত্তব্য? সহায়সম্বলহীন হয়ে কি থাকতে পারবে স্বগৃহে?

পট্টবস্ত্র। বৃদ্ধের কটিবাস বেসামাল হয়ে পড়ে যখন তখন। কথার শেষে পুঁথি তুলে নেন হাতে। জানুতে পুঁথি রেখে পার্শ্বস্থিত চশমা চোখে লাগিয়ে মাথার পিছনে সুতো জড়াতে উদ্যোগী হন।

কৃষ্ণকিশোর অনন্যোপায় হয়ে বললে,—পদধূলি দিন। আমি বিদায় গ্রহণ করছি। শশীবৌদি অপেক্ষা করছেন অন্দরের মুখে। আপনার বৌমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে গৃহে ফিরবেন।

—যাও, তুমি যাও। অবশ্য অবশ্যই যাবে। কথা শেষ ক'রে পুঁথিপাঠে রত হ'লেন। বললেন,—ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।

ইতোমধ্যে ফটকের কাছাকাছি জুড়ীর ঘণ্টা বাজলো ঢঙ ঢঙ।

উঠে প'ড়লো কৃষ্ণকিশোর। চ'ললো অন্দরের দিকে। ফটক থেকে জুড়ী সোজা চ'ললো অন্দরের দরজায়। রাজেশ্বরী জুড়ী থেকে অবতীর্ণ হ'তেই এক নিমেষে লক্ষ্য করলো কৃষ্ণকিশোর, বৌ যেন অতি বেশী গম্ভীর। কেমন বিমর্ষ। সমগ্র মুখে দুঃখানুভূতির বিকাশ। কৃষ্ণকিশোরের বুকটা দুরু দুরু ক'রে উঠলো।

রাজেশ্বরী অন্দরে পা দিতেই পূর্ণশশী দ্রুতপদে প্রায় ছুটতে ছুটতে রাজেশ্বরীর কাছাকাছি এগিয়ে বৌকে সাপটে ধরলেন। তাঁর মুখে কোন কথা নেই। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন কিয়ৎক্ষণ। বললেন,—বৌ, বলে পাঠাও গাড়ী যেন আস্তাবলে তুলে না দেয়। আমাকে পৌঁছে দেবে। আমি বাড়ী ফিরবো। রাত্রি গভীর, হেঁটে যাওয়া আমার পক্ষে বিপজ্জনক ভাই!

—কাঁদছেন কেন? বললে রাজেশ্বরী।

পূর্ণশশী হাঁফ ছেড়ে বললেন,—ভেতরে চল', কথা আছে তোমার সঙ্গে।

কৃষ্ণকিশোর শুধু দাঁড়িয়ে থাকে সদরের প্রাঙ্গণে। আর আকাশে নক্ষত্র, জ্বলছে দপ, দপ।　　[ক্রমশঃ।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

বিশ্ব-রাজনীতি ও শান্তি—

পিকিংএ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলীয় শান্তি সম্মেলনের সাধারণ উদ্বোধন হয় ২রা অক্টোবর (১৯৫২) এবং উহার পরের দিন ৩রা অক্টোবর স্থানীয় সময় বেলা ৮ ঘটিকার সময় উত্তর-পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার উপকূল ভাগ হইতে ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী মণ্টিবেলো দ্বীপপুঞ্জে সর্ব্বপ্রথম বৃটিশ পরমাণু অস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটান হইয়াছে। এই দুইটি ঘটনার পারম্পর্য্য হয়ত সম্পূর্ণ আকস্মিক ব্যাপার, কিন্তু এই আকস্মিকতাকে একেবারেই তাৎপর্য্যহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জনসাধারণ যখন শান্তির জন্য উদ্‌গ্রীব, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বৃটেন সেই সময় এশিয়াবাসীর দ্বারেই তাহার মারণাস্ত্র নির্ম্মাণ সাধনায় সিদ্ধির পরিচয় প্রবল বিস্ফোরণের মধ্যে প্রদান করিয়াছে। ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য যে রাশিয়া, নয়াচীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী জনতার প্রতি হুমকী প্রদর্শন তাহা মনে করিলে হয়ত ভুল হইবে না। বৃটিশ পরমাণু অস্ত্রের এই বিস্ফোরণ পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সংহতিতেও বিস্ফোরণ ঘটিবার সম্ভাবনার প্রাথমিক পূর্ব্বাভাস কি না তাহাও ভাবিবার কথা বটে। এই বিস্ফোরণ ঘটাইবার পূর্ব্ব দিন ২রা অক্টোবর তারিখে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র 'বলশেভিক' পত্রিকায় মঃ ষ্ট্যালিনের পঞ্চাশ পৃষ্ঠাব্যাপী এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই বিরাট প্রবন্ধের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ পি-টি-আই রয়টার আমাদিগকে পরিবেশন করিয়াছেন। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে মঃ ষ্ট্যালিনের বক্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়। হয়ত সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির ঊনবিংশতিতম কংগ্রেসে পার্টির নীতি কিরূপ ধারণা করিবে তাহারই ইঙ্গিত এই প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই প্রবন্ধের গুরুত্ব তাহাতে একটুও হ্রাস পায় নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই প্রবন্ধকে ষ্ট্যালিনের মার্কিণ বিদ্বেষের অভিযান বলিয়া অভিহিত করিতে পারে, কিন্তু বৃটেনের পরমাণু অস্ত্র আবিষ্কারও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে বড় কম ভাবিত করিয়া তুলে নাই।

ষ্ট্যালিনের প্রবন্ধ

৫ই অক্টোবর (১৯৫২) সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির ঊনবিংশ অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ষ্ট্যালিনের উল্লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে উহার তিন দিন পূর্ব্বে। এই প্রবন্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রী অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ধনতন্ত্রবাদী দেশগুলিতে সঙ্কটের ইঙ্গিতই তিনি শুধু দেন নাই, পশ্চিমী দেশগুলি আক্রমণ করিবার কোন অভিপ্রায়ই যে সোভিয়েট রাশিয়ার নাই, তাহাও তিনি সুস্পষ্ট ভাবে জানাইয়াছেন। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ তাঁহার এই উক্তিকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্তু আক্রমণের আয়োজন কাহারা করিতেছেন, পৃথিবীর শান্তিকামী জনসাধারণের কাছে তাহা অজানা নাই। ২রা অক্টোবর পিকিংএ শান্তি-সম্মেলন এবং ৫ই অক্টোবর মস্কোতে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির কংগ্রেস আরম্ভ হইয়াছে। ৬ই অক্টোবর ওয়াশিংটনে আরম্ভ হইয়াছে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বৃটিশ যুক্তরাজ্য এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই পঞ্চশক্তির এক সম্মেলন দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সামরিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনার জন্য। অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় সম্ভাবিত কম্যুনিষ্ট-আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে এই সম্মেলনে আলোচনা করা হইবে। এই আলোচনায় সাধারণ ভাবে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া এবং বিশেষ ভাবে ইন্দোচীন এবং সম্ভবতঃ ব্রহ্মদেশও প্রধান স্থান গ্রহণ করিবে। সোভিয়েট রাশিয়া সমগ্র পৃথিবী জয় করিতে উদ্যত হইয়াছে, এই ধুয়া তুলিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া জাপানের সহিত শান্তি-সন্ধিচুক্তি, ফিলিপাইনের সহিত এবং অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের সহিত পারস্পরিক রক্ষা-চুক্তি করিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে চলিতেছে বিরাট সামরিক আয়োজন। কিন্তু কোন দেশ আক্রমণ করিবার ইচ্ছা সোভিয়েট রাশিয়ার আছে তাহার কোন পরিচয় এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে পৃথিবীর সকল দেশেই ধনতন্ত্র ধ্বংস হইয়া সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হউক, ইহা রাশিয়ার অভিপ্রায় হইলে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই হয় না। কিন্তু ইহার জন্য রাশিয়া কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ভাবে হস্তক্ষেপ করে নাই। এমন কি চীনেও না। অবশ্য সমস্ত পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হউক, রাশিয়ার এই অভিপ্রায়কেই যদি রাশিয়ার সাম্রাজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহা হইলে অবশ্য এ সম্বন্ধে কিছুই বলিবার থাকে না। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যাহাকে স্বাধীন বিশ্ব বলিয়া থাকে সেই স্বাধীন বিশ্বের দেশগুলির অবস্থা কি? বিলাতের টাইমস পত্রিকা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন যে, জাপান হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম জার্ম্মাণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত বৃত্তাংশের মধ্যে এমন কোন দেশ নাই যে-দেশ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে। পৃথিবীর ৩৭টি দেশকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে। আরও ৯টি দেশকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সামরিক সাহায্য দিতেছে। দশটি রাষ্ট্র এবং উহাদের উপনিবেশগুলিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র শতাধিক বিমান-ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে। মোটের উপর বাটটি দেশ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সামরিক চুক্তিতে অথবা পারস্পরিক নিরাপত্তা রক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিতে অর্থ নৈতিক সাহায্যের চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একদিকে তাহার সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছে আর একদিকে গ্রহণ করিয়াছে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির উপনিবেশসমূহ রক্ষা করিবার দায়িত্ব। অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, যেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে একটা অতি-সাম্রাজ্যবাদ গড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু অতি-সাম্রাজ্যবাদ সত্যই সম্ভব কি না তাহা নির্ভুল ভাবে অনুমান করা সম্ভব নয়। যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী

আকর্ষণীয় সৌন্দর্য্যের জন্য ক্যালকেমিকোর
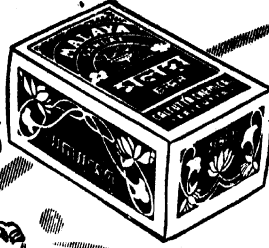
মলয় চন্দন সাবান

শরীর স্নিগ্ধ রাখে চন্দনের গন্ধে চিত্ত প্রসন্ন করে।
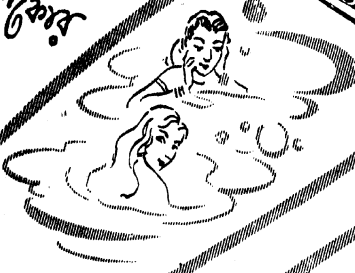
ক্যাষ্টরল ...

সুপরিশ্রুত মধুর-সুগন্ধি ক্যাষ্টর আয়ল। ব্যবহারে চুল ঘন, চিক্কণ ও রেশমের মত মসৃণ হয়।
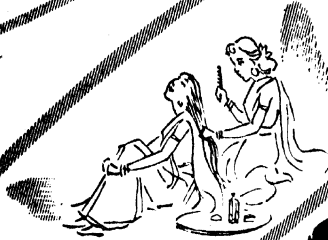
লাবণি স্নো ও ক্রীম

মুখের শ্রী ও লাবণ্য বৃদ্ধি করে। দিনের প্রসাধনে স্নো ও রাত্রে ক্রীম ব্যবহার্য্য।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

কলিকাতা-২৯

দেশগুলি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপর একান্ত ভাবে নির্ভরশীলতার বন্ধন ছিন্ন করিতে অবশ্যই চেষ্টা করিবে। এ সম্পর্কে 'বলশেভিক' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে মঃ ষ্টালিন যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনার যোগ্য।

ষ্ট্যালিনের উল্লিখিত প্রবন্ধের যে-সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, তিনি বলিয়াছেন যে, 'পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য্য নয়, ইহা মনে করা ভুল; তবে নীতিগত ভাবে একথা সত্য যে, ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের অন্তর্দ্বন্দ্ব অপেক্ষা তীব্রতর।' মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ যুক্তরাজ্যের মধ্যে প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলি লইয়া যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতেছে ইহা কাহারও অজানা নয়। বৃটেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। কিন্তু ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন যে, 'পশ্চিম জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী এবং জাপান চিরকাল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও নিপীড়ন সহ্য করিবে, মার্কিণ ক্রীতদাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ভাবে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিবে না ইহা মনে করা ভুল।' তিনি মনে করেন যে, প্রথমে ইংলণ্ড এবং তার পর ফ্রান্স মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কবল হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিবে।

বৃটেনের পরমাণু অস্ত্র ও আমেরিকা

বৃটিশ পরমাণু অস্ত্রের বিস্ফোরণ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব হইতে ইংলণ্ডের মুক্ত হইবার প্রয়াসের পূর্ব্বাভাস কিনা তাহা অনুমান করা কঠিন। কিন্তু একথা সত্য যে, বৃটেন অনেক তাঁবেদারী করিয়াও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে পরমাণু বোমা নির্ম্মাণ রহস্য জানিতে পারে নাই। অবশেষে বৃটেন নিজের চেষ্টাতেই পরমাণু অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। শুধু তাই নয়, অনেকে বলিতেছেন যে, বৃটেন যে পরমাণু অস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে তাহা মার্কিণ পরমাণু বোমা অপেক্ষাও শক্তিশালী। ইহাও বুঝা যাইতেছে, বৃটেনের এই পরমাণু অস্ত্র মার্কিণ পরমাণু বোমা হইতে স্বতন্ত্র ধরণের। বৃটেনের এই সাফল্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরও চমক ভাঙ্গিয়াছে।

পরমাণু অস্ত্র নির্ম্মাণে বৃটেন তো মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ হইয়াছেই, হয়ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়াইয়া আরও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। পরমাণু বোমার একচেটিয়া অধিকারের চাপ দিয়া বৃটেনকে হয়ত আর তাঁবে রাখা সম্ভব হইবে না, এই আশঙ্কা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আর উপেক্ষা করিতে পারিতেছে না। পরমাণু শক্তি আইন (Atomic Energy Act) দ্বারা পরমাণু বোমা নির্ম্মাণ-রহস্য অন্য কোন রাষ্ট্রের নিকট প্রকাশ করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু বৃটেনের পরমাণু অস্ত্র নির্ম্মাণে সাফল্য দেখিয়া মার্কিণ সামরিক ও রাজনৈতিক মহল পরমাণু রহস্যের আদান-প্রদান করা প্রয়োজন এবং অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা আজ হঠাৎ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, মিত্রপক্ষীয় সমরনায়কদিগকে পরমাণু রহস্য সম্পর্কে যদি ওয়াকিবহাল করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে পশ্চিম ইউরোপের রক্ষাব্যবস্থা বানচাল হইবার আশঙ্কা আছে। কারণ, পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগ করিবার দায়িত্ব মিত্রপক্ষীয় সমরনায়কদেরই। দ্বিতীয়তঃ, বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র স্বতন্ত্র ভাবে পরমাণু অস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা পরিচালন করিবার ফলে সময়, অর্থ, লোকবল এবং উপকরণের অপচয় ঘটিতেছে। কিন্তু মিঃ চার্চ্চিল অতঃপর পরমাণু অস্ত্র নির্ম্মাণ রহস্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আদান-প্রদান করিতে রাজী হইবেন কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। যদি রাজী হন, তাহা হইলে বৃটেনের পক্ষে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবমুক্ত হওয়া সম্ভব হইবে না। যদি রাজী না হন, তাহা হইলে ইঙ্গ-মার্কিণ স্বার্থের সংঘাত প্রবলতর হওয়ার আশঙ্কা আছে। কিন্তু রাশিয়া তথা কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সংহতি নষ্ট হইবার আশঙ্কায় বৃটেন সত্যই মার্কিণ কবল হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিবে কি না, সে কথা নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভব নয়। কিন্তু যে কারণে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বার্থের সংঘাত প্রবলতর হওয়ার কথা ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনার যোগ্য।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্কট

ষ্ট্যালিন মনে করেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের ফলে পৃথিবীর বাজার সঙ্কুচিত হওয়ায় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এক ঘনীভূত সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পরে পৃথিবীব্যাপী এক অখণ্ড বাজারের অস্তিত্ব আর নাই। ষ্ট্যালিন লিখিয়াছেন যে, সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত পরস্পর-বিরোধী দুইটি বাজার সৃষ্টি হইয়াছে। পশ্চিমী শক্তিবর্গের অবরোধ নীতির ফলে সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন ও পূর্ব্ব-ইউরোপ লইয়া একটি নূতন বাজার সৃষ্ট হইয়াছে। ষ্ট্যালিন মনে করেন এই নূতন বাজার আরও বিস্তৃত হইবে এবং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদের বাজার আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিবে। পৃথিবীর বাজারের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তাঁহার এই বিশ্লেষণ যে ঠিকই হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চাপে পড়িয়া পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি রাশিয়া, পূর্ব্ব-ইউরোপ এবং চীনের বাজার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। উহাদের অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার ইহা একটি প্রধান কারণ। গত সেপ্টেম্বর (১৯৫২) মাসের প্রথম ভাগে মারগেটে অনুষ্ঠিত বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে যত দূর সাধ্য পুনরস্ত্রসজ্জার নীতি সমর্থন করিয়া প্রস্তাব অধিক সংখ্যক ভোটে গৃহীত হইলেও সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, আন্তর্জ্জাতিক যে-পরিস্থিতি বিশ্ববাসীর মনে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করিয়াছে—চীন, রাশিয়া এবং পূর্ব্ব-ইউরোপের অন্যান্য দেশের সহিত ব্যাপক বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হইলে উহার অনেক উন্নতি হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির তাহাদের বরাবরের বাজার রাশিয়া, চীন ও পূর্ব্ব-ইউরোপের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো নিষিদ্ধ করিয়াছে, অথচ তাহাদিগকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও পণ্য রপ্তানি করিবার সুবিধা দেওয়া হইতেছে না। কিছু দিন পূর্ব্বে বৃটেনের 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকা পর্য্যন্ত বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, বৃটেনের যাহা প্রয়োজন তাহা সাহায্য নয় বাণিজ্য (not aid but trade)। মার্শাল পরিকল্পনা পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর করিবার পরিবর্ত্তে তাহা বৃদ্ধি করিয়াছে। পুনরস্ত্রসজ্জার আয়োজনের ফলে দুর্গতি আরও বাড়িয়া চলিয়াছে এবং

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপর পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির সামরিক ও অর্থনৈতিক নির্ভরতাই শুধু বৃদ্ধি পায় নাই, উপনিবেশগুলি রক্ষা করিবার জন্যও আমেরিকার উপর সম্পূর্ণ ভাবে তাহাদিগকে নির্ভর করিতে হইতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই নির্ভরতাকে কৌশলে ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিয়াছে।

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৫২) ষ্ট্রাসবুর্গে ইউরোপীয় পরিষদের (The Consultative Assembly of the 15-nation Council of Europe) তিন সপ্তাহব্যাপী অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। এই অধিবেশনে প্রস্তাবিত ক্ষুদ্র ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বৃটেন ও পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রকে সংযুক্ত করিবার এক প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছে। এই প্রস্তাব ইডেন পরিকল্পনা নামে অভিহিত। এই সঙ্গে ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ১৯৪৮ সালে কাউন্সিল অব ইউরোপ বা ইউরোপীয় পরিষদ গঠিত হয়। ইহা শুধু আলোচনামূলক এবং উপদেষ্টা পরিষদ মাত্র। সুম্যান পরিকল্পনা অনুযায়ী ফ্রান্স, পশ্চিম জার্ম্মাণী, ইটালী, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড এবং লুক্সেমবুর্গকে লইয়া গঠিত হইয়াছে 'কোল এণ্ড ষ্টিল কমিউনিটি।' সীমাবদ্ধ আওতার মধ্যে উহা একটি অতি-জাতীয়প্রতিষ্ঠান বা Sura-national body. রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও উহাকে সংহত করিয়া ক্ষুদ্র ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস চলিতেছে। এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ পরিষদ (Special Assembly) একটি supra-national Constitution বা অতি-জাতীয় শাসনতন্ত্র রচনা করিতেছে। ইহা ব্যতীত আছে প্রস্তাবিত দেশরক্ষা কমিউনিটি বা ডিফেন্স কমিউনিটি। কোল এণ্ড ষ্টীল কমিউনিটি চুক্তি গত জুলাই মাসে (১৯৫২) অনুমোদিত হইয়াছে। ডিফেন্স কমিউনিটি চুক্তি এখনও অনুমোদিত হয় নাই। কিন্তু ক্ষুদ্র ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা বড় সহজ ব্যাপার হইবে না। জার্ম্মাণীর ঐক্য-সমস্যা উহার পথে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করিবে। বস্তুতঃ অখণ্ড জার্ম্মাণী গঠন সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়ার গত ২৩শে আগষ্ট তারিখের পত্রের যে উত্তর পশ্চিমীরাষ্ট্রত্রয় ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে দিয়াছেন তাহাতে অখণ্ড জার্ম্মাণী গঠনের সম্ভাবনা একটুকুও নিকটবর্ত্তী হয় নাই।

গত মার্চ্চ মাসে (১৯৫২) রাশিয়াই সর্ব্বপ্রথম জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয়ের সহিত বর্ত্তমান পত্রাবলী আদান-প্রদান আরম্ভ করে। রাশিয়া তাহার ২৩শে আগষ্ট তারিখের পত্রে লিখিয়াছিল যে, 'ইহা খুবই সুস্পষ্ট যে, এই সকল সর্ত্ত শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে অন্যান্য দেশের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে জার্ম্মাণীর অধিকার একটুকুও ক্ষুণ্ন করিবে না।' 'এই সকল সর্ত্ত' বলিতে গত ১০ই মার্চ্চ (১৯৫২) তারিখের পত্রে রাশিয়া জার্ম্মাণীর সহিত শান্তিচুক্তির জন্য যে সকল প্রস্তাব করিয়াছিল সেইগুলিকেই বুঝাইতেছে। রাশিয়ার প্রস্তাব অনুযায়ী অখণ্ড জার্ম্মাণী গঠিত হইলে উহা একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া উঠিতে পারে এবং রাশিয়া ও পূর্ব্ব-ইউরোপের সহিত সহযোগিতা স্থাপিত হইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরতা হ্রাস পাইতে পারে, এই আশঙ্কা মার্কিণ শাসকবর্গ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয় রাশিয়ার সর্ব্বশেষ পত্রের যে উত্তর দিয়াছেন তাহা রাশিয়ার বিরুদ্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রচারকার্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু পশ্চিম জার্ম্মাণীর জনগণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছে যে অখণ্ড জার্ম্মাণী গঠন করিতে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের কোন ইচ্ছা নাই। পশ্চিম জার্ম্মাণীর গবর্ণমেণ্ট পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয়ের উত্তর সমর্থন করিয়া এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন বটে, জার্ম্মাণীর জনগণের অভিমত তাহাতে প্রকাশিত হয় নাই। জার্ম্মাণীর রাজনৈতিক দলগুলি এবং সংবাদপত্রসমূহের অভিমত হইতেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। সম্প্রতি পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীর পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি দল 'বনে' গিয়াছিলেন। ঐ সময় বন পার্লামেণ্টের ২৫ জন সদস্য এই প্রতিনিধি দলের সহিত জার্ম্মাণীর ঐক্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন এবং ফ্রি-ডেমোক্রাটিক দলের সদস্যও ছিলেন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে জার্ম্মাণীর ঐক্য-সমস্যার গুরুত্ব সহজেই বুঝা যায়। এই সমস্যার সমাধান না হইলে পশ্চিম ইউরোপের রক্ষাব্যবস্থা বানচাল হইয়া যাইতে পারে।

ইউরোপের বাহিরেও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সমস্যা বড় কম নয়। মধ্যপ্রাচীতে ইঙ্গ-মার্কিণ স্বার্থের সংঘাত অবশ্য অন্তঃসলিলা হইয়াই চলিতেছে। মিঃ চার্চ্চিল এবং প্রেসিডেণ্ট টুম্যান মিলিত ভাবেই ইরাণের তৈল-সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেছেন। গত ৩০শে আগষ্ট (১৯৫২) ইরাণের নিকট তাঁহারা যে প্রস্তাব করেন তাহার উত্তরে ডাঃ মোসাদ্দেক এক পাল্টা প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। অতঃপর বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব এবং মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব চার্চ্চিল-টুম্যান প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিয়া পৃথক্ ভাবে প্রায় একই রূপ পত্র দিয়াছেন। এ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করিবার স্থান আমরা পাইব না। কিন্তু মধ্যপ্রাচীতে ইঙ্গ-মার্কিণ স্বার্থের সংঘাত যেমন আছে, তেমনি

অনন্যসাধারণ কেশবর্দ্ধক

সর্বত্র পাওয়া যায়

মূল্য ১।৵০

টস্ ফার্মাসিউটিক্যাল প্রডাক্টস্ (ইণ্ডিয়া)

হেড অফিস : ৩১, লোয়ার রডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—২০

স্বার্থের সংঘাত আছে মধ্যপ্রাচীর শাসকশ্রেণী এবং পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে। কেহ কেহ মনে করেন যে, অষ্ট্রো-হাঙ্গেরী রাজতন্ত্রের শেষ অবস্থার সহিত মধ্যপ্রাচীর বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিতে পারা যায়। ব্যাপারটাকে অত সহজ করিয়া বলা সম্ভব নয়। মধ্যপ্রাচীতে কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক কোন দিক দিয়াই জনগণের কোন উন্নতি হয় নাই। কিন্তু আজ তাহারা নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে। কাজেই মধ্যপ্রাচীর শাসকবর্গ পড়িয়াছেন উভয়-সঙ্কটের মধ্যে। ইরাণে এই অবস্থাটা বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং অনেকে আশঙ্কা করেন যে, তুদে পার্টি ইচ্ছা করিলেই ক্ষমতা দখল করিয়া বসিতে পারে। করিতেছে না শুধু এই জন্য যে, রাশিয়ার প্রত্যক্ষ সাহায্য ব্যতীত ক্ষমতা বজায় রাখা সম্ভব হইবে না। এই সকল জল্পনা-কল্পনা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু মধ্যপ্রাচী অপেক্ষা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া এবং সুদূর প্রাচ্যের অবস্থাই বিশেষ উদ্বেগজনক হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক শান্তিকামী ব্যক্তিই যে এই অবস্থার দ্রুত অবসান কামনা করিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই শান্তির আকাঙ্ক্ষাই পিকিংয়ের শান্তিসম্মেলনে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

পিকিং শান্তি-সম্মেলন

পিকিংয়ের শান্তি-সম্মেলন ২৫শে সেপ্টেম্বর (১৯৫২) হইতে আরম্ভ হইবার কথা ছিল। পরে উহা ২রা অক্টোবর হইতে আরম্ভ হওয়া স্থির হয়। এই সম্মেলনে মার্কিণ যুদ্ধনীতি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া পাঁচ দফা শান্তিদাবী এবং কোরিয়া সমস্যা সমাধানের জন্য তিন দফা কার্য্যকরী প্রস্তাব করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বিশ্ব-রাজনীতি ও সামরিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল প্রস্তাব আলোচনা করিলে ঐগুলির গুরুত্ব বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা যায়। রাশিয়া ও চীনকে বাদ দিয়া জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্য যে জাপানকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করা তাহাতে সন্দেহ নাই। কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার ফলে কোরিয়া বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। মালয় ও ইন্দোচীনে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনের গলা টিপিয়া ধরা হইয়াছে। এই সকল অবস্থার পটভূমিতেই শান্তি-সম্মেলনে জাতিসঙ্ঘের সনদ, কায়রো ঘোষণা, ইয়াল্টা চুক্তি ও পটসডাম ঘোষণা অনুযায়ী জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি করিবার দাবী করা হইয়াছে। কম্যুনিষ্টদের প্রস্তাব অনুযায়ী কোরিয়া যুদ্ধের অবসান করিবার যেমন দাবী করা হইয়াছে তেমনি ভিয়েটনাম, লাওস, কাম্বোডিয়া ও মালয়ে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবারও দাবী করা হইয়াছে। যুদ্ধের আশঙ্কা দূর করিবার জন্য পরমাণু অস্ত্র, জীবাণু অস্ত্র এবং ব্যাপক ধ্বংসের অস্ত্র সমূহ নিষিদ্ধ করিয়া পঞ্চশক্তির চুক্তি সম্পাদনের দাবী করা হইয়াছে। তাছাড়া, জাতীয় স্বাধীনতা সুরক্ষিত করা, অবরোধ, নিষেধাজ্ঞা ও একচেটিয়া ব্যবস্থার অবসান করিবার এবং যুদ্ধের উত্তেজনা নিষিদ্ধ করিয়া শান্তি-আন্দোলন চালাইবার অধিকারও দাবী করা হইয়াছে। এই সকল দাবী যে আন্তরিক নয়, সঙ্গত নয়, ইহা প্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে কোরিয়া যুদ্ধের অবসান করা আবশ্যক।

যুদ্ধবন্দী-বিনিময় সমস্যাই এখন কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির একমাত্র অন্তরায়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে চীনা-বন্দীর সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার এবং উত্তর কোরীয় বন্দিসংখ্যা ৯২ হাজার। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চীনা-বন্দীদের মাত্র এক-চতুর্থাংশ এবং উত্তর কোরীয় বন্দীদের অর্দ্ধেক মুক্তি দিতে চায়। অবশিষ্ট যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কথা এই যে তাহারা আর দেশে ফিরিতে চায় না। ইহার মত অবিশ্বাস্য কথা আর হইতে পারে না। তাছাড়া, কায়েসাংএ যুদ্ধবিরতির যে খসড়া-চুক্তি হয় তাহাতে সকল যুদ্ধবন্দী বিনিময়েরই কথা আছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আজ আর এই খসড়া-চুক্তি মানিতে চাহিতেছে না। পিকিং শান্তি-সম্মেলনে দাবী করা হইয়াছে যে, আন্তর্জ্জাতিক বিধান, বিশেষ করিয়া ১৯৪৯ সালের জেনেভা ঘোষণাপত্র এবং উভয়পক্ষের সম্মত খসড়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষের যুদ্ধবন্দীদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে এবং যুদ্ধবিরতির পর চীনা স্বেচ্ছাসেবক সহ সমস্ত বিদেশী সৈন্য কোরিয়া হইতে অপসারিত করিতে হইবে। কোরিয়ার জনগণ যাহাতে নিজেদের ইচ্ছামত আভ্যন্তরীণ সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারে তাহার জন্যই ইহা প্রয়োজন। কোরিয়ায় জীবাণু-যুদ্ধ পরিচালনকারীদের এবং ব্যাপক বোমাবর্ষণকারীদের শাস্তি দিবার দাবীও শান্তি-সম্মেলনে করা হইয়াছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই সকল দাবী মানিয়া লইবে, ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশনে এই সকল প্রস্তাব উত্থাপন করিলেও কোন ফল হইবে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ লাই স্বীকার করিয়াছেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম নিরোধ করিতে পারিবে না। তাঁহার আশঙ্কা অমূলক বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। শান্তির জন্য আন্দোলন আশঙ্কিত যুদ্ধকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে অথবা সাফল্যের সহিত নিরোধও করিতে পারে, কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধের অনিবার্য্যতা বিনষ্ট হইবে না, মঃ ষ্ট্যালিন এই অভিমত তাঁহার উল্লিখিত প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। যত দিন সাম্রাজ্যবাদ থাকিবে তত দিন যুদ্ধের আশঙ্কা অনিবার্য্যরূপেই যে থাকিবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। সাম্রাজ্য রক্ষা ও প্রসারের জন্যই অস্ত্রসজ্জার আয়োজন চলিতেছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যেই যুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পূর্ব্বেও জার্ম্মাণী রাশিয়াকেই প্রথম আক্রমণ করিবে এইরূপ সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামটা প্রথমে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেই আরম্ভ হইয়াছিল। রাশিয়া আক্রান্ত হয় পরে। তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম কি ভাবে এবং কাহাদের মধ্যে আরম্ভ হইবে, সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়।

বৃটিশ বনাম রুশ সমাজতন্ত্র—

মোরক্যাম্বেতে গত ৩রা অক্টোবর (১৯৫২) বৃটিশ শ্রমিক দলের বার্ষিক অধিবেশন শেষ হয় এবং ৫ই অক্টোবর মস্কোতে আরম্ভ হয় সোভিয়েট ইউনিয়ন কম্যুনিষ্ট পার্টির উনবিংশ কংগ্রেস। এই প্রসঙ্গে বৃটিশ সমাজতন্ত্র এবং রুশ সমাজতন্ত্রের পার্থক্যের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। এই পার্থক্য হইতেই বৃটিশ শ্রমিক দলের স্ববিরোধ এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব যে ভাবে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে এবং বৃটিশ শ্রমিক দলের বার্ষিক অধিবেশনে পরিস্ফুট হইয়াছে

আপনার ছেলেমেয়ের
দু-তরফা
পুষ্টিলাভ একান্ত আবশ্যক
১. স্কটস্ ইমালশন খাঁটি কড্‌লিভার অয়েল, যা পুষ্টিকর ও বলকারী প্রাকৃতিক খাদ্যের মধ্যে সেরা। ২. ভিটামিন 'ডি' থাকায় এক চামচ স্কটসএ চার গ্লাস দুধের সমান অস্থিগঠনের গুণ আছে আর ভিটামিন 'এ' শিশুদের ছোঁয়াচে ও অন্যান্য রোগের হাত থেকে বাঁচায়। এর চেয়ে সহজ পাচ্য কড্‌লিভার অয়েল আর হয় না।
শরীর বৃদ্ধির জন্য
ক্ষয়িত শক্তির পরিপূরণ, পেশী ও হাড়ের সংগঠন এবং অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয়ের জন্য শিশুদের উপযুক্ত পুষ্টিকর জিনিস আবশ্যক। স্কটস ইমালশন ঠিক এই কাজগুলিই করে — এর পুষ্টিকর উপাদানগুলি অস্থিগঠন ও শক্তিসঞ্চারের পক্ষে চমৎকার।
রোগ প্রতিরোধের জন্য
ছেলেবেলায় একবার অসুখে পড়লেই শরীরটি স্বাস্থ্যহীন ও চিররুগ্ন হয়ে পড়তে পারে। তাই শিশুদের রোগ-প্রতিরোধ শক্তি বাড়িয়ে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য ডাক্তাররা আজ ৭৯ বছর ধরে স্কটস ইমালশন-এর ব্যবস্থা দিয়ে আসছেন।
SCOTT'S Emulsion
স্কটস্ ইমালশন
প্রতি চামচে স্বাস্থ্যোন্নতি হয়
পরিবেশক :
ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ কোচীন নয়াদিল্লী কানপুর S.3435

তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মারগেটের বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বিভানপন্থীদের পরাজয়ের পরে মোরক্যাম্বেতে ঐক্যের ধ্বনির মধ্যেই বৃটিশ শ্রমিক দলের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছিল এবং 'ব্লক' ভোটের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা পাইয়াও নেশন্যাল এক্জিকিউটিভ কমিটির কনষ্টিটিউয়েন্সী সদস্য নির্ব্বাচনে বৃটিশ শ্রমিক দলের অফিসিয়াল নেতৃবৃন্দ বিভানপন্থীদের নিকট বিপুল ভাবে পরাজিত হইয়াছেন। এক্জিকিউটিভ কমিটির কনষ্টিটিউয়েন্সী বা রাজনৈতিক বিভাগের ৭টি আসনের মধ্যে ৬টিই বিভান-পন্থীরা দখল করিয়াছেন। এই পরাজয়ের মধ্যে শ্রমিক দলের দক্ষিণপন্থীদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক হইয়াছে মিঃ হার্ব্বার্ট মরিসন এবং মিঃ হাগ ডাল্টনের পরাজয়। মিঃ মরিসন শেষ শ্রমিক পররাষ্ট্র সচিব এবং মিঃ ডাল্টন ছিলেন বৃটিশ অর্থসচিব। শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের শেষ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ মরিসনের এই পরাজয় শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র নীতির প্রতি বৃটিশ শ্রমিক-দলের অনাস্থা সূচিত হইতেছে বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি, ব্যাপক অস্ত্রসজ্জা, জাপ শান্তি-চুক্তি, পশ্চিম জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করার সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের আমলেই হইয়াছে। উহার পরিণতি কি হইতে পারে তৎকালে উহা বুঝা যায় নাই, ইহা যদি স্বীকার করাও যায়, তাহা হইলেও বর্ত্তমানে উহার প্রতিক্রিয়া খুবই সুস্পষ্ট হইয়াছে। ইহাই মিঃ মরিসনের পরাজয়ের কারণ বলিয়া যদি স্বীকার করাও যায়, তাহা হইলেও শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র নীতির প্রতি অনাস্থার শেষ এইখানেই হইয়াছে এবং পুনরস্ত্রসজ্জার কর্ম্মসূচীর পুনর্ব্বিবেচনা এবং হ্রাসকরণ সম্পর্কে বিভানপন্থীদের প্রস্তাব বৃটিশ শ্রমিক দলের সম্মেলনে অগ্রাহ্য হইয়া শ্রমিক দলের আদর্শ ও নীতিগত স্ববিরোধ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের তৈয়ারী পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তির উপরেই চার্চ্চিল গবর্ণ-মেণ্টের পররাষ্ট্র নীতির প্রাসাদ রচিত হইয়াছে!

শ্রমিক দলের উল্লিখিত আদর্শ ও নীতিগত স্ববিরোধের পরিচয় মারগেটের বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসেও পাওয়া গিয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ৫৫,৯৭,০০০ ভোটে জাতীয় সামর্থ্যের সীমা পর্য্যন্ত (to the limit of the Nation's capacity) পুনরস্ত্রসজ্জা যেমন সমর্থন করিয়াছে, তেমনি বিপুল ভোটাধিক্যে জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় যত দিন বাড়িতে থাকিবে তত দিন মজুরি বৃদ্ধি নিরোধের বিরোধিতা করিবার নীতি সমর্থন এবং সাধারণ মজুরিবৃদ্ধি দাবী করিয়াছে। সমরায়োজন চলিতে থাকিলে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব নয়, বৃটিশ শ্রমিকরা তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। গত কয়েক বৎসরে বৃটেনে পণ্যের উৎপাদন যে বাড়ে নাই তাহা নয়, কিন্তু সাধারণ মানুষ তাহার ফলভোগ করিবার অধিকারী হয় নাই। কেন হয় নাই, শ্রমিকগণ তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই। বৃটেনে মাখন, মাংস, ডিম এবং চিনির রেশন এখনও বহাল রহিয়াছে। গৃহনির্ম্মাণের দিকে বৃটেন অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত হাজার হাজার বাড়ী মেরামতের অভাবে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। সমরায়োজন সমর্থন করিবার পর আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য কম্যুনিষ্ট দেশগুলির সহিত বাণিজ্য করিবার আগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে। তাছাড়া শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিবার জন্য পরিকল্পনা রচনা করিবার প্রস্তাবও গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত-করণ সম্পর্কে শ্রমিক দলের মধ্যে যে স্ববিরোধ রহিয়াছে তাহাও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। শ্রমিক দলের বার্ষিক সম্মেলনে মিঃ মরিসন রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সম্পর্কে বিভানপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গীকে সঙ্কীর্ণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মিঃ বিভান কেয়ার হার্ডির আদর্শের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। উহার উত্তরে মিঃ মরিসন বলিয়াছেন যে, শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার সময় গবর্ণমেণ্টকে কেয়ার হার্ডির আদর্শ অপেক্ষা অন্যান্য অনেক বিষয় ভাবিতে হয়।

বিভানপন্থীদের সহিত বৃটিশ শ্রমিক দলের রক্ষণশীলপন্থীদের বিরোধের মধ্যে বৃটিশ সমাজতন্ত্রের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। বৃটিশ সমাজতন্ত্রবাদ মার্কসবাদ তো নহেই, উহার সুনির্দ্দিষ্ট কোন আদর্শ ও নীতিও নাই, একথা বলিলে ভুল হয় না। মিঃ বিভান এটলী-মরিসন এণ্ড কোং হইতে কিছু ভাল সমাজ-তন্ত্রী হইতে পারেন, কিন্তু তিনি কম্যুনিষ্ট নহেন। বিলাতের স্বতন্ত্র রক্ষণশীল পত্রিকা 'অবজারভার' মিঃ বিভান যে কম্যুনিষ্ট নহেন একথা স্বীকার করিয়াও বলিয়াছেন, "He can not help feeling that Russia, as a traditionally 'left country' is some how an ally, while capitalist America remains the traditional foe." অর্থাৎ বামপন্থী দেশ হিসাবে রাশিয়াকে তিনি মিত্র বলিয়া মনে করেন এবং ধনতন্ত্রী আমেরিকাকে মনে করেন শত্রু বলিয়া। এটলী-মরিসন কোং-এর সহিত এইখানেই তাঁহার তফাৎ। তিনি বৃটিশ পররাষ্ট্র নীতিকে মার্কিণ প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে চান। কিন্তু এটলী-মরিসন তাহা চান না। ইহার কারণ হয়ত ইহাই যে, আমেরিকা ধনতন্ত্রী দেশ হইলে সেখানে ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু রাশিয়ার অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে দেশে সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সে দেশে ট্রেড ইউনিয়নের যে আর কোন প্রয়োজন নাই, এ কথা তাঁহারা বুঝিতে অসমর্থ। তাছাড়া মিঃ বিভান সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির কথা বলেন, বলিয়া থাকেন ধনতন্ত্রের বিলোপের কথা। এটলী-মরিসনের সহিত এই মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও মিঃ বিভান কম্যুনিষ্ট নহেন, এ কথাও সত্য। ভিক্টোরিয়া যুগের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনো-ভাব হইতেই বৃটিশ সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি। মার্কসবাদের উপর ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত নহে। তাঁহারা ধনতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়া ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। কম্যুনিষ্টরা তাহা সম্ভব বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা ধনতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চান। রাশিয়ায় তাহাই করা হইয়াছে। রাশিয়ার প্রতি বিরাগের কারণ যে ইহাই, বলশেভিক পার্টির কংগ্রেস সম্পর্কে ডেইলী টেলিগ্রাফের মন্তব্যেই তাহা সপ্রকাশ।

ডেইলী টেলিগ্রাফ ৭ই অক্টোবরের সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলিয়াছেন, "শান্তি-আন্দোলন ও অন্যান্য নূতন কৌশলের সাহায্যে রাশিয়া সর্ব্বত্র নিরপেক্ষ ও মার্কিণ-বিরোধী মনোভাব জাগ্রত করিয়া ধনতন্ত্রের ধ্বংস ঘটাইতে চাহিতেছে।" রাশিয়ার নূতন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান (৮ই

অক্টোবর) বলিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অপেক্ষা যুদ্ধের উদ্দেশ্যেই উহা পরিকল্পিত হইয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিণ শিবির রাশিয়াকে ভাবী আক্রমণকারী মনে করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিবে, আর রাশিয়া আত্মরক্ষার আয়োজন করিবে না, ইহা যদি গার্ডিয়ানের অভিপ্রায় হয়, তবে তিনি নিরাশ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। মলটোভ তাঁহার বক্তৃতায় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যে তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামের আয়োজন করিতেছে সে-সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। মালেনকভ তাঁহার রিপোর্টে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্ম মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সোভিয়েট সমর-মন্ত্রী কম্যুনিষ্ট পার্টিকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, লালফৌজ সোভিয়েট জনগণের সৃষ্টিকে গৌরবের সহিত রক্ষা করিবে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া শান্তি চায় ; ইহার অর্থ সামরিক দুর্ব্বলতা নহে।

মিশর—

জেনারেল মহম্মদ নাগীব মিশরের ক্ষমতা দখল করিলেও মন্ত্রি-সভার ঠাট বজায় রাখিয়াছেন। তিনি প্রধান মন্ত্রী হইলেও তাঁহার মন্ত্রিসভায় আর কোন সৈনিক স্থান পান নাই। নূতন সাধারণ নির্ব্বাচনের এবং গণপরিষদ আহ্বানের প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়াছেন। তাছাড়া অনেকগুলি পরিবর্ত্তন সাধন করিতেও তিনি উদ্যোগী হইয়াছেন। কাহারও দুই শত একরের অধিক জমি থাকিতে পারিবে না, অভিজাত সম্প্রদায়ের পাশা এবং বে পদবী বাতিল করা হইয়াছে, বাড়ী ভাড়া শতকরা পনর টাকা হ্রাস করা হইয়াছে, শতাধিক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীকে অযোগ্যতা ও দুর্নীতির অভিযোগে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে, নিষিদ্ধ করা হইয়াছে লাল ফেজ। শুধু ইহাই নয়, রাজনৈতিক দলগুলি হইতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদিগকে বিতাড়িত করিয়া ঐগুলির পুনর্গঠনের জন্ম আইন রচনা করা হইয়াছে। মিশরের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক দল ওয়াফদ দলের নেতৃত্ব মুস্তাফা নাহাশের হাতে থাকাও তাঁহার গবর্ণমেণ্ট পছন্দ করেন না। ওয়াফদ দল প্রথমে ইহাতে রাজী হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট যখন ওয়াফদ দলের তহবিল আটক করিলেন এবং ওয়াফদ দল ভাঙ্গিয়া দিবার হুমকী দিলেন, তখন মুস্তাফা নাহাশকে বাদ দিয়াই ওয়াফদ দলের পুনর্গঠন করা হইয়াছে।

ওয়াফদ দল গঠিত হয় ১৯১৮ সালে। মিশরের দাবী-দাওয়া জনাইবার উদ্দেশ্যে ভার্সাই শান্তি-সম্মেলনে যোগদানের অনুমতি চাহিবার জন্ম জগলুল পাশার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল কায়রোস্থিত বৃটিশ রেসিডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অনুমতি অবশ্য পাওয়া যায় নাই, কিন্তু এই প্রতিনিধি দল হইতেই ওয়াফদ দলের উৎপত্তি। বস্তুতঃ ওয়াফদ শব্দের অর্থই হইল প্রতিনিধি দল বা ডেলিগেশন। ইহা রাজনৈতিক দলটি ভূম্যধিকারী ও শিল্পপতিদের প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। যে প্রতিনিধি দল ১৯১৮ সালের বৃটিশ রেসিডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, মুস্তাফা নাহাশ ছিলেন তাহার অন্যতম সদস্য।

জেঃ নাগীবের শাসন মিশরকে কোন্ পথে লইয়া যাইবে তাহা অনুমান করা কঠিন। শাসন ব্যাপারে তাঁহার একক কর্ত্তৃত্ব নাই।

যে-সকল সামরিক অফিসার অভ্যুত্থানের আয়োজন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মতামত তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। মুসলিম ব্রাদারহুড দল ও ওয়াফ্‌দানিয়া দলও তাঁহাকে সমর্থন করে। তাঁহাদের মতামতও উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। বৃটিশের সহিত সম্পর্কের নীতি কি ভাবে পরিচালিত হইবে তাহা এখনও স্থির করা সম্ভব হয় নাই। জে: নাগীব মধ্যপ্রাচী রক্ষাব্যবস্থা সমর্থন করিলেও তাঁহার সমর্থকগণ উহার বিরোধী। বৃটিশের নিকট হইতে অন্ততঃ কিছু সুবিধা আদায় করিতে না পারিলে তাঁহার শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবার আশঙ্কাও উপেক্ষার বিষয় নয়।

লেবানন—

সম্প্রতি লেবাননের রাজনীতিতে যে পট-পরিবর্ত্তন হইয়া গেল তাহাকে বিপ্লব বলিলে বলিতে হয় উহা নিয়মতান্ত্রিক বিপ্লব। তিন দিনব্যাপী শান্তিপূর্ণ সাধারণ ধর্ম্মঘটের পরে প্রেসিডেণ্ট বিশারা এল-খৌরী সেনাপতি জেনারেল ফুয়াদ শেহাবকে সৈন্য দ্বারা ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া দিতে নির্দ্দেশ দান করেন। প্রধান সেনাপতি তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় প্রেসিডেণ্ট তাঁহার পদত্যাগ-পত্র প্রধান সেনাপতির হস্তে প্রদান করেন। কিন্তু প্রধান সেনাপতি নিজে ক্ষমতা দখলের পরিবর্ত্তে প্রতিনিধি পরিষদকে নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করিতে অনুরোধ করেন। বিরোধী দলের নেতা কামিল শামাওন নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং দুর্নীতি দূর করিয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

লেবাননের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটের উপর মন্দ ছিল না। সৌদী আরব এবং ইরাণ হইতে তৈলের পাইপ-লাইন লেবাননের বেইরুট বন্দরে আসিয়া শেষ হইয়াছে। ইহাই তাহার আর্থিক স্বচ্ছল অবস্থার কারণ। কিন্তু প্যালেষ্টাইন হইতে ১ লক্ষ ২০ হাজার উদ্বাস্তুর আগমন এবং সিরিয়ার সহিত অর্থনৈতিক ইউনিয়ন বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বর্ত্তমানে তাহার আর্থিক অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। উদ্বাস্তু আগমনের ফলে মজুরি হ্রাস পাইয়াছে, বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জীবনযাত্রার মান হ্রাস হইয়াছে। আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে লেবাননই বেশ সুসংহত। অধিবাসীদের অর্দ্ধেকের কিছু বেশী খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী। লেবাননের কম্যুনিষ্ট পার্টিও বেশ সুগঠিত। কম্যুনিষ্ট-বিরোধী আন্দোলনও কম শক্তিশালী নয়। কিন্তু কম্যুনিষ্টরা খৃষ্টান-মুসলমান প্রতিযোগিতার সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করিতেছে।

জাপানের সাধারণ নির্ব্বাচন—

গত ১লা অক্টোবর তারিখে জাপানে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গেল যুদ্ধের পরে ইহা চতুর্থ সাধারণ নির্ব্বাচন হইলেও জাপ শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর ইহাই হইল প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচন। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা ইহাকে জাপানে দখলকার অবস্থা অবসান হওয়ার পর প্রথম নির্ব্বাচন বলিয়া প্রচার করিতেছেন। কিন্তু জাপ শান্তি-চুক্তি জাপানে দখলকার অবস্থার অবসান তো করেই নাই, অধিকন্তু জাপানে মার্কিণ দখলকার অবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করিয়াছে এবং জাপানের স্বাধীনতা মার্কিণ তাঁবেদারী ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। এইরূপ অবস্থায় সাধারণ নির্ব্বাচনে যেরূপ ফল হওয়া সম্ভব তাহাই হইয়াছে।

এই নির্ব্বাচনের প্রথম উল্লেখযোগ্য ফল এই যে, লিবারেল দলই পুনরায় ক্ষমতা অধিকার করিয়াছে। যদিও এই দল তাহাদের পূর্ব্বের ২৮৫টি আসনের মধ্যে মাত্র ২৩৭টি আসন দখল করিতে পারিয়াছে, তথাপি জাপ পার্লামেণ্টের নিম্ন-পরিষদে তাহারাই হইয়াছে একক সংখ্যা-গরিষ্ঠ। কম্যুনিষ্টরা ১০৭টি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল। কিন্তু একটি আসনও দখল করিতে পারে নাই। বিগত পার্লামেণ্টে তাহাদের ২২টি আসন ছিল। প্রোগ্রেসিভ দল ৮৮টি আসন দখল করিয়াছে। বিগত পার্লামেণ্টে তাহাদের ছিল ৬৭টি আসন। সমাজতন্ত্রীরা দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী এই দুই দলে বিভক্ত। এই সাধারণ নির্ব্বাচনে তাহারা শক্তিবৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে। দক্ষিণ-পন্থীরা ৫৪টি এবং বামপন্থীরা ৫১টি আসন দখল করিয়াছে। বিগত পার্লামেণ্টে তাহাদের যথাক্রমে ৩০টি ও ১৬টি আসন ছিল।

লিবারেল দলের মধ্যে নেতৃত্ব লইয়া একটা বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে। যুদ্ধের পরে মিঃ হাতোয়ামা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইঙ্গিতে এই দল গঠন করেন। কিন্তু ১৯৪৬ সালে জেনারেল ম্যাকআর্থার তাঁহাকে দল হইতে বহিষ্কৃত করেন এবং মিঃ যোশিদাকে বসান নেতৃত্বের আসনে। জাপ শান্তি-চুক্তির পর ১৯৫২ সালের প্রথম দিকে তাঁহাকে আবার দলে গ্রহণ করা হয়। তিনি দলে স্থান পাইয়াই জাপানের জন্য অধিকতর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দাবী করেন এবং পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তির কতগুলি ধারার কঠোর সমালোচনা করা আরম্ভ করেন। ফলে লিবারেল দল প্রায় দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় মিঃ যোশিদা পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া সাধারণ নির্ব্বাচন ঘোষণা করেন। জাপ পার্লামেণ্টে নির্ব্বাচিত লিবারেল দলের সদস্যরা মিঃ যোশিদাকে প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত করিবেন, না মিঃ হাতোয়ামাকে নির্ব্বাচিত করিবেন, তাহা অনুমান করা কঠিন। তবে যিনিই প্রধান মন্ত্রী হউন না কেন তিনিই যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হাততালির তালে তালে নাচিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে মিঃ যোশিদা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরীক্ষিত বিশ্বস্ত এবং অনুগত বন্ধু। তিনিই প্রধান মন্ত্রী হউন ইহাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চাহিবে ইহা খুব স্বাভাবিক। কাজেই মিঃ যোশিদারই পুনরায় প্রধান মন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী বলিয়া মনে হয়।

চেজু দ্বীপের বন্দীশিবিরে হাঙ্গামা—

সম্প্রতি চেজু দ্বীপের বন্দীশিবিরে যাহা ঘটিয়াছে তাহাকে কোজে বন্দীশিবিরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। গত ১লা অক্টোবর (১৯৫২) চীনে কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার তৃতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে চেজু দ্বীপের ৩এ ক্যাম্পে বন্দী ও রক্ষীদের মধ্যে হাঙ্গামার ফলে ৪৫ জন চীনা কম্যুনিষ্ট বন্দী নিহত হয় এবং আহত হয় ১২০ জন বন্দী। আহতদের মধ্যে পরে আরও দশ জনের মৃত্যু হওয়ায় মোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৫ জন। এই ঘটনার সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে চেজু দ্বীপের বন্দীশিবিরে আরও

একবার হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে এবং উহাতে ৪৯ জন চীনা বন্দী হত হয়।

কোরিয়া উপদ্বীপ হইতে ৭০ মাইল দক্ষিণে চেজু দ্বীপ অবস্থিত। দ্বীপের বন্দীশিবিরে অবস্থিত বন্দীরা চীনা জাতীয় দিবস প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। উহা নিষিদ্ধ করার ফলেই না কি এই হাঙ্গামা ঘটিয়াছে। বন্দীশিবিরের কমাণ্ডাণ্ট কর্ণেল কল্ডওয়েল এ কথাও বলিয়াছেন যে, বন্দীরা দ্বীপটি দখল করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিল। বন্দীশিবিরের এই সকল হাঙ্গামার আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নাৎসী কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পের কথাই শুধু ইহা স্মরণ করাইয়া দেয়। তবে এই ভাবে কম্যুনিষ্ট বন্দী হত্যা চলিতে থাকিলে এক সময়ে সমস্ত বন্দী নিঃশেষ হইয়া বন্দীবিনিময় সমস্যা সমাধানের নূতন পথ আবিষ্কৃত হইবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সপ্তম অধিবেশন—

১৪ই অক্টোবর (১৯৫২) নিউইয়র্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের যে অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে উহা সাধারণ পরিষদের সপ্তম অধিবেশন। এই অধিবেশনে যে সকল বিষয় আলোচিত হইবে তাহার তালিকা হইতেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দুর্ব্বলতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল বিষয়ের মধ্যে এমন গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয় আছে যেগুলি ইতিপুর্ব্বে একাধিকবার সাধারণ পরিষদে আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু কোন মীমাংসা হয় নাই। নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা এইগুলির মধ্যে অন্যতম। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের পুর্ব্ববর্ত্তী একাধিক অধিবেশনে এমন অনেক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে-গুলি কার্য্যকরী করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি এইগুলির মধ্যে অন্যতম। সাধারণ পরিষদের সপ্তম অধিবেশনে এই সকল বিষয় আবার আলোচিত হইবে। কিন্তু কোন ফল যে হইবে, সে সম্বন্ধে ভরসা করিবার কিছুই নাই। ইহার উপর কর্ম্মসূচীতে নূতন আর একটি বিষয় সংযুক্ত হইয়াছে মরোক্কো ও টিউনিশিয়ার সমস্যা। সর্ব্বোপরি রহিয়াছে কোরিয়া যুদ্ধের সমস্যা।

সাধারণ পরিষদের সপ্তম অধিবেশনে কোরিয়া, নিরস্ত্রীকরণ, প্যালেষ্টাইনের উদ্বাস্তু, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি, মরোক্কো ও টিউনিশিয়ার স্বাধীনতা-সমস্যা, যুদ্ধের আশঙ্কা, শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনেক বিষয়ই আলোচিত হইবে। রাশিয়ার আপত্তি সত্ত্বেও অষ্ট্রীয়ার শান্তি-চুক্তি-সমস্যা আলোচ্য বিষয়ের তালিকায় স্থান পাইয়াছে। চেকোশ্লোভাকিয়া একটি নূতন বিষয় প্রস্তাব করিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ, বিশেষ করিয়া রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, চীন এবং অন্যান্য জনগণের গণতান্ত্রিক দেশে ধ্বংসমূলক কার্য্যের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনা দান, এই আলোচ্য বিষয়।

জাতিসঙ্ঘ গঠিত হওয়ার সাত বৎসর পরে উহার যেরূপ দুর্ব্বলতা দেখা দিয়াছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সাত বৎসরে তাহা অপেক্ষা অধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রধান কাজগুলি সংখ্যায় খুব বেশী নয়। নয়া চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে স্থান দেওয়া হয় নাই। ফরমোসার গবর্ণমেণ্টকেই চীন গবর্ণমেণ্টের মর্য্যাদা দেওয়া হইতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা রক্ষার নামে অনেকগুলি আঞ্চলিক চুক্তি করিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বেনামীতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিয়াছে কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে। জাতিসঙ্ঘের মতই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশগুলি রক্ষার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এই সকল কারণেই। কম্যুনিজম নিরোধের নাম করিয়া যতদিন এশিয়া ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদীদের আধিপত্য রক্ষার ও নূতন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিবে ততদিন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বলাধান করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ নামে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হইলেও আসলে উহা কম্যুনিজম নিরোধের নামে সাম্রাজ্যবাদীদের আধিপত্য রক্ষা ও বিস্তারের শাণিত অস্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

আগামী সংখ্যা হইতে

সে-যুগের যান-বাহন

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

ইসারা সব... চুপ করতে বলে নরেন বাবু বললেন, 'না না ! মারবে কেন ওকে ? ও কি মামুলী গুণ্ডা ?' নরেন বাবুর এইটুকু আদরেই মতিরাম গলে পড়েছিল, খুশী হয়ে এগিয়ে এসে সে উত্তর করলে, 'কেয়া বোলে বাবু সাব ! আপ তো সমঝতে সব। হাম হুকুম মাফিক কাম কিয়া। লেকেন হুজুর, যো হো'গয়া হো'গয়া। ইস কামমে আউর মে নেহী রহেগী।' 'উ বাততো ঠিক হ্যায়', আশান্বিত হয়ে নরেন বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'হুকুম তুমকো কোন দিয়া থে ? বাতায় দেও ভাই, জলদী বাতাও।'

'মাফ কি'জিয়ে বড়বাবু', দৃঢ়স্বরে মতিরাম উত্তর করলো, 'বেইমানি হাম নেহি করেগা। হাম মামুলী বদমাস নেহি আছে।' নরেন বাবু বোধ হয় এরকম উত্তরই মতিরামের নিকট প্রত্যাশা করেছিলেন। তাই তিনি একটুও বিস্মিত হলেন না। কিছুক্ষণ ভেবে তিনি মতিরামকে বললেন, 'ঠিক হ্যায় ভাই, কুছ মাত বাতাও। লেকেন দোস্ত তো বান যাও। কুছ মিঠাই উঠাই মাঙায় ?'

নরেন বাবুর আদেশ পাওয়া মাত্র এক জন সিপাহী ছুটে গিয়ে একটা বড় ভাঁড়ে করে দশ-বারোটা বড়-বড় রসগোল্লা নিয়ে এলো, কয়েকটি ভালো সন্দেশও। ভাঁড় সমেত মিষ্টান্ন কয়টি মতিরামের হাতে তুলে দিয়ে নরেন বাবু অনুরোধ জানালেন, 'খা' লেও ভাই, জলদী খা লেও।' নরেন বাবুর এইরূপ ব্যবহারে উপস্থিত সহকারিগণ বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। আসামী মতিরামও নরেন বাবুর আতিথেয়তায় কম বিস্মিত হয়নি। সে ভাষাহীন চক্ষে কিছুক্ষণ রসগোল্লা ক'টির দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো, 'লেকেন আপকো মতলব ?' 'মতলব ? কুছ নেহি, এইসেন,' নরেন বাবু উত্তর করলেন, 'দোস্ত'কো কুছ খানে দিয়া, আউর কেয়া ?'

নরেন বাবু নানা কথায় ভুলিয়ে ভুলিয়ে মতিরামকে সব ক'টি মিষ্টিই গলাধঃকরণ করতে বাধ্য করলেন। কখনও মিষ্টি কথায় কখনও মৃদু ভর্ৎসনা দ্বারা শেষ রসগোল্লাটি তাকে গলাধঃকরণ করিয়ে নরেন বাবু নিশ্চিন্ত হয়ে মৃদু হাসলেন এবং তার পর দরজার সিপাহীকে উদ্দেশ করে হুকুম করলেন, 'এই, কোন হ্যায় উঁহা ? লে' আও এক গিলাস পানি।'

প্রণব বাবু এতক্ষণ অবাক হয়ে নরেন বাবুর কাণ্ডকারখানা উপভোগ করছিলেন। এইবার তিনি সাহস সঞ্চয় করে নরেন বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি স্যার ! আপনি কি রসগোল্লা খাইয়ে কনফেসন আদায় করবেন ?' এক জন সিপাহীকে মতিরামকে জল খাওয়ানোর অছিলায় পাশের ঘরে নিয়ে যেতে ব'লে নরেন বাবু উত্তর করলেন, 'তোমরা মনে করো পেটালেই সকলে সকল কথা বলে দেয় ; কিন্তু এই সত্য সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। প্রথমে তো মারধোর করা এক আইনবিরুদ্ধ ব্যাপার। তা ছাড়া এই ধরণের আসামীকে পিটিয়ে মেরে ফেললেও তাদের কাছ হতে একটি কথাও তোমরা বার করতে পারবে না। মতিরাম হচ্ছে এক জন স্বভাব-অপরাধী, মধ্যম গোছের অপরাধীও ও হতে পারে। এই ধরণের অপরাধীদের মধ্যে কষ্টবোধ থাকে কম। প্রহার এদের অভিভূত করে না বরং ওটা তাদের পক্ষে আরামদায়ক হয়ে থাকে এবং অপর দিকে অযথা তাদের অপমানিত ও ক্রুদ্ধ করে তোলে।' 'কিন্তু স্যার', প্রণব বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'শুধু মিষ্টি কথায় ওর কাছে কি কোনও কথা বার করা যাবে ?' 'না, তা যাবে না,' উত্তরে নরেন বাবু বললেন, 'একটা বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হবে। শোন তবে বুঝিয়ে বলি : আমি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ওকে গুরুভোজ করিয়েছি। এখন ওর মস্তিষ্কের রক্ত পাকস্থলীকে কার্য্যকরী করার জন্য নীচে নেমে আসবে এবং এর ফলে ওর মস্তিষ্কের শক্তি স্তিমিত হয়ে পড়বে। এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ওর মনের প্রতিরোধ-শক্তি বহুল পরিমাণে কমে যাবে। এইবার ওকে তোমরা আমাদের 'জিজ্ঞাসা-ঘরে' নিয়ে যাও। ঐ ঘরের নীল আলোটি একটু স্তিমিত করে ওকে নূতন এক পরিবেশে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। আমি জানি তোমরা ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত, কিন্তু এই সুযোগ তোমরা আর পাবে না। লৌহ তপ্ত থাকতে থাকতে তাতে ঘা দিতে হবে। আসামী এখন ভাবপ্রবণতার শেষ সীমায় এসে পড়েছে, আর সামান্য মাত্রও দেরী করলে তোমাদের সকল পরিশ্রম ব্যর্থতায় পরিণত হবে। এই ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে গভীর রাত্রি হচ্ছে প্রকৃষ্ট কাল। দিনের বেলা কেউ ভূত বিশ্বাস করে না, কিন্তু রাত্রিকালে অনেকেই করে। এর কারণ, রাত্রিকালে মানুষের স্নায়ু দুর্ব্বল থাকে। একটা টুলের জন্য বৃথা খোঁজাখুঁজি করে তোমরা ওকে ঐ ছেঁড়া আরাম-কেদারায় বসতে বলো, এমন ভাব দেখিয়ে যেন টুল না পাওয়ার কারণে অগত্যায় এই ব্যবস্থা করা হলো। আরাম-কেদারায় বসিয়ে বা শুইয়ে দিলে ওর স্নায়ু শিথিল হয়ে যাবে এবং সে ক্রমশঃই গুরু ভোজন এবং অন্যান্য কারণে অসহায় হয়ে উঠবে। এর পর রাত্রি বারোটার পর হতে তোমরা একে একে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তোমরা পালা করে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করে দিও। নিজেরা পালা করে ঘুমিয়ে নিও, কিন্তু ওকে একটুও ঘুমোতে দিও না। সারা রাত্রি ওকে তোমরা প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করে পাগল করে তুলবে, বুঝলে ? কিন্তু সরাসরি ওকে বর্ত্তমান অপরাধ সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করা প্রথমে উচিত হবে না। প্রথমে ওকে ওর বাড়ীঘর, পিতামাতা, প্রিয়জন এবং ওর বিগত দিনের জীবন সম্বন্ধে সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করো। এবং তার পর ওকে সাধারণ ভাবে জিজ্ঞেস করবে কি করে ও অপরাধী হলো, এবং কথাচ্ছলে ওর পূর্ব্বেকার কৃত কয়েকটি অপরাধ সম্বন্ধে এবং পরে সইয়ে সইয়ে ওর বর্ত্তমান অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। আচ্ছা ! এখন আমি কোয়ার্টারে ফিরে যাচ্ছি, তোমরা সকাল ছ'টা পর্য্যন্ত ...